আর আথা[illegible]লেন না। তৎপর দিন [illegible]গে তাহাকে লালচীনের গৃ[illegible]ল। তিনি গিয়া সসম্ভা[illegible]লেন,—আমি তোমার কন্যা [illegible] কথা বলিয়া বড়ই প্রীতি[illegible]মাকে তাহার সহিত আলাপ[illegible] হইলে বড়ই বাধিত হই। [illegible]নবাব তাহাকে ক্রীতদাস বলি[illegible] করিয়াছিল, তাহারই সহে[illegible]দয়াথী হইয়া উপস্থিত। প[illegible]পযুক্ত শিক্ষা দিবার শুভ[illegible]সে অবিলম্বে সামসুদ্দীনকে[illegible]ইয়া গিয়া তাঁহাকে আপ[illegible]রাইয়া দিল। আথা বুদ্ধি[illegible] সে সময়কার নারীগণের ম[illegible]সামসুদ্দীনের সহিত আল[illegible]দ্রতা, সৌজন্য, সদাশয়তা দে[illegible]থারও বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল[illegible]

সামসু[illegible]দীনের গৃহে আসিয়া আ[illegible]নেকক্ষণ যাপন করিতে লাগি[illegible] উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইল[illegible]

ওদিকে [illegible] গিয়াসুদ্দীন একদিন লাল[illegible]ইলেন। লাল-চীন সম্ভা[illegible]লেন,—"লালচীন তোমাকে এক[illegible]হইবে।"

লাল[illegible]কি সৌভাগ্য যে, রাজেশ্বর র[illegible]"

গিয়াসু[illegible] হাতে আছে।

লালচী[illegible] আছে, তা তো আপনার হা[illegible]

গিয়াসু[illegible] কন্যাকে চাই।

লালচী[illegible] নবাব ক্রীত-দাসের কন্যা[illegible]। আচ্ছা, আমার কন্যা তো ন[illegible] অনভিমতে কার্য হইতে পারে[illegible]জ্ঞাসা করি, সে এরূপ সম্বন্ধে[illegible]ক না।

গিয়াসু[illegible]দ্দীনকে বিবাহার্থ চাহিতেছি ন[illegible]রে রাখিবার জন্য চাহিতেছি।

ক্রোধে [illegible]র হইয়া উঠিল। সে ক্রীতদাস[illegible]ন-অপমানের জ্ঞান ছিল। সে [illegible]নে গোপন করিয়া দন্তদ্বারা [illegible]তে লাগিল এবং অনেক সংয[illegible] —"আমি ক্রীতদাস হইলেও এ[illegible] দাস না হইলে; নবাব এমন[illegible]ত সাহসী হইতেন না।" এই [illegible]লিয়া গেল। গিয়া-সুদ্দীন বলি[illegible] আস্পর্ধা, রাজেশ্বর রাজার অনু[illegible]ক্ষা, আচ্ছা দেখিব কন্যা কির[illegible]

সেই ম[illegible] লালচীনের মনে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধর্মজ্ঞান-বিহীন লোকদিগের চিত্ত যখন প্রতিহিংসাদ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন যে তাহারা কি করিতে না পারে বলা যায় না। লালচীন মনে মনে বলিতে লাগিল "সামসুদ্দীন তো আথার প্রেমে আবদ্ধ, সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। দেখি গিয়া-সুদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সামসুদ্দীনকে বসাইতে পারি কি না।" যেই চিন্তার উদয়, অমনি সংকল্পে আরোহণ, অমনি পরামর্শ স্থির, অমনি উপায় উদ্ভাবন। লালচীন স্বীয় কন্যার নিকটে গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল, গিয়াসুদ্দীন যাহা বুঝাইয়া পারে নাই, তাহা নিশ্চয় বলপ্রয়োগ করিবে। অতএব তোমাকে একটু চাতুরী অবলম্বন করিতে হইবে। গিয়াসুদ্দীন কোন লোকের দ্বারা এই প্রস্তাব তোমার নিকট পাঠাইলে তুমি মৌনী থাকিবে, যেন তুমি তাঁহার প্রতি উদাসীন। অবশিষ্ট আমি করিয়া লইব। এই বলিয়া কন্যাকে গড়িয়া লালচীন এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন গিয়াসুদ্দীনের প্রতি তাহার আর বিদ্বেষ নাই। গিয়াসুদ্দীন আবার আর একদিন ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, সে বলিল যে, কয়েক দিন বিলম্ব করিতে হইবে, একদিন আপনাকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া আপনার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিব। হতভাগ্য গিয়াসুদ্দীন তাহার পরামর্শ কিছুই না জানিয়া সোৎসুক অন্তরে ঐ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সেই দিন আসিয়া উপস্থিত। উক্ত দিবস লালচীন নবাব গিয়াসুদ্দীন ও তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক চব্বিশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাত্রে স্বীয় ভবনে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। যে দিন রাত্রে সকলে ভোজে আসিবে, সেই দিন লালচীন কৌশল করিয়া স্বীয় কন্যাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিল। তারপর গিয়াসুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যথাসময়ে নবাব সদলে উপস্থিত হইলেন। লালচীনকে সকলেই ক্রীত-দাস বলিয়া জানিত, তাহার এত সম্পদ ঐশ্বর্য আছে তাহা কেহই জানিত না। যাহা হউক নবাব সদলে পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। লালচীন প্রচুর পরিমাণে সুরসাল সুরা পান করিতে দিল। নবাব সুরা পানে মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তখন অবসর বুঝিয়া লালচীন তাঁহার কানে কানে বলিল, এখন এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বিদায় লউন। নবাব সহর্ষ অন্তরে মনে করিলেন, আথার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় উপস্থিত। এই আশা করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বিদায় করিলেন। তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তদনন্তর লালচীন নবাব গিয়াসুদ্দীনকে একটি স্বতন্ত্র নির্জন ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। সেখানে প্রবেশ করিবামাত্র দুইজন বলবান ভৃত্য আসিয়া নবাবকে ধরিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল। মহম্মদীয় আইন অনুসারে অন্ধ ব্যক্তি সিংহাসনে থাকিতে পারে না, সুতরাং গিয়াসুদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মানসেই লালচীন এই প্রকার আচরণ করিয়াছিল। নবাবকে অন্ধ করিয়া একটি গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া এক একজন করিয়া সেই চতুর্বিংশতিজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট সংবাদ [illegible] নবাব হঠাৎ পীড়িত হইয়াছেন উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তদনুসারে এক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেই লালচীনের গৃহে প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন, অমনি তাঁহাকে হত্যা করা হইল। এইরূপে উক্ত চতুর্বিংশতিজন সম্ভ্রান্ত পুরুষই হত হইলেন।

প্রাতঃকালে সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, লালচীন নবাবকে অন্ধ করিয়াছে ও তাঁহার স্বপক্ষীয় চতুর্বিংশতিজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, তখন রাজ্যমধ্যে একটা ভয় পড়িয়া গেল। অনেকে ভয়ে লালচীনের আনুগত্য স্বীকার করিল। লালচীন অবিলম্বে রাজ-মাতার সহিত একমত হইয়া তাঁহার প্রিয়পুত্র সামসুদ্দীনকে সিংহাসনে আরূঢ় করাইল।

এদিকে আথা যখন এই সকল হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার মনে স্বীয় পিতার প্রতি নিদারুণ ঘৃণা জন্মিল। তিনি যদিও এ বিষয়ে সামসুদ্দীনকে নিরপরাধ জানিতেন, তথাপি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সাম-সুদ্দীন ঐ রুধিরাক্ত সিংহাসনে আরূঢ় থাকিতে তিনি কোনও মতেই তাঁহাকে বিবাহ করিবেন না। কয়েক দিন পরে সামসুদ্দীন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহাকে সেই প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। সামসুদ্দীন বলিলেন, "আথা, আমার কি অপরাধ? আমি ত কিছুই জানিতাম না।" আথা উত্তর করিলেন, "তুমি হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানিতে না সত্য; কিন্তু তুমি যতদিন ঐ রুধিরাক্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছ, ততদিন তুমি ঐ পাপের অংশী. আমি তোমাকে কখনই বিবাহ করিতে পারি না।" সামসুদ্দীন ভগ্নমন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। লালচীন যখন দেখিল যে কন্যাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য সে এই দুষ্কার্যের আচরণ করিল, সেই বাঁকিয়া বসিল, তখন কন্যার প্রতি প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ, প্ররোচনা, পরে কটূক্তি ও প্রহার আরম্ভ করিল। আথা কিছুতেই স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। অবশেষে লালচীন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিগ্রহের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ওদিকে গিয়াসুদ্দীনের স্বপক্ষীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক, যাঁহারা হত্যাকাণ্ডের সময়ে সহরে উপস্থিত ছিলেন না, দলবদ্ধ হইয়া লালচীনের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা লালচীনের সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া সহরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আথা দেখিলেন, শত্রু হস্তে তাঁহার পিতা ও প্রণয়ীর নিধন নিশ্চিত, তখন তিনি একদিন রজনীযোগে দাসী সঙ্গে পিতার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া অবরোধকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

(ইহার পর ১৬ পৃষ্ঠায়)

উপদেশের মূল্য

এক গামলা জল নিন। সেই জলে একটি আঙুল ডোবান। এক মিনিট পরে আঙুল তুলে নিন। যে গর্ত হল তার দিকে চেয়ে দেখুন। জলের উপর আপনার আঙুলের এই ছাপটি বড়ই দামী, কারণ এতে বুঝতে পারবেন ছোটদের মনে আপনার মূল্যবান সব উপদেশও ঠিক ঐ রকম ছাপ আঁকে।

[illegible]ল

নবাব[illegible] যুবক স্ত্রীকে দীর্ঘ চি[illegible]রে নাম লিখতে গিয়ে [illegible]তোমারই হরিশ-চন্দ্র সর[illegible]

নিকষিত হেম

পরশুরাম

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, প্লেটনিক লভ কি-রকম জান? দুটি হৃদয়ের পরস্পর নিবিড় প্রীতি, তাতে স্থূল সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। চণ্ডীদাস যেমন বলেছেন—রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।

পিনাকীবাবু বয়সে বড়, সেজন্য আড্ডার সকলেই তাঁকে খাতির করে। কিন্তু উপেন দত্ত তার্কিক লোক, পিনাকীর সবজান্তা ভাব সইতে পারে না। বললে, আচ্ছা সর্বজ্ঞ মশায়, দুই বন্ধুর মধ্যে যদি নিবিড় প্রীতি থাকে তবে তাকে প্লেটনিক বলবেন?

পিনাকীবাবু বললেন, তা কেন বলব, সম্পর্কটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হওয়া চাই।

—ও, তাই বলুন। এই যেমন নাতি আর ঠাকুমা, নাতনী আর ঠাকুদ্দা, পিসী আর ভাইপো। এদের মধ্যে যদি গভীর ভালবাসা থাকে তাকে প্লেটনিক বলবেন তো?

—আঃ, তুমি কেবল বাজে তর্ক কর। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মনে কর একটি পুরুষ আর একটি নারী আছে, তাদের মধ্যে বৈধ বা অবৈধ মিলন হতে বিশেষ কোনও বাধা নেই। তবু তারা কেবল হৃদয়ের প্রীতিতেই তুষ্ট। এই হল প্লেটনিক প্রেম।

—আচ্ছা। ধরুন ত্রিশ বছরের সুপুরুষ গুরু, আর বিশ বছরের সুশ্রী শিষ্যা। এমন ক্ষেত্রে মামুলী প্রেম আকছার হয়ে থাকে। সুশ্রী স্ত্রী আছে। শিষ্যাও খুব কুৎসিত, তারও সুশ্রী স্বামী আছে। গুরু আর শিষ্যার মধ্যে মামুলী প্রেম হল না, কিন্তু ভক্তি আর স্নেহ খুব হল। একে প্লেটনিক বলবেন তো?

পিনাকী সর্বজ্ঞ রেগে গিয়ে বললেন, যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। বিষয়টি তলিয়ে বোঝবার ইচ্ছে নেই, শুধু জেঠামি।

মাথা চুলকে উপেন দত্ত বললে, আজ্ঞে না, আমি শুধু একটা ভাল ডেফিনিশন খুঁজছি।

ললিত সাণ্ডেল বললে, ওহে উপেন, আমি খুব সোজা করে বলছি শোন। প্লেটনিক প্রেম মানে আলগোছে প্রেম, যেমন শ্রীকান্ত-

রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক। আচ্ছা যতীশ-দা, তুমি তো একজন মস্ত সাহিত্যিক, খুব পড়াশুনোও করেছ। তুমিই বুঝিয়ে দাও না প্লেটনিক প্রেম

যতী[illegible]লে, সব জিনিস কি বোঝানো [illegible], তিনি তো বাক্য আর মনের [illegible] ধর্ম, সৌন্দর্য, রস, আর্ট—এ[illegible] বোঝানো যায় না। লাল রং, আমটে গন্ধ—এসবও অনির্বচনী[illegible] অসম্ভব, শুধু দৃষ্টান্ত দে[illegible] সেই রকম।

উপে[illegible], দৃষ্টান্ত দিয়েই প্লেটনিক [illegible] না।

পিনা[illegible], দৃষ্টান্ত তো [illegible]ড়েই রয়ে[illegible]।

যতীশ [illegible] চণ্ডীদাসের [illegible] উক্তি, সম্প[illegible] কেমন [illegible] তার কোনও স[illegible]। আচ্ছা, আমি বিষয়টা এক[illegible] চেষ্টা ক[illegible]—প্রেম বা ল[illegible], তার অর্থ অতি ব্যাপক আ[illegible] বলে থাকি—ঈশ্বরপ্রেম, দেশপ্রেম, পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রেম। [illegible] বেগুন টমাটো আলু, লংকা [illegible] শ্রেণীতে পড়ে, এদের ফুল-[illegible]ের মিল আছে, যদিও গুণ [illegible] ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম ভালবাসা [illegible]তের। তবে প্রেম বললে সাধার[illegible] আদিম আসঙ্গ প্রবৃত্তিই বো[illegible] যদি বেগুন-টমাটো হয়, [illegible] তবে প্রেমকে বলা যেতে পা[illegible] প্লেটনিক [illegible] বা

ছে, বুক একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে।
অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল।
নিরঞ্জনা যে রহস্য প্রকাশ করলে তা এই।—
পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। সন্দেহ
নেকদিন আগেই হয়েছিল, এখন সমস্ত লক্ষণ
স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডাক্তার কিলোস্কার তার
চিকিৎসা করছেন, হরেক রকম গ্ল্যান্ড
খাওয়াচ্ছেন আর হরমোন ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন।
তিনি বলেছেন, সম্পূর্ণ রূপান্তর হতে বড়
জোর আরও ছ মাস লাগবে।

প্রতিপত্তি, আমি জেদ্ করলে তোমাকে সেখানে একটা ভাল কাজ দিতে পারবেন। ততদিন তুমি বোম্বাই-এ আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

অখিল তার কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জনার কাছেই রইল। সর্বেশ্বরবাবু দয়ালু লোক, আপত্তি করলেন না। দ্রুপদ রাজার মেয়ে শিখণ্ডিনী যেমন পুরুষত্ব লাভ করে মহারথ শিখণ্ডী হয়েছিলেন, নিরঞ্জনাও তেমনি কয়েক মাস পরে পূর্ণ পুরুষ মিস্টার নিরঞ্জন

অখিল ত্রুদ্ধ হয়ে বললে, না নিরঞ্জনা, তুমি পুরুষ হয়ো না, তা হলে আমি মরব। বন্ধ করে দাও, বরং ডাক্তারকে বল এমন ব্যবস্থা করুন যাতে তোমার নারীত্ব রক্ষা পায়। নিরঞ্জনা বললে, তা হবার নেই। আমি পুরুষ হয়েই জন্মেছি, এতদিন লক্ষণগুলো চাপা ছিল, এখন ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। যদি চিকিৎসা বন্ধ করি তা হলেও আমার পরিবর্তন হতে থাকবে, শুধু বছর দেরি হবে। তার চাইতে চটপট পুরুষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

অখিল কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কি হবে নিরঞ্জনা? তুমি না হয় পুরুষই হয়ে গেলে, তোমার ডাক্তার কি আমাকে মেয়ে করে দিতে পারে না? তা হলেও তো আমাদের মিলন হতে পারবে।

নিরঞ্জনা বললে, পাগল হয়েছ? তুমি তো পুরোদস্তুর পুরুষ হয়েই জন্মেছ, তার আর নড়চড় হতে পারে না। এই বইখানা দিচ্ছি, এলিস সেক্স ফ্যাক্টস', পড়ে দেখো।

অখিল বললে, তুমি মেয়েই হও আর পুরুষই হও, তোমার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যে সম্পর্ক তার পরিবর্তন হতে পারে না। আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

নিরঞ্জনা বললে, মন খারাপ করো না। তুমি আর আমি যাতে এক সঙ্গে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। বাবা বলেছেন, আমার চিকিৎসা শেষ হলেই আমাকে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারির পোস্টে বসিয়ে [illegible] আমার খুব

তুলাপত্ররূপে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারি হল। সর্বেশ্বরবাবুর চেষ্টায় অখিল শীঘ্রও সেই ব্যাংকের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি হল। দুজনে এক সঙ্গেই বাস করতে লাগল।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, সেরেফ গাঁজা। তুমি কি বলতে চাও এরই নাম নিকষিত হেম?

যতীশ মিত্তির বললে, আজ্ঞে না, স্টেনলেস স্টীল বলতে পারেন। সোনার জলুস নেই, লোহার মরচে নেই, ইস্পাতের ধারও নেই।

উপেন দত্ত বললে, তারপর কি হল?

—তারপর সব ওলট-পালট হয়ে গেল। একদিন নিরঞ্জন বললে, ওহে অখিল, এ রকম একা একা ভাল লাগছে না, মা-বাবাও বিয়ের জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। আমি বলি শোন।— শেঠ মুলুকচাঁদের এক জোড়া যমজ মেয়ে আছে, দেখেছ তো? তাদের মা বাঙালী। খাসা মেয়ে দুটি। তুমি একটিকে আর আমি একটিকে বিয়ে করি এসো। শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি রাজী, মেয়ে দুটিরও আপত্তি নেই।

বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই দুই বোনের চুলোচুলি ঝগড়া বাধল, যেন তারা দুই সতিন। তার ফলে দুই বন্ধুরেই মনোমালিন্য হল। অখিল অন্য চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল, নিরঞ্জন ইন্দোরেই রইল। এখন আর দুজনের মুখদর্শন নেই।

উপেন দত্ত বললে, যাক্ বাঁচা গেল।

...ম ধর্ম ভয়

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

...হকারে স্বীয় পিতার ও ... জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা ...ন। বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষ- ...তে প্রীত হইয়া বলিলেন, ...বন রক্ষা হইবে, কিন্তু তোমার ...লিতে পারি না, সে বিষয়ে ...প ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই ...বরোধকারিগণ সহরে প্রবিষ্ট ...ন ও লালচীনকে বন্দী ... গিয়াসুদ্দীনকে আনিয়া তাঁহার ... লালচীনকে দণ্ডায়মান করিয়া ... ইহার জীবন-মৃত্যু আপনার ... হয় করুন। গিয়াসুদ্দীন ...ঘাতে লালচীনের শরীর ... ফেলিলেন।

...সাশ্রুনয়নে জেতা সেনাপতির পদ... হইয়া সামসুদ্দীনের ... করিলেন। সেনাপতি তাঁহার আগ্রহ... হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাহাকে ...দেওয়া গেল। সে দৌলতাবাদ নগরের ... পদ পাইল।" এই সংবাদ তাহার... যাও।

আ... প্রাপ্ত হইয়া সেই অন্ধকার... গিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিলেন মৃত্তিকাতে বসিয়া একমাত্র ক্ষুদ্র বা...কে নির্বিষ্টচিত্তে চাহিয়া গভীর চি...ছেন। এমন কি আথা যে সে গৃহে ...ছেন, তাহাও জানিতে পারেন নাই যখন গিয়া "সামসুদ্দীন" বলিয়া ও তখন সামসুদ্দীন সংজ্ঞাথবে চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখের দিকে দেখিলেন ও বলিলেন "একি মৃত্যুর ... একবার শেষ দেখা দেখিতে আ... আথা তাঁহার মুক্তি নিবরণ আনন্দে বর্ণনা করিলেন। সামসুদ্দীন আনন্দে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অনেক কাঁদিলে...র উভয়ে নূতন ... সন্নিধানে গমন, এবং ইহার কিছুদিন পরেই উভয়ে ...হইয়া দৌলতাবাদে গমন করিলেন।

৫ই অক্টোবর, ১৮৯৩।
(অপ্রকাশিত রচনা)

—হ্যাঁ, ভায়া এখ বিশ্বাস করছি বিজ্ঞাপনে কাজ হয়! কালই ওটা নেপালি দারোয়ানের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে আ কাল রাত্রেই চুরি!

রাজশেখরের ছেলেবেলা

শশিশেখর বসু

তিনটা হাতী পিলখানায় বাঁধা। খরকপুর এসটেটে, মুঙ্গের থেকে কুড়ি মাইল। একটা হাতীর পেটের নিচে খড়ের উপর আমি বসে আছি, আমার পাশে তিলকা চাকর, তার কোলে দু বছরের একটি ভীষণ আবদেরে খোকা কাঁদতে কাঁদতে বলচে, "হাম বাঘ দেখেগা আউর দুধ খায়েগা!" আমার বয়স আট বছর। খোকাটাকে ধমক দিয়ে বল্লাম, "তোম দুধ নেহি খায়েগা তো বাঘ নেহি আওয়েগা"। খোকা বাংলা বলতে পারে না! সে সময় যে কয়টি বাঙ্গালী সেই এসটেটে থাকতেন, বলতেন, "এ ছেলে কখনই বাংলা শিখবে না! বাপ-মার আদরের হিন্দী!"

পুনিয়া দাই দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে, চারটে সাঁওতাল তীর ধনুক নিয়ে। অনেক কষ্টে খাওয়া প্রথম কামড় দেবে সাঁওতাল বল্লে, এটা রয়েল টাইগার। তিলকা ছুটি দিলে, বাঘের চেয়েও বাবার বেশী ভয়। পাছে ধমক দেন, "তুম কাহে শোশীবাবু আউর বুত্রু ফটিককো লেকে আয়া কিয়া?"

এই রকম ধমক তিলকা একদিন খেলো, কিন্তু 'বুত্রু' উপাধিতে ফটিক ভয়ানক আবদার করে কেঁদে উঠল, "হাম বুত্রু নেই, বাবু হায়"। 'বুত্রু' সাঁওতালরা খোকাকে বলে। তখন কি আবদেরে ফটিক জানতো যে 'বাবু'কে লাথি মেরে 'শ্রী' আসবে।

দারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, "ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে না কি? কি শেখর হবে?" আমি বল্লাম, ইনার ডাইনেস যখন তাকে আশীর্বাদ করছেন, তখন আপনিই তার শিরোমণি—আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর। দারভাঙ্গার রাজা মহেন্দ্রপালের সভাকবি থেকে এ নাম দেওয়া হয় নি। কবি-শেখর মহাশয়ের সঙ্গে শশিশেখর মহাশয়ের একটু তফাৎ হচ্ছে!

মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের এঞ্জিন, বাঁশের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাটু, এক মুহূর্তের মধ্যেই রাজশেখর লোহার পওর ও হাতুড়ি নিয়ে ভেঙে দেখতো ভেতরে কি আছে, —কেন নাচে?—কেন ঘোরে?

আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং-এর নতুন এঞ্জিন আসতো মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন, 'দেখিস্ যেন ভাঙিস্ না!' অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল,—খেলনা ফেললো! তারপর মা বললেন, "এই নে যা খুসি কর!" তখন নিয়ে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর এঞ্জিনটার মুণ্ডপাত করতো।

রাজশেখর আরো বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াইটাকা দিয়ে এঞ্জিন কিনে এনেছে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিকে সব ডাকলো। সোঁ সোঁ হিস্ হিস্ করচে স্টিম, কিন্তু এঞ্জিন চলচে না। সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে,—চিৎকার করে বলল, "দাদা পালাও! পালাও!" সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াইটাকার বয়লার ফাটলো। সকলেই চিন্তিত,—কর্ডমেসের বয়লার ফাটে যদি?

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলষ্টপ্ দিতে শিখল। দুজন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো আর পায়জামা, চায়না কোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিত। এই তার হাতেখড়ি। কেবটে অটোমেটিক পেনসিল, হাতে লোহার কখনও বা কাঠের "মোটা"।

যখন দারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার থেকে "বেগম্" সিগারেট চুরি করে রাজশেখর যখন আর একটু বড় হল "ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান এতে ভারি মজা!" রাজশেখর একটু কেশে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপ হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। সন্তোষকুমার সেন পেশেণ্টকে অন্যমনস্ক জন্য বল্লেন, "সিগারেট খান একটা।" বল্লে, "খাই না।" "কখনও খান নি?" শেখর উত্তর দিল, "আমার দাদ

'মেজ ঠাকুরপো'র কবিতার সম্পাদিকা সরোজিনী

লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।" ও বল্লেন, "You ought to continued it!" এবং পেশে ডক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা রাজশেখর হাসে না, তাঁরা বেন রোগযন্ত্রণাতেও কি রকম মজা ঝোঁক আট বছর বয়সে মাছ মাং ত্যাগ করলো। লোকে বলল, রাজশে ধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে প দিত, মারতো না।

একটা কলমের খোঁচায় এলাহাবাদে মজা পেয়েছিল ছোটবেলায় দারভাঙ্গায় রা আমাকে "ছোটলোক" বল এলাহাবাদে গিয়ে যখ চিঠি লিখল, রাজশেখ

একবার পাঁচ্‌কলে মেবার বা উদয়পুরে শহরে মাস তিনেকের বাঁধতে হয়েছিল। ছোট্ট দে রূপকথার মতন শহর—এই শহরের স যেটি বড় রাস্তা সেই রাস্তার ওপ বাড়ীতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম। উদয়পুরের চৌরঙ্গী—কয়েক গজ মা হোলেও সেইটেই শহরের প্রধান পথ। এই একদিকে শহরে ঢোকবার সব থেকে বড় দ আর অপর প্রান্তে রাণার প্রাসাদের প্রধান তো —হাতীপোল দরজা। রাস্তার দু-দিকে বাড়ীগুলির একতলার পথের ধারের ঘরগুলি সব দোকান—নানা রকমের ব্যবসার সকালে ঐ রাস্তাতেই বাজার বসে—লো কোলাহল ও গাড়ীঘোড়ার আওয়াজে সম রাস্তাটি গমগম্ করতে থাকত। সন্ধে না হোতেই কে যেন শহরের অ কাঠির পরশ লাগিয়ে দিত—দি কোলাহল, ব্যস্ততা সব থেমে গিয়ে মধ্যেই সব হোয়ে পড়ত নিঝ্ঝুম—

রাত্রি দশটা বাজতে না বাজ ঢোকবার দরজা বন্ধ হোয়ে যায় শহরে ঢুকতে কিংবা বেরুতে হো অনুমতি নিতে হয়। সে অনুমতি পক্ষে সহজলভ্য নয়—রাত্রে শহরের ব

দুবার দেয়ালের ধারে পৌঁ পান পয়সারীর যের ধরলে মাহুতে ত দিত না। কোলে খোকা। নদীতে। মনে কুমীর আছে। দিলে, আবদার দুবছরের কান একটা মেরেচে।

শেখর উত্তর লিখে নাম সহি করল, 'ইতি শ্রী ছোটলোকের ভ্রাতা।" সরোজিনীর বান্ধবীরা তার কাছে এসে স্বামীর চিঠি দেখতে চাইতো না, বলতো, "তোর দেওর কি লিখেচে দেখা।"

"কথাসাহিত্যে" যাঁরা লিখেছেন, কনভার্ সেশনে রাজশেখর হাসে না প্রাণখুলে, তাঁদের বলি, আবার কি গায়ে-পড়া মেয়ের মতন পাবলিকের গায়ে বুড়ো বয়সে হেসে ঢোলে পড়বে?

আমি বুড়ো বয়সের কথা লিখছি না। রাজশেখর বামুনপাড়ায় ১৮৮০ সালে ১৬ই মার্চ জন্মেছিল। তার আতুড়ের নাম "পুবদুয়ারী ঘর"। এর বারান্দায় একটা সিন্দুক ছিল, সেইটার নাম ছিল "মিউটিনির সিন্দুক", —দানাপুরের জিনিষ থাকতো। জেলা বর্ধমান। এই গ্রামে অনেক বাঁদর, বনশুয়োর, সাপ ও ডাকাত ছিল। মোদো কোটাল রিটায়ার্ড ডাকাত আমাদের এই মামার বাড়িটা পাহারা দিত। বেশ লোকটি।

দারভাঙ্গায় পড়বার সময় রাজশেখরের বয়েস যেমন বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সায়েন্স বাড়তে লাগল। আমরা ভাই, ভগ্নী ও বাঙ্গালী ঝি রাই, চণ্ডী, গোবিন্দ বামনীকে নিয়ে থিয়েটার করতাম। রাজশেখর রামতারণের দোকান থেকে বাংলা ছ আনা দামের নাটক পছন্দ করে আনতো ও নিজে পার্ট না নিয়ে ডিরেকশন দিত। আমি কৈকেয়ী সাজতাম, রাই দশরথ সেজে আমার মান ভাঙ্গাতো। রাজশেখর ম্যাজিকও করতো, ঘড়ির ক্যাটলগ পড়তো, গিলটির গয়নার, কেতাবের ক্যাটলগ পড়তো। রামায়ণ মহাভারতও পড়ে ফেলেছিল। "উঠরে সোনার চাঁদ" আওড়াত, "মধুকলু" তার খুব ভাল লাগতো। কখনও "বিদ্যে ফলাতো" না। পেটের মধ্যে বিদ্যা পুঁজি করা থাকতো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তবে বলতো। "জানি—কিন্তু বলবো না!" এ তার-ই ইয়ারকি, নিজের স্বভাব দেখেই বোধ হয় শিখেচে। বন্দুক দিয়ে ডাবনারকোল গুলি করেছে, জীবনে কখনও জানোয়ার মারে নি।

আমার বিয়ে হবার পর রাজশেখরের আর একটি ইয়ার জুটলো, একসঙ্গে আড্ডা দিতাম আমি, ভগিনীরা, রাজশেখর ও আমার পত্নী, পাশের বাড়ির ছেলেরাও যোগ দিত। সায়েন্স পাশ করবার আগেই ল্যাবরেটরী হ'ল, দুটি আলমারি অ্যাসিড, ক্লোরেট অফ পটাস্, কোবাল্ট ক্লোরাইড ইত্যাদি। বোমা তৈরি করে ফাটাতো, কাগজের ব্যারোমিটার দেওয়ালে এঁটে বলতো বিষ্টি হবে কিনা। আমাদের কাশি হলে কফমিকশ্চার প্রেসক্রিপশন লিখতো, কবিরাজি কেতাব আমি এনে দিতাম তাই পড়তো। টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে শখ করে মড়াও চিরতো। আমাকে গীতার বুকনি ইংরেজীতে ট্রান্সলেট করে দিত, আমি সেগুলো টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল ও পাইওনিয়ারে নিজের বলে চালিয়ে দিতাম।

তার অরিজিন্যাল কমপোজিশনে ঝোঁক হতে লাগল, কিন্তু সে কভারওয়ালা ম্যাগাজিন ভিন্ন পড়তো না; ডেলি পেপারকে গ্রাহ্য করতো এখনও নয়। যতদূর মনে পড়ে "ইণ্ডিয়ান [illegible] কি একটা লিখেছিল কি অরিজিনাল লিখতো, দেখাত না। ফেলে দিত ছিঁড়ে। "Nature", "সখা ও সাথী" সবস্ক্রাইব করতো। আমি এলাহাবাদ যেতাম ও কর্ড মেলের গল্প করতাম। সেও চড়ে, কর্ড মেলের স্বাদ পেয়ে রেল রেল আগ্রহ দেখাল। কবিতায় কর্ড মেলকে বড় করল।

সে ছেলেবেলায় বলতো, "দাদা, যখন দুটো এনজিন আসানসোলে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বোধ হয় একটা আর একটার সঙ্গে লড়াই করবে। আমার রেলে চড়লে সব অসুখ সেরে যায়, খিদে বাড়ে।"

রাজশেখর একবার একটা সাহেবের সঙ্গে ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছে। সাহেবটা জিজ্ঞাসা করলো, এ ক্যানভাস ব্যাগ কোথাকার কেনা? রাজশেখর বলল, "আমার তৈরি"। "এ পেস্ট বোর্ডের বাক্স কোথায় কিনেছিলেন?" এও আমার তৈরি। ট্রাভেলিং আউটফিট নিজের হাতের তৈরি। কাঁচি দিয়ে টাইম টেবলের কান কাটা, আঙ্গুল দিলেই অমুক ট্রেন বেরবে। অনেক thumb hole.

রাজশেখর আমার অনুরোধ রাখে, আমিও তার অনুরোধ পালন করতে বাধ্য। তাই আমি এ প্রবন্ধ রাজশেখর বা কোন আত্মীয়কে দেখাইনি, পাছে টের পেয়ে রাজশেখর বারণ করে, "রাম! রাম! দাদা ছোট ভাইয়ের সুখ্যাতি লিখ না, লোকে তোমাকে আমাকে কি বলবে!" আরে বাপু আমি তো তোর নিন্দেও লিখেছি। আর আমাকে কেউ নিন্দা করলে আমার গায়ে কখনোই লাগে না। আমার কানে তুলো, পিঠে কুলো। ছেলেবেলার স্মৃতি সকলেই বের করে। তোমার বাল্যজীবনের সুখ্যাতিকে এত সঙ্কোচ কেন? বুড়ো বয়সের প্রশংসা কি করে সহ্য হচ্ছে? চন্দ্রশেখর তো নিজের জীবনী পঞ্চাশ বছর পূর্বে নিজে লিখে গেছেন, "বঙ্গভাষার লেখক" (বঙ্গবাসী প্রেস)। চুপি চুপি দু' চার জন বলেছেন, "বড়দা লিখবেন না—আপনি ছাড়া রাজশেখরের বাল্যকাল কেউ দেখে নি। আমরা জানতে উৎসুক।"

চলো এখন শ্বশুরবাড়ি—পেরাগ, কর্ড মেলে, বয়লার ফাটে ফাটুক। সেখান থেকে রাজশেখর ও অন্যান্য ভাই বোনদের কর্ড মেলের টিউন লিখে চিঠি দেব দারভাঙ্গায়। আমার উর্দুটা পালিশ করে নেব।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখি অতবড় খোট্টা সহরে বাংলা বিদ্যার চমকপ্রদ অস্তিত্ব! বালক রাজশেখরের কবিত্বের ইঙ্গিত। ঘুমিয়ে পড়লাম,—বৌটা থিয়েটার দেখতে গেল।

হঠাৎ পুজোর থিয়েটার দেখে এসে তের বছরের সরোজিনী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটা হাত নেড়ে অ্যাক্ট করতে লাগল:—

"বিকশিত হেরি ফুল্ল বন,—কাননেতে
ধায় সমীরণ; কোমল পল্লব
কোলে হায় মুকুল বদন লুকোয়
ভাবে বায়ু "ফুটে নাই ফুল!"
ফিরে যায় হইয়া আকুল। কুসুমেরও
স্বার্থের ভাবনা!"

বল্লাম "বাদসাহী মন্দির সেই গাইয়ে ছোঁড়াটা বুঝি কবিতা তৈরি করেচে?" সরোজিনী বলল, "তার বাপের সাদ্দি এরকম কবিতা লেখে?" জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কে তবে তো পারে একদিন শত সহস্র লোকের মুখে; আমি বলে কি করবো?"

কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল, এলাহাবাদের তের বছরের ছাতুখেকো দেশের মেয়ে বাঙ্গলা দেশের "রাজশেখর" আবিষ্কার করেছিল যাট বছর পূর্বে। শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত পিতা চন্দ্রশেখর, বিদুষী মাতা লক্ষ্মীমণি, দাদা, মাষ্টারের দল, ক্লাস ফ্রেণ্ডস কেউ বালক রাজশেখরের কবিতা চুরি করে পড়েনি বা তা থেকে ভবিষ্যৎ আবিষ্কার কিছু করেন নি। ছেলে ভাল পড়াচে, ফার্স্ট হচ্চে, মাইনর পাস করে স্কলারশিপ পেয়েছে, এনট্রান্স পাস করে মেডেল ও স্কলারশিপ পেয়েছে এই যথেষ্ট আনন্দ, এত লিটেরারী মেরিট কে আশা করে? —দারভাঙ্গার মতন স্থানে।

দেবর রাজশেখর ১৪, "ভউজায়ী" সরোজিনী ১৩। রাজশেখর লেখাপড়া করে, টেবিলে বসে কাগজ মুড়ে মুড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কাউকে শোনায়ও না কবিতাটা কেমন উতরাল। উঠে রেলের লাইনে বেড়াতে যায়।

ঘোমটা দেওয়া সরোজিনী চুপি চুপি আসে, মোড়াসোড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পেট কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলে,—আরো খোঁজে, "খেপা খুঁজে খুঁজে দেখে পরশপাথর!" চারিদিকে চট্ করে দেখে নেয় শাশুড়ি ননদ গুরুজন বা কৌতুকপ্রিয় স্বামী দেখচে কি না, —বেচারি ভয়েই অস্থির পাছে কেউ বলে, ধরে ফেলে, "বউ পদ্য পড়ছে,—ছি!" তাতে আবার দেওরের পদ্য! যদি উল্লোর বুড়ি মাগিটা দেখে ফেলে তো বলবে "অ-কম্মে লৌটে দড়ো!"

নিজের ঘরে গিয়ে গভীর রাতে আমি ঘুমালে সরোজিনী ল্যাম্প জেলে ভুমো ভুমো কাগজগুলা মাটিতে খুলে হাত দিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলতো। কবিতা মুখস্থ করতো, তারপর প্যাক করে তোরঙ্গে পুরতো। তোরঙ্গের উপর লেবেল আঁটা হয়েচে "এলাহাবাদ, এনডবলুপি ভায়া মোকামাঘাট"। বাপের বাড়ি গিয়ে সেগুলো কপি হবে,—এমন মোটাসোটা বাঁধান দু'খানা খাতা।

আমি এই তের বছরের কবিতা আওড়ান বালিকাটিকে বেশীদিন দেখতে না পেলেই এলাহাবাদ ছুটতাম,—মোকামায় কর্ড মেল ধরতাম। এই কর্ড মেলের উপর রাজশেখরের ভীষণ ঝোঁক বাড়তে লাগল। এলাহাবাদে পেঁছে বল্লাম, ও বাড়ির মেয়েরা নূতন কবিতা তোমাকে আর শিখিয়েচে? সরোজিনী আওড়াল

"বাস বিতরণ কুসুমের ব্রত
সে ব্রত পালিয়া মরিয়া যায়
কাঁদে কি কুসুম মানবের মত
বিপরীত রীতি দেখি ধরায়।"

কে তখন জানে যে বাটপাড়িয়া জগৎগুরু এই সরোজিনীর খাতায় দানা বেঁধে উঠেচে।

কবিতা লেখক যখন নিজেই নারাজ, তখন সরোজিনীর কথামত তার মৃত্যুর পর মহাদেব, গানের খাতা ও দু'খানা মোটা খাতা "মেজঠাকুরপোর কবিতা" পাটনার গঙ্গাজলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বালকের সাহিত্য ধ্বংস করায় আমার পাপ হল কি? তাতে আবার সে বালক সহোদর, ছোট বয়সে। না কি স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করে পুণ্য হ'ল? আমি বড় ভাই না হয়ে যদি সাহিত্য ইতিহাসের পণ্ডিত

[illegible] পৃষ্ঠায়।

এই পরিকল্পনায় চাষীদের উন্নত ধরণের ধান্য, গম ও ডালের বীজ সরবরাহ, বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা, নির্দোষ আলুর বীজ বিতরণ এবং পশুখাদ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মোট ৯৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার

উৎপাদন বাড়ে এইরূপ বীজ সরবরাহ দ্বারা ফসলের উৎকর্ষতা অনেকখানি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু কেবল উহাতেই হইবে না। চাষীদের যে পন্থা অনুসরণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে তাহার প্রকৃত ফলাফল কিরূপ তাহা তাঁহাদের দেখাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য কতকগুলি প্রদর্শনী-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাবদ ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। সেই সঙ্গে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক ও অন্যান্য সারের ব্যবহারের উপযোগিতাও তাঁহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জন্য রাজ্যের মফঃস্বল অঞ্চলে উভয় রকমের সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চাষীরা যাহাতে সুপারফসফেট, হাড়চূর্ণ এবং খোল পান তাহার ব্যবস্থা হইবে। মিশ্র সার ও সহরের আবর্জনা হইতে তৈয়ারী কম্পোষ্ট সারও তাঁহাদের মধ্যে বিতরণের পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের পয়ঃপ্রণালীসমূহের পাঁক ও ময়লা জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সার রহিয়াছে। এই সার নষ্ট না করিয়া উহা কাজে লাগানোর জন্য পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইয়াছে। আর দুইটি ভাল পরিকল্পনা হইতেছে কচুরীপানা হইতে কম্পোষ্ট সার তৈয়ারী এবং সবুজী সারের ব্যবস্থা করা। রাসায়নিক ও অন্যান্য ধরণের সার চাষীদের মধ্যে বণ্টনের এই যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে মোট ৬২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

কৃষিকার্যে অন্যান্য প্রকার সহায়তা

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাহায্যাদির সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের অন্যান্য বিষয়েও সহায়তা ও উৎসাহ দেওয়া দরকার। অনেক সময় ফসল কাটার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে বন্যজন্তুতে আসিয়া উহা নষ্ট করিয়া দিয়া যায়। এই ক্ষতি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। চাষের সাজসরঞ্জামও তাঁহাদের কাছাকাছি থাকা দরকার। স্বল্পমেয়াদী ঋণ না হইলেও তাঁহাদের চলিবে না। উৎপাদনক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির জন্য ধান, গম ও আলুর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা দরকার হইতে পারে। ভাল ফসলের জন্য যাহাতে তাঁহারা ভাল দাম পান, তজ্জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগও একান্ত প্রয়োজন। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইতেছে ফসল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ, কারণ, উহাকে ভিত্তি করিয়াই কৃষি-পরিকল্পনা গড়িয়া ওঠে। আর কৃষিপ্রণালী শিক্ষাদানও একটা জরুরী কাজ। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উহার কোনটাই বাদ যায় নাই এবং প্রত্যেক বিষয়ের যথাযথ উপযোগিতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

জমি ফেলিয়া রাখিবেন না

আমাদের রাজ্যে মানুষের তুলনায় জমি অত্যন্ত কম। কিন্তু এরাজ্যে এরূপ প্রচুর পরিমাণ জমি রহিয়াছে যাহাতে চাষ হয় না। সাধারণতঃ আমরা উহাকে পতিত জমি আখ্যা দিয়া থাকি। এই সকল জমিতে ট্রাক্টর বা যন্ত্র-লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষি প্রবর্তন সম্ভব এবং পরিকল্পনায় এই বাবদ ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে জল সংগ্রহ। অনুমানিক ৭৫ বৎসর আগে একজন ইংরাজ ভারতবর্ষে কৃষি-কার্যকে বৃষ্টি লইয়া জুয়াখেলার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়ার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাই ছিল তাঁহার আসল বক্তব্য। এই রাজ্যে ১৫,০৪,২০০ একর জমিতে, অর্থাৎ মোট কৃষিজমির মাত্র ১১·৪ শতাংশ জমিতে বৎসরে একবারের বেশী চাষ হয়। উহার একমাত্র অর্থ এই যে, আমাদের রাজ্যের কৃষিজমিকে পুরাপুরিভাবে কাজে লাগানো হয় না বা উহা সম্ভব হয় না এবং উহার আসল কারণ হইতেছে জলের অভাব। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির এই মৌলিক অসুবিধার প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়া ছোট বড় কতকগুলি সেচ পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বাবদ মোট ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে সর্বার্থ-সাধক ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা বাবদই ব্যয় হইবে ১২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। আর একটি সর্বার্থ-সাধক পরিকল্পনা হইতেছে দামোদর নদ উপত্যকার উন্নয়ন। ইহা হইতেও পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ হইবে। ইহার ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। দামোদর

(ইহার পর ২৩৭ পৃষ্ঠায়)

কাজের ফাঁকে — হরেন দাস

কীর্তনীয়া

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কপিলদেওপ্রসাদ এসে বললে তাদের গ্রামে গিয়ে কীর্তন গেয়ে আসতে হবে।

স্কুল-যুগের কথা। এক একটা পরীক্ষার ঝোঁক কেটে গিয়ে মনটা হালকা হয়ে গেলে এক একটা হুজুগ উঠত। সেকেণ্ড ক্লাসে হয়েছিল সেবা-সংঘ, অর্থাৎ রোগীর সেবা এবং দাহ। বেশ কাজ করেছিল সবাই—শম্ভু, নগেন, বিশে, অনিল, যজ্ঞেশ্বর, মদন আরও সব। সবাই এক ক্লাসের নয়, তবে কাছাকাছি। সেকেণ্ড ক্লাসের ব্যাচটাই প্রবল, থার্ড ক্লাসের দুজন আছে, ওদিকে যুগোল গিয়ে ম্যাট্রিকে অপেক্ষা করছে। সেবা-সংঘ বেশ নাম কিনেছিল সহরে। গোটা দশেক কেস হাতে নিয়েছিল, সেবার গুণে দশটাকেই বাঁচিয়ে তুলেছিল। সংঘটা যে টেঁকালে না, সে অনেক দুঃখে, তার জন্যেও বেচারিদের ষোল আনা দোষ দেওয়াও যায় না। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর যে টানা সময় পাওয়া গেল তাতে আর ওদিকে না গিয়ে এক কীর্তন পার্টি খাড়া করেছে সব।

একটা বছর যে গেল ততদিনে অন্য দিক দিয়েও একটু একটু উন্নতি হয়েছে সবার। নগেন ক্ল্যারিয়নেটে ফুঁ দিতে শিখেছে, শম্ভু বেহালার ছড় টানে, অনিল হারমোনিয়ামে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বিশের বাবা ছিলেন গান বাজনায় চৌকস লোক; বিশে একরাশ যন্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে থৈ পাচ্ছিল না। ঠিক করলে কীর্তন পার্টি হ'লে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শুধু খোল নিয়ে পড়বে। গান করবে বলাই; মূল গায়েন। যজ্ঞেশ্বরের ঝোঁক ছিল এ্যাকটিঙের দিকে, থিয়েটার পার্টি হ'লেই খুশি হোত, কিন্তু স্কুলের ছেলের পক্ষে তখন ওটা দুঃসাহস। সবাই বুঝিয়ে দিলে—হবে; একেবারেই তো ম্যাট্রিকে এসে পড়েনি—থার্ড, সেকেণ্ড, ম্যাট্রিক; তেমনি কীর্তন, তারপরে থিয়েটার। মদন ছিল কানে খাটো; গায়ে তেমনি অসুরের শক্তি, সে খঞ্জাল নিলে।

সত্যেন বাইরের ছেলে, বোর্ডিঙের অভাবে একটা বাসা ভাড়া ক'রে পড়াশোনা করছিল **সহরের একটু একটেরেয়া। ওটা ছিলই আড্ডা** সবার; কীর্তন পার্টিও ঐখানেই কায়েম হোল। কাছাকাছি খানতিনেক ভাড়াটে বাড়িই ছিল আরও, খালি হয়ে গেল।

বেহারী ছেলেদের মধ্যে কপিলদেওই বেশি মেলামেশা করত। একটু রগচটা; তাহলেও ছেলেটার মনটা ছিল বড় ভালো; এদের কিসে ভালো হয় সর্বদাই সেই প্ল্যান নিয়ে থাকত। এসে বললে—"তোদের একটু বাইরে বেরুনো দরকার, নইলে নাম হবে না। আমি একটা ব্যবস্থা করেছি।"

বলাই জিগ্যেস করলে—"ব্যাপারখানা কি, পুজো? তোদের মহাবীর কি কিষুণজীর পুজো হলে আবার মাছ-মাংস বারণ, তাই জিগ্যেস করছি।"

"না, বিয়ে।"

"কার?"

কপিলদেও একটু চটে উঠল। বললে—"যাবার ইচ্ছে থাকে তো চল, না হয় ছেড়ে দে।……তোদের গাওয়া নিয়ে বিষয়, বাইরে গেলে একটু নাম বেরিয়ে যাবে ফাঁকতালে, তাই বলেছি। কেন, আমার বোনের বিয়ে হলে যাবি, ভাইয়ের হ'লে যাবি না এমন কোন কথা আছে?"

যজ্ঞেশ্বর ছিল না। এসে পৌঁছুল। ওর বাংলা দেশে একটু যাওয়া আসা আছে, শুনে বললে—"বিয়েতে কেত্তন, এই প্রথম শুনলুম; চুপ, কেত্তন ওসব শ্রাদ্ধর জিনিস। খোল নিয়ে ঢুকলে সেই খোল মাথায় ভাঙবে।"

কপিলদেও বললে—"আমাদের এখানে ওসব বাদবিচার নেই। কেন, কেত্তন তো আর কালীমাঈর গান নয়।……তোদের বাংলা দেশে সবই উল্ট, শ্রাদ্ধয় কেত্তন, বিয়ের সময় কিসের ব্যবস্থা তোদের, চণ্ডীপাঠ?"

অনিল একটু মাততেই চায় হুজুগে, বললে—"ভোট নে বরং। আমি 'ফর'-এ।"

যজ্ঞেশ্বর বললে—"ভোট নিয়ে তো শ্রাদ্ধকে বিয়ে ক'রে দেওয়া চলে না।"

কপিলদেও বললে—"তাহলে দেখছি তোরা না বলিয়ে ছাড়লি নি আমায়। বিয়ে করছে 'ঠাকুরদা', **সত্তর পেরিয়ে গেছে,** এইটে পাঁচ নম্বর। বেশ তো, যার মনে খুঁৎখুঁতুনি থা… বিয়ে না মনে করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এটা … বিয়ের বয়স নয়, টেকবেও না বেশি দিন।"

যজ্ঞেশ্বর বললে—"সত্তর বছরে বিয়ে; … তো হাড়কাঠে ফেলে বলি দিচ্ছে মেয়েটা… বয়েস কত তার?"

কপিলদেও বললে—"এই তো হয়ে… মেয়েটা বলি পড়ছে তো তোরা তার দি… থাক্। গানের পার্টি করেছিস, কোথায় এ… আমোদ-আহ্লাদ করবি, না, মড়া খুঁ… বেড়াচ্ছিস অগ্রদানী বামুনদের মতন—তা… তো পেয়ে গেলি, চল এবার।"

যজ্ঞেশ্বর বললে—"এ ধরণের বিয়ে… উৎসাহ দেওয়াই উচিত নয় আমার মতে।"

কপিলদেও আবার চটে উঠল, ঠোঁট উল… বললে—"তোরা কেত্তন গেয়ে উৎসাহ দিবি ত… বুড়ো বিয়ে করবে, নেঃ! আর চারুটের বে… কোন্ উৎসাহ দিতে গেছলি? …কাজ … গিয়ে বাপু, তোরা বরং খোঁজ নিগে কার কোথ… নাভিশ্বাস উঠছে। তোদের গাঁয়ে ঢুক… দেওয়াই উচিত নয়……অপয়ার দল।"

সবারই ইচ্ছে যাওয়ার, বিয়ে বলে বরং বে… কারেই ইচ্ছে, কিন্তু এদিকে রাগারাগি হয়ে ব… সব ভেস্তে যায়। বলাই হারমোনিয়ামটা নি… টেপাটেপি করছিল, বললে—"তোর মনে য… একটা খুঁৎখুঁতুনি থাকেই ভাগ্য, তো তার উপ… যে নেই তা নয়। সব তো আম… হাতেই,—কি গান গাই, কি না গাই।—আ… মাথুর পর্যন্ত তুলেই ছেড়ে দেবখ… বরং চৈতন্যদাসের সেই গানটা ধরব… বিরহে রাধা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে —মারা গেছেন মনে করে সখীরা বুক চাপড়াচ্ছে তারপর সেই গানটা—দূতী চলল মথুরায়ে… মিলনটা আর ঘটাব না।"

(দুই)

রেলে যেতে হবে। সহর থেকে দুটো ষ্টেশ… তারপর দুমাইল এক্কা। সবাই যেতে পারলে না… বাইরের ব্যাপার, একটা রাত কাটাতে হ… অনেকের গার্জেনের কড়াকড়ি আছে। দেবু জ… জয়েক হোল, কপিলদেওকে নিয়ে সাতজন।

সন্ধ্যার একটু আগে গাড়ি। কাছাকাছি ষ্টেশ… পৌঁছাতে তিন কোয়ার্টার লাগবে, ওদিকে এক্কা… আরও তিন কোয়ার্টার। ঘণ্টা দেড়েকের ম… সব বাড়িতে ফিরে উঠবে। জ্যোৎস্না রাত্রি, সেদি…

(ইহার পর ২৪৭ পৃষ্ঠায়)

এই প্রবন্ধের লেখক ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৪৬ ফুট) হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ২২০১০ ফুট উচ্চ অনারোহিতপূর্ব পর্বতশৃঙ্গ পানডিম অভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। লেখক এই অভিযানের নেতৃত্ব করিতেছেন এবং তেনজিং নোরকে ইহার ব্যবস্থাপনা করিতেছেন। লেখক ভূতত্ত্ববিদরূপে ১৯৫১ সনে শিপটনের সঙ্গে মাউণ্ট এভারেস্ট পথসন্ধান অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন। বর্তমান অভিযানে মোট আটজন যাইতেছেন, তাহার মধ্যে সাতজন বাঙালী।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিমালয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে এটি মুনিঋষিদের বাসস্থান। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য হিমালয় কেবলমাত্র ধর্মতীর্থের প্রতীক। প্রাচীনকালে এই তীর্থভ্রমণ বহু ব্যয়সাপেক্ষ ছিল এবং অতিমাত্রায় ধনী ব্যক্তিরাই এই উপলক্ষে তুষারতীর্থ অমরনাথ, কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী পর্যন্ত ভ্রমণ করতেন। তখনকার দিনে পথে যাত্রীদের বাসস্থানের কোনো সুখসুবিধা তো ছিলই না বরঞ্চ আহার্য পানীয়ের যথেষ্ট অভাব। এছাড়া দস্যুভয় ও মহামারী।

তখনকার ইংরাজ সরকার প্রতিবেশী তিব্বতকে নিতান্ত বন্ধুভাবে দেখতেন না। আবার সে কারণে নিজেরাও অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সারা হিমালয়ের বহুস্থানে রাস্তাঘাট ও নক্সা তৈরীর কাজ আরম্ভ করে দেন।

ইংরাজ শীতপ্রধান দেশের লোক, তাই হিমালয়ের বহু গ্রাম ইজারা নিয়ে বা যুদ্ধে জয় করে দার্জিলিং, সিমলা ইত্যাদি বহু সহর গড়ে তুললেন। নক্সা তৈরী উপলক্ষে ভারতীয় জরীপ বিভাগে কাজের সাড়া পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতেও অনুরূপ নক্সা তৈরীর কাজে বহু ভারতীয়কে গোপনে পাঠান হলো। এজন্য অনেককে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।

নক্সা তৈরীর প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই এক বাঙ্গালীর কথা ওঠে। ইনি শ্রীরাধানাথ সিকদার —জরীপ বিভাগের অঙ্ক বিদ্যায় পারদর্শী প্রধান সাংখ্যক (Chief computer)। শুনে আশ্চর্য লাগতে পারে ইনি কোনোদিনই হিমালয়ে যাননি। হিমালয়ের পাদদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জরীপদারেরা দূরবীণের সাহায্যে যে সব ত্রিকোণমিতিক তথ্য পাঠিয়েছিলেন সেইগুলি নিয়ে গবেষণা করে তিনি এভারেষ্টের উচ্চতা আবিষ্কার করেন। ইনি একদিন বড় সাহেবের কামরায় প্রবেশ করে স্থানকালপাত্র ভুলে উত্তেজনার সঙ্গে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "স্যার আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় আবিষ্কার করেছি"! রাধানাথবাবুর আবিষ্কারে গঙ্গাপ্রসাদ ও কালীমোহন ঘোষ তাঁকে সহায়তা করেন।

এভারেষ্টের উচ্চতা আবিষ্কারের পূর্বে সাধারণ লোকের ধারণা ছিলো গৌরীশঙ্কর (২৩৪৪০ ফিট) শৃঙ্গটি নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। কেননা এই পর্বতটি নেপালের কাঠমণ্ডু সহর ও অন্যান্য সহজগম্য স্থান থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কাছাকাছি বা সামনে আর কোন হিমপর্বত না থাকার জন্য একে আপাতদৃষ্টিতে তুলনায় অসাধারণ উঁচু মনে হয়। এই ভুলের জন্য প্রধানতঃ দায়ী এ জেরমান শ্লাগিণ্টভিট (Schlagintweit)

দক্ষিণে গৌরীশঙ্কর চূড়া (২৩,৪৪০ ফুট) ১৯৫১ সনের মাউণ্ট এভারেষ্ট পথসন্ধানী অভিযানের সময় নেপালের উত্তরপূর্ব প্রদেশ হইতে গৃহীত ফোটো।

নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক। এই অঞ্চলে জরীপ করার প্রসঙ্গে এক প্রাচীন চীন সম্রাটের কথা এসে পড়ে। ইনিই সর্বপ্রথম এক রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রীর শিক্ষকতায় দুটি তিব্বতী লামাকে জরীপবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। পাঁচ বৎসর তিব্বত ভ্রমণ করে পিপিংএ ফিরে পাদ্রী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এঁরা যে নক্সাটি খাড়া করেন তার দক্ষিণে, অরুণ ও সুনকোশী নদীর মধ্যে, এক ৪০ মাইল লম্বা পাহাড় দেখান ছিলো। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নক্সাকার (Cartographer) ডানভিলে এই অঞ্চলের উপরোক্ত লামাদের নক্সা নিজের তৈরী পৃথিবীর মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট করেন। এই ৪০ মাইল লম্বা পাহাড়ের নাম দেখানো হয় চুমু লাংমা (Tchoumou Lancma)।

ভারতীয় তথা তিব্বতীয় নাম উচ্চারণে ইংরাজেরা বিশেষ পটু নন, তাই এই নামের বানানে বিশেষ তারতম্য পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালে এভারেষ্ট অঞ্চলে ভ্রমণের সময় জানতে পারি যে, এর আসল নাম "চোমো লোংমো", তিব্বতী ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় "দক্ষিণের পক্ষীরাজ্য"।

এই প্রসঙ্গে আর এক বাঙ্গালী আবিষ্কারকের নাম স্বতঃই এসে পড়ে। ইনি তিব্বতীভাষাবিদ ও জরীপবিদ্যায় পারদর্শী শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। আবার পর্বত অভিযাত্রীদের মধ্যে ইনিই সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। জরীপ বিভাগের তরফ থেকে অতি সামান্য বেতনে সময় সময় এমন কী অনাহারে থেকেও কী করে নেপাল ও তিব্বত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

প্রথমে এভারেষ্টের উচ্চতা বার করা হয় ২৯০০২ ফিট। তখন দূরবীণ সাহায্যে বায়ুস্তরের আলোক বিকিরণ কোণ (Atmospheric refraction) ধরা হয়েছিল ০.০৭ থেকে ০.০৮। পরে ১৯০৫ সালে আবার পাহাড় অঞ্চল থেকে যে বিকিরণ কোণ বার করা হয় তাতে এই পরিমাপ দাঁড়ায় ০.০৫। ফলে নতুন অংক করে এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯১৪১ ফিট প্রমাণিত হয়। তবু যতদিন না বায়ু চাপ যন্ত্রের সাহায্যে চূড়ায় উঠে সঠিক উচ্চতা না বার করা যায় ততদিন ভারতীয় জরীপ বিভাগ পুরোনো ২৯০০২ ফিটকেই মেনে নেবেন। এভারেষ্টের সঙ্গে হিমালয়ের অন্যান্য পাহাড়ের উচ্চতা তুলনামূলকভাবে দেখানো গেল।

পর্বত আরোহণ পর্যায় শ্রীশরৎচন্দ্র দাস ছাড়া আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা দরকার। সরকারী জরীপ কার্যে এখন বহু গাড়োয়াল ও কুমায়ুনবাসী নক্সা তৈরী করতে সাহায্য করে থাকেন।

এঁদের কষ্টসহিষ্ণুতার জনাই হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলের নক্সা তৈরী আজ সম্ভব হয়েছে। ইংরাজ আমলে এঁদের বেতন ছিল অতি অল্প, অথচ কাজের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হত না। এমনকি এঁদের উচ্চশিক্ষা ও পদোন্নতির কোনই সম্ভাবনা ছিল না। একথা হয়ত বহুলোকেরই জানা নেই যে, এমনি এক অজ্ঞাতনামা ভারতবাসীর পক্ষে তখনকার দিনে সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার কৃতিত্বলাভ ঘটেছিল। সম্প্রতি ভারতীয় জরীপ বিভাগের কর্তা ব্রিগেডিয়ার উইলসন সেকথা স্বীকার করেছেন।

১৮৬৫ সালে সিমলা অঞ্চল জরীপের সময় এই দলের কর্তা এক গাড়োয়ালী খালসীকে নিকটবর্তী ১৪০০০ ফিট পাহাড়ে ১টি নিশান পুঁতে আসতে হুকুম করেন। এই কাজ শেষ করে তার ফেরার কথা সন্ধ্যা ৬টায়। সে রাত্রে এই খালাসীটি তার কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরতে পারেনি। পরদিন বিকালে সে অতিমাত্রায় শ্রান্ত হয়ে ফিরে দেখে যে, উপরওয়ালা ইংরাজ রাগে অগ্নিশর্মা। রাগ কিছুমাত্রায় কম হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে নির্দিষ্ট কাজটি যথাযোগ্য সম্পন্ন করেছে কিনা। জিজ্ঞাসাপত্রের পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, নির্দিষ্ট চূড়া অতিক্রম করে সে মূল শিলাপর্বতের শিখরে পৌঁছে গজাকাটি বরফের উপর পুঁতে দিয়েছে। এই পর্বতটি ২৩০৫০ ফিট উঁচু। চূড়ার কাছে এক বরফের গুহায় সে অভুক্ত অবস্থায় রাত্রিবাস করে।

একছর নাঙ্গা পর্বত জয় করার সময় ২০ বছরের জার্মাণ যুবা শেষ তিন হাজার ফুট একলা ওঠে দুনিয়াকে বিস্মিত করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিনা সরঞ্জামে ও সম্পূর্ণ একক অবস্থায় ভারতীয় খালাসীটি যে কৃতিত্ব অ করেছেন তার তুলনায় কলম্বাসের আমে আবিষ্কারের গৌরবও ম্লান হয়ে যায়। কি পরাধীন ভারতের, জরীপ বিভাগ এক অধ কর্মচারীর নাম পর্যন্ত লিখে রাখার প্রয়ো বোধ করেননি!

তেনজিং নোরকের এভারেষ্ট বিজয়ের ভারতে পর্বতারোহণের যে অধ্যায় শেষ হল সুরু করেছিলেন এক অজ্ঞাত ভারতীয় ব জরীপ বিভাগের প্রাচীন নথিপত্রে ইনি "অ খালাসী" নামে পরিচিত।

তেনজিংএর গৌরবপূর্ণ কৃতিত্বের পর জনসাধারণের মধ্যে পর্বতারোহণের আকা বলবতী হয়েছে। আরোহণকৌশল আয়ত্ত ক জন্য যে যে কৌশল জানা প্রয়োজন তা সংক্ষে বর্ণনা করছি।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার পর্বতারো করতে গেলে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ চলায় অ হলে চলবে না। পাহাড়ে বন্ধুর পথে চল সময় পাথর ও বরফ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থ

(ইহার পর ২৩৪ পৃষ্ঠায়)

পাহাড়ের নাম	কোথায় আছে	উচ্চতা	অক্ষরেখা			ও দ্রাঘিমা
এভারেষ্ট	নেপাল	২৯০০২	২৭	ডিগ্রী	৫৯′	১৬″
			৮৬	,,	৫৫′	৪০″
গডউইন অস্টেন (কে২) *	কারাকোরাম পাকিস্থান	২৮২৫০	৩৫	,,	৫২′	৫৫″
			৭৬	,,	৩০′	৫১″
কাঞ্চনজংঘা *	সিকিমরাজ্য	২৮১৪৬	২৭	,,	৪২′	৯″
			৮৮	,,	৯′	
লোটসে (ই১) *	নেপাল	২৭৮৯০	২৭	,,	৫৭′	৪৩″
			৮৬	,,	৫৬′	১০″
কাঞ্চনজংঘা (২)*	সিকিমরাজ্য	২৭৮০৩	২৭	,,	৪১′	৩০″
			৮৮	,,	৯′	২৪″
মাকালু *	নেপাল	২৭৭৯০	২৭	,,	৫৩′	২৩″
			৮৭	,,	৫′	২৯″
ধবলগিরি *	নেপাল	২৬৭৯৫	২৮	,,	৪১′	৪৮″
			৮৩	,,	২৯′	৪২″
চোইয়ো *	নেপাল	২৬৭৫০	২৮	,,	৫′	৩২″
			৮৬	,,	৩৯′	৫১″
নাঙ্গাপর্বত	পাকিস্থান	২৬৬২০	৩৫	,,	১৪′	২১″
			৭৪	,,	৩৫′	২৪″
অন্নপূর্ণা	নেপাল	২৬৪৯২ ফিট	২৮	ডিগ্রী	৩৫′	৪৪″
			৮৩	,,	৪৯′	১৯″
নন্দাদেবী	কুমায়ুন	২৫৬৪৫ ফিট	৩০	,,	২২′	৩২″
			৭৯	,,	৫৮′	২২″
কামেত	কুমায়ুন	২৫৪৪৭ ফিট	৩০	,,	৫৫′	১৩″
			৭৯	,,	৩৫′	৩৭″
গৌরীশংকর *	নেপাল	২৩৪৪০ ফিট	২৭	,,	৫৭′	৫২″
			৮৬	,,	২০′	১৬″
ত্রিশূল	গাড়োয়াল	২৩৩৬০ ফিট	৩০	,,	১৮′	৪৩″
			৭৯	,,	৪৬′	৪০″
বদ্রীনাথ	গাড়োয়াল	২৩১৯০ ফিট	৩০	,,	৪৪′	১৬″
			৭৯	,,	১৬′	৫২″
কেদারনাথ	গাড়োয়াল	২২৭৭০ ফিট	৩০	,,	৪৭′	৫৩″
			৭৯	,,	৪′	৭″
পঞ্চচুলী	কুমায়ুন	২২৬৫০ ফিট	৩০	,,	১২′	৫১″
			৮০	,,	২৫′	৪১″
পান্ডিম **	সিকিমরাজ্য	২২০১০ ফিট	২৭	,,	৩৪′	৩৮″
			৮৮	,,	১৩′	১০″

* চিহ্নিত পর্বতগুলি আজো জয় করা সম্ভব হয়নি।

** এই পর্বতে লেখক এই বৎসর অভিযান পরিকল্পনা করেছেন।

পঞ্চাশোর্ধ্বে

গোপাল হালদার

মনে হচ্ছিল—জীবনটা সহজ হয়ে আসছে। কলকাতার ট্রামে-বাসে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এযুগে যদি কোনো অপরিচিত সহযাত্রী আসন ছেড়ে দেয় তা হলে এছাড়া অন্য কি কথা মনে করতে পারেন আপনি? অপরিচিত সহযাত্রী সরে বসলেন, বললেন, 'বসুন'। ভদ্রতা-সম্মত কৃতজ্ঞতা অবশ্য জানাবেন, কিন্তু আসনও গ্রহণ করবেন! সঙ্গে সঙ্গে ভাববেন আমার মত জীবনটা সহজ হয়ে আসছে। মানুষ মানুষকে সত্যই স্বীকার করতে শিখছে। ট্রামের আসনে কেউ ৪৫ থেকে ৭৫ ডিগ্রি জংঘা-জানু বিস্তার করে বসছেন না। আমি পাশে বসতে গেলে আপনি জামা-কাপড়ের ইস্ত্রি বাঁচাবার সদিচ্ছায় আমাকে ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষে দেখছেন না অনধিকার প্রবেশকারীর মত। আপনি ও আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে আমিও সুচতুর সেনাপতির মত অনুপ্রবেশ করে বসব না আমার কনুই-এর খোঁচায় বীরবপুখানিকে ছড়িয়ে দিয়ে। এক-কথায়, কলকাতার রথযাত্রায় আমরা বুঝেছি—লিভ এণ্ড লেট লিভ। 'এর পরেই হয়ত মানব—'সকলের তরে সকলে আমরা'—

অতএব আমি বললাম কৃতজ্ঞতা জানাতে, 'আপনার কষ্ট হল'—

উত্তর এল, বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ! 'হলোই বা। বসুন না—আপনারা বয়স্ক লোক।'

পৃথিবী ছলনাময়ী। কাল কুটিলচক্রী। লাফিয়ে উঠে বলতে পারতাম, 'বসতে চাই না।' কারণ পাঁচ বৎসর কম ছিল তখন বয়স কিন্তু বললাম না। আপনিও বলতেন না। তখনো বয়স পঁয়তাল্লিশের দিকে। স্মিত-হাস্যে আসনটিতে চেপে বসতে পারতেন সকৌতুক স্মরণ করতে পারতেন সেদিনের 'প্রবাসী' সম্পাদককে লেখা বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কবিতায় প্রতিবাদ। পক্কশ্মশ্রু সম্পাদক বয়োজ্যেষ্ঠ বিজয় মজুমদারকে উল্লেখ করেছিলেন, কবিতায় প্রতিবাদ করলেন বিজয়বাবু।

পেঁচিয়ে কথা বলতে বুড়ো

বুঝিতে পারি নইক মূঢ়,

ঠারে-ঠোরে 'বুড়ো' বলে চোখ-টেপা।

'বয়স্ক' মানে ত সেই প্রৌঢ়। হাঁ, বয়সটা যখন পঁয়তাল্লিশের প্রান্তে তখন মন্দ লাগে নি আপনার কথাটা। অবশ্য এও সেই ঠারে-ঠোরে 'বুড়ো' বলে চোখ-টেপা। তাতেই বা ক্ষতি কি?

Grow old along with me
The best is yet to be
The best of life for which the
first was made

কিন্তু নেই সেই পঁয়তাল্লিশ—সত্যই এসেছি এখন পঞ্চাশোর্ধ্বে—আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেও অবশ্য এগিয়ে গেছেন আরও পাঁচ বৎসর, আর আপনিও বাদ যান নি। ট্রামে-বাসে এবার সত্যই কেউ আসন ছেড়ে দিলে আমাকে বলে না, বসুন—আপনার বয়স হয়েছে। বলে, বুড়ো মানুষ, বসুন। আর কি করবেন আপনি আমার মত হলে? কবিতা স্মরণ করবেন? "Grow old along with me." না, স্মরণ করবেন আপনার স্মৃতির কথা—Le Temps Retrouve......হারানো কাল, পুরনো দিন!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই—বাঁচলেই কাল হারায়, দিন ফুরোয়, যৌবনের সিংহাসন ছাড়তে হয়। চল্লিশ আসে প্রথম দ্রুতপদসঞ্চারে। আর আসে সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রথম অপরাহ্ন ছায়া, চোখে ঝাপসা হয়ে ওঠে নিকটের লেখা। তার আগে বা পরেই হয়ত আসে দাঁতের জানানী—চল্লিশ আসছে আর দাঁতেই জীবের বয়স। চুপে চুপে শ্বেতপত্রের লেখা পাঠিয়ে সন্ধিপ্রত্যাশী হয় শেষে যৌবন। চল্লিশ আপনার আমার জীবনেও এসেছে এই নিয়মে। কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করেছিলাম প্লাস্-ওয়ান লেন্সের প্রস্তর-চক্র নিয়ে। আমি তাকে স্বীকার করলাম প্লাষ্টিকসের দন্ত-পংক্তি নিয়ে। আর আমরা রবীন্দ্রনাথ নই—সেফ্‌টি রেজরের যুগে জন্মেছি, শ্বেতশ্মশ্রুর স্বীকৃতির কথাই উঠে নি। সহজে—অন্য সকলের মত সহজেই আমি তাই ত্রিশ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি চল্লিশে। যৌবন পেরিয়ে এসে পেলাম এ কালের প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত পরিসর! যৌবনের উন্মাদনা তখন পরিশ্রুত হয়ে উঠছে অভিজ্ঞতায়, বাসনার বাষ্প তখন লঘু হয়ে উঠছে হৃদয়বাগের চারি পার্শ্বে, মথিত সমুদ্রের শান্ত বেলাভূমিতে কামনার মোহিনী হয়ে উঠেছেন জীবনের লক্ষ্মী—আর এ সমস্ত সম্ভব হয়েছে প্লাসওয়ান্ চশমার জন্য, ডেন্টিস্টের সুকৌশল কৃতিত্বে, সেফ্‌টি রেজরের প্রসাধনসৌকর্যে।

যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যখানে প্রৌঢ়ত্বের এই পরিণত রূপকে আবিষ্কার করেছে গত দেড়শত বৎসরের চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রাণ-বিজ্ঞান। যৌবন-বেদনা তাই জীবনরসে দানা বেঁধে উঠবার মত একালে অবকাশ পেয়েছে বত্রিশের পরে চল্লিশের মধ্যে। যৌবনের জ্বালাহীন আভা এসে স্পর্শ করছে চল্লিশের এই শুভ্র ললাট। যৌবন দীর্ঘায়িত হয়েছে প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্ত রাজ্যে। নিস্তরঙ্গ প্রৌঢ়ত্বের স্রোতে সবেগ সঙ্গে জেগেছে যৌবনান্তের মৃদু কলতান।

সুস্থ সৌভাগ্যলাভ করেছি আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে—চল্লিশের চক্রতলে আমরা এখন নিষ্পেষিত হয়ে যাই না। পূর্বযুগে মানুষ তা ভাবতে পারত কি? পৌরাণিক কাহিনী ও কিম্বদন্তী ছাড়ুন, আমরা জানি—ষোল থেকে বত্রিশ এই ছিল যৌবনের সীমানা অন্ততঃ এই দেশে। জীবনের তা মধ্যভাগ। তারপরে আর প্রত্যাশা করা চলত না কিছু—তখন বানপ্রস্থ। জীবনে মাত্র ষোল বৎসর—ষোল থেকে বত্রিশ এই ছিল তাদের স্বর্গ। আশ্চর্য নয় যে, সেদিনের অর্ধেক কাব্য ও কল্পনা ভরে গিয়েছে এই স্বল্পায়ু যৌবনের প্রমত্ত প্রলাপে। আর খুবই স্বাভাবিক বাকি অর্ধেক ছাপিয়ে উঠছে সেই বিলুপ্ত যৌবনের ব্যর্থ-বিলাপ। জীবনের সমস্ত মানে তাদের নিকট শেষ হয়ে যেত দুই স্তবকে—শৃঙ্গার শতকে আর বৈরাগ্যশতকে। শৃঙ্গার শতকের অনিবার্য পরিণতি ছিল বৈরাগ্যশতক। মাঝখানে কিছু নেই—শূন্য যৌবনে নেই সংযমের সবলতা, প্রৌঢ়ত্বে নেই সুস্থ সরসতা।

বিজ্ঞান এই যৌবনকে দীর্ঘায়ু করেছে—বত্রিশের থেকে নামিয়ে তাকে চল্লিশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। অরণ্য সভ্যতাও তা নিয়ে একই সঙ্গে সৃষ্টি করছে—সৌন্দর্য আর বিভ্রমবিলাস। 'ঠোঁটের সিন্দুর' অক্ষয় হচ্ছে আজ সুন্দরীর অঙ্গরাগে আসতে পারে বরাঙ্গে দৈনিক এবং সাময়িক-চিক্কণতা। দেহযষ্টিতেও ইদানীং আসতে পারে পণ্যভারে পীনোন্নত যৌবনের সমৃদ্ধি। এ যৌবন অবশ্য নিজেদের উপলব্ধির জন্য নয়, অন্যদেরই প্রলুব্ধির নেশায়। শুধুই পশরা সাজানো। কিন্তু সত্যই নারীত্বকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দিতে পারে আজ বিজ্ঞান, তাও মানতে হবে। 'কুড়িতেই বুড়ী' হবেন না আজ বাঙালী নারীও যদি দিতে পারেন তিনি সভ্যতাকে কাঞ্চন-মূল্য। কুড়ি থেকে আশী পর্যন্ত বণিক সভ্যতা সমভাবে সকলকে যুগিয়ে যেতে পারবে বিভ্রমের পণ্য—যদি থাকে তাদের ক্রয়-ক্ষমতা।

বিজ্ঞান দীর্ঘায়ু করেছে যৌবনকে, কিন্তু যৌবন চিরায়ু নয়। কুড়িতে যে বুড়ী হবে না, সেও চল্লিশে ছুঁড়ি থাকবে না। হন তিনি ক্লিওপেট্রা, আন্টোনিওর হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞী, অগষ্টাসের চোখে তাঁর বয়স ও বিভ্রম বিশুষ্ক। বত্রিশে যে বিগতযৌবন, চল্লিশের পারে এসে তাকেও স্বীকার করতে হবে বয়স হয়েছে। গ্রন্থিরস-বিদ্যার আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হয়ত একদিন আপনাকে পৌঁছে দিতে পারবে আর এক-আধ দশকের ওপারে। এখনো আপনার ভাঙাকুঞ্জ নূতন করে সাজাতে পারেন ভরোনফের পরামর্শ অনুযায়ী। কিন্তু সে ক্ষণ-বসন্তে ফুল ফুটবে না। আর শাখায়, মুকুলেই ঝরে যাবে অকালের সেই কুসুমের স্বপ্ন। বয়স হবেই একদিন, তাই প্রকৃতির নিয়ম। বাঁচলেই বয়স হবে—এটা প্রকৃতির পরিহাস নয়, তার পরিপূরণ। ফুলকে সে সার্থক করে ফলে, ফলকে সে সঞ্জীবিত করে বীজে, আর বীজকে সে পুনরুজ্জীবিত করে অঙ্কুরে আবার নূতন করে ফুল ফুটিয়ে, ফলাবে ফল, অর্থাৎ বারে-বারে ফুরোবে ফুলের উৎসব। প্রকৃতির এটা প্রতিশোধ নয়, সৃষ্টির পরীক্ষা। আপনার আমার প্রাণ-লীলায় আমরাও তার সে পরীক্ষায় যোগ দিয়েছি। তার সঙ্গে জেনে না জেনে হাত মিলেয়েছি এই ইতিহাসজোড়া সৃষ্টির পরীক্ষায়। প্রতিযোগিতা আছে আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে কিন্তু তা সহযোগিতারই সর্তে। প্রকৃতিকে আমরা সহায়িকা করে তুলি তার নিয়ম-রাজ্যের রীতিনীতিকে আমরা স্বীকার করি বলেই। বয়স হলেও তাই বয়সকে যদি আমরা মানতে কুণ্ঠিত হই, তাহলে প্রকৃতির পরীক্ষা হয়ে উঠে পরিহাস। আর সে পরিহাস বড় নিষ্করুণ। এমন বিদ্রূপ আর নেই—যযাতি যৌবনের মত।

(ইহার পর ২৩৯ পৃষ্ঠায়)

পাটিহার

মনোজ বসু
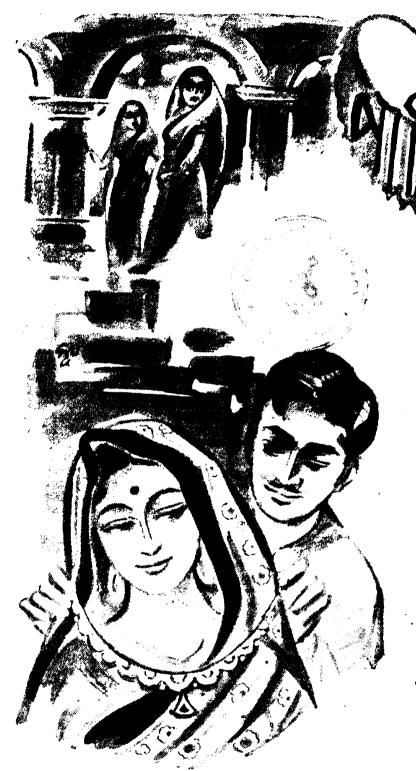
সুকুমার বিয়ে করে ফিরেছে। বড় বড় থাম-ওয়ালা অট্টালিকার সামনে এসে পাশের নূতন বউকে বলে, এই বাড়ি—

জয়ার চোখে পলক পড়ে না। আসছে আমার টালি-ছাওয়া ঘর থেকে। এত ঠাট-ঠমক তার শ্বশুর বাড়ির।

মোটর কিন্তু ফটকের ভিতরে না গিয়ে বাঁয়ের গলিতে ঢুকল। বড় বাড়ির উত্তর সীমানা দিয়ে এই গলি, চলেছে, চলেছে। শেষটা এক আধ-অন্ধকার একতলা ঘরের সামনে গিয়ে বলে, নামো—

নতুন বউ মুসড়ে গেল একটু। শাশুড়ী এসে হাত ধরে নামালেন। এবাড়ি-ওবাড়ির দু পাঁচটা মেয়েও এসেছে।

ফুলশয্যা চুকে গিয়ে ঘর নির্জন হলে এক সময় জয়া বলে, মা গো, যে বাড়ি দেখিয়েছিলে—আমার তো পা কাঁপছিল। যেন রাক্ষস হাঁ করে আছে, ঢুকলেই গিলে খাবে।

সুকুমার বলে, একই বাড়ি তো!

বলে কি—ঐ উঁচুতে আকাশ-ছোঁয়া এতখানি আর এই স্যাঁত-সেঁতে পাতালকুঠুরি নাকি এক!

চৌধুরি বাড়ির পিছন হল এটা। সদরে মালিকরা থাকেন, কর্মচারীদের কোয়ার্টার এগুলো।

সকালবেলা সুকুমারের মা বললেন, চৌধুরি গিন্নিকে বউ দেখিয়ে নিয়ে আয়। এত তোকে ভালবাসেন, এত ধরপাকড় করে আইবুড়ো-ভাত দিলেন—

তারপর গলা নামিয়ে বলেন, কি গয়না নাকি গড়িয়ে রেখেছে দেবার জন্যে। বউমাকে নিয়ে যা।

তা সত্যি, সুকুমার আর দশটা কর্মচারীর মতো নয়। বাপ চৌধুরি-এস্টেটের সদর নায়েব রূপে চিরকাল কাজ করে গেছেন, ছোট বয়স থেকে বড় বাড়িতে তার চলাফেরা। মনিবেরা তাকে বাড়ির ছেলের মতোই জ্ঞান করেন, বাপ মারা গেলে চাকরি দিয়ে প্রতিপালন করছেন।

ফিরে এসে জয়াও তাই বলল। বড় ভালো ও-বাড়ির লোকগুলো। বড়লোকের দেমাক নেই। ছোট বউ বয়সে তো অল্প, পাগল একটা—মন গঙ্গাজলের মতো। ফুল বাঁধছিল বোধ হয়। তেতলা থেকে দুপ-দাপ ছুটতে ছুটতে একলা এসে গলা জড়িয়ে ধরল জয়ার। জয়ারই সমবয়সী—বছর দুই মাত্র বিয়ে হয়েছে। গিন্নি একটু ভারী এখন, মোটা মানুষ—নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। তেমন এক জোড়া দুল কানে পরিয়ে দিয়েছেন, এই দেখ।

(ইহার পর ২৪০ পৃষ্ঠায়)

বান্দিপুরের মানুষখেকো

—আরণ্যক—

প্রায় সত্তর বছর আগে মিঃ এ. মার্ভিন স্মিথ নামক একজন ইংরাজ ভূতত্ত্ববিদ্, ভারতবর্ষের খনিজসম্পদের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের অজ্ঞাত, জনবিরল অরণ্যপ্রদেশে তাঁকে এই কাজে ঘুরতে হোত; এবং সময় সময় এমন গভীর জঙ্গলপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করতে হোত যেখানে আর কোন মানুষ হয়ত পদার্পণ করেনি। সেই যুগে আমাদের দেশের বিশাল বনাঞ্চল যে কি বস্তু ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সময় স্মিথ বন্যপ্রাণীবহুল অরণ্যের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি এইসব বৃত্তান্ত ও বন্য জীবজন্তু সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রবন্ধাকারে সমসাময়িক ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশ করে গেছেন। তবে, মূলতঃ তিনি শিকারী ছিলেন না, বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্র গ্রহণ করায় তাঁকে অস্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। তিনি সোজাসুজি বলেছেন যে, বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ওই বিষয় পারঙ্গম বিশেষজ্ঞদের বর্ণনার সঙ্গে না মিলতেও পারে, যেহেতু তাঁর অভিজ্ঞতা ঘটনাচক্রে লব্ধ, ব্যাপক ও বিশেষ অনুসন্ধানপ্রসূত নয়। তিনি যেমনটি দেখছেন তেমনিই লিখছেন। তাঁর কতগুলি কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ। অরণ্যপ্রিয় বিদগ্ধ পাঠকের কাছে সম্ভবতঃ তাঁর লিখনভঙ্গীর আরও আকর্ষণ এই, তিনি কোথাও ভাবাতিশয্য বা নিজের বাহাদুরী জাহির করবার চেষ্টা করেননি। একটি মনোজ্ঞ বিবরণ হচ্ছে বান্দিপুরের মানুষখেকো বাঘের ঘটনা।

সে সময়ে রেলগাড়ী ছিল না, নীলগিরি পাহাড়ের উতকামণ্ড যেতে হলে মহীশূর হয়ে সিগুর গিরিবর্ত্ম পার হয়ে যেতে হোত। দূর ভ্রমণের একমাত্র উপায় ছিল বলদটানা সওয়ারী গাড়ী। বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর পর্যন্ত রাস্তা মন্দ ছিল না, কিন্তু তার পর থেকে নীলগিরির নীচে সিগুর অবধি একেবারে বাজে মেঠো রাস্তা। বর্ষাকালে গর্ত, কাদায় ভর্তি এই অংশ জলাভূমির মতই দুর্গম রূপ ধারণ করত। গাড়ীর চাকা একবার কাদার ভিতর বসে গেলে তার একচুলও নড়বার উপায় থাকত না, যতক্ষণ না পার্শ্ববর্তী দুটি গণ্ডগ্রাম বান্দিপুর এবং [illegible] থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেত। একবার জুলাই মাসে উতকামণ্ড থেকে মাদ্রাজ আসবার সময় স্মিথের কপালে এরকম দুর্দৈব ঘটে। তখন চাকা মেরামত করবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে দুদিন বান্দিপুর ডাকবাংলোয় থাকতে হয়। সে সময় গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে তাঁর কাছে এক ভয়ানক মানুষখাওয়া বাঘের অত্যাচারের কথা জানায়। তারা বলে বাঘটা আসলে বাঘ নয়, কোন প্রেতাত্মা বা অপদেবতা বাঘের রূপ ধরে তাদের হত্যা করতে এসেছে। কৈফিয়ৎ হিসাবে তারা জানায় পূজা-আচ্চায় এ অত্যাচার কমে না, বাঘের কাছে পূজা দেবার পরেই পুরোহিতকে এই বাঘে নিয়ে গেছে। গ্রামে এমন আতঙ্ক হয়েছে যে, কেউ আর কাঠ সংগ্রহের জন্য বার হয় না, ও তার ফলে জ্বালানী অগ্নিমূল্য হয়েছে। কত মানুষ খেয়েছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে, সকলে কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগল স্মিথকে, যে কোন প্রকারে এই রাক্ষসকে হত্যা করে তিনি তাদের রক্ষা করুন।

কিন্তু স্মিথের সঙ্গে বাঘ শিকারের উপযোগী অস্ত্র ছিল না, শুধু পথের সাথী একটি পিস্তল ছিল। কাজেই গ্রামবাসীদের কোন সাহায্য করতে অপারগ হয়ে তিনি মাদ্রাজে ফিরে গেলেন।

এর আটমাস পরে আবার তিনি মাদ্রাজ থেকে উতকামণ্ড ফিরবার সময় ওই পথে বান্দিপুরে আটকে পড়লেন। এবার যদিও কারণটা ভিন্নরকম। গত আটমাসের মধ্যে ওই মানুষখেকোর কবলে বহুলোক প্রাণ দিয়েছে, তার কুখ্যাতি দূরদূরান্তে বিস্তৃত হয়েছে। স্থানীয় লোকজন সব বিভীষিকায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। স্মিথের গাড়োয়ান বান্দিপুরের পরবর্তী রাস্তা টিপু কাদুর বনের ভিতর দিয়ে আর কিছুতেই যেতে রাজী হোল না। নিরুপায় হয়ে তিনি বান্দিপুরের ডাকবাংলোয় এসে উঠলেন। বাংলোয় কে ও ওয়ার্ড নামে দুজন ইংরাজ শিকারীর সঙ্গে স্মিথের দেখা হোল। এই দুজন গবর্ণমেণ্ট থেকে বিশেষ করে নিয়োজিত হয়েছিলেন মানুষখেকোকে বধ করার জন্য। কে (Kay) অসম সাহস ও অব্যর্থ লক্ষ্যের অধিকারী বলে শিকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েছিলেন, এবং সামরিক বাহিনীর সেনানী ওয়ার্ডেরও সুদক্ষ শিকারী বলে খ্যাতি ছিল। এঁরা বান্দিপুরের বাঘ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করছিলেন, দুদিন ধরে জঙ্গলের ভিতরেও ঘুরেছিলেন, কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি। স্মিথ যখন বাংলোয় আসেন তখন আগের দিন পনের মাইল দূরে ময়ার কফিবাগানে একটি কুলিকে মেরেছে এই খবর পেয়ে উক্ত শিকারী দুজন সেখানে রওনা হওয়ার আয়োজন করছিলেন। এযাত্রায় স্মিথের সঙ্গে বড় শিকারের উপযোগী দোনলা ওয়েস্টলী রিচার্ডস রাইফেল ছিল বটে, কিন্তু হাতে সময় ছিল না বলে ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি শিকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলেন না। এসম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, ওইরকম সঙ্গীদের সঙ্গে এক জঙ্গলে বাঘের সামনে নিশ্চিন্তে দাঁড়ান যায়, কারণ তাঁরা দুজনেই লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত, এবং অত্যন্ত বিষম অবস্থার মধ্যেও সম্পূর্ণ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সক্ষম। যাইহোক, কে ও ওয়ার্ডকে সাফল্যলাভের শুভ ইচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়ে, তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে তৎপর হলেন। চেষ্টা করতে লাগলেন গাড়োয়ানদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দুটি জোড়া বলদ জোগাড় করতে। কারণ, বাকী পথ অনেকখানি দীর্ঘ, একজোড়া বলদের পক্ষে একটানা যাওয়া সম্ভব নয়, অথচ পথের চৌকীতে বলদ পাওয়ার আশা নেই, বাঘের অত্যাচারে সেখানকার বসতি উঠে গেছে। ওদিকে গাড়োয়ানরা স্মিথের প্রস্তাব কানেই তোলে না, তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ও পথে গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্মিথ অনেক লোভ দেখালেন, নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেন, শেষে বললেন, ভয়ের বাস্তবিক কোন কারণ থাকতে পারে না, একটু আগেই কে ও ওয়ার্ডের মত দুর্ধর্ষ শিকারীরা ওই পথে মানুষখেকোর সন্ধান করতে করতে যাবেন, বাঘ যদি কাছাকাছি থাকেই তবে নিশ্চয়ই শিকারীরা তার মহড়া নেবেন, আর যদি না থাকে তাহলে স্মিথের দলও নির্বিঘ্নে পথটা পার হয়ে যাবেন। এই যুক্তির উপর জোর দেওয়াতে গাড়োয়ানেরা ক্রমে আশ্বস্ত হোল। বেলা চারটের সময় স্মিথ গাড়ীতে সওয়ার হলেন, তাঁর বেয়ারা বাইরে

(ইহার পর ২৫৩ পৃষ্ঠায়)

ি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
খন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥

—গোবিন্দ দাসের কড়চা

াপর সে কলিযুগে আর।
নযুগে সংকীর্তন সার॥
াথ পতিত পাবন।
এই দেহ ত শরণ॥

—চৈতন্যভাগবত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সিপাহী বিদ্রোহ মিটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো তাহার জের চলিতেছে। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে এখনো অনেকে ধরা পড়ে নাই, ভারতময় তাহাদের সন্ধান চলিতেছে, জের বলিতে ইহাই। দিল্লীর বাদশাহ নির্বাসিত, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্মুখ-সমরে নিহত, তাঁতিয়া টোপির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে ফৈজাবাদের মৌলবিও নিহত। নানাসাহেব ও তাহার দক্ষিণহস্ত আজিমুল্লা খাঁ এখনো ধরা পড়ে নাই। আরও একজন ধরা পড়ে নাই, সে বিখ্যাত নয়, কিন্তু বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান দায়িত্বই নাকি তাহারই, সে নানাসাহেবের হারেমের একজন ক্রীতদাসী নাম জুবেদা বিবি।

নানাসাহেবকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দিকে দিকে প্রদেশে প্রদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রেরিত হইয়াছে, প্রচুর অর্থমূল্যও ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাকে পাওয়া যায় নাই। তবে পূর্ণোদমে সন্ধান এখনো চলিতেছে, দক্ষিণে মাদ্রাজ, উত্তরে নেপাল, পূর্বে আসাম আর পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশ চষিয়া ফেলা হইতেছে, নানাসাহেবকে ধরিতেই হইবে।

মাঝে মাঝে রব ওঠে নানাসাহেব ধরা পড়িল। ধৃত ব্যক্তিকে কানপুরে আনা হইলে পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিয়া দেখা যায় যে, সে নিরীহ সন্ন্যাসী বা ফকির মাত্র। নানাদেশ হইতে গুপ্তচরেরা আসিয়া বলে যে, নানাসাহেবকে দেখা গিয়াছে, কখনো মন্দিরে, কখনো মসজিদে, কখনো হাটে-বাজারে গঞ্জে গ্রামে বা কোন রেলস্টেশনে। কিন্তু 'ঐ বাঘ ঐ বাঘ' রব এতবার উঠিয়াছে যে ঐরূপ সংবাদে এখন আর কেহ বিচলিত হয় না। বস্তুতঃ এখন অনেকেই বিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছে যে, নানাসাহেব মারা গিয়াছে। নানাসাহেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি মত দাঁড়াইয়াছে। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা যে, নানাসাহেব ১৮৬০ সালে নেপালে বা নেপালের তরাই অঞ্চলে মারা গিয়াছে। তাহারা বলে যে, ঐ সময়ে নানার যে সঙ্গিগণ নেপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মিথ্যা বলিবার কি হেতু থাকিতে পারে? এই সব সঙ্গীর মধ্যে নানার নাপিত অন্যতম। তাহাকে নানার মৃত্যু বিষয়ে প্রশ্ন করিলে এইরূপ উত্তর পাওয়া গইল :

—তুমি নানাকে কামাতে?

—কাকে কামাতাম?

—নানাকে?

—ওঃ সেই বাটপাড়কে! হাঁ বাটপাড়টাকে কামাতাম বটে!

—সপ্তাহে কবার?

—সপ্তাহে দুবার। বাটপাড়!

এখন আর নিশ্চয় তার কামাবার দরকার নেই। সে নিশ্চয় মরেছে, কি বলো?

—মরেছে বলে মরেছে, একেবারে মরেছে। খুব ভালো হয়েছে, বাটপাড়টা!

নানা মারা পড়িয়াছে কিনা তবু সংশয়ের রাজ্যে থাকিয়া যায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা যে মারা পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মানুষ এমনি বটে!

আর এক দলের লোক বলে নানা মরুক আর বাঁচিয়াই থাকুক তাহাতে এখন আর আশঙ্কার কিছুই নাই কে পলাতক আসামী, দেশে তাহার আর প্রভাব নাই। অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এত প্রচুর খরচ করিবার আর প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দলটিই সংখ্যায় ও প্রভাবে প্রবল। তাহাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী। এই উপলক্ষে তাহারা প্রচুর বখশিশ টাকা ও রাহা খরচ পায়, তাহাদের বিশ্বাসের অনুকূলে এ মস্ত একটা যুক্তি। তার উপর আবার বিলাত হইতে একদল গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ আসিয়াছে। তাহাদের কেহ হাতের অক্ষরে বিশেষজ্ঞ, কেহ নাকের আকৃতিতে, কেহ চোখের দৃষ্টিতে, কেহ বুড়ো আঙুলের ছাপে, কেহ [illegible] বিশেষজ্ঞ

বিশেষজ্ঞ। এখন সরকার ভাবে নানা মরিয়াছে, স্বীকার করিলে ইহাদের বিদায় করিয়া দিতে হয়, যে প্রচুর পুলিশ ও গুপ্তচর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের দল ভাঙিয়া দিতে হয়, সে এক হাঙ্গামা, হয় তো বা পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরে ভারত সরকারের অকর্মণ্যতা ঘোষিত হইবে; তাই সরকার নীরব, ভাবে 'অশ্বত্থামা কাল হরণং', নানা মরুক আর বাঁচিয়া থাকুক তাহারা না মরিলেই যথেষ্ট।

ভারতের নানাস্থানে নানাকে ধরিবার জন্য বিশেষ ঘাঁটি বসিয়াছে, কোন লোক ধরা পড়িবামাত্র সে কানপুরে আনীত হয়; দেশময় যে শত শত নানাসাহেব ধৃত হইতেছে তাহাদের আসল নকল বিচার করিয়া মুক্তি দানের বা হাজতবাসের আজ্ঞা দানের একটি ক্লিয়ারিং হাউসে পরিণত হইয়াছে কানপুর সহর। এত সহর থাকিতে কানপুর সহর নির্বাচিত হইবার বিশেষ কারণ আছে; কানপুরের কাছে বিঠুরে নানা দীর্ঘকাল ছিল, এ অঞ্চলের বহু লোকের কাছে নানা পরিচিত, তাছাড়া কানপুর সহরটা বিদ্রোহ-পীড়িত অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত, সেটাও একটা কারণ বটে।

কানপুর সহরের প্রকাণ্ড জেলখানা যেমন নানা শ্রেণীর নানাসাহেবে ভরিয়া গিয়াছে তেমনি মামুদের হোটেল নামে সৌখীন হোটেলটিও বিশেষজ্ঞ, উচ্চ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, কৌতূহলী ইংরাজ অতিথি-অভ্যাগতে পূর্ণ। হোটেলের মালিক মামুদ আলি হাসিখুশি মুখ, গোলগাল সুপুরুষ, নানাকে বেশ চিনিত, কেননা, বিদ্রোহের সময়ে নানা কয়েক মাস এই হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিল।

কোন বিদেশী অতিথি যদি শুধাইত—

নানা কি হোটেলের খানা খেত?

'বিসমিল্লা' বলিয়া মামুদ আলি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিত,—

হোটেলের খানা? সর্বনাশ ও-কথা মুখেও আনবেন না, কে কোথায় শুনতে পাবে!

তবে খেতো কি?

এই ঘরটায় আসুন। এখানে নানার জন্য চুল্লি প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে হাঁড়ি চাপিয়ে হাঁড়ি মানে Earthen Pot......

ওঃ! তার প্রিয় খাদ্য কি ছিল?

ঘি মানে Clarified butter; আর এই ঘরটায় একটা চারপায়া পেতে নানা শুতো।

ঘরে আর কোন আসবাব ছিল?

আসবাব? না। হাঁ, তবে একটা বাছুর ঘরময় অবাধে ঘুরে বেড়াতো, আর একটা চাকর সোনার বাটীতে করে তার চোনা, মানে—

মানে শুনিয়া সাহেবরা বলিয়া উঠিত how horrible, তারপরে শুধাইত সেটা কি করতো?

খেতো।

সাহেবগণ চমকিয়া উঠিত, ইংরাজি ভাষায় মনোভাব প্রকাশের যোগ্য শব্দ না পাইয়া তাহারা অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিত। কেহ কেহ আবার মনে মনে যুক্তিজাল বুনিয়া স্থির করিত উক্ত বস্তু যখন খায় তখন উক্ত বস্তুর আস্বাদিকও অবশ্য খাইত। কোন কোন সর্জ্ঞানী ভাবিত একবার গোপনে উক্ত বস্তুটা চাখিয়া দেখিতে হইবে, নানা কি খামোকা খাইত, তাহার তো অভাব ছিল না, সে ভাবিত দেশে ফিরিয়া এ বিষয়ে একখানা বই লিখিয়া ফেলিবে, প্রকাশকের অভাব হইবে না, এখন নানাসাহেবের বাজার-দর চড়া।

নানার সম্বন্ধে সাহেবগণের মনোভাব যেমনি হোক, হোটেলের মালিক মামুদ সম্বন্ধে তাহাদের অনুকম্পার অন্ত ছিল না। সে প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী খানা জোগাইত, মদ জোগাইত, 'অমুক জিনিষটা পাওয়া গেল না' এ কথা কেহ তাহার মুখে শোনে নাই, বিল আদায় করিতে, ফাইফরমাস খাটিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, আর তার সবচেয়ে বড় গুণ সে সময়মতো হাসিতে পারে। এ গুণটি যার আয়ত্ত সংসারে সে সর্বজয়ী। সর্বজয়ী এই গুণটির বলেই বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সে কোম্পানীর আমলে হোটেল চালাইয়াছে, নানার আমলে চালাইয়াছে এবং এখন খাস মহারাণীর আমলে চালাইতেছে, কেহ কখনো তাহার সততায় সন্দেহ মাত্রও প্রকাশ করে নাই। মামুদ হাসিয়া বলে হোটেলওয়ালা, জল্লাদ ও টেবিল-খানসামা বা waiter-এর সম্বন্ধে বাছবিচার করলে চলে না।

হোটেলের হেড ওয়েটারটি সম্বন্ধে মামুদ সার্থক গর্ব অনুভব করিত; বলিত ঐ যে বিঠুরের ইঁদারার মধ্যে নানাসাহেবের একরাশ সোনার তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলোর বদলেও সে ইসাককে ছাড়িতে নারাজ। ইসাক তাহার প্রধান হেড-ওয়েটার। সে যে কোথা হইতে আসিল, কি তাহার পূর্বেতিহাস কেহ জানিত না, কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না, যাহারা জিজ্ঞাসা করিবার মালিক তাহারা সকলেই ইসাকের গুণে মুগ্ধ। মুখ খুলিবার আগেই সে মনের কথা বুঝিতে পারে, আবার এমন অনেক মনের কথা আছে কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই ইসাক তাহা তামিল করিয়া বসে। দিন এবং রাত্রির যাবতীয় পরিচর্যায় ইসাক এমনি পারদর্শী যে, সাহেব-বিবি অতিথি অভ্যাগত দেশী-বিদেশী সকলেরই মুখে এক কথা, ইসাক, ইসাক। খানসামা-সুলভ চাপকানে ইসাক সজ্জিত, মাথায় টুপি, পা খালি এবং মুখে হোটেলের মালিকের মতোই সর্বজয়ী হাসি। তবে মামুদের ও ইসাকের হাসিতে কিছু প্রভেদ ছিল। মামুদ সকলকে দেখিয়া সমান হাসি হাসিত, কিন্তু ইসাকের হাসিতে তারতম্য ছিল, লোকের পদমর্যাদা বিচার করিয়া সে হাসিত; কাহারো জন্য তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির মোহর, কাহারো জন্য হাসির টাকা, কাহারো জন্য বা হাসির আধুলি বা সিকি দুয়ানি, নিতান্ত হীন-মর্যাদার জন্য পয়সা বা পাই, কেহই একেবারে বঞ্চিত হইত না।

মামুদের হাসি বলিত তোমরা সকলেই আমার অতিথি, আমার চোখে তোমরা সবাই সমান; আর ইসাকের হাসি বলিত সকলকে সমান করিলে আমার চলে না, কে বেশি দামের খদ্দের, কে কম দামের, কে জেনারেল, কে কর্ণেল, কে মেজর আমার জানা চাই; বস্তুতঃ মামুদের হাসি ও ইসাকের হাসি পরস্পর পরিপূরক।

আরও একটি কারণে সরকারী মহলে ইসাকের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সে নানাসাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিত, সে ছিল সরকারী সনাক্তকারী। এই যে নানাদেশ হইতে শত শত নানা আসিয়া জেলখানা ভরিয়া তুলিতেছে কে তাহাদের সনাক্ত করিবে? নানাকে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিত তাহারা হয় মরিয়াছে, নয় পলাইয়াছে, নয় অন্য কারণে সনাক্তকার্যে অসম্মত। এই সংকটে ইসাক একমাত্র রক্ষাকর্তা। সে দীর্ঘকাল বিঠুরে ছিল, কানপুর সহরেও সে কতবার নানাকে দেখিয়াছে, কাজেই সে-ই যোগ্যতম ব্যক্তি। খানা ও মদ রুচিমতো যে ব্যক্তি জোগান দিতে সক্ষম, সে বিশ্বাস-ভাজন না হইয়া যায় না, আর বিশ্বাস-ভাজনের সব কথাই সমান বিশ্বাসযোগ্য। সপ্তাহে একদিন করিয়া ইসাকের ডাক পড়িত জেলখানায় সনাক্তকরণের প্যারেডে। সে গিয়া দেখিত এমন হাজার দুই নানা সারিবন্ধ দণ্ডায়মান; বয়স বাইশ হইতে বিরাশি, মাথায় চার ফুট হইতে সাত ফুট, জাতিতে বাঙালী হইতে পাঠান—আর সবচেয়ে বেশি সাধু, সন্ন্যাসী পীর ফকিরের সংখ্যা। যে গেরুয়া এবং যে আলখাল্লায় জীবনের অনেক দুষ্কৃতি ঢাকা পড়ে, চিত্রগুপ্তের চোখে ধুলি দেওয়া যায়, সেই পোষাকই তো আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বভাবতঃই সাধু-সন্ন্যাসী আর পীর-ফকিরের সংখ্যাই কিছু অধিক। ইসাক সারিবন্ধ নানার সম্মুখ দিয়া সবেগে চলিয়া যাইত, তারপরে অদূরে দণ্ডায়মান জেনারেল সাহেবের নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিত হুজুর, তামাম ঝুটা।

সাহেব জেলারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিত খালাস দো।

নানার দল ছুটি পাইত, কিন্তু জেলখানা কখনো খালি হইত না, কারণ পাকেচক্রে যাহারা চৌবাচ্চার অংক কষিয়াছে তাহারা জানে এক নলে জল বাহির হইতেছে, আর এক নলে ঢুকিতেছে, ফলে চৌবাচ্চা যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণই থাকিত। আর একদল নূতন নানা আসিয়া জেলখানা ভরিয়া তুলিত।

আর এক কারণে সাহেব মহলে ইসাকের ডাক পড়িত। বিদেশী অতিথি আসিলে নানার কাহিনী শুনিতে চাহিলে ইসাক ছাড়া আর কে শুনাইবে? একদিনের কথা বলি। সেদিন দুইজন বিদেশী অতিথি আসিল, একজনের নাম মশিয়ে লাবোলিন, সে ফরাসী, আর একজনের নাম মিস্টার জর্জ, সে ইংরাজ। দুজনেই দেশে থাকিতে পুস্তকে ও পত্রিকায় নানার কাহিনী পড়িয়াছে।

ড্রয়িংরুমে বসিয়া লাবোলিন ও জর্জে নানার বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, অদূরে, বিনীতভাবে ইসাক দণ্ডায়মান। সে একবার মশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসে, আর একবার মিস্টারের দিকে তাকাইয়া হাসে, মিস্টারের প্রতি প্রযুক্ত হাসিটি প্রশস্ততর, কারণ যদিচ হোটেলের অতিথি হিসাবে দুজনেই সমান আদরণীয় তবু মিস্টার যে রাজবংশীয়, তাহার রাজপ্রাপ্য তো মশিয়ের সমান হইতে পারে না।

মশিয়ে বলিতেছে, মিস্টার নানা সম্বন্ধে আমার ধারণা কি জানেন? কাশ্মিরী শিল্প পোষাক গায়ে পালংখানা চটি পায়ে গদির উপরে গড়াচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে দুজন খুপসুরৎ মেয়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখা দুলিয়ে বাতাস করছে, আর বালজাকের Droll

Stories পড়বার ফাঁকে ফাঁকে পায়ের কাছে অর্ধশায়িত অর্ধনগ্ন ইরাণী মেয়ে দুটোকে মাঝে মাঝে সে চিমটি কাটছে। এমন সময়ে একজন সিপাহী সঙীনের ডগায় বিঁধিয়ে নিয়ে এলো একটা ইংরাজ শিশুকে, সেটাকে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর কোলের মধ্যে থেকে একটা মিশরীয় বেড়াল লাফিয়ে পড়ল, ছেলেটাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্যে সে নাক-টেপা চশমাটা পরে নিল, তাড়াতাড়ি উঠ্‌বার সময়ে সেটা খুলে প'ড়ে গিয়েছিল।

মশিয়ে ইসাকের দিকে তাকালো, ইসাক মাথা ঈষৎ নত ক'রে একবার হাসলো।

কিন্তু জর্জের সে রকম মনোভাব নয়। সে বল্‌ল, মশিয়ে নরকের সেই কীট-টা সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। কি রকম বলবো !—Guy Fawkes' Dayতে Guy Fawkes-এর যে মূর্তিটা আমরা দাহ ক'রে থাকি অনেকটা তারই মতো Nana-র (মিষ্টার কৃত উচ্চারণ ন্যান্যা) চেহারা, তবে আরও ভীষণ, কেননা, প্রাচ্যদেশের চেহারা স্বভাবতঃই কুৎসিত। তার মাথাটা প্রকান্ড একটা হাঁড়ির মতন, লেখাপড়া কিছুই জানে না, কোন অনুচরের উপরে রেগে গেলে তখনই পদাঘাতে তাকে নিকেশ ক'রে ফেলে, আর তার প্রিয় খাদ্য শিশুদের লিভার। আর রোজ রাত্রিবেলা সে কুমারী মেয়ের হৃৎপিন্ডের চাটনি খায় স্বাভাবিক শক্তি অর্জনের আশায়! Oh a veritable monster!

মিষ্টার ইসাকের দিকে তাকাইবামাত্র ইসাক মাথা আরও একটু নত করিয়া প্রশস্ততর একটি হাসি হাসিল।

কিন্তু মিষ্টার মশিয়ে নয়, হাসির প্রকৃত মূল্য না দিয়াই সে বলিয়া উঠিল a peg!

মিষ্টার নিজের বর্ণনার চাপে নিজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দুটি পেগ মিষ্টার ও মশিয়ের যথাস্থানে গমন করিলে মশিয়ে বলিল—ইসাক, তুমি তো জানতে নানাকে, বল তো সে কেমন ছিল!

ইসাক দুজনের দিকে তাকাইয়া দুবার হাসিয়া লইয়া আরম্ভ করিত, সাহেব, আপনাদের কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তব পারবে কেন? যে সব গুণের আপনারা উল্লেখ করলেন হতভাগ্য নানার সে-সব কিছুই ছিল না। সে নিতান্ত সাদামাঠা লোক, বেঁচে থাকলে বয়স এতদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝে হ'ত, রঙ কালো, কারণ যে-সব লোক ইউরোপের বাইরে জন্মেছে আপনাদের চোখে তারা সবাই কালো, মোটাসোটা দোহারা চেহারা; খেতো চাপাটি আর ডাল, তা-ও আবার অনেক সময় স্বহস্তে তৈরি ক'রে। তার হারেমে অবশ্য অনেক স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু সেটা তাদের অন্যত্র যাবার ইচ্ছার অভাবে। ফরাসী ভাষা দূরে থাক, ইংরাজি ভাষাও জানতো না বললেই হয়। আর নাকটেপা চশমা! তার এজেন্ট আজিমুল্লা খাঁর একজোড়া কানে পরানো চশমা ছিল বটে!

এই বলিয়া সে মিষ্টার ও মশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিল, ভাবটা এমন যে, আপনাদের বর্ণনাই ঠিক।

মশিয়ে বলিল, 'হাউ ট্রুথফুল', অর্থাৎ তোমার বর্ণনা শুনে মনে হয় সে ছিল তোমার মতোই দেখতে।

মিষ্টার বলিল, All orientals are liars' অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় সত্য গোপন করবার চেষ্টা করছ।

ইসাক দুজনের কথাতেই এমনভাবে হাসিল, যেন বলিল, আপনারা দুজনেই সমান সত্য কথা বলিয়াছেন।

এমন অপরিসীম ধৈর্য, কৌশল, মানব-চরিত্রজ্ঞান ও বুদ্ধি ইসাকের। মামুদের কথাই ঠিক, তুচ্ছ সোনার দামে ইসাকের দাম! সত্যই ইসাকের তুলনা হয় না।

(২)

১৮৬৪ সালে উত্তর ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাহার একটি বাস্তব ফল হইল যে, নানাসাহেবের সংখ্যা অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। আগে শতে শতে ধরা পড়িত, এখন হাজারে হাজারে ধরা দিতে লাগিল। আগে আসামী খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত, এখন আসামী সরকারী লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া ধরা দেয়। আগে সাধু ফকিরের সংখ্যাই বেশি ছিল, এখন গৃহীর সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিল। গৃহীর খাদ্যাভাব, সাধু ফকিরের ভিক্ষার অভাব। সকলেই জানে যে, হাজতে রাখিলে খাইতে দেয়, আরও শুনিয়াছে যে, একবার আসামী বলিয়া সনাক্ত হইতে পারিলে পুলিপোলাও চালান হইবে তখন আর খাওয়া-পরার চিন্তা করিতে হইবে না। সকলেই ভাবে, আহা এমন সৌভাগ্য কি হইবে, যে পোড়া কপাল!

একদিন সকালে সীতাপুর থানায় জন-কয়েক নানা আসিয়া উপস্থিত হইল, হাঁকিল, কইগো দারোগা সাহেব, আমাকে গ্রেপ্তার করো, আমি নানাসাহেব। দারোগা আসিয়া দেখিল অনেকগুলি উমেদার। সে বলিল, এক সঙ্গে এতজন তো নানা হ'তে পারে না।

নইলে নানা বলেছে কেন? একজন হ'লে তো একখানা বলিত।

দারোগা খোঁজ করিয়া জানিল যে, লোকটি পাঠশালার পন্ডিত। বলিল, নইলে আর এমন বুদ্ধি হয়!

তোমার অত বিচারে কাজ কি! তুমি সকলকে চালান দাও, যার ভাগ্যে আছে নানা সাহেব হবে।

দারোগা বিরক্ত হইয়া বলিল, গ্রেপ্তার করতে নিষেধ আছে।

পাঠশালার পন্ডিত বলিল, ওঃ বুঝেছি, কেউ বুঝি দু' পয়সা খাইয়েছে।

দেখো ও সব কথা বললে আইনে পড়বে।

আরে সেই ভরসাতেই তো বলছি। যে-কোন একটা ধারায় গ্রেপ্তার করো।

দারোগা কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিশুদ্ধ দেবভাষায় বলিল, 'অয়ম্ অহম্ ভো'—অর্থাৎ আমি নানাসাহেব, গ্রেপ্তার করো।

দারোগা বলিল, তুমি তো সন্ন্যাসী।

বটে? সন্ন্যাসীর কি এমন হাতের গুলি হয়?

এই বলিয়া বাহুর গুলি পাকাইয়া দারোগার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, বলিল টিপিয়া দেখো, হাতের গুলি, না লোহার গুলি!

দারোগা বলিল—আমি কি করবো ঠাকুর, এরাও যে উমেদার, এই বলিয়া গৃহীদের দেখাইয়া দিল।

তখন 'তবে রে শালে বুরবক' বলিয়া সেই বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী লাঠি তুলিয়া গৃহীদের তাড়া করিল, তাহারা সামান্য গৃহীমাত্র, প্রাণের দায়ে নানাসাহেব পদের উমেদার হইলেও প্রাণের মায়া এখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা পলাইল।

তখন সন্ন্যাসীর অনুকূলে নানাসাহেব পদ সাব্যস্ত হইয়া গেল। থানার বারান্দায় সে দিব্য জমাইয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে দারোগাকে আদেশ করিল, এ বেটা আভি নানাসাহেবকো খিলাও।

উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেক পুলিশ থানাতেই প্রত্যহ এমন দৃশ্যের অভিনয় হইত। আর এই সব নানার ধারা যে মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইত সেই কানপুর সহরের দৃশ্য উপভোগ করা সহজ হইলেও বর্ণনা করা সহজ নয়। জেলখানার নিকটবর্তী পাঁচ সাতটি বড় বড় বাড়ী ভর্তি হইয়া গিয়া এখন খোলামাঠে তারের বেড়া খাটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া নানার দল জেনারেল সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছে ও খরচাটা নাই করিলেন, আমরা পালাইবার জন্য আসি নাই। তাহারা আরও বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, তাহারা মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশবা, কাজেই আহার্যাদির সেই অনুপাতে ব্যবস্থা করা বৃটিশ রাজের পক্ষে উচিত হইবে, পেশবা এখন গদিচ্যুত হইলেও এক সময়ে রাজা তো ছিল বটে!

জেনারেল সাহেব জেলারকে ডাকিয়া শুধাইল হঠাৎ নানার সংখ্যা বেড়ে উঠবার হেতু কি?

জেলার বলিল এতদিনে সরকারী মেশিন বেশ চালু হয়েছে কিনা!

জেনারেল সাহেব বলিল—হুম্! জেলারের খাস মুন্সী মুখুজ্জে বলিল, সাহেব, খালা-বন্দ করে দিন, নানার দল পালাবে।

জেলার বলিল, তা কেমন করে হবে? সনাক্তকরণ না হলে কাউকে ছাড়তে পারিনে।

পরিবর্তিত অবস্থায় এখন সপ্তাহে তিনদিন সনাক্তকরণ হয়, ইসাকের কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ভোরবেলা সনাক্তকরণ আরম্ভ হইয়াছে। জেনারেল সাহেব, সিভিল সার্জেন্ট, ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপার ও বিশেষজ্ঞগণ হাজির আছে। জেলার ও ইসাক সনাক্তকরণে অগ্রসর হইয়াছে।

ইসাক একটা লোকের কাছে একটু থামিতেই তাহার মুখ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, আমিই, মিঞা সাহেব, আমি।

তুমি কি বিবিদের হত্যা করেছিলে?

নিশ্চয়ই। এখন চালান না দিলে অতঃপর বাবাদেরও সাবাড় করবো।

না! তুমি নও।

তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইল জানিবামাত্র লোকটি বুক চাপড়াইয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল মহারাণীর দোহাই লাগে জেলার সাহেব, আমি সেই বাংলা মুল্লুক থেকে আসছি। মামলায় আর বন্যায় আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি।

রেলগাড়ীতে টিকিট কিনবার পয়সা অবধি ছিল না, নানা বলতেই চেকারবাবু ছেড়ে দিলে। বড় ভরসা করে এসেছি সাহেব, এখন তোমরা ঠেললে দাঁড়াই কোথায়?

পাশেই জনকতক হরখাস্ত বাঙালী উমেদার ছিল। তাহারা বলিল, কান্নাকাটির যুগ নয় ভাই, চলো সঙ্গে সঙ্গে গণবিক্ষোভ করি. অমনি সঙ্গে ঢোলের সঙ্গে কাঁসীর মতো দু' চারজনের 'প্রায়োপবেশন' করাও সঙ্গত হবে।

একজন বলিল, আহা, আর কাঁসীর সঙ্গে শানাইয়ের মতো সঙ্গে একখানা সংবাদপত্র থাকলে আজ কি দুশো মজাই না হতো।

অপর একজন বলিল, দেখতাম কেমন ওরা বাংলাদেশের দাবী অগ্রাহ্য করে। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া 'বাংলার দাবী মানতে হবে অবাঙালী নানা চলবে না' প্রভৃতি আওয়াজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে সনাক্তকরণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, যাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইতেছে তাহারা নীরবে বিনয়ভাবে চলিয়া যাইতেছে, বাঙালী নয় বলিয়া গণ-বিক্ষোভ বাধাইতেছে না।

এমন সময়ে এক জায়গায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ইসাক অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, একজন মুসলমান ফকির ও একজন হিন্দু সন্ন্যাসীতে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। ফকির বলিতেছে যে, সে নানাসাহেব আর হিন্দু বলিতেছে যে, সে নানাসাহেব। আর উভয়পক্ষে কিল, ঘুষি চলিতেছে। ভাগ্যে তখন সমাজ-চৈতন্য এখনকার মতো প্রবল হইয়া ওঠে নাই নতুবা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া যাইত।

ইসাক বলিল, বাপু তোমরা কেহই তো নানাসাহেব নও।

বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ? দেখতে পাও না?

আমি নানাসাহেব নই বলে কি তোমার বাপ নানাসাহেব? ইসাক বিরক্ত হইয়া বলিল, স্বীকার করছি বাপু, আমিই নানাসাহেব। এবারে হলো তো?

চাঁদ আর কি। নানাসাহেব তো হলে এসেছ সনাক্ত করতে।

সে বিষয়ে নানাসাহেবই তো সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

জেলার সাহেব কাছেই ছিল। সে 'পড়ুকশী বাবা উটমরূপে শিকস্যা' করিয়াছে, ইসাকের wit দেখিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, বহুৎ আচ্ছা।

তবে রে বেটা অলপ্পেয়ে। দাবীদার দুই জনেও ইসাকের পিঠ চাপড়াইতে অগ্রসর হইল, তবে তাহার রকমটা ভিন্ন।

তাহারা দুইজনে একসঙ্গে ইসাককে আক্রমণ করিল।

বল্, আমি নানাসাহেব। দেশে ভাত ভিক্ষে মেলে না আবার বলে কিনা নানাসাহেব নই। অপরে বলিল, আমার চৌদ্দপুরুষ নানাসাহেব।

ইসাক প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিল। সেদিনের মতো সনাক্তকরণ প্যারেড শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ইসাক জেনারেল সাহেবকে বলিল, হুজুর, আমাকে এবার ছুটি দিন। এমন করে মার খেতে আর পারিনে।

বলো কি ইসাক! তুমি না থাকলে নানাকে ধরবো কি করে? দেখছ তো সরকার কত খরচ

পড়ুয়া — অরবিন্দ দত্ত

করছে। না, না, তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেওয়া চলবে না. তারচেয়ে তোমার সঙ্গে দুজন পাঠান বডিগার্ড দেবো।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে একজন ভদ্রলোক ও একজন স্ত্রীলোক মামুদের হোটেলে ঢুকিয়া ডাইনিং রুমে গিয়া বসিল। ভদ্রলোকটির পরনে সাহেবী পোষাক, আর স্ত্রীলোকটির পরনে মেম সাহেবের পোষাক। গায়ের রঙ দেখিলে তাহাদের পুরো ইংরাজ মনে হয় না, হয়তো বা ইউরোপীয়ান হইবে।

ভদ্রলোকটি বলিল, তোমার পরামর্শে এলাম, এখন বিপদে না পড়ি। স্ত্রীলোকটি বলিল, ইসাকের চোখে পরীক্ষা না হলে বুঝবো কেমন করে? এ বিষয়ে ঐ লোকটাই তো বিশেষজ্ঞ। দেখো না সরকার ওকে কত যত্ন করে পুষেছে।

যদি ধরে ফেলে?

পাগল নাকি। আমি বলছি ধরতে পারবে না। মেয়েদের অশিক্ষিত পটুত্বের খ্যাতি শোনোনি কি? তাছাড়া বিপদের ভয় তো আমারও আছে।

আচ্ছা তাহলে ওকে ডাকি।

পুরুষটির আহ্বানে ইসাক আসিলে দুজনের মতো খাবার আনিতে হুকুম করা হইল।

ইসাক সেলাম করিয়া খাবার আনিতে গেল।

দেখলে তো ধরতে পারেনি।

তাইতো মনে হচ্ছে।

ইসাক খাবার আনিল। দুজনে হৃষ্ট মনে খাইল। তারপরে দাম চুকাইয়া দিয়া ইসাককে কিছু বকশিশ দিল পুরুষটি।

ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম আজি-মুল্লা খাঁ।

বলে কি! শুনিবামাত্র পুরুষ ও স্ত্রী-লোকটির মুখ শুকাইয়া গেল।

পুরুষটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও স্ত্রী-লোকটি প্রত্যুৎপন্নমতিতে বলিল, যাও দু' পেগ মদ নিয়ে এসো।

সে চলিয়া যাইবামাত্র পুরুষটি বলিল, বলেছিলাম ধরে ফেলবে। চলো এখনি পালাই।

স্ত্রীলোকটি বলিল, লোকটা সারাদিন ঐসব নাম ভাবছে, তাই ভুলে বলে ফেলেছে। দেখবে এর পরে হয়তো নানাসাহেব বলেই সেলাম করে ফেলবে। তাছাড়া পালাবেই বা কোথায়? হোটেলের বাইরেও তো ইংরাজের রাজত্ব।

এমন সময়ে ইসাক দু পেগ মদ লইয়া আসিল।

দুজনে পান করিল। এবারে মেয়েটি দাম চুকাইয়া দিয়া বকশিশ দিল।

ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম জুবেদা বিবি।

নাঃ আর সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। ইসাক দুজনকেই চিনিয়া ফেলিয়াছে। ভয়ে তাহাদের মুখ পাংশু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারিল না।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ইসাক মুখে সেই সর্বজয়ী হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আজি-মুল্লা খাঁ, জুবেদা বিবি, আপনারা ভয় পাবেন না। সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে এসেছেন, এখানে নির্ভয়ে থাকুন, কেউ আপনাদের চিনতে পারবে না।

মেয়েটি বলিল, তুমি চিনলে কি করে?

ইসাক বলিল, আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি আপনাদের কাজ? আমি যে নানা-সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

পুরুষ ও রমণী যুগপৎ শুধাইল কিন্তু তুমি কে? এবারে ইসাক তাহাদের কাছে আসিয়া, কণ্ঠের স্বর অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমিই নানাসাহেব।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার কোন কর্তব্য কর্ম নাই, আমার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য বস্তু কিছু নাই, তথাপি আমি লোক-কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থাকি। কর্ম ত্যাগ করি নাই। আমি যদি অনলস হইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথেরই অনুবর্তী হইবে, অলস হইয়া কর্মত্যাগ করিবে। অতএব "হে পার্থ!—

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যান্ কর্তুমর্হসি।"

চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেকের জন্য ত কর্ম করিতেই হইবে—অন্ততঃ দেহযাত্রা নির্বাহের জন্যও কর্মের প্রয়োজন। দেহযাত্রা নির্বাহের জন্যও যদি কর্মের প্রয়োজন না হয়, অন্ততঃ লোক-সংগ্রহের জন্য সৎকর্মসাধনের প্রয়োজন।

লোক-সংগ্রহ বলিতে বুঝায়—লোকের কল্যাণসাধন—মানুষকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করা বা স্বকর্মে ও স্বধর্মে প্রবর্তিত করা। ইহার অর্থ আরো বিশদ করিলে বুঝায় সাধারণ লোককে আশ্বস্ত করা, অভয় দান করা, তাহাদের মনে অস্বস্তি, অশান্তি, হিংসা, দ্বেষ, অসন্তোষ দূর করা, তাহাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা দান, তাহাদের মন হইতে হীনতা দীনতাজনিত গ্লানি অপনোদন, তাহাদিগকে কর্তব্যনিষ্ঠ করিয়া তোলা এবং তাহাদের প্রতি মমত্বের বিস্তার। বিশেষ করিয়া কর্মকুণ্ঠদের কর্মে প্রবর্তিত করা।

কেবল মুখের উপদেশ বাণীতে ইহা সম্ভব নয়। 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাইতে' হইবে। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটি গল্প আছে। মহারাজ সংবরণের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টির ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে না পারিয়া সংবরণ সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র কুরুকে প্রথম যৌবনেই রাজ্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে হইল। মহারাজ কুরু দেখিলেন দুর্ভিক্ষের কারণ কেবল অনাবৃষ্টি নয়, প্রজা-সাধারণের বিশেষতঃ কৃষকদের কর্মকুণ্ঠতা। এই কর্মকুণ্ঠতার জন্য বৎসরের খাদ্য যতটা ততটা ছাড়া তাহারা উৎপাদন করে না। সেজন্য শস্য সঞ্চিত থাকে না, অনাবৃষ্টি হইলে সঞ্চিত শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি দেখিলেন উপদেশের দ্বারা কর্মকুণ্ঠতা দূর করা যায় না, আইনের দ্বারাও নয়, কঠোর শাসনের দ্বারাও নয়। তাহা ছাড়া, বহু লোক কৃষিকে নীচ কাজ মনে করিয়া চাষ করে না। বসিয়া বসিয়া খায়, চাষীদের উপরই নির্ভর করে। এই-সব চিন্তা করিয়া মহারাজ কুরু নিজে লাঙ্গল কাঁধে একজোড়া বলদ লইয়া মাঠে গিয়া চাষ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল ফলিল। কৃষকদের ত কথাই নাই, দেশের সকলেই চাষ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা স্বয়ং যখন মাঠে চাষ করেন তখন প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বিচার না করিয়া ইতর-ভদ্র সকলেই চাষে লাগিয়া গেল। ইহাতে শস্য উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষের ভয় আর থাকিল না। বলা বাহুল্য, কুরুরাজ রাজকার্য ছাড়িয়া সারাদিন মাঠেই থাকিতেন না। তিনি লোক-সংগ্রহের জন্য, কৃষিকর্মের হীনতার গ্লানি দূর করিবার জন্য এবং কর্মে প্রবর্তনার জন্য কিছুকাল অথবা মাঝে মাঝে সকলের সঙ্গেই শ্রম করিতেন। কুরুরাজের এই আদর্শ সর্বযুগে সর্বদেশে অনুকরণীয়।

কুরুরাজের কর্ষিত ক্ষেত্রের নামই কুরুক্ষেত্র। ইহাই ভারতের ধর্মক্ষেত্র। এই লোক-সংগ্রহের জন্যই মহাত্মা গান্ধী ফকির সাজিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। ভোগ-শক্তিরও অভাব ছিল না। সারা দেশ দরিদ্র বলিয়া, তিনি দরিদ্র সাজিয়া অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোক-সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টসাধনের জন্য নয়। জাতিকে স্বাধীনতার পথে, কল্যাণের পথে, সৎপথে প্রবর্তিত ও পরিচালিত করিবার জন্য। ধনেমানে সমৃদ্ধ ভোগাসক্ত বাগ্মী রজোগুণোপেত ব্যারিষ্টার বা ব্যবসায়ী হইয়া দরিদ্র দেশের লোকের সর্বাঙ্গীণ ইষ্টসাধন করা যায় না, একথা তিনি বুঝিতেন। তাই তিনি কেবল নিজে নয়, নিজের চেয়ে সমৃদ্ধতর জনকল্যাণকামী মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জনের মত গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও জনসাধারণের সমতলে নামাইয়াছিলেন। সকল দেশে লোক সংগ্রহের পদ্ধতি একরূপ নয়। ভারতবর্ষে যে পদ্ধতি চিরপ্রচলিত এবং সম্পূর্ণ উপযোগী সেই পদ্ধতিই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তিনি যে তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন তাহা অর্থাভাবে নয়, লোক-সংগ্রহের জন্য। দেশের অধিকাংশ লোক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই যে ভ্রমণ করে।

দেশের লোককে "চরকা কাটো" এই উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। নিজে সহস্র গুরুতর কার্যের মধ্যেও চরকা কাটিতেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও চরকা কাটার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে চরকা কাটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার, যদি বাচ্যার্থে লওয়া যায়। ইহাকে লক্ষ্যার্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার লক্ষ্যার্থ অলস কর্মবিমুখকে কর্মে প্রবর্তনা ও পরোপজীবীকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আহ্বান। ইহার ব্যঙ্গার্থ আরও গভীর, ইহার সহিত জড়িত আছে বিলাস বর্জন, একনিষ্ঠতা সকলের সহিত একলক্ষ্যে সহযোগিতা—জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদা বোধ ইত্যাদি অনেক কিছু।

সাধারণভাবে ইহা অত্যন্ত সহজ পথে কর্মে প্রবর্তনার জন্য আহ্বান। চরকা একটি অনায়াসায়ত্ত কর্মোপকরণ। যে কোনও কর্মোপকরণ ইহার অনুকল্প হইতে পারে। ইহা ছিল মহাত্মার লোক-সংগ্রহের উপকরণ মাত্র। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে আচরণ করেন, সাধারণ লোকেরা তাহারই অনুবর্তন করে। দেশের লোককে কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক সোপানে আহ্বান করিবার জন্য তাই তিনি নিজে চরকা কাটিতেন এবং দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরকা কাটিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাইয়াছিলেন। ইহাই লোক-সংগ্রহের ভারতীয় পদ্ধতি। এইভাবে লোক-সংগ্রহের প্রয়োজন দেশে চিরদিন ছিল। ভবিষ্যতে থাকিবে। বর্তমান সময়ে সব চেয়ে ইহার প্রয়োজন প্রত্যেক সংসারে, প্রত্যেক সমাজে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে—বিশেষ করিয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে। স্বাধীনতা লাভের আগে যতটা প্রয়োজন ছিল, এখন তাহার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন হইয়াছে।

ছোট ছোট ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা তাঁহাদের আচরণের দ্বারা তাঁহাদের অনুবর্তী নর-নারীগণের আচরণ ও কল্যাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। খনার বচনে আছে—"খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়"। বচনটি কৃষিকার্যের জন্য উক্ত হইয়াছিল। জমির মালিক যদি শ্রমের মর্যাদা স্বীকার করিয়া আত্মাভিমান ও আলস্য বর্জন করিয়া শ্রমিকদের সঙ্গে খাটে—তবে সে দ্বিগুণ পায়। বলা বাহুল্য, যাহারা সঙ্গে খাটে তাহারাও ভাগ পায়। লোক সংগ্রহের এই পদ্ধতি প্রত্যেক সংসারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য। পারিবারিক জীবনে, পরিজন, দাস-দাসী, জাতীয় প্রতিষ্ঠানে, সভ্য, সদস্য, কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট লোকদের পরিতুষ্ট, কর্তব্যনিষ্ঠ, পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীবন্ধ ও সংহত রাখিতে হইলে, অধিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষকে তাহাদের সঙ্গে সমভাবে শ্রম করিতে হইবে। কেবল তাহাই নয়, যতদূর সম্ভব তাহাদের সঙ্গে বৈষম্য ও ব্যবধান লুপ্ত করিয়া সমসুখদুঃখভাগী হইয়া চলিতে হইবে। সকলের চেয়ে অধিক সুযোগ সুবিধা সম্ভোগ বা অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণের সমর্থনের জন্য গোপনে নয় প্রকাশ্যেই ক্লেশ স্বীকার বা শ্রম জলপাত করিতেই হইবে। নতুবা অসন্তোষের সৃষ্টি অনিবার্য। বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিলে লোকের কাছে জবাবদিহি দিতেই হইবে। সকল যুগেই সে কৈফিয়ৎ দিতে হইত, বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগে দিতে হইবেই।

দেশের শ্রেষ্ঠ লোক বলিতে সাধারণ লোকে বুঝে—ধনী ব্যক্তিগণ, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ও পদস্থ ব্যক্তিগণ।

ধনী ব্যক্তিরা যদি লোক-সংগ্রহ করিতে চান—তবে তাঁহাদের ধন-সম্ভোগ করিতে হইবে গোপনে কিংবা বিদেশে স্বতন্ত্র সমাজে। দারিদ্র্য-দেশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখানো হৃদয়হীনতা। এখন আর ইংরাজ রাজত্ব নাই। ইংরাজদের সঙ্গে সমান স্তরে ধনীদের গণ্য করার দিন আর নাই। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার ফ্রান্সের অবস্থা স্মরণ করা উচিত। প্রত্যেক ধনীর দরিদ্রদের মধ্যে অপচয়মূলক সমারোহ ও ঘটা দেখানোর লোভ সংবরণ করা উচিত। লোক-সংগ্রহের জন্য যদি তাহারা স্বেচ্ছায় তাহা না করে—রাষ্ট্রীয় বিধানের দ্বারা তাহা করাইতে হয়। ইহাতে কণা কণা করিয়া দরিদ্রগণের হৃদয়ে বিদ্বেষ সঞ্চার হইতে থাকে। পোষাক পরিচ্ছদে এখন আর ধনীরা প্রকাশ্যে বেশী আড়ম্বর দেখান না। বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে

● পথে বেশভূষার বিলাসিতা বাড়িয়া গিয়াছে। দরিদ্র রমণীরা ইঁহাদের 'শ্রেষ্ঠ' মহিলা বলিয়া মনে করিয়া অনুবর্তন করিতেছে। ধনীদের যানবাহনই রাজপথে রাজত্ব করে। যদি মাঝে মাঝে তাহারা পায়ে হাঁটিয়া চলেন অথবা ট্রামে-বাসে আরোহণ করেন, ইণ্টার ক্লাশের ট্রেণে ভ্রমণ করেন—তাহা হইলে লোক-সংগ্রহের কাজ কতকটা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আড়ম্বরের মধ্যে কতকটা লোককল্যাণ জড়িত আছে। সে জন্য দরিদ্র দেশে ইহা বিসদৃশ হয় না। কিন্তু বৈবাহিক অনুষ্ঠানের সমারোহের সংযম প্রয়োজন লোক-সংগ্রহের জন্য। বর্তমান যুগে রাজপথের যান চলাচল বন্ধ করিয়া বরের শোভাযাত্রা অত্যন্ত অশোভন, অপরাধ বলিয়াই গণ্য। আড়ম্বরময় শোভাযাত্রার দৃশ্য দর্শনের অবসর বা মনোভাব অনেকেরই নাই। কন্যার বিবাহে বিবাহ সভায় যৌতুক উপহার ও বিলাস দ্রব্যাদির প্রদর্শনী খুলিলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত আত্মীয়, বান্ধব ও পরিজনদের আমন্ত্রণ না করাই উচিত। মধ্যবিত্তেরা ধনীদের আচরণের অনুবর্তন করে বলিয়াই বিপদ। প্রকাশ্যে ঐশ্বর্যের ঘটা না দেখাইলেও ধনের বিনিয়োগের বহু ক্ষেত্র আছে। তাহাদের বৈঠকখানা, অন্তঃপুর, পাকশালা ইত্যাদিতে ধনের বিনিয়োগ হইলে লোক-সংগ্রহে ক্ষতি হয় না। বহু প্রতিপাল্য পালন, সন্তানদের শিক্ষা, বিদেশে ভ্রমণ, বহু ব্যয়সাপেক্ষ সুচিকিৎসা, স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যানুকূল স্থানে বাস, বহু পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া গ্রন্থশালা গঠন, উদ্যান রচনা ইত্যাদি বহু ব্যাপার আছে, যাহাতে লোকের অগোচরে ধনের সদ্ব্যবহার হইতে পারে। দশ হাজার বিজলী বাতির আলোকে দরিদ্র দেশবাসীর চোখই ঝলসায়, চোখ টাটায়, একটুও মানসিক অন্ধকার দূর হয় না। মোটকথা, ধনীরা যদি ধনসম্ভোগ ও বিলাসের আড়ম্বরটা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রদর্শন না করেন তাহা হইলেও জাতির কল্যাণ হয়।

তারপর বিদ্বজ্জনের কথা। ইঁহারাও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইঁহারাও যদি ধনীদের অনুকরণ করেন, ইঁহারা যদি বিলাসী হন, চরিত্রহীন হন, সুরাপায়ী হন, দাম্ভিক হন, চক্রান্তকারী হন, সুবিধাবাদী হন, ধনী পদস্থ ব্যক্তিদের স্তাবকতা করেন তাহা হইলে লোক সংগ্রহে ব্যাঘাত জন্মে। দেশের লোক ধনীদের চেয়ে চরিত্রের দিক হইতে বিদ্বানদেরই অনুকরণীয় মনে করে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে ইতিহাসের মত সত্য বলিয়াই জানে। এই দুই মহাকাব্যে দৈবীশক্তিসম্পন্ন নরনারী ও রাজপুত্র রাজনন্দিনীদের অদৃষ্ট বিপর্যয় ও অশেষ দুঃখ-কষ্টের কাহিনী পড়িয়া তাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা পায়—পরম দুঃখও তাহাদের সহনীয় হইয়া উঠে। যাহারা সৌভাগ্যবান ও কৃতবিদ্য তাহারাও যদি সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া মাঝে মাঝে দুঃখ-ক্লেশ স্বীকার করে তবে ঐরূপ সুফলই হয়। সাধারণ নরনারী তাহাতে আশ্বস্ত হয়, কর্মে তাহারা উৎসাহিত হয়, তাহাদের মন হইতে দীনতা ও হীনতার গ্লানি দূর হয় এবং তাহাদের শ্রম-ক্লেশ সহনীয় হইয়া উঠে।

অনেক সময়ে দেখা যায়, সাধারণের পক্ষে হিতকর কিন্তু অমর্যাদাকর ক্লেশকর কিংবা হীন বলিয়া গণ্য কাজে লোকে কিছুতেই আগাইতে চায় না। কিন্তু কোন সুশিক্ষিত যুবক পদস্থ ব্যক্তি কিংবা ধনী-সন্তান যদি অগ্রণী হয়, তাহা হইলে সকলেই পরমোৎসাহে সে কাজে লাগিয়া যায়। বলা বাহুল্য, কেবল কর্মে প্রবর্তনা দেওয়ার জন্য একবার মাত্র আগাইয়া নিবৃত্ত হইলেই চলে। বরাবর সহযোগী হইয়া উৎসাহিত করিলে-ত কথাই নাই। এইসব হইল লোক-সংগ্রহের অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত।

সাধারণ লোকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করে পদস্থ রাজপুরুষদের। তাঁহাদের সঙ্গে খুব বেশী-ব্যবধান থাকিলে তাহারা তাঁহাদের 'আপন জন' মনে করিতে পারে না। ইংরাজ ছলেবলে কৌশলে এদেশ জয় করিয়াছিল—দেশের ঐশ্বর্য পুরাদস্তুর ভোগ করিবার জন্য ইংরাজ রাজপুরুষদের বাসভবন, যানবাহন, আসন, ব্যসন, বেতন ইত্যাদি হইয়াছিল তাহাদেরই উপযোগী—রাজকীয় ও রাজসিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাহারা ছিল শাসক ও শোষক। স্বাধীন ভারতের রাজপুরুষেরা দেশের সেবক, জাতির প্রতিনিধি। ঠিক তাঁহাদের রাজকীয় বাসভবন, যানবাহন, বেতন, আসন, ব্যসনে যদি বর্তমান রাজপুরুষেরা অধিষ্ঠিত থাকেন তাহা হইলে দেশের লোকে মনে করিতে পারে, ইংরাজই চামড়া বদলাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাজপুরুষের একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকা উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিলাতী মতে বসন-ভূষণ, বেতন, আসন, ব্যসন, বাসভবন ইত্যাদির সমারোহ ও রাজশ্রীর উপর নির্ভর করিত রাজপুরুষের মর্যাদা। এখন ত তাহা নয়। এখন রাজপুরুষের মর্যাদা নির্ভর করে অনবদ্য সাধুতায়, দেশসেবার ঐকান্তিকতায়, অক্ষুণ্ণ কর্তব্য নিষ্ঠায়। দেশের লোকের সঙ্গে দেশসেবকদের এখন আর ঐশ্বর্যের ব্যবধান ইংরাজ আমলের মত থাকা উচিত নয়। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন—তাঁহাদের পুরস্কৃত করিবার দিন আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের পুরস্কারটি হওয়া উচিত ভারতীয় আদর্শে, বিলাতী আদর্শে নয়। বিশেষতঃ ভারতীয় আদর্শে যাঁহাদের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার কথা, বর্তমান যুগের পদ্ধতিতে যাঁহাদের কাশীবাস, বৃন্দাবন বাস বা মদিনা বাস করিবার কথা। ময়ূর সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাদের পরকাল (ইহকাল ত গতপ্রায়) নষ্ট না করাই উচিত।

রাজপুরুষেরা অতি সহজে বিনাব্যয়ে লোক-সংগ্রহ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোক এত অল্পে সন্তুষ্ট যে, শুধু একটু সৌজন্য, একটু শিষ্ট অনুদ্ধত আচরণ, একটু সহানুভূতির দ্বারাই সাধারণ লোককে তাঁহারা বশীভূত করিতে পারেন। অনেকের ইহাতেও কার্পণ্য আছে। লোক-সংগ্রহের অর্থ লোকের কল্যাণসাধন। লোকের কল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা উদ্‌গ্রীব, সকল দেশেই তাঁহারা একটা কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিতে চান। সেজন্য প্রয়োজন হয় ভোটের। অতএব বর্তমান যুগে লোক-সংগ্রহের অর্থ ভোট সংগ্রহও বটে, এই ভোট সংগ্রহ পদ্ধতি বিলাত হইতে আমদানী। যে দেশের আপামর-সাধারণ সকলেই শিক্ষিত, ভোট কাহাকে বলে তাহারা জানে,—ভোটের মূল্য কি,—অযোগ্য লোকে ভোট পাইলে কি বিপদ এবং যোগ্য লোককে ভোট দিলে কি সুবিধা তাহা ভালো করিয়াই তাহারা পাঠশালা হইতেই জানে। কারণ, বিদ্যালয় হইতেই তাহারা ভোটের সহিত পরিচিত। তাহাদের কাছে প্রার্থীর কেবল রাজনীতিক মতবাদ নয়, বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, সাধুতা, তেজস্বিতা, কর্মকুশলতা ইত্যাদিরই মূল্য অধিক। এদেশে ভোটের ব্যাপারে জেলা-বিচার আছে, জেল বিচার আছে, ধর্ম বিচার আছে, জাত বিচার আছে। সবচেয়ে বড় কথা যে ব্যক্তি নিজের অঞ্চলের লোকের কোন কল্যাণ করিয়াছে সেই-ই বিজয়ী হইয়া আরও কল্যাণ করিবার চেষ্টা করিবে আমাদের দেশের লোক সেই ভরসা করে। অতএব যে বন্ধুভাবে ভোটদাতাদের সঙ্গে কখনও মিশে নাই, তাহাদের আপনজন মনে করে নাই—হঠাৎ প্রার্থী হইয়া "আমাকে ভোট দাও" বলিয়া দাঁড়াইলে সে ভোট কেন পাইবে? বরং কোন অপরিচিত লোক সাধু সঙ্কল্প ও আশা-ভরসার তালিকা পেশ করিয়াও ভোট পায়। কিন্তু কোন পরিচিত লোক জীবনে কখনও কাহারও কল্যাণ না করিয়া প্রার্থী হইলে ভোট পায় না। মোট কথা, ছোট ছোট লোক-সংগ্রহের দ্বারাই বৃহত্তর লোক-সংগ্রহের অধিকার জন্মে। পাঁচ বৎসর পরে যে নির্বাচন হইবে— সে নির্বাচনে প্রতিনিধি পদপ্রার্থী হইতে হইলে এখন হইতে তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এখন হইতে জনসাধারণের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে,—অনুদ্ধতভাবে আত্মীয়জনের মত তাহাদের সঙ্গে মিশিতে হইবে এবং সকল সৎকর্মে তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে, তাহাদের দাবী ও ন্যায্য অধিকার লইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। তাহা হইলেই লোক-সংগ্রহ সার্থক হইবে।

আর একটি লোক-সংগ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়া আমার নিবন্ধ শেষ করি। বর্তমান সময়ে শিক্ষকগণের প্রতি ছাত্রদের স্বভাবতঃ কোন শ্রদ্ধা নাই। তারপর ছাত্রদের অভিভাবকরা শিক্ষকরা দরিদ্র বলিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহার পাঠনার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা থাকে না, ইহা কি তাঁহারা বুঝেন না? তাহাতে ছাত্ররা তথা তাহাদের মাতাপিতাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রগণের অভিভাবকদের যদি স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা না-ই জন্মায়, সন্তানদের কল্যাণের জন্য ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিয়া শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করার ভানও করা উচিত। শ্রদ্ধা অকপট না হইলেও, তাহা প্রদর্শনের অভিনয় করিলেও ছাত্ররা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। এই শ্রদ্ধার সুফল তাহারা পাইবেই। ইহাও এক শ্রেণীর লোক-সংগ্রহ।
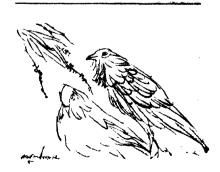
বাইরে। শরতের নির্মল সূর্যালোকে বনানী রৌদ্র সেবনে রত, গাছে গাছে রঙের খেলা। পাতা-ঢাকা ভিজে মাটির উগ্র উত্তেজক গন্ধে শরতের বাতাস ভরপুর।

ভিতরে। স্নানের ঘরের আলমারিটা থেকে পিছন ফিরতে একটা লোক ক্রুর হাসি হেসে ওঠে। আসে পার্বত্যডেরার বায়বহুল সেকেলে শয়নঘরে। তারপর পাইন কাঠের দেয়ালের গায়ে ছোট্ট কুঠুরিটায় ঢুকে পড়ে।

এ কুঠুরিটা তার একেবারে নিজস্ব, এর গায়ে স্প্রিং-এর তালা। এর মধ্যেই রাখে সে তার বন্দুক, গুলী বারুদ, ছিপ, বঁড়শি ও মদ। স্ত্রীকে পর্যন্ত এ কুঠুরির চাবি দেয় না। জাডসন ওয়েব নিজের এই সম্পত্তি এত ভালবাসে যে অন্য কোন হাত তা স্পর্শ করলে ক্ষেপে যায় একেবারে।

কুঠুরিটার দরজা খোলা রেখে শীতকালে চলে যাওয়ার জন্যে জিনিসপত্র গোছাতে থাকে জাডসন। কিছুক্ষণ পরেই সভাসমাজের উদ্দেশে যাত্রা করবে।

যে তাকে মদ রয়েছে সেদিকে তাকিয়ে ও যে হাসি হাসে তা মনোরম নয়। সব কয়টা বোতলের মুখ সীল করা, কেবল বার্বোর একটা বোতল সামনে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করছে সবাইকে, তার পাশে একটা হুইস্কির গেলাস। বোতলটা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী ভরতি। তাক থেকে সে সেটা নামিয়ে নিতেই পাশের শোবার ঘর থেকে তার স্ত্রী বলে ওঠে :

"আমার বাঁধাছাঁদা সব হয়ে গেছে জাডসন। জল বার করে চাবিগুলো নিয়ে নেবার জন্যে অ্যালেক আসেনি এখনো?"

সড়ক ধরে এক মাইল দূরে থাকে অ্যালেক। শহুরে ভদ্রলোকেরা যখন এখানে থাকে না, তাদের বাড়ীঘরের তদারক ও-ই করে।

"ও এখন লেকে নৌকোগুলো জল থেকে তুলে আনছে, বলেছে আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে।"

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে মার্সেলা এসে ঢোকে ভিতরে। স্বামীর হাতে বোতলটা দেখে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়।

"জাডসন", আঁতকে ওঠে মার্সেলা, "এই সকালেই মদ খাচ্ছ না ত?"

"আমায় অপমান করলে প্রিয়তমে", হেসে ওঠে জাডসন, "বোতলটা থেকে কিছুই বার করছি না আমি, শুধু এর মধ্যে কিছুটা আঘাত ভরে রাখছি।"

হাতের মুঠো খুলে সে টেবিলের উপর ছোট্ট দুটি সাদা বড়ি রাখে, তারপর হুইস্কির বোতলটা খুলতে সুরু করে। তাকিয়ে দেখতে চোখ ছোট হয়ে আসে মার্সেলার। জাডসনের এই কণ্ঠস্বরকে ও ভয় করতে শিখেছে, ব্যবসায়ের লেনদেনে যখন মতলব ভাঁজে তখন এই স্বরই বাজে ওর গলায়।

"গত শীতে এই কুঠুরির দরজা ভেঙে যে আমার মদ চুরি করেছিল, আমরা চলে গেলে এবারও হয়ত সে চেষ্টা পাবে", বলে চলে জাডসন। "তবে এবার তাকে ভাবতে হবে, চুরি না করলেই ছিল ভালো।"

বোতলের মধ্যে একটা একটা করে বড়ি ফেলে দিয়ে সেটা উঁচু করে একদৃষ্টে দেখতে থাকে জাডসন, কেমন করে গলছে সে দুটো। স্বামীর এই প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে মার্সেলার।

"ওগুলো কি?" প্রশ্ন করে মার্সেলা, "প্রবল নেশা ধরিয়ে দেবে বুঝি?"

"তাই কি?" সরস বার্বো কেমন করে মারাত্মক দাওয়াইয়ে পরিণত হচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে তা দেখতে থাকে জাডসন। "আজ পর্যন্ত এর লোকটাই সেটা বার করতে পারেনি। এবারের পেটে গেলেই—কালো পর্দা টানা হয়ে গেল।"

প্রতিহিংসায় ভরা বোতলের মুখে ছিপি এঁটে দিয়ে তাকের উপর হুইস্কির গেলাসটার পাশে সেটা রেখে দেয় জাডসন।

"কি সুন্দর, সব তৈরি", সায় দিয়ে বলে ওঠে, "এইবার চোরমশাই যখন দরজা ভাঙবে, প্রাণভরে খেয়ো, এতটুকু আপত্তি করব না আমি।"

নারী-মুখখানি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, "এ কাজ করো না জাডসন", হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মার্সেলা, "কি সর্বনাশ, এ যে খুন!"

"যে চোর জোর করে আমার বাড়ীতে ঢোকে তাকে গুলী করলে আইন তাকে খুন বলবে না।" কঠোর সুরে মন্তব্য করে জাডসন, "ইঁদুরের জন্যে বিষ ব্যবহারও বে-আইনী নয়। কুঠুরিতে ইঁদুর যদি দরজা কেটে ঢোকে, তারপর তার কি হবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।"

"কি করছ তুমি?" মিনতি করে মার্সেলা, "চুরির অপরাধে আইন মৃত্যুদণ্ড দেয় না; তোমার কি অধিকার—"

"আমার সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে আমার আইন আমিই করব।" হাড়ের টুকরাটা কেউ নিয়ে নিতে পারে এই ভয়ে কুকুরটা গোঁ গোঁ করছে যেন।

"একটু মদ চুরি করবে বই-ত নয়," অনুনয় করে মার্সেলা, "হয়ত কোন দামাল ছেলে। কতটুকু ক্ষতি করছে সে?"

"তাতে কি যায় আসে," বলে জাডসন, "যে আমাকে ধরে পাঁচ টাকা কেড়ে নেয়, একশো টাকা কেড়ে নেওয়ার চেয়ে কম বিরক্তি সৃষ্টি করে না সে। চোর—চোর।"

একবার শেষ চেষ্টা করে মার্সেলা, "আবার বসন্ত না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে আসব না। এখানে যে সর্বক্ষণ মারাত্মক ফাঁদ পাতা রইল—

(শেষাংশ ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নতুন মৎস্যকন্যার কাহিনী

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গোড়াতেই বলে রাখি যে, আমি মৎস্য-কন্যার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না—যদিও জানি, আপনারা অনেকেই তা করেন এবং আমাদের কামাখ্যাবাবুর মতো দু-একটা মৎস্য-কন্যা দেখেছেন বলেও হয়ত দাবী রাখেন। কাজেই একটু ভয়ে ভয়েই আমার কথা আরম্ভ করছি।

ছোট্ট মফস্বল সহর। একটু কাজে এসেছিলাম কয়েকদিনের জন্যে। বিকেল-বেলার দিকে নূতন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তৈরি উঁচু সড়ক ধরে বেড়াচ্ছি......মানে হাতে কোন কাজ না থাকায়, উদ্দেশ্যহীন পরিক্রমায় সময় সংহার করছি আর কি। হঠাৎ দেখি কয়েক রশি দূরে, বন্যাপ্লাবিত মাঠের দিকে তাকিয়ে, একটি চাষী মুসলমান ও একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোছের ভদ্রলোক একই সঙ্গে ঠক-ঠক করে কাঁপছেন, আর ব-ব-ব করে অস্পষ্ট অবোধ্য ভাষায় কি যেন বলছেন!

ব্যাপার কি? কৌতূহলী হয়ে দৌড়ে এলাম।

বললাম, কি, হয়েছে কি?

মুসলমান চাষীটি বললো, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন! ইয়া আল্লা, ইয়া রহিম!

বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়ও জলভরা মাঠের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, হরিবোল, হরিবোল! একে ত বানে দেশ ডুবে গেছে, তার ওপর এই......না জানি ভগবানের মনে কি আছে!

তাকিয়ে দেখি, জলডোবা মাঠের মাঝখানে কোমর ডুবিয়ে বসে, এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী দু'হাতে তার কেশবিন্যাস করছে—চেহারাটা তার মানুষের মতোই, তবে নাক-মুখ একটু বসা-বসা, চীনা-চীনা ধরনের, আর সাধারণ মানুষের চেয়ে [illegible]র ছোট—অনেক ছোট। সবচেয়ে আশ্চর্য, গায়ের রং, হাতের রং, মাথার চুল, সব তার লাল......উজ্জ্বল, উদ্ধত সোনালি বললেও বলতে পারেন।

কেমন যেন চমক লাগলো। তবু বললাম, তা এতে ভয়ের কি আছে? একটি মেয়ে ত বসে আছে। [illegible]

পণ্ডিত মশায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, মেয়ে? মেয়ে কি হে বাপু? এই জনমানবশূন্য, এক-গলা জলে ডোবা মাঠের মধ্যে মেয়ে, আর এমন অদ্ভুত চেহারার মেয়ে? দেখতে পাচ্ছো না মৎস্য-কন্যা? সমুদ্দুর থেকে বানের সঙ্গে ভেসে এসেছে! শাস্ত্রের ত খবর রাখো না......

চাষীটি বললো, জলহূরী বাবু, কেতাবে ওনাদের কথা আছে। খোদার মেহেরবাণী......

মনে হল, তাইত, সত্যিই ত! দেখতে মানুষের মতো, তবু মানুষ বলে ত মনে হয় না। চেহারা, স্থান-কাল, সবই তার বিরুদ্ধে।

তিনজনে তখন এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে এই-হেই-হেই শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু সন্দেহ ছিল, চোখের নিমেষে তা দূরে হয়ে গেল! ছলাৎ-ছল শব্দ করে তক্ষুণি মেয়েটি জলে মুখ ডুবালো—অনেকটা যেন লাফ দিয়েই পড়লো, তারপর সেই দিক-রেখাহীন জলরাশির মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু ঐ এক ঝলকেই দেখলাম, নীচের অংশটা তার দেহের অবিকল মাছের মতো—বড় বড় চাকা চাকা রূপালি আঁশ আছে, কালো পাখনা সম্বলিত লেজটাও দু-একবার লীলায়িত হতে দেখলাম!

জলমগ্ন মাঠের মাঝখানে একটা কদম গাছ, তার হাত আষ্টেক দূরে একটা অতি বৃহৎ বর্ষীয়সী গাছ—দুটোরই গোড়ায় অনেকটা পর্যন্ত জল উঠেছে। এই দুই গাছের ফাঁকেই মেয়েটি বসে ছিল......সেখান থেকেই হাওরের দিকে গড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য ভয়ের চেয়ে বিস্ময়, বিস্ময়ের চেয়ে আচ্ছন্নতাই মনকে ঘিরে ধরলো যেন বেশী করে। দিনের আলোতে দাঁড়িয়েই যেন মনে হতে লাগলো, দুনিয়া বদলে গেছে... নইলে এ কি দেখলাম?

* * *

এস-ডি-ও'র বাংলোতে সন্ধ্যার দিকে রোজই একটা মাঝারি রকম আড্ডা বসে। এস-ডি-ও সাহিত্যিক, মানুষটিও বেশ রসিক, তাঁকে ঘিরে তাই কলেজের প্রিন্সিপাল কামাখ্যাবাবু, সরকারী উকিল পার্বতীবাবু, 'পল্লী বান্ধবে'র সম্পাদক দীননাথবাবু, এমনি সমস্ত স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটা ঘরোয়া মজলিস জমে।

এসে পর্যন্ত আমিও এই আড্ডায় ভীড়ে গিয়েছি—চা-পান ও গল্প-গুজবে সন্ধ্যাটা ভালোই কাটে তাতে। ঠিক করলাম, বিকেলের ব্যাপারটা আজ ওখানে উপস্থিত করবো। নিজের চোখে দেখলেও জিনিষটা আমি বিশ্বাসও করতে পারিনি, আবার অবিশ্বাসও করতে পারিনি......ওঁরা কে কি বলেন দেখা যাবে।

আমার একটু দেরী হয়েছিল। সাতটা নাগাদ এসে দেখি, আমার অনেক আগেই সেই পণ্ডিত মশায় এবং সেই চাষী মুসলমানটি হুজুরে হাজির।

আমি পৌঁছুতেই কামাখ্যাবাবু বললেন, আসুন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা—বলুন ত এবার, কি ব্যাপার? তিন-তিন জনের ত একই সঙ্গে দিনের আলোয় দৃষ্টিভ্রম হতে পারে না!

ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে, আমি বললাম, বেশ একটু ঘাবড়ে গেছি ঠিকই, তবু সত্যি বলে মনে করতে পারছি না জিনিষটা!

কামাখ্যাবাবু বিরক্ত হলেন। বললেন, কেন? মৎস্য-কন্যা, নাগ-কন্যা, কিন্নর, স্যাটিওর, সী-নিম্ফ, নায়াড......এদের কথা যে গ্রীক, হিন্দু, আরব, চীনা, সমস্ত সভ্য জাতির শাস্ত্রে ও সাহিত্যেই বলা হয়েছে, সে কি বাজে? প্রাচীন দিনের মনীষীরা কি আমাদের এ কালের মানুষদের চেয়ে কম জানতেন দুনিয়াটাকে?

দীননাথবাবু বললেন, না, না, মোটেই না। গ্রহ-নক্ষত্র বলুন, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত বলুন, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, ধাতু-প্রস্তর বলুন, সব কিছুরই নামধাম, প্রকৃতি, তাঁরা সেই কোন্ কালে বিশ্লেষণ করে গেছেন—তারপর আমরা আর এক-পা দু'পা এগিয়েছি বড় জোর, তাছাড়া নতুন আর কি করেছি আমরা?

সবিনয়ে বললাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারা না-পারার একটা নিজস্ব ধারা ত আছে মানুষের.....চোখে দেখেও অসম্ভব মনে হচ্ছে, কি করবো বলুন?

কামাখ্যাবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, শুনুন—আমি নিজের চোখে যা দেখেছি। নরওয়ে থেকে স্টীমারে ফিনল্যান্ড যাচ্ছি—ব্ল্যাক সী'র ছোট্ট সবুজ একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে স্টীমার চলেছে, হঠাৎ সকালের আলোয় দেখলাম, দ্বীপের ঘাসে কোমর লতিয়ে দিয়ে বসে আছে এক মৎস্য-কন্যা—ঠিক যেমনটি আপনারা দেখেছেন, তেমনি আর কি—দুহাতে চুল গোছাচ্ছে, আর পিং-পিং করে শিস দিচ্ছে!

এস-ডি-ও এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন, মাই গুডনেস! তারপর?

কামাখ্যাবাবু বললেন, শুধু আমি না—নীচের ডেকে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই দেখেছেন। এক সিন্ধী ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি একটা স্ন্যাপও নিয়েছিলেন—জানি না, সেটা পাওয়া যাবে কিনা। যাই হক, হঠাৎ ওপরের ডেক থেকে পাগল হয়ে জলে ঝাঁপ দিল এক জার্মাণ যুবক—সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়লো মারমেড-ও। তারপর অল্পক্ষণ দুজনে নুকোনের উদ্দেশে সাঁতার.....কাছাকাছি হতেই মৎস্য-নারী দুই হাতে ছোকরাটিকে জাপটে ধরে দিলে সমুদ্রে ডুব এবং সেখানেই সব শেষ!

নকীবুদ্দী মানে সেই চাপরাশিটি, দরজার পাশে মেঝেয় বসেছিল চুপচাপ। সে বলে উঠলো, ইয়াল্লা আল্লা! পণ্ডিত মশায়ও কি একটা যেন বললেন। পার্বতীবাবু নড়েচড়ে বসলেন কিছু বললেন না, কারণ কথা তিনি কমই বলেন—তবে বোঝা গেল ব্যাপারটা শুনে তিনিও বেশ বিচলিত হয়েছেন।

কথা কইলেন এস-ডি-ও। তিনি বললেন, কবছর আগে জাপানে ঐ রকম মৎস্য-কন্যা দেখা যেতো মাঝে মাঝে। অনেক চেষ্টা করে জাপানীরা তার একটা বন্দী করে মেরেছিল, আর একটা জ্যান্ত ধরেছিল—আশাহী সিম্বুনে তার ছবি ও কিম্ভূতকিমাকার বিবরণ বেরিয়েছিল। আসলে কন্যা টন্যা কিছুই না—এক রকম সীল জাতীয় প্রাণী, সামুদ্রিক ভোঁদড় বলা যায়। নীচের অংশটা কুমীরের মতো—টাকার মতো গোল গোল আঁশ আছে তাতে..... ভোঁদড়, সীল, পেঙ্গুইন ইত্যাদির মতো কোমর বেঁকিয়ে বসতে পারে—বসলে, দূর থেকে দেখে মানুষ বলেই ভ্রম হয়। তার কারণ, মুখের গঠন চ্যাপ্টা ধরণের, কিন্তু তা মানুষ-মানুষই, রংও সোনালি বা তামাটে.....তা ছাড়া কপালের দুপাশে ছড়ানো গোঁফের মতো দুগোছা কেশর আছে যা বেণী বলে ভুল হয়। সামনের পা দুটো দুই কাঁধ বরাবর তুলে, ঐ কেশরে ঠেকিয়েই ওরা বসে, তাতেই মনে হয়, চুল বাঁধছে! আসলে সাঁতার কাটে ত, তাই সামনের পা দুটো ছোট—হাতের মতো দেখতে! আর হ্যাঁ, শিসও দিতে পারে ওরা পিন পিন করে। হিন্দু পুরাণে, হোমরের কাব্যে, রূপ-কথায় এরাই হয়েছে মৎস্য-কন্যা......জাপানীরা এ প্রমাণ করে দিয়েছে।

কামাখ্যাবাবু বললেন, কে জানে মশায়! চোখে যা দেখেছি, তাই বললাম। অন্যেরা কিছুই বললেন না। হাকিমের উক্তি, বলবেনই বা কি?

* * *

কিন্তু সরকারী মত যাই হক, সাধারণ মানুষকে ঠেকানো গেল না। গ্রামে গ্রামে রটে গেল, সমুদ্রের কিনারা থেকে বানের জলে এক অপরূপ মৎস্য-কন্যা ভেসে এসেছে—কদমতলীর মাঠে এক কোমর জলে বসে সে খোঁপা বাঁধে, গুন-গুন করে গান গায়, সুন্দর চেহারার যুবক দেখলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে...হৈ-চৈ করলেই ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অতলে তলিয়ে যায়। মদু দেখেছে, মধু দেখেছে, বাসুর পিসে, দাশুর ভগ্নীপতি দেখেছে! সুতরাং বিশ্বাস না করবে কে?

লোকের খাওয়া-দাওয়া ঘুচলো, কাজ-কর্ম শিকায় উঠলো—সবাই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে জড়ো হয়ে হল্লা করতে লাগলো। কথার মধ্যে কথা......মৎস্য-কন্যা, তার রূপ-গুণ, আকৃতির ব্যাখ্যা! হঠাৎ কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, ঐ দেখ, ঐ দেখ! সঙ্গে সঙ্গে হাজার জোড় চোখ সেদিকে আকৃষ্ট হয়—কিন্তু না, মায়াবিনী মৎস্য-কন্যা আর ওঠে না!

বেগতিক দেখে শেষটা এস-ডি-ও হুকুম দিলেন, লঞ্চ, স্টীমার, জেলে-নৌকা, যার যা আছে, তাই নিয়ে সবাই হাওরে নেমে পড়ো—টানাজাল, বেড়াজাল, কোঁচ, টাঁটা, বন্দুক, যা দিয়ে পারো, জীবিত বা মৃত মৎস্য-কন্যাকে ধরে এনে হাজির করো.....পাঁচ হাজার টাকা বখশিস! শুধু তাই না, আরো অনেক সম্মান।

চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল। প্রথমে কলকাতা থেকে, তারপর সারা ভারতবর্ষ থেকে, অবশেষে বাইরের পৃথিবী থেকে জনস্রোত আসতে সুরু করলো—কেউ কৌতূহলী দর্শক, কেউ প্রাণিবিজ্ঞানী, কেউ বা সংবাদপত্র প্রতিনিধি! ক্রমে মফস্বল সহর রাতারাতি এক আন্তর্জাতিক মানুষের মেলা হয়ে পড়লো, [illegible] ঐ মৎস্য-কন্যার দৌলতে!

কিন্তু মৎস্য-কন্যা কৈ? আর কোনদিন তার দেখা মেলে না। শুধু, গুজব শোনা যায়—বারো মাইল দূরে কোনো খালের মুখে নাকি কারা একদিন তাকে শালুক ফুল ছিঁড়ে খেতে দেখেছে নাকি একটা নয়, দুটো মৎস্য-কন্যা দেখা গেছে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে এক বালুচরের ওপর.....উৎসাহ ও উত্তেজনা এতে আরো বাড়ে, নৌকার পর নৌকা জলে নামে...... কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই নিরাশ হয়!

উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে আমাদেরও গায়ে—সকাল বিকাল এস-ডি-ওর ওখানে হাজির হই, আসেন প্রতিদিন পার্বতীবাবু, দীননাথবাবুও। কামাখ্যাবাবু কলেজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত—তবু ওরি মধ্যে ঢুঁ দিয়ে যান একবার দুবার তিনিও।

কদিন পরে এক রবিবারের সকাল বেলা এস-ডি-ও বললেন, দেখুন মানুষ কত সহজে বিশ্বাস করে, আর কি রকম অনায়াসেই মেতে ওঠে!

আমি বললাম, আমরা তিনজনেই ত এই কাণ্ডটা করলাম.....কিন্তু বাস্তবিক বলছি আপনাকে, ওটা যে সত্যি নয়, তা বুঝেও, মিথ্যাও ভাবতে পারছি না যেন! কেমন একটা হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে।

ঠিক এই সময় একটি গ্রাম্য লোক হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালো এস-ডি-ও'র। হাকিম বললেন, কি হে, কি চাও তুমি?

লোকটি বললো, হুজুর, মচ্ছ-কন্যের বিত্তান্ত যদি কেউ বলতে পারে, তাহলে সে অত না হক, কিছু বখশিসও পাবে ত?

কি বৃত্তান্ত বলো ত শুনি—কাজের জিনিষ হলে পাবে বৈকি, হাকিম বললেন।

লোকটি বললো, হুজুর, মচ্ছ-কন্যে আমার পরিবার।

দুজনে এক সঙ্গে আঁৎকে উঠলাম। অ্যাঁ, সে কি হে?

লোকটি বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। কদমতলী মাঠের এক টেরে আমার খামার-বাড়ী আছে—আর আছে একটা পুকুর—বানের জল এসে এখন সব হাওরের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে—বিশ টাকার মাছ ছেড়েছিলাম হুজুর পুকুরে, তার সবই ভেসে গেছে, দু-চারটে যা, এখনো আছে, তাই ধরার জন্যে সেদিন পরিবারকে নিয়ে হুজুর জলে নেমেছিলাম—আমি খালুই নিয়ে বসেছিলাম বর্ষাণী গাছটার গুঁড়ীতে, আর গুপালের মা উবু হয়ে কখনো বসে, কখনো সাঁতরে, মাছ ধরছিল......পড়ন্ত বেলা, সূর্য্যু পাটে বসছে, লাল আলোটা পড়েছে চোখে-মুখে, চুলে, গুপালের মাকে দেখাচ্ছিল হুজুর যেন পরী-পরী......উঁচু সড়ক থেকে তিনটে লোক না তাই দেখে হুজুর ফষ্টি-নষ্টি করতে লাগলো। আমি তখন বললাম, ডুব সাঁতরে মেরে সিধে এদিক পানে চলে আয়, যেন ওরা আর না দেখতেই পায় তোকে। তাই এলো হুজুর আমার পরিবার—বর্ষাণী গাছের ওপার থেকে আর ত তাকে দেখতে পেলো না, শুধু কালো চৌখুপী ডুরে সাড়ীর একটা আঁচল তার সোঁতে ভেসে যাচ্ছিল ঐ দিকটায়, তাই দেখেই রটিয়ে দিলে ওরা, মচ্ছ-কন্যে দেখেছে.....মচ্ছ-কন্যে না ওদের বাপের মাথা দেখেছে হুজুর!

এস-ডি-ও তাড়াতাড়ি দুখানা দশ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়েই বললেন, এ কথা কক্ষনো বলো না কারুকে—তাহলে কিন্তু পরিবার ঘরে রাখতে পারবে না। যাও বড়ো পালাও চটে করে।

লোকটি চলে যেতেই, দুজনে হো হো করে হেসে উঠলাম। কামাখ্যাবাবু গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, ননসেন্স!

বাহিনী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাস্তার নাম অন্য কিন্তু হাটের নাম পেটিকোট লেন বাজার। ইষ্টএণ্ডে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। রবিবার সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা। কিন্তু ভাল করে হাট বসতে বসতে বেলা নটা—সাড়ে নটা বেজে যায় আর ভাঙতে ভাঙতে দুপুর দুটো আড়াইটা। শীতকালে আরও এদিক-ওদিক।

লণ্ডনের বনেদি পাড়া থেকেও পেটিকোট লেন বাজারে খদ্দের আসে। জিনিষপত্রের দাম আশ্চর্য রকম সস্তা। মোটা মোটা মুর্গী মোটে পাঁচ-ছ' শিলিং। ওয়েষ্টএণ্ডের বাজারে প্রায় দ্বিগুণ দাম। তাছাড়া ঘটি-বাটি, থালা-বাসন, পুতুল-বেলুন, তরীতরকারী, ফলমূল—সব কিছুই খুব কম দামে পাওয়া যায়। তবু, খদ্দের দর করতে ছাড়ে না। একমাত্র পেটিকোট লেন বাজারেই বোধ হয় এটা চলে।

ঠিক করে বল কত নেবে?

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে আড়চোখে খদ্দেরের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বুড়ো দোকানী বলে, কেন, খুব সস্তা মনে হচ্ছে বুঝি? নেবে নাও নাহলে সরে পড়, বিরক্ত করনা আমাকে—

খদ্দের রাগে না। হেসে বলে, দু' শিলিং হবে?

কি! চোখ যেন বড় হয়ে যায় দোকানীর, রসিকতা হচ্ছে বুঝি আমার সংগে? আট শিলিং-এর এক পেনি কম হবে না। দেখনা বাজার ঘুরে এমন চায়ের বাসন এ তল্লাটে আর পাও কি না।

তাই দেখি, খদ্দের আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

অই মিণ্টার সেই দোকানদার চীৎকার করে বলে, এসো, এসো, আচ্ছা দু' শিলিং কমিয়ে দিলাম—নাও!

উঁহু, খদ্দের মাথা নাড়ে, বলেছি তো যা দাম দিতে পারবো আমি—আবার কিছুক্ষণ দরাদরি, কথা কাটাকাটি তারপর চার কি পাঁচ শিলিং-এ রফা হয়।

চায়ের সরঞ্জাম ভাল করে কাগজে জড়িয়ে খদ্দেরের হাতে তুলে দিতে দিতে দোকানদার বলে, তোমার মত খদ্দের আর দু'চারটে এলে হয়েছে আর কি, ব্যবসাপাতি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে আমাদের।

কি যে বল! আমি তো বেশী দাম দিলাম তোমাকে।

হ্যাঁ খুব দিয়েছ, দোকানদার কটমট করে তাকিয়ে বলে আর তাই শুনে হাসতে হাসতে খদ্দের এগিয়ে যায়।

বাজারের সর্বত্র এই এক ব্যাপার। কোথাও নাক লম্বা ইহুদী বুড়ীর দল চীৎকার করছে, কোথাও যুবতী মেয়ে ফলের ঝুড়ি সামনে নিয়ে খদ্দেরের হাত ধরে বলছে, এসো দেখনা একবার তাজা ফলের দিকে, তোমার কি চোখ নেই ডার্লিং? খেলনাওলা কি একটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে আর তাই শুধু শব্দ হচ্ছে, চর্ চর্ চট্—রীতিমত গোলমাল, চেঁচামেচি, হৈ-হৈ কাণ্ড।

মাথার ওপর ছাদ নেই। খোলা জায়গা। নিজের নিজের জায়গায় যে যার জিনিষপত্র সাজিয়ে বসে। যারা এই হাটে বসে তারা যে সকলেই ইষ্টএণ্ডের লোক তা নয়। অনেক দূরে

থেকে মোটঘাট নিয়ে ছত্রিশ জাতের লোক দু'পয়সা করবে বলে এখানে আসে।

সুযোগ বুঝে আবার একটা রেস্তোরাঁও খোলা হয়েছে বাজারের মধ্যে। এক কাপ চায়ের দাম দু' পেনি। চা ছাড়া আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না এখানে। নাকে ভ্যাপসা গন্ধ লাগে আর রেস্তোরাঁর কর্তা-গিন্নীর চেহারা দেখে প্রচণ্ড খিদে পেলেও খাবার ইচ্ছে উড়ে যায়। তবু রয়েছে অনেক কিছু। কেক-বিস্কুট, সসেজ-রোল, অমলেট-কাটলেট আরও কত কি। মাছ ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসে। পরিবেশনের কাজটা গিন্নীই চালিয়ে নেয়। মোটা গোলগাল চেহারা। থপথপ করে ঘোরাঘুরি করে খদ্দেরকে আপ্যায়ন করে। গিন্নীর সুস্পষ্ট গোঁফের রেখাটি চোখে না পড়ে উপায় নেই। এই ছোট অপরিষ্কার রেস্তোরাঁ ছাড়া আর কোন চা খাবার জায়গা নেই পেটিকোট লেন বাজারের মধ্যে। তাই কেনাকাটা আর দরাদরি করতে করতে লোকের যখন গলা শুকিয়ে যায় তখন তারা চোখ-কান বুজে কোন রকমে শুধু এক কাপ চা খেয়ে যায় এখান থেকে।

অনেক গল্প ছড়ানো আছে এই হাট সম্পর্কে। এখানে নাকি নোট দিলে খদ্দেরের পকেট মেরে দোকানদার চেঞ্জ ফেরৎ দেয়—কে যে কখন হাতে গলা কাটে কিছুই বলা যায় না। আরও কত গল্প। তাই শুনে যারা লণ্ডনে বেড়াতে আসে তারা যাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখে সময়মত প্রচুর কৌতূহল নিয়ে শুধু মজা দেখবার জন্যে একবার পেটিকোট লেন বাজারেও ঘুরে যায়।

মোটামুটি এই হল পেটিকোট লেন বাজার। ভ্যাপসা গন্ধ, গোলমাল, নানা জাতের নানা বয়সের নরনারীর ভীড়। চারপাশ বড় অপরিচ্ছন্ন। লোকে এদিক-ওদিক পিক পিক করে থুতু ফেলে।

হিমশীর্ষ — দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

পেটিকোট লেন হাটে ঢুকে সোজা এগিয়ে ডান দিকে বেঁকতে হয়, কিছুদূর হাঁটবার পর আবার বাঁদিকে—তারপর বেশ খানিক পা চলবার পর গোকুলের মুর্গীর দোকান। দোকান নয়—কাউ। ঠিক দোকান বলা যায় না—সামান্য একটু জায়গা। কাঠের একটা বড় বাক্সের ওপর গোকুল নানা ওজনের মুর্গী সাজিয়ে রাখে। ছুরি দু'তিনটে থাকে বটে তার হাতের কাছে, কিন্তু বেশী ব্যবহার করতে হয় না। লণ্ডনের লোক গোটা মুর্গী বাড়ী নিয়ে যেতে ভালবাসে। রোস্টের ব্যাপার কি না। সে আবার আর এক সমস্যা। কারি খেতে হলে মুর্গী কেনবার সময় দোকানীকে জানিয়ে দিতে হয়, তা না হলে দেবে রোস্ট চিকেন—অমনি হয়ে গেল। মানে সেদ্ধ হতে তিন চার ঘণ্টার ধাক্কা। অবশ্য সেদ্ধ করে খাবার মুর্গী বেশী রাখে গোকুল। বাড়ীতে কারি আর ক'টা লোক বানায় লণ্ডন শহরে। সবাই বলে, রোস্টিং চিকেন। মাঝে মাঝে ভারতীয়রা অন্য মুর্গী চায়। না চাইলেও ক্ষতি নেই, গোকুল জানে কাকে কি দিতে হবে।

ব্যবসা কিন্তু গোকুলের নয়। পেটিকোট লেন বাজারে বসবার জন্যে সে শুধু কমিশন পায়। মালিক হল আর এক বাঙালী। নাম মিহির ঘোষাল। ভদ্রলোকের ছেলে নাকি পড়াশুনো করতে এসেছিলো। ব্যবসায় হাত পাকিয়ে মেম বিয়ে করে লণ্ডনে জাঁকিয়ে বসেছে। বাড়ীতে দামী দামী আসবাব, নিজের মোটর গাড়ী, কুকুর, টেলিভিশন। ছোটোখাটো জায়গায় যেখানে তার মতো ভদ্রলোক যেতে পারে না সেখানে তার কাছ থেকে কমিশন পাবার আশা পেয়ে যায় গোকুলের মত ছোটলোক—আগে যে ছিল জাহাজের অশিক্ষিত খালাসী। রবিবার খুব সকালে থলি ভরে মুর্গী নিয়ে গোকুল টিউব ধরে। অনেকটা পথ আসতে বেশ সময় লাগে তার।

চিকেন—নাইস্ চিকেন—ফ্রেশ চিকেন! হেই মিস্টার, হিয়ার—হিয়ার—মোটা মোটা মুর্গী হাতে তুলে সকাল থেকে দুপুর অবধি গোকুল গলা ফাটায়।

ইউ ইণ্ডিয়ান, পাশের ইংরেজ মুর্গীওলা জনি চোখ রাঙায় গোকুলকে, কি গলা তোমার! অমন চেঁচালে আমাদের গলা কার কানে যাবে বল?

শাটআপ, গোকুল তার দিকে তাকিয়ে বলে, তা তোমার লাভ হবে বলে কি আমি গলাবাজি বন্ধ করে নিজের ক্ষতি করবো?

এই লোকটার সংগে গোকুলের ঝগড়া হবেই। কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। অনেক সময় তারা এমন কাণ্ড করে যে, খদ্দের তাদের দুজনকে এড়িয়ে অন্যত্র মুর্গী কিনতে যায়।

কালো রঙ অর্থাৎ ভারতীয় বলে গোকুলের বেশ অসুবিধা হয় বৈকি। ইংরেজ খদ্দের প্রথমে দেশের লোকের কাছেই আসে। সেখানে সুবিধা না হলে কিংবা মনের মত জিনিষ না পাওয়া গেলে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে এসে দাঁড়ায় গোকুলের দোকানে। কেউ কেউ মুর্গী না কিনেই ফিরে যায়। বিদেশীকে সাহায্য করার বিশেষ ইচ্ছে থাকে না ইংরেজের। কিন্তু সেজন্য গোকুল বিদেশী খদ্দেরকে মোটেই দোষ দেয় না। দেশের লোকই বা কি করেছে তার জন্য। অবশ্য ভারতীয় খদ্দেররা প্রথমে গোকুলের কাছে আসে বটে কিন্তু দরাদরি করতে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

এই তো সেদিন এসেছিল এক বাঙালী স্বামী-স্ত্রী। স্বামী ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, কত দাম?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে গোকুল উত্তর দিল, সাত শিলিং।

দূর, ঠিক করে বল?

স্ত্রী আস্তে আস্তে স্বামীকে বাংলায় বললো, এত সস্তায় অত বড় মুর্গী আর কোথাও পাবে না, নিয়ে নাও।

বেশ কঠিন স্বরে স্বামী বললো, অং করো না তুমি!

সাধারণত গোকুল এসব প্রশ্ন আজকাল

আর কাউকে করে না। তবু আজ কি জানি তার কি মনে হল, হঠাৎ বাংলায় জিজ্ঞেস করলো সেই বাঙালী ভদ্রলোককে, আপানারা বুঝি ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছেন ?

পেটিকোট লেন বাজারের মুর্গীওয়ালার মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী বেশ অবাক হয়ে গেল।

খুব খুশী হয়ে স্ত্রী উত্তর দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বুঝি বাংলা দেশের লোক ?

গোকুল বললো, হ্যাঁ।

ক'বছর ব্যবসা করছ এদেশে -

গোকুল হেসে বললো, বাইশ বছর।

ও বাবা !

স্বামীর খুব বেশী উৎসাহ ছিল না গোকুলের জীবনের ইতিহাস শোনবার। পাছে কথায় কথা বাড়ে তাই সে তাড়াতাড়ি বললো, যাক গে, তবে তো ভালই হল, দেশের লোক যখন একটু কম করে দাম বল ?

বেশ, পাঁচ শিলিংএ নিয়ে নিন।

স্বামীর হয়তো আরও দর করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্ত্রী তার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললো, আঃ নিয়ে নাও !

আচ্ছা দাও, পকেট থেকে পয়সা বের করতে করতে স্বামী বললো, একটু বেশী নিলে কিন্তু—

এবার গোকুল দেশের লোককে একটু খোঁচা মেরে বললো, পেটিকোট লেন বাজার হলেও এটা লণ্ডন শহর—জিনিষপত্রের দাম একটু বেশী এদেশে।

কারণে অকারণে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে জনি, কি লাভ হয় তোমার এখানে বসে সময় নষ্ট করে ?

তোমার কি দরকার তা দিয়ে ?

তোমার ভালর জন্যেই বলছি, এদেশের লোক তোমার কাছ থেকে মুর্গী কিনতে চায় না।

তারা বোকা তাই তোমার পচামাল কেনে।

ইউ ব্লাডি, জনি চেঁচিয়ে ওঠে, কি বললে ? আমার মুর্গী খারাপ ?

খুব জোরে দাঁতে পাইপ চেপে গোকুল বলে, একশোবার খারাপ—আমার মুর্গী তোমার চেয়ে অনেক তাজা—

তা ওগুলো নিয়ে ইণ্ডিয়ায় গিয়ে ব্যবসা করনা ব্লাকি—

আমার যা খুশী আমি তাই করবো বুঝলে শাদা বাঁদর ?

খবরদার গাল দিও না বলছি !

তুমি আগে মুখ বন্ধ কর ব্লাডি !

আচ্ছা দেখি আমার খদ্দের ভাঙিয়ে তুমি এখানে কেমন করে ব্যবসা কর, জনি চোখ পাকিয়ে গোকুলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে এটা ইংল্যাণ্ড।

ড্যাম ইউর ইংল্যাণ্ড আমার পাশে বসে নিজের দেশের লোকের কাছে বেশী দামে পচামাল চালাতে লজ্জা করে না।

তোমার ? আমিও দেখবো তোমাকে—

শাট্ আপ্ !

ইউ শাট আপ !

ব্ল্যাক বাসটার্ড !

রোচেড্ লেপার !

তারপর পাল্লা দিয়ে চেঁচায় দুজনে, চিকেন-চিকেন ফ্রেশ চিকেন—নাইস-চিকেন্ ! হেই মিসটার—হিয়ার হিয়ার। আর তাই শুনে মনে হয় পেটিকোট লেন হাটে শুধু মুর্গী ছাড়া যেন আর কিছু কেনবার নেই।

আজ ভাল করে হাট বসল না। শীতকাল। থেকে থেকে ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে : জানুয়ারী মাস। হাওয়ার জোর বড় বেশী। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া গোকুলের ফাটা ওভারকোট ভেদ করে দেহের হাড় কাঁপায়। শীতকালে বড় অসুবিধা হয় পেটিকোট লেন বাজারের ব্যবসায়ীদের। কখন বরফের ঝড় সব ওলট পালট করে দেয় ঠিক নেই।

ভাঙাহাটে কোলাহল জেগেছে। আর খদ্দেরের আশা নেই। যে যার জিনিষপত্র গাঁছিয়ে তল্পী তোলবার জন্যে ব্যস্ত। চারপাশে চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি হতাশা আর বিশৃঙ্খলা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে গোকুল একবার হাই তুললো, মুর্গীগুলো দুটো কাগজের ব্যাগে ভরে, ছুরী, ওজন করবার জিনিষ, আর দোকানে এটাওটা সেই কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে তালা লাগিয়ে দিল। যদি দিন ভাল থাকে তাহলে আবার খুলবে আগামী রবিবার। সারা শীতকালটা এমনি করেই কাটে। অথচ সংসারের খরচ বাড়ে এ সময়। গ্যাস, গরম কাপড়, সংসারের আরও টুকিটাকি কত খরচ তার হিসাব রাখা কঠিন।

কিন্তু আজ সবচেয়ে বেশী দুঃখ হল গোকুলের। একটিও মুর্গী বিক্রী হয়নি—প্রায় শূন্য পকেট। অথচ আজ তার বড় টাকার দরকার। গোকুলের স্ত্রী পেগী হাসপাতালে। একটা বেশ ভারী ছেলে হয়েছে তার কাল। পেগীর একটা কোটের দরকার। গোকুল কথা দিয়েছিল যেমন করে পারে আজ কোট কিনে নিয়ে যাবে। শরীরের অবস্থা ভাল নয় পেগীর। কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে বলা যায় না।

এই সময় পেগীর ছেলে হল। গোকুল নিজের ওপর রেগে যায় মনে মনে। কি দরকার ছিল এই দুঃসময়ে আরও খরচ বাড়াবার। পেগী ভাল থাকলে এত অভাব হত না তার সংসারে। এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বাসন মেজে আর ঘর ঝাঁট দিয়ে দু'পয়সা আয় করে সংসারের অনেক সুবিধা করে দেয় পেগী। এখন তাও বন্ধ।

শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে গোকুল জুতোর তলায় ঠক ঠক করে পাইপ ঠুকতে লাগল। বড় আশা করে এদেশে থেকে গিয়েছিল সে, ভেবেছিল সুখে খেয়ে দেয়ে থাকবে—এদেশে নাকি কেউ উপোস করে না। দেশে সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। জাহাজের খালাসী হয়ে প্রথম তার চোখ খুলে গেল। ভেবেছিল, এবার জাহাজে করে সে অনেক দূরদেশে গিয়ে নোঙর ফেলবে, যেখানে পেটে ক্ষিধে নিয়ে চোখের জল ফেলতে হয় না। তাই জাহাজ থেকে পালিয়ে পেগীকে খুঁজে বের করে সে লণ্ডনে ঘর বাঁধল।

কিন্তু আজ হাড়ে হাড়ে গোকুল বুঝেছে তার মত লোক যেখানেই থাক না কেন কোন সুবিধা হবে না। সর্বত্র এক অবস্থা। মাঝে মাঝে ভাবনা-চিন্তায় দম্ বন্ধ হয়ে যায় গোকুলের। তবু কোন রকমে চোখের জল চেপে সে ভাবে, এবার কোন্ দেশে যাবে সে ?

পৃথিবীতে কি এমন দেশ কোথাও নেই যেখানে তার মত লোক শান্তিতে থাকতে পারে। অন্তত দারুণ শীতে যেখানে স্ত্রীর সব চেয়ে দরকারী কোট কেনবার জন্যে ভাবনায় দিশাহারা হতে হয় না।

হঠাৎ সব রাগ গিয়ে পড়ে গোকুলের মিহির ঘোষালের ওপর। আচ্ছা লোক বটে মিহির ঘোষাল। যদি নিজে ব্যবসা চালাবার মত মূলধন গোকুলের থাকত তা হলে হয় তো এত অসুবিধা হত না তার। কিন্তু সে অসম্ভব। অনেক চেষ্টা করেছে সে—পারেনি। মিহির ঘোষালের হাত থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই গোকুলের।

মুর্গী বিক্রী না হলে একটি পয়সাও পায় না গোকুল। শুধু যাবার-আসবার টিউবের ভাড়া দেয় মিহির ঘোষাল। একদিন গোকুল বলেছিল, আমি তো চেষ্টা করি ঘোষাল সাহেব, কিন্তু বিক্রী না হলে কি করব বলুন ? আমাকে অন্তত সামান্য মাইনের ব্যবস্থা করে দিন।

গম্ভীর হয়ে মিহির ঘোষাল উত্তর দিয়েছিল, তা হয় না। আমার দিকটাও দেখতে হবে তো— বিক্রী না হলে মুর্গীগুলো নষ্ট হয় না ? শুধু শুধু মাইনে দিয়ে লোক রাখব কেমন করে ?

মিথ্যা কথা বলেছিল ঘোষাল। এদেশে আবার মুর্গী নষ্ট হয় নাকি ! ফ্রিজিডিয়ারে থাকে দু'তিন মাস। মুর্গী তাজা কিনা সে কথা নিয়ে কোন খদ্দের মাথা ঘামায় না। এখানে কাটা মুর্গী কেনাই নিয়ম। জ্যান্ত মুর্গী কোথাও চোখে পড়ে না।

গোকুল কিন্তু কিছু বলেনি। মিহির ঘোষালকে চটালে তারই ক্ষতি। সপ্তাহের বাকি দিনগুলি তাকে তারই জিনিষ নিয়ে বিক্রী করবার চেষ্টা করতে হয়- নকল মণি-মুক্তো, বিলিতি কার্পেট ইত্যাদি।

দুত্তোর, গোকুল দুটো বড় বড় কাগজের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে গেল টিউব ষ্টেশনের দিকে। মুর্গীগুলো ফেরৎ দিয়ে মিহির ঘোষালকে হিসেব দিতে হবে।

বিকেল চারটের সময় ভারী মন নিয়ে গোকুল পেগী আর ছেলেকে দেখতে ইষ্টএণ্ডের হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়ালো। গরীব পাড়ার হাসপাতালে শুধু গরীবের ভীড়। আজ রবিবার বলে অন্যান্য দিনের চেয়ে লোক অনেক বেশী হয়েছে।

চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যে। এখনও ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে। গোকুল দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে মাথা নিচু ক'রে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। উপায় নেই। কোন পয়সা পায়নি সে আজ। রাত্তিরে নিজে কি খাবে জানে না। পেগীর কোট কেনা দূরের কথা, সামান্য ছোট-খাট জিনিষও আনতে পারেনি আজ তার জন্যে। গোকুলের বুক চিরে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

হ্যালো পেগী, কেমন আছ ?

ডাক্তার বলেছে আর ভয় নেই, শীগ্গিরই বাড়ী যাব। ফুটফুটে তাজা ছেলের দিকে তাকিয়ে গোকুল যেন তোতাপাখির মত বললো, হ্যালো হ্যালো—

ওপাশ থেকে নতুন ছেলের কান্না ভেসে আসছে। এপাশে শুয়ে আছে একটা কুচকুচে

কালো ছেলে। বাপ নিগ্রো, মা ইংরেজ। আজ ওরা বেরিয়ে যাবে—তাই তৈরী হচ্ছে।

পেগীর মুখে আরও কত গল্প শুনলো গোকুল। অনেকের সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে। নানা দেশের লোক আছে এই হাসপাতালে। কারুর মা নিগ্রো, বাবা ক্যানাডার লোক, বাবা জার্মাণ মা আইরীশ কিংবা মা ইংরেজ বাবা ইণ্ডিয়ান। পেগী জানালো এদের সকলের অবস্থা নাকি গোকুলদের চেয়েও খারাপ।

হাসপাতালে বেশ গোলমাল হচ্ছে। ছেলের কান্না, বাপের উল্লাস, মায়ের হাসি। গোকুল পেগীর কাছে বসে বসেই দেখতে পেলো, একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেকে। কোলে নতুন ছেলে কিংবা মেয়ে। কি জানি কেন তাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোকুলের মন বেশ সতেজ হয়ে উঠলো। এরা সকলেই তো গরীব। তোমার কোটের টাকা জোগাড় করতে পারিনি পেগী, গোকুল স্ত্রীর দুই হাত চেপে ধরলো।

হেসে পেগী বললো, মুর্গী বিক্রী হয়নি বুঝি? যাকগে আমার এখন কোটের দরকার নেই, দেখছ না হাসপাতাল থেকে দিয়েছে একটা!

পেগী নিশ্চিন্ত হলেও গোকুলের দুশ্চিন্তা দূর হল না। কি করে দিন চলবে সে ভাবনায় মাথার ঠিক নেই তার। তবু ছেলেকে আদর করে যথাসময়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল সে। কোথায় ব্যথা লেগেছে গোকুলের। ছল ছল করছে দুই চোখ।

হাসপাতালের গেটের কাছে আসতে না আসতেই জনির সঙ্গে দেখা। সেই পেটিকোট লেন বাজারে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। গোকুল তাকে এড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু জনি কাছে এসে দাঁড়ালো। হ্যালো, ইণ্ডিয়ান। গোকুলের ছল ছল চোখ দেখে সমবেদনার স্বরে জনি জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? কোন খারাপ খবর নেই তো?

সকালের জনি বিকেলে যেন অন্য মানুষ। এমন করে সে যে কথা বলতে পারে গোকুল কল্পনাও করতে পারেনি। সে শুধু অবাক হয়ে জনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি হে, কথা বলবে না নাকি? আরে এটা তো আর বাজার নয়—এটা হাসপাতাল—কি ব্যাপার বল?

আমার স্ত্রী আছে এখানে—

তোমার স্ত্রীকেও এদেশে এনেছ নাকি?

সে ইংরেজ—এদেশের মেয়ে।

নাকি? বাঃ বাঃ! তা কি হয়েছে তার? ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, ছেলে হয়েছে তার।

আরে তাই নাকি? জনি যেন লাফিয়ে উঠল, আমার স্ত্রীরও তো ছেলে হয়েছে আজ। তাকে দেখতে এসেছিলাম—এই হাসপাতালেই আছে, খুশীতে ঝলমল করছে জনির মুখ।

গোকুল জিজ্ঞেস করলো, ওরা দুজনেই ভাল আছে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ—খুব ভাল আছে। তা তোমাকে এমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? চল ওই 'পাবে' বিয়ার খাওয়া যাক একটু।

না না, আমাকে মাপ কর, আমার কাছে বেশী পয়সা নেই আজ।

আরে আমার কাছে আছে, এসো এসো—

এচিং — ভবানী দত্ত

পাশাপাশি বসে মুর্গী বেচি—দুজনেরই ছেলে হয়েছে—একসঙ্গে বসে একটু স্ফূর্তি করতে বাধা কি, আঁ? কায় অনু—গোকুলের হাত ধরে টেনে নিয়ে সামনের মদের দোকানে ঢুকলো জনি।

আসলে আজ এই গরীবের হাসপাতালে গোকুলকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে জনি। তাই তার এত উল্লাস। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সে বললো, তোমাকে এ হাসপাতালে দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল তুমি বড়লোক।

গোকুল হেসে বললো, বড়লোক হলে পেটিকোট লেন বাজারে মুর্গী বেচতে বসব কেন?

ইণ্ডিয়ানরা তো সখ করে কত কি করে এদেশে। আর তা ছাড়া ফ্রিজিডেয়ারে রাখা অমন বড় বড় মুর্গী তোমার, তোমাকে পয়সাওয়ালা না ভেবে কি করি বল?

মুর্গী আমার নয়, সুযোগ পেয়ে গোকুল জনিকে জানালো মিহির ঘোষালের ব্যাপার।

আঁ বল কি! চোখ বড় করে জনি বললো, এমন করলে তোমার চলবে কেমন করে?

চলছে না, করুণ মুখে জনির দিকে তাকিয়ে গোকুল বললো, আর তো চালাতে পারছি না কিছুতেই।

বিয়ারের গ্লাস হাতে চেপে ধরে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো জনি। তারপর আস্তে আস্তে গোকুলকে বললো, আমার সঙ্গে ব্যবসা করবে?

কেমন করে করবো?, আমার তো টাকা নেই।

ডাম ইউর মানি, তুমি আর আমি মিলে খাটলেই টাকা হবে। বুঝলে ইণ্ডিয়ান—এরা দুজনেই গরীব—কাজেই কেউ কাউকে ঠকাতে পারবো না।

জনি গোকুলকে নিয়ে ঠিক কি করবে তা বুঝতে পারলো না। কিন্তু যেটুকু বুঝেছে সেটুকুই যথেষ্ট। বুঝেছে যে, এত সমবেদনা সে জনির কাছ থেকে শুধু গরীব বলেই পেল।

বিয়ারের গ্লাসে পর পর কয়েকটা চুমুক দিলো গোকুল, তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো জনির মুখের দিকে। তাকে আজ বড় আপনার মনে হচ্ছে গোকুলের।

কিন্তু গোকুল ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিল আজ হাসপাতালে দেখা পৃথিবীর অসংখ্য গরীব শিশুর মধ্যে তার নিজের সন্তানও একজন। ওরা একদিন বড় হবে। আজ যেমন করে জনি তার দুঃখ বুঝলো, অদূরভবিষ্যতে সকলে দুঃখ ভোগ করে ওরাও ভাববে পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা।

আচ্ছা জনি গোকুল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, হাসপাতালের ওই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একদিন বড় হবে তো?

'হাঁ' করে গোকুলের দিকে তাকিয়ে জনি বললো, বিয়ারেই ব্রাডির নেশা হয় দেখছি।

পাঁচালী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বাংগলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ পাঁচালী বলিতে প্রায় পয়ার ছন্দের গানকেই নির্দেশ করেন। যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আবার বাঙ্গলা কবিতায় লেখা অনেক ব্রত-কথাও পাঁচালী নামে পরিচিত। যেমন সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি। আবার অনেকে লাচারী, নাচারী, পাঁচালী একই পর্যায়-ভুক্ত বলিয়া গবেষণাও করিয়াছেন। পাঁচালীর লক্ষণ কিন্তু অন্যরূপ।

সংগীত শাস্ত্রে অনিবন্ধ ও নিবন্ধ এই দুই প্রকারের গানের উল্লেখ আছে। রাগালাপ--আ-তা-না-রি এই অর্থহীন স্বরালাপ এবং সা রি গা মা পা ধা নি এই সপ্ত স্বরালাপের নাম অনিবন্ধ গান। ধাতু অঙ্গবন্ধ গানের নাম নিবন্ধ। শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র, কিম্বা শুদ্ধ শালগ ও সংকীর্ণ অথবা প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক নিবন্ধের এই তিন ভেদ।

শুদ্ধ বা প্রবন্ধের অবয়বকে ধাতু বলে। উদ্গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ এইগুলির নাম ধাতু। প্রবন্ধের অন্য ছয়টি অঙ্গ স্বর, বিরুদ, পদ, তেন, পাঠ ও তাল। প্রবন্ধের পঞ্চ জাতির নাম--মেদিনী, নন্দিনী দীপনী, পাবনী ও তারাবলী।

ছায়ালগ বা শালগ বা বস্তুর মধ্য হইতে লোক সংগীতের সুর ঝুমরীর উৎপত্তি হইয়াছে। আর ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ বা রূপক হইতে পাঁচালীর উদ্ভব ঘটিয়াছে।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে বলিয়াছেন--

তাল ধাতুযুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত।
ধাতু পূর্বে উক্ত উদ্গ্রাহাদি যথোচিত॥
শুদ্ধ শালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয়।
ইথে অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয়॥
ক্ষুদ্র গীত ভেদ চারি--চিত্রপদা আর।
চিত্রকলা, ধ্রুবপদা পঞ্চালী প্রচার॥

অকঠোর অনুপ্রাস ও প্রসাদগুণসম্পন্ন পদ বৈচিত্র্যযুক্ত গান চিত্রপদা।

চিত্রকলা ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন অন্যসম।
পাদত্রয় অষ্টাবধি এ গীত নিয়ম॥

পাঁচালীর এরূপ কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট নাই। তবে নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন--

ধ্রুবপদাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত।
ভাষা সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত॥

এই গান দিব্য, মানুষ ও দিব্য-মানুষ ভেদে তিনপ্রকার। সংস্কৃত গান দিব্য, প্রাকৃত অর্থাৎ দেশীয় ভাষার গান মানুষ এবং সংস্কৃত দেশীয় ভাষা মিশানো গানকে দিব্য-মানুষ বলিতে পারি।

কৃষ্ণ মঙ্গল, শিব মঙ্গল, রাম মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল গানগুলি পাঁচালীর সুরে গীত হয়। পদাবলীর সঙ্গে ইহার সাধারণ পার্থক্য পদাবলী সমধ্রুবা, পাঁচালী বিসমধ্রুবা। মঙ্গল গানে দোহারগণ বার বার ধুয়া পদের আবৃত্তি করে। পদাবলীতে সেরূপ রীতি নাই। পদাবলীতে নানাবিধ সুর ও রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ আছে। পাঁচালী প্রভৃতি গানে সম, অর্ধসম ও বিষম এইরূপ ভেদও কথিত হয়।

পাঁচালীর কথা উঠিলেই দাশু রায়ের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। দাশুকে পাঁচালী গানের প্রবর্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দাশরথির পাঁচালী সংগীত শাস্ত্রের নিয়মে রচিত নহে। তাল এবং সুর থাকিলেও দাশরথির গানে উদ্গ্রাহক, মেলাপক আদি ধাতুর কোন বালাই নাই। দাশুর পাঁচালীতে এক একটি ছড়া তাহার পর গান আছে। ছড়া সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়। গানগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুরে তালে গাহিতে হয়।

পূর্বে কবির গানে ছড়া আবৃত্তি করিবার এবং গান গাহিবার রীতি ছিল, এখনও আছে। মঙ্গল গানের মধ্যে রামায়ণে মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না। মাত্র মন্দিরা ব্যবহৃত হইত। মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গলে বাল্যকাল হইতেই মৃদঙ্গের ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। মঙ্গল গানে ছড়া নাই, আছে গান এবং পয়ার আবৃত্তি, আর মাঝে মাঝে কথা--অর্থাৎ ছোট খাট বক্তৃতা। কবির ছড়া ত্রিপদীতে রচিত। কবিগানে পয়ারগুলি মঙ্গল গানের মত গানের সুরেই বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গাওয়া হয়। দাশু কবির গান ও মঙ্গল গান মিশাইয়া পাঁচালীর সৃষ্টি করেন। দাশুর ছড়া প্রায় ত্রিপদীতেই রচিত, মাঝে মাঝে পয়ারেও আছে। কবির মত পাঁচালী গানেও ঢোলের বাজনার চলন হইয়াছে।

বর্তমানের সাহিত্য সমালোচকগণ কেহ কেহ দাশরথিকে কবি বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্বে সারা বাঙ্গলায় দাশুর অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত মণ্ডলী দাশুকে কবি বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহার পাঁচালী শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। দাশরথি শতাধিক পালা রচনা করিয়া ছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি পালা অশ্লীল বলিয়া ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দেওয়া কোন্ দেশীয় বিচার পদ্ধতি জানিনা। অনুপ্রাসের বাহুল্য ছিল বলিয়া দাশুর রচনা কবিত্ববর্জিত, এমন কথা বলা অন্যায়। দাশুর রচনায় ভক্তিরস প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। দাশু যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন, সামাজিক অনাচারের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। সে কালের সমাজ জীবনে দাশরথির প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি রামপ্রসাদ, দাশরথি ও নীলকণ্ঠকে সম শ্রেণীর কবি বলিয়া মনে করি। ইহাদের মধ্যে দাশরথির প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল। খাঁটী বাঙ্গলার পরিচয় পাইতে হইলে কৃত্তিবাস, কাশী-দাসের সঙ্গে দাশরথিকেও আয়ত্তে আনিতে হইবে।

দাশরথি সন ১২১২ সালের মাঘ মাসে বর্ধমান জেলার পিলা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায় (ব্রাহ্মণ) মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। নিবাস বর্ধমান জেলার বাঁধমুড়া। দাশরথি উত্তরকালে পিলাতেই স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়সে দাশরথির হাতেখড়ি হয়। তিনি গ্রাম্য পাঠশালে ভর্তি হন। কিছুদিন পর পিলার নিকটবর্তী বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্যের নিকট যাতায়াত পূর্বক সামান্য ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিলার নীল-কণ্ঠ হালদার নামক এক ব্রাহ্মণ মুখে মুখে ছড়া ও গান রচনা করিয়া যেখানে সেখানে গাহিয়া বেড়াইতেন। লোকে তাঁহার প্রশংসা করিত। নীলকণ্ঠ হালদারের যশোখ্যাতি দাশুকে প্রলুব্ধ করে। কিছুদিনের মধ্যে সুযোগ জুটিয়া গেল। তিনি পিলার অক্ষয়া বায়তিনীর কবির দলে যোগদান করিলেন। অক্ষয়া তাঁহাকে এমনভাবে বশ করিয়াছিল যে, লোকের গঞ্জনায়, মাতুল রাম-জীবন চক্রবর্তীর ভর্ৎসনায়, পিতা দেবীপ্রসাদের কান্নায় এবং প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনায় কিছুতেই দাশ-রথিকে দলছাড়া করিতে পারে নাই। কিন্তু পর পর কবিওয়ালা পুরুষোত্তম দাস বৈরাগীর, নিধিরাম শুঁড়ির ও কবিওয়ালী সহচরীর দলের বাঁধন দার-কড়ই নিবাসী নদের চাঁদ সাহার গালা-গালি খাইয়া দাশরথির চৈতন্য হয়। সন ১২৪২ সালে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পাঁচালীর দল করেন।

নিকটবর্তী কোন গ্রামে সন্ন্যাসী চক্রবর্তী নামে একজন বর্ণ ব্রাহ্মণের (বাগদী জাতির পুরোহিত) একটি পাঁচালীর দল ছিল। তিনি দাশুর রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া স্বরচিত "আগমনী" পালা লইয়া দাশুর সঙ্গে দেখা করিলেন। পালাটি রায়মহাশয়ের মনোমত হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া সন্ন্যাসীকে অভিনন্দিত করিলেন।

ভালবাসি সন্ন্যাসীরে প্রণাম করি নতশিরে
সন্ন্যাসীর শিরোমণি যিনি।
আদর করি স্বশিরে স্থান দিয়েছেন শশীরে
প্রণাম গ্রহণ করিবেন কি তিনি।

দাশরথি প্রভাসযজ্ঞ বা কুরুক্ষেত্র মিলন রচনা করিয়া দল গঠনের উদ্যোগ করিতে ছিলেন। আগমনী এবং প্রভাসযজ্ঞ পালা লইয়া দাশরথি আসরে নামিলেন। সন্ন্যাসী নিজের দল ভাঙ্গিয়া দাশুর দলে যোগ দিলেন এবং ঢোল বাজনার ভার গ্রহণ করিলেন। কাটোয়া কালিকাপুরের দীননাথ মোদক, গোবা গ্রামের গোপ জাতীয় দশরথ ঘোষ এবং কনিষ্ঠ সহোদর তিনকড়িকে লইয়া দল গঠিত হইল। দাশু ছড়া কাটিতেন, তিনকড়ির গলা খুব মিষ্ট ছিল, তিনকড়ি গাহিতেন, দীননাথ, দশরথ এবং আর দুইজন গায়ক দোহারি করিতেন, সন্ন্যাসী বাজাইতেন। প্রবাদের মত রটিয়া গেল--"দাশু রায় ছড়া কাটিয়ে, আর সন্ন্যাসী চক্রবর্তী বাজিয়ে", যেন মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। দলের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। উত্তরকালে দাশুর দলে থাকিয়া যাঁহারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের জন্য দলেরও খ্যাতি বাড়িয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে পিলার নীলমণি বিশ্বাস ও শচী বিশ্বাস, অদ্বৈত বৈরাগী ও ভগবান বৈরাগী,

আখড়া বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ও রাধামোহন সেন এবং কাটোয়ার অন্তর্গত সিঙ্গির যদুনাথ আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। নীলুর বেহালার বাজনা ও রাগিণী আলাপের খুব নাম ছিল। অগ্রদ্বীপের দীননাথ পোদ্দার সন্ন্যাসীর নিকট ঢোল শিক্ষা করিয়া দলে বাজাইত, ইহারও খুব নাম হইয়াছিল। পরে পিলার শ্যাম বাগচী ঢোলের বাজনায় দাশুর দলের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন।

সেকালে নবদ্বীপের সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণি, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ মাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ভট্টপল্লীর হলধর তর্কচূড়ামণি, যদুরাম সার্বভৌম, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, জয়রাম ন্যায়ভূষণ, ত্রিবেণীর রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিত প্রধানগণ দাশরথির কবিত্বের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন।

রাবণ বধ পালায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে হনুমান আত্মপরিচয় দিতেছেন—"আমার নাম জানে বিশ্ব, শ্রীরাম শিরোমণি শিষ্য লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছাত্র"। পূর্বেই এই দুইজন পণ্ডিতের নাম করিয়াছি। দাশরথি সুরসিক সদালাপী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরস উত্তর দিতেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তালিতপুরের ত্রৈলোক্য রায়কে দেখেছেন ?" দাশু বলিলেন—"তিনি তিল তুলসী তামা নিয়ে ত্রিবেণীতে তর্পণ করচেন, ত্বরায় গেলে তত্ত্ব পাবেন"। শ্রীরাম শিরোমণি বলিয়াছিলেন, "রামপ্রসাদ সিদ্ধ সাধক ছিলেন, কিন্তু তুমি তো সিদ্ধ নও, তোমার কবিত্ব দেখিয়া মনে হয় এ জন্য তপোবনের প্রয়োজন হয় না"। দাশু বলেন, আমিও সিদ্ধ হইয়াছি। তিনটি চক্ষু থাকিতেও শিব শিরস্থিতা সুরধুনীর দর্শন পাইতেন না। আমি দুইটি নয়নেই শিরোমণিকে দেখিতে পাইতেছি। "আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা", "কলঙ্কিনী বলে গো নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে" প্রভৃতি দাশু রচিত পদাংশ আজিও প্রবাদের মত উচ্চারিত হয়। উপমা সংগ্রহে দাশরথির অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। দাশরথি প্রথম জীবনে লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ পান নাই। পরে নিজের চেষ্টায় বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। লালমোহন বিদ্যানিধির কাব্য নির্ণয়ে দাশুর দুইটি গান—

"আমি আছিগো তারিণী ঋণী তব পায়" এবং "ধনী আমি কেবল নিদানে পদের উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত আছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও দাশরথি পাঁচালী রচনায় আপন মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমনে কৈকেয়ীর উক্তি মাত্র উদাহরণ দিলাম।

তুই কি ঘরে এলিরে রামধন।
আমার অন্তরে যে ব্যথা তুই বই জানে কে তা,
আমিরে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা।
কই কই রাম তুই কোথা,
তোরে কই কই দুখের কথা,
আয় দেখিরে চাঁদবদন॥
ভুবন জীবন রাম তোরে বলে দিই নাই আমি
অন্তরের ব্যথা জানেন অন্তর্যামী।
রাবণে বাঁধতে বনে গেলে তুমি
আমায় করে বিড়ম্বন।
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,
বনের পশু কাঁদে আমার দুঃখে কুমার,
পাপিনী মা বলে মুখ দেখে না আমার
পুত্র ভরত শত্রুঘন॥

সন ১২৬৪ সালের ২রা কার্তিক শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পূর্ব দিবস চতুর্দশী তিথিতে বায়ান্ন বৎসর বয়সে দাশরথি পরলোকগমন করেন। দুর্গাপূজায় কাশিমবাজারে রাজকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া কোজাগরী পূর্ণিমার পরে বাড়ী ফিরিয়া জ্বরে পড়েন। এই জ্বরেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

বত্রিশ বৎসর বয়সে মঙ্গলকোট থানার সিঙ্গত গ্রামের হরিপ্রসাদ রায়ের কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত দাশুর বিবাহ হইয়াছিল। রায়মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কালিকাসুন্দরী। কালিকাসুন্দরীকে তিনি কুলীনে না দিয়া শ্রোত্রিয় বরের করেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কালিকাসুন্দরী একটি কন্যা প্রসব করেন। অল্প বয়সেই কন্যাটির মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে কালিকাসুন্দরীও দেহত্যাগ করেন। অল্প দিন মধ্যে তিনকড়িও লোকান্তরিত হইলে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানচন্দ্রের পুত্র ভবতারণ কিছুদিন দল চালাইয়াছিলেন।

দাশরথির জীবদ্দশায় দুইজন খ্যাতনামা পুরুষ পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। একজন কালীয়দমন যাত্রার গায়ক গোবিন্দ অধিকারী, অন্যজন কথক শিরোমণি শ্রীধর। ১২৩৫ সালে নিধুবাবু এবং ১২৩৬ সালে রাম বসু লোকান্তরিত হইলে—টপ্পা গানে শ্রীধর নিধুর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। কিন্তু রাম বসুর স্থান পূর্ণ হয় নাই। কবিদলের অন্যতম বাঁধনদার ঠাকুরদাস দত্ত এই সময় একটি পাঁচালীর দল করেন। যশোরের মধুকান এবং ভাজনঘাটের কৃষ্ণদমন গোস্বামীও এই সময়ের খ্যাতনামা সঙ্গীত রচয়িতা। ইঁহারাও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে কবি ঈশ্বর গুপ্তের এখন বিশেষ প্রভাব। ইনি একদিকে হাফ আখড়াইয়ে গান বাঁধিতেন, অন্যদিকে বাংলা বা ভারত সরকারের সমালোচনা করিতেন। সমাজ ও ব্যক্তির দুর্বলতা লইয়া ছড়া কাটিতেন। ইঁহার জীবনে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের মিলন ঘটিয়াছিল। রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম এই সময়ের সৃষ্টি। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের আন্দোলন দূরে পল্লীগ্রামকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ইহারই মাঝখানে দাশু রায় আপন পরিমিত শক্তি লইয়া বাঙ্গালায় আনন্দ বিতরণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার গানে হাসিয়া কাঁদিয়া বাঙ্গালী কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল।

দাশরথির সম-সময়েই রসিকচন্দ্র রায় মহাশয় পাঁচালী রচনায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। সন ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় রসিকচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম রামকমল রায়, জাতিতে কায়স্থ। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরের পশ্চিমে পালাড়া গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্মিয়া সেখানেই শৈশবে প্রতিপালিত হন। রামকমলের নিবাস হরিপাল। তিনি মাতামহের বিষয় পাইয়া শ্রীরামপুরের নিকট বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কৈশোরেই রসিকচন্দ্র বড়ায় আসিয়া লেখাপড়া শিখিতে থাকেন। দশ বৎসর বয়সেই রসিকচন্দ্র কবিতা লিখিতে পারিতেন। ইঁহার আঠার বৎসর বয়সে পদ্যে রচিত "জীবন তারা" উপাখ্যান অশ্লীলতা দোষে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ইনি বহু কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন।

এগারখানি পাঁচালীর পালা ব্যতীত কবিতায় রচিত "হরিভক্তি চন্দ্রিকা", "কৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর" প্রভৃতি রসিকচন্দ্রের কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল। দাশু রায় ইঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বড়ায় আসিয়া দুই-চারি দিন থাকিয়া যাইতেন। ইঁহার নিজের কোন দল ছিল কিনা জানা যায় না। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে শেষ জীবনে রসিকচন্দ্র একখানি কাব্য রচনা করিতেছিলেন। ইহার কিয়দংশ অনুসন্ধান পত্রে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি সম্পূর্ণ হয় নাই। সন ১৩০০ সালে রসিকচন্দ্র পরলোকগমন করেন। রসিকচন্দ্রের দুইটি গান তুলিয়া দিলাম। শেষের গানটি আজিও যেখানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়।

(১) "খট, কাওয়ালী"

মনে পড়ে সদা সেই কালো কিবা কালো।
কাল রূপে আলো করে নিকুঞ্জ একা লো॥
একে তো চিকণ কালো
ভালে কিবা অলকা লো
চাঁদে দিয়েছে যেন চা কালো—
হেরিয়ে কুলেতে ভার থাকা লো॥
কাল রূপে নাশে কালো
কেমনে ভুলিব কালো
যে তার বাঁশীতে সদা ডাকা লো॥

(২) "মূলতান, একতালা"

আয় মা সাধন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করিলাম মহা পুণ্য রথে,
ভজন পূজন দুটো অশ্ব যুতে তাতে
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান
ভক্তি ব্রহ্ম বাণ বসেছি ধরে॥
মা দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন।
আমার রসনা ঝঙ্কারে, কালীনাম হুঙ্কারে
কার সাধ্য মোর সনে করে রণ॥
বারে বারে তুমি হও দৈত্যজয়ী
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী—
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে মা তোমারি বলে
জিনবো তোমারে॥

দাশরথির পরলোকগমনের পর আর একজন পাঁচালী প্রণেতা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, ইনি ব্রজমোহন রায়। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পিতার নাম রামলোচন রায়। হুগলী জেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে বাস। সন ১২৩৮ সালে ব্রজমোহনের জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। বার বৎসর বয়সের সময় জ্যেষ্ঠ মধুসূদন লোকান্তরিত হইলে—মালদহ জেলার ইংরাজবাজারে এক মহাজনের গদীতে মুহুরীর কাজে নিযুক্ত হইয়া ব্রজমোহন সংসারের ভার গ্রহণ করেন। পরে আবগারী বিভাগে নাজীরের পদে কাজ পাইয়াছিলেন। ব্রজ রায় সুকণ্ঠ ছিলেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালাদি সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবগারী বিভাগে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি কয়েকটি পাঁচালীর পালা রচনা করেন। ঐ পালাগুলি লইয়া কনিষ্ঠ গোপীমোহন রায় পাঁচালীর দল খোলেন। এই দলের প্রতিপত্তি দেখিয়া ব্রজমোহন চাকুরী ছাড়িয়া পাঁচালীর দলের উন্নতিসাধনে মনোযোগ দিয়াছিলেন। ১২৬৯ সালে তিনি নূতন দল লইয়া পাঁচালীর আসরে দেখা দেন। গোপীমোহন এক বৎসর দল চালাইয়াছিলেন। পাঁচালীর আসরে

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনেক ভদ্রলোক

শ্রী পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

না, শেষ কাজটায় মুরারিমোহন উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারলেন না। রাত্রি দশটা নাগাদ খেয়েদেয়ে শুতে যাবার পর বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে ওঠা, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, প্রথমটা আমল না দেওয়ার চেষ্টা, তারপর গরম জলে একটু পাতিলেবুর রস এবং সোডি-বাইকার্বনেট মিশিয়ে দু-এক ঢোক পান, তাতে যখন ফল হোলো না, তখন পাড়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী ডাক্তারকে খবর দিতে পাঠানো এবং ডাক্তার এসে পৌঁছবার আগেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চোখ দুটি চিরকালের মতো বুজে ফেলা...আজকের সহুরে জীবনে এমন ব্যাপার তো হামেশাই ঘটছে। করোনারি থ্রম্বোসিস্, হঠাৎ রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া, হাইপারটেনসান কিংবা এনজিনা পেকটোরিস্..... এমন কত নামই তো রয়েছে এই রকম আকস্মিক ঘটনার হেতু হয়ে। কাজেই সেদিক দিয়ে বিশেষ কোন নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল না মুরারিবাবুর জীবন-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে। বরং বাড়ীর লোকদের তিনি বেশীক্ষণ কষ্ট দিলেন না, একটা দিনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখলেন না, যা ঘটবার তা ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে চুকেবুকে শেষ হয়ে গেল; খরচপত্রের জের পর্যন্ত টানতে হোলো না কাউকে, কোন দিক দিয়ে।

মুরারিমোহন এমন কেউ নন যে, ঘটা করে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজের পৃষ্ঠা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। তিনি বৃটিশ আমলে একটা রায়সাহেব পর্যন্ত পাননি, লড়াইয়ের সময় ঠিকেদারীর দৌলতে হঠাৎ কৌলীন্য অর্জন করে কেউকেটা হয়ে উঠেননি; এমন কি আজকের এই কংগ্রেসী আমলে কোন মহকুমা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য তালিকায় পর্যন্ত তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিতান্তই অনেকের একজন। তাও হঠাৎ বুক ধড়ফড় করে মৃত্যু। মোটরচাপা নয়, ছাদ থেকে পড়া নয়—আগুনে পোড়া নয়, আফিম বা বিষাক্ত কিছু সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টাও নয়; সুতরাং খবরের কাগজের দুর্লঙ্ঘ্য, সীমায়িত এলাকার মধ্যে এ খবর ঠাঁই পাবার কথা নয়, পায়ওনি। একান্তই যেটা স্বাভাবিক সেটা খবরের কাগজের পাতার খবর নয়।

তা না হোক। নিজের সংসার এবং আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশীদের নিয়ে গড়ে-ওঠা পরিসীমার মধ্যে মুরারিমোহন একেবারে অকিঞ্চিৎকর পর্যায়ের লোক নন। একদা তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং খুব সামান্য সূচনা থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যে জায়গাটিতে এসে পৌঁচেছিলেন সাংসারিক পরিভাষায় তাকেই নাকি স্বচ্ছল গৃহস্থ আখ্যা দেওয়া হয়। মুরারিমোহনের বড় ছেলে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সসম্মানে। মেজোটির এইবার সেকেণ্ড ইয়ার, প্রেসিডেন্সিতেই দিয়েছেন মুরারিবাবু। পুত্রভাগ্য তাঁর ভালই বলতে হবে। তৃতীয় পুত্রটি এইবার স্কুল-ফাইনালের জন্যে তৈরী হচ্ছে; সবচেয়ে ছোটটি সবে ক্লাস এইটে উঠলেও পড়াশুনোয় তার যে রকম ধার, তাতে অনায়াসে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে। সব ক'টি ছেলের জন্যেই প্রয়োজনমত প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন মুরারিমোহন, পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত দক্ষিণা নিয়ে তারা পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে ইউনিভার্সিটির বাজী জিতবার জন্য ছেলেগুলিকে তৈরী করে দিয়ে গেছে এবং দিচ্ছে। প্রথম দুটি ছেলের পর দুটি মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে দিয়ে গেছেন মুরারিবাবু, এই মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে—যানে সোনার ভরি যখন একশোর ওপর, মাছ আর দই-মিষ্টির মণকরা দর তার অনেক ঊর্দ্ধে। অণিমা আর তনিমার শুধু বিয়ে দিয়ে যাননি মুরারিবাবু, বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের কর্তাকে ওটা যে করে হোক দিতেই হয়—মুরারিবাবু সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করে গেছেন। বড় জামাই কাস্টমসে কেমিক্যাল এনালিস্ট, মাইনের ওপর উপরির অংকটা অনুল্লেখ্য নয়; আর অফুকের দিনে যে ছেলে চাকরি করে তার এই উপরি আয়টাই অভিভাবকের মাপকাঠি, সর্বাগ্রে ভাবনা পাত্রী পক্ষের বাপ-মায়েদের কাছে। তনিমার স্বামী মানে ছোট জামাই অবশ্য পাকা-পোক্ত সরকারী চাকুরে নয় বটে, তবে কলকাতায় দুখানা বাড়ী, রীতিমত বনেদী ঘর। নিজের ছোটখাট ব্যবসাও একটু আছে বুঝি। মোটের ওপর স্বাচ্ছন্দ্যে সমুজ্জ্বল দুটি পরিবারকে বৈবাহিক সূত্রে বেঁধেছেন মুরারি-মোহন। শুধু তাই নয়। একেবারে খাস কলকাতা না হলেও তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ

কেশতৈল অনেক আছে, কোনটা ভাল,
কোনটা বা সাধারণ। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি
'কেশরঞ্জন' ব্যবহার করছেন, ততক্ষণ আপনি বুঝতেই
পারবেন না এর সঙ্গে অন্য কোন কেশতৈলের তফাৎটা কোথায়।

কেশরঞ্জন

অসাধারণ কেশতৈল

কবিরাজ এন. এন. সেন য়্যাণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা-১

সহজে ফেরৎ পাবার সুযোগ রেখে
ভাল সুদে টাকা খাটাবার উপায়—
আমাদের

৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাস্ সার্টিফিকেট কেনা

- পূর্ণ মেয়াদান্তে বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকার উপর সুদ পাওয়া যায়।
- ৬ মাসান্তে যে কোন সময় টাকা তুলতে পারা যায়।
- ৫০৲ টাকা বা তার যে কোন গুণনীয়ক পরিমাণ 'ক্যাস্ সার্টিফিকেট' কেনা যায়—কোন উর্দ্ধসীমা নির্দ্দিষ্ট নাই।
- আমাদের সেবা ও তৎপরতা সর্ব্বদাই পাবেন।

★
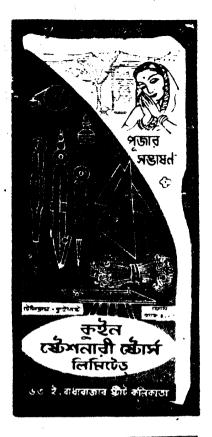
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপকণ্ঠে নতুন একখানা দোতলা বাড়ী তুলেছেন মুরারিমোহন—মাত্র বছর দুই আগে। জায়গার পরিমাণটা অবশ্য খুব বেশী নয়, মাত্র আড়াই কাঠা; তবু নিজেদের মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই, মাসে মাসে একরাশ টাকা অপরের হাতে তুলে দেওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই, পাঁচজনের কাছে দেখাবার মত একটা পরিচয়, বড়লোক আত্মীয়-কুটুম্বের সামনে মাথা হেঁট করে কথা কওয়ার অস্বস্তি থেকে মুক্তি। বাড়ীর মেঝেয় মোজেইক অথবা রঙীন সিমেণ্টের কাজ যদিও করে ওঠা সম্ভব হয়নি; তা না হোক, চারটি ছেলে, মেয়ে-জামাই, নিজেরা স্বামী-স্ত্রী......সকলের জন্যেই গুনে গুনে একটি করে শোবার ঘর তৈরী হয়েছে, বাড়তিও আছে একখানা, ছেলেদের পড়বার ঘর থেকে সুরু করে মাঝারি গোছের একখানা বাইরের ঘর—সবই হিসেব করে, প্ল্যান করে গড়িয়েছেন মুরারিমোহন। উপরের দু-একখানা ঘরে এখনও জানালা দরজাগুলো রং হয়ে ওঠেনি, রান্নাঘরটি প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো একটু স্বল্পপরিসর, কিন্তু বেসরকারী স্কুলের এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টারের জীবনে একার চেষ্টায় এত বড় এবং এতগুলো কীর্তিও সগৌরবে উল্লেখ করবারই মতো।

সুতরাং পরিবার ও প্রতিবেশী-চক্রে মুরারিমোহনের মৃত্যু একটি শোকাবহ ঘটনা এবং তজ্জনিত সমবেদনা, সহানুভূতি, অশ্রুপাত, দীর্ঘশ্বাস সবই অনিবার্য।

এই সব অনিবার্য ব্যাপারগুলি যথানিয়মে সংঘটিত হোলো। মেয়ে-জামাইরা এলো, বেয়াই-বেয়ানরা এলেন, মুরারিমোহনের শ্যালক-গোষ্ঠীও এসে পড়লেন। মুরারিমোহনের শ্যালক-গোষ্ঠী অর্থাৎ ছেলেদের মামারা বর্ধিষ্ণু লোক, বর্ধমান অঞ্চলের ছোটখাট জমিদার। খাস বর্ধমান শহরের ওপর নানারকম ব্যবসা—এগুলো আগে ছিল না, থাকলে তাঁরা সদ্য এম-এ পাশ করা মুরারিমোহনের হাতে মেয়ে যোগমায়াকে সমর্পণ করতেন কিনা সন্দেহ। সে কথা যাক। যোগমায়া নিজেই এখন ছেলে-মেয়েদের মা। মুরারিমোহন প্রায় কলকাতার ওপর একখানা বাড়ী রেখে—মেয়ে দুটির সসম্মানে বিয়ে দিয়ে, ছেলে কটির ভদ্র উপার্জনের ভিত্তি স্থাপনা করে চোখ বুজেছেন। দুঃখের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুতাপের নয়। মুরারিমোহন যে ভবিষ্যৎকালে উন্নতি করবেন যোগমায়ার পিতৃকুলের এ অনুমান মিছে হয়নি। ভদ্র, শিক্ষিত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়ার এই একটা পরম লাভ। নিতান্ত দৈব-দুর্যোগ না ঘটলে ওরা ঠিক নিজেদের পথ করে নেন, ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি যে নামই দাও তার দামই এইখানে। তা নইলে মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে বেরিয়ে সর্বাগ্রে আমরা একটি সচ্চরিত্র, লেখাপড়া-জানা ছেলের খোঁজ করি কেন?

সেই কথাই বললেন জ্যোতিপ্রসাদবাবু তাঁর বড় ভাগ্নে নিখিলকে। জ্যোতিপ্রসাদ যোগমায়ার বড় ভাই।

নিখিল একটা কম্বলের আসন পেতে মেঝেয় বসে আসন্ন শ্রাদ্ধ-পর্বের ফর্দ তৈরী করছিল। যোগমায়া এবং তাঁর ভাইরাও ছিলেন সেই ঘরেই। কথায় বলে পিতৃদায়। এ দায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে চাই সকলের সাহায্য, সকলের পরামর্শ। টাকাকড়ি দিয়ে সংসারে কজন আর কাকে সাহায্য করে! সকলের সহানুভূতি, পাঁচজনের মতামত, বিপদের দিনে এইগুলোই সব চেয়ে বড় পাথেয়।

সেই সহানুভূতি, পরামর্শ আর পাথেয় জোগাবার জন্যেই বিকেলের দিকে ছোটখাট একটি আলোচনা-সভা বসেছিল মুরারি-মোহনের ঘরটিতেই। উত্তর দিকের দেয়ালে মুরারিমোহনের বছর চল্লিশ বয়সের একটা ফটো। খাটখানা খালি। নিখিলের মামারা বসেছেন সতরঞ্চির ওপর। থান-কাপড় পরা যোগমায়া অবসন্নের মত দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি খোলা আছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কত আর বয়স! পঞ্চান্ন পেরিয়ে এই আষাঢ়ে ছাপ্পান্নয় পা দিয়েছিলেন মুরারি-মোহন। মরার বয়স বলা যায় না কিছুতেই। তার ওপর রোগ-বালাই নেই, হঠাৎ মৃত্যু। শ্রাদ্ধ-শান্তিতে ঘটা করবার আছে কি!

এই কথাটাই এক রকম জানিয়ে দিয়ে চুপ করে বসেছিলেন যোগমায়া। কি ভাবছিলেন বলা শক্ত। সদ্য-বিধবার সামনে বসে আত্মীয়স্বজনরা যখন পরলোকগত ব্যক্তিটির পারলৌকিক পরিত্রাণের সবিস্তার কর্মসূচী তৈরী করেন তখন সেই স্বামী-সৌভাগ্য-বঞ্চিতার মনের অবস্থাটা ঠিক কি রকম দাঁড়ায়, সেদিকে বোধকরি কারও লক্ষ্য থাকে না। জ্যোতিপ্রসাদেরও ছিল না।

তিনি আপত্তি জানালেন।

—না, না, তোমাদের কথাটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না। মুরারির চলে যাবার বয়স হয়েছিল এ কথা আমি বলবো না। আমার চেয়ে সে আর কবছরেরই বা ছোট ছিল! কিন্তু কথাটা তো শুধু বয়স নিয়ে নয়। আমাদের বড় জামাই। বর্ধমান শহরের আত্মীয়-স্বজন বলতে এমন কেউ নেই যে, খবর পেয়ে আমাদের কাছে শোক প্রকাশ করতে ছুটে আসেননি। তাঁদের বলতে হবে, আমরা তো আছিই, তার ওপর তোমাদের বেয়াই-বাড়ী...... এঁদেরও কিছু বাদ দিতে পারবে না!

—কিন্তু......

মায়ের হয়ে আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতে গিয়েছিল নিখিল। জ্যোতিপ্রসাদ থামিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা যে মোটেই আনন্দের নয়, তা কি আর আমি বুঝিনে বাবা! খুব বুঝি। কিন্তু উপায়টা কি বলো, মুরারি ভায়া যে স্কুলে পড়াতেন সেখানকার মাষ্টার মশায়দের বলতে হবে, যাঁরা ওর বই-টইগুলো ছাপতেন...... তাঁদের না বলাটাও ভাল দেখাবে না, পাড়া-প্রতিবেশীরা তো আছেই। আরে বাবা, লোকটাতো তিনি সামান্য ছিলেন না। একটা নামজাদা স্কুলের এ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমাষ্টার—নোটবই-ই লিখেছেন কতো। ইচ্ছে করলে প্রফেসারী করতে পারতেন অনায়াসে, সেদিকে মন গেল না বলেই তো স্কুলটাকে আঁকড়ে পড়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত। অথচ মজা কি জানো, যোগমায়ার যখন বিয়ের কথা হয়—

জ্যোতিপ্রসাদ এবার কনিষ্ঠদের দিকে চাইলেন ঃ তোমাদের বয়স তখন অল্প। বাবা একজন স্কুল-মাষ্টারের সংগে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন শুনে আমাদের গুষ্টির সকলের মুখ একেবারে ভার! বাবা কিন্তু ঠিক বলেছিলেন ঃ শিক্ষিত, ভদ্র ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছি—ভাববার কি আছে! ও ঠিক নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে। দেখিস তোরা, দেখে নিস—

একটু দম নিয়ে জ্যোতিপ্রসাদ প্রায় আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে বললেন, ফলেও গেল ঠিক তাই। যোগমায়ার জন্যে আমাদের কোনদিন ভাবতে হয়নি।

যোগমায়া খুসী হলেন কিনা বোঝা গেল না; কিন্তু নিখিল আবার আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলো ঃ আপনি খরচপত্রের দিকটা ভাবছেন না মামা—

'ভাবছি বৈকি, নিশ্চয়ই ভাবছি' অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ফুটলো জ্যোতিপ্রসাদের মুখে ঃ কিন্তু তোমাদের বাপের শেষকাজ, আর আমাদের ভগ্নীপতির। টাকাকড়ি হাতে না থাকে, যা লাগে আমরাই এখন দেব। সুযোগ-সুবিধে মতো শোধ করে দিও, না দিতে পারো তাতেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মুরারি বেঁচে থাকতে কোনদিন আমাদের সাহায্য চায়নি, সেই জন্যেই শোধ দেবার কথাটা বলা। নইলে—

'না দাদা।' ঘরের প্রান্ত থেকে যোগমায়ার অবসন্ন কণ্ঠ ক্রমশঃ যেন কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো ঃ বেঁচে থাকতে যেটা তিনি ভাল-বাসতেন না, তারমধ্যে আমরা নাই বা গেলাম। যার যেটুকু সামর্থ্য সেইভাবে চলাই ভালো।

'আহা, তোমাকে তো কেউ ভায়ের কাছে হাত পাততে বলছে না' এবার কথা সুরু করলেন জ্যোতিপ্রসাদের ছোট ভাই রমাপ্রসাদ ঃ উপস্থিত কাজটা চালিয়ে নেবার জন্যে কিছু টাকা আমাদের কাছে না হয় ধার হিসেবেই নিলে। তারপর জামাইবাবুর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা কিংবা—কনিষ্ঠের বক্তব্য শেষ হবার আগেই জ্যেষ্ঠ বললেন, লাইফ-ইন্সিওরেন্স তো ছিল গোটা দুই মুরারির......কত টাকার বলতো?

যোগমায়া জবাব দিলেন না। আবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন। নিখিল একটু চুপ করে থেকে বললে, দুটো মিলে বোধ হয় হাজার দশেক।

'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের অঙ্কটাও খুব খারাপ হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শ্রাদ্ধ শান্তির পর ইচ্ছে করলে তোমরা আমাদের পাই-পয়সা মিটিয়ে দিতে পারবে।' জ্যোতিপ্রসাদ বললেন।

"বাবার বইগুলো বিক্রীর রয়্যালটি, তাও তো পাঁচজনের মধ্যেই পেতে পারো নিখিল, না হয় তাই থেকেই—"

রমাপ্রসাদ নিখিলের দিকে চাইলেন।

আপত্তির সমস্ত যুক্তিগুলি এমনভাবে খণ্ডন করতে সুরু করলেন তাঁরা যে, নিখিল আর তার ছোটভাই দুটির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠলো। যোগমায়াও আর কিছু বললেন না। নিখিলের ছোটভাই বিমল শেষ চেষ্টা করলো একবার।

'আপনারা বুঝছেন না। আয়োজন খুব বড় হলে কে তার তদারক করবে কে? আমাদের পক্ষে কি মস্ত একটা যজ্ঞি সামলানো সম্ভব।'

জ্যোতিপ্রসাদ দমবার লোক ন'ন। বললেন, লোকের ভাবনা কি! ওই যে তিন-চারটি ছেলে তোমাদের বাইরের ঘরটায় দিব্যি সংসার পেতে পড়াশুনো থেকে সুরু করে অফিসের চাকরি পর্যন্ত সব কিছুই নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে, তারা মুরারির শেষ কাজে একটু সাহায্য করতে পারবে না? খুব পারবে। না পারে যে যার পথ দেখুক, মুরারি এখানে অতিথিশালা খুলে যায়নি।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। মুরারিমোহনের গ্রামের জ্ঞাতি-স্থানীয় তিন চারটি ছেলে এক সময় বিদ্যার্জনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর কাছে এসে পড়েছিল। তিনি না বলতে পারেননি। তারা মুরারিবাবুর ভাড়াটে বাসায় থেকে স্কুল-কলেজে পড়েছে এবং তিনি যখন নূতন বাড়ীতে উঠে এসেছেন তখন তারাও তাঁর পিছনে পিছনে এসে এখানকার বাইরের ঘরটি দখল করে বসেছে। মাত্র একজনের এখনও বিদ্যার্জনের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে, বাকি তিনজন চাকরি-বাকরি অর্থাৎ অর্থার্জনে ব্যস্ত। এদের অন্যত্র চলে যাবার হুকুম দেবার কথাটা মুরারি কোনদিন ভাবেননি এবং তারাও কোনদিন সে বিষয় চিন্তা করার দরকার মনে করেনি। তাদের কেউ কখনও মুরারিমোহনকে অর্থ সাহায্য করেছে বলে জানা যায়নি, যদি করে থাকে, তা দিয়ে দিন চারেকের বেশী বাজার খরচ চলেনি বলেই মনে হয়। তবে এরা বিবেচক লোক। মুরারির মৃত্যুর পর কান্নাকাটি অবশিষ্ট কোন বিশৃঙ্খল হিন্দু ভোজনালয়ে গিয়ে উদরপূর্তি করে আসছে।

বাড়ী তৈরীর জন্য জমি কেনবার পর যোগমায়াই একবার ভুল করে ফেলেছিলেন, মানে আকারে-ইঙ্গিতে এই ক'টি অতিথিকে অন্য কোথাও যেতে বলা যায় কিনা তারই একটা প্রস্তাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন মুরারির কাছে। মুরারি তখন প্রাইভেট টিউশনির পালা শেষ করে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘর্মাক্ত পাঞ্জাবিটা আলনায় তুলে রাখছিলেন, যোগমায়ার যুক্তিগুলো তাঁর মনঃপূত হয়নি। শুধু বলেছিলেন, না মায়া, ও আমি মুখ ফুটে বলতে পারবো না। ছেলেবয়সে এদের বাপ-খুড়োরাই ছিলেন আমার অভিভাবক। অবশ্য টাকাকড়ি দিয়ে কেউ কিছু সাহায্য করেননি, কিন্তু স্নেহটুকু করেছেন তাও কম নয়।

বাস, সে প্রসঙ্গ আর কোনদিন ওঠেনি। আজ আবার যখন সে কথা উঠলো, যোগমায়া চুপ করে থাকতে পারলেন না।

—ওঁরা নিজে থেকে না গেলে যেতে বলা ওঁদের চলবে না দাদা। ওঁদের কথা থাক। আমরা নিজেরা কতটুকু কি করতে পারি তাই তোমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখ।

জ্যোতিপ্রসাদ মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন : বেশ তো। বর্ধমান থেকে আমাদের লোকজন তো আর নেহাৎ কম আসবে না। খাটখাটুনির কাজগুলো না হয় তারাই করবে। তা ছাড়া আমরা তো রইলামই।

জ্যোতিপ্রসাদ যেন প্রীভি কাউন্সিলের রায় পড়ে শোনালেন। এরপর কারও কিছু বলবার রইলো না।

বেশ ঘটা করেই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হয়ে

মরুভূমি ফুল

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শুনেছ কি কোনদিন?
স্তব্ধ দুপুরে চৈত্রদিনের বেলা
ঝাউ-এর পাতারা ধূসর মাঠের বুকে,
ফিস ফিস করে কত কথা কয় কৃষাণ-বধূর সাথে :
মৃদু আলাপন—গুঞ্জন মদিরাতে!
দেখেছ কি তুমি বর্ষা-বাদল-বেলা,
মাদল বাজায়ে বাতাস করে কি খেলা!
গ্রামপথ ছাড়ি বধূরা যখন
কলসী লইয়া কাঁখে,
থমকি দাঁড়ায় নদীর কিনারে
ঝিজক বনের বাঁকে :

চূর্ণ অলকে ঝরে জলকণা, নয়নে লজ্জা ঝরে,
মত্ত বাতাস বসন প্রান্তে দুরন্তপনা করে!
শ্রাবণ-সন্ধ্যা-বেলা
গুরু, গুরু, মেঘ করে গরজন,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া,
আঁধার লাগে ভয় নিরালা কক্ষে,
শিহরিত তনু কম্প্র বক্ষে,

মঞ্জীর চরণে চলে আনমনা কোথা আলতা প্রিয়া!
তনু নয়, যেন বসন কেশর শিকু বাদল রাতে;
সজল মেঘের কাজল আঁকা সে
ভীরু দুটি আঁখিপাতে।

দেখেছ কি তুমি শারদ প্রভাত-বেলা,
রৌদ্রমান শিশু মাঠে মাঠে করে খেলা!
কৃষক-বধূরা চলে মেঠো পথ ধরি,
দুরন্ত শিশু লুটায় চরণে পড়ি।

সরু আল-পথে চরণে বসন বাধে,
মমতা জড়িত শংকিত অপরাধে—
আঁকা-বাঁকা পথ করে আনমনা তাই,
সাবধানে চলে; তৃণের শিশুরে লাগি,
মানুষের মনে—চকিত নয়নে,
মমতা ওঠে যে জাগি!

দেখেছ কি কোনদিন?
দূরদিগন্তে সুনীল আকাশ তলে
শুভ্র পতাকা—হংস বলাকা চলে।

রাখাল ছেলের বাঁশের বাঁশীর সুর
বাতাবী ফুলের গন্ধের সাথে বাতাসে
মিশিয়া যায়;

কলমী লতার নীল ফুলে লাগে ঢেউ,
শোননি কি কানে, পরশ তাহার
লাগেনি কি তব গায়?
দেখনি কি তুমি, আপনার মনে
দেখনি কি কোনদিন;
আকাশের সীমা নত হয়ে যেথা দূরে
সবুজ মাটির অঞ্চলে হলো লীন।

শুনেছ কি কোনদিন?
ওরা গান গায়, ধান কাটে মাঠে মাঠে।
শীতের সকালে সোনালী রৌদ্র ঝরে,
আমন ধানের অঞ্চলে দেয় কনকাঞ্জলি ভরে।
ওরা ঘাম মোছে,
আঁটি আঁটি ধান নিয়ে যায় ভারে ভারে।

ওরা গান গায়, দীপ জ্বালে দ্বারে দ্বারে!
অনশন ক্লেশ মুছে যায় ক্ষণতরে,
ওদের ওষ্ঠে মৃদু হাসি করে খেলা।
ওরা উলু দেয়, শংখ বাজায়,
ধূপ জ্বালে ঘরে ঘরে :
ঝিকিমিকি করে শীতের সন্ধ্যাবেলা!

মাটির বুকের মরুভূমি ফুল ওরা :
নিরালায় ফোটে, মরুপথে ঝরে যায়।
ওদের স্বপন আকাশে মাটিতে কাঁদে,
ওদের স্বপন বাতাসে মিলায়ে যায়।

গেল। সভা করে দানসাগর—না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে গোছের কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণদের ফুটো পয়সা বিলি, অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য ফুলের মালা থেকে সুরু করে কন্ট্রোল-বিধি লঙ্ঘন করে লুচি-পোলাও, দই-মিষ্টি......অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হোলো না।

আরও ক'টা দিন কাটিয়ে ভাগ্নেদের একেবারে মাছে-ভাতে খাইয়ে মাতুলেরা দেশে ফিরে গেলেন। নিখিলদের মামীরা, মামাতো ভাই-বোনরা সকলেই এসেছিলেন। শ্রাদ্ধ-পর্বের পর আর যে ক'টা দিন ও'রা এখানে ছিলেন তার বেশীর ভাগ সময় অবশ্য ও'দের থিয়েটার এবং সিনেমাতেই কেটেছিল। খুব মর্মান্তিক একটা ব্যাপার উপলক্ষ করে আসতে হলেও, কলকাতায় আসা যখন সচরাচর হয়েই ওঠে না, তখন এখানকার আধুনিকতম ছবিঘরগুলো না দেখে ফিরে যাওয়াটা এ'রা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। নিখিলের বড়মামী তো যোগমায়াকে পর্যন্ত একদিন 'বরসাত' দেখবার জন্যে ঝুলোঝুলি সুরু করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ঘুরে আসবে চলো না ভাই, মনটা তবু দু'দণ্ড ভাল থাকবে।

যোগমায়া অবশ্য রাজী হ'ননি।

বর্ধমানে ফিরে গিয়ে শ্রাদ্ধ-পর্বের মোটামুটি একটা হিসেব পাঠাতে জ্যোতিপ্রসাদের দিন পনের সময় লেগেছিল। অঙ্কটা হাজার দুইয়ের কাছাকাছি পৌঁছলেও জ্যোতিপ্রসাদ তার সঙ্গে যে মন্তব্যটুকু জুড়ে দিয়েছিলেন তাতে সেটি খুব ভারি বলে মনে হবার কারণ ছিল না। জ্যোতিপ্রসাদ তাঁর পত্রে লিখেছেন ঃ 'যদিও আমাদের সকলের যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি সবই ইহার মধ্যে ধরিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে জন্য তোমাদের বিব্রত বোধ করিবার কারণ নাই। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে আত্মীয়স্বজনদের রাহাখরচটা দায়গ্রস্ত পক্ষকেই দিতেই হয়, অন্ততঃ আমরা এই সামাজিক রীতিটা এখনও অনুসরণ করি। কিন্তু তোমাদের যে সে নিয়ম মানিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। আর ফর্দ পাঠাইলাম বলিয়া ইহাকে টাকা পরিশোধের তাগিদ বলিয়া ভাবিও না। নিতান্তই তোমার মাতাঠাকুরাণী আমাদের কাছে হাত পাতিতে অনিচ্ছুক, সেই জন্যই টাকার অঙ্কটা জানাইতে হইল। লাইফ-ইন্সিওর বা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাকড়ি পাওয়া গেলে সুবিধামত পরিশোধ করিলেই চলিবে।' চিঠিখানি নিখিলকে লেখা। নিখিল অবশ্য চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত না পড়েই যোগমায়ার হাতে সমর্পণ করেছিল এবং মনে মনে বোধ করি জ্যোতিপ্রসাদকে এই বলে ধন্যবাদ জানিয়েছিল যে, মামীমারা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের সিনেমায় যাওয়ার খরচটা ফর্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়নি।

চিঠিখানি পড়ে যোগমায়া কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। তারপর ছেলেকে স্কুলে এবং লাইফ-ইন্সিওর কোম্পানীর অফিসে গিয়ে টাকা সংগ্রহের জন্যে তৎপর হতে বলেছিলেন।

মাস দুই পরের কথা বলছি।

ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী কি একটা কাজেই যেন জ্যোতিপ্রসাদ কলকাতায় এসে পড়লেন। এর আগে কচিৎ কখনও কলকাতায় এলে তিনি রাত্রের ট্রেণেই বর্ধমান ফিরে যেতেন; নয়তো রাতটা কোন হোটেলে কাটাতেন। এবার—সদ্য-বিধবা বোনটির ম্লান মুখখানি স্মরণ করে কি না জানি না, তিনি নিখিলদের বাড়ীতেই উঠলেন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মুরারিমোহনের খাটখানাতেই তাঁর শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। যোগমায়া এসেছিলেন পান দিতে।

ফিরে যাবার আগেই জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, কেমন আছিস বল্? একটু সামলাতে পেরেছিস? মুখচোখ তো দেখছি আরও শুকিয়ে গেছে!

যোগমায়া কি বলবেন ঠিক করে ওঠবার আগেই জ্যোতিপ্রসাদ যোগ করলেন ঃ মুরারি নেই, এখন তুমিই ছেলেদের সব। শক্ত হতে হবে আর নিজের শরীরটিকে ঠিক রাখতে হবে।

যোগমায়া ম্লান একটু হাসলেন।

—তারপর, টাকাকড়ির কতদূর কি হোলো তাই বল্। লাইফ-ইন্সিওর, বইয়ের রয়ালটি... প্রভিডেণ্ট ফণ্ড...নিখিল তদ্বির-তদারক করে ঠিকমতো সব আদায় উসুল করছে তো?

যোগমায়া এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, নিখিলকে ডাকছি। তুমি তার সঙ্গে কথা কও।

মিনিট কয়েক পরেই নিখিল ঘরে ঢুকলো, পিছনে যোগমায়া।

'টাকাকড়ির ব্যাপারে বেশ একটু গণ্ডগোল এসে গেছে' ভূমিকা না করেই নিখিল বলতে সুরু করলো ঃ ভাবছিলাম, চিঠি লিখে আপনাকে জানাবো। বাড়ীর জন্য দুটো পলিসি থেকে বাবা টাকা ধার নিয়েছিলেন, বরাবর সুদ টেনে আসছিলেন, আমরা জানতেও পারিনি। শেষের ক'টা মাস আবার সুদও দিয়ে উঠতে পারেন নি। কাজেই ওগুলোর একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত...'

জ্যোতিপ্রসাদ মুখের অন্ধকারটা যথাসম্ভব হালকা করবার চেষ্টা করে বললেন ঃ তা হলে তো সময় লাগবারই কথা। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডটা ঠিক আছে তো?

—তনুর বিয়ের সময় টাকা ধার নিয়েছিলেন, এখনও সেটা শোধ হয় নি। শোধ করে যা পাওয়া যাবে তাও খুবই সামান্য।

জ্যোতিপ্রসাদের মুখের ছায়া যেন ঘনতর হোলো। তাকিয়ায় হেলানের ভঙ্গীটা ছেড়ে প্রায় সোজা হয়ে বসলেন।

—বইগুলোর রয়্যালটি এতদিনে কিছু জমেছে নিশ্চয়। সেগুলোর একটু খোঁজ-খবর নিও। বইওলারা শুনেছি পাকা-ব্যবসাদার, লেখকদের ফাঁকি দিতে পারলে আর ছাড়ে না।

'ফাঁকি বাবা নিজেকেই দিয়েছেন' হাসবার ভঙ্গী করে বললো নিখিল ঃ সব কখানা নোট-বইয়ের কপিরাইট বিক্রী করে দিয়ে গেছেন। ঠিক কপিরাইটও নয়, প্রকাশকরাই অন্যান্য লোক-দের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে বাবাকে কিছু করে টাকা ধরে দিতেন। প্রথমদিকের লেখা ও'র খানকতক বই বাজারে বেশ চলেছিল, অনেকটা সেই জন্যেই।

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা নিস্তব্ধতা। কেবল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দেয়ালঘড়িটার টিক টিক শব্দ।

জ্যোতিপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর যোগমায়ার দিকে চেয়ে বললেন, কই এসব তো কোনদিন বলিস নি? তুইও বুঝি জানতিস না?

'না।'

যোগমায়া তাড়াতাড়ি মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। কেন জানি না, হঠাৎ তাঁর মনে হোল, কারা যেন তাঁর স্বামীর মৃতদেহটা নিয়ে কেটে, ছিঁড়ে পরীক্ষা করে দেখছে।

জ্যোতিপ্রসাদ অনেকটা নিজের মনেই বললেন, ভারি আশ্চর্য! তোকেও কিছু জানতে দেয়নি!

যোগমায়া এ কথার জবাব দেননি। দেওয়া দরকার মনে করেন নি। হয়তো সেই সব কথা ভাবছিলেন যেগুলো তাঁর খুব ভাল করে জানা আছে। যখন তিনি নিজের হাতে গুলে দিতেন কয়লার খরচ কমাবার জন্য, মুরারিমোহন নিজেই নিজের পাঞ্জাবিটায় সাবান দিয়ে নিতেন অণিমার বিয়ের পর, বি, এ পরীক্ষার আগে নিখিলের জন্যে মাষ্টার রাখার সময় বাড়ীতে দুধ আসা যখন মাস কয়েক বন্ধ ছিল, তনিমার বিয়ের আগে হঠাৎ যখন সিগারেট ছেড়ে নস্যি নিতে সুরু করেছিলেন মুরারিমোহন...সেই সব দিনের কথা।

কিন্তু সব কথা কি ভায়ের কাছেও বলা যায়? আটাশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর যোগমায়া আজ আর জমিদারবাড়ীর মেয়ে নন, মুরারি-মোহন নামক জনৈক মৃত ভদ্রলোকের স্ত্রী।

পাঁচালী

(৪৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিরক্ত হইয়া ১২৭৯ সালে ব্রজমোহন পাঁচালীর দল ত্যাগ করিয়া যাত্রার দল গঠন করেন। নিজের দলের জন্য তিনি নন্দবিদায়, কাশীখণ্ড, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি প্রায় বারটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজ রায়ের যাত্রার দলের খুব নাম হইয়াছিল। সন ১২৮৩ সালে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ব্রজমোহনের লোকান্তর ঘটে। সখের যাত্রার তখন খুব চলতি। ১২৮০ সালে সুপ্রসিদ্ধ মতি রায় যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। এই সময় দেশে কালীয়দমন যাত্রারও বিশেষ প্রভাব ছিল। কিছু পূর্বে খ্যাতনামা যাত্রা-গায়ক গোবিন্দ অধিকারী লোকান্তরিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নূতন দল লইয়া ধীরে ধীরে সুনাম অর্জন করিতেছেন। এই সময় যাত্রা পাঁচালীতে খ্যাতি অর্জন সহজ-সাধ্য ছিল না। সুতরাং ব্রজমোহন যে শক্তিধর ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্রজ রায়ের এই গানটি বাল্মীকির (লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার উক্তি) রামং দশরথং বিদ্ধি মাম্ বিদ্ধি জনকাত্মজং শ্লোকাংশের অনুবাদ বলিয়া মনে হয়।

সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

যদি তুমি যাও কাননে দাস হয়ে রাঘবের সনে।
ভুলনা ভুলনা বাছা মায়ের কথা রেখ মনে॥
মনে হলে জননীরে, মা বোলো সেই জানকীরে
পিতৃভক্তি রেখ বাছা শ্রীরামের ঐ শ্রীচরণে॥

রসময়ী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাভারতের তেজস্বিনী বিদুলা থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের শ্রীমতী মলি পর্যন্ত বহু নারী-চরিত্র আমাদের সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে দাগ কেটে গিয়েছেন, কেউ বা বই শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতই অন্তর্হিত হয়েছেন। তাই কোনও পাঠক যদি প্রশ্ন করেন, কোন্ নারী-চরিত্র আমাদের সব চেয়ে মুগ্ধ ও অভিভূত করে, তা হলে সহসা জবাব দেওয়া কঠিন কাজ। ভিন্নরুচি মানুষের মতান্তর থাকবেই। তবু আপনি যদি বলে বসেন, 'সেই অদ্বিতীয়া আমার গৃহিণী,' তা হলে আপনাকে শুধু সত্যনিষ্ঠ নয়, পত্নীনিষ্ঠও বলতে হবে। কিংবা কেউ যদি নিজস্ব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ফলে কোনও বিশেষ মহিলা অথবা বান্ধবীকেই আশ্চর্যতম নারী বলে ভাবেন, তা হলে তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাহিনী যতই কৌতূহল সৃষ্টি করুক, সাহিত্যপদবাচ্য হবে না। ঘরে-ঘরে তো অনেক সতী-সাবিত্রী আছেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ে ঘটা করে কেই বা প্রবন্ধ রচনা করতে বসেন? ওদিকে বিদেশিনী নীলনয়নার কীর্তি-কলাপ যতই লোভনীয় হোক, তাঁরা আমাদের দৃষ্টি-পরিধির বাইরে। এ কথা মানি যে, আমাদের দেশজ সাহিত্যে এমন নারী-চরিত্রের অভাব নেই যা আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক সৃষ্টির কথা তুলতে চাই না। একা রোহিণী, মেজবৌ(?) কিরণময়ী... নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। তার ওপর অনেক ভারি-ভারি কেতাব আছে যেগুলি অধ্যাপকীয় পাণ্ডিত্য আর বিশ্লেষণে ভরপুর। লাইব্রেরী থেকে সেগুলো পড়ে নেবেন, আলোচনা করবেন। আপনাদের আদর্শ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তার চেয়ে ভালোয়-মন্দয় মেশা, দোষে-গুণে, রক্ত-মাংসে তৈরি এমন একটি নির্ভেজাল বাস্তব চরিত্রের অবতারণা করা যাক্ যেটি একজন সাহিত্যিকের মানস রচনা হলেও আশ্চর্য রকমের খাঁটি হিউম্যান অর্থাৎ স্ত্রীলোক। এমনি একজন সাধারণ অশিক্ষিতপ্রায় গ্রাম্য রমণী আমার আলোচ্য পদার্থ যিনি শাড়ী পরলেও মালকোঁচা-পরা শক্ত-সমর্থ পুরুষ হতে তাঁর বাধা ছিল না। এই চরিত্র সাধারণ মানবী হয়েও কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। এবং সেই কারণেই তা আমাকে এবং আমারই মতন আরো কয়েকজন গুণগ্রাহী পাঠককে শ্রদ্ধায় বিগলিত করেছে।

প্রভাত মুখুজ্জে মশায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' নামে গল্পটি আপনারা অনেকেই হয়তো পড়েছেন, উপভোগ করেছেন কিন্তু তেমন করে ভেবে দেখেননি এ চরিত্রের প্রকৃত মহিমা কোথায়। এ গল্পটি প্রথম পড়েছিলাম কিশোর-কালে। স্পষ্ট মনে পড়ে, বর্ষার রাতে প্রেম 'এলিজি' কবিতার কোলে গল্পের বইখানি রেখে তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। তারপর আজ পর্যন্ত আরও কয়েকবার পড়েছি গল্পটা। এবং যতবার পড়েছি, ততবারই শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে ও আতঙ্কে মন আমার মাথা নীচু করেছে। রসময়ীর দাবি এমনি জোরালো যে, জোর করেই শ্রদ্ধা-ভক্তি আদায় করে নেয়। ভেবেছি, এমনি একজন মহিলা বাংলাদেশের জোলো মাটিতে জন্মগ্রহণ করে বৃথাই প্রতিভা নষ্ট করেছেন। আবার সেই সঙ্গে একথাও মনে হয়েছে যে, বাংলাদেশ না হলে এমন ফসল জন্মাতই না। রসময়ী খাঁটি বাঙালিনী। ভাষায় ও আচরণে শিক্ষা সুরুচি না থাকুক, সে-কালিনী হয়েও তিনি শাশ্বতী। আধুনিক বাংলার হাল চালে অভ্যস্ত মানুষ কিন্তু জানে যে, রসময়ীর রসনা যতই রস-কষ বর্জিত হোক, তার খরতা ও রসিকতার ধাঁচ বাংলাদেশের নিজস্ব। স্থূলই বলুন আর সাক্ষাই বলুন, দাম্পত্য হুমকির টেকনিকে সবাই সমান চাল চলে সকল স্ত্রীই নির্ভীকের দেওয়াল। সে যাই হোক, রসময়ী হলেন স্ত্রীর বিশেষ। হীরা, পান্না, নীলা নয়, একেবারে খাঁটি পলা। অর্থাৎ স্ত্রীর-চিহ্নিত হলেও মঙ্গল-গ্রহের স্বক্ষেত্রে তাঁর জন্ম। মারামারি, কাটা-কাটিতেই তাঁর অভিরুচি, উল্লাসও বলতে পারেন। এ রমণী যদি দেশান্তরে ভূমিষ্ঠ হতেন, তা হলে ইতিহাসের পাতায় মস্ত নাম রেখে যেতে পারতেন। সম্প্রতি 'করোনেশান'-সমারোহের ছবি দেখতে গিয়ে ছ ফুটের ওপর দীর্ঘ উন্নত দর্পিত রাণীর চেহারা দেখে মনে মনে ভাবলুম হ'লো ভালোই। তবে, তুমি বাছা রসময়ীকে দেখনি! দেখলে মাথা নীচু করে সেলাম জানিয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিতে। ছোটখাটো ঘোমটা-পরা লজ্জাবনতমুখী বাঙালী এই গৃহিণীর কাছে শাসন-পদ্ধতির অনেক কিছুই তোমার শেখার বাকি আছে। ইতিহাসে খ্যাতি হয়তো মেলেনি, কিন্তু ঘরোয়া ইতিহাসের জিজ্ঞাসু পাঠকচিত্তে রসময়ীর জ্বলন্ত স্বাক্ষর কখনোই মুছে যাবে না।'

এমন মহীয়সী মহিলার চরিত্র-কীর্তনে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। রসময়ী হলেন হুগলীর অধিবাসিনী, যেখানে 'সীর খাসের' মতন অমন আঁশহীন, অতুলনীয় রসাল আম জন্মায়। সেখানকার মোক্তার ক্ষেত্রমোহনবাবুর তিনি সহধর্মিণী। ফৌজদারী আদালতে মামলা পরি-চালনে সিদ্ধহস্ত হলে কি হয়, ভদ্রলোকের দীর্ঘ আঠারো বছরের দাম্পত্য-জীবন কেটেছিল ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে আর পরাস্ত হয়ে সন্ধি স্থাপনে। আমাদের একটা ঝুটো সাত্ত্বিক ধারণা আছে যে, স্বামী মাত্রেই ভর্তা এবং প্রভু, আর অত্যাচারী স্বামীর হাতে পড়ে নিরীহ বঙ্গললনা অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে থাকেন। কিন্তু স্ত্রীর হাতে স্বামী-নির্যাতনের কাহিনীটা সাধারণতঃ লোকলজ্জায় চেপে রাখা হয়। আর রসময়ী হলেন সেই জাতীয় মহিলা যাঁকে কোনোমতেই চেপে রাখা যায় না। অদম্য তাঁর শক্তি-স্বাতন্ত্র্য। এমন বর্ণচোরা/বর্ণোজ্জ্বলা(?) রমণীর কথা বিদেশী সাহিত্যে লেখা হলে আমরা তারিফ করতুম। কিন্তু নিতান্তই বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনহীন স্ত্রীলোক। তাই 'গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না।'

একে সাংঘাতিক মুখরা স্ত্রী, তার ওপর নিঃসন্তান। তাই জীবন্ত নরক থেকে উদ্ধার-কল্পে ক্ষেত্রমোহনবাবু ঠিক্ করলেন, অবশ্য গোপনে, যে তিনি দ্বিতীয়বার সংসার করবেন এবং সুখী হবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রস্তাবনায় আর উপসংহারে যে স্বর্গ-পাতাল প্রভেদ, একথা ক্ষেত্রমোহনবাবুর জানা উচিত ছিল না কি? স্বামী হয়েও, আঠারো বছর এক সঙ্গে ঘর করেও, তিনি রসময়ীকে পুরো চিনতে পারেননি, এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ছোকরা এবং হঠকারী পুরুষ হলেও না বুঝতুম, রক্ত গরম। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মতন প্রবীণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি এত বড় একটা ভুল চাল দিলেন, এইটাই দুঃখের বিষয়। সে যাই হোক, স্বামীর মতিভ্রম এবং গোপন সঙ্কল্পের কথা খবর পাওয়া মাত্রই বোন বিনোদিনীকে সঙ্গে নিয়ে রসময়ী সেই কনের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। রাগে ও হিংসায় বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া এমন কিছু বিচিত্র ঘটনা নয়, বিশেষ করে পাত্র যদি হয় আপনারই স্বামী। কিন্তু কনের মা, বাড়ীর ঝি ও অন্যান্য মেয়েদের ধরে রসময়ী এমনি প্রহার দিলেন যে, অন্য-মনস্ক পাঠক পড়ে হঠাৎ চমকে ওঠেন। ভাবেন, কনেটি সামনে উপস্থিত থাকলে আর কি হ'ত, কে জানে! রসময়ীর বিচক্ষণতা সত্যিই শ্রদ্ধার সামগ্রী। কেন না, তিনি বুঝেছিলেন যে, শুধু মুখ ছোটালে কাজটা অর্ধসমাপ্ত থেকে যাবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জেহাদ্-যাত্রা, সেটা পুরোপুরি সফল নাও হ'তে পারে। তাই থুতু, ঝাঁটা এবং অশিবর্ষটির যুগপৎ ব্যবহারে এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তিনি বাড়ীর লোকদের এমন ভয়বিহ্বল করে দিলেন যে, ভবিষ্যতে কোনও দিনই তাঁরা এমন স্থলে সতীনের ঘরে মেয়ে দিতে চাইবেন না। পূর্বরাগের যদি এই পূর্বাভাস হয়, তা হলে প্রত্যক্ষ প্রতিশোধের নমুনা কি না হতে পারে!

ক্ষেত্রমোহন যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন তিনি বিস্ময়ে নির্বাক। কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'তুমি না মরলে আর বিয়ে করছি নে। মরবে কবে?' আমার প্রশ্ন এই: ক্ষেত্রমোহন যদি এতই বিজ্ঞ, তা হলে স্বর্ণমৃগের আশায়, বিপদ প্রত্যাসন্ন জেনেও তাঁর এমন দুর্মতি হল কেন? জবাব বোধ হয় মিলবে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকে: 'ধীরোঽপি পুংসাং মলিনী ভবন্তি।' স্বামীর নিরীহ প্রশ্নে রসময়ী উত্তর দিলেন: 'তার এখনও অনেক দেরী। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে, বুড়ো থুড়থুড়ো হয়ে যাবে, যখন আর কেউ তোমাকে মেয়ে দিতে রাজি হবে না, তখন আমি মরব।' দাম্পত্য সংলাপ এই-খানেই শেষ হ'ল। এর চেয়ে হেঁয়ালিশূন্য সরাসরি উত্তর সক্রেটিস্‌ও দিতে পারতেন না। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনবাবু কল্পনাও করতে পারেননি রসময়ীর প্র্যাকটিক্যাল রসিকতা কতদূর গড়াবে। মাস ছয়েক পরে রোগে ভুগে রসময়ী যখন দেহ রাখলেন, ক্ষেত্রবাবু তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রতিদিন যাঁর তাড়নায় ও লাঞ্ছনায় তিনি জীবন্মৃত্যু ভোগ করছিলেন, সেই স্ত্রীলোকের বহু-ঈপ্সিত মরণে তিনি কমার অশ্রু ত্যাগ করলেন। তারপর মাস ছয়েক নিরাপদ ব্যবধানের পর আর একটি ডাগর মেয়ে

(শেষাংশ ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্যচর্চা — জলে

লাবণ্য পালিত

নৌকা চালনায় লেখিকা

প্রায়ই শুনেছি পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন—"কি রকম প্রশ্ন পড়েছিল রে?"

উত্তর হোল—"জলের মতন সহজ"!

আমার ধারণা যিনি এই উপমাটির সৃষ্টি করেছিলেন জল বস্তুটিকে তিনি বোঝেন্‌নি। জল আর যাই হোক্‌ সহজ নয়! জলের সংগে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জীবন এবং জীবনের বহু জিনিষ এমনভাবে জড়ানো যে, ভাবলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

আমাদের পুরাণে আমরা পাতায় পাতায় জলকেলির কথা পাই। জলের সংগে আমাদের সম্পর্ক, আনন্দ সৌন্দর্য মানব সৃষ্টির সংগে সংগে গাঁথা হ'য়ে গিয়েছে। তাছাড়া জল থেকেই তো প্রাণীর ক্রমবিকাশ হয়েছে। এবং সকলের চেয়ে বিস্ময়ের কথা জলের কাছ থেকেই আমরা আমাদের শিল্পের ও সৌন্দর্যের অনেক তথ্য পেয়েছি.... তরঙ্গের গতি আর তার বিচিত্র ভঙ্গী থেকে এসেছে নাচের ছন্দ.....দেহ রেখার

(শেষাংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়)

সমুদ্রের উন্মুক্ত পরিবেশে

ঝাঁপাইবার পূর্ব মুহূর্তে

সমুদ্রের উন্মুক্ত পরিবেশে

স্বাস্থ্যচর্চা — স্কুলে

রেবা রক্ষিত (দেবীচৌধুরাণী)

"আমি সাধারণ মেয়ে"

মোটর সাইকেলে লেখিকা

আমি সাধারণ মেয়ে। ছোট বেলায় আমি খেলা-ধুলো খুব ভালবাসতাম বড় হ'য়ে হাই-স্কুলে পড়বার সময় দেখলাম যে, সেখানে শুধু কেতাবী শিক্ষাই দেওয়া হয়; কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে যে শরীর-চর্চার সংযোগ রাখার প্রয়োজন এই দরকারী কথাটা কেউ ভাবেন না, ছাত্রীদের পড়তে হয় এক গাদা বই, তার ওপর অনেককেই গৃহস্থালীর কাজ-কর্মও কিছু পরিমাণ করতে হয়, খাদ্যে ভেজাল, স্বাস্থ্য-চর্চার সুযোগ নেই, ফলে, অনেকেরই শরীর নষ্ট হয়ে পড়ছে—অম্ল-শূল, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া প্রভৃতিতে ভুগছে, আমি নিজেও তাদের মধ্যে একজন। স্কুল-কলেজ ছাড়াও ছেলেদের শরীরচর্চার জন্য যেমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি আছে, মেয়েদের জন্য তেমন ভাল কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যায়ামাগার নেই—এমনকি ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত নেই। তবে তারা স্বাস্থ্য শিক্ষা পাবে কেমন করে? দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী, সমাজের সঙ্গিনী এবং পালনকর্ত্রী নারী-রা যদি স্বাস্থ্যবতী না হলে সমগ্র সমাজই যে পঙ্গু

মোটর সাইকেলের নিচে লেখিকা ঃ — আরোহী—বিষ্ণুচরণ ঘোষ

স্বরূপ।

হয়ে পড়বে—রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবনতি হবে, আমি সঙ্কল্প করলাম যে, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মেয়েদের মধ্যে যাতে ব্যায়ামের প্রসার হয় আমার ক্ষুদ্র শক্তি সে বিষয়ে নিয়োজিত করব, এভাবেও ত দেশের কিছু কাজ করা যেতে পারে? কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাকে ফলবতী করতে হলে শারীর-চর্চা ও ব্যায়াম বিষয়ে নিজের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রয়োজন। সে শিক্ষা পাই কোথায়? ভাবতে ভাবতে ব্যায়ামাচার্য যোগীন্দ্র শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ, বি-এসসি, বি-এল মহাশয়ের নাম মনে পড়ে গেল, ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমার আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানালাম, সব কথা শুনে তিনি আমার সদিচ্ছার প্রশংসা করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম-শিক্ষা পেয়ে যাতে আমি নিজের আকাঙ্ক্ষা ফলবতী করতে পারি সে বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আমি ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের শিক্ষাধীনে আসি, ব্যায়ামের প্রভাবে শীঘ্রই আমার রোগজীর্ণ দেহ নীরোগ, সুপুষ্ট ও সুগঠিত হয়ে উঠল—অঙ্গভঙ্গী হল সুষ্ঠু (১নং চিত্র), ব্যায়ামাচার্যের তত্ত্বাবধানে ও অনুগ্রহে আমি শুধু খালি হাতে ব্যায়াম, যন্ত্রাদি সাহায্যে ব্যায়াম, যোগব্যায়াম ইত্যাদি সর্বপ্রকার ব্যায়ামেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভই করিনি, অন্যান্য নানাবিধ কসরৎ ও ক্রীড়া-কৌশলে দক্ষতা অর্জন করেছি, শুধু মোটর গাড়ি নয়, মোটর সাইকেল চালিয়েও ঘোরাফের করতে পারি (২নং চিত্র)। প্রয়োজন হলে যাতে ঘোড়ায় চড়তেও না আটকায় এজন্য রাইডিংটাও শিখে নিয়েছি (৩নং চিত্র)। বুকের ওপর দিয়ে মোটর সাইকেল চলে গেলেও গ্রাহ্য করি না (৪নং চিত্র)। এমনকি দুই টন রোলারও অনায়াসে বুকের ওপর দিয়ে চালাতে দিতে পারি (৫নং চিত্র)। এর জন্য শিখতে হয়েছে প্রাণায়াম, প্রাণায়াম শক্তির সাহায্যে বুকের ওপর হাতী পর্যন্ত নেওয়া যায়—আশা করি আমিও একদিন নিতে পারব। বন্দুকের লক্ষ্য ভেদ করতেও ভালভাবে শিখেছি—ত্রিশ ফুট দূরে ঝোলানো আংটির ভেতর দিয়েও গুলী চালিয়ে দিতে পারি। সাঁতারও বেশ ভালই জানি। এসব ছাড়াও আমি এমন কতকগুলি খেলা আয়ত্তে এনেছি সেগুলি যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি বিপজ্জনক। যেমন ধরুন, লোহার রড সংযুক্ত ক্ষুরধার বর্শাফলকের সূচাগ্র অংশ কণ্ঠ-দেশে রেখে গলার চাপ দিয়ে লোহার রডটি অর্ধ-বৃত্তাকারে বেঁকিয়ে দেওয়া (৬নং চিত্র)। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এসব ক্রীড়া-কৌশল সাধারণ শিক্ষার্থিনীদের জন্য নয় বা আমি কাউকে শিখতেও বলি না। আমি শুধু পরীক্ষা করে দেখতে চেয়ে-

অশ্বপৃষ্ঠে লেখিকা

ছিলাম উপযুক্ত শিক্ষা পেলে একটি অতি সাধারণ স্বাস্থ্যের মেয়ে স্বাস্থ্য-চর্চায় কতদূর এগিয়ে যেতে পারে—তাই আজ বুকে হাতী তোলার কল্পনাও করতে পারছি। দৈনন্দিন সুস্থ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য হাতী তোলা অত্যাবশ্যক নয়।

একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, আমাকে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করতে হয় না, লেখা পড়া করতে হয় না। শুধু শরীরচর্চা ও ব্যায়ামের অনুশীলন নিয়েই আছি, আবার একথাও যেন কেউ না ভাবেন বিশেষ করে যাঁরা আমার ব্যায়ামনৈপুণ্য ও ক্রীড়াকৌশল দেখেছেন—যে আমার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু আছে। আমি সামান্য গৃহস্থ ঘরের সাধারণ পরিবেশের মেয়ে, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য মধ্যপথে সাময়িক-ভাবে লেখা-পড়া বন্ধ রেখে আমাকে চাকরী গ্রহণ করতে হয় এবং এখনও আমি চাকরী করে থাকি। রান্না এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ আমাকে নিজের হাতেই করতে হয়। গান-বাজনার চর্চাও নিয়মিত কিছু কিছু করে থাকি। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের ১৯৫৩ সালের নৃত্য প্রতিযোগিতায় সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। পড়া-শুনার উৎসাহও হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধিই পাচ্ছে। আবার নতুন করে লেখা-পড়া আরম্ভ করে প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনীরূপে উত্তীর্ণ হব এ মনোবল আমার আছে। আমি মনে করি ব্যায়ামই আমার মধ্যে এই মনোবল এবং সব কাজে উৎসাহ এনে দিয়েছে।

দুই টন রোলারের নিচে লেখিকা

স্বাস্থ্য চর্চা—জলে

(৫৬ পৃষ্ঠার পর)

নানান কারুকার্য......। তাই জল অজ্ঞাতসারে সব মানুষকেই আকর্ষণ করে, আমাকেও করতো। যে দিন প্রথম জলে সাঁতার কাটতে শিখলাম সে দিনের আনন্দ আজও ভুলিনি......। এবং আজও জানি জলে সাঁতার কাটা একটা অত্যন্ত দরকারী ব্যায়াম। স্রোতে জলের চাপে এবং জলের সংস্পর্শে আমাদের দেহ-রেখা ও দেহের সৌন্দর্য্য রীতিমত সুন্দরতর হয়ে ওঠে...... সেই জন্যে নৌকা চালানো দেহের গঠন রক্ষার পক্ষে একান্ত সহায়ক। জলের স্বতন্ত্র শক্তি, যাকে আমরা চাপ বলি তার বিরুদ্ধে আমাদের দেহকে রীতিমত কসরৎ করতে হয় নৌকো চালাতে গেলে; সাঁতারেও তাই। সেই জন্যে সমুদ্র-স্নানের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, কারণ সমুদ্রে জলের চাপ অত্যন্ত বেশী এবং সব সময় তরঙ্গের প্রতিঘাত আমাদের দেহে আঘাত করে দেহ ও দেহগত সমস্ত স্নায়ুকে সজাগ করে তোলে......। পুরীতে সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা ভোলবার নয়......। আমার আনন্দের ভাগ যদি কিছুমাত্র আপনারা অনুভব করেন, সেই আশায় সংগ্রহ করে তুলে ধরলাম আপনাদের কাছে কয়েকটি উজ্জ্বল আনন্দদায়ক ছবি......।

পুনর্বার

বোস্টন শহরের এক ধনী ভদ্রলোক নতুন বাড়ি করাবার কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলেন সে বাড়ি তাঁর মনের মতো হয়নি। অবশেষে তিনি এক নিলামওয়ালা নিযুক্ত করলেন সেটিকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। নিলামওয়ালা বাড়িটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এমন বিজ্ঞাপন দিলেন যে ভদ্রলোক বুঝতেই পারলেন না যে সেটি তাঁরই বাড়ি। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে পাঠালেন নিলামে—যত টাকা লাগে ঐ বাড়ি তাঁর চাই-ই।

এবং কিনলেন সেই বাড়ি।

নির্মম

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

এ চিন্তা সহ্য করতে পারব না আমি। মনে কর, আমাদের কিছু হল।—কেউ জানতেও পারবে না—"

স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে আবার হেসে ওঠে জাডসন। বলে, "যা হবার হোক না, এমনি করেই আমি টাকা করেছি। আমি যদি হঠাৎ মরেই যাই, তোমরা যা খুশী করো, ওগুলো তখন ত তোমার।"

মার্সেলা জানে, তর্ক নিরর্থক। বরাবরই ও এমনি নির্মম, বিশেষ যখন প্রতিবাদ আসে। সব কিছু ওর নিজের মনোমত হওয়া চাই। পরাজয়ের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাইরে দরজার দিকে তাকায় মার্সেলা। শান্তভাবে বলে, "আমি হাঁটা দিচ্ছি, গোলাবাড়ীতে বিদায় নিয়ে নেব। তুমি ওখান থেকে তুলে নিও আমায়।" আলেকের স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলবে মনস্থ করে। একজনের অন্ততঃ জানা দরকার।

"উত্তম প্রিয়তমে," খুশীমনে বলে ওঠে জাডসন। "বেচারী চোরের জন্য ভেবে মরার কোন দরকার নেই। কেউ গায়ে পড়ে না এলে কারো কোন ক্ষতি হবে না।"

পথের বাঁকে মোড় ফেরে মার্সেলা। জাডসন কুঠুরির দরজাটা বন্ধ করতে থাকে। হঠাৎ থেমে দাঁড়ায়, মনে পড়ে যায় বাইরের বারান্দায় শিকারের জুতাজোড়া শুকোচ্ছে। এই কুঠুরিতেই থাকে সেটা। তাই দরজা খোলা রেখেই ও আনতে যায়। বাইরের ভারী গোঁয়ো টেবিলটার ওপরে রয়েছে বুটজোড়া, ব্যাগটা আর কোটটাও ত সেখানে।

লেক থেকে উঠে আসছিল আলেক, দূর থেকে জাডসনকে দেখে হাত নাড়লে। কাঠের দেওয়ালের কোটরে ভাঁড়ার বৃদ্ধি করার মতলবে একটা কাঠবিড়ালী একটা কাঠবাদাম

(শেষাংশ তৃতীয় কলমে)

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ প্রাণ, তারই তরে এত ভাংগা গড়া
গ্রীস রোম মিশরের ধূসর সভ্যতা
ইদানীং অনুশীলনের;
ভারতের প্রাণ-মূল্য নিরূপিত মনুসংহিতায়
বেদের বয়স কত? পৃথিবীতে আমরা ক'দিন?
গূঢ়তত্ত্ব উপনিষদের—
আগম-নিগম সেঁচা সূক্ষ্ম যুক্তিজালে
একালীন মানুষের চিত্ত অন্ধকার;
প্রাণ নিয়ে টানাটানি দৈনিক সংগ্রামে,
সে প্রাণই বা কতটুকু?
অক্ষুরন্তকালের বিচারে॥
যে প্রাণ উবিয়া যায় কর্পূরের মত
যে প্রাণের সাড়া নাই—মৃত্যুর ওপারে,
এই আছে, এই নাই—চিহ্ন নাই
কালের কোষ্ঠীতে,—
চোখে দেখে নাই কেহ বস্তু-স্পর্শহীন দুর্লভতা
অভ্রান্ত বিশ্বাসে আর নৈরাশ্যের ঘন দীর্ঘশ্বাসে
স্পন্দিত প্রাণের ব্যথা—শ্রুতি-মধুকর॥
উদভ্রান্ত যে প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণা,
আপনারই কাছে প্রাণ হতমান অসীম লজ্জায়,
অন্নের সামান্য মূল্যে অসামান্য প্রাণের বেসাতি,
লাভ নাই,—লোকসানের মোটা অঙ্ক ফেলে
প্রাণের উদ্বৃত্ত পত্রে ফাজিল হিসাব॥
যে প্রাণের মহিমায় মুখর আমরা,
প্রাণহীন অপদার্থ জ্ঞানীর বিচারে
অগণ্য মানুষ আজ নগণ্যের দলে,
এক দর মুড়ি ও মুড়কির;
জীবনে ক্ষুধার চেয়ে বড় কী তাড়না?
জীবনে প্রাণের চেয়ে ধর্ম বড় নয়,
মনুষ্যত্ব হাস্যকর স্বত্বের মামলায়॥
জীবনে ফুলের চেয়ে কি সুন্দরতর?
তবু ফুলে 'কীটসম তৃষ্ণা জেগে থাকে',
অতএব প্রাণ থাক, থাক তার মূল্যাবধারণ,
আপাততঃ বেঁচে যাই
মোটামুটি কিছু ধার পেলে॥

(দ্বিতীয় কলমের শেষাংশ)

ধরতে যাচ্ছিল। জাডসনের পায়ের ভারী আওয়াজে শিকার ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে সে পালিয়ে যায়। জুতো জোড়া নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই জাডসনের পা পড়ে যায় বাদামটার উপর। পা পিছলে পড়ে যায় জাডসন, ধড়াম করে ভারী টেবিলটায় মাথাটা ঠোকা লাগে।

কয়েক মিনিট পরেই জ্ঞান ফিরে আসতে থাকে। বারান্দায় শোয়ানো জাডসনের মাথাটা আলেকের সবল বাহুতে ভর করে আছে আর একটি সহৃদয় কণ্ঠ বলছে, "এমন কি আর পড়েছেন মিঃ ওয়েব। কাটেনি একদম, মিনিট খানেক মাত্র জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এই নিন, খেয়ে ফেলুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

একটা ছোট্ট হুইস্কির গেলাস চেপে ধরে জাডসনের ঠোঁটে। ঝিম-মারা আধা অচেতন অবস্থায় জাডসন সেটি [illegible]।

---

* মার্কিণ লেখক উইলিয়াম ডোনল-এর গল্প।—অনুবাদক।

মহড়া

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অন্যদিন খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে ঘুমিয়ে নেয় মানসী, কিন্তু আজ আর ওর চোখে ঘুম নেই। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'খানা চোখের সামনে খোলা। তার থেকে বিড়বিড় করে সুমিত্রার পার্ট মুখস্থ করছে মানসী। শুধু প্রম্পটারের ভরসায় থাকবার মত মেয়ে সে নয়। তাতে অভিনয় ভালো হয় না। সময় বেশি নেই। দুদিন বাদেই ষ্টেজ রিহার্সেল আর তৃতীয় দিনেই থিয়েটার। তাছাড়া মানসীর শুধু নিজের পার্ট মুখস্থ করলেই চলবে না। তপতী নাটকে পাড়ার আরো যে সব মেয়ে অভিনয় করবে তাদেরও শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে নিতে হবে। দলের বেশির ভাগ মেয়েই আনাড়ী। এদের দিয়ে যে কি করে জাতমান রক্ষা করবে সেই হয়েছে মানসীর চিন্তা। পদ্মপুকুর মহিলা সমিতির সে সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্ট কিছু নয়। এ পাড়ায় তারা মাত্র বছরখানেক এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সমিতির সবাই মানসীর নেত্রীত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। সে না হলে সমিতির একদিনও আর চলে না। সামনের ইলেকসনে মানসীর সেক্রেটারীশিপ কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু সব কিছুই নির্ভর করছে 'তপতী'র ওপর। আর তপতী নাটকখানা নির্ভর করছে সুমিত্রার ওপর। মানসী অন্য সব ভাবনা রেখে আবার বইয়ে মন দিল।

'মানসী দি, ও মানসীদি।'

শুধু আহ্বান নয়, সঙ্গে সঙ্গে কড়াও নড়ে উঠল। নিশ্চয়ই সুষমা। খাটের ওপর থেকে নিজে আর নামল না মানসী। শুয়ে শুয়েই ডাকল, 'ও নীরজা, নীরজা। কি করছিস তুই ?'

'বাচ্চুকে ঘুম পাড়াচ্ছি বউদি।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা পরে ঘুম পাড়াবি। দোরটা খুলে দিয়ে আয়।'

খানিক বাদে দরজা খোলার শব্দ হোলো। তার একটু পরেই সুষমা এসে সামনে দাঁড়াল। 'এই যে মানসী দি, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি ?'

মানসী শুয়ে শুয়েই মেয়েটির দিকে তাকাল। বাইশ-তেইশ বছর হবে সুষমার বয়স। মাত্র বছর দুই হোলো বিয়ে হয়েছে, এখনো ছেলেপুলে কিছু হয়নি। বেশ আঁট-সাট গড়ন। স্বাস্থ্যবতী। গায়ের রঙ শ্যামলা। কিন্তু ওর চেহারার সব চেয়ে গুণ হোলো দৈর্ঘ্য। সেদিন ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছে মানসী। পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি। দলের মধ্যে এমন লম্বা মেয়ে আর নেই। বিক্রম হিসাবে ওকে চমৎকার মানাবে। মানসীর সিলেকসনের কেউ তারিফ না ক'রে পারবে না।

সুষমা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'অমন ক'রে কি দেখছেন মানসীদি।'

মানসী এবার খাটের ওপর উঠে বসল, তারপর দু' হাত সুষমার দুই কাঁধে রেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাকে নাথ, তোমাকে। কিন্তু সুষমা, ফের যদি তুমি অমন মানসীদি মানসীদি করো, তাহ'লে তোমার আর আমি মুখ দেখব না বলে দিচ্ছি।'

সুষমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি যে আমার চেয়ে পাঁচ ছ' বছরের বড় হবেন মানসী দি। সেদিনই তো বয়সের হিসেব হচ্ছিল।'

মানসী মুখে গাম্ভীর্যের ভঙ্গি এনে বলল, 'সে হিসেব ছেড়ে দাও। আজ থেকে আমি তোমার শুধু মানসী, মানসী দি নই, একথা মনে রেখ। এখন থেকে থিয়েটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার বিক্রম, আর আমি তোমার সুমিত্রা। স্বামী পুত্র ঘর সংসার এক-দিনের জন্যে সব তোমাকে ভুলে যেতে হবে। নইলে কিচ্ছু হবে না।'

সুষমা বলল, 'সব ভুলে যেতে হবে ?'

মানসী বলল, 'নিশ্চয়ই। এখন থেকে তোমার কল্পনার বন্ধু রাজা নয়, সম্পদ নয়, শুধু আমি, শুধু তোমার এই সুমিত্রা। বুঝতে পেরেছ ?'

বলে সুষমার গাল দুটি একটু টিপে দিল মানসী।

সুষমা বলল, 'ভুল হয়ে গেল কিন্তু মানসী দি। সুমিত্রা আর যাই করুক, কক্ষণো বিক্রমের গাল টিপে দিতে পারে না। বিক্রম তেমন মেয়েলি পুরুষ নয়।'

'ঠিক, ঠিক। এবার একটা কথার মত কথা বলেছ বটে।' মানসী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। সুষমাও যোগ দিল সেই হাসিতে।

একটু বাদে মানসী বলল, 'দাঁড়াও এক কাপ ক'রে চা খেয়ে নিই। তারপর পুরো দমে আবার রিহার্সেল চালাব। তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে নিতে না পারলে আমি

গেছি। বিক্রম যদি ভালো না হয়, সুমিত্রার আর কোনো আশা নেই।'

সুষমা আপত্তি করল, 'এই অসময়ে আবার চা কেন?'

মানসী বলল, 'চা আর আর্ট-এর কোন সময় অসময় নেই। একথা মনে না রাখলে ভালো আর্টিস্ট হ'তে পারবে না। নীরজা, ও নীরজা, এদিকে আয় একবার।'

দোরের ওপাশ থেকে উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। গায়ের রঙ কালো। কিন্তু বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। লম্বা ছাঁদের মুখের ডৌলটিও বেশ মিষ্টি। পরনে খয়েরী রঙের পুরোন একখানা তাঁতের শাড়ি। হাতে প্লাস্টিকের চুড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর। সুষমা একটুকাল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন একটু করুণ বিষণ্ণতার ছোঁয়াচে মেয়েটির চেহারায় যেন আরো মাধুর্যের ছাপ লেগেছে।

মানসী বলল, 'ওঘরে কি করছিলে নীরজা?'

নীরজা বলল, 'চাল বাছছিলাম বউদি। এবারও বড় কাঁকর।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা চাল বাছা এখন থেকে। ষ্টোভে দু' কাপ চায়ের জল বসাও গে। আচ্ছা না হয়, তিন কাপই কর। গলাটা কেমন যেন ধরে আছে। চায়ের জলে ভালো করে না ধুয়ে নিলে আজকের রিহার্সেলটা জমবে না।'

নীরজা কোন কথা না বলে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল।

সুষমা বলল, 'এটি কে মানসী দি? আপনার কোন ননদ-টনদ নাকি?'

মানসী মৃদু হাসল, 'অনেকেই ওই ভুল করে। [illegible] কেমন ঠাকুরঝির মত [illegible] দেখেছ? আমার [illegible] স্বীকার কর ভাই।'

সুষমা বলল, 'স্বীকার করছি। [illegible] বলে যে চেহারা চেনবার জো নেই। [illegible] ছিলাম আপনার দূর সম্পর্কের কোন [illegible] হবে। চেহারায় [illegible] একেবারে [illegible] মেয়ে। আর নামটিও বেশ নীরজা। আমি তো কোন [illegible] এমন নাম শুনিনি।'

মানসীর ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের [illegible] উঠল। 'ওর আগের দেওয়া নাম কি ছিল জানো? নেপী। চেহারাও ছিল সেই রকম। এই এক বছর ধরে আমিই ওকে মেজে ঘষে [illegible] করে তুলেছি।'

সুষমা তারিফ করে বলল, 'আপনার অসাধ্য কাজ নেই মানসী দি। আপনাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।'

মানসী হেসে বলল, 'বাঃ, এই তো হয়ে এসেছে। শুধু গলাটা আর একটু ভারি হবে আর একটু জোরালো হবে। তোমার চেহারার পৌরুষ আমি মেক-আপে এনে দেব, কিন্তু স্বভাবের পৌরুষ তোমাকে চেষ্টা করে আনতে হবে সুষমা।'

সুষমা হেসে বলল, 'আশ্চর্য, আপনি রিহার্সেলের কথা ছাড়া আর বুঝি কিছু বলবেন না?'

মানসী বলল, 'না বিক্রম, আমার আর কোন বক্তব্য নেই।'

নীরজা মেঝের ওপর ফোল্ডিং টেবিল পেতে দিল। দুখানা চেয়ার এনে রেখে দিল দুদিকে। তারপর প্লেটে ক'রে বিস্কিট আর শ্বেতপদ্মের মত দুটি চায়ের কাপ এনে রাখল তার ওপর।

সুষমা বলল, 'এত হাঙ্গামার কি দরকার ছিল'।

মানসী বলল, 'হাঙ্গামা আবার কিসের? বিছানায় বসে চা খাওয়াটা আমি তেমন পছন্দ করি নে।'

মানসী শুধু নিজেই সুন্দরী নয়, রুচির দিক থেকেও যে সৌখীন তা এই ঘরখানা দেখেই বেশ টের পেয়েছে সুষমা। পুরোন ভাড়াটে বাড়ির একতলার ঘর। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন প্রাসাদের একটি কক্ষ। খাট, ড্রেসিং টেবিল, দামী কাপড়চোপড় রাখবার জন্যে কাচের আলমারী, বইয়ের র‍্যাক, সব এই একখানা ঘরে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। দেয়ালে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একটি পুরুষের ফোটো। গৃহকর্তা শ্যামল সেন। এ জি বেঙ্গলে সিনিয়র গ্রেডের ক্লার্ক। কিন্তু মানসীকে দেখলে ঠিক কেরাণীর স্ত্রী বলে মনে হয় না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুষমা বলল, 'আপনার ঘরখানা ভারি চমৎকার। আর সুন্দর সাজিয়েছেন। আমি একটা গোটা বাড়ি পেয়েও এমন ভালো করে সাজাতে পারিনি।'

মানসী বলল, 'সাজাবার আর কি আছে। আজকাল অবশ্য নীরজাই সব করে। রান্না-বান্না, ধোয়া-পোঁছা, সাজানো-গুছানো সব নিজের হাতে নিয়েছে। আমাকে কিছুই দেখতে হয় না।'

সুষমা বলল, 'চমৎকার লোক পেয়েছেন মানসী দি। আমাকে দিন না অমন একটি জোগাড় করে। ওকে পেলেন কোথায় বলুন তো?'

মানসী সংক্ষেপে নীরজার এখানে আসার কাহিনীটি বলল।

ওর আগের বুড়ী ঝিটি ঝগড়াঝাঁটি করে চলে যাওয়ায় বড়ই অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল মানসী। এক হাতে রান্নাবান্না, জল তোলা, বাসন মাজা, দুরন্ত ছেলেকে সামলানো— একেবারে হিমসিম খেয়ে যেত। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যাকে সামনে পেত তাকেই বলত, একটা ঝি-টি জোগাড় করে।'

শেষ পর্যন্ত খোঁজ মিলল। এই রাস্তারই [illegible] বাড়ী ওদিকে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁর ঠিকে ঝি মানদা এসে বলল, 'মা, আমার মেয়েটিকে রাখবেন।'

মানসী বলল, 'ঠিকে ঝি দিয়ে আমার দরকার নেই, আমি রাতদিনের লোক চাই।'

মানদা খুসি হয়ে বলল, 'সে রাতদিনই থাকবে। সোমত্ত মেয়ে, পাঁচবাড়ি কাজ করার চেয়ে একজন জানাশোনা ভদ্দরলোকের বাড়ীতে বাঁধা থাকে আমার কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না। দুবেলা দুটো খেতে দেবেন। আর মাইনে খুসি হয়ে আপনি যা দিন তাই নেবে।'

নেপীকে দেখে খুসি হোলো মানসী। ওর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ে যে দেখছি সধবা। তা ওর স্বামীর ঘরে পাঠাও নি?'

মানদা দুঃখ করে বলল, 'কতবার পাঠালাম মা, যত পাঠাই তত পালিয়ে পালিয়ে আসে। আমার অদেষ্ট মন্দ।'

মন্দ অদৃষ্টের কথা তারপর পুরোপুরিই শুনেছে মানসী। নেপীর স্বামী কুঞ্জলালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। স্বভাব চরিত্র ভালো নয়। মদ খায়, গাঁজা খায়। দেহেও নানা ব্যাধি আছে। তাই নিয়ে কিছু বললে নেপীকে ধরে মারে। অমন স্বামীর ঘর কিছুতেই আর করবে না নেপী। কুঞ্জলালও তা বুঝতে পেরেছে। নেপীর আশা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের আধবয়সী এক বোষ্টমীকে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে।

মানসী বলল, 'ওর ওই বোষ্টমীর পাদপদ্মই ভালো। তুই থাক আমার কাছে। তোকে আমি লেখাপড়া শেখাব।'

সেই থেকে নেপী মানসীর কাছেই আছে। আগে ছিল একেবারে গেঁয়ো ভূত, কিচ্ছু জানত না। কিন্তু শিখিয়ে পড়িয়ে মানসী মাত্র বছরখানেকের মধ্যে ওর এই নামান্তর রূপান্তর ঘটিয়েছে। আজকাল নাম ঠিকানা লিখতে পারে নীরজা, সহজ বাংলা বই বেশ পড়তে পারে। সম্প্রতি ওকে ইংরেজীও শেখাতে আরম্ভ করেছে মানসী।

সুষমা আর একবার বন্ধুর প্রশংসা করে বলল, 'আপনার অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

ওদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নীরজা এসে কাপ প্লেটগুলি তুলে নিতে।

মানসী তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, অমন গোমরামুখী হয়েই থাকবি নাকি? লোক-জন এলে আলাপ আপ্যায়ন করতে হয় না বুঝি? এ কে জানিস?'

সুষমাকে দেখিয়ে মানসী জিজ্ঞাসা করল।

নীরজা বলল, 'জানি। আপনার বন্ধু।'

'শুধু বন্ধু নয়রে, আমার বর। তোর দ্বিতীয় দাদাবাবু।' খিল খিল করে হেসে উঠল মানসী।

সুষমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না মানসীদি।'

মানসী নীরজার দিকে তাকাল, 'কিরে পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?'

নীরজা এবার একটু মুচকি হাসল, 'মেয়েছেলে কি মেয়েছেলের বর হয় নাকি বউদি?'

মানসী বলল, 'ও কি আর মেয়েছেলে থাকবে? রাজপোষাকে, রাজমুকুটে ওকে এমন পুরুষসিংহ সাজিয়ে দেব যে, তোরও সাধ যাবে সিংহিনী হয়ে ওর পিছনে পিছনে ছুটতে। ও আমার থিয়েটারের বর বুঝতে পেরেছিস? ও রাজা, আমি রাণী। দেখ না কিরকম মানায়। এসো সুষমা, ড্রেস রিহার্সেলের নমুনাটা আজই একটু নীরজাকে দেখিয়ে দিই। ওর মোটে বিশ্বাসই হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের নীরজাও তো দর্শকদের একজন।'

আলনা থেকে শ্যামলের একটা পাঞ্জাবী পেড়ে নিয়ে জোর করে সেটা সুষমাকে পরিয়ে দিল মানসী। বিছানার নীল রঙের চাদরটা ওর মাথায় পাগড়ীর মত করে জড়িয়ে দিল। তারপর নীরজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে এবার পছন্দ হয়?'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীরজা এবার ওদের সামনে থেকে সরে গেল।

মানসী বলল, 'সুষমা, এই বেশে তোমাকে আজ রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।'

সুষমা হাতজোড় করে বলল, 'রক্ষে করুন মানসীদি। আমি তা মরে গেলেও পারব না।'

খানিক বাদে শাড়ি বদলে চুল বেঁধে, স্নো পাউডারে প্রসাধন সেরে মানসী সুষমার সঙ্গে ড্রামাটিক ক্লাবে চলল। ক্লাব খুব বেশি দূরে নয়। পাড়ার এ্যাডভোকেট বিনয় হালদারের ড্রয়িংরুমেই নাটকের মহড়া চলছে। তাঁর মেজো মেয়ে গীতশ্রী অঞ্জনা করবে বিপাশার পার্ট।

বেরোবার আগে মানসী একবার এগিয়ে ছেলেকে দেখে গেল। বারান্দায় মাদুরের ওপর তিন বছরের শিশু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাচ্চু তো নয় একটি মূর্তিমান বিচ্ছু। যতক্ষণ জেগে থাকে ওর দুষ্টুমির সীমা থাকে না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে একেবারে মোমের পুতুল।

উপুড় হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে একমনে একপাশে নীরজা চাল থেকে কাঁকর বেছে চলেছে। চুলের রাশ পিঠ ভরে ছড়ানো। মানসী একটুকাল ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাচ্চু উঠলে ওকে খাওয়াস।'

নীরজা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'আপনার বলতে হবে না বউদি।'

মানসী যেন এবার একটু লজ্জা পেল। সত্যি, নীরজাকে সংসারের কোন কথাই আজকাল আর বলে দিতে হয় না।

হালদার বাড়ী থেকে রিহার্সেল দিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে গেল। সব ক'টি মেয়েই আজ এসেছিল। রিহার্সেলটা বেশ চমৎকার জমেছে। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে মানসীর পার্ট। অঞ্জনার দাদা নিরঞ্জনবাবুও আজ উপস্থিত ছিলেন। নাট্যরসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি সুস্মিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে মানসীর চোখে পড়ল তাদের বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। কপাটের একটা পাট খোলা, একটা পাট ভেজানো। একজন অপরিচিত সুদর্শন যুবক চেয়ারে বসে রয়েছে। আর তার সামনে তক্তপোষের ধার ঘেঁষে নীরজা পা ঝুলিয়ে বসে তার সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ করছে। বটে! তোমার পেটে পেটে এত! মানসী মৃদু হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল।

দরজার আড়াল থেকে ঘরের পুরোপুরি দৃশ্যটাই দেখা যাচ্ছে এবার। নীরজার পাশে গম্ভীর মুখে বসে বাচ্চু। যত্ন করে তাকে জামা প্যান্ট পরিয়েছে নীরজা, মাথা আঁচড়ে চোখে কাজল দিয়েছে। নিজেও সেজেছে একটু। ঠিক সাজা বলা চলে না। এ ওর নিত্যকার সান্ধ্য-প্রসাধন। মানসীর দেওয়া পুরনো ফিকে চাঁপা রঙের শাড়িটি ঘুরিয়ে সুন্দর করে পরেছে। চুল বেঁধে ঠিক মানসীরই ধরণে, সিঁথিতে এঁকেছে সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখা, পাউডারের পাফও একটু বুলিয়েছে মুখে। মাত্র এইটুকু। কিন্তু এই সামান্য মেকআপেই ও যেন একেবারে বদলে গেছে। বেশ সুন্দরী আর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে ওকে।

অপরিচিত যুবকটির চোখে মুগ্ধতা, মুখে সৌজন্যের স্নিগ্ধ হাসি। সামনে উঁচু টিপয়টার ওপর চায়ের কাপ। এর মধ্যে চা দিয়ে আদর-আপ্যায়নও হয়ে গেছে, হুঁ। মুখ টিপে হাসল মানসী। বেগুনী রঙের এ্যাসট্রেটায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে যুবকটি এবার মৃদু হাসল, 'শ্যামলবাবুর বোধ হয় ফিরতে অনেক দেরি হবে।'

নীরজার ঠোঁটে লজ্জিত মধুর একটু হাসি ফুটে উঠল, 'কি জানি, অন্যদিন তো এর মধ্যে এসে পড়েন। আজ যে কোথায় গেছেন—'

'অফিসে যাওয়ার সময় আপনাকে কিছু বলে যাননি?'

'না তো, আমাকে উনি কিছু বলেন না।'

'ভারি অন্যায়।' হাতঘড়ির দিকে যুবকটি একবার চোখ বুলিয়ে নিল। 'আর বসবার জো নেই। আমাকে আবার অনেক জায়গায় ছুটতে হবে। আপনি কিন্তু শ্যামলবাবুকে বলবেন মনে করে। বলবেন আমাদের উত্তরসুরীর বৈঠক আবার নতুন করে কাল থেকে চালু হচ্ছে। কাল চারু এভেনিউতে অমিয়দার ওখানে অধিবেশন। এবারকার বৈঠকের একটু নতুনত্ব আছে। বিবাহিত সভ্যরা সব সস্ত্রীক আসবেন। লক্ষ্মীদের হাতের ছোঁয়ায় যদি ভাঙা ক্লাব ফের জোড়া লাগে।'

নীরজা স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

'আপনি কিন্তু অবশ্যই যাবেন।'

নীরজা বলল, 'আমাকে আবার কেন।'

যুবকটি হেসে বলল, 'না না, নিশ্চয়ই যাবেন। স্ত্রী ছাড়া কাল সভ্যদের ক্লাবে প্রবেশ নিষেধ। শ্যামলবাবুকে বলবেন, কাল এই সুরদাস ঘটক দোরে পাহারা দেবে।'

নমস্কার বিনিময়ের পর সুরদাস বাইরে নামল, তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে সিগারেট টানতে টানতে দ্রুত পায়ে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে গেল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে রইল মানসী। তার যেন শক্তি নেই কথা বলবার, শক্তি নেই এক পা এগোবার।

তারপর ভিতরের ঘরে যাওয়ার জন্য নীরজা যেই বাচ্চুকে কোলে নিতে গেছে, ঝড়ের বেগে মানসী ঘরে ঢুকল, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেপী, এসব কি হচ্ছিল শুনি?'

আশ্বিনের ঝড়

শ্রী বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আশ্বিনের সোনা রোদ্দুরে আকাশে-বাতাসে আগমনীর গান ভেসে এসেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। আবার এই আশ্বিনেই হঠাৎ এক একবার আর্তনাদ উঠেছে ঘরে ঘরে। মানুষের প্রাণ নিয়ে লেগেছে টানাটানি, গ্রামকে গ্রাম গিয়েছে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে, দুমড়ে গিয়েছে হাওয়ায় উড়ে, ঘরবাড়ী পড়েছে মাটির উপর নুয়ে, ছোটবড় গাছ পড়েছে শুয়ে। আর বানের জলে ভেসে গিয়েছে দিকবিদিক। প্রাণের দায়ে সাপে-মানুষে যখন একই গাছ জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করতে হয়, তখনকার অবস্থা সহজেই অবর্ণনীয়। আশ্বিনের ঝড় এমনই এক আকস্মিক দুর্যোগ, যার পরিণাম যুদ্ধের মহাশ্মশানের মতোই ভয়ানক আর প্রচণ্ডতা একটা বিরাট দৈত্যের পৈশাচিক বিক্ষোভের মতই প্রলয়ঙ্কর।

বাংলা দেশের [illegible] ঝড় [illegible] ১১১০ সালে এমন একটি [illegible] উল্লেখ আছে যে, [illegible] ঝড় [illegible] ও জলপ্লাবনে আনুমানিক দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ১১৭৬ সালেও আর একটি এমন ভয়াবহ ঝড়-বন্যার সঙ্গে বিশৃঙ্খলা [illegible] করে দিয়ে যায় যে, তার ফলে [illegible] দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১১৭৬ সালের এই প্লাবন [illegible] বাকেরগঞ্জের [illegible] এমন লোক অল্পই আছে যার জীবনকালে আশ্বিনের ঝড়ের কোন না কোন একটি ঘটনা স্মৃতিপটে দাগ কেটে যায়নি। ১৯৪২ সালের [illegible] ঝড়, ১৯৪২ সালের মেদিনীপুরের অক্টোবর মাসের [illegible] ১৯৪২ সালের অক্টোবরে [illegible] এই দুই স্মরণীয় ঝড়ের মধ্যে যে ভয়াবহ ক্ষতি করেছে, তা [illegible] ঐতিহাসিক কাহিনী সৃষ্টি করেছে।

ঋতুপর্যায়ে বর্ষার আরম্ভের পূর্বে ও শেষ হয়ে যাবার সময় ঝড়ের তাণ্ডব প্রবল হয়ে উঠে। চৈত্রের ঝড় ও কালবৈশাখীর ঝড় এর অন্যতম, আশ্বিন-কার্তিকের ঝড় বা সাইক্লোন এর শেষ পর্ব। একদিকে এপ্রিল ও মে, অন্যদিকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর—বর্ষা ঋতুর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুই দৈত্যদানো। তারা কখন ক্ষেপে উঠে কি প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে কেউ বলতে পারে না। বাংলার ঝড়ের উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগর। সাগরের কোন এক স্থানে বায়ুর চাপের স্বল্পতা ঘটে, তাতে জলস্ফীতি হয় আর তারই চারিদিক ঘিরে প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ আরম্ভ হয়।

ঝড় ও বৃষ্টি চলে এক সঙ্গে। বাতাস সোজা না এসে ঘুরে ঘুরে আসে বলেই এর নাম হয়েছে সাইক্লোন। উত্তর গোলার্ধে সাইক্লোনের সময় হাওয়া ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, তার বিপরীত দিকে ঘোরে আর দক্ষিণ গোলার্ধে সাইক্লোন বা ঝড়ের সময় বাতাস ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে থাকে। বেশী চাপের স্থান থেকে বাতাস যখন বাইরের দিকে ঘুরতে থাকে তখন তাকে বলে এন্টি-সাইক্লোন। ঝড়ের হাওয়া-[illegible] যখন সাগর ছেড়ে ভূমির দিকে চলে তখন তা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আর সাধারণতঃ খুব বেশী স্থান যেমন একটা দেশ বা প্রদেশের সব স্থান জুড়েও ঝড় হয় না। দুইশত মাইলের বেশী এর পরিব্যাপ্তি ঘটতে দেখা যায় না। ঘণ্টায় এর গতিবেগ ৫০ মাইলের মত, কোথাও বা ২০ থেকে ৮০ মাইল। আমেরিকার ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলে এর নাম হারিকেন, চীন সমুদ্রে টাইফুন বা তুফান, আর ভারত মহাসাগরে সাইক্লোন।

গত একশো বছরের স্মরণীয় ঝড়গুলির একটা বিবরণ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হল। এর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে প্রধানতঃ সরকারী নথিপত্র ও সংবাদপত্র থেকে। গত ২৫ বৎসরের ঝড়ের বিবরণের কয়েকটি স্থলে শোনা কথার উপরে নির্ভর করেও কিছু কিছু লিখতে হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে সকল স্মরণীয় ঝড় বাংলার উপর দিয়ে চলে গেছে তার তালিকা সম্পূর্ণ নয়। পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে সাধারণতঃ এক একটা প্রবল ঝটিকা দেখা দেয়। যদিও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, কারণ নিয়ম মাত্রেরই ব্যতিক্রম আছে। আর সে ব্যতিক্রমের হারও যখন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উপরেই নির্ভরশীল তখন কোন ঝড় ছোট বা কোনটা বড় হওয়াটাই কিছুই বিচিত্র নয়। এ প্রবন্ধে সবগুলো ঝড়ের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তথ্যের অভাব ও স্থানাভাব তার প্রধান কারণ। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ঝড় বলতে যা বুঝায় সে সম্পর্কেও সবাই একমত না হতে পারেন। সে যাই হোক, লেখকের পক্ষে যতটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তাই এখানে প্রকাশ করা হল। অসম্পূর্ণতার জন্য প্রবন্ধের আগেভাগেই সুধীজনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের ঝড়

অসময়ের ঝড় বলেই আশ্বিনের ঝড় স্মরণীয় হয়ে থাকে। তার প্রচণ্ডতা যেমন ভয়াবহ, তার বিপুলতাও তেমনি আতঙ্কজনক। কলকাতাকে গত একশো বছরে যত ঝড় তছনছ করে, ভাসিয়ে বা উড়িয়ে দিয়ে গেছে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের ঝড় তাদের অন্যতম। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এর আঘাত সর্বাপেক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছিল। বেলা দশটা থেকে একটু বাদলা হাওয়া বইতে লাগল, এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে দূরে বজ্র গর্জনের সঙ্গে একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এসে পৌঁছতে লাগল। মনে হ'ল কিছু যেন কলকাতার দিকে ছুটে আসছে। শব্দটা ক্রমেই চললো ওই যে কাছে, আরও কাছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সোঁ সোঁ আর ঝড়ের প্রচণ্ড আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল তাণ্ডব। কোথা থেকে দমকা হাওয়ার ধাক্কা এসে ধড়াস ধড়াস দরজা জানালা ভেঙে দেয় আর [illegible] খড়খড়ি [illegible] ছুটে ফুটিয়ে। ঝড়ের বেগ বাড়ে, হাওয়ার মত্ততায় গাছ পড়তে লাগল, ঘরের চাল উড়তে লাগল, আর বন্যার জল ফুলে ফেঁপে [illegible] উঁচু হয়ে নদীর দুকূল ছাপিয়ে [illegible] মাইল দূরবর্তী যত স্থান ছিল সব নিঃশেষে ডুবিয়ে। সবচেয়ে শক্ত উঁচু বাঁধগুলো গেল জলের চাপে ভেঙে, লবণ-জলের বন্যা বয়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে, যত শস্য ছিল সব নষ্ট করে। ঝড়ের চেয়েও বন্যায় ক্ষতি হল অনেক বেশী। কলকাতা সহর ও সহরতলীর দুর্ভোগ হল অবর্ণনীয়। বিশেষভাবে উত্তর কলকাতায় যত সব কাঁচা ঘর ছিল তাদের প্রায় সবগুলোই উড়ে গিয়েছিল। সহর এলাকায় গাছ ও বাড়ী বা দেয়াল চাপা পড়ে ১৭ জন লোক মারা গেল, সহরতলীতে গেল ৩২ জন। ১৮৬৪ সালের এই ঝড়ে শুধু কলকাতাতেই ১০০ খানা পাকা-বাড়ী ধ্বসে পড়েছিল, আর ৫০০ থেকে ৬০০ বাড়ী নানাভাবে নষ্ট হয়েছিল, চল্লিশ হাজার [illegible] কুঁড়ের বা খড়ের ঘর নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই ঝড়ে রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড গাছ পড়ে পথ আটকে গিয়েছে—গাছের ডালপালা ও অজস্র পাতা গিয়ে পুকুরের উপর পড়ে জল দিয়েছে পচিয়ে—সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। হুগলি, শ্রীরামপুর, কালনা, কৃষ্ণনগর, [illegible] নোয়াখালি, পাবনা ও বগুড়া পর্যন্ত এই ঝড় হাওয়া বয়েছিল। [illegible] জেলখানা এই ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল, আর উপরোক্ত সহরগুলোর অনেক সরকারী বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাধারণভাবে [illegible] সব জায়গাতেই ঝড়ের চেয়ে তুফানে ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশী। কলকাতার বিশ মাইলের মধ্যে আছিপুরে যখন তুফান আসে, তখনই তার জল নদীর পথ ধরে প্রবাহিত হয়। তার পাশে যত নদীবর্তী সব জমির উপর দিয়েই বিপুল বেগে এই জল দুর্দমনীয়ভাবে চলে আসছিল। আড়িয়াদহে [illegible] গতিবেগ ও স্ফীতি [illegible] ব্যাপক হয়নি। জেলাগুলো থেকে সরকারী দপ্তরে এই ধ্বংসের যে বিবরণ পৌঁছল তাতেই এর ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। হাওড়ার [illegible] সেই জেলাতেই [illegible] জলে ডুবে বা ঝড়ের [illegible] গৃহপালিত জীবজন্তু মরে গিয়েছে হাজার হাজার। মেদিনীপুর থেকে [illegible] এক [illegible] মারা

কুমারিকা অন্তরীপের অধীবাসী

—শ্রীচঞ্চল মিত্র

ভোম্বলদা'র সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। তিনি আমাকে ভালোবাসেন, কিন্তু পছন্দ করেন না। অপছন্দর কারণ, তিনি সংগীতবিদ্যার উপর হাড়ে চটা এবং আমি সুরধ্বনী গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীর প্রচার-সচিব। সুরধ্বনীর নাম অবশ্য আপনারা সকলেই জানেন।

ভোম্বলদা'র বয়স চল্লিশ, সুবিপুল দেহ। ছেলেবেলা হইতে মোটা বলিয়া তিনি লজ্জায় বিবাহ করেন নাই। গ্রামোফোন এবং রেডিওর ভয়ে তিনি সহর ছাড়িয়া এমন একটি রাস্তার উপর বাড়ী করিয়াছেন যেখানে দু'মাইলের মধ্যে লোকালয় নাই। কিন্তু ভোম্বলদা খাইতে এবং খাওয়াইতে ভালবাসেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহার জন্য আমার মন কেমন করে।

শনিবার বিকালবেলা আমার পাঁচ ঘোড়ার গাড়ীতে (ফিয়েট ৫) চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম; ইচ্ছা ছিল হপ্তান্ত কাটাইয়া একেবারে সোমবার সকালে কলিকাতায় ফিরিব।

নির্জন রাস্তার ধারে পাঁচিল-ঘেরা জমির মাঝখানে ছোটখাটো দোতলা বাড়ী। ফটকের সামনে ছিরু অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। ছিরু একাধারে ভোম্বলদা'র ভৃত্য পাচক গৃহিণী সচিব। আমাকে দেখিয়া ছিরুর শ্রীহীন মুখ একটু উজ্জ্বল হইল, সে তাড়াতাড়ি ফটক খুলিয়া দিতে দিতে বলিল,—'বাবু এসেছেন—বাঁচলাম।'

'কি খবর ছিরু?'

'আজ্ঞে খবর ভাল নয়।'

গাড়ী থামাইয়া বাহির হইলাম,—'ভাল না! দাদার কি শরীর খারাপ নাকি? জ্বরজারি?'

ছিরু বল্‌লে,—আজ্ঞে জ্বরজ্বারি নয়। বাবু নাচ্‌ছেন।'

চমকিয়া গেলাম। ভোম্বলদা নাচিতেছেন! চল্লিশ বছর বয়সে ওই জলহস্তীর ন্যায় শরীর লইয়া নাচিতেছেন! কিন্তু কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম,—নাচছেন কেন! কোনও সুখবর পেয়েছেন নাকি?'

ছিরু বলিল—সুখের কোথায় বাবু? পরশু সন্ধ্যাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, ফিরে এসে নাচ্‌তে সুরু করেছেন। এখনও চলছে।'

'বল কি! এ তো ভাল কথা নয়।'

হঠাৎ মনে হইল, বুড়া বয়সে ভোম্বলদা প্রেমে পড়েন নাই তো! প্রেমে পড়িলে নাকি নানা প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। দাদা পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কোনও আধুনিকা তরুণীকে দেখিয়া ফেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু দাদার মত নর-পুঙ্গবকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে এমন তরুণী বাংলাদেশে আছে কি? দাদার দেহে যে ওজনের মেদ-মাংস আছে তাহাতে স্বচ্ছন্দে দু'টা মানুষ হয়, সুতরাং দাদাকে বিবাহ করিলে দ্বিচারিণী হওয়ার আশংকা। এইরূপ কলংক কোনও বাঙ্গালীর মেয়ে বরণ করিয়া লইবে না। তবে দাদার এত নাচ কিসের জন্য?

যাহোক চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা প্রয়োজন। দোতলায় উঠিয়া দাদার ঘরে প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখা সত্ত্বেও তাক্ লাগিয়া গেল।

দাদা নাচিতেছেন। দাপাদাপি লাফালাফি নাই, থুপ্ থুপ্ করিয়া কুমড়ো পটাশের মত নাচিতেছেন। নৃত্যের তালে তালে চিবুক হইতে নিতম্ব পর্যন্ত মেদ-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইতেছে; হাতদুটি ভঙ্গিমাভরে একটু সঞ্চালিত হইতেছে।—

কিন্তু দাদার মুখে আনন্দ নাই। নিতান্তই যেন অনিচ্ছাভরে নাচিতেছেন, না নাচিয়া উপায় নাই তাই নাচিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য গাঢ় হইল। তিনি আমার দিকে পিছন ফিরিয়া নাচিতে লাগিলেন।

ভাবনার কথা। দুশ্চিন্তার কথা। ইহা নিশ্চয়ই কোনও প্রকার রোগ। কিন্তু প্রেম-রোগ নয়; প্রেম-রোগ হইলে মুখে হাসি থাকিত, চোখে চটুল কটাক্ষ থাকিত। কিন্তু রোগটা কী?

আমি সতর্কভাবে দুই চারিটা প্রশ্ন করিলাম, দাদা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। নাচিয়া চলিলেন। লক্ষ্য করিলাম, তিনি তালে নাচিতেছেন। তাললয়ের সহিত তাঁহার সুবাদ ছিল না, অথচ অবলীলাক্রমে খেম্‌টা তালে কী করিয়া নাচিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। ভূত-প্রেত স্কন্ধে ভর করে নাই তো!

এই সময় ছিরু আমাদের জন্য চা-জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। দেখিলাম দাদা নৃত্যে বিরাম না দিয়া কচুরি-সিঙ্গাড়া উদরসাৎ করিলেন, এক চুমুকে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। আর যাহাই হোক, ক্ষুধার কোনও অপ্রতুল নাই। এটা ভাল লক্ষণ বলিতে হইবে।

আমি আরও কয়েকবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলাম; তিনি উত্তর তো দিলেনই না, শেষে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে দরজা দেখাইয়া দিলেন।

নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম, কী করা যায়! একটা লোক অকারণে ক্রমাগত নাচিয়া চলিয়াছে, চোখে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। পক্ষাঘাতের পূর্বলক্ষণ কি না কে বলিতে পারে? স্থির করিলাম ডাক্তার ডাকিয়া আনিব।

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া এক ডাক্তার বন্ধুকে ধরিয়া আনিলাম। ডাক্তার দেখিয়া ভোম্বলদা আরও বিরক্ত হইলেন কিন্তু নাচ থামাইলেন না। ডাক্তার সেই অবস্থাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিল, নাড়ী দেখা ও বুকে স্টেথস্কোপ লাগাইবার সময় ডাক্তারকেও দাদার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে হইল।

পরীক্ষা শেষ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিল,—'রোগ তো কিছু দেখলাম না। নার্ভাস ব্রেকডাউন নয়। নাড়ী চমৎকার চলছে। হৃদ্‌যন্ত্র ইঞ্জিনের মত মজবুত।'

'তবে াচছেন কেন?'

'ভগব জানেন। তুমি বরং মনোবিৎ ডাক্তার এনে দেখা ওরা হয়তো হদিস দিতে পারবে।'

রাত্রি য়া গিয়াছিল, ডাক্তার বন্ধুকে লইয়া ফিরিয়া ম ত হইল। পরদিন সকালে একজন মনোবিৎ র লইয়া আসিলাম। ভোম্বলদা

(শেষাংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

সন্তোশ পাকড়াশী সম্প্রতি একটি চাকুরি পাইয়াছে। সুতরাং বাড়ীতে তাহার বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। কিন্তু সন্তোশ একেবারেই রাজী নয়। অনুরোধ, উপরোধ চালতেই থাকে, কিন্তু কোনই ফল হয় না। বিরক্ত হইয়া সন্তোশ একদিন বলিল, দেখ, যদি তোমরা এমন করে বিরক্ত কর, তাহলে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

ইতিমধ্যে পূজার ছুটি আসন্ন হইয়াছে।

একদিন সন্তোশ তাহার পিসিমাকে ডাকিয়া বলিল, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

পিসিমা বলিলেন, রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে বুঝি?

"ভাস্কর"

না গো না। এই ছুটিটা একটু ঘুরে-টুরে আসি। পশ্চিমদিকেই যাব। ওদিকের জল-হাওয়া ভাল। শরীর মন একটু ভাল হবে। তাছাড়া তোমাদের ঘ্যানঘ্যানানি থেকেও একটু রেহাই পাওয়া যাবে।

তা বেশ তো। একটা ভাল দিনটিন দেখে যাত্রা করিস বাপু। তোমার মা বাবাকে বলেছ?

বলিনি। তোমাকেই আগে বললাম। তুমিই না হয় ও'দের বলো।

আচ্ছা, সে হবে'খন। ও'রা কি আর অমত করবেন? তবে যেখানেই যাও না কেন, একটা শুভদিন দেখে—

তোমার ঐ এক কথা। সবদিনই সমান। একদিন গেলেই হ'ল।

পিসিমা যথাসময়ে সন্তোশের মা ও বাবাকে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আচ্ছা, আসুক ঘুরে কয়েক দিন।

সন্তোশ আনন্দিত হইল। কোথায় যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া যে কোন একটা স্থানে যাইবে। আবার সেখান হইতে টিকিট করিয়া অন্য এক স্থানে যাইবে। এইরূপে টো-টো করিয়াই ছুটিটা কাটাইয়া দিবে।

যাত্রার আয়োজন চলিল কয়েক দিন। একটা সুটকেশ, একটা ছোট বিছানা, একটা টিফিন-ক্যারিয়ার, একটি জলের পাত্র, একখানা ব্রাশ, দু' চারখানা বই, কিছু জামা-কাপড়, দাড়ি কামাইবার আসবাব—মোটামুটি অত্যাবশ্যক কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা হইল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, সব গোছ-গাছ হ'ল?

হ্যাঁ, পিসিমা।

কবে যাত্রা করবি?

কাল।

কাল?

হ্যাঁ।

কি সর্বনাশ! কাল যে গ্রহস্পর্শ!

তাতে কি হ'ল। সব দিনই সমান।

তা কি হয়? কাল কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সে কি পিসিমা! আমার যে টিকিট কেনা হয়ে গেছে। আর এই ভীষণ ভীড়ের দিনে কি টিকিট বদলানো যায়?

না, সে কিছুতেই হবে না।

নিশ্চয়ই হবে।. আমার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে।

কি আর বলব, বল। তোমরা আজকাল এমন সব জ্যাঠা হয়েছ, যে কারো কোন ভাল কথা শুনবে না।

সত্যি, পিসিমা, ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা না করার কোন মানে নেই। দেখো না ত্র্যহস্পর্শের দিন ষ্টেশনে গিয়ে, কেমন ভীড়!

যা ইচ্ছে করগে বাপু। কি আর বলব? দুর্গা! দুর্গা!

(২)

সত্তোশের বাড়ী হইতে ষ্টেশন বেশি দূরে নয়। একখানি রিকশা ডাকিয়া তাহাতে জিনিষগুলি তোলা হইল। সত্তোশ কাপড়-জামা পরিয়া প্রস্তুত হইয়া মা বাবাকে এবং পিসিমাকে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে রিকশায় গিয়া বসিল। পিসিমার মনে ত্র্যহস্পর্শ অবিরত খোঁচা দিতেছিল। তিনি আজ সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া দুর্গা নাম জপ করিতেছিলেন। ছেলেবেলা হইতে বলিতে গেলে পিসিমাই কোলে পিঠে করিয়া সত্তোশকে মানুষ করিয়াছেন। রিকশায় উঠিবার সংগে সংগেই পিসিমা 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন।

রিকশাওয়ালা একটি রোগা লিকলিকে ছোকরা বলিলেই হয়। ধীরে ধীরে রিকশাটিকে টানিয়া টানিয়া পথ চলিতে লাগিল। সত্তোশ মুখটি ঘুরাইয়া বাড়ীর দিকে দুই-একবার তাকাইয়া স্থির হইয়া বসিল।

রাস্তার একটি মোড় ঘুরিবার সময়ে হঠাৎ সামনে একটা লরী আসিয়া পড়ায় রিকশাওয়ালা চমকাইয়া উঠিয়া রিকশাটিকে থামাইয়া ফেলিল। কিন্তু এই সময়ে তাহার হাতের মুষ্টি একটু শিথিল হইতেই সামনেটা উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে লাগিল, চেষ্টা করিয়াও নীচু করিতে পারিল না। বরং রিকশাচালক ছেলেটিই রিকশার হাতল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। এদিকে সত্তোশের মাথাটা প্রায় মাটির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, পা উপরের দিকে, জোর করিয়া দুই হাত দিয়া রিকশার ঢাকনিটা চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া পথের অনেকগুলি লোক ছুটিয়া আসিল এবং তাহারা সত্তোশকে ধরিয়া রিকশা হইতে নামাইয়া রিকশাটিকে সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিল। সত্তোশ বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে তাহার পরিচিত এক ভদ্রলোক গাড়ীতে পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া সত্তোশকে বলিলেন, ওহে এস। কোথায় যাবে বলত? এস এই গাড়ীতে। সত্তোশ রিকশাওয়ালার প্রাপ্য দিয়া জিনিষপত্র গাড়ীর পিছনের সীটের কাছে রাখিয়া তাহার ড্রাইভার বন্ধুর পাশে গিয়া বসিল। বলিল, আমি তো শিয়ালদহ যাচ্ছিলাম—

বেশ তো, তোমাকে শিয়ালদহতেই পৌঁছে দিচ্ছি।

পিছনে ও'দের অসুবিধা হবে না তো?

না, না, কি আর অসুবিধা হবে? কতক্ষণই বা লাগবে শিয়ালদহ পৌঁছতে?

গাড়ী বেশ একটু জোরেই চলিয়াছে। ড্রাইভার ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাবে?

সত্তোশ বলিল, এই একটু পশ্চিমে বেড়াতে।

তা বেশ!

উহারা দু' একটা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, গাড়ীখানাও বেশ একটু জোরেই চলিয়াছে, এমন সময়ে একটি ছোট ছেলে ধাঁ করিয়া বাঁ ফুটপাথ হইতে নামিয়া ডান ফুটপাথের দিকে দৌড়িতে লাগিল। চকিত হইয়া ভদ্রলোক সজোরে ব্রেক কষিলেন, গাড়ী থামিল। কিন্তু এই ব্রেকের ধাক্কায় সত্তোশ সামনের দিকে এত জোরে ধাক্কা খাইল যে তাহার মাথাটা সামনের উইন্ডস্ক্রীণ ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ভদ্রলোক 'হাঁ হাঁ, কি হ'ল, কি হ'ল' বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং ষ্টার্টার হাতলটা দিয়া সত্তোশের গলার নিকটবর্তী উইন্ডস্ক্রীণের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে সত্তোশের মাথাটা বাহির করিয়া আনিলেন। দেখা গেল, দু একটা জায়গা একটু ছড়িয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন বেশি আঘাত লাগেনি। ভদ্রলোক বলিলেন, খুব বেঁচে গেছ। গলায় কোন আঘাত লাগেনি?

সত্তোশ শুধু বলিল, না।

কেহই আর কোন কথা বলিলেন না। গাড়ীখানি ধীরে ধীরে যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন ট্রেণ ছাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। সত্তোশ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া তাহার গাড়ীর ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিল। ভদ্রলোক বলিলেন, কি যে বল, তুমি যে প্রাণে বেঁচে গেছ, সেই আমার ভাগ্য! ভদ্রলোককে নমস্কার করিয়া সত্তোশ কুলির মাথায় জিনিষ চাপাইয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে ট্রেণে গিয়া বসিল।

(৩)

ট্রেণ ছুটিয়াছে। আপাততঃ সত্তোশ কাশী যাইতেছে। তারপর কোথায় যাইবে, তাহা এখন স্থির হয় নাই।

ট্রেণে বেশ ভীড়। কোনমতে এক স্থানে একটু বসিবার স্থান সংগ্রহ করিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। দ্রুতগামী ট্রেণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন পার হইয়া অবিরত ছুটিতেছে। গাড়ীর দোলায় মনও একটু একটু দুলিতেছে। ভাবিতেছে, গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান কত মধুর! গাড়ীতে কত প্রকার কত লোক! কত দেশের কত প্রকার ভাষা! সমস্ত গাড়ীটা কত প্রকার জিনিষপত্রে ঠাসা। বিছানা, বালিশ, লেপ, তোষক, বাক্স, ঝাঁকা, বোঁচকা, পুঁটলি, টিফিন-কারিয়ার, ঘটি, কুঁজা, ছাতা, লাঠি, আরো কত কি? সামান্য কয়েক ঘণ্টার গৃহস্থালী। তবু তারই মাঝে সব কিছুই আছে। শিশুর ক্রন্দন, মাতার আবেদন, পিতার ভর্ৎসনা, বন্ধুর উপদেশ, সহযাত্রীর সমবেদনা কলহ, কোলাহল, তরুণ-তরুণীর রঙীন চাঞ্চল্য, সবই আছে এই ক্ষুদ্র গতিশীল গৃহখানির মধ্যে। এক একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামে, মানুষ ওঠে আর নামে,

নিয়ে যারা সঁবহারা — অমল দত্ত

ঠিক যেন সংসার-গৃহে মানুষের জন্ম আর মৃত্যুর মত। আসে আর যায়। আসে, হাসে, খেলে, কাঁদে, আবার কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বাংলাদেশ পার হইয়া আসিতেছে। বাঁশবন, আমবন, নারিকেল, সুপারির গাছ ফুরাইয়া যাইতেছে। শ্যামল ধরণী ক্রমশঃ ধূসর হইয়া আসিতেছে। ভারি, ভিজা হাওয়া ক্রমশঃ হালকা ও শুকনো হইয়া আসিতেছে। সন্তোশের মনটাও ইতিমধ্যে বেশ একটু হালকা মনে হইতেছে। রিকশা ও মোটর গাড়ীর কাহিনী প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

বহু পল্লী, নগর উত্তীর্ণ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে উদ্দামগতি ট্রেণ। সন্ধ্যা নামিতেছে। গাড়ীর ভিতরের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শিশুরা সমস্ত দিনের দোলানি ও ঝাঁকানিতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহিলা-দিগের কাহারও পায়ে খিল ধরিয়াছে, কাহারও কোমর টনটন করিতেছে। যাঁহারা একটু স্থূলকায়, তাঁহারা ক্রমাগত ঘামিতেছেন এবং হাঁসফাঁস করিতেছেন। কেহ কেহ একটা বড় ষ্টেশন পাইলেই, একটু নামিয়া পায়চারি করিয়া আসিতেছেন, কুঁজায় জল ভরিয়া আনিতেছেন, খাবার কিনিয়া আনিতেছেন। মোটের উপর একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ছায়া সর্বত্র নামিয়া আসিয়াছে।

ট্রেণের তো ক্লান্ত হইলে চলিবে না। তাহাকে ছুটিতে হইবে প্রবলগতিতে। মাঠের মধ্য দিয়া, নগরের পাশ দিয়া, পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া, নদীর বুকের উপর দিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে উচ্ছল আনন্দে, শত শত নর-নারীর আশা ও আনন্দের বোঝা বহিয়া, তাহাদের কল-গুঞ্জনের তালে তালে নিজের লৌহ-ঘর্ঘর ধ্বনির তাল মিশাইয়া!

কিন্তু সহসা একি! সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অতর্কিতে একি প্রচণ্ড আঘাত! সমস্ত গাড়ীখানি এক মুহূর্তে একি হইয়া গেল? সন্তোশ সাংঘাতিক একটা ধাক্কা খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে ভীষণ আর্তনাদ! একটা হৃষ্ট পুলকিত মানব-সংসারে একি সাংঘাতিক বিপত্তি! সন্তোশের গাড়ীখানি উল্টাইয়া গিয়াছে। বেঞ্চগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। মানুষগুলির যে কি হইয়াছে, তাহা কল্পনার অতীত!

বিপরীত দিক হইতে আগত একখানি মাল গাড়ীর সহিত সংঘর্ষের ফলেই এই সাংঘাতিক অবস্থা। বহু ঘণ্টা পরে যখন পুলিশ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারীর দল সন্তোশকে এই ভগ্ন-স্তূপের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিল, তখন দেখা গেল একটি নূতন লেপের বাণ্ডিলের নীচে চাপা পড়ায় তাহার দেহটি অক্ষত আছে, তবে ধাক্কার ফলে সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। ডাক্তারদের চেষ্টায় ক্রমশঃ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। এবং নিকটবর্তী স্থান অনুসন্ধান করিতে তাহার জিনিষপত্রও মোটামুটি পুনরুদ্ধার করা গেল। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর, রেল লাইন আপাততঃ কার্যকরী হইলে, অন্য একখানি ট্রেণে করিয়া সন্তোশ পুণ্য বারাণসীধামে উপস্থিত হইল।

(৪)

কয়েক দিন বেশ কাটিল। একটি হোটেলে থাকে, সকাল-বিকাল এখানে-সেখানে বেড়ায়। কোন দিন হয়তো বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া দর্শন করিয়া আসে।

এ অঞ্চলের আবহাওয়া এবার যেন একটু অদ্ভুত। এখনও বর্ষার রেশ কাটে নাই। আকাশ বাতাস কেমন যেন থমথমে। মাঝে মাঝে ঝড়ের আভাসও পাওয়া যায়। তবু বাংলাদেশ হইতে কত পৃথক। সন্তোশ এই পরিবর্তন বেশ উপভোগ করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সন্তোশ গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতেছে। বহু নর-নারী বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বিবিধ প্রকার আনন্দ উপ-ভোগে ব্যাপৃত। সন্তোশ একবার গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, অনেকগুলি নৌকায় অনেকগুলি নর-নারী প্রমোদ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কোন কোন নৌকা হইতে সঙ্গীতের সুরও ভাসিয়া আসিতেছে। সঙ্গীহীন হইলেও সন্তোশের ইচ্ছা হইল একবার একখানি নৌকা লইয়া একটু নৌকাবিহার করে। ঘাটের নিকটেই অনেক নৌকা ছিল। একখানির মাঝিকে ডাকিয়া দুই ঘণ্টার জন্য তাহার নৌকা-খানি ভাড়া করিয়া নৌকায় উঠিয়া মাঝিকে বলিল, তোমার যেদিকে ইচ্ছা যেতে পার। দু' ঘণ্টা পরে আবার আমাকে এখানেই নামিয়ে দেবে।

মাঝি সম্মত হইল। নৌকাখানি হেলিয়া-দুলিয়া চলিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় সন্তোশের মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সন্তোশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সহসা একটা ভীষণ ধাক্কা খাইয়া সন্তোশ জাগিয়া উঠিল। আকাশ ভীষণ মেঘাচ্ছন্ন। শোঁ শোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। নৌকাখানি একবার এপাশে এবং পুনরায় অন্য পাশে ভয়ানকভাবে দুলিতেছে। মাঝিরা ভীত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাণপণে নৌকাখানিকে তীরের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। একটা দমকা বাতাসের চাপে নৌকাখানি সহসা উল্টাইয়া গেল। মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতরাইয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সন্তোশ সাঁতার জানে না। সে উল্টানো নৌকা ধরিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সহসা নৌকাখানি আবার উল্টাইয়া সোজা হইল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতে লাগিল। সন্তোশ নৌকার মাস্তুলটি ধরিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে নৌকাখানি একস্থানে আসিয়া আটকাইয়া গেল। বোধ হয়, সেখানটায় একটা চর ছিল। নৌকাখানি সমগ্রভাবে ডুবিয়া রহিল। শুধু মাস্তুলের ডগাটা জলের উপরিভাগে রহিল এবং তাহার উপরে প্রাণপণে মাস্তুল জড়াইয়া ধরিয়া রহিল সন্তোশ।

ক্রমশঃ ঝড় কমিল, জলরাশি শান্ত হইল। আকাশ ক্রমশঃ একটু পরিষ্কার হইল। গঙ্গায় বহু নৌকা আবার চলাচল আরম্ভ করিল। এক-খানি নৌকাকে নিকটে পাইয়া সন্তোশ চীৎকার করিয়া উঠিতে নৌকার মাঝি নৌকাখানিকে তাহার নিকটে লইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নৌকায় তুলিল। ক্লান্তিতে ও অবসাদে সন্তোশ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া তাহার বাসস্থানের কথা মাঝিকে জানাইল। মাঝি বলিল, সে তো অনেক দূর।

সন্তোশ বলিল, আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতেই হবে।

মাঝি বলিল, তা দিতে পারি। কিন্তু মোটা বকশিস চাই।

তা পাবে।

মাঝি নৌকা ঘুরাইয়া সন্তোশকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল। সন্তোশ যখন নিজের হোটেলে ফিরিল, তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা।

(৫)

কাশী আর সন্তোশের ভাল লাগিতেছে না। গঙ্গায় তাহার প্রাণটা প্রায় গিয়াছিল আর কি!

সন্তোশ ভাবিতে লাগিল, এক সহর ছেড়ে আর এক সহরে এলাম। তার চেয়ে দিন কতক কোন একটা গ্রামে গিয়ে থাকলে বোধ হয় নূতনত্বও হতো, ভালও লাগতো। মনস্থির করিতে আরও দুদিন কাটিল। পরে একদিন হোটেলের দরওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা নিকটে পাড়াগাঁয়ে কিছুদিন থাকবার ব্যবস্থা করতে পার?

দরওয়ান খৈনি মুখে পুরিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, হাঁ, পারি।

কোথায়?

নিকটেই। এখান থেকে সাতাশ মাইল গরুর গাড়ীতে গেলে নন্দপুরা গ্রাম। সেখানে বহু বিশিষ্ট লোকের বাস। সেখানকার বাসিন্দারা প্রায় সকলেই কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি সহরে বড় বড় ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। খুব ধনী গ্রাম। বেশ আরামে থাকবেন।

কে নিয়ে যাবে আমাকে সেখানে?

আমি সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেব।

সন্তোশ প্রস্তুত হইল। পরদিনই গরুর গাড়ীতে করিয়া সন্তোশ নন্দপুরা যাত্রা করিল।

মাঝে দুই স্থানে বিশ্রাম করিতে হইল। গরু দুইটিকে বিশ্রাম করাইয়া, খড় প্রভৃতি খাওয়াইয়া তারপর আবার যাত্রা। অধিকাংশ পথই গাড়োয়ান ঘুমাইতে বা ঝিমাইতে থাকে, বলদ দুইটি নিজে নিজেই মৃদুমন্দগতিতে অগ্রসর হয়। কোন স্থানে একটা গর্তে চাকা পড়িলে, ধাক্কা খাইয়া গাড়োয়ান জাগিয়া উঠে এবং গরু দুইটিকে যা-তা বলিয়া গালাগালি করিয়া তাহাদের লেজ সজোরে মুচড়াইয়া দিয়া আবার ঝিমাইতে থাকে। এমনি করিয়া একটি দিন এবং একটি রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সন্তোশ নন্দপুরায় পৌঁছিল।

তাহার সঙ্গীটি পথ দেখাইয়া এক ভদ্র-লোকের বাড়ীতে গিয়া গাড়ী থামাইল। সে নিজে আগে গিয়া গৃহস্বামীকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলে, সে মহানন্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সন্তোশকে অভ্যর্থনা করিল। সন্তোশ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, কয়দিনের জন্য আপনা-দিগকে একটু বিরক্ত করতে এলাম, অপরাধ নেবেন না।

গৃহস্বামী বলিলেন, সে কি কথা! আপনি আমাদের অতিথি, আমাদের কত সৌভাগ্য! এত কষ্ট করে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। যতদিন ইচ্ছা থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না। সন্তোশ সানন্দে আতিথ্য গ্রহণ করিল।

গৃহস্বামী বৃদ্ধ। তিনি দেশেই থাকেন। তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি অধিকাংশ আত্মীয়ই বিদেশে। অনেকেই বেশ বড় বড়

ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইনি দেশে থাকিয়া দেশের জমি-জমা এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেখাশুনো করেন। দেখিলেই বুঝা যায়, বেশ ধনী এবং মানী।

সত্যেশ খায়, ঘুমায়, বেড়ায়। মাঝে মাঝে বৃদ্ধের সহিত আলাপ করে। খাঁটি-ঘি-মাখানো মোটা মোটা রুটি এবং অড়হরের ডাল খাইয়া সত্যেশের চেহারায় ইতিমধ্যেই একটু জৌলুষ দেখা দিয়াছে। বাড়ীতে কয়েকটি মহিলা ও তরুণী আছেন। তবে তাঁহারা বেশ একটু দূরে দূরেই থাকেন। সত্যেশের সহিত পরিচয়ের কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে তাঁহাদের হাতের রান্নার এবং অন্য প্রকার সেবা-যত্নে কোন ত্রুটি হয় না।

একদিন বৃদ্ধ একটু চিন্তিতভাবে সত্যেশকে বলিলেন, একটা বড় মন্দ খবর পেলাম।

সত্যেশ বলিল, কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ বলিলেন, এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে রঙ্গিলা নামে একটি দুর্দান্ত নদী আছে। এবার নাকি তার দুইটা বাঁধ ধ্বসে যাবার উপক্রম হয়েছে। যদি তাই হয়—

সত্যেশ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, তাহলে কি হবে?

আমাদের গ্রাম জলের তোড়ে ভেসে যাবে।

কি সর্বনাশ! এর কোন প্রতিকার নেই?

চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু—

তাইতো, এ তো ভীষণ দুশ্চিন্তার কথা!

উভয়ে অতিশয় চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দুইদিন পরে। রাত্রি প্রায় এগারটা। সত্যেশ এই মাত্র ঘুমাইয়াছে। হঠাৎ একটা ভীষণ কোলাহল শুনিয়া জাগিয়া উঠিতেই সে শুনিতে পাইল, চারিদিকে ভীষণ চীৎকার, ক্রন্দন, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকির শব্দ। একটু পরেই সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার ঘরের মধ্যে সবেগে জল প্রবেশ করিতেছে। ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখিল প্রকান্ড প্রকান্ড জলের ঢেউ একটার পর একটা আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানাকে প্রায় ডুবাইয়া ফেলিল। জল যখন তাহার মাথার উপর পর্যন্ত পেঁাছিয়াছে, তখন অনন্যোপায় হইয়া সম্মুখস্থ একখানি প্রকান্ড ভাসমান কাষ্ঠখন্ড জড়াইয়া ধরিয়া ভীষণবেগে ভাসিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর অন্য লোকদের কাহার কি অবস্থা হইল, তাহার সংবাদ লইবার কোন সুযোগ বা অবসর পাইল না।

(৬)

ভীষণ বেগে সত্যেশ ভাসিয়া চলিয়াছে। এই অঞ্চলটি একদিকে খুব ঢালু, তাই জলের বেগও অতিশয় প্রবল। এইরূপ ঢালু হওয়ায় আশার কথা এই যে, জল আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। শীঘ্রই জল সরিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। কিন্তু কত শীঘ্র এই অবস্থা হইবে? আপাততঃ ক্রমাগত সে ভাসিয়াই চলিয়াছে। বহুক্ষণ পরে একস্থানে আসিয়া একটি গাছের মাথার নিকটে কাষ্ঠখন্ডটি আটকাইয়া গেল। সত্যেশ একবার মনে করিল, কাঠখানাকে সরাইয়া লইয়া আবার ভাসিয়া চলে, হয়তো কোন লোকালয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল জলের যেরূপ বেগ, তাহাতে এই অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হইতে পারে না। জল কমিবেই। সুতরাং এই গাছেই আশ্রয় লওয়া যাক। এই মনে করিয়া কাঠখানাকে সাবধানে গাছের দুইটি ডালের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া সে নিজে একটি ডালে বসিয়া রহিল।

চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে জলরাশি। প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে গাছের ডাল, ঘরের চাল, গরু, মহিষ, হয়তো দুই-চারিটি মানুষও। এ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! মানুষগুলি খুব সম্ভব তাহারই মত বিভিন্ন গাছের ডালে আশ্রয় লইয়াছে। কত শিশু, কত রুগ্ন মানুষ, তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছে! সত্যেশ আর ভাবিতে পারিতেছে না। কি কুক্ষণেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল! পর পর কেবলই সাংঘাতিক ব্যাপার! সবই যেন তাহারই জন্য পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা করা ছিল!

গাছের ডালে বসিয়া জলের তান্ডব লীলা দেখিতেছে, এমন সময়ে সেই গাছেরই আর এক ডালে মনে হইল যেন কাপড়পরা কি একটা নড়িতেছে। একটু পরেই দেখিল, একটি তরুণী, তাহারই মত বিপন্ন হইয়া গাছের ডাল আঁকড়াইয়া স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সত্যেশ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। দেখিল, অপরূপ সুন্দরী একটি ষোড়শী গাছের ডাল আশ্রয় করিয়া কোনমতে স্থির হইয়া বসিল। তরুণীটিও এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সত্যেশের দিকে চাহিতেই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, সত্যেশ বাবু!

সত্যেশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কে ডাকে তাহার নাম ধরিয়া এই সাংঘাতিক জলীয় পরিস্থিতিতে একটা লিচুগাছের আগডালে বসিয়া? ভূত-প্রেত নয় তো। না, না, এ যে মানবী।

সত্যেশ বলিল, আপনি কি করে এখানে এলেন?

তরুণী উত্তর দিল, আপনি যেমন করে এলেন।

আমাকে চিনলেন কেমন করে?

আপনি তো আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন।

আপনাদের বাড়ীতে?

হ্যাঁ, ওই বুড়ো আমার দাদু।

কি আশ্চর্য! তা বুড়ো কোথায়?

তা কেমন করে জানবো? তবে তিনি খুব শক্ত বুড়ো, খুব সাঁতার জানেন। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছেন।

তরুণীটির মুখের রাষ্ট্রভাষা সত্যেশের কাণে মধু ঢালিয়া দিল। এ তো গোয়ালা, পাঁড়িয়ানের রাষ্ট্রভাষা নয়, রৌডও-মাতানো গজল নয়, তবলা-ফাটানো খেয়ালও নয়। কি মধুর এর ভাষা!

সত্যেশ বলিল, আপনি আমার বাংলা কথা বুঝতে পারছেন?

নিশ্চয়ই। আমি যে কলকাতাতেই থাকি। আমার বাবা সেখানে মস্ত ব্যবসায়ী। ক'দিনের জন্য দাদুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম। তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

বলব আপনাকে?

বলুন না।

কিছু মনে করবেন না কিন্তু।

কেন মনে করব?

আমি বাঙালীরই মেয়ে। খুব ছোট-কালে পথে হারিয়ে যাই। তারপর এঁরাই আমাকে লালন-পালন করেছেন। আমার আসল মা-বাবাকে তো **আমি জানিনে। এঁরাও জানেন না।**

ঘুমেখোলী — নীলিমা মুখোপাধ্যায়

তাতে কি হয়েছে। এখন তো আপনি এ'দেরই মেয়ে।

হ্যাঁ। উঃ কি ঠান্ডা। কতক্ষণ যে এমনি করে থাকতে হবে, জানিনে।

এমনি করে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায়ও নেই।

তাই তো। যতক্ষণ জল না কমে, এমনি করেই সময় কাটাতে হবে। আপনি গল্প করুন না। আমি শুনি।

কি আর গল্প করব, বলুন।

আপনি কেন এখানে এলেন, এই সব বলুন।

যদি বলি, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আহা, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর জায়গা পেলেন না, এই লিচু গাছের ডগা ছাড়া।

কই—আর পেলাম।

ও কথা যাক। বলুন, আপনার সব কথা।

সন্তোশ কি আর বেশি বলিবে। তবু সময় কাটানো চাই। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সব পর পর বলিয়া গেল। তারপর বলিল, এইবার আপনার কথা বলুন।

আমার আবার কি কথা। বললুমই তো, কলকাতা থেকে দাদুর কাছে বেড়াতে এসে এই লিচু গাছে আটকে গেছি।

এমনি করিয়া নানা কথার মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতে লাগিল এবং পরীর আগ্রহে জল কমিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

(৭)

জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঠান্ডায় এবং ক্লান্তিতে দুইজনেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। জল যেমন একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল, উহারাও একটু একটু করিয়া নীচে নামিতে লাগিল। যখন উহারা পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সন্তোশ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামটি তো বললেন না।

আপনিও কই একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি। আমার নাম লছমীয়া।

ক্রমশঃ উহারা মাটির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গাছের উপর হইতে একটু একটু করিয়া নীচে নামিতে উহাদের প্রায় একবেলা কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে উভয়েই এমন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য কথা বলিতেও যেন কষ্ট হইতেছে।

মাটিতে নামিয়াই লছমীয়া একেবারে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল এবং নিশ্চল হইয়া রহিল। সন্তোশ মনে করিল, লছমীয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিল, নিদ্রা নয়, মূর্চ্ছা। সন্তোশ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার নিজের অবস্থাও শোচনীয়, তথাপি এখনও ঠিক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার মত হয় নাই। এখনই কিছু খাওয়াইতে না পারিলে হয়তো ও মূর্চ্ছা আর ভাঙিবে না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই, লোকালয়ের চিহ্নও নাই। হতাশ হইয়া সে লছমীয়ার মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করিল, একটা মস্ত গরু ওইদিকে আসিতেছে। গলায় প্রকাণ্ড দড়ি। সম্ভবতঃ কোন একটা উঁচু টিলার উপরে আশ্রয় লইয়াছিল, এখন ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস খুঁজিতে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সন্তোশ উঠিয়া গিয়া গরুটিকে ধরিয়া আনিল। পাশের একটা গর্তের জল দিয়া যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া গরুটিকে আনিয়া লছমীয়ার মাথার কাছে গাছের তলায় বাঁধিয়া তাহার দুধ দুহিবার জন্য তাহার পিছনের পায়ের সম্মুখে যুক্তাসন হইয়া বসিল। তারপর মূর্চ্ছিত লছমীয়ার মাথাটা টানিয়া নিজের কোলের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখটি একটু ফাঁক করিয়া এমনভাবে দুধ দুহিতে লাগিল যাহাতে দুধের ধারা লছমীয়ার মুখের ভিতর গিয়া পড়ে। প্রথমে দুধ লছমীয়ার ঠোঁটের কোণ বাহিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই একবার ঢক্ করিয়া একটু দুধ গিলিয়া ফেলিল। পরে আবার ঢক। এইরূপে কয়েক ঢোক দুধ খাইবার পর লছমীয়া চোখ মেলিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া নিজের পরিস্থিতিটা দেখিয়াই উঠিয়া বসিতে গেল। কিন্তু সন্তোশ তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আরও একটু দুধ খেয়ে নিন। এক সের আন্দাজ দুধ খাইবার পর লছমীয়া উঠিয়া বসিল এবং বলিল, এবার আপনি দুধ খান। আমি দুধ দুহিয়া দি।

সন্তোশ বলিল, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

এই কথা বলিয়া সন্তোশ নিজেই মুখ লাগাইয়া খানিকটা দুধ খাইয়া লইল। ক্ষুধার তাড়নায় এটুকু করা আর এমন বেশি কি?

তারপর উহারা গরুর দড়ি খুলিয়া লইয়া উহাকে এদিকে-ওদিকে ঘুরাইয়া ঘাস খাওয়াইয়া আনিয়া গাছে বাঁধিয়া রাখিল। গরুর সহিত আপাততঃ ব্যবস্থা হইল, যতক্ষণ ইহারা বাধ্য হইয়া এখানে থাকিবে, ততক্ষণ ইহারা গরুকে ঘাস খাওয়াইবে, আর গরু ইহাদিগকে দুধ খাওয়াইবে।

কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ কাটানো যায়। চারিদিকে ধু ধু মাঠ। কোন্‌দিকে গেলে কোথায় যাওয়া যাইবে, কিছুই বোঝা যাইতেছে না। একবার লছমীয়া বলিল, চলুন, যে-কোন একদিকে হাঁটিতে আরম্ভ করি।

কিন্তু এই দুর্বল শরীরে কতটুকু হাঁটিতে পারবেন?

দুইজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তারপর উপবাসের পর অনেকখানি করিয়া দুধ খাইয়া উভয়েরই ভীষণ ঘুম পাইতেছিল। কথা বলিতে বলিতে একটু পরেই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। গরুটিও তাহাদের পাশে বসিয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

(৮)

এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। ক্লান্তির ঘুম, সহজে ভাঙে না। হঠাৎ তাহারা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাদের পাশে একখানা গরুরগাড়ী এবং তাহাতে দুইজন বলিষ্ঠ চালক।

জল কমিবার পরই লছমীয়ার দাদু ছয় সাতখানা গরুরগাড়ী চারিদিকে পাঠাইয়াছিলেন লছমীয়ার এবং সন্তোশের খোঁজ করিতে। তাহারা যে দুইজনে একস্থানেই থাকিবে এবং এমনি অবস্থায় এতদূরে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে, তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। লছমীয়া গাড়ীর চালকদের চিনিতে পারিল এবং সানন্দে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সন্তোশকেও সে ডাকিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিতে বসিল।

তাহাদের জীবনদাত্রী গরুটিকেও দড়ি দিয়া গাড়ীর পিছনে বাঁধা হইল। পুরা একটিবেলা কর্দমময় উঁচু-নীচু মাঠের পথ বাহিয়া তাহারা নন্দপুরায় পৌঁছিল।

দাদু হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বলিলেন, আর দাদুর কাছে থেকে কাজ নেই। এবার ভালয় ভালয় বিদেয় হও। তোমাকে কালই আমি কলকাতায় পাঠাচ্ছি।

বেশ তো, আমি যাচ্ছি চলে। আমি তোমার একটা আপদ বইতো নয়।

ছিঃ, দিদিমণি, তুমি যে আমার মাথার মণি। কিন্তু এবার দৈবক্রমে কি ভীষণ কষ্ট পেয়ে গেলে। সত্যি, সন্তোশবাবু এখানে না থাকলে আর এমনি যোগাযোগ না হলে কি যে হতো, ভাবতেও পারিনে। তারপর সন্তোশকে বলিলেন, তুমিই একে বাঁচিয়েছ, নইলে—

সন্তোশ বিনীতস্বরে বলিল, সবই ভগবানের ইচ্ছা।

তারপর বৃদ্ধ বলিলেন, দেখ, লছমীয়া তোমার সঙ্গেই কলকাতা চলে যাক। লছমীয়ার এক পিসি অনেকদিন ধরে বায়না ধরেছে কলকাতা যাবে, তাকেও নিয়ে যাও।

বেশ তো।

হ্যাঁ, আর দেরী করে কাজ নেই। এখানকার বন্যার খবর খবরের কাগজে কলকাতার লোকেরা নিশ্চয়ই পেয়েছে। তারা কত ব্যস্ত হয়ে আছে। চিঠিপত্র দিয়ে খবর পাঠানোর এখন অনেক দেরী। এই বন্যায় ডাক-তার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

সন্তোশ বলিল, কোন্ পথে যাওয়া যায় বলুন তো? যে পথে আমি এসেছিলাম, শুনলাম সে পথে এখনও গাড়ী চলতে পারবে না।

বৃদ্ধ বলিলেন, তাই তো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, এক কাজ কর। শুনলাম, লছমনপুরার দিকে নাকি তেমন জল ওঠেনি। এখান থেকে বত্রিশ মাইল লছমনপুরা। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে জানকীমঢ়ী এরোড্রোম। সেখান থেকে তোমরা প্লেনে চলে যাও।

তাহাই স্থির হইল। সন্তোশও অধীর হইয়া উঠিয়াছিল কলিকাতায় ফিরিবার জন্য। আহারাদি করিয়া, বিশ্রাম করিয়া, সামান্য জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া দুইখানি গরুরগাড়ী প্রস্তুত করা হইল। একখানিতে সন্তোশ এবং একজন আত্মীয়, অপরখানিতে লছমীয়া এবং তাহার পিসিমা। তাছাড়া দুই গাড়ীতে দুইজন বলিষ্ঠ চালক।

চোখ মুছিতে মুছিতে দাদু বলিলেন, সাবধানে যেও। কলকাতায় পৌঁছেই তার করো। আর দেখ, পথে ক্ষিদে পেলেই লাড্ডুগুলো খাবে। লছমীয়া এবং সন্তোশ বৃদ্ধের পায়ের ধুলা লইয়া স্ব স্ব গাড়ীতে উঠিল।

দুইদিন এবং একরাত্রি পরে উহারা লছমনপুরায় পৌঁছিল। গাড়ীর ঝাঁকানিতে সন্তোশের সমস্ত হাড়গুলি যেন চিড় হইয়া গিয়াছে। লছমীয়াও খুব কাতর হইয়াছে। কিন্তু পিসিমার কোন ক্লান্তির লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি প্রায় সমস্ত পথই নাক ডাকিতে ডাকিতে আসিয়াছেন। তাঁহার উল্কিশোভিত হাতখানি নাড়িয়া লছমীয়া ও সন্তোশকে বলিলেন, এ আর

এমনকি পথ। এখন তো মোটরবাসের কল্যাণে গরুরগাড়ী প্রায় চড়তেই হয় না। আমরা যখন ছেলেবেলায় শ্বশুরঘর যেতাম, তখন চারদিন পাঁচদিন গরুরগাড়ীতে থাকতে হতো।

লছমীয়া বলিল, বেশ হতো। এখন কিছু খেতে দেবে তো দাও। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

লছমীয়া এবং সন্তোশ উভয়েই অনেকগুলি লাড্ডু খাইয়া এবং একঘটি করিয়া জল খাইয়া এক একটা সতরঞ্চি পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। উঃ, শরীরে আর কত সয়।

বিশ্রামান্তে গাড়ীর চালক দুইজনকে এবং আত্মীয়টিকে মধুর সম্ভাষণে বিদায় দিয়া সন্তোশ লছমীয়া ও পিসিমাকে লইয়া মোটরবাসযোগে জানকীমঢ়ী আসিয়া পৌঁছিল। সেখানকার এরোড্রোমে গিয়া কলিকাতার জন্য তিনটি সীট রিজার্ভ করিল।

যথাসময়ে প্লেন ছাড়িল। লছমীয়া এবং সন্তোশ পাশাপাশি দুইটি সীটে। পিছনের একটি সীটে পিসিমা।

সন্তোশ বলিল, তুমি এর আগে প্লেনে চড়েছ ?

সহসা 'তুমি' শুনিয়া লছমীয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে একবার বম্বে গিয়েছিলাম, আর একবার এলাহাবাদ।

বেশ লাগে, না।

বেশীক্ষণ কি ভাল লাগে, এমনি চুপ করে একজায়গায় বসে থাকা ?

হোস্টেস আসিয়া এক কাপ করিয়া কোকো দিয়া গেল। কোকো খাইতে খাইতে সন্তোশ বলিল, পিসিমার বোধহয় ভয় কচ্ছে। তিনি কখনও বোধহয় প্লেনে ওঠেননি।

লছমীয়া বলিল, তা না উঠলে কি হয়। ও'র ভয়ানক সাহস। কিছুতেই ভয় পায় না।

একথা-ওকথা বলিতে বলিতে তাহারা তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। গত কয়েকদিন যাবৎ শরীরের উপরে এবং মনের উপরে কম অত্যাচার হয় নাই।

সহসা একি! প্লেনখানা এমন একদিকে কাত হইয়া গেল কেন ? এ আবার কি ? অন্যদিকে যেন হেলিয়া পড়িতেছে। প্লেনের শব্দটাও যেন কেমন বেতালা! হোস্টেসটি একবার তাড়াতাড়ি আসিয়া বিশুষ্কমুখে বলিয়া গেল, সম্মুখে বিপদ, ভগবানের নাম করুন।

কিছুক্ষণ ধরিয়া প্লেনখানি চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। ইহার দমদম ঘাঁটিতে নামিবার সময় হইয়া গিয়াছে, অথচ এমন করিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে কেন ? কেন, সেকথা পাইলট ছাড়া আর কেহ জানে না।

প্লেনখানি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ নীচে মাটির কাছে আসিয়া পড়িল এবং একটু পরেই কলিকাতার উপকণ্ঠে সল্টলেকের মধ্যে পড়িয়া গেল।

সন্তোশ এবং লছমীয়া অতিকষ্টে পিসিমাকে টানিতে টানিতে প্লেনের উপরিভাগে উঠিয়া আসিয়া একখানি ডানার উপরে কোনমতে বসিয়া পড়িল। জল খুব গভীর না থাকায় সমস্ত প্লেনখানি ডুবিয়া যায় নাই।

প্লেনের ডানার উপর একটু স্থির হইয়া বসিয়া সন্তোশ বলিল, ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে,

জালফেলা — ক্ষীরোদ রায়

তোমার আর আমার জীবনটা যেন এক সূতোয় গাঁথা। নইলে, এমন সব ব্যাপার ঘটে ?

পিসিমা বাংলা জানেন না, বোঝেনও না।

লছমীয়া বলিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সূতোয় গাঁথার পক্ষে বাধা অনেক।

কেন ?

একে আমি পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন। শুনেছি, আমি বামুনের মেয়ে, এই পর্যন্ত। তারপর এখন পুরোপুরি খোট্টানি। কাজেই—

তাতে আর কি ?

তাতে কি, কলকাতায় গিয়ে আপনার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা নাইবা করলাম।

ওরে বাপু, ভীষণ সাহস দেখি।

এই ধরণের কথা কিছুক্ষণ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে তাহারা লক্ষ্য করিল, পুলিশের লোক কয়েকখানি নৌকা লইয়া এইদিকে আসিতেছে।

নৌকায় চড়িয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিল।

৯

লছমীয়াকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া লছমীয়ার পিতা হাতে স্বর্গ পাইলেন। বলিলেন, একটু আগে নন্দপুরা হইতে তার পাইয়াছেন, সেখানকার ভয়ানক অবস্থার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার পাশে ছিল একটি যুবক, নাম শ্যামলাল চৌবে। বিশাল বপু, বিরাট গোঁফ।

লছমীয়া সংক্ষেপে সন্তোশের পরিচয় দিয়া বলিল, এ'র জন্যই আমি বেঁচে গেছি। নইলে আমাকে আর তুমি দেখতে পেতে না।

লছমীয়ার পিতা আনন্দে বিহ্বল হইয়া সন্তোশকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। বলিলেন, আপনার উপকারের কথা আমি জীবনে ভুলবো না। তারপর বলিলেন, আসছে মাসেই লছমীয়ার বিয়ে, এই শ্যামলালের সঙ্গে। আপনি আসবেন কিন্তু—

বিবাহের কথা কানে যাইতেই লছমীয়া জিভ্ কাটিয়া সুড়ুৎ করিয়া অন্দরমহলের দিকে চলিয়া গেল। পিসিমাও অনুগমন করিলেন।

সন্তোশ লছমীয়ার পিতাকে বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব।

তারপর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল।

বাড়ী ফিরিলে পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন হ'ল ? পথে কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো ? কই, তোর জিনিষপত্রগুলো গেল কোথায় ? সঙ্গে যে কিছুই দেখছিনে। কোথায় ফেলে এলি ?

না, এমন কিছু হয়নি। একটু বিশ্রাম করি। তারপর সব বলছি।

পিসিমা সব শুনিলেন। মা-বাবার কানে যাইতেও বাকি রহিল না। অবশেষে পিসিমা বলিলেন, খুব বেঁচে গেছিস্ বাপু। এবার তাহলে মুখুজ্যেদের মেয়েটিকে দেখার ব্যবস্থা করি ?

যা ইচ্ছে কর গে। আমি জানিনে কিছু।

রেল লাইন ছাড়িয়ে কতদূরে ময়ূরাক্ষী? আরো কত দূরে?

কাঁকর-ছড়ানো মাঠ। অসুর-মুণ্ডের মতো ছোট-বড় ঢিবি ছড়িয়ে আছে আচক্রবাল। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো এক রণক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন এই মাঠ। কোনো কোনো ঢিবির ওপরে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার এক আধটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। হাঁপানি রোগীর গলার অতিকায় মাদুলীর মতো এক একটা হাঁড়ি ঝুলছে কোনো-কোনোটাতে। রুক্ষ মাটির যা শ্রী—এক ফোঁটাও রস গড়ায় বলে মনে হয় না।

ক্যানভাসার শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী হাল সাকিন বারোর সাত ছকু খানসামা লেন, জিলা কলিকাতা—একবার থমকে দাঁড়ালো। এ জেলায় এই তার প্রথম আবির্ভাব। শুনেছিল ময়ূরাক্ষী পার হয়ে—একটা শাল-পলাশের বন ছাড়ালেই ব্রজপুর গ্রাম। ময়ূরাক্ষী নদী, শাল-পলাশের বন, গ্রামের নাম ব্রজপুর। তিনটে একসঙ্গে মিলে মনের মধ্যে একটা কল্পলোক গড়ে উঠেছিল দস্তুরমতো। সুধাংশু চক্রবর্তী কল্পনাতে আরো খানিক জুড়ে নিয়েছিল এদের সঙ্গে সঙ্গে। হোক শীতকাল, থাকুক চারদিকে শস্যহীন মৃত্যুপাণ্ডুতা—তবু ব্রজপুর এদের চাইতে অনেকখানি আলাদাই হবে নিশ্চয়। তার গাছে গাছে কোকিল ডাকতে থাকবে, ফুলের গন্ধ বয়ে বেড়াবে বাতাস, তার মাঠে মাঠে শ্যামলী ইত্যাদি ধেনুরা চরে বেড়াবে। বেণু বাজবে এবং সন্ধ্যে হলেই শ্বেত-চন্দন ঘষা একখানি পাটার মতো পূর্ণচাঁদ উঠে আসবে আকাশে।

কিন্তু কোথায় কী!

আপাতত মাঠ আর মাঠ। দেড় বছরের পুরোনো জুতোটা নতুন জুতোর মতো মচ্ মচ্ আওয়াজ করছে তলায় কঠিন কাঁকরে। এদিকে কি ডালভাঙা ক্রোশ? তিন মাইল পথ যে আর ফুরোয় না!

সামনেই ছোট খাল একটা। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে পড়েছে অনেকখানি ঢালুতে। হোক মরা খাল—তবু তো এতক্ষণে জলের দেখা পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল, সে বুঝি বোখারা-সমরখন্দের কোনো মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ হাঁটছে!

একটা গোরুর গাড়ি ছপ্‌ছাপিয়ে উঠে এল খাল পেরিয়ে। চাকা থেকে তরল কাদা গলে গলে পড়ছে তার। গাড়োয়ান সাঁওতাল। খোলা ছইয়ের ভেতরে রুপোর হাঁসুলীপরা একটা কালো মেয়ে বসে আছে—নিবিড় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে তাকালো সুধাংশুর দিকে। এক ফালি জলের সঙ্গে একটি তরল দৃষ্টি যেন সুধাংশুর সারা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিলে।

—ভাই, ময়ূরাক্ষী কতদূর?

গাড়ির ভেতরে মেয়েটি হেসে উঠল। গাড়োয়ান আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে দেখল সুধাংশুকে। বিদেশী।

বললে, এটাই তো ময়ূরাক্ষী নদী।

—হ্যাঁ! এই নদী!

কয়েক বছর আগে যে সুধাংশু চক্রবর্তী বাস করত মেঘনা নদীর ধারে এবং অধুনা বাস্তুহারা হয়ে সে বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে বাসা বেঁধেছে, তার পক্ষে এটা শোনবার মতো খবর বটে! নদী এর নাম! এবং কাব্য করে একেই বলা হয় ময়ূরাক্ষী।

কিন্তু বিস্ময়টা ঘোষণা করে শোনাবার মতো কাছাকাছি কেউ ছিল না। গোরুর গাড়িটা ততক্ষণে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটার ওপরে উঠে গেছে—শুধু খোলা ছইয়ের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে এখনো।

আপাতত নদী পার হতে হচ্ছে তা হলে।

খেয়া পাড়ি দেবার সমস্যা নেই—সাঁতারও দিতে হবে না। এক হাতে জুতো, আর এক হাতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে ধরলেই চলবে। সুধাংশুও তাই করল। পায়ের তলায় কিছু সাঁতাত শ্যাওলা, ভাঙা ঝিনুকের টুকরো আর এঁটেল কাদা অতিক্রম করে সে ওপারে পৌঁছুল। জুতোটা একরকম করে পরা গেল বটে, তবে পায়ের গোড়ালিতে আঠার মতো চটচট করতে লাগল।

নদী তো মিটল। এবারে শাল-পলাশের বন?

সেও কাছাকাছিই ছিল। কিন্তু এর নাম বন? গোটা কয়েক মাঝারি ধরনের গাছ দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। সুসঙ্গের পাহাড়ে-দেখা নিবিড় মেঘবর্ণ অরণ্য স্বপ্নের মতো ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। এটা পার হলেই ব্রজপুর। সুধাংশুর কল্পনা ফিকে হতে শুরু করেছে।

ব্রজধামই বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে।

লাল মাটির দেওয়াল—খড় কিংবা টিনের চাল। খান দুই নোনাধরা দালান। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের চারদিকে অজস্র পোড়া মাটির ছোট ছোট ঘোড়া। ও জিনিসটা সুধাংশু আগেই চিনেছে—ধর্মঠাকুরের ঘোড়া ওগুলো।

কিন্তু ঘোড়া জ্যান্তই হোক আর মাটিরই হোক সে কখনো কথা কয় না। এবং যুগের মাহাত্ম্যে ধর্মঠাকুরও সংপ্রতি নির্বাক। পতিত-পাবনী এম-ই স্কুলের হেডমাস্টার নিশাকর সামন্তের হদিশটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে? কাছাকাছি কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দুপুরের রোদে গ্রামটা ঘুমিয়ে আছে যেন।

আরো দু পা এগোতেই একটি ছোট দোকান।

তোলা উনুনে খোলা চাপিয়ে একটি লোক খই ভাজছে। বাঁশের খুন্তি দিয়ে নাড়ছে গরম বালি। পট্-পট্ করে ধান ফুটছে—মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র খইয়ের দল খোলা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারপাশে।

সুধাংশু তাকেই নিবেদন করল প্রশ্নটা।

—ইস্কুল?—দু তিনটে বিদ্রোহী খইয়ের

আঘাতে মুখখানাকে বিকৃত করে লোকটা বললে, এগিয়ে যান—সামনে। লাল রঙের বাড়ি। ওপরে টিনের চাল। বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাবেন।

এ বাঁকটা আর ডালভাঙা ক্রোশ নয়—কাছাকাছিই ছিল। এবং টিনের চালওয়ালা লাল রঙের বাড়িটাও আর বিশ্বাসঘাতকতা করল না। আশায়-আনন্দে উৎসুক পা চালিয়ে দিলে সুধাংশু। 'দি গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং কোম্পানি'র মালিক অক্ষয়বাবু আগেই চিঠি দিয়েছেন নিশাকর সামন্তকে। দুজনে কিরকম একটা বন্ধুত্ব আছে। নিশাকর সামন্ত তাঁর ওখানে সুধাংশুকে আশ্রয় দেবেন এবং তাঁরি বাড়িতে দিন চারেক থেকে আশেপাশের স্কুলগুলোতে বইয়ের ক্যানভ্যাস করবে সুধাংশু। ইস্কুলের দর্শন পেয়ে তাই স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে উঠল মনটা। অর্থাৎ থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে, কিছু খাদ্য জুটবে এবং হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে ঘণ্টা কয়েক!

ইস্কুলে টিফিন পিরিয়ড চলছে খুব সম্ভব। বাইরে দাপাদাপি করছে একদল ছোট ছোট ছেলে। একটা টিনের সাইনবোর্ডে কাত হয়ে ঝুলছে ইস্কুলের নাম। 'পি'টা মুছে গেছে—মনে হচ্ছে অতীতপাবনী।

জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া বারান্দাটা পার হয়ে সুধাংশু এসে ঢুকল টীচার্স-রুমে। খান কয়েক কাঠের চেয়ার—মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। কাচভাঙা আলমারিতে ছেঁড়া-খোঁড়া খান তিনেক বই; র‍্যাকে সাজানো গোটা কয়েক ম্যাপ। আলমারীর মাথা থেকে তিন-চারখানা বেতের ডগা উঁকি মারছে। আর এই দীনতার ভেতরে সম্পূর্ণ বেমানানভাবে শোভা পাচ্ছে দেওয়ালে একটি সুধাহাসিনী সুন্দরী মহিলার মস্ত একখানা অয়েলপেইন্টিং। খুব সম্ভব উনিই পতিত-পাবনী।

দোরে পা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুধাংশু। কলাইকরা বড় একখানা থালায় একটি লোক তেল আর চীনে বাদাম দিয়ে মুড়ি মাখছে প্রাণপণে। খুব সম্ভব দপ্তরী। ছ' জোড়া চোখ লোলুপভাবে তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। টিফিনের ব্যবস্থা।

সুধাংশু একবার গলা খাঁকারি দিলে।

ছজন মানুষ একসঙ্গে ফিরে তাকালেন। শীর্ণকান্তি জীর্ণদেহ ছটি খাঁটি স্কুল-মাস্টার। আসন্ন টিফিনের ব্যাপারে ব্যাঘাত পড়ায় স্পষ্ট অপ্রীতি ফুটে উঠেছে তাঁদের চোখে।

সমবেত ছজনের উদ্দেশ্যেই কপালে হাতটা ঠেকাল সুধাংশু। তারপর বললে, নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে আসছি। ততক্ষণে তার কাঁধে কলেজ-স্কোয়ারের স্ফীতোদর ছিটের ঝোলাটি চোখে পড়েছে সকলের। একজন চশমাটা নাকের নিচের দিকে ঠেলে নামালেন খানিকটা। বিরসমুখে বললেন, বইয়ের এজেণ্ট্ তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বসুন একটু।

একটা খালি টিনের চেয়ার ছিল একটেরেয়। সুধাংশু বসতেই ঠক-ঠক করে দুলে উঠল বারকয়েক। একটা পায়া একটু ছোট ছিল খুব সম্ভব।

—আমি নিশাকরবাবুর কাছে এসেছিলাম—

কলাইকরা থালায় মুড়ি মাখবার শব্দটা সুধাংশুর অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল।

—হেড্ মাস্টারমশাই?—প্রথম সম্ভাষণ যিনি করেছিলেন, তিনিই বললেন, তিনি তিন মাসের ছুটিতে দেশে গেছেন। তাঁর খুড়িমা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে, তারপর বিষয়-সম্পত্তির কী সব ঝামেলা মিটিয়ে তবে ফিরে আসবেন।

চমকে উঠল সুধাংশু। ঢোঁক গিলল একটা।

—দিন চারেক আগে আমাদের পাবলিশার অক্ষয়বাবু তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন—

একটা প্লেটে করে খানিক মুড়ি নিজের দিকে টেনে নিয়ে আর একজন বললেন, সেটা নিশ্চয় রি-ডাইরেক্টেড্ হয়ে সাঁইথিয়ায় চলে গেছে—আপনি ভাববেন না।

না, ভাবনার আর কী আছে! মুড়ি চিবোনোর শব্দে সুধাংশু আবার ঢোঁক গিলল। মধ্য দুপুরের তীব্র ক্ষুধা এতক্ষণে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার। নিশাকরবাবুর বাড়িতে থাকার এবং খাওয়ার কথা লিখেছিলেন অক্ষয়বাবু—এই দুপুরেও অন্তত দুটি ভাতের একটা নিশ্চিত আশা মনের মধ্যে জেগে ছিল তার। সুধাংশু এতক্ষণে বাস্তবভাবে অনুভব করল—ব্রজপুরে সত্যিই অন্ধকার। তার কানু মথুরায় নয়—সাঁইথিয়ায় বিদায় নিয়েছেন!

কিছু ভাবতে না পারার আচ্ছন্নতায় সুধাংশু ঝিম ধরে বসে রইল কতক্ষণ। কী অদ্ভুত লোলুপভাবে যে মুড়ি খাচ্ছে লোকগুলো! একজন আবার টুকটুকে একটা পাকা লংকায় কামড় দিচ্ছে—সুধাংশুর শুকনো জিভের আগায় খানিক লালা ঘনিয়ে এল। রিফ্লেক্স্ অ্যাকশন! আঃ—অত শব্দ করে অমনভাবে চিবোচ্ছে কেন ওরা? ওদের খাওয়া কি শেষ হবে না কখনো?

আর থাকা যায় না। ওই একটানা শব্দটা অসহ্য।

—বই দেখবেন না?

—হাঁ—হাঁ, নিশ্চয়।— তিন চারজন ঘাড় ফেরালেন। মুড়ির পাহাড়গুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। দু জন উঠে গেলেন হাত ধুতে।

—এই দেখুন—মুড়ি ছড়ানো টেবিলটার ওপরেই একরাশ বই ছড়িয়ে দিলে সুধাংশু।

—ওঃ! গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং? আপনাদের অনেকগুলো বই তো আমাদের রয়েছে মশাই।—

ধুতির কোঁচায় হাত মুছে একজন একটা বই তুলে নিলেন: 'জ্ঞানের আলো', 'স্বাস্থ্য সমাচার', 'ভূগোলের গল্প'—সবই তো আছে আমাদের।

—এবারেও যাতে থাকে, সেইজন্যেই আসা—অনুগত বিনয়ে সুধাংশু হাত কচলালো: তা ছাড়া আমাদের নতুন ট্র্যান্স্লেশনের বইটা দেখেননি বোধ হয়? বাই কে-পি পাঁজা, এম-এ বি-টি, হেড্মাস্টার বামুনপুকুর এইচ-ই স্কুল—

—হুঁ!

—বাড়িয়ে বলছি না স্যার, বাজারের যে কোনো চলতি বইয়ের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখুন। কিমপ্লেক্স প্রোসেস, নতুন নতুন আইটেম, একটা ওয়ার্ডবুকও আছে সঙ্গে—

ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজল। অবশিষ্ট টীচারেরা গোগ্রাসে মুড়ি শেষ করলেন।

প্রথম লোকটি হাই তুললেন: আপনি আপাতত এই এরিয়ায়ই তো আছেন? কাল তা হলে একবার দশটার দিকে আসুন। তখন কথাবার্তা হবে। আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ হেড্ মাস্টার—এবার আমার ওপরেই ভার। আচ্ছা—নমস্কার—

—নমস্কার!—অগত্যা থলের মধ্যে বইগুলো পুরে সুধাংশু উঠে পড়ল।

আসুন। অর্থাৎ আবাহন নয়—বিসর্জন। আপনি যান। কিন্তু যাওয়া যায় কোথায়?

গ্রামটা যখন মাঝারি, তখন জেলা বোর্ডের একটা ডাক-বাংলো কোথাও থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এই জীর্ণ চেহারার দীন ক্যানভাসার—চৌকিদার কি আমল দেবে? আর যদি বা থাকতেও দেয়—খাওয়া ছাড়াও দৈনিক দুটো টাকা চার্জ তো নির্ঘাৎ। স্কুল বইয়ের ক্যানভাসারের পক্ষে দৈনিক দু টাকা দিয়ে ডাক-বাংলোয় থাকা, আর বারোর সাত ছকু খানসামা লেন থেকে চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠা—এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই কিছু।

অতএব—

অতএব ব্রজধাম ছেড়ে আবার স্টেশনের দিকে যাত্রা? উঁহু, সেও অসম্ভব। এ এরিয়াতে আশে-পাশে পাঁচ-ছটা স্কুল রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে চলে গেলে নিস্তার নেই। অক্ষয়বাবু ঠিক টের পেয়ে যাবেন। এবং, অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

খিদেয় পেটের নাড়ীগুলো দাপাদাপি করছে। সেই খইয়ের দোকানটাকে মনে পড়ল। কয়েকটা কালো ছিট্‌ধরা চাঁপা কলাও ঝুলতে দেখেছিল সেখানে। কিঞ্চিৎ ফলারের ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়।

শুধু চাঁপা কলা নয়, মোষের দুধও ছিল। এবং একটু মোনো-গন্ধধরা ভেলিগুড়। পনেরো পয়সায় খাওয়াটা নেহাৎ মন্দ হল না। আচমকা সুধাংশুর মনে হল, এমন খই-কলার ফলার কাছাকাছি থাকতে দুপুরবেলা খানিক শুকনো মুড়ি কেন চিবিয়ে মরে মাস্টারেরা?

শীতের নরম রোদ। পেটে খাবার পরে গা এলিয়ে আসছে। একটু শুতে পারলে হত।

কাছেই ধর্মঠাকুরের বটগাছ। ছিমছাম জায়গাটি। দেবতার স্থান, অতএব সর্বজনীন সম্পত্তি। এখানে হাতো দেবার নাম করে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিলে কেউ আপত্তি করবে না নিশ্চয়।

যা ভাবা—তাই কাজ। ব্যাগের ভেতর থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা ব্যাপারটা সে বের করে আনল। পথে বিছানাটা এক জায়গায় রেখে এসে ভারী ভুল করেছে সে। নিশাকরবাবুর ওখানে বিছানা নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই—বন্ধু লোক!—অক্ষয়বাবু বুঝিয়েছিলেন।

ফিরেই যেতে হবে। থানা গাড়তে হবে তিন মাইল দূরের স্টেশনেই। ওখান থেকে যতটা 'এরিয়া' কভার করা যায়। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বটগাছের তলায় শুয়ে পড়ল সুধাংশু। ধর্মঠাকুরের মাটির ঘোড়াগুলো কেমন পিট-পিট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কতক্ষণ?

—ও মশাই—কত ঘুমুবেন? উঠুন—উঠুন—

ঘোড়াগুলো ডাকছে নাকি? সুধাংশু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—আপনি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন্—চলুন এবার—ঘোড়া নয়। একটি মানুষ। এবং স্কুলের একজন মাস্টার।

—কেন বলুন তো?

সুধাংশুর মনে পড়ল, এই লোকটিকেই টীচার্স-রুমে বসে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা চিবুতে দেখেছিল সে।

মাস্টার মিটি-মিটি হাসলেন : আছে মশাই, ব্যাপার আছে। সাধে কি আর এসেছি—ওপরওলার হুকুমে।

—ওপরওলার হুকুমে!—সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, অ্যাসিস্ট্যান্ট্ হেডমাস্টার?

—ছোঃ!—মাস্টার উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন : ওকে কে পরোয়া করে মশাই? সেক্রেটারীর কুটুম বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট্ হেড্মাস্টার হয়েছে—নইলে ওর বিদ্যেতো ম্যাট্রিক অবধি। গুণের মধ্যে খালি সেক্রেটারির কান ভারী করতে পারে। আমিও শশধর বাঁড়ুয্যে মশাই—আই-এ পাশ করেছি, হেড্মাস্টারের লেখাতে ভুল ধরেছি দু-দুবার।. গজেন বিশ্বাসকে আমি গ্রাহ্য করিনা।

—তবে কার তলব? থানার দারোগার নয়তো?—এবার ভয়ে সুধাংশুর গলা বুজে এল।

—দারোগা আবার কেন?—শশধর বাঁড়ুয্যে হা-হা করে হেসে উঠলেন : আপনি কি চোর-ডাকাত?

দারোগা নয়—ম্যাজিস্ট্রেট্ ডেকেছে। চলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট! রহস্য অতল!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুধাংশু উঠে পড়ল।

এবং, কী আশ্চর্য—যেতে হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নয়, শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়িতে।

বাড়ি রাস্তার ধারেই। সামনে একটি ফুলের বাগান। লাল মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল। একটি ছোট ধানের মরাই আর এক পাশে।

বাইরের ঘরে ঢুকেই সুধাংশু থমকে গেল। শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়িতে এতখানি আশা তার ছিল না।

একখানি তক্তপোষের ওপরে, পরিষ্কার একটি সুজনী পাতা। শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল এবং পাশে একটি চেয়ার। আর সব চেয়ে আশ্চর্য—টেবিলের ওপরে কোণাভাঙা সস্তা একটি কাচের ফুলদানিতে সপত্র একগুচ্ছ গন্ধরাজ! এই শীতকালে গন্ধরাজ!

কিন্তু গন্ধরাজের চাইতেও বিস্ময়কর অভ্যর্থনার এই আয়োজনটা। মনে হচ্ছে—সুধাংশুর সম্মানেই ঘরখানাকে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন কনে দেখতে এসেছে সে।

শশধর বললেন, বসুন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকছি।—বলেই হেসে উঠলেন হা-হা করে। তারপর পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে।

সুধাংশু থ হয়ে রইল। এ আবার কোন্ পরিস্থিতি। একটা দুর্বোধ্য নাটকের মতো ঠেকছে সব। অসময়ের গন্ধরাজের একটা মৃদু সৌরভ রহস্যলোক সৃষ্টি করতে লাগল তার চারদিকে।

—মণ্টুদা—চিনতে পারছো না?—কপালের ওপর ঘোমটাটা একটুখানি সরিয়ে শ্যামবর্ণ একটি তরুণী মেয়ে ঢুকল ঘরে। হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল।

তটস্থ হয়ে সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। মণ্টুদা—কে মণ্টুদা?

—দেখুন, আমি তো আপনাকে—

—চিনতে পারোনি—না? কিন্তু আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছি। সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারো—কিন্তু আমাকে নয়। কেমন ধরে আনালাম—দেখো।

একটা ভুল হচ্ছে—মারাত্মক ভুল! বলবার চেষ্টায় বার দুতিন হাঁ করল সুধাংশু।

—আহা-হা, আর চালাকি করতে হবে না। তোমাকে আমি জব্দ করতে জানি। বেশি দুষ্টুমি করো তো সব ফাঁস করে দেব—মেয়েটি মৃদু হাসল : দাঁড়াও—তার আগে তোমার চা করে আনি। দিনে এখনো সে পনেরোবার চা খাওয়ার অভ্যাসটি আছে তো? না—রত্নার শাসনে এখন কমেছে একটু?

রত্না? এবার আর হাঁ-টা সুধাংশু বন্ধ করতে পারল না।

—ওই দেখো, সাপের মুখে চুণ পড়ল! মেয়েটি সকৌতুকে হেসে উঠল।

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে শশধর ফিরে এলেন। মেয়েটি একটুখানি নামিয়ে আনল মাথার ঘোমটা।

শশধর বললেন, তুমি তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করো ও'র জন্যে। আমি একবার ঘুরে আসি বাগ্দীপাড়া থেকে। দেখি বিল থেকে দুটো চারটে কই মাছ ওরা ধরে এনেছে কিনা!

—দেখুন শশধরবাবু—

—পরে দেখব মশাই। এখন সময় নেই—

শশধর বেরিয়ে গেলেন।

মেয়েটি হাসল : পালাবার ফন্দি? ও হবে না। অনেকদিন পরে ধরেছি তোমাকে। এখন চুপ করে বোসো। আমি চা আনছি—

অতঃপর আবার সেই বিব্রত প্রহর যাপনের পালা সুধাংশুর। এ কী হচ্ছে—এ কোথায় এল সে! মণ্টুদা বলে তার কোনো নাম আছে একথা সে এই প্রথম শুনল! এবং রত্না! সেই-ই বা কে? বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে যে তার ঘর আলো করে রয়েছে, তাকেও তো সে এতকাল নিভাননী ওরফে বুলু বলেই জানত!

একটা ভুল হচ্ছে—ভয়ঙ্কর ভুল। ভুলটা ভেঙে দিয়ে এই মুহূর্তে তার ভদ্রলোকের মতো সরে পড়া উচিত।

কিন্তু—

কিন্তু চা আসছে। এবং এ সময় এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণ তুচ্ছ করবার মতো মূঢ়তাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়! চা-টা খাওয়া শেষ হলেই এক ফাঁকে ঝোলাটা কাঁধে করে সে উঠে পড়বে। তারপর এক দৌড়ে শালবন ছাড়িয়ে ময়ূরাক্ষী পার হতে আর কতক্ষণ!

সামনে ফুলদানি থেকে গন্ধরাজের মৃদু সৌরভ ছড়াচ্ছে। শীতের ফুল! সমস্ত ঘরে একটা রহস্যময় আমেজ ছড়িয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বেলায় ঘরময় . শীতল ছায়া ঘনাচ্ছে। মশার গুঞ্জন উঠছে। ব্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে সুধাংশু অভিভূতের মতো বসে রইল।

ভেতর থেকে গরম ঘিয়ের গন্ধ আসছে। খাবার তৈরি হচ্ছে—এবং নিশ্চয় তারই সম্মানে। সুধাংশুর মুখে আবার লালা জমে উঠল। রিফ্লেক্স্ অ্যাক্সন! খই জিনিসটা লঘু পাক। কিন্তু চাঁপা কলা আর মোষের দুধও যে এমন অবলীলাক্রমে হজম হয়ে যায়—সে রহস্যই বা কার জানা ছিল! চায়ের প্রলোভনটাকে আরো শক্ত পাকে জড়িয়ে ধরল ঘিয়ের গন্ধ। রাত্রে স্টেশনের হোটেলে তো জুটবে ট্যাঁড়শ-চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের ডাল—এক টুকরো মাছ যদি পাওয়া যায়, তার স্বাদ মনে হবে পিস্বোর্ডের মতো। তার চাইতে এখান থেকে যথাসাধ্য রেশন নিয়ে নেওয়া যাক। হোক ভ্রান্তি-বিলাস, তবু ধরে নেওয়া যাবে এটা বাংলা দেশের পুরোনো আতিথেয়তার নমুনা মাত্র।

গন্ধরাজের সৌরভ ছাপিয়ে লুচির গন্ধ আসছে। সুধাংশু প্রতীক্ষা করে বসে রইল।

একটু পরেই একহাতে সধূম লুচির থালা, আর এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল মেয়েটি।

—এত কেন?

—খাওয়ার জন্যে।—মেয়েটি হাসল : নাও—আর ভদ্রতা কোরোনা। সামনেই গাড়ু-গামছা রয়েছে—ধুয়ে নাও হাতমুখ।

যা হওয়ার হোক। এস্পার কি ওস্পার! মেঘনার ধারের সুধাংশু চক্রবর্তী আর বিস্মিত হবেনা ঠিক করল। দেশ ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালানোর চরম বিস্ময়টাকেই যখন রপ্ত করতে হয়েছে—তখন শিশিরে আর ভয় নেই তার।

বেপরোয়া হয়ে লুচি-বেগুন ভাজায় মনোনিবেশ করল সে।

মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কত রোগা হয়ে গেছ আজকাল!

শুনে রোমাঞ্চ হয় যে সুধাংশুও একদিন মোটা ছিল!

মেয়েটি বললে, সেই দশ বছর আগে যখন তুমি রত্নাকে নিয়ে পালিয়েছিলে, সেদিন কত কথাই উঠেছিল গ্রামে! কিন্তু আমি তো জানতাম—যা করেছ, ভালোই করেছ!

রত্নাকে নিয়ে পালানো! হে ভগবান, রক্ষা করো! সুধাংশুর গলায় লুচি আটকে আসতে লাগল। তাদের হেডমাস্টার থাকলে এখন সাক্ষী দিয়ে বলতেন, ইস্কুলে বরাবর গুড্-কণ্ডাক্টের প্রাইজ্ পেয়েছে সে!

—কাকিমা তো অগ্নিমূর্তি!—মেয়েটির চোখে স্মৃতির দূরত্ব ঘনিয়ে আসতে লাগল : আমাকে এসে বললেন, কণা, তুই দুঃখ পাসনি। ওর কপালে অনেক শাস্তি আছে—দেখে নিস। সত্যি বলছি মণ্টুদা—বিশ্বাস করো আমাকে। আমি খুসি হয়েছিলাম। জাত বড় নয়—রত্না সত্যিকারের ভালো মেয়ে। আর তোমাকেও তো জানি। প্রাণে ধরে রত্নাকে তুমি কখনো দুঃখ দেবে না।

আহা, এই কথাগুলো যদি বুল্‌ু শুনত! তার ধারণা, স্বামী হিসেবে যে বস্তুটি তার কপালে জুটেছে, পুরুষের অপদার্থতম নমুনা হচ্ছে সেইটিই!

—সত্যি, রত্নার কষ্ট চোখে দেখা যেত না। সৎমা কী অত্যাচারই করত ওর ওপরে! কতদিন খেতে পর্যন্ত দেয়নি। তবু মেয়েটা মুখ ফুটে

একটা কথা পর্যন্ত বলেনি কখনো। এমন ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে আর হয়না।

জাতটা কিছু নয় মণ্টুদা—জীবনে সত্যিই তুমি জিতেছ!

অজানা-অদেখা রত্নার জন্যে এবারে সুধাংশুরও দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে পড়ে গেল, ঝগড়া করবার আগে কোমরে হাত দিয়ে রত্নর সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা।

লুচির থালা শেষ হতে সময় লাগল না।

—আর দুখানা এনে দিই মণ্টু দা?

—না—না—সর্বনাশ!

কণা বলে চলল, তোমার চেহারা বদলেছে মণ্টু দা—কত ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ। তবু আমি কি ভুল করতে পারি? সেই চোখ, সেই কোঁকড়া চুল, সেই মুখের আদল, সেই হাঁটবার ভঙ্গি। বাড়ির সামনে দিয়ে যখন ধর্মখোলার দিকে চলে যাচ্ছিলে, তখনি আমি চিনে ফেললাম! তারপর উনি যখন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন যে, কলকাতা থেকে বইয়ের এজেণ্ট এসেছে, তখনি আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। এখনো তো সেই বইয়ের কাজই করছ?

হুঁ!—সংক্ষিপ্ততম উত্তরই সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

—শোনো—কণার গলার স্বর নিচু হয়ে এল: আমি ওঁকে বলেছি, তুমি সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই।—কণা অর্থগভীর হাসি হাসল: তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়োনা—কেমন?

—না—না!—সুধাংশু আন্তরিকভাবে মাথা নাড়ল: তা কখনো বলতে পারি! তা হলে আজ বরং উঠি আমি। রাত হয়ে যাচ্ছে—আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে!

—বা-রে, ভেবেছ কী তুমি? এমনি ছেড়ে দেব? ওঁকে মাছ আনতে পাঠালাম—দেখলে না? আমার রান্না খেতে তুমি কত ভালোবাসতে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? ও সব হবে না। খাও দেখি—কেমন যেতে পারো।

—কিন্তু বিছানাপত্র কিছু সঙ্গে নেই—

—কণা গরীব হতে পারে, কিন্তু তোমাকে শুতে দেবার মতো একখানা লেপ আর একটা বালিশ তার জুটবে। বেশি ভদ্রতা কোরোনা আমার সঙ্গে—বুঝেছ?

বুঝেছে বই কি সুধাংশু। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতারকের একটা চমৎকার ভূমিকায় নেমে পড়েছে সে। এখন আর সহজে পালাবার উপায় নেই। শশধর তাকে কখনোই দেখেন নি এবং কণা তাকে মণ্টু দা বলে প্রমাণ করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতএব জালিয়াতিটা অন্তত আজ রাতে ধরা পড়বে না। কাল ভোরেই তাকে পালাতে হবে—এবং এ এরিয়া ছেড়ে। তারপরে অক্ষয়বাবু রইলেন আর সে রইল।

বাগানের টিনের গেট খুলে কে ভেতরে ঢুকল। পাওয়া গেল চটির আওয়াজ।

শশধর ফিরে এলেন। হাতের বাঁধা ন্যাকড়াটার মধ্যে উত্তেজিত দাপাদাপি চলছে।

উল্লসিত হয়ে শশধর বললেন, অতিথি-সেবার পুণ্যে আজ ভালো মাছ পাওয়া গেল কণা। দশটা বড় বড় কই।

কণার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

—মণ্টুদার ভারী প্রিয় মাছ। মনে আছে মণ্টুদা—রেলের বাঁধের তলা থেকে একবার তুমি আর আমি ছিপ দিয়ে এক কুড়ি কই ধরেছিলাম? তারপর বাড়িতে ফিরে মা-র হাতে সে কি পিট্টি!

শশধর সস্নেহ হাসি হাসলেন। ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারটায়: ভাই বোনে মিলে খুব দুষ্টুমি হত বুঝি? তা বেশ। কিন্তু শিবেন বাবুকে এখনো চা দাওনি?

শিবেনবাবু! সুধাংশু আর একবার ঢোঁক গিলল। নিজের নামটা প্রায় অক্টোবরের পঞ্চাশের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে!

—তুমি আসবে বলেই দেরী করছিলাম।

—দাও—দাও।—শশধর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: বিকেলের চা-ই তো এখনো জোটেনি ওঁর! কুটুম মানুষ—বদনাম গাইবেন।

—মণ্টুদা খুব ভালো ছেলে—কারো বদনাম করে না—কণা ভেতরে চলে গেল।

খাওয়ার দিক থেকে কিছুমাত্র ত্রুটি হলোনা। বারোর সাত ছকু খানসামা লেনের সুধাংশু চক্রবর্তী এমন টাটকা কই মাছ চোখে দেখেনি দেশ ছাড়বার পরে। এ অঞ্চল নাকি কাঁকরের জন্যে বিখ্যাত, কই চালে তো একটি দানা কাঁকরেরও সন্ধান পাওয়া গেল না!

শশধর গল্প করলেন অজস্র। দেশের কথা, স্কুলের কথা। যোগ্যতায় বি-এ ফেল হেড্ মাস্টার নিবারণ সামন্তের পরেই তাঁর স্থান—এ কথাও ঘোষণা করলেন বার বার। শুধু সেক্রেটারীর কুটুম ওই গজেন বিশ্বাস! মামার জোরেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার—নইলে একটা ইংরেজি সেনটেন্স ও কারেক্ট করে লিখতে জানে নাকি?

—আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই। আপনি আমার কুটুম—গ্রেট ইণ্ডিয়ানের সব বই আমি ধরিয়ে দেব স্কুলে। ও দায়িত্বটা এখন আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

বাইরে কনকনে শীতের রাত। ভারী হাওয়ায় অসময়ের গন্ধরাজের গন্ধ। মাটির দেওয়ালে কেরোসিনের আলোর কাঁপনলাগা ছায়া। বিমিশ্র অনুভূতি বিজড়িত একটা স্তব্ধ মন নিয়ে সুধাংশু আধশোয়া হয়ে রইল লেপের মধ্যে। আশ্চর্য! জীবনটা এত আশ্চর্য—কে জানত!

মণ্টুদা?

কণা ঘরে ঢুকল।

—জেগেই আছি। শশধরবাবু কী করছেন?

—ওঁর তো এখন মাঝ রাত। পড়া আর মড়া। শুনেছ না—নাক ডাকছে?—কণা খিল্‌-খিল্ করে হেসে উঠল: ওই নাকের ডাকের ভয়ে পাড়ায় চোর আসতে পারে না।

সুধাংশু অপ্রতিভের মতো হাসল। টেবিলের পাশ থেকে চেয়ারটা নিয়ে বসল কণা। কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল লণ্ঠনের বাড়ানো কমানোর চাবিটা। কিছু একটা বলতে চায়—বলতে পারে না।

সুধাংশু সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল মনের ভেতরে। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল কণার দিকে। এককালে সুশ্রীই ছিল মুখখানা। এখন পরিশ্রম আর চিন্তার একটা ম্লান আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপরে।

তারপর:

একটা কথা বলব ভাবছি মণ্টুদা। বলব কিনা বুঝতে পারছি না।

—বলো। অত সংকোচের কী আছে?

রাতেখাড় সুনীল সরকার

—না, তোমার কাছে সংকোচের আমার কিছু নেই।—কণা ভেতরের দিকে মাথা ফিরিয়ে একবার কী দেখল, যেন কান পেতে শুনল শশধরের নাকের ডাকটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল: রত্না অমন করে মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে তোমার ঘরে হাঁড়ি ঠেলার ব্যবস্থাই যে আমার পাকা হয়ে গিয়েছিল, সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

সুধাংশু শিউরে উঠল। লণ্ঠনের আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে কণার চোখ। ঘন বর্ষার মেঘের মতো কী যেন টলমল করছে সেখানে।

কণা বললে, ভয় নেই। তুমি ভেবোনা—আমি রাগ করিনি। আমি তো জানি, রত্না কত ভালো মেয়ে!—কণার চোখ থেকে টপ করে এক ফোটা জল ঝরে পড়ল বুকের ওপর: আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি মণ্টুদা!—

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে কণা আবার হেসে উঠল। শ্রাবণের মেঘ-রৌদ্রের লীলার মতো তার হাসি-কান্না দেখতে লাগল সুধাংশু।

কণা বলে চলল, দশ বছর পরে দেখা, ভেবেছিলাম, কথাটা বলা ঠিক হবে না। তারপরে ভেবে দেখলাম, পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলতে পারি!—গলার স্বর নামিয়ে কণা বললে, মণ্টুদা, কুড়িটা টাকা দেবে আমাকে?

কুড়ি টাকা! ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তী সভয়ে নড়ে উঠল।

আঁচলের গিঁট থেকে একটা চিঠি বের করলে কণা। বললে, এইটে পড়ো।

সুধাংশু বিমূঢ়ের মতো হাত বাড়িয়ে নিল চিঠিখানা। বোলপুর থেকে কোন্ এক বিনু চিঠি দিয়েছে দিদিকে। তার ম্যাট্রিকের ফী এমাসেই দিতে হবে—দিদি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেয়।

হতবাক হয়ে চিঠিটার দিকে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—অবাক হয়ে গেলে তো? দশ বছর আগে যে ছোট্ট বিনুকে দেখেছিলে, সে আর ছোটটি নেই। ম্যাট্রিক দেবে এবার। ভালো ছেলে—ভালো করেই পাশ করবে। অথচ ফীয়ের টাকা নিয়েই মুস্কিল। বাবার অবস্থা তো সবই জানো—কোনোমতে আধপেটা খেয়ে আছেন। অথচ এদের কাছেও চাইতে পারি না। নিজেরই সংসার চলে না, তবু বাবাকে যখন পারেন দু পাঁচ টাকা পাঠান। এই কুড়িটা টাকার জন্যে ও'কে আর কী ভাবে চাপ দিই বলো?

সুধাংশু তেমনি নির্বাক হয়ে রইল।

কোমল গভীর গলায় কণা বললে, একদিন তোমার কাছে সবই আমার চাইবার দাবী ছিল মণ্টুদা। আজ সেই সাহসেই কথাটা বলতে পারলাম। রত্নাকে আমি সবই তো দিয়েছি—কণার চোখে জল চকচক করতে লাগল ঃ মোটে কুড়িটা টাকাও কি আমি চাইতে পারব না?

অভিনেতা সুধাংশুর কাছে অভিনয়টা কখন সত্যি হয়ে উঠল সে নিজেই জানে না। তেমনি গভীর গলায় সেও বললে, নিশ্চয় কণা—নিশ্চয়।

বালিসের তলায় রাখা মাণিব্যাগটার দিকে সে হাত বাড়ালো।

—এখুনি?—কণা বললে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কলকাতা গিয়েও বিনুকে পাঠিয়ে দিতে পারো। ঠিকানাটা নিয়ে যাও বরং।

ব্যাগটা বের করে এনে সুধাংশু বললে, না—না! অঢেল কাজ নিয়ে থাকি, কলকাতায় গিয়ে ভুলে যেতে কতক্ষণ? টাকাটা তুমিই রাখো কণা।

শীতের হাওয়ায় ঘরে গন্ধরাজের মৃদু সুরভি। দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে। আশ্চর্য তরল কণার চোখ। জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এবার আর সে তা মুছতে পারল না।

* * *

শাল-পলাশের বনে ভোরের কুয়াশা। পায়ের তলায় শিশিরভেজা ধুলো। ময়ূরাক্ষী আর কতদূরে?

ঠাণ্ডা নরম রোদে—শালের পাতায় সোনালি ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে আর মন্থর পা ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তীর মনে হল—অভিনয়টা সত্যি সত্যি করেছে কে? সে—না কণা? কে বলতে পারে, এই পরিচয়ের ছদ্মবেশটা কুড়িটা টাকা আদায় করার একটা চক্রান্ত কিনা?

কিন্তু তা হলে কি এত মিষ্টি লাগত গন্ধরাজের গন্ধটা? এই সকালে কি এত সুন্দর দেখাত এই শাল-পলাশের বন? আর সামনে—সামনে ওই তো ময়ূরাক্ষী! ময়ূরের চোখের মতোই সোনার আলো-ছড়ানো কী অপরূপ নীল ওর জল!

এই কুড়িটা টাকার হিসেব সহজে বোঝানো যাবে না ব্যবসায়ী অক্ষয়বাবুকে। এ এরিয়ার সবই তো পড়ে রইল। আর অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

এর ঋণ শোধ করতে হবে এক মাস রেশন না এনে; কণার চোখের জলের দাম শোধ করে দিতে হবে বুলুকে। পিঠের বোঝাটার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুর। এত বই—রাশি রাশি বই! শুধু চিনির বলদের মতো বয়েই বেড়ায় সে—তার নিজের ছেলের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ারও খরচ জোটে না। তবু একজন তো ম্যাট্রিকের ফী দিতে পারবে—একজন তো কৃতী হতে পারবে জীবনে!

কুড়িটা টাকার চেয়ে ঢের বেশি সত্য বুকের পকেটে এই গন্ধরাজ দুটো। অসময়ের ফুল। কাচের ফুলদানিটা থেকে চুরি করে এনেছে সুধাংশু—পালিয়ে এসেছে ভোরের অন্ধকারে। যে অন্ধকারে রজপুরে একটা স্বপ্ন-মাধুরী নিয়ে পেছনে পড়ে রইল!

সামনে ময়ূরাক্ষী। কী আশ্চর্য নীল-সোনালি ওর জল!

তা তা থৈ থৈ

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)

অনেক মুর্গী মটন খাওয়াইয়াছেন, তাঁহার জন্য এটুকু না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না।

মনোবিৎ দাদার ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর ঘণ্টাখানেক আর তাঁহাদের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমি নীচে বসিয়া ছিরুর তৈরী গরম গরম নিমকি ও পান্তুয়া খাইয়া সময় কাটাইলাম।

মনোবিৎ যখন নামিয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখ গম্ভীর। বলিলেন,—'মনের অসুখই বটে। গভীর একটা কম্‌প্লেক্স তৈরী হয়েছে। সারাতে সময় লাগবে।'

'তাই নাকি? কি রকম কম্‌প্লেক্স?'

'একেবারে আদিম কম্‌প্লেক্স। অনেক কষ্টে ও'র মুখ থেকে একটি কথা বার করেছি। তা থেকে মনে হয়—'

'কী কথা বার করেছেন?'

'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই।'

'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই।'

'হ্যাঁ। যে প্রশ্নই করি, একমাত্র উত্তর—'ঠমকি ঠমকি নাচে রাই।'

আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ডাক্তার বলিয়া চলিলেন,—'আসল কথা উনি নিজেকে স্ত্রীলোক মনে করছেন। মগ্নচৈতন্যে অবরুদ্ধ বাসনা যখন গভীরভাবে আলোড়িত হয়—'

বলিলাম,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বলতে হবে না। —আচ্ছা, মনে করুন, কেউ গান-বাজনা পছন্দ করে না; সে যদি হঠাৎ এমন একটা গান শোনে যা তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে—সে তখন কী করবে?'

মনোবিৎ বলিলেন,—'নিজের মনকে নিগৃহীত করবার চেষ্টা করবে।'

'এবং—?'

'এবং তার ফলে গুরুতর স্নায়বিক রোগ হতে পারে।'

'ব্যস্—বুঝেছি। চলুন এবার আপনার চিকিৎসার দরকার নেই, আমিই দাদার রোগ সারাব।'

মনঃক্ষুণ্ণ মনোবিৎকে ফিরাইয়া লইয়া গেলাম। তারপর একটি গ্রামোফোন ও একটি রেকর্ড লইয়া দাদার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

দাদার ঘরের বন্ধ দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম ভিতরে থুপ থুপ শব্দ হইতেছে। তখন দরজার বাহিরে গ্রামোফোন রাখিয়া দম দিয়া রেকর্ড বাজাইয়া দিলাম। নৃত্য-লীলায়িত সুরে বাজিয়া উঠিল—

ঠমকি ঠমকি নাচে রাই—

কিছুক্ষণ পরে দরজা একটু ফাঁক করিয়া দাদা উঁকি মারিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময়াহত উত্তেজনা; নাচ থামিয়াছে। রেকর্ড শেষ হইল, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন,—'আবার বাজাও।'

আবার বাজাইলাম। দাদা গ্রামোফোনের কাছে চাপটোলি খাইয়া বসিয়া দুহাতে তাল দিতে লাগিলেন। মুখে তন্ময় ভাব।

আরও তিন চারিবার রেকর্ড শুনিবার পর দাদা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া বলিলেন,—'ভাইরে, তুই আমায় রক্ষে করেছিস।'

আলিঙ্গনের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া বলিলাম,—'কী হয়েছিল দাদা?'

দাদা বলিলেন,—'সেক্সপীয়ার ঠিকই বলেছেন, যে-লোক গান ভালবাসে না সে মহাপাষণ্ড। আমার এবার আক্কেল হয়েছে।'

'কিন্তু কি করে আক্কেল হল?'

দাদা তখন আক্কেল হওয়ার কাহিনী বলিলেন। সেদিন হজম বাড়াইবার জন্য দাদা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি ষ্টেশনের কাছে উপস্থিত হন। হঠাৎ একটা রেস্তোরাঁ হইতে রেকর্ডের গান তাঁহার কর্ণপটাহ বিদ্ধ করিল। গান-বাজনায় তাঁহার দারুণ অরুচি, তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

কিন্তু সুরটা তাঁহার কানে লাগিয়া রহিল—ঠমকি ঠমকি নাচে রাই! তিনি উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন এবং জোর করিয়া সুরটাকে মন হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

বাড়ী ফিরিবার পর তাঁহার মাথার মধ্যে কি যেন একটা ঘটিয়া গেল। অদম্য নৃত্যস্পৃহা তাঁহার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইল। তিনি নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু কেন যে নাচিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

তারপর এখন রেকর্ড শুনিয়া সব রহস্য তাঁহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। গানের তুল্য জিনিস নাই, ফ্রেঞ্চ ফাউল কাটলেট ইহার কাছে তুচ্ছ।

কাহিনী শেষ করিয়া ভোম্বলদা আবেগভরে বলিলেন,—'ভাইরে, এতদিন যে পাপ করেছি এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করব। এমন রেকর্ড যে তৈরী হয় আমি জানতাম না। তোর গ্রামোফোন আর রেকর্ড রেখে যা। আমি বাজাব।'

উপরের কাহিনী কেহ যদি বিশ্বাস না করেন তাঁহাকে একখানি 'ঠমকি ঠমকি রেকর্ড' কিনিয়া শুনিতে অনুরোধ করি। গানের নম্বর—পি ০০০১৫, বলা বাহুল্য ইহা স্বনামধন্য সুরধুনী রেকর্ড কোম্পানীর নবতম অবদান। যদি এ গান শুনিয়া নেশা না হয়, নেশায় মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে ইচ্ছা না করে, তবে যা লিখিলাম সব মিথ্যা।

তার আর
জমবে না;
অবস্থায়ই
রকমে

মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর
বসতীর অপূর্ব্ব সুযোগ!
জমি অথবা নূতন তৈরী বাড়ী

গয়না

হার আড়াই ভরি, চুড়ি চারগাছা বারো আনা করে তিন ভরি, চুড় একজোড়া দু'ভরি ছ' আনা, আমলেট তিন ভরি, কানপাশা ছ' আনা, আংটি চার আনা—মোট সাড়ে এগারো ভরির গয়না। রঞ্জনের কি মনে আছে তার বউএর গয়নার হিসাব।

এরই মধ্যে ভুলে যায়নি সে—দু' বছরও হয়নি তার বিয়ে হেয়েছে শোভার সংগে। বিয়ের পরদিন বউ যখন বাড়ি এল, মামিমা তার গায়ের সব গয়না খুলিয়ে, ওজন করিয়ে দেখে নিয়েছিলেন, রঞ্জনকে সামনে রেখে। আগে থেকে সেকরা ডেকে রেখেছিলেন তিনি। পাকা লোক! কথা ছিল দশ ভরির; তার জায়গায় আরো দেড় ভরি বেশি পেয়ে মুখ বেঁকিয়েছিলেন মামিমা।

জানা হিসাবটা মনে করে, মনে মনে মিলিয়ে নিয়ে রঞ্জন বলে, "ঠিক আছে।"

—তার মানে? সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান তার দিকে।

রঞ্জন বলে, "দশ ভরি গয়নার ব্যবস্থা আমিই করব—বিয়ে ঠিক করে ফ্যাল তোমরা।"

বিয়ে গৌরীর। রঞ্জনের মামাতো বোন গৌরী।

রঞ্জনের বাবা মা মারা গেছেন তার ছেলে-বেলাতেই; সেই থেকে মামিমার কোলে, মামার খেয়েই সে মানুষ। তা মানুষই হয়েছে সে, বলতে হবে। তিনটে পাস দিয়েছে ভালয় ভালয়, চাকরি করছে ভাল মাইনেতেই, শহরতলীর পৈতৃক পোড়ো ভিটেতে ছোট একটা বাড়িও করেছে। শেষদিকে অবশ্য টাকার একান্ত অভাব পড়তে বাড়িটা একেবারে সম্পূর্ণ হয়নি—মোটামুটি বাসযোগ্য হয়েছে শুধু।

রঞ্জনের মামা ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের লোক। প্রত্যাশিত সময়ের ঢের আগেই, বছর-চারেক হল, যখন তিনি হঠাৎ একদিন মারা গেলেন তখন দেখা গেল, সঞ্চয় বলতে কিছুই রেখে যাননি, 'বরং' ধার রেখে গেছেন কিছু। সম্পত্তি বলতে রেখে গেছেন তাঁর পিতামহের আমলের এই বাড়ীটি। ভাগ্যিস রেখে গেছেন,

তাই দশ আনা বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই আয়ে বাকি ছ' আনা বাড়ির আড়াইখানা ঘরে মাথা গুঁজে বেঁচে আছে তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনেরা—বৃদ্ধা মা, বিধবা স্ত্রী, পাঁচটি নাবালক সন্তান, তার মধ্যে তিনটেই মেয়ে এবং সবার বড় এই গৌরী।

গৌরীর বয়স আজ ষোলো পেরিয়ে গেছে, তার বিয়ে আর না দিলেই নয়। অনেক চেষ্টার পর ভাল একটি পাত্রও জুটেছে—দুটো পাস, ভাল চাকরি করে, নিজেদের বাড়ী আছে, অবস্থা ভালই। মেয়ে দেখে ছেলের বাপের খুবই পছন্দ হয়েছে, তাই, অনেক ধরাধরি করতে, তিনি নগদ টাকা পণের দাবী ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু ছেলের মা'র গয়নার দাবী কিছুতেই ছাড়ানো যায়নি। নগদ টাকা নেওয়া হবে না, সুতরাং বিশ ভরিই দাবী করেছিলেন তিনি; অনেক সাধ্যসাধনায় এক-আধভরি করে নামতে নামতে শেষে দশ ভরিতে নেমে এমন বেঁকে বসেছেন যে, কিছুতেই আর এক রতিও নামানো যায়নি তাঁকে।

কিন্তু কোত্থেকে দেবেন রঞ্জনের মামিমা দশ ভরি সোনার গয়না? বিয়েটা তো করিয়ে দিতে হবে—তার খরচ তো তুচ্ছ নয় আজকের বাজারে। সে টাকারই সংস্থান হওয়া দায়, তার ওপর দশ ভরি সোনা—অসম্ভব।

প্রথমে রঞ্জনও বলেছিল, "দশ ভরি—অসম্ভব!" কিন্তু এমন পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবার দুর্ভাগ্যটা খতিয়ে দেখে, মামিমা-দিদিমা দু'জনকেই অশ্রুসজল দেখে, স্বয়ং গৌরীকে মনমরা হয়ে যেতে দেখে আর মাতুল-পরিবারের কাছে নিজের অন্নদায় জীবনদায় স্মরণ করে সে নতমুখে ভাবতে বসে। আফসোস হয় বাড়িটা করেছে বলে। বাড়ির পেছনে এতগুলো টাকা না ঢাললে কি আজ দশ ভরি সোনার জন্যে ভাবতে হয় তাকে! দেওয়ালে হেলান দিয়ে, ঘাড় গুঁজে, ভূমি-আসনে অনেকক্ষণ বসে থাকে সে; তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসে, দৃঢ়ভাবে বলে, "ঠিক আছে।"

ঠিক আছে মানে? মামিমা-দিদিমা'র চোখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রঞ্জন বলে, "দশ ভরি গয়নার ব্যবস্থা আমি করব।"

"তুই কোত্থেকে করবি!" দন্তহীন মুখে হাঁ করে থাকেন দিদিমা।

"কেন, করতে পারিনে আমি?" হাসিমুখে রঞ্জন বলে, "আছে—আছে, গোপনে জমা তহবিল আছে আমার।"

মামিমা বলেন, "তা যদি থাকত, বাবা তা হলে তোমার বাড়িটাকে অমন আধাখ্যাঁচড়া করে ফেলে রাখতে না— আর হাজারখানেক টাকার জন্যে। যে শৌখীন ছেলে তুমি—আমি তো জানি।"

দিদিমা বলেন, "তাইতো। টাকার অভাবে ঘরের জানালায় পাল্লা বসাতে পারছিস নে তুই, আর দশ ভরি সোনার বেলায় একেবারে রাজা-বাদশা বনে গেলি আরকি!"

বিরক্ত হয় রঞ্জন, একটু উত্তেজিতও হয়, "অত কথায় তোমাদের কাজ কী, বল দেখি? কোত্থেকে দেবো—কী করে দেবো, সে আমার ভাবনা—আমার দায়। তোমরা দয়া করে বিয়ের কথা পাকা করে ফ্যাল।"

হাসি ফোটে মামিমা-দিদিমা'র মুখে। ব্যাটাছেলে—দুনিয়া চষে খায়। রঞ্জন কিছু অযোগ্য ছেলে নয়। দেবে যখন বলেছে, তখন কোত্থেকে টাকার জোগাড় করবে, সে-ই বুঝবে। টাকা ধার করবে হয়তো। তা, শোধ করার সামর্থ্য আছে বলেই ধার করবে।

দিদিমার চোখের কোণে জল চিক্‌চিক করে ওঠে। বলেন, "তা সত্যিই তো, দাদু, তোর বোন, তোর দায়—তুই জানিস কী করে তাকে পার করবি। আমরা কেন মিছিমিছি মাথা ঘামাই!"

মামিমা ছলছল চোখে বলেন, "গৌরী আসবার আগে তুইই তো আমার কোলে এলি, রঞ্জন—তুই আমার বড়ছেলে। তিনি মনের মত করে তোকে মানুষ করেছেন, তাই-না তোর হাতে আমাদের ভার দিয়ে এমন নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারলেন!"

ছোটরাও এতক্ষণ মুখ অন্ধকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; ঘরের গুমোট কেটে যেতে দেখে তারাও ওঠে চঞ্চল হয়ে এবং রঞ্জন আবিষ্কার করে, গৌরী এইমাত্র তাকে যে চা করে এনে দিয়েছে, তাতে চিনি দিয়েছে অন্তত দু'গুণ—তিনগুণ যদি বা না হয়।

কথাটা বলে রঞ্জন হো হো করে হেসে ওঠে! আরক্তমুখে পালিয়ে যাচ্ছিল গৌরী, রঞ্জন কোলাহল করে ওঠে, "পালাস নে, দাঁড়া—দাঁড়া, গয়নার মাপ দিয়ে যা।"

মামিমা বলেন, "দাঁড়া, বাপু, আগে বিয়ের কথাটা পাকা হোক।"

বিয়ের কথা পাকা হয়।

রঞ্জনের স্ত্রী শোভা বলে স্বামীকে, "আমাকে তো ক'দিন আগেই যেতে হবে, তা নইলে করবে-কুলোবে কে সব?"

রঞ্জন বলে, "ক্ষেপেছ! তোমায় নিয়ে গেলে, মামিমা আমায় মারতে বাকি রাখবেন না এ ধাড়ি বয়সেও।"

"কেন, কী হল!" শোভার বিস্ময়ের অন্ত নেই, "গৌরী-ঠাকুরঝির বিয়ে, আমি যাব না, সে কী কথা!"

রঞ্জন বলে, "অথচ সেই তো দাঁড়াল। মামিমা কথায় কথায় আমাকে বলেন তাঁর বড়ছেলে—তুমি হ'লে বড়বউ, অথচ—"

অধীরভাবে শোভা বলে, "অথচটা কী?"

রঞ্জন বলে, "বাঃ রে! তুমি যে—তোমার যে........"

অর্থাৎ শোভা সন্তানসম্ভবা।

শোভা বলে, "ওমা! সে তো মোটে তিন মাস।"

রঞ্জন বলে, "তিন মাসই হোক আর তিন দিনই হোক, এ অবস্থায় এখন তুমি বাড়ীর বাইরে গেলে, মামিমা-দিদিমা কেউ আর আস্ত রাখবে না আমায়।"

ব্যথিত বিস্ময়ে শোভা বলে, "এমন আইন তো আর শুনিনি কখনও!"

রঞ্জন বলে, "বুঝতে পারছ না? প্রথম বার যে! আমাদের শাস্ত্রে আছে, প্রথম ছেলেই আসল ছেলে। তাই তার বেলাই যত কড়াকড়ির বহর।"

কান্না পায় শোভার। তাই বলে গৌরী-ঠাকুরঝির বিয়েতে যাবে না সে? মোটে তো তিন মাস! এ কোন দেশী আইন!

রঞ্জন প্রথমে ভেবেছিল, শোভাকে বলেই নেবে, কিন্তু শেষে ভেবেছে, না, তার দরকার নেই। শোভাকে বললে, তার গয়না—তার বাপের বাড়ীর দেওয়া বিয়ের-গয়না সে যদি না দেয়! তা হলেই তো সব ভণ্ডুল! না দেবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তার বিয়ের সে গয়নাও তো মামিমা চাপ দিয়ে আদায় করেছিলেন; এখন সেই মামিমার দায় উদ্ধার করতে কেন শোভা দিতে রাজি হবে তার গয়না? অতএব বুদ্ধিমানের মত নীরবই থাকে রঞ্জন এবং ভাবাবেগে ভুলটা করে ফ্যালেনি বলে ধন্যবাদ দেয় নিজেকে।

শোভা কোথায় গয়না রাখে, রঞ্জন জানে। কিপ্‌টে মেয়ে, প্রাণ ধরে একগাছা চুড়িও পরে না কখনও—পাছে বাপের দেওয়া গয়না ক্ষয়ে যায়! শুধু দু' কানে আছে রঞ্জনেরই দেওয়া দু'টি ওপেল বসানো টপ্ আর দু' হাতে আছে মামিমার দেওয়া দু'গাছা সোনার বাঁধানো নোয়া আর আঙুলে আছে রঞ্জনের সাধ করে দেওয়া একটি আংটি। বাপের বাড়ির দেওয়া গয়নাগুলো পরে, শোভা যখন কোথাও বেড়াতে যায়। বাড়ী ফিরেই আবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাগ্রেই গয়নাগুলো গা থেকে খুলে কৌটোবন্দী করে। টিনের একটা বার্লি'র কৌটো, তারই মধ্যে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রাখে সে গয়নাগুলো। সেই কৌটো সে লুকিয়ে রাখে তাকের ওপর রাখা লেপের ভাঁজের মধ্যে।

অনায়াসে একদিন সমস্ত গয়না সমেত সেই কৌটোটি সরিয়ে ফ্যালে রঞ্জন। শোভা তার কিছুই জানতে পায় না। 'না বলিয়া লইলেই চুরি করা হয়'—নিজের বউ-এর সম্পত্তিও? কিন্তু বউ তো তার নিজের সম্পত্তি!

অতঃপর কী হবে, কী করবে, তা ভেবে রেখেছে রঞ্জন। গয়না চুরি গেছে টের পেলেই শোভা কাঁদবে, হাহাকার করবে; রঞ্জন তাকে সান্ত্বনা দেবে অদৃষ্টের দোহাই পেড়ে। বাড়িটা নিরাপদ করে গড়তে পারল না বলে নিজের অক্ষমতাকে ধিক্‌কার দেবে রঞ্জন। তারপরে, স্ত্রীর গয়না দুর্ভাগ্যবশে যখন চুরিই গেছে, তখন শূন্য স্থান পূর্ণ করার দায়িত্ব অবশ্যই স্বামীর। যত ওজনের যে যে গয়না চুরি গেছে, সবই গড়িয়ে দেবে রঞ্জন এক এক করে, ক্রমে ক্রমে। বেশ কিছুকাল তার আর সঞ্চয়ের ঘরে একটি কড়িও জমবে না; বাড়ীও এখন যেমন আছে এ অবস্থায়ই থাকবে দীর্ঘকাল। অবশ্য কোন রকমে শুধু জানালার পাল্লাগুলোই বসিয়ে নেবে সে গয়না তৈয়ারীতে হাত দেবার আগে; তা নইলে নতুন গয়নাগুলোও যে চুরি যাবে না তার ঠিক কী!

শোভার গয়নাগুলো নিয়ে রঞ্জন যায় শহরের এক সেকরার দোকানে। গয়না দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সেকরার। তবু সে একগাছা চুড়ি নিয়ে একবার কষ্টিপাথরে ঘষে দেখে। কোন সন্দেহ নেই আর। সেকরা বলে, "সবই যে, মশাই, কেমিক্যাল সোনা—গিল্‌টি করা!"

কেমিক্যাল সোনা! সোনার জলে গিল্‌টি করা পেতলের গয়না!

চক্ষুস্থির হয়ে যায় রঞ্জনের। হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে যাবে তার। এও কি সম্ভব! মামিমা যে তার বিয়ের পরদিন সেকরা দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিলেন গয়নাগুলো!

নিজের ঘরের নকল সোনাকে আসল সোনা বলে তুলে দিয়েছে সেকরার হাতে রঞ্জন; সেকরা তো তাকে জোচ্চোর মনে করতে পারে, না-হয় মনে করতে পারে এসব চুরির গয়না! নকল সোনা নিয়ে জোচ্চুরি তো হামেশাই চলছে শহরের পথেঘাটে! তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসে রঞ্জন। ছিছি, কী লজ্জা!

আরো একটা দোকানে গিয়ে একটা বানানো কাহিনী সে আগেই বলে নের: গয়নাগুলো যে কেমিক্যাল সোনার তা আগেই জানিয়ে দেয় সে দোকানীকে, শুধু জানতে চায় যে, এর সঙ্গে খাঁটি সোনার কোন গয়নাও ভুল ক'রে মিশিয়ে রাখা হয়েছে নাকি। দোকানী এক-এক ক'রে সব গয়নাই পরীক্ষা করে। না, এক রতি খাঁটি সোনাও মিশে নেই ওগুলোর সঙ্গে। ও, সব গয়নাই কেমিক্যাল সোনার।

কোন সন্দেহ নেই আর। কিন্তু কোন্ ফাঁকে এতবড় ফাঁকিটা রঞ্জনের ঘরে ঢুকতে পারল! মাথার ভিতরটা ঘুরে ওঠে তার। হায়রে, এরই ওপর ভরসা ক'রে এতবড় আশ্বাস দিয়ে এসেছে সে মামিমা-দিদিমাকে! রঞ্জনের চোখের সামনে রাস্তাঘাট দোকানপাট সব যেন দুলছে!

মামিমার যাচাই ক'রে নেওয়া সোনা কী ক'রে পেতল হয়ে গেল! রঞ্জনের শ্বশুর কি তা হ'লে জোচ্চুরি করেছেন? কার সঙ্গে? গয়না তো তাঁর মেয়েরই পরার জন্যে—রঞ্জনের পরার জন্যে নয়।

রাগে রিরি করে রঞ্জনের সর্বাঙ্গ। গয়না তার পরার জন্য নয়, কাজেই তার এতে মাথা ঘামাও উচিত নয়; কিন্তু এগুলোকে সোনা ব'লে মনে করতে দিয়েছিল ব'লেই তো এতবড় বঞ্চনায় পড়তে হ'ল আজ রঞ্জনকে। রাগ সেইজন্যে। রাগ বোকা ব'নেছে ব'লে। আর রাগ, মামাবাড়িতে সে মুখ দেখাবে কী ক'রে তাই ভেবে।

গৌরীর গয়নার ব্যবস্থা তো যেমন ক'রে হোক করতেই হবে—হরিশ্চন্দ্র রাজার মত,

নিজেকে বন্ধক রেখে যদি টাকার জোগাড় করতে হয়, তাও করবে রঞ্জন।

একখানা গাড়ি প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে তার। চাপা পড়তে পড়তে নেহাত আয়ুর জোরে বেঁচে যায় সে। কিন্তু, চাপা পড়লেই ভাল হ'ত বুঝি!

রেলস্টেশনে এসে শহরতলির ট্রেনে চেপে ঝিম মেরে সে ব'সে থাকে। আসল সোনা কী ক'রে যে কেমিক্যাল সোনা হয়ে গেল, সে তথ্যটা অনুমান করা শক্ত হয় না রঞ্জনের। নিজের বিয়ের সময়কার কথা মনে পড়ে তার :

শোভাকে সব দিক দিয়েই পছন্দ হয়েছিল রঞ্জনদের পক্ষের সকলেরই। উদার রঞ্জন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, নগদ টাকা সে নেবে না। কিন্তু মামিমা বেঁকে বসলেন, গয়না চাইই, নইলে বিয়ে হবে না। তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই মা'র মত মানে রঞ্জন, তাঁর ওপর সে কথা বলতে সাহস করে নি, নইলে গয়নার দাবি তার নিজের ছিল না। শোভার বাবা অনুনয় ক'রে বলেছিলেন—পৈতৃক বাড়িটি বিক্রি করতে যাচ্ছেন তিনি, কথাবার্তাও এক রকম হয়ে আছে, লেখাপড়া-লেনদেন হ'তে কয়েক মাস দেরি হ'তে পারে; হয় বিয়ের দিন সে পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হোক, আর নয়তো বিয়ে হয়ে যাক, গয়না তিনি বাড়ি বিক্রি হ'লে ক'রিয়ে দেবেন। কিন্তু কোন প্রস্তাবেই রাজি হন নি মামিমা। সেদিন অত যে নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তখন একবারও কি তাঁর মনে হয়নি যে, গৌরীর বিয়েতে গয়না দেবার দায়ে তাঁকেও পড়তে হবে! ছেলের মা রূপে আর মেয়ের মা রূপে একই লোকের চেহারা বুঝি দু'রকমের হয়ে যায়!

যাহোক, যে ক'রেই হোক শ্বশুর গয়না দিয়েছেন—দশ ভরি চুক্তির জায়গায় আরো দেড় ভরি বেশি দিয়েছেন। নির্দিষ্ট তারিখেই তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি রঞ্জনের সঙ্গে। মামিমা'র অভিভাবকির আড়ালে থেকে সেদিন রঞ্জনও পাপ করেছিল বইকি, তারই ফল আজ পেতে হচ্ছে তাকে, মামিমাকে, যার কোন অপরাধ নেই সেই গৌরীকেও বুঝি!

সেদিন গয়নার জন্যে মামিমা'র ধনুর্ভঙ্গ পণ দেখে অদৃষ্ট-বিধাতার যে চক্ষে রোষদৃষ্টি উঠেছিল কষায়িত হয়ে, বিয়ের পরে মামিমা যখন সোনা কষিয়ে নিলেন, তাই দেখে সেই চক্ষুরই কোণে বুঝি ফুটে উঠেছিল এক কণা বাঁকা হাসি। ইতিমধ্যে কেমিক্যাল সোনা সেই সোনার স্থান দখল ক'রে সেই বাঁকা হাসিকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য অপেক্ষা করছিল শোভার টিনের কৌটোর মধ্যে!

রহস্য বিশেষ জটিল মনে হয় না রঞ্জনের। শোভার বাবা সেদিন হয়তো কয়েক দিনের জন্যে কারো কাছ থেকে গয়না চেয়ে নিয়ে মেয়ের বিয়ের কাজ চুকিয়েছিলেন; তারপর সে সব গয়নার মত ক'রে মেয়েকে কেমিক্যাল সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়ে, চেয়ে-আনা সোনার গয়না ফেরত দিয়েছেন।

এ পর্যন্ত শোভার প্রতি এবং শোভার বাবার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে রঞ্জনের। কিন্তু তারপরে আজ দু' বছর হ'তে চলেছে, ইতিমধ্যে ভদ্রলোক শহরের তাঁর পিতৃপুরুষের প্রকাণ্ড বাড়িটাও বিক্রি ক'রে বেশ কয়েক

পালাস নে, দাঁড়া দাঁড়া—গয়নার মাপ দিয়ে যা—

হাজার টাকা পেয়েছেন। সে টাকা থেকে তাঁর ধারকর্জ শোধ হয়েও আরো যে ক' হাজার টাকা ছিল, তা দিয়ে শহরতলিতে জায়গা কিনে, ছোট একটা বাড়িও করেছেন তিনি; অথচ কেমিক্যাল সোনা পালটে মেয়ের গয়নাগুলো আসল সোনার ক'রে দিলেন না! এত হাজার টাকাই খরচ করলেন, দশ ভরির গয়না করাতে না হয় আর এক হাজার টাকা খরচ হ'ত তাঁর। মজুরি নিয়েই কুলিয়ে যেত ওরই মধ্যে।

কেনই বা দেবেন? ঝানু সংসারী লোক! দায় যখন উদ্ধার হয়ে গেছে, তার পেছনে আর একটা পয়সাই বা খরচ করবেন কী জন্যে! আগুন হয়ে ওঠে রঞ্জনের মাথার ভিতরটা। সেও এর শোধ না নিয়ে ছাড়বে না। বাপের বাড়ি যেতে দেবে না শোভাকে—যতদিন না সে নিজে তাকে খাঁটি গিনি সোনায় গড়িয়ে দিতে পারে সব গয়না। আর, সব গয়না গড়ানো সারা জীবনেও শেষ করবে না রঞ্জন।

শোভা? শোভা কেন তাকে সব কথা জানায় নি? বাপের কীর্তি স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে হয়তো বেধেছে তার। কিন্তু আজ কি আর অপ্রকাশ রইল কিছু? জীবন-মরণের সঙ্গী যে স্বামী, তাকেই শোভা পর ভাবল, আর জোচ্চোর বাপকে ভাবল আপন! রঞ্জনকে জানালে, সে এতদিন আদায় ক'রে ছাড়ত গয়না শ্বশুরের কাছ থেকে। না যদি পারত, সে নিজে দিত তার বউকে গয়না গড়িয়ে—শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিত চিরকালের মত। বাড়ি না হয় আর কিছুদিন পরেই হ'ত তার। বাড়ি তো এখনও পুরো হয়নি, গয়নাতে হাজার টাকা গেলে না হয় আরো খানিক অপূর্ণ থাকত। গয়না যদি না-ই গড়িয়ে দিতে পারত রঞ্জন, তা হ'লেও তো, ব্যাপারটা জানা থাকলে আজ বুক ফুলিয়ে গৌরীর গয়নার ভার নিত না সে।

আর যখন নিয়েছে, গৌরীর গয়নার টাকা তাকে জোগাড় করতেই হবে। না হয় বাড়ি বন্ধক দেবে। পাঁচ হাজার টাকার ওপর যে বাড়ির পেছনে নেমে গেল, সে বাড়ি কি এক হাজার টাকায়ও বন্ধক রাখবে না কেউ? এক হাজার টাকা রঞ্জন এক বছরের মধ্যেই শোধ ক'রে দিয়ে বাড়ি ছাড়িয়ে নিতে পারবে।

বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকেই শোভাকে সামনে পায় রঞ্জন। স্বামীর ঝঞ্ঝাপীড়িত রুদ্ররূপ

দেখে বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে শোভার। কী হ'ল—কী দুর্ঘটনা। কিন্তু রঞ্জনের হাতে তার গয়নার কৌটো দেখেই কাঠ হয়ে যায় শোভা।

কৌটোটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রঞ্জন বলে, "নাও তোমার সোনার গয়না। পুলিসে ধরিয়ে দেয়নি সেকরা নেহাত বরাতের জোরে।"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শোভা। কৌটোটা প'ড়ে আছে তার পায়ের কাছেই মেজেতে, সেটা কুড়িয়ে নেবারও চেষ্টা দেখা যায় না তার।

রঞ্জন বলে, "ভেবেছিলাম, মামিমা'র বারণ শুনব না—তোমায় নিয়ে যাব গৌরীর বিয়েতে। তাই গয়নাগুলো নিয়েছিলাম পালিশ করিয়ে আনব ব'লে। সেকরার হাতে গিয়েই তোমার বাপের জোচ্চুরি-মন্ত্রের বলে সব সোনা পেতল হয়ে গেছে।"

কালো হয়ে যায় শোভার মুখ বেদনার ছায়ায়। মৃদুস্বরে সে বলে, "আমাকে বললেই হ'ত।"

"তা হ'ত। তা হ'লে আর সেকরার কাছে আমাকে জোচ্চোর ব'নতে হ'ত না।" রঞ্জন বলে, "ভেবেছিলাম, বাপের দেওয়া গয়না, পালিশে দিলে ক্ষয়ে যাবে ব'লে দিতে চাইবে না তুমি। পোড়া কপালে একটু মজাও করব ভেবেছিলাম। খুব মজা হ'ল! খুবই মজা হ'ল!"

ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ রঞ্জনের কণ্ঠে যেন গুরুগুরু করে মেঘের চাপা গর্জন।

শোভা নতমুখে সেখান থেকে চলে যায়। উনুনের ওপর চাএর জল চাপিয়ে আবার ফিরে আসে ঘরে। কিন্তু রঞ্জন চ'লে গেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, হন্‌হন্‌ ক'রে চলে যাচ্ছে রঞ্জন। কী করবে শোভা? সে রাস্তায় ছুটে যেতে পারে না—একটা নাটকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করতে। ওই এক স্বভাব রঞ্জনের,—রাগ হ'লে, খানিক বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে তারপর দুম্‌দাম ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চ'লে যায়।

অনেক রাত পর্যন্তও ঘরে ফেরে না রঞ্জন। আজ আর ফিরবে না, বুঝতে পারে শোভা। নিশ্চয় মামাবাড়ি গেছে—মামিমা'র কাছে শ্বশুরের জোচ্চুরির নালিশ জানাতে! ছিছিছি!

কী আর করবে শোভা? পাশের বাড়ির বুড়ো-জ্যাঠাইমাকে ডেকে আনবে তার ঘরে শোবার জন্যে। রঞ্জন যখনই বাড়ি থাকে না রাত্রে—শোভা একলা থাকে, তখন পাশের বাড়ির ওই বৃদ্ধা মহিলাটি এসে শোন তাদের ঘরে। জ্যাঠাইমাকে বলবে শোভা যে, গৌরী-ঠাকুরঝির বিয়ে উপলক্ষে বিশেষ কাজে রঞ্জন গেছে মামাবাড়ি, আজ রাত্রে আর ফিরতে পারল না।

পরদিন সকালেও ফেরে না রঞ্জন। আপিস যাবার সময় পর্যন্ত দেখে শোভা, রান্নাও করে স্বামীর জন্যে, কিন্তু রঞ্জন আসে না। শোভা নিজে খেয়ে নেয়, তার পরে জ্যাঠাইমাকে বাড়িতে পাহারা রেখে, তাঁরই কিশোর ছেলেটিকে সংগে নিয়ে, বাপের বাড়ি চ'লে যায়, ব'লে যায়—সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে।

রঞ্জন রাগ ক'রে অবশ্য মামাবাড়িতেই গিয়ে উঠেছে, কিন্তু কেমিক্যাল সোনার কাহিনী ঘুণাক্ষরেও জানায় নি কাউকে। জানাবেই বা কোন্ সূত্রে? তা ছাড়া রাগটা ততক্ষণে খানিক

গয়নাগুলো নিয়ে এলাম, হাতে করে' দেখ—

আয়ত্তেও এসে গেছে বুঝি। সেখানে গিয়ে বলেছে, "আপিসের কাজে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল, মামিমা; এত খাটুনি গেছে যে, বাড়ি যাওয়া আজ আর পোষাচ্ছে না।"

খাটুনি যে খুবই গেছে তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছেন মামিমা।

পরদিন সেখান থেকে সকাল-সকালই খেয়ে বেরোয় রঞ্জন, কিন্তু আপিসে যায় না। সারাদিন ঘোরে ব্যাংকে ব্যাংকে। কিন্তু কোন ব্যাংকই এখন আর বাড়ি-জমি বন্ধক রাখার ঝুঁকি নিতে চায় না। একটা ব্যাংক যদি বা রাজি হয়, সুদ চড়া তো বটেই, তার ওপর সেখানে দরখাস্তের ফর্মের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে, তারপর দরখাস্ত পেশ করতে হবে সেই ফর্মে লিখে, তারপর সম্পত্তি সম্বন্ধে তদন্ত হবে, সেই তদন্তের ফল দাখিল করা হবে কর্মপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে, তারপর......অর্থাৎ, 'যাবৎ বিবি লায়েকমান তাবৎ মিয়া গোরস্থান!'

ক্লান্ত নিরাশ দেহেমনে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরে রঞ্জন।

শোভা তার আগেই ফিরে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। সে সামনে আসে না রঞ্জনের, আড়াল থেকে বলে, "জল দিয়েছি চানের ঘরে' তাড়াতাড়ি এসো, চাএর জল চাপিয়ে দিয়েছি কিন্তু।"

শোভার কণ্ঠস্বরে তো কোন আড়ষ্টতা নেই! বরং যেন চঞ্চল হাসিখুশি ভাব। রঞ্জন রাগ করে বেরিয়ে যাবার পর বাড়ি ফিরে এলে এমনটা তো কখনও দেখা যায় না।

ঝিম মেরে ব'সে থাকে রঞ্জন। অগত্যা শোভাকে ঘরে আসতে হয় আলো জেলে নিয়ে। তার দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় রঞ্জন। শোভার সর্বাঙ্গে নতুন সোনার গয়না—হাতে চুড়ি, চুড়, আর্মলেট, কানে কানবালা, গলায় চওড়া হার, আঙুলে আংটি! কোন গয়নাই খেলো নয়, হালকা নয়; সব মিলে সাড়ে এগারো ভরির চেয়ে ঢের বেশিই হবে যেন ওজন। গয়নাগুলোর ওপর আলো ঠিকরে পড়ছে। পরেছেও শোভা রঞ্জনের মনের মত একখানা শাড়ি। মুখে তার উচ্ছ্বসিত উজ্জ্বলতা। সব মিলিয়ে ঝলমল করছে শোভা।

রঞ্জনের চোখের আর পলক পড়ে না। চুড়-চুড়ি-আংটি সমেত ডানহাতখানা স্বামীর সামনে তুলে ধ'রে শোভা বলে, "সেকরা ডেকে কষিয়ে-ঘষিয়ে দেখবে নাকি—কেমিক্যাল সোনা কিনা?"

না কষিয়ে না ঘষিয়েই বোঝা যাচ্ছে, খাঁটি গিনি সোনা সবই। কিন্তু কালকের গয়না যে এগুলো নয়, সেটা যেমন পরিষ্কার, কালকের গয়না সবই ছিল কেমিক্যাল সোনার, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কী রহস্য এর মধ্যে? নারী নিজেও যেমন রহস্য, তেমনি রহস্য-সৃষ্টিতেও তার জুড়ি নেই।

রঞ্জন শুধু বলতে পারে, "কী ব্যাপার!"

"বলব কেন?" শোভা বলে, "আগে লক্ষ্মীটির মত চান্ ক'রে এস, চা-খাবার খাও, তার পরে, অনুগ্রহ হ'লে, হয়তো বললেও বলতে পারি। তবে, জোচ্চুরি নেই এর মধ্যে কিছুই—আমারও না, আমার বাবারও না। এ তুমি আগে থেকেই বিশ্বাস করতে পার।"

সংকোচে এতটুকু হয়ে যায় রঞ্জন। ছিছিছি, বড় জঘন্য কথা ব'লে ফেলেছে সে কাল। রাগ বড় পাজি, বড় চণ্ডাল।

তাড়াতাড়ি সে স্নানের ঘরে চ'লে যায়। স্নান সেরে ফিরতেও দেরি হয় না।

জলখাবারও করেছে শোভা আজ রঞ্জনের পছন্দ-মাফিক।

কাছে এসে দাঁড়ায় শোভা, বলে, "আচ্ছা, তোমার সংগে যখন আমার বিয়ের কথা হচ্ছিল, তখন তোমার মত সুপাত্রকে যে বাবা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান নি, সেটা কি তাঁর ভুল হয়েছিল?"

রঞ্জন বলে, "ভূমিকা তো বড়ই জাঁদরেল!"

শোভা বলে, "অবিশ্যি, বাবা তখন জানতেন না যে, কোন ব্যাপারের আগাগোড়া কিছুই তলিয়ে না দেখে তুমি একজন ভদ্রলোককে জোচ্চোর বলতে পার।"

"সে যে রাগের মাথায় বলেছি, শোভা।" কাতরভাবে রঞ্জন বলে, "কেন তুমি বারবার ও-কথা তুলে খোঁচা দিচ্ছ আমাকে!"

শোভার মুখের কোণে দুষ্টু হাসি। বলে, "মানুষের মাথা রাগের মাথা হবে কেন? অবিশ্যি বাবা এখনও জানেন না এ সুকথা। যাক্ সে। তখন তোমার মত সুপাত্রও হাতছাড়া করতে পারেন না বাবা, আবার গয়না না হ'লেও তোমার মামিমা তোমার বিয়ে দেবেন না কিছুতেই। বাবার তখন চারদিক থেকে একগলা ধার। তার ওপর আরো ধার ক'রে তিনি আমার বিয়ে দিচ্ছেন—দেরি হ'লে তুমি হাতছাড়া হয়ে যাবে ব'লে। তোমাকে দিতে হবে ঘড়ি-আংটি-বোতাম—খেলো হ'লে চলবে না, যেহেতু নগদ টাকা নিচ্ছ না তুমি। তার ওপর আর কোথাও ধার পাচ্ছিলেন না বাবা।"

রঞ্জন বলে, "আমি তো ঘড়ি-বোতাম চাই নি।"

"না চাইলেও ওসব দিতে হয় আজকাল বরকে।" শোভা বলে, "আংটির মতই ওসব জিনিসও আজকাল না-দিলে-নয় হয়ে পড়েছে। যাক্। এদিকে বাড়ি বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাও করবেন না কিছুতেই তোমার মামিমা। অগত্যা বাবা গয়না দিয়েই আমার বিয়ে দিলেন। সে সব গয়না এল কোত্থেকে জান? বড়দির চুড়ি, বউদির চুড়, ছোটমাসিমা'র হার, নপিসিমা'র আর্মলেট, মামাতো বোন বিজুর কানপাশা আর কাকিমা'র আংটি নিয়ে, বাবা আগাগোড়া সে সব পালিশ করিয়ে আনলেন—যেন না ক্ষয়ে যায় আর নতুনও দেখায়।"

ঠিক। রঞ্জনও তাই ভেবেছে!

শোভা বলে, "সেই গয়নাই এখানে সেকরা দিয়ে যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন মামিমা। বিয়ের পরে দ্বিরাগমন দশরাত্র সব কেটে যাবার পর যখন মাসখানেকের জন্যে বাপের বাড়ি গেলাম, সেই সময় বাবা ঠিকঠিক সেই সব গয়নার মত ক'রে কেমিক্যাল সোনার গয়না গড়িয়ে দিলেন। তোমাদের কাছে মুখরক্ষার জন্যে কতকগুলো টাকা নেহাতই জলে গেল আরকি। তা, গরিবের অমন যায়। কেমিক্যাল সোনার গয়না দিলেন—একবার যখন যাচাই হয়ে গেছে, আর তো কেউ যাচাই করবে না। আত্মীয়দের যার-যার গয়না তাকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল।"

রঞ্জনও তো এ পর্যন্ত ঠিকঠিক এ রকমই ভেবেছে; তারপর বেঠিক হয়ে দাঁড়াল কোন্ জায়গা থেকে?

শোভা বলে, "বাবার বাড়ি বিক্রি হ'তে ক'মাস দেরিই হ'ল। টাকা হাতে এলে, ধারদেনা শোধ করতে আরো কিছুদিন লাগল। নতুন জমিটার খোঁজ পাওয়া গেছে তার আগেই, সেটা কিনতেও লেখাপড়ায় নানান হ্যাংগামে আরো কিছুদিন গেল। এই সব ক'রে-কুলিয়ে, আমার গয়না করাতে দেরিই হয়ে গেল বেশ। তখন এখানে আমাদের এ বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাবা বললেন, 'তোর বাড়ি উঠুক, তার পরে গয়না বাড়ি নিয়ে যাস।' মা'র কাছে রইল আমার নতুন গয়না। আমি এদিকে কেমিক্যাল দিয়েই কাজ চালাতে লাগলাম। কত সাবধানে পরতাম সেগুলো—পাছে কোথাও ধরা প'ড়ে যাই। সবচেয়ে ভয় ছিল মামিমাকে।"

রঞ্জন প্রশ্ন করে, "আর, আমাকে?"

"সত্যি বলতে কী", শোভা বলে, "তোমাকেও কেমন যেন ভয় ছিল, তাই কোথাও বেড়াতে গেলে, বাড়ি ফিরেই চট্‌পট গয়না খুলে রাখতাম।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের বাড়ি হয়ে যাবার পরও গয়না নিয়ে এলে না কেন? জানালায় পাল্লা বসে নি ব'লে?"

"ঠিক তাই।" শোভা বলে, "আমিই ইচ্ছে ক'রে আনি নি গয়না। পেছনের জানালা-গুলোতে পাল্লা নেই, উঠোনের দুদিককার পাঁচিল ওঠেনি এখনও—যদি চুরি হয়ে যায় গয়না!"

নিজের কাছে নিজেই এতটুকু হয়ে যায় রঞ্জন। পিট্‌পিট ক'রে তাকায় সে শোভার দিকে।

শোভা একমুখ হেসে বলে, "আমি কি ছাই জানতাম যে, ঘরের লোকেই চুরি ক'রে শেষটা আমায় ধরবে জোচ্চোর ব'লে?"

অনুশোচনায় মনের মধ্যে ছট্‌ফট করে রঞ্জন।

শোভা বলে, "ঘরেই যার চোরের আস্তানা, তার আর চোরের ভয় করা মিছে। তাই আজ গিয়ে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম সব গয়না—যা হবার হোক।"

বড় বড় চোখে তাকায় রঞ্জন : কথাটা কী অর্থে বলছে শোভা! হঠাৎ যেন এ প্রশ্নটাই তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়, "তুমি একা গিয়েছিলে বাপের বাড়ি?"

"না গো, না, জ্যাঠাইমার ছোট ছেলেকে সংগে নিয়ে গিয়েছিলাম।" শোভা বলে, "তিন মাসের কালে বেরোলে কিছু হয় না। তুমি যেন মামিমাকে বোলো না।"

রঞ্জন বলে, "নতুন গয়নার কথাটা আমায় জানালে কী হ'ত? বাড়িতে না হয় না-ই আনতে।"

শোভা বলে, "নতুন গয়নার কথা জানালেই তো বলতে হবে যে, বাড়ির এ অবস্থা ব'লে সেগুলো বাড়িতে নিয়ে আসছি না। এমনিতেই বাড়ির কাজ বাকি রয়ে গেছে ব'লে তোমার মনে কত দুঃখ! যাক্‌গে। গয়নাগুলো নিয়ে এলাম—হাতে ক'রে দেখ।"

ব'লে সে দু হাতের চুড় আর চুড়ি খুলে রাখে রঞ্জনের সামনে, খুলে রাখে হার, কানবালা, আর্মলেট, আংটি—সব জড়ো ক'রে রাখে স্বামীর সামনে টেবিলের ওপর।

দেখে রঞ্জন হাতে তুলে নিয়ে নিয়ে, সাড়ে এগারো ভরির চেয়ে ঢের বেশিই হবে ওজন।

আবদার ধরে শোভা, "হ্যাঁ গো, আমি কিন্তু গৌরী-ঠাকুরঝির বিয়েতে যাবই। মামিমা কিছু বলেন তো দিদিমা আর ঠাকুরঝি আমার হাতে আছে।"

ফ্যাল্‌ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে রঞ্জন তার দিকে, খানিক পরে গভীর কণ্ঠে বলে, "গৌরীর বিয়ে এখানে হবে না, শোভা।"

"কেন? পাত্র নাকি খুব ভাল, ঘরও খুব......"

"খুবই ভাল।" রঞ্জন বলে, "কিন্তু মামিমা'র পাপের ফল খণ্ডাবে কে? দশ ভরি সোনার গয়না না হ'লে এখানে ছেলের বিয়ে দেবেন না ছেলের মা।"

সেই দশ ভরি! একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে শোভার। খানিকক্ষণ সে নীরবে চেয়ে থাকে স্বামীর বিষণ্ণ মুখের দিকে, খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে গয়নাগুলোর দিকে, তার পরে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে, "এই গয়নাই তুমি নিয়ে যাও—এদিয়েই বিয়ে দাও গৌরী-ঠাকুরঝির। আমার গয়না মাপে তারও ঠিকই হবে; আমার চেয়ে তো আর মোটা নয় ঠাকুরঝি, রোগাও নয়।"

যেন রোগা-মোটার সমস্যাটাই আসল কথা। রঞ্জনের মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। কথা যখন ফোটে তখন বলে, "কিন্তু, তোমার বাবা—"

শোভা বলে, "তাঁদের বললেই হবে যে, বাড়িতে রাখতে ভয় ব'লে গয়নাগুলো ব্যাংকে রাখা হয়েছে।"

করুণ হেসে রঞ্জন বলে, "কিন্তু ব্যাংক থেকে গয়না ছাড়ানো যাবে কী ক'রে?"

"সে তো ঢের পরের কথা।" শোভা বলে, "আগে তো বাড়ি তৈরি হোক গয়না রাখার মত ক'রে। তার পরে গয়না এক-এক ক'রে ছাড়ালেই চলবে।"

কৌতুকহাস্যে ঝলমল করে শোভার মুখ। রঞ্জনের দিকে চেয়ে হাসে গয়নাগুলো।

ভাগ্যকে আজ ধন্যবাদ দেয় ভিখু। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মুনিষ খেটে অনেকদিন পর আজ সে বেশ কিছু পয়সা পেয়েছে।

চাষের সময় পরের জমিতে লাঙল চষে রোজই কিছু না কিছু রুজি-রোজগার হয়ে থাকে। কিন্তু এই অকালে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। মুনিষের কাজ কোন কোন দিন হয়তো পাওয়া যায়, অনেক দিন একেবারেই পাওয়া যায় না। সংসার অধিকাংশ দিন অচল, উনুন ধরাবারও উপায় থাকে না। ভিখু তাই বাইরে থেকে ভুলে থাকতে চায় তার ঘরের দুঃখ। অনেক সময় আবার ভাবে, আমরা কোনাই—আমাদের মতো বাউরী, লেট, বাগ্দী এবং সাঁওতালরা যারা ছোটই আছি, লেখা পড়া শিখিনি—আমরাও তো মানুষ, তাহলে মানুষের মতো চারটি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ আমাদেরই বা হবে না কেন? কিন্তু সে শুধু ভাবাই!

আজ প্রাপ্তিযোগটা একটু বেশি হওয়ায় ভিখুর আনন্দ আর ধরে না। খরচের হিসেবটাও সে করে ফেলে মনে মনে। বউ-এর জন্যে আর খোকার জন্যে ক্ষুদিরাম ঘোষের মিষ্টির দোকান থেকে দুটো 'রোজেট' নিয়ে যেতেই হবে। সারাদিনের শ্রম বা ব্যর্থতার অবসাদ নিয়ে সে যখন অনেক রাত্রিতে ঘরে ফেরে তখন তার অর্ধাশন-ক্লিষ্ট বউ-এর আদর, তার তিন বছরের খোকার ঘুমন্ত চোখের গভীর ভালবাসার বিনিময়ে সে তো তাদের কিছুই দিতে পারেনি। চেষ্টা সে করেছে, কিন্তু ঘরকে খুশি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার বার বার চুরমার হয়ে গেছে। তবু সামান্য সাফল্যে অসীম পরিতৃপ্তি লাভ করেছে সে মাঝে মাঝে। সে সব সাফল্যের দিনগুলোর কথাই আজ আবার তার মনে পড়ে যায়। আজ যখন সে বিখ্যাত মিষ্টি 'রোজেট' তার ট্যাঁক থেকে টাকা খুলে বউ-এর হাতে দেবে তখন বৌ তার কী খুশিই না হবে! নিশ্চয়ই আগের সব দিনের চেয়ে বেশি খুশি হবে সে। এই ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ভিখু।

অভ্যাসবশে ভিখু কিন্তু পচাইখানার দিকে পা না বাড়িয়ে পারে না। বাঃ রে, সারাদিন ধরে এতো খেটেখুটে সে একটু স্ফূর্তিও করবে না! একাই এক হাঁড়ি তাড়ি কিনে নিয়ে সে বসে পড়ে পচাই-এর আড্ডায়। বেশ জলুষ করে চোকে ঢেকে সে গিলে সেই তাড়ি, হাঁড়িতে চাটি মেরে বাজনা বাজায়, আধা অস্পষ্ট স্বরে অশ্লীল গানেরও দু' একটা কলি গাইতে সুরু করে দেয় মাঝে মাঝে। আবার থেমে যায়। যতো সময় যায় ততোই বেহুঁস হয়ে প্রচুর পরিমাণে পচাই গিলতে থাকে ভিখু। হাঁড়িটা নিঃশেষ হয়ে গেলে তবে নিশ্চিন্ত।

কানের পিঠ থেকে আধ পোড়া একটা বিড়ি বার করে পাশের পান-বিড়ির দোকানের গায়ে লটকানো অগ্নিমুখী দড়ি থেকে আগুন ধরিয়ে টানতে টানতে এগিয়ে চলে ভিখু। চলার তাল ঠিক থাকে না তার। চলতে চলতে দুই হাঁটুতে ঠোকর লেগে যায়, টলতে টলতে পড়ে যাবার উপক্রম হয় এক একবার। তবু সে চলে, ঠিক পথেই এগিয়ে চলে সে তার অভ্যাসমত ছুটো-পাট্টির দিকে।

বিপরীতমুখী হলেও খ্যাতির দিক থেকে রামপুরহাটের 'রোজেটে'র চেয়ে কম নাম ডাক নয় এ ছুটোপাট্টির। কলকাতার সোনাগাছি বা রামবাগানের সঙ্গে অনায়াসেই এর তুলনা চলে। আর সত্যি কথা বলতে কি, এতো পচাই আর দেশী মদের দোকান এবং এ পাট্টির অপূর্ব পরিবেশে যে নরক-গুলজার জমে এখানে তার জুরি মেলা ভার। এ অঞ্চলের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ তো বটেই, প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত ভিখুর অতি পরিচিত। ছুটোপাট্টির মাটিতে পা পড়তেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

আজো আগের মতোই শিহরণ জাগে ভিখুর এ পাড়ায় ঢুকে। মাটির ঘরের দোরে দোরে সুন্দরীরা সব সেজেগুজে কেউ বসে বা কেউ দাঁড়িয়ে। দূর থেকে ময়নাকে চোখে পড়ে ভিখুর। যেমন একটা মোচড় লাগে তার বুকের মধ্যে। খালি বুকটা একবার হাতড়িয়ে ট্যাঁকে গোজা পাঁচসিকে পয়সা হাতে অনুভব করে নেয়, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিখু।

যাবে আজ ময়নার ঘরে? টাকাটা বেশ জোর আছে, অনেক রাত পর্যন্ত স্ফূর্তি করা যাবে। খুশিতে ঝলমল করে ওঠে ভিখুর মুখ। পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় বৌ-এর বিষণ্ণ-মলিন চেহারা, বেটার টলমলে চোখের চাউনি। সে না 'রোজেট' নিয়ে যাবে আজ ওদের জন্যে! টাকা নেওয়াও তো দরকার। ছেলেটা বেশ ভুগছে আজ কদিন ধরে।

পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়ায় ভিখু। ময়নার কথা মন থেকে যে সরাতে পারে না সে। সেই ময়না। পড়ন্ত শীতে সিউড়ী শহরে বড়-বাগানের মেলায় বছর তিনেক আগে প্রথম সে দেখেছিল তাকে তার মাসির সঙ্গে। বয়স তখন

ময়নার বছর চৌদ্দ। সেই সময়ই ভাব করতে ইচ্ছে হয়েছিল ভিখুর ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন সে মোটেই পাত্তা পায়নি সেখানে। বড় খদ্দেরের আশায় মাসি ওর রূপসমুদ্রে ঢেউ গুনেছিল। গুনুক! ক্ষুদ ছড়ালে কাকের

অভাব? বীরভূমের মেলায় মেলায় কতো সুন্দরীই তো বসে তাদের দেহের পসরা সাজিয়ে। ময়নাকে না পেলেও কম পয়সায় মনের সখ মেটাতে সেদিন ভিখুর কোনই বেগ পেতে হয়নি। তবু এ মেয়েটার ছবি যেন তার মনে গেঁথেই রয়ে গিয়েছিল। প্রায় বছরখানেক পর এ মেয়েটারই সংগে আবার তার দেখা হয়েছিল শ্যামচাঁদের মেলায়। শ্যামচাঁদের মেলা বছরে বছরে জায়গা বদলায়। সেবারের মেলায় অভিভাবকত্বের কোন বালাই ছিল না ময়নার। মাসির মৃত্যুর পর থেকে সে চালিয়ে আসছে তার স্বাধীন ব্যবসা। পসার ভালই জমিয়েছে। ব্যবসার খুঁটিনাটি সে বেশ ভাল করেই শিখে নিয়েছে মাসির কাছ থেকে।

সেবার মেয়েটাকে শ্যামচাঁদের মেলায় একা পেলেও, ভিখু কিন্তু খালি হাতে তার কাছে যেতে ভরসা পায়নি। ভারি চমৎকার একটা পুতুল কিনে নিয়েছিল সে সংগে। খুবই খুশি হয়েছিল ময়না সেই মাটির পুতুল পেয়ে। আদর করে তার ঘরে নিয়ে বসিয়েছিল সে ভিখুকে। সেই থেকেই কেমন যেন একটা রং ধরে গেছে ভিখুর মনে। সময়ে অসময়ে তার দেখতে ইচ্ছে হয় ময়নাকে, এখন তো তার কাছে যেয়ে দু' এক ঘণ্টা রোজ কাটিয়ে না এলে প্রাণটাই আনচান করতে থাকে।

রোজ পাওয়ার জন্যেই তো ময়নাকে এনে রামপুরহাট বাজারের ছুটোপট্টিতে জায়গা করে দিয়েছে ভিখু। আগের বছর কার্তিক মাসের তারাপীঠের মেলায় রাজি করানো যায়নি তাকে রামপুরহাটে ঘর বাঁধতে। তারপর বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলায় ভিখু অনেক করে, অনেক ভাল ভাল খদ্দেরের লোভ দেখিয়ে তবে না তার মত পেয়েছে!

ছুটোপট্টিতে যে নতুন মাটির ঘর তুলে নিয়েছে ময়না পুরো এক বছরও তার হয়নি। দেবতার দৃষ্টি আছে তার ওপর। দেবতাদের ফটো দিয়ে সে সাজিয়েছে তার ঘর। বাইরে সামনের দুই মাটির দেয়ালে লোক-শিল্পের অপূর্ব স্বাক্ষর! একদিকে ময়ূরপৃষ্ঠে ধনুর্বাণধারী দেব-সেনাপতি কুমার কার্তিকেয় এবং অপরদিকে গোপিনী-বস্ত্রহরণে উল্লসিত বৃক্ষোপরি বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ পথিকদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এরই মধ্যে নতুন জায়গায় এসেও ময়নার পসার বেশ জমেছে। ঠাকুর দেবতার ওপর তাই তার বিশ্বাসও খুব বেশি। এদিকে সপ্তদশ বসন্তের ঢেউ যে খেলে চলেছে তার দেহ-সমুদ্রের ওপর দিয়ে সে খেয়াল তো আর তার নেই! ভিখু কিন্তু তার কথা রেখেছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকেও সে খদ্দের করে দিয়েছে ময়নার। এ জন্যেই তো রূপোপজীবিনীদের মধ্যে একটা আলাদা প্রেস্টিজ দাঁড়িয়ে গেছে তার এরই মধ্যে। ভিখুর একটু বিশেষ খাতিরও তাই তার কাছে।

এতো খাতির সত্ত্বেও আজ কেন জানি ভিখু নিজের ভিতর থেকেই একটা বাধা পায় এগিয়ে যেতে। আধমরা ছেলেটার ডাগর ডাগর চোখ দুটোই বার বার ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। আজ তো সারা দিনে উনুনও ধরেনি। একেবারেই খাঁ-খাঁ করছে ঘর। বৌ সকাল বেলা কতক্ষণ ধরে ডাক-চিৎকার করছিল। ভিখু তাই শুনতে শুনতে সেই যে বেরিয়ে এসেছে আর কোন খবরই রাখে না। আর খবর রেখেই বা কি হবে? এ তো আর একদিনের সমস্যা নয়, বছরের পর বছরের। সারা বছর খেটেও ছ' মাসের খোরাক পুরো জোটে না। টাকা-পাঁচসিকে বাড়ি দিয়ে গেলে তা' দিয়ে হয়তো সেরটেক চাল জোগাড় করা যাবে। কিন্তু তাতে লাভ? সে চালের ভাত কী করেই বা তারা খাবে? যে চালের গুঁড়োর অভাবে কাঁকড়-গুঁড়ো মিশানো গম-গোলা খাইয়ে ছেলেটাকে তারা মেরে ফেলতে বসেছে, সে চালের ভাত যাবে তাদের পেটে! তার চেয়ে স্ফূর্তি করে যা আছে তার সবটা খরচ করে ফেলাই ভাল।

নেশার ঘোরে এমনি ধারা ভাবতে ভাবতে ঝক্ ঝকে নয়া মাটির ঘরটার দিকে এক পা এগিয়ে যায় ভিখু, আর পরক্ষণেই দু' পা পিছিয়ে আসে। হঠাৎ বারান্দায় টাঙানো খাঁচার ভিতর থেকে টিয়াটা 'জয় রাধে-কৃষ্ণ' বলে ডেকে ওঠে আর ময়নার চোখ পড়ে যায় ভিখুর ওপর, সে অবাক্ হয়ে যায় তার কান্ড দেখে।

ঃ বুলি, মিনসের ঢং দ্যাখো না!

ঃ হবে না ক্যানে, উতো তুমার রসের লাগর। ঝ্যাটা মার পোড়ারমুখোকে! —ময়নার কথার জবাবে পাশের ঘরের রূপসী বাঁদিকে স্তূপীকৃত ছাইপাশের ওপর পচ্ করে একগাল পানের পিক্ ফেলে ঈর্ষার আগুন ছড়ায় এই বলে। ভিখুর ওপর ওদের রাগের অন্ত নেই। ময়নাকে যে সে মনের মতো খদ্দের জুটিয়ে দেয়!

ভিখুর কানেও গিয়ে পৌঁছে ময়না এবং তার প্রতিবেশিনীর কথা। কিন্তু সে আর আজ দাঁড়াতে পারে না সেখানে। তার যেন মনে হয়, তার বেটার হাত-পা-দেহটা সবই মরে গেছে, শুধু চোখ দুটো এখনো বেঁচে আছে। সেই টলটলে চোখ দুটো দেখার জন্যেই সে ছুটে যায় বাড়ির দিকে।

মোড় ফিরেই তমালগাছের তলায় বাবাজীদের আখড়া। গুড়ের চা-এর গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে বাতাসে। ঐতো নাকের রসকলি দুলিয়ে বৈষ্ণবী অভ্যর্থনা করছে এক বাবুকে চায়ের বাটী এগিয়ে দিয়ে। বাবাজীর গুপীযন্ত্রে সুরে হয়ে যায় 'গুপ্ গুপা গুপ্—গুপাং গুপাং' আর বৈষ্ণবী ধরে একতারা। মিলিত কণ্ঠে বীরভূমের বাউল আর চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তন শুনে মোহিত হয়ে যান আগন্তুক। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না তখনো যে, কতো দক্ষিণান্ত হয়ে তাঁকে ছাড়া পেতে হবে আখড়া থেকে।

পথ চলতে চলতে লণ্ঠনের আলোয় ভিখুর চোখে পড়ে বৈষ্ণবীর হাসিখুশি মুখ আর ঐ নবাগত মুগ্ধ বাবুকে, গুপীযন্ত্রের ধ্বনিও তার কানে ভেসে আসে বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে। কিন্তু আজ আর সে থামে না, ফিরেও তাকায় না আর একবার। নেশা খানিকটা কেটে এসেছে এতক্ষণে। নিজের ঘরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়ায় ভিখু। বৌ কাঁদছে? ভিখু মাটির ঘরের জানালার ধারে কান পেতে থাকে খানিক্ষণ। না, ও তার মনের স্বপ্ন! সেদিন সে যে অন্যায় করেছে, সেই থেকে, বৌ আর একটিও কথা বলেনি তার সংগে। ছেলেটা যদি ভাল থেকে থাকে তা' হলে এই টাকা পেলেই বৌ হয়তো অনেকটা খুশি হয়ে যাবে। গোটা দুয়েক রোজেট নিয়ে এলে আরো ভাল হতো। যাঃ রোজেটের কথা একেবারেই ভুল হয়ে গেছে তার।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকেই ট্যাঁক থেকে খুলে একটা রূপোর টাকা আর দুটো দু' আনি হাসিমুখেই ঝণাৎ করে ফেলে সে বৌ-এর পায়ের কাছে। পাশেই তিন বছরের ছেলেটা তখন ধুকছে।

ঃ আমার ট্যাকা চাই না। আমার বাসন লিয়ে এসো। ছেলেটো বেহুঁস, ঘরে নাই কানা কড়ি। চিকিচ্ছা করাবার লেগেই তো থালাটো ঘটিটো বন্দক দিতে দিনু সেদিন। সেই বন্দকের ট্যাকা, ছেলের চিকিচ্ছের ট্যাকা তুমি নিশ্চিন্দি শুঁড়িকে দিয়ে এলে? আর চোখের সামনে ছেলেটা আজ মরছে। তুমি না বাপ!

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাপ! বাপতো হইছে কি? বড় ত্যালান ত্যালাইছিস,। বুলছি এখন খিটকেল করিস নি, মার খেয়ে মরবি।—বৌ-এর কথায় পৌরুষে আঘাত লাগে ভিখুর, সে তার জবাবে গর্জে ওঠে এই বলে।

ঃ মার না দেখি মিনসে! বলে ভাত দেবার ভাতার লয়, কীল মারবার গোঁসাই!—বৌও সহজে চুপ করে যাবার পাত্র নয়। না খেয়ে খেয়ে, দুঃখে ব্যথায় খিট্‌খিটে হয়ে গেছে তার মেজাজ। সেও রুখে দাঁড়ায়।

ঃ তবে রে হারামজাদি!—পচাইয়ের রং চড়ে যায় মুহূর্তের উত্তেজনায়। মত্ত ভিখু পাশ থেকে একটা চালা কাঠ তুলে নিয়ে বৌকে দমাদ্দম দু'ঘা মেরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ভিখু আর ঘরে ফেরে না সে রাত্রিতে। পরদিন সকাল বেলা এসে দেখে ছেলেটা ঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে সেই চ্যাড়া কাথাটার ওপর আর ঐ পাঁচসিকের পয়সা তেমনি ছড়ানো রয়েছে এক পাশে। অদূরে বটগাছের ডালে গলায় কাপড় লাগিয়ে ঝুলছে বৌ। কপালে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এসবই ভিখুর চোখে পড়ে, কিন্তু কোন কিছুর দিকেই সে আর দ্বিতীয়বার তাকাতে পারে না।

ঘর থেকে পয়সাগুলো কোন রকমে কুড়িয়ে নিয়ে পচাইখানার দিকেই ভিখু আবার ছুটে যায়। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কেমন যেন একটা ঘরের আকর্ষণ অনুভব করে সে। সুখী সচ্ছল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন জাগে তার মনে।

ভিখু থমকে দাঁড়ায় পথের মাঝখানে।

স্কেচ ভবানী দত্ত

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিয়ে সুধা সেই থেকে বসে আছে গুম্ হয়ে। পাশে ছেলে ঘুমুচ্ছে। এক একবার ঝিমুনি আসছে তারও। মনের আক্রোশে সোজা হয়ে বসছে আবার। সে একটু ঘুমকাতুরে বলেই লোকটা এমন সুবিধে পেয়ে বসেছে। সকাল ন' টায় ভাত দেবার তাড়ায় রাগ করবার অবকাশ থাকে না। তারপর সেই আপিস-ফেরা মূর্তি দেখে রাগ করা দূরে থাক, জলখাবারের থালা সামনে এনে না ধরা পর্যন্ত নিজেরই কিছু ভালো লাগে না। বাস, খেয়ে দেয়ে দু' পাঁচ মিনিট ছেলে নিয়ে হৈ চৈ করে বাবু বেড়াতে বেরুলেন। তাতেও সুধা আপত্তি করে না। দমবন্ধ ঘরের থেকে গায়ে একটু বাইরের বাতাস লাগানো ভালো। ফিরবে সেই দশটায়। কিন্তু আড্ডার নেশাটা ক্রমেই যেন বাড়ছে। খেয়ে দেয়ে এর পরেও আজকাল আবার তার পার্কে একবার টহল দিতে বেরুনো চাই। অর্থাৎ ইয়ার-বন্ধুদের বেশী রাতের বৈঠক বসে আবারও। কত রাতে ফেরে ঘুমের চোখে সুধার ঠিক খেয়াল থাকে না। কিন্তু অনুমান করতে পারে। ন' টায় আপিসের ভাত রেডি হবে, অথচ সাড়ে আটটায় মানুষটাকে বিছানা থেকে ঠেলে তোলা যায় না।

অনেকদিন থেকেই রাগটা জমছে। তার ওপর আজ যে জন্যেই হোক নিজের মুখে সে বেরুতে বারণ করেছে তাকে। এক আধবার নয়, অনেক-বার। বলল কি না, একটা পান খেয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুরে আসছে। ঘরে আর ঘড়ি নেই যে দেখবে দশ মিনিটের বদলে ক'ঘণ্টা কাটল।

নীচের দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হল একটা। বাবু ফিরলেন। তারপর সিঁড়িতে মৃদু পদধ্বনি। শেষে দরজার গায়ে টোকা পড়ল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে—।

সুধা ধীরে সুস্থে শয়ন করল এবার। দরজার গায়ে শব্দটা বাড়ছে একটু একটু করে। কিন্তু কত আর বাড়বে। নীচে মায়ের ঘুম ভেঙে যাবার ভয় আছে। ফিস্ ফিস্ ডাক শোনা গেল, এই দরজা খোলো না, এই—দরজাটা খোলো একটু—আচ্ছা ঘুম তো—খোলো না দরজাটা!

বৃথা চেষ্টা। দশ পনের মিনিট কেটে গেল। সুকুমার ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ধৈর্য জিনিষটা তারও কম। হঠাৎ জোরেই ধাক্কা দিল একবার, দরজাটা খুলবে, না কি—!

দরজা খুলল। অস্ফুট বিরক্ত কণ্ঠে সুকুমার বলে উঠল, কি যে ঘুমোও মরার মত, এক ঘণ্টা ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছি।

সাড়াশব্দ নেই। অন্য দিনও থাকে না। রিস্ট-ওয়াচ খুলে দেয়ালের তাকে রাখল। যেমন রাখে। অন্ধকারেই জামাটা আলনায় ফেলে দরজা বন্ধ করে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল সুকুমার। সুধা শয্যাপ্রান্তে বসে। এবারে প্রশ্ন করল, কটা বেজেছে?

কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভারী লাগল কানে। সুকুমার জবাব দিল, এই সাড়ে এগারটা হবে। তুমি...মানে ঘুমোওনি?

উঠে খটাস করে সুইচটা টিপে দিল সুধা। তাক থেকে হাত ঘড়ি নামিয়ে দেখল। একটা বেজে গেছে। প্রথম প্রথম ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়ে রাখত সুকুমার। কিন্তু ঘুমের চোখে সময় জিজ্ঞাসা করা ছাড়া স্ত্রীটি নিজে কখনো সময় দেখত না বলে সাবধান হওয়া ছেড়েছে। আজ এই থেকেই বিপর্যয় ঘটে গেল।

স্থির চোখে সুধা চেয়ে রইল তার দিকে। সুকুমার হকচকিয়ে গেল কেমন। পরক্ষণে ঠক্ করে একটা শব্দ হতে চমকে উঠে বসল সে। রাগের ঝোঁকে ঘড়ি রাখতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে কাঁচ গুঁড়িয়ে গেছে।

—ভাঙলে ঘড়িটা!

—বেশ করেছি, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিইনি ভাগ্যি।

জ্বলে উঠতে সময় লাগল না আর। জেগে থেকেও ইচ্ছে করেই পনের মিনিট ধরে দরজা খোলেনি এও আর বুঝতে বাকি রইল না। রাগের মাথায় ঘড়িটা মেজে থেকে সত্যিই জানালা দিয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল সুকুমার। সামলে নিল। ঘড়ি তাকের ওপর রেখে রণসাজে বিছনায় এসে বসল।

একটানে খাট থেকে একটা বালিশ দুম করে মাটিতে ফেলে আলো নিবিয়ে ভূমিশয্যা নিল সুধা।

এরপর আর সুনিদ্রা সম্ভব নয়। ফলে পরদিন সুকুমারের ঘুম ভাঙল যখন, জানালা দিয়ে রোদ এসে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সময় দেখল। দু' চোখ বিস্ফারিত। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। দপ করে মাথায় আগুন চড়ল। শনিবারের দু' তিন ঘণ্টার আপিসে কামাই হয়ে গেল। কত চেষ্টা করে এক একটা দিনের 'ক্যাসুয়াল লিভ্' জিইয়ে রাখতে হয়। বুঝল, স্ত্রী ডাকেনি তাই নয়, চাকরকেও ডাকতে দেয়নি। ছেলেটা ওপরেই দাপাদাপি করে রোজ, তাকেও ভুলিয়ে নীচে আটকে রাখা হয়েছে।

মুখ হাত ধুয়ে জামা টেনে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরল কিছুক্ষণ। রেস্তরাঁয় বসে এক পেয়ালা চা খেল। দোকানে গিয়ে ঘড়ির কাঁচ বদলে নিল তারপর। বাড়ী ফিরল বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ। মা খোঁজ নিলেন, কি রে আপিসে গেলিনে?

একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুকুমার ওপরে উঠে গেল। সেখানে খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে বসে আছে সুধা। অসময়ে বাবাকে দেখে ছেলে মাথা বাঁকিয়ে সানন্দে আপ্যায়ন করল, বাবা, আপি যেতে হয় না?

বাবা জবাব দিল এবার। ঠাস করে আচমকা এক চড় কষিয়ে দিল গালে।

ছেলে কান্না ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইল। হাত থেকে খবরের কাগজ পড়ে গেল সুধার। মনে হল চড়টা নিজের গালেই পড়েছে। উঠল। —ওকে মারলে যে?

যা-হোক একটা উপলক্ষ খুঁজছিল সুকুমার।

গর্জে উঠল, বেশ করেছি, একশ বার মারব, হাজার বার মারব—।

ও—। চোখের পলকে ছেলের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে সপাসপ পিটতে সুরু করে দিল সুধা। শিশুটি তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। সুকুমার আগলাতে চেষ্টা করল তাকে। অতঃপর ছেলে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলল কিছুক্ষণ। প্রাণান্তকর অবস্থা ছেলেটার। পিতা তাকে উদ্ধার করল সত্য। কিন্তু নিজের জামার অনেকটা অংশ সুধার হাতের মুঠিতে থেকে গেল ছেলেকে ধপ্ করে বিছানায় বসিয়ে দিয় সুকুমার জামার অবস্থাটা দেখে নিল একবার, পরক্ষণে কাছে এসে সুধার কাঁধের কাছ থেকে ব্লাউজের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে এলো সেও।

প্রলয় ঘটতে পারত; কিন্তু তার আগেই জপের মালা ফেলে পড়ি মরি করে রণ-রংগ-মঞ্চে আবির্ভূতা হলেন মাতৃদেবী। রসনার সম্মার্জনীতে খানিকক্ষণ ভূত ছাড়ালেন দুজনেরই। শেষে আদরের নাতিকে কোলে চাড়িয়ে নীচে নেমে গেলেন তিনি।

সুকুমার চৌকিতে বসল। সুধা মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। দুজনেই সমাধিস্থ। সময় কাটতে লাগল। স্তব্ধতা ভংগ করে সুকুমারই উঠে দাঁড়াল এক সময়। জামা বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আবার। অর্থাৎ এবেলার মত হাংগার স্ট্রাইক।

কিন্তু যাবে কোথায়। পার্কের ছাউনি-দেওয়া বেঞ্চি ভরসা। বেলা বাড়বার সংগে সংগে গা ঘুলোতে লাগল। তোয়াজের শরীরে উপোস সয় না। সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপর জ্বলতে লাগল বসে বসে।

উঠতে হল। শরীরটার জন্যে অন্ততঃ মুখে কিছু না দিলেই নয়। কিন্তু পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁয় অমন রুটি মাংস কম খেয়েই বা ওঠা যায় কি করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটভরে গেল। ফলে বিরক্তি বাড়ল চতুর্গুণ। বাড়ীতে ওদিকে উপোস দিচ্ছে জানা কথা। এখন ফেরাও চলে না। মুখের দিকে চাইলেই ও মেয়ে ঠিক বুঝে নেবে বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। হয়ত ও বেলাও উপোস করে মজা দেখাবে তখন।

বাড়ী ফেরার চিন্তা বাতিল করে দিল। কিন্তু এতবড় দুপুর কাটে কি করে। সিনেমা ভরসা। যে অপূর্ব ইংরেজী ছায়া-চিত্রটির আলোচনা শুনতে শুনতে গত রাত্রিতে দেরী হয়েছে বাড়ী ফিরতে, সেটা দেখাই সাব্যস্ত করল। কিন্তু ছবি দেখে মন খারাপ হয়ে গেল আরো। অমন যৌবনোজ্জ্বল সৌন্দর্য-স্বরূপিণী নায়িকাটির মর্মন্তুদ পরিণতি মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। তবু বাইরে আসার সংগে সংগে ঘরের কথাই মনে পড়ে গেল। অজস্র ধিক্কার দিতে লাগল নিজেকে। খেয়েছে, সিনেমা দেখেছে—এখন মুখ দেখায় কোন্ মুখে।

বেশ সুন্দর দেখে ব্লাউজের কাপড় কিনল এক গজ। কিন্তু নিজের ছেঁড়া পাঞ্জাবীও বদল না হওয়া পর্যন্ত তার রক্ষা যে এ ব্লাউজ ছোঁবে না জানা কথা। স্ত্রীর এ প্রীতিটুকু কাম্য বটে। কিন্তু পাঞ্জাবী মানে তো সাত আট টাকার ব্যাপার। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল একটা। যাক, আপস তো হোক আগে, তারপর না হয় কেনা যাবে পাঞ্জাবীও।

কিন্তু বাড়ী ফিরে কোন আশাই দেখল না সে। স্তব্ধ কঠিন গাম্ভীর্যে সুধা দূরে দূরে রইল সারাক্ষণ। পরোক্ষে আপসের চেষ্টা করল সে ছেলের মারফং, মায়ের মারফং। কিন্তু অন্য তরফের মেঘমূর্তি তরল হল না এক বিন্দুও। মায়ের ভর্ৎসনায় রাতের আহারে অবশ্য দুর্যোগ ঘটল না কিছু—সুধাকেও ভাত নিয়ে বসতে হল। ফলে ব্যবধান যেন বেড়েই গেল।

রাত্রি। বাইরের রেলিং ধরে সুকুমার আকাশের দিকে চেয়ে আছে দার্শনিকের মত। ক্ষণে ক্ষণে একটা বিষণ্ণতা যেন চেপে বসছে বুকের ভিতরে। কিছুই ভালো লাগছে না তার।

শেষ রাত্রি। ঘুম ভেংগে সুধা চমকে উঠে বসল বিছানায়। স্বামীর কণ্ঠস্বরই বটে! তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললে। ঘুমুচ্ছে মানুষটা। কিন্তু সমস্ত মুখ বেদনার্ত। ঠোঁট দুটো নড়ছে একটু একটু। কণ্ঠস্বর কানে এল আবার,—আমার যে ছেলে আছে, বউ আছে—এখন আমি কি করে যাই—আমাকে ডেকো না—!

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল সুধার। জোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল তাকে। ধড়মড় করে উঠে বসে সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

—কে ডাকছিল?

সুকুমার হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সত্যিই কি যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল সে। ঠিক স্মরণ করতে পারল না। ফেলফেল্ করে খানিক চেয়ে থেকে জবাব দিল, ওপার থেকে কে যেন ডাকছিল বার বার—।

মুখখানা পাংশু হয়ে গেল সুধার। ঘন হয়ে কাছে সরে এল সে। বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। রাগ করে বলল, ঝগড়া-ঝাঁটি সব বাড়ীতেই হয়, সকাল থেকে ভাবচ যা তা—মাথা গরম হতে কতক্ষণ লাগে!

—সে জন্যে নয়, কে যেন—

মুখে হাত চাপা দিল সুধা। —থাক, রাত করে আর স্বপ্নের কথা বলে কাজ নেই, ঘুমোও।

সুকুমার চোখ বুজে ভাবতে লাগল তবু। চেনা মুখ। নারী। অথচ কিছুতে মনে পড়ছে না। প্রথম যৌবনে দু' একজনের সান্নিধ্যে না এসেছে এমন নয়। মনের ভিতরে হাতড়ে-বেড়াতে লাগল।

ওদিকে সকাল থেকে নানা রকম অলক্ষণ চোখে পড়ছে সুধার। মশারি থেকে বেরিয়েই সমস্ত বেড়ালের গায়ে পা দিয়েছে, হতভাগা ছেলে সকাল না হতে এক চোখ দেখিয়েছে, নিজেরও বাঁ চোখটা কাঁপছে থেকে থেকে। গয়লার সংগে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল একপ্রস্থ, বিনা দোষে ঝিটা বকুনী খেলে খুব খানিকটা। শেষ পর্যন্ত শাশুড়ীর কাছে এসে স্বপ্নের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে।

বাস্, ভটচায মশাইয়ের তলব পড়ল তৎক্ষণাৎ। তিনি এসে স্বস্ত্যয়নের নির্দেশ দিলেন। রবিবার, অঢেল সময়ও আছে হাতে। ব্যাপার দেখে সুকুমার চুপচাপ বাড়ী থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু মন থেকে ভাবনাটা কিছুতেই তাড়াতে পারছে না সে। কাকে দেখল? চেনা মুখ, তবুও মনে পড়ছে না কেন! সে কি তাকে ডেকেছে? হাতছানি দিয়েছে? কি জানি, সবই বিস্মৃতি-বিলগ্ন। বিয়ের পরে থেকে নিজের স্ত্রীটির আধিপত্য ছাড়িয়ে আর তো কোন নারী-মুখ-চন্দ্রমা মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেয়নি কখনো। তবে এমন হল কেন।

হঠাৎ সমস্ত দেহে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নিস্পন্দ, বিমূঢ়। সামনে কাগজের সেই প্রেক্ষাগৃহ। তার দেয়ালের গায়ে সেই বিয়োগ-বিধুরা অভিনেত্রীর চিত্রিত মূর্তি।...তার বিগত রাত্রির স্বপ্নালোকচারিণী।

পাঠক-মনে ছন্দ-পতন ঘটল বোধ হয়। সুকুমারের চিত্তেও। নিজের অজ্ঞাতেই বাড়ী ফিরল এক সময়। মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সুধা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে তারই জন্যে। ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, দেখচ একটা কাজ হচ্ছে, এর মধ্যে বেরিয়ে পড়লে? চানের সময় নেই আর, মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে এসো, ঠাকুরমশাই বসে আছেন সেই থেকে।

সুকুমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে তবু।

—হাঁ করে দেখচ কি, এসো না একবারটি চট্ করে—!

ঠাকুরমশাইয়ের জন্যে না হোক, নিজে ঠাণ্ডা হবার জন্যেই মুখ হাতে জল দিয়ে ওপরে উঠল। পরে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিল সে।

বিলম্ব দেখে আবার তাগিদ দিতে এলো সুধা।—কী হল, শুয়ে পড়লে যে!

সুকুমার উঠে বসল। —আচ্ছা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কোথাকার কি একটা আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে—

থেমে গেল। কিই বা বলবে। সুধা নীরবে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পরে দু' হাত জোর করে বলল, আমার ঘাট হয়েছে, এরপর সারারাত তুমি বাইরে কাটিয়ো, পার্কে কাটিয়ো—আর একটি কথাও বলব না আমি। ঠাকুরমশাই ডাকাডাকি করছেন সেই থেকে, এখন না এলে সব ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে দেব আমি বলে রাখছি।

ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে। ছলছলে চোখ দুটি দেখে এবং কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর শুনে সুকুমারের বুকের ভেতরটাও মোচড়াতে লাগল কেমন। অথচ, কি করেই বা ওকে বলে, গত রাত্রির স্বপ্নদূত যমরাজ অথবা তার সাংগপাংগ কেউ নয়, তার স্বপ্ন-অভিসারে এসেছিল বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় কুশলিনী একজন শ্বেতাংগিনী চিত্র-তারকা।

...ওদিকে আলটিমেটাম দিয়ে গেছে। কাপড় বদলে বিরস বদনে নীচে নেমে এলো সুকুমার।

ফোটো—রেখা সেনগুপ্ত

সারেঙ্গর সুর
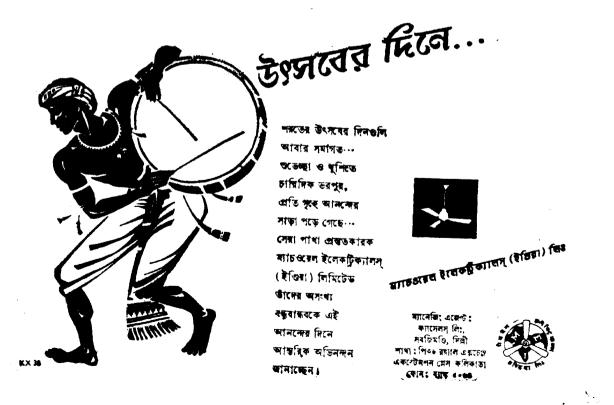
'চামন, চামন!'

কেউ সাড়া দেয় না।

বন্ধুর এক পার্বত্য বন পথ। একটি গিরিনদী উপল খণ্ড ভেঙে, ঠেলে সবেগে নীচের দিকে ছুটে চলেছে। বেলাশেষের নির্মেঘ নীলাকাশ। তার নীচে দিগন্তবিন্যস্ত ঘন নীল পর্বত শিখর। যেন সাগরের স্তব্ধ ঢেউগুলো নীরবে দিনান্তের রোদে স্নান করছে। সেই শিখরেরই আঁকা-বাঁকা পথে পাগলী নদী উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছে।

যেখানে সামান্য একটু সমভূমির মত দেখা যাচ্ছে, সেখানে এসে ওর গতি হয়েছে মন্থর—যেন যৌবনের প্রান্তসীমান্তবর্তিনী এক তন্বী। রূপে চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু স্তিমিত তীক্ষ্ম দ্যুতির দিকেও চাওয়া যায় না।

মতিয়া এই অঞ্চলেরই পাহাড়ী মেয়ে। বন পথ ধরে ছুটে চলেছে চামনের খোঁজে। নদী তটে এসে মতিয়া থমকে দাঁড়ায়। সে এক অদ্ভুত ঝংকার শুনেছে। একি নদী তরংগের জল কল্লোল—উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ভেঙে পড়ছে?

খানিক সে কান খাড়া করে থাকে তার সংগী চামনের কথা ভুলে।

না, না। এ যে এক অপূর্ব বাদ্য সংগীত। মাদলের মৃদু মৃদু বোল নয়—তারের ঝংকার। ওই তারের সংগে যেন তার দেহের তন্ত্রীগুলোর কি এক অব্যক্ত সম্বন্ধ।

মতিয়া ঝংকার অনুসরণ করে নদী পেরিয়ে চলে। কষ্টিপাথরের মত তার রঙে জেল্লা খেলতে থাকে অস্তগামী সূর্যরশ্মির।

মতিয়া বালিকা নয়, যুবতী নয়, চঞ্চলা এক কিশোরী। অত চাঞ্চল্য না থাকলে সে তার দৈহিক গঠনে ভ্রম জন্মাতে পারত যুবতী বলে।

অনেক দূরে ডেরা ফেলে এসেছে। এদিকে সন্ধ্যা হতেও বড় বেশী দেরী নেই। তবু মতিয়া নদীর ওপারে গিয়ে ওঠে। ঐতো ঝংকার শোনা যায় নিকটের ভাঙা দেবমন্দিরে। কে বাজায়, কেন বাজায়? এ যন্ত্র কি মতিয়া কখন দেখেছে? ঔৎসুক্য তার চরম হয়ে ওঠে। কিন্তু সন্ধ্যা নামে দুর্গম অরণ্য কন্দরে নানা শ্বাপদভীতি ও কুসংস্কারের ভীতি নিয়ে। সে ভয়কে জয় করে এবার কিছুটা পথ অতিক্রম করে।

ঝংকার ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে।

মতিয়া স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু ওর স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেন ছিঁড়ে যেতে চায় বাদ্য-যন্ত্রের ঝন-ঝন ঝনৎকারে।

কখন চাঁদ ওঠে মতিয়া টের পায় না। কখন পার্বত্য বনভূমি শীতে কেঁপে ওঠে তা-ও মতিয়া বলতে পারে না। সে তার অজ্ঞাতে এক সময়

অমরেন্দ্র ঘোষ

মন্দিরের ভিতর ঢুকে পড়ে। এ মন্দিরে পূজার নৈবেদ্য না নিয়ে কারুর প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

অনেক রাত্রে বাজনা বন্ধ হয়।

যে বাজনা বাজাচ্ছিল তার মুখে এসে খানিকটা জ্যোৎস্না পড়েছিল ভাঙা দেউলের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু তাকে সুস্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। কত বয়স তা-ও বোঝা যাচ্ছে না সঠিক।

'সাধুবাবা!'

'হামি সাধু নইরে।'

'তবে তুমি কি ছে?'

'হামি, হামি এক বাজানদার। জীবকা সেবক।'

'ইখানে জীব তো নেই ছে, বন-বাদাড়, গাছ-গাছালি আর পাথর।'

বাদ্যকার একটু হাসে মতিয়ার কথায়। 'তুই? তুই কি পাথর আছিস?'

মতিয়া জবাব দিতে পারে না।

সুরের সংঘাতে ভাঙা দেউল এখনও যেন রিমঝিম করছে। নদী বন ঝর্ণার ছন্দের ভিতর মতিয়া জন্মেছে। দেখেছে নৃত্যপরা ময়ূরীর পক্ষ বিস্তারণ। শুনেছে নভোচারী কত বন হংসীর অশান্ত কাকলি। সময় সময় তাকে স্তব্ধ করেছে বৌকথাকও পাখী, নয়ত হস্তিনীর বৃংহতি। কিন্তু কোথায়ও সে এমন মনোমুগ্ধকর সুর শুনতে পায়নি। এ যেন সুরের মধুধারা! গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পদ্মমধু!

যৌবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ সে কখন জীবনে অনুভব করেনি, সে যেন আজ বিরহ অনুভব করছে এক প্রেমিক পুরুষের। কিশোরীর ভিতর জন্মেছে প্রেমের ব্যাকুলতা। চঞ্চলতার সমাধি হয়েছে, দেখা যাচ্ছে প্রসন্ন গাম্ভীর্য।

মতিয়া মুখখানা একটু ঘুরাল। চাঁদের জ্যোৎস্না পড়ল আরও একটু ধারাল হয়ে।

'ও কি বেটি, আঁখ মে পানি কেনে?'

চোখে কেন জল এল তা তো বুঝিয়ে বলতে পারে না মতিয়া। হাসি ঠাট্টা তামাসা ছাড়া যে

কিছু জানে না সে আজ কাঁদল কি অব্যক্ত ব্যথায়? কিশোরী ভিল সে অনন্ত সুরের সম্যক কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। তাই সে আবার সলজ্জ নীরব হয়ে থাকে। চাঁদ একটা মহুয়া গাছ ছাড়িয়ে তাল গাছের চূড়ায় ওঠে। অদূরে শোনা যায় পোকা মাকড়ের ঐক্যতান। এবার চাঁদ আট্‌কা পড়ে শালগাছের ফাঁকে। তারপর দেখা যায় নিঃসীম নীলাকাশে যেন ভেসে চলেছে একখানা সোনার থালা। বর্ণে তার অপূর্ব লালিত্য।

এবার বাদ্যকর মনে মনে একটু হাসে। কি আশ্চর্য যে সব চেয়ে আনন্দ পেল, তার চোখেই জল! একি অদ্ভুত নিয়ম! এই কি তার সেবার ফল? না, না—সে আর মানুষের সেবা করবে না। শিবপূজো করে আর লাভ নেই। জীব মাত্রেই শিব। তাই সে শ্মশানচারী। শ্মশানবাসীর মনের চিতা সে কিছুতেই নির্বাণ করতে পারবে না। তার চেয়ে সে লতাগুল্ম অরণ্য বিটপীকে সঙ্গীত শোনাবে। এতদিন ধরে তো সে তাই করে এসেছে। কোথা থেকে পিছু নিল এই পাহাড়ীবালা?

'তু ঘর যা বেটি, রাত বহুৎ হয়েছে, হামি আর বাজাব নি।'

পরদিন আবার মতিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্বেই আসে।

'হামাকে বাজনা শিখাবি? বড় মিঠা তোর বাজানি।'

'না।'

'কেনে সাধুবাবা?'

'ফের হামাকে সাধু বলছিস? হামি সাধু নইরে। হামার সাধ আছে, আশা আছে বেটি দিল্‌ ভরা।'

যে একাকী ভাঙা দেউলে মনুষ্যবিরল স্থানে বাস করে, তার আবার সাধ আহ্লাদ কি? মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তো সংসারকে জড়িয়ে। সে সংসারই তো ও ত্যাগ করেছে, কিন্তু সন্ন্যাসী বললেও যেন ক্রুদ্ধ হচ্ছে। কিছু বুঝাতে না পেরে মতিয়া হাঁপিয়ে ওঠে। তবু সে বায়না ধরে বাজনা শিখবে বলে। ও জিজ্ঞাসা করে যন্ত্রটার কি নাম।

সারেঙি।

কি সুন্দর নাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মতিয়া।

আচ্ছা একান্তই যদি বাজনা না-ই শেখাবে ওকে তো বাজিয়ে শোনাবে।

বাদ্যকরের মুখ বিকশিত হয়ে ওঠে।

সারেঙির তারে ঘা দিতে দিতে বাদ্যকার বলে, সে ঘর-সংসার বেঁধে গতানুগতিক পথে বাঁচতে চায় না। সে চায় শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় বাঁচতে, সার্থক সুরসেবিকার মাধ্যমে। কিন্তু তেমন একটিও তো অদ্যাবধি জুটল না! সে দেশ হতে দেশান্তরে, কান্তার হতে কান্তারান্তরে বৃথাই চাতকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তেমনি একজন অনুরাগী শিষ্যাই তো মতিয়া হতে চাচ্ছে; কিন্তু কেন আপত্তি করে দূরে ঠেলে রাখতে চায় তাকে বাদ্যকর? মতিয়া কালো চোখের ঘন দিঠি দিয়ে উদ্ঘাটিত করতে চায় রহস্য। তার দুটি নয়ন প্রদীপে প্রশ্ন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

"হামি সাধু নইরে"

বড় কঠিন শিষ্যার্থী হওয়া। অতি দুরূহ ব্রত তাকে পালন করতে হবে। সে এক বিরাট কৃচ্ছ্রসাধনা।

এমন কি কঠিন ব্রত আছে যা মতিয়া পালন করতে পারে না? সে তো তার জাতীয় পালপার্বণে এই অল্প বয়সেই করেছে কত উপবাস—যা তার বয়সী মেয়ের পক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়।

সে এই বনের দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে একবার নাকি শানিত বর্শা ফলকের ওপর দিয়েও হেঁটেছে, ফুটিয়েছে হাতের তালুতে তীক্ষ্ণতম কণ্টক। এই তার চিহ্ন।

এসব শুনেও বাদ্যকর হাসে।

তবে সে এমন কি কঠোর সাধনা?

জংলিবালা তার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা রোধ করতে পারে না। চোখের চাহনি তার বহ্নিমান হয়ে ওঠে।

'হামি জীবন দেবে তোর পায়।'

তবু হবে না। মরেই যদি গেল, তবে কে পূর্ণ করবে বাদ্যকারের মনস্কামনা?

তবে কি সে চায় জীবন্ত মানুষকে দগ্ধে দগ্ধে মারতে? অশ্রু ঠেলে আসতে চায় মতিয়ার চোখে। মতিয়া নিজেকে সংযত করে বহু কষ্টে।

আশৈশব সে সুরের পাগল। সেই সুরের এমন অনবদ্য ঝংকারে প্রকাশ সে কি করে আয়ত্ত না করে থাকবে?

চামন গেছে উঁচু পাহাড়ে মহুয়ার মদ সংগ্রহ করতে। চামন বাঁশী বাজায় চমৎকার। সে ফিরে এলে তাকে চমৎকৃত করে দেবে ভেবেছিল মতিয়া। কিন্তু একি বিঘ্ন?

'গন্ধর্ব কন্যার বাত শুনেছিস বেটি?'

'না দেওতা।'

'বাজানি শিখাতে হলে, গন্ধর্ব কন্যা বনতে হবে।' সে মেয়ে সুর-দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত হবে চিরদিনের মত।

খানিক বিস্ময়ে খানিক বিহ্বলতায় মতিয়া চোখজোড়া বিস্ফারিত করে। এ আর এমন একটা কি।

আমরণ তাকে ভুখা থাকতে হবে। সে কখনও পুরুষের সংগ করতে পারবে না। 'সাদি সোংসার হবে না বেটি।'

এই কথা! সাদি সংসারের জন্য মতিয়া মোটেই ব্যাকুল নয়। তার চিত্তের প্রতিটি পাঁপড়ি আজ আকুল হয়েছে ঐ সুরের রশ্মির জন্য। কিশোরীর ভিতর এখনও বর্বর উন্মাদতা জাগেনি। দেহের চেয়েও আজ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে কোনও রহস্য আয়ত্তকরণ।

মতিয়া উদ্বিগ্ন করে তোলে বাদ্যকরকে। পতঙ্গের মত সে পুড়ে যেতে চায় সুরের শিখায়।

'দে দে বাবা সারেঙির বোল শিখিয়ে দে হামাকে।'

বাদ্যকর বিনা আড়ম্বরে নিয়মিত অনুষ্ঠানে মতিয়াকে গন্ধর্ব কন্যায় দীক্ষিত করে। তারপর সে নিত্য তাকে সারেঙি শেখায়। বেহাগ, ললিত, ভীমপলশ্রী। মতিয়া আশাতিরিক্ত কৃতিত্ব দেখাতে থাকে। বাদ্যকর সন্তুষ্ট হয়ে তার ভাণ্ডার উজাড় করে দেয়। দিন কেটে যায় ঝংকারের মত উল্লাসে কে'পে কে'পে।

একদিন বাদ্যকার অদৃশ্য হয়।

চামনকে বিস্মিত করে দেওয়ার কথা মতিয়া ভুলে যায়। শিক্ষা তার সমাপ্ত হয়েছে। রাগরাগিণী মূর্ছনা এসেছে তার আয়ত্তে, সে সেই আনন্দেই বিভোর হয়ে বাজিয়ে চলে সারেঙি। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি তার পুষ্প-পুলকিত বসন বদলায়, মতিয়ার হাতেও তেমনি সুর ও ঝংকারের অদল-বদল হয়—কখনও জোগের কারুণ্যে, কখনও মেঘমল্লারের অপূর্ব কম্পনে। বনস্থলী, পর্বত শিখর, গুহাবাসী সর্পিণী, নভোচারী পাখীরাও যেন সময় সময় তন্ময় হয়ে থাকে। হয়ত শিকার ধরতে ভুলে যায় সিংহরাজ।

চামন মহুয়ার মদ নিয়ে ফেরে না। সর্পাঘাতে না শ্বাপদের আক্রমণে সে মরেছে, সে খোঁজও মতিয়া নেয় না। গন্ধর্ব কন্যা নিজের সৃষ্টিতেই নিজে মসগুল।

চামন! চামন! একটি দিন যাকে না দেখলে, যার সংগে ফুল নিয়ে, শিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি না করলে মতিয়া অস্থির হয়ে যেত, সেই চামনের স্মৃতি কি করে যে মুছে ফেলে মতিয়া এ এক বিস্ময়।

বছর ঘোরে মতিয়ার বয়স বাড়ে, তবু চামনের কথা মনে পড়ে না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত নানা সম্ভার নিয়ে ওকে ভুলাতে চায়, ওর স্নেহান্ধ নয়ন শুধু সারেঙির দিকেই চেয়ে থাকে। ও সারেঙির ভিতরই দেখতে পায় ধরিত্রীর সর্ব রূপের উন্মেষণ। রূপ যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। ও তন্ময় হয়ে ছড়ি টেনে চলে তারের বুকে।

বর্ষার গেরুয়া জলের ঢলের মত, ওর দেহে যৌবন আসে উন্দাম আবেগে। চোখে নামে নিশিপদ্মের কোমলতা। সময় সময় ও অসম্বৃত বাসে সারেঙি বাজায়। ওর রূপের কেউ পূজো করে না। বৃথাই যেন উপচে উপচে পড়ে যায়। দিবসান্তের কুসুম যেন কাঁদে, কোথায় ভ্রমরের বাগ্র চুম্বন?

এবার ক্লান্ত মতিয়া সারেঙি নামিয়ে রাখে।

'চামন কোথা ছেলো তুলসি?'

তুলসি জবাব দেয় যে সে জানে না। কেন, সেই যে চামন গেছে, আর তো ফেরেনি। মতিয়া কি একথা শোনেনি! বছর গত হয়েছে পুরো চারটা।

'জানিস কি তুলসি?'

'শের খেয়েছে তোর চামনকে। এখন দোছরা মরদ দেখ।'

'ভাগ ইখান থেকে।' মতিয়া ক্রোধে একটা ছড়ির আঘাত করে সপাং করে। তুলসি চলে যায়।

তবু চামন আসে না।

না-ই বা এল চামন। গন্ধর্ব কন্যার কাছে না-ই যদি আসে সে যোয়ান পুরুষ সে তো খুবই ভাল। কাছে এলে মতিয়া খুব জোর তাকে একটু আদর আপ্যায়ন করতে পারবে, তার বেশি সে আর কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু শের যদি খেয়ে থাকে চামনকে, তাই বা সহ্য করে কি করে মতিয়া? উঁচু পাহাড়ে যারা মহুয়ার মদ সংগ্রহ করতে যায়, অনেক সময় তাদের ভাগ্যে এ দুর্দৈব ঘটে। সে কি যে সে বিঘ্নসংকুল ঠাঁই!

শেরের কথা ভাবছে সবাই, বাঘিনীও গ্রাস করতে পারে। বনের নয়, মনের নয়, ভিন গাঁয়ের ভিন দেশের জীবন্ত মানব বাঘিনী। চামন তো সাদি করে কোথায়ও রয়ে যেতে পারে। কিছুই আশ্চর্য নয়। নইলে কি করে গত হল চার চারটা বছর।

সারেঙির সুর ঘন ঘন ছন্দ হারায় ছড়ির উত্থান-পতনে।

মতিয়া অতি কষ্টে হৃদয় সংযত করে। সে আবার দূরে ঠেলে ফেলে দেয় চামনকে। কোনদিন যে বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল, তাও মনের আয়না থেকে মুছে ফেলে দেয় মতিয়া।

গন্ধর্ব কন্যা ওর গুরুর কাছে নীরবে বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করে।

মতিয়া কি যেন কি বাজাতে গিয়ে অবিমিশ্র বেহাগে চলে যায়। বৈকালের বনভূমি উদাসী হয়ে ওঠে। গেরুয়া অঞ্চল মুখে দিয়ে যেন সান্ধ্যতারা সমবেদনায় কাঁদে। সপ্তর্ষিরা আর চাইতে পারে না যেন মতিয়ার দিকে। সারেঙির মূর্ছনা দিকে দিকে হাহাকার করে ফেরে।

গ্রীষ্ম গত হয়। বর্ষা আসে নব নব মেঘমালার অর্ঘ্য নিয়ে। মল্লিকা, যুঁই, বেলা ফুটে ওঠে স্তবকে স্তবকে। ময়ূরী নৃত্য করে ঝর্ণার কিনারে, দেয়ার দ্রিমি দ্রিমি তালের সংগে দাদুরী ডাকে সঘনে।

মতিয়া মেঘমল্লার রাগিণীতে আলাপ করে। সারেঙির কম্পমান তারের গমকে যেন আকাশের কালো মেঘ সজল হয়ে আসে। নামে মুষলধারে বর্ষা। ধরণী ঝাপসা হয়ে যায় মতিয়ার মনের সেই সকরুণ স্মৃতির মত। শুধু জল, শুধু জল—আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, দিগন্তবিসারী শুধুই প্লাবন।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়।

কে যেন ডাকে, 'মতিয়া!'

'কে, কে—? চামন!' সারেঙির বোল সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। অর্ধ পথে থেমে যায় মেঘ-মল্লার রাগিণী।

'হামি মহুয়ার মদ আনতে যাইনি। নকরী করে ঘুরলাম দেহাতে। তোর জন্যি কেতে চিজ এনেছি।'

'আর হামি তোর জন্যি শিখেছি নয়া বাজানি।' রূপের হাসুলি পৈঁছি, কাঠের কাঁকই দেখে মতিয়া উচ্ছ্বাস থামাতে পারে না। 'এই দেখ ইটার নাম তুই জানিস, সারেঙি।'

উজ্জ্বল উপঢৌকনগুলি নিজের হাতে চামন পরিয়ে দিতে যায় মতিয়াকে।

গন্ধর্ব কন্যা নিষেধ করে, 'না, না, ছুঁস নি তু হামাকে।' তার মনে পড়ে কঠোর ব্রতের কথা, মনে পড়ে অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞার কথা। সে হৃদয়ের বল্গা টানে নির্মম হস্তে।

চামন চেয়ে থাকে মূর্খের মত।

(শেষাংশ ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই দেখ ইটার নাম তুই জানিস, সারেঙি

এক কাপ চা নিয়ে বসেছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। রাস্তার ধারেই দোকান। সময় কাটাতে তাই খুব অসুবিধে হচ্ছিল না। রাস্তার লোক দেখছিলাম, আর মাঝে মাঝে দু-একটা চুমুক দিচ্ছিলাম। বিশেষ কোনো ভাবনাও ছিল না মাথায়। বিশেষ কিছুর দিকে দৃষ্টিও ছিল না। তবু বসে আছি। কাজ নেই। কিছুদিন কাজ না থাকলেই জীবনটা কেমন অচল হয়ে যায়, এক-একবার এ কথা মনে হচ্ছিল। দরজির দোকানে কাজ করি। বিয়ের সময় বা পুজোর মরশুমে খুব কাজের চাপ থাকে, পয়সাও কিছু বেশি মেলে। হঠাৎ দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল। আজ পনেরো দিন আমি বেকার। পনেরো দিন কাজ না পেয়েই সব অচল হয়ে গেছে। আশ্চর্য লাগল, কতজন তো আছে—কত দিন কাজ না ক'রেও দিব্যি হেসেখেলে কাটিয়ে যাচ্ছে। তাদের চলে কী ক'রে? কাপে আবার চুমুক দিয়ে মুখ তুলতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনে মস্ত একটা ইমারত। মনে পড়ে গেল নেপালের কথা। সে নাকি কনট্র্যাক্টরির কাজ করে এখন। বড় বড় বাড়ি তুলছে নাকি।

নেপালের ইমারতি কারবার নাকি শুধু চলা নয়, খুব জাঁকিয়ে চলছে। বড় বড় নামজাদা ইঞ্জিনিয়ারকে দাবিয়ে দিয়ে সে নাকি সাত-আট মহলা বাড়ি তৈরির কনট্র্যাক্ট পাচ্ছে। বাজারে এই রকম একটা কথা খুব চালু আছে।

আমার কিন্তু কেমন খটকা লাগে। কারণ, নেপালের যত দোষই থাক্, তার একটা মস্ত গুণ এই যে, সে চাপা। অসম্ভব রকম চাপা—বরাবর। জীবনে কি তার প্ল্যান, কি তার মতলব—তার পেট থেকে এ কথা কেউ কখনো বের করতে পারে নি। এমন লোক যে নিজের কাজের ঢাক নিজে পিটে বেড়াচ্ছে, এইটাই আমার কাছে ভীষণ আশ্চর্য লাগে।

চোখের সামনে আমার এত বড় ইমারত দাঁড়িয়ে, তবু এতক্ষণ তা চোখে পড়ল না কেন—এতেও আশ্চর্য হলাম। চোখে যখন পড়েছে, তখন সেইদিকে চোখ দিয়েই বসে রইলাম। একেবারে আনকোরা নতুন প্রকাণ্ড দালান, আকাশের অনেকটা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে। বলা যায় না, এ-দালানটাও হয়তো নেপালেরই তৈরি।

চা-পান সাঙ্গ ক'রে উঠে পড়লাম। দু-চারটে দরজির দোকানে ঢুঁ দিয়ে দেখার ইচ্ছে। একটা কাজ যে চাইই। এগারো বছর আছি এই লাইনে. কোট, শার্ট প্যান্ট ব্লাউজ সবই ছাঁটতে-কাটতে সেলাই করতে জানি। কাজ কি জুটবে না কিছুতেই! আবার মনে হল নেপালের কথা। জীবনে যে কোনোদিন—শুধু কনট্র্যাক্টরি কেন—কোনো কাজই করে নি, সে যদি বিরাট বিরাট দালান তোলার কাজ পায়, তাহলে আমার মত অভিজ্ঞ লোক আমার লাইনে সামান্য একটা কাজ পাবে না কেন?

কেনর কোনো জবাব নেই। জানি, আসলে সবই কেরামতি।

দোকান থেকে বেরোবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, অমনি বিপিন এসে হাজির। আমাকে দেখেই বলল, খবর কী! আছিস কেমন!

একেবারে যে আর নেই এবং যেটুকু আছি তাও যে মরমে মরে আছি—তা আর বলতে পারলাম না। বললাম, এই, এই আছি একরকম।

কিন্তু আমার মুখের চেহারায় আর মুখের কথায় নিশ্চয় আকাশ-পাতাল ভেদ ছিল, বিপিন বলল, এ রকম থাকা তো ঠিক না, চেহারা বড় খারাপ দেখাচ্ছে। কাজকর্ম নেই বুঝি? তোদের জগদম্বা টেলারিং-এ দেখলাম কুলুপ লাগানো।

সবই যখন জানে বিপিন, তখন আর কিছু চেপে যাওয়ার অর্থ হয় না। তাকে অকপটে সব বললাম।

বিপিন বলল, আয়, বোস্।

বসলাম। পুনরায় চা এল হাফ-কাপ ক'রে। বিপিন বলল: হাতের কাজ জানিস, তোর আবার ভাবনা কি।

বললাম, জানি ব'লেই তো ভাবনা। কিছু না জানলে একটা কিছু জুটে যেত।

কথাটা বিপিনের খুব মনের মত হয়েছে ব'লে মনে হল। ঠোঁটের কাছ থেকে কাপ টেবিলের উপর শব্দ ক'রে নামিয়ে রেখে হো-হো ক'রে হেসে উঠে বলল, সাবাস। দুনিয়াটা চিনেছিস তাহলে, আঁতের কথা গুছিয়েও বলতে শিখেছিস দেখছি। তুই তো চিরকেলে মুখচোরা।

কাপে চুমুক দিয়ে মুচকে মুচকে হাসলাম।

বিপিন বলল, এ-সংসার একটা চিড়িয়াখানা। মানুষের উপর মানুষের দরদ নেই, জন্তু-জানোয়ারের উপর মানুষের যত টান। রাস্তায়-রাস্তায় প্যান-প্যান ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত ভিখিরি, তাদের দিকে আমরা ফিরে তাকাইনে। টিকিট কেটে আমরা জানোয়ার দেখতে যাই, তাদের ছোলা-কলা খাওয়াই। তাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, তার জন্যে কত ব্যবস্থা। বুঝলে হরিপদ, মনুষ্যত্ব রাখলে চলবে না; হতে হবে জংলি, হতে হবে জানোয়ার। তবে লোকের দরদ পাবে।

বিপিন চায়ে চুমুক দিল। মনে হল তার বুকের কোনোখানে হয়তো কোনো ঘা আছে। আমার একটা সামান্য কথায় সেই ঘায়ে হয়তো নুনের ছিটে পড়েছে। তাই ছটফট ক'রে উঠেছে সে।

বিপিন কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলল, মানুষ খুন করো, তার পর যাকে খুন করলে তার মাকে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বল, খুব মৌখিক দরদ দেখাও। তাহলেই পুত্রশোক ভুলে গিয়ে খুনীকে সে ছেলে বলে আদর করবে; খুনীর ছেলের জন্যে রাত জেগে উলের জামা বুনে দেবে। এই তো দুনিয়া। এটা একটা জোচ্চোরের ডিপো হে, এ পৃথিবীটা আস্ত একটা চিড়িয়াখানা। যাক, বাজে কথা। কাজটাজ জোগাড় কর একটা।

আর্তনাদের সুরে বলে উঠলাম, কোথায় পাই?

বিপিন বলল, কিচ্ছু হবে না তোকে দিয়ে। বললাম যে, মুখটাকে আগে পালিশ ক'রে নে। খুব চোখা চোখা বুকনি, আর খুব মিষ্টি মিষ্টি বুলি—এই দুইটি রপ্ত কর। মনের মধ্যে যদি সহানুভূতি আর দরদের গোডাউন থাকে, আর মুখের কথায় যদি সামান্য ঝাঁজ এসে যায়; লোকে তোমাকে হুটাউট ক'রে দেবে—চট্ ক'রে ফাণ্ডামেন্ট ক'রে বসবে। কোনো দরদের দাম পাবে না। কাজ যদি কিছু জানা থাকে, ভুলে যাও। কথা যদি কিছু জানা না থাকে, শিখে নাও। জীবনে সাফল্যলাভের এই হচ্ছে মূলসূত্র। ভালো মানুষ হলে চলবে না; তোমাকে হতে হবে চতুর ধুরন্ধর, আর কী বলে গিয়ে ঠেঁটরস। তাহলে খুনী হলেও তুমি খালাস, ডাকু হলেও কথার কারসাজিতে তুমি সাধু হয়ে যাবে।

আমার উপর বিপিনের যেন টান আছে বলে মনে হল। সে তা না হলে আমাকে এত উপদেশ, আর এত পরামর্শ দেবে কেন। তাই অনেকক্ষণ থেকে বলি-বলি ক'রে এতক্ষণে প্রস্তাবটা ক'রে বসলাম, বললাম, এক কাজ করা যাক। কিছু টাকা জোগাড় ক'রে যদি আমাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনে দাও, তাহলে নিজেই একটা দোকান নিয়ে বসি। পরের নোকরি আর ভালো লাগে না।

বিপিন হাসল, বলল, বেকুব পেয়েছ আমাকে। পাঁচ বছর আগে এ প্রস্তাব করলে হয়তো রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু আর না। বন্ধুর ব্যবসার জন্যে টাকা দিতে গিয়ে প্রাণটা খোয়াই আর-কি!

বললাম, তার মানে!

বিপিন অনেকক্ষণ সামনের বড় বড় ইমারতের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মানে জান না?

একটু যেন বুঝতে পারলাম, তবু বললাম, বল না! বিপিন বলল, নেপাল। তার বন্ধু, ধীরেন্দ্রনারায়ণ না কী-যেন নাম, নেপালের কোম্পানির ব্যবসার জন্যে জমিদারী বেচে দিয়ে সব টাকা—যথাসর্বস্বই আরকি—দিল নেপালকে। সেই টাকা মেরে দেওয়ার জন্যে নেপাল লোক-পয়জন ক'রে সাফ ক'রে দিল বন্ধুকে। তুমিও কি ওই মতলব নিয়ে আমাকে ব্যবসার ফাঁদে ফেলতে চাও?

বলে উঠলাম, ছি-ছি ছি-ছি।

বিপিন হাসল, বলল, বড় মিষ্টি ক'রে বলছ, বেজায় সন্দেহ হচ্ছে হরিপদ, তোমার মতলব ভালো না। আমার কথা শুনে প্রতিবাদ ক'রে যদি রেগে একটা দুঃখ মারতে আমাকে, তাহলে বুঝতাম তুমি সাচ্চা চিজ, নিখুঁত খাঁটি সোনা। ...

বড় বেকায়দায় পড়ে গেলাম। এখন আর ঘুষি মেরে নিজের খাঁটিত্ব জাহির করা যায় না। মিষ্টি ক'রেই আবার বললাম, আমাকে ভুল বুঝে ফেললে চট ক'রে?

—চট ক'রে নয় হে। অনেক দেখে, অনেক ঠেকে। হতে পারে তোমার মতলব ভালো, কিন্তু তবু হুঁশিয়ার আমাকে হতেই হবে। —ব'লে বিপিন একটু থামল, বলল, চরণ তো দিয়েছে কেস ঠুকে। যদি তার সাক্ষীর দরকার হয়, আমি দেব। আমার কাছে অনেক পাকা দলিল আছে, নজির আছে।

বুঝতে পারলাম না, বললাম, কিসের কথা বলছ। বিপিন বলল, নেপালের। তার বন্ধু-হত্যার।

বললাম, সে তো এখন মস্ত কারবারি। বড় বড় বাড়ি তুলছে নাকি!

—হয়তো তুলছে। হয়তো সেগুলো স্বপ্নের স্বর্ণপুরী, কিংবা কল্পনার সাতমহলা দালান। কথা রটিয়ে দিলেই তা মেনে নেব, বিশ্বাস করব? কত নামজাদা কনট্রাক্টর, কত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কাজ পাচ্ছে না, আর, কোনো দিন যে ইঁটের খোলা দেখেনি সে বড় বড় বাড়ির কনট্রাক্ট পেয়ে যাবে? আসল কথা, যে টাকাটা ও মেরেছে, তা নিজের কাজে খরচ করতে চায়। তাই একটা কথা চালু করা দরকার। তা না হলে একটা জাত-বেকারের হাতে টাকা এল কী ক'রে? লোকের মনে এ ধোঁকা লাগতে পারে তো?

আমি নেপালকে খুব ভালো ক'রে চিনি-নে, তার সম্বন্ধে লোকমুখে কিছু কিছু শুনে তার বিষয় মনে মনে একটা ধারণা খাড়া ক'রে নিয়েছিলাম। এখন দেখছি বিপিনের কথার সঙ্গে আমার মনের কথাও হুবহু মিলে যাচ্ছে।

বিপিন বলল, মাভৈঃ। যা উপদেশ দিয়েছি একটু আগে, সব মন থেকে মুছে ফেল। যেমন আছ, তেমনি থাক। জীবনে তাহলেই টিকে যাবে। চালাকি দিয়ে শেষ রক্ষা হয় না।

একটু হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলাম। একটা কাজ পাই বা না পাই, জীবনে টিকে যাবার একটা আশ্বাস যে পেয়েছি, এইটেই এখন আমার মস্ত লাভ। পনেরো দিনের বেকার জীবনেই মনের জোর অনেক কমে গেছে, এখন কারোর কাছ থেকে উৎসাহ পেলে সেইটেই জীবনের মূলধন ব'লে মনে হয়।

বিপিন বলল, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি। মূলধন আমি দেব।

চমকে উঠলাম যেন, বললাম, কিসের।

—তোমার টেলারিং কারবারের। কেবল একটা সর্তে—যদি লাভ হয় তোমার; যদি লোকসান হয় আমার। এমন হলে প্রাণের ভয় থাকবে না, এবং বিপিন একটু চাপা গলায় বলল, বন্ধুত্বটাও টিকে থাকবে। রাজি?

মনে হল বিপিন যেন ঠাট্টা করছে। তাই তার কথায় আর জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

বিপিন আমার মনের ভাব বুঝে থাকবে, তাই কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে বলল, আমার উপর নিশ্চয় চটেছিস। চটলে উপায় নেই, কিন্তু কারবার করতেই হবে।

কোনো উত্তর না দিয়ে আমি উঠে পড়ছিলাম, বিপিন আমাকে টেনে বসাল। এই টাটা রোদ্দুরে অকারণে ঘুরে নাকি লাভ নেই। তার চেয়ে আর দুটো হাফ-কাপ নিয়ে বসে বসে গল্প করা ভালো।

বিপিন বলল, বাড়ির সব খবর ভালো? বাচ্চারা?

বললাম, আছে একরকম।

বিপিন বলল, কেবল নিজের কথা ভেবেই তো সারা হচ্ছ, তাদের কথা ভাব? তাদের ভবিষ্যৎ। তাই চটে চলে গেলেই চলে না। যে প্রস্তাব করেছি, তাতে রাজি হয়ে যাও। খোলো দরজির কারখানা।

বিপিনের গলার স্বরে এতক্ষণে সত্যিই যেন দরদের ছোঁয়া পেলাম, এবার যেন সত্যিই মনে হ'ল সে আমার ভালো চায়। তাই তার দিকে তাকালাম।

বিপিন হাসল। একটু থেমে বলল, পাঁচ বছর আগে নেপালের সঙ্গে তেলের ব্যবসায় নামি, যাকে বলে কেশ তৈল—সেন্টেড কোকোনাট অয়েল। টাকা ঢাললাম তেলে, কিন্তু দেখলাম সব টাকা গেল জলে। নেপালের সেবারকার হাতসাফাই দেখে আমার জ্ঞান বেড়েছে। তাই এখন একটু হুঁশিয়ার হয়েছি। লোকটা, বুঝলে হরিপদ, একটা ক্রিমিনাল। থাকে ভিজে বেড়ালের মত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর রক্তের পিপাসা। তা না হলে, টাকার জন্যে নিজের বন্ধুকে—

হঠাৎ বিপিন চুপ করে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি সে রাস্তার দিকে চেয়ে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পথের দিকে তাকাতেই দেখি নেপাল। এই দিকেই আসছে। অনেক দিন তাকে দেখি নি, কিন্তু চেহারা যা হয়েছে তাতে বড় কনট্রাক্টর বলে মনে হয় না। নেপাল ধীরে ধীরে এসে চা-খানায় ঢুকল।

বিপিন বলল, বড় চিন্তিত দেখছি। অবশ্য তোমরা এখন বড় বড় কারবারি, বড় কন্ট্রাক্টর, তোমাদের মাথায় চিন্তা থাকবে না তো থাকবে কার! তারপর খবর কি? নতুন কি কি দালান তোলা হচ্ছে?

হাতের চেটো দিয়ে নেপাল নাক রগড়ে নিয়ে বলল, উঠছে। দু-একটা উঠছে।

বিপিন আমার হাঁটুর উপর চিমটি দিয়ে নেপালকে বলল, বিনয়ের কি দরকার। তোমার মত করিৎকর্মা লোককে আমি চিনি নে? তোমার ব্রেণটাই কারবারি ব্রেণ, অমন মাথা যদি পেতাম, তাহলে আমাদের এই দশা! আমাদের কিছু কিছু কাজ দাও না। সিমেন্ট আর চুণ আমি সাপ্লাই দিতে পারি।

একথায় নেপাল বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। বলল, আচ্ছা ভেবে দেখি।

নেপাল বিপিনের কথার ঠিক ঠিক উত্তর দিচ্ছে না দেখে বিপিন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, নেপালকেও বিচলিত দেখছিলাম।

বিপিন বলল, তোমার বন্ধুটি চট ক'রে মারা গেল? চরণ নাকি তোমার নামে কী-সব বাজে মামলা আরম্ভ করেছে শুনেছিলাম!

নেপাল বলল, চরণটা ছেলে মানুষ। বুঝতে পারেনি। পাঁচজনে যা বুঝিয়েছে, তাই বুঝে ভুল করেছে। কাল এসেছিল আমার কাছে।

—বলে কি!

—কী আর বলবে, বলল, ভুল হয়েছে। আমি যেন কিছু মনে না করি।

বিপিন আমার হাঁটুতে আর-একটা চিমটি দিয়ে নেপালকে বলল, তুমি নিশ্চয়ই কিছু মনে কর নি।

নেপাল হেসে বলল, পাগোল। কটটুকু বেলা থেকে ওকে দেখছি, ওর একটা ভুলই ক্ষমা করতে পারব না?

মাঝখান থেকে আমি বললাম, ওই কথাই ঠিক। চালাকি দিয়ে শেষরক্ষা হয় না। চরণের ওটা ছিল চালাকি।

নেপাল বলল, বিবেকানন্দের কথা কি কখনো ভুল হয়, চালাকি দিয়ে কিছু হয় না? অমন একজন সৈনিক-সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি

এমন সময় একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল রাস্তায়। জনকয়েক পুলিশ নামল, তার পরে কে ওটা? বিপিন ফিসফিস ক'রে বলল, চরণ।

দোকানে ঢুকেই চরণ আঙুল দিয়ে দেখাল, ওই। আজ চারদিন ধরে ভোগানো হচ্ছে, পালিয়ে বেড়ানো হচ্ছে:

নেপালের মুখ শুকিয়ে গেল। আমাদের চোখের সামনেও যেন একটা মস্ত ইমারত হঠাৎ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে পড়ল।

নেপাল ব্যাকুলভাবে একবার তাকাল বিপিনের দিকে, তারপর আমার দিকে। কিন্তু আমাদের শক্তি আর কতটুকু?

চখড়ির দেশে

শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ

কান্তি

নলমনি রায়

খাদ্যরন্ধন=ছেদক ও অন্যান্য দাঁতের পরিবর্তন
চর্বণাল্পতা=পেষক ও চোয়ালের পরিবর্তন
চোষণ ও লেহনের অল্পতা=জিবের পরিবর্তন
চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজ্যের রূপান্তর (রন্ধনের ফলে)= দাঁত ও চোয়ালের পরিবর্তনের ফলে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি।

সুতরাং, আমরা যে প্রধানতঃ ভোজন ক'রেই সভ্যমানুষ হয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি ভোজন না করতাম এবং রন্ধনের ফলে ভোজ্যবস্তুর পরিবর্তন না হ'ত, তাহ'লে আমাদের সুন্দর মুখের বিকাশ হ'ত না এবং সুন্দর মুখের জয়ও হ'ত না সর্বত্র। কথাটা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আরও বিশেষ ক'রে মনে রাখা উচিত। পুরুষের মুখমণ্ডল নিজের পছন্দমত বদলাবার জন্য নয়, ভোজন ও ভোজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য। অবশ্য পুরুষের সুন্দর মুখের জন্য নিছক এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে মেয়েরা বিশেষ 'ডায়েট' প্রয়োগ ক'রে দেখতে পারেন। অত্যন্ত ভারী চোয়াল ও অগ্রভাগোদ্যত চিবুক যেসব পুরুষের আছে, দেখলেই মনে হয় আদিম পিথিক্যানথ্রোপাসের সহোদর ভাই, তাঁদের জন্য যদি শুধু ষ্টীম-বয়েল্ড শাকসব্জী ভোজ্যের ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে হয়ত ফল ক্রমে ভাল হ'তে পারে। লেহন ও চোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চর্বণের মাত্রা তাঁদের বিশেষভাবে কমিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে চোয়াল ক্রমে চুপ্‌সে যেতে পারে এবং চিবুকও ক্রমে পশ্চাদপসরণ ক'রে নাসাগ্রের ভার্টিকাল রেখার উপর স'রে আসতে পারে। ভারী চোয়াল যেমন কাম্য নয়, দেখলেই চোয়াড়ে চোয়াড় মনে হয়, তেমনি প্রজেক্‌টিং চিবুকও সুন্দর নয়, দেখলেই কেমন শুয়োর শুয়োর ধারণা হয়। ভারী চোয়াল যাঁদের আছে তাঁদের মাংসভোজন করা উচিত নয়, এমনকি ছোলা-মটরভাজা বা চিনাবাদাম পর্যন্ত নয়, কেবল পলতার ঝোল, শুক্তো, আলুসিদ্ধ, শাকসব্জীসিদ্ধ এবং একটু মাখন খাওয়া উচিত। রুগ্ন হ'লে দুগ্ধপান করা চলতে পারে, কিন্তু দুগ্ধজাত কড়াপাকের সন্দেশ সম্ভব হ'লে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেসব পুরুষের মেয়েলী ধরনের চেহারা, মুখটা কতকটা মুর্গীর ডিমের মতন, কথাবার্তা ভাবভঙ্গী পর্যন্ত মেয়েলী ঢঙের হয়ে গেছে, মাংসই তাঁদের প্রধান ডায়েট হওয়া উচিত। মাংস মানে আধুনিক কায়দায় মাংসের শুক্তো বা 'স্টু' নয়, শিকে ঝলসানো আধকাঁচা মাংস। ছেলেবেলা থেকে যাঁরা খুব বেশী মাত্রায় চুষেছেন ও চেটেছেন এবং চিবিয়েছেন খুব কম, তাঁরাই শেষপর্যন্ত রমণীর রূপ ধারণ করেন। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, মেয়েলি-ধরনের পুরুষরাই বুড়ো-খোকার মতন আঙুল চুষে থাকেন এবং চোষার মতন কিছু একটা দেখলেই চুক্‌-চুক্‌ করেন। নানারকমের পদার্থ চুষেই শেষপর্যন্ত তাঁদের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবনেও তাঁরা কলা চোষেণ। যে সব পুরুষ রমণীতুল্য তাঁদের চোষ্য ভোজ্য একেবারে বর্জন করা উচিত; কাস্তা দিলেও খাওয়া (অর্থাৎ চোষা) উচিত নয়। তাঁদের একমাত্র ভোজ্য হওয়া উচিত চর্ব্য পদার্থ, চোষ্য নয়, লেহ্যও নয়। চর্বণসাপেক্ষ খাদ্য যত বেশী তাঁরা খাবেন ততই মঙ্গল। মাংস তো খাবেনই, এবং সম্ভব হ'লে কচ্ছপাঁঠা ছাড়া অন্যও অন্যান্য জানোয়ারের মাংস খাওয়া উচিত। মাংসের বদলে হাড় চিবুতে পারলে আরও ভাল হয়। পেষকের রীতিমত ব্যায়াম প্রয়োজন। তাহ'লে চোয়াল ক্রমশঃ চওড়া হবে এবং ডিম্বাকৃতি মুখের মধ্যভাগ হরাইজণ্টালি বিস্ফারিত হয়ে লুপ্ত পৌরুষ পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। মাংস ভোজনের সামর্থ্য না থাকলে কাঁচা পেয়ারা খাবেন, ঝুনো ন্যারকেল খাবেন, ছোলা-মটরভাজা যতখুশী খাবেন, কিন্তু ভুলেও যেন চুষবেন না কিছু এবং চাটবেন না। তাহ'লেই পেষকের দৌলতে আবার পৌরুষ ফিরে পাবেন।

খাদ্যের জন্য মুখমণ্ডলের রূপ যদি বদলাতে পারে, তাহ'লে জিব বদলাবে না কেন? যুগে যুগে জিবও বদলায়। দেহতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, কতকগুলো পেশী এবং তার উপরে ঝিল্লীর আবরণ দিয়ে মানুষের জিব তৈরী। উপরের এই ঝিল্লীর মধ্যে স্বাদেন্দ্রিয় থাকে। শুধু তাই নয়, কতকগুলি ছোট ছোট স্বাদকোরকও তার মধ্যে থাকে, ইংরেজীতে 'টেস্টবাড' বলে। কোন খাদ্য লালায় দ্রাবীভূত হ'লে এই সব কোরকের স্নায়ুতন্তু স্বাদ-অনুভূতিকে স্বাদকেন্দ্রে বহন ক'রে নিয়ে যায়। তখন আমরা টক মিষ্টি কষার আস্বাদবোধ করতে পারি। স্বাদকোরকগুলি জিবের উপর ছড়িয়ে থাকে, তার ফলে জিবের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের স্বাদ অনুভূত হয়। জিবের দুইপাশের কোরক দিয়ে টক, পিছনের কোরক দিয়ে তেতো, কটু ও কষা, ডগা দিয়ে মিষ্টি এবং উপর দিয়ে নোন্‌তা আস্বাদ পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রসঙ্গে সামান্য এই জিবতত্ত্বটুকু (জীবতত্ত্ব নয়) জানা প্রয়োজন, এবং তার জন্য জীবতত্ত্ববিদ্‌ হবার প্রয়োজন নেই। জিবতত্ত্বের সারকথা হ'ল এই:

জিবের দুইপাশ=টক
জিবের পিছন=তেতো, কটু ও কষা
জিবের ডগা=মিষ্টি
জিবের উপর=নোন্‌তা

এই জিবতত্ত্বের সঙ্গে পূর্বকথিত দন্ততত্ত্বের মোদ্দাকথাটা মনে রাখলে, একনিমেষে খাদ্যতত্ত্বের মহিমা প্রকট হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের (বিশেষ ক'রে বাঙালীর) আসল বৈকট্য যে কোথায়, তাও সহজে বোধগম্য হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে যে খাদ্যসঙ্কট শুধু কি খাদ্যের সঙ্কট, না ভোজনকলাকৈবল্য?

জিবতত্ত্ব অনুযায়ী যাঁরা বেশী টক খান তাঁদের জিবের দুটি পাশ ট'কে যায়, অর্থাৎ অম্লাস্বাদনে অসাড় হয়ে যায়। যাঁরা তেতো ও কষা জিনিস খান বেশী, অর্থাৎ চিররুগ্ন, তাঁদের জিবের পিছনদিকের কোন সাড় থাকে না। যাঁরা কেবল মিষ্টি খান, তাঁদের জিবের ডগায় কোন মিষ্টতাবোধ থাকে না। ঝাল-নোন্‌তা বেশী খান যাঁরা তাঁদের জিবের উপরটা উকোর মতন খরখরে হয়ে যায়। জিবতত্ত্বের এই সূত্রটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায়: রাঢ়দেশের (বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ইত্যাদি) লোকের জিবের দু'পাশের বিশেষ কোন সাড় নেই, ঝোলে ডালে অম্বলে কেবল টক খেয়ে খেয়ে তাঁদের জিবের দুটি পাশ একেবারে ট'কে গেছে। এই অতিরিক্ত টক খাওয়ার ফলে তাঁদের ভাষার মধ্যেও কেমন যেন টক্‌-টক ভাব এসেছে। প্রতিবেশি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কও রাঢ়দেশে মিষ্টমধুর নয়, অম্লমধুর। অবশ্য সম্পর্কের ব্যাপারে, মিষ্টমধুর না অম্লমধুর, কোনটির স্বাদ ভাল বলা কঠিন। সুতরাং সে-কথা না তোলাই ভাল। মনে হয় পৌণ্ড্রবর্ধনের লোকের মিষ্টপ্রিয়তা খুব বেশী। নানারকমের মিষ্টান্ন তো আছেই, রান্নাবান্নাতেও মিষ্টির আধিক্য। প্রকৃত বঙ্গদেশীয় যাঁরা তাঁরা ঝাল ও নুন একটু বেশী খান এবং তার ফলে জিবের উপরটা তাদের খর্‌খরে হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের অনেক জেলার ভাষাতে পর্যন্ত এই খরজিহ্বার প্রভাব খুব বেশী, যেমন বরিশালের।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, এক বাংলাদেশেই (ভারতবর্ষে তো রীতিমত আছে) ভোজনকলার বিভিন্ন 'কালচার-জোন্‌' আছে এবং প্রত্যেক 'জোনের' লোকের জিবেরও একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। রাঢ়ের লোকের জিবের দুটি পাশ অসাড় এবং তার টেস্টবাডগুলি বেশ পরিপুষ্ট। পৌণ্ড্রবর্ধনের লোকের জিবের ডগায় কোন সাড় নেই এবং নেই বলেই বোধ হয় তাদের স্বভাবচরিত্রে মহাপ্রভুভাব খুব বেশী, অর্থাৎ কথায় কথায় লজ্জা পেয়ে তাঁরা জিব্‌ বার ক'রে থাকেন। প্রকৃত বঙ্গদেশের জিব বেশ খরখরে, জকার-ধ্বনি ও ঝগড়ার ঝঙ্কারের মধ্যে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ভোজনকলার বিশিষ্টতার জন্য জিবের আঞ্চলিক বিকাশ তো হয়ই, দাঁত ও চোয়ালের বিশেষ ব্যবহারের জন্য মুখমণ্ডলের গড়নের উপরও তার প্রভাব পড়ে। মিষ্টান্ন ফলাহার ঘি দুধ ইত্যাদির পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁদের নধরকান্তি চেহারার মধ্যেই তার সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। গায়ের চামড়াটি দুধের সরের মতন তেল-চুকচুকে হয়ে যায়, ভুঁড়োটি হয় নেয়াপাতি ডাবের মতন। মাংসাশী যাঁরা তাঁরা সাধারণতঃ বিস্ফারিত-চিবুক, উন্নত-চোয়াল ও রুক্ষমূর্তি। দেখলেই বোঝা যায়, জানোয়ারের হাড় ও হাড়ের গাঁট চিবানো মুখ দুধ কলা ননীর ধার ধারেন না। সুতরাং ভোজন ও ভোজনকলা নগণ্য নয়, বহুদূরবিস্তৃত তার প্রভাব। সামান্য জিবের জন্য একটা জাত পর্যন্ত বদলে যেতে পারে।

ভোজনকলার যে কালচার-জোনের কথা বলেছি, কতকটা তাই নিয়ে কবিয়াল ভোলা ময়রার একটি ছড়া আছে। ছড়াটি এই:

ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।
হুগলীর ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্য থামলেই ভাল, হরি হরি বোল্‌।

ছড়াটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না এবং যা পাওয়া যায় তাতে ভোজন-কালচারের আঞ্চলিক বিশেষত্বেরও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই। মোটামুটি একটা নির্দেশ আছে মাত্র। যেমন, বাঁকুড়ার দই বা বীরভূমের ঘোল যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। ভোলা ময়রার মুখে ঘোল খেয়ে বলছি না, নিজের মুখে আকণ্ঠ খেয়ে বলছি। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, তথা রাঢ়দেশের পোস্ত, কলাই ডাল ও মাছের টকের স্বাদ যাঁরা পাননি, তাঁরা রাঢ়ের ভোজনকলা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ বলতে হবে। রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র পুরোহিত, গ্রামের সাধারণ গরীব 'গৃহস্থের বাড়ী থেকে ধনী

জমিদারগৃহে পর্যন্ত ভোজন করেছি—সর্বত্রই প্রধান উপকরণ ঐ পোস্ত, কলাই আর মাছের টক্। নিজে পূর্ববঙ্গের লোক, গোড়ার দিকে বেশ অসুবিধা হয়েছে, অপদস্থও হয়েছি। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহে (বীরভূমে) খেতে বসেছি, যথেষ্ট আয়োজনও তাঁরা করেছেন। পোস্তর একাধিক মেনু শেষ করছি (কলাই ডালসহ) আর মাছের বাটির দিকে তাক্ ক'রে আছি। খণ্ড খণ্ড মাছের টুকরো, গাঢ় গায়ে-মাখা ঝোল। মাছের টুকরোর সাইজ আধইঞ্চির বেশী নয়। ভাবছি বিজয় গুপ্তের কথাঃ "ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন-মৎস্যের কৈ।" বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে অনেকটা ভাত মেখে নিয়ে মুখে দিতেই জিবটা ট'কে গেল। প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুত হয়ে ভাত সরিয়ে রেখে ঘোল খেয়ে উঠে পড়তে হ'ল। এরকম আর দ্বিতীয়বার হয়নি। জয়দেব-কেঁদুলির মেলায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের গৃহে ভোজনও করেছি, কলাই পোস্তর গল্পও শুনেছি। বৃদ্ধবয়সে তাঁর অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি না থাকলেও, পোস্ত না হ'লে তাঁর একদিনও চলে না, রুটি লুচির সঙ্গেও পোস্ত প্রয়োজন। খাঁটি রাঢ়ের ভোজন।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সেকালের ভোজন ও রন্ধনকলার বিস্তৃত বর্ণনা যেরকম পাওয়া যায়, এরকম আর অন্য কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্বেরও অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বিজয় গুপ্ত নানারকম আমিষ নিরামিষ ব্যঞ্জনের বর্ণনা করেছেন, যেমন—"নারিকেল-কোরা দিয়া রান্ধে মশুরীর সুপ", "কলার থোড় রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই", "সরিষাবাটা দিয়া রান্ধে পানীকচুর চৈ" "মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটী", "শুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইয়ের ডাল" ইত্যাদি নিরামিষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মাছ মাংসের মধ্যে—"রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ", "মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ", "ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা, তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙড়ির মাথা", "ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল", "মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল, ছাল খসাইয়া রান্ধে বড়ো খাসীর তেল", "ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম" ইত্যাদি ফরমুলো আধুনিকারা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন, যদি অবসর পান।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম পশ্চিমবঙ্গের লোক। খুল্লনার রান্নার মধ্যে রাঢ়ের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু তা সহজে বোঝা যায় না, কারণ নিরামিষ ব্যঞ্জন বাংলাদেশে সর্বত্র প্রায় সমান। তবু দু'একটির কথা উল্লেখ করছি, যেমন—'ঘৃতে ভাজা পলা কড়ি, উনটা শাকে ফুলবড়ি', 'দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড', 'মুগ-সুপে ইক্ষুরস', ইত্যাদি। মাছের মধ্যে চিতলের কোলভাজা, 'মান বড়ি মরিচে ভূষিত' রোহিত মৎস্যের ঝোল আছে এবং তার সঙ্গে 'রাঁধিল পাকাল ঝস দিয়া তেঁতুলের রসও' আছে। বিশেষ যে পার্থক্য আছে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তা মনে হয় না। তার একটি প্রধান কারণ হ'ল, ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাংলা দেশে ভোজনকলার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল। আমিষভোজী বাঙালীর মধ্যে নিরামিষ-ভোজনের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল এবং প্রচারের ফলে মধ্যবিত্ত ও ধনী বাঙালী সমাজে ভোজনের পরিবর্তনও হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সাধারণ বাঙালী অবশ্য তখনকার মতন এখনও নিরামিষের প্রভাবমুক্ত। তান্ত্রিক ধর্মের পীঠস্থান রাঢ়ের কবিরাও নিরামিষের বৈষ্ণব প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম দাসীকে দিয়ে যেভাবে শাক সংগ্রহ করিয়েছেন—

নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা,
তিক্ত ফলতার শাক কলতা পলতা।
সাজতা বনতা বন পুই ভদ্র পলা,
হিজলী কলমী শাক জাঙ্গী ডাঁড়ি পলা।
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে,
মহুরী শুলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেতে।
ডাগ ডাগ তোলে যত সরিষার আড়া—ইত্যাদি

তাতে মনে হয় তিনি চন্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বসেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বর্জন করতে পারেন নি। বৃন্দাবন দাস 'শ্রীশাক ব্যঞ্জনে' গৌরচন্দ্রের তৃপ্তির কথা উল্লেখ ক'রে শাকের সৌভাগ্য বর্ণনা করেছেন। হেলঞ্চা সালঞ্চায় ভক্তের 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির' (আধ্যাত্মিক অর্থে, লৌকিক অর্থে নয়) কথাও তিনি বলেছেন। লৌকিক অর্থে, কেবল শাকব্যঞ্জন ভোজনে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' অবশ্য সব সময় ঘটতে পারে, কিন্তু শাকমাহাত্ম্যের সঙ্গে কৃষ্ণমাহাত্ম্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতটা আছে না-আছে তা কেবল শাকজীবী ও শাকপন্থীরাই বলতে পারেন। একটা কথা অবশ্য মনে হয়। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েরই লীলাভূমি কাটোয়া থেকে বেশী দূরে নয়। কাটোয়ার ডাঁটাই কি তাঁদের প্রগাঢ় শাকপ্রীতির কারণ? তাছাড়া কেশব ভারতীও ঐ অঞ্চলের লোক এবং শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে কাটোয়ায় সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনদিন অনাহারে থেকে তিনি গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে যা আহার করলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—নানা রকমের 'বাস্তুক শাক', 'পটোল কুষ্মান্ড বড়ি', মান কচু, কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকী', 'পটোল ফুল বড়ি ভাজা কুষ্মান্ড মানচাকী', 'মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মান্ড', মধুরাম্ল, বড অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়, 'মুদ্গ বড়া, মাষ বড়া, কলা বড়া মিষ্ট' ইত্যাদি ইত্যাদি। নিরামিষ আহার শেষ হবার পরে খেলেন—'ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠা ইষ্ট', 'সঘৃত পায়স মৃৎকুন্ডিকা ভরিয়া', 'তিন পাত্রে ঘনাবর্ত দুগ্ধ' 'দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি, চাঁপাকলা দধি সন্দেশ' ইত্যাদি। শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গৌরচন্দ্র একদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভট্টাচার্য গৃহিণী সযত্নে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পাক করেছিলেন তা সবই নিরামিষ। তার মধ্যে 'দশবিধ শাক', 'দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মান্ড, বেশারী নাফরা, মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বৃদ্ধ কুষ্মান্ড, নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্তাকী' প্রভৃতি সবই আছে। মিষ্টান্ন ও ফলাহারেরও অভাব নেই। এসব কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা। বৃন্দাবন দাসও 'বিংশতি প্রকার শাক, নানা প্রকার শর্করা সন্দেশ' ইত্যাদির কথা ব'লে অবশেষে লিখেছেন—

ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।

পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের যুগ থেকে বাঙালীর খাদ্যের একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর হ'তে থাকে। মাছ মাংসাদি আমিষ ব্যঞ্জন থেকে নিরামিষের দিকে ঝোঁক পড়ে বেশী। শ্রীচৈতন্যের যুগকে আমরা আমিষ-কালচার থেকে নিরামিষ-কালচারে রূপান্তরের যুগ বলতে পারি। নিরামিষ ভোজনের 'করোলারি' রূপে ফলাহার ও মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যও এই সময় দেখা দেয়। শাক মানকচু কুষ্মান্ড, এমন কি বৃদ্ধ কুষ্মান্ডপ্রীতির সঙ্গে নারকেল সন্দেশ, পুলিপিঠা পায়স ও চিপিটক-কদলকানুরাগও বৈষ্ণব গোস্বামীদের গভীর হয়ে ওঠে। "পীত ঘৃতসিক্ত অন্নস্তূপেই" তখন রেওয়াজ ছিল, ঘিয়ে ভাজা লুচির কথা শোনা যায়নি। **বৈষ্ণব মহোৎসবই প্রধানতঃ বাঙালীর নিরামিষ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নকে বৈচিত্র্যে ও মনোহারিত্বে চারুকলার স্তরে উন্নীত করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের এও একটা উল্লেখযোগ্য দান। মনে হয়, এও যেন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা রূপ। বাংলা দেশ প্রাগার্য সংস্কৃতিপ্রধান দেশ, শক্তিপূজা, তান্ত্রিক আচার ব্যবহার বাঙালী জাতির মজ্জাগত। মাংসই বাংলার দেবদেবীর প্রিয়তম খাদ্য, বাঙালীরও। ইসলামের অভিযানের পর বিশেষ ক'রে, মাংসের প্রাধান্য আরও বাড়তে থাকে এবং রীতিমত মাংস ভোজনের একটা হিড়িক আসে। চৈতন্য চরিতকারেরা সকলেই প্রায় "মদ্য মাংস" ভোজনপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয় শুধু হিংসা বা বলিদান নয়, ইসলাম ও তন্ত্র উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বাঙালী বৈষ্ণবরা মিষ্টান্ন, ফলাহার ও নিরামিষ ব্যঞ্জনবিলাসের প্রবর্তন করেছেন। নারকেলের নাড়ু, চিঁড়ের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, সরের নাড়ু প্রভৃতি নানা রকমের নাড়ু তৈরী ক'রে যেন তাঁরা বাংলার জনসাধারণের মন ভুলানোর চেষ্টা করেছেন। বাঙালীর মিষ্টান্নের তাই এত বাহার, এত বৈচিত্র্য! অনুপম শিল্পকলার পর্যায়ে তাই তার চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বাঙালীর নিরামিষ-ব্যঞ্জনও তাই শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। বাংলা দেশে ভোজনকলাকে শিল্পকলার মর্যাদা দিয়েছেন প্রধানতঃ বাঙালী বৈষ্ণবরা।**

ষোড়শ শতাব্দী থেকে মাছ মাংসের যুগ ছেড়ে আমরা চিপিটক-কদলক ও কচু কুষ্মান্ডের যুগে পদার্পণ করেছি। শাক কচুর প্রভাব যেমন চন্ডীভক্ত হয়েও মুকুন্দরাম ছাড়তে পারেন নি, তেমনি রাঢ় দেশের 'ধর্মমঙ্গলের' অন্যান্য কবিরাও মিষ্টান্ন বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেন নি। ঘনরাম উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাকাইল দিয়া ক্ষীর খন্ড ছানা ননী পূরে দিয়া "মিঠা", "ঘৃতপক্ব লুচি", "লাড়ু কলা চিনিফেণী", "মজা মর্তমান মিছরি মনোহরা মতিচুর খাসামৃত" ইত্যাদির কথা বলেছেন। এমন কি, ভারতচন্দ্রের যুগে রীতিমত বিলেতী খানা চালু হওয়া সত্ত্বেও "আশিকা পিষ্টুখী পুরী পুলি চুটী রুটী রাম রোট মুগের সামুলী, কলাবড়া ঘিওর পাপর ভাজা পুলী", "সুধা রুচি মুচি মুচি লুচির" মরশুম শেষ হয়নি দেখা যায়।

বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাঙালীর ভোজনকলাকে শিল্পকলার স্তরে নিয়ে গেছেন সত্যি, কিন্তু বাঙালী জাতিকে কেবল আর্টিষ্টিক খানা খাইয়ে দোদুল দে ও শিহরণ সেনের জাতিতেও পরিণত করেছেন। চিপিটক-কদলকের গুণগান বিদেশী সাহেবরাও করেছেন, খাদ্যগুণেও তার অস্বীকার করা যায় না। মিষ্টান্ন যে শুধু মন হরণ করে তা নয়, বলও বৃদ্ধি করে। কিন্তু চিপিটক কদলকের সঙ্গে যে দই চাই, যে ঘনাবর্ত দুগ্ধ চাই, তা

কে খায় পাই? বাকি থাকে নিরামিষ ব্যঞ্জনবিলাস, বিবিধ শাক মোচা, কুষ্মান্ড মানকচু বড়ি ইত্যাদি। বৃন্দাবন দাস শাক-কচু-কুষ্মান্ডভোজনে 'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি'র কথা বলেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে না হোক, লৌকিক অর্থে আমরা যে শাক-কচু-কুষ্মান্ডাহারের ফলে জাতিগতভাবে 'কেষ্ট' পাচ্ছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুষ্মান্ডবিরোধী হলেও, শাক-কচুর বিরোধী নই। পাকা গিন্নীর রান্না হ'লে ভারত-চন্দ্রের 'মুচি মুচি লুচি কতগুলি' ফেলে কচু খেতে হবে, এও স্বীকার করি। কিন্তু কচু কচু ছাড়া কিছু নয়, কচুর আছে কি? শাকেই বা কি আছে? কাটোয়ার কবিরা যতই শাকের গুণগান করুন না কেন, দেহের হাড়ই যদি লিকলিকে কাঠি হয়ে যায়, তাহলে শাক খেয়ে লাভ কি? কাটোয়ার ডাঁটার তবু একটা ইউটিলিটি আছে, বেশ ক'রে চিবুতে পারলে পেষকদন্তের ক্রিয়ায় চোয়াল ভারী হ'তে পারে এবং মেয়েলী ধরণের পুরুষের ডিম্বাকৃতি মুখমন্ডলে পৌরুষের ভাব ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু শাক, তা সে যে শাকই হোক, ঘাসেরই সে মাসতুতো ভাই এবং ঘাস খেয়ে দুধ দিতে কোন মানুষই চায় না।

বাঙালীমাত্রই নিরামিষ ব্যঞ্জন ভালবাসেন এবং ঠাকুমা-পিসিমাদের যুগের নিরামিষ রান্না শেষ হয়ে যাচ্ছে ব'লে আফশোস করেন। 'কোথায় গেল সেই মোচার ঘন্ট আর এ'চোড়ের ডালনার যুগ', ব'লে অনেককে হাহুতোশ করতেও দেখেছি। আমার কেবল মনে হয়, কোথায় গেল সেই বাঙালী মেয়েরা যারা—

কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া,
ভাজিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া॥
কৈতরের বাচ্চা ভাজে, কাউঠার হাতা।
ভাজিছে থাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা॥
বনিয়া শলুপা বাটি দারচিনি যত।
মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত॥
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়া থর ঝাল।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল॥

মনে হয় ব'লে এমন কথা অবশ্য আমি বলছি না যে তাঁরা যেখানেই যান ফিরে আসুন আবার সেই রান্নাঘরে এবং পাঁঠার মাংস থর ঝাল দিয়ে রান্না ক'রে আমাদের খাওয়ান। 'দিলখুশ কান্তা খাই পুনবন্তার মতন আবার আমরা পরম তৃপ্তিতে খাই। না খেতে পেলেও অমন কথা বলব না। আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে, রান্নাঘরই মেয়েদের কারাগার এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানবগোষ্ঠী ঐ রান্নাঘর কারাগারে ক্রীতদাসের মতন বন্দী হয়ে থেকেছে। অতএব 'ডাউন উইথ রান্নাঘর!' আর 'ডাউন' না বলেই বা উপায় কি? কারণ আধুনিক গৃহিণীরা কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ টেলিফোন গার্ল, কেউ স্টেনোটাইপিস্ট, কেউ কেরানী, কেউ ক্যানভাসার। রান্নাঘরে ব'সে মোচার ঘন্ট বা মুগের সুপ রান্নার সময় কোথায় তাঁদের? কিন্তু রান্নাঘর ডাউন ক'রে 'লঙ লিভ পাইস হোটেল' বলতেও আমি রাজী নই, পেটের উপর দুর্বাঘাস গজিয়ে গেলেও না। তাহ'লে পুনবন্তাদের খাদ্যটা শেষ পর্যন্ত দিলখুশ কে? যদি বলেন ভৃত্য বা রাঁধুনি বামুন, তাহলে বলব এখনও আপনি সেই 'পুরাতন ভৃত্যের' যুগে বাস করছেন। পুরাতন ভৃত্যের যুগ নিশ্চিত অস্তাচলে। সুতরাং 'দিলখুশ কে' প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। ঘুরে ফিরে 'দিলখুশ কান্তাতেই' আসা ছাড়া উপায় নেই, কারণ দিলখুশ হোটেল বা দিলখুশ কেষ্টা, কোনটাই সম্ভব নয়। এটা একটা ট্রানজিশনাল ক্রাইসিস, যুগসন্ধির সংকট! রান্নাঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে যাবার মাঝপথের ভোজনসংকট। অথচ কাজ ক'রে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখেও কান্তারা দিতে পারেন এবং পুনবন্তারা খেতেও পারেন। সর্ব-মঙ্গলাকে স্মরণ ক'রে নানা রকমের নিরামিষ ও আমিষ ব্যঞ্জন তাঁরা রাঁধতে বসুন, এমন কথা বলছি না। 'ডাল ভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা' গোছের কিছু একটা হ'লেই পুনবন্তারা 'দিনতো তা দিনা' ক'রে নেচে সানন্দে খেতে পারেন।

সুতরাং সংকট শুধু খাদ্যসংকট নয়, 'দিলখুশ কান্তার'ও সংকট। খাদ্য ও কান্তা উভয় সংকটে পড়ে বাঙালী পুনবন্তাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে কিছুকাল পরে তাঁরা শাক আর মুগের সুপ ছাড়া আর কিছু খেয়ে হজমও করতে পারবেন না। অর্থাৎ বাঙালী জাতির অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। গোস্বামী যুগের শাক কচু কুষ্মান্ড খেয়ে খেয়ে একে চোয়াল চুপসে যাচ্ছে, তার উপর কান্তারা কর্মক্লান্ত এবং দেখবার কেউ নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সত্যিই দুর্দিন।

সারেঙর সুর

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

অতঃপর একে একে সব বলে যায় মতিয়া। সারেঙ্গির ইতিকথা পর্যন্ত।

অন্ধ কুসংস্কারের ভীতি চামনকেও পেয়ে বসে। সে বলে যে এ দেবতারই অভিশাপ। দেব মন্দিরে কেন প্রবেশ করেছিল মতিয়া পূজার নৈবেদ্য না নিয়ে?

মতিয়া মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চামন চলে যায় উপঢৌকনগুলির দিকে দৃকপাত না করে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মতিয়া ওগুলো হাতে তুলে নেয়। কি করবে এখন? দেবে নাকি ছুঁড়ে ফেলে?

বিবেক তাকে নিষেধ করে। পুরুষের একান্ত সাহচর্যে দোষ হতে পারে, কিন্তু কি দোষ তার উপহার গ্রহণে? রুপোর হাঁসুলি তো আর জীবন্ত বাহুডোর হতে পারে না। নোলক পারে না তার কম্প্র ওষ্ঠে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি জাগাতে। মতিয়া অলংকারগুলো পরে সযত্নে। কাঁকই চালায় দীঘ চিকুরে। তারপর উঁচু খোঁপায় পরে সদ্যফোটা ফুলের কলি।

প্রদোষালোকে সারেঙ্গির মূর্চ্ছনা শোনা যায়। সে এক অবিস্মরণীয় বাদল সন্ধ্যা। বাঁশীতে অনুরাগের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে আসে চামন। সংগত চলে সুরের মাধ্যমে, কিন্তু এ ও-কে কিছু মৌখিক বলতে পারে না।

এমনি করে শরৎ কাটে, হেমন্ত কাটে, কাটতে চায় না শীতের সুদীর্ঘ নিশা। পাহাড় অরণ্যের মাথার অশ্রু তুষারে সাদা হলেও তবু শীত যায় না। কাঁপে সারেঙ্গির সংগে বিরহী বাঁশীর নব নব রাগ, নব নব ধ্বনি।

একদিন শীতও শেষ হয়ে আসে। গিরি-নদী অর্গল খোলে। জীর্ণ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে প্রকৃতি। দেখা যায় রক্ত পীত পুষ্পের হাস্যোজ্জ্বল ক্রীড়া, হরিণীর দেহ আঘ্রাণ করে আর্ত মৃগ। প্রজাপতির পাখায় সুগন্ধি ফুল-রেণু।

কোকিল ডাকে, কিন্তু মতিয়ার চমক ভাঙার লক্ষণ দেখা যায় না। গন্ধর্ব কন্যা বুঝি বা সারেঙ্গির সুরের হৃদয়ে লাভ করেছে সমাধি-শয্যা। সে স্পর্শ, গন্ধ, অনুভবের বাইরে বুঝি দেহাতীত হয়ে গেছে। প্রাণ নেই, যেন শুধু সুর।

আবার কোকিল ডাকে।

চমকিত, বিস্মিত চামন সব ভুলে তাকে জড়িয়ে ধরে। তার সমস্ত সুদৃঢ় সত্তা দিয়ে অনুভব করে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস, পরমায়ু।

গন্ধর্ব কন্যা, দেবকন্যায় নয়, মানব কন্যায় রূপান্তরিত হয় পলকে। সে বলে, 'ঘর চল চামন। বাঁশী আর সারেঙ্গিটে তুলে নে।'

হারাবীন

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পরিবারটি যখন প্রায় দুর্ভিক্ষ কবলিতে, সেই সময় একদিন পরিমলের খুড়তুতো ভাই আসিয়া পরামর্শ দিল, দিদি, "কাকলী"তে কালিদাস নাটকে রাজকন্যার পার্টে দু'খানা গান আছে, তুমি করবে পার্টটা? কথা বিশেষ নেই, দু'খানি শুধু করুণ গান। যদি রাজী হও তো বলো আমি "কাকলী"র কর্তা শ্রীকনককিরণ করকে নিয়ে আসি। ভাল টাকা দেবে।

পরিমলের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, আবার তখনই দীপ্তিটুকু নিবিয়া গেল; বলিল, কিন্তু মা কি—

প্রসূন বলিল, তুমি একবার ব'লে দেখ না ছোটদি'। "কাকলী" সেকালের নোংরা থিয়েটার নয়, তা ত' জান! আর এ রকম ক'রে ক'দিনই বা চলবে? দিন দিন কি হচ্ছে অবস্থা দেখছই ত!'

পরিমল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যা করিয়া দিন চলিতেছে, সে ত কাহারও অজানা নাই। দুটি ছোট ভাই পয়সার অভাবে লেখাপড়া ছাড়িয়া, রাস্তায় রাস্তায় মার্বেল খেলিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, শিস্ দিয়া ছোটলোকদের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার অমন পিতার সন্তানদের এই দুর্গতিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায়। তাহার কেবলই মনে হয়, কন্যা না হইয়া সে যদি পিতার পুত্র হইত, তাহা হইলে তাহার ভাইদুটিকে কখনই এমন ব'য়ে যেতে দিত না। কিন্তু, সে কন্যা। শুধু কন্যা হইলেও কথা ছিল না। তাহার নারী-জন্মটাই যে ব্যর্থ হইয়া গেল—কাহারও কোনও উপকারেই যে আসিল না। পরিমলের চোখে জল টলমল করিতে লাগিল। প্রসূন বলিল, ছোটদি', তুমি একটিবার ব'লেই দেখ না! আমি রইলুম এখানে, জ্যাঠাইমা আমাকে ডাকেন যদি, আমিও বলবো'খন।

প্রসূনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া পরিমল উঠিয়া গেল; প্রসূন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। ছোটদিকে রাজী করায় তাহার বিশেষ স্বার্থ ছিল। নব্য-তন্ত্রের আধুনিকতম রঙ্গমঞ্চ "কাকলী"র উচ্চ-প্রশংসিত সাংস্কৃতিক অভ্যাভিযানের সহিত আপনাকে সংযোজিত করিবার এই একটিমাত্র উপায়ই সে উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছিল। নিজের ও অন্যান্য কলেজ ও সাংস্কৃতিক বৈঠকে বাঁশী বাজাইয়া প্রসূন যথেষ্ট যশ অর্জন করিয়াছে; কিন্তু "কাকলী"তে কিছুতেই পাত্তা করিতে পারিতেছে না। তাহার বিশ্বাস সুধা-কণ্ঠী পরিপ্লাবিত সৌখীন সমাজেও তাহার ছোটদি'র মধুর কণ্ঠ অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সুধীজনমণ্ডলী যদি সে অপ্সরাকণ্ঠের সন্ধান পায় ত লুব্ধিয়া না হইয়া পারিবে না। তাহা হইলে জ্যাঠাইমার সংসারের দুঃখ ত ঘুচিবেই, তাহার মনোরথও সার্থক হইবে, একদিন "কাকলী" তাহার বাঁশীর কদরও করিবে।

জ্যাঠাইমা আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে ছেলে, এ কি তোর দুর্বুদ্ধি! তোর ছোটদি' চিরদিনই কি এমনই ভেসে বেড়াবে? স্বামীর ঘর তাকে করতে হবে না?

পরিমল পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়া উঠিল, ছ' বছর যেমন ধারা ঘর করলে, তেমনই করবে!

শাশুড়ী মাগী কি চিরকাল বেঁচে থাকবে রে? সেই দজ্জাল মাগী মরলেই দীপঙ্কর তোকে নিতে আসবে, তুই দেখিস্ বাছা। তখন যদি তুই থিয়েটার করছিস্ শোনে, তখন কি আর—

পরিমল বলিল, ভাবতে ভাবতে ভবিষ্যতে অনেক দূরে চ'লে গেলে; কিন্তু মা, আমার কচি কচি ভাই দুটোর কথা ত ভাবলে না। তাদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন দিতে পার না, এক পয়সার মুড়ীর জন্যে তোমার আঁচল ধ'রে কাঁদে যখন, কৈ, একটা পয়সা ফেলে দিতে পার না। কোমরে তাদের একখানা কাপড় জোটে না, তাদের লেখাপড়া শেখাতে পারলে না, আমার অমন বিদ্বান বাবার ছেলে হয়েও

হাব, দুঃখে, কষ্টকাড়া, হাড়হাবাতে হয়ে রইলো, কৈ সে কথা ত একটিবার ভাবলে না। সেবারে নার্সিং শিখতে যেতে চাইলুম, দিলে না যেতে, প্রসূন স্কুল ট্রেনিঙের জোগাড় ক'রে দিলে, তাতেও তুমি নাক সেঁটকালে! সেগুলো হ'লে আর কিছু না হোক্ ছোঁড়া দু'টো খেতে পেতো। মা, তিন মাসের ওপর তোমার ঘর ভাড়া দিতে পার নি, বাড়ীওলা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে গেছে, আদালতের ডিক্রী বার করেছে তাড়িয়ে দেবেই একদিন, তখন ভাই দু'টোর হাত ধ'রে, আমাকে নিয়ে কোন্ চুলোয় আশ্রয় নেবে, সেটাত তোমার মনে পড়লো না? সহায় বলতে, সম্বল বলতে, আত্মীয়-বন্ধু বলতে একমাত্র এই ছেলেটা, মাস্টারী ক'রে আরও কি-কি ক'রে দু'টো চারটে টাকা এনে তোমাদের দিয়ে যায়, তাই এখনো দিন কাটছে, আরও কতদিন ভূতের বোঝা ঐ ছেলেমানুষটা বইবে, তা'ও কি একবার ভেবেছো, মা?

আত্মপ্রসঙ্গে বিচলিত হইয়া প্রসূন শশব্যস্তে কহিল, জ্যাঠাইমা, থিয়েটারের নামেই নাক সেঁটকাবার দিন আর নেই, বিশেষ "কাকলীর"। আমাদের স্কুল-কলেজ যেমন, বড় বড় আফিস আদালত যেমন, "কাকলী"র সমস্ত ব্যবস্থাও ঠিক তেমন। দুর্নামের ভয় "কাকলী"তে নেই।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, ওরে বোকা ছেলে, থিয়েটার ত! তার ওপর তোর ছোটদি'র শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা পাড়াগেঁয়ে, তা জানিস্ ত!

পরিমল বলিল, আমি যদি মন্দ না হই, আমাকে মন্দ ক'রে কার সাধ্য আছে, মা?

যা ভাল বোঝ করো বাছা। আমাকে যেন সারা জীবনটা তোমার জন্যে চোখের জল ফেলে মরতে না হয়! মা-মাগীর ভয়েই সে আসে না, খোঁজ-খবর করতে পারে না; নইলে দীপঙ্কর আমার তেমন ছেলেই নয়। বিয়ের সাতদিন পরে যখন তিনি তোমাকে নিয়ে এলেন, তখন একটি কথা আমাকে বলেছিলেন, সে ত বাছা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। শ্বশুর মিন্সে ভেড়ো, রাম-না গঙ্গা-না কোন কথাই বললে না, মাগী ত রণবাইচণ্ডী, বোয়ের, বোয়ের বাপ-মা'র সপিণ্ডকরণ না ক'রে জলগ্রহণ করে না। বললেন, গরুর গাড়ীতে উঠ্‌তে যাচ্ছি দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা, দেখি তার চোখে জল। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলে না, পাছে ধূমাবতী মা দেখতে পায় তাড়াতাড়ি স'রে গেলো; কিন্তু চোখ মুছতে মুছতে গেলো, স্পষ্ট দেখলুম। রাগ করে তিনি পরির আবার বিয়ে দেবো, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কত কি-ই না বলতেন, তখনই আবার দীপঙ্করের চোখের জল মনে পড়তেই থেমে যেতেন।—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখেও প্রবাহ ছুটিল; অঞ্চলাগ্রে মুখ ঢাকিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, পরিমল বলিল, সেই দিনই যদি আসে, মা, চোখের জলের অসম্মান আমি করবো না।

অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই বাছা, বলিয়া জননী প্রস্থান করিলেন।

পরিমল "দেবসেনা" নাম পরিগ্রহ করিয়া "কাকলীর" কবি কালিদাস নাটকে দাম্ভিকা পতি-পরিত্যক্তা অনুতাপ-প্রপীড়িতা রাজনন্দিনীর ভূমিকাভিনয়ে রাত্রিশেষে যশোমুকুট শিরে ধারণ করিয়া নাট্যজগতে বিজয় বৈজয়ন্তীরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কথা বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাস জন্মে, তথাপি সত্য কথা, প্রত্যক্ষ সত্য। মুখে মুখে দেবসেনার জয়গাথা; সংবাদপত্র খুলিলেই তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং এক রাত্রে এই অঘটন সংঘটন। মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে এক অজ্ঞাতনাম্নী, পরিচয়বিহীনা কিশোরী হিন্দুস্থান গ্রামোফোন রেকর্ডে দু'খানি কীর্তন গাহিয়া সংগীতামোদীর চিত্ত জয় করিয়াছিল। পক্ষ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই মধুলোভে মত্ত অলি কলির অঙ্গে আত্মনিবেদন করিয়াছিল; ফুলরেণু অঙ্গে মাখিয়া জীবন ধন্য মানিয়াছিল। "কাকলী"র দেবসেনা কলিকাতা বিচঞ্চল করিয়াছে।

দুই

প্রসূন বলিতেছিল, তুমি 'না' করো না, ছোটদি'। আমি এক রকম কথা দিয়ে ফেলেছি ভাই, আমার মুখটি এবারকার মত রক্ষা করো দিদি, চিরকাল তোমার আমি গোলাম হয়ে থাকবো।

পরিমল হাসিয়া বলিল, ছোট ভাইটির চেয়ে গোলাম কি বেশী আদরের জিনিষ রে?

প্রসূন বলিল, "কেকা"র ও'রাও ঠিক এ'দেরই মত ভদ্র, সুনামও "কাকলী"র মত। আরও সেইজন্যেই আমি এক কথাতেই রাজী হয়ে পড়েছি। আর, তোমাকে নতুন ক'রে কিছু খাটতেও হবে না, কবি কালিদাসের গান-দু'টিই ও'রা ও'দের ছবিতে লাগিয়ে দেবেন। টাকাটাও নিতান্ত কম নয়, ছোটদি'। একটি দিন, এক ঘণ্টার জন্যে স্টুডিয়োতে যাবে, গান দুখানি গেয়ে দু'হাজার টাকার চেক্‌খানা নিয়ে বাড়ী আসবে। লক্ষ্মী ভাই ছোটদি'—

ছোটদি' বলিল, লোকে যে পেশাদার বলবে রে?

ইস্! তা আর বলতে হয় না। কবি-তীর্থে সেদিন তোমার চেয়ারের পাশে বসবার জন্যে রাণী, মহারাণী, ভাইস-চ্যান্সেলার, এসেম্বলীর স্পীকার, প্রেসিডেণ্ট, প্রিন্সিপ্যাল-প্রোফেসারদের মধ্যে কি রকমের ঘোড়দৌড় প'ড়ে গেছলো, দেখো নি? মেয়েপুরুষের 'স্মরণী'গুলো সই করতে করতে হাতে তোমার ব্যথা হয় নি? তোমার জন্যেই ইউনিভার্সিটিতে মিউজিক্ চেয়ার হচ্ছে "জগ-জ্যোতিঃ"তে পড়েছ ত? তোমাকে পেশাদার বলতে পারে এমন স্পর্ধা কার আছে সে ত আমি জানি নে।

পরিমল চুপ করিয়া রহিল। নীরবে, নতমুখে, বোধ করি বা প্রসূনের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতেছিল। তাহার প্রফুল্ল মুখের লালিমাটুকু, ওষ্ঠাধরের চাপা প্রসন্ন হাস্যরেখাটি, তাহার খঞ্জনগঞ্জন নয়নের ক্ষণিক দীপ্তিটুকু প্রসূনের প্রত্যাশাপন্ন দৃষ্টির অগোচর ছিল না। তাই সে পুনরায় প্রবলোৎসাহে বলিতে লাগিল, তিন চার মাসে যেমন-তেমন ক'রে দু' তিনশো সমালোচনা কাগজে কাগজে বেরিয়েছে, আমিও এনে দিয়েছি, কাগজওলারাও তোমাকে গাদা গাদা পাঠিয়েছেন, তুমিই বলো কুৎসিত কটাক্ষ দূরে থাক্, একটা বাঁকাচোরা ইঙ্গিতও কোথায় দেখেছ? ছোটদি, আমাদের দেশ কি আজও কূপমণ্ডুক আছে, মনে করো? স্বাধীনতা যেদিন পেয়েছি, সেইদিন থেকেই সংস্কৃতি, কৃষ্টির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা ধন্য হয়েছি।

পরিমল আস্তে আস্তে অত্যন্ত করুণ, বেদনার্দ্র কণ্ঠে কহিল, মা যে রোজ রাত্রে ফুলে ফুলে কাঁদে ভাই।

এই ক'টা দিন, ছোটদি, এই ক'টা দিন একটু সবুর করো, জ্যাঠাইমার "টিয়ার্স স্পেসিফিক্" এনে দিচ্ছি।

আপনা হইতেই আকুল বিস্ময়ে পরিমলের চক্ষু দু'টি প্রসূনের মুখের উপরে নিবদ্ধ হইয়া কি যেন সন্ধান করিতে লাগিল। দেহের প্রতি লোমকূপ যেন সেই সঙ্গে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু মুখ দিয়া একটি প্রশ্ন পরিমলেরও বাহির হইল না, প্রসূনও বোধ করি কথা বলিবার প্রয়োজন বুঝিল না।

একটু পরে প্রসূন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, তা'হলে বিকেলে আমি ও'দের আনবো এগ্রিমেণ্ট সই করাতে। চারটে? আচ্ছা, পাঁচটা, তাই তাই! —সে আহ্লাদে গদগদ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, পরিমল তাহাকে থামাইয়া বলিল, ঐ কথাটা মা'কে তুই ব'লে যা না ভাই।

কোন্ কথা গো?

ঐ যে কি একটা এখনি বললি তুই। সেইটে মা'কে—

প্রসূন পরিমলের বক্তব্যটা বুঝিল কিনা বলিতে পারি না, উত্তরে তাহা আদৌ স্পষ্ট হইল না, কিন্তু আর তাহাকে দাঁড় করানোও গেল না। সে যেন অশ্বমেধের অশ্ব, গ্যালপে চলে। বলিয়া গেল, তুমি বলো, ছোটদি, তুমি বলো। আমরা আসবো বিকেলে—ঠিক পাঁচটা মনে থাকে যেন।

কথা পরিষ্কার হইল না। অতীতের সহিত বর্তমানকে মিলাইয়া, দুঃখের সহিত সুখের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া, হতাশা ও আশায় মিশাইয়া পাঁচ রঙা পরিকল্পনার একটা ফানুশ তৈরী করিয়া চিন্তায় তাহাকে সজ্জিত, সঞ্জীবিত করিয়া, কাঁদিয়া, হাসিয়া, মান করিয়া, সাধিয়া, মান ভাঙাইয়া একটা বুঝাপড়া করিবার পথ দেখিতে পাইলে সে যে বাঁচিয়া যাইত, প্রসূন সেই পথটাই বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। বিকালেও সে সুযোগ হইল না। প্রসূন ভিড়ের সঙ্গে আসিল, ভিড়ের সঙ্গেই চলিয়া গেল। দুই তিন দিন তাহার জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া পরিমল ছোটভাইটিকে দিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, তবুও আসিবার তাহার ফুরসৎ হয় নাই। প্রসূনদের বাড়ী বহু দূরে নয়, পরিমলের বড় ভাই প্রসেনজিৎ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার করিয়া তাহার খোঁজে গিয়াও দেখা পায় নাই, কোথায় দেখা হইতে পারে সে খবরটুকুও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। প্রসেনজিৎ ছেলেমানুষ, সব কথা বেশ বুঝিতে বা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারে না বটে, তবে তাহার একটা কথা পরিমলকে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কাকিমা, অর্থাৎ প্রসূনের জননী খুব রাগ করিয়াছেন, বলিয়াছেন, প্রসূনের খবর তোমরাই ত ভাল জান বাছা! কোথায় যায়, কি করে, কোথায় থাকে সে সবের পরামর্শ ত তোমাদেরই সঙ্গে। বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল দু'বেলা খাওয়ার। তিনদিন তা'ও আসেনি। তোমাদের এখন সময় ভাল, আমরা ভাবলুম সেখানেই ভাল-মন্দ খাচ্ছে, আছে।—শুনিয়া পরিমল ভয় পাইয়াছে। পূজনীয়া কাকিমাকে তখনি একখানি চিঠি

লিখিয়া প্রসেনকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও আর একবার কিছুতেই যখন সেখানে পাঠাইতে পারিল না, তখন তাহার সমস্ত আনন্দ নিরানন্দ হইয়া গেল। নূতন নাটকের নূতন গানের জন্য যে উৎসাহদীপ্তি তাহা একদণ্ডে নিবিয়া গেল। পৃথক বাস, ভিন্ন সংসার হইলেও জ্ঞাতি-বিদ্বেষ তাহাদের আত্মীয়তাকে এ পর্যন্ত কলুষিত করিতে পারে নাই, তাহারই সম্ভাবনা পরিমলের নির্মল অন্তরকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল, কাকিমা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, প্রসূনের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক যে খুবই কম, ইহাও সত্য, বেশীর ভাগ সময় যে প্রসূন এখানেই কাটায় তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং এই সকল কারণে কাকিমার ক্ষুব্ধ হওয়াও আশ্চর্য নহে। পক্ষান্তরে প্রসূনকে সহায় না পাইলে তাহাদের সংসারের গতি কি হইত, ভাবিতেও পরিমলের অন্তরাত্মা অবশ, আড়ষ্ট হইয়া আসে। এই কথা বলিয়া কাকিমার পায়ে ধরিলেও কি ক্ষমা পাইবে না—যেমন ছিল, তেমনটি হইবে না? প্রসূনের কল্যাণেই তাহারা ভাল বাসায় আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার ভাই দুটি স্কুলে ভর্তি হইয়াছে, দুঃখনিশি প্রভাতে অরুণোদয়ের মুখ দেখিয়াছে। প্রসূনের সাহায্যে বঞ্চিত হইলে ? ভাবিতেও ভয় হয়।

হঠাৎ ঝড়ের মত প্রসূন ঘরে ঢুকিয়া একেবারে ছোটদি'র পা দুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ছোটদি আমার একটি উপকার করবে? বলো, করবো, নইলে আমি পা ছাড়বো না। বলো, আমি একটি বর চাই, বলো তুমি দেবে?

পরিমল বলিতে গেল, তোকে অদেয় আমার কি থাকতে পারে ভাই?

ওসব আমি বুঝিনে, বলো দেবে।

এই বললো, খুশী হোলো তো?

প্রসূন প্রার্থনাটি ব্যক্ত করিল, আমার একটি আত্মীয় বন্ধু "কাকলী"র প্রযোজক বিভাগে একটি চাকরীর চেষ্টা করছেন। তাঁর হয়ে তোমায় কথা বলতে হবে না, কেবল কনককিরণবাবুর সামনে একটিবার বরদাতার মত ঘাড়টি ডান দিকে নাড়লেই হবে। বড্ড গরীব ছোটদি, কলকাতায় কেউ নেই, কাউকে জানেও না, খিদে পেলে কলের বিনি পয়সার জল আকণ্ঠ খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের বাড়ীতে কাল খেতে বলেছিলুম, মা বললেন, আহা! খাবে কি, দুটি চোখের জলে দেখতেই পায় না।

পরিমলের কোমল অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। বলিল, আমি ঘাড় নাড়লে তার চাকরী হবে?

না হয়, আমি কাণ মলবো; আর কখনও কিছু চাইতে আসবো না তোমার কাছে। তাহলে এই কথা রইলো। সন্ধ্যেবেলা ম্যানেজারের ঘরে আমি তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।—বলিয়া সে চলিয়া যায়, পরিমল বলিল, এ ক'দিন তোর জন্যে মা কি রকম ছটফট যে করেছেন তা বলবার নয়। তুই সেখানে যেতে পারিসনি বুঝতে পারছি। ভাই মাকে যা হয় একটা কথা বলে যা, নইলে খোঁটা খেতে খেতে আমার প্রাণ যাবে।

আজ রাতে "কাকলী" থেকে ফেরবার সময় সে সব হবে ছোটদি। সেই গরীব ছেলেটি গলির মোড়ে আমার প্রত্যাশায় শুকনো মুখে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

আহা, তার প্রাণে একটু আশা দীপ জ্বালানো উচিত নয় কি?—বলিয়াই সে ছুটিল এবং পরিমল যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই হইল। জননীর দুর্জয় দুর্বার অভিমান শান্ত করিতে তাহার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম। একমাত্র আশালতিকা যাহার ছিন্ন হইতে চলিতেছে তাহাকে বুঝাইতে কে পারে?

তিন

"কাকলী"র অধ্যক্ষের কক্ষের সম্মুখে উপনীত হইতেই পরিমলের চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া গেল। সঙ্গে মা, তবু এক পা অগ্রসর হইবার শক্তি ছিল না। শুধু শক্তি ছিল না নয়, তাহার সর্বাঙ্গ যে ভাবে কাঁপিতেছিল, ঠিক তখনই প্রসূন আসিয়া ধরিয়া না ফেলিলে কি যে না হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না। প্রসূন হাত ধরিয়া ছোটদিকে লইয়া যাইতেছিল, তাই, নইলে চোখেও সে অন্ধকার দেখিতেছিল, হোঁচট খাইয়া পড়াও বিচিত্র ছিল না। ম্যানেজার শ্রীকনককিরণ কর বিলাত-রাশিয়া প্রত্যাগত সুশিক্ষিত ভদ্রলোক, দ্বারের বাহিরে আসিয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে বলিলেন, দেবসেনা দেবি, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার কোনই কারণ ছিল না। আপনার ইচ্ছা শুনেই দরখাস্ত মঞ্জুর করেছি আমরা। তবে যখন এসেছেন, তখন ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করবার অনুরোধ অবশ্যই করতে পারি। আসুন, মা, আপনিও আসুন।

তাঁহারা আসন অগ্রসর করিয়া দিলেন এবং প্রসূন হাত ধরিয়া বসাইল, চক্ষু তুলিয়া তখনও দেখিবার অবস্থা পরিমলেরও নয়, তাহার জননীরও নয়। চতুষ্পার্শ্বের কালো কালো মাথাগুলো নিশ্চল বিভীষিকার মত ভয় দেখাইয়া তাহাদের মাথা দুটাকে প্রায় টেবিলের সঙ্গে সমতল করিয়া দিতেছিল।

ম্যানেজার কক্ষের অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, দেখ না ভাই প্রসূন, টাইপিস্ট তিন হপ্তের নিয়োগ-পত্রখানা আনতে দেরী করছে কেন? দীপঙ্করবাবুকে আরও কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? আচ্ছা আমিই দেখছি—

নামটা উচ্চারিত হইবামাত্র দুজোড়া চক্ষু সতেজে উঠিয়া পড়িল। প্রসূন সামনেই ছিল। দীপঙ্করকে টানিয়া আনিয়া জ্যাঠাইমার কাছে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল, যে ক'রে তোমার হারাধন উদ্ধার করেছি, জ্যাঠাইমা, সে শুধু আমিই জানি। দীপঙ্করের দেশ বর্ধমানে গিয়ে ও'র নাম করলুম, কেউ বলতে পারে না। বলি, আর্টিস্ট, তারা বলে জানিনে। একজন স্ত্রীলোক কেবল বললে হ্যাঁ গা বাবু, যার মা পাড়াকুঁদুলী ছিল, তাকে খুঁজছো কি? সে ছেলে বাপ-মা মরতে জমি-জায়গা-ঘরদোর বিকিয়ে বেচে, বোনের বাড়ী জামগাঁ স্কুলে কুড়ি টাকা মাইনে ছবি আঁকার মাস্টারী করছে। গেলুম সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে জামগাঁয়ে। বোনের নাম বলে দিয়েছিলো শিউলী, বোনাইয়ের নাম যদুপতি। স্কুলে খোঁজ ক'রে শুনি চাকরী গেছে, লোকটি কোথায় কেউ জানে না। শিউলী-তলায় গেলুম কিন্তু ভয় হোল। মা'র মেয়ে ত, না জানি কি রকম অভ্যর্থনা পাবো। পাড়ার লোক বললে যদুপতি রাণীগঞ্জে মোক্তারী করে, মাঝে মাঝে বাড়ী আসে। বললুম, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি কি? লোকটি যেন অন্তর্যামী! বললে, খুব পারেন, নির্ভয়ে পারেন, মায়ের মেয়ে একেবারেই নয়। বড় ভাল মেয়ে, সতীসাধ্বী, লক্ষ্মীর প্রতিমা। নির্ভয়ে দোরের কড়া নাড়তে যাব, নির্মেঘ আকাশ কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি, একেবারে সামনে দীপঙ্কর। ব্যাণ্ডেলে বার হচ্ছিলেন, কলকাতায় চাকরী খুঁজতে। নাও ছোটদি, উনি চাকরী পেয়েছেন, আর তুমি ও'কে পেয়েছো!

সঙ্কোচকর আসিয়া সংবাদ দিল, নূতন নাটগীতিকার রিহার্সাল "দেবসেনা" দেবীর ডাক পড়িয়াছে।

কল্যাণী — শ্যামা সেন

সংগীতে টাবু

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বেদ পড়বার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণের। অন্যের পক্ষে পড়া দূরে থাক, শুনাও অপরাধ। বেদ শুনবার ফলে অনধিকারীর কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, একথা ইতিহাসে না থাকলেও ইতি-কথায় আছে।

সংগীতেও এ-রকম অধিকারী অনধিকারীর প্রসংগ চিরকাল ধরে চলে এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনধিকারীর সংগীত-চর্চার ফল কানে গরম তেল ঢালার মতই ভয়াবহ হয়েছে।

কিছুদিন আগেও পূর্ববঙ্গের নবাগত কুলবধূর পক্ষে গানের অতি ক্ষীণ গুন-গুনানিও ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। আবার, সেই বধূই যদি পাল-পার্বণে গলা ছেড়ে না গাইতে পারত, তবে শাশুড়ী থেকে পড়শী অবধি সকলের মুখ থেকেই অজস্র গালমন্দ বর্ষণ হত।

বৈদিক আমলে যজ্ঞস্থলের কাছে একজন উদ্‌গাতা দুজন বীণাবাদকের সহযোগে সামগান করতেন। উদ্‌গাতা ত ব্রাহ্মণ ছিলেনই, বৈদিকদেরও ব্রাহ্মণ না হলে চলত না।

অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের সময় অনাচর শ্রেণীর লোকেরা বীণা বাজাতে, এমন কি বাড়ীতে রাখতেও পারত না।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের একাংশের একটি প্রাচীন গল্পে আছে—আগেকার দিনে কেবল মেয়েরাই বাঁশী বাজাতে পারত। আর তারের যন্ত্র বাজানোর অধিকার ছিল একমাত্র পুরুষের। একদিন একটি মেয়ে দেখল তার বাঁশীটি নিয়ে বাজাচ্ছে একজন পুরুষ। অমনি সে পুরুষের তার যন্ত্রটা নিয়ে বাজাতে সুরু করল। তৎক্ষণাৎ দেশে নূতন আইন পাশ হয়ে গেল যে শুধু পুরুষরা বাঁশী বাজাবে, আর তারের বাজনা বাজাবে শুধু মেয়েরা। এভাবে রাষ্ট্রীয় আইন জারীর দৃষ্টান্ত অবশ্য আর কখনো দেখা যায় নি।

অস্ট্রেলিয়ার জিংগু ইণ্ডিয়ান পুরুষরা একটা চোঙের মত লাঠিতে একটা রীড লাগিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে বিকট আওয়াজ বার করে। এ যন্ত্রে মেয়েদের অধিকার নেই। এমন কি কোন মেয়ে দৈবক্রমে যন্ত্রটা দেখে ফেললে তার চোখ উপড়ে ফেলার বিধি আছে।

ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়ে গান-বাজনা একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি যে সব সিনাগগে ইহুদী ধর্মে সংগীতের ব্যবস্থা আছে, সে সব ক্ষেত্রেও এরা সংগীতকে বর্জন করে চলে। সংগীত-বিরোধিতার জন্য অনেকে এদের ইহুদী বলতে নারাজ।

নিউগিনির মফুলু জাতির মধ্যে নিয়ম আছে—ঢাক তৈরীর সময় কোন স্ত্রীলোক তা দেখে ফেললেই সব ভেস্তে গেল।—আবার নতুন করে তৈরী করতে হবে।

ফরমোসায় এক ধরণের বাঁশী আছে, মুখের বদলে নাকে বাজাতে হয়—এ-দেশেও চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথাও এই নাক-বাঁশীর চলন আছে। যা হোক, ফরমোসার নারী-জাতি এ বাঁশীতে নাক দিতে বঞ্চিত। বিশেষ সম্মানিত পুরোহিতের স্ত্রীও এ নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন না। পুরুষদের মধ্যেও যুদ্ধজয়াদি ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষে এ নাক-বাঁশী বাজান নিষিদ্ধ।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কুমা নামক একটি যন্ত্রের চলন আছে। তাকে শালগ্রাম শিলার মতই পবিত্র মনে করা হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ কুমা বাজাবার অধিকারী নন—তাও যথাস্থান থেকে অনুমতি নেবার পর। অথচ যন্ত্রটা ভেঁপু জাতীয় একটা পিতলের বাঁশী।

আরবী সংগীতের নওবা (বহু বচনে নওবৎ) থেকে আমাদের দেশে মুসলমান রাজত্বের সময় নহবতের প্রচলন হয়েছে এবং বিবাহাদি উপলক্ষে গৃহস্থের নহবতের আয়োজনকে সাধারণ অঙ্গ বলেই মনে করা হয়েছে। কিন্তু খলিফার রাজত্বে খলিফার বিশেষ অনুমতি ছাড়া এবং খলিফার বিশেষ [illegible] অভিজাত বংশের ধনী লোক ছাড়া আর কারো পক্ষে নহবতের ব্যবস্থা চিন্তা করাও দারুণ দুঃসাহসের কাজ ছিল। অনুমতি ছাড়া নহবতের আয়োজন করায় রাজদ্রোহের অপরাধে দু-চার জনকে কতল করাও হয়েছে।

ভারতীয় সংগীতের বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণী দিবা ও রাত্রির বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট করা আছে। অসময়ে রাগ-রাগিণীকে অনর্থক উদ্বুদ্ধ করতে নেই। অকাল বোধনে অনেক পৌরাণিক দেব-দেবীরা পূজারীর ওপর বিরূপ হন বলে কোথাও শুনো যায় না। কিন্তু অকালে রাগ-রাগিণীর বোধন করলে, বোধনকারী স্বয়ং তানসেন হলেও তাঁর নিস্তার নেই। রাগ-রাগিণীর রাগে তাঁর নরকবাস অবধারিত। তবে সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। এ ক্ষেত্রেও বিধি অনুযায়ী বিশেষ রাগের পরিবেশনে উপদ্রব খন্ডন হতে পারে।

প্রাচীন মিশরে মন্দিরে একটা লম্বা মানুষের সমান উঁচু বিশটি তারযুক্ত এক রকম বীণা জাতীয় যন্ত্র থাকত। সেটি বাজাবার অধিকার ছিল স্বয়ং রাজার আর মন্দিরের পুরোহিতের। আর কারো পক্ষে তাতে হাত দেওয়া ছিল অসম্ভব।

আগেকার দিনে যাজক শ্রেণীর লোক ছাড়া কেউ চার্চের অর্গ্যান বাজাতে পারতেন না। ফ্রান্সে যে অযাজক অর্গ্যানবাদক সর্বপ্রথম চার্চে বাজাবার অনুমতি পান, তাকে যাজকের পোষাক পরে তবে অর্গ্যানে হাত দিতে দেওয়া হয়েছিল। —তার এই কৌশলেই 'অপবিত্র' হাতে চার্চ-অর্গ্যান স্পর্শ করার এক বিষম কেলেঙ্কারীর হাত থেকেই রেহাই পাবার একটা পথ হল।

কলা-নৈপুণ্যে প্রশংসা আহরণেচ্ছু, বিশেষ পাশ্চাত্য রমণীর পক্ষেই আজকাল পিয়ানো বাজনায় দখল লাভ একান্ত কাম্য। অথচ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীটি যেদিন দশজনের সামনে পিয়ানোয় টুং টাং করল, সে দিন তার দুর্দশা আর অপমানের সীমা ছিল না। টিটকিরী দিতে বেচারীকে ঘর থেকে বার করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হল। আধুনিক যুগের পিয়ানো পারদর্শিনী হয়ত এটাকে নিছক গল্প বলেই মনে করবেন।

এ দেশেও আগেকার আমলে দু-চারজন বাদকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও—বাগ্‌দিনী ছাড়া—কোন বাদিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর ছিল। তখন ঘরে ঘরেই পরিবাদিনী-বাদিনী।

খৃষ্টান পাদরীরা প্রাচীন আমলের গীর্জায় অতি কার্পণ্যের সঙ্গে সামান্য ক'খানি সংগীত যন্ত্র প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন। সেণ্ট অগাষ্টিন লায়ার বা বীণাযন্ত্রকে গীর্জায় স্থান দেন। অথচ তার দু'শ বছর পরে সেণ্ট জেরোম হুকুম করলেন যে, কোন খৃষ্টান মেয়ে লায়ারে হাত বা বাঁশীতে মুখ দেবে না। এমন কি কোনটা লায়ার বা কোনটা বাঁশী, এ বিভেদটুকু জানাও মেয়েদের পক্ষে অপরাধ বলে ধরা হবে।

আজকাল যে কোন বড় গীর্জায় অর্গ্যান বাজে। এ যন্ত্রটি আগে ছিল লৌকিক সংগীতের আসরের বস্তু। ধর্মস্থানের বা প্রার্থনার উপযোগী হিসেবে গণ্য হতে একে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। ৪৫০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের চার্চে প্রথম অর্গ্যান প্রবেশ করে। কিন্তু তারও প্রায় আট শ' বছর পরে একে প্রথম প্রার্থনার উপযোগী বলে মনে করা হয়। তাও আবার সব সম্প্রদায়ের চার্চে নয়। গ্রীক বা রোমান চার্চ একে গ্রহণই করে নি। বিলাতেও মাত্র দু'-এক চার্চ ছাড়া আর কোন প্রার্থনা সভায় এর [illegible] হয় নি। এমন কি, প্রার্থনার জায়গায় অর্গ্যান দেখলে ক্ষিপ্ত ভক্তের দল ওটাকে পুড়িয়ে ছাই না করে ছাড়ত না। এখন একে তিন শ' বছরও হয় নি, অর্গ্যানের দাবী সর্বত্র [illegible] স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই সংগীত একদিনে দানা বাঁধে নি। গোড়ায় এমন [illegible] হয়েছিল যে এক দলের কাছে অর্গ্যান [illegible] ঘৃণ্য নারকীয় উপাসনা নিষ্ফলকারী [illegible] কল বলে বিবেচিত হল। আর এক দল অবশ্য একে ভক্তিমার্গে চলবার এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে সাদরে প্রার্থনা মন্দিরে স্থান দিল।

গেল শতকের মাঝামাঝি অবধি [illegible] প্রেসবিটারিয়ানদের প্রার্থনায় যে কোন যন্ত্র [illegible] দোষের ছিল। ইংলণ্ডে এক সময়ে যে কোন নৌ-সেনার পক্ষে জাতীয় সংগীতের 'গড সেভ দি কিং' সুরে শিস্ দেওয়া ছিল আইনবিরুদ্ধ। আর কোন মেয়ের পক্ষে অর্গ্যানের কাছে [illegible] যাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হত।

জার্মান গীর্জায় ঊনবিংশ শতকের শেষ অবধি সমবেত স্তোত্রগান সমস্বরে গাওয়া হত। অর্থাৎ তাতে বিভিন্ন সুরের সমবায়ে হার্মোনাইজ করা রীতি বিরুদ্ধ ছিল। অথচ ঘরে ঘরে তখন হার্মোনির ছড়াছড়ি দেখা যেত।

অধিকাংশ [illegible] স্তোত্রের সুর নেওয়া হয়েছিল লৌকিক সংগীতের থেকে। কিন্তু নেবার পর এ-সব সুরের অদল-বদল করবার অধিকার আর কোন লৌকিক গুণীদের থাকল না। এ রকম একখানি স্তোত্রের সুর বদলাতে

(শেষাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুইন ও সম্রাট হর্ষবর্ধন

রমেশচন্দ্র সেন

দোচালা ছোট্ট খোড়ো ঘর। সামনে উঠান, উঠানের দক্ষিণে গ্রামের রাস্তার পাশে রাং-চিতার বেড়া। উঠানটা পিয়ালিফুল, মনসা, সিজ, চোরকাটা ও নানা আগাছায় বোঝাই। তার মধ্যেই অযত্নবর্ধিত কচুগাছের বড় বড় পাতা মৃদু বাতাসে দোল খায়। গৃহস্বামী গোড়ায় ছাই ফেলায় গাছগুলি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে গাছ পুষ্ট করার জন্য নয়, তিনি ছাই ফেলিয়াছেন ওখানে ফেলাই সবচেয়ে অল্প আয়াসসাধ্য বলিয়া।

বর্ষার সন্ধ্যা, একটু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; মেঘের কোলে উঠিয়াছে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ। তার আলোয় বর্ষণস্নাত গাছপালা মরকতের রং ধরিয়াছে, পিয়ালি ফুলগুলিকে মনে হয় সোনার কতকগুলি ইয়ারিং।

বারান্দায় হারিকেন জ্বলিতেছে, কিন্তু কালিপড়া চিমনির জন্য বাহির হইতে সে আলো দেখা যায় না। বারান্দায়ও সব জায়গায় সমান আলো পড়ে নাই। তবে দরজার উপরে বেড়ায় ঝুলানো নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের ছবিখানা কোন রকমে চেনা যায়, আর দেখা যায় বৃদ্ধের মাথার টাক ও মুখভরা লম্বা দাড়ি। দাড়ির এই ফসল বেশী দিনের নয়, বোধ হয় কোন দেবতাকে মানত করিয়া সম্প্রতি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, হয়ত বা অপর কোনও খেয়ালে।

বড় একখানা কালো খলে তিনি কি যেন ঘষিতেছেন, খলের নিচে পুরানো খবরের কাগজের উপর ময়দার চেয়ে মিহি কালো কালো গুঁড়া ছড়ানো, তার ভিতরে সাদা দানা চক চক করে। প্রায় প্রতিবার নোড়া ঘষার সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু কালো গুঁড়া ছিটকাইয়া যায়। বৃদ্ধ খেয়াল করেন না।

তাঁর মন সামনে খোলা একখানা খাতার ভিতর। তার মধ্যে যেন ডুবিয়া আছেন, শব্দ করিয়া পড়েন, অঙ্গভঙ্গী করেন, এক একবার উত্তেজিত হইয়া ওঠেন। বেড়ার দরজা ঠেলিয়া দুইটি লোক যে বারান্দার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহাও এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। হঠাৎ একবার 'তবে রে নরাধম' বলিয়া চোখ তুলিয়াই দেখেন সামনে গ্রামের জমিদার মতি সরকার দাঁড়াইয়া। তাঁর সঙ্গে একটি যুবা।

আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—বলিয়া বৃদ্ধ জমিদারকে স্মিতহাস্যে অভিনন্দন জানান।

মতি জিজ্ঞাসা করেন, কি ঘষছেন কবিরাজ মশাই?

কজ্জলী।

সে কি?

পারা, গন্ধক মেশালে কজ্জলী হয়। এরই রূপান্তর মকরধ্বজ।

এত কালো জিনিষ অমন লাল টকটকে হয়! মতিবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন।

কবিরাজ স্মিতহাস্যে বলেন, হয় সোনার ছোঁয়ায়। ওঁকে ত চিনতে পারলুম না।

মতি কহিলেন, আপনাদের মিয়াপুরেরই লোক। দেখুন লক্ষ্য করে।

তিনি তাঁর সঙ্গীর নিকটও বৃদ্ধের নাম করেন নাই। শুধু বলিয়াছেন, চলুন আপনাদের গ্রামের একজনকে দেখিয়ে আনি। তিনি এখানে কবিরাজী করেন।

তাঁর সঙ্গী যুবা কবিরাজকে চিনিতে পারে নাই। তবে বারান্দার এক পাশে দাঁড় করানো থিয়েটারের সিন-সিনারি, গিরিশচন্দ্রের ছবি, তরোয়াল, মুকুট দেখিয়া তার মনে হইল, ইনি হয়ত মিয়াপুরের রাজা সূর্যকান্ত।

বৃদ্ধ একটুক্ষণ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, ঠিক ত ঠাহর হচ্ছে না। মিয়াপুরের কোন্ বাড়ির লোক আপনি?

আমি চুণী বাঁড়ুয্যে মশাইর ছেলে।

এাঁ, চুণী মারা গেছে! আমাদের ছত্রপতি! কি হয়েছিল তার, গেল কবে?

যুবক কহিল, গেছেন আজ সাত বছর। হার্টের অসুখ করেছিল।

ভারী ভাল মানুষ ছিল তোমার বাবা। আমার নিকটতম বন্ধু। একবার শুধু তার জন্যই আমি রাজার পার্ট ছেড়ে দিয়েছিলাম, ছত্রপতি শিবাজীর পার্ট। আচ্ছা, তুমিই কী রবিরঞ্জন?

নামটা গৌরবের নয়, কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করা চলে না। যুবক কহিল, হাঁ, আমি একবার মীরজাফরের পার্ট করেছিলাম। আমার নাম রবি।

তোমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ। এখন চেহারা অনেক বদলেছে, তাই চিনতে পারিনি। তা-ছাড়া দেশ ছেড়েছি এক যুগের উপর।

আমিও জানতুম না যে আপনি এখানে থাকেন। সরকার মশাই আপনার নাম করেন নি, শুধু বললেন, চলুন আপনাদের গ্রামের একজনকে দেখিয়ে আনি, তিনি এখানে কবিরাজী করেন।

সত্যিই ত বুঝবে কি করে? আমার সাত পুরুষে কেউ কবিরাজ ছিল না। বরাবরের জমিদার আমরা, মুর্শিদ-কুলীর আমল থেকে যাক, তুমি এখানে যে বাবা?

এই জেলার সদরে ওকালতি করি, এসে কমিশনে সাক্ষীর জবানবন্দী নিচ্ছি।

দীর্ঘদিন পরে গ্রামের লোককে, বিশেষ বন্ধু পুত্রকে পাইয়া বৃদ্ধের আনন্দ আর ধ না। কি যে করিবেন যেন ঠিকই করিতে পার

না। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যাইয়া ছোট্ট দ মাটিতে চারখানা পাখা ও চারখানা কা বাতাসা আনিয়া বলেন, একটু মুখে দ কবিরাজী, আমার গাছের পাখা। আপনা সাহস করে দিলুম, সরকার মশাই। কিছু ম করবেন না।

এবার চলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, তামাক সাজেন আর প্রশ্ন করেন, মিরাপুরের জয়চাঁদ, জগৎশেঠ, বুদ্ধ, সেলুকস, নাহারিন, মর্জিনা কে কোথায় আছে, কি করে!

নামগুলি তাদের পিতৃদত্ত নয়। রাজা সূর্যকান্তের রাখা। তাঁর সঙ্গে গ্রামের থিয়েটারে যিনি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি তাকে সেই নামে ডাকিতেন। কোনটা পঁচিশ, কোনটা তিরিশ বছরের পুরোনো নাম; সবচেয়ে যেটা আধুনিক, তারও বয়স এক যুগের উপর। রবি অনেককেই চিনিতে পারে না, রাজা সূর্যকান্ত বলেন, জগৎশেঠকে চিনলে না? আমাদের ঘনশ্যাম। জয়চাঁদ, সেলুকস, নাহারিন, অবশ্য এ নামগুলো ত বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল। তবে কি আমি দেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে সে সব ভুলে গেছে?

তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন দেখিয়া রবি সংকোচের সঙ্গে বলে, আমিও দেশ ছেড়েছি আজ ক'বছর।

তা-ছাড়া সে দিনের ছেলে তুমি। তুমি সে সব জানবে কি করে? যাক ভীষ্মের খবর কি?

রবি বলিল, ভীষ্ম কে?

বুঝলে না? প্রকাশ সোম। খাসা ভীষ্মের পার্ট বলত, মনে হত দানি ঘোষের অভিনয় শুনছি।

পি সোম? আজকাল তিনি হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকিল।

হলেই ত। অত ভাল অভিনয় করত। তার ভাই নরেন?

প্রভাতবাবুর কথা বলছেন বোধ হয়। [illegible] নাম নিয়ে তিনি সারা ভারতময় নেচে বেড়ান। বর্তমানে নাচছেন আমেরিকায়। শুনেছি, ওরা সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করতেন। আপনি ছিলেন তাঁদের লিডার।

রাজা সূর্যকান্ত আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন।

প্রথম কলিকা তামাক পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি আর এক কলিকা [illegible] রবিবাবুকে [illegible] এ হচ্ছে [illegible] তামাক, এক বুড়ী দিয়ে গেছে। খেয়ে দেখুন।

রবি আপত্তি করিলেন, আপনি বুড়ো মানুষ, বার বার তামাক সেজে খাওয়াবেন এতে বড় সংকোচ বোধ হয়।

আপনি যে অতিথি নারায়ণ, সূর্যকান্ত তারপর রবিকে বলেন, তোমার তামাক চলে না বাপজী?

রবি কোন উত্তর করে না। সূর্যকান্ত বলেন, লজ্জা কি এতে? বিলেতে বাপ-মায়ের সামনে ছেলেরা প্রণয়িনীর মুখে চুমু খায়, আর তুমি পিতৃবন্ধুর সামনে হুঁকোয় চুমু খেতে চাও না। ভারী সেকেলে ত'

তাঁর বলার সহজ ভঙ্গীতে রবির সংকোচ কাটিয়া যায়। সে বলে, আমি চুরুট খাই।

চুরুট, সিগ্রেটের চেয়ে তামাক ঢের ভাল। ক্ষতি হয় কম। তা-ছাড়া জলের ভিতর থেকে কি মিঠে শব্দই না আসে। মনে পড়ে নবাব আলীবর্দীর তামাকের খোসবয়?

আলীবর্দীর পার্ট বলার সময় সূর্যকান্ত কলিকাতার বালাখানা হইতে দামী তামাক আনাইয়াছিলেন। সেই তামাক টানিবার জন্য থিয়েটার-বিরোধী বুড়োরাও আসিয়া জড়ো হইতেন। রবি বলিল, আজ্ঞে হাঁ।

সূর্যকান্ত বলিলেন, আজ্ঞে নয়, বল জনাব।

"আসুন, আসতে আজ্ঞা হ'ক"...

তিনি তখন অতীতে চলিয়া গিয়াছেন। মনে পড়িতেছে কত কথা, কত কুশীলব, অসংখ্য অভিনয় রজনী। স্মৃতিতে বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। বলিলেন, কী খাসা দিনই না গেছে! সে আর ফিরবে না। মনে পড়ে দেবলা দেবী অভিনয়ের রাত? [illegible] আলো নিয়ে [illegible] চলেছে, [illegible] আমাদের ভয় হল থিয়েটারই হতে পারে না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই [illegible] স্টেজে নামল মালিক কাফুর সেজে। খাসা প্লে করল। তুমি যেন সে দিন কি হয়েছিলে?

প্রম্পটার।

আর অধীর? হ্যাঁ, সে মারা গেছে। যেমন করত অভিনয়, তেমন ছিল সমজদার। মাইকেল অনুবাদ করে প্রতিটি লাইন তাকে শুনিয়েছি। খাসা ছেলে ছিল। হাজারে অমন একটা মেলে না। ছেলেটা গেছে বোধ হয় অসময়ে—বৃদ্ধের চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া ওঠে।

যারা তাঁর সঙ্গে অভিনয় করিয়াছে, তাঁর নাটক শুনিয়াছে, সূর্যকান্ত তাদের প্রত্যেককেই স্নেহ করিতেন। তাদের মধ্যে অধীর ছিল সর্বাধিক প্রিয়। একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুইন নাট্য-পরিষদ কি রকম চলছে? চালাচ্ছে কে?

রবি বলিল, পরিষদ উঠে গেছে।

উঠে গেল বিয়াল্লিশ বছরের প্রতিষ্ঠানটা! পরিষদের ঘর, স্টেজ?

সূর্যকান্ত নিজ বাড়িতে পরিষদকে স্থান দেন, নিজ খরচায় ঘর তুলিয়া দেন, স্টেজ বাঁধেন। তাঁর দেশ ছাড়ার পর দেনার দায়ে সে সব নীলাম হইয়া গিয়াছে। কথাটা জানাইতে রবির কেমন যেন সংকোচ বোধ হয়। সে আমতা আমতা করিয়া বলে, ঘরখানা এখন নেই।

সূর্যকান্ত কহিলেন, বুঝেছি, মিরাপুরে এখন আর নিয়মিত অভিনয় হয় না বল!

না আগের মত হয় না।

পুজোয়, নববর্ষে—?

গেল দু'বছর একবারও হয়নি। তার আগের বারে পুজোয় হয়েছিল।

এ্যাঁ, দু' বছরে একবারও থিয়েটার হয়নি! যাব নাকি দেশে? সূর্যকান্তর গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামে। আপনা-আপনিই বলিতে থাকেন, না, কাজ নেই। ভাঙ্গন ঠেকাবার আর বয়স কোথায়? এখন ত্যাগের সময়। ভোগ ত কম করিনি, দিগ্বিজয়ী সিকন্দর থেকে সিরাজ অবধি সবই হয়েছি। তবে তোমাদের উচিত ছিল কুইনকে বাঁচিয়ে রাখা। আমি বলছি মিরাপুরের তরুণদের কথা।

রবি এ কথার কোন উত্তর করিল না। একটু পরে প্রশ্ন করিল—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, জ্যাঠাবাবু?

কি ?

আমাদের পরিষদের নাম কুইন কেন? ক্লাব কি ভিক্টোরিয়ার সময় হয়েছিল? না, তা-ওত নয়।

বৃদ্ধ কহিলেন, সে—সে আছে। ও নাম রেখেছি আমি। খাসা নাম নয়, কুইন?

নামটার প্রতি দেখা যায় তাঁর একটা অদ্ভুত দরদ। রবি আর কোন প্রশ্ন করে না।

মতিবাবু বলিলেন, রাত হয়ে গেল, আজ আমরা উঠি কবিরাজ মশাই।

সূর্যকান্ত রবির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সরকার মশাই জমিদার মানুষ, ওঁরই আশ্রয়ে আছি। ওঁকে আদর যত্ন করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তুমি দেশের ছেলে, ছত্রপতির ছেলে, তোমায়ও একটু যত্ন করতে পারলুম না। তুমি বরং আজকার রাতটা থেকে যাও।

রবি বলিল, আমাকে এই ভাটায়ই নৌকা ছাড়তে হবে।

একটা রাত থেকে গেলে হ'ত না? কাল যেতে আমার এখানে দুটো ডাল ভাত খেয়ে।

উপায় নেই। কাল কোর্টে রিপোর্ট দিতে হবে। আপনার বাড়িতে ত কত খেয়েছি, কত আদর পেয়েছি, আপনার উপর কত অত্যাচার করেছি।

সেদিন নেই, মীরজাফর। যাক্ তোমার নেমন্তন্ন রইল পূজোর সময়। ভাল প্লে হবে। সরকার মশাইর ভাইপো নতুন বই লিখেছে।

মতি কহিলেন, কে? আমাদের আশু? সেই খানাই পড়ছেন বুঝি?

হ্যাঁ, চমৎকার পৌরাণিক নাটক। পূজোর সময় ঐ খানাই নামাব ভাবছি। তোমার জন্য একটা পাঠও রাখব নাকি জাফর আলি—?

সে সম্ভব হবে না জেঠামশাই; তবে আসতে খুব চেষ্টা করব—।

সূর্যকান্ত মতিকে কহিলেন, ভাল মনে পড়ছে। আপনার মেয়ের কথা ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সে কেমন আছে?

অনেকটা ভাল।

ঐ ওষুধই চলবে। ওষুধ বোধ করি আজ ফুরিয়ে যাবে। কাল বরং আশুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন ওষুধ নিয়ে যাবে, অন্য কথাও আছে তার সঙ্গে।

সূর্যকান্ত রবির ঠিকানা টুকিয়া রাখিলেন। বলিলেন, পূজোর সময় আসতে ভুলো না কিন্তু। আপনিও থাকবেন সরকার মশাই। ভাইপোর লেখা বই দেখবেন।

মতিবাবুরা বিদায় লইলেন রাত নটার পর। জোছনায় ছাওয়া শরতের আকাশ, ভিজা গাছ-পালায় আলোর ঝিলিমিলি। কেমন যেন স্বপ্নময় প্রকৃতি। ব্যথাতুর। ঝিল্লির ঝি' ঝি' ছাড়া আর কোন শব্দ নাই—কিন্তু সে যেন ব্যথারই গুঞ্জন।

দুজনে নীরবে পথ চলেন। উভয়েই ভাবেন বৃদ্ধের কথা। রবির মনে পড়ে এক যুগ আগের এক প্রৌঢ়কে। উজ্জ্বল মূর্তি, উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, গৌরকান্তি সূর্যকান্তকে। রাজবেশে রাজমুকুটে মহীয়ান তাদের গ্রামের রাজা সূর্যকান্ত।

মতিবাবুও তাঁর কথাই ভাবিতেছিলেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি মফঃস্বলে জমিদারীতে থাকেন। সূর্যকান্তকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন না। শুধু জানেন লোকটি কবিরাজ। অভিনয়ের দিকে তাঁর ঝোঁক আছে। আজ তাঁর কথাবার্তা শুনিয়া বিস্ময় লাগিল। তিনি রবিকে প্রশ্ন করিলেন, দেশে কি উনি কবিরাজীও করতেন, না খালি থিয়েটার?

থিয়েটারই করতেন। কবিরাজী করতে দেখিনি। তবে আয়ুর্বেদে দখল ছিল শুনেছি। মস্ত পণ্ডিত। মৃচ্ছকটিক ও ম্যাকবেথের অনুবাদ করে অভিনয় করেছেন। চেষ্টা করেছিলেন "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট"-এর বাংলা নাট্যরূপ দেবার। বই শেষ হয়েছিল কিনা জানি না। আমিও বহুদিন বিদেশে।

মতি কহিলেন, আমি ও'র থিয়েটার দেখেছি মাত্র একদিন। সাজাহান সেজেছিলেন। শুনেছি রাজার পাঠ ছাড়া কিছু বলেন না।

হ্যাঁ, সেইজন্য দেশে সবাই ডাকত রাজা সূর্যকান্ত।

* * * *

রবি মতি সরকারদের জমিদারী সংক্রান্ত কাজেই লক্ষ্মীপাশায় আসিয়াছিল। তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রথম ভাটায় নৌকা ছাড়িয়া রওনা হইয়া গেল।

নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে জোছনা ঝলমল করিতেছিল, ঐ আলোর রাশিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া নৌকা ছোটে। রবি সামনের গলুইয়ে বসিয়া ঐ ভাঙন-গড়ন দেখে। ভাবে সূর্যকান্তের কথা। পাঠ প্রধান হোক আর অ-প্রধানই হোক, রাজা সাজা তার চাই-ই। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মুকুটধারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, মুকুট ও রাজদণ্ড কিরূপ ছিল, উহা জানার জন্য তিনি পুরোণ ইতিহাস ঘাঁটিতেন। রাজার পোষাকের ডিজাইন করিতেন নিজে; নিজ খরচায় সে সব তৈরী করাইতেন। তাঁর রাজমুকুটই ছিল তিন চারটি। একটি মিশরের ফারাওর, একটি দুর্যোধনের, আর একটি সম্রাট জাহিরুদ্দিন আকবরের। কলিকাতা হইতে তিনি সিংহাসন গড়াইয়া আনান। এই শখের জন্য বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ি সবই খোয়াইয়াছেন। তাঁকে দেশ ছাড়িতে হইয়াছে, বিনিময়ে অবশ্য রাজা উপাধি মিলিয়াছে। গ্রামের লোকে আজও বলে রাজা সূর্যকান্ত।

এই উপাধির পিছনে ব্যঙ্গ হয়ত কিছুটা ছিল, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল প্রীতি। মিয়াপুর তাঁকে ভালবাসিত। সেই মানুষ আজ ভাঙা আলমারীর মধ্যে বসিয়া খলে পারা গন্ধক ঘষেন। অতিথিদের তামাক সাজিয়ে খাওয়ান আর বলেন, নবাব আলীবর্দীকে কুর্ণীশ কর জাফর আলি।

* * *

রাজা সূর্যকান্তের নিমন্ত্রণের কথা রবি ভুলিয়া গিয়াছিল। পূজোর দুই দিন আগে লক্ষ্মীপাশা হইতে তাঁর নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। মহাষ্টমী ও মহানবমীর রাত্রে আশুতোষ সরকারের লিখিত 'দধীচি' অভিনীত হইবে।

সঙ্গে ছিল রাজা সূর্যকান্তের হাতের লেখা একখানা চিঠি। তিনি লিখিয়াছেন,

স্নেহভাজন মীরজাফর—

পূজায় তোমায় আসতে অনুরোধ করেছিলুম, বোধ হয় মনে আছে। অষ্টমী, নবমী পর পর দুই রাত্রি আমরা নতুন বই অভিনয় করব। আমার বড় আগ্রহ, তুমি আমার অভিনয় দেখ। ছত্রপতির ছেলে তুমি; আমার বড় স্নেহের, বড় আপনার জন। আশা করি আমার এই অনুরোধ উপেক্ষা করবে না।

—ইতি আশীর্বাদক সূর্যকান্ত রায় (রাজা)

রবি পিতৃ-বন্ধুর এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে লক্ষ্মীপাশায় আসিয়া পৌঁছিল অষ্টমীর রাত্রে আটটারও পরে।

শোনা যায়, পূজোর বাজনার শব্দ, জলের উপর দিয়া ভাসিয়া আসা ঢাক-ঢোল, করতালের মিষ্টি বাজনা। একেবারে বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

রবি ঘাটে নামিয়াই শুনিল থিয়েটার হইবে জমিদার সরকারদের বাড়িতে। কবিরাজ মহাশয় সেইখানেই আছেন।

সে সোজাসুজি সরকার বাড়িতে গেল। বিরাট বাড়ি। মস্ত উঠানের একদিকে একতলা পূজো-মণ্ডপ, আর তিন দিকেই ঘুরানো দোতলা প্রাসাদ। একতলার বারান্দায় থামগুলি জাতীয় পতাকার তিন রঙা কাপড়ে মোড়া।

মণ্ডপে মহিষ-মর্দিনী দশভুজা। মহিষাসুরের মুখখানা জলজ্যান্ত মানুষের মুখের মতন। বিপরীত দিকে রঙ্গমঞ্চ। যবনিকার উপর ছত্রপতি শিবাজীর ছবি। দুর্গম পার্বত্য-পথে শিবাজী অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। পিছনে মাওয়ালি সৈন্যের দল। সমগ্র ছবিতে জয়ের অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

রাজা সূর্যকান্ত গ্রীণরুম হইতে বাহির হইয়া রবিকে বুকে টানিয়া নিয়া কহিলেন, বেঁচে থাক বাবা, তুমি আজ আমাকে বড় আনন্দ দিলে। পথে কোন কষ্ট হয়নি ত?

কষ্ট বিশেষ হয়নি, ঝড়ে পড়েছিলুম তাই আসতে দেরী হয়ে গেল।

সূর্যকান্ত কহিলেন, তবু যাক্ থিয়েটারের আগে পৌঁছুতে পেরেছ। পথে খাওয়া-দাওয়া কি হয়েছে? আমি অবশ্য দুটো ডালভাতের ব্যবস্থা করেছিলুম।

পাশেই একটি যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, এত রাতে আর আপনার ওখানে যাবেন কেন? আপনি না খাওয়ালে আমাদেরও চলবে না।

হেঃ হেঃ তাও ঠিকই।

যুবক কহিল, উনি আমাদের এখানেই জলযোগ করবেন।

সূর্যকান্ত রবির সঙ্গে যুবকের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইনি দধীচির নাট্যকার, মহর্ষি বশিষ্ঠ। এই গ্রামেরই জমিদার মতিবাবুর ভাইপো। —ইনি মীরজাফর, আমাদের গ্রামে বাড়ি, আমার বন্ধু-পুত্র।

মহর্ষি বশিষ্ঠ অর্থাৎ আশু সরকার রবিকে নমস্কার করিয়া কহিল, ও'কে ত চিনি। উনি আমাদের পার্টিশন-স্যুটে বড়ঠাকুরমার জবানবন্দী নিয়ে গেছেন।

রবি প্রতি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মতিবাবু কোথায়?

তিনি কাকিমাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেছেন। ছুটি পেলেই ও'র বেড়ানো চাই।

থিয়েটার শুরু হইল রাত দশটার পর। রবি মনে করিয়াছিল রাজা সূর্যকান্ত দেবরাজ ইন্দ্র কিংবা অসুররাজ বৃত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু তিনি উহার কোন ভূমিকায়ই নামিলেন না। রবি বিস্মিত হইল, ভাবিল ব্যাপারখানা কি?

তৃতীয় অঙ্কে পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বনাকীর্ণ পর্বতগুহার মধ্যে সূর্যকান্ত

মহামুনি দধীচিরূপে বসিয়া আছেন। সামনে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ দণ্ডায়মান। বৃত্রভয়ে তাঁরা মুনির শরণাপন্ন। স্বর্গলোককে, আর্যসভ্যতাকে রক্ষার ভার আজ দধীচির।

দেবতাদের আকুতি শ্রবণে কৃপাপরবশ হইয়া মুনিবর কহিলেন, মা-ভৈঃ।

ছোট্ট পাঠ। কিন্তু নাটকের সব কিছু বিবর্তিত হইয়াছে দধীচিকে কেন্দ্র করিয়া। নাটকের নায়ক বৃত্রাসুর নন, ইন্দ্র ত ননই। নায়ক দধীচি।

রবি এতদিন সূর্যকান্তকে মুকুটধারীর ভূমিকায়ই দেখিয়া আসিয়াছে। আজ তাঁকে এই নূতন পাঠে দেখিয়া সে খুশী হইল, যাক, এতদিনে বুদ্ধ বস্তুকে মূল্য দিয়াছেন, শুধু শূন্যগর্ভ সিংহাসনকেই নয়।

দধীচির পাঠ প্রথম হইতেই খারাপ হইতে লাগিল। উচ্চারণে ভুল হয়, শব্দ বাদ পড়িয়া যায়। নূতন ভূমিকায় বৃদ্ধ নিজেকে খাপ খাওইয়া লইতে পারেন না। একবার নিজেকে মনে করেন সিরাজ। ইন্দ্রকে বলেন, মিস্টার ক্লাইভ তুমি একজন জালিয়াৎ।

শেষের দিকে তাঁর গলা বসিয়া গেল, যেন স্বরবহা নালী মেপে চাপিয়া ধরিয়াছে।

দধীচির আবির্ভাব মাত্র চারবার। শেষ দৃশ্যে নাটকের ক্লাইম্যাক্স (Climax), দধীচির অস্থিদান, বজ্রসৃষ্টি, বৃত্রসংহার।

পর্দা উঠিলে দেখা গেল দধীচির পরিবর্তে চাদর গায়ে কবিরাজ সূর্যকান্ত করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি কহিলেন, বন্ধুগণ আমি প্রথমেই আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

বরাবর আমি নেমেছি ভোগীর পার্টে। সেজেছি রাজা বাদশা মাথায় দিয়েছি মুকুট, বসেছি সিংহাসনে।

মনে হল বুড়ো হয়েছি, ভোগের সময় আর নেই। এবার ত্যাগের সময়; বনে যাওয়ার সময়। বনে না যাই অন্ততঃ রাজা বাদশাগিরি ছেড়ে দেব, হব শ্রমণ, সন্ন্যাসী হব। অন্ততঃ রঙ্গমঞ্চের সন্ন্যাসী।

কিন্তু ভোগলিপ্সা আমার যায়নি, আসেনি ত্যাগের সময়। এখনও মাথায় মুকুট পরার লোভ আছে, তাই দধীচির পার্টে নামা আমার ভুল হয়েছিল। আপনারা আশা করি আমায় ক্ষমা করবেন।

এবার দধীচি হয়ে নামবেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ— অর্থাৎ জমিদার আশু সরকার মশায়। তিনি উঁচুদরের অভিনেতা, নাটকখানিও তাঁর লেখা। আশা করি তিনি আপনাদের আনন্দ দিতে পারবেন। নাটকের রসবস্তু ফুটে উঠবে নাট্যকারের নটপ্রতিভার মধ্যে।

বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে করতালি পড়িল। ছেলেরা আর থামিতেই চায় না। তাদের থামাইতে হয় ধমক দিয়া।

দধীচির ভূমিকায় নামে আশু সরকার। বুড়ো দধীচি আসিয়া রবির পাশে বসিয়া থাকেন। অভিনয় দেখেন, করতালি দেন, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া ওঠেন, চমৎকার হচ্ছে বশিষ্ঠ, বুড়ি দধীচি।

একবার বলেন, এ কি আর বুড়োর কম্ম, অস্থিদান!

অভিনয় শেষ হইল রাত প্রায় দুটোয়। তারপর চলিল আলোচনা, বই কেমন জমিয়াছে, কে কেমন পাঠ করিয়াছে।

আলোচনার সঙ্গে ভূরিভোজ।

দধিচীর ভূমিকায় অসাফল্য সূর্যকান্তের স্নায়ুতন্ত্রে বেশ আঘাত করে। প্রথমে উহা টের পান নাই। ছিলেন উত্তেজনার মধ্যে, করতালি দিয়াছেন, বাহবা দিয়াছেন, চীৎকার করিয়াছেন, চমৎকার হচ্ছে, দধীচি।

এবার তিনি গেলেন পরিবেশন করিতে। লুচির চাঙারি হাতে করিয়া ঘোরেন আর বলেন, দুখানা লুচি দেই ইন্দ্র? তুমি বরুণ আর নিচ্ছই না যে।

তরকারির ভাঁড় ও মাংসের বালতি লইয়াও সমানে ঘুরিলেন। জনে জনে যাচাই করিলেন, ঘোরাঘুরি হইল বোধ হয় এক মাইলের উপর।

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া যায়, পা টলে। রাজা সূর্যকান্ত দইয়ের ভাঁড় হাতে মেজেয় বসিয়া পড়েন। ছেলেরা ধরাধরি করিয়া তাঁকে বৈঠকখানার খাটে আনিয়া শোয়ায়। মাথায় জল দেয়। হোমিওপ্যাথ সত্যেন রায় দেন ঔষধ।

বৃদ্ধ একটু ভাল বোধ করিলে তিনি কহিলেন, আশু কোন বিপদ নেই। তবে সাবধানে থাকতে হবে। এখন দরকার এ ঘরের ভিড় কমানো।

ডাক্তার না বলিলে মুরারা হয়ত সেবায় প্রতিযোগিতা লাগাইত। ঘর এবার ফাঁকা হইয়া গেল। রহিল শুধু রবি। তার বিছানা হইয়াছিল সূর্যকান্তের খাটের ধারে, ছোট্ট আর একটা ক্যাম্পখাটে। পাশেই জানালা। শরতের শেষ রাত, একটু একটু হিম পড়িয়াছে, সেই হিমের ভিতর দিয়া অষ্টমীর চাঁদকে একফালি কুমড়ার মতন দেখায়। যেন দীঘির স্বচ্ছ জলে এক টুকরা কাটা কুমড়া ভাসিতেছে।

সূর্যকান্তের একটু তন্দ্রার মতন আসিয়াছিল। তন্দ্রা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ডাকিলেন, মীরজাফর!

রবি বলিল, আজ্ঞে।

আমার জীবনে আজ একটা ট্রাজেডি ঘটে গেল। বলতে পার জিনিষটা কি ট্রাজেডি, না কমেডি?

কমেডি ত নয়ই, ট্রাজেডিও নয়। আজ দেখলাম আপনার জীবনের একটা মহনীয় দিক।

যারা ভালবাসে তারা ওরকম দেখে। মন্দটা তাদের চোখে পড়ে না।

একটু থামিয়া সূর্যকান্ত বলিলেন, দধীচির পাঠ খারাপ হয়েছিল কেন, জান? প্রেরণা পাইনি, যে প্রেরণা পাই রাজার পাঠে, সম্রাট বাদশার পার্টে।

রবি বলিল, বরাবরের অভ্যাস আপনার সম্রাট সাজা।

তুমি ত বড় বোকা। অভ্যাসটাই বা এল কোত্থেকে? সেই প্রেরণার কথা বলছিলুম। মনে ক'রনা কিছু, মীরজাফর।

রবি বলিল, না মনে আবার করব কি?

রাজা সূর্যকান্ত আরম্ভ করিলেন, সে একটা ছোট্ট ইতিহাস। মুহূর্তের প্রেরণা। অনেকের জীবনে সেই মুহূর্তটাও আসে না।

তাঁর গলা কাঁপিয়া গেল। তিনি যেন অন্তরের গোপন কোন কথা বলিতে চান। গভীর মর্মবাণী।

প্রশ্ন করিয়া তার পবিত্রতাকে রবি নষ্ট করিতে চায় না। চুপ করিয়া থাকে।

বিন্দুময়ী — সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

সূর্যকান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। একটু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, তুমি সে বারে জিজ্ঞাসা করেছিলে মিরাপুর পরিষদের নাম কুইন পরিষদ কেন? আমার নটজীবনের প্রেরণা, পরিষদের নাম—সব কিছুরই উৎস ঐ এক। একটি মেয়ে। কুইন।

রবির চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে সুন্দরী এক তরুণী মূর্তি। যৌবনশ্রীতে বর্ষার গাঙের মতন উচ্ছল। তরুণ সূর্যকান্তের জীবনে সে একটি মুহূর্তের জন্য আসিয়াছিল। তিনি তাকে ডাকেন কুইন বলিয়া। মেয়েটিও দু-একটা খাপছাড়া কথা বলে, যে কথা বলার প্রেরণা জোগায় তার বয়স। সে হয়ত বলে, রাজার পাঠেই তোমায় সব চেয়ে বেশী মানায়।

সূর্যকান্ত সেই মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করিতে চাহিয়াছেন অভিনয়ের মধ্যে, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। জীবনভর তাই রাজা সাজিয়াই গেলেন।

কিছুক্ষণ তাঁরা নীরব ছিলেন। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সূর্যকান্ত বলিলেন, এ অসুখ এমন কিছু নয়। দুদিনেই কেটে যাবে। কি বল?

রবি বলিল, নিশ্চয়।

তখন আবার সম্রাট হয়ে নামব। আশু নতুন বই লিখছে 'সম্রাট হর্ষবর্ধন'। আমি হব হর্ষ। তোমার নেমন্তন্ন রইল, মীরজাফর। অভিনয়ে এসো কিন্তু। রাজার পাঠে আমি তোমাদের নিরাশ করব না। কখনও করিনি। কুইনের—

সূর্যকান্তের গলা কাঁপিয়া যায়। জিভ জড়াইয়া আসে। শেষ কথাটা রবির কানে যায় না।

পেনিসিলিন আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কিছুদিন আগে এদেশে এসেছিলেন। তিনি নানা জায়গায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধের যথেচ্ছ ব্যবহারের কুফল সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ নিয়ে দেশে একটু সাড়া পড়ে যায় এবং খবরের কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবিষয়ে ডাক্তারদের অবহিত হতে বলা হয়। আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধের ব্যবহার অন্যান্য অনেক ঔষধের মত কেবলমাত্র ডাক্তারদের হাতেই সীমাবদ্ধ নয়। উপযুক্ত শিক্ষিত ডাক্তার ছাড়াও আরও অনেক রকম চিকিৎসক এদেশে আছেন, যাঁরা এসব ঔষধ যথেষ্ট ব্যবহার করেন। প্রভাবশালী নেতৃবর্গের অনেকেই আজকাল দেশের দারিদ্র্যের অজুহাতে এবং চিকিৎসার খরচ কমাবার জন্যে এই শ্রেণীর চিকিৎসকদের উৎসাহিত করেন এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আন্দোলন করেন। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের জটিলতা সম্বন্ধে, সেইজন্য সকলেরই মোটামুটি একটা ধারণা থাকা উচিত।

আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের নিরাপত্তা—আজকালকার অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় জীবাণুধ্বংসী ঔষধগুলির একটা প্রধান গুণ এই যে, এগুলি কেবলমাত্র বিশেষ জাতীয় কতকগুলি বীজাণুর জীবন ধারণের, কতকগুলি অতি আবশ্যক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটায়। ফলে বীজাণুগুলির বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং অতি সহজেই সেগুলি ধ্বংস হয়। মানুষের অথবা জীব-জন্তুর শরীরে প্রয়োগ করলে শরীরের ভিতরকার বীজাণুর বিরুদ্ধেও ঐসব ঔষধের ক্রিয়া বলবৎ থাকে। কিন্তু শরীরের কোষগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপর সাধারণতঃ কোনও প্রভাব থাকে না। সেইজন্য এই সব ঔষধের প্রয়োগ শরীরের পক্ষে মোটামুটি কোন রকম ক্ষতিকর নয় বলা যায়। যদিও কোনও কোনও অ্যান্টিবায়োটিক অবস্থাবিশেষে শরীরে মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে, তবুও পুরান ধরণের নানা রকম রাসায়নিক বীজাণুনাশক ঔষধের তুলনায় আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিকগুলি এবিষয়ে অনেক নিরাপদ।

উপকারিতা ও সুবিধা—বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি রোগে চিকিৎসার কল্পনাতীত পরিবর্তন হয়েছে। নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস্, সেপ্টিসিমিয়া (অথবা ব্লাড পয়জনিং), টাইফয়েড, টাইফাস, গনোরিয়া, সিফিলিস্, যক্ষ্মা প্রভৃতি বীজাণুঘটিত অনেকগুলি মারাত্মক রোগের ভয়াবহতা এবং মৃত্যুহার অনেক কমে গিয়েছে। নিউমোনিয়া অথবা টাইফয়েডে সাংঘাতিক রকম আক্রান্ত রোগীও উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে খুব কম সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে।

অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধগুলির আরেকটি সুবিধা এই যে এগুলি অনেক রকম বীজাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী। পেনিসিলিন ককাই জাতীয় সকল প্রকার বীজাণু ধ্বংস করে। তা ছাড়া আরও কয়েকটি বীজাণুও ধ্বংস করতে পারে। অরিওমাইসিন্, ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন্, স্ট্রেপ্টোমাইসিন্, বেসিট্রেসিন্ প্রভৃতি আরও কয়েকটি নতুন ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে যাদের বীজাণুধ্বংসী ক্ষমতা আরও ব্যাপক। কোনটা হয়ত কোনও বিশেষ জাতীয় বীজাণুর উপর বিশেষ কার্যকরী, অন্যগুলির উপর কম কার্যকরী। মোটামুটি যাবতীয় বীজাণুঘটিত রোগে আমাদের আর আগের মত অসহায় অবস্থা নেই। একই ঔষধ অনেক রকম বীজাণু ধ্বংস করতে পারে বলে অনেক সময় সঠিক রোগ নির্ণয় না করেও ফল পাওয়া সম্ভব।

এই ঔষধগুলির বেশীর ভাগই ইনজেকশন্ ছাড়া মুখ দিয়ে খাওয়ান যায়। পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন কেবল ইনজেকশন্ দিতে হয়। পেনিসিলিনও আজকাল মুখে খাওয়ার

বিগত শতাব্দীতে নিউমোনিয়া চিকিৎসা—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শৈশবাবস্থার একটি চিত্র এটি। রোগীর ঘরের চতুর্দিক বন্ধ, ঘরে বাতাস এবং সূর্যালোক প্রবেশের কোনো পথ নেই, রোগীর আপাদমস্তক কম্বল ইত্যাদি দিয়ে এমন ভারাক্রান্ত করা হয়েছে যে, নড়াচড়ার উপায় নেই তার। চিকিৎসক রোগীর পাশে বসে আছেন কড়া নজর রেখে, পরিণামে রোগী হয় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করবে নইলে মৃত্যু, চিকিৎসক অপেক্ষারত।

ব্যবস্থা হয়েছে। ঔষধ প্রয়োগ করবার জন্য ডাক্তার কিম্বা কম্পাউণ্ডার দরকার হয় না। বীজাণুঘটিত কোন রোগ সন্দেহ হলেই সুবিধা মত একটা ব্যাপক প্রয়োগ উপযোগী অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তার বদ্যির সাহায্য ছাড়াই সেবন করা যায় এবং ভাল ফলও পাওয়া যেতে পারে। এই ঔষধগুলি নেহাতই দুর্মূল্য এবং সহজে পাওয়া যায় না, তা না হলে এগুলি এতদিন টোট্‌কা গৃহ-চিকিৎসার স্তরে নেমে যেত।

সহজ চিকিৎসা—যদি এই সব ঔষধ শরীরের উপর অনাবশ্যক প্রয়োগেও বিশেষ ক্ষতিকর না হয়, তবে এদের ব্যাপক বীজাণুধ্বংসের ক্ষমতার জন্য, যে কোনও প্রকার রোগের প্রথম সূত্রপাতে পারিবারিক গৃহচিকিৎসার ব্যবস্থার মত ব্যবহারে আপত্তিটা কি? আমাদের দেশে সব জায়গায় ডাক্তার বদ্যি পাওয়া যায় না। কিন্তু মারাত্মক নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, সেপ্টিক জ্বর, হুপিং কাসি, ডিফথিরিয়া, অ্যাকিউট টনসিলাইটিস্, বা কান পাকা, ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় ঘরে ঘরে। কাজেই ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করতে কয়েক ফাইল পেনিসিলিন টেবলেট্, অরিওমাইসিন্, ক্লোরোমাইসেটিন, কি টেরামাইসিন ঘরে রেখে দিলে কাজে লাগেই। বেশীর ভাগ বীজাণুঘটিত অসুখই জ্বর নিয়ে আরম্ভ হয়। জ্বর হলেই সেটা সামান্য সর্দি জ্বর, না নিউমোনিয়া, কি টাইফয়েড না মেনিনজাইটিস্, কি ম্যালেরিয়া দাঁড়াবে কে বলতে পারে? ডাক্তাররাও প্রথমাবস্থায় সব সময় বলতে পারেন না। রক্ত, প্রস্রাব, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষা করে তবে যদি বলা যায়। কাজেই জ্বর হলেই, একদিকে কুইনাইন এবং অন্যদিকে পেনিসিলিন কি টেরামাইসিন ইত্যাদি খাইয়ে দিলে এক সঙ্গে অন্ততঃ গোটা পাঁচের রোগের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এগুলোর যে কোনও একটা হলেই সেরে যাবে। যদি না সারে তখন ডাক্তার ডেকে যা হোক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধগুলির ব্যবহার একেবারে নিরাপদ হ'ত তবে এব্যবস্থা চলতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহারে নানারকম জটিল সমস্যা উঠতে পারে। কাজেই এরকম সহজ চিকিৎসা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সামান্য রোগে অ্যান্টিবায়োটিক—আজকাল অনেকে অতি সামান্য কারণে পেনিসিলিন বা অরিওমাইসিন ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণ সর্দি জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টন্সিলের ব্যথা, ফোড়া, খোস ইত্যাদি যে সব রোগ অনেকে গ্রাহ্যই করেন না, তাতেও এসব ব্যবহার হয়। অবশ্য এইসব রোগ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই বিশেষ কোনই অনিষ্ট করে না এবং আপনিতেই সেরে যায়, তবুও এগুলি থেকে সময় সময় মারাত্মক রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেই সম্ভাবনা থেকে অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার হয়। কিন্তু যেখানে হয়তো বিশেষ কম্‌প্লিকেশনের সম্ভাবনা নাই, সেখানেও হয়ত ডাক্তারকে এইসব ঔষধ ব্যবহার করতে হয়, তাড়াতাড়ি রোগীকে সারিয়ে দেবার জন্য। যদিও রোগগুলি সামান্য এবং সহজেই একটু বিশ্রাম নিলে সেরে যায়,

MB
হেড অফিস
৯, ক্লাইভ রো, কলিঃ -১
খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—
বালিগঞ্জ
হাতিবাগান (ইণ্টালি)
মির্জাপুর
বিহার শাখা ঃ—
ঝরিয়া
পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র
চা
মজুমদার ব্রাদার্স
৮, সানইয়াৎ সেন ষ্ট্রীট কলিঃ১২

তবুও অত্যন্ত ব্যস্ত কাজের লোকের পক্ষে এরকম ধরণের সামান্য অসুখও হঠাৎ জরুরী কাজের বিঘ্ন ঘটায়। তখন তার পক্ষে বিছানায় দু' এক দিনের বেশী শুয়ে থাকা হয় ত অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেই অবস্থায় বেশী পয়সা খরচ করেও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার তাড়ায় এইসব ঔষধ ব্যবহার করতে রোগীরাই ডাক্তারকে অনুরোধ করে।

রোগ নির্ণয় না করে অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রয়োগ—অনেক সময়ে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। বিশেষতঃ রোগের প্রথমাবস্থায়। তখন রোগনির্ণয়ে লেবরেটারীর বিশেষ পরীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। তাতেও হয়ত বার বার পরীক্ষা না করলে রোগ ধরা পড়ে না। সময় এবং অর্থ এতে দুই-ই যথেষ্ট লাগে। সব জায়গায় পয়সা খরচ করেও উপযুক্ত লেবরেটারীর সাহায্য পাওয়া যায় না। সেখানে কেবলমাত্র ক্লিনিক্যাল—ডায়গ্নোসিসের উপর নির্ভর করে অ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়। একটা না লাগলে আরেকটা, এ রকম দুই তিনটি পর পর অথবা একসঙ্গে দিতে হতে পারে। অনুমান ঠিক হলে এবং বরাত ভাল থাকলে একটা না একটা লেগে যায় এবং রোগী ভাল হয়। রোগী ভাল করাটাই যখন আসল উদ্দেশ্য তখন সঠিক রোগ নির্ণয় না করেও সেটা করতে পারলে আপত্তি কি? যদিও পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নাও হতে পারে। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে সব সময়ে অ্যাণ্টিবায়োটিকের জন্যই যে রোগ সারে তা নয় এবং একসঙ্গে দুই তিনটি ঔষধ প্রয়োগ করলে হয়ত একটায় কাজ হয়, অন্যটি অবান্তর ব্যবহার হয়।

অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধগুলির ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে এবং সবদিক বিবেচনা করে, বিধিমত এইসব ঔষধ ব্যবহার করা পরীক্ষামূলকভাবে অল্পদিনের জন্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চলতে পারে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম বলে এ রকম ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়।

অ্যাণ্টিবায়োটিকের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার—বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিকগুলির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বীজাণুর উপর প্রভাব থাকে। তার মধ্যে কতকগুলির উপর প্রবল প্রভাব থাকে এবং অপরগুলির উপর অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব থাকে। উল্টো ফলও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো বীজাণু কোনো বিশেষ অ্যাণ্টিবায়োটিকের সাহায্যে আরও শক্তিশালী হয়।

রোগটি কোন বীজাণু দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে না জানতে পারলে ঠিক ঔষধ ব্যবহার করা যায় না। একই ধরণের নিউমোনিয়া অথবা মেনিনজাইটিস অথবা পেরিটোনাইটিস অনেক রকম বিপরীতধর্মী বীজাণুর দ্বারা ঘটতে পারে। কোনটাতে হয় পেনিসিলিন সব চেয়ে বেশী কার্যকরী, কোনওটাতে হয় ত টেরামাইসিন অথবা স্ট্রেপ্টোমাইসিন অথবা অন্য কোনও ঔষধ বেশী ফলপ্রদ হবে। ঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে হলে জানা দরকার কোন্ বীজাণু দ্বারা রোগটি ঘটিত হয়েছে।

কিন্তু সব সময়ে কেবল রোগের বীজাণুর পরিচয় পেলেই চলে না। অনেক সময় একই জাতের বীজাণুর বিভিন্ন গোষ্ঠী ধ্বংস করবার ক্ষমতা কোনও বিশেষ অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের এক রকম নয়। সাধারণভাবে পেনিসিলিন ঔষধ স্টেফাইলোকক্কাস জাতীয় বীজাণুর যম। কিন্তু স্টেফাইলোকক্কাস বীজাণুরই কোন কোন গোষ্ঠী পেনিসিলিনের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখে। কোনও রোগীর শরীরে যদি স্টেফাইলোকক্কাস বীজাণুঘটিত রোগ হয় এবং যদি তাদের মধ্যে প্রতিরোধী গোষ্ঠীই বেশী থাকে, তবে পেনিসিলিন প্রয়োগ করলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্টেফাইলোকক্কাসগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু প্রতিরোধী বীজাণুগুলির একাধিপত্য স্থাপিত হবে এবং রোগের উপশম হবে না। যদি এই রোগী থেকে অপর কোন ব্যক্তির শরীরে রোগ সংক্রামণ হয়, তবে তারও পেনিসিলিনে কোনও কাজ হবে না। কিন্তু অন্য আরও অ্যাণ্টিবায়োটিক হয়ত এই গোষ্ঠীর উপর কার্যকরী হবে, তার ব্যবহারে ফল পাওয়া যাবে। কাজেই কোন বিশেষ রোগীর চিকিৎসায় তার শরীর থেকে বীজাণু বার করে সেটার সঙ্গে যে ঔষধ ব্যবহার করা হবে তার সঙ্গে লেবরেটারীতে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, ঐ ঔষধ ঐ বীজাণুর উপর কার্যকরী হবে কি না, এটাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু এ রকম পরীক্ষা কষ্টসাধ্য।

একাধিক বীজাণুঘটিত রোগ হলে, অথবা কোন বীজাণু কোনও অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধ প্রতিরোধ করতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে এবং লেবরেটারী পরীক্ষার সুবিধা না থাকলে দুই বা ততোধিক অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধ একত্রে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এরূপ ব্যবহারেও বেশ অসুবিধা আছে।

বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের সংযুক্ত ব্যবহারে কখনও একে অন্যের কাজে বিঘ্ন ঘটায়, কখনও বা একে অন্যের বীজাণু ধ্বংসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অথবা দুইটি ঔষধের পৃথক পৃথক কাজের সমষ্টিগত ফল পাওয়া যায়। কোনও বিশেষ জাতের স্ট্রেপ্টোকক্কাসের উপর পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন পৃথকভাবে যতটা কার্যকরী একত্রে তার বহুগুণ কার্যকরী। আবার নিউমোকক্কাস ঘটিত মেনিনজাইটিস অথবা নিউমোনিয়ায় পেনিসিলিন এবং অরিওমাইসিন পৃথকভাবে ব্যবহার করলে যে ফল পাওয়া যায়, এই দুইটি ঔষধ একত্রে ব্যবহার করলে তার চেয়ে অনেক খারাপ ফল হয়।

দুইটি অ্যাণ্টিবায়োটিক হয়ত একত্রে কোন এক প্রকার বীজাণুর বিরুদ্ধে বিশেষ শক্তিশালী একে অন্যের কাজের সহায়তা করে। কিন্তু অপর একটি বীজাণুর বেলায় হয়ত একে অন্যের কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে দুইটি পৃথক ব্যবহারে যে কাজ হয় একত্র ব্যবহারে তার চাইতে খারাপ ফল হয়। অ্যাণ্টিবায়োটিকগুলির সংযুক্ত ব্যবহার ব্যাপারটা এতই জটিল এবং অবস্থাবিশেষে পরিবর্তনশীল যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এবিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম করবার এখনও সময় হয়নি।

অ্যাণ্টিবায়োটিকের অপকারিতা—যদিও অ্যাণ্টিবায়োটিকগুলি সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী নয়, তবুও কোন কোন ঔষধ বেশী মাত্রায় অনেকদিন ব্যবহার করলে অনিষ্টকর হতে পারে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন বেশী মাত্রায় অথবা অনেকদিন দিলে শ্রবণ শক্তি নষ্ট হতে পারে এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থার গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। এর থেকে Vertigo অথবা মাথা ঘোরা রোগ হয়। এই উপসর্গগুলি একবার হলে আর সারান যায় না। ক্লোরামফেনিকল ব্যবহারের ফলে কখনও কখনও মারাত্মক রকম রক্তহীনতা (Aplastic anaemia) হতে দেখা গেছে। এসব ছাড়া ছোটখাট উপসর্গ অনেক সময় দেখা যায়।

অনেক সময় প্রথম ব্যবহারে এসব ঔষধে হয়ত কোনই অনিষ্ট হয় না। কিন্তু একবার ব্যবহারের পর শরীরে ঐ বিশেষ ঔষধ সম্পর্কে অ্যালার্জি বা এনাফাইল্যাক্সিস জন্মাতে পারে। যার ফলে, পরে ঐ ঔষধ ব্যবহার করলে মারাত্মক রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। পেনিসিলিনের ব্যবহারে এ রকম হতে দেখা গেছে। কোন কোনও ক্ষেত্রে পেনিসিলিনের দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। অবশ্য যে পরিমাণে পেনিসিলিন ব্যবহার হয়, তার তুলনায় এ রকম দুর্ঘটনা অত্যন্ত সামান্য। তবুও এ সম্ভাবনা মনে রাখা উচিত। সেই জন্য একবার বা অনেকবার যাদের পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে তাদের আবার পেনিসিলিন দেওয়ার প্রয়োজন হলে প্রথমে গায়ের চামড়ার মধ্যে অতি অল্প মাত্রায় পেনিসিলিন দিয়ে অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা আছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত।

আমাদের শরীরের কতগুলি জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক রকম বীজাণু বাস করে। যেমন গায়ের চামড়ায়, মুখ, গলা, নাকের মধ্যে এবং অন্ত্রের নীচের দিকে (যাকে লার্জ ইণ্টেস্টাইন বলা হয়)। এই বীজাণুগুলোর মধ্যে অনেকগুলি এমন আছে যারা সাধারণতঃ কখনই শরীরে কোন রোগ সৃষ্টি করে অনিষ্ট করতে পারে না। আবার কতগুলো আছে যেগুলি সুবিধা পেলেই শরীরের মধ্যে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করে। নিউমোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্টেফাইলোকক্কাস প্রভৃতি জাতীয় কতগুলি বীজাণু এই রকমে স্বাভাবিকভাবে শরীরের আনাচে কানাচে গুপ্ত শত্রুর মত থাকে। শরীরের ভিতর নানা রকম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যতক্ষণ সচেতন থাকে ততক্ষণ এরা বিশেষ কিছু করতে পারে না। যে কোন কারণে কোন জায়গায় এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কোন রকমে দুর্বল হলে এগুলি সুবিধা পেয়ে বসে এবং ফোড়া কার্বাঙ্কল থেকে সুরু করে নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। বি, কোলাই জাতীয় কতগুলি বীজাণুও অন্ত্রের মধ্যে এরকমভাবে থাকে। কতগুলি বীজাণু, বিশেষ করে যেগুলি অন্ত্রের মধ্যে থাকে তারা আবার আমাদের শরীরের অনেক উপকারেও লাগে। যে সমস্ত খাদ্যবস্তু আমাদের হজম করবার ক্ষমতা নেই এবং যেগুলো হয়ত অজীর্ণ অবস্থায় লার্জ ইণ্টেস্টাইনে এসে পড়ে সেগুলোকে ঐ বীজাণুগুলি পরিপাক করতে পারে এবং এই খাদ্য পরিপাক করবার সময় এমন কতগুলি জিনিষ বীজাণুদের জারক রস দ্বারা তৈরী হয় যেগুলি আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারী। যেমন ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভিটামিন। যদি ব্যাপক বীজাণু-ধ্বংসী কোনও অ্যাণ্টিবায়োটিক, যেমন অরিওমাইসিন বা টেরামাইসিন জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায় তবে এইসব বীজাণুও ধ্বংস হয়। ফলে শরীরে ভিটামিনের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

আমাদের শরীরের মধ্যে এইসব বীজাণু [illegible] নিজেদের মধ্যেও একটা পরস্পর

রেষারেষি আছে। যার ফলে কোনটাই বেশী রকম বাড়তে পারে না। প্রবলতর বীজাণুগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বীজাণুগুলিকে দাবিয়ে রাখে। আবার দুর্বল বীজাণুগুলির মধ্যেও আত্মরক্ষার জন্য প্রবল বীজাণুদের ধ্বংসের চেষ্টা আছে। তার ফলে হয়ত তারা এমন সব জিনিষ নিজেদের চারদিকে ছড়ায় যাতে অপর বীজাণু বাড়তে পারে না। দুর্বল জাতীয় কতগুলি বীজাণুর আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী জিনিসগুলি চিনতে পেরেই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করতে পেরেছি। পেনিসিলিয়াম নোটেটাম বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন গ্রীসিয়াম নামক ফাংগাস জাতীয় বীজাণুর চাষ করেই পেনিসিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন পাওয়া যায়। অবশ্য এই বীজাণুগুলি স্বাভাবিকভাবে মানুষের শরীরে থাকে না।

যাই হোক মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, শরীরের মধ্যে যেসব ইষ্টকারী বা অনিষ্টকারী অথবা নিরপেক্ষ গোবেচারা বীজাণুরা বাস করে এদের নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকার দরুণ একটা পারস্পরিক ভারসাম্য থাকে। অ্যান্টিবায়োটিকগুলি অবশ্য এইসব বীজাণুর সবগুলিকেই ধ্বংস করতে পারে না। তবে অপেক্ষাকৃত প্রবল যেসব বীজাণু এবং যেগুলি রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেগুলির বিরুদ্ধেই কার্যকরী ঔষধ আবিষ্কারের দিকেই এতদিন [illegible] হয়েছে। কাজেই এইসব ঔষধে সেগুলিই ধ্বংস হয়। কিন্তু যারা এতদিন নিরপেক্ষ বলে জানা ছিল, যেমন কতগুলি [illegible] জাতীয় বীজাণু, সেগুলির বিরুদ্ধে [illegible] অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। এখন দেখা যাচ্ছে যে যদি বেশী মাত্রায় অথবা [illegible] নানা রকম অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ কোন [illegible] দেওয়া যায় তবে তার নাক, কান, গলা [illegible] থেকে স্টেফাইলোককাস, স্ট্রেপ্টোককাস প্রভৃতি বীজাণু সব ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু [illegible] নিরপেক্ষ বীজাণু [illegible] যার ফলে এইসব [illegible] নিরপেক্ষ বীজাণুগুলি বেপরোয়া [illegible] এবং কোনও কোনও রোগের সৃষ্টি [illegible] সম্প্রতি এই জাতীয় বীজাণুঘটিত [illegible] দেখা [illegible] হয়েছে। [illegible] জাতীয় [illegible] নিজেই বীজাণু [illegible] হয়ে জানা গেছে। [illegible] নামক এক প্রকার [illegible] বীজাণুর দ্বারা [illegible] উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পর পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়েছে।

কাজেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলির আবিষ্কারে যদিও আমাদের হাতে অত্যন্ত শক্তিশালী কতগুলি অস্ত্র এসেছে, তবুও এগুলির সঠিক ব্যবহার না জানলে অনেক সময় শত্রু ধ্বংস না হয়ে এগুলি আত্মঘাতী হতে পারে। এখনও এইসব ঔষধ সম্বন্ধে অনেক জিনিষ জানবার বাকী আছে। তবে আশা করা যায় যে, বিজ্ঞান সর্বদিক দিয়ে নিরাপদ অস্ত্র নিশ্চয়ই দিতে পারবে। ততদিন পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিকগুলির ব্যবহার অভিজ্ঞদের হাতেই থাকা উচিত।

সংগীতে টাবু

(১০৪ পৃষ্ঠার পর)

গিয়ে বার্গয় নামে এক ভদ্রলোককে শ্রীঘর বাস করতে হয়। অবশ্য ক্যালভিনের মধ্যস্থতায় তিনি পর দিনই কারামুক্ত হন। আশ্চর্যের কথা, কারামুক্তির পর তাঁরই বদলানো সুরে যাজক মহল শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করল।

দ্বিতীয় আশ্রম ধর্ম পালনের সময় ব্রাহ্মণের পক্ষে গীত, বাদ্য, নৃত্য থেকে বিরত থাকবার বিধি আছে। অথচ সংগীত হিন্দুর ধর্মপালনের অপরিহার্য অংগ।

কোন কোন রাগ ব্রাহ্মণেতর লোকেরা গাইবে না, গাইলে জীবনাশংকা আছে, যথা দীপক গাইলে দাহে মৃত্যু। কিন্তু ব্রাহ্মণ গাইতে পারেন, কারণ ব্রাহ্মণ মানুষের ওপরে। নায়ক গোপাল এই নীতি অবহেলা করতে গিয়ে মারা গেলেন। কিন্তু এই নীতির সত্যতা সম্বন্ধে যে তাঁর অবিশ্বাস ছিল না, সেটা স্বীকার করতে হয়। অবিশ্বাস থাকলে তিনি গলাজলে দাঁড়িয়ে গাইতে গেলেন কেন?

গোপাল নায়কের প্রায় সমসাময়িক একজন পোপ [illegible] অর্ধস্বরযুক্ত স্বরের ক্রোমেটিক নোট প্রয়োগ দেখে ভাবলেন, এই অপকর্মের দরুণ মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে, অতএব একটা ফরমান জারী করে ওপাপ চার্চের ত্রিসীমা থেকে দূর করে দিলেন। আর সেই পাপই বর্তমানে য়ুরোপীয় সংগীতভূমির ভিতর ও বাহির উজ্জ্বল করছে—পাশ্চাত্য সংগীতে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করে কায়েম হয়ে বসে আছে।

আমাদের এখানেও, এখনও দেখা যায়, সারেংগী বাদনে আপামর সকলেই উল্লসিত। কিন্তু সারেংগী বাদন শিখতে ভদ্রলোকের ছেলের সমূহ আপত্তি—ওটা বাইজীদের সংগে বাজে!

ক বাবুর শিল্পী মেয়ে মঞ্চের উপর নাচবে। ক বাবু অ আ থেকে চন্দ্রবিন্দু অবধি সব বাবুকে নেমন্তন্ন করলেন নাচ দেখার জন্য। কিন্তু সেই মেয়েই যখন তবলা শিখতে চাইল, তখনই বাপের মুখ কালো! —সর্বজন সমক্ষে সমুদয় অংগ সঞ্চালনে আপত্তি নেই— কিন্তু বাঁয়া-তবলার ওপর শুধু অংগুলি সঞ্চালনই ঘোরতর বিসদৃশ!

অনভ্যাস যে অনেক ক্ষেত্রে এই টাবুর জন্য দায়ী, তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। আজকাল সংগীতচর্চা শিক্ষার অংগরূপে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছে। কোলকাতার অলিতে গলিতে বোধহয় হাজার খানেক সংগীত বিদ্যালয়ের অস্তিত্বও ছেলে-মেয়েদের, বিশেষতঃ মেয়েদের সংগীত-শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারছে না। অথচ, বছর কয়েক আগেই ভদ্র-সমাজে এই গান-বাজনার ব্যাপারটাই ছিল অচল।

গেছো মেয়ে — সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় হাতী ধরার কৌশল

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সিংহ

(সুসঙ্গ : ময়মনসিংহ)

১। ভূমিকা

ভারতবর্ষের অরণ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই হাতীর বাস। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার গভীর জঙ্গলে বহু প্রাচীন সময় থেকেই যে হাতীর বাস ছিল তার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন গ্রন্থকারের মতে প্রাচীনকালের গুহাবাসীরা ইয়োরোপের কোথও কোথাও এমন সব চিহ্ন রেখে গেছেন যা থেকে অনায়াসে প্রমাণ করা চলে যে, অধুনালুপ্ত কোনো কোনো জাতের হাতীর পূর্বপুরুষেরা ইয়োরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে বাস করত। লিডেনের প্রফেসর স্লেগেল এবং আরো অনেকে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, সিংহলের হস্তী সম্প্রদায় 'সুমাত্রার ল্যামপংস' (Lampongs of Sumatra) হস্তী জাতির অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মতে এই হস্তীশ্রেণী ভারতীয় হস্তীশ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ডাঃ ফ্যালকোনার অবশ্য "ন্যাচরাল হিস্ট্রি রিভিউ"তে তাঁর লেখা প্রবন্ধে বলেছেন যে, ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর হাতী দেখা যায় তারা এবং এসিয়ার অন্যান্য দেশের হাতী একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

সিওয়ালিক পর্বতমালার কোথাও কোথাও এবং দাক্ষিণাত্যের অংশবিশেষে অস্বাভাবিক বিরাট আকারের যে সমস্ত জন্তুর শিলীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা থেকে ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করতে পারেন, কোন্ যুগে এই সব জন্তু এই অঞ্চলগুলিতে বর্তমান ছিল। আর এই থেকে ভূতত্ত্বের কৌতূহলী ছাত্রেরা বর্তমান ভারতীয় হস্তীর মূল উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করায় যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারেন। গোদাবরী নদীর পলিমাটির গর্ভে হাতীর মাথার খুলির এবং দাঁতের যে শিলীভূত কঙ্কাল (Elephas Antiquous) পাওয়া গেছে (কোলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে) তা দেখে আমার মনে হয় তার সঙ্গে 'Stegodon Ganesa' শ্রেণীর অপেক্ষা ভারতীয় শ্রেণীর হাতীর সাদৃশ্য নিকটতর। আমার অবশ্য জানা নেই যে অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব শ্রেণীর হস্তীর কোনো নিদর্শন গুহাচিত্রের আকারে তখনকার যুগের মানুষেরা রেখে গেছেন কিনা। তবে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায় ভাস্কর্যশিল্পে ভারতীয় হাতীর ছবি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছে তা সত্যিই লক্ষণীয় বিষয়। মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় মৃত্তিকা খননের ফলে মাটির নিচে থেকে যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে সেকালের শীলমোহরের নক্সায় ভারতীয় হাতীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু পুরাণে হাতী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

মেক্সিকোর প্রাচীন [illegible] এক নমুনায় পাওয়া গেছে ভারতীয় হাতীর এক চিত্র। তার উপর বসে রয়েছে মাথায় পাগড়ী বাঁধা মাহুত। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্রিস্টোফার কোলাম্বাস কর্তৃক নূতন জগৎ আবিষ্কারের বহু শতাব্দীকাল পূর্বেই আমেরিকার হন্ডুরাস অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে ভারতীয় সভ্যতার

ফোটো—শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ

প্রগতির ইতিহাস নির্ভুলভাবে লিখিত হওয়ার পথে ভারতীয় হস্তী যে কতখানি সহায়তা করেছে সে কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে মিঃ ইলিয়ট স্মিথের লেখা "এলিফ্যান্টস অ্যান্ড এথনোলজিস্টস" নামক পুস্তকে। ইয়োরোপে সর্বপ্রথম কোথা ভারতীয় হাতীর ঠিক কোন্ সময় নাগাদ আবির্ভাব হয়েছিল সেটা নির্ভুল জানা যায় না। খুব সম্ভব, আলেকজান্ডার [illegible] কর্তৃক পাঞ্জাব বিজয়ের পর ভারতীয় মাহুত এবং হাতী আলেকজান্ডারের সঙ্গেই গ্রীসে [illegible] প্রথম গিয়েছিল। একজন লেখক বলছেন—" সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ইয়োরোপে [illegible] হাতীর দেখা পাওয়া যেত না।" সে সময়কার [illegible] নথি থেকে জানা যায় চতুর্দশ লুইয়ের [illegible] হাতী ছিল এবং সেটি ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে [illegible] পড়ে। এক সময় ইয়োরোপ এবং আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে নিয়মিত হাতীর ব্যবসা চলতো। পর্তুগীজ রাজত্বের সময় কিছু সংখ্যক মুরেরা এসে সিংহল দেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। এরা হাতী ধরার এক অসম-সাহসিক উপায় আবিষ্কার করেছিল। কোনো পোষা হাতীর সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র দু'

তিনজন লোকের সাহায্যে এরা প্রাপ্তবয়স্ক একক হাতী ধরতে পারত। হাতী ধরার এই দুঃসাহসিক পন্থা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে স্যার জে ইমারসনটেনেন্ট-এর লেখা "দি ওয়াইল্ড্ এলিফ্যাণ্ট্ অ্যান্ড দি মেথড্ অফ্ ক্যাপচারিং অ্যান্ড টেমিং ইন্ সিলোন্" নামক অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ পুস্তকে। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো রোমান ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকের ছবিতে দেখে থাকবেন হানিবলের রোম অভিযানের জন্য হাতীদের ভেলায় করে ইটালী অভিমুখে পাঠানো হচ্ছে। আফ্রিকার হাতীকে মানুষের দরকারে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ধরে পোষ মানানো হয়েছে এরকম কোনো নজির পাওয়া যায় না, কাজেই হানিবলের সৈন্য-বাহিনীতে যে আফ্রিকার হাতীও ছিল একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবে ভারতীয় হাতী আনিয়ে এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়েছিল এটাই কেবল সম্ভবপর হতে পারে। ইয়োরোপীয় লেখকদের মতে, হাতী আফ্রিকার অরণ্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও মিশর বা আফ্রিকার কোনো জায়গাতেই আঁকা কোনো হাতীর ছবি পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে স্যার জে-ই-টেনেন্ট'এর কথা উল্লেখযোগ্য—"ভারতবর্ষ থেকে গ্রীসে অ্যান্টিপেটার প্রথম আফ্রিকান হাতী এনেছিলেন ইটালীতে পিয়রেন্সও যে হাতী এনেছিলেন তাও ভারতবর্ষ থেকেই। কার্থেজিনিয়ানরা যুদ্ধে আফ্রিকান হাতী নিয়োগ করেছিল। ভারতবর্ষের মত আফ্রিকাতেও যে হাতী ধরার প্রথা প্রচলিত ছিল সে রকম কোন নজির নেই। তাই কিভাবে এই আফ্রিকান হাতীগুলিকে সংগ্রহ করা হোত সেই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলে না। নিগ্রো জাতির লোকেরা কি করে হাতী পোষ মানাতে হয় তা মোটেই জানত না, এমন কি নীল-নদের উপত্যকাবাসী বিশেষ উন্নত জাতিরাও হাতী ধরতে জানতো না। প্রাচীন মিশরের স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদিতে যে সব ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্পের নমুনা আছে তার মধ্যেও হাতীর ছবি কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ জিরাফ, ... এমন কি জলহস্তীর চিত্রও দেখা যায় ... মিশরে টলেমিগণের শাসন সময়ে এবং ভূমধ্য-সাগরের দক্ষিণ তীরস্থ দেশগুলিতে হাতীদের ধরে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ... ভারতবর্ষ থেকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ অনেক মাহুত ওই সব অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে সুরু করেছিলেন, মনে হয় তাঁদের কাছ থেকেই হাতীদের পোষ মানাবার বা শিক্ষা দেবার কৌশলের কথা সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজা রাজড়াদের রাজকীয় আড়ম্বর বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের নানা রকম আনন্দ বিধানের জন্য হাতীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু বিলাসিতার কথা বাদ দিলেও ভারতবর্ষের সৈন্য-বাহিনীতে সেই সুদূর প্রাক্-মুসলমান সময় থেকে সুরু করে বৃটিশ আমলের বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে পর্যন্ত না যন্ত্রচালিত যান-বাহনের প্রচলন হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত হাতী ছিল সমরোপকরণের এক অপরিহার্য অঙ্গ। আজও বড় বড় কাঠের ব্যবসায়ীদের কাছে এবং সরকারী বন-বিভাগগুলিতে হাতীর প্রয়োজন কমে নাই।

পৃথিবীর পশুশালাগুলিতে এবং সার্কাস-সমূহে দর্শকমণ্ডলীর কাছে হাতীর বিশেষ একটি আকর্ষণ আছে। গভীর বনভূমিতে যেখানে অন্যান্য যানবাহন চালনা দুঃসাধ্য সেখানে হাতী যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা বেশি বাড়িয়ে না বললেও চলবে। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং শুভেচ্ছা স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু হাতীকে ভারতবাসীর উপহারস্বরূপ অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের কাছে পাঠিয়ে হাতীর এক অভিনব মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। কিছুকাল পূর্বে সংবাদপত্রগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য খবর বার হয়েছিল: উত্তর-প্রদেশে হাতীকে চাষবাসের কাজে লাগানো হচ্ছে। খবরটা খুবই উৎসাহজনক এবং প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সাধারণভাবে বন্যজন্তু হত্যার যে পর্ব চলেছে, বিশেষ করে হাতীদের প্রতি যে ধরণের নৃশংস আচরণ করা হয়ে থাকে, তাতে বোধ হয় এদের লোপ পেতে বেশি দেরী হবে না। কিন্তু এইভাবে হাতীকে চাষবাসের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করলে হস্তীসংরক্ষণের দ্বারা এই মহান হস্তী-বংশ লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

যাই হোক, প্রাচীনকালে এবং আধুনিককালে এই বিরাট উপ-মহাদেশে কিভাবে হাতী ধরা হোত সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। 'ট্রাডিশন' চট করে মরে না, বিশেষ করে ভারত-বর্ষে ট্রাডিশনের মৃত্যু হয় না সহজে। মিঃ

মোট ধৃত হাতীর সংখ্যা ৩২। এরা আটদিন খেদায় বন্দী অবস্থায় আছে।
(এন ব্যানার্জির খেদা)

স্যান্ডারসন বলেন, হাতী বিশেষভাবে একেবারে দেশীয় প্রাণী। তাই ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে ট্রাডিশন্ অমর সেখানে বন্যাধিপতি হাতীর সঙ্গে মানুষের সমস্ত রকমের আচার অনুষ্ঠান যে অপরিবর্তনীয়ভাবে কালপরম্পরা চলে আসবে এবং আজও সেই একইরূপে থাকবে তাতে আর অস্বাভাবিকতার কি আছে? এই প্রসঙ্গে এখানে বলা চলে যে, ষ্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগের যুগে এই বিরাট উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মোটেই সুযোগ সুবিধা ছিল না এখনকার মত। তাই সিংহলে, মালয়ে, দাক্ষিণাত্যে, আসামে এবং বাঙলায় বন্য হাতী ধরার যে সব বিভিন্ন পন্থা প্রচলিত ছিল তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের আজও একটুও ... হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, এখনও কোনো কোনো প্রথা নিখুঁতভাবেই হুবহু অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ইয়োরোপীয়ানরা যখন হাতী ধরার ব্যবসা সুরু করেন তখন এসিয়ার এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে হাতী ধরার বিভিন্ন পন্থাগুলি সম্পর্কে তুলনামূলক একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। মিঃ স্যান্ডারসন প্রথমে মহীশূর গভর্ণমেণ্টের অধীনে এবং পরে কিছু-কাল ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে হাতী খেদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। মিঃ স্যান্ডারসন হাতী খেদার এক নতুন পন্থা প্রবর্তিত করেছিলেন, সেটা এখন তাঁর নামেই চলে গেছে। বাঙলা এবং আসামে হাতী খেদায় যে প্রথা প্রবর্তিত ছিল এটা তারই কিছুটা উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। "নতুন ধরণের দরজাটা" সত্যিই একটা উন্নত ব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ কোন উন্নতিকর পরিবর্তন করা হয়নি। এমন কি সুদূর মহাভারতের যুগেও সর্বোৎকৃষ্ট রণহস্তী চালান দেওয়ার জন্য আসামের যথেষ্ট নাম ছিল। হাতী ধরার ব্যাপারে আসামীদের ভারী অদ্ভুত রকমের পারদর্শিতা আছে। এটা একদিনে সম্ভব হয়নি। বহুকাল ধরে তারা এই কাজ করার ফলে বংশপরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতায় এতখানি পারদর্শী হয়ে উঠেছে। ইয়োরোপীয়ানরা হাতী ধরার ব্যাপারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাই লাভ কোরেছেন এসিয়াবাসীর কাছ থেকে; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কেউ কেউ এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেও পরাঙ্মুখ। উল্টে এঁরা হাতী সম্পর্কে ভারতবাসীর জ্ঞান যে কত সীমাবদ্ধ এবং তুচ্ছ সেটা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে জাহির করে থাকেন। স্যার জে-ই-টেনেন্ট, মিঃ মাইব্রয় এবং মিঃ চ্যাম্পিয়ানের মত লেখকেরা ভারতীয় হাতী সম্পর্কে যা লিখেছেন তা পড়ে যে কোন পাঠক আনন্দ লাভ করবেন এবং যথেষ্ট উপকৃত হবেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন লেখক ভারতীয়গণের প্রতি প্রতিনিয়ত কটাক্ষ করে

তাঁদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজিও অপাঠ্য এবং ঘৃণার্হ করে ফেলেছেন। ইয়োরোপীয় লেখকদের লেখা ভারতীয় হাতী সম্পর্কে কয়েকখানি বই পড়লে আশ্চর্য লাগে যে, কোনটিতেই 'পালকাপ্যের' নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন মস্তবড় পণ্ডিত লেখক, পুরাকালে অদ্ভুত একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে অত্যন্ত মূল্যবান এমন কতকগুলি কথা আছে যা আধুনিককালের বিজ্ঞানী প্রাণিশাস্ত্রজ্ঞ সমাজেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভারতীয় পদ্ধতিতে যেভাবে হাতীর উচ্চতা ইত্যাদি নিরূপণ করা হোত তার সঙ্গে আধুনিক কালের প্রাণিশাস্ত্রজ্ঞ-সম্মত উপায়ের এবং গভর্ণমেণ্টের অধীন বিভাগসমূহে প্রচলিত পদ্ধতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ভারতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকাংশ ইয়োরোপীয় সমালোচকের এই কথাটা জানা নেই। হিন্দু যুগে এবং পরবর্তী মুসলমান আমলেও রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে হাতী গ্রহণ করার পূর্বে যে মনোনয়ন হোত তাতে হাতীর এই উচ্চতা মাপার পর্বটা যে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল তার অনেক নজির রয়েছে। বন্য ভারতীয় হাতীর উচ্চতা সম্পর্কে বহু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ ইয়োরোপীয় লেখকের মতে ভারতীয় অরণ্যসমূহে দশ ফুটের বেশি উচ্চতাসম্পন্ন পুরুষ-হাতী পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অন্ততঃ আসাম রাজ্যে অবস্থিত গারো পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের শৈলশ্রেণীতে দশ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-হাতী দেখতে পাওয়া খুব একটা অসাধারণ কিছু ছিল না একথা জোর দিয়ে বলার স্বপক্ষে আমার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

দশ ফুটের বেশি উচ্চতাসম্পন্ন ভারতীয় হাতী দেখতে পাওয়া অসম্ভব বলে কোনো কোনো ইয়োরোপীয় লেখক যে দাবী জানিয়েছেন সেটা আমি মেনে নিতে অক্ষম। খেদায় নিহত একটি হাতীর উচ্চতা আমি নিজে মেপে দেখেছি ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি হয়েছে। হাতীটির পুরোভাগের বাম পায়ের পরিধি দ্বিগুণ করে এই মাপ পাওয়া গিয়েছিল। জীবনে এত বিরাট উচ্চতাবিশিষ্ট হাতী আমি আর দেখিনি। বিজ্ঞের ছাপমারা সংস্কারান্ধ প্রাণিবিশেষজ্ঞের দল নিজেদের অতিরঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সত্য ঘটনাকে অনেক ক্ষেত্রেই বিকৃত করে থাকেন। এই সব মারাত্মক ভ্রান্তির কোনোদিন সংস্কারের আশা পর্যন্ত থাকে না। বর্তমান যুগ হোল বিজ্ঞের যুগ এবং প্রচণ্ড ভুলকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার যুগ। কয়েকজন বিজ্ঞের সঙ্গে আরো কতকগুলি বিষয়ে আমার মতভেদ আছে। যাই হোক, আসল কথায় এখন ফিরে আসা যাক। কারণ, ইতিমধ্যেই আমি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছি। বিজ্ঞ প্রাণিশাস্ত্রবিদগণের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন আসল জিনিষ ঠিক যেমনটি দেখেছেন হুবহু তেমনটি একেবারে অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এর ফলে পরবর্তী বহু সমস্যার সমাধানে তাঁদের নির্দেশ যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারবে।

হাতী ধরার প্রণালী

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হাতী ধরার নিম্নলিখিত প্রণালীগুলি প্রচলিত ছিল:— (১) চোরাগর্ত, (২) পরতালা, (৩) ফাঁস, (৪) খেদা। প্রথমোক্ত প্রণালীটি অর্থাৎ চোরাগর্তে হাতী ধরা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মিঃ স্যাণ্ডারসনের বই থেকে জানা যায় মহীশূরে এককালে এই প্রণালীতে হাতী ধরা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বন্য হাতীদের যে পথে ঘন ঘন আসা যাওয়া চলে, অনেক ভেবে চিন্তে সেই রকম পথেই গর্ত খোঁড়া হোত। গর্তের মুখে একটা 'চোরা' পুল তৈরী করা থাকতো—বন্য হাতীর দল টেরও পেত না এইভাবে চোরা গর্ত আছে, কাজেই সবেগে তারা এর ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলেই পড়ে যেত গর্তের মধ্যে। বন্যহাতী এইভাবে চোরা গর্তের মধ্যে পড়ে বন্দী হোত। গর্ত থেকে এদের বের করে তুলে আনা হোত শিক্ষিত হাতীদের সাহায্যে। হাতী ধরার এই প্রণালীতে অনেক হাতী মারা পড়ত এবং গুরুতর আঘাত পেয়ে একেবারে অক্ষম হয়ে যেত। সেই কারণে উন্নততর খেদা প্রণালীতে হাতী ধরা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এই প্রণালীতে হাতী ধরা চোরাগর্তে হাতী ধরার চেয়ে ঢের বেশি সুনিশ্চিত এবং গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে হাতী চালান দেওয়ার পক্ষে এই প্রণালী বিশেষ লাভজনক। মানুষকে পুরুষপরম্পরা ধরে বহুকাল বন্য হাতীদের স্বভাব পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে গভীর মনোযোগ সহকারে, তবে হাতী ধরা সম্ভব হয়েছে। সর্বপ্রথম কবে হাতী ধরা হয়েছিল এবং পোষ মানানো সম্ভব হয়েছিল তা সঠিক জানা নেই, তবে এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা রকম পৌরাণিক বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

সদ্য ধরে আনা বাচ্চা হাতীকে চট করে পোষ মানাতে আমি দেখেছি। এমনও হতে পারে, সর্বপ্রথম এমনি কোনো একটা বাচ্চা হাতীকেই মানুষ ধরে এনে পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে নিজেদের অনেক কাজ করিয়েছিল। বাচ্চা হাতীকে ধরে এইভাবে মানুষ যখন সাফল্যের সন্ধান পেল, রোমাঞ্চকর এই নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ তাকে তখন নিয়ে গেল আরো এগিয়ে, সে অন্যান্য হাতীকেও বশ করতে স্বভাবতঃই উন্মুখ হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বাচ্চা হাতীদের ধরে বশ মানাতে মানাতে মানুষ এই বন্য জন্তুটির প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খানিকটা পরিচয় লাভ করল। তারপর সে এগিয়ে গেল বড় হাতীদের ধরতে। এইভাবেই চালু হোল পূর্ণবয়স্ক হাতী ধরা। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতীর অত্যন্ত কদর আর চাহিদা ছিল রাজ-রাজড়াদের কাছে। এর ফলেই হয়ত ভবিষ্যতে পরতালা এবং ফাঁসের দ্বারা হাতী ধরা আরম্ভ হয়েছিল। চোরাগর্ত তৈরী করে বন্য জন্তুদের হত্যা করার প্রথা পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। পরতালা প্রণালীতে হাতী ধরা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করব। পরতালা প্রথায় বড় বড় পুরুষ-হাতী ধরা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসাঙ-এর দাইদাররা এই প্রথায় হাতী ধরত। দাইদারদের এই পরতালা প্রথায় হাতী ধরার বিশেষ নৈপুণ্য আছে। এই প্রথায় হাতী ধরার নিয়মটা মোটামুটি এই রকম—বন্য ভারতীয় হাতীদের সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান যাদের আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, একটা বিশেষ সময়ে পুরুষ-হাতীদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। এই সময়টায় তারা নিজেদের স্বাভাবিক নম্র আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে অদ্ভুত এক ধরণের আচরণ করে।

পুরুষ-হাতীদের এই রকম "মস্ত" অবস্থায় তাদের সামনে দৈহিক মিলনে সক্ষম কোনো স্ত্রী-হাতী পড়লে তাদের সঙ্গে উত্তেজিত পুরুষ-হাতীরা মিলিত হয়। অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুদের মত কিন্তু স্ত্রী-হাতীদের বাহ্যিক কোনো যৌন উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয় না। পর্যবেক্ষণকারীদের মতে বাহ্যিক কোন যৌন উত্তেজনার ভাব দেখা যাচ্ছে না এমন "মস্ত" পুরুষ-হাতীও সামনে আকর্ষণযোগ্য কোনো স্ত্রী-হাতীর দেখা পেলে তার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ লাভ করে। তবে সাধারণতঃ এ রকম হয় না। বসন্তকালে বন্য-

হাতীকে পোষমানাবার জন্য বিশেষ বন্ধনী
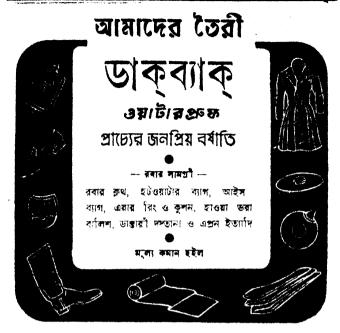
আমাদের তৈরী
ডাক্‌ব্যাক্‌
ওয়াটারপ্রুফ
প্রাচ্যের জনপ্রিয় বর্ষাতি
— রবার সামগ্রী —
রবার ক্লথ, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, এয়ার রিং ও কুশন, হাওয়া ভরা বালিশ, ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রন ইত্যাদি
মূল্য কমান হইল

যূথের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ-হাতী উগ্র যৌন-উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দল ছেড়ে মত্ত-প্রায় অবস্থায় স্ত্রী-হাতীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

হাতীদের যেখানে রাখা হয় সেই জায়গার নাম 'পিলখানা'। পুরুষ-হাতী এমনি 'মস্তু' অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে কোনো পিলখানায় এসে হাজির হলে তাকে বন্দী করার জন্য ৪—৭টি শিক্ষিত 'কুন্‌কি'-কে নিয়োগ করা হয়। 'মস্তু' পুরুষ হাতীদের ধরবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত স্ত্রী-হাতীদের 'কুন্‌কি' বলা হয়। বিশেষ যে স্ত্রী হাতীটি পুরুষ হাতীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম তাকে সর্বদা রাখা হয় পুরুষ হাতীটির সামনে অর্থাৎ স্ত্রী হাতীটির শরীরের পশ্চাৎভাগ পুরুষ হাতীটির দেহের সম্মুখভাগ প্রায় স্পর্শ করে থাকে। স্ত্রী হাতীটির পিঠে বসে থাকে মাহুত।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পুরুষ হাতীটি 'মস্তু' অবস্থায় এমনই বিভ্রান্ত যে, স্ত্রী-হাতীটির পিঠে যে মাহুত বসে আছে তার অস্তিত্বের কথা পুরুষ হাতীটির খেয়ালই নেই, মাহুতের হাতে আত্মরক্ষার আর কিছুই নেই, শুধু আছে একটি জাঠা অর্থাৎ বাঁশের লাঠির ডগায় তীক্ষ্ণ লোহ শলাকা বসানো একটি অস্ত্র বিশেষ। স্ত্রী-হাতীটির পিছনে পিছনে পুরুষ-হাতীটিকে পাগলের মত দিন-রাত্রি এই অবস্থায় তাড়িয়ে বেড়ানো হয়। অবশেষে হাতীটি যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে তার প্রিয়তমা হস্তিনীর দেহের পশ্চাৎভাগে নিজের শুঁড়টি রেখে প্রিয়তমার স্পর্শ সুখাবেশে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত। ১০ ফুট ২½ ইঞ্চি উঁচু একটি হাতীকে সুসাঙ্গ বাজারে-দিনদুপুরে আমি ধরা পড়তে দেখেছিলাম একবার। প্রশস্ত দিবালোকে হাজারো লোক জড়ো হয়েছিল এই মজা দেখতে। স্ত্রী-হাতীটি উচ্চতায় পুরুষ-হাতীটির চেয়ে প্রায় ২ ফুট ৬ ইঞ্চি কম ছিল। হাতীটি তার বিশালকায় শুঁড়টিকে হস্তিনীর নিতম্ব প্রদেশের উপর রেখে একেবারে স্থাণুর মত অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। এই ঘটনাটি ময়মনসিংহের 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' লিপিবদ্ধ আছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯১৫ সালে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সুসাঙ্গের দুর্গাপুর থানা থেকে মাত্র এক শত গজ দূরে অসংখ্য দর্শকের সামনে আরো একটি হাতীকে ধরা হয়েছিল এইভাবে। এবারকার হাতীটা ছিল বাচ্চা ধরণের। চমৎকার দেখতে, উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। ব্যাচারী এইভাবে তার প্রিয়তমা হস্তিনী কর্তৃক প্রলুব্ধ এবং প্রবঞ্চিত হয়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়েছিল।

যে হাতীটিকে এই প্রথায় ধরা হবে ঠিক হয়েছে সেটি যখন তার প্রিয়তমা হস্তিনীর কাছাকাছি গিয়ে ঠিকভাবে দাঁড়ায় তখন দুটি থেকে চারটি কুন্‌কি পুরুষ হাতীটিকে দুদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং নিজেদের দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে তাকে চাপ দিতে থাকে। এই উপলক্ষ্যে নিযুক্ত কুন্‌কিদের দড়ি দিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত একটি কুন্‌কি থাকে, সে দাইদারের একটু ইঙ্গিত পেলেই যথারীতি কাজ করতে পারে। পূর্ববঙ্গে এই বিশেষরূপে শিক্ষিত কুন্‌কিকে বলে— 'সিঁড়ির কুন্‌কি' (অর্থাৎ যে কুন্‌কিকে মই বা সিঁড়ির মত কাজে লাগানো হবে)। এই 'সিঁড়ির কুন্‌কি'র গায়ের চারি পাশে বিশেষভাবে কতকগুলি দড়ি সংযুক্ত থাকে, যাতে বিপজ্জনক সময় উপস্থিত হলে এই দড়ির মইয়ের সাহায্যে হাতীর পিঠে লাফিয়ে দাইদার আত্মরক্ষা করতে পারবে।

এই কুন্‌কির পিঠে সর্বদা এক তাল দড়ি প্রস্তুত রাখা হয়, দরকার হলেই মাহুত এই দড়ি ফেলে দেয়। দড়িগুলো প্রায় দু' ইঞ্চি মোটা এবং বারো থেকে চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা। যে হাতীটিকে ধরা হবে সেটি যখন পূর্বোক্তভাবে প্রলুব্ধকারিণী হস্তিনীর পিছনে এসে কাছাকাছি দাঁড়ায় তখন দাইদার ধীরে ধীরে কুন্‌কির পিঠ থেকে একটি দড়ি (অর্থাৎ পরতালা) হাতে নিয়ে নেমে পড়ে এবং খুব সন্তর্পণে হাতীটির বিপুল দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে এসে দাঁড়ায়। হাতীটি তার লেজটিকে এদিক-ওদিক অনবরতই নাড়তে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দাইদারকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে কোনো রকমে লেজের স্পর্শ না লেগে যায়। অনভিজ্ঞ দর্শকের কাছে এ দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে দেখার মত। চোখের পলক পড়তে না পড়তে এরই মধ্যে কখন দাইদার হাতের দড়িটাকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাতীটার একটা পায়ে দু'পাক জড়িয়ে ফেলে এবং এই দড়িটার শেষ প্রান্তের সঙ্গে আর একটা দড়িও ফাঁস দিয়ে তাড়াতাড়ি যোগ দেবার জন্যে দ্বিতীয় আর একজন দাইদার প্রথম দাইদারকে দড়ি এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দাইদার সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে দু'গাছি দড়ি হাতে নিয়ে প্রথম দাইদারের প্রয়োজনমত ঠিক হাতের কাছে এগিয়ে দেবার জন্য।

দাইদার এবার হাতীটির দ্বিতীয় পায়ের সঙ্গে দড়িটাকে জড়াতে থাকে এবং জড়ানো হলে এবার খুব ক্ষিপ্রগতিতে দুটো পাকেই দড়ি দিয়ে এক সঙ্গে বার বার জড়িয়ে বেঁধে ফেলতে থাকে। বলা বাহুল্য এই কাজে অদ্ভুত রকম ক্ষিপ্রতা এবং বিচক্ষণতার প্রয়োজন। দুটো পা দড়ি দিয়ে এক করে বেঁধে ফেলা হয় অনেকটা এইভাবে—এই কাজ করার সময় দাইদারটিকে অত্যন্ত একনিষ্ঠ হতে হয়, কারণ তার এই কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অসতর্কতা বা অন্যমনস্কতা বিপদ ডেকে আনতে পারে মুহূর্তে। মাঝারী আকারের হাতী হলে কমপক্ষে এই ধরণের ছ-গাছি দড়ি দিয়ে এবং বড় আকারের হাতী হলে আট গাছি দড়ি দিয়ে হাতীর পিছনের পা দুটিকে ওইভাবে বেশ করে পাক দিয়ে জড়াবার পর দাইদার নিজে এবার একটু বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং তার সহকারী নির্দেশমত ততক্ষণ আরো দুই থেকে ছ'গাছি দড়ি ওইভাবে জড়াতে থাকে। এবার দাইদার 'ফিনিশিং টাচ্' দেয় আরো গাছি দুই দড়ি হাতীর পায়ে জড়ানো দড়ির মাঝামাঝি জায়গায় জড়িয়ে দিয়ে। এতক্ষণে 'পরতালা'র কাজ শেষ হয়। এবার হাতীকে গাছের কাছে নিয়ে যাওয়ার পালা। এর নাম 'গাছ-লোয়ানো'। কোনো ঝামেলা না বাধলে গাছের কাছে হাতীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সমাধা হতে বেশী দেরী লাগে না, ঘণ্টা দেড়েকের কাজ। তবে সব কাজগুলোই যে পর পর আগাগোড়া যথাবর্ণিত সুষ্ঠুভাবে শেষ হবে এমন কথা নয়। হাতীর পায়ে দড়ি জড়াবার সময় হাতীই হয়ত গণ্ডগোল বাধাতে পারে, হয়ত একভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে যেতে লাগল কিংবা হয়ত ওইভাবে দড়ি জড়ানোর সময় তার বিরক্তির ভাব দেখা গেল। বিপদের সামান্য মাত্র আভাষ পেলেই দাইদার 'সিঁড়ির-কুন্‌কি'র আশ্রয় গ্রহণ করে। 'সিঁড়ির-কুন্‌কি'র মাহুত এই সময় সর্বদা প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে দাইদারকে সব রকমে সাহায্য করার জন্য। আসলে সিঁড়ির কুন্‌কির মাহুতের সতর্কদৃষ্টি এবং কুনকির নিখুঁত শিক্ষার ওপরেই ভীষণ সংকটজনক মুহূর্তগুলিতে দাইদারের নিরাপত্তা নির্ভর করে। হাতীকে গাছের কাছে নিয়ে যাওয়া পর্ব সুষ্ঠুভাবে শেষ হবার আগেই হয়ত মারাত্মক রকমের একটু ভুলের জন্য দাইদারকে সব কিছু সেই গোড়া থেকে নূতন করে আবার আরম্ভ করতে হেল। আমি এমন দৃষ্টান্তও দেখেছি যে, দাইদারের ভুলের জন্য কোনো কোনো হাতীকে একেবারেই ধরা সম্ভব হোল না। ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু একটি বুনো হাতী একবার সুসাঙ-এর পিলখানার ভেতরেই ছিল সাতদিন সাত রাত্রি।

এই সময়ের মধ্যে হাতীটি অনেকগুলি পোষা এবং সদ্যধরা হস্তিনীর সঙ্গে যৌন মিলন লাভ করেছিল। কিন্তু এত সুযোগ সত্ত্বেও বুড়ো দাইদারের আনাড়ি কাজের দরুণ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই হাতীটিকে ধরা সম্ভব হয়নি। আর একটি হাতী ধরার ঘটনায় ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল হস্তিনীকে আর মাহুত ব্যাচারীকে। হাতীটি বিগড়ে গিয়ে হস্তিনীকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে তাকে প্রায় দলে মথে এমনভাবে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, গুঁতোর চোটে হস্তিনীর প্রায় প্রাণটাই যেতে বসেছিল, আর ওদিকে মাহুতটি এই ধাক্কার চোটে এমন সাংঘাতিক কাবু হয়ে পড়ল যে, সারা জীবনটাই সে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে রইল।

কুন্‌কিরা নিজেদের দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে হাতীটিকে যতক্ষণ চেপে ধরে রাখে ততক্ষণ হাতীটির মেজাজ বেশ ঠাণ্ডাই থাকে, সে বিশেষ নড়াচড়া করে না বা কোন বিরক্তিও প্রকাশ করে না। সেই সময়ে হাতীর পিছনের পা দুটিতে দড়ি বাঁধার কাজ বেশ নিরুপদ্রবেই চলে, হাতী এতে আপত্তি জানায় না। পা দুটিতে দড়ি জড়াবার পর সেই জড়ানো দড়ির ওপরে আবার মাঝামাঝি জায়গায় আর একবার দড়ি জড়িয়ে সেটিকে বেশ মোটা এবং শক্ত গাছের কয়েকটা গুঁড়ির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলা হয়। এবার ধীরে ধীরে কুন্‌কিদের হস্তীরাজের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কুন্‌কিদের দেহের স্পর্শ সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে এইবার হস্তীরাজের হুঁস হয়, কোথাও কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে সে বুঝতে পারে এতক্ষণে। হস্তিনীদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তার চমক ভাঙে, এতক্ষণে তার মোহনিদ্রা কেটে গিয়েছে, কুহকিনী প্রিয়ার কাছে সে আবার এগিয়ে যেতে চায় কিন্তু যাবার কোন উপায় নেই, পা যে নড়তে চায় না, দৃঢ় সন্নিবদ্ধ পাগুলি তার, বন্দী হস্তীরাজের ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙে, ভীষণ রাগে সে ফেটে পড়ে। এ দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব—কুহকিনী প্রিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে—বাস্তবের এই প্রচণ্ড আঘাতে অরণ্য-দানবের মোহনিদ্রা ভেঙে যায়, এরপর সে যে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তা চোখে না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না। রোষে ফুলতে ফুলতে সে নিজের বিশাল বপুর ভার দিয়ে প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টানে চেষ্টা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। এই দারুণ টানের চোটে হাতীর পায়ের বন্ধনরজ্জু মনে হয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আর যে বিশাল গাছের গুঁড়িগুলিতে দড়ি বেঁধে রাখা হয়, মনে হয় সেগুলি সমূলে

"শিল্পী"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ লাহার কৌণ্টিং হইতে

উত্তেজিত হতে দেরী নেই। হাতীটি ঘূর্ণাকারে ঘুরতে থাকে আর অনেক চেষ্টা করেও গাছের কাছ থেকে যেতে না পেরে এবারে এক পাশে কাত হয়ে পড়ে নিজের দাঁত দুটো মাটির ভেতর চেপে গভীরভাবে ঢুকিয়ে দেয়, ভীষণ রাগে আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার অন্য দিকে কাত হয়ে পড়ে, শুঁড় উঁচিয়ে বার বার মাটিতে আছাড় দেয়, ভীষণ ক্রোধে গর্জন করতে থাকে, শক্তিশালী দুটো সামনের পা দিয়ে ধুলো-মাটি আর ইট পাথর সামনে যা থাকে চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিতে থাকে আর গাছের ডালপালা, যা তার নাগালে আসে সেগুলি ভেঙেচুরে একাকার করে দেয়।

মোট কথা, বন্দী হস্তীরাজ যতরকম সম্ভব শারীরিক অঙ্গ চালনার ভেতর দিয়ে নিজের আক্রোশ প্রকাশ করতে থাকে। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এই রকম চলতে থাকে কয়েক ঘণ্টা ধরে। উন্মাদের মত যত রকম সম্ভব বন্ধন শৃঙ্খল ছিন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসের পর হাতীটি নিস্তেজ হয়ে আসে। এ দৃশ্য ভারী মর্মস্পর্শী! বন্ধন-শৃঙ্খল উন্মোচনের সর্বরকম বিফল প্রচেষ্টার পর ভগ্নমনোরথ এক বন্দী দানব!! এ অবস্থায় তার কাছে দুটি মাত্র পথ খোলা থাকে: এক, মৃত্যুকে বরণ করা, দুই, ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে জীবনে যা ঝড়-ঝাপটা আসে তার সম্মুখীন হওয়া। অনাস্বাদিতের আবহাওয়ার মধ্যে অরণ্য-দানব, দ্বিতীয়োক্ত প্রকারের জীবন অবশেষে মেনে নেয় সেই চিরাচরিত ভাগ্যের অংশ। তবে উত্তেজনার দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু এখনো বাকী। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম গ্রহণের পর এবার লোকেরা বিরাট ভারী দড়ির দু-তিনটি ফাঁস এনে হাতীর গলায় পরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই দড়ির ফাঁসের ওজন সোজা নয়, এক একটার ওজন কুড়ি সের থেকে এক মণের মত।

কাজটা মোটেই সোজা নয়। মাহুতেরা তাদের হাতীদের সহযোগিতায় এই কাজ যে রকম সাহসিকতা আর সুনিপুণ অভিজ্ঞতা সহকারে সম্পন্ন করে তা সত্যিই প্রশংসার্হ। চোখে না দেখলে এগুলি বিশ্বাস করা শক্ত। গলায় দড়ির ফাঁস পরানো শেষ হলে এবার সামনের পা দুটি বেঁধে ফেলার পালা। এই কাজেও যে দড়ি লাগে তার আকার আর ওজন সেই আগের মতই। সামনের পা দুটি পিছনের পায়ের মত ঐভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধা হয়না তাই সামনের পা বাঁধা পূর্বের তুলনায় অনেকটা সহজ।

যেখানে কাছাকাছি বড় গাছ ঠিক মত না পাওয়া যায় সেখানে 'গাছ-লোয়ানো'র জন্যে গাছের অভাবে বিরাট আকারের খুঁটি পুঁতে ধাড় হাতীকে তার সঙ্গেই বাঁধা হয়। বাঁধা শেষ হলে হাতীর সামনে এবার কলাগাছ ছুঁড়ে ফেলা হয়। হাতীর রাগ তখনো কমেনি, কলাগাছ দিতে প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় খারাপ—লাথি মেরে দূ করে ঠেলে ফেলে দেয় সেগুলি সামনে থেকে এত বেগে এগুলি ছুঁড়ে ফেলে যে সামনে কাউকে এই নিক্ষিপ্ত বস্তু আঘাত করলে সে আঘাত বেশ সাংঘাতিক হতে পারে, তবে আহত ব্যক্তির একেবারে মৃত্যু হওয়া ব আজীবন পঙ্গু হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই হস্তীরাজের এই দুরন্ত অভিমানের ভাটা পড়ে। একটু-আধটু আপত্তি করেও এবং সে সরস কদলী বৃক্ষ দু-একটি করে গ্রহণ করতে থাকে। দুদিন এইভাবে বন্দী অবস্থায় থাকার পর, কুনকিদের সঙ্গে বদ্ধ অবস্থায় হাতীটিকে সকালে বা সন্ধ্যার সময় নদীতে জলপান করতে এবং স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম যেদিন হাতীটিকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন, যে মুহূর্তে হাতীটি বুঝতে পারে যে তার পিছনের পায়ের বন্ধনডোর মুক্ত হয়েছে সেই মুহূর্তে সে মরিয়া হয়ে পালাবার একটা চেষ্টা করে। এই ঝোঁককে দমন করতে কুনকি আর মাহুতদের ওপর যে ভীষণ চাপ পড়ে তা সাংঘাতিক। কুনকিরা এই ঝোঁক সামলাতে না পেরে অনেক সময় মাটিতে পড়ে যায় আর হাতী তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলে, বরাত জোরে কোনোমতে বেঁচে যায় এরা শেষে। তিন-চারবার এইভাবে নিষ্ফল চেষ্টার পর বন্দী হস্তীরাজের

বুঝতে বাকী থাকে না যে, শুধু গায়ের জোরে বোধহয় পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। এক সপ্তাহ পরে হাতীটিকে শিক্ষা দিতে সুরু করা হয় এবং মাস তিনেকের মধ্যেই দেখা যায় অরণ্য-দানব মানুষের আজ্ঞা পালন করে চলেছে। মোটামুটি পরতালা প্রথায় হাতী ধরার বৃত্তান্ত এই রকম। হাতী ধরার একটি অসাধারণ ঘটনার কথা আমার জানা আছে। এক হস্তিনীর বাচ্চা দলের অন্যান্য হাতীর সঙ্গে ধরা পড়েছিল হাতী-খেদায়, কিন্তু বাচ্চার মা অর্থাৎ হস্তিনী কোনোমতে খেদা থেকে বাইরে পড়ে গিয়েছিল। তাকে 'পরতালা' প্রথায় ধরা হয়েছিল। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন হাতী 'মস্ত্' অবস্থায় না থাকলেও পরতালা প্রথায় ধরা পড়ে অনেক সময়, তবে এ রকম অবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাতীরা মাহুত এবং কুন্‌কিদের গন্ধ পেলেই সরে পড়ে। কিন্তু কোনমতে হাতী একবার কোনো কুন্‌কির প্রলোভনে পড়লে আর তার নিস্তার নেই, প্রায় নিশ্চিতরূপেই সে ধরা পড়ে। এই প্রথায় হাতী ধরতে পূর্ববঙ্গের (সিলেটেরও) মাহুত আর দাইদাররা বিশেষ পারদর্শী। জানা যায়, নেপালীরাও পরতালা প্রথায় হাতী ধরতে অভ্যস্ত। সিংহলের মূরেরা কিভাবে বিরাট আকারের একক পুরুষ হাতীকে ধরে সে বিষয় বর্ণিত আছে স্যার জে টেনেন্টের বিখ্যাত পুস্তকে। সেই প্রণালীর কথা তাঁর বই থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি— "......মাত্র দুজন লোক কারুর কোন সাহায্য না নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে বিরাট আকারের পুরুষ হাতীকে ধরার চেষ্টা করে থাকে। এদের একমাত্র অস্ত্র হোল হরিণের বা মহিষের চামড়ার তৈরী নমনীয় দড়ি। এই দড়ির সাহায্যে তাদের উদ্দেশ্য হোল পিছনের পা বেঁধে ফেলা। হাতী যখন পুরোদমে চলতে থাকে বা বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকে তখন হাতীর মাঝে মাঝে একবার পিছনে একবার সামনে পা দোলানো যে স্বভাব আছে সেই সুযোগ গ্রহণ করে এরা। চলন্ত অবস্থায় তাদের পিছু নিয়ে বা বিশ্রাম গ্রহণের সময় পা টিপে টিপে একেবারে কাছে এগিয়ে এসে হাতী পা তুললেই চট করে পিছনের পায়ে ফাঁস পরিয়ে দেয়। কোনো কোনো সময় এই ফাঁসকে মাটিতে ফেলে রাখা হয়। তার এক অংশ গাছের নীচেকার মোটা শিকড় বা ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। গাছের ওপর একজন থাকে আর নীচে আর একজন থাকে। দড়ির ফাঁসটি মাটিতে পড়ে থাকে আর গাছের ওপরের লোকটি সেই বৃত্তাকার ফাঁসের সঙ্গে একটি দড়ি বেঁধে গাছের ওপর দড়িটিকে টেনে ধরে বসে থাকে। নীচের লোকটি হাতীকে কোনো মতে প্ররোচনা দিয়ে নিয়ে এসে তার পা টিকে দেওয়া করায় ওই বৃত্তাকার ফাঁসের মধ্যে। যেমন পা ফেলা সেই ফাঁসে, অমনি গাছের ওপরের লোকটি দড়ি টেনে ধরে ফাঁসটিকে ঠিকভাবে দেয় হাতীর পায়ে ঢুকিয়ে। দড়ির অন্য প্রান্ত তো বাঁধাই আছে গাছের নীচেকার ডালপালার সঙ্গে, কাজেই ফাঁস আটকে যেতে আর কোন বাধা থাকে না।"

এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, উপরোক্ত শেষ প্রণালীটি পূর্ববঙ্গের মাহুতেরা অবলম্বন করে থাকে, অন্যান্য সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তখনই। হাতী ধরা দড়ি পূর্ববঙ্গে তৈরী হয় পাটের আঁশ থেকে। নারকোল ছোবড়ার তৈরী দড়িতে বা চামড়ার তৈরী দড়িতে হাতীর গায়ের চামড়ায় যে রকম আঘাত লাগে, এই পাটের আঁশের দড়িতে সে রকম আঘাত লাগার সম্ভাবনা নেই।

এইবারে ফাঁসের সাহায্যে হাতী ধরার প্রণালীর কথা। আসামে এই প্রথায় হাতী ধরার নাম 'মেলা শিকার' বা অন্যান্য জায়গায় একে 'ফাঁড়ি শিকার'ও বলে। আসামের ফাঁস নিক্ষেপ-কারীরাই এই প্রণালীতে হাতী ধরতে বিশেষ-রূপে অভ্যস্ত এবং তাদের কুন্‌কিরাও এই কাজে বিশেষ পারদর্শী।

দুটি করে হাতী নিয়ে এক একটি 'ফাঁড়ি' দল গঠিত হয়। ফাঁসে হাতী ধরার জন্যে পুরুষ হাতীও ব্যবহৃত হয়। যে সব পোষা হাতীদের সাহায্যে বন্য হাতীদের ধরা হয় তাদের 'কুন্‌কি' বলা হয়। পুরুষ, স্ত্রী দু'রকম হাতীকেই 'কুন্‌কি' বলে। পাটের আঁশ থেকে বিশেষভাবে তৈরী দড়ি দিয়ে শক্ত ফাঁস নির্মিত হয়। এই দড়ির এক একটির ওজন প্রায় বারো থেকে পনেরো সের পর্যন্ত।

প্রত্যেক হাতীর কাঁধের ওপর বসে থাকে 'ফাঁস নিক্ষেপকারী' এবং তার সহকারী বসে থাকে কুন্‌কির পিঠে। ছোট একটা 'জাঠা' হাতে নিয়ে সহকারী কুন্‌কিকে পরিচালিত করে। কুন্‌কিদ্বয় হস্তীযূথের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে যে হাতীটিকে ধরা হবে সেটিকে প্রথমে নির্বাচিত করে। এরপর যে কোনো ফাঁড়িদল সেই নির্বাচিত হাতীটির যথাসম্ভব নিকটবর্তী হয়ে যখন বুঝতে পারে যে, সেই স্থান থেকে হাতীটির গলায় ফাঁস নিক্ষেপ করলে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে তখন তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। ফাঁস নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটি এমন বোকার মত নিজের শুঁড়কে বেঁকিয়ে ফেলে যাতে ফাঁস তার গলায় অতি সহজেই আটকে যায়। উল্টো দিক থেকে এই সঙ্গে দ্বিতীয় ফাঁড়ি দলও অপর একটি ফাঁস নিক্ষেপ করে। ফাঁস গলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটি ফাঁস খোলার জন্যে যে প্রবল টানা-হ্যাঁচড়া করে তার ফলে যাতে হাতীটির গলায় ফাঁস আটকে দম বন্ধ হয়ে কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনা না হয় সেই কারণবশতঃ ফাঁড়িদল ফাঁসের সঙ্গে, খুব ক্ষিপ্রতা সহকারে দু'গাছি সরু দড়ি বেঁধে ফেলে। বিপদের কথা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটি মরিয়া হয়ে উন্মত্তের মত বাঁধন ছাড়া পাবার চেষ্টা করে।

এই যুদ্ধ বলতে গেলে জীবন-মরণের যুদ্ধ। কখনো কখনো এর শোচনীয় পরিণতি হয় মারাত্মক দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে, যদিও এই ধরণের মারাত্মক দুর্ঘটনার সংখ্যা বোধহয় কুড়িটার মধ্যে একটা। হাতী ধরার এই উত্তেজনা-পূর্ণ প্রণালীতে ফাঁড়িদল লাভ করে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, আর সেই সঙ্গে পারদর্শী কুন্‌কিরাও এই ক্রীড়ামোদ বিশেষভাবে উপভোগ করে। গভর্ণমেন্ট থেকে কুন্‌কি-মালিকদের প্রতি এই প্রণালীতে হাতী ধরার নিষেধাজ্ঞা জারী না হলে আসামে কোনোদিনই সুনিপুণ ফাঁড়িদলের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

একদল বুনো হাতীর মধ্যে ভিড়ে গিয়ে ফাঁড়িদল কুন্‌কিদের সমভিব্যাহারে যেভাবে দুঃসাহসিক কাজ করে তা প্রত্যক্ষ করার মধ্যে জীবনের এক চরম রোমাঞ্চের সন্ধান পাওয়া যায়।

এবারে খেদায় কি করে হাতী ধরা হয় তাই নিয়ে আলোচনা করছি। সকল খেদার বৈশিষ্ট্যই এই রকম :—

১। একদল হাতীকে মানুষের সাহায্যে ঘিরে ফেলা হয়।

২। বড় বড় গাছের কান্ডকে খাড়াভাবে এবং চক্রবাল-সমান্তরালভাবে স্থাপন করে বেড়ার মত তৈরী করে বাইরে থেকে 'ঠেস্' (Prop) দিয়ে সেগুলিকে আটকে রেখে তৈরী করা হয় একটা গোলাকার কিংবা বহুভুজাকৃতি ক্ষেত্র। এই বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটির প্রবেশপথ বন্য হাতীরা যে পথ দিয়ে সচরাচর খুব বেশি যাওয়া-আসা করে তার ওপরেই তৈরী করা হয়।

৩। হাতীরা এই খেদার "গড়ের" মধ্যে অর্থাৎ ঘেরা জায়গার ভেতর প্রবেশ করার পর কুন্‌কিরা (স্ত্রী হাতী) গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে বন্য হাতীদের বন্দী অবস্থায় একে একে বাইরে নিয়ে আসে। খেদার এই "গড়" বা ঘেরা জায়গার মাপের ইতর-বিশেষ হয় বিভিন্ন স্থানে। ঘেরা বৃত্তাকার স্থানটির ব্যাসার্ধ কুড়ি থেকে একশো ফুট পর্যন্ত প্রায় হয়ে থাকে। কোনো কোনো জায়গায় বড় বড় খেদার গড়ের সীমারেখা বরাবর প্রায় ছ' ফুট চওড়া এবং ছ' ফুট গভীর পরিখা খনন করা হয়। হাতী ধরার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় এর শেষ পরিণতি এসে পৌঁছেছে খেদায়। সেটা সম্ভব হয়েছে বন্য হাতীদের স্বভাব এবং নৈসর্গিক বাসস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর অনুশীলনের ফলে। আমরা জানি হাতীরা স্বভাবতঃ দলবদ্ধভাবে বাস করতে ভালবাসে, এক এক দলে সংখ্যায় এদের পাঁচ থেকে কয়েক শত পর্যন্ত দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ঘন বনরাজি হাতীদের নৈসর্গিক বাসভূমি। খাদ্য, পানীয় এবং আশ্রয়ের তাগিদ অনুসারে এক এক দল হাতী নূতন নূতন পশুচারণভূমির সন্ধানে পর্যায়ক্রমে এক পশুচারণভূমি ছেড়ে অন্য পশুচারণভূমির দিকে রওনা হয়। বছরের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, সাধারণতঃ একবার গ্রীষ্মকালে এবং আর একবার বর্ষা শেষ হবার পর কোনো কোনো স্থানের হাতীরা একত্রিত হয়ে বিরাট এক একটি দল গঠন করে। মার্টিন জনসনের লেখা একখানি বইতে পড়েছিলাম যে, আফ্রিকার কোনো একস্থানে বিশেষ একটি ঋতুতে লেখক হাতীর একটি বিরাট দল দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই দলে কয়েক শত বা সহস্র হাতী নয়, তিনি একত্রে দেখেছিলেন বহু সহস্র হাতীকে। আমি এক জায়গায় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় দেড়শোরও বেশি সংখ্যক হাতীকে দেখেছিলাম একস্থানে জড়ো হতে। আসামে আমি যতদূর অনুশীলন করেছি তাতে আমার মনে হয় বছরের যে সময়টায় শিকার নিষিদ্ধ সেই সময়ের গোড়ার দিকে একবার আর শেষে একবার হাতীরা এমনি বিরাট দল বেঁধে বার হয়। এই বিশেষ সময়ের পর হাতীর এই বড় দল ভেঙে ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এই ছোট ছোট দলগুলির এক একটিকে পরিবার-গোষ্ঠী বলা যায়, এরা প্রত্যেকে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। হাতীদের এই ছোট ছোট পরিবার গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হোল মাতৃতান্ত্রিক। হাতীর শরীরের আয়তন বিরাট, তাই হাতীর দলকে ভ্রমণ করতে হয় অত্যন্ত সন্তর্পণে, বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট পথ দিয়ে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যখনই এরা দল বেঁধে যাতায়াত করে তখনই এই বিশেষ নির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করে। আমি এক স্কটিশ ভদ্রলোককে জানি, তিনি

Jagannath Temple, Puri
বিখ্যাত
নীপা
* কেশ তৈল
* প্রসাধন সাবান
* ব্রিলিয়েন্টাইন
* স্নো
* জস স্টিকস
গংগা ওয়ার্কস - আদিয়ার - বোম্বাই-৪
FAMOUS FOR FRAGRANCE
বিনামূল্যে নমুনার জন্য লিখুন।

শারদীয়ায়
উৎসব দিনগুলিকে
তৃপ্তিতে ও আনন্দে
মধুর করে তোলে
SANTOSH THIN ARROWROOT BISCUIT
সন্তোষ বিস্কুট ও ব্রেড
সন্তোষ বিস্কুট কোং লিঃ
কলিকাতা—১১

শারদীয়ার
উপহারে স্বর্ণালঙ্কার শ্রেষ্ঠ
গিনিসোনার
গ্যারান্টীযুক্ত
অলঙ্কারেই
আধুনিকতা
এইচ. এল. সরকার
এণ্ড কোং
১২৫-এ বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা • ১২

আসামের গারো পাহাড় এবং গোয়ালপাড়া অঞ্চলে হাতী খেদা করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই দুটি অঞ্চলে হাতীদের যাতায়াতের প্রধান-পথগুলির ইনি চমৎকার মানচিত্র পর্যন্ত তৈরী করে ফেলেছেন।

হাতীর দল স্বাভাবিক নিয়মের বশেই হোক বা কোন সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার জন্যেই হোক, যখন একস্থান পরিত্যাগ করে আর একস্থানে যায় তখন তাদের দলপতি হাতীর নেতৃত্বে সুসংঘবদ্ধভাবে যায়। ছোটখাট দলে প্রায়ই এই প্রবীণের পদ গ্রহণ করে একটি স্ত্রী-হাতী। কিন্তু ছোট ছোট দলের সমাপ্তি কোনো বড় দলের নেতা থাকে একটি শক্তিশালী প্রবীণ পুরুষ-হাতী। অনেক সময় এ রকমও দেখা গেছে যে, হাতীর দলের নেতা কোন পুরুষ হাতী তার পছন্দমত কোনো তেজী, সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ এক স্ত্রী-হাতীর ওপর ছেড়ে দিয়েছে দলের পরিচালনার ভার। এ রকম ক্ষেত্রে হঠাৎ খুব জটিল কোনো অবস্থার উদ্ভব হলে পুরুষ হাতী বিপদের তাল সামলাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে আসে। দলের সব হাতীই নেতা বা পরিচালককে সর্বদা অনুসরণ করে থাকে—স্বাধীনভাবে চলাফেরার সময় তো বটেই, এমন কি দলের নেতা ফাঁদের মধ্যে ঢুকলেও অন্য হাতীরা তাকেই অনুসরণ করবে। অনুশীলনের ফলে হাতীর আর একটি স্বভাব জানার দরুণ মানুষের বিশেষ সুবিধে হয়েছে। গাছ বা ঐ ধরণের কোনো বাধা পেলে হাতী নিজের কপালের জোর দিয়ে ধাক্কা দেয় সেটাকে সরিয়ে বা ভেঙে ফেলার জন্যে। হাতী নিজের শুঁড়কে এই কাজে কদাচিৎ প্রয়োগ করে বা একেবারেই করে না। হাতী নিজের শুঁড়কে দেহের সবচেয়ে কমনীয় অংশরূপে জ্ঞান করে এবং আঘাত লাগার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হলেই শুঁড়টাকে সর্বাগ্রে গুটিয়ে ফেলে। কোনো দলের হাতীরা সঙ্গে কোনো নবজাত হস্তীশাবক না নিয়ে একটি পশুচারণভূমি ত্যাগ করে নতুন কোনো চারণ-ভূমির উদ্দেশে রওনা হয় না। বিশ্বস্ত প্রত্যক্ষ-দর্শীর কাছে আমি শুনেছি, নিরাপত্তার জন্যে হাতীরা বাধ্য হয়ে হঠাৎ কোনো স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ করলে, সদ্যজাত হস্তী-শাবকটিকে শুঁড়ে করে তার মা এবং দলের অন্যান্য কয়েকটি হাতী বহন করে নিয়ে যায়। অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুদের মত হাতী খাল বা পরিখা লাফিয়ে পার হতে পারে না। ছ' ফুট চওড়া পরিখা পার হওয়া তাই হাতীর পক্ষে অসম্ভব। হাতী ধরার জন্যে হাতীদের সম্পর্কে এর প্রত্যেকটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্য। বন্য হাতীদের গতিবিধি সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তারা বিশেষ কোনো ঋতুতে ঠিক কোন্ ধরণের খাদ্যের সন্ধানে হস্তীরা কোথায় যায় তা সঠিক বলে দিতে পারে। সুসেঙ্গের দিকে এই বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ লোক আমার জানা আছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট হাতীর দলের সম্পর্কে তারা একবার বলেছিল যে, সেই দলটি গারো এবং খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলের কিছুটা অংশ জুড়ে একটা বিশেষ এলাকা পার হয়ে কখোনো সেই এলাকার বাইরে যায় না। আসামী প্রথায় স্থায়ীভাবে খেদার গড় তৈরী করে যে হাতীখেদা হয় সেটিই সবচেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ খেদা। এই ধরণের প্রথায় গড়ন্তে হাতী খেদার সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করে খেদার গড় তৈরী করার উপযোগী স্থান নির্বাচনের ওপর। কোনো জায়গায় হাতী-খেদার গড় তৈরী হলে সেখান থেকে বছরের একটি খেদার সময় (অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত) পার না হলে আর গড় সরানো যায় না। এই প্রথায় হাতী ধরার সাফল্যের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে প্রায় শতকরা আশি ভাগ। এই প্রথায় একই সময়ে একটি একক হাতী, দলের কতকগুলি হাতী কিংবা অনেক সময় সমগ্র হাতীর দলটিই ধরা পড়তে পারে। সাধারণত রাত্রির বেলা চিহ্নিত এলাকার মধ্যে কোনো হাতী এসে পড়লে, সূর্যাস্তের আগে থেকে স্থানে স্থানে যে সব পর্যবেক্ষণকারী রক্ষী দল এই আগমনই প্রত্যাশা করছিল তারা প্রচণ্ড সোরগোল তুলে আগুন জ্বালিয়ে হাতীকে তাড়া দেয়। হাতীর মনে কোনো সন্দেহই নেই, সে তাড়া খেয়ে তাদের চলাফেরার প্রধান পথ ধরে সবেগে এসে ধরা দেয় ফাঁদে। মৃত জন্তু নীচে রেখে রাত্রে মাচানের ওপর বসে বাঘের অপেক্ষা করা আর দিনের বেলা জঙ্গল ঠেঙিয়ে বাঘ তাড়িয়ে এনে মাচানের ওপর বসে বাঘ শিকার করার সঙ্গে যা প্রভেদ হাতীখেদার বেলাতেও প্রথমোক্ত প্রকার খেদার সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকারের খেদা, যার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে যাচ্ছি তারও ঠিক তেমনি পার্থক্য।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, আগরতলা পাহাড় এবং কাছাড় পাহাড়ের অঞ্চল সমেত পূর্ববঙ্গে যে ধরণের হাতীখেদা ব্যক্তিগত দলের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই বিষয়ে এবার আলোচনা করব। এখানে এই সম্পর্কে একটি মন্তব্য করতে চাই। ব্যক্তিগত দলের প্রচেষ্টায় যেমন ফাঁসের সাহায্যে হাতী ধরায় উৎসাহ দেওয়া উচিত সেই সঙ্গে যাতে সমস্ত হাতীখেদাই কেন্দ্রীয় গভর্ণ-মেণ্টের নির্দেশে রাজ্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরি-চালিত হয় তার ব্যবস্থাও করা উচিত। এর ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র হাতীর চাহিদা মেটানো কঠিন হবে না আর বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে এই ব্যাপারে যে অমিতব্যয়ী প্রতিযোগিতার দরুণ বন্য হাতীরা ধীরে ধীরে বিনাশ হতে হতে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হতে চলেছে তার সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে। ভবিষ্যতে এর দ্বারা হাতী ধরা সম্পর্কে ভারতবর্ষের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। হাতী ধরার দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চ-কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য নানা দেশ থেকে ক্রীড়ামোদী শিকারী দর্শকেরা ভারতবর্ষে আসার জন্য আগ্রহ বোধ করবেন এবং তার ফলে গভর্ণ-মেণ্টের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

হাতীখেদার ব্যাপারটা এবারে আগাগোড়া সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

(১) প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা, (২) ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, (৩) পিলখানা, (৪) ধৃত হস্তীদের ব্যবস্থা করা।

গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে হাতীখেদা পরি-চালনা করার অনুমতি পাবার পর যে ধনী ব্যক্তি হাতীখেদা করবেন তিনি এই কাজে অভিজ্ঞ একজনের ওপর আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারের পরিচালনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন (ভারতবর্ষে হাতীদের আইনানুসারে রক্ষা করা হয় এবং কখোনো কখোনো জনসাধারণকে বিশেষ কোনো জায়গার হাতী-মহল ইজারা দেওয়া হয় হাতী ধরার জন্য)। হাতী খেদার ব্যবস্থাপনা করতে হয় এই ভাবে—

১। প্রধান কর্মকেন্দ্র

(ক) সাধারণ তত্ত্বাবধান।

(খ) মালখানা এবং জিনিষপত্র সরবরাহ।

(গ) পিলখানা।

(ঘ) লোকজন নিয়োগ।

২। ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা

(ক) ভ্রাম্যমাণ ভাণ্ডারগৃহ এবং সরবরাহ শিবির।

(খ) যানবাহনের ব্যবস্থা।

(গ) খেদার লোকজন এবং হাতীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির।

(ঘ) পিলখানা।

৩। পিলখানা

(ক) হাতী সংগ্রহ করা।

(খ) লোকজন নিয়োগ করা।

(গ) কুন্‌কিদের শিক্ষা দেওয়া।

৪। বিলি-ব্যবস্থা

(ক) হাতী।

(খ) বাড়তি মালমশলা।

গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে হাতীখেদার সমস্ত ব্যবস্থা হলে যেভাবে বিরাট আয়োজন করা সম্ভব সে রকম আয়োজন কোনো ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় সম্ভব নয়। খেদা পরিচালনা করার দায়িত্বভার যাঁর ওপর থাকবে তাঁকে খেদার লোকজন হাতী এবং খেদার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মালপত্র সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় ঠিকভাবে বুঝে যা কিছু পরিচালনার কাজ চালাতে হবে সুনিপুণ অভিজ্ঞ লোকের মতই। আগে গভর্ণমেণ্টের মিলিটারী বিভাগের তত্ত্বাবধানে খেদা পরিচালনা করার যে ব্যবস্থা ছিল সেটা খুব ভাল ব্যবস্থাই ছিল। যে ধরণের হাতীখেদার কথা আমরা আলোচনা করব সেটা সুষ্ঠুভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করতে হলে মূল ব্যবস্থাপক বা উদ্যোক্তাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খেদায় নিযুক্ত তার অধীন লোকেদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিয়মানু-বর্তিতা বজায় থাকে। খেদার সাফল্যের জন্যে এই নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন আছে সবার আগে। সব সময়ে দেখা যায় সব লোকের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। সকলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা পেতে হলে কুন্‌কি হাতীর মালিক এবং জমির ইজারাদারের মধ্যে একটা ভাগের ব্যবস্থা থাকা দরকার। হাতী ধরার পর সেগুলির বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে খরচ-খরচা বাদে যা লাভ হবে তাতে এদের প্রত্যেকের ভাগ থাকবে। কুন্‌কির মালিকেরা খেদায় ধৃত হাতীদের দায়িত্বভার বুঝে নিলেই খেদায় নিযুক্ত লোকজনের কাজ শেষ। খেদায় ধরা নতুন হাতীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে যে পর্যন্ত কুন্‌কিদের সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে আনতে না পারে ততদিন এদের যা কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কুন্‌কিদের মালিকদের ওপর।

হাতীখেদা করার জন্য যে কি বিরাট আয়োজনের দরকার তা এর তোড়জোড়ের ঘটা দেখেই সকলে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন। হাতীখেদা যে জায়গায় হবে সেখান থেকে খেদার প্রধান ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজারের অফিস খুব দূরে হবে না। হেড-অফিস বা প্রধান কর্মকেন্দ্রের জন্য কোনো জায়গাকে ঠিক করার আগে দেখতে হবে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস যেন সেখান থেকে দূরে না হয় এবং খেদার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্র পাওয়া যাবে এমন একটি বাজারও কাছাকাছি থাকা দরকার। কর্তব্য সম্পাদনে রত-থাকাকালে ম্যানেজার যখন যেখানে

স্কেচ শানু লাহিড়ী

যেকেই হোক নির্দেশ দেওয়া মাত্র সে কাজ সত্বর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম এমন কোনো লোককে হেড অফিসের কর্মকর্তা হিসেবে রাখা উচিত।

সুসঙ্গ-এর দিকে গারো পাহাড় অঞ্চলে হাতীখেদা করতে হলে মোটামুটি কত লোকজন লাগে তার একটা হিসেব এখানে দিলে হয়ত মন্দ হবে না—

(১) দুই দলে ৪ জন করে 'পাঞ্জালী'	৮
(২) স্থায়ী বার্তাবাহক	৪
(৩) বন্দুকের লাইসেন্সধারী শিকারী	৬
(৪) হেড সর্দার (বা জমাদার)	১
(৫) সহকারী জমাদার	১
(৬) সর্দার	১৮
(৭) সহকারী সর্দার	১৮
(৮) প্রত্যেক সর্দারের অধীনে ১৪ জন করে, মোট কুলি	২৫২
(৯) বাড়তি কুলি	৪৮
	৩৫৬
(১০) মেডিকেল অফিসার	১
ঐ কর্মচারী	১
(১১) খেদা অফিসার	১
ঐ কর্মচারী	১
(১২) ভ্রাম্যমাণ শিবির তত্ত্বাবধায়ক	১
'কয়ালদার'	১
সশস্ত্র রক্ষী	১

(১৩) পিলখানা বিভাগ

অন্ততঃ ১২টি বেশ সুশিক্ষিত কুনকি নিয়ে প্রথমে কাজে নামা উচিত। বিভিন্ন আকারের ২০টি ধৃত হাতী এর সঙ্গে থাকলে ১২টি কুনকির সাহায্যেই কাজ চলে যায়। হাতীখেদায় ধৃত হাতীর সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে সেই সঙ্গে কুনকির সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

(১) ইনসপেক্টর ১ (ডিপোর ভার থাকবে এঁর ওপর)
ঐ কর্মচারী ১

(২) সহকারী ইনসপেক্টর ১ (হাতীখেদার স্থানে অবস্থিত পিলখানার ভারপ্রাপ্ত)

(৩) প্রত্যেক কুনকির সঙ্গে এগুলি থাকা চাই
(ক) মাহুত ১
(খ) ঐ সহকারী ১
(গ) ঘেসেড়া ১ থেকে ২ জন।

(৪) সদ্যধৃত যে সব হাতী শিক্ষাধীন থাকবে তাদের প্রত্যেকের জন্যেও চাই—
(ক) মাহুত ১
(খ) ঐ সহকারী ১ (বড় হাতী হলে ২ জন)
(গ) ঘেসেড়া ১—২ জন (বড় হাতী হলে ৪ জন)
(ঘ) সশস্ত্র রক্ষী ২ (১ জন ডিপোর এবং অন্য-জন চলমান পিলখানার)

প্রত্যেক কুনকির পুরো 'সাজ' এবং মাহুতের সঙ্গী থাকা দরকার। মাহুতদের নিজেদের বাসনপত্র নিয়ে যেতে হয়। পিলখানার ইনসপেক্টরের কাছে বেশ কিছু পরিমাণে পাট থাকে। এটা তিনি মাহুতদের মধ্যে ভাগ করে দেন। মাহুতেরা অবসর সময়ে এই পাট দিয়ে বন্যহাতীদের বাঁধার জন্যে নানারকমের দড়ি তৈরী করে। দাইদারের নির্দেশমত এগুলি তৈরী করা হয়। পিলখানার লোকেরা নিজেদের রসদের ব্যবস্থা সাধারণতঃ নিজেরাই করে মালখানা থেকে কেবল ওষুধপত্র দেওয়া হয়। খেদার কাজ আরম্ভ হলে হাতীখেদার ক্ষেত্রে খেদা সর্দারকে এবং তার লোকজনদের [illegible] পরিমাণে জিনিসপত্র দিতে হয় তার একটা আন্দাজ দিচ্ছি। প্রত্যেক সর্দারকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার সঙ্গে প্রত্যেক কুলির জন্যে মাথাপিছু দশ দিনের উপযুক্ত রসদ পাঠাতে হয়। রসদ পাঠানো হয় প্রতি দশদিন অন্তর। হাতীখেদার গড়ে অবস্থিত লোকজনদের জন্যে রসদের সঙ্গে এই জিনিসগুলি পাঠাতে হয়—

১। পাট, ২। বাতি, ৩। খালি কেরোসিনের টিন, ৪। টর্চ, বাড়তি ব্যাটারী এবং বাল্ব, ৫। দেশলাই, ৬। কেরোসিন, ৭। [illegible], ৮। দা, ৯। কুড়ুল, ১০। কোদাল, ১১। খন্তা, ১২। শাবল, ১৩। করাত, ১৪। বাটালি, ১৫। হাতুড়ি, ১৬। সাঁড়াশী, ১৭। ম্যানিলা দড়ি, ১৮। পেরেক দু' ডজন—১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, ১৯। এক মুখ ছুঁচালো লোহশলাকা, ২০। প্রত্যেক লোকের জন্য একখানি করে কম্বল, ২১। কড়াই—২।৩টি, সর্দার এবং তার দলের লোকেদের জন্যে, ২২। চাউল—কর্মরত থাকলে

সেই দিনগুলির জন্যে মাথাপিছু প্রতিদিন এক সের করে এবং কাজ না করলে, বিশ্রামের দিনগুলির জন্যে ১৪ ছটাক হিসেবে, ২৩। গুড়, ২৪। তামাকপাতা, ২৫। তেঁতুল, ২৬। বাদাম, ২৭। ডাল, ২৮। সরষের তেল, ২৯। লবণ, ৩০। পেঁয়াজ, ৩১। আলু, ৩২। শুঁটকি মাছ, ৩৩। মরিচ এবং হলুদ, ৩৪। চিটাগুড়। কোনো কোন আসামী লোকদের জন্যে তেঁতুল, আলু এবং গুড়ের পরিবর্তে আফিং এবং চা দিতে হয় (আজকাল যদিও মহাত্মাজীর প্রভাবে আফিং খাওয়ার অভ্যাসটা গেছে)।

অফিসারদের জন্যে দিতে হয় চা, চিনি, বার্লি, টিনে জমানো দুধ, সিগারেট ইত্যাদি। বন্দুকের জন্য গুলী-বারুদ দিতে হয়। ম্যানেজার এবং তাঁর নিজস্ব কর্মচারীদের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির কথা আমি এখানে উল্লেখ করিনি।

নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ হাতীখেদার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তোড়জোড় পর্ব শেষ হলে হাতীদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে দুদল 'পাঙ্গালী' (হাতীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী) পাঠানো হয়। হাতীখেদা দলে বারোটি কুন্‌কি থাকলে খুঁজতে হবে এমন হাতীর দল যাতে ত্রিশটি হাতী আছে, কুন্‌কির সংখ্যা কুড়ি থাকলে পঞ্চাশ সংখ্যক হাতীর দলের সন্ধান করা দরকার। হাতীর দলের সন্ধান পাওয়ার পর দলটি কোনো সুবিধাজনক জায়গায় এসে পড়লেই 'পাঙ্গালী' এসে জমাদারকে অবিলম্বে জানায়। জমাদার তার দলবল নিয়ে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় অপেক্ষা করে। হাতীর মূল দলটি ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ধানকাটার পরে সাধারণতঃ ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ হাতীখেদার কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত।

হাতীর দল অপেক্ষাকৃত বড় হলে ক্ষতি নেই কিছু। খুব বেশি সংখ্যক হাতী দলে থাকলে সামলাতে না পারলে কিছু সংখ্যক হাতী পালিয়ে যেতে পারে। আজকাল জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য, মজুরীর হারও বেড়েছে, তাই হাতীখেদার ব্যাপারে অর্থনৈতিক সাফল্যের দিকটা বিচার করে দেখলে প্রথম চেষ্টাতেই বিক্রয়যোগ্য অন্ততঃ ষাটটি হাতী ধরা দরকার।

বিশেষ কোনো একটি স্থানে হাতীদের ঘেরাও করার হুকুম দেবার আগে ম্যানেজার পাঙ্গালীর অর্থাৎ হাতীর পদাঙ্ক অনুসরণকারীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়ে খবরগুলি সঠিক জেনে নেন—

১। হাতীর যে দলের সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে কতগুলি হাতী আছে। হাতীগুলি সবই প্রাপ্তবয়স্ক, না, দলে 'মাখনা'ও আছে। ২। দলটি ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে এবং কুন্‌কিদের সেখানে যাওয়া সহজসাধ্য কি না। ৩। সেখানে হাতীর দলের উপযোগী তিন সপ্তাহের মত খাদ্যপানীয় আছে কিনা। ৪। হাতীখেদার গড় তৈরী করা চলবে কিনা সেখানে অর্থাৎ জায়গাটা খুব পাথুরে হলে সেখানে গড় তৈরী করা যাবে না। ৫। জায়গাটার কাছাকাছি সহজে গড় তৈরীর মত প্রয়োজনীয় গাছপালা পাওয়া যাবে কিনা। ৬। হাতী ধরার পর সেখান থেকে হাতীগুলিকে কাছাকাছি কোনো নদীর ধারে এনে ডিপোতে পাঠানো সম্ভব হবে কিনা। হাতীর পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা ভালো করে না দেখে-শুনে আন্দাজে যাচ্ছে খবর এনে দিলে তার পরিণাম হয় সাংঘাতিক। কোথাও কোনো গণ্ডগোল না বাধলে পরের দিন সকালে জমাদার তার দলবল নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং তার দলবলকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেয়। একটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে নিজে এবং অন্য দলটির ভার দেয় তার সহকারীর ওপর। প্রত্যেক দলের সঙ্গে থাকে একজন করে পাঙ্গালী অর্থাৎ হাতীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যক্তি। সুবিধেজনক কোনো একটা জায়গা থেকে অভিজ্ঞ 'পাঙ্গালী'র নির্দেশ অনুসারে রক্ষী বাহিনী হাতীর দলকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলার কাজ আরম্ভ করে দেয়। হাতীর দলকে পরবর্তী ১৪ দিন বেশ আরামে চড়ে বেড়িয়ে খাবার সংস্থান করার মত অবকাশ দিয়ে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে বেড়া দেওয়া হয়। ৫০ থেকে ১০০ গজ তফাতে তফাতে দুজন করে লোক রক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই দুজন সর্দার বা জমাদার বৃত্তাকারে এই-ভাবে রক্ষী মোতায়েন করতে করতে দুদিক থেকে এসে মিলিত হয়। এবারে এক এক স্থানে মোতায়েন করা প্রতিদল রক্ষীর মধ্যবর্তী জায়গাটাকে পরিষ্কার করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে রক্ষীদল কর্তৃক ঘেরাও করা বৃত্তাকার জায়গাটির চারপাশে ১২—১৫ ফুট চওড়া একটা রাস্তা তৈরী করে ফেলা হয় এবং রাস্তা তৈরী শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ধারে ধারে একটা হাল্কা বাঁশের বেড়া তৈরী করে জায়গাটিকে ঘিরে দেওয়া হয়। কোনো হাতী ঘেরা দেওয়া জায়গার ভেতর থেকে দল ছেড়ে বেরিয়ে গেলে এতে বোঝার সুবিধে হয়। সূর্য অস্ত যাবার আগেই রক্ষীরা প্রত্যেকে নিজেদের জন্যে একটা করে ছাউনি তৈরী করে ফেলে। তাছাড়া দিন-রাত আগুন জ্বালিয়ে রাখার মত কাঠ-কাঠরাও জোগাড় করে অনেক। ক্রোধোন্মত্ত হাতীর আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারে এমন কোনো শক্ত গোছের বেশ বড় একটা গাছ বেছে নিয়ে রক্ষীরা সেই গাছে তাড়াতাড়ি ওঠার জন্যে একটা মইয়ের মত কিছু লাগিয়ে রেখে দেয়। হাতীর দল ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করলে বিপদের সময় এই গাছে উঠে যাতে আশ্রয় নেওয়া যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। সন্ধ্যে হলেই প্রত্যেক রক্ষী আগুন জ্বালিয়ে দেয়, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন আগুনের একটা বলয়। এক সময় যে বনে প্রায় অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করত সে জায়গাটা এখন দীপাবলীর রাত্রির শোভায় উজ্জ্বল। হাতীখেদার দলের লোকজনেরা এখন প্রত্যেকে নানা কাজে ব্যস্ত। ওরই মধ্যে একটু কাজের লোক যারা, তারা হাতের কাছের বেত বা বাঁশ থেকে টুকিটাকি নানা দরকারী জিনিষ তৈরী করতে সুরু করেছে, কেউ বাঁশী তৈরী করে বাজাচ্ছে আবার কেউ বা নিজের নিজের জায়গায় বসে এটা-সেটা গল্প হাসি-তামাসা করে সময় কাটাচ্ছে। অন্ধকার হবার আগেই ওদের সকলের রাতের খাওয়ার পাঠ চুকে গেছে। জমাদারের কাছ থেকে অন্যরূপ কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় মোতায়েন দুজন রক্ষী পালা করে রাত জেগে পাহারা দিয়ে যাবে।

হঠাৎ নিরাপদ নিস্তব্ধ বনের মধ্যে বহিরাগত কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় জীবের আবির্ভাবে হস্তীকুলের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সহজেই অনুমেয়। ওরা সকলে দলের বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো নেতৃস্থানীয় হস্তী বা হস্তিনীর নিকট সমবেত হয়। বনের ওপর অন্ধকার নেমে এলে হাতীর দল ঘেরা জায়গাটার চতুর্দিকে ঘুরে একবার পর্যবেক্ষণ করে দেখে নেয়, বেড়া ভেঙে অন্যত্র কোথাও পশুচারণ ক্ষেত্রের সন্ধানে যাওয়া চলে কিনা। বিরাট ঘেরা দেওয়া বেড়ার এখানে-সেখানে মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে এই চেষ্টা চলে। সাধারণত রাতের প্রথম এবং শেষ প্রহরেই এই রকম চেষ্টা চলে, কারণ এই দুটো সময়ই সাধারণত হাতীদের চড়বার সময়। কিন্তু হাতীদের প্রায়ই এই চেষ্টা সফল হয় না। রক্ষী দল সজাগ থাকে। তারা এখানে-ওখানে চিৎকার করে কোথাও বা বাঁশের খটাখট শব্দ করে ও আগুনের শিখাকে আরো একটু বাড়িয়ে দেয়—হাতীদের আর সাহস হয় না এইসব দেখে-শুনে বেড়ার বাইরে যেতে। তবে অনেক সময় যূথভ্রষ্ট কোনো হাতী এসে গণ্ডগোল বাধায়। ঘেরা জায়গার মধ্যে যতদিন খাদ্য এবং পানীয়ের অভাব না ঘটে ততদিন সাধারণত হাতীর দল মরিয়া বা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাবার চেষ্টা করে না। ওরা রক্ষী দলের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে দূরে থেকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। অন্ততঃ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রক্ষীদলের হাতের নাগালের একটু বাইরেই থাকে। প্রত্যেক সর্দার এবং তার সহকারী পালা করে রাত জেগে রক্ষী-দলের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা কড়া নজর রাখে। কারণ তাদের অধীন রক্ষী দলের কাজের কোনো ত্রুটির জন্য তারাই প্রধানতঃ দায়ী থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় হাতীরা বেলা সাড়ে তিনটে থেকে (শীতের সময়) রাত এগারোটা পর্যন্ত চড়ে। আবার শেষরাতে চড়ে রাত্রির তিনটে থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত। বাকী সময়টায় ওরা বিশ্রাম করে। দিনের বেলা হাতীরা ঘন গাছের ছায়াশীতল নির্জন উপত্যকায় বিশ্রাম উপভোগ করে। এইভাবে তারা যখন বিশ্রাম করে তখন হঠাৎ টের পাওয়া কঠিন যে, ওই জায়গাটায় একদল হাতী আছে। অবশ্য মানুষের মতো হাতীর বাচ্চাও যখন তখন দিনেরাতে হঠাৎ চেঁচামেচি করে হাতীদের অস্তিত্বের কথা মানুষের টের পাওয়া সহজ করে দেয়।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বেড়ার চারদিকে মোতায়েন রক্ষী দলের ঘাঁটিগুলির প্রত্যেক একটি ঘাঁটি বাদ দিয়ে আর একটি ঘাঁটিতে একজন করে রক্ষী নিযুক্ত রেখে প্রত্যেক সর্দার লোকজন নিয়ে জমাদারের ছাউনির নীচে এসে জড়ো হয়। প্রত্যেকের হাতে দা এবং হাতীখেদার গড় তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য হাতিয়ার থাকে। জমাদার ইতিমধ্যে চারদিক ঘুরে দেখে এসেছে এবং গড় কোথায় তৈরী হবে তার জন্যে একটা জায়গাও ঠিক করে ফেলেছে। গড় তৈরীর জন্যে এমন একটা স্থান নির্বাচিত করা হয়েছে যেটা হাতীদের যাওয়া-আসার প্রধান পথের ওপরেই পড়ে এবং হাতীর দল সেই জায়গাটির ওপর দিয়ে অতি অবশ্যই পার হয়ে যাবে। আমি এ বিষয়ে আবার জোর দিয়ে বলছি—হাতীখেদার সাফল্য প্রায় ৭৫% নির্ভর করে এই গড় এবং গড়ের দরজা সুনির্বাচিত এবং সঠিক স্থানে নির্মাণের ওপর।

খেদার গড় কোন্ জায়গায় তৈরী হবে সেটা ঠিক হলে জঙ্গলের সেই অংশটা একটা বৃত্তাকারে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। এই বলয়টার
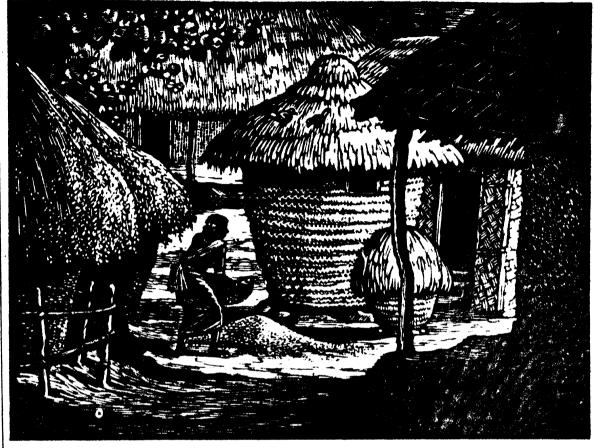
সঞ্চয় — হরেন দাস

ভেতরকার জঙ্গলের গাছপালার ওপর যতদূর সম্ভব কোনো হস্তক্ষেপ করা হয় না, কোনো গাছ না কেটে ঠিক যেমনটি আছে তেমনটি রাখা হয়। গড়ের এক একদিকের অংশ তৈরী করার ভার দেওয়া হয় এক একজন সর্দারের ওপর। আর গড়ের দরজা তৈরী করার কাজ জমাদার নিজে তদারক করে। এই কাজে তাকে সাহায্য করে একজন সুদক্ষ সর্দার এবং তার অধীন বেশ বাছাই করা একদল লোক। এখন থেকে আরম্ভ করে মত্ত হাতীদের গড় থেকে বন্দী করে বাইরে নিয়ে না আসা পর্যন্ত খেদায় নিযুক্ত এই লোকগুলির দিনরাত নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। কতকগুলি লোক মাটিতে গর্ত করছে, কেউ কেউ বিরাট গাছ ভূপাতিত করছে আবার কয়েকজন সেই কাটা গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে চলেছে খাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে। জমাদারের আদেশ থাকে, কেউ যেন কোনো গোলমাল না করে। তবে আমি দেখেছি এই আদেশ কেউই মানে না। জায়গাটিতে লোকজনেরা অসম্ভব কোলাহল করে। গড়ের দরজা করার জন্যে দরকার হয় দু'টি প্রকাণ্ড গুঁড়ির। এগুলিকে 'রাজখাম্বা' বলে। অসম্ভব ভারী দরজার ভার থাকে এই দু'টি 'খাম্বা'র ওপরেই। এই 'খাম্বা' দু'টির জন্যে দু'টি বিরাট গাছ কাটতে এবং গাছের গুঁড়ি দু'টিকে উঠিয়ে বিরাট দু'টি গর্তের মধ্যে ঠিকভাবে বসিয়ে দিতে সময় লাগে মোটামুটি দেড় দিন এবং শুধু এই কাজের জন্যেই লোক দরকার হয় ৪০—৬০ জন। গড়ের প্রবেশদ্বারের এই 'রাজখাম্বা' দু'টিকে সর্বপ্রথম ঠিকভাবে বসানো হয়, তারপর সর্দারেরা যে যার দিকের ভারপ্রাপ্ত গড়ের অংশ তৈরী করার জন্যে খুঁটি পুঁততে সুরু করে। হাতীখেদার গড় এবং তার দু'দিকের বিস্তৃত অংশ সম্পূর্ণ তৈরী করতে মোটামুটি ৭—১০ দিন সময় লাগে। গড় তৈরী শেষ হলে সমস্ত গড়টাকে দেখলে মনে হয় চারদিকে বিরাট গাছের গুঁড়ি দিয়ে সাজানো একটা সুদৃঢ় কাঠামো। গড়ের চার-পাশের দেওয়ালের কাঠামো তৈরী হয় গাছের গুঁড়িগুলিকে চরকাস-সমান্তরালভাবে এবং খাড়াভাবে স্থাপিত করে। এইভাবে স্থাপিত গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী বেড়া বা দেওয়ালের মধ্যে যে টুকু ফাঁক থাকে তার ভেতর দিয়ে একজন লোকের পক্ষে গলে বেরিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। গড়ের মধ্যে আবদ্ধ বিরাট দৈত্যাকায় জানোয়ারগুলোর আক্রোশের যত ধাক্কা সামলাতে হয় এই দেওয়ালগুলোকে। কাজেই এই গুঁড়ির তৈরী দেওয়ালকে আরো সুদৃঢ় করার জন্যে বাইরে থেকে আরো গাছ কেটে ফেলে সেই গুঁড়ির 'ঠেস' দিয়ে রাখা হয়। বাইরের এই 'ঠেস'গুলি এবং গড়ের চার পাশের এই গাছের গুঁড়ির দেওয়ালগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে প্রতিটি বিষয় পরীক্ষা করে তৈরী করা হয়। এরই মধ্যে বন্দী করে রাখতে হয় পৃথিবীতে অধুনাকালের জীবিত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পশুদের, কাজেই এই গড় যে বিশেষরূপে সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়। গড়ের দরজার দু'পাশের বিস্তৃত প্রবেশ কুড়ি ফুট পর্যন্ত সমান্তরাল ভাবে গড়ের দেওয়ালের মতই সুদৃঢ়রূপে নির্মিত। দরজাটা তৈরী শেষ হলে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড মোটা দড়ি দিয়েই তৈরী। দরজা তৈরী শেষ হলে জমাদার একবার সেটাকে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখে নেয়, সহজে দরজাটাকে উপড়ে ফেলা বা ভেঙে ফেলা যায় কিনা।

গড় তৈরীর কাজ এবার প্রায় শেষ হয়ে এলো। পরদিন খুব ভোরে সকলে গড়ের কাছে এসে জড়ো হয়। সকলের মনেই একটা অদ্ভুত উত্তেজনার ভাব। জমাদার এবার তাঁর লোকজনকে গড়ের সমস্ত কাঠামোটাকে গাছ আর ডালপালা দিয়ে ঢেকে ফেলতে নির্দেশ দেন। একেবারে একটি নকল জঙ্গল বানিয়ে ফেলে তারা। কাজ শেষ হলে দেখা গেল কোনোমতে টের পাওয়া কঠিন যে ওটা আসল জঙ্গলেরই অংশ নয়। কাছাকাছি আশেপাশে কয়েকটি

তুবড়ি বাজীও লুকিয়ে রাখা হয়, হাতীর দল গড়ের দিকে যখন সবেগে এগিয়ে চলেছে, তখন এগুলি জ্বালিয়ে দিলে দেখা যায় কাজের অনেক সুবিধে হয়েছে। যাই হোক, এই সব কাজ শেষ করতে ঘণ্টা খানেকের বেশি সময় লাগে না।

হাতী খেদা দেখতে বহু দর্শক আসেন। তাঁদের জন্যে আসন নির্দিষ্ট থাকে কাছেই একটি বড় মাচানে। সেখান থেকে দর্শকরা খেদার কাজে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া উপভোগ করতে পারেন। এবারে দুই দলে ভাগ করে জঙ্গল তাড়াবার জন্যে লোক (বীটার) পাঠানো হয়। এরা এমন-ভাবে সুকৌশলে হাতীদের তাড়া দেয় যাতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হাতীগুলি একটি অবিভক্ত দলে পরিণত হয়ে অভীপ্সিত পথ বেয়ে এসে ঠিক গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। 'বীটার'দের প্রত্যেকের হাতে থাকে 'দা' কিম্বা কুঠার এবং বাঁশের খটখটি। প্রত্যেক দল বীটারের সঙ্গে একজন করে বন্দুকধারী লোক থাকে, এর সঙ্গে যথেষ্ট গুলী-বারুদও থাকে। বন্দুকের সাহায্যে বেশির ভাগ ফাঁকা আওয়াজই এরা করে, কিন্তু খুব প্রয়োজন হলে গুলীও ছোঁড়ে। বিশেষ দরকার না হলে অবশ্য বন্দুক ব্যবহার করা হয় না। রক্ষীবেষ্টিত জায়গার মধ্যে হাতীর দল এসে পড়লেই খেদার দলের লোকেরা ভীষণ এক সোরগোল তোলে। হাতীরা এতে ভড়কে যায় এবং চিৎকার করতে করতে সামনের সব বাধা ভেঙেচুরে এগিয়ে যায় ভীষণ বেগে। তুবড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, বন্দুকের মুহুর্মুহু আওয়াজ হতে থাকে, শুকনো ডালপালা, যা কেরোসিন মাখিয়ে পূর্বাহ্নেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল, তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হাতীর দল হঠাৎ এই রকম একটা বিদ্ঘুটে কাণ্ডকারখানা দেখে রীতিমত তাজ্জব বনে যায় এবং হতবুদ্ধি হয়ে সবেগে এসে মানুষের চাতুরিতে ধরা দেয় গড়ের ভিতরে। গড়ের ছোট্ট পরিধিতে সব দল গিয়ে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে যায়। হাতীর দল এখন খেদার গড়ে বন্দী। দলের যে সব সুদক্ষ লোকেরা এতক্ষণ ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে বসেছিল তারা এবার ছুটে বেরিয়ে এসে গড়ের দরজাটা বেশ ভাল করে দড়ি ইত্যাদি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে এবং গড়ের বেড়ার বাইরে বেড়ার গরাদার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। এদের হাতে থাকে তীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত বর্শা, ক্রোধোন্মত্ত জন্তুর দল মরিয়া হয়ে যাতে কোনো-মতে বেড়া ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে সফল না হতে পারে, এরা সেদিকে দৃষ্টি রাখে। 'বীটার'রা যখন তাড়া দিয়ে হাতীর দলকে গড়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন হঠাৎ কোনো জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে, সাহায্য করার জন্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত একদল কুনকিকে সুবিধাজনক এক স্থানে মোতায়েন রাখা হয়। তাড়া দেবার জন্যে যে প্রচণ্ড সোরগোলের সৃষ্টি হয়, তাতে এই কুনকিরা বিশেষভাবে অভ্যস্ত এবং এই কাজের জন্যেই বিশেষভাবে শিক্ষিত হওয়ায় এত গোলমালেও এদের কোনো রকম ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। এ ছাড়া বাকী কুনকিদের গড়ে হাতী ধরা পড়ার পর কাজের জন্য ডাক পড়ে। হাতী খেদার ব্যাপারটা দর্শকে সাধারণ কিভাবে উপভোগ করে থাকেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি এবারে।

'বীটার'এর দল জঙ্গল তাড়াতে অদৃশ্য হয়ে যায় দূরে। হাতীরা বিশ্রাম গ্রহণ করছে কোথাও গভীর বনের শীতল ছায়ায়। বনে আর পাহাড়ের দিকটা এখন নিস্তব্ধ। এই কদিন খেদার কাজে বনের এদিকে যে লোকজনের হৈচৈ আর কোলাহল ছিল তা একেবারে থেমে গেছে। চতুর্দিকে আবার সেই অরণ্যের অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আকাশের অনেক উঁচুতে বহু দূরে দেখা যায় শকুনির ঝাঁক বিরাট ডানা বিস্তার করে শূন্যে পাক খাচ্ছে, ঈগল পাখীগুলো মহানন্দে উঁচু আকাশে উঠে যেতে যেতে অদ্ভুত চিৎকার করছে, সেই সঙ্গে শোনা যায় চিলেরও ডাক। দূরে জঙ্গলে কোথাও ভীত, সন্ত্রস্ত কাকুর ডাকছে, আবার মাঝে মাঝে এক একটা ময়ূরও ডেকে উঠছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—বনের অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝে একমাত্র এই শব্দ এবং দৃশ্যগুলিই অখণ্ড নিস্তব্ধতা আর এক-ঘেয়েমির মাঝে বৈচিত্র্য আনবার মত। মাচানের ওপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কান খাড়া করে বসে আছেন দর্শকের দল, বীটাররা প্রথম চিৎকার করে উঠবে কখন তাই শোনবার জন্যে। অনভ্যস্ত দর্শকের পক্ষে এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সামনে যতদূর দেখা যায় শুধু গভীর অরণ্যরাজি। এইভাবে কেটে যায় এক ঘণ্টা কি আরো বেশি সময়। হঠাৎ দূরে, অনেক দূরে জঙ্গলের ওধার থেকে অস্পষ্ট চিৎকার শোনা যায় বীটারদের আর তারই সঙ্গে সঙ্গে যেন হাতীদের চিৎকারের একটা ক্ষীণ শব্দ। কয়েক মিনিট যায়, আবার তেমনি শব্দ, তবে এবারে বনের ওইদিক থেকেই নয়, অন্য ধার থেকে। দর্শকদের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি অন্যান্য দর্শকদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন—নিশ্চয়ই বীটাররা কোনো হস্তীযূথের সন্ধান পেয়েছে, তাদেরই তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। এরপর আবার মিনিট পনেরো চুপচাপ। আবার হাতীর চিৎকার শোনা যায়, এবারে বেশ স্পষ্ট, তারপর গাছপালা ভেঙে ফেলার শব্দ আর তারই সঙ্গে বাঁশের খটখটি বাজানোর শব্দ আর অনেক লোকের চিৎকার ভেসে আসে। সব শব্দ-গুলো এক সঙ্গে মিশে গিয়ে বনের মধ্যে প্রতি-ধ্বনিত হতে থাকে, মনে হয় চারদিক থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে। এবার একটা অদ্ভুত শব্দ হতে থাকে, মনে হয় বুঝি বনের সব গাছ-পালা ভেঙে প্রচণ্ড ঝড় ধেয়ে আসছে, কিছুটা দূরে বনের গাছপালাগুলোর মাথায় দেখা যায় ধুলোর মেঘ উঠেছে। এবারে হাতীর ডাক আরো জোরে এবং বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। আবার প্রায় পনেরো মিনিট নিস্তব্ধ চারদিক। আবার হাতীর ডাক, হাতীর দল বেশ ভয় পেয়ে ডাকছে, কণ্ঠে তাদের এই ভীত সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠেছে, শব্দ এবারে আরো কাছে—এদিকে নতুন দর্শকদের উত্তেজনা চরমে উঠেছে, বুকের স্পন্দন বেড়ে চলেছে। খেদার গড়ের বিস্তৃত অংশের অপরদিকে ছোট পাহাড়টার ওপর দেখা যায় সাপের মত হাতীদের শুঁড়ের অগ্রভাগ, এদিকে ওদিকে চারদিকে ওরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুসন্ধান করছে বিপদের উৎপত্তিস্থল কোথায়। প্রবীণ দর্শক এবারে অন্যান্য দর্শক-দের বেশ চাপা গলায় বলেন, হাতীরা এবারে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছে। ক্রুদ্ধ গোখুরোর মত হাতীরা তাদের শুঁড়ের ডগা চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিপদের সূত্রপাত কোথায় বোঝার চেষ্টা করছে। হস্তীযূথের দলপতিকে এবারে দেখা যায়,—বিরাট কান দুটো তার বিস্তৃত, মাথাটা খাড়া করা, অতি সন্তর্পণে ভীষণ ক্রোধে সে এগিয়ে আসছে ধীর পদক্ষেপে। তার সামনের সবল এক পদাঘাতে সামনের জমি থেকে অনেকখানি মাটি আর পাথরের নুড়ি ছিটকে যায় চারদিকে, ভীষণ ক্রোধে সে গর্জন করতে থাকে। এবারে দেখা গেল চমৎকার হাতীর দলের সবগুলি হাতীকে এক সঙ্গে—প্রত্যেকের গায়ের রঙ ধূসর, কতকগুলো একত্রে ঠাসাঠাসি করে এগিয়ে আসছে, অন্যগুলো আসছে সুশৃঙ্খলভাবে। ছোট পাহাড়টার ওপর থেকে ওরা একে একে নেমে আসছে, দলপতি আর কতকগুলি হাতী পাহাড় থেকে ইতিমধ্যেই নেমে এসেছে, অন্যগুলিও আসছে। দলপতি রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, বিষম উত্তেজিত অবস্থা তার, পিছনে তার পলায়মান হস্তীযূথ। দলপতি মাথাটা উঁচু করে তুলে, কান আর শুঁড় খাড়া করে ল্যাজ তুলে দলের অন্যান্য হাতীদের সঙ্কেত করে সবেগে এগিয়ে যেতে। দলপতির নির্দেশ মেনে নিয়ে হস্তীযূথ দল-পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করল ঝড়ের বেগে বন-জঙ্গল ভেঙে, সামনের সব বাধাবিঘ্ন দূর করে। এ দৃশ্যের উত্তেজনা সব সময় সব দর্শক সহ্য করতে পারে না, মূর্ছিত পর্যন্ত হয়ে পড়ে অনেকে। দলপতি হাতী প্রায় গড়ের দরজার কাছে এসে পড়েছে, এবারে তুবড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, চারদিকে আগুন জ্বলে ওঠে, বন্দুকের শব্দ হতে থাকে। চারদিকে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারে না হাতীর দল, হতবুদ্ধি হয়ে ঢুকে পড়ে সোজা গড়ের মধ্যে। দলপতি হাতী হতবুদ্ধির ভাবটা কাটিয়ে বিপদের গন্ধ পায় একটু দেরীতে। কাজেই দলকে আবার পিছু হটবার সংকেত দিতে যে দেরী হয়ে গেছে, তার আর সংশোধনের উপায় থাকে না। ঘুরে আবার দরজার দিকে এগিয়ে দু'পা যেতে না যেতেই সশব্দে গড়ের বিশাল কপাট ওপর থেকে পড়ে পথ বন্ধ হয়ে যায়। দলপতি আবার এক ধাঁধায় পড়ে, বিভ্রান্ত হয়ে সে কান খাড়া করে শুঁড় গুটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, দলের আর সব হাতীগুলিও দলপতির পিছনে জড়োসড়ো হয়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকে। দলপতি রেল এঞ্জিনের মত বেগে এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দেয় গড়ের দরজায়, একটা খুঁটিও ভেঙে পড়ে। কিন্তু সর্দার লোকজন নিয়ে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে এই রকম জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে। বাইরে থেকে বর্শার খোঁচা দিয়ে দলপতি-হাতীকে তারা দরজা ভাঙা থেকে বিরত করে। ভাঙা খুঁটি অতি সত্বর মেরামত করে ফেলা হয়। নিষ্ফল আরো দু'একটা চেষ্টা যে এইভাবে না হয় তা নয়। দরজা ভাঙার চেষ্টায় সফল না হয়ে এবার সে গড়ের ভিতর চতুর্দিকে ভীষণ রাগে ঘুরতে থাকে এবং গড়ের যে অংশগুলিকে সে ভেঙে ফেলা সম্ভব বলে মনে করে, সেই অংশগুলিই আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক আক্রমণকেই সর্দার এবং তার দলবল ওইভাবে বর্শার সাহায্যে বাইরে থেকে প্রতিহত করতে থাকে। উৎসাহ এবং উত্তেজনার প্রথম চোটে এইভাবে গড় ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে এক সময় হাতীর দল গড়ের মাঝখানে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দলের একেবারে মাঝে থাকে

হাতীরা তাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে, তাদের রে থাকে অন্য সকলে। কখনো কখনো এক-ধটা বাচ্চা হাতীও রোখের বশে গড় ভেঙে লতে এগিয়ে যায় দলপতির অনুকরণে, কিন্তু শার খোঁচা খেয়ে ফিরে আসে। এক সঙ্গে তীগুলি গড়ের মাঝে যখন ঠাসাঠাসি করে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সংখ্যায় তারা তো তা খুব কাছে থেকেও নির্ণয় করা কঠিন। ই হোক, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই হাতীরা ে দমে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দ বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে যে উন্মত্তপ্রায় তীদের এই দানবীয় আক্রমণের বেগ সামলাবার ক্ষে গড় উপযুক্ত রকম মজবুত নয়, তাহলে রাতিই প্রয়োজন হলে হাতীদের দড়ি দিয়ে েধে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে গড়ের তরে। কিভাবে এই কাজ করা হয়, মোটা-টি সেটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি। রতালা প্রথায় যেভাবে হাতী ধরার কথা গে আলোচনা করেছি, সেইভাবে একেবারে তী ধরার জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে টি কুনকিকে গড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। ড় বড় হাতী বিশেষকরে দাঁতালো পুরুষ তী ধরার কাজে বিশেষ নিপুণ দুটি বাচ্চা া কুনকির একটির পিঠে থাকবে হেড-ন্দার এবং তার সহকারী থাকবে অন্যটির ঠে। কুনকিরা পিছুদিক করে দরজার দিকে ভাবে অগ্রসর হয়—প্রথমে দুটি, তারপর টি তারপর চারটি এবং সব শেষে আসে 'সিঁড়ির কুনকি'—এর পিঠে দু'জন বাড়তি মাহুত থাকে। দাইদাররা হাতীদের দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজ আরম্ভ করলে এই মাহুত দু'জন তাদের জায়গায় গিয়ে বসে। কুনকিরা ঠিক মত দাঁড়ালে, কুনকিদের দ্বারা তৈরী এই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যবর্তী জায়গাটাকেও গড়েরই একটা অংশ করে নেওয়া হয়, আস্তে আস্তে এবার গড়ের দরজাটা খুলে নেওয়া হয়। গড়ের ভেতরকার হাতীগুলোর আবার বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় বাড়ে, ওরা প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় হাতীদের দলপতি দরজাটা তোলার সংগে সংগে দরজাটাকে আক্রমণ করে, এ রকম ক্ষেত্রে গড়ের কোনো ক্ষতি যাতে না করতে পারে, তার জন্য দলপতিকে বর্শার খোঁচা দিয়ে নিবৃত্ত রাখা হয়। তবে এরকম ঘটনা খুবই অস্বাভাবিক। কুনকিরা পিছু ফিরে দরজার ভিতর প্রবেশ করা মাত্র দলপতি হাতী এবং তার সহচররা শুঁড় তুলে কুনকিদের গোপনাঙ্গের আঘ্রাণ নেয়—এই রকম ঘটনাই স্বাভাবিক। দলের অন্যান্য হাতীগুলো এই কাজে একটু ইতস্ততঃ বোধ করলেও দলপতি হাতী বেশ সাহসের সংগে এগিয়ে আসে। মাহুতেরা বলে যে, একবার কোনো-মতে দলের বড় পুরুষ হাতী যদি কোনো কুনকির পিছু নেয়, তাহলেই তাকে পরতালা প্রথায় বন্দী করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। কুনকিরা গড়ের ভিতর প্রবেশ করার পর আবার দরজা পড়ে যায়। দাইদাররা সিঁড়ির কুনকির পিঠে চড়ে বসে এবং অন্যান্য কুনকিদের অন্যান্য মাহুতেরা সামলায়। এবারে পূর্বে বর্ণিত পরতালা প্রথায় প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই বড় হাতীটিকে বন্দী করে ফেলা হয় এবং এইভাবে অন্যান্য হাতীদেরও বন্দী করা হয়।

এরপর কুনকিদের গড়ের বাইরে নিয়ে আসা হয়। কুনকিরা গড়ের খুব কাছেই বিশ্রাম গ্রহণ করে, ওদের উপযোগী খাদ্যও সেখানে প্রস্তুত থাকে। আধ ঘণ্টাখানেক পরে কুনকিদের কাছাকাছি কোনো ঝরণা বা নদীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা পেট ভরে ঠাণ্ডা জল পান করে এবং ঠাণ্ডা জল নিজেদের সারা দেহে ছিটিয়ে কঠোর কাজের শ্রান্তি দূর করে। ওদিকে গড়ের চারদিকে রক্ষীরা আগুন জ্বালিয়ে পাহারা দিচ্ছে মহানন্দে—অনেক সময় বাচ্চা হাতীগুলো সাহস করে গড়ের কোনো অংশ আক্রমণ করে পালাবার পথের সন্ধান করে। মাহুতেরা বাকী রাতটা তাদের ছাউনীর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখে কুনকিদের পাহারা দেয়, যাতে বাইরের কোনো খ্যাপাটে হাতী এসে কুনকিদের হঠাৎ ক্ষতি করতে না পারে। এই সময় জংগলের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বেশ রোমান্টিক বলে মনে হয়। রাত্রেও মাচানে যে সব দর্শক হাতী খেদার এই নৈশ পরিচ্ছেদটুকু উপভোগ করার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকেন, তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান! খেদার গড়ের মধ্যে বন্দী হাতীগুলো নানা রকম শব্দ করতে থাকে, আর এদের দলের যে সব হাতী হয়ত ধরা

ফোটো—অমিয়কুমার তরফদার
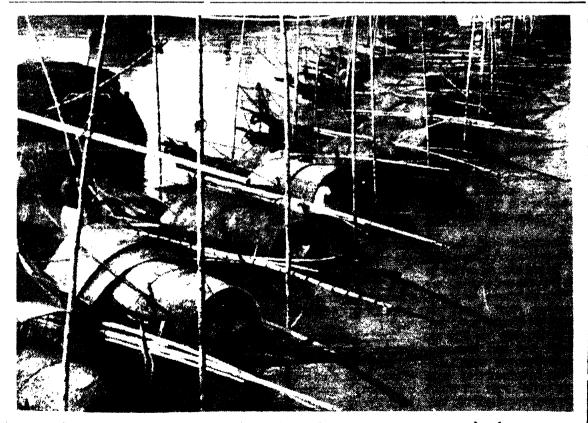
পড়েনি, বাইরে থেকে গেছে তারা দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে আবার গর্জন করে, তারই সাড়া দিচ্ছে। কুনকিরাও অনেক সময় এই ডাকে স্থির থাকতে না পেরে সাড়া দিয়ে থাকে। হাতীদের এই সমবেত সংগীত বনে বনান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে নৈশ অরণ্যকে মুখর করে তোলে। সকাল হওয়ার সংগে সংগে মাহুতেরা তাদের প্রাতঃকালীন আহারাদি তাড়াতাড়ি শেষ করে আবার তাদের কুনকিদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। মাহুতেরা গড়ের মধ্যে ঢুকে বড় হাতীগুলোকে গাছের সংগে বেঁধে ফেলে এবং বাচ্ছাগুলোকে ফাঁসের সাহায্যে বন্দী করে। একেবারে বাচ্ছা যেগুলো অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, মা'র কাছ ছাড়া হয়নি এখনো, তাদের শুধু বাদ দেয়। বন্দী অবস্থায় মায়েদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে এই বাচ্ছাদের প্রতিক্রিয়া হয়, এক এক সময় দারুণ মজার, আবার সময় সময় হয়ে ওঠে হৃদয়স্পর্শী। মায়েদের শারীরিক বা অন্য কোনো কষ্ট হলে সাধারণতঃ সন্তানদের স্তন দিতে তাঁরা ভারী বিরক্ত হন। হাতীদের মায়েদেরও ওই একই অবস্থা—এই সময় স্তন্য পান করতে এলে মায়েরা বাচ্ছা হাতীদের সরিয়ে দেয়। এক একটা বাচ্ছা দারুণ জেদী, তারা সহজে নড়তে চায় না। বাচ্ছা হাতীর মা বিষম বিরক্ত হয়ে সময় সময় শুঁড় দিয়ে বা পায়ের থাবা দিয়ে বেশ জোরে ধাক্কা দেয় তখন। কোনো কোনো মা অবিশ্যি ভারী স্নেহপরায়ণ। এই মা-হাতীরা নিজেদের বাচ্ছাদের তো আদর করেই অধিকন্তু অন্য বাচ্ছাদের প্রতিও যথেষ্ট স্নেহের ভাব দেখায়।

পরের দিন গড়ের ভেতরে কুনকিদের আবার নিয়ে যাওয়া হয়। এবারে এদের সাহায্যে ফাঁস পরিয়ে একেবারে বাচ্ছা হাতীগুলোকে বেঁধে ফেলা হয়। কাজটা মোটেই শক্ত নয় অবশ্য। প্রত্যেক কুনকির সংগে দুটি করে বাচ্ছা হাতীকে বাঁধা হয়। গড়ের ভেতর থেকে বাচ্ছা হাতীদের এইভাবে বন্দী করে বাইরে আনার পর কাছাকাছি যদি জলাশয় থাকে, তা'হলে সেখানে তাদের নিয়ে গিয়ে জল পান করতে এবং নিজেদের দেহে জল ছিটোতে দেওয়া হয়। সেখান থেকে এনে কাছাকাছি কোনো গাছের সংগে বেঁধে রেখে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গড়ের ভেতর থেকে সন্ধ্যের আগেই যতগুলি সম্ভব হাতীকে বাইরে এনে গাছের সংগে বেঁধে ফেলা হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হাতীগুলিকে সেদিন আর গড়ের বাইরে নিয়ে আসা হয় না, পরের দিন এদের গড়ের বাইরে আনার পালা।

তৃতীয় দিন সকালটায় ভারী উত্তেজনার ব্যাপার—সেদিন দলপতি-হাতীকে গড়ের বাইরে আনা হবে। পরতালা প্রথায় বড় হাতীকে কি করে ধরা হয়, চিন্তা করে দেখুন, ব্যাপারটা সেই একই শুধু পরিবেশটা আলাদা। এখানে চারপাশে শুধু গাছ আর পায়ের নিচেকার জমি অত্যন্ত অসমতল আর অমসৃণ। যথেষ্ট দড়ির সাহায্যে এই দৈত্যটির গলায় ফাঁস দিয়ে আর চারটি পা-কে বেশ ভাল করে বেঁধে ছটি কুনকির সংগে বেঁধে রাখা হয়, আরো ২।৩টি কুনকি কাছে কাছে থেকে পাহারা দেয়। গড়ের বিস্তৃত অংশের সংকীর্ণ রাস্তার শেষ সীমানা পর্যন্ত দলপতি হাতী বেশ শান্তশিষ্টটির মতই যায়, কিন্তু যেখানে গড়ের বিস্তৃত অংশ চওড়া হয়ে গেছে, সেখানে এসেই হঠাৎ তার মতিগতি অন্য রকম হয়ে যায়, সে ভাবে, 'এই তো পালাবার পরম শুভ মুহূর্ত!' প্রাণপণ শক্তিতে সে এবার বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে। এই প্রচন্ড টান সহ্য করার জন্যে কুনকিদের জীবন পণ করে যুঝতে হয়। বড় গাছের গুঁড়িকে আশ্রয় করে ওরা এই প্রচন্ড টানের চোটে যাতে বেকায়দায় না পড়ে, তারই জন্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মাহুতেরাও যত রকম সম্ভব কৌশল অবলম্বন করে কুনকিদের বাঁচাতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় ছোট-বড় বহু দুর্ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি। দলপতি হাতীকে কায়দা করে নিয়ে গিয়ে গড়ের বাইরেকার অস্থায়ী পিলখানা সংলগ্ন গাছে বেঁধে ফেলতে যথেষ্ট সময় লাগে। গড়ে আরো বড় হাতী ধরা পড়ে থাকলে তাদেরও এইভাবে গাছের সংগে বাঁধতে বেগ পেতে হয় যথেষ্ট। যাই হোক, সন্ধ্যের আগেই সব হাতীকে গড়ের বাইরে নিয়ে আসা হয়। হেড সর্দারের নির্দেশে মাহুতেরা এবার ধৃত হাতীদের কিছু কিছু খাদ্য পানীয় দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে খেদা পরিচালিত হয়, সেখানে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, যাতে অযত্নের দরুণ হাতীদের কোনো ক্ষতি না হয়।

কুনকিরা এবার নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যায়। আজ রাতে সকলেরই ছুটি কাজেই মহানন্দে তারা ছুটি উপভোগ করে। ঢাক-ঢোলের অভাবে সকলে খালি কেরোসিনের টিনই পিটতে থাকে এবং নাচ-গান করে খুব ফূর্তি করে। পরদিন হেড সর্দারের আদেশে খেদার গড় ভেঙে ফেলা হয়। গড় তৈরী করার কাজে দড়িদড়া ইত্যাদি মালমশলা যা লেগেছিল, সব ঠিক করে গুছিয়ে নেওয়ার পর সকলে অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে বিশ্রাম নেয়। হাতী ধরার কাজে আবার অন্যত্র রওনা হবার আগে এখানে বেশ কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামের মধ্যে দিয়ে দিন কাটে। ধৃত হাতীদের ডিপোতে ঠিকভাবে নিয়ে আসার কাজ এবার পিলখানা বিভাগের। এখানে গভর্ণমেন্টকে হাতীদের বাবদ যা রয়্যালটি দেবার তা নিয়ে হাতীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধৃত হাতীদের দেখাশুনো করার এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সব দায়িত্ব পিলখানা বিভাগের। প্রায়ই দেখা যায় যূথভ্রষ্ট কোনো কোনো হাতী ধৃত হাতীদের পিছু নেয়। এদের শেষে পরতালা প্রথায় ধরে ফেলা হয় অবশ্য। এ কাজটায় প্রায়ই বেগ পেতে হয় না, তবে সময় সময় এই ধরণের যূথভ্রষ্ট হাতী এসে দারুণ গন্ডগোল এবং ক্ষতি করে থাকে। হাতী ধরার ব্যাপারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ হাতী সম্পূর্ণ শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত বহু উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে থাকে, তবে এখানে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিয়ে আমি কেবল হাতী খেদার সাফল্যজনক উপায়ের কথাই বর্ণনা করেছি।

হাতী ধরায় শিকারের সব আনন্দ এবং উপকারিতাই আছে অবশ্য এর বিপদের দিকটা বাদ দিয়ে। খেদায় ক্যামেরাম্যানরা অরণ্যের পরিবেশে অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে থাকেন। বনে-জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারের পিছনে যাঁরা অজস্র অর্থ ব্যয় করে থাকেন, তাঁরা কিছু টাকা হাতীখেদার আয়োজনে খরচ করলে দারুণ রোমাঞ্চের খোরাক জোটাতে পারবেন, সেই সংগে আর্থিক দিকে লাভেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে হাতী খেদা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে আজকের দিনেও যথেষ্ট লাভজনক।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ তারিখে লর্ড লিটনের 'রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে' প্রদত্ত বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে আমার প্রবন্ধ শেষ করব:—"..........গত সপ্তাহটা ক্যাম্পে কাটিয়েছি। সেখানে থেকে হাতীদের আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব সম্পর্কে বহু জিনিষ লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি। এই গৌরবময় অরণ্য নিবাসী প্রাণীদের দেখে আমার মনে হয়েছে, এরা প্রকৃতই ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক। এদের প্রবীণত্ব, এদের চাঞ্চল্যহীন মর্যাদাবোধ, এদের সুচিন্তিত কর্ম পন্থা, এদের অফুরন্ত শক্তি, এদের অটুট আত্মপ্রত্যয় এবং সর্বোপরি এদের চমৎকার বিনম্রতা—এই গুণগুলির প্রত্যেকটিই দেশের যুবকদের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব যাদের ওপরে ন্যস্ত আছে, তাদের উপযুক্ত আদর্শ হতে পারে। যে দেশে হস্তীর মত এক প্রাণী জন্মগ্রহণ করেছে এবং প্রতিপালিত হচ্ছে সে দেশ এবং যিনি এদের তৈরী করেছে যে দেশ উভয় দেশই সমান গর্ব অনুভব করতে পারে এবং যে দেশের অধিবাসী হস্তীর অনুরূপ গুণরাজির অধিকারী হতে পেরেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবীর কোনো দেশের লোককেই ভয় বা ঘৃণা করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।......হস্তীর পক্ষে যদি কথা বলা সম্ভব হোত, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলত। অন্যান্য ছোটো-খাটো প্রাণীদের ব্যাপারে হস্তীর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাব এবং পিঠের ওপর উপবিষ্ট যে কোন মাহুতকে সে ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিতে পারে, তবুও তার এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত আনুগত্য—এগুলি সবসময়েই আমার মনে হয়, এই সোসাইটির এবং এর বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতগণ যেভাবে স্বতঃপ্রণোদিত দেশ সেবা করছেন তারই প্রতীক। বিদ্বান সমাজ এবং হস্তী সমাজ, দুটিই আমার কাছে সমান শ্রদ্ধার পাত্র। যে দেশের মাটিতে আমি এদের উভয়কেই জানবার সুযোগ পেয়েছি সেই দেশের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

[মূল ইংরেজী প্রবন্ধ : **অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সৌজন্যে—অনুবাদ : কিষণচাঁদ বর্মণ**

ফোটো—সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোটদের
পাততাড়ি
পুজার চিঠি
কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,
আবার ত' এলো পুজা—
হাসিমুখ নিয়ে এসেছ এগিয়ে
পূজিবে কি দশভুজা?
রঙীন পোষাক পেয়েছ সবাই
নতুন জুতো যে পায়ে,
সেই ভাই-বোনে মনে রেখো সবে
যারা আছে খালি গায়ে!
থালাভরা তব নিলিলে প্রসাদ
ওদের হাতেও দিও—
পূজার দিনের যত হাসি-গান
সবে ভাগ করি নিও।
তব অপচয়ে, বিলাসে, পুলকে
কাঁদে যদি কারো হিয়া
বিমুখ জননী ফিরে যাবে ভাই
বৃথা হবে শারদীয়া!
ছোটদের পাততাড়ি
যুগান্তর, ১৩৬০
তোমাদের বন্ধু
স্বপনবুড়ো
পরিচালক স্বপনবুড়ো
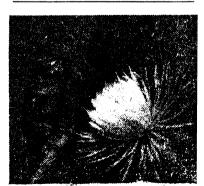
ভাবের অভিব্যক্তি

উপরের সারি বামদিক থেকে [১] নাক দিয়ে জল পড়ছে, [২] ছেলের অসুখ করেছে, [৩] মা ও ছেলে।
মধ্যে—মায়ের দুর্ভাবনা।
নিচের সারি ডানদিক থেকে—[১] কি হয়েছে বলুন না, [২] ডাক্তারবাবু, আমি জিভ দেখাচ্ছি, [৩] ছেলের অসুখ সেরে গেছে।

শরতের রোদের পাখা
উড়াল লাখ্ পতাকা!
ডাক্‌ল,
'সবুজ বন্ধু! আজ, দাঁড়াও সেজে!
তরুণ অভিযানের ডঙ্কা দিগ্বিদিকে যাচ্ছে বেজে।

এই যে! এসে দলে দলেই
তোমরা-ও চলেছ চলেই!
তূর্য, মাদল বাজিয়ে দিয়ে, পায়ের নীচে পাহাড় দলে'ই"
আগামীরে করবে সজীব, অপরূপ আপন বলেই!

এতকাল চলছি, শুধু পথটি করছে ধূ ধূ,
এ তোমাদের প্রবল পণ করল আমায় নিমন্ত্রণ,
নতুনের হর্ষরবে,
অরুণ যুগের মহাদেশের মিলন-মেলার মহোৎসবে!

সবাই মিলে আজ এ ভোরে
চলি পথ উজল কোরে,
বিশ্ব এবার দিচ্ছি ভরি' অক্ষয় ও সোনালী করি'
মানুষের সুগৌরবে!'

ডাকাডাকি দেখাদেখি হবে বলেই
তোমাদেরি আকাশ তলে জলে স্থলেই
শরতের আলো আসে।
তোমরা তার ভালোবাসার
পরো মুকুট,
জীবনের জয়োল্লাসে!

বই'ত পড়ো, টই পড়ো কি?
তাই'ত কাটি ছড়া।
বই পড়া সব মিছেই যদি
না হোল টই পড়া!

টই পাওয়া যায় পড়তে কোথায়?
বলছি তবে শোনো।
বই-এর মাঝে-ই লুকিয়ে থাকে
টই সে কোনো কোনো।

আর পাবে টই, সকাল বেলা
বই থেকে মুখ তুলে'
হঠাৎ যদি বাইরে চেয়ে
মনটা ওঠে দুলে।

টই থাকে সব রোদ-ছোপানো
গাছের ডালে পাতায়;
টই থাকে আর আকাশ-ছোঁয়া
খোলা মাঠের খাতায়।

টই চমকায় বিজলী হয়ে
আঁধার করা মেঘে;
খই হয়ে টই ফোটে দীঘির
জলে বৃষ্টি লেগে।

টই কাঁপে সব ছোট্ট পাখির
রং বেরং-এর পাখায়;
খোকা খুকুর মুখে আবার
মিষ্টি হাসি মাখায়।

বই পড়ো খুব, যত পারো,
সঙ্গে পড়ো টই;
টই নইলে থাকত কোথায়
এত রকম বই!

একজন বাঙ্গালী বীরের গল্প তোমাদের কাছে বলিতেছি:
গল্প নয়- সত্য। ইতিহাসের কথা।

পৃথ্বীরাজের নাম কে না জানে?

তোমরাত জানই—কেন না- ভারতবর্ষের ইতিহাস তোমরা পড়।

সেকালে পারস্য দেশের পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তার নাম ঘুর। সুলতান মামুদ, যিনি বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন, তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এই ঘুর দেশ। মামুদের রাজধানী ছিল গজনী। গজনী ছিল খুব বড় সহর, সেখানে কত যে ছিল মক্তব, মাদ্রাসা, সুন্দর সুন্দর মিনার, মসজিদ, সৌধ—তার অবধি নাই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সুলতান মামুদ। সুলতান মামুদের রাজত্ব কালে তাঁহার দরবারে অনেক বড় বড় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত—সব বিষয়েই তাঁহারা আলোচনা করিতেন। সে সব পণ্ডিতের সকলের নাম নাই বা বলিলাম। তবে দুইজনের নাম অমর হইয়া আছে। একজন ছিলেন ফারদৌসী, যিনি 'শাহনামা' নামে বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অপর জনের নাম ছিল আবুরিহান বা অল বীরুনী। সুলতান মামুদ যখন ভারতবর্ষে যুদ্ধ করিতে আসিতেন, তখন অল্-বীরুনীও তাঁর সঙ্গে আসিতেন। অল্ বীরুনী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁর লেখা সেই ইতিহাস এখনও সব দেশের লোকেরা শ্রদ্ধার সহিত পড়েন।

মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না। সুলতান মামুদেরও মৃত্যু হইল। কোথায় রহিল তাঁহার ধন-দৌলত, কোথায় রহিল তাঁহার মণি-রত্ন, কিছুই তিনি সঙ্গে করিয়া লইতে পারিলেন না। কবরের মাটিতে তাঁহার দেহ মিলাইয়া গেল।

যে ঘুর দেশটির কথা আগে বলিয়াছি, সেই ঘুর দেশ ছিল সুলতান মামুদের অধীন গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দিন সমান যায় না। মামুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িলেন। এদিকে ঘুরের ছোট ছোট রাজারা শক্তি সঞ্চয় করিলেন এবং যুদ্ধ করিয়া মামুদের বংশধরদের ঘুর দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাঁহারা নানা দেশে আশ্রয় লইলেন। কেহ কেহ ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষেও তাঁহাদের নিরাপদে বাস করা সম্ভব হইল না।

ঘুরের অধিনায়ক হইয়াছিলেন তখন সুলতান গিয়াসুদ্দীন। সুলতানের ভ্রাতা মুইজুদ্দীন বা মুহম্মদ বিন্ সাম ছিলেন তাঁহার সেনাপতি। তবে মুহম্মদ ঘুরী নামেই তাঁর পরিচয় বিশেষ বিখ্যাত। এই মুহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, আবার কোথাও কোথাও পরাজিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়াই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন—সে যুদ্ধের ইতিহাস কেই বা না জানে?

দুই

সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তরভারতের দুইজন রাজা খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন—একজন ছিলেন আজমীঢ় ও দিল্লীর চৌহান বংশের রাজচক্রবর্তী পৃথ্বীরাজ, আর একজন ছিলেন কাশী ও কনৌজের গাহড়বাল রাজ জয়চন্দ্র। তবে সাধারণতঃ তিনি জয়চাঁদ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই দুই রাজাই ছিলেন বীর ও সাহসী যোদ্ধা এবং প্রবল প্রতাপের সহিত রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু দুইজনের মধ্যে ছিল ভীষণ শত্রুতা। একটি গল্প আছে যে,- জয়চাঁদের সংযোগিতা নামে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন, এই কন্যা পৃথ্বীরাজকে ভালবাসিতেন,—কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, পৃথ্বীরাজের সহিত কন্যার বিবাহে জয়চাঁদের সম্মতি ছিল না। পৃথ্বীরাজ স্বয়ম্বর সভা হইতে সংযোগিতাকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন—তজ্জন্য দুইজনের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা জন্মে—এমন কি মুহম্মদ ঘুরী যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনও জয়চাঁদ শত্রুতার কথা ভুলিতে পারেন নাই, নানাভাবে পৃথ্বীরাজের শত্রুতা করেন—তাহার ফলে উত্তরভারত মুসলমানদের কবলে পড়িয়াছিল।

পৃথ্বীরাজ ছিলেন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। চারণদের মুখে মুখে তাঁহার বীরত্ব গাথা গীত হইত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে। মুহম্মদ ঘুরী যখন উত্তরভারত আক্রমণ করেন, তখন পৃথ্বীরাজ ভারতবর্ষের সর্বত্র দূত পাঠাইয়া হিন্দু রাজাদের আহ্বান করিয়াছিলেন, যেন সকলে একতাবদ্ধ হইয়া মুসলমানদের তাড়াইয়া দিতে পারেন—কিন্তু জয়চাঁদ দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষাও আপনার অপমানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং ঘুরীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম বার থানেশ্বরের কাছাকাছি তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বিজয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের কাছে পরাজিত ও বন্দী হইয়া অতি নির্মমভাবে নিহত হইয়াছিলেন। চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের একজন বাঙ্গালী সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল উদয় রাজা। উদয় রাজার অপূর্ব বীরত্বের কথা এইবার বলিতেছি।

তিন

উদয় রাজা ছিলেন গৌড় দেশ অধিবাসী বাঙ্গালী। তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী শুধু বাঙ্গলাদেশে নয় বাঙ্গলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা উত্তরভারত আক্রমণ করিয়াছে, পৃথ্বীরাজ সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই কথা জানিতে পারিয়া উদয় রাজা আসিলেন পৃথ্বীরাজের কাছে দিল্লী রাজধানীতে—তিনি পৃথ্বীরাজকে কহিলেন—"মহারাজ, আমি এসেছি আপনার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য!"

বিস্মিত পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে আপনি'? উত্তর হইল আমি গৌড়ের অধিবাসী। বাঙ্গালী যোদ্ধা। আমার নাম উদয় রাজা।

পৃথ্বীরাজ ভারতের রাজাদের দুর্ব্যবহারে যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন উদয় রাজার আগমনে তিনি উৎসাহিত হইলেন এবং তাঁহাকে যোগ্য যোদ্ধা মনে করিয়া এক সৈন্যদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

পৃথ্বীরাজ প্রথমবার তরাইনের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভাবেন নাই যে, মুহম্মদ ঘুরী আবার উত্তরভারত আক্রমণ করিবেন। কিন্তু যাহা ভাবা যায়, তাহা ত সব সময়ে সত্য হয় না—এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—

ল, বলে, কৌশলে সব কিছু জানিয়া লইয়া এবং বিশ্বাসঘাতক জয়-ন্দ্রের সাহায্যে সহসা ঘুরী বিরাট সৈন্যদল সহ আসিয়া পৃথ্বীরাজকে ক্রমণ করিলেন।

পৃথ্বীরাজ যেমন জানিতে পারিলেন, মুসলমান বাহিনী আসিয়া ড়িয়াছে, তৎক্ষণাৎ তিনি অল্প সংখ্যক এক সৈন্যদল লইয়া তাহাদের রুদ্ধে অভিযান করিলেন। যাইবার সময় উদয় রাজাকে আদেশ করিলেন, তুমি যত শীঘ্র পার আমার সৈন্যবাহিনীর অনুসরণ করো।"

মুহম্মদ ঘুরী এইবার বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়াছিলেন। রপর জয়চন্দ্রের প্রেরিত হস্তীযূথ এবং অনেক অশ্বারোহী, পদাতিক ন্যও তাঁহার ছিল।

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল তরাইয়ের বিশাল প্রান্তরে। একদিকে হম্মদ ঘুরীর সুশিক্ষিত রণদক্ষ সৈন্যগণ—অপর দিকে পৃথ্বীরাজের ন্যবাহিনী।—

সেই ভীষণ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ যেরূপ সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ রিয়াছিলেন, তাহার তুলনা মিলে না। চারিদিক হইতে আসিয়া সলমান সৈন্যরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল—পৃথ্বীরাজ শত্রুহস্তে ন্দী হইলেন,—উদয় রাজা তখনও তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। পথে শত্রু সৈন্যরা তাঁহাকে াধা দিয়াছিল। তাহাদের পরাজিত করিয়া উদয় রাজা যখন তরাইয়ের ণক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, মুসলমান সন্যগণের বিজয় ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কম্পিত হইতেছে। বিজয়ী ীর মুহম্মদ ঘুরী বন্দী পৃথ্বীরাজ সহ দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন।

উদয় রাজা রণক্ষেত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না। তিনি পণ করিলেন— হয় আমার প্রভু পৃথ্বীরাজকে শত্রুর াত হইতে উদ্ধার করিব—নতুবা রণক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রিতে মরিব। সমরনিপুণ উদয় রাজা ভয়ানক বীরত্বের সহিত দিল্লী াের আক্রমণ করিলেন। গৌড়বাসী—তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু অনেক াঙ্গালী বলিলেন,—উদয় রাজা, কি কাজ আর যুদ্ধ করে, চলুন আমরা ফিরে যাই'!

গর্জিয়া উঠিলেন উদয় রাজা। 'কখনও না—কখনও না! আমি গৌড়ের অধিবাসী বাঙ্গালী, আমি হিন্দু, কখনও আমি আমার প্রভুকে বিপন্ন অবস্থায় ফেলে কাপুরুষের মত রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করবো না।'

গৌরবের কথা— বিস্ময়ের কথা, এই বীর বাঙ্গালী উদয় রাজা মুহম্মদ ঘুরীর সৈন্যগণকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া প্রায় এক মাসকাল পর্যন্ত শত্রুর হাতে অতিষ্ঠ করিয়াছিলেন। মুসলমান সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শেষবার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষেরা বিজয়ের আশা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছিলেন—এবং কেহ কেহ মুহম্মদ ঘুরীকে বলিয়াছিলেন ঃ—'বিদেশে এই যুদ্ধে প্রাণ হারানো অপেক্ষা বন্দী পৃথ্বীরাজকে মুক্ত করুন, তবেই শান্তি হবে'।

মুহম্মদ ঘুরী সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, 'অসম্ভব! অসম্ভব'। তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠুর ঘুরী পৃথ্বীরাজকে বধ করিবার জন্য জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতি নিষ্ঠুরভাবে ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ বধ্যভূমিতে ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন।

উদয় রাজা কি করিলেন?

তিনি পৃথ্বীরাজের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সৈন্যরা তাঁহাকে ভীতভাবে বলিল, 'তবে আমরা আর কার জন্য যুদ্ধ করবো?' বীর উদয় রাজা বলিলেন—'আমাদের দেশের জন্য—রাজার জন্য আর স্বাধীনতার জন্য!' বাঙ্গালীর শৌর্য ও বীর্যের জন্য! ধর হাতিয়ার! হর হর বম্ বম্, জয় চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের জয়! শোন সৈন্যগণ বীরের কখনও মৃত্যু হয় না—পৃথ্বীরাজ মরেন নাই—চল শত্রু সৈন্য বধ করি'!

মুসলমানেরাও প্রমাদ গণিলেন।

মুখখানা ওল করে ভাবলেন ঠান্দি
সংসারে বাজে কাজে কেন আর কান্দি!
হাসবার সাধ নেই, পায় শুধু কান্না
হাসলেও কাসি আসে, মধু খেতে পান্না।
রুটি, লুচি ভাজা-ভুজি পেটে আর সয়না,
কর্তা ও পুজো এলে দেন্নাক গয়না।
বড় সাধ পরবার বুটিদার ঘাগরা,
বেনারসী শাড়ী আর জরি তোলা নাগরা।
কিনে দিতে বললে, কর্তা যে খাপ্পা,
'—কোন্ ব্যাটা বুড়ি বলে, এই সব ধাপ্পা—'
'—চুল পেকে শোন দড়ি, দাঁত পড়ে ফোকলা'
দেহটাও হয়ে গেছে যেন ভাঙা হোগলা—'
কর্তার কথাগুলো শুনে রেগে গিন্নি
বললেন—'মরো তুমি, দেবো আমি সিন্নি—'
ঝগড়ায় ঝঞ্ঝাটে যত গোল বাধলো,
খোল নিয়ে কর্তার মন সুরে মাতলো।
মালপোয় মালসায় ভোগ পেয়ে কর্তা,
দেখলেন করে তাঁর সংসারে পড়্‌তা—
আশ্রমে গিন্নিরে রেখে দেওয়া ভিন্ন
নামজপ সবকিছু হয়ে যাবে ছিন্ন।
ঠান্দি তো শুনে ও'র বাঁধলেন ঠ্যাঙ্
ওই দেখো উনি বসে ঠিক কোলা ব্যাঙ্।

রণক্ষেত্রে আরম্ভ হইল তুমুল তীরবর্ষণ, হস্তীপৃষ্ঠ হইতে উদয় রাজা একজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষকে নিহত করিবার জন্য তীর নিক্ষেপ করিলেন—সেই সেনাপতির মৃত্যু হইল। তখনি বন্যার প্রবল দুর্দমনীয় স্রোতের মত মুসলমান সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতি অতি দ্রুত উদয় রাজার দিকে ছুটিয়া আসিল।

হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

পরস্পর পরস্পরের প্রতি বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঝনন্ ঝনন্ রণন্ রবে অসিতে অসিতে যুদ্ধ চলিল—

সেই যুদ্ধে অসীম বিক্রমের সহিত শত শত শত্রু সৈন্য নিজ হস্তে বধ করিয়া বাঙ্গালী বীর উদয় রাজা রণক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যরা সেই পবিত্র মৃতদেহ বহন করিয়া যমুনার এক নির্জন তীরে চিতাগ্নিতে ভস্ম করিল। পড়িয়া রহিল ভস্মমুষ্টি মাত্র।

পৃথ্বীরাজের রণসঙ্গী এই বাঙ্গালী সেনাপতির কথা কাব্য ও নাটককারেরা ভুলিয়াছেন, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা ভুলেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সগৌরবে পৃথ্বীরাজের এই বীর বাঙ্গালী সৈন্যাধ্যক্ষ উদয় রাজার বীরত্ব-গাথা সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

টিরেটিবাজার কোথায় জান ত? সেখানে গঙ্গার ধারে আমার পূর্বপুরুষদের একটা মস্ত বাড়ি আছে। সেখানে কেউ থাকে না। দরজা-জানলা ঝুলে রয়েছে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেয়ালে সব ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। শুধু ইঁদুর বাদুড়ের বাস, আর সব জায়গায় একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বাড়িটা বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোম্পানির আমলে তৈরী করেছিলেন, কলকাতা সহরও তখন সবে তৈরী হচ্ছে। দিব্যি চকমেলান দোমহলা বাড়ি, দেয়ালে সব জং ধরে যাওয়া চিত্তির করা, বিরাট পাথরের সিঁড়ি। টাকারও আর তাঁদের অভাব ছিল না, কি সব চোরাকারবার চলত; তখনকার দিনে অত আইন আদালতেরও হাঙ্গামা ছিল না। মোট কথা, বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভয়ংকর ধনী লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী ছিল, তাতে চারটে কালো কুচকুচে ঘোড়া জোড়া হ'ত, বাড়ির পিছন দিকে বিশাল আস্তাবল ছিল। সে সব কবে বিক্রী হ'য়ে গেছে, তার জায়গায় তিনতলা সব বাড়ি হয়ে, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সেবার প্রি-টেস্টে অঙ্কে পনেরো পেলাম। তাই নিয়ে বাড়িময় সে যে কি রকম হৈচৈ লেগে গেল সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাবা পর্যন্ত এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে, শেষ অবধি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হ'লাম। কাউকে কিছু না বলে, সন্ধ্যেবেলায় কয়েকটা কাপড় জামা পুঁটলি কাঁধে নিয়ে, ঘড়ি কিনবার জমানো টাকাগুলো পকেটে পুরে, একেবারে টিরেটিবাজারের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে আলোটালো নেই, রাস্তার আলো এসে যা একটু ভাঙা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকছে, অদ্ভুত সব ছায়া পড়ছে। সামনের দরজায় তালামারা। কিন্তু জানলায় শিক নোনা ধরে ভেঙে গেছে, ঢুকতে কোনও অসুবিধা হ'ল না। একটু যে ভয় করছিল না তাও নয়, আর কত রকম সেডের যে অন্ধকার হয়, তাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচুর, আবার রাগও হয়েছে। নীচের তলাটা কেমন যেন ঘুপ্‌সিপানা, পুঁটলি বগলে ধুলোমাখা সিঁড়ি দিয়ে দুম্ দুম্ করে উপর তলায় উঠে যাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়ির ঠিক উপর থেকে কে বলল—"আহা! তোদের জ্বালায় কি সন্ধ্যেবেলাতেও হাত মুখ ধুয়ে, আলবোলাটা নিয়ে একটু চুপ করে বসা যাবে না? সারাদিন শুধু দাও, দাও, দাও, দাও, এটা নেই, ওটা নেই, এটা চাই, ওটা চাই, এবার একটু শান্তি দে।" ভুরভুর করে নাকে একটা ধূপধুনোর সঙ্গে গোলাপজল আর ভালো তামাকের গন্ধ এল। চেয়ে দেখি রাস্তার আলোতে সিঁড়ির উপর একজন বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ফিকে রং-এর লম্বা জোব্বা পরনে, পায়ে সাদা নাগরাই জুতো, মাথায় একটা ছোট্ট সাদা টুপি, আর ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা মস্ত সবুজ পাথরের আংটি।

যেমন সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে উঠেছি, আশ্চর্য হয়ে বললেন "এ্যা, তোকে ত আগে দেখি নি। তুই এখানে কেন এসেছিস? কি চাস তাই বল দেখি বাবা?" ক্ষিদেয় পেটটা খালি লাগছিল, বললাম—"কেন আসব না, এটা আমার বাবার ঠাকুর-দাদার ঠাকুরদাদার বাড়ি।" ভীষণ চমকিয়ে গিয়ে লোকটি কাছে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বাবার নাম কি? তোমার ঠাকুরদাদার নাম কি?" নাম শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কোথাও জনমানুষ নেই, চারদিকে অন্ধকার, রেলিং-এর কাছে গিয়ে বুড়ো হাঁক দিলেন, "পরদেশি! আমিন! বলি, কাজের সময় গেলি কোথায়, আলো দিবি না?" নীচের তলার অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট একটা সাড়া এল, তার পর লম্বা একটা কাচের ঢাকনি পরান সেজ হাতে কুচকুচে কালো, ডিগডিগে লম্বা, গোলাপী গোঁফ মিহি ধুতী আর গলায় সোনার মাদুলী পরা একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

"ছিলি কোথায়, হতভাগা? বাড়িতে লোক এলে দেখতে পাস না?" "এজ্ঞে, বারোয়ারিতলায় হাফ্-আখড়াইটা একবার দেখে এলাম!"

আমার দিকে ফিরে বলল, "যাবে না, খোকাবাবু, হাফ-আখড়াইতে? কেমন সব সং বেরিয়েছে, গান-বাজনা হচ্ছে।" বুড়ো বললে—"চোপ্, ওসব ছেলেমানুষের জায়গা নয়। এস, দাদা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

সামনের ঘরে গেলাম। মেঝেতে লাল গালচে পাতা, মস্ত নীচু তক্তপোষে হলদে মখমলের চাদর বিছানো। তার কোণায় গোঁফ ঝোলা চুড়ীদার পাঞ্জাবী গায়, কানে মাকড়ী একজন লোক দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন—"যাও এখন, বলেছি ত দশ টাকা চাঁদা আর পাঁচ ভরি আতর দেব তোমাদের বারোয়ারী পুজোর জন্য, এখন কেটে পড়।"

লোকটি চলে গেলে, আমাকে তক্তপোষে বসিয়ে পুঁটলির দিকে চেয়ে বললেন—"ওতে কী? পালিয়ে এসেছ নাকি? কেন?" বলতে হ'ল সব কথা। খানিকটা ভেবে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন—"পনেরো পেইছিস্? হতভাগা, তোর লজ্জা করে না? অঙ্ক হয় না কেন? শুভঙ্করী পড়িস্ না? মুখ অমন পাংশুপানা কেন? খেইছিস্? এ্যা, খাস নি এখনও? পরদেশি, যা দিকি নি, পঙ্ক্তকে বলগে যা।" পরদেশি চলে গেলে বল্লেন—"ইস্, আমার কক্ষণও একটা অঙ্ক কষতে ভুল হ'ত না, আর তুই ব্যাটা একেবারে পনেরো পেলি! জানিস্ নবাবের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেইছিলাম, হৌসের সব হিসেবের ভুল শুধরে দিয়েছিলাম ব'লে। দাঁড়া, কুট্টিকে ডেকে পাঠাই সে তোকে অঙ্ক শিখিয়ে দেবে।"

পরদেশি একটা রুপোর থালায় করে লুচী, সন্দেশ, ছানা-মাখা, আর এক গেলাস বাদামের সরবৎ এনে দিল।

তার পর বারান্দার কোণে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধান স্নানের ঘরে স্নান করে হাত পা ধুয়ে, পাশের ঘরে কারিকুরি করা খাটে সাদা বিছানায় শুয়ে সারারাত ঘুমোলাম।

সকালে পরদেশি এসে ডেকে দিল, কুট্টিবাবু অঙ্ক শেখাতে

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কোথায় এবং কবে ব্যাপারটা ঘটেছিল কিছুই স্পষ্ট করে মনে নেই আজ আর।

শুধু একটা স্বপ্নের স্মৃতির মত মনের নিভৃতে যেন আজও ঘুমিয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে কোন মধ্যরাত্রের নিরালা প্রহরে সংগীতের মত যেন রণরণিয়ে ওঠে ক্রমে উচ্চ গ্রামে, তারপর ধীরে ধীরে এক সময় আবার যায় মিলিয়ে।

বহুদিন পর উস্তাদজী আমারই গৃহে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। রাত্রি দশটা—বাইরের ঘরে ফরাসের উপরে বসে আমি আর উস্তাদজী। পাড়াগাঁয়ের রাত দশটা—এর মধ্যেই সব নিঝুম হয়ে পড়েছে, তায় আবার শীতের রাত।

খোলা জানালা পথে মধ্যে মধ্যে বয়ে আসছে হিমকণাবাহী মৃদু বাতাসের ঝলক। বাইরের বাগানে ঝিঁঝির একঘেঁয়ে কান্না রাতের একতারায় যেন একটি অতীন্দ্রিয় সুর গুন-গুনিয়ে চলেছে। উস্তাদজীর পাশেই তাঁর প্রিয় তানপুরাটি। কিছুদিন ধরে বীণা বাজানর শিক্ষা করছিলাম। উস্তাদজীকে সেই কথাই বলছিলাম।

'আচ্ছা বেটা কুছ শোনাও ত!—শোনাও কেইসে তুমনে বীণ শিখা?—'

'কি শোনাব আমি। কতদিন বাদে আপনাকে পেয়েছি—কত দিন বাদে আপনি এলেন, দয়া করে আপনিই কিছু শোনান উস্তাদজী— বহুদিন আপনার কণ্ঠে বসন্ত বাহার আলাপ শুনি নি। সেবারে কলকাতার আসরে আপনি বসন্ত বাহার আলাপ করেছিলেন—'

'বসন্ত বাহার!—' কি একটু ভেবে মৃদু মৃদু মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললেন : 'নেহি বেটা ও আয়গি নেহি আজ। তবিয়ং ভি আচ্ছা নেই। কাল শোনায়েঙ্গে—

'তবে আপনি শুয়ে পড়ুন উস্তাদজী! বিশ্রাম নিন—'

'আচ্ছা বেটা—'

* * উস্তাদজীর শয়নের ব্যবস্থা করে নিয়ে উপরে নিজের ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বসলাম। কেন যেন কিছুতেই চোখে ঘুম আসছিল না। আমার এক কাকা মস্তবড় প্রত্নতাত্ত্বিক। রাজপুতানায় একবার খননকার্যে গিয়ে মাটির তলে একটা অতি সুন্দর কালো পাথরের এক যুবা বয়েসী পুরুষের মূর্তি খনন করতে করতে পান। জানু দুটি অপরূপ ভঙ্গীতে গুটিয়ে বসে আছে মূর্তি, কোলের মধ্যে বাদনের ভঙ্গীতে ধরা একখানি তানপুরা। একটা মোমবাতি জেলে বসে বসে একটা বই পড়ছিলাম। বই পড়তে পড়তেই কেমন যেন তন্দ্রামত এসেছিল : হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল : অপূর্ব একটি সুরধ্বনি যেন অন্ধকারের বুকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে চলেছে। কখন এক সময় বোধ হয় খোলা জানালা পথে হাওয়ার ঝাপটায় ঘরের বাতিটা নিভে গিয়েছে। অন্ধকার ঘর। নিজের অজ্ঞাতেই কান পেতে কি সুর বুঝবার চেষ্টা করি। বসন্ত বাহার। আহা! বসন্ত বাহারের এমন আলাপ কত দিন শুনি না। নিশ্চয়ই উস্তাদজী বসন্ত বাহার আলাপ করছেন। সুর যেন আমায় টানতে লাগলো, পায়ে পায়ে ঘর হতে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চললাম।

আমার অনুমান মিথ্যা নয়। দেখি বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। তবে উস্তাদজীই বসন্ত বাহার আলাপ করছেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

ফরাসের উপরে বৃদ্ধ উস্তাদজী তানপুরাটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে ভাবে নিমীলিত হ'য়ে মধ্যে মধ্যে মাথা দোলাচ্ছেন। চক্ষু দুটি মুদ্রিত। কিন্তু তারই সামনে অল্প দূরে ফরাসের উপর বসে যে অল্প বয়েসী সুশ্রী যুবাটি তানপুরা নিয়ে বসন্ত বাহার আলাপ করছে কে সে। চেহারা দেখে মনে হয় রাজপুতানার দিকের মুসলমান। পরিধানে সলোয়ার ও চুড়িদার পাঞ্জাবী। মাথায় বাবরী চুল। কি অপূর্ব দেহের গঠন! সঙ্গীতের সুর যেন তার সমগ্র দেহটি ব্যেপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে চলেছে। পশ্চাতের দিকে আলো থাকায় মুখখানা ভাল করে সবটুকু দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তবু আশ্চর্য কেন যেন মনে হলো পরিচিত, বড় পরিচিত ঐ লোকটি। কোথায় কবে নয়, বহুবার যেন দেখেছি। জানু গুটিয়ে বসবার ভঙ্গীটুকু পর্যন্ত যেন বড় পরিচিত আমার। কি মধুস্রাবী উদাত্ত কণ্ঠস্বর! সঙ্গীতের সুর যেন ও কণ্ঠের মধ্যে আপনা হতেই তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠেছে।

সুরতরঙ্গ যেন কেবল এই কক্ষ মধ্যেই নয়, মধ্য নিশীথের তন্দ্রাতুর সমস্ত জগতব্যাপী যেন এক অপূর্ব শিহরণ তুলেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার সমস্ত চেতনা যেন সুরের গহীন তলে ডুব দিয়েছে।

কিন্তু এত পরিচিত মনে হয়, তবু চিনতে পারছি না কেন। কে? কে ঐ গায়ক? কোন সুরলোক হ'তে কি তানপুরাটি হাতে নিয়ে নিশীথের এই ঘুমভরা পৃথিবীর ধুলায় নেমে এলেন কোন সুরসভার গায়ক! না সত্য সত্যই বসন্ত বাহার প্রাণময় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে।

কতক্ষণ! কতক্ষণ সেই সুরের অমিয় নির্ঝর প্রাণভরে পান করেছিলাম মনে নেই, যখন খেয়াল হলো দেখি ঘর অন্ধকার। কিন্তু ক্ষণপূর্বের সেই সুরের রেশ তখনও যেন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে স্বপ্নের মতই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্নের মতই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। আবার আচ্ছন্নের মতই উপরে নিজের শয়ন ঘরের দিকে ফিরে চললাম।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে পা দিতেই মনে হলো কার যেন অস্পষ্ট পদধ্বনি ঘরের কাছেই কোথায় শুনলাম। কে?

মৃদু। অতি মৃদু একটি কণ্ঠস্বর কানে এলো : বাবুজী!

'কে?—'

'আমি দেলোয়ার'—' আশ্চর্য। এ কণ্ঠস্বর কোথায় যেন শুনেছি। হাঁ। হাঁ মনে পড়েছে—এই কণ্ঠই ত এতক্ষণ বসন্ত বাহার আলাপ করছিল।

'আপনিই কি একটু আগে আমার নীচের ঘরে গান গাইছিলেন?—'

'জী!—'

'আপনাকে ত এদিকে কখনো আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না—'

'না বাবুজী! আমি ত আজকের লোক নই। অনেক অনেক দিন আগেকার লোক আমি! বাদশা আকবরের সভায় যে উস্তাদ গানের রাজা তানসেন ছিলেন, তাঁরই এক সাকরেদ ছিলাম আমি —'

তানসেনের সাকরেদ! লোকটা বলে কি, পাগল নাকি! ন

আমিই জেগে স্বপ্ন দেখছি। সে কি আজকের কথা! জাহাঙ্গীরের পিতা বাদশা আকবর।

'কিন্তু—'

'হাঁ বাবুজী! গান গাইতে গাইতে একদিন আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাল গেল কেটে। মুহূর্তে উস্তাদজী যেন আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌লেন। রাগে, উত্তেজনায় উস্তাদজী তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। ভয়ে আতঙ্কে একেবারে গুটিয়ে গেলাম। ক্ষমা চাইবার মত সাহসটুকুও যেন হারিয়েছি সেই সময়। উস্তাদজী রাগত কণ্ঠে বললেন ঃ যে এমন যে পবিত্র ও স্বর্গীয় সঙ্গীত, তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে অন্য চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়, তার পাথর হওয়াই উচিত। সে পাথর হয়েই থাক। জগতের সমস্ত শব্দানুভূতি তার কাছে রুদ্ধ হোক। কেঁদে পড়লাম তখন উস্তাদজীর পা দু'টি ধরে ঃ ক্ষমা! ক্ষমা করুন। আমার কান্না ও কাকুতিতে বোধহয় তাঁর মন ভিজেছিল, বললেন, যে বসন্ত বাহার আলাপের মধ্যে তুই অন্যমনস্ক হয়েছিলি, যদি আবার কোন দিনও কেউ তাল, মান ও লয়ে এবং ঠিক সময়ে বসন্ত বাহার আলাপ তোর সামনে করে সেইদিন আবার তুই প্রাণ ফিরে পাবি। আবার সেদিন সঙ্গীতের রুদ্ধদ্বার তোর কাছে অর্গলমুক্ত হবে। সেই দিন পাবি তুই মুক্তি। তারপর কতকাল। কতকাল পাথর হয়ে আছি ঃ মহাকালের রথচক্রের ঘর্ষণে মাটির নীচে অন্ধকারে চাপা পড়েছিলাম। কিন্তু সে সুরটি শোনবার জন্য প্রস্তরীভূত সমস্ত সত্তা আমার এই দীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর অধীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন গুণেছে, সেটি কই শুনতে পাইনি। তারপর একদিন মাটির অন্ধকার হতে উদ্ধার পেয়ে এখানে তোমার ঘরে এসে স্থান পেলাম—'

'তারপর ?—'

'তারপর এলো সে পরমাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি। নিচের ঘরে তোমার উস্তাদজী বসন্ত বাহার আলাপ করতেই শতাব্দীর প্রস্তরীভূত অনুভূতি আমার যেন মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠ্‌লো। সদা নিদ্রোত্থিত চেতনা আমায় টানতে লাগল। নিচে নেমে গেলাম। আপনা হতেই বহুকাল পরে আমার কণ্ঠে সুর এলো। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আলাপে যোগ দিলাম। মুক্তি আমার মিলেছে বাবুজী! এবারে আমি যাবো!'

'কোথায় ?—'

সুরলোকের সেই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী যেখানে আসন পেতে রয়েছে। সেই অমৃতলোকে।—'

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গল যখন, চেয়ে দেখি সূর্যের আলোয় ঘর ভরে গিয়েছে।

প্রভাতের একটি নির্মল মুহূর্ত যেন সঙ্গীতের সুরের মতই আমার অন্তরাকাশকে ভরিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল ঃ আশ্চর্য টেবিলের 'পরে সেই কালো পাথরের মূর্তিটি নিচে মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ঐ টেবিলের 'পরে ছিল, কেমন করেই বা নিচে পড়ে ভেঙ্গে গেল!

তাড়াতাড়ি নিচে এলাম। আরো আশ্চর্য—উস্তাদজীও নিচে নেই। তাঁর তানপুরাটিও নেই। কোথায় গেলেন উস্তাদজী! আমাকে না বলেই চলে গেলেন!

এমন ত কখনো হয় নি। দু'চার দিন না থেকেও কখনো যাননি আমার গৃহ হতে। তিনি যে বড় স্নেহ করেন আমায়।

বিস্ময়ের আরো কিছু বাকী ছিল।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে আমার এক বন্ধুর চিঠি পেলাম ঃ দিন চারেক আগে লক্ষ্ণৌতে উস্তাদজী নিমুনিয়া রোগে মারা গিয়েছেন।

স্তম্ভিত বিমূঢ় চিঠিখানা হাতে নিয়ে বসে রইলাম।

উস্তাদজীর মৃত্যু—পাথরের মূর্তিটি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া—সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা দুর্বোধ্য রহস্যের মতই আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

আজও যা ভুলতে পারিনি। বৃদ্ধ হয়েছি—কতকাল আগের কথা,

আছে মহাজাতি আর মহাজাতকের
পতন ও অভ্যুদয়;
তাই পলাশীর মাঠে বাঙালীর হল
ভাগ্য বিপর্যয়।
চিরকাল আছে, চিরকাল হবে,
কালের চক্র ঘুরিতেছে ভবে,
বাংলার নামে কলঙ্ক এ যে—
মহাকালে কর জয়;
ভাঙা-ভগবানে জোড়া দিতে গিয়ে
মানিও না ক্ষতি-ক্ষয়।
আম্র-কানন লালে-লাল হোক্,
—হোক অগ্নিময়!
শুনেছি সে কবে দিলীপ-তনয়
রঘুর দিগ্বিজয়;—
দিগ্‌দিগন্তে সে কি অভিযান,
সে কি বিভীষিকাময়!
আমাদেরি সেনা ঠেকায়েছে তারে,
খেদায়ে নিয়েছে সাগরের পারে;
নিজের শৌর্য-বীর্যের বলে
আনিয়াছে বরাভয়;
আমরা যে তাই তাদের বংশ
এ জ্বালা কি বুকে সয়?
আবার আমরা উঁচু করি শির
উঠিব সুনিশ্চয়
জীবনের প্রতি পাতে পাতে পাবে
এ জাতির পরিচয়,
দৈন্যের বোঝা রবে না সে কভু
আলো আছে অক্ষয়।
বিশ্ব জুড়িয়া গাবে একদিন
কাহাদের ত্যাগে এ-দেশ স্বাধীন;
শত শহীদের বুকের রক্ত
এ মাটিতে মিশে রয়।
ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে
ফুটিয়াছে আলয়;
ভবিষ্যতের মানুষের কাছে
সদা রহস্যময়!

কিন্তু শুধু মনে মনে যৌবনের হারান সেই একটি রাত্রি যেন আজও মনোলোকে আমার স্বপ্নের মতই হঠাৎ কোন নিরালা নিশুতি রাতে আমায় বিচলিত করে তোলে। মনে হয় হয়ত আগাগোড়াই সমস্তটা একটা স্বপ্ন! দুর্বোধ্য একটা স্বপ্ন। কিন্তু মন মানতে চায় না।

স্বপ্ন হোক, মিথ্যা হোক, জীবনের এই প্রান্তসীমায় এসে আজ যখন সব কিছু খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করি, মনে হয় সত্য ও মিথ্যার সীমারেখাটা ঠিক কোথায় ?

তখন বাগদাদের খলিফা ছিলেন হারুণ-অল-রসিদ। তিনি ছিলেন যেমন গুণী, জ্ঞানী, ন্যায়-বিচারক, তেমনি দয়ালু ও প্রজারঞ্জক। প্রজারা কে কোথায় কেমনভাবে আছে দেখার জন্য প্রায়ই তিনি রাত্রে ছদ্মবেশে বেরুতেন। প্রজাদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা ক'রে জেনে নিতেন তাদের অভাব-অভিযোগের কথা। এ-ছাড়া অবাধ গতিবিধি ছিল তাঁর কাছে সকলের। কারু প্রতি কোন অবিচার হ'লে তিনি নিজে তার মীমাংসা করতেন। কাজীর বিচারের উপরও আপীল চলত তাঁর কাছে।

এই সময় বাগদাদে আলি রেজা নামে এক বণিক বাস করত। নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়ে উঠেছিল। একবার শহরের অনেক লোক মিলে তীর্থ পর্যটনে যাবার ব্যবস্থা করায়, আলি রেজাও তাদের সঙ্গে তীর্থে যাবার সঙ্কল্প করলে। তার সঞ্চিত যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সে তা একটি কলসীতে ভ'রে তার মুখটা জলপাই দিয়ে ঢেকে, ঐ কলসীটি নিয়ে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রহিমের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই, আমার এই জলপাইয়ের কলসীটা তোমার কাছে কিছুদিনের জন্যে রেখে যেতে চাই। আমি তীর্থ পর্যটনে বেরুচ্ছি, ফিরে এসে এটা আবার তোমার কাছ থেকে নেব। জলপাইগুলো খুব ভাল জাতের, বেশী নাড়াচাড়া হ'লে খারাপ হয়ে যাবে, একটু সাবধানে রেখো।'

রহিম বললে, 'এ আর এমন বেশী কথা কি! তোমার কোন চিন্তা নেই, কলসীটা যেমন রেখে যাচ্ছ ফিরে এসে দেখবে তেমনই আছে।' এই ব'লে রহিম কলসীটাকে যত্ন করে রেখে দিলে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে যায়, আলির কিন্তু দেখা নেই। তার আসার সময় পার হয়ে দু'টি বছর কেটে গেল, তবুও আলি ফিরে এল না। তখন রহিম আর তার স্ত্রী ভাবলে, আলি নিশ্চয়ই মারা গেছে।

এই সময় একদিন রহিমের ভীষণ জলপাই খাবার ইচ্ছা হ'ল। তখন জলপাইয়ের সময় নয়, কোথাও জলপাই পাওয়া গেল না। রহিমের স্ত্রীর হঠাৎ মনে হল আলির সেই কলসীর কথা। সে রহিমকে বললে, 'একবার আলি সাহেবের জলপাইগুলো দেখলে হ'ত, এতদিনে খারাপ হয়ে গেল কিনা।' বলে রহিমের স্ত্রী কলসী খুলে দেখলে সত্যিই সব পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘরের মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত কলসী রেখে লাভ কি, এই ভেবে জলপাইগুলো ফেলে দেবার জন্যে কলসীটা যেই সে বাইরে এনে উপুড় করেছে, অমনি তার ভেতর থেকে টাকা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এই না দেখে রহিম আর রহিমের স্ত্রী দু'জনেই ত' অবাক!

এর পরও যখন দীর্ঘকাল কেটে গেল, অথচ আলি দেশে ফিরল না, তখন রহিম ও তার স্ত্রী সে নিশ্চিত মারা গেছে ধরে নিয়ে, সেই টাকাগুলি মনের সাধে খরচ করতে লাগল। সুখ আর তাদের ধরে না। কিন্তু ঠিক এই সময় হঠাৎ একদিন আলি রেজা ফিরে এসে উপস্থিত হ'ল তীর্থ পর্যটন ক'রে। তাদের দল পথ হারিয়ে অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাই সেখান থেকে নানা বিপদ-আপদ কাটিয়ে দেশে ফিরতে তাদের এত দেরী হয়ে গেছে।

আলির ফেরার খবর শুনেই ত' রহিম মাথায় হাত দিয়ে বসল। কি ক'রে এখন টাকার কলসী ফেরৎ দেবে এই দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে সে। কিন্তু তার দুশ্চিন্তার কথা জানতে পেরে তার স্ত্রী বললে, 'এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে, বাজার থেকে কিছু জলপাই কিনে এনে একটা কলসী ভরে দিলেই ত' চুকে যাবে।'

রহিম তার স্ত্রীর কথামতই কাজ করলে।

যথাসময়ে আলি এসে তার কলসী ফেরৎ নিয়ে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে গেল রহিমকে। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কলসী উপুড় করে সে দেখলে তার মধ্যে একটিও টাকা নেই, শুধু জলপাই। তখুনি আলি আবার ছুটে এল রহিমের কাছে; অনুনয় ক'রে তাকে বললে, 'ভাই আমার টাকাগুলো ফিরিয়ে দাও।'

রহিম অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'টাকা! টাকা আবার কিসের? —তুমি যা রেখেছিলে তা ত' ফেরৎ দিলুম তোমায়!'

রহিমের কথা শুনে আলি কাতরভাবে আবার বললে, 'আমার সারা জীবনের সঞ্চয় ঐ ক'টি টাকা, না খেয়ে-দেয়ে জমিয়েছি—দয়া ক'রে আমায় ফেরৎ দাও'।

আলির কথায় রহিম হেসে বললে, 'আমার কাছে তুমি কি টাকা রেখেছিলে? তুমি রেখেছিলে জলপাই-ভরা কলসী, তাই ত' তুমি পেয়েছ।'

আলি প্রথমে ভেবেছিল রহিম হয়ত তার সঙ্গে মস্করা করছে, কিন্তু যখন সত্যি-সত্যিই সে টাকা আদায় করতে পারলে না, তখন সে সোজা চলে গেল কাজীর দরবারে এবং সেখানে সব নিবেদন ক'রে বিচার প্রার্থনা করলে।

কাজী সাহেব আলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যে কলসীতে টাকা রেখেছিলে তার কি কোন প্রমাণ আছে?

আলি কোন প্রমাণ দিতে পারলে না। প্রমাণাভাবে রহিম অব্যাহতি পেয়ে গেল। আলি বেচারা মনের দুঃখে ঘরে ফিরে এল।

জলপাইয়ের কলসীর কাহিনী সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। খলিফারও কানে গেল সে কথা।

খলিফা একদিন বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় এক জায়গায় পথে দেখলেন ছোট ছোট ছেলেরা বিচার-বিচার খেলছে। তিনিও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন তাদের খেলা। তারা সেই জলপাই কলসীর কাহিনী নিয়েই অভিনয় করছিল। একটি ছেলে সেজেছে কাজী, একজন আলি আর একজন রহিম। অদ্ভুতভাবে বিচার করলে ঐ বালক-কাজী আলির জলপাই কলসীর। জেরা করে আসল ব্যাপারটি বের করে নিয়ে দোষীকে সে শাস্তি দিলে। এই বালক-কাজীর বিচার-বুদ্ধি দেখে খলিফা অবাক হয়ে গেলেন।

পরের দিন খলিফা উজীরের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটি বললেন। তিনি বললেন, 'বালক-কাজীর কাছে আমি শিখে এসেছি কেমন করে এই জলপাই কলসীর বিচার করতে হবে—আমিই ওদের বিচার করব। সব সময় কেবল আইনের নির্দেশেই বিচার করা যায় না—নিজের বিবেক-বুদ্ধিও কিছুটা প্রয়োগ করতে হয়।'

খলিফার নির্দেশমত পেয়াদা দিয়ে আলি আর রহিমকে তাঁর কাছে হাজির করা হ'ল। রহিম ত' ভয়েই আড়ষ্ট।

খলিফা আলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার অভিযোগ কি?'

আলি কুর্ণিশ করে উত্তর দিলে, 'শাহানশাহ, আমি তীর্থে যাবার পূর্বে একটি কলসীতে টাকা ভরে, তার মুখটা জলপাইয়ে চাপা দিয়ে রহিমের কাছে গচ্ছিত রেখে যাই।'

খলিফা রহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রহিম এ কথা কি সত্যি?'

রহিম বিনীতভাবে বললে, 'ধর্মাবতার, সবই সত্যি, কেবল টাকার কথা আমি কিছুই জানি না। আলি সাহেব আমাকে যেমন কলসী দিয়েছিলেন, আমি তেমনি জলপাইসুদ্ধ কলসী তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে টাকা ছিল-কি-ছিল-না তা আমি কিছুই জানি না।'

খলিফা—'রহিম, আলি তোমায় কলসীটা কতদিন আগে দিয়েছিল?'

রহিম—'প্রায় সাত বছর পূর্বে জাহাঁপনা।'

খলিফা—'এই সাত বছরের মধ্যে তুমি কলসীতে হাত দাওনি?'

রহিম—'না জাহাঁপনা।'

খলিফা এই কথার পর এক প্রবীণ জলপাই-বিক্রেতাকে তলব করলেন। জলপাই-বিক্রেতাকে খুঁজে এনে পেয়াদারা হাজির করল

শ্রাবণ মাস। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। থেকে থেকে দমকা বাতাস বইচে। তখন সবে সন্ধ্যা। পাড়ার অতুলবাবু ও হরিবাবু এলেন পঞ্চুবাবুর সঙ্গে গল্প করতে। অনেকেই আসেন। তবে সেদিন বাদলা বলে তাঁরা দুটিতেই এসে বসলেন।

কথায় কথায় ভূত-প্রেতের বিষয় উঠে পড়লো। পঞ্চুবাবু তামাক খাচ্ছিলেন; উঠে বসলেন। কল্কেটা অতুলবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন মশাই, আপনারা নিজেরা কেউ রাতের বেলা ভূত দেখেচেন বলে তো মনে হয় না। দেখেচেন?"

অতুলবাবু বললেন, "উঁহুঃ।"

ভূতের কথা শুনেই হরিবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি বৃষ্টির ছাট ও মশার ঝাঁক আটকাবার ছলে পিঠের দিকে জানালাটা এঁটে বন্ধ করে অতুলবাবুর একটু গা ঘেঁষে বসলেন।

অতুলবাবুও অমনি তাঁর কাছ থেকে হাতখানেক সরে গেলেন।

ঘরে একটি হারিকেন জ্বলছিল। পঞ্চুবাবু বললেন, "আমি স্বচক্ষে ভূত দেখেচি। তখন থাকতুম কেষ্টপুরের ঐ কাচকলটার পেছনে যে ভাঙা বাড়িটা ছিল সেখানে। বাড়িটার পাঁচীল বলতে কিছু ছিল না। তবে একেবারেই যে ছিল না তা বলতে পারি না। ভেতর বাড়িতে ঢোকবার দরজাটা নিয়ে হাত দশ বারো ইঁটের গাঁথা পাঁচীলের মতো খাড়া ছিল। ইঁটের ফাঁকে ছিল কয়েকটা গর্ত। তার একটিতে ছিল একজোড়া গোখরো স্বামী-স্ত্রী। বোধহয় বাস্তু। তারা কাউকে কিছু বলতো না। ভারী সৌখীন ছিল দুটিতে। গ্রীষ্মকালের রাত্রে চাঁদের আলোয় দেখেছি, দুটিতে পশ্চিমদিকে পুকুরটার ধারে চাঁপাতলায়, কি কামিনী গাছটার গোড়ায় শুয়ে হাওয়া খাচ্ছে, আর ফুলের গন্ধ শুঁকচে। হাততালি দিলেই নড়ে-চড়ে উঠে জঙ্গলে সরে যেত। বাড়িটার চারধারে ছিল ঘন বন-জঙ্গল। পূর্বদিকে রেল লাইন। ত্রি-সীমায় লোকের বসতি ছিল না।"

অতুলবাবু বললেন, "এ রকম জায়গায় থাকতে ভয় করতো না?"

পঞ্চুবাবু বললেন, "ভয়? না—হ্যাঁ—এক এক সময় করতো বৈকি। তা সে সেই মৌলবী সাহেবের জন্যে। তবে তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। কাউকে ভয়-টয় দেখাতেন না। চাঁদনী রাত হলে দেখতুম মাথায় সাদা টুপি, গায়ে সাদা পোষাক, মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় সাদা বাবরি চুল, মোটা-সোটা, হাতে তসবী নিয়ে পুকুরধারে লম্বা ঘাসের বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর কোরানের বয়েৎ আওড়াচ্ছেন। শুনতে ভারী মিষ্টি লাগতো। কিন্তু দেখতুম তাঁর পেটের কাছটা লাল। কেন লাল, তাও বলচি।

"ঐ বাড়িটা আগে ছিল ঐ মৌলবী সাহেবের। উনি ঠিক মৌলবী ছিলেন না। তা না থাকুন, আপনার-আমার কি? ও'র অনেক টাকা ছিল। চালানী কারবার করতেন কিনা। তা করুন। কিন্তু ভারী ধার্মিক ছিলেন। একদিন ও'র পরিবারের সকলে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে ডাকাত এসে ও'কে যে-ঘরে আমি থাকতুম সেই ঘরে বেঁধে রেখে টাকা-কড়ি, হীরে-জহরৎ সব নিয়ে যায়। তবে একেবারে কাটেনি, কেবল ও'র ভুঁড়ি চিরে দিয়েছিল।"

হরিবাবু ঢোক গিলে বললেন, "তার—তারপর?"

"তারপর যা হয়। বিবিরা এসে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো। শেষে সাহেবকে ঐ পুকুরের পশ্চিমধারে গোর দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।"

অতুলবাবু জিগোস করলেন, "পুলিশে ডাকাতদের ধরতে পেরেছিল?"

পঞ্চুবাবু জিভ দিয়ে টক্ করে শব্দ করে বললেন, "ক্ষেপেচেন? তারপরের ঘটনা শুনুন। বাড়িটা সেই থেকে অনেক বছর পড়েই ছিল। শেষে লোহাওলা দত্তরা একেবারে জলের দরে কিনে ফেলে রাখে। তাদের মেজোবাবুর ইচ্ছে ছিল ওখানে শখের বাগান করবেন। কিন্তু তা করবার আগেই তিনি মারা গেলেন। কিছুদিন পরে একদল খোট্টা গয়লা এসে মাসিক দশ টাকা ভাড়া দিয়ে গোয়াল তৈরী করে ওখানে থাকতে লাগলো। তারা ছিল চার বছর, কিন্তু তাদের একটাকে একদিন সাপে কামড়ে মেরে ফেললে।"

অতুলবাবু বললেন, "এই যে বললেন সাপ দুটো কাউকে কিছু বলতো না।"

পঞ্চুবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কখন আবার সে কথা বললুম? তারা সাপ কাউকে কিছু বলে না, এ কখন হয়? তবে ওরাই যে কামড়েছিল, সে কথা বলা যায় না। ওখানে তো আরও সাপ ছিল। তা ওদের একটাকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলাতে বাকি সকলে চলে গেল। তখন আমি বেকার। ঐ বাড়িটা পাঁচ টাকায় ভাড়া নিয়ে ওখানে একটা 'মেস' করি।"

দরবারে। খলিফা তাকে কলসীর জলপাইগুলি দেখিয়ে বললেন, 'এই জলপাইগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে বলো—এগুলি কতদিন আগেকার।'

ফল-বিক্রেতা জলপাইগুলি ভাল করে দেখে বললে, 'জাঁহাপনা এই ফলগুলি মাত্র দু'এক মাস আগেকার।'

খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সাত বছর আগে এই কলসীতে জলপাই রাখা হত, তাহলে সেগুলোর কি অবস্থা হত?'

খলিফার প্রশ্নের উত্তরে ফল-বিক্রেতা বললে, 'ফল একেবারে শুকিয়ে যেত, না হয় পচে দুর্গন্ধ বেরুত।'

খলিফা তখন রহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কিছু বলবার আছে কি?'

রহিম মাথা নিচু করে উত্তর দিলে, 'না জাঁহাপনা।'

খলিফা তখন বললেন, 'রহিম, তুমি নিজের কথাতেই নিজে ধরা পড়েছ। পচা জলপাই ফেলতে গিয়ে কলসীর নিচে টাকার সন্ধান পেয়ে সেগুলি আত্মসাৎ করে সেই জায়গায় তাজা জলপাই ভরে রেখে দিয়েছ। এখন যদি ভাল চাও, তাহলে আলির সমস্ত টাকা তাকে ফিরিয়ে দাও—না হলে কঠোর শাস্তি পাবে।'

আলি খলিফার ন্যায়-বিচারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিলে।

রহিম আলিকে তার সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

আর এদিকে খলিফা সেই বালক-কাজীটিকে গ্রাম থেকে আনিয়ে তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। কালে একদিন সেই ছেলে বাগদাদের একজন সেরা বিচারক হয়েছিল। *

---

* আরব্য উপন্যাস হইতে।

হরিবাবু বললেন, "ওখানে মেস্? লোক এল?"

পঞ্চুবাবু বললেন, "আসবে না? ততদিন যে ও-অঞ্চলে তিন-চারটে বড় বড় কারখানা বসেছে। মেসে মেম্বার এল কারখানার চারজন ম্যাট্রিক পাশ পিওন, তিনটে কারিগর আর একজন বাবু। আমাকে নিয়ে হল, ন'জন। কিন্তু চুলো জ্বলতো চারটে। কেউ কারো হাঁড়ি ছুঁতুম না। এমনি করে ছ'টি বছর কাটালুম। তারপর পদ্মা-পার থেকে এল বাস্তু-হারার পাল। ঐ বাড়িটার তিনধারে জলায়, মাঠে, জঙ্গলে তারা ছাপ্পড় তুলে বসে গেল। কে জানে কেন মশায়, তার কিছুদিন পরেই মৌলবী-সাহেব আর দেখা দিলেন না।"

অতুলবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "তিনি হয়তো পাকিস্থানে চলে গেলেন।"

পঞ্চুবাবু বললেন, "ঠাট্টার কথা নয় অতুলবাবু। মনে হয় বিরক্ত হয়েছিলেন। অমন প্রেতাত্মা আর হয় না। আমাকে অর্শের ওষুধ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।" বলে তিনি তিনবার সালাম দিলেন। তারপর বললেন, "তিনি দেখা না দিলেও আর একজন এক রাতে দেখা দিলেন। সেই কথাই শুনুন।

"সেবার পুজোর ছুটির পর বাড়ি থেকে এলুম। কারখানা খুলতে তখনও একদিন বাকি। এসে পৌঁছলুম রাত সাড়ে দশটায়। তখনও একটু চাঁদের আলো গাছের মাথায়, পুকুরের জলে, মাঠের ওপর চিক্ চিক্ করচে। বোধহয় সন্ধ্যার পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তাই সব ভিজে-ভিজে ছিল। আমার মেসের মেমবাররা কেউ আসে নি। আমি পুকুরঘাটের রকে বসে পুঁটলি খুলে পরোটা আর আলু চচ্চড়ি খাচ্চি, আর আমাদের ওখানে যে কুকুরটা থাকতো, তাকে একটু একটু ছিঁড়ে দিচ্চি। কুকুরটাকে আমরা কেলো বলে ডাকতাম। ভারী তেজী কুকুর ছিল। তবে সে অন্য ঘটনা। যাক্। খাচ্ছি আর এক একবার কাঁচকলটার দিকে তাকাচ্ছি। এমন সময়ে হঠাৎ দেখি, বিশ-পঁচিশ হাত লম্বা লেংটিপরা একটা লোক রেল-লাইনের ধারে কচুবনের ওপর দিয়ে লম্বা পা ফেলে হন্ হন্ করে হেঁটে আসচে। তারপরই সে কাঁচকলের দোতলা সমান উঁচু টিনের চালে একখানা পা তুলে উঠে গেল। তারপরই কারখানার দশতলা সমান লোহার চিমনিটার মাথায় আর একখানা পা তুলে একেবারে ওপারে উঠে কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যখন আমার দিকে তাকালো, তখন আমার যে কি অবস্থা। পরোটা গলায় পুঁটলির মতো আটকে রইলো। তবুও হাতে পৈতে জড়িয়ে বললুম, 'আ—আমি রামহোন। আ—আমাকে ভয় দেখানোর মানে?' অমনি সে 'হি হি' করে হেসে' এক পা আমাদের বাড়ির ছাদে আর এক পা বাস্তুহারাদের এক-জনকার ছাপ্পরে দিয়ে চিমনি থেকে নেমে মাঠ ভেঙে জলার দিকে চলে গেল। আর কুকুরটা লেজে মুখ ঢুকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইলো।" বলে পঞ্চুবাবু তিনবার নমস্কার করলেন।

হরিবাবু বললেন, "তবে যে বলে ভূতে লোহা ছোঁয় না। তাহলে টিনের চালে উঠলো কি করে?"

"আলগোচে—আলগোচে—" বলে পঞ্চুবাবু হাইতুলে হাঁয়ে তিন তুড়ি দিলেন।

অতুলবাবু বললেন, "সে বাড়ি আজও আছে?"

পঞ্চুবাবু বললেন, "হ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ। গত বছর কিনে ওর পেছনে কমসে কম্ সাত হাজার টাকা গলিয়েছি।" বলে উঠে দাঁড়ালেন।

অতুলবাবু বললেন, "সবই তো আপনার ঐ র‍্যাশনের দোকানের কল্যাণে?"

"একটা গম-ভাঙানো কলও করেচি, ভাই। আচ্ছা, আহ্নিকের সময় হল।" বলে পঞ্চুবাবু একটু হাসলেন।

"ওখানে কে থাকে এখন?"

"ভাড়াটে। শতখানেক টাকা ভাড়া দেয়। সব জোচ্চোরের দল। ভাল-মানুষের কাল আর নেই। ওরা উঠে গেলে এক্ষুণি দুশো টাকা ভাড়া পাই। কিছুতে কি উঠবে, অমন সুবিধা পাবে কোথায়? পুকুর থেকে দিব্যি মাছ চুরি করচে।"

বাঁদর যদি চাদর কাঁধে নেমন্তন্ন চলে,
ভালুক যদি সাহেব সাজে, কেউ কি কিছু বলে?
টিকটিকিটা দুলিয়ে টিকি কুষ্ঠী দেখে ব'সে,
প্যাঁচা চেয়ার জুড়ে থেকে চাঁচায় শুধু ক'সে,
গাধা যদি রাজা হ'য়ে সিংহাসনে ওঠে,
পুকুর থেকে নেয়ে কুকুর রান্নাঘরে ছোটে,
কান্ড দেখে চমকাবে কি? কোন্নগরের খাঁদা
বললে, "এমন ব্যাপার আমি নিত্যি দেখি, দাদা।
আজকে কেবল জন্তুরা সব ভদ্র সাজে ব'লে,
মানুষ যত ছিল দেশে, স্বর্গে গেছে চ'লে।
পাইনা দেখা সিংহ বাঘের, পাইনা দেখা হাতীর,
ইঁদুর বেরাল সাপের ব্যাঙের চলছে বেজায় খাতির!
সুর্মা চোখের এনেছি সেই বিন্ধ্য পাহাড় থেকে
কোন্ জানোয়ার কে যে, আমি তাই ত' ফেলি দেখে!
বলছ যাকে লক্ষপতি, আমার চোখে চেয়ে—
দিব্যি দেখি, কুমীর সেটা, মুটকো হ'ল খেয়ে।
দেখছ যাকে বিলাতফেরৎ নম্র এবং সোজা,
আমি দেখি বেঁজী সেটা, বুকে কলম গোঁজা।
ঐ মেয়েটা খাকিশেয়ালী সেই ছেলেটা গরু,
চাকর তোমার ছাগল, তুমি যতই ডাকো—'হরু'!
তুমি হ'লে,—থাকগে, সেটি বললে যাবে রেগে।"
পালায়! বলি, "খাঁদু তুমি যাচ্ছ কেন ভেগে?
আয়নাতে মুখ দেখে তোমার সত্যি ক'রে বলো—
তুমি যে কি নিজে!" খাঁদার চক্ষু ছলোছলো!
চোখে কি তার পড়লো বালি, কিংবা কাঠের কুঁচো?
বললে কেঁদে,—"আর্শীতে যে ল্যাজগোছের ছুঁচো!"

"ভাড়াটে কি সপরিবারে থাকে?"

"উঁহুঃ! সেও মেস্ করেচে—"

"ও দাদু! এস না" বলে ঘাগরা পরা একটি বছর ছ সাতের নাদুস্-নুদুস্ মেয়ে ঘরে ঢুকলো।

পঞ্চুবাবু "এই যে, চল" বলে তার সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন।

অতুলবাবু ও হরিবাবু অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লেন। তখন বৃষ্টি ধরেচে।

অতুলবাবু বললেন, "বুঝলেন কিছু?"

হরিবাবু ঢোক গিলে বললেন, "সবই বরাত।"

অতুলবাবু একটু হেসে বললেন "আমাদের দেশে এ রকমটাই দেখা যায়। কি বলেন?"

হরিবাবু কিছুই বললেন না। তিনি তখন নিজের ও পঞ্চুবাবুর অবস্থার কথা ভাবছিলেন।

একটি বারো-তেরো বছরের ছেলের চোখে-মুখে এমন প্রখর প্রদীপ্তি আমি আর কখনো দেখি নি।

কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানে ছেলেটিকে প্রথম দেখি। দেখেই চমক লেগেছিল। ইচ্ছা হয়েছিল, ওকে ডেকেই আলাপ করব।

এমন সময় যোগাযোগ ঘটে গেল। ছেলেটির হাত ধরে এগিয়ে এলেন বন্ধু। বললেন ঃ এটি আমার ভাগ্নে—নাম শাশ্বত। তোমার লেখার ভারি ভক্ত।

হেসে বললাম ঃ তাই নাকি? তাহলে তো আলাপের সার্টিফিকেট জুটেই গেল। আমিও ভাবছিলাম ওকে ডেকে ভাব করব। এসো শাশ্বত।

আলাপ জমতে দেরী হল না। নানা কথা। বেশীর ভাগ সাহিত্য সম্পর্কে। ছেলেটি পড়াশুনো করে।

কথায় কথায় এক সময় শাশ্বত বলল ঃ জানেন স্যার, আজকের উৎসবের সমস্ত আলোক-সজ্জা আমার। আমি নিজের হাতে সব করেছি।

সাধুবাদ দিয়ে বললাম ঃ সে তো করবেই। অন্ধকারে আলো জ্বালানোর কাজই যে তোমাদের। তোমরাই তো নতুন দিনের আলো।

আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল।

শাশ্বত মাতৃহীন, কিন্তু একান্ত মাতৃভক্ত। কথায় কথায়ই বলে ঃ এই আমার মায়ের ইচ্ছা স্যার। এ কথা ওকে কে শিখিয়ে দিয়েছে জানি না। কিন্তু কথাগুলো ও বলে এমন পরম নির্ভরতায় যে, বারো বছরের ছেলের মুখে বিস্ময়কর শোনায়।

দিন যায়।

একদিন আগুন জ্বলে উঠল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। 'ভারত ছাড়ো'র ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হ'ল আসমুদ্র হিমাচল। স্বাধীনতার দুর্জয় সংকল্পে যাত্রা শুরু করল তিমির রাত্রির যাত্রীদল।

একদিন রাত্রে শাশ্বত আমার বাড়িতে এল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

শুধালাম ঃ ব্যাপার কি শাশ্বত?

শাশ্বত বলল ঃ এখান থেকে চলে যাচ্ছি স্যার। যাবার আগে আপনার পায়ের ধুলো নিতে এলাম।

সবিস্ময়ে শুধালাম ঃ কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ চলে যাচ্ছো কোথায়? কেনই বা যাচ্ছ?

অদ্ভুত হেসে শাশ্বত বলল ঃ বুঝতেই তো পারছেন স্যার, পুলিশ আমাদের পিছু নিয়েছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। কিশোর শাশ্বত আজ যৌবনের জয়-রথের রথী। তিমির রাত্রির যাত্রীদলের ও সঙ্গী। তাই দেশ হতে দেশান্তরে [illegible] দেশের ডাকে [illegible]।

একটু চুপ করে থেকে বললাম ঃ তোমার মামার এতে সম্মতি আছে? তাঁর মত নিয়েছ?

ঃ জানতাম মামার মত পাব না। তাই তাঁকে কিছুই বলি নি।

ঃ ওঃ। কিন্তু তোমার মা? তোমার মা কি এ পথ সমর্থন করবেন? এ যে বিপদে, বিঘ্নে একান্ত কণ্টকিত?

সহসা শাশ্বতর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। এক সঙ্গে সে

কয়দিন থেকে তিনু দেখিতেছে বাবার মুখটি ভার
আগের মতন ডাকে নাকো তাকে—আদর করে না আর।
সদাই কেমন মনমরা হয়ে চুপ করে বসে ভাবে
শুনেছি পিতার চাকুরি গিয়েছে—অফিসে আর না যাবে।
এই দুর্দিনে রোজগার নাই, কেমনে চলিবে দিন
তাই বুঝি হায় ভেবে তিনি সারা—দেহ হলো তার ক্ষীণ।
তিন বোন আর পাঁচ ভাই তারা ইস্কুলে পড়ে সবে
কেমনে চলিবে সংসার আর পড়ার কি যে গো হবে!
গরীব যাহারা তাদের পরেই জুলুম চিরটি কাল
স্বাধীন দেশেতে ধনিকেরা চালে একি রে নিঠুর চাল!
বিচার ইহার হবে নাকো কভু মানুষের আদালতে
যার এ পৃথিবী দিবে সে শাস্তি ইহাদের বিধিমতে।
তিনু ভাবে একা একা
আর কত দুখ দিবে ভগবান—কি আছে ভাগ্যে লেখা।
তাহাদের দেশ পাবনা জেলায় পদ্মা-নদীর পার
দেশ ভাগ হতে চলিয়া এসেছে কেহ সেথা নাহি আর।
আজ মনে হয়, ফিরে যাবে সেথা পরিচিত জনতায়
যদিও সে দেশ অপর রাষ্ট্র—তাতে কিবা এসে যায়।
মা বলে ঃ পূজায় নূতন কাপড় কিছু আর হবে নাকো
পড়া ছেড়ে দিয়ে চায়ের দোকানে বয় হয়ে সবে থাকো।
নিজের লাগিয়া ভাবে নাকো তিনু—ছোট ছোট ভাই-বোন
ক্ষুধার জ্বালায় জননীরে তারা করে শুধু জ্বালাতন।
ছিন্ন বসন পরিয়া তাহারা মলিন মুখেতে রয়
ইহাদের পানে চাহিয়া তিনুর মন যে কেমন হয়!
সেই দিন তিনু ফিরিয়া অনেক রাতে
ছোটদের জামা—টাকা একশত দিল তুলি মার হাতে।
জননী অবাক ঃ কোথা পেলি এই জামা ও কাপড় টাকা
অভাব হইলে স্বভাব কখনো যায় নাকো ঠিক রাখা।
তিনু হেসে কয় ঃ ঠিক বটে তবু মিথ্যা এ সন্দেহ
সাইকেল মোর বেচিয়াছি আজ জানে না এ কথা কেহ।
দুঃখ কোরোনা—কিনিব আবার—সুদিন আসিবে মাগো
হিসাব করিয়া করিও খরচ, টাকাগুলি তুমি রাখো।
জননীর চোখে ফুটিল অশ্রু—কথা নাহি মুখে তাঁর
দুই দিন তবু রহিল লাঘব অভাবের গুরু ভার।

চোখে ঝলকে উঠল জল ও বিদ্যুৎ। দৃঢ় গলায় ও বলল ঃ আমার মায়ের নির্দেশেই এ পথে পা বাড়িয়েছি স্যার।

বিস্মিতকণ্ঠে বললাম ঃ বল কি?

ঃ হ্যাঁ স্যর। আপনাকে কখনো বলি নি। অন্ধকার রাতে বোমা নিয়ে পথ চলতে আমার মা মারা গেছেন পুলিশের গুলীতে। তাই তো বিঘ্ন-বিপদের পথ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আমি হতবাক্। শাশ্বত কথা বলল ঃ

কিন্তু আর দেরী নয় স্যার। আমি চলি।

ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে শাশ্বত চলে গেল। ওর যাত্রাপথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। বাইরে নিকষকালো রাত।

নন্তুদের মেজমামার বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু লোকটি বেশ পন্ডিত। কোন্ একটা বড় কলেজে বিজ্ঞানের প্রফেসারী করেন তিনি। পন্ডিত হলেও লোকটি কিন্তু ভারী আমুদে।

রবিবার দুপুরে নন্তুদের বাড়ী ছেলেদের আড্ডা জমেছে। হঠাৎ মেজমামা এসে হাজির। এসেই হাঁকলেন, "নন্তু, একটা দুধের বাটি নিয়ে আয় তো!"

নন্তু দৌড়ে রান্নাঘর থেকে একটা এলুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে এল। মেজমামা বললেন, "দূর্ পাগলা, একি দুধের বাটি হ'ল নাকি?"

নন্তু থতমত খেয়ে আবার ছুটল এবং একটু পরে বেশ বড়সড় একটা কাঁসার বাটি নিয়ে এল। মেজমামা আবার তেমনি ঠোঁট উল্টে বললেন, "এটা আবার কি আনলি?"

নন্তু বলল, "কেন, এই তো দুধের বাটি! খোকন তো রোজ এই বাটিতে করেই দুধ খায়, ঝিনুক দিয়ে।"

মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন, "এ তো হ'ল দুধ রাখবার বাটি; কাঁসার তৈরী। আমি তোর কাছে চেয়েছিলাম দুধের বাটি,—যে বাটি দুধ দিয়েই তৈরী।"

শোন কথা! দুধ হচ্ছে তরল পদার্থ, তা রাখবার বাটি আর কিছু ঐ তরল পদার্থ দিয়ে তৈরী করা যায় না। তবে কি আইস্‌ক্রীম্ দিয়ে তৈরী বাটি! কিন্তু তাই বা কি করে হবে! নন্তু সরাসরি মাথা নেড়ে বলল, "তা হয় না—হ'তে পারে না।" তারপর আরও একটু জোর দেওয়ার জন্য ইংরেজী করে বলল—"ইম্‌পসিবল্"।

মেজমামা এবারে হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "কিন্তু যদি আমি দেখাতে পারি?"

ঘরশুদ্ধ ছেলে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। মেজমামা কিন্তু পকেট থেকে সত্যি সত্যি একটা বাটি বার করে ফেললেন। ধব্‌ধবে সাদা রংএর বাটি, আলো পড়ে চক্‌চক্ করছে। ঠিক যেন হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরী। আর ঠিক তেমনি শক্ত নন্তুর মুখের সামনে সেটা তুলে ধরে বললেন, "এই দেখ্, খাঁটি দুধের তৈরি বাটি। এর মধ্যে দুধ ঢেলে পরীক্ষা ক'রে দ্যাখ্, রাখা যায় কিনা।"

ছেলেদের মুখের হাঁ আরও বিস্ফারিত হ'ল। তারপর অবশ্য মেজমামা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে তাদের বিস্ময় দূর করলেন।

নন্তুদের মত তোমরাও হয়তো গল্প শুনে অবাক্ হচ্ছ, কিন্তু দুধ থেকে বাটি তৈরী করা আজকাল বিজ্ঞানীদের কাছে কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। শুধু বাটি কেন, আরও কতরকম জিনিষ—বাসনপত্র, ছাতার বাঁট, ফাউন্‌টেন্ পেনের খোল, ঠ্যাশ-ট্রে, চিরুণী, দোয়াতদানি থেকে সুরু করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, এমনকি জামা-কাপড় পর্যন্ত তাঁরা দুধ দিয়ে তৈরী করতে ছাড়েন নি। দুধের মধ্যে যে 'কেসিন' নামে পদার্থ আছে তারই সাহায্যে এ সম্ভব হয়েছে।

এক বাটি দুধ নিয়ে যদি তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ফেলে দাও তা হ'লে কি হবে? দুধ ভেঙ্গে দু' ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগে থাকবে ঈষৎ সবুজ রং-এর একরাশ জলীয় পদার্থ, আর ভাগে থাকবে ধব্‌ধবে সাদা কাদার মত একতাল পদার্থ। চলতি কথায় এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলি দুধের ছানাকাটা। দুধের মধ্যে শতকরা ৮৭ ভাগ জল, কাজেই জলের পরিমাণই বেশী হবে, কিন্তু দুধের যা সারবস্তু তার বেশীর ভাগই ঐ ছানাজাতীয় অংশটাতেই চলে আসবে। অবশ্য ছানা আর জল ছাড়াও দুধে আর কয়েকটা জিনিষ আছে। যেমন—খানিকটা মাখন, খানিকটা চিনি, খানিকটা লবণ জাতীয় জিনিষ, খানিকটা ভিটামিন ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা এখন শুধু দুধের ছানা সম্বন্ধেই বলব। বিজ্ঞানীরা এই অংশেরই নাম দিয়েছেন 'কেসিন'। ক্যাল্‌সিয়ামের নাম তোমরা সবাই শুনেছ। হাড় চূণ ইত্যাদি জিনিষের মধ্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। দুধের মধ্যেও এই ক্যালসিয়াম খানিকটা পাওয়া যায় আর তা থাকে দুধের কেসিনের সঙ্গে মিশে। দুধে লেবুর রস ফেললে লেবুর রসের এসিড গিয়ে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয় আর কেসিনকে দেয় ঠেলে বার করে। শুধু লেবুর রস কেন, যে-কোন এসিড দিয়ে এই ভাবে কেসিন আলাদা করা যায়। বেশী পরিমাণে কেসিনের দরকার হ'লে বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ পাতলা সাল্‌ফিউরিক্ এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড—এই সব এসিড ব্যবহার করেন। দুধের মাখন আগে তুলে নিয়ে সেই মাঠা-তোলা দুধে এসিড দিয়ে কেসিন আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর তা ঠান্ডা জলে ধুয়ে, ছেঁকে, কুচি কুচি ক'রে কেটে গরম বাতাসে শুকিয়ে, গুঁড়ো ক'রে নিলেই হ'ল। বাজারে কেসিন কিনতে গেলে তোমাকে এই গুঁড়োই দেবে। কেসিন তৈরী করার অবশ্য আরও কয়েকরকম পদ্ধতি আছে। এসিড একদম্ ব্যবহার না ক'রে দুধ ফেলে রাখলে বাসি দুধ টকে যে জীবাণু জন্মায় তারাই কেসিনকে দুধ থেকে আলাদা করে দিতে পারে—যেমন ক'রে দই পাতা হয়।

কেসিনের নানা গুণ। দুধের যত প্রোটিন সবই রয়েছে এই কেসিনের মধ্যে। চীজ্ বা পনীরও আসলে এই কেসিন ছাড়া কিছু নয়। ওষুধবিষুধেও কেসিন হামেশা ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কাগজের কলে কাগজ মসৃণ করবার জন্য, কাচের কারখানায়, চীনেমাটির কারখানায়, রং-এর কারখানায় কেসিনের কদর অনেকদিন থেকেই।

কিন্তু কেসিনের সবচেয়ে মজাদার যে ব্যবহার—নন্তুর মেজমামার সেই "দুধের বাটি" তৈরীর গল্প এবারে বলি। আবার, আরও মজা, কেসিনের এই অদ্ভুত গুণ আবিষ্কারের জন্য দায়ী একটি বিড়াল।

একবার এক বিজ্ঞানী তাঁর রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বসে কাজ করছিলেন। টেবিলের ওপর ছড়ান ছিল নানা রকম ওষুধবিষুধ, এসিড আর রাসায়নিক মাল-মশলা। আর ছিল একটা পাত্রে খানিকটা 'চীজ' বা পনীর, কি একটা বিষয়ে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি সেটা নিয়ে এসেছিলেন।

বিজ্ঞানী একমনে কাজ করছেন, হঠাৎ তাঁর কানের কাছে শব্দ হ'ল—মিয়াও'! চমকে দেখেন, কোত্থেকে একটা বিড়াল এসে দিব্যি আরাম করে টেবিলের ওপর বসেছে। এখনই হয়তো কোন দরকারী জিনিষ নষ্ট করে দেবে—ব্যস্ত হয়ে তিনি বিড়ালটাকে তাড়াতে গেলেন। তাড়া খেয়ে বিড়াল পালাল বটে, কিন্তু যাবার সময়ে পায়ের লাথিতে একটা বোতল উল্টে দিয়ে পালাল; আর সেটা, পড়বি তো পড়্, একেবারে পনীরের পাত্রে।

বৈজ্ঞানিকমশাই তখন অতটা খেয়াল করেন নি, একটু পরেই

পনীরের খোঁজ পড়তে দেখেন, কোথায় পনীর, পাত্রের মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে হাতীর দাঁতের মতই চক্‌চকে, শক্ত কি একটা জিনিষ! এ কি কাণ্ড! তখন পনীরের ওপর যে বোতলটা পড়ে গিয়েছিল সেটা তুলে দেখেন, তার মধ্যে রয়েছে 'ফর্মাল্‌ডিহাইড্‌' নামে একরকম তরল রাসায়নিক পদার্থ। তা হ'লে পনীরের সঙ্গে ফর্মাল্‌ডিহাইডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই এই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটেছে! ভারী অদ্ভুত তো!

বৈজ্ঞানিকমশাই অবশ্য এখানেই থামলেন না, তিনি ঐ ব্যাপার নিয়ে নানারকম পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। পনীর তো আসলে কেসিন, কাজেই তারপর খাঁটি কেসিন নিয়েও গবেষণা চলল। কিছুদিন গবেষণা চালাবার পর জানা গেল, কেসিনের সঙ্গে ফর্মাল্‌ডিহাইড্‌ মেশালে কেসিনের এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। ঐ পরিবর্তিত কেসিন সেলুলয়েড্‌ বেকেলাইট্‌ প্রভৃতির মতই গুণসম্পন্ন—অমনি শক্ত, চক্‌চকে। আর ঐ চক্‌চকে ভাবটা বহুদিন থাকে। সেলুলয়েড বেকেলাইটের মত কেসিনের সঙ্গেও নানারকম রং মেশান চলে, আর তা বেশ স্থায়ী হয়; উপরন্তু সহজে আগুন ধরে না। দেখতে দেখতে বিজ্ঞানের একটা নতুন দিক্‌ খুলে গেল।

কেসিনের জিনিষপত্র তৈরী করতে হ'লে সাধারণতঃ দুধ থেকে কেসিন বার করে নিয়ে তা আবার ক্ষার-জলে গুলে ফেলা হয়। তারপর তার সঙ্গে ইচ্ছামত রং ও মশলা মিশিয়ে আবার এসিড দিয়ে জমিয়ে পৃথক করা হয়। তারপর তা ধুয়ে, চাপ দিয়ে জল বার করে ফেলে আগের তৈরী ছাঁচে ঢেলে ইচ্ছেমত জিনিষ গড়া যায়। অবশেষে তা ফর্মাল্‌ডিহাইড দিয়ে ভিজিয়ে শক্ত আর চক্‌চকে ক'রে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নেওয়া হয়। অবশ্য এর মধ্যে বহু খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে, কিন্তু মোটামুটি পদ্ধতিটা এই।

কেসিনের ব্যবসায়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে এগিয়ে আছে। সেখানে প্রতিবছর প্রায় ৫৫ লক্ষ টন বা তারও বেশী দুধ হয়। এর অর্ধেকের কিছু বেশী দুধ খাওয়ার জন্য খরচ হয়; বাকিটার মাখন তুলে নিয়ে এই সব ব্যবসায়ে লাগান হচ্ছে। সম্প্রতি আবার কেসিন থেকে কৃত্রিম সুতো বার করে তা দিয়ে কাপড়-জামাও তৈরী হচ্ছে। শুনতে বিলাসিতা মনে হ'লেও এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ভাবলে অবাক্‌ হতে হয় না?

আফিস থেকে ফিরেই সবে পাল্টাতে যাই কাপড়-জামা,
পাশের ঘরে শ্বাস ফেলে কে?—মেঝেয় যেন ঘষছে ঝামা!
বোতাম ক'টা খুলতে বাকি, তর সয়না—ওরে বাবা!
ধড়াম্‌ ধপাস্‌! ঠিক যেন দুই বাঘ-ভালুকে চালায় থাবা!
হুড়ুম ধুড়ুম! ধাপুস ধুপুস—চোর কি ডাকাত ঢুকলো ঘরে,
দিনের বেলাই এ আবার কি পাশের ঘরের মেঝের'পরে?
ওই ঘরে ত থাকেন বাবা, বুড়ো মানুষ গীতা পড়েন,
নড়া-চড়া খুব বেশী নয়, তিনিই কি আর অম্নি করেন?
নিরিবিলি থাকেন একা, সবার সেথায় ঢুকতে মানা,
কিসের লোভে দিনদুপুরে চালাবে চোর সেথায় হানা?
ব্যস্ত হয়ে গেলাম ছুটে, তাইতো, এ যে বাবাই পড়ে!
ওই কে আবার কাঁধটা বাবার অমন করে' জাপ্‌টে ধরে'?
পায়ের ফাঁসে পেঁচিয়ে গলা বগলতলায় হাত গলিয়ে
কেরে অমন জড়িয়ে আছে জুৎ করে' খু-খুৎসু দিয়ে?
তাই তো, ওটা বাব্‌লু নাকি? ওরে ওরে দস্যি ছেলে!
গোবরগাদা বানিয়ে দিলি দাদুরে তুই মেঝেয় ফেলে?
বাবা বলেন—ইস্কুলে ও শিখেছে আজ "যুযুৎসু"—
হাতের কোনো কাজ হবে না, দেখতে চেয়েই বিষম জ্বালা!
জুলুম করে' জড়িয়ে ধরে' "হুড়কো-তালা" দেখায় নাতি,
হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে দিলে, ছাতু হলো পাঁজর ছাতি!

পূজার ছুটিতে সৌরীন গিয়েছিল মুঙ্গেরে। সে চিরদিনই একা একা থাকতে ভালবাসে, মানুষের ভীড় তার ভাল লাগে না। প্রতিদিন বিকালে ফোর্টের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে এসে সে বসে থাকে। সামনেই গঙ্গার মাঝে একটি বড় চর। চরকে পাশ কাটিয়ে নৌকা চলে যায়। নৌকার উপর থেকে দৈবাৎ দু-একটা কথা ভেসে আসে, আর কোথাও কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো নৌকার উপর আলো জ্বলে উঠলো, মাথার উপর গাছের পাতায় পাতায় ঝির ঝির করে একটা শব্দ ওঠে, সৌরীন চুপ করে বসে থাকে।

নদীতীরের এই নিঃসঙ্গ নির্জনতা এক সন্ধ্যায় মুখর হয়ে উঠলো, এক ভদ্রলোক ঝুপ্ করে পাশে এসে বসে পড়লো—সময় কাটাবার জন্য চমৎকার স্থানটি আপনি নির্বাচন করেছেন সত্যি!

সৌরীন তার মুখের পানে তাকালো।

ভদ্রলোক বললেন—ওঃ আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি। আপনি ওই চৌমাথার মোড়ে হ্যাপি হোমে থাকেন তো?

সৌরীন বললো— হ্যাঁ।

—আমি তো আপনার পাশের ঘরেই থাকি।

ওঃ—সৌরীন সংক্ষেপে উত্তর দিল। অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করার জন্য তার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না।

সৌরীনকে গম্ভীর দেখে ভদ্রলোক কিন্তু মোটেই নিরুৎসাহ হলেন না, বলে চললেন—বারো দিন পূজার ছুটি তো শেষ হয়ে এলো মুঙ্গের সব ঘুরে দেখা হল আপনার? রোজ সকালেই তো দেখি টম্‌টম্ চড়ে বেরুচ্ছেন। সব কিছুই তো দেখলেন—বুড়ো শিবের মন্দির দেখেছেন? বাঙ্গলার পাল রাজাদের হাজার বছরের পুরোনো মন্দির। আজ যদিও তার ভগ্নাবস্থা, কিন্তু তবুও দেখবার মত। যতই হোক একটা ঐতিহাসিক প্রাচীন কীর্তি তো!

এবার সৌরীনের কৌতুহল দেখা দিল, বললো—সে মন্দিরটি কোথায়?

—বেশী দূরে নয়, ওই যে গাছগুলো দেখ্‌ছেন, ঠিক ওর পরেই। এখান থেকে বড় জোর পাঁচ ছ' মিনিটের পথ। আমি সন্ধ্যাবেলা অবসর পেলেই ওই মন্দিরটির পাশে গিয়ে বসি, এই এখন যাচ্ছি, যাবেন তো চলুন না?

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে সৌরীনের একটা ঝোঁক আছে। ইতিহাসে এম-এ পাশ করার পর যদিও সে সাধারণভাবে একটি চাকরী করছে, কিন্তু সে বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা পেলে সে রীতিমত পড়াশুনা করে। পালযুগের মন্দিরের কথা শুনে তার কৌতুহল হোল, বললো—চলুন, একবার দেখে আসি।

ভদ্রলোক সমস্ত পথটা বক্‌তে বক্‌তে চললেন—এখানকার এই দুর্গের নাম ছিল, তখনকার দিনে মণ্ডলার দুর্গ। এইটাই ছিল উত্তরাঞ্চল থেকে বাঙ্গলাদেশে প্রবেশের একমাত্র পথ। এই দুর্গ জয় করতে না পারলে বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করা যেত না। আর এই বুড়ো শিবের মন্দির তখনকার দিনে মহাকালের মন্দির নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তখনকার দিনে রাজাদের বিশ্বাস ছিল যে, মহাকালের পূজো করে আশীর্বাদী নির্মাল্য নিয়ে বের হলে যুদ্ধে নিশ্চিত জয় হবে! ইত্যাদি...

কথায় কথায় দু'জনে মন্দিরের কাছে এসে পড়লো। গঙ্গার ধারেই মন্দির। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় মন্দিরটি সত্যই প্রাচীন। তবে বিশেষ অসাধারণ কিছু নয়। জীর্ণ মন্দিরের গা থেকে সর্বত্র পলস্তারা খসে গেছে, শুধু পুরোনো ছোট আকারের ইঁট ছাড়া বাহিরে স্থাপত্য-সৌন্দর্যের কোন নিদর্শন অবশেষ নেই।

ভদ্রলোক মন্দিরের দরজাটি দেখিয়ে বললেন—দেখছেন, দরজা ভাঙা, বক্তিয়ার খিলজি যখন এই পথ দিয়ে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করতে যান, তখন তিনি এই মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন, তারপর এই আটশো বছরের মধ্যে এই মন্দির আর সারানো হয় নি।

ভদ্রলোক বললেন—চলুন, ভিতরে যাবেন?

সৌরীন টর্চের আলো ফেল্‌লো, ভিতরটা অতি সাধারণ, সামনেই এক বিরাট কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ।

ভদ্রলোক বললেন,—এই মন্দির, এই ভাঙা দরজা, এই শিব—কিছু চিনতে পারছেন?

সৌরীন তার মুখের পানে তাকালো। মনে হোল ভদ্রলোক তার মুখের পানে কেমন যেন রুক্ষভাবে তাকিয়ে আছেন। বললো—আমি তো এখানে কখনও আসিনি, চিনবো কি করে?

—এবার আপনি এখানে এই প্রথম এলেন সত্য, কিন্তু সাড়ে সাত শো বছর আগে লক্ষ্মণ সেন যখন বাঙ্গলার রাজা ছিলেন, তখন আপনিই ছিলেন এই মণ্ডলার দুর্গের মণ্ডলেশ্বর! আর আমি ছিলাম এই মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ। মনে পড়ে সে কথা?

সৌরীন ভদ্রলোকের মুখের পানে তাকালো, কি যেন বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারল না। ভদ্রলোকের চোখ দুটি যেন জ্বলছে। সহসা সৌরীনের মাথার মধ্যে সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, একটা কিছু অবলম্বন না পেলে সে তখনই হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যেত। ভদ্রলোক তার একখানি হাত চেপে ধরলেন। তারপর বলে চললেন,—অতীতের কথা আপনি স্মরণ করুন। আপনি ছিলেন মণ্ডলার দুর্গাধিপ। পাঠান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজির সঙ্গে আপনি ষড়যন্ত্র করলেন যে, দশ লক্ষ টাকা পেলে আপনি এই দুর্গ তার হাতে তুলে দেবেন। নবদ্বীপ আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেবেন। বক্তিয়ার খিলজি তাতেই রাজী হোল। মধ্য রাত্রির অন্ধকারে খিলজির দূত ঘোড়ার পিঠে দশ লাখ টাকার থলি এনে আপনার কাছে পৌঁছে দিল। টাকা পেয়ে আপনি দেশের কথা ভুলে গেলেন, জাতির কথা ভুলে গেলেন, ধর্মের কথা ভুলে গেলেন, বিদেশী বিধর্মীর জন্য দুর্গদ্বার মুক্ত করে দিলেন। বক্তিয়ার খিলজি কিন্তু তার কথা রাখলো না। দুর্গে প্রবেশ করে আপনাকে বন্দী করলো, নাগরিকদের হত্যা করলো, যথাসর্বস্ব লুঠ করলো। সবশেষে নগর-উপকণ্ঠের এই মন্দির আক্রমণ করলো। এই মন্দিরের পূজারী ছিলাম আমি। আমি মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিলাম। বক্তিয়ারের সৈনিকরা দ্বারে আগুন দিল, তারপর দগ্ধ দরজা ভেঙে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে বিগ্রহ ভাঙলো, আমাকেও খুন করলো।......

সৌরীন শ্নেছিল। তার কেমন যেন মনে হোল, ভদ্রলোকের কথা নবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে লাগলো যেন সেই দৃশ্যগুলি তার খের সামনে ঘটছে। বায়োস্কোপের পর্দায় যেমন ছবি দেখা যায়, মনি সব ছবি ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে।

কোনো এক সময় সে সহসা যেন সচেতন হয়ে উঠলো, বলে লো—সে তো অনেক দিনের কথা।

ভদ্রলোক বললেন—অনেক দিনের কথাই তো! আপনি এর মধ্যে রো কয়েকবার জন্মেছেন। সে জন্মে আপনি যে পাপ করেছিলেন, ন্ম জন্মে তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এক জন্মে আপনি নিজে বাণিজ্য র প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে দস্যুরা আপনার স্ব লুঠ করে, অর্থের শোকে আপনি শেষ অবধি প্রাণত্যাগ করেন। পনার জন্য মন্ডলার দুর্গে বহু প্রজা পাঠানদের হাতে সর্বস্বান্ত য়েছিল, এই ভাবেই আপনি সেই কর্মফল ভোগ করেন। আরেক জন্মে পনি স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে নদীপথে নৌকায় যাচ্ছিলেন , ঝড়ে কা ডুবে যায়. আপনার চোখের সামনে আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কা-ডুবি হয়ে মারা যায়, আপনার জীবন কোন রকমে রক্ষা পায়, পনি দীর্ঘদিন ভিখারীর মত পথে পথে কেঁদে প্রাণত্যাগ করেন। ডলায় বহু প্রজার প্রাণনাশের কারণ হওয়ায় সেইটি হয়েছিল আরেক য়শ্চিত্ত! আরেক জন্মে প্রচন্ড ভূমিকম্পে আপনার বাড়ী পড়ে যায়। হত হয়ে রাবিশের স্তূপের নীচে আপনি চাপা পড়ে যান। পুরো দিন ধ্বংসস্তূপের নীচে জ্বল জ্বল করে আপনার মৃত্যু ঘটে। মন্ডলার ু প্রজার ঘরে বক্তিয়ার খিলজির সৈন্যরা অগ্নিসংযোগ করে, জ্বলন্ত সে পড়ে তারা মারা যায়, আপনিই তার হেতু, সেই কর্মফল আপনি ভাবে ভোগ করেন।

সৌরীন শোনে, কিছু বলতে যায়, কিন্তু বলতে পারে না। কেমন । আচ্ছন্ন ভাব ধীরে ধীরে তাকে অশক্ত করে তুলতে থাকে।

ভদ্রলোক বলতে থাকে—এই ভাবে জন্ম জন্মান্তর ধরে আজ অবধি পনি নানাভাবে সেই এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন। জন্মে আমার সঙ্গে আপনার বোঝাপড়া হবার কথা, এখানে আপনার গে আমার দেখা হবে জানি, তাই এখানে দিনের পর দিন আমি পনার জন্য অপেক্ষা করে আছি। আপনাকে দেখেই আমি চিনেছি। ই জীবনে আপনার চেহারা যেমন ছিল, এ জীবনেও ঠিক তেমনই ছে। আপনার জন্যই সে জীবনে এই মন্দিরের মধ্যে আমি পাঠানদের তে নিহত হয়েছিলাম, এবার সেই ঋণ শোধ করার সময়। আপনি তো মনে করছেন, এ সব বুজরুকি, কিন্তু তা নয়, আমি জাতিস্মর. মার সব কথা স্মরণে আছে। আপনার জন্য আমি সেনার প্রাণ রিয়েছিলাম, সেজন্য এবার আপনার গুরুতর ক্ষতি করাই আমার পক্ষে চত, কিন্তু আমি আপনাকে ক্ষমা করবো। আমি ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত মূল্য পেলে, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করবো না।

সৌরীন কি যেন বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভদ্রলোকের চোখের র দৃষ্টি পড়তেই সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। চোখ দুটি যেন ক ধক করে জ্বলছে।

সৌরীন ঢলে পড়লো। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পথের পাশে সেই হতলায় সৌরীনকে শুইয়ে দিলে।

রাত্রে কয়েকজন যুবক বায়োস্কোপ দেখে ফিরছিল। পথের উপর ভদ্রলোককে পড়ে থাকতে দেখে তারা প্রাথমিক শুশ্রূষা করে রীনের চেতনা সম্পাদন করলো। সব কথা মনে পড়তে সৌরীনের ক মিনিট সময় লাগলো। তখন সে দেখলো, জামার সোনার বোতাম ই, হাতঘড়ি নেই, মনিব্যাগ নেই, পকেট থেকে হোটেলের ঘরের বটাও উধাও হয়ে গেছে।

যুবকেরা সৌরীনকে হোটেলে পেঁৗছে দিয়ে গেল। সৌরীন উপরে য় দেখে তার ঘরের তালা খোলা। সুটকেশের ভিতর থেকে টাকা-সা ও ক্যামেরাটি উধাও হয়ে গেছে। সৌরীন তখনই হোটেলের নেজারকে নিয়ে ছুটলো থানায়। দারোগাবাবু শুনে বললেন—

জুয়াচোর, আপনাকে সম্মোহিত করে সব নিয়ে গেছে। যদি উদ্ধার করতে পারি, আপনাকে জানাব, কলকাতার ঠিকানা রেখে যান।

দারোগা বাবুতো এক কথায় সব মিটিয়ে দিলেন। হোটেলের মালিকের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তবে সৌরীন কলকাতায় ফিরতে পারে। সেই থেকে সৌরীন একা আর কোথাও যায় না, বলে—দেশ ভ্রমণে আমার সখ আছে, কিন্তু একা গিয়ে জন্মান্তর দর্শনে আমার আর ইচ্ছে নেই।

(সকালে)

"আজ যদি 'কথামালা' পারো শেষ করতে—
কাল থেকে পাবে। যদি 'বোধোদয়' ধরতে;
মন দিয়ে শোনো টুসি—
হবো আমি কি যে খুশি!
আনবো কাঠের ঘোড়া—পারে তায় চড়তে!—"

এই বলে ছোটমামা মুখে দিয়ে দুটো পান—
মিঠে মিঠে হেসে তিনি আপিসেতে চলে যান।

(সন্ধ্যায়)

"এইবারে বলো টুসি, শেষ হলো বই কি?
মুখ দিয়ে ছোটে তব বানানের খই কি?
বাঘের সে কাহিনীটা
লেগেছে কি ভারি মিঠা—?
গিলেছ কি সব পাতা—করে চিঁড়ে দই কি?"

এই বলে ছোটমামা মুখে দিয়ে সাঁচি পান—
আদরেতে হেসে তিনি টুসির পানেতে চান।

"চেয়ে দেখো ছোট মামা, বই শেষ বিলকুল,
কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি বাকী নেই একচুল।
শেষ করে 'কথামালা'—
শুরু 'বোধোদয়' পালা—
করছি সাবাড়! তুমি ঘোড়া দাও দিলখুলে!"

কথা শুনে গলা দিয়ে গলে নাতো সাঁচি পান—
ছানাবড়া ছোটমামা—কেসে কেসে খাবি খান!

টুটুল বড়লোকের আদুরে ছেলে, তাই তার মনে বড় অহঙ্কার। গরীবদের সে মানুষ বলেই গণ্য করে না, তাদের মধ্যেও যে কোনো সদ্‌গুণ থাকতে পারে, এ কথা সে বিশ্বাস করে না।

স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে সে পড়ে। সহপাঠীদের মধ্যে যারা গরীব তাদের সে সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখে, ঘৃণা করে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে। বাবুয়ানা করতেই তার সময় কেটে যায়, লেখাপড়ার দিকে তার বেশী লক্ষ্য নেই। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পায় না বলে পক্ষপাতিত্বের অপবাদে প্রকাশ্যে সে শিক্ষকদের কটূক্তি করে। সেদিন গাড়ীটা খারাপ হ'য়ে গেছে, তাই সে স্কুলে চলেছে হেঁটে। খাতা বই নিয়ে সঙ্গে চলেছে ভৃত্য জয়রাম। পথে ভিখারীদের ছোট্ট একটি মেয়ে হাত পেতে একটা পয়সা চায়, সে নাকি কাল থেকে কিছু খায় নি। তার রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, কাপড়খানা ছেঁড়া আর ময়লা। মুখখানার দিকে চাইলেই মায়া হয়। 'টিফিনের পয়সা থেকে দাও না দুটো পয়সা' মেয়েটা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। রুক্ষস্বরে ধমক দিয়ে মেয়েটিকে সরে যেতে বলে টুটুল।

টুটুলের বয়সীই হবে পল্টু, টুটুলের সঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসেই পড়ে। গরীবের ছেলে, তাই সব সময় বই কিনতে পারে না, এর ওর কাছে চেয়ে চিন্তে পড়ে। পরীক্ষায় বরাবর সে প্রথম হয়। তার স্বভাবে ছাত্র টীচার সকলেই তাকে ভালোবাসে, আর সেইজন্যই টুটুল তাকে দুচোখে দেখতে পারে না। স্কুলে তার কোনো জিনিষ হারালেই সে গরীব পল্টুকেই সন্দেহ করে। বাঁক ঘুরে পল্টু সেখানে এসে পড়ে আর মেয়েটীর কথা শুনে ছেঁড়া পকেট থেকে দুটো পয়সা বের ক'রে তার হাতে দেয়। মেয়েটীর ম্লানমুখ হেসে ওঠে। দরিদ্রের এই বদান্যতা টুটুলের সহ্য হয় না। বলে, "এত বড়লোক তুই কবে থেকে হলি পল্টু,—খুব তো দান খয়রাত করছিস্ ! রোজ দেখি টিফিন না খেয়ে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াস্।" লজ্জিত হ'য়ে পল্টু বলে, "দান কোথায় দেখ্‌লি", "মার শরীর খারাপ, রান্না হয় নি এখনো, তাই কিছু খাবার জন্য মা দুটো পয়সা দিয়েছিলেন। একবেলা না খেলে কি হবে, বিকেলে বাড়ী গিয়ে খেলেই চলবে।" তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায় পল্টু।

ওরা এগিয়ে যায়। পথের একধার থেকে একজন অন্ধ ভিখারী মিনতি ক'রে বলে, "কে তোমরা যাচ্ছো বাবা, একটু দাঁড়িয়ে দুটো কথা শোনো না।"

বিরক্ত হ'য়ে টুটুল বলে, "আবার ঐ অন্ধটা ভিক্ষে চাইছে। নাঃ—এ ছোটলোকগুলোর জন্য পথ চলাই দায় হয়েছে।" অন্ধ বলে "না বাবু, ভিক্ষে চাই নি, আমি অন্ধ, চোখে দেখতে পাইনে, কিন্তু কানে শুনতে পাই তো। ওই ওদিক থেকে একজন লোক বড় কাৎরাচ্ছে, ও নাকি ক'দিন থেকে খায় নি। আমি ভিক্ষে করে ক'টা পয়সা পেয়েছি, ও বেচারা কিচ্ছু পায় নি। আমার পয়সা কটা নিয়ে কিছু কিনে খেতে বলছি ওকে, তা' বাবু ও খোঁড়া, চলতে পারে না। আমি অন্ধ ও খোঁড়া, কিছু কিনে আনবার ক্ষমতা কারো নেই। নাও না বাবু পয়সা ক'টা কিছু কিনে এনে খোঁড়াটাকে দাও—খেয়ে বাঁচুক।"

পয়সা ক'টা সে এগিয়ে ধরে।

আমড়াগাছির কামরাঙ্গায় কামড় দিয়ে শক্ত
দাঁত টকিয়ে দে'তো হাসেন প্রভুদয়াল ভক্ত;
হাসেন বটে, কাসেন কিছু, ভাসেন নানা দ্বন্দ্বে,
মস্ত এ যে বিপদ এসে চাপলো শেষে স্কন্ধে!
একটা কিছু মুখে নিলেই শির্‌শিরিয়ে দন্ত
দাঁতকপাটি লেগে কখন জীবন যে হয় অন্ত।
ক্ষুধায় কাতর পাকস্থলীর জ্বালাও নেহাৎ কম কি?
মাঝে মাঝেই প্রভুদয়াল ওঠেন দিয়ে হুম্‌কি।
বান্দা গিয়ে ফলাও করে খবর দিল ডক্তার;
লক্ষ্য ক'রে ডিগ্রী সাতেক বৃদ্ধি পেলো রাগ তাঁর।
তাই ব'লে কি উপায় কিছু থাক্‌লো কোথাও সত্যি?
হাসপাতালে প্রভুদয়াল হ'লেন গিয়ে ভর্তি।
কামড়ে কিছু খাবার সাধ্য নাই যেখানে দন্তে,
গামলা ভরা সাগুর মণ্ড প'ড়লো তখন কণ্ঠে।
এক মিনিটে পাকস্থলী উঠলো ফুলে ধুম্‌সে,
গিন্নী ব'সে ভাবেন ঘরে—বাঁচবে তো তার মিন্‌সে?
ডাক্তারী-ফি দিয়েও তবু পান না রেহাই ভক্ত,
হাসপাতালের ব্যবস্থাটা নেহাৎ ভারী শক্ত।
দাঁতগুলো তাঁর উপড়ে ফেলে ব'লে দিলেন সার্জেন:
আবার কোনো বিঘ্ন এলেই সটান এসে ভিড়বেন।
মোষের মতো স্বাস্থ্যখানা শুকিয়ে হ'লো চিংড়ি,
গিন্নী বুঝি দেখতে পেয়েই হঠাৎ যাবেন ভিমরি।
ফোক্‌লা দাঁতে ভক্ত কিছু ব'লতে গিয়ে স্তব্ধ,
শেষকালে হায় কামরাঙ্গাই ক'রলো তাঁকে জব্দ।

জয়রাম বলে: "একটু দাঁড়াও খোকাবাবু, এইতো সামনেই মুড়ি দোকান—"

ধমক দিয়ে টুটুল বলে, "থাক্, থাক্—যতসব লোকের আর দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর হ'য়ে উঠতে হবে না। ছোটলোকগুলোর জন্য আমার স্কুলে লেট্ হ'য়ে যাক্ আর কি—!"

মাথায় প্রকাণ্ড একটা বোঝা নিয়ে পথে আরেকটা লোক এদের ডাকে, "কে তোমরা পথ হাঁটছ গো, পথের ঐ ভাঙ্গা শিশিটা তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেও না। এতবড় বোঝাটা মাথায় নিয়ে আমি পারছিনে—।" তার সারা গা দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়ে।

টুটুল বলে: পথে ভাঙ্গা শিশি পড়ে আছে, তাতে তোমার অত মাথাব্যথা কেন বাপু? আমরা কি তোমার হুকুমের চাকর?"

জিভ্ কেটে সে বলে ছি ছি খোকাবাবু, একি কথা? আমি কি কাউকে হুকুম করবার যোগ্য? সকলেই তো তোমার মত জুতো পরে চলে না বাবু, গাড়ী ঘোড়াতেই বা চড়ে ক'টা লোকে? ঐ ভাঙ্গা কাঁচ পায়ে বিঁধলে বড় কষ্ট পাবে তারা। সকলের চোখে তো পড়ে না আমার চোখে যখন পড়েছে তখন আমার উচিত ওটাকে সরিয়ে ফেলে দেওয়া, বোঝাটা না নামালে তো আমি পারব না, তাই তোমাদের বলছি—

স্কুলে সারাদিন অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকে টুটুল, যাদের সে ছোটলোক বলে দূরে সরিয়ে রাখে, ভিখিরী ব'লে ঘৃণা করে, সত্যি কি তারা ছোটলোক? সত্যি কি তারা ঘৃণার পাত্র?

(১) দে
ফটো প্রীতি সে
(৭) অভিজ্ঞ
(রাত ১০টা

রাজা-বাগান!

সারি সারি হরেক রকমের গাছ। ছোট বড় নানা শ্রেণীর নানা ফল-লের গাছে বাগানটিকে মনে হয় যেন তারা আপনা আপনি সেজে বসে াছে। বাগানটাকে বলা যায়—যেন গাছেদের কলোনী। তাই ওর নাম জা-বাগান'। বুড়ো ঝাঁকড়া মাথা বটগাছ—বড় বড় ঝালর দুলিয়ে ন্য গাছেদের শাসনে রাখে—যেন একটা বড় পরিবারের প্রবীণ কর্তা। ঝারি ও ছোট বড় গাছ সবাই বুড়ো বটকে মেনে চলে। গাছের লোনীর যেন ঠাকুর্দা।

বেশ সুখেই সব দিন কাটে। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব, হাসি-নন্দে দিন যায়। নানা রংএর নানা জাতের পাখীরা আসে—ফুলের ু খায়—ফল খায়—গল্প করে—কেউ কেউ কিছুদিনের জন্য বাসা ধে, ডিম হয়, বাচ্চা ফোটে—তারা বড় হলে উড়ে যায়। মা-বাবার সাও ভেঙে যায়।

কেবল বুড়ো বটের ঝাঁকড়া ডালে যে পাখী কর্তা-গিন্নি বাসা রেছিল, তারা বহুকাল ধরে আছে। বুড়ো বট বলে : কোথায় যাবে, মারও বয়স হয়েছে, তোমরাই বা আর কদিন বাঁচবে, যে কদিন কো—এখানেই থাকো—তবুও দুটো সুখ-দুঃখের কথা কয়ে বাঁচি।

পাখী-গিন্নি বটকে ভালবাসে বইকি—উড়ে উড়ে সারা গাছে ঘুরে চর হলদে হয়ে যাওয়া শুকনো পাতা, শুকিয়ে যাওয়া ফল সব ঝরিয়ে য়, পরিষ্কার হয়ে যায় গাছ, আবার ঝড়ে তাদের বাসা ভাঙলে বট লে : নাও না ভাই আমার দু' একটা সরু শুকনো ডাল, ভেঙে বাসা বো। এইভাবে চলে তাদের জীবনযাত্রা।

ছোট ছোট চারা গাছ বড় হয়,—সবুজ সতেজ চেহারা, আবার ন যেতে যেতে তারাও ম্লান-মলিন হয়ে আসে। বড় গাছরা ছোটদের খে—প্রচণ্ড ঝড়ে, অবিরাম বৃষ্টিতে কিম্বা শীতকালে যখন বরফ পড়ে, খন বড়রাই আড়াল করে ছোটদের,—নইলে কি আর তারা বেঁচে কতে পারতো!

একদিন হঠাৎ সাড়া পড়ে গেল—এই বাগানে নাকি নতুন কে সছে—অর্থাৎ অনেক লোকজন এসে এই বিরাট বাগান দেখে গেছে র বলাবলি করে গেছে—ঐ প্রকাণ্ড গাছটা আর কোথায় রাখে—এই গানে পাঠিয়ে দিই।

বুড়ো বট নিজে শুনেছে—তারপর এক এক করে সকলকে ডেকে লছে—নতুন একজন আসছে ভিন দেশ থেকে, এখানে সে থাকবে।

কারুর রাগ, কারুর ঔৎসুক্য, ছোট ছোট গাছেদের উৎসাহ লেগে ছে—রোজই একই পুরোনো মুখ দেখে দেখে একঘেয়ে হয়ে গেছে, বার নতুন কাউকে দেখা যাবে—মন্দ কি! রোজই তারা মা-বাবাদের জ্ঞাসা করে : কর যে আসার কথা ছিল—কই এল না তো? আসবে সবে—শুনেছই তো আসছে—মা-বাবা বলে তাদের।

তারপর দিন গিয়ে গিয়ে যখন সবার প্রতীক্ষা ও কৌতূহল কমে লো—তখন একদিন সব গাছেরা সবিস্ময়ে দেখলো—একটা ঠেলাগাড়ী র মস্ত এক ঝাঁকড়া মাথা গাছকে নিয়ে মানুষেরা বাগানে ঢুকছে। হিস্ হিস্ হিস্—সাড়া পড়ে গেল গাছেদের মধ্যে।

—নতুন যার আসবার কথা ছিল সে এসেছে—ফিস-ফাস করে ছোট ট চারাগুলো কচি ডাল হেলিয়ে এ ওর কানে কানে বলাবলি করতে গলো।

বড়রা ধমক দিল : চুপ করো না সব—দেখ কি হয়। খিল খিল করে কোরাসে হেসে উঠলো মাঝারী গাছগুলো। বড়দের গম্ভীর ভাব আর ছোটদের বকুনী খাওয়া দেখে।

লোকগুলো হেঁইও, হেঁইও করতে করতে মস্ত গাছটাকে ঠেলা-গাড়ী থেকে ফেলে দিল—তারপর কোনও রকমে তাকে দাঁড় করিয়ে পুঁতবার মত করে রেখেই ঠেলা নিয়ে চলে গেল।

অজানা পরিবেশে এসে নতুন গাছটা অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগলো।

বুড়ো বট গম্ভীরভাবে তার ডালা-পালা দুলিয়ে বল্লে : কোন্ দেশ থেকে এলে, বয়স তো বেশ হয়েছে দেখছি। নতুন করে পুঁতলে কি আর গায়ের শক্তি ফিরবে? জায়গা বদলাতে গেলে সময় থাকতে বদলাতে হয়—বয়স হয়ে গেলে কেবল দুঃখ-কষ্ট, তাছাড়া কিছু নয়। এ বুদ্ধি কে দিলে?

নতুন গাছ একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে : বুদ্ধি কে নিচ্ছে, কে-ই বা দিচ্ছে! মানুষেরা কি আমাদের কথা শোনে যে, তাদের কিছু বলবো! পুরোনো হয়ে গেছি তাদের আর হয়তো দরকার নেই—তাই তারা বলাবলি করছিল শুনেছি—ঐটাকে রাজা-বাগানে দিয়ে এসে এখানে নতুন গাছ লাগাও।

—তা বলবে বৈকি তারা! কিন্তু এসবগুলোও তো ভাবা দরকার ছিল।

নতুন গাছ শুকনো মুখে চুপ করে রইল।

দিন কেটে যায়।

নতুন গাছের মনে সুখ নেই। এতদিনের দীর্ঘ জীবন আপন লোকের পরিচিত, বন্ধুলোকের পরিবেশে কেটেছে, এখন তাকে আসতে হয়েছে এক অচেনা-অজানা স্থানে—তাই ভালো লাগবেই বা কি করে। মনের দুঃখে দিন দিন সে শুকিয়ে উঠতে লাগলো—গাছের পাতা ঝরে যেতে লাগলো, যে পাতাগুলো সবুজ ছিল সেগুলোও ক্রমশঃ হলদে বিবর্ণ হয়ে এলো।

সবাই বলাবলি করতে লাগলো—ওর হয়ে এসেছে, আর বেশীদিন নয়।

এতদিন এ বাগানে এসেও নতুন গাছের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি তেমন—মনের দুঃখে নিয়ে সে থাকে, তাছাড়া নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে তার আর কিছুই ভালো লাগে না।

রাতের অন্ধকারে আকাশের মিট্‌মিট্ তারার আলোর নীচে গাছেদের সভা বসে, গল্প হয়—মাঝে মাঝে উৎসবও হয়। উৎসবে যোগ দিতে পারে না কেবল নতুন গাছ।

বুড়ো বট এক একবার ডাকে : কই এসো না গো নতুন গাছ, একা মুখ বুজে থেকে কি হবে?

কাছে গেলেও উৎসাহ পায় না সে। ছোট ছোট দুষ্টু গাছগুলো হেসে লুটোপুটি খায়। এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে আর বলে :—কি বিচ্ছিরী দেখতে ভাই!

অহঙ্কারভরে তার দিকে তাকায়—যে সব গাছ সবুজ সতেজ ফল ফুল, পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন দেখা গেল—অচেনা মস্ত একটা লালরঙের পাখী নতুন বিবর্ণ গাছটার উপর এসে বসেছে। গাছের পাতা তখন সব ঝরে গেছে, শীতের হাওয়া সোঁ সোঁ করে বইছে, তার দাপটে সেজে-গুজে বসে থাকবার মত ধৈর্য ও সাহস কারুর নেই।
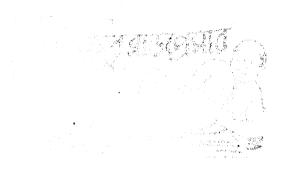
দাদু ত' তোমাদের অনেকেরই আছেন, আর অনেক দাদুর মজার মজার গল্পও তোমরা শুনেছ, কিন্তু আজ আমাদের এক দাদুর এমন একটি মজার গল্প তোমাদের বলব যা হয়তো তোমরা কখনো শোননি। আসলে আমাদের এই দাদু ছিলেন ব্লাডপ্রেসারের রুগী। বয়েস অনেক হলেও, দাদুর এই রোগের লক্ষণ স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিশেষ কিছুই প্রকাশ পায়নি। এই ব্লাডপ্রেসারের ব্যাপারটা দাদুর প্রায়ই ধরা পড়ত' খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ দাদুর ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে শুনলেই আমরা বুঝতুম খাওয়া-দাওয়ার একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। আর এই ব্লাডপ্রেসার বাড়া মানেই বাড়ীশুদ্ধ লোকের উপর প্রেসার। আমরা সকলেই ভয় পেয়ে যেতুম। কিন্তু দিদিমা এ ব্যাপারে একদমই দমতেন না—আমাদের ব্লাড জল হবার উপক্রম হলেও, দিদিমার ব্লাড যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠত। তিনি সে সময়ও বকাবকি করতেন দাদুর সঙ্গে।

একদিন একটা ঘটনা নিয়ে তুমুল কান্ড বেধে গেল। সেটা ঠিক জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন্ তারিখ মনে নেই, ক'দিন আগে জামাইষষ্ঠী চুকে গেছে, তিন-চারজন জামাইবাবু বাইরে থেকে এসে দিদিদের নিয়ে ক'দিন মহাসমারোহে কাটিয়ে গেছেন। মাছ-মাংস, আম-কাঁটালের ছড়াছড়ি,—লুচি-মন্ডার গড়াগড়ি হয়ে গেছে ক'দিন ধরে। বহুদিন পরে বোনে-বোনে সব দেখা, আমোদ-আহ্লাদের আর অন্ত ছিল না। চুণার থেকে আসতে পারেনি শুধু চিনিদি। একদিক থেকে না এসে ভালই করেছিলেন, লোকও আর ধরত'না বাড়ীতে। তা-ছাড়া চিনিদির ছেলে-মেয়েও অনেকগুলি। যাই হোক্ কয়েকদিন হৈ-হল্লা ও খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা থেকে দাদুকে নিস্তার দিয়ে দিদি, জামাইবাবু ও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা

লাল পাখীটা কিচমিচ করে গাছটার সঙ্গে কি কথা বল্লে অনেক-ক্ষণ ধরে—তারপর উড়ে চলে গেল—আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

বুড়ো বট জিজ্ঞাসা করলে : ও কে গো তোমার কাছে এসেছিল?

—আমাদের দেশের পাখী, তা-ছাড়া আমার বন্ধু।

—ওঃ তাই এত খবরদারী করছিল—বেশ! বেশ!

শুকনো, পাতাঝরা, রুক্ষ-কঠিন চেহারা নিয়ে নতুন গাছটা একলাই রাজা-বাগানে বাস করতে লাগলো।

বসন্ত এসেছে। শীতের রুক্ষ-কঠিন চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে। সবুজের ঝলমলে চেহারা চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। গাছে গাছে নতুন সবুজ কচি পাতা, ফুল-ফলে ভরে উঠেছে সর্বাদক। পাখীরা এসে গাছেদের সঙ্গে গল্প করে, গান গায়—মনের খুশীতে এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়ায়—চারিদিকে কেবল খুশী ও আনন্দ উচ্ছ্বাস।

রাজা-বাগানের ছোট বড় মাঝারী সব গাছ একদিন সবিস্ময়ে দেখলো, নতুন-আসা গাছটার রূপে চারিদিকে ঝলমল করছে। সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে, সতেজ ডালগুলি দুলিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে—আর গাছের ভিতরে একটা মস্ত মোটা ডালে কাঠি দিয়ে বোনা এক পাখীর বাসা—তার মধ্যে এক বড় লাল পাখী সপরিবারে বাস করছে। রোজ রাতে চাঁদের আলোয় পাখীটা বেরিয়ে এসে মিষ্টি সুরে গান করে আর নতুন গাছ তাই স্থির নির্বাক হয়ে শোনে। মনে হয় তার বন্ধুর জন্যই সে প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে।

সবাই চলে গেলেন। হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলেন দাদু। বাড়ী খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজের টেম্পারেচার ও ব্লাডপ্রেসার যেন তাঁর নেমে গেল ফ্রিজিং পয়েন্টে। দু'একদিন দিদিমার সঙ্গে এইসব নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি ও যে তাঁর না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা বেশীদূরে গড়ায়নি। এ ব্যাপারে দাদু যে খুবই সংযম দেখিয়েছিলেন, তাতে আর সন্দেহ ছিল না। দিদিমা কিন্তু মনে-মনে বেশ চটেছিলেন দাদুর উপর। তাই নাতি-নাতনি আর নাত-জামাইরা ছেলেপুলে নিয়ে চলে যেতেই দিদিমা আর থাকতে না পেরে দাদুকে গিয়ে বলে বসলেন, "নাও, এখন নিশ্চিন্ত হয়েছ ত'—তুমি থাকতে কেউ যেন এ বাড়ীতে পা আর না দেয়। কি স্বার্থপর লোকরে বাবা!"

এতবড় কথাটা দাদু মোটেই গায়ে মাখলেন না, হেসেই উত্তর দিলেন, "তুমি থাকতে সেটিত হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

এমনি একচোট বেশ হয়ে গেল পরদিন সকালের দিকেই। তারপর দাদু যথারীতি বাজারে গেলেন চাকরকে নিয়ে। নিশ্চিন্তে নিজের পছন্দ-মত যা-যা ভালবাসেন এটা ওটা সব বাজার করে ফিরলেন। নাত-জামাইদের জ্বালায় ক'দিন মাছের মুড়ো পাতে পড়েনি বলে, একটা সের দেড়েক আস্ত কালবোস মাছ কিনে আনলেন বাড়ীতে।

কিন্তু এত গুছিয়ে-গাছিয়ে বাজার করে এনে বাড়ী ঢুকেই দাদুর চোখ কপালে উঠে গেল। দেখেন, চুণার থেকে চিনিদি এসে উপস্থিত। জামাইষষ্ঠীর পর জামাইবাবু ছুটি পান অফিসে, তাই ক'দিন পরেই এসেছেন এখানে একটু ঘুরে যাবার জন্যে। বাড়ীশুদ্ধ সবাই দিদি-জামাইবাবুকে নিয়ে খুসী হয়ে উঠল বটে, কিন্তু দাদুর মেজাজ একেবারে হয়ে গেল অন্য রকম। এইমাত্র ক'দিনের অশান্তিকর পরিস্থিতি কাটিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হবেন মনে করছিলেন, কিন্তু তা আর হ'লনা!

বাইরে সকলের সঙ্গে হেসে গল্প-গাছি করলেও, ভেতরে ভেতরে দাদু যে রেগে টঙ্ হয়ে গিয়েছিলেন, তা সক্রোধে প্রকাশ পেল খাবার সময়। খেতে বসে মাছের ঝোলের বাটিতে কালবোসের মুড়ো না দেখতে পেয়ে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন তিনি। চীৎকার করে ঠাকুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গেল আমার মাছের মুড়ো?" ঠাকুর আমতা-আমতা করে বল্লেন, "মা জামাইবাবুকে দিতে বলেছিলেন, তাই তাঁকে দিয়েছি।" আর যায় কোথা! এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দাদু গলা চিরে চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটিয়ে তাকে গালাগাল দিয়ে বললেন, "বেটারছেলে পাজী নচ্ছার—এই বাড়ীর কর্তা কে? মা, না আমি? পই পই করে বলে গেলুম, মুড়োটায় একটু মাছ রেখে কাটিস, ভালো করে ভেজে তবে ঝোলে দিস্, ব্যাটা বদমাস তবুও মাথায় ঢুকলো না!...... বেরো......বেরো আমার বাড়ী থেকে—তোকে মাইনে দেয় কে? মা, না আমি?......আমার সব খেয়ে ভুষ্টিনাশ কচ্ছেন, আর আমাকে দিনা..." দাদু হাঁপিয়ে উঠলেন।

দিদিমা, মা, চিনিদি ও আমরা সকলেই ছুটে গেলুম। দাদু তখন খাবার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। মুড়োবিহীন মাছ খাওয়ার মানেই হয়না। দিদিমা কি বলতে গেলেন, কিন্তু দাদুর ব্লাডপ্রেসার বাড়ার এই চরম মুহূর্তে। খাবার ব্যাপার নিয়ে রাগ হলে আর দেখতে হয় না। দিদিমা যা বলতে যাচ্ছিলেন তা আর বলা হ'ল না; দাদু থালা ছেড়ে যেমন দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, তেমনি আবার থালার কাছেই ধপাস করে বসে পড়লেন। সকলে ধরাধরি করে দাদুকে শোবার ঘরে এনে শুইয়ে দিলে। ভাগ্যিস এই সময় জামাইবাবু বাড়ী ছিলেন না তাই রক্ষে, তা না হলে কি কেলেঙ্কারীটাই না হ'ত!

এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু ঠিক করলেন, এ বাড়ীতে তিনি আর থাকবেন না, কালই কাশী চলে যাবেন। প্রয়োজনমত যা-যা সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তখুনি সব গুছিয়ে ফেললেন। দিদিমা এসব দেখেও যেন কিছু দেখেননি এমন ভাব করে রইলেন, কিছুই বললেন না দাদুকে। রাত্রে যথাযথ আধ সেরটাক দুধ আর গোটা চারেক তালশাঁস সন্দেশ খাবার পর মেজাজটা

ঠান্ডা হ'ল বটে, কিন্তু পরের দিন কাশী যাবার ব্যাপারটা ঠিকই

রাত্রে আমি ও আমার ছোটভাই কমলদু দাদুর পা টিপতে টিপতে , "দাদু আমরাও আপনার সঙ্গে কাশী যাব, সেখানে গিয়ে র সেবা করব।" দাদু প্রথমটা রাজী হননি বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলেন। বললেন, "আর কারুকে বলিসনি তা'হলে, চুপি চুপি পড়বি আমার সঙ্গে।"

পরের দিন সকালেই দিদিমার সঙ্গে আবার একচোট হয়ে গেল। রেগে বললেন, "দেখ না, এত রাগারাগিতে ব্লাডপ্রেসার বাড়ে না, ড় পয়সা খরচা হলে আর খাওয়ার ব্যাপারে পান থেকে চুণ।" দাদুও রেগে বললেন, "হ্যাঁ, আমি সর্বস্ব ও'দের গেলাই, হাতে দানছত্তর করুন, আর আমার বেলা হরিমটর।"

রাগের মাত্রাটা পাছে আরো চড়ে গিয়ে ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়, চিনি-জামাইবাবু তাড়াতাড়ি এসে দাদুকে ধরে ঘরে নিয়ে। বললেন, "আপনি একে ব্লাডপ্রেসারের রুগী, কেন মিছিমিছি গ করেন দাদু।"

দিদিমা বললেন, "ও কিছু নয়, এখনি চাকরকে নিয়ে বাজার ও, আনাজ-কোনাজ কিচ্ছু নেই।"

জামাইবাবু বললেন, "না-না, ও'কে আর এই বকাবকির পর যেতে হবেনা, আমি আজ বাজারে যাব—আপনি বিশ্রাম করুন

বাজার যাবার মুখে চিনিদি চুপি চুপি কি একটা বলে দিলেন বাবুকে।

সেদিন খেতে বসেই দাদুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবচেয়ে বড় পায় সের চারেক একটা রুই মাছের মুড়ো সমেত ঝোল দিয়ে কুর। অনেকক্ষণ লাগল দাদুর সেটাকে বাগিয়ে খেতে। খাওয়া- র পর দাদুর মুখের চেহারা গেল বদলে। খুশি খুশি মুখে পান ঘরে গিয়ে তাকিয়া হেলান দিলেন দাদু। শুয়ে শুয়ে আলবোলায় খেতে লাগলেন। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরম্ভ হল ধ্বনি। কাশী যাবার কথা নেই, টিকিট কাটবারই বা কোথায় কি! সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় ঘুম ভাঙল দাদুর। ঘুম থেকে উঠেই মোট ঘাট যা কিছু গুছিয়েছিলেন সব খুলে আবার যথাস্থানে দলেন। আমরা কাশী যাবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলুম, দাদুর এই দেখে নিরুৎসাহ হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কই দাদু, কাশী যাওয়া ?"

দের কাছে মুখ নিয়ে এসে দাদু চুপি চুপি বললেন, "আরে দিদিমাকে ভয় দেখাচ্ছিলুম, সত্যি কি আর কাশী যেতুম!"

শিল্পী—মিণ্টু লাহিড়ী

বিয়ের পদ্য

রেবতীভূষণ ঘোষ

বনবেড়ালের বিয়ে
গোমড়ামুখো বর চলেছে আমড়াতলা দিয়ে।
সঙ্গে বাজে বাঁশী
রামশিঙে ঢোল-কাঁসি
রামছাগলের গলায় ঝোলে পেল্লায় এক ঢোলক।

কাঠবেরালি পুরুত
পাওনা নিয়ে মন খুঁৎ খুঁৎ, পালিয়ে গেল সুড়ুৎ।
খড়ম দিয়ে পায়,
উড়নি চাদর গায়
খ্যাঁকশিয়ালে বিয়ে দিলে আউড়ে জংলি শোলোক।

কনে গুণে লক্ষী
রূপের নেইকো তুলনা তার যেন পেচক-পক্ষী।
কানে দোলে পাশা
গলাতে হার খাসা
নাকেতে তার কিবা বাহার দুলছে দেখি নোলক।

চোখের ছবি আঁকা
(কয়েকরকম)

প্রথমে দুটো কালো গোল আঁকো
গোলের মাঝখানটাতে একটু ফাঁক রাখবে!

এখন ওর ওপরে ও নীচে দুজোড়া বাঁকা লাইন টানো!
লাইনগুলো যেন কোনায় কোনায় এম্নি লাগানো থাকে!
এবার তার ওপরে একজোড়া ভুরু মোটা করে টেনে দাও!
ব্যস্, এই হয়ে গেল চোখ!

চোখের ভাব কত রকম করে আঁকা যায়, দেখবে?
এই দেখ! শুধু দুটো জিনিষ জেনে রাখবে —

চোখের মনির ওপরের ও নীচের লাইন যেখানে যেখানে টানা হবে, তার বাইরে যেন মনি বের হয়ে না থাকে! অর্থাৎ, কোনো যায়গায় অর্দ্ধেক মনি দেখা যাবে, আবার কোথাও একেবারেই দেখা যাবেনা!
ভুরুগুলোকেও চোখের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে তেম্নিভাবে বাঁকা করে আঁকতে হবে!

চোখের ভাব আসলে হচ্চে চোখের মনির উপরের ও নীচের লাইনগুলোর খেলা!

রাগ হয়েছে ও রাগ বেড়ে যাচ্চে!

উপরে তাকানো
নীচে তাকানো

ঠাণ্ডা চোখ আরো ঠাণ্ডা হয়ে মেয়েলি হয়ে যাচ্চে

মনোকষ্ট
দুঃখ
কান্না
ইত্যাদি

পাশে তাকানো ও সন্দেহের ভাববৃদ্ধি

ভুরুর মাঝখানের কোনদুটোকে বাঁকা করে তুলে দিলেই সন্দেহ ঘৃণা সব প্রকাশ পাবে

আনন্দ
হাসি
উল্লাস
ইত্যাদি

সুন্দর আর ছোট এক কাঠবেড়ালী পেয়ারা গাছের আগডালে গিয়ে হাজির। কি চমৎকার দেখতে এটা! সাদা আর কালোর ডোরা সর্বাঙ্গে। আর লেজটা তো দেখবার মতো; লম্বা—তার শরীরের চেয়েও, খুব ঝাঁকড়া আর খুব জমকালো।

কাঠবেড়ালীটা এসেই কিড়িক্-কিড়িক্ করে লাফাতে লাফাতে গিয়ে একটা তোতাকে বলছে,—'ও ভায়া, কি হচ্ছে?—লাফালাফি?—আনন্দ?—তা বেশ!' এই বলে ধাঁ করে পাকা একটা পেয়ারা তুলে নিয়ে খেতে লেগে গেল। খাওয়ার ভঙ্গিই বা কি? পেছনের দু পায়ের উপর বসে, জমকালো লম্বা লেজটা পিঠের উপর তুলে দিয়ে, আর সামনের দু হাতে পেয়ারাটা ধরে কুটুর-মুটুর করে খাচ্ছে আর ফেলছে—খাচ্ছে আর ফেলছে!

তোতা বললে গম্ভীর হোয়ে,—'তুই যে এখানে?'

—কেন?—বারে!—

—যা বলছি।

মর কেন শুনি! দেব দেখাবি কামড়ে! এই বলে, কাঠবেড়ালী বিদ্যুৎবেগে লাফ দিলে তোতাকে কামড়াবার জন্যে। তোতা ঝটপট করে লাফিয়ে উঠলো। ঘাড় সোজা করে বুকে দাঁড়ালো। লাল চোখ বার করে বললে,— কাছে ঘেঁসবি তো দেব ঠুকরে।

তারপর ফিরে দেখে কাঠবেড়ালী নেই। ফুড়ুৎ করে কখন যে পালিয়েছে বুঝতেই পারলে না।

পালিয়েছে, কারণ অন্য কাঠবেড়ালীর দল চেঁচামেচি লাগিয়েছে। —ওরে পালা, ওরা ঐ ওদের ওখানে গিয়ে উঠেছি কেন? আয় শিগ্গির।' কাঠবেড়ালীরা অসম্ভব চঞ্চল আর ভীতু। এটার কিন্তু ভয় ডর নেই। কাউকে মানে না। দুষ্টুমির ফন্দিতেই ঘুরে বেড়ায়।

কাঠবেড়ালীরা বলছে,—আয় শিগ্গির। তোকে খুঁজছি কত। চল্ আমাদের সঙ্গে।'

কাঠবেড়ালীর দল ছুট্ মারলে সেখান থেকে। সবাই গিয়ে পৌঁছালো একটা খালের ধারে। তখন একজন বলছে,—'আমরা ক'জন এলুম? গুণে দেখ তো। চোদ্দ জন। বেশ, চল যাই ওপারে।'

—ওপারে? কি করে যাবে?

—তা বুঝি জানিস্ না। কাল ঝড়ে একটা গাছ উপড়ে পড়েছে একেবারে ঠিক খালের উপর, এপার থেকে ওপার। ঠিক যেন একটা সাঁকো হোয়ে গেছে। এ বেশ মজাই হয়েছে। চল্ দেখে আসি, ওপারে গিয়ে।

গুটি-গুটি সাঁকো পেরিয়ে ওপারে পৌঁছালো কাঠবেড়ালীর দল। খালের ঠিক উপরেই প্রকাণ্ড এক নিমগাছ। ডালপালা নিয়ে কি ঝাঁকড়া! কতকালের যে, কে তা বলবে! প্রকাণ্ড মোটা। ওর গোড়ার একটু ওপরে, খুব বড় একটা ফুকর। তাতে আছে কাঠের এক দরজা। এক বুড়ো প্যাঁচা হুতুম, এর ভেতরে থাকে। আর দিনের বেলায় নিম-গাছের গোড়াতে লম্বা দুটো ডানা মেলে চুপ করে পড়ে থাকে। কেউ এলে উঠে বসে পড়ে, গম্ভীর হোয়ে।

কাঠবেড়ালীরা গিয়ে সারবন্দি হয়ে বুড়ো হুতুমের কাছে বসলো। একজন বলছে,—'আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, ঠাকুর্দা। আপনি আমাদের ঠাকুর্দা।'

আর একজন বলছে,—'আপনি আছেন, জানিনে তো! জানলে কিছু আনতেম অবিশ্যি। এবার আনবো নিশ্চয়। আপনার বাগানের ওদিকে অনেক লাল কুল। কিছু নি আমরা?'।

বুড়ো হুতুম্ তার বাঁ চোখের এক কোণ খুলে একটুখানি চাইলে। কাঠবেড়ালীরা এতে কি বুঝলে কে জানে! বললে,—'চল্‌রে চল্। ঠাকুর্দা বলেছেন যেতে।' তখন আনন্দ করতে করতে ছুটলো সবাই কুলগাছের দিকে।

কিন্তু সেই দুষ্টু কাঠবেড়ালীটা গেল না সেখান থেকে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো,—'ঠাকুর্দা, আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দেখে আমার খুব আহ্লাদ। আপনি কত কালের প্রাণী। কত জানেন। এই বলে তার চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো। তারপর বলছে,—'আচ্ছা শুনুন তো আমার এই ছড়াটা। এটার মানে কি?—

হট্টিমা টিম্ টিম্

হট্টিমা টিম্ টিম্

তারা মাঠে পাড়ে ডিম।

তাদের খাড়া দুটো সিং—

তারা হট্টিমা টিম্ টিম্।'

বুড়ো প্যাঁচা হুতুম গম্ভীর। কিছুই বলে না। কাঠবেড়ালীটা তখন সোজা দাঁড়িয়ে বুড়োর পালক ধরে টানতে লাগলো, আর চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলো।

প্যাঁচা কিন্তু গম্ভীর। সে কোন কিছু না বলে, তড়াক্ করে এক লাফ দিয়ে, ফুকরের ভেতর ঢুকে গিয়ে দরজা দিলে বন্ধ করে। কাঠবেড়ালী আর কি করে। সে পালালো সেখান থেকে, আর সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে কুল খেতে লাগলো। কুল খেয়ে ভারি ফুর্তি সকলের। তারপর ফিরে এসে দেখে, দরজা বন্ধ, কেউ নেই বাইরে। একজন বলে উঠলো,—'ওরে পালা চল্, শিগ্গির এখান থেকে। কাউকে দেখ্‌ছি না যে!' ছুটলো সবাই গাছের সাঁকোটার দিকে।

দুষ্টু কাঠবেড়ালীটা যেতে যেতে বলছে,—'বুড়ো হুতুম্ তার ফুকরে গিয়ে সেঁধুলো। আমার ছড়ার জবাব দিলে না তো! কি রকম বুঝলুম না।'

কাঠবেড়ালীর দল আর একদিন এলো কুল খাবার লোভে। এবার অনেক কিছু এনেছে বুড়ো হুতুমের জন্য। পাখীদের বাসা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকগুলো ছোট-ছোট ডিম এনেছে। দুষ্টু কাঠ-বেড়ালী তোতার বাসায় ঢুকে ডিম-ভাঙা একটা বাচ্চা এনেছে চুরি করে। কি ওর ফুর্তি! প্যাঁচা তেমনি গম্ভীর হোয়ে দু-চোখ বুজে চুপটি করে বসে আছে—নড়ন-চড়ন নেই।

কাঠবেড়ালীরা কাছে এগিয়ে গিয়ে ডিমগুলো সব সাজিয়ে রেখে দিলে বুড়োর সামনে। দুষ্টু কাঠবেড়ালী বলছে,—'ঠাকুর্দা, অনেক কষ্ট করে এই এক ভারি মজার দ্রব্য এনেছি আপনার জন্য। চেখে দেখুন এখনি।' বুড়ো হুতুম বাঁ চোখের কোণটা দিয়ে একবার দেখেই আবার গম্ভীর হোয়ে বসে রইলো।

কাঠবেড়ালীরা বলছে,—'যাই আমরা, কুল নিই গিয়ে? কেমন ঠাকুর্দা, যাই?' এই বলে তারা সব চলে গেল। দুষ্টু কাঠবেড়ালী নড়লো না। সে কাছ ঘেঁসে এসে বলছে,—'খেয়ে ফেল না গো, এই মজার দ্রব্যটা। আর আমার সেই ছড়ার জবাব? আজ দেবে তো?

হাট্টিমা টিম্ টিম্

এর কি মানে? অ্যাঃ, এখন বলবে না। আচ্ছা তাহলে আমি এখন কুল খেয়ে আসি। এসে কিন্তু শুনবো।'

সবাই ফিরে এসে দেখলে, বুড়ো প্যাঁচা নেই। সে ফুকরের ভেতর ঢুকে দরজা দিয়েছে বন্ধ করে। ডিমগুলো না পাখীর বাচ্চাটা—কিছুই নেই।

দুষ্টু কাঠবেড়ালীটা খুব চেঁচাতে লাগলো। 'ও ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা—খুলুন দরজা। আসুন বাইরে।—এই দাঁড়া না তোরা একটু। এত তাড়া কিসের। রসো, রসো—ঐ, ঐ আসছে ঠাকুর্দা।'

ঠাকুর্দা ফুড়ুৎ করে লাফিয়ে বাইরে এসেই চোখ বুজে মহা-গম্ভীর হোয়ে বসলো। কাঠবেড়ালীরা সবাই সারবন্দি হোয়ে দাঁড়িয়ে বলছে,—'আমরা তবে আসি ঠাকুর্দা?' চলে গেল সবাই।

দুষ্টু কাঠবেড়ালী এবার তার মুখের কাছে এসে বলছে,—'এবার বলুন ঠাকুর্দা, ছড়ার উত্তরটা।

হাট্টিমা টিম্ টিম্

তারা মাঠে পাড়ে ডিম—

দিন এর জবাব। কি? দেবেন না? একেবারেই না?—'

সে তখন লাফ দিয়ে হুতুমের চওড়া পিঠের উপর চড়ে বসলো। সেখান থেকে আর এক লাফ মেরে ফুড়ুৎ করে ঢুকে গেল হুতুমের ফুকরের ভেতর। ঢুকে দেখলে, [illegible] কিছুই দেখা যায় না। এদিক, ও-দিক ঘুরে ফিরে, আর এক লাফ দিয়ে এসে পড়লো বুড়ো হুতুমের মাথার উপর। আর যায় কোথায়! বুড়ো হুতুম কাঠ-বেড়ালীটাকে ক্যাক্ করে দু পা দিয়ে ধরে ফেললো। সে রেগে গেছে খুব। তারপর তাকে সামনে ফেলে, [illegible] তার নাড়ী টেনে ছিঁড়তে গেল। কাঠবেড়ালী দেখলে, এবার [illegible]। সে তখন ভয়ানক রকমের ছটফট করে, [illegible] দিকে। লাফ মারতে গিয়ে তার লম্বা ঝাঁকড়া লেজটা আটকে রইলো হুতুম প্যাঁচার মুখে। আর বুড়ো কটাস্ করে কামড়ে দু টুকরো করে দিলে লেজটা। কাঠবেড়ালী তার এই কাটা লেজ নিয়েই দৌড় মারলে সেখান থেকে, আর সাঁকোর কাছে গিয়ে হাজির হোল। সেখানে তখন অন্যরা সব জড়ো হয়েছে আর সাঁকোয় চড়বার যোগাড় করছে।

তার কাটা লেজ দেখে সবাই হকচকিয়ে [illegible] তোর লেজটা গেল কোথায়? এ কি ব্যাপার রে? এইটুকু লেগে রয়েছে যে? অ্যাঃ কি তাজ্জব!'

দুষ্টু কাঠবেড়ালীটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আর একটু হোলেই এই বুড়ো ব্যাটা আমায় [illegible] ভাগ্যিস পালিয়ে এসেছি। বুড়ো চোখ চায় না, [illegible] কিন্তু পেটে-পেটে শয়তানী বুদ্ধি। আমি [illegible] এমনি করলে আমার দশা—লেজটাই নিলে [illegible] এই আসছে বুড়ো গুটি গুটি এদিকে। ওই দেখ্‌তো, বুড়ো ভালো নয় মোটেই।'

সত্যই তো বুড়ো হুতুম আসছে হাঁটি হাঁটি করে। মুখে রয়েছে কাঠবেড়ালীর লেজটা।

এরা সব তড়-বড় করে উঠে পড়লো সাঁকোর উপর। বুড়ো এসে পড়লো নদীর ধারে। আসতেই, কোথায় ছিল একটা চিল কাঁ কাঁ করে চেঁচাতে-চেঁচাতে উড়ে এসে পড়লো বুড়োর ঘাড়ের উপর। বুড়ো কি তা ভেবেছে? এখন ঘোর বিপদ। [illegible] আর বুড়োও পালাতে চায় ছুটে দিয়ে। লাগলো দুজনে ঝটাপটি। শেষে বুড়ো কামড়ে ধরলো তার একটা ঠ্যাং, আর চিল ধরলে ধারালো ঠোঁট দিয়ে খুব জোরে তার এক ডানা। তারপর দুজনেই পড়লো গড়িয়ে খালের

মৃগাঙ্ক আজ একখানা আজব বই পড়েছে, তাই খুব মাতব্বরের মত সে গম্ভীরভাবে মলয়কে বললে বাড়িঘরে মানুষ থাকে— বনে জঙ্গলে থাকে পশুপক্ষী। কিন্তু বনবাদাড় যদি কেটেকুটে উজাড় করে ফ্যালে মানুষ, তবে সেখানকার বাসিন্দারা কোথায় যাবে?

মলয় চট্ ক'রে জবাব দিল—বুঝেছি, তাই বুঝি ওরা সব চিড়িয়াখানার খাঁচাতে এসে আস্তা মারে!

—আহা ভারি তো একরত্তি চিড়িয়াখানা তোমাদের, তাই নিয়ে খুব ফটর্-ফটর্ করছ! একখানা জঙ্গলের বাসিন্দেকে জায়গা দিতে হ'লে অমন দশ-বিশখানা কলকাতা শহরই দরকার, পারবে তুমি অত জায়গা দিতে?

মৃগাঙ্ক যে রকম ঠর্-ঠরিয়ে টোক্কর মেরে কথা কইছে তাতে মলয়ের যেন মনে হচ্ছে 'হ-য-ব-র-ল'র শামলাপরা উকীলের মত মহাপালোয়াজ লোক হয়ে পড়েছে মৃগাঙ্কটা। ভাবখানা তার এই রকম, মলয়ই যেন দুনিয়ার বনজঙ্গল সাবাড় করেছে।

অথচ, মলয় মোটেই বনবাদাড়ের কোনো মামলাতেই থাকতে চায় না। চিড়িয়াখানার জানোয়ারগুলোকে দেখে সে খুব মজাই পেয়ে এসেছে, যতবারই গিয়েছে সেখানে ততবারই ভালো লেগেছে। জেব্রা, হরিণ থেকে আরম্ভ করে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার পর্যন্ত কাকেই বা সে অপছন্দ করল! তবে সত্যি কথা বলতে কি, শুয়োর আর গাধাদের খামোখা ওখানে ঠাঁই দেওয়া ঠিক হয়নি। হামেশা ওদের মানবসমাজে দেখা যায় যে।

মৃগাঙ্ক আর এক ধমক মারল [illegible] চুপ করে রয়েছ দাও দশখানা কলকাতা শহর! জানোয়ারগুলোর কাছ থেকে বনজঙ্গল নিয়ে নিয়েছ যেমন।

—সে ত আর এককথায় হয় না!

—কেন হবে না শুনি! ওই যে মশাই, লড়াই-এর সময়ে কত গাছ কেটে বনগুলোকে কোটেল ময়দান বানিয়ে দিয়েছিলে, তখন কি বনের জানোয়ারদের অবসর দিয়েছিলে পালাবার? না, দেওয়ালীর মত হরদম বন্দুকবাজি করে তাদের জানপ্রাণ উড়িয়ে দিয়ে মহা হৈচৈ করে বাহাদুরী করেছ!

মধ্যে একেবারে জলে। সেখানে বসেছিল এক বিপুল কচ্ছপ। সে গাঁক করে ধরলে ওদের দুটোকেই। ধরে ছাড়বার নামটি নেই। তিন মূর্তিতে চললো যুদ্ধ।

ও-দিকে কাঠবেড়ালীর দল ছুট মেরেছে সাঁকোর উপর দিয়ে এ পারে পৌঁছে তারা মজা করে দেখতে লাগলো এদের মজার যুদ্ধ আর সেই দুষ্টু কাঠবেড়ালীটা, তার কাটা লেজ নিয়ে, গান ধরে দিলে—

ওরে—
লাফ দিল ব্যাংটা
ভেঙে গেল ঠ্যাংটা,
ঠ্যাং ভেঙে কান্না
কি ঘেন্না! কি ঘেন্না!

মৃগাঙ্কর কথাগুলো বেজায় কড়া মনে হ'চ্ছে মলয়ের। সে একটু ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল—আমি তখন তিন, চার বছরের ছেলে, তুমিও তার চেয়ে বড় ছিলে না— সে সব ব্যাপার আমাদের হুদ্দোর বাইরে যে! এবার মৃগাঙ্ক হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—তাতে কি হয়েছে। তুমি ত মানুষ, আর এই মানুষ জাতই পশুদের মেরে-ধরে যা-নয়-তাই করেছে, এখনও করছে, কি জানি পরেও যদি পশুরা টিকে থাকে ত মরবে! আমি সেই পশুদের হয়েই আজ লড়াই করতে চাই তোমার সঙ্গে, মানে মানুষের সঙ্গে।

মলয় ঘাবড়ে গেল। সে বল্‌লে—না ভাই, আমি চাইনে ঝগড়া করতে! তুমি আবার ছোট্‌দার কাছে নালিশ দেবে, তখন মার খেয়ে মরি আর কি। ছোট্‌দা মোটে মুখে কথা কয় না, সোজাসুজি কান ধ'রে বসে।

মৃগাঙ্ক নাক সিঁট্‌কে বল্‌ল—তোর ছোট্‌দাকে আমি ঘৃণা করি। পাষণ্ড!

এ কথায় মলয়ের চোখ ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেল, মুখখানা ত শুকিয়ে এতটুকু! ও বল্‌লে চাপা গলায়—আমিও ঘেন্না করি, কিন্তু কেন বল্ তো!

মৃগাঙ্ক বল্‌ল—তোর ছোট্‌দার ছর্‌রা বন্দুক আছে, সেই বন্দুক দিয়ে পাষণ্ডটা পাখি মারে। আচ্ছা বল্‌তো পাখিরা কোনো দোষ করেছে?

মলয় এবার প্রবলবেগে মাথা নাড়ল—ধ্যাৎ, ছোট্‌দার মোট্টে টিপ নেই, আসলে ও সেই বেদেদের বাড়ি থেকে কিনে আনে পাখি! বন্দুকটা হচ্ছে একেবারে লোক দ্যাখানো ব্যাপার!

মৃগাঙ্ক ধমকে উঠ্‌ল—সে ত আরও ভয়ংকর কথা। জানিস, এখনও ওই বেদেরা ফাঁদ পেতে পাখি ধরে। আমাদের দেশের মানুষগুলো যদি মানুষ হ'ত! বেদেগুলো বেজায় বেয়াদপ।

—কেন এতে মানুষের দোষটা কি হ'ল?

মলয় প্রশ্ন করল।

মৃগাঙ্ক বেশ তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বল্‌ল—দোষ হ'ল না, তাই বই কি! আমি আগেই ত বলেছি যে, আমাদের দেশের মানুষগুলোর বুদ্ধি নেই, তারা বড় স্বার্থপর। নইলে নিজেদের পাবার জন্যে নানানের জন্যে হরদম হরিণের মত নিরীহ পশুকে মেরে ফেলছে। এমনি সব কাণ্ড! আরে বাবা, যখন পশুদের সঙ্গে লড়াই করতে হ'ত, কি, পশুদের মধ্যে থেকেই বেঁচে থাকতে হ'ত, এখন যে তোমরা পশুকে হারা করেছ তার জন্যে আমরা ত কিছু বলছি না বাপু। কিন্তু আর কেন! পশুদের বাঁচতে দাও। এখন ত তোমাদেরই পৃথিবী। তবু পশুদের জায়গা জমিগুলো দখল ক'রে শহর-বাজার কল কারখানা বানাচ্ছো—আর তাদের কথাটা স্রেফ ভুলেই বসে রইলে!

—তাদের জন্যে কি করতে হবে শুনি?

মৃগাঙ্ক গম্ভীরভাবে বল্‌ল—কেবল আমাদেরই দেশে নেই—দুনিয়ার ভালো ভালো দেশে জানোয়ারদের নিজেদের রাজ্য আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছে। সেখানকার মানুষেরাও অবাধে হরদম জানোয়ার-দের শিকার করে সাবড়ে দিচ্ছিল। শেষে একসময়ে সেসব দেশের লোকেরা দেখল, মারতে মারতে সিংহ, গণ্ডার আরও অনেক জানোয়ারদের বংশই লোপ ক'রে ফেলছে তারা। তাই তখন তারা ভাবতে লাগল, কি উপায়ে পশুদের রক্ষা করা যায়।

—বাঃ, বাঘ সিংহরা যে নাগে পেলেই মানুষ খায়—ওদের সেইজন্যে হিংস্র বলে সবাই জানে। মিছেমিছি ওদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

—লাভ কিছু আছে বই কি! হিংস্রজন্তুরা না বেঁচে থাকলে পশুদের রাজ্যে আরও কত যে সংখ্যা বেড়ে যেত তা বলা যায় না। ওরা ত শুধু মানুষই খায় না, ছোট-মাঝারি জানোয়ার খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে। সেইজন্য পশুদের রাজ্যেও জনসংখ্যা বেশি বাড়তে পায় না। ওসব কথা বাদ দিলেও একটা জিনিস ত ঠিক যে, পশুরা যদি পৃথিবী থেকে বিলকুল উধাও হয়ে যায় তাতে মানুষের কিছু লাভ নেই। আর তাদের বাঁচিয়ে রাখলে মানুষের অনেক সুবিধেও আছে। ধরো পশুর লোম, চামড়া, শিং এগুলো আমাদের কতো কাজে লাগে। লণ্ডনে ত পৃথিবীর যত পশুর গায়ের লোম যা জড়ো হয়েছে এ বছরে তার দাম খুব কম ক'রে ৪০,০০০০০০্ টাকা হবে। তবেই বোঝো যে পশুরা আমাদের, মানে, মানুষের কাছে একেবারে ফ্যালনা বাজে জীব নয়।

মৃগাঙ্ক যেসব কথা বলছে মলয় এধরণের আজগুবি কথা কোনোদিন শোনেইনি। তবে খুব অবাক হয়ে গেল সে।

সে জিগ্যেস করল—এখন কথা হচ্ছে যে, এইসব জন্তুজানোয়ার-দের কি ক'রে বাঁচিয়ে রাখা যায়?

—ব্যাপারটা খুব সোজা। তবে, এতে আমাদের দেশের লোকের সবাইকে সাহায্য করতে হবে। যখন ইচ্ছে তখনই বন্দুক দিয়ে যা-খুশি তাই শিকার করলে চলবে না।

—তাহলেই হবে? এই যে হরদম সব বনজঙ্গল কাটা হয়ে বসতি তৈরী হয়ে যাচ্ছে সেই রকম চল্‌লে—?

মলয়ের এই প্রশ্নে মৃগাঙ্ক বল্‌লে—ও হো, আমি বল্‌তেই ভুলে গেছি সেকথা। জানো, আমাদের দেশে নেই বটে, তবে অন্য অন্য দেশ—যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এসব দেশে পশুদের চলাফেরা, বসবাস করবার জন্যে আলাদা করা জঙ্গল রয়েছে। এক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছে চল্লিশটি এইরকম জঙ্গল—এগুলোকে বলে ন্যাশনাল পার্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে প্রায় সবরকম জন্তুজানোয়ারই পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের এলাকা ৮০০০ বর্গমাইল। সুইডেন, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লো-ভোকিয়াতেও এরকম জঙ্গল রয়েছে পশুদের রাজ্য এগুলো। বেলজিয়ান কংগোর এ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্কে দেশবিদেশের ছাত্রদের ঢালাও নেমন্তন্ন—যাও, দ্যাখো, শেখো! তেমনি আমাদের দেশেও হ'তে পারে।

—কিন্তু হয় না কেন?

— আমাদের ভারতবর্ষেও পশুদের বাঁচানোর জন্য অনেকগুলো ভালো ভালো আইন রয়েছে। কিন্তু সেসব আইন ক'জনই বা মানছে, বলো?

—আইন না মান্‌লে ত শাস্তিও পেতে হবে!

—কে দেখ্‌তে যাচ্ছে বলো? আকাট জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে তুমি হরিণী মারলে কি ভালুক মারলে সেটা কে-ই বা খবর রাখে? এইসব শিকারীদের পাল্লায় পড়ে গণ্ডাররা সাবাড় হতে বসেছে, সিংহরও সেই দশা, চিতাবাঘেরাও নাকি অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।

—সত্যি ভাই এরকম করলে ত ওরা আর প্রাণেই বাঁচবে না! আমাদের দেশে কেন ন্যাশনাল পার্ক হয় না? কলকাতায় যতসব ছোট ছোট পার্ক—

মলয়ের একথায় মৃগাঙ্ক হেসে উঠ্‌ল—দূর পাগলা—ন্যাশনাল পার্ক তো আর একটু-আধটু জায়গা নয়? শুনছিস ক্রুগার পার্ক হচ্ছে ৮০০০ বর্গমাইল। সেখানে রাস্তাঘাট রয়েছে। অনুমতি নিয়ে শিকারও করতে পারো তুমি। তবে খুব কড়া আইন। মানে সেও জঙ্গল—গভীর জঙ্গল, তা নইলে জানোয়ারেরা থাকতেই পারত না।

মলয় বলল্—ওসব জানি না, পশুদের বাঁচাবার জন্যে মানুষের যে কর্তব্য আছে সেটুকু আমাদেরও করা দরকার। যদি এমনিতে আমাদের কথা কেউ না শোনে তাহলে আমরা অনশন করব এ নিয়ে—ধর্মঘট করব ইস্কুলে।

মৃগাঙ্ক বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল—হুঁ, এ নিয়ে আরও ভেবে-চিন্তে উপায় বার করতে হবে, বুঝলি!

বহু পুরাতন কালের কথা ঃ

দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হয়েছেন অসুরাধিপতি মহিষাসুরের হাতে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে।

মহিষাসুর দখল করে নিল স্বর্গের রাজ্যপাট। বিতাড়িত পরাভূত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে নিয়ে শিব ও বিষ্ণুর কাছে এলেন, সবিস্তারে বল্লেন নিজেদের লাঞ্ছনার কাহিনী।

শুনে বিষ্ণু ও মহাদেব ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং এই দুই ক্রুদ্ধ দেবতা বিষ্ণু ও শিব এবং ব্রহ্মার মুখগহ্বর থেকে মহাতেজ নিঃসৃত হল ! ইন্দ্রাদি দেবগণের দেহ থেকেও নির্গত হ'ল সুবিপুল তেজ !

সকল দেবশরীর থেকে সঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী সেই অনুপম তেজোরাশি একত্রিত হয়ে ধারণ করল এক অপরূপা নারীমূর্তি ! মহাকালের তেজে উৎপন্ন হল সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে কেশপাশ আর বিষ্ণুর তেজে উৎপন্ন হল তার বাহু সকল। এমনি বিভিন্ন দেবতার তেজে উৎপন্ন হল বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সকল দেবতার তেজোরাশিসম্ভূতা এই দেবীকে দর্শন করে দেবতারা পুলকিত হলেন, আশ্বস্ত হলেন, এইবার এই দেবী অস্ত্রধারণ করে বধ করবেন দুরাত্মা মহিষাসুরকে। দেবতারা প্রত্যেকেই নানা আয়ুধ দিলেন দেবীকে, দিলেন নানা অস্ত্রশস্ত্র।

পিনাকধারী মহাদেব দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন সুদর্শন চক্র, বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি ! যমরাজ দিলেন কালদণ্ড, প্রজাপতি রুদ্রাক্ষমালা আর কমণ্ডলু ! পর্বতরাজ দেবতাত্মা হিমালয় দিলেন বাহনস্বরূপ সিংহ।

তারপর দেবগণ সজ্জিত করলেন এই ত্রিলোকমাকে স্বর্গ মর্ত নিখিল চরাচরের সকল মণিরত্ন অলঙ্কারে ! রত্নমুকুট, কেয়ূর, কুণ্ডল অঙ্গদ, বলয় ও ললাটভূষণ সর্ব অঙ্গের সকল আভরণ দিলেন সকল দেবতাগণ !

অতঃপর সিংহবাহিনী জগন্মাতার অট্টহাস্য ও হুঙ্কারে সংক্ষুব্ধ হল চৌদ্দভুবন, কম্পিত হল সপ্ত-সমুদ্র আর পৃথিবী ! দেবগণ জয়ধ্বনি করলেন, মুনিগণ সুরু করলেন স্তব !

* * * *

মহিষাসুর দর্শন করল দেবীকে ! দেখলো দেবীর অঙ্গজ্যোতিতে বিশ্বভুবন জ্যোতির্ময়, দেবীর ধনুকের জ্যা শব্দে কম্পিত সপ্ত নিম্নলোক ! দেবী স্বয়ং পরিব্যাপ্তা সর্বদিকে সুবিপুল কলেবরে !

মহিষাসুরের অনুচরগণ রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীতে সুবিপুল সমর-সজ্জার আয়োজন করল ! অজস্র অস্ত্রের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হল দিক্ দিগন্ত। অম্লানবদনা ভগবতীদেবীর সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হল অসুর সৈন্য ও সেনাপতিবৃন্দ। কিন্তু পারলো না কেউই। সেই ভয়ঙ্কর সমরোৎসবে ভীষণতেজা দেবীর হস্তে প্রাণ দিল রণমদে মত্ত শত শত মহাসুর। কেউ দ্বিখণ্ডিত হল তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে, কেউ বিমর্দিত হ'ল গদাপ্রহারে, কেউ আহত হ'ল মুষলাঘাতে ! কেউ কেউ হল ছিন্নশির, কোন কোন ছিন্নশির অসুর রণবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করতে লাগলো। পতিত রথ, হয়, হস্তী ও অসুরগণের মৃতদেহের স্তূপে অগম্য হ'ল রণক্ষেত্র

আজ শরতের মিষ্টি হাওয়া
দোল্ দিয়েছে মনের বনে,
শিউলী তলায় সুর জমেছে
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে।
কাশের ফুলে দুলছে চামর
ক্ষেত ভরেছে সোনার ধানে,
কানায় কানায় উছল নদী
চলছে ছুটে সাগর পানে।
নীলাকাশে বকের মেলা
দিক্ বিদিকে নূতন আলো,–
আজ শরতের সকাল বেলা
সব কিছুকেই লাগছে ভালো।

বিশাল অসুর সৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষয় করে ফেল্লেন দেবী অম্বিকা !

তারপর এল মহাবল মহিষাসুর মহিষাকৃতিতে। দেবীর নিশ্বাসে সমরক্ষেত্রে বহু সৈন্যের সৃষ্টি হয়েছিল, মহিষাসুর সেই সব প্রমথ সৈন্য ধ্বংস করে দেবীর বাহন সিংহের প্রতি ধাবমান হল। ক্রোধে মহিষাসুর গর্জন করতে লাগলো, তার সবেগ-গমনে নিপীড়িত হল ধরিত্রী, উদ্বেলিত হল সমুদ্র তার পুচ্ছতাড়নে। ঊর্ধ্বলোকে মেঘেরা বিদীর্ণ হল তার ক্ষুরধার শৃঙ্গে, শত শত পর্বত তার নিঃশ্বাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভূপতিত হল !

চণ্ডিকা তখন এই অমিতশক্তি অসুরকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। মহিষমূর্তি ত্যাগ করে অসুর তখন একবার ধারণ করল সিংহরূপ, একবার খড়্গধারী এক পুরুষাকৃতি, একবার বিশাল হস্তীরূপ – প্রতিবারই দেবীর অস্ত্রে ছিন্নশির হয়ে ভূপতিত হল !

তারপর সেই অসুর পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করে বিক্ষুব্ধ করল বিশাল বিশ্বভুবন। বড় বড় পর্বত তুলে নিক্ষেপ করতে লাগলো জগন্মাতার প্রতি।

রক্তবদনা মহাদেবী তখন দিব্যসুরা পান করে ঘোর রণমদে মত্ত ! হুঙ্কার করে বল্লেন, রে মূঢ়, তোর কালান্তকাল এখনি সমুপস্থিত !

লম্ফ দিয়ে মহিষাসুরকে আকর্ষণ করে তার কণ্ঠদেশ পদ দ্বারা নিপীড়ন করে শূলে দিয়ে বিদীর্ণ করলেন তার বক্ষোদেশ !

তখন মহিষাসুর নিজ মুখ থেকেই মহাসুররূপে অর্ধ-নিষ্ক্রান্ত হল এবং দেবীর ভীষণ তেজে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অর্ধ-নির্গত হয়েই

গান্ধীজী হন্ জাতির পিতা,
মোদের সবার মনের মিতা।
অহিংসারি মন্ত্র-বলে
জগৎ জেতেন কি কৌশলে!
সারা জীবন করেন লড়াই—
তাঁহার তরে করবো বড়াই।
নাম যে তাঁহার জগৎ-জোড়া—
থাকবে চির সোনায় মোড়া।
আমরা তাঁরে করবো মনে,
রাখবো সদা হৃদয়-কোণে।
আমরা তাঁরে পূজবো নিতি—
অর্ঘ্য মোদের ভক্তি, প্রীতি!

দেবীর সঙ্গে শেষ যুদ্ধে রত হল সেই অসুরাধিপতি এবং অচিরকালের মধ্যে দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হয়ে অন্তিমদশা প্রাপ্ত হল। তখন হাহাকার করে পলায়ন করল অসুর সৈন্যগণ। আর আনন্দিত হলেন দেবগণ। ভক্তিনম্রচিত্তে সুরু করলেন জগন্মাতা মহামায়ার স্তব!

দুপুরে বেলায় এ কোন্ খেলায়
দুষ্টু হাওয়াটী এলে
ঘন নীল এই পাহাড়ের কোলে
মর্মর ধ্বনি ঢেলে।
ফেলি নিঃশ্বাস ঘন বন দোলে
দিগন্ত নীল ঘোমটাটি তোলে;
নব-বাদলের শ্যাম মেঘছায়া
নামে পাহাড়ের কোলে;—
দুপুরের হাওয়া তোমার খেলায়
নীল দিগন্ত দোলে।
কোন্ সে গোপন কথা?
সে নীরব বাণী বুকে করে আনি
জানাও কি ব্যাকুলতা?
ও পাহাড়ে ক্ষেত কাটিছে কৃষাণ
কান পেতে শোনে যে তোমারি গান;
এ পাহাড়ে কোন্ পাহাড়ীয়া মেয়ে
বোঝা পিঠে আসে উঠে
ওদেরি মনের বেদনা ওঠে কি
তোমার কণ্ঠে ফুটে?
অলস নয়নে ঘুম আসে মোর
শুনি তবু কান পেতে,
কাছে হতে দূরে যায় তব গান
অস্ফুট কল্লোলেতে।
সাধ হয় মোর জড়তা ও গ্লানি
ক্ষুব্ধ শূন্য এ জীবনখানি
ভাসাইয়া দিই প্রাণভরা তব
চঞ্চলতার সাথে।
দুষ্টু-বাতাস সাথী হনু তব
দুপুরের নিরালাতে।

একটা মন্দিরের চারপাশে যদি তোমরা নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে রাখ মন্দিরের পূত আবহাওয়া তো নষ্ট হবেই। মন্দিরের অভ্যন্তরে যদি কোন কিছু মরে পচে থাকে, তাতে শত ধূপধূনোয় ধূমায়িত করে রাখলেও পূজারী বা সেবক তার মনের দেবভাব তাতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তেমনি আমাদের এই দেহ-মন্দির অপবিত্র হয় কি করে জান? দেহের অযত্ন আর অবহেলার মধ্য দিয়ে। কর্মশক্তির উৎস হচ্ছে আমাদের পেট। পেটের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি সক্রিয় থাকে, তাহলে জেনে রেখো তোমার আমার দেহে যে দেহী বিরাজ করছে সর্বদাই সে সচ্চিদানন্দ থাকে—অন্যথায় কর্মে অনিচ্ছা, অবহেলা, অধৈর্য প্রভৃতি অনগুলি প্রভাব বিস্তার করে। এই পেট সর্বপ্রকার রোগের জন্মভূমি, আর এই রোগই হল দেহের প্রতি অবিচারের প্রতিফল বা পাপ। সুতরাং পেটে কোনরূপ গোলযোগ থাকলেই মন-মেজাজ বিশ্রী হয়ে যায় আর তাতেই কাজকর্মের, লেখাপড়ার, খেলাধূলোর স্পৃহা নিস্তেজ হয়ে যায়।

শরীরটাকে সুস্থ সবল রাখার মত প্রথমতঃ নিয়মিত কিছু হাল্কা ধরণের ব্যায়াম করো। অন্ততঃ তোমাদের ব্যায়ামের এইটুকু উদ্দেশ্য যেন থাকে—তোমরা প্রত্যহ যা খাও সেই ভুক্তদ্রব্য যেন ভালভাবে হজম হয়ে তার সম্পূর্ণ সার পদার্থটুকু দেহের সেবায় দান করতে পারে। তোমার হজমতৎপরতালাভের জন্য আপাততঃ লঘুপাক খাদ্য —যেমন সকালে সামান্য গরম জলে পাতিলেবুর রস ও পরিমাণ মত বীট বা সৈন্ধব নুন মিশিয়ে এক গ্লাস পান করা উচিত। হর্লিকস বা ওভালটিন, কফি-চা নাই বা খেলে আপাততঃ, মাঝে মাঝে না হয় খেলে। তারপর ডিম, লুচি, পুরি ইত্যাদির বদলে খেতে পার সামান্য ছোলা, কিসমিস, চিনেবাদাম ভিজিয়ে সঙ্গে মুড়ি দিয়ে। তারপরে স্কুল-কলেজের সময় যদি খিদেভাব থাকে তো অল্প করে ফেন-ভাত সামান্য মাখন দিয়ে ২।১টি সব্জী সেদ্ধ দিয়ে খেতে পার। কোনদিন দুধ-চিনি দিয়ে খেতে পার, তার সঙ্গে ২।৩ স্লাইজ রুটি-মাখন।

বিদ্যায়তনে যাবার পূর্বে বেশ করে ভাল তেল ঘষে ঘষে রোদে বসে মালিশ করে, সাবান দিয়ে তেলটা তুলে স্নান করে ফেলবে। গুরুপাক খাদ্য খেতে যেওনা। চপ, কাটলেট বা পোলাও খাবার নেশা না রেখে—ডাল-ভাত, মাছ-তরকারী, চাটনী বা একটু দই ভাত খেয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করো। খাবার সময় জল পান না করে যদি খাবার অন্ততঃ ১০।১৫ মিঃ বাদে প্রয়োজনমত ২।৩ গ্লাস জল পান কর তাহলে খুব ভাল হয়। তাতে ভুক্তদ্রব্যগুলি তাড়াতাড়ি গলিত পদার্থ হয়ে হজমের কাজে সাহায্য করে। আর তা ছাড়া অম্বল, বুক জ্বালা করা বা কোষ্ঠকাঠিন্য বা তারল্য সহজে হবে না।

টিফিনে যেন কিছু খেও। একদম কিছু না খাওয়াটা কিন্তু খারাপ। যদিও পেট খালি থাকলে পাকস্থলীর চামড়াটা প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তাহলেও সময়মত পাকস্থলীতে খাদ্য-চাহিদা জেগে ওঠে। কেননা সেই ১০টায় খেয়ে যদি ২টায় পাকস্থলীতে কিছু না পড়ে, অযথা তার দেওয়াল থেকে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড নামে অম্ল আর পেপসিন নামে এনজাইম ক্ষরতে থাকে—যে জিনিষটা আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য থাকলে ক্ষরা উচিত ছিল—তাই খালি পাকস্থলীতে পড়ে পাকস্থলীর ক্ষমতা বিনষ্ট করে দেয়।

অম্লরস আর এনজাইমে ভুক্ত খাদ্যকে কি করে জান? পেপসিন আমিষ খাদ্যের পরিপাক করায় আর অম্লরস মিশ্রখাদ্যকে পরিপাক করাতে সাহায্য করে। এই টিফিনে ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লার লোভ না করে মুড়ি আর কলা খেলেও চলবে। অথবা জ্বাল দেওয়া দুধ-সাগু খাও। তা না হলে সাধারণ ফল খাও।

বাড়ী এসে চিড়া দই বা সাগুর খিচুড়ী কিংবা সুজির রুটি (জোয়ান, আদাবাটা দিয়ে তৈরী করে) খেতে পার। খাওয়ার পরে জল খাবে। মনে আছে—কেন? এর অর্ধ ঘণ্টা বাদে হাল্কা ধরণের ব্যায়াম ও কিছু যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করবে। তারপর হাত মুখ বেশ করে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে-মুছে ব্যায়াম করে বিশ্রাম নিলে পর ½ ঘণ্টা। এর পর এক গ্লাস মিছরীর জলের বদলে চিনির জল পান করবে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বা ঘোলের সরবৎ কিংবা আখের গুড়ের সরবৎ। প্রত্যেক সরবৎ পান করার পূর্বে পরিষ্কার সূক্ষ্ম ন্যাকড়ায় ছেঁকে অবশ্য নেবে। পান করে পড়তে বসবে। রাত ৯-৩০ টার মধ্যে রাত্রির খাবার খাবে। রাত্রে যদি তোমরা ভাত খেতে চাও খাবে। আর যদি হজম হয় তো রুটি খেতে পারলেই খুব ভাল হয়। আজ কাল চাল অপেক্ষা আটায় অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী খাদ্যপ্রাণ থাকে। দুপুরে যা খেয়েছো রাত্রে তাই খাবে।

তবে সপ্তাহে ২।৩ দিন রাত্রে নয় মাংসের মেটুলির ঝোল বা লঘুপাক করে অল্প মাংস, প্রচুর সব্জী খাবে। মাংস যে দিন খাবে তার ½ ঘণ্টা বাদে দুধ খেতে পার। অন্যথায় খাবার সময় দুধ-রুটি ও সম্ভব হলে ১টি কলা খাবে বুঝলে? ১০।১৫ মিঃ পর এক গ্লাস জল পান করে ½ ঘণ্টা পায়চারী করে হাতমুখ ধুয়ে ২।১ গ্লাস জল পান করে শোবে। প্রথমে বামকাত হয়ে তাতে যকৃতে চাপ পড়বে না, তারপর সোজা হয়ে এতে ঘুমের একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পাবে। তারপর ডানকাত হয়ে শুলেই ঘুমের আবেশে চোখ দুটো নিমীলিত হয়ে আপনিই আসবে। তুমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছো টেরও পাবে না।

এই খাদ্যাদি খেয়ে যখন দেখবে বেশ হজম অনায়াসেই হচ্ছে, তখন খাদ্যের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেবে—তাও ২।৩ মাস চলবে। ফলে যখন শরীর বেশ উন্নত ধরণের হয়ে উঠবে, তখন এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ডিম, দুধ, ছানা, মাংস ও গ্লাসে গ্লাসে ফলের রস, বাদামের সরবৎ পান করতে পার। তখন খেয়ে হজমও হবে, তৃপ্তিও পাবে, শান্তিও হবে আর উপকারও উপযুক্ত পরিমাণে পাবে। খাবার জন্যই বাঁচা—বাঁচার জন্য খেতে তারা জানে না তাই না? তোমাদের যেসব খাদ্য বর্তমানে খেতে বললাম তার মধ্যে খাদ্যে যে পথ্যগুণ থাকে, যার উপর ওজঃ শক্তি নির্ভর করে সব পরে। খাবে যখন মনে বেশ ধীরভাব রাখবে। একাগ্রতা রাখবে। ঠিক উপকার পাবে। তবে মনে রেখো ব্যায়াম করে শরীরের খিলন ও স্নায়ুগ্রন্থিগুলি যদি সক্রিয় না রাখ, ঐ লঘুপাক খাদ্য খেয়েও তোমার কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হবে না।—সুতরাং খাও—ব্যায়াম করে তাকে ভালভাবে হজম কর।

সা রে গা মা পা ধা নি
গলা সাধে গাধানী।
মাথা নেড়ে গাধা কয়,
চড়া ধর, খাদে নয়।
খেয়ে ধুপ-ফিটকিরি
দিস্ বুঝি গিটকিরি।
গাবি নাতো মাইকে
না শোনালে দায়ী কে?

গাধানীরে গলা সাধা
শিখাইতে এলো গাধা।
বলে—শোন্ কান দিয়ে,
গান করি জান্ দিয়ে।
গাই পিলু, ভৈরবী
কানাড়া-ইমন সবই।
সব চেয়ে ওস্তাদী
সুর যাতে রোজ তা' দি',

গর্দভ-রাগিণীটা
যারে তারে ভাঁজনি তা'।
শোন তবে মন দিয়ে
গাই 'হাই টোন' দিয়ে।
যাই ধরা ঝাঁপতালে
পড়ে পিঠে ফাঁকতালে
ধোপাটার পাকা লাঠি,
মাঝ রাতে ঘুম মাটি।

সে অনেক প্রাচীনকালের কথা। এক গ্রামের একটি পড়ো বাড়ী। তার ধারে-কাছে আর কোন জনমানবের বাসা নেই। পড়ো বাড়ীটা ছিল পাকাই—কিন্তু, এতো পুরোনো যে, তার ফাটলের ভেতর দিয়ে গাছ-গাছড়া বেরিয়ে এসে, এখন হয়েছে একটি জঙ্গল। এরই একটা ফাটলে বাস করে এক প্যাঁচা আর পেঁচী। দুজনে মিলে তাদের ছোট্ট একটি সংসার। ছেলেপুলে বা আর অন্য কোন ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কিছুই তাদের নেই। মাত্র দুটি প্রাণীর সংসার হ'লেও অশান্তি ছিল তাদের প্রচুর। প্যাঁচা ছিলো ভীষণ রাগী। স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি তার লেগেই আছে। স্ত্রী পেঁচী বেচারী কিন্তু নেহাৎ ভালো মানুষ—সে স্বামীর সব অত্যাচারই নীরবে সহ্য করে। এমন কি, স্বামীর নিন্দা শুনতে হবে বলে পাড়াপড়শীদের বাড়ী যাওয়া-আসা পর্যন্ত সে বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

ওদেরই পড়শী ছিলো এক কাক-দম্পতী। সেখানেই বড় একটা প্রাচীন বটগাছের শাখায় নীড় বেঁধে তারাও স্বামী-স্ত্রীতে বাস করছিলো। এদের ছিলো কিন্তু সুখের সংসার—স্বামী-স্ত্রীতে খুবই মনের মিল। কাক-দম্পতী প্যাঁচা-পেঁচীর সংসারের সব খবরই রাখতো। একদিন কাকটা তার স্ত্রীকে বোল্লে, "দেখেছো, লক্ষ্মীছাড়া প্যাঁচাটার কান্ড' এমন গুণবতী স্ত্রী, তাকে কী যন্ত্রণাটাই না দিচ্ছে! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, দিই হতভাগাটাকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে।" স্ত্রী উত্তেজিত স্বামীকে বাধা দিয়ে বোল্লে, "না না, পরের কথায় থাকতে নেই। তা ছাড়া, তাতে বৌটাই লজ্জা পাবে।" স্ত্রীর কথায় কাক সেদিন থেমে যায়।

একদিন কাকের স্ত্রী বাড়ী নেই, কোথায় যেন গেছে বেড়াতে। বাড়ীতে ছিলো শুধু কাকই একলাটি। এমন সময় প্যাঁচাটা তার বাড়ীতে তুমুল কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, অশান্তির একশেষ। প্যাঁচার রাগ দেখে পেঁচী তো ভয়ে জড়োসড়ো। চীৎকার ক'রে গর্ত কাঁপিয়ে প্যাঁচাটা বোলছে, "আজ সমস্ত পৃথিবীটাই ধ্বংস ক'রে ফেলবো—কারুর কথাই শুনবো না।" স্ত্রী পেঁচী তো কেঁদেই খুন! পেঁচী যতই অনুনয় বিনয় ক'রে তার রাগ সম্বরণ করতে বোলছে, প্যাঁচার রাগ ততই পঞ্চমে চড়ে যাচ্ছে। কাকটা অনেকদিনই প্যাঁচাটার চ্যাঁচানি নিজের বাসায় বসে শুনতে পেয়েছে, মনে মনে রেগেও গেছে অনেকদিন—কিন্তু, স্ত্রীর নিষেধ, তাই মনের রাগ মনেই চেপে গেছে। আজ কিন্তু কাকটা আর কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারলে না। সে মুহূর্তে মধ্যে প্যাঁচাটার গর্তে উড়ে গিয়ে, তার ঠ্যাং দিয়ে প্যাঁচাটার গলা চেপে ধ'রে বোল্লে, "কি রে শয়তান! পৃথিবীটাকে নাকি তুই ধ্বংস করবি? কর না এবার ধ্বংস, দেখে নিই তোর বীরত্বটা!" কাক গর্তে এসে ঢুকতেই পেঁচী লজ্জায় ভেতরে স'রে গেল। দূর থেকেই সে তার স্বামীর দুর্দশা দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সেই বেচারী কিই বা আর করতে পারে? এদিকে প্যাঁচার প্রাণ তো যায় যায়! যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে প্যাঁচাটা কাকটাকে বোল্লে, "আমি তো কাউকে কোন কিছু বলিনি? নিজের গর্তে ব'সে আমার স্ত্রীকে আমি ভয় দেখাচ্ছিলাম, তাতে তুমি কেন শুধু শুধু গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে? আচ্ছা, আর কখনো এমন কথা বলবো না। এবারকারের মত আমাকে মাপ ক'রে দাও।" কাকটা প্যাঁচার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে বোল্লে, "আমার স্ত্রীর নিষেধ, তাই তোকে রেহাই দিলাম। নইলে তোকে মেরেই ফেলতাম।"

প্যাঁচাকে সেবারের মত ক্ষমা ক'রে দিয়ে কাক তার নিজের বাসায় উড়ে চলে গেল। এদিকে, পেঁচী তার স্বামীর কাছে এসে ব্যথিত কণ্ঠে ব'ল্লে, "দেখি, কতখানি তোমার লেগেছে ঘাড়টায়? যেভাবে ঘাড়টা তোমার চেপে ধরেছিলো, আমি তো মনে করেছিলাম, আর বুঝি রক্ষা নেই।" প্যাঁচা ভেবেছিল পেঁচী এসব কিছুই দেখতে পায়নি, তাই সে বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বোল্লে, "ও, আমার ছোটবেলাকার বন্ধু কাক যে ঘাড়টা ধরেছিলো, সেই কথা বলছো? আরে, সে শুধু তামাসা ক'রে ধ'রেছিলো। অনেকদিন পরে দেখা কিনা, তাই। কত দুঃখ করলো সে তোমার জন্যে,—তুমি ওকে দেখেই লজ্জায় ভেতর গর্তে চলে গেলে, একটিবারও এলে না যে।" পেঁচী নেহাৎ সোজা মানুষ, স্বামীর কথা বিশ্বাস ক'রে বোল্লে, "তাই নাকি? আমি তো তা হ'লে ভুলই ক'রেছি!" প্যাঁচা বোল্লে, "দেখো, আর আমি তোমার সাথে কোন ঝগড়াঝাঁটি করছিনে। কি জানি, হঠাৎ কখন এসে আবার হাজির হবে। তা হ'লে আমরা ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাবো, কি বলো?"

এদিকে কাকের স্ত্রী তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো, "ব্যাপার কি বলো দেখি? আজকাল ওদের বাড়ী আর ঝগড়াঝাঁটি যে একদম নেই?" কাক তার স্ত্রীকে জবাবে বোল্লে, "আরে এটা বুঝতে পারছ না কেন, হাজার হলেও সে পুরুষ তো বটে! হয়তো বুঝেছে মানুষদের মত রোজ রোজ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করাটা ভাল দেখায় না।" কাকের স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বোল্লে, "যাক্, বাঁচা গেল।"

আমরা দৌড়াতে জানি না। যদি দৌড়াতে জানতাম—তবে পৃথিবীর মধ্যে আমরা উঁচুতে স্থান পেতাম; সেটা আর হয়ে উঠছে না। কারণ এই নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ভাবি না কি-ভাবে দৌড়ালে আমরা অপরকে হারিয়ে দিতে পারবো—কি-ভাবে হাত-পা নাড়লে কম সময়ে আমরা দৌড়ে যেতে পারবো—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কি করে নিতে হবে বা ফেলতে হবে—এই সব বিষয় নিয়ে আমরা মোটেই ভেবে দেখি না। আমরা যে উন্নতি করতে চাই—সে কথা আমাদের মনেই হয় না।

কিন্তু এই দেশে একদল লোক আছে তারা দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছে। তারা তাদের মতামত কাগজে জানিয়ে দেয়। সেই দেখে অনুশীলন আরম্ভ হয়। হয়ত তার ভিতর নূতন কিছু পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিবর্তন হয়ে থাকে। ফলে তারা একটা মাপে এসে পৌঁছায়। তার ফলে কম পাল্লার দৌড়ে [illegible] শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে চলেছে।

কোন শিক্ষক দৌড়-বীরের পায়ে [illegible] দেবার দাবী করতে পারে না। দম এনে দিতে পারে না [illegible] দিতে পারে না। কিন্তু শিক্ষক কয়েকটি জিনিষ করতে পারে যার জন্য দৌড়বীর নাম করতে সক্ষম হয়—যদি তারা শিক্ষকের কথা মেনে চলে।

আমাদের দেশে কেউ কারও কথা [illegible] না। তাতে উন্নতি হবে কি প্রকারে বলতে পারো? এখন তোমরা মন দিয়ে আমার কথা [illegible] চল যদি তবে [illegible] ভালভাবে দৌড়াতে পারবে। ভেবে দেখো—আমার মতে তোমাদের [illegible] কি না।

ভুল দৌড়ানোর জন্য আমরা পেছিয়ে পড়ি। দেহ ঠিকভাবে চালাতে পারলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। দৌড়াতে হলে প্রথমে ব্যায়াম করতে হবে। তাতে মনে জোর আসবে। দেহে জোর থাকলে তবে মনে জোর পাওয়া যায়। মনের [illegible] এবং কাটিয়ে [illegible] করলে মনে [illegible] জোর আসে। ফলে [illegible] সম্ভবপর হয়।

প্রতিযোগিতার কয়েকমাস আগে থেকে সুরু করতে হবে অনুশীলন। দৌড়াবার দিকে [illegible] ব্যায়াম ও কিছু সংযোগ [illegible] ব্যায়াম করতে হবে। [illegible] শক্তি পাওয়া যাবে।

সপ্তাহে দুদিন হাঁটু তুলে [illegible] (logging) দু এক পাক দৌড়াতে হবে। বেশী দূর দৌড়ালে একটা লাফিয়ে ওঠা ভাব (bounce) যেটা দৌড়ানোতে খুব প্রয়োজন হয়—সেটা [illegible]।

দুরকম ভাবে কম দূরত্ব দৌড়ানো [illegible] একটা হচ্ছে ফ্লোট (Float) এবং অন্য একটা হচ্ছে ড্রাইভ (drive)।

ফ্লোট নিয়মে যারা দৌড়ায় [illegible] সহজে মাটিতে পা ফেলে। মাটিতে পা [illegible] বেশী হয় না বা চাপ পড়ে না অধিক। আলতোভাবে তারা পা ফেলে। দেহ এলিয়ে দেয়। কোন অংশ শক্ত করে রাখে না। পা চলে খুব দ্রুত। পদবিক্ষেপ বড় হয় না।

ড্রাইভ নিয়মে যারা দৌড়ায়—তারা পায়ে দ্রুত গতি অবলম্বন করে। বিশেষ করে তারা যখন মাটি থেকে পা তুলে নেয় আর ফেলে সেটাই হচ্ছে দর্শনীয়। স্প্রিং বা বাউন্স [illegible] খুবই প্রয়োজন যারা কম পাল্লায় দৌড়াতে চায়।

অনেকে দৌড়ে চলে। কিন্তু তারা হাঁপিয়ে পড়ে বা পায়ের জোর হারিয়ে ফেলে যখন তারা পা ফেলে দৌড়াতে থাকে। বাউন্স বা স্প্রিং না করতে পারলে দৌড় সার্থক হয় না। নিজের পায়ের কথা ভেবে দেখলে আমরা কিছুই মনে করতে পারি না।

আচ্ছা—একটা রবারের বল মাটীতে মারা হয় যদি—তবে কি হবে বলত? লাফিয়ে উঠবে না? বল কি মাটিতে জমে যেতে পারে?

বল মাটিতে লেগে থাকতে পারে না। আমরা সেই মত পা ফেলে দৌড়াতে পারি যদি—তবে যে দ্রুত দৌড়াতে পারবো—তার কোন সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি পা ফেলা ও নামানোই হচ্ছে দৌড়ের কায়দা। কম পাল্লার দৌড়ে পা দেখা যায় না সহজে। কিন্তু দূর পাল্লার দৌড়ে পা দেখা যায়। এটা হয়—কারণ তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে চোখে পায়ের গতি লক্ষ্য করা যায় না। যেমন রবারের বল চোখের নিমেষে মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠে।

পা চালাতে হলে হাঁটু থেকে চালাতে হবে। সেইজন্য হাঁটু তুলে তুলে দৌড় অনুশীলন করা দরকার। হাঁটু এমনভাবে উঠবে ওপরে—যেন মাঝে মাঝে দাঁতে ঠেকে যায়। হাঁটু তোলা যদি অভ্যাস হয়ে যায় তখন পা সামনে এগিয়ে ফেলা অভ্যাস করতে হবে। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেন রবারের বলের মত মাটি থেকে পা উঠে আসে তা অভ্যাস না করলে চলবে না। যত উঁচুতে হাঁটু উঠবে তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পা পড়বে ও ফিরে উঠে আসবে (rebound)। সেইজন্য প্রথমে অভ্যাস করা উচিত হাঁটু তোলা ও নামানো। এর জন্য অনেক সময় দেওয়া দরকার।

ব্যায়াম করতে হলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে—অন্য পা তুলে বুকের কাছে তুলে এনে হঠাৎ নামিয়ে দিয়ে অন্য পা দ্রুত তুলতে হবে। এইভাবে অভ্যাস করলে পায়ের শক্তি বাড়বে ও নিজের থেকে ওঠানামা করতে থাকবে পা দুটি যখন দৌড়াতে হবে।

মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে—পা দুটি উপরে তুলে সাইকেল চালানোর মত [illegible] করা যায় যদি তাহলেও ভাল ব্যায়াম হয় ও দৌড়াতে সাহায্য করে।

মনে রাখতে হবে ঠিকমত দেহের স্থাপনা করতে পারলে দৌড়াতে সুবিধা হয়। সোজা অবস্থায় না দৌড়ে ২০° ডিগ্রী সামনে ঝুঁকে দৌড়ানো ভাল।

স্টার্ট—পা ফেলা ও শেষ করা—এই তিনটে হচ্ছে আসল জিনিষ কম পাল্লার দৌড়ে। স্টার্ট মানে এই বলতে চাই যে, প্রথম ৩৫ গজ খুব দ্রুত যেতে হবে। পা ফেলা অর্থে এইটে বোঝাতে চাই যে, সম্পূর্ণ দ্রুত-বেগে দৌড়ে যাওয়া। শেষ করা মানে প্রাণপণে ফিতে বা দাগ পার হয়ে যাওয়া। লাফিয়ে কখনও যাবে না পার হয়ে।

স্টার্ট খুব ভাল করে নিতে হবে। পেছিয়ে পড়লে দৌড়ে [illegible] করা খুবই কষ্টসাধ্য। গোড়াতেই পড়ে গেলে সময় নষ্ট হয়। দুই তিন দমে ১০০ গজ দৌড়াতে পারলে ভাল। শেষ করার সময় যত পার জোরে হাত পা চালাবে।

দেহ টান করা (Stretching)। লাফিয়ে ওঠা (bouncing) হাঁটু তোলা, শুয়ে সাইকেল চালানোর মত পা চালানো অভ্যাস করতে হবে। হাঁটা, লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ান এবং এক দমে দৌড়ান অভ্যাস করবে।

একটা কাঁচা ডিম জলে ফেলে দিলে কী হবে বলতো দেখি?—ডুবে যাবে তো?—ঠিক বলেছ ডুবেই যাবে তা। কিন্তু কিছুদিন আগে এক মার্কিণ যাদুকরকে দেখলাম এক মজার ম্যাজিক দেখাতে। একটা লম্বা গ্যাস জারের মতন কাঁচের পাত্র পরিপূর্ণ আছে টলটলে জলে, ম্যাজিসিয়ান সাহেব হাতে একটা ডিম নিয়ে তাতে যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে পরে ডিমটাকে ছেড়ে দিলেন ঐ পাত্রের মধ্যে। পড়ামাত্রই তা ডুবে গেল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ম্যাজিসিয়ান সাহেব আদেশ করা মাত্র আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকল আর অবশেষে ভেসে উঠল ডিমটা। ওঠার পথে ঘুরপাক খেতে খেতে উঠল ডিমটা যাদুকরের আদেশে। ব্যাপার দেখে তো সবাই অবাক্। তোমরা বোধ হয় ভাবছ কোন সুতো-টুতোর কারবার হবে এটা, কিন্তু ভাই সবই ভুল। অতি সহজ খেলা কিন্তু দেখলে অবাক হতে হয় খুবই। কী বললে?—ডিমটাতেই যত কৌশল? হল না। ডিমেও কোন কৌশল নেই, পাত্রেও কোন কৌশল নেই। ম্যাজিক দেখানোর আগে পাত্র আর ডিম সবাই হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। পাত্রটা ছিল তখন খালি—পরে অন্য একটা পাত্র থেকে জল ঢেলে এই পাত্রটাকে পূর্ণ করা হয়েছিল।—তবে কৌশল কোথায়?

আসল কৌশল হচ্ছে ঐ জলে। দেখতে খাঁটী জলের মতন হলেও সত্যি-সত্যিই তা জল নয়। পাত্রে থাকে কমতেজী বা ডাইলুটেড হাইড্রোক্লোরিক এসিড। এই এসিডের মধ্যে ডিম পড়তেই ডিমের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে জন্ম নেয় কার্বনিক এসিড গ্যাস যার ফলে ডিম কিছুটা হাল্কা হয়ে যায়—আর ভেসে ওঠে ঘুরপাক খেতে খেতে।

এ খেলাটা তোমরাও দেখাতে পার খুব সহজে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড ডাক্তারখানায় কিনতে পাবে। এ জিনিষ ব্যবহার করবে কিন্তু খুব সাবধানে, কোন রকম হাতে বা গায়ের চামড়ায় যেন না লাগে, তাহলে কিন্তু ফোস্কা পড়তে পারে। পাত্রের এসিডের (জলের) মধ্যে ডিম ফেলবে কিন্তু খুবই সতর্কতার সঙ্গে ডিম পড়ার ফলে এসিড যেন ছিট্‌কে উঠে চোখে-মুখে কাপড়ে-চোপড়ে না লাগে!

এ খেলাটা দেখানোর সময়ে একটা লাগসই গল্প বানিয়ে নিতে হবে আর সেই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে দেখাবে এই খেলা। পূর্বোক্ত মার্কিণ যাদুকর যা বলেছিলেন তা বাঙলা করলে ধরনটা এমনি দাঁড়ায়ঃ—"আমার হাতে যে ডিমটা দেখছেন এটা হাঁসের ডিম। হ্যাঁ, যেমন তেমন হাঁস নয় একেবারে চীনেহাঁস। চীনেহাঁস কিনা তাই এর কেরামতিও একটু আজব। সেবার চীন দেশে বেড়ানোর সময়ে হোয়াং হো নদীর বানের জলে ভেসে যেতে দেখেছিলাম এই ডিমটাকে। যেই না আমি ধরতে যাই অমনি ডুব দেয় আর সরে আসতেই ভেসে ওঠে—অনেক কায়দা ক'রে শেষে ধরে এনেছি এই আজব চীনেহাঁসের ডিম—এর কেরামতিটা দেখুন এবার!"—তোমরাও এমনি ধরনের একটা গল্প বানিয়ে নিয়ে দেখাতে পারো এ খেলা।

[দার্জিলিং থেকে কালিম্পং ফেরার পথে বমির ভয়ে সকলে ওষুধ খায়। আমি খাইনে। আমি বলি, সঙ্গে বেড়াল আছে। আমি বেড়াল মন্ত্র জপ করব। তা হলে বমি হবে না। সত্যি তাই। এমন প্রত্যক্ষফল-প্রদ মন্ত্র তোমরাও পরখ করে দেখো। তবে সঙ্গে একটি বেড়াল থাকা চাই। কালিম্পং থেকে যেদিন শান্তিনিকেতন ফিরি সেদিন "পিন" হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে খবর পাই তাকে পাওয়া গেছে। তাকে আনাবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় শোক সংবাদ আসে।]

বেড়াল বেড়াল
কেমন বেড়াল
কেউ দেখেনি
এমন বেড়াল
এই যে বেড়াল
সেই যে বেড়াল
এমনটি আর
নেই যে বেড়াল।
আয়রে বেড়াল
আয়রে বেড়াল
কোথায় চলে
যায়রে বেড়াল।
বেড়াল বেড়াল
নয় এ বেড়াল
যেমন বেড়াল
তেমন বেড়াল।
কেউ দেখেনি
এমন বেড়াল।

জনমত

আশাপূর্ণা দেবী

দুর্ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত থাকে না। অবশ্য দুর্ঘটনার জন্য ঠিক প্রস্তুত কেই বা করে থাকে?

জুতো-জামা কিনিতে গেলেই আমরা টেঁক-সই দেখিয়া কিনি, আগামী বৎসর পূজার ছুটিতে কোথায় বেড়াইতে যাইব, এ বৎসরের শীতকালে তাহার প্রোগ্রাম ঠিক করি!

অথচ অহরহই দেখিতেছি, যে-কোনো সময়ে সেই নিঃশঙ্ক জীবনপথের উপর চপল বালকের হস্তনিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ডের মতো দুর্ঘটনা আসিয়া পড়ে।

যেমন, আজকের হারাধনের ব্যাপারটা।

নিঃশঙ্ক হারাধন নিত্যকার মতোই, নিত্যকার পথ দিয়া চলিতেছিল, অকস্মাৎ পথপার্শ্ববর্তী 'মজুমদার বাহাদুরের' বাড়ীর ছাদের কার্নিশ হইতে একখানি ইঁট খসিয়া হারাধনের মাথায় পড়িল।

হারাধন পাড়ার সনৎ উকিলের বাড়ীর চাকর।

মনিব বাড়ীতে হঠাৎ নূতন জামাই আসিয়া পড়ায়, ছুটিতে ছুটিতে বাজারে গিয়াছিল এবং ততোধিক ছুটিতে ছুটিতে ফিরিতেছিল—বড়ো চিংড়ি ও ভালো নৈনিতাল আলু লইয়া।

'মজুমদার বাহাদুরের' বাড়ীর পাশ দিয়া তাহার মাথাটা 'পাস্' করিতে দুই-এক সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগিবার কথা নয়, লাগেও নাই।—তবু—এই ক্ষণিক মুহূর্তের অবসরেই ঠিক হারাধনের ব্রহ্মতালু 'তাক্' করিয়া ইঁটখানা পড়িল।

মাথায় ইঁট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাধন নিতেজ পড়িল এবং মুহূর্তে ভোজবাজীর ন্যায় বোধ হইতে যেন সহরের অর্ধেক লোক আসিয়া হারাধনের আশে-পাশে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

কিন্তু এতোগুলো লোকের 'আহা' 'উহু' 'জল' 'পাখা' 'হাসপাতাল' 'এ্যাম্বুলেন্স' ইত্যাদি দরদী উক্তি ও উদ্বেগের কারণ স্বচ্ছন্দে এতগুলির বক্তব্যকে উপেক্ষা করিয়া হারাধন চৈতন্য-হারা প্রাপ্ত হইল। আর মরিবার সময় কিনা নিঃশব্দে ঘোষণা করিয়া গেল, ইটটা স্বয়ং বিধাতা পুরুষের হস্ত-নিক্ষিপ্ত।

দেখা যায় মরণকালে নাকি মানুষের দিব্য-জ্ঞান জন্মায়। সেই চকিত জ্ঞানের আলোকে হারাধন অলক্ষিত বিধাতার কুটিল হাস্যপূর্ণ মুখ ও ইষ্টক নিক্ষেপোদ্যত উদ্যোতক্ষিপ্ত হস্ত দেখিতে পাইয়াছিল, অথবা চির অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের নির্বোধ সংস্কারের বশে কথাটা বলিয়াছিল, সে এখন আর জানিবার উপায় রহিল না, কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গেই হারাধন চোখ বুজিল।

গোলমালের সূচনাতেই অপরাধীবাড়ীর মালিক বৃদ্ধ রায়বাহাদুর বসন্ত মজুমদার দোতলা হইতে রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছিলেন। একে বৃদ্ধ, তায় ব্লাডপ্রেসারের রোগী, এহেন অভূতপূর্ব দুর্ঘটনায় যেন দিশেহারা হইয়া পড়িলেন ভদ্রলোক। বাড়ীর চাকর তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আনিয়া ফুটপাথেই বসাইয়া দিয়া গেল।

মজুমদারের কৃতবিদ্য বয়স্থ ছেলে দুটিও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। ব্যাপারটা বুঝিবামাত্র একজন তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া থানায় ও হাসপাতালে ফোন করিল ও অপরজন গ্যারেজের চাবি লইয়া ছুটিল গাড়ী বাহির করিতে।

পুলিশ আসিল।

যথারীতি বাড়ীর মালিকের নাম-ধাম টুকিয়া লইল, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিল, অবশেষে 'লাস' চালান দিবার হুকুম দিল। বসন্তবাবুর বড় ছেলে লাসের সঙ্গে গেলো।

ছোট ছেলে গাড়ী লইয়া কোথায় গেলো কে জানে।

বৃদ্ধ মজুমদার বাড়ী গিয়া নীচেরতলার ঘরেই বিছানা পাতিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন আর দোতলায় উঠিবার মতো সামর্থ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

শববাহী গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গেই পথচারী দর্শকেরা যে যার আপন আপন পথ দেখিল। দুই একজন নাছোড়বান্দা শ্রেণীর লোক গাড়ী বাহির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারাও গাড়ী বাহির হইয়া গেলে নানা মন্তব্য করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

রাস্তা ফর্সা হইয়া গেল।

হারাধনের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বালেশ্বর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি কুটীরে বসিয়া বোধ করি তখন কাঁচালঙ্কা ও লবণ সহযোগে 'বাসিভাত' দিয়া প্রাভাতিক জলযোগ সারিতেছিল, তাহারা এতো কাণ্ডের বিন্দু-বিসর্গও জানিল না।

শুধু পাড়ার যে গুটি আষ্টেক দর্শক 'উজ্জ্বল রত্নকে' দিনরাতের মধ্যে অন্ততঃ ঘণ্টা চৌদ্দ পনেরো সময় রায়বাহাদুরের সদর রোয়াকে বসিয়া আড্ডা দিতে দেখা যায়, তাহারা খানিকটা তফাতে একটা গ্যাসপোষ্টের নীচে জটলা করিতে থাকিল।

এতো ভীড়ের মধ্যেও হারাধনের হস্তচ্যুত বড়ো চিংড়িগুলো কাকের উদর গহ্বরে স্থান পাইয়াছিল, আলুগুলোর কি গতি হইল কে জানে। কে জানে কাকে কাঁচা আলুও খায় কিনা!

মোটের উপর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখা গেল বস্তির দুইটা ছেলে মাত্র গোটা তিন-চার আলু লইয়া ডাং-গুলি খেলিতেছে।

সনৎ উকিলের গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন,—"কি রকম দিনে কী রকম কাণ্ড! দিল্লী থেকে জামাই এলো, একটা দিন বৈ থাকবে না, আজকেই এই কাণ্ড!...আর জন্মে আমার কী মহাশত্রুই ছিলো হারাধন! আর দেখো—দুটি মাস কাজ দেখিয়ে দিয়ে—শেষকালে কিনা ঘরে আমার মাথা খেয়ে গেলো গো! অমন চাকর আর পাবো? মাথা খুঁড়ে আমারই মরতে ইচ্ছে করছে!"

সনৎ উকিল কহিলেন- "ও হতভাগা যে একদিন অপঘাতে প্রাণ হারাবে এ আমি আগেই বুঝেছিলাম! যে উজবুকের মতো রাস্তা দিয়ে হাঁটতো!...... কি দিয়েছিলে? দশ টাকার নোট?...... কপালে দণ্ড ছিলো আর কি! কে জানে—এখনও কতো দণ্ড আছে কপালে—"

দুই মাসের পুরানো চাকরের জন্য এর চাইতে অধিক শোকপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। করিলেই বাড়াবাড়ি ঠেকিত।

মানুষ মাত্রেই মানবতাবিহীন, একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে।

হারাধনের মনিব-বাড়ী ছাড়াও পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ীতেই হারাধনের এই শোচনীয় মৃত্যু লইয়া আলোচনা ও আপশোস হইতে থাকিল এবং সকলেরই দৈনন্দিন কর্মধারায় অল্পবিস্তর ছেদ পড়িল বলা চলে।

কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির পরিবর্তে মাথায় ইঁট পড়িয়া মরার গৌরবে' জগতে নিতান্ত অখ্যাত হারাধন কিছু বিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইল।

হারাধনের সামান্য কয়দিনের মনিব সনৎ উকিল হারাধনের বালেশ্বর জিলায় অবস্থিত কুটীরের ঠিকানা জানিতেন না, জানিবার কথাও নয়, কাজেই "পরিচয় অজ্ঞাত" ঐ পরিচয়ে কর্তৃপক্ষ লাস জ্বালাইয়া দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হারাধনের গল্প এইখানেই সমাপ্ত হইল।

কিন্তু গল্পের পরেও থাকে গল্পের পরিশিষ্ট। মৃত্যুর পরে যেমন শ্রাদ্ধ।

হারাধন মারা পড়িল বটে, কিন্তু 'হারাধনে'র না হইলেও প্রায়-বেওয়ারিশ যে দশটি ছেলে' পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইত, পরিশিষ্টটা তাহাদের লইয়া!

অনেক সময় মৃত্যুর পর 'শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ায়'। গড়াইবার ব্যাপারে কিভাবে কাহার হাত থাকে বলা শক্ত।

কে জানে মৃতের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাশীলেরাই শ্রাদ্ধকে গড়াইয়া দেয় কিনা।

তবে এক্ষেত্রে দেখা গেলো—যে ছোকরা কয়টিকে হারাধনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলিয়া সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র হেতু ছিলো না, তাহারাই শ্রাদ্ধকে গড়াইয়া দিবার ভার লইয়াছে।

পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে আলোচনাটা যখন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তখন সহসা রাস্তায় একটা উৎকট হৈ-চৈ চীৎকার উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক ইঁট ছোড়ার 'দমাদম' শব্দ!

পাড়ার কর্তারা তখন অনেকেই অফিসে, আদালতে। গৃহিণীরা সচকিতে ছুটিয়া আসিলেন জানালায়, বারান্দায়, ছাতে। 'হৈ-চৈ' কান্ডের কারণ বুঝিবার উপায় ছিলো না, তবে দেখা গেলো, মোড়ের মাথায় মজুমদার বাহাদুরের সুদৃশ্য মোটরখানা 'ইঁটাহত' অবস্থায় অনড় দাঁড়াইয়া আছে। আর গাড়ী হইতে নামিয়া পড়া 'ছোট মজুমদারকে' ঘিরিয়া রীতিমত একটি ব্যূহ রচনা হইয়া গিয়াছে।

নীরব ব্যূহ অবশ্য নয়।

সম্মিলিত দশটি কম্বুকণ্ঠে উচ্চ নিনাদ ধ্বনিত হইতেছে—"মার শালাকে" ......"ধর শালাকে' '......'শালা গাড়ী চড়ে বড়মানুষী দেখাতে এসেছে"...... "মেরে তক্তা বানিয়ে দে" ......"দে, শালাকে হারাধনের কাছে পাঠিয়ে দে—"

বেতিনীরা অবাক বিস্ময়ে দুগা-

অনুসন্ধান করেন—রাস্তার দরজায় খিল দেওয়া আছে কিনা। বাহিরের গোলমাল অকস্মাৎ না ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে।

পরবর্তী দৃশ্য এই......

ছোট মজুমদার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া, ঘড়ি-চশমা ভাঙিয়া, আঙটি মনিব্যাগ হারাইয়া, কোনগতিকে মাথা বাঁচাইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং সম্ভবতঃ সেই আক্রোশে মজুমদার ভবনের উপর 'দমাদ্দম' শব্দে ইঁট পড়িতেছে!

শার্শির কাঁচ চূর্ণ, দেওয়ালের পলস্তারা বিধ্বস্ত ও বারান্দার কার্ণিশ ক্ষত-বিক্ষত!

ওদিকে আহত গাড়ীখানা তেমনি অনড় দাঁড়াইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

রহিয়া রহিয়া কর্মিবৃন্দের উল্লাস ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে......'শালার বাড়ীখানাকে ইঁটিয়ে শেষ কর না রে'—, 'বুড়ো ঘুঘু গেলো কোথায়, ফুটপাথের ওপর সিংহাসন পেতে বস না চাঁদ ..' 'চোরপোরেশন'কে ঘুস দিয়ে এসে পার পাবে ভেবেছো বাবা?'...ইত্যাদি ইত্যাদি

দর্শক মহিলারা শিহরিত কলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে থাকিলেও সংলাপ এবং দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন অংশকে জোড়া দিয়া দিয়া ও অনুমানের আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া মূল নাটকটি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

বোঝেন—বড়লোকের ছাতের ইঁট পড়িয়া পথের গরীবের প্রাণ যাওয়ায় পাড়ার সাম্যবাদী যুবকেরা ক্ষেপিয়াছে।...এই নাট্যাভিনয় তাহারই কিঞ্চিৎ বহির্বিকাশ মাত্র।

ঘরে ঘরে, বারান্দায় বারান্দায়, জানলায় জানলায়, মহিলা মহলের মধ্যে স্তম্ভিত ও বিক্ষুব্ধ মন্তব্যের আর অন্ত থাকে না। মূল সুরে অভিন্ন।

খানিকটা নমুনা এই—"একী সর্বনেশে কান্ডরে বাবা, ভদ্দর লোকের ঘরে এমন সব খুনে ছেলে জন্মায় কি করে!......নিয়তি বলে কথা! হারাধনের কপালে ছিলো—অপঘাত মৃত্যু! ওদের কি দোষ?......ওরা কি ইচ্ছে করে ইঁট ছুঁড়েছে?......আর এই যে তোরা ইঁট ছুঁড়ে পয়মাল্ল করছিস, এতে দোষ হচ্ছে না?...তোদের ইঁট যদি কারুর মাথায় লাগে? পুরনো বাড়ীর কোথায় কোনখানে নোনা ধরছে, ওরা জেনে রেখেছে? পড়লে তো ওদের ছেলেপুলের মাথাতেও পড়তে পারতো!......আহা-হা........ অমন গাড়ীখানাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারলো গো! নিরীহ ভদ্দরলোকের এ কী লোকসান করিয়ে দেওয়া!...... নির্বিরোধী মানুষ ওঁরা—কখনো কারুর ক্ষেতি করেননি। ওদের ওপর নাহক একি জুলুম! ...আহা, অমন মানমান ছেলেটাকে কি অপমানটাই করলো। আবার বুড়ো ভদ্দরলোককে শুদ্ধু যাচ্ছেতাই গালাগাল করছে গো! ......যতো সব নিষ্কর্মা বখাটে ছোঁড়া জুটেছে পাড়াতে। কাজ নেই তাই অকাজ করবার তালে বেড়াচ্ছে......" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকে আবার ইহাদের মা-বাপকেও অভিযুক্ত করেন।

ভুলিয়া যান, মা-বাপের হাতের বাহিরে যাওয়া ছেলে ভিন্ন এমন কাজ আর কেহ করে

—— [illegible]

শ্রদ্ধাশীল। পরিবারের প্রত্যেকেই ভদ্র ও অমায়িক, পরোপকারীও বলা চলে।' পাড়ার সকল সংসারের 'উৎসবে ব্যসনে'...ইত্যাদি সর্ববিধ প্রয়োজনে ইঁহারা বাহিরের ঘর দু'টি ছাড়িয়া দেন, আবশ্যকীয় বড়ো বাসন সরবরাহ করেন, কার্পেট, সতরঞ্চ, বরাসন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেন, সময় সময় বামুন, চাকর পর্যন্ত ধার দেন।

'বড়োলোক' বলিয়া ঘৃণা করিবার কোনো কারণ আজ পর্যন্ত ঘটে নাই।

বাড়ীর নামকরণটাও শ্রদ্ধারই অভিব্যক্তি বলা চলে।

একদা কর্তা মজুমদার কোনো এক সরকারি অনাচারের প্রতিবাদে 'রায় বাহাদুর' খেতাব বর্জন করিয়াছিলেন, সেই বীরত্বব্যঞ্জক বাহাদুরীকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে 'মজুমদার বাহাদুর' আখ্যা দেওয়া হয়। তদবধি মজুমদার বাহাদুরের বাড়ীই বলা হয়।

বাড়ীটা প্রকান্ড বটে, তবে প্রাচীন, কর্তার পিতার আমলের। বহুবার বহু অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে—কিন্তু কোন রন্ধ্রে যে একখানি অসতর্ক ইঁট স্খলিত অবস্থায় উদ্যত হইয়াছিল কে জানে!

ইঁটখানা শুধু হারাধনের মাথা ভাঙিয়াই ক্ষান্ত হইল না, মজুমদার গোষ্ঠীর কপালও ভাঙিল। সাম্যবাদী যুবকের দল নিমিত্ত মাত্র!

নিমিত্তেরও আবার নিমিত্ত থাকে। তাহা এই—

মজুমদারদের রোয়াক আলো করিয়া তাহারা যখন বিড়ির ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আড্ডারূপ মহৎ কর্মে লিপ্ত থাকিত, তখন তাহাদের উপর মজুমদারদের পক্ষ হইতে যে ভাব প্রকাশ পাইত, তাহাকে ঠিক ভক্তিভাব বলা চলে না। প্রত্যেকে প্রতিবার আসা-যাওয়ার পথে ইহাদের প্রতি যে ধরণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাইতেন তাহাকেই বোধ করি সাধু ভাষায় 'অবজ্ঞা' বলে।

কাজেই বহু দিনের পুঞ্জীভূত উত্তাপ, এই একটা দেশলাই কাঠিকে উপলক্ষ করিয়া মহোৎসাহে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

পুরোপুরি তিনবেলা ইঁট লাঠি ও কদর্য কটূক্তির প্রহরায় অবরুদ্ধ থাকিয়া উত্যক্ত মজুমদাররা ফোন করিয়া পুলিশ আনাইল। কারণ ডাক্তারের আসার পথও নিরাপদ ছিলো না। অথচ কর্তা মজুমদার রক্তচাপ বৃদ্ধিতে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটাইতেছেন। তাঁহার স্নায়ুর উপর কম ধকল তো চলিতেছে না!

পুলিশ ভ্যান আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার ভোজবাজীর খেলা দেখা গেলো। অতোগুলি বীরপুরুষ তাহাদের লাঠি ও সংগৃহীত ইঁটের স্তূপ লইয়া মুহূর্তে যেন মন্ত্রবলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পুলিশ আসিয়া মজুমদারদের এজাহার লইল, পাড়ার দুই একজনকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিল এবং শেষ পর্যন্ত হাতের কাছে কাহাকেও না পাইয়া, পুলিশের প্রতি কৌতূহলাক্রান্ত পথে দাঁড়াইয়া থাকা গোটাকয়েক বস্তির ছেলেকে 'ভ্যানে' তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

ভ্যানটা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রে রে রে রে' শব্দে বীর যুবকরা আবার ভোজবাজীর

(ইহার পর ১৯১ পৃষ্ঠায়)
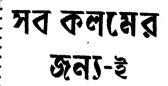
মাইশোর
শিফন
জর্জেট
ও
ব্যাঙ্গালোর
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

প্রিফেক্ট
আপনাদের
পূজার অভিনন্দন
জানাইতেছে।
Prefect
মোদ সোপ ওয়ার্কস,
মোদিনগর, ইউ-পি

সব কলমের
জন্য-ই

BLUE BLACK
KAJAL-KALI
KAJAL-KALI
কাজল কালি
(ইউনিভার্সাল)
উৎকৃষ্ট "লিকুইন"
সলভেন্ট (SOLVENT) যুক্ত
প্রথম ভারতীয়
ফাউন্টেন পেন কালি-১৯২৪
কেমিক্যাল এসোসিয়েশন • কলিকাতা-১

গিনি স্বর্ণের
নতুন নতুন ডিজাইনের
নিখুঁত অলঙ্কার তৈরীই
আমাদের বৈশিষ্ট্য।
ফোন:-
সাউথ ২৬৩৯

TURNING ENERGY INTO COMFORT
IS A DEVINE BLESSING OF
THE MOTHER
IEW
MAY WE BECOME WORTHY OF
HER BLESSINGS

আশ্বিনের ঝড়
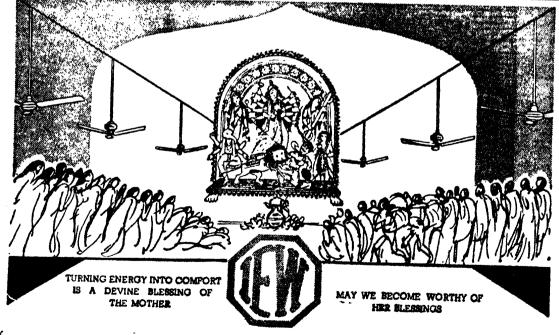
(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

:তে ধাঁধের পরিকল্পনার জন্য ব্যস্ত হয়ে

খৃষ্টাব্দে ক্যানিং-এর ঝড়—১লা, ২রা নভেম্বর

।শেষজ্ঞগণ বলেন যে, ১৮৬৪ সালের ।ঙ্গোপসাগরের ঝড়ে কলকাতার যত ক্ষতি ল, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১লা, ২রা রের ঝড়ে তার চেয়ে ক্ষতি হয়েছে অনেক বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব অংশের স্থান থেকে এর উৎপত্তি। সাগর টর পূব দিয়ে মাতলা নদীর মুখে পোর্ট- : ও বসিরহাট ছিল এই ঝড়ের কেন্দ্র। থেকে উত্তর, উত্তর-পূর্ব দিকে কুমার- পুর ও সিরাজগঞ্জের পশ্চিম অভিমুখে যায়।

য়েলা নভেম্বর সকাল থেকেই ঝড়ের । একটু একটু করে পাওয়া যায়। তারপর র অন্ধকারও ঘনিয়ে এল, আর আব- াতে ও দুর্যোগের ঘনঘটা লেগে গেল। হাওয়া বইতে লাগল ক্রমশঃ জোরে আরও —অবশেষে রাত দেড়টা থেকে তিনটের (২রা নভেম্বর) প্রচণ্ডতম বেগ নিয়ে তার উপর আক্রমণ চলতে লাগল। ধারে বৃষ্টির ফলে সহর জলে ভেসে গেল। ার দাপাদাপিতে দরজা জানালা ভেঙ্গে ভিন্ন হয়ে লাগল ছুটে যেতে। গভীর ; অন্ধকারে এই ঝড়ের মাতন মনে হ'ল ; ভয়াবহ। ১৮৬৪ সালের মত এবছরের জলোচ্ছ্বাস তেমন উঁচু হয়নি, তার ফলে জের ক্ষতি হয়েছিল পূর্বেকার অপেক্ষা ক কম। কিন্তু তাহলেও লোকজন, গরু- ;, ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশী। । পর খবর পাওয়া গেল যে, সহরতলীসহ াত্র কলকাতাতেই মৃত্যুসংখ্যা ১০১৬, বাড়ী ১৬০খানি ও নানা ধরণের কুঁড়েঘর হয়েছে উনত্রিশ হাজার। নদী দিয়ে যত দেহ ভেসে যাচ্ছিল তাদের সংখ্যাও ভয়াবহ। রে জলোচ্ছ্বাস তেমন প্রবল না হ'লেও ঝড় য়েছিল তাতেই ঘাটে-বাঁধা কতক জাহাজের র গেল ছিঁড়ে, তাদের একটা আর একটার গিয়ে পড়ে ধাক্কা দিয়ে জখম করতে ল। কোন রকমে টাল সামলানো গেল কিন্তু অক্ষতভাবে নয়, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে।

কলকাতার বন্দরে কোন জাহাজ ডুবি । বটে, কিন্তু মাল বোঝাই ছোটবড় নৌকা হয়েছিল অসংখ্য। পরদিন ভোরবেলা ভাগীরথীর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল দুই রর পাশে পাশে ভাসছে বাক্স-পেটরা, ভাসছে ।, আরও কত রকম রকম জিনিষপত্র। এত বোঝাই নৌকা ডুবি হয়েছিল এই ঝড়ে বন্দরের কাজকর্ম অধিকাংশই বন্ধ হয়ে রইল কদিন। চাল-ডাল-পাট-কাপড় ইত্যাদি াই যে সকল নৌকা জলের তলে গিয়েছিল কতকগুলো ফিরে তুলতে যেমন সময় লাগল, । দ্ধারের জন্যও অর্থব্যয় হয়ে গেল প্রচুর। কাতার পূর্বদিকে যে খাল আছে, ২১৫ খানা । তাতেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য কখানা পরে ফিরে পাওয়া গিয়েছে। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন কোম্পানীর গার্ডেন-রীচের একখানি ফ্ল্যাট ও 'দিল্লী' নামক একখানি ষ্টীমার ডুবে যায়। সরকারী লাইটশিপ 'হোপ' স্যাণ্ডহেডের পূর্বদিকের খালের প্রবেশমুখ থেকে ঝড়ে কোথায় যে কি হ'য়ে গেল, অনেক সন্ধানেও তার কিছুই জানা গেল না।

এই ঝঞ্ঝায় কলকাতার অনতিদূরে পোর্ট-ক্যানিংএর ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে সর্বনাশা। সেখানে ঝড়ের সঙ্গে জল এসেছিল পাঁচ ফুট উঁচু হ'য়ে, কিন্তু সে জলোচ্ছ্বাসের বেগ এত প্রবল ছিল যে, তাতে ষ্টেশনঘর, মালগুদাম ও রেলওয়ে হোটেলটিকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর store hulk 'হাসেমি' রেলওয়ে জেটির অধিকাংশই ভেঙ্গে নিয়ে চলে গেল। পানীয় জলের ট্যাঙ্ক জলোচ্ছ্বাসের নোনাজলে অব্যবহার্য হয়ে পড়ল। মৃত বা আহত লোকদের সংখ্যা দাঁড়াল ৯০, আর মৃত গৃহ-পালিত জন্তুর সংখ্যাও হ'ল প্রায় পাঁচশত।

চব্বিশপরগণার অবশিষ্ট অংশও এই ঝড়ে কম বিধ্বস্ত হয়নি। কলকাতা থেকে ঝড় এগিয়ে চলল ইছামতী নদীতীরে বসিরহাট। এদিকটায় অনেকগুলি গ্রাম একেবারে পাইকারী হারে ঝড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। এতে লোকও মারা পড়েছিল বেশী। বারুইপুরে, ডায়মণ্ড-হারবার, আঠারোবাঁকা, বসিরহাট, গোবরডাঙ্গা ও সাতক্ষীরার জনবহুল অঞ্চলগুলি ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সাগর দ্বীপ থেকে যে বান এসেছিল তা প্লাবন সীমারেখার উপর ছ-ফুট উঁচু দিয়ে কুলপত্তন ও কোবাদক নদী পর্যন্ত ছুটে গেল। যশোহর, নদীয়া এমন কি ঢাকা বাখরগঞ্জ পর্যন্ত ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে একটি সাইক্লোন রিলিফ কমিটি গঠিত হ'ল। সরকার জানালেন, মোট যত চাঁদা উঠবে, তাঁরাও তত দেবেন। ১০ হাজার ৯৭৬ টাকা চাঁদা উঠল, গভর্ণমেণ্ট দিলেন ১০,৯৭৬্, মোট পরিমাণ দাঁড়াল ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৫২ টাকা। রিলিফ কমিটির মারফতে এই টাকার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫১৪ টাকা বিলি করা হয়। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানী প্রতিদিন প্রত্যেক ট্রেণের সঙ্গে ১৫০০ গ্যালন করে পানীয় জল পাঠিয়েছিলেন, 'পাইয়োনীয়ার' নামে একখানি ষ্টীমার পানীয় জল পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে পূর্ব ক্যানিং-এর অত্যধিক ঝটিকাক্ষুব্ধ অঞ্চলে সাহায্য দিতে বেড়িয়েছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই-১৬ই অক্টোবরের ঝড়

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই-১৬ই অক্টোবর যে প্রচণ্ড ঝড় হয় তাহাতে সমগ্র বর্ধমান বিভাগের জিলাগুলি বিধ্বস্ত হয়। বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠে ১৫ই অক্টোবর উত্তর বালেশ্বরের দিকে গিয়ে দিনদুপুর থেকে রাতদুপুর পর্যন্ত তার বিক্রম প্রকাশ করে, আর মেদিনীপুরের উপকূলে কণ্টাই বা কাঁথির অনতিদূরে বিশ মাইল diameter জুড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ঘূর্ণির মতো পাক দিয়ে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এই ঝড়ে মেদিনীপুর ষ্টেশন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সহরে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল, আর সমগ্র জিলায় মৃত্যু-সংখ্যা হয়েছিল ৩,০৪৯, গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যুসংখ্যা ১৭ হাজার ৫০০। মেদিনীপুর থেকে ঝড় চলল ঘাটাল ও জাহানাবাদ এবং সেখান থেকে বর্ধমান। এই বর্ধমানে ঝড় এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল যে, বাড়ীঘর গাছপালা গেল ধ্বংস হয়ে। যদিও এই ঝড়ে মেদিনীপুরে ক্ষতি হয়েছিল আরও বেশী। বর্ধমানে গির্জার চূড়া ভেঙ্গে পড়ে, খানা জংশনের নিকট ডাউন প্যাসেঞ্জার রেলওয়ে ট্রেণ নিল উড়িয়ে (blown over), ২১ হাজারের অধিক গৃহ বর্ধমানে ভেঙ্গেচুরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মৃতের যে বিবরণ পৌঁছল তাতে জানা গেল হুগলী জিলায় মারা গেছে ৯ জন, বর্ধমানে ২৯, মুর্শিদাবাদ জিলায় ২৭, নদীয়ার ৭, রাজসাহীতে ৪। বাঁকুড়া ও বীরভূমেও মৃদু আকারে ঝড় টের পাওয়া গিয়েছিল।

সিউড়ির দু' তিন স্থানে দেখা গেল যে, এক এক স্থানে খানিকটা জায়গার মধ্যে সব গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে, দেখে মনে হয় যেন

তোমারে যাহা বলিতে চাই সে কথা বলা হলনা,
তোমারে যাহা শুধাতে চাই হলনা তাও শুধানো,
বলিনু যাহা শুধানু যাহা সে সব শুধু ছলনা,
মনের মাঝে ছিল যে কথা সেও কি তুমি না জানো?
ভোরের পাখী প্রথম ডাকে ঘুম ভাঙ্গাল যখন,
ভেবেছিলাম অমনি করে কণ্ঠ কেন জাগেনা,
যে নাম ধরে মনে মনে ডেকেছি দিবা রজনী
সে নাম কেন আপনা থেকে ডাকার বেলা আসেনা!
মর্মরিত শালের তলা শীতের রোদে ছেয়েছে,
গাছের ফাঁকে একটু আকাশ একটু বনের
নীলাঞ্জন,
পায়ের কাছে পাথরখানায় গাছের গুঁড়ি নেমেছে,
সূর্য আঁকে সোনার জলে প্রজাপতির
পাখার কোণ্।
নীলার আভায় আকাশ ঝলে
সোনার আভায় ধরণী,
বাঁধনভাঙ্গা আলোর স্রোতে কান্না কেন গলেনা,
আমার প্রাণে যে গান বাজে পায়না কোন সরণি,
তোমার কানে সুরের ফুলে তাইতো তারা ঝরেনা!
গাছের তলে শালিখ ডাকে গাছের ওপর
ঘুঘুর স্বর,
স্তব্ধ বনের কোণে কোণে ঝরাপাতায় গুঞ্জরণ,
শব্দ ভাসে মাটির পরে শব্দ ভাসে আকাশ পর,
মুক্তি কেন পেলনাকো ভাষার মাঝে আমার মন!
যে ফুল ফোটে আমার মনে সন্ধ্যা এবং প্রভাতে,
মালা হয়ে ঐ হৃদয়ে তোমার কেন দোলেনা,
পারিনা যদি গানের জলে স্রোতের মাঝে ভাসাতে,
মানস হতে কোথায় যাবে হায়রে তারা ভোলে না!
এই যে আলো ভুবন ভরা, এই যে আলো আকাশে,
শিশির হতে লতাপাতায় এই যে আলো ঝরানো,
বনস্থলী মুখ তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে কি আশে,
তৃণের শ্যামে আকাশ নীলে এই যে
আলো জিলানো,
ঐ আলোতে চোখ পড়েছে পাথরতলে যা ছিল,
ঐ আলোতে সুপ্তিধ্বংসের দৃষ্টি মেলে অরণ্য,
তোমার চোখে ঐ আলোতে আজও ধরা না দিল;
ঐ আলোতে দৃষ্টিতলে বৃথাই খোঁজ কি জন্য!

সেখানটায় কামান বর্ষণ হয়ে গিয়েছে। এক স্থানের গাছপালা সব ধরাশায়ী, আর তারই নিকটে সব গাছ অক্ষত, সমুন্নত শিরে যেমন ছিল তেমনি একেবারে ঠিক ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ডালপালা পাতা—কিছুরই কোন ক্ষতি হয়নি। এই ঝড়ের সঙ্গে ধারাবর্ষণও চলেছিল খুব বেশী। মেদিনীপুরে বৃষ্টি হয়েছিল দশ ইঞ্চি, মুর্শিদাবাদে ষোল ইঞ্চি, বর্ধমানে ৭·৪৩, ঝড়ের সময় বহরমপুরে ৬ ইঞ্চি ও রংপুরে ৭ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল। মুর্শিদাবাদে সাইক্লোনের তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। ১৬ই অক্টোবর সকাল আটটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলেছিল সাইক্লোনের খেলা। গঙ্গা পার হ'য়ে রাজসাহী গিয়ে সবশেষে তা শান্ত হ'ল। হুগলী নদীতে অনেক মাল বোঝাই নৌকা ডুবলো, গ্রাম ও সহর থেকে ৩৩৯২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সবাই জানতো যে, প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চয়ই এর ঢের ঢের বেশী। কলকাতা সেন্ট্রাল কমিটি বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে এক লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবরে বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালীর ঝড়

বাংলা সন ১২৮৩ বা ইংরেজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ঝড়, পূর্ববঙ্গে তিরাশী সালের ঝড় নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সুদীর্ঘকাল এর ভয়াবহতার বিবরণ পূর্ববঙ্গবাসীদের মুখে বংশানুক্রমে চলে এসেছিল। মা, দিদিমা, ঠাকুরমা, ঠাকুর্দার মুখে শোনা সে কাহিনীগুলো যেমন চমকপ্রদ তেমনি চাঞ্চল্যকর, বিরাট দৈত্যের কাহিনীর মতই তা ছিল আবেশময় অথচ ভীতিপ্রদ। মেঘনার সাগর মোহনায় সন্দ্বীপ, হাতিয়া, দক্ষিণ সাবাজপুর বা ভোলা প্রভৃতি অঞ্চলেই এ ঝড়ের ভয়াবহতা দেখা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশী। রেজিষ্ট্রেশনের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ বিভার্লির সংখ্যাতত্ত্ব নির্ধারণের বিশেষ খ্যাতি ছিল, তিনি নিজে এ সকল স্থান পরিদর্শন করে, খুব সতর্কভাবে হিসেব করেও না বলে পারেননি যে, '৮৩ সনের এই ঝড় তিন হাজার বর্গমাইল জুড়ে তার রুদ্রলীলা প্রকট করেছে, আর তাতে ১০ লক্ষ ৬২ হাজার অধিবাসীকে হঠাৎ নিরুপায় হয়ে নিদারুণ বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে। খুব কমপক্ষে এই ঝড়ে ২ লক্ষ ১৫ হাজার নর-নারীর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এটাও বিভার্লি সাহেবের অনুমান মাত্র। তিনি নিজেই এ বিষয়ে বলেছেন যে, 'এ একটা আনুমানিক হিসাবমাত্র, প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যা এখনও কিছুকাল জানা সম্ভব হবে না, হয়তো কোনকালেই জানা যাবে না।' কোন গ্রামে দেখলাম সেখানকার শতকরা ত্রিশভাগ লোক মরে গেছে, কোথাওবা এই সংখ্যা মনে হয়েছে শতকরা ৫০, আবার কোন স্থানে গিয়ে দেখা গিয়েছে, সেখানে শতকরা ৭০ জন-এর মৃত্যু হয়েছে। খুব কম করে বললেও বলতে হয় যে, মানুষের যেভাবে জীবন নষ্ট হয়েছে, তাতে আঁতকে না উঠে উপায় নেই

স্যার রিচার্ড টেম্পল ছিলেন সে সময় বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণর। নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে, ঘরে ঘরে প্রশ্ন করে যে তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তার 'মিনিট' থেকে কতকাংশ

"১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবরের রাত্রে বঙ্গোপসাগরে এক ভয়ানক ঝড় হয়। এই ঝড়ের বায়ুবেগ ভীষণ হ'লেও, সেটা তেমন ধ্বংসের কারণ হয়নি, ঝড়ের সঙ্গে দশ ফুট থেকে বিশ ফুট উঁচু হয়ে যে জলোচ্ছ্বাস প্রবল বেগে ছুটে চলেছিল, তাতেই ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশী। কোন কোন স্থানে বাধা পেয়ে জল বিশ ফুটেরও বেশী উঁচুতে উঠে প্রবাহিত হয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় জোরে হাওয়া বইতে লাগল, আবহাওয়াটা মনে হ'ল অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া। গরমটাও কেমন বিশ্রী বিরক্তিকর। তবু কারো মনে কোন আশংকার কারণ ঘটেনি। যে যার রাত্রির বিশ্রামে শুয়ে পড়ল। রাত এগারোটার আগে অকস্মাৎ হাওয়াটা সতেজ হয়ে উঠল। দুপুর রাত্রির কাছাকাছি চীৎকার শুনা গেল, 'বন্যার জলে ভেসে গেল', সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ফুট উঁচু হয়ে জল ভেঙ্গে পড়ল চতুর্দিকে। একটা উঁচু ঢেউ চলে না যেতেই এল আর একটা। তারপর আবার আর একটা। পর-পর এই তিনটে তরঙ্গপ্রবাহ দ্রুতবেগে সামনের দিকে চলে যাওয়ার পরে খুব ঠান্ডা হাওয়া দিতে লাগল। ঘরের ছাদে উঠে পড়ারও আর সময় পাওয়া গেল না, জলোচ্ছ্বাস উঁচু হয়ে এল প্রবল বেগে, আর সেই বন্যার বেগেই মানুষকে ঠেলে নিয়ে গেল কড়িকাঠের ওপর অথবা কুঁড়ে ঘরের খড়ের চালায়। কিন্তু অনেকের বাড়ীর চারিদিকেই বৃক্ষরাজি পূর্ণ। জল এগোচ্ছিল উঁচু হয়ে আর সেই সঙ্গে মানুষ আপনা থেকেই ঠেকতে লাগল গাছের ডালে বা উচ্চ বৃক্ষশীর্ষে। যারা গাছে কিংবা ঘরের ছাদে-চালে আটকে পড়ে থাকতে পারল, তারাই রইল, আর যারা তা পারলে না, তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল চির নিরুদ্দেশের পথে। দূরে দূরে নরদেহ নিল ভাসিয়ে, পরে যদি বা তাদের দেহ পাওয়া গেল, তবু লোকটা যে কে, তা চিনে বার করার উপায় ছিল না। জমির উপর জল জমেছে—তাতে শবদেহগুলিতে ধরেছে পচন। মাটিতে যে পুঁতে ফেলবে তারই বা সুযোগ কোথায়? জমির উপরে ত তখনও জল দাঁড়িয়ে। ঝড়ের ঝাপটায় বঙ্গোপসাগর থেকে জাহাজী খালাসীদের মৃতদেহ তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ভিতর দিকে। ঢেউ-এর টানে সেগুলো এদিক-ওদিক ভেসে চলতে লাগল। চট্টগ্রামের সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলি দেখা গেল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। আর স্রোতের টানে তারই নিকট দিয়ে ভেসে আসচে কুটীর, চালা আঁকড়ে ধরে, যারা তখনও কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে।

স্থানীয় দেশী সরকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই মরে গিয়েছিলেন এই প্লাবনে ডুবে—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ইনস্পেক্টর, সিভিল জজ, নোটারী ও অন্যান্য দেশীয় কর্মচারী প্রায় সকলেই। গৃহপালিত জন্তু গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া যে কত ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার কোন লেখা-জোখা নেই। সাঁতার জানে বলে কতকগুলো মোষ দলবদ্ধভাবে সাঁতরে আত্মরক্ষা করেছিল। ধানের ফসল গেল ধ্বংস হয়ে। এর পরে সচরাচর যা ঘটে থাকে, সেই কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিতেও বিলম্ব ঘটেনি না। ঘরে ঘরে চলছে কলেরা। এর কিছু পরে আবার ধেয়ে এল আর একটি ঝড় হাওয়া আর বৃষ্টির সঙ্গে নিয়ে। জনসাধারণ দ্বিতীয়বারের এই ঝড়ের নাম দিয়েছিল 'ভূতের ঝড়'। কেহ … প্রথম ঝড়ে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদেরই ভূতগুলো আবার অপর সকলকে মারবার জন্য ঝড় নিয়ে এসেছে। শীতের হাওয়ায় মুক্ত মাঠে গরীবদের হাড় করতে লাগল ঠক্ ঠক্, ঝড় থেকে যারা রক্ষা পেয়েছিল, তাদের আবার কলেরায় মরার উপক্রম হ'ল।

১৮২২ খৃষ্টাব্দেও মেঘনার উপর দিয়ে একবার ঝড় গিয়েছিল এবং তার গুরুত্বও এর চেয়ে খুব কম ছিল না, তবু অধিকাংশ লোকই বলতে লাগল যে, গত অর্ধ শতাব্দী বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন প্রলয়ঙ্কর ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।

১২ শত তিরাশী সন বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ঝড়ের অনেক পরে সরকারী কর্মচারীদের মারফতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে, ৯৮,৯৪৫ জন মৃতের মধ্যে চট্টগ্রাম জিলার ২,৯০১, নোয়াখালী ৪৩,৫৪৪ এবং বাখরগঞ্জ ৫২,৫০০, ঝড়ের পরে কলেরায় মারা গিয়েছিল ৩৭,৬৬২ জন। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারীর আগে কলেরার প্রকোপ প্রশমিত হয়নি। এই সাইক্লোনে মোট প্রায় দেড় লক্ষ লোক মারা গিয়েছে—সরকারী কর্মচারিবৃন্দ তাঁদের ওপরওয়ালাদের নিকট এরূপ হিসাব পাঠিয়েছিলেন।

উড়িষ্যার ঝড়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যায় যে ঝড় হয়েছিল তার প্রচন্ডতা অনেক কাল মনে রাখবার মতো। সকালবেলা ৬-২০ মিনিটের সময় দেখা গেল সাগর জল পনর ফুট উঁচু হ'য়ে ফলস পয়েন্ট-এর ওপর ভেঙ্গে পড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেই পনর ফুট উঁচু ঢেউ দেখে প্রথম মনে হ'ল মেঘের সারি, তারপর যেন একটা ধোঁয়া। তার পরেই বুঝা গেল, ও একটা প্রচন্ড বান। পথে আড়াই শত বর্গমাইল পরিমিত স্থান ডুবিয়ে দিয়ে গেল। ১১খানা গ্রাম সম্পূর্ণরূপে নিয়ে গেল ভাসিয়ে। প্রত্যেকটি মানুষ স্ত্রীলোক, শিশু সেই তরঙ্গে ডুবে মরল। আরও দেড়শত গ্রাম চাষের জমির মতো সমতল হয়ে গেল। শস্যগুলি গেল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে। তবে সেখানকার একদল লোক অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। ঝড়ের তুফানে প্রায় পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। মহানদীর মুখের কাছে সমুদ্রোপকূলবর্তী কটক জিলার একাংশ গিয়েছিল ডুবে। বালেশ্বর জিলার ক্ষতি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম। সমুদ্রোপকূলে খালের বাঁধ শক্ত থাকায় প্রায় একশো বর্গমাইল স্থানে আর সমুদ্রের নোনা জল প্রবেশ করতে পারেনি। ভবিষ্যতে যাতে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতি করতে না পরে সেজন্য ফলস পয়েন্ট এর সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটা আশ্রয় নির্মাণ করা হ'ল।

ঢাকা ও ভদ্রেশ্বরের ঘূর্ণি—৭ই এপ্রিল ও ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৮

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল (চৈত্র) সন্ধ্যার দিকে ঢাকায় এক প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যা আরম্ভ হয়। মাত্র কয়েক মিনিটকাল এর স্থিতিকাল হ'লেও এইটুকু সময়ের মধ্যেই দু'শ পা প্রস্থ ও সাড়ে তিন মাইল লম্বা স্থানের উপর দিয়ে চলে যাবার সময় ঘূর্ণিটা যা ক্ষতি করেছিল, তা অসাধারণ। ১৩০ জন লোকের মৃত্যু হল, ১২০০র বেশী লোক হ'ল গুরুতররূপে আহত। সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল প্রায় ৭ লক্ষ টাকার। লালবাগের

জলযোগ　　　　　　　　　　　　ফোটো—মনু বসাক

নগ ব্যারাকের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর রণের ঘরবাড়ীও ভেঙেছিল অনেক।

এরই তিন সপ্তাহ পরে ২৩শে এপ্রিল রাত টার সময় হুগলী জিলার শ্রীরামপুরের টস্তী ভদ্রেশ্বর সহরে এমন এক প্রচন্ড ঝড় আরম্ভ হ'ল যে, পাঁচ থেকে সাত মিনিটের ই তা ২৫,০০০, টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করে দছিল। এই ঝড়ের এতটুকু সময়ের মধ্যেই জন লোক মরে গিয়েছিল আর জীবজন্তুর সংখ্যা উঠেছিল চার শতে।

মের ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাস, ২৪শে অক্টোবর ১৮৯৭

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর রাত্রিতে াম জিলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ন্ত যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল, তার রুদ্রলীলায়] জিলাবাসী বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু ঢর বিপদ অপেক্ষা প্লাবন বা বানে ক্ষতি হ'ল ও বেশী। চট্টগ্রাম সহরের উত্তর দিকে চৌদ্দ ল ও কক্সবাজারের দক্ষিণ দিকে ৪ মাইল, সত্তর মাইল স্থানে এই ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ব্যাপ্ত হয়েছিল। সব স্থানেই আঘাত যেমন র, তেমনি প্রচন্ড। দক্ষিণ দিকে মহানদীর র ডেল্টা। এই ডেল্টার নীচু জমিগুলি সব সয়ে দিয়ে গেল বানের জলে। বহু গ্রামের হেঃ অর্ধেক অধিবাসী ডুবে মল এই ঝঞ্ঝা প্লাবনের ফলে। যারা বেঁচেছিল ঝড়ের পর া চারিদিক তাকিয়ে দেখলে তাদের ঘরগুলো র মাথা উঁচু করে নাই, সব মিশে গিয়েছে টর সঙ্গে, শস্যসামগ্রী গিয়েছে একেবারে স হয়ে, গরু-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুর ধকাংশই মারা গেছে জলে ডুবে। প্রায় চৌদ্দ হার মানুষের জীবন নাশ হয়েছিল চট্টগ্রামের ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসে। জীবজন্তু হয়েছিল প্রায় পনের হাজার। বনের পরে কলেরায় যে কত ক মরেছিল তার কোন হিসেবই পাওয়া নি। কুতুবদিয়ার লাইট হাউস গেল নষ্ট হয়ে, লাইটের আলোটা গেল এমনভাবে ভেঙে তা আর সারাবারও উপায় রইল না। চট্টগ্রাম রেই বন্দরের বাড়ীগুলির খুব বেশী ক্ষতি হয়েছিল এবং জিলার প্রায় সব স্থান থেকেই র এল যে, সরকারী বাড়ী ও জনসাধারণের বাড়ী সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপকভাবে। স্থায়ী লেফটেনান্ট গভর্ণর স্যার সি সি ইভেনস বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে খাদ্য, ব, গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় জিনিসাদি, রামতের জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। গ্রাম জিলা ছাড়াও এই বছরের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা প্লাবন চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বা হিল ট্রাক্টস দক্ষিণ লুসাই পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। তবে খানকার তীব্রতা ছিল কিছু কম। রাঙ্গা-টিতে স্থানীয় অধিবাসীরা যেখানটায় বাস রত সেই অঞ্চল ও বাজারটা একেবারে সাফ র ধুইয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে ১ জনের প্রাণহানি ও ১৫০০ গৃহপালিত শুর জীবনহানির কথা শুনা গেছে। কমা সার্কেলে যে সব নৌকা ভেসে গিয়েছিল বাদ দিয়েও নৌকাহানির সংখ্যা জানা য়েছিল ১৭৬০। বোহমঙ্গ ও চাকমা র্কেলেও শস্যহানি খুব হয়েছিল। দক্ষিণ সাই পাহাড় থেকে খবর পৌঁছল যে, সেখানেও বাড়ী ভেঙেছে, রাস্তা ও শস্যের ক্ষতি হয়েছে। তবে লুসাই থেকে মানুষের প্রাণহানির কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ঝড়—

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। বরিশালে সেবারে এক প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল, আর সেই ঝড়ের সঙ্গে যে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল, তাতে ভোলা মহকুমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় সেবারে প্লাবনের পরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তাতে একটি দুর্ভিক্ষ রিলিফ সমিতি গঠন করে ব্যাপকভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৩২৬ সালে পূর্ববঙ্গের ঝড়, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

ইংরেজী ১৯১৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩২৬ সালের আশ্বিনে) যে ঘূর্ণিবাত্যা খুলনা ও পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল তার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও অনেকের মনে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে আছে। আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার উৎসব নিকটবর্তী। প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে বহু-প্রতীক্ষিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সকলের মনে আনন্দ ও উৎকণ্ঠা। এমন সময় উঠল ঝড়, আশা আশ্বাস করে দিল চুরমার। এই ঝড় বা সাইক্লোনএ ঢাকা বিভাগের লোকেরাই বিপন্ন হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। একমাত্র নারায়ণগঞ্জেই যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাণ ১৫-১৬ লক্ষ টাকা।

সকাল থেকে সারা দিনটাই যাচ্ছিল মেঘলা-মেঘলা, আর মাঝে মাঝে চলছিল জোর হাওয়া, সমস্ত দিন এইভাবেই কেটে গেল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে রাত্রি এল, হাওয়ার বেগও একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করল। তারপর রাত যখন বারোটা তখন প্রভঞ্জনের আকারেই আরম্ভ হল ঝড়ের তাণ্ডব। ভোর ছটা পর্যন্ত তার বিরাম বিশ্রাম কিছুই ছিল না। হাওয়ার সে যে কি জোর, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সারা রাত্রি ধরে চললো হু-হু-শোঁ-শোঁ, সে যেন এক বিরাটকায় দৈত্যের ক্রুদ্ধ আস্ফালন ও ধ্বংসের অভিযানে উন্মত্ত মাতামাতি। মেঘনা নদীতীরে চাঁদপুর, তার একখানি বাড়ীও আর অক্ষত ছিল না। ভেঙে চুরে উড়িয়ে নিয়ে সে এক একাকার কাণ্ড। বহু মোটা মোটা ডাল ভেঙে গেল, বিরাট মহীরুহ শ্রেণীর গাছ গেল সমূলে উন্মূলিত হয়ে। পাট বোঝাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকাগুলো হ'ল জলমগ্ন। পদ্মানদীর তীরে বিক্রমপুর পরগণা—সেখানে ঝড়ে পড়ে অসহায় লোকেদের প্রাণ হারালো শত শত। লৌহজঙ্গ বা তারপাশা বাজারের যা ক্ষতি হ'ল, তা অবর্ণনীয়। ঝড় থেমে যাবার পরে অমৃত-বাজার পত্রিকায় জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বিধ্বস্ত এলেকার যে বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন তা পড়লেই ঝড় বা সাইক্লোনের তীব্রতা ও জন-সাধারণের অবস্থা অনুভব করা সহজ হবে।

প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন—রাজবাড়ী ষ্টেশন থেকেই দেখা গেল নদীর এখানে ওখানে মানুষের মৃতদেহ ভাসছে। গোয়ালন্দ ছেড়ে ষ্টীমার যখন লৌহজঙ্গের দিকে অগ্রসর হতে লাগল তখন তীরে তীরে দেখা গেল মৃতদেহ পড়ে আছে, আর তাই নিয়ে লেগেছে কুকুর-শৃগাল, কাক-শকুনের কাড়াকাড়ি। মড়া নিয়ে তাদের কি মহোৎসব! নদীর তীরে তাকিয়ে একখানা ঘরও স্বস্থানে বা সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। টিনের চালা, গুদাম ঘর ও দোকান ঘরে লৌহজঙ্গে পাঁচ হাজারের বেশী গৃহ ছিল। তার একখানিও দাঁড়িয়ে নেই। ষ্টেশনের রিসিভিং ফ্ল্যাটখানি অদৃশ্য; অন্য দুখানি বড় ফ্ল্যাটের টিনের সুবৃহৎ চালগুলি কোথায় উড়ে গিয়েছে, তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। ঝড়ের ঝটকায় ফ্ল্যাট দুখানিকে ঠেলে নিয়ে তীরের সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—জল ছেড়ে তার একাংশ শুকনো বালুচরের ডাঙ্গায় উঠে আছে। অনাবৃত, ছিন্ন, ভগ্ন কাটিকাহত

কাকের শোচনীয় অবস্থার মতোই ফ্ল্যাটের একটা খাঁচা বা ফ্রেম পড়ে আছে।

বাগেরহাটে ঘরবাড়ী চাপা পড়ে বহু লোকের জীবন্ত সমাধি হয়েছিল। মরা মানুষ আর মরা জন্তু ভাসছিল নদীর জলে। ঝড়ে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ, ওদিকে উড়ে আসা ছেঁড়া পাতা আর ভাঙ্গা গাছের ডালে পুকুর ভর্তি।

নারায়ণগঞ্জ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কাঁচাবাড়ীগুলো মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, পাকাবাড়ীগুলোর দরজা-জানালা ভাঙ্গা। কোথাও দেয়ালের একাংশ ধ্বসে পড়েছে, কোথাও বা বিরাট ফাটল ধরেছে ছাদে, আর তারই একাংশ ঝুলে আছে প্রায় পড়ো-পড়ো অবস্থায়। ষ্টীমারঘাট দেখে মনে হ'ল সেখানে যেন একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। পল্টুনের ব্রীজটা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হয়ে উড়ে গিয়েছে। স্থানীয় হাই স্কুলটা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় ঝড়ের তান্ডবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিক্রমপুরের সংবাদদাতা জানালেন, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে আজ প্রায় সকলেই গৃহহীন। বড় গাছ, ছোট গাছ উপড়ে পড়ে আছে শত শত, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন, পোষ্ট ভগ্ন।

রাউথভোগের হেডমাষ্টার মশাই আর তাঁর একজন সহকারী প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। সাত বছরের সুন্দর কচি একটি মেয়ে কাঠের থামের নীচে পড়ে তখুনি মারা গেল। যাত্রীবাহী একখানা নৌকো সব আরোহী নিয়ে উল্টে গেল। একখানা টিন ছুটে এসে একটা লোককে একেবারে দু-ভাগ করে ফেলল।

ব্রাহ্মণগাঁ (ঢাকা), করাইল, ত্রিপুরা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, মাণিকগঞ্জ, সেনহাটি, খুলনা, ভাঙ্গা, বিঝারি (ফরিদপুর), গোপালগঞ্জ, ভদ্রাসন (ফরিদপুর), বালিখোলা ইত্যাদি বিভিন্ন জিলার গ্রাম-গ্রামান্তর, দূর-দূরান্তর থেকে যে সকল বিবরণ পেঁছিতে লাগল তার সবগুলোই যেমন নিদারুণ তেমনি ভয়াবহ।

ঢাকায় বুধবার রাত্রি ১১-৩০-এ সাইক্লোন পেঁছিল আর বিষ্যুৎবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টাকাল ধরে তান্ডবের ফলে সব বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। দেশীয় নৌকাগুলো ডুবে অথবা ভেসে গেল। কয়েকখানা ষ্টীমলঞ্চ বোঝাই পাট নিয়ে যাচ্ছিল, ঝড়ে পড়ে তা বিধ্বস্ত হ'ল। বাকলান্ড বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে বুড়ীগঙ্গার দিকে তাকালে কেবল ইতস্ততঃ ছড়ানো উল্টে-পড়া নৌকার দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংগঠক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকীল ফেডারেল ষ্টোর গঠন করতে তখন ঢাকায় ছিলেন। তিনি সপরিবারে একখানি গ্রীণবোটে বা হাউস বোটে বুড়ীগঙ্গায় থাকতেন। কাশ্মীরের ন্যায় ঢাকাতেও নদীর উপর সুসজ্জিত নৌকায় থাকার রীতি খুব প্রচলিত ছিল। শীতকালে জমিদারগণ এই সকল নৌকা নিয়ে নদী-বহুল মফঃস্বলের সুদূর অঞ্চলে জমিদারীতে খাজনা আদায়ে যেতেন। অম্বিকাচরণ উকীল মহাশয় যে নৌকায় ছিলেন, সেখানিকে ঝড়ের বেগে নর্থব্রুক হলঘাট থেকে ঠেলে নিয়ে গেল কামানগোলায়,—কমপক্ষেও তিন মাইল দূরে। সকাল বেলা অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে তুলে নিয়ে ঢাকায় আনা হয়। ইমামগঞ্জ ও লালবাগের মধ্যবর্তী এক স্থানে তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। অম্বিকা বাবুর বৃদ্ধ আশী বছরের কাকা তাঁর নৌকোতেই থাকতেন, কিন্তু অনেক খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শুধু অম্বিকা বাবুর দুই নাতি হাউস বোট থেকে রাত এগারোটার সময় বিদায় নিয়ে উপরে উঠেছিল, তাঁরাই বেঁচেছিলেন। এই ঝড় চট্টগ্রাম (দক্ষিণ-পূর্ব), ভৈরব, মেঘনা, সিরাজগঞ্জ, যমুনা, ত্রিকোণ এলাকা জুড়ে ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গিয়েছিল।

সরকারী কমিউনিকে—১৯১৯ সালের ১৩ই অক্টোবর

ঢাকা-মৈমনসিং-এর ঝড় সম্পর্কে যে সরকারী কমিউনিকে প্রচারিত হয় তাহাতে বলা হয় যে, বঙ্গোপসাগর থেকে ঝড় উঠে প্রেসিডেন্সী বিভাগের দক্ষিণ দিকে খুলনাকে বিধ্বস্ত করে, সেখান থেকে সদর মহকুমা হয়ে বাগেরহাটে পেঁছিয়, আবার বাগেরহাটের প্রান্ত ধরে যশোর জিলার নড়াল মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে গোপালগঞ্জের দিকে চলে যায়। সেখানে ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর মহকুমা একেবারে পরিপূর্ণভাবে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে পদ্মা পাড়ি দিতে থাকে, আর নদীর চরগুলোতে দেয় ধ্বংসের প্রলয় ছড়িয়ে। পদ্মা দিয়ে ঝড়ের বিক্রম এগুতে লাগল, মুন্সীগঞ্জ মহকুমায়। মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটি থানাকেও এই ঝড়ের দাপট সহ্য করতে হয়েছিল। সেখান থেকে সাইক্লোনের মোড় ঘুরল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দিকে। সেখানে সব তচ-নচ করে দিয়ে ঝড় ছুটল মৈমনসিং-এ কিন্তু এই মৈমনসিং যাত্রার পথে যত স্থান পড়ল, কিশোরগঞ্জ মহকুমা সম্পূর্ণ ও নেত্রকোণার দক্ষিণ দিকের অর্ধেক বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। চল্লিশ মাইল পথ জুড়ে এই ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়েছিল, আর পঁচিশ মাইল পর্যন্ত স্থানের মধ্যে এর আক্রমণ বেশী ধ্বংসাত্মক হয়েছিল।

ফরিদপুর ও খুলনা এলেকায় যত পশু মারা গিয়েছিল, তেমন আর কোথাও নয়। মুন্সীগঞ্জে ঘর ভেঙ্গে পড়েছিল সবচেয়ে বেশী, ঢাকা জিলায় একখানি এমন ঘর ছিল না, যা ঝড়ে কোন-না-কোন প্রকারে কম-বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সব রকমের সরকারী বাড়ীই বিধ্বস্ত হয়েছিল—সাধারণ কার্যালয়, পুলিশ ষ্টেশন বা থানা, পোষ্টঅফিস, ডিসপেন্সারী, স্কুল, সরকারী কর্মচারীদের বাসভবন—কিছুই অক্ষত ছিল না। বহু নৌকা ডুবে গিয়েছে, কতকগুলোর অবশ্য খোঁজ মিলেছে, কিন্তু অধিকাংশেরই কোন রকমের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ষ্টীমার কোম্পানীগুলিরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। দুখানা ষ্টীমার ও নয়খানা ফ্ল্যাট এই ঝড়ে ডুবে গিয়েছিল, আর ২৮ খানা ষ্টীমার ও ৭০ খানা ফ্ল্যাটের ক্ষতি হয়েছিল নানাভাবে।

মৃত ও নিরুদ্দেশের সংখ্যা—যশোহর—১০, খুলনা—২৭৯, ফরিদপুর—৫৭০, মৈমনসিং—৪২, ঢাকা জিলা—৭৫০ (আনুমানিক)। ঢাকা জিলায় প্রায় হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল এই ঝড়ে, গুরুতররূপে আহতদের নিয়ে মোট সংখ্যা হবে প্রায় ১৯০০।

তৎকালীন বাংলার নেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, নীলরতন সরকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সত্যানন্দ বসু, ফজলুল হক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দের আবেদনে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল রিলিফ ফান্ড নামে একটি সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭ই অক্টোবর মধ্যে এই তহবিলে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। স্বনামখ্যাত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, কেশোরাম পোদ্দার, যুগলকিশোর বিড়লা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা হিসাবে এই তহবিলে সাহায্য দিয়েছিলেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবের ঝড়-বন্যা

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর পাঞ্জাবের আম্বালায় ঝড়ের সঙ্গে বন্যা আরম্ভ হয়। সেই বছরেই মহাত্মা গান্ধী উড়িষ্যার বন্যার্ত নর-নারীর সাহায্যে আবেদন প্রচার করেছিলেন। এই প্লাবনে দুই হাজার মাইল-এ তিন লক্ষ অধিবাসী বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিল। ১৫০০ গ্রাম ধ্বংস হ'ল, বিশ হাজার ঘর ধ্বসে পড়ল। মোট ক্ষতির পরিমাণ অনুমিত হয়েছিল পনর লক্ষ টাকা।

১৯৩৫ সালের আগষ্ট-প্লাবন—

১৯৩৫ সালের ১৩ই আগষ্টের প্লাবন ও মুষলধারে বৃষ্টির ফলে ছোটনাগপুর পাহাড় থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। আশ্বিনের ঝড়ের পর্যায়ভুক্ত না হ'লেও প্লাবনের ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গে উহা স্মরণীয় হ'য়ে আছে। ১৯১৩ সালে দামোদরের জলস্ফীতির পরে এত জল আর কোনবারে হয়নি। বর্ধমানের নীচু জমিগুলোর উপর আট ফুট জল উঠেছিল। তিন জায়গায় দামোদরের বাঁধ গেল ভেঙ্গে, রেল চলাচল বন্ধ রাখতে হ'ল, রাস্তায় চলাচল অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, বহু কুঁড়ে ঘর ধ্বসে পড়ল, কয়েকজনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল। ১৪ই আগষ্ট বন্যার জল তারকেশ্বর মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল। চট্টগ্রাম, আসাম ও ব্রহ্মদেশেও সেবারে প্রবল বন্যা হয়েছিল।

পাঞ্জাবে—পাঞ্জাবে রাবি, চেনা ও অন্যান্য নদীর জলোচ্ছ্বাসে অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। একখানা নৌকাডুবিতে সতরজন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছিল।

কলিকাতায় ১৭ই অক্টোবর, ১৯৪২, ৩০শে **আশ্বিন**, ১৩৪৯-**এর ঝড়—শুক্রবার রাত্রি—**

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই টিপ টিপ করে বর্ষা চলছিল, আর মাঝে মাঝে বইছিল দমকা হাওয়া। প্রথম টিপ টিপ পরে ধারাবর্ষণ এবং প্রায় সারারাত্রি ধরেই চলল মুষলধারে বৃষ্টি। পরদিন শুক্রবার সকাল বেলাতেও আবহাওয়াটা আরও ভারী মনে হ'ল। বেলা যত বাড়তে লাগল, বৃষ্টি আর হাওয়াও তত জোরে বইতে থাকল। সন্ধ্যার দিকে বিজলী-চমক, মেঘগর্জন ও ঝঞ্ঝার বেগে চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। কয়েকখানা কাঁচা ঘরের দেয়াল পড়ল ধ্বসে, পথচারীরা আহত হলেন গাছের ডাল ঘাড়ে পড়ায়। সার্বজনীন পূজার জন্য মহাধুমধামের সঙ্গে যে মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল তা ভেঙ্গে ছিঁড়ে উড়ে একেবারে একাকার হয়ে গেল। প্রতিমারও ক্ষতি হয়ে গেল প্রচুর, জলে কারো পট ভিজে গিয়েছে, কারো বা হাত-পা ভেঙ্গে গিয়েছে বা দেহের কোন অংশ থেকে রং উঠে গিয়েছে। ষষ্ঠী হ'য়ে গেছে, ব্রাহ্মণ না হ'লে অন্য কারো প্রতিমা স্পর্শ করে
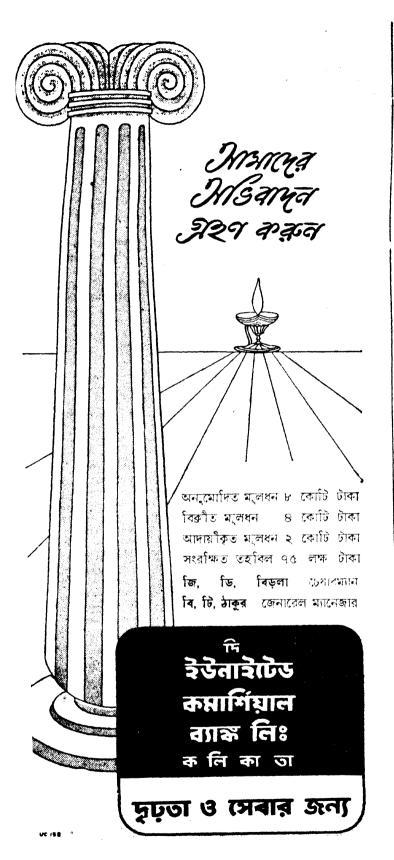
সুপ্রা কালি

দামী ফাউণ্টেন পেনের জন্য

সুপ্রা কালি আজ এত জনপ্রিয় কেন? সব বিদেশী দামী কালিকে সে হার মানিয়েছে, সল-এক্স যুক্ত ও তলানিমুক্ত ব'লে অব্যাহত তার প্রবাহ, বর্ণের স্থায়ী ঔজ্জ্বল্য মনে আনে তৃপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস। কালির রাসায়নিক গুণে নিব কলমটি থাকে চিরনূতন।

সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং, লিঃ

কালকাতা ৫

দৈহিক শক্তির ও স্ফূর্তির প্রস্রবণ

অনঙ্গপ্রভা

কেশর, কস্তুরী এবং অন্যান্য নানাবিধ মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই অমোঘ শক্তিশালী বটিকা সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূর করে। শক্তির উৎস বৃদ্ধি করিয়া মগজশক্তির উৎকর্ষতাবিধান করিতে অনুপম। যাঁহারা বহু অর্থব্যয়ে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও ফলও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে, **অনঙ্গপ্রভা** বটিকা সেবন করুন। ইহার আশু ও স্থায়ী ফলে নিশ্চয়ই আপনি মুগ্ধ হইবেন।

মূল্য ৩০ বটি পূর্ণ শিশি ১০্ টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

(মদনমঞ্জরী ফার্মেসী)

১৭৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

রাহুর গ্রাস থেকে যেন চাঁদের মুক্তি!

কুষ্ঠ ও ধবল

এই দুই ঘৃণিত ব্যাধি মানুষের দেহকে ক'রে ফেলে কুৎসিত ও কদর্য, লুপ্ত ক'রে দেয় স্বাস্থ্য ও রূপগরিমা। সেই লুপ্ত সম্পদকে ফিরিয়ে এনে দেহকে কমনীয়তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করায় কৃতিত্বে হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরের চিকিৎসা প্রতিভা সত্যই বিস্ময়কর। গত ৬০ বৎসরকাল এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় হাজার হাজার কুষ্ঠ ও ধবল রোগী রোগমুক্ত হয়ে সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাপন করছেন। পত্রে অথবা সাক্ষাতে নিয়মাবলী ও চিকিৎসা পুস্তক বিনামূল্যে লউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতাঃ—**রামপ্রাণ শর্মা**, কবিরাজ।

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোনঃ হাওড়া—৩৫৯

শাখা ঃ—৩৬নং **হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯**

(পূরবী সিনেমার পাশে)

ত করতেও শাস্ত্রীয় বাধানিষেধ রয়েছে। নীন পূজোর পরিচালকগণ ফ্যাসাদেই নে। দক্ষিণ কলকাতার সহরতলীতে জ্ঞ এলাকার গণেশ সরকার লেনে শনিবার এক টিনের চালা পড়ে একজন নারীর হ'ল, আরও তিনটি অল্পবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তি আহত হলেন। কালিন এক বাড়ীতে দেয়াল ধ্বসে দু'জন হলেন। পটারি রোডেও একজন ভাবে আহত হয়েছিলেন। ঝড়-বাতাস রতে না পেরে এক ভিক্ষুক রাস্তায় হ'য়ে পড়েছিল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে হ'ল। এক সার্জেন্ট-এর গায়ে এসে টুকরো ছিট্‌কে পড়ল।

র্ধমান থেকে খবর এল প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় দুপুর রাত থেকে সকাল ৫টা বর্ধমানকে বিধ্বস্ত করে গেছে। দুপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফোনের তার ছিঁড়ে পড়ে।

চুড়া থেকে খবর এল সেখানে শুক্রবার সহরের একাংশের সকলেই সারারাত রে কাটাতে বাধ্য হয়েছে। অনেক চেষ্টা আলো জ্বালা সম্ভব হয়নি। ট্রিকের পোস্ট বা থামগুলিও কোন স্থানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হুগলী থেকে খবর পাওয়া গেল তিনখানা দেশী জলমগ্ন হয়েছে। নদীর তীরে জনৈকা মৃতদেহ পড়েছিল, অন্য একজন নারী পা পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

রেমপুর মুর্শিদাবাদের প্রধান সহর। রের উপর দিয়ে ঝড় চলে গেল প্রবল-কান্দীতে অনেক কুটীর গেল উড়ে, লে সমূলে উৎপাটিত হয়। ময়ূরাক্ষী, আর কুনিয়া নদীতে দেখা দিল বিপদ্জনক তি। শস্যক্ষেত্রগুলো সব জলের তলায় লৈ। কুষ্টিয়া মহকুমারও একই অবস্থা। রাজসাহীতে সাইক্লোনের হাওয়া শুক্র-শনি দু'দিন ধরে। কুঁড়ে ঘর ও ভেঙে পড়েছিল অনেকগুলো।

কারী খবরে উড়িষ্যার যে কমিউনিক হয়েছিল, তা থেকেও জানা গেল যে, জলেশ্বর, ভোগরাই, বালিয়াপাল ও থানা অর্থাৎ বালেশ্বরের উত্তর দিকের হে ১৭ই অক্টোবরের ঝড়ে খুব বেশী হয়েছে।

খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ঝড়—

দিনীপুরে ১৯৪২ সালের ঝড় হয়েছিল অক্টোবর, কিন্তু ১লা নভেম্বর পর্যন্ত সযত্নে চেপে রাখা হয়। ২রা নভেম্বর সরকারের এক বিবৃতিতে খবরটি খতভাবে প্রচারিত হয় :—

১৬ই অক্টোবর তারিখ সকালে াগর হইতে একটা প্রচন্ড ঝড় উঠিয়া ায়। ১৬ই অক্টোবর সকাল সাতটা সময় এই ঝড় আরম্ভ হয় এবং ১৭ই প্রত্যুষকাল পর্যন্ত চলে। ১৬ই অপরাহ্নে ঝটিকার ফলে বঙ্গোপসাগর কটা ঝড়, বান উঠে ও তাহা ভূখন্ডের সিয়া পড়ে এবং মেদিনীপুর জিলার এবং ২৪ পরগণা জিলার অনেক ধ্বস্ত করে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও হইতেছিল। কোন কোন স্থানে ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। বান, বৃষ্টি ও ঝটিকার জন্য উক্ত জিলাগুলির সমস্ত নদীতে প্রবল বন্যা হয়। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। বর্তমান হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, মেদিনীপুর জিলায় অন্ততঃ দশ হাজার এবং ২৪ পরগণায় এক হাজার লোক মারা গিয়াছে। গরুবাছুর শতকরা প্রায় ৭৫টিই মারা গিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি কাঁচা ঘর ধ্বংস অথবা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র পাকাবাড়ী-গুলি (তাহাও যেগুলির ছাদ টিনের নয়) ঠিক আছে। এই ঝটিকার ফলে মেদিনীপুরে এরূপ গুরুতর ক্ষতি হয় যে, প্রথম কয়েকদিন যোগাযোগের পথঘাট ঠিক করিতেই কাটিয়া যায়, কারণ তাহা ছাড়া সাহায্য দান কাজ চালানো যায় না। * * * ঝড়ে বিশেষরূপে মেদিনীপুরে ও ২৪ পরগণা জিলার এত সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে যে, দুর্গতদিগকে অনেকদিন খাদ্যবস্ত্র ও তাহাদের গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য করিতে হইবে।"

যুগান্তর ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই কার্তিকের সংখ্যায় 'ঝড়ের বন্ধন-মুক্তি' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সংবাদ চেপে রাখার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হ'লে, সরকারী আদেশে কাগজখানির প্রকাশ তিন দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৭ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর)।

সরকার বলেছিলেন—এই ঝড়ে মেদিনীপুরে ১০ হাজার ও ২৪ পরগণায় ১ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়ে-ছিলেন যে, শুধু মেদিনীপুর জিলাতেই কমপক্ষে ত্রিশ চল্লিশ হাজার নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। মিঃ বি আর সেন এককালে মেদিনীপুর জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। রাজস্ব সচিবরূপে তদন্তের পরে তিনিই বলেছেন যে, মেদিনীপুর সমুদ্রোপকুলবর্তী ৫টি থানার গ্রামগুলিতে ১০৩৬১০টি গৃহের অধিবাসী সংখ্যা ৫৫৬১২৫। এদের অধিকাংশই ছিল পর্ণকুটীর, দু-চারটি টিনের ঘর ছাড়া সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হালের গরু ও গাভী মরেছে ষাট হাজারের বেশী।

মিঃ সেনের হিসাবে যে লোকজনের মৃত্যু-সংখ্যা, তা যে সত্যের বিকৃতি মাত্র, তাঁর হিসেব থেকেই তা অনুমান করা যেতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীদের শতকরা ১০ জনেরও যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তা হ'লেও তার সংখ্যা হয় ৫০ হাজার।

এই ঝড় সম্পর্কে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—ইংরেজী ১৯৪২ সন, বাংলা ১৩৪৯ সাল, মেদিনীপুরে ষষ্ঠীর দিন রাত্রি থেকে সাধারণ জোর হাওয়া দিতে থাকে, সপ্তমীর দিন পুবের বাতাস দশটা থেকে বাড়তে থাকে ১১টা পর্যন্ত। প্রথম খড় উড়ল, চালা উড়িয়ে নিল, নারকেল গাছ থেকে কাঁদি ভাঙ্গল, কলাগাছ, বাঁশের ঝাড় মড় মড় ভেঙ্গে যেতে লাগল। ১২—১টার সময় ঝড় আসে বায়ুকোণ থেকে। তা'তে বড় ঝড় গাছের ডাল ভাঙ্গতে লাগল। সন্ধ্যা ৭টা থেকে বড় বড় গাছ পড়তে লাগল। তার আগে ঘরের চালা, দেয়াল ভেঙ্গে নেয়। গরু-বাছুর চাপা পড়ে, মানুষ, মারা যায়। সমুদ্রের লবণজলে সব ভাসিয়ে নেয়।

বর্ষার আড়ালে দাঁড়িয়ে
আমি যেন দেখছিলুম এক নৌকো
জলের ধারা বেয়ে চলে যাচ্ছে
সহস্র দাঁড় টেনে।
ছপ্ ছপ্ ছপ্ সেই গতির ছন্দ
কবিতার ছন্দের মতোই যেন আমাকে
অভিভূত করে দিয়ে যাচ্ছে।

বার বার ভুল হয়ে যায়,
কোন্ দূরে এক অতীত দিনের
পাল-তোলা এক নৌকোর ছবি
বার বার আমার মনকে পিছিয়ে এনে
আবার এগিয়ে দেয় অনেক ভাবনার পথে।

শূন্য বাড়ীতে দিন যেন আর কাটেনা।
একদিন অনেক ছিল, অনেক ছিল
আমার কাছের মানুষ
দিন যেত আনন্দে কেটে।
আজ সেখানে এক বর্ষার নির্জনতা।
ঝড়ের রাতে ঢেউয়ের তালে ভেসে চলা
পাল-তোলা সেই নৌকোটা আমার
কার হাতে যেন হাল্‌কা মেঘের মতো
উড়ে চলে যেত, মনে হত
একটি বাহু শত বাহু হয়ে
শত আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে ধরে
নিয়ে যাচ্ছে শতাব্দীর পথ দিয়ে।

ঘর-জোড়া খাট, টেবিল, আয়না,
ছবির ফ্রেম, তেলের শিশি, ঘড়ি,
সুখের আর সময়ের সব ইন্ধন যেন
বেঁধে রাখে পরম আগ্রহে। তবু
তোমার ডাক যখন আমি কান পেতে শুনতে চাই
ডাক আসেনা তোমার, কথা যদি ফোটে
সে কথা হয়ে যায় আমারই কথার প্রতিধ্বনি।

চোখের তারায় চেয়ে চেয়ে
ঘড়ির কাঁটা ঘর-পেরিয়ে ঘুরে যায়,
মনের পাখা মন পেরিয়ে উড়ে যায়,
কান পেতে শুনতে চাই
শুধু তোমার কথা। তাই
বর্ষার জলের দাঁড় টানা পার হয়ে
বাঁকা স্রোত পার হয়ে, পার হয়ে অনেক হেঁয়ালি
যখন তোমার দরজায় আসি, দেখি
দুয়ার বন্ধ করে রেখেছ।

তারপরে অনেক অপেক্ষা
অনেক আকাঙ্ক্ষার পর যখন
ভাটির টানে ফিরে আসব
কোথা থেকে তুমি এলে,
আমার মনের প্রতিধ্বনি তুলে বললে,
'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে'।

বর্ষার নৌকোটা দাঁড় তুলে পাল গুটিয়ে
একবার যেন স্থির হয়ে দাঁড়ালো
পেখম-তোলা ময়ূরের মতন,
তারপরে সহস্র দাঁড় টেনে
সহস্র জোয়ার জলের স্রোত পেরিয়ে
আবার উড়ে চললো
পিছনে-ফেলে-আসা কিসের সন্ধানে।

রাত্রি বারোটা-একটায় দেখা যায় কোথাও কিছু নেই, সব শ্মশান, সব ফাঁকা—কেলেঘাই নদী থেকে জলস্ফীতি হতে থাকে ও উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা—বি এন আর রেল লাইনের দক্ষিণ দিকে ক্ষতি করে, প্রধানতঃ সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল দক্ষিণ মেদিনীপুর, কণ্টাই মহকুমা ও উড়িষ্যার বালেশ্বর মহকুমার। ভোর ৪—৫টার সময় সব নিস্তব্ধ।

কাঁথির নীলগোদার নিকট জকি বাঁধ ভেঙ্গে যায়, দশ-বারো হাত উঁচু হয়ে জল আসে, উড়িষ্যার কোষ্ট ক্যানেলের নিকটবর্তী ভোয়া বাঁধ ভাঙ্গে নওসেরাবাদের কাছে। সকাল সাতটায় রওনা হয়ে এক মাইল দূরে বাড়ী পৌঁছতে তিনটা বেজে গেল। গাছ-পালায় রাস্তা আটক। তিন-চার দিন পরে সরকারী সাহায্য পৌঁছে। চারদিন পরে আর জল খাওয়া যায় না। চারিদিকে দুর্গন্ধ, সরকারি হুকুম দিলেন মাটিতে গরু বা মড়া পুঁতে ফেললে দু-টাকা করে পাবে। মেথররা এসে সেই কাজ করতে লাগল। তারপর রাস্তায় বেরোনো যায় না। টিউবওয়েলের জল খাওয়া আর রান্নার জল পুকুর থেকে এনে ফুটিয়ে খাওয়া হ'তে লাগল।

১৩৫০ সালে, ইং ১৯৪৩—দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কণ্টাই-এর পাশে পিছাবনী ক্যাম্পে, দিঘায় রামনগরে বহু সৈন্য ঝড়ে মারা যায়।

তমলুক—কোলাঘাটের নদীর জল বাড়ে। রাত্রে দূরে চীৎকার ধ্বনি—জিনিসপত্র, চেয়ার-টেবিল, সুটকেস-ট্রাঙ্ক ভেসে যাচ্ছে—সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কামড়াচ্ছে না—পরদিন চার-পাঁচজন লোক উপড়া-উপড়ি পড়ে মরে আছে। একটি ষাঁড় গাছে ঝুলে আটকে মরে আছে।

১৭ই অক্টোবর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হ'ল যে, নাশকতামূলক ও অরাজক কাজের জন্য মেদিনীপুর জিলার ভগবানপুর থানার এলাকাধীন মাধবপুর, গোপীনাথপুর, ভীমেশ্বরী, ভগবানপুর ও কাঁকর গ্রামের উপর এবং মীর্জাপুর গ্রামের অধিবাসীদের উপর যথাক্রমে ১৫ হাজার ও ৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। এটা স্বদেশী বা স্বাধীনতা আন্দোলনের জরিমানা। যারা ঝড়ে, প্লাবনে মরেছিল, সরকার তাদের পিটুনী ট্যাক্সের পীড়নেও মারলেন। এ পি'র ২৬শে অক্টোবরের ঝড়-বাদলের খবরে বলা হ'ল যে, ঝড়ের ফলে বাঙলার নানাস্থানের লোকের সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেন বন্যাহত অঞ্চলসমূহে লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের তথ্য সংগ্রহে বাহির হয়েছিলেন। রবিবার, ২৬শে অক্টোবরই মেদিনীপুর জিলার একদল প্রতিনিধি রাত্রে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও রাজস্ব-মন্ত্রী পি এন ব্যানার্জির সহিত সাক্ষাৎ করে সাহায্যদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক এম-এল-এ, বিধুভূষণ হাইৎ (বার এসোসিয়েশন সম্পাদক) ও লোকালবোর্ড সদস্য বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক।

উপসংহার

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, ঝড়-ঝঞ্ঝা—এরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলার তিন সঙ্গী, আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী এদের সংহারপর্বের নিত্যসহচর। ঝড়ে বাঙলার অনেক আশ্বিনের আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছে, পুজোর বহু প্রতীক্ষা বিষাদে পরিণত হয়েছে, কত যাত্রী তার পুজোর পণ্য ও উপহার সম্ভার নিয়ে যাত্রা করেছে গৃহাভিমুখে, কিন্তু ঝড়ে পড়ে তারা চিরদিনের মতো নিরুদ্দেশ হ'য়ে গিয়েছে। কত প্রিয়-মিলনের স্বপ্ন গেছে শূন্যে মিলিয়ে। বিজ্ঞানের দৌলতে আর আবহাওয়ার আফিসের কৃপায় এখন ঝড়ের খবর আগেই পাওয়া যায়, সাবধানও হওয়া যায় পূর্ব থেকে। কিন্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করলেও বিপদের পথ বন্ধ করতে পারে নি। বানের জল উঁচু হয়ে এসে যখন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন তাকে রোধ করবে কে ? জীবনে আনন্দও যেমন সত্য, দুঃখ-বিপদও তেমনি সত্য। অতএব আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রগতি সত্ত্বেও হয়তো আশ্বিনের এক সন্ধ্যায় আবার ঝড় উঠবে—'ঝঞ্ঝাবায়ু ভয়ংকর'—আবার বাল্যশিক্ষার সেই পাঠ স্মরণ করে আমরা 'ঝড়ের সময় দ্বার উদ্ঘাটন করিও না'—মেনে নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেই সেই প্রকৃতির প্রলয় তাণ্ডব কান পেতে শুনব। চারিদিকে ঘর ভেঙ্গে পড়া, গাছের মড়-মড়, প্রবল হাওয়ার বিক্ষোভ, টিন উড়ে যাওয়া, ঝন ঝন, শোঁ শোঁ, হুম হুম ইত্যাদি বিচিত্র ধ্বনির মধ্যেই প্রার্থনা জানাবো—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' 'হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন রূপ, তাই দিয়ে আমাদের সর্বদা রক্ষা কর।'

ধৈর্য — ভবানী দত্ত

একদিন এইখানে প্রাসাদ অঙ্গনে
সায়াহ্নের আস্তৃপ্ত মদিরা রঙ্গনে
প্রসন্ন নয়নে তুমি আসন্ন নিশার
নৃত্যপরা রিক্তবাস প্রমোদ দিশার
মুগ্ধ ছবি মনে মনে দেখে
আলবোলা একপাশে রেখে
মণিমুক্তাখচিত কিংখাবে
সুখস্বপ্নে মৌজ হতে বেহেশ্তের ভাবে।

সুরসিকা তাতারিণী তরুণী প্রহরী
চোরা চাহনীতে বিষ ভরি'
আমন্ত্রণ জানাইত পেয়ারের ওমরাহ জনে
বসরাই গুলাবের বনে;
টগবগে ঘোড়া আরবীক
চড়ি, বান্দাজনে দিয়ে ধিক
কুর্ণিশ করিত তারা হেলায়ে শিরোপা
দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

ধরামাঝে স্বর্গ সেই দেওয়ানী খাসেতে
আজ আসি ভীড় করে সামান্য বাসেতে।

দুই আনা প্রবেশ দক্ষিণা;
দেহাতীয়া নূপুরের রিণঝিন ঝিনা
হটে যেতে করে সাবধান;
পিছনে কঠিন হাঁকে ভাঙ্গা টোঙ্গা যান,
চাষাড়ে মুখের রাঙ্গা পিক,
কড়া নাগড়ার শব্দ ঢাকের অধিক,
ভারী পায়ে গেঁয়ো চলা মোগলাই বাগে
পাগলা 'লু'য়ের তাপে বুলবুলি ভাগে,—
তার মাঝে শাহানশাজাহান,
গণতন্ত্রে তব স্বপ্ন করে অন্তর্ধান।

তবু কি নীরব নিত্য নিবিড় মৃত্যুর
বন্ধন এড়ায়ে তুমি স্মরণ আতুর
এসেছিলে অপরাহ্নে মন্ত্রীর পার্টিতে
সারা বিশ্ব প্রতিনিধি নিমন্ত্রণ 'টি'-তে ?
মধ্যবিত্ত মসীজীবী সামান্য মানুষ
ক্ষণেক জ্বালায়েছিনু জাপানী-ফানুষ
দেওয়ানী খাসের ছায়াতলে,
স্মৃতির অতলে
ডুবায়ে চাকুরী অন্ন উন্নতি ভাবনা
তব রাজছত্র ছায়া বাহিরে পাব না
নিষ্কৃতি যাহার। লেমন বা শুধু আইসক্রীম
ইরাণী সরাব সম বিস্মৃতি অসীম
এনে দিল, ভরে দিল বাসনার অতৃপ্তির ব্যথা।

আমাদের সামান্যতা তোমার সে মদির বর্থতা
পূর্ণ করে দিয়েছে কি স্বপ্ন সফলতা ?
দিয়েছে কি ভরাইয়া যা পাওনি তা ? *

---

* দিল্লীর লালকেল্লায় দেওয়ানী খাসের সামনের উদ্যানে ভারত সরকারের এক মন্ত্রী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উপলক্ষে খুব বড় সান্ধ্য পার্টি দিয়েছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুর পরিক্রমা

অমল ঘোষ

সারা ভারতের সাংবাদিক বন্ধুরা দলে দলে চলেছেন কন্যাকুমারীর দেশে—১৯৫৩ সালের মে মাসের শেষে ত্রিবান্দ্রামে; নিখিল ভারত কার্যকরী সাংবাদিক সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন তাঁদের লক্ষ্য। বাঙলার প্রতিনিধি দল জনতার মতো ধীর মন্থরগতিতে 'জনতায়' এসে মাদ্রাজ পৌঁছালেন সতের ঘণ্টা দেরীতে সকল দলের শেষে। তাঁদের সঙ্গী হয়ে আমিও যাত্রা করলুম সুদূরের পথে। দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে ত্রিবান্দ্রামে।

ষোলজনের জন্যে রিজার্ভ কামরায় আমরা নজন। এ জনতা নয়, ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস। আর এগমোর স্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার গর্ব ভরে বলেই দিলেন, আমার লাইনে গাড়ী চলে মিনিটের কাঁটার নড়চড় না করে। সুতরাং জনতা-যন্ত্রণাভোগী বাঙলা দলের নবীন-প্রবীণ সকলেই স্বচ্ছন্দ মনে খুশী হয়ে উঠলেন।

প্রবীণদের সকলেই স্বনামধন্য সাংবাদিক—বার্তা জগতের দিকপাল এক একজন। নবীন দলে যুগান্তর, সত্যযুগ, বসুমতীর চার তরুণ। প্রবীণ নবীনের ব্যবধান এখন মাত্র কামরার মাঝের কাঠের পার্টিশন—আর পার্থক্য যা কিছু সে জীবন অভিজ্ঞতার।

একটি রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল। সকালে চোখ মেলতেই কোদাইকানাল রোড, দক্ষিণ দেশের অন্যতম শৈলবিহার, রাজাগোপাল আচারির বিশ্রাম বিলাসে যাত্রাপথ। আঙ্গারে হেঁকে চলেছে ফেরীওয়ালা—পাহাড়ি হাওয়া ডেকে বলছে:—"এদিকে এসো গো।"

মাদুরা।

কন্যাকুমারী

তামিলনাদের সংস্কৃতিকেন্দ্র। পবিত্র মীনাক্ষী ভূমি মাদুরা পেরিয়ে গিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতে ক্রমশঃ পাহাড় দেখা দিতে লাগলো এক দৌড়ের নাগালে—কাছে, আরো কাছে। সবুজ পাহাড়ের সাক্ষাৎ এখনও ঘটেনি—ধূসর পাহাড়ের পাদদেশে চাষের চিহ্ন; শ্রমের জয়যাত্রা মহাকাব্য সবুজ শস্যকণায় লেখা। মাঝে মাঝে ফসলের বৈচিত্র্যে নানা ছন্দের হিন্দোল।......

সুড়ঙ্গ পেরিয়ে গাড়ী ছুটতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তার তুলনা ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। যাঁরা কেবল ছোটনাগপুর, পরেশনাথ, বিন্ধ্য-সাতপুরা দেখেছেন, তাঁরা পশ্চিমঘাটের এ রূপ কল্পনা করতে পারবেন না। কল্পনাকে হার মানিয়ে অপরূপ দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে উঠছে বাস্তবে রূপ নিয়ে। যে যার ভাষায় সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করতে চাইছেন—পরমুহূর্তে সে ভাষা-শৈলী অনির্বচনীয়তায় লীন হয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে কবি হয়ে উঠেছেন—বাইরের আবরণে কঠিন কঠোর—মণীন্দ্র রায়। হার মেনেছেন কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—যা ছিল তাঁর স্বপ্নে আর কল্পনায় সেই এসেছে শৈলমালার কায়ায়।

শেষটায় কাব্য ছেড়ে গদ্যে বললেন বিবেকানন্দবাবু—এ যেন অবনীন্দ্রনাথের একখানি ছবি। ছবির রঙে আর প্রকৃতির রঙের গরিমায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ছবিতে মেশিন-চালিত রঙের সুসামঞ্জস্য হয়তো বহু সাধনায় পাওয়া যায়—পাওয়া যায় না রঙের সঙ্গীত। এ যে কী অপূর্ব সুন্দর, সে ত্রিবান্দ্রামের এই ঘাটের পথে চিরসবুজ পর্বতে ফুল-ফলের সমারোহে নারিকেল কুঞ্জের আশ্চর্য সমাবেশে না দেখলে স্বপ্নেও অনুমান অসম্ভব।

ত্রিবান্দ্রাম পৌঁছাতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।
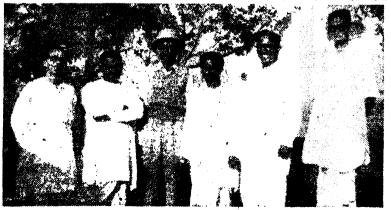
জনতার মধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক রামা রাও—ফোটো—লেখক।

মুগান্তর সম্পাদকসহ অন্যান্য সাংবাদিক ফোটো—লেখক।

তখন নিখিল ভারত বেতনভুক সাংবাদিক সংঘের সম্মেলন সুরু হয়ে গেছল। মাদ্রাজ থেকে পাঁচ শ' বারো মাইল এইমাত্র যাত্রা সেরে হতই শ্রান্তক্লান্ত হোক না যাত্রীদল, সাময়িক-আবাসে সামান্য সময়ের মধ্যে যাঁর যাঁর গুছিয়ে নিয়ে সিনান-আহার অন্তে প্রায় সকলেই বেরিয়ে পড়লেন সম্মেলন ক্ষেত্রে। সেখানে সারা ভারতের সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা,—সবাই এ'রা আগেই এসে পেঁাছে গেছেন।

এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে বেতনভুক সাংবাদিক সংগঠনের সভাপতি শ্রীচলপতি রাও, শ্রীজওলা সিং ও শ্রীরামা রাও; এলাহাবাদ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রী কে বি গোস্বামী, বম্বে থেকে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার শ্রীভূষণ রাও, কাণপুর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীজয়দেব গুপ্ত, শ্রী ও শ্রীমতী মেহেরা, গোয়ালিয়র থেকে শ্রী ও শ্রীমতী বৈদ্য, দিল্লী থেকে সাংবাদিক সঙ্ঘের সাধারণ-সম্পাদক শ্রীচতুর্বেদীজী, শ্রীবিনয় চাটার্জি ও শ্রীভাট, বিহার থেকে গিরিজা-লালজী ও উড়িষ্যার সমাজের শ্রীহর্ষ মিশ্র, আরো অনেক জায়গার অনেকে। বাংলার প্রতিনিধি দলের পথ চেয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিবেকানন্দ-বাবু, ধীরেনবাবু, মণীন্দ্রবাবুকে পেয়ে খুশী হয়ে উঠলেন। তরুণ সাংবাদিক সুনীল ঘোষ, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী ও অনিমেশ চৌধুরী যাঁর যাঁর বন্ধু খুঁজে নিলেন—কেবল একলাটি পড়ে রইলেন কবিগুরুর গুণমুগ্ধ শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীক্ষেমেন সেন।...তিনি আপনাতে আপনি মগ্ন।

সম্মেলনে অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা দীর্ঘ সময় নিয়ে চলেছিল। বিতর্কে এসে পড়েছিল প্রচণ্ড রাজনীতির-ঝঞ্ঝা। সে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে কর্ণধার শ্রীচলপতি রাও তরীকে নির্বিঘ্নে তীরে পেঁাছে দিলেন ৩০শে মে'র মধ্য রাত্রিরও দু' ঘণ্টা পরে। হতাশাবাদিগণও আশা নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন সে রাত্রিতে।

পরের দিন।

এক মন্ত্রী মহোদয় প্রাসাদে পার্টির আয়োজন করেছেন। তাঁরই আমন্ত্রণলিপি সরকারী খামে হাতে এসে পেঁাছাতেই মনে পড়লো—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস সম্মেলনের পর কলিকাতায় তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরীণের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গার্ডেন পার্টিতে আমন্ত্রণের কথা। সেদিন ভাইসরয় ভেবে-ছিলেন : "চিরকাল বিদেশী রাজের অনুগত সদাভূমিষ্ঠ কংগ্রেস সদস্যরূপী এ বিশিষ্ট প্রজা-দের উপরে নির্ভর করা চলে।"........কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই লর্ড ডাফরীণের মারাত্মক ভুল ভেঙেছিল। অনুগত প্রজাদের আনুগত্য শিথিল হয়ে আসতেই তাঁরই ইঙ্গিতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এলাহাবাদ কংগ্রেস পণ্ড করবার প্রচেষ্টা কিছু কম হয়নি।...প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়—এবারে ত্রিবান্দ্রামেও বেতনভুক সাংবাদিক সংগঠনের দ্বিতীয় অধিবেশন!

রম্য-রোমাঞ্চকর-আশ্চর্য-সুন্দর এ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। এ রাজ্যের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব দেখলে আশ্চর্য হবার নয়। কোথাও কোথাও এখনও সুপ্রাচীন চীনের সঙ্গে রাখী-বন্ধন চিহ্ন অব্যাহত। কোথাও বা ঘরের গঠনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য নিদর্শন- কুঁড়ের চালে প্যাগোডার গড়ন মনোরম—আর মহিলাদের পোষাক-পরিচ্ছদে নর্মী মেয়েদের সজ্জার সখিত্ব।

বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির সঙ্গে কেরল-মালাবারের নৈকট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিরসবুজ, আম-কাঁঠাল-কদলীর এত প্রাচুর্য একমাত্র বাঙলাদেশেরই কোথাও কোথাও দেখা যায়। নারিকেল, সুপারি বাঙলাদেশকে মনে পড়িয়ে দেয়। মাছ-মাংসের অবাধগতি স্মৃতি জাগায় আমিষ ভক্ত বাঙলাদেশেরই। গ্রামে গ্রামে কালী মূর্তি বলে দেয়—এরাও বাঙালী শক্তি উপাসকদের সাথী। এদের মেয়েদের মুখের আদল মেলে একমাত্র বাঙালী মহিলাদের সঙ্গে। লাবণ্য, কান্তি, বাঙালীর মতো এদেরও জন্মলব্ধ। মস্তিষ্কের এদের বহুধা ব্যাপ্তি—জাতির নামে, জাতীয় সংস্কৃতির প্রীতি এদের বঙ্গের মতোই বীর্যবান।

বাঙলার রামায়ণ গান—কেরলা-মালাবারে পরিবেশিত হয় কথাকলি নৃত্যে মাধ্যমে। সে নৃত্য সুরু হয় বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলের কোনো কোনো অনুষ্ঠানের, যেমন কবি গানের, মতোই বেশ একটু রাত করে—আর শেষ হয় ঊষার বিহঙ্গ কাকলীতে।

কথাকলি কেরলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তবপন্থী নৃত্যকলা। অতীত কথাকলির আধুনিককালে অনেক রূপান্তর ঘটেছে। আদি কথাকলি ও আজকালকার বহুল প্রচলিত কথাকলি অনেকাংশে আলাদা। এ দুইয়ের ব্যবধান স্বীকার করতে বলতে হয়, ক্লাসিক্যাল কথাকলি আর মডার্ণ কথাকলি। ক্লাসিক্যাল কথাকলির আজকাল যাঁরা (সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয়) চর্চা করেন, তাঁরা নগরীর মঞ্চে অপাংক্তেয়—যেহেতু তাঁদের শিল্পরাগ "জলদি-চলা" নৃত্যকলার পক্ষপাতী নয়। তাই নগরীর পরিবেশের বাইরে তাঁরা থাকেন সুদূর পল্লী অঞ্চলে অখ্যাত, অজ্ঞাত, শিল্প গৌরবে—গৌরবান্বিত অনাহারী সুন্দরের পূজারীরূপে—সাধকরূপে তপস্যারত। আর এ'দের কাছে নৃত্যকলা শিখবার নাম করে কয়েক দিন থেকে, অধীর হয়ে—অকৃতকার্য তার আশীর্বাদ বহন করে, যাঁরা সহর, নগর, বন্দরে ফিরে এসে নিজে-দের ডংকা পেটাতে পটুত্ব অর্জন করেন রাতারাতি, তাঁরাই হন কথাকলির "হীরো"। নৃত্যপাঠ বঞ্চিত—অজ্ঞ দর্শকও দশ হাতে তালি বাজিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। এ সব কথা এখন থাক—আমাদের সৌভাগ্য হোলো নৃত্য-গুরু গোপীনাথের ছাত্র চন্দ্রশেখরণের দলের নৃত্য দর্শনের। শ্রীচন্দ্রশেখরণ কথাকলি নৃত্য পরিবেশনের দাবী না জানিয়ে কেরলার লোক-নৃত্য প্রদর্শনেই বেশী সময় নেওয়ায়, তাঁর সততাকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু নৃত্যা-নুষ্ঠানে যিনি আসর মাৎ করেছিলেন, সর্ব-ভারতীয় দর্শক রসিকদের সামনে তিনি হচ্ছেন, তরুণী, তন্বী, সুন্দরী, নৃত্যশিল্পী কুমারী সরস্বতী। তাঁর মেরী ম্যাকডোলনের ভূমিকায় লাস্যের যে নয়নভঙ্গিমা প্রকাশ পেয়েছিল, বহুকাল পর্যন্ত দর্শকের মনে তার দাগ অস্পষ্ট হবে না।

ত্রিবান্দ্রাম নগরী—রূপসীই নয়, মোহিনীও। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রাসাদ—প্রভাত আলোর ধারায় সিনান করে চিকচিক করতে থাকে রাস্তাঘাট—ছবির মতো বাড়ী-ঘর। হৈ হট্টগোলের হাট কোথাও নেই—নেই বিরক্তিকর যানবাহনের অসহ্য যান্ত্রিক চীৎকার। অফিস, আদালত সেও শান্ত। অমন যে যাদুঘর তার গঠনেও শিল্প-নৈপুণ্যের অনন্য স্বাক্ষর।

এ্যাসফল্টের রাস্তা দিয়ে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ট্যাক্সি ছুটে চলেছিল কন্যাকুমারীর পথে। সহর যেমন, তেমনি সহর-বাহিরের পথ নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া। কত লোক এ দেখে—ভারতের অন্যান্য নগরী থেকে কত অর্থ ব্যয়ে, কত কষ্ট করে এসে এই পথেই কন্যা-কুমারীতে সবাই যান, তাঁদের মধ্যে যে সব

ত্রিবাঙ্কুরী স্ত্রীলোক। ফোটো—লেখক।

পূজোর
প্রীতি-অভিনন্দন

পূর্ব্ব রেলওয়ে
পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার কর্ত্তৃক প্রচারিত

রকর্তা থাকেন, তাঁদের ঘরে ফিরে কি নগর-রকল্পনায় এমনি সৌন্দর্যানুভূতির স্থান বার কথা মনে পড়ে না, একটিবার ভুলেও?

ব্রাহ্ম মুহূর্তে কন্যাকুমারিকায় পৌঁছালুম। একের পর এক ট্যাক্সি আসতে গেলো—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, যুক্ত প্রদেশ, বম্বে, দিল্লীর যাত্রী বহন করে। ত্যুষের আলো আঁধারিতে সাগরপারের বতাংগ মানবের আগমনে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন টলো, "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

পূর্ব প্রান্তে সূর্য উঠলো। ছড়িয়ে পড়লো আলোর আলিংগন কাছে-দূরে-দূরান্তরে। আলোকিত হোয়ে উঠলো সমুদ্রবক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তর—ধ্যানাসন। ওই প্রস্তরাসনে বিবেকানন্দ ধ্যানমগ্ন ছিলেন ত্রি-দিবস-যামিনী। পাথর পেল সেই থেকে ইতিহাস হবার সম্মান। ওই সাগর সংগীতের বন্দনায় তিনি বন্দনা করলেন মানুষকে: Never forget the glory of human nature! We are the greatest God....CHRISTS and BUDDHAS are but waves on the boundless ocean which I am!"

ত্রি-সমুদ্রের সুনীল জলে সকালের সোনালী আলোকে সে কী অরূপ-রূপের সমারোহ। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর সংগম এ কন্যাকুমারিকা—এর ঊর্মিলেখায় কাব্য প্রেরণার অনুরণন! বয়স্ক কে বি গোস্বামী সহসা কবি হয়ে উঠলেন। তিনি ছুটে চলেছেন দূরে কোথায় বালুর রাজ্যে—তারুণ্যের জোয়ার এসেছে তার অণুতে অণুতে। পেছনে যুবক প্রফুল্ল, কণ্ঠে তার সুরের লহরি—

'প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে!
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।"

অথচ প্রফুল্ল প্রায় বলেন, আমি কবি নই।

আশ্চর্য, রঙের নেশায় কে কবি না হয়! কবি হওয়া তো এমন কোনো মারাত্মক অপরাধও নয়—

সমুদ্রতটে কন্যাকুমারীর-মন্দির। ভেতরে খালি গায়ে ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। মন্দির কেন্দ্রিক দাক্ষিণী সভ্যতায় নগর-গ্রামের পত্তন, সমৃদ্ধি বিস্তার পর্যন্ত মন্দিরেরই দৌলতে। কন্যাকুমারী ভারতের সর্বশেষ বিন্দুতে বলেই সম্ভবতঃ এখানে নগর পত্তন সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখানকার জনপদটির প্রাণ-সঞ্জীবনী যে এই মন্দির সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।...... মন্দিরের অদূরে সমুদ্র গর্জে চলেছে—কে যেন মাথা কুটছে মন্দির বহিঃপ্রাচীরে। ভেতরে মণ্ডপ ঘুরে আমরা একদল আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত মানব নগ্নপদে অন্ধকার ভারা-ক্রান্ত বিমান গৃহের দিকে এগিয়ে চলেছি। বিমান মধ্যে কন্যাকুমারী। চার পাশে পেতলের পিলসুজ। পুরানো আমলের অনির্বাণ সেজ জ্বলছে। সে আলোক ছাপিয়ে উঠেছে চিরকুমারী দেবীর হীরক-সজ্জা। কর্ণে, নাসায়, কপালে প্রকাণ্ড হীরক-জ্যোতিষ্ক জ্বলজ্বল করছে। থেকে থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত কণ্ঠে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ। মৃদু হাওয়ায় ফুলের সৌরভ, ধূপের সুগন্ধ ম' ম' করছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সুপ্রাচীন মন্দির বিমানে স্তিমিত তেলের সেজ, তারই মধ্যস্থলে

কোভালম্ স্নানসৈকতে

দেবীদেহে হীরকের দ্যুতি, আশেপাশে পুরোহিত পাণ্ডার ইতস্ততঃ আনাগোনা—সমস্ত মিলে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রভাব যে কোনো মানুষকে অতি সহজে অভিভূত করে ফেলে।......পূজারী হঠাৎ কখন কপালে কুমকুম টিপ পরিয়ে দিয়েছে—হাতে দিয়েছে শ্বেতচন্দন! সংগে সংগে সুরু হয়েছে আরতি; অমনি সাম্যবাদী অনিমেষ চৌধুরীরও দু'হাত কপালে উঠে গেছে। ঠোঁট দুটি তার নড়ছে, কোন্ এক অচিন্তনীয় আকুলতায়।

মন্দিরের বাইরে এসে অনিমেষ চৌধুরীই প্রথম কথা কইলেন, এই আমাদের ঐশ্বর্যময় ভারত। এর কতটুকুই বা আমরা জানি।

উচ্ছ্বসিত সাগর-তরংগে সে স্বীকারোক্তি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরলো।

* * *

কন্যাকুমারী থেকে ফেরার মুখে। পেছনে পড়ে রইল সে—যে গান গেয়ে চলেছে—

"পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে....

পাগল করা সেই গানের তানের শেষ রেশ-টুকু তখনও মর্মের মাঝখানে মিলিয়ে যায়নি, ঢুকে পড়েছি শচীন্দ্রম মন্দিরে। এই শচীন্দ্রমের সংগে কন্যাকুমারীর বিবাহের আয়োজন হয়ে-ছিল—। কি জানি, দেব-দেবীর কোন্ মানব-না-জানা লীলায় সে বিবাহ সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ দেব-দেবীর পাওয়া না-পাওয়ার হাসি-কান্নাটা মানুষের মতো অত সরল নয়—নইলে দু'ই মন্দিরেই কিছু না কিছু বিরহের বিকাশ দেখতে কি পাওয়া যেত না! হঠাৎ ভাবনা স্রোতে বাধা পড়লো—গাইড, স্থানীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের একজন পাচমণি কৈলাস বল্লে—হনুমানজীকে দর্শন করবেন,' চলুন।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যা-বলী বিশ্ববিখ্যাত—কিন্তু এদেশের মন্দির-গুলির মধ্যে শচীন্দ্রম মন্দিরের পাথরের কাজ বহুখ্যাত মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের চেয়েও সুন্দর। এমন জায়গায় সারাভারতের সেরা হনুমান মূর্তি দেখতে না যাওয়াটাই আশ্চর্যের। সত্যি-কথা বলতে কি, এমন নিখুঁত, এমন বিশাল, ও মনোরম হনুমানের মূর্তি ভারতের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ!

ফেরার যাদের তর সইছে না, তাদের তাড়ায় শিল্পের ঐশ্বর্য কিছুই দেখা সম্ভব হোলো না। যে পাথরের কাজগুলি সৃষ্টি করতে ভাস্করকে বছরের পর বছর সাধনা করতে হয়েছে—যে ভাস্কর্যের এক একটি নমুনা যুগ-যুগান্তর ধরে বিশ্বের রসজ্ঞ সুধীজনকে বিমুগ্ধ করে এসেছে—তার অসংখ্য সমাবেশ পাঁচ মিনিটে দেখে সারার চেষ্টা যেমন হাস্যকর, তেমনি অসম্ভব।

গাইড এদিকে তার বিশাল বপু টেনে নিয়ে চলেছে মন্দির পার্শ্বগৃহের পাথর পার্শ্বস্তম্ভ-গুলির দিকে। এর প্রতি পার্শ্বস্তম্ভ সংগীত মুখর। কোথাও সা, রে, গা, মা......কোথাও গং বেজে চলেছে,......কোথাও বা মৃদংগম! পাথর গান গায়—এ যেন কাবুলিওয়ালার গান গাওয়ার চেয়ে অবিশ্বাস্য শোনায়! তথাপি এর একবর্ণও মিথ্যা নয়। অত্যাশ্চর্য এই যে, যে সমস্ত শিল্পী এই স্তম্ভগুলি নির্মাণ করেছেন—তাঁরা কেবল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেই অসাধারণত্ব অর্জন করেননি—সংগীতশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ দক্ষতারও অধিকারী ছিলেন। সুরের এমন মধুর সমাবেশ পাথরে সম্ভব যে

মহান শিল্পীর হাতের পরশ পেলে, সে শিল্পী-সমাজ আজ কোথায়!

৩১শে মে, ১৯৫৩।

সেদিন রাত্রি ৯টার পর সারা ভারতের কার্যকরী সাংবাদিকদের প্রতিনিধি দল ত্রিবান্দ্রমের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ছাত্রাবাসের ডাইনিং হলে নৈশ ভোজনে বসেছেন। ভোজন-পর্ব শেষ হবার মুহূর্তে হঠাৎ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের প্রচার অধিকর্তা শ্রীনায়ার বিদায় ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীনায়ার কিছুকাল আগেও দিল্লীতে বেতনভুক সাংবাদিক ছিলেন—সেই স্মৃতি উল্লেখ করে জানালেন যে, আবার তিনি তাঁর ফেলে আসা জীবনের কঠিন সড়কে নেমে আসতে চান। এবং আজ সুযোগ পেয়ে এককালের সহযাত্রীদের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেশবিদেশখ্যাত রম্যস্থলগুলি দেখবার এমন ব্যবস্থা তিনি করেছেন, যে ব্যবস্থায় সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকবে না—অথচ সারা দেশের সাংবাদিক প্রতিনিধি দল প্রয়োজনমতো সকল সুবিধাই সারাপথ ভোগ করতে পারবেন।

এ ঘোষণায় হাতে চাঁদ পাবার অবস্থা অনেকেরই। তড়িৎগতিতে উঠে বিছানা বাঁধতে লাগলেন সবাই। একটু দেরীতেই যদি হাতের চাঁদ মুঠো থেকে ফসকে যায়।

রাত্রির অন্ধকার চিরে আমাদের এক্সপ্রেস-বাস যুগল ছুটে চলেছে। চলেছে পাহাড়িয়া পথে। কখন যে ভারতের রোম নগরী ত্রিবান্দ্রম ছেড়ে এসেছি—ঢালু পথে ক্রমশঃ নামছি—আর অরণ্য-অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে।

মধ্যরাত্রিতে নাম-না-জানা কি একটা অখ্যাত জায়গা পেরিয়ে এলাম। পথের মাঝে সেখানে জালঝাণ্ডার সভা সবে সুরু হয়েছে। আলো জ্বলছে এখানে-ওখানে, চায়ের দোকানে, পানের দোকানে। সারারাতই মালাবারী দোকানপসার জাগে।

রাতের বিশ্রামের জন্যে আস্তানা ঠিক হয়েছিল কোট্টায়াম ডাকবাংলোতে। যুগলবাস থামতেই জায়গা দখলের জন্যে যাত্রীরা মরিয়া হয়ে ছুটলো। প্রবীণদের সংগে পাল্লা লেগে গেল নবীনদের। মুহূর্তে নবীন দল পাল্লা থেকে সরে দাঁড়ানোর মধ্যে প্রবীণরা হলেন জয়ী।

ঘরের মেঝেয় পাইকারী শয্যা নিতে না-নিতেই ভোরের আলো জেগে উঠল।

১লা জুন। দুপুরের আগে চিত্রপুরম পৌঁছানো চাই। সেখানে মধ্যাহ্নের আহার—রাত্রিবাস ডাকবাংলোতে। চলতে হচ্ছে চড়াই পথে। এই পথের নিম্নভাগে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা হাজারের উপরে। এই ঘনবসতি অঞ্চলে উত্তরভারতের মতো গ্রাম বলতে কিছু নেই। বাস-গৃহের সারি চলে গেছে একটানা মাইলের পর মাইল—বিরতিহীন, শিকল গেঁথে—এ যেন গৃহফুলহার। নাম তার দেশম্। "রেভিনিউ ডিভিশনের" নাম দেশমের পূর্বে ব্যবহৃত হয় বটে—তবে পরবর্তী দেশম আরম্ভ হয় পাশেরই চালে'র থেকে। অংগাঙ্গী এমন বসতি ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না।

উচ্চে—আরো উচ্চে উঠছে বাস। দেশম্ পড়ে রয়েছে পাতালের উৎরাইয়ে। এদিকে তিন হাজার ফুটের উপরে মানুষের বসতি বিরল নয়—কিন্তু দেশমের তুলনায় কিছু নয় বলাই ঠিক।......

দু'পাশে পর্বত। কাছে-দূরে। মধ্যে অরণ্য গম্ভীর। অরণ্যস্থলী নেমে গেছে হাজার ফুটের কাছে। ভয়ঙ্কর সুন্দর সে দৃশ্য!

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্দর মহলে এসে পৌঁছাতেই কেউ বা শিউরে উঠছেন, কেউ বা কবিতা লিখছেন, কেউ বা আশঙ্কায় চোখ বুজছেন। কিন্তু ঘুমবিলাসী ধীরেন দাশগুপ্ত হঠাৎ উঠে পড়েছেন। চতুর্বেদীজী বুন্দেলখণ্ড টানে মনের আবেগ প্রকাশ করছেন: "(ই)গর ফেরদৌস বরুরূহ জমীনস্ত
হমী অস্তো, হমী অস্তো, হমী অস্ত।"......

দুনিয়ার কোথাও যদি স্বর্গ থাকে, সে এ ঠাঁই, সে এ ঠাঁই—সে এ জায়গাই।

মণীন্দ্রবাবু এদিকে ভাবছেন, এই শূন্যপথে বাস গড়িয়ে যদি পড়ে, কাগজে কাগজে দুর্ঘটনার বীভৎস ছবিতে প্রকাশ হবে এ অভিযানের ইতিহাস।......এঞ্জিন আর্তনাদ করে উঠলে অকস্মাৎ—আশঙ্কার কোনো কারণ নেই—বাস আরো খাড়া পথে উঠছে। রামা রাও-এর ভাষায়: We are always flying between the heights.

হঠাৎ বিহারের এক মৈথিলি কবির কাব্যানুরাগের বাঁধ ভেঙে গেল—গুন্ গুন্ করে তিনি সুর ভাঁজছিলেন। চতুর্বেদীজী তাঁকে ধরে বসলেন—আরে ইয়ার, কবিতা শোনাও!

কবি তাঁর কাব্যের এমন এক দল রস-পিপাসুকে এ রম্যপরিবেশে পেয়ে সোৎসাহে নিজের কবিতায় সুর দিতে লেগে গেলেন।

বিহারের সুর ভাণ্ডার শূন্য হতেই ডাক পড়লো বাঙলার। বাঙলা দলের মধ্যে যুগান্তরের শ্রীপ্রফুল্ল গাঙ্গুলী গান ধরলেন—:

"কত আশা কত কল্পনা লয়ে"...... তারপর না—"জীবন এত ছোটো ক্যানে"......সে গান শুনে চতুর্বেদীজী অন্যান্য সকলের সংগে একমত হয়ে সমগ্র ভারতটাই দান করে বসলেন গানের রাজ্য বাঙালীকে।

সারা ভারত—বিহারসহ, বাঙালীর কাছে হেরে বিহারী সুরেন্দ্র মিশ্র অত্যন্ত মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। সহসা কে যেন চীৎকার করে উঠলো—সমুদ্র, সমুদ্র......। চকিতে মিশ্রজীও জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেন—তাঁরও সন্দেহ রইল না—সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে খাড়া পাহাড়-পথের তলায় পথঘেঁসে সমুদ্র উঠে আসছে। সেই মুহূর্তে মেঘের এক শুভ্রঝালর এসে ঘোমটা পরিয়ে দিলে পথটুকুকে। রহস্যময়ী মেঘপুঞ্জ সমুদ্র সৃষ্টি করেছিল, এবারে পথকে করলে প্রিয়ার মতো রোমাঞ্চঘেরা। সমুদ্র আর পর্বত—পার্বত্যপথ আর অরণ্য একের পর এক এ দৃশ্যাবলী ক'দিন কেবলই দেখে চলেছি—সবার মনের এখন ভাবখানি যেন—:

"There is a pleasure in the
pathless woods,
There is a treasure on the
lonely shore,
There is society where none
intrudes,
By the deep sea as music
in its roar;
I love not man the less but
nature move".

ঝিরঝিরে মেঘের নবনি অভ্রশুভ্র ঝালর ভেদ করে পার্বত্যপথের এক মোড় থেকে নিম্নামুখীন বাঁক নিয়ে আমরা চলেছি চিত্রপুরমের ডাক-বাংলোতে। দেখতে দেখতে মেঘ উড়ে গেছে সৈহাদ্রির দিকে—মৌসুমীর চঞ্চল পাখায় ভর দিয়ে। সূর্যের আলোয় ঝলমলে চারপাশের শৈলশিখরশ্রেণী—সবুজে সোনালী। কাছে সাদা বকের ঝাঁকের মতো বাংলো বেশ কিছুটা নীচুতে—আরো নীচের অধিত্যকাভূমিতে লম্বা পা ফেলে ফেলে হাইড্রোইলেকট্রিকের প্রবাহবাহিনী দূরে অদৃশ্য হয়েছে। ওরই পেণ্ট করা লোহ-পদে সূর্যের আভায় রূপোর রঙের ঝলক খাচ্ছে। এমন অপরূপের ছবি-না-হলে আর চিত্রপুরম্ বলার সার্থকতা কোথায়!

চিত্রপুরম—মুন্নার।

কেবল দৃশ্যই নয়, এখানকার ঐশ্বর্যও অফুরন্ত। দক্ষিণ ভারতের সেরা চা-বাগানের একটি বৃহৎ এলাকা এটাই। কাননদেভান পাহাড়ে পাশাপাশি তেত্রিশটি চা-বাগান জুড়ে আছে। এর সবগুলির মালিক সাগর পারের শ্বেতাংগ বণিক। তাদের খাসমহল এটা। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকার এ জায়গাটি ৯৯ বছরের জন্যে শ্বেতাংগ বণিকদের কাছে লীজ দিয়েছেন। কাজেই রাজ্য সরকারের কোনো তাল্লুক এখানে নেই বল্লেই চলে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড থেকে "Very cheerful and happy-go-Lucky bird-এর দল মুন্নার এসে খোদ্ বৃটিশ এলাকার হৈ-হুল্লোড়ে কয়েকটি বছর দিব্যি কাটিয়ে বেশ বিত্ত নিয়েই স্বদেশে ফেরেন—আর এদেশে রেখে যান কুলীকামিনের হাড়ের আবাদ। এখানকার ক্লাবে যে সরাব ওড়ে তার দক্ষিণাতেই গোটা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কয়েক বছরের মধ্যে ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে যাওয়া তো মিথ্যে কল্পনা। সত্যি হচ্ছে, আমাদের স্বদেশের এ ক্ষুদে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাব-রেস্তরাঁ, খেলার মাঠ পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরবাসীদের কাছে নিষিদ্ধ।

কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এ্যাংলো-সেলাকী বার্ডরা পরিবেশ রচনা করতে জানে, থাকতে জানে রম্যনিকেতনে, জীবন উপভোগ করতে জানে ভোগের, ঐশ্বর্যের, সমারোহের মহা-প্লাবনে।

মুন্নার বাজার ঘুরে রাত্রিতে বাংলোয় ফিরেই দুঃসংবাদ—বাসদ্বয়ের একটির স্প্রিং ভেঙেছে। আগামীকাল দূরের কোন জায়গা থেকে স্প্রিং এসে পৌঁছালে আমাদের যাত্রা এগিয়ে চলবে নতুন পথে গেম স্যাংচুয়ারিতে।

গেম স্যাংচুয়ারি যাবার দুটি পথ—একটি পথ সোজা, অন্যটি অনেক ঘুরে। সোজা পথে রামায়ণ বর্ণিত সেই তাড়কার ভয়, অর্থাৎ একেই পথ সদা তৈরী, মাঝে মাঝে হাতির দৌরাত্ম্যে দিনের পর দিন এ পথ যানবাহনের সুমুখে বন্ধ থাকে, তাতে পথটি অত্যন্ত সংকীর্ণ—এক্সপ্রেস গাড়ী চলবে কি না সেও কেউ হলফ করে বলতে পারে না। ঘোরা পথে এ সমস্ত হাঙ্গামা নেই—তবে সেই কোট্টায়াম ফিরে গিয়ে বহু মাইল বেড় করে তারপর স্বচ্ছন্দে পৌঁছাতে হবে গেম স্যাংচুয়ারিতে—সময় লাগবে সম্ভবতঃ অনেক বেশী। বেতনভুক, চাকরীজীবী আমরা সব সহসা এযুগের রাম-লক্ষ্মণ হয়ে পড়লাম। চাকরী বাঁচাতে জানের ঝুঁকি নিয়ে 'তাড়কার' পথে দুঃসাহসিক যাত্রাই স্থির হয়ে রইল।

২রা জুলাই—

সকালে উঠেই অনেকের মনে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগলো। ত্রিবান্দ্রাম থেকে যে ব্যক্তি এত বড় একটি দল নিয়ে পথপ্রদর্শক হয়ে চলেছিলেন—

তিনি কোনো এক ছোট দৈনিক পত্রিকার অখ্যাতনামা সংবাদদাতা। যেমন তাঁর ব্যক্তিত্বের বহর তেমনি রাস্তাঘাট পরিচিতির দৌড়। তদুপরি ইতিমধ্যেই স্থানীয় অধিকর্তাদের উপরে তাঁর প্রভাব অ-কেজো প্রতিপন্ন হতে সুরু করেছে এবং ভ্রাম্যমাণ যাত্রী দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভ্রমণ-সূচী পাল্‌টে চলেছে—যে ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের অসহায়তা, কিংবা রাজ্য সরকারের কোনো অভিনব মতলব, কোন্‌টা যে বেশী কাজ করছে বোঝবার যো নেই। কিন্তু এ ছাড়াও অসন্তোষের অন্যান্য কারণও যে নেই, সে হলফ করে বলা চলে না। ভ্রমণপথের সময়ানুবর্তিতা আগেই কবরস্থ হয়েছে—উপরন্তু গত রাত্রিতে অনেককেই আধ-পেটা আহারে রাত কাটাতে হয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের মহামান্য অতিথি সব—আর তাদেরই কিনা আহারের কোনো যোগ্য ব্যবস্থাই নেই—এর পর আজ ভরদিন কি খেয়ে যে থাকতে হবে—সে কেউ জানে না।

চতুর্বেদীকে পথপ্রদর্শক রাজন নায়ার যেই না বলেছে, পথে অনেকগুলি দেখবার জায়গায় এবেলাটা কাটাতে হবে ঘুরে ঘুরে—অমনি তিনি ফেটে পড়লেন বোমার মতো: তার মানে? না, আমরা কেউ আজে-বাজে দেখবার জায়গা দেখে দিন নষ্ট করতে পারবো না। সোজা গেম স্যাংচুয়ারি ছাড়া কোথাও যাওয়া হবে না।

কিন্তু চিত্রপুরমে সকলের তেজ তখনও মেটেনি, কারো কারো রয়েছে স্ফূর্তির অফুরন্ত ইচ্ছা, কারো বা "চলছে তরী চলুক না" ভাব—তাই এ যাত্রা চতুর্বেদীজীর একলাই রাগের পরে ভর করে মুখ বুজে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

পথে পল্লীবাসম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র—যেখানে বর্তমানে সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের ব্যবহারের জন্যে ৩২,০০০ কিলোওয়াট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এ জলবিদ্যুৎ-আগারে জল নেমে আসে ছটি সুদীর্ঘ পাইপ বেয়ে দু'-হাজার ফুটের উপর থেকে। বিদ্যুৎ-উৎপাদিত জলধারা বেরিয়ে যায় যেদিক থেকে তারই নিম্ন-মুখে নতুন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয়বার জলশক্তি আহরণ করা স্থির করেছেন রাজ্য সরকার। সেই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্থান পরিদর্শনের পর ফিরবার পথে জানা গেল—স্প্রিং এসেছে, স্প্রিং এসেছে—বাসের স্প্রিং।

বাসের স্প্রিং হলে কি হয়, সেই যেন ভ্রাম্যমাণ-উদাসী মনে বসন্তের পরশ বুলিয়ে গেল।

কিন্তু হায়! বেলা বারোটা বেজে গেল, স্প্রিং আর লাগে না। একটা—দুটো—তবু না। লাগবে কি—এ স্প্রিং-এর আকার যে অনেক ছোট! স্প্রিং লাগলো না, লাগতে লাগলো ধোঁকা। আমাদের সংগী এক ত্রিবাঙ্কুরের বন্ধু ছিলেন—তিনি সকল যাত্রীরই "Aide-De-Camp", হঠাৎ তিনি জানালেন, এই মুয়ার বাজার থেকেই অন্য বাসে "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছেন।" ভদ্রলোক ঘরের ছেলে, আমরাও তো ঘরের—বাইরের নই, না-হয় বাইরেই বেরিয়ে পড়েছি—তাই বলে এইভাবে পথের বন্ধু বিদায় নিলে ধোঁকায় না পড়ে যাবার কী আর উপায় আছে! তবু, হায়, বিদায় তাকে দিতেই হোলো। যাবার বেলাতে জানা গেল, ভদ্রলোকের নাম মারণগুলি, কিন্তু মনোরম ব্যবহারে তিনি **সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।**

ভারত মহাসাগরের স্নান ঘাটে
ডি পি মাথুর (পি টি আই), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত।

আকাশে মেঘের আনাগোনার বিরাম নেই। এই "ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা" মেঘ চিরে সূর্যের জ্যোতি চুম্বন পাঠিয়ে দিলে পৃথিবীর আদিম কপালে। এই আবার মেঘেরই হোলো বিস্তার। আবার জ্যোতির কনকপদ্মের আশ্চর্য প্রসার। শান্তিহীন দাহ জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগলো।

নভোলোকের অমৃত বারি না-নামলে যদি, শীতল পানীয়ের আয়োজন পূর্ণ করলে কিশোর ফেরীওয়ালা। বয়স এদের দশ কিংবা বারো—কিন্তু এরা ভিক্ষা না করে ফেরীওয়ালার ব্রতে দীক্ষা নিয়ে যেভাবে সংসারের ভার ঘাড়ে তুলে নিয়েছে এই বয়সে—সে দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

অপরাহ্নে আবার যাত্রা সুরু। সকল যাত্রী এসে উঠলেন এক বাসে। অন্য বাসে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় মালপত্র রইল—ওই বাস আগামীতে স্প্রিং লাগিয়ে পথে ধাওয়া করে অগ্রণী বাসকে ধরবে। এ ছাড়া উপায় ছিল না। তাই এক-চল্লিশজন পুরুষ আর দু'জন রমণী তাদের জীবন-মরণ সঁপে দিলে ঝানু ড্রাইভার পি ডি জনির হাতে।

পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে পার্বত্যপথে বাস রওনা হোলো।......যুগান্তরের সম্পাদক বহু ভ্রমণ পারদর্শী শ্রীবিবেকানন্দবাবু প্রথম থেকেই বল-ছিলেন: "গেম স্যাংচুয়ারিতে দুটি ছাড়া-হাতি ও একটি হাওয়া-খাওয়া বাঘের জলপান দেখতে গিয়ে কাজ নেই—এ যাত্রায় দুর্গতির একশেষ না হয়ে যায় না।" এতক্ষণে তাঁর কঠোর সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলতে সুরু করলো।

এ পর্যন্ত পথ ছিল অল্পবিস্তর পরিচিত। যে পথে এবারে বাস চলেছে সে পথ ড্রাইভারেরও অজানা। অজানা হলেও ক্ষতি তেমন ছিল না, পৃথিবীতে কত অজানা পথেই না কত দুঃসাহসী যাত্রী পথ ভাঙে—কিন্তু এ পথ যে এক্সপ্রেস বাস চলবার জন্যই নয়, এত সরু। কাজেই লেগে গেল পথ-সংকটের সংগে ড্রাইভার জনির অভিজ্ঞ হাতে মেশিনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার সংঘাত।

মাঝে মাঝে মোটরের মধ্যে যাত্রীদের যে **ক'জন ঝিমিয়ে পড়ছিলেন—তাদের বাক্যের** টনিক পরিবেশন করতে লাগলেন সর্বাবিষয়-অস্থির সাংবাদিক রামা রাও। তাঁর সাংবাদিক-জীবন যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এসেছে এতকাল—সেই ট্র্যাডিশন সমানে বজায় রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাতে অদ্ভুত ভংগীমায় রামা রাও কথা বলছিলেন যেন তার নির্বাচন কেন্দ্রের নব নব প্রতিশ্রুতির বন্যা বহাচ্ছে। এক জায়গায় বাস থামতেই এক দল স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রামা রাওকে প্রায় হারিয়ে যেতে দেখা গেল। লেখকের হাতের ক্যামেরা 'ক্লিক' করে উঠতেই রামা রাও উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন—লিখবেন কিন্তু ফোটোর তলায়—নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে রামা রাও।

অনেকক্ষণ ঝিমিয়ে আছেন **অশ্রান্তপ্রাণ** চতুর্বেদীজী। কিন্তু চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন কাঁচা-পাকা বিহারী চতুর্বেদী। তিনি পড়ছেন তাঁর নিজের লেখা প্যারডি। "হিন্দুস্থান হামারার"—প্যারডি, "পামসু হামারা"। শুনেই বম্বের শেঠীই জবাব দিলে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে: "আপনে এ কামাল কিয়া
ধুতি ফাড়কে রুমাল কিয়া।"
ইকবালও এর চেয়ে যোগ্যতর জবাব জুগিয়ে উঠতে পারতেন কি-না, সে আজ আর জানবার উপায় নেই।

মোটরের মধ্যেও দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটছে। জীবন্ত নাটকের অভিনয় লেগে গেছে। যে দৃশ্যটি সকলের মনে আলোড়ন তুললো—সেখানে নায়ককে হঠাৎ দেখা গেল আবেগে পেয়ে বসেছে। অকস্মাৎ লক্ষ্ণৌ-এর এক মুরলী মনোহর বাঁকা নাগররূপে দর্শন দিয়েছেন। যাঁকে দর্শনদান—তিনি চট করে ভ্যানিটি খুলে বের করেছেন আরশি। আধুনিক শ্রীমতীদের যন্ত্রতন্ত্র প্রসাধনের সেরা সহায়ক।

শ্রীমতীকে প্রসাধনে ব্যস্ত দেখে মুরলী মনোহর তারস্বরে এ যুগীয় বংশীনাদ ছাড়লেন। সে যেন পাহাড়ী পথে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে ষ্টিম রোলার গড়িয়ে চলতে লাগলো। পেপসুর সর্দারজীরা **এতক্ষণে মন খুলে হাসবার সুযোগ**

পেয়ে সহসা খানিকটা আয়ু বাড়িয়ে নিলেন।......

অরণ্যপথে কিছুদূর যেতে না-যেতেই বিকট আওয়াজ করে গাড়ীর একটি চাকা জানিয়ে দিলে যে, সে আর অগ্রসর হতে নারাজ। তখনও দিনান্তের শেষ আলোটুকু আঁধার গ্রাস করেনি তাই রক্ষে।

নামতে হোলো দলে দলে। নায়ক-নায়িকা ছুটলেন এলাচের অনুসন্ধানে।

জায়গাটি ভয়ংকর। এপাশে পাহাড় মহারণ্য ঘেরা, ওপাশে কয়েকটি খুপড়ি—একটি চালা; খাদ কাটা তার চারপাশ। এদেশী ভাষায় জায়গার যা নাম—তার বাংলা করলে দাঁড়ায়—"করীস্থান"। করীযূথের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থেই খুপড়িগুলির চারপাশে গভীর খাদ। প্রায়ই এখানে যূথপতির সঙ্গে যূথবন্ধ করীর দল যাতায়াত করে। এক্ষুণি যদি একপাল বন্যহস্তী নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে—কিংবা যদি উপড়ে ফেলে প্রকান্ড মহীরুহের শিশুকে......। এ ভেবে যারা শঙ্কায় কম্পমান তাদের মধ্যে কবির স্থান নেই—। কবি বিবেকানন্দবাবু পথে পা দিয়েই একবার ঊর্ধ্বলোকে তাকিয়ে মহীরুহ রাজ্যের বন্দনা সুরু করেছেন—ঃ "হে অরণ্য তোমায় প্রণাম।" তাঁর প্রাণে নতুন ভাবের সমারোহ। "মানুষ যে ঐশ্বর্যশালী", তিনি বলে চলেছেন, "একথা এখানে এলেই মনে হয়," "এখানেই বিরাজমান এক মহাগরিমা।"

টায়ার ফাটার আওয়াজ পেয়ে আশেপাশের যুবকবৃন্দ শিশু-কিশোর যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে যে ছেলেটি সামান্য ইংরেজী জানে তাকে প্রশ্ন হেনে চতুর্বেদীজী জেনেছেন—"সমুখে সুচির শর্বরী।" তাই তার মুখ শুকিয়ে অমাবস্যার রূপ নিয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশের যৌব-রাজ্যের তরুণ রামা রাও পাকড়াও করেছেন আবার ওই ছেলেটিকে। সে যখন এখানকার চা-বাগানের সহকারী ম্যানেজারের ছেলে তখন আনুকে না ডেকে তার বাপকে। তিনি এলেই একটা কিছু সুরাহা তো হবেই—আর তা যদি হয়, রাও সাহেব ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের দরবারে ছেলেটির ভবিষ্যৎ সীলমোহরাঙ্কিত না করে কি ছাড়বেন কিছুতেই। রাও সাহেব যেমন জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, তাতে গত নির্বাচন না দেখা লোক হলে নিশ্চয় এহেন প্রতিশ্রুতি কিশোরের পক্ষে অবিশ্বাস করার যো ছিল না। কিন্তু ছেলেটি সম্ভবতঃ বিগত নির্বাচনকালীন নেতাদের প্রতিশ্রুতি-অভিজ্ঞ বলেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। কেমন যেন ইতস্ততঃ করছিল—সেই মুহূর্তে খাকীর হাফপ্যান্ট ও সিটের শার্ট গায়ে বেঁটে মোটা এক ভদ্রলোক এসে পড়লেন—ইনিই ছেলেটির পিতা। চতুর্বেদীর রাত্রিবাসের প্রস্তাব ভদ্রলোকের কানে মামার বাড়ীর আবদারের মতো শোনালো কি না বোঝা গেল না। তবে তিনি সে প্রস্তাবের বিপক্ষেই নীরস-কণ্ঠে বললেন—এখানেই কেবল না, এপথে এত লোকের রাত্রিবাসের যোগ্য জায়গা পাওয়া অসম্ভব।

সে কথা শুনে মণীন্দ্রবাবু শুকনো পাঁওরুটি চিবুতে সুরু করলেন। তাঁর পার্শ্ববর্তীরাও চান "শেষ ভেজের" স্বাদ নিয়ে নিতে পারলেই একটা কাজের মতো কাজ করলেন। সুতরাং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভুলতে রুটি চিবানো শুরু হয়ে গেল। যাঁরা শুকনো রুটি দিয়েই শেষ ভোজ সারতে রাজী হতে পারলেন না—তাঁদের কে একজন জানতে চাইলেন—খাবার কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর করলে ইংরেজী জানা ছেলেটা—পাবেন কার্ডামাম।

চতুর্বেদীজী সাগ্রহে বললেন—তুমিও চলো না খোকা, আমাদের সেখানে পোঁছে দিয়ে আসবে।

অবিচলিত কণ্ঠে সে জবাব দিলে—সে কী সহর। জানেন না বুঝি—কার্ডামাম, এলাচ, সামনে শুধু এলাচের প্লানটেশন।

হায় এলাচ! হায় দুঃখ রাতির চলার সাথী এলাচকানন!

এ সেই স্বপ্নে রাঙা এলাচকানন। বিরহ-অনলে জ্বলে জ্বলে বুকে যার বেদনায় কালো হয়ে গেছে—ফুটন্ত সে প্রেমের অঙ্কুর।

দেখে কিন্তু আজ দুঃখ হোলো, এই বুঝি এলাচের গাছ! এ দেখি বাংলাদেশের শটি গাছের স্বগোত্র—হলুদ পাতার মতো পাতা। না আছে রূপের বাহার, না আছে টিকের ঋজুতা! হায় এলাচ তুমি বনারণ্যের উপেক্ষিতা, তবু তোমার ফলের এতো স্বাদ! সংসারে যারা যত উপেক্ষিতা, তারা কি তত স্বাদু—তারাই সেরা।

পাহাড়ের ঢালুতে প্রকান্ড মহীরুহের তলায় এলাচের চাষ—আর দূরে অরণ্যের অভ্যন্তরে হস্তীযূথের বাস। জনি গাড়ী ঠিক করে ফেলেছে সামান্য সময়ের মধ্যে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। সংগে সংগে বৃষ্টি নেমেছে—আকাশ মেঘ-মেদুর। কোথায় যে চলেছি কেউ জানি না। শুধু জানি এ পথের শেষ নিশানা—গেম স্যাংচুয়ারি। কিন্তু সে কোথায়, কতদূরে—? যতদূরে যাওয়া যায় এদিকে লোকালয় নেই। নেই দেশমু। জনশূন্য অরণ্যপথ। মোড়ের মাথা এত সংকীর্ণ যে, মাঝে মাঝে কয়েক মিনিট লেগে যাচ্ছে কেবলমাত্র গাড়ী মোড় নিতে। কয়েকবার তো মোড় নিতে নিতে অতলগহ্বরে পড়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্যশীল, অদ্ভুত অভিজ্ঞ ড্রাইভার জনি—তার চোখ যেমন সজাগ, মস্তিষ্ক তেমনি ক্রিয়াশীল, হাতের উপরে যেমন প্রভাব, তেমনি আস্থাশীল তার চরণযুগল।

রাত নয়টা নাগাত গাড়ী পোঁছাল শান্তমু-পারা। 'পারা' শব্দের স্থানীয় অর্থ পাহাড়। কে জানে এ পাহাড় শান্ত কিনা। কিন্তু চার হাজার ফুট উঁচুতে এ পাহাড়ে পল্লীর বাসিন্দারা মোটরের হেড-লাইট দেখে ছুটে এসে এই প্রথম জীবনে এক্সপ্রেস বাস এ পথে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। পথের পাশেই দুটি পল্লী হোটেল ছিল, সেখান থেকে কেরাসিনের বাতি এসে হাজির হোলো। রাতের আশ্রয় প্রত্যাশী দল অধীর প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে নেমে পড়ে জানতে চাইলো—এ গাঁয়ে কোথাও ঠাঁই হবে কি?

উত্তর পাওয়া গেল, গত রাতে একপাল হাতী এসে অনেকগুলো ঘর ভেঙে দিয়ে গেছে—

শ্রীহর্ষ মিশ্র সহাস্যে বল্লেন—তার কি হয়েছে, আমরা তো এসেছি ভাঙাঘর গড়ে তুলতে। অতএব রাত্রিবাস এ গাঁয়ে না হয়ে আর উপায় আছে!

সত্বরই দুধবিহীন কালো-কফি এলো। তাতেই তৃষ্ণা মিটলো সকলের। কিন্তু পেটে এদিকে যে দাবানল জ্বলছে—তার কী? মালাবারী বন্ধুরা হোটেলওয়ালার সংগে পরামর্শ করে বলল, সে জন্যে চিন্তা নেই—মালাবারী খানা পাওয়া যাবে। নিরাশার আঁধারে আলোর রেখার আভাষ ফুটে উঠলো সবার সারা মুখে।

সদর পথ থেকে সিকি মাইল স্বল্প চড়াই চড়ে এই খাদে পড়ি কি মরি করতে করতে একটি মাত্র টর্চ হাতে এসে পোঁছালাম একে একে, দলে দলে সকলেই একটি অব্যবহৃত আবাসে। বন বিভাগের বাতিল রেস্টহৌস হবে বোধ হয়—এখানেই ঘরের মেঝে ঝেড়ে পুঁছে কোনোক্রমে রাতটা কাটানো—যাতে হিংস্র জানোয়ারের কবলে না যেতে হয়।

পাশেই কোথায় রেডিও বাজছে। সিংহল কেন্দ্রের হিন্দী গান চলছে।

খবরবুভুক্ষু সাংবাদিকদের এ-ক'দিন বহির্বিশ্বের সংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বাইরের জগতে এর মধ্যে কোথায় কি ঘটেছে—কারো জানা নেই। কেবলমাত্র সকালে উড়ো খবর পাওয়া গেছে ভারতের এক বীর সন্তান নিউজীল্যান্ডের এক বীরের সংগে একত্রে অজেয় এভারেস্ট বিজয় করে মরণবিজয়ী মানবের বিজয়-কেতন উড্ডীন করেছে। দার্জিলিংবাসী শেরপা তেনজিং-এর নাম বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কে আগে পরাজিত করেছে অপরাজেয় এভারেস্টকে? তেনজিং, না এডমন্ড পারসিভাল হিলারী? এই সংবাদটুকু পাবার জন্যে প্রিয়া-মিলনের সমআগ্রহে সাংবাদিকদের কয়েকজন ছুটলেন মিঃ কোসীর ঘরে। তাদের পরিবেশিত সংবাদের যে কি মূল্য এমনভাবে এর আগে আর কোনো সাংবাদিক কখনও অনুভব করেছেন কিনা সন্দেহ।

মিঃ কোসী যুদ্ধফেরৎ বর্তমানে এরাজ্যের বন বিভাগের কর্মচারী। তাঁর ঘরে মারণাস্ত্র স্থান পেয়েছে ব্যাটারিচালিত রেডিওর পাশে—টেবিলে গড়াচ্ছে টোটা। ওদিকের রান্নাঘরে কোসীর স্ত্রী পাক করছেন এদেশীয় নোনতা-মিষ্টি মেশানো কিছু একটা। এ ঘরের মধ্যে একটি মাত্র তক্তোপোষ—তার উপরে অবিনস্ত বিছানায় হৃষ্টপুষ্ট দুটি শিশুসন্তান অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশেই গোশালা। রাত্রি গভীর। আহারের জন্যে আবার সেই সদর পথ পর্যন্ত যেতে হবে এই রাত্রিতে। তবু খিদেয় যাদের অবস্থা কাহিল—প্রায় সকলেরই, তাদের কথাই আলাদা। কে আগে গিয়ে বসতে পারে আসন নিয়ে "তারি লাগি কাড়াকাড়ি।" আহার পর্ব শেষ হতে রাত্রি দ্বিপ্রহর। আস্তানায় ফিরে অবাক। শ্রীবৈদ্য দম্পতি বীভৎস ক্ষুধার গ্রাসে নিজেদের রুটীকে বিসর্জন দেন নাই—। এই বৈদ্য দম্পতি মহারাষ্ট্রের সভ্যতা সংস্কৃতির যেন একটি প্রতীক। যেমন এদের সহনশীলতা তেমনি সুরুচিপূর্ণ ব্যবহার।

শ্রীমতী শকুন্তলা বৈদ্য গোয়ালিয়র থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছেন—সেখান থেকে এত পথ দুর্বিষহ বাসভ্রমণে তাঁর সহজাত হাসি-ভরা মুখ শুকিয়ে এলেও হাসি তেমনই আছে।

৩রা জুন, ১৯৫৩।

শান্তমুপারা থেকে রওনা দেবার তাড়া পড়ে গেল অতি ভোরেই। আস্তানায় মাত্র দুটি পায়খানা—তেতাল্লিশজন প্রাণীর সে কী নারকীয় দুর্ভোগের প্রতীক্ষা—আসন্ন। যে যত ভোরে উঠে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারে—নইলে শেষে দেহই বিষাক্ত হয়ে উঠবে। ওদিকে গাড়ীও না ছেড়ে দেয়।

বাসে উঠবার মুখে গত রাতের খাবার দাম অস্বাভাবিক দরে আদায় করতে লেগে গেলেনঃ
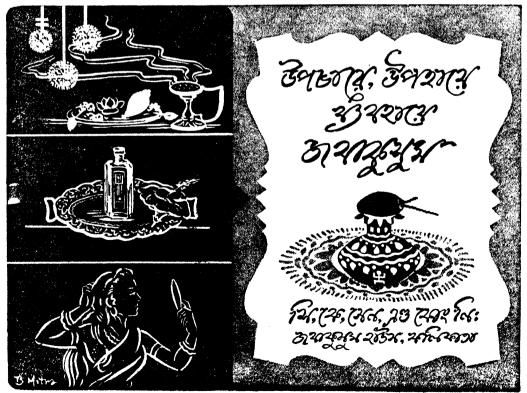
উৎসবের
আয়োজনে বর্ষে বর্ষে ঋতুর রঙ্গমঞ্চে
প্রকৃতি সাজিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর
রম্য অর্ঘের ডালি। বর্ণ, রূপ ও গন্ধের
বিচিত্র সমারোহে সেই ডালি চিরদিনই
পুর্ণ। এই পুর্ণতার অনুভুতিই উৎসবের
অন্তরের কথা। প্রসাধন-বিলাসীদের মনেও
"লক্ষ্মীবিলাস" তেমনি একটি সুরভিত
অনুভুতির স্পর্শ এনে দেয় বলে সকল
উৎসবেই এর আবেদন চিত্তাকর্ষক।

দে'র – –
চা
উৎসব ও
সামাজিক
অনুষ্ঠানের
পরিপূর্ণতায়
অপরিহার্য।
দে'জ টী কোং
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।
২, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট (জোড়াসাঁকো জংশন), কলিকাতা।
—আমাদের ব্রাঞ্চ নাই—

শিল্পে ও
সৌন্দর্যে
PHONE-PK. 2415
MB
বালীগঞ্জে
OMEGA,
WEST-END
ঘড়ির একমাত্র পরিবেশক
মিত্র ব্রাদার্স
৪৭-২ গড়িয়াহাট রোড • কলিকাতা-১৯

উপচারে, উপহারে
শুভ বিবাহে
জবাকুসুম
সি, কে, সেন, এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা
B Mitra

দু'তিনজন সহযাত্রী বন্ধু। এরা যার যার "আপনি মোড়ল"। যাদের নেতৃত্ব নেওয়া উচিত ছিল তাঁরা ইতিমধ্যেই শ্রান্ত-ক্লান্ত-পর্যুদস্ত। সুতরাং যাত্রীদের বেশীর ভাগকে "আপনি মোড়লদের" শিকার হতে হোলো। দু'একজন বিদ্রোহী প্রতিবাদ তুলতে গেলেন, কিন্তু বৃথা বাক্য ব্যয়—তাছাড়া বৃদ্ধ বিজ্ঞ রামা রাও চীৎকার করে বিদ্রোহীদের স্তব্ধ করে ছাড়লেন। এতে লুটেরার ক্ষুদে দলটি অসম্ভব সাহস পেয়ে গেল।......আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে সূর্যের আলো মেঘ চিরে বেরিয়ে এসে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ কখন হারিয়ে যাচ্ছে মেঘেরই আড়ালে। আলোছায়ায় সে চিত্তহারী লুকোচুরিতে মিসেস মেহেরার কোনো আকর্ষণই ছিল না—তিনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আরসি বের করে রূপচর্চায় লিপ্ত হতেই মুরলীমনোহরের বাস্তব অভিনয় নতুন দৃশ্যে জমাট বেঁধে উঠলো।

প্রকাণ্ড মহীরুহের অরণ্যতলদেশ দিয়ে দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা—। যতদূর দৃষ্টি যায়—অরণ্য, অরণ্য, আর অরণ্য।

পাহাড় আর অরণ্যের হাওয়ার একটি গুণ, বড্ড তাড়াতাড়িতে ক্ষুধার উদ্রেক করে। এই তো সবে বেলা দশটা—এরই মধ্যে সকালের ইডলিগুলোও হজম হওয়া সারা। ক্রমশঃ খিদের তীব্রতা যেন বেড়েই চলেছে। মুন্নার বাজারে বাস দাঁড়ানোকালীন কোথা থেকে কিছু আ-ছেঁকা রুটির একটি ঝুড়ি এসেছিল। সে ছিল এতক্ষণ অবহেলায় বেঞ্চের তলায় অস্পৃশ্য হয়ে। হঠাৎ তার কদর আর ধরে না যে। মহাবুভুক্ষার সংগে সংগে মানুষ দেখার ক্ষুধা জেগে উঠলো। অরণ্য-আবাদহীন ভূমিখণ্ড-পর্বত-পাহাড় আর কত দেখা যায়।

মানুষ দেখার জন্যে আমরা প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম।

বেলা ১১-১০ মিনিটে 'পামবাদামপারায় পেঁাছাতেই পামবাদামপারা এস্টেট-এর সাইনবোর্ড দেখেই ধাক্কা ধাক্কি করে মানুষ পাবার আশায় পর পর নেমে পড়ে দলে দলে ছুটে চলেছি—কাছে কোথায় মানুষ আছে। আজীবন অসংখ্য মানুষ দেখে দেখে ক্লান্ত মণীন্দ্র রায় কিন্তু বলে উঠলেন—দ্যাখো দেখি, চা পাওয়া যায় কিনা!

ড্রাইভার জনি বল্লে—পেট্রোল বাড়ন্ত। সুতরাং সমস্যা একটা নয়, সমূহ।......কিন্তু এস্টেটের মালিক যেই শুনলেন একচল্লিশজন পুরুষ ও দু'জনা নারীর দুর্ভোগ যাত্রার কথা—সংগে সংগে বিরক্ত হয়ে তেড়ে এলেন—এখানে কিছু হবে না। বিনীতভাবে এক মালাবারী বন্ধু জাতভাইয়ের কাছে কিছুটা পেট্রোল চাইতেই তিনি কঠিন কণ্ঠে বল্লেন—কুড়ি মাইল হেঁটে টিকারী গিয়ে কিনে আনুন না।

এক বিন্দু জলও এখানে পানের জন্য পাওয়া গেল না। মানুষ দেখার স্বাদ এমন মেটাই মিটলো যে, মুখ দিয়ে কারো আর কথাই সরতে চায় না। পাশেই পাহাড়ের উপরে নতুন বাড়ী উঠছিল। মজুরেরা কাজ করছিল সেখানে—এরা তবু অনেকটা সদয়। কুঁজোতে, দৌড়ে গিয়ে জল ধরে এনে দিলে—দু'আনা পয়সা মাত্র না-চাইতে পারিশ্রমিক পেয়ে খুশীর হাসিতে ছুটে গেল আপন কাজে।

ভাঙা মন চাঙ্গা করে তুলতে একবার শেষ চেষ্টা সুরু হোলো। যে বিবেকানন্দবাবু প্রথম দিকে তাঁর "মালাবার জলদস্যু" কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দিকেই কেউ কেউ এবারে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগলেন।

হতাশার শেষে এসে বাস দাঁড়ালো এক ভাঙা পুলের কাছে। নেমে পড়তে পড়তে মনের ভাবখানা যেন, এর চেয়ে বাস যদি গড়িয়ে পড়ত সৈহাদ্রির শিখর হতে—অন্ধকার পাতাল গহ্বরে—; নীচের কঠিন ভূমি-আবরণের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হবার আগেই আকাশে উড়ে যেত এ প্রাণবিহংগ—সে আর এমন কি মন্দ হোতো!

কিন্তু জনি যেন আমাদের তেনজিং। সে অভিযানের শেষে না পেঁাছেই ছাড়বে না। আর কতটুকুই বা পথ—সামনেই তো গেম স্যাংচুয়ারি। ওরই পাশে আছে টিকারীবাজার। সেখানে আহার্য আছে—আছে পেট্রোল। আছে প্রাসাদোপম সরকারী রেস্টহাউস—আরও আছে পেরিয়ার লেকে নৌ-বিহারের সরকারী ব্যবস্থা। কে বলে আশা নেই।

ভাঙা পুল পার করে বাস এপারে এনে দাঁড় করালে জনি। তার যেন ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—নেই ক্লান্তি, নেই মনের ভ্রান্তি।

টিকারীবাজারের পথে পেঁাছে অতীত দিনের মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন দেশীয় রাজ্যের সীমানা ঘুমটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। জনি, রমণ নায়ারের নির্দেশে আরো এগিয়ে নিয়ে চল্ল গাড়ী।...... কোথায় ডাকবাংলো, কোথায় বিশ্রামশালা? ঘাসের গালিচায় দেহ এলিয়ে দিলে কেউ, কেউ, কেউ বা দাঁড়িয়ে নিজেদের আদুরদর্শিতাকে অভিসম্পাত দিতে লাগলো—কেহ বা অভিযোগে আপনার মাঝে আপনি দগ্ধ হতে থাকলো।......আর জনি, গাড়ী রেখেও তার বিশ্রাম নেই—সে কাছের কোন গাছের আম পেড়ে আনলে—। বিলোতে লাগলো :—দাতাকর্ণ।

গেম স্যাংচুয়ারি আর মাত্র মাইলের পথ। রাজন স্থানীয় কর্তাদের দোরে ধর্ণা দিয়ে যে বাণী বহন করে নিয়ে এলো সে মর্মান্তিক।......

তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "ফেলো কড়ি মাখো তেল।"

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো নেই-ই, তারপর সেই "মরার পরে খাঁড়ার ঘা"—অর্থাৎ লেকে কিছুক্ষণ নৌ-বিহার করতেও মাথাপ্রতি তিন টাকা দু'আনা গচ্চা......

মালাবারের গ্রানিটে গড়া রামচন্দ্রন এবারে প্রকাশ্যেই বল্লে—এ হচ্ছে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মন্ত্রিসভার "মানীর মান রক্ষা"র অভিনব পন্থা হে। বারো রাজপুত্রের তের হাঁড়ি নিয়ে যে মন্ত্রিসভা, তার এক মন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রাসাদে পার্টি দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন তাঁদের প্রমোদ-ভ্রমণ ব্যবস্থা—অন্য মন্ত্রী চাননি তা। পথে তাই বারে বারে ভ্রমণসূচী পাল্টেছে—এখন পাল্টালো "ভদ্রলোকের শেষ প্রতিশ্রুতিটা!"

অতঃপর—টমাসের হোটেলে ঢুকে পড়া গেল। আমিষ ভোজের মুখ দেখা গেল অনেক অনেক ঘণ্টা বাদে। আনন্দ আর দেখে কে? টমাসের হোটেলের মেনু রীতিমত জমকালো—বাংলাদেশের কচু পোড়া আর ঘণ্ট ছাড়া সমস্তই প্রায় পাওয়া গেল। দুটি তরকারী, দু'রকমের মাছ, ভেড়ার মাংস, তদুপরি দই-দেওয়া চাটনী। আর যা না হলে দক্ষিণের কোথাও কোনো আহার পূর্ণ হয় না—সেই সম্বর-রসম্ তো ছিলই। আরো ছিল ম্যালেরিয়া সংহারক "জিরাগরমজল"!.....

টমাস ছিল-না, পারুমেশন-কুট্টি জন, রান্নাঘর থেকে এগিয়ে দিতে লাগলো মেরিয়া। আহারের পরে পয়সা দিতে হোলো মাত্র বারো আনা।......

নিউটন, 'মধ্য-টান' তুমি করেছিলে আবিষ্কার
আপেল-বৃক্ষের তলে বসে,
সহসা আপেল যবে পড়েছিল সম্মুখে তোমার,
ঊর্ধ্ববর্তী বৃন্ত হতে খসে।
হতে যদি দার্শনিক, জন্ম ভারতের পুণ্যভূমে,
আপেলের অধঃপাত দেখে
তাহলে ভাবিতে তুমি আধ-জাগরণে আধ-ঘুমে,
"এই মতো হায় একে একে
জীবনের বৃন্ত হতে খসে পড়ি আমরা প্রত্যেকে।
হায়রে জীবন, তবে কেন মিছে........."
ইত্যাদি ইত্যাদি।
কিন্তু তাহা ভাব নাই, ছিলে না তো
অধি-আত্মবাদী!

ছিলে অতি-কৌতূহলী তৃপ্তিহীন
দুষ্ট শিশু যেন,
অন্তহীন প্রশ্ন যার "কেন? কেন? কেন?
কেন? কেন?"

আপেলের পানে তব দৃষ্টি গেল,
তুমি নাহি গেলে,
শুধাইলে শুধু অতঃপর
"বৃন্তচ্যুত হে আপেল, নিম্নপানে
কেন তুমি এলে?
দাও দাও দাও গো উত্তর!"

জবাব দিল না জানি, আপেল পড়িল অন্য হাতে,
সযতনে ছিন্ন হলো ছুরিকায়, ভিন্ন হলো দাঁতে,
চেনার অতীত তীরে চলে গেল হয়ে রূপান্তর।

ভাবিয়া দেখিলে তুমি "হায়, শুধু
আপেল তো নহে;
নামে বেল, নামে তাল, নারিকেলও
নামে নিম্ন পানে,
ছিন্ন হলে বোঁটা। বৃষ্টি নামে,
নদী নিম্নপানে বহে।"
তারপর খ্যাত হলে আবিষ্কার করি মধ্য-টানে।
কিন্তু ভাবি, তুমি বন্ধু বসেছিলে সেই বৃক্ষতলে,
না হয়ে আপেল বৃক্ষ তাল-বৃক্ষ হতো যদি তাহা,
আর আপেলের মতো যদি হায় বৃন্তচ্যুতি হলে
একটী বৃহৎ তাল পড়িত তোমার টাকে আহা!

হয়তো পাইতে অক্কা টাকে সেই তালাঘাত লেগে,
অথবা ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথা লয়ে হাসপাতালে জেগে
ভাগিত বিজ্ঞানী বুদ্ধি, জাগিত না গবেষণা ভাব,
করিতে না প্রশ্ন তুমি "নিম্নপানে
কেন এলো তাল!"

যাঁরা টমাসের হোটেলে না এসে অন্য হোটেলে ঢুকেছিলেন—যা-তা খেয়ে মুখ ভার করে টমাসের হোটেলেই যখন ফিরে এলেন—তখন সেখানে মাছ-মাংস শেষ হয়ে গেছে।

পেরিয়ার লেক—প্রাকৃতিক হ্রদ নয়—মনুষ্য-সৃষ্ট হ্রদ। পেরিয়ার নদীতে বাঁধ দিয়ে দীর্ঘ-স্থান জুড়ে এই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরই এক পাশে পশ্চিমঘাট পর্বতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে হ্রদের জল প্রবাহিত করা হয়েছে পার্শ্ববর্তী মাদ্রাজ রাজ্যের মাদুরা জেলায় জলসেচনের জন্যে। আর কৃত্রিম হ্রদের চারপাশে তিনশত মাইল অরণ্যভূমিতে হয়েছে আরণ্যজন্তু-জানোয়ার-পশু-পাখীর আনন্দে বিচরণ কেন্দ্র। যাঁরা দুনিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যনিকেতনগুলি ঘুরেছেন—তাঁদের মতে, পেরিয়ার লেকের পরিবেশ অনিন্দ্য সৌন্দর্যমোহ। এর সব-দিকে সবুজ শ্যাম সমারোহ অরণ্যস্থলী। মাঝে মাঝে হ্রদপরিবেষ্টিত দ্বীপ—দ্বীপ জুড়ে ঘন মহীরুহের মায়াজাল—বুকের পাঁজর ঢাকা সবুজ ঘাসের গালিচায়। এখানকার বাসিন্দা যাঁরা, ইচ্ছে মত তাঁরা আসেন জলের কিনারে—জল-কেলি করেন প্রিয়া-অনুচরসহ পরম অনুরাগভরে অভিনব উল্লাসে। কখনও এখানে দেখা যায়, অরণ্যবিলাসী হস্তীযূথ কয়েক পুরুষসহ ক্রীড়া-রত—কখনও দেখা যায় লঘুগতিতে ভ্রমণরত শার্দুল সহসা উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে—অদূরাগত ভ্রমণযাত্রীদের দিকে তার বিহ্বলদৃষ্টিপাত—কী মনোমোহন! কখনও মিশমিশে কালো ডানার সচরাচর অদৃশ্য পাখীর পাখার ঝটপটি, কখনও বা ধূসর সম্বরের দ্রুত পদক্ষেপে এ অরণ্যানী মুখর।

রাত্রে আহার স্থলে পংক্তিতে বসেছি সবাই। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, বম্বে, গোয়ালিয়র, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, মালাবার এক ঠাঁই—সব ভাই ভাই, সবাই আত্মীয়, সবাই স্বজন—সজ্জনও বটে। হঠাৎ খটকা লাগতে লাগলো—দুপুরের সেই টমাসের হোটেল—সেই টেবিল, সেই বেঞ্চ, সেই মেঝের কালো মাটি—তবু যেন হোটেলের কোথায় অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরিবেশক জনের জায়গা নিয়েছে টমাস স্বয়ং, জন এখন শুধু জল দিচ্ছে—। দিচ্ছে না, যেন ইচ্ছে মত করুণা বিতরণ করছে। খাবার মেনু একটি তরকারী আর অখাদ্য রসন-সম্বারে এসে ঠেকেছে। ভেড়ার মাংস আছে, তবে—তার জন্যে হাতাপ্রতি চার আনা অতিরিক্ত দাম দিলেই সে পাওয়া যাবে। কোনোক্রমে খাওয়া শেষে উঠে আসতেই মূল্য সংগ্রহ সুরু হোলো। সংগ্রাহক—আগের সেই খুদে লুটেরা নায়ক। টমাসের সংগে ভিড়ের মধ্যেও তার বারে বারে চোখ ইসারা হতে লাগলো। বিদ্রোহীদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হোলো—"অন্যায় মূল্য আমরা দেবো না।" কিন্তু বিদ্রোহ টিকলো না—দস্তুর মতো আক্কেল-সেলামী দিয়ে সকলে চুপ করলে পরে পকেটভারি লুটেরা নায়ক তড়পে উঠলো : এ টাকায় আমি কি না করতে পারি!

বলতে ভুলে গেছি : আমরা তখন চিত্রপুরম্ থেকে রওনা হবার মুখে। সহসা এই লোকটি একখানি ছেঁড়া কাগজ হাতে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলো—: বকসিস দিতে হবে। চাঁদা চাই।

কাদের এই বকসিস দেওয়া হবে সে কেউ প্রশ্ন করলো না। প্রত্যেকেই সাধ্যমত চাঁদার ছেঁড়াপাতা ভরাট করে দিলে। চিত্রপুরম্ ছাড়িয়ে বহু পথ এসেও কাউকে একটি পয়সা পর্যন্ত বকসিস দিতে দেখা গেল না।

এমন সজ্জনের (?) হাত থেকে পরিত্রাণের কথা চিন্তা করতে করতে আমরা আস্তানায় ফিরলাম। কিন্তু চিন্তা করতে বড্ড দেরী হয়ে গেছল।

মানীর মান রাখার সরকারী আতিশয্যে শেষ পর্যন্ত প্রাসাদোপম বিশ্রামশালার সুসজ্জিত কক্ষগুলি তালা লটকানোই রয়ে গেল। আর বাইরের বারান্দায়—ও-মুক্ত হলের মেঝেয় কোনো-ক্রমে সারা ভারতের বেতনভুক সাংবাদিকদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই হোলো। অন্ধকার রাত্রিতে কেরসিনের টিমটিমে দু'টি লণ্ঠন সম্বল—তাই কেন্দ্র করে যার যার হিসাব কষতে লেগে গেছেন ভ্রমণ-তামামীর। নিজেদের নিকাশটাও খতিয়ে দেখছেন কেউ কেউ আগেভাগেই : বেতনভুক সাংবাদিক দলে বিরাট প্রেসের মালিকও আছেন একজন। তিনি এসেছেন মালিকানীকে সংগে নিয়ে এই সুযোগে দক্ষিণী দেশটা দেখে নেবার প্রোগ্রাম করে। ভদ্রলোক স্ত্রীভাগ্যে সারাপথ ক্রমাগত দাবী করে এসেছেন সেরা সুযোগ-সুবিধা। আর এরই মধ্যে এমন লোকও আছেন—নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছেন সকল অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুবিধা, কেবলমাত্র বন্ধুদের পাছে কষ্ট হয়—এই আশঙ্কায়। কেউ এসেছেন মজা করতে—মজা দেখতে—। আর কেউ বা তীর্যক-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন সভানামী মানুষের মুখোসের তলায় আত্মার অপমৃত্যু। যাঁরা সত্যিকারের দেশ দেখতে, দেশের মানুষকে দেখতে—চিনতে এসেছিলেন—তাঁরা আক্ষেপ করছেন; দেখলাম শুধু পাথর আর পাহাড়—অরণ্য আর পার্বত্যভূমি। মানুষ দেখলাম না। মানুষ দেখতে নাকি ত্রিবাঙ্কুরের শ্রমিক-নেতা বেবি জন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সাংবাদিকদের একটি দলকে আলোপ্পীতে। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিতে কয়েকজন বন্ধু কোট্টায়ামে নেমে আলোপ্পীতে পৌঁছে গেছেন অনেক আগেই। কিন্তু কে জানত,—সারাপথে কেরলার দেশ-বিদেশ বিখ্যাত নরনারীর দর্শন ঘটবে না। কে জানত যে, যে মালাবারী মহিলারা রূপে-গুণে, শিক্ষায় রুচিতে, সেবায় চিকিৎসাবিদ্যায় ভারতের সকল প্রান্তের ঈর্ষার উদ্রেককারী, তাদের শুভ-দর্শনলাভ পথিপ্রান্তে অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা মালাবার-কেরলাকে জানেন, তাঁরাই বলবেন, অন্য প্রান্তের পথঘাটে, পার্কে-পার্টিতে, মালাবারী সুন্দরীদের আনাগোনা যতই কিনা 'ভ্রম' জাগাক মানুষের চোখে—আপন ঘরের কোণে সেই রূপসী রমণীরা তেমন পথে-ঘাটে বের হন না। তাই সেরা কেরল-সুন্দরীদের সাক্ষাৎলাভ ঘটতে পারে একমাত্র বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে—অথবা ঘরোয়া আলাপাচারীতে। অবশ্য সাধারণ কেরল মহিলাদের দর্শন পথে-ঘাটে মোটেই অমিল নয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আর এখানে মুশ্লিম নারীজগতের বোরখাবিহীন চলাফেরা সেও তাজ্জব ব্যাপার। তাদের আঁটোসাঁটো পোষাক পরিচ্ছদের বাঁধুনিতে রূপের হিন্দোল দোলে চলন দেখলে গোঁড়া মুশ্লিমের মাথা ঘুরে যাবে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের মানুষ দেখা যে হয়নি একেবারে এমন নয়—যাদের দেখেছি, তারাও তো দেশের মাটিরই সন্তান। প্রাচ্যের ইতালীয়ান তুল্য সুপুরুষ এন, জি উন্নিথন, যিনি ত্রিবান্দ্রাম যাদুঘরের কিউরেটর, ধীর-স্থির-অচঞ্চল কর্মপটু, অশেষ সহিষ্ণু আমাদের ড্রাইভার জনি থেকে শান্তমপারার সেই হোটেলওয়ালা—টিকারীর হোটেলের মালিক, সে চটকরে ক্ষুদে লুটেরার সংস্পর্শে এসেই হঠাৎ অস্বাভাবিক সেয়ানা হয়ে উঠেছিল, যার পুত্র-পরিবার, পালিত আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকেই হোটেলে কাজ করে; বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রত্যেকটি কর্মচারী, সেংগুলাম প্রোজেক্টের মধুপট্টি বাঁধের চিফ-এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার থেকে আশী টাকা মাইনের নিপুণ এয়ার-ক্রেণ ড্রাইভারগণ—বিদেশী বলেই যাদের এক-একজনকে একই কাজের জন্যে মাইনে দিতে হোতো দেড় হাজার থেকে দু'হাজার, অথচ নৈপুণ্য উভয়েরই সমান—আর শ্রীনারায়ণ গুরু'র শিষ্য সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীনীলাম্বরম্, যার আদি পুরুষ ত্রিবাঙ্কুরের বর্তমান ইড়েবাগণ, এসেছেন আদিতে যারা সিংহল থেকে; এবং চন্দ্রশেখরণের সেই নৃত্য-সম্প্রদায়: এদের প্রত্যেকেই এক গরিমাময় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মাথা উঁচু করে আছেন। এখানে কেউ বসে নেই, কেউ অলস নয়, কেউ ভিক্ষাপাত্র হাতে হাটে-মাঠে-বাটে ভিড় জমায়নি। বাজারের মধ্যে, মন্দির দ্বারে ক্ষুধাতুর তরুণ বালক, অনাহারি কিশোরী বালিকা হয় ঠাণ্ডা পানীয় ফেরী করছে, না হয় পুঁথির মালা, ঝিনুক হাঁকছে। না চাইছে বকসিস, না করছে ভিক্ষা। মনুষ্যত্বকে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নরনারী বিকিয়ে দেয়নি—বিসর্জন দেয়নি শ্রমের মর্যাদা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি ছ'মাসে ৪০০—৫০০ স্নাতক বেরিয়ে আসছে—রাজ্যের কোথায় তাদের ঠাঁই না হলে, তারা ছুটছে কলকাতা-দিল্লী-বম্বে-লণ্ডনে। দেশমের মহিলারা বদ্ধ জলে নারিকেলের ছোবড়া মজলে পরে তার থেকে কাতার জন্যে সুতো বের করতে লেগে আছেন, সহরের মহিলারা ধাত্রী-বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এমনিতর বৃত্তির কি আর শেষ আছে! কাজ—কেবল কাজ এখানে শ্রদ্ধা পেয়েছে—। মানুষ এখানে নত হয়নি আকাশ উচ্চ-পর্বতের মূঢ় দম্ভের কাছে। অরণ্যপর্বতকে বশ করা একটুখানি কথা নয়—এ রাজ্যে মানুষ তাদের জয় করেছে। অরণ্যের বন্য-করীকে বাধ্য করেছে মানুষের সেবায়, আকাশের অসীম বর্ষণকে লাগিয়েছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে—পাহাড়ে ঢালুতে ফুটিয়ে তুলেছে শ্রমের জয়যাত্রার "দুটি পাতা একটি কুঁড়িকে।" ঊর্মিমুখর সফেন সাগর সে যেন প্রিয়ার বাহুডোর। পাহাড়ে, পর্বতে, অরণ্যে, সাগরে রাত্রি জেগে জেগে তরুণ ঊষার অরুণ-রাগের তপস্যা চলেছে এখানে।

তাই, কেবল অভ্রভেদী পশ্চিমঘাট পর্বত-মালায় আর কন্যাকুমারিকায় নয়—এদেশের সাধারণ মানুষকে তাদের সংগ্রামীসত্তায় ও প্রাণ ঐশ্বর্যের সমারোহে একবার দেখলেই সহস্র প্রণাম জানাতে হয়।

পারম্পরিক

যুবক : "আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে পারি কি?"

কন্যার পিতা : "আমাকে একশ' টাকা ধার দিতে পার?"

যুবক : "হ্যাঁ।"

কন্যার পিতা : "হ্যাঁ।"

সাইকেলের রেস

শ্রীমতী বাণী রায়

ছেলেটি চিরকাল চাঁদ চাইতো।

পৃথিবীর বয়স হয়েছে নিঃসন্দেহে। পৃথিবী বড় প্রাচীন। অনেক দেখেছে সে—অনেক শিখেছে। কিন্তু, চাঁদকে চাওয়া দেখে জোনাকীর দুঃখে কতবার কেঁদেছে?

তিন চার ভাই বোনের একটি ভাই দরিদ্র সংসারে। বাবা তাদের পাকিস্থানের রিক্ত ব্যবসায়ী! কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটে। তার মধ্যে আছে রোগ, আছে দুর্ঘটনা। তার মধ্যে চাঁদ চাওয়ার সখ কার সাজে?

ছেলেবেলা থেকে কিছু গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ ও। মনে হ'ত যেন ওর অনেক প্রাপ্তিযোগ আছে। জীবন বোধহয় ওরি সঙ্গে অকথা খারাপ ব্যবহার করছে। ভাগ্য একমাত্র ওকেই গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। যেখানে যাবার, ও সেখানে যেতে পারছে না।

নড়বড়ে দেহ, অতটুকু ছেলের সবটাই বেমানান। প্রকাণ্ড কাঁধের ওপরে বসানো যেন একটা বুড়োর মুখ। যদি শরীরের নীচের অংশটা ঢেকে কাপড় পরিয়ে, উঁচু টুলের ওপর ওকে দাঁড় করিয়ে দিত কেউ, মনে হ'ত মুখ দেখে এ অবশ্যই একটি ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ নিঃসন্দেহে।

ওই যে বাচ্চা ছেলে, তারই গাম্ভীর্য কত। মেপে মেপে পা ফেলে। কথা বলে গম্ভীর বদনে। দেখা যায়, ছোটদের হৈ চৈ থেকে বেশ একটু দূরে বসে কি যেন ভাবছে একা একা। সারা শরীর স্থির, মুখের পেশী শক্ত। শুধু মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে এক-একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ছে নিরুদ্দেশে। ওইটুকু শিশুসুলভ চাপল্য না থাকলে মনে হ'ত এ বুঝি পথ-চলতি খোকা হঠাৎ ক্রুদ্ধ দেবতার শাপে বুড়ো হয়ে ওখানে বসেছে।

কি ভাবত ও? সাতসমুদ্র তের নদীর কথা অবশ্যই নয়, আজকালের ছেলেমেয়ে ওসব ভাবে না। হয়তো ভাবত, পুরাণের স্বর্ণডিম্বপ্রসু রাজহংসীকে যদি ও ধরতে পারে, তা হলে এক দিনেই সোনা পাবার কৌশল শিখে নেয়।

মা অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে একটু বিশেষ চক্ষে দেখত। বোধহয় তাদের মত ও হুড়োহুড়ি করত না, তাদের মত অসভ্য বিলাসে ওর রুচি ছিল না। একটু স্বতন্ত্র, একটু সুদূর গম্ভীর এই ছেলেটিকে মায়ের মাঝে মাঝে কাছে এনে গরীবের সংসারে একটু বেশী যত্ন করতে ইচ্ছা হত। কি বা সম্ভব?

উনুনের ধারে বসে অন্য ছেলেমেয়ের চোখ এড়িয়ে মা চুপি চুপি ডাকত, "রুপো এধারে আয় তো বাবা।"

দুর্লভ দিনে তেল ও বেগুণ দুই-ই আছে। তাই বেগুণ ভাজা হচ্ছে। মা প্রশ্ন করল, "খাবি একখানা গরম গরম ভাজা?"

চোখ চকচকে হয়ে ওঠে, কণ্ঠার হাড় ওঠানামা করে। তবু সে হার মানে না, "বেগুণ ভাজা শুধু মুখে কেউ খায় না কি? রেখে দাও ভাতের পাতে খাব।" চলে যেতে যেতে দুর্বল শিশুত্ব দাবী জানায় একবার, "ওই বড়খানা আমাকে দিও, মা।"

মা আদর করে ডাকে, "রুপো, রুপো!"

রুপীন চটে ওঠে, "রুপো বল কেন? রুপীন বলতে পার না?"

সান্ধ্য আকাশের তারার মত মলিন হাসি মায়ের ক্লান্ত মুখে, "গরীবের ঘরে আমার সোনা তো নেই। তাই তোকে তবু রুপো বলে ডাকি। লোকে জানুক ঘরে রুপো আছে।" চুপ করে থাকে সে। মনে তার অতল সমুদ্রের স্বপ্ন, সোনার খনির স্বপ্ন। সোনা আনবে সে, সোনা আনবেই। সোনার রংয়ে মায়ের জগৎ মুড়ে দেবে সে।

কঠিন ছিল বোধহয় পণ। দুর্বল দেহের অন্তরে কোথাও দুর্বলতা ছিল না। সমস্ত কিছু জয় করে শক্ত হয়ে থাকে সে। কোন জায়গায় একটুও হার মানবে না।

বাড়ীতে কোন খাবার এলে ভাইবোনেরা কাড়াকাড়ি, ছেঁড়াছেঁড়ি করে। ওর লোভে প্রাণ দিশাহারা হয়ে ওঠে। ওরা তো ভালমন্দ খেতে পায় না। কিন্তু, আস্তে আস্তে সরে যায় ও। ইতরামি করে ফেলে নিজেকে নষ্ট করা যেন ওর পোষায় না।

এমনি একটি ছেলের গল্প আজ শোনাতে বসেছি। জাতির আশা যারা, তারা তো বহু দিনই ধ্বংসের মুখে। সাধারণ লোভ ও অভাবের

পাকচক্রে সেইসব শিশুরা হয়ে পড়েছে, যা হওয়া উচিত নয়। আমাদের দিনের কত পাপ, তাদেরি কি স্পর্শ করছে? তাদের দিকে তাকিয়ে চোখে জল আসে। মনে হয়, এই সব শিশুর দল, কিছুই তো দিতে পারিনি তাদের, তবু এতটা অধঃপতনও কি দেখতে প্রস্তুত ছিলাম!

এই মেরুদণ্ডভাঙ্গা, লোভী, নিম্নগামী কিশোরের দলে একজন তার নড়বড়ে মাথা যদি তুলবার চেষ্টা করে, তার দিকে চোখ পড়বেই।

শীতের মুখে সেবার অসুখে পড়ল। পাশের বড় বড় বাড়ীগুলো বিরক্তিতে জেগে থাকে রুপীনের কাশী শুনে। ক্রমে একটু ভাল হ'ল ও কাকার অফিসের হোমিওপ্যাথ কেরাণীর সেধে দেওয়া ঔষধ খেয়ে। বাড়ীর জানালার পাশে ময়লা বিছানায় শুয়ে থাকত, রাস্তা দেখত বসে বসে। কখনও বা ছেঁড়া ছবির বই।

আর ভাবত, ভাবত দিনরাত। সে কি ভাবনা! শিশুর অত ভাবনা বিস্ময়কর।

চোখের সামনে ঘটে যেত কত কি। বাড়ীওলার বাড়ী মা বেড়াতে যেয়ে বাচ্চা মেয়ের আবদারে দেওয়ালির বাজি আঁচলের নীচে লুকিয়ে বাড়ী ফিরছে। মায়ের অপরাধী লজ্জিত মুখও তাকে কোমল করতে পারেনি। ছেলের তিরস্কারে মা ছলছল চোখে বলল, "কি করব? কালী পুজোর দিন ওরা একটাও বাজী পোড়াতে পারবে না"—

"কি দরকার?" রুপো রুখে উঠল, "তাই বলে চুরি করতে হবে? আমি—আমি বলছি আমি বড় হয়ে সব এনে দেব।"

প্রবল আবেগে কাশী উঠে এল রুপোর।

ছোট বোন ক্ষুদি ভেংচে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নাচল, "উনি আমাদের স'ব দে'বেন, রোজ শোনান। ইল্লি! তুই তো বড় হবি না। তুই ভুগে ভুগে মরে যাবি, হারু খুড়ো বলেছে।"

রুপোর সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয় তার মৃত্যুকে শুধু নয়, জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকারকে। তার পণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিশ্বাস তার শুধু নোনা ধরা দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে মরে যাবে, সোনার স্বপ্নকে বীজন করবে না।

তারপরে হয়তো জেদের বশেই ছেলেটি সেরে উঠতে আরম্ভ করল। বাবা রিক্ত ব্যবসায়ী। বিনা মূলধনে ব্যবসা করবার অমানুষিক চেষ্টায় পাকিস্থান ও কলকাতায় ছুটোছুটি করে। ওরা থাকে কসবায়, বাবার বৈমাত্রেয় ভাই হারুর সঙ্গে অ্যাজবেস্টজ-এর ছাদের নীচ দরমার বেড়া দিয়ে ভিন্ন হয়ে। হাতে থাকে যা কিছু মায়ের। বাবা এসে খরচপত্র দিয়ে যায়। এমনি এক সময়ে রুগ্ন ছেলের একটা টনিক কিনে দিয়ে গেল।

টনিক-মাহাত্ম্যে হোক আর যে কারণেই হোক, রুপো সেরে উঠল এবং চলাফেরাও করতে লাগল। ছোট তক্তপোষে ময়লা বিছানা একটা জুটেছিল। সেখানে বসে পড়াশোনা করত, আবার চুপ করে ভাবত কত কি। কতদিন দেখা যেত সান্ধ্য তারার দিকে চেয়ে বিমনা হয়ে কত কি ভাবছে।

হয়তো ওর পণ ছিল সংসারে ভদ্রতা আনা। অর্থের অভাবে সংসার অভদ্র হয়ে গেছে। সেই সংসারকে আবার কি করে ভদ্র করা যায়?

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। রুপীনের দিদি মোহিনী বিদায় ইতি দিয়ে ভাঙা হারমোনিয়ামে সুর-সাধনা করছে। ওপাশের বাড়ীর নীরেনদা মাঝে মাঝে সুর বাতলে দেয়ে যায়।

দিদিটিকে রুপোর বড় শুল লাগত। অভাবের সংসারেও গায়ে দিব্যি পদার্থ আছে। নিজের হাতে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে জামা করে গায়ের খাপে-খাপে। চোখে কাজল দিয়ে কপালে কুঙ্কুমের টিপ আঁকে। ঠোঁটে হাল্কা করে আলতা দেয়। পুরু-পুরু ঠোঁটে লালসার ভাব ফুটে ওঠে। শাড়ী যেন কেমন এলোমেলো-ভাবে গায়ে দিয়ে রাস্তার দিকের কপাটে এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

মা দেখেও দেখত-না। দেখেই বা ফল কি? মুখে বোধ হয় জন্মক্ষণে মেয়েটির ছোঁয়ানো হয়েছিল হাড়ির কোদাল। সে মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য?

"ভাত—কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটার গোঁসাই।" ছড়া কাটে মোহিনী। মা চুপ করে থাকে। সত্যি তো, সোমত্ত মেয়ের কত সাধ-আহলাদ আছে। চারপাশে আজকাল কত কি দেখছে এরা। মা হয়ে কোন সখ পূর্ণ করতে পারে না সে। চুপ করে চেয়ে দেখা ভিন্ন গতি কি?

দুবেলা ভাত-ডাল জোটে নিয়মিত বাবার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে। যে নিরন্ন, সে চায় অন্ন। যার অন্ন জোটে, সে তো মনের স্বাভাবিক নিয়মবশে আরও কিছু চাইবেই।

চোখ মেলে দেখে মা পাশের বাড়ীর নীরেন আসছে গান শেখাতে। গানের শিক্ষা নেবার সময়ে ছাত্রীর গায়ে কাপড় থাকচে না ঠিকমত। ওস্তাদের চোখে কিসের পিপাসা ঝলসে উঠছে?

এরি মধ্যে একদিন ঝুলন-পূর্ণিমায় পাশের মাঠে যাত্রা হ'ল। দেখতে গেল সকলে। জনারণ্যে যে যার মত হারিয়ে গেল।

রুপেনও গিয়েছিল সেখানে। বেশীক্ষণ ওই ভিড়ে বসে থাকা সহ্য হ'ল না ওর। চার পাশের জনতা অতি সাধারণ। অসংস্কৃত রেফিউজির দল। এর মধ্যে নিজের মনের সোনার স্বপ্ন প্রতিমুহূর্তে ধুলো হয়ে যায়!

গ্যাসের আলো জ্বলা, ছেঁড়া শতরঞ্চের ফরাস। তার মধ্যে ঝরে পড়ছে রামায়ণ-মহাভারতের মণিমুক্তা। যে গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য। এখানে দূরে বসে হরি কর্মকারের স্ত্রী চোখ মুছে সাবিত্রীর যমগৃহ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার কথা শোনে—ওধারে হরি কর্মকারের স্ত্রীর উপপতি দুহাতে তালি বাজায় যুধিষ্ঠিরের সত্যভাষণে। অহল্যার পাষাণ হওয়ার কাহিনী মিট্‌মিটে আলোয় বাতাসে ভেসে আসে দরমা-বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

রুপেনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল লোকের ভিড়ে, তার দুর্বল শরীর এখনও সারেনি। বাড়ী চলে এল সে।

তারই তক্তপোষে—নীরেনদা আর দিদি! মোহিনী এলানো চুল হাতে জড়িয়ে, শাড়ী গুছিয়ে উঠে বসল। নীরেন উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে চলে গেল। মোহিনীর হাতে টাকা।

রুপেন কোন কথাই বলতে পারল না। কে যেন তার গলাটা রোধ করে ধরল। সমস্ত জীবনের সাধনা তার দিদি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেলে দিল। অতিকষ্টে আকাশের দিকে উঠেছিল সে, এক টানে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনল। পরের দিন সকালেই লক্ষ্য করলে দেখা যেত রোগা ছেলেটির চোয়ালের হাড় জেগেছে। চোখের কালির কুণ্ড আর একটু বেশী কালি হয়েছে। মুখের রেখাগুলো বাচ্চা বয়সেই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আরও একটু কঠিন হয়েছে তারা।

দৃঢ়সঙ্কল্প আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করল সে। তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে। আর, তারি মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবার পঙ্ক-গহ্বর থেকে উন্নীত হয়ে যাবে। আর তো দেরী করা চলে না। ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সকলে।

আর দেরী করা চলে না। স্কুল-ফাইনালের দেরী আছে। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও পড়া-শোনায় ভাল ছিল না রুপেন। মফঃস্বলের ছেলে, তায় বারে বারে নীড়ভ্রষ্ট। সুতরাং একটু পশ্চাৎপদ। এ ছাড়া স্বাস্থ্যহীনতা মস্তিষ্কে ওর খোঁচা দিত। তাই মাথার ক্ষেত্রে যে কিছু হবে না —সে বুঝেছিল।

তবু, সেই কিশোর জ্বলে উঠতে চায়। একদিন যে নিভে যেতে হবে সকলকেই, সে জানে। জানে সে। তার চারপাশে দেখছে অবিরত মৃত্যু। মৃত্যু সেখানে মহত্ত্ব নিয়ে আসেনি। সেই অবিরাম নিভন্ত অনলে শেষ হয়ে যাবার আগে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে সে জ্বালিয়ে যাবে একবার দারিদ্র্য থেকে সম্পদের পথের আলো, দীনতা থেকে মহত্ত্বের আলো।

এমনি হয় তো অনেক কিশোর জ্বলে উঠতে চায়, জ্বালিয়ে দিতে চায়। তাদের আমি জাতির সম্পদ হিসাবে সঞ্চয় করতে বলি। কিন্তু সকলেই কি পারে মাথা তুলতে? শতাব্দীর শ্রেণী-বৈষম্যের পীড়ন তাদের মাথার ওপরে জগদ্দল শিলার মত চেপে বসেছে। সে মাথা তোলার শক্তি তারা হারিয়েছে।

কি করে নাম হবে? নাম হ'লে তবেই তো জগতে স্থান হবে। স্থান হলে তবেই তো সোনার স্বপ্ন সফল হবে। কি করে সে ব্যতিক্রম এনে দেখিয়ে দেবে?

কাকে দেখিয়ে দেবে? জগতকে, প্রতি-বেশীকে, দিদিকে, নীরেনকে দেখিয়ে দেবে সে সামান্য নয়। সে যে কোন্ দিকে অসামান্য তাই প্রমাণ করতে পারলে যেন যত গ্লানি, যত দুঃখ, সব কিছুর মোচন হয়ে যাবে।

এই সময়ে সাইকেল প্রতিযোগিতা হল কলিকাতার বুকে। দেখতে গিয়েছিল সে। বিজয়ীকে ঘিরে সে কি উল্লাস, সে কি সম্মান প্রদর্শন! কত উপহার, কত টাকা! তারপর ভবিষ্যতে সোনার শীলমোহর।

যানবাহনের মধ্যে একমাত্র সাইকেল রুপেনের আয়ত্তের মধ্যে। এই অর্থে যে হারুখুড়ো বাসের পয়সা বাঁচাতে দু'চাকা পায়ে চালিয়ে অফিসে যান। বাষ্পযানের ভিড়ে মানুষ-চালানো দু'চাকার গাড়ী।

মনে হত রুপেনের এই যে, কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে যাত্রা হারুখুড়োর দূরের পাল্লায়, কখন সে যাত্রা শেষ হয়? জরাজীর্ণ সাইকেলে ততোধিক জীর্ণ হারুখুড়ো লাফিয়ে ওঠেন শুকনো পাতার মত। তারপরে কাঁপা পায়ে একাগ্রচিত্তে সাইকেল চালান দেহের, মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন।

রুপেন কল্পনা করে, চারপাশে ঝক্‌ঝকে গাড়ী, গদিআঁটা বিদ্যুতের ট্রাম, বিরাট বাস, ল্যাণ্ডো-ব্রুহাম, অশ্ববাহিত, স্রোতের মত চলছে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল
প্রণীত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীকৃত
যোগভাষ্য ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা
১ম খন্ড ৭, * ২য় খন্ড ৫, * ৩য় খন্ড ৬,

বিল্বদল

জ্ঞানী সাধকের ভক্তিময় অর্ঘ্য
মূল্য—৪॥০

অভ্যাসযোগ

যোগসাধনার প্রথম সোপান
মূল্য—৩,

দিনচর্য্যা

জীবন গঠনের শাস্ত্রীয় উপায়
মূল্য—১৸০

আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুভূতি

যোগ সাধনার নিগূঢ় সংকেত
মূল্য—১,

●

সর্বত্র পাওয়া যায়।
বিস্তারিত বিবরণীর জন্য লিখুন

উত্তরায়ণ লিমিটেড
১৭০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে!
অসতো মা সদ্গময়
মৃত্যোর্মামৃতংগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়

প্রতিটি
"লক্ষ্মী" পলিসি
মৃত্যুর বিরুদ্ধে
গ্যারাণ্টী

বোনাস ঘোষণা
১১, টাকা ও ৯, টাকা

দি লক্ষ্মী ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড
হেড অফিস—দিল্লী, কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৭, এসপ্লানেড ইষ্ট, ফোন সিটি: ৫১০০

প্রসিদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল
মহানগরীর প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্যগণ বলেন 'হিমকল্যাণ' কেশ প্রসাধনে যেমন অদ্বিতীয়, বায়ুর প্রকোপ (Blood Pressure) প্রশমনেও ইহা অমোঘ।
* নকল হইতে সাবধান *
হিমকল্যাণ
হিমস্নিগ্ধ কেশতৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ। কলিকাতা

ারি মধ্যে ভিড় ঠেলে, অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচিয়ে নুষ দু'পায়ের শক্তি দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। ন্তব্যস্থানে পৌঁছতে হবেই তাকে। এদের সঙ্গে তিযোগিতা! সাইকেলের রেস।

সাইকেলের রেসই ঘোরে মাথায় রূপেনের। রুখুড়োর হাতে-পায়ে ধরে সাইকেল চালানো খেছে সে। জগতের যানবাহনের রেসে কমাত্র সাইকেল ওর আয়ত্তে।

স্থানীয় ছেলেরা একটা সাইকেল প্রতি- াগিতার আয়োজন করল ছোটখাটোভাবে। বড় তিযোগিতাটা তাদেরও অনুপ্রাণিত করেছে ়ূপেনের মত। নাম দিয়ে বসল রূপেন।

হারুখুড়ো কিন্তু একদিনের জন্যও সাইকেল র দিতে রাজী হলেন না, "না বাপু, ও রেসে- সে সাইকেল দেওয়া চলবে না আমার। স্পষ্ট লে দিচ্ছি। সাইকেলটির কিছুমিছু হ'লে না য়ে গোড়াগুষ্ঠী মরতে হবে আমাকে। গাড়ীর াড়া যুগিয়ে অফিসে যাওয়া রোজ, আমার াামতা নেই।"

থু-থু করে থুতু ফেললেন হারুখুড়ো বনা কারণে—"হঃ, এই আরশোলার মত াহারা নিয়ে তুমি ছোঁড়া রেসে নাববে! হঃ!"

মা বাধা দিল, "রূপো বাবা আমার, এসব ুঁশিধ ছাড়, বাবা। এখনও যে শরীর তোর ারেনি। তোর বাবাও এখানে নেই।"

না থাক, বিজয়ী টাকা পাবে, পুরস্কার পাবে, সটাই বড় কথা নয়। বিজয়ীর চিত্র যাবে ত্র-পত্রিকায়। অসাধারণ কাজ সে করেছে। সে াধারণের ঊর্ধ্বে অবশেষে তো উঠতে পেরেছে।

কিন্তু, নিজের সাইকেল নিয়ে যেতে হবে য। অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। দুরন্ত অগ্রগামীর প্রতিযোগিতা নয়। এ হচ্ছে এনডিওরেন্স-এর রস্। কে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে দুই ায়ের এই শক্তির প্রতিযোগিতায়। কার শরীর ততটা সহ্য করে ভেঙে পড়ে না। সহের সীমার ুরন্ত কঠিন পরীক্ষা সাইকেলের রেস।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়লা বিছানায় ভাবছে ়ূপেন শুয়ে শুয়ে। অনেকদিন পরে আজ আবার মাথাটা একটু ধরেছে ওর।

"নীরেনদার নূতন সাইকেলখানা চাইলে পাওয়া যায়।" আড় চোখে তাকিয়ে মোহিনী কেশসংস্কারের ব্যস্ততার মধ্যে বলে উঠল।

সেদিন থেকে ভাইবোনে কথাবার্তা বন্ধ। রূপেনের গা জ্বলে উঠল। কিন্তু, নয় কেন? উপায়ান্তর নেই। নীরেনের চমৎকার নূতন সাইকেলখানা পেলে অবশ্যই রূপেন পারবে সহনশীলতার রেসে জয়লাভ করতে। নীরেনকেও তা দেখিয়ে দিতে চায় রূপেন। নয় কেন?

সাইকেলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। যেখান থেকে আঘাত, সেখান থেকেই সহনশীলতার চেষ্টা!

যথারীতি এল রেসের দিন। গেল চলে। এল পরের দিন। পাড়ার ছেলেরা দিন-রাত্রি জাগিয়ে রাখল কোলাহলে।

"রূপেন চালিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা!" সোৎসাহ গুঞ্জন শোনা গেল চতুর্দিকে।

ওরি মধ্যে ভিড় জমে গেল। বড়দরের কিছুই নয়। আগের সেই সাইকেল রেসের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। তা'হলেও নিশান উড়ল— পথে লোক দাঁড়াল। আর কি চাই?

অবশ্য ধীরে ধীরে পথ জনশূন্য হ'তে লাগল—কাদা-মাটির মধ্যে কাগজের নিশান লুটিয়ে গেল। মুষ্টিমেয় প্রতিযোগীর মধ্যে নেমে পড়ে সিনেমায় যেয়ে বসল অনেকে।

এসব দেখার অবস্থা ছিল না রূপেনের। চোখ-কান-নাক প্রায় সবই বন্ধ তার তখন। কেবল মস্তিষ্কের মূর্চ্ছাপন্ন নির্দেশ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে অলঙ্ঘ্য আদেশে এক অন্ধকার পথে। সে পথের শেষে কি আছে রূপেন জানে না। শুধু জানে পথ ছাড়া ওর গতি নেই। নেমে যেতে ও পারে না।

অনেক দূরে ক্ষেত্র। তবুও মা একবার এসেছিল। ছেলেকে দেখল দশজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। একদিনের মধ্যে চেহারা ছেলের বদলে গেছে। চামড়ার নীচে হাড় ক'খানা দু'চাকার গাড়ী আঁকড়ে রয়েছে শূন্যে। সামান্য যে ক্ষীণ মেদ-মজ্জা দেখা দিয়েছিল টনিক-মাহাত্ম্যে তা-ও ঝরে গেছে ধুলোর সঙ্গে মিশে। কয়েকটি ছেলে সঙ্গে চলছে পথ পরিষ্কার করতে করতে, আর ওকে পাহারা দিতে দিতে। চোখ বন্ধ করে মাতালের মত টলে টলে চলছে ছেলে। শাদা হয়ে গেছে আঙ্গুলের গাঁট সাইকেল আঁকড়ে থেকে।

মা ডুকরে উঠল, "নেমে আয়, বাবা। চল, আমরা যাই। এমন সর্বনেশে রেসে দরকার নেই আমাদের।"

স্বেচ্ছাসেবকেরা থামিয়ে দিল, "চুপ, চুপ। আপনার ডাক কানে গেলে ও দিশেহারা হয়ে পড়ে যাবে। আপনার ছেলের জন্যে আপনার গৌরব হওয়া উচিত। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আর একটু হ'লেই রেকর্ড ভাঙবে আমাদের রূপেন। আপনি এখন বাড়ী যান, মা।"

মা অগত্যা চলে এল। সংসারে কাজ আছে। তা ছাড়া, ওই দৃশ্য সহ্য হয় না।

আসবার আগে শুধু আকাশে প্রার্থনা পাঠিয়ে গেল অসহায় মানুষী, ছেলের কল্যাণে। আকাশে উড়ছে চকচকে উড়োজাহাজ। চারপাশে ছুটছে বিভিন্ন বাষ্প ও বৈদ্যুতিক যান। মধ্যে একা ছেলে তার পাল্লা দিয়েছে সাইকেলের রেসে।

এর পরে আর গল্প বলে কি করব? যা বলব, অমনি পাঠক বলবেন, 'ঠিক ভেবেছিলাম। এমনি করেই শেষ হবে।'

পাঠক অনেক জানেন। জীবন দেখে হয়েছে তাঁর জ্ঞান। কিন্তু, আমিও যে ওই জীবন দেখেই লিখছি। অনিবার্য ঘটনা ভিন্ন আমিইবা কি লিখব?

গরীবের ঘোড়ারোগ না হ'লেও সাইকেল- রেস্। উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয়নি উদ্যোক্তাদের। অর্থের অভাব। পথ পরিষ্কার করা ও পাহারাদারের আয়োজন ছিল অতি নগণ্য।

তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তারাও ছোট, তারাও অর্ধাহারে ক্লান্ত—বিশীর্ণ। ছুটে-আসা সুড়কির লরীখানা ঠিক সময়ে তারা রুখতে পারে নি। রূপেন অনেকক্ষণ ধরেই চোখে দেখতে পাচ্ছিল না।

মুখ থুবড়ে পড়ল ছেলেটা পথের ধুলোয়। ক্ষণিক-বিলাসে ধুলো রক্ত-রাঙা হয়ে উঠল। একটি রিক্ত ব্যবসায়ীর পিতৃ হৃদয় হাহাকার করে উঠল। এক মায়ের চোখের জলে উনুনের আগুন নিভে গেল। এক দণ্ডের জন্য ধুসর ধুলোতে গোলাপ ফুটল মানুষের রক্তে। ওইটুকু রং ধরাবারই সাধ্য ছিল সাইকেল-রেসের।

আমার গল্প শেষ হ'ল। •

নর্মদার মর্মর শোভা

অমপ্রজ্ঞা ভাদুড়ী

অন্তরের অতলান্ত অন্ধকারে অকস্মাৎ,
বিদ্যুতের নীল দ্যুতি হোল বিচ্ছুরিত।
অতনুর তীর্থ হতে স্পর্শময় তরঙ্গ সংঘাত,
মুহূর্তের মানদণ্ডে চেতনায় হোল আবর্তিত।

দৃষ্টিসীমা অতিক্রান্তি জাগে শ্বেত
বর্ণালী বাহার;
নীলাক্ষী নর্মদাধৃত শঙ্খশুভ্র মর্মর পাহাড়।
ছিন্ন করি অরণ্যের শ্যাম কুজ্ঝটিকা,
দীর্ণ করি অম্বরের নীল বর্ণ লিখা,
উত্তুঙ্গ ধবল চূড়া ঊর্ধ্বে শূন্যপটে
চিরস্থির। যেন চন্দনের ফোঁটা কালের ললাটে।

ধ্যানমগ্ন চন্দ্রমৌলী। জটাজুটবাহী;
বিষধর নাগধ্বজ যেন ঊর্ধ্বে চাহি,
লক্ষ মুখে নেমে আসে নির্ঝর প্রবাহে,
সুধা আর বিষ মিশি চূর্ণ হয় ফেনপুঞ্জ দহে
কাঞ্চনিভ শিলাগাত্রে। পদাঙ্ক চুম্বিতা;
নীলাক্ষী নর্মদা নদী শান্ত প্রবাহিতা।
তপস্বিনী উমা যেন ধ্যান করে বিশ্ব দেবতার,
ধ্যান করে মানুষের মোহ ভঙ্গ লাগি অনিবার।
সে ধ্যানের বীজমন্ত্রে, মানুষের প্রাণে জাগে
আনন্দ কল্লোল;
মোহাবিষ্ট চক্ষু দেখে অপার্থিব সৌন্দর্য কমল।

দৃষ্টির অতীত হোক, মানসের একান্ত নিভৃতে;
অহোরাত্র স্থিত সে যে প্রাণময় প্রসন্ন প্রীতিতে।
মনের আকাশে মম বারিদ আর বিদ্যুতের
নিত্য আনাগোনা;
সেথা দেখি নর্মদার নীলতটে মর্মরের
শুভ্র আলিম্পনা।

দুঃখী — রমেশ পাল

অতিলৌকিক

উমা দেবী

ধলজোয়ানের দুঁদে জমিদার প্রতাপনারায়ণ যখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামলালকে সমস্ত জমিদারীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে কাশী যাত্রা করলেন তখন সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। অনেকের কাছেই ব্যাপারটা চমকপ্রদ ব'লে মনে হয়েছিল। রাও রাজা প্রতাপনারায়ণের দুই ছেলে —মোহনলাল আর শ্যামলাল। মোহনলাল জ্যেষ্ঠ—পিতার প্রিয়, সুতরাং শুধু পিতৃস্নেহ সৌভাগ্যের দিক দিয়ে নয়, ন্যায়ত ও ধর্মত মোহনলালেরই সমস্ত জমিদারীর মালিক হওয়া উচিত ছিল।

কাশীতে প্রতাপনারায়ণের সংগে যখন আমার দেখা হয় তখন তাঁকে আমি এই কথাই বলেছিলাম। তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমাকে বললেন—আপনি অতিলৌকিকে বিশ্বাস করেন?

আমি আমতা আমতা ক'রে বললাম—হ্যাঁ-না—হ্যাঁ তা করি বৈকি! ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—আমাদের বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি!

তিনি আমার কথা শুনে আমার চোখে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—শুনুন তবে। আমার ছোট ছেলে শ্যামলাল আমার অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল। বাস্তুবিকই মোহনলাল রাজা হবার ষোল-আনা উপযুক্ত ছিল। শিক্ষায় দীক্ষায় দৃঢ়তায় মোহনলাল ছিল আভিজাত্যের প্রতিমূর্তি। শ্যামলাল ছিল চঞ্চল বেহিসাবী অবাধ্য। জমিদারী চালাবার অনেক কাজেই সে অজ্ঞাতে বা প্রকাশ্যে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করত। একদিন এমনি একটা জমিস্বত্বের ব্যাপারে আমার কাছে যখন খবর এল যে, শ্যামলাল আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তখন অসন্তুষ্টবোধে শ্যামলালকে আমি ডেকে পাঠালাম। শ্যামলাল এল। আমি তাকে অনেক ভৎসনা করলাম, কিন্তু তার ঔদ্ধত্যের অর্থাৎ আমার কাছে যা ঔদ্ধত্য ব'লে মনে হয়েছিল তার কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখলাম না। সকলের সম্মুখে আমি তাকে ত্যজ্যপুত্র করলাম। বললাম—আমার জমিদারীর চৌহদ্দি ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে—এই মুহূর্তে।

শ্যামলাল তার বক্র ও দীর্ঘ ভ্রূযুগ ঊর্ধ্বে তুলে শুধু বললো—যাব।

আমি বললাম—এই মুহূর্তে যাও, আর অন্তঃপুর থেকে তোমার স্ত্রী-পুত্রকেও সংগে নিয়ে যাও।

শ্যামলাল আহত দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করল—কেন? তারা কেন যাবে?

আমি বললাম—আমার হুকুম।

শ্যামলাল বলল—আপনার হুকুম আমি শুনব না, আমি একা যাব।

আমি এবার সান্ত্রীকে হুকুম দিলাম—ভেতর থেকে শ্যামলালের স্ত্রী ও পুত্রকে এখুনি বাইরে পাঠাবার কথা বলে পাঠাও।

শ্যামলাল সান্ত্রীকে গমনোদ্যত দেখে গর্জন ক'রে উঠল—খবরদার!

আমিও গর্জন ক'রে উঠলাম—হুকুম বরদার।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলাম শ্যামলালের জোর কোথায়। দেখতে দেখতে প্রজারা দলে দলে জমায়েৎ হ'ল, ঘিরে ফেলল আমার প্রাসাদ। বুঝিয়ে দিল তারা শ্যামলালের আদেশে বা ইংগিতে এই মুহূর্তে ভেঙে ফেলতে পারে আমার স্বপ্নসৌধ।

প্রতাপনারায়ণ চুপ করলেন। তারপরে বেশ স্পষ্ট সুরে আরম্ভ করলেন—আমি একজন শক্তিশালী জমিদার, অত্যাচারী বলে আমার খ্যাতি ছিল। অনেক প্রজাবিদ্রোহ আমি স্বহস্তে দমন করেছি। কাজেই প্রজাঘটিত এই আতিশয্যে আমি কিছুমাত্র ভয় পাইনি। আমি জানতাম আমার কয়েকটিমাত্র সান্ত্রী কয়েকবার গুলী চালালেই ঐ নিরস্ত্র প্রজামন্ডল ছিন্নভিন্ন হয়ে উবে যেতো। কিন্তু আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম সম্পূর্ণ অন্যকারণে। কি আমার হ'ল জানি না—আমি দেখলাম সেই স্তম্ভিত প্রজামন্ডলের মধ্যে আমার পূর্বপুরুষেরাও দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের স্থিরদৃষ্টি শ্যামলালের ওপর থেকে আমার ওপর ন্যস্ত হ'ল।

আমি শ্যামলালকে বললাম—তুমি জমিদারীর ভার নাও। আমি সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে কাশীযাত্রা করব।

শুনে প্রজারা চীৎকার ক'রে আনন্দে ফেটে পড়ল।

শ্যামলাল শুষ্ক ও কঠিন স্বরে বলল—তা হয় না, আমি আপনার ত্যজ্যপুত্র। আপনি আমাকে একা যাত্রা করতে দিন।

আমি বললাম—আমার কথার অন্যথা হবে না। এমনকি আমি মোহনলালকেও কিছুই দেব না। তোমার ধর্মবুদ্ধিতে এসম্বন্ধে যা উচিত বিবেচনা হয় করো।

শ্যামলালকে সমস্ত জমিদারীর মালিকানা স্বত্ব দিয়ে আমি কাশীযাত্রা করলাম।

আমি প্রতাপনারায়ণকে বললাম—কিন্তু আপনার ঐ দেখা—ওতো ভ্রমও হ'তে পারে!

এই কথা ব'লে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় যখন বেশ গুছিয়ে সবে আরম্ভ করেছি—প্রতাপনারায়ণ তখন আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। একমুহূর্তে তাঁর ঝকঝকে কঠিন দৃষ্টি করুণায় কোমল হ'য়ে এল। তিনি ছোট্ট একটি নমস্কার ক'রে বললেন—আপনি এবারে আসুন।

জনমত

(১৬২ পৃষ্ঠার পর)

ই বাহির হইয়া আসিল এবং শাসাইতে
ল........

"বজ্জাত বুড়ো, হারামজাদা ব্যাটারা!
শ এনে জব্দ করবি আমাদের? ......রোস
দর টের পাওয়াচ্ছি!......গাড়ীতে আগুন
য়েছি, এবারে বাড়ীতে আগুন ধরাবো!......
দের এখনো চেনোনি বাবা!......গাড়ীর
া উড়িয়ে বড্ড লম্ফঝম্প মারা হচ্ছিলো;
ার? ক'খানা গাড়ী কিনবি?......আমাদের
এখনও ফুরোয়নি।"

দেখা গেলো বিধাতা পুরুষ হইতে সুরু
য়া মর্ত্যবাসী জীব পর্যন্ত সকলেই ইঁটের
ই বিশেষ আস্থাবান।

মজুমদাররা যদি এই সব আস্ফালন ও
ক্তির মৌখিক কোনো প্রতিবাদ করিত, তাহা
ল অন্ততঃ ইহাদের কিছুটা সম্মান বজায়
কত। কিন্তু 'সম্ভ্রান্ত বুদ্ধি' মজুমদাররা
াম্মুখির ধারে-কাছেও গেলো না।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ ঘন্টাকাল তাহাদের বাড়ীর
ত দরজা জানলা বন্ধ ছিলো, পরদিন দেখা
লা সমস্ত খুলিয়াছে এবং দরজায় দুই
টি রাইফেলধারী পুলিশ!

তাহাদের একজন দরজায় স্থির হইয়া আছে,
অপরজনকে প্রহরী করিয়া বড়ো ভাইয়ের
ড়ীতে ছোটভাই এবং বাড়ীর ছেলেরা এক-
গে অফিসে ও স্কুলে যাতায়াত করিতে সুরু
রিয়াছে! অতএব আপাততঃ ইঁটের চাকরী
ম হইয়া গেলো!

কিন্তু 'গেলো' বলিলেই কি সব যায়?

ইঁটের চাইতেও দুর্ধর্ষ অস্ত্র আছে।

কি বিধাতার, কি মানুষের।

সে অস্ত্র—কলম! যেখানে ইঁটে কাজ না
য়, সেখানে কলম অব্যর্থ।

রকের ছেলেরা গ্যাসপোষ্টের নীচে জটলা
ধরা প্রস্তাব করিল—তবে কলম!!

সমস্বরে হাততালি পড়িল।

ওরই মধ্যে একজনের 'কবি'খ্যাতি ছিলো,
বৃতি রচনার ভার সে লইল।......

সনৎ উকিল কহিলেন—অসম্ভব। এই
টেমেন্টে সই দেবো? আমি তো ক্ষেপিনি!
মার চাকর মরেছে তো তোমাদের কি মাথা-
থা বাপু?......যাও যাও নিজের চরকায় তেল
ও গে—!......

ছোকরারা কহিল—সই না দিলে সার,
াপনার দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবো!

উকিল কহিলেন—থাকো! —কহিয়া
াদালতে যাইবার উদ্দেশ্যে চৌকাঠের বাহিরে পা
তে গেলেন। গেলেন বটে তবে পারিলেন না।

পুরনো দশটি ছেলে পায়ের নীচে শুইয়া
বং নূতন আমদানী আর দশটি ছেলে সামনে
াইন দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সনৎচন্দ্র সেদিন আদালতে গেলেন না।

পরদিন না।

তৎপর দিনও না।

সেদিন অবশ্য যাইবার ক্ষমতাও ছিলো না।
টির হাড় সরিয়া গিয়াছিল।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে রঙ্গমঞ্চে আবার ইঁটের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

অনবরত উঠানে ঢিল, রান্নাঘরে গরুর হাড় এবং সদরে অহিংস প্রতিরোধের নিপীড়নে নিরুপায় আলিপুরী উকিল সনৎচন্দ্র বিবৃতিতে সই দিলেন!

রাইফেলধারী সান্ত্রীর প্রহরায় সুরক্ষিত বনেদী গম্ভীর চেহারার বাড়ীখানার প্রতি অবিরত তাকাইতে তাকাইতে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে সূক্ষ্ম ঈর্ষার বিষ সঞ্চারিত হইতেছিল, অসম্মতির দৃঢ় বনেদ টলাইবার পক্ষে সেও কিছু কাজ করিল বৈ কি।

এই মূল্যবান দলিলটুকু সংগ্রহ করিবার পর আর কোনো বাধা থাকিল না। ছেলেরা মহোল্লাসে অপরাপর বাড়ীতে হানা দেওয়া সুরু করিল।

প্রত্যেকেই শিহরিত কলেবরে প্রবল আপত্তি করিতে থাকেন, তাঁহারা যে ক্ষ্যাপেন নাই, এবিষয়ে পরিষ্কার ঘোষণা দেন, ছেলেগুলোকে কটু-কাটব্যও করেন।

কারণ মজুমদারদের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল!

কিন্তু হইলে কি হয়!

ওদিকে যে জীবিকার ব্যাপার 'বানচাল' হইবার উপক্রম। কে কয়দিন বাড়ী বসিয়া থাকিবে?...অফিস আদালত যাওয়া হয় না, বাজার করা হয় না।

যুগপৎ ইঁট ও অনুরোধের প্রবল দাপটে—অবশেষে প্রতিপক্ষের সামনে সকলকেই একে একে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল।

একটি একটি করিয়া স্বাক্ষরের সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাইতে থাকে, দলিল ততো শক্তিশালী হয়। ...কয়েকদিন পরে আর ইঁটের প্রয়োজন হয় না, শুধু অনুরোধেই কাজ হাসিল হয়।

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নামে চোখ বুলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তলায় অপ্রতিবাদে স্বাক্ষর পড়ে। এমনকি ক্রমশঃ যেন সকলেরই মনে হয়—ছোকরারা যা লিখিয়াছে ঠিকই।......

সত্যই মজুমদার পরিবার উন্নাসিক ও অহঙ্কারী। কখনোই গরীবকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না। পাড়াপ্রতিবেশীর সহিত যে অমায়িক ব্যবহার করিয়া থাকেন সে যেন অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপা!

রাইফেলধারী পুলিশ বসাইয়া বাড়ী রক্ষার ব্যবস্থা হইল; কেন, পড়শীর সাহায্য লওয়া চলিত না? 'চাল'! 'চাল'!

পড়শীনীরাও সহসা মজুমদার গৃহিণীর 'মদগর্ব' ও বধূযুগলের 'দেমাক' আবিষ্কার করিয়া পূর্ব সহানুভূতি হারাইয়া ফেলেন। এবং উহাদের বিরুদ্ধে একটা তোড়জোড় চলিতেছে দেখিয়া একটু যেন আনন্দিতই হ'ন।

সাধনার জয় হয়!

কয়েকদিন বাদে—

কাগজে কাগজে এই সংবাদ ছাপা হয়—

নিরীহ পথচারীর শোচনীয় জীবনাবসান!

দরিদ্রের প্রতি ধনীর হৃদয়হীন ঔদাসীন্য!

মৌন মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনা।...ইত্যাদি।

সংবাদ পরিবেশনের অপর পৃষ্ঠায় বিবৃতি ছাপা হয়—কেমন করিয়া জনৈক রায় বাহাদুরের বাড়ীর একটি নন্দদুলাল ছেলে খেলার ছলে ছাদ হইতে ইঁট ফেলিয়া হতভাগ্য হারাধনের প্রাণনাশ করিয়াছে, কেমন করিয়া ওই পরিবারভুক্ত সকলে একযোগে ফুটপাথের উপর সারি সারি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া সেই কৌতুক দৃশ্য উপভোগ করিয়াছে, কিভাবে প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া গুপ্ত কৌশলের সাহায্যে পুলিশকে 'হাত' করিয়া অপরাধী ব্যক্তিরা স্পর্ধিত বিক্রমে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি—

অতঃপর জনসাধারণের প্রতি সকরুণ আবেদন জানানো হইয়াছে, অবিলম্বে যেন উক্ত ধনী পরিবারের প্রতি যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়।

কারণ ইহাকে দৈবদুর্ঘটনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া—অন্যায় অসঙ্গত। ইহা যুগ যুগ সঞ্চিত মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের পুনর্লিখন।...দরিদ্রের জীবনমরণের প্রতি ধনীর অবহেলা ঔদাসীন্যের চরম পরাকাষ্ঠা।

নিহত হারাধনের পরিবারবর্গের প্রতিপালন ব্যপদেশে ওই ধনীব্যক্তির নিকট হইতে সমুচিত অর্থ আদায় করিবারও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে।

কারণ—মরণকালে নাকি হতভাগ্য হারাধন "অগ্নিস্রাবী ক্ষীণকণ্ঠে" আবেদন জানাইয়া গিয়াছে...'প্রতি—শো-ধ!'

* * * *

সনৎচন্দ্র সমাদ্দার প্রমুখ ষোলোজন ভদ্রব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত এই আবেদন কাগজে বাহির হইবার পরের রাত্রে ব্লাডপ্রেসারের রোগী বৃদ্ধ মজুমদার সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গেলেন।

প্রতিপক্ষ বলিল—হুঃ হুঃ বাবা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, গরীব মেরে পার পাবি?

দুই একদিন পরে ছেলেরা বাড়ীতে তালা লাগাইয়া সপরিবারে কাশী রওনা হইল, তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করার উদ্দেশ্যে। ...পাড়ার কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

গম্ভীর চেহারার বনেদী বাড়ীখানা মুখে কুলুপ লাগাইয়া মৌন মহিমায় অবিচল দাঁড়াইয়া ......থাকে......।

পাড়ার সকলে সেইদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অসতর্কে নিশ্বাস ফেলে! ...সমারোহের শ্রাদ্ধ হইত সন্দেহ নাই! ..হয়তো তিন-চার বেলার রেশন বাঁচিয়া যাইত! ...পাড়ার লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াগুলো, কী উৎখাতই না করিল ভদ্রলোকদের!

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে—

রসময়ী

(৫৫ পৃষ্ঠার পর)
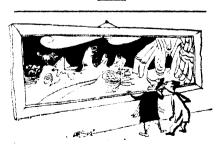
সন্ধান করে তার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন। এবার তো আর রসময়ী বিয়েতে ভাংচি দিতে আসবেন না। কিন্তু তখনও অনেক জিনিষ জানতে বাকি ছিল। শাস্ত্রকারেরা কেন যে সাপিণ্ডিকরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন, সেটা ভেবে দেখা উচিত ছিল।

আশীর্বাদের আগের দিন একখানা খামে চিঠি এলো। রসময়ীর পরিচিত হস্তাক্ষর! তাতে অজস্র চন্দ্রবিন্দু দিয়ে লেখা আছে ঃ 'আমি মরি আছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিষ্কৃতি পাইয়াছ, তাহা মনেও করিও না। বাড়ীর সম্মুখে যে বড় বটগাছ আছে, তাইতে আমি আজকাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর, কোথায় যাও, সমস্তই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। রাত্তিরে গাছ হইতে নামিয়া মাঝে মাঝে তোমার শয়নঘরে যাই, খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা করে, তোমার গলাটা টিপিয়া দিয়া তোমাকেও আমার সঙ্গী করি। বিবাহ করিও না। করিলে তোমার ললাটে অশেষ দুর্গতি লেকা আছে।' এ চিঠি পড়ে পাঠকেরই শিহরণ লাগে, ক্ষেত্রমোহনবাবু যে ভয়ে সন্ত্রস্ত হবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। রসময়ীর স্মৃতি তখনও মুছে যায়নি। পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও, বিশেষ কিছু ভরসা পাওয়া যায় না। জীবিত অথবা প্রেত স্ত্রীর রাগ-রঙ্গ বিস্মরণ কিংবা অবহেলার বস্তু নয়। তাই ভাবলেন, এ বিয়ে বন্ধ করাই ভালো। অবশেষে আর পাঁচ জনের সঙ্গে পরামর্শ করে, কিছু দিন পরে এই ভৌতিক কাহিনী নিতান্তই অলীক স্বপ্ন ভেবে আশ্বস্ত হলেন এবং আবার মনস্থির করলেন। বিয়ের কথা বেশ এগুতে লাগল। বিবাহের দিন ধার্য হল। এমন সময়ে পড়ল দ্বিতীয় বোমা। আর একখানি পত্র ঃ 'তুমি যখন ঘুমাইয়া থাকিবে, তোমার বুকে একখানি দশ মণে পাথর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঙ্গিবে না।' শেষের লাইনটি বেশিক্ষণ পড়লে মাথা ঘুরতে বাধ্য। 'ঘুম আর ভাঙ্গিবে না'— একটি নিরীহ উক্তি বটে। কিন্তু ঘুম না ভাঙ্গলে, দ্বিতীয় বাসর জাগিবে কে! অতঃপর বাধ্য হয়েই বিবাহের চিন্তা ত্যাগ করতে হয়।

পরে অবশ্য ঘটনাক্রমে সমস্ত কথাই খোলসা করে জানা গেল। মৃত্যুর পূর্বে রসময়ী খানকয়েক চিঠি লিখে রেখে যান। স্বামীর নাড়ী তিনি চিনতেন। তাই নিজের নাড়ী ছাড়বার আগে তিনি স্বয়ং মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। পাছে ক্ষেত্রমোহনবাবু আবার বিয়ে করে বসেন, এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। তাঁর জীবনান্তে দারুণ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই রসময়ীর নির্দেশমত সুযোগ্য ভগ্নী বিনোদিনী এক একখানি চিঠি অবস্থা বুঝে দরকার মত ছেড়েছেন। সে যাই হোক— কার্য তো হাসিল। মরে গিয়েও রসময়ী জিতলেন, আপনার জিদ বজায় রাখলেন। স্বামীকে ছাড়লেন না, আবার সতীনও ঘরে আনতে দিলেন না। কয়জন শিক্ষিতা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী এ-কাজ পারেন? সোহাগে, চাটুপ্রণয়ে আর মিষ্টি ছলনায় যতটুকু কাজ উদ্ধার করতে তাঁরা জানেন, তার তিনগুণ কৃতিত্ব দেখালেন রসময়ী ভয়াবহ অস্তিত্বের অশরীরী প্রভাবে। এই প্রসঙ্গে আমার কিন্তু একটা অবান্তর কথা মনে উদয় হচ্ছে। ভরসা করে বলেই ফেলি। প্রভাতবাবু যদিও কাহিনীর কোনওখানেই সে ইঙ্গিত দেন-নি, তবু আমার কেমন অহেতুক সন্দেহ হয় যে, বিনোদিনী মানুষটি যতখানি নেপথ্যবাসিনী নিরীহ বলে মনে হয়, তিনি তা নন্। হয় তিনি স্বামী-পরিত্যক্তা, নয় অল্প বয়সে বিধবা। ক্ষেত্রমোহনবাবুর ওপর তাঁর বিলক্ষণ টান ছিল। নেহাৎ দজ্জাল দিদির ভয়ে কিছু করে উঠতে পারেননি। তাই দিদি স্বর্গতা হলে, তাঁরই বেনামীতে নিরুদ্ধ মনোবৃত্তির কিছুটা প্রকাশ হল, এ সন্দেহ কি নিতান্ত অমূলক? কেবল কি দিদির পারমার্থিক তৃপ্তির জন্যই, না কি আপনার গোপনে লালিত মোহভঙ্গের নিরাশায় আর হিংসায় ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে বিনোদিনী অস্ত্রধারণ করলেন? আর ক্ষেত্রবাবু যদি একটু মনস্তত্ত্বের চর্চা করে' শরৎচন্দ্রের গেলোক চাটুজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, তাহলে গল্পের মোড় কিভাবে ঘুরে যেতে পারত, সে সম্ভাবনাটি আধুনিক সাহিত্যিকরা ভেবে দেখবেন।

রসময়ীর চরিত্র সত্যিই আমাকে বিস্মিত করে। ভাবি, যদি তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা অন্য কোনও সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হত, তাহলে নারী-জগতে তিনি একটা অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। তিনি যে চিঠিগুলি স্বামীকে লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি আজ-কালকার নিষ্প্রাণ সহধর্মিণীদের অবশ্য-পাঠ্য। তার প্রত্যেকখানিতেই গভীর রসজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে। আর কি আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি তথা দূরদৃষ্টি! দূরদৃষ্টের কল্পনাতেই ভবিষ্যতের যাবতীয় ঝামেলা ও বখেড়া তিনি চুকিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতীকার-ব্যবস্থা এমন পরিপাটিরূপে কোনও স্ত্রী নিখুঁতভাবে করেন বলে জানা নেই। যে গরুকে খোঁটায় বেঁধে নিত্য মার খেতে হয়, সে গরু একদিন না একদিন দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করবেই। তখন সেই অবাধ্য নির্বোধ পলাতক জীবটিকে কি নিপুণ প্যাঁচে অদৃশ্য রশি দিয়ে বেঁধে চিরদিনের জন্যে নিজস্ব করে রাখা যায়, তার অভাবনীয় নমুনা দেখিয়েছেন রসময়ী। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ না করে উপায় নেই। তাঁর অস্ত্র যেমনি নতুন, তেমনি তীক্ষ্ম। এমন কর্মিষ্ঠা কল্পনা-রসিকার হাতে নির্যাতন নিপুণ শিল্পকলায় উন্নীত হয়েছে। স্বামীর ওপর মমত্ববোধ কোন্ রমণীর না থাকে? কিন্তু এমন নাছোড়বান্দা সম্পত্তিজ্ঞান, এমন দুরপনেয় অধিকারবোধ কয়জনের আছে? লোকে কথায় বলে ঃ 'ক্ষুদে পিঁপড়ের বল আর দুষ্ট মেয়ের বুদ্ধি' নাকি অসীম শক্তিশালী। কিন্তু বল-বুদ্ধির সঙ্গে কাষ্ঠ-রসিকতার এমন অপূর্ব মিশ্রণ বড় একটা নজরে পড়ে না। অবশ্য মুখরা ও বুদ্ধিমতী এবং সেই সঙ্গে বাস্তব-রসিকার চরম রসিকতা হজম করার হিম্মৎ আপনার-আমার মতন সাধারণ স্বামীর তাগদে নাও থাকতে পারে। কিন্তু এমন রমণীর সান্নিধ্যে বাস করা অথবা অক্ষত দেহমনে বেঁচে থাকাটাই কি একটা চূড়ান্ত শিক্ষা বা জীবনদর্শন নয়? পেরিক্লিস্ নাকি বলেছিলেন যে, নগরশ্রেষ্ঠ আথেন্স্-এ বাস করাই এক দুর্লভ শিক্ষাধিকার। তাঁর এ্যাসপেসিয়া কি তবে রসময়ীর সমগোত্রা? ভদ্রলোক না কি প্লেগে মারা যান। কি জানি হবেও বা!

আমার মনে হয়, প্রভাতবাবুর অনন্যসুন্দর গল্পগুলির যথার্থ সমাদর আজও পুরোপুরি হয়নি। যদি কোনও সুযোগ্য ব্যক্তি তাঁর গল্পগুলি অনুবাদ করেন, তাহলে বিদেশী পাঠক বুঝবে বাংলার সমাজ-সংসারের আসল চেহারাটি কি। তবে রসময়ীর রসিকতা ভাষান্তরিত করা যাবে কি? তাঁর অমন সুন্দর প্রেমপত্রগুলি অজস্র বানান ভুল থাকলেও দাম্পত্য-সাহিত্যের প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখার যোগ্য। কিন্তু অনবদ্য। রসময়ীর মতন নারীকে মন থেকে মুছে ফেলা শক্ত, ঝেড়ে ফেলা যায় না কিছুতেই। জীবনের তিক্ততাটুকু কেটে গেলে শেষ রসিকতার মারাত্মক দীপ্তি আরো যেন বেশি ফুটে ওঠে। ঘরের জঞ্জাল নয় যে ঝেঁটিয়ে সাফ করা যায়, পুরানো আসবাব নয় যে বেচে কিংবা বিলিয়ে দেওয়া চলে। খামের ওপর টোকটিকিটের মতই এসব স্ত্রী স্বামীর গায়ে এঁটে থাকে। পুরাতন, অব্যবহার্য অথবা গতপ্রাণ হলেও চিরসত্য এবং জীবন্ত এদের হাত থেকে কোনও উদ্ধার পথ চিন্তা করা যায় না; টিকিটের সঙ্গে খামখানিকেও যতক্ষণ না পুড়িয়ে ফেলা হয়।
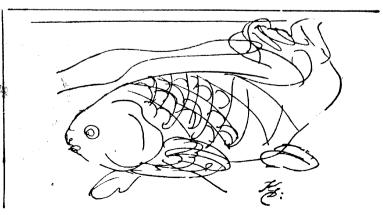
ধু অকারণ পুলকে"

—শ্রীরণজিৎ রায় চৌধুরী
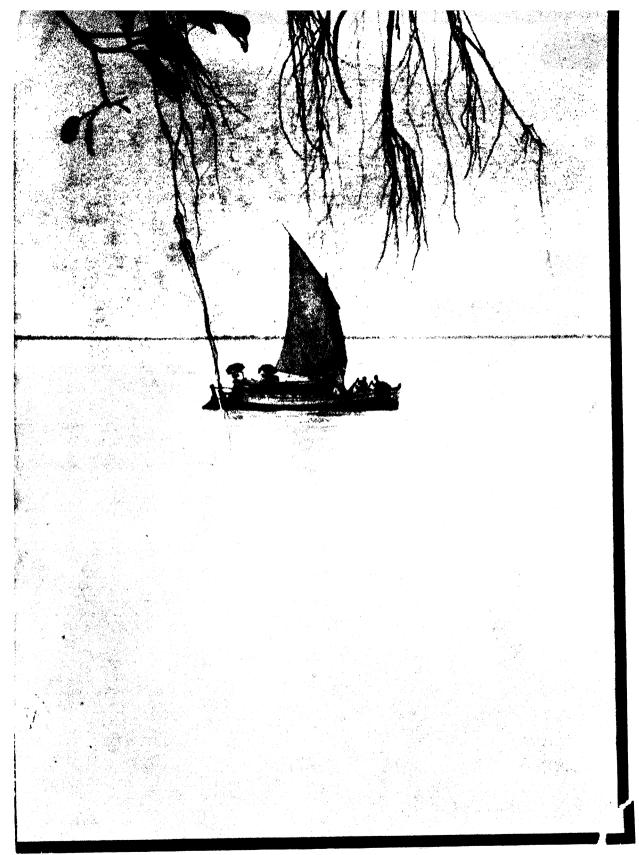
"বাণিজ্যবাহী" —শ্রীনীরদ রায়

জীবনায়ন

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গিরিবালা তিনবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলে, পাড়ার ছেলেরা তিনবার বাঁশ কেটে খাট তৈরী কোরলে, কিন্তু বৃদ্ধ অবিনাশ দত্ত তিন-তিনবারই মৃত্যুকে এড়িয়ে গেল অদ্ভুতভাবে,—পূর্বপুরুষের জরাজীর্ণ গৃহখানাকে তার ৯০ বছরের জরাজীর্ণ দেহখানা আঁকড়ে রইল। গিরিবালার কথা জানিনা—তবে পাড়ার ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করলে, মড়া বাসি হয়েছে খবর না পেলে আর তারা দত্তবাড়ীতে পা দেবে না।

"খক্-খক্-খক্"—কাশছে অবিনাশ, দম নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের দুপাশের পাঁজরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে, চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা কোরছে। "গিরি—গিরি—অ গিরি—" শেষবার শব্দটাকে বাইরে ঠেলতে গিয়ে আরো জোরে কেশে ওঠে অবিনাশ।

"কেন বাবা"—গিরিবালা ঘরে ঢোকে; প্রৌঢ়া বিধবা—সারা মুখের উপর কিছু ভাল না লাগার নিঃস্ব ক্লান্তি।

"কেন বাবা"—রাগে ফুলতে ফুলতে বিকৃত অনুকরণ করে অবিনাশ।—"রাক্ষুসী, ডাকতে ডাকতে গলা পড়ে গেল তবু যদি হুঁস থাকে। গেল্‌বার জোগাড় হচ্ছে সকাল থেকে—" এ ঝোঁকটাকেও সামলাতে পারে না অবিনাশ আবার সজোরে কেশে ওঠে। তার রগের শির দড়ির মত ফুলে ওঠে—শিথিল মাংসপেশীগুলি কঠিন হয়ে ওঠে—বুকের ভিতরের একটা ঘড় ঘড় শব্দ বাইরে আসতে থাকে—হাত দু'খানা সামনে বাড়িয়ে আঁকুপাঁকু করে কি একটা খোঁজবার চেষ্টা করে। গিরিবালা তাড়াতাড়ি বাপের মুখের কাছে পিকদানীটা ধরে—বৃদ্ধ তার গলা থেকে টেনে টেনে থুথু আর কফে সেটা ভর্তি করে দেয়, তারপর বালিশটায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে থাকে। গিরিবালা নির্বিকার ভাবে পিকদানীটা পাশে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

"গিরি—এ গিরি—" অবিনাশ দত্ত আবার চেঁচিয়ে ওঠে। গিরিবালা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে।—"মরণ মরণ হতভাগী কেবল গেলবার জোগাড়ে আছে।"

"আজ একাদশী বাবা"—সংযত কণ্ঠে উত্তর দেয় গিরিবালা।

"এাঁ একাদশী—কৈ বলিসনিত সকাল থেকে—তাইত বলি আজ ভোর থেকে কোমরের সেই পুরোনো ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে—আমার আফিং এর কৌটাটা দে লক্ষ্মীছাড়ী।"

"তোমার আফিং খাবার এখনও সময় হয়নি বাবা"—শান্তকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে গিরিবালা।

"হয়নি, তুই বললেই হবে?—আলবৎ হয়েছে"—অবিনাশ তার ছানিপড়া চোখদুটো তুলে পূব দেওয়ালের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চায়—যে ঘড়িটা সে পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে পেয়েছে, যেটা গত পনের বছর ধরে কোন শব্দ করেনি, চারটা চল্লিশ মিনিটের ঘরে হাত-দুটি প্রসারিত করে দিয়ে মাকড়সার জাল আর ঝুলের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। তা হোক—ওটা অবিনাশের অনেক দিনের অভ্যাস।

গিরিবালা জানে তর্ক বৃথা—তাই তাড়াতাড়ি সেলফের উপর থেকে আফিং-এর কৌটাটা এনে তার হাতে দেয়—বৃদ্ধ আলগোছে একটা বড়ি গলায় ফেলে দিয়ে ঢোক গেলে। গলার উঁচু হাড়টা একবার উঠে আবার নেমে যায়।

"মিছরি ভিজিয়েছিস—মিছরি"

ঘরে মিছরি কেন, এক ছটাক চিনি পর্যন্ত নেই—তবু গিরিবালা হাত নেড়ে বলে—"হাঁ বাবা"।......

"আর দেখ—" অবিনাশের আবার কাশীর দমক আসে—পূর্বানুবৃত্তি, বৃদ্ধ কাশে আর টেনে টেনে কফ ফেলে। একটু দম নিয়ে বলে—"চান আজ আর করব না, তেল দিয়ে কোমরটা একটু ডলে দিস আর গরম জলে গাটা মুছিয়ে দিস বুঝলি।"

গিরিবালা স্বীকার করে।

"আচ্ছা কি খাই বলত গোটা কতক বড়ি ভাজিস বুঝলি, নারকোলের দুধ দিস আটায়, ভারী ভাল হয়, আর একটু বেশী করে ময়েন—নইলে চিবুতে পারি না।"

ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙ্গে পড়তে চায় গিরিবালা—কিন্তু তার অভ্যাস হয়ে গেছে। স্নেহ, মায়া, মমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে তার মন থেকে, যন্ত্রের মত ওই অন্ধ বৃদ্ধের সেবা করে—ফাইফরমাজ খাটে। অতীত জীবনের দুঃখের ইতিহাসের পাতাগুলোর উপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে নেয়—দুঃখ তার নিজের জীবনের নয়, তার বাপের জীবনেরই। কী ছিল না তাঁর—সাত ছেলে আর ছয় মেয়ে...ঝলমলে কলহাস্যমুখর সংসার। আর আজ আছে শুধু বিধবা গিরিবালা, আর তার মেয়ে তরু—তারও বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে এখন সংসারী, মায়ের খোঁজ বড় একটা রাখতে পারে না আজকাল।......ছবির মত মনে পড়ে সব...মায়ের মৃত্যু, ভাইদের মৃত্যু, বোনদের মৃত্যু.. কিছু হারায়নি তার মন থেকে... আর তার সাথে তার বাপের এই উদগ্র আয়ুলিপ্সা...সঙ্গতি খুঁজে পায় না গিরিবালা ওর কিছুতেই যেন ভাল লাগে না, ভাল লাগে না বললেই সব বলা হয় না—ও ঘৃণা করে—সত্যিই ঘৃণা করে গিরিবালা। ছোট ভাইটা জলে ডুবে মরে, সাত বছরের ছেলে, ওইত দীঘির জল আজো টলমল করছে.. স্থলপদ্ম ফুটে পাড় আলো করে আছে.. মা তাঁর বাকী জীবনে দীঘির জল আর ছোঁননি,...সৈরভী ঝি বাসন

মাজছিল...সেই ত 'ওগো বাবুগো' বলে উঠানের উপর ওই জায়গাটায় আছড়ে পড়ল, সবাই দৌড়োলো, গিরিবালা ঘরে ছিল বাইরে এসে দেখলে সবাই বেরিয়ে গেছে, বাপ মিছরির জলের সরবতের গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে তাদের পেছনে পেছনে চলল। গিরিও দৌড়েছিল—কিন্তু এ দৃশ্য সে ভোলেনি। আযও সেই মিছরির সরবতের তাগিদ দেয় বাপ। নাঃ—দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিরিবালা। ঘরের উপরের ঘুণধরা কড়ি-কাঠগুলোর দিকে চেয়ে ভাবে ওটা যথেষ্ট শক্ত কি, তার ভার সইবে ত? তবু সাহস হয়না ঘেমে ওঠে।

মৃত্যু, মৃত্যু—এই সংসারে তাকে বহুরূপে দেখেছে গিরিবালা—প্রত্যেকটি বিচিত্র, কত রোগের শুশ্রূষার অভিজ্ঞতা তার—শ্মশানের মত প্রকাণ্ড দত্তবাড়ীটা ওকে প্রতি পদক্ষেপে সব মনে করিয়ে দেয়। অদৃশ্য অতৃপ্ত আত্মাগুলো যেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এদের সকলকে ভুলে জীবনকে কি করে আঁকড়ে আছে অবিনাশ।

অবিনাশ দত্তও ভোলেনি। ভোলবার কথাও নয়—তারও মনে পড়ে অনেককে...দেওয়ালের গায় কালচে সবুজ রং-এর ছাতলা পড়েছে, সে তার মধ্যে অনেকের মুখ আবিষ্কার করেছে। ঐ ত নবীন, তার বড় ছেলে, উবু হয়ে কেমন এক ধরণে বসত—অবিকল তার মত। আর সুরেশ! জিমনাস্টিক করতে গিয়ে হরাইজেণ্টাল বার থেকে পড়ে মারা যায়—সুরেশের পেশী-বহুল হাত দুটো, হরাইজেন্টাল বারের একটা অংশ স্পষ্ট দেখা যায় পশ্চিমের দেওয়ালটায়, গিরিবালাকে ডেকে কতদিন দেখিয়েছে। কোনদিন চুণকাম করতে দেয়নি দেওয়াল-গুলোয়। কত প্রিয়জনকে সে ঐ দেওয়ালের ছাতলার ফ্রেমকোর মাঝে ধরে রেখেছিল—সে তা আজও মনে করতে পারে—আজ চোখে তার ছানি পড়েছে—স্পষ্ট করে প্রায় কিছুই দেখতে পায় না, কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় যেন ঘরটা ভরে আছে—তবু তাদের ভোলেনি অবিনাশ।

তা হোক, তবু জীবনকে সে ভালবাসে—মরতে চায় না, ফুরিয়ে যেতে চায় না অবিনাশ। প্রত্যেকটি আরামের উপর তার অখণ্ড লক্ষ্য, কেন মরবে সে। দুঃখের সাথে মৃত্যুর সম্বন্ধ খুঁজে পায় না। নিজের শক্তিতে উঠতে পারে না, চোখে দেখতে পায় না, হাঁপানির টানে বালিশ বুকে দিয়ে রাতের পর রাত বসে কাটিয়ে দেয়—তবু সে একবারও মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না। বরং অনুভূতিগুলি যেন তার আরো তীব্র হয়েছে, বাতাসে দেওয়ালের সোঁদা গন্ধে সে যেন সমস্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসকে বুকের কাছে অনুভব করে—তার বাল্যের পৃথিবী—তার যৌবনের পৃথিবী—তার বার্ধক্যের পৃথিবী। ওর কাছে ওর বর্তমান জগতের একটা পরিচয় আছে ও বুঝতে পারে—কিন্তু ঠিক গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে না—নিজের কাছেও না। ঘরের আসবাবপত্র পুরোনো হয়েছে—তার। কেউ কেউ ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে আয়ুর পাল্লায় হার মেনেছে, তবু সেগুলো সরাবার কথায় অনর্থ বাধে—বৃদ্ধ চিৎকার করে, কেশে কেশে এক অনর্থ বাধায়। ওর জীবনের সঙ্গে তাদের এক নিভৃত মিতালি গড়ে উঠেছে, যাকে ও নিজেও কোনদিন জানতে পারেনি। তাই ত্বর, যখন তার ছেলেমেয়ে নিয়ে এ বাড়ীতে আসে—ও তখন ভয় পায়, দিনরাত্রি হাঁ হাঁ করে সকল কিছু আগলাতে থাকে।

"ঠাকুর্দা ও ঠাকুর্দা"—নিতাই হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে—"কেমন আছেন আজ"।

"কে নিতাই—আয় দাদা আয়—বেশ আছি, ভালই আছি"—ভাল থাকাকে প্রমাণ করতে বৃদ্ধ নড়ে-চড়ে বসতে গিয়ে একদফা কেশে নেয়।

নিতাই কাছে যায় না। দূরে থেকেই নাকটা সিঁটকে কণ্ঠস্বরকে প্রসন্ন করে বলে—"উঠবেন না, উঠবেন না ঠাকুর্দা—ঠিক আছে, বাঃ আপনাকে ত আজ বেশ ভালই দেখাচ্ছে—ছেলেছোকরাদের মত।" নির্লজ্জের মত বলে চলে নিতাই—"চোখটাও বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে—সত্যি ঠাকুর্দা কী গ্রাণ্ড আপনার হেলথ"।

খুশীতে নড়ে চড়ে বসে অবিনাশ। তার মনে হয় তার চোখের সামনের ধোঁয়াটা কেটে যাচ্ছে, উত্তরের জানলা দিয়ে দীঘির জল আর স্থলপদ্মের শ্যামলতা যেন দেখতে পাচ্ছে—যদি ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যও জানলাটা বরাবরই বন্ধ থাকে।

—তারপর, "কি খবর রে নিতাই"।

"খবর ভাল না ঠাকুর্দা—নেত্যদার মা আজ সকালে মারা গেলেন।"

নেত্যর মা! মিত্তিরবাড়ীর ছোট বৌ!! চমকে ওঠে অবিনাশ। ওরা দুজনে প্রায় এক বয়েসি—না, মিত্তিরদের বৌ বছরখানেকের ছোটই বুঝি। দশ বছর বয়সে শ্বশুরবাড়ী এসেছিল, ছোটবেলায় কী ভাব ছিল দুজনের, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা আম পেড়ে নুন দিয়ে খাওয়া—সব মনে আছে অবিনাশের।

"তা বয়সও তাঁর হয়েছিল।" নিতাই যোগ দেয়।

অবিনাশের মুখের উপর বিরক্তি ঘনিয়ে আসে। কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা ফুটে ওঠে—"ঐ ত তোদের দোষ নিতাই—কতই বা তাঁর বয়স, এই আমার বয়সী ছিলেন ছোট বৌ।"

নিতাই জিভ কেটে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে—"সাঁইত্রিশ ত ঠাকুর্দা ওকে নাকি আবার বয়স বলে—সবে লোকে বলাবলি করছিল..."

—"লোকের ঐ এক কথা—যেন তিনি সকলের বাড়াভাতে ভাগ বসাচ্ছিলেন।" নিতাই নিজের ভুল বুঝতে পারে—তাই কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চায়। যাত্রার সখ ছিল অবিনাশের—শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস বলে একটা পালাও লিখেছিলেন তাঁর যৌবনে। সেখানা কোন যাত্রার দলের অধিকারী কি করে গায়েব করে নিজের নামে আসরে নামিয়েছিল—সে কাহিনী কয়েক বছর আগেও আসরে, মজলিসে বলেছেন। নিতাই সেই কথার অবতারণা করে—অবিনাশের মুখখানা যেন একটু উজ্জ্বল দেখায় কিন্তু কণ্ঠস্বরে উৎসাহ থাকে না। নিতাই শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে আসল কথায় পৌঁছায়—মুখ চুলকে মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে—"দশটাইনমে কি ঠাকুর্দা—বড্ড টানাটানি যাচ্ছে—ডামাডোলের বাজার, দেখছেন-শুনছেন ত সব।" একটু থেমে বলে—"পাঁচটা টাকা যদি দিতেন ঠাকুর্দা, মেয়েদের বেগুনগুলো বড় হয়ে উঠল—সামনের হপ্তায় হাটে বেচবো—আপনার টাকাটাও সেই সঙ্গে..." কথাটা শেষ না কোরেই অবিনাশের দিকে চায়। অবিনাশ শূন্য দৃষ্টিতে এক দিকে চেয়ে আছে—তার কথাগুলো শুনেছে বলেই মনে হয় না। নিতাই আর একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে।

"না-না—তোর কাছে এখনও পঁচিশ টাকা বাকী—একটা পয়সাও সুদ দিসনি—আর একটা পয়সাও তোকে দেবো না"—যেন জেগে ওঠে অবিনাশ।—তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে। নিতাই জেদ করতে ভয় পায়—মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে বেরিয়ে যায়।

বালিশটায় হেলান দিয়ে অবিনাশ শুয়ে পড়ে। মিত্তিরদের ছোট বৌ মারা গেছে। ও ভাবতে শিউরে ওঠে অকস্মাৎ তার মনে হয়—মিত্তিরদের ছোট বৌ যেন তার জীবনেও মৃত্যুর শমন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, একটা অনাস্বাদিত ভয় যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—নিদারুণ অস্বোয়াস্তিতে সারা দেহ-মন ভরে ওঠে—আপন বার্ধক্য সম্বন্ধে এই প্রথম সচেতন হয়ে ওঠে অবিনাশ। অন্ধকারে অপরিচিত পথ চলার আশঙ্কার মত ও থেকে থেকে চমকে ওঠে। আশ্চর্য! চলে আসা এতদিনের পথটাকে আজ বাস্তবিকই দীর্ঘ মনে হয়...মিত্তিরদের বৌ-এর বয়স হয়েছিল...ওরা নাকি বলেছে...তবে কি...না না অবিনাশ ওসব কথা ভাবতে চায় না। কিন্তু মন ছাড়া ওর সকল ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয়—তাই আর কিছু আশ্রয় করে মনকে ভুলিয়ে রাখতেও পারে না। ওর মনে পড়ে অনেককে—যেন তারা কোথা থেকে কলকণ্ঠে তাকে অভ্যর্থনা করছে। হাঁফ ধরে অবিনাশের—"গিরি—অ গিরি—একবার এদিকে আয়ত মা", মমতায় অনেক অবিনাশের কণ্ঠস্বর। গিরিবালা ঘরে ঢোকে, অবিনাশ তখনও হাঁফাচ্ছে—"একটু বাতাস—একটু বাতাস দেত মা।"—গিরিবালা অভ্যস্ত হাতে বাতাস করে।

—"হ্যাঁরে আজ নাকি একাদশী?"

—"হ্যাঁ বাবা।"

—"তবে আজ আর কিছু খেয়ে কাজ নেই কেমন?"

—"আমি যে খাবার তৈরী করেছি বাবা", স্নিগ্ধকণ্ঠে গিরিবালা উত্তর দেয়।

"তুই আস মা—তুই আস, দেখি তোর হাতখানা।"

নিঃশব্দে গিরিবালা হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। পরম স্নেহে সেখানা বুকের উপর টেনে নেয় অবিনাশ—ধীরে ধীরে তার উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে—"বড় কষ্ট দিলুম মা, বড় কষ্ট দিলুম", তার কোটরগত নিষ্প্রভ চোখের কোণ দুটো জলে ভরে ওঠে। পিতার এ মূর্তি ভুলে গেছে গিরিবালা। তাই অসহায় বেদনায় তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। বাপের বুকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে—"ছি বাবা—ওসব কথা বলতে নেই।"

"দেখত গিরি আমার জ্বর হয়েছে কিনা।"

উৎকণ্ঠিত গিরিবালা বাপের কপাল কণ্ঠ বুকের উপর হাত রেখে পরীক্ষা করে বলে—"কৈ—না ত বাবা।"

আরো কিছুক্ষণ অন্তরঙ্গভাবে বাপ ও মেয়েতে কথা কয়—তারপর অবিনাশ একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

* * * *

—"টুকুন ও টুকুন।"

বহুকালের বিস্মৃত একটা নাম। অবিনাশ চমকে উঠে জানলা দিয়ে চায়। ডুরে শাড়ীর আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিত্তিরদের ছোটবৌ—বছর দশেকের মেয়ে। টলটলে মুখের উপর ভয়চকিত ডাগর দুটি চোখ।

—"টুকুন ও টুকুন—আম পাড়বি না। ...াসেদের গাছে ইয়া বড় বড়"......কথা শেষ না ...রে ছোটবৌ চোখটা বড় করে হাতের ইঙ্গিতে ...মগুলির পরিপুষ্টি দেখায়। জিভের জলটা ...ভতরে টেনে নেবার একটা শব্দ আসে। ...িছুতেই অবিনাশের অংকটা মিলছে না—সে ...| করে খাতাখানা একপাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে ...ড়ে। তারপর বিড়ালের মত সন্তর্পণে পা টিপে ...িপে বাইরে আসে। ফিস ফিস করে বলে— ...—কোন গাছটার।"

"দীঘির পাড়ে—কাঁচামিঠে"—তেমনি চুপি ...িপি জবাব দেয় ছোটবৌ। তারপরে সন্তর্পণে ...াঁচল থেকে একটা ঘষা ঝিনুক বার করে চোখ ...টো বড় বড় করে বলে—"দেখছিস ?"

"ভারী ত—" ঠোঁট উল্টে বলে অবিনাশ। ...নও তার কোমরের কষি থেকে একটা ছুরি বার ...রে সাগ্রহে বলে—"এই দেখ!"

ছোটবৌ কেমন ছোটই হয়ে যায়।

দুজনে দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ায়। রৌদ্র-...ীপ্ত মধ্যাহ্ন আকাশ ঝলমল করে—দিকে দিকে ...বীনের আবাহন আর অভ্যর্থনা। ছোটবৌ একটা ...াছ দেখিয়ে বলে—"দেখ ভাই এটায় বোধহয় ...বার বোল এলোনা, কচিপাতা বেরিয়ে গেছে", ...ালচে হলুদ রংএর আমের কচিপাতা—...ভলভেটের মত নরম, আমের গন্ধে ভরপুর। ...অবিনাশ লাফ দিয়ে একটা পল্লব ভেঙ্গে নিয়ে ...াঁত দিয়ে কচিপাতাগুলো বাজাতে থাকে—তার ঠোঁট দুটোতে সুড়সুড়ি লাগে।

—"কেমন, আমি বলেছিলাম না গোপাল-ভোগে বোল আসবে—এল ত, ঐ দেখ—" ...আঙ্গুল তুলে দেখায় অবিনাশ। ছোটবৌ জিভ কেটে বলে—"এই আঙ্গুলে দেখালি, বোল পচে ...াবে—শিগগির আঙ্গুলে কামড়ে।"

"ইস্ বয়ে গেছে আঙ্গুলে কামড়াবার—" ...বাসবুড়ো যে পাজী—পচুক ওর সব বোল।" ...জবাব দেয় অবিনাশ।

ওরা দুজনে আঘাটায় বসে কাঁচামিঠে আম ...ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খায়। সারা পৃথিবীর উপর ...রং-এর উৎসব, জীবনের আগমনী, শুকনো ...পাতায় গাছের তলাগুলো ভরে গেছে—পা টিপে ...টিপে চলতে গেলেও খসখস করে শব্দ হয়। ...উপরে কচিপাতায় সব গাছগুলো প্রায় ভরে উঠেছে—আম, লেবু লিচু নিম। ইস্ ঐ ...নিমগাছটা ত একেবারে নেড়া হয়ে গিয়েছিল—...এবার কচিপাতায় টলটল করছে...লেবু ফুলের ...গন্ধ...সব মিলিয়ে ভাল লাগার যেন শেষ নেই। ...হঠাৎ পেছনে শুকনো পাতার উপর ...পায়ের শব্দে দুজনে চমকে উঠল—...বোস বুড়ো......কী কুৎসিত চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে—একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে পা টিপে ...টিপে ওদের দিকে আসছে। দৌড়—দৌড়!!

* * * *

ঘুম ভেঙ্গে যায় অবিনাশের। কিন্তু সমস্ত স্বপ্নটা চোখের উপর জ্বল জ্বল করতে থাকে। নবজীবনের আবাহনের রেশটুকু তার স্বপ্নকে অতিক্রম করে বাস্তবে নেমে আসে। ছি—ছি—কী করেছে সে! জীবনকে চুরি করেছে অবিনাশ: কুণ্ঠিত অনুশোচনায় তার সারা দেহমন ভরে ওঠে। বাইরে থেকে একটা বিরাট শিশুজগতের কলোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছে—অকুণ্ঠিত হাসিতে তার উঠান ভরে উঠছে—প্রাণখোলা উচ্চহাসি আর করতালির শব্দ শুনছে অবিনাশ। তারা ভাঙ্গছে ফেলছে চুরমার করে ফেলছে একদিক—অন্যদিক তাদেরই হাতে আবার অপূর্ব নিপুণতায় গড়ে উঠছে। এরই একপাশে শক্তিহীন অবিনাশ—দৃষ্টিহীন অবিনাশ—দীর্ঘ নব্বুই বছরের আয়ুর পরিখার পারে অশক্ত দেহ নিয়ে হাঁফাচ্ছে......আশ্চর্য! না না সে বাঁচতে চায় না—কিছুতেই বাঁচবে না—এই অপূর্ব জীবন-সঙ্গীতের মাঝে ছন্দহীন অসঙ্গতি আজ অসহ্য মনে হচ্ছে অবিনাশের।

বাইরে সবে সন্ধ্যা হয়েছে, একটা প্রদীপ হাতে ঘরে ঢোকে গিরিবালা—অবিনাশ বলে—"বাইরে ছেলেরা খুব হল্লা করছে—দেখিস পড়ে যায় না যেন। তরু কখন এলোরে, তার বুড়ো দাদামশাইকে দেখতে একবার ঘরে ঢোকেও না।"

—"তরু ত আসেনি বাবা"। বিস্মিত গিরিবালা উত্তর দেয়।

"এসেছে—এসেছে—তুই আর চাপিসনি গিরি। আমি তার ছেলেদের গোলমাল শুনছি, জামাই এসেছে নাকি?"

গিরিবালার কেমন যেন সন্দেহ হয়। এগিয়ে এসে বাপের গায়ে হাত দিয়ে দেখে গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

"তোমার যে বড্ড জ্বর হয়েছে বাবা"—কণ্ঠস্বরে অসহায় ব্যাকুলতা গিরিবালার।

—"ও একটু হয়। তুই যা দেখি গিরি, ছেলেমেয়েগুলোর একটু খাওয়ার ব্যবস্থা কর, ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে ওটা কে—নন্টে না? সা নগরের মেলা থেকে ওকে একটা ঢোল কিনে দিস।—তুই যা—যা—বরং তরুকে একটু পাঠিয়ে দে।"

গিরিবালা বাপের মুখের উপর ঝুকে পড়ে বলে—"নিমাই কাকাকে খবর দেবো বাবা"—নিমাই কবিরাজ।

অবিনাশ বিরক্ত হয়। "বলছি না—না—ছেলেগুলো বাড়ী এলো, কোথায় তাদের একটু দেখাশুনা করবি—একটু খেতে বসতে দিবি—না কেবল বাজে বকছিস। তোর ঐ এক দোষ গিরি।"

অবিনাশ যেন যতটুকু পারে ততটুকু প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে চায়। এর পর কবিরাজ আসেন—ফুল আসে। ছেলেরা বাঁশ কেটে খাট তৈরী করে—গিরিবালা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, কিন্তু বৃদ্ধ অবিনাশ দত্ত আর ফেরে না।

১

তাহাদের প্রেম যবে ধীরে ধীরে জমে,
গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।

২

কাটে বাবুরি
খায় রাবড়ি

দ্যাখে পুলিশ
আনে কুলিশ
দেয় দাবড়ি
যায় ঘাবড়ি।

৩

"সুন্দর চুল হবে দেখো
আমার এ কেশরাজ একশিশি নেখো"
মৃদু হেসে বলে গেল টেকো।

৪

যখন মোদের দেখা হল প্রথম
দুজনেই হয়েছিলাম খতম।

যখন মোদের দেখা হল শেষ
দুজনেই বলেছিলাম বেশ।

৫

লেডিজ সিট নেইকো শুধু ট্রামে এবং বাসে
আছে তাহা মন এবং মগজেরও পাশে।

৬

শুভ-বিবাহে হায় কি অনাসৃষ্টি
চোখ উঠেছে বরবধূর হল না শুভদৃষ্টি।

মৃত্যুগুঞ্জা

সাবিনা মিত্র

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

তুংগভদ্রা নদীর স্বচ্ছ জলে আবীর চূর্ণকার প্রলেপ মাখাইয়া সবিতৃদেব অস্ত যাইতেছিলেন। কৃষ্ণা ও তুংগভদ্রার সংগমস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত সুদৃঢ় দুর্গ রায়চুড়--দোয়াবের পাষাণময় প্রাকারের কুড্যে কুড্যে তাহার রক্তাবলেপ প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য মহানগরীবাসীদিগের মধ্যে সংক্রামিত হয় নাই। সমগ্র নগরী যেন বিষাদের ভারে ম্রিয়মাণ। শুধু আজ বলিয়াই নহে, প্রায় বৎসরাবধিই এইরূপ চলিতেছে, রাজধানীর বক্ষ জুড়িয়া যেন ভাগ্যদেবতা এক বিরাট পাষাণভার চাপাইয়া রাখিয়াছেন। এই এক বৎসরে কত শুভকারক ঘটনাই ঘটিল--অতুল পরাক্রমশালী দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের রাজধানী গুলবর্গা অধিকার করিলেন, উড়িষ্যার হিন্দু রাজাকে এক বিরাট যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন, স্বারসমুদ্র জয় করিলেন--মহারাজা কৃষ্ণদেব রায়ের বিজয়েতিহাসে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি অধ্যায় যুক্ত হইয়াই চলিয়াছে। তথাপি রাজধানীর অধিবাসীদের মনে সুখ নাই। তাহারা হাসিয়াছে, নাচিয়াছে, যথারীতি বিজয়-উৎসব করিয়া গিয়াছে,--কিন্তু সবই নিষ্প্রাণ; করণীয় কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিয়াছে কোনপ্রকারে, তাহার মধ্যে আন্তরিক স্পর্শ ছিল না, একটু বা প্রচ্ছন্ন অভিমানও স্বয়ং মহারাজের বিরুদ্ধে। বহিঃশত্রুদের দমন করিবার উপায় চিন্তা করিতেই মহারাজ অহোরাত্র নিমগ্ন, এদিকে গৃহশত্রু যে তাহাদের যথেচ্ছভাবে লুণ্ঠন করিয়া চলিয়াছে তৎপ্রতি আশ্রয়দাতা রাজা উদাসীন।

রাজধানীর ঠিক মধ্যস্থলে কেন্দ্রিত রাজপুরী। একটি শিলাময় বন্ধুর ভূভাগের উপরে অবস্থিত অতি সুরক্ষিত বিশাল হর্ম্য। মরকতমণিবর্ণ উজ্জ্বল প্রস্তরে রাজপুরী আগাগোড়া নির্মিত, অপরূপ শ্রীসম্পন্ন। একটিমাত্র প্রবেশপথ সুদৃঢ় সিংহদ্বার, অহোরাত্র সশস্ত্র রক্ষীবেষ্টিত।

মন্ত্রণাভবনের গুপ্তকক্ষে মহারাজা কৃষ্ণদেব রায় অশান্ত পদচারণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি কয়েকটি সমস্যা তাঁহাকে বড়োই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। গুপ্ত মন্ত্রণাসভার জরুরী অধিবেশন ডাকিয়াছেন অদ্য অপরাহ্নে। প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন করিল।

: মহাবলাধিকৃত ও মহাসন্ধিবিগ্রহিক উপস্থিত। পরক্ষণেই মহাবলাধিকৃত ও মহাসন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহামাত্য ও মহামন্ত্রীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলেন, মন্ত্রণাসভা সুরু হইয়া গেল।

কৃষ্ণদেব অধীর স্বরে বলিলেন :--এ কিরূপ ঘটনা আমার রাজ্যে ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে? একটা সামান্য দস্যুকে দমন করা কারো সামর্থ্যে কুলাইতেছে না? বৃদ্ধ মন্ত্রী শুভ্র শ্মশ্রুর মধ্যে চিন্তিতভাবে অংগুলি চালনা করিতে লাগিলেন।

: গোলযোগ সেইস্থানেই মহারাজ! একটা দস্যু নহে--দস্যুদল।

: হোক। মূল টানিয়া ছিঁড়িয়া দিলে আগার ডালপালা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

: কিন্তু মহারাজ, আপনি সামান্য আখ্যা দিলেও রত্নাহরীক দস্যুদলটি কোনক্রমেই সামান্য নহে। কে ঐ দলের নেতা, দলের অন্তর্ভুক্ত দস্যু কয়জন কোন সংবাদই এক বৎসর যাবৎ পরিশ্রম করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। কি অসাধারণ ধূর্ত এবং ক্ষিপ্রগতি এই রত্নাহরীক জনসাধারণের মধ্যে যে ভীতি এবং ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে--তাহা অবর্ণনীয়! আপনার নিকট ইতিপূর্বে জ্ঞাপন করা হইয়াছে প্রধানতঃ ধনীগণই ইহার লক্ষ্য। নগরে প্রথমে......

: শুনিয়াছি। বহু বহুবার আপনাদের অক্ষমতার বিবরণ আমার নিকটে ঘোষিত হইয়াছে। প্রথমে শ্রেষ্ঠী রত্নমাণিক্যের যাবতীয় মণিমুক্তার অলংকারাদি, তৎপরে সুপর্ণসেনের তিনশত স্বর্ণমুদ্রা, তৎপরে বিজয়াদিত্য...... গত একবৎসরকালের মধ্যে আমার রাজ্যের ছয়জন লক্ষপতি অধিবাসীর সর্বস্ব ঐ দস্যুদল লুণ্ঠন করিয়াছে--একথা শুনিয়া শুনিয়া আমার কর্ণপীড়া ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আমি প্রতিরোধের উপায় শুনিতে চাই। দস্যুর কীর্তিকলাপ বহু শুনিয়াছি। এবার আপনারা কি করিতেছেন তাহাই শুনিব। রাজধানী হইতে দুইমাস অনুপস্থিত ছিলাম বলিয়া আপনারা নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন নাই। আমি আশা করিয়াছিলাম রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর আমার বিজয় অভিযানের পুরস্কারস্বরূপ হস্তপদ-বদ্ধ ঐ দস্যুদলপতিটাকে আমায় আপনারা উপহার দিবেন।

মহামাত্য নীরস স্বরে বলিলেন : চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই আমাদের পক্ষ হইতে--নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু এই দস্যুটা যেন মন্ত্রসিদ্ধ; নিশ্চিহ্নভাবে বাতাসে মিলাইয়া যায় দুষ্কর্মের পরে। ইতিপূর্বে কোন দস্যু ছিল না আমাদের রাজ্যে। সুতরাং অনুমান হয় এ কোন সীমান্ত অধিবাসী বিদেশী দল হইবে। মহাবলাধিকৃত ও মহাসন্ধিবিগ্রহিক উভয়েই অতি কুশলী দক্ষ ব্যক্তি। ইতিপূর্বে বহু দুষ্টের দলন করিয়াছেন কিন্তু বর্তমানে উঁহারাও হিমসিম খাইয়া গিয়াছেন। মহাবলাধিকৃত ও মহাসন্ধিবিগ্রহিক উভয়েই চকিতরুষ্ট কটাক্ষপাত করিলেন।

: সবই বুঝিলাম, কিন্তু এখন কি কর্তব্য? ওদিকে গোলকটনগরে আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানদ্বয় সম্মিলিত হইয়া গোপনে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে--গুপ্তচরের মুখে

াদ পাইয়াছি। এখন কি আর ঘরে বসিয়া ার পক্ষে একটা দস্যু তাড়না করা চলে? ণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল তো? হ এই দস্যুটাকে ধৃত করিয়া আমাকে চিন্তা-র মুক্ত করে যদি তো রাজধানীর অর্দ্ধেকটা াকে দান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধযাত্রায় হর হই। যখন রায়চূড় দোয়াবে গিয়াছিলাম নিও 'দস্যু'. ফিরিয়া আসিয়াও সেই দস্যু ুই শুনিতেছি। নূতন কথা আর জগতে ই অথবা বলিবার লোকের অভাব হইয়া ড়য়াছে।

ঃ একটি লোক আছে মহারাজ! সেনাপতি...

ঃ সেনাপতি মহাশয়? কিন্তু তিনি তো......

ঃ মহারাজ, চন্দনতিলকের কথা বোধহয় স্মৃত হন নাই?

ঃ চন্দনতিলক? ওঃ সেই যুবক যাহাকে আমি কোরী সেনাপতি হইতে প্রধান সেনাপতির পদে ীত করিয়া গিয়াছিলাম?

ঃ হাঁ, মহারাজ সেই আমাদের শেষ ভরসা। ারাজ দোয়াবে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই নতিলক স্বেচ্ছায় আসিয়া দস্যুধৃতির প্রতি-তি দিয়াছিল। তিনমাস সময় লইয়াছিল। হার মধ্যে দুইমাস উত্তীর্ণপ্রায়......

ঃ কতদূর কি করিতে পারিল?

ঃ তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। চন্দন ছুই করে নাই, বস্তুতঃ এই দুইমাসের মধ্যে চন্দনও সে গড়ের বাহির অবধি হয় নাই বারিক সংবাদ দিয়াছে।

ঃ সে কি?

ঃ চন্দন ব্যর্থ হলে মহারাজ আমাদের ত্রাণে র কোন অস্ত্র নাই। চন্দনের নিকট আজ ্বী বার্তা প্রেরণ করিয়াছি। একদণ্ড পরে পোভবনে আসিতেছে।

ঃ চন্দন! চন্দন! এই যুবকের তীক্ষ্ণ মেধা উগ্র সাহস আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। উহার য় কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বল্পভাষী, ঋজু, অনলস ী আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। শুনিয়াছি রাজ অচ্যুত রায় চন্দনের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে। চন্দন যদি অবিবাহিত হয় মি উহার হস্তে আমার মণিকে সম্প্রদান করিয়া শ্চিন্ত হইতে পারি............

রাজপুরীর অন্তর্গত মন্ত্রণাভবনের সম্পূর্ণ পরীত অংশে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে তখন টো স্তম্ভগাত্রে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন জকুমারী মণিমেখলা। তাঁহার মদালস দৃষ্টি রীর সম্মুখস্থ রাজপথের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। নি সাগ্রহে প্রিয়সখী বাসবীর প্রতীক্ষা রতেছিলেন। বাসবী তাঁহার অন্তরতমা, াপি বাসবীকে তিনি পুরোপুরি পান নাই। বিবাহিতা রাজকুমারীর নিত্য সাহচর্যের জন্য রূপ সখীর একান্ত প্রয়োজন বাসবীতে তাহার কণা অভাব নাই, প্রাচুর্যই রহিয়াছে সর্ব-ষয়ে। তথাপি বাসবীকে ঠিকমতো ধরা-ওয়া যায় না।—বাসবীর সম্বন্ধে রাজকুমারীর ন স্বল্প, শুধু জানেন বাসবী বিবাহিতা। হার স্বামী বিদেশে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াছে। সবীর বৃদ্ধ পিতামাতা বৎসর দেড়েক পূর্বে র্থযাত্রা করিতে বাহির হইয়াছেন। কন্যাকে হারা রাজ অবরোধের মধ্যে নিশ্চিন্তে রাখিয়া য়াছিলেন। বাসবী কিন্তু রাজপুরীতে বাস র না। মাঝে মাঝে আসিয়া উদিত হয়, প্রশ্নের উত্তরে বলে ভ্রাতার নিকটে গিয়াছিলাম, মাতৃস্বসার নিকট প্রয়োজন ছিল। বাসবীকে মণিমেখলা আজও চিনিতে পারিলেন না।

সহসা রাজকুমারীর চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। প্রাকারের উত্তরপার্শ্বে এক অশ্বারোহী তেজী অশ্ব সবেগে চালনা করিয়া আসিতেছেন দেখা গেল। যেমন অপূর্ব অশ্ব, তেমনি দেবোপমকান্তি আরোহী। গতির বেগে সুঠাম দীর্ঘ দেহ অল্প অল্প হিন্দোলিত হইতেছে। মাথায় রেশমী উষ্ণীষ স্বর্ণাভায় চিক্ চিক করিতেছে। রাজকুমারী আলিসার 'পরে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখশ্রী এক অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্ফুটে একটি কথা কেবলমাত্র বাহির হইয়া আসিল, "চন্দনতিলক!" অশ্ব তাহার আরোহীকে লইয়া চত্বরের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঃ সখীর মনটি সেনাপতি মহোদয় কি সঙ্গে লইয়াই মন্ত্রণাকক্ষে গেলেন? কিন্তু যতদূর জানিয়াছি, সেখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ। রাজকুমারী চমকাইয়া উঠিলেন। পিছনে বাসবী দাঁড়াইয়া। কখন নিঃশব্দে আসিয়াছে কে জানে! মণিমেখলা ঈষৎ ঘুরিয়া প্রিয়সখীর আননে লজ্জারুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্যসম্ভবা বাসবী সর্বগুণান্বিতা তরুণী। এমন যে অনবদ্য অতুলনীয় রূপশ্রী মণিমেখলার, বাসবীর দেহলাবণ্য যেন তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ঃ ঐ বীরপুরুষই বুঝি সেনাপতি হইয়াছেন?

ঃ কেন তুমি জানিতে না?

ঃ এইরূপ কি একটা কথা জনশ্রুতির মতো যেন শুনিয়াছিলাম পিতা দোয়াবে অভিযান করিতেছিলেন যখন তখনই বোধ হয়। কেন প্রধান সেনাপতির কি হইয়াছে?

ঃ প্রধান সেনাপতি পশ্চিমসীমার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সখীর যেন কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে না?

কৃত্রিম উষ্মাভরে রাজকুমারীর বঙ্কিম ভ্রূলতা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঃ চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটিবার কারণ লক্ষিতই বা হইতেছে কোথায়? আমি রাজকন্যা, রাজ্যের শুভাশুভ বিচার করিবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে। ঐ সেনাপতিকে দিয়া কি কাজ হইবে শুনি? কার্তিকঠাকুরটি তো সর্বদা নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত! রাজ্যরক্ষা করিবার অবকাশ কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া কোমরবন্ধে জরির ফুলটি যতক্ষণে সেনাপতি মহোদয় মনোমত করিয়া সাজাইবেন ততক্ষণে শত্রুসৈন্য কাজ হাসিল করিয়া চলিয়া যাইবে। সংবাদ পাইয়া সেনাপতি অধিকতর বিব্রতভাবে শিরস্ত্রাণ সজ্জিত করিতে বসিবেন। গুম্ফে ঘন ঘন কস্তুরীনির্যাস প্রলেপ দিবেন ব্যস্তভাবে।

বাসবীর ওষ্ঠে একটা বাঙ্গ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঃ দেখিতেছি সখী ইতিমধ্যেই সেনাপতির স্বভাব, আচার-আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রগল্ভতা মার্জনা করুন— দেবী যে অতি সুচারু পুরশাসিকা হইবেন ভবিষ্যতে, এখনই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে সেনাপতি মাত্র দুইমাস পূর্বে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এত পুঙ্খানু-পুঙ্খ জ্ঞান বোধহয় স্বয়ং মহারাজও অর্জন করিতে পারেন নাই।

ঃ যেমন দেখিলাম তেমনি বলিতেছি। ইহা তো একটি শিশুও অবধি বলিতে পারে। মাকাল ফলের মত কিছুটা চটক থাকিলেই লোকে আর

(ইহার পর ২২৩ পৃষ্ঠায়)

যাদুমণি! লক্ষ্মীমণি! সোনামণি!
কোন নামে আজ ডাকব তোরে আজ?
আকাশ দিয়ে, বাতাস দিয়ে, নামগুলো
আজ আসছে ছুটে
বাজিয়ে ঝাজর ঝাজ।

ছড়ার মতন ছড়বড়িয়ে, গড়ার মতন গড়গড়িয়ে,
ফুরফুরিয়ে, সুরসুরিয়ে, সুরে সুরে
আসছে নামের বাণ,
তবু তোরে জুড়োয় নাক প্রাণ।
আসছে যে নাম সামনে দিয়ে,
আসছে যে নাম পিছন দিয়ে,
জানালা দিয়ে দুয়ার দিয়ে
হাজার পথে হাজার রঙে নেয়ে
কোন নামেরে রাখবরে তোর নরম গায়ে,
বলত দেখি টুকুটুকু রাঙা হাসির
রঙন-রাঙা মেয়ে।

মাসীর পিসীর মিষ্টি হাসির আসছে যে নাম
খইমোয়ার রথে,
আসছে যে নাম চাঁদের চুমোয় সোয়ার হয়ে
গড়িয়ে খানিক সাপলা দীঘির পথে।
আসছে যে নাম রামধনুকের সাতটি রঙে
দূরে আকাশে ছড়িয়ে মুখের
রঙন-রাঙা হাসি,
আসছে যে নাম বাতাস দিয়ে,
সুবাসভরা ভালবাসায় ফোটা ফুলের
ছড়িয়ে রেণু রাশি।
আসছে যে নাম রঙিন পাখীর পাখার খামে
সাঁঝ সকালের রঙে রঙিন হয়ে,
আসছে যে নাম মৌমাছিদের গুনগুনানির,
সুর শুনানির সুরেলা কথা কয়ে।
কোন নামেরে রাখব আমি, কোন খুসীরে
রাখব খাঁচায় ধরে?
দুলদুলু, দোল-দুলুনি চুলচুলুনি
ভুলভুলুনি খুকুনমণির তরে।

এক নামেরে রাখি যদি, হাজার যে নাম
যাবে বেজার হয়ে,
তবে আমার সোনার খুকু
একলা ঘরে খেলবে কারে লয়ে।
আকাশ, পাতাল, বাতাস ভরে নামের রথে
আজকে যাহার হচ্ছে গতাগতি,
একটি নামে বরণ করি সে পথ তাহার
ময়না কাঁটায় রুধে দেব, মা হয়ে তার
করতে পারি এমনতর ক্ষতি?

বেশবিন্যাসে নারী

বেলা দে

যে মেয়ে রূপচর্চা করছেন, লোকের চোখ ধাঁধানো তার উদ্দেশ্য হবে না। নিজেকে তিনি ভালবাসেন, তা ছাড়া আছে রেখা, রং আর বৈশিষ্ট্যবোধ। যে কোনো দামী শাড়ী আর গহনায় নিজেকে মুড়ে রাখলেই সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না এ কথা সে বিলক্ষণ জানে। সৌন্দর্য যে তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করে তা সে বোঝে। প্রথমে মূল রূপকে ভাবতে হবে, তার রেখার সুসমতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে ভাস্করের মতো, তারপর দেহের রংয়ের সংগে সামঞ্জস্য রেখে পরতে হবে শাড়ী, ব্লাউস আর গহনা। এই তিনটির উপরই নির্ভর করবে তার বেশবিন্যাসের আবাস রচনা। যাই হোক্ সে সব কথার এখানেই যবনিকা টেনে দিয়ে আমি মেয়েদের কখন কি ধরণের বেশভূষা করা উচিত তাই নিয়ে দু'চার কথা বলছি।

শুধু সান্ধ্য-ভ্রমণ নয়, কিছু কিছু বাজার করারও মতলব আছে। দিনের বেলা যে দুটো রঙীন শাড়ী পছন্দ করে এসেছি, সন্ধ্যার আলো জ্বললে তা কেমন দেখায়—চোখে দেখে তবে তো কিনব।

একটা কথা বেশভূষা সম্বন্ধে কেউ কারুর ধারণাকে শেখাতে পারে না তবে চেষ্টা করবেন জেনে রাখতে। সাজগোজের ব্যাপারে কয়েকটি মূল নিয়ম আছে, সেগুলি সকলকেই মানতে হয়। যেমন সূতির সংগে ব্রোকেট চলে না, বা একই শাড়ী ব্লাউস সমন্বয়ে ডোরা আর বুটিদার, আর ফুল আর জ্যামিতিক নক্সা এক সংগে চলে না বা এক রংয়ের শাড়ীর নীচে অন্য রংয়ের পেটিকোট বা ছাপা পেটিকোট চলে না—এগুলিকেই আমি মূল নিয়ম বলে মানতে বলছি। এর পরের কথা সাজগোজ করবার সময় মনে রাখতে হবে কোন্ প্রসংগে এই বেশবিন্যাস করছেন। সকালে বেড়াতে বেরুবার জন্য যদি হয়, বা দুপুরের খাওয়া বা

(ইহার পর ২২৪ পৃষ্ঠায়)

বিকেলে একটু বেড়াতে বেরুব—তা ওরা-সব এখনো আসছে না কেন—সেই কখন থেকে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

বিয়ে বাড়ির নামে ওরা অলংকারের পাহাড় বয়ে এনেছে দেখছি। আমার কিন্তু অত পছন্দ নয়।

—বেলা কত হল খেয়াল আছে? একটু শীগ্গির আয় না নেমে? যেতে যেতেই ক্লাসের ঘণ্টা বেজে যাবে যে।

ARROW
JESSORE
তীর মার্কা
(ARROW BRAND)
যশোহরের
চিরুণী
প্রস্তুত কারক
ইউনাইটেড এণ্ড কোং
১-১এ, সুবল চন্দ্র লেন, কলিকাতা-৯

মিতব্যয়ীর
পদচিহ্ন
চলাফেরায় চটপটে হ'তে হ'লে জুতায় 'কারুমাকো' রবার সোল ব্যবহার করুন। দীর্ঘস্থায়ী শক্ত রবারে তৈরী এই সোল ও হিল জুতায় লাগালে জুতা বহুদিন টেকসই হয়, হাঁটতেও আরাম লাগে আর তাছাড়া জুতার আকার পরিবর্তিত হয়না।
কারুমাকো
ষ্ট্যাণ্ডার্ড
সোল ও হিল
আজকাল জুতার যা দাম তাতে 'কারুমাকো' সোল লাগিয়ে জুতা বাঁচানই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ 'কারুমাকো' ষ্ট্যাণ্ডার্ড সোল ও হিল বহুদিন টেঁকে।
প্রাচ্যের সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়
কেদার রবার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
৯২, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১
(ভূতপূর্ব্ব ক্যালকাটা রবার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং)

বেঙ্গল শটী ফুড
ইহা
বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক
প্রণালীতে প্রস্তুত।
প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও
কবিরাজগণ কর্ত্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত
ও ব্যবস্থিত।
নিত্য ব্যবহারে
শিশুদিগের
চিত্ত
প্রফুল্ল রাখে।
BENGAL SOTTIE FOOD
অফিস:—অমূল্য ধন পাল এণ্ড কোং
১১৩ নং খোংরাপটী ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নৃত্য দর্পণ

নরনারায়ণ

একদা ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃত্যকলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলাকে যে দৃষ্টিতে দেখা হইত ইদানীং সে দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সে যুগে নিয়ম, নিষ্ঠা ও বিচারের দ্বারা নৃত্য অনুশীলন হইত। সব বিদ্যার মতই নৃত্য-বিদ্যাও ব্রহ্মমুখী ছিল। বর্তমান যন্ত্র-যুগে Mass Production-এর মত বহু ব্যবসা-দারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া নির্বিচারে নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আজকাল রুচির বালাই নাই, না আছে বিশুদ্ধ অভিসন্ধি, নৃত্যের খাতিরেই যেন নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ছন্দ ও মুদ্রা নৃত্যের প্রাণ। সু, কু, উভয় পথেই ইহার গতি। সেই মূলে ইচ্ছার কম্পন সৃজনের মাঝে ছন্দায়িত হইয়া রূপ প্রকাশ পায়। নৃত্যের অঙ্গ ও আঙ্গিকে যদি বিশুদ্ধ ভাব নামিয়া আসে তবে নৃত্যবিদ্‌ যোগীর মতই ভগবন্মুখী না হইয়া পারে না। উহা লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীনেরা ভারতীয় নৃত্যকলাকে গুণগত উৎকর্ষ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছে যথা :—ধর্মমন্দির, সভাক্ষেত্র, গৃহ, রাজদরবার ও রঙ্গমঞ্চ।

১। ধর্মমন্দির—(সত্ত্বগুণে প্রবল) উত্তম-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির অনুষ্ঠেয়। "করণ", "অঙ্গহার", মহামুদ্রা, রেচক, পূরক, ইহার বৈশিষ্ট্য। এটি তপোবন নৃত্যশিক্ষার প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ত্যাদি সংযম ও মনের তেজ বাড়ে এবং সৎজ্ঞানের সন্ধানে কল্পনা শক্তি আনিয়া দেয়। "তণ্ডুমুনির নৃত্যবিজ্ঞান" বলিয়া ইহা খ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও "নটরাজ" এ নৃত্যের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। ইহাতে কোন গুণের ক্রিয়া নাই।

২। সভাক্ষেত্র :—(সত্ত্ব, রজঃ গুণসম্পন্ন) ইহা উন্নত সভাবসম্পন্ন শিল্পীর অনুষ্ঠান। একমাত্র নিরালা ভগবৎ মন্দিরে নিবিষ্ট মনে শিক্ষণীয় বস্তু (দেবদাসী নৃত্য)। রেচক, অঙ্গ-হার ও "করণ" ইহার বৈশিষ্ট্য। এ নৃত্যটিতে বায়ু, পিত্ত, কফ্‌ রোগের উপশম হয়। নাড়ীপথ ও গ্রন্থি সকল সতেজ ও স্বাস্থ্য সুন্দর হয়।

৩। গৃহ :—(রজোগুণসম্পন্ন) পরিবার-বর্গের মধ্যে প্রদর্শনীয়। পরপুরুষ বা লোক-সমাজে এ নৃত্য দেখানো নিষিদ্ধ। ইহা মন নির্মল-আনন্দসূচক। প্রকরণ তাল, লয়, অঙ্গ ও পদ ভঙ্গিমা।

৪। রাজদরবার :—(রজঃ ও তম মিশ্রিত) পোষাকের পারিপাট্য ও হালকা অঙ্গভঙ্গিমার জন্য আকর্ষণীয় নৃত্য (দরবারী মজুরা)। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ও মাদকতাপূর্ণ, নর্তক-নর্তকীর নৃত্য। এ নৃত্য সহজসাধ্য এবং সর্বসাধারণের জন্য।

৫। রঙ্গমঞ্চ :—(তমো প্রবল) এই নৃত্যের আনুষঙ্গিক গর্ব, চঞ্চল অঙ্গভঙ্গিমা, শৃঙ্গার-ভাব, পোষাকের পারিপাট্য, অর্থলালসা, আকর্ষণ-প্রিয়তা দৃষ্টিশক্তি মোহিনী ভাবাপন্ন। অঙ্গাবরণ উন্মুক্ত ইত্যাদি। দর্শক ও দ্রষ্টা উভয়েরই বৃত্তি নিম্নগামী করে। (বিলাস-নৃত্য)।

শ্রীমতী পূরবী গুপ্তভায়ার একটি নৃত্যভঙ্গী।

বর্তমানে ছেলে-মেয়েদিগের মধ্যে নির্বিচারে যেরূপ নৃত্যকলা প্রসার হইতেছে তাহাতে নৃত্য-কলা সম্বন্ধে ভারতীয় এই দিগ্‌দর্শন বিষয়ে বিশেষভাবে অভিভাবকগণের সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নৃত্যশিল্পীর শিল্প সত্ত্বাকে কোন লোকই অসম্মান করিতে পারে না; কিন্তু তবু বলিতে হয়, নৃত্যশিল্পিগণ আজকাল লোকচক্ষে বেশ একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। তাহার কারণ, যেমন ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার, আর শাস্ত্র নাই গুরু নাই প্রেমান পরমহংস।

আর একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল, এক কৃষক একদিন তার জমিতে চাষ-আবাদ করিল। তখন এক সাহেব দেখিতে পাইয়া কৃষককে বলিল, "তোম্‌ জমিমে কোন চাষ লাগাতে হ্যায়! তোমার জমিতে তো খুব ভাল ধান ফলিয়াছে।" কৃষক হাতযোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি জমিতে তেসরা চাষ দিয়া তারপর জমিতে বীজ ফেলিয়াছি। তখন সাহেব নিজের জমিতে আসিয়া তাহার কৃষককে বলিল—তোম আগারি কোন চাষ লাগাতে হ্যায়। কৃষক হাতযোড় করিয়া বলিল আজ্ঞে হুজুর আগে পহেলা চাষ দিয়াছি। কৃষকের কথায় সাহেব চটিয়া গিয়া বলিল তুম্‌ শূয়ার, কুছু নেই জান্‌তে হ্যায়। পহেলা তুম তেসরা চাষ জমিতে লাগাও। সাহেবের মূর্খতা বুঝিয়া কৃষক মনে মনে হাসিতে লাগিল। সেরূপ আমরাও শাস্ত্রীয় পন্থায় নৃত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া একেবারে প্রথমেই তেস্‌রা চাষ দিয়া মাষ্টার হইয়া পড়ি। যার জন্য আজ দর্শকবৃন্দ নৃত্যশিল্পীদিগকে অপমান করিতে কোন ত্রুটী করে না। শিল্পী সামাজিক জীবনের বহু ঊর্ধ্বে। তার সাধনা তার সংযমী জীবনচরিত্র লোক-সমাজের খেলা-ফেলার জীবনের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। শিল্পীর শিল্পসত্ত্বাকে কোন লোকেই অসম্মান করিতে পারে না। যিনি প্রকৃত গুণী—শিল্পী তাঁহার কাছে লক্ষ লক্ষ লোভনীয় বস্তু অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে। কারণ তাঁহার মনপ্রাণ ভগবৎ-শক্তিতে পবিত্র হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। এমন শিল্পী চিরকাল জগতে নমস্য।

হিন্দী নাট্যকার ও কবি জয়শঙ্করপ্রসাদ

মন্মথ গুপ্ত

বাংলাদেশের পাঠকমহলে স্বর্গীয় প্রেমচন্দে'র নাম অজানা নেই। প্রায় তাঁরই সমসাময়িক আর একজন লেখকের পরিচয় পাওয়া যাবে স্বর্গীয় জয়শঙ্কর প্রসাদের মধ্যে। সৃষ্টি-প্রতিভায় হিন্দী জগৎ জয়শঙ্করকে প্রায় প্রেমচন্দের সমকক্ষ পর্যায়ে গ্রহণ করেছে।

যে সময় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিম ও মাইকেল এসেছিলেন প্রায় সেই সময় হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে ছিলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। গদ্য ও কবিতা দুই ক্ষেত্রেই একাকী তাঁকে এই সময় হিন্দী সাহিত্যে আবর্জনা দূর করা ও নতুন সংগঠনের কাজ করতে হয়েছে। জয়শঙ্কর ও প্রেমচন্দ ইত্যাদি মহারথীদের আগমন হয়েছে হরিশ্চন্দ্রের পরে।

এই যুগ ছিল হিন্দী জগতের নবীনতা ও প্রাচীনতার প্রচন্ড বিরোধের যুগ। ভাব ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত ও বিপ্লবী পরিবর্তন হয়েছিল এই সময়। হিন্দীতে 'ব্রজভাষা ও খাড়িবোলী'র যুদ্ধ বিশেষরূপে উল্লেখনীয়। ব্রজভাষা ব্রজ অঞ্চলের কথিত ভাষা এবং পুরাতন হিন্দী কবিতার ভাষা, কবি সাধক সুরদাস তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন ব্রজভাষায়। 'খাড়িবোলী' মিরাট ও দিল্লী অঞ্চলের ভাষা, বর্তমানে এই ভাষা সমগ্র হিন্দী জগতের সাহিত্যের মাধ্যম এবং ক্রমশঃ সমগ্র হিন্দীভাষীদের প্রচলিত কথিত ভাষায় পরিণত হচ্ছে। ব্রজভাষা ও খাড়িবোলীর যুদ্ধে—খাড়িবোলী জয়যুক্ত হয়েছিল—যার ফলে হিন্দী আজ রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গণ্য হয়েছে, অন্যথায় হিন্দীভাষা বহুবিধ স্থানীয় কথিত ভাষা যথা—ব্রজভাষা অবধী ভাষা, মৈথিলী, ভোজপুরী প্রভৃতি খন্ড খন্ড ভাষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতো, এক অখন্ড সর্বভারতীয় ভাষায় পরিণত হতে পারতো না।

হিন্দীর এহেন যুগসন্ধিকালে জয়শঙ্কর প্রসাদ প্রকাশিত হয়েছিলেন। প্রথমে ব্রজভাষা কবিতা রচনা করতেন তারপর তিনি হিন্দী খাড়িবোলীর প্রাধান্য স্বীকার করে পরবর্তী সমস্ত রচনা হিন্দীর খাড়িবোলীতে রচনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জয়শঙ্কর কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়নি, হয়েছিল গৃহশিক্ষকের কাছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপন্ডিত হয়েছিলেন এবং বঙ্গভাষায়ও কবিতা উপন্যাস যথেষ্ট পাঠ করেছিলেন, সেই-জন্য পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় বাংলা কবিতার সুললিত ধারার প্রকাশ হয়েছে।

এভিন্ন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র প্রসাদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর উত্থানাবস্থায় ভারতবর্ষে আর্যসমাজী শিক্ষা ও ভাবধারার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। আর্যসমাজী শিক্ষায় এই ধারণা সাধারণ শিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সকল প্রকার উৎকর্ষই প্রাচীন ভারতে বিদ্য-মান ছিল এবং ভারতের পুনর্জন্ম কেবলমাত্র প্রাচীনতাকে অনুশীলন ও অনুসরণ দ্বারাই সম্ভব। জয়শঙ্কর প্রসাদ ভারতীয় ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তৎকালীন প্রচলিত এই আর্যসমাজী বিশ্বাস হতে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিক চেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল এবং দৃষ্টি ছিল নির্মল।

জয়শঙ্কর প্রসাদ কএকটি নাটক রচনা করেছিলেন 'চন্দ্রগুপ্ত', স্কন্দগুপ্ত' 'ধ্রুবস্বামিনী' প্রভৃতি অন্যতম। সমালোচকেরা 'স্কন্দগুপ্ত' ও 'ধ্রুবস্বামিনী' তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মেনে নিয়েছেন। নাটক রচনার জন্য তিনি প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস হতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। প্রাচীন ভাবধারায় রচিত হলেও প্রসাদের নাটক প্রাচীনপন্থী নয়। হিন্দী সাহিত্য সমালোচকেরা (রামচন্দ্র শুক্ল ও হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী) স্বীকার করেছেন যে, প্রসাদের নাটক উপন্যাস—হিন্দী জগতের ভাবী সংস্কৃতি নির্মাণের পথে অনুকূল-তারই সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন বিষয়বস্তুর প্রয়োগ করে নাট্যকার সমাজকে পশ্চাদপসরণের যুক্তি দেননি। প্রগতিশীলতার পথই নির্দেশ করেছেন।

প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য গ্রহণ করে জয়শঙ্কর সেগুলি বর্তমান সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োগ করেছেন। এইরূপে বর্তমান সমস্যা ও ভাবী সংস্কৃতির কিছু নির্দেশ পাওয়া যায় তার নাটকের পাত্র-পাত্রীর বার্তালাপে।

নাটকের ভাষাও সর্বত্র প্রাচীন নাটকীয় ভাষা নয় স্থলে স্থলে গদ্য কাব্যের অনুরূপ। ভাষা রঙ্গীন চিত্রময় এবং ভাব মধুর কল্পনা আছে—কিন্তু তাঁর কোন নাটকই যথাযথরূপে অভিনয়-যোগ্য হতে পারেনি, পাঠ্যরূপেই হিন্দী জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে। টেকনিক বিষয়ে প্রসাদ অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন। এখনও কদাচিৎ তাঁর রচিত কোন নাটক অভিনীত হবার সময় তাতে প্রচুর পরিবর্তনসাধন করতে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে জয়শঙ্কর প্রসাদ প্রথমে ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করতেন—সে কবিতাগুলি 'চিত্রাধার' সংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হয় খৃঃ ১৯১১। তারপর "কানন কুসুম" "মহারাণা কা মহত্ব" 'করুণালয়' ও 'প্রেম পথিক' কাব্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। এই সময়কার রচনাগুলিতে বাংলা প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। একটি স্বচ্ছন্দ নবীন পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এই সকল রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। তারপর ১৯১৮ খৃঃ 'ঝরণা' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'ঝরণা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রায় ন বৎসর পরে। এই কাব্যগ্রন্থখানি হিন্দী সাহিত্যে এক নবযুগের প্রতীক বলা যায়।

'ঝরণা'য় 'বিষাদ' 'বালুকী বেলা' (বালুচর) 'খোলো দ্বার' "বিখরা হুয়া প্রেম" 'কিরণ' 'বসন্ত কী প্রতীক্ষা" প্রভৃতি কবিতা হিন্দীতে ছায়াবাদ এবং এক প্রকার রহস্যবাদের স্ফুট রচনা। এক রহস্যময় অনুভূতি ও চিন্ময় কল্পনা দ্বারা এই কবিতাগুলি পাঠকের মনোরঞ্জন করে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কত গভীরভাবে প্রসাদকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই কবিতা ও এর পরবর্তীকালের কবিতাগুলি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'কিরণ তুম কোঁও বিখরী হো আজ,
রঙ্গী হো তুম কিস কে অনুরাগ?
স্বর্ণ সরসিজ কিংজল্ক সমান
উড়াতী হো পরমান পরাগ।
ধরাপর ঝুকি প্রার্থনা সদৃশ
মধুর মুরলী-সী ফির ভী মৌন।
কিসী অজ্ঞাত বিশ্ব কী বিকল
বেদনা-দূতী সী তুম কৌন?

(কিরণ-ঝরণা)

'হে কিরণ আজ বিচ্ছুরিত হয়েছো কেন—কার অনুরাগে রঞ্জিত হয়েছো? স্বর্ণ কমলের কেশর পরাগের মত উড়িয়েছো পরাগের কণা। পৃথিবীর বুকে প্রার্থনার মত ঝুঁকে পড়েছো—মধুর মুরলীর মত, কিন্তু নীরব কোনো অজ্ঞাত বিশ্বের বেদনা বিকল দূতীর মত—কে তুমি?

"ভীগ রহা হ্যায় রজনীকা বহ সুন্দর
কোমল কবরীভার
অরুণ কিরণ সম কর সে ছুলো, খোল
প্রিয়তম খোলো দ্বার"

'রজনীর সুন্দর কোমল কবরীভার সিক্ত হয়ে যাচ্ছে, অরুণ কিরণের মত কর দ্বারা স্পর্শ কর—হে প্রিয়তম দ্বার খোল—।

প্রকৃতি চিত্রাঙ্কনের প্রসিদ্ধ কবি প্রসাদ। কবির কাব্যকলায় প্রকৃতি প্রাণবন্ত। প্রকৃতির রূপক দ্বারা মানবীয় প্রেম রহস্যকে বার বার সংকেত করা হয়েছে। শৈশবে একবার ভারতের বিভিন্ন তীর্থ দর্শনের সুবিধা কবি লাভ করেছিলেন—প্রকৃতির বিরাটরূপে কবির আত্মা চিরদিনের জন্য মুগ্ধ হয়েছে মগ্ন হয়েছে। সেইজন্য মধুর ও রঙ্গীন চিত্র বিচিত্র ভঙ্গী ও ভাব প্রকৃতির রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে।

প্রসাদের বিশিষ্ট রচনা 'আঁসু' (১৯২৬ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। 'আঁসু'র কবিতা কবির অতীত সম্ভোগ সুখের স্মৃতি-চিত্রণ। ক্রমশঃ সেই স্মৃতি-চিত্রণ এক অপার্থিব রূপ গ্রহণ করে রহস্যময় পথের সন্ধানে যাত্রা করেছে। হৃদয়ের তরঙ্গ এক 'অনন্ত কোণে' প্রবাহিত হয়ে চলেছে—সেখানে অশ্রু এক 'অজ্ঞাত প্রিয়তমের' উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে। প্রসাদের এই কাব্য-গ্রন্থখানি বহুসমাদৃত হয়েছে। অভিব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য, প্রেম বেদনার অলৌকিক দিব্য জ্যোতি প্রসাদের ক্রম প্রকাশমান নিয়তিবাদ ও দুঃখ-বাদের বিষন্ন সুরকে ক্রমশ আরো দূরে এক আশাময় রহস্যবাদে পৌঁছে দিয়েছে। এই রহস্যবাদ কবির রচনায় উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে তাঁর শেষ বিরাট কাব্যগ্রন্থ 'কামায়নী'তেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কবির বক্তব্য এই যে, চেতনার বিস্মৃতিতে 'কল্যাণের দর্শন' হয় এবং মিলন সুখ প্রাপ্তি হয়। রতি কামঃ অনিবার্যভাবে মহারাত্রিতে উপস্থিত হয়েছে।

"চেতনা লহর ন উঠেগী
জীবন-সমুদ্র থির হোগা,
সন্ধ্যা হো সর্গ প্রলয় কী
বিচ্ছেদ মিলন ফির হোগা।"

মহারাত্রির মহা-অচেতনতায় চেতনার তরঙ্গ আর উঠবেনা, জীবন-সমুদ্র নিশ্চল হবে, প্রলয়ের সন্ধ্যা হবে তবেই বিচ্ছেদ পরিণত হবে চির-মিলনে।'

"স্মৃতি সমাধি পর হোগী
বর্ষা কল্যাণ জলদ কী
সুখ সোয়ে থকা হুয়া সা
চিন্তা ছুট যায় বিপদ কী।"

প্রসাদের 'লহর' (তরঙ্গ) কবিতা গ্রন্থেও আছে সেই রহস্যবাদেরই ধারা। লৌকিক প্রেম অজ্ঞাতে অলৌকিকতার সন্ধানে যাত্রা করেছে। প্রিয়তমের সঙ্গে 'আঁখ মিচৌলী' (লুকোচুরি খেলা, 'দবে পাঁও' (পা টিপে টিপে) আসা, কিরণ অঙ্গুলি' দ্বারা চক্ষু বন্ধ করে দেওয়া এবং তারপর প্রিয়তমের জন্য অভিসার সবই বর্তমান! কখনও মনে হয় কবির প্রিয়তমা নিতান্তই বাস্তব মানবী কিন্তু ক্রমশ তার মানবীয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে হতে এক অজ্ঞাত রহস্যময় জ্যোতিতে পরিণত হয়।

"তুম হো কৌন অওর মৈঁ ক্যা হূঁ
ইসমে ক্যা হ্যায় ধরা, সুনো।
মানস-জলধি রহে চির চুম্বিত
মেরে ক্ষিতিজ (।) উদার বনো। (।)

দিগবলয় তুমি কে এবং আমিই বা কে ইহাতে কিছুই আসে যায় না,—মানস সমুদ্র চিরদিন মিলিত—সুতরাং হে মোর দিগবলয়—উদার হও'। আকাশ আর পৃথিবী কবি মানসের সৃষ্টি অনুরাগ পাত্র-পাত্রী অথবা আর কিছু।

এই 'লহরে'রই আর একটি কবিতা—

"বীতী বিভাবরী জাগ রী!
অম্বর-পনঘট মে ডুবো রহী
তারা ঘট ঊষা নাগরী।
খগকুল 'কুল কুল' সা বোল রহা,
কিসলয় কা অঞ্চল ডোল রহা
লো, যহ লতিকা ভী ভর লাই
মধু মুকুল নবল রসগাগরী।"

কবির অন্তরে এত অপরিমিত অনুরাগ যে, তা যেন সমস্ত বিশ্বে উপচে পড়ছে। অধ্যাত্মবাদী অনুশীলন দ্বারা রহস্যবাদের রহস্য চির রহস্যই রয়ে যায়!

'প্রেম-পথিক' কাব্য গ্রন্থের প্রেমের কবিতা-গুলি প্রসাদের বিদগ্ধ প্রেমী হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কখনও কামনার ব্যাকুলতা, কখনও আহতের বিলাপ, কখনও অপরিসীম মিলনানন্দের নিবিড় রসঘন অনুভূতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। ওমর খৈয়ামের কাব্যে যে ফারসীর প্রভাব প্রসাদের কাব্যে (বাংলা কাব্যের অতিরিক্ত) ফারসীর সন্ততি উর্দুর প্রভাবও আছে।১ লৌকিক সংকেত দ্বারা কবি অলৌকিক প্রণয়চর্যার ব্যঞ্জনা করেছেন। 'স্বভাব', 'প্রিয়তমা', 'অনুনয়', 'স্বপ্নলোক', 'মিলন' কবিতাগুলি তারই নিদর্শন।

ব্রজভাষায় লিখিত 'প্রেম-পথিকে'র কবিতা

প্রেম, সোঁ জানি প্রীতি কীজো সমুঝিলেও মন
নাঁহি প্রেম কো জানি নাম লীজো ভুলি জাও
নিত"

'বুঝে নাও, হে মন, প্রেম করা কিছু নয়।—ও বস্তুর নামও কোরনা, একদম ভুলেই যাও প্রেম শব্দটা'।

আনন্দ স্বপ্নমগ্ন প্রেমিকের মনোরাজ্যের প্রকাশ—

"শূন্য হৃদয় মে' প্রেম জলদ মালা
। কব ফির ঘির আয়েগী?
বর্ষা ইন আঁখো সে হোগী,
কব হরিয়ালী ছায়েগী?
রিক্ত হো রহী মধু সে সৌরভ,
সুখ রহা হৈ আতপ সে
সুমন কলি খিলাকর কব অপনী
পঙ্খড়িয়া বিখরায়েগী?

জীবনের পরমারাধ্য প্রেম কবে জাগবে—

"মন-ময়ূর কব নাচ উঠেগা
কাদম্বিনী ছটা লখকর
শীতল আলিঙ্গন করনে কো
সুরভি লহরিয়া আয়েগী,
(শুষ্ক) বড় উমঙ্গ সরিতা আবেগী
আর্দ্র কিয়ে সুখী (১) সিকতা
সফল কামনা-স্রোত লীন হো
পূর্ণ বিরতি কব পাবেগী"

তারপর

"মিলগয়ে প্রিয়তম হমারে মিলগয়ে
কৌন কহতা হৈ জগত হৈ দুঃখ ময় ?"

ক্রমশঃ সেই মানবীয় প্রেম এক অনিবার্য আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত

"প্রিয়তম-ময় যহ বিশ্ব নিরখনা,
ফির উসকো হ্যায় বিরহ কহাঁ,
ফির তো বহী রহা মনমে',
নয়নো মে' প্রত্যুত জগভর মে'
কাঁহা রহা তব দ্বেষ কিসী সে,
কেওকী বিশ্ব হী প্রিয়তম হৈ"
(প্রেম পথিক)

সর্বশেষে জয়শংকর প্রসাদ 'কামায়নী' নামে এক বিরাট কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিষয়-বস্তু :—জল প্রলয়ের পর মনু চিন্তাগ্রস্ত নিরাশ। তারপর আশার আভাষ এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ ও মনুর সঙ্গে শ্রদ্ধার মিলন। তারপর মনুর পশুহিংসাত্মক কার্য ও শ্রদ্ধার সহিত বিচ্ছেদ, তারপর আছে এক দীর্ঘ কাহিনী। রূপকে রচিত একটি আধ্যাত্মিক কাব্য। সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠককে এত স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

---

১ ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 'হিন্দী সাহিত্য'

ইতিহাসের প্রতীক্ষায়

কৃষ্ণ ধর

এবার সবার জীবন দিয়েই রুখছি
উচ্চকণ্ঠে হাঁকছে প্রাণের বন্যা;
বিষম দিন দু'হাত দিয়ে ঠেলছি
প্রতিমুহূর্তে ঝরছে রুদ্ধকান্না।

ঝরুক আহা, ঝড়ের মাতাল দিন,
অগ্নিকোণেতে অসম্ভাব্য মেঘ;
এ লক্ষ প্রাণ সমুদ্র-সম্ভব
উচ্ছকিত এ নদীর বন্যাবেগ।

বন্ধুহে তুমি এসেছো দুঃসময়ে,
এ আঙিনায় কলকাকলির শেষ;
পদচিহ্নও ক্রমশঃ বিগতস্মৃতি
অধুনা একক রাত্রিই অবশেষ।

তবু কিছু যদি স্বাক্ষর থাকে জেগে
হে মহাজীবন, সেই দৃঢ়তাই আশা;
অপগত আজ মিথ্যার বঞ্চনা
সম্প্রতি মনে সূর্যেরই অন্বেষা।

রামধনু রঙ দিগন্ত-কাল গোপে;
রামধনু রঙ দিগন্ত-কাল গোনে;
কোথায় বা সেই সপ্তপর্ণ রোদ
আকাশ-তিমির তারাখসা রাত বোনে।

জড়কবন্ধ মুমূর্ষু দিন যায়
অগ্রগমনে লক্ষ দুর্বিপাক;
দু'হাতে সরাই পুঞ্জিত জঞ্জাল
অন্ধ তমসা পশ্চাতে পড়ে থাক।

তবু এই কথা নিশ্চিতরূপে জানি
ইতিহাস আসে অপ্রতিহতগতি;
বিদ্রোহী প্রাণ সুদৃঢ় প্রত্যয়ে
সারাদেশে গড়ে জীবনের প্রস্তুতি।

ইস্পাতীফলা কর্ষণে শেষ নয়,
তারি সংঘাতে জন্ম সম্ভাবনা;
নবজাতকেরা জাগছে ভারতবর্ষে
ইতিহাস তুমি জানি আর থামবে না।

সেকেণ্ড ফ্লোর

আমিনুর রহমান
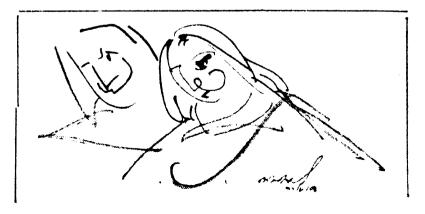
সেদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ী ফিরবার পথে হঠাৎ আকাশ ছিঁড়ে বৃষ্টি নামল। দেখতে দেখতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল, আর ট্রামও মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হল না সহজে বৃষ্টি থামবে, সুতরাং ট্রাম যে কখন চলবে তা অনিশ্চিত। বাদলা দিনে একটু মৌজ করে বিড়ি ধরাব তার উপায় নেই। ট্রামে ধূমপান আইনতঃ নিষিদ্ধ। অথচ ট্রামের অন্যান্য আরোহীদের মধ্যে দেখি এক খোট্টা সশব্দে খৈনি তৈরী করছে, এক ছোকরা নাস্য নিয়ে হাতটা আমার নাকের সামনেই ঝাড়লেন, এক দন্তবিহীন বৃদ্ধ পকেট থেকে তোবড়ান ডিবে বার করে দোক্তাসহযোগে একখিলি পানও খেলেন এবং ঘাড় ফিরিয়ে জানালার বাইরে পিক্ ফেলবার সময়ে দুচার ফোঁটা আমার জামাতে লাগল।

বিরক্ত হয়ে সেই একহাঁটু জলে নেমে পড়লুম এবং ছেঁড়া ছাতাটা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ীমুখো হাঁটা দিলুম। বাড়ী ফিরতে দেরি হলে গিন্নী আবার মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকবেন। পথে নেমে বুঝলুম কাজটা সমীচীন হয়নি। যেমন মুষলধারে বৃষ্টি তেমনি প্রচণ্ড বাতাসের বেগ। মাথার ওপর ছাতা থাকা সত্ত্বেও ভিজে আমসত্ত্ব হয়ে গেলুম। অবশ্য ভেজার দোষ নেই; এলোপাতাড়ি ঝড়ের দাপটে কখন যে ছাতার নড়বড়ে মাথাটা উড়ে বেরিয়ে গেছে তা টেরও পাইনি। বাড়ী পৌঁছে ছাতা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি হাতে শুধু বাঁটটা রয়েছে। দোতলায় জানালার ধারে আমার গৃহিণী আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়তে লাগলুম। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। ঘরের মধ্যে রেডিওতে গান হচ্ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে না পাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু গিন্নী ত আমাকে আসতে দেখেই দরজাটা খুলে রাখলে পারত। ভিজে কাপড়ে বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা গেল না; সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে সুরু করলুম। এইবার গিন্নীর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম, "মা গো মা, দরজাটা যেন ভেঙ্গে ফেললে। কি রকম মানুষ গা?" তারপর দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়েই বলল, "ও, তুমি! আমি ভাবলুম বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়ল।"

আমি বললুম, বাঃ, বেশ, দেখছ আমি ভিজতে ভিজতে আসছি, কোথায় একটু তাড়াতাড়ি এসে দরজাটা খুলে দেবে, তা না, কানে ছিপি এঁটে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হা করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছ। কেন, আমাকে দেখতে পেয়ে আগে থেকে দরজাটা খুলে রাখতে পারনি?

গিন্নী বলল, দেখতে পেলে কি আর তোমাকে অত জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে হত? ঝাপসা অন্ধকারে অতটা ঠাহর করতে পারিনি। দূর থেকে মনে হল বটে কে যেন এই বাড়ীর দিকেই আসছে। আমি ভাবলুম তেতলার ভদ্রলোক বুঝি। তাঁরও ত আবার তোমার মত মাথার সামনে টাক। গ্যাসের আলো টাকের ওপর পড়তেই একবার চিক্ চিক্ করে উঠল।

আমি অবাক হয়ে বললুম, শুধু টাকেই বিভ্রান্ত হলে? কিন্তু ওপরতলার ভদ্রলোক আমার চাইতে অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট। গায়ের রং আমার চাইতে ফরসা। তিনি আমার চাইতে ঢের রোগা। আমার গোঁফ আছে, তাঁর নেই। বড় ভাবনায় ফেললে গিন্নী। কেবল টাক অবলম্বন করে যদি স্বামী সনাক্ত করতে যাও তা হলে ত গেছি।

গিন্নী তার হেডমাস্টারণী মার্কা বপুটা একটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়ে বলল, নাও ঠ্যালা, এতে আবার ভাবনার কি হল তা ত বুঝি না।

আমি বললুম, দুর্ভাবনা হবে না? কোলকাতার সহরে টেকো লোক হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে কর তোমাকে নিয়ে রাত্রে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছি। তুমি সাত হাত ঘোমটা টেনে আমার পেছন পেছন চলেছ। পথে ভিড়ের মধ্যে এক সময় ছিটকে গিয়ে আমাকে হারিয়ে ফেললে; তারপর ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অন্য এক ভদ্রলোকের আমারই মত টাক দেখে তাক্ করে তার পিছু নিলে। তারপর ভাব দেখি কি হয়?

গিন্নী সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দুম্ দাম্ করে পা ফেলে যেতে যেতে বলে গেল, যতসব উদ্ভট ভাবনা, নেশাটেশা সুরু করেছ নাকি? তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলাও। আমি চা করে নিয়ে আসছি।

আমি আপন মনে বেসুরো গলায় একটা রামপ্রসাদী ধরেছি আর একটা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জির উল্টো সোজা ঠিক করছি। এমন সময় সিঁড়ির পথের খোলা দরজা দিয়ে এক অপরিচিত সুন্দরী তরুণী আমার ঘরে ঢুকে ফিক্ করে হেসে বললেন, নমস্কার মিঃ সেন। বেশ গানটা ধরেছিলেন কিন্তু। এমন বাদলা দিনে, আ-হা। বন্ধ করলেন কেন? চলুক না।

আমি থতমত খেয়ে বললুম, এ্যাঁ নমস্কার। কিন্তু আপনি—? মানে আপনাকে—?

আমাকে গুছিয়ে প্রশ্ন করতে দেবার আগেই তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, আমাকে হঠাৎ দেখে ভারি আশ্চর্য হচ্ছেন না? হবারই কথা। আমি বলেই এই দুর্যোগ মাথায় করে, এমন অসময়ে, এতদূরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আজই কোলকাতায় এসে পৌঁছেছি কিনা; বলেছিলুম না, কোলকাতায় এলেই আপনার সঙ্গে দেখা করব। চলুন, লাস্ট শো-তে একটা ভাল ইংরেজী ছবি দেখে আসা যাক্।

আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন সব গুলিয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে বললুম, আপনার সঙ্গে একা লাস্ট শো-তে সিনেমা যাব?

তরুণী এক রকম ধমক দিয়েই বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিনেমা। কেন আপত্তি আছে নাকি?

আমি কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। মেয়েটি প্রশ্ন করলেন, আপনার কি হয়েছে বলুন ত মিঃ সেন? অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে কি দেখছেন?

এবার মনের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে বললুম, দেখুন, আমার স্মৃতিশক্তির বড়াই করতে পারি না। আপনার কি ধারণা আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন?

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললেন, বারে, আমি তেমন মেয়েই নই যে একবার দেখলে দ্বিতীয়বার আর তাকে চিনতে পারব না। তবে হ্যাঁ, এই ক'মাসের মধ্যে আপনার চেহারার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে দেখছি। টাকের পরিধি একটু বেড়েছে, আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছেন, একজোড়া বাটারফ্লাই গোঁফ রেখেছেন দেখছি।

আমি বাধা দিয়ে বললুম, তার মানে খোল নইচে সবই বদলে ফেলেছি।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললেন, প্রথমটা একটু খটকা লেগেছিল। ভাগ্যিস আপনার নাম ঠিকানা লেখা শ্লিপটা সঙ্গে ছিল। দরজার ওপর আপনার নেম-প্লেট দেখে তবে ঘরে ঢুকেছি।

বুঝলুম মেয়েটির তরফ থেকে কোন গলদ নেই। কিন্তু আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলুম না যে, মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কোথায় দেখেছি। অগত্যা চালাকি করে তাঁর কাছ থেকে কথা বার করবার জন্য বললুম, দেখুন, কিছু মনে করবেন না। ইদানিং আমার একটু স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। কিছুই মনে রাখতে পারি না। আপনি যখন বলছেন তখন আমার সঙ্গে আপনার, মানে আপনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ইয়ে, কি বলে হৃদ্যতা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে, আমাদের প্রথম দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয়ের ঘটনাপ্রবাহ ঠিক ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না।

মেয়েটি কিন্তু রাগ না করে বরং হাসতে হাসতেই বললেন, রসিকতা করার অভ্যাসটা আপনার ঠিক আগের মতই আছে দেখছি। এইজন্যই আপনার সঙ্গে আলাপ করে এত আনন্দ পাই। আপনার ফন্দি আমি বুঝতে পেরেছি। না চেনার ভান করে আমার মুখ দিয়েই পুরনো কথা শুনতে চান। যদি শুনে আনন্দ পান ত নিশ্চয়ই শোনাব।

তারপর তিনি ভাবাবেশে যা বলে গেলেন, তার সারাংশ হচ্ছে যে, প্রায় এক বছর আগে দেওঘরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কে এক রায়বাহাদুরের বাড়ীতে আমার সুললিত কণ্ঠের গান শুনে তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রাথমিক আলাপের পরই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। আমরা দু'জনে নাকি 'একা একা' নির্জন পথ ধরে বহুদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়েছি এবং কত গান শুনিয়েছি। তারপর বিদায়ের দিনে তাঁর হাত ধরে আমি আমার মনের কথা যা বলেছি, তা আজও তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। সেই মধুর স্মৃতি বুকে করে কত বিনিদ্ররজনী তিনি যাপন করেছেন—ইত্যাদি।

সব শুনে আমি রীতিমত ঘামতে সুরু করলুম। জীবনে কখনও দেওঘর যাইনি। এখন এই বখাটে মেয়েটার পাল্লায় পড়ে শ্রীঘর না যেতে হয়। গান ত আমি জানিই না, এমন কি আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ গান জানতেন বলে শুনিনি। কি কুক্ষণে বাদলা দিন দেখে ঘরের মধ্যে একা গুন্-গুন্ করে একটা রামপ্রসাদী ধরেছিলুম। পিতৃদত্ত গৃহিণী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমালাপ করিনি। অথচ ভদ্রমহিলা নাম-ঠিকানা ও চেহারার যা বিবরণ দিলেন, তাতে আমিই অপরাধী হয়ে পড়ছি। এ যেন আমার হাতে কে তামাক খেয়ে গেছে, আমি টের পাইনি গোছের। ভেবে দেখলুম ব্যাপারটা ক্রমশঃ ঘোরাল হয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম, দেখুন মিস্ মল্লিক (তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন সুধারাণী মল্লিক) একটা মারাত্মক রকম ভুল কোথাও হয়েছে। কারণ আমি আপনাকে সত্যিই চিনি না। তা-ছাড়া বার বছর আগে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং পাশের ঘরে আমার স্ত্রী আছেন।

মিস্ মল্লিকের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আহত বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠলেন, কি এত বড় প্রতারণা আপনি আমার সঙ্গে করেছিলেন? একটা অবলা কুমারী মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আপনার এতটুকু সংকোচ হল না? আপনি না বলেছিলেন যে, আপনার স্ত্রী জীবিত নেই, আর আমার মত মেয়ে পেলে দ্বিতীয়বার সংসার করতে আপনার আপত্তি নেই? আজ বলছেন, আপনার স্ত্রী জীবিত, আমাকে আপনি চেনেন না। দাঁড়ান ভাল করে চিনিয়ে দিচ্ছি।

চীৎকার শুনে গৃহিণী ছুটে এলেন, তারপর আমাদের দু'জনের মুখের দিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আমাকে রাশভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে এই মেয়েটি, বড় জোর গলায় বলছে আমি বেঁচে নেই?

গৃহিণীর রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে আমি প্রমাদ গুণলুম। বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, মেয়েটিকে আমি মোটেই চিনি না, কিন্তু কে কার কথা শোনে। একদিকে গিন্নী ছোবল মারছে, আর একদিকে মিস্ মল্লিক গর্জে উঠছেন। গৃহিণীর দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, আমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আমি যত বলি, আহা-হা, চট্‌ছ কেন গিন্নী?

সে অমনি রুখে ওঠে—না, চটব না? খুশীতে নাচতে হবে। লজ্জা করেনা তোমার? বুড়ো বয়সে এই ভীমরতি। আর তোমারও, মেয়ে, বলিহারি বুকের পাটা। কবে কোথায় না হয় একদিন পথে-ঘাটে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছেই বা, তাই বলে জানা নেই, শোনা নেই, দুদণ্ডের মধ্যে একটা পরপুরুষের গায়ে ঢলে পড়তে হবে। ছিঃ ছিঃ একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে!

সুধারাণীও তেড়ে উঠলেন, আপনি সংযমের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, মিসেস্ সেন। লেখাপড়া না শিখলে যে মানুষ কতদূর অভদ্র আর ছোটলোক হতে পারে, তার প্রমাণ আপনি দিচ্ছেন।

গৃহিণীও কোমরে আঁচল জড়িয়ে এগিয়ে এলেন, তবে রে মুখপুড়ী, এতক্ষণ কিছু বলি নে বলে—

ব্যাপার যে আরও কতদূরে গড়াত তা বলা যায় না। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে আমরা সকলে তটস্থ হয়ে পড়লুম। ভাবলুম ফ্ল্যাটের অন্যান্য ভাড়াটেরা বুঝি ছুটে এসেছে। দরজা খুলে দেখি টেলিগ্রাফ পিওন। টেলিগ্রামটা সই করে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললুম, এ আবার কি নতুন বিপত্তি কে জানে। সুসংবাদ ত আর কেউ

দিন-রাত্রির কবিতা

★ বিমল চন্দ্র ঘোষ ★

দিনের ঝাঁঝালো আলোয় কল্পনারা
গুহায় লুকিয়ে থাকে!
দিন শুধু আনে কালো নোনা ঘাম
কোনো খাটুনীর জোটেনাকো দাম
পথে প্রান্তরে খাড়া দারোয়ান
কাজের পথের বাঁকে॥
দিনের সূর্য লাগায় গুম্ফে চাড়া
পিলে চমকানো ডাকে॥

কীযে আসুরিক দিনের কাব্যধারা
রোদের সাহারা বুকে।
রুক্ষপথের চোখা চোখা দাঁত
পায়ে পায়ে যেন চালায় করাত
বেকার জীবনে ভাগ্য বরাত
শ্বাস টানে ধুঁকে ধুঁকে।
আশাবাদী মন তবুও আকুলপারা
মুক্তির ধুলো শুঁকে॥

জোনাকীর আলো রাতের অন্ধকারে
স্বপ্নের বনভূমি
রোমাঞ্চকর ঝিল্লির ঝঙ্কারে
খুঁজে মরে কোথা তুমি?
কোথা তুমি কোথা তোমার ঠিক-ঠিকানা
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী রাতে কানা
খঞ্জকে তাই হাতছানি দেয় খানা
কোথা তুমি? কোথা তুমি?
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়েনাকো চীৎকারে
আহত ললাট চুমি'॥

থার্মোমিটারে রজতবর্ণ পারা
থরো থরো সন্তাপে
কাঁপুনী ধরায় হাড়ের শুকনো কান্না
ভেঙে পড়ে অভিশাপে।
ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা ভাঙা খাটিয়ার বুকে
ভুল বকে যায় কবিতা সকৌতুকে
শিথিল ছন্দ নিষ্ফল মনোদুখে
স্মৃতির আঁধারে কাঁপে
ক্ষুধিত পাষাণ রাতের কাব্যধারা
স্বপ্নের অভিশাপে॥

গাটের পয়সা খরচ করে পাঠাবে না। নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ।

টেলিগ্রামে খবর এসেছে আমার শাশুড়ী মারা গেছেন। খবর শুনে গিন্নী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। উঃ সে কি কান্না। কাছে গিয়ে যে একটু সান্ত্বনা দেব সে ভরসাও হচ্ছিল না। মিস্ মল্লিকও রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। কি যে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। আমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া না করে যেতেও পারছিলেন না, অথচ ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে ঝগড়া চালিয়ে যেতেও ভদ্রতায় আটকাচ্ছিল। টেলিগ্রামটা সময় মত এসে পড়ায় আমাকে যেন একটু দম ফেলবার ফুরসত দিল। গিন্নীর কান্নাটা যদি চট্ করে থেমে না যায় তা'হলে সে দিনকার মত নিশ্চিন্ত হতে পারি।

পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। আবার না জানি কি নতুন ল্যাঠা জুটল। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুন সে দিন। সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ চিত্তে কম্পিত হস্তে দরজা খুলে দিলুম। আমাদের বাসার তিনতলার ভাড়াটে নীরেনবাবু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে নরেনদা, কি ব্যাপার বলুন ত? সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যেতে যেতে বৌদির কান্না শুনতে পেলুম।

নীরেনবাবুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে যাচ্ছি, এমন সময় তিনি মিস্ মল্লিককে দেখে বলে উঠলেন, আরে, মিস্ সুধারাণী যে, হঠাৎ এখানে কি মনে করে? দেওঘর থেকে কবে এলেন? নরেনদা একে চেনেন না কি?

আমি বললুম, চিনি না আবার, হাড়ে হাড়ে চিনেছি! ওঁর মুখ থেকেই শুনুন না কত কালের পরিচয় আমাদের।

সুধারাণী ভয়ানক উস্‌খুস্ করতে লাগলেন। একবার আমার মুখের দিকে, একবার নীরেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি তবে নরেনবাবু, তবে যে দরজায় নেম-প্লেট দেখলুম মিঃ এন সেন। আপনি কি এখানে থাকেন না মিঃ সেন?

নীরেনবাবু বললেন, আমি ত এই বাড়ীতেই থাকি, তিনতলায়। উনি নরেন্দ্রনাথ সেন, কমাস হল এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু আমি ত আপনাকে একটা স্লিপে আমার নাম-ঠিকানার মধ্যে স্পষ্ট করে 'সেকেণ্ড ফ্লোর' লিখে দিয়েছিলুম।

সুধারাণী বললেন, আমি তাড়াহুড়োতে সেকেণ্ড ফ্লোর মানে দোতলা মনে করেছিলুম, তারও পর দরজায় নেম-প্লেট দেখে সোজা ঘরে ঢুকেছি। ছি, ছি, কি কেলেঙ্কারী কাণ্ডটাই না হল। ওঁর চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার এত তফাত সত্ত্বেও আমি কিছুতেই নিজের ভুল ধরতে পারিনি। তার ওপর মিসেস্ সেনের সঙ্গেও আমি অভদ্র ব্যবহার করেছি।

নীরেনবাবু আমার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা শুনে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন—তারপর বললেন, টেলিগ্রামটা ঠিক দেখে নিয়েছেন ত। আমার শাশুড়ীর শরীর ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না।

মনে হল হয়ত বা এও উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়েছে। টেলিগ্রামটা নীরেনবাবুর হাতে এগিয়ে দিলুম। তিনি গম্ভীরভাবে সেটাকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এটা পাঠিয়েছে বলরাম, পাটনা থেকে আমার ভায়রাভাই। আমার স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে আমার শাশুড়ী পাটনায় বাস করছিলেন। অথচ নরেনদা একবার তাকিয়ে দেখলেন না যে, এটা কে পাঠাল, কোত্থেকে এল। মাঝখান থেকে বৌদি কেঁদে-কেটে সারা হলেন।

গিন্নীর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। বাইরেও বৃষ্টি থেমে গিয়ে জোৎস্না বেরিয়েছে। নীরেনবাবু বললেন, ফ্ল্যাট্-বাড়ীতে নামের বা চেহারার একটু-আধটু মিল থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু তার পরিণাম যদি এই রকম ভয়াবহ হয়, তাহলে একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। আমি বলি কি আপনার দরজার নেম-প্লেটটা তুলে আপনার পুরো নাম যুক্ত নেম-প্লেট বসিয়ে দিন। আর আমি এন সেন বলে গায়ক হিসেবে পরিচিত; সুতরাং সংক্ষিপ্ত নামটা আমিই রাখি।

নীরেনবাবু যে একজন সুগায়ক, তা এ বাড়ীতে এসেই আমি শুনেছিলুম, অথচ মিস্ মল্লিক যখন বলেছিলেন যে, আমি তাঁকে গান শুনিয়েছিলুম, তখন নীরেনবাবুর কথা একবার খেয়ালও হয়নি। যাকু নামের ফ্যাসাদটা দূর হল। এখন চেহারার মধ্যে যে টুকের সাদৃশ্য রয়েছে, তার একটা বিহিত করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। গিন্নী আমার সমস্যার সহজ সমাধান করে দিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, তোমার মাথায় বাকি যেটুকু চুল আছে, ন্যাড়া করে ফেল।

আমি বললুম, হ্যাঁ, লোকে ঘোল ঢালুক আর কি?

আহা, তবু এই মাটি।
        আজো আমি যেখানেই হাঁটি
কাঁকরের রুক্ষপথে,
        বনপ্রান্তে, উন্মুক্ত প্রান্তরে—
মসৃণ সবুজ ঘাসে,
        কর্দমাক্ত মাঠের উপরে,
সর্বত্র আমাকে ডাকে
        নিরুচ্চার স্বদেশের মাটি
কী অদৃশ্য আকর্ষণে,—
        এমন কি দুর্ভিক্ষ মড়কে
যখন উধাও মেঘ,
        মাঠে-মাঠে শুধু হাহাকার,
স্বদেশে মানুষ কমে,
        বিষাক্ত এ-রিক্ত সংসার—
দাঁড়াই মাটির টানে
        জনহীন ধূসর সড়কে।

আজো গ্রাম পুড়ে' খাক,
        সবুজের যতো সম্ভাবনা
উধাও অনেক কাল,
        অযুত লোকের দীর্ণ প্রাণ
নিরালম্ব উপবাসী,—
        সঞ্জীবনী নিভৃত চেতনা
মাটির গভীর থেকে
        আনে তবু অদম্য আহ্বান
সদ্যোজাত নবাঙ্কুরে,—
        রৌদ্রে জলে মৃত্তিকার ঘ্রাণে
আপ্লুত আকাশ, মাঠ;
        হৃতশক্তি ফিরে আসে প্রাণে।

চিনির মতন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

নুন—নুন —
জীবনের আস্বাদ করুণ;
তবু যদি কোনোখানে কিছু চিনি থাকে—
চামচ খানিক নয় দিলেই আমাকে!

চামচ খানিক শাদা চিনি:
শাদা—সেও নুনেরি মতন,
চিনি তারে, তবু যেন কখনো চাখিনি—
সে বুঝি আরেক আয়োজন!

চোখের জলের মত, সাগরেরো জলে চোখা নুন—
তবু সে সাজিয়ে রাখে স্বপনের সোনালী লেগুন
নাবিকের ক্লান্ত দু'নয়নে;
যেখানে নিমেষগুলি মুক্তারা একা-একা গোণে
নিরিবিলি সারাবেলা ধ'রে—
বেদানা-দানার মত লাল-লাল প্রবাল পাথরে।

মহাসাগরের মত সুবিপুল এ মহানগরে—
এখানের খর, তপ্ত, লোনা ফুটপাতে
যতই খুঁজি না তাই দিনে কিংবা রাতে
জানি ত' মেলে না সেই সাগরের অরূপ রতন;
চামচ খানিক তবু ঝকঝকে চিনির মতন—
কেউ কি পারো না দিতে নুনটুকু মুছে
একটি মধুরতর চিনিমাখা মন!

ধৈর্যহীনা

ম্যাজিস্ট্রেট: "আপনি আপনার স্বামীকে মেরেছেন একথা কি সত্য?"

অভিযুক্তা স্ত্রী: "সত্য। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'তুমি কি আমাকে আজীবন ভালবাসবে?' কিন্তু এ-কথার জবাব দিতে সে এত দেরি করছিল যে, আমি না মেরে থাকতে পারিনি। আমি নারী (চোখ মুছে)—আর ভালবাসা ভিন্ন নারীর জীবন যে একেবারে মরুভূমি।"

যে দীপ জ্বলেনা

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

নিঃশ্বাস ফেলারও অবসর নেই শান্তনুর।

শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় রেল-গাড়ীর যে বিজয় অভিযান সুরু হয়েছিল—তারই কীর্তি ঘোষণায় দিল্লী মহানগরীতে যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যের জোয়ার লেগেছে।

সে এলাহি কাণ্ড কারখানা—সাজো সাজো রব. শতাব্দী স্মরণের বেদ্ ঘোষিত হয়ে যেন স্মারকচিহ্ন হয়ে উঠেছে প্রদর্শনীর বিন্যাসে পটভূমিকায়, কারুকার্য, রাজধানী ছাড়িয়ে বড় বড় রেল-কারখানাগুলি তারই মডেল নির্মাণ কার্যে অশ্রান্ত হয়ে উঠেছে।

শান্তনুর নিঃশ্বাস ফেলবারও অবসর নেই। ওদের কারখানা পাঠাবে কেষ্টনগর ষ্টেশন মডেল—আঠারো নম্বর শপে মডেল নির্মাণকার্য শেষ হয়ে এল—নিখুঁত নিপুণ মডেল। এবার উনিশ নম্বরে পেন্টারদের রং করবার পালা।

পেন্টার শান্তনু কেষ্টনগর ষ্টেশনে রং করছে,—মনের রংটুকুও যেন উজাড় করে মডেলকে জীবন্ত করে তুলছে—, কেষ্টনগর ষ্টেশন এবার ফেমাস না হয়ে পারবে না।

কত শ্রম, কত সাধনা, কত অর্থ কত সময়ের অকুণ্ঠ অবদান. কেষ্টনগর ষ্টেশন মডেল এবার একটা পুরস্কার অর্জন করবেই—ফিটার. পেন্টার টার্ণারদের চোখের তারায় আশার বিদ্যুৎ—, আঠারো নম্বর শপের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ফোরম্যানের চাপা ঠোঁটে স্রষ্টার আনন্দ।

শান্তনু এই মাত্র নিজের কোয়ার্টারে ফিরেছে—, পায়রার খোপের মত দু'খানা ঘর. সামনের ঘরটায় তক্তপোষের উপর ও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে—পেন্টারের হাতে তখনও রঙের আঘ্রাণ, মনে রঙের আমেজ। হপ্তাখানেকের মধ্যে রাজধানী মহানগরীতে মডেল পাঠাতে হবে। ওভার-টাইম ডিউটি না করলে শেষ করা যাবে না, আবার এখন রান্না করে খেতে হবে।

বছর ত্রিশেক বয়স শান্তনুর, বিয়ে করবার এখনও সাহস হয়নি—, একটা মানুষকে সহজেই জানানো যায়—, তারপরের কথা ভেবেই আবার পিছিয়ে আসতে হয়।

বিধবা দিদি ওর সংসার তদারক করেন।

বিধবা মানুষ, ঝাড়া হাত-পা, সব দৌড়ঝাঁপ সেই হাল ধরে বেড়াতে হয়। মাস-দুই আগে হাজারিবাগে বড়দা নিয়ে গিয়েছেন—, বউদির আবার ছেলে হয়েছে—, দিদি আঁতুড় তুলছেন।

না—শান্তনু আর রান্না করে খেতে পারে না—, মডেল ওকে শেষ করতে হবে—, দিদিকে ফেরবার তাগাদা জানিয়ে ও একখানা চিঠি লিখেছিল।

আজ দিদির চিঠির উত্তর এসেছে।

শান্তনু দিদির চিঠি পড়ছে।

"খোকা—বউর আঁতুড় তো এখানে শেষ হয়েছে—, এখন আমি অনায়াসে ফিরতে পারি—কিন্তু তোকে লিখতে লজ্জা করছে মন্টুর কাছে আমি গাড়ী ভাড়া চাইতে পারছি না।

কী করে চাই তুই বল? অভ্রের কারখানায় কাজ করে যা মাইনে পায়—এতগুলি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বড় কষ্টে সংসার চলে।

সে ভাবছে হয়তো তুই টাকা পাঠাবি। [illegible] উদ্বৃত্ত রেলের ভাড়া কেন কমে না বলতো? কেবলই তো বাড়ছে। আমরা সাধারণ মানুষ কী রেলগাড়ীতে চড়বো না?"

চিঠি পড়া শেষ হয়নি—শান্তনুর—, বারান্দায় যেন কার পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলো দিদি এই দিকেই আসছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার আবছা হয়ে আসছে।

"দিদি তুমি এসেছ? বাঁচালে—"

কিন্তু ঘরে যে ঢুকলো তার দিকে তাকিয়ে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো. চৌকীর পাশে টেবিলেই ল্যাম্পটি ছিল. আলো জ্বালতে বালিশের তলায় দেশলাই খুঁজতে লাগলো।

কৃষ্ণা ততক্ষণে একখানা চেয়ারে উপবেশন করেছে।

কৃষ্ণা ওর বউদির অনুজা।

দেশলাইর বাক্সটা ভিজে ছিল. হয়তো কাঠিতে বারুদ ছিল না—বেশ খানিকটা পরেই আলো জ্বললো—, অকেজো কাঠিগুলো বাইরে ফেলে দিতে দিতে শান্তনু বললো—'কৃষ্ণা তুমি এখানে? বউদির চিঠিতে জেনেছিলুম—তোমরা দেশ থেকে এসে ক্যাম্পেই আছো—"

কৃষ্ণা হাসলো। বছর কুড়ি ওর বয়স। রূপের ঐশ্বর্য ওর নেই—, শান্ত কমনীয়তায় চেহারাটা মিষ্টি দেখাচ্ছে—হাসিটা আরও সুন্দর. বললো—"ক্যাম্প থেকে কলোনীতে আমরা প্রমোশন পেয়েছি। মা মারা গেলেন—, বাবার হার্টের অসুখ—ভাই-বোনগুলোকে মানুষ করতে হবে—আমি প্রকিওরমেন্টে চাকরী নিয়েছি—"

"খুব চাল ধরছ তাহলে—"? শান্তনু একটু হাসলো—"শুধু চুনোপুঁটি, না রুই-কাতলাও জালে পড়ছে কিছু—"

"রুই কাতলা আর ধরতে পারি কই [illegible]"—কৃষ্ণা বললে—"চুনোপুঁটি [illegible]

চাকরীতে উন্নতি করে ফেললুম—, তাইতো এ লাইনে বদলি করলো—"

"হ্যাঁ এদিক থেকে চাল খুব বাইরে চলে যাচ্ছে—" শান্তনু এবার স্টোভ ধরাতে মেঝেয় নেমে বসে বললো— "তোমার জন্যে একটু চা করি—, ওই উঠোনে কলঘর—, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস। দিদি আবার নেই কিনা—তোমাকে নিজে সব দেখে শুনে নিতে হবে—"

"তোমার দিদি এখানে নেই শান্তুদা"—কৃষ্ণার চোখে-মুখে একটা অসহায়ের ভাব ফুটে উঠেছে—"আমাকে এখানে যখন বদলি করলো—বেশ আত্মীয়-স্বজনের কাছে থাকতে পাবো জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম—"

"এখন উদ্বিগ্নই বা হচ্ছো কেন তুমি?" মৃদু হেসে শান্তনু বললো—"দিদি দাদার ওখানে আঁতুড় তুলতে গিয়েছে—, কালই আমি টাকা পাঠাচ্ছি—দিন-তিনেকের মধ্যে চলে আসবে—" এবার শান্তনুর গলায় কৌতুকের সুর—, দৃষ্টিতে কৌতুকের চপলতা—"লেডি পেট্রোলার হয়েছ—পুরুষ-মানুষকে জুজুর ভয়টা ঘুচলো না—

"বাক্স বিছানা ঘরে তুলে আটপৌরে কাপড়, গামছা বের করতে করতে কৃষ্ণা বললো—"আহা তোমরাই তো আবার প্রচার করে বেড়াও—মেয়েরা পুরুষকে আত্মসমর্পণ করতে যেন একেবারে কাঙাল—"

"তোমরা বোঝ না কেন—" শান্তনু বললো—"ওটা সহজে হাততালি পাবার কৌশল—"

বাথরুম থেকে ফিরে কৃষ্ণা দেখলো—স্টোভে চা-এর জল ফুটছে—, শান্তনু ঘরে নেই। হয়তো খাবার কিনতে দোকানে গিয়েছে।

এবার কৃষ্ণা তাকিয়ে তাকিয়ে সারা ঘর-খানার দিকে দেখছে।

না—শিল্পী শান্তনুর এখনও মৃত্যু ঘটে-নি—, ছোটবেলায় কী সুন্দর ছবি সে আঁকতো—, মূর্তি গড়তো—, কত সার্টিফিকেট আর পুরস্কার না পেয়েছিল। দেওয়ালের গায়ে গায়ে শিল্পীর সে প্রতিভা মূর্ত হয়ে রয়েছে। বন্যার ছবিটা কী চমৎকার—, ধান ভেসে গেছে জলে, চাষী করুণ-নয়নে তাকিয়ে রয়েছে।

মুগ্ধ কৃষ্ণা অপলক দৃষ্টিতে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

খাবার কিনে ফিরে এল শান্তনু। ব্যর্থ শিল্পীর পরাজয়ের গ্লানি ওর অপ্রতিভ দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে—"দাদা অনেক কষ্টে বছর তিনেক আর্ট ইস্কুলের মাইনে দিয়েছিলেন—" খাবারের ঠোঙারটা টেবলে রেখে একটা নিঃশ্বাস ফেললো শান্তনু— "ভেবেছিলুম সৌখীন কলা চর্চা না করতে পারি—কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হবো—, বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে আমার বেশ ভালো লাগে—"

"তার চেয়ে সুন্দর শান্তুদা"—কৃষ্ণা ওর ক্ষোভ ও দুঃখ মুছে দিতে বললো—"তুমি গাড়ীতে রং কর—, কতদূর দূরান্তর সে গাড়ী যায়—, কত মানুষ সে গাড়ীতে চড়ে—"

রাত ডিউটির ডঙ্ক দিয়ে কারখানার বাঁশী বেজে ওঠে—, কান্নার গোঙানী যেন কাঁপে একটানা—কৃষ্ণার কথা আর শোনা যায় না—, কৃষ্ণা থামে।

দ্রুত হাতে হিঙের কচুরী আর আলুচচ্চড়ি ভাগ করে নিতে নিতে শান্তনু বলে—"আমার ওভার-টাইম ডিউটি সুরু হোল—, এবার যেতে হবে, দিল্লী প্রদর্শনীতে কেষ্টনগর ষ্টেশন মডেল পাঠানো হচ্ছে কিনা—" গলায় কচুরী আটকে ছিল—কয়েক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার ও বললো—"আমাদের মডেল এবার একটা পুরস্কার পাবেই—, আমাদের লেখাপড়া জানা পেণ্টারদের—ড্রাফটসম্যান করে দেবে হয়তো—"

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কৃষ্ণা বললো—"বাঃ কী সুন্দর—তুমি তখন রেল লাইন আর রেল পথের ছবি আঁকবে—"

আশার উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠলো শান্তনুর চোখের তারায়—, ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে ও বললো—"ভালো করে দরজা বন্ধ করে তুমি ওই পাশের ঘরে শুয়ে পড়—, ওটা দিদির ঘর—, আমার ফিরতে অনেক রাত হবে।"

চা আর তৈরী হয়নি, স্টোভে জল ফুটছিল—, কৃষ্ণা এবার নিভিয়ে দিল।

* * * *

কয়েকদিন পরে দিদি ফিরলেন শুধু নয়—, এমন সুযোগ আর হাতছাড়া করতে চাইলেন না, ভাইটির সাথে কৃষ্ণাকে বেঁধে দিতে একাগ্র হয়ে উঠলেন। "সংসারের ঘানি টানতে আমি আর পারিনে বাপু, একটু তীর্থ-ধর্ম করতেও তো সাধ যায়" —ঘন ঘন তিনি অনুযোগ জানাতে লাগলেন। শান্তনু আপত্তি জানায়নি—, আপত্তি জানালো কৃষ্ণা—"সে হয়না দিদি, দাদা যুদ্ধ থেকে আর ফিরলো না যখন—বাবার মন ভেঙে গেল, কর্মশক্তি পঙ্গু হয়ে গেল—আমি সংসারের হাল ধরে রয়েছি—ছোট ছোট ভাই-বোন—"

"তা বলে সোমত্ত বয়সের মেয়ে বিয়ে করবে না—" দিদির কণ্ঠে মান্ধাতা আমলের সংস্কার ঝংকার দিয়ে উঠলো।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো কৃষ্ণা—কী মিষ্টি চেহারা ওর—, রংটা শ্যামল—, কমনীয়তা আর লাবণ্য যেন চোখে মুখে উপচে পড়ছে।

"সেদিন আর নেই দিদি—" ও বললো—"আগে বাঁচা তারপরে বিয়ে, নীড় বাঁধা—"

এই সময় শান্তনু ঘরে এসে ঢুকলো। খুশীর জোয়ার নেমেছে ওর কণ্ঠে—"তুমি এবার দেখো দিদি কেষ্টনগর ষ্টেশন এবার একটা প্রাইজ পাবেই—"

"তাতে তোর কি হবে?" দিদির কণ্ঠে শ্লেষের ব্যঞ্জনা—"তুই তো এই পায়রার খোপে বাস করবি—শেষ মাসে আঙুটি বাঁধা রাখবি—, বিজয়ার মিষ্টি মুখ করাতে কাবুলির কাছে দেনা করবি—"

"না—না তুমি দেখে নিও দিদি—" শান্তনুর কণ্ঠে আরও আশ্বাস জাগে, "আমরা পেণ্টার টার্ণার ফিটাররা একটা মর্যাদা পাবোই—এত শ্রম, এত অর্থ, এত সময়ের ব্যয় তা'হলে সব যে ব্যর্থ হয়ে যাবে—"

তখন পিওন জানালা দিয়ে কৃষ্ণাকে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণার বাবার চিঠি। কৃষ্ণা পড়ছে—

"মা কৃষ্ণা—

তুমি শান্তনুর ওখানে নিরাপদে আছ জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আহ্বান

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিকেলে দেখেছি মেঘ বিদ্যুতের চতুর হাসিও
তারপর অন্ধকার, ঝোড়ো রাত, ফাঁকা ক্ষেত
স্তব্ধ অনাত্মীয়।
নিজের হৃদয়ধ্বনি শোনবার মতো অবসর
পেলুম কখনো।—মন নিঝুম পাথর।
ভয়ংকর নির্জনতা : কান পেতে থাকি
সহস্র মৃতের ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ আত্মা কি
দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘোরে দীর্ঘ দিনযামী?
মুহূর্তের ঝুমঝুমি
ঘুম পাড়াবার
মন্ত্র নিয়ে আসে।—দূরে ঝিঁঝিঁ'র দরবার
যখন জোরালো হয়ে অন্ধকারে জেগে-জেগে ওঠে
বিকেলের ঝড়ে মেঘে বিদ্যুতেও যেন ফুল ফোটে
কিংবা কোনো বাঁকা এক ঠোঁটে
—তখন আহ্বানে কোন ম্লান মন
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে?

এখান থেকে তোমাকে বদলি করে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। তুমি চাকরীও করতে—রান্না-বান্নাও করতে—খুকিটা আর একটু বড় হলে সামলে নিতে পারবে। মাইনে কী এখনও পাওনি? যা টাকা, ডাল কিনে দিয়ে গেছলে, তাইতে চলছে—বাজার আর হয় না—"

চিঠি পড়বার আর উৎসাহ ছিল না কৃষ্ণার—এখুনি একবার অফিসে যেতে হবে—, বড়-বাবুর সঙ্গে দেখা করে মাইনেটা নিতে হবে। ও পাশের ঘরে কাপড় বদলাতে চলে গেল।

তখনও শান্তনুর কণ্ঠে কেষ্টনগর স্টেশন মডেলের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত—, স্রষ্টার সৃষ্টির আনন্দ, শিল্পীর ধ্যানের আনন্দ—সে উচ্ছ্বাসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে—, মুখর হয়ে উঠছে।

* * * *

কেষ্টনগর স্টেশন মডেল পুরস্কার পায়নি।

"বারোদা—যোধপুরের সব [illegible] দের পাশে কেষ্টনগর—" অবজ্ঞার সঙ্গে দিদি ভ্রূ-কুঞ্চন করলেন।

"না দিদি তা নয়—" উদাস আগ্রহে শান্তনু বুঝিয়েছে দিদিকে—"কেষ্টনগর স্টেশন মডেল নিখুঁত হয়েছিল, বৈদ্যুতিক বাতি সব ব্যর্থ করে দিয়েছে নিষ্প্রভ আলো—, জৌলুস খুলতে পারেনি কেষ্টনগরের—"

এবার আস্তে আস্তে পেণ্টার শান্তনু বলেছিল "দীপ নিভে গেছে—" ও গুন গুন করে গেয়ে উঠেছিল "হঠাৎ আলো জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে"। এরপর একটা রাত্রি অতিক্রম করলো—আর একটা সকাল এল—, তবু কৃষ্ণার মন থেকে এ গানের সুর যেন মুছে যেতে চায় না।

ওর স্মৃতিমূলে তার পরের কলিটাও অনুকরণ তোলে—"আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে—"

কৃষ্ণা ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মের লোহার বেঞ্চে বসে রয়েছে। লেডি পেট্রোলার কৃষ্ণা—, ট্রেন থামবে প্ল্যাটফর্মে—, ও মহিলা কামরায় উঠে বে-আইনী চাল নামিয়ে নেবে—মেয়ে চোরা-কারবারীদের গ্রেপ্তার করবে।

(ইহার পর ২২১ পৃষ্ঠায়)

গাড়ি একচুল নড়েছে কি নড়েনি, কে যেন কোথায় ওৎ পেতে ছিল এতক্ষণ, নৌকা বুকে চীৎকার করে বললে—"পুষ্করজী-জী কী জয়!" আর অমনি কামরা ফাটানো আওয়াজ উঠল—"পুষ্করজী-জী কী জয়!" দরজার কাছে চাপাচাপি গাদাগাদির মধ্যে যারা কাজিয়া লাগিয়েছিল, ক্ষণকালের জন্য তারা ঝগড়া মুলতুবী রাখলে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বাঙ্কের ওপর সামান সামলাতে যারা ব্যস্ত ছিল অথবা বেঞ্চির নীচে লাঠিঠেঙা গোঁজাচ্ছিল যে লোকগুলি, আশু-কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে তারাও সে আওয়াজে যোগ দিলে। সামনের পেছনের আরও কম্পার্টমেন্ট থেকে সহস্র কণ্ঠে একই বোল উচ্চারিত হচ্ছে। লটবহর নিয়ে যারা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তাদেরও চীৎকারের বিরাম নেই। গাড়িতে উঠতে পারেনি বলে কি নাম-কীর্তনে যোগ দেবে না? মহাপাতক হবে যে! যেন অজ্ঞাত কণ্ঠ-নিঃসৃত দৈববাণী; কানে এসে পৌঁছলে সাড়া দিতে উঠতেই হবে। কামরার ভেতরে তিলধারণের জায়গা নেই। কে শোনে সে কথা। দরজা-জানালা দিয়ে তখনও সমানে পোঁটলাপুঁটলি বর্ষিত হচ্ছে, আর যে কৌশলে ও ক্ষিপ্রতায় তাদের মালিকেরা ভেতরে গলিয়ে প্রবেশ করছে তা স্বচক্ষে দেখলে ডারউইন সাহেবকে তাঁর থিয়োরী প্রকাশ করবার আগে হয়ত বহু-বর্ষকাল প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে হত না। দুই মোটা থামে বসানো লোহার জংশন লেখা সাইনবোর্ডটা পার হয়ে গেলে জয়জয়কার ক্রমশ থেমে এল। গাদাগাদি জনতা থিতিয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল এইবার।

আমার কোলে একটা এটাচিকেস ছুঁড়ে দিয়ে যে ছোকরা জানালা দিয়ে অর্ধেক মাত্র গলিয়েছিল, এবার সে অতিকষ্টে ভেতরে নেমে দাঁড়ালে। বেঞ্চের ওপরে তিনজনের জায়গায় বসেছে পাঁচজন আর মেঝেতে যে বসেছে কত তার লেখাজোখা নেই। ছোকরাকে একটু জায়গা করে দিতেই সে পকেট থেকে সস্তা সিগারেটের প্যাকেট বার করে ফেললে। জয়পুর কলেজে পড়ে মনোহরলাল; সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। পুষ্করতীর্থে চলেছে তার মায়ের চিতাভস্ম সেখানে বিসর্জন দেবে বলে। গত মাসে এই রকম সময়ে তার মা স্বর্গারোহণ করেছেন। ঐ এটাচির মধ্যে আছে তার দু'একখানা জামাকাপড় আর একটি তামার পাত্রে তার জননীর দেহাবশেষ। হাতের সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে; উদাস দৃষ্টিতে **মনোহরলাল তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে।** পড়ন্ত আলোয় তার দুই চোখের কোণ চিকচিক করছে দেখলুম।

বেঞ্চিতে আমার অন্যপাশে বসেছে তিন জোয়ান রাজপুত; মাথায় তাদের বিরাট পাগড়ি, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ আর কানে পেতলের সরু আংঠা। তারা চলেছে তাকতদার বলদ কিনতে। কি অসুখ হল কে জানে, তাদের অনেকগুলি বলদ এক সঙ্গে মারা গিয়েছে সম্প্রতি। বাবু ভেইয়ার যেমন জরু, কিষাণের তেমনি গরু—এক লহমা না হলে চলে না, বললে এক জোয়ান আর এ রসিকতায় তার দুই ব্রাদারেরও কৃষ্ণ দন্তপংক্তি বিকশিত হতে দেখলুম। প্রধানত ধর্মউৎসব হলেও, প্রতি বছর কার্তিকী পূর্ণিমার সময় পুষ্করে যে কয়েকদিন ধরে বিরাট মেলা বসে তাতে গরু, ঘোড়া ও উটের আমদানী হয় প্রচুর। উত্তর-ভারতে শুধু হরিহরছত্রের মেলা ছাড়া গৃহপালিত পশু কেনাবেচার এত বড় হাট আর কোথাও বসে না। হাতের থাবায় খৈনী টেপা চলছিল এতক্ষণ আর আলাপ [illegible] আমার সঙ্গে। তিন জোয়ান এবার তৈরী [illegible] সমান ভাগ করে নিয়ে জিভের তলায় ফেলে চুপ করে গেল।

দুই বেঞ্চের মাঝখানে গাঁঠরির ওপর বসে আছে এক প্রৌঢ় ও সম্ভবত তার স্ত্রী, এক প্রৌঢ়া। মাঝে মাঝে যখন হাঁটু থেকে মাথা তুলে লোকটি সামনে তাকাচ্ছে তখন সেই অনির্দিষ্ট চাহনি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, দৃষ্টিশক্তি সে হারিয়েছে বহুদিন। বিকানীরের দিকে দূরে দেহাতে তাদের বাস। পুষ্করজীর মাহাত্ম্যের কথা তারা শুনেছে অনেকদিনই। এতদিন বার হতে পারেনি, কোনো রকমে দিন গুজরাণ হয়ে যাচ্ছিল বলে। আঁচলে চোখ মুছে প্রৌঢ়া বললে, জোয়ান বেটাটা আমার যে মারা যাবে এ কি কোনোদিন ভেবেছি বাবু! এখন তার বাপের চোখেও যদি দিশার থাকে তবে দুবেলা দুমুঠো জুটবে কোত্থেকে? এই ত গত বছরেই পুরানা গাঁয়ের পাশে যে গাঁও সেখানকার এক

রঙ্গজীর মন্দির ঃ পুষ্কর
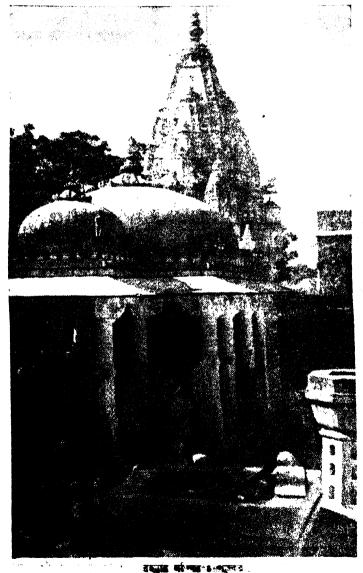
আকাট অন্ধ কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে পুষ্করজীতে স্নান করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। সে এখন দিব্যি জমিজিরেত দেখছে, চাষবাস করছে। কৃপা করলে পুষ্করজী কী না করতে পারেন। ময়লা কাপড়ের খুঁটে বৃদ্ধা বার-বার চোখ মুছতে লাগল: অনুচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধ শুধু বললে, "পুষ্করজী-কী-জয়।"

সামনের বেঞ্চের এককোণে একগলা ঘোমটা টেনে একটি অল্পবয়সী বউ: কোলে বছরখানেকের একটি শিশু। শিশুটিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি; বোধ করি আঁচলের আড়ালে মার কাছে খাচ্ছিল। এবার তার দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেলুম। কে যেন কচি মাথাটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গিয়েছে; বড় বড় বিকৃত চোখে অসহায় দৃষ্টি: কষ বয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। বউটির পাশে যে লোকটি বেঞ্চির ওপর পা তুলে নির্লিপ্তভাবে বিড়ি খাচ্ছে সেই হয়ত তার স্বামী। জিজ্ঞাসা না করেও বুঝলুম এই অসুখী দম্পতী পুষ্করে চলেছে তাদের হতভাগ্য সন্তানের আরোগ্য কামনায়। দিব্যকান্তি হয় নাকি পুষ্কর হ্রদে স্নান করলে। এ অঘটন পুরাকালে বারংবার ঘটেছে বলে কত কিংবদন্তী এ অঞ্চলে প্রচলিত। এখনও লোকমুখে অলৌকিক আরোগ্য সংবাদের বিরাম নেই। মহাশক্তিশালী পুষ্কর তাদের এই সামান্য অভিলাষটুকু কি পূর্ণ করবেন না? নিষ্পাপ, অসহায় একটি শিশুকে কি বাঁচতে দেবেন না সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে?

হয়ত দেবেন, হয়ত দেবেন না—ঠিক জানিনে। বিশ্বাসে নাকি পাহাড় টলে, পাষাণ গলে। সঠিক যেটুকু জানি তা হল পুষ্কর হ্রদের জল গাঢ় নীল। প্রতিদিন প্রতি বর্ষমাসে লক্ষ কোটি লোকের বেদনায় সিক্ত যে জল তার আর অন্য কি রঙ হবে!......

* * *

আজমীঢ় স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল রাত নটায়। [illegible] চেনা হোটেল আছে বাজারের কাছে। সেখানেই দুজনে ঠাঁই নিলুম রাতটুকুর মত। কাল ভোরে উঠে সাত মাইল দূরে পুষ্করের দিকে রওনা হতে হবে।

কার্তিকী পূর্ণিমার পরবের দিনে, আনা সাগরের পাশ দিয়ে, একটি নীচু পাহাড় ডিঙিয়ে এই সাত মাইল [illegible] পথের সম্যক বর্ণনা দিতে পারি এমন শক্তি আমার কলমের নেই। [illegible] কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধবনিতা চলেছে পুষ্কর অভিমুখে। গরুর গাড়ি, টাঙ্গা, এক্কা, ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করছে মোটর বাস আর প্রাইভেট কার। সড়কের ওপরে, দুপাশে, বাইরের মাঠের পাশে চলা পথ ধরে [illegible] রাজপুতানা আজ চলেছে পুষ্কর হ্রদ আর ব্রহ্মার মন্দিরের দিকে। [illegible] রাজপুতানা। [illegible] এই সম্ভবত সর্ববৃহৎ মেলা। [illegible] হিন্দুমাত্রেরই [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] কে না [illegible] পারেন।

পুষ্কর মেলায় রাজপুত তরুণী

সে মহাযজ্ঞের কিংবদন্তী সুবিদিত। ব্রহ্মার নামের সঙ্গে জড়িত। মর্ত্যধামে ব্রহ্মার কোনো মন্দির নেই। [illegible] যজ্ঞ দেখতে গিয়ে [illegible] তিনি মহাসমস্যায় পড়লেন। [illegible] অন্যমনস্কভাবে তাঁর করধৃত পদ্মফুলটি স্খলিত হয়ে ধরাপৃষ্ঠে পড়ল আর অমনি সে আঘাতে এক জলাশয়ের সৃষ্টি হল সেখানে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিহত হয়ে পার্শ্ববর্তী আরও দুটি জায়গায় আঘাত করল স্বর্গীয় পুষ্পটি। সেখানেও ছোট ছোট দুটি হ্রদের জল টলটল করে উঠল। ব্রহ্মা মর্ত্যভূমিতে নেমে এলেন ও পুষ্পাঘাতে সৃষ্ট [illegible] জলাশয়গুলির নাম দিলেন পুষ্কর। স্থির হল, সর্ববৃহৎ হ্রদটির তীরে যজ্ঞ হবে। স্বর্গলোকের তাবৎ দেবতা পুষ্করতটে সমবেত হলেন। কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে যজ্ঞারম্ভের কথা। অমৃতভাণ্ড মস্তকে ধারণ করে ব্রহ্মা অপেক্ষা করে আছেন কিন্তু সাবিত্রীর দেখা নেই। দেবদূত পবন খবর নিয়ে এলেন, লক্ষ্মী, পার্বতী ও ইন্দ্রাণী সমভিব্যাহারে সাবিত্রী আসছেন, তবে কিছু দেরী হবে। অমৃতকলসী ব্রহ্মার বিলক্ষণ শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠল। তিনি ইন্দ্রকে আদেশ করলেন এই মুহূর্তে স্থানীয় জনপদ থেকে একটি স্ত্রী সংগ্রহ করে আনতে, তাকে বিবাহ করে যজ্ঞ আরম্ভ করবেন। ইন্দ্র কাছেপিঠে এক গুজারী-কন্যাকে আবিষ্কার করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর [illegible] যজ্ঞ বিধেয় নয়। ইন্দ্র তখন তাকে এক গাভীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় বার করে আনলেন। সমবেত দেবগণ একবাক্যে রায় দিলেন পবিত্রতায় গাভী এবং ব্রাহ্মণ সমান একই পর্যায়ের ও একনায় [illegible] যজ্ঞকর্মে এঁর সাহচর্য [illegible]। দেবসভার নির্দেশে গুজারী-কন্যার নাম হল গায়ত্রী। ব্রহ্মা তাঁকে বিবাহ করে [illegible] অমৃতকলসী তাঁর মস্তকে স্থাপন করে যজ্ঞ শুরু করলেন।

হিন্দু ও গ্রীক পুরাণে দেবগণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বেষ ও মাৎসর্যের যে সব [illegible] উল্লেখ আছে তাতে মনে হয় দেবলোকে মর্ত্যলোকের অভাব-অভিযোগগুলিই শুধু নেই, তাছাড়া আর সবই আছে। ব্রহ্মার যজ্ঞ বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই, শিবের প্ররোচনায়, এক উলঙ্গ ব্যক্তি যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূত হয়ে 'আহার', 'আহার' বলে চীৎকার জুড়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সে এক নরকপাল নিক্ষেপ করলে হোমকুণ্ডে। একটা

পশু মেলায় উটের দল

"উঃ —মাগো!"—

তিনু শিউরে ওঠে। শান দেওয়া অস্ত্রগুলো অদ্ভুত উজ্জ্বলতায় ঝক্ ঝক্ ক'রছে দীননাথের কাজের ঝুড়িতে।—এখনও সে আগুনে পুড়িয়ে লোহাগুলো লাল ক'রে চ'লেছে ঠিক ঐ আগুনেরই মত! উজ্জ্বল—লাল! ও যেন অস্ত্র নয়—জমাট্ করা মানুষের রক্ত!—তাজা রক্তের পিপাসা র'য়েছে ওর প্রতি কণায়। তাইতো তিনুর ভয় করে,—শিউরে ওঠে সে! মনে হয় ওরা যদি আবার জীবন্ত হ'য়ে ওঠে! ফেলে আসা ভিটের আগুনের মত সর্বগ্রাসের ক্ষুধায় যদি তাকে গ্রাস ক'রতে চায়?—তবে!......

কাজ ক'রতে ক'রতে একবার মুখ তোলে দীননাথ বলে—

—ঃ "দিনরাত অমন ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবিস কি, বলতো নতুন বৌ? কি-ই বা দেখিস অমন ক'রে?"—যাই ভাবুক,—তিনু তা স্বীকার করে না। একটু হাসে। চোখের পাতা দুটো নামিয়ে নেয় বড় জোর। বলে—

—ঃ কৈ,—কিছু না তো!

—ঃ "কিছুই নয়?"

দীননাথ বিস্মিত হয়। মনে পড়ে যায় আগের বৌয়ের কথা। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সে ছিল সচেতন, আর এ?......এ-যেন অধিকারকেই চায় এড়িয়ে চ'লতে, তাই মনের কথা প্রকাশে তার এত কুণ্ঠা! এত লজ্জা!

জীবন কাটাবার মত শুধু সঙ্কল্পহীন মন আর স্বাস্থ্যহীন যে দেহ নিয়ে সংসারে এসে সে দুই হাতে দীননাথকে আশ্রয় ক'রেছে,—তাকে আজ সব আপদ, সব বিপদ থেকে বাঁচবার দায়িত্ব দীননাথেরই, তাই তো সে আজ পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে,—গ্রামের মাটি ছেড়ে ঘর বেঁধেছে সীমান্ত শেষে। যেখানে সে তিনুকে নিয়ে স্বস্তিতে থাকতে পারবে। অন্ততঃ স্বীপুরের মানইজ্জতের ভয়ে দীননাথকে সশঙ্ক হ'য়ে থাকতে হবে না।

ঝন্-ঝন্—! ঝনন্-ঝন্......

সমস্ত বাইরেটা ডুবে গেছে রাতের অন্ধকারে,—ঘরের মধ্যে কেবল কেরোসিনের ল্যাম্পের আলোয়—এখনও লোহা পিটে চ'লেছে দীননাথ।......কাজ, আর কাজ! এ কাজের যেন বিরাম নেই! বিরাম নেই ঐ শব্দের; তাইতো ঘুম ভেঙে খোকা কেঁদে উঠছে বার বার......।

—ঃ "ওঙা, ওঙা, ওঙা—!"

ওকে বুকে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালো তিনু, ধীরে ধীরেই জানালে মনের ইচ্ছাটা—

—ঃ 'একটু ওষুধ-বিষুধ পেলে হয়তো কাঁদতো না—।" হাতের কাজের দিকেই নজর রেখে চড়া স্বরে দীননাথ জবাব দিলে—

—ঃ "দিনের বেলায় বলতে কি হয়েছিল? এখন এই রাতের বেলা,—তায় দু'-তিন মাইলের পরে মানুষের বসতি। তার পরেও এই রাত্তিরে ডাক্তার-বদ্যি কারো কথা শোনে কখনও?"

শুনুক, আর নাই শুনুক,—মনের যে আশঙ্কাটাকে সে এই কথার আড়াল ক'রে রাখলে, অনুমান ক'রলেও তিনু তা ব্যক্ত ক'রতে পারলে না।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে দীননাথ ব'লে চ'ললো—

—ঃ "কপাল! সবই কপাল। তা নইলে গাঁয়ের মধ্যে মোড়ল ব'লতে এক দীনু-কামার। সাতখানা গাঁয়ের লোক যাকে মানতো, চিনতো,—

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনেকে বলে যে আশায় বুক বেঁধেছিল? পুত্র-শোকাতুরার তুচ্ছ অভিলাষ কি পূর্ণ করেছেন মহাশক্তিশালী পুষ্কর?

কতক্ষণ বসেছিলুম মনে নেই। যেন ঘুম থেকে জেগে দেখলুম ঘাটের ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে। হ্রদের জলে আর একটিও দীপশিখা জ্বলছে না। গাড়ি চলাচলের সড়কে ফিরে এসে একটা টাঙ্গা নিলুম। নির্মল আকাশে, দূরের পাহাড়ের পেছন থেকে চাঁদ উঠে এল। আজ কার্তিকী পূর্ণিমা।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

নিজস্ব সম্পদ
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সে আজ পরিবারের ইজ্জৎ রাখতে হ'য়েছে দেশান্তরী। এরই নাম—কপাল।"

দিনের আলো আবার দেখা দেয় পরের দিন। কামারশালার আগুন ধরে ওঠে কাঠকয়লার; শোনা যায় হাপরের ফোঁস-ফোঁসানী। ঝন্ ঝন্ শব্দে ওঠে লোহা পেটার আওয়াজ!

ভাত খেতে ব'সে হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে—

—"এই যা! ডাক্তারের কাছে যাওয়া হ'লো না যে!—" খোকনের অসুখের চিন্তাটা এতক্ষণে যেন মাথায় বাসা বাঁধে ওর,—ভাতগুলো বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে মুখে। তিনু হাসে। বলে—

—: "দরকারও নেই; আজ ও ভালো আছে।" আনন্দে উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে দীননাথ—

—: "থাকবে না? আলবৎ থাকবে। গরীবের আর কেউ না থাক,—মানে মাথার ওপোর 'ভগবান' আছেন, জানিসতো নতুন বৌ! নইলে, সব ছেড়ে এই বিদেশ বিভুঁয়ে ঘর বাঁধবো কেন বল! কোন্ ভরসায়?—দেখ্ দিকিন ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে,—কোথাও কেউ নেই। তেপান্তরের মাঠ! এমাঠে কেঁদে ম'লেও কেউ সাড়া দেবে না।"

—: "কিন্তু এখানেও যদি কিছু হয়?"—

দীননাথ হাসে। বলে—

—: "বিপদ-আপদের কথা বলছিস তো? তা নেই কোথায় তাই বল! ভালো ভাবনা তোর। এসব দিনরাত্তির ভেবে ভেবেই মরছিস্!—যা, উঠে যা।"

কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেই বোধ হয় ঘুমটা ভেঙ্গেছিল হঠাৎ। মনে হ'লো পাশের ঘরে কারা যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ব'লছে।—

আস্তে আস্তে উঠে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলে তিনু; অনুমানটা মিথ্যা নয়! দীননাথ ব'সে ব'সে গুণে নিচ্ছে কতকগুলো টাকার নোট। আর ওপাশে ব'সে ওরই তৈরী অস্ত্রে বস্তাবন্দী ক'রছে কতকগুলো চেনা অচেনা মানুষ।

ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে দেরী হ'লো না তিনুর। ভয়ে, আর কি একটা দুর্ভাবনায় কাঁপতে কাঁপতে এসে শুয়ে পড়লো তিনু,—কিন্তু, চোখের পাতায় ঘুম আর এলো না।

পরের দিন হাট থেকে ফিরেই পাংশুমুখে বিছানা নিল দীননাথ। ভয়ে ভয়ে তিনু জিজ্ঞাসা ক'রলে—

—: "কি হলো তোমার? অসুখ?......"

দীননাথ ম্লান হেসে উত্তর দিল—

—: "কিছু না। একটা কথা ভাবছি।"

—: "কি?—"

—: "এই মানে,—বরং হঠাৎ যদিই আমার কিছু হয় তো ছেলেটাকে নিয়ে তুই যেমন ক'রে হোক—নিজের প্রাণটা বাঁচাতে পারবিনে? তাই।"

—: "কেন, একথা কেন?—"

—: "বললাম তো কিছু নয়। তবে ভাবছি এখান ছেড়ে আর কোথাও নিয়ে যাব তোদের। শুনতে তো পাচ্ছি, ক'লকাতার পাশে পাশে ঘর পাচ্ছে আমাদেরই দেশছাড়া লোকেরা। ব্যস, তারপর? তারপর চাকরী একটা জুটিয়ে নিতে কতক্ষণ?—বলিস?—"

তিনুর কাছ থেকে—এ সম্বন্ধে কোনও জবাবই ফিরে এলো না,—এলো কেবল দুটো ডাগর চোখের অসহায় কাতর দৃষ্টি।

গভীর রাত্রি! কাদের মিলিত কণ্ঠের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ। উঠে বসে দীননাথ ডাক দিল—

—: "বৌ! ওঠ্,—ওঠ্, শীগ্গির! বাঁচতে চাস্ তো পালা—ছেলেটাকে নিয়ে।"

ঘুম ভাঙ্গলেও ব্যাপারটা তখনই বুঝতে পারলে না তিনু, পারলে একটু দেরীতে। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠলো; তবু দীননাথের হাতখানা জড়িয়ে ধরে যেন কাতর আবেদন জানালে—

—: "তুমি?......"

—: "আমি?—"

হাতখানা ওর মুঠোর মধ্যে থেকে সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে ছুটে গেল দীননাথ;—তারপর নিভন্ত হাপরের আগুনে কেরোসিনের টিনটা উপুড় ক'রে দিতে দিতে ব'ললে—

—: "ওঝা মরে সাপের কামড়ে, শুনিস্‌নি? টাকার লোভে ওদেরই হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি রাশি রাশি—ক'রেছি লাভ-লোকসানের কারবার; তার পেরাচিত্তির করতে হবে না? আজ তারই পালা আমার।—"

দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো বাইরের মশালের আলোকে বিদ্রূপ করে। ঘরে স্ত্রী-পুত্রের আর্তনাদের সঙ্গে মিশে গেল—দীননাথের উন্মত্ত কণ্ঠের হাসির আওয়াজ—

—: হা, হা, হা, হা!......

পরের দিন! আবার দিগন্তে দেখা দিল—নতুন দিনের সূর্য।—আবার আলো ছড়িয়ে পড়লো তার।......

দীননাথ কর্মকারের পোড়া ঘরগুলো থেকে তখনও দুর্গন্ধ বার হ'চ্ছে, তখনও ধোঁয়া উঠছে থেকে থেকে।

এ-গ্রাম আর ও-গ্রামের দর্শকরা সেই আগুন ঠেলে উদ্ধার ক'রলে—দুটো নরকঙ্কাল—আর কতকগুলো অস্ত্র। দীননাথের শিশুসন্তানের দগ্ধ-দেহের হাড়গুলো হয় গুঁড়িয়ে গেছে, না হয়তো আর কোনও সংসারের স্নেহ-মায়ায় বেঁচে সে—নূতন অস্ত্র তৈরী করবার জন্যে বড় হ'য়ে উঠবে কি না, কে জানে?......

যে দীপ জ্বলে না

(২১২ পৃষ্ঠার পর)

দূরে লাইনে লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জারের কালো ধোঁওয়া দেখা যায়। কালো ধোঁওয়া কুণ্ডলি পাকায় কৃষ্ণার অন্ধকার মনের পটভূমিতে—কোথাও একটু আলোর চিহ্ন নেই— শুধু কেষ্টনগর ষ্টেশন মডেল কেন। আলো মাত্রই বুঝি তার রোশনাই বিকীর্ণ করতে ভুলে গিয়েছে। আকাশের জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়েছে—, সূর্য ওঠে না—, নক্ষত্র নিভে গিয়েছে।

শুধু অন্ধকার—, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার রাক্ষসের মত হাঁ করে দিগন্ত গ্রাস করছে।

"কৃষ্ণা—" শান্তনু ওর বেঞ্চের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—"রেল জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন—, ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় আজ প্রথম রেলগাড়ী চলতে সুরু করেছিল—"

"ইংরেজের বাণিজ্যিক মৃত্তিকা কায়েম হয়েছিল—" কৃষ্ণা মাথা হেলিয়ে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে হাস্‌লো—, "তাই বুঝি তোমাদের কারখানা বন্ধ—, ইষ্টিশনের জাঁক-জমক আর জৌলস দেখতে এসেছ—"

হ্যাঁ ষ্টেশন—, অফিস, গুদমঘর সাজানো হয়েছে বে কি-রং বেরঙে কাগজের ফুলে, কাগজের মালা শতাব্দী কীর্তির ইতিহাসকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

প্লাটফর্মে পায়চারী করছে ওরা দুজন—লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ালো—, ঝকঝকে এঞ্জিন নব-বধূর সজ্জায় সজ্জিত—, গলায় দুলছে রঙিন ফুলের মালা—, রঙিন পতাকা উড়ছে—, যেন স্বাগতম জানাচ্ছে বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযানকে।

মিনিট দুই দাঁড়িয়ে ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে—, তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ে কামরায় উঠে কৃষ্ণা কয়েকটি বিধবাকে চালশুদ্ধু নামিয়ে নিয়েছে। গাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে।

তবু কৃষ্ণা আর শান্তনু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণা রেল-লাইনের আর এক ধারে কয়েকটি মালগাড়ীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এ গাড়ীতে মাল যায় না—মানুষ বাস করে। রেল জীবনের আর এক পরিচ্ছেদ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ লাইন ফিটার আর পোর্টারেরা এর মধ্যে জানোয়ারের মত মুখ বুঁজে বাস করছে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করলো—"এরা বাসা পায় না কেন শান্তু দা?"

"টাকা কোথায়?"

সত্যি টাকা কই? মানুষের চেয়ে বড় স্মৃতি—, জীবনের চেয়ে বড় ঐতিহ্য—; মুঠো মুঠো টাকার ছড়াছড়ি—তাই ঐতিহ্যের স্মরণে—, স্মৃতির সম্মানে—, জীবনে ঘুণ ধরে যাক— মানুষে আর পশু এক হয়ে যাক—ক্ষতি কী?

বিড়ি ধরাতে পকেট থেকে দেশলাই বের করে শান্তনু বললে—"তোমাকে তো আবার বেলুড়ে বদলি করেছে—"

"আমাকে না হলে সংসার অচল—"কৃষ্ণা হাসলো—"তাই বাবা চেষ্টা করেছিলেন।"

শান্তনুর বিড়ি ধরলো না—, কাঠিতে বারুদ ছিল না হয়তো দেশলাই তাই জ্বললোনা। কেষ্টনগর ষ্টেশন মডেলে আলোর রোশনাই বিকীর্ণ হয়নি।

আলো নিভে গেছে—, গান থেমে গেছে—, তবু সুরের আমেজ রয়েছে শান্তনুর কণ্ঠে। ও গুন্ গুন্ করে গাইছিল—"যতবার আলো জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে"।

কৃষ্ণা ওর পাশে পাশে হাঁটছিল—, আস্তে আস্তে বললো—"আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে"।

আর একখানা ট্রেণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল—এবার কৃষ্ণা সেই দিকে এগিয়ে গেল।

শান্তনু বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়ামাগারের কয়েকজন সুদেহী কৃতী ছাত্র

প্রথম সারি : কমল ভাণ্ডারী—বিষ্ণুচরণ ঘোষ বি-এস্‌সি বি-এল; যোগী গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-বি, বি-এস; কান্তি চক্রবর্তী (স্কুলের ছাত্র)

দ্বিতীয় সারি : শ্রীমান গোবিন্দ (স্কুলের ছাত্র); রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (মেডিক্যাল কলেজ); মনতোষ রায়; কমল ভাণ্ডারী (১৯৫২ কলিকাতা শ্রী)

তৃতীয় সারি : সুনীল নাগ; মধুসূদন পাণ্ডে; নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় (বজরং ব্যায়ামাগার) প্রফুল্ল ঘোষ (যোগাসনী)।

মৃত্যুশুল্ক

(১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

কিছু গুরু দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্য হইয়া উঠে না।

ঃ যথার্থ। রাজকুমারী, তোমার উক্তি অতি মূল্যবান। উপযোগিতার দিক দিয়া উহার তুলনা নাই।

ঃ বেশ তো, আমি মরিয়া যাইবার পরে আমার মুখের এই কথাটা যাহাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণবাক্যে লটকাইয়া থাকে তাহার ব্যবস্থা করিস সভাকবির সহিত পরামর্শ করিয়া, কিন্তু তোর আজ কী হইয়াছে বাসবী? মুখগোমড়া করিয়া সমানে চড়া চড়া কথা বলিতেছিস? আমার নিকট হইতে কোন কিছু লুকাইতে পারিবি না বাসবী, বল—কি হইয়াছে তোর? সৌরাষ্ট্র হইতে কোন সংবাদ পাইয়াছিস কিনা বল বাসবী? আমাকে লুকোস না। রাজকুমারী নিবিড় স্নেহে বাসবীর দক্ষিণ করতল স্বীয় হস্তদ্বয়ের মধ্যে আলিঙ্গিত করিয়া ধরিলেন। বিমনা বাসবী নির্নিমেষে রাজকুমারীর অপরূপ স্নিগ্ধ দুটি নয়নের 'পরে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ধরা গলায় বলিল ঃ রাজকুমারী তোমার অনুমানই ঠিক। কেন হইবে না, তোমার ন্যায় পবিত্র মন জগতে আর দ্বিতীয় কাহারো আছে কিনা সন্দেহ। বিধাতা তোমার মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তুমিই একমাত্র উপযুক্ত আধার। সৌরাষ্ট্র হইতে কোন সংবাদ পাইলে ত ভালো হইত,—কোন সংবাদই যে পাইতেছি না। আমার মন বলিতেছে অনুকূল কিছু নয় সখী, বর্তমানে তাঁহার দুর্গতির পরিসমাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে—

বাসবী বক্তব্য শেষ করিবার সুযোগ পাইল না। রাজকুমারী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। ঃ তুই যেন কী হইয়া গিয়াছিস বাসবী। উৎকণ্ঠা আশঙ্কায় সে বাসবী আর নাই। কোন কারণে হয়ত সংবাদ পাঠাইতে কিছু বিলম্ব হইতেছে, আর তুই একেবারে সে বেচারার দুর্গতির কোড়ই ফিরাইয়া নিয়া বসিয়া রহিলি! তুই না সর্ববিষয়ে এত বিচক্ষণ? এই সামান্য ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে পারিলি না?

বাসবী গভীর স্বরে বলিল ঃ তোমার কথাই যেন সত্যে পরিণত হয় রাজকুমারী—

সহসা চত্বরে এই সময়ে অশ্বক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইল। উভয়েই সচকিত দৃষ্টিপাত করিলেন। চন্দনতিলক বাহির হইয়া যাইতেছে। একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বাসবী সহসা মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিল। ঃ মন্ত্রণার অবসান করিয়া বীর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

ঃ এমন কি গুরুমন্ত্রণা বাসবী?

ঃ মহারাজ যে বিষয় লইয়া নিদারুণ চিন্তিত। দস্যু-সংক্রান্ত বোধহয়। কিন্তু উহা অপেক্ষা গুরুতর মন্ত্রণা কার্যের দূতী হইয়া উহার নিকট যাইতে পারি যদি মহারাজকন্যা অনুমতি দেন............

এখনো চেষ্টা করিলে ধরিতে পারা যাইবে—রাজকুমারী বলো বলো—বাসবী আলিন্দের 'পরে সমগ্র দেহভার ন্যস্ত করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

প্রত্যুত্তরে রাজকন্যা সুগোল হস্তের স্বর্ণবলয় দ্বারা বাসবীর দেহে চটুল আঘাত করিলেন।

রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দ যেন উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

সেনাপতি চন্দনতিলক রাজ্যের দুষ্টগ্রহ দস্যুদমন করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সীমান্তদেশে গিয়াছিলেন পক্ষকাল পূর্বে। সেস্থান হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন তিনি জয়ী হইয়াছেন। অতি সতর্কতার সহিত জীবন্ত দস্যুটাকে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছেন—রাজসকাশে। অদ্য তাঁহার পৌঁছিবার দিন।

পুরবাসী এক বিরাট উৎসবের পরিকল্পনা ফাঁদিয়াছে। যে দস্যুটা এতদিন তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল সে আজ ধরা পড়িয়াছে। আজ আর ভয়ের কিছু নাই, শুধুই আনন্দের—শুধুই উৎসবের।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মুক্তিক্ষণ আজ—এতদিন ধরিয়া যত উৎসব তাহারা প্রাণ ভরিয়া করিতে পারে নাই সব শোধ তুলিয়া লইবার মহালগ্ন দ্বারে সমুপস্থিত।

যথাসময়ে সেনাপতি আসিয়া পৌঁছিলেন। অতদিনের দৈহিক পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে মানসিক উৎকণ্ঠায় তাঁহার চেহারা অর্ধেক হইয়া গিয়াছে, দেহশ্রী অবলুপ্তপ্রায়। সহস্র সহস্র নাগরিক পুরনারী তাঁহাকে উল্লাস-অধীর সম্বর্ধনা জানাইল—পুরনারীগণ চন্দন লাজ ও পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, সহস্র কণ্ঠে সেনাপতির নিজয়ধ্বনিনাদ গগনে উঠিতে লাগিল। সুদৃঢ় কাষ্ঠনির্মিত একটি শকটের মধ্যে দস্যু বন্দী অবস্থায় আনীত হইয়াছে। কেহ কেহ তাহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া গেল। বালকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড লইয়া শকটের পাশ্বেই মনের সাধ মিটাইয়া বালকোচিত কার্যে লাগিল।

সেনাপতি দস্যুবাহিত শকটটি প্রথমে বিচারসভায় লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে স্বগৃহে অশ্বচালনা করিলেন। জনতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উল্লাস তরঙ্গের ন্যায় বহিয়া চলিল।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচারের জন্য বিশেষ বিচারসভা বসানো হইয়াছে। একপার্শ্বে সুউচ্চ একটি শিলাপট্ট, তাহাকে বেদী করিয়া মহারাজ ও যুবরাজের সিংহাসন স্থাপন করা হইয়াছে। শিরোপরি চন্দ্রাতপ, পার্শ্বে শ্যামল দূর্বার আস্তরণের পরে রাজকুমারী ও রাজরাণীর জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মণিময় আসন। সম্মুখে সুকারু প্রস্তরনির্মিত অলিন্দ বিস্তৃত।

সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছে অপরাহ্ণ পূর্বভাগে। রাজ-পরিবার প্রবেশ করিলেন—সবার যে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন মণিমেখলা মন্থর ভঙ্গীতে—আজিকার পর্ব এবং গৌরবের যেন তিনিও অর্ধ অংশভাগিনী। বিচার কার্য সুরু হইয়া গেল। প্রথমে নগরবাসীদের পক্ষ হইতে পুররক্ষক নবীন সেনাপতিকে অজস্র উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিলেন—মহামাত্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তাহার পর কাষ্ঠশকটের দ্বার উন্মোচন করিবার আদেশ দান করিলেন স্বয়ং মহারাজ। একদল সেনানী তদনুযায়ী শকটের নিকটে আগাইয়া গেল। ওদিকে বধ্যভূমি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। বিচার শেষ হইলেই পরক্ষণেই দস্যুর শাস্তিবিধান হইয়া যাইবে। সাংঘাতিক দস্যুটাকে এক দণ্ডও আর অকারণ জীবিত রাখিবার ইচ্ছা বা সাহস কাহারো নাই।

দৃশ্যপটটা সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল। জনতার মধ্য হইতে একটি নারী দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া আসিলেন একেবারে রাজসিংহাসনের সম্মুখে। সুকুমার দেহ ঘিরিয়া দুর্বার যৌবন যেন লাবণ্যের বন্যা ডাকাইয়াছে, সমগ্র জনতা, রাজধানীর অধিবাসী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। রেশমী জালিকার অন্তরালে মণি-মেখলার দুটি অপরূপ চক্ষু প্রশ্নমুখর হইয়া উঠিল।

যথরীতি অভিবাদনান্তে নারী ঋজু হইয়া দাঁড়াইলেন, মহারাজের সম্মুখবর্তী হইয়া।

ঃ বিচারপ্রার্থী মহারাজ!

মহারাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইলেন ঃ বাসবী?

ঃ হাঁ মহারাজ! অগ্রে আমি একটি প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা করি। সেনাপতি মহাশয় দস্যুকে ধরিয়া আনিয়াছেন, তাহার বিচার আপনি এই সভায় করিতেছেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য স্বয়ং সেনাপতির বিচার কোথায় হইবে, কে করিবেন?

ঃ বাসবী!! তুমি কি উন্মাদ হইয়া গিয়াছ? রাজকার্যে বিঘ্ন ঘটাইও না। তুমি নারী, এ বিষয়ে কোন বোধ নাই।

ঃ তবে মহারাজ অবহিত হৌন। আমি এই প্রকাশ্য সভায় সেনাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতেছি। তিনি মাত্র বৎসর দুই এই রাজধানীতে বসবাস করিতেছেন। কিন্তু তাহার পূর্বে কোথায় থাকিতেন, কোন দেশাধীন ব্যক্তি, কি করিতেন এসব সম্পর্কিত যে সব পরিচয় তিনি রাজসকাশে নিবেদন করিয়াছেন তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

ঃ বাসবী!!

মণিমেখলার দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া গেল। অস্ফুটকণ্ঠে শুধু উচ্চারিত হইল ঃ বাসবী!

ঃ মহারাজ আমার কথা মিথ্যা হইলে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী হইতাম, ঈশ্বর জানেন! কিন্তু এ তথ্য নিদারুণভাবে সত্য। চন্দনতিলক আপনার শত্রুপক্ষীয় এবং চন্দনতিলক স্বয়ং "রত্নাহরণ" দস্যুদলপতি। আপনার জন-সাধারণকে শোষণ করিবার জন্যই সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। যেন তেন প্রকারেণ আপনাকে উৎপীড়ন করাই উহার একমাত্র লক্ষ্য। এতদিবস দস্যু সাজিয়াই চালাইতেছিল। সম্প্রতি তিন সপ্তাহ পূর্বে রাজভবনে অনুষ্ঠিত গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় দস্যু ধরিতে পারিলে যে পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়াছেন তাহার প্রস্তাব কে প্রথম উত্থাপন করিয়াছিল?

মহারাজ অভিভূত স্বরে বলিলেন ঃ চন্দনতিলক।

ঃ পুরস্কারটা কি যথেষ্ট লোভনীয় নহে? চন্দনতিলক তৎপরেই সহসা দস্যুর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া পড়িল না কি? তাহার পূর্বে দস্যুর বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়াও সে যে এতটুকুও অগ্রসর হয় নাই তাহা সর্বসাধারণ অবগত আছেন।

মহামাত্যের শির সমর্থনসূচক আন্দোলিত হইল।

: কিন্তু চন্দনতিলকের পক্ষে পুরস্কার তো পর্যাপ্ত নহে? আমি মনস্থ করিয়াছিলাম উহাকে...উহাকে—

: রাজকুমারী সম্প্রদান করিবেন—তাই না? তাহাই হইতে পারিত, কিন্তু অতি লোভ উহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে

—রায়চড়ে দোয়াব বড়ো সর্বনাশা বস্তু—

মহারাজ ঈষৎ স্বস্থ হইতে পারিলেন এতক্ষণে।

: কিন্তু এসব অতি গুহ্য গোপনীয় তথ্য, তুমি অন্তঃপুরচারিণী, কিরূপে অবগত হইলে? আর তোমার অভিযোগের প্রমাণই বা কোথায়?

: প্রাণের দায়ে আমাকে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে মহারাজ! আর যথোপযুক্ত প্রমাণ সমস্তই আমার নিকট আছে। কিন্তু তাহার বোধ হয় আর প্রয়োজন হইবে না। সেনাপতি মহোদয় আর যাহাই হৌন—বীর এবং সাহসী। কৃতকর্ম উনি অস্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। মহারাজ চন্দনতিলকের প্রতি ফিরিলেন।

: চন্দনতিলক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল—এই যুবতী তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা সত্য কিনা।

চন্দনতিলক মুখ নত করিলেন। আত্ম-সংবরণ করিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগিল, তাহার পর গ্রীবা উন্নত করিলেন।

: সর্বাংশে সত্য মহারাজ।

: তুমি কে? তোমার যথার্থ পরিচয়ই বা কি?

: দ্বারসমুদ্রের রাজপুত্র।

: দ্বারসমুদ্র? বিজিত রাজ্য? যাহার বিরুদ্ধে আমি অভিযান করিয়াছিলাম? ওঃ তাই—মহারাজ যদিবা এতক্ষণ আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন—চন্দনতিলকের স্বমুখের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ বিবশ হইয়া গেল।

: চন্দনতিলক ওঃ তুমি তুমি...বিশ্বাসঘাতক? কেহ লক্ষ্য করিল না জালিকের অন্তরালে একটি কমনীয় মৃত্যাতুর দেহ রাজরাণীর ক্রোড়ে ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িতেছে। সমগ্র জনতা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ঘটনা পারিপার্শ্বিকের অভা-বিত পূর্ব গতি লক্ষ্য করিতেছিল—সহসা ঐ বিশাল লোকসমুদ্র যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্বরে সুতীব্র চীৎকারে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

: মারিয়া ফেল, শূলে চড়াও—কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া কুক্কুর দ্বারা মাংস ভক্ষণ করাও, প্রতারক, হীন গুপ্তচর, মন্দজাত দস্যু কোথাকার, উহার সর্বাঙ্গ তৈলসিক্ত করিয়া অগ্নি প্রবাহে নিক্ষেপ কর......বিক্ষুব্ধ জনতা কোন প্রকারেই শান্ত হয়না। যন্ত্রচালিতের মতো মহারাজ চন্দনতিলকের বিচার করিলেন। দস্যু হিসাবে চন্দন ধৃত করিয়া আনিয়াছেন যাহাকে সেটা দ্বারসমুদ্র রাজের এক সাধারণ অপরাধী। তাহারও বিচার হইল।

লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় চন্দনতিলক দৃঢ় অকম্পিত চরণে বধ্যভূমিতে উঠিলেন। বীর তিনি, ভাগ্যবিপর্যয়কে স্বীকার করিয়া লইতে জানেন—নিয়তির অমোঘ বিধান মানিবার শক্তি আছে তাঁহার। বক্ষোপরি যুক্তবন্ধ দৃঢ় সংবদ্ধ, উন্নত মহিমান্বিত ভঙ্গীতে চন্দনতিলক

মাঝে মাঝে স্বপ্নভঙ্গে জেগে উঠি বিমর্ষ ব্যথায়,
মনে হয়, অর্থহীন জীবনের সর্ব গর্ব
সব আয়োজন—
যে প্রসন্ন পরিতৃপ্তি মানুষের নিত্য প্রয়োজন,
প্রত্যহের কলরোলে হারায়ে তা গিয়াছে কোথায়!

কর্মের ধর্মের দ্বন্দ্ব—হানাহানি কথায় কথায়,
অকারণ আত্মগ্লানি, অহেতুক নিন্দা বিদ্বেষণ—
অসার্থক মতদ্বৈধ, তুচ্ছ ক্ষতি, তুচ্ছ আহরণ,
এই নিয়ে প্রতিদিন প্রতি রাত্রি নিষ্ফলে কাটাই!

*

যে অম্লান অমৃতত্বে মানুষের পরম প্রকাশ—
রূপ যার পরিস্ফুট জ্ঞানে প্রেমে
শিল্পে সাধনায়,
দ্যুতি যার আত্মোৎসর্গে, অপ্রমেয়
বিশ্ব বেদনায়,
তারে ভুলে এ কি করি মূঢ়তার মিথ্যা অভিলাষ?
যা ক্ষণিক, যা ক্ষয়িষ্ণু, তারি লাগি
ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
আত্মার সম্পদ যাহা খোয়া যায়
ক্ষীণ অজ্ঞতায়।

দাঁড়াইলেন। সুবর্ণগৌর তনু প্রভাতলোকে দীপ্তি বিকিরণ করিতে লাগিল।

মহারাজ বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন: চন্দনতিলক তোমার শেষ কোন অভিলাষ থাকিলে ব্যক্ত কর। পূরণ করিবার চেষ্টা করিব। চন্দনতিলক যেন শিহরিয়া উঠিলেন ক্ষণকাল। বিচলিত স্বরে কহিলেন—: আমার প্রিয়তমা পত্নী এই অঙ্গনেই উপস্থিত আছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত অযোগ্য স্বামীর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

সকলে বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। উহার স্ত্রী? দ্বার-সমুদ্রের রাজপুত্রবধূ? কে তিনি? কোথায়?

কিন্তু সকলের বিস্ময় মাত্রা ছাড়াইবার উপক্রম করিল যখন সকলে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিল—বধ্যভূমির সোপানপরে টলিতে টলিতে আরোহণ করিতেছে বাসবী। বাসবীর কথা এতক্ষণ উগ্র উত্তেজনায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চন্দনতিলক ধরা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—: বাসবী বাসবী! তুমি বিষপান করিয়াছ?

নিজের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়াও তিনি এতটুকু চঞ্চল হন নাই—কিন্তু আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না।

: বাসবী, পিতার ক্ষমা আমি পাইব না আর। আমি মহা পাপিষ্ঠ, রাজকুলবধূর অবাধ মৃত্যুর কারণ হইলাম।

ছিন্নমূল লতার ন্যায় বাসবী স্বামীর বুকে আকুলভাবে এলাইয়া পড়িল। মরণাহতার মুখে ম্লান একটি অপূর্ব দীপ্তিময় হাসি ফুটিয়া উঠিল ধীরে ধীরে। : প্রিয়তম, আর আমি বুঝি তোমার মৃত্যুর কারণ হইলাম না?

তুমি ভুলের পর ভুল করিয়া চলিয়াছ দেখিয়া সংশোধনের ভার আমাকে লইতে হইল।

বেশবিন্যাসে নারী

(২০০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিকেলের ছবি দেখতে যাবার জন্য হলে সূতিই মানায়। রাত্রে গাঢ় রংয়ের শাড়ী ব্লাউস এমন কি জরী, রেশম ও কিংখাব জাতীয় জিনিষ রাত্রির আলোয় ভালো দেখায়। রাত্রের আলোতে শুধুমাত্র উৎসব ক্ষেত্র বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে বা খেতে গেলে যে কোনো গাঢ় রংয়ের শাড়ী যেমন মেরুন, কালো, গাঢ় সবুজ প্রভৃতি আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্লাউস পরতে হবে, সবুজ শাড়ী, কালো জামা, মেরুন শাড়ী, হলদে জামা আর কালো শাড়ী সাদা জামা এইগুলি পরলে ভাল দেখায়। গয়নার বাহার এই সঙ্গে বেশী না থাকাই ভালো। কৃত্রিম গয়না বা রূপোর অলঙ্কার ও মাথায় একটু ফুলের বাহার এইতেই মানাবে। তবে মনে রাখবেন বিবাহ উৎসবে বা কোনো বড় পার্টিতে যেতে হলে দামী বেনারসী ও তার সঙ্গে জড়োয়ার গহনা বা প্লাটিনামের গহনা পরাই ভালো। সম্ভব হলে খুব সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে তাতে ফুল ও জড়োয়ার সাজ-সরঞ্জাম করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে ভুলবেন না—এই সঙ্গে থাকবে পায়ে জরী বা মকমলের চাপলী ও হাতে জরীর ভ্যানিটি ব্যাগ। দুপুরে, বিকেলে বা যে কোনো সময় বাজার, দোকানে যদি যাবার দরকার হয় তাহলে কখনো জমকালো সাজসজ্জা করবেন না, বেশ আঁটসাঁট করে চুল বেঁধে নেবেন, সাদা বা যে কোনো দেশী ছাপা ইত্যাদি ধরণের শাড়ী, হাতে একটি চামড়ার ব্যাগ, পায়েও চামড়ার জুতো। কোন রকম গহনার বাহুল্য করবেন না। স্কুল-কলেজের বেশভূষা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের হবে। চুলের খোঁপা বা এলোচুল করে স্কুল বা কলেজে যাওয়া ভাল দেখায় না, দুটি বিনুনী করতে হবে। অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের শাড়ী ও ব্লাউস, পায়ে চামড়ার জুতো এ ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

তবে এই বেশভূষার ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখবেন কখনো দেশী-বিলাতীর সংমিশ্রণে নিজেকে সাজাবেন না, কারণ লোকচক্ষে তা বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হবে। সাজগোজের ব্যাপারে 'ধারণার একতা' বলতে আমি যা বুঝি তাই সংক্ষেপে বললাম। কিন্তু আগেই বলেছি, এ জিনিষ ঠিকভাবে শেখানো যায় না—কষ্ট আর অধ্যবসায় দিয়ে শিখতে হয়। কারণ তালিকা দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয় কিন্তু সংক্ষেপে যা বললাম এগুলি মনে রাখলেই অন্ততঃ বেশভূষার পারিপাট্য বজায় রাখতে পারবেন।

আমি যে তোমার সহধর্মিণী, আমাকে ক্ষমা কর—আর আমাদের ইহকালে বিচ্ছেদ হইবে না...

নিষ্ঠুর বজ্রের ন্যায় ঘাতকের উদ্যত খড়্গ রাজকুমারের মস্তকোপরি নামিয়া আসিল। কৃষ্ণদেব দন্তে ওষ্ঠাধর নিষ্পিষ্ট করিয়া ধরিলেন।

ঘধুলুক্কা

The Respectable Prostitute

জাঁ-পোল-সার্ত্র

অনুবাদক :- সখানাথ বসু

[নাটকটির দুই দৃশ্যে সমাপ্ত। ইংরেজী নামকরণ দেখে অনেকে হয়ত নাক সিঁটকবেন, কিন্তু নামে কী আসে যায়? সভ্যতার নামাবলীর অন্তরালে জপমালা জপতে জপতে গণতন্ত্রের শিরোমণি ঠাকুর আমেরিকা কপাটের আড়ালে যে কপট লীলা করছেন—এই ছোট্ট নাটকটি তারই একটি শিল্প-সুন্দর রূপায়ণ। জঘন্যতম মিথ্যার ও হীনতম চক্রান্তের চক্রতলে নিষ্পেষিত নিগ্রো আত্মার আর্তি-মুখর এই কাহিনী এবং সংকল্পে দৃঢ় অথচ স্নেহ-লুব্ধ মনের উপর নিদারুণ চোরাকারবার ঘটতে দেওয়ার বেদনায় বিমূঢ় গণিকার মর্ম উদ্ঘাটনের এই দ্বন্দ্বমধুর আলেখ্য অভিভূত করবে যে কোন পাঠককেই।]

প্রথম দৃশ্য

[সুদূর দক্ষিণ দেশের এক সহরের একটি ঘর। সাদা দেয়াল। ঘরে আধুনিক সোফা শয্যা। ডানদিকে জানলা। বাঁদিকে স্নানাগারে যাবার দরজা। পেছনদিকে একটি ছোট্ট কামরা। তারপর সদর দরজা। পর্দা উঠবার পূর্বে মঞ্চের উপর ঝড়ের মত সোঁ সোঁ শব্দ। পর্দা উঠল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে লিজি। একা, ব্লাউজ আর স্কার্ট পরা। হাতে একটি ঘর-পরিষ্কারক বৈদ্যুতিক "হুভার" যন্ত্র। দরজায় ঘণ্টা বাজল। লিজি একটু ইতস্ততঃ করে বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। আবার ঘণ্টা। লিজি হুভারটা বন্ধ করে বাথরুমের দরজাটা একটু ফাঁক করল।]

লিজি [মৃদু স্বরে] দেখ, বাইরে কে যেন এসেছে। তুমি বেরিও না। [দরজা খুলে দেখল দরজায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লম্বা চওড়া পক্ককেশ নিগ্রো] কি চাই? এ দরজা নয়। [একটু চুপ থেকে] বল না কি চাই তোমার? মুখে রা' নেই কেন?

নিগ্রো [মিনতির সুরে] : মাডাম, দয়া করে যদি ....

লিজি : কীসের দয়া? [নিগ্রোটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে] দাঁড়াও ত'। তোমাকে না ট্রেণে দেখেছিলুম? পালালে কী করে? আর আমার ঠিকানাই বা পেলে কেমন করে?

নিগ্রো : অনেক খুঁজে মাডাম। [এক পা' এগিয়ে গিয়ে] দয়া করে যদি...........

লিজি : ভিতরে এস না। ঘরে লোক আছে। বল, কী চাই তোমার?

নিগ্রো : কিছু না।

লিজি : তবে? কী চাই, টাকা?

নিগ্রো [একটু চুপ থেকে] : মাডাম, তার কাছে দয়া করে যদি বলেন যে আমি নিরপরাধ।

লিজি : কার কাছে? কার কথা বলছ তুমি?

নিগ্রো : জজ সাহেবের কথা। তাঁকে যদি দয়া করে বলেন...........

লিজি : দেখ, তাঁকে বলতে আমার বয়ে গেছে! নিজের ঝঞ্ঝাটেই মরে যাচ্ছি, তা' আবার পরের ঝামেলা! যাও, এখন সরে পড়।

নিগ্রো : আপনি ত' জানেন, আমি নির্দোষ।

লিজি : একশ'বার। দেখ, জজের কাছে আমি যাব না। থানা-পুলিশের নাম শুনলেই আমার পিলে চমকায়।

নিগ্রো : কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সংসার। সারা রাত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর এগুতে ভরসা হচ্ছে না।

লিজি : সহর ছেড়ে পালিয়ে যাও!

নিগ্রো : ওরা সব রেল লাইন পাহারা দিচ্ছে।

লিজি : কারা?

নিগ্রো : শাদা লোকেরা। সবাই। আপনি বাইরে বেরুবেন না?

লিজি : না। কোন দরকার নেই বেরুবার।

নিগ্রো : রাস্তায় লোক গিজ গিজ করছে। ছেলে বুড়ো সবাই ঐ এক কথাই বলছে।

লিজি : কী বলতে চাও তুমি?

নিগ্রো : তাড়া খেয়ে যতক্ষণ না ধরা পড়ি, ততক্ষণ প্রাণের দায়ে আমাকে এ-গলি সে-গলি দৌড়তে হবে। জানেন ত', শাদা চামড়ারা যখন ঘোঁট পাকিয়ে এ সব কথা বলাবলি করে, তখন কালা আদমির আর নিস্তার থাকে না। ওদেরকে, জজ সাহেবকে খবরের কাগজওয়ালাদেরকে, মানে, সবাইকে যদি আপনি দয়া করে বলেন যে, আমি নির্দোষ, তাহলে এ যাত্রায় রক্ষে পাব। কাগজওয়ালারা হয়ত আপনার বিবৃতি ছেপে দিতে পারে।

লিজি : অত চেঁচাচ্ছ কেন? বলছি না ঘরে লোক আছে। [খানিক চুপ থেকে] কাগজে এখন আমি কিছু প্রকাশ করতে চাই না, তবে, ওরা যদি তলব করে, তবে আমি সত্যি কথাই বলব।

নিগ্রো : আমি নিরপরাধ, এ'কথা আপনি বলবেন ত'?

লিজি : হ্যাঁ, বলব।

নিগ্রো : আপনি দিব্যি করে বলছেন?

লিজি : হ্যাঁ, বাপু, হ্যাঁ।

নিগ্রো : ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলছেন?

লিজি : উঃ, কী জ্বালা! হাজার বার বল্লুম না যে, আমি সত্যি কথা বলব। যাও, এখন দূর হও!

নিগ্রো [সহসা] : মাডাম, দয়া করে আমাকে লুকিয়ে রাখুন।

লিজি : লুকিয়ে রাখব! তোমাকে?

নিগ্রো : মাডাম দয়া করুন!

লিজি : তোমাকে? আমি! কী আবদার! [দড়াম করে দরজা বন্ধ করে] বাপস্! কী ঝামেলা! [বাথরুমের কাছে গিয়ে] এবার বেরিয়ে আসতে পারো।

[ফ্রেড বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। জামার হাত গুটোনো। টাই আর কলার লাগানো নেই]

ফ্রেড : কে?

লিজি : কেউ না।

ফ্রেড : আমি ভাবলুম পুলিশ বুঝি!

লিজি : পুলিশ! কেন, পুলিশের সঙ্গে তোমার কিছু হয়েছে নাকি?

ফ্রেড : আমার সঙ্গে? আরে-না-না। আমি ভাবলুম তোমার সঙ্গে হয়ত কিছু একটা.....

লিজি [অসন্তুষ্ট হয়ে] : কেন? আমি ত কারুর কিছু চুরি করিনি!

ফ্রেড : সত্যি বলত, পুলিশের সঙ্গে তোমার কোন দিন গণ্ডগোল হয়নি?

লিজি : অন্ততঃ, চুরির দায়ে নয়।

[লিজি হুভার নিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে সুরু করল। বিকট আওয়াজ]

ফ্রেড [আওয়াজে বিরক্ত হয়ে] : এই!

লিজি [চড়া গলায় চীৎকার করে] : কী বলছ?

ফ্রেড [চীৎকার করে] : কান ফাটাবে নাকি?

লিজি [চীৎকার করে] : এই হয়ে এল বলে।

[লিজি হুভার বন্ধ করল]

ফ্রেড [বিছানাটা দেখিয়ে] দেখ, বিছানাটা ঢেকে দাও।

লিজি : কী করব?

ফ্রেড : বিছানাটা ঢেকে ফেল। ওটা থেকে পাপের দুর্গন্ধ আসছে।

লিজি : পাপ! বুলি শিখলে কোথা থেকে? তুমি ত সাধু-সন্ন্যেসী নও!

ফ্রেড : নই ত', তাতে কী হলো?

লিজি : পাপ-পুণ্যির তত্ত্ব কথা আওড়াচ্ছিলে কিনা, তাই। [ফ্রেডের দিকে কটাক্ষ করে] যাকগে। তুমি ত আর ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নও। দেখি তোমার আংটিটা। [উৎফুল্ল হয়ে] কী সুন্দর!

তুমি বড়লোক, নাগো?

ফ্রেড : হ্যাঁ

লিজি : খুব বড়লোক!

ফ্রেড : খুব।

লিজি : চমৎকার! [ফ্রেডের গলা জড়িয়ে চুমু খাবার জন্য নিজের ঠোঁট এগিয়ে দিয়ে] পুরুষ মানুষের বড়লোক না হলে যেন মানায় না! এতে বিশ্বাস আসে।

[ফ্রেড চুমু খায় না, একটু পরে উঠে যায়]

ফ্রেড : বিছানাটা ঢেকে ফেল।

লিজি : আচ্ছা! আচ্ছা! ঢাকছি'খন [বিছানাটা ঢেকে হঠাৎ খুব হাসতে লাগল] পাপের দুর্গন্ধ! এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। এত' তোমার পাপ [ফ্রেড অস্বীকারের মুখভঙ্গি করল] না হয় মানলুম আমারও। [নিজে বিছানায় বসে এবং জোর করে ফ্রেডকে পাশে বসিয়ে] মুখ ঘুরিয়ে বসলে কেন? কাছে সরে এস না! আমার পানে তাকাতে কী ভয়

করছে ? [ফ্রেড সহসা লিজিকে বুকের কাছে টেনে এনে জোরে চেপে ধরে] উঃ! লাগছে—বড্ড লাগছে! [ফ্রেড লিজিকে ছেড়ে দিল] বাব্বাঃ, কী দুষ্টু তুমি! ভাল কথা, তোমার নাম কিগো? বল না! নাম না জানলে কেমন কেমন লাগে যেন! লক্ষ্মীটি বল।

ফ্রেড ঃ না!

লিজি ঃ বেশ, বল না। [উঠে দাঁড়িয়ে] র'স, ঘরটাকে গুছিয়েনি। [কতকগুলো আসবাব গোছগাছ করে] এতক্ষণে সব ফিটফাট দেখাচ্ছে! আচ্ছা, ছবি কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, বলত? আমি কিছু ছবি কিনব। বাক্সের মধ্যে একটি ছবি আছে। নাম "ভাঙা কলসী", ফরাসী চিত্র ......একটি মেয়ে আর তার ভাঙা কলসী—এই নিয়ে ছবি। ভারী সুন্দর!

ফ্রেড ঃ কিসের কলসী?

লিজি ঃ বলতে পারি না। মনে হয় মেয়েটির একটি কলসী ছিল। এ ছবির ঠিক উল্টো—যেমন ধর, বুড়ী ঠাকুমা বসে বসে বুনছে কিম্বা নাতি-নাতনীদের গল্প বলছে—এমন একটি ছবির খুব সখ আছে আমার। আঃ! যাই জানলাটা খুলে দি। [উঠে জানলা খুলে দিল] বাঃ, কী সুন্দর সকালটা! [গা এলিয়ে দিয়ে] কী চমৎকার দেখাচ্ছে ভোর বেলাটাকে! ইস, কী যে ভাল লাগছে আমার! কাল রাতে কী মধুর প্রেম করলেন.........কী চমৎকার যে লাগছে, কী বলব! আমার বরাত খুব ভাল। সহরে পা' দিয়েই সেরা জায়গায় ঘর পেলাম! এস না, উঠে এস। জানলা দিয়ে সহর দেখতে তোমার ভাল লাগে না?

ফ্রেড ঃ লাগে, কিন্তু সেটা নিজের বাড়ীর জানালা থেকে!

লিজি [সহসা] ঃ আচ্ছা, সকাল বেলায় সবার আগে নিগ্রোর মুখ দেখলে বুঝি দিনটা খারাপ যায়?

ফ্রেড ঃ হঠাৎ এ প্রশ্ন?

লিজি ঃ গলিটায় একটা নিগ্রো দেখতে পেলাম কিনা।

ফ্রেড ঃ হ্যাঁ, খুব খারাপ যায়। জানালাটা বন্ধ করে দাও।

লিজি ঃ ঘরে একটু বাতাস আসতে দাওনা।

ফ্রেড ঃ সব বন্ধ করে দাও। শুধু আলোটা জ্বলুক।

লিজি ঃ কেন? নিগ্রোর ভয়ে? সত্যি, রোদ্দুর এত চমৎকার লাগে!

ফ্রেড ঃ রোদ্দুরে দরকার নেই। কাল রাতে যেমনটি ছিল এখনও তা থাকবে। যাও, জানলাটা বন্ধ করে দাও। বাইরে গেলে, খুব রোদ্দুর পাব। [উঠে গিয়ে লিজির সামনে দাঁড়াল]

লিজি [ঈষৎ ভাবিত হয়ে] ঃ ব্যাপার কী?

ফ্রেড ঃ কিছু না। টাইটা দাও।

লিজি ঃ দিচ্ছি [উঠে বাথ-রুমের দিকে গেল। এই ফাঁকে ফ্রেড টেবিলের ড্রয়ার খুলে চট্‌পট কী সব দেখে নিল। লিজি টাই নিয়ে বাথরুম থেকে ফিরে এল] এস আমি পরিয়ে দিই। [টাই পরাতে পরাতে] দেখ, রোজ রোজ নূতন নূতন ছ্যাটকো মক্কেলের সঙ্গে কারবার করতে আমার ভাল লাগে না। আমি চাই দু'তিন জন বাঁধাধরা মক্কেল—একজন মঙ্গলবার, একজন বিষ্যুৎবার, আর একজন শনিবার। তুমি বলেই তোমাকে বলছি। আমার এই আইডিয়া, তোমার কেমন লাগে? থাক, আর বলে কাজ নেই। ইচ্ছে হয় তো ভেবে দেখো। বা, দিব্যি মানিয়েছে তো! নাও, একটা চুমু খাও। [চুমু খেয়ে ফ্রেড লিজিকে ঠেলে সরিয়ে দিল] উঃ!

ফ্রেড ঃ তুমি একটি আস্ত শয়তান।

লিজি ঃ আবার সেই ধর্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠিরের মতন কথা! তোমার হ'ল কী?

ফ্রেড ঃ কিছু না। ভাল লাগছেনা আমার।

লিজি ঃ ঢং দেখে আর বাঁচিনে। [একটু চুপ থেকে] যাক্‌গে, তুমি খুসী হয়েছ ত'?

ফ্রেড ঃ খুসী! কিসের খুসী?

লিজি [ফ্রেডের উক্তির অনুকরণ করে হেসে হেসে] ঃ
কীসের খুসী? —ন্যাকা কোথাকার!

ফ্রেড ঃ ওঃ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, খুব খুসী—খুব খুসী! কত দক্ষিণে দিতে হবে?

লিজি ঃ টাকার কথা কে বলেছে তোমায়? খুসী হয়েছ কিনা তাই জিজ্ঞেস করলুম। জবাবটা ভদ্রভাবেই দিতে পারতে। তা থাকগে। আমাকে তোমার কেমন লাগলো?

ফ্রেড ঃ বাজে বকোনা।

লিজি ঃ তা বৈকি! আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি বললে, তুমি আমায় ভালবাস।

ফ্রেড ঃ তুমি মদ খেয়ে চুর হয়েছিলে।

লিজি ঃ মোটেই না।

ফ্রেড ঃ তাহলে আমি। আমার কিছুই স্মরণ নেই।

লিজি ঃ বল্লেই হ'ল। আমি বাথরুম থেকে কাপড় জামা খুলে এসে দাঁড়ালাম। লজ্জায় তোমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তুমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বসে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ সুরু করলে। কী, মনে পড়ে?

ফ্রেড ঃ না!

লিজি ঃ তারপর শুয়ে শুয়ে আমরা এমন ভাব দেখালাম যে, আমরা যেন একটি দোলনায় সদ্যোজাত দু'টি উলঙ্গ শিশু! কী গো চাঁদ, মনে পড়ে?

ফ্রেড ঃ আঃ, একটু চুপ করতো! রাতে যা মানুষে করে, সেটাকে রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলোতে টেনে এনে যাচাই করার কী দরকার?

লিজি [গ্রাহ্য না করে] ঃ আমার যদি ভাল লাগে, তাতে কার কী? কাল যা আনন্দ পেলাম কী বলব!

ফ্রেড ঃ ওঃ [উঠে গিয়ে লিজির ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে] তাত লাগবেই! লোককে ভেড়ুয়া বানিয়ে তোমার ত মজা লাগবেই!

[একটু চুপ থেকে] কালকের রাতের কথা আমি ভুলে গেছি—একদম বিলকুল ভুলে গেছি। নাইট ক্লাবের পর যা যা হয়েছে—তা শুধু তুমি—একমাত্র তুমিই মনে রেখেছ [লিজির ঘাড় মুচড়ে দিল]

লিজি ঃ ও কি হচ্ছে?

ফ্রেড ঃ ঘাড় মটকাচ্ছি।

লিজি ঃ লাগছে যে।

ফ্রেড ঃ তুমিই একমাত্র লোক যার ঘাড়-মটকে দিলে কালকের রাতকে মনে রাখবার মত আর কেউ থাকবে না [ঘাড় ছেড়ে দিয়ে] বল, কত চাই তোমার?

লিজি ঃ আমাকে ভাল লাগলে কি সব ভুলতে পারতে? ভাল যখন লাগেনি তখন আর টাকা-কড়ির কথা কেন?

ফ্রেড ঃ বাজে কথা রাখ। কত দিতে হবে?

লিজি ঃ দেখ, সবে সহরে পা' দিয়েছি। তুমিই আমার প্রথম মক্কেল। প্রথম বড় পয়মন্ত। তার কাছ থেকে কিছু নিতে নেই।

ফ্রেড ঃ বুঝেছি। তোমার সোহাগে আমার কাজ নেই [একখানা দশ ডলারের নোট টেবিলে রেখে দিল]

লিজি ঃ তোমার টাকা আমি চাই না [নোটটা তুলে চোখ বুজে] আচ্ছা, আমার দাম কত হতে পারে? চল্লিশ! পঞ্চাশ! একশ! [চোখ খুলে নোটটার দিকে তাকিয়ে] ভুল করলে নাত?

ফ্রেড ঃ মনে ত হয়না।

লিজি ঃ কত দিয়েছ তা জানো?

ফ্রেড ঃ খুব জানি।

লিজি ঃ ফিরিয়ে নাও এক্ষুণি ফিরিয়ে নাও তোমার টাকা [ফ্রেড অস্বীকার করল ফিরিয়ে নিতে] দশ ডলার! আমার মতন মেয়ের দাম কিনা দশ ডলার! নরকেও ঠাঁই হবে না তোমার! [পা দেখিয়ে] আমার উরু দেখনি তুমি? দেখনি বুক? তার দাম কী দশ ডলার! নিয়ে যাও তোমার নোংরা টাকা। নইলে রাগে ফেটে পড়ব আমি। দশ ডলার! আমার সর্বাঙ্গে চুমু খাওনি তুমি? শোনাই নি তোমায় রাত জেগে আমার জীবন-কাহিনী? আর এখন ভোরে উঠে মেজাজ দেখাচ্ছ আমাকে? দশ ডলার দিয়ে যেন মাথা কিনে নিয়েছেন! চল্লিশ নয়, তিরিশ নয়—এমন কি কুড়িও নয়—মোট্টে দশ ডলার—তাও আবার ফাউটেন!

ফ্রেড ঃ তোমার মত নোংরা মেয়ে-মানুষের পক্ষে ওই যথেষ্ট।

লিজি ঃ আমি নোংরা মেয়ে-মানুষ? আর তুমি? তুমি কী? কেমন মায়ের ছেলে তুমি যে মেয়েদের মান রেখে কথা বলতে শেখনি?

ফ্রেড ঃ মুখ-সামলে কথা বল!

লিজি ঃ হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা!

ফ্রেড [অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে] ঃ শোন, লিজি, এখানকার ছেলেদের মা তুলে গাল দিও না। কোনদিন হয়ত কে রাগের মাথায় ঘাড়-মটকে দেবে।

লিজি [তেড়ে গিয়ে] ঃ দেয় দেবে! তাতে তোমার কী? যাও, বেরিয়ে যাও।

ফ্রেড [সরে গিয়ে] ঃ চুপ—একদম চুপ। [লিজি টেবিল থেকে ফুলদানি তুলে ফ্রেডের মাথা লক্ষ্য করে তাক করল] এই নাও, আরো দশ ডলার, ভাল চাও ত' এই নিয়ে চুপ মেরে যাও। নইলে হাজতে পুরবো।

লিজি ঃ হাজতে পুরবে?

ফ্রেড [বাগতভাবে] ঃ হ্যাঁ, জেনে রাখ, আমি উইলসন ক্লার্কের ছেলে।

লিজি ঃ কার ছেলে?

ফ্রেড ঃ সিনেটার ক্লার্কের।

লিজি ঃ আর তুমিও জেনে রাখ, আমি ট্রুম্যানের মেয়ে।

ফ্রেড ঃ সিনেটারের ছবি কাগজে দেখেছ, নিশ্চয়ই!

লিজি ঃ তাতে কী হয়েছে?

ফ্রেড [একখানা ছবি দেখিয়ে] ঃ দেখ তার পাশে আমি, আর সে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে।

লিজি [অকস্মাৎ শান্ত হয়ে] : উনিই বুঝি তোমার বাবা ?

[ফ্রেড ছবিটা টেনে নিল]

ফ্রেড : খুব হয়েছে। আর দেখতে হবে না।

লিজি : দেখতে বেশ, না ? মনে হয় উনি খুব ভাল আর খুব জ্ঞানী। [ফ্রেড নিরুত্তর]। বাগানটা বুঝি তোমাদের ?

ফ্রেড : হ্যাঁ।

লিজি : আর ওই ছোট ছোট মেয়েগুলো—তোমার বোন ? [ফ্রেড নিরুত্তর] পাহাড়টার উপরে তোমাদের বাড়ী ?

ফ্রেড : হ্যাঁ।

লিজি : সকালে যখন ব্রেকফাস্ট খাও তখন জানলা দিয়ে সহরটা বেশ দেখতে পাও—না ?

ফ্রেড : হ্যাঁ।

লিজি : খাবার সময় ডাকতে হলে কী ইলেকট্রীক বেল বাজে ?

ফ্রেড : না। পেটা-ঘড়ি বাজে।

লিজি [উৎফুল্ল ও চমৎকৃত হয়ে] পেটা-ঘড়ি ! অবাক করলে তুমি ! আমার যদি অমন বাড়ী আর পরিবার থাকত, তাহলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে ঘুমবার জন্যে আমাকে টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হত। [একটু চুপ থেকে] সে যাক ! তোমার মাকে নিয়ে যা বলেছি, তার জন্য দুঃখিত। আমার মাথার ঠিক ছিল না। ছবিতে তোমার মাও আছেন নাকি ?

ফ্রেড : তোমাকে মা সম্বন্ধে কিছু বলতে মানা করলুম না !

লিজি : আচ্ছা, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

[ফ্রেড চুপ-চাপ] আমার সঙ্গে মন-দেয়া-নেয়ার কারবার করবার মতলব যদি নাই ছিল, তবে আমার ঘরে রাত-কাটাতে এলে কেন ?

[ফ্রেড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল]

ফ্রেড : তুমি উত্তর দেশ থেকে আসছ না ?

লিজি : হ্যাঁ।

ফ্রেড : নিউইয়র্ক থেকে ?

লিজি : তা খোঁজে তোমার কী দরকার ?

ফ্রেড : কাল রাতে নিউইয়র্কের গল্প করছিলে কিনা।

লিজি : নিউইয়র্কের গল্প সবাই করতে পারে। এতে কিছু প্রমাণ হয় না।

ফ্রেড : ওখান থেকে চলে এলে কেন ?

লিজি : বিশ্রী লাগছিল।

ফ্রেড : তোমাকে কি নিগ্রোটা ধর্ষণ করতে চেয়েছিল ?

লিজি : কী বললে ?

ফ্রেড : কাল সকালে ছ'টার এক্সপ্রেসে তুমি এখানে এসেছ ?

লিজি : উঁ-হুঁ !

ফ্রেড : তা হলে তুমিই।

লিজি : বাজে কথা। কেউ আমাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করেনি।

[লিজি একটু তিক্ত হাসি হাসল]

ফ্রেড : হ্যাঁ তুমিই। ওয়েবস্টার কাল রাতে ক্লাবে আমায় বলছিল।

লিজি : তাই ত বলি ! তোমার চোখ অমন চক্‌চক্ করছে কেন ? শুনে খুব গরম হয়েছিলে—কেমন ? অমন বাপের ছেলে হয়ে কিনা......

ফ্রেড : আগে যদি জানতুম, তুমি একটা নিগ্রোর সঙ্গে......

লিজি : তারপর ?

ফ্রেড : আমার পাঁচ-পাঁচটা নিগ্রো চাকর আছে। আমার ফোন এলে ওরা যদি ধরে তবে ভাল করে না পুঁছে আমার হাতে ফোন দিতে সাহস পায় না।

লিজি [শিস দিয়ে] : সত্যি !!

ফ্রেড [শান্তভাবে] : নিগ্রোদের আমরা থু-থু করি। আর যে সব মেয়েরা ওদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করে বেড়ায় তারাও আমাদের ঘৃণার পাত্রী।

লিজি : ভাল কথা। নিগ্রোদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে, তাই বলে তাদের গা-ছুঁতে দেব, এমন মেয়েও আমি নই।

ফ্রেড : কী করেই বা বিশ্বাস করি বল ? তুমি ত একটি শয়তান, আর নিগ্রো ব্যাটারাও হাড়-বজ্জাত [হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে] তাহলে, ও বেটা তোমায় ধর্ষণ করতে চেয়েছিল ?

লিজি : এ নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ?

ফ্রেড : দুটো নিগ্রো তোমার কামরায় ঢুকে তোমাকে ধর্ষণ করতে যায়। তুমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই কয়েকজন সাদা চামড়া তোমার সাহায্যে ছুটে যায়। একটা নিগ্রো ক্ষুর বের করে বুকে দাঁড়াতেই একজন শ্বেতকায় তাকে গুলী করে সাবড়ে দেয়। আর একটা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কেমন—এই ত ?

লিজি : মোটেই না। নিগ্রো দুটো বসে বসে আপন মনে গল্প করছিল। আমার দিকে মোটেই তাকায় নি। তারপর চারজন শাদা ছোকরা গাড়ীতে ঢুকে আমার দিকে একটু কটাক্ষ করল। ওরা ফুটবল জিতে মদে চুর হয়েছিল। ওরা বলতে লাগল, গাড়ীতে নিগ্রো-নিগ্রো গন্ধ উঠছে। নিগ্রো দুটোকে গাড়ী থেকে ফেলে দেবার মতলব করে ওরা সবাই মিলে ওদের ওপর চড়াও হল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে একটা ছোকরার চোখে খোঁচা লাগল। সে রেগে গিয়ে গুলী করে একটা নিগ্রোকে সাবড়ে দিল। অপরটা ষ্টেশনে গাড়ী ভাল করে ভিড়তে না ভিড়তেই প্রাণভয়ে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়।

ফ্রেড : সে ব্যাটাকে আমরা জানি। পালিয়ে আর ক'দিন থাকবে ! [একটু ভেবে নিয়ে] জজের কাছে কি তুমি এই কথাই বলবে ?

লিজি : তোমার এত গরজ কেন ?

ফ্রেড : জবাব দাও।

লিজি : জজের কাছে যেতে আমার বয়ে গেছে। ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না।

ফ্রেড : লাগুক আর নাই লাগুক, যেতে তোমাকে হবেই।

লিজি : কক্ষণো-না। পুলিশের হাঙ্গামায় আমি নেই।

ফ্রেড : ওরা তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

লিজি : তাহলে যা দেখেছি তাই বলব।

ফ্রেড : তুমি কী ভুল করছ, তা বুঝতে পারছ ?

লিজি : ভুল করছি !

ফ্রেড : আলবৎ ! তুমি একজন কালা আদমীকে শাদা চামড়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করছ।

লিজি : কিন্তু শাদা চামড়া যে অপরাধী !

ফ্রেড : না, সে দোষী নয়।

লিজি : যে একটা লোককে গুলী করে মারল, সে নিশ্চয়ই দোষী।

ফ্রেড : কিসের দোষী ?

লিজি : কেন—খুনের।

ফ্রেড : সে ত একটা নিগ্রোকে গুলী করেছে।

লিজি : তার কোন অধিকার নেই !

ফ্রেড : কিসের অধিকার ?

লিজি : লোক খুন করবার।

ফ্রেড : বড্ড বড় বড় কথা বলছ যে, [একটু চুপ থেকে] দোষী হউক চাই না হউক, ওর মত ছেলেকে ফাঁসানো তোমার চলবে না।

লিজি : দেখ, কাউকে ফাঁসাতে আমি চাই না। ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, তবে আমি যা দেখেছি তাই বলব।

[ফ্রেড লিজির দিকে এগিয়ে গেল]

ফ্রেড : নিগ্রোটার সঙ্গে তোমার কী এমন যে তুমি তাকে বাঁচাতে চাইছ।

লিজি : তাকে আমি চিনিই না।

ফ্রেড : তবে ?

লিজি : আমি সত্য কথা বলব।

ফ্রেড : সত্যের নিকুচি করেছে ! দশ-ডলারের মাগী, তার আবার সত্য কথা ! দেখ, এটা তোমার নিউইয়র্ক নয় ! সত্য-টত্যের ধার আমরা ধারি না। আমাদের একমাত্র সত্য হ'ল শাদা চামড়া। মনে রাখবে, আমরা সতের হাজার শাদা মানুষ আর ওরা বিশ হাজার কালা আদমি। [একটু চুপ থেকে] জানো, টম আমার পিসতুতো ভাই।

লিজি : কে ?

ফ্রেড : টম, যে গুলী করেছিল।

লিজি : ওঃ।

ফ্রেড : তোমার হয়ত কিছু আসে যায় না। কিন্তু মনে রেখ টম ভাল ঘরের ছেলে—হেঁজিপেজি নয়।

লিজি : তা না হলে অমন হবে কেন ? ভাল ঘরের ছেলে না হলে আমার পাশে বসে আমার গায়ে গা' দিয়ে আমার স্কার্ট তোলবার সাহস হবে কার ? ভাল ঘরের মুখে আগুন। তুমি ত তার মামাতো ভাই ! ধরতে গেলে একই ঝাড়ের বাঁশ !

ফ্রেড [মারতে গিয়ে আত্মসংবরণ করে] : তুমি একটি আস্ত শয়তান !

লিজি : সরো, আমি যাই।

ফ্রেড : তোমার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেছে—নিগ্রোটাকে গুলী করে মেরেছে—এতে আর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে ! ঝোঁকের মাথায় ও রকম হয়েই থাকে—ও কিছু না ! টম একজন নেতা—এইটাই হল আসল কথা।

লিজি : হবে। কিন্তু নিগ্রো বেচারী ত কোন দোষ করেনি !

ফ্রেড : নিগ্রো ব্যাটারা চিরকালই বজ্জাত।

লিজি : সে যাই বলো, কাউকে ধরিয়ে দিতে পারব না আমি।

ফ্রেড ঃ হয় টম, নয় নিগ্রো—এ দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমার। বল, কত টাকা চাও তুমি?

লিজি ঃ এক পয়সাও না।

ফ্রেড ঃ পাঁচিশ' ডলার।

লিজি ঃ একটা কানা-কড়িও না।

ফ্রেড ঃ ভেবে দেখ, পাঁচিশ' ডলার রোজগার করতে তোমার অনেক রাত লাগবে।

লিজি ঃ অসম্ভব কী! তোমার মত কিপটে মক্কেলের ত আকাল নেই! তাই ত বলি! এইজন্যেই বুঝি ভাব-সাব করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে? ভেবেছিলে মেয়েটাকে পটিয়ে-পাটিয়ে কাজ হাসিল করে নেব—কেমন? এই যখন মতলব তখন সোজাসুজি আমার কাছে এলেই পারতে? হাত কাটাবার দরকার কী ছিল? বেজন্মা! বেহায়া কোথাকার!

ফ্রেড ঃ শোন লিজি, অনর্থক চেঁচামেচি কর না। ভেবে দেখ, পাঁচিশ' ডলার।

লিজি (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে) ঃ আমি কিছু নিতে চাই না। চাই না তোমার পাঁচিশ' ডলার। জজের কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারব না। আমি নিউইয়র্কে ফিরে যেতে চাই। এখান থেকে পালাতে চাই—পালাতে চাই। [দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। লিজি চুপ। আবার ঘণ্টা] আমি দরজা খুলব না।

[দরজায় জোরে ধাক্কা পড়ল]

[বাইরে থেকে] ঃ দরজা খোল। পুলিশ।

লিজি [চুপি চুপি] ঃ এই-রে পুলিশ! আমি জানতুম। যাও, বাথরুমে গিয়ে লুকোও।

[আবার ধাক্কা]

(বাইরে থেকে) ঃ দরজা খোল। পুলিশ।

[ফ্রেডের নড়বার নামটি নেই। লিজি তাকে প্রাণপণে ঠেলে দিচ্ছে]

[বাইরে থেকে] ঃ ক্লার্ক আছ ভিতরে—ক্লার্ক?

ফ্রেড ঃ এই যে—আমি ভেতরে।

[ফ্রেড লিজিকে ঠেলে দিয়ে দরজা খুলে দিল। লিজি বিস্মিত হয়ে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজা দিয়ে জেমস ও জনের প্রবেশ]

জন ঃ আমরা পুলিশ। তোমার নাম কি কুমারী লিজি ম্যাকী?

লিজি ঃ [জনের কথায় কান না দিয়ে একদৃষ্টে ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে]

তাহলে তাই হল!

জন [লিজির কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে] ঃ তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হল তার উত্তর দাও।

লিজি [নিজেকে সামলে নিয়ে একটু কর্কশ ভাবে] ঃ আমি জানতে চাই আমার ঘরে ঢুকে এ সব করার মানে কী? [জন তাকে পুলিশের ব্যাজ দেখাল] যে কেউ ও ব্যাজ দেখাতে পারে— ভারী বাহাদুরী! [ফ্রেডকে দেখিয়ে] এর বন্ধু বুঝি তোমরা। আমায় ধরতে এসেছ?

[জন লিজির নাকের কাছে ব্যাজটা উঁচিয়ে ধরল]

জন ঃ চিনতে পার?

লিজি [জেমসকে দেখিয়ে] ঃ এর ব্যাজ কই?

জন [জেমসকে] ঃ তোমার কার্ড দেখাও।

[জেমস কার্ড দেখাল। লিজি কোন কথা না বলে নীরবে ড্রয়ার থেকে কতকগুলো কাগজ বার করে জনের হাতে দিল]

জন [ফ্রেডকে দেখিয়ে] ঃ তুমি কি এই ছেলেটিকে কাল রাতে তোমার ঘরে ধরে এনেছিলে? জান, এই রাজ্যে বেশ্যাবৃত্তি গুরুতর অপরাধ?

লিজি ঃ আর তোমাদের ভয় নেই? তোমরা যে বিনা ওয়ারেন্টে একজনের ঘরে ঢুকে তম্বি-তম্বা করছ! জান, এই নিয়ে আমি তুমুল কাণ্ড করতে পারি?

জন ঃ আমাদের ভাবনা আমরা ভাবব। তোমাকে যা বলা হল তার জবাব দাও। একে তুমি কাল রাতে ধরে এনেছিলে?

[পুলিশ ঢোকবার পর থেকেই লিজি যেন মারমুখী হয়ে উঠেছিল]

লিজি ঃ হ্যাঁ, এনেছিলেম। তবে, প্রেমের কারবার বিনি পয়সাতেই করেছি।

ফ্রেড ঃ ওর টেবিলে দু'খানা দশ ডলারের নোট আছে। ওগুলো আমার দেওয়া।

লিজি ঃ তোমার যে তার প্রমাণ কী?

ফ্রেড [লিজির দিকে না তাকিয়ে জন আর জেমসকে লক্ষ্য করে] ঃ কাল ব্যাঙ্ক থেকে ত্রিশখানা নোট তুলে আনি। নোটগুলি পর পর নম্বর দেওয়া। তোমরা ব্যাঙ্কে গিয়ে মিলিয়ে দেখতে পার।

লিজি ঃ নোট আমি ছুঁইনি। ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিলুম।

জন ঃ নাই যদি নিয়ে থাক, তবে তোমার টেবিলে পড়ে আছে কেন?

লিজি [কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে] ঃ মুস্কিলে পড়লাম দেখছি। [ফ্রেডের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে মৃদুস্বরে] এইজন্য এত! [পুলিশের দিকে চেয়ে] ভাল! কী করতে হবে আমায়?

জন ঃ বসো। [ফ্রেডকে] ওকে সব বলেছ? [ফ্রেড মাথা নাড়ল] তোমাকে না বসতে বললুম! [জোর করে লিজিকে বসিয়ে দিয়ে] তোমার কাছ থেকে লিখিত জবানবন্দি পেলে জজসাহেব টমকে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। আমরা সব লিখে এনেছি। তুমি শুধু সই করে দেবে। কাল তোমাকে শুধু দু' একটা প্রশ্ন করা হবে। তুমি পড়তে জানো?

[লিজি ঘাড় নাড়ল। জন কাগজ বের করল]

পড়। পড়ে সই কর।

লিজি ঃ এযে আগাগোড়াই মিথ্যে।

জন ঃ তাতে কী হয়েছে?

লিজি ঃ আমি সই করতে পারব না।

ফ্রেড ঃ ধরে নিয়ে চালান দাও মাগীকে। [লিজির প্রতি] একেবারে আঠার মাসের ধাক্কা!

লিজি ঃ আঠার মাস! বেশ! ফিরে এসে ঘাড় মটকাব তোমারই।

[ওরা পরস্পরের মুখে চাওয়াচায়ি করল]

ফ্রেড ঃ তোমরা নিউইয়র্কে টেলিগ্রাম কর। মনে হয় ওখানে কিছু একটা করে শালী এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছে।

লিজি ঃ তুমি মেয়েমানুষেরও বেহদ্দ! ছ্যা, পুরুষমানুষ এত নীচ হতে পারে!

জন ঃ ভাল করে ভেবে দেখ। নইলে চালান দেব।

লিজি ঃ তাই দাও। মিথ্যে আমি বলতে পারব না—কিছুতেই না।

ফ্রেড ঃ মিথ্যে উনি বলবেন না। ইনিয়ে-বিনিয়ে ভালবাসার কথা বলে সারারাত ধরে করলি তুমি মিথ্যের বেসাতি?

লিজি [প্রতিবাদের সুরে] ঃ না মিথ্যের বেসাতি আমি করিনি। করেছি বললে বোধ করি তুমি খুসী হও—না?

[পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। ফ্রেড চোখ নামিয়ে নিল]

ফ্রেড ঃ থাক গিয়ে ওসব কথা। এই নাও কলম। সই কর।

লিজি ঃ গলায় দড়ি জোটে না তোমার!

[ওরা সবাই হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

ফ্রেড ঃ শেষে এই হল! টমের মত চমৎকার একটা ছেলের জীবন কিনা একটা বেশ্যার হাতে! [পাইচারি করতে করতে লিজির কাছে এসে একটা ফটো দেখিয়ে] এই দেখ টমের ছবি। তোর এই জঘন্য জীবনে অনেককেই ত দেখেছিস, কিন্তু এমনটি কী বাপের জন্মে দেখেছিস? সই না করে খুব একটা বড় কাজ করছিস বলে তোর ধারণা—কেমন? এদ্দিন আমাদের কেবল পকেট হাতড়েছিস, এখন আবার মোকা পেয়ে একজনের প্রাণ নিয়ে পায়তারা করছিস।

চুপ মেরে আছিস কেন? হাঁটু গাড়, হাঁটু গাড়, হারামজাদী—হাড়-বজ্জাত মাগী! [জোর করে লিজিকে হাঁটু গাড়াল]

[সিনেটার ক্লার্কের প্রবেশ]

সিনেটার ঃ ওকে ছেড়ে দাও।

ফ্রেড ঃ বাবা!

জন ঃ হ্যাল্লো সিনেটার!

ক্লার্ক ঃ হ্যাল্লো। [লিজিকে] উঠে দাঁড়াও ত বাছা।

জন [লিজিকে] ঃ ইনি হচ্ছেন সিনেটার ক্লার্ক।

ক্লার্ক [লিজিকে] ঃ হ্যাল্লো লিজি।

লিজি ঃ হ্যাল্লো।

ক্লার্ক ঃ বেশ! বেশ! [লিজিকে ভাল করে দেখে] মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর মনটা বড় নরম।

ফ্রেড ঃ ও সই করতে রাজী হচ্ছে না। বলছে, সই করবে না।

ক্লার্ক ঃ ঠিকই করেছে। তোমরা বিনা এক্তিয়ারে ওর ঘরে ঢুকে জোর জুলুম করে জবরদস্তি সই আদায় করবে—সেটি ত চলতে পারে না। এটা তোমাদের ভয়ানক অন্যায়। আমেরিকান হয়ে তোমাদের এ রকম অভদ্র আচরণ আদৌ সমর্থনীয় নয়। শুনলাম, নিগ্রোটা নাকি তোমায় ধর্ষণ করেছিল?

লিজি ঃ ভুল শুনেছেন।

ক্লার্ক ঃ না—না, তোমার কথা মিথ্যে হতে পারে না।

[একটু চুপ থেকে] বেচারি মেরী! চল সব। এবার যাওয়া যাক। যা হবার তা হবেই। মিছে আর কেন! মিস্ ম্যাকীর কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

[ফ্রেড, জন ও জেমস বেরিয়ে গেল]

লিজি ঃ মেরী কে?

ক্লার্ক ঃ আমার বোন, হতভাগা টমের মা। ও আর বাঁচবে না।

আচ্ছা চলি। [পা বাড়াল]

লিজি [রুদ্ধ কণ্ঠে] ঃ দাঁড়ান [ছুটে গেল]

ক্লার্ক ঃ বল।

লিজি ঃ আমি দুঃখিত।

ক্লার্ক ঃ যখন সত্যি কথা বলছ, তখন আর দুঃখিত হবার কী আছে?

লিজি ঃ সত্যি কথা বলতে কী......

ক্লার্ক ঃ তোমার, আমার কিছুই করবার নেই। তাছাড়া, তোমাকে জোর করে মিথ্যে বলতে

ক্যাপস্টান
কেনাই ভালো
আমাদের
সংমিশ্রণ
উৎকৃষ্টতর
MEDIUM STRENGTH
CAPSTAN
Navy Cut
CIGARETTES
W.D. & H.O. WILLS.
BRISTOL & LONDON.

শারদীয়ার অভিনন্দন
"আজি শরত-তপনে,
প্রভাত স্বপনে,
কী জানি পরাণ,
কী যে চায়"
শারদীয়ার আগমনী সুরে ভেসে আসে মনোরম বস্ত্রেরই কামনা।
J. S. Mohamedally
CLOTH MERCHANTS
TOWER HOUSE
CHOWRINGHEE SQ., CALCUTTA-1.

করবার কোন অধিকারও কারো নেই। না—
ার কথা আর মিছিমিছি ভেবে কী হবে?

লিজি : কার কথা বলছেন?

মার্ক : কেন, আমার বোনের। ওর ভাবনা
থেকে মুছে ফেলাই ভাল।

লিজি : তার কথা না ভেবে আমি পারব না।

সিনেটার : তোমার চোখ আমায় বলে দিচ্ছে
কী ভাবছ। আমি জানি তোমার মনের কথা।
ার মন বলছে, "যদি আমি সই করি তাহলে
টার তার বোনের কাছে গিয়ে বলবে, 'দেখ,
ম্যাকী বড় চমৎকার মেয়ে। তোমার ছেলের
বাঁচিয়ে দিল'। আর তা শুনে সিনেটারের
ঈষৎ হেসে অশ্রুসিক্ত চোখে বলবে, 'লিজি
ী! ওকে আমি জীবনে ভুলব না'। আমি
, "অদৃষ্টের পরিহাসে সমাজের বাইরে পড়ে
। আপন বলতে কেউ নেই। কেউ নেই
করবার, ভালবাসবার। তবুও ত একজনকে
যা যাবে যে আমাকে চিরদিন মায়ের মত
রাখবে।" যাকগে, ও সব ভেবে মিছি-
মন খারাপ করে লাভ কী?

লিজি : আপনার বোনের চুল কী শাদা?

সিনেটার : একেবারে বরফের মতন। কিন্তু
খানা বড় কাঁচ। আর কী সুন্দর তার
টুকু—তা যদি দেখতে? দুঃখ এই, সে আর
দিন হাসবে না। আচ্ছা, চলি।

লিজি : চললেন!

সিনেটার : হাঁ, বোনের কাছে যাচ্ছি। তাকে
সব বলতে হবে।

লিজি : তিনি কী জানেন আপনি এখানে?

সিনেটার : সেই তো তোমার কাছে আমাকে
লে।

লিজি : হা ভগবান! তিনি সেখানে বসে
ভাবছেন, আর আপনি কিনা তাঁকে গিয়ে
বেন যে আমি সই দিইনি। শুনে নিশ্চয়ই
আমাকে ঘৃণা করবেন।

সিনেটার [লিজির কাঁধে হাত রেখে] :
জি, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি
খান থেকে নাক গলাতে চাই না।

লিজি : কী অদৃষ্ট! এখন দেখছি ধর্ষিতা
নই যেন ভাল হতো!

সিনেটার [ব্যথিত হয়ে] : বেচারি।

লিজি [দুঃখের সহিত] : সে হলে বরং
ন ছিল। আপনাদেরও সুবিধে হত আর
আরও তেমন কিছু এসে যেত না।

সিনেটার : ধন্যবাদ! [একটু চুপ থেকে]
, আমার ইচ্ছে ছিল তোমাকে সাহায্য করি,
ন্তু সত্য যা তা সত্যই।

লিজি [দুঃখের সহিত] : তা যা বলেছেন!

সিনেটার : আর সব চাইতে বড় সত্য হল,
গ্রোটা তোমায় ধর্ষণ করেনি।

লিজি : সে কথা ঠিক।

সিনেটার : হাঁ, তবে ব্যাপারটা হল একটা
লিক সত্যের প্রশ্ন।

লিজি [কিছু বুঝতে না পেরে] :
লিক সত্য!

সিনেটার : মানে......আদিম ও অকৃত্রিম
।

লিজি : আদিম ও অকৃত্রিম! আসলে এটা
তা?

সিনেটার : নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—একশ'বার!
ব কী জানো, সত্যেরও একটু ঊনিশ-বিশ
ছে।

লিজি : আপনার কী ধারণা যে, আমি
ধর্ষিতা?

সিনেটার : আরে, না—না। একদিক থেকে
বিচার করতে গেলে নিগ্রোটা তোমায় আদৌ
ধর্ষণ করেনি। তবে এ'ক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে
আমার একটু মতের পার্থক্য আছে।

লিজি : আপনি কী বলতে চান?

সিনেটার : কী করেই বা তোমাকে সমঝাই।
ধর, আমেরিকার আত্মা-পুরুষ হঠাৎ তোমার
ঘরে এসে ঢুকল। বলত, তিনি তোমাকে কী
বলবেন?

লিজি [সভয়ে] : আমার ত মনে হয়
আমাকে বলবার মত বিশেষ কিছু নেই:

সিনেটার : তুমি কী কম্যুনিস্ট?

লিজি : বাঃ-রে! কম্যুনিস্ট হতে যাব কোন্
দুঃখে।

সিনেটার : তবে তোমাকে তাঁর অনেক
কিছুই বলবার আছে। তিনি বলবেন, "লিজি,
আমার দু'টি সন্তানের মধ্যে তোমাকে একটিকে
বেছে নিতে হবে। যেটা ভাল সেটা থাকবে, আর
যেটা মন্দ সেটা যাবে নিশ্চিহ্ন হবে। যে
নিগ্রোটাকে বাঁচাতে চাইছ, তার কী দাম আছে?
নিগ্রো কোথায় জন্মেছে, ঈশ্বর জানেন।
নিগ্রোকে আমি খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি।
কিন্তু প্রতিদানে সে কী দিচ্ছে? সে শুধু গান
গেয়ে, বখামি করে, রং-বেরং-এর সুট আর টাই
কিনে ফক্কুড়ি-ফাজলামি করে গায়ে হাওয়া
লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। নিগ্রো আমার ছেলে। তাকে
আমি স্নেহ করি। কিন্তু তার জীবন কি
মানুষের জীবন? সে মরে পড়ে থাকলেও আমি
তার দিকে ফিরে চাইব না। অথচ শ্বেতকায়
টমাস ছেলেটাকে দেখ কী সুন্দর! স্বীকার করি,
কালো ছেলেটাকে গুলী করে সে অন্যায় করেছে।
তবুও আমার টমকে চাই। ও যে প্যুরোপুরি
আমেরিকান। ও যে একটা প্রাচীন বংশের বংশ-
ধর, উচ্চশিক্ষিত অফিসার। ওর কারখানায়
খাটছে দু' হাজার লোক, ও দু' হাজার লোকের
অন্নদাতা। ও মরলে দু' হাজার লোক হবে
বেকার। ইহুদী, কম্যুনিজম আর ট্রেড ইউনিয়ন-
নিজমের সর্বনাশা আক্রমণ থেকে আমেরিকাকে
বাঁচাতে হলে টমই হ'ল একমাত্র নির্ভরযোগ্য
নেতা। টমের কর্তব্য বেঁচে থাকা আর তোমার
কর্তব্য ওকে বাঁচানো। এখন বেছে নাও কাকে
রাখবে আর কাকে ফেলবে।"

লিজি : আপনি কী সুন্দর বলেন!

সিনেটার : বেছে নাও!

লিজি [লাফিয়ে উঠে] : কী করব? ওঃ,
হাঁ...... [চুপ করে থেকে] আমার সব গোল-
মাল হয়ে যাচ্ছে। কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

সিনেটার : লিজি, আমার দিকে তাকাও,
আমাকে তুমি বিশ্বাস কর?

লিজি : নিশ্চয়ই।

সিনেটার : তুমি কী বিশ্বাস কর, তোমাকে
আমি অন্যায় কিছু করতে বলব?

লিজি : আজ্ঞে—না।

সিনেটার : তবে তুমি সই কর। এই নাও
কলম।

লিজি : সই করলে উনি খুব খুসী হবেন
—না?

সিনেটার : কার কথা বলছ?

লিজি : আপনার বোনের।

সিনেটার : নিশ্চয়ই। সে তোমাকে নিজের
মেয়ের মত ভালবাসবে।

লিজি : আমাকে ফুল পাঠাতে পারেন—
কেমন?

সিনেটার : অসম্ভব নয়।

লিজি : কিংবা সই-করা ফটোগ্রাফ—
কী বলেন?

সিনেটার : তাও হতে পারে।

লিজি : আমি তাহলে দেয়ালে টাঙিয়ে
রাখব। [পাইচারি করতে করতে] কী সব
গোলমেলে কান্ড! [সিনেটারের কাছে এসে]
আচ্ছা, সই করলে নিগ্রোটার কী হবে?

সিনেটার : নিগ্রোটার? তেমন কী আর......
[লিজির কাঁধে হাত রেখে] যদি সই কর গোটা
সহরটা তোমায় আপন করে নেবে। আর সহরের
সব মায়েদের তুমি হবে আদরের দুলালী!

লিজি : কিন্তু........

সিনেটার : তুমি কী মনে কর এই সহরের
মেয়ে-মদ্দ, উকিল-ডাক্তার, মন্ত্রী-মেয়র শিল্পী
সাহিত্যিক—সবাই মিলে আমরা ভুল করছি?

লিজি : না—না—তা বলছি না আমি।

[ফ্রেড-জন-জেমসের পুনঃ প্রবেশ]

সিনেটার : নাও সই কর। [জোর করে
লিজির হাতে কলম গুঁজে দিয়ে] বাঃ, লক্ষ্মী
মেয়ে। আমার বোনের হয়ে, ভাগ্নের হয়ে, সহরের
হাজার শ্বেতকায়দের হয়ে তোমায় আমি ধন্যবাদ
জানাচ্ছি লিজি। আর জানাচ্ছি আমাদের আমে-
রিকান জাতির তরফ থেকে। বিদায় লিজি,
আবার দেখা হবে! এস হে তোমরা।

[সিনেটার নিষ্ক্রান্ত হলেন]

ফ্রেড : গুড বাই, লিজি!

লিজি : গুড বাই! [ওরা চলে গেল।
দোমড়ান পুতুলের মত লিজি দাঁড়িয়ে রইল।
তারপর হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে ছুটে গেল দরজার
কাছে] সিনেটার! সিনেটার! দয়া করে শুনে
যান! কাগজটা ছিঁড়ে ফেলুন—ছিঁড়ে ফেলুন!
[ফিরে এসে 'ভ্যাকুয়ামক্লীনার'-এর হাতলটা তুলে নিল]
আত্মা-পুরুষ! আমেরিকান জাতি! গুষ্ঠীর
পিন্ডি!!! [প্লাগ খুলে দিয়ে যন্ত্রটা জোরে
জোরে ঘষতে লাগল]।

—যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যপট অপরিবর্তিত। বার ঘণ্টা পরের
ঘটনা। ঘরে আলো জ্বলছে। জানলা খোলা।
বাইরে হৈ-চৈ শব্দ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
নিগ্রোটা জানলার নীচে এসে দাঁড়াল। তারপর
জানলা টপকে এক লাফে ঘরে ঢুকে পড়ল। সে
প্রায় মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়েছে এমন সময়
দরজায় ঘণ্টা বাজল। সে গিয়ে পর্দার আড়ালে
গা ঢাকা দিল। লিজি বাথরুম থেকে বেরিয়ে
এসে দরজা খুলে দিল।]

লিজি : ভিতরে আসুন। [সিনেটারের
প্রবেশ] তারপর, কী খবর?

সিনেটার : টমাস খালাস পেয়েছে। তাদের
হয়ে তোমায় ধন্যবাদ জানাতে এলুম।

লিজি : আপনার বোন এবার খুসী
হয়েছেন তো?

সিনেটার : সে কথা আর বলতে!

লিজি : দাঁড়িয়ে কেন? বসুন-না!

সিনেটার : ধন্যবাদ।

লিজি : ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুব কাঁদছেন
—না?

সিনেটার : কন্যা! না—না, কাঁদতে যাবে কেন? সহজে ভেঙে পড়বার মত মেয়ে সে নয়!

লিজি : আপনি বলে গেলেন তিনি খুব কাঁদছিলেন।

সিনেটার : সেটা তেমন কিছু নয়।

লিজি : তিনি এতটা ভাবতে পারেননি! ভেবেছিলেন, আমি নষ্ট-দুষ্ট মেয়ে নিগ্রোটার হয়েই সাক্ষী দেব।

সিনেটার : মেরী, ঈশ্বরের হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছিল।

লিজি : আমার কথা তিনি কী বল্লেন?

সিনেটার : তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

লিজি : আমি কে, কেমনতর মেয়ে—এসব কিছু জিজ্ঞেস করেছেন?

সিনেটার : কিছু না।

লিজি : তাঁর কী ধারণা আমি সই করে ঠিক কাজ করেছি?

সিনেটার : একশ'বার। আর ভবিষ্যতেও যে করবে, এটাও আশা করে।

লিজি : হুঁ।

সিনেটার : শোন লিজি, [লিজির কাঁধে হাত রেখে] যা' করেছ ন্যায্য কাজই করেছ। আশা করি এর ব্যতিক্রম করে মেরীর মনে দুঃখ দিতে তুমি চাও না।

লিজি : সেজন্যে আর আপনাদের ভাবতে হবে না। কলে ফেলে কাজ হাঁসিল করে নিয়েছেন, এখন ত' আর উপায় নেই। [একটু চুপ থেকে] বাইরে অত গোলমাল কিসের?

সিনেটার : ও কিছু না।

লিজি : অসহ্য লাগছে এই বিশ্রী হল্লা। [জানালার কাছে গিয়ে] সিনেটার!

সিনেটার : বল।

লিজি : আপনি ঠিক জানেন আমি কোন ভুল করিনি?

সিনেটার : নিশ্চয়ই।

[বাইরের হট্টগোল আরো উৎকট হয়ে ওঠেল]

লিজি : মাথা-মুণ্ডু কিছুই ছাই বুঝতে পারছি না। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! ক'টা বাজল?

সিনেটার : এগারটা।

লিজি : ভোর হতে এখনও দু'টি ঘণ্টা! আজ আর ঘুম হবে না। [একটু ভেবে] নিগ্রোটার হাল কী হবে?

সিনেটার : নিগ্রোটার? ওরা ত' ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লিজি : ধরতে পারলে কী করবে? [সিনেটার কাঁধ ঝাকুনি দিলেন। ভাবটা, তিনি কিছু বলতে পারেন না। বাইরে হট্টগোল বেড়েই চলেছে। লিজি কৌতূহলী হয়ে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল] কীসের এত হৈচৈ গোল! টর্চ আর কুকুর নিয়ে এত লোক কী মিছিল করতে বেরিয়েছে? না অন্য কিছু......সিনেটার, ব্যাপার কী বলুন তো?

সিনেটার [পকেট থেকে একটা খাম বের করে] : আমার বোন তোমায় এটা দিতে বলেছে।

লিজি : চিঠি! আমাকে চিঠি দিয়েছেন তিনি!!! [খামটা ছিঁড়ে দেখল চিঠি নয়, একশ' ডলারের একখানা নোট। খামটা দুমড়ে হাতে .... দিয়ে রুক্ষকণ্ঠে] একশ ডলার! আপনার ... দিতে চেয়েছিলাম পাঠিয়ে! চারশ ডলার বাঁচাতে পেরে খুসী হয়েছে। নিশ্চয়।

সিনেটার : ঠিক তা নয় লিজি। ব্যাপারটা...

লিজি : আপনার বোনকে ধন্যবাদ। ওর চাইতে নিজে দেখেশুনে লিপস্টিক কিংবা একজোড়া মোজা পাঠালেই পারতেন! [নোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে] আপনাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ! বিশ্বাস করে মাটি খেয়েছি!

[চুপচাপ। ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। সিনেটার একপা' এগিয়ে এসে]

সিনেটার : মিছিমিছি মাথাগরম করে কী হবে লিজি? তার চাইতে এস মাথা ঠাণ্ডা করে এ নিয়ে আলোচনা করা যাক্। তোমার মনে এখন একটা নৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছে। এসময়ে আমার সাহায্য তোমার দরকার।

লিজি : আমার দরকার এখন স্কচ্ হুইস্কীর। আশা করি আপনি এখন বুঝতে পারছেন যে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশ বুঝে নিয়েছি।

সিনেটার : তোমার কতকগুলো স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ আছে, কিন্তু নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার দোষে সেগুলো তুমি নষ্ট করছ। [লিজির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল] আজ তবে উঠি। পারি ত' পরে একদিন আসব।

[সিনেটার নিষ্ক্রান্ত হলেন। লিজি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নোটটা তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে দলা করে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগল। বাইরের গোলমালটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। দূরে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। নিগ্রো পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। লিজি মুখ তুলে আবার কাঁদতে লাগল]

লিজি : ঢুকলে কী করে?

নিগ্রো : জানলা টপকে।

লিজি : তা ত বুঝলুম। কিন্তু এখানে কী চাই?

নিগ্রো : যদি লুকিয়ে রাখেন!

লিজি : সে হবার নয়। তোমায় আগেই বলেছি।

নিগ্রো : বাইরে কী হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন?

লিজি : খুব।

নিগ্রো : ওরা শিকার করতে বেরিয়েছে, এটা বুঝতে পেরেছেন?

লিজি : শিকার! কিসের শিকার?

নিগ্রো : মানুষ-শিকার!

লিজি : হুঁ। [কিছুক্ষণ চুপ থেকে] ঠিক বলছ, ওরা তোমায় দেখতে পায়নি?

নিগ্রো : আজ্ঞে, না—মোটেই না।

লিজি : ধরা পড়লে তোমার কী দশা হবে?

নিগ্রো : গ্যাসোলিন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

লিজি : কী দিয়ে?

নিগ্রো : গ্যাসোলিন। [মুখে আতঙ্কের ভাব]

লিজি : বসো। [নিগ্রো ধুপ করে চেয়ারে বসে পড়ল]

তুমি কী আমায় নিষ্কৃতি দেবে না? [উঠে গিয়ে নিগ্রোর সামনে রুদ্র মূর্তি ধরে] জানো, আমি ঝঞ্ঝাট ভালবাসি না। [মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে] দস্তুরমত—রীতিমত ঘৃণা করি।

নিগ্রো : আমাকে খুঁজতে ওরা হয়ত এখানে আসবে না?

লিজি : ওরা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন?

নিগ্রো : আমি নাকি আপনার উপর বলাৎকার করেছি।

লিজি : এ কথা ওদের কে বলেছে—জানো?

নিগ্রো : আজ্ঞে, না।

লিজি : আমি বলেছি। [নিগ্রো নির্বাক বিস্ময়ে লিজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল] অবাক লাগছে—কেমন?

নিগ্রো : কেন আপনি বলতে গেলেন মাডাম্—কেন?

লিজি : কেন বলতে গেলাম? সে কথাই কেবল ভাবছি। ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

নিগ্রো : ওরা কোন ক্ষমা-ঘেন্না করবে না। চাবুক মেরে চোখ ফাটিয়ে দেবে। তারপর গায়ে টিন গ্যাসোলিন ঢেলে পুড়িয়ে মারবে। কেন আপনি ও কথা বলতে গেলেন? আমি ত কোন ক্ষতি করিনি আপনার?

লিজি : হ্যাঁ-হ্যাঁ করেছ। তোমার ধারণা নেই কত বড় ক্ষতি তুমি আমার করেছ। [একটু চুপ থেকে] আমার ঘাড়টা মটকে দিতে পার না? তুমি বড্ড ভালমানুষ। [আরো খানিক চুপ থেকে] কাল রাত পর্যন্ত তোমায় লুকিয়ে রাখতে পারি। [নিগ্রো কৃতজ্ঞ হয়ে ওর পায়ে হাত দিতে গেল] খবরদার, আমায় ছুঁয়ো না। কালো আদমী আমার দু' চোখের বিষ। [বাইরের চীৎকার ক্রমেই এগিয়ে আসছে] ওরা এদিকে আসছে। [আলো নিভিয়ে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দা ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে] সর্বনাশ! বোধ হয় ধরা পড়ে গেলাম!

নিগ্রো : কেন? ওরা কী করছে?

লিজি : রাস্তায় রাস্তায় ওরা পাহারা রেখেছে, আর বাড়ী বাড়ী তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করছে। তুমি এ এইমাত্র ঢুকলে। হয়ত কেউ দেখে থাকবে। [আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে] নাঃ, দেরী হয়ে গেছে। ওরা উপরে আসছে।

নিগ্রো : ক'জন?

লিজি : পাঁচ ছ'জন হবে। বাকি সব নীচে দাঁড়িয়ে। [নিগ্রো পালাবার চেষ্টা করল] অমন ঠক ঠক করে কাঁপছ কেন? ... অমন করে কাঁপলেনি? [গলার হারটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে] ভয় নেই। কোন অন্যায় তুমি করনি। [নিগ্রোটা উঠে পালাতে চেষ্টা করতে] চুপ করে বসে থাক। বাইরে গেছ কী, একেবারে দফা-রফা!

নিগ্রো : কেন ছাড়েন!

লিজি : ছাড়ো! তা আবার এই চাঁদনী রাতে! পাগল নাকি? গুলী মেরে ঝাঁঝরা করে দেবে। [একটু ভেবে নিয়ে] দাঁড়াও। ওদের আসতে এখনও একটু দেরী আছে। একতলা দোতলা আগে শেষ করুক। [নিগ্রোটা ভয়ে চেয়ারে গুটিশুটি মেরে বসে রইল। লিজি অস্থিরভাবে পাইচারী করতে লাগল]

লিজি : তোমার কাছে বন্দুক আছে?

নিগ্রো : আজ্ঞে না।

লিজি : নেই? আরে এই ত মনে পড়েছে! [সুটকেস খুলে একটি রিভলবার বের করল]

নিগ্রো : ওটা দিয়ে কী করবেন আপনি?

লিজি : কী করব? বলছি শোন, দরজা খুলে দিয়ে ওদের ভেতরে আসতে বলব। মাতৃস্নেহের তত্ত্বকথা শুনিয়ে, বীরত্বের বুলি আউড়ে আর আমেরিকান আধা-পুরুষের বুজরুকি দেখিয়ে ওরা আমায় পাঁচিশ বছর ধরে সমানে ধাপ্পা দিয়ে এসেছে। আর আমি ওদের ধান

হিমালয় সমারোহ

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

দরকার। হিমবাহের মধ্যে কখনও কখনও গভীর খাদ থাকে, আবার কোন সময় কোনাচে বরফের স্তূপগুলি (Serac) সামান্য আঘাতে গায়ের ওপর ভেঙ্গে পড়ে মানুষকে সমাধিস্থ করতে পারে। সামান্য অভিজ্ঞতার পর কোথায় বরফের চাঁই ধ্বসে পড়তে পারে তা সহজেই জানা যায়। বেলা বেশী হলে রোদের তাপে বরফ গলে এই সব ধ্বসের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা হলে অভিযাত্রীরা বেলা ১২টার মধ্যে এই সব স্থানে আরোহণ করেন। বরফের সঙ্গে কখনও বড় পাথরের চাঁই পড়ে মানুষকে আহত করতে পারে।

বিঘ্নসঙ্কুল হিমস্তরে চলার সময় অভিযাত্রীরা একে অপরের সঙ্গে কোমরে সিল্কের দড়ি বেঁধে থাকেন। যে ব্যক্তি আগে থাকেন, তাঁর ওপর সমস্ত দলের নিরাপত্তা নির্ভর করে। এই কাজে এতবেশী পরিশ্রম যে, দিনের মধ্যে কয়েকবার সামনের লোকটিকে পালাক্রমে বদল করার প্রয়োজন হয়। মধ্যেকার কোন লোকের পদস্খলন হলে তিনি শূন্যে ঝুলতে থাকেন এবং অন্য সকলে তখন তাঁকে দড়ি ধরে টেনে তোলেন।

পেঁজা তুলোর মত নরম বরফ থাকলে সে পাহাড়ের পথ পিচ্ছিল। এক্ষেত্রে কয়েকদিন অপেক্ষা করে বরফকে জমাট বাঁধতে দেওয়া উচিত। জমাট বরফে হাঁটার সময় জুতোর তলায় এক রকম লোহার কাঁটা Crampon লাগাতে হয়। এই কাঁটা বরফকে এমন শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে যে, পিছলালে কোন ভয় থাকে না। শক্ত বরফ যখন খাড়া উঠে যায়, তখন তুষার-কুঠার (Ice axe) দিয়ে সিঁড়ির মত ধাপ তৈরী করার প্রয়োজন।

তুষারকুঠার আকৃতিতে একটি গাঁইতির মত, এক দিকের পাতটি চ্যাপটা অপরটি ছুঁচালো।

পাহাড়ের ওপর ঠান্ডা বাতাসের বেগ অতি তীব্র। এজন্য বাতাস প্রবেশ করতে পারেনা, এমন একটি সিল্কের জামা পরা প্রয়োজন। পায়ের জুতাটিতে যেন জল না ঢুকতে পারে। পায়ের আঙ্গুলগুলিকে হিমদংশন (Frost bite) থেকে বাঁচাবার জন্য দু'তিন জোড়া হাতেবোনা গরম মোজা পরা দরকার—আর মাথায় কান-ঢাকা গরম টুপী, হাতে দু'জোড়া আঙ্গুলহীন দস্তানা।

দিনের বেলায় বরফের উপর সূর্যতাপ এত প্রতিফলিত হয় যে, অনেক সময় গায়ের চামড়া পুড়ে যেতে পারে। মুখে বা হাতে এজন্য এক প্রকার সূর্যতাপনিরোধক মলম লাগানো দরকার। অতিবেগুনি আলোর (Ultra-violet) হাত থেকে বাঁচবার জন্য চোখে রঙিন চশমা না পরলে হিমান্ধ (Snow blind) হতে হয়। রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয় হাল্কা সিল্কের তাঁবুতে। প্রচন্ড শীত—তাই শয়নের ব্যবস্থা এক জোড়া পালকের খোলের (Sleeping bag) মধ্যে।

পৃথিবীর অন্যান্য পর্বতের তুলনায় হিমালয় অভিযানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে প্রধান, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, উচ্চতা-অসুস্থতা (Altitude-sickness)।

উচ্চস্তরে ওঠার সময় বাতাসে অম্লজান বাষ্প কম হয় ও বায়ু-চাপ হ্রাস পায়। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের হৃদস্পন্দন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ধমনীর গতি এতো অসম্ভব বেড়ে যায় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠে যে মানুষের ধমনীর গতি থাকে মিনিটে ৭২ বার, ১২০০০ ফিটে সেটি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৯০ বার। ২০০০০ ফিটে হয় মিনিটে ১০০ বার। এ-ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টও ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সমর বৈজ্ঞানিকরা লোহ-গোলকের মধ্যে মানুষকে বন্ধ করে নানারকম গবেষণা সুরু করেন। এঁরা হাল্কা বায়ুস্তর সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেন, তার কয়েকটি এখানে বলছি। ধরুন—সমুদ্রপৃষ্ঠ (Sea level) থেকে কোনো লোককে বায়ুযানে উঠিয়ে হঠাৎ যদি ২০০০০ ফিট পাহাড়ে প্যারাসুট দিয়ে নামান হয়, তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান হারাবেন। ২৫০০০ ফিটে তাঁর জ্ঞান থাকবে মাত্র ৮ মিনিট। তেমনি ২৭০০০ ফিটে তাঁকে ফেলে দিলে তিন মিনিটের মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ ঘটবে। এর চেয়ে বেশী মাত্রায় অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়নি। কেননা যাঁকে নিয়ে অনুসন্ধান করা, এতে তাঁর প্রাণ হারাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

একনাগাড়ে কয়েকদিন হিমপর্বতে বাস করার পর শরীর ক্রমে ক্রমে উচ্চতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অভ্যস্ত হওয়াকে ইংরাজীতে acclimitisation বলা হয়।

এভারেস্ট আরোহণের ইতিহাসে মানুষ কী করে ধীরে ধীরে নিম্ন বায়ুচাপে অভ্যস্ত হয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৯২৪ সালে ওডেল (Odell) ২৬০০০ ফিটের ঊর্ধ্বে সময় সময় অম্লজান বাষ্পের সাহায্য না নিয়েও কয়েকদিন কাটান। ১৯৩৩ সালে স্মাইথ (Smythe) ও শিপটন (Shipton) ২৭৪০০ ফিটে তিন রাত্রি বাস করেন। এক জায়গায় তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন—

'আমরা যেভাবে ছ নম্বর তাঁবু থেকে বেরোলাম, তা যে কেউ দেখলে বলত, "এই যে দুজন গুন্ডা গোছের লোক যাচ্ছে, তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।"

কতদিন পাহাড়ে বাস করার পর উচ্চতা-অভ্যস্ততা জন্মায়, তা বলা কঠিন। এবারকার এভারেস্ট অভিযাত্রী দল মূল অভিযানের আগে তিন সপ্তাহ ১৪০০০ ফিট উঁচু থ্যাংবোচে (Thyangboche) গ্রামে বাস করেন।

হিলারীর কথাই ধরা যাক। ১৯৫১ সালের জুন মাসে নিউজীল্যান্ড দলের সঙ্গে গাড়োয়ালের মুকুট পর্বতে ২১০০০ ফিট অবধি ইনি ওঠেন। সেই বছর অক্টোবরে ইংরাজ দলের সঙ্গে খুম্বু হিমপ্রপাতে (Khumbu icefall) ২১০০০ ফিট অবধি তাঁকে আরোহণ করতে দেখা যায়। টেসী লাপচা (২০০০০ ফিট) হিমবাহের ওপর যেভাবে প্রচুর প্রাণশক্তির সাহায্যে হিমপ্রপাত পার হবার চেষ্টা করছিলেন, তা দেখে আমি যে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম সেকথা অস্বীকার করব না। পরের বছর (জুন ১৯৫২) চো ইয়ু (Cho Oyu) ২৬৭৫০ ফিট অভিযানে তিনি ২২৫০০ ফিট অবধি উঠেছিলেন।

শেরপা তেনজিং বহু হিমালয় অভিযান ছাড়াও ১৯৫২ সালে দুবার যথাক্রমে ২৮২১৫ ও ২৬৭৫০ ফিট অবধি চড়েছিলেন। এভারেস্ট বিজয়ের অধিকার যে তেনজিং ও হিলারী অর্জন করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অন্য যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে শীততাপ বৃদ্ধি অন্যতম। ২৮০০০ ফিটে সাধারণ চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রিতে ঠান্ডা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত নামতে পারে। আবার এ-সময়ে প্রতিকূল আবহাওয়া বা তুষার-ঝঞ্ঝা থাকলে শীতমান (temperature) আরও নীচে নামতে পারে। ঠান্ডা ও অম্লজান বাষ্পের স্বল্পতার জন্য রাতে ভালো ঘুম হয় না। এই পাতলা ঘুম আবার প্রথম প্রথম তুষার ধ্বসের

(ইহার পর ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

নাং পা লা নামক স্থানে লেখকের ব্যাম্প

ধিরের শ্রবণশক্তি ?

চিরতরে আরোগ্য—পুনরাক্রমণের ভয় নাই

বধিরতা—শ্রবণযন্ত্রে যে কোন প্রকার গোল ঘটুক না কেন অতি সহজেই শ্রবণশক্তি ফিরাইয়া আনা হয়। গ্যারাণ্টিযুক্ত এবং ঔষধ **"এয়ারেন্ড পিলস এন্ড র‍্যাপিড ইয়ার ড্রপ"** (রেজেষ্টিকৃত) (একত্রে ব্যবহার্য) পূর্ণমাত্রা ৩৭৮/০ আনা, পরীক্ষামূলক সংখ্যা ১২৮/০ আনা।

শ্বেতী বা ধবল—শরীরে শাদা দাগ অল্পমাত্র ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য করিবার ঔষধটি আধুনিকতম উপাদানে প্রস্তুত ও উদ্ভিদবিজ্ঞানসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষিত **"লিউকোডারমাইন"** (রেজেষ্টিকৃত) প্রতি বোতল—২৫৮/০ আনা। ইতিমধ্যেই ইহার খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বংশানুক্রমিক হউক বা যে কোনপ্রকার ধবল হউক না কেন, ঔষধ সেবনে আরোগ্যের গ্যারাণ্টি আমরা দৃঢ়তার সহিত দিয়া থাকি।

অ্যাজমা কিউর—আপনি অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে রোগ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছে মাত্র। আপনি অন্যদিনের মত হাঁপানীর হাত হইতে মুক্তি চান? বহুদিনের পুরাতন যে কোন প্রকারের হাঁপানী, ব্রংকাইটিস হউক না কেন, সাফল্যের সহিত চিরতরে আরোগ্য করা হয়। মূল্য ১২৮/০।

ডাঃ শ্যারম্যান এফ সি এস (ইউ এস এ),
৮, রামধন মিত্র লেন, পোঃ বক্স ২৩০৯, কলিকাতা।

নিউ

বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রতিষ্ঠিত : ১৯৩৩

হেড অফিস—পি-২, **মিশন রো এক্সটেনশন**

নিউ বেঙ্গল ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ প্রভিডেণ্ট জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান। প্রভিডেণ্ট জীবন-বীমা জগতে 'নিউ বেঙ্গলের' স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়।

দুইশত টাকা হইতে এক হাজার টাকার জীবন-বীমা পলিসি 'নিউ বেঙ্গল' হইতে প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়. অল্প প্রিমিয়াম দিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার জন্য প্রত্যেক মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক পরিবারেই 'নিউ বেঙ্গলের' পলিসি থাকা আবশ্যক।

'নিউ বেঙ্গলের' জীবন-বীমার প্রস্তাব সংগ্রহ করিবার জন্য কলিকাতা ও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জিলাসমূহে, আসামে এবং ত্রিপুরায় কয়েকজন এজেণ্ট ও অর্গানাইজার নিযুক্ত করা হইবে। বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদন করুন।

শ্রীসত্যকিঙ্কর মজুমদার,
বি-এ; এল, এল, বি
ম্যানেজার ও চেয়ারম্যান।

সুরুচি ও সুনামের জন্য খ্যাত

সুরুচিবিজ্ঞান ও পছন্দের জন্য খ্যাত এদেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ পরিবারে

জনতা ষ্টোর্স কে

মহিলা-পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের উৎকৃষ্ট শাড়ী, অনুষ্ঠানের পোষাক, অন্যান্য পরিচ্ছদ ও জুতা প্রভৃতির অকৃত্রিম গ্যারাণ্টি বলিয়া মনে করা হয়।

কোন মার্জিতরুচি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলাকে উপহার দিতে হইলে জনতার শাড়ীই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাপেক্ষা ভাল শাড়ী কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দিতে পারে না।

জনতা ষ্টোর্স

৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

উপত্যকা পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গে দশ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হইবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ফলে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় খারিফ শস্যের মওসুমে (জুন হইতে অক্টোবর) ৬ লক্ষ একর এবং রবিশস্যের মওসুমে (নভেম্বর হইতে মে) ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে জলসেচন সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া আরও বিশটি পরিকল্পনা আছে এবং এই সকল ছোটখাট সেচ পরিকল্পনাগুলি বাবদ ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে যে দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইবে, তাহা ছাড়া অন্যান্য ছোট বড় সেচ পরিকল্পনা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি দ্বারা আরও ১৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে।

আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা যথাসম্ভব ব্যাপক এবং কৃষি খাতে সমস্তগুলি পরিকল্পনা বাবদ মোট ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

উন্নত ধরণের গো-মহিষাদি প্রজনন

কৃষির উন্নতির জন্য যত প্রচেষ্টাই করা হউক না কেন, এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি না দিলে আমাদের লক্ষ্য কখনও সফল হইতে পারে না। পশু-পালন ও [illegible] ব্যবস্থা কৃষির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে [illegible] উন্নত ধরণের গো-মহিষাদির [illegible] কথা [illegible]। এই প্রশ্নের [illegible] সেই সময়ের অপেক্ষাও বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলতঃ এবারে যুক্তিযুক্তভাবেই পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনায় [illegible] পশুর উৎকর্ষ সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। হরিণঘাটায় কেন্দ্রীয় গবাদি পশু [illegible] গবেষণাগার এবং [illegible] কেন্দ্র [illegible] ধরণের গবাদি পশু সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফলে, বর্তমানের [illegible] পশুর পরিবর্তে কালে হৃষ্টপুষ্ট [illegible] পশু পাওয়া সম্ভব হইবে। কৃত্রিম প্রজনন-ব্যবস্থা দ্বারাও [illegible] পশুর উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হইতেছে। বর্তমানে পশু-পালন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সকল পরিকল্পনা চালু হইয়াছে তাহাতে ৭১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

আরও মাছ—আরও দুধ

কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দুধ যোগানের সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। এই রাজ্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ যে দুধ দরকার, তাহাও পাওয়া যায় না। দেহপুষ্টির জন্য প্রয়োজন বিবেচনায় আমাদের বৎসরে ২২ লক্ষ টন দুধ দরকার, কিন্তু আমরা ৪ লক্ষ টনের বেশী পাই না। যেটুকু দুধ পাওয়া যায়, তাহা আরও ভাল হওয়া দরকার। এই সকল অসুবিধা যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং খাঁটি দুধ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইয়াছে।

দুধের মত মাছের দিক দিয়াও আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭ লক্ষ টন মাছ ও মাংস দরকার, কিন্তু আমাদের এখানে ৪ লক্ষ টনের বেশী পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বাঁধা খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য। রাজ্যের মধ্যকার ফিসারীগুলির উন্নতি এবং উপকূলবর্তী সমুদ্র-খাঁড়ি হইতে মাছ ধরার ব্যবস্থার প্রসার দ্বারা এই ঘাটতি কিছু পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। সামুদ্রিক মাছ ধরার পরিকল্পনা বাবদ ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, রাজ্যের মধ্যকার ফিসারীগুলি বাবদ ৮৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং ফিসারীর উন্নতির বাবদ অন্যান্য পরিকল্পনায় [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বাবদ মোট ব্যয় হইবে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

বনসম্পদ সংরক্ষণ

দেশের বৈষয়িক জীবনে বনসম্পদের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা আমরা অনেক দেরীতে বুঝিয়াছি। বনসম্পদের সুপরিকল্পিত ভাবে সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান না হইলে দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবীরূপে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। মৃত্তিকাক্ষয় এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন না থাকায় আমাদের দেশে বনসম্পদের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া, বে-সরকারী বনগুলি নির্বিচারে নির্মূল করিয়া ফেলার পরিণতিতে আমরা কেবল যে বনজ-সম্পদ হারাইয়াছি তাহা নহে, ভূমিরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] দেশের রাজ্যের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ ভূমিতে জঙ্গল থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের মাত্র [illegible] শতাংশ জমিতে জঙ্গল রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বনসম্পদের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য দিয়া সরকারী [illegible] জমিতে বনানী সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মালিকদের সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা বে-সরকারী বনগুলির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বন-সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাবদ ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

রাজ্যের অর্থনীতিতে সড়কের গুরুত্ব

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক। পৃথিবীর সর্বত্রই সড়কের সুষ্ঠু বিন্যাসের ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ হইয়াছে। যানবাহন চলাচলের সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা না থাকিলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্বল্পব্যয়ে তাড়াতাড়ি একস্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণ সম্ভব হয় না। কাজেই উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রের মধ্যে সুবিন্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকিলে কোনও কৃষি পরিকল্পনাই দেশবাসীর পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় না। পশ্চিম বঙ্গের রাস্তা-সমস্যা দুই রকমের। প্রথমতঃ উৎপাদনের স্থান ও বাজারের মধ্যে সংযোগের জন্য রাস্তা দরকার। দ্বিতীয়তঃ দেশবিভাগের পরিণতিতে অবিলম্বে সামরিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্মাণ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা নির্মাণে ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রত্যেক ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামকে সুবিন্যস্ত রাস্তার সহিত সংযুক্ত রাখাই সরকারের লক্ষ্য। রাজ্যের ৪৮৮ মাইল রাজপথ, ১,০৮২ মাইল বড় রকমের জিলা সড়ক এবং প্রায় ২০০ মাইল পল্লীপথ নির্মাণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। এই বাবদ ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ছাড়া, এই রাজ্যের মধ্যে ২৯৬ মাইল দীর্ঘ যে জাতীয় রাজপথ পড়িয়াছে তাহার উন্নতিসাধনের জন্য ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। আরও রাস্তা নির্মাণের জন্য অন্যান্য সূত্র হইতেও অর্থ যোগানো হইবে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ যখন সমাধা হইবে তখন সরকারের সংরক্ষণাধীন রাস্তার দৈর্ঘ্য দাঁড়াইবে ৫০০০ মাইল, বাংলা বিভক্ত হওয়ার কালে আমাদের অংশে পড়িয়াছিল মাত্র ১,১৮১ মাইল রাস্তা।

স্বল্পব্যয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ

প্রায়ই এই কথা শোনা যায় যে, দেশে বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণই হইতেছে উহার সভ্যতার মাপকাঠি। এই ধরণের মন্তব্য অবশ্য অবিবেচনা-প্রসূত। বিদ্যুৎ খরচকে সভ্যতার মাপকাঠি হিসাবে না ধরিয়া, বরং দেশের বৈষয়িক উন্নতির সূচকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, যত বেশী পরিমাণ লোক গার্হস্থ্য কাজকর্মে ও শিল্প কারখানায় স্বল্পব্যয়ে বিদ্যুতের ব্যবহার করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নাই। এই জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই বাবদে ৭৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতার উত্তরবর্তী পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কলিকাতার উত্তরে যেসকল সহর ও পল্লী অঞ্চল আছে এই ব্যবস্থার ফলে ক্রমশঃ সেই সকল স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হইবে। ইহার জন্য এক হাজার বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া নানারূপ নির্মাণকার্য চালাইতে হইবে। ইহা ছাড়া, দামোদর উপত্যকা ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা হইতেও স্বল্পব্যয়ে বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। এই সকল পরিকল্পনা হইতে ৪০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

শিল্প প্রসার

কৃষি ও শিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। তাই, পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির জন্য লক্ষ্য দেওয়া হইলেও, শিল্পকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান খুব উচ্চ এবং এই রাজ্যে বড়, ছোট নানা আকারের বহু শিল্প ও অসংখ্য কুটীর-শিল্প রহিয়াছে। বড় বড় শিল্পগুলির নিজ কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখার সামর্থ্য আছে, কিন্তু ছোট-খাট শিল্প ও কুটীর-শিল্পগুলির সামর্থ্য খুবই নগণ্য। পশ্চিমবঙ্গে অন্যূন ৫ লক্ষ কুটীর শিল্পী ও কারিগর আছে। ইহারা বছরে ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য তৈয়ারী করিয়া থাকে। এই সকল শিল্পের সমস্যা নানাবিধ। বড় বড় শিল্পগুলির প্রসার সাধনের জন্য যে কার্যসূচী রচিত হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ অ্যালুমিনিয়াম, কৃষির সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, বয়ন কারখানার যন্ত্রপাতি, বাইসিকেল, সেলাই মেশিন, ইলেকট্রিক বাতি, কেবল্‌স, তার, ফ্যান, মোটর, বাতি ও ট্রান্সফর্মার, রেডিও রিসিভার, রাসায়নিক দ্রব্য, রাসায়নিক সার, ভেষজ ও ঔষধ, রং ও বার্ণিশ, সাবান,

ট্যানিং ও লেদার, পাট, দেশলাই, প্লাইউড, লবণ, চিনি, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গে অপেক্ষাকৃত সুবিধাও রহিয়াছে। কিন্তু ছোট-শিল্প ও কুটীর-শিল্পগুলি কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ইহাদের সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে কুটীর-শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৭৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য ৪২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। এই বাবদে মোট ব্যয় হইবে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

শিক্ষার স্থান সকলের উপরে

কৃষি, শিল্প বা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যাহা কিছুই করা হউক না, যে-মানুষের জন্য এই সবকিছু করা হইতেছে তাহার কথা বিস্মৃত হইলে মারাত্মক রকমের ভুল করা হইবে। অধিবাসীরা যেসকল সুযোগ সুবিধা অর্জন করিবে তাহা সর্বাধিক পরিমাণ কাজে লাগাইতে হইলে তাহাদের সুস্থ দেহ হওয়া দরকার, মনও সজাগ থাকা প্রয়োজন। রুগ্ন অথবা নিরক্ষর মানুষের কাছে ঐশ্বর্য বা বৈষয়িক সম্পদের কোনও মূল্য নাই। তাহা ছাড়া, ধন যাহারা উৎপাদন করে তাহারা যদি রুগ্ন অথবা নিরক্ষর হয়, তাহা হইলে ধনসম্পদও যথোচিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কারণ যাহারা উৎপাদক তাহারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা কি হওয়া উচিত তাহা বুঝিবে না, কাজেও তাহাদের মন বসিবে না। কাজেই, সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা বিশেষ নিষ্ঠার সহিত অনুসৃত হওয়া দরকার। ইহার মধ্যে শিক্ষার স্থানই প্রথম। এই জন্য রাজ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক, আবশ্যিক বনিয়াদী ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প আছে। এই বাবদ মোট ১৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু এই কার্যসূচী অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদের। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাবিস্তার বাবদ ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। প্রাথমিক বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারেরও সংকল্প আছে। এই খাতে ব্যয় হইবে ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান শিক্ষাদান, নারীদের জন্য কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উচ্চস্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যের সুযোগ দানের জন্য ৪৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা বাবদ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, যুবকল্যাণ, অন্ধ, বধির ও মূকদের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি, লাইব্রেরীর প্রসার এবং জনজাতীয় ভাষা ও সাধারণ সাহিত্যের প্রসারের জন্যও পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য

শিক্ষার পরেই স্বাস্থ্য। পরিকল্পনায় সহরে ও পল্লীতে সর্বত্র রোগ পীড়াদি চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে অধিবাসীদের বাসস্থানের যথাসম্ভব কাছাকাছি জায়গায় এইরূপ চিকিৎসাকেন্দ্র থাকা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক ইউনিয়নে ও থানায় একটি করিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আগেই করা হইয়াছে। ইহার ফলে, রাজ্যে মোট ২,৩৫৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। পাঁচ বছরের মধ্যে ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৫০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পল্লী-ডিস্পেন্সারি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সহরগুলির ক্ষেত্রে, কলিকাতায় একটা সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ড, যক্ষ্মা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠা, যৌন ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষেধ একটা আয়ুর্বেদ কলেজ ও একটা দন্ত চিকিৎসার কলেজ প্রতিষ্ঠা, পল্লী অঞ্চলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য শিক্ষাদান, সেবা-শুশ্রূষা রীতির উন্নতি এবং ঔষধ তৈয়ারী করার প্রথা শিক্ষাদানের পরিকল্পনা আছে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট সমস্যা। ম্যালেরিয়া দমন ও প্রতিষেধের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ, কুষ্ঠ ব্যাধি নিবারণ এবং বি-সি-জি টীকাদানের ব্যবস্থাও ব্যাপক আকারে প্রবর্তিত হইয়াছে। সহরে ও পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহও আমাদের আর এক সমস্যা। এই সম্পর্কেও যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমানে রাজ্যে যে হাসপাতালগুলি আছে সেগুলির উন্নতিবিধান, সহর ও পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার, ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ এবং ভাল পানীয় জল সরবরাহ দ্বারা পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধিই চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির প্রধান লক্ষ্য। চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যবস্থাদিতে মোট ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আরও ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

গৃহ নির্মাণ

সকলেই জানেন যে, পৃথিবীতে যে সকল ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল আছে, পশ্চিমবঙ্গ তাহার অন্যতম। ভারতীয় ইউনিয়নে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৩১৭ জন লোক বাস করে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এক বর্গমাইলে ৮০৯.৩ জন লোকের বাস। কলিকাতায় এক বর্গমাইলে ৭৭,২৬৩ জন লোক বাস করে শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। পশ্চিমবঙ্গে বসতি যে অতিমাত্রায় ঘন তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। গ্রামের চেয়েও সহরে স্থান সমস্যা অনেকগুণে বেশী। সহরে হাজার হাজার লোক বস্তীতে অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে বাস করে। এই সকল বস্তীর মধ্যকার অবস্থা ভয়াবহ, এগুলি সহর-জীবনের কলঙ্কস্বরূপ। এই সমস্যার নিরাকরণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইলেও পরিকল্পনায় উহাকে এড়াইয়া যাওয়া হয় নাই। আর্থিক সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বস্তীগুলির উন্নতি দ্বারা এই সমস্যায় হস্তক্ষেপের সংকল্প করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কলিকাতায় বাসস্থানের অভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কলিকাতার যথাসম্ভব কাছাকাছি জায়গায় কয়েকটা উপনগরী নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হইয়াছে। মানুষের বাসস্থানের সংকুলানের এই ব্যবস্থার জন্য ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়

যে কোনও রকম সমাজ-সেবার কাজই হউক না কেন, তাহার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতিবিধান। এই সাধারণ মানুষদের মধ্যে একদল ভাগ্যহীনের অস্তিত্ব রহিয়াছে যাহারা অনগ্রসর সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। নিজস্ব কোনও ত্রুটির জন্য তাহারা অনগ্রসর নয়, তাহাদের অনগ্রসরতার কারণ এই যে, আত্মোন্নতির সুযোগ-সুবিধা তাহাদের দেওয়া হয় নাই। কোন না কোন কারণে দীর্ঘকাল যাবৎ সামাজিক ন্যায়বিচার হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে তাহার সন্ধান করিয়া আজ আর লাভ নাই। আসল কথা হইল, তাহাদের প্রতি এই অবিচারের প্রতিবিধান করিতে হইবে, তাহারা যাহাতে আগাইয়া আসিয়া সকলের সহিত সমান তালে চলিতে পারে, সেইজন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। সুখের বিষয় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাদিগকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনায় ৮ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অন্তরের প্রেরণা চাই

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে তাহা সাধারণ মানুষের নৈতিক ও বস্তুজাগতিক সম্পদ বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়ক হইবে বটে কিন্তু এই জন্য মানুষের নিজেরও উদ্যোগী হইতে হইবে, উন্নততর জীবন-যাপনের আগ্রহ তাহার নিজের মধ্যেও দেখা দেওয়া চাই। স্বাবলম্বনে প্রেরণা যোগাইবার জন্য পরিকল্পনায় পল্লী পঞ্চায়েত গঠনে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতগুলি নিজেরাই নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিবে এবং ছোটখাট রকমের বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। নিজ নিজ অঞ্চল হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহারা পরিকল্পনায় হাত দিবে। সরকারও তাহাদের অর্থ সাহায্য দিবেন।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার রূপান্তর সাধনের জন্য দেশ আজ যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা সাধারণে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। পল্লীবাসীদের জীবনযাত্রার সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের চেষ্টা এই পরিকল্পনার মধ্যে রূপ নিয়াছে। ইহার সাফল্য কেবলমাত্র একটি জিনিষের উপরই নির্ভর করে। উহা হইতেছে যে, দেশের মাটিতে উহা কিভাবে শিকড় নেয় এবং ভিতর হইতে কিভাবে সাড়া পায়। উহার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জনগণের সহযোগিতার উপর। এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য পল্লীবাসীদের নেতৃত্ব অপরিহার্য। এক বৎসর পূর্বে আটটা উন্নয়ন ব্লকে ইহার কাজ আরম্ভ হয়। এই আটটা ব্লক হইতেছে, নদীয়ায় ফুলিয়া, ২৪ পরগণায় বারুইপুর, বর্ধমানে শক্তিগড় ও গুসকারা, বীরভূমে আহম্মদপুর, মহম্মদবাজার ও নলহাটি এবং মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম। কৃষি, খাদ্য, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিক্ষা, সমাজ-কল্যাণ, যোগাযোগ, সেচ, ভূমি-সংস্কার, পল্লী-শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার, বাসস্থান প্রভৃতি পল্লীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য এই সকল ব্লকে সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করা হইবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে পল্লীর জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করিতে

আমাদের অপরাধ নির্ণয় পন্থা

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

কেবলমাত্র প্রাণবান জীবই কথা বলে তা নয়, বহুক্ষেত্রে নির্জীব বস্তুসমূহও কথা বলে থাকে। সুসভ্য মানুষ মিথ্যাকথা বললেও এই নিষ্প্রাণ বস্তুসমূহ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। কিরূপে এইরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয়, তা পরে বিবৃত করবো। প্রথমে এইরূপে ঘটনাস্থল পরিদর্শন দ্বারা রক্ষিগণ কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন এবং তার উপর নির্ভর করে তাঁরা অপরাধ সম্বন্ধীয় গবেষণা সুরু করেন। এইরূপ গবেষণার জন্য গবেষক ছাত্রদের অনুরূপ তাঁদেরও প্রথমে ঘটনা সম্পর্কীয় কয়েকটি থিওরী বা অনুসংজ্ঞা অনুমান করে নিতে হয়েছে। এই থিওরী সমূহের একটি অনুসরণ করে কিছুটা তদন্ত করার পর যদি তাঁরা দেখেন যে সমূহের পথ রুদ্ধ হয়েছে তাঁরা ফিরে এসে মামলা সম্পর্কীয় অপর থিওরী বা অনুসংজ্ঞাটি অনুসরণ করে নতুন করে নতুন পথে তদন্ত সুরু করে দেন। কথা বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। ধরুন—কোনও এক নির্জন স্থানে আমরা একটি মুণ্ডহীন মনুষ্য-দেহ আবিষ্কার করলাম। কিন্তু পল্লীর কোনও ব্যক্তিই এই বিষয়ে একটুমাত্রও আলোকপাত করতে সক্ষম হলো না। এইরূপ অবস্থায় তদন্তের সুবিধার জন্য রক্ষিগণ নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি থিওরী বা পরিসংজ্ঞা অনুমান করে নিতে পারেন, যথা—

(১) এমনও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি একজন পুরোনো চোর। দলের অপরাপর ব্যক্তির সহিত হিস্যার ব্যাপারে বা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার সহিত তাদের মনোমালিন্য ঘটেছিল। এই কারণে দলের লোকেরা সুযোগমত তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

(২) এমনও হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তি কোনও ধনী জমিদার বাড়ীর ভৃত্য বা পাচক ছিল। ঐ বনেদী বাড়ীর এক বিধবা, সধবা বা অনূঢ়ার সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ঘটে। বাড়ীর ব্যক্তিরা এই ব্যাপার অবগত হয়ে, তাকে নিহত করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

(৩) এমনও হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তি কোনও ধনীর সন্তান। ধন-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে অপরাপর শরিকেরা তাকে নিহত করে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

উপরোক্তরূপে কয়েকটি থিওরী অনুমান করার পর রক্ষীরা অবগত হতে সচেষ্ট হন এর মধ্যে কোন থিওরীটি সম্ভাব্য। যদি মৃতদেহের গঠন হতে বোঝা যায় যে, সেটি কোনও ধনী-পুত্রের বা মধ্যবিত্তের মৃতদেহ নয় কোনও দরিদ্র বা নিম্ন-শ্রেণীর ব্যক্তির দেহ এবং তদন্ত দ্বারা যদি তাঁরা অবগত হন যে, কোনও ধনী-পুত্র ঐ সময় হতে অন্তর্ধান হননি, তাহলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তৃতীয় অনুসংজ্ঞা বা থিওরীটি পরিত্যাগ করবেন। তদন্ত দ্বারা যদি তাঁরা কোনও অসৎ চরিত্র ধনীর দুলাল বা তার অবৈধপ্রণয় সম্পর্কীয় কোনও গুজব বা কাহিনী না শুনতে পান তাহলে রক্ষিগণ দ্বিতীয় থিওরীটিও পরিত্যাগ করবেন। এর পর তাঁরা পুরোনো চোরদের মধ্যে অনুসন্ধান করতে সুরু করবেন। প্রথম থিওরী দ্বারা অনুমিত কোনও ঘটনা কোনও স্থানে আদপে ঘটেছে কিনা।

এই সকল থিওরী কয়েকটি বিশেষ সত্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়ে থাকে। অপরাধ খুন সম্পর্কীয় হলে প্রথমে আমাদের অবগত হতে হবে যে খুন হলো বা হতে পারে, কখন ও কোথায় সে খুন হলো এবং কিরূপে ও কি উদ্দেশ্যে সে খুন হয়েছে। এই কয়টি প্রাথমিক তথ্য ঘটনাস্থলের পরিবেশ এবং মৃতদেহ ও তার আঘাত চিহ্ন হতে অতি সহজে বলে দেওয়া সম্ভব। নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর সম্মুখে নিহত হলে তার মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই একটি [illegible] দেখা যাবে যে, হত্যাকাণ্ডটি হত্যাকারীর সম্মুখে সংঘটিত হয়েছে। একস্থানেই মানুষকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করলেও রক্ত ফিনকী দিয়ে বার হয়ে প্রাচীরের বা ভূমির বহুদূর পর্যন্ত স্বভাবতঃই ছড়িয়ে পড়বে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পরিদর্শন দ্বারাও বলা যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে হত্যাকাণ্ডটি কোথায় সম্পাদিত হয়েছে। এমন কি মৃতদেহ হতে মুণ্ড কর্তনের ধরন সম্বন্ধে অনুমান করা চলে যে, মৃত-ব্যক্তি একজন স্থানীয় লোক কিংবা তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি তাহা হলে অকারণে মুণ্ড-কর্তনের ঝুঁকি অপরাধীরা গ্রহণ করবে কেন? এতদ্ব্যতীত মৃতদেহের কাঠিন্য ও রক্তের জমাট হতে এর পাকস্থলীর পচমান খাদ্য হতে ডেরাই-পরীক্ষার পর বলে দেওয়া সম্ভব মৃত-ব্যক্তিকে কতক্ষণ পূর্বে নিহত করা হয়েছিল। আঘাত চিহ্নের স্বরূপ হতে কিরূপে ও কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাকে নিহত করা হয়েছে তাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে অবগত হওয়া সম্ভব। এই সকল তথ্যের প্রত্যেকটি অনুধাবন করে তবে উপরোক্তরূপ থিওরীসমূহ তদন্তের কারণে সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছে।

কখনও কখনও তথ্যানুসন্ধান দ্বারা কেবল একটিমাত্র থিওরী অনুমান করা সম্ভব হয়েছে এবং একটিমাত্র থিওরী অনুসরণ করে দুরূহ হত্যা মামলার মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক হত্যাকাণ্ড তদন্তের উল্লেখ করা হলো।

১৯৪২ সালে ভবানীপুরের অঞ্চলে জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা এবং তাঁর বয়স্কা পুত্রবধূ তাঁদের নিজবাটীতে বসবাস করতেন। একদিন সকালে তাঁদের এক নিষ্কর্মা দূর-সম্পর্কীয় যুবক-আত্মীয় এসে দেখতে পেলেন যে, তাঁর সম্পর্কীয় মাসীমা গলদেশ কর্তিত অবস্থায় তাঁর শয়নকক্ষে এবং তাঁর সম্পর্কীয় বৃদ্ধা দিদিমা অনুরূপ অবস্থায় তাঁর ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে রোয়াকের উপর প্রাণহীন দেহে পড়ে রয়েছেন। যুবক ভদ্রলোক থানায় সংবাদ দিলে প্রথমে স্থানীয় পুলিশ পরে গোয়েন্দা বিভাগ হতে আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। ঐ যুবক ভদ্রলোক আমাদের এই তদন্তের সম্পর্কে সাহায্যরত ছিলেন। বৃদ্ধা মহিলাটি নিহত হবার পূর্বে রোয়াকে বসে পূজান্তে মালা জপ করছিলেন। এ বাড়ীর একমাত্র বহির্দরজা হতে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ঐ শয়নকক্ষে যেতে হলে রোয়াকের এই স্থানটি অতিক্রম করে যেতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঐ শয়নকক্ষের আলমারীর অভ্যন্তরের [illegible] বিপর্যস্ত ভাব হতে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল [illegible] হত্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গহনা চুরি। সম্ভবতঃ প্রত্যাগমনের পথে ঐ বৃদ্ধা [illegible] তাকে দেখতে পায় এবং এইজন্য সে তাঁকে নিহত করতে বাধ্য হয়েছে। হত্যাকারী ঐ বৃদ্ধার কোনও পারিবারিক বন্ধু কিংবা দূরসম্পর্কিত আত্মীয় ছিল, তা না হলে বৃদ্ধার সম্মুখ দিয়ে তাঁর পুত্রবধূর শয়নকক্ষে যাওয়া [illegible] পক্ষে সম্ভব হতো না এবং হত্যাকারী বৃদ্ধার নিকটও সুপরিচিত না হলে সে [illegible] কখনও ঐ বৃদ্ধাকেও নিহত করার প্রয়োজন অনুভব করত না।

এইরূপ গবেষণা দ্বারা আমরা [illegible] একটি মাত্র হত্যা সম্পর্কীয় থিওরী [illegible] করে তদনুযায়ী তদন্ত সুরু করে দিলাম। [illegible] সময় সহসা আমার লক্ষ্য পড়লো ঐ [illegible] যুবকের পরনের নতুন নীল সার্টের [illegible] এই সময় লক্ষ্য করলাম যে ঐ সার্টের [illegible] স্থানে ছোট ছোট ছিদ্র, যেন [illegible] বিভিন্ন ফুলকী দিয়ে ঐ কাজ [illegible] কারণ ছিদ্রের ফোকরে ঈষৎ পোড়ার চিহ্ন [illegible] যায়। সন্দেহের কারণে এই সম্পর্কে [illegible] জিজ্ঞাসাবাদ করলাম সে [illegible] বিড়ি খাবার সময় অসাবধানতাবশতঃ [illegible] সার্টের এইরূপ অবস্থা হয়ে গিয়েছে। [illegible] যুবকের লম্পট ভাব ও উদাসীন [illegible] হতে বুঝে নিতে পারলাম যে ঐ ছোকরা [illegible] খাবার ছেলে নয়। যদি সে [illegible]

শ্রীমান সুশান্তগোপাল দত্ত—ইনি এই বৎসর "উত্তর কলিকাতা শ্রী" দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ দেহী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

হ্যাভানা চুরুট বা সিগারেটই খাবে, অন্ততঃ বিড়ি কখনই খাবে না। এরপর আমি তার পকেট তল্লাস করে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট ও একটি দিয়াশলাইও উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম। আমি এতক্ষণে পরিস্কাররূপে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, খুনের সময় রক্তের ফোঁটা লাগায় সে জ্বলন্ত বিড়ির ছোঁয়াচ লাগিয়ে রক্ত-বিন্দু সহ জামার ঐ অংশ সদ্য সদ্য পুড়িয়ে ফেলেছে। এরপর ঐ বাটীর বাহিরে রাজপথে তদন্ত করে আমরা অবগত হলাম যে, সে সত্য-সত্যই সকাল আটটায় এই বাড়ী হতে বার হয়ে এসে একটি বিড়ি বিক্রেতার নিকট একটিমাত্র বিড়ি এমনিই চেয়ে নিয়েছিল। এতদ্ব্যতীত আরও দুইজন দোকানী সেইখানে পাওয়া গেল, যারা বললে যে, ঐদিন সকাল আটটায় তারা এই যুবককে তিনজন বন্ধুসহ ঐ বাড়ী হতে অতি-দ্রুত বার হয়ে আসতে দেখেছে। এরপর এই যুবককে গ্রেপ্তার ও পীড়াপীড়ি করা মাত্র সে এই হত্যা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে বলে যে, তারা চারজনে এই জোড়া খুন সমাধা করে অপহৃত অলঙ্কারাদি স্থানীয় এক পোদ্দারের নিকট বিক্রয় করে এসেছে। আমরা এরপর অপর তিনজন আসামীকে গ্রেপ্তার করি এবং পোদ্দারের দোকান হতে অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করে আনি। দায়রা আদালতের বিচারে এই মামলার আসামীদের অতি কঠোর সাজা হয়ে গিয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি ব্যতিরেকেও কেবল-মাত্র পরিদর্শন, অনুমান, অনুধাবন এবং গবেষণা দ্বারা কিরূপে দুরূহ মামলাসমূহের সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উপর একটি হত্যাকাণ্ডের কাহিনী বলছি।

কলিকাতা মহানগরীর নাগরিকবৃন্দের জানা আছে যে, খিদিরপুরের ব্রিজ হতে ডক পর্যন্ত একটি প্রশস্ত ট্রাম সড়ক বিস্তারিত আছে। এই রাজপথের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ডাস্টবিনের মধ্যে ১৯৪২ সালের এক প্রভাতে পৌরপ্রতিষ্ঠানের এক ঝাড়ুদার একটি অদ্ভুত দ্রব্য আবিষ্কার করলে। এই দ্রব্যটি অপর কিছুই নয়, একটি নারীদেহের নিম্ন অর্ধাংশ। দেহটির কোমর হতে পরিষ্কারভাবে কেটে সেটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আমরা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে নারীদেহের এই নিম্নাংশটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ সুরু করে দিলাম। এটি যে একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। আমরা ঐ মৃতদেহাংশের ডান উরুতে একটি তিলচিহ্ন এবং ঐ পায়েরই বৃদ্ধাঙ্গুলেতে একটি পুরাতন কাটা চিহ্ন লক্ষ্য করি এবং এতদ্ব্যতীত ঐ মৃতা নারীর একটি পা 'কুশ পা' ছিল। আমাদের আশা হয় যে, একদিন এই সকল চিহ্ন হতে ঐ নারীদেহ তার নিকট-আত্মীয়দের দ্বারা সনাক্ত করানো যাবে। মৃতদেহের অবয়বের গঠন এবং পরিসৌষ্ঠব হতে ওটি কোনও এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদেহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সময় আমরা লক্ষ্য করি যে, ঐ মৃত নারীর যোনিদেশ ক্ষৌরীকৃত। এদেশে সাধারণতঃ বেশ্যাগণ এবং কখনও কখনও অল্পবয়স্কা অভিজাত নারীরাও তাদের যোনিদেশে ক্ষৌরকার্য করে থাকে। কিন্তু ঐ মৃত নারীর দেহাবয়ব হতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, তার বয়স ছিল অন্ততঃ ৫০। এই বয়সে এদেশে কোনও গৃহস্থ নারী অসচ্চরিত্রা না হলে সাধারণতঃ এ কাজ করবে না। এইরূপ পরিদর্শন হতে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, ওটি একজন ৫০ বৎসর বয়স্কা মধ্যবিত্ত পরিবারের চরিত্রহীনা নারীর মৃতদেহ। এর পর আমরা অকুস্থলে সংগৃহীত তথ্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু করে দিই। হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত হত্যাকারীর স্বগৃহে সমাধা হয়েছে তা' না হলে মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করার প্রয়োজন হতো না। ঐ খণ্ডাংশ দেহ কাহারও দ্বারা ঐস্থানে পদব্রজে বহন করে আনা হয়েছে, শকটযোগে আনীত হলে মৃতদেহ দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন ছিল না। সম্ভবতঃ হত্যাকারী ও পাচারকারী একই কোনও ব্যক্তি ও সংখ্যায় সে একজনই। সম্ভবতঃ একাকী বহন করে আনার সুবিধার জন্যে ঐ মৃতদেহ সে দ্বিখণ্ডিত করেছিল এবং ঐরূপ কার্য ঘটনাস্থলের এক নিভৃত কক্ষে দুয়ার বন্ধ করে সে সমাধা করেছে। এইরূপ সুযোগ-সুবিধা কেবলমাত্র নিহতা নারীর আত্মীয় বা সহবাসী ব্যক্তিদেরই থাকবে, বাহিরের কাহারও পক্ষে এইরূপ সুযোগ-সুবিধা লাভ সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যাকারী ও নিহতা নারী ব্যতীত যে ঐ কক্ষে বা বাটীতে আর কেহই উপস্থিত ছিল না তাহাও অনুমান করা চলে অন্যথায় ইহা ইতিমধ্যেই সাতকান হয়ে সাধারণের গোচরীভূত হয়ে পড়তো। সম্ভবতঃ মৃতদেহের উপরি অংশ অনুরূপ একটি থলিয়াতে পুরে সে ইতিপূর্বেই নিকটস্থ আদি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছে। উহার নিম্নাংশ অধিকতর ভারী বিধায় কিংবা ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসায় সে ওটি ঐ ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে সরে পড়েছে। মৃতদেহ আদি গঙ্গার ওপার হতে কিংবা ডকের ওপার হতে নিশ্চয়ই আনীত হয়নি, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে পাচারকারী উহা আদি গঙ্গার কিংবা ডকের জলে নিক্ষেপ না করে অকারণে এতো দূর নিয়ে আসতো না। এইরূপ গবেষণা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, হত্যাকাণ্ডটি এই প্রশস্ত রাজপথেরই উভয় পার্শ্বের কোনও উপপথে অবস্থিত বাটীতে সমাধা হয়েছে। এইরূপ একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ঐ কক্ষটিতে বা বাটীতে তালা দিয়ে হত্যাকারীর পক্ষে অন্যত্র সরে পড়াও স্বাভাবিক ছিল। এজন্য আমরা অদ্য প্রাতে কিংবা পূর্ব রাত্রে কোনও ভাড়াটিয়া সহসা তার ঘরে তালা বন্ধ করে সরে পড়েছে কিনা তা জানতে চেষ্টা করি। এর পর আমরা ঐ রাজপথের উভয় পার্শ্বের রাস্তায় বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান সুরু করে দিই, পরিশেষে আমরা অবগত হই যে, ঐদিন অতি প্রভাতে অমুক নম্বরের বাড়ীর একতলার এক ভাড়াটিয়া ঘরের তালা বন্ধ করে অন্যত্র কোথায় চলে গিয়েছে। আমরা তদন্ত দ্বারা অবগত হই যে, ঐ কক্ষে ১৭ বৎসর বয়স্ক এক বালক তাহার ৪৫ বৎসর বয়স্কা মাতার সহিত গত এক মাস যাবৎ বসবাস করছিল। যুবকটি তার মাতার স্বভাব-চরিত্রের ব্যাপারে প্রায় সন্দিহান হয়ে তাঁর সহিত প্রায়ই কলহে লিপ্ত হয়েছে। এইদিন বাটীর বাড়ীওয়ালীর মা অতি প্রত্যূষে উঠে দেখতে পান যে, ঐ যুবক একটি ভারি বস্তা মাথায় বাটী হতে বার হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করায় সে এইরূপ বলে যে, ওতে পচা ময়দা আছে, তাই তা সে রাস্তায় ফেলে দিতে চলেছে। তার মাতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে সে উত্তর দিয়েছিল যে, ভোর বেলায় সহসা কলেরা হওয়ায় সে তার মাতাকে হাসপাতালে রেখে এসেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ তালা ভেঙ্গে ঐ ঘর তল্লাসী করে দেখি যে, সারা মেঝেতে নর-মাংসের টুকরা ও মনুষ্য-

বটতলা — সুধীর মৈত্র

রক্তে পরিপ্লাবিত। এর পর আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে নি—কে, কোথায়, কার দ্বারা নিহত হয়েছিল।

এইরূপ পরিদর্শন ও গবেষণার দ্বারা কিরূপে দুরূহ মামলাসমূহের কিনারা করা সম্ভব তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এইবার একটি বিলাতী ঘটনার উল্লেখ করবো। নিম্নে এই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হলো।

লণ্ডন শহরের কোনও এক প্রসিদ্ধ হোটেলের কক্ষে দুপুরবেলা একটি যুবতী নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। পুলিশ ও বৈজ্ঞানিকগণ একত্রে এই মামলাটির তদন্ত সমাধা করে। যুবতী নারীর দেহ চিৎ অবস্থায় শোয়া ছিল। পরিদর্শন দ্বারা দেখা গেল যে, ঐ নারীর গলদেশে আঙ্গুল ও নখের দাগ; বুঝা গেল যে, যৌনসংগমকালে অসহায় অবস্থায় তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। ঐ দেশের কন্যাগণ বহুক্ষেত্রে ক্ষীণাঙ্গী হবার মানসে কটি-দেশে বস্ত্রখণ্ড জড়িয়ে প্লাসটার-অব-প্যারিস দ্বারা এঁটে রাখেন। এই নিহতা যুবতীটিরও কটিদেশ অনুরূপভাবে প্ল্যাস্টারবদ্ধ করা ছিল। এই সময় রক্ষিগণ লক্ষ্য করলেন যে, তাতে বিশেষ এক প্রকার প্যাটার্ণ বা বুননের প্যাণ্ট পরা হাঁটুর দাগ উৎকীর্ণ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত ঐ নিহতা কন্যার বস্ত্রাভ্যন্তর হতে তাঁরা একটি পুরুষের যৌন কেশও উদ্ধার করলেন। এই যৌন কেশটি পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন যে, তার রঙ ফর্সা ও পাতলা। কাহারও যৌন কেশের রঙ যদি ফর্সা বা পাতলা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির মস্তকের কেশ অধিকতর ফর্সা বা পাতলা হয়ে থাকে। উপস্থিত রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ বুঝে নিতে পারলেন যে, হত্যাকারী ব্যক্তির মস্তকের কেশ অত্যধিক-রূপ ফর্সা। এতদ্ব্যতীত ঐ নিহতা নারীর মস্তকের নিকট এবং তার নাসিকায় সামান্য পরিমাণে রক্তও দেখা গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকগণ ঘটনাস্থলেই তা পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ঐস্থানে দুইজন ব্যক্তির রক্ত পতিত হয়েছে। কারণ ঐখানে "এ" এবং "বি" এই দুই গ্রুপের মনুষ্য-রক্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে এই "এ" গ্রুপের রক্ত ঐ মৃত নারীর দেহ হতেই নির্গত হয়ে থাকবে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হতে বুঝা গেল যে, হত্যার সময় ঐ নারী কেবলমাত্র তার আততায়ীর মুখে ও নাকে বা মস্তকে আত্মরক্ষার্থে আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিল এবং এই কারণে ঘটনাস্থলে দুই প্রকারের মনুষ্য-রক্ত দেখা গিয়েছে। এর পর রক্ষিগণ এমন এক ব্যক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন যার মস্তকের কেশ অত্যধিক ফর্সা, যার মুখে নাকে বা মস্তকে আঘাতের চিহ্ন, যে বিশেষ একপ্রকার বুননের কাপড়ের প্যাণ্ট পরিহিত এবং যার দেহের রক্ত "বি" গ্রুপের অন্তর্গত। এইরূপে তদন্ত দ্বারা তাঁরা এক ট্যাক্সিচালকের নিকট হতে অবগত হতে পারলেন যে, সে ঐরূপ এক ব্যক্তিকে ঐ সময়ে ঐ হোটেলের দ্বারদেশ হতে উঠিয়ে অমুক রাস্তায় অত নম্বরের বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

এইরূপ ব্লাড গ্রুপিং—অপরাধ সম্পর্কীয় সত্য-নিরূপণে বিশেষরূপে সহায়ক হয়ে থাকে। এক এক ব্লাডগ্রুপে বহু ব্যক্তির রক্ত পড়ে—এই জন্য এই প্রণালী হতে অমুক ব্যক্তি এই অপরাধ সমাধা করেছে না বলা গেলেও তা যে অমুক ব্যক্তি করেনি তা নিশ্চিতরূপে বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই প্রণালী অপরাধ তদন্তের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান এনে দিয়েছে এবং এই সূত্র অনুসরণ করে রক্ষিগণ তাঁদের গন্তব্য স্থলে সহজে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। এইরূপ তদন্ত প্রণালী সম্পর্কে নিম্নে একটি এদেশীয় উদাহরণ প্রদত্ত হলো।

মহানগরীর কোনও এক অফিস অঞ্চলের এক অফিসের সিঁড়ির উপর জনৈকা নারী কর্ম-চারিণীকে ছুরিকাহত হয়ে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল এবং ঠিক এই একই সময়ে পার্শ্ববর্তী এক অফিসের লিফ্‌টের নিকট ঐ অফিসের এক যুবক কর্মচারীকেও পূর্বে ছুরিকা আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু তার পূর্বের এই আঘাত তার হাতের নাগালের মধ্যে সামান্যাকারে দেখা গিয়েছিল। আহত যুবকটি কৈফিয়ৎস্বরূপে বলে যে, সে ঐ অফিস থেকে বের হওয়া মাত্র এক অদেখা মানুষ তাকে ছুরির আঘাত করে পলায়নে সমর্থ হয়েছে।

এর পর রক্ষিগণ ঐ নারীর বাড়ী তল্লাস করে তার বাক্স হতে কোনও এক রাজনৈতিক দলের কয়েকটি দলীয় কাগজপত্র দেখতে পান। এতদ্ব্যতীত ঐ নিহতা নারীর অফিসের ড্রয়ারে একটি নূতন সাড়ীও পূর্বদিন দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

এইরূপ অবস্থায় আমরা তদন্তের কারণে মাত্র নিম্নোক্ত তিনটি থিওরী সৃষ্টি করতে সমর্থ হই, যথা :—

(১) হয়তো ঐ যুবকের সহিত ঐ নারীর প্রণয় ছিল, অপর এক যুবক ঈর্ষান্বিত হয়ে পর পর উভয়কেই ছুরির আঘাত করে সরে পড়তে পেরেছে।

(২) হয়তো ঐ যুবক ও নারী উভয়েই কোনও এক রাজনৈতিক দলভুক্ত। দলগতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে দলের কোনও ব্যক্তি দ্বারা উভয়েই পর পর ছুরিকাহত হয়ে থাকবে।

(৩) হয়তো ঐ যুবক এই নারীর সহিত প্রণয়াসক্ত থাকাকালে কোনও কারণে সে ঐ নারীকে কোনও ব্যাপারে সন্দেহ করে। এইরূপ-ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে সে প্রথমে ঐ নারীকে ছুরিকা-ঘাত করে নিহত করে, কিন্তু হত্যাকালে তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে নিহত নারীর রক্ত লেগে যায়। পরিধেয় বস্ত্রাদি রক্তরঞ্জিত থাকলে বহুক্ষণ তা এই মহল্লায় পথচারীর নজর এড়ানো সম্ভব নয়। এইজন্য একটি অজুহাত দেখানোর জন্য সে আপন পৃষ্ঠেও ইচ্ছাকৃতভাবে স্বয়ং আঘাত হেনেছে, যাতে সে বলতে পারে যে, তার ঐ ক্ষত হতে তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে রক্ত ঝরে পড়ে-ছিল। কিংবা এমনও হতে পারে যে, ঐ দুটি ঘটনাই হয় পরস্পর সম্পর্কশূন্য একান্তই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা।

আমরা এরপর ব্লাড গ্রুপিঙের জন্য উভয় ঘটনাস্থল হতে সংগৃহীত রক্ত রক্তপরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করি। কারণ যদি রক্তপরীক্ষক বলে দিতে পারে যে, ঐ যুবকের পরি-ধেয় বস্ত্রে দুই গ্রুপের রক্ত পাওয়া গিয়েছে এবং তাদের একটি রক্ত ঐ নারীর রক্তের গ্রুপের ও উহার অপর রক্ত ঐ যুবকের রক্তের গ্রুপের রক্ত, তাহলে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারবো যে, আমাদের পরিকল্পিত তৃতীয় থিওরীটিই সত্য। আমরা এরপর মাত্র এই তৃতীয় থিওরীটি অনু-সরণ করে এই মামলার তদন্ত শুরু করে দিতে পারবো।

এইরূপ পরিদর্শন ও গবেষণা দ্বারা কিরূপ সাফল্যের সহিত রক্ষিগণ দুরূহ মামলাসমূহের তদন্ত সমাধা করতে সক্ষম, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এপর একটি মামলার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

কোনও এক বেশ্যা-পল্লীতে একটি কক্ষে এক বেশ্যা-নারী একাকী বাস করতো। একদিন বিকাল পর্যন্ত তার কক্ষের অর্গল ভিতর হতে বদ্ধ থাকতে দেখে সহ-ভাড়াটিয়ানীগণ সন্দিহান হয়ে রক্ষী মহলে সংবাদ প্রেরণ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে কক্ষের ঐ একমাত্র দুয়ার ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে দেখে যে, ঐ নারী রক্তাক্ত কলেবরে শায়িত আছে। তার গলদেশ কাটা এবং হাতের কাছে রক্তমাখা একটি ছুরি। স্থানীয় পুলিশ অবস্থা বুঝে এটি যে হত্যা নয়, আত্ম-হত্যা মাত্র, এইরূপ এক অভিমত প্রকাশ করলেন। গোয়েন্দা বিভাগ হতে ঘটনাস্থলে উপনীত হয়ে আমি কিন্তু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন মত প্রকাশ করি। আমি ঘরের উন্মুক্ত আল-মারীর নিম্নে ঐ নিহতা নারীর রিঙসহ চাবির-গোছা পড়ে থাকতে দেখি। ঐ নারীর সাড়ীর আঁচলের মোড়ানো কোণটি পরীক্ষা করে বুঝি যে, তার ঐ আঁচলের খুঁটে ঐ চাবির রিঙ বাঁধা ছিল। এ ছাড়া এই আলমারীর ড্রয়ারে গহনার কেসগুলি প্রত্যেকটিই খালি দেখা যায়। এই সময় আমি ঘরের এক কোণে রক্ষিত টেবিলে একটি মোমবাতি দেখতে পাই, বাতিটি জ্বলে জ্বলে প্রায় পরিশেষ হয়ে গিয়েছে। এই টেবিলের নিচে দুইটি দেশলাইএর কাঠি পড়ে থাকতে দেখি, তার একটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পোড়া এবং অপরটির মুখ সামান্য মাত্র পুড়েছে। গবেষণা দ্বারা আমি বুঝে নিই যে কোনও তস্কর প্রথমে একটি দেশলাই জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ কক্ষের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে। এইজন্য আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ দেশলাই কাঠিটি পেয়েছি। এর পর সে অপর একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে এই বাতিটি জ্বালিয়ে দিয়েই সেটি নিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। এই জন্য ঐস্থানে আমরা সামান্যরূপে দগ্ধ দেশলাই কাঠিটি পেয়েছি। এইবার আমি বিবেচনা করি যদি সত্য হয় তাহলে তস্করগণ এই কক্ষে প্রবেশ করল কিভাবে ? এই সময় জানালার একটি গরাদ পরীক্ষা করে বুঝি যে, উহা সহজে সরিয়ে পুনরায় তা স্বস্থানে পুনঃ-সন্নিবেশিত করা সম্ভব। এতক্ষণে আমি ঐ জানালার ওপারে ঐ বাড়ীর বাইরের দেওয়ালে সন্নিবেশিত জলের পাইপের পাশে একটি পদচিহ্নও আবিষ্কার করতে সমর্থ হই। এইরূপে আমি প্রমাণ করতে পারি যে, এই মামলা একটি নরহত্যা, উহা আত্ম-হত্যা বা দৈব-দুর্ঘটনা নয়।

উচ্চারণ

দীর্ঘ হাঁচির শেষে স্কি উচ্চারণ করলেই রাশিয়ান নাম উচ্চারণ করা হয়।

পাটিহার

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

দুল পরিয়ে মুগ্ধ চোখে গিন্নি জয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন—লোকে যেমন করে ছবি দেখে। কি লজ্জা, কি লজ্জা!

আহা, দুর্গা-প্রতিমা! এতে যা-ই পরাও, কি সুন্দর দেখা যায়! আর আমি ঐ বউ নিয়ে এসেছি, যেন চালের মাথায় সুপারি বসানো।

বরুণের মুখ রাঙা হয়ে যায়। গিন্নির কিন্তু অন্যায়—রোগা আর একটু লম্বাটে কিনা, তাই অমন কুচ্ছো করেন। কিন্তু মেম সাহেবের মতন ফর্সা, আর মেঘবরণ একপিঠ চুল।

তার পর ফিক্-ফিক্ করে হাসছে জয়া। বলে, এক কাণ্ড হয়েছিল—

সুকুমার বলে, কি?

গিন্নি এলেন বরুণ-বউয়ের পরে তো! তার পাটিহার ফেলে এসেছিল ড্রেসিং টেবিলে, সেইটে গিন্নি নিয়ে এলেন। কী চমৎকার যে কারে নতুন প্যাটার্নের ঐ হারগুলো! ভাবলাম আমায় দিচ্ছেন বুঝি, তাই হাতে করে নিয়ে আসছেন—

সামলে নেয় তখনই।

ঠিক তা নয়। অত দামী হার কেউ কাউকে দেয় নাকি? হাতে হার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সুকুমার অবহেলার স্বরে বলে, কত দাম—পাঁচ সাত হাজার?

পাঁচ-সাত শ হলেও সে জিনিস তো আমাদের পরবার নয়—

একটু নরম হয়ে সুকুমার বলে, তা-ও নয়। সাত শ তো নয়ই, পাঁচ শ-ও নয় পুরোপুরি। আমি সব জানি, ও-বাড়ির কোন কিছু আমার অজানা হয় না।

জয়া বলে, সে যা-ই হোক, তিন-পাঁচশের বেশি হলেই আমাদের কাছে অনেক। কি বলো?

সুকুমার মানছে, কিন্তু সুকুমার জবাব দেয় না। সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে, অলঙ্কার সম্পর্কে এতখানি উঁচিয়ে জ্ঞান নতুন বউয়ের না থাকলেও হত!

দিন কয়েক পরে সুকুমার একখানা গয়নার ক্যাটলগ এনে দিল জয়ার হাতে।

বলছিলে যে—দেখ, কত দাম পাটিহারের! চার শ বাইশ—

সেই পাটিহারের পাতাটা জয়া নিমগ্ন হয়ে দেখছে। পাতা আর উল্টায় না। বলে, ছবিতে দেখছ সাদামাটা একটা জিনিষ—কিন্তু বরুণ-বউয়ের গলায় যা মানিয়েছিল! তবু তো গিন্নি নাক সিঁটকে বেড়ান বউয়ের নামে।

জয়ার দিকে চেয়ে সুকুমার বলে, আমার বউয়ের গলায় মানাবে আরো ভাল—

ভ্রূভঙ্গি করে জয়া বলে, তাই নাকি?

এ কি বন্দন তোমার জয়া—কি সুখ পাও সুকুমারের সাধ-বাসনা নিষ্ঠুর আঘাতে ধরাশায়ী করে?

অলক্ষ্য সেই রণভূমে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে সুকুমার বলে, হাঁ—হার পরিয়ে বরুণ-বউয়ের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখাবো কাকে মানায় বেশি ভালো। নবমীর দিন পাটিহার পরে তুমি পুজো দেখবে... ...

ভাল মেয়ে জয়া। এই দেড়খানা ঘরে ক'দিনের মধ্যে নতুন শ্রী ফুটিয়েছে। সামান্য টেবিল-চেয়ার ও আলমারি দুটো ঝাড়-পোছের ঠেলায় ঝিক-মিক করছে। এক কণিকা ধুলো কোথাও থাকতে দেবে না। বাসার পিছনে এক ফালি জমি—সেখানে নানা রকম ফুলের চারা লাগিয়েছে। এ তুমি কোন পরী উড়ে এলে মা—ছেলের গরিব গৃহস্থালীর ঘরে-বাইরে ফুল ফোটাবার পণ নিয়ে?... একটু ফাঁক করতে পারলেই সুকুমার এখন সুড়ুৎ করে বাসায় চলে আসে। বুড়ো খাজাঞ্চি সুকুমারের বাপের বয়সী—তাঁর বন্ধুলোক ছিলেন। চশমার ফাঁকে সকৌতুকে তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। ছেলে মানুষ লজ্জা পাবে—তাই বলেন না কিছু।

একদিন দুপুরে সুকুমার অনেক বেলা করে ফিরল। জয়ার রান্না-বান্না শেষ—কি করে একা একা, বিছানায় গড়িয়ে পড়ছে। তন্দ্রাও এসেছে একটুখানি। কে এসে ঘুমন্ত মানুষের চোখ চেপে ধরেছে। জানি গো জানি—জন্ম-জন্মান্তরের মানুষটিকে ছোঁয়ায় চেনা যায়। তন্দ্রার আবেশে হাত দুখানা তার গলায় বেষ্টন করে আরও নিবিড় করে নিয়ে আসে বুকের উপর।

সুকুমার বলে ওঠে, না খেয়ে-দেয়ে ঘুম—আচ্ছা ঘুমকাতুরে মানুষ তো!

মধুর হেসে জয়া বলে, এমনি একটু শুয়েছিলাম—তা ঘুম এসে গেল। মিষ্টি এক স্বপ্ন দেখছিলাম—

ঢুলুঢুলু তন্দ্রালস চোখ দুটি মেলল।

কি এনেছ? দেখি কি তোমার হাতে—

সুকুমার কোটের পকেট থেকে সেই জিনিসটুকু বের করেছে। চমকে গিয়ে জয়া উঠে বসল। নীল কাগজের মোড়কে পাটিহার—অবিকল সেই বরুণ-বউয়ের মতো।

শরতের ঝিকমিকে রোদ জয়ার মুখে। কিন্তু এক মুহূর্ত—তারপর মেঘ উঠল এবং বজ্রপাত। মুখ কালো করে জয়া বলে, এ তুমি কোথায় পেলে?

সুকুমার এখন আর চৌধুরি এস্টেটের মুহুরি মাত্র নয়—নিজের আনন্দে মশগুল, জয়ার মুখ তাকিয়ে দেখে না।

চুরি করেছি—

সে না হোক ধার-দেনা করেছ। এ জিনিষ পরার অবস্থা তো আমাদের নয়—

আঘাত কঠিন বটে তবু সান্ত্বনা আছে। কত বুদ্ধি জয়ার, কত ভালবাসা সুকুমার এবং তাদের এই নতুন সংসারের উপর।

দেনা করিনি জয়া—

তবে কি করেছ? তিল তিল করে জমিয়েছিলে হয়তো কিছু—সমস্ত শেষ করে এলে আমার একটা ঠাট্টার কথায়?

দেয়ালের দিকে চেয়ে বিড়-বিড় করে কি-একটু হিসাব করল। বলে, জমালেই বা কি করে অত টাকা? ঠিক না জানলেও রোজগারের মোটামুটি একটা আন্দাজ তো আছে! খরচ-খরচা করে থাকে কি?

অধৈর্য হয়ে সুকুমার তার মুখে হাত চাপা দেয়। সখ করে জিনিষটা নিয়ে এলাম, জমা-খরচ মুলতুবি রেখে পরো দিকি কেমন দেখায়? পরে হলো একটুখানি মন খারাপ—

পরল জয়া। সত্যি, এই গয়নার পরিকল্পনা এমনি কোন এক সুখের কথা ভেবে—কচি বং, জোয়াড়ে চেহারার বধূদের জন্য নয়। আর এর উপরে যদি হাসত একবার জয়া! তা নয়—পুনরপি সেই একঘেয়ে প্রশ্ন, টাকার জোগাড় কি করে হল, বলো আমায়। সত্যি কথা বলো, নইলে শান্তি পাবো না।

সুকুমার রাগ করে বলে, ধার করিনি, চুরি জোচ্চুরি করিনি, নিজের টাকায় কিনে এনেছি। বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে।

এমনি সময় চৌধুরি-গিন্নি। অভাবিত ব্যাপার—তিনি নিজে এসেছেন এ-বাড়ি। আরও একবার এসেছিলেন সেদিন সুকুমারের বাপের অন্তিমে অবস্থা, পুরানো কর্মচারীকে শেষ দেখা দেখে গিয়েছিলেন।

কালকে মহানবমী, মনে আছে তো? দুপুরে খাবে আমাদের ওখানে।

সুকুমার বলে, তার জন্য আসতে হবে কেন মা? ওখান থেকে হুকুম করলে কি চলত না?

গিন্নি বলেন, তুই না হয় ঘরের ছেলে। এই যে মা লক্ষ্মী নতুন এসেছে—

জয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আমি কারো কেউ নই। মস্ত বড় মান নিয়ে বসে আছি। দুপুর-বেলা ঠাঠা রোদে নিজে এসে না বললে নেমন্তন্ন নিইনে—

গিন্নি রাগের ভঙ্গীতে বলেন, আচ্ছা ফুলুলে মায়ের মেয়ে তো! নেমন্তন্নের ছলো করে এসেছি ছেলে-মেয়ের নতুন ঘর-কন্না দেখতে। নইলে আসতে দিতেন না কর্তা—

বসুন মা। কোথায় বা বসতে দিই এই ঘরে—

গিন্নি বসলেন না। বড় কাজ, পুজো বাড়ির কাজ-কর্ম—তা ছাড়া যেতে হবে আরও দু-তিন জায়গায়।

:: ধূসর ধরণী ::

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে আকাশ আবিল,
সুদূর পশ্চিমে বহে বিক্ষুব্ধ বাতাস।
সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটা কার পূর্বাভাস?
জীবনের ছন্দ আজ হারায়েছে মিল।
দ্বিধা ও সন্দেহ ভরা এ বিশ্ব নিখিল,
মানুষ পায় না খুঁজে কিছুতে বিশ্বাস।
কি চায় জানে না তারা—সৃষ্টি না বিনাশ?
অন্তরের অন্তরীক্ষে মুছে গেছে নীল।

এ বিরাট, এ নীরন্ধ্র ধূসরতা মাঝে
রুদ্ধ বেদনায় আর্ত পৃথিবীর বুক।
চারিদিকে অচঞ্চল স্তব্ধতা বিরাজে,
কিসের প্রতীক্ষা কর একান্ত উন্মুখ?
হে বিহ্বল, হেথায় কি অশ্রুজল সাজে?
কোথা তুমি, কোথা আমি? কোথা
দুঃখ-সুখ?

বাড় ফেরে স্নান কর্তার উপর গিয়ে পড়লেন। সুকুমার দু-হাতে টাকা লুঠছে।

কর্তাটি নিরুদ্বেগ, ফড়-ফড় করে গড়গড়া টানছেন।

তুমি কানে নিচ্ছ না কিছু—

সে হল মুহুরি। করচা-সেহা লেখে, টাকা তার হাতেই আসে না—লুঠবে কি করে?

নিশ্চয় আসে। নতুন বউকে পাটিহার গড়িয়ে দিয়েছে ছোট বউয়ের মতো। আমাদের সংগে টক্কর দিয়ে চলছে। কত টাকা মাইনে পায় যে, পরিবারকে ঐ রকম দামী দামী গয়না গড়িয়ে দিচ্ছে?

মুখ শুকনো করে বরুণো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার নতুন হারটি পাওয়া যাচ্ছে না মা। সন্ধি-পুজোয় পরে গিয়েছিলাম। তারপর খুলে আলমারির ড্রয়ারে রেখে চাবি দিতে ভুলে গেছি। কে এলো এর মধ্যে ঘরে, কে এসে নিয়ে গেল—

কেঁদে ফেলল বরুণা-বউ।

নিবিষ্টমনে সুকুমার কাজ করছিল। কাজটুকু সেরে বেলাবেলি বাসায় যাবে। জয়াকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরুবে—সেজেগুজে হার পরে যাবে আজকে জয়া। তাকে তৈরি থাকতে বলে এসেছে।

খাজাঞ্চি মশায় দরজায় এসে ডাকলেন, উঠে এসো—শুনে যাও একটা কথা।

কথাটা শুনে সুকুমার ছুটল বাসায়। জয়াকে বলে, খোল পাটিহার। এক্ষুণি—এক্ষুণি—

জয়া হতভম্ব।

এক মিনিট দেরি নয়। তোমার ফুলবাগানে একটা জায়গায় মাটির নিচে পুঁতে রাখো। তুমি পারবে না, দাও আমায়—

সবুর মানে না—নিজেই জয়ার গলা থেকে টেনে খোলে। তাড়াতাড়িতে কাঁধের কাছটা একটু ছড়েও যায় বুঝি। ঝরঝর করে জয়া কেঁদে ফেলল।

কাঁদো কেন, কান্নার কি হল? জায়গাটার নিরিখ রইল, দিন কতক পরে তুলে নিও। কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, সোজা 'না' বলে

বাবা-মাকে এক-এক সময় বুঝতে পারিনা আমি!

দিও। উঁহু, পাটিহার ছিল না তোমার—চৌধুরিগিন্নি ভুল দেখে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করতে এলো অনতিপরেই—বাজে কোন লোক নয়, পুলিশ। এক-আধজন নয়, রীতিমত একটা দল। বাসা ঘিরে ফেলেছে।

তন্নতন্ন করে খুঁজল,—তাক-কুলুঙ্গি-আলমারি হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে, মাথার বালিশ ছিঁড়ে তার মধ্যে দেখে। গয়না পাওয়া গেল না, তবু সুকুমারকে ধরে নিয়ে গেল চুরির দায়ে।

ঘৃণায় জয়ার মন রি-রি করে জ্বলছে। চোর তার স্বামী! গলার এইখানটা জ্বালা করছে, যে জায়গায় চোরাই-হার পরেছিল। শাশুড়ী কঠিন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তার দিকে, বাক্যালাপ বন্ধ। এদের শান্তির সংসারে পুলিশের হাঙ্গামা—এবাড়ি-ওবাড়ির লোক এসে জয়ার দিকে তাকাচ্ছে কেমন করে, হাসছেও বোধ হয় টিপিটিপি। সে-ই যেন চুরি করেছে, কিম্বা বুদ্ধি দিয়ে সুকুমার হেন সৎ ছেলেকে দিয়ে করিয়েছে চুরি। এত লজ্জার মধ্যে ফেলে সে জন তো জেলে গিয়ে বসেছে—কার মুখে তাকায় আজ জয়া? দুটো দুখের কথা বলে সান্ত্বনা দেবে, তেমন মানুষ নেই।

একটা দিন গেল, উকিল-মোক্তারের ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। চুরির ব্যাপার বলে প্রতিবেশীরা মুখ বাঁকায়, কারো কোন উৎসাহ দেখা যায় না। খাজাঞ্চি মশায় অবশেষে এক সময়ে জয়ার মামার বাড়ি খবর নিয়ে এলেন। মাতুল সম্পর্কীয় একজনে মোক্তার—তিনি এসে জয়ার দিকে চেয়ে চমকে ওঠেন। সারারাত্রি ঘুমোয়নি, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

সস্নেহ স্বরে বললেন, কি হয়েছেরে? এইটুকু ব্যাপারে উতলা হলে চলে? কালকের মধ্যেই জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। বড়-লোকের চক্রান্ত—ওঁদের খাতির-উপরোধে এদ্দুর হয়েছে। ভয়-টয় দেখিয়ে সুকুমার যদি কিছু বলে ফেলে—এই আর কি! নইলে মাল পাওয়া যায়নি, সাক্ষিসাবুদ নেই—রামাশ্যামা লোক হলে থানা থেকেই ধমকে তাড়িয়ে দিত, ওঁদের আন্দাজি এজাহার নিত না।

কথা রেখেছেন মোক্তার মশায়। সুকুমার বাড়ি এলো, মোক্তারও এসেছেন।

ও মা!

মা হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন।

এই ছিল আমার কপালে? এই রকম রুচি-প্রবৃত্তি তোর! চোরের মা—লোকের সামনে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

সুকুমার তাকিয়ে দেখে এদিক-ওদিক। দু-দিন পরে এসেছে বাড়ি—রুক্ষ বিপর্যস্ত চেহারা। জয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। তার এমন জয়া—সে-ও পর হয়ে গেছে।

চুরি করিনি আমি মা, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

এবং সংগে সংগে প্রায় নাটকীয়ভাবে চৌধুরিগিন্নির আবির্ভাব।

তুই কিছু করিসনি বাবা। দোষ আমাদের। ভাল করে না জেনে বুঝে কর্তা এক কাণ্ড করে বসলেন। বুড়ো হয়ে ঐ রকম হয়েছে ওঁর। তুই তো ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে এলি, আমি নিজে তোর মায়ের কাছে মাপ চাইতে এলাম। তুই ছেলে—তা তোরও আমি হাত ধরে বলছি, এসব কিছু মনে রাখিসনে। ঐ যে ন্যাকা হাবা ছোট বউটা—খুব বকাবকি চলছে, যথেষ্ট তার শাস্তি হয়েছে—

সুকুমারের মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। গিন্নি বললেন, হাবা ছোটবউ সেফের মধ্যে গয়না তুলে রেখেছে। মনে নেই—তল্লাস করে বেড়াচ্ছে সমস্ত বাড়ি। অনর্থক বাছার ভোগান্তি। তা কর্তা বলছেন, মুহুরি আর নয়—সুকুমারের বাপ যা ছিলেন, সদর-নায়েব করে দেবেন আসছে বোশেখ থেকে।

গিন্নি চলে গেছেন। হাসছে জয়া। হেসে বলে, মাটির নিচে সারারাত্তিরেই তো মন খারাপ হয়ে গেল। পুলিশ আসছে শুনে তোমার ভয় ধরে গেল—এমনি কাপুরুষ! আমি গ্রাহ্য করিনে—নিজের জিনিস যখন, গায়ে পরে হাঁকডাক করে বেড়াব। দেখিয়ে আসব এক্ষুণি বরুণা-বউকে।

তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়তে গেল। খুঁড়ে বের করল পাটিহার। কালিবর্ণ হয়ে গেছে—কি সর্বনাশ! সোনার গয়না নয়, যেন পাথুরে কয়লার।

মা জিজ্ঞাসা করেন, এ কি?

সুকুমার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, আসল জিনিস কোথায় পাবো মা? একটা দাম সাত টাকা নিয়েছিল। বলেছিল, তিন-চার বছর ঠিক থাকবে—

মোক্তার মশায় হেসে বলেন, কি বুদ্ধি, শুনুন বেয়ান ঠাকরুণ। জেরা করে করে বের করলাম। পুলিশের হাতে পড়লে গিল্টি গয়না ফাঁস হয়ে যাবে, জয়া-মা দুঃখ পাবে—তারই জন্য এত কাণ্ড!

ঘৃণায় রি-রি করে জ্বলছে জয়ার মন। এই তার স্বামী! গিল্টির হার দিয়ে ঠকিয়েছে তাকে।

—

মহাকাব্যের জয়

মণিমালা দাশগুপ্ত

দিলাম অনেক।
তবুও যে শুনি—,
হয়নি কিছুই দেওয়া।
ক্রূর-কাঠিন্য লাল হোয়ে
ফেটে পড়ে—,
এখনও সম্মুখে—
চঞ্চল আসা-যাওয়া।
যতদূরে চাই—,
পথ শুধু পথ—
পাথরের মত কালো।
মৃত্যু-স্তব্ধ-ইশারা—,
ওখানে—, হঠাৎ জ্বেলেছে আলো।
শান্তির দূত—,
সারি সারি সারি—
জমা হোলো অক্ষর।
সানন্দ শ্রম—,
অগণিত স্বাক্ষর।
নাহি রাখে কোনও ভবিতব্যের ভয়।
রিক্ত মানুষ—,
অক্ষম-ক্ষমা লয়ে,
রাজপথে রচে—মহাকাব্যের জয়॥

মাতৃপূজায়
চারটি
রাঙ্গাজবা - ফুল
রাঙ্গাজবা - সিন্দুর
রাঙ্গাজবা - আলতা
রাঙ্গাজবা - স্নো
"আনন্দ বিতরণে"
অনুপমা কেমিক্যাল - কলিকাতা-৪০

আধুনিক রুচিসম্মত
বর্মা সেগুন কাঠের
নিখুঁত আসবাবের
প্রতিষ্ঠান
পি.এন.দাস এণ্ড কোং
১২৮/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

আধুনিক গৃহে
ক্রাউন ব্র্যাণ্ড
PURE ALUMINIUM
THE CROWN
এ্যালুমিনিয়াম বাসনই
ব্যবহৃত হয়
ক্রাউন ব্র্যাণ্ড যে এ্যালুমিনিয়ম
পাত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়
আপনি নিশ্চিত হইতে পারেন। আজ
"ক্রাউন" শুধু একটি মার্কাই নয়
ইহা গৃহস্থালীর শোভা ও সৌন্দর্যের
প্রতীক। প্রত্যেকটি বাসনের গঠন ও নির্মাণের
মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত
কারকের কলানৈপুণ্য সূচিত হয়।
জীবনলাল (১৯২৯) লিঃ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর রায় বাহাদুর হিমচাঁদ কে শা
ক্রাউন ব্র্যাণ্ড এ্যালুমিনিয়াম বাসন প্রস্তুতকারক
কলিকাতা — বম্বে — মাদ্রাজ — রেঙ্গুণ — রাজমন্দ্রী — এডেন

কথা বাদ দিলাম; তবে বারোটার বেশি প্রায়ই হয় না।"

চারিদিকে মাঠ, একটা গ্রাম, তাও অনেক দূরে, সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল; সবাই চুপ ক'রে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। রাগে, ক্ষোভে ভেতরটা সবার জ্বলে খাঁখ্ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কপিলদেও কি উল্টে চাপ দেবে, কি দোষ বের ক'রে, সেইজন্যে কেউ মুখ খুলতে সাহস করছে না। সহরের বাইরে কেউ বড় একটা বেরোয় না, কিছুই যেন থৈ পাচ্ছে না।

কপিলদেও ভাবছে, তবে মোটেই অপ্রতিভ নয়, বললে—"তোরা হাতপা এলে দিয়েছিস, কিন্তু আমি তো ভাবছি ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই।"

এতটা সহ্য করা শক্ত, তবু ভালোটা কি তা শোনবার জন্য সবাই কিছু না ব'লে ঘুরে চাইলে মাত্র, শুধু যজ্ঞেশ্বর বললে—"রাত বারোটা-একটায় সবাই ফিরবে, একটা ক'রে বাসি রুটিও কারুর কপালে জুটবে না; ভালোটা দেখলি কোন্‌খানে তুই?"

কপিলদেও বললে—"টাটকা লুচি-মাংস ছেড়ে তোরা যদি বাসি রুটির পেছনে দৌড়ুস সে তোদের বরাত। ভালোটা নয় কিসে? আমাদের গাঁ এখান থেকেও যতদূর আবার পরের ষ্টেশন থেকেও প্রায় ততটাই দূরে—কেউ বলে এটা কাছে, কেউ বলে ওটা কাছে। ওখানে নামলে এক্কাটা পাওয়া যেত, তেমনি এদিকে প্রায় আধঘন্টা আগে তো নামা গেল। বগের মতন হা-পিত্তেস ক'রে ব'সে না থেকে যদি এই আড়াইটে মাইল একটু পা চালিয়ে চলে যাওয়া যায় তো এইটিই সুবিধে নয়?"

বিশে মোটা, বেঁটে, একটু ভুঁড়িও আছে, তায় সঙ্গে খোল; অনিলেরও হারমোনিয়াম, দুজনেই এক সঙ্গে ব'লে উঠল—"হেঁটে!"

কপিলদেও একটু ধমকের সুরেই বললে—"খুব খারাপ হোল?...তোদের না হয় দুরমণের গতর দিয়েছেন ভগবান—কিন্তু ঐ বলাই, লিক্‌লিক করছে, ছটাক খানেকের মানুষ, তিনটে মাইল দেহাতী এক্কার ধকোল সামলে আর আসরে গিয়ে বসতে পারত? দু' কাঁকাল টিপে বিছানা নিত না? ......আর ঐ নগা এখুনি হাঁপিয়ে সারা,—বাঁশিতে ফু দেবে কি—সিগে ফুঁকতে হোত না একেবারে?—তারচেয়ে কুইকমার্চ করে গিয়ে চনচনে ক্ষিদে নিয়ে একেবারে লুচি-পাঁঠার সামনে ব'সে গেলাম—বড় মন্দ বলছে কপিলদেও, না?"

কোন উপায়ও তো নেই। হেঁটে বাড়ি ফিরে যেতে হ'লে ঝাড়া সাত মাইল; এদিকে কপিলদেও যদি কমিয়েই ব'লে থাকে তো পুরোপুরি তিন মাইল হলেও লুচি-পাঁঠার সান্ত্বনাটুকু হাতে থাকেই। অনিল বলাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"কিরে, কি করবি? আমি বলি না হয়......"

যজ্ঞেশ্বরই উত্তর দিলে—"যাবে যে, রাস্তা কোথায়? সবই তো মাঠ দেখছি। কপিলদেও তার দিকে আড়চোখে চেয়ে নিয়ে বললে—"সোজাসুজি আলের ওপর দিয়ে। আরও সুবিধেই—দু'মাইলও হয় কি না হয় তাতে।"

"আর আল-কেউটে; যদি ছোবলায়? রাত তো হয়ে এল বলে।"

"পাড়াগাঁয়ে তো লোক নেই! সব কেউটের ছোবলে মরেছে।"

বলাই বললে—"সে কিছু এমন শক্ত কথা নয়; একটু আওয়াজ করলেই ওরা সরে যায়... ও'রা স'রে যান। আমরা যদি তালি দিতে দিতে এগিয়ে যাই......"

যজ্ঞেশ্বর ঘাড়টা বাড়িয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—"এক হাতে তালি বাজে না মশাই! সবার হাতেই একটা না একটা কিছু রয়েছে—শম্ভোর বেয়ালার বাক্স, নগেনের ক্ল্যারিয়নেটের, অনিলের তো......"

কপিলদেও বললে—"সে উপায়ও আমিই করে দিচ্ছি......বুদ্ধির দৌড় তো সবার দেখা গেল—শুধু নাক সিঁটকুতেই ওস্তাদ।"

মদন কানের অসুবিধার জন্য একটু ছাড়া-ছাড়াই থাকে নিজেকে নিয়ে, গায়ে প্রচুর শক্তি থাকার জন্য মেজাজটাও শান্ত, এরা যা ক'রে তাই নিরুপদ্রবে ক'রে যায়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে খঞ্জনী নিয়ে ঠোকাঠুকি করছিল, কপিলদেও এগিয়ে গিয়ে একটু গলা চড়িয়ে ডাকলে—"মদনা!"

মদন কথাও সাধামত কম কয়, মাথা দুলিয়ে প্রশ্ন করলে—"কি?"

"এরা তো বোকামি ক'রে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল গুরুঠাকুরের হুকুমে। এখন বলছে পায়ে হেঁটেই যাবে সবাই। তোকে খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে যেতে হবে।"

"কেত্তন করতে করতে যাবে?"

"সে মন্দ হোত না—একটাকে খাটে তুলে নিয়ে।......খঞ্জনি বাজাতে হবে, কেউটে সাপ তাড়াবার জন্যে; জগা বলছে আলে কিলবিল ক'রছে, পা দেওয়ার জো নেই।"

"খঞ্জনি শুনবে?"

"তোর খঞ্জনি শুনবে না এমন জীব আছে চরাচরে?"

"সে-শোনা নয়। বলছি মানবে? সরে যাবে? ওরা বড্ড রাগী কিনা।"

যজ্ঞেশ্বর হেসে বললে—"না শোনে ক্ষেতি নেই মদনা—হয় কেউটে না হয় কপিলদেও; আমরা খরচের খাতায় নাম তুলেই দিয়েছি, তুই আয়।"

একটা একটু চওড়া গোছের আলই গাঁয়ের দিকে গেছে, রাস্তা হিসেবে ব্যবহার হয়; সবাই নেমে পড়ল। কপিলদেও আগে আগে, তার পেছনেই মদন, কানের জন্যে আওয়াজের আন্দাজ থাকে না বলে এমনিই জোরে বাজায় খঞ্জনী, আরও জোর করে দিয়েছে, তার পেছনে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে অনিল, তার পেছনে বেহালা আর বাঁশির বাক্স হাতে পর পর শম্ভু আর নগেন, সবশেষে যজ্ঞেশ্বর।

সামনের গ্রামটিতে এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত্রি হ'য়ে এল। খঞ্জনী চলল না, কেউটেকে তাড়াতে পারে, কিন্তু কুকুরের দলকে টানে, একেবারে সাত আটটা এসে জুটল। বিশে একটু ভয়কাতুরে, বললে—"আমায় মাঝখানটায় থাকতে দে।......ভয়ের কথা নয়, চামড়ার জিনিস কাঁধে নিয়ে রয়েছি, দাঁত বসিয়ে দিলেই চিত্তির: একে তো বাবাকে লুকিয়ে আনা।"... খঞ্জনীর আওয়াজ শুনে কিছু লোক জুটে গিয়েছিল, জলুস দেখে আরও জুটল।...... নানারকম প্রশ্ন মন্তব্য—"কোথায় যাবে—উদ্দেশ্যটা কি?—বাঙালী কীর্তনপার্টি?.........দাউদপুর যাচ্ছে?—সকালে গেলেই তো হোত—এখনও তিন মাইল—বরং বেশি, মুরদঘাটার শ্মশানটা বাদ দিয়ে গেলে—বাদ দিয়ে যাওয়াটাই ভালো, রাত হয়ে যাবে তো?......ওদিকটা মুসলমানদের কবর গাহ্‌টা পড়ে বটে, তা ও'রা তত খারাপ নন......"

ছোট গ্রাম, পেরুতে দেরি হোল না, আবার মাঠে গিয়ে পড়ল সবাই। খানিকটা পর্যন্ত খঞ্জনী বাজাতেও হোল না, কুকুরগুলোই এগিয়ে দিলে, তারপর একটা দুটো ক'রে খসে পড়তে লাগল।

বয়সটাই এমন যে, এগুতে এগুতে পেছনের গ্লানি মন থেকে পড়ে খসে। শুক্ল পক্ষ, গ্রাম ছাড়ার একটু পরেই জ্যোৎস্নাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে উৎসাহটা নিয়ে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে সেটা প্রায় সমস্তটাই ফিরে এসেছে, এক রকম হুল্লোড় করতে করতেই চলল সবাই। বেশ খানিকটা এসে একটা বড়মঠাকুরের আস্তানা পাওয়া গেল। বোধ হয় হাটও বসে; খানতিনেক দোকান ঘর আছে, তার একটা কান্‌সার, অর্থাৎ ভাজাভুজির দোকান। কপিলদেও জিগ্যেস করলে—"কুটাহা খাবি?"

—অর্থাৎ মকাই ভাজা। কেনা হোল কিছু। অবশ্য সামনে লুচি-মাংস রয়েছে, আরও সব কি, কে জানে, তবুও হোল কেনা। হুল্লোড়বাজি তখন পুরোমাত্রায় জেগে উঠেছে, যজ্ঞেশ্বর বললে—"কেন, দেহাতে এসে যদি মকাই না খেলাম দুটো তো......লুচি-পাঁঠা সেতো সহরেও দেদার রয়েছে।"

খেলে না শুধু নগেন। সব অবস্থাতেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে, বললে—"ঐ হোল দেহাতের পাঁঠা, দেহাতের কি, সিটি ছেড়ে ক উঁহু খাবে কোন্ বক্কা!—তো সব খা কেনে।"

রাত এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ রাত্রি সব বাঁধন-ছেঁড়া বেপরোয়া, হুজুগের জন্যেই মুরদ ঘাটার শ্মশানের পথ বেছে নিয়ে হাসি-হুল্লোড়ে ভূত-প্রেতদের মধ্যে বিপর্যয় ঘটিয়ে এল বেরিয়ে। গ্রামের পো-খানেক আগে একটা রাস্তাও গেল পাওয়া, আল ছেড়ে সবাই উঠে পড়ল; তৎক্ষণে ওদিককার কষ্টের কথা একেবারেই মুছে গেছে সবার মন থেকে। খোলা হাওয়ায় মাইল তিনেক মেঠো পথ ভেঙে সবার খিদে চনচনে হয়ে উঠেছে। আগে খেয়ে নিয়ে আরম্ভ করবে কীর্তন, কি খিদেটা আরও শানিয়ে নেবে গেয়ে বাজিয়ে, কি মাঝামাঝি পথ ধরবে—গিয়েই চা আর হালকা একটু ক'রে কিছু, তারপর একেবারে শেষ ক'রে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে খাও সব—খালি লে আও, আর লে আও .....

যজ্ঞেশ্বর বলছে—"তোকে আজ ফেল্ করাব কপিলদেও, আমাদের এতটা পথ হাঁটিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিস—তারওপর মদনাকে আবার আগাগোড়া খত্তাল বাজিয়েছিস, ও একাই কি ক'রে দেখ্।"

কপিলদেও বলছে—"তোরা খাবার কথাই ভাবছিস শুধু। আমার মনে যে কী হচ্ছে—বাঙালী কেত্তনপার্টি আসছে—হৈচৈ পড়ে গেছে গ্রামে, ঠিক যদি না ওৎরাতে তো......"

বলাই দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে—"একটা

আইডিয়া আমার মাথায় এসেছেরে কপিলদেও।... তোরাও সবাই ভেবে দেখ্।......হৈচৈ বলছিস, হৈচৈ আর কোথায়? হৈচৈয়ের ব্যবস্থা বরং এবার আমি করছি। কথাটা বুঝলি না? বাঙালী কেত্তনপার্টির ওদিক থেকে এক্কা করে এসে পৌঁছবার কথা, অনেকক্ষণ আগে; তা পৌঁছুলোম আর কোথায়? হৈচৈ বলছিস—সবাই একেবারে চুপসে গেছে—কৈ, এলো না তো বাঙালীয়ারা—এমন সময় গানগানিয়ে গিয়ে ঢুকলাম আসরে, সমস্ত গ্রাম একেবারে জাগিয়ে দিয়ে!"

সবাই হাঁ করে রইল।

বলাই বললে—"বুঝলি না? আলের ওপর দিয়ে যেমন আগুপিছু হ'য়ে আসছিলাম আমরা সেই রকম করে দাঁড়া, শুধু মিলিটারিদের মতন খোলটা নিয়ে বিশে সামনে থাকুক, তারপর সব একেবারে পুরোদমে ইনস্ট্রুমেণ্ট আর গলা ছেড়ে... কিরে কপিলদেও, কি বলিস?"

কপিলদেও বললে—"আইডিয়াটা মন্দ নয়, তবে এতখানি দম মাঠে মারা যাবে এতে আমি রাজি নই। বাড়িটা হচ্ছে গ্রামের এক পাশেই, আমরা তো উল্টো দিক দিয়েই যাচ্ছি, একরকম খিড়কি দিয়েই ঢুকব। একটা বড় পুকুর আছে—বেশ বড়, তার এদিকে পাকুড়তলা সেইখানে গিয়ে ঠিক করে নোব। তার পরেই পুকুরের ধার থেকে আরম্ভ করে দিয়ে একেবারে....."

যজ্ঞেশ্বর বললে—"তাহলে আমিও একটা কথা বলি—একেবারে যখন সবাই আরও হতাশ হয়ে গেছে, আচমকা গিয়ে একেবারে মাঝখানে পড়া। মানে, এক কাজ করুক না কপিলদেও, মুখটি চুপ করে একা গিয়ে পৌঁছাক ... কিরে? তোর বাঙালী কেত্তনেরা কোথায়?—ছাঁচোর কেত্তনে মেতেছে? ... ঠাট্টা একটু করবেই তো—কপিলদেও মুখটা চুপ করে রয়েছে—তাদের কথা যদি মনে হয়, তখনকার সব ... এমন সময়—পুকুরের ওদিক থেকে নয়, একেবারে ও কোণে বাড়ির কানাচে থেকে—কেশব কুণ্ডু, করুণা দাঁতে—আর সেই সঙ্গে অনিলের হারমোনিয়ম, কেষ্টর বেহালা, নগেনের বাঁশি, বিশের খোল, মদনের খঞ্জনী ... আর বিয়ের আসরে যদি একটু ঠাট্টা নিয়েই না ঢুকলাম ...."

যে মজাটা হবে তার কথা ভেবে একটু হাসিও পড়ে গেল সবার মধ্যে। ঐ সংকল্পই হোল। মদনের খঞ্জনীও বন্ধ করে দেওয়া হোল।

(চার)

প্রকাণ্ড পাকুড়তলা, অন্ধকার যেন চারিদিক থেকে তাড়া খেয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। ক'জনে যতটা সম্ভব ভেতর দিকে গিয়ে গাছের গুঁড়িটার কাছাকাছি বসেছে যন্ত্রপাতি নামিয়ে। সাড়াশব্দ নেই, শুধু পুকুরের দামের মধ্যে একটা ঢোঁড়া-সাপ ব্যাঙ ধরেছে তারই ঝিমুনো ডাক মাঝে মাঝে, আর একটানা গোটা কতক ঝিঁঝির সুর। কপিলদেও চলে গেছে।

বেশ খানিকক্ষণ গেল, তারপরে আস্তে আস্তে ফিরে এসে চুপ করে একপাশে বসল। একেবারে ভাবান্তর দেখে কেউ কিছু জিগ্যেস করতে সাহস করছে না; আরও একটু এইভাবে কেটে গেল।

তারপর নগেন জিগ্যেস করলে—"কিরে, ওরকম করে চুপটি মেরে বসলি যে?—ওদিকেও কোন সাড়াশব্দটি নেই!"......

কপিলদেও বললে—"একটু বাইরের দিকে এসে বোস, গুঁড়ির কাছে ওখানটায়—পুরোনো গোখরোর আড্ডা।"

বাইরের দিকে খানিকটা বেরিয়ে এসে গোল হয়ে বসল সবাই কপিলদেওকে ঘিরে। কপিলদেও গালে হাত দিয়ে উবু হয়ে একটু বসেই রইল, তারপর বললে—"সাড়াশব্দ খুবই উঠেছিল, বাইরেও, আবার মেয়েদের মধ্যেও। এখন সব ঝিমিয়ে পড়েছে।"

দুতিনজনে বলে উঠল—"কোন খারাপ খবর নাকি?...তোর ঠাকুর্দা..."

"ওরকম সম্বন্ধ ধরে ঠাট্টা করিস নি সব। ঠাকুর্দা মানেই আমার ঠাকুর্দা? তবে হ্যাঁ, লাগে ঠিক প্রাণে; ঐ বলেই তো ডাকতাম আহা!"

"তোর নিজের ঠাকুর্দা নয়!"

কপিলদেও ও প্রশ্নটা কানেই তুললে না, আগের প্রশ্নের উত্তরেই বললে—"খবরটা খারাপ কি ভালো সেই কথাই তো ভাবছি—বিশেষ করে তোদের দিক দিয়ে—জগা বলছিল না?—কেমন শ্রাদ্ধের ব্যাপার..."

"শ্রাদ্ধ!...মারা গেছে নাকি?...কবে?... কি করে?..."

"না, শ্রাদ্ধের দেরি আছে; তবে সিওর, মোক্ষম মার দিয়েছে কিনা।... এই গ্রামেই বিয়ে ছিল ওপাড়ায়। যেমন শুনলাম ছোঁড়াদের প্ল্যান ছিল—আসুন আস্তেজ্ঞে হোক বলে সবাইকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে। তারপর মার—বিশেষ করে বরকে তো জ্যান্ত বের হতেই দেবে না ঠিক করেছিল, একটা খাটুলি পর্যন্ত লুকিয়ে জোগাড় করে রেখেছিল বুধন ঠাকুর্দার জন্যে। তবে গুরুবল, যেমন শুনলাম দু একজন বাগটা আর চেপে রাখতে পারলে না, বর গিয়ে উপস্থিত হওয়ামাত্র আরম্ভ করে দিলে। কানাঘুষোয় এরা একটু বোধহয় পেয়েছিল আঁচ, বিলাট চাপড়টা আরম্ভ হতেই তাড়াতাড়ি লুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সত্তর বছরের বুড়ো তো, আগলে ফেলতে ফেলতে মা অবস্থাটা করে দিলে ছোঁড়ারা তাতে সোজা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হোল। সেই খাটুলিই কাজ দিলে, তবে শুনছি ঐ কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। বাড়িতে কান্না তুলেছিল মেয়েরা, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। মানে, আশা তো নেই, আবার লাগতে হবে, মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতনী, নাতবৌ—অনেকগুলিতো একসঙ্গে মিলিয়ে।"

নগেন বললে—"সে তো বোঝা করলাম, যেমন দুর্বুদ্ধি তেমন ফলটিও পেলেক, এখন আমাদের কি হবেক?"

"তোদের শ্রাদ্ধের দিন নিশ্চয় নিয়ে আসব। সে তো আর বানচাল হবার নয়..."

যজ্ঞেশ্বর খিঁচিয়ে উঠল—"শ্রাদ্ধের দিন নিয়ে আসবে! আর আজ যে ডেকে নিয়ে এসে আমাদেরই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেছিস, তার কি?—খাব কি? থাকব কোথায়? ফিরবই বা..."

কপিলদেও ডান হাতটা তুলে বললে—"অত চেঁচিয়ে নয়!"

যজ্ঞেশ্বর থেমে গেল। সবাই ওর মুখের পানে চেয়ে রইল।

"বলছি অত চেঁচিয়ে নয়। ভেবেছ বুধন ঠাকুর্দাকে সরিয়ে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? এরা ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওরা এদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, দেখছিস না, এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, গ্রাম তবু কিরকম নিশুতি। এখন কাজ হচ্ছে চুপিসাড়ে—কাল দেখবে বনেজঙ্গলে লাস পড়ে রয়েছে..."

অনিল বললে—"তোদের বাড়িই নিয়ে চল তা'হলে..."

"বাধা রয়েছে যে, বুঝতে পারছিস না। ভয়ানক বাধা। তোদের যেমন ভালোয় ভালোয় নিয়ে এসেছি—গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিইনি, তেমনি আবার ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো। তোরা যে এখন এণ্টি পার্টি। সারা গ্রামে রটে গেছে কপিলদেও সহর থেকে বাঙালী কেত্তনপার্টি নিয়ে আসছে, গুরুবল যে এক ষ্টেশন আগেই নামিয়ে দিয়েছিল, সবাই জানে তারা আসেনি, এখন বাড়িতে যদি নিয়ে গিয়ে তুলি...ভেবে দেখ না একটু...কেত্তনাম শুনিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারবি?—তাহলে না হয় চল।"

জ্যোৎস্নায় সবার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করলে—"তাহলে?"

কপিলদেও বললে, "তাই তো ভাবছি। এক যদি..."

যজ্ঞেশ্বর মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে—"দেখ্ কপিলদেও, ঢের সয়েছি, এবার সত্যিই বন্ধুবিচ্ছেদ হবে।...নিয়ে চল তুই তোদের বাড়িতে, চল নিয়ে, যা হবার হবে—এই নিগ্রহ, তারপর এই পাঁচ মাইল আলভাঙা, তার ওপর পেটে অন্ন নেই...তোরা সব ওঠ, যাবো, ও না নিয়ে যায়, জিগ্যেস করতে করতে..."

সবাই উঠে পড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় পুকুরের ওপার থেকে "কোন হ্যায় রে!" বলে এক বিকট আওয়াজ উঠল। কপিলদেও চাপা গলায় বলে উঠল—"লুকিয়ে ফ্যাল! আগে বাক্স খোল সব লুকিয়ে ফ্যাল!..."

"কোথায়?..."

"পাকুড়ের গুঁড়িটার খাঁজে খাঁজে—যেখানে যেটা আঁটে..." নিজেই একটা তুলে নিয়ে ছুটল। বাকিগুলোও তুলে নিলে সবাই।

"কিন্তু বলছিলি পুরনো গোখরো..."

"পালা আগে, তার বোঝা আছে; লুকো।"

পরি তো মরি করে ছুটে গিয়ে গুঁড়ির গোড়ায় জমাট অন্ধকারের মধ্যে যেখানে যেটা আঁটল তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললে সবাই। কপিলদেও বললে—"এইবার চটপট..."

কি তা আর বলতে হোল না। সেই অন্ধকারে—পুরনো গোখরোর ঘাড়ে পা দিচ্ছে কি কোথায় পা দিচ্ছে কিছু হুঁস নেই—হুড়োহুড়ি করে উঠে পড়ল সবাই পাকুড় গাছটায়, নগেন আর বিশে মোটা, মদন তাদের ঠেলে ঠেলে দিলে তুলে, তারপর নিজেও উঠে পড়ল।

"আরে কোন হ্যায়?"—আরও এগিয়ে এসেছে আওয়াজটা পুকুরের মাঝামাঝি।

"নিঃশ্বাসটি পড়বে না, খবরদার!" চাপা গলায় নির্দেশটা দিয়ে কপিলদেও গাছতলা থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর দিলে—"কে, সবদু কাকা?...আমি কপিলদেও।"

"এখানে! এত রাত্তিরে! কে যেন কথা কইছিল না?"

"কইছিল বৈ কি, ওপাড়ার মুখিয়ালোর ছেলে—কোন মতলবেই আসছিল লুকিয়ে—

কোন ভয় নেই বলে আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসছিলামও, আপনি হেঁকে উঠতে হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে...”

ওদিকেই যাচ্ছে কপিলদেও, তবু সরযু কাকা খানিকটা এগিয়েই এল। বললে—“পালাল ছোঁড়া? শুনলাম ঐটেই সবচেয়ে বেশি লাঠি-বাজি করেছে।...আর ইয়ে...শুনলাম নাকি তোর সংগে বাঙালী কেত্তনপার্টি আসবার কথা ছিল? এসেছে?”

গাছতলার ঠিক বাইরেটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। কপিলদেও একেবারেই থতমত খেয়ে চুপ করে গেল একটু, তখনি আবার সামলে নিয়ে বললে—“ও!...কেত্তনপার্টি... বাঙালিয়াদের?”

“এই জন্যে জিগ্যেস করছি—এলে একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল; কন্যাপক্ষদের দিকে গাইবার জন্যে নাকি ডেকে আনছিলি...তুই?”

“আমি? ...আজ্ঞে আনছিলাম বইকি, অস্বীকার করতে যাব কেন? তা ঐখানেই গোলমালিনা হয়ে গেল আমার, ঐ কথা নিয়েই। বা বলে—আমরা কেত্তন গাইতে যাচ্ছি, মেয়ে পক্ষরই দল আমরা, একেবারে আসরে গিয়ে বসব—আমি বললাম—বাঃ, তোরা তো বাইজী নয়, তোরা বরযাত্রীদের সংগে জলুস করতে করতে যাবি। ...ওরা বললে সে আমাদের দ্বারা হবে না। আমি বললাম—তাহলে পথ দেখ্ নিজের। চলুন, ওরা ঐ রকম। কান মলেছি।”

“নিয়ে আসতে হয়। কি রকম একটু ভালো ক’রে দেখতাম।” গল্প করতে করতে ওরা চলে গেল ওদিকে।

একেবারে নিশুতি রাত, আন্দাজে প্রায় একটা হবে। কপিলদেও অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে বললে—“ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?”

ভয়েই বোধ হয় কেউ কথা কইলে না, তবে ছ’খানা নাকে পুরনো গোখরোর নিঃশ্বাসের মতোই ফোঁস করে একটা নিশ্বাস পড়ল—যেন এই ঘণ্টা দুয়েক দম বন্ধ করে ছিল সবাই।

কপিলদেও বললে—“আস্তে আস্তে নেমে আয় সবাই। দেখলি তো? ভাগ্যিস পাকুড় গাছটা ছিল। গ্রামে এখন কে শত্রু, কে বন্ধু বোঝবার জো নেই...নে, খোল বাক্স সব তোল যে যার।...আমি এই অন্ধকারটুকুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম...” দু’তিনজন প্রশ্ন ক’রে উঠল—“কিছু খাবারটাবার...হ্যাঁরে...?”

কপিলদেও ধমক দিয়ে উঠল—“চুপ কর, বলিহারি লোভ!...আমি কোন্ দিকে, সরযু কাকার এখনও সন্দেহ ঘোচেনি। বসে বসে তাওয়া দিচ্ছিলাম এতক্ষণ ধরে, তবু আমাকেই একবার জিগ্যেস করলে না মুখে কিছু দিয়েছি কিনা...আমি বলি আমায় এতজনের খাবার দিতে হবে! কে তোমার সৌখীন কুটুম্বের দল বাপু? তাদের যে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে...”

গাছতলা ছেড়ে রাস্তা। পোয়াটাক পরে আবার আলে নামবার সময় নগেন বললে—“হ্যাঁরে কপিলদেও...”

কপিলদেও চটে উঠল—“বলে পাঠাও, তোমার আবার কি নতুন আব্দারটি বটেক!”

“আব্দার নয়, বলা করছিলাম—তোর পকেটে—তোদের পকেটে ফুটাঙ্গা আছে প’ড়ে—দু’-চার দানা?...”

বাল্মীকী

(২১ পৃষ্ঠার পর)

খাণ্ডার গৃহিণীর মালিক আমি, নুব্জপৃষ্ঠ হইয়া নতগুম্ফে মিতব্যয়ের সংকীর্ণ পথে কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। মোটেই তাহা নয়। আমার তিনকুলে কেহ নাই। এই সেদিন পর্যন্ত ব্যাচিলর ছিলাম। সম্প্রতি, মানে মাস দুই আগে, বিবাহ করিয়াছি।

বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। না, না, আপনারা যাহা ভাবিতেছেন তাহা নয়। বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি অন্য কোন কারণে নয় আমার চাকর গোবর্ধনের জন্যই। ব্যাটা ভয়ানক চোর। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু, পটল, এমনকি পানের ভিতর হইতে সুপারী পর্যন্ত সরায়। আর কিছু না পারুক দুই চারিটা দেশলাইয়ের কাঠি তো পার করিবেই। একা তাহাকে সামলাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। দালালি করি, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়। ভাবিলাম ঘরে একটা লোক থাকা দরকার।

আমার সদ্য-পরিণীতা পত্নীর নাম শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। আজকাল নারীমাত্রেই দেবী, মনোমোহিনীকে আমার সম্রাজ্ঞী পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে। মনোমোহিনী রূপসী, কিন্তু রূপের জন্যই তাহাকে ধর্মপত্নীত্বে বরণ করি নাই। করিয়াছিলাম সে ইকনমিক্সে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে বলিয়া।

প্রথম সংকোচটা কাটিয়া যাইবার পর তাহার সহিত আমার নিম্নলিখিত রূপে আলাপ হয়।

“তোমার শাড়ীটা তো বেশ চমৎকার। দাম কত?”

“সাতাশ টাকা—”

“সাতাশ টাকা! বল কি! কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে—”

“ধনেখালি শাড়ীর তো এইরকমই দাম। পিসিমা দিয়েছেন এটা। কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলেন জানি না।”

“ঠকিয়েছে। এসেন্স মেখেছ নাকি। ভারী সুন্দর গন্ধ তো”।

“হ্যাঁ, আমার মামাতো বোন টুকু দিয়েছিল একটা ‘ইভনিং ইন প্যারিস’।”

“ও।”

দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। তবে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম, অলংকারে কাপড়ে তিনি যাহা পরিধান করিয়া আছেন, তাহা কিনিয়া দিতে হইলে আমার দম ফুরাইয়া যাইত। জানা-শোনা সস্তা দোকানে গেলেও দীর্ঘশ্বাস অনিবার্য হইত। সুতরাং ঠিক করিলাম কাঁচা নগদ পয়সা এখন উহার হাতে দিব না। আগে কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া দেখি। গোবর্ধনের আমলে যেমন নিজেই সব জিনিস কিনিয়া দিতাম, তেমনই দিতে লাগিলাম। গোবর্ধনের বিষয়েও তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলাম।

বলিলাম, “খুব কড়া নজর রাখবে ওর উপর। বাজার থেকে যা জিনিসপত্র আসবে তা ওজন করে’ গুণে নেবে, এমন কি আলু, পটল পর্যন্ত। ভাঁড়ার ঘরের চাবি যেখানে সেখানে ফেলে রেখ না। দেশলাইটি খুব সাবধানে রাখবে। তা’ নাহলে একদিনেই ফাঁক করে’ দেবে। রোজ এক বাণ্ডিল করে’ বিড়ি ফোঁকে। খুব কড়া নজর রেখ—”

মধুর হাসি হাসিয়া মনোমোহিনী বলিল, “রাখব—”।

গালে টোল পড়িল। হাসিটি সত্যই বড় সুন্দর। ওই হাসিই আমাকে শেষ পর্যন্ত ডুবাইল।

একদিন কি খেয়াল হইল গোপনে দেশলাইয়ের কাঠিগুলি গণিয়া দেখিলাম। ইতি-পূর্বেও গোবর্ধনকে ‘চেক’ করিবার জন্য মাঝে মাঝে গণিয়া দেখিতাম। দেখিলাম যত খরচ হওয়া উচিত ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়াছে। এক আধটি নয়, দশটি কাঠি অন্তর্ধান করিয়াছে। বুঝিলাম মনু গোবর্ধনকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভয়ানক রাগ হইল। কিন্তু মনুর আত্মসম্মানে পাছে আঘাত লাগে, এই ভয়ে ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিলাম না।

ইহার দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন বেলা দেড়টার সময় বাসায় ফিরিতে হইল। সাধারণতঃ আমি পাঁচটার আগে ফিরি না। ঢুকিয়াই দেখি গোবর্ধন মনের আনন্দে বিড়ি ফুঁকিতেছে—। আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, সেদিন-কার অবরুদ্ধ ক্রোধ বোমার মতো ফাটিয়া পড়িল। গোবর্ধনের গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলাম।

গোবর্ধন মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর হেঁট হইয়া আমার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। জুতা দুইটি খুলিয়া লইয়া স-সম্ভ্রমে বলিল, “বৌমা এই সবে শুয়েছেন, একটু পা টিপে টিপে ওপরে যাবেন বাবু—”

“পা টিপে টিপে? তার মানে—”

“আমাকে তাই তো হুকুম দিয়েছেন, বলেছেন, দেখো সিঁড়িতে যেন কোনও শব্দ না হয়—”

পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা, মানে—অচিন্তনীয়—! মনু নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিল। গালে টোল পড়িল। বইটি দেখিলাম একটি ইকনমিকস্ বিষয়ক বই।

দ্বিতীয়বার বোতাম টিপিবার পর কপাট খুলিল। বিজন ডাক্তার চোখ কচলাইতে কচ-লাইতে নামিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে বলিল—“কে মহীতোষ? কি ব্যাপার, এত রাতে”।

“একবার গলাটা দেখতো ভাই, বড্ড কষ্ট পাচ্ছি—”

গলা দেখিয়া বিজন মন্তব্য করিল, “সিগারেট ধরেছ নাকি—”

“ধরেছি সম্প্রতি”।

“তাই না কি! সেই জন্যেই হয়েছে—”

বিজন একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়া আমার হাতে দিল। আমি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—“ফর মহীতোষ না লিখে, লিখে দাও ফর বাল্মীকি—”

স্কেচ—দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

নির্মলকুমার দত্ত

মদন দত্ত

জে ভি ষ্টালিনের রচনাবলী

জে ভি ষ্টালিনের রচনাবলী—
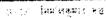
১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ড—১॥০ প্রতি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ১৯০১ সাল হইতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত লিখিত রচনাবলী, গ্রন্থকারের মুখবন্ধসহ। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ১৯০৭ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত লিখিত রচনাবলী (রেক্সিন বাঁধাই, প্রত্যেক খণ্ড ৪০০/৫০০ পৃষ্ঠা)।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস (বলশেভিক) **১৸০**

১৯৩৭ সালের শেষ পর্যন্ত, লেনিন এবং স্টালিনের পার্টির ইতিহাস (রেক্সিন বাঁধাই, ৫৫১ পৃষ্ঠা)।

লেনিনবাদের সমস্যা **১৷৵০**

স্টালিনের রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ ১৯৫২ সালের রুশ সংস্করণ হইতে অনূদিত হইয়াছে (রেক্সিন বাঁধাই, ৮০৩ পৃষ্ঠা)।

জে ভি স্টালিন—

(একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী) ॥৵০
মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংকলিত (রেক্সিন বাঁধাই, ১৪টি চিত্র)।

উপরোক্ত বইগুলি ইংরাজি ভাষায় মস্কো থেকে প্রকাশিত। ক্যাটালগের জন্য লিখুন:

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি

(১১ পৃষ্ঠার পর)

মহিষাসুর দেবীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো......সমস্ত দিকমণ্ডল প্রকম্পিত ক'রে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো দেবতারা, রোষ-রাগ-রক্তিম দেবীর চরণে লুটিয়ে পড়ে বলে—

হে দেবী! সম্বরণ কর তোমার এই মহা-ভয়ংকরী মূর্ত্তি, প্রসন্ন হও, বরদা মাতার রূপে গ্রহণ কর আমাদের পূজো!

মহা-ক্রোধে আরক্ত দেবীর আননে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ মাতৃ-মাধুরী........ মৃত্যুমদারুণ-লোচনে ধীরে ফুটে ওঠে অভয়-আশীর্বাদের আলোর জ্যোৎস্না। সেই প্রসন্ন মাতৃ-মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেবতারা বন্দনা করে ওঠে,

দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহিবিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥

হে দেবী! শরণাগতের হে আর্তিহরা, তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরী, এই নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টি, বিশ্বের তুমি জননী, রক্ষা কর তোমার এই বিশ্বকে।

মহাশক্তি, আদিশক্তি তুমি! তুমি অনন্ত-বীর্য্য, মহাবৈষ্ণবী। তোমারই অপার মায়ায় তুমি গেঁথে রেখেছ এই অনন্ত সৃজনের মালা। তোমাকে নমস্কার!

তুমিই সমস্ত বিদ্যা......জগতের সমস্ত নারীর মধ্যে বিরাজ করছো তুমিই, তোমারই মাতৃরূপে তুমি পূর্ণ করে রেখেছ জগৎকে। তোমাকে নমস্কার।

সর্বমংগলমংগল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥

হে শরণ্যে, হে ত্রিনয়নে, হে গৌরী, হে নারায়ণী, হে শিবানী, সমস্ত মংগলের তুমিই মংগল-ইচ্ছা, তুমিই মংগল-শক্তি, সমস্ত সাধনার তুমিই সিদ্ধি। তোমাকে নমস্কার!

শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি, নমোঽস্তুতে॥

শরণাগত যে, দীন যে, যে কেউ কাতরে চায় পরিত্রাণ, হে দেবী, হে নারায়ণী তুমি সকলের বেদনা কর দূর। তোমাকে নমস্কার!

তুমিই আবার মহাভয়ংকরী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, মৃত্যুরূপা কাল-রাত্রি......তোমার নয়নে অনল, কণ্ঠে বজ্র, সহস্র হস্তে সহস্র মৃত্যু, চরণের নূপুরে বাজে প্রলয়ের তরঙ্গের ছন্দ। মহা রুদ্রাণী, তোমাকে নমস্কার!

লক্ষ্মী লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে
মহারাত্রি, মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

তুমিই আবার লক্ষ্মী, তুমিই লজ্জা, মহা-বিদ্যা তুমি। তুমিই শ্রদ্ধা, তুমিই পুষ্টি, তুমিই জীবন-যজ্ঞের আহুতি-মন্ত্র। মহারাত্রি তুমি, চলমান জীবন-স্রোতের মধ্যে তুমিই ধ্রুব জ্যোতির্শিখা। তোমাকে নমস্কার!

তোমার যে ত্রিনয়নের অগ্নি-দৃষ্টিতে দহন করেছ অসুর-শক্তিকে, হে দেবী, তোমার সেই ত্রিনয়নের আলো মাতৃ-প্রহরী হয়ে আমাদের বরুক রক্ষা। যে জ্বলন্ত ত্রিশূলে বিদ্ধ করেছ অসুরের হৃদয়, ত্রি-শিখা প্রদীপের মত সেই ত্রিশূল সমস্ত বিঘ্ন থেকে আমাদের রক্ষা

এই পথে একবার

দিলীপ দাশগুপ্ত

এপথে অনেক আলো। মুছে নেয়া সব অন্ধকার
দু'টি হাত অভয়ের; কুসুমের সব গন্ধভার
একাকী বহন-গর্বে মালঞ্চের একটি হৃদয়—
শোনায় কবিতা-কথা, হিয়া দিয়ে হিয়া করে জয়।

এই পথে এসো তুমি। ব্যাঘ্র-গুহা থাক পিছনেতে,
পড়ে থাক যন্ত্রণার প্রখর মুহূর্ত কান পেতে,
উর্বরা-ঊষার ক্ষেত্রে—রাত্রি-মন করিবে বপন'—
সোনালি শস্যের বুকে একথোকা নরম স্বপন।

এই পথে ঘুরে যেয়ো। দুঃখহরা নিমেষের কোলে
সকল ক্লান্তির ঘুম জেগে জেগে আশাবুকে দোলে
সেখানে নির্জন-ছায়ে' একবুক-ভালোবাসা দান
বিনাঋণে স্বীকৃতিতে ভরে দেবে অনেক পরাণ।

এই পথে দুটি বাহু ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রত্যহের বুক—
কী যে কথা বলে দেবে—তার লাগি
হোয়ো উৎসুক।

করুক...যে ঘণ্টার মৃত্যুরোলে তুমি সম্মোহিত করেছ অসুরদের চেতনা, আমাদের ঘিরে মায়ের আশীর্বাদের মত নিত্য হোক্ তা ধ্বনিত... অসুরদের রক্ত আর মেদের পঙ্কে চর্চিত হয়েছে তোমার যে খড়্গ, শুভায় খড়্গ ভবতু চণ্ডিকে! হে চণ্ডিকে, অসুর-রক্ত-রঞ্জিত সেই খড়্গ হোক্ আমাদের কল্যাণ-কেতু!

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে
দেবি! নমোঽস্তুতে!

সকল ভয় থেকে আমাদের রক্ষা কর, হে দেবী, হে দুর্গে, তোমাকে নমস্কার!

শক্তি বো যদ্ বিভর্ত্তি রোদসী উভে

তোমারই শক্তি পৃথিবী আর অন্তরিক্ষকে ব্যেপে রয়েছে মহাশূন্যকে পূর্ণ করে।

শক্তো স্বা শকেয়ম্

হে পরমা শক্তি, হে আদি শক্তি, তোমার সেই শক্তি দিয়েই করবো তোমার উপাসনা।

ওজোঽসি সহোঽসি অমৃতমসি।

তুমিই ওজঃ-শক্তি, তুমিই সহন-শক্তি, তুমিই অমৃত।

উর্জং ময়ি ধেহি

তোমার সেই অমৃত জীবন-শক্তি দাও আমাকে।

বলমসি বলং মে দাঃ

তুমিই বল...সেই বল দাও আমাকে।

আয়ুরসি আয়ুর্মে দাঃ

তুমিই আয়ু, সেই আয়ু দাও আমাকে।

দেবতাদের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে মহাদেবী চণ্ডিকা অভয়া বিশ্বজননীর বরদা মূর্তিতে প্রকট হয়ে বর দিলেন,

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

যখনি এই ভাবে দানবের উত্থানে ব্যাহত হবে সৃষ্টির গতি, বাধা পাবে বিশ্বের শান্তি, বিশ্বের শান্তির শত্রুদের ধ্বংস করবার জন্যে তখনি অবতীর্ণ হব আমি!...

রোশোনাই

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বনবাদাড়ে আদাড় ঘেঁটে
খুঁজতেছিলাম একটি মধুচাক,
কাঁটায় কাঁটায় শরীর ক্ষত
মর্মে ছিলাম তৃষ্ণাহত,
পিছন থেকে শুনতে পেলাম
তখন তোমার ডাক।
নেমেছিল আকাশ জুড়ে
কালো মেঘে—তখন বাদলবেলা,
নানা রঙিন বুনোফুলে
তোমার মাথার এলোচুলে
মুগ্ধমধুর সমাবেশে—
সুরু হলো কী জানি এক খেলা।
সবুজ জমির আস্তরণে সে এক রোশোনাই
জাগলো কী যে মনের মাঝে আজও
ভুলি নাই।

ক্ষণিকের অতিথি

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

মিলে মহা সমারোহে শোভাযাত্রা ক'রে ওঁকে বাড়ী থেকে নিয়ে গেল। সেইদিন থেকে বাড়ীর সঙ্গে ওঁর আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—আমাদের এখানে এসে ওঁরা অভুক্ত থাকবেন—ওঁরা কি খাবেন জিজ্ঞাসা কর, আমরা আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। মুন্সী আবার সেই ভাষায় তাঁদের কি জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু সেদিক থেকে কোনো প্রত্যুত্তরই এল না—তাঁরা সেই স্থির চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন, মনে হোলো মুন্সীর কোনো কথা তাঁদের কানেই গেল না।

সাধ্বীরা আমার কাছেই বসেছিলেন। চোখ খোলা অথচ মনে হোতে লাগল যেন তাঁরা ধ্যানে বসেছেন; দৃষ্টি কোনো পদার্থের ওপর নিবদ্ধ নয়, যেন দূরে বহুদূরে এই সুখ-দুঃখময় সংসার-সাগরের ওপারে সে দৃষ্টি প্রসারিত। বিশেষ ক'রে উভয়ের মধ্যে বয়ীয়সীর চোখ দুটো অদ্ভুত। সে চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—যেন একজোড়া চকচকে কাচের চোখের পেছনে শক্তিশালী আলো রয়েছে, তারই জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে বাইরে। স্বচ্ছ সেই চোখ দুটোর ভেতর থেকে মনের তল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়—যতদূর দৃষ্টি চলে তার মধ্যে বাসনা বা কামনার মালিন্য কোথাও নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীর চোখও ছিল অদ্ভুত। কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় সদ্যপরিত্যক্ত সংসারের আবিলতার কিছু ছাপ যেন তখনও তাতে লেগে রয়েছে।—সদ্যজাগরিতা তরুণীর চোখে স্বপ্নের আবেশ যেমন জড়িয়ে থাকে।

আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম—দেখলুম ধীরে ধীরে তাঁদের চোখ বন্ধ হোয়ে এল। ভাবতে লাগলুম সংসারের এই কলুষ পারাবারে এমন শুভ্র শতদল ফোটে কি ক'রে!

সারা রাত্রি তাঁরা ধ্যানে কাটিয়ে দিলেন। অতি প্রত্যুষে বিহঙ্গ কাকলীর সাড়া পাওয়া মাত্র উঠে পড়ে আমাদের কোনো সম্ভাষণ না করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেলেন।—দুর্যোগের রাত্রে পাখী যেমন বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেয়, আবার সকাল হোলেই উড়ে চলে যায়।

রাজশেখরের ছেলেবেলা

(২০ পৃষ্ঠার পর)

ভয় ধমক ধামক দ্বারা বা যাদু-বাছা বলে : তো "মেজ ঠাকুরপোর কবিতা" ইংরেজী খকদের "Early Poems", "Fragments' ত্যাদির মতন প্রকাশ করতাম আর তাতে বাংলা হিত্যের গৌরব হ'ত।

সরোজিনী যে কর্ড মেলের run বিতা আওড়াত তাও শুনেচি। এলাহাবাদে র্ড মেল ঢুকচে আর রাজশেখরের দাদা ট্রেনে স্ত্রীর জন্য অস্থির হয়েচেন। দাদার বিরহে র চেয়ে ছ বছরের ছোট ভাইও ব্যথিত :—

আর কত দেরী আর যে সহেনা
ধড়ে প্রাণ আর থাকিতে চাহেনা
এইবার মেল ঢোকে ইসটিশান
ভ্যাকু-অম্ ব্রেকে পড়েছে কি টান?
গুম্ গুম্ গুম্, কড় কড় কড়
হুড়াং হুড়াং হুড় হুড় হুড়
ক্যাঁচ ক্যাঁচ কোঁ থামিল গাড়ি।

কবিতার টুকরা যা দিলাম তা সরোজিনীর মুখেই শুনেছি. মুখে আওড়ান কবিতা র প্রপারটি, রাজশেখরের নয়। আমি স্মৃতি তা থেকে কিছুই কখনও বের করে রাজশেখরের বারণের সীমা অতিক্রম করিনি। তাঁর মুখে শুনেই আওড়াতে শিখলাম।

দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী অনুরোধ-নয় করে বল্লেন, "শেলির আত্মহত্যার ইচ্ছাটা করার আওড়ান না।" পত্নীর মুখে যেমন শুনেছিলাম আওড়ালাম :—

নীরে বহে যাবে মৃদুল পবন
হেরিব চৌদিকে নীল পাথার।
শুনিতে শুনিতে সাগর গর্জন
ত্যজিব অন্তিম নিঃশ্বাস তার।

"বহুৎ! এ যে মৃদুল মৃদঙ্গধ্বনি" প্রাণ দিলো ইংরেজী ছন্দে বাংলার স্বাভাবিক তান!" তিনি বল্লেন, "আত্মহত্যা করবো না কি?"

১৬ বছর বয়সে বোধ হয় বালক রাজশেখর লা কবিতা অনুবাদে কি রকম আকৃতি [illegible] করে দেখবার জন্য এমপাথি বা সমানু- [illegible] দ্বারা নিজেকে শেলীর পেজিশনে [illegible] কল্পনা করছিল। শেলীর জন্য [illegible] নয় আমার বোধ হয়। এই সমানু- [illegible] বুড়ো রাজশেখর খাঁটি নিরা- [illegible]। বোধ হয় মাংসখোরদের পেজিশনে [illegible] ফেলে অ্যাংলো মোগলাই হোটেল, [illegible] হোটেলওয়ালা ইত্যাদি সৃষ্টি করে- [illegible]। যখন এমপ্যাথি কেটে গেল তখন রাজা- [illegible] দের মাংসের লোভ চলে গেল,—বার্লি [illegible] টার খেয়ে বাড়ি গেলেন।

এই বাল্যকালের কবিতা এখন বিশ্বকে [illegible] দিকে দু'চার লাইন নমুনা শোনাতে কি [illegible]? ভাণ্ডার ফাজলামীর কি কিছু বাকি [illegible] এই বুড়োবয়সে?

পর্বত ভেঙ্গে হে'ইঅ'!
বয়লার ফাটে হে'ইঅ!

এর চেয়ে কর্ড মেলের তান অনেক ভাল। বাল্যকালকে অত অবজ্ঞা করতে নেই,— "Child is father of the man."

"বয়লার ফাটে হে'ইঅ" তো রাস্তায় না যায়। ওরিজিনালিটি কোথা এতে?

কর্ড মেলের তাল সম্পূর্ণ অরিজিন্যাল। সরোজিনী বলতো, "ও আমার কর্ড মেল! উঁচু শেড থেকে চমৎকার প্রতিধ্বনি আসে।" সেই প্রতিধ্বনি পাবেন এ কবিতায়।

তাহলে ছেলেবেলার মেডেলটা গঙ্গায় ফেলে দিতে হয়, বার্ধক্যের দুটোই রাখতে হয়। সরোজিনী কেন বলেছিল "সব খাতা গঙ্গায় দিও।" তার কি 'মেজঠাকুরপোর কবিতার' প্রতি রাজশেখরের মতনই অবজ্ঞা জন্মেছিল? তা নয় সে লুকিয়ে টুকে নিয়েছিল বলে চিরকাল খাতা দুটো লজ্জায় লুকিয়ে রাখতো। মনে করলে গোপন করা জিনিষ জলের মধ্যেই গোপনে থাকে। তাকে তো কেউ ডিসকভারির জন্য বাহাদুরী দেবে না।

না হয়তো মনে করতো মেজঠাকুরপো যখন কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছে, তখন ও খাতাদুটো দেখলে হয়তো রাগ করবে, কাজ কি দিয়ে? সরোজিনী নিজেই আওড়াত

বিপদ [illegible] মনের চাহেনা
[illegible] [illegible] সতত রয়
[illegible] [illegible] একথা ভাবে না
[illegible] [illegible] [illegible] মানব হৃদয়।

দেবরের কবিতায় এত লজ্জা কেন? দেবরের ফেলে দেওয়া লেখা চুরি করে কুড়িয়ে নেওয়া ও তার বিনা অনুমতিতে খাতায় কপি করা এই ছিল [illegible] সংকোচ। কেন দেবরের [illegible] [illegible] [illegible]? কেন অতল জলে।

আমি [illegible] বলছি না যে আমি [illegible] সে কাকে আওড়াতো। তাহলে লজ্জায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খাতা কখনও [illegible] [illegible] সে সন্দেহ করতো।

সরোজিনীর স্কুলের বান্ধবীরা দলে দলে এসে "মেজঠাকুরপোর কবিতা" নিজেদের খাতায় কপি করে নিয়ে যেত। বাপ মা দিকে [illegible] "মেজঠাকুরপো" নাম এলাহাবাদে [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে গেল। [illegible] নয়, ছোট [illegible] বাঙ্গালী মেয়েমহলে [illegible] প্রথম এই বালকের নাম [illegible] হল।

ছেলেবেলা বা বুড়ো বয়সের লেখা ছাপা না হলে কি সেটা সাহিত্য হয় না। পুরাণ [illegible] ইত্যাদি [illegible] জন্মগ্রহণ করেছিল। ডাঃ সুনীতি চাটুজ্জে মহাশয় বোধ হয় তাঁর অভিমত এবার বদলাতে পারেন "রাজশেখর পরিণত বয়সেই সাহিত্য-রসে অবতীর্ণ হয়েছেন" (বঙ্গ-সাহিত্য, রাজশেখর সংখ্যা)। সাহিত্যরস ১৮৯৩ সালেই সুরু হয়েছিল সুনীতিবাবুকে জানাই।

বাংলা গল্প লেখবার আগে রাজশেখর অন্যান্য ইংরেজী ম্যাগাজিনে লিখত। একটা মনে পড়ে "দি টিউবওয়েল।" কলম একেবারে ঘুমিয়ে ছিল না।

রাজশেখর সাহিত্যসম্রাট হয়েই জন্মেছিল। তা বন্ধ হবার জো নাই। ডাঃ চাটার্জি লিখেছেন "এতদিন ধরে কোথায় চাপা ছিলেন?" তার উত্তর কে দেবে?

রামায়ণ মহাভারতও সাত বছর বয়স্ক রাজশেখরের মস্তিষ্কে 'সেমি-ফ্লুইড' অবস্থায় ছিল। বাল্যকালের কবিত, শেলির জলমগ্নের করুণ আভাস, রামচন্দ্রের সীতার জন্য বিলাপে গদ্যতে প্রকাশ পাচ্চে, পাঠকের চোখ আর্দ্র হচ্চে। মস্ত আড্ডায় চন্দ্রশেখর একদিন সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনারা কেউ রাবণের বাপের নাম জানেন?" সকলেই আমতা আমতা করে মাথা চুলকান, বলতে পারল না। বাবা গুড়গুড়ির নলটা নাবিয়ে রাজশেখরের পিঠ থাবড়ে আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন "তুই জানিস রে ফটিক?"

ফটিক বিড়বিড় করে লজ্জায় উত্তর দিল "বিশ্বশ্রবা মুনি!" চারিদিক থেকে লোক উঠে এসে পিঠ ঠুকে দিয়ে বললে, "বা-রে ফটিক বা-রে ফটিক!" এই বামুনপাড়ায় পাড়াগাঁয়ে মাগীদের দেওয়া নাম ধরে ডাকবার অধিকার যাঁদের ছিল সব গুরুজন গিয়া,—বাপ, মা, দিদি, দিদিমা। কেবল আমি আর সহোদরা শীলাবতী (৭৫) দুজন এই নামে ডাকি।

নারী পুরুষে এবং পুরুষ নারীতে পরিণত হওয়ার কথা হালে আলোচনা হচ্চে খুব। এই সব আমাকে মনে করিয়ে দিচ্চে যে, সরোজিনীও এই রকম তার দেবরকে নারীতে পরিবর্তন হতে দেখেছিল,—অবশ্য কেবল তার চোখেই। তখন এফ-এ পাস করেছে তার দেওর। সে খেয়ালে রাজশেখরকে মা সরস্বতী দেখতে লাগল। এর পূর্বে সে তৌদ বছর বয়সের দেবরকে একদিন শাড়ী পরিয়ে গহনা পরিয়ে দেখেছিল যে সে দেবর না বাণী বিদ্যাদায়িনী বিদ্যার প্রতীক। রাজশেখর চুপ করে ছিল। সায়েন্টিস্ট কখনও কি এক্সপেরিমেন্টে আপত্তি করে? সরোজিনী ভুলে গেল রাজশেখর সম্পর্কে ছোট ও তাকে প্রণাম করে। সে রাজশেখরের ফ্যাটবুকে পীনোন্নত দেখলে সে দেবরকে বাগদেবী বীণাপাণি ভেবে 'আপনি' বলতে সুরু করল! এ-রোগ সরোজিনীর চিরকাল রয়ে গেল। সীতাও নিজ হাতে সাজিয়ে লক্ষ্মণ দেওরকে এত আদর করেন নাই।

রাজশেখরের এখন ১৬ বয়স, বি-এ পড়বে ও পরে বিয়ে করবে। তবেই ডিকসনারীতে দেখি যে ১৬ বছর পর্যন্ত বাল্যকাল বলে অতএব আমার কথাটি ফুরাল নটে শাকটি—ইত্যাদি।

অতৃপ্তি

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ কবিভূষণ

শয়নে স্বপনে ধ্যানে নিশিদিন পাই
বিশ্বের আননে মনে সর্বত্র তোমায়,
তবে কেন মরীচিকা মধুর মায়ায়
ভালবেসে অবশেষে অন্তরে হারাই?
সংসারে সুখের সার শুধু ব্যর্থতাই,
বিরহ মিলন মায়া কাঁদায় আমায়।
দু'দিনের মেলামেশা সুখের নেশায়—
ভালবাসে আজ যারা—ভুলিবে তারাই।
ভারতের পুণ্যতীর্থ করিয়া ভ্রমণ,
নীরবে দেখেছি প্রেম সৌন্দর্য ভূমার।
তবু মিটিল না সাধ—দেহ-প্রাণ-মন,
কী যে চায় সে নহেকো অজানা তোমার।
প্রেরণা পরশে প্রাণ রঙীন সবুজ,
বাসনায় কামনায় ব্যথিত অবুঝ।

মধুলুব্ধা

(২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

পেছন ছুটল। লিজি দরজায় দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চিৎকার সুরু করল]

লিজি: ওকে মিছিমিছি মেরনা! ও কোন দোষ করেনি। [দু'বার গুলী ছোড়ার আওয়াজ হ'ল। লিজি ঘরে ফিরে এল। মুখখানা শক্ত পাথর। টেবিল থেকে রিভলবারটা তুলে নিল। ফ্রেড ফিরে এল। বন্দুকটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লিজি রিভলবারটা পেছন করে লুকিয়ে ধরে রেখে] কী, নিগ্রোটাকে ধরতে পারলে? [ফ্রেড নিরুত্তর] ভাল! এইবার তোমার পালা। [লিজি রিভলবার তুলে ফ্রেডকে লক্ষ্য করল]

ফ্রেড: লিজি! পাগলামি করনা। আমার মায়ের কথা একবারটি ভেবে দেখ।

লিজি: মায়ের নিকুচি করেছে তোমার! ও আমার ঢের দেখা আছে।

ফ্রেড [লিজির দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে]: শোন লিজি। ক্লার্কদের আদিপুরুষ নিজহাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে এখানে পত্তন করেন। ষোলটা রেড ইণ্ডিয়ানকে নিজহাতে গুলী করে মেরে, পরে ওদের হাতে মারা পড়েন। তাঁর ছেলে, বলতে গেলে, এই সহরটা তৈরী করেন। তিনি ছিলেন মস্ত বীর এবং ওয়াশিংটনের বন্ধু। স্বাধীনতার যুদ্ধে দেশের হয়ে লড়াই করতে করতে তিনি ইয়র্ক সহরে প্রাণত্যাগ করেন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন স্যানফ্রেন্সিসকো সহরের একজন হোমরা-চোমরা পুলিশ অফিসার। একবার সহরে আগুন লাগলে তিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে বাইশজন লোকের প্রাণ বাঁচান। আমার ঠাকুরদা ছিলেন এই দেশের গভর্ণর। তিনি মিসিসিপি পর্যন্ত একটা খাল কাটান। আমার বাবা সিনেটার। তারপর আমি হব সিনেটার। আমার বাবার আমিই একমাত্র বংশধর। ধরতে গেলে এই দেশ আমাদেরই সৃষ্টি, আর এখানকার ইতিহাস আমাদের ক্লার্ক পরিবারের সৃজনী প্রতিভার ইতিকথা। তাই বলছি, আমাকে কী তুমি গুলী করতে পারো?

লিজি: আর এক পা' এগিয়েছ কি, আমি গুলী করব!

ফ্রেড: তাই কর! তাই কর! আমি জানি, তুমি তা' পার না। আমাকে গুলী করা তোমার মত মেয়ের কর্ম নয়। কী তুমি? কী তোমার সামাজিক পরিচয়? কে তোমার বাবা? কে তার বাবা? আর আমি! আমি একটা খানদানি বংশের ছেলে! আমাকে বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকা আমার দরকার—একান্ত দরকার। দাও, রিভলবারটা আমার হাতে দাও। [লিজি তাই করল। ফ্রেড রিভলবারটা পকেটে রেখে দিল]

ফ্রেড: ব্যাটা বড্ড পালিয়ে গেল! দু' দু'বার গুলী করলুম একটাও লাগল না! [লিজির ঘাড় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে] নদীর ওপারে পাহাড়ের উপর তোমাকে একখানা বাড়ী দিয়ে দেব। বাগানওয়ালা বেশ সুন্দর বাড়ী! বাগানে তুমি বেড়িয়ে বেড়াবে! কিন্তু বাইরে আসতে পারবে না—তা বলে রাখছি। আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার কাছে আসতে পারবে না। অন্যরা হিংসেয় জ্বলে মরবে। সপ্তাহে তিনদিন আসব সন্ধ্যেবেলায়। তোমার নিগ্রো চাকর থাকবে। আর থাকবে প্রচুর টাকা যা তুমি কোনদিন ভাবতেও পারনি। কিন্তু আমি যা চাইব, তাই তোমাকে করতে হবে। তোমার কাছে আমার চাওয়ার অন্ত নেই! [ফ্রেডের বাহুবন্ধনের মধ্যে লিজি আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল] সত্যি করে বলত, তুমি আমায় ভালবাস?

লিজি: খুব ভালবাসি!

ফ্রেড [লিজির গাল টিপে দিয়ে]: বাঁচা গেল! [একটু চুপ থেকে] আমার নাম ফ্রেড। এখন থেকে ফ্রেড বলেই ডেকো।

হিমালয় সমারোহ

(২[illegible]৪ পৃষ্ঠার পর)

(avalanche) আওয়াজে অতি সহজেই ভেঙ্গে যায়।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় হাতের বা পায়ের রক্ত-চলাচল সময় সময় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় দস্তানা বা মোজা খুলে আক্রান্ত স্থানে জোরে মালিস করে রক্ত সঞ্চালন করতে হয়।

হিমশিখরে নানা কারণে স্নায়ুগুলি অতি-মাত্রায় ক্ষয়ের ফলে মস্তিষ্ক ঠিকমত কাজ করে না। একনাগাড়ে একঘেয়ে খাবার খেতে খেতে খাওয়াতেও বিতৃষ্ণা জন্মায়। খাওয়ার যাদের অত্যন্ত বাচ-বিচার তাদের জন্য পর্বতারোহণ নয়।

২৭ হাজার ফিটের বেশী আরোহণ করতে গেলে সঙ্গে অক্সিজান বাষ্পের সিলিণ্ডার নিয়ে যেতে হয়। ১৯২৪ সালে এভারেষ্ট অভিযানে সিলিণ্ডারের ওজন ছিল প্রায় ১৮ সের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গবেষকরা যখন নূতন ধাতু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন, তখন এর ওজন দাঁড়ালো ৫ সের। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, অক্সিজান সিলিণ্ডার হাল্কা হওয়ার জন্যই এবারকার এভারেষ্ট অভিযান সফল হয়েছে।

পর্বতের খাঁজে তাঁবু লাগাবার মত সমতল স্থান থাকা প্রয়োজন। আবার এই জায়গাটিতে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন না আসতে পারে। মিষ্টার কোপ সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা সম্বন্ধে লিখেছেন যে, শেষ ৫ হাজার ফিটে যদি তাঁবু লাগাবার মত উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজয় অসম্ভব নয়। নাঙ্গা পর্বত অভিযানে বার বার জার্মানরা বিফল হয়ে ফিরে আসেন শেষ তিন হাজার ফিটে তাঁবু লাগাবার উপযুক্ত স্থানের অভাবে। এবারকার জার্মান দলে অপরিমিত প্রাণশক্তিবিশিষ্ট হেরম্যান বুল (Herman Buhl) না থাকলে এ পাহাড় বোধ হয় চিরদিনই অজেয় থাকত।

সাধারণতঃ আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য বহু অভিযান ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তিব্বতের নিকট বাতাসে সাময়িকভাবে বায়ুস্তরে হ্রস্ব চাপ (depression) সৃষ্টি হয়। এর ফলে অকস্মাৎ তুষার-ঝঞ্ঝার প্রকোপ দেখা যায়। কখনও বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও বেশী তীব্র হয়। এই ঝড়ের জন্য আরোহীদের ঠিক-ভাবে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া দুষ্কর। কখনও বা এই ঝড় তুষার-ধ্বসের অবতারণা করে, বিশেষতঃ যেখানে হিমস্তরের কোণ ২৫ ডিগ্রীর বেশী।

সচরাচর সমতল থেকে ১২ হাজার ফিট অবধি বৃষ্টি পড়ে। যত উপরে ওঠা যায় বৃষ্টির পরিমাণও অনুরূপ কম হতে থাকে। ১২ থেকে ২৩ হাজার ফিট অবধি তুষারপাত হয়। কয়েকদিন পরেই হাওয়ার সংস্পর্শে এসে এই বরফ জমে শক্ত হয়। ২৩ হাজার ফিটের উপরে কিন্তু বরফ বরাবর দানাদার চিনির মত। এই বরফ কোনদিনই জমাট বাঁধে না।

এই না জমা বরফের স্তর অনেক ক্ষেত্রেই কোমর অবধি উঁচু। জলের মধ্য দিয়ে কোন মানুষের তাড়াতাড়ি চলা যেমন কষ্টকর, তেমনি এই বরফ প্রতিপদে চলার অন্তরায় সৃষ্টি করে।

অভিযাত্রী দল প্রথমে পায়ের চাপে ক্রমাগত চলে চলে এই নরম বরফের মধ্যে রাস্তা তৈরী করেন। তারপর ভারবাহীরা এ রাস্তায় যেতে সক্ষম হন। শিলা ও এভারেষ্টবিজয়ী ভারতীয়েরা পর্বত অভিযানের যে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তা এখনও শেষ হয় নি। কষ্টী পর্বতারোহীদের থাকা দরকার দৃঢ় স্নায়ু ও পেশীমণ্ডলী এবং স্থিরবিচারের ক্ষমতা। বিপদের সামনে এদের হতে হবে অতিমাত্রায় নির্ভীক। ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে এই গুণের সমন্বয় দুর্লভ নয়।

পর্বতারোহণের প্রধান অন্তরায় হল অর্থের অপ্রাচুর্য। সময়ও লাগে দু' তিন মাস। এবারকার মাউণ্ট এভারেষ্ট অভিযানে খরচ হয়েছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, আর নাঙ্গা পর্বতে ব্যয় হয়েছিল তিন লাখেরও বেশী। সুখের বিষয় কলকাতার হিমালয়ান ক্লাবে বা দার্জিলিংএ শেরপাদের কাছে যাবতীয় সরঞ্জাম ভাড়া পাওয়া যায়। পর্বতারোহণ আজ দুঃসাহসের বদলে এক বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের জনসাধারণ, শাসক সম্প্রদায়, সংবাদপত্র ও ধনী ব্যক্তিরা যদি এর পৃষ্ঠপোষক হন, তবে পর্বতারোহণের ভবিষ্যৎ গৌরবময়।

পূজা সংখ্যা সম্পাদনা: পরিমল গোস্বামী ও সহকারী কৃষ্ণ দাস।

ছোটদের পাততাড়ি: অখিল নিয়োগী ও সহকারী কিষণচাঁদ বর্মণ।

গল্পের ইলাষ্ট্রেশনে সাহায্য করিয়াছেন: কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, গোপাল ঘোষ, শৈল চক্রবর্তী, সূর্য রায়, ধীরেন বল ও সুধীর মৈত্র।

প্রচ্ছদপট: কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার।

---

১১৯ পৃষ্ঠায়—"শিল্পী নামক চিত্রখানির নিচে হইবে—"শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহার পেণ্টিং হইতে"—ছাপার ভুলের জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকা প্রেস, ১২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।

খুনে কারবার করি না আমরা
লুঠি নাকো জান মাল।
অপরের মাথা কাটিবার লাগি
জোগাই না তরোয়াল।
তেমন যুদ্ধে নেই কোন রুচি,
জানি সেটা পাপ, নেহাৎ অশুচি,
জয়-পরাজয় করি না হিসাব
আসল কিম্বা জাল॥

তবু আমাদের লড়াই চলেছে
—কেরানী কর্মচারী,
লড়াই চলেছে ক্ষেতে ও খামারে
নয়া মনছবদারী।
কারখানা আর যত দপ্তর
বুক ঢিপ ঢিপ ভয়ে থরথর,
মুনাফাবাজির হবে বুঝি শেষ
শোষণের দিগদারি !

পদে পদে ভাই, লড়াই চলেছে
কী যে মজা বাঁচিবার !
এমন যুদ্ধে নাই পরাজয়
লাজ নাই ঢাকিবার।
লাখো লাখো লোক বাড়ায় জনতা,
বুকে বুকে কী যে গভীর মমতা,
দূর সমুদ্রে এলো যেন ঢেউ
উদ্বেল চারিধার॥

যুদ্ধবিরতি নয় হে বন্ধু
শান্তির বাণী নয়,
রণভূমি আর বধ্যভূমিতে
মৃত্যুরে করি জয় !
মোদের লড়াই হবে নাকো শেষ
আজো পৃথিবীর বাকি আছে দেশ,
মানুষে মানুষে হয়নি বন্ধ
জীবনের অপচয় ॥

বেদালোকে সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গা

ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মেধস ঋষি বলিয়াছেন—মহান মহিষাসুর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট করিলে, তাঁহারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন কুপিত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইলে, সেই সঙ্গে ইন্দ্রাদি সকল দেবতার দেহ হইতে নির্গত তেজ মিলিত হইয়া রাশীকৃত জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তখন সেই একস্থ (মিলিত) তেজ ত্রিলোকব্যাপ্ত কান্তিসমন্বিতা স্ত্রীরূপে আবির্ভূতা হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতার তেজে সেই নারীর বিভিন্ন অঙ্গ গঠিত হইল। সকল দেবতারা তাঁহাদের বিভিন্ন অস্ত্রাদি তাঁহাকে অর্পণ করিলে, হিমবান তাঁহাকে বাহনরূপে সিংহ দিলেন। তখন দেবতারা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিলে মহিষাসুর সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবী প্রথমে তাম্র ও অন্ধক নামে অসুরদ্বয়কে চূর্ণীকৃত করিয়া মহিষাসুরকে ঊর্ধ্বে উত্থিত ও পদদ্বারা আক্রমণ করতঃ তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তখন দেবতারা তাঁহাকে স্তব করিলেন—"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা। নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্ত্যা"। ইত্যাদি যে দেবী আত্মশক্তিতে জগদ্ব্যাপ্তা, তথা সমস্ত দেবগণের সমষ্টি শক্তিরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনিই দশভুজা হইয়া, শুভ্র পশুরাজ সিংহরূপে রূপায়িত সিংহাসনারূঢ়া দেবীরূপে, মহিষাসুররূপী বিরুদ্ধ শক্তিকে পদতলে হনন করিতেছেন। ইহাই দুর্গার কল্পিত মূর্তি।

এই মহিষাসুরের স্বরূপ কি? ঃ—"দ্যাবা পৃথিবী বরুণায় সম্রাজে ঘৃতবৎপয়ো মহিষায় পিন্বতঃ॥" (ঋ. ১০,৬৫,৮)। মহিষায় মহতে পূজ্যায় বরুণায় বা। (সায়নভাষ্যে)। 'বরুণের মহিষাখ্যা দেওয়া হইয়াছে কেন? যাস্কের নিরুক্তে "অহর্বৈ মিত্র রাত্রি বরুণ।" বৃ ধাতু আবরণে হইতে সাধিত বরুণ=অন্ধকার কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ তম। দিবার সাহায্যে সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন হয় জন্য তাহাই মিত্র। বিরাট দেহধারী কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ মহিষাসুর, তাহার তাম্র ও অন্ধকাররূপী সেনাপতি তাম্র ও অন্ধকের সহিত সেই জন্য বরুণের সহিত উপমেয়। মৃত্যুর পর চির অন্ধকার কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ। তাই মৃত্যুর প্রতীক যম কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ-মহিষ বাহন। "পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ—" ইত্যাদি। ঋ. ১০,১৭৭,১)। অসুর বা অসনকুশল পরমাত্মার মায়ায় অভিভূত পতঙ্গরূপী গতিশীল আত্মাকে সাধকেরা মনদ্বারা নিজ হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন। (সায়নভাষ্যে)। অস বা অসুধাতু নিক্ষেপার্থক। যেমন অস্ত্র। তাই অসন বা নিক্ষেপকুশল অসুর এমন একটি কারণ (ফ্যাক্টর) যাহা কোনও বস্তু নিক্ষেপ করে। সেই অসুরখ্য মহিষ=মহ্+ইষ্। মহ বা মহা+ইষ হইলে মহেষ হইত। এই ইষ্ হইতে ইষু শব্দের অর্থ তীর বা বাণ যাহা নিক্ষিপ্ত হয়। মহ্=মহান বা বিরাট রূপে নিক্ষেপরূপ কার্যের উৎপত্তি যেখান হইতে হয় তাহাই 'মহিষ।' জিহ্বাকে উপরে (মূর্ধাতে) সংলগ্ন করিয়া সজোরে বহিঃশ্বাসের সহিত ইষ শব্দ করিলে তাহার সহিত মুখস্থ তরল লালা অসংখ্য বিন্দুরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। ঐরূপ ইষ শব্দের সহিত নাসারন্ধ্র হইতেও তরল পদার্থ নির্গত হয়। রেলের এঞ্জিনের চুম্বক (চোঙা) হইতে হিষ হিষ শব্দে কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণ ধূমে নির্গত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে। তেমনি ক্রুদ্ধ মহিষের বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র ও মুখ হইতে সেইরূপ ইষ্ ইষ শব্দে অসংখ্য তরল পদার্থের বিন্দু নির্গত হইতে সকলেই দেখিয়াছেন। তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে "নাসানিলাস্তাঃ ......" সেই বিশাল দেহ মহিষাসুরের শ্বাসবায়ুর সহিত অসংখ্য তরল পদার্থ নির্গত হইয়া নভোমণ্ডলে ধূসর বর্ণ পর্বতের ন্যায় অচল হইয়া রহিয়াছিল। পক্ষান্তরে অন্যমনস্ক ব্যক্তি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত হইলে যে ঈ—ঈ—শ শব্দে শ্বাস টানিয়া জিহ্বাকে তালুস্পর্শ করায় তাহাতে তাহার জাগ্রত আত্মাই যেন বেদনা জানায়। তাই দীর্ঘ ঈ ও তালব্যশকারান্ত ঈশ শব্দে আত্মার প্রতীক, ঈশ্বর শব্দে সূচিত হয়। যথা মহা+ঈশ=মহেশ অর্থে মহেশ্বর শিব।

"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽ প্রকেতং সলিলম সর্বমা ইদং।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়েতৈকম্।" (ঋ. ১০,১২৯,৩)

অগ্রে শুধু তমই ছিল। সেই গূঢ়তমরূপেই, ভেদহীন সলিলরূপেই বিশ্ব লুপ্ত ছিল। সলিল=সল্—গতৌ যাহা গতিপ্রাপ্ত অদৃশ্য হয়। "সলিলমিতি লুপ্তোপমং।" (সায়ন)। সেই তুচ্ছ অন্ধকাররূপ তমতে যে আভু (আ—সমন্তাৎ+ভূ—বিদ্যমান—সর্বব্যাপী) ছিল, তাহাই "নিজতেজ রূপ তাপের শক্তিতে (তপস হইতে তাপ ও তপস্যা) এক অদ্বিতীয় কারণরূপে অজায়ত বা আবির্ভূত হইল। তখন তাহারই উজ্জ্বল প্রভায় বা দীপ্ত আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইল। উজ্জ্বলপ্রভ আলোকের নিকট তম তাই তুচ্ছ। এই আভুর স্বপ্রকাশের পর সৃষ্টিকরণোদ্দেশে তদনুযায়ী বিবিধ রূপ শক্তিকে সমষ্টিরূপে যেন নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াই পরে হিরণ্যগর্ভরূপে "হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাত পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবী দ্যুতেমাম্ কস্মৈদেবায় হবিষাবিধেম।" সমস্ত ভূতজাত পদার্থের স্রষ্টারূপে হিরণ্যগর্ভ অগ্রে সমবর্তিত হইয়া যেন নিজ গর্ভেই পৃথিবী স্বর্গাদি ধারণ করিলেন। সুতরাং আর কোন দেবতাকে হবি প্রদান করিব ঋষি বলিলেন। বেদের অন্যত্র বলা হইয়াছে "উক্ষা দাধার পৃথিবী মুতেদ্যাম"। বৃষ পৃথিবীও অন্তরীক্ষ বা স্বর্গ ধারণ করিয়া আছে। চীনদেশের প্রবাদ বৃষ বা ষণ্ড পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। ভারতীয় শাস্ত্রে বলে বাসুকী সর্প পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে—"ধরণী বৈঠত বাসুকী ফনমে।" প্রত্যূষের শৈত্যে জলপূর্ণ বাষ্পের সূক্ষ্ম বারিকণা নিক্ষিপ্ত হইয়া কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইলে তাহাই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করে। উক্ষ—উক্ষ শব্দে সজোরে শ্বাস বায়ু নির্গত হইলে তাহার সহিত অসংখ্য লালারূপে বারিকণা মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত বা বর্ষিত হইয়া নিকটবর্তী কিঞ্চিৎ স্থান আচ্ছন্ন করে। তাই উক্ষ=উক্ষা শব্দে বৃষ বা বর্ষণকারী সূচিত হয়। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন তাই তাঁহার এক নাম বৃষ। প্রত্যূষ .... ন্যায় বলে সূর্যের উদয়ে এই কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া যেন অন্তরিক্ষে অন্ধকারে লুপ্ত বিশ্বের প্রকাশ হয়; যেন সেই সূর্যদেবই বিশ্বকে প্রকাশ বা প্রসব করিয়াই তাহার সৃষ্টি করিলেন। তাই সূর্যের সবিতা আখ্যা—সূধাতু প্রসবে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াই বৈদিক ঋষি অনুমান বা কল্পনা করিলেন যে শক্তি আভুরূপ আধারে অক্রিয় অবস্থায় (স্ট্যাটিক) নিহিত ছিল সেই শক্তিমান কারণই নিজ সেই শক্তিকে প্রকট বা ক্রিয়াশীল করিয়া (ডাইনামিক অবস্থাতে) যেন তাহা হইতেই তাহা উদ্ভিন্ন হইয়া বহুবিধ অন্যরূপে সৃষ্টিক্রিয়া সাধন করিল। তাই হিঃ+অন্যঃ হিরণ্য। হিঃ শব্দ শক্তির দ্যোতক বা প্রকাশক সংজ্ঞা। শিবিকাবহনে নৌকাচালনে গুরুভারে বস্তুর ভূমি সমতল করণে শক্তি প্রয়োগের সময়, তৎকার্যে লিপ্ত শ্রমিকগণের মুখ হইতে স্বতঃই ঐরূপ হিঃ-হিঃ-হিঃ শব্দ বাহির হয়। তাই হিঃ শব্দ শক্তির প্রকাশক সংজ্ঞা—যেন শক্তিই হিঃশব্দে নিজকে প্রকট বা প্রকাশ করে। তাই শক্তি আরাধনায় জপের ইষ্ট মন্ত্র হিঃ+ঈং হ্রীং নির্দেশিত হইয়া থাকে।

(ইহার পর ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

অমানিশার বাতি

শিবনাথ শাস্ত্রী

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে ফরাসী দেশের অন্তর্গত নালেটস্‌ নামক নগরের সন্নিকটে আবেলার্ড নামক এক প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভাগুণে ইঁহার নাম খৃষ্টীয় ধর্মের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আবেলার্ড অদ্ভুত প্রতিভার গুণে তৎকালের বিদ্বান ও জ্ঞানিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ন্যায় দেশ-বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে আসিয়া বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। সে সময়ে আবেলার্ডের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ধর্মযাজকের পদই একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল; কারণ ঐ পদেই বিদ্যাবুদ্ধির সমুচিত বিকাশের স্থান মিলিত এবং পদ ও সম্ভ্রম সংযুক্ত ছিল। সুতরাং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহাকে ধর্মাচার্যের পদ অবলম্বন করিতে বলিলেন। এদিকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির সুযশের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে বিদ্যার্থী আসিয়া জুটিতে লাগিল। তিনি প্রোৎসাহিত অন্তরে তাহাদিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। যে একবার তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত, সেই মোহিত হইয়া যাইত। কেবল যে তাঁহার পুরুষ শিষ্যই জুটিত তাহা নহে, অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয়া ধীশক্তিশালিনী রমণীও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নারীকুলের মধ্যে হিলোইসী নাম্নী এক সদ্বংশজাতা, রূপশালিসম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য ধারণাশক্তি দেখিয়া আবেলার্ড তাঁহার দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষা দিবার অধিক অবসর মিলিবে বলিয়া তাঁহার খুল্লতাত ফুলবার্ট সাহেবের ভবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নিরন্তর সাহচর্য ও চিন্তা ও ভাবের বিনিময় নিবন্ধন আবেলার্ড ও হিলোইসীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হইল।

ইতিবৃত্ত লেখক বলেন যে, এই প্রণয়ের সঞ্চার হওয়া অবধি আবেলার্ডের প্রতিভা ও শক্তি যেন আরও খুলিয়া গেল। তিনি অগ্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কবিত্ব ও সংগীত বিদ্যাতে নিপুণতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি হিলেইসীকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল প্রণয়-গর্ভ কবিতা রচনা করিতেন, প্যারিস নগরে সর্বত্র তাহার ভূয়সী প্রশংসা প্রচার হইত। হিলোইসীও আপনার হৃদয়স্থ প্রীতি অগ্নিকে গোপন রাখিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন না। ক্রমে তাঁহাদের প্রণয়ের বিবরণ লোকের জানাজানি হইয়া গেল। পাছে কর্তৃপক্ষ বিরোধিতা করেন, এই জন্য গোপনে তাঁহাদের পরিণয়-কার্য সমাপন হইয়া গেল। হিলোইসীর গর্ভে আবেলার্ডের একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। কিন্তু হিলোইসী যখন শুনিলেন যে, রোমীয় ধর্মসমাজে ধর্মযাজক-দিগের পরিণীত হইবার নিয়ম নাই এবং পরিণীত ব্যক্তি উক্ত সমাজের কোনও পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তখন হিলোইসী মহা-চিন্তান্বিতা হইলেন। কারণ তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা এই ছিল যে, তিনি আবেলার্ডকে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, আবেলার্ডের পত্নী বলিয়া নিজের পরিচয় দিবেন না; পত্নীর অধিকার গ্রহণ করিবেন না বরং চিরজীবন কলঙ্কিনী হইয়া থাকিবেন এবং আবেলার্ডকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে দিবেন। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত এই ব্যবহারে তাঁহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া আবেলার্ডকে অমানুষিক শাস্তি দিলেন। তাঁহাকে পুরুষত্ব হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং হিলেইসীকে স্বীয় গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আবেলার্ড হিলোইসীকে সন্ন্যাসিনীদিগের এক আশ্রমে রাখিয়া নিজে সেন্ট ডেনিস নামক সন্ন্যাসী-দিগের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এখানে তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দলে দলে ছাত্র জুটিতে লাগিল। তিনি সেই আশ্রমস্থ সন্ন্যাসীদিগের চক্ষুশূল হইয়া পড়িলেন। তাহারা ঈর্ষাতে জ্বলিতে লাগিল। লৌকিক অপবিদ্যার এত প্রাচুর্য সন্ন্যাসী-গণের উপযুক্ত নহে, এই বলিয়া তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। এই সময় আবেলার্ড আপনার ছাত্রগণের ব্যবহারার্থে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে ধর্মবিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিপক্ষগণ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। অবশেষে মূর্খ ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ কতকগুলি ধর্মাচার্যের এক সভাতে তাঁহার গ্রন্থ নিন্দনীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল এবং পোপের আদেশক্রমে তাঁহাকে নিজ হস্তে, নিজের এই গ্রন্থ অগ্নিতে সমর্পণ করিতে হইল। এরূপ কথিত আছে যে, উক্ত গ্রন্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার সময় আবেলার্ড অতিশয় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তাঁহার প্রতি অত্যাচার এখানে নিরস্ত হইল না। উক্ত আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ একটা ছল ধরিয়া একদিন তাঁহাকে বলপূর্বক অর্ধচন্দ্র দিয়া আপনাদের আশ্রম হইতে নিঃসারিত করিয়া দিল। তিনি অনন্যোপায় ও অনন্যাশ্রয় হইয়া ট্রোয়া নগরের সন্নিধানে এক নির্জন অরণ্যের মধ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু নির্জন ত্বরায় সজন হইয়া পড়িল। নানা শ্রেণীর যুবকগণ নানাস্থান হইতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে 'প্যারাক্লিট' নামক একটি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি সেই আশ্রমে বসিয়া ধর্মশাস্ত্র পাঠনাকার্যে রত হইলেন। যতই তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার বিপক্ষ দলের ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। এই সময়ে হিলোইসী তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্র অদ্যাপি পবিত্র, নিঃস্বার্থ, অকপট প্রণয়ের নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়াছে। তাঁহার যৌবন-কালের সেই প্রগাঢ় অনুরাগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই। বরং বিচ্ছেদের দিন হইতে আবেলার্ড যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রেম নবীভূত হইয়াছিল। কিন্তু আবেলার্ড তাঁহার পত্রের যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রেমের সে পূর্বকার সতেজ ভাব নাই। জীবনের সংগ্রামে, লোকের অত্যাচারে বিবিধ ঘটনার আঘাতে তাঁহার হৃদয় যে একটু কঠোরভাব ধারণ করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি!

যাহা হউক, এ সুখও অধিক দিন রহিল না। তাঁহার বিপক্ষগণের উত্তেজনাতে আবার এক সভা আহূত হইল। সে সভাতে আবেলার্ড উপস্থিত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে ভাল করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে দেওয়া হইল না। তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া নির্ধারণ করিল। তিনি প্রাণভয়ে সে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেন। এদিকে হিলোইসীও অনেক নির্যাতন সহ্য করিতেছেন, আবেলার্ড প্রথমে তাঁহাকে যে আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেখান হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। তিনি আসিয়া আবেলার্ডের পরিত্যক্ত 'প্যারাক্লিট' আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে আবেলার্ডের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃতদেহ হিলোইসীর বিশেষ অনুরোধক্রমে প্যারাক্লিট আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি সেখানে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া, স্বীয় গুরু ও প্রণয়ীর মৃতদেহ সমাহিত করিলেন। ইহার পর হিলোইসী একবিংশতি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার মৃতদেহ, তাঁহার অনুরোধক্রমে আবেলার্ডের পার্শ্বে এক সমাধি-মন্দিরে সমাহিত হইল। তিন বৎসর পরে, তাঁহাদের মৃতদেহ একত্রে রাখা অকর্তব্যবোধে

(শেষাংশ ২৫৩ পৃষ্ঠায়)

সিদ্ধিনাথের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। বিদ্যার খ্যাতি আছে, সরকারী কলেজে পড়াতেন, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকরি ছেড়ে তিন বৎসর প্রায় নিষ্কর্মা হয়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। এখন ভাল আছেন, শিবচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কুবুদ্ধির উৎপত্তি সম্বন্ধে থিসিস লিখে পি এচ. ডি ডিগ্রী পেয়েছেন।

সিদ্ধিনাথের বাল্যবন্ধু উকিল গোপাল মুখুজ্যের বাড়িতে যথারীতি সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। উপস্থিত আছেন—গোপালবাবু, তাঁর পত্নী নমিতা, নমিতার ছোট বোন সিদ্ধিনাথের ভূতপূর্ব ছাত্রী অমিতা, অমিতার স্বামী রমেশ ডাক্তার, আর সিদ্ধিনাথ। সিদ্ধিনাথের বাড়ি খুব কাছে। তাঁর স্ত্রী নবদুর্গা একটু সেকেলে, এই মেয়ে পুরুষের আড্ডায় তিনি আসেন না।

আড্ডারম্ভে গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, তুমি ডক্টরেট পেয়েছ তাতে আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি। এই সম্মান অবশ্য তোমার বিদ্যার তুলনায় কিছুই নয়, তবে শোনায় ভাল—ডক্টর সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্য। নমিতা তোমাকে আর অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

নমিতা বললেন, ডক্টর একটা নিতান্ত বাজে উপাধি, গণ্ডা গণ্ডা ডক্টর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমি এঁকে একটা ভাল উপাধি দিচ্ছি—বকবক্তা।

অমিতা বলল, মানে কি দিদি?

মানে খুব সোজা। যে বকে সে বক্তা, আর যে বক বক করে সে বকবক্তা।

সিদ্ধিনাথ বললেন, থ্যাংক ইউ নমিতা দেবী, আপনার প্রদত্ত উপাধিটির মর্যাদা রাখতে আমি সর্বদাই চেষ্টা করব।

নমিতা বললেন, তবে আর সময় নষ্ট করছেন কেন, আপনার বকবক্তৃতা এখনই শুরু করুন না।

—কোন্ বিষয় শুনতে চান? শংকরের অদ্বৈতবাদ, মার্কসিজম, [illegible], জড়বাদ, শারীরিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব না পরলোকতত্ত্ব?

গোপালবাবু বললেন, ওসব নীরস তত্ত্ব শুনতে চাই না। প্রেমের কথা যদি তোমার কিছু জানা থাকে তো বল।

—প্রচুর জানা আছে। আমি নিজেই একবার বিশ্রী রকম প্রেমে পড়েছিলুম।

নমিতা বললেন, [illegible] বাড়িতে পাহারাদার গিন্নী থাকতে প্রেমে পড়েছিলেন কোন্ আক্কেলে? বলতে লজ্জা হয় না?

—মানুষের যা স্বাভাবিক ধর্ম তা স্বীকার করতে লজ্জা হবে কেন? আপনারা [illegible] শুনেছি যে অমিতার পতি [illegible] পর পর করে চার গণ্ডা [illegible] [illegible] কি [illegible] বলতে না।

গোপালবাবু বললেন, আঃ, [illegible] নমিতা, সিদ্ধিকে বলতে দাও, তোমার [illegible] পরে করো।

সিদ্ধিনাথ বলতে লাগলেন। [illegible]

এঁকে একটা ভাল উপাধি দিচ্ছি—বকবক্তা।

হয় এবং কোনও আশা না থাকে তবে বৃথা তার চিন্তা করছ কেন? মন থেকে একেবারে মুছে ফেল।

—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি না যে।

—আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করছি। আগে তার পরিচয় দাও।

আমি সবিস্তারে পরিচয় দিলুম। তাকে সিনেমায় দেখেছি, তিলোত্তমা ছবিতে নায়িকার পার্টে—

নমিতা বললেন, আরে রাম রাম, ছি ছি, এত জ্ঞানিতার পর সিনেমার অ্যাকট্রেস! ইস্কুলের চ্যাংড়া ছেলেরাই তো সে রকম প্রেমে পড়ে। ডক্টর সিদ্ধিনাথ বকবক্তার নজর অত ছোট তা মনে করি নি, একটা উঁচু দরের কিছু আশা করেছিলুম। অন্তত একটি পিস্তলওয়ালী অগ্নি-দিদি, কিংবা নাটোরের বনলতা সেন।

অসিতা বলল, অমন আশা করাই তোমার অন্যায় দিদি। এঁর তো তখন কম বয়েস, ডক্টর বা বকবক্তা কোনও খেতাবই পাননি।

সিদ্ধিনাথ বললেন, ছি ছি করবার কোনও কারণ নেই, আমার মনোরথে আকাশের নক্ষত্র জোতা ছিল। তিলোত্তমা ছবিতে সে নায়িকা সাজত। তার নিজের নামও তিলোত্তমা। তার বাপ আর ঠাকুর্দা বাঙালী, ঠাকুমা বর্মী, মা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, দিদিমা ইংরেজ, দাদামশায় পঞ্জাবী। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়ে মোটেই সুশ্রী নয়। জারুল কাঠের মতন গায়ের রং, ছোট ছোট চোখ, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত মুখের হাঁ—যেন ইঁদুর ধরা জাঁতিকল, থুতনি এত-টুকু। বিশ্বাস না হয় তো আরশিতে মুখ দেখবেন।

—দূর হ মায়াবিনী, ভাগো, গেট আউট।

নমিতা বললেন, বাঙালী পুরুষদের চেহারা কেমন শুনবেন? আবলুস কাঠের মতন রং, চোয়াড়ে গড়ন—

সিদ্ধিনাথ হাত নেড়ে বললেন, থামুন থামুন, যা বলবার আড়ালে বলবেন, সামনা-সামনি পতিনিন্দা মহাপাপ। যা বলছিলুম শুনুন। তিলোত্তমার দেহে চার জাতের রক্ত মিশেছিল, সেজন্যই সে অসাধারণ সুন্দরী। গোড়ালি পর্যন্ত চুল, চাঁপাফুলের মতন রং—

অসিতা বলল, রং কি করে টের পেলেন সার? তখন তো টেকনিকলার হয়নি।

—রংটা অনুমান করেছিলুম। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা, পীনস্তনী, নিবিড়নিতম্বা। কালিদাস যাকে বলেছেন—যুবতিবিষয়ে বিধাতার আদ্য সৃষ্টি।

নমিতা বললেন, বিধাতার সৃষ্টি থোড়াই, আপনি আদেখলে হাঁদা ছিলেন তাই আসল রূপ টের পান নি। রং সুর্মা পরচুল তুলো আর খড় দিয়ে কি গড়া যায় তার কোনও আইডিয়াই আপনার নেই।

—হুঁ, রামদাস চুণ্ডুও তাই বলেছিলেন বটে। তার পর শুনুন, তিলোত্তমার গলার আওয়াজ এত মিষ্টি যে তা বলবার নয়।

উপমা খুঁজে পাচ্ছেন না? রূপলী কণ্ঠস্বর বলা চলবে?

ও হল ইংরিজীর অন্ধ নকল, কণ্ঠস্বর সোনালী রূপলী হয় না। সোনা রূপোর আওয়াজও ভাল নয়। বরং স্টীলের তারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন বীণার ঝংকার কিংবা দামী ঘড়ির গংএর ডিং ডং। তার পর শুনুন। রামদাস চুণ্ডু তিলোত্তমার বিবরণ শুনে প্রশ্ন করলেন, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

বললুম, আলাপ কোত্থেকে হবে সার, সে থাকে বোম্বাইএ। তাকে কোনও দিন সশরীরে দেখি নি, শুধু ছবিতেই তার মূর্তি দেখেছি, ছবিতেই তার কথা আর গান শুনেছি।

চুণ্ডু মশায় সহাস্যে বললেন, বেশ বেশ। কায়া দেখ নি শুধু ছায়া দেখেছ। এখন শুয়ে শুয়ে ছায়াও দেখছ না, শুধু মায়া দেখছ, ভয় নেই, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। সাংখ্য-দর্শনে বলে, প্রকৃতি এক আর পুরুষ অনেক। পুরুষ আসলে শুদ্ধ বুদ্ধ নির্বিকার, কিন্তু তার সামনে যখন প্রকৃতি সেজেগুজে নৃত্য করে তখন পুরুষের বিকার হয়, সে ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। প্রজ্ঞা লাভ করলেই পুরুষের নেশা ছুটে যায়, প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়। তুমি একজন পুরুষ, তিলোত্তমারূপো প্রকৃতি তোমার সামনে নেচেছিল, এখনও তোমার মনের মধ্যে নাচছে, তাই তোমার এই দুর্দশা। বৎস সিদ্ধিনাথ, প্রবুদ্ধ হও, তোমার পৌরুষ দেখাও, প্রকৃতিকে ধমক দিয়ে বল—দূর হ মায়াবিনী, ভাগো, গেট আউট। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মোহমুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ কর।

আমি বললুম, ও সব তত্ত্বকথায় কিছুই হবে না পণ্ডিত মশায়।

—বেশ, সাংখ্যে যদি কাজ না হয় তবে অদ্বৈতবাদ শোন। এই জগতে হরেক রকম যা দেখছ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, শুধুই মায়া। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি পুরুষ নন, স্ত্রী নন, ক্লীবলিঙ্গ এবং তুমিই সেই ব্রহ্ম।

—বলেন কি সার! আপনি ব্রহ্ম নন?

—আমিও ব্রহ্ম। তিলোত্তমা, তোমার সহ-পাঠীরা, তোমাদের ভাইস চ্যান্সেলার, প্রত্যেকেই ব্রহ্ম। সবাই এক, শুধু মায়ার জন্য আলাদা আলাদা বোধ হয়।

—আপনি বলতে চান তিলোত্তমা আর আমাদের বাড়ির কুঁজী বুড়ী ঝি দুইই এক?

—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুন্দর বা কুৎসিত, সাধু বা অসাধু, সব তুল্যমূল্য, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। লোকে মনে করে এক সের তুলোর চাইতে এক সের লোহা বেশী ভারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইএরই ওজন সমান।

—মানি না সার। আপনি নীচের ওই উঠনে দাঁড়ান, আমি দোতলা থেকে আপনার মাথায় এক সের তুলো ফেলব, তার পর এক সের লোহা ফেলব। তার পরেও যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনার কথা মানব।

অট্টহাস্য করে চুণ্ডু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, গুরুমারা বিদ্যা এখনও তোমার হয় নি, একটু সায়েন্স পড়ো। তুমি গুরুত্ব আর আপেক্ষিক গুরুত্ব, ভার আর সংহতি গুলিয়ে ফেলেছ।

আমি বললুম, যাই বলুন সার আপনার অদ্বৈতবাদে কোনও ফল হবে না। তিলোত্তমা হচ্ছে অলোকসামান্যা নারী, তার সঙ্গে অন্য কারও তুলনাই হতে পারে না। তার চেহারা অভিনয় আর গান আমাকে জাদু করেছে।

চুণ্ডু মশায় বললেন, তবে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ কর, যাকে বলে কমনসেন্স। পক্ষিরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম, শিংওয়ালা খরগোশ—এসবে বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে না, ওসব তো কল্পনা, কিন্তু তিলোত্তমা বাস্তব।

—একেবারেই ভুল। কবি খুব হুঁশিয়ার হয়েই বলেছেন—অর্ধেক কল্পনা তুমি অর্ধেক মানবী। তোমার তিলোত্তমা অর্ধেক নয়, পনরো আনা কল্পনা। তুমি তার কতটুকু জান হে ছোকরা? তার মূর্তিটা জোড়াতালি দিয়ে তৈরী; তার ভাষা নিজের নয়, নাট্যকারের; তার গানও নিজের নয়, অন্য মেয়ে আড়াল থেকে গেয়েছে। একটা কৃত্রিম মানবীর চিত্রার্পিত ছায়া দেখে তুমি ভুলেছ। তার মেজাজ তুমি জান না, হয়তো খেঁকী কুঁদুলী, হয়তো নেশা করে, হয়তো

(শেষাংশ ২৫৩ পৃষ্ঠায়)

ইত্যাদি, এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতন খবর পাওয়া গেল তার বাবার ব্যবসা ফেল পড়েছে।

খারাপ খবর প্রায় মিথ্যা হয় না। শঙ্করের বাবা পাওনাদারদের দেনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিলেন। তাতে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হোয়ে তো গেলই উপরন্তু বসতবাড়ীখানাও বাঁধা পড়ল। শঙ্করের বাবা সত্যবাবু সবাইকে বারণ ক'রে দিলেন, এ খবর যেন তাকে পাঠানো না হয়। মাসে মাসে তার খরচ তিনি যেমন ক'রে হোক পাঠিয়ে দেবেন।

যেমন ক'রেই হোক মাসে মাসে শঙ্করের খরচ যেতে লাগল। কিন্তু বিধাতা এতেও বাদ সাধলেন—একদিন রাত্রিবেলা আহারাদির পর সত্যবাবু হঠাৎ হার্ট ফেল হোয়ে মারা গেলেন।

তখন আর শঙ্করকে কে টাকা পাঠাবে! তার দুই ভাই তখন লেখাপড়া শেষ ক'রে চাকরী করছিল। বাপের কল্যাণে তারা ভালই রোজগার করত—তারা ইচ্ছা করলে দুজনে মিলে দু-তিনশো টাকা মাসে বড় ভাইকে পাঠাতে পারত কিন্তু তারা তা না ক'রে সমস্ত বৃত্তান্ত শঙ্করকে লিখে জানালো।

অগত্যা পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখেই শঙ্করকে ফিরে আসতে হোলো। কিন্তু সে একলা ফিরল না—তার সঙ্গে এল শঙ্করী—এক মেমসাহেব।

বলা বাহুল্য মেমসাহেবকে নিয়ে বাড়ীতে ভাইদের সংসারে বাস করা সম্ভব নয়, কাজেই শঙ্করকে উঠতে হোলো চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে। ওদিকে ট্যাঁক খালি, এদিকে প্রত্যহই অর্থ চাই। আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনগ্রস্ত বাড়ীখানা ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি আর কিছুই নেই, কিছুদিনের মধ্যেই ভাইয়ে ভাইয়ে পার্টিশনের মামলা বেধে গেল। পাওনাদারদের দিয়ে থুয়ে অবশিষ্ট অংশ তিন ভাইয়ে ভাগ ক'রে যা পাওয়া গেল তা দিয়ে আর চৌরঙ্গীর হোটেলে থাকা চলে না।

হগ্ সাহেবের বাজারের কাছে একখানা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শঙ্কর সেখানে উঠে এল।

এবারে চাকরী চাই। কিন্তু চাকরীর বাজার সব কালেই সমান। তার ওপরে সেই আধা-ইঞ্জিনীয়ারকে চাকরী কে দেবে! সম্মানে আঘাত লাগবে বলে কেরাণীগিরি বা অন্য চাকরীও করতে পারে না। শেষকালে অনেক ধরাধরি করায় বিলেত যাবার আগে যে কোম্পানীতে সে কাজ শিখছিল তারা তাকে নিতে রাজী হোলো! আপাততঃ যা হয় একটা জুটল, কায়ক্লেশে তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হোতে লাগল।

কথায় বলে দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন তার সহচরীরাও তার অনুগমন করে। শঙ্করের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। দুর্ভাগ্য তো এসেইছিল এবার তার সহচরীরাও বিচিত্ররূপে দেখা দিতে লাগল।

একদিন শঙ্কর কারখানার কাজ করছে এমন সময় পুলিশের লোক এসে তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। শোনা গেল, যে মেমসাহেবকে সে বিয়ে করে এনেছে সে নাকি পূর্বে একবার বিয়ে করেছিল এবং তার প্রথম পক্ষের স্বামী বর্ত্তমান। সেই ব্যক্তি শঙ্কর ও সেই মেমসাহেবকে জড়িয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুই আদালতে ঠুকে দিয়েছে নালিশ।

হৈ হৈ ব্যাপার পড়ে গেল। মেমসাহেবকে টেনে নিয়ে গেল বিলেতে, শঙ্করের হাজতবাস চলতে লাগল। ওদিকে কোম্পানী মাইনে বন্ধ করে দিলে—প্রায় আট মাস ধরে টানাটানির পর সে মুক্তি পেল—শুধু আইনের কবল থেকেই নয়, মেমসাহেবের কবল থেকেও।

মেমসাহেব যাবার আগেই চাকরী গিয়েছিল—আবার চাকরী খোঁজা সুরু হোলো! কিন্তু চাকরী মেলা কি সহজ কথা! আজকে একটা জোটে তো দু-মাস বাদে তা ছুটে যায়। ধাপে ধাপে সে নামতে লাগল। লিন্ডসে স্ট্রীট ছেড়ে বৌবাজারের হোটেল। ইজের ছেড়ে ধুতি, সিগারেট ছেড়ে বিড়ি। শেষকালে বেকার অবস্থায় সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের এক মেসের স্যাঁতসেঁতে একতলার এক ঘুলঘুলির মত ঘরে তাকে আশ্রয় নিতে হোলো।

ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ না হোলেও শঙ্কর বি এস-সি পাশ ছিল, কিন্তু তবুও কেন সে চাকরী জোটাতে পারত না অথবা জুটলেও রাখতে পারত না তা বলতে পারি না। ভাগ্য বিরূপ হোলে সবই সম্ভব হয়। তার ধুতি ছিঁড়ে গেল, জুতো ছিঁড়ে গেল—আমরা মাঝে মাঝে তাকে কিছু কিছু সাহায্য করতুম বটে—কিন্তু আমাদের আর সাধ্য কত ছিল!

(ইহার পর ২৫৫ পৃষ্ঠায়)

কুমারী রেবা রক্ষিত—(শ্রীগোপাল ব্রজবাসীর ছাত্রী) পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নৃত্য প্রতিযোগিতায় ও মনোজ স্মৃতি বার্ষিকী নৃত্য প্রতিযোগিতায় ১৯৫০ সালে সিনিয়র বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

নিতান্ত হালকা মামলা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ফুরিয়ে গিয়েছে প্রাতরাশের পালা। শেষ হয়েছে সংবাদপত্র পাঠ। জয়ন্তের ইচ্ছা বাঁশী সাধে। মাণিকের সাধ দুই-এক চাল দাবা খেলে। এমন সময়ে কালীবাবুর প্রবেশ। দুজনেরই সাধে পড়ল বাদ।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। দক্ষিণ-বাংলার একজন বড় জমিদার। কিন্তু এক রকম স্থায়ীভাবেই শিকড় গেড়েছেন কলকাতায়। জয়ন্তদের পাড়ার লোক এবং প্রায় বন্ধুও বটে। বয়স ষাটের কম হবে না। মাথার চুল কাপাস তুলোর মত ধবধবে। কিন্তু গায়ের টকটকে রাঙের জেল্লা এখনো ময়লা হয়নি এবং লম্বা-চওড়া দেহখানিও বেশ শক্তসমর্থ। একাধিক জ্যোতিষী রজতমুদ্রার বিনিময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অন্ততঃ পঁচাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যে কোন সমস্যাকে কলা প্রদর্শন করতে পারবেন এবং সেইজন্যে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যার অধিকারী হয়েও কালীবাবু নিরা সপ্রতিভ মুখে নিষ্করুণ পৃথিবীর বক্রদৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

পরমায়ুর বাকি এখনো সিকি শতাব্দী— সে তো বহুকালের ব্যাপার! বয়সে বিয়ে করেছি তো হয়েছে কি? দীর্ঘজীবীকে ভবার বুড়ো বলে খোঁটা দেওয়া কেন বাপু? কালীবাবুর মনের ভাবখানা হচ্ছে এই রকম। জ্যোতিষীদের কথায় তাঁর অটল নির্ভরতা।

মাণিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'আরে কালীবাবু যে! ভোরবেলা তো আপনার কাছে অবেলা! এমন অসময়ে বৌদির রঙিন আঁচল ছেড়ে আমাদের মত চিরকুমারদের খাস্তা আস্তানায় কেন?'

কিন্তু জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অসুস্থ।'

কালীবাবুর প্রফুল্ল মুখে অসুস্থতার ছাপ কেউ দেখে না। জয়ন্তের বিস্ময়ের কারণ আছে।

কালীবাবু অবসাদগ্রস্তের মত একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আমি অসুস্থ। কিন্তু দেহের নয়, মনের অসুখ।'

সরকার সব জমিদারী হস্তগত করবেন বলে আজকাল কোন জমিদারেরই মন সুস্থ নয়। কালীবাবু কি তাই—

জয়ন্তের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে কালীবাবু হঠাৎ বললেন, 'জয়ন্তবাবু, শুনেছি আপনারা সখের গোয়েন্দাগিরি করতে ভালোবাসেন। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন?'

জয়ন্ত ক্ষণকাল নির্বাক হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আপনাকে আমরা কোন দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি কিছু চুরি গিয়েছে?'

কালীবাবু বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'চুরি না। আমার কিছুই চুরি যায়নি। চুরি গেলে আমি এতটা চিন্তিত হতুম না, আর সরকারী পুলিশ থাকতে আপনাদের বিরক্ত করতেও আসতুম না।'

—তবে?

—এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন। এখানা কাল বৈকালে পেয়েছি।' কালীবাবু নিজের পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কালীবাবুর ডান হাতের দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে, 'আপনার বুড়ো-আঙুলে আর তর্জনীর উপরে পটি বাঁধা কেন?'

—'একটা ঘরের দুই দরজার মাঝখানে পড়ে কাল বড়ই চোট লেগেছে। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আজ আর আঙুল দুটো নাড়তে পারছি না। কিন্তু ও-কথা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চিঠিখানা আগে পড়ে দেখুন।'

খামের দিকে তাকিয়েই জয়ন্তের চোখ একটু চমকে উঠল। তার উপরে হাতের লেখা নেই, ছাপা বই থেকে কতকগুলো অক্ষর কেটে নিয়ে পরে পরে বসিয়ে কালীবাবুর নাম ও ঠিকানা লেখা হয়েছে। সাধারণ সরকারী খাম, আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট-অফিসের ছাপ মারা।

খামের ভিতরের কাগজও চিঠির কাগজ নয়, সাধারণ ফুলস্ক্যাপ কাগজের আধখানা কেটে নিয়ে মাঝখানে ভাঁজ করে ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির কথাগুলোও মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর কেটে নিয়ে বসানো।

কথাগুলো এই:

২০।৮।৫৪

"শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
সমীপেষু

মহাশয়,

আমার স্ত্রী মাধবী বিধবা নয়। আমিই তার বৈধ স্বামী এবং বলা-বাহুল্য আজও বহাল-তবিয়তে সশরীরে বিদ্যমান। স্বামী বর্তমান থাকতে হিন্দু স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে পারে না, অথচ শুনেছি আমার স্ত্রীকে আপনি আবার 'বিবাহ' করেছেন। এটা যে গুরুতর অপরাধ, আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমহীতোষ সেন"।

পত্রখানা পাঠ করে জয়ন্ত নীরবে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

কালীবাবু বললেন, 'আমার বিবাহের ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অজানা নেই?'

না, জয়ন্তের তা অজানা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে এই:

নিঃসন্তান অবস্থায় কালীবাবুর প্রথম সহধর্মিণী পরলোকে গমন করেন ১৯[illegible] খৃষ্টাব্দে। বিপুল বিত্তের মালিক হয়েও সন্তানের অভাবে কালীবাবুর দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁর তারাপ্রসন্ন নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে বটে, কিন্তু তার নাম [illegible] আনেন না। সে হচ্ছে মদ্যপ, জুয়াড়ী, [illegible]

ও অকর্মণ্য; নিজের সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছে খোলামকুচির মত এবং কালীবাবুও তাকে আর নিজের বাড়ীতে ঠাঁই পর্যন্ত দিতে রাজি নন। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্তিময়। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিধবা মাধবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তখন মাধবীর বয়স কুড়ি বৎসর এবং কালীবাবু পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং বর-কন্যার এই মিলন যে রাজযোটক বলে গণ্য হয়নি, সে কথা বলাবাহুল্য। ভার্যার সার্থকতা পুত্রের জন্যই, অনেকের কাছে শাস্ত্রবাক্য আউড়ে কালীবাবু তা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শুধু শাস্ত্রের নির্দেশ পালনের জন্যেই যে তিনি পুনর্বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, এটা একেবারে পূর্ণ সত্য না হতেও পারে। কেবল যুবতী নয়, মাধবী ছিল পরমা সুন্দরী। অধিকাংশ বৃদ্ধের পক্ষে একটা মস্ত অস্বস্তিকর কথা হচ্ছে এই যে, পঞ্চাশের ওপারে গিয়েও মনের ভিতরে অসংগলিপ্সা প্রবল থাকে যুবকের মতই। দুনিয়ার বহু ট্রাজেডির (এবং কমেডিরও) জন্ম এই মনোবৃত্তির মহিমাতেই।

এই অসম-মিলন মাধবী কিভাবে গ্রহণ করেছিল, বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীরই মত মুখে কোন প্রতিবাদ করেনি, কারণ প্রতিবাদ করবার যোগ্যতা তার ছিল না। শৈশব থেকেই সে বাপ-মা-হারা, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘরে অনাদরে মানুষ; তার উপরে প্রথম যৌবনেই স্বামী হারিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অনাথ-আশ্রমে; অতএব এখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠতেই পারে না, বরং বলা যায় যে, এই দ্বিতীয় বিবাহটা তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে বরের মত, কারণ কালীবাবু যুবক না হলেও ধনকুবের। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কামিনীর যৌবন তো চিরদিনই বিক্রীত হয়ে আসছে কাঞ্চনের বিনিময়ে।

তার বৈধব্যের পিছনেও আছে একটুখানি ইতিহাস। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মহীতোষ সেনের সঙ্গে যখন তার বিবাহ হয়, তখনও সে হয়নি উদ্ভিন্নযৌবনা। বিবাহের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফৌজে চাকরি নিয়ে মহীতোষ মিশরে চ'লে যায়। তারপর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মিশর থেকে সরকারী খবর আসে যে, কোন একটা যুদ্ধের পর থেকে মহীতোষ সেন 'মিসিং', অর্থাৎ নিখোঁজ। তারপর একে একে কয়েক বৎসর কেটে যায়, কিন্তু তার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সকলে ধরে নেয় যে, মহীতোষ আর ইহলোকে বর্তমান নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে মৃত্যু, এইটেই দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ থেকে নিখোঁজ মহীতোষের আত্মা যে এখন প্রেতলোকে বাস করছে না, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লিখিত তার পত্রে সেই সত্যটাই প্রমাণিত হচ্ছে। বিস্ময়ের কথা, কিন্তু অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশে অগুন্তিবার দেখা গিয়েছে এমন ব্যাপার।

দুই

জয়ন্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয় হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী-জীবনে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না।

কালীবাবু বললেন, 'আমি এখন কি করব?'

মাণিক বললে, 'কি করা উচিত, তার কিছুই কি আপনি স্থির করতে পারেননি?'

কালীবাবু বললেন, 'আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছি, আর সেইজন্যেই তো আপনাদের সাহায্য চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কিন্তু কি-রকম সাহায্য?'

—'এই পত্রখানা দেখে আপনার কি মনে হয়?'

—'আর পাঁচজনের যা মনে হতে পারে, তাই। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই নয়। প্রথমতঃ পত্রলেখক নিজের হস্তাক্ষর গোপন করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ লেফাফা সরকারী, কাগজেও কোন বিশিষ্টতা নেই; এর 'ওয়াটার মার্ক'

বেশী মেলামেশা জন্যই শুধু খেটে মরতে হচ্ছে।

পাওয়া যায় বটে—Howard Smith, Bell fast Bond, Made in Canada. কিন্তু এও হচ্ছে খুব সাধারণ।'

কালীবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ, আমিও ঐ মার্কা-মারা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ব্যবহার করি।'

জয়ন্ত ভুরু-সঙ্কুচিত ক'রে বললে, 'তাই নাকি? আপনিও ঐ একই কাগজ ব্যবহার করেন?' তারপর অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে বললে, 'তাহ'লেই বুঝুন, এ রকম কাগজ আপনি ব্যবহার করেন, আমি ব্যবহার করতে পারি, আবার আরো অনেকেও ব্যবহার করতে পারেন। তাই বলছিলুম, কাগজেও কোন বিশিষ্টতা নেই।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আন্দাজ করা যেতে পারে। পত্রলেখক নিজের ঠিকানা দেয়নি। সে নিজের হস্তাক্ষর দেখাও কারুকে দেখাতে চায় না। এ লুকোচুরির কারণ কি?'

কালীবাবু বললেন, 'অথচ সে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় না, কারণ সে নাকি শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে! সুতরাং কোন রকম লুকোচুরিই এখানে যুক্তি-হীন ব'লে মনে হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও মনে মনে মাথা ঘামাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছে নিশ্চয়ই কোন মতলববাজ লোক। আমার সন্দেহ হয়, লোকটার মনে বিশেষ কোন মন্দ অভি-সন্ধি আছে, কিন্তু সেটা যে কি, তা বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।'

মাণিক বললে, 'চিঠিখানার ধরণ-ধারণ অনেকটা উড়োচিঠির মত। উড়োচিঠি প্রায়ই ভিত্তিহীন হয়।'

কালীবাবু বললেন, 'কিংবা কেউ হয়তো আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার ফিকিরে আছে।'

জয়ন্ত বললে, 'তাও অসম্ভব নয়।'

—'কিন্তু এ সবই তো আন্দাজী কথা। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটা নিশ্চিত নির্দেশ পাবার আশায়।'

—কালীবাবু, এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা চলে না। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। মনে হচ্ছে একটা পথের সন্ধান পেয়েছি। আমরা কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেই সময়ে হয়তো কোন কোন কথা বলতে পারব।'

তিন

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে কালীবাবুর বাড়ীর দিকে পদচালনা করলে জয়ন্ত ও মাণিক।

মাণিক শুধোলে, 'কাল দুপুরে তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে? আমি এসে ফিরে গিয়েছি।'

—'গিয়েছিলুম সৌরীনের কাছে, কলেজের সৌরীন মিত্রের কথা তোমার মনে আছে?'

—'সৌরীন মিত্র? এক সৌরীন মিত্র তো আমাদের সঙ্গে 'ফোর্থ ইয়ার' পর্যন্ত পড়ে-ছিল। তুমি কি তার কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ সেই-ই। আমি জানতুম, সৌরীনের

(ইহার পর ২৩০ পৃষ্ঠায়)

শালভূমি

প্রবোধকুমার সান্যাল

জমশেদপুর থেকে অনেক দূরে। ধলভূম পেরিয়ে মোটর চলেছে দূর থেকে দূরে। হেমন্তের প্রভাতে তখনও তন্দ্রার জড়তা মাখানো, তখনও শীতের কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। অনেক দূরে গেলে তবে চাইবাসা।

কেউ কেউ বলে, এটি ভারতের প্রাচীনতম ভূ-ভাগ। এখানকার যারা আদিবাসী তারাই হোলো সুপ্রাচীন জম্বুদ্বীপের প্রকৃত বাসিন্দা, তারাই নাকি প্রথম ভারত-পরিচয়। দুই পাশে সেই আদিবাসীদের গ্রাম প্রান্তর, আর তারই মাঝে মাঝে টিলা পাহাড়—যেমন দেখা যায় হায়দরাবাদে সেই অজন্তার প্রান্তরে—আদি পাথরের জটলা। একখানি পাথরের সংগে আরেকখানির মৃৎ বন্ধন গেছে ক্ষয়ে, পরস্পরের মধ্যে স্নেহের ডোর নিশ্চিহ্ন—কেবল আপাদমস্তক রুক্ষ দৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন, কৃষ্ণাভ জরাগ্রস্ত এক একখানা পাথরের খণ্ড। ভয় করে ঝড়-ঝাপ্টায় ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে পড়ে বুঝি।

মোটর চলেছে। সামনে ওই চাইবাসার শীর্ণ ঋজু পথটি বারবার চোখের সামনে ধরছিল যেন নিরুদ্দেশের সংকেত, বারবার যেন ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল হাজার হাজার বছর পিছনের ইতিহাসে। সেই ইতিহাস শোনেনি কেউ খবর পাওয়া যায় না তার,—কিন্তু তার এক একটি অনুচ্ছেদ আপন আপন চিহ্ন রেখে গেছে একটির পর একটি টিলা পাহাড়ে—যেমন সে স্বতন্ত্র, তেমনি যূথভ্রষ্ট। ভূতত্ত্ববিদরা বলে, এদের বয়স অনেক, হিমালয়ের চেয়েও নাকি বেশী। আজ নতুন কালের মানুষ এসে তাদের রাজ্যপাট বসিয়েছে, মাঠে মাঠে ফসল ধরেছে নতুন কালের জন্য, প্রতি জনপদ জনাকীর্ণ হয়ে চলেছে,—কিন্তু ওই আরণ্যক আদিবাসী আর আদি পাহাড়ের দল নিত্য গতিশীল ভারত সভ্যতার মাঝখানে লক্ষ লক্ষ বছরের একটা অতি প্রাচীন চেতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা যেন কথায় কথায় পর্যটকের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করে।

সিংভূম আদিবাসীর নৃত্য

পৃথিবী বিস্ময়কর, মাটি যেখানে নতুন। চাইবাসা ছাড়িয়ে আবার চলেছি নতুন পথে। যাচ্ছিলুম সিংভূমের দিকে। বহুকাল থেকে রোমাঞ্চ এনেছে আমার মনে সিংভূমের অরণ্যলোক। যখন আধুনিক সভ্যতা তার বিজয় রথের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে নানাদিকে, মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালালো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—তখন সিংভূম যেন তার সমস্ত ভয়াল অন্ধকার অরণ্যানী নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যপাদ অবধি তপস্বীর মতো, একান্তে চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলো। তার সেই চেহারাটি দেখবার প্রবল কৌতূহল ছিল আমার মনে।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন চাইবাসার প্রসিদ্ধ 'কাঠুরিয়া' বন্ধুবর হরেন্দ্র হুই। টিম্বারের ব্যবসায়ে তিনি সিদ্ধার্থ। তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত আতিথেয়তা আমাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। আমি অরণ্য ভ্রমণে বেরিয়েছি শুনে তিনি একটি ভ্রমণ তালিকা বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় নতুন সংগী হলেন ইনকাম ট্যাক্সের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী এবং সাহিত্য সুরসিক বন্ধুবর দুর্গাপ্রসাদ। উনি দর্শনশাস্ত্রের এম-এ। বিহারী হলেও বঙ্গ সাহিত্যের একান্ত অনুরক্ত।

গাড়ীর গতি অতি দ্রুত। স্বয়ং হরেন্দ্র চালক এবং গতি পিপাসু। এদেশে যিনি গাড়ীর মালিক তিনিই অর্গতির গতি। দুর্গাপ্রসাদ টিপ্পনী কাটলেন, হরেন্দ্রর হাতে আমাদের গতি কি দুর্গতি ঠিক বুঝিনে। তবে দ্রুতগতি বটে! সে যাই হোক, আমরা চক্রধরপুর ছাড়িয়ে সেনুয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

কিছু দূর গিয়ে স্টেশন সীমানা পেরিয়ে পথ এবার ঘুরে গেল। রাঙ্গা মাটির পাথুরে পথ চলে গেছে অরণ্যের দিকে। আশে-পাশে ভাঙ্গাভাঙ্গা, পার্বত্য ভূমি। কোথাও কোথাও আদিবাসীদের ছাউনি, কোথাও বা গরু বাছুর আমাদের পথের উপরে ভাসমান দেখা দিচ্ছে। কিন্তু ওদেরই ভিতর দিয়ে রাঙ্গা মাটির যে পথ চলে গেছে অরণ্যলোকে সেই দিকে আমাদের একান্ত আকর্ষণ। মাঠের পরে মাঠ, তার যেন আমাদের সামনে রূপালি পর্দা, পল্লের রাজসভায় পরিণত। গ্রাম কোনখানে তার গ্রাম থাকে না, সে হয়ে দাঁড়ায় ছবি। সহজপথের আবরণ উঠে যায় তার উপর থেকে। দেখতে দেখতে যেন রূপ রূপান্তরের পালা পড়ে। জানা জিনিষকে মনে হতে থাকে কতকালের অজানা। একান্ত মনের ভাবনাটিকেই যেন সন্দেহ হয় স্বপ্নের আবেশ। সেনুয়া গ্রাম বটে, কিন্তু এখনও সেটি পথের সংকেত—সেইটিই তার বৈশিষ্ট্য। জনবিরল গ্রাম, দু'চার ঘর চাষীদের বসতী। কাজের মধ্যে এসব অঞ্চলের প্রধান কাজ

সেতারহাট মালভূমিতে অরণ্যবেষ্টিত ডাকবাংলো

সিংভূম অরণ্যের আদিবাসী হো

হালো লোভী জন্তু-জানোয়ারের কবল থেকে পাকা ফসলকে সর্বদা রক্ষা করা। এখানে এসব [illegible] প্রায় নিত্যই চলে, কোন্ জন্তুর সঙ্গে কোন্ মানুষের কবে লড়াই হয়ে গেছে। হিংস্র জানোয়ার আর মানুষ এখানে বড় কাছাকাছি বাস করে। উভয়ের সম্পর্কটা হোলো বিদ্বেষের। একজনের তৈরী ফসল আরেকজন এসে চুরি করে খায়,—ফলে একজনের সেই আদিম বিদ্বেষ ও ঘৃণা আপন নখরে নিজেকে [illegible] করে। শুধু জঙ্গলে কেন, শিক্ষিত গৃহস্থ ঘরেও [illegible] এই। বিড়ালে দুধ খেয়ে [illegible] গৃহস্থের বউ তার পিছনে খুন্তি নিয়ে তাড়া করে। কুকুর একটু ভদ্র, আগে থেকে ল্যাজ নেড়ে আবেদন জানায়।

প্রায় মধ্যাহ্নকালে আমরা এসে পৌঁছলুম [illegible] পথের ধারে একটি কাঠুরিয়া পল্লীতে। হেমন্তের পাখীরা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। [illegible] যেন সমস্তটা শান্ত। সমস্ত কোলাহলের বাইরে, সমস্ত সভ্যতার বাইরে। কালের পর কাল চলে গেছে, যুগের পর যুগ—এদের কিছু [illegible] করেনি। যতদিন অরণ্য, এরা ততদিন। অনন্তকাল ধরে চেয়ে রয়েছে এক একটি [illegible] [illegible] দিকে, সেই গাছটি কতদিনে [illegible] [illegible]। জীবিকার প্রথম পর্যায়ে কোনো পরিশ্রম নেই, কেবল বর্ষায় ও বসন্তে বনভূমির দিকে চেয়ে থাকা। নীচে দিয়ে চলেছে হাতীর পাল, হরিণের দল, ভালুকের অভিযান, সাপ-সর্প-[illegible] দলের রাজ্যপাট—কিন্তু কাঠুরিয়ার চোখ পড়ে থাকে বনে বনে। শীতের শেষে [illegible] [illegible] লাল পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার বন, [illegible] [illegible] রক্ত [illegible] করতে [illegible] [illegible] অরণ্যে [illegible] মধুর [illegible] উত্তেজনা— [illegible] ভালুকেরা সেই উন্মাদনায় এসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। উপর থেকে [illegible] পাখীরা সেই কৌতুকে কলকূজন আরম্ভ করে দেয়।

[illegible] পার এসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আর, সন্ধ্যের নীচে [illegible] [illegible] লেপার্ড এসে ওৎ পাতে [illegible] হরিণের আশায়। মানুষের চোখের বাইরে জানোয়ারের প্রাণীর সমস্ত রাজ্যপাট।

গ্রামটির নাম গোয়েলকেরা। পিছনে মস্ত পাহাড় এবং তারই কোনো অজানা অঞ্চল দিয়ে [illegible] চলেছে অতি প্রাচীন বন্য নদী কোয়েল। গ্রামের তিন দিকে ঘন বনের ছায়া এবং এই কাছাকাছি ছাড়া মানুষের বসতি কম। এখানে [illegible] কয়েকজন টিম্বার ব্যবসায়ীর মধ্যে [illegible] হরেন্দ্র দুই মশায়েরও মস্ত কারবারের ঘাঁটি। জঙ্গলের কোলের মধ্যেই মোটামুটি সকলের বসবাস এবং ওরই মধ্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিপণি বেসাতির কাজ কারবার। কাজেই একটি ডাক বাংলো এবং সেখানকার ব্যবস্থাদি ভদ্র। কিন্তু আমাদের কাছে হরেন্দ্রর কুঠিবাড়ীর আকর্ষণ অনেক বেশী। সেজন্য প্রায় অপরাহ্নের প্রারম্ভে আমরা এসে তাঁর ওখানেই উঠলুম।

বাতাস ফিরেছে হেমন্তের, রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা নামবে। এমন নৈঃশব্দ্য চতুর্দিকে—যেন সহসা আমরা সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমাদের আধুনিক পরিচয়টা গেল [illegible]। নতুন মাটির টান আমার মধ্যে—অভিনবত্বের রোমাঞ্চকে উপলব্ধি করছি চারিদিকে। স্থানীয় বিবরণ কিংবা ভৌগোলিক সংখ্যার আমাদের দরকার ছিল না—কেননা আমাদের প্রধান আস্বাদটি আনন্দের। কতক্ষণে আমরা জন্তু পাবো সেই আনন্দ; হঠাৎ চকিতের দর্শন মিলবে,—সেই উন্মুখ প্রত্যাশা। অরণ্যলোকে এসেছি তাই পদে পদে আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মন। এ যাত্রায় আমার সঙ্গে ছিল সাহিত্যিক বন্ধু পবিত্র গাঙ্গুলী। তার স্থায়ী আবাস হোলো কলকাতার হট্টগোলে। সে এখানে এসে রস পাচ্ছে কম, কারণ সে অনেক কাজ ফেলে এসেছে। কাজের মানুষ এসে ছিটকে পড়েছে বাঘ ভালুকের জঙ্গলে তাই সে কেবল এবেলা ওবেলা পালাবার পথ খুঁজছিলো। আমার চেষ্টা তাকে ভুলিয়ে রাখা এবং তার কাজ-কর্ম পণ্ড করা। এদিকে হরেন্দ্র তাঁর অশ্রান্ত ও

[illegible] অরণ্যে কুমুডি জলাশয়—(সিংভূম)

নিপুণ অভিনয়ের গুণে আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই অতি প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখে এবং আমরা অরণ্যের [illegible] [illegible] যাবো, এই ছিল আমাদের [illegible] [illegible]। ইতিমধ্যে দুর্গাপ্রসাদ ছাড়া আরেকজন ডেপুটি ফরেস্ট অফিসার আমাদের সঙ্গে মিলেছেন। তিনি এসেছেন অরণ্য— [illegible] কাজে। তিনি পাঞ্জাবী যুবক, নাম তার [illegible] প্রসাদ। ভালো মোটর চালান এবং সাহসী ব্যক্তি। বিকালের দিকে রাইফেল এবং বন্দুক সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাড়ী ছাড়লো পাহাড়ের দিকে [illegible]। এই সুবিস্তৃত পাহাড়ের ঢাল, প্রকৃতটাই হোলো গোয়েলকেরা গ্রাম। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা গেল আমাদের [illegible] এই বিশাল পাটোয়ারী কি প্রকার। ছোট্ট গ্রামের মানিনী ছাড়া মধ্যেই জানা গেল, সন্ধ্যার আগেই মানুষ এখানে ঘর-দরজা বন্ধ করে। পাহাড় উঠে গেছে নানাদিকে, তার সঙ্গে অরণ্য মিলিয়ে সমস্তটাই নিরেট নিঃঝুম। ওরই মধ্যে পথ, ওরই মধ্যে হঠাৎ এক আধজন দল-ছাড়া আরণ্যকের আনাগোনা। আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মন প্রতি পদে বাস্তবিকই খুঁজে ফিরছিল যে কোনো জন্তু যে কোনো মানবেতর জীব। কিন্তু একথা আমাদের জানা দরকার ছিল যে, দলবল মিলে গাড়ী ও বন্দুক সমেত কোলাহলরত আমরাই হলুম সেদিন অরণ্যচারীদের লক্ষণীয় বস্তু। তারা সামনে এসে পড়েনি এই কারণে যে, আমাদের আচরণই তাদেরকে আমাদের সামনে আসতে দেয়নি।

দুর্গাপ্রসাদ হলেন ইনকাম ট্যাক্সের লোক এবং হরেন্দ্র হলেন ব্যবসায়ী। উভয়ের সম্পর্কটা হোলো ইঁদুর-বিড়ালের এবং সেজন্য উভয়ের মধ্যে পরিহাস বিতর্ক ছিল। চালক হরেন্দ্র বলছিলেন, পাহাড়ের উপর থেকে মোটর দুর্ঘটনা হলে খুশী হই—দুর্গাপ্রসাদের হাত থেকে রেহাই পাই। তাঁর হাতে স্টিয়ারিং সুতরাং আমরা ভয়ে আড়ষ্ট। দ্রুতগামী মোটরখানি পাহাড় থেকে ছিটকে পড়লে অন্তত দেড় হাজার ফুট নীচের দিকে গড়াবে। অতঃপর পরিণামটি কিরূপ দাঁড়াবে এই ভেবে নিরীহ পবিত্র গাঙ্গুলীর গলাটা শুকিয়ে উঠলো। হাতী কতক্ষণে তার ভয়ানক শুঁড় বাড়াবে আমাদের গাড়ীতে, অথবা কতক্ষণে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর—সেই আতঙ্কের সঙ্গে মোটর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা মিলিয়ে আমরা একেবারে ভয়ে কাঠ। [illegible] মধুসূদন।

উরুগুণ পাহাড়ের শিখর পল্লীর কাছাকাছি

(ইহার পর ২৩৭ পৃষ্ঠায়)

ভদ্রলোক

বনফুল

ভদ্রলোকের বিবেকেই গলদ ছিল, তাহার উপর ট্রেনটা ছিল লেট। তিনি হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন ছিল না, তবু আরও কয়েক সেকেন্ড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘড়িটার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। ঘড়ি কোন সান্ত্বনা দিল না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন, কেহই আসে নাই। একটু আরাম বোধ করিলেন। ভদ্রলোকের সহিত মুখোমুখি হইয়া গেলে একটু অপ্রস্তুত হইতে হইত। ভদ্রলোক আর একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। ষ্টেশনে না আসিবার অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে—ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নিশ্চয়ই নয়, হইতেই পারে না, কিন্তু যতীনবাবুকে ষ্টেশনে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি বেশ একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ তাঁহার বিবেকে একটু গলদ ছিল। বিবেকে যে গলদ আছে, তাঁহার আচরণ যে অশোভন হইতেছে, এতকাল তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, লিখিয়াছেন কার্যকালে যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন, একথা যতীনবাবু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। চিঠিতে অবশ্য সে কথার আভাস পর্যন্ত দেন নাই, বুদ্ধিমান লোক তো, কিন্তু মনে মনে হাসিয়াছেন নিশ্চয়ই। আবার তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, গৃহিণীর উপর রাগ হইল। উঁহারই প্ররোচনায় তিনি এই অপকর্মটি করিতে রাজি হইয়াছেন! সহধর্মিণী? হঠাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল 'কচু'। যে কুলিটি তাঁহার সুটকেসটি নামাইয়াছিল সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও—"

কুলি বলিল, "ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"রাত হয়েছে। এত রাতে ট্যাক্সি আজকাল থাকে না। তার উপর হাঙ্গা হয়েছে, মেছুয়া-বাজারে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে নাকি—সব ভেগেছে তাই।"

"রায়ট?"

"ঠিক জানিনা। রিক্সা, ঘোড়াগাড়ী পাবেন—"

ভদ্রলোকের ভ্রূযুগল আর একবার কুঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, এই অজুহাতে ফিরিয়া গেলে কেমন হয়।

"সাহেবগঞ্জে ফেরবার ট্রেন কখন?"

"সকালের আগে কোনও ট্রেন নেই" অর্থাৎ সমস্ত রাত ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইবে। সহধর্মিণী দাক্ষায়ণীর মুখটাও মনে পড়িল। ভারী মাংসল মুখ। ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করিলেন। দাঙ্গা বা যুদ্ধ যা-ই হোক, হাওড়া পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। গেলে দাম্পত্য-সৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হইবে। যদিও লাইটনিং কণ্ডাকটার আছে, ভিত্তিও বেশ মজবুত, তবু ভদ্রলোক সাহস করিলেন না।

কুলিটি তাঁহাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতেই তুলিয়া দিয়াছিল। গাড়োয়ান প্রথমে কিছু বলে নাই, কিন্তু কলেজ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড জংসনে গাড়োয়ানী ভাষায় ব্যক্ত করিল যে সে শ্যামবাজার অভিমুখে যাইবে না, কারণ তাহার ঘোড়া দুইটি ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত হইয়াছে। সে তাহাদের এইবার বউবাজারে অবস্থিত আস্তাবলে লইয়া যাইতে চায়।

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নামিয়া পড়িলেন। ঘোড়ার দুঃখে বিগলিত হইয়া নয়, একটি রিক্সা দেখিয়া। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সহিত বচসা করা যে তাঁহার সাধ্যাতীত ইহা তিনি জানিতেন, রিকসটা আসিয়া পড়াতে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। সোজা রিকসায় উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিকসাওলাও তেমন যেন উৎসাহ দেখাইল না। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকের মুখে বেশ ঘন কাঁচা-পাকা চাপদাড়ি, গোঁফও বেশ ঝাঁকড়া, ভ্রূ দুইটি যেন দুইটি শুঁয়োপোকা। মাথায় বাবরি। চেহারাটা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ-ছাগলের মতো। ইহার উপর ভদ্রলোকের পরিধানে মোটা খদ্দরের জামা কাপড়। রিকসাওলার বিশেষ দোষ নাই।

"কোথা যাবেন?"

রিকসাওলা প্রশ্ন করিল।

"হেদোর ধারে নাবিয়ে দিলেই হবে।"

সুযোগ বুঝিয়াই হোক বা তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই হোক, রিকসাওলা বলিল,—

"দেড় টাকা ভাড়া লাগবে বাবু।"

"তাই দেব, চল।"

ভদ্রলোক উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিকসাওলা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"আমার অন্য একটা সোয়ারি আছে বাবু, হেদুয়া পর্যন্ত যেতে পারব না।"

বলিয়াই সোজা শিয়ালদহের দিকে ছুটিয়া দিল। ভাগ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা রিকসা পাইয়া গেলেন, তাহা না হইলে একটু বিপদে পড়িতে হইত। দ্বিতীয় রিকসাওলাটিকে দেখিয়া তিনি ভরসা পাইলেন। বেশ গম্ভীর লোক। আট আনা চাহিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এ পাড়ায় কোনও দাঙ্গা হয়েছে না কি?"

"মেছোবাজারে ঘটেছিল একটা হাঙ্গা। কতকগুলো মাতালের কাণ্ড। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে..." ভদ্রলোকের সন্দেহ রহিল না যে, কিছু একটা ঘটিয়াছিল। তিনি রিকসা হইতে অবতরণ করিয়া কিন্তু একটু মুশকিলে পড়িলেন। সুটকেসটি ফুটপাথে নামাইয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দরজা খুলিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রিকসাওলাকে দিয়াই সুটকেসটি ভিতরে বহন করাইবেন। কিন্তু কয়েকবার কড়া নাড়িয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন রিকসাওলাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। রিকসাওলা চলিয়া গেলে বাড়ির নম্বরটি আর একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। না, নম্বর ভুল হয় নাই।

উপরের জানালা খুলিয়া গেল।

"কে?—"

"আমি।—"

"আমি কে? নাম বলুন—"

"যজ্ঞেশ্বর আইচ।"

"কি চান?"

"যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

পূর্বেই বলিয়াছি ভদ্রলোকের বিবেকে গলদ ছিল। যতীনবাবুর সহিত এইবার অনিবার্যভাবে দেখা হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। তিনি একবার গলা খাঁকারি দিলেন। যে কোনও গলার আওয়াজ এমন কি নিজের গলার আওয়াজও বিপদের সময় মনে কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার করে। করিল। তিনি যতীনবাবুর সম্মুখীন হইবার জন্য সপ্রতিভতার ভান করিতে সক্ষম হইলেন। উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল—"বাবা বাড়ি নেই।"

ধূমকেতুর নজরুল

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

'বিদ্রোহী' কবিতাটি এক সঙ্গে 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের খ্যাতিতে বাঙালী সমাজ একেবারে টগবগ করে ফুটে উঠল। তরুণ সমাজ ত বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। সকলের মধ্যে সেই মনোভাব—'আপনারে ছাড়া কাহারে করি না কুর্ণিশ।'

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের আড্ডা আরও সরগরম হয়ে ওঠে। আমরা যারা আগে থেকে ছিলাম তাদের সঙ্গে আরো এসে জুটল খান মঈনুদ্দীন, গোলাম মোস্তাফা, মঈনুদ্দীন হোসেন, তরুণ রেজাউল করীম। তা ছাড়া কত পরিচিত-অপরিচিত যুবক আসছে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

কে যে নজরুলের মাথায় ঢুকিয়ে দিল—পত্রিকা বার করতে হবে। মতলবটা নজরুলের মাথায় চেপে বসতেই তাতে তালিম দিয়ে উঠল আর সবাই। একমাত্র আফজলই নীরব রইল।

নজরুল তখন মূর্ত বিদ্রোহ, আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে নতুন চেতনায় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাণী তার কণ্ঠে। গতানুগতিক ব্যবস্থায় যারা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে তাদের অকল্যাণ ঘোষণা করে তাই 'ধূমকেতুর' উদয় হল।

এক পয়সা দামে ফুলস্কেপ চারপাতা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুবে 'ধূমকেতু।' কিন্তু পয়সা কোথায়। সবারই পকেট ঢু-ঢু. তবু মনে সংশয় নেই; স্থির বিশ্বাস, কাগজ বেরুবেই। প্রস্তুতির প্রথম পর্ব হল কবিগুরুর আশীর্বাণী চেয়ে তার করা।

কয় রীম কাগজ বাকীতে সংগ্রহ করা গেল, মেটকাফ প্রেসের মালিক মণি ঘোষ 'ধূমকেতু' ছাপার দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন। কাগজ একপিট ছাপা হয়ে গেছে, এমন সময় এল কবিগুরুর আশীর্বাণী। পয়লা পৃষ্ঠায় তা বসিয়ে দেওয়া হল।

নজরুলের অগ্নিঝরা প্রবন্ধ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ওরফে ত্রিশূলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও মনুষ্য ধর্মের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করে 'ধূমকেতু' যেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করল, সেদিন সারা শহর উদ্বেল হয়ে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠায়ই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী :

> আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
>
> আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
>
> দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
>
> উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
>
> অলক্ষণের তিলক-রেখা
>
> রাতের ভালে হোক না লেখা,
>
> জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
>
> আছে যারা অর্ধচেতন।।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে দু হাজার কাগজ উবে বত্রিশ নম্বরে—আরো কাগজ চাই। চার-পাঁচ হাজার ছেপে দিলেও তারা তখনই তা নিয়ে নিতে রাজী।

দে গরুর গা ধুইয়ে! সাপ্তাহিক পত্রিকার আর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় না। সংখ্যার পর সংখ্যা বেরিয়ে যেতে লাগল, আফজলের আড্ডা থেকে কার্যালয় বদলি করে সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের লেনে। ম্যানেজারির ভার পড়ল তরুণ শ্রীমান শান্তিপদ সিংহের উপর। কবিগুরুর আশীর্বাণীটি প্রতি সংখ্যায় ছাপাবার জন্য কবির হাতের লেখা ব্লক করে নেওয়া হল, আর তার স্থান হল মূল সম্পাদকীয়ের ঠিক উপরে। বিক্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দাদন দিয়ে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকে মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে—হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম গরম বক্তৃতা চলে। ছাত্র হস্টেলে, রোয়াকে, বৈঠকখানায়, তারপর দিন পর্যন্ত একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে—'ধূমকেতু' জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশ এমন করে ধাক্কা মেরে চলে 'ধূমকেতু' যে রাজশক্তি প্রমাদ গণে।

'ধূমকেতু'র আড্ডায় সারা দিন লোকের পর লোক আসে, কেউ পরিচিত হতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন করতে, কেউ বা প্রেরণা লাভ করতে। মাটির ভাঁড়ে করে চা সবার জন্যে তৈরী। একদিন এল সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি কিশোর, ফরিদপুর থেকে এসেছে, নাম হুমায়ুন কবীর।

অনেক প্রশ্নের মধ্যে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা মাটির ভাঁড়ে করে চা খান কেন ?

জবাবে বললাম, 'একটু বসে থাকলে নিজেই এর জবাব পেয়ে যাবে।'

একটু পরেই নলিনীদা এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল আধ-ভরতি চায়ের ভাঁড় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল—দে গরুর গা ধুইয়ে! চা ছিটকে পড়ল মেঝেতে মাদুরে বইয়ে-কাগজে—সবার গায়ে। ভাঁড়টা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কবীরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বুঝতে পারছ এখানে ভাঁড়ে চা খাওয়ার রেওয়াজ কেন ? গরুর গা ধুইয়ে দিতে প্রথম তিন দিনেই দু'ডজন কাপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কাপ ভাঙা মিঠে আওয়াজ শোনবার জন্যে নিত্যি কাপ কেনা হবে, এমন ক্যাপ্তেন, আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

বয়েস আঠার কি উনিশ। মেঝের এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেওয়ায় বললে—চা খাইনা। আত্মপরিচয়ে যুবক জানালে তার নাম গোপীনাথ সাহা। সে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে চায়, পথের নির্দেশ ও প্রেরণা লাভের জন্যই সে ধূমকেতু'র আখড়ায় এসেছে।

পথ-নির্দেশ বা প্রেরণা দেওয়ার আখড়া এটা নয়, প্রাণের প্রাচুর্য ঘোষণা করার এবং অন্যায় অত্যাচারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেওয়াই 'ধূমকেতু'র ব্রত। আর তার ব্রতভাঙনের জয়গান গাওয়া।

প্রাণের প্রাচুর্য প্রকাশ ও ভাঙনের জয়গান সেখানে যে হৈ-হল্লার পরিবেশ সৃষ্টি করে গোপীনাথ তার দিকে বিস্মিত চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আপনাদের মনে এত আনন্দ জাগে কোথা থেকে ?'

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন ! সবাই তাজ্জব বনে যায়।

দে গরুর গা ধুইয়ে বলে নজরুল জবাব করে, 'আনন্দ কোত্থেকে জাগে তার উত্তর নেই, কিন্তু নিরানন্দ কেন হবে, তাই শুনতে চাই তোমার কাছে।'

মনে আছে, অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গীতেই গোপীনাথ জবাব করেছিল, 'দেশ পরাধীন, সায়েবদের অত্যাচার-জুলুম দিন দিন বেড়ে উঠছে। সেই জ্বালার মধ্যে আনন্দ জাগে কি করে ? প্রত্যেকটি ইংরেজ আমাদের শত্রু। তারা বুক ফুলিয়ে আমাদের চারপাশে বিচরণ করবে, আর আমরা আনন্দে হাসব গাইব !'

'প্রত্যেকটি ইংরেজ নয়, বললে নজরুল, 'সমগ্র ইংরেজ-সমাজ আমাদের শত্রু।' তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্যা। তারই আবাহন করছি আমরা এখানে।'

এ প্রশ্নের কোন জবাব করেনি গোপীনাথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেছে।

কিছুদিন বাদেই সারা শহরে হকচকিয়ে খবর বেরুল, সকাল বেলা চৌরঙ্গীর মোড়ে বাঙালী যুবকের পিস্তলের ঘায়ে খুন হয়েছে ডে সাহেব। হাতেনাতে ধরা পড়েছে আসামী। দেশশত্রু পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করার ব্যর্থতায় আফশোস প্রকাশ করলে গোপীনাথ সাহা।

দিকে দিকে সন্ত্রাসবাদ বিভীষিকার কালো ছায়া বিস্তার করেছে। অসুরনাশিনী খড়্গ-ধারিণী নৃমুণ্ড মালিনী সংহারকর্ত্রী মহাকালীকে বোধন করে 'ধূমকেতু' সেই সন্ত্রাসবাদের প্রেরণা যোগাচ্ছে—এই অপরাধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ 'ধূমকেতু'কে দমন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল।

পুজার সময় কবিতা বেরুল :

> আর কতকাল থাকবি বেটী
>
> মাটির ঢেলায় মূর্তি আড়াল,
>
> স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
>
> অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

মাস দুই যেতে না যেতেই পুলিশ এসে হানা দিল 'ধূমকেতু' অফিসে, ছাপাখানাকেও রেহাই দিল না। সম্পাদক-মুদ্রাকর-প্রকাশক নজরুল ফেরার হয়ে গেল। শান্তিপদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল পুলিশ, ধাওয়া

(বাকি অংশ ১০৮ পৃষ্ঠায়)

সমগোত্রীয়, দুজনেই বেচে কাঁচা মাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েট রাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ঐ দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রপ্রাণ রাষ্ট্র—মস্কোর নাম বদলে তাকে 'সেণ্টার' নাম দেবার প্রস্তাব ঐ কারণেই একবার হয়েছিল—তাই, তার উপরাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্থান উজবেকিস্থানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিনে। অবশ্য উত্তম সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য রাশানের মত ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক ঐ কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব জাতি এই কটি রাষ্ট্রে বিভক্ত:—ইরাক, সিরিয়া (শাম), লেবানন, হাশ্‌মাইট্‌ ট্রানস্‌-জর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান টুনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া। তা ছাড়া কুয়েৎ বাহরেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সব কটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পোর্ট কেনবার দুই নম্বরের 'স্বরাজ' পাব সেদিন আরবের আনাচে কানাচেও আমাদের কনস্যুলেট বসাতে হবে। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদী আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর এসব 'মেলা' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে গেলে আমরা পুজোর বাজার পেরিয়ে শ্যামা পুজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার মনে হয়, আমাদের স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্প্যানিশ-ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি বলবেন, এটুকু দেশ স্পেন—তার ঐ 'ভাঙা নৌকায়' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে! খুলে কই।

আমি স্পেনের কথা আদপেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে ডজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্পেনিশ—হিস্পানী। এদের পুঁটিকোলে আমাদের রাজদূতেরা বেশ কিছুকাল হল ডেরা গেড়ে বসেছেন। আমার বিশ্বাস, সব কটাতে না হোক, বাকী অনেকগুলোতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্প্যানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। তবু বলবো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি:—আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং রাশা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ-প্রস্তুতির চতুর্দিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জন্য তাদের যে সব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকেয় তুলে রাখবে, আপনার কাঁচা মাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এ সব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে—আমাদের তৃতীয় 'স্বরাজ' লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিনশটা চাকরী দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিম্বা ত্রিশ হাজার। আর চাকরী ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষার জোরে ব্যবসা চালান তবেতো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দি। ভাষা শেখার সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। উদাহরণস্থলে বলি, আপনি বাঙালী, আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আসামী এবং উড়িয়া দিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তারপর শিখবেন, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠি, গুরুমুখী। ঠিক ঐ রকমই পর্তুগীজ ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পেনিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনার বাঙলা জানা থাকলে আসামী শিখতে কত দিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল ধরুন স্পেনিশ শেখা হয়ে গেলে পর্তুগীজ, কিম্বা ফরাসিস্‌ শিখতে। ঠিক সেই রকম জর্মন, ফ্লেমিশ এবং ডাচ্‌ পড়ে এক গোত্রে। একদা ব্রাসেলস্‌ শহরে আমি একখানা ফ্লেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বক্তব্যটা ধরে ফেলতে পেরেছি—অল্পস্বল্প যা জর্মন জানি তারই কৃপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি আসামী 'শিশুশিক্ষা' কখনো পড়েননি। একখানা আসামী বই নিন। দেখবেন, বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিম্বা বেতারে যখন 'আসামীয়া খবর' শোনেন তখন কি তার মোটামুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই অনুচ্ছেদের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যে কথা তুলেছিলুম সেটাতে ফিরে যাই। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে যদি বিদ্যাভ্যাসে আপনি স্পেনিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে না যেতেই বাড়িতে, কারো সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজ কিম্বা ফরাসী আরম্ভ করে দেবেন। [illegible] দুদশ পাতা উল্টাতে পাল্টাতেই দেখবেন এক সঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দেহ নেই [illegible] কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে না উঠতে পারেন তবে বুঝবেন, ঐ দিকে ভগবান আপনাকে প্রতিভা দেন নি, তখন না হয় লেগে যাবেন অন্য [illegible] ব্যবসাতে—যাকে অজ্ঞজন বলে ডাক্তারি, কিম্বা রেল-কর্মচারীর পরিপাটি ব্যবস্থা করতে—যাকে অজ্ঞজন নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি।

কিন্তু মিলবেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মাট্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাশ করে থাকতে পারেন তবে গোটাতিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন?

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১। লাতিন গোত্র—স্পেনিশ, ফরাসিস্‌, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান।

২। জর্মন্ গোত্র—জর্মন, ডাচ্‌, ফ্লেমিশ।

৩। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গোত্র—নরউইজিয়ান সুইডিশ।

৪। তুর্কী গোত্র—তুর্কী (ওসমানলি তুর্কী, অর্থাৎ টার্কির ভাষা; তুর্কোমানিস্থানের ভাষা জগতাই তুর্কী। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবুর বাদশার)—হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ কিন্তু এক গোত্র হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫। রাশান গোত্র—রাশান, পোলিশ, ল্যাটভিয়ান, স্লোভাক ইত্যাদি।

৬। ইরানী গোত্র—ইরানী ফার্সী ও কাবুলী ফার্সী—পার্থক্য সামান্য।

৭। আরবী গোত্র—আরবী, হীব্রু, ইভ্রিশ (অধুনা প্যালেস্টাইনে প্রচলিত প্রাচীন হীব্রুর অর্বাচীন রাষ্ট্রভাষা), আমহেরিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮। চীনা গোত্র—চীনা, জাপানী, কোরিয়ান ইত্যাদি।

(ইহার পর ২৫০ পৃষ্ঠায়)

শাশ্বত তরুণ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

করি, সেই তরুণে বন্দনা,
নিত্য গাহে তাহার লাগি চিত্তের মোর চন্দনা।
চিরন্তনের তরুণ সে,
এই জীবনের চক্রবালের আনন্দেরি অরুণ সে।
তৃষ্ণা-ক্ষুধা সমর্পণের অগ্নিশিখায় মনজ্বলি,
অজানারা রঙ্গে তারে প্রাণ দিল তাই অঞ্জলি।
সেই তরুণের অঙ্গ চুমি,'
জাগলো সকল ছন্দরে মোর
জাগলো আমার রঙ্গভূমি।
মোর সে তরুণ চিরন্তন,
দৈবেরি সে দৈব ওরে নিত্য তারি রূপক্ষরণ।
এই জগতের যৌবনে সে ছন্দে করে নৃত্য রে,
শাশ্বত তার নিত্যলীলা মৃত্যু যে তার ভৃত্য রে।
জন্মাবে সে প্রেমিক কবি চণ্ডালে দেয় আলিঙ্গন,
চিরন্তনের বৃন্দাবনে খেলছে
সে যে দোল্ ফাগুন।
তার পরশের নন্দনে,
প্রহ্লাদেরি বিষের লাড্ডু তরল সুধা চন্দনে।
ত্রিলোকেরি সঙ্গীত ওঠে
তার বাঁশিতে ছন্দরে,
বিশ্বেরি সব সুন্দরীরা
তার চরণে বন্দীরে।
এক সাথে সে বংশী বাজায়
চক্রধারার ঘর্ঘরে,
সৃষ্টিলয়ের শক্তি তাহার
উৎসে পড়ে ঝঞ্ঝার।
[illegible]
[illegible]
নিত্যর ঐ হিরণেরি ভাণ্ডারে
[illegible]
সর্পিণীরে নৃত্য তারি ধ্বংস করে বংশরে,
[illegible]
দুর্নীতিদের চূর্ণিতে সে
বক্ষে ফাটে অশনি,
সেই তরুণের জয় গানেতে
চল্ বাঙালির ধরণী।

নাকে আসছে।...আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার তো কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসে নি! পুলিসের লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো ভাল জানে না!...সোখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরী! ...নিশ্চয়ই পুলিসের লোক! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তার পর অন্য কথা। ...কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজানতে।......

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক

ঘটি দেখেই তার খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমাজোড়া বার ক'রে নাকের ডগায় বসালেন।

উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা গুণবে কি! ......বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ী তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

"কে?"

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছম ছম করে।

"ঘর যে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢোক কি করে?"

"কে, সোখী! ওমা তুই! আমি ভাবি কে

তুই কুপিটা জ্বালতো আগে। তার পর সব কথা হবে।"

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সোখী, যা'তে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তার পর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য, দেশলাইয়ের কাঠি জেলে তুলে ধরে।

বুড়ী এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগারোগা লাগছে যেন! সোখীটার তো জেলেই ... জেলে গেলে শরীর ভাল হয়।

বুড়ী ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে। ...এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল! জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়ীতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা'র সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ!...এ আনন্দ তার রাখবার জায়গা নেই।......

"লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশী হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশী আর কি! হেড জেমাদার সাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলরবাবুর কাছে। তাই বেশী 'রেমিশন' পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেওয়াল পর্যন্ত কি যেন খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়ীকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।......

"হ্যাঁ রে জেলে তোর অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি?"

সোখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না জিজ্ঞাসা করে "এদের কাউকে দেখছি না?"

প্রতি মুহূর্তে বুড়ী এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই;... তবু......

"বউ বাপের বাড়ী গিয়েছে।"

"হঠাৎ বাপের-বাড়ী?"

...এতদিন পর বাড়ী ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ! শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দুলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। ...নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সোখী। আগের বউটার ছেলেপিলে হয়নি। এ বউয়ের ওই একটিইতে, টিম টিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সোখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারবনা? খেয়ে দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।......

"কেন, মেয়েদের কি মা বাপকে দেখতে ইচ্ছা করে না একবারও"?

"না না, তাই কি বলছি নাকি?" অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশী সোখী। তার বাড়ী ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ... দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে... কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ী বউছেলেকে নিয়ে আসতে। একথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভাল দেখায় না; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে। ...মা কত কি বলে চলেছে এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

"নে, হাতমুখ ধুয়ে নে।"

"না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।"

"না, রাঁধছে কে। খই মুড়ি আছে। খেয়ে নে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না!"

ব্যবসার পুঁজি খই মুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা'র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

"ওখান আমাকে দে।"

আপত্তি ঠেলে সোখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ীর ঘুম আর আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে

(শেষের পর ২৪৯ পাতায়)

জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

তরুণকান্তি ঘোষ
(পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগের উপমন্ত্রী)

২রা অক্টোবর তারিখটার একটা মস্ত বড় গুরুত্ব রয়েছে ভারতীয় জনগণের কাছে। তাদের চোখে এই টা অতি পবিত্র। কারণ, ২রা অক্টোবর দের কাছে যে আশা ও কর্মের বার্তা পৌঁছে দেয়, তার মূলে রয়েছে আত্মানুসন্ধান অন্তরের গভীর উপলব্ধিতে। এই দিনে ত্মা গান্ধী পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন। বার এই দিনেই ভারত সত্যের এক ঃসাহসিক পরীক্ষায় ব্রতী হয়। সেই পরীক্ষা হ্‌ মানবিক মৌলিক মূল্যবোধের পরীক্ষা। ছর আগে এইদিনে অনির্বাণ আশা ও মনীয় মনোবল নিয়ে দেশের সর্বত্র সমাজ য়ন পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়েছিল।

মৌলিক পরীক্ষা

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা একটা মৌলিক ক্ষা। মানুষের প্রাণশক্তির উৎস যেখানে, দৃষ্টি রয়েছে তারই দিকে। এর কাছে সেই দেবতা। মানুষের গৃহ ও আবেষ্টনই কাছে পেয়েছে মন্দিরের মর্যাদা। মানুষকে দনন্দিনের ব্রতে উদ্দীপ্ত করাই এর ধর্ম। তেক মানুষ যাতে নিজের দৈনন্দিন জীবনকে ড়ে তোলবার সামর্থ্য পায়, সমাজ উন্নয়ন কল্পনার তাই লক্ষ্য। তা ছাড়া, এই কল্পনা মানুষকে এই কথাই বুঝিয়ে দিতে যে, মানুষের নিজের সম্পর্কে যেমন কর্তব্য ছে তেমনি যে সমাজে সে বাস করে সেই জ সম্পর্কেও তার একটা কর্তব্য রয়েছে। ষের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে এবং সেই ক্ষ্য তার পৌঁছতে হয় নিজের চেষ্টায়, এই চেষ্টার পেছনে সমাজের অন্যান্য ষের সাহায্য থাকে। আর্থিক অনটন বা রকমের অবস্থা বৈগুণ্যে হয়তো তার মনে া দেখা দিয়েছে, গতানুগতিক জীবন-কেই হয়তো সে নিরুপায়ভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে ন নিয়েছে, অদৃষ্টের কাছেই হয়তো সে প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করেছে। যা ষের মনুষ্যত্ব হরণ করে, সমাজ উন্নয়ন কল্পনা তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত তুলে, তাদের সংহত শক্তি দিয়ে অর্থনীতি, জ, বস্তু সম্পদ, নীতি সমস্ত দিক দিয়ে রে মানুষ ও সমাজ সৃষ্টি করাই এর য।

রিকল্পনা কার্যকরী করার পন্থা

চার বছর আগে পরিকল্পনা কমিশন সমস্ত শের উন্নয়নের জন্য একটা পরিকল্পনা চালু ছিল। দেশে প্রাচুর্যের সৃষ্টিই ছিল এই রকল্পনার লক্ষ্য। বলিষ্ঠ চিন্তা ও দূরদৃষ্টির ান্ত হিসাবে এই পরিকল্পনা সমস্ত তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই পরি-না সুদূরবিস্তারী এবং সাহস ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক। জীবনের কোনো ক্ষেত্রই এর আওতা বা বিবেচনা থেকে বাদ পড়েনি। দেশের আশা ও ভবিষ্যৎ ছিল এরই মাঝে নিহিত। কিন্তু সমস্যা এই যে, পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হবে কিভাবে? বড় বড় শিল্প, দীর্ঘপ্রসারী যানবাহন বা ঐ ধরণের ব্যাপক কোনও প্রচেষ্টার কাজ চালিয়ে যাওয়ায় হয়তো অসুবিধা হবে না। কিন্তু ভারত মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। যে পরিকল্পনাজাত কল্যাণ দূর গ্রামাঞ্চলে এবং গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছবে না, তার ভিত্তি কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যাবে না। পরিকল্পনায় চিন্তাশীলতার যত পরিচয়ই থাক না কেন, গ্রামাঞ্চলকে যদি তার কল্যাণকর ব্যবস্থার আওতায় না আনা যায়, তাহলে তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে। পল্লীবাসীদের মনে এই প্রত্যয় জন্মাতে হবে যে, এই পরিকল্পনা তাদেরই এবং এর রূপায়ণে তাদের একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যে মানসিক ক্লৈব্য ও জড়তা তাকে বিকল করে ফেলেছে, সবলে নাড়া দিয়ে তার থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। এই জটিল সমস্যার উত্তর দিয়েছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা। প্রকৃতপক্ষে, পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্টতঃই বলেছেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর সাধনের প্রয়াস পাচ্ছে।

মৌলিকত্ব কোথায়?

লোকে একথা জিজ্ঞাসা করার নিশ্চয়ই অধিকার রাখেন এবং অনেকে করছেনও যে, অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই পরিকল্পনার সঙ্গে যে গুরু-দায়িত্বের জড়িত আছে, তাকে কিভাবে কার্যকরী করতে হবে একথা লোকের বোঝা দরকার। এর মধ্যে এমন কি গোপন রহস্য রয়েছে যার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রচয়িতারা এঁদের সাফল্য সিদ্ধির জন্য এর ওপরে এত নির্ভর করছেন? অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন পরি-কল্পনার পার্থক্য এই যে, এটা বিদেশ থেকে আমদানী কোনো বস্তু নয়, দেশের মাটির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে এবং দেশের মানুষেরা শ্রম দ্বারাই এর পুষ্টি সাধন হচ্ছে। পল্লী-জীবনের আসল ব্যাধি কোথায় তা সতর্কভাবে নির্ণয় করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন-যাত্রার ভারসাম্য রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এতে করা হয়েছে।

সম্পদ সৃষ্টি

আমাদের জীবনের আসল সমস্যা কি? স্পষ্টতঃই দেখা যায়, অভাব ও দারিদ্র্যই আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা। আমাদের জীবনে যে বহুতর জটিল সমস্যা রয়েছে তার সবগুলিরই মূলে খুঁজে পাওয়া যাবে এর মধ্যে। কাজেই, আমাদের আসল লক্ষ্য থাকা উচিত সম্পদ সৃষ্টির দিকে। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, কাজেই, এখানে সম্পদ সৃষ্টির সব চেয়ে বড় উপায় কৃষি। কৃষি-কার্যের উন্নতি-বিধানের প্রতি সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে বটে, কিন্তু একথা কোনভাবে ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশে কৃষির উপর নির্ভরতা একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। কাজেই কৃষি ছাড়া অন্যান্য শিল্পের প্রসারের প্রতি আমাদের অবিলম্বেই মনোযোগী হওয়া দরকার। আমাদের বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় কৃষি ও শিল্প উভয় ধরণের জীবিকার সুসমঞ্জস প্রসারের ওপর ভিত্তি করেই পল্লীর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে।

পল্লী জীবনের সর্বাঙ্গীণ সংগঠন

আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান ও উন্নতিই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আসল লক্ষ্য। কিন্তু তৎসঙ্গে এই কথাও অনুধাবন করা দরকার যে, আর্থিক উন্নতিই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না এবং পরিকল্পনার কার্যসূচী পল্লী-জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রসারিত হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক কার্যসূচী সামগ্রিক পরিকল্পনার একটা অংশ। একথা নিঃসন্দেহ যে, উদরপূর্তির ওপরই মানুষের জীবন নির্ভর করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনেরও খোরাক যোগানো দরকার। তার শিক্ষা লাভের আরও বেশী সুযোগ, আরও ভালো বাসস্থান, স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি দরকার। তার যাতায়াতের সুব্যবস্থা হওয়া দরকার, অবকাশ বিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় পল্লীর জীবন-যাত্রার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা চলেছে, এইখানেই তাদের সঙ্গে এর প্রভেদ।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে জীবন্ত মানুষ নিয়ে একটা প্রাণবন্ত পরীক্ষা। এই ধরণের পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে কেবল মাত্র একটি জিনিষের ওপরে। তা হচ্ছে যে দেশের মাটির সঙ্গে এর সম্পর্ক কতখানি এবং সেই মাটির রস নিয়ে এ কতখানি বাড়তে পারে। পরিকল্পনার সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতাই এর আসল কথা। পরিকল্পনা নিজের সামনে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রেখেছে, জনসাধারণ যদি তার সঙ্গে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি দেখে এবং একে সফল করে তোলবার জন্য স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে তাহলেই এ সফল হবে। যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা কৃত্রিম, যাতে জনসাধারণের সহযোগিতা নেই, তা সাময়িকভাবে যদি সফল

([illegible]র পর ২৪১ পৃষ্ঠায়)

ডি লুক্স ফিল্ম
ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ'র
আনন্দ শারদীয় সমাচার!

সমারোহে চলছে — উত্তরা পূরবী উজ্জলায়..ও দেশের আরো ৭ জায়গায়

এম·পি... **অগ্নি পরীক্ষা**
পরিচালনা : অগ্রদূত
সুর : অনুপম ঘটক
শ্রেঃ - সুচিত্রা · উত্তম · চন্দ্রাবতী
সুপ্রভা · জহর · কমল

আর আসছে —

এম·পি'র অগ্রদূত পরিচালনায় আর দুটি
সূর্যগ্রাস শ্রেঃ অনুভা · বিকাশ · উত্তম
কাহিনী : সুশীল জানা
সবার উপরে কাহিনী : নিতাই ভট্টাচার্য্য

চিত্রনাট্য পরিষদ ...
রিক্সা ওয়ালা শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র
কালী ব্যানার্জী
পরিচালনা : সত্যেন বসু
সুর : সলিল চৌধুরী

অরোরা .....
পরিশোধ
কাহিনী ও চিত্রনাট্য : প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা ও প্রযোজনা : সুকুমার দাশগুপ্ত •
শ্রেঃ মঞ্জু দে · অনুভা গুপ্তা
ছবি · ধীরাজ · পাহাড়ী · জহর
... ও বাবুয়া (ছেলে বাঘ)

আই·এন·এ ...
বাংলার বীর **হাম্বীর**
পরিচালনা : শ্যাম দাস
শ্রেঃ মঞ্জু দে · মিত্রা বিশ্বাস
রবীন্দ্র · পাহাড়ী · ভানু
নীলিমা দাস .....

রূপজ্যোতি ... **অভিনয়ের শেষে**
কাহিনী : মনোজ বসু
পরিচালনা : নির্মল দে
বোম্বায়ের বহুখ্যাত অনিল বিশ্বাসের পরিচালনায় সমৃদ্ধ সুর এর সঙ্গীতাংশ!

ডি লুক্স পিকচার্সের .. **মীরাবাঈ**
গেভাকলারে প্রথম বাংলা ছবি!

এস·সি·প্রোডাকসন্সের **আগন্তুক**
পরিচালনায় 'অগ্রগামী'রা।

দেবকী বসু প্রোডাকসন্সের — একটি ছবি!

কিছু এগুচ্ছে না। চিকিৎসার জন্যে যার কাছেই যাওয়া যাচ্ছে 'রোগীকে' দেখতে চাইছে—সেখানেই নিয়ে যাও কিম্বা কল দিয়ে নিয়ে এসো বাড়িতে। অথচ গোরাচাঁদ মোটেই সুবিধে করে উঠতে পারেনি এখনও। মাসীর ওখানেই রয়েছে আজ-কাল, আনাগোনা করে করে ও রাস্তাটুকু মুখস্থ করে ফেলেছে, ছায়াকেও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু বুড়ীর সংগে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, এখনও দুটো কথাও ক'য়ে উঠতে পারেনি। বিড় বিড় করে সর্বদা কি বকে বুড়ী—কেমন যেন ভয় হয়।

ত্রিলোচন এলো। অন্যদিন খোঁজ-খাঁজ নিয়ে এসে আর সবার মতোই মনমরা হয়ে বসে, আজ যেন একটু উৎসাহিত, বললে—"শেষ পর্যন্ত বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন ভগবান,—খুব এক জাঁদরেল হোমিওপ্যাথের সন্ধান পাওয়া গেছে, এই এতখানি টাইটেল, নতুন এসে পঞ্চাননতলার ওদিকটায় বসেছে..."

গনশা একটু আড়ে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"রুগীকে দেখাতে হবে তো?"

"কিছু না। খালি সিম্পটমটুকু বলে দাও, ওষুধ নিয়ে যাও। ওসব ভড়ং নেই।"

পকেট থেকে গুলিভরা একটা ছোট্ট শিশি বের করতে করতে বললে—"এই তো! বললে—রোজ সকালে উঠে বাসিমুখে চারটে করে গুলি..."

"সিম্পটম্ সব বললি কি করে তুই?"

"সে তো উনি নিজেই বললেন—সব সিম্পটমের দরকারও হয় না। যেটুকু জানা আছে—রোগা, হাড় জিরজিরে, বাড় নেই..."

গনশা শিশিটা হাতে নিয়ে বললে—"কত নিলে?"

"দু টাকা—ওতেই কন্‌সাল্‌টেশন্ ফি, ওতেই ওষুধ..."

গনশা হাতে গুলিগুলো ঢেলে মুখে ফেলে দিলে।

এমন সময় দেখা গেল গোরাচাঁদ হনহনিয়ে ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে ব্যস্ত হয়ে বললে—"কেউ শীগ্গির গলার পৈতেটা খুলে দে, গেল বোধহয় ফস্কে এতক্ষণে।"

তিনজনেই প্রশ্ন করে উঠল—"ব্যাপার কি?"

"সে পরে শুনবি, আগে কেউ পৈতেটা খুলে দে। এতক্ষণ বোধহয় হয়ে গেল হাতছাড়া।"

গনশা গম্ভীরভাবে বললে—"কথাটা আগে বলবি, না, এই রকম করে হাত-পা ছুঁড়বি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চো—চ্চোপোর দিন?"

—গোরাচাঁদ ছিল আজ মাসতুতো বোন নেড়ীর 'বামন'। জলটল খেয়ে ওর পারণটা করিয়ে এদিকেই আসছিল, দেখে সামনে ছায়ার দিদিমা ঠুক ঠুক করে চলেছে, মনে হোল যেন গঙ্গাস্নান করে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। একটা মস্ত-বড় চান্স, কি ব'লে কথাটা আরম্ভ করবে ভাবতে ভাবতে পা চালিয়ে দিয়েছে, একটু কাছে আসতেই টের পেলে ভয়ানক চটে আছে বুড়ী—বিড় বিড় করে এলোধাবাড়ি গাল পাড়ছে। প্রথমটা তো একটু থমকে গেল গোরাচাঁদ, একে-বারে আগুন ছুটিয়েছে, এর মুখে যাবে কিনা, তারপর কানে গেল 'বামন' পায়নি খুঁজে পাড়ার মধ্যে, সবাই 'বুকেড'—বুড়ী তাই আত্যন্তরে পড়ে সমস্ত পাড়াটা নিয়ে গাল পাড়তে পাড়তে চলেছে। ...এমন একটা মোকা, গোরা পা চালিয়ে গিয়ে বলবে—রয়েছে বামন কাছেই, তারপর পৈতেটা খুঁজতে গিয়ে দেখে লাপাত্তা! ...তাড়া-তাড়ি ছুটে এসেছে।"

ঘোৎনা বললে—"গেল কোথায় তোর পৈতে?"

গোরাচাঁদ বললে—"কাল গেঞ্জী কামিজ সব লণ্ড্রীতে গেল তো, তারপর বামনও হলাম—তা বাড়িতেই, পৈতের আর খোঁজ করবার দরকার হয়নি।" তারপর আবার একটু ব্যস্ত হয়েই বললে—"তোরা কিন্তু কাঁচিয়ে দিলি সব, সে বুড়ী বোধহয় আবার বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে, বলছিল—এবার সমস্ত শিবপুর উটকে দেখবে, না পায়—চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গাল পাড়বে।"

গনশা একটা ঘাসের শিষ তুলে নিয়ে দাঁতে চেপে কি ভাবছিল, বললে—"কি—কি বলে গিয়ে দাঁড়াবি? এতো গেরোন নয় যে 'গে—গেরোনদান দাও, গে-গেরোনদান দাও' বলে রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যাবি, বুড়ী বেরিয়ে আসবে।"

ত্রিলোচন বললে—"আর যে রকম মনে হচ্ছে বুড়ীকে—সহর জায়গা, একটা লোক পাত্তা নিয়ে নিয়ে এসে বলছে—আমি বামন, পারণ করিয়ে দিচ্ছে—একটা পৈতেও দেখাচ্ছে—থানা পুলিশ না করে বসে।"

গোরাচাঁদ একেবারে দমে গেছে—হতাশ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল—গনশা রাজেনকে বললে—"যা, একটা ফুলের সাজি নিয়ে আয়...আর শোন, একটা না-মামাবলিও,—টপ করে নজরে পড়ে যাবে'খন।"

গনশার বুদ্ধি, চমৎকার কাজ হয়েছে!

বুড়ীর বাড়ীর সামনে খালি জায়গাটার এক-পাশটিতে একটি জবাফুলের গাছ, আর তারই পাশে কপালগুণে একটা বেলগাছও। কপালগুণ বৈকি, বেলগাছের গোড়ায় শিবঠাকুর গড়বার জন্যে মাটি খুঁড়ছে ছায়াই। নামাবলিটি একটু তুলে নিয়ে, সাবান দিয়ে কাচা পৈতের গোছাটা ভালো করে ঝুলিয়ে সাজি হাতে করে গিয়ে উঠল গোরাচাঁদ, জিগেস করলে—"খুকি, গোটা-কতক ফুল আর বিল্বপত্তর নোব তোমাদের গাছ থেকে?"

ছায়া একবার ঘুরে দেখলে, তারপর হ্যাঁ-না কিছু না বলে ছুটলো বাড়ির ভেতরে। ওষুধ সংগে সংগে ধরে নিলে। বুড়ী কি কাজ করতে করতে বেশ গলা ছেড়েই পাড়াটাকে ভাগাড়ে দিচ্ছিল, একেবারে চুপ করে গেল। সংগে সংগে দৌড়িয়ে এসে রক থেকে নেমে উৎ-কণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁ, বাবা তুমি বামন? বামনই তো দেখছি। পোড়া জায়গায় আমি একটা বামন খুঁজে পাচ্ছি না বাবা...বুড়ো মানুষ—উপোস করে রয়েছি..."

যেমন শেখানো ছিল গনশার, গোরাচাঁদ বললে—"আমিও তো উপোস করে রয়েছি মা, পুজোটুকু না সেরে তো জল গ্রহণ করতে পারব না; আপনার দেরি হয়ে যাবে না? বুড়ো মানুষ......"

কাজ তো হোলোই, বেশ সুচারুরূপেই হোল। ব্রাহ্মণ-দুর্ভিক্ষের দেশ, বুড়ী ওরকম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দেখে আর চোখের আড়াল করতে চাইলে না কোনমতেই। ঐখানেই পুজোর ব্যবস্থা হোল, ঐখানেই পারণ। তার পরেও আটকে রাখলে বুড়ী একেবারে খাইয়ে দাইয়ে দক্ষিণান্ত করে তবে ছাড়বে।

দেরি হচ্ছে দেখে যখন গনশা এল, তখন দেখে বুড়ী হেঁসেলে এদিকে গোরাচাঁদ একটা ঘরে বেশ গুছিয়ে বসেছে ছায়া আর তার ভাইয়ের সংগে। তার পর গনশার খোঁজে ত্রিলোচন এল, ত্রিলোচনের খোঁজে ঘোৎনা এল, যেমন ওদের পদ্ধতি।

তারপর যখন বেশ জমে বসেছে সবাই, বুড়ী সবার দিদিমা হয়ে বসেছে, সংসারের খুঁটিনাটি থেকে ছায়ার শরীরের অবস্থা নিয়ে দুর্ভাবনায় বুড়ীর সংগে মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছে সবাই, হীরের টুকরো ছেলে পাঁচটি 'আপন' হয়ে উঠেছে—সেই সময়ে একদিন রাজেনকেও নিয়ে এসে ছায়ার হাত দু' তিনের মধ্যে বসালে সবাই।

এদিকে তো চমৎকার যোগাযোগ; রাজেন 'ছায়া'—ব'লে পদ্য লিখেছিল, এসে দেখা গেল মেয়েটির নামও ছায়া। এ ব্যাপারটায় দৈবের হাত স্পষ্ট দেখে সবাই আরও উৎসাহিত হয়ে উঠেছে; কিন্তু এদিকে আসল ব্যাপারের কিছুই হচ্ছে না। বুড়ী দুঃখ করে,—করিয়েছিল বৈকি চিকিৎসা—ঐ একটি নাতনী, তার মা-বাপ নেই, করাবে না? এখানে প্রথম প্রথম এনে খুব একচোট করিয়েছিল—ডাক্তারী, কবিরাজী, সব রকম; কিছুতে কিছু হয় না। কোনও যে রোগ আছে, তা নয়; শুধু ঐ রকম—খাচ্ছে-দাচ্ছে; কোনই উপসর্গ নেই, তবে বাড়ও নেই মেয়ের!

এ সব কথা অবশ্য ছায়ার অবর্তমানেই হয়। দিদিমা দুঃখের হাসি হেসে বলে—কি কুক্ষণে বাপমায়ে যে ছায়া নাম রেখেছিল!... আমিও হেরে এখন বাঁকড়ি বলে ডাকি, কি করব?"

গনশা বলে—"না—নামটা অমন করে বিগড়ে দেবেন না দিদিমা; বিয়ের সময় ডাকনামেরও খোঁজ হয় কি না।"

বুড়ী বলে—"ও-মেয়েকে কে বিয়ে করবে ভাই? ও বাঁকড়ি হয়েই থাকবে বাড়িতে।"

খুব দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথমটা একটা সংকোচ ছিল, পরের মেয়ের জন্য খুব বেশি একটা আগ্রহ দেখানো—তার পর ঘনিষ্ঠতার সংগে সংগে সেটা যখন কেটে গেল, এরা নিজেরাও চিকিৎসার ব্যবস্থাটা তুলে নিলে হাতে। এমনি জিজ্ঞাসাপত্র করে নামজাদা নামজাদা টনিকগুলো চালালে প্রথমে—বাঁকড়ি, না বাড়ে না কমে, যেন কোথায় যাচ্ছে ওষুধ গুলো। তার পর নিয়েও এল কল দিয়ে—এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ...কিছু না; কী যে রোগ, তিন-গুপ্তের পূর্বে ও পরে একই চিত্র।

রাজেন তিন চারদিন অন্তর এক একটা পদ্য শেষ করছে। শুধু হা-হুতাশ, সবাই শোনে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাঁচটা বুকের দীর্ঘশ্বাসে যেন ঝড় বয়ে যেতে থাকে। পাছে কেউ মনে করে দরদ নেই; কে-গুপ্ত দীর্ঘশ্বাসের যেন হাপর টানতে থাকে।

এই করে যখন প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে, কে-গুপ্তই একদিন একটা একেবারে নতুন ধরণের চিকিৎসার খবর দিলে।

কে-গুপ্ত ভাইঝির বিয়েতে দিনকতকের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, ছাপরা জেলার ছোট্ট একটা সহরে। শীঘ্রই ফেরবার কথা এবার। এরা আজকাল খেয়ে-দেয়ে রাজেনের বাড়িতেই একত্র হচ্ছে। সবাই যে-যার নূতন সন্ধান নিয়ে

(শেষাংশ ১৪০ পাতায়)

সকলের আগে দরকার
বসন-ভূষণই উৎসব-আনন্দের সব নয়—মনের প্রফুল্লতাই আসল কথা। পরিচ্ছন্নতা ও সেই সঙ্গে সুস্থ দেহ—উৎসবের আনন্দ উপভোগ করবার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। বিশুদ্ধ উপকরণে প্রস্তুত "ব্রাইট" ও "সেন্টিনেল" সাবান দুইটি পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থ দেহের প্রতীক বলেই স্বীকৃত।
Bright
ব্রাইট
বার ও কেক সাবান
সেন্টিনেল
বীজাণু শোধক সাবান
প্রস্তুতকারক
ডি. এন. মিত্র য়্যাণ্ড কোং, কলিকাতা—১১
পুজোর আনন্দ...
প্রিয়জনদের মিলনে
পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক
পূর্ব রেলওয়ে

স্বপ্ন

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শৈবাল মৈত্রের নার্সারী অভিমুখে গীতা এইমাত্র রওনা হয়েছে। শেয়ালদা স্টেশন থেকে দমদম জংসন—মাত্র ছটা চারেকের ব্যবধান, গীতা লোকাল ট্রেনে চড়ে বসলো। মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যেই ও শৈবাল মৈত্রের নার্সারীতে পৌঁছে যাবে।

দিন কয়েক আগে গীতা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখেছিল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শৈবাল মৈত্র নিজের ফার্মে জেনেটিক সাইকোলজি রিসার্চ করে আদর্শ শিশু চরিত্র গঠন করবেন।

এর জন্য তার উপযুক্ত একজন মহিলা ট্রেনার চাই। অনেক অবসর গীতার, মুহূর্তগুলি যেন এক একটা বছরকেও ছাড়িয়ে যায়, অতিক্রম আর করতে চায় না হাঁপিয়ে ওঠে গীতা সময়ের ভারাক্রান্ত অকারণে।

মৈত্র পরিবারের একটিমাত্র বধূ গীতা, প্রৌঢ়া শাশুড়ী ধ্যান জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে আত্মনিমগ্ন, জিওলজিস্ট স্বামী এগ্রিকালচার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে আনতে বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যে বিলেত চলে গেছে। সূর্যমুখী পাপড়ি না মেলতে সূর্য ডুবেছে মেঘের আড়ালে,—কে জানে কবে সে আবার নীল দিগন্তে উদিত হবে? প্রতীপ কবে ফিরবে এখনও জানে না গীতা,—দেখতে দেখতে বছর দুই অতিক্রম করে গেল,—মরু তৃষা জাগে বুকের সংগোপনে গীতার,—অব্যক্ত বেদনার বাষ্পে সমস্ত মন থমথম করে। স্নেহরসে অভিষিক্ত প্রতীপের চিঠি পায় সে—"দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে যাবে গীতা, তুমি ইতিমধ্যে এম, এ-টা পাশ করে ফেল, দুজনে এক সঙ্গে আমরা এগ্রিকালচার রিসার্চ করব। মাটিতে আনবো নূতন প্রাণের বন্যা,—খাদ্যসম্ভারে দেশের ভাণ্ডার ভরে যাবে। কি অভিশপ্ত বলতো আমরা,—মানুষ জন্মায়, অথচ ধান জন্মায় না—" গীতা বি-এ পাশ করেছে, এম-এ পড়বার আর উৎসাহ পায় না,—স্বপ্ন দিয়ে একখানা ঘর ও গড়বে,—প্রেমের নীড় রচনা করবে,—ও যেন আর স্বামীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে পারছে না,—উঃ আরও একটা বছর,—অনন্ত অবসর গীতার। শৈবালের নার্সারী ওকে টানছে। ছেলেমেয়েদের গঠন করতে ওর বেশ ভালো লাগবে।

উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে আবার ছেড়েছে। ফুরফুরে বাতাসে গীতার চোখের পাতা দুটি মুদে এসেছে। তন্দ্রা আবেশে ওর দেহ যেন মধুর আমেজ লেগেছে। পাতলা ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

"প্রতীপ প্রিয় তুমি ফিরে এসেছ?" ঘুম ভেঙ্গে যায় গীতার যেন স্বামীর একটি সোহাগ চুম্বনে। রোমাঞ্চজাগা বুকে ও গাড়ীর কামরায় চোখ মেলে তাকালো। স্বপ্নের তার যেন ছিঁড়ে গেছে গীতার, হৃদ সুর মিলোয়নি, করাঘাতের মর্মর ধ্বনি ওর স্নায়ুর স্পন্দনে অনুরণিত হয়ে ফেরে। তাপসী বাগ খুলে ও স্বামীর উপহার দেওয়া একখানা রুমাল বের করে গালে বুলিয়ে নিয়ে আবার তুলে রাখলো। ট্রেন থেমেছে দমদম জংসন স্টেশনে।

* * *

গীতা শৈবাল মৈত্রের নার্সারীতে পৌঁছেচে। সংবেষ্টী অঞ্চলের প্রকাণ্ড বাড়ী, শৈবালের পিতামহ, প্রপিতামহর কালে এ গৃহে দোল-দুর্গোৎসব বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হোত। এ কালে হয়েছে এ বাড়ী বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। ধ্যানের ভারতবর্ষ প্রেমের তপস্যায় জেলেছে যুগে যুগে অনির্বাণ দীপশিখা, বেদ থেকে বেদান্ত উপনিষদ, হর-পার্বতী থেকে মহা-মানব, শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধার্থ থেকে শ্রীচৈতন্য, অধ্যাত্মদর্শনকে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন। সাধনার রং যুগে যুগে বদলেছে। কিন্তু কাঠামো বদলায়নি। ঘুণ ধরেছে কাঠামোতে, সংস্কার করবে এবার শৈবাল—নূতন রংয়ের তুলি ও বুলিয়ে দেবে।

হ্যাঁ ঘুণ ধরেছে বৈদিক কাঠামোয়। মানবের মন উল্লাসে মেতেছে,—অসুর আর দুঃশাসনের সম্পদে মুক্তিলাভে জেগেছে কলুষ কলঙ্ক,—দেবে অন্যায়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

দেবতা মরে গেছে,—পিশাচ জেগেছে, মানুষে মানুষে হানাহানি, মানুষের বুকে মানুষ উন্মত্ত ছুরিকা হানে, রক্তপিপাসায় মানুষ আকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। কত দ্রৌপদী আর সীতার নিশ্বাসে আর চোখের জলে আকাশ থমথমে, সাগর উপচে উঠেছে,—নারী ভাগ্যের মর্মন্তুদ ইতিহাস। ভারতবর্ষ, এই কি তোমার তপস্যার মহিমা?

না ভারতবর্ষের জরা নেই, মৃত্যু নেই। ঘুণধরা ভিত আবার সংস্কার করবে শৈবাল মৈত্র,—নূতন রংয়ের তুলি সে বুলিয়ে দেবে। পূজার নাট-মন্দিরেই সে বিজ্ঞানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। শৈবালের স্বপ্ন, আদর্শ মানুষ সে তৈরী করবে। গীতা এতক্ষণ অফিসরুমে শৈবালের নার্সারীর অনুষ্ঠানপত্র এবং স্মারকলিপি পাঠ করছিল,—শৈবাল ঘরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার জানালো। হাসিমুখে গীতা প্রতি নমস্কার করলো।

"আমার নার্সারীর অনুষ্ঠানপত্রাদি দেখলেন মিসেস ভাদুড়ী,—আমার থিওরী বুঝলেন?" একখানা চেয়ারে উপবেশন করে শৈবাল বললো,—"আপনি আমার নার্সারীর ছেলে-মেয়েদের পরিচালনার ভার নিতে পারবেন নিশ্চয়ই।"

"আশা করছি মিঃ মৈত্র"—উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তাকালো গীতা শৈবালের আগ্রহ উজ্জ্বল মুখে।

"জীবন স্বপ্ন আমার,—বুক এলোমেলো চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগলো আটাশ বছরের তরুণ বৈজ্ঞানিক,—ভালোবাসা,

আর হৃদয়বত্তার ঐশ্বর্যে আমি গড়বো এক নূতন জগৎ, নূতন ইতিহাস রচনা করবো,—প্রেম, মৈত্রী, স্নেহ আর করুণার উৎস হবে মানুষ। বিরাট মহীরূহের মুকুল তো শিশুরাই, তাই ওদের গঠনে আমি আত্মসমর্পণ করেছি।

গীতা বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো—"বারে বারে তো ভারতবর্ষ শুনিয়েছে প্রেম, মৈত্রী আর করুণার বাণী, কিন্তু এ আদর্শবাদ কি জীবন মুখরতাকে নির্জীব আর নিষ্ক্রিয় করে তোলে না মিঃ মৈত্র? উন্নতির মর্মমূলে আঘাতই হানে না?" "তাই আমার স্বপ্ন গীতা দেবী ওই ঘুণধরা কাঠামো নূতন রঙয়ে আবার সংস্কার করবো,—শৌর্য, বীর্য আর বীরত্বের দীপশিখা জ্বালবো আমি প্রেম, মৈত্রী আর করুণার প্রদীপে, রক্তে জাগবে মানুষের প্রচন্ড ভিসুভিয়াসের উদ্দাম। ডিনামাইটের শক্তি অর্জন করবে মানুষ প্রেমের দুর্বার তপস্যায়"—উজ্জ্বল মুখে শৈবাল বলতে লাগলো—"আমার পরিকল্পনা আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না—আপনি আমার সংগে আসুন—"

প্রশস্ত কয়েকটি বারান্দা অতিক্রম করে ওরা প্রাঙ্গণের আর একদিকে প্রাচীন আমলের নাট-মন্দিরের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো।

পুরাতন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর মন্দিরের সর্বত্র বিদ্যমান। পাথরের দেওয়ালের গায়ে দেব-দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। কত আরতির ধূপ-দীপ শিখা জ্বলেছে একদিন এ পূজামন্দিরে, কাঁসরঘণ্টা আর শংখধ্বনি দেবতাকে আরাধনা জানিয়েছে। আজ আর দেবতার আরাধনা নয়, মানুষ গঠন,—পূজা উপচার নয়, বিজ্ঞান উপাদান। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গীতা,—আধুনিক মন্দিরের দিকে, বড় বড় তারের আর জালের বাক্সে গিনিপিগ, খরগোস প্রভৃতি রয়েছে। খাঁচায় রয়েছে কয়েকটা ব্যাঘ্রশাবক।

আর একদিকে ডিসেক্‌সন টেবিল, ইলেকট্রিকের নানা আয়োজন, ছুরি-কাঁচি ফরসেপ, কাঁচের জারে বিজ্ঞানের নানা স্পেসিমেন,—গীতার বিস্ময়ের দৃষ্টি একটা গিনিপিগের দিকে তাকিয়ে থমকে গেছলো। শৈবাল বলছিল—"ভারতবর্ষ এ কথাও বলেছে—নর নারায়ণ, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা বিরাজমান। এর চেয়ে বড় সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ আর কোথাও বলা হয়েছে বলে আমি শুনিনি। কিন্তু আজও আমরা আমাদের তপস্যায় রূপ দিতে পারিনি, রং দিতে পারিনি স্বপ্নের কল্পনায়। আলো জ্বেলেছি যত ছায়া ফেলেছি তার বেশী, সূর্য নিভেছে কুয়াশার আবরণে। অন্ধতা আর সংস্কারের দাসত্ব করতে করতে আমাদের বিবেক মরে গেছে।

হঠাৎ বলে উঠলো গীতা—"দেখুন মিঃ মৈত্র গিনিপিগটা কি রকম ফোঁস ফোঁস করছে—"

"আসুন আপনাকে দেখাই, কেউ রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, কেউ শান্ত হয়ে বসে আছে, কেউ বাচ্চাকে আদর করছে। কারও চোখে আবার জল,—ওরা বিজ্ঞানাগারে ঘুরে ঘুরে পশুগুলির চরিত্র উপলব্ধি করতে লাগলো। শৈবাল বললো—"ওদের মেণ্টাল সাইকলজি আমি ষ্টাডি করি, রিসার্চ করি, ওদের ব্রেন ডিসেক্ট করি। হাইয়ার নার্ভ সেণ্টার, ফ্রণ্টাল, ইণ্টেলেকচুয়াল প্রভৃতি নার্ভগুলিতে ইলেকট্রিক চার্জ করে সাইকলজিকাল রিসার্চের সংগে মেণ্টাল ট্রিটমেণ্ট করি।"

করলো—"এদের সাইকলজিকাল রিসার্চকে সেণ্টার করে আপনি শিশুদের মেণ্টাল ট্রিটমেণ্ট ব্রেন ডেভালপমেণ্ট, নিশ্চয়ই করেন?"

"আসুন আমার সংগে—" উজ্জ্বল দৃষ্টিতে গীতার দিকে তাকিয়ে তরুণ বৈজ্ঞানিক উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠলো—"আপনি আমার স্বপ্নকে সার্থক করতে পারবেন—আমার বিশ্বাস হচ্ছে মিসেস ভাদুড়ী—" এবার ওরা সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছুলো। বছর-পাঁচেক বয়স থেকে দশ-বারো অবধি—গোটা আষ্টেক ছেলে-মেয়ে মাঠে খেলা করছিল। একধারে তারের জালের মধ্যে ময়ূর, কাকাতুয়া, ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখী রয়েছে। শৈবাল বললো, "এদেরই পরিচালনার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে গীতা দেবী. এরা বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির, মায়া-মমতা আত্মপ্রকাশ করেনি, নগ্ন স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক, অথচ বুদ্ধি এদের যত তীক্ষ্ণ, তত চকিত। তাই এদের যে নার্ভগুলো অপুষ্ট, ডেভালপ হবার সুযোগ পায়নি, ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে ডেভালপ করি, পুষ্ট করে তুলি; ওদের হৃদয়বোধ জাগিয়ে তুলতে এই পশু-পক্ষীগুলোকে ভাল-বাসতে শেখাই।" মুগ্ধ বৈজ্ঞানিক আত্মবিভোর কণ্ঠে বলতে লাগলো—"হিটলার নিতান্ত কম বড় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জাতি গঠন সার্থক হয়নি, একমাত্র প্রেম, স্নেহ, মমতার অভাবে। নগ্ন স্বার্থপরতা আর উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলে হিটলারবাদ ধ্বংস হয়ে গেল। প্রকৃত জাতি গঠন হয়নি, যন্ত্র না হয় দানব সে তৈরী করেছিল।" ময়দান সংলগ্ন পুষ্করিণীতে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সাঁতার দিচ্ছিল। গীতা জিজ্ঞেস করলো—"এ ছেলে-মেয়েরা কি আপনার নার্সারীর মিঃ মৈত্র?" "হ্যাঁ মিসেস ভাদুড়ী"—শৈবালের চোখে খুশির বিদ্যুৎ ঝলসালো—"ওদের মেণ্টাল ফ্যাকাল্টি ষ্টাডি করে দেখছি, অত্যন্ত উদার, হৃদয়বোধ বড় বেশী গভীর—তার ফলে মন এত বেশী নম্র কোনও দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হতে পারে না। ভীরুতা, অলসতা ওদের বড় হবার সুযোগ দেয় না, প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয় না। তাই আমি ওদের জলে ছেড়ে দিয়েছি, মধ্যে মধ্যে বাঘ শীকার দেখতে জঙ্গলে পাঠিয়ে দি, সৈনিকের কুচকাওয়াজ শুনতে ময়দানে পাঠাই—, আমার বিশ্বাস, প্রতিভা আর প্রেমের সংমিশ্রণের মধ্যেই সার্থক জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটবে।" চোখ মেলে তাকালো গীতা ওর আনন্দ উজ্জ্বল মুখে, জিজ্ঞেস করলো—"আপনার নার্সারীতে কত ছেলেমেয়ে মিঃ মৈত্র?"

"খুব বেশী কই? মাত্র কুড়িজন—, আপনার যদি সহযোগিতা পাই সাহসের সংগে অগ্রসর হতে পারি," শৈবাল বললো—"অবশ্য আপনি মা হয়েছেন কিনা আমি জানি না, ভালো মা পারে কিনা ভালো চরিত্র গঠন করতে, কুমারী মেয়েদের দরখাস্ত তাই আমি য়্যাক্সেপ্ট করিনি—"

বিবর্ণ হয়ে উঠলো গীতার সুশ্রী মুখ—"আমি কিন্তু মা নই মিঃ মৈত্র," শৈবাল হেসে উঠলো ওর নৈরাশ্য মুখের দিকে তাকিয়ে—"ইতিমধ্যেই আপনি নিশ্চয়ই মা হবার আশা ত্যাগ করেন নি?"

মনের সংগোপনে গীতা একটু বিষণ্ণ হাসি না হেসে পারলো না। আশা পরিত্যাগ ছাড়া আর কি?

জন্মানো অনায়াসে, খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হবে যেদিন ওরা মানুষকে সেদিন আগ্রহে আহ্বান জানাবে।

মৃদু কণ্ঠে ও বললো—"মিঃ ভাদুড়ী এখন এগ্রিকালচার ষ্টাডিতে বিলেতে"—"ওঃ, তবে আপনার অফুরন্ত অবসর", শৈবাল বললো, "আপনি আমার ফার্মের উপযুক্ত ট্রেণার, কয়েক-দিনের মধ্যেই য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার পেয়ে যাবেন"—

খুশির আতিশয্যে গীতার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

* * *

ডক্টর শৈবালের চেয়ে ওর স্ত্রী গোপাকে সত্যই বিচিত্র লাগলো গীতার। গতানুগতিক মেয়ের চেয়ে গোপা যেন কিছু ব্যতিক্রম, কিছু খাপছাড়া, বাইওলজিষ্ট সে। নিজের ক্লিনিকে এমব্রয়লজিতে রিসার্চ করে, জৈববিজ্ঞানের একটানা সৃষ্টি বিকারের সে পরিবর্তন করবে। জীব সৃষ্টির ক্ষেত্রে নূতন অধ্যায় সে আনবে। নারী ও পুরুষের যৌন প্রেমকে ও বলে সেণ্টিমেণ্টালিটি। পুরুষ মাত্রেরই বড় প্রতিভা দেশের সম্পদ। পুরুষের প্রতিভা কোনও নারীর ব্যক্তিগত বিলাস হতে পারে না।

একদিন গীতা নার্সারীর একটি দুরন্ত বালককে আয়ত্তাধীনে আনতে পারছিল না। মৃদু হেসে শৈবাল বললো "মায়ের কুশলী মনটা আপনি এখনও জানতে পারেন নি কি না,—তাই ওদের সামলাতে পারছেন না"—পরমুহূর্তে তরুণ বৈজ্ঞানিক আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো—"মিঃ ভাদুড়ী কবে ফিরবেন কিছু খবর পেয়েছেন গীতা দেবী?"

"এখন আর ফিরছেন কই?" নৈরাশ্যের নিরুদ্যম কণ্ঠে গীতা বললো, "খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সারা পৃথিবী টুর করবেন,—" পাথর চাপা ঝর্ণার মত অব্যক্ত বেদনা গীতার বিষণ্ণ বুকের সংগোপনে গুমরে ওঠে। সেইদিন আলোচনা প্রসঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় জানিয়ে শৈবাল বলেছিল "আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কারও অপেক্ষায় কারও পিছিয়ে থাকা উন্নতির প্রতিবন্ধক যে গীতা দেবী, মাতৃত্ব সম্বন্ধে আপনার নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই,—এই বাড়ীর অন্দরমহলে আমার স্ত্রীর ক্লিনিক—সাইণ্টিফিক ওয়েতে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশনে আপনি অনায়াসে মা হতে পারেন,—" গীতা রক্ষণশীল সমাজের মেয়ে, স্বামী ছাড়া সন্তানের জননী হওয়া ও যে ভাবতে পারে না। ওর রক্তের স্রোতে আজন্ম সংস্কার যেন ঘোলাটে হয়ে উঠলো। ফিজিওলজিষ্ট শৈবাল বলছিল উৎসাহের কণ্ঠে—"স্বামীর সন্তানকেই যে গর্ভে ধারণ করে মা হতে হবে তার কোনও যুক্তি নেই,—এই রুচিবিকারের মধ্যে প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমার স্ত্রীর বিজ্ঞানাগারে সারা পৃথিবীর প্রতিভাবান মনীষীদের সৃষ্টির উৎস সংরক্ষিত। আপনি আপনার ইচ্ছেমত সন্তানের পিতা বেছে নিতে পারেন।"

অপরিচিতের অনুভূতি গীতার সমস্ত চেতনাকে যেন পীড়িত করে তুলেছিল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে সে অস্বীকার করে না, কিন্তু প্রতীপকে তো সে ভুলে যেতে পারে না, আজও প্রতীপের চিঠি পেয়েছে,—সে

করেনি, কিন্তু মাদাম কুরীর মেয়ে অইরিন কুরী হয়েছে গোপা দেবী।"

গোপা খানিকটা হেসে বললো—"তারই রিসার্চের দিন তো এবার এসেছে,"

"মিসেস ভাদুড়ী.—আমি চাই ঘরে ঘরে সৃষ্টি হোক কালজয়ী প্রতিভার প্রতিমূর্তি, যথেষ্ট আগাছা জন্মেছে, আর নয়,—মানুষের ইতিহাস এবার নূতন অধ্যায়ের গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—"

বড় বড় প্রাঙ্গণ দরদালান অতিক্রম করে ওরা গোপার লেবরেটরীতে পৌঁছলো—গোপা এবার গীতাকে জিজ্ঞেস করলো—"আপনি আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশানে একটা বাচ্চা চান বুঝি—?"

গীতা তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে লেবরেটরীর ঐশ্বর্য, দেওয়ালে টাঙ্গানো দেশ-বিদেশের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের ছবি, নিউটন, সক্রেটিস, আইনষ্টাইনের জীবন বিদ্যুৎ যেন ছবির কাঁচে ঝলমল করছে, জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস আলভা এডিসন, রলাঁ আর শ' জীর্ণ সংস্কারবোধকে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গছে। টলষ্টয় গর্কি লেনিনের জীবনসাধনা যেন ছবিগুলিতে মূর্ত হয়ে রয়েছে। উদাত তরবারির শাণিত ঝলক রামমোহন, কেশব সেন, বিবেকানন্দর কীর্তির স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ নূতন যুগের আহ্বান জানাচ্ছে ধ্যানের মন্ত্রে আত্মজ্ঞানের সাধনায়।

ক্লিনিকের আর একধারে টেষ্ট টিউবগুলি থরে থরে সুসজ্জিত। এ যুগের প্রতিভাবান মানুষের সৃষ্টি উৎস ফিজিওলজিক্যাল সলিউসনের ভিতর। ইনকিউবেটারে প্রিসার্ভ রয়েছে। টেষ্ট-টিউবের গায়ে কাগজের টুকরোতে লাল কালির অক্ষরে সৃষ্টির স্বত্বাধিকারিগণের জীবন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় লেখা রয়েছে। বিস্ময়ের চোখে গীতা নূতন পৃথিবীকে দেখছে, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে অনাগত কালকে সম্ভাষণ না জানিয়ে পারছে না। ব্যক্তিগত চেতনা ওর রক্ষণশীল চেতনার প্রভাবে পাক খেয়ে মরছে।

গোপার মানুষ সৃষ্টির নবতর বৈজ্ঞানিক অভিযানকে ধন্যবাদ জানিয়ে গীতা বললো—, "বাচ্চা চাই কিনা—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা মিসেস মৈত্র, স্বামী—কাছে নেই, তবু দূরে থাকার অভাব বোধটা সমগ্র স্নায়ুতে যেন অনুভব করি। একটা শ্রান্তির অবসাদ সারা মনকে অবসন্ন করে রাখে যেন.—মিঃ মৈত্র বলেন —মাতৃত্বের ক্ষুধাবোধ আপনাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলছে, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কারও অপেক্ষায় কারও পিছিয়ে থাকা উন্নতির প্রতিবন্ধক ছাড়া আর কিছু নয়—" গোপা ওকে উৎসাহিত করে বললো "—মিঃ মৈত্র আপনাকে যথার্থ বলেছেন মিসেস্ ভাদুড়ী—, রক্ষণশীলতাকে আপনাকে অতিক্রম করে—প্রগতিশীলতাকে আয়ত্ত্বাধীন করতে হবে। আপনি আসুন আমার গবেষণাগারে—।" পাশের কক্ষে এসে ওরা দুজন দাঁড়ালো। গোপার গবেষণাগার। একটা সেলফে তাপমান যন্ত্রের আধারে কয়েকটা টেষ্ট টিউব দেখিয়ে গোপা বললো—

"এগুলি নামকরা প্রতিভার অবদান, একটি মেয়ে আসবে—, এখন আমাকে রিসার্চ করতে হবে—"

গীতার রক্তে আবার আবহমান কালের সংস্কার মাথা উঁচু করে তুলতে চায়, নিজেকে সংযত রেখে বললো—"আপনার দুঃসাহসের সত্যি তুলনা হয় না, কি উপায়ে আপনি পুরুষের উজ্জ্বল প্রতিভার জীবন উৎস সংগ্রহ করেন বুঝতে পারি না—"?

হেসে উঠলো গোপা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে—"জীবনটাকে আপনি যদি বাইওলজিক্যাল ফ্যাক্টের দিক থেকে বিচার করেন, কোনও আবেগ বোধই আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পুরুষদের অত্যন্ত সহজ মনে হবে। বর্তমান শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, বৈজ্ঞানিক এবং মনীষী বলে আমার যাঁদের মনে হয়েছে, প্রত্যেককেই সক্রিয় সহযোগিতা করতে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি। অনেকে সানন্দে সাড়া দিয়েছেন। আমার মনে হয় পুরুষের বড় প্রতিভা কোনও মেয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। আমি চাই সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও মনীষা সমস্ত মানুষের কাজে লাগুক, সমস্ত জাতির সেরা সম্পদ হোক। উগ্র জাতীয়তাবোধ জাতি গঠন করে না, ধ্বংস করে।"

গীতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—"আমার ইচ্ছে আমি আমার স্বামীর সন্তানের মা হই—, উনি এখন বিলেতে রয়েছেন—, আপনি তা পারেন না"?

মৃদু হাসলো গোপা— "বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছু নেই" —একটা নোটবুক এগিয়ে দিয়ে ও বললো— "প্রতীপের ঠিকানাটা লিখে দিন" —প্রতীপের ঠিকানা লিখছে গীতা—, বিচিত্র সুখের অনুভূতি জাগছে ওর বুকের রোমাঞ্চ জাগা স্পন্দনে। স্বামী কত দূরে, দূরান্তরে, তবু তার মধুর স্পর্শ সে বুকের সঙ্গোপনে অনুভব করবে। অভূতপূর্ব সে আস্বাদন। পরম আবেশে গীতা চোখ দুটি মুদ্রিত করলো।

গোপা ভাবছে—প্রতীপকে লিখবে—প্রতীপ কলেজে তুমি হায়ার ইন্টেলেক্চুয়েল ছেলে ছিলে, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার চিরদিন মতদ্বন্দ্ব ছিল। আজও তোমার থিওরী আমি সমর্থন করিনা। ধান না জন্মালেও, প্রতিভাবান মানুষকে জন্মাতে হবে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কখনও খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তুমি লিখেছিলে তোমার ছেলে মেয়ের জেন আমাকে ষ্টাডি করবার সুযোগ দেবে—, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখলে না। তোমার স্ত্রী গীতা দেবী আমার লেবরেটারীর পেসেন্ট, মা তাকে হতে হবে। তুমি অবশ্য পিতৃত্বের সৃষ্টির উৎস পাঠাবে। কোনও বিজ্ঞানাগারে চলে যেও, তারা সব বন্দোবস্থা করে দেবে।......

অনমনা গোপা আরও কি লিখবে...ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। গীতা ওকে স্বামীর ঠিকানা এগিয়ে দিল।

* * *

মাস তিন চার অতিক্রম করেছে। প্রতীপ বিলেতে গোপার চিঠি পেয়ে উত্তর লিখেছিল। তুমি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছ ধন্যবাদ জানাই।

তোমার বিজ্ঞানের নব অভিযান সার্থক হোক। তুমিও কলেজে কম ব্রিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্ট ছিলেনা, তাই না এই দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হতে পেরেছ। আমি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা নিশ্চয়ই করব। জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়তো খাদ্য সমস্যার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আনতে পারবে না, তবু এই খাদ্য সঙ্কটের দিনে কিছু সংযমের প্রয়োজন রয়েছে বৈকি..., আমাদের দেশে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া বাঁচবার আর উপায় নেই। আমি দেশে ফিরে, গ্রামে যাব, অনাবাদী জমিতে ফসল উৎপাদন করব, এগ্রিকালচার রিসার্চ করব। আমাদের উপনিষদে বলা হয়েছে—"অন্নই ব্রহ্ম"। আমাদের ঋষি বলেছেন "শস্যসমৃদ্ধ এই ভারতবর্ষ"। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে কৃষিক্ষেত্র আজ রিক্ত। খাদ্য অভাবে বুভুক্ষিত মানুষ বঞ্চিত। আমি মাস কয়েক এদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে টুর করে কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবো—তাই এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। মাস কয়েক পরে তোমার অনুরোধ আমি রাখবো। এয়ারে পাঠাব। গীতাকে বোল—আমি এখন চর্কির মত ঘুরবো—, সে যেন আমাকে এখন চিঠি না লেখে।

শৈবাল গোপার ক্লিনিকে প্রতীপের এই চিঠি পড়েছিল—, একটু আক্ষেপ প্রকাশ করে গীতাকে বলেছিল— "আপনারা মেয়েরা বড় রক্ষণশীল, পুরাতন গণ্ডীকে অতিক্রম করবার দুঃসাহস আপনাদের নেই। মিঃ ভাদুড়ী ষ্টাডিতে রয়েছে, তাকে আপনি বিরক্ত করছেন। অথচ গোপার লেবরেটরীতে" বলতে বলতে শৈবাল হঠাৎ গীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। গীতার বেদনা-থমথমে মুখটা কালো হয়ে উঠেছে—, চোখ দুটোতে অশ্রু টলমল করছে।

ব্যথার বাষ্প জমে উঠেছে ওর রুদ্ধ বুকের সঙ্গোপনে—, একটা নিঃশ্বাস ফেলে ও বললো —"আমার মন তো আপনার মত বিজ্ঞানের কঠিন পাথর দিয়ে তৈরী নয়, ভালোবাসার বুভুক্ষা আমাকে কাঙ্গাল করে নিরন্তর, তাই আমি স্বামীকে ভুলতে পারি না যে মিঃ মৈত্র—" ওর চোখের জল এবার গাল বেয়ে উপচে পড়লো।

অসহায় বৈজ্ঞানিক কি করবে এখন, বিচলিত হয়ে উঠলো ওর অভিভূত মন, "আমি আপনাকে আঘাত দিয়েছি মিসেস্ ভাদুড়ী, সত্যি বুঝে উঠতে পারিনি," শৈবাল ওর একান্ত কাছে সরে এসে, নিজের রুমালে ওর অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মুছিয়ে দিল। পরম আবেশে গীতা ওর কাঁধে মাথা রেখেছিল। এরপর প্রায় মাস চার পাঁচ কেটে গেল। গীতা নিয়মিত ওর নার্সারীতে কাজ করে।

গোপার সামনে দুর্বার আশা—, আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশানে ও গীতার মাতৃত্ব আনবে—, এবার নিশ্চয়ই প্রতীপের গ্রামান্তর টুর শেষ হবে, ও তার জীবনসৃষ্টির উৎস পাঠিয়ে দেবে। ও ক্লিনিকে বিজ্ঞান অভিযানের নূতন দুয়ার উদ্ঘাটন করবে।

সম্প্রতি একটি মেয়ের সে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশানে মাতৃত্ব এনেছে, সেদিন সে মেয়েটির গর্ভস্থ সন্তানের হৃদস্পন্দ পরীক্ষা করছিল। এই সময় ভৃত্য একখানি কেবল্ ওকে দিয়ে গেল।

প্রতীপ জানিয়েছে......"তোমার অনুরোধ এবার আমি রাখবো গোপা তিন চার ঘণ্টার মধ্যে আমার পিতৃত্বের উৎস তুমি পাবে, আমি বিজ্ঞানাগারে যাতায়াত করছি এখন,—এয়ারে পৌঁছুবে—।"

(ইহার পর ১৫৯ পাতায়)

জঙ্গলের ভ্রূকুটি

• আরণ্যক •

ইংরাজ লেখক H. M. Tomlinson-এর একটি সুন্দর অরণ্য বর্ণনা পড়েছিলাম। গভীর বনের ভিতর শিকারীর অগ্নিকুণ্ড যখন শেষ রাত্রে নিব-নিব হয়ে এসেছে, অদূরে বাঘের গুরু গর্জন শোনা গেল; শিকারী ত্বরিতে শয়ন ছেড়ে কাঠের গুঁড়ি ঠেলে আগুনটাকে ভাল করে উস্কিয়ে তুললেন ও রাইফেল হাতে নিয়ে স্তব্ধ অন্ধকারে বন-কাঁপানো গম্ভীর গর্জন বসে বসে শুনতে লাগলেন। লেখক বলছেন ঘন জংগলে মাটিতে বসে কাছ থেকে ওই চাঞ্চল্যকর গর্জন শোনা এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। এমন লোক নেই যে, ক্ষণিকের জন্যও মনে ভয়ের শীতল স্পর্শ ওই সময় অনুভব না করে।

আর একজন বিখ্যাত শিকারী বলেছিলেন, সংগীন মুহূর্তে ভয়ের আবির্ভাব অসমসাহসী শিকারীও অবশ্যই অনুভব করে, কিন্তু অন্যের সংগে তার তফাৎ এই যে, সে ভয়কে আমল দেয় না। ভয় তার কাছে অন্যান্তর মনোবিকার মাত্র, অগ্রাহ্য না করলে তার প্রাণের আশংকা ষোল আনা।

বনে-জংগলে যারা শিকারের পিছনে ঘুরেছে, তাদের অনেকেই কোন না কোন সময়ে হঠাৎ বিপদের সামনা সামনি হয়েছে। কেউ প্রাণ বাঁচাতে পারেনি, কেউ জখম হয়ে ছাড়া পেয়েছে, আবার কেউ বিনা আঁচড়ে ফিরে এসেছে। যারা বেঁচেছে, তারা কোনদিন নিজেদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারে না। বহু দিন পরেও অতীত ঘটনা তাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যারা শক্ত সুবোধ নয়, তারা ভয়ের নিষ্ঠুর কামড় খেয়েও জীবন-মরণের জুয়া খেলতে আবার জংগলের ছক পেতে বসে। বিপদের নেশাই বোধ হয় সব নেশার সেরা, হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় তাই এত ভিড়।

বাঘের গর্জনের কথা বলছিলাম এইজন্য যে, ওটাকে উপলক্ষ করে মর্মান্তিক ভয়ের শাসনে আমিও আসামী হয়েছি। ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনে দিশেহারা হয়ে পড়তাম। বয়সের সংগে ভয়টা না বেড়ে কমেই গেছে; কিন্তু এখনও বাঘের গর্জনকে সমীহ করি, যদি চোখের আড়ালে বাঘ থাকে, আর আমরা দুজনই এক মাটির উপর অবস্থান করি।

প্রথমে চিতাবাঘ সম্পর্কে একটা ঘটনা বলি। অনেকদিন আগে আমাদের গ্রামে বেশ বড় একটা চিতাবাঘ এসে উৎপাত আরম্ভ করে। তার অভ্যাস ছিল সন্ধ্যার পর থেকে কিছুক্ষণ ডেকে বেড়াত। বোধ হয় সংগিনীর অনুসন্ধানে এ-রকম করত। আমাদের বাড়ীর পিছনে কাঁটা-ঝোপে ভর্তি একটা জংগলে তার আড্ডা ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে ডাকতে ডাকতে সে আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটা বটগাছের তলায় ঘন ঝোপের মধ্যে আসত, তারপর অল্পক্ষণ হাঁক-ডাক শুনিয়ে আবার পথ ধরে জেলাবোর্ডের রাস্তায় উঠে শিকারের জোগাড়ে বেরোত। বাঘটা অসাধারণ ধূর্ত ছিল বলে তাকে মারবার চেষ্টা সফল হয়নি। আমরা তার দরাজ গলা শুনেই খুসী থাকতাম। একদিন রাত্রে আমাদের পাশের গ্রামের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বেড়াতে এসেছেন, আমরা সকলে দোতলার

বারান্দায় গল্প-গুজব করছি, এমন সময় বাঘটা পশ্চিম দিকে ডেকে উঠল। আমার ছোটদাদা খুব সাহসী এবং ভাল শিকারী, তিনি রহস্যচ্ছলে উক্ত বন্ধুদের দলের একটি ভীতু ছেলেকে বললেন, সে ওই বাঘের চলাফেরার রাস্তায় ঘুরে আসতে সাহস করে কি না? ছেলেটির মুখে কথা নেই। তার দাদা আরও ভীতু ও কুটিল প্রকৃতির লোক, তিনি ভাবলেন তাঁদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই বুঝি ছোটদাদা এ-রকম প্রস্তাব করলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য একটু গরম-ভাবেই তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ওখানে ঘুরে আসতে পার"? আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "হ্যাঁ, পারি"। তিনি বললেন, "যাও দেখি, তোমার কত সাহস একবার বুঝব"। ছোটদাদা বললেন, "ও যেতে চেয়েছে তাই যথেষ্ট, যাওয়া না যাওয়া আসল কথা নয়"। কিন্তু ওই ভদ্রলোক শাইলকের মত নাছোড়বান্দা, পাল্টা নেবেনই। ছোটদাদা উভয়সঙ্কটে পড়েছেন তখন, তিনি জানেন শিকারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, আমি গাছেও চড়তে পারি না, ওদিকে অপরকে যখন তিনি যাবার কথা বলেছেন আমাকেই বা কি করে বাধা দেন? আমি যখন বেরোচ্ছি, শাইলক বললেন, সংগে বন্দুক বা টর্চ নেওয়া চলবে না। এতে তাঁর স্বগ্রামবাসীরা পর্যন্ত চটে ওঠায় ও সর্ত আর টিকল না। পশ্চিমে আম-বাগানের ভিতর দিয়ে আমি গ্রামের দিকে রওনা হলাম, তখনও বাঘটা ডেকে চলেছে। এগিয়ে আমাদের বাড়ীর রাস্তা আর গ্রামের রাস্তার মোড়ে বাঁদিকে ঘুরে বটগাছটার কাছে যখন যাচ্ছি, তখন ডাক থেমে গেল। অমনি আমার ভয়ও বাড়তে লাগল। বাঘটা বটগাছের নীচ থেকে শেষবার ডেকেছিল, কিন্তু তারপর যে কোথায় আছে তার নির্দেশ নাই। রাস্তার দু' পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়, আমার বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছে, মনে হচ্ছে বাঘটা ঝোপের আড়ালে আমার পাশে পাশে চলেছে। চারদিকের অন্ধকার যেন টর্চের একমুখী আলোকে গিলে খেতে আসছে। আমি কলের মত পা চালিয়ে বটগাছের তলায় পৌঁছলাম, মনে হল টর্চটা চারদিকে ঘুরিয়ে একবার দেখে নিই, কিন্তু তা পারলাম না। ঠিক দম দেওয়া পুতুলের মত আমার অবস্থা, একভাবে পা ফেলছি; দাঁড়াতে পারি না, তাড়াতাড়ি হাঁটতেও পারি না। বটগাছ পার হয়ে আমার বাড়ী ফিরবার কথা। জেলাবোর্ডের রাস্তায় না ফিরে পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে

সর্টকাট্ করব ঠিক করলাম, কারণ, উৎকণ্ঠা আর সহ্য হচ্ছিল না। পাটক্ষেতের মধ্যে মেগে অবস্থা আরও খারাপ হল; মাথা সমান উঁচু পাটগাছ ঠেলে ঠেলে যাচ্ছি আর বরফের মত ঠান্ডা ধারালো ছুরির ডগা যেন আমার শিরদাঁড়ার উপর থেকে নীচে দাগা বুলিয়ে যাচ্ছে। সেটা চিতাবাঘের নখের তুলনায় বোধ হয় কম পীড়াদায়ক নয়। ভাবছি মরবার জন্যই বেকুবের মত এই পাটক্ষেতের মধ্যে পা বাড়ালুম। ভগবানের করুণা ছাড়া সব জিনিষেরই সীমা আছে, তেপান্তরজোড়া পাটক্ষেতেরও। বাড়ীর সামনের বাগানে যখন পেঁছলাম, বটতলা থেকে আবার পরিচিত ডাক সুরু হল। বাঘটা গুঁড়ি মেরে ওখানেই ছিল। আমি তার পাশ দিয়ে আসবার সময় সে যে আমার উপর কড়া নজর রেখেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অভিজ্ঞতা কখনও ভুলব না। কিন্তু সত্যিই আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না, যেহেতু চিতাটা মানুষ-খেকো নয়। তবে সে বয়সে বন্য জানোয়ারের মনস্তত্ত্বে আমার পণ্ডিত হবার কথা নয় এবং আক্রান্ত হলে আমার বন্দুক, টর্চ খুব কাজে আসত না।

আর একবার ডোরাদার বাঘের গর্জনের সূত্র অনুসরণ করতে গিয়ে উৎকট আতঙ্ক ভোগ করেছিলাম। সেবার শীতকালে আমি ভুটানের সীমানায় পাহাড়ের নীচে ক্যাম্প করেছিলাম। একটা পাহাড়ী নদী যেখানে সমতলভূমিতে পড়ে চওড়া হয়েছে, তারই ধারে আমার ঘাঁটি ছিল। চার পাশে বিশাল জঙ্গল এলাকা, জানোয়ারও বেশ আছে, কিন্তু আমার অদৃষ্টে কোন বড় শিকার জুটছিল না। অথচ প্রায়ই বনের মধ্যে বাঘের চলাফেরার চিহ্ন পেতাম, সম্বরের ঘোড়ার মত বড় পাঞ্জা দেখে তার শিং-এর মাপ অনুমান করতে চেষ্টা করতাম, আর মাঝে মাঝে জংলি মুরগি, বার্কিং ডিয়ার মেরে আশ মিটাতাম। কয়েকটা মড়ি পেয়েছিলাম, কিন্তু বাঘ আসেনি। বাঘের টোপ হিসাবে যে মোষ বাঁধা হত, পাশ দিয়ে গেলেও বাঘ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করত না। আমার রুটিন ছিল রোজ ভোরবেলা ও বিকালের পর জঙ্গলের এক-একটা অংশ ভাল করে খুঁজে দেখা। সরকারী বাংলোর চৌকিদার, অধীর নামে এক ছোকরা অনেক সময় শিকার অনুসন্ধানে আমার সঙ্গ নিত। সে খুব উৎসাহী, সাহসী আর চটপটে ছিল এবং ওখানকার জঙ্গল ও জানোয়ার সম্বন্ধে তার মোটামুটি মন্দ জ্ঞান ছিল না। উত্তরদিকের দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গল বাদে আর সব জায়গাই আমার দেখা হয়েছিল। প্রায় ছয় সপ্তাহ আমার এইভাবে কাটল, ফিরবার সময় যত এগিয়ে আসছে, আমিও তত নিরাশ হয়ে পড়ছি। একদিন অধীর বলল, ভাল শিকার তো মিলছে না, মহাকালের পুজো দিয়ে দেখলে হয়: এটা মহাকালের রাজ্য, তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আমার আস্থা না হলেও অধীরের কথায় পুজার জন্য কয়টা টাকা দিলাম, যথা-সময় গেরুয়াধারী পুজারী প্রসাদ দিয়ে গেল। তারপরেই অধীর খবর আনল, নদীর ডান দিকে আরও উপরে পাহাড়ের মাথায় একটা হ্রদ আছে, তার চারিদিকে গভীর জঙ্গল; সেইখানে বিরাট সম্বর আছে, সে নিজে পায়ের দাগ দেখে এসেছে। ওখানে বাঘের উৎপাত নেই বলে না কি সম্বরগুলো ওই দিকে বেশী বিচরণ করে।

সেই সময় আমার কাছে মিঃ হফ্ নামে এক বন্ধু এসেছিলেন। আমরা এই খবরে আশান্বিত হয়ে পরদিন বেলা দুটো-আড়াইটায় সময় জায়গাটা দেখবার জন্য বার হলাম। হফ্-এর সঙ্গে তার পাহাড়ী বেয়ারাও চলল। অনেক নালা, জঙ্গল ভেঙে আমরা একটা খাড়া পাহাড়ের তলায় পেঁছলাম, অধীর বলল, হ্রদটা ওরই উপরে। ঘন ঘাস ও ছোট ছোট আলগা পাথরের উপর দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে আমরা উপরে উঠে দেখলাম মাথার ওপিঠে অল্প নীচেই ছোট একটা হ্রদ, পরিষ্কার টলটল করছে জল। তিন ভাগ ঘিরে পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ শিরার খাড়া পাড়, আর আমাদের সামনে ওপারে একভাগ হচ্ছে সমান জমী, ওদের সঙ্গে মিশেছে। বড় বড় গাছের নীচে ঘাসে ঢাকা সব জায়গাটা। গভীর, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দৃশ্যটা অতি মনোরম। বিলাতের পার্ক বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে তুলনার যোগ্য। সামান্য বিশ্রাম করে আমরা জানোয়ারের হদিস খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু পাথুরে জমীতে চলাফেরার পথের রেখা ছাড়া বিশেষ

হ্রদের একটি স্কেচ

কিছু পেলাম না; হ্রদের একেবারে ধারে অল্প জলের নীচে সম্বরের মস্ত পাঞ্জা দেখলাম। তখন সূর্য অস্তমান, হ্রদ ঘুরে সমান জমীটায় আর গেলাম না। অন্ধকার হওয়ার আগেই পাহাড় থেকে নামবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হফ্ পরদিন চলে যাবে, তার খুব আগ্রহ যে, সন্ধ্যা অবধি সুযোগের অপেক্ষা করে। অগত্যা রাজী হয়ে আমি জলের ধারে ঘাসের মধ্যে একটা পাথরে বসলাম, অধীর আমার পিছনে বসল। হফ্ ও তার লোক আমাদের বাঁ দিকে হ্রদটা ঘুরে, মাঝামাঝি পাড়ের খাড়াই ধরে উপরে উঠে কতগুলো বড় গাছের নীচে অদৃশ্য হল। কোথায় জায়গা নিল ঠিক দেখতে পেলাম না। শিষ দিয়ে আমরা পরস্পরের অবস্থান আন্দাজ করে নিলাম। অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে এমন সময় জোরে ঝটপট্ শব্দ শুনে চমকে দেখি মাথার উপর ধনেশ পাখীর দল গাছে গাছে বসছে। তাদের ডানার ঝাপট্ যখন থামল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে; আমি ফিরবার সমস্যায় একটু অসহিষ্ণু হয়ে, হফ্‌কে ইসারা দেব ভাবছি, অকস্মাৎ পাহাড়ের স্তব্ধতা রেখার মত উদ্যত [illegible] জলের উপর দিয়ে

এসে যেন ধাক্কা মারল। অধীরের খবর যে এক্ষেত্রে নির্ভুল হয়নি তার জীবন্ত প্রমাণ। আমি অনুমান করতে চেষ্টা করলাম রাজকীয় নির্ঘোষের কর্তা ঠিক কোনখানটিতে রয়েছে। কিন্তু ওপারে সেই সমান জমীটাতে যে রয়েছে তার বেশী বুঝতে পারলাম না। একটু পরে আরও জোরে হাঁক এল। এবার আওয়াজটা বাঁ দিকে, অর্থাৎ ওপার থেকে এদিকে আসার সরু পথের মুখে। আমার মনে হোল প্রচণ্ড গর্জনে মাটি যেন কেঁপে উঠল। আমি বন্দুকটার সেফটি ক্যাচ তুলে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি: হফ্ ওদিকেই আছে, একটা সুযোগ নেবেই। একটু পরে আবার সাড়া পেলাম, এবার আরও কাছে এবং স্বর বেশ মৃদু। আওয়াজের শেষে হাঁফ ছাড়বার সময় মুখ দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললে যে রকম শব্দ হয়, সে রকম শব্দ। কেন বলতে পারিনা বিকট হুঙ্কারের চেয়ে এই মোলায়েম স্বগতোক্তিটা আমার কানে বেশী বিশ্রী লাগল। অধীর তখন একেবারে আমার পিঠ ঠেসে বসেছে। আমি মনে মনে নানা হিসাব কষছি; প্রথম, আমার সঙ্গে টর্চ নেই এবং সাধারণ শট গান, অধীরের সঙ্গে একটা কমজোর টর্চ আছে, তার ব্যাটারিও ক্ষীণ। দ্বিতীয়তঃ হফ্‌এর কাছে একটা ·৪০৫ উইনচেস্টার ম্যাগাজিন রাইফেল; হফ্ ওটাকে যতই শক্তিশালী অস্ত্র মনে করুক, আমি মনে করিনা ভুটানের জঙ্গলে রাত্রে বড় বাঘের সঙ্গে মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়বার উপযুক্ত অস্ত্র ওটা। ৪০৫-এর সঙ্গে আমি পরিচিত। এক গুলীতে না পড়লে, হফ্‌এর গুলী খেয়ে বাঘ যদি আমাদের দিকে ছুটে আসে তাহলে নিশ্চিত মরণ। ওই সঙ্গে হফ্‌এর রাইফেলের গুলী কোণাকুণি এসে, অথবা জলে ঠিকরে আমাদের গায়ে লাগতে পারে কি না তাও একটু মনে হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, হফ্ যদি মারবার সুবিধা না পায় তবে বাঘটা পথ ধরে সোজা আমাদের দিকে চলে আসবে এবং আচমকা আমাদের দেখতে পেয়ে যদি ভড়কে একটু ঠোনা মারে তাহলেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার, শেষ এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সঙ্গে যে দুই বেচারা এসেছে তাদের নিরাপত্তা। আমি ও হফ্ না হয় সখ করে প্রাণ সংশয় করতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমিও বন্দী তুমিও বন্দী,
সাত মহলার বাড়ী
আলো ও বাতাস দলিয়া মথিয়া
উঠিছে আকাশ ছাড়ি;
দেয়ালের পরে দেয়াল গড়ান
মিলনের পথে বাধা
কোন্ সে বিধির নিদয় বিধানে
দুটি প্রাণী মোরা বাধা,
সরমে ভরমে সকল করমে
বাধা যে নিরন্তর
তোমার সকাশে তবু বাঁধা
মোর উন্মুখ অন্তর।
আমি শুধু আছি তোমার হাতের
মুক্তি লাভের আশে
হোক অলংঘ্য বাধার পাহাড়
তবুও রয়েছ পাশে।
ওধারে দেয়াল মাথা তুলে আছে
নীরেট বুকের পাটা
হেথায় এ বুকে তোমার পায়ের
শব্দের ছন্দ কাটা,
কণ্ঠস্বরের সুরলালিত্য
লেগে আছে মোর কানে
কথা শুনে মন হয় উচাটন
বুঝি না তাহার মানে,
উদয় অস্ত তোমার আমার
মাঝখানে ব্যবধান
মনে হয় যেন এ জনমে তার
হবে নাক অবসান।
পরিচয় নাই তবু আমি চিনি
তুমি যে অচিন দেশে
ছিলে একাকিনী হে দূরভাষিণী—
দেখা দিলে অবশেষে।
বন্দীশালার পথ উপান্তে
ছিনু আমি আনমনা
মনের মুকুরে তব ছায়াছবি
করে শুধু আনাগোনা
কভু ছায়া ধরে সুন্দর কায়া
ছুঁয়ে যায় ভালবেসে
কখনও সে ছায়া ধুয়ে মুছে দেয়
মনের কুয়াসা এসে।
সম্মুখে আমার দাঁড়াও যখন
তুমিও চেন না মোরে
আমি চিনি তাই তোমারে দেখিব
সেদিন হৃদয় ভরে।
মনে হয় তুমি আমার আকাশে
ফুটেছ সন্ধ্যা তারা
তোমারে খুঁজিতে জনমে জনমে
তোমাতে হয়েছি হারা;
বাতাসে তোমার মধুর পরশ,
শিহরিত যৌবন,
ফাল্গুনে বনে ফুলে ফুলে তুমি
রেখে যাও চুম্বন।
কাছে আছ তবু কাছে নও
তুমি রহস্য সুগভীর

নদী ভেসে চলে সম্মুখ পানে
চেয়ে থাকে দুই তীর;
এক দিক ভাঙে আর দিক গড়ে
নদীর দিন যায় আসে,
তীরের বেদনা নদী বুঝিবে না
জল-তরঙ্গে ভাসে
ছিন্ন-ভিন্ন শাখা প্রশাখার
ছেঁড়া পাতা ফুল দল।
নদী চিনেনাক দুকূল তাহার
স্রোতে করে টলমল।
এই ত তাহার জীবনধর্ম,
বৃথা করি অভিমান
তুমিও বন্দী, আমিও বন্দী,
মাঝখানে ব্যবধান।

জঙ্গলের ভ্রুকুটি

(৪৪ পাতার পর)

পারি, কিন্তু ওরা আমাদের উপর নির্ভর করে এসেছে, সঙ্গে কুকরি ছাড়া আত্মরক্ষার কিছু নেই। কোন রকম সঙ্কটে ওদের আগে রক্ষা করার দায় সম্পূর্ণ আমাদের। অবশ্য এ সব কথা খুব তাড়াতাড়ি আমার মনে খেলে গেল। হফ্‌কে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আর নয়। আমি নিঃশব্দে বন্দুকে একটা চার নম্বর টোটা পুরে আকাশে ফাঁকা আওয়াজ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে নুড়ির উপর ভারী লাফএর শব্দ শুনলাম। বাঘটা উল্টো দিকে সমান জমীন ওপিঠে পালাল। তারপর হফ্‌এর মহা ক্ষোভ আর অনুযোগের পালা। আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে না কি পরম সুযোগ পেত, আমি তার আগেই সব নষ্ট করে দিলাম। ও নিয়ে আর বেশী কথা হল না। অতি কষ্টে পাহাড় থেকে নামলাম, হফ্‌এর জোরালো টর্চ ছিল তা সত্ত্বেও রাত্রে ফিরবার পথ একেবারে অচেনা লাগছিল। অধীর বলছিল একজন পাহাড়ী আছে ও অঞ্চলকার সব অন্ধিসন্ধি সে জানে, চোরাই শিকারের বদনামও তার আছে। আমরা নাস্তার পর বাম্পে ফিরেই সে লোকটাকে ডাকতে পাঠালাম। আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর সে এসে পৌঁছল। চেহারা দেখে বুঝলাম জঙ্গলের পাকা লোক, রোগা কিন্তু পাকানো তারের মত দেহ কঠিন। হ্রদের ওদিকে আমাদের শিকারে নিয়ে যাবার কথা বলাতে সে একদম খাড়া অস্বীকার করল। শত টাকাই বখ্‌শিস দেওয়া হোক ওখানে সে কিছুতেই যাবে না। ওটা মহাকালের স্থান, ওখানে কোন জানোয়ার মারলে অশুভ হবে। আর ওই বাঘটা সাদা রংএর, বহুকাল থেকে ওখানে আছে, ওকে কেউ মারতে পারে না। এক শিকারী ওকে গুলী করার পর দুর্ঘটনায় পড়েছিল এবং একটি পাহাড়ী হ্রদের ধারে গাছে রাত কাটানর ফলে ঘোর পাগল হয়ে গেছে। সে লোকটিকে এখনও সকালে দেখে মাঝে মাঝে, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া ওটা কার এলাকা সঠিক বলা যায় না, ওই সব পাহাড়ে স্বভাবদুর্বৃত্ত ভুটিয়ারা ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। ওরা দুর্ধর্ষপ্রকৃতি, ভারত সরকার, ভুটান দরবার কাউকেই গ্রাহ্য করে না। বন্দুক টোটার লোভে অপরিচিতকে গোপনে আক্রমণ করবার ঘটনাও ঘটেছে, ইত্যাদি। আমাদের ওখানে যেতে বারবার মানা করে পাহাড়ী শিকারী বিদায় নিল। আমরা আলোচনা করলাম ওর শিকারের ভাল জায়গা নষ্ট হবে বলে এ সব গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়ে গেল। হফ্ যাওয়ার পর আমি ওই কৌতূহল জাগান জায়গা সম্বন্ধে খবর নিতে, আরও রহস্যময় ব্যাপার শুনলাম। কয় বছর আগে দূরে সহর থেকে এক মারোয়াড়ী যুবক স্বপ্ন পেয়ে আসে, হ্রদের ধারে রাত্রে মহাকালের পূজো দিলে সে গুপ্তধন পাবে। যুবকটি তার সঙ্গের লোককে নীচে রেখে দুপুরবেলা পূজোর উপচার নিয়ে একলা পাহাড়ের উপর চলে যায়। পরদিন তাকে ফিরতে না দেখে তার সঙ্গী লোকজন নিয়ে উপরে উঠে দেখে যুবকটির মৃতদেহ হ্রদের জলে ভাসছে। শরীরে কোন জখমের চিহ্ন নেই। লাস নামিয়ে থানায় খবর পাঠান হয়, তারপরে ময়না তদন্তের জন্য সদরে সেটা চালান যায়। এটা আর বানানো কাহিনী নয়, স্থানীয় অনেকে লাস দেখেছিল। বিবিধ লোমহর্ষক বৃত্তান্ত যতই শুনছি, ওই নিরীহদর্শন হ্রদের গুপ্ত-রহস্য ততই আমাকে আকর্ষণ করছে। উপরন্তু, শিকারের প্রশস্ত ক্ষেত্র, তা নিজেই পরখ করেছি; বিশেষতঃ সাদা বাঘের সুযোগ জীবনে কখন পাব না। আরও অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনলাম, কিন্তু সে সব নিছক রূপকথা বলে এখানে উল্লেখ করছি না। ঠিক করলাম সঙ্গে কেউ না গেলেও একলাই ওখানে রাত্রে থাকব। রেলওয়ের কোন বন্ধুর সৌজন্যে ওখানে মাচা করার বন্দোবস্ত সহজ হল। খাওয়ার পর দুপুরে আমার চাকর বাহাদুর, অধীর ও কয়েকজন কুলি নিয়ে আমি রওনা হলাম। এবার হ্রদের ধার ঘুরে সমান জমীটায় গেলাম। জমীটা শক্ত পাথুরে, হাঁটু সমান ঘাসে ঢাকা। ওদিকে একটা ছোট টিপির পিছনে বড় বড় পাথরে ভর্তি শুকনো ঝোরা পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গেছে, এক পাশে আরও উঁচু বড় পাহাড়ের ঢালু এসে এই পাহাড়ের গায়ে মিশেছে, দুটোর মাঝখানের খাড়-খোলে জানোয়ার চলা পথ, আর সমান জমীর উপর দিয়ে হ্রদের জল অবধি ক্ষীণ একটা পথের দাগ। এই তিনটে পথের তেমাথা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সুবিধামত গাছে মাচা বাঁধতে বলে আমি ঘুরে জায়গাটা দেখতে লাগলাম। চোখে পড়ল শিং সমেত একটা ছোট বাইসনের মাথা, অনেকদিনের পুরোন বাঘের মড়ি। এক জায়গায় নরম একটু মাটিতে বাঘের পাঞ্জা দেখলাম, বিরাট তার আকার। এ যে সেই ভীম গর্জনের মালিকের থাবা তাতে সন্দেহ রইল না। যেমন গলা তেমনই আকৃতি। এখানে সেখানে হাড়ের টুকরো ছড়ানো, গাছে নখের আঁচড়। বেলা চারটের আগেই মাচা হয়ে গেল। ফ্লাস্কে গরম কফি, বিস্কুট ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আমি মাচায় বসলাম, বাহাদুরকে বলে দিলাম পরদিন সকালে রোদ উঠবার পর দূর থেকে সাড়া দিয়ে যেন আসে।

জায়গাটার প্রাকৃতিক শোভা মুগ্ধ চোখে দেখছি, নির্জন বনের মধ্যে অজানা পাখীর সুমধুর শিষ, ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রংএর পাখীর আসা যাওয়া। দূরে সম্বরের শিং ঠোকাঠুকির আওয়াজ শুনতে পেলাম, ঠিক যেন বাঁশের গায়ে লাঠির ঘা পড়ছে। কতগুলো জংলি

(ইহার পর ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

মমতা

চিত্তরঞ্জন দেব

আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত

মা ঘুমিয়েছেন। বাবার নাক ডাকছে। ছোড়দা চুপ। ঘরটা অন্ধকার। আমাকে কেউ দেখে না। আমিও দেখতে পাইনে কাউকে। তবু আমার চোখের পাতা খোলা।

বাইরে যেতে ইচ্ছে করে। দরজা খুলবো? কিন্তু মায়ের যা কান পাতলা। ঠিক আমাকে আটকাবেন। অস্থির হয়ে উঠবেন। ভাববেন, সন্তুকে ভূতে পেয়েছে।

টমীর বাচ্চারা বাইরে থাকে। ওদের লোভে শেয়াল আসে। টমী ছুটতে থাকে আর হাঁপায়। কান পেতে শুনি আমি। কুকুর ধরতে পায় না শেয়ালকে। ফন্দিবাজ শেয়াল একা আসে না। একটা আড়ালে থাকে। একটা আসে টমীর সামনে। টমী ধাওয়া করে একটার পিছনে। অন্য শেয়াল এসে বাচ্চা মুখে করে পালায়। এর মধ্যেই তিন তিনটে বাচ্চা নেই হয়ে গেছে।

মনটা আমার কেমন করে। মাকে বলি,

একটা জায়গা করে দাও মা ঘরে কোথাও, যাতে শেয়াল বাচ্চাদের পাত্তা না পায়।

মা মুখ টিপে হাসেন। বলেন তক্ষুনি, আজকালের মধ্যেই আপদগুলোকে ফেলে দিয়ে আসবে কিন্তু মড়াপুকুরে।

উল্টো বুঝিলি রাম। মড়াপুকুরে জল কম। জমি বেশি। চিতা, কবর, ভাগাড়ে ভরা। পাশেই গড়ের জঙ্গল। শেয়ালদের আড্ডা।

মা বলেন, দিন দিন বড় হয়ে উঠছে বাচ্চারা। হাড় শক্ত হয়ে গেলে ছোঁবে না শেয়ালরা। এক গাদা জানোয়ার যে পুষবে, ও-গুলোর পেটের আয়োজন আসবে কোথা থেকে?

শেয়াল খুশি হবে টমীর বাচ্চা খেয়ে। কিন্তু টমীর মন কেমন করবে। মা হয়ে আমার মা কেমন করে এমন কথা বলেন। আশ্চর্য লাগে ভাবতে।

রাত বেড়ে চলে। ঘুম লাগে না চোখে আমার। চৌকিদার হাঁক দিয়ে যায় বাজখাই গলায়। রাত কমে আসে। ভোরের আলো ঢোকে দরজার ফাঁক দিয়ে, পাশের বাড়িতে হাঁস ডাকে পাঁক পাঁক। মনে রোদের ঝাপ্‌টা লাগে। কানে আসে মায়ের গলার স্বর,

সন্তু, ওঠো চটপট। বস্তায় পুরে রেখেছি। কাঁইকুঁই সুরু করেছে। বিদেয় করে দিয়ে এসো আপদগুলোকে। দেরি করো না। ওঠে পড়ো সোনা!

ঃ মা, এখন তো শেয়াল খাবে না। ওরা ঢুকে পড়েছে ঘরে, মড়াপুকুরের পাশের গড়ে। এ যে দিনের বেলা। বাচ্চারা বাড়ি চলে আসবে টুক টুক করে। টমীই গিয়ে নিয়ে আসবে আবার পথ দেখিয়ে।

ঃ শেয়ালে খাবে বলেই-ত ফেলা শুধু নয়। হয়তো কারো-না-কারো চোখে পড়বে দিনের বেলায়। পছন্দ হলে আদর করে নিয়েও যেতে পারে কেউ-না-কেউ। এমন যদি হয়, সে কি মন্দ কিছু?

ঃ কিন্তু, এখন যে আমি পড়তে বসবো মা! খাতায় লিখতে আছে কয়েক পাতা। ইস্কুলে পা দিলেই মাষ্টারমশায় হাত বাড়াবেন—খাতা কই? না দেখাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে নাড়ুগোপাল। ফিরে আসিগে। বিকেলের দিকে রেখে আসবো বাচ্চাদের।

কান পেতে শুনলেন মা। বললেন না কিছু। বুঝি বিরক্ত হলেন। গেলেন ঘাটে চান করতে। পিছনে রেখে গেলেন এক অদ্ভুত দৃষ্টি। আমার বুক দুরদুর করতে থাকলো। ঘাটের সিঁড়িতে কলসীটা রাখলেন। শব্দ শুনতে পেলাম ঘরে বসে। মাটির কলসী হলে ঠিক ভেঙে যেতো। মা নিশ্চয় চটেছেন।

এগিয়ে গেলাম বাচ্চাদের কাছে। দুধ টানছে ভাইবোনেরা। সটান শুয়ে আছে টমী। বাৎসল্যে পাতা বোজা চোখের। চারটে বাচ্চা চার বাঁটে ধরেছে। জিভ দিয়ে চুষে নিচ্ছে দুধ চুক চুক। আরাম পায় টমী এতে। হঠাৎ আবার লাফিয়ে ওঠে। বাচ্চারা দুষ্টুমি করে বুঝি!

বুঝতে পারে অপরের আবির্ভাব। তাকায় সে আমার দিকে। চোখের পাতা পুরোপুরি খুলে দিয়ে অপলকে। আমার মায়ের চোখে এমন তাকানো দেখেছি।

বাচ্চারা যায়নি মড়াপুকুরে। আমার মাথা ধরে ছিলো দু দিন। পেটের ব্যথায় গড়াগড়ি দিতে হলো একটা উদয়াস্ত। আরো তিন দিন গা-বমি-বমি। লেগেই আছে পর পর অসুখ-বিসুখ।

মার মুখ শুকিয়ে আমশি। থাকেন সারাদিন ঠাকুরের আসনতলে। বেশি করে ফুল দেন। চোখ বুজে জপ করেন। ছুটে ছুটে আসেন বারে বারে আমার বিছানায়।

দিনে তিনবার চান করেন। নূতন কাপড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে মাথা ঠোকেন ঠাকুরের পায়ে। শুয়ে থেকে আমি সব দেখি।

মায়ের ঠোঁটের ছোঁওয়া পাই বারে বারে গালে। অস্থির হয়ে উঠে পড়ি, বাইরে যেতে চাই, জড়িয়ে ধরেন আমাকে মা। বুকের কাঁপুনি মিশিয়ে কথা বলেন,

ষাট, ষাট! এমন করো না বাপ। শুয়ে থাকো সোনা। তোমার-না অসুখ করেছে!

মনে মনে হাসি। আমি কি এতোই ছোটো খোকা।

সাগু বার্লি ডাবের আর ছানার জল খেয়ে কত থাকা যায়। পেটে আমার গরুড়ের খিদে। ওষুধে অনুপানে সুস্থ শরীর ব্যস্ত হয়ে উঠলো!

দুরন্তপনা বেড়েছে বাচ্চাদের। পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়। ঢুকে পড়ে এর তার রান্নাঘরে। মারমুখো হয়ে ছুটে আসে লোক। আমার বিছানার কাছে এসে চেঁচায়—

আহ্লাদ করে যে এক গাদা রেখেছো, **সামলাও এবার।**

মা হায় হায় করে ওঠেন।

বাচ্চাদেরও লজ্জা নেই। সবাই যেন ওদের আপন। একবার বকে দিলেও আবার যায়। ঘাড়ের চামড়া টেনে ধরে কেউ, দু' আঙুলের টিপে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে। আমার বুক কনকন করে। কিন্তু উপায় কি! ওরা আমার কথা বোঝে না যে!

হিন্দুর ঘর অপবিত্র হয় কুকুর ঢুকলে। হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে দিতে হয়। বেশি খুঁতখুঁতেরা পুরুত ডেকে আনে। গোবরে-রাঙা-মাটিতে ঘর নিকিয়ে রাখে। পুরুত ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করেন। তবে মনে শান্তি!

বাচ্চা বড় হয় আর বিপদ বাড়ে। টমীর বুকেও দুধ শুকিয়ে আসে। তবু বাচ্চারা চুষতে চায় শুকনো চামড়া। টমী সারাদিন পালিয়ে বেড়ায়। বাচ্চারা খোঁজাখুঁজি করে।

টমীও ঢোকে ফাঁক পেলেই। লোকের তৈরি খাবার সাবাড় করে দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বাড়ি ফেরে।

বারান্দায় বসে আছি। সন্ধ্যে হতে বাকি আছে একটু এখনও। কার্তিকের শেষ। শীত শীত করে। গায়ে কাপড় জড়িয়ে কে আসছে একটা ধামা হাতে!

দাঁড়ালো এসে আমার সামনেই। পাশের বাড়ির আমার বয়সী নিতাই। জিজ্ঞেস করলাম, ধামা দিয়ে কি হবে রে?

মা ডেকে নিলেন ওকে উত্তরের দরজায়। আমি তাকিয়ে রইলাম উদ্বেগ নিয়ে।

বাচ্চাদের তুলে নেয় ধামার ভিতর। একটাকে তোলে আরেকটা কানা বেয়ে নেমে পড়ে। নিতাই আবার তুলে নিয়ে একটা বস্তা চাপা দেয়। টমী কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে দাঁড়ায় এসে নিতাইর পাশে। তাকায় নিতাইর মুখের দিকে, কান পেতে রাখে ধামার ঢাকনিতে। ধামার ভিতর থেকে শব্দ ওঠে কাঁইকুঁই কাঁইকুঁই।

দূর থেকে সুর ভেসে আসে। মা ডাকছেন টমীকে রান্নাঘরের পিছন থেকে। টমী, টমী, ট-মী-ঈ-ঈ......

হতচকিত হয়ে টমী তাকায় একবার ধামার দিকে, একবার মায়ের ডাক লক্ষ্য করে। গলা থেকে একটা মিহি সুর বের করে টমী। এদিকে বাচ্চা ওদিকে ভোজ। ঠিক করে উঠতে পারছে না কোন্‌দিকে যাওয়া উচিত। বুক কাঁপে দুরদুর আর জল গড়ায় জিভ দিয়ে!

পা মাথা এক সঙ্গে করে হঠাৎ দিলো ছোট্। সুযোগ ছাড়লো না নিতাই। ধামা মাথায় নিয়ে পড়ি মরি করে দৌড়। আমার চোখ জলে ভরে ওঠে!

বহুদূরের মসজিদের আজানে প্রথম শীতের কুয়াশামাখা সুর। রাত শেষ হয়ে আসে। দূরে মোরগ ডাকে মুসলমান পাড়ায়, কাছে ডাকে হাঁস। **আর গাঁয়ের সব চেয়ে উঁচু গাছে থেকে ডাকে**

কোড়াল। হাঁসমুরগী তো শুধু শেষ-
র ভাণ্ডায়। কিন্তু এই কোড়াল চৌকি দেয়
প্রহরে। গাঁয়ের লোকের ঘাড় বাঁধা
ার গলায়। ভোরের বৈতালিকও ওর

অ°-অ°-অ°, ক°-হ°-হ°-হ°।

র কাঁপতে থাকে দেবদারু পাতার মতো।
বার ভোর। চাদর গায়ে বেরিয়ে পড়লাম।
নন আমার অসুখ। আমি না জানি
কাউকে।

ড়ি থেকে নেমেই নিচু জমি। তারপর কাঁচা
জমি পেরিয়ে উঠলাম সড়কে। সোজা
কে হেঁটে চলি।

দূর্বাঘাসের গালিচা শিশিরে নিকোনো।
পায়ের ছাপ আর পাকা ধানের ছড়া। বোঁটা
পড়েছে আগের দিন বিকেলে কার ভার
।

পাশেই খাল। সড়কের সঙ্গে সঙ্গে আছে

কাক উড়ে যায় একটা দুটো। পাখায় মুছে
যায় প্রথম রোদ। পথ যেন ভেজা ভেলভেট।
শ যেন রান্নাঘর। কিন্তু গরম নয়, ঠাণ্ডা।
ার ঢল নেমেছে।

পথের মাঝে মাঝে ভাঙা। ছোটো ছোটো
বাট। বাঁশের পুল। এ-পাশ থেকে জমির
গড়িয়ে যায় ও-পাশে। খালে গিয়ে পড়ে
বাটের তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে।

বাঁ-হাতে গড়। ডান-হাতে মড়াপুকুর।
নই ডানে বাঁয়ে। মনটা ছ্যাৎ করে ওঠে।

খালি। এখানটা একেবারে খালি। কেউ নেই
ু নেই। একপায়ে দাঁড়িয়ে একমাথা পাতা
র একটা কুলগাছ। তলায় অসংখ্য গোর।
কে ছোটো শিশু শুয়ে আছে গোরের ভিতর।
রের উপর ছোটো ছোটো আকন্দ গাছ। মা-
র কান্না যেন ভারী হয়ে উঠেছে আকন্দ-
ায়। সন্তানের হাসি মিলিয়ে গেছে গাছের
য় ফুলে।

মাটির উপরে মানুষ। নিচেও। মড়াপুকুরে
লেছে এসে কত-যে। কেউ ছাই হয়ে। কেউ
চ গিয়ে।

টমীর বাচ্চারা কোথায় গেল?

দেখছিনে একটাকেও। মন ধুকপুক করে।
দেখা বান ডাকে অশুর। কাঁদিতেও ভয়।
কাই এদিক ওদিক। কে-না কে দেখে ফেলে!

গোরের উপর কঞ্চির ঘেরা। যেন এক একটি
লের ঝুড়ি। কিন্তু এ-তো ফলের দোকান নয়।
নুষের শ্মশান। এখানকার বাতাসে সব শোকের
থা ওড়ে। এখানকার মাটি চোখের জলে স্যাঁত-
সেঁতে। কোনোদিন শুকোয় না।

আমার চোখে আর জল নেই যেন। কি হয়েছে
ঃ! শ্বাস বন্ধ কিছুক্ষণ। একটা শব্দ
সছে থেকে থেকে। কিন্তু কোথা থেকে?
খছিনে। দেখছি, সূর্য উঠছেন খোলাজলের
তর দিয়ে।

দিনের বেলা-ই। তবু যেন অন্ধকারে হাত-
নো। গায়ে কাঁটা কাঁটা। গা ছম ছম। আর
ই শব্দ। এই শব্দই সাহস বাড়ায়। ভয় ভুলে
ই। কান খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা ঘোরাই
রাই সামনে পিছনে।

চোখে দেখতে পাইনে, তবু শব্দ শুনতে
ই। পা বাড়াই সম্মুখে। ধরতে যাই পাইনে।
ন কাঁপে হঠাৎ ভূতের গল্পে। ভূতেরা নাকি
মানুষকে ভুলিয়ে নিতে আসে। আমি যাকে
খুঁজে বেড়াই, ভূত ঠিক তার ভাষায় কথা বলে
আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো?

দমবন্ধ অন্ধকার ঘিরে আছে আমাকে।
পাশে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি দেখতে
পাবো না।

শব্দটা বাড়লো। এগিয়ে গেলাম সুড়ঙ্গের
দিকে। বসে পড়লাম উবু হয়ে সুড়ঙ্গের মুখে।
তাকালাম মাথা নিচু করে গুপ্ত পথটাতে।

একটা জন্তু ছুটে বেরিয়ে এলো আমার
দিকে। আমি পড়ে গেলাম। নাকে একটা উগ্র
গন্ধ লাগলো।

উঠে দাঁড়ালাম। কাপড়ে চাদরে চাপ চাপ
কাদার দাগ। তাকালাম চারদিকে। এখনও কারও
মুখ দেখতে পাচ্ছিনে।

কাদা ধুতে গেলাম খালের জলে। জলে ঢেউ
তোলে কে? মাছ নয় তো? ঢেউএর ধারগুলো
বেশ উঁচু হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। এগিয়ে
গেলাম।

উঁকি দিতেই দেখি দুটি অসহায় মুখ।
কাতর সুরে বলছে বারবার, কেউ নেই কিছু
নেই, কেউ নেই কিছু নেই।

(কাঁইকুঁই কাঁইকুঁই, কাঁইকুঁই কাঁইকুঁই)।

সারা রাত কত কান্নাই কেঁদেছে বেচারীরা।
কত অশ্রুই মিশেছে ওদের এই খালের জলে।
জলে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে উঠেছে কচি
প্রাণ।

ঝাঁপ দিলাম ঠাণ্ডা জলে।

দু'হাতে কুড়িয়ে নিলাম দুটো বাচ্চা দু'দিক
থেকে।
জড়িয়ে ধরলাম দুই বুকে।

ঘাসের উপর আবার জল। পায়ের ঘষা লেগে
পথে যেখানে মাটি বেরিয়েছে সেখানে রাখলাম
একটু বাচ্চাদের। ওরা কাঁপছে থর থর আর
কাঁদছে। আমি চটপট ভেজা কাপড়ের জল
নিঙড়ে নিচ্ছি।

এমন সময় ছোঁ মারলো কোড়াল। একটা
বাচ্চার কান্না উড়ে চললো আকাশে। ধীরে ধীরে
শব্দটা মিলিয়ে গেল শূন্যে। হাত বাড়িয়ে কি
নাগাল পাওয়া যায়! হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম
কিছুক্ষণ।

দু'চোখে জলের ধারা নিয়ে বাকি বাচ্চাটাকে
কোলে করে আমি ফিরে চললাম বাড়ির দিকে।
দিনটা এবার ফরশা হতে সুরু করেছে।

চাদরের তলায় বাচ্চাটা আমার। শব্দ এখনও
উঠছে ওর মুখ থেকে—কাঁইকুঁই কাঁইকুঁই।
শীতের রাত, খালের জল, কম ধকল গিয়েছে
এই ছোটো দেহখানির উপর দিয়ে। ওকে
বাঁচানো যাবে তো!

পথে কত লোক চলে। সবাই তাকায়
অবাক হয়ে আমার দিকে। বাচ্চার মুখের শব্দটা

(ইহার পর ১৫৬ পৃষ্ঠায়)

একটা বাচ্চার কান্না উড়ে চললো আকাশে

যমরাজ ও কাঠুরে

পরিমল গোস্বামী

কাঠুরে কাঠ কেটে আর কাঠ বয়ে সারাটা জীবন কাটাল, কিন্তু এখন আর যেন পারে না। এখন প্রতিদিনই বোঝা যেন আগের দিনের চেয়ে আরও বেশি ভারী ঠেকে।

সেদিনও তার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো ছিল, আজ সমস্তই পাকা। সেদিনও দু'চারটে দাঁত ছিল, আজ একটিও নেই। সেদিনও দেহ একেবারে ঋজু ছিল, আজ সে দেহ বেঁকে গেছে।

কাঠ কাটা, বোঝা বওয়া, এখন আর তার পোষায় না। কিন্তু তবু কাঠ কাটতে হয় এবং বোঝা বইতে হয়।

একদিন বোঝা বয়ে আনতে তার এমন কষ্ট হচ্ছিল যে সে পথের মাঝখানে বোঝা নামিয়ে একটুখানি না বসে আর পারল না।

গরিব সে। তার মনে হল, "আর কেন এ ঝামেলা? এখন মরণ হলেই ভাল। কিন্তু চাইলেই কি মরণ আসে? পরাণটা তো আর পাখী নয় যে একটা তুড়ি দিলেই উড়ে পালাবে।"

কথাটা যমরাজের কানে গেল, তিনি স্বয়ং নেমে এলেন স্বর্গ থেকে এবং কাঠুরের সামনে এসে বললেন, "আমি এসেছি।"

কাঠুরে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, "কে বটেন আপনি?"

"যাকে তুমি ডাকছিলে, সেই আমি। আমি যমরাজ।"

"আমি কি ডেকেছি এজ্ঞে আপনাকে? পেন্নাম হই, দেবতা।"

"তোমার বাসনা পূর্ণ করতে এসেছি—তোমাকে এখন মরতে হবে।"

কাঠুরে সখেদে বলল, "আমি ডেকেছিলাম বটে আপনাকে, কিন্তু এজ্ঞে, সে মরণের নিগে নয়, বোঝাটা তুলিয়ে নেবার জন্যে। তা আপনি যখন দর্শন দিয়েছেন, তখন দয়া ক'রে দিন না বোঝাটা মাথায় তুলে?"

যমরাজ গম্ভীরভাবে বললেন, "চালাকি পেয়েছ? ও সব ধূর্তামি চলবে না আমার কাছে। তুমি মরতে চেয়েছ, তাই আমি এসেছি। তোমাকে না নিয়ে আমি ফিরব না।"

কাঠুরে কাতরভাবে বলল, "না দেবতা, যদি বলেও থাকি, ওটি আমার অন্তরের কথা নয়।"

যমরাজ বললেন, "তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছ, অবস্থাও খুব ভাল নয়, এমন অবস্থায় বেঁচে থেকে আর কি করবে?"

"বেঁচে থাকার আনন্দ, এজ্ঞে, আপনি কি বুঝবেন, দেবতা। অবিশ্যি মরতে একদিন হবেই। তবে প্রাণটা তো আর পাখী নয় যে ইচ্ছে হল উড়িয়ে দিলাম।"

যমরাজ বললেন, "বেঁচে তোমাকে থাকতে দিচ্ছে কে? মরতে চেয়েছ, আমি এসেছি। এই বিড়ম্বনার হাত থেকে তুমি চিরকালের জন্য বেঁচে যাবে।"

কাঠুরে জোড়হাত ক'রে বলল, "বিড়ম্বনা আছে দেবতা, কিন্তু এরে আর নিন্দা করি কোন্ মুখে। বাঁচতে ভালই লাগে এজ্ঞে। দোহাই আপনার—আমি মরতে চাই না।"

"কেন চাও না?"

"আমি গরিব, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটি, সব সত্যি। তবু চোখ মেলে অনেক কিছু দেখি, কান পেতে অনেক কিছু শুনি। বড় ভাল লাগে, এজ্ঞে। সব হাত, পা গা মেলে দিয়ে পিরথিমের মাটি ছুঁই—মায়াজালে জড়িয়ে যাই, দেবতা। আপনি এয়েছেন, আপনারে দেখে দুনিয়াটা যেন আরও ভাল লাগছে। এত ভাল আগে কখনো লাগেনি, দেবতা।"

যমরাজ এ কথায় অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন, বললেন, "তুমি বড়ই চতুর, তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারব না, আমি দূত পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

যমরাজ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, এবং তাঁর জায়গায় দেখা গেল যমদূতকে।

কাঠুরে তাকে দেখে বিনীতভাবে বলল, "তুমি আর নতুন কি বলবে ছোট দেবতা, আর আমিই বা তোমাকে নতুন কি বলব। পার তো বোঝাটা তুলে দিয়ে যাও।"

যমদূত সিংহের মতো গর্জন ক'রে উঠে বলল, "চোপরাও বুড়ো।"

কাঠুরে বিপদ গণল। সে চেয়ে দেখল যম-দূতের চেহারাটা বড়ই নির্মম। তার চোখ দুটিতে আগুন জ্বলছে। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হাতে কাঁটাওয়ালা মোটা এক লাঠি। তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা বলতে কাঠুরের ভয় হল, কি জানি যদি আবার গর্জে ওঠে, কি জানি যদি মাথায় লাঠি মারে।

সে কি করবে বুঝতে পারল না। একবার তার মনে হল, "যমরাজ তো ইচ্ছে করলেই তাকে মারতে পারেন, তবে কেন না মেরে কথা কাটাকাটি করলেন, এবং পরে যমদূতকে পাঠালেন। তবে কি আমার আয়ু না ফুরোতেই আমাকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে? তা যদি হয় তবে তো দেবতার কাছে গলদ আছে।"

এবারে তাই সে অনেকখানি সাহসের সঙ্গে বলল, "এই গরিবের কাছে তা হলে কেন এলেন, এজ্ঞে?"

যমদূত কর্কশ স্বরে বলল, "তুমি মরতে চেয়েছ, তোমাকে নিতে এসেছি।"

কাঠুরে বলল, "ওটা সত্যি বলিনি, এজ্ঞে। যদি পেত্যয় না হয়, তা হলে আর কি করতে পারি বলুন? নিয়ে যান আমারে। আমি মরতে চাইনি, তবু যদি ধম্মে সয়, নিয়ে যান।"

যমদূত তার কর্কশস্বর একটুখানি কোমল ক'রে বলল, "মরতে চেয়েছ ঠিকই, এবং মরতে হবেই। তবে"—

কাঠুরে খুব ভরসা পেয়ে বলল—"তবে কি, ছোট দেবতা? এর মধ্যে কিছু গোলযোগ আছে না কি এজ্ঞে?"

যমদূত বলল, "তুমি মরতে চাও না?"

"কে আর সাধ ক'রে চায়, আপনিই বলুন না?"

"তা হলে শোন।"

যমদূত কাঠুরের কাছে বসে তার আসল কথাটি এতক্ষণে বলল। একটি বিকল্প প্রস্তাব। "হয় মৃত্যু, না হয়"—

বলল, "যমরাজ স্বয়ং তো আর এ প্রস্তাব

শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্তীর একটি নৃত্যভঙ্গি

তোমায় খুঁজেছি জীবনের পথে পথে
তোমায় খুঁজেছি ভোরের সূর্য-রথে
রাত জেগে জেগে কালীর আঁচড়ে
খুঁজেছি খাতার পাতায়।
জুঁই ফোটা রাতে সুরভি যখন
প্রেমিকের মন মাতায়।
খুঁজেছি তোমায় নন্দন বনে সমুদ্রে পর্বতে
কুয়াসা মলিন উদাসীন মনোরথে॥

নিরানন্দিত স্পন্দিত বুকে বেদনার হাহাকারে,
তোমায় খুঁজেছি অযাচিত উপহারে।
বর্ণে গন্ধে কত না ছন্দে
প্রাণ-চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আকুল অন্বেষণে।
কেটেছে দিবস কেটেছে রাত্রি
অধীর চপল জীবন যাত্রী
একান্ত কোরে তোমায় চেয়েছি অশান্ত মনে মনে,
বাসন্তী রাতে খুঁজেছি তোমায় ফাল্গুনী
সমীরণে।
নিখিল কাব্যসাধনার ধন সব চাওয়া সব পাওয়া
মিটে যায় যে গো তোমাকে পেলেই জীবনের
দাবীদাওয়া।
খুঁজে মরি তাই পথে পথে দেশে দেশে
শত অপমান শত লাঞ্ছনা সয়ে যাই
অক্লেশে।
নূপুরে নূপুরে ঝঙ্কার তুলে
হৃদয়ের বীণাযন্ত্রে
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি মায়ার মন্ত্রে,
হে আমার প্রেম সুনিবিড় অনুরাগ'
ফাগুনের রাঙা ফাগ!
তুমি বিনা মহাবিশ্বভুবন তনু প্রাণ মন ফাঁকা
ওগো ইহকাল, ওগো পরকাল!
টাকা! টাকা! ওগো টাকা!

তোমার কাজে করতে পারেন না, কিন্তু বুদ্ধি ক'রে তোমারই এটি বলা উচিত ছিল। যাই হোক, ভেবে দেখ, কি চাও। আমার কথা আমি বলেছি, বাকীটা এখন তোমার হাতে। এর মধ্যে আর দরদস্তুর করতে যেয়ো না। আমার এক কথা।"

কাঠুরে কাঁপা গলায় বলল, "না হলে মরতেই হবে?"

যমদূত বলল, "সন্দেহ নেই; আমিই তোমাকে মেরে রেখে যাব।" ব'লে লাঠিখানা উঁচু করল।

কাঠুরে হতাশভাবে বলল, "বুঝতে পেরেছি! আসুন এজ্ঞে, আমার সঙ্গে। পরাণটা তো আর পাখী নয় যে উড়িয়ে দেব। তোমার মনে যা আছে তাই হোক।"

যমদূত খুব উৎসাহের সঙ্গে বোঝা তুলে দিল কাঠুরের মাথায় এবং তাকে অনুসরণ ক'রে চলল তার বাড়ির দিকে। কাঠুরের পা যেন আর চলে না।

বাড়ির কাছাকাছি এক ঝোপের কাছে থেমে যমদূত বলল, "আমি আর এগোব না, এইখানে এই ঝোপের আড়ালে বসছি, তুমি এসো ফিরে তাড়াতাড়ি।"

যমদূত ঝোপের আড়ালে বসে খৈনি টিপতে টিপতে গুন্ গুন্ ক'রে একটি হাল্কা সুর ভাঁজতে লাগল।

কাঠুরে প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এলো এবং দ্রুত প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রে আরও দুর্বল পায়ে ফিরে গেল।

আশ্চর্য এই যে, তাকে মরতে হল না জেনেও তার মনের শেষ জোর এবং শেষ আনন্দটুকু হঠাৎ অন্তর্হিত হল।

অনুতাপে সে হায় হায় করতে লাগল।

সংসারে সে একা। একটা টিয়ে পাখী ছিল তার অনেক দিনের। তার উপর মায়া জন্মে গিয়েছিল। বাঁচবার ইচ্ছা অনেকটা তার জন্যও। কিন্তু সে আজ তাকে খাঁচা থেকে মুক্ত ক'রে দিল।

সমস্ত জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে বুড়ো-বয়সের জন্য যে কটা টাকা জমিয়েছিল—তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত বের ক'রে দিতে হল যমদূতের হাতে।

পাঁচ শ টাকা ঘুস দিয়ে শূন্য, স্বাদহীন, জীবনের কটা দিন বাড়তি পেয়ে তার কি লাভ হল? এই একটি প্রশ্নের [illegible] আলো নিবে এলো।

যে-জীবনকে সে এতদিন পাখী বলে স্বীকার করেনি, আজ বুঝতে পারল সে ভুল করেছে। জীবন পাখী নয় তো কি?—খাঁচা খুললেই সে উড়ে পালায়। রাত্রে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

পরদিন কেউ কেউ বিস্মিত হল, কেউ বা বলল, এ ছাড়া গরিব বেচারার আর উপায়ই বা কি ছিল। কেউ কেউ নীরবে এগিয়ে এসে গাছের ডাল থেকে গলায়-দড়ি কাঠুরের মৃত-দেহটি নিচে নামাতে লাগল।

নামাবার পর সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখল কাঠুরের মুখে এক অদ্ভুত হাসির রেশ। এমন কষ্টের মরণ যার, তার মুখে এ কিসের হাসি?

কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।

সত্যি, কি ক'রে তারা জানবে যে যমের ইচ্ছায় নয়, যমদূতের লাঠিতে নয়, নিজের ইচ্ছায় স্বাধীন মৃত্যুর বিশেষ সুবিধাটি ভোগ করতে পেরেছে বলেই তার মুখে এই হাসি।—এটি কি কম আনন্দের?

বিনোদ লাট

মনোজ বসু

ভারত হোটেলে ম্যানেজারের ঘরে বিনোদ। ম্যানেজার এই বড় খাতা নিয়ে হিসাবে ব্যস্ত। চোখ তুলে একনজর দেখে পুনশ্চ সে পাতায় ঝুঁকে পড়ল।

বিনোদ ভ্রূকুটি করে। আচ্ছা ধড়িবাজ! ন্যায্য পাওনা আট মাস ধরে ঘোরাচ্ছে। খদ্দেরের বেলা অথচ একটা বেলা মাপ হয় না। হিসাব এখন অনন্তকাল ধরে চলবে, অতএব গলা খাঁকারি দিয়ে বিনোদ বলে, নমস্কারে এলাম রসময়—

হুঁ—

রাত ন'টায় মিস্টার রায় এসে পৌঁছচ্ছেন। ভাল ঘর চাই। খালিটালি আছে কিনা দেখ।

হিরণ্য রায় আসছেন—ওরে বাবা! মুখ তুলে মিষ্টি হাসি ছেড়ে রসময় বলে, ঘর না থাকলেও খালি করে দেবো। সবচেয়ে ভাল ঘর পাবেন—বাড়ীর খোদ মালিক—তাঁকে কি যেখানে সেখানে রাখা যায়? আচ্ছা, বুক করা রইল—অগ্রিম দিতে হবে না।

বিনোদ বলে, আর আমার টাকাটা—

চা খাও।

বলে হাঁক দিয়ে চায়ের ফরমাস করে রসময় আবার খাতায় মন দিল।

কিন্তু আজকে বিনোদ মরিয়া। হাসিকে বলে এসেছে এসপ্লানেডের গুমটিতে থাকতে। এখানকার কাজ সেরে বেরিয়ে দু-জনে মিলে সওদা করবে। উষ্ণকণ্ঠে বলল, কতকাল ঘোরাচ্ছ বল দিকি? বাড়ী লীজ নেওয়া হয়ে গেছে—ভাবছ, আবার কি, গাঙ পার হয়ে কুমীরকে এই কলা! কিন্তু নানান ফ্যাসাদ বেরোবার কায়দা আছে এখনো। তখন আমায় দুষতে পারবে না।

রসময় অবিচল কণ্ঠে বলে, বোসো না হে! এই, চায়ের কি হল রে—আসামের বাগান থেকে তুলে আনছিস?

অনতিপরে এক সুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়াল। বারম্বার হিসাবে বাধা পেয়ে রসময় বিরক্ত হয়েছে।

কত নম্বর ঘর আপনার?

তেত্রিশ—

খাতার কয়েকটা পাতা উল্টে বলে, অনুরাধা দেবী। তা হয়েছে কি? সবে তো এসে পৌঁছলেন। ঘরে যান—আধ ঘণ্টার মধ্যে জলখাবার চলে যাবে। প্রথম বেলাটা একটু আধটু দেরী হয়—তাতে উতলা হলে চলে না।

বিনোদের পাশে এসে বসে ইত্যাদি—

অনুরাধা ফিক করে হাসল। হাসি যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। বলে, জলখাবারের জন্যে আসিনি। ভাল লেস কোথায় পাওয়া যাবে বলুন তো?

বড়বাজারে—

বই?

কলেজ স্ট্রীটে—

জুতো?

চীনাবাজারে—

স্যুটকেস?

হগ মার্কেটে—

চিলের মতো ছোঁ মারল……অনুরাধা হাত ধরছে……

মুখস্থের মতন জবাব দিয়ে যাচ্ছে। এই অপরূপ চেহারা, মনোরম সাজ-পোষাক, প্রসাধনের মাদক সৌরভ, গানের সুরের মত কথা বলা—রসময় কিন্তু নজরই তুলছে না। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে—অনুরাধা আর অন্নদা-চরণ একই বস্তু তার কাছে। ভারত-হোটেলের খদ্দের মাত্র।

অনুরাধা বলে, কতকগুলো কেনাকাটা আছে, একজন কাউকে দিতে পারেন আমার সঙ্গে?

পয়সা দিলেই জিনিষ দিয়ে দেবে। হ্যাঙ্গামা নেই। মাল বওয়াবয়ির মুটেও পাবেন বিস্তর—তার জন্য হোটেল থেকে মানুষ সাজিয়ে নিতে হবে কেন? ফালতু মানুষ নেইও আমার।

কলকাতা শহর চিনিনে তেমন। অনেক জায়গার কথা তো বললেন। কোথায় বড়বাজার, কোথায় বা চীনাবাজার—

জিজ্ঞাসা করলে সবাই বলে দেবে। ট্রামে যান তো কণ্ডাক্টরকে বলবেন, ট্যাক্সি করেন তো ঝামেলাই নেই। ভয় পাবার কি আছে? পাঁচ বছুরে এক বাচ্চা চিনে যেতে পারে, আর আপনি এক ধেড়ে—সরি, দিব্যি তো গায়ে-গতরে আছেন আপনি।

মেয়েটা তবু নিরস্ত হয় না। বিপন্ন কণ্ঠে বলে, বড়বাজারটা শুনেছি ভারী গোলমেলে জায়গা। নেহাৎ পক্ষে ঐখানটায় যদি কেউ—

এবারে রীতিমতো গরম হয়ে রসময় বলে, দেখুন, আপনি একা নন—ষাটজন বোর্ডার আমাদের। সকলের এমনি আবদার সামলাতে হলে ব্যবসা চলে কি করে? এই দেখুন, আপনার সঙ্গে বকতে বকতে আটে ছয়ে ষোল করে বসে আছি।

বলে প্রসঙ্গে পুরোপুরি ইতি দিয়ে রসময় সশব্দে যোগ সুরু করল। অনুরাধা আরও একটু দাঁড়িয়ে হতাশভাবে চলে যায়। বিনোদের পরোপকার-বৃত্তি চাঙ্গা হয়ে ওঠে সহসা।

শুনুন, আমি যাচ্ছি ওদিকে। আমি দেখিয়ে দেবো।

অনুরাধা সেই পাগল করা হাসি হেসে বলে, বাঁচালেন। কলকাতায় এর আগে বার দুয়েক মাত্তোর এসেছি। থই পাইনে—শহর আমার কাছে সমুদ্রের মতো লাগে।

আবার হেসে বলে, তাড়াতাড়ি রওনা হলে ভাল হয়। রাত হলে পছন্দর অসুবিধে। দোকান-পাটও খোলা পাওয়া যাবে না।

যাচ্ছি চলুন—সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের হাসির কথা মনে পড়ে যায়। একটু পরেই বেচারি এসে এসপ্লানেডে দাঁড়াবে। সঙ্কোচ-ভরা সুরে বলে, অত জায়গায় ঘোরাঘুরির সময় হবে না কিন্তু আমার—

কাজ আছে? বেশ—শুধু বড়বাজারটা হলেই হবে। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলব—সে-ই তারপর অন্য সব জায়গায় নিয়ে যাবে।

উঠে দাঁড়িয়ে বিনোদ রসময়ের দিকে হাত বাড়ায়, কই হে—দাও মিটিয়ে।

নির্বিকার ঔদাসীন্যে রসময় বলে, চা বসে দিলাম যে তোমার জন্যে—

অনুরাধা বলে, চা বাইরে খেয়ে নেবো। আপনি চলে আসুন।

বিনোদও বলে, চায়ে কাজ নেই। তুমি টাকা বের করো। আজকে আমি কিছুতেই শুনবো না।

রসময় গজর-গজর করে, বড্ড জ্বলাম তোমায়। বাড়ী খুঁজে দেবে, তার দালালি দুশো। টাকা যেন খোলামকুচি। অত হবে না—এই যা দিচ্ছি হাসিমুখে নিয়ে যাও।

একশ' টাকার নোট একখানা দিল। বলে, ভাড়া যখন আড়াই শ'র কম করতে পারলে না, দস্তুরি দশ হবে না—পাঁচ। তবে ঠিক ঠিক পাবে এবার থেকে, মাসে মাসে ভাড়ার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

বটে!

বিনোদ গর্জন করে উঠছিল, অনুরাধার দিকে নজর পড়ে থেমে গেল। এমন মেয়ের সামনে ছোট ব্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করা চলে না। আচ্ছা, বেঁচে গেলে আপাততঃ রসময়—আর একদিন।

কলেজ ষ্ট্রীট কাছেই। ঐটুকু হেঁটে গিয়ে কয়েক দোকানে বই খোঁজে। ওসব বই এখানে নয়—সাহেবপাড়ায় মিলবে। শনিবারে সকাল সকাল বন্ধ, নয়তো আনিয়ে দেওয়া যেতো। আজ আর হবার উপায় নেই—সেই সোমবারে—

আবার হাঁটছে। এ মেয়ের পাশাপাশি হেঁটে আনন্দ। কিন্তু চতুর্দিকে দৃষ্টিশূলে অবিরত খোঁচাখুঁচি করছে। এ ভারি মজা—পাকা দাড়িওয়ালা অথর্ব মানুষটি, চেহারা দেখে মাথা নুয়ে আসে—তিনিও থমকে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সুন্দরী মেয়ে দেখে নিচ্ছেন। পাশাপাশি চলতে দেমাক হয় বই কি! বিনোদ নিজের দিকে এক-নজর তাকিয়ে দেখে। তালি-মারা জুতো, জামা আধময়লা। ইস্ত্রি-করা জামা বাড়ীতে আছে—হাসি বলেওছিল একবার সেই জামা পরতে—কিন্তু বিনোদ ভাবল, আজকের দিনটা এ জামায় স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। তার উপর বাজারে ঘোরা-ঘুরি আছে হাসির সঙ্গে। বুঝবে কেমন কপাল খুলেছে, পরীরাজ্যের একজন গায়ে গায়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে পথ চলবে?

ট্যাক্সি যাচ্ছে দেখে অনুরাধা হাত নেড়ে থামাল। দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়ায়। আগে বিনোদ উঠবে, তারপরে সে গিয়ে পাশে বসবে। নিজের ইচ্ছেয় হলে বিনোদ ড্রাইভারের সীটের পাশে গিয়ে উঠত। কিন্তু এ মেয়ে বাদ সেধে বসে আছে।

বড়বাজার অঞ্চলটা ভাল রকম জানা। লেসের দোকানে নিয়ে বসিয়ে বিনোদ বলে, সরেস মাল বের করো ছটুলাল। সবছে আচ্ছা—

এত সৌখিন দোকানে তুলে মেয়েদের পছন্দ করানো চাট্টিখানি কথা নয়। এটা দেখছে, ওটা দেখছে। বিনোদের মনে তাড়া—হাসি পৌঁছে বোধ হয় গেল এতক্ষণে! বলে আপনি পছন্দ করুন। আমি তবে আসি।

অনুরাধা তাড়াতাড়ি বলে, হয়ে গেছে আমার। একসঙ্গে যাবো। আর একটুখানি—এক মিনিট—

শো-কেসে দেখিয়ে বলে, কি হল ছটুলাল—ওগুলোও বের করতে বললাম না?

বিষম গেরো—দোকান শুদ্ধ সওদা করবে নাকি? যার পাঁঠা সে লেজে কাটুক, বিনোদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু একটা মিনিট এদের ক'ঘণ্টায় শেষ হবে?

মনের কথা কি জানি কেমন করে টের পেয়ে যায়। অনুরাধা কাতর হয়ে বলে, আপনার অসুবিধে হচ্ছে। এই হয়ে গেল আমার। মরু-ভূমির দেশে থাকি, পছন্দমত জিনিষ পাইনে। দাও ছটুলাল, উনি ব্যস্ত হয়েছেন—আর কাজ নেই। একটা প্যাকেটে করে দাও সমস্ত।

বিনোদও ভেবে দেখল, সন্ধ্যেবেলা এখন ট্রামে-বাসে ওঠা মুস্কিল। চীনাবাজারে যাচ্ছে তো জুতো কিনতে—সেইখানে নেমে পড়বে। হাঁটতে হবে না, ভালোই হবে।

ক্যাশমেমো হাতে নিয়ে টাকা দিতে গিয়ে অনুরাধা ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতড়ায় এই সর্বনাশ—

কি হল?

পার্স নিয়ে আসিনি, রুমে ফেলে এসেছি। এমন ভুলো মন আমার! বাইশ টাকা সাত আনা হবে আপনার কাছে?

না হয়ে উপায় কি, চোখের উপরেই যখন রসময় একশ' টাকার নোট দিয়েছে। ঐ দেখেই পার্স নিখোঁজ হচ্ছে কিনা, কে জানে? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অনুরাধার দিকে। চোর-জোচ্চোরেরা আবার নানান রূপ ধরে বেড়ায় কিনা—বাইরের সুন্দর চেহারা দেখে কিছু মালুম পাওয়া যায় না।

দিতে যখন হবে, মেজাজ মাফিক দেওয়াই ভালো। একশ' টাকার নোট বিনোদ বাঁহাতের দুটো আঙুলে আনিটা দুয়ানিটার মতো ছুড়ে দিল ছটুলালের দিকে। ছটুলাল ফেরৎ টাকা গুণে দিচ্ছে—এই সেরেছে রে! হাত বাড়িয়ে অনুরাধা সমস্ত মুঠোয় তুলে নিল।

হোটেলে গিয়ে পুরো নোট দিয়ে দেবো আপনাকে। ভালই হল—নইলে ফিরে যেতে হত টাকা আনতে, দোকানপাট এদিকে বন্ধ হয়ে যেতো। কালকে রবিবার—মুস্কিলে পড়ে যেতাম।

বেশ কেমন সপ্রতিভভাবে ভ্যানিটি-ব্যাগে ঢোকাল টাকাগুলো, বিনোদ হতভম্ব হয়ে গেছে। উদ্ধার হবে তো ঐ ব্যাগের মধ্যে থেকে। না, মিষ্টি মিষ্টি হেসেই শোধ দেবে।

বিনোদ বলে, বিস্তর কাজ আমার—চীনা-বাজারে কিন্তু নেমে পড়ব:

আপনার টাকা নেবেন না? কেনাকাটা সেরে হোটেলে গিয়ে তবে তো টাকা দেবো!

বিনোদ চুপ করে থাকে। অর্থাৎ হোটেলটা আগেভাগে হয়েই এসো না লক্ষ্মীমাণিক, কতক্ষণ লাগবে? মুখ ফুটে বলতে পারে না, তা হলে কাবুলিওয়ালার তাগিদের মতো শোনাবে। যেন সে অবিশ্বাস করছে টাকাটা দিয়ে! চালাক মেয়ে যদি হয়, আর সদিচ্ছা যদি থাকে, এই চুপ করে থাকা নিয়েই বুঝে নিক।

ও হরি, বলে যে একেবারে ভিন্ন কথা!

আপনার টাকা অবিশ্যি কালও দেওয়া যেতে পারবে। কিন্তু—

গাড়ি চলছে তখন। মুখটা একেবারে বিনোদের মুখের কাছে এনে ফিসফিসিয়ে অনুরাধা বলে, রাত হয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সঙ্গে একা-একা ট্যাক্সিতে ঘুরতে আমার ভয় লাগছে।

কি সব মাখে এরা মুখে—উগ্র সুগন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে, নেশা লেগে যায় যেন। কলকাতার সঙ্গে পরিচয় কম বলেই ভয়। ভাবতে ভাল লাগে, এই ভয়ানক শহরে রূপসী মেয়েটার একমাত্র সহায় বিনোদ। পার্স ফেলে এলে বিনোদ টাকা দিয়ে তার মান রক্ষা করে, গাড়ির সঙ্কীর্ণ খোপের ভিতর বিনোদের পাশে এসে বসে, মুখের কাছে—অতি কাছে মুখ নিয়ে আসে, অল্পের জন্য রক্ষে হয়ে যায়। হাসি এসে গেছে নিশ্চয়, পথ তাকাচ্ছে। কিন্তু শহরে অবিরত দুর্ঘটনা—[illegible] ধরে [illegible]

হওয়া যদি না ঘটে ওঠে! হাসি হল চিরদিনের—আর দিন কয়েকের জন্য এসে, দেখ দিকি, কি নাকালটা হচ্ছে নিঃসহায় এই অনুরাধা!

জুতোর দোকানে একলা ছাড়া যায় না। চীনাপাড়ার ওরা তো এক একটা ডাকাত। তিন গুণ দাম হেঁকে বসল—কত কমাবে কমাও। 'পিচবোর্ড' দিয়ে দেয় শুকতলার নিচে, ভালো বলে খারাপ চামড়ার জিনিষ গছায়।

জুতো সওদা অন্তে এবারে হগ-মার্কেট। এসপ্লানেডের মোড়ে ভিড়, গাড়ি আটকে দিয়েছে। ট্রাম একের পিছনে অন্য সারবন্দি দাঁড়িয়ে গেছে। মোটরেরও লম্বা লাইন। ভুখড় ব্যক্তিরা এরই মধ্যে ব্যাপার-বাণিজ্য করে নিচ্ছে—চানাচুর, ছবির বই, ছুরি-কাঁচি, রেস-গাইড ফেরি করছে মোটরের ধারে ধারে এসে। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ—হাসি যে এখানে!

ওদের ট্যাক্সির ঠিক গা ঘেঁষে হাসি দাঁড়িয়েছে। দেরি করে ফেলেছে—এতক্ষণে যাওয়া হচ্ছে এসপ্লানেডের দিকে। গাড়ী-মানুষের ভিড়ে মোড় পার হতে পারছে না। তবে তো বেড়ে কৈফিয়ৎ হবে—পাঁচটায় তোমায় না পেয়ে অন্য কাজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সময় ঠিক রাখতে পারো না—ছিঃ ছিঃ, কাজের মানুষ আমার অনর্থক হয়রানি হল।

গাড়ির গায়ে অন্যমনস্কভাবে হাসি ডান হাত রাখল। দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি ভিতরে বসে—তাদের থেকে ইঞ্চি আষ্টেক ব্যবধান হয় যদি বড় জোর। তাকিয়ে ফেলে যদি ভিতরের দিকে! সে সব কিছু নয় গো হাসি, প্রেম-ট্রেম মাথায় চড়ে গেছে—এক শ' টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। টাকার ধান্দায় পিছন ছাড়তে পারছিনে। এ তো এসপ্লানেড—দরকার হলে যমালয় অবধি যাবো।

রাস্তার দিক থেকে বিনোদ মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখ দেখে ধরে না ফেলে! চোখাচোখি অনুরাধার সঙ্গে—অমনি চোখ দুটো তার হেসে উঠল। মেয়েটা ভাবল নাকি, চুরি করে তার রূপ দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে? নির্ঘাৎ তাই ভেবেছে।

কি দেখছেন?

দেখছি মুণ্ডু তোমার! বিনোদ জবাব দেয় না, রাগে গরগর করছে। হাসি পাশে দাঁড়িয়ে—আর এখন খোশ মেজাজে আলাপনের সময় হল!

অনুরাধা বলে, আপনার যেমন তাড়া—পথ বন্ধ করে কি মুস্কিলে ফেলল দেখুন।

জমিয়ে শুরু করল যে! তোমার বকবকানি বন্ধ করলে মুস্কিলটা তবু কিছু কমত। যাকগে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল—হাসি এগিয়ে চলেছে। ভাল মেয়ে হাসি—পরের ব্যাপারে কিছুমাত্র কৌতূহলী নয়।

হগ-মার্কেটের সাজানো দোকানপাট দেখে অনুরাধা যেন ক্ষেপে যায়। শুধুমাত্র সুটকেস কেন, টাকায় কুলোলে মার্কেট সুদ্ধ কিনে নিতে পারে। যত না কিনছে, ঘোরাঘুরি তার চতুর্গুণ। মেয়েটা হাঁটে না তো—উড়ে বেড়ায় এ-দোকানে ও-দোকানে। বিনোদের পা টনটন করে। তার চেয়ে বড় বিপদ—গায়ে গায়ে লেপটে বেড়াচ্ছে, চেনা-জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি মনে করবে?

বিরক্ত হয়ে বিনোদ বলে ওঠে, শেষ করুন, আর পারা যাচ্ছে না।

অর্ধাবেশে একবার হিল্লোল তুলে অনুরাধা ধপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, চলুন—চা খেয়ে নিই গে—

দরকার নেই।

আপনি রাগ করেছেন। সত্যি, কি জ্বালাতন করছি যে আপনাকে!

কিছু না, কিছু না—

তবে খাবেন না কেন? চা আসছিল, সেই সময়টা আমি টেনে নিয়ে এলাম।

হাত ধরল অনুরাধা। টানাটানি করছে, চলে আসুন—

দেখ কাণ্ড! এমন করে রসাতলে যেতে বলাও তো না করা যায় না। যায় যাক এক শ' টাকা। টাকা তো কতই আসে জীবনে! স্বপ্ন দেখছে না তো যে ফুটফুটে যৌবনমতী মেয়ে কোমল মুঠিতে তার হাত ধরে টানছে?

হাত ধরাধরি করে ছোট্ট এক কেবিনে ঢুকে সামনা-সামনি বসল।

বিনোদ বলে, আপনি ছাত্রী?

সেই অপরূপ হাসি হেসে অনুরাধা ঘাড় নাড়ল। কানের হীরের দুল ঝিকঝিকিয়ে ওঠে।

ইকনমিকসে অনার্স আছে?

অনুরাধা পাল্টা জিজ্ঞাসা করে, আপনি টিকটিকি পুলিশ?

হতভম্ব মুখ দেখে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।—তা নইলে এত সব খবর পেলেন কি করে?

বিনোদ বলে, সেই যে দোকানে বই চাইলেন। শখ করে ঘরে পড়বার জন্য কেউ ও সব বই কেনে না।

অনুরাধা সবিস্ময়ে তাকায়। নতুন চোখে দেখছে এই দালালি ও দস্তুরি আদায়-করা মানুষটাকে। বলে, আপনারও ইকনমিকস ছিল বুঝি?

সে কোন্ যুগের কথা! শেষ অবধি ছেড়ে দিয়েছিলাম অনার্স—

অনুরাধা বলে, আমি পড়াশুনোই ছেড়ে দেবো। মুচকি হেসে বলে, ছেড়ে না দিয়ে আর কোন উপায় নেই—

কেন, কেন?

অদৃষ্ট! ওয়পারের মানুষকে ধরুন গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি নিয়ে তুলছে। পৃথিবীর এপ্রান্ত আর ওপ্রান্ত। তা হলে পড়াশুনো হয় কেমন করে?

জলপাইগুড়ি থাকবেন বুঝি?

হাসিমুখে ফোঁস করে এক নিঃশ্বাস ফেলল অনুরাধা। বলে, ঘরে নিয়ে আটকে রাখবে—না থেকে উপায় কি?

(ইহার পর ১৫৩ পাতায়)

বার্ধক্যের আক্রমণে যৌবনের জ্যোতিঃ
হোলো ম্লান।
দেহচর্ম লোল হোলো। তবু জানি চিরজয়ী প্রাণ।
আমার পরম 'আমি'—কোন্ জরা
গ্রাসিবে তাহারে?
অনন্তের ক্ষুধা মোরে দিক হ'তে দিগন্তের পারে
টানিছে দুর্বার টানে। মজ্জার গভীরে কোন্ ব্যথা
আমারে কাঁদায় শুধু। রক্তে কেন এই চঞ্চলতা?
এই কান্না, এই ব্যথা, এ চাঞ্চল্য—এরই মাঝে মোর
চিরশ্যাম তারুণ্যের স্পর্শ পাই মর্মের ভিতর।

দেহের যৌবন যদি গিয়ে থাকে—কোন দুঃখ নাই!
জীবনের মর্মমূলে যদি চির-কিশোর কানাই
বাজায় বাঁশরী তার আর মোর অন্তরের রাধা
কানুর সে বেণু রবে দূর করি দিয়া সর্ব বাধা
বাহিরায় অভিসারে কূল হ'তে অকূলের পানে—
জানিব যৌবন-লক্ষ্মী অম্লান গৌরবে
জাগে প্রাণে।

সে আমারে বেঁধে রাখে একঠাঁই—
সে-ই তো আয়ান।
হাতে তার বাঁশি নাই, কণ্ঠে তার নাই কোন গান।
রোমশ নিষ্ঠুর হস্তে দণ্ড নিয়ে রয় সে প্রহরী
আমার দ্বারের প্রান্তে। রাখিবে সে
প্রতিধ্বনি করি
আমারে ছায়ায় তবু দিবে না সে হইতে বাহির
উদার উন্মুক্ত পথে—যে-পথ গিয়াছে পৃথিবীর
দেশ হ'তে দেশান্তরে; যে-পথের বাঁকে বাঁকে রয়
কত নদী-গিরি-বন, কত জনাকীর্ণ লোকালয়!
শস্যশ্যাম কত মাঠ কিষাণের সঙ্গীতে মুখর!
মাথার উপরে জাগে সৌরকরোজ্জ্বল নীলাম্বর।

নয়, নয় শুয়ে থাকা। নয়, নয় বৃক্ষের মতন
মাটিরে আঁকড়ি রহি একই ঠাঁই জীবন যাপন!
গৌরব দুঃখের পথে; মৃত্যু হ'তে বাহিরায় প্রাণ।
মৃত্তিকার অন্ধকারে মরে বীজ। সেই আত্মদান
হেমন্তের মাঠে মাঠে আনে স্বর্ণ-শস্যের সম্ভার।
শহীদের রক্ত হতে সত্য পায় গতিবেগ তার।

এ জীবন কুরুক্ষেত্র। অন্তহীন নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
অন্তরে বাহিরে জাগে শত্রুর বাহিনী অবিরাম।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। 'ওঠো, জাগো'—
এ বাণী অভয়
উঠিল ঋষির কণ্ঠে। 'দৌর্বল্যেরে দিও না আশ্রয়,
যুদ্ধ করো প্রাণপণে দুঃখে সুখে করি সমজ্ঞান'—
এই বাণী ভারতেরই। এ পুণ্য ভূমিতে ভগবান
ক্লৈব্য হতে মুক্ত করি ভক্ত হাতে দিলো ধনুঃশর।
দুর্বল মুহূর্তে কোন্ ভুলে গেনু গীতার ভাস্বর
অমর সে শ্লোকগুলি! মন দিনু রসের চর্চায়!
গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণেরে দিলাম বিদায়।

শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে বসো এসে কপিধ্বজরথে!
পাঞ্চজন্য বাজাইয়া আর বার এসো হে ভারতে।
বজ্রমন্দ্রে কর্ণে দাও অগ্নিমন্ত্র 'চরৈবেতি'র,
বলো, 'জয়-পরাজয় দুঃখ-সুখ, লাভ ও ক্ষতির
ভাবনারে বিসর্জিয়া যুদ্ধ করো,
হোয়ো না দুর্বল।'
বলো, 'যে কল্যাণ করে বিশ্বের তার
নাহি অমঙ্গল।'
অপগত হোক মোহ, চূর্ণ হোক আত্ম-অবিশ্বাস,
জড়তার রাজ্যে আনো জীবনের দুরন্ত উল্লাস।
বন্দরের শান্তি হতে নিয়ে যাও যেখানে অকূল
সিন্ধুর ফেনিল বক্ষ গর্জমান তরঙ্গসংকুল।

আন্তর্জাতিক ছোটগল্প প্রতিযোগিতার বাংলা বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে অবিনাশবাবু প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, কবিরাজদা, আপনার বৈঠকখানায় মেমসাহেবের ছবি, তাও আবার টানিয়েছেন মা কালীর পাশে—ব্যাপার কি বলুন তো?...

আড্ডা জমে ওঠে। কবিরাজদা বলে চলেন—ডিসপেনসারী উঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডিত্য করতে ফিরে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় একদিন দেখি পূবদিক থেকে একজন ফিরিঙ্গি মেমসাহেব ছাতা হাতে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে আসছেন। হঠাৎ বৃষ্টিটা ঝম্ ঝম্ করে পড়তে থাকে। মেমসাহেব আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েন। এত জোরে বৃষ্টি এসেছে যে, ওয়াটার-প্রুফ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ছাতাতে মাথা বাঁচলেও, জলের ছাটে সমস্ত গাউনটা ভিজে যাচ্ছে। বুড়ী মেমের একটু সর্দির ভাবও দেখলাম। খুকখুক কোরে কাশছেন।

মেমসাহেবদের সঙ্গে কোনদিনই কথা বলি নি। তা ছাড়া ইংরেজি জানি না মোটেই। কি করি? সৌজন্যবোধে ইঙ্গিতে ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দির সাহায্যে তাঁকে ভিতরে এসে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি যেন এইরূপ আমন্ত্রণই আশা করছিলেন। তৎক্ষণাৎ হাতের ছাতাটা গুটিয়ে ভিতরে এসে চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটার আবার এক পা ভাঙ্গা, একটু ঝুঁকলেই মনে হয় পড়ে যাচ্ছি। বুড়ীকে সাবধান করে দিলাম।

আমার বিচিত্র হিন্দি ও অঙ্গভঙ্গী দেখে বুড়ী হেসে ফেললেন। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় জিগ্যেস করলেন—আপনিই হরিনাথ কবিরাজের ছাত্র—না?

মেমসাহেব এত সুন্দর বাংলা বলতে পারেন, আমি অবাক হয়ে মেমসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঝকঝকে দাঁত, একটাও পড়ে নি। মুখের চামড়াটা একটু ঝুলে গিয়েছে। বার্ধক্যের ছাপ দেখা যায় চুলে ও চোখের চাহনিতে। কিন্তু হাসিতে উজ্জ্বল মুখ তাঁর। খানিক বয়সের প্রাণোচ্ছ্বাস শুনতে পাই তাঁর মিষ্টি গলার সুরে। দাদার মেয়ে অরুণার মতনই ছেলেমানুষ যেন তিনি—ঠিক তারি মত খুশিতে উপচে পড়ে বুড়ী বলেন—আপনার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কাব্যতীর্থ—নতুন ডিসপেনসারী দিয়েছেন এই পাড়ায়—কত খবর রাখি, দেখলেন তো।

আচ্ছা, কবিরাজদা, আপনার বৈঠকখানায় মেমসাহেবের ছবি, তাও আবার টানিয়েছেন **মা কালীর পাশে—ব্যাপার কি বলুন তো?**

এক নিমেষের হাসি; কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এ হাসি যেন বহুদিনের পরিচিত। ঠিক স্মরণ করতে পারছি না কার মুখে, কবে দেখেছি। আমি কতকটা অন্যমনস্কভাবে বুড়ীর প্রশ্নের উত্তর দিই। বুড়ীর কথায় জানতে পারি রেভারেন্ড ব্যানার্জী একবার আমার শিক্ষাগুরু হরিনাথ কবিরাজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। কবিরাজী ওষুধের উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা হয়েছে। বহুদিনের পুরোনো বুকের বেদনা আশ্চর্যভাবে সারিয়ে দিয়েছেন হরিনাথ কবিরাজ। হরিনাথ কবিরাজেরই ছাত্র যখন আমি তখন মাঝে মাঝে দেখা হবে এবার থেকে। বুড়ী আর একবার আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবেন। আমিও অস্বস্তি অনুভব করি।

মাত্র দশটা বাড়ী পিছনেই তাঁর বাসা। বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে আবার। বুড়ীও উঠে দাঁড়ান। যাবার সময় আমাকে কার্ড দিয়ে যান। সেই সময়ে ইংরেজি বিদ্যে যা ছিল পুঁজিতে তাতে সমস্ত অক্ষরগুলো পড়ে উচ্চারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু বুড়ীর বাড়ীর ঠিকানাটা বেশ বুঝতে পারলাম। কি একটা মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বুড়ী। বুড়ীর নাম মিস্ নোরা কলিন্স।

কয়েকদিন পরেকার ঘটনা। সন্ধ্যেবেলায় একটি নেপালী ভৃত্য এসে আমাকে জানালে, মেমসাহেব ভয়ানক বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, আমাকে কল দিয়েছেন। খোলা খামে একটি দশ টাকার নোট গোঁজা ছিল। আমি তাড়াতাড়ি হাতবাক্সে কয়েকটি বাছাই বাছাই ওষুধ নিয়ে অগ্রসর হোলাম।

বাড়ীটা দোতলা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে চোখে পড়ে যীশুখৃষ্টের জীবনী অবলম্বনে নানা ছবি টানানো। একটি ঘরে একটি কালো মেম বসে টেবিলের উপর আলো জেলে কি যেন টাইপ করে চলেছে। আর একটি ঘরে অনেক বই সাজানো। আলমারীর পর আলমারী। সেই ঘর দিয়ে বারান্দা ঘুরে মিস্ কলিন্সের কামরায় যেতে হয়। দরজায় পর্দা টানানো—ভিতরে সবুজ আলো। পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মিস কলিন্স চোখ বুজে শুয়ে আছেন, আমরা যেতেও তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না।

লোহার স্প্রিং-এর খাটের উপর গদী বিছানো, পাশে একটি ছোট হেলান চেয়ার। একটা লিখবার টেবিল—দেওয়ালে আলমারীর মধ্যে কতকগুলো ওষুধের শিশি, খানকতক বই ইতস্ততঃ ছড়ানো।

কবিরাজদা দম নেন। যেন সিঁড়ি বেয়ে আসতে আসতেই তাঁর দম ফুরিয়ে গিয়েছে।

পুনরায় শুরু করেন—ড্রেসিং টেবিলের উপর দেখলাম নিকেল স্ট্যান্ডে এলুমিনিয়াম প্লেটের উপর কি ভাবে যেন তোলা একটি যুবক-মূর্তি—সাহেবী পোষাক কিন্তু বাঙ্গালীর মতন মুখটা কোমল।

নেপালী ভৃত্য ডাকাডাকি করে, কিন্তু মিস্ কলিন্স কোন উত্তর দেন না। বুকটা ছ্যাং করে ওঠে। তবে কি আমি আসতে না আসতেই মারা

ছুন—হার্ট ফেল হচ্ছে? লোহার চেয়ার নিয়ে বসি খাটের কাছে। সন্তর্পণে দেহ স্পর্শ করি। এর আগে কোনদিন গ্রান বা খৃষ্টান—কারুরই শরীর স্পর্শ হয়নি আমাকে। ভাবলাম, চিকিৎসক আমাকে কার্যক্ষেত্রে অনেক অশাস্ত্রীয় করতে হবেই। বাড়ী গিয়ে স্নান করে ব, তা হোলেই দোষ কেটে যাবে।

সেই রাত্রি মিস্ কলিন্সকে মকরধ্বজ ও র্ণ খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলি। মেমসাহেব অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর ফেরে। আমাকে দেখেই তাঁর মুখটা পূর্বের বালিকাসুলভ হাসিতে ভরে ওঠে। তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ং টেবিলের উপর রাখা ফটোটার দিকে র চান, হঠাৎ প্রশ্ন করেন, এবার তার র্গীন" বলেন না—আচ্ছা, তোমার বাবা কে নো পনোয় ছিলেন?

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি—না তো।

বুড়ী নিজেকে সামলিয়ে নিতে বেগ পান। হঠাৎ ম্লান হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধরে টোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে। ক্রমে মুখের দীপ্তি রে আসে। ধীরে ধীরে পূর্বের খুশিভরা বও দেখা দেয়, বলেন—আমি খুবে আনন্দিত ম আমাকে দেখতে এসেছ। এবার থেকে রোজ ালবিকেলে সময় করে একবার আমাকে দেখে ও। আমার শরীরটার যা অবস্থা, প্রতিদিনই কিৎসকের আসা দরকার। নয় কি?

মেমসাহেব হঠাৎ উঠে বসেন, আমি বাধা দেও শোনেন না।

—মাঝে মাঝে বুকের ব্যথাটা বাড়ে যখন, জ্ঞান হারা হয়ে যাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে উঠি। আমার আর অসুখ নেই—তোমাকে দেখেই র অসুখই সেরে গিয়েছে আমার।

আবার সেই ছেলেমানুষী হাসির উজ্জ্বল্য দেখা দেয় তাঁর মুখে।—আমি ভেবেছিলাম তুমি নের কেউ হবে হয়তো। চেহারার মধ্যে াদৃশ্য মিল কিন্তু।

—কার কথা বলছেন? আমি বিস্মিত হয়ে শ্ন করি এবার।

মিস্ কলিন্স কথাটা বলে ফেলে লজ্জিত য়ে পড়েছিলেন। কথাটা চাপা দিয়ে বললেন—না আমারি ভ্রান্তি, তুমি তো চক্রবর্তী; আর স ছিল সেনগুপ্ত। আচ্ছা, সেনগুপ্ত আর ক্রবর্তীতে বিয়ে হয় না?

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে উত্তর দিই—য়, ব্রাহ্ম হোলে হয়, হিন্দু মতে হয় না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। নরেনও তাই যেন লেছিল একদিন। তোমাদের হিন্দুদের মধ্যে নেক প্রকারের শ্রেণীভেদ আছে।

বিষ্টুদা বাধা দিয়ে বলেন—দাঁড়ান, দাঁড়ান, কবিরাজদা, কি বলছিলেন—নরেন সেনগুপ্ত? সেই নরেন সেনগুপ্ত নয়তো যিনি কেমব্রিজের র‍্যাংলার ছিলেন? বিলেত থাকতে প্রফেসরের মেয়ের প্রেমে পড়েন, বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক, কি রে যেন বিয়েটা ভেঙ্গে গিয়েছিল শেষকালে।

কবিরাজদা সবিস্ময়ে বিষ্টুদার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। অবিনাশবাবু ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলেন—চুলোয় যাক নরেন সেনগুপ্ত আসল গল্পটা শেষ হোক।

কবিরাজদা পুনরায় বলতে থাকেন—কয়েক দিনের মধ্যেই সর্দিজ্বরে হয়ে আমি শয্যা নিলাম। বুড়ী কি করে যেন আমার বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে এসে উপস্থিত। তোমাদের বৌদি মিশনারী স্কুলে পড়েছিলেন ছেলেবেলায়। মেমসাহেবদের দেখে ভয় পেতেন না। তাই তিনি সপ্রতিভভাবে মিস কলিন্সের সঙ্গে বৈঠকখানায় গিয়ে কথাবার্তা কইলেন। মেমসাহেবের ইচ্ছে ছিল নাকি একবার আমাকে দেখে যাবেন কিন্তু শোবার ঘর পর্যন্ত আসতে সাহস করেন নি, জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমাদের ঘরে ঠাকুর দেবতা নেই তো? আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল না মেমসাহেব ভিতরে এসে আমাদের সংসারের

বুড়ী ছাতা মাথায় লাঠি নিয়ে টুকটুক করতে করতে পিছন পিছন চলছেন।

দারিদ্র্যের নিদর্শন সবগুলি দেখে ফেলেন। তাই তিনি বললেন—হ্যাঁ, আমাদের শোবার ঘরেই ঠাকুরের চৌকি আছে। লক্ষ্মীর চৌকি একটা ছিল বটে, কিন্তু নারায়ণ শিলা ছিল পাশের ঘরে।

সেরে উঠে যখন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন তাঁর মুখের ভাবটা আমার পরিষ্কার মনে আছে। মুখে কেমন বিষণ্ণভাব। তাঁর বুকের ব্যথাটা বেড়েই চলেছে। বিছানার উপর কাৎ হয়ে শুয়েছিলেন। আমি নাড়ী পরীক্ষা করলাম, ব্যবস্থাপত্র বদলে নতুন ওষুধের নাম লিখে দিলাম,—বললাম—নেপালী চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়ে ওষুধ আনিয়ে নেবেন যেন। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—ওষুধ খেয়ে কি হবে? রোগ আমার সারবে না আর। তুমি তো আমাকে দেখছ—যখন—কত কি ভাবো নিশ্চয়। তুমি এত গোঁড়া কেন? কৈ, নরেনের বাবা...তিনিও তো খুব গোঁড়া ছিলেন শুনেছি—দেশের বাড়ীতে লক্ষ্মীর পূজা করতেন, কিন্তু আমার তৈরী চা খেয়েছিলেন, স্নান তো করেন নি? তবে তুমি কেন আমাকে ছুঁয়ে রোজ রোজ স্নান কর?

—কে বললে আপনাকে? আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তর দেন—তোমার স্ত্রীর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি।

—আমার স্ত্রী বললেন, আপনাকে ছুঁয়ে রোজ স্নান করি!

—না, তা কেন বলবে। তবে দেখ, তোমার স্ত্রী ছেলেমানুষ—কত আর বয়স হবে? তেইশ, চব্বিশ। আমার বয়েস চৌষট্টি পার হয়ে গেল। রাত্রিতে স্নান করে তোমার সর্দিজ্বর হয়েছে, আর সেই রাত্রিটার তারিখ যখন জেনে নেওয়া যায়, তখন কি আর বুঝতে কষ্ট লাগে কেন তুমি স্নান করেছিলে?

([illegible])

অলঙ্কারে প্রাচীনের পুনরাবির্ভাব

শ্রীমতী বেলা দে

প্রতিদিন ভোরবেলা খবরের কাগজ হাতে পড়লেই কয়েকটি বিজ্ঞাপন নিশ্চিত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, বিশেষ করে গহনার দোকানের নাম ও সেই গহনার তালিকা। তারমধ্যে আবার যে সব গহনার নাম অতীব চমকপ্রদ—চমকপ্রদ কথাটির উল্লেখ করছি এই কারণে যে, গহনার নামের সঙ্গে অর্থাৎ গহনার নামকরণ হয় আর একটি চমকপ্রদ জিনিষের নাম থেকে; যে সব জিনিষ আপনার মনকে হরণ করেছে এই সূত্রে যথা—[illegible] প্যাটার্ণ হল অথবা কোন বহু সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্রের নাম যেমন 'মানে না মানা' প্যাটার্ণ ইত্যাদি। এই প্যাটার্ণের নামেই নতুনত্ব, কিন্তু প্যাটার্ণ হিসাবে হয়তো দেখা গেল নতুনত্বের কোনো বালাই নেই। কারণ এর আঙ্গিকটা খুব সুশ্রী নয় এবং আঙ্গিক সুশ্রী করবার কোনো চেষ্টাও এই সব অলঙ্কারের মধ্যে দেখা যায় না। লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে প্রথমতঃ আজকালকার গহনা বেশীর ভাগই পাত থেকে কাটা—পাতলা গহনাকে ছাঁদ করলে কখনই ভালো দেখতে হয় না, কারণ যে পাতলা গহনা দেহের অঙ্গশ্রীকে কখনই অলংকৃত করতে পারে না। তবে এই সব নব-উদ্ভাবিত প্যাটার্ণ থেকে একটা জিনিষ অবশ্য জানা যায় তা হলো এই যে, প্যাটার্ণটি কবে প্রচলিত হয়েছিল তার একটা সঠিক তারিখও পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে এটুকুও জানা যায় সেই সময়কার লোকের রুচিজ্ঞান কি ছিল।

বাংলাদেশের অলঙ্কার-শিল্পের বিচিত্র ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় বাংলার পুরুষ আর গৃহলক্ষ্মীর আভরণশ্রীর উপকরণ আয়োজনে একটা বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ করে এসেছে বিভিন্ন যুগে তার বৈচিত্র্যের সমাবেশের মধ্যেও একটি মূল ভাবধারা বিভিন্ন পরিকল্পনায় রূপায়িত হয়ে এসেছে! আধুনিক অলঙ্কারশিল্পে তাই দেখা যায় প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি কিছু পরিবর্তিত অথবা পরিমার্জিত সংস্করণে! ইয়ারিং মাকড়ির স্থান এখন অধিকার করেছে সে যুগের সেই কর্ণ-কুণ্ডল বা ঝুমকো, প্রাচীনার কানের কানঝাপটা এখন সংক্ষেপ করে পাশা বা কানদোলা হয়েছে। বেসলেট ও চেনচুড়ির স্থানে এখন শোভা পায় কঙ্কণ চুড়, কণ্ঠে আবার দোদুল্যমান হয়েছে সেকালের পুষ্পহার বা সাতনরীর জায়গায় মুক্তার হার বা সুবর্ণমালা, প্রাচীনার কলার বা চিকের স্থান জুড়ে বসেছে হালের রং ঢং করা জয়পুরী প্যাটার্ণের চিক বা কলার। মাথার অলংকারের মধ্যে সেকালের টায়রা বা ঝাপটার জায়গায় অধুনা সিঁথি বা টিকলির ব্যবহার!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাট্যে মানুষের চিরনবীনতা সম্পর্কে যে ভাবটি ব্যক্ত করে ছিলেন— "বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম

বারে বারে,
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে।"

আজকের দিনের নবীনারাও কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নিশ্চয়ই প্রাচীনার কাছে এই কথাই বলতে পারবেন যে, অলংকারের ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রাচীন লুপ্ত হয়নি, আবার ফিরে এসেছে নবীনরূপে অর্থাৎ একটু পরিবর্তিত হয়ে। এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না প্রাচীনার যে অলঙ্কার শিল্পের প্রচলন নবীনাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, তার গোড়াপত্তন করেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার পুরনো শিল্প ও সংস্কৃতির সমাদর একদিন তাঁরাই বাংলাদেশে করে প্রাচীনের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তুলনা করতে গেলে [illegible] মনে হয় নবীনাদের সঙ্গে সঙ্গে নবীন ও প্রাচীনের মিলন ঘটেছে! বাংলার এই অলংকার শিল্প আজ পরিকল্পনার বৈচিত্র্যে ও শিল্পীর নিপুণ হাতে পড়ে শুধু ভারতে নয় [illegible] পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক [illegible]

সজ্জাকরণ

কানবালা ও চিক

গ্রহণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কাল বিয়ের তারিখ ছিল। যদিও সমস্তটা রাত কেটেছে ফিরোজপুর এক্সপ্রেসের অসাধারণ ভিড়ের মধ্যে, যদিও সারা শরীর ক্লান্ত, ঘুমে ঝিম-ঝিম করছে এখন, আর কানের ভেতরে সমানে বাজছে ট্রেনের চাকার শব্দ—তবুও বেশ বোঝা গেল কালকে বিয়ের তারিখ ছিল একটা। থেকে থেকে যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ আঁচড়ে কাল যখন দুঃসহ প্রহর গণনা করেছে রাজেন, অন্ধকারের ঘূর্ণিতে লুটোপুটি খেয়েছে সমস্ত মন, তখন ঃ তখন অনেক বাঁশি আর সানাইয়ের শব্দে উৎকর্ণ হয়েছে সন্তোষ—স্রক্-চন্দনে সাজানো বধূর মুখের ওপরে কেঁপেছে যজ্ঞাগ্নির রক্তিমা, কত জুনিয়ার কেরাণী জীবনে শুধু একবারের জন্যে পেয়েছে আশ্চর্য একটা রাজকীয় মহিমা!

ক্যানিং লাইনের লোক্যাল ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে রাজেন ঘোর-ঘোর চোখে চেয়ে রইল। বালিগঞ্জ-ঢাকুরিয়া-যাদবপুর-গড়িয়া। কলকাতার শহরতলী পড়ে আছে দুধারে। দুটি-একটি প্যাণ্ডেল দেখা যাচ্ছে এদিক-ওদিক, চেয়ারগুলোকে ভাঁজ করে তোলা হচ্ছে লরীতে, কুকুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে এখন কলাপাতার রাশিতে গোরুর ভিড় সুরু হয়েছে। প্রায়ই এক-আধটি বর-কনে চোখে পড়ছে স্টেশনে। ঢাকুরিয়া স্টেশনেই দেখা গেল দু[illegible]

বানে—দীর্ঘদেহ সুপুরুষ বর—সঙ্গে মেয়েদের একটা বিরাট দল—উচ্চবিত্ত না হোক, উচ্চ-মধ্যবিত্ত তো বটেই। আর একটি নববধূ কুঁজো হয়ে বসে আছে লোহার বেঞ্চিতে—পরনে সস্তার বেনারসী, ময়লা হাড় বেরকরা হাত, পায়ে মোটা আলতার রেখা; বরের গায়ে জ্যাল-জেলে সিল্কের শার্ট—পেশীবহুল কালো শরীরে কঠিন বাস্তবের ছাপ—শ্রমিক বলে চিনতে ভুল হয় না।

এমন হতে পারে, ওই দীর্ঘকায় সুন্দর মানুষটিই হয়তো এর কারখানার মালিক। হতে পারে এ হয়তো ওরই মোটরের ড্রাইভার কিম্বা ক্লীনার। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের দুজনের মর্যাদাই এক। পাশাপাশি দুটি রাজকুমার—যারা অনেক দুরন্ত অভিযান শেষ করে বীরের গলায় বরমালা পেয়েছে। এখন দুজনেই দুজনের দিকে তাকাতে পারে সমমর্যাদার সরলরেখায়।

রাজেনের জীবনেও এমনি একটি দিন এসেছিল একবার। কিন্তু—

ঢাকুরিয়া স্টেশন পেছনে থমকে গেছে অনেকক্ষণ। এখন লাইনের ধারে অপরিচ্ছন্ন ঝোপ-ঝাড় আর নানা রঙের বাড়ির টুকরো টুকরো। একটা খোলার বস্তি—মোষের খাটাল। কর্দমাক্ত বীভৎস আবর্জনার ভেতরে কতগুলো শুয়োর লুটোপুটি খাচ্ছে। গায়ের ভেতরে কেমন ঘিনঘিন করে উঠল।

সেই বিস্বাদ দিনটা মনে পড়ে যাচ্ছে। জোর করে বাবা বিয়ে দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজেন বিদ্রোহী হতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস ছিল না মাথা তোলবার; পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পা দুটো আঁকড়ে ধরেছিল অনিশ্চয়তের ভয়। চিরদিন নিশ্চিন্ত আদরে বড় হয়ে ওঠা রাজেন অ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকি নিতে উৎসাহ পায়নি সেদিন।

মাথা নিচু করে—প্রায় ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেবার ভঙ্গিতে বিয়ে বাড়িতে পৌঁছেছিল রাজেন। কিন্তু শঙ্খের প্রথম শব্দটাই যেন বুকে এসে বিঁধেছিল বন্দুকের গুলির মতো—উলুধ্বনি শুনে মনে হয়েছিল হৃৎপিণ্ডের ওপরে করাত চলছে তার। চিৎকার করে বলতে চেয়েছিল, আমাকে বাঁচাও লতিকা, আমাকে তুমি বাঁচাও—

আর হয়তো সেই সময় আকাশে প্রথম-ফোটা তারার দিকে তাকিয়ে লতিকা তারই কথা ভাবছিল। ভাবছিল, রাজেন তাকে কোনোদিন ঠকাবে না। অথচ ঠিক তখন—

পরাজিত পৌরুষের লজ্জা নিয়ে এতক্ষণ নিজের মধ্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে ছিল রাজেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে সুরবালার হাত তার মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল—তৎক্ষণাৎ আর একজনকে ঘৃণা করবার অধিকার এল রাজেনের। তখনি মনে হল, এই মেয়েটাই চক্রান্ত করে তার আর লতিকার ভেতরে চিরকালের ব্যবধান এনে দিয়েছে। এইবারে এর ওপরে শোধ নিতে পারে রাজেন। জর্জরিত করতে পারে আঘাতে আঘাতে। প্রতিদিন মনে করিয়ে দিতে পারে—এখন সে একান্তই রাজেনের করুণার পাত্রী। এমনকি, এই যে ছোট হাতখানা তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে, ইচ্ছামাত্র রাজেন একটা কঠিন পেষণে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারে তার হাড়গুলো। অসহ্য যন্ত্রণায় মেয়েটার মুখের চেহারা কি রকম বিকৃত হয়ে উঠবে—তার একটা কাল্পনিক রূপও সে ভাবতে চেয়েছে হিংস্র উল্লাসে।

কিন্তু অতটা ইতর নয় রাজেন। গায়ে একটা দৈত্য শক্তি আছে বলেই তার প্রয়োগ করতে প্রবৃত্তি হয়নি তার। সবচেয়ে সহজ রাস্তাই বেছে নিয়েছে সে। বিয়ের তিন দিন পরেই নিরুদ্দেশ হয়েছে সে।

তারপরে আট বছরের একটা বেপরোয়া জীবন। এম. এস-সির ডিগ্রী ছিল, আর ছিল স্পোর্টস্-জিম্‌নাষ্টিকের বহু মেডেল-কাপ-প্রশংসাপত্র। সামান্য চেষ্টা করতেই কাণপুরের একটা বড় ট্যানারীতে কেমিষ্টের কাজ জুটল।

পাঁচ বছর পরে বাবার কুশল সংবাদ চেয়ে বাড়িতে চিঠি লিখল রাজেন।

খবর এল দুটো। বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, বাবা খুন হয়েছেন। আর তার স্ত্রী সুরবালা—মৃত্যুর চাইতেও চরম লজ্জা আর লাঞ্ছনা বইতে হয়েছে তাকে। এক মাস পরে সে এসেছে হাসপাতাল থেকে। চিঠির জবাব দিয়েছিলেন এক জ্ঞাতি কাকা।

পাঁচ বছর পরে নিজের ওপর হিংস্র ক্রোধে রাজেনের আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়েছিল। ভেবেছিল, টেবিল থেকে ধারালো ছুরিখানা তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয় গলায়। এত শক্তি এত শক্তি তার গায়ে। প্রতি মুহূর্তে নিজের পেশীতে পেশীতে সে অনুভব করে খরধার রক্তের স্পন্দন, প্রত্যেক দিন বিকেলে ঘোড়া ছোটাবার সময় উদ্দাম আনন্দে তার মনে হয়—এই সময় একটা সিংহ এসে তার সামনে দাঁড়ালে সে তাকে খরধার ভাবে... (illegible) নিয়ে তাড়া করত।

আর তার বাবা—তার স্ত্রী—

একমাস রাজেন ঘুমোতে পারল না। সারা রাত ঘরময় পায়চারী করতে লাগল, দু তিন দিন নিজের আঙুলে পিন্ ফুটিয়ে রক্ত বের করল। কিন্তু তবুও গ্রামে ফেরবার উৎসাহ পেল না রাজেন। যে স্ত্রীকে সে স্বীকারই করতে চায়নি আজ তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবে সে কোন্ অধিকারে? যাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার ছিল, ইচ্ছে করলেই যাকে সে বাঁচাতে পারত এই গ্লানি থেকে—কোন্ মুখে আজ তার সামনে গিয়ে সে বলবে, আমি দুঃখিত, আমায় ক্ষমা করো?

তারপরে তিন বছর ধরে নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করল রাজেন। উদ্দাম অসংযমে ভাসিয়ে দিলে জীবন। দুর্দান্ত বেগে ঘোড়া ছোটানোর ফলে মুখে ফেনা তুলে মরল ঘোড়াটা।

কিন্তু জ্বালা কিছুতেই নেভে না। কিছুতেই ভোলা যায় না এই অসহ্য আত্মগ্লানি। সুতরাং এতদিন পরে তিন মাসের ছুটি নিয়ে রাজেন দেশে ফিরছে।

কাল শুভলগ্ন ছিল—অনেক বিয়ে হয়ে গেছে চারদিকে। শানাই বেজেছে, শঙ্খধ্বনি উঠেছে, সপ্তর্ষির সঙ্গে অরুন্ধতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ নেমেছে অনেক লজ্জারুণ মুখের ওপর। এখনো প্যান্ডালগুলো সব ভেঙে ফেলা হয়নি, এখনো গোরুতে স্তূপাকার কলাপাতা নিয়ে জাবর কাটছে। আট বছর আগে যেদিন রাজেন বাড়ি ছেড়ে বিদায় নিয়েছিল—সেদিনও উৎসবের রেস এমনিভাবেই জড়িয়েছিল হাওয়ায়—ফুলশয্যার মালাগুলো তখনো শুকিয়ে যায়নি!

হঠাৎ চমকে উঠল রাজেন। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কাল সারারাত ফিরোজপুরে এক্সপ্রেসে অতন্দ্র জাগরণ বিশ্বসঘাতকতা করছে নাকি শরীরে? জোর করে চোখের ভারী ভারী পাতাদুটো টেনে ধরল সে। সর্বনাশ—ট্রেণ যে চম্পাহাটি পার হয়ে চলেছে! এখুনি নেমে পড়তে হবে।

উবু হয়ে পায়ের জুতোর ফিতে বাঁধতে শুরু করল সে। কী আশ্চর্য রকমের শক্তিহীন মনে হচ্ছে নিজেকে। যেন যে-কোনো সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে। একটা রাত্রির জাগরণেই কি এমন শক্তিহীন হয়ে পড়ে মানুষ?

পিয়ালী নদীর ধার দিয়ে অনেকখানি রাস্তা। সেই সব—কিছুই বদলায়নি। সেই ঘোলা জলে খুশির মতো সূর্যের আলো দুলে চলেছে—সেই কালো কালো জেলে নৌকোর গতিবিধি।

[illegible] কঠিন মুখের
একদিকে আলো, একদিকে অন্ধকার

মাথার ওপরে সেই পুরোনো শঙ্খচিলের পরিক্রমা, মাছরাঙার নীল শরীর আর লাল ঠোঁটে পান্না-চুনীর দীপ্তি। জলে এক একটা আলোড়ন তুলে সেই শুশুকের দীর্ঘশ্বাস!

একহাতে ভারী একটা এয়ার-ট্রাভেল্ ব্যাগ, অন্য এক হাতে রাজেনের বেশ-বাসের মতো অটোসাটো হোল্ড্-অল। নরম মাটির ওপরে জুতো চেপে চেপে পড়ছে—যেন কোমল একটা মাংসল শরীরকে দলে দলে চলেছে সে। কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে এসে চশমায় পড়ল—একবারের জন্যে বাঁ চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল। হোল্ড-অল নামিয়ে চশমা মুছে ফেলবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল রাজেন।

—আরে, তুমি!

আট বছর পরে বাংলা দেশে—তার নিজের দেশে প্রথম পরিচিতের সম্ভাষণ। হাত কেঁপে উঠল রাজেনের একটু, হলেই চশমাটা নিচে একরাশ কাদার মধ্যে পড়ে যেত।

নিমাই পাল। গ্রামে গোলদারী দোকান। বেঁটে রোগা মানুষটার মাথা জোড়া সেই পুরোনো টাকটা আজো তেমনি চকচক করছে। আরো দু পা সামনে এসে থমকে গেল নিমাই পাল। যেন রোদের দিকে তাকাচ্ছে এইভাবে একটা হাতকে ফণার মতো বাঁকিয়ে চোখের ওপর ধরল।

—আরে, আমাদের রাজেন নয়?

অস্বীকার করতে পারলেই খুশি হত যেন। যেদিন সে এখান থেকে পালিয়ে চলে গেছে, সেদিন থেকেই সে অপরাধী হয়ে আছে সকলের কাছে। চারদিকে তার প্রতি ধিক্কার—চারদিক থেকে সকলে যেন রুক্ষ ভাষায় কৈফিয়ৎ চাইছে তার কাছে। পাথরের মতো চওড়া তোমার বুক, গায়ে তোমার দৈত্যের মতো শক্তি। তবু তুমি কয়েকটা ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাতে পারোনি তোমার বাপকে—রক্ষা করতে পারোনি তোমার স্ত্রীর সম্মান!

যেন কিছুই হয়নি, যেন মাত্র একবেলার জন্যে সে গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিল, এমনি একটা সহজ ভঙ্গি গলায় আনতে চাইল রাজেন: হাঁ, এই এলাম। ভালো আছেন আপনারা?

কেমন হকচকিয়ে গেল নিমাই পাল। এটা ঠিক আশা করা যায়নি।

—আমরা তো আছি একরকম, কিন্তু তোমাদের বাড়িটার দিকে আর তাকানো যায় না। কেবল মনে পড়ে—বেশ ভণিতা করে শুরু করেছিল নিমাই পাল—পুরো আধঘন্টা বিস্তৃত একটা উপদেশ দেবার জন্যে তৈরী হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু রাজেন মাঝপথেই থামিয়ে দিলে তাকে।

—আচ্ছা, পরে কথা হবে নিমাইদা—এখন চলি।

নিমাই পাল হাঁ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। দেখতে পেল, নরম মাটির ওপরে ভারী জুতোর ছাপ আঁকতে আঁকতে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হচ্ছে রাজেন।

বাড়ী পৌঁছুল আরো আধঘন্টা পরে।

সামনের আমের বাগানটা জঙ্গল হয়ে গেছে—কলমের গাছগুলো বেয়ে উঠেছে বুনো লতা। বাতাবী লেবুর মস্ত গাছটা কবে ঝড়ে জুটিয়ে পড়েছে—একটা গর্ত রয়েছে সেখানে। সদরে ঢোকবার চওড়া রাস্তাটা একটি সরু ফালির মতো ঢাকা পড়তে চলেছে শ্যামলতার নিবিড় বন্যতায়।

একবারের জন্যে থমকে দাঁড়াল রাজেন। একবারের জন্যে মনে হল, মাটির ভেতর থেকে যেন তার পা দুটো ধরে টেনে নিতে চাইছে কেউ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত কে জানে! হয়তো অপেক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত আর ঢোকবার সাহসই সঞ্চয় করতে পারত না। তারপর এক ফাঁকে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথেই পালিয়ে যেতো চোরের মতো—নিমাই পাল ছাড়া আর সাক্ষী থাকত না কেউ। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা খালি ঝুড়ি হাতে করে বেরিয়ে এল বাড়ীর বুড়ো কৃষাণ একজন। প্রথমটা কিছুক্ষণ ভূত দেখার মতো চেয়ে রইল, তারপরে চিৎকার জুড়ল হাউ হাউ শব্দে।

—দাদাবাবু, শেষ পর্যন্ত তুমি ফিরলে!

(ইহার পর ৬৩ পৃষ্ঠায়)

মাটির মূর্তি

বাণী রায়

আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত

মাধবী মিত্র ও তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্রী রঞ্জনা একসঙ্গে থাকতে পারে না। ঝাউগাছ মাথা হেলিয়ে বলে দিল, আমার চলে যাওয়াই মঙ্গল।

মাধবীদি বললেন, "এভাবে চলে যাচ্ছ, রঞ্জনা! আজ না গেলেই কি হ'ত না?"

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ—শাদা চুলে, কালো চুলে ঘেরা বেষ্টনী। ঋষাণীর মত সেইমুখে অনেক রেখার দাগ আজ। সেই প্রশান্ত কপালে কয়েকটি আঁচড়। আমার মন বলল: না গেলে হ'ত না। তোমার চরম পরাজয় আর তো আমি দেখতে পারব না। প্রকাশ্যে মাধবী মিত্রের ছাত্রী রঞ্জনা পালিত বলে উঠল, "না গেলেই নয়"।

কৃষ্ণচূড়ার গাছে অনেক ফুল—আগুনে জ্বলে উঠেছে পাতার আগায় আগায়। মাধবীদি অনমনা চেয়ে রইলেন।

ফুলের গাছে আগুন, সূর্যের পরিমণ্ডলে কাল মেঘে আগুনের ভস্ম আর ধোঁয়া। আমার মনে: নৃশংস বসন্তের সর্বগ্রাসী আমন্ত্রণ। কেঁপে উঠলাম। বলে উঠলাম, "যেতেই হবে।"

মাধবী মিত্রের ছাত্রী ছিলাম। ছাত্রী জীবন শেষ হবার পরেও যোগ ছিল শিক্ষয়িত্রীর সংগে। জননী হয়েছিলেন আত্মীয়া। চল্লিশের ঊর্ধে তাঁকে আবার অতি কাছে থেকে দেখছি দীর্ঘদিন পরে।

মনে পড়ে গেল বিগত দিনের কৃতজ্ঞতার সমস্ত স্মৃতি। যেন আলনায় এলোমেলো রক্ষিত পোষাক। একটায় টান পড়লেই একে একে খসে যায়।

মনে পড়ে গেল— অলস দিনে, দেহাতের তেঁতুল পাতা দোলানো বাতাসে মনে পড়ে গেল, মাধবীদি আমার কত করেছেন! শিক্ষা দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে আমার কিশোর জীবন উনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অযাচিত দাক্ষিণ্যে তাঁর অভ্যস্ত ছিলাম। প্রতিদানের কথা মনে আসেনি। তিনি যেন দিয়েই কৃতার্থ হতেন। আমি নিয়েই কেবল আমার পরম কর্তব্য করে গেছি। এতদিনের অলক্ষিত ঋণ তাই অবশেষে নির্মম হাত বাড়িয়েছিল। আবার নিতে এসেছি। এম-এ পরীক্ষার পরে রোগ ধরেছিল। জীবনে হয়তো স্বাস্থ্য ফিরে পেতাম না। মধ্যবিত্ত সংসারে মাতৃহারা কন্যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়তো হ'ত না। নিরানন্দ আমার গৃহে নিষ্কর্মা দিনযাপনের বন্ধন গ্লানি থেকে মুক্ত বাতাসে ডেকে এনেছেন ইনি। যে যত্ন বিগতা জননী দিয়ে যেতে পারেন নি, সে যত্ন পাচ্ছি এঁরই কাছে। তিনি শুধু আমাকে শিক্ষা দেননি, তিনি যে আমাকে জীবনও দিলেন। তবু—শেষ পর্যন্ত আমাকে পালিয়ে আসতে হ'ল।

বসন্ত-বিহ্বল বনের প্রান্তে, ছোট টীলার ধারে, নীলাভ হ্রদের সীমায় আমার মৃত স্বাস্থ্য পুনর্জীবন লাভ করতে প্রস্তুত হ'ল। মাধবীদি'র দুই-একটি রেখাসঙ্কুল মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্রদের তীরে ঘাসে বসে সন্ধ্যার আকাশে চেয়ে ভাবলাম: তরুণীর জননী হ'বার বয়স অদ্যাপি অর্ধ-প্রৌঢ়ার আসেনি। তবু, শিথিল-পেশী মুখের প্রতি রেখার মাধুর্যে তিনি যে স্নেহের কিরণ বিকীর্ণ করছেন, মাতৃস্নেহের মাধুরী ভিন্ন কি বলি? অনূঢ়া জননী তিনি—ভার্জিন মেরী। দ্বিতীয় খৃষ্টের প্রতীক্ষায় অস্তন্দ্রা।

ভিড় অঙ্গে তুলে দিল—গৈরিক খদ্দর; পথের ধূলোর মিল ছিল সেখানে।

মহনীয়ার পরিবর্তন হয়েছিল অসাধারণ। সরকারী গণ্ডীর বাইরে মাধবী মিত্র ছিটকে পড়লেন। যাঁকে উদ্দেশ করে এত ত্যাগ, সেই প্রেমিক কারাবাসে বিনষ্ট হ'লেন।

অস্তরাগে রঙীন হ্রদের ধারে বসে একটি প্রশ্ন বারে বারে মনে ফিরে আসে। নিঃশব্দ উপস্থিতি মাধবীদির থাকে পাশেই—তর্জনী তোলা তাঁর: রঞ্জনা, তোমার সন্ধান আমাকে পীড়া দেবে কেবল। তুমি যে আমার সন্তানের মতই।

দুই হাতের একাগ্র নিবিড় পীড়নে হঠাৎ আমার পূর্বার্ধ তৃণশয্যায় লুণ্ঠিত হলো

মনে পড়ে গেল অতীত। অর্থ ও আভিজাত্যে বহুদৃষ্টিস্নাতা বিদুষী মাধবী মিত্রকে। অক্সফোর্ড বিদায় সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা, দীপ্তি ও খ্যাতিতে অনন্যা।

তারপর—? অতি পুরাতন সে কাহিনী। সমুদ্রের তরঙ্গ এল জীবনে। মাধবীর প্রসাধন মুছে গেল রাজনীতির ঘর্মক্ষরণে। বিচ্যুত হ'ল আভরণ জনসভার মণ্ডপতলে। মিছিলের

মনের অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। দেহাতী গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে নূতন জীবন গড়ে তুলেছেন মাধবীদি। দেশকে আবৃত করে এঁর জীবনপটে একদিন মানুষ জেগেছি'ল তার প্রেম নিয়ে। ছাত্রীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহে অধ্যাপনার দিনও ছিল তন্ময়। সেই আবেগ,

(ইহার পর ১৪৫ পৃষ্ঠায়)

হিম

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এলাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঠিক রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় ক্রয়ডনে এসে পৌঁছলাম। বিলেতে আসবার পরদিনই হয়তো আমি স্টিভেন্স আর মিরিয়মের সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। কিন্তু এতদিন ঠিকানা জোগাড় করতে পারিনি।

প্রায় পাঁচ বছর পর আমি আবার লণ্ডনে এলাম। ভারতবর্ষে ফিরে যাবার দিন থেকেই ভেবেছিলাম মিরিয়ম আর স্টিভেন্সকে চিঠি লিখবো, ওদের সঙ্গে চিরকাল যোগাযোগ রাখবো, যদি আবার কোনদিন বিলেতে বেড়াতে আসি তাহলে ওদেরই বাড়ীতে উঠবো। কিন্তু আশ্চর্য, এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে আমি ওদের চিঠি লেখবার অবসর করে উঠতে পারিনি। যখন জাহাজে চড়বার দিন ঠিক হয়ে গেল তখন অবশ্য বার বার মনে হয়েছিলো একবার ওদের একটা খবর দিলে হয়।

সেকথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি লণ্ডনে ওদের পুরোনো ঠিকানায় চিঠি ছেড়েছিলাম। ওরা সেটা পেলে নিশ্চয়ই আমাকে নিতে স্টেশনে আসতো। ওদের কাউকে স্টেশনে না দেখে আমি তখনই বুঝে নিয়েছিলাম হয় ওরা এখন লণ্ডনে নেই অথবা বাড়ি বদলে অন্য কোনো পাড়ায় উঠে গেছে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। অর্থাৎ ওরা বাড়ি বদলেছে। কিন্তু ওদের সন্ধান পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি. টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে স্টিভেন্সের নাম দেখে আমি একদিন ফোন করলাম। কিন্তু কিছুতেই উত্তর না পেয়ে আমি তাকে চিঠি লিখলাম। খুব শিগগিরই উত্তর পেলাম। আজ সকাল সাড়ে আটটায় স্টিভেন্স আমাকে আর এলাকে সাগ্রহে দেখা করতে লিখেছে।

এলার সঙ্গে মিরিয়ম আর স্টিভেন্সের আলাপ না থাকলেও ও আমার কাছ থেকে ওদের কথা এত বেশি শুনেছে যে, তাদের সম্বন্ধে তার অজানা বোধ হয় কিছুই নেই। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি যখন বিলেতে ছিলাম তখন ওদের অতিথি হয়ে থাকতাম। সবে স্টিভেন্সের বিয়ে হয়েছে, চেলসীর একটা ছোটো ফ্ল্যাট ওরা তখন ভাড়া নিয়েছিলো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি এসে ওদের বাড়িতে উঠেছিলাম। শুধু আতিথেয়তায় ওরা আমাকে মুগ্ধ করেনি, ওদের অজ্ঞাতে সংসারধর্ম পালনের কঠিন মন্ত্র ওরা যেন খুব সহজে আমাকে শিখাতে পেরেছিলো।

তখন আমার বিয়ে হয়নি। ঠিক ছিলো বিলেতের পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরলেই আমার বিয়ে হবে। আমি মিরিয়ম আর স্টিভেন্সকে দেখে মনে মনে কল্পনা করতাম, আমি যেন স্টিভেন্সের মতো স্বামী হতে পারি, আমি যেন আমার স্ত্রীকে অমন আশ্চর্য রকম ভালোবাসতে পারি, হাজার অসুবিধা হলেও নিজের সমস্ত স্বার্থ ভুলে পরম স্নেহে তাকে যেন সংসারের সব কাজে সাহায্য করতে পারি, তার সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার মুখের হাসি যেন কোনোদিনও মিলিয়ে না যায়।

আমার শপথ অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করেছিলাম। এত বেশি পালন করেছিলাম যে এলা অবাক হয়ে প্রায়ই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতো, কি অদ্ভুত ধৈর্য তোমার! এমন মানুষ আমি আর দেখিনি।

আমি হেসে বলতাম, আমার মধ্যে কি তুমি এত দেখলে এলা? কণ্ঠস্বরে গভীর দরদ মিশিয়ে এলা বলতো, তোমার মধ্যে আমি সমস্ত পৃথিবীকে পেয়েছি যে গো। তুমি সত্যিকারের পুরুষ!

এলার কথা শুনে গর্বে আমার বুক ভরে যেতো। আমি তার খুব কাছে এসে বলতাম, তুমি কবি, তাই আমাকে এত সুন্দর করে কথা বলতে পারছো—

বাধা দিয়ে এলা বলতো, কবি কি না জানি না, তবে বিয়ের আগে কিছু কিছু কবিতা লিখেছিলাম বটে। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর সত্যি যেন আমার নিজেকে কবি বলে মনে হয় আর. একটু থেমে আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও বলতো, তোমাকে নিয়ে অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

খুব আস্তে ওর সুন্দর কপাল স্পর্শ করে আমি বলতাম, লেখনা কেন?

কে বললো লিখি না? দিন রাতই তো তোমাকে নিয়ে আমি মনে মনে কত কবিতা লিখি তবু আমার আশ মেটে না। তুমি বুঝতে পারো না বুঝি?

আমি হেসে বলতাম, আমি কবি নই কি না। তাই এবার তুমি কাগজে-কলমে লিখে ওগুলো প্রকাশ করে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

এলা শক্ত করে আমার হাত ধরে বলতো, লিখবো বৈ কি। তোমাকে নিয়ে আমি সারা জীবন ভরে অজস্র কবিতা লিখবো। কোনোদিনও আমার ক্লান্তি আসবে না, তুমি দেখে নিও।

এলার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ কখন আমার মন সাত সমুদ্র পেরিয়ে ভেসে চলে যেতো চেলসীর একটি ছোটো ফ্ল্যাটের আনাচে-কানাচে। আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াতো স্টিভেন্স আর মিরিয়ম। তাদের আমি ভুলবো কেমন করে! এলা কি জানে তার মুখ থেকে এমনি প্রশংসার কথা শোনবার যোগ্য আমাকে কারা করে তুললো। কে আমাকে শেখালো আদর্শ স্বামী হতে! কারা আমাকে নতুন করে দেখালো সংসারের মধুময় রূপ!

আমি এত বছর পরেও মনে মনে ওদের সংসারের স্পষ্ট ছবি দেখতে পেতাম। কঠিন শীতের ভোরে স্টিভেন্স আস্তে আস্তে হাসিমুখে নিচে নেমে এলো ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে। তখনও মিরিয়মের ঘুম ভাঙেনি। ওকে জাগিয়ে কষ্ট দিতে চাইলো না সে। একেবারে খাবার আর চা তৈরি করে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো, মিরিয়ম! চোখ খুলে মিরিয়ম বললো, কি ভালো লোক তুমি! কাল আমি তোমাকে ব্রেকফাস্ট করে খাওয়াবো লক্ষ্মীটি!

স্টিভেন্সের কোনো ক্লান্তি নেই, তার মুখের হাসি মিলায় না। একটু পরেই তাকে অফিসে বেরোতে হবে, আর কথা বলবার সময় নেই। মিরিয়ম উঠে তার পাশে পাশে যেন ছায়ার মতো ফিরছে। সার্ট নিয়ে আসছে, টাই এগিয়ে দিচ্ছে, স্টিভেন্স কিছু না বলতেই বুঝে নিচ্ছে কখন তার কোন জিনিসের দরকার।

শুধু সার্ট টাই আর এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে কেন, জীবনের অনেক বড়ো ব্যাপারেও ঠিক একই রকম। কেউ মুখ ফুটে কিছু না বলতেই দুজনে বুঝে নিচ্ছে কার কখন কোন জিনিসের দরকার। সব চেয়ে তাই আমার ভালো লেগেছিলো। এই না চাইতেই পাওয়া, এই না বলতেই পরস্পরের প্রয়োজন অন্তর দিয়ে বুঝে নেওয়া। অফিস ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টিভেন্স বাড়ি চলে এলো। আর কোথাও ওর মন নেই, আর কোথাও ও মিরিয়মকে বাদ দিয়ে একা যাবে না। মিরিয়ম স্বামীর জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। স্বামী এলে ওরা দুজন এক সঙ্গে রান্নাঘরে গল্প করতে করতে রাত্তিরের রান্না সেরে নেবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে গ্যাস ফায়ার খুলে স্বামী-স্ত্রী লাউঞ্জে বসে অনেকক্ষণ গল্প করবে। আর কেউ নয়, শুধু স্টিভেন্স আর মিরিয়ম। গ্রীষ্মকাল হলে দুজনে বেরিয়ে পড়বে মাঠে ময়দানে কিংবা বায়স্কোপ-থিয়েটারে। পরস্পরের মনের বিপুল সম্পদের বিনিময়ে পরিপূর্ণ করে রাখবে সমগ্র জীবন। বন্ধু যে ওদের নেই তা নয়, কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বন্ধুর জন্যে এক মিনিটও ব্যয় করে না, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়া যেন তার আর কোনো বান্ধবীকেও চায় না।

সংসার করতে হলে এর চেয়ে বড়ো পাওয়া জীবনে আর কি থাকতে পারে! স্টিভেন্স মিরিয়মকে দেখতাম আর মনে মনে ভাবতাম এরা তো পরস্পরের কাছ থেকে কোনো কিছু আদায় করবার কোনো চেষ্টা করেনি। তাহলে এরা কেমন করে এত পেলো? তারপর ওদের পরিবারে অনেক দিন বাস করবার পর আস্তে আস্তে বুঝলাম ওরা পরস্পরের কাছ থেকে কিছু আদায় করবার চেষ্টা করেনি বটে কিন্তু বুঝেছে না চেয়ে কি করে পেতে হয় আর

তার জন্যে অনেকদিনের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে দু'জনে নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েছে।

এলা যখন আমাকে বারবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা বলতো তখন এক ফাঁকে আমি ওকে ষ্টিভেন্স আর মিরিয়মের কথা না বলে কিছুতেই পারতাম না। আমি তো ওদের দেখেই নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। বিলেত যাবার আগে আমি এমন শান্তভাবের সহনশীল মানুষ কোনোদিনও ছিলাম না। নিজের সামান্য অসুবিধার কারণ ঘটলে আমি চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করতাম।

অবশ্য আমার কথা বিশ্বাস না করে এলা বলে, দূর তাও কি কখনও হয়? এমন মাটির মানুষ তুমি যে তোমার ধৈর্যচ্যুতি কখনও ঘটতে পারে না। হাজার বললেও সেকথা আমি বিশ্বাস করবো না।

সত্যি বলছি এলা, আমি ষ্টিভেন্স আর মিরিয়মের কথা ভাবতে ভাবতে বলি, বিলেতে ওয়াটসন দম্পতিকে দেখে আমার অনেক ধারণা বদলে গেছে—

এলা হেসে বলে, তবু তো তোমার ধারণা বদলেছে। কিন্তু আমি আরও অনেক বিলাত ফেরৎ দেখেছি, তারা দেশে থাকতে যাও বা ভাল ছিলো, বিলেত থেকে ফেরবার পর তাদের দাপটে পাষাণ ফাটে।

তারা যে মিরিয়ম ষ্টিভেন্সকে দেখেনি।

এক মিনিটের জন্যে চোখ বন্ধ করে কি ভেবে এলা বলে, ওদের কথা তোমার কাছ থেকে প্রায় শুনি। এত বেশি শুনি যে ওদের না দেখেই আমি বুঝে ফেলেছি। আমার ওদের বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওদের দেখা হবে। অাপিসের কাজের জন্যে আমাকে শিগগিরই মাস ছ'য়েকের জন্যে আবার বিলেত যেতে হবে তখন তুমি তো সঙ্গে যাবেই।

একথাও রেখেছিলাম। বিলেত থেকে ভারতবর্ষের জাহাজ ধরবার দিন থেকে আমি আবার কবে ওদেশে বেড়াতে যাবো—আবার কবে ষ্টিভেন্স মিরিয়মকে দেখবো—তাই ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। বস্তুত, দেশ দেখবার চেয়ে ওই দম্পতিকে দেখবার ইচ্ছা আরও প্রবল ছিলো। তারপর এলার সঙ্গে বিয়ে হবার পর বারবার মনে হয়েছিলো ওর একবার ইউরোপ ঘুরে যাওয়া দরকার। এলা কবি। সে শুধু ভালো কবিতা লেখে না, লেখাপড়ার দিকে তার খুব বেশি ঝোঁক। বিশেষ করে আধুনিক ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে ওর আশ্চর্য দখল আছে।

যেদিন আপিসের কাজের জন্যে মাস ছ'য়েকের জন্যে আমি সস্ত্রীক বিলেত যাবার অনুমতি পেলাম সেদিন চোখেমুখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসে এলাকে বললাম, সব ঠিক হয়ে গেছে এলা, আসছে মাসে বিলেত যাচ্ছি।

এলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, এবার তাহলে ষ্টিভেন্স আর মিরিয়মকে সব খবর দিয়ে চিঠি লিখে দাও।

হ্যাঁ লিখবো, কিন্তু ওদের চিঠি লেখবার কথা মনে হতেই আমার কেমন যেন ক্লান্তি আসে। কিছুতেই কলম ধরতে ইচ্ছে করে না। আজ লিখবো, কাল লিখবো করে শেষ অবধি লিখা আর হয়ে ওঠে না। আজ পাঁচ বছর ধরে তাই হচ্ছে। আসলে ওরা যে আমার চেয়ে সাত হাজার মাইল দূরে আছে সে কথা বিশ্বাস করতে মন চাইতো না। ওরা যেন আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে। কেমন করে ওদের দূরের মানুষ বলে মনে করবো। আমার সংসারের চারপাশে আমি সব সময় ওদের ঘুরে ফিরতে দেখতাম। তাই শেষ অবধি চিঠি লিখে খবর দেয়া নেয়া আর হয়ে ওঠেনি।

আমি আবার নতুন করে বিলেত যাওয়ার আয়োজন সুরু করলাম। এলাও প্রস্তুত হতে লাগলো। তারপর কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল জানি না। সহসা একদিন দেখি মাঝ সমুদ্রে জাহাজের ডেকে আমি আর এলা বসে আছি।

অদ্ভুত ভালো লাগছে, ও হেসে বললো, কিন্তু তোমাকে আমার আরও ভালো লাগে।

অন্য যাত্রীরা ডেকে আনন্দ করছে। নাচ গান হাসি তামাশা—আরও কত কি! আমাদের কিন্তু কিছুতেই মন নেই, অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। নির্জনে এই পাশাপাশি বসে থাকা, এই তো জীবনের পরম লগন। এ লগ্ন আমাদের বড়ো চেনা, আমরা একে বয়ে যেতে দেবো না। আমাদের জীবনে এ লগ্ন অমর।
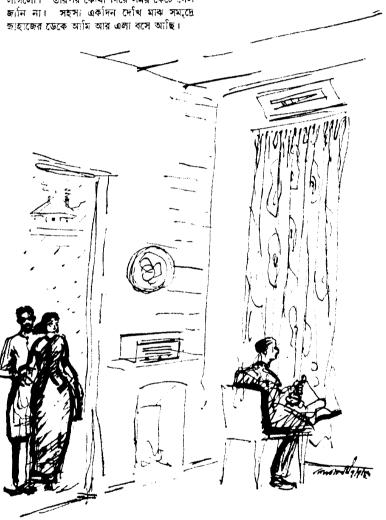
ষ্টিভেন্স আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো

সমুদ্রের বুকে আমি যেন এলার নতুন রূপ দেখলাম। ওর কালো চোখে শুধু গভীর বিস্ময়। উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে ও সারাদিন চেয়ে থাকে, মাথার ওপর বিশাল আকাশের সংগে ও যেন কথা বলে। তারপর চোখে প্রচুর স্নেহ নিয়ে এক সময় আমার খুব কাছে এসে বসে একটা হাত কোলে তুলে নেয়।

সমুদ্র কেমন লাগছে এলা? আমার হাতে সিগ্রেট জ্বলে।

জাহাজের দোলায় এলাকে আমার আরও আপনার বলে মনে হয়। ওর সংগে নানা প্রলাপ বকতে ইচ্ছে করে। বেশ অনেক বছর হলো তবু ওর সংগে প্রলাপ বকবার সাধ আমার মিটলো না।

ছেলেমানুষের মতো আমি প্রশ্ন করলাম, আমাকে তোমার এত বেশি ভালো লাগে কেন এলা?

(ইহার পর ১৫১ পৃষ্ঠায়)

যাত্রী

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তোমার এ পান্থশালা বারবার ভরিল উৎসবে;
জীবনের জয়গান গাহিল প্রভাত,
সন্ধ্যা দিল কুসুম-অঞ্জলি
দিনান্তের অঞ্চল ভরিয়া।
এলো যারা রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে,
প্রভাতেরে দিয়ে গেল দিনের বারতা;
রেখে গেল স্মৃতি।
বলে গেল কানে কানে,
এ রাত্রি প্রভাত হলো যাহাদের উদাত্ত আহ্বানে,
তারা তব প্রাণের অতিথি।

ওই যারা দিনের পথিক
আলোর জোয়ারে তুলি পাল,
পাড়ি দেয় সমুদ্র পর্বত;
তাহাদের রথ
থামে না জীবনদ্বারে।
মনের গহন অন্ধকারে
খুঁজে মরে রাত্রিদিন মৃত্যুর বারতা।
সৃজনের মহাবীজ দীর্ণ করি, কপিশ-পিঙ্গল
ভ্রূকুটি-ভয়াল-মহাকালে
করে আরাধনা;
ধরিত্রীর প্রতি ধূলিকণা
মৃত্যুর তাণ্ডবে ওঠে নাচি।
কাঁপে হিরোশিমা,
সমুদ্র পর্বত শিহরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
ধূম্রাচ্ছন্ন বহ্নিশিখা
ম্লান করে আকাশের নিবিড় নীলিমা।

প্রকৃতির করুণা নির্ঝর
অর্গল ভরিল যেথা মিটাইতে মানুষের তৃষা;
ও পান্থ ধরিত্রীর রিক্ত বক্ষ ভরি
মাতৃস্তন্য সুধাধারে,
দিল তারে
অপরূপ ঘন শ্যামলিমা।
ক্ষুধিতের ক্ষুধার ফসল!
দিগ্ধ সে তুষার-বুকে
ওরা জ্বালে মৃত্যুর অনল।
তাহাদের করিও না ক্ষমা,
রেখো না তাদের স্মৃতি।
মসীলিপ্ত গাঢ় অন্ধকারে
নিভে যাক জীবনের শিখা; মুছে যাক ওরা।
ওরা ভাম্পায়ার!
পথশ্রান্ত পথিকের শিয়রে বসিয়া,
মেলিয়া ধূসর ডানা ব্যজনী দুলায়;
আনে ঘুম ক্লান্ত আঁখিপাতে।
পরম উল্লাসে
মিটায় শোণিত তৃষা তীক্ষ্ণ চঞ্চুপুটে।
বিলাস-লালসা-স্ফীত দৃপ্ত বক্ষ তলে
কাঁদিতেছে ক্ষুধিত শ্বাপদ;
প্রলুব্ধ গৃধিনী
মাতিছে উল্লাস-বিগলিত শবগন্ধে।
ওরা ক্রীতদাস!
উৎকর্ণ ইন্দ্রিয় জাগে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ-পীড়নে;
উলঙ্গ প্রেতিনী
সুরত-সুরভিমত্তা নাচে ধমনীতে।

নন্দন কাননে
শ্বাসরুদ্ধ কাঁদিছে দেবতা,
বদ্ধ নাগপাশে।
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
তেজস্ক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রী-পঙ্গু-মূক নর
কাঁপে থর থর!
ওরা পান্থ এ পান্থশালায়?
কুসুমিত মাধবী কাননে,
স্নেহাসিক্ত তুষার-কণায়
রাত্রিদিন নরকের আগুন জ্বালায়!
দিকভ্রান্ত দানবের মত,
মানবের দ্বারে ওরা হানে করাঘাত,
আণব-অশনি হানি।
তাহাদের করিও না ক্ষমা।
নৃশংস জল্লাদ ওরা,
মানুষের উষ্ণ রক্তে ভরিছে খর্পর,
স্নায়ুহীন কবন্ধ-কিন্নর।
পৃথিবীর দ্বারপ্রান্তে ওরা
পুঞ্জীভূত কলুষ কংকাল!
কদর্য জঞ্জাল!
না-না-না, ওগো না:
তাহাদের করিও না ক্ষমা।
দাও অভিশাপ:
আত্মঘাত দাবানলে পুড়ে হোক ছাই
যত মহাপাপ।
তোমার এ পান্থশালা ভরিয়া উৎসবে,
আসুক নূতন দিনে নব যাত্রীদল।
হোক অভিষেক:
মৃত্তিকায় সোনার ফসলে
তুষারে উঠুক ফুটে মানুষের তৃষ্ণা-শতদল।

গ্রহণ

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

আর পালানোর উপায় নেই। চোখ বুজে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মতো বাড়ীর ভেতরে পা দিলে সে।

কিন্তু সুরবালাকে কোথাও দেখা গেল না। এই পুরোনো বড় বাড়ীটার একরাশ ফাটলধরা ঘরে কোনখানে সে ডুব দিয়েছে কে জানে। শুভ দৃষ্টির সময় একবার যার মুখের দিকে তাকিয়েও দেখেনি রাজেন—ফুলশয্যার রাতে যার ঘোমটা একবারের জন্যে সরাতেও সে উদ্যম বোধ করেনি—একা অন্ধকার ছাদে দাঁড়িয়ে শুধু ভেবেছে লতিকার কথা, সেই সুরবালা কেনই বা আসবে তার কাছে! রাজেন তার সম্পূর্ণ অপরিচিত—সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। সৌভাগ্যের দিনে যে মুখ তুলে চায়নি—দুর্ভাগ্যের লজ্জা বয়ে কেন সুরবালা আসবে তার কাছে!

সেই বুড়ো কৃষাণই সব ব্যবস্থা করে দিলে। ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে গেল দুতলায়, খুলে দিলে দক্ষিণের ঘর। এই ঘরেই ফুলশয্যার ব্যবস্থা হয়েছিল তার—রাজেনের মনে পড়ল। সেই নতুন খাট আর ড্রেসিং টেবিল এখনো পাতা আছে, শুধু তাদের ওপর জমেছে আট বছরের ধুলো।

ধুলো ঝেড়ে বিছানা পাতলে লোকটা—ভেতরে গিয়ে আলনাও টেনে আনল একটা। ব্যাগ খুলে কয়েকটা জামা-কাপড় সাজিয়ে দিলে তাতে। তারপর জানতে চাইল: চা খাবে দাদাবাবু?

—পেলে তো ভালোই হয়।

কৃষাণ ভেতরে চলে গেল। সেই-ই তা হলে বাড়ির দেখা-শোনা করে এখন। লোকটা বিশ্বাসী, সুরবালা ভালোই আছে মনে হয়।

গায়ের শার্টটা খুলে রাজেন জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। দূরে পিয়ালী নদী ঝলমল করছে রোদে। ঠিক আট বছর আগে যেমন দেখাত, সেই রকম। ওই দিকে তাকিয়ে রাজেনের চোখ জ্বালা করতে লাগল। বার বার মনে পড়তে লাগল কাল সমস্ত রাত অসহ্য ভীড় আর ক্লান্তিকর জাগরণের মধ্যে কেটেছে তার—ফিরোজপুর এক্সপ্রেসের চাকার আওয়াজ এখনো বেজে চলেছে মাথার মধ্যে।

জানালার গরাদে ধরে ভাবতে লাগল, এখন কী করবে, কী করবার আছে তার। কাছে ডাকবে সুরবালাকে? সান্ত্বনা দেবে? কিছু টাকা গুঁজে দেবে হাতে? বলবে, এখন থেকে আমি নিয়মিত খোঁজ-খবর নেব তোমার, টাকা পাঠাব মাসে মাসে?

কিন্তু সুরবালাকে ভালোবাসেনি বলেই কি সে তাকে অপমান করতে পারে? বিশেষ করে এই সময়?

পেছনে পায়ের শব্দ। রাজেন চমকে ফিরে তাকালো। অবচেতন আশাটা মুখ থুবড়ে পড়ল তার। সুরবালা আসেনি—বুড়োই চা নিয়ে এসেছে।

—চা খেয়ে নিয়ে হাত-মুখ ধোও দাদাবাবু। তারপর খাবার এনে দিচ্ছি।

উগ্র কৌতূহলটা গলার কাছে এসে থমকে গেল। জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না।

বিছানার কোনায় বসে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিলে রাজেন। কোনো স্বাদ নেই কোথাও। শুধু একটা অসহ্য উত্তাপে পুড়ে যেতে চাইল ঠোঁট দুটো।

—চা কে করেছে?—ইচ্ছা সত্ত্বেও রাজেন প্রশ্নটাকে ঠেকাতে পারল না।

—আমি। বৌদি তো এখন পুজোর ঘরে। তাঁর বেরুতে বেরুতে সেই তিনটে।

—ও।—আস্তে আস্তে পাশের টিপয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল রাজেন। এতক্ষণের সহানুভূতি মৃদু বিরক্তির রূপ নিচ্ছে একটা। দেখা যাচ্ছে সুরবালাকে সে যতটা অসহায় ভেবেছিল, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। অন্ততঃ নিজের জন্যে একটি জায়গাও সে খুঁজে পেয়েছে—দেবতার আশ্রয়ে এসে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে সে। আজ কি রাজেন সেখানে প্রক্ষিপ্ত—একেবারেই অনাবশ্যক?

বুড়ো বললে, কী হল দাদাবাবু, চা খেলেন না যে? ভালো হয়নি?

—না-না, বেশ হয়েছে।—অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর একটা চুমুক দিয়ে রাজেন বিছানায় এলিয়ে পড়ল: এখন আমি একটু ঘুমুব—কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে।

বুড়ো বেরিয়ে গেল। চোখের পাতা দুটো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আসার আগে, কড়ি কাঠের গায়ে সবুজ শ্যাওলার এলোমেলো আঁচড় দেখতে দেখতে রাজেন ভাবতে লাগল: কার কথা বলল সে? কে এসে বিরক্ত করবে? সুরবালা? তা যদি হত, তা হলে বাড়িতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সে এসে দাঁড়াত

(শেষাংশ ১৩৮ পৃষ্ঠায়)

আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল
.০০,০০০৲ টাকার উপর

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়
ডিপজিটে শতকরা ৪৲ ও
সেভিংসে ২৲ সুদ দেওয়া হয়

সেন্ট্রাল অফিস
নং ষ্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা
অন্যান্য অফিস
বাঁকুড়া ও কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ

চেয়ারম্যান
শ্রীজগন্নাথ কোলে, এম পি
জেঃ ম্যানেজার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে

গিণি স্বর্ণের সর্বপ্রকার অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ সর্বদা মজুত থাকে অথবা অর্ডার অনুযায়ী তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়।

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত :—"আমি স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর নানা প্রকার শিল্পকার্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে, দেশীয় শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের নিকট আমি ইহাদের সর্বোন্নতি কামনা করি।"

সোল এজেন্টসঃ—কৃষ্ণা এন্ড কোং
কলিকাতা—১২

মেইন এজেন্ট ও ডিষ্ট্রীবিউটর :

এফ এণ্ড সি অসলার (ইণ্ডিয়া) লিঃ

কলিকাতা—১২নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

—চঞ্চল মিত্র

(ফটো: ফরেষ্ট রেঞ্জার মিঃ আলীর সৌজন্যে)

জ

কেমন আছ ?

—পরিমল গোস্বামী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

জেনারেল হ্যাভেলকের সৈন্যদল কানপুর পুনরধিকার করিয়াছে। কানপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শেরার আবার কানপুরের ভার লইয়াছে। সে কয়েকজন গোরা সেনা সঙ্গে লইয়া কানপুর সহর পরিদর্শন করিতেছে। সে যখন চকে পৌঁছিল, দেখিল যে, কোথা হইতে এক ঢুলী আবির্ভূত হইয়া সশব্দে ঢোল বাজাইয়া দিয়া হাঁকিল—

খাল্‌ক-ই-খুদা
মুল্‌ক-ই-কম্পানী বহাদুর
হুকম্‌-ই-সাহেবান আলিশান

অর্থাৎ কিনা কোম্পানীর রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল, এখন হইতে বড় সাহেবের হুকুম মানিতে হইবে।

ঢুলীর অযাচিত সহযোগিতা দেখিয়া মিঃ শেরার ভাবিল যে, লোকটা হয়তো ঠিক এমনিভাবেই নানার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, জল্লাদের মতো নকিবও নিরপেক্ষ, যে-পক্ষের জয় নির্বিকারচিত্তে তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

মিঃ শেরার কোতোয়ালীর কাছে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিল। কোতোয়ালীর উত্তরদিকে একটি বড় বাড়ী, লোক আছে মনে হয় না, বাড়ীটি সরকারী কাজের জন্য অধিকার করা যায় কিনা দেখিবার জন্য সে যেমন উহার সম্মুখে গিয়াছে অমনি এক কাণ্ড ঘটিল। মুহূর্ত মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে পাঁচ সাত জন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল—

ইওর অনার সেভ অ্যাস্
[illegible]
ওলোগ হামলোগোকো একদম মার ডালা
[illegible]
নো ফুড নো ড্রিংক,
[illegible]
[illegible]
সেভ অ্যাস্
ভেরি লয়াল

লোকগুলির ভাব ভাষা, চেহারা ও অবস্থা দেখে শেরার হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে মনে মনে হাসিয়া মুখে গম্ভীর ভাব আনিয়া শুধাইল তোমরা কে?

উই বেঙ্গলিস্
ভেরি লয়াল
কোম্পানীকা নোকর

আবার একসঙ্গে দুঃখের কোরাস আরম্ভ হয় দেখিয়া দলের একজন প্রবীণকে বাছিয়া লইয়া সে শুধায় তুম কোন হ্যায়

লোকটি বলে ইওর অনার হাম বদ্যিনাথ মুখার্জি কোম্পানীকা নোকর ফর থ্রি জেনারেশনস্। মাই গ্র্যাণ্ডফাদার কোম্পানীকা নোকর।

শেরার বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলে,

হ্যাং ইওর গ্র্যাণ্ডফাদার

মুখুজ্জে বলে, হি ইজ লং ডেড্ স্যার

দেন হ্যাং ইওর ফাদার

হি অল্‌সো ডেড স্যার

দেন গো হ্যাং ইওরসেলফ্

কোম্পানীর বিচার বিভ্রাটে সন্ত্রস্ত মুখুজ্জে সাহেবের পায়ের বুট জুতার উপরে পড়িয়া বলে, হাম তো ইওর বুটীশপকা লয়াল সার্ভেণ্ট হ্যায়।

দেন টেল মি হোয়াট ইউ আর এণ্ড হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট।

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মুখুজ্জে নিজেদের অবস্থা ও প্রার্থনা বিবৃত করে, তাহার সঙ্গীরা নীরব সমর্থনে মুখুজ্জের বাগ্মিতা ও সাহেবের মুখভাব লক্ষ্য করিতে থাকে।

বদ্যিনাথ মুখুজ্জে যাহা বলিল, তাহা হইতে স্বেদকম্পপুলক অশ্রু ও মূর্চ্ছা বাদ দিলে এবং হিন্দী, উর্দু, বাংলা ও ইংরাজীর বিচিত্র মিশ্রণ ছাঁকিয়া লইলে এইরূপে দাঁড়ায়।

এই কয়জন রাজভক্ত বঙ্গসন্তান বহুদিনের প্রবাসী। সকলেই কোম্পানীর চাকুরে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে তাহারা আগ্রা, মীরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত। কেবল বদ্যিনাথ কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারী করিত। এমন সময়ে শালেক সিপাহী-লোকেরা ক্ষেপিয়া ওঠে। এইসব বাঙালী রাজভক্ত, কাজেই অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে বাধ্য হয় এবং দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিয়া কানপুর সহরে আসিয়া আশ্রয় লয়। সিপাহীগণ তাহাদের মারিয়াই ফেলিত, কিন্তু নিতান্তই হোলি থ্রেড ও হোলি ক্রাফট্ অব্ হেয়ারের বলে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে সত্য, কিন্তু সিপাহী পক্ষে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিবার অপরাধে তাহারা খাদ্য পায় নাই। সিপাহী শাসনে অনুমতি ছাড়া খাদ্যসংগ্রহের উপায় না থাকায় এই কটি রাজভক্ত বঙ্গসন্তানকে লংড্রন ফাষ্টিং বা একটানা একাদশী করিতে হইয়াছে। তাহাও না হয় সহ্য হয়, কারণ প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন খাইতেও পারে, তেমনি উপবাস করিতেও অভ্যস্ত। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা, ইহাদের যা কিছু সঞ্চিত ছিল, যুদ্ধের ঋণ বলিয়া সিপাহীরা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা কোনমতে এখানে আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোম্পানী বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে, এখন তাহাদের উপরে যাহাতে জুলুম না হয় ইওর অনারকে দয়া করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বদ্যিনাথ থামিলে অন্যান্য রাজভক্ত বঙ্গসন্তানগণ সমস্বরে বলিল—হি ইজ ট্রুথফুল স্যার—অর্থাৎ তাহার সবকথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শেরার বুঝিল খুব সম্ভব ইহাদের বিবরণ সত্য। প্রথম প্রমাণ ইহাদের ভাবগতিক ও অবস্থা। দ্বিতীয় প্রমাণ, কলিকাতা হইতে আগত ইংরজ সৈনিকদের কাছে সে শুনিয়াছিল যে, তথাকার শিক্ষিত বাঙালীগণ সিপাহীদের আচরণ সমর্থন করে না, তাহাদের অনেকে নাকি সিপাহীদের কার্যের নিন্দা করিয়া বহুতর গদ্য পদ্য রচনা লিখিয়া ফেলিয়াছে। শেরার ভাবিল মাতৃভূমি হইতে ছিন্ন হইলেও ইহারা সেই বৃক্ষেরই তো শাখা, কাজেই লয়াল হওয়াই স্বাভাবিক। তবু একবার দস্তুরের খাতিরে বলিল, তোমরা যে রাজভক্ত তাহার আর কি প্রমাণ আছে!

আর কি প্রমাণ হইতে পারে? ঘোষাল বলিল, টেন ডেজ ফাষ্টিং নট প্রুফ এনাফ?

বাড়ুজ্জে বলিল—গড অলমাইটি নোজ

গড অলমাইটি এবং টেন ডেজ ফাষ্টিং-এর উপরে সাহেবের খুব বেশি আস্থা না থাকায় তাহার মুখে করুণার সঞ্চার হইল না, তখন মুখুজ্জে বলিয়া উঠিল—ষ্ট্যাণ্ড স্যার, ষ্ট্যাণ্ড—অর্থাৎ আপনি একটু দাঁড়ান এই বলিয়া সে বেগে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানি কাগজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেখানা সাহেবের হাতে দিল—সী ইওর অনার প্রুফ অব্ আওয়ার লয়াল্টি।

কৌতূহলী সাহেব পড়িতে লাগিল। মুখুজ্জের সঙ্গীগণ কেহই মুখুজ্জের আচরণে কৌতূহল প্রকাশ করিল না, কারণ কাগজখানার সহিত তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সিপাহী বিদ্রোহের দুস্তর সাগরে এই উডুপখানা অবলম্বন করিয়াই তাহারা দুর্দিনের ভরসায় ছিল। কৌতূহল অনুভব না করিলেও বদ্যিনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে পড়িল বদ্যিনাথের আশ্বাস, বদ্যিনাথ থাকিতে কোম্পানীর হাতে তোমাদের ভয় নাই। এবারে তাহার পরীক্ষার ক্ষণ সমুপস্থিত।

দরখাস্তখানার প্রথম দুটি ছত্র পড়িয়াই শেরার স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় আর তাহার মনে ছিল না। শেরার মনে মনে পড়িল—It is well known, your excellency's lordship that we, the Bengalees, are a cowardly people *

তবু সে একাধিকবার দলিলখানা পড়িল এবং লেখকদের [illegible] পরিচয় পাইবার মানসে প্রশ্ন আরম্ভ করিল—তোমরা শিখযুদ্ধে গিয়েছিলে?

মুখুজ্জে উত্তর দিতে থাকিল—এরা সবাই নয়, আমি আর বাড়ুজ্জে মশাই গিয়েছিলাম।

যুদ্ধেই যদি গিয়েছিলে তবে হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

হুজুর যুদ্ধে যাচ্ছি বলেই সত্য সত্যই যে লড়াই করতে হবে এমন কথা বাপের কোন্ পুরুষে ভেবেছিল?

---

* কেহ যেন পাঠক এ উক্তি আমার কল্পনা নয়, লেখকের কল্পনাশক্তিরও সাধ্য নাই এমন উক্তি সৃষ্টি করে। এই উক্তিটি History of Indian Mutiny, Volume I (By Charles Ball) নামক গ্রন্থে ৬১২ পৃষ্ঠায় পাইয়াছি। বিশ্বাস না হইলে, বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এপর্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি নিজেদের সম্বন্ধে এমন সরল সত্য লিপিবদ্ধ করিতে সাহস পায় নাই, আপনি উক্তিটি যথাস্থানে পাইবেন।

তোমরা কি ফৌজী ছিলে না?

রাম! রাম! ওসব তো দুরবিয়ায় করবে। আমরা ছিলাম কমিসারিয়েটে। আমরা বাঙালীরা ঐ কাজটা ভালো পারি। * হুজুর আমার গ্র্যান্ড-ফাদার তেসরা মারাঠা যুদ্ধে ঐ কাজ করেছেন, আমার ফাদার বরাবর ঐ কাজে ছিলেন, বংশধারায় দাবীতে আমিও ঐ বিভাগে কাজ পেয়েছিলাম।

তোমার এতো পৈত্রিক পেশা হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

পৈত্রিক পেশা সত্য, হুজুর আমার ছেলেটিও লায়েক হয়ে উঠেছে, কিন্তু কাউকে কখনো হুকুম দেওয়া হয়নি যে, কামানের পাল্লায় এগিয়ে যেতে হবে।

যুদ্ধের সময়ে কখনো কখনো তেমন প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

প্রয়োজন হয় বলেই কি আমাদের স্বভাব বদলাবে? হুজুর আমরা বাঙালীরা হচ্ছি Children taming people অর্থাৎ ছাঁ পোষা মানুষ।

কামানের পাল্লায় যাবার হুকুম শুনে কি করলে?

আর কি করবো? আমরা বাঙালীরা যা পারি তাই করলাম, জংগীলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের বরাবর এই দরখাস্তখানা লিখে তাঁর সেক্রেটারীর হাতে দিলাম।

তিনি কি করলেন?

তখনি দরখাস্ত মঞ্জুর করে বললেন, বাস্তবিক তোমরা মারা পড়লে কমিসারিয়েটের কাজ চালাবে কে?

তারপরে?

তারপরে আর কি শিখ লড়াই ফতে ক'রে কোম্পানীর ফৌজ সাটলেজ পার হ'ল আমরা পিছু পিছু চললাম।

দরখাস্তখানা তো থাকলো মিলিটারী দপ্তরে, তার নকল নিলে কেন?

পাছে কখনো কাজে লেগে যায় এই আশায়। সত্যিই তো আজ কাজে লেগে গেল হুজুর! এখানা দেখে তবে তো হুজুরের বিশ্বাস হ'ল যে, আমরা রাজভক্ত।

তোমরা অবশ্য তখন রাজভক্ত ছিলে, কিন্তু এখনো যে আছ তার প্রমাণ?

এবারে মুখুজ্জে যে কয়টি কথা বলিল, তাহা স্বর্ণাক্ষরে বাঁধাইয়া রাখিবার মতো। সে বলিল—হুজুর ভীরু লোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।

শেরার বুঝিল তাহার এখনো অনেক দেখিবার, অনেক শুনিবার এবং অনেক শিখিবার বাকি আছে। সে বলিল—আচ্ছা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো গিয়ে, কেউ তোমাদের উপরে অত্যাচার করবে না।

মুখুজ্জে বলিল—নো মাউথ ওয়ার্ড স্যার অর্থাৎ শুধু মুখের কথায় হবে না, অমনি এক ছত্র লিখে দিতে হবে।

এখন কাগজ কলম পাই কোথায়?

এই আনছি বলিয়া মুখুজ্জে মুহূর্ত মধ্যে কাগজ কালি কলম সংগ্রহ করিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ফেলিল

—"This house belongs to one Mokarjea, very loyal subject, please not to molest." *

তারপরে শেরারের হাতের কাছে কাগজ ও কলম ধরিয়া বিনীত হাস্যে বলিল—স্যার একটা সই।

সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিতেই মুখুজ্জে সেখানা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বাড়ীর দরজার কাছে সযত্নে সাঁটিয়া দিল

সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিতেই মুখুজ্জে সেখানা ছোঁ মারিয়া......।

—আর সব কটি বঙ্গসন্তান সাহেবকে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া ধন্যবাদ জানাইল।

শেরার অন্যত্র রওনা হইল আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল আশ্চর্য এই বাঙালী জাতটা! যাদুকরের মতো কোথা হইতে কাগজ-কলম বাহির করিল। আর সাহেবের স্বাক্ষরের উপরে ইহাদের কি অসীম বিশ্বাস! হইবেই বা না কেন, ঐ দেশেই তো কোম্পানীর রাজ্যের প্রথম বুনিয়াদ! দীর্ঘকালের শাসনে ইহাদের মজ্জা অবধি বেশ নরম হইয়া আসিয়াছে, তুলনায় এই পুরবিয়া গোয়ারগুলো কি বর্বর। শেরার মনে মনে স্থির করিল বিদ্রোহের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই উপরে ধরাও করিয়া কলিকাতায় বদলি হইতে হইবে—বাঙালীর কাছে শিখিবার অনেক কিছু আছে।

ওদিকে সাহেব নিরাপদজনক দূরে চলিয়া যাইতেই মুখুজ্জে অপসৃয়মান সাহেবের প্রতি দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সমবয়সী বাঁড়ুজ্জেকে বলিল দেখলে ভায়া কেমন পলিটিক্স করলাম।

একজন বলিল—অত নীচু না হলেই পারতেন!

মুখুজ্জে বলিল—আরে নীচু না হলে জুতো চুরি করা যায়। তাছাড়া নীচুটাই বা কি হলাম। দরখাস্তখানা তো মিথ্যা নয়। তার উপরে দুটো মিষ্টি কথা বলেছি এই তো! তা রাজার জাতকে অমন বলতে হয়।

দেখা গেল যে, মুখুজ্জের সঙ্গে কাহারো মতের বিশেষ অনৈক্য নাই।

অতঃপর বলিল—চলো আজ ভালো করে খাওয়া-দাওয়া যাক। এ ক'দিন নাকে ভাত দিয়েছি না মুখে ভাত দিয়েছি ঠিক ছিল না। আজ নিশ্চিন্তি! বাবা—এ স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের সই। গোরা কালা সবাই বাড়ীর কাছে থেকে হেটমুন্ডে ফিরে যাবে! নাও চলো, আর কোন ভয় নেই।

তখন সকলে মুখুজ্জের অনুসরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

(২)

বদ্যিনাথ মুখুজ্জের আশঙ্কা মিথ্যা নয়, এ সব বিষয়ে রাজভক্ত প্রজার অনুমান বড় মিথ্যা হয় না। কানপুর সহর পুনরায় দখল করিবার পরে কোম্পানীর ফৌজ অত্যাচার আরম্ভ করিল। বিচার করিয়া করিলে যাহা ন্যায়ধর্মরক্ষা, নির্বিচারে করিলে তাহাই অত্যাচার। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে ইংরাজ যাহাকে পারিল ফাঁসি দিল, সামান্যতম সন্দেহের ছায়াগ্রস্ত ব্যক্তিও মুক্তি পাইল না। অত্যাচারের আশঙ্কায় লোকের মনে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আত্মরক্ষার আশায় অনেকেই নির্দোষ প্রতিবেশীকে ধরাইয়া দিল; প্রতিবেশী মরিল, নিজেও রক্ষা পাইল না। একতরফা দণ্ডের আঘাতে সমগ্র কানপুর সহর মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ফল কথা সিপাহীরা যে কাণ্ড করিয়াছিল কোম্পানীও তাহার পুনরাভিনয় করিল, তবে সেবারে ইংরাজ মরিয়াছিল, এবারে ভারতীয় মরিল তফাৎ এইটুকু মাত্র। জেনারেল নীলের শাসনে কানপুরের নাগরিকদেহ ভয়ে নীল হইয়া গেল। অবশ্য মুখুজ্জের আবাসের উপরে কেহ হানা দিল না, তবে সেটা কোটওয়ালীর কাছে বলিয়াই হোক বা ম্যাজিস্ট্রেট শেরারের অনুশাসন বলিয়াই হোক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক। তবু মুখুজ্জের সতর্কতার অন্ত ছিল না। সে নিজে কখনো বাড়ী হইতে বাহির হইত না কিংবা অপর কাহাকেও বড় বাহির হইতে দিত না। তবু এক-আধবার বাহির না হইলে চলে না, বাজার করিতে হয়। সন্ত্রস্ত ইঁদুর গৃহস্বামীর অনবধানতা লক্ষ্য করিয়া যেমন চট করিয়া বাহির হইয়াই আবার গর্তে প্রবেশ করে তেমনি কেহ একজন কোন এক ফাঁকে গিয়া বাজার করিয়া আনিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে গোপনে থাকিয়াও সহরের বিভীষিকার প্রভাব হইতে মুখুজ্জে ও তাহার সঙ্গীগণের রক্ষা ছিল না। শ্মশানযাত্রীর উৎকট চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গৃহস্থ যেমন জাগিয়া উঠিয়া ভীত বোধ করে, তেমনি আসামীর অন্তিম আর্ত-মিনতিতে মুখুজ্জেদের মুহুর্মুহু চকিত করিয়া দিত।

দোহাই কালেকটার সাহেব আমার কোন কসুর নাই।

দোহাই কোম্পানী বাহাদুর আমি নির্দোষ।

গোড়লাগে কাপ্তান সাহেব তুমি আমার বাপ।

আসামীদের কোটওয়ালীতে টানিয়া আনা হইতেছে।

মুখুজ্জে জানলা দিয়া উঁকি মারিয়া সদর রাস্তায় আসামীর ভূলুণ্ঠিত দেহটি একবার দেখিয়াই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিত আর কাঁপিতে কাঁপিতে উপবীত অবলম্বন

---

* পাঠক ইহাও আমার অনুমান নয়। বাংলা উপন্যাসের অনেক নায়কই কমিসারিয়েটে কাজ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করিয়াছে। আপাততঃ ইন্দিরা উপন্যাসের ইন্দিরার স্বামী এবং গোরা উপন্যাসের কৃষ্ণদয়াল বাবুর কথা মনে পড়িতেছে। খুঁজিলে আরো অনেক বাবুর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

* এটিও বাস্তব সত্য, কল্পনা নয়। দ্রষ্টব্য Havelock's March on Cawnpore by J. W. Sherar.

করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপিতে থাকিত। কিন্তু মন লাগিত না, তাহার দৃষ্টি শিখযুদ্ধের দরখাস্তখানার উপরে পড়িত, মুখুজ্জে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইত। দরখাস্তখানা ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে গোরা লোক ঘরে ঢুকিবামাত্র দেখিতে পায়। মুখুজ্জে অনেক ঠেকিয়া বুঝিয়াছিল যে, সময়বিশেষে ভগবানের চেয়ে শেরার সাহেব প্রবলতর।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সপারিষদ মুখুজ্জে যার দিয়া বসিয়াছিল। মাঝখানে মুখুজ্জে আর চারিদিকে বাঁড়ুজ্জে, ঘোষাল, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি রাজভক্ত বঙ্গ-সন্তানগণ। একটা পাটের দড়িকে অতিরিক্ত কয়েকটা পাক দিয়া সংক্ষুতব করিয়া একপ্রান্তে একটি গিরো বাঁধিয়া দিলে যেমন দেখিতে হয় মুখুজ্জের দেহটি ঠিক তেমনি; সমস্ত দেহটা শুকাইয়া পাক খাইয়া রসকষহীন একটি রজ্জুতে পরিণত হইয়াছে, ঐ গিরোটি তাহার মস্তক, ঠাহর করিয়া দেখিলে মুখমণ্ডলে নাক চোখ মুখের কয়েকটি গর্ত দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। মুখুজ্জের জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষা প্রবঞ্চনার ইতিহাস সম্যক জানিলে হয়তো তাহার প্রতি ধিক্কারের ভাব মনে উদিত না হইয়া সহানুভূতির ভাবটাই জাগ্রত হইবে, কিন্তু তেমন অবসর কোথায়? মানুষকে দোষ মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ বিচার করিতে বসে না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া যখন স্থির হইয়া গিয়াছে তখনি বিচারের প্রহসন আরম্ভ হয়। মুখুজ্জে ঠকিতে ঠকিতে শিখিয়াছে যে, ঠকানোটাই জীবনের উদ্দেশ্য, দুঃখ পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে, দুঃখটাই জীবনের ধর্ম, ভয় পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে, ভীতবোধ না করিলে কার্যোদ্ধার হয় না; আর রাজভক্তি! বাল্যকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রতি ভক্তি, তারপরে জমিদার, মহাজন ও পুরোহিতের প্রতি ভক্তি—এ সমস্তই তো রাজভক্তির ভূমিকা; রাজভক্তি সমস্ত ভক্তির ঘনীভূত চরম মূর্তি। মুখুজ্জেকে আমি বিচার করিতেছি না, অংকন করিতেছি মাত্র।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন সন্ধ্যায় মুখুজ্জে বাড়ীর সদর দরজায় ঘা পড়িল এবং সেই শব্দে বন্দসংহনে কয়টির চিত্ত উদ্বেগে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, অসময়ে দরজায় ঘা দেয় কে? বাঁড়ুজ্জে আফিংয়ের ঘোরে ঝিমাইতেছিল, চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল দরজা এঁটে দাও, বলিয়াই আবার নেশার স্রোতে ডুব দিল।

গুম্ গুম্ গুম্!

গুম্ গুম্ গুম্!

মুখুজ্জে রাজভক্ত হইলেও নির্বোধ নয়। তাহার আশংকা হইল যদি সরকারী লোক হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা করা কিছু নয়, আর উপেক্ষা করিলেও তাহাকে এড়ানো যাইবে না, দরজা ভাঙিয়া ঢুকিবে। তাই মুখুজ্জে একজনকে বলিল—দেখে এসো কে?

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া একজন ফিরিয়া আসিল, বলিল—ইনিই দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন।

সকলে দেখিল একজন বাঙালী যুবক, **বয়স পঁচিশের বেশি হইবে না, ছিন্ন মলিন বেশ, উদ্বাস্তু চেহারা।**

মুখুজ্জে শুধাইল তুমি কে বট?

পদ্মপুকুর —সতীন্দ্রনাথ লাহা

যুবক বলিল—মহাশয়, আমি একজন বাঙালী যুবক।

সেতো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কোত্থেকে আসছ, কি সমাচার, কি পরিচয় জানা আবশ্যক।

মশায় আমার নিবাস কাশীধামে। আমি কাজের সন্ধানে এলাহাবাদে আসি, সেখানে কোন কাজের সন্ধান না পাওয়ায় কানপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে সিপাহীদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে কোন মতে এখানে এসে পৌঁছেছি।

এ বাড়ীর সন্ধান পেলে কিভাবে?

সহরের একজনের কাছে শুনলাম এ বাড়ীতে কয়েকজন বাঙালী আছেন।

তোমার নাম কি বাপু।

আজ্ঞে শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

তোমরা?

আজ্ঞে ব্রাহ্মণ,

এ পরিচয় যথেষ্ট নয়।

আর কি পরিচয় দেবো বলুন!

তুমি যে সিপাহীদের গুপ্তচর নও তার কি প্রমাণ?

তাদের দ্বারাই যে আমি সর্বস্বান্ত।

তোমার কথা ছাড়া তার তো কোন প্রমাণ নেই!

আজ্ঞে আমার কথা বিশ্বাস করুন, এই সময়ে বাঁড়ুজ্জে হঠাৎ আবার চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল—"অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসোদেয় ন কস্যচিৎ"—তারপরে সে আবার পূর্ববৎ নীরব হইল।

সকলের মৌনভাবে বোঝা গেল যে বিপদের সময়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না।

তাহাদের ভাবগতিক দর্শনে উদ্বিগ্ন যুবকটি বলিল আজ্ঞে বাঙালী হয়ে বাঙালীকে রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে?

ঘোষ বলিল ওসব অনেক শুনেছি এখন কেটে পড়ো।

যুবকটি ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মুখুজ্জে বলিল—আচ্ছা, তুমি বসো।

সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া বলিল—এতরাত্রে আর কোথায় যাবে?

যুবকটি থাকিয়া গেল।

সেদিন শেষ রাত্রে আর্ত নারীকণ্ঠস্বরে হঠাৎ সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সকলেই এরূপ আর্তস্বরে অভ্যস্ত, তবে নারী কণ্ঠস্বরটা নূতন বটে। অনুরূপ অবস্থায় কি কর্তব্য সকলেরই পরিজ্ঞাত, সকলে উঠিয়া দরজা জানলার অর্গল পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়া বসিল।

কেবল সেই বাঙালী যুবকটি বলিল আপনারা চুপ ক'রে বসলেন যে! একবার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক ব্যাপারটা কি?

কিন্তু সকলের মুখের ভাব দর্শনে তাহার মনে হইল এমন অদ্ভুত কথা যেন তাহারা ইতিপূর্বে শোনে নাই।

একজন বলিল—তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? অপরে বলিল—চুপ ক'রে ব'সে থাকতো। তারক বলিল—আমি বরঞ্চ একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

বাঁড়ুজ্জের নেশা তখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, শ্লেষ্মাবিজড়িতকণ্ঠে বলিল অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নর কর্তুমিচ্ছতি, স ভূমৌ... বাকিটুকু আর শ্রুতিগোচর হইল না।

তাহারা কিছুই করিবে না বুঝিতে পারিয়া আর্তনারীকণ্ঠের রহস্যোদ্ঘাটন উদ্দেশ্যে তারক জানালার দিকে অগ্রসর হইতেই সকলে তাহার উপরে গিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

কে একজন বলিল, সিপাহীর গুপ্তচর না হয়ে যায় না!

মুখুজ্জে বলিল—বাবা, তোমাকে আশ্রয় দিয়ে কি অপরাধ করেছি? তবে? তবে এমন ক'রে ছাপোষা মানুষগুলোকে মেরে কি লাভ?

আপনাদের দেখছি প্রাণের ভয় বড্ড বেশি।

এত দুঃখের মধ্যেও তাহার কথায় সকলের **হাসি পাইল; মুখুজ্জে বলিল—ভয়টা তবে কিসের জন্য হবে?**

কে কার উপরে অত্যাচার করছে দেখতে হবে না?

চারদিকে অত্যাচারের বন্যা বইছে। কে কার উপরে নয়! যে যার উপরে পারছে করছে। নিবারণ করতে গেলে তার কোন লাভ হবে না, মাঝে থেকে তুমি প্রাণে মারা পড়বে।

কিন্তু এমন অসহায়ভাবে থাকাও যে কঠিন।

সে কি আমরা জানিনে। দয়ামায়া আমাদেরও আছে। তবে কি জানো দুর্বলের দয়া করবার অধিকার নেই। অন্যায় সহ্য করতে হয় বলেই তো দুর্বল দুর্বল।

মুখুজ্জের সারগর্ভ উপদেশে তারকের যে চৈতন্যোদয় হইল মনে হয় না, কিন্তু সে এক্ষণে নিতান্তই অশক্ত, কেননা ইতিমধ্যে কয়েকজনে মিলিয়া তাহাকে একখানা বিছানার চাদর দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। সে অসহায়ভাবে পড়িয়া পড়িয়া গজরাইতে লাগিল।

আর্তস্বর থামিয়া গিয়াছে। তখনো রাত্রি ছিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল মুখুজ্জে চোখ বুজিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল আজকালকার ছেলেরা ক্রমেই বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে, না মানে গুরুজনের উপদেশ, না জানে আত্মরক্ষার উপায়। তারপরে এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাইল যে একটু বয়স ভারি নিচেই ছোকরার বীরত্বের অভিনয় চুকিয়া যাইবে, তখন সত্যই সে জীবনের রস পাইবে যেমন নিজেরা আজ পাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সে নিজে একদিন পরমারাধ্য পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করিয়া একটা বুনো মহিষকে তাড়া করিয়াছিল আর একটু হইলেই মারা পড়িত আর কি! বহুদিন পূর্বেকার অবিমৃষ্যকারিতায় নিজের প্রতি সে ধিক্কারের ভাব অনুভব করিল—আর সেইসূত্রে মনস্তত্ত্বের কোন্ নিয়মে না জানি যুবকটির প্রতি তাহার মনে এক প্রকার সস্নেহ অনুকম্পার ভাব উদিত হইল। মুখুজ্জে উঠিয়া গিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া দিল।

পরদিন সকালে যুবকটিকে চোখে চোখে রাখিল, তাড়াইতেও সাহস হয় না, আবার আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠা।

দেয়ালে বিলম্বিত সেই দরখাস্তখানা দেখিয়া তারক শুধাইল ওটা কি?

কাল রাত্রে কাগজখানা সে দেখিতে পায় নাই।

মুখুজ্জে বলিল—পড়ে দেখো, ঐ কাগজখানার জোরেই এখনো টিকে আছি।

কাগজখানা পড়িয়া যুবক ক্রোধে বলিয়া উঠিল—এমন কথা আপনারা লিখতে পারলেন?

মুখুজ্জে বলিল—কেন বাপু মিথ্যে কি লিখেছি?

মিথ্যা নয়?

তুমিই ভেবে দেখোনা কেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হলে বাঙালীর গুরু-পুরুত শালগ্রাম শিলা দর্শন চাই, মন্ত্রপাঠ চাই, নির্মাল্য ধারণ চাই! চাই কি না বল? ঐ সবগুলো দেই গুছিয়ে এক কথায় যদি ভীরুতা বলা হয় তবে দোষ কিসের?

অপরে বলে বলুক, তাই বলে নিজ মুখে স্বীকার?

আমাদের বাপু মনে মুখে আড় নেই। বাড়ির কর্তাদের মুখ একবার ছাড়া দু'বার কথা বলে না।

তেলেঙ্গী লড়ছে দুরবিয়া লড়ছে, শিখ লড়ছে মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয়।

আরে বাপু আমরা যে বাঙালী! তেলে-জলে আমরা মানুষ। মাছের ঝোল-ভাত আমাদের প্রাণ, মা-মাসির কোলে আমাদের স্থান। ওসব চোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা করো কেন?

জগতে আর কারো মাসি পিসি নেই—আর মাছ ভাতও কেউ খায় না! আমরাই কি সব চেয়ে অকর্মণ্য!

অকর্মণ্য এমন বলি না। কাজ ওরাও জানি। হিসাব রাখতে দাও, খাতা লিখতে দাও, সাহেবের মুন্সীগিরি করতে দাও! করুক তো দেখি এসব কাজ ওরা! জিভ বেরিয়ে পড়বে।

করুক তো দেখি এসব কাজ ওরা! জিভ বেরিয়ে পড়বে।

বলিয়া কিভাবে কত খানি জিহ্বা বহির্গত হইবে মুখুজ্জে তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইল।

বাড়ির ভেতর থেকে একজন কাঁদো কাঁদো সুরে মা-দুর্গার উপরে অত্যাচারের কথা, গুরু পুরুতের কথা বলিল ... তাকো, তেকো যে আবার এক করে।

কথাবার্তা তখন ঐ খানেই মিটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে কোতোয়ালীতে মুখুজ্জের ডাক পড়িল। সে কম্পিত পদে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে পৌঁছিয়া দেখে স্বয়ং শেরার সাহেব উপস্থিত।

হ্যালো মুখার্জি, তোমাদের বাড়িতে কি একজন বাঙালী ছোকরা আশ্রয় নিয়েছে।

না, হুজুর।

আমিও তাই বলি। আমাদের গোয়েন্দা বলছিল তাকে নাকি ঐ দিকে যেতে দেখেছে, লোকটা বিদ্রোহীপক্ষের লোক।

না হুজুর, এমন লোককে আমি কেন আশ্রয় দিতে যাবো।

রাইট! আমি গোয়েন্দাকে বললাম বকুসিতকর ও কখনো সম্ভব নয়। মুখার্জি রাজভক্ত প্রজা, এ রকম কাজ সে কখনো করবে না।

হুজুর ঠিক বলেছেন। অচ্ছা তুমি যাও।

মুখুজ্জে লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া আসিল।

অনাশ্রিত হইলে শেরার খানাতল্লাসী করিত, কিন্তু মুখুজ্জের বাড়ী সম্বন্ধে প্রয়োজন অনুভব করে নাই, কারণ মুখুজ্জের মুখনিঃসৃত সেই অক্ষয় বাণী অন্ধ বাদুড়ের মতো এখনো তাহার অন্ধকার মনের মধ্যে পাক খাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল—ভীরুতাই রাজভক্তির বীজ! মুখুজ্জের মতো ভীরু লোক কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিবে ইহা শেরারের কল্পনাতীত। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আশ্রিতবাৎসল্য প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

মুখুজ্জে ফিরিয়া আসিয়া আসল ঘটনা প্রকাশ করিল না, যা হয় কিছু একটা বলিয়া দিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কর্তব্য কি? উক্ত যুবকই যে শেরার সাহেবের উদ্দিষ্ট লোক সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। শেষে ভাবিল রাতে আর গোলমাল করিয়া কাজ নাই, কাল ভোরবেলায় ভালোয় ভালোয় উহাকে বিদায় দিলেই চলিবে।

পরদিন ভোরবেলায় উঠিয়া যুবকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মুখুজ্জে মনে মনে বুঝিল যে শেরার সাহেবের তলবের কারণ অনুমান করিয়া যুবক সরিয়া পড়িয়াছে, ভাবিল ভালোই হইয়াছে, অপ্রিয় কাজটা আর করিতে হইল না।

এমন সময়ে একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল মুখুজ্জে মশায় ব্যাপার কি!

সকলে শুধাইল কি হয়েছে?

আর কি হবে? দরজায় শেরার সাহেবের পরোয়ানাখানা নেই, তার বদলে এই কাগজখানা ছিল।

সকলে পড়িল কাগজখানায় লিখিত আছে—

"This house belongs to traitors to the Country. NANA Sahib."

এ যে মুখোপাধ্যায় কাণ্ড।

হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়াতে দেয়ালে বিলম্বিত দরখাস্তখানার কাছে গিয়া মুখুজ্জে একেবারে ভুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল!

কি হলো, কি হলো, বলিয়া সকলে অনুসরণে গিয়া দেখিল কে যেন দরখাস্তখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। আর মুখুজ্জে অসহায়ভাবে মাথা কুটিতেছে—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল!

টিনগুলো কি করবো স্যার? এতে খাদ্যও নেই ভেজালও নেই—স্রেফ খালি।

চরম চরিতার্থতা
শরতের নির্মল আকাশে
বৈরাগী মেঘ; বাতাসে
শেফালির স্নিগ্ধ নিমন্ত্রণ।
সোনার আভায় বিজড়িত
দিগন্তে শরতের প্রসন্ন
মহিমা। রঙে রসে
মধুর এই যে উৎসব-
মুহূর্ত, হৃদয়ের আনন্দ-
গানেই এর চরম
চরিতার্থতা। তেমনি
রম্য রুচির চিরন্তন
বিলাস, রূপসাধনার
চরম চরিতার্থতা—
"লক্ষ্মীবিলাসে"।
লক্ষ্মীবিলাস তৈল
এম • এল • বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস : কলিকাতা-৯

কবির গান

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
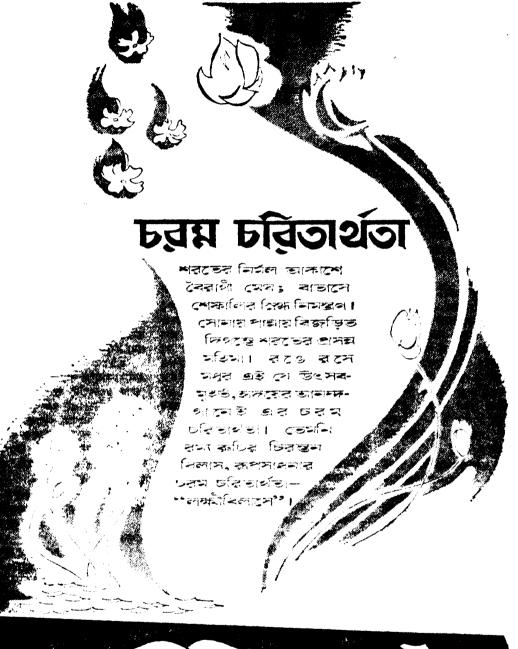
বর্তমানে বাঙ্গালা সন তেরশত একষট্টি সাল চলিতেছে। সন বারশত একষট্টি সালের (১২৬১ সাল) ১লা অগ্রহায়ণ—ঠিক একশত বৎসর পূর্বে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন—"প্রায় ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল গোঁজলা গুঁই নামক একব্যক্তি পেশাদারী দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন। ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তৎকালে টিকেরার বাদ্যে সঙ্গত হইত।

লালু নন্দলাল, রঘু ও রামজী এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা প্রভৃতির সংগীত শিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়, তিনি তন্তুবায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন। লালু নন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই।"

রাজা রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহে (১৭৭৯ শকাব্দা, খ্রীঃ ১৮৫৭, বাঙ্গালা সন ১২৬৪, ৫৮ খন্ড, ২৩৫ পৃঃ) লিখিত আছে—"কথিত আছে এই কবির গান রচনায় চুঁচুড়া নিবাসী লালু নন্দলাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলী নিবাসী রামজী ও কলিকাতা নিবাসী রঘু তাঁতি প্রসিদ্ধ হয়।"

রঘুর জন্মস্থান ফরাসডাঙ্গায় ছিল কিনা জানিনা। তবে তিনি যে কলিকাতায় বাস করিতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একটি গানে তিনি নিজেকে "সিমলেবাসী অধ্যাপক" বলিয়াছেন। রামজী হুগলীর অধিবাসী ছিলেন। লালু নন্দলালকে আমরা বীরভূমের লোক বলিয়া মনে করি। বীরভূমে লালুর একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন, জাতিতে রাজপুত, নাম দলহরি রায়। রাজা মানসিংহের সঙ্গে এদেশে যে সমস্ত রাজপুত সৈন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বীরভূমের তুরিগ্রাম বরুল প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। বীরভূমের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য আমি রামপুরহাট অঞ্চলে তুরী গ্রামে গিয়া রাজপুতদের বাড়ীতে পুরানো ঢাল, তলোয়ার দেখিয়া আসিয়াছিলাম। বরুল গ্রাম সিউড়ীর সন্নিকট।

ভবানী বেনে রামজীর শিষ্য, নিতাই দাস লালু নন্দলালের নিকট গান শিক্ষা করেন। সুপ্রসিদ্ধ হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী) রঘু তাঁতির সঙ্গীত শিষ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ সাহিত্য-ইতিহাসের বার প্রতিবাদ দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন "নিদেন সমস্যা"। তিনি বাল্যকালে ভাটপাড়ায় "নিতে ভবানের লড়াই" কবির গান শুনিয়া ফিরিতেছিলেন, গান তখনো শেষ হয় নাই, জয়-পরাজয়ও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু ভবানীর বিজয় সূচনা দেখা দিয়াছিল। পথের মধ্যে এক শিবমন্দির হইতে শুনিতে পাইলেন "নিদেন সমস্যা", "নিদেন সমস্যা"। **অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিচিত এক ব্রাহ্মণ** পণ্ডিত দেব-মন্দিরে উভয়ের—নিতাই দাস ও ভবানীর সমতুল্যতা প্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনি নিতাই দাসের গানের ভক্ত ছিলেন। এই দল নিতাই দাসকে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলিয়া প্রশংসা করিতেন। দাদামশাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির গানের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া "গুপ্ত রত্নোদ্ধার" প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আড়াই শত বৎসর পূর্বে এই কবির গান ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে সকলকেই আনন্দদান করিত। কবির গানে অশ্লীলতা ছিল, তাই বলিয়া তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ রস-মাধুর্যের অসদ্ভাব ছিল না। সেকালের নিরক্ষর পল্লীবাসীও কবির গানে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইত। সেকালের কবির গান অপেক্ষা বর্তমানের অধিকাংশ "সবাক চিত্র" যে কত ভয়াবহ, কি ভীষণ সর্বনাশা, তথাকথিত প্রগতিবাদী ভিন্ন সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। আপাত মনোরম পরিণাম বিষময় এই পরিবেশ হইতে সমাজকে রক্ষার কথা চিন্তার সময় আসিয়াছে।

হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালার রচিত গান আজও পুরাতন হয় নাই। ইঁহারা শিক্ষিত ছিলেন না, অন্ততঃ আজিকার দিনের সমালোচকগণ সেই কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কবিত্ব ইঁহাদের সহজাত ছিল। ইঁহাদের উপস্থিত রচনাশক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়। একজন সাধারণ কবিওয়ালার কথা বলি। সে আজ অনেক দিনের কথা। বীরভূমের যোগীন্দ্রনাথ রায়ের কলিকাতা, পোস্তার বাজারে মসলার দোকান ছিল। পোস্তা বারোয়ারীতলায় কবির গান হইতেছে। একদিকে ছকু ঠাকুর অন্যদিকে গোর গোঁসাই। রায় মহাশয়ের ইঙ্গিতে ছকুকে বাঙ্গ করিয়া গোঁসাই আসরে দাঁড়াইয়া এই ছড়াটি আবৃত্তি করিলেন। বলাবাহুল্য ইহার রচনার জন্য কাগজ-কলমের প্রয়োজন হয় নাই।

এই যে ভুবন মাঝে যে কিছু মঙ্গল কাজে
এক "কু" সঞ্চারে যদি তায়।
সে কর্মের নাহি ভায়া লোকে করে উপহাস্য
সকল ভণ্ডুল পড়ে যায়॥
দক্ষ করেছিল যজ্ঞ ভৃগু তাহে ছিল পক্ষ
দুই "কু" যে দক্ষযজ্ঞ নাশ।
কেকয়ী, মন্থরা আর শনি পৃষ্ঠে ছিল তার
তিন "কু"য়ে রাম বনবাস॥
অশ্বত্থামা, শকুনিতে কর্ণ, দুঃশাসন তাতে
চার "কু"তে কত করেছিল।
দারুণ পাশার খেলে রাজ্যধন হরে নিলে
পঞ্চভাইয়ে বনে পাঠাইল॥
পাঁচ "কু" একত্রে মিলি নহুষ রাজারে ঠেলি
স্বর্গ হইতে ফেলিল ভূতলে।
ছ "কু" জুটেছে যথা কি কব ভাগ্যের কথা
ধন্য বাস ভারত মণ্ডলে॥

রায় মহাশয়ের সঙ্গে দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা ছিল। ঘর ছাদনের টিন কিনিতে গিয়া রায় মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলাম। কবির আসরে উপস্থিত ছিলাম এবং ছড়াটি লিখিয়া লইয়াছিলাম। নহুষ স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাণীর সঙ্গ-কামনায় ঋষিবাহিত যানে ইন্দ্রের অন্তঃপুরে আগমন করিতেছিলেন। শীঘ্র গমনের জন্য সর্প, সর্প বলিয়া ঋষিগণকে তাড়না করিলে তাঁহাদের শাপে সর্পদেহ ধরিয়া স্বর্গচ্যুত হন। হরু ঠাকুরের সমস্যাপূরণ "বঁড়শী বিঁধেছে চাঁদে" সমস্যার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের সভায় এক দিগ্বিজয়ী আসিয়া সমস্যা দিলেন "বঁড়শী বিঁধেছে চাঁদে"। সভা-পণ্ডিতগণ সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না। রাজা হরু ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন। ঠাকুর তেল মাখিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া গামছা কাঁধে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্যা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করিয়া দিলেন—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলী হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে
বঁড়শী বিঁধেছে যেন চাঁদে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলার উদাহরণে এই সমস্যা পূরণ বিস্ময়জনক কবিত্বের পরিচায়ক। রাজা নবকৃষ্ণ এই কৃতিত্বের জন্য ঠাকুরকে [illegible] টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

দুইজন কবিওয়ালার মধ্যে গানের শেষে সমস্যা-সমাধান পালা হইত। বীরভূমে ইহাকে "ফোল কাটাকাটি" বা "[illegible]" [illegible] বলে। একটা সমস্যা ধরিয়া এই গান চলিতে থাকে। একজন কবিওয়ালা গোপাল, অন্যজন যশোদা হইয়াছিলেন। গোপাল আঙিনায় খেলিতে খেলিতে বলিলেন, "মা আমি চাঁদ নিব"। গোপালের কথা মত "চিতা" দিবার জন্য মা চাঁদকে [illegible]। কবিওয়ালা গান ধরিলেন—

চাঁদ নিব মা চন্দ্র চাই।
(কপালেতে) টিপ দিতে [illegible]
ডাকছিলে যে [illegible]।
মণিময় অঙ্গন তার
সমুজ্জ্বল, ঐ যে জ্বলে
আমি মা যাবো একলে।
ভাল করে ডাকলে তাকে
নিয়ে এসো [illegible]
ভাল করে ডাকো মাগো
চাঁদ দিলে আজ [illegible]
শুধু কাঁদবো গো
না পেলে চাঁদ [illegible] জীবন
[illegible]।
অন্য জন উত্তর দিলেন—(যশোদার পক্ষ হইতে)
চন্দ্রবদন চন্দ্র চায় কি হলো দায়।
চাঁদ নিব বলে দুধের ছেলে
ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
চেয়ে দেখ্ তোর হাতের পানে
কত চাঁদ তোর নখের কোণে
চাঁদ কাঁদিস কেন।
এ চাঁদ কোথা পাব এনে দিব
ঘরে [illegible]।
চাঁদ হয়ে চাঁদ চাইলি নিতে
চাঁদ কোথা মোর প্রাণগোপাল
চাঁদ নিব যে হাতে—
**ও যে বৃষভানু রাজনন্দিনী
চন্দ্র নয়নে যাদব রায়॥**

ইঁট

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সাবেক দেনার জের টানতে টানতে বাড়ীটা একদিন সত্যিই বিক্রী হয়ে গেল। পল্লীগ্রামের বাড়ী—তাহোক, তবু তো বাপ-পিতামহর স্মৃতির সঙ্গে জড়ান; আত্মীয়-স্বজনরা যতীনবাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে খুশী হতে পারলেন না।

যতীনবাবুকে কিন্তু খুব বিমর্ষ মনে হোলো না।

অফিসে এসে বন্ধুবান্ধবদের বললেন, যাক বাবা, ডেলি প্যাসেঞ্জারী থেকে বাঁচা গেল।

কলকাতার চাকরী, দেশের বাড়ী মাইল পঞ্চাশ দূরে। পুরো এগার বচ্ছর যতীনবাবু ভোর ছটায় ভাতে-ভাত খেয়ে, প্রমাণ সাইজ একটা এলুমিনিয়মের কৌটোয় পরটা এবং আলু চচ্চড়ি ঝাড়নে বেঁধে ইস্টিশনে ছুটতেন ফার্স্ট ট্রেণ ধরতে। হাঁফাতে হাঁফাতে গাড়ীতে উঠে ঝাড়নটা খুলে, বসবার জায়গাটা ঝেড়ে মুছে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ঢুলতে সুরু করতেন। ব্যান্ডেল পার হলে অফিসের চেনা-শুনো আরও দু'চারজনকে সেই কামরায় দেখা যেত। তাদেরই একজনের পকেট থেকে বেরুতো একপাটী তাস। তারপর, থ্রি স্পেডস্, 'ফাইভ ক্লাবস' করতে করতেই যতীনবাবু হয়তো বলতেন, 'ব্যাপার কি হে, আজ যে বড় থার্ড লাইনে দিলে?'

এ প্রশ্ন করবার জন্যে কাউকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে লাইনের দিকে তাকাতে হোতো না, বসে বসে গাড়ীর ঝাঁকুনি আর ঘটঘট আওয়াজ শুনেই ধরে নিতেন, গাড়ী কোন্ লাইনে পড়লো। কোন্ লাইনে মানেই হাওড়ায় পৌঁছে কোন্ প্ল্যাটফর্ম। গাড়ী দশ নম্বরে ইন করলে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পা চালাতে হোতো একটু জোরে, এক নম্বরে ঢুকলে তবু একটু হাঁফ নিয়ে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে বোসা যেত।

এতদিনে এই দৌড় ঝাঁপের ইতি। সেই কথাটাই যেন সগর্বে প্রচার করলেন যতীনবাবু।

'তা তো হলো, কিন্তু তারপর—?' প্রশ্ন করলে একজন। জবাব দিলে আর একজন: মেস-শাবক, আর কি? দরকার হলে বলো যতীন, আমাদের লাটুবাবুর গলির অন্নপূর্ণা বোর্ডিং-এ সীট-ভাড়া সস্তা. মীল চার্জও বেশী নয়; তিন তরকারী, ভাত, ডাল, মাছ দুবেলা, অম্বল...

যতীনবাবু বাধা দিয়ে বলেছিলেন, উহুঁ, ফর্দ বড্ডই লম্বা কর, এ বয়সে আর মেসে গিয়ে উঠছি না। কলকাতাতেই খান দুই ঘর ভাড়া নেব। ফ্যামিলি নিয়ে আসবো।

এবং তাই করেছিলেন যতীনবাবু।

ফ্যামিলি মানে একটী ফিমেল, আর দুটী কাচ্চা-বাচ্চা; ছেলে-মেয়ে আর তাদের মা।

ছেলে-মেয়ের মা সুরধুনীর খুব অসুবিধে হয়েছিল প্রথম প্রথম। গাঁয়ের বাড়ীর সেই প্রকাণ্ড উঠোনের বদলে কলকাতার বাসার একতলায় দুটী অর্ধ-অন্ধকার ঘর আর দু'হাত [illegible] রোয়াক- সেইখানেই রান্না।

সুরধুনী অনুযোগ করতেন মাঝে মাঝে: [illegible] বন্ধ। দম আটকে আসে যেন—

'হুঁ! দম অত সহজে আটকায় না!' বেশ বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে জবাব দিতেন যতীনবাবু: হিসেব নিয়ে দ্যাখ, কলকাতায় যারা থাকে তাদের শতকরা নব্বইজনের নিজের কোন চাল-চুলো নেই। তারা এই রকম করেই কাটায়। গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপুলে নিয়ে দিব্যি আরামে বসবাস করে। এরাই জনসাধারণ—দেশের সাধারণ মানুষ, ভদ্দর লোক বলতে এদেরই বোঝায়—

বিত্তবান বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি কখনও প্রশ্ন করতো, এই ঘুপসি, অন্ধকার ঘরে থাকিস কি করে?

যতীনবাবু গলার স্বর রীতিমত চড়িয়ে জবাব দিতেন: আমরা সব পারি। আমরা প্রোলেটেরিয়েট।। বাড়ীখানা বিক্রী করিয়ে ভগবান আমাকে পাঁচজনের সঙ্গে একেবারে এক করে দিয়েছেন। তাদের দেখছি, বুঝছি, ভালবাসছি। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ।

[illegible] একটা চড় মেরে...

[illegible]

'আরে বাবা! [illegible] যেন কেউ না করে। [illegible] ছাদ না লাগে অন্য বাড়ীতে উঠে [illegible] নয়তো, দিনের পর দিন বছরের পর বছর একই কোঠার মধ্যে কাটাতে [illegible] ভাঙছে, কাল [illegible] কাটছে, কোথায় চুণ, কোথায় বালি, কোথায় সুরকি, [illegible] শেষ আছে রে বাবা! [illegible] পাঁচিশখানা বাড়ী আছে, মাসের পর মাস হাজার হাজার টাকা ভাড়া আসছে, সরকার গোমস্তা টাকা আদায় থেকে চুণ-বালির তদ্বির-তদারক পর্যন্ত সবকিছু করছে। আর কর্তারা মনের আনন্দে মোটর চেপে সভায় গিয়ে ইংরেজ খেদাবার জন্যে লম্বা লম্বা, গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে আসছেন...

এ সব অনেক দিন আগের কথা। তারপর অনেক কিছু ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসেছে এবং গেছে, ইংরেজ খেদানর পালা শেষ হয়েছে...দেশ ভাগ হয়েছে...

যতীনবাবু এখন নামজাদা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গোটা একটা সেকশানের বড়বাবু। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশী কর্তাদের কারবারও ফেঁপে ফুলে উঠেছে, যতীনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ফুলে না উঠলেও একটু ফেঁপেছেন। মানে মাইনের অঙ্কটা চারশ' দাঁড়িয়েছে, ডান হাত বাঁ হাত দিয়েও আসে কিছু কিছু...

সেদিন কালেকশান ডিপার্টমেন্টের রাখাল চাটুয্যে এসে বললেন, একটু কথা ছিল যতীনদার সঙ্গে—

উঠে একটু আড়ালে যাবার ইঙ্গিত। দুজনে এসে একটা পার্টিশনের অন্তরালে গা-ঢাকা দিলেন।

—সুবিধে দরে জমি পাওয়া যাচ্ছে, দাও বললেই হয়। নেবেন নাকি কিছুটা? আমিও অবশ্য সঙ্গে আছি—

'আরে না ভাই, না!' যতীনবাবুর কণ্ঠস্বরটা প্রায় আর্তনাদের মত শোনালো: বিষয় নয় বিষ। একবার জড়ালে আর রক্ষে নেই। [illegible] আছি। পাঁচজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে দিন কাটাচ্ছি। তা ছাড়া [illegible] একটা ভাল ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছে— [illegible]—

[illegible] সেখানে। বাড়ী ও [illegible] পারলেন না। কিন্তু [illegible]

[illegible]

এক দিনের [illegible] নিজেই নিলেন। [illegible] সুরু করে দিলেন। [illegible] ডিপার্টমেন্টের কাঁচা পয়সা, সেদিক থেকে [illegible] নেই রাখাল চাটুয্যের।

কিন্তু রাখাল নিজেই যেন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলেন। এক সঙ্গে জমি কেনা, এক সঙ্গে মাপজোখ, সীমা-সহরদ্দ ঠিক করা, এক সঙ্গে বায়না, এক সঙ্গে রেজেস্ট্রী, এখন একভাগে বাড়ী উঠবে, আর একটা দিক ন্যাড়া, ফাঁকা পড়ে থাকবে?

রাখাল বললেন, দাদা, দুর্গা বলে আপনিও নেমে যান। নতুন জায়গায় পাশাপাশি দু'ঘর হবে...

যতীনবাবু সে দিকে কান না দিয়ে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। যত সব ছোট-লোকের মরণ—

দিন চারেক পরে রাখাল চাটুয্যে বাসায় এসে হাজির।

—একটু পরামর্শ করতে এলুম যতীনদা। বাড়ী যা ফেঁদেছি তাতে পয়সাকাড়ি তো হু হু করে গলে যাচ্ছে। শেষ হতেও প্রায় ছ' মাস। ভাবছিলাম, সামনের দিকে যদি খানকয়েক দোকান-ঘর তুলে দিই......পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির ওপর টিন কিংবা টালির চাল...খরচ এমন কিছু নয়, অথচ—

—আরে ভায়া, ওসবে অনেক ঝামেলা, বিল ছাপানো, ভাড়া আদায়.........

—তা আছে একটু। কিন্তু মাসে মাসে একটা বাঁধা আয়। ট্যাক্স, মেরামত খরচা, এগুলো তো উঠবে। কি বলেন আপনি!

যতীনবাবু মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তা হলে আমারও বরং সামনের দিকে খান দুই ঘর—

অর্থাৎ দোকানঘর তোলাও সুরু হয়ে গেল।

রবিবারের সকাল। যতীনবাবু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে, জমির ফাঁকা অংশটায় ছোট্ট একটি বাগান করবার ছক আঁকছিলেন মনে মনে। বিকেলবেলার দিকে খোলা বারান্দায় ইজি চেয়ারখানা পেতে বাগানটির দিকে চেয়ে থাকতে মন্দ লাগবে না বোধহয়—

মালপত্র—লোহালক্কড় থেকে ইট-সিমেণ্ট সব-কিছুর খবরদারির জন্য কসবায় একটি লোক রেখেছিলেন দুজনে। ওভারসিয়র গোছের লোক। যতীনবাবুর চায়ের পেয়ালা শেষ হবার আগেই লোকটা প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকলো।

সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বড়বাবু! ছাদ ঢালাইয়ের লোহার রডগুলো—'

'কেন, ডেলিভারি দিয়ে যায়নি। টাকা তো কালই—'

'আজ্ঞে তা নয়। ডেলিভারি কাল সন্ধ্যের মুখেই দিয়ে গেছে। মাল খালাস করে বেড়ার ভেতরেই তুলিয়ে রেখেছিলাম...সকালবেলায় গিয়ে দেখি এক বাণ্ডিল কম—'

'নালিশ করবো।' যতীনবাবু বোমার মত ফেটে পড়লেন : তোমাদের সক্কলের নামে নালিশ করবো।

'আজ্ঞে, আমি কিন্তু—'

'কোন কথা শুনতে চাই না। আমি কাউকে ছাড়বো না। গিয়ে খোঁজ খবর কর। আমিও যাচ্ছি—'

যতীনবাবু জামা গায়ে দিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, গৃহিণী সুরধুনী ঘরে ঢুকলেন।

হ্যাঁগা, বেরুচ্ছ বুঝি?

তোমার কি মনে হচ্ছে বসে বসে ডুগি-তবলা বাজাচ্ছি? যতীনবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

একটু ঘাবড়ে গেলেন সুরধুনী। তবু ইতস্ততঃ করে বললেন, পাশের বাড়ী গিন্নি বলছিলেন, ও'দের কর্তা দিল্লীতে বদলী হয়ে যাচ্ছেন। তোমরা তো কসবায় বাড়ী করছো, ও'দের মোটরখানা যদি.........কম দামেই দেবেন বলছিলেন......

'ঘোড়া হলে চাবুকের জন্যে আটকাবে না। এখন একটু দম নিতে দাও দেখি।' জুতোটা পায়ে দিতে দিতে জবাব দিলেন যতীনবাবু—

'খুকী শ্বশুরবাড়ী থেকে চিঠি দিয়েছে।' আর একটু ইতস্ততঃ করে আবার বললেন সুরধুনী : বাড়ী হচ্ছে শুনে খুব খুসী। এবার পুজোয় এক ছড়া হার না নিয়ে ছাড়বে না লিখেছে।

বাড়ী, বাড়ী, বাড়ী!

যতীনবাবু চীৎকার করে উঠলেন : দেব না, কাউকে কিছু দেব না। বাড়ী বিক্রী করে সন্ন্যেসী হয়ে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—

জুতোর ফিতে না বেঁধেই গট গট করে বেরিয়ে গেলেন যতীনবাবু।

খোয়া মালের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। থানায় একটা ডায়রী করিয়ে রাখবেন কি না রাখালের সঙ্গে যতীনবাবু তারই একটা পরামর্শ করতে লাগলেন সেই তালগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে।

কোট-প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক সবিনয় নমস্কার করে যতীনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—দক্ষিণ দিকে যে পাঁচিলটা তুলেছেন সেটা একটু সরিয়ে নিতে হবে।

—সরিয়ে নিতে হবে! পাঁচিল গাঁথা হয়ে গেল...এখন... কেন বলুন তো?

—ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনার সীমানা ছেড়ে প্রায় তিন ইঞ্চি এগিয়ে গিয়ে আপনি পাঁচিল তুলেছেন।

অসম্ভব। আমরাও ম্যাপ একটু আধটু দেখেছি। কি বলো হে রাখাল? এক ইঞ্চি জমিও আমি ছাড়বো না। পাঁচিল ওঠবার আগে জানাননি কেন? আমি মামলা করবো, দরকার হলে হাই-কোর্ট পর্য্যন্ত লড়বো—হ্যাঁ—যান আপনি।

লোকটি কিছু বলবার আগেই যতীনবাবুর চোখ পড়লো উত্তর দিকের কোণে বাতাবির চারাটার ওপর হাড্ডিসার একটা বাছুর কখন বেড়া টপকে সেই দিকে গিয়ে কচি কচি পাতা-গুলো নির্বিবাদে চিবোতে সুরু করেছে।

'দেখেছ! দেখেছ! এদের কাণ্ডকারখানা দেখেছ!' বলতে বলতে যতীনবাবু কাউকে কিছু বোঝাবার অবকাশ না দিয়ে সেই দিকে ছুটলেন, হাতের ছাতাটা উঁচু করে। কাছাকাছি পৌঁছতে বাছুরটা তাঁর সেই ধাবমান উগ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে ছুটতে সুরু করলো। জমিটার দু'দিকে পাঁচিল উঠেছে, বাকী দু'দিকে কাঁটা-তারের বেড়া। বাছুরটা বার হবার পথ না পেয়ে ল্যাজ তুলে দৌড়য়, যতীনবাবুও উর্দ্ধশ্বাসে তার পিছনে ছোটেন।

রাখাল চাটুয্যে থেকে সুরু করে মিস্ত্রী-মজুর পর্য্যন্ত সবাই হাসতে সুরু করলো যতীনবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে।

রাখাল চাটুয্যে চীৎকার করে বললেন : ও নিজেই যাবে দাদা। আপনি মিছিমিছি হয়রাণ হচ্ছেন—

'মিছিমিছি' দৌড়তে দৌড়তেই উন্মত্তকণ্ঠে জবাব দিলেন যতীনবাবু : আমার জমি—আমি পয়সা খরচ করে গাছ পুঁতবো আর পরের গরু বাছুর তাই চিবিয়ে শেষ করবে! কখখনো না... নেভার!

জবাব দিতে গিয়ে বোধহয় একটু অন্য-মনস্ক হয়েছিলেন। ইটের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে এক-রাশ ভাঙ্গা খোয়ার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন যতীনবাবু। বাঁধানো দাঁত আর খোয়া গুলোর ধাক্কায় তলার ঠোঁটটা কেটে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেল।

—

গহন • •

• গোবিন্দ চক্রবর্তী

একটি নির্জ্জন তরী
ভেসে যায় গোধূলির ছায়ার ভিতর :
একটি বিজন তরু
ছুঁই-ছুঁই করে সেই মাস্তুল ধূসর—
শাখা তার ঢের দূর নদীতে গড়ানো;
একটি আশ্চর্য শান্তি, যতদূর চাও—
গেরুয়া ধূতির মত চূর্ণিতে ছড়ানো!

বাদুড়েরা ঝাড়ে ডানা,
থেকে-থেকে পেঁচা তোলে সাড়া :
আর যে ফোটে না কোথা
জীবনের এতটুকু অস্ফুট ফোয়ারা।
কি নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ জগৎ!
পাইথনের মত হিম ছাই-ছায়াপথ।
আরেক ব্যাকুল বিস্ময়
শুধু এই জল হয়ে, নদী হয়ে বয়!

কথার অতীত অনুভূতি :
একটি গহন-ঘন তরঙ্গিত স্ফূর্তি
শাসন-না-মানা কোনো দেশ-কাল সীমা—
জানি না সে থেকে সে কি
অন্তরঙ্গ, অপার নীলিমা!
তবু স্থির, তবু শান্ত, কি যে শান্তিময়—
পৃথিবী আশ্চর্য মনে হয়।
পৃথিবী—পৃথিবী যেন নয়।

একটি বটের ঝুরি ধরে অতঃপর
এক গলা অন্ধকারে ডুবে এইভাবে
যদি বসে থাকা যেত হাজার বছর!

—

নীলকণ্ঠ (২১৬৪০ ফুট)

জিতেন্দ্রনাথ বসু

রাজভোগ

অমরেন্দ্র ঘোষ

কাকা তোমায় কি বলে ডাকে? ও পাড়ার কাকা?

লক্ষ্মী ছেলে।

দিদি তাকে কি বলে?

বুলু।

আর তোমার বাবা?

সোনার চাঁদ ছেলে।

সত্যিই সোনার চাঁদের মত মুখখানি। চল-চল করছে পরিপূর্ণ লাবণ্যে। জবা একবার সস্নেহে তাকায় লোটনের দিকে। মাত্র চার বছরে পা দিয়ে ও কত কথাই না বলতে শিখেছে! এমন কথা তো জবার আর কোন ছেলে-মেয়ে বলেনি।

শীতকাল। সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। এক হাতে রেশন ব্যাগ, অন্য হাতে লোটন—জবা এগিয়ে চলে আর কথা বলে।

দিদি তোমায় বুলু বলে কেন বাবা?

আমি যে ঢুক্-ঢুক্ করে দুধ খাই।

কার দুধ?

গোয়ালার?

উত্তর শুনে জবার বুকের মধ্যটা আবার দুলে ওঠে। লোটনের জন্য প্রায় তিন বছর এক পো' করে দুধ রোজ রেখেছিল। কিন্তু ওর বাবা একদিন ঝগড়া-ঝাটি করে তুলে দিল দুধ। ওতে ডাহা জল মিশান, আর বাকীটা নিছক পাউডার।

কলকাতার দুধ অমনি হয়—শাদা জলই সব্বাই খাওয়ায়। একান্ত যদি অক্ষম হয়ে থাক, এ-ও যদি না চলে—

কে বলে অক্ষম হয়েছি? এ তোমার নিছক গায়ের জ্বালার কথা। আমি ভাবছি লোটনকে রোজের পয়সার সঙ্গে কিছু যোগ করে হরলিক্স এনে খাওয়াব।

তা ঠিক বলতে গেলে পিটালি গোলাই চলে না—হরলিক্স! জবা বাপের মাথায় এক বাটি জল ঠিক করে দাওয়ার ওপর রাখে, খানিকটা ছলকে পড়ে।

হাউ-মাউ-কাউ করতে করতে লোটন এসে সেই জলে পা হড়কে পড়ে যায়। ঐ দেখো মা দিদি ভূতুম সেজেছে, আমার ভয় করে।

স্বামী-স্ত্রী চেয়ে দেখে সত্যই সরলা একটা ছাই রঙের কাঁথা মুড়ি দিয়ে কেমন হুম্-হুম্ শব্দ করছে।

জবা কঠিন ভর্ৎসনার সুরে বলে, সময় অসময় বুঝবে না, একটা জরুরী কথা বলতে দেবে না, লেখাপড়া করবে না—কেবল খেলা আর খেলা।

সরলার কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক। যার হাতেখড়ি পর্যন্ত হয়নি, যে হাজারো কেঁদে-কেটে ছবিওয়ালা একখানা বই আজ পর্যন্ত পায়নি—শুধু নিজের অধ্যবসায় শিখে এসেছে অন্য ঘরের খোকনের পড়া শুনে দিব্যি কটি মুখের ছড়া, সে-ও মার খায়।

বিপিন বলে আহা তুমি ওকে অমন মারতে পারলে কিনা দোষে। তারপর সে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবে। হয়তো খোঁজে বিবাহ-রাত্রির আধফোটা একটি জবার কোড়কটিকে। সেই যে শিশির-ছোঁয়া সদ্য-ধোয়া মুখটি ছিল তার বুকে লগ্ন হয়ে।

বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে এই-জন্য লোকে আজকাল একটু শিক্ষিতা মেয়ে খোঁজে।

তাই নাকি? জবা অঞ্চলের চাবি খোলে।

সন্তানের স্বাস্থ্য কিসে টেকে না টেকে কিছুই বুঝবে না, কেবল কোন্দল।

বিপিনের কথা শেষ হতে না হতে জবা একটা জং-পরা ট্রাঙ্ক খোলে। টেনে বার করে আনে তার ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট। সেই সঙ্গে গাঁথা রয়েছে মার্কসিট। স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের নম্বরগুলো ষাটের কোঠা ছাড়ান।

বিপিন চোখ নত করে।

ও কি? এখন যে দেখছ না? ভুলে গেলে এমন মাঝে মাঝে চোখে আঙুল দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। জবা একটু জিরিয়ে ফের বলতে সুরু করে, আমি তো বেঁচে রইলাম, লোটনের দুধ বন্ধ করলে, দেখব সাহেবীয়ানা কদিন চলে!

না, না, দুধে ডাহা জল মিশান কিনা, তাই ও আমার রাখতে আপত্তি।

আচ্ছা, আচ্ছা, নাই রাখো দুধ, অন্য ভাড়াটেদের আর শুনিয়ে লাভ কি।

আহা কেন রাখব না। ও-ই তো বললাম, হরলিক্স এনে দেখুন। তা এর চাইতে অনেক পুষ্টিকর—বুঝলে?

হুঁ বুঝব না কেন? এই সাত বছর ধরে বুঝে বুঝে আমার দাঁত ভেঙে গেল!

বিপিন গলাটা অনেক খাদে নামিয়ে জবাব দেয়, দুঃখের বিষয় দেখছি তবু কিছু বুঝবে না।

জবা ক্রন্দনরত লোটনকে নিয়ে উঠে যায়।

বিপিন দু-দুটো পাশ করেছে, অনেক বোঝার গৌরবও করল—কিন্তু হরলিক্স আর আনা হল না।

ইদানীং জবার শরীরটা বেশ খারাপ যাচ্ছে। সংসার খুব বড় না হলেও, ছেলে-মেয়ে গুটি-তিনেক। তাদের দৌরাত্ম্য, হাট-বাজার, জল তোলা, কয়লা আনা পর্যন্ত—একার ওপর সব চাপ। বিপিনের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব।

কারণ তার ধরা-বাঁধা আয় নেই। এখন হয়েছে নাকি ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট। রাত দশটা, বেলা বারটা, ফেরার ঠিক নেই কোনো দিন।

জবার বর্ষীয়সী আত্মীয়-স্বজন পরামর্শ দিয়েছেন, এখন না হয় ছেলেটার দুধ ছাড়িয়ে দাও। নইলে শরীর ফিরবে না।

তা বটে! নিজের স্বাস্থ্যের থেকে জগতে আর বড় কি আছে? লোটন তুমি কিন্তু দুধ খেতে পাবে না। বড় হয়েছ, সব্বাই মন্দ বলে শুনেছ তো?

তবে আমি কি খাব? বড় সকরুণ জিজ্ঞাসা। জবার মাতৃ-হৃদয় কেঁদে ওঠে।

যা চাইবে তাই দেব। মুড়ির মোয়া, রসগোল্লা, সন্দেশ।

'রসো' কি, মা?

দুধ ছাড়ো—তখন দেখতে পাবে।

আমি আল দুধ খাব না—কখন দেখাবে?

কাল সকালে।

না, না—এখন দেখব।

উঁহু, আগে দুধ ছাড়ো—তখন দেখবে রসগোল্লায় কত রস। আমার দুধের চেয়ে ঢের মিষ্টি। ঠিক মধুর মত—বুঝলে?

জ্ঞান হয়ে অবধি লোটন রসগোল্লা এ সংসারে আনতে দেখেনি। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শোনে তার মর্মকথা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে মাকে। তার অণু-পরমাণুতে লোভাতুর জিজ্ঞাসা।

রাত্রে সে মার বুক থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে শোয়।

কিন্তু সুষুপ্তি আসে না। এতদিনের অভ্যাস—দমন করা কি সহজ?

গভীর রাত্রে বিনিদ্র লোটন কেঁদে ওঠে।

জবা তাকে বুকে টেনে নেয়।

অতিরিক্ত নিষ্পেষণে একদিন জবার সে দুধও শুকিয়ে যায়।

এখন লোটন কি খাবে?

আবার রসগোল্লা, সন্দেশের কথা ওঠে—ছানা ও শর্করার।

লোটন বলে, মা আমি এমনি করে চেটে চেটে খাব। একটুও নসও পলবে না? উঃ কি মিত্তি!

বাজার ফেরৎ কদিন জবা কিনেও দিল। দশটা, বিশটা নয়—প্রত্যহ একটি করে, হয় সন্দেশ, নয়তো রসগোল্লা। এর জন্য জবাকে কি কম হিমসিম খেতে হয়েছে। নিতাই বাদ পড়ে গেছে বাজারের একটা বিশিষ্ট ফর্দ। তবুও সন্তানের পাণ্ডুর দিকে না চেয়ে পারে না মা।

মিষ্টি পেয়ে লোটনের কি আনন্দ যেন সসাগরা ধরিত্রীর সমস্ত রস ওর অংগুলি হাতের আয়ত্তে। ও এক-একদিন সগৌরবে এনে মিষ্টি হাতখানা চাটিয়েছে দাদা সরলাকে।

জবা ভেবেছে না এবার একবার সুবিধে পেলে সবাইকেই এনে খাওয়াবে রসগোল্লা। ভাল জিনিষ—ওরা তো একরকম মুখে দিয়েই দেখেনি না।

কিন্তু সে সুদিন ওদের জন্য বুঝি বিধাতার বিধানে নেই। তাই জবার আশা আর পূর্ণ হয় না।

অথচ মাঝখান থেকে লোটনটার একটা বদ-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। মিঠাইর দোকানের সুমুখ দিয়ে কিছুতেই হাঁটা যায় না। পয়সা থাক কি না থাক, সে একেবারে কুরুক্ষেত্র করে ছাড়ে।

মাঝে মাঝে লোটন মারও খায়। মধ্যে মধ্যে লোটনকে ফাঁকি দিয়ে রেখে আসতে হয় পড়শী এক দিদির কাছে। রোজ দু'আনা পয়সা তো আর সহজ নয়।

আগে দুধ ছাড়ো—তখন দেখবে রসোগোল্লার কত রস।

লোটন সাধারণ ছেলে নয়। অসাধারণ তার বুদ্ধি। সে দু'একদিন জবার গতিবিধি লক্ষ্য করে—কোন্ পথে আসে এবং যায়। সে ওৎ পেতে থাকে পরবর্তী সুযোগের জন্য।

সেদিন পূবের দরজা দিয়ে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে জবা। পথের বাঁক ঘুরতেই সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কচি দুখানা বাহু-বন্ধনের মধ্যে কেন জড়িয়ে পড়ল?

লোটন, তুই ও দরজা দিয়ে বুঝি এলি? কি সাংঘাতিক দুষ্টু ছেলে!

লোটন হাসে বটে, কিন্তু তার চোখে জল। যেন সমস্ত আঁখিকোণ টলটল করছে।

কদিন নে, যাবি আমার সঙ্গে? কিন্তু কিছু চাইতে পারবি নে!

লোটন মাথা নাড়ায়।

আবার লোভাতুর বালক প্রতিজ্ঞা করে অকপটে।

জবা লোটনের মুখে চুমো খায়। এই তো লক্ষ্মী ছেলে। কারা সাধে এ নাম রেখেছে!

আজ আর লোটন একটুও গণ্ডগোল করে নি বাজারে যাবার মুখে। সে মহা-সংযমীর মত মিঠাইর দোকানের সুমুখটা পেরিয়েছে।

কিন্তু ফেরার পথে জবার একটু ভয় হয়। হঠাৎ এখন কোথায় কড় উঠেকে উঠতে পারে। চঞ্চল শিশুর মন বোঝা বড় দায়। যাওয়ার সময় যদিও বা কিছু কিনে দেওয়া যেত, ফেরার বেলা তো তাও একেবারেই শূন্য।

সেইজন্য জবা আবোল তাবোল সহস্র কথা বলতে বলতে পথ চলে। কে তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসে তোমার বাবা, না দিদি, না ছোড়দি, না কাকা?

বালক এতবড় একটা জটিল প্রশ্নের শুধু একটি কথায় উত্তর দেয়, তুমি।

জবার সমস্ত দেহ শিউরে ওঠে। ও আমার লক্ষ্মী বাবা!

কিন্তু সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে মিঠাইর দোকানটা যত কাছে আসে।

উজ্জ্বল আলোটা শো কেসে জ্বলছে। আর অফুরন্ত প্রলোভনের সামগ্রী যেন শিশুদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

শো কেসটার কাছাকাছি এসে লোটন একেবারে পরম বৈরাগী হয়ে যায়। সে ক্ষুদ্র হাতখানা নাড়িয়ে বলে, ও সব আমি খাইনে মা, আমি ভাল ছেলে হয়েছি—ও সব খাই নে।

জবা চেয়ে দেখে লোটনের মুখে এক সকরুণ হাসি।

ও সব যারা চায়, তারা বড় দুষ্টু ছেলে। আমি ও সব চাইনে।......

শো কেস পেরিয়ে আসে। এবার লোটন ফিরে চায়; কিন্তু মুখে সেই বৈরাগ্যের বাণী, সংযমের নিদারুণ পরীক্ষা।

হঠাৎ লোটন থামে, অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে, আমি আর হাঁটতে পারি নে।

জবা এ ক্লান্তির কারণ নিমেষে বোঝে। সে লোটনকে কোলে তুলে নিয়ে মিঠাইর শো কেসটার কাছে আসে।

কোনটা নেবে ধন?

অত্যুৎসাহে বালক কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে। মুহূর্তে তার ঘুচে যায় সমস্ত অবসাদ।

ঐটে মা, ঐটে—

চার আনার একটা রাজভোগ। তবু জবা আপত্তি করে না।

একটা ঠোঙা করে, ধীরে ধীরে ধীরে লোটন যায় প্রবীণের মত। কতদিন তার বরাদ্দটা বাদ গেছে!

মা, পয়সা? দোকানী বলে চার আনা।

জবা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এখন তো খুচরো নেই, সঙ্গে পাঁচ টাকার নোট।

কই দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি!

জবা আঁচল খোঁজে। ভান করে বিস্ময়ের। আশ্চর্য নোটটা গেল কোথায়? লোটন, তুই কি খুলে ফেলে দিয়েছিস?

লোটন নির্বোধের মত চেয়ে থাকে।

দোকানী বলে আচ্ছা এ পথ দিয়ে তো রোজই আপনি চলাফেরা করেন—কাল না হয় দিয়ে যাবেন।

কিন্তু সে আগামীকাল আর জবার ভাগ্যে আসে না। সে সোজা পথ ছেড়ে বাধ্য হয়েই বাঁকা পথে চলে।

চিত্রকর: এস গাঙ্গুলি

গান-বাজনার জলসায় অনেকেই যায়। কেউ যায় একটু আনন্দ কুড়িয়ে আনতে, কেউবা যায় সংগীত সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করতে, আবার কারো কারো যাবার উদ্দেশ্য, গান-বাজনার ভালো-মন্দ বিচার করতে বা গুণীদের ক্ষমতা-অক্ষমতা যাচাই করতে। উদ্দেশ্য কারো মন্দ থাকে না, তবে অনেক সময় আচম্বিতে এমন সব ঘটনা আসরে ঘটে যায়, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে এই সব উদ্দেশ্যের কোনটার সাধনেই সাহায্য করে না। অথচ একটু বিচার করে দেখলে মানতে হয়, এই ধরনের ঘটনা বা তার বিবরণ রসিকজনের মনোরঞ্জন বিধান আর সংগীত শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-বিবেচনার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর দেশব্যাপী সংগীত-পরিক্রমায় এই শ্রেণীর বহু ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কখনো কখনো দু'চারটে ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমাদের মত লোকেরও হয়েছে। নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল।

'মহাদেব উবাচ'

এক বিখ্যাত ওস্তাদের বাড়ীতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে গিয়েছেন গান শুনতে। তাঁর হাতে 'সংগীতসার সংগ্রহের' একখানি মুদ্রিত কপি ছিল। ওস্তাদ জানতে চাইলেন ওখানি কি বই। পণ্ডিতজী ভুল করে বললেন, "সংগীত দর্পণ"। শুনেই ওস্তাদ হাসতে লাগলেন এবং যখন শুনলেন সংগীত দর্পণের লেখক দামোদর মিশ্র তখন তাঁর হাসি আর থামতেই চায় না।—শেষে বললেন, "দেখ মিছিমিছি এই সব বাজে বই পড়ে লাভ কি? এটা যদি শাস্ত্রের কিতাবই হয়ে থাকে তাহলে এর লেখক মানুষ হ'ল কি করে? দেবতা ছাড়া আর কারো পক্ষে শাস্ত্র লেখা কি সম্ভব?—এই জন্যই আমরা আমাদের বই কাউকেও দেখাই না।"—এই বলে তিনি তাঁর ঘর থেকে একখানি জীর্ণ পুঁথি বার করে আনলেন এবং পণ্ডিতজীকে খানিকটা পড়তে বললেন। পণ্ডিতজী পড়তে আরম্ভ করলেন, "মহাদেব উবাচ"—তৎক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে ওস্তাদজী বললেন, "দেখলেন ত স্বয়ং মহাদেবের লেখা বই।"—পণ্ডিতজীর জানতে বাকী রইল না যে এই পুঁথিখানা 'সংগীত দর্পণ' ছাড়া আর কিছু নয়!

স্বর ও ব্যঞ্জন

এক সংগীত শাস্ত্রীর সংগে জনৈক সংগীত শিক্ষার্থীর কথাবার্তা হচ্ছিল:—

শাস্ত্রী—"দেখ 'স্বর' শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে আমি তোমাদের 'সংগীত রত্নাকর' পড়তে বলি না,—এ বিষয়ে আমি পাণিনীর ব্যাখ্যাই স্বীকার করি।"

শিক্ষার্থী—"কি রকম?"

শাস্ত্রী—"আরে, 'স রি গ ম প ধ নি' এগুলো স্বর হ'ল কি করে?—যে কোন ব্যাকরণের মতে এগুলি ব্যঞ্জন নয় কি?—কথাটা কেউ তলিয়ে দেখেছে কি?"

শিক্ষার্থী—"কিন্তু শার্ঙ্গদেব ত এইগুলিকেই স্বর বলেছেন।"

শাস্ত্রী—"তোমরা দেখছি শার্ঙ্গদেবের বেজায় ভক্ত। উনি ছিলেন কাশ্মীরের এক বৈদিক ব্রাহ্মণ, —দাক্ষিণাত্যে গিয়ে এখান ওখান থেকে নানা কথা সংগ্রহ করে 'রত্নাকর' খাড়া করেছেন। কিন্তু সংগীতের উনি জানতেন কি? এটা ত সোজা কথা যে সা রে গা মা কথাগুলোর উচ্চারণ ঠিক অ আ ই ঈ উ ঊ ইত্যাদি স্বরের উচ্চারণের সংগে একেবারেই মেলে না?"

অতঃপর শিক্ষার্থী বেচারীকে শাস্ত্রীর ব্যাখ্যাই মেনে নিতে হ'ল!

'এই সেই দীপক'

যদু ওস্তাদের গান সুরু হয়েছে। শ্রোতাদের মধ্যেও অনেক নামকরা গুণী আছেন। তাঁদের মধ্যে মধু ওস্তাদ একটু দূরে আসন গ্রহণ করেছেন। গান হচ্ছিল একটা মামুলি রাগের—[illegible] না কেদারার না বাগেশ্রী। কিন্তু একজন অনাড়ী শ্রোতা রাগটা ধরতে পারছিলেন না, তাঁর মুস্কিলের কথা—বন্ধুবান্ধব যদি জিজ্ঞাসা করে "কি কি রাগ শুনে এলি?" তবে কি বলবেন তিনি? নিরুপায় হয়ে নামী ওস্তাদ মধুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি জানতে চাইলেন "এটা কি রাগ হচ্ছে?" কৃত্রিম বিস্ময়ে মধু ওস্তাদ জবাব দিলেন "এটা বুঝতে পারলেন না? —এই হচ্ছে দীপক!"—অধিকতর বিস্ময়ে অনাড়ী শ্রোতা বললেন, এই সেই দীপক?— যে দীপক তানসেন আকবর বাদশার দরবারে গেয়েছিলেন, আর যাতে করে দরবারে দীপ জ্বলে উঠেছিল?—মধু ওস্তাদ বললেন, "হ্যাঁ, এখানেও তাই হচ্ছে।—এই দেখছেন না, গান শুনে আমার পিত্তি অবধি জ্বলে যাচ্ছে!" যদু মধুর সম্পর্কটা ছিল অহিনকুলের।

মূর্চ্ছনা তত্ত্ব (১)

সংগীত শাস্ত্রে মূর্চ্ছনার সংজ্ঞা হচ্ছে "ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানাং আরোহশ্চাবরোহশ্চ।" এরই ব্যাখ্যায় একজন পণ্ডিত বললেন, "আহাহা এই ব্যাপারটার রহস্যই আলাদা!" শ্রোতারা রহস্যটা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বললেন, "আহা, সাত সুরের ক্রমে আরোহণ এবং পুনরবরোহণেই যে মূর্চ্ছনা এটা ত শ্লোকের ভাষা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। 'সা' এর পর রে গা মা পা ধা নি স্বরগুলির মূর্চ্ছনা। এর পর আবার তার ওপরের সপ্তকের সাত স্বরের মূর্চ্ছনা,—তারপর আবার তারও ওপরের সপ্তকে মূর্চ্ছনা। এই শেষোক্ত সপ্তকের নিখাদ প্রথম সপ্তকের সা অপেক্ষা একুশ স্বর উঁচু হবে, এ ত বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে!—" শ্রোতারা বিস্ময়ে হতবাক! মানুষের কণ্ঠ এত উঁচুতে উঠতে পারে এ ধারণা কারো নেই! পণ্ডিত অতঃপর বললেন, "আপনাদের কল্পনায় হয়ত এটা সম্ভবপর মনে হচ্ছে না, —না হবারই কথা, এটা যে কলিকাল! অর মূর্চ্ছনার এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন সত্যযুগের ঋষিরা। যে যুগের মানুষ ছিল একশত ফুট উঁচু, সে যুগে এই সামান্য কয়েক সপ্তক সুরে তার অধিকারও ছিল। আর সব কথা ছেড়ে দিলেও এটা ত বিশ্বাস করেন যে সীতা মাটিতে বসে বসেই হাত বাড়িয়ে নারকেল পেড়ে খেয়েছিলেন?" শ্রোতারা দেখলেন যুক্তি অকাট্য!

মূর্চ্ছনা তত্ত্ব (২)

খাঁ সাহেব গাইতেন ভাল, আবার শাস্ত্রচর্চাও করতেন কিছু কিছু। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসীম দখল গায়ক মহলে, বিশেষতঃ তাঁর নিজের শিষ্য মহলে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। মূর্চ্ছনার প্রসংগ উঠতে তিনি প্রথমেই বললেন, "সংগীতের কিতাবওয়ালারা (গ্রন্থকারগণ) সংস্কৃত ভাষাটাই ভাল করে জানতেন না; দেখুন 'কর্মাৎ স্বরাণাং সপ্তানাং আরোহশ্চাবরোহশ্চা' (বোলগুলো খাঁ সাহেবের)। মূর্চ্ছনার এই সংজ্ঞা যিনি নির্দেশ করেছেন, ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মূর্খতা কি সাংঘাতিক! —'কর্মাৎ' শব্দে তিনি কর্মের কথা বললেন, অথচ 'কর্তার' উল্লেখ নেই। আপনারাই বলুন, কর্তা ছাড়া কি কোন সংস্কৃত বাক্য নিষ্পন্ন হতে পারে? এই সব আনাড়ী লোকের হাতে পড়ে সংগীত শাস্ত্রটাই মাটি হতে বসেছে।" খাঁ সাহেবের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান কি গভীর! অথচ অনেকের ধারণা ছিল ইনি বড় বড় পণ্ডিতকে তর্কে হটিয়েছেন!

রাগ-সিদ্ধ গায়ক

কথায় কথায় এক খাঁ সাহেব নানা রাগের স্বর ব্যাখ্যা করলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সব কথা শুনে জানতে চাইলেন এই ব্যাখ্যাই যে ঠিক তার প্রমাণ কি? উত্তরে খাঁ সাহেব বললেন—"দেখুন আমি যে তানসেনের বংশধর সে কথা প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি। তানসেন দেবতাসদৃশ ছিলেন। তিনি সারা শাস্ত্র গ্রন্থের ভুল চুক দেখিয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে কোন পণ্ডিতের বা গুণীর সাধ্য কুলোয়নি। তিনি ছিলেন স্বরসিদ্ধ, সুতরাং তাঁর বংশধর আমিও তাই। এখন যদি দেখান আমার কণ্ঠনির্গত স্বরের সংগে অপর কোন গুণীর স্বরগুলি মিলে যাচ্ছে তবেই জানা গেল সেই গুণীর শিক্ষা ঠিক হয়েছে, আর যদি কারো স্বর আমার সংগে না মিলে তবেই প্রমাণিত হ'ল তার স্বরে কিছু গলদ আছে। এর চাইতে বেশী প্রমাণ আর কি চাই আপনার?

আসল শাস্ত্র আরবী ফারসীতে লেখা

আর একজন তন্ত্রীবাদক খাঁ সাহেব তীব্রতর, তীব্রতম, অতিকোমল, তীব্রকোমল, অতিতীব্রতম ইত্যাদি সূক্ষ্ম স্বরের উল্লেখ করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ে দেখেছেন কিনা। তিনি বললেন, "সংস্কৃতকে আমি কি পারোয়া করি? আমার আধারগ্রন্থ সবই আরবী ফারসী!" পুনরায় প্রশ্ন হ'ল "কিন্তু সেই সব কিতাবের বক্তব্য ত সংস্কৃত

থেকেই নেওয়া ?" খাঁ সাহেব বললেন, "তা হবে কেন ? সংগীত ত সারা দুনিয়ার বস্তু। —হয়ত আরবী ফারসী কিতাব থেকেই সংস্কৃত শাস্ত্র এসেছে। —এই দেখুন না, আরবী 'বাবন' থেকে সংস্কৃত 'ভৈরোঁ' আর আরবী 'মাক্‌স' থেকেই আপনাদের মালকোশ এসেছে।" আবার প্রশ্ন হ'ল "'তীব্রতর', 'তীব্রতম' ইত্যাদি যেসব নাম আপনি করলেন, সেগুলি আরবী ফারসী কিতাবে কোত্থেকে এল ?" খাঁ সাহেব এবার চটে গিয়ে বললেন, "যাঁরা কিতাব লিখেছে, তাঁদের কাছে যান, আমার ওসবে দরকার কি ?"

'তেরী বী চুপ ঔর মেরী বী চুপ'

একজন বিখ্যাত গুণী বলছেন, "ঘটনাটা হয়ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না। গানের আসরে বসে আছি। একজন গায়ক গাইতে বসে প্রথমেই পরিচয় দিলেন, তিনি আমার সাকরেদ। তারপর যা গেয়ে শোনালেন তার রাগ, চলন কোন কিছুই আমার জানা মনে হ'ল না,—অন্ততঃ এটা বুঝা গেল, গানটা আমার কাছে শেখা নয়। কিন্তু তখন আমি কি করি ? যদি বলি এ আমার সাকরেদ নয় তবে ওর গুমোর ফাঁক হয়ে যায়, আর বেচারী আসরের মাঝখানে জব্দ হয়। আর যদি বলি আমারই সাকরেদ, তাহলে গানখানির রাগ এবং তার চলন সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে পারা উচিত হয়ে পড়ে! মহাবিপদেই পড়া গেল! কি আর করি ?—শেষে 'তেরী বী চুপ ঔর মেরী বী চুপ' এই নীতির আশ্রয়ে মৌন অবলম্বন করাই নিরাপদ মনে করলাম !"

উপবেদের লক্ষণ

গুরু—শাস্ত্রে আছে "সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।"

শিষ্য—মহাশয়, ব্রহ্মা যদি সামবেদ থেকেই সংগীত সংগ্রহ করে থাকেন, তা সংগীতকে বেদ না বলে উপবেদ বলা হয় কেন ?

গুরু—তার মানে বেদ হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, আর সংগীত তা নয়,—কোন উপবেদই অপরিবর্তনীয় নয়,—বেদে আর উপবেদে এই তফাৎ—

শিষ্য—কিন্তু সংগীতকে পঞ্চম বেদও ত বলা হয়।

গুরু—ঐ একই কথা,—পঞ্চম মানে হীন, পঞ্চম জাতি মানে হীন জাতি। অথবা যেমন দলাই লামার তুলনায় হীন হচ্ছে পঞ্চম লামা !

শিষ্য—কথাটা ত পঞ্চম লামা নয়, পঞ্চেন লামা।

গুরু—জ্যাঠামি করো না, যা বলছি মন দিয়ে শোন। বর্গীয় পঞ্চমবর্ণগুলির উচ্চারণে একটু নাকী সুর থাকে, আর নাকী সুর যে ভীরুতা বা হীনতার পরিচায়ক একথা কে না জানে ?

শিষ্য—এইবার বোধহয় খানিকটা বুঝতে পারছি।

গুরু—বুঝতেই হবে যে! দেখ, গান্ধর্ববেদ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, সবই উপবেদ বা পঞ্চমবেদ। এদের লক্ষণ হচ্ছে, উপাদানঘটিত পরিবর্তন যা ঘটবার ঘটবে, অথচ মূল পরিচয়ে কোন গোলমাল থাকবে না। অর্থাৎ নামরূপঘটিত নিয়মটা এদের ক্ষেত্রে খাটবে না,—রূপের বা গুণের তফাৎ হয় হোক, নাম ঠিক থাকবে। যে কোন কবিরাজকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি স্বীকার করবেন, চ্যবনপ্রাশের কোন কোন শাস্ত্রোক্ত উপাদানের স্বরূপ তাঁর জানা নেই, অথচ সেগুলির পরিবর্তে অন্য উপাদান যোগ করলেও চ্যবনপ্রাশের নাম চ্যবনপ্রাশই থাকে! সেই রকম প্রাচীন শাস্ত্রবর্ণিত রাগ-রাগিণীর স্বরগুলি আগাগোড়া বদলে গেলেও ওদের প্রাচীন নাম এখনো টিকে আছে।

শিষ্য—আপনি কি বলতে চান বর্তমান যুগের কামান বন্দুক অভ্যাসঘটিত বিদ্যাকে আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ধনুর্বিদ্যা বলব ?

গুরু—আবার জ্যাঠামি !

অজা বদতি গান্ধারম্‌

শাস্ত্রাভিমানী গায়ক মেঘমল্লারের ব্যাখ্যা করছিলেনঃ—"শাস্ত্রে আছে 'গনিহীনোঽপি মল্লার'—অর্থাৎ মল্লারে গান্ধার আর নিখাদ স্বর দুটি বর্জিত। আহা ধন্য এই শাস্ত্রকার! রাগ রাগিণীর তত্ত্বে তাঁর কি গভীর অধিকারই না ছিল ? দেখুন 'ষড়জাদি মূর্চ্ছনোপেতঃ' এই বর্ণনায় ষড়জকে আদি বলা হয়েছে,—কেন বলা হয়েছে ? না ষড়জ হচ্ছে ময়ূরের ডাকের তুল্য। ময়ূর যে বর্ষায় বিশেষ আনন্দলাভ করে এ তো সকলেই জানে। সংগে সংগে দেখুন মল্লার বর্ষারই রাগ। বৃষভ (ঋষভ) হ'ল ষড়জের বিবাদী,—এটাও জানা কথা যে ময়ূর আর বৃষ জন্মবৈরী! ওদিকে 'পিকো বদতি পঞ্চমং', কাজেই পঞ্চম স্বর বর্জন করা হয়নি,—বর্ষায় পিক অর্থাৎ কোকিল যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়! ধৈবত নিখাদের আওয়াজ শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে ঘোড়া আর হাতীর মতন। এদের মধ্যে হাতীকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ঘোড়াকে রাখা হয়েছে (মল্লারে ধৈবত আছে কি নিখাদ বর্জিত)—এতে আর তেমন দোষটা কি হয়েছে ? বাকী রইল গান্ধার ও মধ্যমের কথা। মধ্যম চাতকের স্বরতুল্য, সুতরাং বর্ষার রাগে তাকে রাখতেই হবে। কিন্তু গান্ধারকে আর কিছুতেই বাদ না দিয়ে পারা গেল না।—গান্ধার হচ্ছে কি রকম, না 'স চ ছাগস্বর তুল্যঃ।' ছাগলকে বর্ষার জলে বার করুন ত—সে কিছুতেই ঘরের বাইরে গিয়ে চরতে চাইবে না, সুতরাং অমন প্রাণীর যে আওয়াজ [illegible] তাকে বর্ষার উপযোগী রাগে বর্জন না করে শাস্ত্রকারের আর গত্যন্তর ছিল না।

স্কেচ : কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

দাঁড়িয়ে তিনি ঘুড়ি ওড়াতেন। মাঞ্জা-করা রঙিন সুতো দিয়ে লম্বা বাটওয়ালা মোটা লাটাই জড়ানো। একটা ঘুড়ি উড়তো আকাশের শূন্যে, আর, চার-পাঁচটা থাকত চাকরদের হাতে। প্যাঁচ খেলতে গিয়ে একটা ঘুড়ি কাটা পড়লেই চট্‌পট্‌ আর একটা সাপ্লাই করত চাকরেরা।

আমরা তখন খুব ছোট, খোকনবাবুর বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো। যেমন তাঁর লাটাইয়ের সুতো ছিল মাঞ্জা করা, তেমনি ছিল তাঁর চেহারাটাও। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং—যেমন নকনকে, তেমনি চকচকে। মসলিনের মত ফিনফিনে ধুতি পরনে। খালি গা। কোমরে কাপড় বাঁধা। এইটেই ছিল তাঁর ঘুড়ি ওড়ানোর সাজ।

রমাদাসী ও-তল্লাটের মস্ত জমিদারণী অগাধ টাকা, আর অঢেল প্রতাপ। ছেলেপুলে হয়নি। বিধবা হয়েছেন। এত টাকা খাবে কে? তাই তিনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এই খোকনবাবুকে। খোকনবাবুর বয়স তখন এক।

এক বছর বয়সের খোকনবাবু ক্রমে ডাগর হয়ে উঠলেন। ক্রমে তাঁর নানা রকমের বায়না বাড়তে লাগল।

ঘুড়ি আর লাটাই-ই কেবল নয়, ইনডোর গেমের জন্যে এল ডুগি-তবলা, তানপুরা, এস্রাজ, হারমোনিয়ম। সেই সঙ্গে জুটল চেলা-চামুণ্ডাও মধুলোভী ভৃঙ্গের মতন।

সেই ভৃঙ্গদের মধ্যে কারো কারো বিষাক্ত হুল যে লুকানো ছিল, তা অবশ্য কেউ ধরতে পারেনি।

ক্ষেমেন্দ্রর সঙ্গে ব'সে একদিন এইসব অতীত কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সে শ্রোতা খুব উঁচুদরের। কথার মাঝখানে এতটুকু বাধা দেয় না। মনোযোগ দিয়ে সব কথা শোনে। আমার কথা শেষ হবার পর ক্ষেমেন্দ্র বলল, মিস্টি ব'লে মিস্টি। শুনেছি, মধু খেতে হলে হুলও খেতে হয়। কিন্তু নেপালের মজাটা দেখ। মধুটাও সে খেল আবার হুলও বেঁধাল সেই। হুলটাও তো তারই খাওয়ার কথা।

হেসে উঠলাম। কিন্তু কেন যে হাসলাম তা জানি নে। এ-কথা তো এতটুকু হাসির কথা নয়। এ যে এক মর্মান্তিক কাহিনী।

যাই হোক। যে কথা বলছিলাম। অনেক চেলা-চামুণ্ডা জুটে গেল খোকনবাবুর। এর মধ্যে একজন হল নেপালচন্দ্র। আর যারা জুটেছিল, তারা সকলেই নগদ-বিদায়ের খদ্দের, তারা টাকা-টাকে খোকনবাবুর কাঁচা মাথায় হাত বুলিয়ে হাতিয়ে নিতে পেরেছে, তাতেই তুষ্ট হয়ে সরে গেছে। কিন্তু নেপাল ছিল পাকা গাহাক। তাই শেষ অবধি সে লেগে ছিল খোকনবাবুর পিছনে।

আমাদের ও-তল্লাটে নেপালকে সকলে কেমন যেন অবজ্ঞার চোখে দেখত। তখন মানে বুঝতাম না। কিন্তু এখন বুঝি।

এককালে নাকি নেপালদের অবস্থা ছিল খুব সরেস। কিন্তু তার বাবা মারা যাবার পর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বিধবা মা, ভাই-বোন নিয়ে অভাবে টাল-মাটাল হচ্ছেন। দু-বেলা খাওয়া জোটে না।

এমনি ঘরের ছেলে নেপাল। কিন্তু তার চাল-চটকই আলাদা। ধব্‌ধবে সাদা কেড্‌স্‌ জুতো পায়ে দিয়ে নতুন গাট-করা ঝক্‌ঝকে র‍্যাকেট হাতে নিয়ে সে যায় টেনিস খেলতে।

খোকনবাবুর শাগরেদ। খোকনবাবু যা ছিবড়ে ব'লে ফেলে দেন, নেপাল তাই কুড়িয়ে নেয় খাদ্য ব'লে। এতেই তার বাবুয়ানিটা চলে দিব্যি সহজেই।

এইভাবে চলেছে দিনের পর দিন। ইংরেজি কথায় যেমন কিউ অক্ষরটা আর ইউ অক্ষরটা পাশাপাশি থাকবেই, সে আমলে তেমনি একটা কথা চালু হয়েছিল যে, খোকনবাবু আর নেপালবাবু পাশাপাশি থাকবেই। এদের দু-জনের আর একটা নাম ছিল মাণিকজোড়।

আমল বদ্‌লে গেল। কেটে গেল অনেকদিন। দেশের পরিবর্তন এল অনেকটা আমূলে সংস্কারের ধরণেই। বদলের এই বন্যার প্যাঁচে একেবারে ভেসে যেতে হয়, তাই জমিদারী-বিলোপের হাওয়া ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই খোকনবাবু বেচে দিলেন তাঁর জমিদারী। রমাদাসী দেব্যা জীবিত থাকলে হয়তো বাধা দিতেন। কিন্তু তিনি না থাকায় বাধা তো কেউ দিলেই না, উপরন্তু উৎসাহই দেওয়া হল খোকনবাবুকে। নেপাল তাঁকে নাকি পরামর্শ দিয়ে বলে, ব্যাঙ্কে টাকা রেখে তার সুদে দিব্যি আরামে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জমিদারী বেচে দিয়ে মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে খোকনবাবু আরাম ক'রে বসলেন।

এইখানেই কথা শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু আসল কথার শুরু হল এখানে।

আমার বাবা ছিলেন দয়ালু ও পরোপকারী পুরুষ এবং তিনি ছিলেন উকীল। আমি বাবার সদ্‌গুণগুলো পাইনি; কিন্তু তাঁর পেশাটা নিয়েছি। উকীল হয়েছি আমি। খুব যে পসার আছে এমন নয়—তবে টেনে-কষে চলে যাচ্ছে।

একদিন এই দরিদ্রের ঘরে হাতির পা পড়ল। বড় আদালতের ছোট উকীল আমি। মক্কেল মাঝে মাঝে যা আসে, মাপে তা আমারই মত ছোট। কিন্তু হঠাৎ আজ খোকনবাবু আমার কাছে এসে হাজির কী মনে করে?

খোকনবাবু আমার চোখে চিরদিনের বিস্ময়। কোনোদিন তাঁকে নিবিড় কাছে থেকে দেখিনি। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য ঘটেনি। কেবল তফাৎ থেকেই দেখেছি এই ঐশ্বর্যময় পুরুষটিকে।

কিন্তু সেই খোকনবাবু হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির। আমার ঘরে পড়ল হাতির পা।

মনে হল, হঠাৎ কোনো মামলায় প'ড়ে হয়তো এসেছেন আমার কাছে। মনে মনে ধন্য হয়ে যেতে লাগলাম আমি। নথিপত্র ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম।

খোকনবাবু একটু হেসে বললেন চিনতে পারিস? সেই কাটটুকুন দেখেছি তোদের। এখন মস্ত উকীল হয়ে বসেছিস।

ঘাবড়ে গিয়ে কথা বলতে পারলাম না। হেঁ-হেঁ করতে লাগলাম বোকার মত। বললাম বসুন। হঠাৎ, এখন আছেন কোথায়?

—আছি শান্তিপুরে। ইস কী জায়গাতেই বাড়ি নিয়েছিস। একটা গোলকধাঁধার রাস্তা। কাঁকুলিয়া রোড না ব'লে এ রাস্তাকে সর্পিল সড়ক বলাই ঠিক।

কী উত্তর দেব। পুনরায় হেঁ-হেঁ ক'রে উঠলাম। আমার ঘরে এমন একজন সম্রাটতুল্য লোক এসেছেন—এ খবর চেঁচিয়ে জানাতে ইচ্ছে করল সকলকে। সকলকে জানানো যদি সম্ভব না-ই হয়, অন্ততঃ অন্দরমহলে খবরটা পৌঁছে দেওয়া যে চাই-ই। বললাম, একটু চা ব'লে আসি।

—উঁহু। উঁহু। বাধা দিয়ে উঠলেন খোকনবাবু, বললেন, অমন পাগলামি ক'রো না মিহির। কি বল, মিহিরই তো তোমার নাম? দেখ, কি রকম মনে রেখেছি তোমাদের।

আমাকে বাধা দিয়ে বসিয়ে খোকনবাবু বললেন, বড় ফাঁপরে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি।

নিশ্চয় বড় দরের একটা মামলা হবে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে বললাম, বলুন।

খোকনবাবু যা বললেন, তা শুনে বিশ্বাস হল না। মনে হল ভুল শুনে ফেললাম। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি বললেন।

খোকনবাবু বললেন, বেশি না। গোটা পঞ্চাশ। টাকা যা নিয়ে এসেছিলাম, সবই খাটিয়ে বসেছি কারবারে। হঠাৎ দরকার হয়ে পড়েছে।

মাথায় বজ্রাঘাত হল যেন আমার। পঞ্চাশটা টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করা যায় এখন?

কিন্তু চিন্তার অবকাশ নেই। সব জামার সব কয়টা পকেট হাটকে, ট্রাঙ্ক-সুটকেশ তোলপাড় ক'রে, সিঁদুরের কৌটা উল্টে, টাকা জোগাড় হল।

টাকা নিয়ে খোকনবাবুও রওনা হলেন, তার একটু পরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। ক্ষেমেন্দ্রকে সব কথা বলতেই সে লাফিয়ে উঠে বলল, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

—কাকে কি বলছ, হে।

—নেপালকে। নেপালচন্দ্রকে। হেসে নিয়ে ক্ষেমেন্দ্র বলল, কারবারের মালিক কে, তা শুনেছ?

—না তো।

ক্ষেমেন্দ্র বলল, না শুনেছো এ কথা কেন?

নেপালকে আমি ভালো করেই চিনি বটে, কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র বুঝি আমার চেয়েও বেশি চেনে।

মাঝে অনেকদিন কেটে গেল। আবার একদিন খোকনবাবু এসে হাজির। ভাবলাম, টাকা কয়টা ফেরৎ দিতে এসেছেন, তাই একটু অবাক চোখেই তাকালাম তাঁর দিকে।

দেখলাম খোকনবাবুর চোখের কোণে দুটো জল টল করছে। বললেন: ... অন্য কাকে ভাই। তুমি উকীল। একটা সুরাহা কর।

—কি হল?

—আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিল ও?

—কে?

খোকনবাবু একটু থেমে বললেন নেপাল।

জমিদারী বেচা টাকা জমা রয়েছে নেপালের কারবারে। গ্যারান্টি কেনা হবে ব'লে দেড় বছর আগে খোকনবাবু নেপালের হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত—

বললাম রসিদ আছে?

—উঁহু।

—কিংবা কোনো চিঠি?

চিঠিও নাকি নেই। সব-কথা মুখে-মুখেই।

(ইহার পর ৮৪ পাতায়)

স্বাক্ষর

রনজিৎকুমার সেন

হাতের আংটিতে সিঁদুর মেখে শবরীর শুভ্র সীমন্তের উপর দিয়ে টেনে দিতে গিয়ে চকিতে হাতখানি একবার থেমে প'ড়লো জয়ন্তর। পাশে দাঁড়িয়ে দু'টি অনূঢ়া মেয়ে শাঁখ বাজাচ্ছিল। সেই শঙ্খধ্বনিকে ছাপিয়ে কোন্ একটি বর্ষীয়সী মহিলার কণ্ঠ সহসা উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌তে শোনা গেল : 'দাও বেশ গাঢ় ক'রে সিঁদুর এঁকে দাও শবরীর সিঁথেয়।'

কিন্তু জয়ন্তর কানে গিয়ে সেকথা পৌঁছালো ব'লে মনে হ'লো না।

কে একটি অষ্টাদশী ঠাট্টা ক'রে ব'ল্‌লো, 'দাদু বুঝি সিঁদুর লেপে আপনার সারা মাথা রাঙা ক'রে দিয়েছিলেন দিদিভাই?'

দিদিভাইর তোবড়ানো গাল দু'টি যেন একবারে সিঁদুরের মতই লাল হ'য়ে উঠ্‌লো! ব'ল্‌লেন, 'তা আর দেয়নি, সেকালে অমনি ক'রেই দিত। আজকাল তোরা যে কি হ'য়েছিস, বুঝি না বাপু। পানের বোঁটায় ক'রে কোনো-রকমে একটা টিপ মেরে নিয়ে কি সাধ্বীপনাই যে দেখাস! আমরা হ'লে লজ্জায় ম'রে যেতাম।'

—'আমরাও যে লজ্জায় মরি দিদিভাই।'

কথা শুনে মুখ থেকে শাঁখ নামিয়ে অনূঢ়া মেয়ে দু'টি কৌতুকের হাসি হাসছিল।

কিন্তু দিদিভাইর সেদিকে নজর নেই। সম্পর্কে শবরী তাঁর নাতনী। বাসি বিয়ের শেষ কাজ সেরে নিতে তাঁকেই ধ'রেবেঁধে জোর ক'রে পাঠিয়েছে সবাই এঘরে। নাত্‌-জামাইর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ক'রতে দিদিভাইকেই যে দরকার। ব'ল্‌লেন, 'বাজা না, ভালো ক'রে শাঁখটাও কি বাজাতে পারিসনে তোরা? নাও, আংটিতে আর একটু বেশী ক'রে সিঁদুর জড়িয়ে নাও দিকি জয়ন্ত!'

কিন্তু জয়ন্ত হঠাৎ যেন কেমন স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়েছে। শবরীর অনবগুণ্ঠিত মুখ-খানির দিকে দৃষ্টি তুলে ধ'রতেই আর এক-দিনের আর একখানি মুখ ক্যামেরার স্লাইডের মতো সহসা তার দু'চোখে ভেসে উঠ্‌লো। সেদিনও আজ্‌কের মতই বাসি বিয়ের শেষ লগ্ন। এম্‌নি ক'রেই শাঁখ বাজ্‌ছিল, এম্‌নি ক'রেই ঘরভর্তি নানা মেয়ের চকিত কলকণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছিল। এম্‌নি ক'রেই আংটিতে সিঁদুর জড়িয়ে সযত্নে পরিয়ে দিয়েছিল সে অনসূয়ার শুভ্র সীমন্তের সরল রেখায়। লজ্জায় মুখখানি আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল অনসূয়ার, সেই সঙ্গে কেমন একটা অজানা রহস্যের সংশয়। বেশ লাগ্‌ছিল দেখ্‌তে অনসূয়াকে। দামী বেনারসীর সোনালী আঁচলের একটা পাশ পিঠের উপর দিয়ে এসে ভেঙে প'ড়েছে বুকের উপর। গলায় সোনার সরু চেনের উপর মুক্তোর মালা, হাতে চারগাছা ক'রে চুরি আর গজদন্ত কাঁকন। ব্যাঙ্কের দেড়শো টাকার কেরাণী জয়ন্ত সেন ভেবে আশ্চর্য হ'য়েছিল যে, এমন ঐশ্বর্যময়ীর স্বামী সে! সেই স্বামিত্বকে গাঢ় ক'রে এঁকে দিয়েছিল সে অনসূয়ার শুভ্র সীমন্তে। অনভ্যস্ত জীবনে এতটুকুও হাত কেঁপে ওঠেনি, বরং একটি নারীকে নিঃশেষে নিজের ক'রে পাবার দুর্জয় আগ্রহে হাত দু'খানি বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

মিথ্যে হয়নি সেদিন জয়ন্তর স্বপ্ন। শুধু অঙ্গাভরণের ঐশ্বর্য নিয়েই আসেনি অনসূয়া, হৃদয়ের ঐশ্বর্য নিয়েও এসেছিল। দেড়শো টাকার কেরাণী-জীবনের অবাঞ্ছিত অভাবের রাজ্যে ধন-ধান্যের ললিত লাবণ্য নিয়ে অগোছালো সংসারটাকে লক্ষ্মীশ্রীতে ভ'রে তুলেছিল সে। প্রথম মাসেই ব্যাঙ্কের কাজে একটা লিফ্‌ট্ পেয়ে গেল জয়ন্ত, ডি. এ নিয়ে কুড়ি টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট্। ন'বছরের চাক্‌রীতে এমন লিফ্‌ট্ কোনোদিন কল্পনাই ক'রতে পারেনি জয়ন্ত। কাছে এসে তার গলার উপর দিয়ে নরম-নিটোল হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে মুখ টিপে হেসে অনসূয়া ব'ল্‌লো, 'আমি ঘরে এলাম, তাই লিফ্‌ট্ পেলে। এজন্যে আমাকে তোমার খাইয়ে দেওয়া উচিত।' সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত তার মুখখানি অনসূয়ার ঠোঁট পর্যন্ত এগিয়ে আন্‌তেই অনসূয়া ছুটে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ালো, ব'ল্‌লো, 'অমন খাওয়া আমি চাই না।' তারপর একছুটে সোজা একেবারে হেঁসেল ঘর। জয়ন্তও আর অপেক্ষা না ক'রে তাড়াতাড়ি আপিসে বেরোবার জন্য তৈরী হ'য়ে নিল। তারপর আপিস থেকে একটু সন্ধ্যা উৎরে ফিরে আস্‌তেই অমনি অনুযোগ : 'এই বুঝি তোমার পাঁচটার ছুটি! আমাকে নিয়ে কোথাও তুমি না হয় নাই-ই বেরোলে, কিন্তু তোমারও কি ক্লান্তি ব'লে কিছু নেই?'

উত্তরে ছোট্ট ক'রে জয়ন্ত ব'লেছে : 'এতো-কালের অভ্যাস একদিনেই কি যায়! এবার থেকে ঠিক শুধ্‌রে যাবে, দেখো।'

বন্ধু-বান্ধবেরা শুনে হেসেছে, টিপ্পনী কেটে ব্যঙ্গ ক'রেছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেনি জয়ন্ত। ভেবেছে—এমন যার স্ত্রী তার তো দিনে রাতেই সুখ। স্ত্রীহীন সংসারে এতোকাল একা একা শুধু উড়ে বেড়াতো, মেসের মেঝের সঙ্গে পথের ডাস্টবিনের পার্থক্য ছিল না এতটুকুও। পোড়া বিড়ি আর দেশলাইয়ের কাঠিতে সারা মেঝেটা আস্তাকুড় হ'য়ে উঠেছিল। বাধা দেবার লোক ছিল না, শাসন ক'রে একথা বলবার এমন কেউ ছিল না : 'আর যদি এই বিড়ি খাও তো আমার মাথা খাও।' যে মাথায় নিজের হাতে একদিন সে স্বামীত্বের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে, সে মাথা কি ইচ্ছে ক'রলেই খেতে পারে জয়ন্ত! লজ্জায় সেদিন থেকেই বিড়ি ছাড়লো সে। এক সময় কাকে দিয়ে লুকিয়ে সিগারেট এনে তার হাতে তুলে দিল অনসূয়া। সেই সঙ্গে কড়া হুকুম : 'সকালে চা খেয়ে একটা, খেয়ে উঠে আপিসে বেরোবার পথে একটা আর বিকেলে একটা।'

অনুনয়ের সুরে অনুরোধ তুলে ধ'রেছে জয়ন্ত : 'অন্ততঃ আর দু'টো বাড়িয়ে দাও, দুপুরে আপিসে কাজের ফাঁকে একটা আর রাতে খেয়ে উঠে একটা।'

চোখের কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে অনসূয়া ব'লেছে : 'রাতে সিগারেট খেয়ে তুমি কিছুতেই আমার কাছে শুতে আস্‌তে পারবে না, এই ব'লে রাখ্‌চি। তিনটের বেশী আর একটাও সিগারেট পাবে না তুমি।'

কিন্তু অনসূয়া যত সহজে আইন বেঁধে দিল, জয়ন্ত তত সহজে নেশা ছাড়তে পারলো না। প্রথম প্রথম অনসূয়াকে লুকিয়েই যখন-

সত্যিই বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে। অনসূয়া চ'লে গিয়ে জীবনটা শ্মশানের মতো হয়ে উঠেছে। আর কাউকে পাশে না পেলে সত্যিই হয়ত পাগল হ'য়ে যাবে জয়ন্ত; শ্মশান-ক্ষ্যাপা হ'য়ে নিঃসঙ্গ জীবনের মহাশ্মশানে নৃত্য ক'রে কতকাল কাটবে তার? সংসারে কারুরই কি কাটে?

বিয়ে ক'রতেই আবার রাজি হয়ে গেল জয়ন্ত। এতকাল নতুন একটি নারীর জন্য সেই শুধু প্রতীক্ষা করেনি, একটি পুরুষকে কামনা ক'রে প্রতীক্ষা ক'রেছিল বুঝি শবরীও। শবরীর প্রতীক্ষা। কিন্তু এ কার জন্য প্রতীক্ষা করেছিল শবরী? রামচন্দ্র যে জীবনে একমাত্র সীতাকেই গ্রহণ ক'রেছিলেন, রাজা দশরথের মতো একাধিক স্ত্রীর অধিকার কাউকে দেননি। তাঁর প্রতীক্ষায় শবরীর নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়নি, বরং সতীত্বের প্রোজ্জ্বল মহিমায় তার নারীধর্ম ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিল। আর একালের শবরী, একালের জয়ন্ত? ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই একবার হাসলো সে।

কাল মধ্য রাত্রির বাসরে প্রথম পরিচয়ের সূত্রে শবরী জিজ্ঞেস ক'রেছিল: 'আমাকে আপনার পছন্দ হ'য়েছে?'

উত্তরে নীরবে বুকের মধ্যে তাকে টেনে নিয়েছিল জয়ন্ত—যেমন ক'রে একদিন নিয়েছিল অনসূয়াকে। ব'লেছিল: 'যদি জানো, এর আগেও আমি বিয়ে করেছি, তবু কি তুমি ভালোবাসতে পারবে আমাকে?'

উত্তরে মধ্য রাত্রির বিহ্বল বাসরের অন্ধকার ঘরখানি বুঝি একবার কেঁপে উঠেছিল। জবাবে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেনি শবরী, শুধু বলেছিল: 'সব আমি শুনেছি।'

শুনে নিজের মধ্যে আঁৎকে উঠেছিল জয়ন্ত। শুনেছে? কি শুনেছে শবরী? কিন্তু তা সেও যেমন স্পষ্ট ক'রে কিছু জিজ্ঞেস ক'রতে পারেনি, শবরীও মুখ ফুটে ব'লতে পারেনি কিছু। তার আগেই সারা বাড়ীটাকে সচকিত ক'রে প্রভাত-সূর্য জেগে উঠলো।

সকালে উঠে শয্যা তুলুনি, এটা ওটা মেয়েলি আচার আর যাগ-যজ্ঞেই কেটে গেল। তারপর এলো ক'নেকে এয়োতির চিহ্ন এঁকে দেবার পালা। শাঁখের শব্দে দেখতে দেখতে ঘরখানি মুখর হ'য়ে উঠলো। নতুন বরের কান্ড দেখতে এসে মেয়েরা এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ছে, হাসছে কৌতুকের হাসি। তার মধ্য থেকেই অকস্মাৎ সচকিত হ'য়ে উঠলো দিদিভাইর কন্ঠ: 'দাও, বেশ গাঢ় ক'রে শবরীর সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দাও জয়ন্ত। আংটিতে আর একটু বেশী ক'রে জড়িয়ে নাও সিঁদুর।'

কিন্তু হাতখানি হঠাৎ যেন কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে প'ড়লো জয়ন্তর। অনসূয়া'র মুখখানিকে মিলিয়ে গত রাত্রির বাসর-সম্ভাষণের কথাটাই হঠাৎ আর একবার মনে প'ড়ে গেল। তার সম্বন্ধে সব কিছু শোনার পরেও পারবে কি শবরী অনসূয়া'র মতো তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে, পারবে কি তার ভাঙ্গা বন্দরে উজান-গাঙের নৌকো ভাসাতে? যদি ব্যর্থ হয়, যদি তাকে সহজ মনে স্বীকার ক'রে নিতে না পারে শবরী, তবে? তবে আগামীকালের দিনগুলিকে কোন্ শস্য দিয়ে ভরাবে জয়ন্ত? ছিন্ন মেঘের মতো চোখের উপর দিয়ে অনসূয়া'র মুখখানি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। শবরীর অপেক্ষমানা দৃষ্টির উপর গিয়ে চোখ দুটো ঠিকরে পড়তেই কিছুটা প্রকৃতিস্থ হ'তে চেষ্টা ক'রলো জয়ন্ত।

কিন্তু দিদিভাইর ধৈর্যের বাঁধ ততক্ষণে শিথিল হ'য়ে প'ড়েছে। শবরীর শ্বেত-শুভ্র সিঁথিকে লক্ষ্য ক'রে নিজে থেকেই এবারে জয়ন্তর হাতখানি চেপে ধ'রলেন দিদিভাই, ব'ললেন: 'এমন বোকা জামাইও কোথাও দেখিনি বাপু, দেখিয়ে দিলেও যদি সিঁদুরটুকু ভালো ক'রে পরিয়ে দিতে পারে! এই এমনি ক'রে পরাতে হয়, বুঝলে?' ব'লে নিজেই এবারে জয়ন্তর হাতখানি শবরীর সিঁথির উপর দিয়ে টেনে দিলেন। আংটির গা থেকে গাঢ় হ'য়ে সিঁদুর ব'সে গেল শুভ্র-সীমন্তের শ্বেত রাজপথে। শবরী এবার তবে একান্ত ক'রে জয়ন্তর হ'লো—যেমন হ'য়েছিল অনসূয়া।

আর কিছু একটাও ভাবতে পারলো না জয়ন্ত। তার সকল ভাবনাকে আচ্ছন্ন ক'রে তীব্র নিনাদে আর একবার শাঁখ বেজে উঠলো, বেজে উঠলো পাঞ্চজন্য।

শুল্ক

(৮০ পাতার পর)

হয়েছে। আসানসোলে বিরাট কোলিয়ারি, সেই কোলিয়ারি কিনে মস্ত একটা ব্যবসা গড়ে তোলা হবে—এই ছিল পরিকল্পনা। নেপাল এই প্ল্যান বাৎলায়।

অনেকক্ষণ ভাবলাম, বললাম, তা'হলে ক'দিন আপনাকে কলকাতা থাকতে হয়। শান্তিপুর থেকে যাতায়াত ক'রে তা সুবিধে হবে না।

—দিন চারেক হল তো আছিই।

—উঠেছেন কোথায়?

—নেপালের ওখানে।

—খাওয়া-দাওয়া?

—ওখানেই।

বললাম, নেপাল বলে কি?

—বলে, সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেই হয়। কিন্তু আমি যে একেবারে রিক্ত।

খোকনবাবুর গলা দিয়ে ভয়ার্ত আওয়াজ বের হল, অসহায়ের মত তাকাতে লাগলেন আমার দিকে।

বললাম, নেপালের ওখানে থাকা আপনার ঠিক হচ্ছে না।

—কেন? তা না হলে ওর সঙ্গে কথা বলব কী করে? ওকে ধরব কি করে?

—তবু। তবু আপনি অন্য কোথাও থাকুন।

আমার এ পরামর্শের কারণ কি, জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন খোকনবাবু।

বললাম, সব কথা খুলে বলা কি ঠিক? আপনাকে স্লো পয়জন তো করতে পারে। আপনার টাকা হাতিয়েছে, এখন আপনাকে সরিয়ে দিতে পারলেই ও সাফ।

আঁৎকে উঠলেন খোকনবাবু। বললেন, হতে পারে না। হতে পারে না। বিশ্বাস করিনে আমি।

বললাম, বিশ্বাস আমিও করি নে। কিন্তু সব অবিশ্বাস্য ঘটনাই যে ঘটছে, খোকনবাবু।

খোকনবাবু সেইদিন চলে যাবার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি তার পরদিনই নাকি শান্তিপুরে চলে যান।

শান্তিপুর থেকে দিনকয়েক বাদে খবর এল খোকনবাবু মারা গেছেন—হঠাৎ একদিনের আমাশায়।

খবর শুনে ক্ষেমেন্দ্র বলল জিন্দাবাদ।

বললাম, তুমি একটা পাথর হে ক্ষেমেন্দ্র, তুমি একটা লোহা। এমন একটা মর্মান্তিক খবরেও তোমার জিন্দাবাদ আসে?

ক্ষেমেন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, পারবে না লোকটা হজম করতে? অত টাকা গাপ ক'রে দেওয়া হিম্মতের কাজ।

—কে? কার কথা বলছ?

—তোমার সেই বাল্যকালের দেশের লোকটা।

কোলিয়ারি চলে গেছে রসাতলে। অভ্র ভেদ ক'রে উঠছে এখন নতুন আকাঙ্ক্ষা। নেপাল নাকি হয়েছে একজন কন্ট্রাক্টর—বড় বড় ইমারত গাঁথছে।

ক্ষেমেন্দ্র বলল, ওটা ওর ধাপ্পা। লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার ফিকির। সেদিন আমাকে কি বলল জান?—একটা মন্দির বানাতে চায়, কিংবা একটা মঠ।

—মঠেশ্বর কে হবে?

হো-হো ক'রে হেসে উঠল ক্ষেমেন্দ্র, বলল, অবশ্যই নেপালচন্দ্র। এ ছাড়া ওর নিস্তার নেই। পিছনে পুলিশ লেগেছে।

আমলকীর বনে

· অপর্ণা ভাদুড়ী ·

সবুজ সবুজ শুধু সবুজের তরঙ্গ তিমির;
ওষ্ঠপ্রান্তে তন্দ্রাতুর তারুণ্যে সমীর;
মুহুর্মুহুঃ সঞ্চালিত হিল্লোলের তড়িৎ হিন্দোলে
আমলকী অরণ্য কাঁপে থর থর
কৃষ্ণনীল পর্বত সংকুলে।

পার্বতী আমলকী বনে রহস্যের রাত্রি কুন্ডলিত;
কি সৌন্দর্য মুঞ্জরিত পুষ্প আর পত্রে
আন্দোলিত।
কি আনন্দ সুধামৃতে সুপুষ্ট সফল:
শ্বেত রক্তিমাভা মুক্ত মুক্তাসম আমলকী ফল।

ও কি কারো নয়নাশ্রু বিচ্ছেদের বৈরাগ্যে বিধুর?
বেদনার অন্তর্জ্বালা মর্মদহে অম্লরসে
তাই পরিপূর।
নির্বাক অঞ্জলি শুধু অক্ষিপুটে মেঘার্দ্র মেদুর।
তোমার আমার নয় নিসর্গ লোকের কারো
বেদনার ব্যাপ্তি সুমধুর।

অপ্সরী কিন্নরী যক্ষ গন্ধর্ব লোকের,
মৃত্তিকার মানুষের চিন্তাগম্য বেদনা শোকের,
নিত্য যেথা জন্মান্তের রহস্যের শব্দ অবক্ষয়।
সেখানে কি আছে দুঃখ, অশ্রুজল, ব্যর্থ পরিণয়?

পার্বতী আমলকী বনে পত্রান্তরে শ্যামশুভ্র ফলে,
কি জানি সে কার অশ্রু বিন্দু বিন্দু দোলে,
নিস্তব্ধ অরণ্য তল, সুষমিত শৈলাভ্যন্তর;
ক্রন্দসী মানবী তৃষ্ণা কেঁদে ফেরে কোথা
প্রান্তরের ॥

প্রাচীন অ্যাথেন্স নগরীর এক ধনী পরিবারে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা ছিল। মেয়েটির রূপের খ্যাতি সহরময়। তার কৃশ তনুলতা, উজ্জ্বল চক্ষুতারকা ও পান্ডুর গন্ডদেশের গোলাপী রং-এর খেলা তার রূপলাবণ্য বর্ধিত করত। মেয়েটি কিন্তু মাঝে মাঝে একটু কাশত। আর রাত্রিতে ঈজিয়ান সাগরের শীতল বায়ু আন্দোলিত মুক্ত বাতায়নে শুয়েও ঘামে তার জামা ভিজে যেত। মেয়ের সব সময়েই ক্লান্তভাব দেখে তার পিতা চিন্তান্বিত হলেন এবং তখনকার বিখ্যাত বৈদ্য হিপোক্রেটিসের নিকট তাকে নিয়ে গেলেন। বৈদ্যরাজের হাতিয়ার কিছুই ছিল না। তিনি সব কিছু শুনলেন। ভাল করে মেয়েটির মুখের দিকে দেখলেন। হাতে ধমনীর স্পন্দন অনুভব করলেন। অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রতিমা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর কাছে মেয়েটির উজ্জ্বল চক্ষুতারকা, শঙ্খধবল বর্ণ, রক্তিম গন্ডদেশ ও ধমনীর দ্রুত গতি অবিরাম জ্বরের সাক্ষ্য দিল। ঘন ঘন কাশি, রাত্রে ঘাম, সর্বদা ক্লান্ত ভাব, ক্ষয়িষ্ণু দেহ এসব তাঁর বহু পরিচিত লক্ষণ। অনেকদিনের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং শব পরীক্ষায় এইসব লক্ষণের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের গভীর ক্ষত ও শ্বেত গুটিকাযুক্ত রোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তিনি দেখেছেন। এই রোগের পরিণতি, তাঁর অভিজ্ঞতায় অবধারিত মৃত্যু।

বৈদ্যরাজ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। চিন্তান্বিত পিতাকে বললেন মেয়ে তাঁর গুরুতর পীড়িত। নিদারুণ রোগে তার শ্বাসযন্ত্র তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছে। শরীর অবিরাম ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এ রোগের নাম তিনি দিয়েছেন থাইসিস (Phthisis) বা ক্ষয় রোগ। এ রোগে মৃত্যু অবধারিত। তিনি পিতাকে বললেন যদি অবিলম্বে মেয়েটিকে অ্যাথেন্সের জনকোলাহলের বাইরে কোন সুদূর পর্বতের উপর নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে কেবল টাটকা দুধ ডিম ও নদীর তাজা মাছ খাওয়ান হয় তবে কয়েক মাস সে বাঁচতে পারে।

মেয়েটির পিতা কতটুকু ভরসা পেলেন জানা নেই। গভীর নৈরাশ্যই স্বাভাবিক। হিপোক্রেটিসের পর প্রায় দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত ক্ষয়রোগের রোগ নির্ণয় ব্যাপারে অথবা চিকিৎসায় এর চেয়ে আর বিশেষ কোনও উন্নতি দেখা যায় নাই। রোগীর অথবা তার আত্মীয়স্বজনের নৈরাশ্যেরও কোন লাঘব হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই নৈরাশ্যময় অজ্ঞানতার অন্ধকারে আলোর আভাষ দেখা যায়। তারপর ধীরে ধীরে নূতন নূতন জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর সভ্য মানুষ আজ যক্ষ্মাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছে।

প্রাচীন যুগে যক্ষ্মা রোগ

যক্ষ্মা রোগের ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যে সব কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অস্থিতে যক্ষ্মা রোগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিশরেও মমীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিশর, বেবিলোন, ভারতবর্ষ ও চীন দেশীয় প্রাচীন ধর্ম ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে যে সব রোগের বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে যক্ষ্মা রোগ চেনা যায়। হিন্দু শাস্ত্রে এ রোগের নাম যক্ষ্মা। এর চিকিৎসায় প্রাতঃভ্রমণ, অশ্বারোহণ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের উপকারিতার কথা উল্লেখ আছে। এই রোগ যে অত্যন্ত দুরারোগ্য এবং সংক্রামক সে কথা প্রাচীন হিন্দুদের ও গ্রীকদের জানা ছিল। রাজ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রসার প্রতিরোধ করবার কিছু কিছু উপায় প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কিন্তু এই রোগের পরিণাম সম্বন্ধে প্রাচীন যুগে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সেই জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশেষ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে মুক্ত বায়ুতে বাস ও পুষ্টিকর খাদ্যই এই রোগে প্রধান উপকারী বলে হিন্দুদের ও গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল। যদিও ফলাফল সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহই ছিলেন। ঔষধ হিসাবে নানা রূপ তেল ও নির্যাসের ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। প্লেটো এবং এরিস্টটল যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার চেষ্টা নিষ্ফল বলে বর্ণনা করেছেন।

গ্রীকদের পরে রোমান বৈদ্যরা কিন্তু যক্ষ্মা চিকিৎসায় অতটা হতাশ ছিলেন না। রোমান চিকিৎসক কেলসাস (Celsus) যক্ষ্মা রোগের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ও তাঁর পরবর্তী রোমান চিকিৎসকরা নানা রূপ ঔষধ ব্যবহারের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই থেকে তাঁদের এ বিষয়ে গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। রোমানরা যক্ষ্মায় সমুদ্রযাত্রার উপকারিতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলেন।

খৃষ্টীয় যুগে যক্ষ্মা চিকিৎসা

রোমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চিকিৎসায় অবনতি হয়। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সব দিক থেকেই বন্ধ করে দেন। মানুষের জীবনে আত্মার মুক্তি সাধনই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য। শারীরিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য হয় গৌণ। শয়তানের দৃষ্টি অথবা আত্মায় অপদেবতার প্রভাব এইসব রোগের মূল বলে প্রচারিত হয়। সুতরাং রোগমুক্তিতে প্রার্থনা ও কৃচ্ছ্রসাধনই একমাত্র উপায় বলে নির্ধারিত হয়। চিকিৎসা ব্যাপারটা ধর্মাচরণের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় এবং পুরোহিতই চিকিৎসকের স্থান লাভ করেন। কাজেই প্রাচীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় যেটুকু জ্ঞানও লাভ হয়েছিল, সে সবই কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর পঙ্কে ডুবে যায়।

রাজস্পর্শ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে 'রাজস্পর্শ' যক্ষ্মা রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলে বিবেচিত হত। দেশের রাজা যখন ধর্মের রক্ষক এবং প্রজা সাধারণের ইহলোক পরলোকের ভাগ্যবিধাতা তখন তিনি তাঁর পবিত্র স্পর্শে এই নশ্বর দেহকে ব্যাধিরূপে অপদেবতার দৃষ্টি থেকে মুক্ত নিশ্চয়ই করতে পারেন বলে তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল। তাই এই রাজস্পর্শের জন্য দলে দলে যক্ষ্মাগ্রস্ত নর-নারী ও শিশু দূর-দূরান্তর থেকে বহু কষ্ট ভোগ করে রাজদর্শনে যেত। রাজা কিন্তু বিনামূল্যে এই করুণা বিতরণ করতেন না। উপযুক্ত দর্শনী দিয়ে রাজার নিকট যেয়ে নতজানু হয়ে তাঁর স্পর্শ লাভ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হত। এই প্রথা ইংলন্ডেও প্রচলিত ছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের দরবারে যক্ষ্মারোগের জন্য রাজস্পর্শ নিতে অনেক লোক যেত এবং এই বাবদ রাজকোষেও সামান্য অর্থ অর্জিত হত না।

আরব চিকিৎসক আভিসেনা

আরব দেশে দশম একাদশ শতাব্দীতে আভিসেনা নামে এক চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তিনিও যক্ষ্মা চিকিৎসায় বিশুদ্ধ বায়ু ও দুধের উপকারিতার কথা বলে গেছেন। তাছাড়া আরব দেশে যক্ষ্মা চিকিৎসায় কর্পূর, আঙ্গুরের চিনি ও গোলাপ নির্যাস ব্যবহার হত।

নূতন জ্ঞান

ইউরোপে অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের মধ্যেও জ্ঞানের আলো একেবারে নিভে যায় নাই। মাঝে মাঝে দুই একজন দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধর্মানুশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের পথে চিকিৎসায় গবেষণা করবার চেষ্টা করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যক্ষ্মা যখন ইউরোপে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে তখন কেউ কেউ এর সংক্রামকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করেছেন। কেউ কেউ এ রোগের কারণ সম্বন্ধে জীবাণুরও কল্পনা করেছেন। চিকিৎসায় হিপোক্রেটিসের মুক্ত বায়ুর উপকারিতার কথাও বলতে আরম্ভ করেছেন। ইংরাজ চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকে ঘোড়ায় চড়ার উপকারিতার উপর খুব জোর দিতেন। এমনকি ঘোড়ার উপর জীবন কাটাতেও অনেকে উপদেশ দিতেন। নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য, তেল, কড মাছের তেল, মাখন, পারাঘটিত ঔষধ এইসব নিয়েও যক্ষ্মা চিকিৎসার চেষ্টা হয়।

এই সময় যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তার পুনরুপলব্ধিই প্রধান উন্নতি। সে সময়ে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে ঠাণ্ডা লাগান অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঠাণ্ডার ভয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে, আপাদ-মস্তক আবরণ দিয়ে শোওয়াই ছিল রীতি। মেয়ে-পুরুষ সকলেই আপাদ-মস্তক আবৃত করে পোষাক পরত। শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই নয়, শালীনতা রক্ষার জন্যেও। এর ওপর কাশির ব্যারাম থাকলে ত কথাই নাই। বন্ধ ঘরে সর্বাঙ্গ ঢেকে কেবল নাকটি বের করে রোগীকে থাকতে হত। এই রকম প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে কোন রোগীকে ঘরের জানালা খুলে শুতে বলা খুবই দুঃসাহসিকতার কাজ। বিশেষতঃ ইউরোপের মত ঠাণ্ডা দেশে এ রকম উপদেশ দিলে তাকে লোকে পাগল মনে করত।

কাজেই এ রকম উপদেশ দিতে তখনকার চিকিৎসকদের অনেক কৌশল করতে হত। একজন ইংরাজ চিকিৎসক তাঁর এক ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী রোগীর চিকিৎসায় মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তিনি সেই মেয়েটিকে একটি গাছের ডাল দিয়ে বললেন যে এই ডালটি মন্ত্রপূত। এটিকে মেয়েটির বয়সের প্রত্যেক বৎসর অনুযায়ী এক এক ইঞ্চি মেপে মোট ষোল ইঞ্চি লম্বা করে কাটা হয়েছে। এই ডালটি তার ঘরের জানালার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে এবং জানালার পেল্লাটি ঐ ডালের ওপর রাখতে হবে। দিবারাত্রি রোদ বৃষ্টি সব সময়েই ঐ ডালটি ঐভাবে থাকবে এবং সকাল সন্ধ্যায় মেয়েটিকে ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে বাইবেলে উক্ত যীশুখৃষ্টের ১২ জন শিষ্যের নাম উচ্চারণ করতে হবে। কিন্তু সাবধান, প্রত্যেকটি নাম করবার পর ধীরে ধীরে গভীর নিঃশ্বাস এমনভাবে নিতে হবে যেন ঐ জানালায় বসান মন্ত্রপূত গাছের ডালের ছোঁয়া লাগা হাওয়া নাকের মধ্যে দিয়ে একেবারে শরীরের মধ্যে দিয়ে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত নেবে যায়। তবেই তার রোগের উপশম হবে। চিকিৎসক জানতেন ধর্মভীরু ও মন্ত্রে বিশ্বাসী ঐ মেয়েটি এই ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এবং এই ব্যবস্থায় তার ঘরের মধ্যে মুক্ত বায়ু চলাচল করবে। মেয়েটিও মুক্ত বায়ু সেবন করতে বাধ্য হবে।

ক্রমে ক্রমে ইউরোপে নানারূপ রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তখনকার প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সে সব হাসপাতালে বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা থাকত না। বন্ধঘরে অল্প জায়গায় যখন যক্ষ্মা রোগীদের এমনভাবে রাখা হত, তখন রাত্রে জ্বরের জ্বালায় অনবরত কাশির যন্ত্রণায় তাদের প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসত।

মুক্ত বায়ু ও সেনিটোরিয়াম চিকিৎসা

মুক্ত বায়ুতে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা বেশ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে করে যে সুফল লাভ হয় তা প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথমে প্রচার করেন ইংলণ্ডের জর্জ বডিংটন, ১৮৪০ সালে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার নিয়মাবলী নিয়ে তিনি একটি বই লেখেন এবং এই চিকিৎসায় শেষ অবস্থা থেকে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন এই রকম কয়েকটি রোগীর বিবরণও তিনি দেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িককালে অন্যান্য চিকিৎসকেরা তাঁর এই নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্বাস করেন নি। অনেকে তাঁকে বিদ্রূপও করেছেন। কিন্তু জার্মাণীতে কয়েকজন চিকিৎসক এই মুক্ত বায়ু চিকিৎসায় উৎসাহী হন। জার্মাণীতে ১৮৫৯ সালে হারমেন ব্রেমার ও তাঁর কিছু পরে পিটার ডেটভাইলার পাহাড়ের উপর যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য আলো হাওয়া খেলবার মত করে হাসপাতাল তৈরী করেন। এগুলিকে বলা হয় সেনি-টোরিয়াম। সেনিটোরিয়ামে এমন ব্যবস্থা থাকে, যাতে রোগীরা শীতগ্রীষ্ম দিনরাত্রি সব সময়েই খোলা হাওয়ায় থাকতে পারে, তারা যাতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায় তার জন্যে তাদের সেবার ব্যবস্থা হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য তাদের দেওয়া হয়।

বন্ধঘরের দূষিত গরম হাওয়াতে জনাকীর্ণ অপরিসর বস্তী থেকে তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের উপর পাইন বনের মনোরম প্রাকৃতিক শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে খোলা হাওয়াতে দিনরাত্রি আরামপ্রদ শয্যায় শুয়ে উপযুক্ত দরদী হাতের সেবায় যক্ষ্মা রোগীরা এইসব সেনিটোরিয়ামে এসে যেন স্বর্গ লাভ করেন। কারণ এই চিকিৎসায় এত ভাল ফল দেখা গেল যে, অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীময় এই সেনিটোরিয়াম চিকিৎসার জয়-জয়কার পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে ১৮৮২ সালে জার্মাণীতে রবার্ট কখ যক্ষ্মার বীজাণু আবিষ্কার করে এর সংক্রামকতা প্রমাণ করেন। তার ফলেও যক্ষ্মা-রোগীদের জনবসতি থেকে অনেক দূরে আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্ধি করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সব দেশেই এই রকম সেনিটোরিয়াম গড়ে ওঠে।

লেনাক ও রোয়েণ্টগেন

সেনিটোরিয়াম চিকিৎসায় আগের চেয়ে অনেক বেশী সুফল পাওয়া গেলেও দেখা গেল যে রোগ বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার আগে চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। প্রথমাবস্থায় রোগ ধরা সেইজন্য চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার। এই বিষয়ে ফ্রান্সের রেনে লেনাক ও জার্মাণীর বিলহেলম্ রোয়েণ্টগেনের দান অবিস্মরণীয়।

লেনাক ক্ষয়রোগে মৃত লোকেদের দেহ কেটে ফুসফুসের নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করতেন। জীবিতাবস্থায় ঐ সব পরিবর্তন কিরকমে শ্বাসক্রিয়ার উপর প্রভাব করে জানবার জন্য তিনি যক্ষ্মা রোগীদের বুকে কান পেতে শুনতেন এবং সুস্থ লোকেদের বুকের শব্দের সঙ্গে তুলনা করতেন। সেই চেষ্টা থেকেই তিনি স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন এবং যক্ষ্মা রোগে বুকের শব্দ শুনে রোগ চেনবার উপায় উদ্ভাবন করেন। লেনাকের আগে পর্যন্ত চিকিৎসকেরা সেই হিপোক্রেটিসের বর্ণিত লক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করে যক্ষ্মারোগ চিনতেন। কাজেই রোগ অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে রোগের বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রকাশ না পেলে রোগ ধরা পড়ত না।

এরপর রোয়েন্টগেন আবিষ্কৃত এক্সরে যখন বুকের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফোটো তোলার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল তখন থেকে যক্ষ্মা রোগ অতি প্রথমাবস্থায় ধরা সহজ হল। আজকের দিনে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার সাফল্যের জন্য এই দুইটি আবিষ্কার অতুলনীয়।

আধুনিক চিকিৎসা

সেনিটোরিয়াম চিকিৎসার সাফল্য যদিও সব রকম যক্ষ্মা রোগীর সব অবস্থাতেই ফল-প্রদ নয়, তবুও এই সাফল্যে চিকিৎসকদের মধ্যে যক্ষ্মা চিকিৎসা সম্বন্ধে হতাশার ভাব কেটে গিয়ে নূতন উদ্যমের সূত্রপাত হ'ল। তারপর যখন যক্ষ্মার বীজাণু আবিষ্কৃত হল তখন এই রোগ সম্পূর্ণ রকম আয়ত্তে আনার আশা আরও উজ্জ্বল হল। তখন থেকেই বীজাণুধ্বংসী নানা রকম ঔষধ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়। তাছাড়া অস্ত্র চিকিৎসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মা রোগেও অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োগের চেষ্টা হতে থাকে। ইতিমধ্যে ইটালিতে ফর্লানিনি যক্ষ্মাগ্রস্ত ফুসফুসকে সঙ্কুচিত করে রাখবার এক উপায় বার করেন। এই উপায়ে রোগগ্রস্ত ফুসফুসটিকে শ্বাসক্রিয়া জনিত অনবরত সঙ্কোচন ও বিস্ফোরণ থেকে মুক্ত করে রোগ সারবার সহায়তা করা সম্ভব হয়। এই চিকিৎসার নাম আর্টিফিসিয়েল নিউমোথোরাক্স (Artificial Pneumothorax) অথবা সংক্ষেপে এ-পি। এ-পি যেখানে করা সম্ভব হয় না সেখানেও ফুসফুসের শ্বাসক্রিয়ার লাঘব করার আরও অন্য উপায়ও এখন আবিষ্কার হয়েছে। সেনিটোরিয়াম চিকিৎসার সঙ্গে এই সব চিকিৎসা পদ্ধতি ও অস্ত্র চিকিৎসায় অনেক রকম যক্ষ্মা রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথ প্রশস্ত হয়।

এ ছাড়া বীজাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টায় বহু বৎসরের গবেষণার ফলে এখন কতগুলি এণ্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক ঔষধ পাওয়া গেছে যা দ্বারা শরীরের মধ্যে যক্ষ্মা-বীজাণুর ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

এই সব ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতির সম্যক ব্যবহারে যে কোন অবস্থাতেই যক্ষ্মা রোগ এখন আরোগ্য করা সম্ভব। চিকিৎসকদের এখন আর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ফুটনোন্মুখ তরুণ-তরুণীর জীবনের সব আশা নির্মূল করে রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে হয় না।

বিজ্ঞান এখন মুক্তির উপায় এনে দিয়েছে। সেই উপায় ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের সহজলভ্য করার ভার সমাজ-সেবক ও রাষ্ট্র-নায়কদের হাতে।

ঐকতান

অতীন্দ্রিয়

সাধনা মিত্র

দ্বিসহস্র বৎসর পথপরিক্রমান্তে কাল-সঙ্কেতী অতীত যবনিকা উত্তোলিত হইতেছে ধীরে ধীরে।

নাট্যমঞ্চ—গ্রীক্ অধ্যুষিত ভারতের তক্ষশিলা।

সারা দেশের রূপশ্রীকেন্দ্রিত নগরী। সম্পদে, ঐশ্বর্যে, গৌরবে, প্রাচুর্যে, বিভবে মহার্ঘ তক্ষশিলা সর্বদা ঝলমল করিতেছে পরম অহমিকা ভরে। সুনামী ব্যবসায় কেন্দ্র এটি—বিশেষ করিয়া গ্রীক্ রাজপুরুষগণের অবস্থিতির জন্য সর্বদেশীয় সর্বপ্রকার পণ্যের সম্মিলন আপাততঃ এস্থানে ঘটিয়াছে।

বিগত অপরাহ্নে প্রচণ্ড মৌসুমী ঝড়ের তাণ্ডবে সারা নগরী বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সিন্ধু নদের সমুদ্রসঙ্গমে তুমুল সমুদ্রোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহা আজ বিগতই। বৃষ্টি-বিধৌত অপরূপ পরিচ্ছন্ন একটি প্রভাত জন্ম নিয়াছে কৃষ্ণারাত্রির ক্রোড়ে—এক আশ্চর্য নীলিমা সারা আকাশ ভরিয়া কোন্ অপার্থিব তুলিকা দ্বারা রঞ্জিত। স্বর্ণাভ রৌদ্রের সতেজ দাক্ষিণ্যে প্রসন্ন উজ্জ্বল তক্ষশিলা যেন উষালগ্নে হাসিতেছে পরম প্রীতিভরে।

রাজধানীর কেন্দ্র পণ্যমার্গ। এই পণ্যমার্গে নগরের বিপণি আলয়। প্রস্তরখচিত সংকীর্ণ পথের দুই পার্শ্ব আকীর্ণ করিয়া পণ্যবীথিকা।

একপ্রান্তে মণিহারী বাজার, অপরপ্রান্তে সব্জি, ফল, সুরাসার প্রভৃতি। বহ্লীক মধু, দাক্ষিণাত্যের কুটির শিল্প, কলিঙ্গদেশের গজদন্তের কারুকার্য, শিলাজতু ধাতব নির্যাস, পঞ্চনদজাত প্রিয়ঙ্গু, কোশল স্ফটিক ইত্যাদি বিচিত্র পণ্যের স্তূপে বিপণিগুলি ভারাক্রান্ত।

এমন সুন্দর একটি প্রভাতে রীতি অনুযায়ী বিপণি আলয়ের প্রতিটি বিপণি উন্মুক্ত—প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিপণি আলয় পূর্ণোদ্যমে উন্মুক্ত থাকিবে, ক্রেতারও অভাব নাই, কিন্তু প্রত্যেকের আনন বিমর্ষ। তাহার কারণ নবীন সেনাধ্যক্ষ হেরাক্লিডাস্ মাত্র গতকল্য তক্ষশিলার মৃত্তিকায় সহসা পদার্পণ করিয়াছেন। অযোধ্যা বিজয়ের পূর্ববর্তী যুগ—গত দীর্ঘ পঞ্চ বৎসর যাবৎ হেরাক্লিডাস্ একাদিক্রমে মালবেই বাস করিয়াছেন—শিবি ও ক্ষুদ্রক রাজ্যেও কিছুকাল কাটাইয়াছেন; কিন্তু তক্ষশিলার সীমানায় পদার্পণ করেন নাই। আজ সহসা তাঁহার এরূপ আকস্মিক অনুগ্রহে নগরবাসিগণ অত্যন্ত ভয়-ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের চেতনায় সুস্পষ্টরূপে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে পাঁচ বৎসর পূর্বেকার লুণ্ঠন ও অত্যাচারের স্মৃতি।

হেরাক্লিডাস্ একে নবীন যুবক তায় সেনাধ্যক্ষ। যুদ্ধবিগ্রহকালে অত্যধিক আসবাসক্তির অবস্থাতেও তিনি প্রকৃতিস্থ থাকেন; কিন্তু শান্তির সময় তাঁহার দেহে শয়তানের আত্মা ভর করে বলিয়া সকলের দৃঢ়বিশ্বাস। অথচ দেশাধিপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলে না বা শান্তির সময়ে সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষকে শান্তি-ভঙ্গের অপরাধে বহির্দেশে নির্বাসনে প্রেরণ করাও সম্ভব নয়।

সুতরাং হেরাক্লিডাস্ নির্বিবাদে অত্যাচার চালাইয়া যান। মনে মনে অভিসম্পাতমুখর হইয়া নগরের সাধারণ দ্রোহ-পরাঙ্মুখ অধিবাসিগণ মুখ বুজিয়া অন্যায় পীড়ন সহ্য করে। অপরপক্ষে সপ্ত-সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ককে স্বয়ং রাজ্যপালও যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলেন।

রৌদ্রঝলমল শীকরস্নাত প্রভাতে প্রফুল্লমনা হেরাক্লিডাস নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সহচর দুইজন গ্রীক্ সৈন্য ও [illegible] টাপেনিয়ুস্। ক্ষুদ্র দলটি সম্মুখ [illegible] মেদিনীর আর্তনাদ জাগাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া হেরাক্লিডাস্ ইতস্ততঃ তাকাইতেছিলেন। গ্রীক রাজপুরুষ-সুলভ দৈহিক রূপে তাঁহার ঘাটতি নাই—বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘাকৃতি যুবক—ঋজু, সুপ্রশস্ত অবয়বের প্রতিটি পেশী অনমনীয়, চম্পকগৌর ত্বক, সুতীক্ষ্ণ মুখশ্রী অনুলিপ্ত উদ্ধত কাঠিন্যের প্রলেপ; সেনাধ্যক্ষের দেহে বা মনের কোথাও কোনোখানে কোমলতার কণামাত্র বাষ্প নাই।

বহুদিন পরে তক্ষশিলায় তাঁহার আবির্ভাব—তুচ্ছ সাধারণ বস্তুগুলোও তাই হেরাক্লিডাসের নূতনত্ব সন্ধানী দৃষ্টিতে বিচিত্ররূপে পরিস্ফুট হইতেছে। মালবের পণ্যসামগ্রী, নারী, মদিরা ও ভোজ্যবস্তুতে তাঁহার স্পৃহা মিটিয়া গিয়াছে—রুচির বৈলক্ষণ্য দেখা দিয়াছে অবিশ্রান্ত উপভোগ অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায়। বৈচিত্র্যপিয়াসী মন লইয়া তাই তাঁহার তক্ষশিলা গমন।

রাজবর্ত্মের দুই প্রান্ত অবরোধ করিয়া মালার আকারে সৌধশ্রেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হেরাক্লিডাস্ ও টাপেনিয়ুস্ অলস আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পর্যায়ক্রমে অট্টালিকাগুলির গবাক্ষ পথে সন্ধানীলুব্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিলেন—শ্রীময়ী মুখমাত্রেই হেরাক্লিডাসের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু হেরাক্লিডাসের আগমন সংবাদেই অন্তঃপুরিকাগণ পুরনিভৃতে আত্মগোপন করিয়াছে—কায়া তো দূরের কথা সামান্য অঙ্গনা দেহচ্ছায়াও কোনস্থানে নজরে পড়িল না। হেরাক্লিডাসের প্রকৃতির সহিত পরিচিতি হইয়া গিয়াছে ইতিপূর্বে প্রত্যেকেরই।

প্রভাতটি ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় হেরাক্লিডাসের মানসিক হর্ষ অপগত হইয়া মুখশ্রী ক্রমশঃ ভ্রুকুটিকুটিল হইয়া উঠিল।

সহসা এক নাগরিক ত্রস্তভাবে সেনাধ্যক্ষের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিতে গিয়া মলিন ছিন্ন উত্তরীয়ের প্রান্তদেশ অজ্ঞাতে হেরাক্লিডাসের দেহ স্পর্শ করাইয়া ফেলিল। আর যায় কোথায়? সাধারণ দরিদ্র লোকের এ অসহনীয় স্পর্ধায় স্তম্ভিত হেরাক্লিডাস্ কয়েক মুহূর্ত শুধুমাত্র ক্রোধভরে কাঁপিতে লাগিলেন। অতঃপর

পারেই সহসা প্রচণ্ডবেগে কেশাকর্ষণপূর্বক লোকটিকে ভূমিশয্যায় টানিয়া ফেলিলেন। হতভাগ্য করজোড়ে প্রাণপণে আকুলস্বরে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু নির্দয় হেরাক্লি-ডাসের পাষাণ অন্তরে ক্ষমা নামক বস্তুটির অস্তিত্ব হাস্যকর। সঙ্গী সৈনিক দুইজনকে ইঙ্গিত মাত্রেই তাহারা আসিয়া ভূপাতিত নিরীহ লোকটির দুই পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া দুই হস্তে মুঠা মুঠা কেশ উৎপাটন করিতে লাগিল। প্রায় মুণ্ডিত অবস্থা হইতে হেরা-ক্লিডাস্ সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন—কঠিন চর্ম-পাদুকার আঘাতে তাহার মস্তক ছেঁচিতে আরম্ভ করিলেন। অকথ্য যন্ত্রণাপ্রসূত আর্ত-বিলাপে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া গেল—অত্যাচারিতের সে অমানুষিক চীৎকার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া হেরাক্লিডাসকে যেন কথঞ্চিৎ স্বস্থ করিয়া তুলিল—এতক্ষণে মৃদু হাস্যের আভা তাঁহার সুশ্রী মুখশ্রী সুরঞ্জিত করিয়া তুলিল। অচেতনপ্রায় দেহটাকে পথ-পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক-ভাবে সঙ্গীদের সহিত গল্প করিতে করিতে তিনি পুনরায় অগ্রসর হইয়া চলিলেন। যেন ইতিমধ্যে কিছুই ঘটে নাই।

ক্রমে তাঁহারা বিপণি-আলয়ের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। পসারীরা তাঁহাদের দর্শনমাত্র আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। দোকান বন্ধ করিবার আদেশ তাহাদের নগরপাল দিবেন না অথচ হেরাক্লিডাস অনুচরগণসমেত সমস্ত পণ্য-মার্গ মত্তহস্তীর ন্যায় চষিয়া বেড়াইবেন। যে বস্তুটি তাঁহার চোখে লাগিবে সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইবেন—কোনো মূল্য বা শুল্ক প্রদান তাঁহার জন্মপত্রিকায় লিপিবদ্ধ নাই। একবার এক অসমসাহসিক বিক্রেতা তাঁহার নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য উচ্চারণ করিয়াছিল—হেরাক্লিডাস্ তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে এমন চপেটাঘাত করিয়াছিলেন যে, কর্ণপটহ ছিঁড়িয়া গিয়া লোকটি জন্মের মতো সম্পূর্ণ বধির হইয়া গিয়াছিল। পরম মূল্যপ্রাপ্তিই তাহার ঘটিয়াছিল। ভাগ্যে চরম নয়।

হেরাক্লিডাসের সহচরগণ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মেহগিনি ছড়ির ঘায়ে প্রস্তর, স্ফটিক ইত্যাদি মূল্যবান ভঙ্গুর পণ্যগুলিকে ভাঙিতে ভাঙিতে পথ চলে। উহাতেই তাহাদের আনন্দ. ঐ ঝন্‌ঝন্ শব্দেই তাহাদের কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট তাই হেরাক্লিডাস্ মূর্তিমান বিভীষিকাস্বরূপ। কত সহস্র কার্যাবলীর কাহিনী যে তাঁহার অতীত ইতি-হাসে কলঙ্কাধ্যায়রূপে বিজড়িত তাহার আর লেখাজোখা নাই।

বিপণি স্বত্বাধিকারিগণ হেরাক্লিডাসকে সঙ্গীসহ প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত দেখিয়া কোনো-প্রকারে শুষ্কস্বরে "আসুন মহাভাগ" শব্দটা জড়িতস্বরে উচ্চারণ করিল। আসন্ন ক্ষতির কথা ভাবিয়া বিশেষ করিয়া শৌণ্ডিকের মুখ অপরিসীম বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাদের পূর্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ সহসা হেরাক্লিডাসের মনোযোগ বিপণিসমূহকে পরিহারপূর্বক অপরদিকে আকৃষ্ট হইল। রাজধানীর প্রধান রঙ্গীণ প্রস্তরখচিত পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে কিনারায় একটি রমণীয় উদ্যানবাটিকা। আর তাহারই পরিখা-প্রান্তে কখন যেন একটি নারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হেরাক্লিডাসের চিত্রার্পিত দৃষ্টি পলক ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

নারী তো নয়—তপ্তকাঞ্চন কান্তি জ্যোতিঃ কন্যা—লাবণ্যঝরা ঈষৎ ক্ষীণা চন্দ্রিকা।

মলিন ছিন্ন চীনাংশুকের স্বচ্ছ বাসান্তরালে দীপশিখার মতো জ্বলিতেছে সূর্যরশ্মিধারার দেহদ্যুতি। সর্বাঙ্গ আকুল করা রসলিপ্সিত চিত্রণা।

এই কী দেবকন্যা? মিনার্ভা স্বয়ং, অ্যাফ্রোদিতে, প্রোক্রিস্ প্রোক্রিস্ অথবা দেবী ভিনাস?

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিবামাত্রই দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া শিকারলিপ্সু ব্যাধের ন্যায় হেরাক্লিডাস্ রমণীর উদ্দেশ্যে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। চকিতা হরিণীর মতো তৎক্ষণাৎ রমণী উদ্যানান্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

হস্তের ইঙ্গিতে হেরাক্লিডাস টার্পেনিয়ুসকে নিরস্ত করিলেন

তন্বঙ্গী নারী উদ্যানের অন্তস্তলে কোন্ স্থানে আত্মগোপন করিল তাহা দুই দণ্ড যাবৎ সারা উদ্যানবাটিকা ছত্রভঙ্গ করিয়াও নিরূপণ করা গেল না।

ক্লান্তদেহে, শ্রান্তচরণে ক্ষুধাবসন্ন হেরা-ক্লিডাস অবশেষে ধীরে ধীরে স্বীয় আবাসের পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সূর্য তখন শীর্ষ-দেশে। অত্যধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও অভীপ্সিত বস্তুলাভে হতাশ হেরাক্লিডাসের দুই চক্ষু তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অগ্নিপ্রভা বিকিরণ করিতেছে। টার্পেনিয়ুসের উপর সংবাদ সংগ্রহের ভার দিয়া তিনি ফিরিলেন।

অনুজ্ঞামতো টার্পেনিয়ুস গোধূলি-বেলাতেই আসিল।

অধীর উদ্বেগে হেরাক্লিডাস তখন সহ-[illegible]রীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

[illegible]টার্পেনিয়ুস কোনো প্রকার ভূমিকা করিল [illegible]র। হেরাক্লিডাসের প্রকৃতি তাহার অজানা নয়। খেয়ালের দাস তিনি—যখন যেরূপ খেয়াল মস্তিষ্কে উদ্ভূত হয় তাহার একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অসহিষ্ণুতার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া থাকেন।

: সে নারী উন্মাদিনী।

: উন্মাদিনী??

: যথার্থ দণ্ডনায়ক। প্রভাতে দৃষ্ট উদ্যানটি উন্মাদাগারের পশ্চাদভাগ। মেয়েটি এদেশীয়া নয়। মাত্র কয়েক মাস এস্থানে আসিয়াছে।

কামনার যে লেলিহান শিখা হেরাক্লিডাসের অস্থির অভ্যন্তরস্থ মজ্জা অবধি দগ্ধ করিতে-ছিল নারীটিকে দর্শন যাবৎ কোথায় যেন তাহাতে চিড় খাইয়া ফাটল ধরিল সংবাদবাহির নিষেকে।

অভিজাত গ্রীক রাজপুরুষ বায়ুর মতোই শক্তিশালী—সর্বত্র তাঁহার অবাধগতি। সুতরাং উন্মাদাগারে পা দিবামাত্র ভারপ্রাপ্ত রক্ষক সেনা-ধ্যক্ষকে শশব্যস্তে রোগিণী দর্শন করাইতে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে অলিন্দেই পূর্বদৃষ্ট রমণীটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, লোভার্ত ভঙ্গীতে এক মনে দুটি পিষ্টক লেহন করিতেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই উহার দেহজ্যোতিঃ বহুলাংশে ম্লান হইয়া গিয়াছে যেন। হয়তো বা তাঁহার ভ্রম; নিকটতর হইয়া হেরাক্লিডাস উপলব্ধি করিলেন, না তাঁহার অনুমানই সত্য, ইতিমধ্যে কোনো স্থানে মনের সুখে ভূলুণ্ঠন করিয়াছে; সর্বাঙ্গে কর্দম অনুলেপন। হেরাক্লিডাসকে দেখিয়াই কোনো এক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া সেই ক্ষিপ্তা নারী সহসা বিকট চীৎকার করিয়া এক বিরাট লম্ফ প্রদান করিল। লম্ফ দিয়া অলিন্দ অতিক্রম করিয়া স্বীয় কক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হওয়াই বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু মন্দভাগ্য বশতঃ কোনো কঠিন বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আকস্মিকভাবে বেচারী একেবারে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল।

হেরাক্লিডাস দ্রুতগতিতে নিকটে গেলেন। পাষাণনির্মিত অঙ্গন হইতে পাগলিনীকে সযত্নে ধরিয়া তুলিলেন। সে সত্যই আহত আতঙ্কিত হইয়াছিল—সম্পূর্ণরূপে হেরাক্লিডাসের স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাহায্যে কোনোমতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যথায় না অন্য কোন মানসিক আবেগে উন্মাদিনী সহসা তীব্র চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল—তাহার অপরূপ মুখশ্রী বিকৃত হইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সহসা দশ অঙ্গুলির মলিন দীর্ঘ তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা হেরাক্লিডাসের মুখ প্রাণপণে আঁচড়াইয়া উন্মত্তা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল।

হোক্ পাগলিনী, হোক্ সুন্দরী—স্বয়ং সেনানায়কের মুখে নখরাঘাত—এ কিরূপ ধৃষ্টতা?

টার্পেনিয়ুস পাগলের মতোই দৌড়াইয়া আসিল পাগলীকে শাস্তি দিবার মানসে। কিন্তু হস্তের ইঙ্গিতে হেরাক্লিডাস উহাকে নিরস্ত করিলেন। কি এক মায়ায় তিনি যেন সম্মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন—পাগলিনীর ছিন্ন মলিন শাটিকার উৎকট দুর্গন্ধ, রুক্ষ পিঙ্গলবর্ণ কেশ-মধ্যস্থ উৎকুনরাশি, তাহার নখরাঘাত কোনো কিছুই তাঁহার অসহ্য লাগিতেছিল না।

মুখচর্ম স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছিল, কিন্তু তাহার জ্বালা হেরাক্লিডাসের অনুভূতির আয়ত্তে আসিল না। মূল্যবান পোষাকে কর্দমপ্রলেপ তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল

—অতিসৌখীন বিলাসী শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের একি মনোবিকার! আচ্ছন্নের ন্যায় বিশ্বস্ত বান্ধবের স্কন্ধে ভর দিয়া উন্মাদাগার হইতে হেরাক্লিডাস্ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

স্কন্ধের ক্ষতজনিত ব্যথা অথবা কোনো মানসিক দুশ্চিন্তার আবেগে সেদিন সমস্ত রাত্রি হেরাক্লিডাসের দুই চক্ষুতে নিদ্রাকর্ষণ হইল না। দীর্ঘ রজনীব্যাপী গুরুপদচারণার শব্দ তাঁহার প্রাসাদের যামিকরক্ষিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিল। দ্বারপাল ও ভৃত্যবর্গ পরম আশ্চর্যান্বিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল—এ কী প্রভুর এরূপ বৈলক্ষণ্য তাহারা তো আজ পর্যন্ত দেখে নাই?

সত্যই এ কী বিশ্বাসযোগ্য? একটিমাত্র শরীর স্পর্শ, একটি পাগলিনীর মলিন দেহের সাময়িক সান্নিধ্য অন্তরে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে? কোন্ ইন্দ্রজাল প্রভাবে মানসিক গতি প্রকৃতির সূক্ষ্ম পরিবর্তন সুরু হইয়া গেল এমন বিপর্যস্তভাবে? হেরাক্লিডাসকে নির্ভর করিয়া আজ ঐ নারী ভূমিশয্যা হইতে উত্থিত হইতে পারিয়াছে—একদিন এই হেরাক্লিডাসের সাহায্যে, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া অজ্ঞান তমসালোক হইতে পাগলিনী জ্ঞানলোকে পদার্পণ করিবে।

নিশীথ রাত্রির কৃষ্ণাঞ্জন তাঁহার উপরে কোন্ মোহ বিস্তার করিল যাদুবলে কে জানে! উত্তেজিত-মস্তিষ্ক হেরাক্লিডাস আপন মনে উচ্চকণ্ঠস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন : তাহাকে আমি নীরোগ করিয়া তুলিব। তাহার জন্য পৃথিবীর অপরপ্রান্তে যাইতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। সে আমার—আমি তাহাকে [illegible] দেবী সাইপ্রাস [illegible] পিগম্যালিয়নের মতো আমাকে বর প্রদান করুন, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমার নারী, আমার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি তাহাকে ভোগ করিব। এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেহ তাহাকে পাইবে না।

বার বার প্রতিজ্ঞাটি আবৃত্তি করিয়া হেরাক্লিডাস যেন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এযাবৎ বহু নারীর উষ্ণ সাহচর্য তিনি পাইয়াছেন, নবীন যৌবনের উপচার হিসাবে বহু রূপসীকে ভোগ করিয়াছেন কিন্তু এমন করিয়া [illegible] কে জানে [illegible] কি অসাধারণ শক্তিশালিনী ঐ মত্তা নারী! অথবা কোনো বিশেষ [illegible]?

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু পূর্বদিগন্ত রক্তিম উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া উষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিমির যামিনীর অর্ধোচ্চারিত শপথবাণী বিলীন হইয়া গেল না।

[illegible] সেনাধ্যক্ষের খেয়ালের অন্ত পাওয়া ভার। হেরাক্লিডাস্ চিকিৎসাশাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন আকস্মিকভাবে। পাগলিনীর পরিচর্যায় ভিষগাচার্যকে নিযুক্ত করিলেন। চিকিৎসার জন্য গুর্জর, সৌরাষ্ট্র, শিবি প্রভৃতি প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ আহূত হইয়া আসিলেন—মুক্তহস্তে গ্রীক রাজপুরুষ এক সামান্যা ভারতীয়া নারীর জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন অকাতরে। দেশে বিদেশে যেখানে মানসিক রোগ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য-সমন্বিত যাহা কিছু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ছিল সমস্ত একযোগে সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টায় হেরাক্লিডাস্ অধীর হইয়া উঠিলেন।

উন্মাদিনীর জন্য উন্মাদ হইবার এ কি আকুল সাধনা!

একমাস কাটিতে না কাটিতে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, হেরাক্লিডাস্ প্রায় অহোরাত্রই উন্মাদাগারে পড়িয়া থাকেন। ভিষগাচার্যের সহিত পরামর্শ করেন, বৈদ্যগণের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। স্নানের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, ক্ষুধায় জঠর-যন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি মোচড়াইয়া বিবমিষা উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু হেরাক্লিডাস্ নির্বিকার। অশেষ প্রকার অনুসন্ধান করিয়াও কিন্তু পাগলিনীর ইতিহাস কেহ কণামাত্রও বলিতে পারে নাই—বহু আয়াসেও উহার পরিচয় কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। বিদেশীয়া নারী—রাজবর্ত্মের একাংশে একদিন পথলীনা অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া উন্মাদাগার অধিকর্তা তুলিয়া লইয়া আসেন—ঐ অসামান্য রূপ উহার ক্ষতিকারক হইবে সেই আশঙ্কায়। শুধু স্বীয় নামের অপভ্রংশ উন্মত্তা উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিল—মণি। তাহার পর যাঁহার ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে বিনা দক্ষিণায় উহার চিকিৎসা করেন, তাহা ব্যতীত অনাদৃতা পাগলিনী অযত্নে, অবহেলায় পড়িয়া থাকে। শুষ্ক চণক ও ইষ্টকের ন্যায় পিষ্টক ব্যতীত উহার ভাগ্যে অপর কোন সুখাদ্য এ পর্যন্ত জোটে নাই।

প্রায় অহোরাত্রই উন্মাদাগারে পড়িয়া থাকেন

হেরাক্লিডাস অন্তরে অন্তরে প্রীত হইয়া উঠিলেন। নিতান্ত কর্তব্যজ্ঞানে, শুধু [illegible] মোহেই তিনি মণির আত্মীয়স্বজনের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র আলোক না পাওয়াতে তাঁহার অন্তর আশায় উদ্দাম উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। তবে সত্যই দেবতা কিউপিড্ শুধু তাঁহার জন্যই এই রমণীরত্নকে প্রেরণ করিয়াছেন করুণা করিয়া—অমরাবতী সুধাধারা হইতে যে নামিয়া আসিয়াছে তাহার পরিচয় মর্ত্যের ধূলায় কেমন করিয়া মিলিবে! শুধু তাঁহার চিত্তপরীক্ষার জন্য উহার উন্মত্ততা ব্যাধি সৃষ্টি করিয়াছেন দেবতা—এ পরীক্ষা-সংকট তিনি পার হইতে পারিবেন না?

হেরাক্লিডাস্ অন্যমনা হইয়া উঠিলেন। মণির জন্য তিনি দুইজন বিশেষ সেবিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। খাস দাসী একজন বহিল সেবিকা ব্যতীত। তাহারা সর্বদা উহাকে সুপ্রসাধিতা [illegible] চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ চেষ্টাই সার—মণি দুরন্ত অশ্বিনীর ন্যায় কোনোমতেই বাগ মানে না।

হেরাক্লিডাসের অন্তরস্থ কামনার দুর্বার আকৃতি ধীরে ধীরে কেমন করিয়া কোমল সহানুভূতির রূপে দ্রবীভূত হইয়া গেল—সে রহস্য তাঁহার নিজস্ব চেতনার নিকটেও দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিল।

মণির জন্য তিনি কোমল আস্তরণ বিস্তৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যা, দুর্মূল্য পালঙ্ক, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস, মোদক, শর্করাকন্দ, ক্ষীরকদম্ব, পৌলিক, ননী, মধু প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের প্রভূত আয়োজন করিলেন।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা সবই প্রায় ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। মণি শয্যায় শয়ন করে না, আহারকালে দন্তে দন্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া থাকে, অপূর্ব লাবণ্যদ্যুতি ম্লানিমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল দিনদিন। তাহার অবস্থা উন্নতির দিকে না গিয়া ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। হেরাক্লিডাসের প্রতি তাহার অণুমাত্র অনুরক্তির ভাব দেখা গেল না—তিনি যে তাহাকে ধর্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল সেবাই করিতেছেন ইহা বুঝিয়াও মণি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞ হইল না।

কিন্তু তথাপি হেরাক্লিডাস্ ক্রুদ্ধ বা অসহিষ্ণু হইলেন না। এতদিনে তাঁহার চিত্তে সৎসংস্কারের প্রেমের কল্যাণদীপটি জ্বলিয়াছে—মণির প্রতি তাঁহার নিষ্কাম ভালোবাসা উত্তরোত্তর চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও।

সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ, বন্ধু-বান্ধব, অত্যাচারের কেন্দ্র প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া উন্মুখ তাপসচিত্তের গাঢ় একাগ্র উপাসিত অবদান—সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হেরাক্লিডাস্ কঠোর তপস্যায় যেন ব্রতী হইলেন উন্মাদিনী মণির জ্ঞানচেতনা ফিরাইয়া আনিবার আকুলতায়।

হিন্দু যাগযজ্ঞবিধিতে অবাধ তিনি আস্থা-ভাজন হইয়া উঠিয়াছেন—মণির কল্যাণ কামনায় আর্যাবর্তের পঞ্চাশৎ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হোতাকে কর্ণধার করিয়া মনশ্চারণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে বিদেশী গ্রীকের তত্ত্বাবধানে।

তাহার পর সেইদিন!!

প্রতিদিনের রীতি অনুযায়ী হেরাক্লিডাস্ সেদিনও প্রভাতে আসিয়াছেন উন্মাদাগার পরিদর্শনে। মণিকে লইয়া একদেশদর্শিতার মৃদু অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কয়েকবার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুরুষের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি উত্তোলন করিবারও সাধ্য তাঁহাদের নাই।

মণির অবস্থা আজ উৎকট রকম [illegible]। দাসীদ্বয়ের অনুযোগে হেরাক্লিডাস্ বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন—এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত আকাঙ্ক্ষা, এত আন্তরিকতা—বিধাতা এত কিছুর কোনোরূপ মূল্য দিবেন না? একটি প্রাণ প্রকৃতিস্থ করার এত যে মানুষী সাধনা—সবই কি ব্যর্থ হইবে?

মণি তাঁহার সম্মুখে আসিল—আপাদমস্তক পুষ্পাভরণ অলংকৃতা, রাজকীয় সজ্জায় ভূষিতা, নববধূর ন্যায় লজ্জাশীল পদক্ষেপে মণি আসিয়া দাঁড়াইল। সেবিকারা আজ উহাকে অপরূপ সাজাইবার সুযোগ পাইয়াছে যেন কেমন করিয়া।

([illegible] পর ৯৬ পৃষ্ঠায়)

ডাউনিং স্ট্রীট থেকে ড্রাইভারের গাদিতে

বাসব ঠাকুর

ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে তখন দেখা দিয়েছে এক নিবিড় কালো মেঘ। হিট্‌লারের বক্তৃতার বিদ্যুতে থেকে থেকে চমকে উঠছে বিশ্বব্যাপী একটা মহাযুদ্ধের আশংকা। এমন সময় সূর্যাস্তবিহীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার নিযুক্ত হলেন নেভিল চেম্বারলেন। তিনপুরুষ ধরে চেম্বারলেন বংশ ইংলণ্ডের রাজনীতির ক্ষেত্রে সুযশ অর্জন করে এসেছেন, তাই জনসাধারণ আশান্বিত হয়ে উঠলো এই ভেবে যে নেভিল নিশ্চয় বিশ্বশান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। মিউনিক ক্রাইসিসের সময় ইউরোপের বহু দেশের প্রতি অবিচার করা হলেও আসন্ন যুদ্ধকে তিনি বছরখানেক স্থগিত রেখে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন, কারণ পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালে অষ্টম এডওয়ার্ডকে রাজ্যচ্যুত করা নিয়ে লোকে এতই ব্যস্ত ছিল যে, প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর কোনই লক্ষ্য রাখা হয়নি, যার ফলে জার্মানির দুর্ধর্ষ বিমান বাহিনীর সামনে এক মিনিট দাঁড়ানোই ইংলণ্ডের পক্ষে ছিল একেবারে অসম্ভব।

মনে পড়ে চেম্বারলেন যেদিন শান্তি স্থাপনের শেষ চেষ্টায় বার্লিন অভিমুখে রওনা হলেন, সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধু সমর সেন, যিনি সম্প্রতি ইউরোপের কোন রাজ্যে ভারতীয় রাজদূত নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে রিজেন্টস্‌ পার্কের বেঞ্চিতে বসে মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে যে একটি আলোচনার সূত্র করেছিলাম সেটা শেষ হবার আগে কখন দেখি, রাত্রিটাই কাবার হয়ে গেছে। ভোরের সংবাদপত্রে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসের বর্ণনা পড়তে পড়তে ফিরে গিয়েছিলাম যে যার বাসার দিকে। ফটকের চাবিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই বাসায় ফিরে কলিং বেল টিপতে হ'ল। বাড়ির তদারক কর্তা ডিক্‌ ও তার স্ত্রী অ্যানা। দরজাটা খুলে আমাকে দেখতে পেয়ে ডিক বলে উঠলো "গত দুদিন থেকে আপনার কোন খোঁজখবর নেই, কাউন্টি কাউন্সিল থেকে তিনবার লোক এসে ফিরে গেছে। শিগ্‌গির যান, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে গ্যাস মাস্ক নিয়ে আসুন। যুদ্ধ ঘোষণা হলে সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো বিমান আক্রমণ সুরু হবে আমরা সব গ্যাস মাস্ক পেয়ে গেছি।" ইতিমধ্যে অ্যানা তার ঘর থেকে সদ্য প্রাপ্ত গ্যাস মাস্কটি নিয়ে এসে মুখে লাগিয়ে বলে, "এই দেখুন আমারটা কত ভালো ফিট করেছে।" তাদের ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছে করে না, তবু বলি "ধন্যবাদ, ভগবানের কৃপায় মানুষের মতন চেহারা নিয়ে আমরা জন্মেছি, তাকে ঐ রাক্ষুসে মুখোস পরে বিকৃত করতে কোন ইচ্ছে আমার নেই। ওসব আমি কোন দিন পরবো না, আর নিশ্চয় করে বলতে পারি যুদ্ধ এখনই লাগবে না।" যুদ্ধ লাগবে না এটা যে কেন বলেছিলাম জানি না, তবে খুব সম্ভব তখনকার ইংলণ্ডের যুদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অভাব দেখেই হয়েছিল আমার ঐ ধারণা। আমার ঘরে নানা রকম ছেলেমেয়ের হত ভিড় আর কাউকে কিছু না বলে মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে আমায় উধাও হয়ে যেতে দেখে ওরা যে কি ভাবতো তা কে বলবে? আমি কোন রাজনৈতিক গুপ্ত কাজে লিপ্ত আছি ভাবলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। আমার বক্তব্য শেষ হলে ডিক বল্লে, "মিঃ টেগোর, তুমি এক অদ্ভুত লোক নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে তবু কুৎসিত দেখায় বলে গ্যাস মাস্ক পড়বে না? কিন্তু যুদ্ধ না লাগা এখন কি আর সম্ভব? তবু আশা করি তোমার কথাটাই সত্যি হবে।"

রাত্রে না ঘুমিয়ে শরীরটা ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেই তন্দ্রার ঘোরে চোখ দুটি জড়িয়ে এলো। ঘুম যখন ভাঙলো সন্ধ্যে তখন হয়ে গেছে, তাই পোষাক বদলে বেরোলাম কিছু খাদ্যের অন্বেষণে। নিকটস্থ স্ন্যাকবারে গিয়ে কয়েকটা সস্তা স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম লোকজনের মুখে আবার একটা সহাস্য ভাব দেখা দিয়েছে, গত সন্ধ্যায় যেটা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছিল। আর একটু পরেই জানতে পারলুম হিট্‌লারের কাছ থেকে শান্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চেম্বারলেন বার্লিন থেকে ফিরে এসেছেন এবং যুদ্ধের আশংকা আর নেই।

বাড়ি ফিরে দেখি ডিক ও তার স্ত্রী আমাকে এক পূর্ব দেশীয় ভবিষ্যৎ বক্তা বলে ধরে নিয়েছে। তাদের উৎসাহ দেখে ভয় হচ্ছিল, একটু পরে হয়তো তারা হাত দেখতে অনুরোধ করবে। তাই কোন রকমে তাদের এড়িয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

এরপর ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে চেম্বারলেনের খ্যাতির অসম্ভব রকম বেড়ে উঠলো। ওঁর ছাতি ধরার অনুকরণে সৃষ্টি হল এক নতুন সুরের নাচ যার জনপ্রিয়তা লম্বেথ ওয়াক ...

রুপ্পসে ডেইসি অথবা রোল অস দি ব্যারেলের স্বরকেও ছাড়িয়ে যাবার জোগাড় হল। তবে মিউনিক চুক্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি অবিচার করে হিট্‌লারকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া হল মনে করতেন একদল লোক। তাঁরা চেম্বারলেন নামটিকে ফরাসীতে রূপান্তরিত করে বলতেন, "জেম বার্লিন" যার মানে হয় বার্লিন আমার প্রিয়।

তখন ডিউক স্ট্রীটের যে বাড়িটায় আমি থাকতুম সেটা ছিল লণ্ডনের এক ফ্যাশানেবল্‌ বড়লোক পাড়ায়, কিন্তু যে মহিলাটি বাড়ির মালিক তাঁর সুনজরে থাকায় সামান্য ভাড়াতেই পেয়েছিলাম ঘরখানা। বিখ্যাত সেল্‌ফ্রিজের পেডিকিওর ডিপার্টমেণ্টটি (পদশ্রী চর্চার বিভাগ) ছিল আমার জানালার ঠিক সামনেই, তাই প্রায়ই ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই দেখতে হত কারুর না কারুর নগ্ন পা। সেই সব পায়ের অধিকারিণীদের মুখগুলো কখনও কখনও ভারি সুন্দর লেগেছে আর কখনো মনে হয়েছে পায়ের বেশি আর কিছু না দেখলেই ভালো হত।

রয়েল কলেজ অব্‌ আর্টে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিপ্লোমা পেতে তখনও আমার এক বছর বাকি। ভয়ে ভয়ে ছিলাম এতদূর এগিয়েও যুদ্ধটা লাগলে ডিপ্লোমাটা হয়তো আর পাওয়াই হবে না। তাই যুদ্ধ না লাগায় অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। কয়েকদিন পর আমার সাউথ কেন্‌সিংটনের পুরোনো বাসার বাসিন্দা দ্বারকা চাটার্জি (উপস্থিত লণ্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম কর্মসচিব) নিয়ে এলেন পুরোনো ঠিকানায় আসা আমার কয়েকটা চিঠি। যার মধ্যে দেখি একটা খামের উপরে লেখা আছে From Mrs. Neville Chamberlain (মিসেস নেভিল চেম্বারলেনের নিকট হইতে) কিন্তু পেন্সিলের দাগ দিয়া কে সেটা কেটে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম নিশ্চয় কোন ভারতীয় বন্ধু খামের উপর মিসেস চেম্বারলেনের নাম লিখে আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে, কিন্তু বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর নাম নিয়ে অমন করাটা ঠিক নয় ভেবে দ্বারকাই ওটা পেন্সিল দিয়ে কেটে দিয়েছে। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় খামটা তখনই খোলা হয়নি। পয়লা এপ্রিল হলে কখনও সেটা খুলতাম কিনা সন্দেহ। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে খুলে দেখি ভিতরে একটি নিমন্ত্রণপত্র। আর সত্যিই সেটা এসেছে মিসেস চেম্বারলেনের কাছ থেকে উত্তর দিতে হবে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে। তবুও সন্দেহ হয়, কারণ মনে পড়ে না মিসেস চেম্বারলেনের সঙ্গে কোন দিন পরিচয় হয়েছে বলে। চিঠিটা আমাদের কলেজের প্রফেসরকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি সেটাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। তিনি চিঠিটা দেখে অবাক হয়ে যান, বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী তোমায় চা খেতে ডেকেছেন এতে সন্দেহের কি আছে! তুমি অতি ভাগ্যবান ছেলে। আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাবো কিনা জানাতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেল তাই আর একটা চিঠি পেলাম প্রধানমন্ত্রী আবাসের কর্মসচিবের কাছ থেকে তিনি লিখেছেন মিসেস নেভিল চেম্বারলেন তাঁর কয়টি বিদেশী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছেন সেদিন আমি আসতে পারবো কিনা শীঘ্র জানালে তিনি বাধিত হবেন। উত্তর দিতে এতটা দেরি করে

ফেলেছি দেখে বিশেষ লজ্জিত হয়ে ছুটলাম দীপক দত্ত চৌধুরীর কাছে। কারণ ডক্‌টর শশধর সিনার কাছ থেকে একটা টাইপরাইটার কিনে হঠাৎ টাকার প্রয়োজনে মাসখানেক পরে ওরই কাছে সেটা অর্ধেক দামে বেচে দিয়েছিলাম, কিন্তু বেচবার সময় সর্ত ছিল দরকার হলে ও আমার চিঠি ইত্যাদি টাইপ করে দেবে। এর উত্তরটা ওকে দিয়েই টাইপ করিয়ে নিলাম। চিঠিটা আমার ঘরের ম্যান্টল্‌পীসের উপরই অন্যান্য নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে রাখা ছিল। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি ডিক ও তার স্ত্রী আমার ঘরের সমস্ত পুরোনো আসবাবপত্র বার করে কয়েকটা সুন্দর-দেখতে নতুন আসবাব ঢোকাতে ব্যস্ত; এর কারণ কি জিজ্ঞেস করে জানলাম, যে মহিলাটি বাড়ির মালিক তিনি আমার ঘরটা ইন্সপেক্‌ট করতে এসে মিসেস চেম্বারলেনের নিমন্ত্রণপত্রটি দেখতে পান এবং ভাবেন যে-লোক প্রধানমন্ত্রী-ভবনে নিমন্ত্রিত হয় তার ঘরে ঐসব বাজে আসবাব রাখা যায় না। আর দেখি ডিক ও তার স্ত্রী ধরে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মিউনিক চুক্তির আগে নিশ্চয় আমায় বলেছিলেন যে যুদ্ধ সেবার লাগবে না। ওটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী বলে আর তারা মানতে রাজি নয়।

যাবার দিন দেখি স্যুটগুলো সব কুঁচকে যা তা হয়ে আছে আর সব চেয়ে ভালো স্যুটটা লণ্ড্রি থেকে আনা হয়নি। হাতে এমন পয়সা নেই যে, সেটাকে আনা যায়। ঘরে কোন জিনিষও দেখতে পেলাম না যা বাঁধা দিলে বা বিক্রি করলে ঝট করে কয়েকটা টাকা পাওয়া যায়। অনেক ভেবে শেষকালে বন্ধু সমর সেনের কাছেই ধার নেওয়া স্থির করলাম। বন্ধুদের মধ্যে ওঁর তখন খুবই সচ্ছল অবস্থা। সবে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একদিন আমায় বাড়িতে না পেয়ে মিসেস চেম্বারলেনের কার্ডটার পেছনেই তাঁর নতুন ঠিকানাটা লিখে রেখে গেছলেন। তাই সেখানে গিয়ে ওঁর কাছ থেকে পাউণ্ড-খানেক সংগ্রহ করতে মোটেই অসুবিধে হল না। সেটা ছিল শরৎকাল সেদিন চারদিকে খট খট করছে রোদ্দুর, বেশ একটু গরম লাগছিল। সদ্য প্রেস করা স্যুটটি চড়িয়ে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। খুঁজে পেতে বাড়িটার সামনে যখন হাজির হলাম ঠিক তখন চা খাওয়ার সময়। এর আগে লণ্ডনের এদিকটায় আমার কখনো আসা হয়ে ওঠে নি। দেশের লাট সাহেবের বাড়ির সামনে জাঁকজমক দেখে ধারণা ছিল ঐসব লাটসাহেবদেরও উপরওয়ালা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে আরো হয়তো অনেক বেশি আড়ম্বর দেখা যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বাড়িটার কাছে একটা পুলিশের পাহারাও দেখতে না পেয়ে সন্দেহ হল ভুল রাস্তায় এসেছি বলে। আশেপাশে কোন একটা লোকও নেই যে, জিজ্ঞেস করি। চৌকাঠের উপর পিতলের অক্ষরে লেখা ছিল ১০নং, কাজেই ঠিকানার গোলমাল হয় নি। দরজাটা খোলাই ছিল, তবু ভিতরে যেতে ইতস্ততঃ করছিলাম। এমন সময় দেখি দাড়ি কাটা ট্রাউজার ও টেইল কোট পরা একটি পক্বকেশ, মধ্যবয়সী লোক ও তাঁর সমবয়সী একটি মহিলা কোথায় থেকে উদয় হয়ে বাড়িটায় প্রবেশ করলেন। এবার সাহস করে আমিও তাঁদের অনুসরণ করলাম। এখনও ভয় হচ্ছিল অনধিকার প্রবেশ করার জন্য

দুলাল — সিদ্ধেশ্বর মিত্র

হঠাৎ হয়তো কেউ আমায় প্রশ্ন করে বসবে। তাই পকেটে হাত দিয়ে ভালো করে একবার দেখে নিলাম কার্ডটা এনেছি কি না। সেই মহিলা ও ভদ্রলোকটি দোতলায় এসে একটি দরজার সামনে দাঁড়ালেন। এখানে খুব দামী সজ্জায় ভূষিত আর একজন ইংরেজ দাঁড়িয়ে ছিল। আগন্তুক লোকটি তার কানের কাছে মৃদুস্বরে নিজেদের নামগুলো বললে পর দরজা-রক্ষক ইংরেজটি দরজাটা খুলে তাঁদের ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করলে "স্যর ফ্রেডারিক সাইক্স ও লেডি সাইক্স"। তাঁরা দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। এঁদের পিছু পিছু আসবার সময় ভাবছিলাম ওঁরা হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কোন সামান্য কর্মচারী। কিন্তু নামটা শুনে বুঝতে পারলুম ওঁরা বম্বের ভূতপূর্ব গভর্ণর ও তাঁর স্ত্রী। এবার আমিও দরজারক্ষকের কাছে গিয়ে আস্তে করে বললাম আমার নামটা, আর একটু হলেই কার্ডটা বের করে ফেলতাম বোকার মতন, কিন্তু লোকটা তার আগেই মৃদু হেসে দরজাটা খুলে আমায় ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করলে এবং ঘোষণা করে দিলে মিঃ বি টেগোর। দরজার ওধারে দাঁড়িয়েছিলেন ভারি সুন্দর গাঢ় নীল রংএর সান্ধ্য গাউন পরে একটি মধ্যবয়সী মহিলা। কোমরে সরু রূপালী রংএর কোমরবন্ধ। মনে হল পূর্বে কোথায় মহিলাটিকে দেখেছি, কিন্তু ঠিক করতে পারলুম না। ঘরের ভিতর বেশ একটা ভীড়, কিন্তু তার মধ্যে নজরে পড়লো না কোন পরিচিত অথবা ভারতীয় লোকের চেহারা। সেই সব অপরিচিত লোকেদের মধ্যে একটু নার্ভাস হয়েই এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তার পর দেখি একদল লোক দরজার কাছে যে মহিলাটি সবার সঙ্গে করমর্দন করছিলেন তাঁকে ঘিরে ধরেছে একটা বক্তৃতা দেবার জন্য; তখন বোঝা গেল তিনিই মিসেস চেম্বারলেন। সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে শেষে তিনি ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের বিষয় কিছু কথা শোনাতে রাজি হলেন। পাশের ঘরটা ছিল বোধ হয় কনফারেন্স রুম, যেখানে চৌকি পাতা ছিল অনেকগুলো, সবার সঙ্গে গিয়ে সেই চৌকিগুলোর মধ্যে আমিও একটাকে অধিকার করে বসলাম। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে সুরু করলেন মিসেস চেম্বারলেন তাঁর বক্তৃতা। সকলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "আজ সর্বাগ্রে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মিসেস

কেনেডি", ইংলন্ডে তখনকার মার্কিণ রাজদূতের পত্নী এবং তাকে ডেকে এনে নিজের কাছে বসালেন। সমবেত শ্রোতারা আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন। মিসেস চেম্বারলেন বলে চললেন "সেই সঙ্গে আরো আছেন বহু পরিচিত ঔপন্যাসিক সার হিউ ওয়ালপোল আর ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক বি, টেগোর। আবার সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। ঐভাবে আমার নাম উল্লেখ হতে দেখে ভয়ানক আত্মসচেতন হয়ে উঠলাম। এতক্ষণ ভাবছিলাম এখানে আমায় কেউই চেনে না, তবে কষ্ট করে যখন এসেছি তখন চায়ের সময় কষে খেয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়বো, কিন্তু হাততালি থামলে দেখলাম দুতিনজন লোক আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। তাঁদের চিনতে পারলাম, একজন মিস গারট্রুড ব্রেইটন সি-বি-ই, অন্যটি এক ক্যানেডিয়ান ডাক্তার ইংলন্ডে করোনেশন দেখতে এসে এখনো দেশে ফেরেন নি। পাশে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী। আর অন্যটি চায়নার বৃটিশ রাজদূতের পত্নী। এঁদের সঙ্গে আগেই বিভিন্ন পার্টিতে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মনে পড়লো শেষোক্ত মহিলাটির সঙ্গে জাপান সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে একদিন অনেক কথাই বলে ফেলেছিলুম, যেমন জাপানের জাতীয় ধর্ম ভারতবর্ষ থেকেই রপ্তানি হয়েছিল, হিন্দু-ধর্মই উচ্চারণ প্রভেদে জাপানে গিয়ে শিণ্টো-ধর্মে পরিণত হয়েছে, স্থান কাল পাত্রভেদে সামান্য প্রভেদ দেখা গেলেও মূলে ঐ দুইটি ধর্ম এক। কিছুদিন আগে জেনিভায় জাপানি রাজদূত মিঃ নিগাকির সঙ্গে ভারত-জাপান সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনার সময় ওই দুটি ধর্মের মিল যে কোথায় দেখিয়ে দিলে তিনিও বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হল আমার ঐ কজন বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে কারুর কাছ থেকে মিসেস চেম্বারলেন হয়তো আমার বিষয় শুনেছিলেন কিছু আর তাই সেদিন প্রধানমন্ত্রী আবাসে নিমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিসেস চেম্বার-লেন ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীট যা নাকি সার রবার্ট ওয়ালপোলের সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রীদের সরকারী বাসায় পরিণত হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের শোনালেন। তার পর সকলকে সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে দেখালেন সমস্ত বাড়িটা। বসবার ঘরে টার্নার অঙ্কিত একটি দৃশ্যপট আমার অত্যন্ত ভালো লেগে-ছিল। তার পর চা খাওয়ার পালা। ক্যানেডিয়ান ডাক্তারটি আমার ও তাঁর স্ত্রীর জন্য বুফে টেবিল থেকে নানারকম খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতে লাগলেন। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে করতে তাঁর স্ত্রী আমাকে জানালেন দেশে ফেরার আগে আমার কাজের কিছু নিদর্শন না দেখে তাঁরা ছাড়বেন না, তাই আমার ষ্টুডিওয় একদিন তাঁদের আসতে অনুরোধ করতে হল। অন্য একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁরা একটু সরে গেলে মাথায় সাদা কাপড়ের এক বিচিত্র টুপি পরা যে মেয়েটি টেবিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে সকলকে চা পরিবেশন করছিল, সে এবার আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে উঠলো, মিষ্টার টেগোর, শুধু সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বল্লে কি পেট ভরে, খাবার দিকেও একটু নজর দিতে হয়! কেকটেকগুলো সব যে ফুরিয়ে এলো। এক পরিচারিকার পক্ষে কোন নিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে কোন রকম রসিকতা করাটা অত্যন্ত স্পর্ধার কথা, কিন্তু এই নতুন পরিবেশে প্রথমে না বুঝলেও কণ্ঠস্বর শুনে এবার তাকে চিনতে পারলাম। সোহোতে এক বন্ধুর বাসায় মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যেতুম সেইখানেই বেসমেণ্টের একটা ঘরে ও থাকতো। ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, পড়াশুনো করেছে প্রচুর। অবস্থার পরিবর্তনে আজ হয়তো তাকে পরিচারিকা হতে হয়েছে এখানে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাস করলাম, তুমি এখানে কি করে এলে? মেয়েটি বল্লে, সে অনেক কথা, অন্য কোথায় দেখা হলে বলবো। পলের বাড়িতে তার সঙ্গে একদিন দেখা করতে রাজি হয়ে ও যে আমার সঙ্গে কথা বলছিল এটা কেউ লক্ষ্য করার আগে সেখান থেকে সরে এলাম। মিস ব্রেইটনের সঙ্গে চোখাচোখি হলে একগাল হেসে তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নরওয়ের দূতা-বাসের একটি পদস্থ লোক ও তার অপূর্ব সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা আশা করি ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে এঁর নাম আরো অনেক গৌরব অর্জন করবে। আমার বয়স তখন বছর কুড়ি। এর আগেই বাংলা ভাষায় কয়েকটা বই ফেলেছিলাম লিখে। লণ্ডনের একটি সোসাইটির অনুরোধে বাংলার ভূতপূর্ব গভর্ণর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনের সভাপতিত্বে বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে একবার এক বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। বক্তৃতার সময় বেশ নার্ভাস হয়ে গেছিলাম, তবু টাইমস পত্রিকায় সে সম্বন্ধে দেখি এক লম্বা রিপোর্ট বেরিয়েছে। আর আমার শিল্পচর্চার উল্লেখ করে ওখানকার বিভিন্ন খবরের কাগজে দু একবার কিছু খবরও বেরিয়েছিল এ কথা সত্যি, তবু ব্যাপক-ভাবে সুযশ অর্জন করতে হলে যেমন খ্যাতিমান হতে হয় তা যে আমি নই এ কথা জানতাম, তাই ভয় ছিল ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে হয়তো তাঁদের বিশেষভাবে নিরাশ হতে হবে। মনে পড়ে রয়েল সোসাইটি অফ আর্টের এক মিটিংএ সার ফিরোজ খাঁ নুনের সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি এখন কোথায় আছেন?" বললাম, "রয়েল কলেজ অফ আর্টে।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ওখানে ছাত্র না শিক্ষক"? তাঁর গাম্ভীর্য দেখে ঠাট্টা বলে মনে হয় নি, তাই বলেছিলাম 'ছাত্র'। আর একবার এক হাউস পার্টিতে বন্ধু ফ্রেডারিক রিফটার পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড হেইলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইংলণ্ডে আপনি কি শিখতে এসেছেন? কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তখন-কার ভারত সচিবের উপদেষ্টা সর্দার বাহাদুর মোহন সিং, জবাবটি আমার বদলে তিনিই দিলেন, "ঠাকুর বংশের ছেলেরা যেখানে যায় শিক্ষা দিতেই যায়, শিখতে নয়।" খুব অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি যে কোন বংশের ছেলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যাস আমার কখনই ছিল না। তা ছাড়া কোন কাজের মতন কাজ আমার কাছে কেউ কোন দিন শিখেছে অথবা শিখবে কি না জানি না; তবে এইটুকুন জানি যে, পৃথিবীর এই বিরাট পাঠশালায় আজো কেবল শিক্ষা পেয়েই চলেছি এবং সব শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই হয়ত অকস্মাৎ যেতে হবে প্যাস আউট করে। বছর কয়েক পরে পাতিয়ালা ষ্টেটে শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে দেখি সর্দার বাহাদুর মোহন সিং সেখানকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমরা দুজনেই হেসেছিলাম লণ্ডনের ঐ ঘটনাটি স্মরণ করে। ছটা বাজতে দেরি নেই দেখে অন্যান্য অতিথিদের মতন মিসেস চেম্বার-লেনের সঙ্গে আর একবার করমর্দন করে প্রধানমন্ত্রী আবাস থেকে সেদিন বিদায় নিলাম। ওখানে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁদের মধ্যে বহু লোক নিজেদের মোটরে করে আমায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইলেন, কিন্তু শেষে আমার ক্যানেডিয়ান ডাক্তার বন্ধুটির বিশেষ অনুরোধে তাঁর মোটরেই উঠে বসলাম।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে নেভিল চেম্বারলেনের মতন শান্তিপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীও মহাযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। ঐ বছরেই কয়েক মাস আগে রয়েল কলেজ অব আর্টের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিপ্লোমাটা পেয়ে গেছলাম। রাজবংশীয় সুন্দরী ডাচেস্ অফ গ্লসটার বিতরণ করেছিলেন ডিপ্লোমো-গুলো। ফিরে যাওয়ার জন্য দেশ থেকে যে টাকা এসেছিল লণ্ডনে ধার শোধ করতে সেটা সমস্ত শেষ হয়ে যায় বলে দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। কাউণ্টি কাউন্সিলের অ্যাম্বুলেন্স বিভাগে লোক নেয়া হচ্ছে শুনে পাঠিয়েছিলাম এক দরখাস্ত। সঙ্গে ছিল একটি ইণ্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, তাই যুদ্ধ লাগার হপ্তা দুএকের মধ্যেই বহাল হয়ে গেলাম অ্যাম্বুলেন্স চালকের পদে। নানা দেশের লোকের মধ্যে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তারই মধ্যে একটি লর্ড বংশীয়া মেয়েকে বেণ্টলি চালিয়ে এসে ওভার-অল পরে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলোর চাকা ধুতে দেখেছিলাম। আর এক বিখ্যাত নাইটের স্ত্রী ক্যানটিনের ভার নিয়ে রান্না করা থেকে বাসন মাজা অবধি সবকাজ নিজেই করছেন দেখে শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারলাম না। মিঃ গ্রাণ্ট ক্রফটন কাউণ্টি কাউন্সিলের বিভাগীয় কর্তা একদিন ইন্সপেকট করতে এসে আমায় দেখে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, যদি আর্মিতে যোগ দিতে রাজি থাকি তো তিনি চেষ্টা করে একটা কমিশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তখনও ভারতীয়দের কমিশনড্ অফি-সার পদে নেয়া হয়নি। অ্যাম্বুলেন্স চালানো হচ্ছে মানুষ সেবার কাজ, কিন্তু আর্মিতে যোগ দিলে লিপ্ত হতে হবে ধ্বংসের কাজে। তাছাড়া ভাবলাম সারা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে দুচারটি দর্পিত জাতির মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তার মধ্যে পরাধীন ভারতের লোক আমি, কি দরকার আমার কোন অংশ নিয়ে। তাই রাজি হয়নি তখন তাঁর সাহায্য নিয়ে আর্মিতে যোগ দিতে। তারপর বিমান আক্রমণে আঘাতপ্রাপ্তদের কিছু সেবার চেষ্টা করে বছর-খানেক বাদে আমার মাতুলের অনুরোধে এবং ভারতীয় হাই-কমিশনার দপ্তরের মিঃ পি কে দত্ত যিনি বহুকাল ধরে ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্যকল্পে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় অবশেষে দেশে ফেরা সম্ভব হল। অ্যাম্বুলেন্স ষ্টেশন পরিত্যাগ করার সময় লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল আমায় যে ধন্যবাদ-পত্র দিয়েছিলেন অন্যান্য বহু পুরোনো চিঠির সঙ্গে আজো সেটা পড়ে আছে আমার বাক্সের মধ্যে।

দাদুর বৃহস্পতি

রান্নাঘরে উমা তার মাকে সাহায্য করছিল, আর রান্নার ফাঁকে ফাঁকে তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন সেটা লক্ষ্য করছিল। অন্দরে মশ-মশ জুতোর শব্দ কানে আসতে তিনি মেয়েকে ইশারা করলেন মাথায় শাড়ির আঁচলটা তুলে দিতে—নিজের দুটো হাতই জোড়া। পরক্ষণে উমার বাবা এলেন আর এসেই কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ালেন।—এই নাও তোমার মেয়ের ঠিকুজি-কুষ্ঠি আর মাথা মুণ্ডু।

ঘরের কোণে মেয়ে দাঁড়িয়ে খেয়াল করলেন না। তাঁর সাড়া পেয়ে ওপর থেকে উমার দাদু দোতলায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, কি হল রে, ওরা নকল নিয়েছে?

এদিক থেকে জবাব গেল, না, তারাই মিলিয়ে দেখেছে—।

—মিলল না বুঝি?

—হ্যাঁ, মিলবে। মিললে আর নাকের জলে চোখের জলে এক করবে কি করে। মেয়ে নয় তো একখানি যেন মাকাল ফল—একটা কিছু যদি ভালো থাকত।

মা অস্ফুট বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, মেলেনি তো মেলেনি, চেঁচামেচি করছ কেন, ওর কুষ্ঠি অমন তা ও কি করবে?

ফলে ধৈর্যবিচ্যুতি ঘটল আরো।—না, ও কি করবে, যত করব আমি! তখনি বললাম, দিয়ে কাজ নেই, তারাই যা হোক খবর দিয়ে যাবেখন, না, আশায় আশায় একেবারে অস্থির—এক্ষুণি রোদে তেতে পুড়ে ছোটো—সপ্তমে বৃহস্পতিটা আছে, বরাতে লাগলে লাগতেও পারে—নাও, বৃহস্পতি ধুয়ে ধুয়ে জল খাও এখন।

বাবার গা ঘেঁষেই উমা দুম-দুম করে পা ফেলে একেবারে দোতলায় গিয়ে উঠল। রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে প্রায় হেসে ফেললেন।

দোতলায় দাদু পথ আটকালেন। হাত বাড়িয়ে তিনি নাতনিকে ধরতে গেলেন, আ-হা-হা, বিরহিণী উমা গো।

মিললে আর নাকের জলে চোখের জলে এক করবে কি করে!

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে এবং যতটা পারে মুখ বিকৃত করে জিভ ভেঙচে উমা নিজের ঘরে এসে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। পাশে মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।—যত নষ্টের গোড়া ওই দাঁতপড়া বুড়ো, ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলাবে না কপাল-কুষ্ঠি মেলাবে!

উমার রাগ বা দুঃখ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। বিয়ে হচ্ছে না বলেও, আর, হামেশা এরকম কথা শুনতে হয় বলেও। তার চেহারা ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, গায়ের রঙ ফরসা। দেখতে এলে কেউ অপছন্দ করে না—কিন্তু দাদুর ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলানো চাই—পেঁয়ো কলেজে সংস্কৃতের মাস্টারী করে করে এই হয়েছে। আর, তার কুষ্ঠিটাও এমন যে, কোনোদিন কোনো ছেলের সঙ্গে মিলবে বলে মনে হয় না। যত সব প্রতিকূল গ্রহ-নক্ষত্র যেন একসঙ্গে জোট বেঁধে এসেছিল তারই বেলায়। দাদু ঠাট্টা করেন, এমন বস্তু যে সে না নিয়ে নয় এই জন্যেই এরকম কুষ্ঠি তোর, তড়-নড় করে খুঁজে পেতে তবে একজনকে বার করতে হবে। কখনো বা বলেন, আর কিছু না থাক, সপ্তমে বৃহস্পতি তো আছেন, উনি একাই একশ হয়ে জায়গা মত তোকে পৌঁছে দেবেনখন দেখিস।—বৃহস্পতির নিকুচি করেছে। একে একে চেনাশুনো সবগুলো

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, কি-ই বা ছিরি সব চেহারার! বিয়ে করে গরবিণীরা এক একজন আনন্দে যেন একেবারে উপচে উঠেছেন—।

আজ নয়, দু'বছর ধরেই এই কুষ্ঠি মেলানোর ধকাধকি চলেছে। দাদুটি এখন

মফঃস্বলে বসেই কলকাঠি ঘোরাচ্ছিলেন। এখান থেকে ছেলেগুলোর রাশি-চক্রের নকল পাঠানো হত আর সেখানে বসে উনি সবগুলো নাকচ করে পাঠাতেন। অথচ, ষোল বছর বয়েস হতে না হতে নাতনির বিয়ের জন্যে চিঠি লিখে লিখে ছেলেকে একেবারে অস্থির করে তুলেছিলেন। ওর বয়েস তো এখন আঠারো ছাড়িয়ে উনিশে গড়ালো। রাগের মাথায় ভুলে গেল সবটাই দাদুর দোষ নয়। অনেক পাত্রপক্ষও মেয়ের কুষ্টি দেখে পত্রপাঠ জবাব দিয়ে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু সত্যিই উমার অনেকদিন ধরেই মেজাজ বিগড়েছে। মা বাবা বলেন, মেয়েটার আর বিয়ে হল না, দিদিরা ঠাট্টা করে—উমি, বাংলাদেশে তোর বর নেই, তুই রাঙামুখো সাহেব বিয়ে কর, দাদারা বিরক্ত হয়ে বলে, কি যে তোমরা মাথামুন্ডু কুষ্টি দেখে বেড়াও, এমনিতেই বিয়ে দিয়ে দাও, ওসব দেখতে হবে না।—একে নিজের জ্বালা, তারওপর এরকম শুনে শুনে কাহাতক মেজাজ থাকে!

উমা ভাবছে।......বাবা আবার মেজাজ দেখায়। তার জন্যেই তো, নইলে কবে এতদিনে ওর বিয়ে হয়ে যেত। আর, অমন কেলেঙ্কারী কান্ডও হত না। তখন দাদু এখানে নেই, একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। দাদুকে যা হোক করে জোড়াতাপ্পি দিয়ে বোঝানো যাবে ভেবে ঘটকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে বাবা বেশ ভালো ভালো গ্রহ-নক্ষত্র বসিয়ে একটা মনগড়া রাশিচক্র করে মেয়ের কুষ্টির নকল বলে পাত্রপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলে। তারপর কি কান্ড, কি কান্ড! সে কুষ্টিও মিলল না, ছেলের কুষ্টি এনে দেখা গেল, সেটিও প্রতিকূল গ্রহ-নক্ষত্রে ভরা এমন যে, ওর আসল কুষ্টির সঙ্গে ঠিক মিলত। অত শিক্ষা হয়েও কুষ্টি মেলানোর বাতিক গেল না। এখন তো দাদু এসেছে, শুধু তাই নয়, একেবারে নারায়ণ বিগ্রহ নিয়ে এসেছে সঙ্গে—এখন পায়ে পায়ে কুষ্টি আর পাঁজি ছাড়া একেবারে নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু।

কিন্তু একটা বিচিত্র যোগাযোগ ঘটে গেল। উমা আজকাল কলেজ যাবার সময় রোজই লক্ষ্য করত, দু'তিন বাড়ি পরের একটা বড় বাড়ির দরজায় একটি ছেলে যেন বেশ সেজে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে তাদের বাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে ছেলেটি পিছন পিছন একেবারে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এসে ট্রামে বা বাস্-এ ওঠে। একদিন দু'দিন নয়, আজ প্রায় মাসাবধি এই দেখছে। এরকম চোরা-দেখা বা চোরা-প্রতীক্ষা উমা এরই মধ্যে কলেজে অনেক দেখেছে, কাজেই ঠিক বুঝতে পারে। রাগে এক একদিন তার গা জ্বলে যেত, যত সব হ্যাংলা ছেলে—যেন কোনোদিন মেয়ে দেখেনি! হঠাৎ শুনল, সেই বাড়ি থেকেই কারা তাকে দেখতে আসছেন। কুষ্টি মেলানো-টেলানো নয়, একেবারে দেখা! ঘটকের মুখে শোনা কথাটা উমারও কানে এলো আস্তে আস্তে। ছেলে নাকি নিজেই ওকে দেখে বিয়ে করবে বলে বাড়িতে প্রস্তাব করেছে, তাই তার বাবা মা আত্মীয় পরিজনেরা যতশীঘ্র মেয়েটিকে একবার দেখতে চান। উমার বাবা মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।......এমন লোভনীয় প্রস্তাব নিজেদের বাড়ি, এম-এস-সি পাশ ছেলে, [illegible] চাকরী করে, কোনো দাবী-দাওয়া নেই—কিন্তু সেই বরাত কি হবে তাদের।

ছেলের রাশিচক্র চেয়ে পাঠানো হল। কিন্তু পাত্রপক্ষ জানালেন, ওসব কুষ্টি-ফুষ্টির ওপর তাঁদের আস্থা নেই, সে সব পরে হবে, আগে মেয়েটিকে সত্বর একবার দেখানো হোক।

শুনে উমার একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম। ও মা, সেই ছেলেটা! এম-এস-সি পাশ আবার চাকরীও করে!.....সেই জন্যেই উমা বেরুতে একটু দেরী করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করত। কিন্তু কোন্ মুখে বাপ-মাকে সরাসরি গিয়ে বলল, বিয়ে করবে!

উমার বাবা মেয়ে দেখাতে রাজি হলেন। দাদু অবশ্য আগে কুষ্টিটা মিলিয়ে দেখে নিতে বলেছিলেন। তার বাবা জবাব দিয়েছেন, দেখানেই তো আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না, একবার দেখতে চাইছে দেখে যাক—।

পরদিন সকালেই উমাকে দেখে গেলেন তাঁরা। বেশ পছন্দও হয়েছে বোঝা গেল। ছেলের কুষ্টির ছক রেখে তাঁরা তাড়া দিয়ে গেলেন যেন তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হয়।

উমার বাবা তাড়াতাড়ি ছকটা পকেটস্থ করলেন। এমন একটা সুযোগ কিছুতেই যেতে দেবেন না তিনি। স্ত্রীকে ডেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছকটা দেখালেন। সেই একই ফেরো। মেলে না। মিলবে না তিনি জানতেন। এত বছর ধরে দেখে দেখে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে কাগজ-পেন্সিল এনে তাড়াতাড়ি আর একটা ছক কেটে সুবিধে মত ছেলের গ্রহ-নক্ষত্র সব ওলট-পালট করে দিলেন। অনুমানে বুঝলেন, এবারে ঠিক মিলবে। তারপর মেয়ের দাদুর কাছে সেটা পেশ করে দিলেন। বললেন, দেখুন, যদি ওর

(ইহার পর ১২৬ পাতায়)

অতীন্দ্রিয়

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

হেরাক্লিডাস্ চিন্তামগ্ন ছিলেন। মণিকে দেখিয়া তিনি চিত্রকরকে অনুজ্ঞা দিয়া বিশেষরূপে অঙ্কিত কয়েকটি বৃত্ত পরপর কুট্টিমের উপরে সাজাইলেন। মনঃসমীক্ষণের এক নূতনতম পরীক্ষা সুরু করিয়াছেন বর্তমানে।

ঃ মণি! এই কৃষ্ণ পরিধির প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকো তো!

অবাধ্য মণি দুরন্তবেগে শিরঃসঞ্চালন করিল।

ঃ মণি লক্ষ্মী! ইহাতে তোমার উপকারই হইবে, মনঃসংযোগ হইবে, স্মৃতিপথে সহায়তা করিবে।

কিন্তু মণি কিছুতেই পারে না। সহস্রবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হেরাক্লিডাস্ নিরাশমনে করোণিদ্বয়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নতমস্তকে বসিয়া পড়িলেন।

ঃ হেরাক্লিডাস্!

তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় হেরাক্লিডাস্ গ্রীবা উন্নত করিলেন। কাহার কণ্ঠস্বর?

ঃ হেরাক্লিডাস্ তোমার সাধনায় প্রকৃত উন্মাদিনীর প্রকৃতিস্থ হওয়ার কথা। কিন্তু যে জাগিয়া নিদ্রাকর্ষণের ভান করে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা কঠিন। আমি প্রকৃত উন্মাদিনী নই হেরাক্লিডাস্।

ঃ নও?? প্রচণ্ড বিস্ময়ের আঘাতে হেরাক্লিডাসের মস্তকাভ্যন্তরস্থ সমস্ত স্নায়ু, উপস্নায়ু আলোড়িত হইয়া গেল।

ঃ না। আমি মণিকর্ণিকা—পাটলিপুত্র নিবাসী সামন্ত রাজবধূ। বিগত কোশল যুদ্ধে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আমার স্বামী সহসা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন—উন্মাদিনী আমি নহি। তক্ষশিলার এই উন্মাদাগার সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্মাদাগার। এ স্থানেই গত বৎসর আমার স্বামীকে প্রেরণ করি। স্বামীর একান্ততমা প্রিয়া আমি—আমার বিচ্ছেদে স্বামীর রোগ প্রবলতর হইয়া উঠে। তিনি কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ভিষগাচার্য নির্দেশ দেন ইহার একমাত্র প্রতিষেধক উন্মাদাগারে আমার নিজের উন্মাদিনীরূপে অবস্থিতি। তাঁহার বিধান অনুযায়ী আমি মাত্র পঞ্চ মাস পূর্বে তক্ষশিলায় আসিয়াছি।

ঃ তবে? হেরাক্লিডাসের সুনীল নয়নতারকাযুগল বোধ হইল বিস্ফারিত হইতে হইতে ক্রমশঃ ফাটিয়া যাইবে।

ঃ আমার প্রতি তোমার আকর্ষণে ভীতা হইয়া অসহায়া নারী আমি আত্মরক্ষার্থে এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, পরিচয় গোপন করিয়াছিলাম। তোমার প্রতি তারতবাসীরাও অসন্তুষ্ট তাই সকলে আমাকে সাগ্রহ সাহায্যদান করিয়াছিলেন। কর্দম অনুলেপনে আমি আমার রূপ ঢাকিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ধারণা ভ্রান্ত হেরাক্লিডাস্ তোমার আকর্ষণ শুধুমাত্র রূপজ মোহ নহে, তাহার বহু ঊর্ধ্বে অপার্থিব প্রেম। তোমার চারিত্রিক আমূল পরিবর্তনে আজ আমি সর্বাপেক্ষা সুখী হেরাক্লিডাস্।

আমার স্বামী এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। আমাকে অবাধ উন্মাদ হইয়া সাইতে দেখিয়া এবং আমার প্রতি তোমার আনুরক্তির প্রতি[illegible] ক্রিয়ায় সর্বোপরি ভিষক ও [illegible] অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্প্রতি তিনি আরোগ্য [illegible] করিয়াছেন—আজ আমাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন দিবস। অধিকর্তা তোমার অগোচরে রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমাদের পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সত্তাকে আজ চিনিতে পারিয়াছি। হেরাক্লিডাস্ আমার বিদেশী সুহৃৎ, আজ শুভদিনে স্নানমুক্তিতে আমাকে বিদায় দাও, আশীর্বাদ কর যেন অবশিষ্ট জীবন সুস্থ স্বামী লইয়া আমি সুখে কাটাইতে পারি।

অভিভূত হেরাক্লিডাস্ মণিকর্ণিকার প্রতি দীর্ঘায়ত নেত্রে নিজের বাঁধাভুর দৃষ্টি মিলাইলেন। সে দুটি চক্ষে আজ আর উগ্র বিদ্রূপ, অস্বাভাবিক দৃষ্টি নাই—স্নেহক্ষরা দৃষ্টি মৈত্রী ও কোমলতার মাধুর্যধারা সৃষ্টি করিয়াছে যেন।

অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল হেরাক্লিডাসের—অস্ফুটস্বরে যেন প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে বলিলেনঃ বিদেশিনী বান্ধবী, সাধ্বী নারী তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে, আমাকে মনে রাখিও দয়া করিয়া—

থর থর কম্পিত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা যজ্ঞভস্ম লেপনে মণিকর্ণিকার [illegible] অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুরাঙ্কিম ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিলেন হেরাক্লিডাস্, তাহার পর উগ্র উত্তেজনার আবেগে তাঁহার মূর্চ্ছাতুর দেহ কক্ষের কর্কশ কুট্টিমে এলায়িত হইয়া পড়িল।

অচ্ছোদ-পটল

রাণু ভৌমিক

মিছে ডাকিয়ে অনেক বেলায় দেবুর ঘুম ভাঙলো না আবিষ্কার করা হয়েছিল তাই।

নিদ্রা নয় মহানিদ্রা। কারণ, নিদ্রার আধার মহাশয়কে ও স্পর্শ করেনি মোটেই। খাটের পাশেই মাটিতে কেমন যেন জড়ের মত পড়ে আছে, চিরতরে ঘুমে।

ওর গায়ে হাত না দিয়ে, ওর কাছে না গিয়ে কি করে বুঝলো সবাই সে কথা? বুঝলো নয়, অনুভব করলো। বুদ্ধি দিয়ে যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, অনুভূতির কাছে অনেক সময় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রমাণও পাওয়া গেল। পাশেই খামবিহীন একখানি চিঠি।

অপর রাজ্যে যাবার সময় যথারীতি এ রাজ্যের নিয়মগুলি পালন করে গেছে সে। পরে তার অনুপস্থিতিতে কেউ কোন অসুবিধায় পড়ে, তাই বুঝি বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়।'

এ তো সাধারণ কথা। কি প্রয়োজন ছিল একথা ঘটা করে লিখবার? প্রাণকে লাভ করতেই যা অপরের প্রতি নির্ভর করতে হয়, তারপর তাকে রক্ষা করা বা বিনাশ করা সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর নির্ভর করে। এমন কি কেউ যদি নিহতও হয় তবেও আমার মনে হয়, অধিকাংশ স্থলে সেই মৃত ব্যক্তির চরিত্র খুঁজলেই কারণ পাওয়া যাবে। নইলে, দুনিয়ায় এত লোক পাশাপাশি আসছে, যাচ্ছে, খাচ্ছে, থাকছে—শুধু শুধু হঠাৎ একজন আর একজনকে মারতে যাবে কেন?

তবুও, এসব লিখতে হয়। অসময়ে মৃত্যুরাজকে আহ্বানের অনুষ্ঠান এগুলি। নইলে, মৃতের আত্মীয়স্বজনের হয় নানা মুস্কিল।

তাতেও রেহাই কম না কি? পুলিশ এলো—প্রশ্নবাণ চালালো। ওকে সরাতেই দেখা গেল একখানা ছোরা বুকে বেঁধানো। সন্দেহ হয় এটি হত্যা না আত্মহত্যা। কিন্তু কেন? অল্প বয়স, লেখাপড়ায় ভাল, সচ্ছল অবস্থার ছেলে দেবু।

সচ্ছল তো নিশ্চয়ই, বরং ধনীই বলা যায় ওদের। দেবুর বাবা বিমলেন্দু হাইকোর্টের মস্ত-বড় এ্যাডভোকেট। নিজেদের দুটো বাড়ী কলকাতার উপর। শুধু ধনী নয়, খুব সুখী পরিবারও বটে। বিমলেন্দুর ঐ একমাত্র ছেলে দেবু আর এক মেয়ে কমলা। অতি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে কমলা। এই পরিবারের মত এত আনন্দময় সংসার আমার পরিচিতদের মধ্যে আর ছিল না। সেখানে এ কি বিপদ?

মৃতদেহ সরানোর পর একটা সাদা খাম বের হলো। উপরে কারও নামধাম লেখা নেই। কাজেই পুলিশই খুললো সেটা। বৈতরণীর পারের পারানী তো তারই।

ছোট চিঠি—'কোন দৈহিক, মানসিক বা নৈতিক কারণে আজ আমি মরণকে ত্বরান্বিত করছি না। অর্থঘটিত বা প্রেমঘটিত ব্যাপারও কিছু নেই। শুধু এই চোখ দুটোর জন্য। ওদের আর আমি সইতে পারছি না। কি করবো জানি না। কিন্তু, কিছু একটা করতেই হবে। আমাকে সে কোথায় নিয়ে চলেছে?......ওঃ ভগবান! আমার এ কি হলো?'

বলা বাহুল্য, এ চিঠিতে কোন লাভ হলো না। না পুলিশের তদন্তের, না আত্মীয়স্বজনের শোক-সান্ত্বনার। কেউ বুঝতেই পারলো না ও চিঠির অর্থ।

(২)

ওর পড়ার ঘরে চুপ করে বসে ছিলাম। দেবুর মৃত্যুর শোক ছাপিয়ে বারবারই মনে হচ্ছিল চিঠিটার কথা। ভাবছিলাম—যে চোখের জন্য ও নিজেকে শেষ করেছিল সে চোখও তো ওর নিজের নয়। কিংবা হয় তো নিজের নয় বলেই। কিন্তু......তাই বা কেন?

চমকে উঠছেন শুনে, না? তাহলে খুলেই বলি। ছোটবেলা থেকেই দেবুর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। ওর যখন ষোল-সতের বছর বয়স তখন ও প্রায় অন্ধ হয়ে যায়।

সবাই জানেন বোধ হয় যে, চোখের মণির উপর একটা পাতলা পর্দা আছে, যার নাম কর্ণিয়া। বাংলায় যার নাম হয়েছে অচ্ছোদ পটল। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের পথ এই।

ছেলে অন্ধ হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে ওর বাবা-মা যেন পাগল হয়ে গেলেন। কত আদরের ছেলে, কত আশা-ভরসা ওর উপর। এমন কোন চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন না কলকাতায় যিনি দেবুকে দেখেননি।

ভাগ্যক্রমে তখন বিদেশ থেকে একজন চক্ষু চিকিৎসক সার্জন এসেছিলেন। অনেক গলি ঘুঁজি পার হয়ে তবে তাঁকে ধরা গেল।

তিনি ভার নিলেন। আর কোন উপায় নেই। একমাত্র কাজ যা করা যায় তা হচ্ছে অপরের সুস্থ কর্ণিয়া এনে অসুস্থ কর্ণিয়ার স্থানে বসিয়ে দেওয়া। দেবুর বাবা-মা [illegible]

অবাক। এ রকম কথা কখনও শোনেননি তাঁরা। এ খবর অনেকেই হয়তো জানেন না, যদিচ বিলেতে এরকম অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই কর্ণিয়া। পাওয়া মুস্কিল সত্য, কিন্তু যেখানে টাকার অভাব নেই সেখানে কিছুরই অভাব ঘটে না। যথাসময়ে সংগ্রহ হলো অচ্ছোদ পটল।

এদিক-ওদিক তাকাতে একটা ডায়েরী চোখে পড়লো। ও কি ডায়েরী লিখতো না কি? অনামনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে চোখটা আটকে গেল। লাল কালিতে দাগ দেওয়া একটা তারিখ। মনে পড়লো, এই তারিখেই ওর চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছিল বটে। তবে, সে পাতায় কিছু লেখা নাই।

লেখা আছে অনেক পরে। তাকে ডায়েরী বলা যায় না, বরঞ্চ এক ধরণের স্বীকার নিজের বিবেকের কাছে। যে আবেগের প্রতিক্রিয়া তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে সেই আবেগই যেন লিখিয়েছে এই কনফেশন। ভাঙা ভাঙা লাইনে, উত্তেজনার মুখে লেখা—

এ নরম নধর ওর দেহ!
মুঠিতে ঝিক্ ঝিক্ করে উঠলো ছোরা।

......নিষ্কৃতি? ...চোখ মেলে মনে উদগ্র হত্যা বাসনা নিয়ে কখনও বিছানায় ছটফট করেছ? মুহূর্তের পর মুহূর্ত জর্জরিত হয়েছ সে বিষে? সাপের বিষ—সে তো ভালো। সে শুধু দেহকে অবশ করে। কিন্তু এ বিষের জ্বালা যে অন্তহীন, বিরামহীন। শুধু মনের জ্বালা, শুধু মনের যন্ত্রণা। আজ এক মাস হলো এই যন্ত্রণা আমি সইছি। যুদ্ধ করে আজ আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।

কেন এমন হলো? কি হলো আমার? কে আমি? আর কেন্দ্রচ্যুত আত্মা আমার কোন্ বিসর্পিল পথে নামতে নামতে আজ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত শক-খেয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে।

মুহূর্তের জন্য? আমি জানি, এই ভাব সাময়িক। আবার একটু পরেই জয় হবে সেই অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তির। ওর সাথে যুদ্ধ করে করে আজ আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। আঁধার রাতের কুয়াসার মত ও আমাকে ঢেকে ফেলেছে। কোথাও কোনদিকে বিন্দুমাত্র আলোর রেখা নেই। নিয়তির চেয়ে দুর্বার, হত্যার চেয়ে নিষ্ঠুর ওর আকর্ষণ।

কে সে? কোন্ সে হিংস্র পশু যার নখ-ঘাতে দেহমন জর্জরিত। কোন্ রন্ধ্রপথে এই শনি ঢুকছে আমার শরীরে। তাকে জানি, তাকে চিনি, সে যে আমারি আঙ্গিক, আমারই চোখ!

যেদিন অস্ত্রোপচার শেষ হলো সার্জন হাসতে হাসতে বল্লেন:

"জান এ কার চোখ? বিখ্যাত এক বদ-মায়েসের চোখ এ দুটো। দেখো, তুমি যেন আবার তার দৃষ্টি দিয়ে দেখ না দুনিয়াকে।"

লোকটার নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম। মনে পড়ল তার কথা। হত্যা আর লুণ্ঠন ছিল তার ব্যবসা এবং সেই অপরাধেই প্রাণদণ্ড হয় তার। অনেক টাকা ওর পরিবারকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে কর্ণিয়া দুটো পাওয়া গিয়েছিল।

সাধারণ পরিহাস। আমি জানি, এমনি হয়তো কিছু না ভেবেই পরিহাস করেছিলেন সার্জন। তবু, ঐ কথা কটা যেন আমার মনে গেঁথে গেল। সব সময়ই শুধু ঐ কথা ভাবি। দিন-রাত কেমন একটা [illegible] অবস্থা। থেকে থেকে মনে হয় যেন আমি-ই সেই, আমি-ই সেই।

ক্রমে, আমার মনের পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আমি অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম। কি রকম একা একা লাগতো। মনে হতো আমার সঙ্গী কোথায় হারিয়ে গেছে। তাকে চাই-ই-চাই। শীতল কঠিন তার স্পর্শ অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে চাই। অর্থবিনিময়ে সংগ্রহ করলাম তাকে—একখানি ছোরা।

ওকে কাছে নিয়ে আমি শুই। প্রথম প্রথম তাতেই মন শান্ত থাকতো। কিন্তু পরে?—তাতেও শান্তি হয় না। ঘুম হয় না রাতে। যে চিন্তাধারা জেগে ওঠে আমার মনে তা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

আমি তখন অন্য এক জগতের অধিবাসী। কত নিরীহ পথচারীর রক্তধারা যেন এসে মেশে রক্তের মত লাল মদের সঙ্গে, মাতাল হয়ে ওঠে মন।

এ কি কল্পনা না সত্য? কল্পনা কি এত প্রখর, এত স্পষ্ট? আর কেন এই সব চিন্তা ক্রমে ক্রমে অভিভূত করছে আমাকে। এ কি আত্ম-সম্মোহন?— অটো-সাজেসশান? যাই হোক্ না কেন, আমি তার দাস, সে আমার প্রভু।

আজ আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। প্রতি রক্ত-কণিকা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। চোখ জ্বালা করছে, মাথার শিরাগুলি দপ দপ করছে, কণ্ঠতালু শুকনো। আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। হিংস্র নীল আলোয় বীভৎস হয়ে উঠেছে চোখ দুটো।

না, না, আর পারি না। ঠিক এই মুহূর্তের জন্য যেন আমি কি রকম [illegible] হয়ে গেছি। আর আমাকে আরও অস্থির করে তুলেছে আমারই বুকের মধ্যে বসে বসে ঐ শীতল পদার্থটি। লক-লকে তার জিভ। সেই জিভ মেলে বারবার আবেদন জানাতে চাইছে 'ময় ভুখা হুঁ'।

কোথায় পাব ওর ক্ষুধার তৃপ্তি, তৃষ্ণার পানীয়। কিন্তু, পেতে আমাকে হবেই হবে। কোথায় যাই? কি করি?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—দূরে [illegible] দরকার নেই। মন আমার আনন্দে নেচে উঠলো। কমলা! ও তো আমার পাশের ঘরেই থাকে।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে ওর ঘরে প্রবেশ করলাম। [illegible] নিদ্রায় [illegible] ও ঘুমোচ্ছে।

কি নরম, নধর ওর দেহ। [illegible] ঝিক্ ঝিক্ করে উঠলো ছোরা। [illegible] উঠলো। এখনই, এই [illegible] [illegible] [illegible] বুকের [illegible] হবে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর। [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] সমস্ত শরীরকে [illegible] কাঁপিয়ে [illegible] [illegible] জেগে উঠলো আমার [illegible]।

কি করতে যাচ্ছি আমি? ও যে আমার সহোদরা বোন। এ কি ভয়ঙ্কর [illegible] আমি কি পশু?

[illegible] ছোরা সরিয়ে নিলাম। [illegible]

ওদের বধ করবেই [illegible] [illegible] [illegible] নিজেই [illegible] [illegible] কিন্তু

কিন্তু..... ও আমার চেয়ে [illegible] [illegible] কে করে একে শেষ করবো?

পেয়েছি। হাঁ, পেয়েছি.....সহজ উপায়।

শুধু চোখ নয়, সমস্ত দেহ, [illegible] অন্তঃকরণ বিষাক্ত হয়ে গেছে।—আর আমার এই শীতল কঠিন সঙ্গীর বুভুক্ষা অতএব......

* * *

ডায়েরী ও জীবন এক সময়েই শেষ হয়েছে।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট জানা গেছে— আত্মহত্যা। শুধু যে সার্জন নতুন চোখ বসিয়েছিলেন, তাঁর হঠাৎ মনে পড়লো—নিজেরই উচ্চারিত একটি কথা—দেখো যেন তুমি আবার তার চোখে দেখ না—কলকের জন্য নিজেকে হয়তো অপরাধী মনে করছিলেন তিনি।

হ্ ভোজন

—চঞ্চল মিত্র

—মদন দ

সেতু

কি অদ্ভুত! মাত্র কুড়িদিন হইল পল্লবের বিবাহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে যার জন্য পল্লবকুমার নিরুদ্দেশ হইবে!

বিবাহ, ফুলশয্যা, আট দিন পরে অষ্ট-মঙ্গলা সবই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মাত্র তিন দিন হইল নববধূ রমা শ্বশুর বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। ইহার মধ্যে কি এমন ঘটিল, যাহাতে পল্লব সকালে নূতন জরিপাড় ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, গিলটির বোতাম পরিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবে বলিয়া যাত্রা করিল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না। যাইবার সময়ে শুধু মনিব্যাগে কিছু বেশী টাকা লইয়া বাহির হইয়াছিল। রমা মনে করিয়াছিল, হয়তো কিছু একটা কিনিবার জন্য বা কাহাকেও দিবার জন্যই। কিন্তু যাইবার সময়ে রমার সহিত কোন কথা হয় নাই। উভয়েরই উভয়ের প্রতি তীব্র টান জন্মিয়াছিল।

সমবয়সী, অসমবয়সী, নিকট আত্মীয়েরা রমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বেচারা রমা চোখ মুখ লাল করিয়া কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পায় না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বলে, আমি জানিনে কিছু। কাজ নেই আমার অমন গোঁসার বরে! গৃহিণীরা শুনিয়া হাসেন, কেহবা তিরস্কার করেন। কেহ বলেন, ওইটুকু বউ, অতশত কি বোঝে? না হয় একটু অবাধ্যই হয়েছে। তাই বলে একেবারে নিরুদ্দেশ! না বাপু, লেখাপড়া শিখে কি যে সব মতিগতি হচ্ছে—

পল্লবের বাড়ীতে এবং তাহার শ্বশুর বাড়ীতে তুমুল আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তোমরা ভেব না, দুদিন পরে রাগ পড়লে আপনি ফিরে আসবে। কিন্তু ইহাতে সকলে আশ্বস্ত হইতে পারেন না। কেহ রমাকে তিরস্কার করেন, কেহবা বলেন, অলক্ষণে বউ। মোটের উপর বিবাহের আনন্দোৎসবের পরেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে দুইটি পরিবারেই অশান্তির বায়ু প্রবলভাবে বহিতে পারে। সকল অনর্থের মূল রমা 'চোর' হইয়া মুখ বুজিয়া থাকে।

(২)

পল্লবকুমার নিতান্ত অন্যমনস্কভাবেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। অন্যমনস্ক-ভাবেই এলাহাবাদের একখানি টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিল। কোথায় যাইবে? তাহা সে জানে না। আপাততঃ কলিকাতা ত্যাগ করিবে। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে না করিবে তাহা স্থির করিবে।

ট্রেণ ছুটিয়াছে। পল্লব হাঁড়িমুখে এক পাশে বসিয়া আছে। ষ্টেশনে আসিবার পূর্বে পথে থামিয়া একটা ছোট সুটকেস এবং একখানা ধুতি, গামছা, রুমাল ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষ তাহাতে ভরিয়া আনিয়াছিল। এই সুটকেসটিতে একটু হেলান দিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। একটু পরেই লক্ষ্য করিল, গাড়ীর অপর এক কোণে একটি ছোট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী, একটি কন্যা এবং একটি পুত্র। কন্যাটির বয়স ষোল-সতের হইবে। মেয়েটি মাঝে মাঝে পল্লবের দিকে চাহিতেছে এবং মিটমিট করিয়া হাসিতেছে। এ আবার কি! মা বাবা সামনে রয়েছেন, একটু লজ্জা নেই! তা ছাড়া পল্লবের পোষাক দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায়, সে বিবাহিত এবং সদ্য বিবাহিত। তৎসত্ত্বেও এর মানে কি? যাহা হউক, তাহার অশান্ত মনের পক্ষে এই অপরিচিতা তরুণীর সকৌতুক দৃষ্টি খুব যে ক্ষতিকর তাহা মনে হইতেছিল না।

একটা বড় ষ্টেশনে ঐ পরিবারটি অনেক-গুলি খাবার কিনিলেন এবং ট্রেণ ছাড়িবার পর তাহা বণ্টন করিয়া খাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পল্লব একটু অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে দূরের ক্রম-অপসৃয়মান দৃশ্যাবলী দেখিতেছিল এমন সময় সহসা অনুভব করিল, কে যেন তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সেই মেয়েটি একখানি ছোট রেকাবীতে সিঙাড়া, কচুরী, পান্তুয়া প্রভৃতি খাবার লইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, এ খাবারগুলো মা আপনাকে দিতে বললেন, খান। একটু পরে আমি জল নিয়ে আসছি।

ব্যাপার কি! পল্লব কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া মেয়েটির হাত হইতে জলের গ্লাস লইয়া জল খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে কি?

মেয়েটি বলিল, কেন, জামাইবাবুকে একটু জল খেতে দেওয়া কি দোষের?

জামাইবাবু!

হ্যা, আপনি আমার পিসতুতো বোন রমাদির বর না?

হ্যাঁ। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

আমরা কমলাপুর যাব। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি? কোথাও না।

মানে?

এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

বিয়ের পরেই বেড়াতে বেরিয়েছেন, একা যে?

ও, এমনি।

পল্লবকুমারের বেশী কথা বলিবার ইচ্ছা নাই বুঝিয়া মেয়েটিও আর বেশী কথা না বলিয়া স্বস্থানে গিয়া বসিল।

কয়েক ষ্টেশন পরেই এই পরিবারটি নামিয়া গেলেন। নামিবার অব্যবহিত পূর্বে পল্লব উঠিয়া গিয়া ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিল। গুরুজন তো! মেয়েটিও হাসিয়া জামাই-বাবুকে নমস্কার করিল। উঁহারা নামিয়া গেলে পল্লবও একটু নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে বসিল। মনে ভাবিল, যদি এঁরা তাহার শ্বশুর বাড়ীতে চিঠি লেখেন। লিখবেনই। কোথায় যাইতেছে, তাহা তো সে বলে নাই।

(৩)

দুপুর রাত্রি। হু হু শব্দে ট্রেণ ছুটিয়াছে। গাড়ীতে বেশ ভীড় জমিয়াছে। যাত্রীরা সকলেই নিদ্রাকাতর। কেহ বসিয়া, কেহ একটু কাত হইয়া, কেহ একটু পা ছড়াইয়া, কেহ অপরিচিত সহযাত্রীর কাঁধে মাথা রাখিয়া, যিনি যেভাবে পারেন, একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

একটি বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। একটি

পরিবার জিনিষপত্রসহ হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। স্বামী, স্ত্রী, একটি যুবতী কন্যা ও একটি শিশু। সঙ্গে প্রায় কুড়ি একুশটা লগেজ। কেমন করিয়া যে তাঁহারা এই গাড়ীর মধ্যে স্থান করিয়া লইলেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাও বলিতে পারিবেন না। লগেজের স্তূপের অপর পার্শ্বে পল্লব কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া একটু নিদ্রার চেষ্টায় অবহিত হইল।

প্রাতঃকালে সকলেই একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। সদ্য বিবাহিত পল্লবের বেশ-ভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই এই নূতন পরিবারের মেয়ে উষা সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারিল না। পল্লব মনে করিল, আবার আর একটি শ্যালিকা নয় তো?

একটু বেলা হইতেই একটি বড় ষ্টেশনে এই পরিবারের ভদ্রলোক অর্থাৎ বিনয়বাবু একটি বড় কেটলিতে করিয়া প্রস্তুত চা লইয়া আসিলেন। তারপর পল্লবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, খাবেন একটু চা? আসুন না এদিকে একটু সরে। জামাইবাবু সম্ভাষণ না পাইয়া পল্লব একটু আশ্বস্ত হইয়া ইঁহাদের সহিত চা পানে এবং তৎসহ কিছু আহারাদিতে যোগদান করিল। সহযাত্রীর সহানুভূতি প্রত্যাখ্যান করিয়া কি লাভ?

বিনয়বাবু বলিলেন, কতদূর যাওয়া হচ্ছে?

আপাততঃ এলাহাবাদ পর্যন্ত।

তারপর?

এখনও ঠিক করিনি। তবে হরিদ্বারের দিকে যাব মনে করেছি।

উষা ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে। উষার মাতাঠাকুরাণী তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। বিনয়বাবু বলিলেন, এলাহাবাদে কোথায় উঠবেন?

তাও ঠিক করিনি। কোন একটা হোটেলে উঠব মনে করেছি।

দেখুন, আপনি বাঙালী। আমরা এতগুলি বাঙালী থাকতে আপনি দুদিনের জন্য হোটেলে উঠবেন, সে হয় না। আপনি চলুন, আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

পল্লব আপত্তি করিল না। দুই তিনদিন পরেই তো হরিদ্বার বা দ্বারকা চলিয়া যাইবে। সংসারই যখন ত্যাগ করিতেছে, তখন আর এই পরিবারটিকে ভয় করিবার কি কারণ আছে?

(৪)

পল্লব খায় দায় ঘুমায় এবং বাকি সময়টা মুখ গোমড়া করিয়া বসিয়া থাকে। বৈরাগ্যে যাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখে হাসি আসিবে কোথা হইতে?

বিনয়বাবু তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে না।

স্ত্রী বলিলেন, উষা বলছিল, উনি নিশ্চয় বাসরঘর থেকে পালিয়েছেন। কি জানি বাপু।

বিনয়বাবু পল্লবকুমারকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কলিকাতায় কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসিতেছেন। তার উত্তরে পল্লব উদাস-ভাবে বলিয়াছে, যা পেছনে ফেলে এসেছি, তা পিছনেই থাক।

বিনয়বাবু আর কি বলিবেন? অগত্যা চুপ করিয়াই থাকেন।

ধৈর্য — অমল সান্যাল
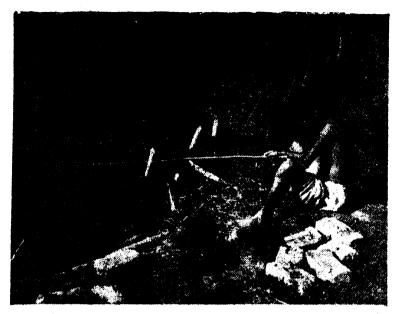
একদিন সকালে পল্লব বলিল, আমি হরিদ্বারে যাওয়া স্থির করেছি।

বিনয়বাবু বলিলেন, কবে?

আজ। দুপুরে যাব টিকিট করতে।

কিছুক্ষণ পরে একজন হকার একখানি সংবাদপত্র বারান্দায় ফেলিয়া গেল। উষা সেখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। এক পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। একটি নিরুদ্দিষ্ট যুবকের ছবি এবং তাহার বর্ণনা। অবিকল পল্লব। সে কাগজের ঐ পাতাটি লইয়া পিতাকে দেখাইল। পাতাটি পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখা হইল।

বিনয়বাবু অতি বিনীতসুরে পল্লবকে বলিলেন, দেখুন, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

বলুন, আমার অনুরোধ রাখবেন?

সম্ভব হলে নিশ্চয় রাখব। আপনারা আমাকে এত যত্ন করলেন।

দেখুন, পাঁজিতে দেখলুম আজ আর কাল দিন দুটো খুব খারাপ। আপনি পরশুর আগে এখান থেকে যেতে পারবেন না।

পল্লব একটু চিন্তা করিল এবং পরে বলিল, তা আপনারা যখন বলছেন, আর দুটো দিন থেকেই যাই।

'পরশু' আসিল। প্রাতে আহারাদির পর পল্লব ষ্টেশনে গিয়া হরিদ্বারের টিকিট কিনিয়া আনিয়া, জিনিষপত্র অর্থাৎ সুটকেসটি গুছাইয়া রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিতে গেল। বৈকালে ট্রেণ।

পল্লবের মনে হইল, একখানি টাঙ্গা আসিয়া এই বাড়ীতে থামিল। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, একটি যুবক এবং একটি অবগুন্ঠনবতী তরুণী টাঙ্গা হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে। পল্লবের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সে শুনিতে পাইল, বাড়ীর মধ্যে কি সব যেন আলোচনা হইতেছে। কথার শব্দ কানে যাইতেছে, কিন্তু অর্থ বোঝা যাইতেছে না।

যুবকটি বলিতেছে, আপনাদের টেলিগ্রাম পেয়েই আমি আমার বোনটিকে নিয়ে চলে এসেছি। এখন, ব্যবস্থা যা হয়, আপনারা করুন। আমার ভয় হচ্ছে, আবার একটা অনর্থ না হয়। কিছুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। তারপর সব নীরব।

পল্লবকুমার এই গাড়ী আসা এবং তারপর নানাপ্রকার গুঞ্জন একটু সন্দেহের সঙ্গেই দেখিতেছিল এবং শুনিতেছিল। তথাপি তাহার মনে এমন কোন সন্দেহ আসে নাই যে, তাহারই বধূ বা শ্যালক এখনই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তবু পল্লবকুমার মনে করিল, এখানে আর বিশ্রাম করিয়া কাজ নাই। বরং ষ্টেশনেই একটু বসিয়া থাকা যাইবে।

ইহাই স্থির করিয়া পল্লব বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। যাইবার সময়ে বিনয়বাবুকে ডাকিয়া বলিয়া যাইবে, না তাঁহার অজ্ঞাতসারেই চলিয়া যাইবে এই কথা চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে দরজাটা হঠাৎ খুলিয়া আবার বন্ধ হইয়া গেল এবং ঘরে প্রবেশ করিল রমা।

রমা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পল্লবের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আজ হরিদ্বার যাচ্ছ?

পরম বিস্মিত পল্লব সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

রমা ধীরে ধীরে বিছানার উপর পল্লবের পাশে গিয়া বসিল।

সেইদিনই বৈকালে রমা এবং পল্লব উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া হরিদ্বারের একখানি টিকিট ফেরত দিয়া তিনখানি কলিকাতার টিকিট কিনিয়া আনিল।

—১

জয়ী

আশাপূর্ণা দেবী

এখনকার কথা আলাদা। এখনকার মায়েরা ছেলে বিয়েয় নারাজ হলে কান্নাকাটি করা তো দূরের কথা, নিজেরাই ছেলেকে বিয়ে দিতে অরাজী।

মুখে স্পষ্ট স্বীকার না করলেও মনের ভাব এই—"খাল কেটে কুমীর কে আনতে যায়!"

.....কিন্তু মুরলীধরের যখন বিয়ের বয়স ছিলো, তখন মায়েরা এতো চালাক হয়ে ওঠেন নি, নারাজ ছেলেকে রাজী করাতে কান্নাকাটি, কপাড়া-ঝাঁটি কোন কিছুই করতে বাকী রাখতেন না।

মুরলীধরের মাও বাকী রাখেন নি।

তথাপি, মায়ের কান্না, বোনেদের অনুনয়, 'পাত্রর গাম্ভীর্য' এবং কন্যার পিতাদের কাকুতি-মিনতি কিছুতেই মুরলীধরকে টলাতে পারলো না।

বন্ধুরা বললো—'সাবাস'!

ততোদিনে মুরলীধরের বন্ধুদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, দু'চারটি ছেলেপুলেও হতে সুরু করেছে। আর—মুরলীধরের, পরের বৌয়ের জন্যে উপহার কিনতে কিনতে এবং বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন খেতে খেতে, বিয়ে বস্তুটার ওপর আরো খানিকটা অরুচি জন্মে গেছে।

অভিভাবকরা যখন মুরলীধর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে হাল ছাড়লেন, তখন বন্ধুরা বলতে লাগলো—"না ভাই, তুমিই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো! ভদ্রলোকে বিয়ে করে? আমরা এখন হাড়ে হাড়ে পস্তাচ্ছি। সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাতে ইচ্ছে করে!"

শুনে মুরলীধর একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসেছিলেন। সে হাসি উত্তরোত্তর বেড়েছে— ঘরে বাইরে সমসাময়িক আত্মীয়বর্গের অবস্থা দেখে। বয়সে অনেকটা ছোটো বোনেরাও **ক্রমশঃ** রীতিমত সংসারী হয়ে উঠেছে, শুধু 'সংসারী'ই বা বলি কেন, সংসার-জ্বালায় জর্জরিতই বলা উচিত। তাদের দেখে মুরলীধর নমস্কার করে বলেছেন—'উঃ!' আর ভগ্নীপতিদের জরজর অবস্থা অনুমান করে মনে মনে নিজেকে নিজে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছেন।

মা দিল যে! তা' দেবে বৈকি! আমি বারণ করেছি যে!

কারণ যখনি বোনেরা সপুত্র-কন্যা পিত্রালয়ে আসতো, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের ঠ্যালায় দু'দিনেই বাপ-ভাইকে চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছাড়তো!

তা' এসব অনেক দিনের কথা!

এখন মুরলীধর পঞ্চাশ পার হয়েছেন, মা, বাপ গতাসু, বোনেরা কদাচিৎ আসে। আপাততঃ তিনি ছোট ভাই-বৌদের সংসারে আইবুড়ো বট্‌-ঠাকুর হয়ে বিরাজ করছেন! বেশ চলছিলো—

কিন্তু মুস্কিল এই, হঠাৎ মুরলীধরের খেয়াল হয়েছে, বুদ্ধির জোরে সংসারের আর পাঁচজনের থেকে জিতে গিয়ে, এমন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটা নিয়ে এতোকাল ধরে করলেন কি? এতোগুলো বছর যে কাটলো কোন্ ফাঁক দিয়ে সেইটাই তাজ্জব লাগছে।

সংসারের পাকে জড়িয়ে না পড়ার জন্যে যারা মুরলীধরকে 'সাবাস' দিয়েছে, তাদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎই হয় না, যদিও বা ন'মাসে ছ'মাসে ট্রামে-বাসে, কি পথে-ঘাটে, দেখা হয়ে যায়, কুশল প্রশ্নের ওপর দিয়েই কাটে।

তাছাড়া মুরলীধরকে কুশল প্রশ্ন ব্যতীত প্রশ্ন করার আর আছেই বা কি?

মুরলীধরও অবশ্য সংসারী লোককে যথোপযুক্ত প্রশ্ন করবার ধারাটা ঠিক শেখেন নি, হয়তো বড়ো জোর বললেন—ছেলেরা কে কি পড়ছে?

'কটি ছেলে-মেয়ে' জিগ্যেস করতে লজ্জা করে, মনে হয় বন্ধুর সম্বন্ধে এতোটা অজ্ঞতা প্রকাশ করা ভালো দেখাবে কি না।

কিন্তু 'ছেলেরা কি পড়ছে'—প্রশ্নের উত্তরে যখন শুনতে পান—"বড়ো ছেলে তো—বি-এ **পাশ করেই অমুক ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিলো—বছর দুই হলো বিয়ে দিয়েছি। বাড়ীতে অসুখ-বিসুখের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে গেলো, কাউকে** জানাতে টানাতে পারিনি ভাই। যাই হোক, বৌমাটি আমার বড়ো লক্ষ্মী, সম্প্রতি একটি খোকা হয়েছে। মেজ ছেলেটা লেখাপড়ায় **তেমন**

সুবিধে করতে পারলো না. দিয়েছি একটা কারখানায় ঢুকিয়ে. বলি—যা বেটা লোহা পিটোগে যা! যেমন মগজ তেমনি তো কাজ হবে! আর সেজ-ছেলেটির এই সেকেন্ড ইয়ার চলছে।” কিম্বা— যদি শোনেন—“আরে ভাই, দুটো মেয়েকে তো তবু সহজে পার করেছি—দেখতে-শুনতেও মন্দ ছিলো না। এই তৃতীয়-টিকে নিয়েই মুস্কিলে পড়ে গেছি। রংটাও—দিদিদের চেয়ে চাপা, আর বাজারও পড়েছে তেমনি। ঘরের বৌ করবে, তার বি-এ, এম-এ, পাশ হওয়া চাই! কেন রে বাপু, বৌ নিয়ে গিয়ে চাকরী করাবি নাকি? আমাদেরও তো জানো—তেমনি কনজারভেটিভ বাড়ী, মেয়েদের কলেজে-টলেজে পড়ানোর রেওয়াজ নেই! যাক হয়ে যাবে একরকম করে!......তুমি বেশ আছো ভাই!” শুনে তখন যেন 'হাঁ' হয়ে যান মুরলীধর।

এরা কোন্ জগতে বাস করছিলো,—আর মুরলীধর কোথায় ছিলেন? জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ কোথাও খানিক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি?

বন্ধু ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। মুরলীধরের জীবনে অতো ব্যস্ততা নেই, রুটিনবাঁধা কতক-গুলো কাজ আছে তাঁর, সেগুলোর জন্যে সময়ও ঠিক করা থাকে।

স্বাস্থ্যটা মুরলীধরের খুবই ভালো, ভোর-বেলা দৈনিক খানিকটা করে হাঁটার অভ্যাসও আছে। আজকাল এই হাঁটার সময়টাতেই নানা চিন্তার ভীড় মাথায় জমে।

যে-সব বন্ধুরা বলে—'তুমি বেশ আছো ভাই'—তাদের ওপর কেমন একটা জাতক্রোধ অনুভব করেন। মনে হয়—এ একটা অন্য ধরণের পিঠ চাপড়ানো। ঠিক চাপড়ানো নয়, পিঠে হাত বুলোনো। এই—'তুমি বেশ আছো ভাই'য়ের যথার্থ অর্থ করলে এই দাঁড়ায়—'আহা তুমি কি বেচারা ভাই! সংসার যে কী চীজ্, একবার জানতেও পেলে না ভাই!”

এ-সব বন্ধুদের অনেক সময় না দেখতে পাওয়ার ভান করে এড়িয়েও যান মুরলীধর!

বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে মুরলীধরের চোখে পড়লো বামুনঠাকুর তখনো বৈঠকখানা ঘরে নিজ-নির্দিষ্ট কোণটিতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

দেখে মুরলীধরের আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। ক্রুদ্ধস্বরে ডাক দিলেন—ঠাকুর! ঠাকুর! এই ঠাকুর!

ধড়মড় করে উঠে বসলো ঠাকুরটা। সামনেই বড়োবাবুকে দেখে একটু তটস্থের ভান দেখিয়ে বললো—আজ্ঞে?

—বলি বেলাটা কতো হয়েছে খেয়াল আছে? অতো নবাবী এ বাড়ীতে চলবে না। বেলা আটটা অবধি ঘুম! লাট সাহেব!

ঠাকুর উঠে পড়ে বিছানা গুটোতে গুটোতে বললো—আজ রবিবার—তাই একটু দেরী—

কথাটা শেষ করতে পায়না বেচারা, মুরলী-ধর গর্জন করে উঠলেন—রবিবার তার কি? রবিবার বলে কি হাঁড়ি চড়বে না বাড়ীতে? আমার দশটায় ভাত চাই!

দম্-দম্ করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন মেজভাইয়ের মেয়ে দুটো দালানে পাতা চৌকীতে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে, এক-একটা প্লাস্টিকের প্লেটে করে সন্দেশ খাচ্ছে।

সাত আর আট বছরের মেয়ে দুটো। তদের এই পা দুলিয়ে সন্দেশ খাওয়া দেখে সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়িয়ে দিলো মুরলীধরের!

সন্দেশ খাওয়া হচ্ছে! সকাল বেলা উঠেই ভীম নাগের সন্দেশ খাওয়া চাই! বাদশাজাদীরা! বোগুলো হয়েছে যেমন লাটসাহেব, ভাইগুলোও কি তেমনি অপদার্থ! ছি ছি! বৌরা যা হুকুম করবে, তাই জোগাতে হবে?......তোরা কী খেয়ে মানুষ হয়েছিলি? ......সকালবেলা উঠে সন্দেশ-মন্ডা চোখে দেখেছিস কখনো? কেন, রাতের রুটি খানকতক রাখা যায় না? গুড় নেই সংসারে?

এ সব কথাগুলো অবশ্য মনের পর্দায় ফুটে উঠতে থাকে, এতোটা প্রকাশের সাহস হয় না। 'সন্দেশ' নিয়ে একটা কথা বলে ফেলে একদিন ভারী অপদস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এতোটা রাগ গিলে ফেলাও তো শক্ত। তাই সহসা আর একটা ছুতোর বড়ো মেয়েটার নাম ধরে চীৎকার করে ওঠেন—এই—পাপড়ি! ফের ওই প্লাস্টিকের থালায় খাচ্ছিস? কতোদিন বারণ করেছি? বাড়ীতে আর থালা নেই?

মেয়েটা সেকালের মেয়ে নয় যে, জেঠার ধমকে থতমত খাবে। সে সমানতালে পা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিলো—মা দিলো যে!

—মা দিলো যে!—কুৎসিত একটা মুখভঙ্গী করে কণ্ঠস্বরটা একটু নামিয়ে প্রায় ভেঙানোর সুরে কথাটা শেষ করেন মুরলীধর—তা' দেবে বৈকি! আমি বারণ করেছি যে! দু'বেলা ভীম-নাগের সন্দেশ জোটে, আর একটা কাঁসার বাসন জোটে না?

দৈবক্রমে পাড়ার ময়রার দোকানের মধ্যে “ভীমচন্দ্র নাগ ও তস্য পুত্রের” দোকানটাই সব চেয়ে কাছে, কাজেই ওটা সহজে আসে। কিন্তু উল্লেখ কালে মুরলীধর ওই 'ভীমনাগে'র ওপর এমন একটা জোর দেন, যেন মনে হয়, ওর সন্দেশটা ভয়ানক একটা দুর্লভ বস্তু।

ছোট মেয়ে পরাগ কি ভেবে তাড়াতাড়ি সন্দেশটা মুখে পুরে প্লেটটা নামিয়ে রাখলো, কিন্তু পাপড়ির মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। বরং মনে হলো জেঠাকে অগ্রাহ্য ভাব দেখাতে আরো "টুকে টুকে" খাচ্ছে, আর পা দুটো আরো কায়দা করে দোলাচ্ছে!

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন মুরলীধর। হ্যাঁ, ঘর একখানা তাঁর আছে। কোণের দিকের সবচেয়ে ছোট ঘরটা, যে ঘরে জানলার বালাই কম, জিনিষের গর্দাত বেশী। সংসারের অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তুই এ ঘরে এসে আড্ডা গেড়েছে!

এটা অবশ্য আর কারো দোষ নয়।

আগে—যখন মুরলীধর সর্বদাই আত্ম-প্রসাদের সাগরে ভাসতেন, আর ভাবতেন— 'আমার কিছু দরকার নেই'—তখন উদারতা দেখিয়ে নিজের বড়ো ঘরখানি ছোট ভাইকে দান করে বসেছিলেন।

কেন কে জানে, এখন যেন এই ছোট্ট ঘরের কাছাকাছি দেয়াল চারটে চেপে মারতে চায় মুরলীধরকে। এখন মনে হয়—ওরা বুঝি ওঁকে ঠকিয়ে বড়ো ঘরটা দখল করে বসে আছে।

বাজে বাড়তি জিনিষগুলো অবশ্য এক-দিনে এসে ঢোকেনি। ধীরে ধীরে কখন একটি একটি করে......ঠাঁই নিয়েছে, এই বেওয়ারিশ জায়গাটায়।

ঘরে ঢুকেই মুরলীধরের মনে হলো, পৃথিবীর সকলে মিলে যেন আজ ও'কে উত্যক্ত করবার জনাই ষড়যন্ত্র করেছে।......নইলে, এ কি? এর মানে কি? ঠিক মুরলীধরের ঘরের সামনেটাই দরকার পড়লো ওদের?

দেখলেন—ঘরের সামনে রাস্তার দিকে যে হাত দেড়েক সরু ফালি বারান্দাটুকু দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, সেই বারান্দা-টিতে খাসা একটি দড়ি টাঙিয়ে চারটি কাঁথা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে!

এটা নতুন! বারান্দার রেলিঙে ছোট বৌমার ছোট খোকার ভিজে তোষক, ভিজে কাঁথা দেওয়া হয় বটে, কারণ বারান্দাটা পূর্ব-মুখী। সকালের রোদ আগে আসে! রাস্তার-ধারে এসব বিশ্রী জিনিষ দেওয়াটা মনে মনে মোটেই সমর্থন করেন না মুরলীধর, শুধু ছোট বৌমার ফোঁস্ করে ওঠবার ভয়ে বলেন না কিছু। কিন্তু এ যে পারমানেণ্ট ব্যাপার! সকাল-সন্ধ্যা, উদয়াস্ত কিছু না কিছু ঝুলবেই নির্ঘাৎ!

আর দড়িটা কি টাঙানোও হয়েছে তেমনি সভা করে। দরজা দিয়ে বেরোতে গেলে নাকে ঘষটাবে।

ইচ্ছে হলো দড়িটা পট্ করে টেনে ছিঁড়ে কাঁথাপত্র সমেত তাল পাকিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেন।

হায়! মানুষের সব ইচ্ছেই যদি পূরণ করা সম্ভব হতো!

'সব' ছেড়ে, সামান্যতম ইচ্ছেটুকুই কি পূরণ হয়?

ওই ইচ্ছেটার পরই মনে হলো—দূর ছাই, কিছু বলবো না। কিন্তু সে বৈরাগ্যের জন্যে মনের যে স্থৈর্যের প্রয়োজন, সেটা খুঁজে পেলেন না। খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, অনেকটা খাঁচার বাঘের মতো রুদ্ধ আক্রোশে।......হঠাৎ চোখে পড়লো ছোট ভাইয়ের বড়ো ছেলেটা যাচ্ছে সামনে দিয়ে। আর দেখলেন—টার্গেট রয়েছে অদূরেই!

ভারী গলায় হুংকার দিলেন—অভি!

অভিমন্যু যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মুরলীধর একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত তিক্ত হাসি হেসে বললেন— হ্যাঁরে, এখানে এমন সুন্দর করে দড়ি টাঙিয়েছে কে রে?

জানিনা, মা বোধ হয়!

উদাসীন 'টার্গেটের' অদূরবর্তী আতুড়ের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুরলীধর পূর্বস্বরেই বললেন—বাড়ীটার বেশ বাহার খুলেছে, না রে?

—বাহার, না হাতী!—মন্তব্য প্রকাশ করলো অভিমন্যু!

বেশ, বেশ তো!......দেখলেন আভাস একটু স্পষ্টতর হলো......মুরলীধর কথা শেষ করতে উদ্যত হলেন—বেশ কেমন পাড়ার লোক জানতে পারবে তোদের ঘরে কতো বাহারে বাহারে কাঁথা আছে! তোর ভাইবোন—কি চমৎকার ছিটের—

উদ্যত কথা মুখের মধ্যে আটকে রেখে গলতে পেলেন মুরলীধর! থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন—সহসা ছোটবৌমা দাপাদাপি করে এসে ভাসুরকে প্রায় ঠেলে দিয়ে দড়ির মাঝখান ধরে বারান্দায় ঝুঁকে পড়েছেন।

এরপর যা হলো সেও চমৎকার!

চমৎকৃত মুরলীধর দেখলেন, তাঁর কনিষ্ঠা

নিজের খুসিতেই কথা কয়ে যান ভদ্রমহিলাটি। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে বাক্যধারা।

চায়ের কথা বলতে গিয়ে খুব সম্ভব কর্তার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করে আসেন দেবেশজায়া, কারণ একটু পরেই সদ্য মুখ ধোওয়া মুখ নিয়ে দেবেশবাবু এসে বসেন।

বেশ খানিকক্ষণ গল্প চলে।

যদিও অধিকাংশ গল্পই সংসার জন্বালার। দেবেশবাবুই বেশী বলেন। কিন্তু বলাটা যে খুব জন্বালায় জর্জরিত ভঙ্গীতে বলা হয় তা নয়। মনে হয় এরা স্বামী-স্ত্রী যেন ইচ্ছে করে কৌতুক করছে! নইলে জন্বালার আলোচনায় ক্ষণে ক্ষণে এমন হাসি বিচ্ছুরিত হয়?

মুরলীধরও অবশ্য সে হাসিতে যোগ দেন, কিন্তু সে যেন ফাঁকা ফাঁকা। যেন শার্সি বন্ধ জানলার ওপিঠে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার, কিন্তু স্পর্শ করতে পারছেন না কিছু।

অনেকক্ষণ ওদের বাড়ী কাটিয়ে উঠে পড়েছেন মুরলীধর। বন্ধু হাই তুলে বললেন—আমিও বেরোই এবার। এতোক্ষণ তো ছুটি বলে আয়েস করা গেলো। অতঃপর ঘানিগাছে জুড়তে হবে তো?......কই, আর এক পেয়ালা জুটবে নাকি?

দেবেশ গৃহিণী শাসনের সুরে বলেন—আবার? তোমার না বেশী চা খাওয়া বারণ?

তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ভুলে দেবেশবাবু বয়সানুচিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন—আর নিজে?

—আমার বারণ শুনতে বয়ে গেছে! বাঙালীর মেয়ে সহজে মরে না।......কি বলেন চৌধুরী মশাই? চল্লিশ পার করে আনলে তারপর আর কোনো বঙ্গনারীকে আশীর আগে মরতে দেখেছেন আপনি?...চল্লিশের আগে যখন মরতে পারলাম না, তখন তুচ্ছ দু'পেয়ালা চায়ের ঢেউতে কি আর শেকড় ছিঁড়ে ভেসে যাবো? আরো চল্লিশের আগে পৃথিবী থেকে নড়ায় কে?

অজস্র কথা বলেন মহিলাটি।

আশ্চর্য, খারাপ তো লাগছে না? কিন্তু বাড়ীতে—বেশী কথা শুনলেই গায়ে যেন বিষ ছড়ায়! ভাই, ভাই বৌয়েদের হাস্য পরিহাস কানে গেলে, মনে হয় যেন ওরা মুরলীধরকে অপমান করছে।

এদের বাড়ী রোজ বেড়াতে এলে কি হয়? বেশী নয় দৈনিক খানিকক্ষণের জন্যে? ধরো সকালে বেড়াতে এসে চা-টা এদের বাড়ীতে খেয়ে গেলেন। অবিশ্যি তার প্রতিদানে উপহার দিয়ে পুষিয়ে দেবেন। বরং বেশী ছাপিয়েই দেবেন!

শুধু চায়ের সময়টুকু!

বাড়ীর চা-টা মনে করলেই যেন বিরক্তি আসে। মুরলীধর যখন বেড়িয়ে ফেরেন, তখন ওদের খাওয়া হয়ে যায়। মুরলীধর একা বসে খেয়ে নেন, কোনোদিন দালানে, কোনদিন বাইরে ঘরে। বাঁধাবরাদ্দ চারখানা করে থিন এরারুট বিস্কুট থাকে, চায়ের প্লেটটারই পাশে। প্রায়ই খানিকটা করে চা চলকে পড়ে ভিজে যায় বিস্কুটগুলো! ছোট মেয়ে দুটো, কি ছোঁড়া চাকরটা, এরাই কেউ এনে ঠক্ করে বসিয়ে দিয়ে যায় কিনা।

না, প্রাতরাশে কোনো নতুনত্ব তিনি দেখতে পান না। আর দ্বিতীয় প্রস্থ চা? নিয়মী মুরলীধর তা খাবেনই না। মনে হচ্ছে শুধু একদিন কবে যেন সদি্দ হয়েছিলো বলে বাড়তি আর একবার চায়ের আবেদন জানিয়েছিলেন, তারপরই মেজবৌমার শানানো কণ্ঠ কানে এলো—অ ঠাকুর, ভাত বসাবার আগে বড়োবাবুর জন্যে আর একবার চায়ের জল চাপিও......ছোট বৌ, বটঠাকুরের চায়ে আদা দিতে হবে।...আদা নেই?...কেন, কাল যে অতোটা আদা ছিলো ঝুড়িতে?...সব কালকের অালুরদমে দেওয়া হয়ে গেছে?...বেশ বাবা! রোজ থাকে—কারুর আদার চা খাবার ইচ্ছে হয় না, আজ নেইকো আর আজই দরকার পড়লো!...আশ্চর্য্যি 'তুক্' আছে বাবা এ সংসারে।...কেষ্টা, অ কেষ্টা, বড়োবাবুর চায়ের জন্যে দু' পয়সার আদা এনে দে দিকি!...কেষ্টা বাড়ী নেই? এখন আবার গেলো কোন্ চুলোয়? না বাবা, আমারই হয়েছে যতো ঝামেলা। অঃ ঠাকুর, তুমিই একবার হাতখালি করে যাওদিকি, বড়োবাবুর চায়ের জন্যে আদা নিয়ে এসো দু' পয়সা। এনে একেবারে একটু ছেঁচে ফুটন্ত জলে ফেলে দিও।...পরাগ, এই পয়সা দুটো ঠাকুরকে দিয়ে আয় দিকি!"

শুনতে শুনতে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন মুরলীধর। তবু সেই আদার চা না খেয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাবার সাহস হয়নি। সেই না খাওয়ার কৈফিয়ৎ তা হলে হয়তো ছোট ভাইদের কাছেই দিতে হবে!

অনেক সময় ভেবে দেখেছেন মুরলীধর বুঝতে পারেন না—কেন এরা এমন করে! কেন সহ্য করতে পারে না ও'কে! অথচ মোটা মাইনের চাকরী তিনি করেন এবং সে টাকার প্রায় সবখানিই মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দেন। তা' ছাড়া—রাত দিনই ভাইপো ভাইঝিদের এটা-ওটা কিনে দিচ্ছেন। 'নিজের খরচ' বলতে তাঁর আর কি-ই বা আছে? আর দেন যে, সেও ভালোবেসে যতোটা না হোক, অনেকটা ভাইদের মন রাখতে। তবু মন পান না। কে জানে কোথায় কি গলদ!

কে জানে কেন নিজের বাড়ীতে, নিজেদের সংসারে এমনভাবে দাবী হারালেন! আর কবেই বা হারালেন!

"—নাঃ ও বেটা বেটিদের আর কিছু দেবো না। মনে মনে এই সংকল্প বাক্যটি উচ্চারণ করে, দোকানীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মুরলীধর। ভালো একটিন বিস্কিট আর একটা চকোলেটের বাক্স কিনেছেন।

এ তিনি দেবেশের বাড়ী নিয়ে যাবেন।

পর পর ক'দিন ওদের বাড়ী গিয়ে চা খেয়ে এসেছেন! প্রথমদিন চায়ের 'অনুপান' হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন ডালমুটের ঠোঙা, উচ্ছ্বসিত আনন্দে গ্রহণ করেছিলেন দেবেশজায়া।......বলেছিলেন—যাই বলুন, আপনার মধ্যে কিন্তু এখনও তারুণ্য আছে চৌধুরী মশাই। ভেবে-চিন্তে কেমন উপহারটি আবিষ্কার করেছেন।...বেশ করেছেন, কতোদিন যে খাওয়া হয়নি! আপনার বন্ধুটি মহা স্বার্থপর কি না, নিজের দাঁত খারাপ হওয়া পর্যন্ত ডালমুট চীনেবাদামের নামই ভুলিয়ে দিয়েছেন!

—কেন ছেলেকে দিয়ে আনাতে পারেন না?

বোকার মতো এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন মুরলীধর। বলেই বুঝেছিলেন তেমন যুৎসই হলো না কথাটা। দেবেশজায়া মিষ্টি হাসি হেসে চটপট্ উত্তর দিয়েছিলেন—নাঃ শুধু তারুণ্যই নয়, আপনার মধ্যে এখনও শিশুত্বও রয়েছে চৌধুরী মশাই!...এই যে আমি আপনাকে চা এগিয়ে দিলাম, এই দেওয়াটা যদি আপনার জেঠিমা দিতেন, ঠিক এ আস্বাদ পেতেন?

যাই হোক, অপূর্ব লেগেছিলো সেই সকালটি! মোহময় সুন্দর! সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন মুরলীধর পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে তাঁর!

সেইদিন থেকে কী যেন এক নেশা ধরেছে! সমস্ত কাজের অন্তরালে সমস্তদিন মনটা তৃষিত হয়ে থাকে সেই এক পেয়ালা চায়ের জন্য, সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হয়ে থাকে সেই ঘণ্টাখানেক সময়ের জন্য! সমস্তক্ষণ ভাবতে থাকেন—কাল কি উপঢৌকন নেবেন সংগে!

এ এক অনাস্বাদিত স্বাদ!

জীবনে কতো ছোট ছেলেমেয়ের হাতেই তো চকোলেটের বাক্স ধরে দিয়েছেন ভাইপো ভাইঝি, ভাগ্নে ভাগ্নী, ভাগ্নীদের ছেলেমেয়েকে পর্যন্ত।...কই, এমন আবেগময় আনন্দতো অনুভব করেননি কখনো, যেমন করছেন দেবেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়ে!

গতকাল এক বাক্স চকোলেট নিয়ে গিয়ে লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন দেবেশের বড়ো মেয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে, তার ছেলেটি রয়েছে।

(ইহার পর ১২৬ পাতায়)

সেরেনেড

(লঙ্‌ফেলো)

অনুবাদক তরুণ রায়

গর্মিরাতের আকাশ ভরা তারা
দূরে দিগন্তে আপন মনে ঝিমায়
লুকোও লুকোও, তোমার আলোর ধারা
সে ঘুমায়
আমার, রাণী ঘুমায়,
ঘুমায়।

গর্মিরাতের শান্ত মধুর চাঁদ
পশ্চিমেতে চলার গতি থামায়
গোটাও তোমার রুপোলী আলোর ফাঁদ
সে ঘুমায়
আমার, রাণী ঘুমায়
ঘুমায়।

গর্মিরাতের পাগোল করা হাওয়া
লতার মাঝে কত কথাই শোনায়
তোমার আলোও হয়নি আজ চাওয়া
সে ঘুমায়
আমার, রাণী ঘুমায়
ঘুমায়।

গর্মিরাতের ওগো মধুর স্বপন
প্রেমিক তার করুণ চোখে তাকায়
বোলো তাকে ঘুমেল আলোয় যখন
সে ঘুমায়
আমার, রাণী ঘুমায়
ঘুমায়।

গোল্ডেন "র" নস্য
(সর্বপ্রকার নস্য প্রস্তুতকারক)
Dipak
MADRAS SNUFF
দীপক
মান্দ্রাজ নস্য
মূল্য :—
২৪ তোলা টিন ৩৷৹
১ তোলা টিন ৵৹
দীপক স্নাফ কোং—মাদ্রাজ

পূজা-বাজার
বেঙ্গল সিল্ক হাউস
বেনারসী ও সিল্ক সাড়ী
১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রমেশচন্দ্র সেন

সহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনী। পূর্ব-পাকিস্থানের গৃহহারারা এসে নূতন পল্লী গড়েছে! নাম দিয়েছে শ্রী পল্লী!

রাত প্রায় দশটায় ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে ঊষানাথ ডাকল, 'হেম'!

ছোট্ট একখানা ঘর থেকে 'কি দাদা' বলে বেরিয়ে এল সতর আঠার বছরের এক তরুণ, দাদার ঘরের সামনে উঠানে এসে দাঁড়ালো! গৌরকান্তি, সুন্দর মুখে সবে গোঁফের রেখা পড়েছে! চাঁদনী রাতে মনে হয় কাজল রেখা টেনে দিয়েছে সুন্দর ঠোঁটের উপর!

ঊষানাথ বলল, 'আজ রজনীর কাছে যাসনি কেনরে? সে তোকে 'ডলকার্টের' আপিসে নিয়ে যেত'!

হেমনাথ বলল, কাপড় ভেজা ছিল।

বর্ষাকালে কাপড় শুকোতে ত দেরী হয়ই। গামছা পরে স্নান করলেই পারতিস্। তোদের বুদ্ধি ভাষ্যি আর হবে কবে!

কাপড়খানা বড্ড ময়লা হয়ে গিয়েছিল! তাই সাবান দিয়ে ধুয়ে দিলুম! তখন বুঝতে পারিনি যে বৃষ্টি নামবে!

ঊষানাথ বলল, এমন কি আমীর হয়েছ? একটু ময়লা কাপড়েই নয় যেতে! রজনী দুঃখ করছিল, অতি কষ্টে যদি বা একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছিলাম, তোমার ভাই গেলই না! আমায় আর অনুরোধ ক'র না ওদের জন্য!

হেমনাথ সলজ্জকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'কাল গেলে হয় না?'

ঊষানাথ বলল, হবে না? ডলকার্টের সাহেবেরা তোমায় অভ্যর্থনা করার জন্য তোরণ গাড়িয়ে রাখবে।

তার স্ত্রী মালতী ছেলে কোলে ক'রে কাপড়ের খুঁট পেতে বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বামীর কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়: সে বলে, ঐ আট হাতি ময়লা কাপড় পরে গেলে চাকরি ত হতই না, তোমার ভাই বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা করত।

নিজের মর্যাদার কথা শুনে মনে মনে খুশী হলেও ঊষানাথ মুখে বলে, লজ্জা ত' করবেই। আমীরের ভাই আমীর!

এই অবস্থায় আজ প্রথম নয়, চাকরির খবর পেয়েও কাপড়ের অভাবে হেমনাথ বেরুতে পারেনি। তারও মেজ ভাই লোকনাথের কাপড় মাত্র একখানা করে! এতদিন বৌদির সাড়ী ছিল! —কিন্তু এখন কাপড় ধুয়ে দিলে গামছা পরে থাকতে হয়! সব জেনেও ঊষানাথ স্ত্রীকে বলে, 'ওদের বলে দাও বসে বসে গান্ডি-পিন্ডি গেলা আর চলবে না!'

মালতী বলে, কসুর ত' ওরা করে না! বিশেষ করে হেমনাথ টো টো করে সারাদিন ঘুরছে!

"ঘুরছে বাজে কাজে! চেষ্টা করলে কি আর কাজ জোটে না? চেষ্টা নেই, খালি আড্ডা দেবে, থিয়েটার করবে! জানে বাড়ি গেলেই বাড়া ভাত আছে'!

ফেরিওয়ালার মত হাঁকতে ইচ্ছে হল, দেবে? চাকরি দেবে? আমি চাকরি চাই।

প্রতিবাদ করলে স্বামী আরও চেঁচামেচি করবে। ভাইদের শুনিয়ে শুনিয়ে কটুকথা বলবে! মালতী তাই কোন প্রতিবাদ করলে না! স্বামীকে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগল! তার জন্যও সে দুঃখবোধ করছিল!

ঊষা বাড়ি থেকে সকাল ৯টার আগে বেরোয়! ফেরে রাত ১০টার পর। দিনে ১০টা ৫টা আপিস করে! তারপর এক কালোয়ার বাড়ী যায় খাতা লিখতে। সেখান থেকেও সোজাসুজি বাড়ি ফেরে না। ষ্টেশনে নেমে বিজয়গড় যায় টিউশনি করতে। সেখান থেকে দু মাইল পথ জল-কাদা ভেঙ্গে বাড়ি আসে রাত ১০টার পর। দিন চলছে এই একই নিয়মে। চার-চারটা বছর একই নিয়মে কাটছে।

পরের দিন সকালেই হেমনাথ বেরিয়ে গেল! কলকাতায় গিয়ে আপিসে আপিসে ঘুরল। দুপুরে ফিরল না। লোকনাথ খেতে নামল। মালতী বললে, হেম গেল কোথায়? কাল ওর দাদা একটু বকেছে কিনা তাই ভাবছি।

লোকনাথ হেসে বলে, দাদার বকুনি ত খেতেই হবে, যে গরু দুধ দেয় তার চাট সইবে না?

মালতী হেমকে অত্যন্ত স্নেহ করে। সে যে সময় বধূরূপে এ বাড়িতে আসে হেমনাথের বয়স তখন ৬ মাস। তাদের পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল। মালতীর শাশুড়ী ছোট ছেলেকে তার কোলে তুলে দিয়ে—হাতে গড়া সোনার এক ছড়া হার দিয়ে বলেন, ওর গলায় পরিয়ে দাও বৌমা। আমার শরীর খারাপ, তাই তোমায় এনেছি। ওকে তুমিই দেখবে।

হেমনাথ মালতীরই দেওয়া নাম। তাকে সে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে। ভালবাসে হয়ত নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী।

সে বলল, বেচারা বড় অভিমানী, হয়ত পথে পথে ঘুরছে। আমার বড় ভয় করে। রাস্তায় ট্রাম-বাস-মোটরের যা ভিড়। পাড়াগাঁয়ের সাপ, কাঁটার বিপদের চেয়েও কলকাতার রাস্তার বিপদ অনেক বেশী।

লোকনাথ হেসে বলল, ভয় নেই, কলকাতায় এসে দেওর তোমার পেকে গেছে। এঁচড়ে পাকা।

কথাটার হৃদয়হীনতা শুধু মালতীকে নয়, লোকনাথের স্ত্রী সর্বাণীকেও পীড়া দেয়।

হেমনাথ বাড়ি ফিরল রাত ৯টার পর। সর্বাঙ্গ ধূলিমলিন। চোখ বসে গেছে, ফরসা মুখের উপর পড়েছে কালির পোঁচ।

মালতী বলল, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, সারাদিন ছিলি কোথায় ?

হেম বলল, কাল রাত্তিরে কাপড় জামা সাবান দিয়ে কেচে শুকিয়ে নিয়ে ছিলুম। তাই পরে আপিসপাড়ায় ঘুরলুম। ফেরিওয়ালার মত হাঁকতে ইচ্ছে হল, দেবে ? চাকরি দেবে ? আমি চাকরি চাই। ম্যাট্রিক পাশ আমি। ভদ্রলোকের ছেলে, চাকরি চাই।

তার বলার ভঙ্গীতে মালতীর হাসি পাচ্ছিল। এই সময় সর্বাণী এসে পড়ায় হেমনাথ চুপ করে গেল।

কোন রকমে হাতে মুখে জল দিয়ে সে খেতে বসল। খেতে খেতে বলল, সবই বুঝি বৌদি, দাদার কত কষ্ট, নইলে কী তিনি কিছু বলেন ? কিন্তু জান ডলকার্টের আপিসে কোন লোক নেয় নি। নেওয়ার কথাও হয়নি। রজনী বাবু ধোঁকা দিয়েছেন।

তুই জানলি কি করে ?

সেখানে আমাদের গ্রামের পঞ্চাননের ছেলে কাজ করেন। তিনি বললেন। অথচ দাদার বিশ্বাস আমি গেলেই চাকরি হত।

মালতী বলল, শুধু কি রজনীবাবু, আজকাল অনেকেই ও রকম আশা দিয়ে বেড়ায়, তাতেই তাদের আনন্দ। কেউ বা এটাকে ব্যবসা করে নিয়েছে। ও বাড়ির পদু মাষ্টারের কাছ থেকে চাকরির আশা দিয়ে অচিনবাবু দেড়শো টাকা বার করে নিল। বলল, অফিসারকে ঘুষ দিতে হবে।

হেমনাথ বলল এক ফ্যাক্টরীর সুপারকে ঘুষ দেবে বলে আমার কাছেও ২৫, টাকা চেয়েছিল, যাক্ বৌদি কিছু ভেবো না, তিন মাসের মধ্যে আমি একটা চাকরি যোগাড় করে নেবো। বল দাদাকে, কোন কষ্ট থাকবে না তোর। সব টাকা এনে তুলে দেব তোমার হাতে।

মালতী হাসে। এ সময় উষানাথ বাড়ি ফিরে তার হাতে একখানা কাপড় দিয়ে বলল, এই তোদের দু ভাইয়ের আপিসের কাপড়। যার যখন দরকার এখানা পরে কাজের চেষ্টায় বেরুবে।

তার পরেই হেমনাথের দিকে চেয়ে বলল, এবার থেকে তোমাদের বেরুতে গাফিলতি হয় না যেন।

উষানাথ ও লোকনাথ পিঠোপিঠি ভাই। লোকনাথ মাত্র তিন বছরের ছোট। তা ছাড়া তার প্রকৃতি অন্য রকম। উষানাথ তাই তাকে সামনা-সামনি কিছু বলে না।

মালতী স্বামীকে বলল, জানো ঠাকুরপো রজনীবাবুর কাণ্ড! শুধু শুধু হয়রাণি করেছে।

কে বললে ? হেম বুঝি !—উষানাথ গর্জন করে উঠল !

মালতীর ভয় হয়, স্বামীর তর্জন গর্জনে হেমনাথের খাওয়াই বুঝি নষ্ট হবে! সেও তাই উঁচু গলায় বলে, চুপ কর তুমি! মানুষ চেন না, জান শুধু চেঁচামেচি করতে!

গজর গজর করতে করতে উষানাথ ভিতরে চলে যায়।

রাতে মালতী জিজ্ঞাসা করল, হাতে ত একটা পয়সাও ছিল না, কাপড় আনলে কি দিয়ে ?

কাবোয়ারবাবুর কাছ থেকে কটা টাকা আগাম এনেছি !

এ মাসের মাইনের আর বাকী রইল কত ?

আছে টাকা পাঁচেক বোধ হয়। যাক্ কাপড় কিনে আরও আড়াইটা টাকা আছে। কাল একটু মাছ আনিও। মাছ খাইনি অনেকদিন।

সে মাছ ভালবাসে খুব। অথচ দাম চড়া বলে মাছ কেনা হয়নি আজ দশ বারদিন।

* * *

অতিরিক্ত কাপড় হয়। দুভাইয়ের বেরুবার কাপড়। উষানাথ সতর্ক করে দিয়েছে। চাকরির চেষ্টায় বেরুবার সময় এখানা পরে বেরুবে। অন্য সময় নয়।

কাপড় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের কাজের চেষ্টা বেড়ে গেল। সে ঘন ঘন বেরোয়। আজ হয়ত কাজের খবর পেয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালে গেছে। ফিরে এসেই বলল, কাল যেতে হবে পোর্ট কমিশনার অফিসে ভূতনাথবাবু বলে এক ভদ্রলোকের কাছে। তিনি কাজের আশা দিয়েছেন।

হেমনাথ কাপড়খানা পায় খুব কম। তার যখন দরকার তখনই দেখা যায় লোকনাথ ঐ খানা পরে বেরিয়ে গেছে।

প্রথমে হেমনাথ কিছু বলত না। খুব অসুবিধা হওয়ায় শেষে একদিন বলল, কোথায় গেছলে মেজ দা ? তোমাকে কালকে না বলেছিলাম আমাকে আজ বুলু ডোক্তারের আপিসে যেতে হবে ?

আমিও কাজেই গিছলাম,—লোকনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করে।

এই গুরুগম্ভীর আওয়াজের পর হেমনাথ আর কিছু বলে না। বলতে ভরসা পায় না। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। লোকনাথ বলে, তুই গেলেই কি চাকরি হত। আজ কাল স্কুল ফাইনাল পাশ ছেলের চাকরী অত সোজা নয়। কমার্স পড়েই আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

সে দু বছর আই-কম ক্লাসে পড়েছে। ছোট ভাইকে প্রায়ই সে কথা শুনিয়ে দেয়। হেমনাথ নীরবে শোনে। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেও অর্থাভাবে তার আর পড়া হয়নি।

হেমনাথ বলেছে যে করেই হোক তিন মাসে চাকরি জোগাড় করে নেবে। তারও দুমাস কেটে যায়।

মালতী কিছু বলে না বটে! কিন্তু সর্বাণী প্রায়ই মনে করিয়ে দেয়, কি ঠাকুর-পো দুমাস যে কেটে গেল। হেম বলে, দেখো, এই এক মাসের মধ্যেই আমি চাকরি জোগাড় করে নেব। একটা কাজের আশাও সে পেয়েছে! কোনও সরকারী আপিসের হেডক্লার্ক তার নাম বেয়ারার তালিকাভুক্ত করেছেন! বলেছেনও আমি যখন তোমার মুরুব্বি, তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পার, সময় মতন ডাক পড়বে। আগে একাজ আমিই দিতুম! এখন সে ক্ষমতা বড় সাহেব কেড়ে নিয়েছেন! দেশী সাহেব ত, ভারী ছোট নজর এদের।

কিন্তু সে বেয়ারাগিরিও জোটে না! মুরুব্বি খালি আশা দেয়, ওয়েটিং লিষ্টে নাম আছে। ওয়েট ত করতেই হবে! হেমনাথ বলল, কতদিন দেরী করতে হবে আর! আমি যে বৌদিদের কাছে বলেছি তিন মাসের মধ্যেই চাকরি জোগাড় করে নেব।

মুরুব্বি হেসে উত্তর করেছেন, বৌদিদের কাছে দেওররা ওরকম বলেই থাকে" মধ্যযুগের য়ুরোপের নাইটদের (Knight) মতন" ছোকরা, তোমার ওকাজ ঠিক হবে। তবে অনেক আই-এ, আই-এস-সি'র দরখাস্ত পড়েছে! গ্র্যাজুয়েটও আছে কয়েকজন।

বেয়ারার কাজের জন্য গ্র্যাজুয়েট !— হেমনাথ সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে!

হ্যাঁ, আজ আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের এই-ই অবস্থা—বলে মুরুব্বি সমাজের অবস্থা সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন।

হেমনাথকে এইরূপ বক্তৃতা মাঝে মাঝে শুনতে হয়! বিরক্তিকর হলেও চাকরির চেষ্টার অঙ্গস্বরূপ এটাও বাদ দিতে পারে না।

* * *

দুভাইয়ের পুরানো কাপড় দুখানা একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে! লোকনাথের খানা ছিঁড়েছে কম, কিন্তু এমন ফেঁসে গেছে যে, পরা আর চলে না! সেলাই করারও উপায় নেই!

এদিকে দাদার কাছে কাপড় চাইতেও পারে না! চাইবেই বা কোন্ মুখে ? তার ছেলেদের জামা নেই, ইজের নেই! নিজেরও জামা একটায় এসে ঠেকেছে! রাত্রে কেচে তবে পরের দিন সে আপিস করে! নইলে বাদল থাকলে উনানের আঁচে শুকিয়ে নেয়!

চাকরির কাপড়খানা লোকনাথই বেশী পরে থাকে! হেমনাথ কিছু বলে না! তার অসুবিধা হয় খুবই! অনেকদিনই কাজের চেষ্টায় বেরুতে পারে না। উষানাথ সেজন্য রাগ করে।

লোকনাথ চাকরির চেষ্টায় বেরোক না বেরোক, প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর বৌদের কাছে এসে আপিসের গল্প করে। জেনারেল পোষ্ট আপিসের থাম গম্বুজ, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ছাদের কোণায় কোণায় ন্যায়ের ও ধর্মের প্রতীক পুতুলগুলো, লাটের বাড়ীর সিঁড়ি, হংকং ব্যাঙ্কের আলোর ঝাড়ের গল্প। ঐসব আপিসের দারোয়ানরা কেমন করে খৈনি টেপে, সুর ভাঁজে সে সব বলেও বধূদের হাসায়। তারপর কোন দিন মুড়ো মুড়ি, কোনদিন বা খালি লেবুর জল খেয়ে যায় কলোনির ড্রামেটিক ক্লাবে রিহার্সাল দিতে। শক্ত কোন জিনিষের চেয়ে লেবুর জলই খাওয়া হয় বেশী! কারণ লেবুটা তাদের কিনতে হয় না।

সেদিন হেমনাথ অতি কষ্টে মেজদার কাছ থেকে কাপড়খানা চেয়ে রাখল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ মুরুব্বির আপিসে গেলে তিনি বললেন—এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে যাতে তোমার নাম পাঠিয়ে দেয় তার ব্যবস্থা কর।

হেমনাথ বলল, সেখান থেকে ত পাঠিয়ে দেছে! আপনাকে ত বলেও গেছি!

আই সি! বলে গিছলে বুঝি ? কিন্তু সরি, বড় সাহেব শ্রীভাগানাথন অন্য দুটি ছোকরাকে নিয়েছেন!

হেমনাথ বলল, আমার হল না তাহলে ?

নো ফিয়ার! পুরানো তালিকা বাতিল হয়েছে বটে কিন্তু আবার নতুন তালিকা হবে মাসখানেক পরে! তখন এসে মনে করিয়ে দিয়ো! এবারও ওয়েটিং লিষ্টএ নাম তুলে দেব! তারপর তোমার ভাগ্য আর শ্রীভাগানাথনের দয়া!

অনেক ঘোরাঘুরির পর বেয়ারার ভবিষ্যৎ তালিকায় তার নাম উঠবে, মুরুব্বি এটুকুর বেশী আশাও আজ দিলেন না!

হেমনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে

বেরিয়ে আসছিল। তিনি আবার ডাকলেন, শোন হরিনাথ।

হেমনাথ বলল, আমি হেমনাথ, বেশ হেমনাথই সই। আমি জোর রিকমেণ্ড করেছিলুম! তোমার হয়েও যেত! হলনা ময়লা কাপড়-চোপড়ের জন্য! বড় সাহেব বলছিলেন, *That boy is much ill dressed.*

হেমনাথ মুরুব্বির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি বলেন, কোন দিন আধময়লা কাপড়ের সাথে সাবান কাচা জামা পরে আসবে! কোনদিন বা দুটোই ময়লা থাকবে! এসব সাহেবের ভারি অপছন্দ!

হেমনাথ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে!

মুরুব্বি বলেন, ওঃ, কাপড় জামা নেই বুঝি? বেশ, মাসকাবারে এস। দেখি আমি কিছু সাহায্য—তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই হেমনাথ বলল, দরকার নেই। আপনি বরং দয়া করে তাড়াতাড়ি আমায় চাকরিটা করে দিন!

হেঃ, হেঃ. Vanity! ভ্যানিটি আমিও ভারী পছন্দ করি! তুমি বরং এক কাপ চা খেয়ে যাও!

হেমনাথের ইচ্ছা ছিল না! তবুও মুরুব্বি অসন্তুষ্ট হবে মনে করে চায়ের জন্য সে অপেক্ষা করে! চা আসে! চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার সময় তার হাত কেঁপে যায়! এদিকে মুরুব্বি তাঁর আত্মকাহিনী বর্ণনা সুরু করেন! কি ছিলেন আর কি হয়েছেন! হেমনাথ কিছু শোনে, কিছু বা তার কানেই যায় না!

বেরুবার সময় সে জিজ্ঞাসা করল, আবার কবে আসব?

যখন খুশি! চাকরির চেষ্টায় বেরুতে ত' হবেই! এ ধারে এলেই এসো! এক কাপ চা তোমার জন্য বরাদ্দ রইল! আর একটা কথা। আসবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে! দামী পোষাক অবশ্য পরতে বলছি না! গরিবের ছেলে, তা আর পাবে কোথায়!

মুরুব্বির আফিসের বাইরে এসেই হেমনাথ প্রতিজ্ঞা করল এমুখো আর হবে না!

একখানা মাত্র আস্ত কাপড়! তাও ভাগাভাগি করে পরতে হয়! কী নিচেই না নেমে গেছে তারা! অথচ তাদের বাবা ছিলেন পঞ্চাশ টাকা ফির বড় উকিল! জেলার সহরে তাঁর নামে আজও একটা রাস্তা আছে!

এক কাপ চা, মাসকাবারে এস, Ill dressed বলে কাজ হয় নি, শ্রীভাগ্যনাথন্—মুরুব্বি লোকটি যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছেন!

হেমনাথ অর্থহীনভাবে পথে পথে ঘুরল। সম্বল ছিল বৌদির দেওয়া দু আনা পয়সা, শিয়ালদহ পর্যন্ত এসে সে ট্রামে উঠল! চার পয়সায় বালিগঞ্জ অবধি যাবে! আবার হাঁটা সুরু করবে, বালিগঞ্জ থেকে যাদবপুর ত আর বেশী দূরে নয়! বড় ক্ষিদে পেয়েছে! ট্রাম থেকে নেমে দু' পয়সার আলু কাবলি খাবে! আর কিনবে দু' পয়সার চিনাবাদাম! খোসা ছাড়িয়ে খেতে খেতে অনেকটা পথ যাওয়া চলবে!

সন্ধ্যার পর সে ঝিল রোড দিয়ে বাড়ি ফিরছে! অন্ধকার রাস্তা! মাঝে মাঝে বাড়ির ও দোকানের আলো এসে পড়ছে রাস্তার উপর! উঁচু নীচু রাস্তা, খোয়া বের করা, কোথাও বা কাদা প্যাচ প্যাচ করছে।

একটা টিনের ঘরে থিয়েটারের রিহার্সাল হচ্ছিল! উদ্বাস্তুরা পূজার সময় অভিনয় করবেন!

হেমনাথ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়! মহড়ার কিছু কিছু তার কানে যায়, বারান্দায় একটা খুঁটি ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে পথের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য!

পিছন থেকে লোকনাথ এসে রুক্ষ কণ্ঠে বলল, কোথায় ছিলি সারাদিন? সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল!

হেমনাথও রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, গিছলুম *D.A.G.-র আপিসে! তুমি ত' জানতে!*

চাকরির চেষ্টার নামে সারাদিন টো টো করবি!

টো টো করিনি আমি! মিছিমিছি বকছ কেন?

কী! মুখে মুখে জবাব! পাজী কাহাঁকা—বলেই লোকনাথ ভাইয়ের গালে এক চড় মারে!

হেমনাথ অবাক হয়ে যায়! সে বুঝে উঠতে পারে না এত লোকের সামনে দাদা তাকে না-হক অপমান করল কেন?

হেঃ হেঃ Vanity!
ভ্যানিটি আমিও ভারী পছন্দ করি!

লোকনাথের রাগের কারণ সে আজ থিয়েটারের মহড়ায় যেতে পারেনি! কথা ছিল, দ্রৌপদী সাজবে! কিন্তু তার নিজের কাপড়-খানার অবস্থা এমন যে তা পরে পুরুষের পার্ট যদি বা বলা চলে দ্রুপদনন্দিনী সাজা চলে না। হেমনাথ আর দাঁড়াল না। দ্রুতপদে সোজা-সুজি বাড়ি ফিরে এল! মালতী তার পায়ের শব্দ শুনেই বলল, সকাল আটটায় ফেনাভাত খেয়ে বেরিয়েছিস্। হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি খেতে বস এসে!

হেমনাথ বলল, এখন খাব না বৌদি!

তার কণ্ঠে ছিল বেদনা ও অভিমান! মালতী কাছে এসে বলল, কি হল আজ? গালে দাগ কিসের রে? রাস্তায় ঝগড়া হয়েছে বুঝি!

হেমনাথ নীরব।

বল্না কি হয়েছে।

কিছু হয় নি!

মালতীর মনে হয় পথে গোলমাল কিছু হয়েছে! মুরুব্বি খুব সম্ভব নিরাশ করেছে! দাদা বকবে! এই সব নানা কারণে হেমনাথ খেতে চাইছে না! সে বলল, তোর দাদাকে বুঝিয়ে বলব! সে রাগ করবে না, তুই চেষ্টা করছিস, তোর ত' কোন দোষ নেই!

সাধ্যসাধনা করে হেমনাথকে সে এনে পিঁড়েয় বসায়! দু' তিন গ্রাস ভাত মুখে তুলে সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বৌদি, এমন কোন ওষুধ বেরোয় না যা একবার খেলে সারা জীবন আর কিছু খেতে হয় না?

বেরুবে হয় ত' একদিন! কিন্তু তার দাম এত বেশী হবে যে আমরা কিনতে পারব না। তখন বলব এর চেয়ে ভাল ভাতই আমাদের ভাল।

এই সময় উষানাথ এসে উপস্থিত! অন্য দিন এ সময় আসে না! শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি ফিরেছে! উঠানে দাঁড়িয়ে সে দেওর ভাজের কথা শুনছিল! বলল, 'কি রে হেম, কি হল? মুরুব্বি আজ কি বলল?

হেম একটা গ্রাস মুখে তুলছিল, ভাত হাতের মুঠোয়ই রয়ে গেল! সে বলল, গিছলুম। তিনি বললেন, পুরানো লিস্ট বাতিল হয়েছে; আবার নতুন তালিকা হবে!

আর সেই জবাব নিয়ে এসে তুই বড় বড় সমস্যার সমাধান করছিস্ বৌদির সঙ্গে! আমার ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দেই! বেশ আছিস তোরা! একজন টো টো করবি, আর একজন উর্বশী, দ্রৌপদী সাজবি! পথে দেখে এলুম মেজবাবু কার শাড়ী পরে নাকিসুরে দ্রৌপদীর পার্ট করছে! আর ও বাড়ির আশু রাস্কেল করছে তার বস্ত্রহরণ। লোকে চেঁচাচ্ছে, শ্রীমধু-সূদন, শ্রীমধুসূদন! এ দুটোর কোন আশা নেই!

হেমনাথ বলল, মুরুব্বি বলেছেন, পরের তালিকায় আমার নাম উঠবে! কাজ এবারই হয়ে যেত, হয়নি পোষাক আশাক খারাপ বলে!

কেন? পোষাক খারাপ হল কেন? সাবান দিয়ে কেচে নিতে পার না? এই সেদিনও আপিসের কাপড় নিলুম! সেইনি পট্টিপিড্ কাহাঁকা?

হেমনাথ নীরব!

উষানাথ বলল, ইনটারভিউতে খুসি করতে পার নি! রাম বোকা ত'। একেবারে ভেটকি মাছ!

ভেটকি মাছ উষানাথের সব চেয়ে বড় গাল!

হেমনাথ এমনিতে কাঁদে না. কিন্তু আজ টস্ টস্ করে তার চোখের জল পড়তে লাগল ভাতের থালার উপর!

মালতী স্বামীকে বলল, তুমি এখান থেকে যাও দেখি! শুধু শুধু একরত্তি ছেলেকে বকছ!

কিন্তু হেমনাথের খাওয়া আর হল না! লবণাস্বাদ ভাত ফেলে সে উঠে গেল! মালতীও খেল না। দেওরকেও খেতে ডাকল না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল তাদের বিড়ম্বনার কথা। ছেলেকে স্তন্য দিতেও বিরক্তি বোধ করছিল। কি হবে ছেলে মেয়েদের বড় করে। এই ত তাদের ভবিষ্যৎ। পথে পথে ঘুরবে হা ভাত, হা ভাত করে!

* * * *

মাঝে একটা দিন কেটে গেছে! তৃতীয় দিন ভোরে সারা বাংলার লোক সংবাদপত্রে পড়ল 'উদ্বাস্তু তরুণের শোচনীয় জীবনান্ত—'

মঙ্গলবার ভোরে যাদবপুর ষ্টেশনের ডিস্-টাণ্ট সিগন্যালের নিকট একটি উদ্বাস্তু তরুণ

(১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

প্রথম দৃশ্য

[অধ্যাপক ডাঃ অরিন্দম বসুর বাড়ীর উপরতলার ছোট একখানা ঘর—দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড জানালা, তাকালেই একটু দূরে পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো দেখা যায়, গ্রীষ্মের প্রকোপে লাল-হলুদ রং-এর ফুলে শাখা-প্রশাখাগুলো ভরে গেছে।

আসবাবপত্রের মধ্যে আছে মাঝারি আকারের একটি টেবিল, খান দুই চেয়ার, একটা আরামকেদারা এবং খোলা সেলফে ভর্তি বই এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঘরখানা দেখলেই মনে হয় গৃহকর্ত্রী সুশৃঙ্খল এবং সৌখীন। কিন্তু আপাততঃ শৃঙ্খলার ব্যতিক্রমই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ টেবিলের উপর একগাদা বই ছড়ানো আছে, সেলফেও বইগুলি বিপর্যস্ত, এমনকি মেঝের উপরও দু-একটা সাপ্তাহিকপত্র লুটোচ্ছে।

ঘরের এককোণে ছোট একটি টেবিলের উপর টেলিফোন—অটোমাটিক এই অঞ্চলে এখনও অধ্যুষিত হয়নি।

টেবিলের সম্মুখে বসে সুচিত্রা দেবী গল্প লিখছেন। সৌন্দর্যসুষমা যাই যাই ক'রেও তাঁর চোখেমুখে ফুটে আছে। তাঁর বয়স ত্রিশ একত্রিশ হবে।

সময় সায়াহ্ন। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। একটু বিরক্ত হয়ে সুচিত্রা দেবী উঠলেন এবং রিসিভারটা হাতে নিলেন। কলমটা তখনও ডানহাতে আছে।]

সুচিত্রা। হ্যালো...সাউথ ২৪...ও: তুমি?...আবার কি হ'ল?...আরও দেরী হবে?...আজ যে সাড়ে ছ'টার শোতে তুমি আমায় সিনেমায় নিয়ে যাবে বলেছিলে! সম্ভব হবে না?...বেশ, তোমার যখন খুসী আসবে, ফিরে এসে আমাকে যদি বাড়ীতে দেখতে না পাও তাহ'লে অপরাধ আমার নয়, মনে যেন থাকে।

[একটু রাগ ক'রেই যেন সুচিত্রা দেবী টেলিফোনটা বন্ধ ক'রে দিলেন এবং আবার লিখবার টেবিলের সম্মুখে এসে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ এই ব্যাঘাত হওয়ায় লেখা যেন কিছুতেই জমতে চাইল না। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তিনি বাইরের পার্কের দিকে তাকালেন।

একটু পরে টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো। এবার আহ্বানকারী তাঁর স্বামী নন, তাঁর বান্ধবী—শ্রীলতা চক্রবর্তী।]

সুচিত্রা। হ্যালো হ্যাঁ, ভাই, লতা, আমি বাড়ীতেই বসে আছি। কর্তা এখনও বলেছে, কোন্ এক মার্কিণী প্রোফেসার নাকি এসেছেন, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দেবেন, সেটা শুনে বাড়ীতে ফিরবেন।...তা' রাত আটটা ত নিশ্চয়ই হবে।...আমার কোনই প্ল্যান নেই।...তুই এই পাড়ায়ই এসেছিস? নিশ্চয়, আমার এখানে চলে আয়, আমি খুব খুসী হব।...এখ্খুনি চলে আয়।

[টেলিফোন বন্ধ ক'রে সুচিত্রা দেবী আবার লেখায় মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলেন, শ্রীলতার সঙ্গে আলাপের পর লেখার স্ফূর্তি যেন সহজ হয়ে এল। এইভাবে মিনিট পাঁচেক কাটল। ইতিমধ্যে তড়্‌তড়্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে শ্রীলতা উপরে উঠে এল এবং পর্দাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।]

শ্রীলতা। ধন্যি মেয়ে যাহোক্, এখনও বসে বসে লিখছিস? তা বাতিটা জ্বালাস্‌নি কেন?...লিখতে বসলে তোর হুঁস্ থাকে না বুঝি!

[শ্রীলতা সুইচটা টিপে দিল, বিদ্যুতালোকে ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।]

সুচিত্রা। (কলমটা টেবিলের উপর রেখে) লিখছি ত কম নয়, দু'একটা সাপ্তাহিকে ছাপাও হয়েছে, কিন্তু, ভাই লতা, মন ভরছে না। যেখানে প্রকাশ হ'লে সাহিত্যিকের সমজদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেই জাতীয় কোন পত্রিকায়ই ত এ পর্যন্ত স্থান পেলাম না!...মাঝে মাঝে ভয় হয়, নিজের অক্ষমতা হয়ত আমি বুঝতে পারছি না।...গত বছর আমি একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলাম যে কলম আর স্পর্শ করব না, কিন্তু উনিই জোর ক'রে আমাকে আবার লেখার টেবিলে ঠেলে দিলেন।

শ্রীলতা। তুই নাকি এবার একটা গোটা উপন্যাস লিখে ফেলেছিস?

সুচিত্রা। (বিস্মিতভাবে) তোকে আবার এখবর কে দিল?

শ্রীলতা। (রহস্যচটুল হাসি মেশানো স্বরে) এসব খবর দিতে হয় না, পায়রার মারফতে যথাস্থানে পৌঁছয়।

সুচিত্রা। বুঝলাম না...

শ্রীলতা। এর মধ্যে রহস্যের কিছুই নেই। তোর উপন্যাসের নাম দিয়েছিস "হাসি আর আসছেনা", নয় কি?...ভূমিকায় আবার লিখেছিস, "এই উপন্যাসকে অনেকে আমার জীবনের কাহিনী বলে মনে করতে পারেন, তাঁদের আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, পৃথিবীর অভিজ্ঞতার ছাপ লেখিকার মনে যতটুকু পড়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক তার বেশী বা গভীরতর সাদৃশ্য যেন না খোঁজেন..."

[সুচিত্রার বিস্ময় ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল, সে আর সহ্য করতে পারছিল না। দুই হাতে শ্রীলতাকে ঝাঁকিয়ে চীৎকার ক'রে বললো, বল্, তুই কার কাছে শুনেছিস্, শীগ্‌গীর বল...]

শ্রীলতা। আঃ, লাগে!...ছাড়, বলছি।...'সহযাত্রী'র সহকারী সম্পাদক শ্রীপবিত্র মল্লিক হচ্ছেন ও'র ছেলেবেলার বন্ধু......তুই তোর উপন্যাসখানা 'সহযাত্রী'র কাছেই পাঠিয়েছিস্ ত?......পবিত্রবাবু গতকাল আমাদের ওখানে চা' খেতে এসেছিলেন, কথায় কথায় বললেন, সুচিত্রা দেবী আপনার বন্ধু, নয় কি?......আমি জবাব দিলুম, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন ত?......তখন তিনি বললেন যে তুই তোর উপন্যাসখানা পাঠিয়েছিস্ ও'দের কাছে, যদি তাঁরা ধারাবাহিকভাবে সেখানা প্রকাশ করেন......

সুচিত্রা। (সাগ্রহে) তিনি কি বললেন?

শ্রীলতা। বললেন, প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে খুবই ভাল হয়েছে, সব চেয়ে ও'র ভাল লেগেছে তোর ভাষার স্বচ্ছতা এবং প্লটএর বৈচিত্র্য।......তোর ভূমিকাটাও বেশ একটু নতুন ধরণের হয়েছে বললেন।

সুচিত্রা। (একটু বিনয়ের সুরে) নতুন আর কি, লতা, ওরকম ভূমিকা বিদেশী

সাহিত্যে ত অহরহই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।...... আমি বিদেশী লেখকের অনুকরণ করেছি মাত্র।

শ্রীলতা। অনুকরণের মধ্যেও বাহাদুরী থাকা চাই, সুচিত্রা। তোর কৃতিত্ব এই যে, তোর প্রকাশভঙ্গী অনুকরণের স্থূলতা ভেদ করে উঠেছে নিজের গৌরবে।......পবিত্রবাবুও এই কথাই বল্‌লেন।

সুচিত্রা। তাহলে উপন্যাসখানা ও'রা প্রকাশ করবেন?

শ্রীলতা। সেটা ঠিক বল্‌তে পারলেন না, কারণ শেষ বিচারক হচ্ছেন ও'দের সম্পাদক। তবে পবিত্রবাবু খুবই প্রশংসা ক'রে তোর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা সম্পাদকের কাছে পেশ করেছেন।

সুচিত্রা। কতদিনের মধ্যে জানা যাবে?

শ্রীলতা। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সম্পাদক নাকি পবিত্রবাবুর সামনেই পাণ্ডুলিপিটা উল্‌টেপাল্‌টে দেখলেন এবং বল্‌লেন যে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই বল্‌তে পারবেন উপন্যাসখানা মনোনীত হ'ল কিনা। তবে উপন্যাসের নামটা নিয়ে নাকি একটু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, 'হাসি আর আসছে না' এ আবার কি রকম নাম?

সুচিত্রা। (একটু উষ্মার সহিত) কেন? বাংলা দেশেই ত কত লেখক আজকাল আছেন যাঁদের উপন্যাসের নাম আমার দেয়া নামকেও ছাড়িয়ে যায়।......আমার নামকরণের বুঝি যত দোষ?

শ্রীলতা। না, সে কথা বোধ হয় বলছিলেন না। বল্‌ছিলেন যে নামটা একটু অন্যরকম হ'লে পাঠকপাঠিকাদের নজর আকৃষ্ট হবে।......এর উত্তরে পবিত্রবাবু বলে রেখেছেন যে উপন্যাসখানা যদি সম্পাদক মহাশয় পছন্দ করেন তাহলে নামের জন্য আট্‌কাবে না। তোর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা নূতন নাম না হয় দেওয়া যাবে।

সুচিত্রা। (গম্ভীরভাবে) নাম আমি কিছুতেই বদ্‌লাব না।

শ্রীলতা। ছেলেমানুষি করিস্‌নে, সুচি!... নামে কি আসে যায়— গোলাপকে যে নামেই আমরা বর্ণনা করি না কেন, তার সৌরভ, তার কমনীয়তা কোনদিনই কমে না।

সুচিত্রা। (অন্যমনস্কভাবে) সে দেখা যাবে......

[এমন সময় চাকর বনোয়ারিলাল দরজার সম্মুখে এসে বল্‌লে, মাঈজী, চিঠ্‌ঠি আয়া।

সুচিত্রা বাইরে চলে গেল। বনোয়ারিলালের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে ঘরে পুনঃপ্রবেশ করল।]

সুচিত্রা। (কম্পিতভাবে) এ যে 'সহযাত্রী' অফিস থেকে এসেছে!

শ্রীলতা। (আগ্রহের সহিত) দেখি, দেখি! যাক্‌, বাঁচা গেল, শুধু চিঠি, তার মানে তোর উপন্যাস ও'রা গ্রহণ করেছেন। আমার একবার ভয় হয়েছিল, যদি পাণ্ডুলিপিটা ফেরৎ দেন। সম্পাদকদের কথা বলিস্‌ না, ও'দের যেরকম খামখেয়ালী মন, হয়ত বলে বস্‌বেন যে, লেখাটা ভালই হয়েছে, কিন্তু ও'দের পত্রিকার ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় বলে অত্যন্ত দুঃখের সহিত ফেরৎ দিতে হ'ল!

[সুচিত্রা ইতিমধ্যে খামটা খুলেছে, চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করেছে। তার মুখে প্রথমে বিস্ময়ের রেখা, তারপর ক্ষোভ, অবশেষে অপমানে সে পাংশু হয়ে গেল।]

শ্রীলতা। কি লিখেছে রে, সুচি?

[সুচিত্রা কোন কথা বল্‌লে না, নীরবে চিঠিখানা শ্রীলতার হাতে দিল।]

শ্রীলতা। 'মাননীয়েষু, আপনার উপন্যাস 'হাসি আর আসছে না' পড়িয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই। অনেকদিন পর হাসির যথার্থ খোরাক পাইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছি। কিন্তু এই হাসির অংশ আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, কারণ আমাদের ভয় হইতেছে যে, উপন্যাসের আরম্ভে যত মুন্সীয়ানাই থাকুক না কেন, শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদে আপনি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পাঠ করিয়া আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ লাঠি উঁচাইয়া আমাদিগকে মারিতে আসিবেন এবং বলিবেন দস্তয়ভস্কি, মঁপাসা, টমাস হার্ডি এবং কঠোপনিষৎএর এমন বিচিত্র সংমিশ্রণ বাংলার কথাসাহিত্যে অবতারণা করিতে হইলে সুচিত্রা দেবীর চেয়ে একটু বেশী চতুর এবং কম কল্পনাপ্রবণ লেখককে কলম ধরিতে বলা উচিত।..... সুসাহিত্যিক হইবার সম্ভাবনা আপনার লেখার মধ্যে আছে, আমাদের উপদেশ নিজের নাম ভাঁড়াইয়া সম্পাদকের চোখে ধূলি দিয়া অকাল-বোধনের প্রচেষ্টা না করিয়া আপনার যথার্থ রূপ সম্পাদক-গোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপিত করিলে আপনার লেখা অদূরভবিষ্যতে মনোনীত হইতেও বা পারে।......আপনার পাণ্ডুলিপি এই সঙ্গে পাঠাইলাম না, আমার নিজের হেফাজতে রাখিয়া দিয়াছি। যে কোনদিন অফিসে আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সেটি ফেরৎ লইয়া যাইবেন।...নিবেদন ইতি ..."

সুচিত্রা। (তার চোখ প্রায় জলে ভরে এসেছে) কি স্পর্ধা! বলে কি না লেখা আমার নয়, আমি মহিলা লেখিকার নাম নিয়ে ও'দের অনুকম্পা ভিক্ষে করছি!

শ্রীলতা। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, সুচি! পবিত্রবাবু যা বল্‌লেন তাতে এরকম বিদ্রূপাত্মক জবাব আসবে ভাবতেও পারিনি!

[এর উত্তরে সুচিত্রা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল।]

সুচিত্রা। হ্যাঁ, আমি সুচিত্রার কথা বলছি। সাড়ে নটার শোতে সিনেমা?......না, সাড়ে নটার শোতেও আমি যেতে পারব না।......

কেন যেতে পারব না?......

বলছি যেতে পারব না, আমাকে বার বার প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করো না।......আমি যাব না......না...না...না...

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরের দিন। ভোরের আলো তখনও সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। সুচিত্রাদের শোবার ঘর। সারারাত সুচিত্রা ঘুমোতে পারেনি, চোখ মেলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামী অরিন্দম পাশের খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

সুচিত্রা কৃপামিশ্রিত চোখে একবার স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর আবার কড়িকাঠ গোনায় মনোনিবেশ করল।

বাইরে কর্পোরেশনের মেথরেরা রাস্তায় জল দিতে এসেছে। জলের শব্দে অরিন্দমের ঘুম ভেঙে গেল। নিদ্রালু চোখ খুলে সে পাশ ফিরল, সুচিত্রা যেদিকে শুয়ে আছে সেইদিকে।

অরিন্দম। তুমি উঠে পড়েছ?

সুচিত্রা। হুঁ......

অরিন্দম। তুমি সহজেই বড় চঞ্চল হয়ে ওঠো, সুচি!......কোথাকার কোন্‌ 'সহযাত্রী' সম্পাদক তোমার লেখার মর্যাদা দিতে পারেনি' বলে এতখানি উতলা হওয়া কি তোমার মত লেখিকার শোভা পায়?

[সুচিত্রা। নীরব। অরিন্দম ব'লে চল্‌ল।]

অরিন্দম। তোমার কত ছোটগল্প অন্যান্য কাগজে লুফে নিয়েছে। এই তোমার প্রথম উপন্যাস, যদি কোন একজন সম্পাদক পছন্দ না ক'রেই থাকেন তাতে দুঃখ করবার কি আছে?......অন্য কোন পত্রিকায় পাঠাও, দেখ তারা কি বলে।

সুচিত্রা। (সংক্ষেপে) গল্প উপন্যাস আমি আর লিখব না।

অরিন্দম। আঃ, চট্‌ করে এরকম ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে বসোনা! তোমাদের সমরসেট্‌ মম্‌ তাঁর আত্মজীবনীতে কি বলেছেন ভুলে গেলে? ও'র প্রথম বয়সের লেখা কত সম্পাদক ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট্‌এ ফেলে দিয়েছিলেন, অথচ আজ তারা তাঁর লেখা দু'লাইন পেলে নিজেদের ধন্য মনে করেন।......বার্ণার্ড শ'র জীবন-কাহিনীটাও ভেবে দেখো, সুচিত্রা!

সুচিত্রা। আমি মমও নই, শ'ও নই।

অরিন্দম। তা' তুমি কি ক'রে প্রমাণ করবে? তোমার মধ্যে কি ক্ষমতা লুকোনো আছে তা' বার করবে পৃথিবীর লোকে, তাদের অনুভূতির মধ্য দিয়ে তুমি নিজেকে দেখতে পাবে নতুন পরিচয়ে।

সুচিত্রা। নতুন পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নেই।

অরিন্দম। আমি একটা কথা বলতে পারি?

সুচিত্রা। স্বচ্ছন্দে।

অরিন্দম। বল্‌ছি কি, তুমি লেখাটা মাসখানেক ফেলে রাখো। তারপর আবার খুলে দেখ একমাস আগে তুমি যা লিখেছিলে তা তোমার নিজের কাছেই ভাল লাগছে কি না। হয়ত দেখতে পাবে আগে যা লিখেছিলে তারমধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে তোমার বিচ্যুতি কোথায়।

সুচিত্রা। আমি ত তোমায় আগেই বলেছি, লেখার ত্রিসীমানায় আমি আর ঘেঁষব না।

[বাইরে বনোয়ারিলালের গলার শব্দ শোনা গেল।]

—মাঈজী, চা' তৈয়ার হ্যায়।

অরিন্দম বল্‌লে, চা এখানে দিয়ে যা'।

[বনোয়ারিলাল ট্রেতে ক'রে দু'জনের মত চা ছোট একটি টেবিলের উপর রেখে বার হয়ে গেল। অরিন্দমই চা' তৈরী করতে সুরু করল।]

অরিন্দম। (সুচিত্রার সম্মুখে এক পেয়ালা চা ধরে) চাটা খেয়ে নাও, সুস্থ বোধ করবে।

সুচিত্রা। অসুস্থ আমি মোটেই হইনি।

[অরিন্দম নীরবে চা'এর পেয়ালায় চুমুক দিল।]

বনদেবী

গোপাল ঘোষ

অরিন্দম। (একটু পরে) সুচি.....

সুচিত্রা। কি ?

অরিন্দম। মিত্র-ঘোষদের ওখানে গয়নাটার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে, কিন্তু ব্যাঙ্কে ত একটিও পয়সা নেই!

সুচিত্রা। গয়নার প্রয়োজন নেই, অর্ডার ক্যানসেল করে দিয়ে এসো।

অরিন্দম। সে কি করে সম্ভব? আমাদের দেওয়া ডিজাইন মত গয়না তৈরী করছে, এখন কি করে বলবো যে গয়নার প্রয়োজন নেই!

সুচিত্রা। গয়না আমি পরব না। আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই বলেছিলাম, গয়নার অর্ডার দিয়োনা।

অরিন্দম। কিন্তু এবার যে আমাদের বিয়ের এনিভারসারী, সুচি!...বিয়ের পর অবধি আমি তোমাকে একটা সামান্য জিনিসও দিতে পারিনি!

সুচিত্রা। আমিও ত ঠিক ঐ কথাই বলছিলাম। বিয়ের পর নয় বৎসরই যদি এইভাবে কেটে থাকে তবে সে আজ নতুন এক অধ্যায়ের পত্তন না করলেই কি ভাল হ'ত না?

অরিন্দম। (কাতরভাবে) আমার প্রতি অবিচার করোনা, সুচি! কলেজ থেকে যা' মাইনে পাই তার প্রতিটি পয়সা চলে যায় সংসারের খরচে। পরীক্ষার খাতা দেখে যে সামান্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কএ তুলেছিলাম তাও গত বছর নিঃশেষ হয়ে গেল প্রমীলার বিয়েতে। এবার য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষকদের ব্যাহও ভেদ করতে পারলাম না! অথচ যে টাকাটা দরকার তা কত সামান্য—মাত্র তিনশ'!

সুচিত্রা। তিনশ' টাকার গয়না পরবার মত সৌভাগ্য আমি করে আসিনি। আমি আমার দেনার কথা বলছি—মিত্র-ঘোষদের বলে এসো গয়নার দরকার নেই।

অরিন্দম। (সসংকোচে) আমি ভেবেছিলাম তোমার উপন্যাসটা যদি ওঁরা নিতেন তাহলে কিছুটা টাকা হয়ত পাওয়া যেত.....

সুচিত্রা। (তীব্রভাবে) ওঃ—তুমি আমার টাকা দিয়েই আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিলে বুঝি? ভালবাসার চমৎকার নিদর্শন কিন্তু!

অরিন্দম। না, গো, না! আমি তোমার কাছ থেকে শুধু ধার নিতে চেয়েছিলাম। সারা বছরের মধ্যে কোন না কোন দিক থেকে অতিরিক্ত আয় হবে নিশ্চয়ই—আমি ভেবেছিলাম বছর না ঘুরতেই তোমার ধার শোধ করে দেব।

সুচিত্রা। বুঝেছি।...কিন্তু আমার আয়ের আশাটা যখন একেবারেই উবে গেল, তখন গয়নার আশাটাও বর্জন করলে হয় না?

অরিন্দম। কেন বারবার ঐ এক কথা বলে তুমি আমাকে কশাঘাত করছ, সুচিত্রা?...অর্ডার দিয়েছি এবং যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করবই!

[সুচিত্রা কিছু বললনা। খানিকক্ষণ উভয়েই নীরব হয়ে রইল। অরিন্দম চায়ের শূন্য পেয়ালাগুলি ট্রের উপর রেখে দিল।]

অরিন্দম। (হঠাৎ সোৎফুল্লে উঠে) একটা ভারী মজার প্ল্যান মাথায় এসেছে। যদি ঠিকমত খাটে যায় তা হলে আমাদের সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে!

[সুচিত্রা বিস্মিতভাবে অরিন্দমের দিকে তাকাল।]

অরিন্দম। তুমি কিছু ভেবো না, সুচিত্রা। শুধু আমাকে তোমার সেই চিঠিটা একবার দেখতে দাও ত!

সুচিত্রা। কোন্ চিঠি?

অরিন্দম। সেই যে "সহযাত্রী" অফিস থেকে এসেছিল—তোমার উপন্যাস সম্বন্ধে।

সুচিত্রা। কেন, চিঠির আবার কি প্রয়োজন? পড়ে ত তুমি দেখেই নিয়েছ!

অরিন্দম। আর একবার দেখা দরকার। বলো, কোথায় রেখেছ?

সুচিত্রা। (ক্লান্তভাবে) ছোট ঘরের টেবিলের দেরাজে আছে—ক্যালেণ্ডারের পিছনে পাতার ভেতরে!...চিঠিটা ফেলে দিয়ো না, কিন্তু...আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা ফেরৎ নিয়ে আসতে হবে।

অরিন্দম। যাতে ফেরৎ আনতে না হয় সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি।.....তুমি ভেবো না, সুচিত্রা, তোমার উপন্যাস "সহযাত্রী"তে ছাপা হবেই, আমি বাজি রাখতে রাজী আছি!

[অরিন্দম তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হয়ে গেল, আর সুচিত্রা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[সেই দিনেই, বেলা এগারোটা।

"সহযাত্রী" মাসিক পত্রিকা অফিসে সম্পাদকের ঘর। সম্পাদক শ্রীঅপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একগাদা চিঠি এবং গল্প প্রবন্ধ কবিতার স্তূপের মধ্যে প্রায় নিমজ্জমান।

তাঁর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীনরেশ পাকড়াশী তাঁরই সম্মুখে বসে আছেন।]

অপরেশ। কি ফ্যাসাদেই আমাকে ফেলেছ তুমি, নরেশ! ভবিষ্যতে তোমার উপর নির্ভর করা আমার মোটেই চলবে না দেখছি।

নরেশ। আমি কি করে জানব, স্যার, যে উপন্যাসখানা লিখেছেন আমাদের ডাঃ অরিন্দম বসু? আগাগোড়া মেয়েলি হাতে লেখা......

অপরেশ। বোকার মত কথা বলো না, নরেশ! আগাগোড়া মেয়েলি হাতে লেখা বলেই ত তোমার মনে হওয়া উচিত ছিল যে, লেখাটা সুচিত্রা দেবীর। তা হলে তুমি কেন আমাকে বল্লে যে, লেখাটা কোন পুরুষমানুষের—মেয়ের ছদ্মনামে তিনি আমাদের পত্রিকার আসরে নামতে চান?

নরেশ। ঐখানে ত আমার কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে, স্যার। হাতের লেখাটা যদিও মেয়েলি তবু ভাব, ভাষা, ভঙ্গী সবই পুরুষোচিত। এতদিন ধরে কত গল্প, কত উপন্যাস আমার হাত দিয়ে এসেছে, গেছে, কোনদিন ত চিন্‌তে কষ্ট হয়নি কোন্‌টা পুরুষের, কোন্‌টা মেয়েদের লেখা!

অপরেশ। অরিন্দমবাবু আমাদের বহু পুরানো লেখক। লেখেন না বেশী, কিন্তু তাঁর সারগর্ভ প্রবন্ধ পেলে আমরা ধন্য হয়ে যাই, প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপে থাকি আমরা। ...প্রবন্ধের জন্য কোন পারিশ্রমিক আমরা সাধারণতঃ দিয়ে থাকিনে সত্য, কিন্তু তোমার বোধ হয় মনে আছে আমরা গত মাসেই আলোচনা করছিলাম এবার থেকে অরিন্দমবাবুকে কিছু দর্শনী না দিলে তাঁর লেখা হয়ত আর পাবনা! ...আর তোমার মূর্খামির ফলে সেই অরিন্দমবাবুকে আমি এমনভাবে অপমান ক'রে ফেল্‌লাম!

নরেশ। আমি কি ক'রে জান্‌ব, স্যার, যে সুচিত্রা দেবী হচ্ছেন অরিন্দমবাবুরই স্ত্রী! সুচিত্রা দেবী দিয়েছেন তাঁর বাড়ীর ঠিকানা, আর অরিন্দমবাবু বরাবর আমাদের কাছে দিয়ে থাকেন তাঁর কলেজের ঠিকানা। ...তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, অরিন্দমবাবুর এইপ্রকার নাম ভাঁড়ানোটা আমি মোটেই লেখকগোষ্ঠীর এটিকেট্‌ অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে কর্‌তে পারছিনা।

অপরেশ। তোমার মাথায় ঐ একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, লেখাটা সুচিত্রা দেবীর নয়, লেখাটা হচ্ছে কোন পুরুষমানুষের। ...কই, পবিত্র মল্লিক ত সেকথা বলেনি! উপন্যাস সম্বন্ধে পবিত্রর মন্তব্যটা দেখেছ ত?

নরেশ। দেখেছি বই কি, স্যার। কিন্তু আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, উপন্যাস সম্বন্ধে পবিত্রবাবুর কোনই অভিজ্ঞতা নেই। উনি হচ্ছেন ছোট গল্পের সম্পাদক—তাছাড়া যেই দেখেছেন মেয়েলি হাতে লেখা, অম্‌নি স্বাভাবিক দুর্বলতা এসে ও'র বিচারবুদ্ধিকে ক'রে দিয়েছে পঙ্গু...

অপরেশ। (তীব্রভাবে) বাজে কথা ব'লোনা, নরেশ। তোমার বিচারবুদ্ধি যে কত উঁচুদরের তা' বুঝ্‌তে পারছি তোমার কথার মধ্য দিয়ে। একবার বল্‌ছ লেখাটা সুচিত্রা দেবীরই, আবার বল্‌ছ সুচিত্রা দেবী বলে কেউ নেই, লেখাটা হচ্ছে কোন পুরুষমানুষের। এর মধ্যে কোন্‌টা সত্যি?

নরেশ। (একটু আহত স্বরে) আমি ত কখনও বলিনি, স্যার, যে লেখাটা সুচিত্রা দেবীর। আমি বরাবরই ব'লে এসেছি লেখাটা আসলে কোন পুরুষমানুষের।

অপরেশ। তাই যদি হয় তাহ'লে তুমি স্বীকার করছ্‌ যে লেখাটা অরিন্দমবাবুর।...... তাঁর লেখা সম্বন্ধে তুমি বল্‌লে কিনা যে, তিনি চর্বিতচর্বণ করেছেন, এবং তা'ও ভালভাবে নয়! তাঁর প্রবন্ধগুলো কি তুমি কখনও দেখনি'?

নরেশ। মাপ কর্‌বেন, স্যার, এই উপন্যাস-খানা যদি অরিন্দমবাবুর লেখা হয়ে থাকে, তাহ'লে তাঁর লেখ্‌বার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার মত বদ্‌লাতে হচ্ছে...

অপরেশ। মত বদ্‌লাতে হবে? ...একবার চেষ্টা ক'রে দেখ দেখি অরিন্দমবাবুর লেখার ত্রিসীমানায় ঘেঁষ্‌তে পারে এমন লেখা তুমি নিজে সৃষ্টি কর্‌তে পার কিনা! ...আর তোমার কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রে আমি নিজে একবার পড়েও দেখ্‌লাম না, একটা কদর্য চিঠি লিখে দিলাম অরিন্দমবাবুকে!

নরেশ। আপনি ত অরিন্দমবাবুকে লেখেননি, স্যার, আপনি লিখেছেন সুচিত্রা দেবীকে!

অপরেশ। তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। খামের উপর সুচিত্রা দেবীর নাম থাক্‌লেও ভেতরে যা' লিখেছি তা' কি কোন পুরুষমানুষকে লক্ষ্য ক'রে লেখা নয়? ...অরিন্দমবাবু আজ টেলিফোনে আমাকে যে দু' একটি কথা বললেন, তার কোন প্রতিবাদই আমি করতে পারলাম না। ...লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

[এই সময় চাপরাশী এসে অপরেশবাবুর সম্মুখে একখানা কার্ড রাখ্‌লে।]

অপরেশ। এই ত ডাঃ বসু নিজেই চলে এসেছেন। ...যাও, তুমি বাইরে যাও। শুধু রঘুকে ব'লো দু' পেয়ালা চা' তৈরী ক'রে যেন পাঠিয়ে দেয়, বেশ গরম তাজা চা, আর তার সঙ্গে খানকয়েক কচুরী এবং সিঙ্গাড়া।

[নরেশ বাইরে চলে এল, তার পেছনে পেছনে এল চাপরাশী। অনতিবিলম্বে ডাঃ অরিন্দম বসু ঘরে ঢুকলেন। অপরেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত বাড়িয়ে ডাঃ বসুকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন।]

অপরেশ। এই যে আসুন, ডাঃ বসু, বসুন। গরীবের এই অফিসে আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য!

অরিন্দম। প্রথমেই আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি, অপরেশবাবু। টেলিফোনে আপনাকে হয়ত একটু কড়া কয়েকটা কথা বলে ফেলেছি—যার প্রয়োজন বোধ হয় ছিল না...

অপরেশ। সে কি কথা, ডাঃ বসু, মার্জনা চাইব ত আমি—নিতান্ত না বুঝে ঐ যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেজন্যে!

অরিন্দম। আপনাদের ত দোষ ছিল না, চিঠিটার উত্তেজনা যে জাগিয়েছিলাম আমি! হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল—নিজের নাম ভাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীর নাম দিয়ে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা পাঠালাম আপনার কাছে। এই আমার প্রথম উপন্যাস ব'লে মনে হয়ত একটু সংশয়, একটু দ্বিধাও জেগেছিল। তাই ভাবলাম কোন মহিলার লেখা ভেবে আপনাদের যদি করুণার সঞ্চার হয়।

অপরেশ। আমরা কিন্তু সেটা সহজেই ধরতে পারি, ডাঃ বসু! তবে কি জানেন, আমার ত্রুটি হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যরকমের। আপনার কাছে অকপট একটা স্বীকারোক্তি করছি, লেখাটা আমি নিজে পড়িনি। আমার এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলাম, তিনি মাঝখান থেকে কয়েকটা জায়গা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, সেগুলো শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, উপন্যাসের আরম্ভ যদিও অত্যন্ত ড্রাম্যাটিক্‌, শেষদিকে যেন ব্যালান্স হারিয়ে গেছে, তাছাড়া নানারকম দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক থিওরির চাপে গল্পের গতিভঙ্গীও যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।...... আমার বন্ধু কেবল এই কথাই আমাকে বল্‌ছিলেন...

অরিন্দম। তিনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন, অপরেশবাবু!

অপরেশ। বিলক্ষণ! ...আপনার টেলিফোন পেয়েই আমি আপনার পাণ্ডুলিপিটা খুলে পড়লাম, আগা থেকে গোড়া অবধি। নিঃসঙ্কোচে এখন স্বীকার করছি যে, আমাদের বিরাট ভুল হয়ে গেছে। এরকম উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি...এবং আমরা গৌরব বোধ করব যদি আপনি আমাদের অনুমতি দেন ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি আমাদের পত্রিকায় ছাপতে—আগামী বৈশাখ মাস থেকে।...অবশ্য আমরা আপনার নিজের নামে ছাপতে চাই।

অরিন্দম। কিন্তু, দেখুন, আপনার ঐ চিঠি লেখার পর...

অপরেশ। (সানুনয়ে) আপনাকে আগেই বলেছি, ডাঃ বসু, আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে এবং সেজন্য আমি মার্জনা চাচ্ছি।

[ইতিমধ্যে চাপরাশী দুই পেয়ালা চা' এবং একটি প্লেটে গোটা কয়েক কচুরী এবং সিঙ্গাড়া টেবিলের উপর রেখে বাইরে চলে গেল।]

অপরেশ। আপনি এখ্‌খুনি উঠবেন না, ডাঃ বসু। এক পেয়ালা চা' না খেলে বুঝ্‌ব আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি।

অরিন্দম। চা' খেতে আমার আপত্তি নেই,

(ইহার পর ১২৭ পাতায়)

আমি যবে চলে যাব

● কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমি যবে চলে যাবো পৃথিবীর
শিশির ও ঘাসে
পড়বে সোনালি রোদ অঘ্রাণের মাসে?
ফসল কি উপহার দিয়ে যাবে তারা?
সেই এক কুমারীর চোখের ইসারা অনায়াসে
অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করবার
মন্ত্র বুঝি গেছে রেখে বসন্ত উচ্ছ্বাসে।

যে-সব সোনালি রোদ পড়েছে অঘ্রাণে
কথা আর গান আর জীবন প্রাঙ্গণে
সহস্র সহস্রবার হেসেছে কেঁদেছে
গ্রীষ্ম-শরৎ-শীতে অশান্ত আকাশে।

আমি যবে চলে যাবো পৃথিবীর
শিশির ও ঘাসে
জ্বলবে অনেক রোদ আকাশে-বাতাসে॥

পলকা সুতোর ঘুড়ি

ধীরাজ ভট্টাচার্য
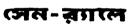
আকৃতি প্রকৃতি রুচি—কোনওটার সংগে মিল না থাকলেও অলক্ষ্যে কোথায় যেনো একটা ছোট্ট যোগসূত্র আত্ম-গোপন করে ছিল, নইলে অবিনাশের সংগে এত দীর্ঘদিন বন্ধুত্ব আমার অটুট থাকতো না—একদিন না একদিন চিড় খেয়ে যেতোই।

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম ভর্তি হয় অবিনাশ—তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই কি করে যে অতোখানি ঘনিষ্ঠতা হল—ভাবতেও অবাক লাগে। ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম ডানপিটে ছেলের দলে। মারামারি, দল পাকানো, পরনিন্দা এসব তো ছিলই, তাছাড়া লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া, মেয়েদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ আলোচনা এও রীতিমত চলতো আমাদের দলে। মরালিষ্ট ভাল ছেলের দল আমাদের বেশ ভয় করেই চলতো—আর পারত-পক্ষে আমাদের বেঞ্চের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতো না। স্বল্পভাষী গম্ভীর অবিনাশই ছিল এর একমাত্র ব্যতিক্রম। বেশ বুঝতে পারতাম—আমাদের এইসব আলোচনা ও মোটেই পছন্দ করতো না, তবুও মুখফুটে কোনদিন প্রতিবাদও করেনি বা আমার ঠিক পাশের সিট থেকে উঠেও যায়নি। ঠায় সিটে বসে নীচের দিকে চেয়ে লাল হয়ে ঘামত; আর নখ খুটতো, এতেও নিষ্কৃতি ছিল না, দুষ্টু ছেলের দল অবিনাশের নামের পাশে যতসব বিশেষণ দিতেও ছাড়ত না। যথা ভিজে বেড়াল, বর্ণচোরা, দুষ্কর্মের পাদরী ইত্যাদি। একটা জিনিষে শুধু মনে মনে সবাই শ্রদ্ধা করতো ওকে, লেখা-পড়ায় অসম্ভব ভালো ছিল অবিনাশ। প্রতি পরীক্ষার প্রথম বা দ্বিতীয়; এর বাইরে যেত না—আর এইখানেই আমার সংগে খানিকটা মিল ছিল ওর, এতো দুষ্টুমি করেও পরীক্ষার ফল খারাপ হত না।

অবিনাশের বাবা পাটনায় বড় চাকরী করতেন—রিটায়ার্ড হয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় প্রকান্ড বাড়ী, গাড়ী, ব্যাংকে প্রচুর টাকা—আর এসবের একমাত্র উত্তরাধিকারী অবিনাশ। অবিনাশের পোষাকে আষাকে, কথা বার্তায়, চাল চলনে ধারণাও করা যেত না যে ব্যাক-গ্রাউন্ডে অত বড় একটা ঐশ্বর্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও জানতাম না—ওর সংগে আলাপ হবার বছর দুই বাদে কি একটা উপলক্ষ্যে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। বাড়ী দেখেই তো চক্ষুস্থির—বালিগঞ্জে প্রায় এক বিঘের ওপর জমিতে বাগান ও বাড়ী। আমার হতভম্ব ভাব দেখে ও সংকোচে এতটুকু হয়ে গেল। সেদিন থেকে অজ্ঞাতে কেমন একটা শ্রদ্ধাও এসে গেল ওর ওপর। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে নয়, ওর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ওপর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভাল বৃত্তি পেয়ে পাশ করলো অবিনাশ। বৃত্তি না পেলেও ভাল নম্বর পেয়েই পাশ করলাম আমি। আই-এ পড়তে ও ভর্তি হল প্রেসিডেন্সী কলেজে; আই এস-সি নিয়ে আমি ঢুকলাম আশুতোষে। ভাবলাম যোগসূত্র বোধ হয় এইবার ছিন্ন হল—হল না। প্রতি রবিবার বা ছুটীর দিনে অবিনাশ এসে হাজির হত আমার ছোট্ট বাইরের ঘরটিতে। ভাংগা তক্তপোষের ওপর পাতা ময়লা মাদুরটার এক পাশে চুপটী করে বসে আমাদের আলোচনা শুনতো, বেলা বেড়ে উঠলে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়িয়ে বলতো—চলি, আর একদিন আসবো। ওকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরতো—কিন্তু কেন যে ও আসে, চুপ করে অতক্ষণ কেনই বা বসে থাকে—এর কোনও মীমাংসাই হতো না। এর পরের ঘটনাগুলো খুব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত। হঠাৎ পড়া ছেড়ে চাকরীর চেষ্টায় কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। অবিনাশ কিন্তু সরস্বতীর সোপানগুলোর উঁচু মাথা খুঁজে পড়ে রইল। আই. এ থেকে সুরু করে এম এ, তারপর ল' পাশ করে তবে মুখ তুলে বহির্জগতের দিকে ফিরে চাইল। খবরটা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—ঐ লাজুক মুখচোরা ছেলে উকিল হোল? কিছু দিন বাদেই ওর মুনসেফ হবার খবরটা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার ডানপিটে বন্ধুবান্ধবের দল কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল বলতেই পারলাম না। অবিনাশ কিন্তু কলকাতায় থাকলেই নিয়মিত দেখা করে যেত। একদিন ঠাট্টা করে বলে-ছিলাম আর কেন, এইবার বে থা করে একটা আস্তানা বাঁধবার চেষ্টা কর, আর কতদিন এইভাবে ভেসে বেড়াবে। ভীষণ লজ্জায় হয়ে জবাব দিয়েছিল অবিনাশ—বিয়ে? ওরে বাবা রে, ওসব আমার ধাতে সইবে না। তার চেয়ে এইতো বেশ আছি। বলেছিলাম কিন্তু তোমার বাবা মা, তাঁরা কিছু বলছেন না? উত্তরে অবিনাশ ম্লান হেসে বলেছিল—তাঁরা কর্তব্যের ত্রুটি কিছুই করছেন না, কিন্তু 'বয়েতো করব আমি।' এর কোনও জবাব খুঁজে পাইনি সেদিন।

এরপর বছর খানেক অবিনাশের সংগে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। সরকারী চাকরীতে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল, তবু ওরই মধ্যে সময় করে ওর বাড়ীর ঠিকানায় দু' তিন খানা পত্র দিয়েছিলাম—জবাব পাইনি। **আরও একবছর কাটলো—আমার জীবনের ওপর দিয়ে একটা মস্ত বিপ্লবের ঢেউ বয়ে**

গেল। সরকারের চাকরী ছেড়ে বায়োস্কোপের অভিনেতা হয়ে ঢুকে পড়লাম এক অন্য জগতে। এই বিচিত্র জগতের অধিবাসীদের সঙ্গে অবিনাশের মত ছেলের যোগসূত্র রাখা ও থাকা সম্ভব নয়, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওকে। হঠাৎ জেসিডি থেকে এক চিঠি পেলাম অবিনাশের, লিখেছে,—ভাই,

ইচ্ছে থাকলেও অনেক দিন খোঁজ-খবর নিতে পারিনি, সে জন্য প্রথমেই মাফ চাইছি। হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছি, কাউকে বলতে পারিনি। জানি তুমি আজকাল ছবির কাজে খুব ব্যস্ত, তবুও যদি দু'দিনের ছুটি নিয়ে একবার আসতে পার—তোমার বৌদি ও আমি খুব খুসী হব। রাতের গাড়ীতেই এস—ভোরে পৌঁছে যাবে। আমরা ষ্টেশনে থাকবো। ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমাদের

অবিনাশ

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এতদিন বাদে বিয়ে করেছে অবিনাশ, নিশ্চয় লভ্ম্যারেজ, হানিমুন করতে গেছে শুকনো পাহাড়ের দেশ জেসিডিতে, আমি ফিল্মে কাজ করি জেনেই বৌ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। অবাক হবার এতগুলো এলিমেণ্ট এক সঙ্গে কারো ভাগ্যে জুটেছে কিনা আমার জানা নেই।

সত্যিই সে সময় কাজের খুব চাপ, জোর স্যুটিং চলেছে, ছুটী পাওয়া এক রকম অসম্ভব। অন্য কেউ হলে গ্রাহ্য করতাম না কিন্তু এতদিন বাদে অবিনাশ! কৌতূহল চুপ করে থাকতে দিলে না। অতি কষ্টে দু'দিনের ছুটী নিয়ে পরদিনই রাতের গাড়ীতে জেসিডি রওনা হয়ে পড়লাম।

(দুই)

ভোরেই জেসিডি ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। অনুসন্ধানী চোখ দুটো দিয়ে সারা প্লাটফর্মটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম না যাকে ভুল করেও অবিনাশের বউ বলে মনে হতে পারে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু অবিনাশ আর ওর হাত ধরে দশ-এগারো বছরের একটা ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়ে। গাড়ী থামতেই ছোট স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। অবিনাশ বা আমি কিছু বলবার আগেই মেয়েটা এগিয়ে এসে বললে 'আপনি তো দাদাবাবুর বন্ধু? বায়োস্কোপ করেন। দেখেছি, দক্ষযজ্ঞ ছবিতে আপনিই তো শিব সেজেছিলেন?' এতগুলো প্রশ্নের ছোট্ট একটি উত্তর দিলাম হ্যাঁ। অবিনাশের দিকে চেয়ে বললাম—কে?

মৃদু হেসে অবিনাশ বললে অতএব শ্যালিকা নিভা।

বললাম, তোমার স্ত্রীর আসবার কথা ছিল না?

অবিনাশ কিছু বলবার আগেই নিভা বললে—'আপনার সব ছবিই আমরা দু'বার-তিনবার করে দেখি, দাদাবাবু কিন্তু কোন ছবি দেখে না, বলে ভাল লাগে না। ম্যাগো, কি যে লোক! আপনিই বলুন তো, বায়োস্কোপ ভাল লাগে না?' একটু বেশী কথা বলা অভ্যাস নিভার। অবিনাশকে বললাম—তোমার স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

'না না সে সব কিছু নয়, মানে আসতে চাইলে না, লজ্জাটা একটু বেশী কি না, বললে,—তোমরা যাও আমি বরং রান্নাবান্নার যোগাড় দেখি।' প্রসঙ্গটা যেন চাপা দেবার জন্যেই অবিনাশ তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে বললে—'চল না—এগুনো যাক, এই তো কাছেই বাসা।'

ষ্টেশন ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। একটু গিয়েই সামনে বাঁ হাতের রাস্তা দিয়ে

এই আমার স্ত্রী মমতা—একটু বেশী সেকেলেপন্থী আর লজ্জাটা একটু বেশী।

চলতে চলতে বললাম,—তা ভারতবর্ষে এত সব মনোরম জায়গা থাকতে এই রসকসহীন পাথুরে দেশ জেসিডিতে মধুযামিনী করতে এলে কেন? বেশ বুঝতে পারলাম লজ্জায় লাল হয়ে গেছে অবিনাশ, প্রবলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'না না মধুযামিনী টামিনী নয়, বৌটা রোগা।' থমকে দাঁড়িয়ে বললাম—বৌটি রোগা?

ম্লান হেসে বললে অবিনাশ 'হ্যাঁ তোমার বৌদির আমার দুজনেরই। ডাক্তার বললে, অন্ততঃ মাস দুই-এর ছুটী নিয়ে কোনও শুকনো জায়গায় চলে যান। এই দেখো না।' ডান পাটা বাড়িয়ে কাপড়টা উঁচু করে দেখালে অবিনাশ। দেখলাম সত্যিই পায়ের পাতা গোছা বেশ ফুলো। বৌদির ষ্টেশনে না আসবার কারণ খানিকটা বুঝলাম।

পাঁচ মিনিটের পথ—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। রাস্তা থেকে একটা উঁচু মাটির ঢিবি উঠে গেছে—তিন চারটে ধাপ উঠে গিয়েই সামনে পড়ে ছোট একটা উঠোন, উত্তর দিকে একতলা সারি সারি তিনখানা ঘর, সামনে সিমেণ্ট করা বারান্দা, উঠোনের দক্ষিণ দিকে রান্নাঘর, তার পাশে পাতকুয়ো, দেখে মনে হল বাড়ীটা আনকোরা নতুন। অবাক হয়ে চারদিকে চাইছি, আর ভাবছি। অবিনাশ এই বাড়ী নিয়েছে? ওদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে চাকর ড্রাইভারও এর চাইতে ভাল কোয়ার্টার্সে থাকে। নিভা চিৎকার করে রান্নাঘরে ছুটে গেল—'ও দিদি, তোমার দক্ষযজ্ঞের শিব এসেছে,' পরক্ষণেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। বুঝলাম এই অতি উচ্ছ্বাসের জন্য তিরস্কার পেয়েছে নিভা।

আস্তে আস্তে অবিনাশের সঙ্গে প্রথম ঘরটায় ঢুকে পড়লাম। বুঝলাম এইটেই বাইরের ঘর। এক পাশে তক্তপোষের ওপর বিছানা পাতা,—পাশেই একখানা নতুন বড় টিনের চেয়ার। সব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে। টিনের চেয়ারটার ওপর স্যুটকেসটা রেখে তক্তপোষের ওপর বিছানায় বসলাম। বেশ বুঝতে পারলাম আমার এই হতভম্ব ভাব দেখে অবিনাশও বেশ অস্বোয়াস্তি বোধ করছে। কিছু একটা বলতে হয় তাই বললাম—'বাঃ দিব্যি ছোটোখাটো বাড়ীটা মনে হচ্ছে তুমিই প্রথম ভাড়াটে।'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল অবিনাশ, তাড়াতাড়ি বললে,—'নাও, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমি দেখি চায়ের কদ্দুর হল।' বুকের ওপর দিয়ে গট গট করে চলে গেল অবিনাশ।

[illegible] ওপর চা, টোস্ট, [illegible] দুটো ডিম সিদ্ধ, আর দুটো সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকলো একটা আধা বয়সী বিধবা মেয়েছেলে, ঘোমটায় মুখের বারো আনাই ঢাকা, থাকলেও বুঝতে কষ্ট হয় না, যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। ভাবলাম বোধ হয় অবিনাশের দূর সম্পর্কে আত্মীয়া বা রাঁধুনী হবেন। প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গেলাম, তারপর তাড়াতাড়ি হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে সুটকেসটার ওপর রাখলাম। কোনও কথা না বলে ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিল—সুটকেস সমেত চেয়ারটা কাছে টেনে এনে বিছানায় বসেই অনশন ভঙ্গ সুরু করলাম। একটা আস্ত ডিম মুখে পুরে দিয়েছি—এমন সময় অবিনাশ ঘরে ঢুকে বললে—'চা খেয়ে একটু বিশ্রাম কর ভাই—আমি বাজারটা করে আসি।' বিষম খেতে খেতে তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিয়ে ধাক্কা সামলে নিয়ে দেখি অবিনাশ ততক্ষণে রাস্তায় নেমে বাজারের পথ ধরেছে। অবাক হ'য়ে ভাবলাম এসব কী ব্যাপার! অবিনাশ, যার পয়সা খাবার লোক নেই, সে একটা চাকর রাখেনি—নিজে চলেছে বাজার করতে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে একমাত্র অবিনাশ। কিন্তু কিসের জন্য এসব হেঁয়ালি!

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বারান্দায় হাত ধুতে গিয়ে দেখি—নিত্য রকে বসে একখানা টোস্ট খেতে খেতে আমায় দেখতে পেয়ে চকিতে ম্লান মুখে অপরাধীর মত রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো। বুঝলাম আমার সঙ্গে দেখা করা বা কথাবার্তা কওয়া, ওর নিষেধ। কিন্তু কেন?

ঘরে ঢুকে দেখি ইতিমধ্যে যাদুমন্ত্রে কে যেন ট্রেটা নিয়ে গেছে, আর সেইখানে রেখে গেছে ছোট্ট একটা রেকাবিতে দুটো পান—আর মসলা। পান খাই না, দুটি মসলা মুখে দিয়ে ভাবলুম—যা থাকে কপালে, অবিনাশ বাজার থেকে ফিরলেই আগে এর হেস্তনেস্ত করে তবে অন্য কথা।

রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি—শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম মনে নেই।

(তিন)

ভাত খাবার জন্য পায়ে ধাক্কা দিয়ে অবিনাশ ডাকছিল, ধড়মড় করে উঠে দেখি বেলা একটা বেজে গেছে। অবিনাশ হেসে বললে, 'ট্রেনে মোটেই ঘুম হয়নি, না?' বললাম—'একদম না, ট্রেনে আমার কোনও দিনই ঘুম হয় না, ঐ গোলন আর কানের কাছে একঘেয়ে ঘক্ ঘক্ ঘক্—ঘুম দেশ ছেড়ে পালায়।'

মাঝের ঘরটিতে খাবার দেওয়া হয়েছিল,—দুখানা আসন পাতা, তার সামনে দুখানা ভাত, তার চার পাশে পাঁচ-ছ'টি বাটিতে আমিষ-নিরামিষ তরকারি। পাশা-পাশি আমি আর অবিনাশ খেতে বসলাম—চারদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু মিত্রা দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি সরে পড়েছিল, কি জানি কেন কথা বলতে ইচ্ছে হ'ল না আমারও—ক্ষিদেও পেয়েছিল, মুখ বুজে বাটীর পর বাটী শেষ করে চললাম। এরই মধ্যে দুটো পেয়ালা করে দই মিষ্টি রেখে গেলেন, অবিনাশের স্ত্রী নয়, সেই প্রৌঢ়া মেয়েটি। সত্যি কথা বলতে কি—অবিনাশের স্ত্রীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল! খেয়ে দেয়ে বাইরে আমার ঘরে এসে মসলা খেয়ে সিগারেট ধরলাম। কিছু বলবার আগেই অবিনাশ বললে—'বেশ করে একটা ঘুম দাও, রাতে ত' চোখের পাতা বোজোনি।' সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে ওকে বলি—এইবার একটা মজবুত তালা এনে চাবি লাগিয়ে দাও, যাতে পালাতে না পারি। কিছু না বলে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘরে একখানা বই—বা খবরের কাগজও নেই যে তা দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেবো। সকালে ট্রেন থেকে নামবার পর এদের অদ্ভুত আচরণ গুলো একটার পর একটা মনে মনে সাজিয়ে একটা সহজ মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করলাম—পারলাম না। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

এবার যখন ঘুম ভাঙলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হঠাৎ অবিনাশের চাপা গলার আওয়াজ কানে এল—একবারটি এস লক্ষ্মীটি!

উত্তরে লক্ষ্মীটি যে কি বললে শুনতে না পেলেও অবিনাশের পরের কথাগুলো শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।—'লজ্জা? এত লজ্জা কিসের? এত করে বলছি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তা সকাল থেকে তার সামনে পর্যন্ত গেলে না—ও কি মনে করছে বলতো? এস!

ইচ্ছে করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। কানে এল—কি ব্যাপার সন্ধ্যে হয়ে গেছে এখনও ঘুম ভাঙলো না?

হঠাৎ ঘুম ভাঙার ভান করে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। একটা কিছু সাফাই বলতে গিয়ে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলাম। অবিনাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিনতি—মীনা!!

চমক ভাঙলো অবিনাশের কথায়,—এই আমার স্ত্রী মমতা—একটু বেশী সেকেলে-পন্থী, আর লজ্জাটা একটু বেশী।

মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হ'ল মীনার সঙ্গে, দু'চোখে কাতর মিনতি জড় করে কী সে বলতে চায় বুঝতে কষ্ট হল না।' সামলে নিয়ে সহজভাবে বললাম—'বেশ যা হোক বৌদি! অত কষ্ট করে ছুটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ছুটে এলাম এত দূরে—আর আপনি কিনা লজ্জাটাকেই আঁকড়ে আড়ালে সরে রইলেন? লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ স্বীকার করি—কিন্তু বেশীটা সন্দেহ জাগায়'।

অবিনাশ বললে,—'যা বলেছ ভাই। তোমার সামনে তবু এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কোনও আলাপী লোকের সামনে ওকে নিতে পারিনি।'

সহজ কথা-বার্তায় ঘরের আবহাওয়া খানিকটা বদলে গেল।

অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললাম,—'ভাই তো কি যে করি শরীরের ধারে বৌদির পায়ের ধুলো পড়লো—অথচ উপযুক্ত এমন একটা আসন নেই, যাতে ওঁকে বসতে বলে সম্বর্ধনা জানাই।'

কিসলেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। মীনা অবিনাশকে বললে,—তোমরা দুই বন্ধুতে গল্প কর, আমি রান্নাঘরে চললুম—নইলে খেতে রাত বারোটা-একটা বাজবে। মীনা চলে গেল। ইচ্ছে করেই বাধা দিলাম না। সংসার অনভিজ্ঞ, সরল লোকটার সামনে আর বেশিক্ষণ অভিনয় করতে মন চাইল না। বিছানায় আমার পাশে বসে অবিনাশ বললে,—কেমন দেখলে বল? বললাম,—চমৎকার! সত্যিই তোমার স্ত্রী-ভাগ্যে হিংসা হয় অবিনাশ। বেশ বুঝতে পারলাম, লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে অবিনাশ। বললাম,—'তা এতদিন বাদে চিরকুমার ব্রত ভাঙবার কারণটা কি ঘটলো হঠাৎ?' একটু চুপ করে থেকে বললে অবিনাশ 'সে অনেক কথা ভাই, কোনটা আগে সুরু কোরবো ভাবছি।'

বললাম,—'তোমার ভাবনার হাত থেকে রেহাই দিচ্ছি আমি। সকাল থেকে এক গাদা প্রশ্ন মনের মধ্যে জমে আছে, এক-একটা করে করি—তুমি জবাব দিয়ে যাও।'

প্রথম প্রশ্ন,—বিয়ে করে তুমি এত বড় কঞ্জুস হয়ে উঠলে কবে থেকে—যার জন্য নিজের এ রকম ছোট্ট একটা বাড়ী নিয়েছো, একটা চাকর পর্যন্ত রাখনি, শুধু একজন রাঁধুনী—" হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বাধা দিল অবিনাশ, বললে, "উনি মমতার মা!"

ভারি লজ্জা পেলাম, কিন্তু কৌতূহল তখনও রয়েছে, বললাম—মাফ করো ভাই, না জেনে বলেছি—কিন্তু অন্য প্রশ্ন দুটো?'

অবিনাশ বললে—'চাকর হয়তো রাখতে দেয়নি, আর এর বেশী টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।' শেষের দিকটা গলা ধরে এল অবিনাশের। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তবুও জোর করে বললাম 'এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে বল অবিনাশ! তোমাদের অবস্থা যদি আমি না জানতাম তাহলে হয়ত বিশ্বাস করতাম।'

ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে তোষকের একটা ধার নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিল অবিনাশ—'বাড়ীর সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। বাবা আমায় ত্যাজ্য পুত্র করেছেন।'

কথা খুঁজে পাইনে। অন্ধকার ঘরে দুজনে ভূতের মত চুপ করে বসে থাকি। আমিই কথা বলি—মমতাকে বিয়ে করার জন্যই কি?

হাঁ! কিছুদিন আগে এক রায়বাহাদুরের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ের ঠিক করেন—তখন আপত্তি করে বলেছিলাম বিয়ে মোটেই কোরবো না। তারপর কিছুদিন বাদে একে বিয়ে কোরবো বলতেই বাবা রাগে দিক্-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, জানো তো কি রকম রাশভারি একগুঁয়ে লোক। আমায় পরিষ্কার বলে দিলেন—এত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলুম, অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ টাকা যৌতুকই পেতে, তা না করে কোথাকার বস্তির একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? এসব পাগলামি আমার বাড়ীতে চলবে না।' অবিনাশ চুপ করলো। জিজ্ঞাসা করলাম—'তার পর'?

—বাবাকে বললাম—বিয়ে না করলেও আমার চলবে না বাবা, কথা দিয়েছি', একটু থেমে বাবা বললেন,—বেশ, আমার কথায় যখন

যদি তোমার কথার দাম বেশী মনে কর তাহলে এ বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে বাইরে গিয়ে কথা রাখো। শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন বাবা, স্বরে উষ্ণতা ছিল না—বুঝলাম, এর আর নড়চড় হবে না। সেই দিনেই চলে এলাম, আর—'।

বাধা দিয়ে বললাম,—'থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না, দোষ আমারই। অনেক দিন তোমার খোঁজ-খবর রাখিনি বলেই এতগুলো প্রশ্ন করছি।' আর কি বলে সান্ত্বনা দেব, কথা খুঁজে পাই না, চুপ করে থাকি, অবিনাশও চুপ, অন্ধকার ঘরে কেমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া বরফের মত জমে নিথর হয়ে থাকে। অবিনাশের নাটকীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথাই ভাবছিলাম। বাইরের কেউ, যারা ওকে জানে না, তারা ত বিশ্বাসই করবে না কথাগুলো—আর সত্যি বিশ্বাস করবার কথাও নয়। কিন্তু আমি তো জানি অবিনাশকে—আমি জানি ওর প্রতিটি কথা—সত্যি এক কথায় কুবেরের ঐশ্বর্য ঠেলে ফেলে বস্তির দারিদ্র্য মাথা পেতে নিতে পারে, এক গল্প-উপন্যাসের নায়ক, আর পারে মঞ্চের বা পর্দার হিরো—এই ত জানতাম এতদিন, আজ অবিনাশের নামটাও যোগ করে নিলাম ওর সঙ্গে। মীনার সঙ্গে ওর পরিচয় আর বিয়ের ইতিহাসটা জানবার অদম্য কৌতূহল মনটাকে তোলপাড় করে তুলছিল—কিন্তু এই থম-থমে অস্বস্তিকর পরিবেশে সেটা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম—ঠিক এমনি সময় একটা হ্যারিকেন হাতে ঘরে ঢুকলো নিভা। আলোটা মেজের ওপর রেখে অবিনাশকে বললে,—দাদাবাবু, দিদি ডাকছে, শিগ্‌গির একবার আসুন।' অবিনাশ ও আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঐ ছোট্ট হ্যারিকেনের আলো আমাদের মনের আঁধার দূর না করলেও ছোট্ট ঘরের অন্ধকার অনেকখানি ঠেলে ফেলে দিল। অবিনাশ উঠে ভেতরে গেল। হ্যারিকেনটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

(চার)

রাতে খাওয়ার সময় মীনাই পরিবেশন করলে—কিন্তু সহজভাবে কথাবার্তা কেউ কইতে পারলাম না, না অবিনাশ না আমি। কোনও মতে ফরম্যালিটি বজায় রেখে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে চলে এলাম। নিঃশব্দে একটা সিগারেট শেষ করে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি—ভেতরের দিকের দরজাটায় খিল নেই—অগত্যা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ অবিনাশের কথাটা মনে পড়ল—শুকনো পাহাড়ের দেশ, সাপ-খোপের ভয় আছে, রাতে আলো না নিয়ে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়! অন্ধকারে হাতড়ে সুটকেশ থেকে টর্চটা বার করে মাথার বালিশের পাশে রেখে দিলাম।

চোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি, যদিও নির্ঘাৎ জানি ঘুম আজ আর আমার ত্রি-সীমানায় ঘেঁসবে না। ভাবছিলাম শুধু মীনা আর অবিনাশের এই অদ্ভুত যোগাযোগের কথা, কি করে পরিচয় হল, ঐ লাজুক ছেলেটির আজন্ম লজ্জার আবরণ কোন্ যাদুমন্ত্রে সরিয়ে নিল মীনা?—

বায়োস্কোপের ফ্লাসব্যাক ছবির মত প্রথমটা আবছা, পরে স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার বন্ধ চোখের সামনে—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও। বছর দেড়েক আগের কথা। 'শকুন্তলা' ছবির সুটিং; রাজা দুষ্মন্ত সেজে বসে আছি অসংখ্য পাত্র, মিত্র, সৈন্য, সভাসদ নিয়ে—রাজসভার বহুমূল্য সিংহাসনে। পরিচালক অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাসিস্‌ট্যান্টদের ওপর—'এখনও এক্‌স্ট্রা মেয়েদের মেক-আপ শেষ হল না? কখন তাহলে সুটিং হবে? বেলা দুটো বেজে গেছে।' দু-তিনজন ব্যস্ত হয়ে ছুটলো মেক-আপ রুমের দিকে। মিনিট দশেক বাদে আট-দশটি মেয়ে ঢুকলো সেটে। মারাঠি ধরণে কাছা-কোঁচা দিয়ে রঙীন কাপড় পরা, অনাবৃত দেহ, শুধু বুকটা এক ফালি রঙিন কাপড় দিয়ে কশে বেঁধে পেছনে গেরো দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া, হাতে, গলায়, তখনকার দিনের অনুকরণে জড়োয়া গহনা—মাথায় ফুলিয়ে বাঁধা খোঁপায় রঙ-বেরঙের জরি জড়ানো। যেনো বিভিন্ন রঙের কতকগুলো প্রজাপতি ফুল-বাগানে না ঢুকে এসে পড়েছে পথ ভুলে রাজসভায়। সাধারণতঃ একস্ট্রা মেয়েদের চেহারা

কাজটা ভাল করনি, যদি হঠাৎ ঘুমভেঙে বিছানায় তোমায় না দেখতে পেয়ে এসে পড়ে অবিনাশ?

যেমন হয়—মোটামুটি চলনসই, সাজলে-গুজলে মন্দ দেখায় না।

একটি মেয়ে শুধু ওরই মধ্যে যেন
কাজটা ভাল করনি, যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে বি
তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে কাত হয়ে বসেছিলাম—সোজা হয়ে উঠে বসলাম। সব ছেড়ে চোখ দুটো শুধু ঐ একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে অপলক চেয়ে থাকতে চায়। সব দিক দিয়ে এমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে কদাচিৎ নজরে পড়ে। বড় টানা-টানা চোখ, নিটোল, নিখুঁত মুখখানাতে নিষ্পাপ প্রথম যৌবনের সরম-জড়ানো স্নিগ্ধতা। একে যেন প্রশংসা করেও অতৃপ্তি থেকে যায়, মনে হয় যেন সব বলা হল না। দেখলাম সেটশুদ্ধ লোক ওকে দেখে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অন্য মেয়েরা ইতিমধ্যে পরিচিত, অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে,—ঐ মেয়েটি শুধু নতমুখে জড়-সড় হয়ে এক পাশে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে। পরিচালক মেয়েদের সিংহাসনের চারপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন—কারও হাতে ফুলের থালা—কারও হাতে চামর, ধূপ, তাম্বুলাধার, সব শেষে ঐ মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঠিক সিংহাসনের পেছনে—আমার মাথার কাছে—হাতে দিলেন একখানা বড় তালপাতার পাখা, তাতে নানা কারুকার্য করা, ঝালর দেওয়া—আর বলে দিলেন সট্ আরম্ভ হলে আস্তে আস্তে ঐ পাখা দিয়ে রাজাকে অর্থাৎ আমাকে হাওয়া করতে।

দু-তিনটে সট নেওয়া হয়ে গেল—অন্য মেয়েরা হাতের বস্তু নামিয়ে ইতস্ততঃ বসে গল্প-গুজব করতে সুরু করে দিল—পেছন ফিরে দেখি ও তায় নতমুখে পাখা নেড়ে হাওয়া করেই চলেছে। বললাম—'থাক্ থাক্, যখন ছবি নেওয়া হবে, তখন শুধু হাওয়া করবে,—অন্য সময় নয়।' পাখা থামিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বলি—'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? বোসো;' বসে না, কোনও জবাবও দেয় না। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করি—মন চায় ওকে পাশে বসিয়ে, আলাপ করি—চক্ষুলজ্জা আর সেটের সবার ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়ে সাহস পাই না। এই-ভাবে কিছুক্ষণ কেটে যায়—অন্য সটের জন্য লাইট সিফ্‌ট্ করা হচ্ছে—সট নিতে অন্ততঃ এক ঘণ্টা দেরী হবে—হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওর হাত ধরে বলি—'বোসো এখানে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?' জড়সড় হয়ে বসে পড়ে সিংহাসনের এক পাশে। বেশ বুঝতে পারি অন্য মেয়েরা এবং সেটের বহুলোক আমাদের কথা নিয়ে হাসা-হাসি করছে—গ্রাহ্য করি না, জিজ্ঞাসা করি,—'তোমার নাম কি?' নতমুখে জবাব দেয়—মিনতি!

'কোথায় থাকো?' মিনতি জবাব দেয়—'বেলেঘাটায়'। আর কথা খুঁজে পাই না—অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকি। চমক ভাঙে পরিচালকের কথায়—'আমরা অনেকক্ষণ রেডি হয়ে বসে আছি, মহারাজ দুষ্মন্ত হুকুম করলেই

সুটিং আরম্ভ করতে পারি।' লজ্জা পাই, মিনতি তাড়াতাড়ি পাখা হাতে নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে সুরু করে। সুটিং সুরু হয়ে যায়। প্রথম দিন এই পর্যন্ত। পাঁচ দিনের কাজ ছিল রাজসভার সেটে। দু'-তিন দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। এর মধ্যে মিনতির অনেক খবরই জানতে পেরেছি। নাম মিনতি, মীনা বলেই সবাই ডাকে। বেলেঘাটায় একটা বস্তির ভেতর একখানা ঘর, পনের টাকা ভাড়া দিয়ে থাকে। বাবা কলকাতায় এক সওদাগরী অফিসে কেরাণীর কাজ করতেন—আজ ছ' মাস হল অফিস থেকে আসবার সময় ট্রাম থেকে পড়ে যান—সঙ্গে সঙ্গে একখানা চলতি ট্যাক্সি এসে চাপা দেয়—অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—আর জ্ঞান হয় না। তারপর ছ'মাস ধরে বিধবা মায়ের সামান্য গহনা বিক্রি করে দেনা ও বাড়ীভাড়া শোধ দিয়ে কোনও মতে একবেলা খেয়ে—বস্তিতে উঠে আসে। ঐ বস্তিতেই থাকে দু' তিনটে মেয়ে—তারা সিনেমায় এক্সট্রার কাজ করে। তাদের পরামর্শে মীনা কাজ করতে এসেছে। সংসারে বিধবা মা, ছোট একটা আট ন' বছরের বোন ও ছ' বছরের একটি ভাই।

সব শুনে গুম হয়ে গেলাম। বললাম,—'হুঁ, কিন্তু এই সামান্য কাজ করে তুমি কী এমন রোজগার কোরবে—যা দিয়ে চার-পাঁচটি লোক খেয়ে-পরে বাঁচবে?' উত্তর দেয় না মীনা, ফ্যাল ফ্যাল করে মহা শূন্যে চেয়ে বুঝি বা যোগ্য উত্তর খোঁজে। বলা বাহুল্য এই কদিনে সমস্ত ষ্টুডিও মহলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছি আমি আর মীনা। মীনার কথা ঠিক বলতে না পারলেও আমার যে বেশ খানিকটা দুর্বলতা এসে গেছে ওর ওপর, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

একদিন সুটিং-এর অবসরে মীনা বললে—'মাকে আমি আপনার কথা সব বলেছি, তিনি বললেন,—'ও'র মত লোক যদি তোমার জন্য একটু চেষ্টা করেন, তা'হলে ছবিতে ভাল চান্স পেয়ে নাম করতে তোমার দেরী হবে না।'

বললাম,—'চেষ্টা আমি নিশ্চয় কোরবো—তবে উপযুক্ত চান্স আসতে হয়তো কিছুটা দেরি হবে,—ততদিন তুমি চালাবে কি করে? তাছাড়া এ লাইনে প্রলোভন এত বেশী যে, সুরুতেই পা পিছলে বদনাম করে বসলে, পরে বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়তে হবে।'

আজও স্পষ্ট মনে আছে,—প্রায় এক মিনিট নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল মীনা—তারপর বলেছিল—'যদি খুব বেশী দেরী না হয় তা'হলে উপোষ করে হোক বা যেভাবেই হোক, অপেক্ষা আমি কোরবো, আর যদি পা পিছলানো ছাড়া আর কোনও গতি নেই বুঝতে পারি— তা'হলে—তার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা আমি কোরবোই—কথা দিলাম'।

রাজসভার সেটের সেদিন শেষ সুটিং। কেন জানি না, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেক-আপ তুলে গাড়ীর জন্য ষ্টুডিওর গেটের দিকে পা বাড়ালাম। মধ্যে দু'ধারে ফুলের গাছ বসানো সরু সিমেন্টের পথ পড়ে। আলো-অন্ধকারে ঢাকা সেই পথ দিয়ে বুঝিবা মীনার কথা ভাবতে ভাবতেই চলেছি—হঠাৎ হুড়-মুড় করে কে যেন পায়ের ওপর এসে পড়লো। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই দেখি আমাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে মীনা—কিছু দূরে দেখি বস্তির আর দু'টি মেয়ে দাঁড়িয়ে, আছে মীনার অপেক্ষায়।

বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই আবছা অন্ধকার পথে, কে এসে বললে,—'এ কি, উনি এখানে দাঁড়িয়ে? গাড়ী রেডি করে ওরা সব তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

বাড়ী চলে এলাম।'

এরপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। মীনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই নি, খবরও পাই নি। আমার এক পরিচালক বন্ধু নতুন ছবি তুলছেন শুনে তার সঙ্গে দেখা করে মীনার কথা বললাম। সব শুনে তিনি বললেন,—'নতুন মেয়ে, একেবারে হিরোইনের পার্ট দিয়ে রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। তবে তুমি যা বলছো, চেহারা যদি সত্যিই ভাল হয়, তা'হলে আমি একটা ছোট সাইড্ রোল, এই সাত-আট দিনের কাজ, দিয়ে দেখতে পারি। দু'-এক দিনের মধ্যেই আমাকে ফাইনাল কাষ্টিং করে ফেলতে হবে, গাড়ী দিয়ে লোক পাঠালে এখুনি নিয়ে আসতে পারো?'

একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। গাড়ী নিয়ে লোক চলে গেল মীনাকে আনতে। প্রায় ঘন্টা তিনেক হা-পিত্যেশে বসে আছি—গাড়ী বা মীনার দেখা নেই। আরও কিছু সময় কাটলো, তারপর ফিরে এল শুধু গাড়ী, মীনা আসে নি, মানে সেখানে নেই। বস্তির অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছে খোঁজ নিয়ে শুনে এসেছে, আজ দিন সাতেক হোলো এক ধনী মাড়োয়ারীর সুনজরে পড়ে ওরা সবাই চলে গেছে বস্তি ছেড়ে, কোথায়, কেউ বলতে পারে না। সব শুনে বন্ধু-পরিচালক বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন,—'এই হয়, এই স্বাভাবিক। তুমি যা বললে—ও-রকম সুন্দর চেহারা নিয়ে বেশী দিন কেউ বস্তিতে থাকে? না থাকতে পারে? ওদের স্থান অট্টালিকায়।'

সমস্ত মনটা তেতো বিষাক্ত হয়ে গেল। শুধু ভাবছিলাম—সেদিনের মীনার সেই নীরব চাহনি,—ষ্টুডিওর পথে আবছা আঁধারে হঠাৎ প্রণাম করে চকিতে চোখের জল লুকিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া,—এ সবই মিথ্যে? সত্যি শুধু ছবির পর্দায় ইনিয়ে-বিনিয়ে সস্তা প্রেমের অভিনয়?

.........ধড় মড় করে উঠে বসে বালিশের পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে জ্বালতেই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমার পায়ের তলায় উবুড় হয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদছে মীনা, মানে মমতা, আমার আশৈশবের বন্ধু সরল, উদার অবিনাশের স্ত্রী।

টর্চ নিভিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এত রাত্রে এভাবে আমার ঘরে এসেছ, অবিনাশ জানে?' অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কানে ভেসে এল মীনার ছোট্ট উত্তর—'না'। বললাম,—'কাজটা ভাল করনি, যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানায় তোমায় না দেখতে পেয়ে এসে পড়ে অবিনাশ?'

মীনা বললে—'বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে এসেছি—তা-ছাড়া, রাতে ও'র ঘুম ভাঙে না—গাঢ় ঘুম।' চুপ করে কান পেতে শুনি শেষের ঘরটা থেকে অবিনাশের চাপা নাক-ডাকার আওয়াজ।

বললাম,—'তোমার সঙ্কোচ, লজ্জা—এত রাত্রে এই অভিসার-এর কারণ আমি জানি মীনা—তাই প্রথমেই বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার!' তোমার কোনও উপকারে আসতে পারিনি আমি সত্যি, কিন্তু তাই বলে ক্ষতিও কোরবো না কোনদিন।'

অন্ধকারে শুনতে পেলাম,—'তা আমি জানি, আপনি হয়তো অভিনয়ে ঢেকে মানিয়ে নেবেন, কিন্তু আপনার সামনে আমি যদি কোনও দিন ধরা পড়ে যাই?'

হেসে বললাম—'বুঝেছি কি বলতে চাও। বেশ তাই হবে, আজ থেকে তোমাদের এ সুখের নীড়ে বাজপাখীর মত উদয় হব না কোনও দিন, কথা দিয়ে গেলাম। আর একটা কথা—আমার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে এবং কোথায়, কিভাবে সে আলাপ হয়েছিল—একথা অবিনাশকে বলেছ?'

মীনা শঙ্কা-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—'না—শুধু ঐটুকু ছাড়া আর সব উনি জানেন। ঐ কথাটা চেষ্টা করেও বলতে পারি নি।'

বললাম—'ভাল করনি। বনেদ পাকা না করে তার ওপর তুমি অট্টালিকা তুলে চলেছ।

(ইহার পর ১২৫ পৃষ্ঠায়)

তৃষ্ণার মেঘ

কৃষ্ণ ধর

আজি তৃষ্ণার দেশে সজল মেঘের সজ্জা,
অঙ্গে নামে কি শ্রাবণ-মুখর ঢল।
ক্লান্তি নামে না, নামে না শ্রান্তি লজ্জা
এ যৌবন শুধু ক্লান্ত চোখের জল॥

শস্যের আশা সারা মাঠে বিস্তার,
প্রতীক্ষা শেষে এল কি চাতক মেঘ।
আকস্মিকতায় এ কী রূপ বিস্তার,
দুকূলপ্লাবিনী বিপুল বন্যা বেগ॥

ধানের বীজেতে অজস্র পদচিহ্ন,
এ মেঘ এনেছে কৃষকের চোখে কান্না।
আকাশে করুণ সূর্যের অপরাহ্ণ,
জল দাও মেঘ, ভয়াল বিপুল বান না॥

হে কাজল মেঘ, সংহার রূপ ঢাকো,
টিয়াপাখি-ডানা মাঠে আনো বর্ষণ।
ধানের স্বপ্নে প্রাচুর্য দিন ডাকো,
অহল্যা মাটি বুকে নিক কর্ষণ॥

এদেশে অনেক জমেছে দিনের ঋণ,
দুঃসহ ভার জমাট রাত্রি ঘেরা।
এ দেশে বিলাস পণ্যেতে সমাসীন,
প্রাচুর্যভোগী বিশ্বাসঘাতকেরা॥

আজি তৃষ্ণার দেশে রক্তমেঘের সজ্জা,
আকাশে জমেছে বিদ্যুৎ সমারোহ।
অঙ্গেতে নেই দ্বিধা, সংশয়, লজ্জা,
গাণ্ডীবী তুমি, ত্যাগ করো মায়ামোহ॥

বাসি ফুলের বাস

দেবেশ দাশ

হঠাৎ একটা মিণ্টি সেণ্টের গন্ধে ভরে গেল সারাটা মন।

ব্যারিণ্টার মিষ্টার রাকসিট খুব ভাল করেই চেনেন ওই সেণ্টটাকে। নাম হচ্ছে মিস চিফ। বাংলায় তার ঠিক মানে কি হবে? বম্বেতে এত বছর এক নাগাড়ে কাটিয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ঘুচে এসেছে। গুজরাটি বলুন, মারাঠি বলুন, হিন্দী বলুন কিছু কিছু পরিচয় হয়েছে সে সব ভাষার সঙ্গে। কিন্তু বাংলা? না। রাকসিট সাহেব বহু বছর এদেশে আসেননি। না হয়েছে সময়, না তেমন চাড়। কাজেই মিসচিফ কথাটার কি মানে হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত ভাষা চর্চার চেষ্টা ছেড়ে তিনি পাইপ ধরালেন। যে মেয়েটি বম্বে মেলের এয়ার-কণ্ডিশন কোচের টানা বারান্দা দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল তার চিন্তাটা অনেক সহজ, অনেক আরামের ইংরেজী মিসচিফ কথাটার মানে যাই হোক না কেন।

ও মেয়েটির বয়েস হয়েছে নেহাৎ মন্দ নয়। চল্লিশের ওপারে নিশ্চয়ই। কিন্তু কেমন ছিম-ছাম, গড়ন পেটন কেমন নিটোল। টয়লেট ঘর থেকে বেরিয়ে এল যেন একটি রূপসী তন্বী তরুণী। হাঁ, মিসচিফ, মানে—মানে নষ্টামি নামের সুরভিটা ওকে মানায় বটে।

পাইপে আরো নিবিড়ভাবে একটা টান দিলেন মিষ্টার রাকসিট।

হায়, এই স্বাধীনতাটা এসে গিয়ে অনেক দিকেই লাভ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি পি এন, জি, এস'এর দলও বিলেত না গিয়ে সাহেবী করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু যারা দেশী সাহেবরা দেশে বসেই যে সব বিলাতী রঙ অব চঙ, ক্যারা মেরী, দাসিদের চারদিকে ... সুখ পেতেন, সে সব এখন মিস করছেন। এসবের অভাব অনুভব করছেন।

সে জন্যেই মিঠে গন্ধটা আরো বেশী মিঠে লাগল।

মুছে গেল রাকসিটের নাকে প্রায় লেগে থাকা পানা পুকুরের এঁদো গন্ধ। লর্ডকে অর্থাৎ ভগবানকে তিনি প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলেন।

তা লর্ডকে তিনি প্রায়ই ধন্যবাদ দিয়ে থাকেন। এই ত খানিকক্ষণ আগেও দিয়েছিলেন। তখন গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি হাওড়া ষ্টেশনের ভিড় ঠেলে কোন মতে বম্বে মেলের এয়ার কণ্ডিশন কোচে এসে উঠেছিলেন। বাঃ বাঃ, কি সাংঘাতিক অবস্থা এই বাংলাদেশের। এত নোংরা, এত হট্টগোল, চারদিকে ভাঙ্গা আর পুরোনোর ছড়াছড়ি। তবু এই কলকাতাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলে কেন যে ইংরেজরা বলত তা তারাই জানে।

তার চেয়ে মিষ্টার রাকসটের ঘষা-মাজা, রাতদিন মুখে মেক-আপ করা বম্বে সহর অনেক ভাল। বেঁচে থাক তার সমুদ্রের উপর

একটু দাঁড়িয়ে আবার ভাল করে তাকালেন সেই নারীমূর্তির দিকে

মালাবার হিলে বাড়ী আর ফিরোজশা মেটা রোডে চেম্বার।

নিজেও তিনি বাঁচতে চান। সেই বাঁচবার তাড়াতেই তিনি বি-এ পাশ করে কিছুদিন চাকরীর দরখাস্ত লেখা মকস করেছিলেন। কিছুই হল না অবশ্য। তারপর গাঁয়ের মামা বাড়ী থেকে বাপ-মাহারা জীবনে রক্ষিত যে দিন কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেল, সেদিন তার বেশী হেঁচে হয়নি বোধ হয়। অন্ততঃ বম্বের মিল অঞ্চলে যে অচেনা বাঙ্গালী যুবক মজুরদের চিঠিপত্র, মণি-অর্ডারের ফর্ম এসব দু' আনা মাথাপিছু 'ফি' নিয়ে লিখে দিত, সে কিছু টের পায়নি।

তারপর কেমন করে সে জাহাজে মাল হিসাবের চাকরী নিয়ে বিলেত গেল, সে কথা আজ মনে করার দরকার নেই। তার চেয়ে অনেক কম এলেম পেটে নিয়ে চাটগাঁ শিলেটের লোক হামেসাই বিলেত ঘুরে আসে। এমনকি, 'ইষ্ট এণ্ড' অর্থাৎ লণ্ডনের গরীব পাড়াতে ঘর-সংসারও পেতে বসে। দশ বছর পরে দেখা গেল ব্যারিষ্টার মিঃ রাকসিট বিনা টাকায় বম্বেতে মজুরদের মোকদ্দমা লড়ছেন। রাকসিট সাহেবকা জিন্দাবাদ।

তারো প্রায় পনের বছর পরের কথা।

এই সাতাশ বছরের মধ্যে তিনি বাংলা-দেশে আসেন নি। কেনই বা আসবেন? মামারা বোধ হয়, তাঁর পা ঢাকা দেওয়াতে খরচ কমল বলে খুসীই হয়েছিলেন। এতদিন ধরে খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েও যে ভাগ্নের কাছ থেকে দু' মুঠো টাকার মুখ দেখা গেল না তার বাড়ীতে বসে আর তেলি পালঙ্কজাবী করে দু' বেলা অন্ন ধ্বংস করায়, তাঁদের লাভটা কি? আর গাঁয়ের বন্ধু-বান্ধবরাও ওর উধাও হয়ে যাওয়াতে দুঃখ করবার কথা ছিল না।

কিন্তু সেই গাঁয়েই তিনি আজ গিয়ে-ছিলেন। সম্পূর্ণ অকারণে। শুধু একটা খেয়ালে। হাড়ভাঙ্গা ঠিক নয়, তবে মাথা ঘামান খাটুনীর ফলে ব্লড-পেশার বেড়ে গিয়ে-ছিল। ডাক্তার বললেন, হাওয়া বদলাতে হবে। বাইরের হাওয়া নয়, মনের হাওয়াও বদলাতে হবে। তাই তাঁর মানস হোম বিলেতের বদলে এবার এলেন বাংলাদেশে। মানে, কলকাতায়।

তা এই ষ্ট্রাণ্ড আর মেফেয়ার, চৌরঙ্গী আর আলিপুরে ঘেরা কলকাতায় রাকসিট সাহেবের মন্দ কাটেনি। তাঁর গুজরাটি মক্কেলের কলকাতার বাড়ীখানা বম্বের অভাব মোটেই অনুভব করতে দেয়নি। কাজের দরকারে গেল বছর কয়েকের মধ্যে যে সব বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তারাও লোক ভাল। বাংলাদেশের অতিথিকে ভালভাবে দেখাশোনা করেছেন।

তবু আজ সকাল থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে ছিল। ঠিক খারাপ নয়, একটু যেন উদাস। রাকসিট সাহেব উদাস ভাবটা ঠিক বোঝেন না। তাঁর বন্ধুদের বললেন, কেমন একটা ব্লেজে (blase) বোধ করছেন তিনি। যে ভাবটা বাংলায় খুলে বলা তার কাছে সহজ নয়, ফরাসী কথাটা তার সবখানি গন্ধ, সবটা রূপ তার মনের কাছে তুলে ধরল। বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলেন যে আজ কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলেই যে এই উদাস ভাব, তা নয়।

কিছু ভাল লাগছিল না। এই মেঘে ঢাকা মেঘ-ডাকা আকাশটা মানুষকে শান্তি দেবে না। সারা সকাল তার ভার তাঁর মনের উপর চেপে ছিল। তাই তিনি লাঞ্চের খানিকক্ষণ পর চুপ-চাপ নীচে নেমে এসে ড্রাইভারকে গাড়ী নিয়ে লম্বা ড্রাইভে নিয়ে যেতে বললেন। ভাল পিচ-ঢালা রাস্তায় যেতে বললেন।

মোটরের চাকা জোরে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে লাগল মিষ্টার রাকসিটের মনের চাকা। জোরে জোরে। শেষ পর্যন্ত দু'পাশের পাটের কল আর কারখানার চিমনী তাঁর অসহ্য লাগল। তিনি ড্রাইভারকে কোন নিরিবিলি ছোট রাস্তায় মোটর নিয়ে যেতে বললেন।

কিন্তু আশ্চর্য। মাইল পনের যাবার পরই এ ত চেনা রাস্তা মনে হচ্ছে। এখানে অবশ্য আগে মোটর চলার মত রাস্তা ছিল না। ছিল পায়ে হাঁটার, গরুর গাড়ী চলার মত সরু রাস্তা। হ্যাঁ, ওই ত খিলানওয়ালা দালান বাড়ীটা, ওই ত তার পিছন দিয়ে বাঁশ ঝাড়ে আড়াল করা দ্বাদশ শিবের মন্দির। তার নাটমণ্ডপটাও দেখা যাচ্ছে। গাঁয়ের প্রাণ ছিল এই জায়গাটা। তা' হলে এখানেই নেমে একটু হেঁটে গাঁখানা দেখে নিলে মন্দ হয় না। বাংলাদেশে এসে কি কি দেখলেন তার গল্প হিসাবে বেশ মুখরোচক হবে।

বম্বের সমুদ্র পারে মেরিণ ড্রাইভের ঠিক ওপরেই ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়াতে সান্ধ্য আড্ডাতে এমন জমাট গল্প আর কেউ করতে পারবে না।

জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলেন রাকসিট সাহেব। সুশীল ও সুবোধ বালক ছিলেন না বলে যে গাঁয়ে তাঁর কোন আদর ছিল না, সেখানে আজ খাস বিলেতের র‍্যাণ্ডাল কোম্পানীর তৈরী জুতো মস মস করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

মন কিন্তু ঘুরতে লাগল সন্তর্পণে। না; তিনি এখানে কাউকে পরিচয় দিতে চান না। এখানে এমন কেউ তাঁর ছিল না যে সাতাশ বছর পরে আবার দেখা হওয়ার জন্য আনন্দে গলে যাবে। হাত ধরে তুলে এনে দাওয়াতে বসাবে। একটু হিংসা, একটু তেরছা প্রশ্ন না করে খোলা মনে সব কথা বলবে, জানতে চাইবে। বরং ভয় আছে যে পুরানো দুঃখের আর বিপদের রোগ আর মরণের কথা শুনতে শুনতে ব্লাড প্রেশারটা আবার বেড়ে যেতে পারে।

কাজেই তিনি অচেনা লোকের মত চুপি সাড়ে গ্রামটিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিজে কাউকে পরিচয় দেবেন না। সুট আর চোখের উপর টেনে আনা হ্যাট তাঁকে ঢেকে রাখবে। কিন্তু আগের চেনা লোকদের হয়ত তিনি নিজে চিনে নিতে পারবেন।

কিন্তু, কই কাউকে ত চেনা ঠেকল না। হাঁটতে হাঁটতে শিব মন্দিরের পিছন পর্যন্ত চলে গেলেন। লোক নেই। আরো দূরে যেখানে হাট বসত, সেখানেও কেউ নেই। ভিটে-গুলো এখনো উঁচু হয়ে আছে; কিন্তু চালা নেই। সেখানে নিশ্চয়ই আর হাট বসে না। চাটুয্যে বাড়ীর সামনের দরজায় তালা লাগানো। কিন্তু বাড়ীর যা অবস্থা তাতে তালা লাগিয়ে রাখার দরকার যে কি তা বোঝা গেল না। আরো কয়েকটি বাড়ীরও সেই অবস্থা। শুধু রামু ঘরামির ঘরগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ছাদ ধ্বসে গেছে বলে। ঘরই যখন নেই, তখন ঘরামিকেও দরকার নেই কারো—মনে মনে টিপ্পনী কাটলেন রাকসিট সাহেব।

একজন পশ্চিমাগোছের লোককে দেখা গেল। তাকে ডেকে তিনি গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আলগোছে, গা বাঁচিয়ে। যাতে তার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা না ওঠে। পশ্চিমাও এখানে নতুন এসেছে। খালি বাড়ী-ঘর জমি পড়ে আছে অনেকের। মাটি খুব ভাল; ফসল পাওয়া সোজা। বি টি রোডের মেহেরবাণীতে কলকাতার বাজারে সব্জি পাঠান খুব সহজ হয়ে গেছে। সে আরো দেশোয়ালী ভাই বেরাদরদের লিখেছে, এখানে এসে আস্তানা গাড়তে। বাঙ্গালী ভাইরা ত সব ম্যালোয়ারীতে সাফা হয়ে গেল। গায়ে তাকত নেই: মেহনতি করতে পারে না। ক্ষেতির কাম করবার লোক নেই। কেউ বা কলকাতায় গিয়ে বাবুর কাম লিয়েছে। কাজেই মুলুক থেকে নতুন লোক এলে সহজেই পাট্টা গাড়তে পারবে।

তবে ত এখানকার ভবিষ্যৎ খুব ভাল—পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন রাকসিট সাহেব।

হ্যাঁ বাবুসাব। সবই এখানে ভাল। এই দেখুন না, আধ মাইল দূরে যে "রেফোজি" কলোনী বসেছে, তারাও কেমন জঙ্গল সাফ করে সব্জী চাষ সুরু করেছে। ইয়া বড় টিউব-ওয়েল বসিয়েছে সরকার থেকে। এই গোটা এলাকাতেই রেফোজি বসবার কথা আছে। তা'হলে আর এমন হাল থাকবে না। আপনি কি কোন কলের সাহেব নাকি বাবুসাব। তা হলে আমার একটা আর্জি আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়লেন রাকসিট সাহেব। কিন্তু যাবেন কোথায়? এই পুরানো ধ্বসে পড়া পানা-পুকুরের চাপা গন্ধ এড়িয়ে যাওয়া কি সোজা কথা? পুকুরের ওপারে পচা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে জল নিয়ে উঠে আসছে কে ওই বুড়ী?

থমকে দাঁড়ালেন রাকসিট সাহেব। কয়েক পা পেছিয়ে এলেন। একটু দাঁড়িয়ে আবার ভাল করে তাকালেন সেই নারীমূর্তির দিকে। নজর করে দেখতে লাগলেন, তার চলন, তার ঘাড় দোলান, তার কলসী ধরার ভঙ্গি। দেখতে লাগলেন আর চোখের উপর টুপীটা আরো একটু টেনে দিলেন।

ব্লাড-প্রেশারটা যেন একটু একটু করে আবার বেড়ে যাচ্ছে।

এই সব পুরানো কথা, ভুলে যাওয়া স্মৃতি এগুলো অত্যন্ত খারাপ জিনিষ। কেবল অস্বস্তি এনে দেয়। পিছু টান দেয়। মনে করিয়ে দেয় যে, এককালে আমিও ছিলাম এমনি তুচ্ছ, নড়বড়ে। হ্যাঁ, এই গাঁখানারই মত মরাচে পড়া। ভবিষ্যৎহীন। তার চেয়ে এই অচেনা পশ্চিমা, এই নতুন গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনী ভাল। এদের বর্তমানটা কাজে ভরা; ভবিষ্যৎটা আশায়।

সেজন্যই তিনি সাতাশ বছর ধরে বম্বেতে প্রবাসী। মুছে ফেলেছেন তাঁর মন থেকে ওই ভাঙ্গন ধরা গ্রাম, শিকড় ছেঁড়া অতীত। কলকাতায় শুধু নিজের, মানে মিষ্টার রাকসিটের, সমান ওজনের নতুন বন্ধুদের সঙ্গেই করেছেন মেলামেশা।

এই অম্বালী ছিল তাঁর গ্রামের স্বর্ণ-লতিকা। সোনার মত বরণ, লতার মত গড়ন। মাইকেলের কবিতা ছিল গ্রামের মধ্যে ফ্যাসান। "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে।" স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে লাইনটা সারা গ্রামে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সদ্য বি এ পাশ করা জীবেনের মনেও গেঁথে ছিল এই স্বর্ণলতিকা। এই অম্বালী।

কিন্তু কোন রসালের কপালে জুটবে এই সোনার বরণ লতা? সে জানত যে অম্বালীকে বিয়ে করার লোকের অভাব হবে না। তার বাপ-মাও জানত। বিয়ের বহু সম্বন্ধ আসছিল দূর দূর থেকে। কাজেই বেকার তরুণের এ অবস্থায় কোন আশা ছিল না। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, যাতে বিয়ে করতে চাইবার মত সামান্য একটু অধিকার তৈরী করতে পারে। যদি কপাল গুণে একটা চাকরী জুটে যায়, মামা বাড়ীতে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অম্বালীকে পাওয়া অসম্ভব হয়ত হবে না। কিন্তু অল্প বয়সের ভীরু প্রেম সে কথা কাউকে খুলে বলতে পারেনি। এমনকি অম্বালীকেও না।

অল্প সময়ের মধ্যেই অম্বালীর বিয়ে হয়ে গেল। নিজেদের গ্রামেই। ঘরে বরে সব দিকেই ভাল পাত্র। সবাই খুসী। অন্যান্য আরো তরুণের মনে অম্বালীর জন্য হয়ত ঢেউ উঠে-ছিল। সে খবর তাদের নিজেদের ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাইরে কেউ জানবার কথা নয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে দল বেঁধে মুখ বুজে ঠোঁট চেপে জীবেনও পরিবেশন করে গেল সমান দৌড়াদৌড়ি করে।

নতুন কনে শ্বশুর বাড়ী চলে যাবার পর সন্ধ্যাবেলায় জীবেন একবার এসেছিল অম্বালী-দের বাড়ীর কাছে। এই পুকুরেরই পাড়ে। তাতে ছিল টলটলে জল: নিজের চোখের জলের মত। ঝাপসা চোখে পাড়ে জমানো বাঁস ফুলের রাশি দেখতে দেখতে খুব আস্তে আস্তে সে চলে গেল। গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়ে গেল। তার আগের দিন পর্যন্ত সে ভাবেনি যে এমন

(ইহার পর ১২৫ পাতায়)

স্বর্গরাজ্য

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণখোলা তেতলার ফ্ল্যাটটা পেয়ে মনে হল যেন স্বর্গরাজ্যের অধিকার পেয়েছি। সেই জানালার ধারে তিনতিনটে তেলেভেজা বটকাটে বালিস সাজিয়ে ইন্দ্রাসন তৈরী করলুম — এবং তাইতে ঠেসান দিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে ইন্দ্রাণী—মানে, বাসন্তীকে ডেকে পাঠালুম। বটু এসে খবর দিলে ছোটখুকি বমি করেছে মা এখন আসতে পারবেনা। বটু আমার চতুর্থ......দাঁড়ান, ভেবে বলি—বাবলু, মিন্টী, সোনা, হারু, বটু,—না, বটু আমার পঞ্চম সন্তান, তারপর ঈশ্বর ইচ্ছেয় আছে তিনটি—টিনি, খাঁদি, খুকি......এদের নামগুলো রোজ সকালে একবার জপ করি, নিজেরই সন্দেহ হয় যে দু একটা বোধ হয় ফস্কে যাচ্ছে—কড় গুণে না মিললে আবার গোড়া থেকে সুরু করি—তবু ভগবানের দয়ায় অনাগতদের সংখ্যা জানা যায় না, আর তাদের ব্যবস্থা রাখবার দরকার হয় না।

বিড়িতে দুটো টান দিতেই মনে হল ভাগ্যই হয়েছে। মনের ফূর্তিতে ঠিক এই মুহূর্তে বাসন্তীকে যে দুটো কথাই বলতুম—তা শুনে হয় সে নাক সিঁটকে চলে যেত, না হয় যা বলত তাকে রসাত্মক বাক্য বলা কিছুতেই চলত না—অথচ বাসন্তী আই-এতে বাংলায় লেটার পেয়েছে—কবছর আগেও তাকে। লুকিয়ে কবিতা লিখতে দেখেছি।

কম মেহনত করতে হয়েছে বাসাটার জন্য—দক্ষিণের খোলা পার্কটার দিকে চেয়ে চেয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

১৯৪২-এর কোলকাতার বোমাপড়ার সময় যিনি নামমাত্র ভাড়ায় এই বাসাটি নিয়েছিলেন আমি তাঁরই উত্তরাধিকারী। অবশ্য ভাড়া ধাপে ধাপে উঠেছে তবুও এসব অঞ্চলের বাড়ীর সিকিভাগ হবেনা। সত্যিকথা বলতে কি, ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে বলতেই যেন লজ্জা করে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয় একটি বিয়ে-বাড়ীতে, তারপর সে পরিচয়কে আত্মীয়তার পর্যায়ে তুলেছি তাঁদের দাদা বৌদি বলে—আর দীর্ঘদিন তাঁদের মন জুগিয়ে চলে—। তাঁদের দুটি ছেলেমেয়েকে বিনা দক্ষিণায় পড়াতে পড়াতে আজ তিন বছর ধরে শুনে আসছি—ও এক মাসের মধ্যে দাদা হয় দিল্লী, নয় কানপুর, নয় মীরাট একটা কোথাও না কোথায় বদলি হচ্ছেন—আর যাবার সময় ফ্ল্যাটটি আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য পরবর্তী বাধা অনেক, কিন্তু একবার ঢুকে পড়িত।

ছাই—ভুতুড়ে বাড়ী—দেওয়ালের পলস্তারা খসে গেছে... ... ...

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে যখন হয় এসপার নয় ওসপার এমন একটা কিছু করব ভাবছি—এমন সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। দাদার বদলীর অর্ডার হল। খবর শুনে যথাসাধ্য চেষ্টায় মুখটা মলিন করে বললুম—"তাইতো এখানে আপনারাই ছিলেন আমার সত্যিকারের

আত্মীয়ের মত।......" নির্জলা মিথ্যে গলায় আটকাচ্ছিল—তবু তাঁদের মুখ দেখে মনে হল তার এফেক্ট ভালই হয়েছে। যাইহোক, দাদাই আমাকে দাবার ছকে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। বৌদি অবশ্য বলেছেন—"ভালয় ভালয় যদি কয়েকমাস পরে ফিরে আসতে পারি ভাই, তাহলে কিন্তু তোমাকে—"

অর্থাৎ এটা 'ইর্‌রিভোকেবল ডিড্' নয়—স্বত্ব সাময়িকভাবে হস্তান্তর মাত্র। তা হোক অতদূর ভেবে স্বয়ং বিধাতাপুরুষই কোন কাজ কোরতে পারেন না—মানুষ ত কোন ছার। তাই আমিও তাঁর কথা লুফে নিয়ে বলেছিলুম—"সে আর বলতে বৌদি, আপনার দয়ায় না সেই এঁদো বস্তী থেকে স্বর্গপুরীতে এসে উঠলুম—এ বাড়ীঘর সব আপনার, আমি শুধু আপনার অবর্তমানে এগুলো রক্ষা কোরবো—বলেই মনে হল ভাষাটা ঠিক হলনা—ওটা 'অবর্তমানে' হবে না হবে 'অনুপস্থিতিতে'—প্রথমটার আবার ছাই লোকান্তর বোঝায়। বরাং ভাল বাংলাভাষার শব্দতত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বৌদি জলভরা কণ্ঠে বলেছিলেন—"ভগবান তোমার ভাল করুন ভাই!"

বাসন্তীকেও একটু চোখ টিপে দিয়েছিলুম—গাড়ীতে ওঠবার সময় দিদি টিদি বলে অমনি মানানসই একটা কিছু বলতে।

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের মত অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে নিস্পৃহ সুখে রোমন্থন করছি এমন সময় বাসন্তী এলো কোমরে কাপড় জড়িয়ে। ভ্রূ কুঁচকে বললো—"ডাকছো" ভঙ্গী দেখে স্বীকার করতে শঙ্কা হল। তবু বললুম—না এমনি, বেশ বাসা না?

"ছাই—ভূতুড়ে বাড়ী, দেওয়ালের পলেস্তরা খসে গেছে—চুনবালি ধরান হয়নি বোধহয় বাড়ীটির জন্ম ইস্তক,—ছাদের ফাটলগুলো দেখেছ—বর্ষার সময় বুঝবে মজা—আর কিছু না হোক দরজার পাল্লাগুলো একটু ঠিক করে দিতে বোলো বাড়ীওয়ালাকে, কারো ঘাড়ে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। যাকগে,—ওদিকে একগাদা জিনিষপত্র নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, ডাকছিলে কেন, কি বলবার চটপট বল।"

বললুম—"কালীবাড়ীর পুজোটা কালই দিয়ে দাও—কাল শনিবার, মানত করেছিলুম......"

"মানত?—মানত কিসের, কই আমি তো কিছু জানিনা—"

বাসন্তী সবিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল।

—"বিশেষ কিছু নয় এই নিখিলদার ব্যাপারটা নিয়ে—তিনবছর ধরে ভাঁওতা খেতে খেতে আর না পেরে বলেছিলুম—'আর ত পারিনা মা, নিখিলদার বদলীটা একটু তাড়াতাড়ি করাও—সোয়া পাঁচ আনার......"

বাসন্তী ঝঙ্কার দিলে—"ছি ছি—তুমি পারলে, তুমি কি মানুষগো! যাবার সময় দিদি আমার দুটো হাত ধরে কেঁদে বললেন, কোলকাতা ছেড়ে যেতে বুক ভেঙে যাচ্ছে ভাই, জন্ম, কর্ম সব আমার এখানে......আর তুমি কিনা......' বাসন্তীর গলা ভারী হয়ে এলো, তারপর দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বললে—"ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করি, মা—তুমি ক্ষমা কোরো।"

ক্ষমা?—ক্ষমা কোরবে কাকে, এই অর্বাচীন, অর্থাৎ আমাকে। আশ্চর্য স্ত্রীচরিত্র। 'যার জন্য চুরি করি—' ভাবলুম একবার যেমন আছি [illegible] দোষের নাই, ঘরে [illegible] [illegible]—।

কিন্তু এরকম ভাবনা গত বারবছরের বিবাহিত জীবনে কতবার ভেবেছি সেকথা মনে করাও আজ শক্ত।

ওদিকে বটুর সঙ্গে বোধ হয় মিলির লেগেছে। মিলি চিৎকার করে উঠতেই বাসন্তী সেইদিকে দৌড়ালো।

ইচ্ছা ছিল এক কাপ চায়ের। মোনা হারুর হাত দিয়ে নয়, বাসন্তী নিজে নিয়ে এসে আমার বাসা-বিজয় গৌরবকে চিহ্নিত করে দিক, একটু দাঁড়াক, ভাবগদগদ প্রেমের কথা নয়, সহজ সচ্ছন্দ দুটো কথা বলুক—এ ধরণের কথা ত পৃথিবী থেকে লোপ পায়নি। কিন্তু একথা বর্তমানে বাসন্তীকে বলার কোন অর্থ হয় না। তাই পকেট থেকে ছটা পয়সা নিয়ে নীচে নেমে গেলুম।

নীচে নেমেই চক্ষুস্থির। কোথা থেকে কম্যুনিষ্টদের দু' তিনখানা প্রচারপত্র পেয়েছে জানিনা—বাবুল আর বিল্লী সেগুলো সিঁড়ির দেওয়ালে যত্ন করে সাঁটছে। সর্বনাশ, গা টা রী-রী—করে উঠল। একেই ত ছেঁড়া ছাতার মত চাকরী, জল গলে পড়ছে, বাতাস এলে উল্টে

দেখলুম ওরা মার্চ করতে করতে বেরিয়ে আসছে

যায়—তা হোক শিকগুলো 'বৃটিশ মেড' মানে সরকারী পাকা চাকরী—এতগুলো কাচ্চাবাচ্চাকে ত তার তলায় আশ্রয় দিয়েছে।

চুলোয় যাক 'চা'। দুটোর কান ধরে প্রায় ঝোলাতে ঝোলাতে উপরে তুললুম—"ওখানে কি হচ্ছিল বাঁদর—এদিকে দেখতে পাওনা মা খেটে খেটে মরে যাচ্ছে" তাদের মায়ের উপর এই আচমকা দরদ দেখে ওরা বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মনে হল অপরাধের গুরুত্বও ঠিক বুঝতে পারেনি, অথচ মুস্কিল একথা পরিষ্কার করে বোঝানও যায় না।

কদিনেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে এ পাড়াটাই লাল ঝাণ্ডার পাড়া। নিত্যি পার্কে মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে—তার কী জোররে বাবা, কানের [illegible] দিয়ে [illegible] না [illegible]—[illegible] মর্মান্তিক করবার পক্ষে

যথেষ্ট। লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল আসছে—নানান কালিতে ভাঙাচোরা হরফের প্ল্যাকার্ড সেঁটে আশপাশের দেওয়ালের আর কিছু রাখেনি। মাঝে মাঝে মোড়ে মোড়ে পুলিশ বসছে—অর্থাৎ বেলা চারটার পর থেকে এ অঞ্চলটা কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, পুলিশ, হকার, সিনেমাযাত্রীর আটকড়াই ভাজা। নিখিলদার ছেলেমেয়েকে পড়াতুম সকালে সুতরাং এ ব্যাপারটা কোনদিন লক্ষ্যই করিনি।

বাসন্তীকে বলি—বেরোবার পর এই হতভাগা বাঁদরগুলোকে একটু সামলে রেখো—পুলিশের লাঠিগুলী খেয়ে না মরে—মরুক দুঃখ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের বাঁচাও শক্ত হবে—চাকরীটাও......"

বাসন্তী মুখ ভেংচে বললে—বালাই ষাট, ছিরির কথা দেখ—মরবে কেন, কোন্ শ্বশুরের পাড়া ভাতে ভাগ বসিয়েছে—বাহাত্তুরে ধরেছে—?"

তারপর দুম দুম করে পা ঠুকে অন্যঘরে চলে গেল।

কি করে বলি ছাত্রিশ বছর বয়সে যে আটটি সন্তানের জনক হবার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে—তার ছত্রিশেই বছর, অর্থাৎ ছত্রিশেই বাহাত্তুর হয়। কিন্তু মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

বাসাটার সম্বন্ধে বাসন্তীর অভিযোগ অবশ্য অনেক—তবে আমি যেটা স্বীকার করি সেটা জলের। একটা পাম্প আছে সত্যি তা সে মাসের মধ্যে ছাব্বিশ দিন বিগড়ে থাকে—তাই নীচে থেকে জল আনতে হয়। বাসন্তীর পক্ষে এ কাজটা যে অসম্ভব সে তার পরম শত্রুও স্বীকার করবে—আর শেষের তিনটি বাচ্চার প্রশ্নই ওঠে না—সুতরাং বাকী রইলুম আমি ও আমার পাঁচটি। তাদের শাস্তি হিসেব করে লক্ষ্মী দি, দাদা, রসুই—এমনি নানা সাইজের টিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি—যে যতটা পারে করুক, কাঠবিড়ালীও [illegible] বেঁধেছিল।

পুণতিতে না ধরলেও ছনম্বরটি এ্যাপ্রেনটিস খাটছে একটা সিগারেটের টিন নিয়ে—টিনটাই ওর সংগে ওঠা নামা করে জলটা থাকে সিঁড়িতে —আর জলপড়া পেছলা সিঁড়িতে পড়ে বাকী দু একটার আছাড় কান্না এসব ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

প্রথমটা মায়ামমতা রেখেই ওদের নিয়োগ করা হয়েছিল—কেউ দুবার, কেউ বা বড় জোর তিনবার। কিন্তু বাসন্তীর চাহিদায় সেটা ক্রমেই ওভারটাইমের পর্যায়ে উঠল আপত্তি করলে যাদুবাছা থেকে মারধোর গালিগালাজ এসবত আছেই। দেখতুম জল বয়ে উপরে উঠলে ওদের পাঁজরাগুলো ফোঁস ফোঁস কোরতে— কিন্তু প্রতিবাদ করবার পথ ছিল না। সকালে বিকেলে দুটো করে টিউসনি সামলে মাঝে যেটুকু ফাঁক থাকে সেটা জল তোলায় ভরাট করলেও বাসন্তীর প্রয়োজনের তুলনায় কিছু নয়।

তারপর আছেন ফ্ল্যাটের অন্যান্য প্রতিবেশী —প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের মত—অর্থাৎ একমাত্র বাড়ীওয়ালার বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে সহযোগিতা করি—একটা সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ি—বাকী সময়টা নয় নিজেরা খেয়োখেয়ি করি, নায় ধাক্কা লাগলেও কথা বলি না। বিশেষ করে আমার মত আটটি অপোগণ্ডকে নিয়ে যার প্যারেড কোরতে হয় তার ত্রুটিবিচ্যুতি ত পদে পদেই—কি করব, ভগবান মেরেছেন তাই চুপ করে থাকি।

সব মিলিয়ে স্বর্গরাজ্য চলছিল মন্দ নয়— একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে দেখলুম বাবুল ও বিল্লী ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি যখন ফিরি—তখন ছোটগুলো প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকলেও ওরা দুটো জেগে থাকে—বইপত্তর নিয়ে আলোর সামনে বসে থাকে। পরের ছেলে পড়ানর ধকল সামলে ওরা পড়ে কিনা এটা আর খোঁজ নিতেও পারি না।

জামা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলুম— "ওরা যে বড় ঘুমিয়ে পড়েছে—অসুখ বিসুখ করেনি ত।"

বাসন্তীর দিক থেকে জবাব এলো না—মোনা বালিশ থেকে ঘাড় তুলে বললে—"মা দাদা আর দিদিকে খুব মেরেছে—"

মার অবশ্য ওরা রোজ খায় কিন্তু ঘুম পাড়ানী মার?

তাই প্রশ্ন করলুম, "কী হয়েছিল রে?" মোনা আবার ঘাড় তুলতে যাচ্ছে—বাসন্তী তাকে ধমক দিলে। বললে—"হবে আর কি—এমনি সারাদিন ত ওদের চুলের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না—বিশেষ করে বিকেল হলে—ওই "পার্ক"-এর মিটিংগুলিতো ওদের সতেজ প্রাণ— সন্ধ্যাবেলা দুজনে পৃথিবী জয় করে লাফাতে লাফাতে উঠে এলেন—ভাল কথায় বললুম, যা দু বালতি জল নিয়ে আয় ত।' আমার মুখের উপর কি বলল জান? 'আমাদের দিয়ে রোজ রোজ এমনি জল তোলান তোমার অন্যায়, প্রত্যেক লোকের ইচ্ছের স্বাধীনতা থাকা উচিত।' হাঁ কোরে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম—কি ভাষায় কথা কইছে ওরা,—ওদের যে দুধের দাঁত পড়েনি এখনও—এই আমি তোমায় বললুম; যদি ভাল চাও ত চাবি বন্ধ করে অফিস যেও—এ কি কাল পাড়ায় এলুম গো।"

কিছু না বলে একটু চিন্তা নিয়েই শুতে গেলুম। ভোরে উঠে বাথরুমে ঢুকে দেখলুম চৌবাচ্চায়, বালতিতে, ঘটিতে কোথাও একফোঁটা জল নেই—চৌবাচ্চার জল বেরোবার পাইপটা পর্যন্ত খোলা। বাইরে বেরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছি এমন সময় দেখলুম দরজায় একটা কাগজে গোদা গোদা করে লেখা—'আমাদের দাবী মানতে হবে।'

চমকে উঠলুম। এক লহমায় ব্যাপারটা অনুমান করে নিলুম। ইচ্ছে কোরলো সব কটাকে ধরে একটার পর একটা বারান্ডা দিয়ে নীচে ফেলে নির্বংশ হয়ে যাই। বাঁদরদুটো 'ক রাতভোর—। হাঁক দিলুম—'বাবুল, বিল্লী, মোনা, হারু—' কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই।

আরো জোরে হাঁক ছাড়লুম—'বেরিয়ে আয় এক্ষুণি। ঘরের দরজাটা খুলে যেতে চোখ জুড়িয়ে গেল—বাবুলের পেছনে বিল্লী তার পেছনে মোনা—আমার ছয়টি সন্তান ড্রিল করার ভংগীতে দাঁড়িয়েছে—প্রত্যেকের হাতে লাল ঘুড়ির কাগজের নিশান। গলার পর্দা আরো একটু তুলে বললুম—"এদিকে এখানে—"

দেখলুম ওরা মার্চ করতে করতে বেরিয়ে আসছে। বাবুল ডান হাতটা উপর দিকে ছুঁড়ে বললে—'আমাদের দাবী—'

বাকী পাঁচ তারস্বরে শেষ করলে—'মানতে হবে—মানতে হবে—'

বাবুল আবার হাঁকল—'জুলুম করা—' ওরা সবাই যোগ দিলে—চলবে না, চলবে না— এমন কি মিলিটার গলা পাচ্ছি—'চলবে না চলবে না।'

কি ভাবছিলুম জানি না—বোধ হয় আমার বোধ ও বাকশক্তি দুইই এক সংগে রুদ্ধ হয়ে গেছে। যখন গলা খুললো তখনও বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থায় না থাকলে আর বলব কেন—'কি তোদের দাবী।' মিলের মালিকরাও বোধ হয় এমনি বুদ্ধিভ্রংশ হয়। বাবুল দু পা এগিয়ে এলো—ওর বুসসার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বাড়িয়ে ধরলে—। বড় বড় অক্ষরে পুরো চারদফা দাবী—

(১) কেউ চার বালতির বেশী জল তুলব না।

(২) জল তোলার জন্য আমাদের টফি বা লজেঞ্চুস দিতে হবে।

(৩) মা কখনও আমাদের মারতে বা বকতে পারবে না।

(৪) আমাদের পড়ার সময় আরো কম করতে হবে।

কাগজ থেকে মুখ তুলতে ওরা আবার স্লোগান দিল—

'আমাদের দাবী—'

'মানতে হবে—মানতে হবে—'

'—জুলুম করা—'

—'চলবে না—চলবে না'

পুলিশের মতই ছুটে যাচ্ছিলুম—কিন্তু হাতে টান পড়তে ফিরে দেখলুম বাসন্তী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দম আটকান হাসি হাসছে।

* * *

স্বর্গরাজ্য ছেড়ে আবার গুলু ওস্তাগর লেনে একটা ছোট একতলা বাসা দেখে উঠে এসেছি। বৌদিকে জানিয়ে দিয়েছি—তাঁর বাসা রক্ষে করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না— স্বর্গরাজ্য সকলের হাতে সয় না।

তোমাকে দেখলাম
তোমাকে জানলাম
তবুও হলোনা বুঝা আজও,
হিসাবে পাইনা খুঁজে
থাকিতো চোখ বুজে
কত না সুরে তালে, তুমি যে বাজো।

কখনো বল হেসে
আলতো ভালোবেসে
সোনায় রাঙানো রোদ-ই ভালো,
তখনই ভুলে যাও
কাঁদারই গান গাও
শ্রাবণ পেতে চাও, যে মেঘ ঘন কালো।

একী এ খেলা তব
নিত্য নব নব
আমি তো তোলপাড় বন্যায়,
অবাকে নির্বাক
কি সে যে পরিমাপ
হাতড়ে ফিরে ফিরে খোঁজে তো মন তাই।

সাপ, সাপ, সাপ!

ঘুমের ঘোরে সাপ সাপ বলে লাফিয়ে উঠে খাট থেকে পড়েই যায় মেয়েটা। ছয় সাত বছরের মেয়ে। পড়ে গিয়ে সারা শরীর তার নীলবর্ণ হয়ে যায় একেবারে। বাড়িময় হৈ-হল্লা সুরু হয়ে যায়। মেয়েটা বুঝি আর বাঁচে না! অচৈতন্য, অসাড় তার দেহ।

ডাক্তার, বদ্যি, ওঝা, হেকিম দেখতে দেখতে সব এসে জড়ো হন দত্ত সাহেবের বাড়িতে। যে যার বিদ্যে খাটাতেও সুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে। সুখের কথা 'খোকনে'র জ্ঞান ফিরে আসে অল্প সময়ের মধ্যেই। আর চিকিৎসকরাও যে যার কৃতিত্ব দাবী করতে সুরু করেন। বেশতো, তাতে আর আপত্তি করার কি আছে? 'খোকনে'র বাবা দত্ত সাহেব সকলের কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েই সকলকে বিদায় দেন যোগ্য বিদায়ী দিয়ে খুশি করে।

ছোটবেলায় কবে যে ঘুমুতে ঘুমুতে দিনের বেলাতেই সে স্বপ্ন দেখে মূর্ছা গিয়েছিল, সে কথা তার মনেও পড়ে না। তবে সেই থেকেই যে তার নাম হয়েছে স্বপ্না তা আর তার অজানা নয়। আগের দিন বর্ষার জলে একটা সাপকে ব্যাঙ গিলতে দেখে সে নাকি খুব ভয় পেয়েছিল এবং তার পরদিনই ঘটে এই ঘটনা, একথা অনেক পরে সে তার মায়ের মুখে শুনেছিল।

এলাহাবাদ শহরের পুরোনো ব্যারিস্টার বঙ্কিম দত্ত। দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থেকে সন্তান লাভের আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন একরকম। দত্ত সাহেবের মাতা কমলকামিনী মৃত্যুর পূর্বদিন অবধি নাগ বাসুকির কাছে কতো মানত করেছেন, মাথা কুটে ফেলেছেন তাঁর পুত্রের ঘরে একটি পুত্র সন্তান দেখে যাবার জন্যে। সুচরিতার তো দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর শাশুড়ীর মানতের এবং প্রার্থনার গুণেই পুত্র না হলেও তাঁদের এই কন্যা লাভ ঘটেছে। হঠাৎ এই কন্যারত্ন পেয়ে দত্ত সাহেব এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, 'খোকন' নামটাই তিনি চালু করে দিলেন সারা বাড়িতে এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। বিশেষ করে তাঁর মায়ের কামনাকেই তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন এইভাবে। কিন্তু ঐ দুর্ঘটনার পর কেমন যেন একটা খটকা লেগে যায়, এমনকি দত্ত সাহেবেরও মনে। মেয়েটার মধ্যেও আকস্মিক ও অদ্ভুত রকমের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

: ঘর ভরা 'খোকনে'র এত খেলার সরঞ্জাম, কিন্তু তার কোন কিছুই সে আর এখন ধরেও দেখে না, এ কেমন কথা! —কোর্টে বেরুবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জামার কলার ঠিক করতে করতে বলেন দত্ত সাহেব।

: তুমি আর 'খোকন' 'খোকন' বলে ডেকো না ওকে। আমার যেন এ ডাকটা মোটেই আর ভালো ঠেকছে না। তার চেয়ে বরং খুকু বলেই ডাকো না! কি জানি কেন এমন হয়ে গেল মেয়েটা। সারাদিন মাটি নিয়ে বসে বসে সে কেবল সাপ তৈরী করে আর তা নিয়ে সারাক্ষণ ধরে খেলা। কে জানে ঠাকুর দেবতার ইচ্ছেকে খুশি মনে মেনে না নেবার ফলেই হয়তো হয়ে থাকবে এরকম। কাজেই কি দরকার মেয়েকে সাধ করে খোকন বানানোর?

দত্ত সাহেব গৃহিণীর কথা শুনে একটু মুচকি হাসি হাসেন বটে, কিন্তু কোন জবাবই তাঁর মুখ ফুটে বেরোয় না। হঠাৎ একটা সিগারেট বার করে কেস-এর ওপর ঠুকতে ঠুকতে কি যেন তিনি ভেবে নেন দু'তিন সেকেন্ড, তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন কোন কথা না বলে।

নিজের মেয়ের ব্যাপার না হলে গিন্নীর কথা কুসংস্কার বলে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তো আর তা হবার নয়। কাজেই কোর্টে বসে সব কাজের মধ্যেই বার বার মেয়ের চিন্তাই আলোড়িত করে তুলতে থাকে দত্ত সাহেবের মনকে। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিকই করে ফেললেন যে, সেদিন থেকে খুকুর নাম হবে স্বপ্না। কারণ স্বপ্ন দেখে খাট থেকে পড়ে যাওয়া থেকেই যখন খুকুর এরকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তখন তার নামের সঙ্গে সে ঘটনার একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত বলেই তিনি মনে করেন।

কোর্ট থেকে বাড়িতে ফিরেই স্ত্রী সুচরিতার কাছে তাঁর প্রস্তাবটা তুললেন দত্ত সাহেব। সে প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে সানন্দেই মেনে নিলেন সুচরিতা।

* * *

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। স্বপ্নাকে পুত্রবধূ করে নেবার যে প্রস্তাব ব্যবসায়ী বন্ধু শ্রীমন্ত ঘোষ করে রেখেছেন, লণ্ডন থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে সুধাময় ফিরে আসার পর সে প্রস্তাবই কার্যকরী হতে চলেছে। দত্ত সাহেব প্রায় প্রস্তুত। কিন্তু হঠাৎ এক অভাবনীয় অঘটন ঘটে গেল ইতিমধ্যে। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু তাতো হবার নয়। দত্ত সাহেবের বন্ধুত্বের কথা কি ভুলতে পারেন শ্রীমন্ত ঘোষ? কতবার যে তিনি তাঁকে মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করেছেন, তার হিসেবপত্র নেই কিছু। একটি কানাকড়িও নেননি তিনি তার জন্যে। এ অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর শ্রীমন্ত ঘোষ যে স্বপ্নাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রাখবেন, সে আর কি এমন বেশী!

হঠাৎ হার্টফেল করলেন দত্ত সাহেব। স্বপ্না কিন্তু বলে অন্য কথা। সে বলে সাপে কামড়ে মেরেছে তার বাবাকে। দু'দিন ধরে ক্রমাগত সে শুধু কেঁদেইছে, কোন কথাই বলেনি। শেষে বলে কিনা সাপের কামড়ে মারা গেছেন তার বাবা! স্বপ্নার সে কি আপশোষ সেজন্যে? এত পুজো দিয়েও, এত দুধ-কলা খাইয়েও নাগ বাসুকিকে, বাসুকি ভগ্নী মনসাকে খুশি করা গেল না! বিস্ময়ে বেদনায় ভেঙে পড়ে স্বপ্না। তবু কিন্তু বাসুকি ও বিষহরির পুজো বন্ধ হয় না তার। ঘুম থেকে উঠেই নাগ বাসুকির মন্দিরে নিত্য প্রণাম করতে যাওয়া, তারপর স্নানান্তে একবার করে দুধ-কলা ভোগ দিয়ে পুজো দিতে মন্দিরে আসা এবং প্রতি সন্ধ্যায় আরতি ও প্রার্থনায় যোগ দেওয়া একদিনের জন্যেও এ নিয়মে ছেদ পড়তে দেয় না স্বপ্না। এমনকি তার বাবার মৃত্যুর পরেও নয়।

নাগ বাসুকির পুজার্চনায় দিনের অনেকখানি কাটিয়ে দিলেও সংসারের আর সব কাজ-

কর্ম কিন্তু স্বপ্না স্বাভাবিকভাবেই করে থাকে। আর সংসার বলতে এখনতো শুধু তার মা, পাচক বামুন আর ঝি-চাকর। মায়ের কাজ, তাঁর সেবা-যত্ন যেটুকু করার তা নিখুঁতভাবেই করে স্বপ্না। তবু তার মনটা যেন সব সময়েই পড়ে থাকে ঐ নাগ বাসুকির মন্দিরে। এ ব্যাপারের রহস্য যে কি তা জানবার জন্যে দত্ত সাহেব থাকতেই অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নানা গবেষণায় নানা রকমের অনুমান করা গেলেও প্রকৃত রহস্যোদ্ধার এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

নাগ বাসুকির মন্দির পরিবেশ সত্যি ভারি আকর্ষণীয়। মন্দিরের তিনদিক ঘিরে রয়েছে গঙ্গা। মাতা গঙ্গার কোলে যেন আদরে দোল খাচ্ছেন পুত্র বাসুকি। সাতশ' বছরের পুরোনো এ মন্দির। ভারতে হিন্দু যুগের অবসানকাল থেকে ইতিহাসের নানা অধ্যায়ের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর ইঁটে-পাথরে। তিনশ' বছর আগে পেশোয়ারা নাকি নতুন রূপ দিয়েছেন এ মন্দিরের। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে দক্ষিণ গঙ্গায় যেয়ে নেমেছে দুধারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের সিঁড়ি। একটি ঘাটের সদৃশ্য সিঁড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনেকখানি হতশ্রী হয়ে পড়েছে মন্দির পরিবেশ। তাহলেও এ পটভূমি নিতান্তই মনোরম। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় গঙ্গা স্পর্শ পেতে। প্রতিদিন প্রতি-বার গঙ্গা স্পর্শে পবিত্র হয়ে তবেই স্বপ্না মন্দিরে প্রবেশ করে। একথা এলাহাবাদ [illegible] কে না জানে।

উচ্চশিক্ষিত আধুনিক বাঙালী পরিবারের এই তরুণী [illegible] ভক্তির প্রবণতা [illegible] রটেছে মহাতীর্থ [illegible]। [illegible] স্বপ্না তো গ্রাহ্যই [illegible]। [illegible] কাহিনী [illegible] শ্রীমন্ত [illegible] সম্ভব হয়নি। [illegible]

[illegible]

[illegible] ঘরে ফিরে দেখে আসতো। কিন্তু এখন তার বাড়িতে বড় একটা ডাকে না। দত্ত সাহেবের নানা স্মৃতি [illegible] মতো যেন এসে [illegible]। অথচ এ বাড়ির মালিক এখন স্বপ্নাই। দত্ত সাহেবের উইলে সেই-ই তাঁর উত্তরাধিকারী।

একদিকে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাকে ব্যবসায় হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নয় সুধাময়। বিপুল সম্পদের অধিকারী তাঁর পিতা, শ্বশুরের প্রচুর সম্পত্তি এসে গেছে তাঁর হাতে স্ত্রী স্বপ্নার মাধ্যমে। রোগক্লিষ্ট মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে সুধাময় কৃতসংকল্প। এরই মধ্যে দরদী চিকিৎসক হিসেবে অত্যধিক জনপ্রিয়তা হয়েছে তাঁর সারা শহর জুড়ে। রোগের অর্ধেক উপশম হয় চিকিৎসকের দরদে, একথা যখন তখন শোনা যায় সুধাময়ের মুখে। একথাও তিনি বলেন যে, ডাক্তারীকে নিছক ব্যবসায় বা অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে মনে করা ঠিক নয়, এর একটা সেবার দিক আছে এবং সেটাই এবৃত্তির মহত্তর দিক।

: আচ্ছা স্বপ্না, পঙ্গু শিশুদের চিকিৎসার জন্যে দত্ত লজে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়! জীবনের সুরু থেকেই যারা পৃথিবীর আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত তাদের কতো কষ্ট বলতো! আনন্দের মধ্যেই মানুষের দেহ ও মন সত্যি করে বেড়ে ওঠে। পঙ্গু শিশুদের সে রকম আনন্দ পাবার সুযোগ করে দিতে পারলে কেমন ভালো একটা কাজ হয়, বলতো! তাছাড়া আমারতো মনে হয় দত্ত সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কোন কিছুতেই হতে পারে না। তোমার মত পেলেই আমি একাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।

: বারে, আমার বাবার স্মৃতি-রক্ষার কাজে আমার মতামত সম্বন্ধে আবার কোন প্রশ্ন হতে পারে নাকি? আশ্চর্য! আজ থেকেই তাহলে কাজ সুরু করে দাও না। —যে স্বামী তাঁর নব-পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে হ্যাঁ কি না ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা বলার সুযোগ পান না তিনি যে এতো বড়ো একটা কাজের কথা তুলতে পারেন তার কাছে স্বপ্না তা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই সে সুধাময়ের ইচ্ছার সঙ্গে, তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেকেও একান্তভাবে জড়িয়ে রাখতে চায়।

স্বপ্নার মা কিছুকাল ধরে কাশীধামে বাস করছেন। বাবা বিশ্বনাথের চরণামৃত মুখে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছে। তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ করার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মেয়ে-জামাই।

দত্ত সাহেবের তিন মহলা বাড়িতে বি কে দত্ত পোলিও ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। ত্রিশটি [illegible] শিশুকে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। এছাড়া আউট-ডোরের রোগী তো আছেই। রোগের যন্ত্রণা আছে, পঙ্গু শিশুদের [illegible] মনোদুঃখ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বি কে দত্ত পোলিও ক্লিনিকে যে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে রোগী শিশুরা ভালো হয়েও দত্ত লজ ছেড়ে যেতে চায় না। [illegible] হাতি-ঘোড়া চড়বার ব্যবস্থা [illegible] রয়েছে দোলনা, খেলনা আরো কত কি। বিশেষ করে ডাঃ ঘোষের সঙ্গ ছাড়া [illegible] যায় যেন ওদের। ডাঃ ঘোষ ওদের কথা দেন যে, ওদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে তিনি রোজ দেখা করে এবং ওদের সঙ্গে খেলা করে আসবেন, চকোলেট আর খেলনা দিয়ে আসবেন। তবেই না তারা হাসপাতাল ছেড়ে ওদের বাপ-মা-ভাই-এর সঙ্গে বাড়ি যেতে রাজী হয়!

প্রথম প্রথম স্বপ্নাও মাঝে মাঝে পোলিও ক্লিনিকে এসে রুগ্ন শিশুদের সঙ্গে হাসি-তামাসায় যোগ দিত। তার ভালোই লাগতো তাতে। এক একটি মা এসে প্রাণঢালা ভালো-বাসায় তাঁর সন্তানকে কিভাবে সিক্ত করে দিয়ে যায় তা গভীর ক্ষুধাতুর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছে স্বপ্না। দেখতে দেখতে শেষে এ দৃশ্য যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। তার বুকে যেন সূঁচের মতো যেয়ে বিঁধেছে সেই মাতৃস্নেহের ধারা। তাছাড়া বার বার নাগ বাসুকির মন্দিরে যাতায়াতের পর এমন বেশী সময়ও আর থাকে না তার হাতে যে, সে নিয়মিতভাবে হাসপাতালে যেতে পারবে। স্বামীর ওপরও যে অভিমান হয়নি একটু তাও নয়। একজন তো দিনরাতের পোনে ষোল আনাই কাটিয়ে দিচ্ছেন হাসপাতাল নিয়ে, সেখানে আবার আর একজনের কীই বা এমন প্রয়োজন হতে পারে?

স্বপ্না কেমন যেন শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। তার কিসের যে এতো ভাবনা-চিন্তা তাও বুঝে উঠতে পারে না কেউ। বৌমার শারীরিক অবনতি শ্রীমন্ত ঘোষকে চিন্তিত করে তোলে। ওর বাপ নেই, তাঁকেই তো এখন পুরো নজর রাখতে হবে স্বপ্নার ভালোমন্দের ওপর। বাপ নেই, একথা যেন কখনো মনে করতে না হয় স্বপ্নাকে। সত্যি সত্যি তেমনি সতর্ক ভাবেই চলেন শ্রীমন্ত ঘোষ। সর্বক্ষণ ডাক খোঁজ, স্নেহ-আদরে তাকে সুখী করার চেষ্টার যে কোন ত্রুটি নেই ঘোষ বাড়িতে একথা স্বপ্না নিজেই তার মাকে জোরগলায় বার বার বলেছে।

: হ্যাঁরে খোকা, বৌমাকে কিছুদিনের জন্যে কাশীধামে তার মায়ের কাছে পাঠালে হয় না। সেখানে থেকে শরীরটা বৌমার যদি ভালো হয়। কিছুদিনের মধ্যে কেমন কালো কটা হয়ে গেল মা আমার, আর কেনই বা যে এমন হলো তারও তো কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না! তুই তো ডাক্তার, না হয় একটা ভালো রকমের চিকিচ্ছেই করে দেখনা। —সুধাময় মধ্যাহ্ন আহারে বসেছেন, এই সুযোগে শ্রীমন্ত এসে বল্লেন ছেলেকে এই কথা।

: হ্যাঁ বাবা, তাই করবো। —এই বলে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুয়েই স্টেথিস-কোপটা আবার গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে পড়েন ডাঃ ঘোষ। বাড়িতে বসে গল্প করে সময় কাটালে আর যারই চলুক তাঁর চলে না। এক আধ ঘণ্টা দেখতে না পেলে হাস-পাতালের ছেলেমেয়েগুলো অধীর হয়ে ওঠে 'ডাক্তারদা কোথায়, ডাক্তারদা কোথায়' বলে। তাদের ছেড়ে বেশীক্ষণ বাইরে থাকার জো আছে?

সুধাময়ের একদার সহপাঠী এবং এখনকার সহকারী ডাঃ শংকরীপ্রসাদও একদিন ডাঃ ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বপ্নার স্বাস্থ্যের দিকে। ঘোষ বাড়িতে শংকরীপ্রসাদের আনাগোনা নতুন নয় কিছু, তবে স্বপ্নার আগমনের পর সে আসা-যাওয়াটা একটু বেশী বেড়েছে বৈকি! নিত্য বন্ধুপত্নীর খোঁজ-খবর ও তদারক করা এবং সেই অজুহাতে একটু আধটু ঠাট্টা তামাসা করা একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে তাঁর। স্বপ্নার ভালো লাগে না এ বাড়াবাড়ি।

বাইরে তো কোন রোগই ধরা পড়ছে না। তবু নানা ওষুধপত্তর, পুষ্টিকর খাদ্য ও ভালো ভালো ফলফলাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বপ্নার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুতেই যেন কিছু হবার নয়। স্বাস্থ্য তার ক্রমশঃই খারাপ হয়ে চলেছে। নাগ বাসুকির মন্দিরে তবু তার নিয়মিত যাওয়া চাই। অবশ্য যেতে হয় তাকে অতি কষ্টে। ফিরে এসে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে সে।

অসুস্থ স্বপ্না এখন প্রায় সারাদিনই শুয়ে শুয়েই কাটায় বটে, কিন্তু চোখে তার ঘুম আসে

না কখনো। ঘুমুতে যেন ভয় লাগে তার। ইচ্ছে করে চোখ বুজলেও তার যেন মনে হয়, নাগরাজ বাসুকির ক্রোধান্বিত সহস্র ফণা তার কোন্ অপরাধের শাস্তিবিধানের জন্যে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আর চোখ বুজে থাকতে পারে না, চোখ খুলতেই দেখে—না, কোথাও কিছু নেই তো!

রাত্রিতেও একা ঘরেই কাটায় স্বপ্না। ক্লান্ত সুধাময় কচিৎ কখনো যদিও বা বাড়িতে এসে রাত কাটান, তাও রাত্রির শেষ দু'তিন ঘণ্টা। দু'টো কথা বলার মতোও শরীরের অবস্থা তখন থাকে না তাঁর। অবসন্ন শরীরকে বিছানায় এলিয়ে দিয়েই ঘুম। এদিকে সারা রাত ধরে স্বপ্না ঘরময় পঙ্গু শিশুদের কিলিবিলিতে হাফিয়ে ওঠে যেন। তাকে ঘিরে সাপের মতো কিলিবিলি করে এই শিশুর দল। স্বপ্না এক-একবার ওঠে বসে, আলো জ্বালায়। কই, কোথাও তো কিছু নেই!

হঠাৎ সেদিন দু'চার মিনিটের অবসরে স্বপ্না বলেছে, সুধাময়কে এসব কথা।

ঃ ও সব কিছু নয়, তোমার নাম মাহাত্ম্য—নিয়মমতো ওষুধ খাও, ভালো ভালো ফল আর খাবার খাও, সেরে যাবে। এই বলে আলোচনায় দাড়ি টেনে দিয়েছেন সুধাময়।

অবশ্য বড়ো বড়ো ডাক্তারও ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে স্বপ্নাকে। ওষুধে ওষুধে বাড়িতে একটা পৃথক হাসপাতাল তৈরী হয়ে গেছে তার জন্যে। কিন্তু কোনটাতেই কোন ফল না পাওয়ায় ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীমন্ত ঘোষ তাঁর বৌমাকে কাশীধামে পাঠিয়ে দেওয়াই স্থির করে ফেলেছেন। দিন তারিখও ঠিক।

ডাঃ শংকরীপ্রসাদকে ঠিক করেছেন সুধাময়, তিনিই বেনারসে পৌঁছে দিয়ে আসবেন স্বপ্নাকে তার মায়ের কাছে। স্বপ্না আপত্তি জানিয়েছে ডাঃ প্রসাদের সঙ্গে যেতে, সে আপত্তির কারণ সম্বন্ধেও সে ইঙ্গিত করেছে। সুধাময় তাকে দিয়ে আসে এই তার ইচ্ছে। কিন্তু ডাঃ ঘোষের সময় কোথায়? বি কে দত্ত পোলিও ক্লিনিক ফেলে শহরের বাইরে যাবার কথা তিনি যে কল্পনাও করতে পারেন না। এতোগুলো ছেলেমেয়ের কী দশা হবে তা হলে?—এই চিন্তাই সুধাময়ের মনকে পঙ্গু করে ফেলেছে। তাই নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন তিনি স্বপ্নার আপত্তি। স্বপ্না চুপ করে থাকে, একটি কথাও আর বলে না। স্তব্ধ মেঘের মতোই তার সে নীরবতা।

সুধাময়ের অনুরোধে প্রথম প্রথম একটু মৌখিক আপত্তি জানালেও ডাঃ শংকরীপ্রসাদ আনন্দে আটখানা হয়ে ওঠেন মনে মনে। অনুরোধ আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্ল্যান ছকে ফেলেন ডাঃ প্রসাদ। সুন্দরী স্বপ্নার পরো-পটের একখানা ছবি ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। শুধু একখানা ছবি নয় স্বপ্নাময় মনে হয় তাঁর সারা পৃথিবী। তাকে যে চাই-ই তাঁর।

দ্বিতীয় বারের অনুরোধে শংকরীপ্রসাদ আর আপত্তি করেন না। দিন ও সময়টা জেনে নেন যাওয়ার। পরের দিন বিকেলের ট্রেনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলে দেন তাঁকে সুধাময়।

প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ। অন্ততঃ এ সময়টুকুর জন্যে শংকরীপ্রসাদ সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পাবেন স্বপ্নাকে। কিন্তু সে পাওয়া যদি সত্যিকারের পাওয়া না হয়! কেমন একটা আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে তাঁর মন। স্বপ্না তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায় এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এবার? এবার আর তাঁকে এড়িয়ে চলার কোন উপায় নেই। ট্রেনের তিন ঘণ্টা ব্যর্থ হলেই বা কি ক্ষতি? তারপরেই বা স্বপ্না কোথায় যাবে এবং কি করেই বা যাবে তাঁর হাতছাড়া হয়ে? সুধাময়ের সঙ্গে কথা হবার পর সেদিন সারা রাত ধরে শংকরী-প্রসাদের ভাবনা চলেছে এই ধারায়।

সেদিন অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরেছেন সুধাময় হাসপাতাল থেকে। খুব ক্লান্ত, খুব অবসন্ন। স্বপ্না একবার চেয়ে দেখেছে তাঁর দিকে, তাঁর সঙ্গে একটু কথাও বলতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু এতো রাত্তিরে পরিশ্রান্ত এই মানুষটির ওপর জুলুম করা হবে না কথা বলতে গেলে? স্বপ্নার মনে কেমন যেন একটু মমতা জাগে। সে পাশ ফিরে শোয়।

বারবার এতো বাবার কথা মনে পড়ছে কেন? মায়ের কথাও মনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এমন তো কোন দিন হয়নি! কেমন যেন একটা অবসাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহ জুড়ে স্বপ্নার। একি তন্দ্রা? ডাঃ শংকরীপ্রসাদের মুখে একটা বীভৎস হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন স্বপ্নার তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে।

সাপ, সাপ, সাপ! —স্বপ্নার ভয়ার্ত চিৎকারে শুধু সুধাময় নয়, বাড়িশুদ্ধ সবাই জেগে ওঠে। এঘর ওঘর দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি পড়ে যায় সারা বাড়িতে। ডাকা-ডাকি, হাঁকাহাঁকিতে আশ-পাশের লোকজনও ছুটে আসে।

ঃ ফিটের ব্যামোতো বৌমার ছিল না কোন দিন। এ এক নতুন উপসর্গ। ভারি তো মুস্কিল!—বিশেষ চিন্তান্বিতভাবে বড়ো শ্রীমন্ত ঘোষ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেন একথা।

ঃ কিছু চিন্তে করো না বাবা। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে স্বপ্না। এক্ষুণি সে ভালো হয়ে উঠবে, ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি। কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেছে, চোখেমুখে জল ছিটোতে ছিটোতেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। —সুধাময় এই বলে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করেন তাঁর পিতাকে। কারণ ছোটখাটো ভাবনা-চিন্তার ফলেই ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ শ্রীমন্তর ফিট হচ্ছে, আর এতো একটা বড়ো দুশ্চিন্তা।

শাশুড়ী হিরণ্ময়ীর আশীর্বাদ স্পর্শে ও ননদ ছন্দার সেবাযত্নে স্বপ্নার জ্ঞান ফিরে আসতে থাকে আস্তে আস্তে। মাঝে মাঝে অনুচ্চ স্বরে শুধু সে বলে ওঠে 'সাপ, সাপ, সাপ!' রাত্রি ভোর হয়ে আসে। স্বপ্না নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে বেশখানিক বেলা পর্যন্ত।

নাগবাসুকি মন্দিরে তো এখনও প্রণাম করতে যাওয়া হয়নি! —স্বপ্না ধড়ফড় করে উঠে বসে। তাড়াতাড়ি বেশবাস ঠিক করে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মন্দিরে যাবার উদ্যোগ করে সে। হিরণ্ময়ী এসে তার সামনে দাঁড়ান।

ঃ বৌমা, তোমার এই শরীর নিয়ে তুমি কি আজ পারবে যেতে মন্দিরে? যদি যেতেই হয়, তাহলে হরদেওকে অন্ততঃ সঙ্গে নিয়ে যাও।

ঃ তাই যাচ্ছি মা। —এই বলে শাশুড়ীকে প্রণাম করে এবং শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে মন্দিরের পথে এগোয় স্বপ্না। হরদেও তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

* * *

সকাল থেকেই দিনটা কেমন মেঘলা মেঘলা। নাগবাসুকির মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে গঙ্গার ওপারে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে দেখা যায়, নদী-তীরের বক্ষরাজির ওপর আকাশের কালো মেঘমালা যেন শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঃ তুই দাঁড়া এখানে হরদেও, আমি গঙ্গা স্পর্শ করে আসি। —এই বলে স্বপ্না নীচে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে, অনেক নীচে। সব নীচের সিঁড়ি থেকে গঙ্গা জল স্পর্শ করতেই হঠাৎ কেমন একটা কম্পন বোধ করে স্বপ্না। শুধু স্বপ্না নয়, উপরে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে সবাই 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে। শাঁখ বেজে ওঠে মন্দিরে, শঙ্খধ্বনি আর সীতা-রামের জয়ধ্বনি ভেসে আসে শহরের চতুর্দিক থেকে। গঙ্গার তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। হরদেও হতভম্ভ হয়ে পড়েছিল, তার সম্বিৎ ফিরে আসতেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় গঙ্গার ঘাটে, কোথায় তার বৌদিদি! হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করে দেয় হরদেও।

এদিকে মন্দির-পুরোহিত সবাইকে এসে দেখাতে বলেন এক অদ্ভুত ঘটনা। নাগ বাসুকির ফণা তখনও কাঁপছে। কোন্ ভক্তের বিপদে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন নাগরাজ কে জানে?

একটু পরেই হরদেওর কান্না থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে সব ঘটনা—ভূমিকম্পে স্বপ্নার সলিল-সমাধির কথা।

আরো পরে শ্রীমন্ত, হিরণ্ময়ী, সুধাময় ও ছন্দার অশ্রু বন্যা বয়ে মেশে গঙ্গার পবিত্র জলের সঙ্গে আর শংকরীপ্রসাদের আপশোষ ও দীর্ঘশ্বাস বাতাসকে করে তোলে বিষাক্ত।

আলোছায়া

ফোটো ঃ বিষ্ণুচরণ ঘোষ

বাসি ফুলের বাস

(১১৮ পাতার পর)

একটা কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। তার জন্য কারো কোন মাথা ব্যথাও ছিল না।

সে দিনের তুচ্ছ জীবেন কারো কাছে দাবী জানাতে পারেনি, করেনি কোন অভিযোগ। দাবী করবার ক্ষমতা ছিল না। ছিল না নালিশ করবার মুখ। কিন্তু কেন সে তা করেনি? কেন চোরের মত, পরাজিতের মত সে সরে পড়ল? বেকার হয়ে ব্যর্থ হয়ে বসে থাকা বড় শক্ত। সবাই তার দিকে চেয়ে আহা করবে সে কথা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে। তার উপর এটা হল নতুন একটা ভাব। যদি সেই পালানর মত দুঃসহসী কাজই করতে পারল, কেন সে পালাবার আগে দুঃসাহস দেখিয়ে বলতে তার স্বর্ণলতিকাকে অন্য কোন গাছে তুলে দেবার দিন পেছিয়ে দিতে অনুরোধ করেনি? যে ধাক্কার চোটে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই ধাক্কা কেন তাকে ঘর গড়বার জন্য আরো বেশী চেষ্টা করাল না? না। সে প্রশ্ন এখন তুলে তিনি নিজের আলোয়ভরা বিকেল বেলাটাকে মেঘলা করতে চান না।

বম্বে মেল অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে থেমে এল। মিস্টার রাকসিট নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। আজ বিকেলের ওই হঠাৎ খেয়ালে মোটর ড্রাইভটা তার মনকে একটু এলোমেলো করে দিয়েছিল। ওই পচা পানা পুকুর, পোড়ো জঙ্গলবন্ধ বাড়ীঘর, ভাঙ্গা শিবতলা— তার পুরানো অতীতের মুছে যাওয়া ছবি। কিন্তু সে ছবিকে তিনি মেরিন ড্রাইভের পারে ক্লাব আর ইন্ডিয়াতে লাউঞ্জে বসে তার সাহেব কোম্পানীর আসবাবে সাজান বাড়ী, দেওয়া বসান ক্রাইসলার গাড়ী আর প্রত্যেক মাসের ছুটিতে হোমে পাড়ি দেওয়া এ সবের একসঙ্গে ছবির পাশে এনে দাঁড় করাবেন না। ওই পিছনেরাই দাঁড়িয়েই যে মরে যাওয়া গাঁয়ের চেয়ে নতুন গড়ে ওঠা রেফিউজি কলোনীর দিকে তার নজর গিয়েছিল বেশী। পানায় ঢাকা পুকুরের চেয়ে নতুন আবাদ করা ফসলের খবরই তার মনে ধরেছিল। তিনি নিজে তার বেকার অসহায় জীবনের উপর জয়ী হয়েছেন। তার পারে না গ্রামের পরাজয়ের ক্ষেত্রে তাই রাকসিটের দেশী জুতো মস্ মস্ করে দাপটে হাঁটাহাঁটি করেছেন। আজ সবটুকু গ্রাম হেরে গেছে, চোখ তাকে মরার মত পড়ে আছে। জীবেন হেরে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মিঃ রাকসিট আজ জয়ী।

কিন্তু সত্যি কি তাই, জীবেন? পাইপের ধোঁয়াটা যেন কুন্ডলী পাকিয়ে একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যি কি তাই? তুমি আজ মিস্টার রাকসিট সেজে নিজেকে জয়ী বলে ভাবছ। এমন কি আজ ইচ্ছে হলে এই গ্রামটাকে নতুন করে গড়ে দিতেও পার তোমার টাকা আর প্রভাব দিয়ে। কিন্তু ওই যে তোমার স্বর্ণলতিকা, তোমার অম্বালী। তাকে তুমি কি আবার ফিরে পেতে পার? পার নতুন করে তাকে নতুন রূপে সার্থকতায় ভরে তুলতে? টাকা করলে তুমি পুকুরের শ্যাওলা তুলে নতুন টলটলে জল তাতে ভরে দিতে পার। কিন্তু ম্যালেরিয়া, অপথ্য আর গেঁয়ো আবহাওয়ায় ওর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া জীবনে যে শ্যাওলা পড়ে গেছে তা থেকে কি পার ওকে বাঁচাতে?

না। তোমার হারই হবে মিস্টার রাকসিট। তোমারই হার হবে।

কিন্তু পশ্চিম সাগরের হাওয়ার দোলায় মাথা ঠাণ্ডা ব্যারিস্টারের হার হল না। অম্বালী? আজ যাকে পুকুর পাড়ে দেখলাম সে ত সেই অম্বালী নয়। মানি যে সেই মানুষই বটে কিন্তু সে অম্বালী নয়। তার মধ্যে হয়নি আমার মন পরাজয়। অবশ্য তার কথা মনে পড়ে তাড়াতাড়ি হয়েছি। বেশ ভালই সকাল। সে হচ্ছে শুধু বাসি ফুলের বাস।

এই মিস্টার রাকসিট (?) ... পাইপটা মুখে চেপে ধরে মিস্টার রাকসিট হালকা নীল কাচের সার্শির উপর প্ল্যাটফর্মের পর্দাটা টেনে দিলেন।

পলকা সুতোর ঘুড়ি

(১১৬ পৃষ্ঠার পর)

যদি কোনও দিন অবিনাশ জানতে পারে—আমার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু তোমার?'

কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে মীনা। বললাম,—'আর একটা কথা শুধু জানতে চাই—তাহলে আমার ক্রস-ওয়ার্ড পাজ্‌ল-এর সব ঘর পূর্ণ হয়ে যায়। কোথায় কি করে অবিনাশের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল?'

অন্ধকারে বুঝতে পারলাম, তক্তপোষের এক পাশে উঠে বসেছে মীনা, তারপর বললে,—'সেদিন কি একটা কাজে গাড়ী করে আমাদের বস্তির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন উনি—আমার ছোট ভাই নিতু রাস্তায় খেলা করছিল—ওঁর গাড়ীর ধাক্কায় পড়ে যায়। উনি তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে খোঁজ করে বস্তিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমে মনে হয়েছিল কিছুই হয় নি, কিন্তু পরে হাসপাতালে গিয়ে জানা গেল বুকে চোট লেগেছে—ইনটারন্যাল হেমারেজ—সেই দিন ভোর রাত্রে নিতু মারা যায়।' একটু চুপ করলো মীনা। তারপর বলতে সুরু করলে—'এরপর থেকে রোজই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ী আসতেন উনি—চুপ করে ঘণ্টা দুই বসে থাকতেন, তারপর কোনও কথা না বলে চলে যেতেন। এইভাবে এক হপ্তা কেটে যায়, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কাছে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন উনি। এর মধ্যে লোকমুখে ওঁর পরিচয়ও কিছু কিছু জেনেছি আমরা। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু............'

বাধা দিয়ে বললাম—থাক, বলতে হবে না, আর সবই আমার জানা। এবার তুমি যেতে পারো। ভোরের আর দেরী নেই—তাছাড়া সকাল নটার গাড়ীতে আমায় কলকাতায় ফিরতে হবে। মনে হল একটু যেন থমকে দাঁড়াল মীনা—যেন কিছু বলবে, বললে না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

কাহিনী আমার শেষ হয়ে গেছে মীনার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু জম-জমাট ভাল গান শেষ হয়ে গেলেও যেমন তার সুরের মূর্চ্ছনার রেশ কিছুটা থেকে যায়, তেমনি এর একটুখানি জের টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

ভোরের দিকে বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ জেগে দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে—পাশে চুপটি করে বসে আছে অবিনাশ।

বেশ একটু লজ্জিত হয়ে বললাম,—"বেশ লোক ত? এত বেলা হয়ে গেছে ডেকে দাওনি কেন? ন'টার গাড়ীতে যেতে হবে আমায়।" একটু যেন অবাক হয় অবিনাশ, বলে—আমি জানতাম দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ।

সঙ্গে সঙ্গে বলি—একদম ভুলে গেছলাম ভাই, অন্য একটা ছবির সুটিং-এর ডেট অনেক আগে দেওয়া ছিল—আজ রাত আটটা থেকে সুটিং—বেলা পাঁচটার মধ্যে কলকাতায় আমায় পৌঁছুতে হবেই।

আর কোনও প্রতিবাদ করে না অবিনাশ, উঠে ভিতরে চলে যায়। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে, জলটল খেয়ে মামুলি বিদায়ের পালা শেষ করে দুই বন্ধু চলে আসি ষ্টেশনে। ভাগ্য খুব ভালো, সেকেন্ড ক্লাশের একটা ছোট্ট কামরা খালি পেয়ে যাই। ট্রেনের বেশী দেরী নেই, বাইরে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে ট্রেনের কামরায় আমার দিকে চেয়ে অবিনাশ বলে—তোমার বৌদির পেছনের ইতিহাসের একটুখানি অধ্যায় হয়তো অন্ধকারে ঢাকা আছে—কিন্তু তার জন্যে আমার তো কোনও কৌতূহল বা ক্ষোভ কিছু নেই—আমি তো ওকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি।—তবুও ও কেন সব সময় একটা সঙ্কোচ ও লজ্জার পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায়, বলতে পার? আমি ভাই মেয়েদের ব্যাপার কিছুই বুঝি না—তোমরা সংসারে অনেক দেখেছ, অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছ—অনুমান করতে পার কিসের সঙ্কোচ, কিসের লজ্জা, কিসের এত আশংকা ওর?

কী উত্তর দেব? ওর মুখের দিকে চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল—হয়তো মীনার সাধের অট্টালিকা এখুনি ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এ বিপদে রক্ষা করলেন ভগবান—ঘণ্টা দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। জোর করে মুখে হাসি এনে ওর হাত দুটো মুঠো করে ধরে বললাম—'কোনও ভয় নেই অবিনাশ, দুদিন বাদেই দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্ল্যাটফরম পার হয়ে ট্রেন ছুটতে থাকে। একলা কামরার বাইরে চেয়ে উদাসভাবে বসে থাকি। জেসিডির গাছ-পালা, ছোট পাহাড় সব যেন আজ ভয়ে আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে—শুধু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে টেলিগ্রাফের তারগুলো, থামগুলো একটার পর একটা বদলে গেলেও তারগুলো সঙ্গ ছাড়ছে না। একটু পরে মনে হল—ওগুলো টেলিগ্রাফের তার নয়—অবিনাশ আর আমার মধ্যে যে যোগসূত্র এতদিন অলক্ষ্যে আত্মগোপন করেছিল, আজ সেটা প্রকট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—প্রাণপণে চেষ্টা করছে যোগসূত্র বজায় রাখবার, কিন্তু পারল না—জেসিডির সীমানা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ পট্ করে ছিঁড়ে গেল। আর কিছুই দেখতে পাই না। জলে চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম।

বন্ধনমুক্ত ট্রেন তখন ফুল স্পীডে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে।

দাও ফিরে সে অরণ্য

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

আজ বুঝি মর্মে মর্মে, কবি, তুমি কেন বলেছিলে
অতি দুঃখে—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর',
কী ক্ষোভে, কী বেদনায় অকপটে তুমি হেনেছিলে
কঠিন বিদ্রূপ-বাণী এ কুটিল সভ্যতার পর।

এ সভ্যতা বণিকের, লালিত এ বঞ্চনার কোলে,
লোভের জঠরে জন্ম মুনাফার অন্ধ কারাগারে;
কণ্ঠে এর পীড়িতের, শোষিতের মুণ্ডমালা দোলে,
লোল জিহ্বা মেলে এ যে খোঁজে নিত্য নতুন
শিকারে।

গহন অরণ্য মাঝে, অন্ধকার গুপ্ত গুহাঘরে
অসভ্য মানুষ যারা যাপে প্রায় পশুর জীবন,—
ভালো-মন্দ, হিতাহিত জ্ঞান আছে
তাদেরও অন্তরে,
সভ্য মানুষেরা তারে বুদ্ধি দিয়ে করেছে বর্জন।

এ সভ্য সমাজে সেই সম্মানের ততো অধিকারী,
যে যতো মুনাফাখোর, চোর আর চোরা কারবারী।

জয়ী

(১০২-এর পাতার পর)

ভাবতে ভাবতে চললেন...গিয়েই বড়োমুখ করে হাঁক পাড়বেন—নাতিসাহেব কই, নাতি সাহেব—!

পরবর্তী আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্যের ছবি চোখের ওপর ভাসতে থাকে।...ভাসতে থাকে না, নিজেই তিনি আঁকতে থাকেন।

নাঃ সেদিন আর সে উপঢৌকন দেওয়া হয়নি দেবেশের নাতিকে। হবে কি করে?

দেবেশের দরজায় ঢুকতে গিয়ে অন্তরীক্ষ থেকে বাজ পড়েছিল মুরলীধরের উপর। ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পারেননি।

সেই বাজের চেহারাটা এই—"নাও চা-টুকু খেয়ে নাও দিকি? একখুনিতো তোমার বন্ধু-রত্নটি এসে হাজির হবেন! যা সুরু করেছেন! একদিন আর নিজেরা নিজেরা একটু শান্তি করে খাবার জো থাকছে না!...বিয়ে না করলে কি লোকে এতো ভোঁতাও হয়ে যায় গো?......এতোই যদি প্রাণমন খাঁ খাঁ করে, পরের সংসারে নাক গলিয়ে লাভ কি? কর না বাপু একটা বিয়ে! এখনো সময় আছে। খুঁজলে আজকাল তিরিশ চল্লিশ বছরের কনেও পাওয়া যায়!"

ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছে বাক্যধারা!

যাক্, অনেকটা মূল্য দিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মুরলীধর। উত্তর পেয়েছেন—কেন তাঁকে বাড়ীতে কেউ সহ্য করতে পারে না।......অবান্তর মুরলীধর অন্যের সংসারে নাক গলিয়ে বসে আছেন!

কিন্তু না থেকেই বা যাবেন কোথায়?

সংসারে আর পাঁচজন বোকা লোকের চাইতে অনেক বেশী চালাক, অন্তর অনেকের চাইতে জিতে যাওয়া মুরলীধর ক্রমাগত ভাবতে থাকেন—সব ছেড়ে ছুড়ে পালাতে ইচ্ছে হলেই বা পালানো যায় কোথায়?

অন্ততঃ যতোদিন না রিটায়ার করছেন, ততোদিন তো হাত পা বাঁধা।

মেজভাইটার যে রোজগার কম, আর তিন তিনটে মেয়ে—এ কথাটা তো কিছুতেই মন থেকে তাড়ানো যায় না!

অবসর গ্রহণের সময় এগিয়ে আসছে ভেবে আতঙ্ক হয়। নিষ্কর্মা সেই জীবনটা নিয়ে করবেন কি তখন?

যা খুসি?

কিন্তু যা খুসি করবার স্বাধীনতা থাকলেই কি যা খুসি তা করা যায়?

সপ্তমে বৃহস্পতি

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

দরাতে মেলে, কুষ্ঠি না মিললে তো আর কিছু হবে না।

উমা সেদিনও কলেজ যাবার মুখে দেখে মূর্তিটি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। কি ছেলেরে বাবা! আজ আবার মিটি মিটি হাসছে। তাকে অতিক্রম করে যেতে উমার যেন ঘাম ছুটে গেল। তার পরেও সে পিছন পিছন আসছে উপলব্ধি করে ওর দুপা যেন মাটির সঙ্গে বার-বার আটকে আটকে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট ট্রামষ্টপ ছাড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে উমা সন্তর্পণে একবার পিছন ফিরে তাকালো। ও মা গো! লজ্জায় সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে গেল উমার। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে কলেজ গেটে ঢুকে পড়ে যেন বাঁচল সে। আজ আর আপিস-টাপিস নয়, নির্লজ্জ একেবারে কলেজ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে!

কিন্তু ক্লাশে প্রফেসারের বকুনি ভালো লাগছে না উমার। কানে যাচ্ছেও না কিছু। কোন রকমে দুটো আড়াইটে পর্যন্ত কাটিয়ে শেষের দু'ঘণ্টা ক্লাশ না করেই সে বাড়ির পথ ধরল। দাদু তখন দিবা-নিদ্রা শেষ করে সবে উঠে বসেছেন। বাবা দাদারা আপিসে। মা ঘুমে অচেতন। বইপত্র রেখে হাত-মুখ ধুয়ে দু'পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়ে শেষে দাদুর ঘরেই এসে ঢুকল উমা। নিস্পৃহ মুখে বলল, দাদু কি করছ—?

দাদু জবাব দিলেন, একটু তামাকের অপেক্ষায় বসে আছি, নীলু ছোঁড়াটা কোথায় গেল? নীলু বাড়ির ছোকরা চাকর। দাদু ঘুরে বসলেন, তুই এরই মধ্যে চলে এলি যে আজ, কলেজ ছুটি হয়ে গেল?

—হুঁ-উ—। উমা আড় চোখে চেয়ে দেখল, ও ছেলের ছকের আধখানা দাদুর বালিশের নীচে চাপা পড়ে আছে। কিন্তু বুড়ো সেয়ানা তাও দেকে কম নন্। কেমন যেন একটা খটকা বাধল তাঁর মনে। হয়ত বা ওর এই চুরি করে দেখাটা তিনি দেখে ফেলেছেন। জিজ্ঞাসা করে বসলেন, আচ্ছা ওই যে ছেলেটা বলা নেই কওয়া নেই ঝপ করে তোকে বিয়ে করে ফেলতে চাইলে এর আগে মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার কিছু ঘটেনি তো?

উমা বড় করে একটা ভেঙচি কেটে পালালো সেখান থেকে। কিন্তু রাগ তেমন প্রকাশ পেল না। বাইরে এসে দেখে, নীচে নীলু দাদুর তামাকের টিকে ধরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চারটে পয়সা নিয়ে সে নীচে এসে তার হাত থেকে হুঁকো-কল্‌কি কেড়ে নিল। পরে তাকে পয়সা চারটে দিয়ে হুকুম করল বেশ ভালো করে দেখেশুনে টাটকা দেখে চার পয়সার ডালমুট কিনে নিয়ে আসতে। খানিক বাদে হুঁকো হাতে দু'গাল ফুলিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে উমা আবার দাদু সন্নিধানে এলো।

দাদু বিস্মিত হলেন, নীলু কই—?

—কি জানি কই, তোমার তো আবার সময় মত এক ছিলিম না হলেই সব অন্ধকার।

দাদু গম্ভীর মুখে তাকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন একটু। পরে হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিলেন। গোটা দুই-তিন টান দিয়ে বললেন, অন্ধকার দেখি আর যাই দেখি, রাশিচক্র ঘেঁটে ঘেঁটে এমনি দাঁড়িয়েছে অভ্যেসখানা, ফাঁক কোথাও কিছু থাকলে চোখে পড়বেই—তোমার হাতের মিষ্টি তামাক খেয়েও ভুল করতে পারব না—।

উমা আবার রাগ দেখিয়ে বাইরে চলে এলো। কিন্তু এবারে মুখখানি শুকনো। ক্ষণকাল বাদে নীলু ডালমুট নিয়ে হাজির। ঠোঙাটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে উমা সেটা জানালা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরে গুম হয়ে বসে রইল।

কিন্তু বিকেলে দাদুর ঘোষণা শোনা মাত্র বাড়িতে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। কুষ্ঠি মিলেছে। শুধু মেলা নয়, একেবারে রাজ যোটক না কি!

দাদু গম্ভীর মুখে নাতনিকে হুকুম করলেন, আজ থেকে আর কলেজ যেতে হবে না, যতদিন না বিয়ে হচ্ছে দিনে একুশবার করে আমায় তামাক সেজে দেবে।

উমা এবারও দাদুকে জিভ ভেঙচালো। কিন্তু এখন মুখের রঙ অন্য রকম।

বিয়ের দিনক্ষণ, কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল।

আপিসে বেরুবার আগে উমার বাবা রোজ নারায়ণ বিগ্রহের কাছে প্রণাম করে যান। সেদিন মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর, ছলনা করে পিতার অনুমোদন নিতে হয়েছে বলে অপরাধ নিও না, দোষ আমার, ওদের যেন মঙ্গল হয়—।

উমার মাও সেদিনের প্রণামে ঠাকুরের পায়ে কাতর মিনতি জানালেন, দেবতুল্য শ্বশুরের কাছে এই সত্য গোপনের জন্য অপরাধ নিওনা ঠাকুর, দোষ আমাদের—আমার মেয়ে-জামাইয়ের যেন মঙ্গল হয়।

ঠাকুরকে প্রতিদিন ভোগ দেন স্বয়ং উমার দাদু। সকলের অগোচরে তিনিও সেদিন চোখের জলে ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করলেন, প্রভু অপরাধ নিও না, ওদের কুষ্ঠি মেলেনি—কিন্তু আর একটা কুষ্ঠির মিল আমার চোখে পড়েছে বলেই ছেলে-বউয়ের সঙ্গে এমন ছলনা করেছি—এ মিথ্যে যেন কাউকে স্পর্শ করে না—সব দোষ আমার—ওদের সকলের মঙ্গল দেখো মঙ্গলময়।

পূজা মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর
ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ।
সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা,
প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি,
সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে
সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং
মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে
পূজার সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর
আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১৩

—রমেন ঘোষ

তিনি উঠতেন ছাদে। বসতেন ধ্যানে—ভোরে আসন ত্যাগ করতেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি গল্পটি শুনেছি। সে অনেক পরের কথা। সে কথাও ক্রমশঃ আসবে।

এমনিভাবে অনেক দিন কেটে যাবার পর একদিন তিনি একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। সেদিন বিকেলের কিছু আগেই স্নান করে আসনটি আর কমণ্ডলুটি নিয়ে তিনি ছাতে উঠেছেন—দেখলেন একটি গরুর গাড়ী ক'রে ছোট-খাট একটি গেরস্থালী বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। যে বাড়ীতে তিনি ছিলেন, সেটি জঙ্গলের ধারে একটি পোড়ো বাড়ী—পাকা বাড়ীর ভগ্নাংশ। জঙ্গলের মধ্যেও দুটি-একটি কাঁচা পোড়োবাড়ী খালি পড়েছিল। তারই একটির সামনে এসে গাড়ীটি থামল।

সোয়ারী দুজন—স্বামী আর স্ত্রী। কিছু-দিন যেতেই বুঝলেন—স্ত্রীটি অতি লক্ষ্মী মেয়ে—সতী-সাধ্বী স্ত্রী যাকে বলে। স্বামীকে সে এমন ভক্তি করত—এমন তার সেবা-যত্ন করত যে, হলধর অধিকারী তার প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠলেন। ছাত থেকে সে ঘরের সবই দেখা যেত। অপ্সরীর মতন একটি সুন্দরী মেয়ে দাসীর মতন ঘর-কন্নার কাজে মেতে আছে—দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন।

এমনিভাবে দিন যায়। অমন নিষ্পাপ, সুন্দর, সহাস ফুলেও ঘুণ ধরল। স্বামীটি কাজ করত চটকলে। চটকলে তাকে যেতে হোতো রাত থাকতে—ফিরতে হোতো সন্ধ্যা। প্রথম প্রথম বৌটি সারাটি দিন একলাই ঘর-কন্নার কাজে মেতে থাকত। ক্রমে লোক জুটল।

কি ক'রে—কেমন ক'রে সে সৌন্দর্যের সন্ধান—তার অতুলন যৌবন অন্যকে প্রলুব্ধ করল সে এক অজ্ঞাত অধ্যায়। সেই [illegible] দিন সেখানে থেকে সন্ধ্যার কিছু আগে [illegible] যেত। সে চলে গেলে বৌটি আবার গা-টা [illegible] রান্না-বান্না করে স্বামীর অপেক্ষায় বসে [illegible]ত। স্বামী এলে নিজে হাতে তার পা ধুইয়ে দিত—গামছা-গামছা এগিয়ে দিত—স্বামী স্নান করে আসতে-আসতেই তার ভাত বেড়ে রাখত। ভাত খেয়ে স্বামী পাতা বিছানায় গড়াতেই তার হাতে পান দিয়ে পা টিপতে বসত। তাদের [illegible] চেহারা দেখে কেউই কল্পনা করতে পারত না যে, এর মধ্যে কতটা ভান আছে! হয়তো ভান ছিল না—কে জানে মনুষ্য-চরিত্র!

চিরঞ্জীব থামলেন। দু-হাতে মাথা টিপে মুহূর্তেক চুপ করে থেকে তিনি আবার সুরু করলেন। মিসেস্ গুপ্তা বললেন—কামিনী, তুমি এখন যাও, তোমাকে এখন আর কোনো দরকার নেই।

—থাকুক না ম্যাডাম—চিরঞ্জীব বললেন—তারপর কেমন করে যেন স্বামীর মনে সন্দেহ জাগল। জাগাটা স্বাভাবিক। স্বামী চটকলে কাজ করত বটে, কিন্তু কুলি-মজুরের জাত সে ছিল না। ভাগ্যের ফেরে তাকে কাজ নিতে হয়েছিল চটকলে। ভাগ্যের ফেরে তাকে বাসা বাঁধতে হয়েছিল জঙ্গলের পোড়ো বাড়ীতে। ভাগ্যের ফেরে তার লাভ হয়েছিল সুন্দরী কন্যা। উদ্যানের গোলাপকে সে ছিঁড়ে এনেছিল বন-ভূমিতে—লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে এনে রেখেছিল—চোরের ধনের মত। [illegible] সঙ্গের মত সে ছিল লজ্জার বস্তু—আনন্দের বস্তু। স্বামী [illegible]—তাকে সে সন্দেহ রাখেনি।

তবু তাঁর মুখ সুখে ঢলঢল কেন? কেন তার ক্ষোভ নেই? অশান্তি নেই? ক্লান্তি নেই? বৌটিও অতি বুদ্ধিমতী। সে অনুমান করল স্বামীর অন্তরের জ্বালা। বারণ ক'রে দিল লোকটিকে কিছুদিনের মত আসতে।

দিন কত পরের কথা। একদিন বৌটি ব'সে রাঁধছে—চটকল থেকে একজন এসে খবর দিল। স্বামীর পা জখম হয়েছে। হাসপাতালে আছে। যন্ত্রণায় বড্ড অস্থির হয়েছে। স্ত্রীকে ডেকে

কামিনী এসে দাঁড়াল। বেশ [illegible] একটি মেয়ে।.....

[illegible] কোনো লোককে নিয়ে [illegible] সে [illegible] যে তাকে থাকতে হবে—ঠিক নেই। তার [illegible] সে সব ঠিক হবে। বৌটি [illegible] থাকতে চায়—তাও সে জানতে চায়।

—কাঁদতে কাঁদতে [illegible]

[illegible] মাথা [illegible] সে সময় দিল না [illegible]।

সে দিন [illegible] মধ্যেই [illegible] লোক এসে হাজির হোলো। মাংস এসেছে—নিশ্চিত এসেছে।

হলধর অধিকারী দেখলেন—বারান্দায় ইঁটের উনুনে পেতে মাংস রান্না হচ্ছে। কাছেই ব'সে বৌটি আর সব রান্নার যোগাড়-যন্ত্র করছে।

ক্রমে জঙ্গলে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আম-বনের পাতার ঝোপে জোনাকি জ্বলতে লাগল। মাংস নামল—একে একে সব রান্নাই নামল—বারান্দায় মাংস-রান্নার আগুন ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলতে লাগল। বৌটি রান্না-বান্না সেরে গা ধুয়ে একখানা বাসি-করা শাড়ী পড়ে উঠোনের তুলসী তলায় আলো দেখাতে গেল। অন্য লোকটি শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। [illegible] এক রকম [illegible] কোপ এসে পড়ল তার মাথার মাঝখানে।

না—কোনো কথা না, [illegible] চীৎকার-চেঁচামেচি, গোলমাল কিছুই না। [illegible] স্বামীর পা জখমের কথা সব মিথ্যা। এই ছলটুকুর আশ্রয় নিয়ে সে প্রত্যেকে প্রতিশোধ নিলে।

(ইহার পর ২২৩ পৃষ্ঠায়)

শারদোৎসবের শুভলগ্নে দেশবাসীকে জানাই আমাদের অভিনন্দন, কামনা করি তাঁদের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা।

আর্য্যস্থানের জীবনবীমা স্বল্পব্যয়ে নিরাপত্তার প্রতীক।

বর্ত্তমান প্রিমিয়াম হার পূর্ব্বাপেক্ষা কম।

বর্ত্তমান বোনাস
বছরে প্রতি হাজারে ৮৲

১৯৫৪ এর ভ্যালুয়েশনে আরও সুফল আশা করা যায়

আর্য্যস্থান
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩
শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কয়েকটি সোবিয়েৎ উপন্যাস

● **"এ নেস্ট অফ দি জেণ্ট্রি"**
—ইভান তুর্গেনিভ

জার আমলের মর্যাদী বংশের নিখুঁত চিত্র। মহান শিল্পী তুর্গেনিভের লেখনীতে আজও ভাস্বর। বহু চিত্র সম্বলিত রাজ সংস্করণ। উপহারের যোগ্য উপন্যাস। মূল্য—২৸৵০

● **"মাদার"**
—ম্যাক্সিম গোর্কী

সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ভিত্তি এই যুগান্তকারী উপন্যাসের মাধ্যমেই গোর্কী রচনা করেন। নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযুদ্ধে দেশে দেশে, যুগে যুগে এই কাহিনী প্রেরণা দিয়েছে, আজও দিচ্ছে। মূল্য—২৷৵০

● **"অডিল"**
—আলেক্সি তলস্তয়

প্রাকবিপ্লব, বিপ্লব, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার তিন যুগের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন আলেখ্য—তিন খন্ডে সম্পূর্ণ। রেক্সিন বাঁধাই। মূল্য—৬৸০

(গ্রন্থগুলি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত)
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৫টি সোবিয়েৎ পত্রিকা
(ইংরাজী ভাষার সংস্করণ)

"নিউ টাইমস্" (সাপ্তাহিক)
পত্রিকাটিতে পাবেন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বক্তব্য ও সোবিয়েৎ রাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ।

"নিউস্" (পাক্ষিক)
জগতের প্রধান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংবাদগুলির সত্য ও সুষ্ঠু চয়ন।

"সোবিয়েৎ উওম্যান"
(মাসিক)
সোবিয়েৎ মেয়েদের জীবনযাত্রা ও সারা দুনিয়ার মেয়েদের খবর পাওয়া যায়।

"সোবিয়েৎ লিটারেচার"
(মাসিক)
সোবিয়েৎ সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন—পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, ছোট গল্প, মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ পত্রিকাটির বিশেষত্ব।

"সোবিয়েৎ ইউনিয়ন"
(মাসিক)
পত্রিকাটিতে অজস্র রঙ্গিন ছবি ও ঘটনার মাধ্যমে সোবিয়েতের জীবন-ধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

Please Contact :—
CURRENT BOOK DISTRIBUTORS
3/2 Madan Street, Calcutta-13.

সার্থক নির্বাচন!

শারদীয়া পূজায়

প্রিয়জনের মিলন মধুময় করিতে প্রতিটি মনের সার্থক নির্বাচন

কল্পনা পারফিউমারী ওয়ার্কস
৭৬/২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ★
কলিকাতা-৬

আমাদের
নতুন শো-রুমে
আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

গিনি সোনার নিখুঁত কাজের জন্য

টি, সি, আড্ডি এণ্ড সন্স
শতাব্দীর প্রাচীন জুয়েলার্স
৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : বিবেকানন্দ রোড জংশন
কলিকাতা—৬ :: ফোন: বি, বি—২১৯৮

উকিলের চিঠি

শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

হরিচরণকে আমিই 'বার্তাবহ' অফিসে এনেছিলাম। ফ্যাসাদে পড়লামও তার জন্যেই।

বৈশাখের বেলা দু-টোয় গরমের যেমন তাপ, তেমনি কাজ। টেবিলের উপর পুঞ্জীকৃত চিঠির রাশি। এর ওপর অমায়িক, অতি সজ্জন, বিনয়-নম্র ভদ্রমহোদয়গণের যখন তখন আবির্ভাব ত আছেই। সম্ভব-অসম্ভব অনুরোধ, যেন বার্তাবহই বিশ্বসমস্যার একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম কর্ণধার।

'আপনাদের মতো বোঝেই বা কে? ভাবেই বা কয়জন, আর এত দরদ দিয়ে লেখারই বা সাধ্য কার?'

[illegible] উপরকার সিলিংয়ের [illegible]। [illegible] হাওয়া [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] কোনোর পরেও আর একবার কেউ এসে যদি বলে যে, 'আপনার মতো—' তবে, [illegible] না হলেও গালাগালি হওয়া কঠিন।

[illegible] কখন টেবিলের উপরে একখানি রেজেস্ট্রিকরা খাম চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছে।

এ আবার এল কোত্থেকে!—উদাসীনভাবেই চিঠিখানি খুললাম, কিন্তু পড়ার সঙ্গে মনোযোগ দুগুণ হয়ে উঠল।

রেজেস্ট্রিকরা চিঠি খবরের কাগজের অফিসে কিছু নয়, বিভিন্ন বিভাগে ওর দুইএক ডজন রোজই আসে। কিন্তু যে চিঠি হাতে পড়ল সে এক উকিলের চিঠি।

উকিলের চিঠি?

হ্যাঁ, উকিলের চিঠিই, কিন্তু তাও খুব বিচিত্র নয়। সকল স্বার্থের দায় ও দায়িত্বের ঝুঁকি যাদের কাঁধে, সেই দৈনিক সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দু-চারখানা উকিলের চিঠি কিংবা দুই এক নম্বর মামলার জন্য কারো কাঁদা বা সাধার কারণ ঘটে না।

মামলা সংবাদপত্রের ভূষণ না হলেও দুর্লক্ষণ নয়। ও হাঙ্গামা লেগেই থাকে। উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, সলিসিটর আছে বাঁধা, ফাইল হচ্ছে গাদাগাদা। উকিলের চিঠি আসে—উত্তর যায়, মামলা ওঠে, মিটে যায় কিংবা যা হবার তা হয়।

কিন্তু এ চিঠিটায় কেমন একটু খট্‌কা লাগে।

চিঠিতে আছে, বার্তাবহের ১৭ই বৈশাখের সংখ্যায় ৩য় পৃষ্ঠায় 'বিনাপণে বিবাহ' শীর্ষক সংবাদে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসুর যে মানহানি করা হয়েছে সাত দিনের মধ্যে তার যথোপযুক্ত প্রতিকার না করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা খেসারৎ দাবীতে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে।

'বিনাপণে বিবাহ!' তাতে আবার মান-হানি! কে হে, বৈশাখের ফাইলটা আনো ত দেখি।

ফাইল এল। তৃতীয় পৃষ্ঠা বার হল। মফস্বল সংবাদের মধ্যে ক্ষুদ্র অক্ষরে যে সংবাদ [illegible] তা এই—গত ১০ই বৈশাখ স্থানীয় ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্তা বিনতা দেবীর বিবাহ সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্র এই বিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট কপর্দকও দাবী করেন নাই। পাত্রী বিধবা। [illegible] এই মহানুভবতার জন্য [illegible] [illegible] নিকট [illegible]। এই শুভ সংবাদে [illegible] বিশিষ্ট ব্যক্তি বরবধূকে শুভকামনা জানাইতে বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন।"

উকিল জানিয়েছেন সংবাদটি তাহা মিথ্যা, এরূপ কোন ঘটনাই ঘটেনি।

শুধু মিথ্যা হলেও ক্ষতি ছিল না, ঘটনাটি কলঙ্কজনক মিথ্যা। একটা গুরুত্বহীন ব্যাপারের মিথ্যা অনুষ্ঠানকে ফলাও করে রসানুভূতির জন্যই নির্দোষ সংবাদের ছদ্মবেশে সেটি বার্তা-বহের অফিসে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু ছাপতে দিল কে? পুরাতন কপি ঘেঁটে অনেক সন্ধান করে জানা গেল, হরিচরণের হাত দিয়ে কপিটা প্রেসে গিয়েছিল।

হরিচরণের দোষ কি? সে সাংবাদিকের পেশায় নবাগত, আদর্শের নেশাতেই বিনাপণে বিবাহ এবং বিধবা বিবাহের সংবাদ দেখে তার নবীন বয়সের চিত্ত নেচে উঠেছিল দুটি মহৎ-কার্যের এমন সংযোগ! জানুক বার্তাবহের পাঠকগণ জানুক, বিধবাকে বিয়ে করবার এবং বিনাপণে কন্যা গ্রহণ করবার যুবকের অভাব নেই এ বাংলাদেশে। সে নিজেও যুবক। আদর্শের এমন আবেদনে বিচার, বিবেচনা লোপ পায়। খবরটি দেখা মাত্রই আনন্দাতিশয্যে সে স্বহস্তে দিয়ে নিজনামে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন রাত বারোটা। নৈশ সম্পাদকের এসব খুঁটে খতিয়ে দেখবার সময় থাকে না। সুতরাং পরদিনই প্রভাতের সংবাদপত্রে এবং সকল ডাকে খবরটি ছাপা হয়ে গিয়েছে।

স্বার্থ না থাকলে কেউ যে সহসা সংবাদপত্রে আসে না, এবং প্রত্যেক সংবাদই যে পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন আছে, হরিচরণের সাংবাদিক বুদ্ধি তখনও ততটা পেকে ওঠেনি। সে মাত্র ছয় মাস বার্তাবহে এসেছে। কাজে নামও করেছে। তাকে সবাই ভালবাসে। অত্যুৎসাহের জন্য হরি-চরণ চটপটি আখ্যাও লাভ করেছে। ফাঁকি ও ফাঁকের রন্ধ্রগুলি এখনও সম্যক চিনতে পারেনি।

পদ্ম শামুকেও পা কাটে। নিরীহ সংবাদের এমন নির্দয় লাঞ্ছনায় চটপটি বা চট্টোপাধ্যায় হরি-চরণ এমন চুপসে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল যে, তার সাংবাদিক ভ্রাতারাও তার জন্য মায়া বোধ করতে লাগল।

"অত ছোট ছেলে, আমাদের ন্যায় প্রাজ্ঞ বুদ্ধি কোথায় পাবে?"—বললেন নবকুমার। শিবশম্ভু বলে—চট্‌পটি ভাই তুমি আমার কাছে বোসো, আমি সব দেখে দেবো। ভুল সবারই হয়, অত ঘাবড়ে যাবার কি হল?'

হরিচরণ মাথাও তোলে না, কারো সঙ্গে কথাও কয় না। শুধু দুই একবার আড়ালে গিয়ে চোখ মুছে আবার ফিরে আসে।

'যা করবার আমিই করব। যা দেখবার আমিই দেখব হরিচরণ, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—' বলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন বার্তাসম্পাদক নিজেই।

এই সহানুভূতি হরিচরণ আরও সামলাতে পারে না। দুটি চোখই জলে ভরে টল টল করতে থাকে;

শুধু আমাকেই গুম্ হ'য়ে থাকতে হয়। হরিচরণকে না পারি ডাকতে, না পারি ক্ষমা করতে।

স্বত্বাধিকারী বিচলিত হন্‌নি। শুধু একবার কৌতুক করে বলেছিলেন, এই ত আপনার অফিস। কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। সংবাদপত্রের বহু বিপদ উত্তীর্ণ হয়েই তাঁকে বার্তাবহ চালিয়ে আসতে হয়েছে। তিনি জানেন ঢেউ ভেঙে চল্‌বার সাহস না থাকলে জাহাজ চালানো যায় না। তাই সমস্যা আসামাত্রই তিনি সমাধানের কাজে লেগে যান। বিপদ একদল বাধাবেই, তা কাটাতেও হবে আর একদলকে।

সন্ধ্যার দিকে স্বত্বাধিকারী আমার ঘরে এসে বল্‌লেন, আপনি নিজেই একবার ঘুরে আসুন জলপাইগুড়ি। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে জানা থাকলে মামলারও সুবিধে হতে পারে।

পাপ মুখ দর্শন করেই বিনতা দেবী চাইলেন আমার আশীর্বাদ

সুবিধের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। উকিলবাবু কথাই বল্‌তে চান না। কথা? আপনার সঙ্গে আবার কথা কিসের? কাণ্ড-জ্ঞানের মাথা খুইয়ে কাগজ চালান, মজা একটা পেলেই হ'ল। এবারে বুঝবেন মজা। কথা যা হচ্ছে তা আদালতেই শুনবেন।'

"দেখুন মজার জন্যে নয়, মহৎ উদ্দেশ্যেই খবরটা ছাপা হ'য়েছিল।"

"সেই মহৎ উদ্দেশ্যের ঠেলা সামলাতেই এখানে ছুটে আসতে হয়েছে?"

বললাম, রাগ করবেন না, ব্যাপারটা শুনুন। উকিলবাবু কিছুই শুনবেন না। এক রকম জোর করেই বলে ফেল্‌লাম, একটি নূতন সাব-এডিটর 'বিনাপণে বিবাহ' দেখেই ছেপে ফেলেছে, তার মহৎ ছাড়া কোন্ অসদভিপ্রায় থাকতে পারে? সে ত কাউকে চেনে না জানে?

অকস্মাৎ উকিলবাবুর মনের ঘোর যেন ঘুরে গেল। আঃ! কই দেখি চিঠিটা। চিঠিখানা পাকা হাতেই লেখা, স্বাক্ষর ও ঠিকানাও একটা আছে, তবে সে ঠিকানায় সে লোক কোনকালে ছিল না, এখনও নেই। উকিলবাবু কিছুকাল মাথা নীচু করে ভাবলেন, অনেকক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, আচ্ছা কাল একবার আসবেন, দেখি কি করতে পারি।

উঠ্‌বার আগে বল্‌লাম, 'ভালোর জন্যেই এসেছি, প্রতিপক্ষকে চিঠিটা দেখানো উচিত নয় জেনেও আপনাকে দেখিয়েছি সেই একই উদ্দেশ্যে, নইলে মামলা-মোকদ্দমায় আমরা ভয় করিনে।'

ভয়টা বোধ হয় আমাদেরই—মৃদুহাস্যে বল্‌লেন উকিলবাবু।

প্রাচীনকালের মনীষীরা বলেছেন, নারীদের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবতারাও জানেন না, মানুষ ত ছাড়। এ যুগের মনীষীরা হয়তো সেই সঙ্গে উকিলের মতিগতির কথাটাও জুড়ে দেবেন।

কারণ পরদিন কোন্ রহস্যময় কারণে কে জানে, উকিলবাবু একেবারে এমন সহজ সরল সুজনতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন যে, আমারই কেমন তাক্ লেগে গেল। আবার কোন চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি না ত?

পাঁচটার একটু আগেই পিওন পাঠিয়ে উকিলবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন জলপাই-গুড়ির বার-লাইব্রেরীতে। গোল একটা টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে কয়েকজন উকিলের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন, 'এই দেখুন আমার আসামী।'

তারকবাবু বার লাইব্রেরীর চেয়ারম্যান। অভিযোগকারী ডাক্তার নরেন বসু সেখানকার সবচেয়ে বড় চিকিৎসক। আর যে নারীর বিয়ের সংবাদ বার্তাবহে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই বিনতা দেবীও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের এক বিধবা মহিলা।

অপরিচিত এক প্রবীণ উকিল সহানুভূতির সুরেই বল্‌লেন, বড্ড কাঁচা কাজ করেছেন মশাই, মানুষের মান ইজ্জত নিয়ে কি কেউ এমন করে? এ যে আগুন নিয়ে খেলা।

আগুন কোথায় কিভাবে লেগেছে জানিনে, তবে দমকল ডাকার ক্ষমতা ত আপনাদেরই হাতে। দিন না মিটিয়ে ব্যাপারটা।

দম যে আমাদেরই ছেড়ে যাচ্ছে, কল ঘোরাবে কে?

ইতিমধ্যে বেয়ারা কয়েক কাপ চা ও কিছু খাবার সকলের সামনে রেখে গেছে। উকিলবাবু বললেন, নিন আপাততঃ এইটুকু সেবা গ্রহণ করুন, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

সেবা নয়, সম্বর্ধনা। বারের বিশিষ্ট উকিলেরা সমবেত হয়েছিলেন, সেই জন্যেই। জাতীয় আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক বিষয়েই প্রশ্ন ক'রলেন তাঁরা। কিন্তু আসল প্রশ্নের কোনই সমাধান হ'ল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে বিজলীর আলোয় সারা সহর যেন জোনাকির ন্যায় ঝিক্‌মিক করছে। আলো না থাকলে রাত্রির অন্ধকারে আরো কত অকাণ্ড-কুকাণ্ড না ঘটে যেত! রাত্রির যে দুটি রূপ সাধারণ চোখে ধরা পড়ে তার একটি গভীরতায় অন্তরতম, আর একটি গভীর ষড়যন্ত্রে গাঢ় মসীলিপ্ত।

বাংলোয় ফিরবার পথে উকিলবাবুকে বলেছিলাম, কিছু হবে কি মনে হয়?

উকিলবাবু একটু রহস্য ঘনিয়েই বলে-ছিলেন, হবে হয়তো, তবে সহজে নয়, কিছু কাঠখড় পুড়িয়ে।

কিসের কাঠ, কা'র খড়?

আস্তে আস্তে জানালেন উকিল তারকবাবু, অভিযোগকারী ডাঃ বসুকে মিটমাটের বিষয়টি জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন, 'অসম্ভব'।

বিনতা দেবীকেও সম্পাদকের সঙ্গে একবার কথা বলার খবর ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছিল, তিনিও জানিয়েছেন, 'অত ইতর যে সম্পাদক হতে পারে, তার মুখ দেখাও পাপ।'

বাংলোর অনতিদূরে রাস্তা দিয়ে সমবেত কণ্ঠে দুই বন্ধু হেসে চলে উচ্চৈঃস্বরে গেয়ে চলছিল—

"উলুধ্বনি দেলো তোরা উলুধ্বনি দে
ঠাকুরাণী পাকা চুলে সিঁদুর পরেছে।"

"এই শুনুন আপনাদের বার্তাবহ এ সহরে কি করেছে। ওটাও "বিনাপণে শুভ-বিবাহ সংবাদের প্রতিক্রিয়া।" উকিল তারকবাবু বললেন।

মনটা ভারি দমে গেল। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, একজন পতিহীনা বিধবা নারীকে নিয়ে কি পৈশাচিক উল্লাস! সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মানসম্ভ্রম নাশের কি অদ্ভুত ষড়যন্ত্র! আমাদের সমাজও এগুলো উপভোগ করে আসছে পরম কৌতুকের সঙ্গে। ওই যুবক দুটির গানের উল্লাসে যেন তাদের মনের আদিম পশুগুলোই ছটফট করছে।

বিনিদ্র অবস্থার সারারাত বাংলোর বারান্দায় শুয়ে কেটে গেল। একদিন পরে জলপাইগুড়ি

থেকে বিদায় নেবার কথা ছিল, এখন ইচ্ছা হ'তে লাগল আজই এই বিষাক্ত হাওয়া ছেড়ে যাই,—সম্ভব হ'লে এই মুহূর্তেই।

সাড়ে পাঁচটায় গাড়ী। স্টেশনে বিদায় জানাতে এলেন উকিল তারকবাবু। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে জানালায় হাত রেখে তিনি হাসলেন, আর যাবার সময় বলে দিলেন,—যত ভয়, তত নয়।'

'কি রকম ?'

রকম আর কি ? মামলা বাধাতেও যারা জানে, মামলা মেটাতেও তারাই পারে, নৈলে আদালতে ঝগড়া ক'রে, এক উকিল অপরকে আক্রমণ করে আবার দু'জনেই এসে বার এসোসিয়েশনে পাশাপাশি বসে খোসগল্পে আসর জমায় কি করে ?

গার্ড হুইস্‌ল দিলেন। সবুজ রঙের পতাকা দোলাতে লাগলেন উচ্চে তুলে।

তবে কি ?

কি আদালতেই শুনতে পাবেন, দেখা বা বোঝাপড়া যা হবার সেখানেই হবে।

বিকট আর্তনাদের সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দিল।

'যা' রটে, তা' বটে !'

সবটা না হ'লেও কতকটাও বটে। সকল কথা খুলে বলায় কারোর লাভ হবে না। ডাঃ বসুর সঙ্গে বিনতা দেবীর শুভ-বিবাহ একদিন সত্য সত্যই হ'য়ে গেল। পথের কাঁটা গেল সরে। উকিল তারকবাবুর ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বিবাহ বাসরে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হল। ইতর সম্পাদক আতরে সুবাসিত হলেন, দেহ ও মনের মিলন-মাধুরীতে ফুটে উঠল অপূর্ব সুষমা। পাপ মুখ দর্শন করেই বিনতা দেবী চাইলেন আমার আশীর্বাদ। 'অসম্ভব' সম্ভব হ'ল, উকিলবাবু আবার কানে কানে বললেন, মামলা যারা বাধাতে জানে, মামলা মেটাতেও তারাই পারে।

কিন্তু উকিলবাবু কেন মামলা মেটাবার জন্য এত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, তা জেনেছিলাম আরো অনেক বছর পরে।

বিনতা দেবীর এক হতাশ ব্যর্থ প্রেমিক উকিলই বিনাপণে বিয়ের সংবাদটি পাঠিয়েছিলেন তাঁর আক্রোশ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিকের অফিসে। সংবাদের মূল কপির হাতের লেখা দেখে উকিল তারকবাবু প্রথম দিনেই তা বুঝে নিয়েছিলেন। শুধু আমাকেই তা জানতে দেন নি।

রণে ও প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই।

ডাঃ দম্পতি আর জলপাইগুড়িতে নেই, বিয়ের পরেই তাঁরা উঠে গিয়েছেন লাহিড়িয়া সরাই-এ।

"কি ক'রে বুঝলে একজন অবিবাহিত এবং অপরজন বিবাহিত ?"

"একজনের দেখলাম শার্টের বোতাম নেই। বোঝা গেল লোকটা অবিবাহিত।"

"আর বিবাহিতের কি চিহ্ন দেখলে ?"

"তার শার্টই নেই।"

উর্ব্বশীর বিদায়

হাসিরাশি দেবী

কেন এ সময় এলে ? এখন যে অন্ধকার নামে
আকাশ পৃথিবী ঘিরে, মূর্চ্ছনায় শেষ সুর থামে
ভাষাহীন বেদনার বুকে নিয়ে অন্তিম আকুতি,—
নিভৃত বক্ষের তলে শয্যারচে ক্লান্ত অনুভূতি।
রাত্রি আঁধারে কালো-কুয়াশায় সর্বদিক ঢাকা,
কোথায় নক্ষত্রলোক !—কতদূরে আলোর দীপালী :
ছায়ানীহারিকা কোন্-বর্ণ-সুষমায় মাখা—
কত বিরহিণী বধূ জাগে রাত্রি স্বপ্ন-দীপ-জ্বালি

আমার সে স্বপ্ন নাই ; আমার প্রদীপ নাই হাতে,
একাকিনী চলিয়াছি মেঘঢাকা ম্লান-জ্যোছনাতে
প্রাসাদপুরীর পথ অতিক্রমিয়া ধীরে ধীরে ;—
কেন তুমি ডাক দিলে ? গৃহ ছাড়ি আসিলে বাহিরে ?
ফেরবার সময় কই ? এখন নির্জ্জন সভাঘর,—
স্তিমিত আলোর আশা বুকে লয়ে রাতের প্রহর
কাঁপিছে তোমার মনে,—তোমার নয়ন তারকায়,—
যে কথা হয়নি বলা,—আজ কেন শোনাবে আমায় !
আমারে মার্জনা করো ; এখন সময় নাই আর,—
সুর সভাতলে তব নবীন প্রভাতে ফিরিবার।
বৃন্তচ্যুত কুরুবক বন্ধন এলায়ে কবরীর
ধূলায় লুটায় ঐ ;—ছন্দহীন তামসী-রাত্রির
স্মৃতি সকরুণ-ক্লান্ত। ধূসরিত পথ ধূলি পরে,—
একান্তে দাঁড়ায়ে শুধু অকৃপণ ক্ষমাভিক্ষা করে॥

থাক্,—তবে থাক্—
আমার এ নয়নের উৎসুক নির্বাক
দৃষ্টি তোমার পথের পরে ; যত কিছু গান,
দিনান্তের সাথে সাথে হয় যদি হোক অবসান
ব্যথাহত মূর্চ্ছনায় ; তারপর মোর বীণাটিরে,—
নীরব ক্লান্তির মাঝে নামায়ে রাখিব ধীরে ধীরে
এই বাতায়ন তলে,—ঝরে পড়া রজনীগন্ধার—
ম্লান গন্ধ বুকে বহি দ্বারে ফিরে কাঁদিবে সন্ধ্যার
পরিশ্রান্ত শান্ত হাওয়া ; উৎসবের আলো যাবে নিভে—
সুর-সভাকক্ষ মাঝে,—বর্ণহীন প্রবাল প্রদীপে।

কতক্ষণ চলে যায় ! কত মুহূর্ত্তের
অবসান হয় ধীরে ! এ নৃত্য-ছন্দের
নূপুর-গুঞ্জন-ধ্বনি রণি' বারম্বার
থেমে যায় নিয়ে শুধু প্রতীক্ষা তোমার—
হে বৈরাগি ! আমি ভাবি তাই—
কত যুগ বসে আছি ? কত যুগ তুমি আস নাই ?

নাই আস ; তবু নিত্য নব
তোমার স্বপ্নেরে লয়ে রাত্রি জেগে রব।

গ্রহণ

(৬৩ পৃষ্ঠার পর)

কুঁড়িয়ে পড়ত তার। সে আসবে না। পুজোর ঘরের দুর্ভেদ্য অভ্যন্তরে নিশ্চিন্তে আশ্রয় পেয়েছে—রাজেনের কাছে কিছুই আর তার চাইবার নেই।

তা হলে কেন বলতে গেল ও-কথা? আত্মতৃপ্তি? নিজের ক্ষুব্ধ পৌরুষের উদ্দেশ্যে স্তোক বাক্য? কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণ শেষ হওয়ার আগেই চোখের সামনে অন্ধকার এল ঘনিয়ে। এক চক্ষু দৈত্যের মতো ট্রেন আসছে একটা। নিকষ কালো এঞ্জিন, থর-থর রাত্রি, চোখে যেন খানিকটা করকরে কয়লার গুঁড়ো—মাথার মধ্যে চাকার আওয়াজ। তারপর—

তারপর ষাট মাইল বেগে চলা ট্রেনের আলোকিত জানালার মতো এলোমেলো স্মৃতির কতগুলো ঝলক উল্কার গতিতে রাত্রির সমুদ্রে ঠিকরে পড়ল।

একদিন নয়—দু' দিন নয়, পুরো সাত দিন।

একটা তিক্ত তীব্র ক্রোধে ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে রাজেনের মন। আজ পর্যন্ত একবারের জন্যেও সে দেখতে পায়নি সুরবালাকে, চোখে পড়েনি এতটুকু শাড়ীর ঝলক, কানে আসেনি একটুখানি চুড়ির আওয়াজ। *এই সেকেলে আমলের প্রকাণ্ড বাড়িটার ছায়া-মাখানো ঘর-গুলোর কোথায় সে ছায়ারূপিণী হয়ে লুকিয়ে আছে—আজো রাজেন তার সন্ধান পায়নি। একটা মানুষ নিজের অস্তিত্বকে এমনভাবে যে লুপ্ত করে দিতে পারে, এ অভিজ্ঞতা এই তার প্রথম।*

ভেবেছিল রাগ করবে না। সুরবালার জীবনে আর তার কোনো প্রয়োজনই নেই, এইটুকু জেনেই স্বস্তির শ্বাস ফেলবে সে। দায়মুক্ত মন নিয়ে আবার ফিরে যাবে কানপুরে। তার না-থাকাটাই যখন এ বাড়ির অভ্যাস হয়ে গেছে, তখন সেখানে আর অহেতুক বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবে না সে।

কিন্তু ক্রমশই রাজেনের মনে হতে লাগল, এ স্পর্ধা। অন্যায়, অসহ্য দুঃসাহস। রাজেনের এমন শক্তিমান প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে দিনের পর দিন উপেক্ষা। নিজের হাতে তার জন্যে রাঁধে না সুরবালা, পরিবেশনও নয়।

কোথা থেকে এক বামুনদিদি এনেছে—সেই-ই রাঁধে, সেই-ই ভাত বেড়ে দেয় সামনে। রাজেন শুধু এ-বাড়িতে যে আগন্তুক তা নয়, সে যেন অস্পৃশ্য।

এক একদিন উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। ইচ্ছে হয়েছে, সামনে থেকে টান মেরে ফেলে দেয় ভাতের থালা। গিয়ে দাঁড়ায় সুরবালার পুজোর ঘরের সামনে, লাথি মেরে ভেঙে ফেলে তার বন্ধ দরজা, বলে, অমন করে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছ কেন আমাকে? জানো, এই বাড়ির আমি মালিক? আমার অন্নই খেতে হচ্ছে তোমাকে? আমি যদি তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিই, কোথায় গিয়ে তুমি দাঁড়াবে?

কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সুরবালা? রাজেনও কি তা জানে না? মা-বাপ নেই, ভাইয়েরা আইবুড়ো বোনকে ঘাড় থেকে নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সেখানে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। তাই সমস্ত লাঞ্ছনা লজ্জা নিয়েও সে শ্বশুর-বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। আর নিজেকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছে যে, পৃথিবীর কাক-পক্ষীও যেন তার অস্তিত্ব টের না পায়।

কী করতে পারে রাজেন? এখনি বের করে দিতে পারে রাস্তায়। লাঞ্ছিতা স্ত্রীকে ঘরে না রাখবার পেছনে সামাজিক যুক্তি আছে তার—কেউ তাকে ছিঃ ছিঃ করবে না। নিজের স্ত্রীর সম্মান সে রাখতে পারেনি কেন, সেজন্যে কেউ কৈফিয়ৎ দাবী করবে না তার কাছে।

আর কী হবে তা হলে? পুরোনো বাড়ির তিমিরবান্ধ আশ্রয় থেকে নগ্ন আলোয়—প্রকাশ্য পথে, মানুষের চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে সুরবালা। মুহূর্তে কুঁকড়ে এলিয়ে পড়বে ধুলোয়।

কিন্তু যতটা ভাবা যায়, তার এক শতাংশও করা যায় না বাস্তবে। বাধে রুচিতে, বাধে পৌরুষে।

—রাজেন আছো? —ডাক দিয়ে প্রকাশ-কাকা ঘরে ঢুকলেন।

গ্রামে ফেরবার পরে কারো সঙ্গে মিশতে পারেনি রাজেন। তার চেহারা, তার পোশাক, তার চাল-চলন এমন একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে রাখে যে সবাই-ই তাকে যেন এড়িয়ে চলতে চায়। সহজ হওয়ার জন্যে সে নিজেই দু' দিন গিয়ে বসেছিল নিমাই পালের মোদিখানা *দোকানে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখল, সে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতক্ষণের গল্প-গুজব হঠাৎ ভাটা পড়ে যায়—তারপরে যে যেদিক পারে উঠে পড়ে একে একে।*

রাজেন বুঝতে পারে। ওদের মধ্যে কোথায় ওরা তাকে খাপ খাইয়ে নেবে, তা ওরা জানে না। শুধু প্রকাশ কাকাই অদ্ভুত সহজ। দ্বিতীয় দিন থেকেই যাতায়াত শুরু করেছেন নিয়মিত। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, যতক্ষণ খুশি বসেন—কুশল নেন—গল্প-গুজব করেন। রাজেনের সুস্পষ্ট বিরক্তিটাকেও না বোঝবার নির্লজ্জ দক্ষতা তাঁর আছে।

পরশু থেকে একটা নতুন সুর লেগেছে তাঁর গলায়।

সুরবালার প্রসঙ্গ কোনোদিনই তিনি তোলেননি—সেদিনও তুললেন না। শুধু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আর ঘর-সংসার করবেনা হে? এমনিভাবেই কাটাবে?

—ক্ষতি কী কাকা! বেশ তো চলে যাচ্ছে।

—আরে একে কি আর চলা বলে! এ যে বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া জীবন। অথচ এমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—প্রায় হাজার টাকা মাইনে পাও! না—না, এ ঠিক নয়। এবার তোমার চারদিকে একটুখানি গুছিয়ে গাছিয়ে নেওয়া উচিত।

—গোছাবার আর কী আছে প্রকাশ কাকা। বেশ চলছে, বাকী কটা দিনও চলে যাবে।

—বাকী কটা দিন! বলো কি হে! বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সেই তুমি বুড়ো হয়ে গেলে নাকি? না—এ কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। এবার একটু ঘরমুখো হও।

ইঙ্গিতটা আর অস্পষ্ট থাকেনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিষিয়ে উঠেছে মন। আবার! সেই একটি দুঃস্বপ্নের রাত এখনো তার সমস্ত মনের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সেই একটি রাতই এমন করে তাকে ঠেলে দিয়েছে প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়ার ভেতরে। কোথায় মিলিয়ে গেছে কার্তিকা, তার স্বপ্ন-মালিকা এখন কার ঘর আলো করে পাকা গৃহিণী হয়ে বসেছে কে জানে! আর সুরবালা—

মুখে তিক্ত হাসি ছড়িয়ে রাজেন বললে, ও সব কথা এখন থাক প্রকাশকাকা, আমার ভালো লাগছে না।

কিন্তু প্রকাশকাকা ছাড়বার পাত্র নন। আজ আবার এসে হাজির হয়েছে।

নিজের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মনটাকে সংযত করে আনতে আনতে রাজেন বললে, বসুন।

প্রকাশকাকা ধীরে সুস্থে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। একবার এদিক-ওদিক তাকালেন, মোটা দুই গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর শুরু করলেন বিনা ভূমিকাতেই।

—আমার কথাটা ভেবে দেখলে?

—কোন্ কথা?—অনাবশ্যক জেনেও [illegible] টানতে হল রাজেনকে।

—এই ঘর সংসারের ব্যাপার?

বিদ্যুতের মতো চমকালো রাজেন। তার আবরণ নয়—আর মুখের ওপর মিথ্যে ভদ্রতা টানা নয়।

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ আর স্পষ্ট গলায় বললে, কী বলতে চাইছেন, খুলে বলুন।

প্রকাশকাকা আর একবার চারদিকে তাকালেন। *কী দেখলেন বুঝতে দেরী হল না রাজেনের। বলতে ইচ্ছে করল, যাকে খুঁজছেন সে এ ঘরের ত্রিসীমানাতেও নেই, এ ঘরের একটি শব্দও তার আত্মরক্ষার দুর্গে গিয়ে পৌঁছোবে না।*

এবার গলা নামালেন প্রকাশকাকা।

—আবার বিয়ে করো তুমি।

—বিয়ে?—এই কথাটা শোনবার জন্যেই রাজেন অপেক্ষা করছিল। তবু প্রকাশকাকার মুখ থেকে কেমন বিভ্রান্তভাবে যেন বেরিয়ে এল শব্দটা। একটা ঘা লাগল বুকে।

—ও স্ত্রীকে নিয়ে তো তুমি আর ঘর করতে পারবে না।—সন্তর্পণে, লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন প্রকাশকাকা: ওর সঙ্গে তোমার চুকে-বুকেই গেছে সব—

—চুকে গেছে?—রাজেনের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, শান দেওয়া ছুরির মতো ধারালো হয়ে উঠল গলার স্বর: চুকে যাবে কেন? কুকুরে কামড়েছে বলেই আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করব? আমাকে কি আপনি এমন অপদার্থ ভাবলেন?

বলেই চমকে উঠল রাজেন। কথাগুলো যেন বড় বেশি সাজিয়ে আর বানিয়ে বলা হল। কিন্তু কেন এ সব বলতে গেল সে? সেও কি মনে মনে আশা করে—এই ঘরের বাইরে কোথাও আড়ি পেতে রয়েছে সুরবালা—শুনতে পাচ্ছে এই সব আলোচনা? আর তার কাছে রাজেন এইটেই কি প্রমাণ করতে চায় যে, জীবনে যদিও সুরবালাকে সে কোনো-দিন গ্রহণ করতে পারেনি, তবু তার একটা বিরাট ঔদার্য আছে? সুরবালাকে সে ভালো [illegible] তাকে অবহেলা করবার মতো

মনুষ্য সে হারায়নি—সে তার পৌরুষকে বিসর্জন দেয়নি এখনো?

কিন্তু কেউ শুনল না। শোনবার মতো কাছাকাছি কেউ নেই।

একবারের জন্য থতমত খেলেন প্রকাশকাকা। কথাটা অত্যন্ত আকস্মিক মনে হল রাজেনের মুখে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আবার বললেন, সে কথা না হয় থাক। কিন্তু এটা তো সত্যি যে তোমার আগের স্ত্রীকে কোনোদিনই তুমি মেনে নাওনি। ফুলশয্যার রাতেই তুমি দেশছাড়া হয়েছিলে—

—সেদিন ভুল করেছিলাম বলে আজও কি ভুল করতে হবে? হঠাৎ স্বরগ্রামটাকে অনেকখানি উঁচু পর্দায় তুলে দিলে রাজেন। গম গম করে উঠল ঘর। সারা বাড়িটাকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করেই যেন নিজের কথাটা শুনিয়ে দিতে চায় সে।

কিন্তু কেউ কি শুনল? কাছে না হোক—দূরেও কি কান পেতে আছে কেউ?

একটা তীব্র অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালো রাজেন। অস্বাভাবিক চিত্ত বিক্ষেপের তাড়নায় টগবগ করতে লাগল রক্ত। কাছে একটা ঘোড়া থাকলে এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে সেটাকে ছুটিয়ে দিত সে।

রাজেন বললে, একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।—তারপরেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রকাশকাকা বিমূঢ় নির্বোধ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

তার বাড়ি—তার ঘর। এর প্রতি ইঞ্চি জমিতে তারই তর্কাতীত অধিকার। তবু কেন সে এতদিন পা বাড়ায়নি এর অন্তঃপুরের দিকে, কেন সে নিতান্ত অতিথির মতোই সসংকোচে নিজের ঘরটিতে থেকেছে সংকীর্ণ হয়ে? দেশাত্মের মাতালের মতো পায়ের বড় বড় জুতোর প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে রাজেন এগিয়ে চলল অন্দরের দিকে। শূন্য ঘরগুলোয় তার জুতোর আওয়াজ কাঁপতে লাগল, শান্ত নির্জন বারান্দার আশ্রয় থেকে দুটো ভয়ার্ত কবুতর ঝটপট করে উড়ে গেল বাইরে।

এমনভাবে ক্ষ্যাপার মতো এগিয়ে চলছিল রাজেন যে মনে হচ্ছিল এই বারান্দাটা বুঝি অফুরন্ত। এই ছায়াঘেরা নিজনতা বুঝি হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে! কিন্তু প্রবল বেগে ছুটতে ছুটতে সামনে অতলান্ত খাদ দেখে যেমন থমকে দাঁড়ায় ঘোড়া, হঠাৎ তেমনিভাবেই স্তব্ধ হয়ে গেল রাজেন।

পাশের একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায়া শীর্ণ মেয়েটি। পাণ্ডুর মুখে কৃচ্ছ্র সাধনার কঠিন রেখা নির্ভুলভাবে আঁকা রয়েছে।

রাজেন বলতে চাইল: প্রকাশকাকা আমার বিয়ে করাতে বলছেন আবার। কিন্তু আমি এমন কাপুরুষ নই যে তোমাকে এইভাবে—

কিন্তু মাঝপথে থমকে যেতে হল রাজেনকে। একজোড়া চোখ দপদপ করে যেন জ্বলছে তার সামনে। অনেক অপমান, অনেক আত্মনিগ্রহ আর অনেক দুঃখের সমিধ এই চোখে এমনি ভয়ংকর দাহ এনেছে— এর উত্তাপে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল রাজেনের।

কাকে দয়া করবে রাজেন—কাকে অনুকম্পা দেখানোর দুঃসাহস রাখে সে? স্পষ্ট সরল গলায় জবাব এল: বিয়ে আপনি করছেন বইকি—বিয়ে করাই তো আপনার দরকার।

তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরল রাজেন। মুহূর্তের মধ্যে নিজের এত বড় শরীরটা যেন তার কাছে ছোট হয়ে গেছে। রেড ইণ্ডিয়ানরা যেমন বিচিত্র বন্য-কৌশলে মানুষের ছিন্নমুণ্ডকে মানুষের মুঠোর মতো ছোট করে আনে—সুরবালার দৃষ্টি আর স্বরের ছোঁয়া লেগে তেমনিভাবেই সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে রাজেন।

মাথা নীচু করে সে ফিরে গেল—যেখানে তার অপেক্ষায় তখনো প্রকাশকাকা বিহ্বলভাবে বসে আছেন। যাওয়ার পথে অদ্ভুত রকম নিঃশব্দ হয়ে গেল পায়ের জুতো। প্রায় একটা ছায়া-মূর্তির মতোই অদৃশ্য হল রাজেন।

* * *

প্রকাশ কাকারই ভাইঝি। নেমন্তন্নের অছিলায় মেয়েটিকে দেখানো হল। লুচি নিয়ে এল দুবার, শেষে নিয়ে এল পায়সের বাটিটা। খাওয়ার পরে কাঁপা হাতে পান এগিয়ে দিলে, সকলের পীড়াপীড়িতে দুখানা কীর্তনও গেয়ে শোনালো। বেশ মিষ্টি গলা মেয়েটির। নামটিও সুন্দর—বনানী।

আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। আশ্চর্য করুণ আলোয় ছেয়ে গেছে পথটা। একটানা পাপিয়া ডেকে চলেছে। দূরে পিয়ালী নদীর জলটা জ্যোৎস্নায় থমথস হয়ে উঠেছে।

এতদিন ধরে যেন একটা কঠিন সূর্যতাপের মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছিল রাজেন। একটা ছায়া ছিল না, একটু দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। অসহ্য তপ্ত গরম বালিতে যেন পুড়ে যাচ্ছিল পায়ের পাতা দুটো। এতদিন পরে, আজ এই জ্যোৎস্নার আলোয় হাঁটতে হাঁটতে—নিজের দাবদগ্ধ শিরা-স্নায়ুতে যেন মেদুর শ্যামচ্ছায়া অনুভব করল রাজেন।

বনানী।

ছোট্ট একটুখানি মেয়ে—কিশোরী। বয়েসে রাজেনের প্রায় অর্ধেক। লজ্জাবতী লতার মতো ভীরু, একটু ছোঁয়া লাগলেই এলিয়ে পড়বে। নিজের লোহার মতো শক্ত বুক আর শক্তি-তরঙ্গিত পেশীগুলোর কথা মনে পড়ল রাজেনের। একটি চাপে মেয়েটিকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে সে—একটা প্রজাপতিকে যেমন করে হাতের মুঠোতে নিষ্পিষ্ট করে দেওয়া যায়!

আচ্ছন্নভাবে বিচিত্র একটা সুখানুভূতির রোমন্থন করতে করতে নিজের ঘরে এসে পৌঁছুল রাজেন। বনানী! নামটা মনে মনেই একবার আবৃত্তি করলে সে। ছায়ার মতো—মায়ার মতো নাম। কত সহজে সুরবালার কথা—সমস্ত মর্মজ্বালার কথা ভুলিয়ে দেয়!

মন্দ কী! এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে মন্দ কী!

টেবিলে ল্যাম্পটা কমানো ছিল। সেটাকে উসকে দিয়েই রাজেন হঠাৎ ঘর ফাটানো আর্তনাদ করে উঠল একটা। জানলার শিকে লতার মতো জড়িয়ে রয়েছে একটা চন্দ্রবোড়া সাপ। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় তার শাদায়-কালোয় মিশানো হিংস্র শরীরটা ঝিকমিক করে উঠছে!

রাজেনের চিৎকার অন্ধকার স্তব্ধ বাড়িটার ওপর অমানুষিক প্রতিধ্বনি তুলল। বিদ্যুৎবেগে শিক থেকে পাক খুলে নেমে গেল সাপটা, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনল রাজেন।

সুরবালা এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কাকে বেশি ভয় পাবে রাজেন? সাপকে, না সুরবালাকে? নিষ্ঠুর আত্মশাসনে জর্জরিত কঠিন মুখের একদিকে আলো, একদিকে অন্ধকার। যেন অতিলৌকিক মূর্তি সুরবালার। দুটো চোখে অগ্নিদহনের স্ফুলিঙ্গ। রাজেনের বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সুরবালা বললে, কী হয়েছে? ভয় পেয়েছেন কেন?

—একটা সাপ ঢুকেছিল—পালিয়ে গেছে।

সুরবালা আস্তে আস্তে বললে, পাড়াগাঁয়ের বাড়ি, চারিদিকে জঙ্গল। সাবধান হয়ে থাকবেন। —তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, আর একটা খবর দেবার আছে আপনাকে। কাল আমি চলে যাব। হঠাৎ যেন বুকে একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল রাজেনের।

—কোথায়?

—বাপের বাড়ি। এতদিন আপনার বাড়ি-ঘর জমি-জমা দেখেছি, এখন আর কিছু করার নেই আমার। কাল থেকে নিজেই বুঝে নেবেন সব।

শেষ কথা কানে গেল না রাজেনের। ব্যাকুল হয়ে বললে, কিন্তু বাপের বাড়ি যাবে কী করে? তোমার ভাইয়েরা তোমাকে চায় না—তা ছাড়া একবার ঢোক গিলে রাজেন বললে, যা হয়ে গেছে সেজন্যে গ্রামের লোকেও তোমায় ভালো চোখে দেখবে না।

সুরবালার দীপ্ত চোখ দুটো রাজেনের মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে রইল: আমার নামে বাবা কিছু সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখি, সেগুলো উদ্ধার করতে পারি কিনা।

এইবারে রাজেন আর ভয় পেলো না। অনেকক্ষণ ধরে সে তাকিয়ে রইল সুরবালার দিকে। না— বনানী তার জন্যে নয়, তার প্রকাণ্ড হাতের মধ্যে একটা প্রজাপতির মতোই পিষ্ট হয়ে যাবে সে! তার দরকার সুরবালাকেই। উপেক্ষিতা একটি পল্লীবধূ নয়—লজ্জা আর অপমানের আঘাতে যে জেগে উঠেছে শক্তিময়ী হয়ে। অসম্মানের স্পর্শে যে ইস্পাত আজ তলোয়ার হয়ে উঠেছে, তাকেই তার একান্ত করে প্রয়োজন!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেল রাজেন। হঠাৎ সুরবালার একখানা হাত টেনে নিলে নিজের হাতে। এই তার প্রথম পাণিগ্রহণ।

—আমাকে ক্ষমা করো সুরবালা—আমার সঙ্গে কানপুরেই চলো তুমি।

—না—না—সুরবালা আর্তনাদ করে উঠল। জোর করে ছিনিয়ে নিতে চাইল হাত: সে হয় না, সে আমি পারব না।

—একটি গ্রামের মেয়ে নিয়ে তো আমার মন ভরত না সুরবালা। নিজের চেয়েও বেশি যাকে শ্রদ্ধা করতে পারি, তেমনি একজনকেই আমি চেয়েছিলাম। ওই দুঃখটা তোমার মধ্যে তাকেই জাগিয়ে দিয়েছে—আজ তুমি ছাড়া আমার আর চলবে না। যদি তুমি সঙ্গে না যাও—একদিন ছুটন্ত ঘোড়া থেকেই আছড়ে পড়ে মরতে হবে আমাকে। তাই কি তুমি চাও সুরবালা?

সুরবালা কিছু বুঝতে পারল কিনা কে জানে, কিন্তু হাত আর সে ছাড়াতে পারল না। আর দুঃখ-দগ্ধ অগ্নিমুখী চোখ দুটো হয়তো আট বছর পরেই একটু একটু করে অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল তার॥

"টনসিল"

(৩৬ পাতার পর)

আসে, ছায়া সম্বন্ধে আপাতকর্তব্য নির্ণয় করা হয়, হোল তো রাজেনের পদ্য শোনে খানিকটা, তার পর একবার ছায়াদের বাড়িতে চা খেয়ে, কিছু দরকার রইল তো সেখানে খানিকটা কাটিয়ে, কে-গুপ্তর খোঁজ নিয়ে গঙ্গার ঘাটে চলে যায়। ছায়া মেয়েটি বড় ভালো। পাড়াগাঁয়েই কেটেছে এতদিন, তার ওপর শরীরের বাড় নেই বলে বোধ হয় মনেও পাক ধরেনি, রোম্যান্স জিনিসটা একেবারে বোঝে না। সবাই ভাইয়ের মতন ভালোবাসে, সবারই নেওটা, আর মধ্যে কে আবার ভেতরে ভেতরে ভাইয়ের অতিরিক্ত ভালোবাসছে সে খোঁজও রাখে না, তার জন্যে মাথাব্যথাও নেই। একটু তারতম্য অবশ্য আছেই, গনশারই স্নেহ বেশি, তার ভক্তও একটু বেশি; রাজেন মুখচোরা, থাকেও যেন একটু সবার আড়ালে, তাই তারদিকে একটু যেন ঘেঁষেও কম, তবে এর জন্যে যে সন্দেহ করতে হবে কিছু গোলযোগ আছে এমন কথা নয়। ভাইকে দিয়ে মুড়ি আনিয়ে রাখে; প্যাঁজের বড়া, বেগুনি, এ সব তেলে ভাজা নিজেই করে—চমৎকার পাড়াগেঁয়ে হাত—আব্দার করে খাওয়ায়, আবদার করে এটা-ওটা আদায় করে। চমৎকার মেয়ে; এক যা ঐ বাড় নেই একেবারে।

আর, যেন বছর দশেকের একটা মেয়ে, সে কি করে বাড়ি থেকে ছুটে আসছে এদের দেখেই; কি, এরা বেরিয়ে যাবার সময় কি আবদার ধরেছে—ফরমাস করছে, কি, কার হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে আসছে—এ সব কেউ অত ধরে না।

আজকে ছায়াদের বাড়িতে অনেকক্ষণ কেটেছে। সবাই বেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এসেছে, এমন সময় দেখা গেল কে-গুপ্ত হনহনিয়ে এদিকেই চলে আসছে। ছায়া শেষের দিকটা এদের কাছে ছিল না, চলে যাচ্ছে দেখে ছুটে ঠিক এই সময়টা রকে এসে দাঁড়াল। এদেরই কিছু বলতে যাচ্ছিল হয়তো, কে-গুপ্তকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—"কবে এলেন? আসুন না, দিদিমা জিগ্যেস করছিলেন।...গনেশদা, কে-গুপ্তদাকে নিয়ে আসুন না?...ওমা, কত মুটিয়েছেন কদিনে!"

গনশাই উত্তর দিলে—"আজ যাই, কাল আবার......"

—"কাল কিন্তু নিশ্চয় আসবেন—নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়ই আলুর চপ করব, নতুন শিখেছি!............ওমা, কত মুটিয়েছেন কে-গুপ্তদা"...

ঘরের ভেতরে যেতে যেতেও বলছে—"ও দিদিমা তুমি দেখলে না—কে-গুপ্তদা এসেছেন ...আর কত......"

এরাও ততক্ষণ এগিয়ে পড়েছে, আর শোনা গেল না।

একে জল-হাওয়াটা ভাল, তায় এদের পাঁচ-জনের চাপ থাকে না, বিশেষ করে ঘোৎনা, কে-গুপ্ত ওদিকে গেলে দিব্যি গোলগাল হয়ে আসে; মনের দিক থেকেও বেশ একটু চাঙ্গা থাকে কয়েকদিন, তার পর আবার যেমনকার তেমনটি হয়ে যায়।

হেসে বললে—"বাঁকুড়ি সেই বাঁকুড়িই রয়ে গেল দেখছি।"

ত্রিলোচন মাথা হেঁট করে কি ভাবছিল, বললে—"আমিও সেই কথাই ভাবছি—একবার আপনাদের ওখানে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? —কত রকম করা হচ্ছে কিছুই ত লাগসই হচ্ছে না। এ-সাইডটা একেবারে কারুর মনে হয়নি।... কি বলিস রে গনশা?—অমন চমৎকার জল-হাওয়া।..."

গোরাচাঁদ বললে—"তার ওপর এন্তার দুধ-ঘি, মাছ-মাংস...ওদিকে এবার আমটা কি রকম হয়েছে মশাই?"

কে-গুপ্ত কি বলতে যাচ্ছিল, গনশা গোরাচাঁদের দিকে চেয়ে বললে—"ও যা মেয়ে, স-স-সমস্ত ছাপরা জেলাটা পেটে পুড়ে বসে থাকলেও কিছু হবে না। সমুদ্রে পা—পাদ্যঅর্ঘ্য।"

কে-গুপ্ত হঠাৎ বলে উঠল—"এই দেখুন! আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলুম—অথচ দেখা ইস্তক সেই কথাই ভাবছি—শিবপুরে গিয়েই প্রথম কাজ—সবাইকে বলতে হবে। জলহাওয়া, ঘি দুধ, মাছ-মাংস—এ সবের কোন কথাই নেই—স্রেফ টনসিল......"

সবাই ঘুরে চাইলে, গনশাও চোখটা তুললে একটু। ত্রিলোচন চোখ দুটো কপালে তুলে বললে—"সত্যি নাকি? ...তার পর?"

আজ আর গংগার ঘাটে অতদূর না গিয়ে ওরা রাজেনের বাড়িতেই ফিরে এসেছে। সবার সংগে ঘাটে বসতে বসতে কে-গুপ্ত বললে—"সে এক আশ্চর্য কান্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না! দাদার শালীকে ত এর আগেও দেখেছি—চাপড়ায় বাড়ি ওদের, কতবার এসেছে। ঠিক এই কেস—আজ বোধ হয় পাঁচ বছর থেকে দেখে আসছি—হয়তো পশ্চিম জায়গা, ছায়ার চেয়ে একটু গায়ে মাংস আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত—পাঁচ বছর আগেও যেমন—পাঁচ বছর পরেও তেমনি; এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক নয়। নামও এর যেমন বাঁকুড়ি, ওর তেমনি পড়েছে বাতাসী।... এবার গিয়ে সেই কথাই ভাবছিলুম—সবাইকে দেখছি বাতাসীকে দেখছি না কেন? বুঝি মানুষ শেষ পর্যন্ত সারড়ে গেল নাকি?... দাদার বড় শালী ভানুদিও এসেছে, কিন্তু ঐ ভয়ে জিগেস করতেও পারছি না; কারুর বাড়িতে পাওয়াও যাচ্ছে না ঠিক করে। তার পর একবার একটু একলা পেয়ে 'ওঁ ভানুদি'... বলে আরম্ভ করতে যাব, হেসে বললেন—"বুঝেছি, দাঁড়াও একখানটায়।"...যেতেও হোল না বেশি দূর—একটি মেয়ে, ঢাকাই শাড়ী ব্লাউজ পরা, একগা গয়না গায়ে—বারান্দা দিয়েই যাচ্ছিলো, এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলেন। আমাদের সেই বাতাসী। দু'দিন থেকে ওঁদেরই দেখলাম—কপালে সিঁদুর, টকটক করছে রং—আমার সংগে চোখোচোখি হল মৃদু ফিক করে একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে কি-ভাবে যাচ্ছে—এ আবার কেমন ধারা কান্ড! একটা নতুন বিয়ে-হওয়া মেয়ে...আরে গোলো শেষে, সেই কি না আমাদের বাতাসী!"

ভানুদি আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছিলেন, বললেন—"আন্দাজ করো তো ব্যাপারখানা কি!"

"কি আন্দাজ করবো?—সেই বাতাসী, টক টক করছে রং, এদিকে মনে হয় যেন হাতখানেক বেড়ে গেছে—বিশ্বাসই হচ্ছে না তো আন্দাজ করব কি?"...তখন ভানুদি নিজেই বললে—"কিচ্ছু না, শুধু টনসিলটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে—না ওষুধ, না পত্তর..."

ঘোৎনা এসে উপস্থিত হোল, হাতে একটা নতুন টনিকের শিশি। দু' তিন জনে একসঙ্গে বলে উঠল—"ওরে ঘোৎনা! পাওয়া গেছে...কে গুপ্ত জেনে এসেছে...ওসব আর কিছু নয়, শুধু টনসিলটা বাদ দিয়ে দাও..."

ঘোৎনা সামনে বসতে বসতে প্রশ্ন করলে—"কি বাদ দিতে হবে?"

"টনসিল"—গনশা ছাড়া সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

"সেটা আবার কি?"

তার পর কে-গুপ্তর দিকে চেয়ে বললে—"কথাটা যেন শোনা, জিনিসটা কি মশাই?"

—কেউই জানে না, ধরা পড়বার ভয়ে এতক্ষণ জিগ্যেসও করে নি কে-গুপ্তকে, সবাই মুখ তুলে তার দিকে চাইলে।

কে-গুপ্ত বললে—"টনসিল হোল যাকে আলজিভ বলি আমরা।"

ঘোৎনা বললে—"আলজিভ সেতো গলার মাঝখানে। গলাটা তাহলে কেটে ফেলতে হবে?"

গনশা বিরক্ত হয়ে বললে—"আগে শোনই সবটা। উনি কি ক-কন্ধ-কাটা মেয়ে দেখে এসে বলছেন?...আপনি বলুন না মশাই গোড়া থেকে সবটা।"

আগের বারে যেমন বেশ সরস করে গুছিয়ে বলেছিল, সে রকম করে আর পারলে না কে-গুপ্ত, তবুও ব্যাপারটা মোটামুটি বললে। তার পর ডাক্তারদের নূতন থিয়োরীর কথাও যা শুনেছে তাও বললে—ওরা নাকি আজকাল বলছে আলজিভটার বিশেষ কোন দরকার নেই শরীরের মধ্যে—অথচ যদি কোন কারণে সেটা পেকে কি অন্য কিছু দোষ হোল তো এইরকম নানা উপদ্রব ঘটায়, কাউকে অসম্ভব কাহিল করে, কারুর বাড় কমিয়ে দিচ্ছে, ডাক্তারেরা এদিকে বই ঘেঁটে ঘেঁটে সারা—রোগ কি ধরতে পারছে না।

ঘোৎনা বললে—"আপনাদের বাতাসীর রোগটা ধরলে কে?...কে অপারেশনটা করলে?"

কে-গুপ্ত বললে—"ছাপরার সিভিল সার্জেন।"

ঘোৎনা মাথাটা ঘুরিয়ে নিলে। বোধ হয় মুখ বন্ধ করতে পেরেছে বলেই কে-গুপ্ত এই প্রসঙ্গেই ডাক্তারদের থিয়োরী সম্বন্ধে আরও কি সব শুনে এসেছে তা নিয়েও খানিকটা বলে গেল—বাতাসীর প্রসঙ্গ থেকে বাড়িতে এই আলোচনাটাই খুব হচ্ছিল তো। ডাক্তারদের মতে শুধু টনসিল নয়, আরও অনেক জিনিস আছে শরীরে যার আগে হয়তো দরকার ছিল কিছু, এখন আর নেই—কেন না মানুষ তো আগে মানুষ ছিল না, তার দরকারও ছিল অন্য রকম—যেমন মানুষের কান,—এত এবড়ো-খেবড়ো টেড়াবেঁকা হবার কোনই দরকার নেই আর।

ঘোৎনা ওর কানের দিকে একবার এমনভাবে চেয়ে নিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে, মনে হোল যেন ছাপরার সিভিল সার্জেনের সেই ছুরি দিয়ে ওর কান দুটো ও চেঁচে দিতে পারলে তবে কতকটা আশা মিটত। অবশ্য কিছু বললে না।

একটু নূতন ধরণের কথা, এরা চুপ করেই

বেড নিয়ে পড়ে থাকুক, ভালো হলে খালাস করে নিয়ে যাও, শেষ হয়ে গেলে—তোমার নসীব। মোটা হবে কি আরও শুকিয়ে যাবে, বাঁচবে কি বাঁচবে না, কেউ লেখাপড়া করে দিতে পারবে না।

বললে—মাসীর পিসতুতো ভাইয়ের এক বন্ধু মেডিকেল কলেজে হাউস্ সার্জেন, তারই কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে, আর, সব হাস-পাতাল-কলেজেই এই ব্যাপার।

একটা কথা উঠল, অথচ তার কোন হেস্তনেস্ত হচ্ছে না, সবাই খুব মনমরা হয়ে রয়েছে, এমন সময় গনশাই একদিন খবর আনলে সব ঠিক হয়ে গেছে; হাসপাতালেই, তবে হাওড়া কলকাতায় নয়; বাইরে।

গনশা তিনদিন ছিল না। কাছেই একটা জেলা-সহরের সিভিল সার্জেন বদলি হয়ে নূতন লোক এলেন, সেই সম্পর্কে একটা বিদায় সম্বর্ধনা ছিল। হাসপাতালের এক কম্পাউন্ডার ছোকরা গনশার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। গনশা জানতও না, সেই হঠাৎ এসে উপস্থিত, পরিচয় দিয়ে চেপে ধরলে ঐ উপলক্ষে তার একটা এ্যামেচার শো নিতে হবে। একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি করে এসেছিল, কাউকে খবরও দিতে পারেনি গনশা। তারপর সেখানে শিব-পুরের গনেশ গেছে—কয়েক জায়গাতেই ধরা পড়ে গেল—এ ক্লাব, তো ও লাইব্রেরী, তো-ওর বৈঠকখানা—আরও দুটো দিন কেটে গেল।

কিন্তু কাজ করে এসেছে. অপারেশনের ব্যবস্থা, থাকবারও একটা ভালো ব্যবস্থা। পেয়িং ওয়ার্ডেই, তবে প্রায় নিঃখরচায়। সিভিল সার্জেনের সঙ্গে খুব খাতির করে নিয়েছে তো, শেষ শোটা তাঁর বাড়িতেই দিয়ে এল।

দিদিমাকে রাজি করানো শক্ত হোল না। মেয়েটা তো একরকম খরচের খাতাতেই. যদি স্বাস্থ্যটা ফেরে—হাতও নয়, পাও নয়, শুধু আলজিভটুকু—আধ ছটাকও নয়: ওটুকু দিলেই সের দুপাঁচ মাংস যদি লাগে গায়ে এসে তো দেখতে দোষ কি?

ছায়াতো শরীর ফেরবার নামে নাচতে লাগল। তাকে অবশ্য আসল কথাটা বলা হোল না। হাসপাতালে যাবে, মোটা হয়ে ফিরবে এই বোঝানো হয়েছে।

অপারেশনের ঘরে নিয়ে গিয়েই তো ক্লোরোফরম্; কি হোল না হোল টেরই পাবে না, যখন পাবে টের তখন হ্যাঙ্গাম কেটে গেছে। ......ছায়া নাচতে আরম্ভ করেছে—বয়স হয়েছে তো ওরই মধ্যে—আর পাঁচটা মেয়ের মতো হতে সাধও তো হয় দেখেশুনে।

ঠিক হোল দিদিমা, আর ছোট ভাই হাঁদু সঙ্গে থাকবে। এরা ততদিন বাড়ি আগলাবে, রাত্রে যেমন সুবিধা হয়—তিন চারজন করে শোবে—মাঝে মাঝে এরা গিয়ে দেখে আসবে। ভৌমিক যেমন বলেছিল তিন সপ্তাহ, সেসব কিছু নয়, মেরে-কেটে একটা সপ্তাহ যদি লাগে।

একটা ভালো 'দিন' দেখে সবাই বেরিয়ে পড়ল। উঠোনের পাশে একটা পুঁইশাকের নধর ডগা লকলকিয়ে মাচায় উঠছে, বুড়ী কালী-ঘাটের কালীকে উদ্দেশ করে মানৎ করলে—"বাঁকাড়ির আমার এইরকম বাড় দাও মা, এই শক কেটে দিয়ে আসব তোমার ভোগে।"

অপারেশন হয়ে গেল। পেইং ওয়ার্ডে রোগীকে নিয়ে এলে, এরা সবাই উৎসাহে হৈ চৈ করতে করতে ঢুকছিল, সিসটারের কাছে এক প্রচণ্ড দাবড়ানি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হোল। সে পরিচয় নিয়ে বললে—দিদিমা আর ভাই যখন রয়েছে আর কারুর থাকবার দরকার নেই। গনশা সম্পর্কে দাদা তো, আসতে পারে এক আধ দিন, বন্ধুরা ভিড় করবে না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তিন থাকে খুব হৃষ্টপুষ্ট শরীর: বললে—টন্‌সিল্ অপারেশন সে নিজে করিয়েছে, এমন কিছু ব্যাপার নয় যে, পাড়াসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়তে হবে। এটা তামাসার জায়গা নয়, হাসপাতাল।

বেটাছেলেদের মতো মোটা কালো ফ্রেমের গগ্‌ল্‌স্ চশমা পরা, খুব কড়া চাউনি। সরু গলা, কিন্তু চিলের মতো কর্কশ। সবাই নিচে থেকেই ফিরে এল।

গনশা বাইরে এসে বললে—"মে—ম্মেয়ে মনুষ তাই পার পেয়ে গেল।"

আজকাল ছায়াদের বাড়িতেই সবাই জুটছে এসে। শুধু দুপুর বেলাটায় দোরে তালা এঁটে একবার নেয়ে খেয়ে আসে, তারপর সমস্ত দিনই এইখানে। রাত্রেও দুজন তিনজন—যেমন হোল, এসে শুয়ে থাকে। আলোচনা বেশির ভাগ অবশ্য রাজেনের বিয়ে নিয়ে; সেই যে পুঁটুরাণী তো তুলেছে—বিয়ে দাও ও দুজনের, তারপর থেকে বাকি তিনটে বোও তিনজনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, যদি রাজেনটাকেও ঝুলিয়ে দিতে পারে আপাতত তো কতকটা শান্তি। ছায়া যদি যেমনটি আশা করা যাচ্ছে তেমনটি হয়ে ফিরে আসে তো আর কিছুতে আটকাবে না; মা-মরা ছেলে রাজেন, ওর জ্যেঠাইমা বলে রেখেছেন মেয়েটি শুধু মনের মতন হলেই হোল, তিনি আর কিছু চান না। বলেন—ও'র জায়ের সেই রকম ইচ্ছে ছিল, আর ছেলেও ছড়াটড়া লেখে—একটু খুঁৎখুঁতে........

এরা এখনও কিছু ভাঙেনি, ঠিক করে রেখেছে ছায়া ফিরে আসুক—তারপর একদিন হঠাৎ তাক্ লাগিয়ে দেবে—ওখানে নিয়ে গিয়েই হোক কিম্বা জ্যেঠাইমাকেই ডেকে নিয়ে এসে হোক। এত করে খেটেখুটে একটা দাঁড় করাচ্ছে—কে না চায় বেশ একটু সাড়া পড়ে যাক পাড়ায়?

বেশ কাটছে. শুধু এক অশান্তির ধর হয়েছে সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স মিস্ টেম্পল্। এক কথায় সবার যাওয়া বন্ধ করেছে. ওকে নিয়ে এক একদিন খুব জোর আলোচনা হয়। ত্রিলোচন বলে—"লে, লে! দেবেনা ঢুকতে! দুড্‌ডুম্বশুর জগদ্দোকে নিয়ে দিচ্ছি আসছে দুজন কি?—আরও ছজনকে নিয়ে যদি হুড়মুড়িয়ে না ঢুকি....."

গনশার সম্বন্ধে আপত্তি না থাকায় বার দুই গেছে এর মধ্যে। অবশ্য, ওরা কেউ যায়নি, কোন-না-কোন রকম কাজ পড়ে গেছে সবার। প্রথমবার গনেশ যায় অপারেশনের দুদিন পরে। এসে রিপোর্ট যা দিলে তাতে মনে হোল খুবই আশার কথা; মাত্র দুদিন হোল অপারেশন হয়েছে, এখনও শুধু দুধ, গ্লুকোজ এইরকম তরল আহার্য খেয়ে রয়েছে একটু একটু করে, তবুও যেন মনে হচ্ছে এরই মধ্যে একটু অন্য-রকম।......বুড়ীর দুহাত মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ, বলে—ফিরে যাই, তারপর তোমরা সবাই মিলে ওর একটা গতি করে দাও দাদা।—গতি যে হয়েই রয়েছে তাতো আর জানে না।......আর পই পই করে বলে দিয়েছে পুঁইলতাটা না নষ্ট হয়।

ত্রিলোচন জিগ্যেস করলো—"আর সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সিস্‌টারটা?"

গনশা চোখ পাকিয়ে বললে—"সিস্‌টার—তা কি?"

গোরাচাঁদ বললে—"না, তুই বললি না সেদিন—সিভিল সার্জেনকে বলে ওর নূজর্ কি বের করবি......"

"আলবৎ করব, একশ'বার করব!" কট-মটিয়ে চেয়ে রইল গোরাচাঁদের দিকে, একটু থেমে ওকেই মুখটা ভেঙচে ভেঙচে আবার বললে—"সিস্‌টার!......এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান! গ-গনশার কাছে!"

দিব্যি কথা হচ্ছিল, সিস্‌টারের নামে হঠাৎ এইরকম খিঁচিয়ে উঠতে শেষাশেষি কিছু যে আবার একটা হয়েছে আন্দাজ করে কেউ আর ঘাঁটাতে চাইলে না।

দুদিন পরে আর একবার হয়ে এল, কিন্তু সেদিন আরও এত থমথমে ভাব যে কেউ আর কোন কথাই তুললে না। হাঁদুও চলে এসেছে, কেমন একটা আতঙ্কগ্রস্ত ভাব, বলছে আর কোনমতেই যাবে না।

খোৎনাব হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে অনেক-ক্ষণ ধরে একদিকে দৃষ্টি ফেলে টেনে গেল গনশা, তারপর বললে—"তরশু বাঁকড়ু ডিস্-চার্য হয়ে আসবে, খ-খ-খরচ আছে, যে যা পারবি নিয়ে আসবি।"

কেগুপ্ত বললে—"ছেড়ে দেবে বলেছে তরশু?"

গনশা চোখ পাকিয়ে ঘুরে চাইলে—

"আলবৎ দেবে মশাই, দি-দেবে না বাধা; আমার কেস আমি আট দিনের কড়ারে দিয়ে এসেছিলাম, সে-সেরে উঠছে, আমি নিয়ে যেতে চাই; এতে সিস্‌টারগিরি চলবে না।...... সিস্‌টার।"

আনবার দিন বেশ তোড়জোড় করেই সকালের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ল সবাই। ব্যাপার যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে সবার মনের ভাবটা যেন কোন রাক্ষসীর কবল থেকে ছায়াকে উদ্ধার করে আনতে চলেছে। রাজেন ঐ ধরণের একটা কবিতারও খানিকটা লিখে ফেলেছে; সকালের খালি গাড়ি, সেইটে নিয়ে আলোচনা—আস্ফালন করতে করতে সবাই স্টেশনে নামল। প্রায় সাড়ে আটটা আন্দাজ হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হোল।

রাস্তার ধারেই হাসপাতাল, গেটের মধ্য দিয়ে ওরা সামনেই আফিস ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠল। গনশা ভেতরে গিয়ে উপস্থিত হোল। খাতির আছে।

'এই যে আসুন গণেশবাবু'......'গনেশদা' এস!......আপনার সেই কেসটা:—পেইং ওয়ার্ডে?"

ওরাও এক এক করে ভেতরে এসে উপস্থিত হোল।

গনশা বললে—"আজ ডিসচার্য করবার কথা।"

"হবে না। এখনও বোধ হয় দিনদশ বারো হবে না। খুব ইণ্টারেষ্টিং কেস, সিভিল সার্জেন নিজের স্পেশ্যাল অবজারভেশনে রেখেছেন। সিস্‌টার টেম্পলের খাস তদারকে রয়েছে......ও আবার বড় কড়া মেয়েমানুষ তো, ভিজিটার একেবারে বারণ, তবে আপনারা

দেখতে চান তো ব্যবস্থা যে না হতে পারে এমন নয়।"

আরদালিকে ডেকে বললে—"দেখো তো সিস্টার টেম্পল্স এখন কোথায়।"

আরদালি বেরিয়ে দু'পা গিয়েই ফিরে এসে খবর দিলে করিডোর দিয়ে বোধ হয় আফিসের দিকেই আসছেন।

বলতে বলতেই মিস টেম্পল্স গনগনিয়ে খানিকটা খাওয়াসুদ্ধ আফিসের মধ্যে এসে ঢুকল। "হ্যালো, চাক্রাবার্টি আই ওয়ান্ট দ্যাট্......"

—বোধ হয় কোন ফাইল-টাইল চাইতে এসেছিল, এদের দিকে নজর পড়তে গগ্‌ল্‌সের ভেতর দিয়ে কটমটিয়ে চেয়ে বলে উঠল—"ওয়েল, দ্যাট ব্লেসেড লট্‌!......টোমরা আবার কি দরকারে এসেছে?...ও নো, শি মাস্ট নট বি ডিস্‌টার্‌ব্‌ড্‌। উহাকে বিরকটো করা হইবে না।"

সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তারই মধ্যে গনশা দ্রুত তোতলামির মধ্যে দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, চক্রবর্তীই বললে—"ওদের বলছিলাম কি রকম ইন্টারেষ্টিং কেস, তাই ওরা......"

গনশা বললে—"তাই আমরা বলছিলাম—সিস্টার টেম্পল্‌ তো রয়েছেনই...আমাদের আর দা-দা-দাখবার......"

"হ্যাঁ, আমি রয়েছে। আই অ্যাম্‌ দেয়ার রাইট্‌ এনাফ্‌। টোমরা যাও, দশদিন পরে ঘুরে আসবে। শি ইজ্‌ আন্ডার অবজারভেশন....."

দশদিন পরে এসেছিল গনশা, তবে হাসপাতাল পর্যন্ত যায়নি। বেশ খানিকটা দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষকালে একটা ঝাড়ুদারকে এদিকপানে আসতে দেখে বকশিষের লোভ দেখিয়ে খোঁজ নিতে বললে—চার নম্বর পেইং ওয়ার্ডে একটি কেস্‌ এই রকম দেখতে—কি রকম উন্নতি করে জানতে পারে।

লোকটা এসে বললে ওরকম কেউ নেই ও-ওয়ার্ডে। আট আনা পয়সা নিয়ে একটা সেলাম ঠুকে নিজের কাজে চলে গেল।

এ আবার এক নতুন সমস্যা মেয়েটাকে পাচার করে দিলে নাকি কিন্তু নাড়ী?........ দারুণ দুশ্চিন্তায় বাড়ি অশান্তিতে কাটতে লাগল সবাই। রাজেনের কাবলিয়া আবার একটা নতুন সর্গ শুরু হোল। কেউ না থাকলে গাড়ী গাড়ীর ঘোড়া দাঁড়ে জল দিয়, বেশ সাবধানে করে নিয়ে এসেছিল; এখন শুধু চোখের জল ফেলে।

হাঁদুকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখছে, খাওয়া-দাওয়ার দিকে খুব নজর রাখে। ক্রমে সেও যেন একটু একটু করে উতলা হয়ে উঠেছে।

চিন্তা দাঁড়িয়েছে, গেল কোথায় মেয়েটা। একটু ভালো করে ভেবে দেখবার ফুরসৎ হলে হাসপাতাল থেকে পাচার করে দেবার কথাটা অসম্ভব বলেই মনে হোল। খবর পেতে কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে, লোকটা যেমন গেল আর ফিরে এল, ঠিক খবর নাও নিয়ে আসতে পারে, কিম্বা হয়তো ভুল ওয়ার্ডে দেখেছে।

মুস্কিল হয়েছে হাঁদু একেবারে ওমুখো হতে চায় না। এরা তবু মুখে বাঘ মারে, ওর আবার এমন আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গেছে, রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে 'সিস্টার-সিস্টার!'—করে আঁতকে ওঠে। তবুও একদিন ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল গনশা; হঠাৎ দেখে কখন কোন স্টেশনে ওকে লুকিয়ে নেমে পড়েছে। একবার মনে হোল নিজেই কপালঠুকে হয়ে আসবে, তারপর ওর ভাবনাতেই স্টেশনে স্টেশনে খোঁজ নিতে নিতে ফিরে এল।

হাঁদুর নাম করে ওর কাকার ঠিকানায় একটা চিঠি দেওয়া সাব্যস্ত হোল—অপারেশনের পর শরীর সারাতে যদি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দিন কতক থাকবার পরামর্শ দিয়ে থাকে ডাক্তারে। কাকার ওখান থেকে চিঠি এল—ওখানে যায়নি; বাড়ীতে সবাই খুব দুর্ভাবনায় আছে।

কিছু করবার নেই, ওদিকে ঐ দুশ্চিন্তা এদিকে সিসটার টেম্পল নিয়ে আক্রোশ—আপসানি, এই করে আরও দিন দশবারো কেটে গেল। ছায়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সে প্রায় মাসখানেকের কথা। কিছু একটা না করতে পারলে অশান্তিটা যেন আর কাটতে চায় না। রাজেনের লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। একদিন তাই থেকে খুব উগ্র একটা অংশ, যাতে সিসটার টেম্পলের চেহারার বর্ণনা আছে, নকল করে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোল।

খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল। কে-গুপ্ত ছিল না, এসে বললে—সর্বনাশ হয়েছে; মানহানির মামলায় না পড়ে যেতে হয়।

শীতের দুপুর গড়িয়ে গেছে, সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে জুটেছে ছায়াদের বাড়ি। রাজেন নিচের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে, শরীরটা কদিন থেকে ভালো নয়; কারণটা তো জানাই, গোরাচাঁদ একটা বালিস টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। গনশা ছাতে রোদ পোয়াচ্ছে। খিড়কির দিকে একটা ছোট ডোবা আছে, ত্রিলোচন আর কে-গুপ্ত দুটি মাছ ধরবে; রবিবার, হাঁদুর ছুটি, তাকে বললে একটা টোপ পেড়ে নিয়ে আসতে, আটা দিয়ে ময়দাটা মাখবে।

বেলগাছ, তায় দুপুর বেলা, হাঁদু ডান হাত দিয়ে গাছটা স্পর্শ করে কপালে ঠেকিয়ে চড়তে যাবে, খপাং খপাং করে দুটো শব্দ কানে গেল। রাস্তার ওদিকটায় একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়া দুটো যেন এতটা কোন রকমে এসেছে, আর এক পাও এগুতে পাচ্ছে না, সহিস ছিপটি হাঁকরাচ্ছে। তারপরেই গাড়িটা একটু এগুতে গাড়ির পেছনকার সীটে নজর পড়তে ও যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি মুহূর্ত, তারপরেই—"গণেশদা, সিস্টার!!"—বলে বাড়ির দিকে মুখ করে পা বাড়াল। এবং পরক্ষণেই কি ভেবে আবার দিক পরিবর্তন করে গাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা চেয়ে প্রাণপণে ছুটল।

রাজেন, গনশা, গোরাচাঁদ একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল—"কে!" গনশা সঙ্গে সঙ্গে ছাতের আলসের ওপর মুখ তুলে চীৎকার করে উঠল—"ওরে গোরে, এ্যাংলো! তিলে, এ্যাংলো, নামছে!!"

—আর ঘুরে না দেখে অর্ধেক সিঁড়ি ভাঙতে না ভাঙতে নিচে লাফিয়ে পড়েই খিড়কির দিকে ছুটল। ছোট দোর, চারজনে জমেছে, কোন রকমে ধস্তাধস্তি করে ঠেলে বেরিয়ে ডোবার ধারের আগাছা ভেদ করে, মিউনিসিপ্যালিটির বড় ড্রেন ডিঙিয়ে ঘুরে ফিরে একেবারে রাজেনদের পুকুরঘাটে গিয়ে উঠল।

হাঁপাচ্ছে। হাঁদুও হাঁপাতে হাঁপাতে রাজেনদের বারান্দা থেকে বেরিয়ে এল, চোখ দুটো ঠেলে আসছে, বললে—"দেখলাম গাড়ির মধ্যে এই রকম বাঘের মতন হামদো মুখ।......"

গনশা দাঁত দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে কি যেন ভাবছিল, বললে—"আমি মু-মু-মুখটা দেখিনি, ছোট হচ্ছে না—নামছিল......কিন্তু হঠাৎ এল কি করতে?"

কে-গুপ্ত বললে—"সেই পদ্যটা হয়তো রাজেনবাবুর; মানহানির মামলা......"

গনশা একটু ধমক দিয়ে উঠল—"ব-ব বলুম্‌লেগে মামলা করতে মশাই, তাতে নাম নেই কারুর, গ-গগনশা অমন কাঁচা কাজ করে না।"

ত্রিলোচন নিজের চিন্তার সূত্র ধরেই বললে—"আর সামনে আগে রেজোটাকেই পাবে। আহা, গেল বেচারি।"

গনশা একটু যেন অপ্রতিভ হয়েই সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে, উলটে একটু অনুযোগের স্বরেই বললে—"রেজোটা আবার রয়ে গেল কেন?"

গোরাচাঁদ বললে—"সে ফেণ্ট্‌ হয়ে যায় নি তো?......গোঁ-গোঁ করছিল—আমি যখন—যখন আমি বললাম—চল্‌ আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে ধরে ধরে নিয়ে যাই।"

গনশা চটে উঠল, বললে—"ফে-ফে-ফেণ্ট্‌ হয়ে যাচ্ছে দেখেও তাকে ছেড়ে এলি? তুই মা-মানুষ, না, কি? চল্‌, আমি এক এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সিস্টার।......মা-মানহানির মামলা—গ-গ-গড়াগড়ি যাচ্ছে রাস্তায়!"

ছায়াদের বাড়িটি একেবারে নিস্তব্ধ।

ভেতরে যাই থাক্‌, গনশা যেন গটগটিয়েই এগিয়ে গেল। কে-গুপ্ত আর ত্রিলোচনও একটু দূরে থেকে পেছনে পেছনে চারদিকে নজর ফেলতে ফেলতে চলেছে। গোরাচাঁদ বললে—"আমি এখানেই থাকি না হয় হাঁদুকে নিয়ে; ও আবার কি যে বলে, বড্ড ভয়কাতুরে।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।

তিনজনে গিয়ে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়াল।

ঝলমল করে আলো
প্রভাত আকাশে—
ঝির ঝির হাওয়া বয়
গাছে ও পাতায়,
রোদ ওঠে, ফুল ফোটে
মাধুরী মাখা সে,
বনে বনে কত পাখী
কূজনে মাতায়।

এসো এই সোনা ভরা
শরৎ সকালে,
পাশাপাশি বসে থাকি
গাছের ছায়ায়,
প্রাণ ভরে গাই গান
নব সুরে তালে,
নিরজনে ডুবে যাই,
সবুজ মায়ায়!

ঘরের ভেতর সামনাসামনি রাজেনকে দেখা যাচ্ছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, ফ্যাল-ফ্যাল করে সামনের জানলাটার দিকে চেয়ে আছে। বোধ হয় গিয়েই ছিল অজ্ঞান হয়ে, এখনও ঘোরটা কাটেনি।...বুড়ী বলছে—"অ রাজু, তুমি অমন হয়ে গেলে কেন দাদু?...ও যে বাঁকুড়ু—তোমাদের ছায়া—তোমারই তো সব করলে কম্মালে, এখন, বলতে নেই, গায়ে একটু গত্তি হয়েছে—তা চিনতে পারবে না, এমন তো নয়—অ, রাজু'...আর এরা সবাই বা গেল কোথায়?..."

তিনজনে গিয়ে দাঁড়াল।

"এই যে গণেশভাই, তোমরাও এয়েছ। এসেই দেখি বিপজ্জয় কাণ্ড, রাজু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, বাড়ি ভোঁ ভোঁ, কেউ কোথাও নেই। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সাড় হয়েছে, কিন্তু দেখো না।... তোমাদের ছায়া গো! পাপ মুখে বলতে নেই, একটু হাড়ে-মাসে হয়েছেন মেয়ে এতদিনে। তাও কি থাকতে পেত ভাই? মেয়ে সেরে উঠেছে, বাড়ির জন্যে হাঁকুপাঁকু করছি, তবু ছাড়তে চায় না। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম—নাকি কাহিল করে আনবার ওষুধ দেবে!...ওমা! কী অলক্ষুণে কথা! কোন মতেই শুনবে না, শেষকালে যখন কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম—বললাম—আর এখানে জলস্পর্শ করব না, এই তখন গিয়ে...। বাইরে কে ও, গোরাচাঁদ ভাই নয়?...ঐ যে হাঁদুও।...ওরে দেখসে তোর দিদি এলো যে! ও গোরাচাঁদ, তোমাদের ছায়া!"

সামনের জানলার সমস্তটুকু জুড়ে বসে আছে ছায়া: ওপারের দিকেও অনেকখানি পর্যন্ত। টকটক করছে রং, সিসটার টেম্পলকেও যেন ছাড়িয়ে যায়।

চিবুকের মাংস দুটি বড় বড় থাকে পড়েছে ঝুলে, এদিকে দুটি গালে যেন দুটি টেনিস বল পুরে বসে আছে, মাংস দুদিক থেকে চেপে এসে—রাজেন যেমন আশংকা করেছিল, অমন

সাঁওতাল জননী
গৌর দত্ত

খাড়া, টিকোলো নাকটাকে যেন লোপাট করে দিয়েছে মুখ থেকে, চোখ দুটিও ভেতরে।

এই অনুপাতেই গলার নিচে থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সবটুকু। ঘরে বেশ ঠাণ্ডাই, ছায়া কিন্তু বসে বসে হাঁপাচ্ছে আর গলগল করে ঘামছে।

উলটো সমস্যা। উপায় ঠাওরাবার জন্যে সবাই রোজই গঙ্গার ঘাটে একত্র হচ্ছে, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। ঘোৎনা দুদিন ছিল না, সেও এসেছে, তাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার সময় সবাই আবার এসে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কারুর মুখে কথা নেই; গনশা একটা বিড়ি টানছিল—ঘোৎনার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে—"কিছু ঠাওরাতে পারলি তুই? আমাদের মাথায় তো কিছু আসছে না।"

ঘোৎনা বিড়িটা নিয়ে, আঙুলের টোকায় ছাইটা ঝেড়ে বললে—"অনেকক্ষণ। তোদের মাথায় গোবর পোরা আছে।"

সবাই চকিত হয়ে ওর দিকে চাইলে। ঘোৎনা নির্বিকারভাবে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—"কে-গুপ্ত রয়েছে তো..."

কে-গুপ্ত একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—"আমি!!...আমার...মানে আমাকে কি করতে হবে?"

"বিয়ে করতে হবে মশাই।...আপনি তো রাজেনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন বলতে গেলে—এক ছাপরেয়ে চিকিৎসা আমদানি করে। এখন নিয়ে যান..."

"আমি!...আমি পড়ছি...বিয়ের কথাও ওঠেনি!...আমি কি করে!...গণেশবাবু শুনচেন?"...

গণেশ মুখটা ঘুরিয়ে একটা জাহাজ দেখছিল, আরও ঘুরিয়ে নিলে।

"ত্রিলোচনবাবু! গোরাচাঁদবাবু! শুনুন না একবার ঘোতনবাবু কি বলেন!......আমি—মানে!..."

ত্রিলোচন মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—"রাজেনের সঙ্গে আর তো মানাচ্ছে না।" গনশা মুখটা না ঘুরিয়েই বললে—"হাতির সঙ্গে চামচিকে।"

কে-গুপ্ত অসহায়ভাবে সবার দিকে চাইলে, বললে—"তা আমার সঙ্গেই বা কি এমন...এই দেখুন না চেয়ে আমার দিকেও।...আর রাজেনবাবু ভালোবেসেছেন—পদ্য লিখছেন।...বলুন না রাজেনবাবু।"

রাজেন শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। সেটাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস মনে করলেও কিছু দোষ হয় না। ঘোৎনা বললে—তা কবিতাগুলো নিয়ে নিন, আপনিই শোনাবেন।...দিয়ে দে রাজেন।"

গোরাচাঁদ বললে—"আর এও ভেবে দেখুন না; রাজেন বদ্দি, আপনিও বদ্দি..."

গনশা বললে—"যেন ভ-ভ-ভগবানই ঠিক করে রেখেছেন..."

কে-গুপ্ত বললে—"না হয় রাজেনবাবুর টেনিসলটা কাটিয়ে নিন না।"

ঘোৎনা আবার ধমক দিয়ে উঠল—"একটু ভেবেচিন্তে কথা বলুন মশায়, গোল থাকে না তাতে। বিয়ের পর বরকনেকে প্রেজেন্ট করে নিয়ে আসতে হবে। অমন দুটো ল্যাদ এক আটেয়ে আটবে।...বলুন দুজনা জামাদের খবর

কল্যানকুমার দাশগুপ্ত

জীবনের লেনদেন সব কিছু হিসাব নিকাশ
তিতিক্ষার সুরে বেঁধে, সাধ হয়, হবো দেশান্তরী,
সুদূরের স্বপ্ন আর নির্জনের মনের সুবাস
শুধু সঙ্গে নিয়ে যাবো,—
মৃন্ময় বাসনা ত্যাগ করি।

আমি যাবো সেই দেশে:
শান্তি হলো সম্রাজ্ঞী যেখানে,
আনন্দ যেখানে প্রজা, স্বপ্ন যার অনন্য সম্পদ,
সংগত সৌন্দর্য-ঘেরা বীতশোক সর্বান্তর গানে
সর্বদা মুখর যার আকাশ-পাহাড় নদী-মাঠ।

এই ভেবে যাত্রা করি। আনন্দিত। এমন সময়
চেনা সুরে মনে হলো কে যেন আমাকে বারবার
পিছু ডাকে; চেয়ে দেখি:
ম্লান দুটি চোখে চেয়ে রয়
কনিষ্ঠার কারু কান্না। ফিরে আসি;
সমাপ্ত যাত্রার॥

লরীতে নিয়ে আসবে,—আপনি তাও পারেন বলতে..."

কে-গুপ্ত ব্যাকুলভাবে বললে—"বেশ তো, নাইবা হোল বিয়ে। রোগা মেয়ের হচ্ছিল না, মোটা মেয়েরও হবে না..."

ঘোৎনা আবার চটে উঠল—"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। হাসপাতালের রিপোর্টটা তো দেখেছেন—কি থেকে কিসে দাঁড়িয়েছে গিয়ে। একটা গরীব বিধবা, সে কায়ক্লেশে একটা সাড়ে আটাশ সেরের মেয়েকে কোন রকমে খাওয়াচ্ছিল, এখন সে মেয়েটা দু' মোন একুশ সের, কোথা থেকে অন্ন জোগাবে মশাই—এই মাল্পিগণ্ডার দিনে?"

যা করবার ঠিক করেই এসেছিল, বুক পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাফ ফরম আর ফাউন্টেন পেনটা টেনে নিয়ে বললে—"কাঁদুনি ছাড়ুন তার ঢের সময় আছে; এখন একটা টেলিগ্রাম করে দিই ছায়াকে, এসে পড়ুক সব তাড়াতাড়ি; এখানে আপনার স্নেহ-মশাইকে ঠিক করে নিতে দেরি হবে না—সবাই আপনার মতন নয়।...শোন গনশা এই লিখছি—marriage settled come sharp K. Gupta fallen love...

সাংঘাতিক রকমের ইংরিজী কি হবে মশাই? সাংঘাতিক ভালোবাসায় পড়েছে..."

ত্রিলোচন টিকা করলে—"হার্টে আসফ্যোক্ত করে ফেলতে পারে..."

কে-গুপ্ত আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—

"টেলিগ্রাম! হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, টেলিগ্রাম!..."

গনশা যেন আর অন্যায় আবদার সহ্য করতে না পেরে মুখটা এতক্ষণে ঘোরালে, বললে—"হঠাৎ হঠাৎ বিয়ে ঠিক হলে হঠাৎ টেলিগ্রাম যাবে না তো কি মশাই? বাজে কথা না বলে ইংরিজীটা বাতলে দিন না, টি-টেলিগ্রাফ অফিস আপনার জন্যে খোলা থাকবে কেয়ামত রাত?"

নূতন করে আজ বেঁধেছেন তিনি। তাই রঞ্জনার রূপ অবসাদে নূতন করে আলো জেলেছেন তিনি। কৃতজ্ঞতা? তুচ্ছ—প্রতিদান। রঞ্জনার মাতৃহীন জীবন সে এই মহাশিল্পীর পায়ের নীচে বিছিয়ে দিতে পারে তাঁর পদক্ষেপের নিমিত্ত।

তিনি আমাকে এনে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সুযোগ—জীবনে প্রথম অসামান্যের সাক্ষাৎ পেলাম। আমার জীবনে প্রথম পুরুষ সে

দীর্ঘ চিত্রিত অজগর—মসৃণতা তার ধর্ম। কখনই সে উচ্চারিত উপস্থিতি নয়। তার শিকার-সংগ্রহ পর্যন্ত নিঃশব্দে—তার মৃত্যুগ্রাস তারই মত নীরব। পর্যটন তার সরল—মসৃণ দোলনে। কোথাও মৃত্যুর রুক্ষ কাঠোরতা, উচ্চ ধ্বনি নেই। আফিম ফুলের সর্ব-নির্বাপিত সুপ্ত সর্পের বিষস্পর্শে। অজগর নীরবতা ধর্মী।

সম্মোহন সেদিনও তার চোখে ছিল। আমার দৈনিক সাথী হ্রদের পাশে সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যে দুইটি চোখ, আমার বসনমুক্ত যেটুকু শরীর দৃশ্যমান, তাই দেখছিল, সে চোখে আমি পেয়েছিলাম আফিমফুলের বিষ, গোলাপের মধু।

"তোমার মূর্তি গড়ব এবারে, কি বল শান্ত মেয়ে?"

প্রাণপণে আত্ম সংবরণ করে নিলাম। তাঁর হাত দৃঢ়তায় লগ্ন হয়েছে আমার কাঁধের হাড়ের ওপর।

"আমার তো এখনও শরীর সারেনি। তাছাড়া, ঠিক মূর্তি গড়ার মত মডেল কি আমি?"

ধীরে ধীরে হাতখানা আরও দৃঢ়, আরও কঠোর হয়ে উঠেছে—"শিল্পীর ব্রত অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে তোলা। যা সম্পূর্ণ, তা নিয়ে নিজের সৃজন-প্রতিভার গর্ব চলে না। সে হয় কপি বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। আমি পূর্ণতা দেব। শিল্পী দিতে চায় নিজেকে বার বার। মূর্তি মূল্য পায়।"

আমার মুখ থেকে সেই দৃষ্টি নামল আমার এখনও ক্ষীণ, এখনও মৃত-যৌবন দেহে—দেহের প্রতিটি চূড়ায় চূড়ায় ওই দৃষ্টির বিচরণ। নির্লজ্জ, বর্বর প্রার্থী। এই কি ঈশ্বরের সমকক্ষ সৃজন-দক্ষ শিল্পী?

বললাম, "মাধবীদির একটা মূর্তি গড়ুন না। সে মূর্তি কখনও গলে যাবে না।"

এবারে তার দুই হাত উঠে এলো আমার দেহ প্রাকারে অলঙ্ঘ্য কিন্তু অনুচ্চারিত আদেশ সে হাতের। ভাস্করের হাত।—"মাধবীর অনেক মূর্তি গড়া হয়েছে। ওর সঙ্গে তো বহুদিনের যোগাযোগ। আমার গড়া সব মূর্তিই হাতের ছাপ পাথর করে রাখে।"

"আচ্ছা মাধবীদি তো আপনার চেয়ে অনেক বড়—তবু তো নাম ধরে ডাকেন?"

অবান্তর কথা বলে যেন কোন অনিবার্য মুহূর্তকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় আছি।

"আমি শিল্পী, বয়স আমার কাছে বাধা নয় কোন। মাধবী আমার সর্বপ্রধান আশ্রয়।"

"আশ্রয়?"

"হ্যাঁ। বাংলা দেশের শিল্পীর এমন একজন অনুগ্রহদাত্রী দরকার হয়। ও আমাকে সুষ্ঠু বিষয়ে সাহায্য করে।"

অলকাপুরী (১২৮৬৯ ফুট)

জিতেন্দ্রনাথ বসু

"উনি আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।"

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে—দূর স্রোতের দিকে চেয়ে নীলাঞ্জন গভীর কণ্ঠে বলল, "ওর দেবার অনেক আছে। তাই নিতে হয়।"

"এইমাত্র বলছিলেন না, শিল্পী দিতে চায়? তাহলে শুধু নিতে চান কেন?"—আমি বাঁকা প্রশ্ন করলাম।

"আমার দেওয়ার রূপ ফুটেছে আমার গড়া মাধবীর মূর্তিতে, আমার আঁকা ওর ছবিতে।"

"কি সে রূপ?"

"সে রূপ? সে রূপ—" উগ্র উত্তেজনায় নীলাঞ্জন সাপের তির্যক ভঙ্গীতে মাথা তুললেন। "সে রূপ—তাড়না তাকে মাত্র আত্মাকে পীড়ন করার মধ্যে পারে—একমাত্র সোনালী শস্যকে কাস্তে দিয়ে কাটার মধ্যে পারে। মাধবী মেয়েদের সেই রূপ আমাকে দেখিয়েছে। চিরদিন তাকে ধন্যবাদ জানাই।"

শত-সহস্র শীতের দেশের প্রান্ত যে হিমালয় প্রবাসী বায়ু বাস করে, যে বাতাসে পাতার ডাল রিক্ত, পাখী মূক, সে বাতাস আমার কণ্ঠ নিথর স্তব্ধহীন করে দিল। দুর্গম তের হিমানীর স্পর্শে যেন আপাদ মস্তক কম্পিত হয়ে বললাম, "শুধু ওইটুকুর জন্য ধন্যবাদ! আর কিছু নয়? এত যে সাহায্য, টাকা—"

"সে আমি না নিলেও আর কেউ নিত—" লঘুস্বরে নীলাঞ্জন অনায়াসে বলল, "না, মাধবীকে সত্যি ভালবাস দেখছি। কিন্তু, এত মাধবীর কথা কেন? নিজের কথা কি কিছুই নেই?"

অতি আদরে তার স্বর বিগলিত, কিন্তু স্পর্শে রুক্ষ পর্বতের কাঠিন্য—দুই হাতের একাগ্র-নিবিড় পীড়নে হঠাৎ আমার পূর্বার্ধ তৃণ-শয্যায় লুণ্ঠিত হল।

"একি, একি!" আর্তনাদ করে উঠলাম।

"ভয় পেয়োনা। তোমাকে কি রূপে দেখব, তাই দেখছি মাত্র।" তীক্ষ্ণ-নির্মম দৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হল লেহনশীল বিরাট সর্পের ক্রূর লক্ষ্য। হিমানীর অনবচ্ছিন্নতায়

সেই দৃষ্টি তখনি নির্লিপ্ত স্থির হয়ে গেল।

"সুন্দর! রঞ্জনা, তোমার হাড়গুলো বড় সুন্দর। মাংস না থাকায় তাদের রূপ আরও স্পষ্ট হয়েছে।"

আমার অঞ্চল আমার গায়ে ছিল না। কিন্তু, লজ্জা পেলাম না। আমার সম্মুখের পুরুষ তখন নিরপেক্ষ দর্শক, কঠোর বিজ্ঞানী। সে দৃষ্টিতে নারীর জন্য আর কোন সম্মোহন লেখা নেই। মাথা নীচু হয়ে গেল পরাজয়ে। এবং এক মুহূর্তে আমার জগতের কত ঊর্ধ্বে চলে গেল! নিবিড় আলিঙ্গনেও এ অপমান। আস্তে উঠে বসে, বিপর্যস্ত সমানা শ্রী দেহকে ঢেকে বললাম, "এতক্ষণে মাধবীদির সভা শেষ হয়ে গেছে। বাড়ী চলুন ওঁর কাছে।"

আজ এই কাহিনীর স্মৃতি মনে এনে দেয় দুঃসহ অপরাধবোধ, কিন্তু সেদিন এ ছিল আনন্দময়। শরীরের উন্নতিকল্পে বিছানায় যেতাম রাত্রি নয়টার মধ্যে। দীর্ঘ রাত্রি নীলাঞ্জনের ঘরে মাধবীদির গুঞ্জন চলত, এই সময়টাতেই দুই অসম বয়সের বন্ধু পরস্পরের সাহচর্য সুখ লাভ করতেন। মাধবীদির শিক্ষা-কেন্দ্র খুলে গিয়েছিল। রঞ্জীর নিত্যকার ভ্রমণও ব্যাহত হয়েছিল।

আজও নীলাঞ্জনের পর্দার আড়ালে বাতির দিকে চেয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরেরই পর্দার দোলন যে বাতিকে কখনও ঢেকে কেবা কখনও তুলে ধরে। লুকোচুরির খেলা খেলছে আমার চক্ষে বাতি আর পর্দা।

একলব্যের কথা মনে পড়ে গেল। বালিশে মুখ রেখে ভাবতে লাগলাম। দ্রোণাচার্য একলব্যের আত্মীয় ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষা-চার্য। বর্তমান জগতে গুরু-শিষ্যের অতি হৃদয়স্পর্শী, অতি অপরূপ সম্পর্ক নেই। কিন্তু, আমি তো একলব্যের মতই গুরু-দক্ষিণা দিতে চাই।

নীলাঞ্জন—আমার নীলাঞ্জনকে মাধবীদি কি এবারে ডেকে এনেছেন আমারই জন্য? না,

প্রায়শঃ অতিথির এই আগমন আকস্মিক মাত্র? উনি কি চান নীলাঞ্জন আমারি হোক? আজ নীলাঞ্জনের ব্যবহারে ছিল আমার অস্বস্তি, কিন্তু, ভয় কি? মাধবীদি দেখছেন। বুঝতে পারি, অত্যন্ত সতর্ক তিনি নীলাঞ্জন ও আমার সম্পর্কে। সেটাই স্বাভাবিক। অনুঢ়ার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন।

চোখ আচ্ছন্ন করে এল তন্দ্রা, এল নিদ্রা, এল স্বপ্ন।

সমগ্র জীবন যার আবির্ভাবে উত্তেজিত, দেখলাম তাকেই। পাহাড়িয়া পথে ঝোপের ধারে—নীলাঞ্জন আর আমি। দেখলাম, দুই-হাত তার হাত নয়—চিত্রিত অজগর। মনোহারী অজগরের লুব্ধ গ্রাস আমি। চীৎকার করে ডাকলাম, "মাধবীদি, কোথায় আপনি?"

স্বপ্ন ভেঙে গেছে। শয্যার সামনে দেহাতী ঝি ধরে দিল চা, টোস্ট, ডিম। আমি উঠতে আদিষ্ট হয়েছি বেলা করে। মাধবীদিই সংসার মাস্কীর মত মাথায় ধরে রেখেছেন।

ঝি-এর সঙ্গেই প্রায় হাজির হলেন মাধবীদি নিজে। সকালেই পোষাকের পারিপাট্য নিমন্ত্রণ বাড়ীর উপযুক্ত। অবশ্য, বাইরের লোক, শিল্পী অতিথি হওয়ায় তাঁর সজ্জার মধ্যে যত্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, আজ তাঁর শাড়ীতে জরির ঘোর বেশী, আমার কাছে তারুণ্যের জয়-নিশান উড়ছে।

"এখনও শুয়ে আছ তুমি? আজ থেকে না নীলাঞ্জন তোমার মূর্তি গড়বে?"—মাধবীদির স্বর রুক্ষ।

বিছানায় উঠে ট্রে টেনে নিয়েছিলাম,—"কই, আজকের কথা তো—?"

"যখন রাজী হয়েছ, তখন প্রস্তুত হয়ে ওঘরে যাও।" মাধবীদির স্বর তীব্রতর।

বুঝলাম। আস্তে জানালাম, "আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে রাজী হইনি। আর—আমার মূর্তি গড়ার মত কিছু তো নেই আমার।"

মাধবীদির মুখ যেন জাগরণ-ম্লান, মুখের সৌরভ মাধুরী-শুষ্ক বৈশাখী-মরা। নীলাঞ্জন ও আমার যোগাযোগে সজাগ ভীতি তো অভিভাবিকার ধর্ম। মনে সংকল্প করলাম: মূর্তি গড়া মূর্তিতেই শেষ হবে। মাধবীদির মনে ব্যথা দিয়ে প্রগল্ভতা আমি করব না।

"আপনি না বললে আমি যাব না, মাধবীদি!" বিছানা ছেড়ে আলনার দিকে গেলাম।

"আমিই তোমাকে যেতে বলছি।" মাধবীদি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দেহাতী ঝি চায়ের ট্রে ফেরৎ নিতে এসেছিল। ওকে বললাম, "নীলাঞ্জন বাবুকে খবর দাও আমি আসছি।"

ঝি যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে জানাল, খবর দিতে হ'বে না। সাহেব নিজেই তো মাকে বলেন আপনাকে ডেকে দিতে।"

তার পরের দিন শ্বাসরোধকারী দিন গুলি। সারাদিন কেটে যেত শিল্পীর মডেল সেজে। মাধবীদি পরীক্ষার খাতা দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন, কথাবার্তাও কম হ'ত।

প্রায় দুই মাস হয়ে গেল। বাড়ী ফিরবার বাঁশী ডাকছে। সেই নিরানন্দ নীলাঞ্জন-হীন জীবন,—মাধবীর মাধুরী বর্জিত। রূপ যেহ এখনও সবল হয়-নি। এই লাল মাটির টিপির নীচে, কাপাস গাছের ছায়ায় মনের সমাধি রচনা করে ফিরে যাব কি?

দুরাশার দিবাস্বপ্নে বেজে ওঠে শানাই তরঙ্গে মিলন: এল, এল, এল, এল! সাদা পট্টবস্ত্রে কে নেমে এল আমাদের পটল-ডাঙার বাড়ীর দরজায়? ময়ূরপঙ্খী-সাজানো ফুলের গাড়ী: গলায় ফুলের মালা, ললাটে চন্দন-লেখা। এই জনতায় এখন সে আর আমার মধ্যে যোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন। লজ্জাবস্ত্রের নীচে অতি পরিচিতের আবার দেখা পেলাম। বাঙালী মেয়ের চিরদিনের স্বপ্ন।

অসম্ভব! রূপহীনা মধ্যবিত্ত দুহিতার এ স্বপ্ন ব্যর্থ। কিন্তু, আমার আশ্বাস, শিল্পী হয়তো সাধারণকে ভালবেসেছে। তাই, নিবিড় সাহচর্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেও মাধবীদি বাধা দেন না। মাধবীদি ভাল না বুঝলে আমাকে কখনও মডেল হ'তে দিতেন না। আমার মাধবীদি আছেন। অঙ্কের মত দিনের হিসাব মিলিয়ে গেলাম কেবল। টুকরো—টুকরো—অঙ্ক। উত্তর ঠিক হ'ল কিনা দেখবার উপায় নেই।

শিল্পীর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্কল্প প্রয়োজন ছিল না। সে এখন নির্লিপ্ত বিজ্ঞানী। কাগজে অজস্র রেখায় আমার ছবি। মাটির মূর্তিরও কাঠামো তৈরি হয়েছে।

অজগরের সম্মোহন এখন দূরে থেকে। কেমন করে বলব, নির্লিপ্ততার অবকাশে দৃষ্টি তার চুম্বনের মত শক্তিধর? কেমন করে জানাব যে আলিঙ্গন না করেও নিবিড়তার আস্বাদ আনা যায় দেহভঙ্গিমাতে? যেন তার দৃষ্টি শব-ব্যবচ্ছেদের ছুরি। আমার সংযত দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকটি অণু পরীক্ষা করে দেখছে। পূর্ণবসনা নারীর দেহ সে দৃষ্টির কাছে বিবসন। আমি কেমন করে কিছু বলব? আমার হাত যে কোথাও পড়ছে না! শুধু অনুভূতি।

তার পরের ইতিহাস এমন সযত্ন-সজ্জিত, লাল ফিতেয় বাঁধা ফুলের গোছা নয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, খণ্ড খণ্ড ঘটনা। এই কাহিনীর সূত্রে তাদের গাঁথা শক্ত, শুধু তাদের অনিবার্য পরিণতি, সমষ্টিগত ঐক্যের কথা বলা চলে।

অনিবার গতিতে যে বন্যা এল, যে ঝড় মাথার ওপরের আশ্রয় উড়িয়ে নিল, তার কথা বলা চলে। স্রোতের নীচে যে ধারা সৃষ্টি করেছে, যে মেঘে আকাশে ঝড় গতি সঞ্চয় করেছে, সে কথা অবান্তর।

সত্যই আকাশে মেঘ জমেছিল। কাল-বৈশাখী। এতদিন পরে সে রাত্রির কথা মনে পড়ে যথার্থ ভাবে।

মনে পড়ে, একদিন মাধবীদি আমাকে কি একটা কথা বলতে যেয়ে চুপ করেছিলেন হঠাৎ। হয়তো তিনি বলতে আরম্ভ করতেন নীলাঞ্জন বিষয়ে গূঢ় কোন কথা। আবেগ তপ্ত ছিল সেদিন মুহূর্তটি। আমার মন কোন কারণে কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করে উঠেছিল। কিন্তু, কেন মাধবীদির বলা হ'লনা সে কথা, আজ মনে নেই আর। অস্ফুট ইঙ্গিত একটা কেন থেমে গিয়েছিল।

মাটির মূর্তি প্রায় শেষ হয়ে এল। কয়েক-দিনের মধ্যেই আমি চলে যাব। বাবার চিঠি এসেছে। তার আগে-কি জেনে যাব না সে কি চায়?

দরজায় আস্তে টোকা পড়ল। জানালার কাছে সরে গেলাম। হাত পা কাঁপতে লাগল। আবার পুবালী ঝড় শীত নিয়ে এসেছে। শিক চেপে ধরে দাঁড়ালাম।

এতক্ষণ বিনিদ্র শয্যা যার স্মৃতি-তপ্ত, এত আলোচনা-মনের যাকে নিয়ে, গভীর রাত্রে সে—ই এসেছে।

"দরজা খোল। কথা আছে। দিনের বেলায় সুযোগ থাকে না।"

মাধবীদির দৃষ্টির প্রহরায় শিল্পীর মডেলের সঙ্গে শিল্পীর গোপনীয় কথা চলে না। মাধবীদি শিক্ষা-কেন্দ্রে আবার ছুটি নিয়েছেন। অবশ্য শিল্পীর চোখের দৃষ্টির ওপর প্রহরা ছিল না। সে যা জানাবার জানিয়েছে।

মুখে শুনতে পাবার লোভে ঘরে আনলাম তাকে। দীর্ঘ বাহু বেষ্টনে দৃঢ় বক্ষে সে—আমাকে গ্রহণ করল।

জোর করে ছাড়িয়ে নিলাম। মাধবীদির অনুচ্চারিত আদেশে নিজেকে পরিচালনা করতে হ'বে আমার।

"এত রাত্রে কেন?"

"কি হয়েছে?"

"কুমারী মেয়ের ঘরে আসার এটাই কি-সময়?"

"শিল্পী নিয়মের ঊর্ধ্বে"।

"আমি তো শিল্পী নই।"

"তুমি আরও বড়—শিল্পীর মানসী"।

অবশেষে সেই কথা এল, যা আমার মনের চরম কামনা। কিন্তু, কাব্যিক কথায় বাস্তবের মিল পাওয়া দায়। চুপ করে রইলাম।

চেয়ার থাকতেও বিছানায় বসল সে—, 'দিনে কাজের ভিড়ে কথা-বার্তা বিশেষ হয়না—। তাই রাত্রে এসেছি। "জানো তো,

বলেছিলুম এটা থ্রি ডাইমেনসান ছবি

শেষ রাত ছাড়া আমার ঘুম আসেনা। মূর্তি তো শেষ হয়ে এল। এবারে চলেও যাচ্ছ শুনছি। মূর্তিকারকে কিছু দেবার নেই?"

সাধারণ কথা। গৃহস্থ প্রেমিকের মত সহজ উক্তি। ভয় কেটে গেল। এতো শিল্পীর অসাধারণ বাক্যবিন্যাস নয়। গভীর রাতে নিরালা উপস্থিতিও স্বাভাবিক মনে হল।

সহজ গলায় উত্তর দিলাম। তার অস্তিত্ব আমার এখন এই খাটিয়ার মত, ওই লেবু গাছটার মত অনেক বেশী চেনা অস্তিত্ব। তাকে আমার ভয় নেই। আমার বিশ্বাস আছে, আমার আশা আছে। উত্তর দিলাম, "দিলেই কি নিতে পারবেন?"

"আমার কিছু নিতেই বাধা নেই, রঞ্জনা। যত পাই ততই লাভ"।

তাড়াতাড়ি অবচেতনের নির্দেশে অন্য কথা তুললাম, "আমার মূর্তির কি নাম দেবেন?"

"নাম কাল রাত্রে এই সময়ে তোমাকে বলে যাব।"

"সে কি? না, না। আর এভাবে কাল আসবেন না।"

"রোজ আসব। তোমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে এখন।"

আবার সাধারণ মানুষ শিল্পীর জটিলতায় ফিরে গেল। আমি পীড়িত হয়ে উঠলাম। সামান্যের স্বাধীন সত্তার ওপর অসামান্যের পীড়ন। এ সহ্য হয়না।

বললাম, "এখন আপনার নিজের ঘরে যাওয়াই ভাল।"

"ভয় পেয়ো না"। চকিতে আমার দেহ তার কবলগত হ'ল। আমার ভীত—অনিচ্ছুক অধরে বন্যার মত নেমে এল চুম্বন।

আমার সর্বতো সমর্পণ সে চুম্বনের নীচে। আমি বাধা দেবার যোগ্যতা হারালাম।

নীলাঞ্জন চকিতে আবার দূরে সরে গেল, "আজ যাই। কাল রাতে আসব এমনি সময়ে। কাল তুমি না বলতে পারবে না"।

"কিন্তু—কিন্তু—"

"আমার ওপরে সব ভার—ছেড়ে দাও।" শেষ কথার আশ্বাসে আমার ভীরু চিত্ত শান্ত করে সে সহজ মসৃণতায় অদৃশ্য হ'ল। এত কাছে যে এল, এত নীরবে, তার মসৃণ দেহের গতি সাপের গতি। তবু তাকেই আমার চাই। হয়তো তার মধ্যে মৃত্যু আছে, তবু তার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

বলব, মাধবীদিকে বলব এই বর্ষাব্যাকুল রাতের কাহিনী? আমার দিক থেকে সামান্য গোপনতাও যেন না হয়। কিন্তু, ওতো আমাকে কথা দিল। ওতো আমার ভার নেবে। ও—ই নিশ্চয় বলবে।

তবু, ওর কাছ থেকে আরও একটু শুনতে চাই। দরজা খুলে বার হয়ে এলাম দ্রুতগামীর পেছনে। কলাগাছের চওড়া পাতায় দুলছে বর্ষার জল। টুপ টুপ করে বাড়ীর ছাতার পাতাবাহারে জল ঝরছে। বড় অন্ধকার।

সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে কার হাতে উগ্র বিজলী হাত-বাতি জ্বলে উঠল? মর্মভেদী স্বরে শোনা গেল, "কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"দূরে নয়। বর্ষার রূপ দেখতে।" একটি হাত আর একজনের পিঠে উঠে এল। তারা পা-টিপে-টিপে চলতে লাগল। টর্চের-আলো নিভে গেলেও চিনতে ভুল হ'লনা।

নীলাঞ্জন কর ও মাধবী মিত্র আমাকে বোকা ভেবেছিলেন। আমি বোকা নই, অসাবধান। একচক্ষু-হরিণের মত সম্ভাব্য দিকে চেয়ে থাকি, ব্যতিক্রম আমার লক্ষ্যে আসেনা—। আমার জীবনের অনভিজ্ঞ সারল্য—সেই দিনই শেষ হ'ল।

অনেক দিনের অনেক অঙ্ক মিলিয়ে এবারে যে উত্তর পেয়েছি, মাধবী মিত্রের সেই টুকুই কাহিনী।

দেশ-প্রেমের স্রোত রেখে গেল নীরস কর্কশ ভূমি। নিঃসঙ্গা মাধবীর আত্মসমর্পণে উৎসুক মন খুঁজে পেল আধার। প্রায়-বেকার শিল্পী নীলাঞ্জন। সাধারণ মানুষ মাধবী মিত্র, অনন্যা হ'লেও শিল্পী নন তিনি। সাধারণ তাঁর ছাত্রী রঞ্জনা। একজন তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীকে মনে করে নিল অসামান্য। তার নাটুকেপনাকে তারা প্রতিভা বলে ভুল করল—দারুণ অসংযমকে স্বর্গীয় পাগলামি বলে শিহরিত হ'ল।

টাকা ছিল মাধবীর, আশ্রয় পেল শিল্পী। মাসিক অর্থ সাহায্য প্রেমের পরিবর্তে। নগরের পথে পথে এমন শিল্পী ঘুরে বেড়ায়। ক্ষুধিত দৃষ্টি তাদের। আধো অন্ধকারে অশুভ ছায়ার মত গলিতে গলিতে তারা ফেরে, মাটি চায়। সে মাটি দিয়ে ইচ্ছামত মূর্তি গড়বে তারা। মাধবী নিঃশেষে তলিয়ে গেলেন।

বয়সে বহু ছোট, তাতেই বা কি? অসাধারণের জন্য কি সাধারণ লৌকিক প্রথা? বিবাহ-বিরোধী নীলাঞ্জন। সমাজ ও নীতির বাইরে চলে এলেন মাধবী।

বুঝলাম নীলাঞ্জনকে আমার উদ্দেশে ডাকা হয়নি। রূপসী রূপহীনা ছাত্রীকে নীলাঞ্জনের দৃষ্টিযোগ্যা মাধবী মনে করেননি। না হলে, রঞ্জনা ও নীলাঞ্জনের দেখা হ'তনা। নীলাঞ্জনের আসাও আকস্মিক—তিন মাসের মধ্যে আসবার কথা ছিল না। সে কাশ্মীরে ছিল।

মাধবী মিত্রের প্রহরা অনূঢ়া কন্যার মাতৃ-ভারে নয়, প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বের পূর্বাভাষ। নীলাঞ্জনের নূতন শিকার তাঁর সন্তান-প্রতিমা ছাত্রী কিনা, সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে না পারলেও তিনি সতর্ক হয়েছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্রে ছুটি নিয়ে প্রহরী ছিলেন। তবে নীলাঞ্জন যে তাঁর চেয়েও সতর্ক। ধরার বাইরে তার লক্ষ্যভেদ।

মাধবীর সম্পূর্ণ পরাজয় সেদিন সকালের চটুল প্রসাধনে। রঞ্জনার মূর্তিগড়া ভাল লাগেনি তাঁর; নীলাঞ্জনের মূর্তি গড়ার সঙ্গে তাঁর যে প্রচুর পরিচয় আছে। কিন্তু নীলাঞ্জনকে বাধা দেবার সাহস ছিল না। নিজেকে লোভনীয় করে তোলার প্রয়াস ছিল। জানি না কতবার নীরবে মাধবী মিত্রকে এমনি নীরবে স্বীকার করতে হয়েছে। কতবার মরুভূমির বালি জলবিন্দুকে এমনি নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

যে মুখ বয়সের তাপে শিথিল হয়ে গেছে সে মুখে প্রণয়ের উগ্রভাব বিকাশ সম্ভব হ'তনা। প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়মে সে মুখে জননী-সুলভ ভাব লিখে গেছেন সময়ের ধর্মে। তাই রঞ্জনা প্রেমের আত্মসমর্পণকে জননীর স্নেহ বলে ভুল করেছিল।

অভিজন নাগরিকা অভিজাতা স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন এই নেহাতই গ্রামের অখ্যাত নিভৃতাবাসে। সকলের কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন তিনি এই নিষিদ্ধ প্রেম—প্রৌঢ়ার উন্মাদ প্রেম যৌবনের প্রতি। নীলাঞ্জন এখানেই আসত। রঞ্জনাকে প্রেম দান করে দেবার পূর্বে মাধবীর প্রতীক্ষা সে দেখেছিল।

অনেক ছোটখাটো কথা, অনেক হালকা দৃশ্য একসঙ্গে গেঁথে তুলে মুহূর্তেই সত্যকে পেলাম।

আজ রাতে ওদের কোন সতর্কতা প্রয়োজন ছিল না যে। কোন দৃষ্টিকে এড়াতে যেয়ে সহজ বন্ধুত্বের অভিনয় করে যেতে হয়নি। মাধবীর পিঠে হাতখানা নীলাঞ্জনের তাই রাত্রির নির্জনে বড়বেশী মালিকানা প্রকাশ করে ফেলেছিল। দুই অসম বয়সের বন্ধুর মধ্যে এ ধরণের অন্তরঙ্গতা অবশ্য আগেও রঞ্জনা দেখেছে। কিন্তু আজ আলিঙ্গনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, ওই হাতের সব কিছু জানা আছে—ওই হাত অধিকারী।

মাধবীর শিথিল দেহভঙ্গীতেও স্বীকৃতি—সমর্পণ অধিকারীর কাছে। বহুদিনের বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় প্রকাশ প্রয়োজন হয় না, তারা

অন্তহীন দ্বিধা ছিল,
ছিল শুধু অসীম জিজ্ঞাসা,
ছিল চির-অন্বেষণ,
পাইনি কো পথের সন্ধান,
নিদারুণ সমস্যার
হয়নি ত কোন সমাধান,
ছিল ব্যাকুলতা,
আর ছিল এক অনির্বাণ আশা;
অন্তরে বিশ্বাস ছিল,
ছিল ভক্তি, ছিল ভালবাসা,
সেদিন পেয়েছি শুধু
অশান্ত এ হৃদয়ের গান,
জীবন-অঞ্জলি পদে
আনন্দে করেছি আমি দান,
সেদিনের ভাষা ছিল
দীপ্ত তীব্র আবেগের ভাষা।

হে দেশ, হে দেবী
আজ বাহিরে পেয়েছি তব দেখা,
অতীতের স্বপ্ন হ'ল
চরিতার্থ অপূর্ব বাস্তবে,
মিশেছি সবার সাথে
আমি আজ—সেদিনের একা,
অন্তরবাসিনী হ'লে
মূর্তিমতী, ছিলে শুধু স্তবে,
আকাশে ফুটেছে
এ কি অনুপম আলোকের লেখা,
ওঠে তব জয়ধ্বনি,
বিজয়িনী, বিশ্বের উৎসবে।

———

পরস্পরকে পেতে অভ্যস্ত। তাদের দেখে প্রেমিক-প্রেমিকা বলে বোঝা শক্ত হয়। রঞ্জনা বুঝেছিল, তাই তার সন্দেহমুক্ত চোখে এই দুইটি লোকের জটিল সম্পর্ক বন্ধুর সহজতা বলেই মনে হয়েছিল।

কিন্তু আজ? স্বতঃসিদ্ধ আলিঙ্গন, মাধবীর নীলাঞ্জনের কাছে দাঁড়ানোর ভঙ্গি—সব কিছুই বলে দিল অভ্যাস, বহুদিনের অভ্যাস। মাধবীর ওঘরে খিল দেবার আগেই বোঝা গিয়েছিল।

এরা জীবনের চোরা-বালিতে এত তলিয়ে গেছে যে এদের টেনে তোলা অসম্ভব। ঈশ্বর জন্মলগ্নে দুইটি নিষ্পাপ আত্মা দিয়েছিলেন যাদের, তারা সে আত্মা হারিয়েছে।

কিন্তু আমি? পরকীয়া প্রমত্ত, সস্তা পোটোকে কেন মন দিলাম? কেন ওর লাম্পট্যকে ভালবাসা বলে ভুল করলাম? কেন, কেন না জেনে আমার মাতৃসমার অধিকারে হাত বাড়ালাম? আমি, যে একলব্যের মত গুরুদক্ষিণা দিতে চেয়েছিলাম, সে অত ঋণের কি এই প্রতিদান দিল?

আমার ভুল গুরুতর, আমার পাপ আরও বেশী। মনে মনে যাঁকে মা ডেকেছি, তাঁর অবৈধ প্রণয়ীও আমার কাছে পিতার মত নমস্য। না জেনে অপরাধ করলেও পাপ তাতে যায় না। বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ দুঃখের নায়ক অয়ডিপস্ (Aedipus) যাকে তিনি না জেনে স্ত্রী করেছিলেন। অজানিত অপরাধেও তিনি দেবতাদের কাছ থেকে ক্ষমা পাননি। বাংলার শ্যামল-সুকোমল মৃত্তিকায় আমার পাপের প্রতিরূপ পাইনা। আমার অপরাধ ওই অয়ডি-পসের অপরাধ।

আমি কাল সকালেই পালিয়ে যাব। কাল রাত্রে সে আসবে। এই বিভীষিকা থেকে পালিয়ে বাঁচব। প্রেম, তুমি আমার জীবনে কেন এত পাপ, এত বীভৎসতা নিয়ে এলে? প্রেম, তুমি আমার মন চাওনা শুধু। তুমি আমার আত্মাকে চির-অভিশপ্ত করতে চাও।

অনিদ্রার পরে জিনিষপত্র গুছিয়ে বেলায় ঘরের বার হলাম। আমার আজই চলে যাবার কথা শুনে মাধবীদির চোখে এতদিনে জ্বালা নিভে গেল। মূর্তি গড়ার দিন থেকে জ্বালা দেখেছি।

গলার তীব্রতা আমার স্নেহমধুর চেনা-সুরে ফিরে গেল। আজ সব কিছুর অর্থ বুঝলাম।

যিনি আমাকে সত্য বলবার শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর কাছে মাথা নামিয়ে মিথ্যা বললাম, "রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বাবার অসুখ। আমাকে যেতেই হবে।"

সকাল থেকে বৃষ্টি রাত্রির জের টেনে চলেছে। ঝড় উঠেছে। মাধবীদি আপত্তি করলেন। কিন্তু, সে আপত্তি ভদ্রতা মাত্র। তাঁর তনুভূতি তাঁকে বলে দিতে চাইছিল : রঞ্জনা আর তোমার ছাত্রী নয়।

তিনি ভয় করছেন আমাকে! যার জীবন তিনি গড়ে তুলেছেন নিজের হাতে, যাঁর জীবন তাঁরি দান, তাকেও তাঁর ভয়! মাধবী মিত্রের এত বড় পরাজয় তাঁর ছাত্রী তো দেখতে পারবে না।

শিল্পীর পরদা-ঘেরা ঘরের দিকে তাকালাম। সে আমার ঘৃণার্হ—তবু একবার যাবার আগে তাকে দেখে যাই।

আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে মাধবীদি জানালেন, 'নীলাঞ্জন ভোরে উঠেই শিকারে গেছে পাশের গ্রামে। ঘোড়া চড়ে গেছে, ফিরবে বিকাল বেলার মধ্যেই। ঝড়-বৃষ্টি দেখে নিষেধ করেছিলাম, শোনেনি। আগেই ঠিক ছিল কিনা। তুমি চলে যাবে জানলে ওকে ধরে রাখতাম।"

কিন্তু, আমার চলে যাওয়া কি অতই সহজ? স্টেশন থেকে ফিরতে হল। ঝড়-বৃষ্টি গাড়ীকে লাইনচ্যুত করেছে।

সেই প্রবল ঝড় মানুষের আর্তনাদের মত ঘরের-চালে আঘাত করতে লাগল। যেন সে আরব্য কাহিনীর জীন, মুক্তি চায়। সেই বৃষ্টি সারা পৃথিবীতে আবার প্রলয় ডেকে আনল। প্রলয়-পয়োধি-জলে কোন্ কেশব তাকে ধারণ করবেন?

সন্ধ্যার পরে বিছানায় চলে গেলাম। মাধবীদি আলো নিয়ে প্রতীক্ষায় রইলেন। অশ্বের ক্ষুরের শব্দ কই শোনা তো যায় না? সে ঝড়-বৃষ্টিতে বাধা পেয়েছে, মাধবীর তবু পথ চাওয়ার শেষ নেই।

মনে ভাবলাম : সস্তা নাটকের সস্তা নায়ক শিকারে গেছে ঘোড়ায় চেপে—সবটাই নাটুকে-পণা। সুলভ পরিচিত কোন নাটকের ছক। শিল্পী প্রেমের ভান করে জমি তৈরী রেখেছে। আদিম হী-ম্যানের বেশে পুরুষ এবার গ্রহণ করবে নারীকে। শিকারী বাইরে সারাদিন থাকবে, তার মনের ভাব গোপন থাকবে মাধবীর কাছে। রক্তমাখা হাতে জীব-হত্যার শেষে সে ফিরে আসবে অন্য শিকারের সন্ধানে। কল্কি-অবতারের মত ঘোড়ায় চেপে সে আসছে ধ্বংসের আশায়।

সে আসছে, তার ঘোড়া এগিয়ে আসছে ঝড়-বৃষ্টি বিদীর্ণ করে। পৃথিবীর বুকের মধ্যে বিদ্ধ আছে যে নিষিদ্ধ অপবিত্র পাপের মোহ, পাকা ফলের মত দুহাতে তুলে আনছে সে। ইভ, এবার আদমই তোমাকে লোভ দেখাবে। ওই ফলের স্বাদে স্বর্গ থেকে নির্বাসন, তবুও কি লোভনীয়!

পৃথিবীর চেয়েও পুরনো পাপের উত্তরাধি-কার। সে আসছে—আমার দরজায় সে কাল-পুরুষ আসছে। ওই বুঝি অশ্বক্ষুর ধ্বনি শোনা যায়!

আদিম পাপের মত আদিম সাহারা বালির সোনায় ক্ষুরের দাগ, ক্লান্ত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি মরুভূমির খিস্র-লু-এর বাতাসে। যে রুক্ষ-কর্কশ খেজুর গাছে ফলেছিল, সেওতো শুকিয়ে গেছে। সাহারায় পিপাসা পায়ে পায়ে হাঁটে—আগুনজ্বলা, হাঁফধরা বাতাসে চোখে মরুজ্বালা; কণ্ঠে মরু-তৃষ্ণা। জ্বলন্ত মরুভূমি—সেখানে মানুষের পাপ চলে আসছে উল্কার বেগে। ঘোড়ার পায়ে আগুনের চকমকি, বালুতে—নালে।

আমার মূর্তির নাম আজ বলে দেবে.—'রিক্তা' একমাত্র নাম হতে পারে। হারিয়ে গেলাম মানুষের ওপরে বিশ্বাসকে। মাধবীর বিচার আমি করব না। তাঁর কোন পাপ আমার বিচার-যোগ্য নয়। কিন্তু, নিজেকে কি করে ক্ষমা করব? না-জানা অপরাধও তো পাপ।

সাহারা পেরিয়ে উঠল কলির ঝড়, আর জলের আভাস নেই সে ঝড়ে, সে শুকিয়ে বালি হয়ে গেছে। তার মধ্যে বাতাসের আর্তনাদ, হু-হু করে আসছে ঘোড়া। চক্রধারী পুরুষোত্তম তুমি আমাকে বাঁচাও।

সমগ্র মরুভূমি ঢেকে গেল জলে। প্রলয়-পয়োধি-জলে কেশব দেখা দিলেন সাহারা মরুতে। ঘোড়ার ক্ষুর ডুবে গেল।

সারারাত্রির বিনিদ্রা মাধবীর কাছে এল প্রিয়ের জুতোজোড়া শুধু। অন্ধকার সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটে আসছিল বর্ষার জল কেটে। চোরা-পাঁক গিলে খেয়ে ফেলেছে ঘোড়া আর ঘোড়-সওয়ারকে। নরম পাঁক, তলায় তার রাক্ষস স্রোত হাঁ করে লুকিয়ে থাকে। যে মাটিতে মূর্তি গড়ে নীলাঞ্জন খেলা করেছে এতদিন, সে মাটি শেষ মুহূর্তে তাকে আশ্রয় দিল না। অন্ধকারের রাজ্যে সমস্ত ডুবে গেল।

ফিরে এলাম। মাধবীদির কাছে তো আমি অবিশ্বাসী হইনি। আমার অপরাধে ছিল অজ্ঞানতার কুয়াশা। কেন নিজেকে ক্ষমা করব না?

কিন্তু সমস্ত মন মথিত করে সন্দেহ জাগে। সেদিন রাত্রে যে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে কান পেতে ছিলাম, সে চাওয়ার মধ্যে কি শুধু আশঙ্কা ছিল? যদি সে আসত, চিত্রিত অজগর, তাকে কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারতাম? সব জেনেও মাধবীদির কন্যাসমা ছাত্রী কি ঘৃণার বস্তুকে ঘৃণা করে সরিয়ে দিতে সক্ষম হত! পৃথিবীর ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছি—নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে বাঁচা চলেনা।

অনেক দূরের দেশে কোথায় সে আছে—পঙ্ক-সমুদ্র অর্ধ-প্রোথিত হয়ে, অর্ধ-নিমজ্জিত হয়ে কর্দম-মিশ্র জল স্রোতে? গভীর রাত্রে আমার সুপ্তির কানে ধাতব স্বরের অমানুষী ভাষণ শুনি, তীব্র হাসি দেখি। সে বলে : সত্যই কি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতে তুমি?

প্রায় সমাপ্ত মাটির মূর্তি সেখানেই পড়ে আছে, পড়ে আছে সেখানে আমার জীবনের সব-চেয়ে দুঃখ—ঘৃণার্হকে ভালবাসার বেদনা, ভাল-বাসার পাত্রীকে ঘৃণা করার বেদনা।

জীবন, আর তো আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। তুমি বড় ভয়ংকর, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

"এই চড়া বাজারের বছর কটা কেমন ক'রে কাটালে ন্যাঙাত, সেই সব বিত্তান্ত কও।"

"চড়া বাজার আর বুঝলাম কোথা?"

"কি বল, ন্যাঙাত?"

"হাঁ, সত্যি কথা, এই তো জেল থেকে বেরুচ্ছি এত দিন পরে।"

হিম

(৬২ পৃষ্ঠার পর)

এলা কবিত্ব করে উত্তর দিলো, কারণ না চেয়ো ম সব কিছু পেতে জানো বলে।

আশ্চর্য, আমার মনের কথা ও ঠিক ধরতে রেছে। এই কথাটা এলা এত সহজে বলতে রবে আমি ভাবিনি। আমি তো এমনি কথা র মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। আর তার না, আমি যতদিন বিলেত ছিলাম ততদিন জেকে প্রস্তুত করে এসেছি। চেয়ে নয়, ভিক্ষে র নয়, জোর করে আদায় করে নয়—না চেয়ো করে সব কিছু পেতে হয় সে-মন্ত্র আমি যে শেখছি ওয়াটসন দম্পতির কাছ থেকে।

বস্তুত, বাংলাদেশের স্বামী-স্ত্রীরা কি পায়, তটুকু পায়, ক'জনই বা শান্তিতে বাস করে! পায় নেই বলে, অসহ্য প্রতিকূল পরিবেশে ধু কোনোরকমে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে সারা-ীবন গুমরে গুমরে জ্বলে। স্ত্রী যন্ত্রের মতো খ বুজে সংসারের কর্তব্য পালন করে, স্বামীর নের খবর রাখবার প্রবৃত্তি থাকে না। আর ামী তো তার বাইরের পৃথিবী নিয়ে এত বেশি স্ত যে স্ত্রীর বিশেষ সত্তার কথা তার খেয়াল রাখার কথা নয়—থাকেও না। দুই পক্ষ কেই শুধু কর্তব্য পালন—চোখে ঠুলি বেঁধে াধরা গন্ডীতে দিনের পর দিন নিদারুণ িতে সম্পন্ন করে শুধু ঘুরে ফেরা!

আমাকে ভাবতে দেখে এলা বললো, কি বছো?

তোমার কথা ভাবছিলাম এলা, আমি হেসে লাম, তোমার মতো স্ত্রী যদি বাংলাদেশের র ঘরে হতো তাহলে বাঙালী স্বামীরা সারের অনেক অশান্তি ঘটিয়ে বাইরের জীবনে িত খোঁজবার চেষ্টা করতো না।

আমার তো বাহাদুরীর কিছু নেই গো, মার মতো স্বামী পেয়েছি বলেই তো মি যে এমন হতে পেরেছি, একটু গম্ভীর হয়ে লা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমিই মাকে এমন করে তুলেছো। আমি তো আগে ক এমন ছিলাম না।

আমি কোনো কথা বললাম না। লক্ষ লোয়ারের মতো সমুদ্রের জ্বলন্ত ঢেউগুলি ন মনে গোনবার চেষ্টা করছিলাম।

হঠাৎ এক সময় বললাম, এমন কিই বা আমি মার জন্যে করেছি, এ তো সব স্বামীরা করে কে।

এলা হাসলো, আমি স্বীকার করছি, অনেক ামী হয়তো তোমার চেয়ে বেশি কর্তব্য পালন রে কিন্তু স্ত্রীর মনের সন্ধান রাখবার প্রয়োজন ন করে না, রাখেও না, একটু থেমে এলা লো, তুমি আমার কাছে মুখ ফুটে কোনোদিনও ছু চাওনি তাই কেবলই তোমাকে আমার সব ছু দিতে ইচ্ছে করে। কারণ তুমি আশ্চর্যভাবে মার সত্তা বাঁচিয়ে রেখেছো।

এসব কথা আমি জানি। তবু এলার মুখ কে আর একবার নিজের প্রশংসা শোনবার াভ দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, মার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না এলা, আরও ষ্ট করে বলে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

এলা হেসে বললো, অন্য স্বামীরা কি করে? ঠুরের মতো তারা স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু আদায় করে, তারা বোঝে না পেতে গেলে দিতেও হয়। আমার কত বন্ধুকে দেখেছি নিজেদের সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়ে বাধ্য হয়ে তারা শুধু স্বামীর সেবা করে, সংসারের কঠিন কর্তব্য পালন করে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সে তো তুমিও কর এলা।

করি। কিন্তু জানি, না করলেও তুমি একটি কথাও বলবে না, তুমি নিজেই হয়তো সব করে নেবে। আমি বুঝতে পারি তুমি শুধু আমাকে দিতে চাও কিন্তু কিছুই নিতে চাও না। তাই তোমাকে সব সময় সব দেবার জন্যে আমি সব সময় প্রস্তুত। তোমার সেবা, সংসারের কাজ—এসবে আমার কখনও ক্লান্তি হয় না। তুমি যেন প্রতিদিন আমাকে দিয়ে ফুল ফুটিয়ে নাও!

আস্তে আস্তে শুধু বললাম, এলা, তুমি সত্যি মনে-প্রাণে কবি। কী সুন্দর তোমার কথাবার্তা!

মুখে একথা বললেও আমি তো জানতাম ওয়াটসন দম্পতি আমার জীবনে কী প্রচন্ড পরিবর্তন এনেছে। কত সহজ সরল করে জীবনকে দেখতে শিখিয়েছে। শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে মানুষের সত্তাকে। যদি আমি এলাকে বিয়ে না করতাম, যদি আমার স্ত্রী কবি না হতো, তাহলেও কিছু আসতো যেতো না; আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে কোনো মেয়ে আমাকে ঠিক এমনি কথা বলতো। যদি তার কোনো সত্তা না থাকতো তাহলেও আমি জানি আমি তা সৃষ্টি করতে পারতাম। তবু স্বীকার না করে পারি না, কি জানি কেন, এসব কথা শুনলে আমার কেবলই মনে হয়, এ আমার জন্যে নয়, সমস্ত প্রশংসা ষ্টিভেন্স আর মিরিয়মের প্রাপ্য।

আবার আমি তাদের দেখতে পাবো!

বাড়ি খুঁজে পেতে খুব বেশি দেরি হলো না। ক্রয়ডন আমার চেনা পাড়া। আগে এদিকে আমি কিছুদিন থেকে গেছি। যথা সময় আমি কলিংবেল বাজালাম।

ষ্টিভেন্স আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো। ঘণ্টা বাজবার সংগে সংগে অধীর আগ্রহে দরজা খুলে আমার সংগে এলাকে দেখে একটু অবাক হলো যেন।

কিন্তু সে একমুহূর্তের জন্যে। তারপর দুই হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে বললো, এসো এসো! পাঁচ বছরের মধ্যে একটা চিঠি লিখলে না, হঠাৎ একেবারে সশরীরে এসে হাজির হলে! সাধে কি আর আমরা বলাবলি করি যে, ভারতীয়রা ভোজবাজি জানে—

আমি হেসে বললাম, আমার স্ত্রীর সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দিই, এই যে, এর নাম এলা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। এসো ভেতরে এসো। তোমরা বোসো আমি মিসেস ওয়াটসনকে ডেকে আনি—আমাকে আর এলাকে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে ষ্টিভেন্স ভেতরে গেল।

একটু পরে ষ্টিভেন্স মিসেস ওয়াটসনকে নিয়ে ফিরে এসে এলাকে বললো, এই যে, মিসেস ওয়াটসন—

এলা উঠে দাঁড়িয়েছিলো, তোমাদের কথা, আমার স্বামীর মুখ থেকে এত শুনেছি, বহুদিন থেকে আমার তোমাকে দেখবার প্রবল ইচ্ছে ছিলো—

ও, হেসে মিসেস ওয়াটসন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার স্ত্রীর সংগে আমার স্বামীর আলাপ নেই?

কথার উত্তর দেবো কি, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি কার সংগে কথা বলছি, ষ্টিভেন্সের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে কে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রশ্ন করছে। এতো আমার চেনা সেই মিরিয়ম নয়।

বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে থেমে থেমে ষ্টিভেন্স বললো, কতদিন তোমার সংগে যে দেখা নেই ও একবার ওপরে তাকালো, তুমি যাবার পর আমার সংসারে একটু পরিবর্তন হয়—সে কি বলবে বুঝতে পেরে নিদারুণ অস্বস্তিতে আমার মন ভরে উঠলো। বুঝলাম, ডাইভোর্সের ইতিহাস শুনতে হবে। তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি প্রসংগ পরিবর্তন করলাম।

যথাসময়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলার সংগে বাইরে এলাম।

কাল সারারাত ধরে বোধ হয় হিম পড়েছিলো। সেই হিম বিন্দুগুলি জড়ো হয়ে জমা হয়েছে গাছের মাথায়, বাড়ির গেটের ওপর, এপাশে ওপাশে। অল্প রোদে চিকচিক করছে কাল রাতের ঝরা পড়া হিম। তাই দেখতে দেখতে আমি মিরিয়মের কথা ভাবছিলাম। তার ওপর শুধু এমনি হিম ঝড়ে পড়েছে—সময়ের হিম।

এখানে ভোরের দুয়ারে দুয়ারে
ভীরু-পাখীদের ভীড়
অসাড় প্রাঙ্গণে গান গেয়ে গেয়ে
বৃষ্টি-গন্ধ ওড়ে,
এখানে স্বপ্ন-রেখার শিয়রে সুরের শুভ্র-মীড়
সাগরের জলছবি আঁকে চোখে নির্জন বালুচরে।

কুয়াশা-কফিনে ঢাকা কালো-মেঘ তৃষ্ণার রোদ্দুরে
ঝলকায় নীচে দিগ্বলয়ের ওপিঠে ধূসর মাঠে,
শিহরণ আনে অচেনা-হৃদয় অচেনা-আকাশ ঘুরে
তারাদের ফুল-ঘরে সারাদিন
তবু তার ছায়া হাটে।

দুপুরে এখানে ঘন-নিবন্ধ পাইন পাতার ফাঁকে
অবসাদ আনে উদাসীন ঘুঘু রঙ্-ময়ূরের মনে,
সাদা কাশফুল বিহ্বলতাকে
হাতছানি দিয়ে ডাকে
রূপকথা এসে শরীর ছোঁওয়ায় সান্দ্র-সম্ভাষণে।

সন্ধ্যা এখানে আবছায়া
ম্লান জ্যোস্নায় স্নান করে
নেমে আসে ধীরে সিক্ত-বসনে চোখে তন্দ্রাচ্ছ ঘ্রাণ,
সাগরের তলে মুক্তোর মত সব কাজ থাকে পড়ে
অঞ্জলি ভরে পান করি তার হৃদয়ের যত গান।

কবর-পুত্র

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

পরদিন বুড়ীর জন্য অপেক্ষা করলাম, বুড়ী কিন্তু এলেন না। কল্যাণও বুড়ীর জন্য অপেক্ষা করে শেষে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল মিস্ কলিন্সকে দেখতে। ভেবেছিলাম কল্যাণকে দিয়েই নিমন্ত্রণটা সেরে আসব। কিন্তু গিয়ে শুনলাম বুড়ী গত রাত্রিতে বাড়ী ফিরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, প্রায় বার ঘণ্টা কেটে গিয়েছে এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।

মিশনের সাহেব ডাক্তার দেখছিলেন। নার্সও এসেছিল। আমি আর কবিরাজী ওষুধ দেবার সাহস পেলাম না। সুযোগও হোল না। বেলা এগারটা নাগাদ মিস্ কলিন্স মারা যান।

কালো মেম যাকে প্রথমদিন টাইপ করতে দেখেছিলাম—মিস্ কলিন্সের হাউসকিপার—মিসেস ভিসুজা আমার হাতে একটি খামে ভরা চিঠি দিলেন। চিঠিটা লিখতে লিখতেই নাকি মিস্ কলিন্স অজ্ঞান হয়ে পড়েন, আর জ্ঞান হয়নি। তৃতীয় ছত্রটি শেষ করতে না করতেই চেয়ার থেকে ঢলে পড়েন মেজের উপর। কার্পেট ছিল বলেই রক্তপাত হয়নি।

পত্রটির সব অক্ষরগুলো ঠিক ঠিক স্মরণ নেই, যতদূর মনে পড়ে মিস্ কলিন্স লিখেছিলেন—বিশ্বনাথ, আমি চললাম। পরম কারুণিক ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। যদি তুমি গোঁড়া হিন্দু না হোতে তাহলে বলতাম আমার মৃত্যুর পর আমার কবরে মাটি দিও; তোমার হাতের মাটি—

আর লিখতে পারেন নি, সইও করে যেতে পারেন নি চিঠিটায়।

—তারপর ?

—তারপর, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ?...... হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর বুড়ীর কবরে মাটি দিলাম।

—মাটি দিলেন !

—হ্যাঁ, মাটি দিলাম, কিন্তু এই মাটি দেওয়ার জন্য আমাকে মূল্য দিতে হোল অনেক, মূল্য পেলামও প্রচুর।

—কি রকম ? বিল্টুদা পুনরায় প্রশ্ন করেন।

—শ্বশুর শাশুড়ী, জ্ঞাতি গোষ্ঠী যাঁরা তখন কলকাতায় ছিলেন তাঁদের কাছে গেলাম অনুমতি নিতে। কেউই অনুমতি দিলেন না। খৃষ্টানের মৃতদেহ স্পর্শ করব, কবরে গিয়ে মাটি দেব—তাহলে আর খৃষ্টান হোতে বাকী কি রইল ? এমন কি আমার স্ত্রীও সবাইএর অমতে অসামাজিক কাজে উৎসাহ দিতে সাহসী হলেন না। তবে তিনি মুখ ফুটে বারণও করলেন নি, নাও বললেন নি। বুঝলাম হৃদয় চাইছে যা, বুদ্ধির বিচারে তার সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না। শুধু ম্লানমুখে একবার বলেছিলেন, আহা, এমন ভালবাসা গর্ভধারিণী মায়ের কাছেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম সমাজের অমতে কাজ করব না। মেয়ে হয়েছে দুটি, বিয়ে দিতে হবে তো সমাজের মধ্যেই। সমাজপতিদের চটানো উচিত নয়। আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ যে কি গোঁড়া ছিল কিছুদিন আগে তা' তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। জানতো পিরালী ব্রাহ্মণের ইতিহাস। মুসলমানী খাবারের ঘ্রাণ নাকে গিয়েছে এই অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ। আমাদের সমাজের গোঁড়ামী প্রায় সেই কালের গোঁড়ামীর পর্যায়ভুক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না নিজেকে ঠিক রাখতে। যতই শবানুগমনের সময় নিকট হয়ে আসে, আমার মন ছটফট করতে থাকে। মনে হয় কোন অশরীরী আত্মা যেন আমাকে ডাকছে বহুদূর থেকে। আমার হাতের ছোঁয়া মাটির এত দাম ! সন্তানস্নেহ বঞ্চিতা যবনী নারী কখন যে অলক্ষ্যে আমার সমস্ত সংস্কারকে ছাপিয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, মানসসরোবরের সে তরঙ্গবিক্ষোভের কাহিনী তোমাদের আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। মহাকালী মহামায়ার ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখি। কোথায় মহামায়া ? এ যে মিস্ কলিন্সের মুখ ! গর্ভধারিণী মায়ের কথা মনে নেই। আমার শৈশব অবস্থায় তিনি মারা যান। পাড়াগাঁয়ের লোক, মায়ের একটা ফটোও ছিল না যে বড় হয়ে মায়ের মুখ স্মরণ করতে পারব। এই অভাব আজ আর নেই। তাই মহাকালীর ছবির পাশে মেমসাহেবের ছবি টানিয়ে রেখেছি।

কবিরাজদার গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে। সবাইএর মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন, মনে মনে সংশয় জাগে যেন, কাঁধের চাদরটায় একবার হাত দিয়ে দেখেন ঠিক জায়গায় আছে কিনা, তারপর বলেন—

শুধু মাটি দিই নি, মোরণিং-ড্রেসও যোগাড় করেছিলাম রেভারেন্ড ব্যানার্জীর সাহায্যে।

কবিরাজদা চাদরটাকে দু'কাঁধের উপর ভালভাবে বুলিয়ে উঠে দাঁড়ান, দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এসে বলেন, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। তোমাদের বলেছিলাম না, জ্ঞাতিগোষ্ঠী সব আমাকে ত্যাগ করলেন; আমার সংসার অচল, বাড়ীভাড়া বাকী পড়েছে প্রায় চার মাসের, মুদীর তাগাদায় অস্থির, কবিরাজী ছেড়ে পণ্ডিতী করতে ফিরে যাব কিনা পুনরায় গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি, এমন সময় মিস্ কলিন্সের এটর্ণি অফিস থেকে চিঠি এল, জানলাম বুড়ী তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে প্রায় দশ হাজার টাকা, দেরাদুনে একটি বাংলো, আর জুটমিল ও চা-বাগানের শেয়ার—তাও মূল্যে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা হবে—সবই আমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন।

বিল্টুদা লাফিয়ে উঠে বলেন—এ্যাঁ, বলেন কি, এ যে ভারবা উপন্যাস !

অবিনাশবাবু টিপ্পুনি করেন—তাহলে বলুন আগে আপনার বুড়ীর সম্পত্তি পাওয়ার আশাও ছিল, তাই সংস্কারকে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছিলেন ?

কবিরাজদা মৃদু হেসে বলেন—না হে না, তোমরা সাহেবকারের গোঁড়া হিন্দুকে ভুলে যেতে বসেছো বলেই একথা বলছ। আমারি পূর্বপুরুষ স্বয়ং বশিষ্ঠমুনি বহু রাজা মহারাজা, সম্রাটের দেওয়া উপহার অবলীলাক্রমে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমাদের তো আর সে ব্রহ্মতেজ নেই। ঘোর কলিকাল, চারিদিকে অভাব, অনটন, আর অর্থলালসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, উত্তাপ এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। তবু, তোমাদের বলছি, আমার মায়ের

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কে যেন আমাকে ডাকে;

বারংবার তার পিছু ঘুরে

সর্পিল সময় কাটে, ঊর্ধ্বশ্বাস একটানা বুকে

কাটে রাত্রি কাটে দিন, হৃদয়ের অন্তর্দেশ জুড়ে

রোমাঞ্চিত উজ্জীবন, মনে হয় আড়ালে কৌতুকে

কে যেন সুস্মিত হাসে, অন্যদিকে সুস্থ প্রগতিক

দুর্বার যাত্রায় ভাসি, খুঁজে যায় নিশ্চিত আশ্বাস

সংসারের নানা মোড়ে, রক্তে জ্বলে আদিম নির্ভীক

প্রমত্ত উদ্দাম আশা, অরাজক চরাচরে

শুধু দীর্ঘশ্বাস।

ভগ্ন তরী, ছেঁড়া পাল; পণ্ডশ্রমে শ্রান্ত নভোদর

পদে-পদে আসে বাধা, তিক্ত দীর্ঘ গ্রীষ্মবর্ষা দিন

অতিক্রম ক'রে সেই যৌবসেনা পিপাসাকাতর,

কে যেন সহসা ডাকে, উচ্ছ্বসিত লীলায় রঙীন।

জীবনের শুষ্ক মাঠে মাঝে-মাঝে তার আনাগোনা,

আজো তাই বাঁচে প্রাণ, পূর্ণ হয়

নির্বাক কামনা॥

আশীর্বাদে লোভকে আমি অতি কষ্টে দমন করতে পেরেছিলাম। বুড়ীর কোন টাকাই আমি স্পর্শ করিনি। যবনী-মাতার স্নেহ গ্রহণে আমার ধর্ম নষ্ট হয়নি, কিন্তু সম্পত্তি গ্রহণ করলে আমিই নষ্ট হোতাম। যে মাকে শৈশবে হারিয়ে আবার জীবনের মধ্যভাগে ফিরে পেয়েছি তার মর্যাদা কি করে ক্ষুণ্ন করি ? বুড়ীর সমস্ত সম্পত্তিই আমি মিশনের হাতে তুলে দিয়েছি। দেরাদুনের বাড়ী এখন অনাথ আশ্রম, যাকে তোমরা ইংরেজীতে বল অর্ফ্যানেজ।

—তাহলে আপনার অবস্থা ফিরল কি করে ? অবিনাশবাবু অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করেন।

—ঐ যে বললাম, ঐ দুই ছবিই আমার পয়া, তাইতো টানিয়ে রেখেছি পাশাপাশি। সেদিন টানালাম পাশাপাশি তারপর দিন থেকে একটু একটু করে পসার বেড়ে চললো। অর্থকষ্টে আর পড়তে হয় নি কোনদিন। তোমরা সব আধুনিক জগতের বিজ্ঞানভক্ত লোক, এসব কথায় তোমাদের বিশ্বাস হবে না। আমরা সেকেলে লোক, তোমাদের মতন ইংরেজি বুলি জানি না, কিন্তু মহামায়ার আশীর্বাদে বিশ্বাস রাখি।

কবিরাজদার চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা মন্দ নয় আজকাল। শহরে নিজস্ব বাড়ী, গাড়ী ও টেলিফোন আছে। কবিরাজদার স্থানত্যাগের পর রমেশ আচার্যি ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—বোগাস্, স্রেফ ধাপ্পা, সম্পত্তি পেয়ে কেউ ছাড়ে না—শুনেছ কোনদিন ?

আমি খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি। বৃষ্টি ঝরে গিয়েছে। আকাশে আর মেঘ নেই। ফুটপাতের উপর দিয়ে অগণিত জনস্রোত। আনমনে ভাবি, পৃথিবীটা কি বিরাট ! —কিন্তু আকাশের তুলনায় ছোট, অনেক ছোট, অনেক অনেক ছোট—নয় কি ?

বিনোদ লাট

(৫২ পাতার পর)

।বারে বন্ঝেছে বিনোদ। রাজপন্তানা স্বর্ণপ্রতিমা নিয়ে ঘরে আটকাচ্ছে, সেই টার ভাগ্যে ঈর্ষ্যাও হয় বন্ঝি একটন্।

য় এসে চা ইত্যাদি দিয়ে গেল। চা চালতে অনন্রাধা আন্তরিক সমবেদনায় দেশের কি গতিক হল, তাই ভাবছি। এত পড়া করেও বাড়ী-ভাড়া আদায়ের কাজ—যা গোমন্খন্য দরোয়ান কি সরকার দিয়ে ন্দ চলে। আপনি তবন্ পেয়েছেন—থা বলে আমার বান্ধবী আছে, তার এম-এ ভাই বলছিল, কর্পোরেশনে রাস্তা ঝাট কাজ পেলেও রাজি আছি। কিন্তু এম-এ করেছি, সেই অপরাধে তা-ও দেবে না।

ক্ষত্রবিশেষে সমবেদনাও গালাগালির চেয়ে স্বগর্ব ভঙ্গিতে বিনোদ বলে, বাড়ী-ভাড়া আদায় না করে স্বচ্ছন্দে দরোয়ান করাতে পারি। চাকরির একটা গালভরা চান, তা-ও আছে—অফিস-সন্পারি-ডন্ট। কিন্তু নামে পেট ভরে না। ভাল মন্দ বলন্ন, ভাড়া আদায়ের কাজ স্বহস্তে হবে আমায়—

স্যান্ডউইচ কামড়ে নিয়ে মৌজ করে চিবাচ্ছে ত বলে, জজের চেয়ে জজের পেস্কারের র্ন বেশি, তা জানেন? জজের বাঁধা —আর যে মামলাই উঠন্ক, পেস্কার দের হাতে দন্টো টাকা গন্ঁজে না দিয়ে বাদী-নী কারো পরিত্রাণ নেই। জজ হাকিম পেস্কার হয়ে বসেন না—সে হল সৎ দের অভাব। আমার সেটা আছে। রেন্টকালেক্টর মাইনে তো কুল্লে একশ—কা গোমলা আর বাড়ী-ভাড়ায় খতম হয়ে আসল রোজগার এদিকে-সেদিকে। এ সব কথাবার্তা শন্নেছেন হোটেল-জারের সঙ্গে।

হেসে উঠে বলে, যাক গে, যাক গে। দন্টো হাসি করতে নেই। মনিবের লোক কেউ ফেলবে। ইনকাম-ট্যাক্সের চরও হতে পারে। আপনি একটা হিসেব ধরে না—দন্দ-বাড়ীভাড়ার একশ গেলে পেরতে আর কত লাগতে পারে? ভিন-ন্নে তো বটেই।

চোখ বড় বড় করে অনন্রাধা বলে, বলেন

ঠিক তো ই! অনন্রাধার দৃষ্টি অনন্সরণ করে র দিকে চেয়ে বলে, সাজসজ্জা দেখে স হচ্ছে না। কিন্তু এটা হল আমার সব পোষাক—অফিস থেকে ফেরা ছ কিনা! বাড়ীর পোষাক আলাদা। থেকে সাজ-গোজ করে যখন বেরোই, কি বলাবলি করে জানেন? বলে, লাট-—বিনোদ লাট।

অনন্রাধা বলে, অফিসে ময়লা ছেঁড়া সাজ আসতে হয় কেন?

য়তো চোখ টাটায় অন্য সকলের। র কাছে লাগানি-ভাঙানি করে, এত সাজ-র পয়সা পাচ্ছে কোথায়? কি বলব, টাও হয়েছে পাজির পা-ঝাড়া। যেন বীর যত ভাল জিনিষ ওদেরই জন্যে। দের ভোগে এক-আধটা এলে মহাভারত ধ হয়ে যায়।

চায়ের পরেও অনন্রাধা ছেড়ে দেবে না।

লেক দেখিনি আমি—

অনেক দন্র!

তা কি হয়েছে, চলনে না। দেখে আসি—

দেখবার কিছন্ নেই, খানিকটা জল। জলের ধারে এক-একখানা বেঞ্চি। শহরে-বাবন্রা ইটের খোপে থাকেন পোকার মতো—অবরে-সবরে বেরিয়ে লেকের ঐ ফাঁকা জায়গায় জলের দিকে চেয়ে আ-হা ও-হো করেন। খোলামেলার মানন্ষ আপনি, লেক দেখে কোন সন্খটা পাবেন?

তবে চলন্ন সিনেমায়। কাছাকাছি চলন্ন কোন ভাল জায়গায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে জিনিষপত্তোর নতুন সন্টকেসে ভরে সিনেমা-ম্যানেজারের কাছে জমা রেখে দেবো। বেশ হবে, চলন্ন—

ছাড়বে না আজ কিছন্তে। আঁকড়ে ধরে আছে—গায়ে যেন ঝন্লে ঝন্লে বেড়াচ্ছে! একটা-দন্টো দিনের জন্য এসে শহরের সমস্ত কিছন্ না দেখে ছাড়বে না। অথবা মনের অন্তর্বর্তী কোন ঘোরালো ব্যাপার নাকি?

হাসি তো রাগে গরগর করতে করতে ফিরে গেছে এতক্ষণে! রাগ ভাঙাতে এটা-সেটা বলতে হবে। তাই যখন, দন্'ঘণ্টার জায়গায় হোক না চার ঘণ্টা!

অন্ধকার হলে পাশাপাশি বসে ছবি দেখছে। ছবিটা ভালো—নায়িকার সখি, আমার ধরো-ধরো অবস্থা। আলগোছে অনন্রাধার হাত এসে পড়ে বিনোদের হাতের উপর। হাত অমনি পড়ে রইল—টের পায়নি বন্ঝি, দেখছে এত মগন হয়ে। মাথাটা কাত হয়ে পড়েছে বিনোদের দিকে—পাখার হাওয়ায় এলো চন্লের কয়েক গাছা উড়ে উড়ে পড়ছে। কোন মোহিনী একটা দিন কয়েকটা ঘণ্টার জন্য উড়ে এলো জীবনে। বিনোদের মন ছবিতে নেই—পক্ষীরাজে চেপে আকাশে বেড়াচ্ছে।

সিনেমা থেকে বেরিয়ে উৎফন্ল্ল কণ্ঠে অনন্রাধা বলে, বড় ভালো কাটল সন্ধ্যেটা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে, নটা বাজে যে! চলন্ন, চলন্ন—

বিনোদের ছ্যাঁৎ করে মনে পড়ে হিরণ্য যে এসে পড়বে এইবার। আসবে ঐ হোটেলে। ওখানে যাওয়া যায় না। অনন্রাধাকে নিয়ে মনিবের সামনে পড়ে যায় যদি।

হোটেলে চলন্ন—

ঘাড় নেড়ে বিনোদ বলে, আপনি একা চলে যান। বড্ড জরন্রী এক কাজ—দেরী করা চলবে না।

টাকা নেবেন না? সকালবেলা যাবেন তাহলে। নিশ্চয় যাবেন। আজকের মতন আনন্দ করে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

বিনোদ চিন্তার ভান করে বলে, সকালে অনেকগন্লো লোক আমার বাড়ী আসবেন। রবিবার কিনা!

ঠিকানা বলন্ন আপনার বাড়ীর। আমিই চলে যাবো। আমার বন্ধন্ সন্লেখার বিয়েয় এসেছি—পরশন্ দিন বিয়ে। কাল আমার কাজ নেই তেমন কিছন্।

চোর-জোচ্চোর বলে সন্দেহ করেছিল, এখন যে উল্টো ব্যাপার—তেড়ে গিয়ে টাকা শোধ করবে। তার টিনের বাড়ীতে তা বলে নিয়ে তোলা চলে না। বলে, এক কাজ করন্ন। লেক দেখবার এত ইচ্ছে—তিনটের সময় কাল সোজা চলে যাবেন সেখানে। ব্রিজের কাছে দাঁড়াবেন। আমি বড় লেক ছোট লেক দেখিয়ে বলেন তো চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে পারি ওখান থেকে।

একশ'খানি টাকা—হাতের লক্ষ্মী ঠেলে দেওয়া বন্দ্ধির কাজ হল কি? তা সে যা-ই হোক—লক্ষ টাকার লোভেও এ মেয়ের সঙ্গে হিরণ্যর সামনে পড়া চলবে না।

অতএব একা অনন্রাধা সামনে গিয়ে পড়ে। হিরণ্য সবে এসে নেমেছে, হোটেলের লোকজন জিনিষপত্র বয়ে কামরায় তুলছে। আশ্চর্য হয়ে হিরণ্য তাকিয়ে থাকে ক্ষণকাল। বলে, তুমি অনন্? আমি কলকাতা আসছি, তুমিও যে অন্দর থেকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে—এতখানি ভাবতে পারিনি।

অনন্রাধা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, নিজের গরজে এলাম—তোমার জন্যে নয়। এই দেখ, কত রকম সওদা করে ফেলেছি!

হিরণ্য বলে, পঞ্চাশ টাকার সওদার জন্যে দন্'শ টাকা খরচ দিয়ে ছেড়ে দিলেন মাসিমা?

শন্ধন্ সওদা নাকি? বিয়ে যে সন্লেখার! আমরা চেষ্টা-চরিত্র করে বিয়ে ঘটাচ্ছি, তাই আসতে হল।

হিরণ্য অনন্যোগের সন্রে বলে, আরও দন্টো প্রাণীর দণ্ড না অমনি ঘটিয়ে। বেচারিদের বড় কষ্ট। কোথায় জয়পন্র-কলকাতা, কোথায় জলপাইগন্ড়ি-কলকাতা—ছন্টোছন্টি করে নাজেহাল হচ্ছে। বাধা তো কিছন্ দেখিনে—একজনের কেবল চিত্ত পাবার উগ্র লোভ ছাড়া।

মন্খ টিপে হেসে অনন্রাধা বলে, ছিল না নাকি। কিন্তু সাধ্য বন্ঝি হয়ে দাঁড়ায়। আর এক প্রাণী মাঝে এসে পড়ে ভারী ভারী নিশ্বাস ফেলছে। আমার মায়া পড়ে যাচ্ছে।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হিরণ্য গর্জন করে ওঠে, কোন্ সে দন্র্জন?

অতিশয় সজ্জন। তারই সঙ্গে ছিলাম বিকেল থেকে। দেখতে চাও তো যেও আমার সঙ্গে কালকের অভিসারে লেকের ব্রিজে দোল খাওয়া। সেখান থেকে চিড়িয়াখানায়—

জামা-কাপড় দেখে লাটই আজ বলতে হবে বিনোদকে। সন্টকেস হাতে নিয়ে বেরন্চ্ছে—দোকান থেকে একজোড়া জন্তো কিনে নেবে। এই পোশাকের সঙ্গে তালি-মারা বস্তু পায়ে চলে না। আর ভাবছে, এক কোটো ক্রীম কিনে মন্খে মেখে দিলে কেমন হয়!

হাসিও দেখা দেন, তৈরি হয়ে পিছন্ নিয়েছে।

তুমি কোথায়?

কেন কী হবে না? কাল তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে এসেছি।

সময় নেই হাসি। অফিসের জরন্রী কাজ—

অফিস রবিবারে?

মনিব এসেছে কলকাতায়। এক নম্বর পাজি। কাল হয়তো নিজেই অফিসে হানা দেবে। খাতাপত্তোর লিখতে বাকি আছে, সেগন্লো সেরে রাখিগে।

হাসি ঘন ঘন তাকাচ্ছে। পোশাক একেবারেই অফিসের নয়, সন্দেহ পড়বার কথা। বিনোদ বলে, খাতার কাজ সেরে কাশীপন্রে হনন্মানপ্রসাদ-বাবন্র বাড়ী যাবো। ভাইপো বিয়ে করে এসেছে, একবার না গেলে ভাল দেখায় না।

একেবারে হনন্মানপ্রসাদ বলে দিল,—আত্মীয়-জন হচ্ছে জেরার্য তালে পড়তে হয়!

হয়তো বা বায়না ধরবে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।

হাসি বলে, কাপড়-চোপড় পরেছি যখন, দিদির বাড়ী ঘুরে আসি তবে। যাওয়া হয় না বলে দিদি বড় দুঃখ করেন।

কপাল বিনোদের—একটা কিছু মতলব করেছে, অমনি শতেক রকমের বাধা। হাসির বড় বোনের বাড়ীটা হলো লেক রোডে—লেকের ব্রিজ ওদের ছাত থেকে নজরে আসে। এখন করতে হবে কি—অনুরাধাকে ভুজুং-ভাজাং দিয়ে লেক থেকে শহরের অন্য প্রান্তে নিয়ে ফেলতে হবে। ধরো, পরেশনাথের বাগান। সেইখানে বেড়ানো।

নতুন জুতো পায়ে দিয়ে ক্রীম মেখে চকচকে হয়ে বাস থেকে নামছে—পিছন থেকে হাসি ডাকে, এই যে তুমি! খাতা লেখা, আর হনুমানপ্রসাদের হাঙ্গামা মিটে গেল এর মধ্যে?

ঢোক গিলে বিনোদ তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ রচনা করে, দরোয়ান বেটা অফিসের চাবি নিয়ে কোথায় ভেগে পড়েছে। হনুমানপ্রসাদের ঠিকানাটাও অফিসের লেজার বইতে! কোন কাজ হল না—

বিধাতা বিরূপ— লড়ালড়ি করে আর লাভ নেই। একশ'খানি টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় গেল বলে ঠেকছে। বেটা রসময় ভাল মনে দেয়নি।

ওদিকে হল না তো হাসিকেই আচ্ছা করে তোয়াজ করা যাক। বলে, কাজকর্ম কিছু হল না তো ভাবলাম, কালকের কেনাকাটাগুলো আজ করিগে। তুমি এদিকে এসেছ, তোমার খোঁজে খোঁজে চলে এলাম—

সর্বরক্ষে! তাকমতো খাসা-খাসা কথা জুটে যাচ্ছে।

হাসি বলে, আমি এসে শুনলাম, দিদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাদের কাছে যাচ্ছি।

এক ছোকরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বলে, ঐ যে ব্রিজের ওখানটা বেড়ান ওঁরা। বেশি গিয়ে থাকেন তো ব্রিজ পার হয়ে আমগাছের তলায়।

একগোছা রজনীগন্ধা নিয়ে এসেছে বিনোদ। গোড়ায় ঢাকবার তালে ছিল, নিরুপায় হয়ে এবারে মেলে ধরল।

হাসি বলে, ফুল কার জন্যে?

কার বলে মনে হয় তোমার?

মুচকি হেসে হাসি বলে, ফুল কিনে পয়সার অপব্যয় করো কেন?

শুধু একটা দিন হাসি। বিকেলে লেক-অঞ্চলে আসাও এই একটা দিনের। পুরানো ছেঁড়া জুতো বেমানান লাগছিল বলে তাও এই বদলে এনেছি—

হাসির দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, সেই এককালের নতুন বর হয়ে এসেছি—না?

হাসি গলে গিয়ে বলে, দুজনে দিদির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বড্ড খুসী হবেন তিনি। বিয়ের পরেই সেই যেমন এসেছিলাম। পিছিয়ে পড়ছ কেন তুমি? এসো—

বিনোদের হাত ধরেছে। ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধমকের সুরে বিনোদ বলে, যেতে হয়—একলা তুমি যাও। আমি চললাম—

হাসির মুখে ছাই মেরে দিয়েছে যেন। সামলে নিয়ে সুর বদলে তাড়াতাড়ি বিনোদ বলে, আরে দূর! এই বেশে যাওয়া যায় নাকি দিদির কাছে?

বেশটা খারাপ হল কিসে?

খারাপ হবে কেন. বড্ড বেশী ভালো।

স্কেচ — দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের মতন অবস্থার লোকের এমন সাজ-গোজে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে না? তার চেয়ে শহরের ওপাড়ায়—পরেশনাথের বাগানে যাই চলো। যেখানে কেউ চেনে না আমাদের।

দোতলা বাসে উঠে পাশাপাশি দুজনে বসেছে। ব্রিজ নজরে আসছে—দুলছেও যেন ব্রিজটা। বিনোদ সন্তর্পণে একটা নিশ্বাস চেপে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে আর হাসি। আজকে নতুন লাগে হাসিকে। সেকালের হাসি ফিরে এসেছে।

বাড়ী ফিরছে, তখন বিনোদের একটুও আর ক্ষোভ নেই। একশ'টি টাকার কি গতি দাঁড়াবে—শুধু এই ভাবনাটাই মাঝে মাঝে বিঁধছে কাঁটার মতো। যা থাকে কপালে, সকালবেলা চলে যাবে হোটেলে। রসময়ের ঘরে অনুরাধাকে ডাকিয়ে আনবে। টাকাটা পকেটে ফেলেই দে ছুট। হোটেলে পা দিলেই অমনি অনুরাধা আর সে যুগলে হিরণ্যের সামনে পড়বে, তার কি মানে আছে? পড়লেই বা কি? খাতক-মহাজন ছাড়া কোন্ সম্বন্ধ অনুরাধা আর তার মধ্যে?

রসময় বলল, এসেছ—খুব ভাল হয়েছে। তোমার কাছে লোক পাঠাচ্ছিলাম। হিরণ্যবাবুর জোর তলব।

বিনোদ হকচকিয়ে যায়। কেন? তাঁর হঠাৎ কি দরকার পড়ল?

মুখ কালো করে রসময় বলে, সেটা তাঁর কাছেই শুনো। ঘরে আছেন, যাও।

হিরণ্যর ঘরের দিকে চলল গুটিগুটি। রসময়ও দূরে দূরে যাচ্ছে।

হিরণ্য বোমার মতো ফেটে পড়ল, চুরিতে চুরিতে আমার এস্টেট ফাঁক করে দিচ্ছ। ভাড়াটে-দের সঙ্গে বখরা। মোটা টাকা খেয়ে কম ভাড়ায় ঘর দিয়ে দাও। ঘর খালি আছে দেখিয়ে ভাড়ার টাকা নিজে গাপ করো—

অভিযোগের তোড়ে বিনোদ খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারে না। শেষে বলে, মিথ্যে কথা স্যার। বেকারের দশদশা—তার মধ্যে আমি কোন রকমে দুটো শাকভাত খাচ্ছি, হিংসেয় তাই দশখানা করে আপনাকে লাগায়।

মিথ্যে? সাক্ষীপ্রমাণ না পেয়ে আমি বলিনে।

রসময়ের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারাই আগে হোক ম্যানেজারবাবু—

রসময় বলে, দুশো টাকা দালালি আপনার এই বাড়ী বন্দোবস্ত করে দেওয়ার দরুন। ভাড়ার মধ্যে আড়াইশো আপনার হিসাবে, এর হিসাবে দশ—

বিনোদ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, স্রেফ বানানো কথা। রসময় বলছিল ভাড়াটা দুশো'র মধ্যে করে দিতে। আমি বললাম, নুন খেয়ে হারামি করতে পারব না। সেই আক্রোশে স্যার—

অনুরাধা এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। রসময় সালিশ মানে, এই তো—এঁর সামনেই বিনোদ আমাকে তাগিদ দিচ্ছিল। বলুনে ইনি—

অনুরাধা আকাশ থেকে পড়ে, মনে পড়ছে না তো—

বলেন কি, আপনার সামনেই একটা এক শ' টাকার নোট দিলাম—

কখন?

অনুরাধা দাঁড়িয়ে আছে, এখনই সে সুলেখাদের বাড়ী চলে যাবে। মামলা অতএব খারিজ করে হিরণ্য দুপক্ষকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিল।

মনমরা হয়ে চলছে বিনোদ। মেয়েটা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে বাঁচাল, অবস্থা তবু তো সবই জেনে গিয়েছে।

চিলের মতো ছোঁ মারল কি যেন পিছন দিক থেকে। অনুরাধা ছুটে এসে হাত ধরেছে। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ হিরণ্যর যদি চোখে পড়ে যায়! হাতের মুঠোয় কি গুঁজে দিয়ে চক্ষের পলকে আবার পালিয়ে গেল।

বাইরে এসে সন্তর্পণে মুঠো খুলল। প্রেম-পত্র নয়, নোট। একশ' টাকার নোট— একখানা নয়, দু'খানা।

মমতা

(৪৭ পৃষ্ঠার পর)

তাদেরও কৌতূহল জাগায়। আমার ভয় বাড়ে। কে আবার বলে দেয় গিয়ে আমার মাকে।

ভিজে কাপড়টা বার বার লেপটে যাচ্ছে আমার গায়ে। চামড়া দেখা যায়। লোকেরা বুঝে ফেলবে—আমি জলে নেমেছিলাম।

নামলাম জমিতে। অপথে। পাটের গাছ কেটে নিয়েছে ছ'মাস আগে। তারপর বর্ষার জল এসেছে গিয়েছে। এখন ক্ষেত খটখটে। তবু রয়ে গেছে গাছের গোড়া উঁকি দিয়ে। হাঁটা চলে না ও-সবের উপর দিয়ে। আমার পায়ে ভীষণ লাগছে। কিন্তু রক্ষে, কেউ বুঝতে পারবে না আমি কি নিয়ে যাচ্ছি। আমার পাশ দিয়ে কেউ পথ চলছে না আর। সড়ক ছাড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ।

আমাদের বাড়ির পিছনে খাল। পাড়ে পুরনো মাদারগাছ। শিকড়ের গায়ে মাটি নেই। চ্যাপটা হয়ে নেমেছে বেশ উঁচু থেকে। সুন্দর এক একটি আড়াল তৈরি হয়েছে। বাচ্চাটাকে রাখলাম এখানে।

কাইকুঁই শুনে টমী ছুটে এলো। নাকে গন্ধ টানতে লাগলো বাচ্চার গা থেকে বারে বারে। হঠাৎ শুয়ে পড়লো গা ছেড়ে দিয়ে। বাচ্চার মুখ মায়ের বাঁটে লাগিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়লাম।

কান পাতলাম বাড়ির দিকে। মা আমাকে ডাকছেন কিনা। বাচ্চার কাইকুঁই বন্ধ হয়েছে তবু কেন মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছিনে। মা নিশ্চয় রেগেছেন খুব। মাদারগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি মায়ের ভয়ে।

মাঝখানে আরও কটা দিন গেলো কেটে। মায়ের আট বাঁটে আগে বাচ্চারা ফুটে থাকতো সাতভাই চম্পার মতো। এখন সবেধন নীলমণি এই একটি। টমীর শুকনো চামড়া আবার দুধে টুবুটুবু হয়েছে। এক বাচ্চাতে কত খাবে!

টমী-তো দেখতে কালো, আর এই বাচ্চা, যেন দুধের সর একতাল এমনি গোলগাল।

রঙিন কাপড়ের টুকরো দিয়ে ছোটো ছোটো বল আর খেলনা তৈরি করে দেন মা বাচ্চাকে। খেলনা পেয়ে কি খুশী সে। রান্নাঘরের বারান্দায় মায়ের কাছেই থেকে যায় দিনরাত।

রান্নার জন্য মা কাঠকুটো এনে রাখেন। বাচ্চা সেগুলো এলোমেলো করে। মা রেগে ওঠেন। ডাণ্ডা নিয়ে পটাঙ করে বসিয়ে দেন এক-আধ ঘা। কাঁই কাঁই শব্দ করে বাচ্চা কাঁদে। কিন্তু ছুটে পালায় না। মায়ের পায়ে গড়িয়ে পড়ে।

মা ডেকে বলেন,

দ্যাখ্, মেরেছি, তবু ছেড়ে পালায়নি।

বলি,

সারাদিন তুমি খাবার যোগাও লুকিয়ে লুকিয়ে। 'সেবায় দেবা বন্দী।' তোমার রান্নার গন্ধ ওকে অন্ধ করে বসিয়ে রাখে এক ঠাঁই।

শুধু সকাল-বিকেল দুবার ছেড়ে দিতে হয় বাচ্চাকে। নিজেই ছুটে যায় চোখের আড়ালে। একটু পরেই ফিরে আসে। এবার নির্দিষ্ট জায়গায় বাকি দিন।

মা বলেন,

যেমনি শেখাবে, তেমনি শিখবে।

পুকুরে নিয়ে যেতে হয় বাচ্চাকে রোজ এক-বার। বহুদূরে জলে বল ছুঁড়ে মারি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে নিয়ে আসে গিয়ে মুখে করে। ছোটো ছেলেরা ভিড় জমিয়ে হৈ চৈ করে। সেই ছেলেটাও আসে নিতাই যার নাম। আমার চোখে তার চোখ পড়তেই ছুটে পালায়। তার মনে পড়ে যায় কি একটা পুরনো কথা।

ঘুমিয়েছিলাম দুপুরবেলা। উঠে দেখি কোল খালি। বাচ্চাটাকে কাছে বসিয়ে খেলা দিচ্ছিলাম। কখন আমার চোখ লেগে গেছে। বাচ্চা পালিয়েছে। খালি হয়ে গেছে আমার মনের অনেকটা।

ছুটে গেলাম রান্নাঘরের বারান্দায়। সেখানেও শিকল খালি। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

বাচ্চা কোথায় গেল মা?

ঃ তোমার কাছে ছিল না?

খুঁজে খুঁজে হয়রান। এ-তো পালাবার ছেলে নয়। নিশ্চয় কেউ চুরি করেছে। সুন্দর জিনিসের উপর সংসারশুদ্ধ লোভ। কিন্তু কে এমন চোর? নিতাই?

হ্যাঁ, পটলির মাও গলাবাজি করেছিল এক-দিন। ওর শুকনো মাছরান্না খেয়ে ফেলেছিল নাকি বাচ্চা। আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি। যদি সত্যি হয়। ছুটে গেলাম পটলির মার বাড়ি।

ঘরের ত বেড়া বলতে নেই। চালে ছেঁড়া চাটাই, তালের পাতা, সুপারির বাগলা, কেলে-শুনার ঝাঁপাপ এখানে ওখানে। বাইরে থেকেই দেখা যায়, কালো হাঁড়িটা ঝুলছে ঘরের কড়ি থেকে ঝুলকালি শিকেয়। বেশ উঁচুতে। ওখানে বাচ্চা নাগাল পাবে? লাফ দিলে অসম্ভব নয়।

বমি আসছিল ঠেলে আমার গলায়। মুখ বন্ধ করে সামলে গেলাম। নাক টিপে ধরলাম দু'আঙুলে। ভিজে সাঁতসেঁতে। মাছের আঁশ তরকারির খোসা পচে পচে গন্ধ হয়েছে। কতকালের আবর্জনা জমেছে। ওরা বড় নোংরা। পরিষ্কার করে না কোনোকালে বুঝি।

চেঁচিয়ে উঠলো পটলির মা,

ছিঃ ছিঃ ছোটোবাবু! তুমি এই আঁস্তাকুড়ে দাঁড়িয়ে কেন?

বললাম,

আমাদের বাচ্চাটাকে দেখেছো?

হন হন করে ছুটে এলো ছোড়দা। ধরলো আমার ডানায়। মুগুরভাঁজা হাতে ওর ভীষণ জোর। একেবারে শূন্যে তুলে নিয়ে ধপাস করে ফেললো আমাদের উঠোনের মাঝখানে। মা চীৎকার ছাড়লেন,

এখানে কেন, পুকুরে নিয়ে যা। জলে চুবিয়ে আন জামা-কাপড় সমেত। কুত্তা খুঁজতে মরেছে গিয়ে বাগদিদের আঁস্তাকুড়ে। হাড় জ্বালিয়ে খেল এই ছেলে।

ছোড়দা বললো,

যত সব আহ্লাদে আটখানার দল। 'গলায় দড়ি দিলে কত হবে!' ছেড়ে-যে দিয়েছিলে এবার মর-গে খুঁজে খুঁজে যা!

মাটি আঁকড়ে থাকলাম আমি কচ্ছপের মতো। আমার হাত ছিঁড়ে যাবে তবু আমাকে পুকুরে নিয়ে যেতে পারবে না।

মা একটা নিশুন্দেগাছের ডাল নিয়ে এসে শপাং শপাং লাগালেন কয়েক ঘা। আমার পিঠের ছাল উঠে গেছে যেন। আমি মরে গেছি এমনি ভান করে পড়ে রইলাম হাত-পা ছেড়ে দিয়ে। গজ গজ করতে করতে মা কোথায় চলে গেলেন তাড়াতাড়ি হেঁটে। আবার ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গেই। লুটিয়ে পড়লেন আমার পাশে। কোলে তুলতে চাইলেন টেনে। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি।

বাবার পায়ের শব্দ কানে আসতেই ধড়মড় করে উঠলেন মা। ছুটলেন পুকুরে। আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

চান সেরে এসে মা ডাকলেন চুপি চুপি। গেলাম। ছিটিয়ে দিলেন তুলসী পাতার জল। একটা তুলসীপাতা আমার কপালে ঠেকিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বললেন, খেয়ে ফেলো।

দুপুর গড়িয়ে চলে বিকেলের দিকে। বোষ্টমী এসে হাঁক ছাড়ে,

হরিবোল হরিবোল।

চেনা গলা শুনে ছুটে বেরুলাম আমি। হ্যাঁ, ঠিক সেই। মাটিতে আঁকজোঁখ কেটে বলে দেয় কার গরু হারিয়েছে। কার ছেলে বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়েছে। চুপি চুপি ডেকে জিজ্ঞেস করলাম,

জানো আমাদের বাচ্চাটা কোথায় আছে?

ঃ নিয়ে এসো স' পাঁচ আনা পয়সা। আঁক কষে দেখি।

ঃ আগে কষো-না। পরে দেবো'খন।

ঃ আঁকের ঘরে পয়সা বসাতে হবে-যে।

মা ঘুমুচ্ছেন। ডাকলে রেগে যাবেন। আশে-পাশে ঘুরলাম। কোনো সাড়া নেই। ডাকলাম চুপি চুপি মা, মা। উঠলেন না। এখন উপায়। পয়সা পাই কোথায়?

মায়ের আঁচলে চাবি-বাঁধা। পিঠের দিকে গড়িয়ে পড়েছে মাদুরে। আস্তে খুলে নিলাম। হাত কাঁপছিল বার বার।

বাকস খুলে পেলাম খুচরো পয়সা চার আনা। আরও পাঁচ পয়সা বাকি। নিয়ে গিয়ে দিলাম বোষ্টমীকে। বোষ্টমী বললো,

নিয়ে এসো পাঁচটা সুপারি। তবেই ঠিক কথা সুরু করবে।

পানের বাটাতেই সুপারি থাকে। পেয়ে গেলাম। এবার আনন্দ।

বোষ্টমী চটপট গুনে ফেললো। বললো,

বাচ্চা বাড়িতেই আছে। দেখো এসে গে তোমাদের মাচার তলাটা! সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেলাম। মাচার তলায় ঢুকে পড়লাম। কিন্তু একেবারে পরিষ্কার। বাচ্চা দূরে থাক, একটা খড়কুটোও পড়ে নেই। ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু বোষ্টমী গেল কোথায়?

সারা পাড়া ঘুরে দেখলাম ঘরে ঘরে। সকলের মুখেই এক কথা, বোষ্টমী এখানে আসেনি।

কদিন পরে গিয়েছি আবার ইস্কুলে। ছেলেরা যেন চিনতে পারছে না। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপাটেপি করছে। মাস্টারমশায় দাঁতে গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে বলছেন আমাকে,

কি-হে, মনস্থটা কি? পড়াশুনো করবে, না, কুকুর পুষে কাটাবে জীবন?

আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

মাস্টারমশায় বললেন,

তবে শোনো একটা ছড়া—

বলতেই যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। ভন ভন করে বেরুতে লাগলো সকল ছেলের মুখ থেকে এক সঙ্গে

কুকুর পাগলা সন্তু

দুপুরবেলা পুকুরজন্তু

খুঁজে বেড়ায় জন্তু।

জঙ্গলের ভ্রূকুটি

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

মুরগি ফাঁকা জায়গায় চরতে লাগল। একটা মাঝারি মাপের শুয়োর আমার ডানদিকে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কি খুঁজতে লাগল। আমি খুসী মনে অনেক আশা নিয়ে প্রবীণ সাদা বাঘটার রূপ কল্পনা করছি। এই পটভূমিকায় তাকে কি সুন্দর মানাত! আশঙ্কার লেশমাত্র আমার মনে নেই। হঠাৎ নজর পড়ল একটা বড় চিতাবাঘ দুই পাহাড়ের মাঝের গলিটা দিয়ে আসছে। খানিকদূর এসে তার কেমন সন্দেহ হল, সন্তর্পণে একটু এগোয় আর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে, লেজটা আস্তে আস্তে ডাইনে বাঁয়ে দোলায়। দেখলাম তার কড়া নজর আমার মাচার কাছেই কোনো জিনিষের উপর। জিনিষটা অন্য কিছু নয়, সদ্য ছাল ছাড়ানো গাছের ডালের সাদা একটা টুকরা। মাচা বেঁধে ওরা অসাবধানতাবশতঃ ওখানেই ফেলে রেখেছে। চিতার ভাবভঙ্গী উন্মুখ হয়ে দেখছি আর ভাবছি মুভি ক্যামেরায় কি চমৎকার ছবি উঠত। একটু পরে এমনিই তার দিকে নিশানা করতেই সে বিদ্যুৎবেগে ত্রিশ গজ পিছনে ছুটে গিয়ে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ডালপালা ঢাকা আমার মাচার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিশ্চল হয়ে রয়েছি। এর আগে সে উপরে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু আমার সামান্য নড়া আড়াল থেকেও তার চোখে পড়েছে। ভাল করে ঠাহর করতে পাচ্ছে না ওখানে ব্যাপারটা কি। সে স্থির করল আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়, ঘুরে পালাল। আমি মাচা থেকে নেমে সাদা ডালের টুকরোটা দৃষ্টির বাইরে সরিয়ে ফেলে আবার স্বস্থানে ফিরে গেলাম। তখনও দিনের আলো শেষ হয়নি। বিচিত্র ঐশ্বর্যের গোপন রহস্য নিয়ে ধাপে ধাপে হিমালয়ের উদ্ধত শির আকাশ ছুঁয়েছে। হ্রদের জল আয়নার মত স্থির, আকাশের ক্ষীয়মাণ আলোর ছিটেটুকু বুকে ধরে আছে। জংলি মুরগি জমী ছেড়ে রাত্রের জন্য গাছে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যায়। সমস্ত পরিবেশ একটা অবর্ণনীয় শান্ত গাম্ভীর্যে পূর্ণ। অন্ধকার ঘনিয়ে এল, আমিও উৎসুক হয়ে সেদিনকার বুড়ো বাঘের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সামান্য শব্দের জন্য কাণ খাড়া, সেই সময় ঘরমুখো ধনেশ পাখীদের ডানার ঝাপটা বড় বিরক্তিজনক লাগছিল। অন্ধকারে হরিণের সাড়া পেলাম, আমার মাচার পিছন দিয়ে একটা সম্বরকে স্বাভাবিক গতিতে যেতে দেখে বুঝলাম মহাকালের সাদা জটাধারী বাঘ (বেশী বয়স হলে ঘাড়ের লোম বেশ বড় হয় এবং রংও ফিকে হয়) সহজে আমাকে কৃতার্থ করতে আসবে না। সেদিনকার ফাঁকা আওয়াজ তাকে খুব হুঁসিয়ার করে দিয়েছে। তারার আলোর তরল অন্ধকারের মধ্যে সাধ্যমত নজর চালাবার চেষ্টা করছি। চারিদিক ঘিরে সুগভীর স্তব্ধতা, কাছেপিঠে একটা মানুষও নেই যে আমার কোন বিপদ হলে সাহায্য না করুক জানবে যে দুর্ঘটনা ঘটল, বা কি ধরণের দুর্ঘটনা। নানা-রকম আতঙ্ককর গল্প শুনে মনে কিছু সন্দেহের ভাবও হয়ত লুকিয়ে ছিল ওই রহস্যময় বনের স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে। দুশ্চিন্তা একটু একটু করে আমার মাথায় জড়ো হতে লাগল। মজার কথা যে, বন্য জীব জন্তুর কোন ভয় বোধ করিনি, ভূত প্রেতেরও বড় প্রাধান্য দিইনি। সেই পাগলটার চিন্তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

ওই অদ্ভুত পরিবেশে পাগলটার উপস্থিতির চিন্তা অস্বাভাবিক অস্বস্তি আর ভয় জাগিয়ে তুলল। হঠাৎ সে এসে উপদ্রব আরম্ভ করলে মহামুস্কিলে পড়ব; গুলী চালিয়ে ঠেকানো চলবে না, আর অন্ধকারে নীচে নেমে তার সঙ্গে কুস্তি লড়বার কল্পনাও বিষম। হয়ত রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়ব, সেই সুযোগে পাগল মাচা আক্রমণ করবে। এইসব উদ্ভট আশঙ্কার সঙ্গে পাহাড়ী দুর্বৃত্তদের সম্বন্ধে ভয়ও ঘনীভূত হচ্ছিল। তারা যদি আমাকে সাবাড় করবার সুযোগ খোঁজে, তাহলে সেটা কঠিন হবে না। মনে পড়ল কবে কোন্ ফরেস্ট গার্ডের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, কোথায় কোন্ ফরেস্ট অফিসারকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, এসব পুরোন কাহিনী। ভাবতে লাগলাম একলা এখানে আসা গোঁয়ার্তুমি হয়েছে। নীচে যে সব বিবরণ শুনে গাঁজাখুরি বলে মনে হয়েছিল, এখন মনে হল সে সব গল্প মহাকালের প্রসাদ সেবনের ফল নাও হতে পারে। এমন সময় আমার ডানদিকে ঢিপির নীচে আর্তনাদ শুনে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। অবিকল কচি শিশুর ককানির শব্দ। আমি টর্চ ঘুরিয়ে ভাল করে দেখলাম কিছুই নাই, শুধু ঘাস। বিষম ধাঁধায় পড়লাম। পাখী রাত্রে ঘাসের মধ্যে ডাকবে কেন? আর কোন্ জন্তু এরকম আওয়াজ করতে পারে? আবার অন্য এক পাশ থেকে ওই শব্দ, দেখি কিছু নাই। ভয় তখন পুরোপুরি আমার ঘাড় চেপে ধরেছে, মহাকাল ভাঁর মোধ মিটে দেখা দক্ষিণ মুখ উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। কোণঠাসা জন্তুর মত বসে বসে ভাবতে লাগলাম ভূত, মানুষ যাই অসুক আমিও সহজে ছেড়ে দেব না। এবং আমার সুবিধা যে আমি মাটির থেকে উপরে রয়েছি, যা হওয়ার এই মাচাতেই ঘটবে। আরও কয়েক-বার ওইরকম স্পষ্ট শিশুর ককানির শব্দ শুনলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপরে হঠাৎ ওই শব্দ হল একটা গাছের উপর থেকে। সেই মুহূর্তে বুঝলাম ওটা আমার অচেনা কোন রাতচরা পাখী। যেমন ভয় পেয়েছিলাম তেমনিই আশ্বস্ত হলাম। তারপর সারারাত বিভিন্ন জীবের সাড়াশব্দ শুনে কাটালাম কিন্তু মহাকালের বাঘ দেখবার সৌভাগ্য হল না। রাত আন্দাজ বারোটায় আমার তন্দ্রা এসেছিল, আমি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম, শুকনো পাতার ঈষৎ একটা আওয়াজ পিছনে শুনে বুঝলাম বাঘ বা চিতা এসেছে। অপেক্ষা করলাম কিন্তু কিছুই এগিয়ে এল না। তখন যতদূর সম্ভব আস্তে ঘুরবার চেষ্টা করবামাত্র ঝপ করে একটা আওয়াজ হল, এবং আমিও জানলাম মহাকালের বাঘ আমার গুলীতে মরবে না। তার যেটুকু সন্দেহ ছিল মিটিয়ে নিয়ে কিছুকালের মত সে চলে গেল। পরদিন সকালে বাহাদুরদের সঙ্গে নীচের পাহাড়ী বস্তির অনেক কৌতূহলী লোক আমার ঘাড় মটকানো লাস দেখতে এসে নিরাশ হল।

প্রথম রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আমার আর ভয় হয়নি। পর পর কয় রাত আমি ওখানে ছিলাম। বাঘের পাত্তা পাইনি, কিন্তু এক রাত্রে সংলগ্ন পাহাড়ের বাঁশবনে অসম্ভব গোলমাল শুনে হাতীর কথা ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম। মড়মড় বাঁশ ভাঙ্গার আওয়াজ, পাথর গড়ানোর আওয়াজ সব মিলে মনে হচ্ছিল বুঝি বা হাতীর পাল জঙ্গল ভেঙ্গে শেষ করছে। ভোর হওয়ামাত্র ওদিকে গিয়ে বাইসনের লাদি দেখে বুঝলাম বাইসনের পাল বাঁশবনে চরতে এসেছিল। বাইসন যে এত হুটোপাটি করে আমার জানা ছিল না। শিং ঠোকাঠুকির আওয়াজ অনুসরণ করে দূর থেকে সম্বরের লড়াইয়ের দৃশ্যও উপভোগ করেছি। পাহাড় থেকে একেবারে খালি হাতে ফিরিনি। বাঁশবনের ধার ঘেঁষে একটা প্রকান্ড দলছুট সম্বর (মদ্দা সম্বর বয়স বেশী হলে দল থেকে সরে যায়) একদিন পেয়েছিলাম। হাওয়া আমার অনুকূল থাকায় নাগাল পাওয়া কঠিন হয়নি। শিং বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ও গোড়ার বেড় দশ ইঞ্চি ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের পক্ষে দৈর্ঘ্য মন্দ নয়, যদিও মধ্য ভারতে লম্বায় এর চেয়ে অনেক বড় শিং পাওয়া যায়। তবে বেড়টা মধ্য ভারতের তুলনায়ও খুবই ভাল বলা চলে।

ওই সুদৃশ্য স্থানের কুখ্যাতি সম্বন্ধে আমি চাঞ্চল্যকর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি বটে, কিন্তু মনে হয়েছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো লোক যদি রাত্রে নিরস্ত্রভাবে ওখানে একলা পড়ে তাহলে পাখীর অদ্ভুত আওয়াজই তার কাছে এমন বিভীষিকা সৃষ্টি করবে যে মাথা খারাপ হওয়া অসম্ভব নয়।

মারোয়াড়ী যুবকের মৃত্যুর কারণ অবশ্য এরকম নির্দোষ কিছু নয়। ও সম্পর্কে রহস্য ভেদ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে আমি নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সমান জমীটির একদিকে নাবাল জমীর একটা চওড়া পটি হ্রদ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের তলায় মিশেছে। হ্রদের জল বাড়লে এ পথেই বাড়তি জলটা উপচে যায়। কাদা জমী বলে এখানে ঘাস জন্মায় না, হরিণের চলাফেরায় পটিটা ক্ষতবিক্ষত। এর মাথায় হ্রদের জলে কতগুলো বড় পাথরের চাতাল জেগে আছে। এটাকেই হ্রদের ঘাট বলা যায়। পূজোর উপকরণ নিয়ে যুবকটি এখানেই বসেছিল, সময়টা ছিল বর্ষার শেষ। হিমালয়ের নীচের নাতিউচ্চ জঙ্গলে শঙ্খচূড় সাপ (Hamadryad বা snake eating cobra) মোটেই বিরল নয়, এবং এদের মত ক্রুদ্ধ হিংস্র প্রকৃতি সর্পকুলে আর কেউ নয়। শোনা যায় এরা জলের কাছে থাকতে ভালবাসে, কারণ জলখেলা নাকি এদের অভ্যাস। হ্রদে আসতে হলে ওই চওড়া পটিটা সাপের উপযোগী পথ হবে। খুব সম্ভব রাত্রে শঙ্খচূড় সাপ ওইখান দিয়ে এসে যুবকটিকে আক্রমণ করে ও সে বেচারী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরের দিন পূজোর জিনিষ পাথরের উপরই ছিল বলে শোনা যায়। মৃতদেহ দেখেছিল এরকম একজন বলল আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না, কিন্তু দেহ কালচে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ওই মুলুকে শঙ্খচূড় মেরেছেন এরকম লোকও আমি জানি। দুর্ঘটনার সব তথ্য আমার জানবার উপায় নেই, কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ ভুল নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের কোলে শান্তশ্রী হ্রদের আকর্ষণ এখনও আমার কাছে প্রবল, কিন্তু প্রথম রাত্রে রাতচরা পাখীর ডাক শুনিয়ে যে ভয়ঙ্কর রসিকতা সে করেছিল তা চিরকাল মনে থাকবে।

আনন্দ
উৎসবে...

প্রিয়জনের
আনন্দ

কেশরঞ্জন

কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং, লিঃ। কলিকাতা

ছোটদের পাততাড়ি
স্বপনবুড়োর চিঠি
চারি দিকে বন্যা,- জল করে থৈ থৈ
তারি মাঝে হে জননী, তোরে খুঁজে পাই কৈ?
মার কোল থেকে ছেলে ভেসে যায় বন্যায়
দুর্গতি হারিণী গো, রাখো ছেলে কন্যায়।
অনাহারে সন্তান, ঘরে ঘরে ক্রন্দন ...
কে সাজাবে পুজো লাগি পুষ্প ও চন্দন?
চিরকাল শুনি তুমি জগতের ধাত্রী -
কবে বলো পোহাবে গো এই কাল-রাত্রি!
তব আগমনী দিনে কোথা মাগো উৎসব?
পূজা-মণ্ডপে নাচে বিভীষিকা ভূত-সব!
কোথা প্রাণ? কোথা গান? অঞ্জলি দেবে কে?
কান্নার শতদল আঁখি মুছি নেবে কে?
তোমারই ত' সন্তান, অভিমান আছে গো,
সব ব্যথা মুছে দিয়ে ডাকিবেনা কাছে গো?
জয় আর যশ পাবো - মা তোমারি আশিসে
প্রাণ খুলে গান গাবো আনন্দে ভাসি যে!
অঞ্জলি দেবো মাগো, ছেলে-মেয়ে সকলে
স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধায় নেবো সবে দখলে॥
পরিচালক স্বপনবুড়ো
অনিল

(১) চিড়িয়াখানার গন্ডার—ফোটো : শ্রীদিলীপ কুমার দাস, (২) কেমন জব্দ!—ফোটো : শ্রীপান্না সেন, (৩) 'চয়ন'—ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ,
(৪) "পদ্মদীঘির তীরে"—ফোটো : শ্রীঅমিয় কুমার তরফদার।

ছল সবুজ ঝুরু ঝুরু,
শিউলি পরীরা গাঁথল মালা,
শরৎরাণী আনেন রোদের রঙিন্ ডালা।

কাশফুলবনে বলাবলি——ও মালা বুঝি
তাদেরি গলায় আসবে এবার সোজাসুজি!
আকাশে বকেরা বলে কক্ কক্ হাজার পাখার হেসে
মালাটি তো তাদেরি শেষে!

শুধু
তোমার তলোয়ার
শাণ দিচ্ছ প্রাণ দিয়ে.........কি.........করছ ধরধার!
কিশোরী কিশোর
বিজয়কুমারী, অজয়কুমার!
যেতে হবে সুদূর দূরের পার!
—পরম বীরের বেশে!

আপন-পথে যাবে গেয়ে মহামঙ্গল গান,
শির মুকুটে বয়ে দেশের মহিমা, সম্মান,
কোথাও হাহাকার, দারুণ আঁধার—ডাকবে বারবার!
একটুও না টলে
জয়ের মণি আনবে দেশের মন্দির তলে!

এগিয়ে ডালা এল কার তরে?
শরতের অতুল মালাখানি
দিতে এসে——হঠাৎ শরৎরাণী
রন অবাক চেয়ে,
সে মালাটি রাখছ তখন দেশ-দেবীর পায়ে
'জয় হিন্দ জয়!' গেয়ে!

ধন্য সে অঞ্জলি যেন চিরদিনের জন্য
—অগণ্য অমর পুণ্যে মেশে!

পাহাড়ের বুকে গাঁ। গাঁয়ে পাশাপাশি দুখানা বাড়ী। একখানা বাড়ী খুব প্রকান্ড—বড়লোকের বাড়ী। বাড়ীতে যেমন জাঁক, তেমনি জমক। বড়লোকের নাম শে-রিঙ্। আর একখানা বাড়ী পাহাড়ের গুহায় লতা-পাতা আর গাছের ডালের ছাউনি—গরীবের বাড়ী। গরীবের নাম চাম্-বা।

শে-রিঙ্ ভয়ানক দেমাকী—দুনিয়ার কাকেও সে মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না—কারো দুঃখ বোঝে না নিজেকে নিয়েই সব সময়ে মত্ত! কেউ এসে যদি দু'পয়সা চায়, চোখ রাঙিয়ে তাকে বিদায় দেয়! টাকার ঝাঁজে মেজাজ তার সব সময়ে গরম হয়ে আছে।

গরীব চাম্বা মানুষটি কিন্তু খুব ভালো—সকলের উপরে তার দরদ—সকলের উপর মমতা। ব্যাঙটিকেও সে বলে, ভগবানের জীব! নিজের দুখানা রুটি থাকে যদি কেউ তার কাছে এসে বসে, কিছু খেতে দেবে চাম্বাই। চাম্বা তখনি ওকে নিজের একখানা রুটি দেবে। গরীব মানুষ—অভাব আছে তবু মেজাজ ভারী ঠান্ডা। কাকেও একটা কড়া কথা বলে না। চাম্বার গুহার ছাউনির দরজায় এক চড়াই আর তার চড়াইনী বাসা করে থাকে। চড়াইনীর কটা ছানা হয়েছে। চড়াই যায় চরতে, চড়াইনী বাসায় থাকে ছানাদের দেখে।......ছানারা একটু বড় হলো তখন চড়াইয়ের সঙ্গে চড়াইনীও বেরুলো চরতে। বাসায় ছানারা খেলা করছে......খেলা করতে করতে একটি ছানা বাসা থেকে ঝুপ করে গেল পড়ে......অন্য ছানারা কি করবে? তারা নেমে গিয়ে তাকে তুলে বাসায় আনবে, সে সামর্থ্য তাদের নেই! তারা জুলজুল করে চেয়ে আছে তার দিকে......কখন সন্ধ্যা হবে চড়াই আর চড়াইনী ফিরবে তখন তারা এসে ওকে দেখবে।

কিন্তু সন্ধ্যার আগেই চাম্বা বাড়ী থেকে বেরুবে, দেখে সদরে চড়াইয়ের ছানা পড়ে আছে। বাসা থেকে পড়ে গেছে...আহা! চাম্বা তাকে তুললো—তুলে দেখে ছানার একটি পা গেছে মোচ্কে ভেঙে। ছানাকে বুকে করে ঘরে এনে চাম্বা তার পায়ে কি একটা গাছের পাতা ছেঁচে তার প্রলেপ লাগিয়ে নাকড়া দিয়ে তার ভাঙা পা দিলে বেঁধে—নিয়ে ছানাকে তার বাসায় তুলে রেখে এলো। তার পর দিন যায় মাস যায় বছর গেল চলে. একদিন চাম্বা বাড়ীর সামনে রোদে কটি ধান শুকোতে দিচ্ছে এমন সময় একটা চড়াই পাখী এসে তাকে ডাকলো চাম্বা চাম্বা—চেয়ে চাম্বা দেখে, চড়াই পাখী—চড়াই পাখীর ঠোঁটে পাতার ঠোঙা! চড়াই বললে—"তুমি চিনতে পারছো না। আমি সেই চড়াই যখন ছোট্ট ছানা ছিলুম বাসা থেকে পড়ে পা ভেঙে ছিল—আমায় তুমি যত্ন করে তুলে নিয়ে গিয়ে ওষুধ দিয়ে আমার পা বেঁধে বাসায় এনে রেখেছিলে সেদিনের কথা আমি ভুলিনি, চাম্বা—তাই তোমার জন্য এই জিনিষ এনেছি......নাও।"

একথা বলে পাতার ঠোঙা চড়াই দিলে চাম্বার হাতে। ঠোঙা খুলে চাম্বা দেখে গাছের বীজ।

চড়াই বললে—"শোনো আমি সত্যিকারের চড়াই পাখী নই, আমি পরী...কে কেমন মানুষ...পাখী হয়ে উড়ে উড়ে দেখে বেড়াই'... তুমি এই বীজ যত্ন করে পুঁতে দাও তোমার ঘরের সামনে ছোট্ট এই বাগানে।"

এ কথা বলে চড়াই গেল উড়ে।

পাখী কথা কয়— তার উপর জাদুকরের সে কথা মনে রেখেছে... চাম্‌বা খুব একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন শুনলো, সত্যিকারের পাখী নয়—পরী, তখন কি আহ্লাদ যে হলো তার! পরী এ বীজ এনে দেছে, নিশ্চয় সামান্য বীজ নয় তাহলে! চাম্‌বা বীজ পুঁতে দিলে তার বাগানে।......তারপর দুঃখে-ধান্দায় সে ভুলে গেছে...বীজের কথা। একদিন সকালে উঠে চাম্‌বা দেখে সে বীজে চমৎকার একটি গাছ হয়েছে—আর সে গাছের ডালে ডালে ফুল—কত রঙের ফুল। লাল, সবুজ, সাদা, হলদে, নীল। চাম্‌বা ডালি এনে ফুল পাড়তে লাগলো। লাল ফুল পাড়লো—পাপড়িগুলো থেকে ঝর্‌ ঝর্‌ করে পড়লো বড় বড় লালচুণী......সাদা ফুল পাড়লো...... হীরের ঝকঝকে কুচি ঝরলো......সবুজ ফুলের পাপড়ি থেকে ঝরে পড়লো এত পান্না......হল্‌দে ফুল পাড়তেই সোনার গুঁড়োর কুচি যেন, চাম্‌বা মহাখুশী—সেই সব চুণী পান্না হীরে আর সোনার গুঁড়ো ঘরে এনে রাখলো...একদিন নয়...রোজ সকালে গাছে এমনি করে ফুল ফোটে... রঙীন ফুল...আর চাম্‌বা পায় সেই সব ফুলের পাপ্‌ড়ি থেকে চুণী, পান্না হীরে আর সোনার কুচি।

দেখতে দেখতে চাম্‌বা খুব বড় লোক হয়ে উঠলো। চুণী পান্না বেচে অনেক অনেক টাকা হলো। সে টাকায় চাম্‌বা তৈরী করলো পাথরের মস্ত বাড়ী—সে বাড়ীর কি বাহার! তার বাড়ীর পাশে শে-রিঙের বাড়ী—দেখায় যেন এতটুকুন। বড়লোক হলেও চাম্‌বার মেজাজ কিন্তু রইলো আগেকার মতো ঠাণ্ডা-নরম... সকলের উপর তেমনি দয়া-মমতা...গরীব-দুঃখীদের ডেকে ডেকে সে দেয় পয়সা-কড়ি...খাবারদাবার পোষাক আশাক।

চাম্‌বার ধনদৌলত দেখে শে-রিঙের কি হিংসা! এমন লোক অনেক আছে পৃথিবীতে...নিজেদের অনেক টাকা-কড়ি থাকলেও যদি অন্য লোকের অনেক টাকা হচ্ছে দেখে, তাহলে হিংসায় তারা জ্বলতে থাকে। শে-রিঙ ঠিক সেই স্বভাবের মানুষ!—সে থাকতে পারল না —এলো চাম্‌বার বাড়ীতে—বললে কি করে এত ধন-দৌলত হলো তোমার, বলো তো? চুরি? না, ডাকাতি? যখের ধন না—

হেসে চাম্‌বা বললে; চুরিও করিনি; ডাকাতিও করিনি মশায়... যখের ধনও পাইনি...আমার এ ধন-দৌলত...

চাম্‌বা বললে শে-রিঙকে সেই চড়াইয়ের কাহিনী...। শুনে শে-রিঙ আর দাঁড়ালো না...বাজার থেকে কিনে আনলো একটা চড়াই আর একটা চড়াইনী...একপাল ছানাশুদ্ধ কিনে এনে নিজের বাড়ীর ফটকে তাদের জন্য বাসা তৈরী করিয়ে সেই বাসায় রাখলো চড়াইদের।

তারপর রোজ রোজ দেউড়িতে আসে—এসে দেখে, ছানা পড়লো কি না—কিন্তু পড়ে না; ভারী মুস্কিল তো! টাকা খরচ করে চড়াই কিনে আনা, টাকা খরচ করে তাদের বাসা তৈরী—টাকা খরচ করে রোজ রোজ এদের খোরাক জোগানো—এমন পাজী ছানাগুলো যে, কিছুতে একটা বাসা থেকে নীচে পড়ে না। শে-রিঙের দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো রাগে...কত আর ধৈর্য ধরে থাকবে...ওদিকে চাম্‌বা রোজ রোজ পাচ্ছে এত এত হীরে পান্না চুণী সোনার কুচি বড় বেশী বেশী বড়লোক হচ্ছে চাম্‌বা...আর শে-রিঙ.....

একটি লাঠি এনে শে-রিঙ দিতে লাগলো চড়াইয়ের বাসায় খোঁচা—সে খোঁচা খেয়ে একটা ছানা পড়লো বাসা থেকে নীচে পাথরের উপর...কিন্তু এমন বরাত, তার পা ভাঙলো না। তখন শে-রিঙ ছানাকে তুলে তার একখানা পা দিলে মোচড়ে ভেঙে। তারপর তার ভাঙা পায়ে পট্টি বেঁধে রস লাগিয়ে রেশমী সুতো জড়িয়ে বাঁধলো...বেঁধে ছানাটাকে বাসায় তুলে রাখলো।

পরের দিনই কিন্তু বাসা খালি করে চড়াই আর চড়াইনী উড়ে গেল ছানাদের নিয়ে।

—ওদের আর পাত্তা রইলো না।

রাগে গর্‌গর্‌ করে শে-রিঙের দিন কাটে—কোথায় কি মিথ্যা কতকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। তার বরাতে পাখীগুলো বেইমান!

ছ'মাস পরে একদিন চড়াই এলো—তার ঠোঁটে লাউয়ের ঠোঙা... চড়াইকে কিছু বলতে হলো না। পাখীর ঠোঁটে ঠোঙা দেখে দু'হাত বাড়িয়ে শে-রিঙ বললে—এই যে ঠোঙা এনেছো, বেশ ভালো। আমি ভেবেছিলাম একেবারেই ফেরার হয়ে থাকবে। পাখী ঠোঙা দিল, দিয়ে বললে, ঠোঙায় গাছের বীজ আছে। তোমার বাগানে পুঁতে দিয়ো। ধমক দিয়ে শে-রিঙ বললে, জানি জানি, গাছের বীজ মানুষে বাগানেই পোঁতে, তোমার আর জ্যাঠামি করতে হবে না। তুমি এখন ভাগো তো।

চড়াই উড়ে গেল—শে-রিঙ পুঁতলো গাছের বীজ দেউড়ির পাশে তার যে মস্ত বাগান, সেই বাগানে।

পরের দিনই সে বীজ থেকে একবড় গাছ—আর গাছের মগডালে মস্ত একটি ফুল—চন্দ্র সূর্যের মতো প্রকাণ্ড ফুল—লাল টকটক করছে ফুলের রঙ!

শে-রিঙ ভাবলো, ও ফুল ছিঁড়লে কোন্‌ রাজার তোষাখানা না পাবো!

আঁকশি এনে মগডাল থেকে সে ফুল পাড়লো—পেড়েই পাপড়ি ধরে চড়চড় করে টান—পাপড়ি ছিঁড়তে ফুলের ভেতর থেকে—হীরে চুণী, পান্না, সোনার কুচি ঝরা নয় বেরুলো মোটা বেঁটে একটা মানুষ— মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী...মুখখানা কি ভয়ানক দেখতে আর কি মোটা ভুঁড়ি, লোকটার কাঁধে এত বড় ঝোলা, লোকটা বেরিয়েই বললে— এই যে শে-রিঙ!

শে-রিঙ ভয়ে কাঁটা...কোনো মতে বললে, তুমি কে?

লোকটা বললে চিনতে পারছো না! আমি তোমার মহাজন... আমার কাছে তুমি অনেক টাকা ধারো...তুমি দেনদার আর আমি তোমার পাওনাদার...আমার ঝোলার মধ্যে আছে বিশ পঁচিশ বছরের খাতা...তোমার কাছে থেকে দু'লাখ, পাঁচ লাখ নয় অনেক লাখ টাকা পাই—তুমি ধারো—খাতার পাতায় পাতায় তার হিসাব কষা আছে— দেখো আর দেরী নয়! আমার পাওনা কড়া-ক্রান্তিতে আদায় করে তবে এখান থেকে নড়বো! হাঁ-হাঁ! এই বসলুম আমি তোমার দরজা চেপে!

কথা শুনে আর পাওনাদারের চেহারা দেখে শে-রিঙ একেবারে থ। এর সঙ্গে কখনো কোনো কারবার করেছে বলে মনে পড়ে না তো! লোকটা বললে—কি ভাবছো মশায়—[illegible] এই দেখো খাতা...পাতায় পাতায় তোমার হিসাব...

খাতা খুলে খুলে লোকটা দেখাতে লাগলো এক বছর, দু বছরের খাতা নয়—বারো বছরের খাতা—আর সব খাতার পাতায় লেখা শে-রিঙের হিসাব! শে-রিঙ যেন স্বপ্ন দেখছে...না, কে এর সঙ্গে কারবার কখনো না! কিন্তু খাতা কথায় বলে [illegible] খাতাপত্রে দেনার অঙ্ক যা দেখলে......

দেনার দায়ে শে-রিঙের বাড়ী, বাগান, ক্ষেত খামার, টাকাকড়ি, ঘোড়া, গরু, ছাগল... মানে যা কিছু ছিল—পাওনাদার সব নিলো তার পাওনা-গণ্ডা! শে-রিঙের কিছু রইলো না...একটা কাণাকড়ি পর্যন্ত না!...থাকতে রইলো তার একটি ছেলে...ছেলের বয়স বারো-তেরো বছর। এই ছেলে ছাড়া কোনো কুলে তার আর কেউ ছিল না। তার হাত ধরে শে-রিঙ পথে এসে দাঁড়ালো। ভুঁড়িওয়ালা পাওনাদারের কি মনে হলো—সে বললে কোনো মশায় তোমার এ [illegible] ছেড়ে দিচ্ছি—কোথায় গিয়ে থাকবে—ঐ [illegible] থাকতে পারো।

গোয়ালেই আশ্রয় নিলে শে-রিঙ...ছেলে রইলো সঙ্গে।

তারপর যে কষ্টে দিন চলে...এর ক্ষেতে কাজ করে—ওর ছাগল চরিয়ে নিয়ে আসে—কারো বা মোট বয়—

কমাস পরে চাম্‌বা—চাম্‌বা এখন খুব বড়লোক—তার অনেক ঐশ্বর্য—চাম্‌বা এলো শে-রিঙের কাছে—বললে—আমি বিদেশে যাচ্ছি এক বস্তা সোনার গুঁড়ো তোমার কাছে রেখে যেতে চাই,

শে-রিঙ...আমার তোষাখানায় ধরছে না—সেখানে তিল-ধরাবার জায়গা নেই, তা কি বলো, রাখতে পারবে?

শে-রিঙ বললে, কেন পারবো না, আমার এতবড় গোয়ালঘর—এ ঘরে থাকবার মধ্যে আমি আর আমার ছেলে—অনেক জায়গা আছে—রেখে যেতে পারো তোমার সোনার বস্তা।

চামবা তখন সোনার গুঁড়োর বস্তা এনে শে-রিঙের ঘরে রাখলো—রেখে সে গেল বিদেশে।

শে-রিঙের মনে হলো লোভ হয়েছে। এ বস্তা চামবা রেখে গেছে আর কেউ তা জানে না। কতকাল সোনা-রুপোর মুখ দেখিনি, ঐ সোনার গুঁড়ো যদি সরিয়ে রাখি কে জানবে?

শে-রিঙ করলে কি—চামবার বস্তা থেকে সোনার গুঁড়ো সরিয়ে নিজের বস্তায় রাখলো—রেখে, চামবার বস্তায় পুরলো এক রাশ বালি—পুরে সেই বালির বস্তা রাখলো গোয়ালঘরের কোণে।

মাসখানেক পরে চামবা বিদেশ থেকে ফিরে এলো—এসে বস্তা নিয়ে গিয়ে দেখে, বস্তার মধ্যে সোনার গুঁড়ো নেই—শুধু রাশ রাশ বালি।

চামবা এলো শে-রিঙের কাছে, বললে—এ কি ব্যাপার শে-রিঙ—আমি সোনার গুঁড়ো ভরা বস্তা রেখে গেলাম—আর তুমি আমাকে ফেরৎ দিলে বালির বস্তা!......

শে-রিঙ বললে—তাই নাকি! আশ্চর্য কথা তো!......
তোমার সোনার গুঁড়ো বালি হয়ে গেছে! বরাত খারাপ হলে এমনিই হয়ে থাকে।

চামবা আর কোনো কথা বললে না—বাড়ী চলে এলো।

এর দু'তিন মাস পরে চামবা এক মঠ তৈরী করলে—এ মঠে বহু ছেলে এসে লেখাপড়া শিখবে—লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। এর জন্য কাকেও মাইনে দিতে হবে না—বিনা মাইনেয় লেখাপড়া শিখবে।

অনেক ছেলে মঠে এসে আছে—মঠে তারা লেখাপড়া শেখে, চামবা তাদের শুধু বিনা মাইনায় লেখাপড়া শেখায় না, তাদের [illegible]। [illegible] ছেলেদের জন্য বাপ-মাকে একটি পয়সা খরচ করতে হয় না। শে-রিঙ কিন্তু তার ছেলেকে মঠে দেয়নি—কি হবে লেখাপড়া শিখে? ছেলে তার সঙ্গে খাটে—খেটে বা রোজগার করতে পারে।

কিন্তু একদিন কি কাজে শে-রিঙকে বিদেশে যেতে হবে—[illegible] মাস থাকতে হবে—তখন ছেলেকে [illegible] শে-রিঙ এলো চামবার কাছে—বললে আমাকে বিদেশে যেতে হচ্ছে চামবা, যতদিন না ফিরি, ছেলেটিকে যদি তোমার কাছে রাখো........ আমার [illegible] তো কেউ নেই, আমি চলে গেলে কে ওকে দেখবে?

চামবা বললে—বেশ বেশ, তোমার ছেলে এখানে থাকবে [illegible] লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

ছেলেকে চামবার কাছে রেখে শে-রিঙ গেল বিদেশে। শে-রিঙ চলে যেতেই চামবা কোথা থেকে একটা বাঁদর নিয়ে এলো—তাকে [illegible] কটা কথা [illegible]......

বাঁদর, বাঁদর হয়ে গেছি বাবা—বরাত খারাপ হলে এমনিই হয়ে থাকে।

শে-রিঙের ছেলে মঠে আছে, যখন লেখাপড়া শেখে অন্য [illegible] ছেলেদের সঙ্গে।

ক' মাস পরে শে-রিঙ এলো বিদেশ থেকে ফিরে—ফিরেই চামবার মঠে এলো, বললে আমার ছেলে? ঐ যে!

মঠে তখন ছেলেরা বসে পড়া করছে, ছেলেদের সঙ্গে বসেছে সেই বাঁদরটি।

বাঁদরের দিকে দেখিয়ে চামবা বললে—ঐ তোমার ছেলে।

এক যে ছিলো বাদশা, হ'লো কি যেন তার রোগ,
বললো হকীম দাওয়াই খেতে নামে মালসা-ভোগ।
মুন্সীখানার বক্সী নিলো ফর্দখানা লিখি,
মালসা-ভোগের মাল মশলা আনতে হবে কি কি।—
ইরাক দেশের শুকনো খেজুর, চীন দেশের আরসোলা,
তিব্বতী গাইর দুধের ছানা,—প্রত্যেকে নয় তোলা,
মেরু-সাগর-তীরের দুটো পেনগুইনের ডিম,
চিল্কা-হ্রদের একটি কাচ কুমীর বা কাছিম।
সিন্ধু দেশের বাদশা কিনা, সিন্ধুঘোটক চড়ে
লোকজনেরা আনতে দাওয়াই ছুটলো উঠে জোরে।
দাওয়াই নিয়ে ফিরলো তারা, [illegible] দেখে আসি—
বাদশা হকীম দুই-জনারই কবর পাশাপাশি!
মনের দুঃখে চললো তারা আপন আপন বাড়ী,
সেথা দেখে নাতির মুখে এত্তো-বড় দাড়ি!

আমার ছেলেটি! ঐ বাঁদরটা?......শে-রিঙ বলে উঠলো।

চামবা বললে—ওকে জিজ্ঞাসা করো ওর পরিচয়।

চামবা বাঁদরের দিকে চেয়ে বললে—কি হয়েছে এঁকে বলো।

বাঁদরকে যেমন শেখানো হয়েছে বাঁদর বলে উঠলো—বাঁদর হয়ে গেছি বাবা, বরাত খারাপ হলে এমনিই হয়ে থাকে!

শে-রিঙের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! [illegible] চালাকি! মানুষ কখনো বাঁদর হয়! সে বললে—চালাকি ছাড়ো চামবা—আমার ছেলে ও নয়! ছেলে ফিরিয়ে দাও।

চামবা বললো ঐ তো তোমার ছেলে নিয়ে যাও!

রেগে-মেগে শে-রিঙ বললে—মানুষের ছেলে কখনো বাঁদর হয়? তামাসা পেয়েছো?

চামবা বললে—কেন হবে না শে-রিঙ! সোনার গুঁড়ো বরাতের দোষে বালি হতে পারে যদি তো মানুষের ছেলে বরাতের দোষে বাঁদর হতে পারবে না কেন?

এতক্ষণে যেন লোকের মুখে বুলি পড়লো। শে-রিঙ [illegible] তখনি এলো নিজের ঘরে—চামবার সোনার বস্তা এনে চামবাকে দিয়ে বললে—এই নাও তোমার সেই সোনার গুঁড়োর বস্তা—এখন দাও আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে।

হেসে চামবা বললে—এই তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

ছেলে নিয়ে শে-রিঙ ফিরলো ঘরে।

সেকালে

লীলা মজুমদার

পঁয়ষট্টি বছর আগে আমার মামাবাড়ীর দেশে একদিকে যেমন সাধুসজ্জনের ভিড় ছিল এবং তার ফলে পুজোপার্বণ, তিথি পালন, হরির লুট, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী বিদায় লেগেই থাকত, আবার তেমনি অন্য দিক্ দিয়ে ঠগ্ ঠ্যাঙ্গাড়ে, জোচ্চোর, বাটপাড়েরও এমনি উপদ্রব ছিল যে, দিনের বেলাতেও কেউ একা নির্জন পথে বেরুতে সাহস পেত না।

তখন লোকের অবস্থাও ছিল ভালো। খাওয়া-দাওয়ার কারো অভাব ছিল না, পুকুরে প্রচুর মাছ, গোয়াল ঘরে বড় বড় দুধী গাই, বাগানে অপর্যাপ্ত শাকসব্জি, ফলপাকুড়, কোনও ভিখিরী কখনও গৃহস্থের বাড়ী থেকে খালি হাতে ফিরে যেত না।

কিন্তু তা হ'লে হবে কি? দুষ্টুলোকদের ঠেকান কারো সাধ্য নয়; উপরন্তু দু'একজন ছিঁচ্কে চোর ছাড়া কেউ বড় একটা ধরাই পড়ত না, তা তাদের সাজা দেওয়া হ'বে কী করে? সে সময়ে ঐ অঞ্চলের জেলখানাগুলো বারোমাস খালি পড়ে থাকাতে গ্রামের পঞ্চায়েতের পরামর্শে নাকি সে সব ঘরগুলি গরীবদের কাছে অল্প দামে ভাড়া দেওয়া হ'ত, আর ঐ ভাড়ার টাকা থেকে শীতকালে ঐ গরীবদেরই লাল কম্বল কিনে দেওয়া হ'ত। কিন্তু সৎকাজের সব সময় ভালো ফল হয় না। চুরি ডাকাতি উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে লাগ্ল।

শেষকাণ্ডে এমন হ'ল যে, সরকারী খাজাঞ্চিখানার একদিকের দেয়াল রাতারাতি কারা কেটে নিয়ে যথাসর্বস্ব ত' নিয়ে গেলই, উপরন্তু দেয়ালের ইঁটগুলি খুব মজবুত হওয়াতে সেগুলিকে শুদ্ধ যে গোরুর গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গেল, চাকার সব দাগ থেকেই তা' বোঝা গেল। সমস্ত অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা, চৌকীদার, জমাদারদের মুখে কাপড় বেঁধে একটা ছোট কুঠ্রীতে তালাচাবিবন্ধ করে এই কাজটি সারা হ'ল, বাইরের কাকপক্ষীটি কিছু টেরই পেল না। পাহারাওয়ালারা শুধু এইটুকু বল্তে পারল যে, লোকগুলো দারুণ ষণ্ডা আর বীভৎস সব মুখোস দিয়ে সারা মুখটা ঢাকা।

এত সব উপদ্রবের মধ্যে যে আমার মামাবাড়ীর লোকেরা নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস করতে লাগ্লেন, ছেলেমেয়েদের পৈতে ও বিয়ে উপলক্ষে তাল তাল সোনার গয়না গড়িয়ে, পাড়াশুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন, তার একমাত্র কারণ হ'ল নাকি ওঁদের গুরুদেবের আশীর্বাদ।

আমার ছোট মামার কাছে শুনেছি যে, গুরুদেবটি যে সে লোক ছিলেন না। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা দুই হাত, ফর্সা রং, তালঢ্যাঙ্গা মানুষটি। আর শরীরে সে কি শক্তি! একবার বাঁ হাতে একটা পাগ্লা মোষের শিং চেপে ধরে তাকে এমনি বশ ক'রে ফেলেছিলেন যে, সেই অবধি সে কুকুর বাচ্চার মত তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরত, কেউ কাছে এলেই ল্যাজ নাড়ত।

গুরুদেবের অবিশ্যি খুবই নামডাক, খুবই চাহিদা, তাই বারোমাস গাঁয়ে থাকা তাঁর ঘটে উঠ্ত না। দুটি শিষ্য নিয়ে আসতেন যেতেন, দুদিন এর বাড়ী, দুদিন ওর বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ ক'রে সকলকে আশীর্বাদ ক'রে চলে যেতেন। ঠিক আতিথ্যও বলা যায় না, কারণ সাধুসজ্জন মানুষ কারো বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করতেন না, উঠোনে তাঁদের জন্য কানাৎ ফেলা হ'ত। নিজেরা রান্না করে নিরামিষ খেতেন, তার জন্য কাঁচা ফল, তরকারী, দুধ, ছানা শিষ্যরা যোগান দিত। টাকাকড়ি যে যা' পারত প্রণামীও দিত, কিন্তু গুরুদেব কখনও কিছু চাইতেন না। লোকে খুসি হ'য়ে চ্যালাদের হাতে যা খুসি দিত। তারাও সেটাকে খুসি হ'য়ে মাথায় ঠেকিয়ে ছোট একটা কালো সিন্দুকে তুলে রাখ্ত। যাবার সময় সিন্দুকটি কাঁধে ক'রে নিয়ে যেত, আবার দরকার হ'লে গরীব দুঃখীকে সিন্দুক খুলে টাকা-পয়সা দানও করত।

গুরুদেবের ক্ষমতাও ছিল অনেক। ফোঁটা দিয়ে, বড়ি দিয়ে, মাদুলী দিয়ে সাধারণ রোগ ত' সারিয়েই দিতেন, আবার তেমন কঠিন ব্যামো হ'লে অনেক সময় চাই কি সহরের হাসপাতালে যাবার খরচটাও দিয়ে দিতেন। কাজেই লোকে যে তাঁদের দেবতার মত ভক্তি করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গাঁয়ের বুড়োরা গুরুদেব সম্বন্ধে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ছেলে-ছোকড়ারা ততটা ছিল না। বিশেষ করে আমার ছোটমামা ও তাঁহার বন্ধুরা। তাহার একমাত্র কারণ অবিশ্যি হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়।

গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছাড়া তাদের মনে আর কিছুই থাকা উচিত ছিল না। কারণ ধর্মের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু গুরুদেব যাদের বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তাদের বাড়ির লোকদের আর কখনও যে কিছু খোয়া যেত না এটা ত' কম কথা নয়।

সমস্ত শীতটা গুরুদেব গাঁয়ে থেকে ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে চলে যেতেন; আবার পৌষ পড়লে এসে হাজির হ'তেন। মাঝের কটা মাস গাঁয়ের লোকরা তাঁর আগমনের আশাতেই কাটিয়ে দিত। আর এমনি ছিল তাঁর তেজের মহিমা, যে কেউ যদি তাঁর অনিষ্ট বা নিন্দামন্দ করেছে ত' তার একটা বড় ক্ষতি হবেই হবে। ফিরে এসে তাই শুনে অবিশ্যি গুরুদেব খুবই দুঃখ করতেন।

একবার ছোটমামা পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। পাড়ার কতক-গুলি জাঁহাবাজ ছেলে মিলে একটা ক্লাব খুলেছিল। সেখানে তাস পেটা, জুয়ো খেলা, লুকিয়ে চুকিয়ে সবই চল্ত। ছোটমামা তাঁর একটি গুণধর বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, মেলা টাকা হেরে, শেষটা আর উপায় না দেখে গাঁয়ের মহাজনের কাছে ধারধোর ক'রে, সে সব শোধ না করেই, আবার ছুটির শেষে কলকাতায় কলেজের মেসে পালিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে মহাজন মহা চটে গিয়ে চিঠি লেখালেখি সুরু করেছে, বাড়িতে বলে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। ছোট মামার বয়স তখন আঠার

[illegible]
তখন হঠাৎ গুরুদেবকে মনে পড়ল। কতবার ঐ গুরুদেবকে নিয়েই বন্ধুমহলে হাসিতামাসা করেছেন। এবার বিপদের সময় কিন্তু মনে মনে দিনরাত গুরুদেবকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। আর কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে গুরুদেব নিশ্চয় একটা হিল্লে ক'রে দেবেন।

হ'লও তাই। পুজোর ছুটিতে দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে আবার দেশে যাচ্ছেন। পথে সন্ধ্যা নেমে গেছে, চারদিক অন্ধকার করে দারুণ মেঘও করেছে। মাঝপথে ছোট একটা জংশনে গাড়ি বদল করতে হয়। ষ্টেশন মানে একটা সেডের মত, তারই পাশে একটা কুঠ্‌রীতে ষ্টেশন মাষ্টারের অপিশ, আর সেড্‌ বোঝাই গুড়ের নাগরি ও দিশী খেজুরের তাল। সবটা থেকে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই আধ-অন্ধকারে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হ'বে।

ছোট মামার ত' বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে। খালি মনে হচ্ছে গুড়ের ভাঁড়ের ওপাশে যেন দুটো লোক গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তারপর যেই না দূরে থেকে ট্রেণের আলো দেখে, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ছোটমামা দু' পা এগিয়েছেন, অমনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো কালো মুস্কো লোক এসে তাঁর দু ঘাড়ে বিরাশী সিক্কা ওজনের দুই হাত রেখেছে। ছোটমামা ত' পাথর হয়ে গেছেন।

কানের কাছে মুখ এনে একজন বল্‌লে—"ঈশ্‌, ভারী ভালোমানুষ বনে গেছিস্‌ দেখছি! থ্যাদা নাকের উপর আঁচিলটা না দেখলে ত' চিন্‌তেই পারতাম না। নে ধর, ভণ্ড কোথাকার! তোর আশায় বসে বসে হাত পায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে।" ততক্ষণে ট্রেণটাও এসে লেগেছে, আর দু' চারজন লোকও ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। লোক দুটো ছোট মামার মুঠোর মধ্যে একটা ছোট কালো থলি একরকম জোর ক'রে গুঁজে দিয়ে নিমেষের মধ্যে পিঠ্টান দিল। এক হাতে নিজের গ্লাডষ্টোন ব্যাগ, অন্য হাতে থলিটা নিয়ে ছোটমামা গুটি গুটি সামনেই যে গাড়ি পেলেন তাতে উঠে পড়লেন। গাড়িও ছেড়ে দিল।

এতক্ষণে ছোট মামার জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এসেছে, নেড়ে দেখেন ব্যাগটা দারুণ ভারী। চারদিকে চেয়ে দেখেন গাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, ভুল করে ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়ে পড়েছেন। তখনকার দিনে গাড়ির আলো এত উজ্জ্বল ছিল না, সেই টিমটিমে আলোতেই থলির মুখের দড়ি খুলে, একবার তাকিয়েই ছোটমামা আরেকটু হলেই মূর্চ্ছো খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন! থলিটার গলা অবধি হীরে, জহরৎ, সোনার গিনি দিয়ে ঠাসা! সবচেয়ে উপরে একটা লাল পাথরের আংটি, জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে, তার গায়ে মকরের মুখ খোদাই করা।

"জয় গুরুদেব" বলে এক মুঠো গিনি যেই না ছোটমামা হাতে করে তুলেছেন, অমনি জান্‌লা দিয়ে একটা যমদূতের মত লোক গলে এসে,—তখন জানালায় শিক্‌ লাগান থাকত না,—ঝুপ করে সীটের উপর এসে পড়ল। ছোটমামা অবাক হয়ে দেখ্‌লেন তার কুচ্‌কুচে কালো হাতে একটা বেঁটে মোটা মুগুরের মত কি, আর মুখে একটা বিকট মুখোস, তার নাকের কাছটা ফাঁকা। সেইখান দিয়ে থ্যাদা একটা কালো নাক বেরিয়ে রয়েছে, তার উপরে বিরাট একটা আঁচিল!

লোকটি হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—"বা-ব্বা! দিব্যি ত' গুছিয়ে নিয়েছ চাঁদ! এবার দাও দিকি নি থলিটা! খুব লোক বাবা তুমি!" ছোটমামা কোনও আপত্তি না ক'রে থলিটা তার হাতে দিয়ে দিলেন। গিনিগুলিও দিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটা ফিক্‌ ক'রে হেসে থলির মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। "আহা, অত ভালোমানুষী নাই বা দেখালে! ৪টি তোমার টিপিন খাবার পয়সা ব'লেই নয়ত' রেখে দাও" ব'লে এক লাফে যে রকমভাবে এসেছিল, তেমনি ভাবে জান্‌লা গলে চলে গেল! ছোটমামাও বারবার গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে গিনিক'টি পকেটস্থ করলেন।

আল্‌জিভেরই অপারেশন কালকে হবে খুকুর।
খুকু যাবে হাসপাতালে। আজকে সারা দুকুর
বোঝায় তাকে মা যে, "মোটেই একটুও ভয় নেই!
লাগে নাকো কোথাও কিছু। দেখতে না দেখতেই
হয়ে যে যায় অপারেশন। যায় না পাওয়া টের।
তারপরেই না বাড়ী ফিরে আমোদ করো ফের!
সেই যে যেমন অপারেশন সেবার হোলো আমার?
হাসপাতালে দুদিন থেকেই এলাম ফিরে আবার
কেমন মজা করে'?
তুমিও তেম্‌নি আসবে বাড়ী মোটর গাড়ি চড়ে।"

বল্ল খুকু, মিনিটখানেক থামি,
"হাসপাতালে যেতে মোটেই ভয় খাইনে আমি।
তোমার মতন অপারেশন হোক্‌ না কেন আমার!
ভয় কি তাতে? কিন্তু একটা কথা জেনো আমার—
হাসপাতালের লোকদের মা কি রকম যে বেভার!
খেল্‌না দেবার নামে তোমায় গছিয়ে দিলো সেবার
কাঁদুনে এক খোকা!
আমি কিন্তু নেব না তা। নইকো অতো বোকা।
বলে দিকো খোকা দিতে আছে খুকুর মানা।
খুকুর আমার চাই যে কুকুর ছানা।।"

তারপর যথাসময়ে দেনা শোধ ক'রে, ছোটমামা কুসঙ্গ ত্যাগ করে, আগ্রহের সঙ্গে গুরুদেবের আগমনের অপেক্ষায় থাক্‌লেন। পৌষ মাসের আরম্ভেই শ্যামলবাবুদের বাগানে গুরুদেবের তাঁবু পড়েছে শুনে ছোটমামা আগেবাগে ছুটে গিয়ে গুরুদেবের দুই পা জড়িয়ে ধরলেন। গুরুদেবও উদ্ধত ছেলেটার সুমতি হয়েছে দেখে, মহা প্রসন্ন হ'য়ে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আর পাশের ফুলের সাজি থেকে একটা আশীর্বাদী স্থল-পদ্ম তুলে তার হাতে দিলেন।

ছোটমামা হাত জোড় করে ফুল নিতে যাবেন, হঠাৎ চোখ পড়ল গুরুদেবের ডান হাতের বকবার আঙ্গুলে একটা লাল পাথর দেওয়া আংটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, তার গায়ে মকরের মুখ খোদাই করা। ভীষণ চমকে গিয়ে ছোটমামা গুরুদেবের মুখের দিকে চাইলেন। গুরুদেব দু'চোখ বুজে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন।

এযুগের বিশল্যকরণী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, তাঁর বাঁচবার বুঝি কোন আশাই নেই! তখন হনুমান ছুটল গন্ধমাদন পাহাড়ে। সেই পাহাড়ে ছিল বিশল্যকরণী গাছ। হনুমান গাছ খুঁজে না পেয়ে পাহাড়শুদ্ধ উপড়ে আনল। তারপর সেই গাছ বার করে তার থেকে ওষুধ তৈরী করে তাই দিয়ে লক্ষ্মণকে বাঁচানো হল। অদ্ভুত গাছ ছিল এই বিশল্যকরণী! এমন ওষুধ নাকি আর হ'ত না। যত কঠিন আঘাত, যত কঠিন রোগই হোক না কেন, এই এক ওষুধেই কাজ দিত অব্যর্থ।

এ হল ত্রেতা যুগের কথা। বিশল্যকরণী গাছ নাকি এখনও পাওয়া যায়, কবিরাজী চিকিৎসায় প্রয়োগও করা হয় কঠিন কঠিন রোগে। তবে সে খাঁটি বিশল্যকরণী কিনা—অর্থাৎ তার কার্যকরী শক্তি এখনও ত্রেতা যুগের মতই আছে কিনা—আমার জানা নেই।

কিন্তু তা না জানলেও সম্প্রতি নতুন ক'রে এমন দু-একটি ওষুধের কথা আমরা জানতে পেরেছি যাদেরকে এ যুগের বিশল্যকরণী বললে হয়তো খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। আজকাল ডাক্তারেরা নানান রোগে এগুলি এত বেশী ব্যবহার করছেন এবং এত অব্যর্থ ফল পাচ্ছেন যে, এগুলি এখন আমাদের কাছেও খুব পরিচিত হয়ে গেছে।

পেনিসিলিন আর স্ট্রেপটোমাইসিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পেনিসিলিনের কথা আমরা শুনিনি—যদিও এর আবিষ্কার হয়েছিল তার অনেক আগেই। পেনিসিলিনের আবিষ্কার কি ক'রে হয়েছিল সে গল্প বেশ মজার।

অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং হচ্ছেন একজন নামকরা বিজ্ঞানী—জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। একদিন ফ্লেমিং সাহেব লণ্ডনের এক হাসপাতালে বসে কাজ করছেন, সামনে ছড়ানো রয়েছে নানা রকম রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, ওষুধবিষুধ—যেমন ল্যাবোরেটরীতে থাকে। আর রয়েছে একটা কালচার প্লেট। কিছুক্ষণ আগে ফ্লেমিং সাহেব এই প্লেটে এক রকমের জীবাণুর চাষ করেছিলেন—স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর। ভারী মারাত্মক জিনিষ এটা।

হাতের কাজ শেষ করে ফ্লেমিং প্লেটটা তুলে নিলেন পরীক্ষা করবার জন্য। কিন্তু একি কাণ্ড! প্লেটের ওপর এরই মধ্যে কেমন এক রকম সবুজ ছাতা ধরে গেছে! স্যাঁৎসেঁতে, অপরিষ্কার জায়গায় কোন কিছু ফেলে রাখলেই এমন ছাতা ধরতে পারে; কিন্তু এখানে, এই পরিষ্কার জায়গায় এ রকম ছাতা এল কোথা থেকে? আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল, সবুজ ছাতাগুলি শুধু ওখানে গজায়ই নি, ছাতার ধারে ধারে যে সব স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু ছিল সেগুলিও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে!

কোথায় গেল—কোথায় গেল? তবে কি ঐ সবুজ ছাতাই ওগুলিকে হজম করে ফেলল? ফ্লেমিং-এর ভীষণ কৌতূহল হল। কিসের ছাতা তা আবিষ্কার করতেও তাঁর বেশী সময় লাগল না।

ছাতাকে সাধুভাষায় বলা হয় "ছত্রাক", ইংরেজীতে বলে "ফাঙ্গাস"। অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর এক জাতের উদ্ভিদ এরা। এই বিশেষ সবুজ ছাতাটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে "পেনিসিলিয়াম নটেটাম"। পরীক্ষা করতে করতে ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন, এই ছাতার অদ্ভুত গুণ হচ্ছে—এর ভেতর এমন একটি জিনিষ আছে যা নাকি বেরিয়ে এসে নানা রকম মারাত্মক মারাত্মক জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে বলা যায় ঐ সব বিষাক্ত জীবাণু হচ্ছে ঐ সবুজ ছাতার খাদ্য, সবুজ ছাতা বাগে পেলেই ঐ জীবাণুদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।

ফ্লেমিং দেখলেন ভারী মজা তো! আমাদের সমস্ত ব্যারাম-পীড়ারই তো মূল হচ্ছে এই সব দুরন্ত জীবাণু। কাজেই এই সবুজ ছাতার সাহায্যে তো তা হলে ঐসব রোগজীবাণুও ধ্বংস করে কঠিন কঠিন রোগ সারাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে! তিনি তখন ঐ সবুজ ছাতা—অর্থাৎ পেনিসিলিয়াম নটেটাম্ ভালো করে চাষ করার পদ্ধতি আবিষ্কারে লেগে গেলেন এবং প্রচুর পরিশ্রমের পর, তা বার করেও ফেললেন। দেখা গেল ছাতাগুলি বিশেষভাবে তৈরী এক রকম ক্বাথের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জন্মায়, আর জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের শরীর থেকে ঐ অদ্ভুত জিনিষটি বেরোতে থাকে জীবাণু ধ্বংস করতে যার জুড়ি নেই। ফ্লেমিং ঐ জিনিষটিকেও আলাদা করে ফেলতে ছাড়লেন না, আর পেনিসিলিয়াম নটেটাম থেকে জন্মায় বলে ওর নামকরণ করলেন "পেনিসিলিন"।

ওষুধ তো তৈরী হল, কিন্তু রোগীর ওপর ওর পরীক্ষা করাও তো দরকার। এমনও তো হতে পারে যে, ঐ ওষুধ মারাত্মক মারাত্মক জীবাণু ধ্বংস করতে যেমন পটু তেমনি মানুষের শরীরও আক্রমণ করতে পিছু-পা নয়। রোগ ধ্বংস করবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকেও যদি ধরে সাবাড় করে দেয় তবে তো ভীষণ কথা!

পরীক্ষা করার সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে তেমন জুটল না—জুটল কয়েক বছর পরে, বিশ্বজোড়া মহাযুদ্ধ সুরু হবার পর।

যুদ্ধের ফলে নানান রকম নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরী হল—মানুষের শরীরে সেগুলির প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিল নতুন নতুন ব্যাধি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাজ বেড়ে গেল—নতুন নতুন ওষুধের সন্ধানে তাঁরা চারদিক হাতড়াতে লাগলেন। অনেক অজানা ওষুধ, অনেক পুরানো ওষুধ নিয়ে আবার নতুন করে পরীক্ষা সুরু হল মানুষের ওপর। পেনিসিলিন নিয়েও আবার সুরু হল পরীক্ষা নতুন করে।

পরীক্ষায় পাওয়া গেল অদ্ভুত ফল। ডাক্তারেরা বললেন, এর এটার কথা আগে জানতাম না! এমন ওষুধ যে আমাদের শাস্ত্রে নেই বললেই চলে!

তারপর পেনিসিলিন কি করে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আসর জাঁকিয়ে বসল সে কথা তো সবাই জানে। এর আবিষ্কারক অধ্যাপক ফ্লেমিংকেও নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল।

কিন্তু পেনিসিলিন সব জীবাণুর ওপর কাজ করে না—কতকগুলো বিশেষ বিশেষ জীবাণুর ওপরই এদের শক্তি সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া খুঁটিনাটি কিছু কিছু অসুবিধাও আছে এর ব্যবহারে।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন খুঁজতে—এই জাতীয় বা এর চেয়েও ভালো কোন ওষুধ পাওয়া যায় কিনা।

পাওয়া গেল মাটী থেকে। স্ট্রেপটোমাইসিন। এবারে সে গল্প বলি।

মানুষ মারা গেলে ওদেশে প্রায় সকলকেই কবর দেয়। আর মানুষে বেশীর ভাগই মারা যায় কোন কঠিন রোগে। অনেকদিন আগে একদল বিজ্ঞানী এই থেকে ভাবলেন, তাই যদি হয়, তবে গোরস্থানের মাটীতে নিশ্চয়ই ঐ সব কঠিন রোগের জীবাণু বা বীজাণু পাওয়া যাবে। কারণ, মৃতদেহ থেকে ঐ জীবাণু নিশ্চয় মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু

সে সব জীবাণু নেই! কোথায় গেল সেগুলো?

বিজ্ঞানীরা জানতেন জীবজন্তুর মধ্যে যেমন পরস্পর হানাহানি চলে জীবাণুদের মধ্যেও তেমনি হয়। অনেক জীবাণু আছে যারা অন্য জীবাণুদের মেরে খেয়ে ফেলে। নিশ্চয়ই তা হলে এখানেও সেই রকম ঘটেছে গোরস্থানের ঐ মাটীতে এমন কোন জীবাণু রয়েছে যা ঐ দুরন্ত রোগ-জীবাণুগুলোকে খেয়ে হজম করে ফেলেছে!

এবং তাই যদি হয় তবে তো ঐই জীবাণুগুলো মানুষের পরম বন্ধু বলতে হবে। ওদের সংগ্রহ করে, তাই দিয়ে ওষুধ বানিয়ে যদি সে ওষুধ রুগ্ন মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যায় তা হলে হয়তো তাদের সহজেই রোগমুক্ত করা যেতে পারে। তখন বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন মাটী নিয়ে পরীক্ষা করতে,—মাটীর ভিতরকার ঐ সব শিকারী জীবাণুকে খুঁজে বার করা যায় কিনা দেখতে। এই রকম একজন বিজ্ঞানী হচ্ছেন ডাঃ সেল্‌ম্যান্‌ ওয়াক্‌স্‌ম্যান।

ওয়াক্‌স্‌ম্যান জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌ কৃষিবিজ্ঞানী রোগের ডাক্তার নন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক চাপল এ কাজ তিনি হাসিল করবেনই। কিন্তু কাজটা তো বড় সহজ নয়! এক কণা মাটির মধ্যে লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি জীবাণু ভিড় করে আছে। তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন জাতের জীবাণু বেছে তাকে পৃথক করে ফেলা—এ যে কী অসম্ভব একাগ্রতা আর ধৈর্যের কাজ তা যারা ও নিয়ে কাজ করেছে তারাই জানে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলল তাঁর সাধনা। ওয়াক্‌স্‌ম্যান্‌ স্লাইডের ওপর কতকগুলি বিষাক্ত রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেন। তারপর যে মাটি নিয়ে পরীক্ষা করবেন তা জলে গুলে ঐ স্লাইডের ওপর ঢেলে দেন। তারপর সেই স্লাইড অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে বসিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে থাকেন কোথাও কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা,—স্লাইডের কোনও জায়গায় কোনও রোগ-জীবাণু মুছে গেছে কিনা। দশবার—বিশবার—শতবার—হাজারবার পরীক্ষা করেন। ধৈর্যের বাঁধ তাঁর এতটুকু ভাঙ্গে না। তারপর হয়তো দেখা গেল স্লাইডের কোন জায়গায় সত্যি রোগজীবাণু কমে গেছে। তখন খোঁজো কোন্‌ জীবাণু এর জন্য দায়ী। অবশেষে সে জীবাণুও যদি খুঁজে পাওয়া গেল, তখন দেখ তার মধ্যে কি এমন রাসায়নিক পদার্থ আছে যা এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

এত করেও নিস্তার নেই। সেই রাসায়নিক পদার্থ বার করার পরে হয়তো দেখা গেল ও জিনিষ রোগ-জীবাণু ধ্বংস করতে যেমন পটু, মানুষের শরীর ধ্বংস করতেও তেমনি ওস্তাদ্‌। মানুষের দেহে প্রয়োগ করলে রোগের সঙ্গে রোগীও একদম খতম্‌ হয়ে যাবে।

অবশেষে সেটা ১৯৪৩ সাল, একদিন ভাগ্যদেবী ওয়াক্‌স্‌ম্যানের ওপর প্রসন্ন হলেন। সেদিন তিনি মাটি থেকে তাঁর সহকারী আলবার্ট শাজের সাহায্যে "স্ট্যাক্‌টিনোমাইসেস্‌ গ্রীসিয়াস্‌" নামে একরকম জীবাণু বার করে ফেললেন। শুধু জীবাণু নয়, তার ভিতরকার রাসায়নিক পদার্থটুকুও। মনে হল, এতদিন ধরে যা চাইছিলেন ঐ বুঝি তাই। তিনি এর নাম দিলেন "স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন্‌"।

আগেই বলেছি ওয়াক্‌স্‌ম্যান্‌ নিজে ডাক্তার নন, তাই এবারে তাঁর ডাক্তারের সাহায্যের প্রয়োজন হল। এগিয়ে এলেন পঞ্চাশজন ডাক্তার।

প্রথমে পরীক্ষা হল ইঁদুর, গিনিপিগ—এদের ওপর। অদ্ভুত ফল পাওয়া গেল। তার পর মানুষ রোগী। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। নানারকম কঠিন রোগীতে হাসপাতালগুলি ভর্তি। কাজেই ডাক্তারেরা নির্বিবাদে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, পেটের ঘা, খাদ্যে বিষক্রিয়া, সেপ্‌টিক ফিভার—যে অসুখে ব্যবহার করা গেল তাতেই পাওয়া গেল আশ্চর্য ফল। শেষে দুরন্ত যক্ষ্মারোগও এ ওষুধের কাছে হার স্বীকার করল। চিকিৎসাজগতে এল যুগান্তর।

ওয়াক্‌স্‌ম্যান শুধু স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারই করলেন না কি করে ভালভাবে 'গ্রীসিয়াস্‌' জীবাণুর চাষ করা যায় তাও বার করলেন। দেখা গেল এটিও পেনিসিলিনের মত, একটি বিশেষভাবে তৈরী ক্বাথের মধ্যে ভালো জন্মায় আর ধীরে ধীরে তা থেকে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন বেরিয়ে এসে ঐ ক্বাথে জমা হয়। তারপর ক্বাথ থেকে ওটি আলাদা করলেই হ'ল। অবশ্য সে কাজটা খুব সহজ নয়।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখনও ক্ষান্ত হন নি। পেনিসিলিনের সঙ্গে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন মিশিয়ে তাঁরা এক নতুন ওষুধ তৈরী করেছেন। এর ফলে নাকি দুটোরই গুণ একত্র হয়েছে, আর একের ত্রুটি অপরে ঢেকে দিয়েছে। মৃত্যুকে জয় করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু অকাল-মৃত্যুকে কি জয় করা যায় না? ডাক্তারেরা আশা করছেন, এই নতুন অস্ত্র নিয়ে তাঁরা একবার ভালো করে এ বিষয়ে বোঝাপড়া করে নিতে পারবেন।

মহা-পালোয়ান এসেছে সভায়, সবাই খাতির করে!
লোহার মতন হাতের কব্জি টেনে টেনে কেউ ধরে;—
নাড়াতে পারে না, ছাড়াতে পারে না হাতটি ধরিলে চেপে।
হাসি-হাসি মুখ, বিগলিত মন। সহসা উঠিল ক্ষেপে!
কেন না বগলা বলিয়াছে তার সমুখে আসিয়া—'এ কি,
আপনি মশায় আমার চেয়েও বেশী ছোটলোক দেখি!'

স্তব্ধ তখন সভাতল; বীর ছাড়িল তাহার গলা—
'কয়েন আবার কি যে কইলেন!' চলে বগলার বলা—
'আপনি আমার চেয়ে ছোটলোক!' পেশী ফুলে ফুলে ওঠে,
ব্যায়ামবীরের দুটি চোখে যেন আগুনের গোলা ছোটে;
কি করিবে, ভেবে পায় না সে মোটে, বলিতে পারে না খুলে,—
বন্দা মারে, না মাটিতে আছাড় লাগায় দু'হাতে তুলে!

কহিল বগলা—'মানেটা বুঝুন', কিন্তু ভ্যাবাচাকা খেয়ে—
'আলবৎ ত' বটে, আপনি মাথায় ছোট যে আমারো চেয়ে!'

সন্ধ্যাবেলা শম্ভু খুড়ো নৌকা ভাড়া করেন,
চেনা মাঝির সাক্ষাতে ক'ন—"জোরে চালাও হরেন,
কাল্‌কে ভোরেই পৌঁছাতে চাই আমার দেশের বাসায়";
এই-না বলেই বিছ্‌না পাতেন নিদ্রা-সুখের আশায়।
বৃদ্ধ মাঝি হরেন বলে, "ভয়টা বাবু মিছাই,
ঘুমান্‌ সুখে ছইয়ের তলে,—এইটুকু পথ কি-ছাই?
তর্‌তরিয়ে নৌকা আমার ছুট্‌বে ভাঁটির টানেই
সারাটা রাত দাঁড়টি টেনে চলব দেশের পানেই।
ভোরের বেলাই একেবারে পৌঁছে যাবেন দেশেই।"
অভয় দিয়ে বলে বুড়ো ফোক্‌লা হাসি হেসেই।
শম্ভু খুড়ো খুশি হলেন হরেন বুড়োর কথায়,
ছইয়ের নীচে ঢোকেন গিয়ে,—বিছ্‌না পাতেন তথায়।
কাল সকালেই জরুরী কাজ, মামলা আছে তাঁহার,
মিষ্টি-লুচি সঙ্গে আনেন; হয়নি ঘরে আহার।
ঘরে যা খান্‌, নৌকা চেপে খেলেন তাহার ডবল,—
এমন সময় ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি এলো প্রবল।
শম্ভু খুড়ো ছইয়ের তলে এবার শুয়ে পড়েন,
ছপ্‌ছপিয়ে দাঁড় টেনে যায় বৃদ্ধ মাঝি হরেন।
চিন্তা কি আর, কাল সকালেই সূর্য ওঠার আগেই—
পৌঁছে যাবেন দেশের ঘরে, ভাব্‌তে ভালো লাগেই।
ছইয়ের ছোট জান্‌লা দিয়ে দেখেন তিনি এবার,
আঁধার জুড়ে জোনাকি দল চল্‌ছে উড়ে দেদার।
বৃষ্টি জলের ছাট লাগে গায়, লাগিয়ে দিলেন আগল,
ধারায় ভিজে গাঙের জলে ব্যাংগুলি আজ পাগল।
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকছে তারা, শম্ভু শোনেন আবার,—
শিয়ালগুলি ডাকছে দূরে, ফিরছে খুঁজে খাবার।
নৌকা দোলে ঢেউয়ের তালে, শম্ভু খুশি তাতেই,
নাকটি ডাকান গভীর সুরে চক্ষু বোজার সাথেই।

শম্ভু খুড়োর ঘুম ভেঙে যায়, সদ্য তখন প্রভাত,
বিছ্‌না ছেড়ে তড়াক্‌ করে লাফিয়ে ওঠেন হঠাৎ।
দেখেন তিনি বৃদ্ধ মাঝি দাঁড় টেনে যায় ধীরেই
বাইরে এসেই শম্ভু খুড়োর বজ্র পড়ে শিরেই।
দেখেন তিনি ভোরের আলোয় এলেন তিনি কোথায়?
যেখানে তাঁর নৌকা ছিল নৌকা আছে তথায়।

"আজব ব্যাপার, ওহে হরেন, সারলে তুমি মোরেই,
একই ঘাটে নৌকা চালাও 'সারাটা রাত' ধরেই?"
তাই-না শুনে চমক্‌ ভাঙে বৃদ্ধ হরেন মাঝির,—
"ঐ যাঃ, রাতে হয়নি খোলা গিঁটখানা ঐ কাছির।
গাছের সাথে কাছি বাঁধা, নেইনি সেটা খুলেই,
পরিশ্রমটা বৃথাই গেল একটুখানি ভুলেই।"
এই-না বলে হুঁকো নিয়ে টান্‌লো ভড়ুক্‌ ভড়ুক্‌,
শম্ভু খুড়ো হতভম্ব, চক্ষু হোলো চড়ুক্‌।

আচম্‌কা বদলীর পরোয়ানা পেয়ে চাটগাঁ থেকে লুংলে যাবার পথে, মিলিটারীর চাকরী জীবনে এক রাত্রির জন্য ডিমাগিরির ডাকবাংলোতে রাত কাটাতে হয়েছিল।

আসামের পার্বত্যসঙ্কুল জায়গা। অনেকটা খাড়াই উঠে পাহাড়ের উপরে অস্থায়ী একটি টিনের চালা তুলে বাংলো তৈরী করা হয়েছে মিলিটারী অফিসারদের সুবিধার জন্য।

চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় ও দুর্ভেদ্য জংগলের ঘন সবুজ রহস্যঘেরা প্রাচীর। বহুনিম্ন দিয়ে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণফুলীর মূল অগভীর ধারাটি। বর্ষায় স্ফীতা হয়ে ওঠে কিন্তু শীতে শীর্ণা হয়ে পড়ে। পাহাড়ী উঁচু নীচু দীর্ঘ এগার মাইল পথ পায়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে শীতের এক সন্ধ্যায় আমি, মেজর ক্রিশ্চান ও অর্ডারলী রামসিং এসে বাংলোয় আশ্রয় নিলাম।

নীচে শীতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও পাহাড়ের উপরে তখনও একটা আবছা আলোছায়া মায়াজালের মত চারিদিকে থির থির করে কাঁপছে। দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে তোড়ে নদীর উৎস নেমে আসছে তারই গুম্‌ গুম্‌ শব্দ কানে এসে বাজছে দূরাগত ঢাকের বাদ্যির মত দুম্‌ দুম্‌ দুম্‌!......

বাংলোয় পাশাপাশি মাত্র দুটি ঘর। ঘরের চারদিকে কাঁচা বাঁশের চাচড়ীর বেড়া।

হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘনায়মান শীত রাত্রির।

বাংলোকীপার একজন লুসাই। নাম লাউঙ্গা। বয়স চল্লিশের বেশী নয়। আমাদের সাড়া পেয়ে সেলাম দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মলিন রুক্ষ চুল।

পরিধানে বটলগ্রীণ মলিন একটা বড় সাইজের মিলিটারী ঝল্‌ঝলে প্যান্ট। গায়ে অনুরূপ একটি জ্যাকেট ঢলঢল করছে।

'কেয়া খানা হোগা সাব!—'

'ভাত আর মাংস!—' সঙ্গে আমাদের একটা চিকেন ছিল রামসিংকে বললাম সেটা নিয়ে গিয়ে রান্না করবার জন্য।

লোকটা চলে যাচ্ছিল তাকে ডেকে বললাম, থোরা গরম পানি গোসলকে লিয়ে মিলে গা রে!

'মিলেগা সাব!—'

আহারাদির পর রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ বাংলোর দুটো ঘর আমি ও মেজর ক্রিশ্চান দুজনে আশ্রয় নিলাম।

নিদারুণ পথশ্রমের ক্লান্তিতে গায়ে কম্বল চাপিয়ে শয্যায় শুতে না শুতে চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরটা অন্ধকার।

আলোটা জেলে দরজাটা বন্ধ করে শুয়েছিলাম। চেয়ে দেখি হা হা করছে ঘরের দরজাটা খোলা এবং সেই খোলা দরজাপথে হু হু করে শীত রাত্রির পাহাড়ী ঠাণ্ডা হাওয়া বেপরোয়া ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করছে। আলোটা বোধহয় সেই হাওয়াতেই একসময় কখন নিভে গিয়েছে।

কম্বলের তলাও যেন ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম থাক অমনি, কিন্তু সাধ্য কি দরজাটা খুলে শুয়ে থাকি! কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডারে বাবা! হাড় শুদ্ধ জমে গেল বুঝি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালাম।

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম। বাইরের দিকে তাকাতেই সদ্যঘুমভাঙা চোখ দুটি আমার যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল।

নিজের অজ্ঞাতেই পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বাইরের খোলা অপ্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

মধ্য রাত্রি।

মেটে মেটে চাঁদের আলো শীত রাত্রির অস্বচ্ছ কুয়াশার সঙ্গে জড়িয়ে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে।

দূরে অস্পষ্ট পাহাড় ও জঙ্গলের ধূসর ইংগীত চারিদিকে মধ্য শীতরাত্রির অদ্ভুত এক নীরবতা। সহসা সেই নীরবতা ছিন্ন হয়ে গেল দীর্ঘায়িত কার করুণ কণ্ঠের ডাকে: লা-তি-য়া—য়া। লাতিয়া।

নিঝুম নিঃশব্দ রাত্রি যেন কাকে ডেকে ডেকে খুঁজছে

লাতিয়া! লাতিয়া!....

এমন করুণ কান্নার মত ডাক জীবনে আর কখনো শুনিনি।

লাতিয়া! লাতিয়া!

কোথা থেকে কে কাকে ডাকছে অমন করে করুণ কণ্ঠে এই মধ্য রাত্রে!

এগিয়ে গেলাম বারান্দার শেষ প্রান্তে কিসের কৌতূহলে কে জানে!

অস্পষ্ট আলোছায়ায় তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকালাম।

ডাকটা তখনও শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে: লাতিয়া! লাতিয়া!...পুরুষকণ্ঠের ডাক।

সহসা যেন বহুদূর হতে নারীকণ্ঠের ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা প্রত্যুত্তর এলো ভেসে: বাউংগা!

বাউংগা! চমকে উঠলাম! এই বাংলোরই সেই লুসাই কীপারটার নামই ত বাউংগা।

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে আঁকা-বাঁকা এবড়ো খেবড়ো পায়ে চলা পথে বাংলো থেকে নীচের দিকে একেবারে নদীর পার পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

নদীর একেবারে জলের কোলঘেঁষে একটা উঁচু পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল যেন অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি হাতে একটা লণ্ঠন মাথার উপরে দোলাতে দোলাতে ডাকছে: লাতিয়া! লাতিয়া!...

চিরদিনের অলাপপ্রিয় আমি, পথেঘাটে কাউকে দেখলেই মিলিটারীর ঘরছাড়া জীবনে কাউকে দুদণ্ড পেলেই আলাপ না করে পারতাম না।

আজ রাতে খাবার সময়ই দুচারটে কথায় বাউংগার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম: লোকটা বছর দেড়েক হলো এখানে আছে একাই! নিঃসঙ্গ একক জীবন। বাংলোর অল্প দূরে ছোট একটা চালা ঘরে লোকটা থাকে। তবে শীতের এই মধ্যরাত্রে আলো দুলিয়ে দুলিয়ে কাকে অমন চীৎকার করে ডাকছে বাউংগা!

আশেপাশে কাউকে হয়ত ডাকছে। বার্কিং ডিয়ারের কয়েকটা ডাক শোনা গেল। আশেপাশে কোথায়ও পাহাড়ী বার্কিং ডিয়ার ফসল ক্ষেতে বা নদীর জলে তৃষ্ণা মিটাতে বেরিয়েছে হয়ত। হঠাৎ আবার বাউংগার গলা শোনা গেল: লাতিয়া! লাতিয়া!......

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতই যেন নারীকণ্ঠে জবাব এলো: বাউংগা!...বাউংগা!

মনে হলো যেন খুব কাছে থেকেই জবাবটা এলো এবার। তারপরই দুড়দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা লক্ষ্য করে চেয়ে দেখি একটা ছায়ামূর্তি প্রায় ছুটতে ছুটতে এই পাহাড়ে উঠবার পায়ে-চলার পথটা ধরে নীচের দিকে নামছে।

দাঁড়িয়ে রইলাম নীচের দিকে সেই দ্রুত চলমান ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে।

ছায়ামূর্তিটা নামতে নামতে হঠাৎ সুমিষ্ট মেয়েলী কণ্ঠে খিল্ খিল্ করে যেন হেসে উঠলো। হাসিত নয় যেন কলোচ্ছল একটি ঝর্ণাধারা উচ্ছ্বসিত আনন্দে পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

নামছে ঝর্ণাধারাটা কল কল ছল ছল আনন্দে: হঠাৎ স্তব্ধ নিশুতি রাতকে দীর্ণবিদীর্ণ করে একটা রাইফেলের ক্রুদ্ধ গর্জন চারিদিকে ছড়িয়ে গেল: দুড়ুম।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকি! একটা দীর্ণ আর্ত নারী কণ্ঠের চীৎকার। তারপরই দেখলাম সেই চলমান নারী মূর্তিটা গড়াতে গড়াতে নীচে পড়তে লাগল পাহাড়ী ঢালু পথ বেয়ে এবং সর্বশেষে কোন ভারী বস্তু কিছু একটা জলে গিয়ে পড়বার মত ঝুপ্ করে একটা শব্দ হলো।

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপরই সব ভুলে একলাফে বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে সেই ঢালু পথ ধরে নদীর দিকে নীচে নামতে লাগলাম একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই।

সেই পাথরটার কাছে পৌঁছে দেখি সত্যি দাঁড়াই বাউংগা হাতে একটা জ্বলন্ত হারিকেন হাতে স্থাণুর মত পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কেউ নেই!

চীৎকার করে বললাম: কে যেন কাকে গুলী করল বাউংগা!—

'হামার লাতিয়াকে সাব্।—' বলে লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো!

'লাতিয়া! লাতিয়া কোথায়?—'

'ওই জলের মধ্যে পড়ে গেছে। মরে গেছে সাহেব সে। আর তাকে পাওয়া যাবে না!—'

ঝোঁকের মাথায় জলের মধ্যে নেমে মৃতদেহটা বোধহয় তুলতে যাচ্ছিলাম, বাউংগা বাধা দিয়ে বলল: জলের মধ্যে ত লাতিয়া নেই, সাহেব!

'তবে?—'

'ও তার প্রেতাত্মা! রোজ মাঝ রাতে এমনি করে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এসে জলের মধ্যে গুলী খেয়ে পড়ে যায়। ও লাতিয়া নয়: তার প্রেতাত্মা!—'

'প্রেতাত্মা!—'

'হ্যাঁ!—'

ভাঙা ভাঙা হিন্দি ও লুসাই ভাষায় মিশিয়ে বাউংগা সে রাত্রে যা বলেছিল সবটা তার বুঝতে না পারলেও যেটুকু বুঝেছিলাম, গত বৎসর আমাদেরই মত এক মিলিটারী সাহেব এসে ঐ বাংলোয় রাত্রি কাটাবার জন্য ওঠে। সাহেবের ছিল শিকারের খুব ঝোঁক! রাত্রে নদীতে বার্কিং ডিয়ার জল খেতে আসে শুনে সাহেবের সাধ জাগে রাত্রে হরিণ শিকার করার। সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বাউংগা

জঙ্গলের ধারে, হরিণ এলে সে তাড়া দিয়ে নীচের দিকে পাঠাবে। ঐ ভাবে একটা হরিণ শিকার করবার পর দুজনে উপরে উঠে এসে লাতিয়াকে না দেখতে পেয়ে বাউঙ্গা চিন্তিত হয়ে ওঠে। চারিদিক খুঁজেও তাকে না পেয়ে আলো জেলে আবার নীচে নদী কিনারে গিয়ে ডাকতে থাকে লাতিয়া লাতিয়া বলে। কৌতুকপ্রিয় লাতিয়া লুকিয়ে স্বামীর সঙ্গে কৌতুক করছিল। এমন কৌতুক স্বামীর সঙ্গে সে প্রায়ই নাকি করত। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ডাকে বনের আড়াল থেকে বের হয়ে স্বামীর কাছে বোধহয় ছুটে যাচ্ছিল এমন সময় দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। লাতিয়ার পদশব্দে হরিণ ভেবে বাউঙ্গা বাধা দেবার আগেই সাহেবের হাতের রাইফেল দ্বিতীয়বার গর্জে উঠলো। এবারের লক্ষ্যও ব্যর্থ হলো না। গুলীবিদ্ধ লাতিয়া একটা আর্ত কাতর শব্দ করে গড়াতে গড়াতে একেবারে ঝপ্ করে নদীর জলের মধ্যে এসে পড়লো।

তারপর হতে এমনি করেই প্রতি রাত্রির মধ্যযামে কে যেন আলো হাতে বাউঙ্গাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় ঘরের দরজা খুলিয়ে নীচে ঐ নদী কিনারে। তার হারিয়ে যাওয়া লাতিয়ার খোঁজে।

গলা ছেড়ে ও আজও প্রতি রাত্রে ডাকে, লাতিয়া, লাতিয়া। যেমন করে সে রাত্রেও ডেকেছিল পাথরটার উপর আলো হাতে দাঁড়িয়ে। কৌতুকপ্রিয়া লাতিয়া আজও সাড়া দেয়; বাউঙ্গা!...তারপর গুলীবিদ্ধা হয়ে গড়িয়ে জলে গিয়ে পড়ে।

কাহিনী যখন শেষ হলো দেখি বাউঙ্গার শীর্ণ গালের দুদিক দিয়ে নেমেছে চকচকে দুটি ক্ষীণ জলের ধারা। ভোরের আলোর পূবের আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে এবং কখন না জানি ইতিমধ্যে এক সময় মেজর ক্রিশ্চানও ঘুম ভেঙে পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শুনছে বাউঙ্গার কাহিনী। ডিমাগিরীর বাংলোর এক রাত্রি শেষ হলো।
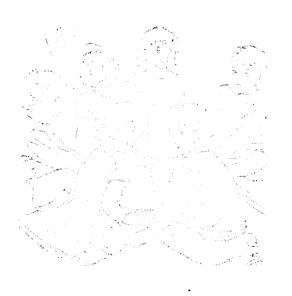
খুকু। ঘোড়ার ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার থেকে গড়িয়ে পড়ি
টগবগ টগবগ।

আঁখি। গোল তাকিয়া ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি
টগবগ টগবগ।

মুনিয়া। ভুঁড়ির ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
দাদু নড়লে আমিও নড়ি
টগবগ টগবগ।

খুকু। যা রে ঘোড়া ছুটে যা
খেতে দেব গরম চা।

আঁখি। চল রে ঘোড়া ছুটে চল
খেতে দেব ঠাণ্ডা জল।

মুনিয়া। নাচ রে ঘোড়া জোরে নাচ
খেতে দেব নরম ঘাস।

তিন জনে। টগবগ টগবগ ছোটে ঘোড়া
নামে ঘোড়া ওঠে ঘোড়া।
বেড়া দেখে লাফায় ঘোড়া
গর্ত দেখে ঝাঁপায় ঘোড়া।
নাচে ঘোড়া খেলে ঘোড়া
শেষ কালে দেয় ফেলে ঘোড়া।
হুড়মুড়িয়ে পড়ি রে
আর কি ঘোড়ায় চড়ি রে।

এর পর কোন কারণেই চাঁদা আর দেবেন না স্থির করলেন দীনদয়ালবাবু।

এ পাড়ায় নতুন বাড়ী করে প্রাণ তাঁর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চাঁদা দিতে দিতে। দু' টাকা, এক টাকা করে ২১৷০ আনা চাঁদা দিতে হয়েছে এবার তাঁকে সরস্বতী পুজোয়। এক পাড়ার মধ্যে বড়দের, ছোটদের, তস্য ছোটদের করে শেষে আট আনা, চার আনা পর্যন্ত দিয়ে তবে তিনি রেহাই পেয়েছেন।

ক'দিন চাঁদার জ্বালায় ভোরের দিকেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তেন দীনদয়াল, এখানে-ওখানে ঘুরে বাড়ী ফিরতেন পড়ন্ত রোদ মাথায় করে। কিন্তু তাতেও কি রেহাই ছিল নাকি? সেই সময়েই এসে ধরত ছেলেগুলো তাঁকে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বাঘের মত ওত পেতে বসে থাকত যেন তারা; ওঁকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। উনি চার আনা দিতে চাইলে এক টাকা আদায় করে তবে ছাড়ত।

রিটায়ার্ড মানুষ দীনদয়াল। সারাটা জীবন চাকরি-বাকরি করে যা জমিয়েছিলেন, তাই দিয়েই তুলেছেন এই বাড়ীটুকু। বাকী সামান্য যা পেনসন পান তাই থেকে কোনরকমে চলে তাঁর সংসার। খুব টেনেটুনে হিসেব করেই সব চালাতে হয়—একটু এদিক-ওদিক হলেই টানাটানি। কিন্তু তা'হলে কি হবে—বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বন এই পুজো-আচ্চাই সেরেছে তাঁকে। আজ দুর্গো, কাল কালী, পরশু সরস্বতী—এক পাড়ায় বারোটা দলের তেরটা পুজো—কেন রে বাবা, একসঙ্গে সবাই মিলে সার্বজনীন করলেই ত চুকে যায়—তা নয়, চাঁদা, চাঁদা, আর চাঁদা! এমন করে প্রত্যেক লোককে চাঁদা দিতে গেলে ছাপোষা লোক পারবে কেন!...

বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন আর এই সব কথাই ভাবছিলেন দীনদয়াল। এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

'কে?' প্রশ্ন করলেন দীনদয়াল।

'আমরা!' উত্তর এলো বাইরে থেকে।

'তোমরা কারা?' আবার প্রশ্ন করলেন দীনদয়াল।

'আমরা এই পাড়ারই- দরজাটা একটু খুলুন না দয়া করে!' ছেলেদের গলায় কে যেন বললে।

এই ছোঁড়াদের গলাকেই ভয় দীনদয়ালের সবচেয়ে বেশী। নিরাশ মনে উঠে তিনি দরজাটা খুলে দিলেন। খুলেই দেখেন, চার-পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে, দু'একজন তাদের মধ্যে মুখচেনা। এই সেদিন তারা ক্লাবের জন্যে সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিয়ে গেছে।

তাদের দেখেই তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আবার কি খবর তোমাদের—চাঁদা-টাঁদা নয় ত?

—'না স্যার, এ অন্য ব্যাপার!—আমাদের এই পাড়াতেই এক বাস্তুত্যাগী ভদ্রলোক থাকতেন ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে। কাল ভোররাত্রে হঠাৎ তিনি মারা গিয়েছেন। টাকার অভাবে এখনো তাঁর দাহ হয়নি। তাছাড়া তাঁদের এমন কেউ নেই যে সৎকারের ব্যবস্থা করে। তাই, আমরা পাড়ার পাঁচজনের কাছ থেকে কিছু কিছু তুলে তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করছি।'...

তাদের কথা শেষ হতে-না-হতেই দীনদয়াল বেশ ক্ষেপে উঠেই বলেন, 'সেই ত চাঁদার কথাই বাপু—তা তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন? এর জন্যে ত আলাদা সমিতি রয়েছে, তাদের খবর দিলেই পারো!'...

—'বলেন কি স্যার, পাড়ায় আমাদের 'বয়েজ ওন্ ক্লাব' থাকতে!'...

ওদের সঙ্গের অপর একটি ছেলে বললে, 'তাছাড়া আমরা পাড়ায় সবার কাছ থেকে ত নিচ্ছি না, শুধু আপনাদের মত চার-পাঁচজনের কাছ থেকে চার-পাঁচ টাকা করে তুলেই কাজ সেরে দিচ্ছি—এটা স্যার আমাদের পাড়ারই গৌরব!'

'ও:, এত লোক থাকতে আমাকে বুঝি ঐ চার-পাঁচজনের ভেতর থেকে বাদ দিতে পারলে না?—আমি একটা পয়সাও দেব না।' দীনদয়াল এক কথায় এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাকে একেবারে যেন ধূলিস্যাৎ করে দিলেন।

—'হিন্দু হিন্দুকে না রাখলে উপায় কি বলুন? তাছাড়া আপনার নাম দীনদয়াল—ও কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনি আর পাঁচ টাকা দিলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে—পাশের বাড়ীর ননীবাবুও পাঁচ টাকা দিয়েছেন।'...

ননীবাবুর ছেলে সন্টুও ছিল এই দলের মধ্যে। তার দিকে চেয়ে দীনদয়াল বললেন, 'তোমার বাবা বড়লোক তিনি পারেন, আমাদের মত লোকের পক্ষে এ কি সম্ভব?'

কিন্তু এ সত্ত্বেও বহু রগড়ারগড়ি ও জেদাজেদির পর হিসেবপত্তর করে কে কি দিয়েছে সব খবর জেনে, দীনদয়ালবাবু তিন টাকা দিতে রাজী হলেন।

—'সত্যি বলছেন স্যার—আর একটা টাকা দিয়ে দিন না' সন্টু একটু রহস্য করে বলতেই দীনদয়াল যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'তোমরা আমার শত্তুর ছাড়া মিত্তির নাকি?'

টাকা নিয়ে ছেলেরা চলে গেল বটে, কিন্তু দীনদয়াল বাবুর সুখের ঘুমটা সেদিন একেবারে মাটি হয়ে গেল তিন টাকার শোকে। কোন রকমে কয়েক ঘণ্টা এপাশ-ওপাশ করে সন্ধ্যানাগাদ এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পাশেই ননীবাবুদের বাড়ী গিয়ে ডাকলেন তাঁকে। ননীবাবু বেরিয়ে আসতেই বললেন, 'আর ত পারি না মশাই আপনাদের পাড়ায় চাঁদা দিতে দিতে!'

—'কেন, পুজো-আচ্চা নেই এখন আবার কিসের চাঁদা দিলেন?' ননীবাবু বললেন।

—'কেন, আপনি জানেন নি—ওই যে কে এক গরীব বাস্তুত্যাগী মারা গেছে, টাকার অভাবে সৎকার হচ্ছে না বলে ছেলেরা আজ দুপুরে চাঁদা নিয়ে গেল!' বললেন দীনদয়াল।

—'কই না, আমি ত কিছুই জানি না!' বিস্ময় প্রকাশ পেল ননীবাবুর কথায়।

দীনদয়াল যা সন্দেহ করেছিলেন ব্যাপারটা ঠিক তাই। তিনি ননীবাবুকে আর কিছু না বলে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সন্টু কোথায়?'

—'সে বোধহয় ওদের ক্লাবে গেছে।—কেন, সেকি ঐ ছেলেদের সঙ্গে ছিল নাকি?' প্রশ্ন করলেন ননীবাবু।

কিন্তু সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে দীনদয়াল হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। ওদের ক্লাব-বাড়ী তাঁর জানা ছিল। অলি-গলি পথের ভেতর দিয়ে গিয়ে তিনি হাজির হলেন সেখানে। যতই কাছাকাছি হতে লাগলেন ততই মাংস রান্নার তীব্র একটা গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল তাঁর নাকের মধ্যে। চুপি চুপি তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের বাইরের দিকে একটা জানালার ধারে। কয়েকটা বড় গাছের জন্যে সেদিকটা অন্ধকার। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরের সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। ছোটখাটো

একটি জগ্‌গি বসেছে। একটা বড় ডেক্‌চিতে মাংস চেপেছে। ডেক্‌চির ঢাকাটা ঠেলে ঠেলে সুগন্ধী ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে বাইরের দিকে। বারকোসের উপর একতাল আটা মাখা, লেচি করছে দু'তিন জনে। একটা চ্যাঙারিতে পটল ছড়ানো, ডুমো ডুমো করে আলু কোটা অন্য একটাতে। একটা বড় বঁটির উপর বসে সন্টু দু'ফালা করে বেগুন কুটছে। দারুণ সমারোহ। দীনদয়ালবাবু একটু ভাবলেন। ভাবলেন, তাঁরই ঘাড় মটকে মিথ্যে সংকারের কথা বলে টাকা তুলে হচ্ছে কিনা ফিস্ট! কী সাংঘাতিক ছেলে সব বাবা! তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত এক যোগে যেন মাথায় গিয়ে ঠেলে উঠতে চায়। কিন্তু তক্ষুণি কি ভেবে তিনি তার গতিরোধ করেন। তারপর জানলার ধার থেকে একেবারে সোজা এসে হাজির হন ক্লাব-রুমের মধ্যে।

হঠাৎ ভূত দেখলে যেমন হয় জ্যান্ত মানুষ দীনদয়ালকে দেখে ছেলেদের সকলের হাত-পা যেন একেবারে পেটের মধ্যে ঢুকে যাবার অবস্থা হল। কারু মুখ দিয়েই আর কথা বেরোয় না। দীনদয়াল নিজেই তাদের ভয় ভেঙে দিয়ে সহজভাবে কথা বললেন, 'ঘাটের কাজ সেরে এসে বুঝি আজ তোমাদের ফিস্টি হচ্ছে--তা বেশ বেশ, কিছু বেঁচেছিল বুঝি?'

সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সন্টু তাড়াতাড়ি বললে, 'এই ত কিছুক্ষণ হল ফিরছি আমরা।'

দীনদয়ালের চোখ দুটো একবার সন্টুর চোখের উপর পড়তেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

সহজভাবে মুখে হাসির রেশ টেনে দীনদয়ালবাবু বললেন, 'বেশ ভালই হয়েছে, ক'দিন ধরেই মাংস আনব আনব ভাবছিলুম, তা আমাকেও আজ তোমাদের দলভুক্ত করে নাও, তোমাদের সঙ্গে আজ আমারও নেমন্তন্ন এখানে।—কেমন?'

সকলেই প্রায় একসঙ্গে 'বেশ বেশ, এ ত আমাদের ভাগ্যি', চেঁচামেচি করে উঠল। সকলেই ভাবলে, আর কিছু গণ্ডগোল না করে বুড়ো যে খাবার কথা তুলেছে এই যথেষ্ট!

কিন্তু খাবার সময় যা কাণ্ড ঘটল তা আর কহতব্য নয়!

বাষট্টি বছরের দীনদয়াল মরিয়া হয়ে একাই তিন-চারজনের খাবার খেয়ে ফেললেন। যেন গোগ্রাসে গিললেন লুচি, মাংস, মিষ্টি।

সবার আগেই খাইয়ে দেওয়া হল তাকে। খাওয়া শেষ হবার মুখে সন্টু চুপি চুপি কাকে যেন বললে, 'দেখলি, বুড়ো উসুল করে নিলে সবটাই!'

সে কথা দীনদয়ালের কানে গিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর যাবার মুখে তিনি অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলে গেলেন, 'পেটে খেয়ে আমার খানিকটা উসুল হ'ল বটে, তবে তোমাদের পিঠে কিছু পড়লে মনটা আরও খুশি হ'ত।'

মোরা বাংলা দেশের মেয়ে,
ঘাট-আঘাটায় নায়ে বেড়াই,
যখন যা পাই বয়ে নে' যাই,
ভাই পত্তর পত্তর বেয়ে।
ঝড়-ঝাড়িতে উলসে উঠি,
থৈয়া ঢেউ-এ ঢেউ-এ ছুটি,
পাল তুলে দে' মাঝ-দরিয়ায়,
দুই হাল ধ'রে পাল চেয়ে।
আজকে গাঙে তুফান ভারি,
ঢল্ নেমেছে, ভাঙছে খাড়ি,
মার রে পাড়ি, আলিস ছাড়ি
ওরে খোল কাটা দোল্ খেয়ে।
বাঁক-বরাশে উঠ্‌ছে পানি,
চাপান দে রে,—খা' রে টানি,
জোয়ার-ভাটি মানিস নে ভাই
দ্যাখ ভয় ভাগে ভয় পেয়ে।
কল্ কল্ ছল ছল,
নাও করে টল মল,
মার জোর মার টান—হেঁইয়া।
ছপ্ ছপ্ ফ্যাল দাঁড়,
ঝড় ঝড় জল ফাড়্,
তর তর বেয়ে চল্—ভেইয়া।
হেঁইয়া—হেঁইয়া—হেঁইয়া।
হাতের কচা আঁটন রেখে
দাঁড় ফেলে যা' সুমুখ দেখে,
পেছন হেলে, সামনে ঝুঁকে,
ভাই টানিস নে একঘেয়ে।
পোলোর খুঁটি নামল কি রে?
নজর রাখিস সড়ার গিরে,
গড়েন দিয়ে গড়গড়িয়ে
ভাই যা'র জলে পড়্ যেয়ে।
গোলুই-মুড়ি চাপ্‌রে কসে,
পুব আকাশে চিকুর রোষে,
ঈশেন কোণে মেঘ জমেছে
ওরে খোর নামে গাঙ্ ছেয়ে।
চাপা-ঝিঁকি ধ'রছি এবার,
কেউ কারো মু চাস্ নে রে আর,
গোড় বেড়েতে দু-পাও থুয়ে
অথই ছেড়ে খেয়ে।
কল্ কল ছল ছল
নাও করে টল মল
মার জোর মার টান—হেঁইয়া
ছপ ছপ ফ্যাল দাঁড়
ঝড় ঝড় জল ফাড়
তর তর বেয়ে চল্—ভেইয়া।
হেঁইয়া—হেঁইয়া—হেঁইয়া।

—বাবুজী!

পরেশ একখানি বই পড়ছিল, চোখ তুলে তাকালো। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বললেন—বাবুজী, আপনি যত সব পুরানো আমলের জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আমার এই চাবিটা নেবেন?

একটি বড় চাবি সে এগিয়ে দিল পরেশের দিকে। পরেশ চাবিটি তুলে নিয়ে দেখলে। এখনকার মত চাবি নয়। চাবিটি লম্বা বেশী, মাথাটা বেশ চওড়া। চওড়া মাথার একদিকে নটরাজ শিবের একটি ছোট মূর্তি খোদাই করা আছে। আর দেবনাগরী অক্ষরে কি যেন লেখা, লেখাটা ক্ষয়ে গেছে, কোন অক্ষরই স্পষ্ট আর বোঝা যায় না। জিজ্ঞাসা করলেন—এ চাবিটা কিসের?

—এই চাবিটার একটা ইতিহাস আছে বাবুজী। এই চাবির বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। এই চাবি দিয়ে আমার কোন পূর্বপুরুষ সম্রাট শ্রীহর্ষ বর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সে অনেক কথা বাবুজী, আমার বাপ্ ঠাকুর্দার মুখে সেই কথা আমি শুনেছি, তাঁরা আবার শুনেছিলেন তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার মুখে, এইভাবেই সে কাহিনী চলে আসছে।

পরেশ বললো—সব কথা বলুন তো শুনি। কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই চাবিটি কি আপনি বিক্রী করতে এনেছেন?

—বিক্রী করবো এই চাবি? না বাবুজী। এই চাবি আমার কাছে অমূল্য, আমার বংশের গৌরব।

—তাহলে এ চাবি আমাকে দেখাতে এনেছেন?

—বাবুজী, এই চাবিটি আমি আপনাকে দিয়ে যাব। এই চাবিটি আপনি কলকাতার যাদুঘরে পাঠিয়ে দেবেন, চাবির পরিচয় লিখে দেবেন—"মৌখরি-রাজ গ্রহবর্মার সুহৃদ রবিশঙ্কর উপাধ্যায়ের বংশধর হরিশঙ্কর উপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।"

—যে জিনিষটি আপনার বংশের গৌরব তা হাতছাড়া করতে চাইছেন কেন?

—এ জিনিষ আর আমি কাছে রাখতে পারছি না বাবুজী। এবারকার বন্যায় আমার ঘর পড়ে গেছে। এই চাবিটি মাটির মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল, চারদিন মেহনৎ করে তবে একে খুঁজে বের করেছি। তাছাড়া আমার এই কুঁড়েঘরে একে রেখে লাভ কি বাবুজী? জাতীয় যাদুঘরে থাকলে লোকে দেখবে, জানবে!

এবার জিনিসটি খাঁটি ঐতিহাসিক বলেই পরেশের মনে হোল। ইতিহাসে এম-এ পাস করে সে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন খুঁজছিল বিহারের পথে প্রান্তরে। পৈতৃক টাকা পয়সা আছে, এখন ঐতিহাসিক কিছু আবিষ্কার করে সে কীর্তি রাখতে চায়। বললো—বেশ, বলুন, আপনার কথাটা শুনি।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কাহিনী বলতে সুরু করলেন:

গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করলেন, তার পর দুজনে মিলে কনৌজ আক্রমণ করলো। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন বটে, কিন্তু দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পরাজিত ও আহত হলেন। মালবের সেনা রাজপ্রাসাদ লুঠ করলো, মহারাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করলো। কনৌজ শত্রুসেনা দখল করলো!

সন্ধ্যার পর মশাল হাতে নিয়ে রাজপুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রবিশঙ্কর উপাধ্যায় রণক্ষেত্রে মহারাজের মৃতদেহ খুঁজতে এলেন। রাজার মৃতদেহ শিয়াল কুকুরে টানাটানি করবে, এ তিনি চান নি। মশাল হাতে নিয়ে তিনি রণক্ষেত্রের মধ্যে শায়িত, আহত ও মৃতের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। শেষে পোষাকে জাঁকজমক দেখে মহারাজকে তিনি খুঁজে বের করলেন, মহারাজ তখনও মরেন নি। সর্বদেহ রক্তাক্ত হয়ে গেছে, তবু ক্ষীণভাবে নিঃশ্বাস বইছে। কমণ্ডুল থেকে জল নিয়ে তিনি মহারাজের চোখে মুখে দিলেন। মহারাজ চোখ মেলে চাইলেন। একটু জল পান করে স্তিমিত কণ্ঠে তিনি বললেন—উপাধ্যায়, আমি চললাম, তুমি রইলে, যেভাবেই হোক মহারাণীকে থানেশ্বরে পিতৃগৃহে পৌঁছে দিও।

পরমুহূর্তেই মহারাজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই কয়টি কথা বলার জন্যই যেন তিনি বেঁচে ছিলেন। পুরোহিত তাঁকে কিছু বলার অবসর পেলেন না।

পুরোহিত মৃতদেহের যথাবিহিত সৎকার করে পরদিন প্রত্যূষে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন—আমি মৌখরী রাজবংশের কুলপুরোহিত, আপনার কাছে একটা নিবেদন জানাতে এসেছি।

—কি বলুন?

—মহারাজ গ্রহবর্মা নিহত হয়েছেন, তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করে দ্বাদশ দিনে তাঁর শ্রাদ্ধ করা প্রয়োজন, আমি আপনার অনুমতি চাইছি।

—আপনি শ্রাদ্ধ করবেন সেজন্য আমার অনুমতির প্রয়োজন কি?

—মহারাজ গ্রহবর্মা অপুত্রক ছিলেন, তাঁর শ্রাদ্ধ করার একমাত্র অধিকার তাঁর রাণীর। কিন্তু মহারাণী এখন বন্দিনী, আপনার অনুমতি না পেলে তো মহারাণীর পক্ষে শ্রাদ্ধ করা সম্ভব হবে না।

—আপনি কি তাহলে মহারাণীকে মুক্তি দিতে বলেন?

—আপনার অনুমতি পেলে আমি কারাগারের মধ্যেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করতে পারি মহারাজ।

—আপনি দেবগুপ্তের অনুমতি নিয়েছেন?

—না, তাঁর কাছে যাবার আগে আপনার কাছে এসেছি, কারণ মহারাণী রাজ্যশ্রী আপনার মাতুল কন্যা। সদ্যবিধবা মাতুল বোনের প্রতি আপনার যেটুকু সহানুভূতি আশা করি, মালবরাজ দেবগুপ্তের কাছ থেকে তা আশা করতে পারি না।

উপাধ্যায় রবিশঙ্কর শশাঙ্কের মনের দুর্বল স্থানে আঘাত করলেন। বাল্য ও কৈশোরের বহুদিন শশাঙ্ক, রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রী একত্রে কাটিয়েছেন, সেই কথা শশাঙ্কের মনে হোল, শশাঙ্ক বললেন—বেশ, ব্রাহ্মণ, আপনি কারাগারেই শ্রাদ্ধতর্পণাদির ব্যবস্থা করুন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তবে আপনি একা ছাড়া সঙ্গে কাউকে নিতে পারবেন না।

উপাধ্যায় বললেন—শাস্ত্রসম্মত সামান্য উপকরণ আমিই নিয়ে যাব, আর যদি কোন প্রয়োজন হয় কারাগারের কোন প্রহরীর সাহায্য নেব।

উপাধ্যায় কয়েকদিন ধরে প্রস্তুত হলেন। দ্বাদশ দিন প্রত্যূষে

কারারক্ষী রাজ্যশ্রীকে এসে সংবাদ দিল,—আজ মহারাজ গ্রহবর্মার শ্রাদ্ধ। উপাধ্যায় রবিশঙ্কর সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, আপনি প্রস্তুত থাকবেন, বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি আসবেন।

রাজ্যশ্রী প্রথমে কথাটা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। অত্যধিক অবসাদে তিনি আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। রাজার মেয়ে, রাজার বউ, একদিনের ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে একেবারে সর্বহারা হয়ে কারাগারে এসে পড়েছেন। অবসাদে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। সন্ত্রীর সংবাদটুকু হৃদয়ঙ্গম করে যখন তিনি মুখ তুললেন, সান্ত্রী তখন চলে গেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে উপাধ্যায় এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন সামান্য উপকরণ। সাধারণ একজন দরিদ্র কৃষকের শ্রাদ্ধে যতটুকু দরকার লাগে তার চেয়েও সংক্ষেপ। উপাধ্যায়কে দেখে রাজ্যশ্রী কেঁদে ফেললেন, পুরোহিত বললেন—সকলি বিধিলিপি, এ নিয়ে দুঃখ করো না মা। শাস্ত্রে আছে "ক্ষেত্রে কার্যম বিধিয়তে"—যেখানে যেটুকু প্রয়োজন সেখানে সেইটুকু করতে হবে।

ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ করে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে বেলা তৃতীয় প্রহর কেটে গেল। শেষে অশ্রুসজল কন্ঠে রাজ্যশ্রী বললেন—আপনাকে দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য আজ আমার নেই, আপনার অনুগ্রহেই আজ স্বামীর আত্মার তর্পণ করা সম্ভব হোল, আপনার চরণে আমি প্রণাম জানাই।

উপাধ্যায় আশীর্বাদ করলেন। রাজ্যশ্রীর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—দুঃখ করিস্ নে মা এ সব তাঁরই খেলা, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি অবধি পড়ে না, তাঁরই চরণে সব সমর্পণ কর।

মাথায় হাত দিয়ে ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করলেন। রাজ্যশ্রীর মনে হোল মাথার রুক্ষ চুলের মধ্যে কি যেন একটা জিনিষ তিনি গুঁজে দিলেন। রাজ্যশ্রী মাথায় হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছিলেন, উপাধ্যায় চোখের ইসারায় তাঁকে নিরস্ত করলেন।

দুজন সান্ত্রী এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল, একজন রাজ্যশ্রীর কারাকক্ষের দ্বার বন্ধ করলো, আরেকজন উপাধ্যায়কে কারাগারের ফটকে বাহিরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

উপাধ্যায় চলে গেলেন, সান্ত্রী চলে গেল, এবার রাজ্যশ্রী মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, এক টুকরো কলাপাতা মাথার চুলে গোঁজা আছে। পাতাটি খুলতেই উল্টো পিঠে লাল কালির লেখা চোখে পড়লো—রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রস্তুত থেকো!

পাতাখানি টুকরো টুকরো করে রাজ্যশ্রী ফেলে দিলেন, তারপর চুপ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন মধ্যরাত্রির। বুঝতে পারলেন ব্রাহ্মণের কারাগারের মধ্যে শ্রাদ্ধ করতে আসার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ছিল।

রাজশ্রী উৎসুকভাবে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। অবসাদে শরীর ভেঙে পড়লেও দরজার পাশে তিনি চুপ করে বসে থাকেন। অন্ধকার সঙ্গীহীন কারাগারের বুকে রাত্রির স্তব্ধতা ঘনীভূত হতে থাকে।

রাত্রি প্রথম প্রহরের শিয়ালের ডাক ভেসে আসে দূর থেকে। সান্ত্রীরা মশাল হাতে নিয়ে কারাকক্ষের ঘরগুলি দেখে দেখে চলে যায়। তাদের পদশব্দ মিলিয়ে যাবার পর শেষ রাত্রি পর্যন্ত কারাগারে আর কোন শব্দ পাওয়া যায় না।

রাজ্যশ্রী জেগে বসে থাকবেন মনে করেও কখন যেন তন্দ্রার ঘোরে ঝিমিয়ে পড়েন, কখন রাত দ্বিতীয় প্রহর আসে তিনি জানতেও পারেন না, সহসা কে তাঁর কাঁধে হাত দেয়, রাজ্যশ্রী চমকে উঠলেন, উপাধ্যায় সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, বললেন—এসো!

মন্ত্রচালিতের মত রাজ্যশ্রী উপাধ্যায়ের পিছনে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। বারান্দা দিয়ে কিছুটা অগ্রসর হবার পরেই আরেকটা ফটক। সে ফটকও খোলা ছিল। ফটক পার হয়ে মাঠ। মাঠকে ঘিরে কারাপ্রাচীর। উপাধ্যায় রাজ্যশ্রীর হাত ধরলেন, দ্রুতপদে অন্ধকারে প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হলেন।

সহসা মনে হোল অন্ধকারের মধ্যে যেন একটি মানুষের ছায়া। ছায়াটি তাদের দিকেই আসছে। ব্রাহ্মণ রাজ্যশ্রীর হাতের মধ্যে একটি চাবি গুঁজে দিলেন, বললেন—সামনেই ফটক, সুবিধা পেলেই চাবি খুলে বেরিয়ে যাবে, আমার জন্য অপেক্ষা কর না।

ছায়া বোধ হয় সেই স্বর শুনতে পেয়েছিল, বললো—কে ওখানে?

উপাধ্যায় বললেন—আমি।

—আমি কে?

—রবিশঙ্কর।

—কে রবিশঙ্কর?

—মহারাজ গ্রহবর্মার কুলপুরোহিত।

ছায়া এবার ব্রাহ্মণের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, তার হাতের মুক্ত কৃপাণ, অন্ধকারেও ইস্পাতের ঝিলিক দিল। উপাধ্যায় এগিয়ে গিয়ে তার কৃপাণশুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরলো। রাজ্যশ্রীর পানে ফিরে বললেন—দাঁড়িও না মা, তুমি যাও!

পরক্ষণেই ব্রাহ্মণ জড়িয়ে ধরলো সান্ত্রীকে।

রাজ্যশ্রী ক্ষণেক থমকে দাঁড়ালেন উপাধ্যায়কে কিভাবে সাহায্য করবেন ভেবে পেলেন না। উপাধ্যায় বোধ হয় তা লক্ষ্য করলেন, বললেন—যাও!

রাজ্যশ্রী আর দাঁড়ালেন না। অগ্রসর হলেন। সামনেই কারাগারের প্রধান ফটক। ফটক বন্ধ। অন্ধকারে হাত বুলিয়ে তালাটা খুঁজে নিলেন। চাবি দিয়ে তালা খুলে বাহির হয়ে পড়লেন।

বাইরে অন্ধকার। পথ অজানা। কোন্ দিকে যাবেন রাজ্যশ্রী ঠিক করতে পারলেন না, রাজার মেয়ে, রাজার বউ, কখনও তো এমনভাবে পথে বের হননি। কিন্তু তা বলে তো এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না! সামনের পথ ধরেই তিনি হাঁটতে সুরু করে দিলেন।

খানিকটা গেছেন, এমন সময় পিছন থেকে কে একজন ছুটে এলো, চট করে রাজ্যশ্রীর একখানি হাত ধরে বললো—এদিকে এসো মা, মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে এসো, আর দেরী করা চলবে না।

উপাধ্যায়ের গলা। রাজশ্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আপনি এসেছেন!

—কথা নয় মা, এসো,—

ব্রাহ্মণ রাজ্যশ্রীকে প্রায় টেনে নিয়ে চললেন মাঠের উপর দিয়ে। রাজ্যশ্রী কতবার যে হোঁচট খেলেন তার সংখ্যা নেই। ব্রাহ্মণ কোন দিকে গ্রাহ্য করলেন না, একেবারে নদীর তীরে এসে থামলেন। তীরে একটি গাছের সঙ্গে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল। ব্রাহ্মণ রাজ্যশ্রীকে নিয়ে সেই নৌকায় উঠে বসলেন। দড়ি খুলে, দাঁড়ের ঠেলায় নৌকা নিয়ে ফেললেন একেবারে নদীর মাঝে।

সেই সময় নদীর তীরে অনেকগুলি মশালের আলো দেখা গেল। কোলাহলের মৃদু রেশ ভেসে এলো বাতাসে। ব্রাহ্মণ হেসে বললেন—ওরা আর আমাদের ধরতে পারবে না মা, মহারাজ মৃত্যুকালে আমাকে যে অনুরোধ করেছিলেন তা রক্ষা করলাম। বহু পুরুষ ধরে মৌখরী বংশের অনেক দয়াদাক্ষিণ্য ভোগ করেছি আজ তাদের কিছুটা কাজে লাগলাম, মা!

—ও কথা বলবেন না, আপনার এ ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবো না।

ব্রাহ্মণ হাসলেন।

রাজ্যশ্রী বললেন—আমরা এখন কোথায় যাব?

উপাধ্যায় বললেন—ভেবেছিলাম থানেশ্বরের দিকেই যাব, কিন্তু আমি বড়ই ক্লান্ত, দাঁড় টানতে পারছি না, যেদিকে স্রোত সেই দিকেই

উপাধ্যায় দাঁড় ছেড়ে হাল ধরলেন। স্রোতে নৌকা ভেসে চললো।

নদীর মুক্ত বাতাস ও অসীম আকাশের নীচে মুক্তির স্বস্তি শান্তি দিল, রাজ্যশ্রী নৌকার উপর বসে বসে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙলো একটা ঝাঁকুনি লেগে। রাজ্যশ্রী চমকে উঠে বসলেন। সকাল হয়ে গেছে, নৌকা চড়ায় এসে লেগেছে। উপাধ্যায় হালের উপর শুয়ে আছেন। সামনে ঘন জংগল।

রাজ্যশ্রী ডাকলেন—পণ্ডিতজী উঠুন!

সাড়া নেই।

—পণ্ডিতজী!—রাজ্যশ্রী উপাধ্যায়ের পায়ে হাত দিলেন, পা হিমের মত ঠাণ্ডা। রাজ্যশ্রী উপাধ্যায়ের কপালে হাত দিতে গিয়ে দেখেন, কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে উত্তরীয়ের উপর জমে আছে। উপাধ্যায়ের দেহে প্রাণ নেই। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে কারাগারের সান্ত্রীর হাতে তাহলে উপাধ্যায় আহত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্যশ্রীকে কিছুই বুঝতে দেননি। বৃদ্ধ জীবন দিয়ে তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। রাজ্যশ্রী বৃদ্ধের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

কি করবেন, কোথায় যাবেন, রাজ্যশ্রী কিছুই ঠিক করতে পারলেন না, ব্রাহ্মণের মৃতদেহ ফেলে রেখেও চলে যেতে পারলেন না। নৌকার উপর মৃতদেহের পাশে বসে রইলেন চুপ করে। কি করে মৃতদেহের সংকার করবেন সেই হোল তাঁর সমস্যা।

দ্বিপ্রহরে নদীর তীরে এক কাঠুরিয়াকে চোখে পড়লো, তারই সাহায্যে রাজশ্রী উপাধ্যায়ের সংকার করলেন। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রবেশ করলেন সেই জংগলের মধ্যে। কাঠুরিয়া কিন্তু তাঁর সংগ ছাড়লো না, বললো—মা, এই জংগলে, একা কোথায় যাবেন? আমার ঘরে চলুন, সেখানে খাবার কাল সকালে যাবেন!

সেই রাতে নিরাশ্রয় রাজকন্যাকে কাঠুরিয়ার ঘরেই আশ্রয় নিতে হলো!

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, সেই জংগলেই তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁর বড় ভাই রাজ্যবর্ধন শশাংক ও দেবগুপ্তের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। মনের দুঃখে রাজশ্রী আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য চিতা সাজালেন। কিন্তু আগুনে প্রবেশ করবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁকে রক্ষা করেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে কাহিনী আছে।

এতো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও কারাগারের ফটক খোলার জন্য যে চাবিটি উপাধ্যায় রাজশ্রীকে দিয়েছিলেন সেটি রাজশ্রী হারাননি। কারাগার থেকে বাহির হয়ে অভ্যাসের বশে কোন এক সময় চাবিটি আঁচলে বেঁধে ছিলেন, সেই থেকে সেটি আঁচলে বাঁধাই ছিল। কনৌজে ফিরে এসে রাজশ্রী উপাধ্যায়ের পুত্রকে আহ্বান করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই চাবিটি এবং পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামগুলির অবশিষ্ট আজ কয়েকটি জংগল মাত্র আছে, কিন্তু এই চাবিটি আমরা সযত্নে রক্ষা করে আসছি। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি—জাতীয় নিদর্শন জাতীয় যাদুঘরে থাকাই ভাল। তাই এটি আপনার কাছে দিতে এলাম, বাবুজী।

পরেশ চাবিটি গ্রহণ করলো। আরেকবার ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখলো সত্যই চাবিটি বহুদিনের পুরানো বলেই মনে হোল।

মিছে নয় মিছে নয় শনিবার সকালে
শংকর বসুরায় পেনখানি খোয়ালে।
আমাদের পড়োভাই নীতিনের কাকা কন
রাজাবাজারের ধারে চলছেন হনহন
পার হতে মোড় যাই ধরেছেন লেনটি
উবে গেল হাওয়া হয়ে পার্কার পেনটি।
তোমরা শুনেছ কত এরকম ঘটনা
কাগজে ছাপিয়ে দিলে হয়ে যায় রটনা।

যত বলো হবে তুমি বেশী করে সাবধান
বুকেতে কলম নিয়ে কেউ দেবে সটকান
তুলে নেবে ট্রামে বাসে নিয়ে যাবে বেমালুম
হাই তুলে আনমনা হয়েছ কি —হুস গুম
তোমার পেয়ার করা চকচকে মসৃণ
হতে পারে সোনা-ক্যাপ কিম্বা ডার্ক গ্রীণ।
হঠাৎ [illegible] দিয়ে বুকে হাত তুললে
হায় হায় ফাঁকা বুক—সব কিছু ভুললে,
কোথা যেন এলো গেল, কোথা কি যে হোল ভুল
সব যেন এলোমেলো, চোখে সরিষা ফুল।

এরকম [illegible] হয় হামেশাই
শকু থাই নিত্য চোখ থেকে চোখ নাই।
আছে এর প্রতিকার, [illegible] বুদ্ধি
[illegible] পাওয়া যায় হাতে হাতে সিদ্ধি।
[illegible] নিয়ো সেফটি নিয়ে রাখ গেঁথে বক্ষে
[illegible] আঁটো [illegible] অলক্ষ্যে।
[illegible]
[illegible] কিছু না অদ্ভুত!

[illegible] যত খুশী গান গাও
[illegible] যত খুশী আনমনা হতে চাও।
[illegible] কোনও দিকে তাকানো
পড়ে যাই যত বোর্ড দোকানেতে লাগানো।
যত কিছু প্রশ্ন মন নিয়ে কারবার।
গুরুতর চিন্তা করে যাই বারবার।
পেন [illegible] যদি নাই থাকে ভয় হে।
আনমনে পথ চলা কিছু নয় নয় হে!

কমপক্ষে তিরিশ বছর আগে পড়া একটি বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছে। একটি ছোটদের মাসিকের এক পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপনটি, তাতে একটি ধাড়ি কোলা ব্যাঙ তার গুটি কয়েক বাচ্চাকে নিয়ে ভারি বিব্রত হয়ে পড়েছে তার ছবি, নীচে কয়েক ছত্র কবিতা।—তার শেষ চারিটে লাইন আজো ভুলিনি—

"বাচ্চাগুলি আচ্ছা ত্যাঁদোর
খাচ্ছে নাকো কেঁচো,
কাঁদছে শুধু 'মুকুল', 'মুকুল'
মুখখানি যা পেঁচো।"

একেবারে পেঁচামুখ করে গোঁসা করে বসে আছে বাচ্চারা, কেঁচো দিলেও খাচ্চে না। কেন?—না, তারা 'মুকুল' পায়নি, তাই। 'মুকুল' কি জানো? মুকুল ছিল সে যুগের ছোটদের একটি চমৎকার মাসিক।

ছোটবেলায় পড়া সেই ছোটদের মাসিকের বিজ্ঞাপনটি আজো ভুলিনি। ছোটদের বইপত্র বিজ্ঞাপন দেওয়ার মধ্যেও যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তা তো বেশ বোঝা যায়। সচরাচর বিজ্ঞাপন, বিশেষ করে বই-এর বিজ্ঞাপন, এমন নীরস করে লেখা হয় যে, তাতে কেবল বই-এর নাম আর তার দাম বড় জোর লেখকের নামটাই থাকে, ফলে ছোটরা পড়ে কি পড়ে না, পড়লেও এমনভাবে মনে থাকে না যাতে তিরিশ বছর পরেও ঠিক আউড়ে যাবে।

অথচ ছোটদের বই-এর বিজ্ঞাপনেই সব চেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া দরকার। ছোটদের জন্য আজকাল অনেক পত্রিকা বের হচ্চে, বড়ো বড়ো দৈনিকেও তারা পৃথক পৃষ্ঠা দখল করেছে। বইপত্রও বেরুচ্ছে প্রচুর। এখন আমাদের অবহিত হওয়ার সময় এসেচে, আমরা কি করে ছোটদের বই-এর বিজ্ঞাপন আরো আকর্ষক করে তুলতে পারি।

সচরাচর দেখা যায় ছোটদের বই-এর প্রচ্ছদপটটা বেশ চক্‌চকে হয়, ওটাই একটা বিশেষ আকর্ষণের সামগ্রী। আশুতোষ লাইব্রেরী এক সময়ে প্রত্যেক বই-এর মলাটের ছোট ব্লক করে বিজ্ঞাপন দিতেন। তাদের সাইনবোর্ডেও এইভাবে অনেকগুলি বই এঁকে দেখান হয়েছে। এই ব্যবস্থা অল্পের মধ্যে খুব ভালো।

ছোটদের পত্রিকা ও বড় কাগজে ছোটদের পাতায় আকর্ষণীয় করে বিজ্ঞাপন দিলে তা সহজেই ছোটদের চোখে পড়ে। ওই সব ক্ষেত্রে পুস্তক সমালোচনায় আলোচিত বইগুলিতেও ছোটদের নজর পড়ে।

কিন্তু দরকার এর থেকে আরো কিছু অগ্রসর হওয়া। আজকাল ছোটদের অনেক আসর, সঙ্ঘ, মেলা প্রভৃতি গঠিত হয়েছে, তাদের হাতে সরাসরি বই-এর কথা পেঁছে দেওয়া আরো কার্যকরী।

যেখানেই পুস্তকাগার আছে সেখানেই ছোটদের বিভাগ পৃথক করা উচিত এবং তাদের উপযোগী বই-এর পৃথক তালিকা থাকা একান্ত দরকার। নতুন নতুন বই এলে সেই তালিকাতে তো উঠবেই, পরন্তু পৃথক নোটিশ টানিয়ে ছোটদের আকৃষ্ট করা দরকার। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে পৃথক বোর্ডে ছোটদের বই পৃথকভাবে দেখানো খুবই কার্যকরী হতে পারে। যেখানে সম্ভব সেখানে বই-এর জ্যাকেটটি খুলে পিন লাগিয়ে দিলেও ছোটদের চোখে পড়বে।

এই সব কাজ গ্রন্থাগারিকের। তাঁর উচিত দুশো পাঁচশো বইয়ের মধ্যে হতে বাছাই করে কিছু কিছু ছোটদের সুমুখে তুলে ধরা। পাঠক তৈরী করাই হল পুস্তকাগারের প্রধান স্বার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ তাই একটি ভাষণে বলেছিলেন—

"In order to bring a library into the fullest use, it is necessary that its contents should be clearly and specifically brought to notice, otherwise it is difficult for the ordinary man to find his way about them, and the library is left as a city of vast accommodation that lacks sufficient communication.

অর্থাৎ পুস্তকাগারের সম্যক ব্যবহার সম্ভব করতে হলে চাই তার ভাণ্ডারে কি আছে না আছে তার হদিশ বিশেষ বিশেষভাবে সবাইকে জানানো, অন্যথায় সাধারণ মানুষের পক্ষে ওর মধ্যে নিজের পথ খুঁজে নেওয়া সম্ভব হয় না, আর পুস্তকাগার অব্যবহারেই পড়ে থাকে,—কোন বড় শহরে বাড়িঘরের সুবন্দোবস্ত থাকলেও যদি যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে যেমন হয়।

বই-এর সযত্ন বিজ্ঞপ্তি সেই রকম পথ দেখায়, পথ সুগম করে।

আমাদের দেশের প্রকাশকেরা প্রায়ই দুঃখ করেন, বই বিক্রী হয় না। ছোটদের বই পড়বার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে তারা খাবার না কিনে বই কিনবে এ দৃষ্টান্ত আমরা অনেকবার দেখেছি। তবে ছোটদের বই-এর বিষয়ে দু' রকম চিন্তা, হয়ত পরস্পর বিপরীতমুখী চিন্তা,—দরকার। একটা হল, বইটা যেন আকর্ষণীয় হয়,—ছবি, ছাপা, বাঁধাই আর বিষয়বস্তুতে। আর একটা উল্টো কথা—দামটিও যেন বেশি না হয়।

ছোটদের বই বড়দের কাছেও যাতে পেঁছে তাও করা চাই, কেন না ছোটরা যেমন বই চায় বড়রাও তেমন বই কিনে দেয়। বড়দের জানাবার জন্য বইএর বিজ্ঞাপন অন্যত্র বড়দের কাগজে পৃথকভাবে দেওয়া দরকার।

ছোটদের বই-এর মধ্যে অনেকগুলি ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়', 'বোধোদয়' আজো সমাদৃত। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' প্রায় সমপর্যায়ের বই। প্যারীচরণ সরকারের 'A First Book of Reading' (যা 'ফার্ষ্ট বুক' নামে বিখ্যাত), Æsop's Fables দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি পুরুষ পুরুষানুক্রমে লোকে পড়ছে। এই ক্রমবহমান ধারাই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' সবারই পড়তে ভালো লাগে। এখন নিত্য নূতন বই বেরুচ্ছে। ফলে এই পুরাতন বইগুলি কিছু কিছু স্থানচ্যুত হচ্ছে। শুনতে পাই 'ফার্ষ্ট বুক' নাকি এখন আর পাওয়াই যায় না। 'টুক্‌টুকে রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত' নানা হাতে নানা রকম বেরুচ্ছে। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বই-এর মতো অমন মিষ্টি লেখা বুঝি দুর্লভ! সুকুমার রায়ের ছড়াগুলির সৌভাগ্যক্রমে নতুন সংস্করণ হয়েছে, আর অবনীন্দ্রনাথও হারিয়ে যাননি।

ছোটদের বই-এর একটি সুনির্বাচিত তালিকা প্রকাশিত হওয়া একান্ত দরকার। সেই যে আমরা 'পাতার ভেঁপু' পড়তাম তা তো কই আর দেখি না। কত 'বুড়ো আংলা', 'যখের ধন', 'কুট্‌কুটের দপ্তর' বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। স্বপনবুড়োর 'বেপরোয়া' নতুন করে বই আকারে বেরুলো তাই, নতুবা অমন চমৎকার উপন্যাসেরও এ যুগের ছেলেরা সন্ধান পেতো না।

ছোটদের বই-এর মধ্য দিয়েও রাষ্ট্রচেতনা জাগাবার চেষ্টা সুরু হয়েচে। জীবনী পাঠের, নীতিশিক্ষার দিন যেন গত হয়েছে। অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ, যোগীন বসুর মাইকেল চরিত কৈ আর দেখি না।

''এ আবার কে?''

অশোককৃষ্ণ দত্ত

"ভাই কচ্ছপ, আমি আবার বলি—সমাজকে বাদ দিয়ে একা থাকা কোনো কাজের কথা নয়। একা থাকা মানে স্বার্থপরতা, কর্তব্য থেকে পালিয়ে থাকা, ওতে সুখ নেই। তোমার পিছনে চেয়ে দেখ, ভূচর, খেচর, উভচর সবাই সমাজবন্ধ জীব। ওদের আদর্শ অনুসরণ কর। নইলে সমাজকে বাদ দিয়ে একা একা তুমি শুধু আয়ুর দিক দিয়েই বাড়বে, মান সম্মানের দিক দিয়ে বাড়তে পারবে না। ভেবে দেখ, সমাজের উন্নতিই জীবের লক্ষ্য। স্বজাতিপ্রেম বড় আদর্শ। তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, তবু কর্তব্যের খাতিরে না ব'লে তো পারি না। পান্না সেন আমার অনুরোধে ক্যামেরার সাহায্যে অনেক কষ্ট ক'রে তোমার জন্য এই সব সমাজবন্ধ জীবদের দৃষ্টান্ত তুলে এনেছেন। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রো না—ইংরেজী নীতি-বাক্যটি অন্ততঃ মনে রেখো—ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল।"

(১) গঙ্গাজল সই—ফোটোঃ শ্রীসুনীল সেন, (২) থোড়াই কেয়ার!—ফোটোঃ কিষণচাঁদ বর্মণ, (৩) বিজনবনের পাখী—ফোটোঃ ভগবতী দে, (৪) বক ডন্—ফোটোঃ অমর মুখোপাধ্যায়, (৫) বন-মহোৎসব—ফোটোঃ প্রতিমা দেবী, (৬) কুট্‌স্ কামড়!—ফোটোঃ কমল মিত্র, (৭) 'শ্বশুরবাড়ী যাই'—ফোটোঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, (৮) 'অবাক কাণ্ড ভাই!'—ফোটোঃ শ্রীমদন দত্ত, (৯) 'না ঘুমালো!—ফোটোঃ অমিয় তরফদার, (১০) 'মিন্দে কোরোনা'—ফোটোঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়, (১১) দেখন-হাসি—ফোটোঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

আজ ক্লাস সিক্সের প্রমোশন।

অতি বড় দুষ্টু ছেলেও আজ চুপটি করে বসে আছে ক্লাসে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কখন হেডমাষ্টারমশাই ক্লাসে ঢুকবেন প্রমোশনের লিস্ট হাতে নিয়ে।

একধারে চুপ করে বসে আছে নালক। সেও পড়ে ক্লাস সিক্সে। আজ তারো প্রমোশন।

বাড়ি থেকে আসবার সময় মাকে প্রণাম করতেই মা ওর মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন পূজোর প্রসাদী ফুল। তার পর সেই ফুল গুঁজে দিলেন কানে। বললেন: বংশের মুখ উজ্জ্বল করো বাবা। আমাদের দুঃখ ঘুচুক।

মায়ের হাসি-অশ্রুর আলো-ছায়া খেলা মুখখানিই বারবার মনে পড়ছে নালকের। ও শুধুই ভাবছে: পাশের খবর নিয়ে বাড়ি ফিরলে মায়ের মুখখানি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে খুসির দীপ্তিতে।

ঘরে ঢুকলেন হেডমাষ্টারমশাই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালো ছেলেরা। হেডমাষ্টারমশাইয়ের উদার তর্জনীর ইঙ্গিতে সবাই বসলো যার যার আসনে। গম্ভীর মুখে হেডমাষ্টারমশাই খুললেন প্রমোশনের তালিকা। গম্ভীরতর-কণ্ঠে একে একে পড়তে লাগলেন উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম। তার মধ্যে তৃতীয় নাম নালকের।

ময়ূরের মতো নেচে উঠলো নালকের মন। সেই মুহূর্তে উড়ে যেতে চাইলো মায়ের চরণতলে।

হেডমাষ্টারমশাই চলে গেছেন ক্লাস থেকে। কারু সঙ্গে কোন কথা না বলেই বাড়ির পথে ছুটলো নালক।

• • •

নালকের বাবা সামান্য চাকরি করেন। যে মাইনে পান তাতে কোনমতেই সংসার চলে না। ধার-দেনায় তিনি জর্জরিত।

বাড়ি পৌঁছুতেই নালকের কানে গেলো বাবা-মার আলোচনা।

মা বললেন: কিন্তু পরীক্ষায় যদি নালক পাশ করে—

বাবা বললেন: যদি নয় বড়বৌ, পাশ নালক করবেই। সে আমি ঠিক জানি।

মা বললেন: তাহলে তো ওর পড়ার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

বাবা কোন জবাব দিলেন না। নালক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কান পেতে রইলো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা বললেন: সেই কথাই তো ভাবছি বড়বৌ। নালক এবার ক্লাস সেভেনে উঠবে। ওর অনেক নতুন বই-পত্তর লাগবে। সে টাকা আমি কোথায় পাব?

আবার চুপ। একটু পরে মা বললেন: আর কোথাও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমার মাথার সিঁথি বিক্রি করেই ওর বই-পত্তর কিনে দিও।

বাবা কি যেন বলে আপত্তি জানালেন। কিন্তু সে কথা নালকের কানে গেলো না। নালকের দুটো কান তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুক ভার হয়ে উঠেছে অবরুদ্ধ কান্নার স্রোতে। খসে পড়েছে খুসির পেখম। পরীক্ষা পাশ করেছে বলে কি ও বিকিয়ে দেবে মায়ের মাথার সিঁথি?

বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হরিণ-শিশুর মতো ও ছুটে পালিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। নদীর তীরে শুয়ে ছটফট করতে লাগলো আহত প্রাণের দুঃসহ বেদনায়।

আকাশে নতুন-ওঠা চাঁদের মুখ ছেয়ে গেলো কালো মেঘে।

তিলোত্তমা দাদীর কেন নেইকো কোথাও তিল?
সুবোধ-দাদা ক্ষেপেন মাগো, দুষ্টু শান্তশীল।
মণীন্দ্র দেহে নেইকো মণি, নূরউদ্দীনের নূর,
ভূতনাথেরও নেইকো ভূত, গণেশ মামার শুঁড়।
ভূতের ভয়ে অভয় কাঁপে; রসিক নীরস রয়
পাশের বাড়ীর প্রফুল্লতো মোটেই ফুল্ল নয়।
অন্নপূর্ণা উপোষ করে, খুকি মোদের বুড়ী,
সদানন্দ রেগেই আগুন,—সাধু করছে চুরি।

হেম কেন মা ভীষণ কালো দেখতে যেন মোষ
পরের ভিটেয় ঘুঘু চরায় পাড়ার প্রাণতোষ
পয়সা চিটেজ দয়ালবাবু, বাঁশের মত বাঁশী
নিঠুর হলেন হৃদয়বাবু, ছিঁচকাঁদুনে হাসি।
বিষ্টুচরণ ভজছে কালী—করছে কাশীবাস,
তুলসী মালা গলায় পরে বেড়ায় কালিদাস।
মধুর কথায় পিত্তি জ্বলে, যদি ঝিঙের ফুল,
ভীম কেন মা বেজায় রোগা, হয় না তোলার তুল!

ওদের হাবু, বাক্যবাগীশ, মোদের গদাই নুলো,
ময়লা কাপড় পরিমলের, বিমল মাখে ধুলো।
বাণীকুমার মূক হয়ে মা কয় না কেন কথা?
পদ্মলোচন অন্ধ হয়ে হাতড়ে বেড়ায় সদা।
কটু কথায় আলাপ করেন রামভদ্র বাবু
বেজায় ভীতু প্রতাপ সিংহী, বীরেন খায় সাবু।
রিক্সা চালায় রাজ্যেশ্বর, রাণী কুড়োয় ঘুঁটে,
রাজকুমারের ভিক্ষা ঝুলি, ভবেশ হোলো মুটে।

সরল এসে বাঁকা কথায় কেন কোন্দল করে?
অশোক সদা শোকেই কাতর, শিশু অমর মরে।
সাধন ভাই পকেট মারে সত্য মিথ্যাবাদী
দুঃখহরণ দুঃখে কাঁদে, চাঁপা চিরুণ-দাঁতী।
প্রশ্ন শুনে ভাবেন মাস্তা রঙ্গ হবে রাধা,
কর্তাবাবুর আদরেতে যদি না পায় বাধা।

ছোটদের পাঠের স্পৃহা জাগানো ও ঠিক পথে সুনিয়ন্ত্রিত করতে প্রকাশক, শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক সকলেরই বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং মনে হয় প্রকাশকদের মধ্যে উদ্যোগীরা এ কাজে অগ্রসর হলে লাভবানই হবেন।

যারা দিল প্রাণ

— এক —

আমাদের দেশে একটি কথা আছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—অর্থাৎ মাতা এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। একথার মত সত্য ও মহৎ কথা আর আছে কি? কত দীর্ঘ সাধনার পর, কত দুঃখ বেদনার পর—আমরা লাভ করিয়াছি স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে তিন-চারশো বৎসর পূর্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য রাজপুত বীরেরা প্রাণ দিয়া দেশবৈরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, "বসুধাবেষ্টিত যার কীর্তি মেখলায়" রাজপুতনা সত্যই তাই।

রাজপুতদের বাসস্থান—রাজস্থান। মেবার, চিতোর, জয়পুর, উদয়পুর, বিকানীর, যোধপুর সর্বত্র রাজপুতনার মরুভূমির ঊষর প্রান্তরে, আরাবল্লীর পর্বতশিখরে শিখরে জাগিয়া আছে তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনী—গৌরব পতাকা।

শোন তাদের বীরত্বের একটি গল্প। গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

সে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। মোগল বাদশাহ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। সম্রাট আকবর বীর পুরুষ ছিলেন এবং ইতিহাসে তাঁহাকে বলা হয় মহানুভব আকবর। সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। এদিকে কিন্তু আকবর ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া প্রভুত্ব করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। এই রাজ্যলোভের ফলে তিনি নানা ছোটবড় স্বাধীন দেশের রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন—কোন অপরাধ ছিল না তাঁহাদের, অপরাধের মধ্যে তাঁহারা ছিলেন স্বাধীন। এইভাবে আকবর গোণ্ডরাজ্যের রাণী দুর্গাবতীর রাজ্য আক্রমণ করেন। বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী পরাজিতা হইয়া বন্দিনী হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মহত্ত্ব-কথা কে না জানে? এইভাবে অনেক রাজ্য তিনি জয় করিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রাজপুতনার দিকে। মেবারের রাণা রহিলেন অটল। রাণা জয়মল্লের প্রতি বাদশাহ আকবরের ছিল খুব রাগ, কেননা তিনি মালবারের রাজ্যচ্যুত সুলতান রাজবাহাদুরকে দিয়াছিলেন রাজধানীতে আশ্রয়।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর চিতোর নগর আক্রমণ করিলেন। রাণা উদয় সিংহ সিংহের তনয় হইয়াও রাজধানী ছাড়িয়া গোপনে স্থানান্তরে আশ্রয় নিয়াছিলেন। পরে চিতোর হইতে রাজধানী পরিবর্তন করেন এবং নাম রাখেন উদয়পুর। রাণা জয়মল্ল লইলেন দেশরক্ষা ও চিতোর রক্ষার ভার। দুইপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত বীরেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—কিন্তু প্রচুর গোলাগুলীর কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছিলেন না। একে একে অনেক রাজপুতবীর প্রাণ দিলেন। কামানের গুলীর আঘাতে দুর্গের একদিকের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জয়মল্ল—নিজে সেই ভগ্ন প্রাচীরের পাশে দাঁড়াইয়া—মেরামত করাইতেছিলেন। এমন সময় একজন সৈনিক আকবরকে দেখাইয়া দিলেন—বলিলেন ঐ-ঐ দেখুন রাণা জয়মল্ল। চিতোরের সেনাপতি।

শব্দ হইল দুরুম্ দুরুম্—বন্দুকের শব্দ। জয়মল্ল মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

হস্তীপৃষ্ঠ হইতে আকবরের অব্যর্থ লক্ষ্য বীরশ্রেষ্ঠ রাণা জয়মল্লের প্রাণনাশ করিল। আকবরের নিক্ষিপ্ত গুলী পড়িয়াছিল—জয়মল্লের শিরে। রাজপুত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ধ্বনিত হইল—হায়! হায়! হায়!

— দুই —

মা আমি যুদ্ধ করবো।

মহারাণা জয়মল্লের ষোল বৎসরের পুত্র তাহার মাতাকে বলিল—মা আমি যুদ্ধ করবো। পিতার পরিবর্তে আমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে সৈন্য পরিচালনা করবো।

কর্মদেবী জয়মল্লের পত্নী। বীরাঙ্গনা তিনি—পুত্র পুত্তের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন—যাও বৎস! রাজপুতের নাম—পিতার নামের গৌরব রক্ষা কর। তুমি হও সেনাপতি। রণে বিজয়ী হয়ে এসো বীর। বীরের পুত্র তুমি। পিতার বীরত্বের গরিমা রক্ষা করো। একলিঙ্গ দেব হবেন তোমার সহায়। মনে রেখো, জয়-পরাজয়ে সর্বদা সত্য পালন করবে।

মাতা কর্মদেবী প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধের জন্য বিদায় দিলেন। বীরপুত্র চলিল যুদ্ধ করিতে।

পুত্ত তখন গেলেন—কিশোরী পত্নীর কাছে ও বালিকা ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় লইতে। পরমাসুন্দরী অপূর্ব লাবণ্যবতী দুইজনে। সাহসিকা ও নির্ভীকা।

তাঁহাকে দুইজনে বরণডালা সাজাইয়া—স্বামী ও ভ্রাতাকে বীরসাজে সাজাইয়া দিলেন। বাজিল শঙ্খ—বাজিল রণদামামা। সৈনিকবাহিনী উচ্চৈস্বরে জয়ধ্বনি করিলেন। রাজপুতনার-চিতোরের গিরি ও প্রান্তর হর হর বম্ বম্ জয় মহাদেব, জয় একলিঙ্গ রবে ধ্বনিত হইল। চলিলেন বীর সাজে রণ অঙ্গনে রাজপুত বীর বালক পুত্ত। ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রণক্ষেত্রে।

— তিন —

রণকৌশলী বাদশাহ আকবর তাঁহার সৈন্যদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। একদিকে সম্রাট নিজে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন—অন্যদিকে চারিদিকে ছিল উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষের অধীনে মোগল সেনাবাহিনী। দক্ষ গোলন্দাজ—কামান ও বন্দুক পরিচালক ও যোগ্য তীরন্দাজ। পদাতিক ও অশ্বারোহী।

সেই গিরিপথের পাশে ছিল শ্রেণীবদ্ধ শ্যামল তরুশ্রেণী। সেই পল্লবঘন ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষনিচয়ের নিভৃত স্থান হইতে ভীষণ বেগে কামানের গোলা ছুটিয়া আসিতেছিল। গুড়ুম্ গুড়ুম্ দুরুম্ দুরুম্। সে কি শব্দ!—তরুণ সেনাপতি পুত্তের এই কৌশল আক্রমণে—গোলা বর্ষণের দরুণ সম্রাট সৈন্যেরা কোনরূপেই অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না—অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিতেছিল। বিস্মিত হইলেন সম্রাট। একি অদ্ভুত ঘটনা! কোথা হইতে আসিতেছে গোলার পর গোলা! মোগল পক্ষের বীর সেনাদের এইভাবে মৃত্যুতে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্য করিতেছিলেন চারিদিকে—! কোথায় কোন্ গোপন অন্তরালে রহিয়াছে শত্রু!

সহসা দৃষ্টি পড়িল—সেই তরুলতাচ্ছন্ন গিরিপথের দিকে সম্রাট বিস্মিত চক্ষে দেখিলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য—তিনটি নারী, তাহার সৈন্যদের আক্রমণ গতি প্রতিহত করিতেছে। অশ্রান্তভাবে গুলী চলিতেছে। বাদশাহ দেখিলেন তিনজন নারীর মধ্যে একজন প্রৌঢ়া, অপর দুইজন বালিকা ও কিশোরী।

সম্রাট প্রমাদ গণিলেন। শেষটায় কি তিনজন নারীর নিকট পরাজিত হইবেন দিল্লীশ্বর! বিস্ময়ের বিষয়!

পত্তের জননী কর্মদেবী, পত্নী কমলাবতী ও ভগিনী কর্ণদেবী —তাঁহাদের একমাত্র আশা ও ভরসা, রাজপুতনার চিতোরের ভবিষ্যৎ বীর বালককে—রাণা পত্তকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারাও বীরবেশে পত্তের সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন এবং একদিক দিয়া মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে গোলা বর্ষণ করিতেছিলেন—এই তিনজন বীরাঙ্গনা—অশ্বারোহণে বর্মে চর্মে সজ্জিতা হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

আকবর বীরত্বের মর্যাদা করিতে জানিতেন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি আদেশ করিলেন—তোমরা যেরূপেই পার এই তিন বীর নারীকে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনিবে—যে পারিবে তাহাকে আমি বহু মূল্যবান পুরস্কার দিব! কিন্তু কার সাধ্য—সিংহিনীকে পিঞ্জরে পুরিবে!—কে না জানে সিংহিনীর পরাক্রম!

— চার —

একদিকে পত্ত মোগল সৈন্যের আক্রমণ বেগ বীরদর্পে রোধ করিতেছিলেন,—অন্যদিকে তাঁহার মাতা-পত্নী ও ভগিনী যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেনারা জয় জয় ধ্বনি করিতেছিল—'হর হর মহাদেও'।

মোগলেরা সম্রাটের নির্দেশে বীরদর্পে যুদ্ধ করিতেছিল।

রাজপুত নারীরাও অসিভল্লধারিণী হইয়া দলে দলে অসীম সাহসের সহিত মোগল সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন—হঠাৎ একটি গোলা ছুটিয়া আসিল। আঘাত করিল সেনাপতি পত্তের ভগিনী কর্ণদেবীকে। কর্ণদেবীর দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত হইল রক্তের স্রোত। বাতাসে ধ্বনিত হইল হায়! হায়! হায়!

মাতা কর্মদেবী—একবার কন্যার প্রাণশূন্য দেহের প্রতি তাকাইলেন। চোখ হইতে এক ফোঁটা জলও পড়িল না। দেশ বড়, না কন্যা বড়? তারপর আবার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—রণরঙ্গিণী করালবদনী শ্যামা মায়ের মত—তীরের পর তীর গোলার পর গোলা ছুঁড়িতেছিলেন।—করিতে হইবে শত্রু নিধন।

আবার একটা গোলা ছুটিয়া আসিল। পড়িল আসিয়া কমলাবতীর হাতে। তবু, বীরাঙ্গনা কিশোরী বিচলিত হইলেন না! যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—কিন্তু নিরুপায়!

গোলার পর গোলা ছুটিয়া আসিতেছে। কি সে ভীম গর্জন! বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, গোলা ছুটিতেছে—আঘাতের পর আঘাতে—কর্মদেবী ও কমলাবতী উভয়েই কঠিন গিরির বুকে শিলাস্তূপের উপর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন।

এমন সময় সেনাপতি পত্ত মোগলবাহিনীর এক অংশকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া—ঐ গিরিপথের কাছে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার কিশোরী ভগ্নী, পত্নী ও মাতা জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছেন। কমলাবতীর তখন একটি কথা বলিবারও শক্তি ছিল না। বাক্‌রোধ হইয়াছিল। পত্ত মাতা ও পত্নীকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া ধরিয়া তুলিলেন—কমলাবতীর দেহে প্রাণ ছিল না। মাতা কর্মদেবী স্নেহপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—পুত্র, আর দেরী নয়। সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে এসো—এসো স্বর্গে—আমরা মিলিত হব।

কর্মদেবীর শেষ নিঃশ্বাসও ধীরে ধীরে আকাশে বাতাসে মিলাইয়া গেল।

তারপর? তারপর আর কি শুনিবে?

বীর পত্তও রণক্ষেত্রে বীরের মত শত শত শত্রু সৈন্যের রক্তে তরবারির রঞ্জিত করিয়া প্রাণ দিলেন।

দিন শেষে সায়াহ্ন রবির স্তিমিত লোহিতালোকে শত্রু ও মিত্র সকলে দেখিতে পাইল—চিতোরের মহাশ্মশানে জ্বলিতেছে চিতা।—

নেপাল ছোঁড়ার কপাল খারাপ—ফাইনালে বার বার
ফেল করে' সে স্থির করে তার চাকরী করাই সার!
হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে ধর পাকড়ের শেষে
চাকরী একটা বেশ জোটালে নেপাল অবশেষে।
নেপাল বলে—কি আর হবে শিখলে লেখাপড়া?
কারখানাতেই চাকরী নিলাম যন্ত্রপাতি গড়া।
পাশ করে তো জানাই আছে কেরাণীদের দর,
ইঞ্জিনীয়ার কোথায় লাগে, যেমন কারিগর!
মালিক সে খুব মানুষ ভালো, বন্ধু বলেই ধরি,
বরাতখানা খুলবে, যদি নজরে তার পড়ি!

মাসখানেকও যায়নি নেপাল অফিস কামাই করে,
সাঁঝ সকালে আড্ডাও নেই, একলা কাটায় ঘরে।
কী হলো তোর ন্যাপলা, সবে নতুন ঢুকে কাজে
এমনধারা লম্বা কামাই করা কি তোর সাজে?
না হয় মালিক বন্ধু, তবু চাকরী সবই এক,
কাজের কামাই ভালো ত নয়, ভেবে চিন্তে দ্যাখ!
ন্যাপলা বলে বন্ধু বটে, তাই বলে কি আর
কোনো আগল থাকতে নারে কথাগুলোয় তার?
কথাটা তার মালিক যদি না ফিরিয়ে নেয়—
বলছি দেখিস আর কে সেথায় ফের কাজে যোগ দেয়?
আমি বলি পাগলামী ছাড়, আবার কাজে লাগ,
কী আর মালিক বলেছে, তাই এমন হলো রাগ?
ন্যাপলা বলে—মালিক কেন দশটা লোকের মাঝে
বললে আমায় কাল থেকে আর আসবে নাকো কাজে?

সেই লোহিত অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে ধূমের কুণ্ডলী মেঘের মত ধূসর আকাশের শেষ রক্তিম দীপ্তির সহিত মিলাইয়া যাইতেছে।

এক চিতায় জ্বলিতেছিল—রাণা পত্ত ও কমলাবতীর পুণ্য দেহ,—অপর চিতায় জ্বলিতেছিল রাণী কর্মদেবী ও কন্যা কর্ণবতীর পবিত্র শরীর—দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল!

রাজপুত বীরগণ যাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। চার মাস কাল পর্যন্ত তাঁহারা নির্ভীকভাবে আকবরের আক্রমণকে বাধা দিয়াছিলেন—শেষে যখন পরাজয় মানিতে হইল—তখন তাঁহারা জননী, ভগিনী, কন্যা ও পত্নীর মান-সম্মান রক্ষার জন্য করিলেন জহর ব্রতের ব্যবস্থা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যেক বীর রাজপুত সন্তান বীরদর্পে মোগল বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া—জননী জন্মভূমির জন্য রণে দিলেন জীবন বিসর্জন।

মৃত্যু-মলিন বিবর্ণ মুমূর্ষু বীরদের মুখে মুখে তখনও ধ্বনিত হইতেছিল 'হর হর বম্ বম্ হর হর মহাদেও!'
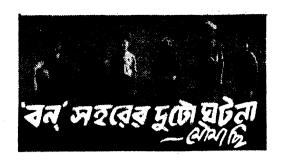
ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে আমি রুমানিয়া, হাঙ্গারী, পোল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডের পূর্বদিক হয়ে ইতালীর প্রায় সবকটা বড় শহরই ঘুরে দেখি। তারপর আবার সুইজারল্যান্ডের পশ্চিমদিকের বড় বড় কটা জায়গা দেখে বা-আল শহর হয়ে জার্মাণীর কয়েকটা শহরে যাই। পশ্চিম জার্মাণীর রাজধানী 'বন্' শহরের ছোট্ট দুটো ঘটনার কথাই তোমাদের শোনাবো।

'বন্' শহরটি রাইন নদীর তীরে ভারী সুন্দর জায়গা। গত মহাযুদ্ধের পর জার্মাণী দেশটা পূর্ব জার্মাণী আর পশ্চিম জার্মাণী এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তাই পশ্চিম জার্মাণীর রাজধানী করতে হয়েছে এই 'বন্' শহরকে। সেখানে নতুন পার্লামেন্ট ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ঘুচিয়ে—এই অল্প কয়েক বছরেই জার্মাণরা ছোট বড় সকলে খেটে এই শহরকে নতুন রূপ দিয়েছে। এই সমস্ত দেখবার জন্যে এখন বহু লোক ঐ শহরটিতে যায়। তা ছাড়া এই শহরেই আছে ইউরোপের জগৎপ্রসিদ্ধ সুরকার বেটোভানের বাড়ি। সেটি দেখতেই আমি সেখানে গেছলাম। আরও একটি উদ্দেশ্য ছিলো—পশ্চিম জার্মাণীর ভারতীয় দূতাবাসে—আমাদের ভারতের পক্ষে ওখানে যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেই পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুবিমল দত্ত মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসা। আর ঐ দূতাবাসে আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা।

বন্ শহরে যাওয়ার পর মাননীয় রাষ্ট্রদূত ডক্টর সুবিমল দত্ত ও দূতাবাসের ভারতীয় বন্ধুরা জার্মাণী ঘুরে দেখার ব্যাপারে নানা পরামর্শ দিয়ে—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ডক্টর দত্ত দূতাবাসের গাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। পরমস্নেহে বৈদেশিক দূতদের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছেন, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অনেকের সঙ্গে। শুধু তাই নয় নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। সেখানে শ্রীযুক্তা দত্ত নিজে বসে থেকে পরম আত্মীয়ার মতো যত্ন করে লুচি, মাংস খাইয়েছেন। তাঁদের যত্নের কথা কোন দিনই যেমন ভুলতে পারবো না, তেমনি ভুলতে পারবো না—বন্ শহরের ছোট্টদের নিয়ে ছোট্ট কয়েকটি ঘটনা।

বন্ শহরের পথে সেদিন একলা ঘুরতে বেরিয়েছি। মতলব ছোটদের সঙ্গে ভাব করবো—সহজ পরিবেশে—সাধারণ ঘরের জার্মাণ ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক রূপটা দেখবো। আরও একটা ইচ্ছে—অষ্ট্রিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে থেকে ভাঙা ভাঙা জার্মাণ ভাষা যেটুকু শিখেছি—সেটুকুই কাজে লাগিয়ে বন্ শহরে দু'চারটে ছোট্ট বন্ধুর সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে যাই।

দোস্ত বন্ধুর খোঁজে রাস্তার একটা মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোস্ত ভারতীয় পোষাক চুস্ত-শেরওয়ানী আমার অঙ্গে দেখে—একটি বারো তেরো বছরের ছেলে বগলে এক তাড়া খবরের কাগজ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ বড় বড় করে জড়সড় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে—"স্যার! ইউ ইন্ডিয়েন? আন্ডারস্ট্যান্ড জর্মেণ্?" ভারী মজা লাগলো, ভাবলাম আমার জার্মাণ বিদ্যের মতোই ইংরেজীতে ওর দৌড়। আসল মতলব ও আমাকে একটা কাগজ বেচতে চায়। ভরসা পেয়ে গলা খাটো করেই জার্মাণ বুলিতে বললাম—"ইয়া গেনোস্সিন! আইখ বিন্ ইন্ডিয়েন, আইখ ভেরসটে হে হাল্‌ফটে ডয়েস। (হ্যাঁ বন্ধু আমি ভারতীয়—আধা-জার্মাণ ভাষা বুঝতে পারি) আবের গেবেন সাই মির আইন ভোলস্টানডিখ্ ৎসাইটুঙ (কিন্তু তুমি আমাকে একটা গোটা খবরের কাগজই দাও)।

ছেলেটি আমার কথা শুনে হেসে ফেললে—একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে জার্মাণ ও ইংরেজীর খিচুড়ী করে বললে—দান্‌কেশ্যন! আই স্পিক হাফ ইংলিশেস—বাট সেলিং ফুল ইংলিশ ৎসাইটুঙ! ইউ টেক ইংলিশ!" (ধন্যবাদ! আমি আধা-ইংরেজী বলি, কিন্তু ইংরেজী কাগজও বেচি—আপনি ইংরেজী কাগজই নিন।) আমি বললাম—"না! তোমার কাছে যত রকমের জার্মাণ কাগজ আছে—সবই আমাকে একটা করে দাও।" ও আমাকে পাঁচ রকমের পাঁচখানা কাগজ দিলে—দাম হলো ১২৫ ফেনি। ও গদগদ স্বরে বললে—"ইউ ভেরী কাইন্ড স্যার! গ্রেট হেল্‌ফ্।" আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

"বিটে সের! বিটে সের! ব্রুডের।" (ও কথা বলো না, ও কথা বলো না ভাই)—বলে ওর হাতে কাগজের দাম দিলাম। ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো—বললে "আইখ বিন দাঙ্কবার" (আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ)। আমি বললাম—"ভাস্ ফেল্‌ট্ ডার?" (কি ব্যাপার তোমার বলতো?) ও তখন শুরু করলে—"সকাল থেকে আজ একখানা কাগজও খুচরো বেচতে পারিনি—বাবার মতো আমি কাগজ বেচতে পারি না!"

—"তোমার বাবাও খবরের কাগজ বিক্রী করেন বুঝি?"

—"বাবারই তো ঐ কাজ—আমি তো স্কুলে পড়ি।"

—"তাই নাকি! তোমার বাবার কি হয়েছে?"

—"বাবার আজ সাত দিন হলো অসুখ করেছে, হাসপাতালে আছেন—তাই আমাকে স্কুল কামাই করে কাগজ ফেরী করতে হচ্ছে। বাবার বাঁধা খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি কাগজ দিয়ে আসতে হচ্ছে—কিন্তু বাড়তি কাগজ আমি খুচরো মোটেই বেচতে পারি না। ভারী লজ্জা করে চেঁচিয়ে ফিরি করতে। তা ছাড়া বেশী জোরে চেঁচাতে মা বারণ করে দিয়েছেন—তাহলে বাবার মতো গলা দিয়ে রক্ত পড়তে পারে এই ভয়ে।"

ওর কথা শুনে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা—জিজ্ঞেস করলাম তোমার বাবা কোথায়? হাসপাতালে?

—"হ্যাঁ, হাসপাতালেই তিনি আছেন? কদিন পরেই বাবা ভালো হয়ে ফিরবেন। আমাদের দেশের হাসপাতাল আর ডাক্তাররা খুব ভালো।"

ছেলেটির নাম জানতে চাইলাম। ও জানালে ওর নাম কার্ল হাইনজ টমাস। টমাসরা থাকে বন্ শহরের বেশ দূরে শহরতলীতে। রোজ ভোরে উঠে তিন চার মাইল হেঁটে আসে—শহরে। সারাদিন কাগজ ফিরি করে—কাগজের মালিকদের দাম চুকিয়ে দিয়ে যেটুকু আয় হয়, তাই দিয়ে নিজে কিছু কিনে খায়, আর বাজার করে নিয়ে বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার সময়।

ছেলেটির সহজ সুন্দর ব্যবহারে আর অকপট আচরণে মুগ্ধ হলাম। ওর কথা শুনে ভারী কষ্ট হলো—পকেট থেকে পাঁচ ডয়েশমার্কের একটা নোট বার করে ওর হাত ধরে বললাম—"তুমি যদি কিছু মনে না করো, আমাকে বড় ভাই আর ভারতবর্ষের বন্ধু মনে করে এটা নাও। আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যাও—এই আমার অনুরোধ।"

ও জলভরা চোখে ঘাড় নেড়ে জানালো—"না! না! ও আমি নিতে পারবো না! মা বলে দিয়েছিলেন—কাউকে বলো না দুঃখকষ্টের কথা, কারুর কাছ থেকে নিও না সাহায্য—নিজের চেষ্টায় রোজগার করে আনবে। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, ভুল বুঝবেন না। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। কাগজগুলো বেচতেই হবে।" এই বলে ছেলেটি হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চকিতে ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে সে হারিয়ে গেল খুঁজে পেলাম না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম কি অদ্ভুত এই জার্মাণ কিশোরের মা-বাপের প্রতি ভক্তি। কি অদ্ভুত ওর আত্মমর্যাদাজ্ঞান! ইচ্ছে ছিল ছেলেটির একটি ছবি তুলবো। ও পালিয়ে গেল, তা আর হলো না।

(২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অন্তরীণাবস্থায়। দোভাষীর প্রয়োজন ছিল, কারণ, কানিয়া তিমুং খুব ভাল করে অসমীয়া ভাষা জানত না। বাংলা ত' মোটেই নয়।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় অবাক হয়ে গেলাম তার এক অদ্ভুত কান্ড দেখে। প্রতি রাত্রে ব্যারাকের দরজার গরাদের বাইরে একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখা হত ৯টা পর্যন্ত। দরজার পাশে বসে সেই আলোতে ভীড় করে আমাদের পড়তে হত। ব্যারাকের ভিতর হাতের পাশে আলো রাখা নিষিদ্ধ। ওপরে মিটি মিটি কেরোসিনের আলো জ্বলত, তাতে একে অন্যকে দেখতে পেতাম, বইয়ের হরফে দৃষ্টি দেওয়া চলত না।

সেদিন আমরা বসে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' পাঠ করছিলাম। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির উপদেশ দিচ্ছেন। একজন ছিলেন পাঠক আর সবাই ছিলেন শ্রোতা। কখন যে এসে কানিয়া তিমুং আমাদের পেছনে বসেছিল জানতে পারিনি। হঠাৎ যখন তার ওপর চোখ পড়ল তখন চেয়ে দেখি জোড়হাতে মুদিত চক্ষে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে সে। ভাঙ্গপড়া কুঞ্চিত মুখের পেশীগুলোতে মৃদু স্পন্দন, অধরোষ্ঠে লেগে আছে এক অপূর্ব হাসি। দু'চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা।

সর্বক্ষণ চেয়ে রইলাম এই সমাহিত মানুষটির দিকে। মন থেকে মুছে গেল মহাভারত, শুধু জেগে রইল একটি লোক।

প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি কিছু বুঝেছিলে আমরা কি পড়ছিলাম ও শুনছিলাম?

উত্তর দিল তিমুং, আমি বুঝেছিলাম আপনারা পুণ্যকথা কিছু আলোচনা করছিলেন। গান্ধীর লোক ভাল ছাড়া মন্দ কথা কিছু ভাবতে পারে না, আলোচনা করতে পারে না। পুণ্যকথা কিছু শুনলেই জীবন সার্থক হয়।

এই কানিয়া তিমুং ১৯২৬ ইংরেজী থেকে গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও সৈনিক। সে সত্যাগ্রহে বারবার জেলে যায়, নিজের জাতির সেবা করে, কিন্তু ক'জন তার সংবাদ রাখত, পরেই বা রেখেছে?

এই নিরক্ষর সাধু পাহাড়ীটি নিজের জাতির দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে অনুভব করত। সেই অনুভূতি তাকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করে তুলেছিল। সে তার দু'টি ছেলের নাম রেখেছিল , বলবন্ত আর বিদ্যাবন্ত। সে দুঃখ করে বলেছিল, মিকির জাতির বল নেই, বিদ্যা নেই। তাই জাতির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছিল নিজের প্রিয় সন্তানদের নামকরণে। তার বাবাও একদিন তার নামকরণ করেছিল নিজেরই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে।

(৪)

এখনও আরো বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আমার হৃদয় জুড়ে আছে ঐ কানিয়া তিমুং। তার বহু কাহিনী মন জুড়ে রয়েছে। ১৯৩২-এর সেই সাক্ষাৎ আজো মনে হয় যেন এই সেদিনের। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ওপার থেকে কানিয়া তিমুং তার মৃদুমধুর কণ্ঠে অনেক কথাই বলে ওঠে। সে সব কিছু বলবার এ স্থান নয়। আর একটি মাত্র ছোট ঘটনারই এখানে উল্লেখ করছি।

একটি কয়েদী মেট একজন রাজনৈতিক বন্দীকে অপমান করেছিল খাওয়ার প্যারেডে। হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীমহলে। জেলার, জমাদার সবাই ছুটে এসেছিলেন আমাদের শান্ত করতে। শান্ত হলাম আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়ে যে, মেট তার অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি পাবে। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার সুপারিন্টেন্ডেণ্টের কাছে তাকে বিচারের জন্যে হাজির করা হবে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল মেট। শাস্তির অর্থ, শুধু সেই শাস্তিই নয়। বছরে সদ্ভাবে থাকার জন্য যে বিশেষ 'রেমিশন' তারা অর্জন করে, সেটার থেকে বঞ্চিত হবে সে। এর অর্থ অন্ততঃ দিন পনরোর জন্য জেলের মেয়াদ বেড়ে যাওয়া। সে সারাটি জেল জুড়ে রাজনৈতিক মহলে ক্ষমাভিক্ষা করে বেড়াতে লাগল। অধিকাংশের কেন, প্রায় সকলেরই অভিমত হল, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

কি জানি কেন কৌতূহল হল। আচ্ছা, এ সমস্যায় আমাদের কানিয়া তিমুং কি বলে? জ্ঞানবাবুকে নিয়ে তার কাছে গেলাম। সেদিন কানিয়া তিমুংয়ের মত একটি অক্ষরজ্ঞানহীন মিকিরের কাছে যে উত্তর পেয়েছিলাম আজো সেটা আমার কাছে একটা বিস্ময় হয়ে রয়েছে। এ কি তার নিজের কথা, না আর কেউ তার ভেতর থেকে কথা বলছে?

কানিয়া তিমুং বলল, ক্ষমা যখন চাইছে, তখন ক্ষমা করাইতো নয় শাস্তি দেওয়া বাবুজী। গান্ধীজীর লোক এ ছাড়া আর কোন শাস্তির কথাতো জানে না। অন্যরকম শাস্তি দিলে ওর এর-তার মতো কয়েদীদের জেদই বেড়ে যাবে। যদি বলেন, সে অনুতপ্ত নয়, শাস্তি এড়াবার জন্যে ভান করছে, তাহলে নিজেকেই সে আরো অপরাধী করবে। আমাদের ধর্ম আমাদেরই থাকবে।

কানিয়া তিমুংয়েরই জয় হয়েছিল। আমরা প্রায় দু'শো রাজনৈতিক বন্দী তার অভিমত গ্রাহ্য করেছিলাম। কিন্তু সে হয়ত আমাদের সবার এক কোণে বসে ভাবতেই পারেনি যে, তার এই অভিমত গ্রহণ করে আমরা তারই জয়ধ্বনি করছি।

কিন্তু সেদিন সকলে করেছিলাম, আজও করছি মুক্তকণ্ঠে ওই মানুষটির জয়ধ্বনি।

• শ্রী দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য •

জ্যোতিষ অদৃষ্টবাদ নহে; অবশ্য কার্যকারণে তাহা অদৃষ্টবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে। মাটির গুণাগুণ ও স্থানীয় জলবায়ু অনুসারে কোন্ জমিতে কি ফসল জন্মান যায়, তাহা যদি অদৃষ্টবাদ না হয়, তাহা হলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতি ও মানসিক ধারা বিশ্লেষণ করে তাহাদের সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া বা কাজে লাগানোও অদৃষ্টবাদ হতে পারে না। ভবিষ্যৎ জানবার প্রবল আগ্রহ প্রত্যেকের আছে; এমন কি জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ কত সাধ্যসাধনা করেছে; পরলোক বা ঈশ্বর সম্বন্ধে নব নব বাণী শুনিয়ে অলোকসামান্য চরিত্রমাহাত্ম্যে অনেকে লোকচিত্তে অমরত্ব লাভ করে গেছেন; কেহ ঈশ্বরপুত্র হয়েছেন, কেহ প্রেরিত পুরুষরূপে পরিচিত হয়েছেন, কেহ বা অবতার আখ্যা লাভ করেছেন। তাঁদের বাণী আশ্রয় করে শত শত গ্রন্থ রচনা হয়েছে; টিকাটিপ্পনি হয়েছে অজস্র। এই থেকেই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কথামৃত ও তর্কবিতর্কের ছড়াছড়ি; আশ্রম, মঠ, দেবালয় ও মন্দিরের হয়েছে প্রতিষ্ঠা। আধুনিক বিজ্ঞানী-মনের কাছে হয়ত তাহা মানসিক বিলাস কিংবা মানসিক বিকৃতি। জ্যোতিষ অবশ্য ধর্মকথা নহে; তাহা মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত দেয়, তাহার প্রধান অবলম্বন গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশি।

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে, তাহা সাধারণ ভূগোলের জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন। আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্রি, ঝড়বৃষ্টি, বাতাস ও

এক যে ছিল রাজা—রাজার মতই রাজা, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অগাধ ঐশ্বর্য, লোকজন, সেপাই বরকন্দাজ, মন্ত্রী-সেনাপতি একেবারে গমগমে ব্যাপার। যাকে বলে রাজার মত রাজা।

এমন যে রাজা, সুখ-ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, শুধু রাজার কেন—রাজ্যের কারুরই কষ্ট নেই, সবাই সুখী, সবাইর মুখে হাসি—কিন্তু হলে কি হয়—রাজার অসুখ—সে অসুখ কিছুতেই সারে না।

হঠাৎ সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো। রাজসভায় রাজা বসে আছেন—পাত্রমিত্র নিয়ে—কাজকর্ম পুরোদমে চলছে। কিন্তু রাজার দিকে তাকালেই মনে হয়, রাজা অসুস্থ! রাত জাগার ম্লানিমা সারা মুখে, চোখের কোলে মোটা হয়ে কালি পড়েছে—কেমন যেন অবসন্ন ভাব সারা শরীরে—তবু রাজা কাজ করছেন। রাজার কাজ তো আর সহজ কাজ নয়। এমন সময় রাজার সান্ত্রী এসে খবর দিল—একটি ছোট মেয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করবে, তাকে এখন আসতে বারণ করা হচ্ছে, —তবু সে শুনবে না, বলছে: আমার খুব দরকার—আমি রাজার অসুখ ভাল করে দেবো।

রাজা একটু ভেবে বল্লেন: আচ্ছা নিয়ে এসো তাকে।

সভাসদরা বল্লেন: আপনি ওসব শুনবেন না মহারাজ, বাচ্চা মেয়ে সে আবার কি অসুখ ভালো করবে? এত ডাক্তার-বদ্যি হেরে গেল।

তাঁদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্রীর সঙ্গে একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে রাজসভায় ঢুকলো। সাদা পোষাকে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে, কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো মুখের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে, বড় বড় কালো টানা চোখে যেন আনন্দমাখা। মিষ্টি গলায় বল্লে: তুমি তো রাজা? নমস্কার! আচ্ছা দেখো এরা আমায় কিছুতেই ঢুকতে দেবে না কেন? আমি তোমার অসুখ সারাতে এসেছি।

রাজা বল্লেন: আমি কাজ করছি বলে তোমায় ঢুকতে দেয়নি, এখন তো এসেছ, আর বলছো অসুখ সারাতে এসেছ—কিন্তু জানো, কত বড় বড় ডাক্তার-বদ্যি হার মেনেছে, অসুখ সারাতে পারেনি? তুমি তো ছোট্ট খুকু, তুমি আবার কি অসুখ সারাবে?

হলেই বা ছোট্ট খুকু, আমি অসুখ সারাবো তাই নিয়ে কথা, বড় আর ছোট্টতে কি এসে যাবে?

—কিন্তু কার কাছে ওষুধ শিখেছ বলতো? তোমার মা কিছু টোটকা ওষুধের কথা বলেছেন তাই নিয়ে এসেছ?

—মা বলবেন কেন—আমি নিজেই জানি।

রাজা আর সভার লোকেরা হো হো করে হেসে উঠলেন আর বল্লেন: বলে কি, একটা বাচ্চা মেয়ে নিজেই জানে ওষুধ!

মেয়েটি বল্লে: করেই দেখো না যা বলি, অনেক ওষুধপত্র তো করেছ।

রাজা আবার শব্দ করে হেসে উঠলেন: জানো, কত বড় বড় ডাক্তারের ওষুধে কাজ হয়নি আর তোমার মার শেখানোমত অনেক টোটকা ওষুধও হয়েছে, কিছু হয়নি। বেশী কথা বল না, মার কাছে গিয়ে বলগে 'ওসব হবে না'।

মেয়েটাও নাছোড়বান্দা, কেবলই কথা বলে যাচ্ছে, আর বলছে, এ ওষুধ সে নিজে জানে—মা তাকে কিছু বলেনি।

কথা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো—রাজা রেগে উঠে বল্লেন: যাও তো কে আছ এই মেয়েটাকে নিয়ে, হাত-পা বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখো।

মেয়েটি একথায় কিছু ভয় পেলো না, বল্লে: তুমি আমার কথা শোনো রাজা, ওষুধ নিয়ে দেখো।

কিন্তু রাজার আদেশ পাওয়ামাত্র আর কেউ অপেক্ষা করলো না, মেয়েটিকে নিয়ে হাত-পা বেঁধে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে এলো।

সারাদিন কেটে গেল, সন্ধ্যাও গেল। সব কাজের মধ্যে মধ্যে রাজার এক একবার মনে হচ্ছিল মেয়েটির কথা, কিন্তু একটা ছোট্ট মেয়ে তার কথার মূল্য দেবার মত সময় আর মন কোনটাই নেই।

কিন্তু রাত্রে যখন রাজা শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, হঠাৎ মেয়েটির কথা মনে হলো। কৌতূহল হলো কি করছে মেয়েটি জানতে।

রাজার তো রাতে ঘুম হয় না—তাই যে ঘরে মেয়েটিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল সেখানে গিয়ে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন।

রাজা দেখলেন মেয়েটি সবেমাত্র মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর এক টানে হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খুলে ফেললো। তারপর জামাকাপড় ঠিক করে নিয়ে পাশের স্নানের ঘরে ঢুকে হাত-মুখে জল দিয়ে এলো—চুল আঁচড়ে, কাপড় বদলে সে মাটিতে বসে পড়লো হাঁটুমুড়ে। তার সামনে খোলা জানলা। ঝির ঝির করে বাতাস আসছে, মেয়েটির কোঁকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলোয় ঘরটি ভরে গেছে। তেমনি হাঁটু মুড়ে বসে, হাতজোড় করে চোখ বুঁজে মেয়েটি কপালে হাত ঠেকালো—তারপর তেমনি করে অনেকক্ষণ রইল, মনে মনে হয়তো কি বললো, তারপর কপালে হাত তুলে প্রণাম জানালো। কিছুক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের আলোর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। আরো কিছুক্ষণ পরে সে অগাধে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাজা অনেকক্ষণ ধরে তা দেখলেন। তারপর ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ফিরে এলেন নিজের শোবার ঘরে। ঠিক তেমনি করে স্নানের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, তাঁর ঘরের খোলা জানলার সামনে হাঁটু মুড়ে হাতজোড় করে বসলেন। তারপর আর কিছু তিনি বুঝতে পারলেন না।

সকাল বেলা রাজার চাকর এসে দেখে রাজা তাঁর পালঙ্কে শুয়ে অগাধে ঘুমোচ্ছেন। এরকম আশ্চর্য ব্যাপার সে বহুকাল দেখেনি—রাণীমাকে ডাকলো। রাণীমাও আশ্চর্য হলেন খুসী হলেন।

রাজার যখন ঘুম ভাঙলো—তখন তাঁর শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে, মনটাও বেশ প্রসন্ন।

সেদিন যথারীতি নিজের ও সভার কাজকর্ম সেরে তিনি সেই ছোট্ট মেয়েটির খবর আনতে পাঠালেন। লোক ফিরে এসে খবর দিল, যে ঘরে মেয়েটিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল—সে ঘরে কেউ নেই, দরজাও খোলা।

—এ কেমন করে হয়—? বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল—সে দরজা কেমন করে খুলে গেল—কে খুল্লে? রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারলে না— অনেক খোঁজখবর করেও মেয়েটির সন্ধান কেউ করতে পারলে না।

উচ্ছের চপ্ খেতে
ইচ্ছে তোমার বুঝি হচ্ছে?
আচ্ছা হে তাই হবে ;
বাচ্চা-বাবুই সেটা করছে।
তুচ্ছ এ ব্যাপারেতে
কিচ্ছু হে কোরো নাকো চিন্তা,
কচ্ছ মুড়ে করি'
স্বচ্ছন্দেই নাচো ধিন্-তা।
খিচ্ছরি রাজভোগ
কেমন জিতে খাবে বাপ্ গোচ্চার?
খাচ্ছ কি খাজা গজা?
ও সব তো খায় যত মচ্ছার!
পিচ্ছিল কর্দমে
চিংপাত কেমন হবে দুর ছাই?
হাঁচ্চো-র চোটে শেষে
হাত-ছাড়া কোরো না হে ভোজটাই।
তা'র চেয়ে ব'সে ব'সে
আচ্ছা-ক'সেই গান গাও না!
'কাঁচ্চা আলু'র সাথে
উচ্ছের চপ্ ঠেসে খাও না!
বাচ্চা-বাবুর হাতে
তৈরী খাবার তাল লাগ্‌বেই,
খাঁচ্চা জিনিষ পেয়ে
কাচ্চা-বাচ্চা খুব নাচ্‌বেই।

সেদিন রাতে শুতে যাবার আগে রাজা আগের দিনের মত সব করলেন। চোখ বুজে, হাত জোড় করে রাজা যখন মনে মনে প্রার্থনা করছেন—মনে হলো, সেই ফুটফুটে ছোট মেয়েটি যেন কাছে এসে বলছে : রাজা, প্রার্থনা কর, প্রার্থনায় সব আছে।
দেখ, কাজ সবই তুমি করো—কিন্তু কোনওদিন ভুলেও একবার প্রার্থনা কর না। কিন্তু যখন হোক একবার সব মানুষের প্রার্থনা দরকার। তুমি অনেক কাজের লোক কিন্তু তাহলেও সব কাজের আগে কি শেষে যখন হোক একবার সব মানুষের প্রার্থনার দরকার। আমি বলেছিলাম তোমার অসুখ সারাবো, বিশ্বাস করোনি—মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

প্রার্থনা শেষ করে রাজা উঠলেন—চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোনদিকে মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই।

রাজা হাত তুলে প্রণাম জানালেন।

রাজার অসুখ সেরে গেছে।

যদি তোমরা কোনদিন রাজার শোবার সময় যাও—দেখবে সারাদিনের কাজকর্ম সেরে রাজা নিয়মিত প্রার্থনা করে তারপরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন—তার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যান।

মেয়েটি বলেছিল: প্রার্থনা করা প্রত্যেকের জীবনে দরকার, এবং মনে রাখা উচিত।

রাজা সে কথাটা কোনওদিন আর ভোলেননি।

মহাকোশলের দূরে মাইকাল পাহাড় শ্রেণীর উপলবন্ধুর অরণ্য-গহন উপত্যকায়—গন্ড, আগারিয়া, পারধান, আহির ইত্যাদি যত উপজাতি বাস করে, তাদের কল্পনাপ্রবণ কবিমানস যত কাহিনীই না রচনা করেছে, কত গাথা, গান, কত রকম তার আবেদন!!

বাপ-মা মরা ছেলে কান্থি আর তার একটি বোন! ভাইটি হল বোনের প্রাণ! রাঁধা-বাড়া করে দেওয়া, ভাইকে দেখা-শোনা যাবতীয় কাজ বোনটি করে ভাই কান্থির জন্য!

বোন বলে, ভাই রে, ঐ কালো পাহাড়টা আমাদের বাবা, আর মা হল ঐ ছায়া-ঘন বাঁশের বন। এই দুনিয়ায় আমাদের কেউ নেই আর, শুধু তুই আর আমি, আমি আর তুই!

বারো বছর ধরে মোষগুলো বাথানে বাঁধা, ওদের কেউ চরায় না মাঠে, কেউ দেয় না ঘাস-জল!

ওরা ডেকে বলে, সুন্দরী কুমারী, বারো বছর আমরা ঘাস-জল পাই না, খিদেয় মরে গেলাম, আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা দেব দুধ, দেব দই!

কিন্তু মেয়েটি ফিরে তাকালো না, পারলো না চোখ তুলে তাকাতে বিশাল দেহ ঐ বন্য মোষগুলোর দিকে।

—ভাই কান্থি, নিজের মনে খেলা কর, কিন্তু ভুলেও কখনো মোষগুলোর ধারে-কাছে যেওনা!

একদিন খেলাতে খেলাতে কান্থি চলে এল মোষের বাথানের কাছে।

কান্থিকে দেখামাত্র আর্তনাদ করে উঠলো ভীষণাকৃতি মোষগুলো!

—কান্থি, বারো বছর হল তোমার বাপ মা মরে গেছে, আর আমরা বাঁধা আছি এই বাথানে, ঘাস-জল পাই না, দোহাই তোমার, আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

তখুনি কান্থি বন্ধনমুক্ত করে দিল মোষগুলোকে আর বন্ বন্ করে মোষগুলো দৌড়ে চলে গেল বনময় উপত্যকায় এখানে সেখানে!

বোন দেখলো, বল্ল ভাইকে, কত করে বলাম, যেওনা ওদের কাছে, দিও না খুলে বাঁধন, কিন্তু নিষেধ শুনলে না।

প্রতিদিন কান্থি মোষগুলোকে চরাতে নিয়ে যায় বনের মধ্যে সবুজ আঁধার অরণ্যভূমিতে, সেরে আসার সন্ধ্যা সাঁঝে আবার ওদের ঘরে নিয়ে আসে।

দুধ দোয়ায় ভাই, আর বোন সেই দুধ বিক্রী করে বাড়ী বাড়ী।

—কান্থি, কোন বনে চরাও তুমি মোষগুলোকে, কোন্ নদীতে খাওয়াও জল? কান্থি, ভাই, ওই বনময় পাহাড়ে ওদের নিয়ে যেও, জল খাইও ঝুমের কিনারে!

কিন্তু কান্থি বোনের কথা না শুনে ওদের নিয়ে গেল

কাজলা কচ্ছর বনে, ঢল হারাকরে। ... কোয়েলি নদীর ধারে!

দুষ্টু মোষগুলো জল খেতে নামলো গভীর কোয়েলি নদীর জলে, কিন্তু কিছুতেই উঠে এলো না তীরে, সাতদিন সাত রাত ঐভাবে ডুবে রইলো। কান্থি কত ডাকলো, আয়, আয়, তোদের নারকোল দেব, ছাগল দেব দেখিস, উঠে আয়!

দুষ্টু মোষগুলো নেমে গেল নদীর আরো গভীরে, বল্ল, উঠবো, যদি তোমার বোনকে বিসর্জন দাও এই জলে।

অগত্যা কান্থি রাজি হল আর মোষগুলো উঠে এল!

—কান্থি ভাই, কত নিষেধ করেছি, কোথায় কোন্ বনে নিয়ে গিয়েছিলে, জল খাওয়াতে নিয়েছিলে কোন্ নদীতে? সাতদিন সাত রাত তোমার পেটে খাবারের একটা দানাও পড়েনি, এবার হাত-মুখ ধোও। খাও খাবার।

কান্থির ছোট্ট হৃদয়ে তখন ঝড়ের দোলা, এক মায়ের গর্ভে জন্মালেন, আমরা দুই ভাই-বোন, হা রাম, এ তুমি কি ক'রলে, এখন কি ক'রে ভগ্নী বিসর্জন দিই?

—হাত পা ধোব না বোন, খাব না খাবার আমার মাথা ধরেছে বড়, আমি মাঠে চলে যাই, তুমি নিয়ে এস মাঠে আমার খাবার!

বোন অবাক হ'য়ে ভাবলো, কি হল?

নিশি ভোরে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কান্থি উঠে মোষগুলোকে ছেড়ে দিল, মোষগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গেল বনের মধ্যে।

তারপর কান্থি ওদের ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এক মাস, দু'মাস, তিন মাস, কান্থি ঘুমিয়ে রইলো বারটি মাস নিবিড় ঘুমে!

মোষগুলো এর মধ্যে কোয়েলি নদীর গভীর জলে নেমে গিয়ে ডুবে রইলো।

এদিকে বোন, ভাত রাঁধলো, ডাল রাঁধলো, রুটি বানালো, তারপর সুন্দরী মেয়েটি তার সমস্ত অলঙ্কার গায়ে প'রে নিল, ঘর বন্ধ করে ঝুড়ি ভরে খাবার নিয়ে ভাই-এর উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। মনে মনে বল্ল, ভাই, যতদিন আমি বেঁচে আছি, তোমাকে দেখবো আমি, কিন্তু নিষেধ ক'রলে ত কথা শোন না!

সারা রাজ্য খুঁজলো বোন, কিন্তু কান্থি কোথায়? শেষে কাজলি কচ্ছরে এসে দেখা পেল ভাই-এর, ঘুমিয়ে আছে কান্থি কাজলি কচ্ছর বনে! নীচে দূরে বিস্তার কোয়েলি নদীর গহন কালো জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো মোষগুলো গলা ডুবিয়ে রয়েছে নদীর গভীরে!

চিন্তার কালো ছায়া ঘনালো বোনের সুন্দর ললাটে!

—কান্থি ভাই ওঠো, খাবার খাও, কতদিন না খেয়ে আছো তুমি। জেগে উঠে কান্থি বোনকে দেখলো, অশ্রুভারে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো তার সমস্ত মন।

—বোন আমার বোন, এক কলসি জল আনো বোন বড় তেষ্টা পেয়েছে। নিটোল কটিতটে গাগরী নিয়ে সুন্দরী কুমারী নামলো কোয়েলি নদীর গহন জলে।

—কান্থি ভাই, এখান থেকে জল নিচ্ছি।

—ওখানে নোংরা জল, তুমি আরো এগিয়ে যাও। জান, ডুবে গেল কুমারীর!

—এখান থেকে নেবো জল?

—ওখানকার জলে বড় আবর্জনা বোন, তুমি আরো এগিয়ে যাও। কটিতট ডুবে গেল কোয়েলির কালো জলে।

—ভাই এখান থেকে নেবো জল?

—ওখানে শ্যাওলা রয়েছে বোন, আরো এগিয়ে যাও!

বুক পর্যন্ত ডুবে গেল মেয়েটির।

—ভাই, এখান থেকে নিই জল?
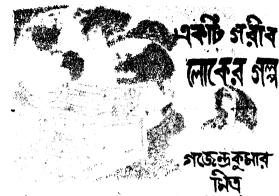
—বোন, ওখানকার জলও নোংরা, আর একটু দূর থেকে আনো। আস্তে আস্তে কুমারীর গলা পর্যন্ত ডুবে গেল, তবু পরিষ্কার জল মিললো না!

তারপর সম্পূর্ণ জলের নীচে চলে যাবার আগে গাগরী জলপূর্ণ করে দূরে ছুঁড়ে দিল তীরে তার বড় আদরের ভাই-এর দিকে, কান্থির একেবারে সামনে এসে পড়ল কলসীটি।

একটি বুদ্বুদ শুধু উঠে ফের মিলিয়ে গেল কোয়েলির গহীন জলের বুকে। তারপর রইলো শুধু নিবিড় স্তব্ধতা জলের বুকে, দূরের আকাশে আর চারপাশের অরণ্যলোকে!

মোষগুলো উঠে এল এবার কোয়েলির গভীর জল থেকে।

বোনের আনা খাবারগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল কান্থি, হা রাম, এ বিদেশে এখন আমি একেবারে এক!

আহির বালকেরা মাঠে মাঠে গরু মোষ চরাতে চরাতে বাঁশী বাজিয়ে গায় এই গান, কান্থি আর তার বোনের এই করুণ কাহিনী:

বিশ্বাস হবার কথা নয়—কিন্তু সত্যিই বলছি। এলিফালেট রেমিংটন লোকটি মরবার সময় পর্যন্ত নিতান্ত গরীব ছিলেন।

নামটা চেনা-চেনা লাগছে, না?

আজকালকার দিনে কোন্ সভ্য মানুষের টাইপরাইটার না হ'লে কাজ চলে? হাতের লেখা—? একে ত হাতের লেখা ভাল হওয়া চাই, তাতে সময় লাগে বেশি। এক ছাপা—কিন্তু ফি-হাত ত আর ছাপা চলে না। ধরো তুমি একটা চিঠি লিখবে কি দরখাস্ত করবে—সেটাও যদি ছাপাতে হয় ত, কত টাকা খরচ এবং সময় নষ্ট।

অথচ টাইপরাইটার যন্ত্র দেখলে মনে হয় কাজটা কতই সহজ! একটি ছোট্ট বাক্সর ভেতর কতকগুলি বোতাম বসানো, বোতামের গায়ে হরফগুলো আঁকা। সেই বোতামে ঈষৎ একটু চাপ দিলেই ওখানে সেই হরফগুলি পরপর ছাপা হয়ে এল। ওস্তাদ লোকের হাতে পড়লে এক মিনিটের ভেতরই একখানা চিঠি ছেপে বেরিয়ে আসে। এই টাইপ-রাইটার যন্ত্র এক একটা বড় অফিসে শয়ে শয়ে রাখতে হয়। ছোটখাটো ব্যবসারও অঙ্গ এটা। এমন কি আজকাল কোন কোন সাহিত্যিক কলমে না লিখে সোজা এই যন্ত্র চালিয়েই রচনা করে যান। মানুষের কাজে লাগার মত যত জিনিস আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে, টাইপরাইটার তাদের কারুর চেয়ে কম নয়। এখন অনেক রকমের টাইপরাইটার যন্ত্র বাজারে চলে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি নাম বোধহয় আজও রেমিংটন টাইপ-রাইটারেরই!

এই টাইপরাইটার যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন, সেই রেমিংটন সাহেবের কথাই বলছি।

(শেষাংশ ১৮৫ পৃষ্ঠায়)

এ'রা প্রথমে একটি বন্দুকের কারখানা করেন—ইনি এবং এ'র ভাই। এ'দের বন্দুকের খুব নাম ছিল, সে বন্দুকের গঠনকৌশলও এলিফালেটের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। তখন এমন হ'ল যে, এ'দের সংগে আর কোন বন্দুকওয়ালা পাল্লা দিতে পারলে না। প্রচুর পয়সা আর নাম।

সুখেই থাকতে পারতেন। কিন্তু সুখ এ'র কাম্য ছিল না। বন্দুকের ব্যবসাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হ'ত—তা উনি সব ধরে দিতেন দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। বিশেষ করে সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি যেন উজাড় করে দিলেন এ'র যা-কিছু সঞ্চয়, নিজে বলতে গেলে নিঃস্ব হয়ে দান করলেন যথাসর্বস্ব। বললেন, 'আমার আর কি দরকার, খানকতক বই আর দুবেলা কিছু খাবার, এই হলেই ত চলে যাবে!'

নিজের জন্য কিছুই চাই না। কিন্তু মানব জাতির যে ভাবী বংশধর—যাদের হাতে আগামীকালের পৃথিবীকে তুলে দিতে হবে—তাদের শিক্ষায় কোন ত্রুটি না থাকে! ও'র যতটুকু ক্ষমতা— উনি সাহায্য করবেন তাদের মানুষ হয়ে উঠতে।

তা ত করবেন। কিন্তু উনি নিশ্চিন্ত হয়ে বইয়ের ভিতর ডুবে থাকেন বলে বাইরের পৃথিবী ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই! শিগ্‌গিরই অন্য ব্যবসাদাররা নতুন নতুন ধরণের বন্দুক তৈরী করতে লাগল। রেমিংটনদের বন্দুক হয়ে গেল সেকেলে—অচল! এ'দের কারখানা-কারবার ডুবতে লাগল। বিপুল ভয়াবহ রকমের দেনা হয়ে গেল চারিদিকে—শেষে একদিন দেউলিয়া হবার উপক্রম হ'ল।

এইবার যেন রেমিংটন জেগে উঠলেন। একটা কিছু ত করা দরকার।

অল্প কদিনের মধ্যেই মাথা খাটিয়ে তৈরী করলেন এই টাইপ-রাইটার যন্ত্র। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল—পৃথিবীর সব দেশে রেমিংটনের নাম, ও'র টাইপরাইটারের চাহিদা। আবারও ব্যবসা জমে উঠল, আমদানী হ'তে লাগল লক্ষ লক্ষ টাকা।

তাতে কি আবিষ্কর্তার কিছু সুবিধা হ'ল? বিন্দুমাত্রও না। কেন?

সোজা কথা। কারবারের যে দেনা জমে আছে পর্বতপ্রমাণ তা শোধ হওয়া চাই। কারখানা বাড়াতে হবে দেশ-বিদেশে চারিদিকে আফিস খুলতে হবে—কোটি কোটি টাকার দরকার। এগুলো হলে তবে ত এলিফালেট কিছু পাবেন।

সুতরাং তাঁর চলতে লাগল—প্রায় উপবাস। ছেঁড়া পোষাক—সামান্য জীবনযাত্রা। তা হোক্, তাতে কোন দুঃখ নেই। দুঃখ এই যে, ইচ্ছেমত বই কিনতে পারা যায় না।

রেমিংটন তাঁর কোটরেই থাকেন। দারিদ্র্য গায়ে লাগে না। বই পড়ে দিন কেটে যায়— সাংসারিক অভাবের কথা মনেও থাকে না।

ক্রমে কথাটা কানে গেল সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের, যাঁর বিপুল সম্পদে এই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে—তাঁরই এমন দুরবস্থা! অনেক ভেবেচিন্তে আলোচনার পর তাঁরা একটা মাসোহারা ঠিক করে দিলেন। ফলে শেষের কটা বছর তবু অপেক্ষাকৃত আরামেই কাটলো।

সময় যেদিন শেষ হয়ে এল সেদিন এই অদ্ভুত লোকটি—বেশ প্রশান্তচিত্তে হাসিমুখেই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ ছিল না সেদিন তাঁর। শিক্ষাকে তিনি সেবা করেছেন—শিক্ষাও তাঁকে ভোলেনি। আর কি চাই!

এই লোকটি যে বছর মারা যান—সেই বছরই আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে।

একটি মজার গল্প আমি আজ তোমাদের বলবো ভাই
আগাগোড়াই সত্য এটার একটি কথাও মিথ্যা নাই।
বোলতে যখন করবো সুরু সবাই খাড়া রাখবে কান,
গল্প শোনার সাথে সাথেই ডাকবে দেখো হাসির বান।
দুই বেড়ালে ঝগড়া হলো কী যে ভীষণ রূপ ধ'রে,
সে কথাটাই বোলছি আমি শ্রবণ করো চুপ্ ক'রে।
একদিন এক ঝড়ের রাতে আঁধার ঘরের এক কোণে,
দিচ্ছিলো ঘুম নাক ডাকিয়ে দুটি বেড়াল ভাই-বোনে।
ঝোঁকের মাথায় একটি ইঁদুর যেমনি আসা অকস্মাৎ,
তড়াক্ কোরে লম্ফ দিয়েই ভাই-বোনে তার ধরলো হাত।
ইঁদুর নিয়েই ঝগড়া তখন দুইজনাতে বাধলো জোর,
ভাই তেড়ে কয়, হাত ছেড়ে দে'—নয় মাথাটাই বাঁধবো তোর।
বোন চেঁচিয়ে কয়, আমার শিকার তুই খেতে চাস্ ফাঁকতালে?
এক চাঁটিতে ঠিক লাগাবো এগালের দাঁত ঐ গালে।
ঘাড় ফুলিয়ে লেজ দুলিয়ে ম্যেয়াও ও'য়াও ভাই হাঁকে,
চোক পাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ম্যাও ফোঁস্ ফোঁস বোন ডাকে।
এমনি কোরে ঝগড়া যখন উঠলো চড়া মাত্রাতে,
ঘুমের ঘোরেই গিন্নি স্বয়ং লাগলো লাঠি হাত্‌ড়াতে।
এরপরে যা' ঘটলো ব্যাপার বুঝতে পারো আন্দাজে,
প্রহার বিনাই ছাড়বে এদের নয়কো তেমন বান্দা সে।
অর্ধ রাতে ঘুম-ভাঙ্গালো, তাতে আবার গিন্নী-মা'র
খোকনা হুতোই পোষা বেড়াল কোনই খাতির নেইকো তার
পা-টিপে তাই নেমে এসে পালঙ্কটার পাশ দিয়ে,
ছাগল-তাড়া ক'রলে তাদের ইয়া মোটা বাঁশ নিয়ে।
হাতের কাছে মিললো যখন দুটি বেড়াল বাচ্চাকে,
সটাং দিলে আড়ং ধোলাই লাঠির ঘায়ে আহ্লাদে।
তারপরে তাই রেগেমেগে গিন্নী দুটোর ঘাড় ধ'রে
আছাড় মেরে জানলা দিয়েই দিলে ঘরের বার ক'রে।
আগেই আমি বোলেছিলাম হচ্ছিলো জোর ঝড়-বাদল,
সব ডুবেছে খানা-ডোবা চারদিকে ভাই জল কেবল।
দুটি বেড়াল ছিটকে গিয়ে পড়লো যখন সেই জলে,
বোন উঠে কয় ডুকরে কেঁদে ভাই-বোনে কি বাদ চলে?
বাইরে ঝড়ের মাতামাতি নিকষ-কালো অন্ধকার,
ঘরে ঢোকার নেই কোন পথ, হায়রে কপাল বন্ধ দ্বার!
ভাই বোন তাই ভিজলো ভীষণ মুষলধারা বৃষ্টিটার,
ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপছে শীতে, ঝল্‌সা লাগে দৃষ্টিটার!
আজকে তাদের মরতে হবে, এই কথাটা সার বুঝে,
কুন্ডলি পাকিয়ে দুজনেই রইলো তারা ঘাড়-গুঁজে।
ইঁদুর নিয়েই ঝগড়া সুরু সেই শিকারই হাতছাড়া,
মাঝখানেতে গিন্নী তাদের করলে মেরে জান সারা।
মনের খেদেতে ভাই-বোনেতে করলো শপথ সেই রাতে,
বাঁচলে এবার, ভবিষ্যতে শিকার খাবে এক সাথে।

সাহেব-বাড়ী

শ্রীমতী পুষ্পবসু

শেষ পর্যন্ত বাড়ী পাওয়া গেল কারমাটারে—একেবারে একটেরে, লোকালয় থেকে বাইরে। পাশেই অবশ্য নন্তুবাবুদের বাড়ী। এই নন্তুবাবুই সস্তায় বাড়ীটা করে দিলেন। আমার দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীপতির বন্ধু নন্তুবাবু, অনেক দিন আছেন কারমাটারে। এত সস্তায় এ-বাড়ী না পেলে আমাদের আর চেঞ্জে আসা হত না। নেহাৎ রোগের জ্বালায় এখানে আসা।

ভগ্নীপতি দামোদরবাবুর চিঠি পেয়ে মা ও বৌ রাধাকে নিয়ে চলে এলুম কারমাটারে। নন্তুবাবু আমাদের নিয়ে গিয়ে পাশের বাড়ীর একখানা ঘর খুলে দিলেন। বললেন, "এইটে আপনাদের শোবার ঘর, আর রান্নাবান্না করবেন এই দালানে।" বাড়ীটার চেহারা দেখে মোটেই ভাল লাগল না। অনেক দিন যে পড়ে রয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। বাইরেটাও যেমন আগাছায় ভরে আছে, ভেতরটাও তেমনি ফেটে-ফুটে ধুলোয়-ঝুলে ভর্তি। সস্তায় পাওয়া গেলেও, চেহারা দেখে সত্যিই মুষড়ে পড়লুম। নন্তুবাবুকে বললুম, "আমরা আসব শুনে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখেননি?"

চেহারা দেখে নন্তুবাবুকে যেরকম অমায়িক প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়েছিল, কথার উত্তরে বুঝলুম লোক বিশেষ সুবিধের নয়। তিনি বেশ চেঁচিয়েই বললেন, "আরে মশাই সেইজন্যেই ত' টাকা এ্যাডভান্স চেয়েছিলুম; টাকা হাতে না পড়লে কিছুই করা যায় না—অনেক ঠেকেছি—দিন দেখি তিন মাসের ভাড়া একসঙ্গে, সব সাফ-সুফ করিয়ে দিচ্ছি।"

বললুম, "আপনি ত' বলেছিলেন দুখানা ঘর দেবেন, কিন্তু আর একখানা ঘর খুলে না দিলে অসুস্থ মাকে নিয়ে খুবই অসুবিধে হচ্ছে।"

—"সে আর হবে-টবে না মশাই, পনর টাকায় পুরো বাড়ীটাই নেবেন নাকি আপনারা?" ভীষণ মেজাজ দেখালেন নন্তুবাবু।

বললুম, "বাড়ীর কথা ত' বলছি না, কিন্তু দুখানা ঘর ত' দেবার কথা ছিল।"

এবার আরো রেগে নন্তুবাবু বললেন, "তাহলে আপনারা আমার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ী দেখে নিন।"

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল সেদিন। বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই এই অশান্তি কার ভাল লাগে!

সেদিন সকাল থেকে ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল, ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল হু-হু করে। সন্ধ্যার দিকে আকাশ আরো ঘনঘটা করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সকালেই রাধাকে বলেছিলুম রাতে খিচুড়ী রাঁধতে আর তার সঙ্গে দেশ থেকে আনা সুঁটকি মাছের ঝাল। দাওয়ায় বসে লণ্ঠন জেলে রান্না করছিল রাধা, আর আমি ঘরে বসে মা'র সঙ্গে গল্প করছিলুম। হাওয়ার বেগ জলের ঝাপটা নিয়ে রান্নার জায়গাটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল, লণ্ঠনের আলোটা মাঝে মাঝে বাড়ছিল-কমছিল।

ঘর থেকে মা বললেন, "তুমি সব ঘরে নিয়ে চলে এস বৌমা, এই জল-ঝড়ে ওখানে বসে রাঁধাবাড়া যায় নাকি!" আর আমি ভাবছিলুম অন্য বাড়ীতে উঠে যাবার কথা। [illegible] দাওয়া থেকে হাউ-মাউ করে ঘরের মধ্যে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাধা।

—"কি হয়েছে—হ'লটা কি!" বলে আমি চেঁচিয়ে উঠতেই সে বললে, "ও ঘরের দরজায় একজন সাহেব!" আর কিছুই মুখ দিয়ে বেরুল না তার—গলা যেন কে বন্ধ করে দিলে।

তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা একটু বাড়িয়ে আমি বেরিয়ে গেলুম দাওয়ায়। দেখি, দাওয়ার অপর দিকে যে ঘরটা তালা দেওয়া ছিল সেটা খোলা, আর তার দরজার দু'পাশে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ লম্বা এক বুড়ো সাহেব। আবছা আলোয় মুখটা খুব ভালো করে দেখতে পেলুম না। এমন জায়গায়, এমনভাবে একজন সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না আমার।

সাহেব নিজেই মুখ খুলে বললে, "হ্যালো বাবু, ডোণ্ট বী এ্যাফ্রেড—দিস হাউস আমার আছে। দিস রুম হামি তোমাদের খুলে দিচ্ছে। হামি বাংগলা জানে—নন্তুটা তোমাদের বড় কষ্ট দিচ্ছে—টাকা ভি লিচ্ছে, ঘরভি দিচ্ছে না, এ ঘর-বাড়ী আমি তোমাদের দিয়ে যাবে।"...

গড়গড় করে বাংগলা-ইংরেজী মেশান কথা বলে যেতে লাগলো সাহেব, আর আমি যেন থ-হয়ে শুনে যেতে লাগলুম সব কথা। সাহেব বলে কি! কার বাড়ী, কে দেবে, কাকে?

রাধা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, বাড়ী দিয়ে যাবার কথায় উৎসাহিত হয়ে দরজা থেকে এদিকে উঁকি মারলে।

হঠাৎ বাড়ী দেবার কথা থেকে সাহেব একেবারে অন্য কথায় চলে গেল। বললে, "টোমরা খিচুড়ী বানাচ্ছ—খিচুড়ী হামি খুব ভালবাসি—শুখা মছ্‌লীভি পশন্দ করি—ওঃ, ভেরী সুইট স্মেল!"......

সাহেবের কথা শেষ হতে-না-হতেই রাধা দরজার পাশ থেকে চাপা-গলায় বললে, "বলনা সাহেবকে একটু খেতে।"

আমি তার কথায় ভরসা পেয়ে সাহেবকে খাবার জন্যে অনুরোধ করে বললুম, "সাহেব আমরা পুওরম্যান, তবু তুমি যদি দয়া করে আমাদের সামান্য একটু খিচুড়ী আর তরকারি খাও তাহলে কৃতার্থ হব।"

—"ওঃ ইয়েস, মেনি থ্যাংকস" বলেই সাহেব ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাধাকে বললুম, "শীগ্‌গির একটা পরিষ্কার থালায় সব সাজিয়ে দাও। ব্যাপারটা কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

যা যা রান্না হয়েছিল বেশ খানিকটা করে রাধা তাড়াতাড়ি সাজিয়ে এনে দিলে। এক হাতে ঐ থালা আর এক হাতে লণ্ঠনটা নিয়ে আমি গিয়ে ঘরে ঢুকলুম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, চতুর্দিকের জানলা-দরজা সব বন্ধ, কেমন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এক ইঞ্চি ধুলো জমে আছে আসবাবপত্রের উপর। এখানে সাহেব কোথায়! কয়েক সেকেণ্ড মাত্র এই কথাগুলো ভেবেছি, এমন সময় হঠাৎ ঘরের এক কোণ থেকে সাহেব বলে উঠল, "[illegible] বাবু, ডিনার রেডি?" লণ্ঠনের আলোটা একটু তুলে দেখি, একটা ইজিচেয়ারের মধ্যে সাহেবের চেহারাটা যেন জ্বল-জ্বল করছে—অস্বাভাবিক রকমের আলো পড়েছে সর্বাঙ্গে! তার পাশেই একটা টিপয় রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি টিপয়ের উপর থালাটা রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কোন কথাই মুখ দিয়ে আর বেরুল না আমার। ব্যাপারটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অলৌকিক! ঘরের মধ্যে ঐভাবে সাহেবকে দেখে এইবার সত্যিই আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলুম। মনে হল সাহেব কিছুতেই মানুষ নয়! কথাটা রাধাকে বলবার জন্যে বাইরে রান্নাঘরের দাওয়ায় সবেমাত্র পা দিয়েছি এমন সময় পেছন থেকে আবার সাহেবের ডাক, "হ্যালো বাবু, কাম হিয়ার!"......

চেয়ে দেখি হাতে কি একখানা কাগজ নিয়ে সাহেব দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। আমি ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই সাহেব

(শেষাংশ ১৮৭ পৃষ্ঠায়)

(১)

গল্প হলেও সত্যি। আমার চোখ দিয়ে দেখা, হৃদয় দিয়ে জানা একটি লোকের কাহিনী। রক্তমাংসের সে অপূর্ব মানুষটি সেদিন শুধু আমারই নয়, আরো অনেকের মনেই বিস্ময় জাগিয়েছিল।

মোড়হাট জেলের একটি কর্মশালা। মুঞ্জ ঘাসের দড়ি দিয়ে তৈরী হয় সেখানে মাদুর, চাটাই ইত্যাদি।

নতুন এসেছি, তাই পূর্বাগত বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজবের অন্ত নেই। কিন্তু কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে আমি চেয়ে দেখছিলাম নূতন পরিবেশটিকে। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে কত জাতীয় লোক যে এসে সমবেত হয়েছে। পোষাকে আমরা সবাই সমান। কারণ, সবারই অঙ্গে সাধারণ কয়েদীর পোষাক। কিন্তু চেহারা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছে। বাঙালী, অসমীয়া, মণিপুরী, নেপালী, নাগা, গারো, মিকির কত জাতের লোক! বিচিত্র মুখাবয়ব।

একটি বেঁটেখাটো লোক বসে দড়ির চাটাই বুনছে আর মাঝে মাঝে থেমে আমাদের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে কি যেন দেখছে, এ আমি বার বার লক্ষ্য করছিলাম। দৃষ্টিতে তার শান্ত স্নিগ্ধ সারল্য, অধরোষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা। লক্ষ্যই করছিলাম শুধু, আর একবার মনে হয়েছিল পুরাতন বন্ধুদের প্রশ্ন করি, লোকটি কে? পরক্ষণেই মনে হলো এ রকম করে কাজনেরইবা খবর নেওয়া সম্ভব। অন্ততঃ ছ'শ সাতশো কয়েদী আছে আমাদের এ নতুন পৃথিবীতে।

সন্ধ্যাবেলায় ব্যারাকে প্রবেশ করে দেখি লোকটি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তেমনি মিটি মিটি করে হাসছে। তাই তো! এখানেও! সম্ভবতঃ নবাগত বলেই আমি তার গভীর কৌতূহলের সঞ্চার করেছি। আমারও কৌতূহল জাগল আবার। জনৈক বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা এই লোকটি আমাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কেন?

বন্ধু উত্তর করলেন, দলের লোক বলে।

প্রশ্ন করলাম, দলের লোক মানে?

তিনি এবার হাসলেন, সেও সত্যাগ্রহী।

(২)

সত্যাগ্রহী কানিয়া তিমুং জাতিতে মিকির। মিকির পাহাড়ের অধিবাসী।

আসামে এককালে আফিমের রাজত্ব ছিল অপ্রতিহত। সমস্ত দেশের লোক আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমোত। পাহাড়ীদের মধ্যেও সেই নেশা ছিল প্রচুর। অসমীয়া ভাষায় আফিমকে বলা হয় 'কানি'। যারা আফিম খায় তাদের বলা হয় 'কানিয়া'। কানিয়া তিমুংয়ের বাবা তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটির নাম নিবেদিত করেছিল তার সন্তানকে। তাই তার নাম রেখেছিল কানিয়া তিমুং।

কানিয়া তিমুংও পিতার তথা বংশের মর্যাদা রক্ষা করে প্রচণ্ড কানিখোর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এল তার জীবনে পরিবর্তন। ১৯২৬ সাল। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে গৌহাটি কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। কানিয়া তিমুং-এর শ্বশুর সজামাতা গৌহাটিতে গেল কংগ্রেস দেখতে। সেখান থেকে ফিরে এল —তারা স্বদেশীদের। 'কানি'র সঙ্গে সম্পর্ক সেদিন থেকে ঘুচে গেল।। কানিয়া তিমুং বলে সেই বিপুল জনসমাবেশে কি হচ্ছে, তার অনেক কিছুই—প্রায় সবকিছুই তাদের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। কিন্তু একটা কথা তারা অন্তর দিয়ে বুঝেছিল। এই হাজার হাজার লোক সেখানে সমবেত হয়েছে নিশ্চয়ই একটা পুণ্যকার্যে এবং সেই পুণ্যকার্যটি গান্ধীর নাম নিয়ে হচ্ছে। দেশের লোক সব গান্ধীর 'ভলাণ্টিয়ার' আর সবাইকে নেশাভাঙ ছাড়তে হবে।

(৩)

কানিয়া তিমুং প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল আমাকে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার নেশায় পেয়ে বসেছিল। দোভাষীর কাজ করছিলেন সেই বন্ধু জ্ঞানেন্দ্র ধর মহাশয়। অতীত যুগের প্রচণ্ড বিপ্লবী, তখনকার যুগের অহিংস সত্যাগ্রহী জ্ঞানবাবু। পাহাড়ী ভাষার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় তাঁর ঘটেছিল সদিয়া সীমান্তের পাহাড়ে

(১৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বললে, "নাউ দিস্ হাউস ইজ ইয়োর্স, নন্তু ইজ নো-বডি—হামি সব ঠিক করে দিছে!" হাতের কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে সাহেব ধরা গলায় আবার বললে, "কিপ ইট কেয়ারফুলী মাই বয়, দিস ইজ মাই গিফ্‌ট টু ইউ!"

কাগজটা হাতে নিয়ে আমি কিছু বলবার আগেই দেখি সাহেব অদৃশ্য! চোখের সামনে যেন ভোজবাজী হয়ে গেল! আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না আমার। ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে কোন রকমে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

ঝড় জল তখনও তেমনি হয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে কড়্ কড়্ করে বাজ পড়ছে। মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে রাধাকে বললুম সব কথা। সে আগেই যেন সব বুঝে কাঠ হয়ে বসে ছিল। এক একবার মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখলুম আমরা। কিন্তু স্বপ্ন যে নয়, তার প্রমাণ এই কাগজ। লণ্ঠনের আলোয় সেটাকে ভাল করে মেলে ধরে দেখলুম ইংরেজীতে লেখা একটা 'দানপত্র', আমার নামে সাহেব তার বাড়ী সম্পূর্ণ লিখে দিয়েছে!

সে রাত্রে আর ঘুম এল না আমাদের দুজনেরই চোখে। সাহেব যে কি করে আমার নাম জানলে, আর কখন কি করেই বা লিখলে, তা ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এল। চারিদিক একটু একটু ফরসা হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে কান্নার আওয়াজ উঠল। জেগেই ত' ছিলুম, ধড়মড় করে উঠে পড়লুম দুজনে।

বৌ বললে "নন্তুবাবুদের বাড়ী থেকেই কান্নাটা আসছে।" কয়েকদিন ও-বাড়ীতে যাতায়াত ছিল না, তবু আস্তে আস্তে উঠে গেলুম ওদের বাড়ীতে। গিয়ে শুনলুম, কাল রাত্রে নন্তুবাবু হঠাৎ বুকের ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন, তারপর ভোরের দিকে হার্টফেল করে মারা যান।

সাহেবের ঐভাবে ঝড়জলের রাত্রে আবির্ভাব ও নন্তুবাবুর তিরোভাব আমাকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে। সোজা ঐখান থেকেই রাখালবাবুর কাছে গিয়ে আমি আগাগোড়া সব কথা খুলে বলি।

সব শোনার পর পাড়ার রাখালবাবু বলেন, "এমনি একটা কিছু যে একদিন ঘটবে তা আমি জানতুম। পাছে ভয় পান বলে প্রথম দিন আপনাকে কিছুই বলিনি। যাই হোক, মশাই আপনার ভাগ্যি ভাল। সাহেবের তিন কুলে ত' আর কেউ ছিল না, তাই নন্তু ভেবেছিল ওটা বাগিয়ে নেবে। আট-দশ বছর নিজের বাড়ী বলেই ভোগ করে নিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কপালে সইল না! সাহেব নিজে লোক খুবই খাঁটি ছিল এবং ওকে ভালবাসত যেমন বিশ্বাসও করত তেমনি। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারে দুজনের মধ্যে একদিন রাগারাগি হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ মারা যায় সাহেব ওরই মত হার্টফেল করে।"

এর পরে একটা রাস্তা ধরে হাঁটিতে হাঁটিতে চলেছি। দেখি রাস্তার ধারে একটা পড়ো মাঠে সাত আট বছরের পাঁচ-সাতটি জার্মাণ ছেলে দুপুর রোদেই ফুটবল খেলছে। মাঠের ধারে রাস্তায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাকে দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে খেলা থামাবে। ছুটে এসে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ করবে—প্রশ্ন করবে রকমারী। কি আশ্চর্য! ওরা খেলতে খেলতে আড়চোখে আমাকে দেখতে লাগলো বটে, কিন্তু কেউ কাছে ঘেঁষলো না। তখন কি আর করি বাধ্য হয়েই আমি ওদের ডাকলাম। ডাক শুনে দলের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ছেলেটি সে রাস্তার পাশে মাঠের ধারে একটু দূরেই এসে দাঁড়ালো। আমাকে জিজ্ঞেস করলে "কি চান আপনি?" আমি বললাম তোমরা সবাই যদি একসঙ্গে দাঁড়াও তা হলে তোমাদের একটা ছবি নিই। ছেলেটি খুব গম্ভীরভাবে বললে—"ধন্যবাদ! মাপ করবেন, এখন আমাদের ছবি তোলাবার সময় নেই—আমরা এখন প্রাকটিশ করছি—ইউনিফর্ম পরে নেইতো! এখন দয়া করে এ বেশে আমাদের ছবি তুলবেন না।" আমাদের কথাবার্তা যখন চলছে তেমন সময় আমার পাশে যে একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা খেয়াল করিনি। তিনি ছেলেটির কথা শুনে তখনই ওকে মিষ্টি শাসনের সুরে বললেন—"ছিঃ, তোমরা ওঁর কথা রাখছো না? ভালবেসে তোমাদের ফটো তুলতে চাইছেন—লজ্জা হচ্ছে না? উনি বিদেশ থেকে এসেছেন,—উনি কি মনে করবেন? তোমরা একটুখানি খেলা থামিয়ে এসে দাঁড়াও। ওঁকে ফটো তুলতে দাও।" আশ্চর্য ব্যাপার! ভদ্রমহিলার কথা শুনে তখনই দলের সর্দার সবাইকে ডাক দিলে। ছবি তোলাতে সবাই এসে দাঁড়ালো—কিন্তু মোটেই খুসি হয়ে নয়! ভাবটা সবারই এমনি যেন আমায় কৃতার্থ করলে। যাই-হোক আমি বুঝলাম—জার্মাণ জাতি যুদ্ধে পরাজিত হলেও ও জাতির স্বাধীন ও তেজী মনটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও রয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরাও বিদেশীর ক্যামেরার চোখে ধরা দিতে চায় না—যেমন তেমন বেশে—হ্যাংলামি নেই। আছে গাম্ভীর্য—আছে আত্মমর্যাদা বোধের ষোল আনা জ্ঞান।

সবচেয়ে ভালো লাগলো—অপরিচিতা ঐ মহিলাটির কথা রেখে ওদেশের ছেলেমেয়েরা গুরুজন ও মায়ের জাতকে সম্মান করার যে পরিচয়টি দিলে।

জার্মাণীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল যাওয়ার পথে বা স্কুল থেকে ফেরার পথে সব সময়েই দেখেছি দলবেঁধে লাইন দিয়ে ফিরতে ফুটপাথ ধরে নিস্তব্ধে চলতে। দেখেছি—রাস্তার ধারে লোকের বাগানে আপেল গাছে লাল টুকটুকে আপেলের ভারে ডাল এমনই নুয়ে পড়েছে যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও হাত বাড়ালেই কয়েকটা আপেল ছিঁড়ে নিতে পারে। কিন্তু ওদেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কেউ পরের গাছের আপেলে হাত দেয় না। ছোটবেলা থেকেই এমন তাদের আত্মমর্যাদার শিক্ষা!

'বেড়াতে চল্লাম' ফোটো—শ্রীঅমর ঘোষ

ঝিম ঝিম করে রাত ঝিঁ ঝিঁ ঝিন্ ঝিন্—
কোথা থেকে শোনা গেল পিন্—পিন্—পিন্—।
মনে হলো সন্দ—
রাজা হবুচন্দ্রের নাক ডাকা বন্ধ।
"কোথা গেল গবুচাঁদ—সেনাপতি—সর্দার—
উজীর—নাজীর কই—কোথা হুঁকো বর্দার।
মশারিতে ঢুকে কেন মশা আজ গায় গান?
এইবার নেব আমি সকলের গর্দান।"
হাঁক ডাক ছাড়ে রাজা—রাত ঝিন্ ঝিন্—
মশারিতে বাজে শুধু পিন্—পিন্—পিন্।

ছুটে এল গবুরাম উজীর—নাজীর—
দ্বারোয়ান গাড়োয়ান সবাই হাজির।
মুখে নেই শব্দ
থর্ থর্ কাঁপে সব একদম স্তব্ধ।
"ঘুঘু সব দেখেছ তো—ফাঁদটাকে দেখনি—
কাহাকে যে বলে মজা টের পাবে এখনি!
মশা যদি নাহি মরে তোমরাই মরবে—
সুড় সুড় করে সব শূলে গিয়ে চড়বে।"
ঝাঁ—ঝাঁ—করে রাত—ঝিঁঝিঁ বলে ঝিন—ঝিন—
মশারিতে গায় মশা পিন্—পিন্—পিন্।

কেউ বা ডি-ডি-টি আনে—ফ্লিট আনে কেউ—
চারিদিকে কুকুরেরা করে ঘেউ ঘেউ।
রাজা বলে চেঁচিয়ে—
"বোকাদের কানগুলো দেব আমি পেঁচিয়ে।
হেঁজি পেঁজি নয় মশা—রাজাকে সে কামড়ায়—
উড়ে উড়ে বসে এসে রাজকীয় চামড়ায়!
তুচ্ছ ডি-ডি-টি দিয়ে করা তাকে অপমান?
কোথা গবু? নির্ঘাৎ নেবো তার গর্দান।"
ভয়ে সব ভ্যাবাচ্যাকা—মাথা ঝিন্—ঝিন্—ঝিন্,
মশারিতে নাচে মশা : পিন্—পিন্—পিন্।

শেষকালে বুদ্ধিটা হয়ে গেল সাফ্
উজীর কোটাল ছোটে দিয়ে তিন লাফ্।
তিন শো জোয়ান
হেঁইয়ো—হেঁইয়ো রবে আনল কামান।
তারপর দুমদাম চলে গোলাবৃষ্টি—
মনে হল আজ বুঝি লোপ পাবে সৃষ্টি।
নেচে নেচে গবু বলে—"মশকের ছানা হে—
এইবার বাছাধন বোঝো ঠ্যালাখানা হে।
ঢাক বাজে কাড়া বাজে কাঁশী টিন্ টিন্
মত খুশী করো দেখি পিন্—পিন্—পিন!"

হায় হায় এ কি হল—কোথা হবুচন্দর—
বিছনা মশারি কই সব ফুস-মন্তর।
ঘর—দোর সব সাফ্ কামানের গুলীতে—
রাজার টিকিটি নেই—মিশে গেছে ধূলিতে
থেমে গেল ঢাক ঢোল কাঁশী টিন্—টিন্
মশা শুধু গান গায় : পিন্—পিন্—পিন্!

খুব মজার মজার অনেক বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক তো শিখলে এত-দিন ধরে, এবারে এসো একটা খুব মজাদার অঙ্কের ম্যাজিক শিখিয়ে দিই। অঙ্কের নাম শুনলেই আবার অনেকের গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু ভাই, অঙ্ক ছাড়া যে বিজ্ঞান অচল তা কি তোমরা জান না? তাই ত বলি ভাই যদি বিজ্ঞান ভাল লাগে তবে অঙ্ক দেখে ভয় পেলে চলবে না মোটেই। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান মানেই অঙ্ক আর অঙ্ক মানেই বিজ্ঞান।

এই অঙ্কের ম্যাজিকটা আমি দেখিয়ে আসছি বহুদিন ধরে। বিশেষ করে ছাত্র মহলেই এ খেলাটার কদর সব চেয়ে বেশী। এই খেলার আর একটা মজা হচ্ছে এই যে, যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে—কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এ খেলা দেখানো চলে। ধরো কোন বন্ধুর বাড়ীতে গেছ তুমি বেড়াতে। হঠাৎ তোমার বন্ধু তোমাকে ধরে বসলো একটা ম্যাজিক দেখাতে। সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এই খেলা দেখাতে পারো যদি একটু কাগজ আর একটা পেন্সিল জোগাড় করতে পারো। কাগজ পাওয়া মাত্র তাতে লিখতে হবে অঙ্কের ডাক। অল্প কয়েকদিন আগে ফরমোসার টাইপেই বিমানঘাটীর বেতার ইঞ্জিনীয়রদের ঘরে সবাইকে এই খেলাটা আমি দেখিয়েছিলাম—দেখে তো তারা অবাক। এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে তাতে আমি ইংরাজীতে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ এই সংখ্যাটা বড় অক্ষরে লিখলাম। এর পরে চীফ ইঞ্জিনীয়রকে বললাম, "আপনি কি দয়া করে এক ঘরের (বা এক ডিজিট-এর) একটা সংখ্যা বলবেন?" তিনি বললেন ৬। এইবার তাঁর হাতে কাগজটা দিয়ে আমার দেওয়া সংখ্যাটাকে ৫৪ দিয়ে গুণ করতে অনুরোধ করলাম এবং সকলকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আমার মন্ত্র-প্রভাবে চীফ ইঞ্জিনীয়র সাহেবের ইচ্ছা মতন এই অঙ্কের গুণফল হবে একটি '৬'-এর সারি।" চীফ ইঞ্জিনীয়র সাহেব গুণ করলেন:—

১২৩৪৫৬৭৯
৫৪
————
৪৯৩৮২৭১৬
৬১৭২৮৩৯৫×
————
৬৬৬৬৬৬৬৬৬
————

বলা বাহুল্য, আমার কথা মতন ফলও হল একটি '৬'-এর সারি। দেখে অবাক হলেন সবাই। ভাবলেন হয়তো কোন যৌগিক শক্তিতেই এই খেলা সম্ভব হল। তোমরাও কি তাই মনে করো?

শোন তবে বলেই দিচ্ছি মূল কৌশলটা। যে সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে সেটা সব সময়েই থাকবে ১২৩৪৫৬৭৯, কিন্তু যে সংখ্যাটা দিয়ে গুণ করতে হবে সেটা পাল্টাবে দর্শকের বলা সংখ্যার সঙ্গে। দর্শক যে সংখ্যা বলবে তাকে ৯ দিয়ে গুণ করলে যে ফল হবে,—তাই দিয়েই গুণ করতে দেবে তোমার সংখ্যাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দর্শক '৬' বলেছিলেন তাই ৬×৯=৫৪ দিয়ে গুণ করতে বলেছিলাম। '৩' বললে বলতাম ৩×৯=২৭ দিয়ে গুণ করতে। মনে রেখো দর্শককে সব সময়ে এক ঘরের সংখ্যা বলতে হবে। ফল হবে দর্শকের বলা সংখ্যার সারি।

আমাদের সব পেয়েছির আসরে যে কিছুরই অভাব নেই—তা তোমরা দেখতে পারছো বোধ হয়। তোমাদের সহযোগিতায় স্বপনবুড়ো যে সব শেখবার জিনিষ তোমাদের সামনে তুলে দিচ্ছেন—তা দ্বারা যে মনের খোরাক অনেক বাড়িয়ে নিতে পারছো—তাতে কি কোন সন্দেহ আছে!

যে সব খবর বা ভাল ভাল প্রবন্ধ তোমরা পড়ে থাক সে সব তোমরা জমিয়ে রেখে দাও কিনা জানি না। কিন্তু কেটে কেটে আমি জমিয়ে রাখতাম। যখন মুষ্টিযুদ্ধ করতাম তখন চারদিক থেকে খবর কেটে কেটে জমিয়ে রাখতাম। কে কি ভাবে লড়তো, কি করতো এই সব পড়ে নিয়ে মনে একটা আন্দাজ করে নিতাম। তাই মুষ্টিযুদ্ধে কিছু করতে পেরেছিলাম। তোমাদের কাছে তাই একটু ফুটবল খেলার কথা জানাবো যা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে—যদি খেলায় উন্নতি করতে চাও। দরকার মনে করলে লেখাগুলি যত্ন করে তুলে রেখে দিও।

ফুটবল খেলায় খেলুড়েরা সব জায়গায় গিয়ে খেলতে পারে না, সেইজন্য তারা নিজের সুবিধা অনুযায়ী এক একটা ভাগে খেলে থাকে। খেলুড়েদের কাজ হচ্ছে বল আটকানো এবং কেড়ে নিয়ে প্রতি-পক্ষকে গোল দিয়ে হারিয়ে দেওয়া। তা ছাড়া বল যোগান দিতে হয় যেখানে ফাঁক পাওয়া যায়।

ধরা যাক, যারা আক্রমণ বিভাগে ভিতরে বা ইনসাইড ফরওয়ার্ডে খেলে তাদের কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। কেবল মনে রাখলে হবে না, বুঝে দেখতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে।

প্রথমে খেলার কৌশল জানতে হবে, দৌড়ানো চাই, বল মারা চাই, মাথায় বুদ্ধি খাটানো চাই, চোখ দুটি খুলে রাখা চাই-ই। নিজের সাথীদের ভাল করে জানতে হবে, তাদের শক্তি না জানা থাকলে তাদের উপর নির্ভর করা যায় না। ২০।৩০ গজ দ্রুত দৌড়ানো অভ্যাস করবে, তার বেশী বল নিয়ে দৌড়াতে হবে না।

দৌড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তীব্রভাবে বলে সট করতে শিখবে। বল নিয়ে কায়দা দেখাবে না পায়ে রেখে দিয়ে। বল পাবামাত্র চোখ দিয়ে দেখে নেবে কোথায় সাথী ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আছে—সেখানে বল দিয়ে এগিয়ে যাবে। বল কেড়ে নেয় যদি—তবে তাড়া করে চলবে। বিশেষ করে বিরুদ্ধ দলের উইং হাফব্যাককে লক্ষ্য রাখবে।

গোলে খেলতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখ, উপরদিকে লাফিয়ে বল ধরতে শেখ, বিপক্ষ খেলুড়ে কোন্ পাশ দিয়ে বল মারছে লক্ষ্য রাখ। গোল ছেড়ে এগিয়ে যেও না। সব সময় গোলের মুখ ছোট করে নিতে হয় ঠিকমত দাঁড়িয়ে। সব সময় দুহাত দিয়ে বল জড়িয়ে ধরবে। কায়দা করতে গেলেই গোল খেতে হয়।

পূজো শেষ হবার পর থেকেই বুট পায়ে খেলতে অভ্যাস কর ধীরে ধীরে—দেখবে কত ভাল খেলতে পার। সাধনা করলেই ফল পাওয়া যায়। মনে বিশ্বাস সব সময় রাখবে। দেখবে ভাল খেলুড়ে হয়েছ। বুট পরে খেললে পা ভাঙে না—বরং জোর পাওয়া যায়। ভুল ধারণা দূর করতে হবে।

(১) এখানে কয়েকজনের খেলা অনেকেরই মৃত্যুর কারণ হয়েছে (অ্যাম্ফিথিয়েটার)।

(২) কঠিন-কোমল সুইজারল্যাণ্ড।

(৩) উপকথার হাঞ্চব্যাক এর ওপর থেকেই পড়ে যায়।

(৪) মানুষকে দেয় আনন্দ আর প্রকৃতিকে দেয় সৌন্দর্য।

(৫) মুসোলিনী যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—

প্রফুল্লকান্তি ঘোষ

আত্মরক্ষায় কয়েকটি যুযুৎসু কৌশল

শ্রীমতী লাবণ্য পালিত
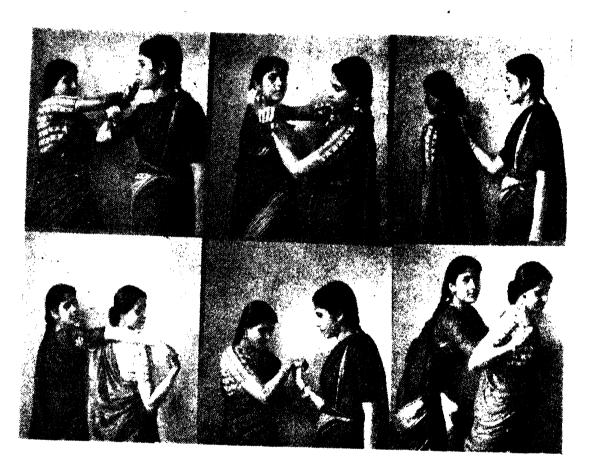
ধরুন আপনি পথ চলছেন।

সামনে থেকে কেউ এসে ছোরা তুলেছে। কি করবেন তখন?

বুদ্ধির কৌশল খাটিয়ে আর দৈহিক শক্তি এনে টপ্ করে তার ছোরা তোলা ডান হাতটিতে আপনার ডান হাতের পুরোবাহু দিয়ে জোর করে আটকে দিন। তখুনি আবার আপনার বাঁ হাতের পুরোবাহুটি তার তোলা হাতের ভেতর দিয়ে দেবেন, তারপর ডান হাত দিয়ে ঐভাবে ঠেলে দিলে শত্রুপক্ষ আর হাত তুলতে পারবে না, তার হাতটি মচকে যাবে...!

কিভাবে হাতটি মুচড়ে যাচ্ছে ভালো করে দেখানো হচ্ছে।

হঠাৎ পেছন থেকে এসে ঘাড়ের জামা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আপনি মহা বিপদে পড়লেন। সেই সময় তাড়াতাড়ি আপনার ডান হাত দিয়ে তার ডান হাতটি (যে হাতে সে ধরেছে) ধরে আপনার কাঁধের ওপর তার হাতটি ফেলে জোরে টেনে ধরুন। এখুনি তার হাত মচকে যাবে তখন কাঁধে হাত দিয়ে নাচের পার্টনারের মত দেখাবে...!

কেউ হয়ত সেকহ্যান্ড করবার সময় শত্রুতা করে জোরে হাত চেপে ধরে ঐ একহাতে দিয়েই আঙ্গুলে বেশ ব্যথা দিচ্ছে, তখন কি করবেন জানেন তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে? টপ্ করে বাঁ হাতে তার হাতটি ধরে নিয়ে ডান হাত দিয়ে তার সমস্ত আঙ্গুলগুলো উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবেন, ঠিক ছবির মত, তখন আর কোন ক্ষমতা থাকবে না হাতে ব্যথা দেবার!

পেছন থেকে কেউ দুটি হাত দিয়ে আপনাকে ছবি অনুযায়ী ধরে নিয়েছে আপনি তখন চট্ করে বুদ্ধি এঁটে- একটু সরে গিয়ে পেছন দিয়েই তার তলপেটে এক জোর লাথি - বাস্, তারপর শত্রুপক্ষ কুপোকাৎ...!

আবেদন শুনে বালক পত্র মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে দেখলাম। দিদিমা যখন তামাকের সুব্যবস্থার গ্যারাণ্টি দিলেন, তখন একগাল হেসে সে চ'লে গেল। এর মধ্যে দেখি সেই বাচ্চা ছেলেটি একদৌড়ে বাড়ীর দফাদারের কাছে গিয়ে, তার হাত থেকে ধূমায়মান কল্কেটি কেড়ে নিয়ে, দুই হাত মুঠো করে ধ'রে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া

১। বৈদিকযুগের ত্রিকোষা হুঁকো, ২। সেমানাগাদের তুম্বুরুবা, ৩। বাংলার থেলো হুঁকো, ৪। গড়গড়া, ৫। আফ্রিকার হুঁকো, ৬। সেমা-নাগাদের তমূপ

ছেড়ে ফিরিয়ে দিল। অবাক হয়ে গেলাম। কি চমৎকার এফিসিয়েন্সি! মাতৃ-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় থেকে কল্কে টানার ট্রেণিং না পেলে এরকম এক্সপার্ট হওয়া সাত-আট বছরের মধ্যে সম্ভব নয়। তামাক না খেলে এ ছেলের যে সত্যিই পেট ফুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কল্কেতে ধূমপানের পদ্ধতিটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম।

হুঁকো আগে, না কল্কে আগে

তখন তামাকের মর্যাদা বুঝতাম না, সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বুঝবার মতন বয়সও হয়নি। এখনও সেই ছেলেটির কল্কের টানের কথা মনে পড়ে। দুই-হাতের মধ্যে কল্কেটি ধরবার ভঙ্গী এবং হাতের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া টেনে বার করার কৌশলের কথা ভাবলে মনে হয়, এই হ'ল ধূমপানের সবচেয়ে প্রিমিটিভ পদ্ধতি। মাটি দিয়ে হাতে কল্কে গড়া যায়। কল্কের গড়নের বৈজ্ঞানিক সূত্রটিও খুব সহজ সরল। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ডায়েমিটার ক্রমে ছোট ক'রে গড়লেই তামাকের ধোঁয়া প্রসূত হয়ে আসতে পারে। হাতে-পটে মাটির পাত্র গড়ে, আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহারযোগ্য ক'রে নেবার সময় মানুষের যে কল্কে গড়বার মতন বুদ্ধি হয়ে ছিল, তা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। কাঁচা বা শুকনো তামাকপাতা, ভাং, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি না চিবিয়ে খেয়ে, এইভাবে কল্কের মধ্যে আগুনে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া সেবন এবং অবসরবিনোদনেরও সুবিধা হয়। এ সত্যও আবিষ্কার করতে আদিম মানুষের যে খুব বেগ পেতে হয়েছিল তা মনে হয় না। হুঁকোর জলে ধোঁয়াটাকে ধুয়ে নেওয়ার চিন্তাটা অনেক পরের। হুঁকো উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতীক। কিন্তু দুই-হাতের মুঠোয় কল্কে বাগিয়ে ধরার পদ্ধতিটি রীতিমত প্রিমিটিভ। কল্কের বয়সও স্থূল হাতে-গড়া মাটির পাত্রের বয়সের সমান। অর্থাৎ কল্কে আগে, হুঁকো পরে। কল্কে না থাকলে হুঁকোর বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হ'ত না। ধূমপানের বিলাসিতার দিকটা, অবসর-বিনোদনের দিকটা যত বেড়েছে, তত কল্কের সাজসরঞ্জাম হুঁকো গড়গড়া আলবোলা ইত্যাদির বৈচিত্র্যও বেড়েছে। কর্মজীবনের প্রেরণা থেকে ধূমপান ক্রমেই অকর্মণ্যতার ইন্ধন হয়ে উঠেছে। কল্কে কর্মজীবনের প্রতীক, হুঁকো গড়গড়া আলবোলা ইত্যাদি আয়াস ও আলস্যের প্রতীক। এমন কি কল্কের প্রত্যক্ষ বংশধর পাইপও তাই। কল্কের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করব।

তামাকের উৎস সন্ধানে

দেশ-বিদেশের মানুষের ধূমপানের পদ্ধতি দেখলেই বোঝা যায় যে, কল্কে বা কল্কে-জাতীয় অন্য কোন জিনিসই হ'ল আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু কল্কের বা পাইপের কথা বলার আগে তামাক খাওয়ার কথা বলার দরকার। তামাক খাওয়ার প্রচলন হ'ল কবে ও কোথায়? তামাক সম্বন্ধে সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল জানিয়ে নৃবিজ্ঞানী লিণ্ডব্লোম (Lindblom) ১৯৪৭ সালে বলেছেন যে—"Probably everyone is now agreed that tobacco reached America from the old world"—একথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল, বিশেষজ্ঞরা এতদিন মনে করতেন যে—"Snuff, Cigarettes, Cigars, Pronged, Cigar-holders and tobacco pipes ...

দ্বন্দ্বের মীমাংসা এখনও হয়নি। বিড়ি-সিগারেট, চুরুট যাঁরা খান তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না যে পণ্ডিতমহলে তাই নিয়ে কিরকম গবেষণা হয়। সাধারণ গাঁয়ের লোক এক-ছিলিম তামাক খেয়ে দশ গ্যালন পেট্রোলের সমান এনার্জি পান, তাতেই তাঁরা খুশী। ছাই হয়ে উড়ে যায় তামাক, তা নিয়ে গবেষণা করার কোন কারণ থাকে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বিড়ি-সিগারেট খান একটু চাঙ্গা হবার জন্যে। ধনিকরা ধূমপান করেন, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্যে। কবি-শিল্পীরা হয়ত সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে নিজেদের কবিসত্তাকে বিলীন করে দেন। কিন্তু কেউ কোনদিন এক-ছিলিম তামাক খাওয়ার সময় তামাকের উৎপত্তি প্রসার বা তামাক খাওয়ার প্রচলনের ইতিহাস সম্বন্ধে এক-মুহূর্ত চিন্তার অবকাশ পান না। এক-ছিলিম তামাক খাব, তা নিয়ে আবার অত গবেষণার দরকার কি? সেকথা ঠিক, কিন্তু তামাক নিয়ে গবেষণার কথাটাও মিথ্যা নয়। যাঁরা তামাক নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা তামাক খান কিনা জানি না, তবে যাঁরা খান তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। যেমন, তামাক, নস্য, সিগার পাইপ ইত্যাদি সব আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের আবিষ্কার ব'লে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, তা নয়। আমেরিকার বাইরে থেকে তামাক খাওয়ার রীতি আমেরিকায় প্রচলিত হয়েছে। দুই দলের পণ্ডিতদের মধ্যে আজও কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি এবং তার জন্য তামাক খাওয়া আটকে নেই। একদল পণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে কলম্বাস ওয়েস্ট ইণ্ডীজের আদিম জাতির কাছ থেকে প্রথম ধূমপানের সন্ধান পান। এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ইংলণ্ডে ধূমপানের প্রথা প্রচলন করেন। মোগলযুগের শেষে পর্তু-গীজরা নাকি ভারতবাসীদের ধূমপান করতে শেখায়, এবং তারপর ধূমপান সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলেন যে কলম্বাসরা প্রথম যখন আমেরিকান মহাদেশে যান তখন সেখান-কার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে "Habit of producing smoke from an herb held in mouth" দেখে চমৎকৃত হন এবং সেই অভ্যাসটি ইয়োরোপে বহন ক'রে নিয়ে এসে প্রচলিত করেন। জাঁ নিকট (Jean Nicot) নামে পর্তু-গীজ রাজসভায় একজন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ধূম-পানের অভ্যাস সেখানকার রাজকর্মচারী মহলে প্রথমে চালু করেন। এই ফরাসী রাষ্ট্রদূতই নিকোটিনের আবিষ্কারক শোনা যায়। পণ্ডিত মহলে 'এক-ছিলিম তামাকের' এরকম অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বেশ কড়া না চার ছিলিম তামাক না খেলে এরকম বিচিত্র গবেষণা করা সত্যিই যে সম্ভব নয়, একথা পণ্ডিতদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও বলা যায়। পরের হাতে তামাক খেতে যেদিন থেকে পণ্ডিতেরা শিখেছেন তার অনেক আগে থেকে নিজের হাতে মানুষ তামাক খেয়ে আসছে।

প্রথমে আদিবাসীদের কথা বলব। আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় সকল শ্রেণীর আদিবাসীই তামাক খায়। কেবল তামাক খায় বললেই সব বলা হয় না। ধূমপানের এত রকমের সব যন্ত্র ... আছে যা আবিষ্কার বাখতে যে কোন

মাতৃ পূজায়
পাঁচটী
রাঙ্গাজবা - ফুল
রাঙ্গাজবা - সিন্দুর
রাঙ্গাজবা - আলতা
রাঙ্গাজবা - স্নো
রাঙ্গাজবা - পাউডার
পুজার দিনগুলিকে
স্বার্থক করিয়া তোলে
অনুকম্পা কেমিক্যাল
কলিকাতা-৪০

aply economical at that, has had a rapid, world-wide diffusion. It is also essentially neutral toward the ideology or value pattern of most of the cultures it entered. (Anthropology: P. 479).

এই কথা বলে ক্রোবার তামাকের বিশ্বভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ক্রোবারের বিবরণ সবিস্তারে এখানে উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর বিবরণ সঠিক বলে মনে হয় না। ক্রোবার বলেছেন, প্রধানত স্প্যানিয়ার্ডরা তামাকের প্রচলন করে ইয়োরোপে এবং স্পেনীয় tabaco কথা থেকে ইংরেজী tobacco কথা হয়েছে। একথা হয়ত ঠিক। কিন্তু স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ ও আরবরা তামাক ও চুরুট খাওয়ার প্রথা আফ্রিকা ও এসিয়ায় প্রচলন করেছে, একথা ঠিক নয়। তার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি এখানে। আদিবাসীদের তামাক খাওয়ার অভ্যাস কতদিনের প্রাচীন, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেও বলা যায় যে স্প্যানিয়ার্ড পর্তুগীজ বা আরবদের দেশবিদেশে যাত্রার অনেককাল আগে আমাদের দেশের চরক ও সুশ্রুত ধূমপানের কথা বিশেষভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আলোচনা করে গেছেন। চরক বলেছেন:

স্নাত্বা ভুক্ত্বা সমুল্লিখ্য ক্ষুত্বা দন্তান বিঘৃষ্য চ।
নাবনাঞ্জন নিদ্রান্তে চাত্মবান ধূমপো ভবেৎ॥

অর্থাৎ স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, হাঁচি হলে, দাঁত ধুয়ে, নস্য দ্বারা শির বিরেচনান্তে, নিদ্রান্তে এবং অঞ্জনান্তে ধূমপান করবে। সুশ্রুত বলেছেন:

নরো ধূমোপযোগাচ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রুঃ সুগন্ধি বিশদাননঃ॥

অর্থাৎ ধূমপানে মানুষের ইন্দ্রিয় বাক্য ও মন প্রসন্ন হয়, কেশ দাঁত শ্মশ্রু দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধি ও বিশদ হয়।

ধূমপানের প্রথা লোকসমাজে কতকাল ধরে প্রচলিত থাকলে চরক ও সুশ্রুতের মতন মনীষীদের পক্ষে এরকম বিধান আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ধূমপানের প্রথা চলে আসছে। স্প্যানিয়ার্ড ও পর্তুগীজদের জন্মের অনেক আগে থেকে। আমাদের ভারতবর্ষের আদিবাসীদের মধ্যে নয় শুধু, পৃথিবীর সমস্ত আদিমজাতির মধ্যেই ধূমপানের বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। বিখ্যাত জার্মান নৃবিজ্ঞানী জুলিয়াস লিপস্ বলেছেন:

The smoking of hemp and opium was probably known to the prehistoric Lake-dwellers, as extant implements indicate.... In the primitive world, however, the desire to let the mind sojourn in 'artificial paradise' often had religious reasons. (The Origin of Things: P. 158).

১। মাটির পাইপ (পশ্চিম আফ্রিকা), ২। ইয়াকুটদের পাইপ, ৩। সাধারণ পাইপ, ৪। কালো পাথরের পাইপ (চেরোকিদের), ৫। কাঠের পাইপ (পশ্চিম আফ্রিকা), ৬। সিগার-বান্ডিল ও ছাই ফেলার ট্রে (মেক্সিকো)

আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেও ধূমপানের প্রথা জড়িত আছে দেখা যায়। তামাক ভাং গাঁজা বা আফিম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা বা বীজ খেয়ে মত্ত হয়ে তারা ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এক ছিলিম তামাক না খেলে, দেবতারা বা ভূতপ্রেতরা তাদের স্কন্ধে ভর করে না। মায়া পুরোহিতরা ধূমপানকে ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ বা আচরণ বলে মনে করেন। মধ্য ও উত্তর আমেরিকার অনেক আদিম জাতির মধ্যে ধূমপানের বিচিত্র অভ্যাস দেখা যায়। পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকাতেও এক ছিলিম তামাকের প্রভাব যথেষ্ট।

তামাকের সামাজিক ভূমিকা

নৃতত্ত্বের কণ্টকাকীর্ণ তথ্যের ভিতর প্রবেশ করলে এইটুকু বোঝা যায় যে, এক ছিলিম তামাকের সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। তার উৎপত্তি ও প্রসার যেভাবেই হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কারণ যাঁরা ধূমপানের মাহাত্ম্য বাইরে প্রচার করেছেন বলে শোনা যায়, তাঁদের জন্মের অনেক আগে থেকেই মানুষ সর্বত্র স্বচ্ছন্দে ধূমপান করেছে দেখা যায়। এক ছিলিম তামাক শুধু যে মানুষকে কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছে তা নয়, তার ধর্মানুষ্ঠানেরও অপরিহার্য উপকরণ হয়েছে। তবু, তামাক অনেকটা নিউট্রাল আচার বলে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি এবং স্বাধীনভাবে যে আচার সর্বত্র বিচরণ করেছে তার উৎসকেন্দ্র কোথায় তা আজ আর ঠিক করা সম্ভব নয়। করার দরকারও নেই। শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই হল যে এক ছিলিম তামাকের একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। তা যদি না থাকত তাহলে তার অভাবে সেই বাখাল বালকটির পেট মাঠে উঠত না।

তামাক যখন মানুষ খেতে শিখল তখন তার মাদকতায় বিভোর হয়ে থাকা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি হত তাহলে তামাক খেয়েই অনেককাল আগে মানুষ উচ্ছন্নে যেত, এতদূর এগোতে পারত না। আদিম শিকারী বা চাষীরা তামাক খেয়ে, ভাং বা আফিং খেয়ে যদি মাঠেঘাটে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকত, তাহলে আজ তামাকের ইতিহাস লিখত কে? তামাক যাঁরা খান এবং যাঁরা খান না, তাঁরা সকলেই এই কথাটা ভেবে দেখবেন। তামাক কি সত্যিই 'নিউট্রাল' ছিল? এইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হয়, কোনকালেই ছিল না। তামাক চিরকালই অ্যাক্টিভ বা সক্রিয়। মাঠে হাল চষতে যাবার

(ইহার পর ২০৬ পৃষ্ঠায়)

মোগলকাল তামাকখোর

সিগার হোল্ডার (টাকানা ইন্ডিয়ান)

পূজোর
প্রীতি-অভিনন্দন

ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিমিটেড

পূজা অভিনন্দন
উষা
সেলাই মেসিন
কলিকাতা—১

দেহের সৌন্দর্য্য ও
অন্তরের তৃপ্তি বিধানে
মহীশূর
চন্দন সাবান
আজও অতুলনীয়
পশ্চিম বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা
এবং আসামের সোল সেলিং
এজেন্ট :
অমৃতলাল ওঝা
এণ্ড কোং লিঃ
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

আনন্দময়ীর আগমনে
প্রিয়জনকে সাজাতে
ফোন-৩৪-২৫০১
রুচি ও সৌন্দর্য্যের
পরিচয়ে
অলঙ্কার!
আধুনিক
ডিজাইনের
অভিনব বৈচিত্র্যে
স্বর্ণালংকারের
বিপুল সমাবেশ
জুয়েলার্স
ইউ. এন. সরকার এণ্ড কোং
১২৬-এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা ১২
ব্রাঞ্চ ১৫৯/১ বি • রাসবিহারী এভিনিউ
হিন্দুস্থান মার্ট নং ১ কলিকাতা ২৯

ফেবর লিউরা
থেকে
আফগান স্নো
গন্ধে আনন্দদায়ক। ইহা ত্বকের
পারিপাট্য সাধন করে এবং সর্বসময়
ত্বককে সজীব, মসৃণ ও ফুলের
পাপড়ির মত কোমল রাখে।
Patanwala

থিয়েটার রোড। বাড়ী এসে পড়েছে রিতার। নিশাকরের হাতটা টেনে বললে সে, —'আরম্ভেই শেষ হয়ে গেল নিশা?'

একটা তাজা চুরুট ধরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল নিশাকর, যবনিকা পতনের পর ক্লান্ত অভিনেতার মত। নিশ্চিন্তে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। নিশাকর যাদু জানে কি? কেমন এক মেকী প্রেমের চালে মাৎ করে রেখেছে ঐ নবীনাদের। তাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে জলসিক্ত করেছে নিশাকর। ট্যাক্সির চাকার শব্দের মত সজোরে হাসতে ইচ্ছে করছে আজ। নিশাকরও হাসলো মনে মনে।

অনেকগুলো চোখের পাতা আর এক হল না রাতে।...ঊর্মিলা সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। শেষ প্রহরের হিমক্লান্ত বাতাস স্থবির সেনের চোখে তন্দ্রা আনল। অন্ধকার ঘরের জানলায় বসে বসে তারা গুণেছে, আকাশ থেকে দৃষ্টি ফেরায়নি সে। পথহারা পথিকের মত ঘুমচোখে পায়চারী করেছে নন্দিতা চৌধুরী। কস্তুরী মৃগীর উন্মাদনা তার দেহ মনে। দেওয়াল ঘড়ির জলতরঙ্গ শব্দে বেজে গেছে একটা, তিনটে, সাড়ে চারটে। রিতা হালদারের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে অনেক স্বপ্ন ভেসে উঠল। গোটা চারেক লাকি ষ্ট্রাইক পুড়িয়েও জেগে থাকতে পারল না রিতা। স্বপ্নের মধ্যেও সে বলেছে,—'যেও না নিশাকর।' আরও কত বীভৎস স্বপ্ন! রাত ফুরিয়ে গেল!

* * *

পথের শেষ কোথায়? গুন্‌গুন্ করছিল নিশাকর। নীচে গাড়ী হর্ণ বাজাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চুলের পেছনে ব্রাস চালিয়ে দিল। এইচ. জি. ওয়েলস আর বার্ট্রান্ড রাসেলকে যে দেশে সকাল হলেই দেখা যাবে, সেই ইংলণ্ড শুধু লরেন্সের নয়। জার্মানি নয় শুধু গোয়েরিং, গেব্বেলসের।

ভারতবর্ষে জন্মেছে বলেই তার মন কি সমুদ্রপারের আকাশে উড়ে যেতে পারে না। কত দেশী পাখীও উড়ে গিয়ে বসে আছে টেমস নদীর তীরে। হাইড পার্ক, ডাউনিং ষ্ট্রীট, বৃটিশ মিউজিয়াম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, লর্ড বাইরণের ইংলণ্ড, ডিউক অব উইণ্ডসরের প্রিয় ইংলণ্ড। সেখান থেকে নিশাকর যাবে যন্ত্রদেবতার দেশে—জার্মানিতে।

সবাই ম্লান মুখে আনাগোনা করছে। নয়নতারার মুখের সে লাবণ্য শুকিয়ে গেছে আজ। দাদাভাই চলে যাচ্ছে যে।

নিশাকর বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নাচতে নাচতে নীচে নেমে গেল ফলেন্ এ্যাম্পিল হোয়াইল ইয়ং-এর সেই পুরাতন সুরে। বিদায় বেলার মালাখানি পরিয়ে দেয়, বোন হ'লে কি হবে, ঐ নয়নতারা।

পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমে আগুন ছড়িয়ে গেছে এতক্ষণে, রিতা হালদার আর ঊর্মিলা চ্যাটার্জির দলের গয়না আর শাড়ীর আগুনে। টাটকা ফুলের সুরভিতে ষ্টেশনের পানের পিকের গন্ধ ম্লান হয়ে গেছে। সাতটা পঞ্চাশ' ওরা কারা? দূরে থেকে দেখল নন্দিতা চৌধুরী। কানে এল কার গলা,—'কৈ ভাই নিশা কোন্ গাড়ীতে? আসেনি নাকি এখনও?' উত্তর আর শুনতে পারল না নন্দিতা। এগিয়ে গেল ভাঙ্গা পায়ে। গার্ডের গাড়ীর আগেই ছোট্ট গাড়ীটায় চোখ পড়তেই থেমে গেল সে। কার সঙ্গে কথা বলছে নিশাকর! গাউন পরা মেয়েটার নীল চোখ আর সোনালী চুল দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে গাড়ীর দরজায় মাথা রাখল নন্দিতা। উল্টো দিকের দরজায় মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা দুজন। মেয়েটার সোনালী চুল এসে লাগছে নিশাকরের গালে। প্রশ্ন শুনে অবাক হল নিশাকর। সদ্য পরিচিতা এক বিদেশিনী তাকে বলছে,—'পথ শেষ হবার সঙ্গে কি আমাদের পরিচয়ও শেষ হবে?' নন্দিতা শুনল নিশাকরের গলা,—'না আমাদের পরিচয় তো, আজকের নয়, সে ত কবে থেকে, কত যুগ থেকে!' ভাবতে চেষ্টা করল নন্দিতা চৌধুরী এই কথাটিই অনেক দিন আগে কে শুনিয়েছিল তাকে? সে কি ঐ নিশাকর?

* *

শ্যামবাজারে বসে জবাব হাতড়াচ্ছেন বৃদ্ধ কল্যাণমোহন। মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব শুধু শুধু প্রেমে পড়বে কেন? মনে মনে হাসলেন তিনি।

মাঝরাতে খবর দিলেন মেজগিন্নী, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে—'ওগো নন্দি ফিরেছে এতক্ষণে। শরীর তার বড় অসুস্থ বোধ হল।'

আর একবার হাসলেন কল্যাণমোহন।

অন্ধকার রাত। এক বিশ্রী স্বপ্ন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল নন্দিতার। ঘরের টেবিলের ঘড়ির রেডিয়ামের কাঁটাগুলো চোখের সামনে তার জ্বলজ্বল করে উঠল। নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল নন্দিতা, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে কখন। সাতটা পঞ্চাশে এসে থেমে গেছে ঐ ঘড়ির কাঁটা!

বহু দূর থেকে ভেসে আসছে বিশ্রী, তীব্র, তিক্ত একটা সুর। ঘনঘন সাইরেনের আওয়াজ। কোন্ রাতের ট্রেন বোধ হয় ষ্টেশন ছাড়ল।

এক ছিলিম তামাক

(১৯৮ পাতার পর)

সময় এক ছিলিম তামাক চাই, কারণ হালচাষ সম্বন্ধে চৈতন্য বাড়বে ব'লে, অচৈতন্য হবার জন্য নয়। মাঠ থেকে ফিরে সবার আগে এক ছিলিম তামাক চাই, কারণ দেহের ক্লান্তি দূর হবে তাতে। দাঁড় টানতে, বোঝা বইতে, মেহনৎ করতে, এক ছিলিম তামাক না হ'লে চলে না। কারণ তামাক বলসঞ্চার করে। ধর্মের অনুষ্ঠানে ওঝা বা পুরোহিতের যখন তামাকের প্রয়োজন হয়, তখনও তামাকের ভূমিকা সক্রিয়। ধর্ম হ'ল সংঘবদ্ধ জীবনের অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ, তামাক তার প্রেরণা, তামাকের ধোঁয়া তার বাষ্পীয় শক্তি। তাই আদিম ও অসভ্য লোকসমাজে ধূমপানের এত বিচিত্র আয়োজন ও সরঞ্জাম। সভ্য মানুষ তামাকের সক্রিয় ভূমিকাকে নিউট্রাল করেছে। তামাক হয়েছে নিছক মাদকতা নেশা ও বিলাসিতার উপকরণ। কল্কের সঙ্গে যত সব লম্বাচওড়া আনুষঙ্গিক যোগ করা হয়েছে তামাককে একেবারে নিষ্ক্রিয় করার জন্যে। এক ছিলিম তামাক যখন শুধু কল্কেতে ধূমায়িত হ'ত তখন সেই ধোঁয়া জীবন-ইঞ্জিনের বাষ্পের কাজ করত। কিন্তু কল্কে যখন ক্রমে থেলো হুঁকো থেকে বিশাল গড়গড়া বা আলবোলার মাথায় বসল এবং তার লম্বাচওড়া নল কয়েক গজ দূরে গিয়ে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করতে আরম্ভ করল, তখন বোঝা গেল মধ্যযুগের আলস্য, অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার প্রতীক হয়েছে তামাক। জীবনের সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ কল্কের যে-রকম ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, লম্বা নলওয়ালা গড়গড়ার তা নেই। কল্কের যুগে হাতের জোর ছিল বোঝা যায়, ফুস্‌ফুসও সজীব ছিল। গড়গড়ার নলের যুগে হাতের জোর গেল কমে, তাকিয়া ঠেস দেবার প্রয়োজন হ'ল। তারপর এল বিড়ি-সিগারেটের আধুনিক যুগ। একটার পর একটা ফুঁকে যাচ্ছি, কেন ফুঁকছি বলতে পারি না। অত্যন্ত তরলচরিত্র ইন্ডিভিজুয়ালদের যুগ। বিড়ি-সিগারেট এই নবযুগের 'ইন্ডিভিজুয়ালদের' প্রতীক। মেহনতী মানুষের মেরুদণ্ডহীন বংশধরদের লিক্‌লিকে আঙুলের ডগায় শোভা পায় সিগারেট। এমনকি সিগার বা চুরুটও যে ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার কারণ আমাদের পৌরুষ ও জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে। যাঁদের কর্মোদ্যম, যাঁরা এখনও বীরের মতো কাজ করতে পারেন, তাঁরা চুরুট বা পাইপ খান। চার্চিল ও স্টালিন তার প্রমাণ। চুরুটপন্থী চার্চিল এখনও এক ইংলণ্ডের হাল ধরে রেখেছেন, সিগারেটপন্থী হ'লে পারতেন কি না সন্দেহ। আর স্টালিন যদি সবচেয়ে প্রিমিটিভ পাইপপন্থী না হ'তেন, তাহলে তাঁর সমাজতন্ত্রের তরী অনেককাল আগেই ভরাডুবি হ'ত।

এক ছিলিম তামাক পোড়া মাটির কল্কেতে বা বাঁশের কিংবা কাঠের পাইপে সেজে খাবার যুগ ক্রমেই যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। হুঁকো বা গড়গড়ার যুগ আর ফিরে আসবে না কোনদিন, না এলেও দুঃখ নেই। কারণ ফরাস ও তাকিয়ার হারেমে জীবন ফিরে না আসাই মঙ্গল। কিন্তু কল্কে বা দেশী পাইপের যদি পুনর্জ্জীবন হয়, তাহলে হয়ত আমরাও আবার নতুন জীবন পেতে পারি। কিন্তু যতদিন অভাব-অভিযোগ থাকবে, জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানি থাকবে, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থাকবে, বেকার জীবন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, ততদিন বিড়ি-সিগারেটের স্বর্ণযুগ চলবে। ততদিন কেবল ফুঁকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। কেবল ফোঁকার পালা যতদিন না শেষ হবে, ততদিন কল্কের ও পাইপের যুগ আসবে না। ফোঁকার বদলে টানার যুগ আসবে তখন। একটার পর একটা সিগারেট ফোঁকার ফক্কাবাজির যুগ নয়, এক ছিলিম তামাক টানার সক্রিয় যুগ।

"তোমার ছেলে কলেজে কি শিখল?"
"এই তো সেদিন এসেছিল সে।—একটা পয়সার সাহায্যে বোতল খোলার কৌশলটা আমাকে দেখাচ্ছিল।"

বিপরীত দিকে আঙুলে দেখিয়ে ছেলেটি বলল, 'ঐ—ত' মা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার আড়ালে। দেখুন না পিছন ফিরে।'

পিছন ফিরে তাকাল অনুপমা। দেখল, যে রাস্তাটা মাণিকতলার মোড় থেকে বরাবর নারকেলডাঙ্গার দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তার ধারে কিছু দূরে একটা খোলার ঘরের দরমার বেড়ার আড়ালে একটি মেয়েলোক দাঁড়িয়ে। এতদূর থেকে ঠিক চিনতে পারল না অনুপমা, তবে দেখতে পেল হাতছানি দিয়ে ওকেই ডাকছে যেন।

বিস্ময় বেড়ে গেল অনুপমার। যাবে কি যাবে না ইতস্ততঃ করতে লাগল সে। সাড়ে চারটে বেজে গেল। বাসায় ফিরতে আজ অনেক দেরী হয়ে যাবে। অনুপমাকে চিন্তিত ও ইতস্ততঃ করতে দেখে ছেলেটি বলল, চলুন না। মা আপনাকে চেনে। মা বলেছে, আপনি আমার মাসী।'

দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই অনুপমার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। এই ভর দুপুরে যদি সম্মুখে অনুপমা ভূত দেখত, তাতে এতটা না আশ্চর্য হত, তার চেয়ে বেশী হল এতদিন পরে কংকাকে দেখে। অজান্তে অনুপমার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল, 'কংকা! তুই এখানে?'

ঝাঁপের বেড়াটা খুলে দিয়ে কংকা বলল, 'তোদের সে কংকা আর নেই। এখন যাকে দেখছিস, সে কংকার কঙ্কাল!'

মাথা নিচু করে ঘরের ভিতর ঢুকে স্বল্প-পরিসর বারান্দায় এসে দাঁড়াল অনুপমা, কংকার সাথে। টিনের ছাদ-দেওয়া ছোট্ট একটি মাটির ঘর। রান্নার ব্যবস্থা বারান্দার এক কোণে। উঠোনটা নিতান্তই ছোট। একপাশে কয়েকটা এঁটো বাসন জড়ো করা; পাশে তাপ্পা একটা বালতি। একটা কেরোসিনের বাক্সে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে। ঠিক তার পাশে দিগম্বর একটা তিন-চার বছরের ছেলে মাটি আর ছাই নিয়ে আপন মনে খেলা করছে। নতুন লোক দেখে ছেলেটা একবার তার ক্ষুদে চোখ দিয়ে দেখে নিয়ে আবার তার নিজের খেলায় মন দিল। বড় ছেলেটা অনুপমাকে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে পাড়ার ছেলেদের সাথে খেলা করতে চলে গেছে।

বারান্দায় একটা পুরোনো ছেঁড়া আসন পেতে দিয়ে কংকা বলল, 'কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবি অনু, বস একটু।'

হাতের ছাতাটা দেয়ালের এক কোণে রেখে দিয়ে আসনে বসল অনুপমা। অনুপমার পাশে মাটির উপর বসে কংকা বলল, 'খুব আশ্চর্য হচ্ছিস না অনু, এতদিন পরে দেখে। প্রায়ই তোকে দেখি এই পথ দিয়ে যেতে। কিন্তু দূর থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারি না। আজ যখন এই রাস্তাটা পার হচ্ছিলি, পেছন দিক থেকে তোর হাঁটার স্টাইলটা দেখে ঠিক চিনে ফেললাম তোকে।'

'তাই বুঝি তোর বড় ছেলেটাকে পাঠিয়েছিলি আমার কাছে? সে ত' আমায় অবাক করে দিয়েছিল। আমি না কি ওর মাসী হই!' শেষের দিকে একটু না হেসে পারল না অনুপমা।

অনুপমার হাসিতে যোগ দিয়ে কংকা বলল, 'ওটা আমারই শেখানো।'

তারপর কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্তায় যতি পড়ল। নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথম কথা বলল অনুপমা,—কোলকাতায় এসেছিস ক'দিন?'

'তা প্রায় বছর তিনেক হ'ল বৈ কি!' বাঁশের বেড়ার উপর দিয়ে নীল আকাশের বুকে সাঁতার দেওয়া একটা শকুনের দিকে তাকিয়ে বলল কংকা।

'পার্টিশনের পরেই এসেছিস তা' হলে। আগে আসতে পারলি না বুঝি' কংকার দিকে তাকিয়ে বলল অনুপমা।

চোখ ফিরিয়ে অনুপমার দিকে তাকিয়ে কংকা বলল, 'আসতে আর পারলাম কই। চেষ্টা করেছিলাম খুব। আসবার মুখে ওঁর এমন অসুখ করল, গ্রাম ছেড়ে যে কোথাও যাব এমন সাধ্য ছিল না।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে আবার কংকার দৃষ্টি উদাস হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ দুজনে কোন কথা বলতে পারল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে অনুপমা তাকিয়ে রইল কংকার দিকে, আর তার মন চলে গেল বহুদূরে—অতীতের অনেক ঘটনাবহুল দিনগুলিতে!

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর গ্রামে ছিল অনুপমাদের বাড়ী। পাশের গ্রামে থাকত কংকারা। কংকাদের গ্রামে কোন স্কুল ছিল না। তাকেই কংকা এসে ভর্তি হল অনুপমাদের স্কুলে ক্লাস সেভেনে। প্রথম যেদিন স্কুলে এল কংকা, সেদিন সমস্ত স্কুলের মেয়েদের মধ্যে প্রথমেই অনুপমার সাথে ভাব হয়ে গেল কংকার। কংকার সুন্দর চেহারা আর আয়ত চোখদুটির দিকে তাকিয়ে অনুপমা যেন চোখ ফেরাতে পারছিল না। এত সুন্দর হয় মানুষের চোখ! কালো ভ্রূর নিচে সুগভীর একজোড়া চোখ।—কী গভীর সে চোখের চাহনি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, [illegible] সংস্কারের [illegible] অতি সহজেই অনুপমার সমস্ত হৃদয় দখল করে নিল।

তারপর আরও কয়েকটি বছর পার হয়ে গেল এই দুটি কুমারীর জীবনের উপর দিয়ে কালের [illegible] ছাপ রেখে। বাল্যকালের দুটি অভিন্নহৃদয় খেলার সাথী—যৌবনের প্রারম্ভে জীবনের সাথী হতে চলেছে। সম্মুখে বিশাল পৃথিবী চোখের সামনে রঙীন-স্বপ্নের মেলা জীবনের সংকেত। এক জীবন আর এক [illegible] জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ধীরে, অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে।

১৩৫০ সাল। বাংলার বুকে নেমে এল এক মহাকাল। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বাঙালীর সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত। অনাহার আর হাহাকারের মর্মভেদী চীৎকারে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত, কম্পিত। ঠিক এই সময়ে অনুপমার বাবা ঢাকা থেকে বদলি হয়ে সপরিবারে কোলকাতায় চলে গেলেন। যাবার সময় অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে অনুপমা বলেছিল, "অনেক দূরে চলে যাচ্ছি ভাই। জানি না আর দেখা হবে কি না। মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে খোঁজ খবর নিতে ভুলিস না যেন। আর, পড়াশুনোয় ফাঁকিবাজি করিস না কিন্তু। ম্যাট্রিকটা পাশ করা চাই-ই। পরীক্ষার আর ক'দিনই বা বাকি।"

চোখের জলের ভিতর দিয়ে দু বন্ধুর বিদায় হল। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ—তের—বছর। মাঝে মাঝে চিঠির আদান-প্রদান হত। চিঠির মাধ্যমে জেনেছিল অনুপমা, ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে কংকা, বিক্রমপুর স্কুল থেকে, সংস্কৃতে আর ইতিহাসে লেটার নিয়ে। অনুপমাও জানিয়েছিল ওর খবর। সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে আই-এ পড়বার জন্য।

ঠিক তার কয়েক বছর পরেই এল সর্বনাশা আগস্টের বন্যা। বাংলা হয়ে গেল দুভাগ। দু' বন্ধুর মধ্যে আনল এক বিরাট ব্যবধান। বিস্মৃতির আড়ালে ডুবে গেল দুটি জীবন।

তারপর দীর্ঘ—তের—বছর পরে আবার যখন দুই বন্ধুর দেখা হল, তখন দেখা গেল, একজনের জীবন ভেঙে-চুরে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আর একজন সংসারক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে চলেছে।

* * * *

বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে অনুপমার দিকে তাকিয়ে কংকা বলল, 'ওখানে যখন গ্রামে থাকা সম্ভব হল না, একদিন সাঁঝের আঁধারে গ্রামের মায়া ত্যাগ করে ছেলে দুটির হাত ধরে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কোলকাতার পথে রওনা হলাম। অনেক কষ্ট আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যখন পশ্চিম বাংলায় এসে পৌঁছুলাম তখন ওঁর অবস্থা মুমূর্ষু। রাণাঘাটে গাড়ীতে উনি মারা গেলেন। ভাবতে পারিস ছেলে দুটিকে নিয়ে তখন আমার কি অবস্থা?'

একমনে শুনে যাচ্ছিল অনুপমা কংকার কথাগুলি। কোন কথা বলবার এমন মনের অবস্থা যেন হারিয়ে ফেলেছিল ও। পশ্চিম আকাশের কোলে সূর্য অস্তগমনোন্মুখ। আকাশ-সাঁতার-শ্রান্ত একদল পাখী এসে জড়ো হয়েছে সামনের গাছটার ডালে ডালে। পাশের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ ভেসে আসছে। বাইরে [illegible] [illegible] কয়েকজন [illegible] তাদের [illegible] অনুপমা।

অনুপমা বলল, 'এখন কি করছিস? চলছে কি করে?'

তের বছর আগেকার সেই বাঁকা হাসি হেসে কংকা বলল, 'চলছে আর কই। বয়সের দাঁড়িয়ে আছি চলমান এই সংসারের মধ্যে। [illegible] ছিল তাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চালাচ্ছি এতদিন।'

অনুপমা আবার বলল, 'একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারলি না? অন্ততঃ একটা টিউশানি?'

আবার হাসল কংকা, তবে এবার ওর হাসিটা বড্ড করুণ। পরে বলল, 'বাইরে বেরিয়ে চেষ্টা যে করব কোথাও এমন সামর্থ্যও আজ আর নেই অনু, দেখছিস ত' আমার চেহারা কেমন হয়েছে?' নিজের কঙ্কালটুকু জানাতে একটুকু কুণ্ঠা বোধ করল না কংকা।

এতক্ষণ পরে অনুপমা পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল একবার কংকার দিকে। দেহের সে জৌলুস আর নেই। শরীরটা শুকিয়ে একেবারে আমসি। তালি দেওয়া সাদা থান কাপড়ের আড়ালে যে শরীরটাকে ঢেকে রাখবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে কংকা, সেখানে নেই কোন কামনার আকর্ষণ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহের রঙ দারিদ্র্যের আঁচে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। হাত দুটো সরু সরু, কাঁধের দুপাশে [illegible] কঙ্কালের মত ঝুলছে। সমস্ত দেহটা সমান্তরাল

(ইহার পর ২১৮ পৃষ্ঠায়)

ঘরে ঘরে সঙ্গীতের এত প্রসার আজ হোতো না- যদি হারমোনিয়মের মত একটি বাঁধা সুরের অতি সহজে আয়ত্তকারী বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার না হোতো। অবশ্য হারমোনিয়ম বেসুরা ও কর্কশ হলে উহার সাহায্যে গান বাজনা না শেখাই উচিৎ।

প্রায় ৮০ বৎসর পুর্ব্বে ডোয়ার্কিনের বাড়ী হইতে এই হাত হারমোনিয়মের আবিষ্কার হয় এবং তিন পুরুষের অভিজ্ঞতা এই যন্ত্রের নিখুঁত রূপ দিয়েছে।

[illegible]
[illegible], এসপ্ল্যানেড ইষ্ট
কলিকাতা—১

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের নিত্যসংগী

"ট্রিপল ডাই"

হাজা, ফাটা, কাটা, পোড়া ও খোস পাঁচড়ার জন্য

"সলুরিসসিনল"

হেয়ার টনিক

"ইফাইটল"

সর্ব্বপ্রকার দাদের জন্য

"কেরাসল"

কড়ার জন্য

বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত অন্যান্য চর্ম্মরোগের ঔষধের জন্য লিখুন

পাস্তুর ল্যাবরেটরীস্ লিমিটেড

২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
ফোন—৩৪-২৬৭৫

---

২ টির যেকোনো একটি

মাল্লিক ফ্যাক্টরী হক মেসিন

কুটীর শিল্পে "মল্লিক" ও "বাটকো" সেলাই কলের দাম বড় কম আছে!

শত শত পরিবার এই দুটি সেলাই কলের সাহায্যে উপার্জ্জন করে ও বাড়ীর নিজেদের প্রয়োজনীয় পোষাক তৈয়ারী করে ঘরের পয়সা বাঁচান। এই কলগুলি বেশ মজবুত, দামও কম এবং সহজ কিস্তিরও ভাল ব্যবস্থা আছে।

অল্প মূলধনে ঘরে ঘরে কুটীর শিল্পের প্রসার করুন।

★

সেন্ট্রাল বাটকো সি. টি. মেসিন

মল্লিক এবং বাটকো সেলাই কল

কে. সি. মল্লিক এণ্ড সনস্ লিঃ

অফিস: ১০৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ ফোন: [illegible]
কারখানা: [illegible], কলিকাতা-১০, ফোন: [illegible]

কুমার-কুমারী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ন্যাশনাল স্টোর্সে কলমের জন্যে আমার সপ্তাহে দু'বার এক-বার করে না গেলে চলে না, তার মানে এই নয় যে, আমি সপ্তাহে দু'বার করে কলম বদলাই। আমার কলম বিশেষজ্ঞ বন্ধু বিজয় সেনের হাতে পুরোন কলমটা তুলে দিয়ে অপেক্ষা করি। তিনি স্ক্রু কমান বাড়ান নিবের অবস্থানটি একটু নেড়ে চেড়ে ঠিক করে দেন। তারপর আমাকে কলমটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এবার লিখে দেখুন।' এখনকার মত বেশ লেখা পড়ে; কিন্তু দু'চার দিন বাদে আবার যা তাই।

বিজয়বাবু নানারকম মন্তব্য করেন, 'দোষটা কলমের নয়।' কোন দিন বলেন, 'ফাউন্টেন পেন বাদ দিয়ে আপনার খাগের কি পাখির কলমেই লেখা ভালো।'

কোন দিন বা বলেন, 'আপনার ম্যানিয়া হয়েছে মশাই, কলমের কিছু হয় নি।'

দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে আমরা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক পার হয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তাই তাঁর সঙ্গে আমি রঙ্গ করি। আর আমি তাঁর খুব ব্যস্ততার মুহূর্তে গিয়ে হাজির হলেও তিনি বিরক্ত হন না। স্মিতমুখে মাথা নাড়েন। হাতের কাজ সেরে শুধু কুশল প্রশ্ন নয়, দু'চার মিনিট সুখ দুঃখের গল্পও করেন।

বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স হয়েছে ভদ্র-লোকের। একটু লম্বা বড় বড় চুল রাখতে ভালোবাসেন। সেই নিবিড় কালো ঘন চুলের মধ্যে আজকাল রুপালী রেখা বেশ চোখে পড়ে। শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার সৌম্যদর্শন মানুষটি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মিষ্ট ভাষায় শিষ্টাচারে সেলস্‌ম্যানের পক্ষে একেবারে আদর্শ। তাঁর কাউন্টারের সামনে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে। পুরুষদের চেয়ে মহিলা-দের এবং তাঁদের মধ্যে আবার স্কুল কলেজের কিশোরী তরুণী ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। কলম সম্বন্ধে ছাত্রীদের ভারি কৌতূহল। নানারকম কলমের দরদাম থেকে শুরু করে তাদের উপযোগিতা উৎকর্ষ অপকর্ষের কথা বিজয়বাবুকে বুঝিয়ে বলতে হয়।

আমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম 'আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। এত মহিলা কাস্টমার বোধহয় সারা কলেজ স্ট্রীটে আর কারো কাউন্টারে আসেন না।'

বিজয়বাবু একটু লজ্জিত হলেন, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ ওঁরা কেবল আমার কাউন্টারেই এলেন।'

তাঁর গলার স্বরে এমন একটু বিষণ্ণতার সুর ছিল যে আমি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেলাম, আমি জানতাম যে তিনি অবিবাহিত।

আমার ভাবভঙ্গি দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'দিন আপনার কলম দিন। কি হয়েছে দেখি।'

সেদিন কলম দেখবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু আজ দরকারের সময় এসে দেখি তিনি নেই। গ্লাস কেসে নানা রঙের নানা নামের নানা দামের ফাউন্টেন পেন। তাঁর পিছনে বিজয়বাবুর ছোট্ট টুলটি শূন্য। তাঁর সহকারী বলাই জনদুই ক্রেতার সঙ্গে কথা বলছে।

'বিজয়বাবু কোথায় গেছেন?' বলাইকে জিজ্ঞাসা করলাম।

বলাই আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল 'উনি আর একজন কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বাইরে গেছেন। তাঁর ফিরতে খুব—খুব দেরী হবে। কলমটা আজ আমাকে দিয়েই পরীক্ষা করিয়ে নিন কল্যাণবাবু।'

বললাম 'তা না হয় নিলুম। কিন্তু তুমি অত হাসছ কেন। ব্যাপার কি?'

বলাই হেসে বলল, 'বিজয়বাবুর এতদিনে বিয়ের ফুল ফুটেছে। ফুটি ফুটি করছিল ক'বছর থেকেই, এবার একেবারে প্রস্ফুটিত।'

দোকানে আর কোন বাইরের লোক ছিলনা। কিন্তু আমিও তো ভিতরের লোক নই। তাই হোলসেলারী ডিপার্টমেন্টের চারুবাবু, বুড়ো-ক্যাশিয়ার প্রমথবাবু, স্টেশনারী ডিপার্টমেন্টের বিনোদবাবু সবাই প্রায় একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠলেন 'ওকি হচ্ছে, ফাজিল বকাটে ছেলে কোথাকার। বিজয়বাবু তোমার কত সিনিয়র। আর তুমি—'

বলাইয়ের বয়স আঠারো উনিশের বেশি নয়। টেরিলিনের হাফ সার্ট আর ব্যাকব্রাশ করা চুলে খুব স্মার্ট দেখায় বলাইকে। কিন্তু এক সঙ্গে এত লোকের ধমক খেয়ে বলাই একেবারে থ' বনে গেল। হোলসেলারীর চারুবাবু মুখ নিচু করে পাকা গোঁফের মধ্যে হাসি লুকোলেন তা আমার চোখ এড়াল না।

'আচ্ছা, আমি আর একদিন আসব।'

বলাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তা পার হতে বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা। শুধু তিনি নন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন ভদ্রমহিলা। মাথায় প্রায় বিজয়বাবুরই সমান। বরং মনে হয় যে বিজয়বাবুর চেয়েও একটু বেশি লম্বা। মেয়ে সাড়ে পাঁচ ফুটের কম হবেন না তিনি। প্র[স্থ] সেই অনুযায়ী না হলেও বেশ পুষ্টাঙ্গী বল[া] চলে। গায়ের রং গৌর। মুখখানা বেশ ভরা চেহারায় খানিকটা গাম্ভীর্য ব্যক্তিত্বের ছা[প] আছে। বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশের কম হবে না। পরনে সাদা খোলের শান্তিপুরী শাড়ী। ত[বে] পাড় বেশ চওড়া। রংটিও কাঁচা সবুজ। আভরণ খুব অল্প। গলায় চিকচিকে একটা হার। বাঁ হাতে কালো ফিতের একটি সোনা[র] ঘড়ি। আর কোথাও কিছু নেই। হাতে শান্তি-নিকেতনী একটি ভ্যানিটি ব্যাগ আর মুখ[ে] মলাটে ঢাকা মোটা বই। লক্ষ্য করলাম সিঁথি[র] রেখাটি সাদা। আমাকে দেখে বিজয়বাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু আমি পা কাটিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাড়াতাড়ি আমাকে কাছে ডাকলেন, 'ওকি চলে যাচ্ছেন কে[ন] কল্যাণবাবু, আসুন আলাপ করিয়ে দিই কল্যাণকুমার রায় সাহিত্যিক। আর শ্রীমতী সুস্মিতা দাশগুপ্ত অধ্যাপিকা।'

আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম।

শ্রীমতী দাশগুপ্ত স্মিতমুখে বললেন 'ও' আর আমি সেটুকুও না বলে শুধু স্মিত মুখ হয়ে রইলাম।

এরই মধ্যে দক্ষিণগামী ডবলডেকার বাসটি এসে পড়ল। তিনি হাত উঁচু ক[রে] কন্ডাক্টরকে থামিয়ে তাতে ওঠার আগে আবার

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাই আজ বড্ড তাড়া আছে।'

বিজয়বাবু বললেন, 'এই বাসেই যাবে ?'

সুমিতা বললেন, 'হ্যাঁ, বিজয় যাই। কল্যাণবাবুকে নিয়ে একদিন যেয়োনা আমাদের ওখানে। আলাপ করব। দয়া ক'রে যাবেন একদিন।'

আমি স্মিত সৌজন্যে ঘাড় নাড়লাম।

সুমিতা দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তবে তাঁর কাহিনী বিজয়বাবু একদিন বলেছিলেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের শ্রীমন্ত কেবিনের নিরালা কোণে আমরা বসে চা খাচ্ছিলাম। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশে পুরু মেঘ থাকায় দুপুরকে আর দুপুর বলে মনে হচ্ছিল না। বিজয়বাবুর পকেটে একটি লেডীজ সেফার্স পেন দেখে কৌতূহলটা আবার আমার মনে জেগে উঠল। বললাম, 'এমন দিনে শুধু তারে নয়, আমাকেও সব কথা বলা যায়। বলুন বিজয়বাবু।'

বিজয়বাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'আপনি কিছুকাল থেকেই এধরণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আর আমাদের দোকানের কলিগরা এমনকি ছোকরা বলাই পর্যন্ত হাসি-তামাসায় আমাকে অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, বলবার বেশি কিছু নেই কল্যাণ-বাবু।'

বললাম 'বেশ বেশি কিছু না বলতে চান অল্প কিছুই বলুন।'

আরো একটু ওজর আপত্তির পর বিজয়বাবু মুখ খুললেন, মন খুললেন।

"আমি কেন যে বিয়ে করিনি তা আপনাকে আকারে ইঙ্গিতে আরো কয়েকবার বলেছি। যে চাকরি করি আর যা মাইনে পাই তাতে বিয়ে করা চলে না। দোকানের সেলসম্যানরা কি বিয়ে করে না? করবেনা কেন, আমাদের দোকানের এক বলাই ছাড়া সবাই বিবাহিত। প্রত্যেকেরই ছেলে মেয়ে এমনকি নাতি নাতনী পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু আমার সেভাবে বিয়ে করবার জো ছিল না। আমাদের পরিবারে আমার কাকাদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রফেসার, কেউ বড় সরকারী চাকুরে। আর আমি হংস মধ্যে বক। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, রোজগারে সবচেয়ে অধম। আমার আবার বিয়ে! আমি তো জানি বাড়িতে ওরই মধ্যে যার রোজগার কম, যার ক্ষমতা কম তার বউয়ের কি দশা। সব সময় নিচু হয়ে তাকে থাকতে হয়। আর সেই তুলনায় আমার বউকে তো একেবারে ঝি হয়ে থাকতে হবে। তাই বিয়ে আমি করবনা এটা আমি প্রথম বয়সেই ঠিক করে ফেলেছিলাম। দিব্যি আছি। কাকীমাদের বউদিদের ফাইফরমায়েস খাটি। আর অবসরমত বইটই পড়ি। সেই অবসর কতটুকুই বা জোটে। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয় আর কাজকর্ম সব সেরে ফিরি রাত দশটা সাড়ে দশটায়। তাতেও তো কোম্পানীর সেক্রেটারী ম্যানেজারের মন ওঠে না। নিজের কথা ভাববারই সময় নেই আর তো বউয়ের ভাবনা। তবু আমার ছোট ভাই ইঞ্জি-নীয়ার অজয়ের যখন গ্রাজুয়েট আর গীতশ্রী উপাধি পাওয়া সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, মনটায় যে একেবারে নাড়াচাড়া লাগেনি একথা হলফ ক'রে বলতে পারব না। অবশ্য তার বিয়ের আগে মা অনেক রাত্রে আমার ঘরে এসে আমার হাত ধরে কেঁদে পড়েছিলেন 'আমার কথা শোন বিজু, ওর আগে তুই বিয়ে কর। তুই হলি বড়। তোর আগে ও বিয়ে করবে একি ম্লেচ্ছপনা সুরু হয়েছে এ সংসারে।"

আমি হেসে বলেছিলাম, 'ম্লেচ্ছপনা হবে কেন মা, আজকাল তো এরকম হচ্ছে? তাছাড়া আমি তো সম্মতিই দিয়েছি। আমি কোনদিনই বিয়ে করব না।' মা রাগ করে বলেছিলেন, 'কেন করবিনে শুনি। তোর যোগ্য মেয়ে বিয়ে কর তুই। গরীবের ঘরের অল্প লেখাপড়া জানা। তেমন সম্বন্ধ তো আমার হাতে আছে। বেশ এ বাড়িতে থাকতে তোর লজ্জা করে তুই আলাদা বাসা ক'রে থাক। আমি তোর কাছে বছরে ছ' মাস গিয়ে থাকব।'

বলেছিলাম, 'তার কি দরকার মা, তার চেয়ে আমি তোমার কাছে সারা বছর থাকব সেই ভালো।'

অল্প মাইনেয় আলাদা বাসা ক'রে স্ত্রী আর বেশি ছেলেপুলে নিয়ে কি দুর্দশায় ভুগতে হয় তা আমি বিনোদ দাসের বাসায় গিয়ে একবার দেখেছিলাম।

তার চেয়ে বেশ আছি। মাস অন্তে যা পাই হাত খরচটা রেখে মার হাতে সব ধরে দিই। আর কোন ঝামেলা বাকি নেই।

তারপর সেই মাও একদিন গেলেন। আমি বাঁচলুম। আর বিয়ের তাগিদ শুনতে হয় না। কাকারা আর যাঁরা আছেন সবাই মুক্তিমার্গী মানুষ। আমার মুক্তির পথে কেউ বাধা দিতে আসেন না। তাঁদের সময়ই বা কই, বছরে কতটুকুই বা তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়। দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। কলকাতায়ও কেউ কেউ আলাদা বাড়ি-গাড়ি করেছেন। যাঁরা তা পারেন নি তাঁরাই শুধু পৈতৃক বাড়ি আগলে পড়ে আছেন।

আর আছি আমি। বেশ আছি। এতদিন বাদে ছাদের লাগা একখানা ঘর পেয়েছি। একজোড়া টেবিল-চেয়ার আর একটি বইয়ের র‍্যাক। ইংরেজী বিদ্যা তত নেই, আপনাদের ওই বাংলা গল্প উপন্যাসই পড়ি। সব যে বুঝি সব যে ভালো লাগে তা নয়, তবু পাতা উলটে যাই। পড়তে পড়তে যেদিন বড্ড ঘুম পায় বই বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি। আর যে রাত্রে একেবারেই ঘুম আসে না জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। গরাদের ফাঁক দিয়ে কখনো বা চাঁদ দেখা যায় কখনো বা দুটি একটি তারা। ভাবি একজন মানুষের পক্ষে এই তো যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আর কি দরকার।

কোন দরকারই ছিল না। তবু একদিন— মানে বছর তিনেক আগে সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নতুন কলম কিনতে এসেছে। সেই সঙ্গে পুরোন কলমটাও নিয়ে এসেছে রিপেয়ার করাবার জন্যে। আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কলম বাছতে বাছতে দাম জিজ্ঞেস করতে করতে ও হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকায়, 'আরে বিজু না, তুমি যে এখানে!'

হেসে বললাম, 'আমি এখানে না থাকলে তুমি কলম কিনতে কার কাছ থেকে।'

সুমিতা হেসে বলল, 'তা বটে। রাজসাহীর কথা তোমার মনে আছে?'

রাজসাহীতে সুমিতার বাবা ছিলেন সিভিল-সার্জন, আর আমার বাবা সাবজজ। বাড়ি ছিল পাশাপাশি। দুই পরিবারের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তখন সুমিতার বয়স দশ আর আমার বারো। আমি ওকে উঁচু ডাল থেকে কাঁচা পেয়ারা পেড়ে দিতুম, আর ও আমাকে আচার, জেলি আর নিষিদ্ধ বই জোগাত। ওর সঙ্গে আমারই ভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। আমার দাদারা এ নিয়ে আমাকে হিংসে করতেন। তার-পরও বড় হয়ে সুমিতার সঙ্গে দু'একবার এই কলকাতাতেই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু ও তখন কলেজেপড়া রূপসী, বিদুষী মেয়ে। ক্লাসের ছেলেরা থেকে আরম্ভ করে তরুণ প্রফেসরেরা পর্যন্ত ওর অনুরক্ত, আর আমি পাড়ার অকাট-মূর্খ বকাটে ছোকরা। আমি কেন ওর কাছে পাত্তা পাব। পাত্তা পাওয়ার জন্যে আমার যে আগ্রহ ছিল তাও না। শুধু চালচলনে, আচার-আচরণে নয় মনের দিক থেকেও আমি নিচের সিঁড়িতে নেমে এসেছিলাম।

আশ্চর্য, এতদিন বাদে সত্যিই তাহলে ও আমাকে চিনতে পারল। চিনতে যখন পেরেছে আমিই বা অকৃতজ্ঞ হব কেন, আমিও আগের

বিজু, এমন ঢেউ কি নেই যাতে সব বাধা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

নিউ থিয়েটার্সের
শারদীয়া নিবেদন

বকুল

কাহিনী • মনোজ বসু
পরিচালনা • ভোলানাথ মিত্র
সঙ্গীত • প্রণব দে

চরিত্রে
অরুন্ধতী • উত্তম • শোভা
শ্রীমান বিজু • হরিমোহন
তুলসী প্রভৃতি

সমাপ্তির পথে

রাইকমল

কাহিনী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা • সুবোধ মিত্র
সঙ্গীত • পঙ্কজ মল্লিক
চরিত্রে
কাবেরী বোস • উত্তম
নীতিশ • চক্রবর্তী
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

•

জোঙ্কুলি

কাহিনী • নরেন্দ্র নাথ মিত্র
পরিচালনা • কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

সবার রুচিতে সর্ব্বোত্তম
সন্তোষ বিস্কুট ও ব্রেড

সন্তোষ
বিস্কুট কোং লিঃ কলিকাতা

আনন্দময়ীর আগমনে—

দেশবাসীকে আন্তরিক
শুভেচ্ছা জানাই

পরিচয় স্বীকার করলাম। যত বেশি পাওয়া যায় কমিশন বাদ দিয়ে দাম নিলাম ওর কাছ থেকে। স্টকে যা ছিল তার মধ্যে বেছে সবচেয়ে ভালো কলমটাই দিলাম। এক কৌটো কালি এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এর দাম লাগবে না,' মানে দামটা আমি নিজের পকেট থেকে দিলাম। পুরোন কলমটা ও রেখে গেল মেরামত করাবার জন্যে। বললাম, 'দিন দুই পরে এসে নিয়ে যেয়ো।'

দ্বিতীয় দিনে কলমের খবর নেওয়ার জন্যে সুমিতা আমাকে কলেজ থেকে ফোন করল, 'দেখ, আমি গিয়ে উঠতে পারব না। বড্ড কাজের চাপ। তুমি কলমটা আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

বললাম, 'দিতে পারতাম। কিন্তু আমি যাঁদের চাকর তাঁরা যে ছুটি দেবেন না। আমারই বা সময় কই।'

ফোনের ভিতর দিয়ে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, 'বুঝতে পেরেছি। তা হলে, যেদিন ছুটি আছে সেদিনই এসো। রবিবার সকালে। অবিশ্যি এসো এক সঙ্গে বসে চা খাব।'

কলমটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে অগত্যা যেতেই হোলো। সত্যেন দত্ত রোডের ওপর বিরাট তেতলা বাড়ি। আমি এসেছি শুনে ও একতলার ঘরে নেমে এল। বড় বসবার ঘরখানার ওর ব্যারিষ্টার দাদার মক্কেলরা ভিড় করে রয়েছেন। ও আমাকে সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে তুলে এনে পাশের ছোট আর একখানা ঘরে নিয়ে এল। সে ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। চোখে পড়ে নিরমিষ সরস্বতী ফুলের টব। মাঝখানে ছোট একটি টেবিল। দুজন দুদিকে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি বসলাম।

সুমিতা প্রথমেই বলল, 'সত্যিই খুব ভালো কলম তোমার। কি চমৎকার লেখা পড়ছে দেখবে?'

বললাম, 'কই দেখি।'

সুমিতা চাকরকে ডেকে ওপর থেকে একটা লম্বামত খাতা আনিয়ে নিল। তারপর পাতা খুলে আমাকে দেখাল। ছোট ছোট ইংরেজী অক্ষরে পাতা ভর্তি।

সুমিতা হেসে বলল, 'থিসিস তৈরী করছি।'

কি সাবজেক্টে তা আমিও জিজ্ঞেস করলাম না, সুমিতাও বললে না।

হেসে বললাম, 'তা হলে তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। কি মজার কাণ্ড দেখ। আমরা দুজনেই কলমের কারবারী। যত অমিলই থাকুক এই মিলটুকু আমাদের মধ্যে আছে।'

সুমিতা একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর খাতাটা ফেরৎ পাঠিয়ে চায়ের সেট আনতে হুকুম দিল। নিজেই চা করল, চা ঢালল কাপে।

দুজনে দুজনের পরিবারের আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিলাম।

তারপর আমি বললাম, 'তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না তো?'

সুমিতা বলল, 'স্বামী কোথায় যে আলাপ করিয়ে দেব! তোমার খবর কি। তোমার ছেলেপুলে কটি?'

হেসে বললাম, 'সেই মহাভারতের যুগ আর নেই। এ যুগে ছেলেপুলে চাইলে বিয়ে করতে হয়।'

সুমিতা বলল, 'তা বটে। কিন্তু বিয়ে কেন করোনি?'

সত্যি কথাই বললাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তুমি? তুমি কেন বিয়ে করলে না?'

সুমিতা একটু হাসল, 'বর জুটলো না বলে।'

বুঝতে পারলাম কথাটা এড়িয়ে গেল সুমিতা।

কথাটা আমার মত অত সহজ নয়।

রিপেয়ার করা কলমটা পকেট থেকে বের করে ওর হাতে দিলাম। ও সেই কলম দিয়ে একটু লিখে বলল, 'বাঃ একেবারে নতুন কলমের মত লেখা পড়ছে যে, কত খরচ পড়ল বল।'

বললাম, 'অতি সামান্য। সে হিসেব আর একদিন করা যাবে। আজ উঠি।'

সেই কলম মেরামতের খরচটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে দিনকয়েক বাদেই সুমিতা ফের একদিন গিয়ে আমাদের দোকানে হাজির হোলো। আমি সেদিনও দাম নিলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

তারপর প্রায়ই সে আসতে লাগল। আপনার মত ওর কলমও মাঝে মাঝে বিগড়ায়। তা ঠিক করে নেওয়ার জন্যে, তা ছাড়া টুকিটাকি আরো জিনিসপত্রও সুমিতা আমাদের দোকান থেকে কেনে। কর্মচারীরা মুখ টেপা টেপি করে। কোন মেয়ের সঙ্গে আমার যে এত আলাপ আছে তা ওরা ধারণাও করতে পারেনি। আর এ মেয়ে কি যে সে মেয়ে? একেবারে রাজেন্দ্রাণী। বিনোদবাবু পর্যন্ত হাসিঠাট্টা করেন। বলেন, 'আপনি বুঝি এই জন্যেই বিয়ে করেননি বিজয়বাবু, শুধু ও মেয়ের জন্যে এক জন্ম কেন, একাধ জন্মও অপেক্ষা করে থাকা যায়।'

আমি জবাব দিই, 'ছি-ছি-ছি কি যে বলেন। জানেন ওরা কত বড়লোক। আর দেশী বিদেশী কতগুলি ডিগ্রী ওর নামের সঙ্গে জুড়ে আছে। আমি তো ওর চাকর হওয়ারও যোগ্য নই। আমি কলম সারাই, আর ও সেই কলমে লেখে, আমাদের মধ্যে শুধু এইটুকুই সম্পর্ক।'

মাস ছয়েক ধরে এমনি দেখা সাক্ষাৎ চলল। তারপর ও হঠাৎ একদিন এসে বলল, 'বিজু, পুরী যাবে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম 'পুরী?'

সুমিতা বলল, 'হ্যাঁ, চলনা বেরিয়ে আসি, দাদা বউদিরা শিলং যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যেতে আমার ইচ্ছে নেই। পাহাড়ের চেয়ে আমার সমুদ্রই বেশি ভালো লাগে।'

বললাম, 'কিন্তু আমি তো ছুটি পাব না।'

ও বলল, 'একা একা যেতে ইচ্ছে করছে না। অন্ততঃ দু'তিন দিনের জন্যেও যেতে পার না? তুমি শুধু আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে।'

বললাম, 'তা হয়ত পারি।'

ও আমার আপত্তি মোটেই শুনল না। আমার গাড়ি ভাড়াটা ওই দিল। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই কাটল দু'খানা।

হোটেল নির্বাচনও ওর পছন্দ মতই করতে হোলো। সমুদ্রের ধারে হোটেল... পাশাপাশি দুটো ঘরই আমরা পেলাম। ঠিক তিনদিনে ফিরে আসতে পারলাম না। সপ্তাহখানেক লাগল। কটা দিন যেন হৈ হৈ করে কাটল। সকাল সন্ধ্যা দু বেলা বেড়ানো, দুপুরে স্নান। মনে হোলো বয়স যেন দুজনেরই বিশ বছর করে কমে গেছে। তারপর অনেক রাত অবধি অন্ধকারে বালির মধ্যে সমুদ্রকে সামনে রেখে বসে থাকা। আকাশে তারা। আমার সেই জানলার দুটি-একটি তারা নয়, অসংখ্য। সেই অগুণতি তারা আর অগুণতি তরঙ্গের মাঝখানে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার বলো সুমিতা, কেন তুমি বিয়ে করনি। তোমার এত রূপ, এত বিদ্যা, এত সম্পদ—। আমার মত অভাজন তো তুমি নও। কেন তবু তুমি বিয়ে করলে না?'

সুমিতা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'দেখ এ প্রশ্নের জবাবে প্রথম বয়সে একেকজনকে একেক কথা বলতাম। আজ আর একটি কথাও খুঁজে পাইনে। সব যেন মন থেকে হারিয়ে গেছে। যতটা মনে পড়ছে কারো ভালোবাসা পেলামনা বলেই আমার বিয়ে করা হোলো না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কথা কি বিশ্বাস করতে বলো? তোমার মত মেয়ে—'

সুমিতা বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'যার এত রূপ এত বিদ্যে এত বুদ্ধি তাই না? কিন্তু জানো বিজু, ভালোবাসা রূপ-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। যে পাবার সে ও সব না থাকলেও পায়। যে পায় না, সে সব থাকলেও পায় না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

সুমিতা বলতে লাগল, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ভালোবাসা আসেনি। তবে অনেক সম্বন্ধ এসেছিল। বড় বড় সম্বন্ধ। দাদারা ভাবতেন আরো বড় আসুক। আমিও হয়ত তাই ভাবতাম। এমনি ভাবতে ভাবতেই দিন চলে গেল। আমার অবশ্য অন্য ভাবনা ছিল। নিজের ক্যারিয়ারের ভাবনা, ক্যারিয়ারের সাধনা। ভাবলাম তাতেই বেশ ডুবে থাকা যাবে। কিন্তু জ্ঞানসমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মত শক্তি কজনের থাকে! আমার যে তা নেই, সেই জ্ঞান যখন হোলো তখন সময় গেছে।'

বললাম, 'সময় গেছে একথা কেন বলছ সুমি, সময় হয়তো এখনো আছে।'

সুমিতা হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আছে! সত্যিই তুমি একথা বিশ্বাস কর বিজু! একটু আগে রূপ, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধির কথা বলছিলে। কিন্তু ওসব অনেক সময় অন্যের কাছে বাধা। অন্যের কাছে বাধা, নিজের কাছেও বাধা। বিজু, এমন ঢেউ কি নেই যাতে সব বাধা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়? যাতে সব সীমা আমরা পার হয়ে আসতে পারি!'

কতক্ষণ বসেছিলাম ঠিক নেই। হঠাৎ হোটেলের চাকরের ডাকে আমাদের চমক ভাঙল। দেরি দেখে সে আমাদের খুঁজতে এসেছে।

পরদিনই আমরা কলকাতায় চলে এলাম। আসার সময় সুমিতার যেমন বেশি গরজ ছিল, ফেরার গরজটাও তেমনি ওরই বেশি দেখলাম। আমার মনে হোলো ও লজ্জা পেয়েছে, ভয় পেয়েছে। অন্ধকার সমুদ্রতীরে দ্বিতীয় রাত সুমিতা আর কাটাতে চায় না। আমিই বা কেন কাটাতে যাব! আমারও চাকরির টান আছে।

বিজয়বাবু থামলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর?'

বিজয়বাবু একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'তারপর আর কি। আপনাদের কার যেন একখানা উপন্যাসে পড়েছিলাম কলকাতাও সমুদ্র, জনসমুদ্র। কিন্তু সেই অন্ধকার নির্জন সমুদ্র থেকে এ সমুদ্র অনেক আলাদা। এখানে

(ইহার পর ২২২ পৃষ্ঠায়)

বিষণ্ণ-বিকেল

(২১০ পৃষ্ঠার পর)

—কোথাও এতটুকু উঁচু-নীচুর আভাষ নেই। কংকার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল অনুপমা। হ্যাঁ, চোখের সেই গভীর ও ভাবপ্রবণ দৃষ্টিটা আজও আছে বটে কংকার! যে দৃষ্টির মোহে পড়েছিল একদিন অনুপমা—আজ হতে প্রায় তের বছর আগে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপমা বলল এক সময়, "টিউশানি করবি! আমার হাতে আছে একটা। দেবে মন্দ না—মাসে চল্লিশ টাকা করে।"

সহসা অনুপমার এ প্রস্তাবে কংকার চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "সত্যি! কেন করব না। একূল—ওকূল দুকূল হারিয়ে কিভাবে যে চলছি—"

বাধা দিয়ে অনুপমা বলল, "কাল দুপুরে তৈরী হয়ে থাকিস। আমি এসে নিয়ে যাব। দুপুরে দু'ঘণ্টা করে পড়াতে হবে। পারবি না?"

কোন কথা বলতে পারল না কংকা। শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনুপমার দিকে। চমক ভাঙ্গল অনুপমার কথায়—"আজ তাহলে উঠি কংকা। কাল দুপুরে আমি আসব, তৈরী থাকিস কিন্তু।"

ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অনুপমা। স্লিপার জোড়াটা পায়ে গলিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। অনুপমার পিছনে পিছনে দরজার কাছে এসে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কংকা বলল, "এতদিন পরে দেখা। তোকে যে এক কাপ চা দিয়ে——"

ফিরে দাঁড়াল অনুপমা। বলল, "আমাকে ভুল বুঝিস না ভাই। যদি বহু পুরাতন সেই সম্পর্কটাকে মনে রেখে থাকিস তবে চায়ের প্রসঙ্গ আজ আর তুলিস না। নিজেকে একটু দাঁড় করিয়ে নে এই নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন সমাজের বুকে। তারপরে যতখুশী চা খাওয়াতে পারিস খাওয়াস, বাধা দেব না সে দিন।"

রাস্তায় এসে দাঁড়াল অনুপমা। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছ'টা। সন্ধ্যা নামছে ধরণীর বুকে। বাতিওলা রাস্তার উপর বাতি-গুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। লোক চলাচলের ভীড় বেড়েছে রাস্তায় রাস্তায়। মাণিকতলা রোড পেরিয়ে অনুপমা বিবেকানন্দ রোড ধরে গিরিশ পার্কের দিকে চলতে লাগল। আর একটু এগুলেই বাসা। পা দু'টো যেন আর চলতে চাইছে না। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ীগুলো যেন একযোগে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে। মাথার দু'পাশে রগ দু'টো যন্ত্রণায় টনটন্ করছে। সারা দেহের ভিতর একটা অস্বস্তি নিয়ে এগিয়ে চলল অনুপমা।

প্রথমে অনুনয় শুনে হয় ত' ঘাবড়ে যাবে। মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করে আসত সংসারে। —এতে সংসারের একটা বড় রকমের সাহায্য হত। হঠাৎ এ আয়টা কমে গেলে—কিন্তু কি করবে অনুপমা। সে নিজের চোখে যে অবস্থা আজ দেখে এলো, কংকাকে একটু সাহায্য না করলে ওর চলত কি করে। অসহায় দু'টি নিরপরাধ পিতৃহীন ছেলেকে নিয়ে যেভাবে দিন কাটছে কংকার, বন্ধু হয়ে সে যদি কিছু করতে না পারে এ সময়ে—তবে সে বন্ধুত্বের মর্যাদা রইল কোথায়!

বাসায় ঢুকে দেখল অনুপমা, অনুনয় চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে আর মোক্ষদা টুটুলকে একটা কাপে করে দুধ খাওয়াচ্ছে। বারান্ডাটা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল অনুপমা। খবরের কাগজের ফাঁক দিয়ে একবার আড়চোখে অনুপমাকে দেখে নিয়ে অনুনয় আবার কাগজে মনোনিবেশ করল।

কিন্তু কাগজ পড়া অনুনয়ের বেশীক্ষণ হল না। কলঘর থেকে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ভেসে আসাতে, পাশের টেবিলে কাগজটা রেখে দ্রুতপদে কলঘরের দিকে এগিয়ে গেল অনুনয়। এসে দেখল, কলঘরের নালাটার কাছে বসে অনুপমা বমি করবার চেষ্টা করছে, আর একটা অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনুপমার গায়ে হাত দিয়ে অনুনয় বলল, "কি হল অনু, হঠাৎ বমি করছ কেন?"

নিজেকে একটু সামলে নিল অনুপমা। চোখে মুখে জল দিয়ে আঁচলে মুখটা মুছে নিল। পরে লজ্জামিশ্রিত স্বরে একটু হেসে অনুনয়ের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আহা, ন্যাকা যেন। কিছু বোঝ না।"

ভয়ের ভাবটা কেটে গেল অনুনয়ের। চোখে মুখে খুসীর একটা ভাব এনে বলল, "সত্যি!"

একটু থেমে আবার কি ভেবে বলল, "দরকার নেই আর রোজ রোজ এতটা পথ হেঁটে গিয়ে টিউশানি করবার। একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিও কাল ওদের।"

অনুনয়ের কথা শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অনুপমা তাকাল একবার অনুনয়ের মুখের দিকে।

চৈত্রবাতাস ফেলিছে শ্বাস বনে
দাহ অধীর সন্ধ্যা, মদির ক্ষণে
ফুটেছে গুল-মোহর ফুল, আলো
জ্বালানো যেন, আবীর কেন ঢালো!

স্বপন গাঢ় হৃদয়, আরো বাণী
ফাগুন দিনে ইসারা এনে জানি
আশার কাঁপে: সুখতাপে স্নাত
খুশী অশেষ। যৌবন শেষ না ত!

মৌমাছি-গান ফুরালো, প্রাণ হাসে
বৈশাখী ঝড় বিচিত্রতর আসে।
সুখরঙীন দুপুর নবীন ফোটা
ফুলে পাগল হৃদয় আগল ছোটা।

বিবর্তন
[illegible]

অলঙ্কার শিল্পে শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ
বি, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সনস্ অব লেট বি সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৫, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা।
ফোন : ৩৪-২৭২৮
৮৯, চৌরঙ্গী রোড
ফোন : পি কে ৩০৯৩

('পাগ্লামীর বিভিন্ন অবস্থায় বিরচিত)

সিরাজ উদ্দৌলার প্রতি

(সিরাজ আমাদিগকে কিছু কিছু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমরাও নানাজনে নানাভাবে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া আসিয়াছি। তাহারি প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি রচিত হইয়াছে মনে করিলে ভুল করা হইবে।)

কখনো কি ভেবেছিলে সিংহাসনে শৃগালের থাবা
সত্য হবে? ভাব নাই, তাই দিলে ভুলের মাশুল।
ভুলেছিলে দুনিয়ার যারা হয় সন্তানের বাবা
বাবারও সন্তান তারা; ভেবে তাই পাও নাই কূল।

হে নবাব, তাই তব দিতে হলো আত্মভোলা প্রাণ
পরের খঞ্জর-পথে আপন পঞ্জর পেতে দিয়ে
বলীবর্দ সম বলী আলীবর্দী নানারে কাঁদিয়ে।
নাতি-শোকে কাঁদে বৃদ্ধ কবরের গহ্বরে শয়ান।

সবুজ পলাশী মাঠে রক্ত-রাঙা পলাশের প্রায়
আজিও গোধূলি নামে, তারপর—সন্ধ্যার তিমির।
সেই সেদিনের মতো, যেদিনের মলিন ছায়ায়
গুটিকয় লালমুখ দেখেছিল ভেড়াদের ভিড়।

ইতিহাস আজো হাসে বঙ্গ কিছু ইতি করা হাসি,
পথেরে পথিক ভোলে, পথিকেরে ভোলে না তো পথ।
কত সাক্ষী ফাঁকি হলো, কত যে সিরাজী হলো বাসি,
জীবন-চক্রের 'পরে চলে মহা-জীবনের রথ।

ভ্রান্তি-সংহিতা

(পঞ্চনদীর তীরে এককালে শিরে বেণী পাকাইয়া 'কবিগুরুর ভাষায় যেমন করিয়া নির্মম নির্ভীক শিখ জাগিয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চভূতের ভিড়ে জট পাকাইয়া তেমনি মাঝে মাঝে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মাথা চাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিতে চায়; কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য সাড়া-শব্দ না পাইয়া আবার ঝিমাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার সেই ঝিমানোই চরম ঝিমানো নয়, এই পরম সত্যটা অন্তরে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত বিশ্ব-মানবের আধ্যাত্মিক নিঃস্বতা কোনোদিন ঘুচিবে না। নিম্নলিখিত কবিতায় এই সত্যটি বুঝাইবার চেষ্টা কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, পাঠিকারাই তাহার বিচার করিবেন।)

লোহার খনিতে দেশালাই জেলে সোনা খুঁজিবার নেশা
ভুলিবি রে তুই কবে?
রাসভের গীতে যদি রে খুঁজিবি হ্রেষা অশ্বের হ্রেষা
বৃথা হল কেন তবে?
শরতের মেঘে কেন রে খুঁজিস ঘন কাল-বৈশাখী?
শীতের রাতে ফিরি করে যাস কুল্পি বরফ হাঁকি?
বিসর্জনের ডুবে গেল ঢাক, ভাসিয়া রহিল ঢাকী,
মরণের ঋণ করিবি কি শোধ জীবন-মহোৎসবে?
বাঁশীর অতীতে ছিলো যে রে বাঁশ
যদি আনমনে তাই ভুলে যাস,
হাঁক করে তবে সব ইতিহাস

গুনেগুনে কয়ে' ওরে নিগুঢ় , কত গান হলো গাওয়া,
কত সুরে তাল ভুলে'।
হিমসিম খায় বিশ্ব-বিধাতা ভুলে গিয়ে নাওয়া খাওয়া
বিশ্ব-বিধান খুলে'।

চিড়িয়া-বিহীন চিড়িয়াখানায় জনোয়ারী গঞ্জনা,
আসিতে আসিতে দেখাদেখি নাই, খাপে খাপে বঞ্চনা,
মনের আড়ালে চাপা পড়ে যায় কত মনোরঞ্জনা,
পরম বিত্ত হারায়ে চিত্ত তবু ওঠে দুলে দুলে।
চিত্তগুপ্ত লিখিছে খাতায়
ডালে ডালে আর পাতায় পাতায়,
না জেনে ফারাক আপেলে আতায়
একসাথে ফেলে গুলে'।

নেপথ্যের গান

(জীবনে এক একটি সময় আসে যখন কাল ও মহাকালের সাক্ষাৎ সীমারেখাটুকু লক্ষ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, চেতনায় ও অবচেতনায় বার বার গোল বাধিতে থাকে গতি ও স্থিতির মধ্যে কোন আপোষবিহীন দ্বন্দ্বের আভাস মাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামধনুর সপ্তবর্ণ, সপ্তাহের সপ্তদিন, সঙ্গীতের সপ্ত সুর, সপ্তর্ষিমণ্ডলের সপ্ত তারা, সেকেলে ভূগোলের সপ্ত সাগর, সওদাগরী বাণিজ্যের সপ্ত ডিঙা মধুকর প্রভৃতি ডিঙাইয়া চিত্ত অনায়াসে উধাও হইয়া যায়। পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চ নদ, পঞ্চ বটী, পঞ্চ গব্য, কবিরাজী পাঁচন, পঞ্চ শর... এমন কি পঞ্চ ভূতের কথা পর্যন্ত টাইফয়েড রোগীর প্রলাপের মত বার বার বিস্মরণ হইতে থাকে। সেই অতীন্দ্রিয় তুরীয় অবস্থার অব্যবহিত পরেই কাব্য-প্রেরণা জাগিলে নিম্নোদ্ধৃত জাতীয় কবিতা লেখা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।)

পত্র ঝরা শেষ হলো, ঝরিবার পত্র নাহি আর;
রিক্ত শাখে মৌন তরু করে হাহাকার।
মন পেতে শুনি তাই দাঁড়ায়ে সবুজ ঘাসে,
নিরন্ধ্র স্বপন দেখি ঘুমন্ত বাতাসে।

অকস্মাৎ রিক্ত শাখে কোথা হতে এসে এক পাখী
গেয়ে ওঠে গান, আনে নূতন আশার মৃদু বাণী,
বলে "ওরে রিক্ত তরু, সিক্ত কেন আঁখি
রিক্ত না রহিবি তুই, নব পত্র আসিবে আবার।"
তরু কেঁদে কহে "হায়, আসিবে নূতন পত্র জানি—
যে পত্র ঝরিয়া গেছে সে পত্র ফিরিবে না তো আর।"

আগ্নেয়গিরি অগ্নি ঝাড়ে, ঝরে স্রোত গলন্ত লাভার,
কম্পমান ভূমি বক্ষে থরে থরে জাগায়ে ফাটল,
রাহু করে সূর্য গ্রাস, ধরা-বক্ষে নামে অন্ধকার,
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বহে, ফুলে ফুলে ওঠে বন্যা-জল
ডেকে ওঠে চতুর্দিকে জীবন-মাতাল ভীত প্রাণ
"ত্রাহি ত্রাহি, করো করো ত্রাণ।"

বাণী হানে দার্শনিক অমায়িক মৃদুমন্দ হেসে
"নাই ওরে নাই নাই ভয় রে
হবে জয় হবে হবে জয় রে,
যতই ভীষণ হোক এ মহা প্রলয় রে
আবার হাসিবে ধরা প্রলয়ের শেষে।"

শুনে কাঁদিয়ের দল কেঁদে কেঁদে কয় রে
"যেন থাকিলেও আছা কাকের কি হয় রে?
ধরণী হাসিলে ফের নাহি সংশয় রে,
তার আগে ভয় হয়ে মোরা যাবো ফেঁসে।"

প্রাচীন বাংলায় পুলিশি কর্মকৃত্য

পঞ্চানন ঘোষাল

অপরাধ-নিরোধ ও অপরাধ নির্ণয়ার্থে রক্ষী নিয়োগ এদেশে নতুন নয় এবং একে এক সার্বিক প্রথা বলা যেতে পারে। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে ও মুসলমান যুগে এর অস্তিত্বের বহুবিধ প্রমাণ আছে। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভকালে দেশের শান্তি রক্ষার ভার যখন স্থানীয় ভূস্বামী বা উপরাজাদের উপর ন্যস্ত ছিল তখনও এদেশে সুগঠিত পুলিশি কর্মকৃত্য বর্তমান ছিল।

প্রথমে ঐ কর্মকৃত্যের অপরাধ-নিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই ব্যবস্থায় একটি গ্রামকে কয়েকটি পল্লীতে বিভক্ত করা হতো এবং রাতের বেলা প্রতিটি পল্লীর জন্য একজন বা দুজন চৌকিদার পাহারারত থাকতো। গ্রাম ছোট হলে অবশ্য সেখানে মাত্র একজন চৌকিদার কর্মরত থেকেছে, প্রয়োজনবোধে এরা হাঁক ডাক করে অপরাধীদের গ্রেপ্তারার্থে এদের সাহায্য করবার জন্য গ্রামবাসীদের ডেকেও তুলেছে। এই রকম চার পাঁচটি গ্রামের চৌকিদারদের কার্যের উপর তদারক করবার জন্য একজন করে দফাদারও নিযুক্ত করা হতো। এই দফাদারকে মধ্যে মধ্যে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে এসে এদের কার্যের উপর নজরদারী করে গিয়েছে। এই ব্যবস্থা গ্রাম্য পুলিশ অধ্যায় ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের অধীনে আজও পর্যন্ত চালু আছে। এছাড়া অপর এক একটি বিশেষ পদেরও প্রচলন ছিল। তাঁদের সেই যুগে বলা হতো ঘাটিয়াল। এ গ্রাম-সমূহ হতে অপর গ্রামসমষ্টিতে যাবার উপযোগী রাস্তাদের উপর বা পথের কোনও এক সংযোগস্থলে ঘাঁটি নির্মাণ করে এঁরা সেইখানে সাঙ্গোপাঙ্গসহ পাহারায় মোতায়েন থাকতেন, যাতে সন্দেহজনক কোনও এক গ্রামবাসী প্রবেশ করবার মুখেই বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

এই সকল ঘাঁটি অঞ্চলে যে সকল ঘাঁটিয়াল বসবাস করতেন তাঁদের নিজেদের ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের ভরণ-পোষণের জন্য জমিদার বা রাজারা যে নিষ্কর জমি দান করতেন তাকে বলা হতো ঘাঁটিয়ালী বা ঘাঁটিয়াল-স্বত্ব। ঘাঁটিয়ালগণ প্রয়োজনবোধে আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গদের সংখ্যা নির্ণয় করে তাঁদের নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য যা কিছু দায়িত্ব তা ছিল ঘাঁটিয়ালদের নিজেদের। অনুরূপভাবে পূর্বকথিত চৌকিদার ও দফাদারদের জন্যও নিষ্কর জমিজমার বন্দো-বস্ত করা হয়েছে। এই রকম ঘাঁটিয়ালী বা চৌকিদারী স্বত্বের জমিজমা পরবর্তীকালে তাঁদের বংশধরগণ ঐ রকম কাজে পরবর্তীকালে বহাল না থেকেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভোগ-দখল করে এসেছেন, কারণ ঐ সকল পদ বা কর্ম ছিল সম্পূর্ণ বংশগত।

উপরোক্ত পদ কয়টি ছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদ ছিল। তাকে বলা হতো দারোগা। এই পদটি আজও পর্যন্ত এদেশে সুপরিচিত। জমিদার শাসকগণ এই সব পাহারারত বংশগত কর্মচারীদের প্রধানরূপে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভার এই দারোগা আখ্যায় ভূষিত এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করতেন। এই সব দারোগা দলবলসহ যে স্থানে বাস করতেন তাকে বলা হতো থানা। হিন্দীভাষী অঞ্চলে দারোগাকে বলা হতো থানাদার। এই পদটিও বহুদিন পর্যন্ত বংশগতভাবে চলে এসেছে এবং এঁদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রদত্ত জমিজমাকে বলা হয়েছে থানাদারী। এই সব কর্মচারী অধীনস্থ লোকজনদের ভরণ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট জমিজমার নাম ছিল চাকরাণী। দারোগারা এঁরাও বহু ক্ষেত্রে বংশগতভাবে বহাল হয়ে এসেছেন।

যে সব বংশগত কর্মচারী গ্রামাঞ্চলে পাহারা দ্বারা অপরাধ-নিরোধের কার্য করেছেন তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির নাম ছিল পাইক-চৌকিদারী-চাকরাণ; এবং যে সব বংশগত কর্মচারী অপরাধ-নির্ণয়ের কাজে বহাল থাকতেন তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রদত্ত জমিজমাকে বলা হতো [illegible] চাকরাণী স্বত্ব। এ ছাড়া খোঁজী নামক এক সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট গোয়েন্দার কাজ করেছেন, জমিদার রাজা ও নবাবরা প্রায়ই অপরাধ নির্ণয়ার্থে এঁদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। যে পদচিহ্ন-বিদ্যা অধুনা বিশ্ববিখ্যাত তা এই সব অজ্ঞ লোকেরাই ভারতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। এঁরা ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্ন সংগ্রহ করে পাথর উপর জল ছড়িয়ে তার পাশে চুপ করে বসে থাকতেন এবং তার উপর দল উৎসাহী জনগণের পদচিহ্নসমূহ সযত্নে অনুসন্ধান করে প্রকৃত অপরাধীকে পাকড়াও করে দিতো। অনুরূপ কারণে ভারতে এই সব লোকেদের দ্বারা হস্ত অঙ্গুলীর ছাপ গ্রহণ রীতি সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। কেননা দুইজন মানুষের পদ বা হস্তাঙ্গুলী চিহ্ন যে এক রকম হয় না তা ভারতবাসীই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। এই কারণে সম্রাট শাজাহানের মতো সৌখীন ব্যক্তিও দস্তখতের বদলে হাতে কালি মাখিয়ে দলিল বা জরুরী পত্রে পাঞ্জার ছাপ প্রদান করতেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রাচীন পুলিশি কর্মকৃত্যের এই বংশগত উপস্বত্বভোগী প্রথা উচ্ছেদ করে শান্তি রক্ষীদের বেতন দ্বারা নিযুক্ত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই চাকরাণী প্রথার উচ্ছেদ এবং শান্তিরক্ষায় বংশগত কর্মীর বিলোপ করার সময় বহু বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের চুয়ার (CHUAR) বিদ্রোহের মূলে ছিল এই বিক্ষোভ। পুরানো কালেক্টরীর নথিপত্রে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

বহু দারোগাসহ বিবিধ রক্ষীপুঞ্জ ও তাঁদের অধীন কর্মচারিগণ যোগ জমিদার শাসকগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এ ছাড়া রিজার্ভ পুলিশরূপে এঁরা স্বকীয় প্রাসাদ বা কাছারিসমূহে বহু পাইক, বরকন্দাজ এবং পেয়াদা বহাল রাখতেন, যাতে প্রয়োজনবোধে এই সব দারোগা, চৌকিদার, দফাদার ও ঘাটিয়ালদের সাহায্যের জন্য তাঁরা তড়িৎগতিতে অগ্রসর হতে পারেন। দ্রুত গমনাগমনের জন্য জমিদারগণ তাঁদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বহু দ্রুতগামী ছিপ-নৌকা, রণ-পা এবং অশ্ব সদাসর্বদা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অধীনে প্রস্তুত রাখতেন। কর্দমাক্ত নদীনালাবহুল প্রান্তর ও রাজপথবিহীন গ্রামাঞ্চলে গমনাগমনের জন্য উহাদের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। এ ছাড়া কোনও এক সন্দেহমান ব্যক্তিকে ডেকে আনতে হলে পেয়াদা ও তাকে ধরে আনতে হলে পাইক পাঠানোর রীতি ছিল। অধিকন্তু প্রয়োজন-বোধে আর্মড পুলিশ বা বরকন্দাজও পাঠানো হয়েছে।

বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত হয় তার ৫নং রিপোর্ট হতে বক্তব্য বিষয় ভাল রকম বোঝা যাবে। এই সম্পর্কে ঐ রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এই সময় জমিদার শাসকগণ আপন আপন জিলা বা জমিদারীর শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন। এ ছাড়া রাহাজানি, ডাকাতি, সিঁদেল চুরি অপরাধের অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্বও ছিল তাঁদের। যদি তাঁরা তাদের গ্রেপ্তার করতে বা অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করতে না পারতেন তা হলে ক্ষতিগ্রস্ত প্রজা-সাধারণ তাঁদের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারতেন। এই কারণে তৎকালীন জমিদার শাসকরা একটি বিরাট রক্ষীবাহিনী প্রতি-পালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

উপরোক্ত রিপোর্টে বর্ধমান মহারাজার জমিদারীর শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে। এই সব তথ্য হতে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। বর্ধমান জেলা সম্পর্কে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ১২ই অক্টোবর, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত পত্রটিতে এই সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। তার প্রয়োজনীয় অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো।

"বর্ধমান মহারাজার অধিকারভুক্ত এলাকা পুলিশি কার্যের জন্য কয়েকটি থানায় বিভক্ত ছিল। এই প্রতিটি থানায় একজন করে থানাদার নিযুক্ত ছিল। ইহাদের অধীনে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২৪০০ সশস্ত্র পাইক কার্যরত থাকতো। এই সকল পাইক গ্রামবাসীদের দুর্বৃত্তদের কবল হতে রক্ষা করতো এবং তৎসহ প্রয়োজনীয় ও জরুরী সংবাদসমূহ থানাদারদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত। এই সকল লোক-লস্কর ব্যতীত ১৯০০০ সশস্ত্র জমিদারী পাইক প্রয়োজনবোধে ঐ সকল পুলিশি পাইকদের সাহায্যে অগ্রসর হবার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থেকেছে।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Mr. D. T. Mc. Niele I. C. S. স্পেশাল অফিসাররূপে তৎকালীন জমিদারী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তার নিম্নোক্ত অংশ বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"দশসালা বন্দোবস্তের পূর্বের কালের ন্যায় উহার পরেও দেশের পুলিশি কার্য তথা

শান্তিরক্ষার ভার এই দেশের জমিদারদের উপরই অর্পিত আছে। এই জমিদারগণই চুরি-চামারি ও ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ-নির্ণয় এবং তা নিবারণের জন্য এখনও দায়ী আছেন। তদন্ত করে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার ভারও আজও পর্যন্ত তাঁর অধীন লোকদেরই করণীয় কার্য।"

যদিও জমিদাররাই বর্তমান কালের পুলিশ সুপার ও ম্যাজিস্ট্রেটের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন এবং প্রকাংভাবে তাঁরাই যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, তা'হলেও গ্রাম্য পঞ্চায়েং-সমূহেরও এই সব বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এই সব প্রতিষ্ঠানকে জমিদার শাসকদের সাহায্যকারী ইনিট্ মন্ত্রণা সভা বললেও অন্যায় হবে না। প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ স্বারা নির্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েং বা নিষ্কলঙ্ক জ্ঞান-প্রধানদের দ্বারা ঐ গ্রামরক্ষিগণের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। জনগণের শুভেচ্ছার উপরই এদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করেছে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সুপারিশ অনুসারে এদের এইসব চাকুরীতে বহাল করা হয়েছে।

ঐ সময়কার পুলিশ কর্মকৃত্য সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার ঐ সময়কার বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলবো। কারণ ঐ সময় পুলিশ ও বিচার একত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধের বিচারের ভার ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এবং সাংঘাতিক অপরাধের ভার সম্ভবতঃ ছিল স্থানীয় প্রধান বা জমিদারদের উপর। এই সম্পর্কে গ্রাম্য প্রধানদের বিচার মনোনীত না হলে যে কোনও প্রজা জমিদার কিংবা জমিদারের দেওয়ান বা অন্য কোনও প্রধানের নিকট আপিল দায়ের করতে পারতো। এই সকল নালিশের কার্য মৌখিক বা লিখিতভাবে করা হতো এবং এই জন্য কাহেও এক কড়ি বা পাই পয়সাও ব্যয় করতে হয়নি। শহরাঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে মুসলমান শাসনকালে বিচার কাজের জন্য একজন করে কাজী সাহেব নিযুক্ত থাকতেন। এই সব কাজী, ফৌজদার বা জমিদারদের বিচারে কোনও প্রজা অসন্তুষ্ট হলে সে অনায়াসে রাজা বা নবাব (পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেট)এর নিকট আপীল দায়ের করতে পেরেছে। এতদ্ব্যতীত সক্ষম হলে তাদের জমিদার, ফৌজদার, রাজা বা নবাবের বিচারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এসে বাদশা বা সম্রাটের নিকট অভিযোগ দায়ের করারও বাধা ছিল না।

প্রয়োজনবোধে অপরাধীদের সাময়িকভাবে বন্দী করে রাখবার জন্যে কাছারি ও থানায় সুগঠিত হাজত-ঘর এবং জমিদার ও রাজভবনে বৃহৎ কারাগার নির্মিত হতো। ভূমির স্বত্ব অপহরণ, বেত্রাঘাত, বেগার খাটানো, সামাজিক অপমান প্রভৃতি বিবিধ শাস্তি স্থানীয় বিচারকরা অপরাধীদের উপর বিচারের পর প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু প্রাণদণ্ড সম্ভবতঃ একমাত্র রাজা বা নবাবরা দিতে পারতেন।

পুরাতনকালে এই সব প্রধানের ওপর একাধারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল। উপরন্তু শাসন ও রাজস্ব আদায়ের ভারও এ'দের ওপর অর্পিত ছিল। এই কারণে সমাজের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল প্রচুর। এই জন্য অপরাধ-নির্ণয় ও নিরোধের কার্যে তাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। তৎকালীন বিবিধ অপরাধের স্বল্পতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ভারতের নিজস্ব শাসন ও বিচার-পদ্ধতি অনুসরণ করে যুগোপযোগী করে য়ুরোপীয় পদ্ধতির পরি-প্রেক্ষিতে বর্তমানকালীন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুলিশ কর্মকৃত্যে বহাল বংশগত রক্ষি-পুঙ্গবদের কর্তব্য কার্যে অটল থাকতে বাধ্যকর কয়েকটি প্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কারণ পথঘাটের অনুন্নত অবস্থা ও স্থানীয় দূরত্বের জন্য সবক্ষেত্রে তাঁদের করণীয় কার্যের তদারক করা সম্ভব হয়নি। এই প্রথানুযায়ী যদি কোনও গ্রামবাসীর ধনসম্পত্তি অপহৃত হতো তাহলে গ্রামরক্ষিগণই তা উদ্ধার করে আনতে বাধ্য ছিলেন। অন্যথায় তাঁকে সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণস্বরূপ জমি-জমার আয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করতে হতো। যদি অপহৃত অংশের কিয়দংশ গ্রামরক্ষী উদ্ধার করে আনতে পারতেন তা'হলে সম্পত্তির বাকি অংশের জন্য তাঁকে ক্ষতি-পূরণ করতে হোত। এই রকম পরিস্থিতিতে গ্রামরক্ষীকেও আপন ধনসম্পত্তির আয় হতে বহু উপরক্ষী নিযুক্ত করতে তো হয়েছেই, উপরন্তু তাঁদের অপরাধ নির্ণয় ও অপরাধ নিরোধের জন্য বিবিধ উদ্ভাবনী শক্তিরও উন্মেষ ঘটাতে হয়েছে। কোনও এক স্থানে অপরাধ ব্যাপক আকার ধারণ করলে এই সব গ্রামরক্ষীকে কয়েদ করে তাঁদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার রীতি ছিল। এই সব কারণে প্রাচীন বাংলায় ও ভারতে ঐ সময়কার উপযোগী এক সুগঠিত পুলিশ কর্মকৃত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠেছিল।

গ্রাম্য পাহারা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার নগর রক্ষার ব্যবস্থার কথা বলবো। প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে নগর রক্ষার জন্য নগররক্ষী বাহিনীরূপ একদল রক্ষীকুল বহাল ছিল। হিন্দু রাজত্বকালে এই নগররক্ষী বাহিনীর প্রধানকে বলা হতো কোটাল। ভারতীয় প্রাচীন উপকথাসমূহ পাঠে জানা যায় যে, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র একত্রে মেলামেশা করতো। তা থেকে বুঝা যায় যে, মন্ত্রীর পরেই রাষ্ট্রে কোটালের স্থান ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে নগর-রক্ষীর প্রধানকে বলা হতো কোতোয়াল এবং তাঁর প্রধান ঘাঁটিকে বলা হতো কোতোয়ালী। পূর্বকালে যে সব রক্ষী প্রাসাদ, ধর্মমন্দির, অস্ত্রাগার, রাজ-ভাণ্ডার প্রভৃতিতে মোতায়েন থাকতেন তাঁদের বলা হতো সান্ত্রী। সাধারণ রক্ষিগণ নগর-প্রাচীর ও নগরের রাজপথে অপরাধ নিরোধার্থে পাহারা দিতেন।

"স্ত্রীকে ছেড়ে কেমন করে দিন কাটছে?"
"অনেক শান্তায়!"

কুমার-কুমারী

(২১৭ পৃষ্ঠের পর)

আমরা কেউ অসম্ভব স্বপ্ন দেখিনে, অসম্ভব আশা করেনি। এ অতি বাস্তবের রাজ্য।'

বললাম, 'তাই নাকি !'

বিজয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এখানেও কাজের ফাঁকে, কি কাজে ফাঁকি দিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে আমরা মাঝে মাঝে দাঁড়াই। কত লোক যায়, কত লোক আসে। কত ঢেউ উঠে, কত ঢেউ পড়ে। কিন্তু সে দিন যে কথা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল তা আর ফের সুরু করা হয় না।'

জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন হয় না!'

বিজয়বাবু বললেন 'কি করে হবে। বয়স হয়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, চুলে পাক ধরেছে যে, এখন হঠাৎ কিছু করা তো ভালো, বারও সাহস নেই। এতকাল আইবুড়ো থেকে সুমিতার মত মেয়ে কি সাধারণ একজন সেলসম্যানকে বিয়ে করতে পারে! লোকে ছি ছি করবে যে, আর আমি স্বামী হতে পারলাম না সেই দুঃখে কেন কোন মেয়ের চাকর হয়ে থাকব। হোলোইবা সে যশস্বিনী। আমার অন্তরাত্মা যে অনুক্ষণ ধিক্কার দেবে। তার চেয়ে যে চাকরি করছি তা অনেক ভালো। আমি কলম সারাই আর আপনি সেই কলমে লেখেন। যে যার কাজ, যে যার সমাজ নিয়ে বেশ আছি। তবু এই যে একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-সলাপ হয় এও কি কম! এই চায়ের টেবিলের বন্ধুত্বের চেয়ে আর বেশি কিছু আশা করতে নেই।'

রেষ্টুরেণ্টের বয় এসে দাঁড়াতে বিজয়বাবু জোর করে চা টোস্টের দাম চুকিয়ে দিলেন। আমাকে কিছুতেই দিতে দিলেন না।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ধারা স্নান   অজিত মিত্র

পূজারিণী

ভারতীয় সঙ্গীতে দর্শন

শ্রী হীরেন বসু

এই প্রবন্ধে আমি সঙ্গীতের ইতিহাস বা তার ক্রমবিকাশ কিভাবে হলো বা কি করে সঙ্গীত লোকজনপ্রিয় হয়ে উঠলো তার আলোচনা হয়ত করবো না—তার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য সঙ্গীত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে কি সম্ভার নিয়ে আসে, মানুষকে তার আত্মিক পরিচয়ে কিভাবে সাহায্য করে। প্রতি মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গীতের বিধানের মাঝে কেমন করে তাকে বেঁধে রাখে।

বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত যেমন সঙ্গীত গানে, সুরে, কাব্যে, গাথায় প্রকাশিত হয়ে এসেছে তেমনি সে চিরপ্রবাহিত প্রতি মানব আত্মার জন্ম দিয়েছে; তার জীবনী নিষ্কাম এবং তার অন্তিম সংগীতে। এইটুকুই যে কিভাবে বিজড়িত প্রতি অন্তর অনুভূতে তাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

সংগীতজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যিনি বেদের প্রকাশক বলেই কথিত, লিখেছেন—

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি॥

আমাদের মুখ্যাতি সংগীতজ্ঞ এ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন যে, যিনি শ্রুতি, জাতি, তাল সম্বন্ধে বেশ বীণা বাজাতে জানেন তিনি বিনাই মোক্ষ লাভ করেন—কিন্তু কি এই বীণা বাজালেই মোক্ষ লাভ হয়? এটি আজ প্রশ্ন উঠাতে হবে। ঋষির উক্তি আক্ষরিক অর্থে বলে পরিত্যাগ করি আমরা, কিন্তু কি যে বীণা, কি যে শ্রুতি, কি যে তার তাল বা ছন্দ বা জাতি এ নিয়ে বিশ্লেষণ করার হয়ত প্রয়োজন আছে। আজ পর্যন্ত তথাকথিত সঙ্গীতজ্ঞরা পৌঁছান নি বলেই এই শ্লোকের মর্মার্থ গ্রহণ করতে না পেরে আক্ষরিক অর্থের পর্যায়ে থেমে রয়েছেন। আবার সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব হঠাৎ এক স্থানে লিখে গেছেন—

বংশবীণা শরীরাণি [illegible]।
ললিতো মধুরঃ স্নিগ্ধস্তেষু বংশঃ প্রশস্যতে॥
বংশবীণা শরীরাণাং একো হ্যন্যো যো ধ্বনিঃ।
তত্র রক্তি বিশেষস্য প্রমাণং বিদুষো বিদুঃ॥

মানে, বংশী, বীণা, শরীর এই তিনই স্বরের হেতু। কেন? এতদ্ব্যতীত কি স্বরের হেতু আর কিছুই পৃথিবীতে নেই? তারপর বলছেন—"এদের মধ্যে ললিতো, মধুর, স্নিগ্ধতায় বংশীই প্রশংসনীয়। কেন? অন্য কোন কি যন্ত্র নেই যা এই তিনগুণের বেশী প্রশংসনীয়? আবার বলছেন—বংশীধ্বনি, বীণাধ্বনি ও কণ্ঠধ্বনি, এই তিনের একত্র সমন্বয়ে যে ধ্বনি তা বিশিষ্ট রূপরক্তিপ্রদ।" রূপরক্তিপ্রদ অর্থে কি বুঝায়—আর কেনই বা এ তিনের সমন্বয়ে ঘটে তা? এর পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না। অথচ যাঁরা লিখে গেছেন তাঁরা ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। তাঁদের এ বিষয় কেন ভুলই হতে পারে বলে আমাদের মনে হওয়া উচিত নয়। কাজেই এঁদের কথার মাঝে যে দার্শনিক অর্থ লুকিয়ে রয়েছে তারই বিশেষ করে আলোচনা করাই হচ্ছে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সংগীত অর্থে আমরা বুঝি "তৌর্য" সমষ্টি। যথা—গান-বাজনা (তাল) ও নৃত্য (তৌর্যত্রিক)। সংগীত অর্থে আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে বলা যেতে পারে, যে গীত সারা অঙ্গে ধ্বনিকম্পনের সৃষ্টি করে তাকেই সংগীত বলা হয়। সে কণ্ঠেই গীত হোক বা সুরেই গীত হোক। এই যৌগ বিশ্লেষণে যেমন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বোঝায় তেমনি একই অঙ্গের অনেক সমন্বিত সুরের অর্থই বুঝিয়ে দেয়। তাই সে মানবাত্মার প্রথম প্রণব। (প্রণব অর্থে Resonance of one's self.)

সংগীত আবার দু-পর্যায় বিভক্ত; মার্গী ও দেশী। পৌরাণিক সংগীতাংশে আমরা যথারীতি পাই যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চতুর্বেদ হতে এই মার্গ-সংগীতের সঙ্কলন করেন এবং আচার্য ভরত প্রতি-জীবনের মাঝে জীবন-সংগীত-রূপে তাকে ব্যবহৃত করেন। মার্গ বা মার্গী মানে পথ অর্থাৎ যে সংগীত পথ প্রদর্শক। আধ্যাত্মিক জীবনের পূজা-পাঠ, প্রার্থনায় তাই আমরা মার্গ-সংগীতের পরিচয় পাই—এর অপর নাম "অভ্যুদয়িক" এই অভ্যুদয়িক অর্থে বুঝি যে যে সংগীত নিজের নিজস্ব অন্তর্নিহিত সত্তার পথ প্রদর্শক। এই মার্গী আজ আমাদের Classic Music পর্যায় পর্যবসিত যার নাম ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি। দেশী অর্থাৎ দেশজ যা বিভিন্ন দেশ হতে উদ্ভূত। আরও স্পষ্টতর করে বলা যায় যে, সংগীতের বিশিষ্টতা শুধু বিশিষ্ট স্থান বা দেশ হতেই পাওয়া। এখন যদি অন্তর্নিহিত লুকানো পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে এক-কথায় বলতে পারা যায় যে, যে সংগীত নিজস্ব অন্তর্নিহিত সত্তার পথ প্রদর্শক-রূপে মানুষের মাঝে, স্তরে স্তরে উঠে প্রতি স্তরের বা দেশের বা স্থানের বিশিষ্টতা নিয়ে প্রকাশিত তাকেই মার্গী ও দেশী বলা হয়। একটি প্রদর্শক অপরটি পরিবেশক। একটি রাগ-রাগিণীর পরিচায়ক ও অপরটি পরিবেশযুক্ত বর্ণ ছটায় তাকে অলংকৃত করে। যদি মানব-দেহের পরিসীমার মাঝে এ দুটিকে যুক্ত করা যায়, তাহলে অনায়াসেই এখন বলা যায় যে, মার্গ আনে জ্ঞান এবং দেশী দেয় বিজ্ঞান। মার্গ আত্মিক বিকাশের মহাজ্ঞান এবং দেশী সেই প্রকাশকে স্তরে স্তরে নিজের সপ্তবর্ণী রঙে বিচিত্র করে তোলে।

আমাদের দেহকে ঋজুতা থেকে রক্ষা করছে আমাদের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডই মানুষের সর্বাপেক্ষা সবল শক্তি। যোগিগণের মতে মেরু-দণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুটি স্নায়ু-বীয় শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নীচে কুণ্ডলিনীর আধারভূত পদ্ম (Centre) অবস্থিত। ঋষিরা এটিকে ত্রিকোণাকার বলেই মত প্রকাশ করেন। নীচের দিকে এই নালীর মুখ বন্ধ থাকে। এরই নিকটে ও স্তরে স্তরে কয়টি দেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacrel plexus) আছে। এই দেশজ স্নায়ুজাল কেন্দ্র কটিকে Physiology-তে plexus বলে বা Centre বলে। আমাদের স্নায়ু মধ্যে দুটি প্রবাহ চলছে, একটি বহির-মুখী, অপরটি অন্তর্মুখী। একটি জ্ঞানাত্মক অপরটি গত্যাত্মক। একটি কেন্দ্রাভিমুখী যা আমরা সংগীতে মার্গী বলি অপরটি কেন্দ্রাপসারী যা কেন্দ্র হতে কেন্দ্র পর্যন্ত বিচরণ করে অর্থাৎ দেশী। একটি মস্তিষ্কে সংবাদ প্রদর্শক অপরটি মস্তিষ্ক থেকে সেই সংবাদ বহন করে যা সমভাবে কেন্দ্র হতে কেন্দ্রে প্রচার করে। এই দেশজ প্রচার-কেন্দ্র মাত্র ৭টি। সর্বনিম্নে কুণ্ডলিনী আধারভূত পদ্মের উপরেই যেটি স্থিত তার নাম মূলাধার ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে মণিপুর পরে অনাহত। বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং মস্তিষ্কে সহস্রার (Thousand petalled lotus). কিন্তু মূলতঃ মূলাধার মণিপুর ও সহস্রারকেই ত্রিকেন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়। প্রদর্শক মার্গ মানবদেহে যখন উচ্চারিত হয় তখন সে তার আত্মিক সত্তাকে পথ দেখিয়ে কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং সে বিশিষ্ট কেন্দ্রের পরিবেশে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হয়ে বিশিষ্ট বর্ণে বিচিত্রিত হয়ে সহস্রার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। এই উপস্থিতিতে মানুষ কোথায় গিয়ে পৌঁছান তা পরে আলোচ্য।

সংগীতের মাঝে যেমন আছে ত্রয়ী তেমনি সুরের মাঝেও আছে ত্রয়ী জড়িয়ে। কারণ সুরের আদি অধ্যায় যে-কোন সুরকেই "সা" বা ষড়জ বলা যেতে পারে। এই "সা"-ই হচ্ছে সুরের আদ্যবর্ণ এবং মধ্যম হচ্ছে এর অন্তবর্ণ। মাঝে লুকিয়ে আছেন গান্ধার। এই তিনটির সমন্বয়েই তিন গ্রামের সৃষ্টি। বায়ু পুরাণে লিখেছেন যে, গান্ধার গ্রামে মর্ত্যবাসীর অধিকার নেই। এটা নাকি গন্ধর্ব লোকের জন্যই অনির্দিষ্ট। বায়ু পুরাণের এই লুকানো গ্রামটিকে নিয়ে আলোচনার পূর্বেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি প্রাথমিক স্বর বা শব্দের উপর যা আমাদের শাস্ত্রে প্রণব বলে কথিত আছে।

শিশুও তার জন্মেই বিনা সহযোগে "ওয়া" বলে চীৎকার করতে পারে। এবং যদি তার সেই স্বরকে হঠাৎ মুখবন্ধ করিয়ে বন্ধ করা যায় তবে শেষ হয় এক "আম্" ধ্বনিতে। কিন্তু এই প্রথম স্বর "অ" ও শেষ স্বর "অম্"-এর মাঝে লুকিয়ে থাকে "উ" যা মাত্র পূর্ণ উচ্চারণেই প্রকাশ পায়। অতএব সব-গুলির যোগফলে ধ্বনিত হয় "অউম"। এই অউমকেই আমাদের শাস্ত্র প্রাথমিক শব্দ বলেছেন; এরই অপর নাম প্রণব। অ এবং ম্-এর মাঝে যেমন "উ" লুপ্ত তেমনি সা ও মা-এর

মাঝে "গা" লুপ্ত হয়েই থাকে এবং এই 'গা'য়ের মাঝে লুকিয়ে থাকে এক চতুর্মুখী প্রকাশ যার সন্ধান না পেলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সৃষ্টি। সবটাই এই গান্ধার গ্রামের মাঝে লুকিয়ে আছে। মর্ত্যবাসী মানে যাঁরা সংসার বুদ্ধি ও ব্যবসা বুদ্ধিতে নিজেদের খুইয়ে বসেছেন তাঁদের কাছে এ গ্রামের পরিচয় নাই কিন্তু যাঁরা এই লুকানো ধ্বনিকে অনুসরণ করতে পারেন তাঁরা হয়ে যান গন্ধর্বলোকবাসী মানে যাঁদের (finer sense) সূক্ষ্মানুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি।

এইবার উদ্ভূত শব্দের উৎপত্তির পরিচয় দিতে চাই। যখনই কোন শব্দ উচ্চারিত হয় তখনই আমরা যতখানি বায়ু অন্তস্থলে গ্রহণ করি ঠিক ততখানি বায়ুই বাহিরে প্রক্ষেপ করি তবেই একটি শব্দ উচ্চারিত হয়। কাজেই শব্দ-উৎস, বায়ুর আক্ষেপ ও প্রক্ষেপ নিয়ে আবার ত্রয়ীর সৃষ্টি রচনা হলো। যদি কোন তারের যন্ত্রের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায় তাহলেও দেখা যায় যে, তার প্রাথমিক অবস্থা (static) শিবত্ব, দ্বিতীয় প্রসারণ তারপর আকুঞ্চিত হয়ে নিজের নিজস্ব স্থান পরিক্রম করে প্রসারিত হয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই তিনটি স্থানের মাঝে কোথায় যেন গান্ধার গ্রামেরই মত কি লুকিয়ে রয়েছে। সেইটুকু বিশ্লেষণ করা প্রথম দরকার। তৃতীয় স্থানের পূর্বে যে সে অকুঞ্চিত হয় প্রাথমিক উৎসে ফিরে এসে তবে প্রসারণের তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তার অর্থ তিনটি প্রকৃষ্ট ও বিশিষ্ট স্থানের অবস্থানের মাঝে একটি অর্ধকম্পন স্থিতি বিরাজ করছে। একেই বলে অর্ধ মাত্রা। অর্থাৎ ধ্বনি উৎস (১), প্রথম প্রসারণ (২), আকুঞ্চন (অর্ধপথ) ও দ্বিতীয় প্রসারণ (৩)। "অউম" উচ্চারণে এই অর্ধমাত্রার স্থিতি "ম্" বলার পর অনুনাসিক "চন্দ্রবিন্দু" শব্দে। এই অর্ধমাত্রা যেমন লুকানো অবস্থায় ওঁ-এর অন্তরে বাস করে তেমনি গান্ধার শেষ করে মধ্যমে পৌঁছিলে এর অর্ধমাত্রা থাকে কড়ি-মধ্যম বা তীব্র "মা"-তে। প্রথম সুর "সা"র জের মেটাতে আমাদের লেগে যায় সাড়ে তিন মাত্রা অর্থাৎ সা—গা—মা এবং তীব্র মধ্যম। সমান কম্পন (same vibration) রেখে একে অনুসরণ করে আবার এরই অনুকম্পিক শ্রুতিজাত পা—ধা—নি এবং তীব্র সা তখন হয়ে পড়ে এর অর্ধমাত্রা। এমনি করে গড়ে ওঠে প্রাথমিক সাড়ে তিন-মাত্রিক গ্রাম ও অনুকম্পিত সাড়ে তিনমাত্রিক গ্রাম ; যার সংযোগে সপ্তসুরের সমন্বয়।

সংস্কৃত শব্দ বিন্যাসের আদি উৎপত্তি অনুধাবন করলেও দেখা যায় এরা উঠেছে অন্তরের সাতটি কেন্দ্রকেই আশ্রয় করে। স্বরবর্ণের ন্যাসে দেখা যায় দীর্ঘ ও হ্রস্বস্বর মিলে সংখ্যায় বারটি। অ-ই-উ-ঋ-৯ হ্রস্বস্বর এবং আ-ঈ-ঊ-এ-ঐ-ও-ঔ দীর্ঘস্বর। ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুচ্ছেরও উৎপত্তি কেন্দ্রীভূত। যেমন ক-খ-গ-ঘ-ঙ এই পাঁচটি অক্ষরগুচ্ছ একই কেন্দ্র হ'তে উচ্চারিত হচ্ছে কিন্তু চ-ছ-জ-ঝ-ঞ উচ্চারণ করতে হলেই আপনাকে অপর কেন্দ্রে বায়ু সংযোগ করতেই হবে নচেৎ এগুলি উচ্চারিত হবে না। এমনি করে মেরুদণ্ডের সাতটি কেন্দ্র হতেই যেমন অক্ষরমালার জন্ম তেমনি এই সাতটি সুর সাতটি কেন্দ্র বা পদ্মকে আশ্রয় করেই বিস্তার লাভ করে এবং এক একটি সুরকে উচ্চারণ করতে হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের পাখার মতই রেচক ও পূরক আত্মপরিচয়ের দুটি পক্ষ এবং বাহিরের এই আত্মিক অহমিকাকে লুপ্ত করে', এই রেচক পূরকের পূর্ণত্ব অর্থাৎ তাদের অর্ধমাত্রা যা কুম্ভকরূপে অভিহিত হয়েছে। কুম্ভক মানে অন্তরের সম্পূর্ণ শূন্যতা (vacancy). আবার এই শূন্যতাই সৃষ্টি করে আত্মিক-চুম্বক শক্তি (self-magnetism).

এই আত্মচুম্বক শক্তি যাঁর মধ্যে যত প্রকাশ তিনি ততই অপরের শ্রদ্ধাস্পদ এবং তিনি জাগতিক লোকের কাছে পরম পুরুষ। তাঁর ইচ্ছায় ও আজ্ঞায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। লাল জবাগাছে সাদা জবাও ফোটে। এখন এই আত্ম-চুম্বকশক্তি সঙ্গীতের মধ্য থেকে কেমন করে সংকলন করা যায় ?

জগতে সর্বাপেক্ষা শক্তি পরিচায়ক হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের এতই শীঘ্র গতি যে এর গতির সঙ্গে গতি রাখতে পারে এমন শক্তি জগতে দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের মন ক্ষিপ্রতায় এর প্রচণ্ড গতিকেও হার মানিয়ে দেয় অনায়াসে। যদিও মনের গতি বৈদ্যুতিক গতি অপেক্ষা অনেক অনেকগুণ বেশী তবু বৈদ্যুতিক গতি যতোধিক ক্রিয়াশীল মানুষের মন ততোধিক নিষ্ক্রিয়। কারণ এতবড় গতিশীল মন নিয়েও মানুষ মনের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যকে পায় না। বজ্র তার বৈদ্যুতিক শক্তিতে চারিদিক উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যদিও নীচে নেমে আসে তবু মাটি ছুঁলে সে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। এর থেকে বোঝা যায় যে মনের মত গতিশীল বস্তুও কিছু না কিছুর ছোঁয়া পাচ্ছে যার জন্যে সে এত নিষ্ক্রিয়। বিদ্যুৎ যেমন মাটি স্পর্শে 'নিশ্চুম্বক' (demagnetised) মানুষের মনও তেমনি কিছুর সংস্পর্শে নিশ্চুম্বক।

সমপূরক বৈদ্যুতিক প্রবাহ-ই, (Sympathetio Electricity) হচ্ছে আধুনিক জগতের সর্বোচ্চ শক্তি; যা সৃষ্ট হয় দুইটি সজীব বৈদ্যুতিক প্রবাহের বিনিময়ে একটি নিষ্ক্রিয় শূন্য বস্তুকে চুম্বকরূপে রূপান্তরিত করে। এই শূন্যতাই কেবলমাত্র অনুপূরক শক্তিতে পরিণত হবার উপযুক্ত আধার। কিন্তু যে মুহূর্তে এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ এই শূন্য বস্তুর মধ্যে চালিত হয় সেই মুহূর্তেই তারা নিজেরাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং পূর্ণ ক্রিয়াশীল করে তোলে ঐ শূন্য বস্তুকে।

পুরাকালে মুনি ঋষিগণ আত্মচর্চায়—এমনি করেই তাঁরা তাঁদের শূন্য মনকে রেচক পূরক দুইটি বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা পূর্ণ ক্রিয়াশীল করে গড়ে তুলতেন। মানুষকে শান্ত হয়ে বসে নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করতে বহু ক্লেশ বহু আয়াস করতে হয় কিন্তু সঙ্গীত এই রেচক পূরকের দ্বারা আয়াসশূন্য হয়েই নিজের মনকে পূর্ণ ক্রিয়াশীল করতে সক্ষম হতে পারে। মনকে এই বৈদ্যুতিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করতে পারলেই আত্ম-চুম্বকশক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং অসাধ্য সাধন করবার অধিকারী হয়। এই আত্ম-চুম্বকশক্তির দ্বারা জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য হতে সুরু করে আধ্যাত্মিক মোক্ষ পর্যন্ত করায়ত্ত করা সম্ভব হয়। এবং এই শক্তি আহরণের জন্য নিজের মনকে সম্পূর্ণ শূন্যতায় ভরে তুলতে হয়।

মোহমুক্ত
সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

ভাবেই সৃষ্টি করা যায়। সুর সংযোগে পৃথিবীর যোগাযোগ সূত্র আপনা-আপনি ছিন্ন হয় এবং নিজের মনকে সম্পূর্ণ করে তোলে সমপূরক বৈদ্যুতিক শক্তি, ফলে আত্ম-চুম্বক আকর্ষণ করে পারিপার্শ্বককে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বিক্রয়কারী ক্রেতাদের মন হরণ করেন এই শূন্যতার সাহায্যে। ভিখারী ভিক্ষা আদায় করে এই শূন্যতার পরিচর্যায়। জাগতিক ভালবাসা প্রেম সবই এই শূন্যতার সৃজনের উপর নির্ভর করে। যেমন মনে করুন আপনি ভালবাসেন একটি যুবতীকে; সেই যুবতী ভালবাসেন আবার অপর পুরুষকে। আপনার ভালবাসার প্রবাহ যুবতীর মনের পূর্ণতায় আকর্ষণী হারাবেই হারাবে। অথচ যদি যুবতী—সেই পুরুষের কাছ কোন কারণে আঘাত পান এবং মনে শূন্য হয়ে পড়েন তখন আপনি অনায়াসে সেই শূন্য মনকে ভালবাসার বৈদ্যুতিক প্রবাহে পূর্ণ চুম্বকরূপে আকর্ষিত করতে পারবেন।

গায়ক ও শ্রোতার মাঝেও ঠিক এমনিতর ব্যাপার। সুরে যতখানি শূন্য গায়ক নিজেকে করবেন ততখানি শূন্যতাই শ্রোতার মনে গঠিত হবে এবং তাঁর সঙ্গীতপ্রবাহ ততখানিই শ্রোতার মন অধিকার করে বসবে ও শ্রোতার প্রশংসার্হ হবেন।

সর্বশক্তিমান বৈদ্যুতিক প্রবাহের চতুর্বর্গ প্রতাপ (Four Phase)। এই চতুর্বর্গ প্রতাপই আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি (Energy)। আমাদের শাস্ত্রও সৃষ্টিশক্তির চারিটি মুখ দেখিয়েছেন। ব্রহ্মাকে তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসনে বসিয়াছেন। তাঁর চারিটি মুখ (Four-faced) ও চারিটি হাত। এবং শুধু ব্রহ্মাই নন, যত দেবতা কর্মশক্তির পরিচায়ক প্রত্যেকেরই ৪টি করে হাত দিয়ে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কর্ম-শক্তির চতুর্বর্গ ফল হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চারিটিই হচ্ছে, কর্ম-শক্তি ও সৃজনশক্তির পূর্ণ বিকাশ। এরই নানান সঙ্গতিতেই বিভিন্ন সৃষ্টি। তাই আমাদের সঙ্গীতেও, রাগ-রাগিণী বলুন বা তাল ছন্দ বলুন এদেরও চারিটি প্রকাশ। সুরে—বাদি, বিবাদি, সমবাদি ও

(ইহার পর ২৫১ পৃষ্ঠায়)

ডাঃ উমেশ রায়ের

পাগলের মহৌষধ

বিগত ৮৬ বৎসর ভারত ও বহির্ভারতে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা ও সর্বরকমের মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির অমোঘ ও অভ্রান্ত মহৌষধ হিসাবে বিচক্ষণ চিকিৎসাবিদ্ দ্বারা অনুমোদিত ও পরীক্ষিত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে বা পৃথিবীর অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত ইহার সমকক্ষ উন্মাদ রোগের নিরাময় আর কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া চিকিৎসা জগতের বহু মনীষী বিশ্বাস করেন।

গত ৮৬ বৎসরের অর্জিত বহু প্রশংসাপত্র ও বহু রোগমুক্ত ব্যক্তির আশীর্বাণী 'রয়াপিলা'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার—কুইনাইন, ডায়েবিটিসের—ইনসুলিন ও বহু দুরারোগ্য রোগে—পেনিসিলিন ও মকরধ্বজের মতই সুচিকিৎসকের হাতে 'রয়াপিলা' অনুরূপ কাজ করে।

বিস্তারিত বিবরণী পুস্তিকার জন্য লিখুন:—

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

রাসায়নিক কার্যকারক

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রকাশিত বঙ্গভাষায় লিখিত কয়েকখানা গ্রন্থ

পাতঞ্জল যোগদর্শন ৯৲
বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ (২য় খণ্ড) (আশু শাস্ত্রী) ১০৲
বৈষ্ণব-দর্শনে জীববাদ (শ্রীশচন্দ্র) ৩৲
উপনিষদের আলো (মহেন্দ্র সরকার) ৩৷৷৹
গীতার বাণী (অনিলবরণ রায়) ২৲
বাঙ্গালীর পূজা-পার্বণ (অমরেন্দ্র রায়) ৪৲
বাংলার বাউল (ক্ষিতিমোহন সেন) ২৲
রামদাস ও শিবাজী (চারুচন্দ্র দত্ত) ৪৲
শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (বিমানবিহারী মজুমদার) ৭৷৷৹
বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী) ৭৲
বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (সুনীতি চট্টোঃ) ৩৲
ভারতীয় সভ্যতা (ব্রজসুন্দর রায়) ১৲
নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস (কল্যাণী মল্লিক) ১৫৲
সাহিত্যে নারী—স্রষ্টী ও সৃষ্টি (অনুরূপা দেবী) ৬৲
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (রবীন্দ্রনাথ) ৷৷৹
শিক্ষার বিকিরণ (রবীন্দ্রনাথ) ৷৹
বাংলার ভাস্কর্য (কল্যাণ গাঙ্গোঃ) ২৲
কালীপূজা-চিত্রাবলী (চৈতন্যদেব চট্টোঃ) ১৷৹
দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী (চৈতন্যদেব চট্টোঃ) ১৷৹
কৃষি-বিজ্ঞান (২য় ভাগ) (রাজেশ্বর) ১০৲
ভারতীয় বনৌষধি (সচিত্র) (কালীপদ) ১ম খণ্ড—১০৲, ২য় খণ্ড—৬৲, ৩য় খণ্ড—৬৲
শারীর-বিদ্যা (Physiology) (রুদ্রেন্দ্র পাল) ১২৲
বঙ্গ-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি (অমরেন্দ্র রায়) ৩৷৷৹
বাংলা নাটক (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) ৫৲
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তমোনাশ দাশগুপ্ত) ১২৲
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা (তমোনাশ দাশগুপ্ত) ৭৷৷৹
বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (সুকুমার) ২৷৷৹
বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচয় (২ খণ্ডে) (দীনেশচন্দ্র সেন) ১৬৷৹
বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (অমূল্যধন) ৪৲
প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য (শিবরতন মিত্র) ৩৲
বঙ্কিম-পরিচয় (অমরেন্দ্র রায়) ৷৷৹
গিরিশচন্দ্র (হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত) ২৷৹
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (মন্মথমোহন বসু) ৭৲
পটুয়াসঙ্গীত (গুরুসদয় দত্ত) ১৷৷৹
চারাদর্শ (মনসুরউদ্দীন) ২৷৷৹
বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) ২৲
সাংগীতিকী (দিলীপকুমার রায়) ২৲

• কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে "সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—১৯" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

অল্প পুঁজিতে লাভের ব্যবসা

মাত্র ৪০০৲ বিনিয়োগে

আপনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সোডা ওয়াটার প্রস্তুতের কারখানা করিতে পারেন এবং ইহা হইতে মাসে ১০০৲।১৫০৲ আয় করিতে পারেন।

এক ডজন সোডা ওয়াটার করিতে খরচ হয় মাত্র ৵০ আনা।

বিনা খরচে শেখান হয়

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন:—

•

এসেন্স এণ্ড বটল সাপ্লাই (ইং) লিঃ

১৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১

আপনার প্রয়োজনীয়

জয়েণ্ট, টী, অ্যাঙ্গেল, প্লেট, ফ্ল্যাট, রড, ঢালাই লোহার রেলিং, পাইপ, গ্রিল, কোলাপসিবল গেট, স্যানিটারী ফিটিং প্রভৃতির খোঁজ করুন—

টি, ডি, কুমার এণ্ড ব্রাদার্স

—লিমিটেড—

টাটা ইস্কো ডিলার্স ও
প্রকিন্ধ লোহ এবং ইস্পাত বিক্রেতা

২০।১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

অফিস ফোন: ৩৩-২৯০৬
মেটেল ইয়ার্ড হাওড়া ১৩৭২

তার—"আয়রণ জয়েণ্ট"
কলিকাতা

হাসপাতালে

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই যেতে হল সরলাকে। মায়েদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল মাতৃসদনে।

তিনটি মেয়েকে জন্ম দিয়েছে সরলা—তিনটিতেই প্রায় বিনা কষ্টে। কে জানে এবার কি দাঁড়াবে হাল কোন দেবতা-দানব পেটে এল, অল্প অল্প প্রসব বেদনার সঙ্গে এমন কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিল যে, ডাক্তার সরাসরি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা দিল।

বাড়ীতে রীতিমত বিপদের আশঙ্কা আছে।

প্রথমে সরলা ভয়ে ভাবনায় একটু দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে বড় হল ঘরটিতে কয়েকজন নতুন-মা ও হবু-মার মধ্যে ঠাঁই পাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে সে সামলে নিতে পারে।

সরলা চিরদিন খুব মিশুকে। বেড ছেড়ে নামা বারণ—নিজের বেডে শুয়ে-বসেই সে কাছাকাছি বেডের অধিকারিণীদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়।

এ পাশের বেডে প্রায় তার সমবয়সী এবং প্রায় তারই মত সেকেলে চারটি সন্তানের মা প্রভাকে তার ভাল লাগে না।

তার মুখে কেবল নিজের দুঃখ দুর্দশার গাউনি। এতগুলি নতুন-মা আর হবু-মার একমাত্র তারই যেন মন্দ কপাল।

ও পাশের বেডে অল্পবয়সী মণিমালাকে তার খুব পছন্দ হয়।

তিন দিন আগে মণিমালার একটি মেয়ে হয়েছে। যতই স্মার্ট আর একেলে মেয়ে হোক, প্রথম কচি মেয়েটাকে নিয়ে কী বিব্রতই সে হয়ে পড়েছিল—জগৎ-জোড়া জীবনের খেলা চালিয়ে যাওয়ার কাণ্ড-কারখানায় আনাড়ি অবুঝ খেলোয়াড়নীর মত প্রথম জড়িয়ে পড়ে।

অল্প অল্প প্রসব বেদনা নিয়ে সরলা তাকে তিন দিন ধরেই দেখছে, দেখায় হাতে-নাতে শেখায় কি করে কচি বাচ্চা সামলাতে হয়।

বেড ছেড়ে নামার নিষেধাজ্ঞাটা বার বার অবহেলা করে।

একদিনেই যেন ভাব জমে যায় কাঁচা ও পাকা দুটি মায়ের মধ্যে।

তৃতীয় দিন বিকালের দিকে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে সুরু করে সরলা। বেদনা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে, কিন্তু তিনবারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে এ বেদনাকে যেন প্রসব বেদনা বলে সরলা চিনতেই পারে না।

স্ট্রেচারে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রসবাগারে। রাত দশটায় সে জ্ঞান হারায়। বাচ্চাটাকে কেটে বার করার সম্ভাবনার কথা দু-একবার উঁকি দিয়ে যায় ডিউটিরত ডাক্তারের মনে।

কিন্তু রাত একটা নাগাদ যন্ত্র দিয়ে টেনে বার করা সম্ভব হয় সরলার ছেলেটাকে। আধ ঘণ্টা পরে তাকে ও বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বেডে।

অন্য হবু-মায়েদের প্রসবাগারে নিয়ে যাওয়া বিষম রকম জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্যকার ব্যাপার। প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় যেন জোড়া-তালি দেওয়া ব্যবস্থা, কোন রকমে কাজ চালিয়ে যাওয়া।

ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে আসতে সুরু হয়। সুগভীর বেদনার চেতনাহীন অতল গহ্বর থেকে সরলা উঠে আসতে থাকে নবতম মাতৃত্বের চেতনা ও অনুভূতির স্তরে।

ভাল করে জ্ঞান ফিরে আসার আগেই সরলা টের পায়, তার বিছানায় বাচ্চাটা কাঁদছে না, নড়ছে না।

বৈদ্যুতিক শক্ লাগার মতই অনুভূতিটা যেন দু'চার মিনিটের মধ্যে তার সমগ্র চেতনাকে টনটনে করে তোলে।

কি করা যায়? ডাক্তার বা নার্স কেউ কাছে নেই। সরলা মাথা তুলবার, উঠে বসবার চেষ্টা করে, ক্ষমতায় কুলোয় না।

কি করা যায়?

নজর পড়ে পাশের বেডে ঘুমন্ত মণিমালার দিকে।

সরলা ক্ষীণস্বরে তাকে ডাকে। তারপর মাথার বালিশটা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু নরম বালিশের ঘায়ে কি ঘুম ভাঙে প্রথম বিয়োনী কাঁচা-বয়সী মা'র? সরলা অগত্যা কাঁচের গেলাসটাই ছুঁড়ে মারে।

একেবারে মাথায় গিয়ে লাগে গেলাসটা, মেঝেতে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অস্ফুট আর্তনাদ করে মণিমালা—ধড়মড় করে উঠে বসে।

সরলা ক্ষীণস্বরে বলে, বাচ্চাটা কাঁদছেও না, নড়ছেও না। মরে গেছে নাকি দেখবে একবার?

কাঁচের গেলাসের আঘাতে সিঁথির পিছন দিকটা জখম হয়েছিল—মণিমালা এদিকে পিছন ফিরে ঘুমোচ্ছিল। ঘন কালো চুলের নীচে চাপা পড়ে যায় তাজা রক্ত। সরলা বহুদিন জানতেও পারেনি যে, গেলাস ছুঁড়ে মেরে মণিমালার মাথায় রক্তপাত ঘটিয়ে সে নবজাত সন্তানকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিল!

অতি কষ্টে হলেও মণিমালা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে, বাচ্চাটাকে কাঁদাবার এবং নড়াচড়া করাবার অভ্যস্ত প্রক্রিয়া ঘটিয়ে ব্যর্থ হয়ে নিজে গিয়ে ডেকে আনে ঘুমন্ত ডাক্তার গোস্বামীকে।

বাচ্চাটার কচি পা ফুঁড়ে পাট করে একটা ইনজেকসন দিয়ে, চটপট সেঁক ইত্যাদি আরও কয়েকটা জরুরী ব্যবস্থা করে, ডাক্তার গোস্বামী মণিমালাকে বলে, দেরী হয়ে গেছে। কি হয় দেখা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে সরলা ক্ষীণস্বরে কেঁদে ওঠায় ডাক্তার গোস্বামী ও মণিমালা দুজনেই বিব্রত বোধ করে।

কদিন ধরে কষ্ট পেয়ে আসছে, কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিল, সে বালিশ গেলাস ছুঁড়ে মেরে মণিমালাকে জাগিয়ে ডাক্তারকে সক্রিয় করিয়েছে—ডাক্তারের নীচু গলায় বলা...প্রতিটি কথা শুনে ক্ষীণ স্বরে কাঁদছে!

মেয়েদের প্রাণশক্তির চরম প্রকাশ কি সত্যই তবে মা হবার ক্ষমতায়? সাত আট দিন কষ্ট পেয়ে কয়েক ঘণ্টা জ্ঞান হারিয়ে থেকে একটা বাচ্চা বিইয়ে যেটুকু প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিল তাও বোমার চেয়ে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে পারে শুধু জ্ঞানটুকু ফিরে আসা মাত্র!

বাচ্চাটা একটু নড়েচড়ে, নিস্‌পিস্ করে। তারপর হঠাৎ ওঁয়াও ওঁয়াও করে চেঁচিয়ে ওঠে।

সেই কান্নার আওয়াজ শুনেই সরলা আবার জ্ঞান হারায়। সে যেন সজ্ঞান হয়েছিল শুধু সদ্যোজাত সন্তানটার জীবন-কান্না শোনার জন্য!

দুদিনেই সরলা অবশ্য সামলে নেয়। হেসে-খেলে অবহেলার সঙ্গে তিন তিনটে মেয়ে বিয়োনো পাকাপোক্ত মা তো! দু'একদিনের মধ্যে ছেলেকে বুকে নিয়ে বাড়ী ফেরার প্রস্তুতি সুরু করে দেয়।

হাসপাতালে ভাড়া করা বেডে ছেলে বিয়ানোর খরচ বড় বেশী চড়া!

(ইহার পর ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

নিতান্ত হাল্কা মামলা

(২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এক ভাই বারীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পল্টনে যোগ দিয়ে উত্তর-আফ্রিকায় গিয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল আমার দরকার।'

মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'তার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। আমি খালি জানতে গিয়েছিলুম, ফৌজে মহীতোষ সেন নামধারী কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল কিনা?'

মাণিক ব'লে উঠল, 'ওহো, বুঝেছি! ......তারপর কি জানতে পারলে?'

—'জানলুম, মহীতোষ সেন নিখোঁজ হ'লেও যুদ্ধে মারা পড়েনি।'

—'তারপর?'

—'ব্যাপারটা আর একটু ফলাও ক'রে বলছি শোনো। মহীতোষের কথা তুলতেই বারীন উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—'ব্যাকগার্ড'। সে ভারতের বাইরে বাঙালীর নাম ডোবাতে চেয়েছিল!' আমি বললুম—'কেন?' বারীন বললে,—'লড়াই সুরু হ'তেই সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এটা জানা যায়নি, তাই তার নাম বেরিয়েছিল নিখোঁজদের তালিকায়। তারপর সব কথা প্রকাশ পায়, তাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি চলে, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। ধরা পড়লে 'ডিজার্টার' ব'লে সামরিক আদালতে নিশ্চয়ই তার কঠিন শাস্তি হ'ত। বুঝেছ মাণিক! এতদিন পরে সেই বীরপুরুষই দুষ্টগ্রহের মত আবির্ভূত হয়েছেন বেচারা কালীবাবুর ভাগ্য-গগনে!'

—'হুঁ। ব্যাপারটা দেখছি বড়ই ঘোরালো হয়ে উঠল।'

—'সৈনিকবেশে বারীন আর অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে তোলা মহীতোষের একখানা ফটোও আমি সংগ্রহ করেছি। ভবিষ্যতে সেখানা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।'

—'বিশেষ কাজে লাগবে ব'লে মনে হয় না। ভারত আজ স্বাধীন, আর মহীতোষ ছিল ইংরেজ আমলের সেপাই। 'ডিজার্টার' ব'লে এখন কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইবে কি?'

—'বোধহয়, না। আর সেইজন্যেই তো এতদিন পরে এই কাপুরুষ আত্মপ্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে।'

—'কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েও সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা লুকোতে চায় কেন?'

—'ঠিক বলেছ। এর মধ্যে যেন কোন শয়তানির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন একথা চাপা দাও, এই আমরা কালীবাবুর বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি।'

চার

জয়ন্ত ও মাণিক সচমকে দেখলে, কালীবাবুর দরজার সামনে ছোট এক জনতা। তার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় একাধিক লাল-পাগড়ীকেও।

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, 'এখানে আবার

ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইনস্পেক্টর ভূপেন চক্রবর্তী। মেদদোষাক্রান্ত, কিন্তু দশাসই চেহারা। ভারিক্কে চালচলন, উপরিতন কর্মচারী ছাড়া দুনিয়ার আর সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কৃপালু নেত্রে। জয়ন্ত ও মাণিক তাঁকে চিনত, কারণ কোন কোন মামলার তাদের পুরাতন বন্ধু ও পরামর্শপ্রার্থী ডিটেক্টিভ ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবুর সঙ্গে ভূপেনবাবুর দেখা হওয়া গিয়েছে কয়েকবার।

তাদের দেখেই ভূপেনবাবু ব'লে উঠলেন, 'আরে, আরে, একি ব্যাপার? মড়া পড়তে না পড়তেই শকুনির টনক নড়ে?'

জয়ন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, 'মশায়ের উপমাটার অর্থ বুঝলুম না।'

—'অর্থটা কি এতই দুর্বোধ্য? হা হা হা হা! কিন্তু গোড়াতেই জেনে রাখুন মশাই, সুন্দরবাবুর মত আমিও আপনার সাহায্যপ্রার্থী নই—নিজের মামলার ভার আমি নিজেই বহন করতে পারি। আর তা ছাড়া এটা একটা মামলার মত মামলাই নয়, এ হচ্ছে নিতান্ত হাল্কা মামলা, যে কোন শিশুও এর তদ্বির করতে পারে।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কী সব বাজে বকছেন? আমরা কোন মামলার ভার নেবার জন্যে এখানে আসিনি। কালীবাবু ডেকেছেন তাই আমরা এসেছি। আমরা তাঁর বন্ধু।'

—'কালীবাবু আপনাদের ডেকেছেন? কিন্তু তিনি এখন কোথায়?'

—'কেন, তিনি কি বাড়ীতে নেই?'

—'বাড়ীতেও নেই, পৃথিবীতেও নেই।'

—'মানে?'

'কাল রাত্রে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে জয়ন্ত ও মাণিক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মন একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না এবং তাদের মৌন মুখের উপরেও ফুটে উঠল সেই মনের কথা।

ভূপেনের শিক্ষিত দৃষ্টি সে কথাটা বুঝতে ভুল করলে না। ওষ্ঠাধর টিপে মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'যা ভাবছেন, তা নয়। কালীবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।'

ততক্ষণে জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে। কালীবাবুর অভাবনীয় অপঘাতের সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকের মত তারও মন প্রথমটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরই জাগ্রত হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণধারনিশিত গোয়েন্দা-বুদ্ধি—যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে যা থাকে সর্বদাই অবিচল ও অবিভ্রান্ত। সে বেশ সহজভাবেই বললে, 'মৃতদেহ কি এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

—'না, উপরওয়ালাদের আদেশের অপেক্ষা করছি।'

—'বলেছি, কালীবাবু ছিলেন আমাদের বন্ধু। শেষবারের জন্যে একবার তাঁকে দেখতে পাব কি?'

আবার ঠোঁট টিপে একটু হেসে ভূপেনবাবু বললেন, 'এ সব জায়গায় বাইরের বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ। তবে আপনি পরিচিত ব্যক্তি, অতএব আমার আপত্তি নেই। কিন্তু

এখানেও যেন সখের গোয়েন্দাগিরি ক'রে আপনি আমার উপরে টেক্কা মারবার চেষ্টা না করেন, কারণ আমি সুন্দরবাবু নই। আমি বলছি এটা আত্মহত্যার মামলা, সব দেখে-শুনে আপনাকেও আমার কথা মানতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, তাই সই।'

ভূপেনের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মাণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সেটা হচ্ছে কালীবাবুর একাধারে বসবার ও পড়বার ঘর। আকারে বড়ই বলতে হবে। তিনদিকের দেওয়াল আড়াল ক'রে সারি সারি বইভরা আলমারি। যেদিকে দেওয়াল-ঢাকা আলমারি নেই সেইদিকে তিনটি জানলা ও ঘরে ঢোকবার জন্যে একটি মাত্র দরজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল ও তার তিনদিকে চারখানা ও একদিকে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে লেখবার 'প্যাড', দোয়াতদান, কলমদান, কাগজ চাপা, খানকয় বই ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিষ।

ঘরের এক কোণে একটা টাইপরাইটারের ছোট টেবিলের উপরে টাইপ করার যন্ত্র। জয়ন্ত জানত, সেটা হচ্ছে কালীবাবুর বাংলা টাইপ-রাইটার, তিনি নিজে ব্যবহার করতে ভালো-বাসতেন।

বড় টেবিলের একপাশে কিছু তফাতে একখানা ইজি-চেয়ার এবং তারই উপরে দেখা যাচ্ছে অর্ধশয়ান অবস্থায় হতভাগ্য কালীবাবুর মৃতদেহ। তাঁর মাথাটি বাঁ-কাঁধের উপরে লুটিয়ে পড়েছে এবং ডান রগের উপরে একটা গভীর, ভীতিকর ও রক্তাক্ত ক্ষত। মুখ ও বুকের কতক অংশের উপরে ও চেয়ারের একদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং মেঝের উপরেও রয়েছে চাপ-চাপ রক্ত। ইজি-চেয়ারের হাতলের উপরে পড়ে আছে তাঁর ডান হাতখানা এবং সেই হাতের মুষ্টির মধ্যে রয়েছে একটা রিভলভার—ট্রিগারের উপরে তখনো সংলগ্ন রয়েছে মৃতের তর্জনীটি।

কালীবাবুর চোখ দুটি খোলা এবং তাদের মধ্যে তখনো আড়ষ্ট হয়ে আছে বিস্ময়ের মত একটা ভাব— জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করবার জন্যে মৃত্যু যে এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে, তিনি তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। জয়ন্তের মনে হ'ল এ চোখ যেন আত্মঘাতীর চোখ নয়।

কিন্তু ভূপেনের তা মনে হয়নি। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, 'দেখছেন ক্ষতের চারিদিকে পোড়া দাগ? তার মানে কালীবাবু রিভলভারের নলটা একেবারে নিজের রগের উপরে রেখে টিপকল টিপে দিয়েছিলেন।'

মুখে খালি 'হুঁ' ব'লে জয়ন্ত হেঁট হয়ে প'ড়ে খরচোখে কালীবাবুর হাতটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে। তারপর বললে, 'পরশু দিন কালীবাবুর অঙ্গুষ্ঠে আর তর্জনীর উপরে বিষম চোট লেগেছিল, এখনো তার চিহ্ন জাজ্বল্যমান। কাল দেখেছিলুম আঙুলো দুটোর উপর পটি বাঁধা রয়েছে—'

ঘরের দরজার কাছ থেকে নূতন গলার আওয়াজ এল—'রিভলভারের ঘোড়া টেপবার আগে কালীবাবু নিশ্চয়ই সেটা খুলে ছু'

মুক্তি প্রতীক্ষায়
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ
এর
সশ্রদ্ধ নিবেদন

জয়দেব

PURE
HINDUSTHAN
H.D.C. LTD. CALCUTTA

সাবানের সেরা

ফেলে দিয়েছিলেন। ঐ দেখুন, ঘরের কোণে ব্যাণ্ডেজটা এখনো প'ড়ে রয়েছে।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূর্ত্তি। বয়স হবে পঁইত্রিশ-ছত্রিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মুখশ্রী বিশেষত্ববর্জ্জিত হ'লেও দেখতে মন্দ লাগে না। মাথার পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো লম্বা চুল, জোড়া ভুরু, ওষ্ঠের উপরে চার্লি-চ্যাপলিন গোঁফ। ডান গালে একটা বড় আঁচিল সহজেই চোখে পড়ে। জামাকাপড় বাবুয়ানার পরিচয় দেয়। দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসু চোখে ভূপেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

ভূপেন বললেন, "ইনি হচ্ছেন মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাসা এই বাড়ীতেই। কাল রাত এগারোটার সময়ে রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে এসে উনিই প্রথমে জানতে পারেন, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন।"

মতিলালের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূপেনের জবানীতে জয়ন্ত তার পরিচয় শ্রবণ করলে। তারপর তার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার ক'রে সে ঘরের কোণে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে তুলে নিলে পরিত্যক্ত ব্যাণ্ডেজটা।

ব্যাণ্ডেজের খানিকটা অংশ রক্তের ছোপে আরক্ত।

জয়ন্তের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ফিরে মাণিকের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "ভূপেনবাবু, আত্মহত্যার কোন কারণ আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন ?"

যেন কেল্লা ফতে করেছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ভূপেন বললেন, "পেরেছি বৈকি! এই চিঠিখানা দেখুন। এখানা ছিল বড় টেবিলটার উপরে। এই একখানা চিঠিই আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।"

সেই চিঠি—ছাপার অক্ষরে কেটে নিয়ে যা লেখা হয়েছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা কেন দেখেও দেখলে না। বললে, "আর কোন সূত্র পেয়েছেন ?"

—"পেয়েছি বৈকি, সবচেয়ে বড় সূত্র। এদিকে আসুন।" ভূপেনের মুখে মহা গাম্ভীর্য্যের ভাব।

পাঁচ

ভূপেন কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বাংলা টাইপরাইটারের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "দেখুন।"

তখনও টাইপরাইটারের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একখানা 'টাইপ' করা কাগজ। জয়ন্ত মুখ নামিয়ে পাঠ করলে :

"সধবাকে আমি বিধবা ভেবে বিবাহ করেছি—মাধবীর শাস্ত্রসম্মত স্বামী আবার ফিরে আসছে। এর পর সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এই লজ্জা ও অপমানের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে আজ আমি এই পত্র লিখেই আত্মহত্যা করব এবং এর জন্যে আর কেহ দায়ী হবে না। ইতি—

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী"

জয়ন্ত টাইপরাইটার যন্ত্রটা ধ'রে নাড়া-চাড়া ক'রে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগল। তারপর পকেট থেকে রূপোর শামুকের মত দেখতে নস্যদানটা বার ক'রে একটিপ নস্য গ্রহণ করলে।

গোড়া থেকেই মাণিক এই অতাবিক আত্মহত্যার ব্যাপারটা স্বাভাবিক ব'লে গ্রহণ করতে পারে নি। উড়োচিঠির সত্যতা সম্বন্ধে কালীবাবুর নিজেরই সন্দেহ ছিল এবং সেইজন্যেই তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সন্দেহ নিরসন না ক'রেই তিনি যে আত্মহত্যা করবেন, তাঁর প্রকৃতি একটা দুর্ব্বল ছিল না। বিশেষ কালীবাবু ছিলেন যেন জীবনজোয়ারের মূর্ত্তিমান উচ্ছ্বাস; নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আনন্দ আশ মিটিয়ে উপভোগ করবার জন্যে তাঁর চিত্তে ছিল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা; এত সহজে দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আত্মহত্যা করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তার বিশ্বাস, জয়ন্তও এই কথা জানে এবং মানে।

জয়ন্ত হঠাৎ এখন নস্য নিলে কেন? বহু মামলায় মাণিক বারংবার লক্ষ্য করেছে, স্বপক্ষে কোন মূল্যবান সূত্র পেলেই জয়ন্ত খুসি হয়ে নস্য না নিয়ে পারে না। ঐ টাইপরাইটারটা নেড়েচেড়ে সে এমন কি আনন্দজনক সূত্র আবিষ্কার করলে? কিন্তু জয়ন্তের মুখ দেখে এ প্রশ্নের কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। তার মুখ একেবারেই কালীঘাটের পটে আঁকা মূর্ত্তির মত ভাবহীন।

মুরুব্বির মত মস্তক সঞ্চালন করতে করতে ভূপেন বললেন, "কি জয়ন্তবাবু, এখন কি ভাবছেন? যা বললুম, তাই তো? কালীবাবু নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছেন—এটা হচ্ছে নিতান্ত হাল্কা মামলা !"

রূপোর নস্যদানটা পকেটস্থ ক'রে জয়ন্ত বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। এটা নিতান্ত হাল্কা মামলা।"

ভূপেন বললেন, "তাহলে এই রক্তাক্ত লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্থক খামোকা আর মেজাজ খারাপ করি কেন? বাইরে চলুন।"

—"তাই চলুন। বাইরে গিয়ে মতিবাবুর কাছ থেকে আমি দু-একটা কথা জানবার চেষ্টা করব। আশা করি ওঁর আপত্তি হবে না ?"

মতিলাল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললে, "বিলক্ষণ! আপত্তি আবার কিসের? তবে আমাকে বেশীক্ষণ ধ'রে না রাখলেই বাধিত হব, কারণ এই দুর্ঘটনার ফলে আমার ঘাড়ে পড়েছে অনেক অপ্রীতিকর কাজের ভার।"

ছয়

—"মতিবাবু, আপনি কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করছেন কতদিন ?"

—"তিন বৎসর।"

—"কালীবাবু নিজের সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার উপরে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। কেবল সাংসারিক নয়, সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন।"

—"কালীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপ্রসন্নবাবুকে আপনি চেনেন কি ?"

—"নিশ্চয়ই চিনি ! এই কালকেই তো তিনি এখানে এসে বিষম হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছিলেন।"

—"সে আবার কি ?"

—"কালীবাবুর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হয়েছিল। আমি সেখানে হাজির না থাকলে খুড়োকে তিনি নিশ্চয় মেরেই বসতেন।"

—"কেন ?"

—"কালীবাবুর অবর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তি পাবার কথা তারাপ্রসন্নবাবুরই। কিন্তু কালীবাবু সম্প্রতি উইল ক'রে সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন তাঁর সহধর্ম্মিণী মাধবী দেবীকে।"

—"সমস্ত সম্পত্তি ?"

—"এক রকম তাই বটে। তারাপ্রসন্নবাবু পাবেন কিছু কিছু মাসোহারা মাত্র। অবশ্য মাধবী দেবী ভোগ করবেন কেবল জীবনস্বত্ব—তাঁর অবর্ত্তমানে তারাপ্রসন্নবাবুরই বংশধররা সম্পত্তির মালিক হ'তে পারবেন। কিন্তু উইলের এই সর্ত্ত তারাপ্রসন্নবাবুর মনঃপূত হয়নি, আর তাই নিয়েই ঝগড়া।"

—"উইল কবে হয়েছিল ?"

—"গেল হপ্তায়, অর্থাৎ আজ থেকে ছয়দিন আগে।"

এই সময়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একজন দাসী মতিলালের সামনে এসে বললে, "মা-ঠাকরুণ আপনাকে ডাকছেন।"

মতিলাল বললে, "শুনেছেন তো, আমার তলব পড়েছে? কর্ত্তা-গিন্নী দুজনেরই আমাকে না হ'লে চলে না। বেশী বিশ্বস্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে, বেশী খাটুনি খেটে মরা।"

—"মা-ঠাকরুণ কে ?"

—"মাধবী দেবী।"

—"বেশ, আপনি আসুন, আমার আর কিছু জানবার নেই।.........না, না, আমার আর একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে। কালীবাবুর বাড়ীতে বাংলা টাইপরাইটার আছে কয়টি ?"

"একটা।"

—"বাস্, আমার কথা ফুরুলো।"

মতিলালের হন্তদন্তের মত প্রস্থান।

ভূপেন বললেন, "জয়ন্তবাবু, বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মিছে আর ফ্যাকড়া বাড়াচ্ছেন কেন? নিজের হাতে যে মরে, তাকে আর কোন সাহায্যই করা যায় না।"

জয়ন্ত রসহীন কণ্ঠে হাস্য করে বললে, "আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। এটা নিতান্তই একটা হাল্কা মামলা। তবে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন ?"

—"বলুন।"

—"আত্মহত্যার আগে কালীবাবু যে কথাগুলি 'টাইপ' করে গিয়েছিলেন, ঐ টাইপ-রাইটারেই সে কথাগুলি আর একখানা কাগজে 'টাইপ' করিয়ে আমাকে একবার দেখাতে পারেন ?"

—"এ আবার আপনার কি খেয়াল ?"

—"যথাসময়েই সব কথা বলব। বৈকালে আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।"

সাত

বৈকাল। জয়ন্ত ও মাণিক থানার ভিতরে প্রবেশ করল।

তাদের দেখেই ভূপেন টেবিল চাপড়ে ব'লে উঠলেন, "আরে জয়ন্তবাবু, আপনি এ আবার কি গোল বাধালেন ?"

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে, "ব্যাপার কি ?"

—"বড়ই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"কি বুঝতে পারছেন না ?"

—"যে টাইপরাইটারের সঙ্গে কালীবাবুর

অন্তিম স্বীকার-উক্তি সংলগ্ন ছিল, তার মধ্যে 'রিবন' বা কালির ফিতে নেই।"

—"আমি তা জানি।"

—"কেবল তাই নয়। তারপর নতুন রিবন আনিয়ে কালীবাবুর সেই স্বীকার-উক্তির 'কপি' করে দেখা গেল, সেটা 'টাইপ' করা হয়েছে অন্য কোন 'মেসিনে', কারণ আসল আর নকলের 'টাইপে'র ছাঁদ একরকম নয়।"

—"ব্যাপারটা যে এই রকম দাঁড়াবে, আমি আগেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলুম। এটা নিতান্ত হাল্‌কা মামলা।"

ভূপেন প্রায় গর্জন করে বলে উঠলেন, "কে বলে মামলাটা হাল্‌কা? মামলাটা এর মধ্যেই দস্তুরমত ভারি হয়ে উঠেছে!"

জয়ন্ত বেশ সহজভাবেই বললে, "হালকা কি ভারি জানিনা মশাই, তবে এটা যে খুনের মামলা, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

ভূপেন উত্তেজিতভাবে বললেন, "আপনি যে আরো বেশী ভারি—অর্থাৎ গুরুতর কথা বলছেন! আত্মহত্যাকেও আপনি খুন বলে চালাতে চান নাকি?"

—"ভূপেনবাবু, আমার মত আপনিও তো স্বকর্ণে শুনেছেন, কালীবাবুর একটার বেশী টাইপরাইটার ছিল না? আর স্বচক্ষেই তো দেখেছেন, তাইতেই আটকানো ছিল তাঁর স্বীকার-উক্তি? অথচ সেই টাইপরাইটারে কালির ফিতে ছিল না! আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে, আত্মহত্যার পূর্ব-মুহূর্তে নিজস্ব টাইপরাইটার থাকতেও কালীবাবু বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও ছুটে গিয়ে অন্য যন্ত্রে তাঁর স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' করে এনেছিলেন? এটা একেবারেই অসম্ভব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত আছে।"

—"দ্বিতীয় ব্যক্তি?"

—"হ্যাঁ, হত্যাকারী।"

ভূপেনের লম্ফত্যাগ ও আসনত্যাগ। সে চমকিত কণ্ঠে বললে, "কি বলছেন আপনি!"

জয়ন্ত নিজের মনেই বললে, "ঘরের মেঝে থেকে কালীবাবুর আঙুলের ব্যাণ্ডেজ তুলে নিয়ে প্রথমেই আমার চোখ খুলে যায়। কালীবাবুর ডান হাতের অংগুষ্ঠ আর তর্জনী ছিল ঐ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা। সে অবস্থায় কেউ রিভলভারের ঘোড়া টিপতে পারে না। অবশ্য কালীবাবু নিজেই পটি খুলে ঘোড়া টিপতে পারতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পটির উপরে এক ফোঁটা রক্তের দাগও লাগত না এবং তিনি তা করেনও নি। তিনি যখন গুলীবিদ্ধ হন, তাঁর আঙুলের উপরে তখন পটি বাঁধা ছিল আর সেই জন্যেই পটির উপরে ছিল রক্তের ছোপ। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের পর পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারীই যে পটিটা সরিয়ে ফেলেছিল, এতে আর কোনই সন্দেহ নেই!"

নির্বাক ভূপেন মুখব্যাদান করে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরম বিস্ময়ে।

জয়ন্ত বললে, "এই মামলার দুটো সব চেয়ে প্রমাণ হচ্ছে, রক্তাক্ত পটি আর 'রিবন'-হীন টাইপরাইটার। এই দুটো প্রমাণেই জানা যায়, ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাড়াতাড়িতে সে লক্ষ্য করতে পারেনি যে, পটির উপরে রক্তের ছোপ আছে। অন্য কোন টাইপরাইটারে আগে থাকতেই সে স্বীকার-উক্তি টাইপ করে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কালীবাবুর মেসিনে সেখানা আটকাবার সময়ে কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার মধ্যে নেই কালির ফিতে।"

ভূপেন চমৎকৃত, তখনও তাঁর মুখে নেই রা।

জয়ন্ত বললে, "এখন প্রশ্ন ওঠে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হ'তে পারে? ভূপেনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে দেখেছেন, যে-পত্রখানা কালীবাবুর তথাকথিত 'আত্মহত্যা'র হেতু, তার 'ট্রেডমার্ক'? খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, কালীবাবু নিজেও ঐ একই 'ট্রেড-মার্ক' মারা কাগজ ব্যবহার করেন। এই দেখে সন্দেহ হয়, পত্রপ্রেরক তাঁর বাড়ীতে আনাগোনা করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এ সন্দেহের বিশেষ মূল্য নেই, কারণ এরকম কাগজ বাজারে সুলভ, সুতরাং পরস্পরের সংগে অপরিচিত যে কোন ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারে। অতএব অন্য উপায়ে আমাদের হত্যাকারীর সন্ধান করতে হবে। ভূপেনবাবু, আপনি আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি?"

ভূপেন ক্ষীণস্বরে শুধোলেন, "কি?"

—"ইজি-চেয়ার আর তার উপরকার মৃত-দেহের অবস্থান?"

—"হ্যাঁ। চেয়ার আর দেহ দুইই ছিল ঘরে ঢোকবার দরজার মুখোমুখি।"

—"ঘরে দরজা ছিল একটিমাত্র। তাহ'লে?"

—"কেউ যদি ঘরে ঢুকে থাকে, তবে তাকে কালীবাবুর সুমুখ দিয়েই ঢুকতে হয়েছিল।"

—"কেউ যদি কেন ভূপেনবাবু, কেউ নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল।"

—"আপনি কি বলতে চান, খুনী যখন ঘরে ঢোকে, কালীবাবু তাকে দেখতে পেয়েছিলেন?"

—"তাইতো বলতে চাই।"

—"অথচ কালীবাবু তাকে বাধা দেননি?"

—"না, কারণ সে ছিল তাঁর পরিচিত। হ্যাঁ, অতি পরিচিত, তাই সন্দেহের অতীত। কারণ খুনী যে ঘরে ঢুকেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলী ছোঁড়েনি, সে প্রমাণও আছে। কালীবাবুর ডান রগের উপরে রিভলভারের নলচে লাগিয়ে গুলী ছোঁড়া হয়েছিল, আমরা সকলেই তা জানি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, খুনী যখন ঘরে ঢুকে কালীবাবুর খুব কাছে ডানপাশে এসে দাঁড়ায়, তখনও তিনি তাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারেননি, কেন না সে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এখন আন্দাজ করতে পারেন, কে এই ব্যক্তি?"

ভূপেন কতকটা ভাড়ীভূতের মত হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁর দেহে, মুখে ও চোখে জাগ্রত হল জীবনচাঞ্চল্য! উত্তেজিত-ভাবে বলে উঠলেন, "আলবৎ আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারি!"

—"কে সে?"

—"কালীবাবুর ভাইপো তারাপ্রসন্ন। আমি এখনি তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।"

জয়ন্ত স্মিতমুখে বললে, "হ্যাঁ, সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে কালীবাবুর উপরে সে বিষম খাপ্পা হয়ে আছে বটে। এমন অবস্থায় অনেক খুনখারাপি হতে দেখা গিয়েছে। আপনার অনুমান অসংগত নয়।"

"তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর সময় নষ্ট করি কেন? বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।"

জলদর্পণ
নীলিমা মুখোপাধ্যায়

—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল। আর একটু সবুর করলে ক্ষতি হবে না। আমার হাতে আরো কিছু কিছু প্রমাণ আছে।"

আট

ভূপেন বললে, "যা বলবার বলে ফেলুন মশাই, আমার আর তর সইছে না!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, তারাপ্রসন্নের উপরে সন্দেহ হবারই কথা। ও-বাড়ীতে তার আনাগোনা ছিল। সে জুয়াড়ী, মদ্যপ, লম্পট, বেকার—তার মত লোক সম্পত্তি হারিয়ে যে চণ্ডালে-রাগের বশবর্তী হয়ে নরহত্যা করবে, এটা কিছুই অসম্ভব নয়।"

ভূপেন বললে, "হায় হায়, গোড়া থেকেই তার উপরে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, তাহ'লে এতক্ষণে তার হাতে আমি লোহার বালা পরিয়ে দিতে পারতুম!"

—"এই বারে আর একটা কথা ভেবে দেখুন ভূপেনবাবু। ঘটনার রাত্রের কথা স্মরণ করুন। ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে। দরজার দিকে মুখ করে কালীবাবু ইজি-চেয়ারের উপরে বসে আছেন। এমন সময়ে যে তারাপ্রসন্ন খানিক আগে মারমুখো হয়ে তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে গেছে, সে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। আপনি যদি কালীবাবু হতেন, এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন?"

"উঠে তারাপ্রসন্নকে তেড়ে মারতে যেতুম, নয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম, নয়তো—"

"থাক্, ওতেই চলবে। কিন্তু কালীবাবু ও সব কিছুই করেন নি। তিনি নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারের উপরেই বসে রইলেন, আর তারা-প্রসন্ন নির্বিবাদে সুমুখ দিয়ে সোজা তাঁর ডানপাশে এসে তাকে গুলী করে স'রে পড়ল! এটা কি সম্ভবপর?"

—"উঁহু!"

—"তাহ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারাপ্রসন্ন হত্যাকারী নয়!"

ভূপেন দস্তুরমত মুসড়ে প'ড়ে বললেন, "আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! এই টেনে তোলেন আকাশে, এই ঠেলে ফেলেন পাতালে!"

(ইহার পর ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

ROPE TRICK?
Yes!
We Serve the Nation with
CARUMACO
PRODUCTS.
SHOES, HOSES
FAN BELTS
SOLES & HEELS
RICE POLISHERS
KADAR RUBBER MFG. CO. LTD.
92, NARKELDANGA MAIN ROAD, :: CALCUTTA-11.
Phone : B. B. 3590 - B. B. 2318

প্রশাখার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে উপত্যকা আর অধিত্যকা লতায়-পাতায়, ফলে-ফুলে অরণ্যের বিবিধবর্ণ পুষ্পে এবং ওষধি গাছ-গাছড়ায় তারা যেন নন্দনের অনৈসর্গিক দৃশ্য চোখের সামনে মেলে ধরেছে।

আমরা ধীরে ধীরে বনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। ঠিক কি দেখছি জানিনে, কিন্তু চুপ করে দেখছি। সৌন্দর্য অপেক্ষা মহিমার উপলব্ধি। দৃষ্টি আমাদের আবেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু দেখাটা চলছিলো মনপ্রাণ দিয়ে। চম্পকের বন যাচ্ছে পেরিয়ে, মাঝে মাঝে চকিত মৃদু সৌরভের ইসারা পেয়ে দেখতে পাচ্ছি কদম্ব বৃক্ষের শোভা, দেখতে পাচ্ছি ওরই মধ্যে রক্তরাঙ্গা শিমুলের সমারোহ। ঋতু হিসেবে এখন অসময়, কিন্তু বনলোকে নাকি প্রায়ই ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। চারিদিকে দীর্ঘ ঋজু শালপ্রাংশু—ঊর্ধ্বায়িত, গগনচুম্বী। দিনমানকে তারা রেখেছে অন্তরালে, সূর্যকে এই নিস্তব্ধ ছায়ান্ধকার গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। এদেরই মধ্যে কোথায় যেন আছে 'রঙ্গনগড়া'—সেখানকার ভূস্বর্গে নাকি অনেক শিল্পী ছবি আঁকতে যায়। সমস্ত সারান্দার বনের তুলনায় সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মানুষের দৃষ্টির সামনে নানাবর্ণের ইন্দ্রজাল রচনা করে বলেই হয়ত নাম দেওয়া হয়েছে রঙ্গনগড়া।

বোরাইকেলাতে এসে আমরা একটি পাহাড়ী তাঁবুর মধ্যে পেলুম ফরেস্ট অফিসার ও বিহারী লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহকে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Round the World-এর লেখক এবং সত্য সত্যই পৃথিবী পর্যটক। তাঁর কথা আগে আমাদের শোনা ছিল। তিনি আমাদের আসামাত্রই একটি চায়ের আসর বসালেন। তাঁর সেই সুন্দর ডাকবাংলোর তলা দিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চলে গেছে রেলপথ। এ অঞ্চলটিও প্রধানতঃ টিম্বার ব্যবসায়িগণের কেন্দ্র। আমাদের বন্ধু পরলোকগত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই এ অঞ্চলে আসতেন এবং যোগেন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে অরণ্যে ভ্রমণে বেরোতেন। বিভূতিভূষণের নানা স্মৃতিকথা নিয়ে আমাদের সেদিনের অপরাহ্নকালটি যেন দিনান্তের আকাশের মতোই বিষণ্ণ হয়ে এলো।

পরদিন পুনরায় আমরা অরণ্য অভিযানে বেরুলাম। এবার আমরা যাচ্ছি আরো নিভৃত-লোকে। সমস্তটাই পার্বত্য অরণ্যে ভরা। কোথাও তার বিশেষ ছেদ নেই। মোট তিনশো তিরিশ বর্গমাইল নিয়ে এই সারান্দার বন। দক্ষিণ আমেরিকাকে বাদ দিলে পৃথিবীর উচ্চতম শালবৃক্ষ এই সারান্দার জঙ্গলে পাওয়া যায়। এক একটি গাছ চৌদ্দ ফুট মোটা এবং একশো তিরিশ ফুট উঁচু। অনেকের কাছে শুনেছি ভারতে এমন গাছ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সমগ্র সারান্দায় নাকি মোট সাতশো ছোট বড় পাহাড় মিলিয়ে এই জগদ্বিখ্যাত শাল-শ্রেণী জন্মায়। সেজন্য এই অঞ্চলের অপর নাম হোলো 'সাতশো পাহাড়ের দেশ।'

অরণ্যের নেশা লেগেছিল আমাদের। গভীর থেকে গভীরতর অঞ্চলে আমাদের গাড়ী কখনও নামছে, কখনো উঠছে। মাঝে মাঝে কদম্ব-চম্পকের শোভা দেখছি। অত্যন্ত নিরিবিলি গহনলোকে দেখতে পাচ্ছি আম-জামের বন। ছোট ছোট মিষ্ট আম পাকলে হাতী আর বন-শুয়োর এসে খেয়ে যায়। যতগুলি পাহাড় আছে এ অঞ্চলে তার মধ্যে সর্বোচ্চ চূড়াটির নাম হোলো সারংদা বুরু। বুরু অর্থে পাহাড়, —'হো' জাতির ভাষা। এই সারংদার মালভূমির উপরে রয়েছে একটি পুষ্করিণীর মতো নাবাল-ভূমি,—সেখানে একটি দিকে বাঁধন থাকলে চমৎকার হ্রদ হতে পারতো। এই তড়াগের ধারে আসে সর্বপ্রকার বন্যজন্তুর দল। শিকারের পক্ষে খুব উপযোগী অঞ্চল। এছাড়া আরো কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। যেমন বুধ বুরু, গুয়া বুরু ইত্যাদি। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা যায় হিংস্র বাইসন্। অরণ্যে তারা ভয়াবহ জীব। পথের মাঝে মাঝে ক্বচিৎ এক আধ জন 'হো'-কে দেখতে পাচ্ছি। এরা থাকে ছোট ছোট বস্তিতে একেবারে লোকচক্ষের বাইরে। জলপাইগুড়িতে যেমন 'বাহে', কোচ-বিহারে যেমন 'কোচ'। এদের মধ্যে অনেকেই মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে খৃষ্টান হয়েছে। কেউ কেউ আবার এদের মধ্যে মুন্ডা শ্রেণীর অন্তর্গত। সারান্দার দক্ষিণ অঞ্চলে এক শ্রেণীর গোয়ালারা থাকে, ওড়িয়া হোলো তাদের ভাষা। কিন্তু মোটামুটি জনসাধারণের ভাষাটাই হোলো 'হো'।

সারান্দার মাঝামাঝি অঞ্চল পেরিয়ে জেট নামক বসতি ছাড়িয়ে আমরা 'টেবো' পাহাড়ে এসে পৌঁছলুম। বেলা মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে। এখনও আমরা যাবো অনেক দূরে। পবিত্র গাঙ্গুলী আজ তিনদিন পরে অরণ্যের স্বাদ পেয়েছে,—মনে তার আনন্দের জোয়ার এসেছে। দুর্গা প্রসাদ কলমুখর। হরেন্দ্র রস পাচ্ছেন শাল শ্রেণীর নিখুঁত চেহারায়। আমি এতক্ষণে মোটামুটি এই মহারণ্যের ব্যাস ও পরিধি অনুধাবন করতে পেরেছি, এই হোলো আমার কৌতুক। দেখতে দেখতে এক সময় নানা পার্বত্য পথ পেরিয়ে 'রোগড' নামক ডাক-বাংলোয় এসে পৌঁছলুম। এই ডাকবাংলোর তিনদিকে সুউচ্চ পাহাড় গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ। ডাকবাংলোর সামনে একটি নাতি-বৃহৎ প্রাঙ্গণ, কিন্তু তার বাইরে দিনের বেলায় পা বাড়াতেও গা ছমছম করে। বিশেষ বিশেষ কালে এই ডাকবাংলোর সামনে আসে হাতী, বাঘ, ভাল্লুক এবং সেই আদি ও অকৃত্রিম বন্যশূকর। মানুষ ছাড়া যে কোনো প্রাণীর এখানে নিত্য আনাগোনা। বনবিভাগ থেকে যাঁরা এ অঞ্চলে তদন্ত করতে আসেন, তাঁদের সকলকেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। পাগলা হাতীর ভয় আছে প্রচুর।

বাংলোর ভিতরে এসে আমরা দেখা পেলুম অন্য একজন ডেপুটি ফরেস্ট অফিসারের। তিনি হলেন শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বর্মা। তিনি সহাস্য স্বাগতমের দ্বারা আমাদের চারজনকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এমন সৌজন্য ও মিষ্টস্বভাব সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর সঙ্গে গল্প সুরু হোলো। বন্যহাতী এ অঞ্চলে প্রচুর। তারা শস্যক্ষেত্রগুলি আক্রমণ করে—যখন ধান আর ভুট্টায় পাক ধরে। অনেক সময় তারা চাষীর ঘর-বাড়ী আক্রমণ ক'রে সঞ্চিত শস্যের ভান্ডার লুট ক'রে নিয়ে যায়। বাঘ আছে অনেক, তবে নরখাদকের সংখ্যা কম।

বাইসন, সম্বর, হরিণ, শূকর—এরাও সংখ্যালঘু নয়। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে পাইথন হরিণ শিশুর লোভে। এ ছাড়া আছে সবুজ বর্ণের বিষধর সাপ।

আমরা উত্তরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। এখান থেকে দূরে দেখা যায় চক্রধরপুরের দিককার দিগন্তব্যাপী সমতলক্ষেত্র। পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা থেকে যেমন ধূসর সুদূর প্রান্তর। আমাদের এবার গন্তব্যস্থল হোলো চক্রধরপুর। কিন্তু সেখানে সন্ধ্যার আগে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

বিদায় নেবার আগে শ্রীযুক্ত বর্মা আমার হাতে কিছু উপহার দিলেন। সেই উপহারের [illegible] লোভনীয় বটে, তবে তাতে হিন্দুয়ানীর অংশ ছিল কম। বিশেষ পাখীর কথা বলছি।

মোটর আমাদের ছেড়ে চললো আবার জঙ্গলের দিকে। রাঁচী রোড ধরে আমরা যাবো চক্রধরপুরের দিকে। বেশ লাগলো বর্মা সাহেবের বাংলো। কিন্তু 'রোগড়' ছাড়াও আরো এইরূপ কয়েকটি বাংলো রয়েছে এই সারান্দায়। যেমন জামদা ষ্টেশন থেকে ষোল মাইল দূরবর্তী কুমডি। সেরাইকেলা থেকে বলকোবাদ—গহন অরণ্য লোকে। মনোহরপুর থেকে কুড়ি মাইল দূরে ছোটনাগরা। এ ছাড়া বলকোবাদের পথে তিরিলপোসি কিংবা সারান্দার সীমানাবর্তী নোয়াগাঁও। তাছাড়া সলাই ও আনকুয়া ইত্যাদি বাংলোও পাওয়া যায় এ পথে ও পথে।

দেখতে দেখতে অপরাহ্নের দিকে আমরা এসে পৌঁছলুম চক্রধরপুর রোডে। প্রশস্ত পিচঢালা মসৃণ চিক্কণ রাজপথ। পথের দুই পাশে পার্বত্য অরণ্য কিন্তু এমন রাজপথেও কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখছিনে। এটি রাঁচী যাবার পথ। কিন্তু পরন্ত বেলায় যানবাহনাদি আর বিশেষ চলে না। পথের পাশেই দেখছি হাতী 'নাদ' ফেলে গেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই পথের এপার থেকে ওপার জন্তুজানোয়ারের চলাফেরা বাড়তে থাকে।

প্রাত্যহিক জীবনধারার বাইরে যে কালটুকুতে ভ্রমণ করি, সেটি অপ্রাকৃত বিচ্ছিন্ন, কিন্তু পরিপূর্ণ। সেটির অমৃত আস্বাদ হোলো দীর্ঘস্থায়ী। দুর্গা প্রসাদ, হরেন্দ্র, গৌরীশঙ্কর, যোগেন্দ্র—এঁদের সঙ্গেই সেই আস্বাদ জড়ানো। এঁরা যদি এসে দাঁড়ায় প্রত্যহের বৈষয়িক জীবনে—তবে তাঁদের সত্য পরিচয় পাওয়া যাবে না। অমনি করে যেতে হবে অরণ্যে ওই সংশয়—আশঙ্কার মধ্যে, অমনি বেপরোয়া দিনযাত্রায়—তবেই ওদের সুপ্রকাশ। যে পথ দিয়ে মন ছোটে মোটর ছোটে সেই পথেই ওদের সঙ্গে আমার মন পড়ে রইলো। ওরা জড়িয়ে রইলো আরণ্য কল্পনায়, অন্ধকার রাত্রের ভূতের গল্পে, জ্যোৎস্নালোকিত নিঃসঙ্গ বনভূমির মায়ালোকে, কাঠুরিয়ার কুঠিবাড়ীর আগুনের আভায়। ওরা জড়িয়ে রইলো একটি বিশেষ খন্ডকালের নামহারা, পরিচয়হারা বাসাহারা জীবনে।

চক্রধরপুর ষ্টেশনে এসে যখন রাত্রে ট্রেণে উঠলুম ওরা সবাই প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু প্রখর আলোয় ওদের যেন আর চিনতে পারলুম না।

কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের
অন্ন নাহিক জুটে,
যা আছে মোদের, এনেছি সাজায়ে
জীর্ন পর্ণপুটে,
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চির দারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধুলা লুটে।
— রবীন্দ্রনাথ
সূরযমল নাগরমল
কলিকাতা।

শারদীয়ার শুভাশিস মাথায় নিয়ে ---

সবাই বলেন:

সুপ্রা কালি

পৃথিবীর সেরা

[illegible] একজন এম এস সি ফলিত রসায়নে প্রথম স্থান অধিকৃত কৃতী বৈজ্ঞানিকের ক্রমাগত ২২ বৎসরের গবেষণার ফলে সুপ্রা কালি নাকি পৃথিবীর সেরা।

ইহা ভারত সরকারের টেস্ট হাউস হইতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান ডাঃ এইচ. কে সেন, এম এ ডি আই. সি. ডি. এস সি লণ্ডন, ফলিত রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক ডাঃ শ্রী এম. এন গোস্বামী, ডাঃ ইএন, সিএইচ. (প্যারিস), প্রাণীতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যার রিডার ডাঃ শ্রী এন এন, দাশগুপ্ত পি-এইচ. ডি লণ্ডন, পাটনা বিজ্ঞান কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ শ্রী এস. কে. গুহ, ডি. এস সি এফ. আর আই. সি. লণ্ডন ও অন্যান্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত।

সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা : পাটনা . বোম্বে।

জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হয়ও, তবু পরমায়ু বেশীদিন পায় না। জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে যদি সামান্য কিছুও করা যায়, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু যে কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা নেই, তার সাফল্য যত বেশীই হোক না, তার বিশেষ মূল্য নেই। আসলে, এই কার্যসূচী হবে জনসাধারণের, তারাই একে সফল করে তুলবে এবং এর লক্ষ্যও হবে তাদের কল্যাণ।

পশ্চিমবঙ্গে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা চলছে দু' বছর। যে ফল পাওয়া গেছে তার হিসাব-নিকাশ হবে এরই পটভূমিকায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কর্মীদের আসল লক্ষ্য রয়েছে জনসাধারণের সহযোগিতা আদায় ও তাদের উৎসাহ বর্ধনের দিকে। কর্মীরা কেবলমাত্র নীতিকে আউড়েই ক্ষান্ত থাকেননি তাঁরা সেগুলো কাজে পরিণত করেও দেখিয়েছেন। গ্রামবাসীদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি মতবাদের চেয়ে হাতে-কলমে সামান্য কাজের মূল্য অনেক বেশী।

কৃষি উন্নয়ন

কৃষির ক্ষেত্রে জনসাধারণকে ক্রমান্বয়ে উন্নত ধরণের বীজ এবং কৃত্রিম ও জৈব সার ব্যবহারে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। হাতে-কলমে দেখিয়ে এদের মনে প্রত্যয় জন্মাবার পরই তারা এগুলো ব্যবহার করেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পরিকল্পনার এক বৎসরে লোকে ১৫,২৪৬ একর জমিতে ৭৬২৩ মণ উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করেছে। ৬৯,৬৭৫ মণ জৈব ও কৃত্রিম সার এবং ৪৯.১০৭ পাউণ্ড রাসায়নিক সার যথাক্রমে ৪৬,৪৫০, ৪০৯২ ও ৪০৯২ একর জমিতে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামবাসীদের ভাল কম্পোস্ট সার তৈরী করতে শেখানো হয়েছে এবং তাদের নিজের নিজেরাই তৈরী করে নিতে দেরী লাগেনি। এই ধরণের সার এ পর্যন্ত ১৭,২৫১ মণ তৈরী করে ব্যবহার করা হয়েছে। চাষের প্রণালী প্রদর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অনেকগুলি প্রদর্শনী ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে জাপানী প্রথায় ধান চাষ, সবুজ সার, কৃত্রিম সার ও উন্নত ধরণের বীজের ব্যবহার দেখানো হয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লকে চার ধরণের ৫৫০টি প্রদর্শন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা। উন্নত ধরণের চাষ ও বাগান পরিচালনার [illegible] প্রথমে লোকের আস্থা ছিল না। কিন্তু এখন এই ভাব কেটে গিয়ে তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে তারা এই সকল পন্থার গুণাগুণ পরীক্ষা করে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে এর অনুসারী হচ্ছে।

কৃষি অর্থনীতির উন্নতির জন্য আর যা করা হচ্ছে তার মধ্যে ৪৪৪৮ একর জমি উদ্ধার, স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান এবং সমবায় প্রথায় শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। চাষীরা যাতে বীজ ও সার ক্রয় এবং জল সেচের খরচ যোগাতে পারে সেই জন্যই স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে। চাষীরা এই ঋণের অপব্যবহার করেনি, যা দেওয়া হয়েছে ফসল **ওঠার পরই তা তারা পুরোপুরি শোধ করে** দিয়েছে। বনানী সৃষ্টি একটা জরুরী কাজ। ইতিমধ্যেই ২৮৪ একর ভূমিতে বনানী সৃষ্টি করা হয়েছে। পুষ্করিণীতে মাছের চাষের উন্নতি করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৭৮৭ একর পরিমিত পুকুরে এই উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। ১৯,৯৯৭টি গরু-বাছুরের আলোচ্য বৎসরে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং ১,৪৪,০১৪ গরু-বাছুর ও হাঁস-মুরগীকে টিকা ও ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে।

জল কৃষির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। পুষ্করিণী সংস্কার, ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা, পাম্প, গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা কৃষিজীবীদের যথাসম্ভব পরিমাণে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি যথোচিত লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। পল্লীবাসীদের ক্রমাগত এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে চিকিৎসার মোটা খরচ এড়াতে হলে বা যে সব রোগ প্রতিরোধ করা যায় তার আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য দিতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডিস্পেনসারী-গুলোতে এই সময়ের মধ্যে ১,২১,৭২৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে, ১৭৮৬ জন প্রসূতির পরিচর্যা করা হয়েছে, ৯৯,৬১৬ জনকে টীকা দেওয়া হয়েছে এবং ১২১৬টি বাড়ী ও কূয়া সংক্রামক রোগবীজ থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা

যদি শরীরের প্রতি নজর দেওয়া হয় তাহলে মনের প্রতিও নজর দেওয়া একান্ত দরকার। পল্লীবাসীদের গ্রহণের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক ও সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য দুটি, যথা বয়স্ক শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মসূচী প্রবর্তন দ্বারা প্রতিবেশী প্রীতির প্রসার। ৩৩৬টি সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৫১৮৬ জন লোককে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এদের পড়ার উপযোগী বইও তৈরী করা হয়েছে। লাইব্রেরী, দেখা ও শোনার মাধ্যমে শিক্ষামূলক প্রচার এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শন কিশোর ও বয়স্কদের মধ্যে শেখবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বৈষয়িক উন্নতির অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকা রাস্তাগুলো সরকার তৈরী করেন, কিন্তু পল্লীপথগুলো একেবারে নিছক পল্লীবাসীদের স্বেচ্ছাশ্রমে তৈরী। সরকার এই পথগুলোর জন্য সেতু ও কালভার্ট তৈরী করে দেন। এ পর্যন্ত ১৩ মাইল দীর্ঘ পল্লী পথের মাটি কাটা হয়েছে। পল্লীর চারুকলা ও কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে উন্নত ধরণের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অর্থ যুগিয়েছেন। পল্লী অঞ্চলে কারিগরের অভাব খুব বেশী এবং কারিগর তৈরীর জন্য একই সঙ্গে শিক্ষণ ও পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

কর্মচক্রে নিষ্পেষিত সারাটী জীবন
রিক্ততার তিক্ততায় চির ব্যর্থতায়,
মরমে মরিয়া আছে অসহ ব্যথায়,
তোমার মূরতি শুধু করিয়া স্মরণ।
হৃদয় গগনে তুমি প্রদীপ্ত তপন,
তবে কেন মোহ ফাঁদে ভুলাও মায়ায়।
রচেছি তাসের ঘর কাঁসের আশায়,
মুছে গেছে আজ সব রঙীন স্বপন।
জীবন সন্ধ্যায় প্রিয় ভাবি আনমনে,
যারে হেরি আপনার, সে তো ওরে নয়।
অতীত আঁকিয়া গেছে বিচিত্র স্বপনে,
বর্তমানে অভিনয় ছলনা—প্রণয়।
চাতুরী—কনকে যত মিথ্যা মরীচিকা,
পাথেয় ললাটে মোর তব জয়টীকা।

সামগ্রিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

প্রবন্ধের গোড়ার দিককার আলোচনা থেকে একথা সহজেই বোঝা যাবে যে, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সব চেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে পল্লীজীবনের সমস্যাগুলির সমাধান সমগ্রিকভাবে করার চেষ্টা হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা কোন ক্ষেত্রে বিখণ্ডিত নয়, কাজেই তার জীবনের সমস্ত দিকের প্রতিই একযোগে নজর দিতে হবে। সরকারী বিভিন্ন বিভাগ যখন নিজ নিজ দিক দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পল্লী-বাসীর সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে যাবে, তখন পল্লীর লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়বে, তাছাড়া, তাদের মনে কোনও স্থায়ী ছাপও পড়বে না। সরকারী কার্যকলাপ যেমন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত, একজন চাষীর জীবনযাত্রা তেমনি খণ্ডবিচ্ছিন্ন নয়। এইজন্য চাষীর জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে সামগ্রিকভাবে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক নীতি নির্ধারণকালে ভারতের বিভিন্ন অংশে পল্লী-উন্নয়ন কার্য থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, (১) যে কার্যসূচী বাইরে থেকে লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তার তুলনায় জনসাধারণের সহযোগিতায় গড়েওঠা কার্যসূচীর স্থায়ী সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশী, (২) যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ উন্নয়নমূলক কার্যসূচী নিজের বলে গ্রহণ না করবে এবং এতে তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে বলে মনে না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ কোনও ফললাভের আশা নেই, (৩) যে কার্যসূচী প্রধানতঃ সরকারের অর্থ ব্যয়ের ওপরই নির্ভরশীল এবং জনসাধারণের স্বাবলম্বন ও সহযোগিতার ভাগ যাতে খুব সামান্য, তার টিকে থাকার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নেই (৪) হাতে কলমে কাজ না দেখালে শুধু উপদেশে কাজ হবে না, (৫) **পল্লীবাসীর নিজ অভিজ্ঞতা ও সমস্যার সম্বন্ধ**

সঙ্গতি রেখেই তাকে খুব যোজাভাবে জিনিষটা বুঝিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য হবে পল্লীর জনগণের মধ্যে জীবনযাত্রার উচ্চতর মান,—ভাল ভাবে জীবনযাপনের জন্য একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার চিন্তন ও বাস্তব রূপদানে অতীতের এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়েছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা

জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার যুক্তিসংগত পরিণতি এবং এর সংগে অপরিহার্যভাবে যুক্ত। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন কার্যের ব্যাপক প্রসার, যার ফলে প্রত্যেক চাষী তার দ্বারা উপকৃত হবে এবং পল্লীজীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়নে সহায়তা হবে। ১০ বছরের মধ্যে দেশের যাতে ব্যাপক উন্নতি সম্ভব হয় তদুপযোগীভাবে জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার দেশব্যাপী প্রসার এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রামে সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বিস্তার করা হবে। এর ফলে ভারতের পল্লীবাসীদের এক চতুর্থাংশ সম্প্রসারণ ব্যবস্থার আওতায় আসবে। কৃষি সমবায়, পশু-চিকিৎসা, মৎস্য-চাষ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, যোগাযোগ, পল্লী চারুশিল্প, কারিগরি ও যন্ত্রশিল্প এই পরিকল্পনার আওতায় আসবে।

কোনও থানার প্রতি একশটা গ্রামের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার এক একটি ব্লক গড়ে তোলা হচ্ছে। এইরূপ একটা অঞ্চলের অধিবাসী-সংখ্যা হবে কমবেশী ৬৬ হাজার। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাস থেকে এই রাজ্যে এই রকম ছটা ব্লক চালু আছে এবং এই বছর ২রা অক্টোবর তারিখে আরও ১০টার উদ্বোধন হবার কথা আছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে এই রকম ৫০টা ব্লক গড়ে তোলার সংকল্প আছে। এই রকম প্রত্যেকটি ব্লক বাবদ তিন বছরে আনুমানিক সাড়ে নয় লাখ টাকা খরচ হবে। এর মধ্যে কৃষি সমবায়, পশু-চিকিৎসা ও মৎস্য-চাষ বাবদ এক লাখ টাকা, রিজার্ভ ব্যাংক মারফৎ কৃষী-জীবীদের স্বল্পমেয়াদী ঋণদানের জন্য তিন লাখ টাকা, সেচ বাবদ ৪০ হাজার টাকা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা বাবদ ৪৫ হাজার টাকা, শিক্ষা বাবদ ৪০ হাজার টাকা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বাবদ ৪৯ হাজার টাকা এবং পল্লীর চারুশিল্প, হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিল্প বাবদ খরচ হবে এক লক্ষ টাকা। সরকারী বিভিন্ন বিভাগ সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্য-কলাপ বাবদ যে অর্থ ব্যয় করে থাকে বিভিন্ন ব্যবস্থা বাবদ এই সকল ব্যয় হবে তদতিরিক্ত। এই রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাভুক্ত কোন কোন ব্লককে ভবিষ্যতে ব্যাপকতর উন্নয়নের জন্য সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্লকে রূপান্তরিত করা হবে।

এই সকল ব্লকে একজন করে ব্লক উন্নয়ন অফিসার থাকবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন একজন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, একজন সমবায় সমিতির ইনস্পেক্টার, একজন কৃষিকার্যের ইনস্পেক্টার, একজন ফিটার মেকানিক, একজন পশু চিকিৎসার এসিস্ট্যান্ট সার্জন, দুইজন পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট, একজন মেডিক্যাল অফিসার ও তাঁর দুইজন সহকারী, একজন ধাত্রী, ১০ জন সর্বার্থসাধক পল্লীকর্মী ও দুজন সামাজিক শিক্ষা সংগঠক। ব্লক উন্নয়ন অফিসারের উপর জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কার্যকরী করার ভার থাকবে। তাঁর কাজ হবে বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের কাজ কর্মের সমন্বয় সাধন করা এবং সকলকে পরস্পরের সহযোগী হিসাবে কাজ করানো। তিনি এই কার্যসূচীকে জনসাধারণের কাছে একটা সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসাবে তুলে ধরবেন। সর্বার্থসাধক পল্লী কর্মীরা সমস্ত বিভাগের সংগেই সহযোগিতায় কাজ করবেন।

জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার তিনটি ব্লক একসংগে গ্রুপ হিসেবে গণ্য হবে এবং যে সব জেলায় এই ব্লক প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে কালেক্টরের অধীনে একজন করে জিলা উন্নয়ন অফিসার থাকবেন। ইনি প্রত্যেকটি ব্লকের কাজের তত্ত্বাবধান করবেন এবং কালেক্টরের তরফ থেকে জিলার অন্যান্য উন্নয়ন কার্যের ওপরও লক্ষ্য রাখবেন।

পরিকল্পনার মূলগত নীতি

জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার নাম থেকেই বোঝা যাবে যে, উন্নয়নমূলক কাজের ক্রমাগত প্রসারই এর মৌলিক নীতি। এর ফলে, এর কল্যাণ দেশের নিভৃত কোণে অবস্থিত গ্রামবাসীর কাছেও পৌঁছুবে এবং সে এতে অংশ গ্রহণে প্রেরণা পাবে, কারণ, এর দ্বারা যে সে-ই শুধু উপকৃত হবে তা নয়, অন্য যাদের সংগে সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে জড়িত তারাও এর দ্বারা উপকৃত হবে। এই পরিকল্পনা কেবল পল্লীবাসীদের নিজ নিজ সমস্যা নির্ধারণ ও তা সমাধানের পন্থাই শেখাবে না, পরন্তু তাদের এই কাজে প্রেরণাও যোগাবে। কৃষি, সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কাজের সূচনায় একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছে। বিষয়গুলো যে এলোমেলোভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা নয়। যাঁরা এর কার্যসূচী প্রণয়ন করবেন তাঁদের একটা বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জন করতে অনেক কষ্ট হয় বটে কিন্তু তা হারানো যায় খুব সহজেই। কাজেই এমন বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনার সূচনা হওয়া দরকার, কৃষি উৎপাদনে যার কার্যকারিতা সম্পর্কে কৃষকের মনে দ্বিধা নেই। তাদের আস্থা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জনের পরই অপেক্ষাকৃত অপরীক্ষিত ব্যবস্থাগুলোর পত্তন করা দরকার এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ নিজেরা এতে সাড়া না দেয় ততক্ষণ এই কাজ পরীক্ষামূলক পর্যায়েই থাকা উচিত। সম্প্রসারণ সংস্থা স্থাপনের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া হিসাবে চাষীদের মধ্যে ঋণ, জিনিষপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের চাহিদা দেখা দেবে বলে পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেছেন। এই চাহিদা মেটাতে না পারলে সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কাজ-কর্ম ব্যাহত হবে। এই বাস্তব জ্ঞান ও সতর্কবাণী মনে রেখেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কার্য-কলাপের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা যে মানব সমাজে এক অসমসাহসিক পরীক্ষা, সেকথা অস্বীকার করার আজ আর উপায় নেই। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধানের জন্য সরকার আজ এই সর্বতোপণ চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। এই সকল ব্যবস্থার লক্ষ্য শুধু সাময়িক কোনও পরিবর্তন সাধন নয়, মানুষের সামাজিক, আর্থিক, মানসিক ও স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধনই এর লক্ষ্য। এই সকল ব্যবস্থার সংগে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে সংগতি রয়েছে, এই কথা তাদের যে পরিমাণে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, এই পরীক্ষার লক্ষ্য সিদ্ধিতে ঠিক ততখানি পরিমাণেই সফল হওয়া সম্ভব হবে। যাঁরা এই সব পরিকল্পনা কার্যকরী করার ভার পেয়েছেন তাঁরা শুধু পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি পল্লীবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েই নিরস্ত হবেন না,—এই সকল ব্যবস্থার পরিণতিতে ভবিষ্যৎ অবস্থার সামগ্রিকভাবে যে রূপান্তর ঘটবে তাও তাদের বুঝিয়ে দেবেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে অগণিত মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রায় যে পার্থক্য দেখা যাবে, তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অংগীভূত প্রতিটি পরিকল্পনাকে গ্রাম, ব্যষ্টি ও সমষ্টির পটভূমিকায় বিচার করে দেখাতে হবে। কেবলমাত্র এই পটভূমিকার বিচার দ্বারাই পরিকল্পনার মধ্যে যা কিছু অবাস্তব ও সুদূরে তা দূর করা সম্ভব হবে এবং তাকে বাস্তব ও পরিচিত আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে আসা যাবে। দেশে জনসাধারণের কার্য-পরিচালনার সংগে যাঁরা যুক্ত তাঁদের এই বিষয়টা নিজেদের বোঝবার এবং জনসাধারণকে বোঝাবার একটা দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের দরকার নিজের ওপরে আস্থা, জনসাধারণের ওপর আস্থা, আমাদের আরব্ধ কার্যের ওপর আস্থা। এই আস্থা কেবল সুস্পষ্ট উপলব্ধি থেকেই জন্মাতে পারে। সেবার কাজে স্বার্থকে বিলিয়ে দিতে হবে। আমাদের সাময়িকভাবে ব্যর্থতা ঘটতে পারে, কিন্তু পরাজয় আমরা স্বীকার করব না। মানুষ বরং ধ্বংস হোক তবু যেন পরাজয় বরণ না করে। জাতি এত বড় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন আর কখনো হয়নি। কিন্তু আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

টেলিফোন কম্পানির প্রেসিডেন্ট রাত দুটোয় টেলিফোনের ঘন্টায় জেগে উঠলেন।

প্রেসিডেন্ট : হেলো।

প্রতিধ্বনি : আপনি কি টেলিফোন কম্পানির কোনো অফিসিয়াল?

প্রেসিডেন্ট : হাঁ। আপনি কি চান?

প্রতিধ্বনি : শেষ রাত্রে রং নাম্বারের উত্তরে বিছানা ছেড়ে উঠে টেলিফোন ধরতে কেমন লাগে, জানতে চাই।

সুনিপুণ শিল্পীর
হাতে তৈরী গিনি
স্বর্ণের অলংকারই
আমাদের
বিশেষত্ব
দে, জুয়েলার্স
এণ্ড কোং
১৬৮, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিঃ ১২

সুশোভিত নূতন বাক্স
আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও
পৃষ্ঠপোষকদিগকে আনন্দের সহিত
জানাইতেছি যে আমরা এখন হইতে আমাদের
রেডিয়ম স্নো নূতন সুশোভিত বাক্সে পরিবেশন করিব।
রেডিয়ম স্নো
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী • কলিকাতা-৩৬

Maxifoam
BREAD
Clintex
BREAD
ম্যাক্সিফোম • ক্লিনটেক্স
দুইখানি উৎকৃষ্ট নূতন পাউরুটি
ক্লিনটেক্স—সেরা পাউরুটি। প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণযুক্ত উপাদান সহযোগে স্বয়ং-সম্পূর্ণ
ম্যাক্সিফোম—বিভিন্ন উপাদানের পুষ্টি-সাধন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিশিষ্ট পদ্ধতিতে প্রস্তুত।
বেঙ্গল বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ, কলিকাতা-১১
আনন্দ অনুষ্ঠানে অপরিহার্য্য
BENGAL
MARIE
BISCUITS
BENGAL BISCUIT CO LTD
Petit Beurre
CALCUTTA
বেঙ্গল বিস্কুট
B B
সাদর আতিথেয়তার জন্য

ধূমকেতুর নজরুল

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

করল নজরুলের পিছনে। কুমিল্লা থেকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে এল নজরুলকে।

'ধূমকেতু'র মামলায় পুলিশ কোর্টে যে চাঞ্চল্য জাগল তা অবর্ণনীয়। বহু উকিল স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন বিনা পারিশ্রমিকে নজরুল তথা 'ধূমকেতু'র পক্ষ সমর্থনের জন্য। শ্রীযুক্ত মলিন মুখোপাধ্যায় হলেন প্রধান উকিল। সাক্ষী-সাবুদের শেষে নজরুল এক ধূমকেতু-মার্কা লিখিত জবানবন্দী দাখিল করল। তাতে বলল:

> 'সত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তাকে কোন রক্তআঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না......দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়। দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই।......আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয়বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তাঁর আদেশ পালন করেছি।'
>
> বিচারক জানে, আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়। ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়ত সে শাস্তি দেবে। কেননা, সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।.....'

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো নজরুলকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

নজরুলের জেল হওয়ার পর দু সপ্তাহ কাগজ বন্ধ থাকে, তারপর বীরেন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পাক্ষিক হিসেবে দুটো সংখ্যা বেরিয়ে 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে যায়।

আদালত থেকে যখন ওকে কয়েদী গাড়ীতে তোলা হয় তখন বিমর্ষ বন্ধুবান্ধবদের সান্ত্বনা দিয়ে নজরুল বললে, 'দুঃখ করিস নে ভাই, একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হয়ত এই কারাবাসের আমার দরকার ছিল। বিধাতার অমোঘ বিধান খণ্ডাবে কে? এর পিছনে আমি মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্তই দেখতে পাচ্ছি।'

কারাবাসের প্রথম কিছুদিন নজরুলকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করলে জেলে ওর কাছে বই পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর পড়ল। একটা সাধারণ 'কনভিক্টকে 'পোয়েট টেগোর' বই 'ডেডিকেট' করেছেন, একথা শুনে তাজ্জব বনে গেল জেলের সাহেব ও ফিরিঙ্গি অফিসার ও পাহারাদার মহল। সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল: 'ইজ হি রীয়েলী সো গ্রেট এ ম্যান্‌ থাঙ্ক হেভেন্‌স!'

আলিপুর থেকে নজরুলকে বদলি করা হল হুগলী জেলে। জেল থেকে নজরুলের খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়মিত আমাদের জানাবার ভার নিল হামিদ আর সিরাজ, তাদের সঙ্গে হুগলীর আরো অনেক তরুণ যোগ দিল।

কলকাতায় একদিন খবর পেলাম, জেলের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং উৎপীড়ন নিপীড়নের প্রতিবাদে কাজী অনশন শুরু করেছে। খবর পেয়েই আমি চলে গেলাম হুগলীতে। ইতি-পূর্বে জেলে একাধিকবার আমি দেখা করেছি কিন্তু এবার কর্তৃপক্ষ সাক্ষাতে বাধা দিল। আশ্বাস দিলাম, দেখা করতে পারলে নজরুলের অনশন ভঙ্গ করিয়ে দিতে পারব, কিন্তু সে আশ্বাসও কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করলে না।

দিনের পর দিন যায়, খবর আসে—নজরুল নাছোড়বান্দা, এসপার-ওসপার লড়ে দেখবে সে। জেল কর্তৃপক্ষ নানা শাস্তির ব্যবস্থা করল: ডাণ্ডাবেড়ি, হাণ্ডকাফ, নির্জন কুঠরিতে কয়েদ—কিছুতেই কিছু হল না। তারপর শুরু করল ফরস্‌ড্‌ ফীডিং। সেটা নাকি আরো যন্ত্রণাদায়ক। দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে শুধু।

বে-পরোয়া হয়ে নলিনীদাকে সঙ্গে করে আবার গেলাম হুগলীতে। এবারও জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি আমাদের প্রত্যাখ্যান করলে, কোন আশ্বাস কোন প্রতিশ্রুতিই কানে তুলল না। প্রমাদ গণলাম আমরা। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম জেলের ফটক থেকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ধীরে ধীরে পথ হাঁটছি। জেল প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নলিনীদা বললেন, 'এই একটা পাঁচিল মা ফারাক, হয়ত ওপারের উঠানেই কাজী ঘোরাফেরা করছে। একবার চোখের দেখা পেলেও কাজ হত।'

আমি বললাম, 'এই মাছি-পেছলানো বিরাট উঁচু পাঁচিল, এর উপরে উঠে যে নজরুলের দেখা পাওয়ার চেষ্টা করব, তাও সম্ভব নয়।'

এক মিনিট চোখ বুজে কি ভাবলেন নলিনীদা, তারপর বললেন, 'পাগলাকে সাঁকো নাড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছো পবিত্র, পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে হয় না কি?'

'বলেন কি নলিনীদা, আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালাম, 'তারপর আমাদেরও শ্রীঘর বাস করতে হবে।'

'তবে কি, নলিনীদা জবাব করলেন, 'আমি আর কাজী যে-যার সেল থেকে গলা মিলিয়ে সুরেই গাইব, আর তোমার সেল থেকে তুমি দিবে তুড়ি। কাজীর অনশন কোথায় ভেসে যাবে।'

'কিন্তু উঠবেন কি করে? সেটাই ত সমস্যা।'

নলিনীদা প্রস্তাব করলেন, আমি উবু হয়ে বসলে তিনি আমার কাঁধে উঠবেন, তারপর আমি দেয়াল ধরে কোন মতে দাঁড়াতে পারলে তিনি উঠে পড়বেন পাঁচিলে। স্টেশনের দিকের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নিচু। আমায় বললেন, 'তোমার কাঁধ থেকে যে মুহূর্তে আমি পা তুলে নেবো, তুমি একেবারে চম্পট। স্টেশনের ভিড়ে মিশে থাকবে।'

যে কথা সে-ই কাজ। কাঁধের বোঝা যে মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল, সোজা চলে এসে স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। বেশী দূর নয়, কয়েক গজের মাত্র ব্যবধান। পাঁচিলের উপর ঘোড়-সওয়ারের মত দুপাশে দুঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে নলিনীদা জেলখানার দিকে তাকিয়ে হাত-মুখ নাড়ছে। একটু পরেই এক-জন পাহারাওয়ালা সেখানে এসে হাজির হল। নলিনীদার মুখ কাচুমাচু। পাহারাওয়ালাই নলিনীদাকে নামালে পাঁচিল থেকে। দেখতে দেখতে বলা নেই কওয়া নেই হু-হু করে এক জনতা জমে উঠল সেখানে। পুলিশ নলিনীদার শার্টের কলার ধরে আছে, আর নলিনীদা তাকে সানুনয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম, হামিদ, সিরাজ, মনতোষ, শৈলেশ—আমাদের সকলেই প্রায় হাজির। তারাও বোঝা-বার চেষ্টা করছে। আমিও ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। নলিনীদা বোঝান, 'আমরা সরকারের দুশমন নই—দোস্ত। আমাদেরই এক দোস্ত—বহুৎ বড়া আদমী, সে অনশন করেছে। সে যাতে খাওয়াদাওয়া করে, জেলের নিয়ম মেনে চলে—তাই বলতে এসেছিলাম তাকে।'

সব হৈ-হল্লার মাঝে কি ভেবে সিপাই বললে, 'জলদি ভাগো বাবু, নেই ত হামারা নোকরি জায়েগা।'

গা ঝাড়া দিয়ে নলিনীদা বেরিয়ে এলেন। বললাম, 'হল ত!'

'আরে কে জানে ভাই, পাঁচিলের ওপাশে বার হাত লম্বা জলভরা ডোবা আর তুমি ত পাঁচিলে তুলে দিয়ে কাঁধ সরিয়ে নিয়ে পালিয়েছ। আমি না-পারি এদিকে আসতে, না-পারি ওদিকে যেতে। তবু শেষ পর্যন্ত স্কুলের দল এসে পড়েছিল, তাই রক্ষে, তাদের হৈ-হল্লায় ব্যাটা সেপাইকে ভালমানষী করতে হল।'

'আসল যে কথা, কাজীকে পেলে?'

'পেলাম, কিন্তু কাজ হল না। আমি যত মুখ হাত দিয়ে খাবার ইসারা করি, ও তত হাত-মুখ নেড়ে অস্বীকার জানায়। খুবেই দুর্বল হয়ে গেছে, এ কদিনে। কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।'

আমি বললাম, 'চলুন কলকাতায়, সেখানে গিয়ে শলাপরামর্শ করা যাবে।'

স্থির হল, শিলং-এ কবির কাছে চিঠি লেখা হবে, তিনি কাজীকে অনশন ভাঙতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু কবি যা লিখলেন তাতে আমরা নিজেদের আরো অসহায় বোধ করলাম। তিনি লিখলেন, 'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমময় হয়ে থাকবে।'

অনেক দিন পরে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় জেনেছিলাম যে আমাদের ওই চিঠি লেখার পরও তিনি সেণ্ট্রাল জেলে কাজীকে তার করেছিলেন—'গিভ্‌ আপ্‌ হাঙ্গার-স্ট্রাইক, আওয়ার লিটরেচার ক্লেম্‌স্‌ ইউ।' তার ফিরে গিয়েছিল কবির কাছে—'য়্যাড্রেসী নট্‌ ফাউণ্ড'—বলে।

কিন্তু কবির কাছ থেকেও যখন আমরা কোন আশ্বাস পেলাম না তখন সবাই মিলে গিয়ে ধরলাম দেশবন্ধুকে এর জন্যে অবিলম্বে কি করা যেতে পারে। নজরুলের দাবি জেল কর্তৃপক্ষকে মেনে নেবার জন্য দেশবন্ধু জনসভা আহ্বান করলেন।

কিন্তু তার ফল ত সময় সাপেক্ষ, হু-হু করে চলে যাচ্ছে দিন। অনশনে ওর দেহ যাচ্ছে শুকিয়ে, আয়ু যাচ্ছে প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে।

আমরা স্থির করলাম বেসরকারী জেল-

পরিদর্শক স্যার আবদুল্লা সুরওয়ার্দিকে একবার হুগলী যেতে অনুরোধ করা যদি তাতে কিছু সুরাহা হয়। তিনি রাজীও হলেন সহজেই, সামান্য একটু দাবি জানালেন শুধু। তাঁর হুগলী যাওয়া-আসার জন্য মোটরের ব্যবস্থা করতে হবে।

মোটর কোথায় পাব আমরা, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ভাড়াই যাদের জোটে না! ধরপাকড় করে মোটর গাড়ী যোগাড় করা—তাও সময়-সাপেক্ষ। আমাদের অক্ষমতা সুরওয়ার্দিকে নিবেদন করতে তিনি জানালেন, এমন অবস্থায় তিনি ট্যাক্সি করেই না হয় যাবেন, অবশ্য ভাড়ার টাকাটা যোগাড় করে দিতে হবে। যার পকেটে যা ছিল ঝেড়েপুছে ত্রিশটি টাকা দেওয়া হল সুরওয়ার্দি সাহেবকে। তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে তা হাত পেতে গ্রহণ করলেন।

সুরওয়ার্দিও গেলেন হুগলী, সেই দিনই গোলদীঘিতে জনসভা। সভাপতি দেশবন্ধু; হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি সকলে দাবি জানালেন—নজরুলকে বাঁচানো বাঙলা দেশ ও সাহিত্যের প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।

সভাও শেষ হল বিরাট জয়ধ্বনি ও চাই-চাইর মধ্যে; কিন্তু জনসভার দাবি আইনসভার সিদ্ধান্ত নয়, আর আইনসভার সিদ্ধান্তও লাল ফিতার দৈর্ঘ্য বেয়ে তামিল হতে অনেক সময় লাগে। ওদিকে আবদুল্লা সুরওয়ার্দিও ফিরে এসেছেন ব্যর্থ হয়ে। দারুণ অবসাদ ও অসহায় ভাব নিয়ে বসে আছি বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, এমন সময় বন্ধুবর বীরেন সেন জানালেন যে নজরুলের মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী তার পাঠিয়েছেন, তিনি ঐদিনই চাটগাঁ মেলে কুমিল্লা থেকে আসছেন। বীরেন তখনই চলেছে স্টেশনে। আমরাও তার সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম এবং পরদিনই সকালে বিরজা-সুন্দরী দেবীর সঙ্গে হুগলী যাত্রা করলাম আমি ও বীরেন।

নজরুলের সঙ্গে বিরজাসুন্দরীর দেখা করার দরখাস্ত সহজেই মঞ্জুর হয়ে গেল। আমরা দুজনে অনুমতি পেলাম না। উনি ভিতরে ঢুকে গেলেন, আমরা বাইরে ঘুরে-ঘুরে করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে হাসিমুখে ফিরে এলেন তিনি, বললেন, খাইয়েছি পাগলকে। কথা কি শোনে! মড়ার মত নেতিয়ে পড়েছে শরীর, ওই গলা চিঁ-চিঁ করছে। কিন্তু কথা কি তবু শোনে। বলে—না, অন্যায় আমি সইব না। শেষ পর্যন্ত আমি হুকুম দিলাম, আমি মা, মা'র আদেশ সব ন্যায়-অন্যায় বোধের উপরে। চুপ করে গেল। তারপর বললে—দাও, কি খেতে দেবে। নিজের হাতে করে লেবুর রস খাইয়ে এসেছি।'

দেখতে পেলাম দুইজন জেলরক্ষীর কাঁধে ভর করে নজরুল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। ও এসে দাঁড়াল গরাদের ওপাশে। বললে—তোদের সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। যা—আর ভাবনা করিস না, লক্ষ্মী ছেলের মত থাকব বাকী ক'টা দিন। আর কবিতা লিখব। বলিস সবাইকে—কাজী এবার থেকে অতিবাধ্য কয়েদী।

বেদালোকে সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গা

(দশম পৃষ্ঠার পর)

কি জন্য হিরণ্যের আর একটি অভিধা সুবর্ণ বা স্বর্ণ? বালসূর্যের উদয়ে সুদিনের উদয় হয়। স্বর্ণালঙ্কার সুভাগ্যের পরিচয় দেয়। এই শক্তিই যক্ষরূপী ব্রহ্ম হইতে উদ্ভিন্ন বা প্রকটিত হইয়া "বহুশোভমানা হৈমবতী বা হেমবর্ণা উমারূপে অসুর বধে বলদর্পিত দেবতাগণকে নিজকে ব্রহ্মের শক্তি ও তাহাতেই তাঁহারা যে শক্তিমান হইয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্যমনস্ক ব্যক্তি হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে উঃ শব্দে নিজ হৃদয়ে স্থিত আত্মার অস্তিত্বের প্রকাশ করে তাই—উং অর্থে পরমেশ্বর। উং-পরমেশ্বরং মাতি বা মিমেতি-মাপ বা অনুমান করে যে শক্তি তিনিই কেনোপনিষদের উমা। সদ্যঃ প্রসূত মৃতকল্প শিশু আঘাতপ্রাপ্ত হইলে ঐ উমা-উমা শব্দে রোদন করিয়া নিজদেহে আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। তাই জননী মা হইয়া থাকেন। এই উমাই চণ্ডীতে কৌশিকী দেবীরূপে হিমালয় হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কোষ বা কোশ (একার্থবোধক) হইতে রেশমের উৎপত্তি হয়। রেশম পীত বা হেম বর্ণ। তাই তিনি হেমবর্ণে রূপায়িত হইয়াছেন।

চণ্ডীর উপক্রমে ঋষি বলিলেন—"ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি মণিমণ্ডপ রত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীত বর্ণাং পীতাম্বরাং কনক-ভূষণ মাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গর বৈরীজিহ্বাং।" অমৃতসিন্ধুজাত স্বচ্ছ মণিময় রত্নবেদী সিংহাসন পরিপূর্ণভাবে অধিকৃত করিয়া সর্বতোভাবে পীত বা হেমবর্ণা, পীতাম্বরপরিহিতা, কনক বা হেমভূষণ ও মাল্যশোভিতা যে দেবী উদ্যত মুদ্গরহস্তে শত্রুর জিহ্বা টানিয়া তাহাকে বিকল করিতেছেন, তাহাকে ভজনা করিতেছি। বগ—অর্থে বিকলীকরণ। তাই এই দেবীকে দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলা নামে রূপায়িত করা হইয়াছে। ষ্টিব ও উকষ শব্দ এই জিহ্বার সাহায্যেই উচ্চারিত হইয়া যেন নিষ্ঠীবন নিক্ষেপেই কুজ্ঝটিকারূপে অন্ধকার সৃষ্টি করে আর তাহাই কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণে তমরূপে আকাশ-পাতাল আচ্ছন্ন করিয়াই যেন আদিতে গূহ্য অপ্রকেত তম বা সলিলরূপে প্রতিভাত হইয়া-ছিল। দ্যাবা পৃথিবীব্যাপী কৃষ্ণ বা ধূসরবর্ণ কুজ্ঝটিকা নিক্ষেপকারী অসুররূপী এই তম বা অন্ধকার সৃষ্টিকারী যে কারণ তাহাই কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ বিরাট দেহধারী মহিষে রূপায়িত হইয়া মহিষাসুরেরই প্রতীক। আর সেই অসুরেরই জিহ্বা টানিয়া দেবী বগলা তাহা মুদ্গর প্রহারে নিষ্পেষিত করিয়া বিকল করিতেছেন। যেন আর তাহার সাহায্যে সে নিষ্ঠীবন ত্যাগে তম বা অন্ধকার সৃষ্টি না করিতে পারে।

বেদের এই হিরণ্যগর্ভই চণ্ডীর হৈমবতী পীতাম্বরা দেবী যেন আভুরূপে অচল, হিমবৎ পর্বত বা অচল হিম সিন্ধু হইতে তজ্জাত মণিময় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। ইনিই সমস্ত দেবগণের শক্তিসমূহ মূর্তা, ত্রিনয়নে স্বর্গ মর্ত্য পাতালরূপ তিন-লোকে দৃষ্টি করিয়া দশভুজে দশদিকের মহিষ-

মৌমাছি মন দ্রাক্ষাদিনের সৌরভে
চেয়েছে একটি সবুজ জীবন প্রান্ত
সূর্যের রঙে স্বপ্ন বুনেছে গৌরবে
আপন মনের সৌরভে উদ্‌ভ্রান্ত।

খুঁজেছে মদির উতল হাওয়ার ফাল্গুনে
ছায়ারঙ্গিণী একটি নিবিড় সন্ধ্যা
মনের নিভৃতে শুভ্র ব্যথার জাল বুনে
ফোটাতে চেয়েছে হাজার রজনীগন্ধা।

চেয়েছে কখনো খুশির হাওয়ার সঙ্গীতে
আবেশে ছড়ানো হৃদয়ে নিগূঢ় মন্ত্র
হৃদয়-নটীর ভ্রূভঙ্গিমার ইঙ্গিতে
পঞ্চশরের গূঢ়তম ষড়যন্ত্র।

মৌমাছি মন দ্রাক্ষাদিনের সৌরভে
আকাশমদের ভৃঙ্গার হাতে তন্বী
খুঁজে ফেরে নীল স্বপ্নে, যেখানে গৌরবে
হৃদয়ের পাখা পোড়ায় সুনীল বহ্নি।

রূপ তমকে অপসারিত করিয়া, যেন হিমাচল দত্ত সিংহরূপ সিংহাসনে এক পদ রাখিয়া তুচ্ছ মহিষাসুরকে যেন বামপদেই নিতাড়িত করিতেছেন—তুচ্ছকে বাঁ পায়ে ঠেলিয়া ফেলার ন্যায়। তাঁহাতেই সমস্ত শক্তি প্রতিভাত, তাই সংযমনী বসুনোংরূপে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণে, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী বামে, সমস্ত গুণশক্তির প্রতীক হস্তীমুখ গণপতি ও কুমার শক্তির প্রতীক কার্তিকসহ তিনি একাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়া সর্বশক্তির প্রতীকরূপে রূপায়িত হইয়া-ছেন। যুদ্ধাদি সমস্ত কার্য সাধনে ধন ও বিজ্ঞান বলের প্রয়োজন। একা হস্তী বহু লোকসাধ্যকার্য সাধন করিতে পারে তাই গণপতি হস্তীমুণ্ডধারী। এই দেবী দুর্ভেদ্য অতিকষ্টে গম্য দুর্গের ন্যায় তাই অতিকষ্টে সাধনায় প্রাপ্যা দুর্গা। স্বচ্ছমণিনির্মিত সিংহাসন শুভ্র সিংহরূপে রূপায়িত, যদিও তাহার প্রকৃত বর্ণ অন্যরূপ। বর্তমান বিজ্ঞান বলেন আদিতে শুধু অন্ধকারই ছিল। তাহাতেই কোন শক্তি বলে অগ্নির উদ্ভবে বিশ্ব অগ্নিময়, (ফায়ারি ফারমামেণ্ট) রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। সেই অগ্নি হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া পৃথিব্যাদি গ্রহগণের সৃষ্টি হইয়াছিল। সূর্য ও অন্যান্য দীপ্তিশালী নক্ষত্রগণ সেই অগ্নির কিছু অংশ রক্ষণে সমর্থ হইয়া ভাস্বর হইয়া বর্তমান কালেও তাহাদের দীপ্তি অব্যাহত রাখিয়াছে। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে দুর্গাপূজার উদ্ভব অনার্য জাতির কিম্বদন্তী (ফোকটেলস) হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাও এখন খণ্ডিত হইতে পারে কি?

ডাকাতের মা

(৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উঠেছে। সোখীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ী এল; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে; তা নয়, সোখীকে কি খেতে দেবে কাল সকালে, সে-ই হয়েছে বুড়ীর মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিস্কুট থইমুড়ি দিয়ে কোন রকমে চলে গেল!... যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তা হলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে।... আলু চচ্চড়ি খেতে কি ভালই বাসে সোখীটা। কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি আলু! চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা যোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেবো!......

...কাছারীর ঘড়িতে দুটো বাজল। ...ভেবে কূল কিনারা পাওয়া যায় না।......

মনে পড়ল যে, পেশকার সাহেবের বাড়ী রাজমিস্ত্রী লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে পড়েযাওয়া উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ী বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরুল ঘর থেকে।

মাতাদীন পেশকারের বাড়ী বেশী দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙ্গা ইঁটের পাহাড় নীচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ডিঙতে বুড়ীর বিশেষ অসুবিধা হল না।.. বাড়ী নিশুতি!....

অন্ধকারে কি কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোরগোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকার সাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে। তার বাড়ী উঠানের আর কোথায় কি আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল [illegible]। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি।... এখন রাত দুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে দশবারের লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের [illegible] নিশ্চিন্দ হবে। সেইজন্য হুলুস্থুলে পড়ে গেল তাঁর বাড়ীতে সকালবেলায়।

খোকার মা—নাকে কেঁদে স্বামীকে জানিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ীর লক্ষ্মী।— এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে। —'বাজে বক বক্ কর না' তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিসকে না দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?"

আইনচঞ্চু মাতাদীন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ী থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া যায় না। পেশকারসাহেব বড় খুঁতখুঁতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো দেওয়া লোটা বুঝলে কিনা— এই এত বড় সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রূপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য।

........দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"পুরনো হলে চলবে? নামেই পুরনো। সস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।"

পুরনো বাসনও বিক্রি হয় না কি এখানে? দেখি।"

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল! পকেট থেকে চশমাজোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন।... খুরোর নীচে ঠিক সেই তারা আঁকা! আর সন্দেহ নেই!......

মাতাদীন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুঁটি চেপে ধরেন।—"বল্! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকান-দারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!"

একেবারে হই-হই রই-রই কান্ড। দোকানে লোক জড় হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দ আনা পয়সা গুণে, সোখীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণমাত্র আগে।

"চোদ্দ আনায় এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাইমাল জেনেই কিনেছিস! চোরাইমাল রাখবার ফৌজদারী ধারা জানিস?"

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন এক-জন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার শুনে তিনি সদলবলে সোখীর বাড়ীতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সোখীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনানে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সোখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা পুলিস দেখে বুড়ীর বুক কেঁপে ওঠে। পুলিস দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিসকে তাদের বাড়ীতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদীন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিসের সঙ্গে রয়েছে! তার যে ধারণা ছিল, বাসনওয়ালারা পুরনো বাসন-গুলোকে রং চং দিয়ে নতুনের মত না করে নিয়ে বিক্রি করে না......পাঁচ সাত বছর আগে পুলিস একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ী ঘেরাও করেছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখনতো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার স্বামী-পুত্রের হকের পেশা। সেওতো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সে ক্ষেত্রে দুরদৃষ্ট মাত্র, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি! ......ছিঁচকে চোরের কাজ, শেষকালে ...

লজ্জায় সোখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তাকে— "তুই এই লোটা আজ বাজারের বাসনের দোকানে চোদ্দ আনায় বিক্রি করেছিস?"

কোন জবাব বেরুল না বুড়ীর মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে, সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সোখী ব্যাপারটা। চোদ্দ আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল!...কেন মা তাকে বলল না!...এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার।...বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল।......কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণতো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি।......শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! ...জেলের মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কদু-চোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোন দিন!...ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়!...কদুচোরদের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয়!...মা কি জানে না যে......

"এই বুড়ী! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল্। জবাব দে!"

বুড়ী নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কি না, সে কথা বোঝাও যায় না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারল না সোখী।

"দারোগাসাহেব মেয়েমানুষকে নিয়ে টানা-টানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাতে।"

বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সোখীকে ঘুমতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ীর মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সোখীর মা ভেঙে পড়ল।...ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে!......

"না না দারোগাসাহেব! সোখী করেনি। আমি করেছি। ওকে গ্রেপ্তার করবেন না! আমাকে করুন। ও কিছু জানে না; ওযে ঘুমুচ্ছিল। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর।......"

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ী।

কিন্তু তিনি বাসনওয়ালা কিম্বা এই বুড়ীটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সোখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনানে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়াগন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

"চন্দনা, আমি তোমাকে ভালবাসি চন্দনা"—

"মিথ্যা কথা। আমার নাম চন্দনা নয়, ছায়া।"

"আমি দুঃখিত, ছায়া, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি।"

হরিনাথ দে'র স্মরণে

(২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

১। এছাড়া টিবেটো-বর্মন গোত্রের বর্মী ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইন্ডোনেশিয়ন ইত্যাদি। এই ইন্ডোনেশিয়নে প্রচুর সম্ভাবনা থাকার কথা; আমি অনুসন্ধান করে দেখিনি।

অজানাতে এবং জানাতে ও ছোট এবং বড় কোনো কোনো ভাষা বাদ পড়ে গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অন্যগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানী তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরের খবর জানিনে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দু'টো ভাষা এক সঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সং-প্রতিষ্ঠান ও সৎগুরু প্রয়োজন।

এই দু'টির বড়ই অভাব—এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম; আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই সুসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষের কোথাও এমন সুব্যবস্থা নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লী শহর, যেখানকার লোক কেন্দ্রের নোকরী বাবদে হামেহাল তৈজ-নজর ওকীবহাল সেখানে যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদ্দী অথচ টাকা লুটছে এন্তের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাদুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জ্যাঠার আমল থেকে বাড়িতে দু'চারখানা হুগো, দু'চারখানা মালবর পড়ে আছে, কিন্তু ইংরিজি ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা কেউই শেখেননি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসিনি যিনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনো বিদেশী ভাষা শিখেছেন।

অধমের শেষ সাবধান বাণী : সবকটা আন্ডা একই ঝুড়িতে রাখবেন না—কুল্যে শিনি একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বি-এ, এম-এ, পাশ অবহেলা করে হঠাৎ তৌরিয়া হয়ে বিদেশী ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বি-এ, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন—আড্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে ফুটবল দেখাটা একটু মুলতুবি রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলবো কেন, তওবা, তওবা, তাহলে আপনার বাঙালীত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বি-এ, এম-এ পাশ করে যা করতেন, তাই করবেন। তাহলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে—, তোর কথায় না—ইত্যাদি।'

—খ

সাহিত্যিক গোষ্ঠী

(২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বললেন—"ওহে তোমার পদ্য থেকে গদ্যটাই ভালো হয় দেখছি। "গদ্যই লেখ।" এ মন্তব্যে আমার মনটা বড় বিষন্ন হ'ল। তারপর রংপুরে গিয়ে গদ্য লেখা ছেড়ে দিলাম। রংপুর সাহিত্য সম্মেলনে বীরবলের সঙ্গে দেখা। তিনিও গদ্য লিখবার জন্য উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন—"কবিরাই ভালো গদ্য ভাষা লিখতে পারে—এই আমার ধারণা।" তাঁর আদেশে গদ্য কিছু কিছু লিখেছিলাম—কিন্তু সবুজপত্রে পাঠাতে সাহস করিনি—যদিও তিনি বলেছিলেন—"ভয় নেই, আমি রিভাইজ ক'রে নেব।" সে সব গদ্য লেখা পরে বঙ্গবাণী বেরুলে তাতেই ছাপা হয়েছিল। বঙ্গবাণী উঠে গেল—আমিও গদ্যের কাছ হতে বিদায় নিলাম। এখন আর কবিতা সহজে আসে না, তাই বাধ্য হয়ে গদ্য লিখি। গদ্য রচনা স্বধর্ম-চ্যুতি। লেখাটা পেশা হ'লে ছেড়ে দিতেও হয়ত পারতাম, কিন্তু নেশা ত ছাড়া যায় না। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্র বলে গেছেন—'সব ছাড়তে পারো, নেশা ছেড় না। নেশার ভোল বদলাতে পার।" দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' তখন চলছে। নারায়ণের গোষ্ঠীটিও বেশ জমকালো। এ গোষ্ঠী হতে ফিরে বাড়ীতে রাত্রি ভোজন করতে হ'ত না। বেশি রাত্রে বাড়ী ফিরবার গাড়ী ভাড়াও পাওয়া যেত। এই গোষ্ঠীতে প্রত্যহ আসতেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি জোড়াসাঁকো হতে হেঁটে আসতেন, তাঁর প্রতিদিনকার বৈকালী ভ্রমণ ছিল এটা। এ মজলিসে থাকতেন সত্যেন্দ্র গুপ্ত (এঁকে আমরা কালো রবি বলতাম। চেহারাটা বিশেষ ক'রে দাড়িটা ছিল অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত), গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, সতীশ ঘটক ইত্যাদি। বহু সাহিত্যিকই যাতায়াত করতেন। এখানেই কবিবর অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে এবং উপেনদাদার (গাঙ্গুলী) সঙ্গে আমার আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই কবিবরের সঙ্গে আমার বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় চণ্ডীদাস। তিনি বলেন—বৈষ্ণব সাহিত্যে একমাত্র কবি চণ্ডীদাস। আমি বললাম—সে কি ? বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাস রয়েছেন যে। তিনি রেগে উঠে বললেন—"কি চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম! কোথাকার অর্বাচীন ছোকরা হে তুমি।' আমি ঘাবড়ে না গিয়ে সমানে তর্ক করতে লাগলাম—তিনি ততই ক্ষেপে যেতে লাগলেন—শেষে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুললেন—তখন আমি দেখলাম খুবই তিক্ত হয়ে পড়ছে—চুপ করে গেলাম। দেশবন্ধু দেখলেন মজলিসের রসভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে—তিনি আমাকে মৃদুভাবে একটু সমর্থন করলেন। তখন তিনি থামলেন। উপেনবাবু চণ্ডীদাসের একটা গান গেয়েছিলেন—তা হতেই ঝড়টা উঠেছিল। ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনও ছিল। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন সুধীবাবু। কি বাড়ীতে কি মজলিসে সর্বত্রই নির্বাক। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করলে তিনি কথা বলতেন না। এমন নীরব শ্রোতা আর দেখা যায় না।

চিত্তরঞ্জনও রবীন্দ্রনাথের রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে কখনো ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেন না। শুধু বলতেন—আমার ভাল লাগে না। বড় আর্টিফিসিয়াল। নারায়ণের কবি ছিলেন ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী। রবীন্দ্র শিষ্যদের রচনাও তাঁর প্রীতিকর ছিল না। একজন রবীন্দ্র-শিষ্যের দুটি কবিতা নারায়ণের কর্মকর্তার অনুরোধে তাঁর হাতে এসেছিল। তিনি কবিকে ১০০৲ টাকার সঙ্গে কবিতা দুটি ফেরৎ দিয়েছিলেন।

আমি বৈষ্ণব কবিতা লিখতাম। ভুজঙ্গধরবাবুর মত। সেজন্য বোধ হয় আমাকে একটু প্রীতির চোখে দেখতেন। দেশবন্ধু তখন লাখ লাখ টাকা রোজগার করছেন, আর দুহাতে খরচ করছেন। তাঁর কাছে তখন কোন প্রার্থী নিরাশ হয় না। দেখলাম—বড়াল কবিকে পাঁচ শ' টাকার চেক লিখে দিলেন।

রাত্রি ১১টার সময় ভোজনের আহ্বান হ'ল। আহারের আয়োজন রাজবাড়ীর বিয়ের বৌ-ভাতের মত। দেখে অবাক হ'লাম। সত্যেন গুপ্ত বললেন—প্রত্যহই এই ব্যবস্থা। আয়োজন দেখে মনটা অপ্রসন্ন হ'ল। কোন ভদ্র অতিথির একদিন এলে দ্বিতীয় দিন আসতে সঙ্কোচ হবার কথা। এরূপ মজলিসে কচিৎ কখনোই যাওয়া চলে।

আমাদের যৌবনকালে নবীন সাহিত্যিক ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশ মেলামেশা ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাতে নবীন সাহিত্যিকরা সস্নেহ উৎসাহ পেতেন এবং সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। তখন সাহিত্যিকরা যেন এক জাতির লোক ছিলেন। এ যুগে সাহিত্যিকরা যেন একাধিক জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং আধুনিক ও প্রবীণ, অত্যাধুনিক ও আধুনিক জাতির মধ্যে ব্যবধান ঘটেছে দুস্তর। এখন Birds of the same feather flocked together—এতে প্রত্যেক দলই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

"আজ আমার শিশু-পালনী সিরিজের রেডিও টক্ হয়েছে—ফিরতে রাত হবে।"

ভারতীয় সঙ্গীতে দর্শন

(২২৬ পৃষ্ঠার পর)

অনুবাদি যার চক্রআবর্তনে লক্ষ লক্ষ রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হচ্ছে এবং তালেও সম, অতীত, অনাঘাত, বিশমের চতুর্বর্গ আবর্তে লক্ষাধিক তাল ও ছন্দের সৃষ্টি হচ্ছে।

পূর্ববর্ণিত মানবানিবারিত গন্ধর্বলোকের গান্ধার গ্রামে যে লুকানো তথ্য রয়েছে সেও এই চতুর্মুখী প্রকাশ। গান্ধারই চারিটি হ্রস্ব স্বরের প্রকাশক; যারা সপ্তকের কোমল ঋ জ্ঞ দ ণি॥ যতক্ষণ না এই চারিটি প্রকাশিত হচ্ছে ততক্ষণ সপ্তকমণ্ডলী অর্থাৎ উদারা, মুদারা, তারার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। প্রথম তিন গ্রাম এবং তার চতুর্মুখী প্রকাশই তাই বারটি সুরের সমন্বয়। প্রণব মন্ত্রেরও তাই—১২টি মাত্রায় অভিব্যক্তি হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র। ১ (ওঁ), ২ (ভূঃ), ৩ (ভুবঃ), ৪ (স্বঃ), ৫ (তৎ), ৬ (সবিতুঃ), ৭ (বরেণ্যং), ৮ (ভর্গো), ৯ (দেবস্য), ১০ (ধীমহি), ১১ (ধীয়োজন), ১২ (প্রচদায়ৎ)। ধ্রুপদ তালের সম্রাট চৌতালও তাই ১২ মাত্রিক। ধা ধা দেন তা কৎ তাগে দেন তা তেটে কতা গদি ঘেনে। খেয়ালে ১২ মাত্রিক একতালাকেই সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়। জগতের গঠনবৈজ্ঞানিক সমালোচনায় সূর্যের কিরণই সর্বোত্তম। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এই তিনের চতুষ্পথ ধরিয়া ১২টি রাশির সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্ষকেও সূর্যপথ ধরে বারটি মাসে বিভক্ত করেছে। সাতটি প্রধান সুর, ৪টি কোমল ও একটি তীব্র নিয়ে ১২টি সুরের যেমন প্রকাশ তেমনি মনুষ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে মহাকাল পুরুষের ১২টি অঙ্গ ঘিরেই মানুষের জন্মচক্র ও তার অভিব্যক্তি বাররাশির গুণাগুণের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব, রজ, তম) মানুষের প্রকৃতি অঙ্গাদিও এই বারের ছন্দে বাঁধা। এ বিষয় সুদীর্ঘ আলোচনার ফলে যেটুকু পেয়েছি তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ১২টি সুর ১২টি রাশিগত এবং তাদের গ্রহদেবতাদের অনুগত। তাই মানুষের

'[illegible] বিশাখা বলেন, উনি নাকি অভিনয় জানেন না।'

ত্রিগুণের সংযোগ যেমন ত্রিগ্রামের সঙ্গে তেমনি ত্রিদোষের সঙ্গেও। তাই কোন সঙ্গীত মানুষকে উত্তেজিত করে আবার কোন সঙ্গীত বিকার নিয়ে আসে।

আয়ুর্বেদে বর্ণিত ত্রিদোষ অর্থে বায়ু-পিত্ত-কফ। এই ধাতুগত ব্যক্তিমাত্রেই তিন গ্রামেই বাঁধা এবং তাঁদের দেহের ছন্দ প্রবাহেও ত্রিতালের অভিব্যক্তি। এই তিন শ্রেণীর ছান্দিক প্রাণীদের বর্ণ-ও তিন; যথা নীল, লাল ও হলদে (Spectrum Original Colours) নীচের তালিকায় কিছু বুঝাবার চেষ্টা করলাম।

ত্রয়ী ও অর্ধমাত্রা

	স্থিতি	পালন	সংহার	অর্ধমাত্রা
ত্রিদেবতা—	বিষ্ণু	ব্রহ্মা	শিব	ঈশ্বর
ত্রিপ্রণব—	অ	উ	ম	•
ত্রিগ্রাম—	সা	গা	মা	তীব্র মধ্যম
ত্রিবর্ণ—	হলদে	লাল	নীল	আল্ট্রাভায়লেট
ত্রিগুণ—	সত্ত্ব	রজ	তম	আকাশ (ether)
ত্রিদোষ—	বায়ু	পিত্ত	কফ	সান্নিপাত (Mellingities)
ত্রিনাড়ী—	ইড়া	পিঙ্গলা	সুষুম্না	কুণ্ডলিনী
ত্রিশ্বাস—	রেচক	পূরক	কুম্ভক	সমাধি (সবিকল্প)
ত্রি-পদ্ম—	মূলাধার	মণিপুর	সহস্রার	সমাধি (নির্বিকল্প)
ত্রিগ্রহ—	সূর্য	চন্দ্র	পৃথিবী	রাহু কেতু
ত্রিকাল—	বর্তমান	ভবিষ্যৎ	অতীত	ত্রিকালজ্ঞ

শ্রীস্বরূপিণী হচ্ছেন লক্ষ্মী বাক্ ও সঙ্গীত-রূপিণী হচ্ছেন সরস্বতী, প্রণব স্বরূপিণী হচ্ছেন গায়ত্রী এবং প্রেমদায়িনী হচ্ছেন শ্রীরাধা। প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গীত স্বরূপিণী সরস্বতীর হাতে বীণা দিয়েছেন অর্থাৎ বীণাই প্রকৃতির সঙ্গীত প্রতীক।

শ্রীরাধা মানে—'রা' অর্থে মুক্তি বা মোক্ষ এবং 'ধা' অর্থে ধাতৃ। যিনি মুক্তিপথের ধাতৃ তিনিই রাধা। এই প্রকৃতির মধ্যে থেকে তার মায়ার বাইরে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ—কাজেই শ্রীরাধাই হচ্ছেন মুক্তিপথের ধাতৃ—কাজেই পঞ্চ-প্রকৃতির একমাত্র প্রধান হচ্ছেন "রাধা"। এই রাধার কমলে জন্ম। যখন তিনি জন্ম নেননি তখন তিনি কমলকোরকে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে মাতৃজঠরে।

কমল কোরকের উপরিভাগ দেখতে একটি ত্রিকোণের আকার। আমাদের পূর্ববর্ণিত মূলাধারের নিম্নে কুণ্ডলিনীশক্তিও এমনি ত্রিকোণে বসবাস করেন সে কথা ভুলবেন না। এই রাধার স্বামী হবেন আয়ান। স্বামী অর্থে দেহকে যে চালায়—অর্থাৎ শ্বাস বা বায়ু। কিন্তু আয়ান মানে—"আ" অর্থে বিপরীত "য়া" অর্থে—বায়ু এবং 'অন' অর্থে আধার; অর্থাৎ যিনি বিপরীত বায়ু বহন করেন। যে বায়ু প্রাণ-শক্তিদায়ী—সে যদি বিপরীত হয় তাহলে সে তো মরণের দিকেই টেনে নিয়ে চলবে—বা চলেছে। মুক্তিধাতৃ রাধার ইনি হবেন স্বামী। মুক্তিদায়িনী রাধার আবার ১৬শ গোপিনী হচ্ছেন সহচরী যাদের নিয়ে তিনি কেন্দ্রীভূতা। সর্বশক্তির মূলাধার প্রকৃতি পূর্ণ স্বরূপ রাধা

পঞ্চ—

স্বর — অ — ই — উ — ঋ — ৯

সুর — ঋ — জ্ঞ — দ — নি — হ্রু

শ্বাস — প্রাণ — অপান — সমান — উদান — ব্যান

ইন্দ্রিয় — দর্শন — শ্রবণ — আঘ্রাণ — আস্বাদন — স্পর্শন

গঠন — ক্ষিতি — অপ — তেজ — মরুত — ব্যোম

সপ্ত—

গ্রহ — সূর্য — চন্দ্র — মঙ্গল — বুধ — বৃহ — শুক্র — শনি

বর্ণ — হলদে — কমলা — লাল — ভায়লেট — ইণ্ডিগো — নীল — সবুজ

স্বর — আ — ঈ — উ — এ — ঐ — ও — ঔ

ব্যঞ্জন — ক-বর্গ — চ-বর্গ — ট-বর্গ — ত-বর্গ — প-বর্গ — য-বর্গ — উষ্ম-বর্গ

সুর — সা — রে — গ — ম — প — ধ — নি

ত্রয়ী তার ৪টি ভাব নিয়ে (৩×৪=১২) ১২টি পূর্ণ প্রকাশ করেছে যেমন :

দ্বাদশী—

গ্রহ— রবি, চন্দ্র—বৃহ—ইউরেনাস—বুধ—শুক্র—নেপচুন—শনি—মঙ্গল—হারসেল—রাহু কেতু

সুর— স — রে — ঋ — গ — জ্ঞ—ম —হ্রু — প — ধ — দ — নি-ণি—

স্বর— অ — আ — ই — ঈ — উ—ঊ —ঋ — ৯ — এ—ঐ — ঔ

প্রণব— ওঁ —ভূঃ —ভুবঃ— স্বঃ—তৎ—সবিতু —বরেণ্যং—ভর্গো—দেবস্য—ধীমহি- ধীয়োজন-প্রচদয়াৎ

চৌতাল— ধা —ধা —দেন—তা —কৎ—তাগে —দেন — তা— তেটে—কতা—গদি—ঘেনে

এছাড়া Twelve tissues যার অভাবে সারা দেহের আরোগ্য ইত্যাদি প্রমাণিত হয়েছে।

শাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে বলেছেন যে পুরুষ অর্থে মহাকাল এবং প্রকৃতি অর্থে স্ত্রীশক্তি। বৈদ্যুতিক প্রবাহ নেগেটিভ ও পজেটিভ বলা যায়। প্রকৃতি অর্থে প্র—মানে প্রথম বা আদি গুণ মানে সত্ত্ব। কৃ—অর্থে মধ্যগুণ অর্থাৎ রজ এবং তি—মানে অন্তগুণ—অর্থাৎ তম। কাজেই ত্রিগুণই হচ্ছে প্রকৃতির স্বরূপ (বেদে এই রকম বলেছেন) ব্রহ্ম বৈবর্ত-পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে বলেছে প্রকৃতির গুণতরূপ ৫টি। শক্তি স্বরূপিণী হচ্ছেন শ্রীদুর্গা,

মূলাধারে ত্রিকোণযুক্ত কমলকোরকে কুণ্ডলিনী অবস্থায় ১৬শ গোপিনী পরিবৃত হয়ে এতেই নিস্তেজ যে, প্রতি নশ্বর মৃত্যুপথের যাত্রী। কারণ, স্বামী তার সঞ্জীবনী—বায়ু না হয়ে বিপরীত বায়ু—প্রাণঘাতী বায়ু। তবে কে বাঁচাবে এই জীবগণকে? কার প্রকাশে এই প্রাণঘাতী বায়ু বিপরীত না বহে প্রাণময় হয়ে বইবে?

মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী স্নায়ুজাল হচ্ছে

মানবদেহের ১৬শ নাড়ীর কেন্দ্রীভূত শক্তি। যে ১৬শ নাড়ীর অবস্থান এতই গোপন স্থলে যে, তাদের গোপিনী বললেও অত্যুক্তি হয় না। এহেন শক্তিকে জাগ্রত বা বিকশিত করতে পারলে শুধু যে কুন্ডলিনী শক্তি জাগরিত হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে ১৬শ গোপিনী নাড়ীজাল প্রাণ পাবে। অতএব চাই এমন পুরুষ যিনি এই প্রকৃতিকে হাতে ধরে টেনে তুলতে পারেন—যিনি প্রাণঘাতী বিপরীত বায়ুকে নপুংসক করে প্রাণবন্ত করে তুলবেন। সেই অজ্ঞাত চির জ্যোতির্ময় জ্ঞানী মহাপুরুষ আমাদের চোখে তমসায় আবৃত—তাই সে কালো—তাই সে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ হলেন বসুদেব পুত্র বাসুদেব। বসু অর্থে পৃথিবী—দেব অর্থে স্বামী অর্থাৎ পৃথিবীর যিনি কর্তা তাঁরই সন্তান। পৃথিবী অর্থে এখানে স্থিতি অর্থাৎ প্রতি প্রাণী—এবং তিনি তাঁরই স্বামী। তাঁর পুত্র বাসুদেব। তিনি পুত্ররূপে সর্বভূতে বিরাজমান তবু তিনি আমাদের চোখে অন্ধকারে ডুবে আছেন এমনি কৃষ্ণ তিনি।

নন্দের দ্বারা প্রতিপালিত; কোথায়? না গোপপুরে—ব্রজধামে। নন্দ অর্থে আনন্দ। গোপপুর অর্থাৎ গোপনপুর; ব্রজধাম অর্থে খেলার রঙ্গধামে। অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ শক্তি গোপনে আনন্দ দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে খেলার রঙ্গধামে বিচরণ কচ্ছেন। হাতে তার বেণু। কেন? পুতুল নয়—বা আর কোনো যন্ত্র নয়, বেণু কেন? কারণ, বংশীই যে একমাত্র যন্ত্র যা বায়ুর দ্বারা চালিত হয়।

পুরুষের হাতে বেণু এবং প্রকৃতির হাতে বীণা। অর্থাৎ প্রাণশক্তিস্বরূপ সেই বেণু শ্বাসে প্রশ্বাসে, রেচকে পূরকে, সপ্তসুর দিয়ে সপ্ত-কেন্দ্র পদ্মকে মথিত করে—উদাত্ত প্রাণময় বায়ু সঞ্চার করে কমল-কোরকের ত্রিকোণকে বিকশিত করবেন তাই তাঁর হাতে বেণু।

প্রাণশক্তি মানে বায়ুশক্তি—অর্থাৎ নাদশক্তি; যা অন্তস্থিত উচ্চারিত মার্গ-সুর—যাকে যৌগিক ভাষায় প্রাণায়াম বলা হয়। সেই বেণু নিনাদে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, স্তরে স্তরে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, পদ্মে পদ্মে প্রতি দেশজ বর্ণছটাকে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে আঘাত দিয়ে কমলকোরকের পাঁপড়ীর দ্বার উদ্ঘাটিত করলেন—রাধার কুন্ডলিনীশক্তি—বন্ধনমুক্ত হয়ে বিস্তারিত হলো। আয়ান হলো নপুংসক আর তার বিপরীত বায়ু কি করবে! সপ্তসুরের হিতকর প্রাণময় বায়ু রাধাকে আহ্বান জানালেন। বেণু তুললো ঝংকার বীণার ষোড়শ তারে, শ্রীরাধার কুন্ডলিনী রূপ এখন ফণা বিস্তার করে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ সন্ধানে সহস্রার দিকে যাত্রা সুরু করলেন। ১৬শ গোপন নাড়ী কেঁপে উঠলো রাসযাত্রার ন্যায় সবাই সেই কৃষ্ণমুরলী শুনে সজাগ হয়ে উঠলো—৯-কারের ন্যায় কুন্ডলিনী রাধা বিস্তারিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন আনন্দধামে, ব্রজপুরে অর্থাৎ সহস্রারে; কৃষ্ণ-বেণু সুধায় তার কুন্ডলিনী ৯-কার উর্ধমুখ হয়ে বিপরীতভাবে বিন্দুর অর্ধমাত্রায় শোভা পেতে লাগলো। সপ্তসুরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইন্দ্রধনুর দেশজ বর্ণ প্রকাশিত হলো প্রদর্শক মার্গ-সঙ্গীতে। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সে সঙ্গীতনাদ ব্রহ্ম সুর ব্রহ্মের রূপ নিল। কৃষ্ণের বেণু রাধার বীণা ও দেহের সংযোগে মুক্তির দুন্দুভি ঘোষণা করল। আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য ও শারঙ্গ দেবের যোগানুভূতি প্রসূত শ্লোকের যথার্থ অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল।

স্কেচ — এস গাংগুলী

জীবনে অনন্ত তৃষা কাঁদিতেছে ক্ষণে ক্ষণে
বক্ষের কারায়—
রাত্রির সীমানা হতে বারে বারে ফিরে আসে
ক্ষুধিত নিঃশ্বাস,
কাঁদিছে তুষার গিরি জনহীন
শব্দহীন উষর উষায়
একটি হৃদয় আজো রহিয়াছে
পথ প্রান্তে মেলিয়া নয়ন।

দক্ষিণ সমীরে আসে বহু দূরে
দিগন্তের হিমেল পরশ
আসিছে যাত্রীর দল—দিশাহারা মরুভূর
উটের মিছিল,
মাটির নিবিড় রসে ইহাদের আমন্ত্রণ
এসেছে সহসা—
অরণ্য বিদারি তাই চলিয়াছে স্রোতধারা
নিরন্ধ্র আঁধারে।

জীবন বিটপী হতে ঝরিতেছে পলে পলে
আয়ুর সঞ্চয়
ধূসর মনের' পরে লাগিয়াছে
ঈগলের ডানার ঝাপট,
আজিকে ফোটে না ফুল—আসে নাকো
প্রজাপতি হেথায় বারেক
পড়ন্ত প্রদোষ বেলা—চলে গেছে চিরতরে
মাধবী বিলাস।

দিগন্ত কুয়াশা ঢাকা—তবু চাহি দেখিবারে
নীরব অতীত
রয়েছে কত না ভুল—কত ত্রুটি পদে পদে
হয়েছে সেদিন,
একটি সোনালি রাত্রি জড়াইয়া আছে দেহে
ঘুমের মতন
ধূলির পৃথিবী হাসে—
আকাশের ছায়া পড়ে তৃণের শিশিরে।

আমার মনের শিখা চিররাত্রি
চিরদিন জ্বলে অনির্বাণ
পুড়িয়া নিঃশেষ হলো জীবনের হলাহল—
যৌবন কামনা।
বিক্ষত বিহঙ্গ—আজ রুধিরাক্ত শ্রান্ত দেহে
ফিরিল কুলায়
হেথায় আশ্রয় তার—তৃপ্তিহীন তৃষা লয়ে
রহে প্রতীক্ষায়।

তিলোত্তমা

(১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দেমাকে মটমট করছে, হয়তো তার কালচারও বিশেষ কিছু নেই।

একটু ভেবে আমি বললুম, পণ্ডিত মশায়, আপনার কথা শুনে এখন মনে পড়ছে—তিলোত্তমা সরোবরকে সড়োবড়, জিহ্বাকে জেহোভা, আর প্রেমকে ফ্রেম বলেছিল।

—তবেই বোঝ। তুমি আবার ভীষণ খুঁত-খুঁতে। যদি তোমাদের মিলন হয়, তার সঙ্গে তুমি যদি ঘর কর, তবে দুদিনেই তার গ্ল্যামার লোপ পাবে। সেকালে কলকাতায় একজন অতি শৌখিন বনেদী বড়লোক ছিলেন। তিনি রোজ সন্ধ্যায় তাঁর রূপসী রক্ষিতার বাড়িতে যেতেন, দুপুর রাতে বাড়ি ফিরতেন। কোনও কারণে দুদিন তিনি যেতে পারেন নি। বিরহযন্ত্রণা সইতে না পেরে তৃতীয় দিনে ভোর বেলায় তিনি হাজির হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রেয়সী গামছা পরে গাড়ু হাতে কোথায় চলেছেন। তাই দেখে ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ে বললেন, ওঃ তুমি—তুমি—

নমিতা বললেন, আপনি অতি অসভ্য, মুখে কিছুই বাধে না।

—ও তো আমি বলি নি, গুরুমুখে যা শুনেছি তাই আবৃত্তি করছি। প্রেয়সীর সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃত রূপ দেখে ভদ্রলোকের মোহ কেটে গেল, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবনবাসী হলেন।

নমিতা বললেন, আপনার নিজের কি হল তাই বলুন।

—তার পর চুণ্ড মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, এখন তোমাকে আসল তিলোত্তমার ইতিহাস বলছি শোন। সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই ছিল দুর্বিষহ অসুর। তাদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, ভয় নেই, আমি দু দিনেই ওদের সাবাড় করে দিচ্ছি। তিনি ব্রহ্মী মায়ায় এক সিন্থেটিক ললনা সৃষ্টি করলেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর বস্তুর তিল তিল উপাদানের সংযোগে তৈরী, সেজন্য তার নাম হল তিলোত্তমা। তার ট্রায়াল দেখবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মসভায় সমবেত হলেন। ব্রহ্মার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তিলোত্তমা নাচতে লাগল। পিতামহ প্রবীণ লোক, চক্ষুলজ্জা আছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পারেন না, অথচ দেখবার লোভ ষোল আনা, অগত্যা তাঁর ঘাড়ের চারদিকে চারটে মুণ্ডু বার হল। ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র লোচন ফুটে উঠল, তাই দিয়ে তিনি চোঁ চোঁ করে তিলোত্তমার রূপসুধা পান করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ নাচ দেখে ব্রহ্মা বললেন, বাঃ খাসা হয়েছে, এখন তুমি সুন্দ উপসুন্দের কাছে গিয়ে তাদের সামনে নৃত্য কর। তিলোত্তমা তাই করল। তাকে দখল করবার জন্য দুই ভাই কাড়াকাড়ি মারামারি করে দুজনেই মরল। দেবতারা নিরাপদ হলেন। ইন্দ্র বললেন, তিলোত্তমা, আমার সঙ্গে অমরাবতীতে চল, শচীকে বরখাস্ত করে তোমাকেই ইন্দ্রাণী করব। বিষ্ণু বললেন, খবরদার, তিলোত্তমা বৈকুণ্ঠে যাবে, আমার পদসেবা করবে। মহেশ্বর বললেন, ওহে বিষ্ণু, তোমার তো বিস্তর সেবাদাসী আছে, তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কৈলাসে যাবে, পার্বতীর একজন ঝি দরকার। তখন ব্রহ্মা বেগতিক দেখে বললেন, তিলোত্তমে, স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়! তিলোত্তমা দড়াম করে ফেটে গেল, অ্যাটম বোমার মতন। তার সমস্ত সত্তা বিশ্লিষ্ট হল, যে উপাদান যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল,—কান্তি বিদ্যুল্লতায়, কেশরাশি মেঘমালায়, মুখচ্ছবি পূর্ণচন্দ্রে, দৃষ্টি মৃগলোচনে, ওষ্ঠরাগ পক্কবিম্বে, দন্তরুচি কুন্দকলিকায়, কণ্ঠস্বর বেণুবীণায়, বাহু মৃণালদণ্ডে, পয়োধর বিল্বফলে, নিতম্ব করিকুম্ভে, উরু কদলীকাণ্ডে। পড়ে রইল শুধু একটু রেডিওঅ্যাকটিভ ধোঁয়া।

অসিতা বলল, তিলোত্তমার মন কোথায় ফিরে গেল তা তো বললেন না স্যার।

—তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার কিছুই ছিল না, আত্মাও ছিল না। তিলোত্তমা একটা রোবট। পুরাণ কথা শেষ করে চুণ্ডু মশায় প্রশ্ন করলেন, বৎস সিদ্ধিনাথ, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করছ কি? মোহ অপগত হয়েছে?

আমি লাফ দিয়ে উঠে বললুম, একদম সেরে গেছি স্যার। আমার মানসী তিলোত্তমাও এক্সপ্লোড করে বিলীন হয়েছে।

—এখনও বলা যায় না, কিছু ধোঁয়া থাকতে পারে। দেখ সিদ্ধিনাথ, তোমার চটপট বিবাহ হওয়া দরকার। তোমার বাপ-মায়েরও সেই ইচ্ছে। আমার ছোট শালী নবদুর্গা দেখতে নেহাত মন্দ নয়, কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাকে একবার দেখো।

আমি উত্তর দিলুম, দেখবার দরকার নেই স্যার। ছায়া দেখে একবার ভুলেছি, কায়া দেখে আর ভুলতে চাই না। ওই নবদুর্গা না নবদুর্গা কি নাম বললেন, ওকেই বিয়ে করব। আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা কি।

চুণ্ডু মশায় বললেন, ঠিক বলেছ সিদ্ধিনাথ। দশ মিনিট দেখে তুমি কি তার বুঝবে, আমি তো দশ বছরেও নবদুর্গার দিদি জয়দুর্গার ইয়ত্তা পাই নি। বিবাহ হয়ে যাক, তার পর ধীরে সুস্থে যতদিন খুশী দেখো।

তার পর চুণ্ডু মশায় বাবাকে বললেন, বাবা-মা রাজী হলেন, দু মাসের মধ্যে নবদুর্গার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

গোপালবাবু বললেন, সিদ্ধিনাথের ইতিহাস তো শেষ হল, এখন নমিতা তোমার মন্তব্য বলতে পার।

নমিতা বললেন, আপনার গিন্নীকে এই কেচ্ছা শুনিয়েছেন?

সিদ্ধিনাথ বললেন, শুনিয়েছি। আরও অনেক রকম জীবনস্মৃতি তাঁকে বলেছি, কিন্তু পতিবাক্যে তাঁর আস্থা নেই, আমার কোনও কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না।

—জীবনস্মৃতি না ছাই, বক বক করে আবোল-তাবোল বানিয়ে বলেছেন। আগাগোড়া মিথ্যে, শুধু নবদুর্গা সত্যি।

অমানিশার বাতি

(১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আশ্রমাধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে, দুইজনের মৃতদেহ, দুই স্বতন্ত্র সমাধি-মন্দিরে সমাহিত করা হইয়াছিল। আবার এক শতাব্দীরও অধিককাল পরে দুইটি দেহকে আবার এক সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিগণ সেই আশ্রম ভগ্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু ফরাসীগণ হিলোইসার পবিত্র প্রেমের স্মৃতিকে বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই। প্যারিস নগরের 'পিয়ের-লা-সেজ' নামক উদ্যানালয়ে, এক মার্বেল নির্মিত শয্যোপরি দুইটি শ্বেত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি শয়ান রহিয়াছে। তাহা আবেলার্ড ও হিলোইসার মূর্তি। হিলোইসার প্রেমের এমনি মহিমা। এমন প্রেম 'অমানিশার বাতি'। অন্ধকার যতই বাড়ে ইহার জ্যোতি ততই বাড়ে।

(Massy প্রণীত The Secret History of Romanism নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত।)

আলিম্পন — [illegible] লাহিড়ী

মুচী পড়া
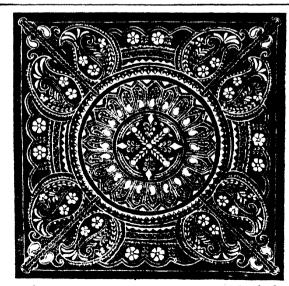
(১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এবং হেঁট হয়ে পাতা কুড়াতে লাগল। এক একটা মুচিনী একটা পাতা মুড়ে আঁচলে বাঁধচে এবং পাশের পাতাটাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে নিজের দখলে রাখচে! তার উচ্ছিষ্ট পাতা অন্য কেউ নেবে না। চারিদিকে ফুৎকারের ধুম 'থুঃ! থুঃ! দরওয়ান ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষায় শাসন করেছে 'এই হাল থোরিন! থুকো মৎ! 'ভদ্রলোকরা দোতলার বারান্দা থেকে দেখে বলচেন ছোট লোক কি না, এক পাত কুড়চ্ছে,— এক পাতে থুতু দিচ্চে!' হয়ত এখনও সকলে এই সভ্য যুগে বলবেন নীচ জাতি তাই লুচি মেঠাই মাছের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। সভ্য কলকাতায় কেতাবের পাতা ওল্টায় কি করে? ষ্ট্যাম্প আঁটে কি করে? গ্রামে ঘূর্ণী হাওয়ায় ধুলো যখন পাক খায় ঠাকুমা নাতির অঙ্গে থুতু দেন থু থু করে পাছে ভূতে পায়। এক মেম বাঙ্গালীর প্রেরিত খানা পেয়ে সকল 'ডোঙ্গা'র ঢাকনা খুলে থু থু করে দিয়ে সাহেবকে ডাকতে গেল পাছে ওয়েটাররা কিছু চুরি করে।

হোটেলের 'ওয়েটার' জিব দিয়ে চেটে প্লেটের দাগ ছাড়িয়ে চট করে কোমরে বাঁধা ঝাড়নে মুছে খাবার 'সার্ভ' করে। সেকালে আমাদের স্কুলে 'মাষ্টার মশায় নেতিটা ভিজিয়ে আনি' বলে ছুটি পাওয়া যেত না। মাষ্টার বলতেন, 'সেলেট' নিয়ে আয়। তাতে থুৎকুড়ি দিয়ে বলতেন 'মোছ'। ইতর ভদ্রের একই রকম ইল্লৎ দেখে মহাত্মা অসাধ্য সাধনে ব্যাপৃত হলেন। একাকারের পথ খুলে দিলেন।

নন-কোঅপারেশনের সময় যখন সরকারী বড় অফিসার কেউ এলাহাবাদের প্রধান সড়ক দিয়ে যেত, দুধারের ফুটপাথে হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকেরা 'থ্যাক-থো' চিৎকার করতো। বাংলাতেও আমরা কনে দেখে এসে বলি হ্যাক থুও নয় আহা মরিও নয়। বন্দুকে মরচে দেখলে সভ্য বৃটিশ আরমির স্ল্যাং হচ্ছে—"Spit and polish." হাড়ি, মুচী, ডোম, বাগদীর দোষ ধরলে চলবে কেন?

মুচী, বাগদী, ডোম, হাড়ি, বুনো সকলে এক সঙ্গে খাবার জিনিষ তুলছে। ঝুড়ি, নেকড়া, থলে এনেছে। ছেলেমেয়ে পুরুষ একমন হয়ে জিনিষ কুড়চ্ছে। বৃহৎ লুচির গাদা পাতে পাতে পড়ে আছে, অফুরন্ত বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা গড়াগড়ি দিচ্ছে, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, রাণাঘাটের পান্তুয়া, উলোর দেদো-মন্ডা, শান্তিপুরের খৈচুর, নিখুঁতির মেঠাই পাতে ও মাটিতে স্তূপাকার হয়ে আছে। পাঁপড় ভাজার কি বাহার! মুচী পদদলিত হয়ে 'কর কর' শব্দ করছে। মটরশুঁটির কচুরি ফেলে কেউ পাঁপড় খায়নি। খুরি খুরি দৈ, ক্ষীর পড়ে আছে। অনেকবার পরিবেশন হয়েছে। পেট ভরা তো মোট নয়! ছোট ছোট ছেলেরা এই খুরি হাতে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। এত জিনিষ পরিবেশন করা মানে তুমি দেখ আমি কত বড় মানুষ! যিনি যত জিনিষ ফেলবেন কলকাতাতেও তিনি তত দারিদ্র্য দুর্নাম হতে মুক্তি পাবেন। এই গরব আছে বলেই দরিদ্র কুড়িয়ে খেতে পায়।

একবার এক কর্তা স্বয়ং লুচি পরিবেশনকারীকে হুকুম করে বল্লেন, "ওরে, এই পাতে বারোখানা লুচি দে!" পরিবেশনকারী নিজের কমনসেনস্ খাটিয়ে মাত্র চারখানা ফুলকো লুচি দিল, কারণ তাঁর পাতে তখনও দশখানা লুচি মজুদ, চিবিয়ে শেষ করতে পারেননি। ভোজ্জীর পাতে যত বেশী ভোজ্য ঢালা হয়, তিনিও নিজেকে তত সমাদৃত মনে করেন।

কর্তা জ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁত খিঁচুলেন "তোর বাবার লুচি?" নিজে ঝুড়ি কেড়ে নিয়ে উল্টে দিয়ে প্রায় ২০০ লুচি ভদ্রলোকটির পাতে ঢেলে দিলেন। কাজেই মুচীদের পোয়া বারো, চক্ষু জ্যোতির্ময়, ঠোঁট আনন্দে বিস্ফারিত। তিন চার দিনের আহার সংগ্রহ হ'ল।

এই অজাতির দল অন্যান্য "কল্লর" বা জাতিভ্রষ্টদের সঙ্গে সমবেত সভার মধ্য দিয়ে, দ্বারাভিমুখে পিঠে মাল বোঝাই বলদের মত চলে গেল। দৈ, ক্ষীর, ডাল, পোলাওয়েতে নেবড়ে রয়েছে মাঠ। খাদ্য লেপনে স্থান যত পচে উঠচে হাওয়া তত সুবাসিত হচ্ছে। মুচিপড়া শেষ।

ছোটখাট "মুচীপড়া" রোজ কলকাতার রাস্তায় দেখা যায়। সিগারেট শেষ অংশটুকু ফুটপাথে ফেলে দেবামাত্র একটা ছোঁড়া সেই জ্বলন্ত টুকরা ফুঁকতে আরম্ভ করে। যদি আপনার হৃদয়ে দয়া থাকে তবে অন্ততঃ সিকি ইঞ্চি থাকতে ফেলবেন।

শশা শেষ করে খাওয়া দয়ার লক্ষণ নয়। ফুটপাতের ভ্যাগাবণ্ড ছোঁড়া ক্ষুধায় কাতর। একবার একটা ছোঁড়া দেখে বুঝেছে এক ভদ্রলোক সব শশাটাই খাবেন। তাই খানিকটা থাকতে চিৎকার করলো "বাবু! পোকা, পোকা, পোকা!" বাবু শশা ফুটপাথে ফেল্লেন। ছোঁড়া কুড়িয়ে খেতে লাগলো। বাবু নষ্টামি বুঝতে পেরে ছোঁড়ার হাতটা খপ্ করে ধরলেন থাবড়া দেবেন বলে। ছোঁড়া "ঘা! ঘা! ঘা!" করে চেঁচিয়ে উঠ্লো। পাছে পুঁজ লাগে বলে বাবু হাত ছেড়ে দিলেন, শশা চিবুতে চিবুতে ছোঁড়া চলে গেল। ফিকিরে-ই পেট ভরে।

"কিঞ্চিৎ দেব বঞ্চিত করবো না" কথাটা মনে রেখে তরমুজের রাঙা শাঁসটাই কেবল খাবেন। একটা কাঙালী বলেছিল "দিদি লো, হ্যাংলা গিন্নীর দয়া-ধম্মো দ্যাখ্! সাদা শাঁসটুকুও খেয়েছে, কেবল ব্যাক্লা ফেলেছে"।

আখের ছিবড়ের পুরান গল্প বিবেকানন্দ রোডে আপনার সত্য বলে প্রতীতি জন্মাবে। এক দাড়িবালা নোংরা যুবা আফিসের দোকানের ওপারে আখের ছিবড়ে কুড়িয়ে চিবায়। সে নিশ্চয় মনে মনে বলে "বাবুটা কি ক্যাংলা, ছিবড়েতে একটু করুণার রস রাখেনি; বাঘও শেয়ালটাকে মনে রেখে মাংস এত কষে চিবায় না, এক পলা রক্তর সঙ্গে ছিবড়ে ফেলে রাখে।"

পূজোয় কোথায় যাবো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

পুজোয় কোথায় যাবো—
কোথা যাবো সেই ভাবনায়
ঘুম নেই, হাজার হাজার
চিন্তা ভিড় করে আসে—
আমি ও খোকার মা
নিস্তব্ধ নীরব আশপাশে
মুখোমুখি বসে থাকা
মেল ট্রেণে ছোট কামরায়,
কত না বিচিত্র দেশ,
কত কত পাহাড়ী ঝরণায়,
নির্মেঘ আকাশ নীলে,
শম্ শম্ অরণ্য বাতাসে
জীবন উজাড় করা গান
বাজে অপূর্ব উল্লাসে:
টাইম টেবিল দেখি—
ভর করি মন-পাখনায়!

সূর্যাস্তের সোনা-সোনা
আশ্চর্য ও বাহারে বিকেলে
ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোনো
ঘর থেকে বের হলে পর—
গীতিরিশে, বাড়ীতে আজ
রুগ্না স্ত্রী পথ্য কী খেলো
সে চিন্তাও দূরে যায়:
ক্লান্ত কানে ভাসে শুধু শরতের স্বর।
হাওড়া ষ্টেসন জাগে,
আঁকা বাঁকা মোহিনী সড়ক
আশী টাকা বোনাসকে
ব্যঙ্গ করে খোঁচায় কুহক!

দেহশ্রী — মনোতোষ রায়

শঙ্কর

(১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এমনি করে প্রায় যখন সে দুর্দশার শেষ ধাপে নেমে এসেছে তখন আমাদের অন্যতম বন্ধু দুর্গাপদ তাকে বল্লে—আমাদের বাড়ীতে তো অনেক ঘর পড়ে রয়েছে, তুই সেখানে এসে থাক, খাওয়া-দাওয়াও আমাদের সঙ্গেই করবি—তারপরে নিশ্চিন্ত হোয়ে একটা চাকরী খুঁজে নিয়ে তখন অন্য কোথাও গেলেই হবে।

কিন্তু শঙ্কর তাতেও রাজী হলো না। সে বল্লে—যে পাড়ায় আমরা একদিন মাথা উঁচু করে থেকেছি সেখানে কারুর বাড়ীতে অন্নদাস হোয়ে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলে—দেখ্ না তোরা, শীগ্‌গীরই একটা প্যাচ লাগাচ্ছি।

দিন দুই পরে শঙ্করের মেসে গিয়ে জানলুম, সত্যিই সে প্যাচ লাগিয়েছে অর্থাৎ দিন দুই থেকে সে উধাও হয়েছে, আর মেসে আসেনি। মেসওয়ালা বল্লে যে, শঙ্করবাবুর কাছে মাস চারেকের পাওনা বাকী পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সে জানালে যে, শঙ্করবাবু অতি ভদ্রলোক—টাকা একদিন না একদিন তিনি শোধ করে দেবেনই।

আমরা শঙ্করের ঘরে গিয়ে দেখলুম, যে ট্রাংকটা নিয়ে সে বিলেত গিয়েছিল সেটা খাটের নীচে পড়ে আছে। খালি তক্তপোষে ছেঁড়া পেন্টালুন ও সার্ট পুঁটলী করে বেঁধে বালিশ করে সে শুতো—তা যেমন তেমনই পড়ে আছে। দেখা গেল, ঘরের এককোণে ছেঁড়া জুতোটাও সে ফেলে গেছে।

শঙ্কর এইভাবে চলে যাওয়ায় সত্যিই মনটা বড় খারাপ হোয়ে গেল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপর নানা অনুভূতির প্রলেপ পড়তে পড়তে আমাদের বন্ধু শঙ্কর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল।

প্রায় পনেরো বছর শঙ্করের কোনো খোঁজ পাইনি। একদিন হাওড়া অঞ্চলে একটা ঠিকানার খোঁজে গিয়েছি। এ গলি সে গলি ঘুরতে ঘুরতে কেমন করে একটা বস্তীর সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সরু কাঁচা রাস্তা দু-পাশে খোলার বাড়ীর সারি। বাড়ীগুলোর সামনে আবর্জনার স্তূপ প্রায় মানুষের সমান উঁচু হোয়ে আছে। একটু আগে বৃষ্টি হওয়ার সেই ময়লা থেকে গন্ধ ছুটেছে। রাস্তা হয়েছে পেছল আর সেই পেছল রাস্তায় পালে পালে মনুষ্যাকৃতি কাদায় মাখামাখি করে ছুটোছুটি করছে—কোনো রকমে কোঁচার নাসারন্ধ্র টিপে ধরে রাস্তাটুকু পার হচ্ছি এমন সময়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করল—এখানে কোথায় আসা হয়েছিল? মুখ তুলে দেখি রাস্তার কল টিপে একটা লোক বালতিতে জল ভরছে। মিস্ কালো তার রং, মাথায় টাকের চারপাশে পাকা চুল উর্দ্ধমুখী হোয়ে আছে। পেণ্টুলান পরা তবে পায়ের কাছটা গুটিয়ে একেবারে হাঁটু অবধি তোলা—তার ভেতর থেকে কালো কাঠির মত দুটো উলঙ্গ পা বেরিয়ে রয়েছে, পায়ের অনুপাতে হাতও তেমনি সরু। মুখের হাড়গুলো সব যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আমি লোকটার দিকে অবাক হোয়ে দেখছি এমন সময় বালতিটা তুলে নিয়ে আমার কাছে এসে সে বল্লে—কি বাবা, চিনতে পারলে না তো! আমি শঙ্কর।

তুমি শঙ্কর!!

শঙ্কর বল্লে—এদিকে কোথায় গিয়েছিলে! চল আমার ওখানে।

শঙ্কর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে। খোলার বাড়ীতে একটা ঘর—খোলার বাড়ী হিসাবে ঘরখানা বেশ বড়। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি অতিশয় শীর্ণা একটি স্ত্রীলোক মেঝের ওপর চেটাইয়ে বসে তাড়ি খাচ্ছে! তার সামনেই মুখে নেকড়া বাঁধা বেশ বড় একটি তাড়ির ঝাঁপ্পা রয়েছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে মুখ তুলে একবার আমাদের দিকে চেয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলে।

ঘরের মধ্যে দু-দিকে দু-খানা জারুল কাঠের খাট। একখানার ওপরে একটা মাদুর ও একটা বালিশ পড়ে আছে। তাড়ির দুর্গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না এমন অবস্থা। দেখলুম, এক কোণে আরও তিন চারটে তাড়ি ভর্ত্তি কলসী রয়েছে—দলে দলে মধুলোভী মক্ষিকা সেগুলি ঘিরে গুঞ্জন করছে।

আমাকে সেই মাদুরপাতা খাটখানার ওপর বসিয়ে শঙ্কর জলভরা বালতিটা ঘরের এক কোণে রেখে আমার পাশে এসে বসে বল্লে—তারপর। তোমাদের সব খবর কি ভাই! ওঃ কতদিন বাদে দেখা হোলো!

বল্লুম—আমাদের খবরের কথা ছেড়ে দাও—তোমার খবর কি? সেই যে মেস থেকে উধাও হোয়ে চলে গেলে তারপরে এই দেখা।

শঙ্কর একটু হেসে বল্লে—আমার খবর কি আর বলতে হবে—দেখেই বুঝতে পাচ্ছ তো সব।

কথা বলতে বলতে একবার সে টপ্ করে উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা তাড়ির কলসী তুলে নিয়ে এসে খাটের তলা থেকে একটা মোটা কাঁচের গেলাস টেনে নিয়ে তাড়ি ঢালতে ঢালতে বল্লে—মেস্ থেকে উধাও হোয়ে গিয়েছিলুম কাশীতে। সেখানে ছেলে পড়ানোর কাজ করতুম আর ছত্রে খেতুম।

এক গেলাস তাড়ি ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে শঙ্কর বল্লে—খা।

আমি খাব না বলাতে শঙ্কর বল্লে—কেন তাড়ি খাস্ না—খুব ভাল জিনিষ

বল্লুম—সকাল বেলা নেশা করলে সারাদিনই চালাতে হবে সেইজন্য—

ওঃ—বলে শঙ্কর নিজেই এক চুমুকে গেলাসটা মেরে দিলে।

শঙ্কর বলতে লাগল—কাশী থেকে সে মেস্-ওয়ালার পাওনা টাকা মাসে মাসে পাঠিয়ে শোধ করে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কাশী ছেড়ে এখানে কতদিন হোলো এসেছিস্?

—এখানে এসেছি তা পাঁচ-ছ বছর হবে। কাশীতে টিকতে পারলুম না—দশ বছর ধরে নানা ছত্রে খেয়ে খেয়ে রক্তআমাশা ধরে গেল।

শঙ্কর বলে চলল দীর্ঘ কাহিনী—তার দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস। যেখানেই সে গিয়েছে দুর্দশার দূত কেমন করে তাকে ধাওয়া করেছে—সঙ্গে সঙ্গে গেলাস গেলাস তাড়িও চলতে লাগল। বলতে বলতে কখনো সে কাঁদে কখনো হাসে। বল্লে—কাশী ছেড়ে এখানে এসে এই ঘরখানা ভাড়া নিয়েছি। বরাত সে সময়ে ভাল ছিল—কারণ এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলা লরী চালাবার জন্য জনকয়েক লোকের দরকার ছিল—দরখাস্ত করতেই চাকরীটা লেগে গেল। পঞ্চাশ টাকায় ঢুকেছিলুম, এই পাঁচ বছরে সত্তর টাকা হয়েছে।

বল্লুম—সত্তর টাকায় তো এর চেয়ে ভালভাবে থাকতে পারিস্?

শঙ্কর বল্লে—দূর! কুড়ি টাকা তো তাড়ি খেতেই যায়—পাঁচ টাকা ঘরভাড়া—রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করিনি, ঐ মোড়ের দোকান থেকে তন্দুরের রুটি কিনে আনি—কোনো দিন শিক কাবাব, কোনো দিন টিকিয়া, কোনো দিন সুখা—বেশ রাঁধে ওরা—খাবি।

বল্লুম—না ভাই, সকাল বেলা আর ও সব চলবে না। শঙ্কর বল্লে—তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চাকরী—ক'দিন হোলো ধাঙড়েরা ধর্মঘট করায় কাজ বন্ধ আছে।

শঙ্কর গেলাসের পর গেলাস তাড়ি ওড়াতে লাগল। ক্রমেই তার কথা এড়িয়ে আসতে লাগল। তারপর সেই তেলচিটে বালিসটা টেনে এনে তাতে মাথা দিয়ে আমার পাশেই শুয়ে পড়ল। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সেই স্ত্রীলোকটি আগেই চেটাইয়ের ওপর অঙ্গ ঢেলে দিয়েছে। ঘর হোয়ে পড়ল নিস্তব্ধ। তাড়িখোর মক্ষিকাদের গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হোয়ে উঠতে লাগল।

চুপ করে বসে বসে কি করব তাই ভাবছি—বাইরে শিশুদের কোলাহল, জলের কলের কাছে নারীদের কলরোল, কয়লার দোকানের চীৎকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের ধিক্কার, অদূরে রেল-ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস ও ভোঁ সব জোট পাকিয়ে এক অখণ্ড ওঙ্কারের মত আমার কানে এসে বাজতে লাগল, আর তারই প্রভাবে আমার মন, আমার চেতনা স্তিমিত হোয়ে আসতে লাগল। এরই মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতন একটা চিন্তা আমাকে খোঁচা দিতে লাগল—এ আমি কোথায় এসে পড়লুম! ভূতলে ঐ যে নারী নেশার ঘোরে পড়ে রয়েছে—কেন? শঙ্কর বলে ছেলেবেলায় আমরা যাকে চিনতুম সেই বা এখানে এল কি করে! শঙ্কর আজ যে অবস্থার মধ্যে পড়েছে আমিও তো সে অবস্থায় পড়তে পারতুম। শুধু আমি কেন! আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে কেউ এই অবস্থায় পড়তে পারত। কি জানি কেন আমার মনে হোতে লাগল শ্মশানবাসী শঙ্কর যেমন জগদ্বাসী জীবকে রক্ষা করবার জন্য কালকূট কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন সেই রকম আমাদের সকলের প্রাপ্য দুর্দশা শঙ্কর একাই বহন করে চলেছে।

সহানুভূতিতে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে লাগল। শঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরবার অদম্য ইচ্ছা আমায় অস্থির করে তুল্লে। আমি তার অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ অঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে ডাকলুম—শঙ্কর—শঙ্কর ভাই—

শঙ্কর কোনো জবাব দিলে না। ভূতলশায়িনী সেই স্ত্রীলোকটি দু-হাতে ভর দিয়ে খানিকটা উঠে বল্লে—ও এখন উঠবে না—উঠতে বার নাম বেলা তিনটে।

এই বলেই সে আবার শুয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ শঙ্করের গায়ে হাত বুলোলুম—কিন্তু সে জাগলে না দেখে আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

নিতান্ত হালকা মামলা

(২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

জয়ন্ত অবিচলিতভাবে বললে, "আপনি মহীতোষ সেনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?"

—"ভুলিনি, কারুকেই ভুলিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক ?"

—"চিঠিতে সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা গোপন করেছে। কালীবাবু তাকে নিশ্চয়ই চিনতেন।"

"ও-রকম গোপনতার মানে হয় না। কালীবাবু বেঁচে থাকলে সে যে নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, এটাও ভুলবেন না যেন।"

—"হ্যাঁ, পরে সত্যই দেখা করতে সে এসেছিল হত্যার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু সে চিঠিখানা লিখেছিল অন্য উদ্দেশ্যে।"

—"কি উদ্দেশ্য ?"

"ঐ চিঠির সঙ্গে কালীবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হ'লে সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হবে, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন। দৈবগতিকে তদন্তে কেউ আসল ব্যাপার সন্দেহ করলেও, সে থাকবে নিরাপদে। কারণ, পরে তার হাতের লেখা বা ঠিকানা নেই।"

ভূপেন হতাশভাবে বললে, "এ যে বিশ বাঁও জলের নীচে পড়লুম রে বাবা। যাকে জানি না, চিনি না, তাকে ধরব কেমন ক'রে ?"

ভূপেনের হাতে একখানা ফোটো গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "বন্ধুদের সঙ্গে সদলবলে এই দেখুন মহীতোষকে। ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিই হচ্ছে আপনার আসামী। চিনতে পারেন ?"

ছবির উপরে চোখ বুলিয়ে ভূপেন ঘাড় নেড়ে বললেন, "মোটেই না।"

জয়ন্ত আর একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, "এর মধ্যে মহীতোষের মূর্তি 'এনলার্জ' করে দেখানো হয়েছে। ছোট ছবিতে ওর মুখের খুঁটিনাটি ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছিল না। মহীতোষের দাড়ি-গোঁফ কামানো ছিল, কেবল আমি সখ ক'রে তার নাকের তলায় ছোট্ট এক-জোড়া গোঁফ এঁকে দিয়েছি। এখন বলুন তো মহাশয়, ঐ গোঁফ, ঐ জোড়া ভুরু আর ডান গালের ঐ আঁচিল আপনি এর আগে আর কোন মুখে দেখেছেন কিনা ?"

ভূপেন দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত ক'রে তুলে বললে, "আরে এ যে মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি !"

—"তাহ'লে এবারে চিনতে পেরেছেন ? উত্তম ! হ্যাঁ, মতিলালই হচ্ছে খুনী এবং মহীতোষ সেন। নাম ভাঁড়িয়ে সে কালীবাবুর কাছে চাকরি নিয়েছিল। কালীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে তার যোগসাজস থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে মাধবী দেবী যে তাঁর পূর্ব-স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একে পূর্ব-প্রেম, তার কালীবাবু বৃদ্ধ আর মতিলাল প্রায় যুবক, সুতরাং মাধবীকে খুব দোস দেওয়াও যায় না—যৌন নির্বাচনে জয় হয় প্রায়শঃ যৌবনেরই। কালীবাবুকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ত অনেকদিন পূর্বেই, কিন্তু মাত্র ছয়দিন আগে উইলে মাধবীকে জীবন-স্বত্ব দিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুকে ঘনিয়ে এনেছিলেন নিজেই। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করুন ভূপেনবাবু, আপাততঃ বিদায় মাগে সখের গোয়েন্দারা।"

জয়ন্তের দুই হাত চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন বললেন, "স্বীকার করি, আপনি হচ্ছেন অতুলনীয় !"

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "কিছু না, কিছু না। সত্যই এটা নিতান্ত হালকা মামলা, নইলে এত সহজে কিনারা হ'ত না। তবে ব্যাণ্ডেজ আর টাইপরাইটার নিয়ে ভ্রম না করলে মতিলালকে মহীতোষ বলে চিনতে পারলেও কেউ তার কিছুই করতে পারত না। সে ধরা পড়ল খালি সামান্য অসাবধানতার জন্যেই। চ'লে এস মাণিক, এখন ভূপেনবাবু যাবেন মহীতোষের খোঁজে।"

হাসপাতালে

(২২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মণিমালা আগের দিন বাড়ী ফিরবে। সরলা ছুটি পাবে পরদিন।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করে, খুসী হয়েছেন তো ? ছেলে হয়েছে ?

: খুনে ছেলে। প্রায় খুন করে ফেলে-ছিল।

মণিমালা একটু ভেবে বলে, এখন আপনাকে বলি, দোষ হবে না। জানেন, এই হাসপাতালে আমার মা ছেলে বিয়োতে এসে মরে গিয়েছিল ? ভাইটা বেঁচে আছে। আপনাকে শুধু কষ্ট দিয়েছে নির্দোষ অজ্ঞান বেচারা আমার খুনে ভাইটা মা-কে খেয়ে শেষ করে-ছিল।

সরলা চমৎকৃতা হয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার ভয় হল না এই হাসপাতালে আসতে ?

মণিমালা শীর্ণ সুন্দর মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলে, ভয় ? কি জানি। সব যেন কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল, দশ মাসের পেটের দায়টা ঠিকমত নামানো ছাড়া কোন ভাবনা-চিন্তা ছিল না। নিজে মরব কি বাঁচব, মোটেই তো ভাবিনি।

সরলা হেসে বলে, ওটাই তো আসল কথা। নইলে এত ঝন্‌ঝাট, এত যন্ত্রণা সয়ে তুমি আমি মা হতে চাইতাম ? মুসকিল তো ওইখানে—এতেই আমরা বাঁচার মজা পাই—খুসী মনে বার বার মা হতে চাই !

ঠিকানা নেওয়াই ছিল।

ছেলের ঘাড় শক্ত হতেই সরলা তাকে নিয়ে মণিমালার দু'খানা ঘরের ছোট ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়।

ছেলেকে মণিমালার কোলে তুলে দিতে দিতে বলে, যা, আসল মায়ের কাছে যা। আমি তো শুধু বিইয়েছিলাম, এই মা তোর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

বলে' মণিমালার মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়।

মণিমালা বলে, ইস, সে কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আপনার জ্ঞান হতে যদি আর কিছুক্ষণ দেরী হত, গেলাস ছুঁড়ে মেরে আমায় জাগাবার বুদ্ধি যদি মাথায় না আসত—মাগো ! ডাক্তার বলছিলেন, দশ পনের মিনিট দেরী হলে ফাঁড়া কাটত না।

সরলা প্রথমেই লক্ষ্য করেছিল যে, মণি-মালার চুলে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে, মুখের চেহারাও সেজন্য অনেকটা অন্য রকম হয়ে গেছে। হাসপাতালে দেখেছিল মোটা লম্বা গোছের পিট ঢেকে দেওয়া চুল, সেই চুল আজ দাঁড়িয়েছে অল্প বয়সী স্কুলের মেয়েদের চুলের মত।

একেলে সখের ব্যাপার কিনা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে চুলের কথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। পরে জেনে নেবে ভেবে সে প্রশ্ন করে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। গেলাস ছুঁড়ে তো মারলাম মাথায়, তুমি চীৎকার করে ধড়মড়িয়ে উঠেছিলে। খুব লেগেছিল, না ?

একটু হেসে মণিমালা বলে, মাথা কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। অনেকটা কেটেছিল। মেয়ে সামলাতেই প্রাণ যায়, ওদিকে নজর দিতে খেয়াল থাকেনি। ঘাড়টা একেবারে সেপটিক হয়ে গিয়েছিল। মাথা নাড়া করতে হয়েছে !

: তাই চুলের এ দশা !

: কি করি, বব করে স্কুলের মেয়ে সেজেছি। বেশ একটা টাক পড়েছে, দেখবেন ?

চুল সরিয়ে মণিমালা তাকে ক্ষত চিহ্নটা দেখায়।

সরলার মুখের ভাব দেখে বলে, না না, দুঃখ করবেন না। একটু কেটেছে, একটা দাগ হয়েছে—তাতে কি ? ওতো চুলেই ঢাকা থাকবে। সত্যি কথা বলি, নাড়া হবার সময় কান্না পাচ্ছিল, বড় রাগ হচ্ছিল আপনার ওপর। কী চুল ছিল আমার সবাই হিংসা করত। নাড়া হবার পর কিন্তু আস্তে আস্তে ভারি আরাম লাগতে লাগল। আয়নায় মুখ দেখে মনটা খানিকক্ষণ বিগড়ে যেত, কিন্তু তারপরেই ভারি স্বস্তি লাগত।

মণিমালা একটু হাসে। সহজ শান্ত হাসি।

: বেঁচেছি মনে হয়। মোটা গোছের লম্বা চুল থাকার সোজা ঝন্‌ঝাট ? মেয়ে নিয়েই পারি না—একটা বোঝা থেকে যেন রেহাই পেয়েছি।

সরলা বলে, তোমার চুলের বাড় আছে। দেখতে দেখতে আগের মত হয়ে যাবে। আরও হয়তো ভাল হবে, নাড়া হলে চুল বাড়ে।

মণিমালা মাথা নেড়ে বলে, চুল আর আমার বাড়বে না। বাড়তে দিলে তো বাড়বে। আমার দরকার নেই একগাদা চুলের গন্ধ বাড়াবে খোঁপার। অন্যদের মনে হিংসা জাগাবার বিশ্রী সুখও আমি চাই না। মাগো মা, চুল নিয়ে কী হাঙ্গামা, শুধু তেলের কি খরচ চুলের পেছনে।

সরলা একটু আশ্চর্য হয়েই মণিমালার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মণিমালার মেয়ে তার কোলে, মণিমালার কোলে তার ছেলে। এর সঙ্গে কিন্তু বেমানান মনে হয় না, মেয়েমানুষ হয়েও মণিমালার মোটা গোছের লম্বা চুলের মায়া কাটানোর কিম্বা সেকেলে মাঝ-বয়সী গিন্নিবান্নি মানুষ হয়েও মণিমালার সঙ্গে তার ভাব জমানোর।

চলমান সম্পত্তি

ভূপেনের ...
দিয়ে জয়ন্ত বললে ...
এই দেখুন মহী...
দ্বিতীয় ব্যক্তিই ... আপনার আসামী ...
চিনতে পারেন ?"

ছবির উপরে চোখ বুলিয়ে ভূপেন ঘাড় নেড়ে বললেন, "মোটেই না।"

জয়ন্ত আর একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, "এর মধ্যে মহীতোষের মূর্তি 'এনলার্জ' করে দেখানো হয়েছে। ছোট ছবিতে ওর মুখের খুঁটিনাটি ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছিল না। মহীতোষের দাড়ি-গোঁফ কামানো ছিল, কেবল আমি সখ ক'রে তার নাকের তলায় ছোট্ট এক-জোড়া গোঁফ এঁকে দিয়েছি। এখন বলুন তো মহাশয়, ঐ গোঁফ, ঐ জোড়া ভুরু আর ডান গালের ঐ আঁচিল আপনি এর আগে আর কোন মুখে দেখেছেন কিনা ?"

ভূপেন দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত ক'রে তুলে বললে, "আরে এ যে মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি !"

—"তাহ'লে এবারে চিনতে পেরেছেন ? উত্তম ! হ্যাঁ, মতিলালই হচ্ছে খুনী এবং মহীতোষ সেন। নাম ভাঁড়িয়ে সে কালীবাবুর কাছে চাকরি নিয়েছিল। কালীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে তার যোগসাজস থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে মাধবী দেবী যে তাঁর পূর্ব-স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একে পূর্ব-প্রেম, তার কালীবাবু বৃদ্ধ আর মতিলাল প্রায় যুবক, সুতরাং মাধবীকে খুব দোষ দেওয়াও যায় না—যৌন নির্বাচনে জয় হয় প্রায়শঃ যৌবনেরই। কালীবাবুকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ত অনেকদিন পূর্বেই, কিন্তু মাত্র ছয়দিন আগে উইলে মাধবীকে জীবন-স্বত্ব দিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুকে ঘনিয়ে

...ঠিকানা নেওয়াই ছিল।

ছেলের ঘাড় শক্ত হতেই সরলা তাকে নিয়ে মণিমালার দু'খানা ঘরের ছোট ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়।

ছেলেকে মণিমালার কোলে তুলে দিতে দিতে বলে, যা, আসল মায়ের কাছে যা। আমি তো শুধু বিইয়েছিলাম, এই মা তোর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

বলে' মণিমালার মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়।

মণিমালা বলে, ইস, সে কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আপনার জ্ঞান হতে যদি আর কিছুক্ষণ দেরী হত, গেলাস ছুঁড়ে মেরে আমায়

এনেছিলেন নিজেই। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করুন ভূপেনবাবু, আপাততঃ বিদায় মাগে সখের গোয়েন্দারা।"

জয়ন্তের দুই হাত চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন বললেন, "স্বীকার করি, আপনি হচ্ছেন অতুলনীয় !"

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "কিছু না, কিছু না। সত্যই এটা নিতান্ত হালকা মামলা, নইলে এত সহজে কিনারা হ'ত না। তবে ব্যাণ্ডেজ আর টাইপরাইটার নিয়ে ভ্রম না করলে মতিলালকে মহীতোষ বলে চিনতে পারলেও কেউ তার কিছুই করতে পারত না। সে ধরা পড়ল খালি সামান্য অসাবধানতার জন্যেই। চ'লে এস মাণিক, এখন ভূপেনবাবু যাবেন মহীতোষের খোঁজে।"

—

বেশ একটু ...
চুল সরিয়ে ...
দেখায়।

সরলার ...
দুঃখ করবে...
হয়েছে—...
সত্যি কথা ...
পাচ্ছিল, ...
চুল ছিল ...
হবার পর কিন্তু ...
লাগতে লাগল। আয়না...
খানিকক্ষণ বিগড়ে যেত, কিন্তু ...
স্বস্তি লাগত।

মণিমালা একটু হাসে। সহজ...
: বেঁচেছি মনে হয়। মোটা গো...
চুল থাকার সোজা ঝনঝাট ? মেয়ে নিয়ে...
না—একটা বোঝা থেকে যেন রেহাই পেয়েছি...

সরলা বলে, তোমার চুলের বাড় আছে, দেখতে দেখতে আগের মত হয়ে যাবে। আরও হয়তো ভাল হবে, ন্যাড়া হলে চুল বাড়ে।

মণিমালা মাথা নেড়ে বলে, চুল আর আমার বাড়বে না। বাড়তে দিলে তো বাড়বে। আমার দরকার নেই একগাদা চুলের মস্ত সাজানো খোঁপার। অন্যদের মনে হিংসা জাগাবার বিশ্রী সুখও আমি চাই না। বাবাগো মা, চুল নিয়ে কী হাঙ্গামা, শুধু তেলের কি খরচ চুলের পেছনে।

সরলা একটু আশ্চর্য হয়েই মণিমালার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মণিমালার মেয়ে তার কোলে, মণিমালার কোলে তার ছেলে। এর সঙ্গে কিন্তু বেমানান মনে হয় না, মেয়েমানুষ হয়েও মণিমালার মোটা গোছের লম্বা চুলের মায়া কাটানোর কিম্বা সেকেলে মাঝ-বয়সী গিন্নিবান্নি মানুষ হয়েও মণিমালার সঙ্গে তার ভাব জমানোর।

—

চলমান সম্পত্তি

পান্না সেন

"শরৎ আলোর কমল বনে"— ক্ষীরোদ রায়

এমন অনেককে জানি যাঁরা দক্ষিণ ভারত বেড়িয়ে গেছেন অথচ মহীশূর রাজ্যে আসেন নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, মাদুরা, রামেশ্বর বা তিরুপতির মত এখানে কোন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নেই। কিন্তু এ রাজ্যে প্রাচীন হিন্দুযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এমন কতকগুলি নিদর্শন আছে আমাদের শিল্পকলার ইতিহাসে যার স্থান মহাবলীপুরম্ ও ইলোরার পরেই। এ ছাড়াও এখানকার প্রধান আকর্ষণ হ'ল মহীশূর শহরটি। মহীশূরের মত মনোরম শহর সারা দক্ষিণ ভারতে আমাদের একটিও চোখে পড়ে নি।

মাদ্রাজ থেকে মহীশূরের পথে আমরা বাঙ্গালোর অভিমুখে রওনা হলাম। মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর ছ' সাত ঘণ্টার পথ। রাতের ট্রেনে না গিয়ে আমরা ইচ্ছে করেই দিনের গাড়ীতে গেলাম এই ভেবে যে গাড়ীতে বসেই এ রাজ্যের বাইরের চেহারার কিছুটা দেখা যাবে নীলগিরির ও আরাবলী পাহাড়ের উপত্যকায় মহীশূর রাজ্যটি সাগরাঙ্ক থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। কাবেরী নদী এই কঠিন পাহাড়ে-জায়গাকে করে তুলেছে সম্পদশালী। আমরা যতই বাঙ্গালোরের দিকে এগুতে লাগলাম ততই চোখে পড়তে লাগল চারিদিকে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে সাত আটটি কুঁড়েঘর নিয়ে এক একটি ছোট গ্রাম। এগুলো ঠিক বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের মত নয়। কয়েকটা বাঁশের খুঁটির ওপরে তালপাতা বা নারিকেল পাতার ছাউনি গোল হ'য়ে ওপর থেকে নেমে এসেছে প্রায় মাটি পর্যন্ত। কোন দরজা বা জানালার বালাই নেই। দেখলাম হামাগুড়ি দিয়ে এর মধ্যে ঢুকতে হয়। কাছেই পাহাড়ের গায়ে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি চরে বেড়াচ্ছে। মনে হ'ল পশুচারণ এদের প্রধান উপজীবিকা। অনেকে আবার এই কঠিন শুকনো পাহাড়ের খানিকটা জমিতে চাষ করে শস্য প্রভৃতি কিছু কিছু ফসলও ফলিয়েছে। খুব সম্ভব এই কুঁড়েঘরবাসীরা মাঝে মাঝে তাদের ঐ সামান্য ফসল, পশুর চামড়া ও লোম নিয়ে শহরে যায় বিক্রি করতে, বিনিময়ে নিজেদের নিরাড়ম্বর জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনে। যখন আমরা বাঙ্গালোরে পৌছলাম তার একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাহাড়ে জায়গায় - বৃষ্টি হলেই বেশ ঠান্ডা পড়ে, সুতরাং ট্রেণ থেকে নেমে আমাদের বেশ শীত করতে লাগল।

বাঙ্গালোর শহরের নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বহু শতাব্দী আগে একদিন হোয়সলরাজ বীরবল্লাল মৃগয়া করতে বেরিয়ে তাঁর অনুচরদের সঙ্গ হারিয়ে [illegible] পথ খুঁজে না পেয়ে বনের মধ্যে [illegible] রাত্রির আঁধার নেমে আসে। [illegible] একটি কুটীর দেখতে পান। [illegible] বৃদ্ধা থাকত। পরিশ্রান্ত ও [illegible] কাছে কিছু খাবার চান।
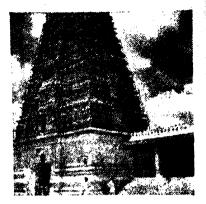
মহীশূর সহরের উপকণ্ঠে চামুণ্ডী পা[illegible] উপর বিখ্যাত নন্দীবৃষ মূর্তি

চামুণ্ডী মন্দিরের গোপুরম বা প্রবেশদ্বার।

বৃদ্ধার ঘরে কিছুই ছিল না। সে শুধু কয়েকটা শুকনো সীম জলে সিদ্ধ করে দিল। সেই সিদ্ধ সীমের থেকে কিছু তাঁর ঘোড়াকে দিয়ে বাকীটা নিজে খেয়ে রাজা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। রাতটা কোনরকমে ঐ কুটীরে কাটিয়ে পরদিন সকালেই রাজা নগরে ফিরে যান। এই ঘটনাটি শীঘ্রই জানাজানি হয়ে গেল। পরে ঐ জায়গার চারপাশে যে জনপদ গড়ে উঠল তার নাম হল বাঙ্গালুরু অর্থাৎ বাঙ্গালু উরু। কানাড় ভাষায় বাঙ্গালু মানে একপ্রকার সবুজ সীম, উরু মানে শহর বা নগর। বর্তমান বাঙ্গালোর নামটি বাঙ্গালুরু শব্দেরই অপভ্রংশ।

বাঙ্গালোর শহরের দুটি ভাগ। বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট— পুরান শহর, বাঙ্গালোর সিটি— নূতন শহর। চমৎকার সাজান গোছান শহর— প্ল্যান করে তৈরী করা হয়েছে। সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোক-শোভিত চওড়া চওড়া কংক্রীটের রাস্তার দু পাশে উঠেছে নানাধরণের ইমারত। মাঝে মাঝে সুসজ্জিত, সুরক্ষিত পার্ক শহরের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য বাড়িয়ে তুলেছে। সিটিতে চিৎপেটের বাজারটি বেশ বড়। এখানকার বাঙ্গালোর সিল্কের দোকানগুলিতে মেয়েদের ভিড় লেগেই থাকে। শহরে সিনেমার ছড়াছড়ি সহজেই চোখে পড়ে। যে কোন রাস্তায় দু'পা এগোলেই একটি করে প্রেক্ষাগৃহ। অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহেই হিন্দী ছবি দেখান হচ্ছে। কিন্তু হিন্দী ফিল্মের গান কর্ণাটক সঙ্গীতের ঐতিহ্য কতটা নষ্ট করতে পেরেছে জানি না। শহরে সরকারী বাসের ব্যবস্থা বেশ ভালই মনে হল। টিপু সুলতানের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেওয়ানী-আম ও দেওয়ানী খাসের প্রায় বিনষ্ট কারুকার্য, হায়দরআলীর দুর্গ, লালবাগ প্রভৃতি এখানে ভ্রমণকারীর প্রধান আকর্ষণ। দুর্গের প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাধরেশ্বর গুহা-মন্দিরটি অবস্থিত। একটি ছোট পাহাড়ের ওপর গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গ ও পার্বতী মূর্তি আছে। এখানে পূজা আরতির জন্য একজন পূজারী থাকেন। গুহার সামনে চত্বরের মাঝখানে পাথরের লম্বা স্তম্ভের মাথায় একটা বড় ডম্বরু দূর থেকে দেখা যায়। শিবমন্দিরের ধ্বজস্তম্ভের শিখরে বৃষমূর্তির বদলে ডম্বরু আর কখনও দেখিনি। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানের গবেষণাগার ভারতের গৌরবের বস্তু।

বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর শহর মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ। মহীশূরের আগে পড়ে শ্রীরঙ্গপত্তম্।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় দেখা যাচ্ছে টিপু সুলতানের ভাঙ্গা দুর্গ—যেন প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় যেখানে ছিল কত কর্মচঞ্চলতা, সন্ধ্যার সংগে সংগে যার প্রতি কক্ষে জ্বলে উঠত সুদৃশ্য বেলোয়ারী কাচের আলো, যেখানে কত মন্ত্রণা সভা বসেছে—আজ তা শুধু অতীতের বীর সন্তান টিপুর স্মৃতিবহনকারী ধ্বংসস্তূপ মাত্র। কিন্তু শুধু কি টিপু সুলতান? মহীশূর রাজ্যের সংগে জড়িয়ে আছে কত পুরান ইতিহাস। প্রাচীনত্বের জন্য মহীশূর গৌরবান্বিতা। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শেষজীবন কাটে মহীশূরে; তখন অবশ্য এর নাম ছিল পুন্নাম। জৈনধর্মের নির্দেশ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে সিংহাসন ছেড়ে গুরু ভদ্রবাহুর সংগে মহীশূর রাজ্যের শ্রবণবেলগোলায় আসেন। সেখানে ভদ্রবাহুর মৃত্যু হয়। বার বছর তপস্যার পর তাঁর প্রিয় শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত গুরুদেবের পথানুসরণ করেন। অশোক মহিষমন্ডলে (মহীশূরে) ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধভিক্ষু পাঠিয়েছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পর গংগবংশীয়রা প্রভুত্ব করে এই উর্বর মনোরম ভূখন্ডে। শ্রবণবেলগোলায় জৈন সন্ন্যাসী গোমতেশ্বরের বিরাটমূর্তিটি গঙ্গারাজদেরই কীর্তি। গঙ্গাদের পরাজিত করে ওঠে চোলেরা। হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধন চোলদের মহীশূর থেকে বিতাড়িত করেন। দোরসমুদ্র (আধুনিক হাসান জেলার হালেবিড় গ্রাম) ছিল তাঁদের রাজধানী। বিষ্ণুবর্ধন ও তাঁর পৌত্র বীরবল্লালের রাজত্বকালই এই বংশের সব চেয়ে গৌরবের যুগ: বিষ্ণুবর্ধন রামানুজের প্রভাবে জৈনধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। হালেবিড়ের কেদারেশ্বর ও হোয়সলেশ্বর মন্দির ও বেলুড়ের কেশব মন্দির হোয়সল রাজাদের প্রধান কীর্তি। মালিক কাফুর দোরসমুদ্র বিধ্বস্ত করায় হোয়সলরাজ শ্রীরঙ্গপত্তমে পালিয়ে যান। দক্ষিণ ভারতে শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর মহীশূর তাদের অধীন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের হাতে বিজয়নগর ধ্বংস হওয়ার পর মহীশূর মুসলমান রাজত্বের অধীন হয়। মহীশূরের মুসলমান রাজাদের মধ্যে হায়দরআলি ও টিপু সুলতানের নাম সবাই জানে। ইংরেজের সংগে লড়াইএ টিপু সুলতান নিহত হন। মহীশূরে আবার হিন্দু রাজারা ফিরে আসেন আর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে মহীশূর শহরে নিয়ে আসা হয়।

মহীশূরের বর্তমান রাজপরিবারের পত্তন সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক সময়ে যদুবংশীয় দুজন যুবক উত্তরভারত থেকে দক্ষিণে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। মহীশূর রাজ্যের সৌন্দর্য ও সম্পদে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা এখানেই বাস করতে লাগলেন। তখন মহীশূর এক একজন প্রধানের অধীনে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। হাদিনারু নামে একটি রাজ্যের প্রধান বা ওডেয়ারের (Wodeyar) অপ্রকৃতিস্থতার সুযোগে পাশের রাজ্যের নীচ জাতীয় দলপতি ওডেয়ার কন্যাকে বিয়ে করে হাদিনারুর কর্তা হতে চেষ্টা করে। কিন্তু আগন্তুক যুবকদ্বয় কৌশলে ঐ দলপতিকে হত্যা করেন। তাঁদের একজন ওডেয়ারের কন্যাকে বিয়ে করে হাদিনারু ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের কর্তা হন এবং ওডেয়ার উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁনিই নাকি বর্তমান রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ। মহীশূর রাজপরিবারের উপাস্যা দেবী চামুন্ডা বা মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুর থেকেই খুব সম্ভব মহীশূর বা মাইসুর নামটির উৎপত্তি। কন্নড়ভাষায় মাইস মানে মহিষ ও উরু মানে শহর।

আমরা মহীশূর ষ্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম রাতের কালো আকাশতলে বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত শহর ঝলমল করছে। আধুনিক শহর মহীশূর সম্পূর্ণ আধুনিক কায়দায় সজ্জিত। কালো চকচকে চওড়া রাস্তার দু পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় লাল, হলদে রংএর ফুল ফুটে আছে, মনে হয় যেন গাছের মাথায় মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নানা ঢংএর সুন্দর সুন্দর বাড়ী মাঝে মাঝে সুসজ্জিত পার্ক, কোথাও বা সবুজ ঘাসের

আলোকমালায় সজ্জিত নব বৃন্দাবন উদ্যান।

বাগিচা—শহরকে করে তুলেছে সুষমামন্ডিত। বাঙ্গালোরও খুব সুন্দর সাজান শহর, কিন্তু মহীশূরের এই শান্ত মনোরম পরিবেশ বাঙ্গালোরে নেই। সেখানে সব সময় একটা কর্মব্যস্ততার সাড়া পাওয়া যায়। এ শহরে টাঙ্গা যথেষ্ট আছে. দেখলাম একেবারে উত্তর ভারতের টাঙ্গার মতই দেখতে। এখানকার স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য বড় বড় বাড়ীগুলিতে ইংগ-ভারতীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়। ষ্টেশনের কাছে Exhibition Buildingটির স্থাপত্যে বেশ একটু অভিনবত্ব আছে। এখানে একটি চিরস্থায়ী প্রদর্শনী সাজান থাকে। চামরাজেন্দ্র টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট মহীশূরের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এখানে নানারকম শিল্পকলার কাজ শেখানোর ব্যবস্থা আছে। এখানকার হাতের কাজের কিছু কিছু নিদর্শন—নানারকম খেলনা, চন্দন কাঠের জিনিষ, হাতীর দাঁতের মূর্তি, বেতের কাজ প্রভৃতি—এক্সিবিসন বিল্ডিংএর পাশেই একটি শো-রুমে সাজান আছে। চন্দনের দেশ মহীশূর। চন্দন ধূপ, চন্দন তেল, নানারকম চন্দন কাঠের মূর্তি ও জিনিষ বাজারের সব জায়গায় চোখে পড়ে। মহীশূরে সিল্কেরও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে।

মহীশূর শহরে রাজপ্রমুখ থাকেন। ... প্রায় মাঝখানে রাজপ্রাসাদ—প্রবেশদ্বার ... প্রাসাদ দেখতে হলে "হুজুর সেক্রেটারী ... থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয় ... খুলে প্রাসাদে প্রবেশ করার নিয়ম। বিস্মিত হয়েছিলাম এ তো দেবতার মন্দির নয়, তবে কেন খালি পায়ে যাওয়ার নিয়ম? কিন্তু পরে বুঝলাম, প্রত্যহ এখানে যে দর্শনার্থীরা আসেন তাঁদের জুতোর ঘর্ষণে পাথরের চকচকে মসৃণ মেজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে—এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। প্রাসাদটির গঠন প্রণালীতে মিশ্র হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের রীতি অনুসৃত হয়েছে, সম্পূর্ণ চাঁদির দরজা, হাতীর দাঁতের দরজা, কাঠের ওপর হাতীর দাঁতের কারুকার্যখচিত দরজা, চন্দন কাঠের দরজা ও Ceiling প্রভৃতি দেখে অর্থব্যয়ের পরিমিতিটা আন্দাজ করা যায়। দোতলায় প্রার্থনার ঘরটি এমনভাবে তৈরী যে, ছাদের ওপর থেকে সূর্যের আলো পড়ে ঘরটিকে আলোকিত করে। দরবার হলটির পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে—অসংখ্য স্তম্ভযুক্ত বিরাট ঘর, সামনের দিকটা উন্মুক্ত, একপাশে গ্যালারী ও মহিলাদের জন্য আড়াল দেওয়া বসবার জায়গা—উৎসবের দিন মহারাজা পরিজনদের নিয়ে এখানে বসেই মল্লযুদ্ধ, হাতীর লড়াই ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। কয়েকটি স্তম্ভের মাথার দিকে বিচিত্র কাজ করা পরীর মূর্তি আছে যে রকম আমাদের পুরোন থিয়েটার হলে দেখা যায়. প্রাসাদটিতে জাঁকজমক যত আছে সূক্ষ্ম শিল্পকলা তেমন নেই। নানা মাপের সিংহাসনের সারি, মহারাজাদের পাওয়া উপঢৌকনের প্রদর্শনী, এই সব দেখতে তো রীতিমত ক্লান্তি লাগে। উপহার সামগ্রীর মধ্যে দুটি ঝাঁটাও রয়েছে দেখলাম। একটি ঝাঁটা চন্দন কাঠের আরেকটি হাতীর দাঁতের। শক্ত কাঠ বা হাতীর দাঁত চিরে সরু সরু নরম কাঠি বার করতে যে অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের দরকার হয়েছে সে কথা ভাবলে অজানা শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। আয়ুধশালাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে বহু প্রাচীনকালের অনেক অস্ত্র সংগৃহীত আছে। টিপু সুলতানের তরবারি ও শিবাজীর বিখ্যাত বাঘনখ দেখলাম। নিচের একটি বারান্দার সারা দেওয়ালে দশরা বা দশহরা উৎসবের শোভাযাত্রার চিত্র অঙ্কিত আছে।

দশরা এ দেশের একটি বড় উৎসব। চারদিন ধরে উৎসব চলে। সাধারণতঃ অক্টোবর বা সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে দশরা উৎসব

অনুষ্ঠিত হয়—আমাদের দেশের শারদীয়া পূজার সময়। ঐ সময় নানা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়; রাজপ্রাসাদ ও সারা শহর রাত্রিবেলায় আলোকমালায় সজ্জিত হয়। আধুনিক শহরে তেলের প্রদীপের কারবার নেই, সর্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার। দশরার পরে পূর্ণিমার দিন চামুণ্ডীপাহাড়ে আরেকটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন রাজা ও রাজপরিবারের সকলে চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে দেবীর পূজা দেন, তার পর দেবীপ্রতিমাকে রথে চড়িয়ে এক শোভাযাত্রা বের করা হয়।

প্রাসাদের একজন রক্ষী বা প্রহরীর কাছে প্রাসাদটি কবে তৈরী হয়েছে জিজ্ঞাসা করে কিছুই জানা গেল না; কারণ সে ইংরেজি বা হিন্দী (বা বাংলা) কোন ভাষাই বোঝে না। তখন আমরা একজন দর্শনার্থী দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোককে ঐ লোকটির কাছ থেকে জেনে আমাদের বুঝিয়ে দিতে বললাম। কিন্তু ভদ্রলোকটি বললেন যে, তাঁরও ঐ একই জিজ্ঞাসা। কন্নড়ভাষী প্রহরীটি তামিল বা তেলেগু কিছুই বোঝে না সেজন্য তিনি তার সংগে কথা বলতে পারছেন না। শুধু দক্ষিণ-ভারতের মধ্যেই ভাষাগত এত বৈষম্য দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তামিল ও তেলেগুভাষী অঞ্চলে আমাদের অনেক সময় বড় অসুবিধায় পড়তে হয়েছে; কারণ বেশীর ভাগ লোক ইংরেজি জানে না এবং হিন্দী একেবারেই বোঝে না। অথচ হিন্দী নাকি ভারতের রাষ্ট্রভাষা। মহীশূরে কন্নড়ভাষীদের অনেকেই অল্পবিস্তর ইংরেজি ও হিন্দী বলতে পারে। সেজন্য মহীশূরে আমাদের সাধারণতঃ কোন অসুবিধা হয়নি—একমাত্র প্রাসাদরক্ষীর এই ঘটনাটি ছাড়া।

শহরের অন্যতম আকর্ষণ জগনমোহন প্রাসাদ। মহীশূরের এই পুরনো রাজপ্রাসাদটি এখন চিত্রশালা ও মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বহু ছবি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। নন্দলাল বসুর ছবি ও রবি বর্মার কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া চীন ও ইন্দোনেশিয়ার হাতের কাজের অনেক নিদর্শন এখানে দেখা যায়। মহীশূরে মহারাজাদের বড় বড় তৈলচিত্র, বহু পুরনো হাতে লেখা পুঁথি এবং আগেকার মহারাজাদের ব্যবহারের অনেক জিনিষ, তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলার সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। একটি ঘরে বহুপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র সাজান রয়েছে।

শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বসতিবিরল নিরালা জায়গায় চামুণ্ডীপাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সুন্দর মোটর চলাচলের রাস্তা উঠে গেছে চূড়ায় চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের কাছে। পায়ে হেঁটে ওঠার জন্য পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে—চূড়া পর্যন্ত এক হাজার ধাপ। ছশো ধাপ ওঠার পর মন্দিরের পথে পড়ে নন্দী বৃষের এক বিরাট মূর্তি। কাল পাথরে খোদাই করা শিবের বাহনের এই মূর্তিটি ষোল ফুট উঁচু। একটা পা মুড়ে একটা পা সামনে এগিয়ে দিয়ে বৃষটির বসার ভংগীটি ভারী সুন্দর। তা ছাড়া বৃষটির গায়ে গলায় অনেক গয়না ও ছোট ছোট ঘণ্টির মালা পরানো আছে—সবই অবশ্য ঐ একই পাথরে উৎকীর্ণ। দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য ভাস্কর্যের তুলনায় এই বৃষটির ভাস্কর্য এমন কিছু অসাধারণ নয়, কিন্তু এর বিরাট আকৃতি ও শিল্পীর নিখুঁত মাত্রাজ্ঞান দেখে বিস্মিত হতে হয়। এটি খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ধর্মপ্রাণ রাজা ডোড্ডাদেবের সময় নির্মিত হয়েছিল; এবং তাঁরই জন্য পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরী করা হয়। পাহাড়ের চূড়ার ওপর উচ্চ গোপুরমযুক্ত চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরটি বহু প্রাচীন। তৃতীয় কৃষ্ণরাজা ওডেয়ার মন্দিরটি সংস্কার করে মন্দিরের চূড়ায় একটি গম্বুজ তৈরী করান। রাত্রিবেলায় গম্বুজের মাথায় লাল রংএর আলো জ্বলে। শহরের সব জায়গা থেকে এই আলোটি ধ্রুবতারার মত দেখা যায়। মন্দিরের সামনে পূজা দেবার জন্য ডালি বিক্রি হয় তাতে নারিকেল, কর্পূর, সিন্দুর, ফুল প্রভৃতি থাকে। একটি ডালি ও কিছু দক্ষিণা দিয়ে পুরোহিতকে দিলেই পূজার ব্যবস্থা হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে সালঙ্কারা, সহাস্যবদনা সিংহ-বাহিনী চামুণ্ডেশ্বরীর মূর্তি সহজেই মনকে প্রশান্ত করে। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের ওপরে একটি ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে। এখানে একটি ডাকবাংলো আছে।

মন্দিরের পূর্বদিকে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় রাজপ্রাসাদ তৈরী হয়েছে। রাজা বা রাজপরিবারের কেউ দেবীদর্শন অথবা পূজা দিতে এলে এই প্রাসাদে ওঠেন। রাত্রে এই প্রাসাদের মাথায় একটা খুব বড় আলো জ্বলে আর প্রাসাদে যাওয়ার সমস্ত রাস্তাটিতে আলো দেওয়া হয় তাতে শহরের শোভা আরও বাড়িয়ে দেয়। এই প্রাসাদ থেকে রাত্রে নিচে আলোকিত শহরটির দৃশ্য অতি চমৎকার। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে প্রাসাদ না থেকে মন্দিরটি থাকলেই যেন ভাল হত। দেবতার স্থানই সব চেয়ে উঁচুতে হলে শোভা পায়।

মহীশূরে গিয়ে কৃষ্ণরাজসাগর ও শ্রীরংগপত্তন

(ইহার পর ২৬১ পৃষ্ঠায়)

গ্রামিক — গোপাল ঘোষ

পুরীর জগন্নাথ দর্শন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে কটকে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে আমরা এলাহাবাদ থেকে প্রতিনিধি হয়ে কটকে গিয়েছিলাম। ২৪, ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হ'ল। ২৭ তারিখ সকালে আমরা কোনার্ক, ভুবনেশ্বর, খন্ডগিরি এবং উদয়গিরি দেখে সন্ধ্যায় কটকে ফিরে এলাম। ২৮ তারিখে সম্মেলনের অন্যতম সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্তের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম একদিনের জন্য। উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একদিনের জন্য থাকবো—তাঁদের সাহিত্যের প্রতি দরদ বোঝবার জন্যে। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। একদিন থেকে অনুভব করলাম কটকের প্রবাসী বাঙালীদের শুধু সাহিত্যের প্রতি দরদ অকৃত্রিম নয়, মনুষ্য-জীবনের সমস্ত বড় প্রেরণার প্রতিই তাঁদের আনুগত্য অকৃত্রিম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বও আমার বেশ ভাল লাগলো। স্থানীয় উৎকলবাসীদের সাধু স্বভাব এবং আতিথেয়তাও খুব হৃদয়গ্রাহী।

কটক এখন পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজধানী রয়েছে। ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। ভুবনেশ্বর একদিন মোটরে বেড়িয়েও দেখে এলাম। ঠিক নয়াদিল্লীর মত—ছোট নয়াদিল্লী বলা চলে। কিন্তু শোনা গেল ওখানে জলের নাকি ভারি কষ্ট—আশানুরূপ জল পাওয়া যায়নি। তবে লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সভাগুলি সব এখন ভুবনেশ্বরেই হচ্ছে—কারণ সদস্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কটকের পুরানো বাড়িতে স্থান সংকুলান হয় না।

কটক সুন্দর সহর—পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। এখানে বিখ্যাত র‍্যাভেন্স কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সবই আছে। শীতকালে শীত নেই বল্লেই হয়—একেবারে বাংলা দেশের মত। গরমের সময়ে শুনেছি খুব গরম—দুপুরে রাস্তায় বেরুনো যায় না—১১৭।১১৮ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ ওঠে। কটক সহরটি কাঠজুড়ি এবং মহানদী এই দুই নদীর মাঝখানে। মহানদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি 'আনিকাট' (Anicut) একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। কটকে জিনিষপত্র দুর্মূল্য—আদৌ সস্তা নয়। তবে ডিসেম্বর মাসে সজনের ডাঁটা দেখে মজা লেগেছিল।

সাহিত্য সম্মেলনের অনেকগুলি ছবি বিভিন্ন মাসিকপত্রে এবং দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু একটি ছবি প্রকাশিত হতে দেখিনি। সেটি হ'ল সম্মেলনের সভাপতি-বর্গ এবং প্রতিনিধিগণ সকলে একত্র বসে ভোজন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবেশ-চন্দ্র দাশ প্রভৃতি সভাপতিগণ, সমবেত প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ সকলে একত্রে মাটিতে ব'সে পান ভোজন করছেন। সাহিত্য সম্মেলনের এইটি একটি বিশেষ লাভ—জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় এবং বিভিন্ন বয়স থেকে মানুষকে টেনে এনে একটা বিশেষ আদর্শের তলে সকলকে সমবেত করা।

২৯ তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন মানসে পুরী যাত্রা করলুম। বেলা ১২টায় ট্রেন। খাওয়া দাওয়ার পর বন্ধুবর শচীনবাবু মোটরে করে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। পুরীতে আমার থাকার কোন নির্ধারিত স্থান ছিল না। শচীনবাবু কটকের অমৃতবাজার পত্রিকার আপিসের চার্জে আছেন—তিনি তাঁর এক সংবাদদাতাকে আগের রাত্রে একখানি চিঠি লিখে রওনা ক'রে দিয়েছিলেন। সংবাদদাতার নাম সত্যবাদী ত্রিপাঠি—অবশ্য উড়িয়া। পত্রে অনুরোধ ছিল সত্যবাদী ষ্টেশনে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। যদি না আসেন আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে থাকার চেষ্টা করবো।

সত্যবাদী আসেননি। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। শুনলাম তিনি চিঠি পাননি। তখন পুরীতে Forward Bloc-এর সম্মেলন হচ্ছে। দুটি বড় বড় ধর্মশালা একেবারে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধি দিয়ে বোঝাই। সত্যবাদী সেই কারণে খুব ব্যস্ত। তিনি 'পত্রিকা' ছাড়া পি. টি. আই-এরও প্রতিনিধি। আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘে প্রথমটা জায়গা পাই কিনা দেখবার জন্যে গেলাম। সেখানকার স্বামীজী আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বল্লেন, আপনি কি কখনো এলাহাবাদে ছিলেন? আমি বল্লুম, আজ্ঞে হাঁ, এখনো সেখানেই থাকি। তিনি বল্লেন, নামটা বলুন ত। নাম বলার পর বল্লেন, তিনি কুড়ি বছর আগে আমাকে এলাহাবাদে দেখেছেন। স্বামীজীর নাম অব্যয়ানন্দ। আমার মনে নেই, অথচ তিনি মনে রেখেছেন দেখে লজ্জিত বোধ করলুম। বলা বাহুল্য এর পর আর জায়গা পেতে দেরি হ'ল না।

পুরীতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রকান্ড বাড়ি—বিনা পয়সায় থাকতে পাওয়া যায়। তাঁরা আরো একটা বাড়ি তৈরি করিয়েছেন—সেখানে দৈনিক এক টাকা ভাড়া দিলে থাকতে পারা যায়। কাছেই সমুদ্র—হোটেল—কোন অসুবিধে নেই। এ স্বার্থশূন্য মানব-সেবা, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সকালে যখন সত্যবাদীকে খুঁজে বের করলুম তখন তিনি নিজে যেতে না পারলেও সঙ্গে একজন লোক দিয়েছিলেন যে আমাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তখন জগন্নাথদেবের নিত্য পূজো, স্নান ইত্যাদি হচ্ছে—বেলা দশটা। দরজা বন্ধ—সুতরাং দেখা হ'ল না। চারি পাশের অন্যান্য মন্দিরগুলি সব আমরা পরিক্রমা ক'রে ঘুরে দেখে এলুম। মন্দিরে পান্ডাদের অত্যন্ত উপদ্রবের কথা আগেই শুনেছিলুম কিন্তু সত্যবাদী প্রেরিত ঐ উড়িয়া সঙ্গীটির দৌলতে আমার একটি পয়সাও খরচ হ'ল না। কেবল যেখানে ইচ্ছা ক'রে দু' এক পয়সা প্রণামী দিয়েছিলাম তাই খরচ হ'ল। সঙ্গীটি বলে দিল আমি খাওয়া দাওয়া ক'রে বিকেলের দিকে যেন ফের আসি এবং সত্যবাদীর হোটেল থেকে (ইম্পিরিয়াল হোটেল, এখানে সত্যবাদী বসেন) তাকে ডেকে নিই।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির

মন্দির থেকে আমি স্বর্গদ্বারে বসন্ত কুমারী বিধবাশ্রম দেখতে গেলুম। সেখানকার কর্ত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সঙ্গে দেখা এবং কথাবার্তা হ'ল। তিনি সম্মেলন উপলক্ষ্যে যখন কটক এসেছিলেন তখন তাঁর আশ্রম দেখবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সময় উড়িষ্যায়

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব সেখানে এলেন। আশ্রমের মেয়েরা তাঁকে মাল্যদান ক'রে অভ্যর্থনা করলে এবং গান গেয়ে শোনালো।

শুনেছিলাম জগন্নাথদেবের মন্দিরের "আনন্দবাজারে" রান্না করা ভোগ কিনতে পাওয়া যায়—অনেকে তাই খেয়ে থাকেন। সেদিকে গিয়ে দেখলাম সেদিন ভোগ তখনো হয়নি—আগের দিনের পান্তা ভাত প্রসাদ আছে। একজন জল থেকে নিংড়ে ভাত তুলছিলেন—দেখে খাওয়ার প্রবৃত্তি হল না। সুতরাং হোটেলে খাওয়ার জন্য আমি ভারত সেবাশ্রমে ফিরে এলাম।

বিকেলে পুনরায় জগন্নাথদেবের মন্দিরে গেলাম। সকালের সঙ্গীটিকে আর ডাকলাম না—বেচারা নিজের কাজ ফেলে অনেকটা সময় আমার সঙ্গে ঘুরেছে, পুনরায় তার কাজের ক্ষতি করতে লজ্জা করতে লাগলো। একাই দর্শন করবো সাব্যস্ত করলাম। মন্দিরের পাশেই সজনের ডাঁটা, চালতা, মুলো বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। এ জিনিসগুলি তখন এদিকে দুষ্প্রাপ্য—সুতরাং কিছু সংগ্রহ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এইদিক দিয়েই এক গাল হেসে আমার ঝোলাটা রেখে দিলে। লোকটা আমাকে মন্দিরের পাকশালার দিকটা দেখালে। তারপর বললে, আপনি জগন্নাথ-দেবকে ভোগ দেবেন ত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভোগের খরচ কত? লোকটা বললে, পাঁচ সিকে থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচ লাখ পর্যন্ত। আমি সর্বনিম্নের রেট বেছে নিলাম। তখন লোকটা বললে, জগন্নাথদেব, বলরাম এবং সুভদ্রাদেবী তিনজনের ভোগ কিনে আনার টাকা দিন। আমি একখানি পাঁচ টাকার নোট লোকটির হাতে দিলাম। সে আমাকে বসিয়ে রেখে ভোগ কিনতে চলে গেল। খানিক পরে ভোগ কিনে এনে আমার হাত ধরে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। খানিকটা দূরে আমরা দাঁড়ালাম—লোকটা বাংলায় মন্ত্র পড়ালে। বললে, বলুন, আমি এসেছি, আমার কাঞ্চন শরীর। আমি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি জগন্নাথদেবকে দেখতে পাচ্ছেন? আমি বললুম, হাঁ। লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে, জগন্নাথদেবের মাথার উপর হীরে জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমি বললুম, হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তারপর বললে, বাঁপাশে বলরাম,

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কটক অধিবেশনে প্রতিনিধি শিবিরে প্রতিনিধিগণ, সভাপতিগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একত্রে 'পংক্তি ভোজনে'র আনন্দময় দৃশ্য।
ফটো—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

হল প্রথম বিপদ। মন্দিরের যে প্রহরী সে আমার হাতের ঝোলা পরীক্ষা ক'রে দেখে বললে, সজনের ডাঁটা মন্দিরে ঢুকতে পারবে না। মনিব্যাগ এবং হাতের রিষ্টওয়াচের ব্যান্ডটা প্ল্যাস্টিকের ছিল—তাই রক্ষা পেলাম। কিন্তু ঝোলা ফেলেই বা যাই কার কাছে, আর মন্দিরে ঢুকিই বা কি ক'রে? এমন সময় একজন লোক এসে খপ্ ক'রে আমার হাতটা ধরে ফেল্লে। বোধ হয় পান্ডা হবে কিংবা পান্ডাদের গোষ্ঠীর কেউ। আমাকে অভয় দিয়ে বললে, কোন চিন্তা নেই, আপনি ঝোলাটা মন্দিরের প্রহরীর কাছেই রেখে যান—চারটে পয়সা দিলেই হবে। এত সহজে ব্যাপারটার সমাধান হবে আন্দাজ করতে পারিনি। প্রহরী মাঝখানে সুভদ্রা—দেখতে পাচ্ছেন? আমি বললুম, হাঁ, দেখতে পাচ্ছি—তবে কষ্ট ক'রে। কেননা বিজলি আলোর ব্যবস্থা না থাকায় ভিতরটা আবছা অন্ধকার। লোকটা সহানুভূতির স্বরে বললে, আপনি বুড়ো মানুষ—ভাল ক'রে দর্শন ক'রে নিন। আমি মনে মনে বললুম, সে কথা আর বলতে। সাহিত্য সম্মেলনের দোহাই দিয়ে কোন গতিকে পুরী পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছি—পুনরায় আসতে পারবো এমন আশা নেই বললেই হয়। সুতরাং এই দর্শনই শেষ দর্শন। মনে একটা সান্ত্বনা থাকলো যে, আমি ত দর্শন করতে তাঁর পায়ের তলা পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছি—আমরা দেখা ঠিক হয়েছে কিনা জানি নে, কিন্তু তিনি ত দেখেছেন যে আমি এসেছিলাম।

বাইরে বেরিয়ে লোকটা নিজের পেটের উপর আমার ডান হাতটা রেখে বললে, আমি খাব—আমার পুরো একটা টাকা খাওয়া চাই। এই সব ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত নই—বিশেষ ক'রে পাঁচ টাকার ভাঙানি তখন তারই হাতে। কাড়াকাড়ি ত আর করতে পারিনে! সুতরাং সব পয়সা তার হাতে তুলে দিয়ে আমি ফিরে এলাম। সেই রাত্রেই পুরী এক্সপ্রেসে হাওড়া রওনা হলাম।

মহীশূর

(২৫৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নব বৃন্দাবন উদ্যান না দেখে ফিরে এলে মহীশূরে দেখা কখনই সম্পূর্ণ হয় না। শহর থেকে ফাঁকা কংক্রীটের রাস্তা দিয়ে হু হু করে বাস ছুটে দশ মাইল পথ প্রায় আধঘন্টায় পৌঁছে দেয় কৃষ্ণরাজসাগরের গেটের কাছে। ট্রেনে করেও এখানে আসা যায়। মহারাজা শ্রীকৃষ্ণরাজ বাহাদুরের সময় কাবেরী নদীর ওপর প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট লম্বা বাঁধ দেওয়ায় মহীশূরে সারা মাদ্রাজ প্রদেশকে বঞ্চিত করে নিজেরা সম্পদ-শালী হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণরাজের নাম অনুসারেই বাঁধটির নাম হয়েছে কৃষ্ণরাজসাগর। এখান থেকে খাল কেটে সারা রাজ্যে চাষের জন্য জল সরবরাহ হচ্ছে, আর এই জলপ্রবাহ থেকেই প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন হচ্ছে। তাই তো মহীশূরের সর্বত্র বৈদ্যুতিক আলোর অত অকৃপণ ব্যবহার। বাঁধটির নিচে জল যেখানে প্রবল বেগে এসে জমা হচ্ছে সেখানে রচিত হয়েছে এক মনোরম উদ্যান—নব বৃন্দাবন। বাঁধ থেকে নিচে নেমে প্রথমে একটি ছোট পার্ক দেখে আমরা বেশ হতাশ হলাম। এই কি নববৃন্দাবন যার সৌন্দর্যের এত খ্যাতি শুনেছি? কিন্তু আর একটু এগিয়ে নিচে নেমে আমাদের জন্য যে এত বিস্ময় লুকান আছে তা কি জানতাম? সন্ধ্যার আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে নানা রংএর সহস্র আলো উঠল জ্বলে আর অসংখ্য ফোয়ারা হয়ে উঠল সক্রিয়। মনে হ'ল যেন কোন্ যাদুবলে আমরা এক নিমেষে চলে এসেছি এই ইন্দ্র-পুরীতে। ফ্রান্সের ভেরসাইয়ের উদ্যান দেখিনি, কিন্তু তার সৌন্দর্যখ্যাতি শুনেছি। হয়ত তার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতে কোথাও রাধাকৃষ্ণের মূর্তির প্রচলন নেই। বোধ হয় নববৃন্দাবন নামের জন্য এখানে দেখলাম উদ্যানের প্রবেশদ্বারের নিচেই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। শনি ও রবিবার সপ্তাহে দুদিন উদ্যানটি আলোয় ফোয়ারায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। ঐ দুই সন্ধ্যায় শহরের বহু লোক এখানে আসেন সৌন্দর্য উপভোগ করতে। অনেক সৌন্দর্যবিলাসীরা শহর ছেড়ে এখানকার সরকারী হোটেলে দু' রাত কাটিয়ে যান। সেই বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের সামান্য দু'এক কণা ক্যামেরায় ফিল্মে আবদ্ধ করে আনা হল।

উদ্যানে, আলোয়, পাহাড়ে, প্রাসাদে ঐশ্বর্যশালী মহীশূরকে যথার্থই বলা হয়—A City of garden and light.

(এতৎসহ আলোকচিত্রগুলি শ্রীশৈলেন্দু মজুমদার কর্তৃক গৃহীত)

আহা, লোকটা অপঘাতে মরল। কিন্তু দুনিয়ার কেই বা জানছে সে কথা, কেই বা এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? নেহাৎ পাড়ার লোক ছিল বলে, একবার আমার বাড়ি মেরামতের সময় কয়েক গাড়ি ইট বয়ে এনে দিয়েছিল বলে, আর পথে যেতে আসতে এক আধবার নজরে পড়ে যেতো বলে লোকটাকে আমি চিনতাম, এই পর্যন্ত। কিন্তু পাড়ার পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, কেউ হয়তো স্মরণ করতেই পারবে না। বলবে, "ফকরে বলে আবার কে ছিল?" যারা দু'একজন চিনত তারা হয়তো বলবে—"ও, সেই ফকরে ধুনী?" কেউ হয়তো বলবে, "ও, সেই ফকরে গাড়লটা? সাত চড়েও যার মুখে রা বেরোত না? তা সে আবার মরল কেমন করে? ঐ তো গণ্ডকচ্ছপ চেহারা। কি হয়েছিল তার? গাড়িচাপা পড়ে একেবারে মারাই গেল? তা অমন রাস্তায় ঘাটে আজকাল কতই মরছে। কিংবা হয়তো আসলে না-খেতে পেয়েই মরেছে, কে আর সে কথা জানছে?"

বিশেষ কেউ জানেনা তার সম্বন্ধে। কবে সে রাস্তায় মোটরচাপা পড়ল, পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেখানেই থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত সে মরল, এত খবর কেউ না নিতে যাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি টানতে টানতে যদি একটা ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে মরে যায়, কিংবা যদি অ একালকার একটা মোটর গাড়ির কল বিগড়ে যায়, তো চারিদিকেই তখন লোকের ভিড় জমে যায়, সবাই তাই নিয়ে কতরকম বলাবলি করে, বাড়িতে গিয়ে আরো পাঁচজনের কাছে তাই নিয়ে গল্পগুজব করে। কিন্তু ওর মতো তুচ্ছ একটা রাস্তার লোকের সম্বন্ধে সে ঔৎসুক্য কারো নেই।

লোকটা যেন তুচ্ছ, নগণ্য, নির্বাক ভাবেই পৃথিবীতে এসেছিল, আবার তুচ্ছ, নগণ্য, নির্বাক হয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেল। তার কোনো জন্মদিনও হয়নি, কোনো কিছু উপলক্ষে তার বাড়িতে কেউ কখনো ভোজ খেতেও যায়নি, বলবার কইবার মতো কিছুই নেই তার সম্বন্ধে। চিরকালই গরিব। সমুদ্রতটের অসংখ্য বালুকণার ভিড়ের মধ্যে একটামাত্র কণা, বাতাসের ঝাপটায় সেটা উড়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। এর আবার ইতিহাস কি আছে? হাসপাতালে মরবার পরে সরকারী গাড়িতে মড়ার গাদার সঙ্গে তার চালান হয়ে গেল।

কিন্তু আমি তবে এত কথা জানলাম কেমন করে? আমাদের বাড়ির চাকরটি, তার নাম বিনোদ, সে হলো পাড়ার গেজেট। পাড়ায় দৈনিক কোথায় কি ঘটছে, সব খবরই তার কাছে মিলবে। তার কাছেই সব কিছু শুনলাম।

সেই বলছে, লোকটা ছিল একেবারে বোবার মতো। পোড়া মুখে কখনো কোনো বাক্যি শোনা যেতনা। সকল সময় চুপ করেই থাকতো, কোন কথাতেই কথা বলত না, সেই জন্যেই তো ওর এমন দুর্দশা। দুঃখে দুঃখেই সারা জীবনটা কেটেছে, দুঃখ নিয়েই সে মরেছে। মরবার সময় কিছুই রেখে যায়নি, কোনো [illegible] না। একটা বিয়ে করেছিল সে বৌ কবে ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। একটা ছেলে হয়েছিল, তাকে বাচ্চা বেলা থেকে অনেক কষ্টে একাই মানুষ করলে, কিন্তু সে ছোঁড়া যেমনই একটু বড়ো হলো অমনি বাপকে কলা দেখিয়ে সেও চলে গেল।

লোকটা আগেকার দিনে ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানি করত। কিন্তু আজকাল ঘোড়ার গাড়ির আর তেমন চল নেই বলে এখন সে গরুর গাড়ি চালাত, গরুর গাড়িতে লোকের মোট বয়ে এখানে ওখানে পৌঁছে দিত। এই ছিল তার উপজীবিকা, সেইজন্যে কেউ কেউ ঠাট্টা করে ওকে বলত ফকরে গাড়ল। এ নামটা শুনতে সে খুশীই হতো মনে হয়। ওর ভিতরকার আসল ঠাট্টাটুকু সে হয়তো বুঝতেই পারত না, বরং কেউ ঐ নাম ধরে ডাকলে একটু হাসত আর ভারি ভারি মোট বইয়ে তাকে যে যা দিত, অম্লানবদনে তাই ট্যাঁকে গুঁজত, ভাড়া নিয়ে কখনো দর কষাকষি করতে সে জানতই না। বুদ্ধিশুদ্ধি একটু মোটা কিনা।

নিজের গাড়ির গরু দুটোকে বাঁচাতে গিয়েই সে বেচারা মোটর চাপা পড়ল। গরু দুটো হঠাৎ ভয় পেয়ে এক প্রকাণ্ড মোটরের সামনেই গিয়ে পড়ল, গরুকে আড়াল করতে গিয়ে সে নিজেই মোটরের ধাক্কা খেলে। সেই ধাক্কায় তার পিঠের শিরদাঁড়ার হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল। মোটরটা এই পাড়ারই কোনো বড়লোকের, কিন্তু ধাক্কা মেরেই সে গাড়িটা জোরে ছুটে অন্য দিকে বেরিয়ে গেল। লোকটা রাস্তায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে।

একটা পুরনো বাড়ির নিচের তলায় ঘুঁটে গোয়ালের পাশের ঘরখানা ভাড়া নিয়ে সে থাকত। বরাবর ঐ ঘরে বাস করে আসছে বলে তার ভাড়াটাও ছিল কম। এটাও অনেকের পক্ষে ঈর্ষার কারণ ছিল, ঐ ঘরখানার দিকে অনেকেরই নজর ছিল। ওর মারা যাবার খবর যেদিন পাওয়া গেল, সেইদিনেই একজন [illegible] ডবল ভাড়া দিয়ে ঘরখানা দখল করে নিলে।

এই সব গল্প শুনেছিলাম বিনোদের কাছে। সে দুপুরবেলা আমার পা টিপতে টিপতে গল্পটি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বাজনা সহকারে বলছিল। শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম এই মনুষ্যটির ব্যর্থ জীবনের কথা। মানুষকে এমন ধরনের ব্যর্থ জীবন অনর্থক ভোগ করিয়ে ভগবানের কি লাভটা হয়, তাঁর কোন উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয়? এমনি সব জটিল প্রশ্নগুলো ভাবতে ভাবতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

তার পরে যা কিছু দেখলাম সমস্ত আমার স্পষ্টই মনে আছে।

স্বর্গরাজ্যে মহা হৈ চৈ বেধে গেছে। চারিদিকে শাঁখ বাজছে, ঘণ্টা বাজছে, লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, স্বর্গের দেবমন্দিরে দেবরাজ, পাতা আর মজুরের চুমকি দিয়ে

"ওসব বাদ দিয়ে একেবারে আসল কথায় চলে এসো।"

"না ধর্মাবতার, ছেলেবেলার কষ্টগুলোর কথা বলে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না, কেবল এইটুকু বলে রাখি যে, তখন থেকেই উনি এক সৎমায়ের পাল্লায় পড়লেন, অনেক বয়স পর্যন্ত তার হাতে ওঁকে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। দয়ামায়া বলে কিছুই তার ছিল না—"

ফটকের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, এবার সে কথাগুলো আগ্রহ সহকারে শুনছে। বোধ হয় মনে মনে ভাবছে, এবার যেন ওর কথাই বলা হচ্ছে।

বিচারক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, "অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির নামে নিন্দা করা বেআইনী।"

"তা নয় ধর্মাবতার, তবে ঘটনাগুলো তো বলতে হবে। সে নিজে ভালো ভালো জিনিস খেতো, কিন্তু ওঁকে কখনো পেট ভরে খেতে দিত না। কতদিন শুধু মুড়ি খেয়ে কেটেছে, কতদিন কিছু না খেয়েও ওঁকে বালতি বালতি জল বয়ে আনতে হয়েছে। তাতেও রেহাই নেই, সামান্য কিছু ভুলত্রুটি হলেই পিঠের ওপর কাঠের চেলার প্রহার চলত, ঝাঁটাপেটাও খেতে হতো। নিতান্ত অল্পবয়স্ক হলেও সেই কাঁচ কাঁচ হাতে কুড়ুল দিয়ে কাঠ চিরাতে হতো, কতবার তাতে হাত জখম হয়েছে, পায়ে কুড়ালের চোট পড়ছে। কিন্তু উনি সব কিছুতেই বরাবর চুপ করেই থাকতেন, সেই ছেলেবেলা থেকেই, আর ওঁর বাবার নজরে এ সব কিছুই পড়ত না।"

প্রতিবাদী উকিল বললে, "বলো না, সে লোকটা মদ্যপান করত—"

"হাঁ ধর্মাবতার, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। উনি ওঁর বাপের কাছে এই নিয়ে কিছু নালিশ করেননি। চিরকাল নিঃসঙ্গ হয়ে চুপচাপ একা একাই থাকতেন, সকল অত্যাচার সহ্য করতেন। ওঁকে লেখাপড়াও শেখানো হলো না, ঠাকুর দেবতার নাম করতেও শেখানো হলো না, ওঁর কোনো বন্ধুবান্ধবও জুটল না, ভালো কাপড়চোপড়ও জুটল না,—অথচ হাড়ভাঙ্গা খাটুনিরও বিরাম রইল না।"

"তুমি বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলোই কেবল বলে যাও।"

"একদিন পৌষ মাসের রাত্রে ওঁর বাবা খুব মারধোর করে একবস্ত্রে খালি গায়ে ওঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, বোধকরি সে তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। তারপর থেকে সেই অবস্থাতেই উনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। খুব খিদে পেলে উনি কলতলায় গিয়ে পেট ভরে খানিকটা জল খেয়ে নেন, কিন্তু কারো কাছে কিছু চেয়ে খেতে পারেন না। রাত্রে এইভাবে ঘুরতে দেখে পুলিশে ওঁকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেল, তাতে এই সুবিধা হলো যে, জেলে থেকে উনি দুটো দিন কিছু খেতে পেলেন। কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না পেয়ে পুলিশ ওঁকে দুদিন পরে ছেড়ে দিলে। তখন উনি মোট বইতে শুরু করলেন। বোঝা বওয়া আর কঠোর পরিশ্রম করা বাল্যকাল থেকেই অভ্যাস, তাই এ কাজে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কিন্তু অর্থাগম হতো খুবই কম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘাম ঝরিয়ে কত ভারী বোঝাগুলো যে উনি বইলেন, কতবার কতগুলো মোট পার করে দিলেন, তার কোনো হিসাব রাখতেন না, আর হিসাবটা জানা থাকলেও মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। পারিশ্রমিক যে যা দিত তাই চুপ করেই নিয়ে নিতেন, যেন উচিত মূল্যই পেয়ে গেলেন। এমনকি নিজের হক পাওনাটাও চেয়ে নিতে পারতেন না। যার কাজ করে দিয়েছেন তার দরজায় গিয়ে চোরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন, চোখমুখের কাঁচুমাচু ভাব দেখে মনে হতো লোকটা বুঝি ভিক্ষে চাইতে এসেছে। গৃহস্বামী যদি বলত 'পরে এসো' তবে আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই চলে আসতেন। পরের দিন আবার অমনি চোরের মতো গিয়ে দাঁড়াতেন। পাওনার হিসাবটা যদি কেউ কমিয়ে দিত তাতেও উনি কিছু বলতেন না, কেউ যদি অচল টাকা-পয়সা দিত তাতেও কিছু বলতেন না। সকল বিষয়ে চুপ করে থাকাটাই উনি অভ্যাস করে নিয়েছিলেন। কাজেই পয়সা-কড়ির সচ্ছলতা কখনো হয়নি, অমানুষিক পরিশ্রম করেও।"

ফকরের মুখের দিকে তখন আমি আবার একবার চেয়ে দেখলাম। এখন দেখি তার মুখ-ভাবটা একেবারেই বদলে গেছে। এখন সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে তার কথাই বলা হচ্ছে। সে ঘাড় গুঁজে নিস্পন্দ হয়ে নিচের দিকে চেয়ে আছে, একবারও আর মাথা তুলে চাইছে না।

উকিল তার সেই মিঠে গলায় বলে চলল, "একবার যেন ওঁর কপাল ফিরল। একজন ধনী লোক জুড়ি গাড়িতে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল, ঘোড়া দুটো রাস্তায় কি দেখে হঠাৎ খেপে উঠল। তারা এমন ছুটে ছুটতে লাগল যে কোচোয়ান রাস্তায় ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। ঘোড়া দুটো গাড়িসমেত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, আর গাড়ির মধ্যে সেই ধনী লোকটি অসহায় হয়ে বসে আছে। ঘোড়াদের মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, চোখগুলো লাল টকটক করছে। সেই উন্মত্ত ঘোড়া দুটোকে থামাতে কেউই এগিয়ে যেতে সাহস করলে না, কিন্তু ইনি নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের মুখের লাগাম টেনে ধরলেন, বাধা পেয়ে তারা থেমে গেল। গাড়ির মালিক প্রাণ পেয়ে খুশি হয়ে ওঁকে বললে, আজ থেকে তুমিই আমার কোচোয়ান হলে। তার পরে সেই লোকটাই ওঁকে মাইনে দিয়ে যত্ন করে রাখলে। কিছুকাল পরে ওঁর একটা বিয়েও দিয়ে দিলে আর ওঁর স্ত্রীর গর্ভে একটা ছেলেও জন্মাল। তখন ওঁর অবস্থাটা ফিরেছে।"

ফকরের দিকে চেয়ে বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-সব কথা ঠিক মিলছে তো?"

ফকরে একেবারে নিরুত্তর। সে আর মাথাই তুললে না।

উকিল আবার বলে যেতে লাগল, "কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন রইল না। ধনী লোকটির ঘোড়ার গাড়ির বদলে যখন মোটর গাড়ি কেনার শখ হলো, তখন সে গাড়ি-ঘোড়া বেচে ফেললে। কাজে কাজেই ওঁর চাকরিটা তখন ঘুচে গেল, এমন কি বাকি কয়েক মাসের মাইনেটাও আর পেলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে ওঁর স্ত্রী কোলের ছেলে ফেলে রেখে অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেল। তখন থেকে উনি গরুর গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। অনেক দুঃখেকষ্টে ছেলেটাকে মানুষ করে তুললেন, কিন্তু ষোলো বছর বয়সে যেমনি তার কিছু উপার্জন করার শক্তি হলো অমনি সেও বাপকে ছেড়ে চলে গেল।"

"এইবার বেশ বলা হচ্ছে। তারপর শেষের দিকটা কি হলো বলো।"

"উনি তখন থেকে একাই রইলেন, নিজেই যাহোক কিছু রেঁধে তাই দুবেলা খেতেন, আর গরুর গাড়ি চালাতেন। কষ্টেই দিন যাচ্ছিল, কিন্তু উনি চিরকালই নীরব, কাউকেই কিছু বলতেন না, কেউ জানতো না ওঁর অবস্থার কথা। সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতেন, তার পরে গঙ্গার ধারে গিয়ে কোনো একটা নির্জন জায়গায় জলের কাছ পর্যন্ত নেমে অন্ধকারে একা চুপ করে বসে থাকতেন, তখন মনটিকেও রাখতেন অমনি নির্বাক নিস্তব্ধ করে, কোনো চিন্তার তরঙ্গকে সেখানে মোটে ঢুকতেই দিতেন না। হয়তো এই ভাবেই ওঁর আরো বহুকাল কাটত। কিন্তু ওঁর ভোগের শেষ হয়ে আসছিল, তাই চরম ভোগটা ভুগবার জন্যে উনি গাড়িচাপা পড়লেন। যে গাড়িতে উনি চাপা পড়েছিলেন, সে ওঁর পূর্বপ্রভু সেই ধনী লোকটারই মোটরগাড়ি, উনি তা চিনতেও পেরেছিলেন। কিন্তু পুলিশ যখন ওঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করলে, তখন উনি কোনো কথাই বললেন না। ওঁর শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে গিয়েছিল, পাঁজরার হাড়ও ভেঙেছিল। এ-অবস্থায় পড়লে মানুষে চিৎকার করে থাকে। আর হাসপাতালে যেখানে ওঁকে রাখা হলো সেখানে প্রায় সকলেই যন্ত্রণায় কত কি বায়না করছে, কত কিছু নালিশ করছে। কিন্তু উনি রইলেন একেবারে চুপচাপ হয়ে। রোগীরা একটু যত্ন পাবার জন্যে ডাক্তারদের খোসামোদ করছে, কেউ মেথরদের বকশিশ দিচ্ছে নার্সদের ডাকাডাকি করছে। কিন্তু উনি কাউকে ডাকেনও না, কারো কাছে যত্নও চান না। উনি যে নির্বাক সেই নির্বাক।"

আমি দেখলাম, সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনছে আর ফকরে ঘাড় হেঁট করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

"অল্পদিন নয়, হাসপাতালে থেকে উনি ঐ ভাবে প্রায় দেড়মাস ভুগলেন। শুয়ে শুয়ে পিঠের দিকটাতে দগদগে ঘা হয়ে গেল, অসংখ্য মাছি বসতে আর পিঁপড়ে বেড়াতে শুরু করলে। তবুও ওঁর মুখে কোনো কথা নেই কোনো নালিশ নেই। যেদিন মারা গেলেন তার আগের দিন রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলেন। রাতের নার্সটি তাই দয়াপরবশ হয়ে ওঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?' উনি বললেন, 'না, আমি বেশ আছি। কোনো কষ্ট নেই।' পরের দিন যখন মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে তখনো মুখে কথাটি নেই, নিঃশব্দে সকল যন্ত্রণা সহ্য করলেন। ধর্মাবতার, আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।"

বিচারক প্রতিবাদী উকিলের দিকে ফিরে চাইতেই সে উঠে দাঁড়াল। বললে, "ধর্মাবতার, একটা কথা—একটা কথা বলতে ওঁর বাকি রয়ে গেল। শুনলাম যে ইনি পৃথিবীতে থেকে কারো ক্ষতি করেননি, কারো বিরুদ্ধে নালিশ করেননি, কখনো কিছুতে আসক্তি প্রকাশ করেননি,

(ইহার পর ২৭২ পৃষ্ঠায়)

বউকে ভালবাসো—বেশ করো। তাতে আপত্তি করছে কে? বিয়ে করেছ কি বউকে না ভালবাসার জন্যে? বউ বেচারীর যে জন্মের তরে বাপ-মা-ভাই-বোন ছেড়ে তোমার ঘর করতে এসেছে—সে কি তোমার ভালবাসা না পাবার জন্যে? ভালবাসো, কিন্তু কথা হচ্ছে, তার কাছে একেবারে দিলখোলা হওয়া চলবে না—অন্তত মাইনের ব্যাপারে তো নয়ই।

দেড়শো টাকা যদি মাইনে পাও, লোকের কাছে নিজের মান বাড়াবার জন্যে দু'শো টাকা বোলো তাতে না বলব না, কিন্তু বউএর কাছে বলবে একশ টাকা—মান তাতে থাকে তো থাক।

আরে মান কি আর আছে? বিয়ে যেদিন করেছ, মান তো সেদিনই, মানে সেই রাতেই খুইয়ে বসে আছ। যে রাতে বাসরঘরে বউএর সই-সাঙাতনীরা তোমার কান মলে দিয়ে এক-মুঠো খাবার পরেও মান আছে বলতে চাও? তোমার চেয়ে কম-বয়সী, কম বিদ্যেরও, একটা মেয়ের হাতে যেদিন তোমার নাকের দড়ি তুলে দিয়েছ, মান কি সেদিনই—

যাকগে সেসব কথা। মেলাই বক্তৃতা করার চাইতে বরং এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত শোনাই, এসো। আসলে জিনিসটা কী তা দেখাতে গেলে, হাজারো কথার লেকচার দেওয়ার চাইতে একটা দৃষ্টান্তএর কাঠি জ্বেলে দেখানো ঢের ভাল নয়?

অনিমেষ চৌধুরী ছিল তখন অফিসে আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। এখন সে আর নেই এখানে; আমার রিটায়ার করার বছর-খানেক আগে এলাহাবাদে চলে গেছে—বেশ বড় একটা চাকরি পেয়ে। বেশ ছেলেটি। যেমন দেখতে-শুনতে, তেমনি আচার-ব্যবহারে, তেমনি চটপটে—মানে, সব দিক দিয়ে একেবারে মনের মতন ছেলে। হ্যাঁ, ছেলে ছাড়া আর কী বলা যাবে? যখনকার কথা বলছি, তখন ধর, আটত্রিশ কি উনচল্লিশ সাল, সে সময় তার বয়স বছর-ত্রিশ-বত্রিশ। বিয়ে করেছে তার তিন-চার বছর আগে।

পূর্ববঙ্গের ছেলে। এখানে বাসা ছিল যাদবপুরে। অনিমেষ আবার লিখত-টিখত মাঝে মাঝে, কাগজপত্রে বেরোত তার লেখা। মনটি খুব দরদী, স্বভাবটি বেশ মিশুকে। কাজেই যে পাড়ায় থাকত, সেখানকার তরুণ-সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তা নইলে তার বাসায় আমার যাবার কোন কারণ ঘটত না।

একবার এক ছুটির দিনে সকালবেলা তারা এক সাহিত্যসভার আয়োজন করেছে। অনিমেষ তো আমাকে ধরল সেখানে সভাপতি হবার জন্যে। নেহাত যে খোশামোদ তাও নয়। এককালে তো কিছু কিছু লিখেটিখে ছিলাম—সেই সূত্রেই সভাপতি করা আর কি। তা গেলাম সভাপতি হয়ে। সভা ভাঙল—বেলা তখন সাড়ে-দশটা। অনিমেষ বলল, "আপনার, স্যর, এখন বাড়ি ফেরা হবে না।"

সে কী কথা? বাড়ি ফিরব না তো যাব কোথায়?

না, "এতখানিই যখন এসেছেন দয়া করে, গরিবের কুটিরে একবার পদার্পণ করতেই হবে।"

সে, জোর-জুলুম একেবারে। স্নেহ করি অত্যন্ত। সেই দাবিতেই বলছে। অনুরোধ কিছুতেই এড়ানো গেল না। যেতে হল তার বাসায়। তাও আবার চা খেয়ে কি জলযোগ করেই চলে আসা চলবে না—মধ্যাহ্নভোজনটি সেরে আসতে হবে!

বললাম, "বাড়িতে বলা নেই যে!"

বলল, "আপনার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে গিয়ে বলুক যে, আপনি এবেলা ফিরবেন না। বিকেলে আবার গাড়ি নিয়ে আসবে সে। নয়তো, তারও দরকার নেই, বিকেলে আপনাকে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব এখান থেকেই।"

অনিমেষকে চিঠিখানা পড়তে দিলাম

রেখা এসে হাজির হল আমার বাড়ীতে

ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়লে আর কী করা! রাজি হতেই হল।

তা, যত্ন-আত্তির আর সীমা-পরিসীমা রইল না। বেশ পরিবারটি—অনিমেষ আর তার স্ত্রী রেখা আর একটি খোকা হয়েছে, তখন চার-পাঁচ মাস বয়স, আর একটি ছোকরা চাকর। রেখা মেয়েটিও বেশ—চেহারাটি ভারি সুন্দর, কাজে-কর্মে তুখোড়, কথায় বার্তায় চমৎকার, সেবায় যত্নে একেবারে জননী। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজনে আমায় এমন আপন করে নিল যে, ভুলেই গেলাম অনিমেষ আমার অধীন কর্মচারী। মনে হল যেন ওরা আমার কতকালের আপন।

ভারি চমৎকার কাটল দিনটি।

আর একদিন মাত্র গিয়েছিলাম—খোকার অন্নপ্রাশনের দিনে। এমন একটা আত্মীয়তা বোধ করছিলাম সেই প্রথম দিনের পর থেকেই যে, ওই দিনটিতেও না গিয়ে থাকতে পারলাম না।

আর, অনিমেষের তো ব্যবহারই ছিল এমন যেন আমিই তাদের অভিভাবক।

তার আগে থেকেই তো পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা আসছে পশ্চিম বাংলায় দলে দলে। তা, প্রথম দফায় অনিমেষদের জেলায় কোন গোল-যোগ হয় নি; তা হলেও সে খাটতে কসুর করে নি, যখন যেভাবে পেরেছে উদ্বাস্তুদের সেবা করেছে। তার জেলার লোক আসতে লাগল পরের দফায়। তার তখন সে কী অবস্থা! প্রায়ই এসে বলে—আজ অমুক পিসিমা এল—আজ অমুক মাসিমা এল—আজ এল অমুক মামা—কাল এসেছেন অমুক মাস্টারমশাই—

এদিকে আপিসের কাজে তার এক চুল ফাঁকি পড়ার জো নেই, ওদিকে রয়েছে সংসার, তারও মধ্যে. ছোকরার মুখচোখ-চেহারার হাল দেখেই বোঝা গেল, খাটুনি চলছে খুবই। আমাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি চেয়েচিন্তে নিতে লাগল। বললাম, "তাই নাও, গায়ে খেটে কিছু সাহায্য-টাহায্য করবার তো ক্ষমতা নেই—"

তারপর ক্রমে ক্রমে বাস্তুহারাদের আসাও কমে যেতে লাগল। সেই সময়ের ঘটনা—

একদিন আপিসে বসে এক চিঠি পেলাম—রেখা লিখেছে। অনিমেষের স্ত্রী রেখা। কী ব্যাপার? না, তার স্বামী অনিমেষের স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে—টাকাপয়সা নয়ছয় করে—অনেক দিনই রাত্রে বাড়ি ফেরে না—মাঝে মাঝে মেয়েছেলে নিয়ে আসে বাড়িতে—ইত্যাদি! সর্বশেষে আমাকে পিতা-জ্ঞানে সে প্রার্থনা জানাচ্ছে, তার স্বামীর সম্বন্ধে যেন বিহিত বিধান করি।

চিঠি পড়ে তো আমি থ! কিন্তু অনিমেষের সম্বন্ধে এসব কথা আমি বিশ্বাস করি কী করে? কথায় বলে, নিজের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করা। তা আমি বোধহয় তাই করি অনিমেষকে—মানে, নিজের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি। সচ্চরিত্র ছেলে। কয়েক বছর ধরেই তো দেখে আসছি তাকে। সাধারণ কেরানী হয়ে ঢুকেছিল, নিজের কর্মগুণে, চরিত্রবলে সে আমার দক্ষিণহস্ত হয়েছে আজ। আর, আমার মানে কার? আমি কম্পানির সেক্রেটারি তখন।

ওদিকে রেখাকেও স্বচক্ষে দেখে এসেছি। অমন লক্ষ্মীমতী মেয়ে! সে কি কম আগুনে জ্বলেপুড়ে মাত্র দুটি দিনের পরিচয়ে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে এমন জঘন্য কথা আমাকে জানাতে পারে? মেয়েদের, বলে, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না! কালিকলমে লেখা তো মুখ ফোটার বাড়া। মুখের কথা একজন আর-একজনকে বলল, সাক্ষী যদি না থাকে তো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু লেখা মানে নজির—যাকে বলে রেকর্ড একেবারে। ব্যাপার কতখানি চরমে উঠলে তবে সে আমাকে লিখিত-ভাবে জানাতে পারে এসব কথা!

তবে কী জান, পুরুষ হচ্ছে বাউণ্ডুলের জাত, কখন কার মতিচ্ছন্ন ধরে তার কি কিছু ঠিক আছে? আমার মনটা একটু ভারি হয়েই উঠল।

অনিমেষ তো আমার পাশের কামরাতেই। তাকে ডেকে, কিছু না বলে চিঠিখানা পড়তে দিলাম—তার বউএর সেই চিঠি। পড়ে তো তার মুখ উঠল লাল হয়ে। ফরসা রঙ, রক্ত যেন ফেটে পড়বে। তার অবস্থা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। দেখলাম, ও অবস্থায় তক্ষুনি কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না। কোণে আমার খাবার টেবিলের কাছের চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম, "ওখানে বোস একটু, আমি হাতের কয়েকটা কাজ সেরে নিই, তারপর কথা বলব।"

গিয়ে বসল। আমি খানিকক্ষণ নথিপত্র নিয়ে অকাজেই ঘাটাঘাটি করলাম। কাজ করতে কি ইচ্ছে যায় সেই অস্বস্তির মধ্যে!

খানিক পরে যখন দেখলাম তার মুখের লাল ভাবটা অনেকখানি মিলিয়ে এসেছে, তখন আবার ডাকলাম সামনে। বললাম, "দেখ, অনিমেষ, চিঠিতে মালক্ষ্মী যা লিখেছেন, আমি জানি, পরকে এসব কথা লেখা যায় না—উচিত নয় লেখা; কিন্তু আমাকে পর ভেবে তিনি তো লেখেন নি।"

বলল, "আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জেনেই লিখেছেন। গত কিছুকাল ধরে আমার ওপর নির্যাতনের একশেষ করেছেন, তার ওপর গত কদিন ধরে কথাই বন্ধ করে দিয়েছেন, তাতেও তাঁর শান্তি হয় নি। আপনাকে জানিয়েছেন—চাকরিটা যদি যায়, তা হলেই খুশি হবেন মনে হচ্ছে।"

বললাম, "তার অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তা হলে এ রকম পুরুষপুঙ্গবকে পোষার রাখাও তো উচিত হবে না। কিন্তু সে কথা থাক, তুমিও আমায় আপন ভেবেই সব কথা খুলে বল দেখি, কী হয়েছে।"

খুলেই বলল সে আমাকে সব কথা। ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ববঙ্গ থেকে অনিমেষের এবং রেখারও, অনেক আত্মীয়স্বজনই বাস্তুহারা হয়ে এসেছেন। অনিমেষের তো অত্যন্ত দরদী মন, সে সব সময়ই নিজে গিয়ে আপনজনদের খোঁজ-খবর নেয়, দরকারমত সাধ্যমত টাকাকড়ি দিয়েও সাহায্য করে। কাজেই সংসারের দিকে টাকা-পয়সার ঘাটতি পড়ে। অনিমেষ বলল, "দেখুন, আমি সাড়ে তিনশ' টাকা পাই; আমার বাসা-ভাড়া পঞ্চাশ টাকা, সংসারে তিনজনের পেছনে দেড়শ' টাকাই লাগুক—আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন যে সময় না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, নানান দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, সে সময় আমাদের তিনজনের সংসারে মাসে দেড়শ' টাকার বেশি—দেড়শ' টাকাও—খরচ করা অপরাধ। তিনি বলছেন, আমার ছেলে আছে—ভবিষ্যৎ আছে—"

বললাম, "সত্যিই তো, সে কথাও তোমার ভাবতে হবে বইকি।"

বলল, "আগে মাইনে পেয়েই একশ' টাকা করে ব্যাংকে রেখেছি, এখন রাখছি পঞ্চাশ টাকা করে। আগে পঞ্চাশ টাকায় আমার হাত-খরচ আর সংসারের টুকিটাকি খরচ চালিয়েছি, এখন সেখানে পঁচিশ টাকা খরচ করি। তার শখের জিনিসপত্র আজকাল একটু বিবেচনা করে কিনতে হয়। কিন্তু আমিও তো কিছু অসুবিধা বরণ করে নিয়েছি, আমারও তো হাত-খরচ কমিয়ে দিয়েছি।"

তার মানে, নিজের জলযোগ-ফলযোগের দিকটা সংক্ষেপ করেছে। তা, এই করে মাসে আত্মীয়স্বজনদের সে সত্তর-পঁচাত্তর—কি আশি টাকা পর্যন্ত সাহায্য করতে পারছে। দুর্দিন, মানুষের দুরবস্থা, কাজেই সাধ্যে কুলোলে সেটা করতেই হয়। মানুষের দুঃখ দুর্দশা তো আর চিরকাল বসে থাকে না—চিরকাল এ সব সাহায্য করতেও হয় না।

কিন্তু অনিমেষের বউএর তাতে ঘোর আপত্তি। সে বলে, চিঠিপত্রে, মুখের কথায় সহানুভূতি জানাও, নেহাত যেমন বুঝলে দু-পাঁচ টাকা দাও—বাস, তার বেশি নয়।

শুধু যে অনিমেষের আত্মীয়স্বজনকে দিতে আপত্তি তাই নয়, রেখার নিজেরও যে আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন উদ্বাস্তু হয়ে, তাঁদেরও বেশি পয়সা দিয়ে সাহায্য করুক অনিমেষ, রেখা তা চায় না। সে চায়, শুধু নিজেরা খাবে, নিজেরা পরবে, নিজেরা একে আরেকে ভালবাসবে, একের জন্য আর-একজন দরকার হলে প্রাণও দেবে, কিন্তু পরের জন্য—ওই আত্মীয়স্বজনদেরই পর ভাবে সে—তাদের জন্য কষ্ট করে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতেও সে রাজি নয়।

এখন ধর, আগে থেকেই অনিমেষ যদি তার বউকে জানাত যে, সে আড়াইশ' টাকা মাইনে পায়, তা হলেই এ সমস্যাটা আর দেখা দিত না।

টাকা রোজগার করি আমি, খরচও করব আমার খুশিমত—এ কথা বললেই যদি সমস্যা মিটে যেত, তা হলে আর অনিমেষের মত ছেলেকে এরকম বিপদে পড়তে হত না।

আরে, বিয়ের সময় তো কন্যাপক্ষকে মাইনের কথা জানাতেই হয়। বর যা মাইনে পায়, তার চেয়ে বরং কিছু বাড়িয়েই বলা হয় কন্যাপক্ষকে—তাতে পাত্রের দর বাড়ে। সেটা কি আর বুঝিনে! বেশ তো, বল না হাই, আড়াই-শ' টাকা মাইনে পেলে, বল তিনশ' টাকা পাচ্ছি। তারপর বিয়ে হয়ে গেল। পণ যা আদায় করা গেল, তা এল। তার কিছুদিন পরে ঘোষণা করে দাও যে, মাইনে ছিল দুশ' টাকা আর অমুক-তমুক খাতে অ্যালাউন্স ছিল একশ' টাকা—মোট তিনশ' টাকা মাইনে ঠিকই ছিল, কিন্তু কম্পানি এমনি ইয়ে যে, ধাঁ করে কেটে দিয়েছে তোমার অ্যালাউন্সের একশ' টাকা। সেই সঙ্গে জানিয়ে দাও যে, বউ ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ অকল্যাণটা ঘটল—অতএব বউ অপয়া! বাস্, বউ এবং সেই পক্ষের একেবারে......হাঁ, ফেস্ ক্যাল্সিয়াম্'—মুখ চুন।

অনিমেষকে বললাম, "রেখা যে লিখেছে, তুমি মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়ি ফের না!"

তারও জবাব দিল। বাস্তুহারা আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতে যায় তো অনিমেষ প্রায়ই। আপিস ছুটির পরেই যেতে হয়; তা ছাড়া আর সময় কোথায়? এখন, কাছাকাছি যে সব আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের খোঁজ নিয়ে, রাত আটটা-নটা কি দশটা-এগারোটার মধ্যেও ফিরে আসা যায়। ফিরে এসে বলে, আপিসে বেজায় কাজ পড়েছিল। চুকে যায় ল্যাঠা। কিন্তু দূরে দূরেও আছেন আত্মীয়স্বজনরা—ধর, কাঁচরাপাড়ায়, রাণাঘাটে, কেষ্টনগরে। সে সব জায়গায় গেলে, হয়তো চেষ্টা করেও আর সে রাতে ফিরতে পারে না। এদিকে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়েছিল—সে কথাও বলবার জো নেই!

বিয়ে করার ওই আর এক ফ্যাসাদ। বিয়ে করেছ কি ব্যস্ রিজার্ভ। সারা দিন, এমনকি রাতেরও দশটা অবধি তুমি বাইরে বাইরে গো-হত্যা—নরহত্যা করে বেড়াও, দোষ নেই, কিন্তু তার পরে—মানে, রাতের শোয়ার সময়টা যদি তুমি শ্বশুরের পা টিপেও কাটাও, রেহাই পাবে না, কৈফিয়ৎ দিতেই হবে; প্রশ্ন হবে, যেখানে বসে শ্বশুরের পা টিপেছ, সেখানে শালীরা কেউ ছিল কিনা—থাকলেও ছিল কোন্ ঘরে?

অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়িতে বোনেদের নিয়ে আমার কথা কী লিখেছে যেন দেখ......"

তারও উত্তর পাওয়া গেল। অনিমেষের ভগ্নীপতির মাস্টারমশাই, শুধু টিউশনেই মাস্টার নন, বাড়িতেও ওদের সবকটি ভাই-বোনকে প্রাইভেট পড়াতেন তিনি, [illegible] কাছেই বাড়ি তাঁদের, দু' পরিবারে খুবই মাখামাখি ছিল, সেই মাস্টারমশাইও এসেছেন সপরিবারে বাস্তুহারা হয়ে। তাঁর ছোট মেয়েটি দেখতেই সুন্দরী, এখনও তার বিয়ে দিতে পারেন নি গরিব বাপ। সেই মেয়ে একদিন কোনরকমে জোর করেই অনিমেষের সঙ্গে চলে এসেছিল অনিমেষদের বাড়ি দেখতে, দেখে গেছে একটু বেড়িয়ে। অনিমেষ তাকে সঙ্গে আনতে চায়নি, কিন্তু মেয়ে নিজেই [illegible] আবদার ধরে জোর করেই চলে এসেছে। ব্যস, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। [illegible] মেয়েটির নাকি কোন অপরাধ করেনি দেখা, আদর-আপ্যায়ন [illegible] অবশ্যই করেছে, [illegible] [illegible] সারাদিন কাটিয়েছে। তারপরে, বিকেলবেলা সেই মেয়েকে পৌঁছিয়ে দিয়ে অনিমেষ যখন বাড়ী ফিরল তখন—আর যাবে কোথায়? [illegible] তাই বলে বউটি একেবারেই নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল বেচারি ভালমানুষ ছেলেটাকে।

বউএর চেয়ে বছর-দুয়েক ছোট তারই এক খুড়তুতো বোন—সেই বোনকে বউ সেই যে ছোটবেলা দেখেছিল, তারপর এতকাল আর দেখেনি। সেই মেয়েটি এখন ডাগর ডোগর হয়ে বাপ-মার সঙ্গে এসেছে বাস্তুহারা হয়ে। সে এসেছে একদিন অনিমেষের সঙ্গে। মজা করবার জন্য পথেই দু'জনে পরামর্শ ঠিক করে এসেছিল। দিদির বাসায় এসে মেয়েটি গোড়ায় পরিচয় দেয়নি নিজের—বলেছে, সে অনিমেষবাবুর বান্ধবী।

ব্যস, দেখতে-না-দেখতে আকাশে মেঘ করে ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিল। তারপরে পরিচয় দিয়েও মেয়েটির নিস্তার নেই। বোন বলে আদর-আপ্যায়ন করেছে বটে, কিন্তু যাবার সময় বলেছে, "এতবড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছিস, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঢলাঢলি করতে লজ্জা করে না?"

এই বলে শুরু করে, মেয়েটিকে একেবারে নাকি চোখের জলে নাকের জলে ভাসিয়ে তবে বিদায় দিয়েছে। বাড়ী ফিরে ক'দিন পরে সেই মেয়ে নাকি আবার নানা রকম দুঃখটুঃখ করে অনিমেষের কাছে এক চিঠি লিখেছে। তার ফলে আর একখানা ঝড় বয়েছে অনিমেষ বেচারির ওপর দিয়ে।

ছোঁড়ার অসহায় অবস্থা দেখে আমি তো হতভম্ব। সে দেখি ফুঁসছে। বুঝলাম, বাড়ি গিয়ে হয়তো একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। বললাম, "বুঝলাম সবই। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে, অনিমেষ। বাড়ি গিয়ে রাগারাগি কিছুই করবে না, ঘুণাক্ষরেও বউমাকে জানাতে পারবে না যে, তার চিঠির কথা তুমি জানতে পেরেছ। একেবারে চুপচাপ থাকবে। তোমার মুশকিল-আসানের ভার আমি নিচ্ছি।"

খিঁচিয়ে উঠে বলল, "ও কাজটি দয়া করে করবেন না, স্যর। ওকে যদি বোঝাতে যান, হয়তো আপনারও মান রাখবে না। ওর মিষ্টি-মুখটাই দেখে এসেছেন, শুনে এসেছেন; সে-মুখ দিয়ে যে কী পরিমাণ তোড়ে ঝরাতে পারে, কী প্রখর বাণ ছুঁড়তে পারে, আপনি তা ধারণাও করতে পারবেন না।"

বললাম, "ক্ষেপেছ? সে পথই মাড়াব না আমি।"

মতলবটা তখনই জানালাম অনিমেষকে। বললাম, তার মন যদি না হলে, বাড়ি গিয়ে নিজেই একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসবে হয়তো, আমার অনুরোধ হয়তো চেষ্টা করেও রাখতে পারবে না। বোকা বউটা খাণ্ডারি তো কারও কম নয়।

সব শুনেই বললাম অনিমেষকে। শুনে সে একমুখ হেসে, পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করে, বেরিয়ে গেল।

কী করলাম? তার দিনদুই পরে, আপিসের প্যাডের কাগজে অনিমেষকে দিয়েই টাইপ করিয়ে, [illegible] মেরে, নিজের সইটির তলায় [illegible] করে, একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম অনিমেষের নামে, তার বাসার ঠিকানায়। তাতে লেখা হল, তার স্ত্রীর অভিযোগক্রমে জানা গেছে যে, সে অতি দুশ্চরিত্র, সুতরাং এই আপিসের চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল।

শুধু বড়সাহেবকে ছাড়া আর কাউকে জানালাম না এই ষড়যন্ত্রের কথা। কাজটা একটু বিপজ্জনক তো। খোদ-কর্তাকে না জানিয়ে এমন করা ঠিক নয়। শুনে, সাহেব হাসল আরকি প্রাণভরে খানিকটা। সাহেবও খুব ভালোবাসেন ছেলেটাকে।

ছুটি পাওনা ছিল অনিমেষের কিছুর. তাকে দু' মাসের ছুটি দিয়ে দিলাম। তখন, রোজ সে বাসা থেকে বেরোতে লাগল চাকরি-খোঁজার নাম করে। চাকরি যখন নেই, পুরো মাইনের সঙ্গে তিনশো টাকা দিয়েই আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করার সুযোগ পেল দুটি মাস। দিনের শেষে সন্ধ্যার সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতেও আর বাধা নেই তখন।

ওদিকে বধূমাতার অবস্থা তখন কাহিল। বোকা মেয়ে, রাগের মাথায় ভাবতে পারেনি যে, তার চিঠির ফলে স্বামীর চাকরিতে টান পড়বে। বেকার স্বামীর বউএর যা হাল হয়, তাই হল আরকি তার। এদিকে অনিমেষ বাক্যবাণ ছাড়তে লাগল টিপে টিপে, বিবাগী হয়ে বেরিয়েও যেতে লাগল মাঝে মাঝে। কেষ্টনগর-শান্তিপুর পর্যন্ত যেতে হলে সেইটেই সুবিধে।

দু'মাস যেতে হল না। মাসদেড়েক যেতেই একদিন শ্রীমতী রেখা এসে হাজির হল আমার বাড়িতে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। দেখে মায়া হল। কেঁদেকেটে একাকার—তার স্বামীকে আবার চাকরিতে নিতে হবে।

গম্ভীরভাবে বললাম, "কিন্তু চাকরি যাওয়া যত সহজ, হওয়া যে তত সহজ নয়, মা। তা ছাড়া, অমন দুশ্চরিত্র লোককে চাকরিতে নিই কী করে?"

রেখা এক রকম দিব্যি গেলেই বলল যে, তার স্বামীর আর সে স্বভাব নেই—সেসব একেবারেই শুধরে গেছে।

বললাম, "তা হলেই বা চাকরি তাকে আমি এখন দিই কোত্থেকে? চাকরি তো আমি হাতে গড়তে পারি না।"

সেদিন ফিরে গেল বিরস মুখে। আবার এল ক'দিন পরে। বললাম, "দেখি কী করা যায়।"

ফের এল আর একদিন। বড় মায়া হল। আর ঘোরাতে পারলাম না। বললাম, "আগের চাকরি তো আর হতে পারে না। একটা চাকরিতে এখন চেষ্টাচরিত্র করলে বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে, মাইনে কম—আড়াইশো টাকা সাকুল্যে।"

যেন হাতে স্বর্গ পেল।

বললাম, "কিন্তু আমার কাছে তাকে কথা দিতে হবে যে, মাইনে পেলেই সে পুরো আড়াইশো টাকাই তোমার হাতে তুলে দেবে—গোনাগুনতি হাতখরচার টাকা ছাড়া আর এক পয়সাও পাবে না"।

ভারি খুশি হয়ে। স্বামীর নাকের দড়ি একেবারে পুরোপুরি হাতে এসে গেল আরকি!

বললাম, "কিন্তু এ কাজটাতে মাঝে মাঝে তাকে মফঃস্বলে যেতে হবে। হয়তো আগে থাকতে বাসায়ও জানানো চলবে না—আপিসে এল, সেখান থেকেই মফঃস্বলে যাত্রা। ফিরবে হয়তো পরদিন—কি তার পরদিন। অবশ্য যাতায়াতের খরচা কি বাইরে থাকা-খাওয়াদাওয়ার খরচা এসব আপিস থেকেই পাবে।"

তাতেই রাজি—এবং মহাখুশি হয়েই চাকরির কাজে বাইরে যেতে হবে, বাইরে থাকতে হবে, তার ওপর তো আর কথা চলে না।

দু' মাস ছুটি-অন্তে অনিমেষ এসে আমাকে পেন্নাম করে, সাহেবকে সেলাম ঠুকে, হাসিমুখে নিজের জায়গায় এসে বসল।

বেড়ী

অনিল বরন ঘোষ

কাঁচা সোনার মত গায়ের রং। বাপ মা তাই আদর করে নাম দিয়েছিলেন রাই কাঁচা সোনা। পঞ্চান্ন বছরের রাই কাঁচা সোনাদি পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ বিধবা।

স্বামী মারা যাবার পর পাঁচ বছর ছিলেন শ্বশুর ঘরে। ত্রিশ বছর আগে একমাত্র ভায়ের প্রথম সন্তান হবার সময় তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন ও-ই। তারপর থেকে রয়ে গেছেন ভায়ের সংসারে। প্রথমদিকে শ্বশুরঘর থেকে নেবার জন্য এসেছিল বারকয়েক। বোনকে ছাড়েনি বুদ্ধিমান সহোদর। চিররুগ্না স্ত্রীর সংসারে তার এমন একটি মানুষের প্রয়োজন রয়েছে বৈ কি—।

বছরের পর বছর এগিয়ে চলে। ভায়ের সন্তান সংখ্যা একটি থেকে বারটিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। রুগ্ন বৌঠান আর সবল হবার সুযোগ পেলেন না। সন্তানের জন্ম দেওয় যেদিন তাঁর শেষ হোল, বার্ধক্য সেদিন হিংস্র নখর মেলে হেসে উঠল।

সন্তান খালাস করেই ভ্রাতৃবধূ নিশ্চিন্ত। গড়ে-পিটে মানুষ করার ঝামেলা সোনাদির। অতবড় সংসারের হেঁশেল ঠেলা, অপগণ্ড একগাদা শিশুর ঝক্কি সামলানো......

প্রথম দিকে অস্থির হয়ে উঠতেন সোনাদি। এক একবার ইচ্ছে হোত শ্বশুরঘরে ফিরে যাবার। জ্ঞাদের একটু মন জুগিয়ে চল্লেই সেখানে আর কিছু বাধে না, সেখানে কে সয় এমন ঝামেলা—কিন্তু ইচ্ছে তাঁর একবারের তরেও বাস্তবরূপ নেবার সুযোগ পায়নি। অবোধ শিশুগুলির কাঁকলি...কচি কচি মুখের কুটি কুটি দাঁত বের করে হাসি...রাতে বিছানার চারপাশ থেকে নরম নরম হাত দিয়ে পিসিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমন আর রূপকথা শোনার বায়না...

একটু একটু করে সোনাদির নতুন জগৎ গড়ে ওঠে। সে জগতে তিনি একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। সুখদুঃখ, হৃদয় তাঁর ভরে যায়, দুঃখ তাঁর মুছে যায়। ভায়ের সংসারকে নিজের করে নিয়ে তিনটি যুগ কাটিয়ে দিলেন।

কিছুদিন আগে দুই ভাইপোর বিয়ে হয়েছে। নতুন লোক এসেছে সংসারে। তারা ভাগ করে নেয় সোনাদির ক্ষমতা। দুবেলা রান্না করা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই তাঁর। বউরা হাসি-মুখে বলে, সারাজীবন এ সংসারের জন্য এত খাটলেন পিসিমা। এবার একটু বিশ্রাম নিন—

বজ্জাতি দেখে গা জ্বলে যায়। পিসিমার জন্য অত দরদ ত আয়না উনানের ধারে। রান্নাটা তোরা কর, আমি না হয় পরিবেশন করব...দেখে-শুনে খাওয়াবো—

কাজকর্মের ফাঁকে রান্নাবান্নার অবসরে সোনাদি পাশের দাসেদের বাড়ী গিয়ে বসেন। সুখ-দুঃখের দশটা পাঁচটা কথা হয়।

কথার ফাঁকে দাসগিন্নী বলেন, তা দিদির এবার গা জুড়োল। বুড়ো বয়সে কেন আর শুধু শুধু রান্নার পাটটুকু হাতে রেখেছেন, ও মায়া ছেড়ে দিন—

ইঙ্গিতটা সোনাদি বোঝেন। গম্ভীর হয়ে যান তিনি। বলেন, ছেলেমানুষ ওরা কি রান্না করবে দিদি? কে কতটুকু ঝাল খায়, কার কতটুকু মশলা লাগে—পরের ঘরের মেয়ের এসব কি জানে?

শুনে ওরা মুখ লুকিয়ে হাসে।

বছর না ঘুরতেই সন্তান-সম্ভবা হোল বড়-ভাইপো বউ। রান্নাঘর থেকে ডাক পড়ল সোনাদির।

যথাসময়ে একটি মেয়ের জন্ম দিল বউ। স্বামীর কাছে তাদের মানুষ হবার কাহিনী শুনেছে সে। তাই মেয়ের জন্ম দিয়ে মেয়ের দায়িত্ব আর নিলে না।

সোনাদির রাজত্বে নতুন প্রজার আবির্ভাব হোল।

সেদিন উনানে ডাল বসিয়ে চৌকাঠে পিঠ দিয়ে বসে আছেন সোনাদি। একটু ঝিমুনিও এসেছে। কোলের মাঝে মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ওঠে।

চমকে ওঠেন সোনাদি। আমেজ যায় ভেঙ্গে। ঝিনুক থেকে আলগোছে করে এক ফোঁটা মধু তুলে লাগিয়ে দিলেন মেয়েটার ঠোঁটে আসা জিভে।

মুখের মাঝে জিব টেনে নেয় মেয়ে। চুকচুক শব্দ তুলে চাটতে থাকে পরমানন্দে।

শিশুর মুখের দিকে তাকালেন সোনাদি।

ফোলা ফোলা চোখ দুটি ওর বুজে আসে। ভ্রুর রেখা অস্পষ্ট। কালো কালো এক মাথা চুল। টুসটুসে দুটি গাল।

একটি মাছি এসে বসে মেয়ের টিকালো নাকের উপর। চমকে ওঠে মেয়ে। সোনাদি হাত নাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মাছি।

তিন বছরের সর্বকনিষ্ঠ নাদুস ভাইপোটি এগিয়ে এল পিসিমার দিকে। নতুন আগন্তুকের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থেকে কেঁদে উঠল সে মিন মিন করে।

—কি চাই? ভ্রূ কুঁচকে সোনাদি তাকালেন ভাইপোর দিকে। উত্তর দেয় না ছেলে। কান্নার আওয়াজ ওর আরও একটু বাড়ে।

—আঃ কি জ্বালাতন! বল না কি চাই? বিরক্তি ফেটে পড়ে সোনাদির কণ্ঠে।

এবার ছেলেটা মাটির ওপর ধপ করে বসে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে কণ্ঠে দরদ ঢেলে সোনাদি বলেন, কি হয়েছে বাবা।

ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেটি বলে, খা—ব...

—ও রামো...তাই বল খিদে পেয়েছে? ফটি...ও ফটি...

পিসিমার ডাকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অতি রুগ্ন বছর দশের একটি ভাইঝি।

—কি কাচ্চাবাচ্চা ওখানে? নে দু' পয়সার মুড়ি এনে দে ওকে। আঁচল থেকে একটা আধ আনি খুলে দিলেন সোনাদি। ওর ঘর ছেড়ে যেতে না যেতেই অষ্টম ভাইপোর সুতীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসে।...দাদা চাল খাচ্ছে পিসিমা...

—নরক...নরক...সাক্ষাৎ নরক! কোথায় এনে ফেলে ভগবান—সখেদে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সোনাদি।

রান্নাঘরে গিয়ে তাঁর চক্ষুস্থির। ওবেলার দেড় আনা ব্যাগভর্তি চালগুঁড়ি মেঝেতে

অ্যাডভাইস

কার্তিক মজুমদার

খুলনায় সকালের ট্রেণটা ফেল করে কলকাতার দুপুরের গাড়ীটায় উঠেছিলাম। সারা রাত্তির ষ্টিমারের ভিড়। ট্রেণে আগে থাকতে উঠেই একটু জায়গা পেয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। কখন খুলনা ছাড়ল কখন দৌলতপুর পার হল ভগবানই জানেন।

ঘুম ভাঙ্গল পাশের লোকের কথাবার্তায়। আমার বেঞ্চেরই এক কোণে এক ভদ্রলোক ও একটি মেয়ের গলার আওয়াজ সবচাইতে শোনা যাচ্ছে বেশী। কামরায় বেশী লোক নেই। ভদ্রলোকের বেশ জোরালো গলার আওয়াজ, খুব হা হা করে হাসছেন, আর মেয়েটি কথা বলে যাচ্ছে অনবরত। তাদের কথার বকর বকরের ঠেলায় আর বেশীক্ষণ শুয়ে থাকা গেল না, উঠে বসতে হল। ভদ্রলোক তাঁর লাল দাঁত বের করে আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, বললেন, 'এরই মধ্যে যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

একটু অপ্রতিভ হাসি হাসলাম। এবার ভদ্রলোক আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভাল করে। বছর কুড়ি বয়স মেয়েটির, সাঁওতাল মেয়েদের মত রং আর সেইরকম অপূর্ব স্বাস্থ্য। পরণে হাল ফ্যাসানে শাড়ী পরা, কিন্তু খালি পা। একটানা কথা বলে যাচ্ছে হাত পা নেড়ে হেসে হেসে। ভদ্রলোক তাঁর লাল দাঁত বের করে হ্যা হ্যা করে হাসছেন। মাঝে মাঝে সিল্কের একটা রুমাল বের করে মুখ মুছছেন।

আমি উঠতেই ভদ্রলোক একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'যাবেন কদ্দুর?' একটা কাঁচি সিগারেটের প্যাকেটও এগিয়ে ধরলেন তিনি।

বললাম, 'কলকাতা।'

উনি চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আরে, জানিও ত' কলকাতা [illegible] এমন ভাব দেখালেন যেন কলকাতায় খুব কদাচিৎ লোকে যায়, তারপর আপনায় হাসি হাসলেন, 'ভালোই হল একসঙ্গে যাওয়া যাবে, একজন সঙ্গী মিলল। আমি শিয়ালদা' থেকে যাব ভবানীপুরে, আপনি?'

'বালীগঞ্জ।'

'বাঃ একসঙ্গেই তা হলে চলেছি আমরা। কলকাতায় যা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে, কোন্ সময় কে যে তলাপেটে ছোরা মারে কে জানে, আচ্ছা বিশ্রিক যায়গা হয়েছে মশায়।' ভদ্রলোক এক কুণ্ডলী ধোঁয়া গিলে ফেলে বললেন, 'আচ্ছা একটা অ্যাডভাইস দিন ত' মশাই। কলকাতায় গিয়ে বালীগঞ্জের ট্রেণ ধরা কি ভাল হবে, না বাস?'

বললাম, 'আমি ত বালীগঞ্জের ট্রেণই ধরব, এ সময় ওটাই ভাল।'

'ঠিক বলেছেন', উনি আবার গ্ল্যাড হয়ে গেলেন, আপনি খুব দামী অ্যাডভাইস দিয়েছেন, ট্রেণই ভাল, তারপরে ওখানে গিয়ে বাসে উঠলেই হল। কি বলেন।'

ফাঁকা ট্রেণ, ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিতে সুরু করলেন, দৌলতপুরের কাছেই গভর্ণমেন্টের একটা এগ্রিকালচারাল ফার্মের উনি জুনিয়ার অফিসার। মাইনে-টাইনে ভালই দেয়। কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে তাদের বাড়ী আছে, সেখানে বাবা, স্ত্রী পরিবার সবাই থাকে। হামেসাই তার কলকাতা খুলনা যাতায়াত করতে হয়।

বললাম, 'সঙ্গে উনি কে আপনার—?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হাঁ ওর কথাই বলছি। ও দৌলতপুরের, সেখান থেকে ওকে নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায়। বড় দুঃখী মেয়ে, কলকাতায় আমার বাড়ীতে ঝি-টির কাজ-টাজ করবে। ওর কেস যদি শোনেন ত সে একটা হিস্ট্রী—।'

'হিস্ট্রীর নাম শুনে নিজের অজ্ঞাতেই আমি একটু হাঁ করলাম।

ভদ্রলোক আরও একটু কাছে এসে ঘেঁসে বসলেন, বললেন 'মেয়েটা মিশনারী [illegible] মানুষ, ভাল আদব-কায়দা জানে, ইংরেজী-টিংরেজীও একটু আধটু জানে মশাই। ছিল এক সাহেবের বাড়ী, আয়ার কাজ করত। কিন্তু সাহেব বদলি হওয়াতেই মুস্কিলে পড়ল। ওখানকার একদল বদ ছোকরার নজরে পড়ে গেল। তারা মশাই ওকে একেবারে উদ্বাস্তু করে তুলল। শেষকালে মেয়েটা এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে পড়ল। আমি ওখানকার লোক [illegible] নই, তারপরে [illegible] লোকের ভাল করতে গেলে বিষম বিপদ। অথচ মেয়েটাকে উদ্ধার না করলে নিশ্চিত বদমাইসের হাতে পড়ে। আপনি কি বলেন?'

বললাম, 'উদ্ধার করা অবশ্যই উচিত।'

উনি খুসী হয়ে আমার কাছে এসে বসলেন, বললেন, 'আপনার অ্যাডভাইসের দাম আছে, শিক্ষিত লোক আপনি, মতে মেলে। আমিও মশাই ঠিক করলাম ওকে উদ্ধার করবই। মেয়েটাকে বললাম, কলকাতায় গিয়ে আমার বাড়ী বা কোন আত্মীয় বাড়ীতে ঘরের কাজ-কর্ম্ম করতে আপত্তি না থাকে ত চল। এ ছাড়া ওদের হাত থেকে বাঁচবার কোনো উপায়ও নেই। মেয়েটা তখনি রাজী সে তখন কান্নাকাটি করছে। মুখে বলা সোজা কিন্তু কাজ করা ভারি কঠিন মশাই। কত কষ্টে যে মেয়েটাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করলাম সে ভগবানই জানেন। আসবার দিনেও মশাই চারখানা উড়ো চিঠি পেলাম আমাকে মারবে বলে শাসিয়েছে ছোকরারা। বেশী উচ্চি করা যায় না, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লতিফ মিঞার ছেলেও দেখি সেই দলে। কিন্তু মশায় আমার নামও নলিনী [illegible], সরকারী চাকরে, কাজ করে তবে [illegible] নেই।'

বললাম, 'খুব ভাল কাজ করেছেন আপনি, একটা অনাথা মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচালেন।' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখি জানলার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় না আমাদের কথা তার কানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে।

ভদ্রলোক ব্যগ্রভাবে বললেন, 'ভাল কাজ করিনি একটা অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে? এ আমাদের উচিত নয় কি? সে যত বিপদই আসুক। আপনার কি অ্যাডভাইস?'

আমি উদারভাবে ভদ্রলোকের কাজের প্রশংসা করলাম। গান্ধীজীর উক্তি উল্লেখ করলাম, বললাম, যথার্থ পুরুষের কাজ করেছেন আপনি। শুধু এ কাজ করলেই হবে না, আরও করবেন।

উনি গদ গদ হলেন, বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলেও সুখ। আপনার অ্যাড-ভাইসের দাম অনেক।'

গল্প করতে করতে সময় কেটে গেল। এক-সময় হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ঘড়িতে চারটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ। উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকলাম কখন শিয়ালদা আসবে। উদ্বিগ্ন হবার কারণ সাড়ে পাঁচটার মধ্যে শিয়ালদা না পৌঁছাতে পারলে কারফিউতে আটকে পড়ে যাব। তখন ওদিকে আমাদের দাঙ্গার দ্বিতীয় দফার হাঙ্গামা চলছে। সাড়ে পাঁচটা থেকে ট্রাম বাস সব বন্ধ হয়ে যায়, ছটা থেকে সারারাত চলে কারফিউ। [illegible] ট্রেনও ঐ সময়ের মাথায় মাথায় ছেড়ে [illegible] সেই কথা [illegible] সুতরাং দুজনেই উদ্বিগ্ন হলাম।

[illegible] ছাইলো [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] ইচ্ছে করতে লাগল। [illegible] বালীগঞ্জের ট্রেন ছেড়ে [illegible] ট্রাম বাস বন্ধ, কারফিউ [illegible]

ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে উঠলেন, [illegible] একটা [illegible] এক রকম [illegible] একটা অ্যাডভাইস দিন [illegible]

কি আর ব্যবস্থা করা যায়, বললাম, [illegible] রাতটা কাটাই। [illegible] কাল সকালে উঠেই [illegible] ট্রেন বালীগঞ্জ ধরব।

উনি খুসী হলেন, বললেন, 'আপনি ঠিক অ্যাডভাইস দিয়েছেন।' বুকিং অফিসটার সামনে বহু ট্রেন থেকে নামা কারফিউতে আটকা যাত্রী সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়েছিল। ওরই মধ্যে একটু জায়গা করে মেয়েটার জন্যে সতরঞ্চি পেতে বিছানা করে এপাশে আমাদের বিছানা পাতা হল। আমার সঙ্গেও বিশেষ কিছু ছিল না, সুতরাং ভদ্রলোকের অনুরোধে তাঁর বিছানারই একটা অংশ গ্রহণ করলাম। উনি [illegible] বালিশের তুলায় দিয়ে চিৎ হয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালেন।

নিস্তব্ধ শিয়ালদা স্টেশন। বহু দূরে অন্ধকারে দাঙ্গা হল্লার আওয়াজ অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। সশস্ত্র পাঠান পুলিশ বন্দুক হাতে নিয়ে আমাদের আশে-পাশে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে টর্চ ফেলছে এর ওর মুখে। এই অদ্ভুত পরিবেশে ঘুমে জাগরণের দোলায় কখন সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন মাঝরাত্তির। ঘুম ভাঙ্গল বললে ভুল হবে ঘুম ভাঙ্গানো হল। চোখ মেলেই দেখি জনতিনেক পুলিশ আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, একজন প্লেন ড্রেসে সাব-ইনস্পেক্টার গোছের লোক আমাকে ঠেলছেন, মশায় শুনছেন উঠুন উঠুন।'

শিয়রে যম দেখার কথা লোকে প্রায়ই কল্পনা করে, যমকে সত্যি শিয়রে দেখলেও হয়ত তাই ডরায় না। কিন্তু শিয়রে পুলিশ, এ একেবারে কল্পনার বাইরে, এ দৃশ্য দেখলে মনে হয় কোথায় বাঁচি বাবা? ধড়মড় করে উঠে বসলাম, 'কি ব্যাপার?'

সাব-ইনস্পেক্টারটি ছোকরা বয়সী, বললেন, 'আপনি [illegible] মজুমদারকে চেনেন? দৌলত-পুরের [illegible] এর প্রোপ্রাইটার।'

বললাম, 'চিনি না, সামান্য আলাপ হয়েছে ট্রেনে।'

উনি বললেন, 'তার সঙ্গের মেয়েটিকে?'

বললাম না। [illegible] তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক আর সেই মেয়েটি বিছানায় নেই। বললাম, এরা কোথায় গেল?

উনি [illegible] বললেন, 'থানায়।'

[illegible] ছিল [illegible] উনি গেল, বললাম, কি হয়েছে ব্যাপার?'

উনি বললেন, [illegible] চুরির কেস, মেয়েটিকে [illegible] দৌলতপুর থেকে। আমরা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম।

এর পরে কিছুক্ষণ উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ওর সঙ্গে এক [illegible] কিছুই জানেন না এ ব্যাপারে?'

[illegible] কিছুই জানি না, [illegible]

উনি বললেন, 'আপনার নামটা কি?'

নিজের নামটা বললাম, ছাপ করে নিজের [illegible] আওয়াজ করে উঠল। কি সর্বনাশ আমার পদবীও যে মজুমদার।

তবে বিপদে পড়লে লোকের সাহস মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। [illegible] থেকে [illegible] সাব-ইনস্পেক্টারকে [illegible] যোগাযোগ ছাড়া [illegible] মজুমদারের সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই। শুধু ট্রেনের সহযাত্রী হিসাবে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। নিজের পরিচয় দিলাম, যে কলেজে মাস্টারি করি তার নামটাও বললাম।

আমার মুখ দেখে তার বিশ্বাস হল, গরু চুরি হলে হয়ত এড়াতে পারতাম না, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বাস করলেন। যাবার সময় বললেন, কিছু মনে করবেন না, একটা ফরমাল এনকোয়ারির হিসাবে দরকার ছিল বলেই আপনার ঘুম ভাঙ্গালাম। আমিও ভগবানের নাম নিলাম, খুব রক্ষা পেয়ে গেছি!

সারা রাত কোনো রকমে ভোর হল। কাল রাত্তিরের কারফিউ আজ সকালে দিনের আলোয় দেখলে টেরও পাওয়া যায় না। আমি

মাছ চাই—চাই মাছ

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথাটা না ভেবে সোজা বালীগঞ্জের একখানা টিকিট কাটলাম। তার সহযাত্রীটা কাল রাত্তিরেই পুলিশের জিম্মায় দিয়েছিলাম। সুতরাং আর কোনো দরকার ছিল না তাকে। মনে হল কি সর্বনেশে লোকের পাল্লায় পড়েছিলামরে বাবা!

ট্রেন ছাড়ার দেরী আছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্টল থেকে ধীরে ধীরে এক পেয়ালা চা খেলাম, একটু কাগজ পড়লাম, তারপর খানিকটা পায়চারি করে একটা কামরাতে উঠে পড়লাম। যেখানে বাঘের ভয়—উঠেই দেখি ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি। কিন্তু একা, সঙ্গে মেয়েটা নেই।

আমাকে দেখেই উনি ব্যাকুল হয়ে লাফিয়ে উঠলেন, আপনাকেই খুঁজছিলাম দাদা সেই তখন থেকে। একটা অ্যাডভাইস দিন ত কি করা যায়।

আবার অ্যাডভাইস! কিছু না বলে শুধু বললাম, 'কি হয়েছে?'

উনি তাড়াতাড়ি সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে বললেন, আপনি হয়ত সব জানেন না। কাল রাত্তিরে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ পুলিশে টেনে নিয়ে গেল থানায়, বলে কিনা মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে এসেছি। বুঝুন ব্যাপার! কই প্রমাণ দিই, কিন্তু মশাই দারোগার কাছে কি ভদ্দর লোকের কথার দাম আছে। মেয়েটাও মশাই মহা ধড়িবাজ, সেই যে চুপ করে বসে রইল বাস, মুখে আর রা নেই! মাঝখান থেকে পরের উপকার করতে গিয়ে মশাই আমার মহা বিপদ। আবার আমার অফিসে কোয়্যারি করবে বলে দিল। দেখুন ত কি হাঙ্গামা।

বললাম, 'দারোগা কি বলে?'

ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বললেন, 'নীচের মাথার কাজীর বিচার! দারোগা বলল, যতদিন আমি কলকাতায় আছি ততদিন মেয়েটা তার জিম্মায় থাকবে। আমাকে ফিরবার সময় পুলিশ সমেত দৌলতপুর যেতে হবে। ব্যাপার বুঝুন। এসব না হয় মিটিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু এরা আবার কলকাতার ঠিকানায় খোঁজ করতে যাবে আমার বাড়ীর কাজের জন্যে কোনো মেয়েছেলে নিয়ে আসবার কথা ছিল কিনা!'

বললাম, 'তাতে কি আছে, বাড়ীতে সব কথা বলবেন খুলে, আমাকে যা বলেছিলেন।'

ভদ্রলোকের মাথাটা আকাশে মেরে গেল। একটা চোখ [illegible] আমার দিকে তাকিয়ে থেকে

বললেন, 'ধ্যাঃ মশাই তাকি হয়। বাড়ীতে আমার ফাদার রয়েছে, ওয়াইফ্ রয়েছে। মেয়েছেলের ব্যাপার, তারা কি চট্ করে ইয়ে করবে? কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, একটা অ্যাডভাইস দিন ত দাদা। আমার সঙ্গে একটু চলুন নয়ত'।

এমন সময় জানলায় হঠাৎ এক লাল-পাগড়ি পুলিশের মুখ দেখা গেল, সে জানলার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোককে দেখে 'এই তো বাবু ইধার হ্যায়' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে এল। বলল, 'আপনি কোথায় গিসলেন, দরোগাবাবু বোলাছেন জলদি। সঙ্গে সঙ্গে আর চারজন পুলিশ কামরায় ঢুকল।

ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেছে। তবু তিনি হাঁপ-ঝাঁপ দিয়ে উঠলেন, 'আবার কেন? আমি ত বলে এসেছিলাম।

'উয়ো জানি না, আমাকে জলদি লিয়ে যেতে বলেছেন।' জমাদার তাঁর কাঁধে হাত রাখল, 'জলদি চোলেন।'

নামতে নামতে ভদ্রলোক বললেন, ঠারো, এবাবুকি যায়েগা, হামারা দোস্ত।' আমাকে বললেন, 'একটু আসুন না দাদা কাইন্ডলি, পরের ট্রেণটায় না হয় যাবেন। আমার কিছু অ্যাডভাইসের দরকার ছিল—।'

কিন্তু তার চাইতে বেশী দরকার ছিল আমার। অন্তর্যামীকে ডাকলাম, ভগবান এ লোকটার হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায় উপদেশ দাও। একবার এর পাল্লায় পড়ে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে আবার সেখানে গিয়ে পড়ব? ভগবান ডাক শুনলেন, অচমকা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেণটা ছেড়ে দিল।

ভদ্রলোক তখন লালপাগড়ি ঘেরা হয়ে প্ল্যাটফরমে। আমার কামরার বাইরে, অ্যাডভাইসের বাইরে, বহু দূরে।

পূজা-সংখ্যা সম্পাদনা : পরিমল গোস্বামী ও সহকারী ভূষণ দাস। ছোটদের পাততাড়ি সম্পাদনা : অখিল নিয়োগী ও সহকারী কিরণচাঁদ বর্মণ।

গল্পের ইলাস্ট্রেশনে সাহায্য করিয়াছেন : কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, গোপাল ঘোষ, সূর্য রায়, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন বল, সুধীর মৈত্র, সিদ্ধেশ্বর মিত্র।

শারদীয় যুগান্তরের লাইন ও হাফ-টোন ব্লক প্রস্তুত করিয়াছেন : সরকারস্ ফোটোটাইপ স্টুডিও।

ফক্‌রে গাড়ুল

(২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

অথচ নিজের অবস্থায় বিরক্ত হয়ে সাধুসন্ন্যাসী হয়েও বেরিয়ে যাননি। কি কি উনি করেননি, সবই আমরা বুঝলাম। কিন্তু সেখানে থেকে উনি কি কি কাজ করে এলেন, তার বিবরণ তো কিছু শুনলাম না।"

বাদী-উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ধর্মাবতার, ও প্রশ্ন এখানে অবান্তর। পৃথিবীর মানুষরা কাজগুলো তো কেউ নিজের থেকে করে না, প্রকৃতি যাকে দিয়ে যেটা করিয়ে নেয় সে তাই করে মাত্র। তার বোঝাপড়া হতে পারে প্রকৃতির দরবারে, এখানে নয়। এঁর উপরে প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি নির্দয় ছিল, কোনো দিক দিয়ে কোনো সুযোগই সে এঁকে দেয়নি, জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু তবুও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওঁর কোনো নালিশ ছিল না। একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে সবরকম দুর্ভাগ্যই উনি সহ্য করে এসেছেন সজ্ঞানে, অথচ একেবারে নির্বাক হয়ে। আমার মনে হয়, এই নির্বাক হয়ে থাকাটাই ওঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা।"

প্রতিবাদী উকিল বললে, "ধর্মাবতার তাহলে ওঁর বিরুদ্ধে আমিও নির্বাক হয়ে রইলাম। বিরুদ্ধে বলবার মতো কোনো কথাই আমার নেই।"

সভাগৃহ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে স্বয়ং বিধাতা পুরুষই সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। অত্যন্ত সহানুভূতির স্বরে তিনি বললেন, "বৎস, আজ থেকে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সমস্ত দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে আত্মা দিয়ে তুমি নির্বাক থেকে সহ্য করবার সাধনাই করে এসেছ, সে সাধনাতে তুমি জয়ী হয়েছ। পৃথিবীতে এর মাহাত্ম্য কেউ বুঝতে পারে না। শক্তি না থাকলে এতখানি সহ্য করা অসম্ভব। তুমি নিজেও জানতে না যে কতখানি শক্তি তোমার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তবু তুমি ভয় পাওনি, নিজের সংকল্প থেকে একবারও বিচ্যুত হওনি। এবার তার পুরস্কার তোমার মিলবে। বল তুমি কী চাও।"

কিন্তু ফক্‌রে মুখ তুলে কথাই বলল না, পূর্বের মতো নিষ্পন্দ নির্বাক হয়ে রইল।

বিধাতাপুরুষ বললেন, "বুঝতে পারছি, পৃথিবীতে থেকে সারা জীবনটাই তুমি কষ্ট পেয়েছ, সুখের মুখ একবারও দেখনি। একবার না হয় ফিরে গিয়ে সেখানকার সুখগুলো তুমি ভোগ করে এস, কি প্রকৃতিকে আমি বলে দিচ্ছি, এবার সে তো[illegible] সুখ-সৌভাগ্যে পূর্ণ করে দেবে। এতে তো[illegible] মত আছে তো? এবিষয়ে তোমার মতটাই জানতে চাই।"

এই প্রথম ফক্‌রে মুখ তুলে চাইলে, প্রথম সে কথা বললে। সে হাতজোড় করে ব[illegible] "প্রভু আপনি যা হুকুম করেন তাই [illegible] তবে আপনি যে সব সুখের কথা বল[illegible] ওগুলোকে সইয়ে নেওয়া আরো বেশি [illegible] আমি দেখেছি কিনা, একটু যার কপাল [illegible] তার অমনি মাথা বিগড়ে যায়। বক[illegible] রাগারাগি না করে তার একটা দিনও কা[illegible] আমার ধাতে ওসব সয় না। তবে সে কথা [illegible] দিন, হুকুম মেনে চলাই আমার কাজ।"

বিধাতাপুরুষ একটু হেসে বলে[illegible] "না না, আমি তো হুকুম করছি না। তো[illegible] যখন তা ইচ্ছা নয়, তখন তুমি এখানেই থাকে[illegible] তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই, এখানে[illegible] সব জিনিসই তোমার। যা নিতে চাও ন[illegible] যা ভোগ করতে চাও ভোগ করো। কোন [illegible] চাই তোমার?"

ফক্‌রে হাতজোড় করে বললে, "আ[illegible] প্রভু যখন হুকুম করলেন তখন বলি, এ [illegible] কোনো কিছুই আমি চাই না। এসব নিয়ে [illegible] করব? শুধু যদি রোজ সকালে উঠে দু[illegible] গরম রুটি আর তার সঙ্গে একটু [illegible] গুড় পেয়ে যাই তবে তাতেই আমি খুশি।"

সভাসুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দ শুনে ঘুমটা আমার ভে[illegible] গেল। চেয়ে দেখি পাশের ঘরে অনিল ভা[illegible] আড্ডা বসেছে, সেখান থেকেই হাসির শ[illegible] উঠছে। কিন্তু এতক্ষণ যা বাপার দেখল[illegible] তা কি নেহাৎ স্বপ্নই দেখলুম?

(হিন্দী সাহিত্যের একটি কাহিনী অবলম্বনে)

সম্পাদক—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকা প্রেস, ১২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।

নতুন মানুষ

তোমারে দেখেছি আমি নেভা তটে ফিন্ উপসাগরের মুখে,
যেখানে দিনের আলো নেভে নাকো বহুদূর রজনীর বুকে—
সেই সমুদ্রের ধারে গোধূলির নেভা নদী যেথা কম্পমান
সেখানে দেখেছি তোমা, পৃথিবীর নবাগত হে নওজোয়ান !

দেখেছি সে রণতরী যেথা লাল পতাকার প্রথম বিদ্রোহ,
জারের প্রাসাদে যেথা পড়েছিল অগ্নি গোলা বিষম দুঃসহ
রক্তক্ষত ইতিহাস,—পায়ে পায়ে কী দুর্দান্ত দুরন্ত মিছিল,
কে রুধিবে গতি তার ? দীপ্তমুখে সূর্যালোক করে ঝিলমিল !

মস্কোভা নদীর গর্ভে রাজ্য গেল, গেল সান্ত্রী সিপাই লস্কর,
বরফে ডুবিয়া মরে রাজগুরু—অভিজাত জুয়াড়ী তস্কর।
ক্রীতদাস তোলে মাথা, ভূমিদাস আসে দুই শীর্ণ বাহু মেলি—
এলো নারী নবনেত্রী, মধ্যযুগ অন্ধকার কারাগার ফেলি।

নীপার নদীর বাঁকে—দেখেছি তোমার মুখে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা,
দিগন্ত প্রান্তরব্যাপী ফসলের মাঠে যেন নাই কোন সীমা,
কসাকের অশ্বক্ষুরে ধূলি উড়ে, ডন নদী যেথায় স্তিমিত
চাবুকে জর্জর গাত্র, একদা যে মানুষেরা ছিল মৃত্যুভীত—
তারা যেন আয়ু পেল, আশা পেল, জীবনের বাঁচিবার আশা,
শহরে বন্দরে পেল সর্বহারা জনতার জয়ধ্বনি ভাষা !

শির দরিয়ার রেখা পার হয়ে দেখেছিনু সেই মরুভূমি,
তাতার মোঙ্গল আর তৈমুরের করধৃত তরবারি চুমি—
কোথায় সমরখন্দ ? কোথা জাগে বোখারার বর্বর প্রহরী ?
অতীতের ইতিবৃত্ত আজ যেন বোর্খা ঢাকা নির্জীব শর্বরী।
মধ্য এশিয়ার বন্ধু, হে বিপ্লবী, জাগিয়াছ বধ্যভূমি হতে—
দীর্ঘ চেনারের ছায়ে দেখেছি তোমায় আমি পামীরের পথে।'

পূর্বাগিরি অরণ্যেরে ভেদ করি বহে যেথা নীল দানিয়ুব
মধ্য যুগ সামন্তের দানবেরা একদিন মেতেছিল খুব—
বোতলে ডুবিত যারা, নারী সঙ্গে রণরঙ্গে ঘোর মাতলামি,
রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধে দিত যারা জীবনের আক্কেল সেলামি,
সেথায় দেখেছি তোমা, সন্ধ্যালগ্নে নীল চক্ষু দানিয়ুব তীরে
নয়া গণতন্ত্র দেশে—স্বপ্ন যেথা আসে আজ দুই তীর ঘিরে,
পাখীর পালকে যেথা ঘুম নামে কিষাণের খামারে খামারে
সেই পূর্ব ইউরোপে—রক্তাভ আপেলকুঞ্জে দেখেছি তোমারে।

আমি এক পর্যটক, বহুদূর ভারতের রাজধানী হতে—
এসেছিনু দেশে তব, দেখে গেনু তোমাদের অরণ্যে পর্বতে—
নব নব জনপদে জীবনের কী আশ্চর্য তপস্যা গভীর !
তোমারে প্রণাম করি নবযুগ সাধনার হে বিপ্লবী বীর,
পুরানো এ পৃথিবীর ইতিহাস ঝরে পড়ে জীর্ণপত্রসম—
এই সিন্ধু এই গঙ্গা এই পদ্মাতীরে হোক নবজন্ম মম।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপূজার সময় আমার যে কি আনন্দ হ'ত, বালক না হ'লে হৃদয়ঙ্গম হবে না। সে আনন্দ আমার একার নয়। এবার অমুক তারিখে পূজা, এক মাস দু মাস থাকতে দিন গণা হ'ত। যখন যা ইচ্ছা, কলিকাতা সহরে তখন তা কিনতে পাওয়া যায়, একদিনের মধ্যে বিয়ের যোগাড় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা উৎসব নয়, রেল-গাড়ীতে তীর্থ ভ্রমণ। গ্রামের লক্ষণ এই, সেখানে প্রত্যেক উপকরণ খুঁজতে হবে, যোগাড় ক'রতে হ'বে। আমি আমার দশ বার বৎসর বয়সের পরের (আশি, পঁচাশি বৎসর পূর্বের) কথা ভাবছি। তখন মা বাড়ীর গিন্নী, বড়দাদা বাইরে কর্তা।

পূজার এক মাস পূর্বে কর্তা ফর্দ বা'র ক'রতেন, এত খইর ধান, এত মুড়ির চা'ল, এত আলো চা'ল, এত সিদ্ধ চা'ল, এত সরু চা'ল চাই। কনকচূর ধানে বড় বড় গোল গোল খই, খরকুলি ধানে ফুলা ফুলা মুড়ি হয়। আমাদের দুই ধানেরই চাষ হ'ত। না হ'লে গ্রামে পাওয়া যেত। রামশা'ল চালের মত সুস্বাদু কোমল চা'ল বড় দেশে আর একটি নাই। রামশালি অবশ্য শালি ধান্য। আমরা এই চা'ল প্রায় বার মাস খেতাম। মরাই হ'তে ধান বা'র করে' 'ভাচা' দেওয়া হত। মুড়ির চা'ল কারে দিতে এত, ভাতের চা'ল করে' দিতে এত ধান যাবে। এত ধান দিলে এত চা'ল পাওয়া যাবে, এটা জানা কথা। সেটি ভাচার বেতন। গ্রামে জ্বালানের কষ্ট, পূজাতে অনেক চাই, পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছ বাবলা গাছ কাটতে ও চেলাতে মুনিষ লেগে গেছে। দিন কয়েক চেলিয়ে কর্তাকে দেখালে, 'এই কাঠে কুলাবে?' কর্তা 'হাঁ' ব'লতে যাচ্ছিলেন, গয়লা এসে হাজির, 'দই বসাতে কাঠ চাই, এখনই দেওয়া হ'ক, সে গোয়ালঘরের মাচায় তুলে রেখে যাবে, একখানি কম হ'লে চ'লবে না, দই ভাল না হ'লে তার অখ্যাতি। গিন্নী এসে বললেন, 'খই, মুড়ি ভাজবার কাঠ কই? এখনই দাও, আমি ভাজাশালে রেখে দিইগে'। মুনিষরা কুড়াল রেখে তামুক খাচ্ছে। কর্তা ব'ললেন, তাই ত, আর একটা তেঁতুল ডাল নামিয়ে আন।' বাবলা ও তেঁতুল গাছ আপনি জন্মে। চারা গাছ কেটে লাভ নাই। গাছও অফুরন্ত নয়। অনেক বাঁশ ঝাড়; শুখনা বাঁশ খুঁজতে হ'ত; অনেক তাল গাছ, শুখনা তাল-বাখড়া কাটতে হ'ত, ভাজা-শালায় চলে' যেত। দিন কয়েক পরে, মুড়ির চা'ল, ভাতের চা'ল এল, কর্তারা মাপিয়ে নিলেন। বাকুলে গিন্নীরা দাঁতে কেটে দেখে নিলেন। কেউ বল্লেন, 'মুড়ির চা'ল বেশী শুখিয়ে কড়া করে ফেলেছে', কেউ বল্লেন, 'ভাতের চা'ল রসা আছে।' মুড়ি খই—অনেক চাই, যে আসবে তাকেই এক সরা মুড়ি, এক সরা মুড়কি, গোটাচারি নারিকেল নাড়ু দিতে হবে। যাত্রার দলকেই কত চাই। বাড়ীর মেয়েদের এত ভাজবার সময় নাই, ও পাড়ার জাঁখালের বউকে, সে পাড়ার তিনুর মা-কে ডাকাতে হবে, তারা মুড়ি ভাজে ভাল, বছর বছর ভাজে (এখানে বেতনের কথা উঠত না।)

কর্তা ফর্দ দেখেন। কোন্ দিন কি চাই, কত চাই, কোন্ কুটুম্বাড়ী কি তত্ত্ব পাঠাতে হ'বে, গিন্নীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে। পূজার বলির পাঠা এই সময়েই কিনতে হবে, পরে দাম চড়ে' যাবে। পশ্চিমের বন দেশের কা-রা ছাগলের পাল নিয়ে এসেছে, অনেক ছাগলের মুখে ঘা, দেখে দেখে কিনতে হবে, পূজার পাঠায় খুঁট চলবে না। সন্ধি পূজার কাল পাঠা সহজে পাওয়া যায় না। একজন ব'ললে, অমুকের একটা আছে, এখনই ব'লে রাখা ভাল। যাত্রার দলও ত চাই। 'অমুক দল গেল বছর গেয়েছিল, মন্দ নয়।' মন্ত্রীরা বলে, 'বছর বছর একই দলের যাত্রা ভাল লাগবে না। অমুক দল গায় ভাল, ফুরাণ কিছু বেশী।' কর্তা ঘাড় নাড়েন 'ফর্দে এত নাই।' (ফর্দে ছিল ৩০্ টাকা।) 'পূজার সময় ভাল যাত্রাই বা কোথায় পাওয়া যাবে? এই দেখ না, সে বছর যে সম্প্রদায় এসেছিল, সেটা একেবারে নূতন, দিন কতক তা-না-না করে' বলে, অমুকের ভাঙ্গা দল' কথায় বলে, পূজার সময় কানা-কুঠো পাঁঠাও প'ড়তে পায় না।'

চন্ডীমন্ডপের নীচের মেঝায় এই রকম কথাবার্তা হ'চ্ছে, তামুক পুড়ছে, চিন্তামণি সূত্রধর শুনছে। এই সূত্রধরের বাবা ও খুড়ো প্রতিমা গড়ত। এরা গড়ত না, খুড়া, ভাই, বেটা নিয়ে তিন-চারজনে আসত। আগে এক মেটো করে গেছে। খড়ের পুতুল, বেটো দোড়ী দিয়ে টান করে' বেঁধে মাটি ধরিয়ে গেছে। উত্তর মাঠে প্রতিমা গড়ার মাটি পাওয়া যেত, গাঁয়ের কুমরও সে মাটিতে হাঁড়ী গড়ত। এক মুনিষ ঝোড়া চারি মাটি এনে দিত। কাঠের পাটার উপর মাটি রেখে, কাঁকর বেছে বেছে ফেলে দিয়ে তুষ মিশিয়ে এক মেটোর মাটি হ'ত। এখন দু-মেটো ক'রতে এসেছে। এখন মাটিতে পাট মেশাতে হবে। তখন গাঁয়ে পাট চাষ ছিল না, হাট হ'তে কিনে রাখতে হ'ত। চিন্তামণি যাত্রার নামে কান খাড়া করেছিল।

দু' মেটো করতে দু-তিন দিন লাগত, সকালে আসত, দুপুরে এখানে হাত না পুড়িয়ে ঘরে ভাত খেতে যেত। আবার বিকালে আসত। চিন্তামণি বাকুলে যেত, কে খুড়ী, কে দিদি চিনত। 'খুড়ী নাইবার তেল দাও,' 'খুড়ী জল-পান দাও,' 'খুড়ী ঘর যাচ্ছি, সিধা দাও'। প্রতিমা গড়বার সময় আমি কোথাও ন'ড়তাম না, চিন্তামণির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম। মেড় এতদিন এক কোণে দাঁড়িয়েছিল খড় আর দোড়ী। চিন্তা-মণি কি গুণ জানে, তার ছোট সুরাঁদ খড় দোড়ীকে মানুষ করে' দিয়েছে। এতদিন মানুষও হয়নি, মাথা ছিল না। চিন্তামণি ঘর হ'তে মুন্ড গড়ে এনেছে, বলে, ছাঁচে গড়েছে।

কুমর বউ বাকুলে গেল, পূজার বাসন এনেছে। দু বাজরা হাঁড়ী-কুড়ী দু বোন-পোর মাথা হ'তে বাইরে ঠাকুর দালানে নামানো হ'চ্ছে। পথ অল্প বটে, এই দক্ষিণ পাড়ায়, তবু ঘেমে গেছে, মাথার কাপড়ের বিড়া খুলে বাতাস ক'রছে, এক ছিলিম তামুকের চেষ্টা দেখছে। শীতলা মা, এর বাড়ীতে থাকতেন, কুমর বউ সেবাইত। বিধবা, তার একটি মেয়ে ছিল, ছেলে ছিল না। তার মেয়ের নাম বসন্ত, সে বসন্তের মা। সে টোটকা-টুটকী অনেক ঔষধ জানত, জল-পড়া, তেল-পড়া দিত, ছেলেদের অসুখ-বিসুখ হ'লে প্রথমে তাকেই ডাকা হ'ত, সে শীতলা-মায়ের চান-জল নিয়ে আসত। সে যে ভিটায় থাকত, সেটা আমাদের। শীতলার ঘরও সেই ভিটায়। সে সূত্রে শীতলা-মাও আমাদের। কুমরণী আমাদের প্রজা, সে সে, কুমর এই তিন গুণে তার পসারও দ্বিগুণ ছিল। মানুষটিও ভাল, খল কপট নয়। তার নাম বিন্ধ্যবাসিনী, অসাক্ষাতে লোকে বিন্দে কুমরণী বলত। কর্তার কাগজে ফর্দ আছে, তার মুখেই ফর্দ আছে। সে একটিও ভুলে না। গিন্নীরও ভুল হয় না। ঠাকুর দালানের নীচে দিয়ে বাকুলে যাবার পথ, সেখানে সদর দরজা। তার সম্মুখে খোলা বারান্ডা, তার সম্মুখে রোয়াক। গিন্নী ও দুই ঝিঅড়ী বেরিয়ে এলেন। গিন্নী বারান্ডায় থাকলেন, ঝিঅড়ী রোয়াকে দাঁড়ালেন। পূজার ঘট, গাড়ু-হাঁড়ী, সহস্র ধারার ছোট ভাঁড়, প্রদীপ, ধুনোচুর, ছোটখুরী, বড়খুরী, চাঁটি, বাটী সরা, তেলানো সরা, মালসা, মুড়ি ভাজা খাপরী ও খোলা, ভাতের ছোট-বড় মাঝারী হাঁড়ী, চেপ্টা তিজেল, কলসী, ভাঁড়, তামুক খাবার ক'লকে, সব নূতন চাই, পুরানো ফেলা হবে। কুমর-বউ হাঁড়ী-কলসী-খাপরী-ঘট সব বাজিয়ে বাজিয়ে আলাদা ক'রছে, ঝিঅড়ীরা রোদের দিকে ফুটো দেখছে। 'কই গো, ভাতের হাঁড়ী আর কই? ফেন ঢালবার ডাবা কই? ঘটের গায়ে ফুল আরও সাদা করনি [illegible]? জল ধ'রবে না তো?' কুমর-বউ বলে, 'মায়ের ঘট, আর কিছু নয়! জল ধ'রবার জো আছে?' সে সব বাসন একদিনে আনতে পারেনি, কাল-পরশুর মধ্যে বাকি দিয়ে যাবে। পূজোর সময় সম্বৎসরের বাসন জমা হ'ত, নীচেতলার একটা ঘরে হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী সাজানো থাকত। খাপরী ভেঙ্গে গেলেই কুমরঘরে নূতন পাওয়া যেত না। ভাঙ্গছে, ভাঁড়ার হ'তে বেরুচ্ছে। অতিথি আসে, কাকেও মালসা দিলে চলে, কাকেও হাঁড়ী দিতে হয়। কখন কে আসে, ঠিক নাই। ভাঁড়ারের হাঁড়ীতে

ধনুমামার হাসি

পরশুরাম বিরচিত

ভোলানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের ছেলেদের সর্দার। তার বয়স সকলের চাইতে বেশী, পর পর তিন বছর ফেল করে ক্লাস নাইনে স্থায়ী হয়ে আছে। তার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল।

আমাদের শহরটা বড় নয়, ছোট একটি সিনেমা। মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ হত, পুজোর সময় থিয়েটার হত, সরস্বতী পুজোও জাঁকিয়ে হত। এ সব ছাড়া আমাদের ফুর্তির অন্য উপায় ছিল না। একদিন হেডমাস্টার বললেন, কাল শনিবার ছুটির পর তোমরা থাকবে, স্বামী বোমপ্রকাশজী এসেছেন, তাঁর লেকচার শুনবে।

নীরস হিন্দী বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমাদের ছিল না, কিন্তু খোলা মাঠে দল বেঁধে বসাতেও একটা মজা আছে। বোমপ্রকাশ এক ঘণ্টা ধরে সদুপদেশ দিলেন। চুরি, মিথ্যা কথা, অবাধ্যতা প্রভৃতি কুকর্মের পরিণাম, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলে পরিশেষে একটি মন্ত্র সর্বদা আমাদের ইয়াদ রাখতে বললেন — নেকী করনা ঔর বদী ছোড়না, অর্থাৎ ভাল কাজ করবে আর মন্দ কাজ ছাড়বে।

বক্তৃতা শেষ হলে আমরা সকলে খুব হাততালি দিলাম। ভোলা আমার পাশেই বসেছিল, হঠাৎ সে খ্যাক খ্যাক করে বিশ্রী রকম হেসে উঠল। আমি বললাম, ওকি রে?

ভোলা বলল, একটু হেসে নিলাম। এই নতুন হাসিটা প্র্যাকটিস করছি, ধনুমামার কাছে শিখেছি।

—ধনুমামা আবার কে?

—আমার দিদিমার পিসেমশাই ধনঞ্জয় দত্ত, খুব বুড়ো মানুষ। মা তাঁকে বলে ধনু দাদা, তাই তিনি আমার মামা হন। দশ দিন হল এসেছেন, আমাদের বাড়িতেই বরাবর থাকবেন। চমৎকার হাসেন ধনুমামা, কিন্তু বেশী নয়, খুব যখন ফুর্তি হয় তখন।

—তোর তা শেখবার কি দরকার?

—নতুন বিদ্যে শিখতে হয় রে। তুইও তো মুখে দুটো আঙুল পুরে সিটি বাজাতে শিখেছিস। আমার হাসিটা এখনও ঠিক হচ্ছে না, সুর দুরস্ত করতে আরও সাত দিন লাগবে। চল্ না আমাদের বাড়ি, ধনুমামার হাসি শুনে আসবি। একটা চার পয়সা দামের খাতা কিনে নে। ধনুমামা যদি জিজ্ঞেস করে—কি করতে এসেছ হে ছোকরা? তুই অমনি খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে বলবি—আজ্ঞে একটি বাণী নিতে এসেছি।

মোড়ের দোকান থেকে একটা খাতা কিনে নিয়ে ভোলার সঙ্গে চললাম। তার বাবা ঠিকাদারি করেন, বেশীর ভাগ বাইরেই ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে তার মা আছেন, দুটো ছোট ভাইও আছে। ভোলার কাছে শুনলাম, ধনঞ্জয় দত্তর তিন কুলে কেউ নেই, কিন্তু ব্যাঙ্কে লাখ টাকা আছে। তিনি ওদের বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বাস করবেন এতে ভোলার বাবা আর মা খুব খুশী হয়েছেন।

ধনুমামা রোগা বেঁটে মানুষ, কালো রং, তোবড়া গাল, আসল বা নকল কোনও দাঁত নেই। সাদা চুল, খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি গোঁফ, বোধ হয় সাত দিন নাপিতের হাত পড়ে নি। তাঁর শোবার ঘরে তক্তপোশে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন, ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে।

আমি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। ভোলা পরিচয় দিল—এ আমার বন্ধু রামেশ্বর, এক ক্লাসে পড়ে।

ধনুমামা কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙের মতন মোটা গলায় বললেন, কি মতলবে এসেছিস রে?

খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আজ্ঞে বাণী নিতে।

—বাণী? সে আবার কি?

ভোলা আমার হয়ে উত্তর দিল, বাণী জানেন না? সদুপদেশ আর কি, যাতে এর আখেরে ভাল হয় সে রকম কিছু কথা আপনার কাছে চাচ্ছে।

ধনুমামার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে, মিথ্যা কহিবে না, চুরি করিবে না—এই সব তো?

আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ, ঐ রকম যা হয় কিছু।

ধনুমামা বললেন, চোখে ভাল দেখতে পাই না, হাতও কাঁপে। একটা কবিতা বলছি, তুই লিখে নে, নীচে আমি দস্তখত করে দেব। লেখ্—পরের ধন লইবে না, তাহাতে বিপদ। চোরের ধন লইতে পার, অতি নিরাপদ।

অদ্ভুত বাণী শুনে আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ধনুমামা বললেন, কিরে, পছন্দ হল না বুঝি?

ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনি ঠাট্টা করছেন স্যার।

ধনুমামা মাথাটি পিছনে হেলিয়ে চোখ মিটমিট করে উপর দিকে চাইলেন। তাঁর বদনমণ্ডলের সবটা কুঁচকে গেল এবং তাতে যেন তরঙ্গ উঠতে লাগল। তার পর মুখ থেকে বিকট হাসির আওয়াজ বেরুল—খ্যাক খ্যাক খ্যাক। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ভোলা চুপি চুপি বলল, শুনলি তো?

ধনুমামা বললেন, এই ভোলা, একে আমার কাছে এনেছিস কেন রে? এ তো দেখছি ভাল ছেলে, তোর মতন বকাটে নয়। আমার কথা শুনলে এর স্বভাব বিগড়ে যাবে।

ভোলা বলল, আপনি জানেন না ধনুমামা, এই রামেশ্বর হচ্ছে ওয়াটে ক্যাট, মানে ভিজে বেরাল। আপনি নির্ভয়ে একে উপদেশ দিতে পারেন।

ধনুমামা বললেন, উপদেশ তো বিস্তর শুনেছিস, আমি আর বেশী কি বলব। তবে যেটুকু আমি আবিষ্কার করেছি তা তো ওকে বলেই দিলাম।

সাহস পেয়ে আমি বললাম, কি করে আবিষ্কার করলেন বলুন না মামাবাবু।

প্রসন্নমুখে ধনুমামা বললেন, জানতে চাস? আচ্ছা, বলছি। ভোলা তো সোজা ইস্কুল থেকে এসেছিস, জলটল খাস নি তো? ওরে ভোলা, তোর মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে চট করে বিশু ময়রার দোকান থেকে এক পো গজা আর এক পো জিলিপি কিনে আন।

ভোলা খাবার আনতে গেল। ধনুমামা আমাকে বললেন, খাবার আসুক, তোরা খেতে খেতে আমার গল্প শুনবি। ততক্ষণ বরং তুই আমার একটু পা টিপে দে।

আমি ধনুমামার পা টিপতে লাগলাম। একটু পরেই ভোলা খাবারের ঠোঙা নিয়ে এল, বাড়ির ভিতর থেকে দু গেলাস জলও এল। ধনুমামা বললেন, তোরা খেয়ে নে। না না, আমার জন্যে রাখতে হবে না। আমি ও সব খাই না।

গজায় কামড় দিয়ে আমি বললাম, এইবার বলুন মামাবাবু।

ধনুমামা বললেন, লোকে যা বলে তা ঠিক [illegible] নয়। আর কেউ হলে এ সব রহস্য প্রকাশ করত না, কিন্তু আমি কারও [illegible] রাখি না। [illegible] বলে।

[illegible]

—হাঁ। [illegible] বলছি [illegible]।

অনেক বছর [illegible] আমার [illegible] ছিল না। মারা যাবার আগের দিন মা বললেন, [illegible] এই পাড়াগাঁয়ে [illegible] একটা চিঠি লিখিয়ে দিলেন।

মা মারা যেতে [illegible] কাকা [illegible] প্রয়াগদাসের [illegible] চালান লিখতেন। এই ফার্মের [illegible] গয়াপ্রসাদ। [illegible] মাথাপাগল ছেলেমেয়ে আছে, দ্বিতীয় পক্ষের একটি স্ত্রীও আছে। প্রয়াগদাস বাতে পঙ্গু হয়ে প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকতেন, অগত্যা তাঁর খুড়তুতো ভাই বুদ্ধিচাঁদকে ম্যানেজার করে ব্যবসা চালাবার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন। বুদ্ধিচাঁদের বয়েস প্রায় তিরিশ, নিঃসন্তান, স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেন নি।

সে সময়ে আমার চেহারাটি এমন মর্কটের মতন ছিল না, বেশ নাদুস নুদুস বেঁটে গড়ন, ফুলো ফুলো গাল, একটু বোকা বোকা ভাব। কান সর্বদা খাড়া থাকত, গুজ গুজ ফিস ফিস করে কে কি বলছে সব মন দিয়ে শুনতাম। ক্রমশ আমার কানে এল—বুদ্ধিচাঁদ খুব তুখড় কাজের লোক, সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ভাল। কিন্তু হাতটান আছে, ফার্মের টাকা সরিয়ে থাকেন, জুয়ো খেলেন, নেশা করেন, অন্য দোষও আছে।

রামনবমীর দিন ওঁদের নূতন খাতা হত। তার আগের দিন বড় বড় খদ্দেররা তাদের

ফিরে এসে দেখলেন আমি তোরঙ্গের ওপর গাঁট হয়ে বসে আছি!

দেনা চুকিয়ে দিত। আমি বহাল হবার পাঁচ-ছ মাস পরেই ওঁদের বছর কাবার হল, যাকে বলে সংবৎসরী। রাত পর্যন্ত কাজ চলবে তাই আমাদের জলখাবারের জন্যে প্রচুর কচৌড়ি আর লাড্ডু আনা হল। অনেক রাত পর্যন্ত টাকা আসতে লাগল, বুদ্ধিচাঁদ তাঁর কামরায় বসে নিজেই নোট আর টাকা গুনতি করতে লাগলেন, আমি নোটের বাণ্ডিল বাঁধতে লাগলাম। চেক খুব কম, খুচরো টাকাও কম, বেশীর ভাগই পাঁচ শ, এক শ, আর দশ টাকার নোট।

রাত এগারোটার সময় কাজ শেষ হল, আমলারা ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে গেল। বুদ্ধিচাঁদ আমাকে বললেন, হিসাব মেলাতে আমার কিছু দেরি হবে, হাব্দু তুই দরজায় বসে থাক, আমার কামরায় কাকেও ঢুকতে দিবি না। আর শোন, এই প্যাকেটটা তোর কাছে রাখ, কাল মথুরানাথ মিসিরের কিতাবের দোকানে ফেরত দিয়ে বলবি, এসব জাসুসী কহানী (অর্থাৎ ডিটেকটিভ গল্প) বুদ্ধিচাঁদজী পড়তে চান না, ভজমাল গ্রন্থ যদি থাকে তো তাঁকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বইএর প্যাকেটটা আমার চিঠি বিলির ব্যাগে পুরে আমি কামরার বাইরে পাহারায় বসলাম, বুদ্ধিচাঁদ দরজা বন্ধ করে হিসাব মেলাতে লাগলেন। দরজার কবজার কাছে একটু ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। ঘরে কেরোসিনের একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছে, বুদ্ধিচাঁদ টেবিলের ওপর নোটের বাণ্ডিলগুলো নাড়াচাড়া করছেন, মাঝে মাঝে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছেন। তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, একটু পুরানো খুঁক

লোকে বলত এই হাব্দুটা হচ্ছে হাবাগোবা। আমি মনে মনে হাসতাম আর যতটা পারি বোকা সেজে থাকতাম। তাতে কাজও হত। লোকে আমাকে বিশ্বাস করত, অনেক সময় আমার সামনে গুপ্ত কথা বলে ফেলত। কাকা আমাকে বুদ্ধিচাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, হুজুর, আপনাদের আশ্রয়ে বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আর ক দিন। দয়া করে আমার ভাইপো এই হাবুলচন্দ্রকে যা হয় একটা কাজ দিন।

বুদ্ধিচাঁদ আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, আরে হাব্দু, তুই তো বোকা পাগলা আছিস, কোন কাম করবি? আচ্ছা, এখন তোকে পাঁচ টাকা মাহিনা দিব, আমার খাস আরদলী হয়ে ইধর-উধর চিঠ্‌ঠি লিয়ে যাবি। পারবি তো? আমি খুব ঘাড় দুলিয়ে উত্তর দিলাম, জী হুজুর, পারব।

তখনই আরদালীর পদে বহাল হয়ে গেলাম। বুদ্ধিচাঁদ শৌখিন লোক, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গদিতে বসতেন না, টেবিল-চেয়ার-আলমারি দিয়ে তাঁর আপিস-ঘর সাজিয়েছিলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে ডাকতেন। আমার কাজ খুব হালকা, বুদ্ধিচাঁদের খাস কামরার দরজার পাশে একটা টুলে বসে থাকতাম, তাঁর ছোটখাটো ফরমাশ খাটতাম, মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি বিলি করতাম। চিঠি বইবার জন্যে তিনি আমাকে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ দিয়েছিলেন।

হাবা গোবা মনে করে সবাই আমাকে ঠাট্টা করত, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম আর বোকার মতন হাসতাম। কিন্তু

খ্যাক শব্দ বার হল, যেন খ্যাকশেয়াল ডাকছে। তিনি চেক আর খুচরো টাকা লোহার আলমারিতে বন্ধ করলেন, আর সমস্ত নোটের গোছা একসঙ্গে খবরের কাগজে জড়িয়ে সরু দড়ি দিয়ে বাঁধলেন। তার পর পাশের ঘর থেকে একটা ছোট স্টীল ট্রাঙ্ক এনে মেঝেতে রেখে খুললেন। দেখলাম তাতে কাপড় চোপড় রয়েছে।

ঠিক এই সময় আপিস ঘরের সামনের রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। সহিস চেঁচিয়ে আমাকে বলল, এ হাব্বু, মাইজী এসেছেন, বুদ্ধিচাঁদজীকে জলদি আসতে বল।

মাইজী হচ্ছেন কারবারের মালিক প্রয়াগ দাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বুদ্ধিচাঁদ যাঁকে ভাবীজী অর্থাৎ বউদিদি বলেন। আমি দরজা একটু ফাঁক করে বললাম, হুজুর, মাইজী এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। বুদ্ধিচাঁদ বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, আসবার আর সময় পেলেন না, এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছেন! কাজের সময় যত সব বখেড়া। আমাকে তো এখনই রওনা হতে হবে, ট্রেনের টাইম হয়ে এল। হাব্বু, তুই ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে বসে থাক, কেউ যেন না ঢোকে। আমি ভাবীজীকে বিদায় করে এখনই আসছি।

বুদ্ধিচাঁদ তাঁর তোরঙ্গের কাপড়ের মধ্যে নোটের বান্ডিলটা গুঁজে দিলেন। ডালা বন্ধ করতে পারলেন না, একটু উঁচু হয়ে রইল। আমাকে বললেন, হাব্বু, তুই এই তোরঙ্গের উপর বসে থাক, আমি তুরন্ত আসছি।

বুদ্ধিচাঁদ বেরিয়ে যেতেই সিদ্ধিদাতা গণেশ আমাকে বুদ্ধি দিলেন। তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ থেকে নোটের বান্ডিলটা বার করে আমার ব্যাগে পুরলাম, আর ব্যাগে যে বইএর প্যাকেট ছিল তা তোরঙ্গে গুঁজে দিলাম। নোটের বান্ডিল আর বইএর প্যাকেট আকারে প্রায় সমান ছিল।

একটু পরেই বুদ্ধিচাঁদ ফিরে এলেন। দেখলেন, আমি তোরঙ্গের ওপর গট হয়ে বসে আছি, আমার চাপে ডালাটি ঠিক হয়ে বসেছে। ডালা একটু খুলে ভিতরে হাত দিয়ে দেখলেন বান্ডিলটা ঠিক আছে কিনা। তার পর চাবী বন্ধ করে বুদ্ধিচাঁদ ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন, আমি এখনই বহরমপুরে রওনা হচ্ছি, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে হবে। আর সময় নেই, তুই আমার তোরঙ্গটা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দে।

বুদ্ধিচাঁদ আপিস ঘরে তালা লাগিয়ে তার চাবিটা আমাকে দিয়ে বললেন, কাল সকালে বৈজনাথবাবুকে দিয়ে আসবি। বৈজনাথ ছিলেন ফার্মের বড়বাবু, দূর সম্পর্কে মালিকের শালা।

আমার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আর বুদ্ধিচাঁদের তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে আমি আগে আগে চললাম, বুদ্ধিচাঁদ আমার পিছনে চললেন। স্টেশন খুব কাছে। সেখানে পৌঁছে টিকিট কেনা মাত্র ট্রেন এসে পড়ল। তোরঙ্গটা আমার হাত থেকে নিয়ে বুদ্ধিচাঁদ উঠে পড়লেন আর আমাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোর বকশিশ। তখনই ট্রেন ছাড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি কাকার বাসায় ফিরে এলাম এবং নোটের বান্ডিল সুদ্ধ ব্যাগটা বালিশের মতন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম মোটে হল না। বুদ্ধিচাঁদের হাসিটা ছিল ছোঁয়াচে, সমস্ত রাত জেগে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলাম। আমার একটা তোবড়া টিনের তোরঙ্গ ছিল, তাতেই সর্বস্ব থাকত। সকালে সেই তোরঙ্গে নোটের বান্ডিল রেখে বৈজনাথবাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁকে আপিসের চাবি দিলাম। বুদ্ধিচাঁদ বহরমপুরে গেছেন শুনে তিনি বললেন, বহুত তাজ্জব কি বাত! তখনই তিনি প্রয়াগদাসের কাছে গেলেন।

বেলা দশটা নাগাদ হই হই কান্ড। সমস্ত শহরে রটে গেল—বুদ্ধিচাঁদ বিস্তর টাকা নিয়ে পালিয়েছেন, ফার্মের আপিস পুলিসে ঘেরাও করেছে, প্রয়াগদাসের দুজন উকিলও সেখানে গেছেন। আমি কাকাকে বললাম, আমার মনিব তো ফেরার, এখানে থেকে কি করব, কলকাতায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করিগে। কাকার তখন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কিছুই বললেন না। আমি আমার টিনের তোরঙ্গ নিয়ে কলকাতায় চলে গেলাম। শুনেছিলাম দু দিন পরে পুলিশ আমাকে সাক্ষী তলব করেছিল, কিন্তু আমি তখন নাগালের বাইরে।

এর পরের কথা খুব সংক্ষেপে বলছি। কলকাতায় পৌঁছেই নামটা বদলে ধনঞ্জয় করলাম। যে হোটেলে উঠেছিলাম, দু দিন পরে সেখানেই রাজার সরকারের চাকরি জুটে গেল। তার জন্যে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা জমানত দিতে হয়েছিল।

ভোলা বলল, ধনুমামা, আসল কথাই তো আপনি বললেন না। কত টাকা সরিয়েছিলেন?

—এখন পর্যন্ত ঠিক করে গুনতে পারি নি, বাচ্চাদের কাজ তো আমার রপ্ত নেই। একবার গুনে হল দেড় লাখের কাছাকাছি, আর একবার হল চোদ্দ হাজার কম, আর একবার ত্রিশ হাজার বেশী। ভাবলাম গুনে ঠিক করে রেখে কি হবে, টাকা তো ব্যাঙ্কে দিচ্ছি না, আমার কাছেই থাকবে। তার পর রোজগারের চেষ্টায় লেগে গেলাম, যে সব [illegible] কথা তোদের ভাল লাগবে না। একটা [illegible] করেছিলাম, কিন্তু সেটা টিকল না। আমার এই বুড়ো বাঁধানো কাঁথা [illegible] সেই [illegible] দান পেয়েছিলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক রকম ব্যবসা করেছি, তেজারতিও করেছি। রোজগার মন্দ হয় নি। আমার বাবুগিরি আর বদখেয়াল ছিল না, তাই পুঁজির টাকা খরচ হয় নি, বরং একটু বেড়েই গেছে। শেষ বয়সে আর রোজগারের ইচ্ছে রইল না, শরীরও গেছে, তাই কলকাতা ছেড়ে এই নিরিবিলিতে বাস করতে এসেছি। এইবার পাততাড়ি একবার গুড়ে ফেলতে হবে।

ভোলা বলল, বুদ্ধিচাঁদের কি হল?

—তাঁর নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল, শুনেছি তিনি সাধু সেজে হরিদ্বারে ছিলেন, পুলিস সেখানেই তাঁকে ধরে। অনেক দিন মামলা চলল, বুদ্ধিচাঁদ জোর জবানবন্দিতে বলেছিলেন—চুরি তো করেছে সেই শয়তান হাব্বু শালা, আমি শুধু বদনামের ভয়ে ভেগেছিলাম। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। বুদ্ধিচাঁদের নিশ্চয় জেল হত। কিন্তু তাঁর ভাবীজী তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে প্রয়াগদাস মকদ্দমা মিটিয়ে ফেললেন। শুনেছি বুদ্ধিচাঁদ আসামে গিয়ে চায়ের কারবার ফেঁদেছিলেন।

ভোলা বলল, আচ্ছা ধনুমামা, অত টাকা কাকে দিয়ে যাবেন?

—তোর মাকে অনেক টাকা দেব, আমার খুব সেবা করছে কিনা। বাকী আমার সঙ্গেই যাবে।

—সে কি! মরে গেলে কেউ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নাকি?

—আমি ঠিক পারব, তোরা দেখে নিস।

ধনু মামার কথা শেষ হল। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

সাত দিন পরে একজন লোক আমাদের ইস্কুলে এসে খবর দিল, ধনুমামা হঠাৎ মারা গেছেন, ভোলাকে তার মা এখনই বাড়ি যেতে বলেছেন। ছুটি নিয়ে আমিও ভোলার সঙ্গে গেলাম।

ধনুমামাকে উঠানে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর মুখ একটু ফাঁক হয়ে আছে, যেন হাসতে হাসতেই মারা গেছেন। পাড়ার অনেক মেয়ে-পুরুষ ভোলার মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি চিৎকার করে হাত নেড়ে বলছেন, পাজী হতভাগা নিমকহারাম বুড়ো, এতদিন সেবা যত্ন করলাম আর দিয়ে গেলেন কিনা মোটে দু শ সতেরো টাকা [illegible] আমাকে না হয় ফাঁকি দিলি, নাতিনাতনীদের জন্যেও তো রেখে যেতে পারতিস।

ভোলা থেকে [illegible] আমাকে যা জানাল তা এই — ধনুমামার তোরঙ্গ থেকে পুরো [illegible] একটা [illegible] কাগজ পেয়েছে। [illegible] বান্ডিলটার উপর লেখা আছে ভোলার জননী [illegible] এই দুই শত টাকা [illegible]। [illegible] উপর লেখা আছে [illegible]। [illegible] আমার [illegible] নিয়ে [illegible] — আমার যে [illegible] সেইটে [illegible] আছে [illegible] শ্রীমান [illegible] এবং আমার [illegible] শ্রীমান [illegible] পাইবে।

[illegible] কিন্তু ধনুমামার অভিপ্রায় ঠিক পালন করেন নি, শুধু বান্ডিলটাও খুলে দেখেছেন। [illegible] নোট আছে বটে, কিন্তু তার দশ এক পয়সাও নয়, সমস্ত কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা। তাঁর [illegible] [illegible] না হয় ধনুমামা তার পাকা ব্যবস্থা করে গেছেন। ভোলার মা সেই নোটের কুচি কৌটোয় [illegible] দিলেন। [illegible] ভোলার ভোগে লাগে নি, তার মা [illegible] ফেলে রুপোর [illegible] খুলে নিলেন। কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করেন নি, [illegible] রুপোর [illegible] আমাকে দিয়েছিলেন। ধনুমামার সেই স্মৃতিচিহ্ন আমি সযত্নে রেখেছি।

শ্রীশ্রীদুর্গা

উপন্যাস প্রসঙ্গে

শ্যামশেখর বসু

উপন্যাসে যখন চোর ডাকাত বা দুশ্চরিত্র ক্যারাকটার থাকে, তার মানে এটা নয় যে তুমি এই রকম হবে। এর মানে এ রকম আচার ব্যবহার বর্জন করবে। এমন নভেল ইংরেজীতে বা বাংলায় নেই যে তাতে ভাল-মন্দ চরিত্র দেখা যায় না। "চোখের বালি"কে "কুৎসিত উপন্যাস" বলার জন্য সুরেশ সমাজপতি পঞ্চাশ বছর পরে কবিশেখরের হাতে প্রচন্ড থাবড়া খেয়েছেন। কবিশেখর একটি পত্রিকায় লিখেছেন "বাংলা সাহিত্যে চোখের বালির যে তুলনা নাই তাহা আজ কে না জানে?" মিথিলা ও উত্তরপ্রদেশের জেলা বিশেষে চুম্বনের সাহিত্যে বা (স্কচ, স্প্যানিশ গানের মতন) সংগীতে স্থান নেই। থিয়েটারে ৫০ বছর পূর্বে যখন "গোবিন্দলাল" জলে ডোবা রোহিণীর মুখে ফুঁ দিতেন ভীর-হুতিয়া দর্শকরা বাঙ্গালী দর্শককে ঘৃণায় বলতো "কেহন গন্ধানালা কি পোঁথি লিখ্‌ল' তোহর বঙ্কিম ছোঁড়ীরকে মুহাসে ওঠ লাগাকর বাঙ্গালীবাবু হাওয়া ফুকত রাম!"

অথচ এত ঘৃণা করেও সেই খোট্টাদের একই দল প্রতি পারফরম্যানসে যেত, আমরাও প্রতি পারফরম্যানস-এ রোহিণী দেখতাম, না রাগ করে। বাড়ীতে দর্শকরা রোজই ফুঁ দিচ্ছেন, কিন্তু পরের ফুঁ দেখা চাই। একেই ফ্রয়েডিয়ান পণ্ডিতগণ "পীপিং ম্যানিয়া" বলেন। আড়ি-পাতার সঙ্গে প্রায় এক, এই মহাপাপ।

একটা লাইব্রেরী থেকে "চোখের বালি" এনে দেখুন বইখানার আকর্ষণ কি রকম। মলাট-খানিতে চা দুধ ঘি হলুদ মাছের ঝোল লেবড়ে আছে, কর্তা পড়েছেন, গিন্নী পড়েছেন, ছেলে-পিলে বউ ঝি একসঙ্গে উপভোগ করেছে। শত শত বাড়ীর লোক পড়েছে, ফিংগার প্রিণ্ট দিয়েছে, পেনসিলে কালিতে হরেক রকম নোট লিখেছে মার্জিনে।

বিনোদিনী কিরণময়ী কি নভেলিস্টের কোন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার? বউ থাকতেও কি কারণে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে "দৃঢ় বক্ষে" টানাটানি করতো? গল্পে কোনও 'সায়েণ্টিফিক' বনিয়াদ দেখাবার জন্য কি বই লেখা হয়েছে?

ফ্রয়েডিয়ান পণ্ডিতরা বলেন, যখন নারীর পুরুষের প্রতি ভালবাসা অতিরিক্ত হয়, তখন "সেম সেক্সের" প্রতিও ভালবাসা সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়। রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জন্য সখিদের প্রতিও গাঢ় অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবেসে তার স্ত্রী আশা বিনোদিনীকেও ভালবেসে ফেলল। বিনোদিনী ও আশা এক হ'ল। অনেকে মনে করেন আশা বুঝি বোকা ছিল, তাই বিনোদিনীর "বাড় বেড়ে গেল"। না, "লেসবিয়ান লভ" জন্মাল বলেই আশা বিনোদিনীকে উপঢৌকন স্বরূপ স্বামীকে দিল।

কিরণময়ী, রোহিণী, শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ের" ছোট গিন্নী "বিনোদিনী" জগতে চির-কালই আসছে যাচ্ছে, চলচ্চিত্র মতন। কোনটাই মিথ্যা নয়, কোনটাই 'নভেলটি' নয়। কেবল লেখবার কেরামৎটাই নভেলটি। এমন কত বিধবা রেনলডসের বইতে দেখা যায়। টনি ওয়েলারও পুত্রকে সাবধান করেছে :—"স্যামিভেল! স্যামিভেল! বিধবার কহলে পড়িও না।"

[পিকউইক]

সকল দেশে যেমন বিধবা আছে আমাদের বাংলা দেশেও অনেক "বিনোদিনী" "রোহিণী" আছে। তাদের উদ্ধার করবার জন্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর আইন পাশ করিয়েছিলেন। তাদের প্রণয়-জীবনের দুরবস্থা, লাঞ্ছনা, ভ্রম, দেখাবার জন্য বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ গড়েছেন রোহিণী, কিরণময়ী, বিনোদিনী। তিন মহা-পুরুষকে প্রণাম করুন।

মনঃসংযোগে বিনোদিনীর গূঢ় তত্ত্ব বুঝুন, মাতৃজাতির মর্যাদা রক্ষা হবে। গোরুর সতীত্ব নেই, তবু মাতৃজাতি বলে কেউ ঘৃণা করে না, কুৎসিত বলে না। গো-রক্ষার জন্য কত কাণ্ডই না হচ্ছে। গোরুর উন্নতির জন্য দুজন সুইডিস এক্সপার্ট এসেছিলেন। "স্ত্রীজাতি গোজাতির ন্যায় পবিত্র"—উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত দ্রষ্টব্য।

যৌন তাড়নাকে কুৎসিত না বলে চেষ্টা ও প্রার্থনা করুন—যেন জন্মান্তরে বিনোদিনী, রোহিণী, কিরণময়ী মাতৃজাতি পবিত্র দাম্পত্য জীবন ভোগ করেন, আর বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমকে কোলে নিয়ে বলেন "তোরা কার যাদু রে! আমার ছেলের মতন ছেলে রে!"

প্রেমের জন্য মানুষ যখন এত অপমান এবং ক্লেশ স্বীকার করে, আত্মহত্যা করে, সবটা তার কুৎসিত হতে পারে না। বিধাতার সৃষ্টি-ই উদ্দেশ্য।

দেখা যাক, কি রকম পাঠক এরূপ কাহিনী পড়ে ধৈর্যচ্যুত হন। একটা অবান্তর আবশ্যক। এক বাঙ্গালী বাড়ী ভোজ। মুরগী ও পোলাও। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকরা খেতে বসে "হোসটের" সাহস দেখে খুসী হল, কিন্তু জনকয়েক গোঁড়া গো-গ্রাসে কুঁকড়ো গিলছেন ও উড়িয়া পরি-বেষণকারীকে জিজ্ঞাসা করছেন, "কি মাংস?" উড়িয়া বলল, "কুকুড়া অছি"। গোঁড়ারা "হোসটকে" বললেন, "আ ছি ছি ছি! এ কাজটা তোমার ভাল হয়নি, আর একটু রেসটের মাংস দাও ত ঠাকুর।"

যাঁদের ভিতরে ভিতরে কুৎসিত মুরগী মাংস খেতে, 'কুৎসিত' রচনা পড়তে, অভিরুচি, ভণ্ডামির জন্য তাঁরাই গালি দেন। যিনি প্রকৃত ধার্মিক তিনি হেডলাইন দেখেই হেসে ফেলে দেন, আর বকধার্মিক বলেন, "দেখি পড়ে নচ্ছারটা কি লিখেছে!"

শেলি এ রকম লোককে "মেল প্রুড" নাম দিয়েছেন। তাঁর "কাউণ্ট চেনচি" নাটক পড়ে জনকয়েক বালিকার পিতা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে-ছিলেন এই বলে যে, এ রকম অস্বাভাবিক পিতা হয় নাই। অথচ দেখা যায়, এ কল্পনা নহে।

বকধার্মিক 'কুৎসিত' লেখা পড়তে পড়তে দেখেন তাঁর মনের চোর কুঠরির লুক্কায়িত ইচ্ছার সঙ্গে এবং তাঁর বৈড়াল প্রবৃত্তির সঙ্গে মহেন্দ্রের ইচ্ছা মিলে যাচ্ছে, তখন তাঁর নিজের উপর রাগ হয়, তবে তো আমিও তো এই ভাবি, তাহলে আমিও বদলোক। ফ্রয়েডিয়ান পণ্ডিতগণ বলেন, এই রাগ তখন লেখকের উপর পড়ে, তাই তো এ লোকটা আমাকেও বদ প্রমাণ করছে দেখছি,—মার তাকে! এই নিজের প্রতি ঘৃণা লেখকের প্রতি ন্যস্ত করাকে "প্রক্ষেপ" বা "প্রজেকসন" বলে।

মহেন্দ্রর কি ইচ্ছা হ'ত? একবার পত্নীকে "বক্ষে টেনে কেশ চুম্বন করেন [৭০ পৃঃ], আবার "দৃঢ় বলে দুই বাহু দিয়ে বিনোদিনীকে বক্ষে টানলেন" [১৭২ পৃঃ]। এইখানেই তো মুশকিল বাধছে। সেই পরস্ত্রী-প্রেম রবীন্দ্র-নাথকেও বর্ণন করতে হল। যাঁরা পরস্ত্রী-প্রেমের কথায় নাক সিঁটকন, অথচ পড়তেও ছাড়েন না তাঁরা এই বকধার্মিক জাতীয়।

সৌভাগ্যক্রমে সমাজপতির মতন সমালোচক এখন বিরল। এখনকার সমালোচক, কবি, নভেলিস্ট পাঠক-পাঠিকা প্রেমের আর্ট বুঝে-ছেন। রাষ্ট্রভাষা আমাদিগকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়েছে "মরদ কুত্তা কি জাত হায়!" বাংলা গানেও বলে "পুরুষ ভ্রমরা জাতি নানা ফুলে মধু খায়!" কুত্তা এবং ভোমরাকে যদি একনিষ্ঠ করেন তবে ঔপন্যাসিককে কেউ আর্ট সম্বন্ধে বলবে না। সতী-সাধ্বী নিয়ে তো নভেল লেখা চলে না; এক কাপও বিকাবে না।

এই স্থানে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের নারী সৌন্দর্যের বর্ণন মাপজোখ করে দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথের সাহস বেশী, গাঢ় বুকের বর্ণনার একাগ্রতার অপ্রতিহত বেগ শরৎচন্দ্রেও নির্বিরণীর বর্ণন নেই।

বঙ্কিমের মনে "রিপ্রেসন" বা "অবদমন" বা দ্বিধা লক্ষ্য হয়, ম্যাজিস্ট্রেট বলে লজ্জা আছে। ভয় ভয়ে ভূমিকা করে প্রেমের রহস্য ব্যক্ত করেছেন "গ্রন্থকার প্রাচীন, লিখিতে লজ্জা নাই [অর্থাৎ লজ্জা হচ্ছে!] মার্জিত রুচি পাঠক পড়া বন্ধ করবেন। আ ছি ছি ছি! ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে চুম্বন করিলেন।"

ফ্রণ্টিয়ারে কাবুলীরা বর্ডার-নিবাসী মেম সাহেবদিগকে বড় বিরক্ত করতো। ৫টি মোটা খাটো গোট্টা মেম এক বাগানে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে একটি ইংরেজ পুরুষকবি ছিলেন। কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড কাবুলী এসে হঠাৎ পাঁচটা মেমের 'বোসা' খেয়ে বোঁ দৌড় দিল। মেমরা ঘৃণায় 'হিস্' করতে লাগলো। কবি-সাহেব "সিভ্‌ল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটে" কবিতা লিখলেন :—

The fat ladies hiss
The fat ladies hiss
The fat ladies hiss
At a Kabili's kiss!

ফ্রান্সে এক রকম রবারের "কিস্-নেট" বেরিয়েছে। এটা পত্নীর মুখে সেঁটে দিয়ে স্বামী চুমা খান; ব্যাকটেরিয়া কিছু করতে পারে না।

চুমায় কেউ বা ভয় দেখান কেউ উৎসাহ দেন। নেলসন ট্রাফলগারে মরবার সময় বলেছিল :—"কিস্ মি হারডি!" এ দেশেও যা

সেদিনটা ছিল বোধ হয় রবিবার। ছুটির দিন বলে বেলা তিনটে থেকেই আড্ডায় লোক জমতে আরম্ভ করেছিল। হাসি, গান, গল্প ও নানা রসালাপে আড্ডা জমজমাট—এমন সময় শরৎচন্দ্রের উদয়। শরৎদাকে পেয়ে সকলেই খুশী কারণ তিনি ছিলেন আড্ডা জমাতে ওস্তাদ এবং তাঁর গাল-গল্প ছিল যেমন অভিনব তেমনি চমকপ্রদ। তার ওপরে তাঁর গল্প বলবার ভঙ্গী ছিল একেবারে নিজস্ব এবং রসাল। শুধু আমাদের আড্ডা নয়, সে যুগে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যে কোনো আড্ডার পক্ষেই স্পৃহনীয় ছিল।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র আসন গ্রহণ করেই জমিয়ে ফেললেন। তার পরে হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কই হে, সত্যেন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছিনে, সে আজকাল আড্ডায় আসে না?

আমরা বললুম—আসেন, কিন্তু সন্ধ্যের পরে।

আমাদের কথা শুনে শরৎদা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, কেন? তার শরীর ভাল তো? তার চোখ কেমন আছে?

অনেকেই বোধ হয় জানেন না কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত তাঁর জীবনের শেষ দশ পনের বৎসর উৎকট চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। কখনো কখনো তিনি কাল চশমা পরে থাকতেন, পড়া-শুনো একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর দরজা-জানলা বন্ধ করে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। নেহাৎ আপনজনের তাগাদা ছাড়া লেখাটেখাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই রকম নানাপ্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁর চক্ষের দীপ্তি দিনে দিনে নিভে আসছিল। এইজন্য বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। বিকেলে ছুটির দিনে তাঁকে আড্ডায় অনুপস্থিত দেখে শরৎচন্দ্র স্বতঃই মনে করেছিলেন যে, তাঁর চোখের অসুখের কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে আমরা বললুম যে, তিনি আজকাল বিকেলবেলাটা হেদোতে কাটান এবং অন্ধকার হবার পর আড্ডায় আসেন।

—বিকেলবেলা হেদোতে কি বেড়ায়?

—না, বেড়ান না, সাঁতার দেখেন। তিনি আজকাল হেদোর সাঁতারের ক্লাবের একজন মস্ত বড় মুরুব্বি হয়েছেন। সকাল থেকে বেলা ন'টা সাড়ে ন'টা অবধি আর বিকেলে চারটে থেকে সন্ধ্যা অবধি সাঁতারেই মেতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—সাঁতার কাটা খুব ভাল হে, ওটা একটা উঁচুদরের ব্যায়াম।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা উল্লেখ করা কর্তব্য বোধ করছি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে প্রতিদিনই সত্যেন্দ্রনাথ সকাল এবং বিকাল এই হেদুয়ায় কাটাতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হবার আগের দিন বিকেল অবধি তিনি এই নিয়ম পালন করে-ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই হেদুয়া দীঘিতে যে শোকসভা হয়েছিল তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। খুব সম্ভব সে সময় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। এই সভায় কথা হয়েছিল যে, হেদুয়াতে সত্যেন্দ্রনাথের একটি মূর্তি স্থাপিত হবে এবং তাঁরই নামে এই উদ্যানের নামকরণ হবে। কিন্তু—কি করে মুখেরই কথায়!

আড্ডাধারীদের একজন বললেন—সত্যেন-বাবু কি করে সাঁতার শিখেছেন জানেন?

—না, কি করে? পিঁপড়ে খেয়ে নাকি?

সত্যেনবাবু প্রথমে তো সাঁতার ক্লাবের মেম্বার হতেই চান নি। শেষকালে চারুবাবুর (চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পারায় তাঁকে মেম্বার হতে হল। কিন্তু তিনি বলে দিলেন যে, ঐ অদ্ভুত পোষাক পরে হাজার লোকের সামনে জলে নেমে কচি ছেলের মত সাঁতার শিখতে তিনি পারবেন না। তবে কথা রইল প্রতিদিন সকালে বিকেলে তিনি হেদোতে এসে ছেলেদের সাঁতারকাটা দেখবেন। সেই সময়ে জনকয়েক আধবুড়ো লোকও সাঁতারকাটা শিখছিল। মাসখানেক ধরে প্রতিদিন সকাল বিকেলে অন্য লোকের সাঁতারকাটা দেখে দেখে তাঁরও সাঁতারের সখ হ'ল। একদিন এক শুভ-মুহূর্তে তিনিও সুইমিং কস্টিউম পরে জলে লাফ মেরেই হেদোময় কিল বিল করে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। স্রেফ দেখে সাঁতার শেখার কথা ইতিপূর্বে আর কেউ শোনে নি।

সবার হাসি থামলে শরৎচন্দ্র একখানি মোক্ষম রকমের ভাগলপুরী ছাড়লেন—দেখ হে, ওরকম হয়। আমরা ছেলেবেলায় যখন ভাগলপুরে থাকতুম তখন কয়েকজন মিলে প্রতিদিন সকালে গঙ্গায় যেতুম স্নান করতে। সেখানে জলের মধ্যে খুব হুটোপুটি হ'ত। দূরে পাল্লার প্রতি-যোগিতায় সাঁতার ইত্যাদি হত। আমরা যে জায়গায় স্নান করতুম সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে একটা চড়া দেখা যেত। একদিন এক বন্ধু স্নানের আগে প্রস্তাব করলেন—চল, ঐ চড়ায় গিয়ে কপাটি খেলা যাক। সকলেই রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা বাধল ভোঁদাকে নি[illegible] ভোঁদা ছিল বিরাট মোটা আর আমাদের প[illegible] কাজেই ভোঁদা না হলে চলত না। কিন্তু ভো[illegible] সাঁতার জানত না, [illegible] সমস্যা [illegible] কি হবে।

[illegible] বললে ভোঁদা না হ[illegible] খেলা হবে না, ভোঁদাকে চাই।

[illegible]

[illegible] একটি ছেলে চিৎকার করে উঠল ওরে, সাপ সাপ!

সামনের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই এক বিরা[ট] গোখরো সাপ মুখ তুলে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। সেই দৃশ্য দেখে আর কালবিলম্ব না করে আমরা সকলে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীরের দিকে চললুম। প্রাণপণে সাঁতরে কোনো[মতে] জলে এসে মনে পড়ল—ভোঁদার কি হলো!

—ওরে ভোঁদা—ভোঁদারে—

নিশ্চয়ই সে জলে ডুবে গেছে মনে করে আমরা আবার চড়ার দিকে যাব ঠিক করছি এমন সময় ভোঁদা তীর থেকে সাড়া দিলে—এই যে আমি।

ভোঁদা বললে—তোরা যখন সবাই জলে ঝাঁপ দিলি সেই সময় যা থাকে কপালে মনে করে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তার পর তোদের মত হাত-পা খেলাতে খেলাতে তোদের আগেই পাড়ে এসে উঠেছি।

স্রেফ সাপের ভয়ে ভোঁদা সাঁতার শিখে গেল।

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে আর একটি কৌতুককর ঘটনার কথা এই সঙ্গে মনে পড়ছে যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও তাঁকে নিয়েই ব্যাপারটি হয়েছিল।

একবার কি একটা ছুটির সময় আমরা

বাইসন

১৯১৬ সালের এপ্রিলের শেষ দিনে ভোরের অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে প্রথম বাইসন দেখি পালামৌর চেমো গ্রামের সামনে। ৩০।৪০টি বাইসন নিয়ে এই যূথ, যূথপতি এবং যূথের অন্যান্য সকলেরই ঘন কৃষ্ণ সুপুষ্ট দেহ ১॥ টন ওজন তো হবেই হয়তো আরো কিছু বেশী। প্রকাণ্ড মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকানো সুতীক্ষ্ণ একজোড়া শিং যার গোড়ার পরিধি প্রায় ২৪ ইঞ্চি। কোয়েলের ধারে গজিয়ে ওঠা নূতন ঘাস খেয়ে চরতে চরতে ওপারের মেরালের সংরক্ষিত ঘন বনে ঢুকে গেল। সংরক্ষিত বনে বিনা ছাড়পত্রে [illegible] নিষিদ্ধ এবং শিকারের আইন ভঙ্গ করলে সমূহ বিপদ সুনিশ্চিত জেনে তাদের সেবার শুধু দূর থেকে দেখেই ক্ষান্ত হলাম। তখনও তাদের অভ্যাস, স্বভাব ও ভাব-ধারার কোন পরিচয়ই জানতাম না। কিন্তু দেখবার আগেই এই বাইসন বা 'গওর'য়ের খ্যাতি এবং অখ্যাতি কিছুদিন আগে রোদো সিঞ্জো ও বিজকা গ্রামের অধিবাসীদের কাছে শুনেছিলাম এবং তাতে এতই ঔৎসুক্য বেড়েছিল যে, স্বচক্ষে দেখবার ও তথ্য সংগ্রহের আশায় এই অঞ্চলের বনে বনে দু' তিন দিন ঘুরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছি তাদের অস্তিত্বের চিহ্নও চরাগাই (যেখানে চরে) মাত্র দেখে।

সুরগুজা রাজ্য সীমা সংলগ্ন পালামৌর দক্ষিণ পশ্চিমের রাঙ্কা ও ভাণ্ডারিয়া থানা এলাকার এই ছোট বড় উঁচু নীচু পর্বতসংকুল অঞ্চল গহন অরণ্যে ঢাকা। পথ অত্যন্ত দুর্গম। পাহাড়ের গা বেয়ে যে সংকীর্ণ পথরেখা কখনও উঠে কখনও নেমে সর্পিল গতিতে চলে গেছে তাতে পথিক চলে হয় পায়ে হেঁটে নয় ঘোড়ায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় মহাজনদের লাদনা বলদের দল ধীর মন্থর গতিতে দলে দলে পিঠে করে বহন করে নিয়ে চলেছে বোঝা। দ্রব্যসম্ভার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অথবা গ্রাম থেকে গারোয়ার বাজারে নিয়ে যাবার অন্য কোনও যানের পথ নেই, তাই হয় মানুষ, নয় বলদই একমাত্র ভারবাহী। এই লাদনা বলদের দলের প্রত্যেকটির গলায় থাকে বিভিন্ন আকারের কয়েকটি করে ঘণ্টা, কোনটি বা ধাতু নির্মিত, কোনটি কাঠের। বহুদূর থেকে শোনা যায় সমবেত এই বিচিত্র ঘণ্টাধ্বনির রেশ, প্রথম উদ্দেশ্য—হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের সচকিত করে তোলা, দ্বিতীয় কোনটি দলছাড়া হয়ে গেলে তার গলার ঘণ্টার শব্দ লক্ষ্য করে তাকে খুঁজে বের করা সহজ হয়।

গয়ার দক্ষিণ সীমা ও উত্তর পালামৌর গোয়ালারা এই গভীর অরণ্যে দলে দলে হাজার হাজার গরু মহিষ নিয়ে আসে চরাতে। শীতের শেষে যখন সমতল দেশে বইতে থাকে গ্রীষ্মের উষ্ণ নিঃশ্বাস, শ্যামলিমার ক্ষীণ আভাসটুকুও হয়ে আসে নিঃশেষ তখন এরা এদের গোধন নিয়ে সুরগুজার অরণ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ তিন চার হাজার ফুট পাহাড়ের শিখরের দিকে উঠতে থাকে। এখানে তখনও শীতের ছোঁয়া লেগে থাকে অরণ্যের ছায়ায়, ঘাস পাতা থাকে সজীব। এরা যেমন পাহাড়ের উপরে চরতে চরতে উঠতে থাকে, মাংস লোলুপ বাঘ, নেকড়ে, চিতা, হায়নাও করে এদের অনুগমন এদের অলক্ষ্যে এবং সুযোগ পেলেই নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। প্রথম বর্ষার সজল কাজল ছায়া নিয়ে আসে ঘরে ফেরার আহ্বান, আবার নেমে চলে এরা অরণ্য থেকে জনপদের অভিমুখে, মৃত্যুর অনুচর মাংসাশি জীবরাও অরণ্যসীমা পর্যন্ত চলে পেছন পেছন।

পথ চলতে চলতে কোথাও বা চোখে পড়ে এই নিবিড় অরণ্যের মাঝে দূরে নীচে খেলাঘরের মত ছোট ছোট গুটিকয়েক লাল খোলার চালের ঘর, একটুখানি খোলা জায়গায় দ্বীপের মত জেগে আছে মানুষের অস্তিত্বের বার্তা ঘোষণা করে। ২।৪ জন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী যুবক জমিদারদের কাছ থেকে আবাদোপযোগী কিছু জমি বন্দোবস্ত নেয়, বন জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করে চাষ করে, বন্যপশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করে, রচনা করে বাসের জন্য কুটির। ক্রমে তাদের আত্মীয় বন্ধু এসে বাসা বাঁধে আশে-পাশে। তারা আনে তাদের গরু, মোষ, হাঁস, [illegible]। দিন, মাস ও দীর্ঘ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকৃতি ও বন্য পশুর সঙ্গে সংগ্রাম করে গড়ে তোলে ক্ষুদ্র গ্রাম। এমনি করে গড়ে ওঠা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের কথা মনে পড়ে, নাম গোরগাড়া। এখানকার রামশরণ রাউতের বাড়ীতেই ছিল ভাল ২০০০ দুগ্ধবতী গাভী, এ ছাড়া আরো বহু গোসম্পদ ছিল তার জঙ্গলের বাথানে। তার এক একখানা সর্ষে ক্ষেতই ছিল প্রায় আধ মাইল লম্বা। আবার এমনও অনেক সময়েই হয় যে, প্রকৃতি ও বন্য হিংস্র পশুর সঙ্গে সংগ্রাম করে ঠিক যখন গ্রামটি গড়ে উঠছে এমন সময় যে অগ্রণী তার মৃত্যু বা কোনও রোগের প্রাদুর্ভাবে গরু মোষ মরে গেলে, কিম্বা বাঘ ও বন্যজন্তুর উপদ্রবে কোনও বিপদ ঘটলে, সরল আদিবাসী প্রজারা সেটা দেবতার কোপ বা ভৌতিক উপদ্রব মনে করে সে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যায়। অরণ্য আবার কায়েম সব গ্রাস করে নেয়। অতি দীন দরিদ্র তারা, জগতে নিজস্ব সম্পত্তি বলতে যা তা এতই অল্প যে এক আবাস ত্যাগ করে যাওয়া তাদের পক্ষে কিছুই দুরূহ নয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমনি একটি পরিত্যক্ত গ্রামের চিত্র, রাঙ্কা রাজের দৈরীয়া গ্রাম। ভগ্ন গৃহপ্রাচীর স্তূপে পরিণত হয়েছে জন-মানবের কোনও চিহ্ন নেই। পাদ্মবন অশ্বত্থ, কোথাও বা বট-অশ্বত্থ একদিন যে গ্রাম ছিল তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোথাও কোথাও মানুষের অধিকারের অতীত স্বাক্ষর লেখা রয়েছে ক্ষেতের আলের চিহ্নে। অসংস্কৃত একটি দীঘি পদ্মবনে ঢাকা, তাতে দলে দলে হরিণ এসে জল খেয়ে যাচ্ছে, আমায় দেখে বিস্মিত হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। মানুষ এদের কাছে এতোই অপরিচিত। [illegible]কের সংরক্ষিত বনে এমন বহু পরিত্যক্ত গ্রাম আছে।

এই দুর্গম অঞ্চলে সাধারণতঃ সরকারী অফিসারদের বিশেষ গতায়াত ছিল না, বড়জোর বছরে একবার কেউ কেউ যেতেন, কেউবা পরি-দর্শন করতে, কেউ শিকার করতে। অশ্বারোহণে অপারগ হলে খাটুলী ছিল তাঁদের যান। একটি দড়ির খাটিয়াকে উল্টে দিয়ে তার চার পায়ার সঙ্গে বাঁশের বাঁকারী বেঁধে তার ভেতর দিয়ে বাঁশ পার করে দেওয়া হত এবং দু'পাশে পাল্কীর মতন কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত—এরই নাম খাটুলী। এখানে যে কেউ বেশীদিন থাকতে চাইতেন না। এলেও, ম্যালেরিয়া এবং সঙ্গহীনতা তার একটি কারণ। যে সব পুলিশ কনেস্টবল বা দারোগাকে শাস্তি দেওয়া হতো তাদের এখানে বদলী করা হত। তাতে তাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না, রাজ-প্রতিনিধি হয়ে তারা সেখানে রাজত্ব করতো। রাজার তহশীলদাররাও তাই, তারাও যতো পারতো প্রজাদের শোষণ করতো।

১৯২৫এর ডিসেম্বরে যেদিন এই অঞ্চলের কুন্দরুম ক্যাম্পে এসে এ এম ও [illegible] পাণ্ডের কাছ থেকে সেটেলমেন্টের চার্জ নিলাম তার দুদিন আগে গ্রামের প্রান্তে [illegible] তাঁবুর কাছেই [illegible] বাঘ এসে তার ঘোড়া খেয়ে গেছে। [illegible] একদিন [illegible] চাকরের বাপ এসে [illegible] ফরাসত অঞ্চলে তার ছেলেকে সে [illegible] না।

এমনি দুর্গম অরণ্য পাহাড়ের মধ্যে বিজকা গ্রাম। ১৯২৬ সালের এপ্রিলে কোয়েল নদীর তীরে পাহাড়ের [illegible] ক্যাম্প [illegible] সেখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে বিজকাতে গেলাম। সে গ্রামের মাহাতো বা সর্দার বাইসনদের সম্বন্ধে [illegible] বলল যে এরা সাধারণতঃ মানুষের সব সংস্পর্শ এড়িয়ে জনমানব শূন্য জঙ্গলে থাকে যেখানে মানুষের গলার স্বর পর্যন্ত পৌঁছায় না। স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করে তারা এবং বাঘ এদের সম্মিলিত প্রতি-রোধের সম্মুখীন হতে সাহসী হয় না। কচিৎ যূথভ্রষ্ট দু' একটি বাইসনকে বাগে পেলে শিকার করে। কিন্তু যদি মানুষ এই বাইসনদের

পরিবারের
গৌরব

গতিপথে পড়ে যায় এবং তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে তাহলে ওরা হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ, হিংস্র, তখনই তাকে শিং দিয়ে শেষ করে ফেলে। এই প্রসংগে সে মিঃ ফ্রাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়লের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলল তার নিজের প্রত্যক্ষ করা।

আই-সি-এস ফ্র্যাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়ল ছিলেন পালামৌতে ডেপুটি কমিশনার ১৯০০ সাল থেকে ১৯০২ পর্যন্ত। গ্রামবাসী সকলের সংগেই তাদের আপন জনের মত মেলা-মেশায় এবং সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর ও ভার নেওয়ায় তাঁর খুবই সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন তাদের সহায় ও সৎ পরামর্শদাতা। অন্যদিকে তাঁর শিকার, অসীম সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁকে সারা জেলায় এনে দিয়েছিল বিশ্বাস, অনুরাগ ও প্রসিদ্ধি। একদিন এই বিজকাতে এসে তিনি ঠিক করেন বাইসন শিকার করবেন। গ্রামের সর্দার ও বৈগা (পুরোহিত) দুই দেশী গাদা বন্দুক নিয়ে এবং সঙ্গে আরো দু'-একজনকে নিয়ে গেল তাঁকে সেই গভীর বনে বাইসনের সন্ধানে। দূরে জঙ্গলের মাঝে একটু খোলা জায়গার ধারে দেখা যায় এক বাইসন যূথকে। অতি সন্তর্পণে গাছের ঝোপের আড়ালে তাদের দৃষ্টি ও ঘ্রাণ এড়িয়ে গুলী করবার উপযুক্ত কাছে পৌঁছে মিস্টার লায়ল বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে গুলী করেন যূথপতিকে। তখনকার দিনে আগ্নেয়াস্ত্র আজকের দিনের মত উন্নত ছিল না, গুলী লাগা সত্ত্বেও যূথসুদ্ধ যূথপতি পালিয়ে যায় রক্ত বিন্দুতে তার গতিপথ চিহ্নিত করে। গুলী যখন লেগেছে তখন ও তো মরবেই, বিশেষতঃ লায়ল সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, এই বিশ্বাসে এগিয়ে গেল শিকারীরা সর্বাগ্রে, উৎসুক বৈগা। হঠাৎ মিঃ লায়ল দেখেন ছুটতে ছুটতে তারা ফিরে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা বলল যে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় যেতেই সহসা ফিরে দাঁড়ায় যূথপতি এবং ক্রুদ্ধ আক্রোশে বৈগাকে পেড়ে ফেলে শিং দিয়ে তার পেট ও সর্বাঙ্গ চিরে ফেলে, কিন্তু তাতেও তার রোষ শান্ত হয়নি। সে ফোঁস ফোঁস করে ফোঁপাচ্ছে এবং শিঙে করে তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলছে, আবার সেখানে গিয়ে তাকে ফুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে শিঙ দিয়ে, যেন প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তার নিবৃত্ত হচ্ছে না। সব শুনে মিঃ লায়ল বল্লেন, "বন্দুকধারী দুজন মাত্র আমার কিছু দূরে পেছনে থাক, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, যদি দেখ বাইসন আমাকে মেরে ফেলেছে তখন তোমরা গুলী কোরো বা পালিও। যতক্ষণ আমি না মরি তার আগে যদি তোমরা গুলী কর তাহলে ফিরে উল্টে আমি তোমাদের গুলী করে শেষ করে দেব।" এই বলে কি করতে হবে বেশ করে তাদের বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি, কিছুদূরে পেছন পেছন চলল সর্দার ও আরেকজন। যেখানে চলেছে আহত বাইসনের তান্ডবলীলা সেই খোলা জায়গার ধারে একটি বড় শাল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রুমাল বার করে নাড়তে লাগলেন ক্রুদ্ধ বাইসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। চোখ পড়তেই প্রতিহিংসার নেশায় উন্মাদ সে, তখন বৈগার ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ ছেড়ে শিং বাগিয়ে মাথা নীচু করে দৌড়ে এলো সোজা মিঃ লায়লের দিকে। সর্দারের কথায় "আমরা তো হুজুরে তখন বুঝলাম সাহেব তো মরেছেই এবার আমাদেরও পালা। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পালাব কি না ভাবছি। সাহেব স্থির হয়ে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে, অচল অটল যেন গ্রাহ্যই নাই। গওর যখন মাত্র দশ বারো হাত দূরে, তখন বন্দুক তুলে সেই মাথা লক্ষ্য করে গুলী করলেন একবার দুবার, হুড়মুড়

করে এসে বিশাল মাথা গওর লুটিয়ে পড়ল সাহেবের পায়ের কাছে, সাহেব এক তিল নড়লেন না।"

এই কাহিনী শুনে আমার বাইসন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও শিকারের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল, কিন্তু সে যাত্রা আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়ে ওঠেনি। পরে যখন পালামৌ খাস-মহলের ভার পাই তখন বাইসন শিকারের রোমাঞ্চকর উত্তেজনার অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ট সুযোগ এসেছে।

হিংস্র পশু শিকারে আত্মবিশ্বাস দুর্দমনীয় সাহস এবং ভয়ের যত বড় কারণই থাক, তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করার দু'একটি ঘটনায় ও অন্যত্রে আদিবাসী, বনবাসী, বড় অফিসার ও শিকারীদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। পালামৌ খাসমহলের ভার নিয়েই বাইসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। বাইসনকে ওরা বলে 'গওর'। জানলাম, বাইসনরা তৃণভোজী। গভীর বনের মাঝে যে পরিত্যক্ত গ্রাম ও তার লাগা ধান ক্ষেত বা নালা নদীর ধারে বড় গাছ খুব সহজে জন্মায় না, ছেয়ে যায় অজস্র ঘাসে। বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে বাধা পায় এই ঘাসের বনে, তাতে সারা জায়গা হয়ে ওঠে স্যাঁৎসেঁতে, ঘাসরা আরো জোর পেয়ে মাথা তোলে, কোথাও কোথাও হয়ে ওঠে হাতীর পিঠ সমান উঁচু। এমনি জায়গা বাইসনের প্রিয় বিচরণ ভূমি।

ধ্যানমগ্ন নেতারহাট পাহাড়ের ৩৮০০ ফুট উঁচু শিখর থেকে চঞ্চলা ঘাঘরী প্রপাত ধাপে ধাপে নেমে এসে নালা বেয়ে [illegible] মিশেছে উত্তরবাহিনী কোয়েলের সঙ্গে। নালাটি অধুনা লুপ্ত পাণ্ড্রা নামে একটি গ্রামের কোল বেয়ে [illegible] নাম নিয়েছে পাণ্ড্রানালা। এই নালার কোয়েলের সঙ্গে সঙ্গমের ধারেই আছে নোনা মাটি ইংরিজিতে যাকে বলে Salt lick। সহস্র [illegible] ফুট জায়গা নিয়ে জলার মত যেন খুব স্বল্প জল পুকুরের মত দেখাচ্ছে। সেই নোনা মাটি চাটতে আসে হরিণ, শম্বর ও বাইসনের যূথ। জায়গাটির নাম মুরাচ্ছাপ্পর। স্থির করলাম আগে কাছে থেকে এই বাইসন যূথকে দেখব। ১৯২০ সালের বর্ষাকাল। মুরাচ্ছাপ্পরের সেই জলার কাছে ৮ হাত লম্বা ৮ হাত চওড়া কোমর সমান এক গর্ত খোঁড়ালাম কাছের একটু উঁচু জায়গায়। তারপর গর্তের গাড়ীর ছেতরের মত বাঁশের কঞ্চি ও মহুলানের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছই তৈরী করলাম। চারিদিক দিলাম ডালপালা দিয়ে ঢেকে। কিছুদিন আগে স্পেন্সস হ্যান্ড ল্যান্টার্ণ নাম দিয়ে কলকাতার সাতকড়ি দাস এন্ড কোং সবে প্রথম দু'ডজন পেট্রোম্যাক্স নমুনা আনায় তার একটি কিনেছি। সেই আলোটি জেলে সেই ছইয়ের উপর একটি বাঁশের ডালার উপর রেখে তাকে একটি টুকরী দিয়ে ঢেকে দিলাম। টুকরীটিকে আগেই গোবর মাটি লেপে দেওয়া হয়েছে যাতে ভেতর থেকে আলো ফুটে না বেরোয় এবং টুকরীর মাথা চিরে গরম হাওয়া বেরোবার পথ করা হল। একটি চোপের দড়ি দিয়ে টুকরীটি আটকে মাথার উপরের গাছের ডালের সঙ্গে কপিকল দিয়ে বেঁধে সেই দড়ির প্রান্তটিকে আনা হল ছইয়ের ভেতর দিয়ে

(ইহার পর ২৪০ পৃষ্ঠায়

অগ্নিতীর্থ সোমনাথের দিকে যাচ্ছিলুম সৌরাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে। পথে পড়ে শবরমতী। সবাই জানে, এটা সিংহ শিকারী কিরাতের দেশ,—শবরের মুলুকে। এককালে পাশুপত শাস্ত্রের দ্বারা এ অঞ্চল নাকি নিয়ন্ত্রিত হোতো। শিবের উপাসক ছিল সবাই। পাশুপত অস্ত্রাদি এখানে নির্মাণ করা হোতো, সেই কারণে কাথিয়াওয়াড়ের প্রাচীন নাম ছিল অগ্নিক্ষেত্র। এই ভূভাগটিকে মহাভারতের আমলে বলা হোতো প্রভাসপত্তন, কিন্তু পরবর্তীকালে এরই নাম হয়েছিল সোমপুর। সোমপুরার শৈব-সম্প্রদায় অতঃপর সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করে।

এ পথ আমার অপরিচিত নয়। উত্তর-পশ্চিমে গেলে সমুদ্রপ্রান্তে দ্বারকাপুরী—দক্ষিণ পশ্চিমে জুনাগড়ের ভিতর দিয়ে এলে বিরাবল, অর্থাৎ সোমনাথ। যেমন হাওড়া স্টেশনে এসে নামলে কালীঘাট। পথের টানে এবারেও এসেছি বটে, কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের মতো কাথিয়াওয়াড়ও আমার কোনোদিন ভালো লাগেনি। অনভ্যস্ত আহার্যের ভূমিকায় যে সৈন্যটা থাকে, সেটি বাঙালীর রসনায় অসহ্য। পথে ঘাটে অনেক অত্যাচার সইতে হয়।

দ্বারকা একটি নয়, একাধিক। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সংগে সংগে একটি করে নতুন-নতুন দ্বারকার সৃষ্টি হয়। সেকালের এই উপদ্বীপের দক্ষিণকূলে [illegible] একটি দ্বারকা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর সেটি নাকি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একথাটি বিশ্বাস করতে বাধে না, কেননা [illegible] উপদ্বীপের সমুদ্র এক একটি তীরপ্রান্তবর্তী নগরকে গ্রাস করেছে এর পরিচয় [illegible]। মহাভারত এবং পুরাণের দ্বারকা আজও নির্ণীত হয়নি। এখনও দুটি দ্বারকা পাশাপাশি বিদ্যমান। একটি হোলো [illegible], আরেকটি মহাতীর্থ পুরী। উভয় মন্দিরে দর্শনী না দিলে দর্শন মেলে না। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের আঞ্চলিক নাম হোলো রণছোড়জী। কেউ কেউ বলে, রণছোড় রায়। দ্বারকা হোলো ভারতের চতুর্ধামের অন্যতম।

অগ্নিতীর্থ সোমনাথের পথে পড়ে জুনাগড়। মুসলমান রাজত্বকালে জুনাগড়ের নাম দেওয়া হয়েছিল মুস্তাফাবাদ। কিন্তু এর প্রাচীন নাম ছিল গিরিনগর। গিরিনগর এখন গিয়ে উঠেছে গিরনার পর্বতে, নীচে পড়ে আছে জুনাগড়। পুরাণে বলে, বস্ত্রাপথক্ষেত্র! এমন উদ্ভট নামের পিছনে পৌরাণিক উপকথা ছিল কিনা আমার জানা নেই। গিরনার পাহাড়ের উপরে ওঠবার সর্পিল সিঁড়ি রয়েছে, তার সংখ্যা নাকি দশ হাজার। কিন্তু এপথে যাবার আগে যে প্রাচীন 'সুদর্শন হ্রদ' পাওয়া যেতো, সেটি অরণ্যবিটপীর মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখানকার পাহাড়ও যেন বিচিত্র চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে,—আশেপাশে কোথাও পার্বত্য ঐতিহ্য নেই,—এ যেন যূথভ্রষ্ট একখণ্ড ক্ষুদ্র হিমালয়। দেরাদুনের দিকে কালসী অঞ্চলের এক প্রস্তর গাত্রে যেমন সম্রাট অশোকের শিলালিপি দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। ওই 'বস্ত্রাপথক্ষেত্র' অঞ্চলের এক দীর্ঘাকার প্রস্তর গাত্রে সম্রাট অশোকের চতুর্দশ শিলালিপি পথিক মাত্রেরই চোখে পড়ে। এই শিলালিপির বয়স বাইশ শত বছরেরও বেশী।

একটি অলক্ষ্য পাখীর চূর্ণ কণ্ঠ, চকিত-চঞ্চল কাঠবিড়ালীর একটি ছুট, একটি নদী-নূপুরের [illegible]—সামান্যতম আকর্ষণেও আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। আমার উৎকর্ণ মন [illegible] পথ ধরে কোথায় উধাও হয়ে যায়, বুঝতে পারিনে। আমার অস্থির চক্ষু কেবল যে প্রাচীনকে দেখতে চায়, তাই নয়, প্রাচীন ভারতের সমস্ত অমর চিত্রগুলিকেও যেন বাঁচাতে চায়। 'সুদর্শন হ্রদের' বাঁধ ভেঙেছে পর পর দুটি নদীর আঘাতে—ওদের নাম হোলো সুবর্ণসিকতা ও পলাশিনী,—কিন্তু ওরা যেন ওদের সেই আঘাত আমার বুকের মধ্যেও রেখে গেছে। এই শিলালিপিকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গেছে আঠারো শো বছর আগে রাজা রুদ্রদামন এবং দেড় হাজার বছর আগে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত। ইতিহাস মরে গেছে, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ধসে গেছে,—শক-হূন-তাতার-মোগল-পাঠান একে একে প্রত্যেক আসুরিক শক্তি তার আধিপত্য লীলা রচনা করে গেছে,—কিন্তু এই চতুর্দশ শিলালিপি তার শান্তি ও মাধুর্যবাণী নিয়ে অম্লান হয়ে রয়েছে আজও। ভারতের অন্তরের সংকল্প নিয়ে পাথরখানা আজও দাঁড়িয়ে।

প্রায় হাজার বছর আগে রাজা গ্রহরিপু জুনাগড়ের দুর্গটি নির্মাণ করেন। এই দুর্গের প্রাচীন নাম ছিল উপরকোট। পরবর্তীকালে [illegible] সুলতান এবং মুসলমানী চেহারা দেন এবং একে আরো দুর্ভেদ্য ও সুদৃঢ় করে তোলেন। বলাবাহুল্য সৌরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন, এখানেও তেমনি নানা ধর্মমতের একটা পরস্পরের বোঝাপড়া চলে। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলাম,—এই পাঁচটি ধর্মমতের পাঁচ প্রকারের স্থাপত্য শিল্পের যে প্রাচুর্য এখানে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস, ভারতের আর কোনো প্রদেশে এমনটি নেই। সমস্ত জুনাগড় অঞ্চলে [illegible] মাত্র গুটিকয়েক লোক—কিন্তু [illegible] রয়েছে [illegible] অঞ্চলে। জুনাগড় দুর্গের মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধ গুহা আজও বর্তমান। একটি কূপ রয়েছে সেটি প্রায় [illegible] গভীর এবং রাজা গ্রহরিপুর সেটি নির্মাণ, প্রায় আড়াই শত সিঁড়ি ধাপে ধাপে এই কূপের তলায় নেমে গেছে। জৈন মন্দিরের সংখ্যাও এই দুর্গে কম নয়,—যেমন দেখে এসেছি জয়শলমেরের দুর্গের ভিতরে। একটির পর একটি সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ের ঝঞ্ঝা প্রলয় চলে গেছে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। কিন্তু সেটি বাহ্যিক, তার সাময়িক বিলোড়ন এখানে ওখানে দাগ রেখে গেছে মাত্র। কিন্তু ভারতের আত্মিক চেহারাটা হোলো বিভিন্ন ধর্ম সভ্যতার অভিযান পরীক্ষা। মতবাদের প্রাধান্য নয়,—বিভিন্ন দর্শনের সমন্বয়। সংঘর্ষ নয়, সংযোগ। অন্যোন্যের উপর সাম্প্রদায়িকতা নয়,—কিন্তু শান্তিময় সহাবস্থিতি। ঘৃণার দ্বারা এক কর্তৃক অন্যকে জয় নয়, প্রেমের দ্বারা পরস্পরকে জয়।

সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটা পরিভ্রমণ করা এখানে দুঃসাধ্য। গিরনার পর্বতের চূড়াটি ছাড়াও অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য চূড়ায়ও এখান থেকে যাওয়া যায়। ওদের একটি নাম হোলো গুরুদত্ত এবং অপরটি গোরক্ষনাথ। কামরূপের কামাখ্যা ছাড়িয়ে উপরে উঠলে যেমন পাওয়া যায় ভুবনেশ্বরীর মন্দির, এখানেও তাই,—গিরনারের উপর দিয়ে [illegible] দেবী অম্বিকার মন্দির। মন্দিরের বাইরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালে চোখে পড়ে নদী-অরণ্য-পর্বত-সমতলসহ সমগ্র জুনাগড়। ভারতের এই একমাত্র অরণ্য—যেখানে আজও পশুরাজ সিংহ বিচরণ করে। কিন্তু সিংহ শিকারের অনুমতি কোনোমতেই পাওয়া যায় না, কারণ তারা অতি স্বল্প সংখ্যক। অনেকের ধারণা এই গিরনার পর্বতের কোনো একটি অঞ্চলে অপর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু জৈন মন্দিরগুলোই এখন প্রধান, দুর্গের কথাটা চাপা পড়ে গেছে। বলাবাহুল্য এ মন্দিরগুলি আধুনিক কালের নয়—এদের উপর দিয়েও প্রায় আটশো বছর চলে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর বাস্তুপাল এবং তেজপালের প্রাচীন স্মৃতি নিয়ে তারা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে সগৌরবে।

জুনাগড় ছাড়িয়ে চললুম পশ্চিমের পথে। জুনাগড়ের প্রাক্তন নবাব—যিনি কুকুরের বিয়েতে খরচ করতেন লক্ষ টাকা এবং হারেমে বাঁদী পোষার জন্য যাঁর যেতো কয়েক লক্ষ,—তাঁর প্রাসাদের প্রাকারটি দেখিয়ে দিলেন আমার পাঞ্জাবী বন্ধু মিঃ নাগিয়া। কয়েক বছর আগে নবাব পলায়ন করেছেন পাকিস্থানে। সময় বুঝে ওরা পালাতেও জানে!

আমরা রাজকোটের পথ ধরেই যাচ্ছিলুম। পথটা সত্যই ক্লান্তিকর এবং ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থাপনাটা নিঃসন্দেহই কষ্টদায়ক। প্রতিবাদ কোথাও নেই বলেই পুরনো ব্যবস্থাটা কায়েমী হয়ে বসে আছে। ভারতের আর কোনও অঞ্চলের রেলপথ বোধ করি এত কষ্টসাধ্য নয়।

অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে [illegible] এসে নামলুম বিরাবলে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ,—বেলা দুটো বাজে। একালে দুশো সত্তর মাইল পথ সতেরো আঠারো ঘণ্টা লাগে, এ অসহ্য। হেমন্তকাল বটে, কিন্তু রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। সমুদ্র কাছাকাছি, সুতরাং ঠাণ্ডা নেই।

বিরাবলের ভিন্ন নাম হোলো [illegible]। স্টেশনের বাইরে এসে অগ্নিক্ষেত্রের বাতাসে যখন নিশ্বাস নিলুম, গায়ে গায়ে তখন রোমাঞ্চ লাগলো। এটি যে ভারতের একটি প্রধান তীর্থস্থান সেকথা কারো কাছে উল্লেখ নেই। জীবনযাত্রার চেহারাটা এত সুন্দর যে, মনে হোলো,

(ইহার পর ২৭৭ পৃষ্ঠায়)

প্র·না·বি

সেকেন্দর শা-র প্রত্যাবর্তন

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা পাঞ্জাব বিজয় করিয়া হঠাৎ কেন ভারত ত্যাগ করিলেন, ইতিহাসের এটি একটি অমীমাংসিত সমস্যা। এ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত কোন সমাধান পাওয়া যায় নাই, নানা মুনির নানা মত। মগধরাজ্যের বিক্রমের সংবাদ, মাসিডন হইতে ভারতের দূরত্ব, নব-বিজিত রাজ্যসমূহে বিদ্রোহ, সৈন্য দলের অসন্তোষ প্রভৃতি নানাবিধ কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন একটি কারণ বা সবগুলি একত্রে ঐতিহাসিকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। সেকেন্দার শা-র প্রতিভা, প্রভাব ও বীরত্ব এমন বিরাট ছিল যে, পূর্বোক্ত কারণগুলি সত্য হইলেও তাঁহার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা ছিল না। সম্প্রতি আফগানিস্থানের একটি গুহাচৈত্য হইতে যে প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে সেকেন্দার শা-র আকস্মিক ভারত ত্যাগের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। লেখক সেকেন্দার শা-র অনুগামী একজন গ্রীক সৈনিক, নাম পেস্কাডস্ এরিওফিস, অর্থাৎ এরিওফির পুত্র পেস্কাডস্। তিনি সেকেন্দার শা-র সহপাঠী ছিলেন, দুজনেই বিখ্যাত এরিস্টটেলের ছাত্র। পেস্কাডস্ সেকেন্দার শা-র দিগ্বিজয়ের বিবরণ লিখিয়াছিলেন তৎকালীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ এ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, কিছুকাল আগে পাণ্ডুলিপি আকারে তাহা পূর্বোক্ত চৈত্যগুহা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, পেস্কাডসের পাণ্ডুলিপি কিভাবে এই বৌদ্ধগুহায় আসিল। এই পর্যন্ত অনুমান করা চলে যে, সেকেন্দার শা-র সাম্রাজ্যের যে অংশে আফগানিস্থান পড়িয়াছিল পেস্কাডস সেখানে কোন রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নহে যে, সেকেন্দার শা-র মৃত্যু হইলে আফগানিস্থানে যখন বিদ্রোহ হইল, তখন পেস্কাডস অন্যান্য গ্রীক রাজপুরুষগণের সহিত এই গুহায় আশ্রয় লইয়া থাকিবেন। বৌদ্ধগণ গ্রীকবিদ্বেষী ছিল না। খুবই সম্ভব যে, রাজভবন পরিত্যাগ করিবার সময়ে পেস্কাডস অতি প্রিয় ডায়েরীখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। যাই হোক, পেস্কাডসের পরিণাম বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ডায়েরীর যাবতীয় বিষয় আলোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে অংশে সেকেন্দার শা-র ভারত ত্যাগের কৌতূহলজনক কারণ বিবৃত হইয়াছে তাহাই আমাদের লক্ষ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পেস্কাডসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখন সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। *

২

পেস্কাডস্ লিখিতেছেন—

পাঞ্জাব বিজয় সম্পন্ন হইলে সম্রাট পূর্ব-ভারত জয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, পাঞ্জাব ও মগধের মধ্যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নাই। তিনি জানিতেন যে, পরীক্ষা হইবে মগধে পৌঁছিয়া, কারণ মগধরাজ যেমন বীর, মগধরাজ্য তেমনি শক্তিশালী। কিন্তু যিনি পারস্য সাম্রাজ্য অবহেলাক্রমে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, মগধরাজ্য যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। নূতন খ্যাতির আশায়, নূতন লুণ্ঠনের লোভে সৈন্য ও সেনাপতিগণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। সম্রাট ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আগামীকল্য প্রাতে অজেয় গ্রীক বাহিনী পূর্বদিকে যাত্রা করিবে। এমন সময়ে, সেদিন অপরাহ্ণে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে গ্রীক বাহিনীর নূতন বিজয়াভিযান তো বন্ধ হইলই, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে অধ্যায় পরিবর্তনের যে সূচনা দেখা দিয়াছিল তাহাও অকালে অপ্রত্যাশিত উপসংহারে পৌঁছিল।

সেদিন অপরাহ্ণে সম্রাট যখন সেনাপতিগণ-সহ শিবিরে বসিয়া আগামী দিনের কর্মসূচী আলোচনা করিতেছিলেন তখন একজন সেনানী শিবিরে ঢুকিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

সম্রাট শুধাইলেন—কি খবর?

দূত বলিল—সম্রাট একজন বিদেশী ধরা পড়েছে।

বিদেশী? কোন্ দেশী? ভারতীয়?

চেহারায় ও পোষাকে তো মনে হয় না, ভারতীয় তো অনেক দেখেছি।

লোকটা বলে কি?

বুঝতে পারি না।

ভাষা অজ্ঞাত।

আজ্ঞে না, ভাষা দুর্বোধ্য নয়, ভাবটাই কেমন গোলমেলে।

কি করছিল সে?

গ্রীক বাহিনী মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এখন কোথায়?

তাঁবুর বাইরে পাহারাধীন। আদেশ হয়তো আনি।

ক্ষতি কি। নিয়ে এসো।

সেনানী প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে কথিত বিদেশীকে লইয়া সম্রাটের কাছে ফিরিয়া আসিল।

সম্রাট ও সেনাপতিগণ দেখিল যে, বিদেশী যতদূর সম্ভব কৃশ, নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ। পরনে মূল্যবান রঙিন পট্টবাস; সম্মুখে অকারণ একটা কুঞ্চিত অংশ মাটি পর্যন্ত দোদুল্যমান; গায়ে চিত্র-বিচিত্র রঙিন আঙরাখা, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা; কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণহার, কানে কুণ্ডল, অনাবৃত মস্তকে কেশদাম তরঙ্গিত, কোটরগত চক্ষুতে এক সঙ্গে ভীতি, চাতুরী ও কৌতূহল; নাসাগ্র আত্মম্ভরিতায় উদ্ধত; সূক্ষ্ম চিবুকে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানসিক স্থিরতার অভাব; অসমান দন্তপঙ্ক্তি তাম্বূলরাগে রঞ্জিত; জীর্ণ তম্বুরার মতো দীর্ঘ ও মলিন কণ্ঠে অনেকগুলি শিরা-উপশিরা দৃশ্যমান; আর দেহটি বাতাহত

(ইহার পর ২৭৩ পৃষ্ঠায়)

* পাণ্ডুলিপির ফরাসী ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে আমরা প্রয়োজনীয় অংশের সার সংকলন করিয়া দিলাম। স্থানাভাববশতঃ সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব না হইলেও কোথাও মূল লেখকের অনভীপ্সিত ভাব আমদানি করি নাই

সাহিত্যক্ষেত্রে অলংকরণের চেষ্টা সর্বত্রই আছে। কি য়ুরোপে, কি আমেরিকায়, কি এসিয়ায়। যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন পুঁথির পটে হাতের লেখার সংগে থাকত ছবির রেখা।

বাংলা ভাষায় ছাপানো প্রথম সচিত্র পুস্তক কি? বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন। ছেলেবেলায় প্রথম যে সচিত্র বই (উপন্যাস) আমার চোখে পড়ে তা হচ্ছে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ছবিগুলি ছিল রঙীন এবং শিলাক্ষরে (লিথোগ্রাফ) ছাপা। বইখানি আমার পুস্তকাধারে রক্ষিত ছিল যেমন সযত্নে, তেমনি সযত্নে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কবে কোন্ ফাঁকে সেখানি হস্তগত করেছেন, কিছুই টের পাইনি।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, যুদ্ধে এবং প্রেমে কিছুই অন্যায় নয়। যাঁদের দুষ্প্রাপ্য জিনিষ সংগ্রহের সখ আছে, তাঁদের সম্বন্ধেও সাবধান! কারণ তাঁরাও ঐ প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন।

কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর সচিত্র পুস্তকের কথা ছেড়ে, সচিত্র সাময়িক পত্রিকার কথা বলা যাক। এখানেও নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না, কারণ বাংলা ভাষায় কোন্ সাময়িক পত্রিকা সর্বপ্রথমে চিত্রিত হয়, তার সঠিক হদিস আমার জানা নেই; তা নিয়ে কেউ আলোচনা করেছেন বলেও মনে পড়ে না।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ত মাসিকপত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (১২৫৮—১২৬৯ সাল)। সে কাগজ প্রায় একশো বছর আগে চলত। [illegible] দেখবার সুযোগ কম হলেও [illegible] নাম শুনেছেন নিশ্চয়। [illegible] রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। [illegible] তিনি বলেছিলেন: [illegible] আমার মনে পড়ে।"

[illegible] মৃত্যু হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই। অগ্রজের পুস্তকাধার থেকেই বোধহয় পত্রিকাখানি তিনি বেছে নিয়েছিলেন। আকর্ষণের কারণ হয়তো কেবল লেখা নয়, ছবিও। কারণ উক্ত পত্রিকা ছিল নিয়মিতরূপে চিত্রসংবলিত।

প্রায় শৈশবে বাবার কাছে দেখেছিলুম আমিও ঐ পত্রিকাখানি। স্মরণ হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যান্য ছবির সঙ্গে প্রায় পাতা-জোড়া ছবিও ছিল এবং কাগজখানির আকারও ছিল মস্ত ডাগর। তখন তো লেখা পড়ে বোঝবার বয়স হয় নি, কিন্তু কোন্ শিশু নয় ছবির কাঙাল? উদগ্র আগ্রহে পাতার পর পাতা উল্টে দেখতুম কেবল ছবির পর ছবি। একদিন [illegible] মনে পড়ে, ছবিগুলি ছিল বিলাতী চিত্রের নকল।

হয়তো তখন আরো দুই-একখানা ছবির কাগজ ছিল। কিন্তু আমার হাতে আসেনি।

"বিবিধার্থ সংগ্রহের" পর ক্রমে ক্রমে সাবালকদের উপযোগী কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় এবং পরে তাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে যথাক্রমে "বঙ্গদর্শন" (১২৭৯), "আর্যদর্শন" (১২৮১), "বান্ধব" (১২৮১) ও "ভারতী" (১২৮৪)। বড়দের কাগজে ছবি দেওয়া ব্যাপারটা তখন বোধ করি ছেলেমানুষি বলে গণ্য হ'ত, তাই তাদের মধ্যে থাকত গুরুগম্ভীর কলমবাজি। যৌবন-সীমায় পা দেবার আগে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবার আগ্রহ হয় নি।

"ভারতী" যখন রীতিমত আসর জমিয়ে বসেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে তখন বালক-বালিকাদের মুখ চেয়ে "বালক" মাসিকপত্র (১২৯২) প্রকাশিত হয়। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণযৌবন এবং তিনি বড়দের আসরে নামী লেখক। কিন্তু শিশু ও বালকদের প্রতি চিরদিনই ছিল তাঁর সহজ প্রাণের টান, তাই তাদের জন্যে নিয়মিতরূপে দিতে লাগলেন গানে-গল্পে নানাশ্রেণীর রচনার পর রচনা উপহার। তাঁর "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ও "সাত ভাই চম্পা" প্রভৃতি শিশু-সাহিত্যে বিখ্যাত বহু কবিতাই "বালকে"র পৃষ্ঠায় প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু অপর এক কারণে "বালক" শিশু-চিত্তকে বিশেষভাবে স্পর্শ করতে পারত—সে ছিল চিত্রসংকুল।

আজকের শিশুদের মনকে সে সব ছবি নাড়া না দিতেও পারে, কিন্তু সেকালের শিশুদের কাছে সেই চিত্রসম্পদ আলিবাবার রত্নপুরের চেয়ে কম আশ্চর্য ছিল না।

শিশুদের কাগজে ছবি দেওয়া একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যায়। দেখা দেয় "সখা" এবং "সাথী"। কাঠের ব্লকের ছবি। দুজন ছবি-কারের নাম মনে আছে—এ. দাস ও পি. জি. ডি বা প্রিয়গোপাল দাস। তখনকার দিনে শেষোক্ত ব্যক্তি খুব নাম কিনেছিলেন এবং তাঁর লোকপ্রিয়তা পরে হাফটোন ব্লকের যুগেও অল্পবিস্তর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তখনকার অধিকাংশ কাল্পনিক ছবি হ'ত বিলাতী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চিত্রমালার প্রতিলিপি—বদলে দেওয়া হ'ত কেবল সাজপোষাক। এই পদ্ধতি একালেও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি। কেবল বিলাতী লেখা নয়, ছবিও চুরি করতে আমাদের বাধে না।

সাপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ)। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন একজন দূরদর্শী পুরুষ। যে কাজে তিনি হাত দিতেন, তাতেই থাকত তাঁর অগ্রগামী মনের পরিচয়। বিবিধ শ্রেণীর চিত্র ও গল্পপ্রবন্ধাদি দিয়ে নূতনভাবে "বঙ্গবাসী"কে সাজিয়ে তিনি সংবাদপত্রমহলে নিজের আসন কায়েমী করে নিয়ে নজর দিলেন মাসিক সাহিত্যের দিকে।

এখানেও তিনি চললেন না চলতি পথে। অন্যান্য মাসিকের মালিকরা যখন ভারি ভারি প্রবন্ধ ছাপিয়ে নিজেদের ভারিক্কি চাল বজায় রাখতে ব্যস্ত, তখন তিনি বড় বড় কাগজ-ওয়ালাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকাশ করলেন মাসিকপত্র "জন্মভূমি"।

পত্রিকাখানি কয়েক বৎসর জোর-কদমে অগ্রসর হয়েছিল। আমার পিতৃদেব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার গ্রাহক ছিলেন। সাল-তারিখের কথা মনে নেই, তবে শৈশব থেকেই দেখে এসেছি, মাসে মাসে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে পাতলা রঙীন মলাটে মোড়া "জন্মভূমি।"

চোখে না দেখলেও বিজ্ঞাপনে দেখেছি, "জন্মভূমি"র রাজসংস্করণও ছিল। ভালো কাগজে ছাপা, দামও বেশী। সাহিত্যক্ষেত্রে "রাজসংস্করণে"র নাম শুনি সেই প্রথম।

বড়দের কাগজ, তার প্রবন্ধাদি ছিল আমার পক্ষে জ্ঞান-অগম্য। কিন্তু আমার কাছে সচিত্র বলেই সে ছিল বিচিত্র। বিপুল পুলকে আমি পাঠ করতুম তার চিত্র-ভাষা। সে কত রকমের ছবি—বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তিচিত্র, গল্পে উল্লিখিত পাত্রপাত্রীদের চিত্র, ঐতিহাসিক ও সাময়িক ঘটনার চিত্র! অনেক ছবি হ'ত পাতাজোড়া। এত ছবি আর কোন মাসিক কাগজে প্রকাশিত হ'ত না। সর্বসাধারণের উপযোগী সচিত্র বাংলা মাসিকপত্রের নাম করতে হলে সর্বপ্রথমেই "জন্মভূমি"র নাম উল্লেখ-যোগ্য। সব ছবিই অবশ্য কাঠের ব্লক থেকে ছাপা, কিন্তু সে যুগে তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

বাংলা মাসিকের মালিকদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ছবিকে ছেলে ভুলানো ভাবলেও এটা না মেনে উপায় নেই যে, বড়োদেরও পোড়-খাওয়া মনের আড়ালে থাকে বেশ-খানিকটা কাঁচা ছেলেমি, সুতরাং যে কোন শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে সচিত্র পুস্তক হচ্ছে স্বভাবত লোভনীয়। তিনি যে সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, বৎসরের পর বৎসর ধরে "জন্মভূমি"র চাহিদাই সেটা প্রমাণিত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে রচনার দিক দিয়ে একখানি যুগান্তকারী পত্রিকা হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা সম্পাদিত "সাধনা" (প্রথম প্রকাশ ১২৯৮)। ঠিক সচিত্র কাগজ বলতে যা বোঝায় "সাধনা" তা ছিল না বটে, কিন্তু কখনো কখনো তার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'ত রবীন্দ্রনাথ লিখিত কবিতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্র। উল্লেখ্য হচ্ছে "সাধনা"র মাধ্যমেই চিত্রাচার্য অবনীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে জনসাধারণের সভায় আত্মপ্রকাশ করেন।

ঐ সময়কার অন্যতম প্রধান পত্রিকা ছিল "সাহিত্য" (প্রথম প্রকাশ ১২৯৯ সাল)। তখন তা সচিত্র ছিল না। পরে তার প্রতি সংখ্যার মুখপাতে একখানি করে বিলাতী চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হ'ত। কিন্তু ১৩০০

([illegible] পত্র ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

ক্ষেমঙ্কর

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

"মাফ করবেন, ও আমাদের একটা উইকনেস ভিন্ন কিছু না। মিলিয়ে দেখবেন, যখন থেকে দয়া-ধর্ম নিয়ে এইরকম বাড়াবাড়ি হয়েছে, ঠিক সেই সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে আমাদের দেশের অধঃপতন। বানিয়ে বলা নয়, ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখুন...."

ছোকরার মুখে খই ফুটছে। ভদ্রলোক যে ঠিক কোমর বেঁধে তর্কে নেমেছিলেন তা নয়, চলতি মতামতের একেবারে উল্টোরকম কিছু শুনলে যেমন দু'একটা কথা বেরিয়েই পড়ে, সেইভাবে একটু মৃদু আপত্তি তুলতে গিয়েছিলেন, এঁটে উঠতে না পেরে একরকম নীরব শ্রোতা হয়েই শুনে যাচ্ছিলেন, একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বললেন—"ইতিহাসের যে যে রকম মানে করবেন..."

"মোটেই নয়; মাফ করবেন। ইতিহাস একটি মাত্র রায় দেবে, স্পষ্টাক্ষরে; এই এই ঘটনা হয়েছিল, তার এই পরিণাম; অন্যরকম হতে পারত না। বৌদ্ধ-জৈনদের অহিংসাবাদ—ফল, দেশ পরহস্তগত। ঘা খেয়ে খেয়ে ডি. এল. রায়ের ভাষায়—বদলে আসছিল মতটা, ইতিহাসও একটু মোড় ফিরবে ফিরবে করছিল, চৈতন্যদেব এলেন..."

ভদ্রলোক সেইরকম একটু হেসে বললেন—"অনেকের মত,—ভাগ্যিস এসেছিলেন..."

"মাফ করবেন, সে অনেকের মধ্যে আমি একজন নয়। দয়া, ক্ষমা, মমতা—আরও এ জাতীয় যে-সব কথা আছে আপনাদের অভিধানে, মানব সভ্যতার প্রগতিতে সেগুলো যে কত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বোঝবার সময় এসেছে। যত শীঘ্র এগুলোকে আমাদের মনের মধ্য থেকে সরিয়ে দিতে পারি ততই মঙ্গল। নীট্শের নাম শুনেছেন বোধ হয়—জার্মাণ দার্শনিক নীট্শে; যিনি সুপারম্যানের আবির্ভাবের কথা বলে গেছেন—তাঁর মতে মানুষের হৃদয়ের এই দুর্বল বৃত্তিগুলোই মানুষকে সেই অতিমানবের স্তরে পৌঁছতে দিচ্ছে না। আপনি দয়া দেখিয়ে যত মনে করছেন ওপরে উঠছেন, আসলে মনের একটা দুর্বল প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে ততই যাচ্ছেন নীচে নেমে। শুধু আপনি একা নয়, যার ওপর আপনার দয়া গিয়ে পড়ছে তাকেও টেনে নামাচ্ছেন আপনি। খুব সোজা লজিক; ভেবে দেখুন না, যে-পরিমাণে আপনার দয়া সেই পরিমাণেই আপনি তার আত্মশক্তিকে চেপে রাখছেন না কি?"

ভদ্রলোক আবার সেইরকম একটু হেসে বললেন—"একজন খুব বুড়ো—শরীরের সব ক্ষমতা হারিয়েছে, কি একজন অন্ধ, কি একজন খোঁড়া—বিকলাঙ্গ—এদের যদি দয়া না করা হয়..."

"মাফ করবেন, এদের তো সমাজে থাকবারই অধিকার নেই। স্পার্টানদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়—তাদের মত চারিদিক দিয়ে একটা পারফেক্ট মানব-গোষ্ঠী পৃথিবীতে হয়নি এখন পর্যন্ত—তারা কি করত জানেন?—যারা ঐরকম বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছে—ভবিষ্যতে সমাজদেহে একটা ব্যাধির মতন হয়ে থাকবে—তাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে দিত। আর জরাজীর্ণ বুড়োদের কথা বলছেন?—তাদের তো আর থাকবার অধিকারই নেই। পৃথিবীতে যায়গাই কম, লোকে কোথায় চাঁদে, মঙ্গল গ্রহে জমির সন্ধানে ছুটছে, আর এরা অকর্মার দল অযথা ভীড় বাড়াচ্ছে। এ্যাফ্রিকার একটা বুনো জাত, নামটা ভুলে যাচ্ছি, তাদের কেমন ব্যবস্থা দেখুন চমৎকার,—কেউ যেই এরকম অথর্ব বুড়ো হয়ে গেল একেবারে—বাপ-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, যেই হোক, ঘরের চালের ওপরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে গড়িয়ে দিয়ে ঘণ্টাকাঁসির বাজিয়ে দিলে, নিশ্চিন্দি। কিছু বলবার নেই, একটা প্রথা, তারাও তাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের ঐ করেছে..."

পাশের একজন প্রৌঢ় গোছের যাত্রী খবরের কাগজ পড়ছিলেন, আড়াল থেকে মুখটা তুলে প্রশ্ন করলেন—"সে স্পার্টানরা এখন কোথায়? আর, আপনার এ্যাফ্রিকান সুপারম্যানদের তো দেখছি আপনিই শুধু চিনতেন, তাও নাম ভুলে বসে আছেন এরই মধ্যে।"

ছোকরা একটু ধাঁধা খেয়ে গেলই। এই সময় গাড়ির বেগটা কমে এল।

যাকে সামনে করে তর্ক তিনি পাশ থেকে ছোট সুটকেশটা কোলে তুলে নিলেন। বললেন—"কে জানে মশাই, ভগবান দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস মানুষের মনে দিয়েছেন, তাই..."

ছোকরা প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মন্তব্যে যে থতমত খেয়ে গিয়েছিল সে-ভাবটা যেন সুধরে নেওয়ার জন্যে ওঁকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে হাতজোড় করে ব্যঙ্গের ঢঙে একটু মাথা নেড়ে বললে—"মাফ করবেন, আপনারা যদি ভগবানকে সাক্ষী মানেন তাহলে নাচার, সে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নেই, কি করেন, কি ভাষায় কথা কন কিছুই জানি না..."

রসিকতার অল্প একটু হাসি মুখে করে গাড়ির সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে এনে আমার মুখের ওপর এসে যেন একটু থমকে পড়ল। অথচ আমি নিতান্ত নির্লিপ্ত-ভাবেই আছি বসে।

গাড়ি থামতে ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

ছোকরা একেবারে পাশটিতে বসেছিল, উনি নেমে যেতে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেবে, এমন সময় একটি বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। চেহারা দেখে মনে হয় বয়স বাহাত্তর-তিয়াত্তরের ওপরে। বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছেন; বাইরে থেকে দেখাতে যে খুব দুর্বল তা নয়, তবে ভেতরটায় বেশ ঘুণ ধরে এসেছে। এই যে একটু মেহনৎ হয়েছে, এই যে গাড়ি ধরবার উদ্বেগ, এতে লাঠির ওপর ভর দিয়ে কাঁপছেন। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি খুবই খারাপ, চোখে খুব মোটা চশমা, সেইটে সুদ্ধ মুখটা তুলে গাড়ির গায়ে হাত টেনে টেনে আমাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

(ইহার পর ২৭১ পৃষ্ঠায়)

চিরন্তন

জ্যাক লণ্ডন

অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি : পথে পথে ঘোরা বাউণ্ডুলে ছেলে জ্যাক লণ্ডন (১৮৭৬-১৯১৬)। খবরের কাগজ ফিরি করেছে, কারখানায় কাজ করেছে, [illegible] অঞ্চলের সমুদ্রবেলা থেকে ঝিনুক চুরির কারবার করেছে, সমুদ্রে নাবিক বৃত্তিতে দক্ষতা দেখিয়েছে, করেছে উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরেগিরি, আবার সোনার খনিতে সম্পদ আহরণের চেষ্টায় আলাস্কায় গিয়ে বাস করেছে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, [illegible] বিশেষ সাংবাদিকের [illegible] রচনা [illegible] করেছে এই মানুষটি মাত্র চল্লিশ বছরের জীবনে। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে [illegible] ও বাস্তবতায় এক [illegible] দান করেছে।

ক্লণ্ডাইকের এক অতি দরিদ্র পরিবারের [illegible] — অনুবাদক।

বুড়ো কসকুশ [illegible] কান পেতে শুনছে। দৃষ্টিশক্তি ওর অনেক দিনই কমজোরী হয়ে গেছে, কিন্তু কান দুটো এখনো উৎকর্ণ। [illegible] যাওয়া কপালের নিচে [illegible] আজও মিটমিট করছে, চোখের ভিতর দিয়ে দুনিয়ার কোন কিছুর খবর সেখানে আজ আর পৌঁছয় না বটে, কিন্তু একটুকু শব্দ হলে তা চট্ করে মাথায় ঢুকে যায়।

ওঃ, ওই ত সিন-কাম-টো-হা কুকুরগুলোকে গলাবন্ধ পরিয়ে দিচ্ছে। [illegible] করে লাগাম বাঁধছে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে গালাগালিও দিচ্ছে সেগুলোকে।

সিন-কাম-টো-হা ওর মেয়ের মেয়ে, কিন্তু এত কাজের তাড়া তার যে, অথর্ব দাদুর কথা ভেবে নষ্ট করবার সময় নেই। অসহায় ও নিরুপায় বুড়ো তাই একাই বসে থাকে বরফের উপর।

কত কাজ ওদের। তাঁবু তাড়াতে হবে, যেতে হবে দীর্ঘপথ। অথচ দিন ছোট। কোনমতেই একটুকু দেরি করতে দেবে না দিনটা। জীবন ডাকছে সিন-কাম-টো-হাকে। ডাকছে জীবনের অপরিহার্য কর্তব্য। মৃত্যু নয়। আর কসকুশ বসে আছে মৃত্যুরই গা ঘেঁষে।

অকস্মাৎ ভাবতেই মুহূর্তের জন্য বুড়োর মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। পঙ্গু হাত একটা বাড়িয়ে দেয় পাশে-রাখা জ্বালানি কাঠের ছোট গাদার উপর। কেঁপে কেঁপে ফেরে হাতটা। কাঠগুলো যে ওখানে ঠিক আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে হাত ফিরিয়ে আনে। আবার ঢাকা দেয় সেই খোলসানো লোমে ঢাকা চামড়ার আবরণের নিচে, তারপর আবার কান খাড়া করে শুনতে থাকে।

মোটা পাঁচ-ছয় শুকনো চামড়ার ভারী চড়চড়ে শব্দে ও বুঝতে পারে যে মুজ্-হরিণের চামড়ায় তৈরী সর্দারের ঘরটা ভেঙে নামানো হচ্ছে। চাপাচাপি করে বাঁধা হচ্ছে সেটা—যাতে বহন করা যায়।

সর্দার ওরই ছেলে। লম্বা ও তাগড়া চেহারা। গোষ্ঠীর মোড়ল আর ওস্তাদ শিকারী। মেয়েরা মালপত্র নিয়ে খেটে মরছে, আর সর্দারের গলা চড়ছে—ধীরে কাজ হচ্ছে বলে বকাবকি করছে।

উৎকর্ণ হয়ে সব শোনে বুড়ো কসকুশ। এই আওয়াজ এই শেষবারের মত শুনছে ও। গীহাও-এর ঘর ভাঙল, এবার টাসকেনের। সবে আটটা গেল। পুরুতে মশাইর ঘরটাই যা এখনো খাড়া আছে। ওই, সেটা নিয়েই পড়েছে এবার। বুড়ো শুনতে পাচ্ছে, ঘরটা জড়িয়ে স্লেজের (১) উপর রাখতে রাখতে কি গজর গজর করছে পুরুত।

একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল, একটা মেয়েছেলে নরম সুরে গুন্ গুন্ করে শান্ত করে তাকে। বুড়ো ভাবে বাচ্চা কো-টিটার মেজাজই বদ, তেমন তাগদও নেই ওর। হয়ত কদিনের মধ্যেই মরে যাবে। তুন্দ্রার জমাট বরফে একটা গর্ত করবে ওরা, তারপর লোভী নেকড়ের দলকে ঠেকাবার জন্য কিছু পাথর দিয়ে ঢাকা দেবে গর্তটা।

যাক গে, কী আর হবে তাতে। বছর কয়েক ভালভাবে থাক, দিন কয়েক ভরপেটে, কিছুদিন আবার খালি পেট, আর সব শেষে মৃত্যু। ভুখা মৃত্যু চরম ভুখ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ওকি? ওঃ, স্লেজের গায়ে চামড়ার ফালিগুলি টেনে বাঁধছে ওরা, আর ছিপটি মারছে। সমগ্র মন দিয়ে শোনে বুড়ো, আর ত কোনদিন শুনতে পারবে না। চাবুকগুলো শপাং শপাং করে—যেন কেটে বসে কুকুরগুলোর গায়ে। ও শুনতে পায়, কেঁও কেঁও করে কেঁদে ওঠে কুকুরগুলো। কাজে ওরা বিরক্ত হয়, দীর্ঘ পথযাত্রাকে ঘৃণা করে। এইবার স্লেজগুলি ছেড়ে দিল। একটার পর একটা স্লেজ ঘষ্-ঘষ্ করতে করতে এগোয়, ধীরে ধীরে আওয়াজটা দূরে সরে যায়। তারপর সব নিস্তব্ধ।

ওরা সবাই চলে গেছে, ওর জীবন থেকে একেবারে মিলিয়ে গেছে। একেবারে একাই ওকে জীবনের শেষ তিক্ত প্রহরটা গুজরান করতে হবে।

না না, তাত নয়, কার জুতোর চাপে বরফ মস্ মস্ করে উঠল, কে যেন দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। ওর মাথার উপর মৃদুভাবে হাত রেখেছে। নাতা ছেলেটাকে ভাল বলতে হবে। বুড়োর মনে পড়ে আরও অনেক বুড়োর কথা। তাদের ছেলেরা কিন্তু দলের সবাই চলে যাওয়ার পর আর অপেক্ষা করেনি। কিন্তু ওর ছেলে এখনো রয়েছে। মনটা অতীতে ঘোরা-ফেরা করতে থাকে, কিন্তু পুত্রের কণ্ঠস্বরে ফিরে আসে বর্তমান পরিবেশ।

'তোমার সব ব্যবস্থা ভালভাবে হয়েছে ত?' ছেলে জিজ্ঞাসা করে।

'সব ঠিক আছে,' জবাব করে বৃদ্ধ।

'তোমার হাতের কাছেই কাঠ রয়েছে। আর ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব, এখনই বরফ পড়তে শুরু হবে। একটু একটু এখনি পড়ছে।'

'এাঁ, হ্যাঁ, বরফ পড়ছে।'

'দলের সবাই যাবার জন্য ব্যস্ত। সঙ্গে বোঝা অনেক, অথচ পেট খালি। খাওয়া ত আর জোটে নি। অনেক দূরের পথ, ওরা চলেছেও ছুটে। আমি তাহলে এখন আসি। তোমার সব ঠিক আছে ত?'

'সব ঠিক আছে। আমি ত গেল সালের পাতা, কোনরকমে বোঁটায় লেগে আছি, একটু বাতাস বইলেই ঝরে পড়ব। গলার আওয়াজ হয়েছে বুড়ীদের মত, কোন্ দিকে পা চালাব, চোখে ত দেখতে পাই না। পা দুটোও ত ভারী হয়ে গেছে, শরীরে এসেছে অবসাদ। তবু ভালই আছি।'

মনে কোন নালিশ না নিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে বুড়ো। ধীরে ধীরে বরফের উপরকার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যায়। ও বুঝতে পারে যে, হাজার ডাকলেও ছেলে আর শুনতে পাবে না। তাড়াতাড়ি হাতটা বার করে দেয় লাকড়িগুলোর উপর। যে অসীম শূন্যতা ওকে হাঁ করে গিলতে আসছে, তার আর ওর মধ্যে এগুলিই যা একমাত্র ব্যবধান। শেষ পর্যন্ত এক মুঠো লাকড়িতে এসে ঠেকেছে ওর জীবনের পরিমাপ। একটা একটা করে আগুনে গিলবে এগুলো, আর ঠিক তেমনি এক-পা এক-পা করে মৃত্যু এগিয়ে আসবে ওর দিকে। শেষ কাঠটা যখন তার উত্তাপ নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে, তখনই হিমের জোর বাড়তে থাকবে। আগে পা দুটো যাবে, তারপর যাবে দুটো হাত। অসাড় অবস্থা ধীরে ধীরে হাত-পা বেয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে

(ইহার পর ২৬৮ পৃষ্ঠায়)

(১) কুকুরে টানা একপ্রকার চাকাবিহীন গাড়ি বরফাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।—অনুবাদক।

এককালে এই রকম একটা ধারণা বজায় ছিল যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনীতিকে কোনও পরিকল্পিত পথে চালিত করা সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়নের জন্য ভারতে যখন ২,২৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করা হল তখন মনে করা হয়েছিল যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যসিদ্ধি এবং রূপায়ণের জন্য অর্থ-সম্পদাদি সংগ্রহের দিক থেকে এই পরিকল্পনা অবাস্তব ও দুষ্কর প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু পরিকল্পনার আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, যদি অনমনীয় সংকল্প নিয়ে কাজ করা যায় এবং সর্বোপরি যদি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করা যায় তাহলে পরিকল্পিত পন্থায় দেশকে উন্নতির পথে চালিত করা সম্ভব।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অনেকখানি পরিমাণ উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কার্যকলাপ বাবদে গোড়ায় ব্যয় ধরা হয়েছিল ৬৯ কোটি ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা; কিন্তু পরে, মূল পরিকল্পনায় কিছু সামঞ্জস্য বিধান এবং নূতন কয়েকটা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তির ফলে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৭৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা করতে হয়। প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের রাজ্যের পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নতি ঘটে থাকলেও, দেশ বিভাগের পর থেকে এই বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ যে সমস্ত দুর্ভোগের কবলিত হয়েছে তার থেকে তাকে মুক্ত করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমরা এখনো আমাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমাদের রাজ্যকে গড়ে তুলতে পারিনি এবং পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরও সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা হওয়া দরকার। এই জন্যই আমাদের রাজ্যে আরও উচ্চাশাপূর্ণ ব্যাপকতর এক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা রাজ্যের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নামে প্রখ্যাত। এটা কার্যকরী করা হবে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে।

পল্লী অর্থনীতিকে গুরুত্ব দান

রাজ্যের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে সুসমঞ্জস উন্নতিবিধানের মূল নীতির উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে, শুধু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর লক্ষ্য নিবদ্ধ না রেখে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহসংস্থান এবং অন্যান্য সমাজ-কল্যাণ ব্যবস্থারও পর্যাপ্ত উন্নতি বিধানের চেষ্টা পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিকে সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তুলতে হলে কোনও বিষয়কেই উপেক্ষা করা যায় না। কাজেই, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতিকে সর্বদিক থেকে উন্নতির পথে পরিচালিত করা, যার ফলে সামগ্রিকভাবে শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায় একথা বহুবার স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, সমস্ত পরিকল্পনারই শুরু হওয়া দরকার একেবারে গোড়া থেকে। আমাদের প্রথম কাজই হবে পশ্চিমবঙ্গের মুমূর্ষু পল্লী অর্থনীতিতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করা, কারণ, রাজ্যের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রাই তার ওপর নির্ভরশীল। পল্লীর অর্থনীতি যদি দৃঢ়মূল হয়, তাহলেই সামগ্রিকভাবে রাজ্যের বৈষয়িক বুনিয়াদ শক্তাপোক্তভাবে গড়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে পল্লী-অর্থনীতির সম্প্রসারণের প্রতি আরও বেশী জোর দিয়েই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে যথোচিত গুরুত্ব দিইনি। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা লাভের সুবিধা প্রভৃতি সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারণ ও উন্নতির প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

২৫৫ কোটি টাকা ব্যয়

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নীতিগত ব্যবস্থার দিক থেকে অনুমোদন করেছেন। এই পরিকল্পনায় ২৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। গঙ্গাবাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা, ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন পরিকল্পনাসমূহ এবং সহরাঞ্চলে জল সরবরাহ ও সুন্দরবনে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি পরিকল্পনা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বাবদ ব্যয়ের টাকা এর মধ্যে ধরা হয়নি। সহরাঞ্চলে জল সরবরাহ ও সুন্দরবনে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা পৃথকভাবে বিবেচিত হবে এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করবেন।

গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণ বাবদ আগামী পাঁচ বছরে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই টাকা যোগাবেন ভারত সরকার।

আমাদের রাজ্যে কৃষির উন্নতিবিধানই আজ সব চেয়ে জরুরী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নত ধরণের বীজ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ ও বিতরণ এবং রাসায়নিক সার ও মিশ্র সার ক্রয় এবং বণ্টনের ব্যবস্থা স্থান পেয়েছে। চাষীরা যাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন সেজন্য তৈলসার মত অস্থিচূর্ণ পাঁক ও সহরের আবর্জনাজাত মিশ্রসার সরবরাহের সংকল্প করা হয়েছে। কৃষি উন্নতির জন্য সেচেরও পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে কয়েকটি ছোটখাটো রকমের সেচ ও জলনিকাশ পরিকল্পনাও চালু করা হবে। পাম্পের সাহায্যে সেচকার্যে উৎসাহ দানের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে বছরে [illegible] বিতরণের পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এ পাম্পগুলি দেওয়ার সময় চাষীরা এর দামের অর্ধেক মিটিয়ে দেবেন এবং বাকী অর্ধেক দেওয়ার সময় থেকে এক বছরের মধ্যে শোধ করবেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য অন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিকল্পনা আছে তার মধ্যে যন্ত্রের সাহায্যে পতিত জমি পুনরুদ্ধার, চাষ, চারা সংরক্ষণ, মৃত্তিকাক্ষয় নিবারণ, কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও গবেষণার উল্লেখ করা যেতে পারে।

পশু পালন ও বন

রাজ্যে পশুপালন ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে যে কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয়েছে তার মধ্যে গো-মহিষাদির উন্নয়নের পরিকল্পনা আছে। এই উদ্দেশ্যে, রাজ্যে বর্তমানে যে সব পশু প্রজনন কেন্দ্র আছে সেগুলোতে কৃত্রিম প্রজনন-কার্য চালিয়ে যাওয়া হবে। গৃহপালিত পশুর উন্নতি বিধানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পশুখাদ্য একান্ত দরকার। এই জন্য রাজ্যে সর্বত্র উন্নত ধরণের পশুখাদ্য উৎপাদনে অভিপ্রদর্শনী-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাজ্যে দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বৃহত্তর কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের এ

(ইহার পর ২৬৫ পৃষ্ঠায়)

অনেকেই জানিয়া ফেলিয়াছিল যে উমাশঙ্কর বোমারুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। চাকুরিয়া এবং পদলেহীরা তাঁহাকে তাই এড়াইয়া চলিত। কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করাও তাই তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সম্প্রদায় হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করেন সে সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকুরিজীবী। তাহারা যেই শুনিল যে উমাশঙ্করবাবুর সহিত টেরোরিষ্টদের সম্পর্ক আছে, অমনি তাহারা পিছাইয়া গেল। ওই বাড়ীতে বিবাহ দিয়া কে পুলিশের কবলে পড়িতে যাইবে! পিতৃনাম স্মরণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে লাগিল।

উমাশঙ্করবাবু সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনকড়ির সহায়তায় বিনয়ের নাগাল পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিনয় নামটাও তাঁহার খুব পছন্দ হইয়া গেল। বিপ্লবীদের ইতিহাসে 'বিনয়' নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বলা বাহুল্য নন্দিনীও মনে মনে খুব খুসী হইয়াছিল। বিনয়ের চিঠি পড়িয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। উমাশঙ্করবাবু তো আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উত্তীর্ণ হইলেন।

২

স্বর্গ হইতে কিন্তু পতন হইল। বিবাহের দিন বিনয় যখন ট্রেন হইতে নামিল তখন উমাশঙ্করবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি এবং পাড়ার আর একজন মাতব্বর লোক মোটর লইয়া বিনয়কে ষ্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, দেখিলেন বিনয় ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ট্রেন হইতে নামিল। বিনয় খোঁড়া। ভয়ংকর খোঁড়া। লাঠির সহায়তা ছাড়া চলিতেই পারে না। সঙ্গে বরযাত্রী একজনও নাই। সে একাই আসিয়াছে। উমাশঙ্করবাবু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে মাতব্বরটি সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি একবার উমাশঙ্করের দিকে চাহিয়া উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটি চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষুদ্বয় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্টেশনে ইহা লইয়া হুলুস্থুল করা শোভন নহে। খোঁড়া বিনয়কেই মোটরে চড়াইয়া তাঁহারা বর ও বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীটিতে লইয়া গেলেন। মাতব্বর বাড়ীটি ছাড়িবার পূর্বে আড়ালে উমাশঙ্করকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "খোঁড়া-লাইয়া বিদেয় করে দাও। বাউণ্ডুলে, জোচ্চোর!..."

"সেটা কি ভালো হবে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে খোঁড়া পাত্রের হাতে সম্প্রদান করবে না কি! যারা ঘটক তারা কোথায়?"

"তাদের তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি।—"

"সব যোগসাজস, ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছ না, দূর করে দাও ব্যাটাকে—" মোটরে চড়িয়া মাতব্বর ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। মোটরটি তাঁহারই। উমাশঙ্কর কয়েক ইতস্তত করিয়া অবশেষে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন মনে করিলেন। গত্যন্তরও ছিল না।

"আচ্ছা, তোমার পা এমনভাবে খোঁড়া হয়ে গেল কি করে?"

"ছটিতে খুব চোট লেগেছিল একবার, বছর পাঁচেক আগে।"

"কি করে চোট লাগল, খেলতে গিয়ে কি?"

"মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।"

"কেন বলতে বাধাটা কি।"

"বলতে বাধা আছে।"

এ উত্তর শুনিয়া উমাশঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গোপন করিবার অর্থ কি? বিশেষত, হবু-শ্বশুরের কাছে! উমাশঙ্কর কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিলেন।

"তোমার সঙ্গে একজনও বরযাত্রী আসেনি কেন।"

"দু'চারজন আসতে চেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই আনি নি। আমার হাঁটুতে কি হয়েছিল সেটা দু'একজন জানে, তাদের মুখ থেকে কথাটা হয়তো প্রকাশ হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদের এড়িয়ে একলাই চলে এসেছি।"

"হরপ্রসাদবাবু কি জানেন ব্যাপারটা?"

"জানেন। কিন্তু তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ব্যাপারটা কোথাও ফাঁস করবেন না।"

বিনয় হাসিমুখে উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমাশঙ্কর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারও সন্দেহ হইল ইহার অন্তরালে কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পাড়ায় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যাঁহারা কোনও কালেই উমাশঙ্করের হিতৈষী ছিলেন না তাঁহারা সহসা অত্যন্ত হিতৈষী হইয়া পড়িলেন। সকলেই লাঠি উঁচাইয়া বলিল, "ব্যাটা জোচ্চোরকে মেরে দূর করে দাও—"।

উমাশঙ্করের অনেক আত্মীয়স্বজন বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে এ বিষয়ে একমত হইলেন। উমাশঙ্করের বিষয়টি হস্তগত করিবার আশায় পাড়ার লক্ষ্মীকান্তবাবু তাঁহার নব-ম্যাট্রিক পুত্রটির সহিত নন্দিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদা বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় প্রস্তাবটি করিলেন।

"ওই খোঁড়া অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার গদাইয়ের হাতে দেওয়া শতগুণে ভাল। মেয়ে তোমার ঘরেই থাকবে। গদাই আজকাল কন্ট্রাক্টরি করে বেশ রোজকার করছে—"

উমাশঙ্কর হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। সত্যই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। উমাশঙ্করের দূরসম্পর্কীয় যে মাতুলটি আসিয়াছিলেন তিনিই অবশেষে বলিলেন, "ওর হাতে আমরা মেয়ে দেব না। তোমার বলতে যদি চক্ষুলজ্জা হয়, আমিই বলে আসছি গিয়ে।"

তিনি গিয়া দেখিলেন, বিনয় নাই।

চাকরটি মুচকি হাসিয়া বলিল, "উনি নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে ষ্টেশনে চলে গেছেন।"

ইহার খানিকক্ষণ পরেই কলিকাতা হইতে হরপ্রসাদ এবং তিনকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি একটা বিশেষ কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সময় মতো উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

৩

তাহার দিনই সন্ধ্যার পর ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে যে ঘটনা ঘটিল তাহাকে নাটকীয় আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃশ্যটা এইরূপ উমাশঙ্কর, উমাশঙ্করের মাতুল এবং তিনকড়ি তিনজনেই করজোড়ে বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বিনয় স্মিতমুখে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিতেছে।

উমাশঙ্কর বলিতেছিলেন, "আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, আমরা তো জানতাম না। হরপ্রসাদবাবুর কাছে সব শুনলাম। রাত তিনটের সময় আর একটা লগ্ন আছে, চল।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের মত নিয়েছেন?"

মাতুল বলিলেন, "সে বলছে আপনার সঙ্গে যদি বিয়ে না হয় তাহলে সে আর বিয়েই করবে না।"

তিনকড়ি বলিলেন, "উমাশঙ্করবাবু মেয়ের বাপ, তাঁর মনোভাবটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনাকে বেশী বলা বৃথা। চলুন—"

বিনয় বলিল, "যেতে পারি একটি সর্তে। তামা তুলসী গঙ্গাজল আর গীতা স্পর্শ করে আপনাদের শপথ করতে হবে যে যা শুনেছেন তা জীবনে কখনও প্রকাশ করবেন না।"

তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিলেন—"আমাদের কিছু আপত্তি নেই।"

বিনয় ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে গিয়া পুনরায় মোটরে উঠিল।

হরপ্রসাদবাবু পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, বিনয় একদা একটি বিপ্লবী দলে ছিল। একবার সেই দল স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। পুলিশের সহিত সংঘর্ষের ফলে তাহার হাঁটুতে গুলি লাগে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, তাহার দলের লোকেরা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। দলের কেহই ধরা পড়ে নাই। তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন এখন চাকরিও করিতেছে। কথাটা প্রকাশ হইয়া গেলে তাহাদের চাকরি থাকিবে না। তাই বিনয়ের এই সাবধানতা।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

কেরানী, [illegible] পাল

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লি

ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্র ঠিক নয়, খাঁড়ি। [illegible]

[illegible]

কি করা যায়। [illegible] জাহাজের [illegible] খাঁড়ির এপার-ওপার করি। [illegible] অফিসে হানা দিই [illegible]। [illegible] সাদা একজনের সঙ্গে মুখচেনা হয়ে গেছে। গোঁফের আড়ালে মুচকি মুচকি হেসে সে বলে, হাসছ কেন? দেরি হচ্ছে, ভালই তো! বন্দরে এসে কেউ তো নড়তে চায় না। আমোদ-স্ফূর্তির ভালো ভালো ঠিকানা আছে। খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি?

আরে ভাই, খুঁজে বের করতে হবে কেন? সে এমন জায়গা, স্ফূর্তি আপনি এসে জেড়ে ধরে। দিন-দুপুর অথবা খোলামেলা রাজপথ বলে পরোয়া নেই। আসুন—শুনে যান একটা কথা। শুনতে পাচ্ছেন না, ও আপনি কোন্ দেশের মানুষ?

একদিন কি বিপদে পড়লাম, বলি আপনাদের। সঙ্গীরা টহল দিতে বেরিয়েছেন—সকাল থেকে শরীরটা ভাল ঠেকছে না, আমি যাইনি ওঁদের সঙ্গে। চুপচাপ [illegible] বসে আছি। [illegible]

[illegible] একটা মেয়ে কোথা [illegible] এসে আমার [illegible] চেয়ারে বসে পড়ল। চীনা মেয়ে, নাক চ্যাপ্টা। [illegible] মুখ ঘুরিয়ে নিলাম অন্য দিক থেকে।

এইটুকুতে উঠে পড়বে, তেমন পাত্র এরা নয়। [illegible] মেয়েটা হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, শুনছেন? আমি একটু চা খাবো—

বলার সুরটা ভারি মিষ্টি। ইংরেজী বলছেও খাসা। সেই জন্যেই বোধহয় অবহেলার ভাব কিছু কাটল।

বেশ তো, খাও—

জবাব দিয়ে বসেছি, আর তখন রক্ষে আছে! ঘাড় দুলিয়ে আবদারের ভঙ্গীতে বলে, শুধু চা নয় কিন্তু। খিদে পেয়েছে, আর কিছু চাই ঐ সঙ্গে।

নিরুৎসুক কণ্ঠে বলি, যা তোমার পছন্দ চেয়ে দেখতে পারো। থাকলে ঠিক দিয়ে দেবে।

এবারে সোজাসুজি বলল, দামটা তুমি দেবে কিন্তু। তুমিই অর্ডার দাও। যা খাওয়াবে, তাই খাবো আমি।

গতিক দেখে গা জ্বলে যায়। চীন ঘুরে আসছি, এদেরই স্বজাতি কত মেয়ে দেখে এলাম। জ্বলজ্বলে মুখ লি-কুই-হুয়ার কথা ভাবছি। নাচের আসরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এক পাক নাচার জন্যে। তখন [illegible] কি-একটু আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, অবশেষে ঠাহর করতে পারিনি। ঠাহর হল [illegible] যখন ফড়্-ফড়্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। [illegible] শুনে যাও—কি যেন নাচের কথা বলছিলে!

উঁহু, মাথা ধরেছে আমার—

[illegible] সেই সব মেয়েরা, আর এই! একই দেশের মাঝখান দিয়ে সরু খাল। তারই এপার-ওপারে আকাশ আর পাতালের ব্যবধান।

লোক ডেকে অর্ডার দিয়ে দাও না—

আমার হয়ে গেছে, উঠছি। দুঃখিত, তোমার সঙ্গ এবং খাওয়ার সুখলাভ করতে পারলাম না।

দিন দুয়েক পরে ঘুরতে ঘুরতে এক চমৎকার জায়গায় গিয়ে পড়েছি। বাঁধানো পোস্তা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে খাঁড়ির জলে। মোটরলঞ্চ কয়েকটা—ভাড়ায় ছুটোছুটি করছে। জল-ভ্রমণে বেরুবেন তো নিয়ে নিন ওর একটা। ভাড়াও এমন কিছু নয়—ঘণ্টায় দশ ডলার, হংকং ডলার অর্থাৎ ন' টাকারও কম গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাচ্ছেও দলে দলে। একলা যেতে মন খুঁত-খুঁত করে তো সঙ্গিনী বেছে নিন। কত চাই, ঘাটের বাঁ দিকটায় গাদাগাদি হয়ে আছে। কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। হাসি-মস্করা চলছে নিজেদের মধ্যে, এক-একটা কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। শিকারের দিকে নজর কিন্তু ষোল আনার উপর আঠারো আনা। চোখাচোখি হলেই হল, অমনি হাসতে হাসতে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে। তারপর উঠুন গিয়ে লঞ্চে, চলে যান অকূলের পানে। তরঙ্গে হাবু-ডুবু খান।

জায়গাটা কিন্তু সত্যি মনোরম। বসবার চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো বসতে পারছেন না। চেনা লোকে দেখতে পেলে মুখ টিপে হাসবে। চুপ-চাপ বসে বসে নিরামিষ জল-শোভা অবলোকন করছেন, তামা-তুলসী ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। চলে যাবার জন্য অতএব পা বাড়িয়েছি, এমন সময় প্রবল

সেরে একটা লঞ্চ ঘাটে ভিড়ল এবং তড়াক্ করে লাফিয়ে নামল সেই মেয়েটা। থোপা-থোপা চুল কপাল ঘিরে পড়েছে, চোখ-মুখ অবিকল সেই—নির্ঘাৎ সেদিনকার হোটেলের সেইটি। পিছু পিছু নামল প্রকাণ্ডকায় মাঝ-বয়সি একজন। মিলিটারি মানুষ, চেহারাতেই মালুম। বাগিয়েছে আচ্ছা বটে, অমন হিমালয় সম মানুষটার 'সখি আমায় ধরো ধরো—' অবস্থা। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, জল বেধে আছে এখানে-ওখানে। মেয়েটার জুতোর তলায় এক ফোঁটা জল না লাগে—সেজন্য কখনো হাত ধরে কখনো বা কোমর ধরে কত কি কায়দা করছে, সে এক দেখবার বস্তু। দেখে তো আপনাদের হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বার কথা। অথচ সেই হাসি চেপে-চুপে ঠোঁটের মধ্যে আটকে রাখতে হবে। যেহেতু নাম-করা জায়গা, দুনিয়ার এক সেরা বন্দর—যা-কিছু ঘটছে, সমস্ত সভ্য জগতের রীতিসম্মত।

সমুদ্র-বিহারের পর ডাঙায় উঠে আবার কোন নতুন স্ফূর্তিতে যাবে! ট্যাক্সি-রিক্সা অগুন্তি। ট্যাক্সিগুলো ভারি বনেদি এখানকার। খাস বিলাতি ড্রাইভার—পোশাক দেখে মনে হবে, শাপভ্রষ্ট কোন লাট-বেলাট অনুগ্রহ করে স্টিয়ারিং-চাকায় হাত দিয়ে বসেছেন। ট্যাক্সির কাছে যেতে মেয়েটা কিন্তু না না—করে উঠল। রিক্সায় যাই চলো—

দেরি হয়ে যাবে যে!

তা হোক, তা হোক, অনেকক্ষণ ধরে বেশ গায়ে গায়ে বসে যাওয়া যাবে—

এ হেন গায়ে গড়ানোর প্রস্তাবেও কিন্তু লোকটার বেজার মুখ বিশেষ প্রসন্ন হল না। দরের মেজাজ এখন। আদুল-গা, তালি-মারা হাফ-প্যান্ট পরনে, একবেলা খাওয়া চীনা-মূর্তি' ধুঁকতে ধুঁকতে রিক্সা টানছে, চোখের সামনে এখন উৎকট লাগবে। মেয়েটা এ সমস্ত আমলে আনে না, হাত ধরে একটা রিক্সার কাছে গিয়ে এসে খিলখিল করে হেসে বলে, উঠে পড়ো গো—

মনোভাব যা-ই হোক, হেসে হেসে হাত ধরেছে—সে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া চলে না। চলল দু-জনে। কোন্ চুলোয় চলল, সঠিক জানি নে। আন্দাজে যা-হোক্ ধরে নিন।

চলে গেছে, মেয়েটার হাসির ধ্বনি তবু মনে পড়ছে। হাসি নয়, গরম সীসা ঢেলে দিচ্ছে কানের মধ্যে। লি-কুই-হুয়াকে ভাবছি। বাংলা 'দাদা' কথাটা কিভাবে কাছে সে শিখে নিয়েছিল, তাই বলে ডাকত। সাংহাই শহরে এখনো দু-পাঁচটা সাদা সাহেব বিচরণ করে। ঐ ঘর গলা-লগ্ন হয়ে মেয়েটা চলে গেল, হয়তো বা তারই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ফ্রেঞ্চ টাউনের ভিতর এক সাহেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে লি একদিন বলল, এদেরই পাড়া ছিল এই সেদিন অবধি। নোটিস টাঙানো ছিল দ্বারে, চীনা আর কুকুরের প্রবেশ নিষেধ। কুকুর আর চীনা দুটো জন্তু এখানে বরদাস্ত করবে না।

কলিযুগে চোখের আগুনে কিছু পোড়ে না। সাহেবটার তাই কিছু হল না, বহাল তবিয়তে চলে যেতে পারল। কিন্তু সাংহাই অনেক দূরে। তার কথা কেন ভাবছি এই মেয়েটার সঙ্গে? নাক থ্যাবড়া—ঐ যা একটু মিল। আর কিছু নয়।

সেই রাত্রে ডিনারে বসেছি। গটমট ক— মিলিটারি লোকটা ঢুকল এবং আগে ঠাহর ক— নি—এত রাত অবধি মেয়েটাও লেপটে আছে জোঁকের মতন। অদূরে এক ছোট টেবিল নিয়ে তারা বসল। আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। সাহেবের মেজাজ এখনো দিলদরিয়া সেই বিকালের মতো। খানার অর্ডার নিতে এলো, তা বাছাই বাছাই পদ একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে। মেয়েটার দেখছি কপাল খুলে গেছে। সহজে ছাড়ছে না লোকটাকে হাড় খাবে, মাংস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

রুটি দিয়ে গেছে, সুপ এসে পৌঁছয় নি। মেয়েটা গো-গ্রাসে ঐ রুটি গিলে চলেছে। কী ক্ষিধে পেয়েছে দেখে কষ্টও হয়। হেনকালে নিচের গেটম্যান এসে বলল, রিক্সাওয়ালা ভাড়া চাচ্ছে—

রুক্ষস্বরে লোকটা বলে, দিয়ে এসেছি তো!

তবু তো দাঁড়িয়ে রয়েছে, নড়ছে না—

মেয়েটা বলল, দিয়েছ দুই ডলার। ঘণ্টায় দু-ডলার রেট। আমাদের তো আড়াই-তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। পাঁচ ডলার পাবে অন্ততঃ।

কে বলে আড়াই ঘণ্টা? কুলো এক—তা-ও বোধহয় পোরে নি। দুই ডলার তো খুশিতে বেশি দিয়ে এসেছি।

ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে লাগল। মেয়েটা অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, এত খরচ করলে, সামান্য ভাড়ার পয়সা নিয়ে অমন করে না। গরিব মানুষ—।

গরিব তো মানি, কিন্তু মানুষে বলছে কি করে? পাঁচ-পাঁচটা ডলার একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেছে কুত্তার বাচ্চাগুলো?

আধেক খাওয়া রুটির টুকরো ফেলে দিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। মুখে ছাই মেড়ে দিয়েছে। মিলিটারি হাদিরামের খেয়াল হল বোধহয়, যার সঙ্গে আমোদ-স্ফূর্তি করছে সেটিও তো ঐ জাতের। বেকুব হয়ে বলে, হল কি?

আমি বললাম—

ক্ষিধে পেয়েছে বললে যে! তোমার জন্যেই তো হোটেলে আসা—

না, খেতে পারবো না আমি তোমার সঙ্গে। তোমার পয়সার খাবার গলায় ঢুকবে না—

বলতে বলতে—অবাক্ কাণ্ড, কেঁদে ফেলল সহসা। টপ টপ করে ক-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল পালিশ-করা মুখের উপরে। মাটি খুঁড়ে যেমন খাল বানায় তেমনি ধারা বয়ে গেল দু-গালের উপর। কী বিশ্রী, কী বিশ্রী! এমনি করে রূপ-যৌবন রচে এরা। সে রূপ এত পলকা, দু-ফোঁটা জলের ভর সয় না।

তা হোক, আমার কিন্তু কি রকমটা হয়ে গেল। এক অপকর্ম করে বসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অতি সম্ভ্রমে মেয়েটিকে ডাকলাম, আমার টেবিলে আসুন অনুগ্রহ করে। বড় আনন্দ পাবো।

বিদেশ-বিভুঁই এবং বন্দর জায়গা বলেই পারলাম ডাকতে ঐ শ্রেণীর মেয়েকে টেবিলে নিয়ে। দেশে হলে আপনারা আস্ত রাখতেন?

দি গ ন্ত

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দিগন্ত সন্ধানে চলে নীড়হারা লুব্ধ বিহঙ্গম
অবিশ্রান্ত অবিরাম দূর দূরান্তরে,
বিলীন তাহার চোখে পরিচিত স্থাবর জঙ্গম
হঠাৎ সে থেমে যায় বৃক্ষহীন ধূসর প্রান্তরে।

সে জানে না কেন থামে,
কেন তার স্বপ্নের বিরতি
স্বপ্নভাঙা নিস্তব্ধ সকালে,
দূরে ঊষা সীমন্তিনী রক্তরাগে জানায় মিনতি
কোন বিহঙ্গমী ডাকে বিহঙ্গমে দিকচক্রবালে

প্রান্তরের শূন্যতায় প্রাণে তার জাগে অস্থিরতা
হাহাকার নিঃসীম আকাশে,
এর চেয়ে ভাল ছিল বিহঙ্গের জন্ম-বধিরতা
দিগন্তের ডাক কভু শুনিত না
ইঙ্গিত আভাসে

এ কী মোহ দিগন্তের, উড়িবার এ কী আকর্ষ
এ কী মায়া বিহঙ্গে ভুলায়
কবে কোন সন্ধ্যাকালে মুক্ত হবে এই আবরণ
বিহঙ্গ ফিরিয়া যাবে পরিচিত আপন কুলায়।

আবার বিহঙ্গ তার ডানা মেলি উদ্ধত আকাশে
দিগন্তের উচ্ছ্বসিত অনন্তে বিলীন,
অরণ্যের পিছু ডাক বার বার ফিরে ফিরে আসে
উদভ্রান্ত মনের আশা অন্ধকারে
হয়ে আসে ক্ষীণ

ভিখারিণী (লিনো কাট) — শ্রীদেবেন্দ্রকুমার সেন

যে ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার পাশের ঘরেই বলুদা। ঘরের এক কোণে, ও'র শিয়রের দিকে একটা মোমবাতি মিট মিট করে জ্বলছে। দুই ঘরের মধ্যে এককালে দরজা ছিল। এখন নেই। সেই মিটমিটে আলোয় দেখলাম, বলুদা নিস্তব্ধ শুয়ে। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুকটা দুলছে। চোখ বন্ধই বোধ হয়, ঠিক বোঝা গেল না।

ওই বলুদা! বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বলদেব রায়! যাঁর নামে যুব-মন ঈথরের মতো তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। ওইখানে শুয়ে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে কিসের প্রতীক্ষায় কে জানে, নিস্তব্ধ মৃত্যুর, না চঞ্চল জীবনের। এই জরাজীর্ণ গৃহের জীর্ণতর শয্যায় বাংলার তথা সমগ্র ভারতের কোন ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাই বা কে জানে!

কিন্তু থমথমে রাত্রিও অবশেষে প্রভাত হল।

বলুদা উঠে বসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমার রিভলবারটা কি হারিয়ে ফেললাম চিনু?

—আজ্ঞে না। আমি রেখে দিয়েছি।

চিনুদা রিভলবারটা ওঁর হাতে দিয়ে দিলে।

সেটিকে পাশে সযত্নে রেখে অন্যমনস্কভাবে একবার নিজের ললাটে হাত বুলোলেন। কি যেন একটু ভাবলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, একটু চায়ের ব্যবস্থা হতে পারে চিনু? খিদে পেয়েছে ভয়ানক।

—দেখি কি করা যায়। মুখটা ধুয়ে নিন আগে। জল দিচ্ছি।

দুটি মুড়ি ছিল, আধ-বাসি। চিনু তাই দুটিখানি দিয়ে সহাস্যে বললে, দেখুন চলবে কি না।

গোগ্রাসে তাই চিবুতে চিবুতে বলুদা বললেন, চলবে না! বল কি হে! এর চেয়ে খারাপ জিনিসও চলত।

বললেন, গত কটা মাস কি যে খেয়েছি আর কি খাইনি বলতে পারব না। পেটের জ্বালায় গাছের কচি পাতা পর্যন্ত খেয়েছি। বেশ লাগে হে! মন্দ লাগে না। বনকুল, শাঁক আলু জাতীয় কন্দ, গাছের পাতা, ঝরণার জল,—নিতান্ত খারাপ নয়।

—তাহলে এই পাজি অসুখটা বোধ হয় ওই সব খেয়েই?—চিনু সহাস্যে বললে।

—বিচিত্র নয়!—বলুদা তাঁর ফোঁকলা দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন।

[এই ভাঙা দাঁতের একটা ইতিহাস আছে, জানিস অচ্যুত।—বলেছিলেন চিনুদা অন্য সময়। সার্জেণ্টের ঘোড়ার লাথিতে ওদুটি গেছে। লাথি খেয়ে উনি ছিটকে গড়িয়ে পড়লেন একটা আধ-মজা পুকুরের জলের ধারে। বুঝলেন, আর রক্ষা নেই। পকেটেই ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড। সমস্তটা ঢেলে দিলেন মুখে।

—পটাসিয়াম সায়ানাইড! কী সর্বনাশ!—বলতে আমার চোখ নিশ্চয় বড় বড় হয়ে উঠেছিল।

—সর্বনাশ খুব বেশি হয়নি। কারণ ওটা অক্সিডাইজড্ হয়ে গিয়েছিল। মরলেন না, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ভেঙে গেল।

—আর সেই সার্জেণ্ট?

—তার কি অপেক্ষা করার ফুরসুৎ ছিল? সে চলেছিল বলদেব রায়কে গ্রেপ্তার করতে!]

—কিন্তু তারপরে মাসখানেক বেশ আরামে কেটেছিল হে! যখন টাইফয়েড হয়েছিল।

—টাইফয়েড! তাও হয়েছিল নাকি?—চিনুদা জিজ্ঞাসা করলেন।

—হবে না? বাঃ!—বলুদা বললেন,—আমার বিশ্বাস ওটা রীতিমতো টাইফয়েডই। শরীরটা ক'দিন থেকে খারাপ লাগছিল। গাছের পাতা ছাড়া আর কিছু পেটেও যায়নি। মধ্য-ভারতের একটা জঙ্গলে। অনির্দিষ্টভাবে চলেছিলাম। পথে একটা ছোট্ট পাহাড়িয়া নদী পড়ল। হেঁটেই পার হব। জলে নেমে শরীর যেন স্নিগ্ধ হল। সেই ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুতে লাগলাম। এই পর্যন্ত মনে পড়ে। তার পরে দেখি, জঙ্গলের মধ্যে একটা পর্ণকুটিরে শুয়ে। আমার পাশে ক'টি সাঁওতাল ছেলে এবং মেয়ে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে চোখ বন্ধ করলাম।

বলুদার কাছে ব্যাপারটা কি এখনও স্পষ্ট নয়? এখনও তিনি চোখ বন্ধ করলেন কেন?

বলুদা বলতে লাগলেন: ডাক্তার নয়, কবরেজ নয়। কত কি পাতার রস ওরা খাইয়েছিল। আর ওদের দেবতার কাছে দিয়েছিল কত মোরগ বলি। সেই মোরগের সুপ ছিল পথ্য। কী যত্নই না করেছিল ওরা!

এতক্ষণে বলুদার চোখ পড়ল আমার উপর।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে চিনুদা সঙ্গে সঙ্গে বললে, ও অচ্যুত। আপনার অবস্থা দেখে কাল ওকে আনিয়েছি।

—তা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? অমন অপরাধীর মতো? এদিকে এস ভাই।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম।

আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, বাঃ বেশ!

জিজ্ঞাসা করলাম, আশীর্বাদ করবেন না?

—করব বই কি। কিন্তু আমার তো একটিই আশীর্বাদ, সে কি তুমি সইতে পারবে?

—পারব!—অহংকারে আমার বুকটা যেন ফুলে উঠল।

—তাহলে আশীর্বাদ করি, মরতে শেখ। মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের উৎস। বাঙালীকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে তাকে মরতে শিখতে হবে।

বলুদার চোখ দুটো যেন নেকড়ে বাঘের মতো জ্বলতে লাগল। আর সেই দৃষ্টির সামনে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম।

এর পরে অনেক কাল বলুদাকে দেখিনি। গা-ঢাকা দিয়ে তিনি কোথায় কোথায় ঘুরেছেন, সে কাহিনীর কিছু কিছু পরে তাঁর মুখে শুনেছি। তখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। এবং অন্যান্য অনেকের মতো তিনিও গুপ্ত বিপ্লব ছেড়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

এ তাঁর কর্মবহুল জীবনের আর একটি অধ্যায়।

কিন্তু এই অধ্যায়ে আমার সঙ্গে তাঁর যোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। আমার কেমন মনে হত, অনেক কাছের আকাশে যিনি ছিলেন মস্ত বড় জ্যোতিষ্ক, অনেক দূরের আকাশে লক্ষ কোটি তারার মধ্যে তাঁকে যেন ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে। জেল টপকাতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে চিনুদা মারা গেছেন। আমি পুলিশ কোর্টে ওকালতি করি। তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দূরে বলুদার সঙ্গে কখনও-সখনও দেখা হয়।

তারপরে একদিন অসহযোগও শেষ হল। বলতে গেলে, এক রকম অপ্রত্যাশিতভাবেই ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে গেল। সেই বাধাবন্ধহীন উন্মত্ত হুল্লোড়ের মধ্যে হ্যারিসন রোড আর চিত্তরঞ্জন এভিনুর মোড়ে একবার যেন মনে পড়ল বলুদাকে।

সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে ভিড়ের চাপ সামলাচ্ছি তখন। তার মধ্যে তপস্বী বলদেবকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ করে ধরা সম্ভব নয়। ধরলাম কাটা-কাটা ছেঁড়াছেঁড়াভাবে।

কাকে? যে বলদেব এক ছিলেন বহু হয়েছেন, তাঁকে?

না, তাঁকেও না।

বোধহয় বলদেব রায়কেই নয়। বলুদাকেও নয়। স্পষ্ট শুনলাম, কানের কাছে একটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর: টাইফয়েড হবে না? বাঃ!

সেই মোরগের সুপ ছিল পথ্য। কী যত্নই না করেছিল ওরা!

অকস্মাৎ নিবিড় অরণ্যে যেন মধ্যভারতের গভীর জঙ্গলে পরিণত হল। চিত্তরঞ্জন এভিনুর মাঝখানে মোটর যাত্রীদের জন্যে মাঝে মাঝে এক চিলতে [illegible] আলোয় ঝিকমিক করে উঠছিল। আমার মনে হল, ওটা যেন পথ নয়, [illegible]। বলুদা ওর কোন ঘাটে [illegible] কে জানে। কিন্তু তাঁর সেই ফোকলা দাঁতের হাসি যেন দেখতে পেলাম। [illegible] গেছে। [illegible] হাসি, হঠাৎ যেন ঝলমল করে উঠল।

কিন্তু [illegible]? [illegible] আছে। [illegible]

অবশেষে [illegible] মধ্যে বলুদা [illegible]

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, বলুদার খুব অসুখ।

মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় থাকেন তিনি? সবাইকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ সঠিক জানে না। কেউ বলে বেহালায়, কেউ টালিগঞ্জে, কেউ বা বলে দমদমে।

কি আশ্চর্য! স্বাধীনতা পাওয়ার পরে বাঙলা দেশ কি বলদেব রায়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলল!

শেষবার জেলে যাওয়ার আগে চিনুদা একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন, কত কাজ আছে, অচ্যুত, এক জীবনে সব কি করে যেতে পারব?

বলেছিলাম, নাই পারলেন। হাতের মশাল দিয়ে যাবেন পরবর্তীদের হাতে। শেষ তারাই করবে।

—ঠিক। এমনি করেই তো মানুষ অমর হয়ে থাকে এক কাল থেকে অন্য কালে।

কাজ শেষ না করে যাওয়ার কথাই চিনুদা

(ইহার পর ৬৪ পৃষ্ঠায়)

বাঁ হাতি ঘরেও লোক সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

তবু আশা রাখা যায়।

পঁচিশ টাকা?

আছেতো পকেটে?......আশ্চর্য! আস্ত আর খুচরো মিলিয়ে পঁচিশ টাকা দশ পয়সা! ঠিক ট্রাম ভাড়াটা থাকে!

বিধাতা বলে, তা হলে সত্যিই কেউ আছে নাকি?

তাঁর বিধান বলেই সব চলছে?

আচ্ছা দেখাই যাক না বলদেব শর্মা কি বলেন!

বলদেব শর্মা পুঁথির কাগজপত্র গোছ করতে করতে নিস্পৃহ ভাবে বলেন—'কবচ? নাঃ! এ রকম কেসে আমি কবচ দিই না। লাভ কি? মহামৃত্যুঞ্জয় কবচেরও বাবার সাধ্য নেই এক্ষেত্রে রক্ষা করে!......হ্যাঁ কাঠখোট্টা মানুষ আমি, যা বলবার মুখের ওপরই বলি। কালপূর্ণ হলেই চলে যেতে হবে মানুষকে, ওর আর রদ নেই! যাওয়া মানেই তো আবার আসা? ওর জন্যে মন খারাপের কি আছে? আপনার পরনের এই কাপড়খানা বদলে অপর একটা কাপড় পরতে কি আপনি দুঃখ অনুভব করেন?'

ডাক্তারের রোগী দেখার ঘরের মতো আলাদা ছোট্ট ঘর। মোটা কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। একজনের গোপনীয়তা আর একজনের কর্ণগোচর হয় না।

গলির মুখে মাঝারি দোতলা বাড়ীখানার সামনে দাঁড়ালে কে বলবে ভেতরে এতো কাণ্ড!

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুরদেব হাতের গোটানো কাগজখানা খুলতে খুলতে ভাবলো কে জানতো জগতে এতো কাণ্ড আছে! এতোদিন এ সব কথা নস্যাৎ করে এসেছে সুরদেব, আজও করবার চেষ্টা করে, কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও বল খুঁজে পায় না।

বারবার একই কথা বললো সবাই।

বলদেবের কবচ দিতে অস্বীকৃতিতেই আরো বিচলিত হয়ে গেছে সুরদেব। 'ওরা বুজরুক, ওরা ব্যবসাদার'—এ কথা বলবার জোর গেলো। হঠাৎ মনে হলো—একটা বাজে বুজরুকীর ব্যাপার হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকাই কি সম্ভব?

দূর-দূরান্তরে অবস্থিত চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবাইয়ের গতি রহস্য যদি ধরে ফেলে থাকে মানুষ, তবে মানুষের জীবন-মৃত্যুর গতি রহস্যই বা ধরতে পারবে না কেন?

শূন্যে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রগুলো যদি পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তবে পৃথিবীর জল মাটিতে গড়া মানুষগুলোর ভাগ্যের নিয়ামকই বা হবে না কেন তারা?

তিন মাস আঠারো দিন!

শুধু এইটুকু মাত্র সময়! এই টুকুর জন্য পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শে সুরদেবের অধিকার। তারপর লোকাতীত রহস্যলোকের অন্তহীন বিস্মৃতির শূন্যতায় হারিয়ে যাবে সুরদেবের সত্তা!

তিন মাস আঠারো দিন পরে সুরদেব আর এ পৃথিবীতে থাকবে না!

পৃথিবীতে কতোদিন থাকবে, আর কবে থাকবে না, এ নিয়ে সুরদেব কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। সে যে পৃথিবীতে আছে এই যথেষ্ট! এই শেষ কথা!

অহংকৃত দৃপ্ত ভঙ্গীতে সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে সচেতন করে রাখতো নিজের উপস্থিতির ঘোষণায়।......নাঃ পৃথিবী থেকে একদিন সুরদেব চৌধুরীর সত্তা মুছে যাবে, এ কোনোদিন ভেবে দেখেনি সুরদেব।

প্রথম মনে পড়িয়ে দিয়েছিলো অফিসের যতীন সমাদ্দার!

ঠিক মনে পড়িয়ে দেওয়া নয়, কথাটা তোলা।

মুখোমুখি বলবে এতো সাহস হয়নি, বলেছিলো নেপথ্যে। হিংসুটের হাড় এই যতীন সমাদ্দার! যুবক সুরদেব ওদের মতো—আগুনে কড়া পড়ে যাওয়া কেরানীদের 'ওপর-ওলা' হয়ে এলো, এ যতীন সমাদ্দারের অসহ্য। স্পষ্টই সে সুরদেবকে অগ্রাহ্য করে ঊর্ধ্বতন অধস্তনের আইনটুকু মাত্র বাঁচিয়ে। আড়ালে ব্যঙ্গ করে, মন্তব্য করে।

নিজের জায়গায় বসেও, কাঠের পার্টিশনের ওপিঠের মন্তব্য কানে এসেছিলো সুরদেবের।

পাশের কাকে উদ্দেশ করে দাঁতে দাঁত পিষে বলছিলো যতীন—'ওটি দেখেছেন সাহেবের? হেঁটে যান, যেন ধরাকে সরা দেখেন।..... আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি হিমাংশুবাবু বেশীদিন নয়! জ্যোতিষ-ফোতিষ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া আমি করে থাকি, কপাল দেখে ধরতে পারি। সাহেবের কপালে কালছায়া ঘনিয়ে এসেছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

হিমাংশু বোধহয় এর একটা মৃদু প্রতিবাদ করে থাকবে কিন্তু যতীন সমাদ্দারের স্পষ্ট ঘোষণায় সে প্রতিবাদ চাপা পড়ে যায়।......'না বলবার কি আছে? যতীন সমাদ্দার ওসব সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। দেখবেন না আর ছ'টি মাস! তারপর বলবেন—হ্যাঁ যতীনদাদু বলেছিলো বটে!

শুনে, আর কিছু নয়, শুধু রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিলো। কিন্তু চোখের আড়ালে উচ্চারিত কথা তুলে তো আর শাসিয়ে দেওয়া যায় না! আর কথাটা—ঠিক অধস্তন কর্মচারীকে তলব করে জেরা করবার মতোও নয়।

লোকটাকে চাকরীর ইচ্ছে দমন করে নিজের কাজ করে গিয়েছিলো সেদিন সুরদেব। হ্যাঁ, শুধু একটা অনুকম্পা, রাগ তা ছাড়া আর কিছু নয়। খোঁচা সেদিন লাগেনি।

খোঁচা লাগলো বন্ধু নলিনীরঞ্জনের সাবধান বাণীতে।

নলিন হাতদেখার চর্চা করে।

বন্ধুবান্ধবরাতো ওর সামনে হাত পেতেই আছে। "দেখতো হে সময়টা কেমন যাচ্ছে" এ তাদের মুখের বুলি। শুধু সুরদেবই কখনো বন্ধুর কাছে হাত পাতেনি। বলে—"আচ্ছা এক ভাঁওতা নিয়ে শিখেছিস বটে! শিখলি কি করে বলতো?"

যতীন সমাদ্দারের মন্তব্যের ক'দিন পরে, আড্ডায় গিয়ে হঠাৎ কি খেয়াল হলো, হাতটা বাড়িয়ে বললো—দেখি কি রকম ভাঁওতা দিতে শিখেছিস! বলদিকিন কবে মরছি!'

নলিন প্রথমে বলেছিলো—ভূতের মুখে রাম নাম যে!' কিন্তু হাতটা দেখতে দেখতে ওর ভুরু কুঁচকে এলো।...... তারপর কালি-মাড়া মুখে বললো—'কিছুদিন তোমার একটু সাবধান থাকা দরকার!'

সুরদেব হেসে উঠেছিলো—হো হো করে।

'হাসি নয় হাসি নয়'—বললো নলিন—'তোমার হার্টটা একবার—একজামিন করান উচিত্।'

'হুঁ। শালগ্রিরের মধ্যে ওটা বিনা নোটিশে ফেল করে বসবে, এমন নোটিশ পাচ্ছো নাকি?

নলিন বিরক্তভাবে বললো—'দেখ্ সবকিছুই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমি বলছি তুই একবার ডাক্তার দেখা।'

সুরদেব বললো—'যে আজ্ঞে'!

সেটা হয়ে গিয়েছিলো মাস খানেক।

নলিনকে ক্ষ্যাপানো ছাড়া তারপর আর কিছুই করেনি সুরদেব, কিন্তু খামখেয়ালের বশেই ডাক্তারকে হার্ট না দেখিয়ে বিজ্ঞাপনে দেখা এক জ্যোতিষীর [illegible] নিজের জন্ম সময়টা পাঠিয়ে দিয়েছিলো দু' টাকা দণ্ড দিয়ে।

উত্তর এলো। হাতের কাছেই নাকি মারাত্মক এক ফাঁড়া আছে সুরদেবের, মৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ অবশ্য প্রয়োজন। তার সঙ্গে ছাপানো [illegible] একখানা। কোন্ কোন্ দিবসে কোন্ কোন্ কাজে [illegible]

[illegible] সুরদেব [illegible]

[illegible] সুরদেব।

[illegible] বললো—আচ্ছা [illegible] করা নেই?

[illegible]

[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

—কিন্তু [illegible]

—তুই দেখে বলতে পারিস?

—দেখি না! একটু আধটু দেখতেও বলতে কি আর না পারি!

বলেছিলো কিন্তু পারেনি।

ছাপানো [illegible] আর কাশীর পণ্ডিতের লেখাকরা কুষ্ঠী [illegible] অনেক তফাৎ। অগত্যাই সেখানা নিয়ে গিয়ে পাঠোদ্ধার করিয়েছিলো সুরদেব, এক ভাগ্যগণনা কার্যালয় থেকে।

হাঁ, সেখান থেকে জেনে এসে গিয়েছিলো একত্রিশ বছর সাত মাস দশদিনে মৃত্যুযোগ

সুরদেব গম্ভীর হয়ে বলে—কিন্তু আজ তো বলা সম্ভব নয় নমিতা।

সম্ভব নয়!

অভিমানে মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে নমিতার। ততোধিক গম্ভীর হয়ে সে বলে—এতো অসম্ভব হয়ে উঠছে কিসে?

—সে তোমাকে বোঝানো যাবে না মিতা। কিন্তু আজ! নাঃ আজ হয় না। আজ আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা না করেই পালাবো।

আগুনের মতো টকটকে লাল মুখে নমিতা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে—বেশ, কবে তোমার সময় হবে বলে যাও।

সুরদেব যেন বাস্তব জগতের বাইরে চলে গেছে। এ জগতের প্রচলিত ব্যবহারিক রীতি-নীতি যেন ওর কাছে অর্থহীন, তা' নইলে এমন একটা কথা বলে বসে?

—আমার যা বলবার, যদি সম্ভব হয়, দু' মাস পরে বলবো নমিতা।

দু'মাস! তাও 'যদি সম্ভব হয়'!

সুরদেব কি ঠিক করে রেখেছিলো নমিতাকে আকাশ থেকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দেবে?……নাকি কৌতুক? কৌতুকের ধরণ এই? সুরদেবের মুখ দেখে কি কৌতুক বলে মনে হচ্ছে? ঠাট্টা করে যা বলছিলো নমিতা, সত্যিই তেমন ব্যাপার ঘটেনি তো?

সুরদেবের জীবনে নমিতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে?

আগুনের রং পাংশু হয়ে আসে।

পাংশু মুখ আর অশ্রুসজল(?) চোখ নিয়ে নমিতা বলে—আমাকে বিয়ে করা সম্ভব কিনা, এইটা স্থির করতে দু'মাস সময় লাগবে তোমার?

—ভুল বুঝো না নমিতা, স্থির করতে নয়, [illegible] করতে।

—[illegible]

[illegible]

কিন্তু সুরদেব কি করবে?

আসলে কি, সে কথা কি বুঝে দেখবে?

অসম্ভব!

এদের কাছে, নমিতার কাছে সেই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলা যায় না। এরা একেবারে অন্য জগতের। এদের কাছে সেই [illegible] কথার উল্লেখ করলে সুরদেবকে পাগল সাব্যস্ত করবে এরা।

কিন্তু সুরদেবই কি করতো না? কিছুদিন আগে পর্যন্ত?……এখনই কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে সে?……না না। সম্পূর্ণ বিশ্বাস সুরদেবও করে না। ও জানে ও সব বাজে কুসংস্কার!……তবু—! তবু—একেবারে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেই বা পারছে কই? কিছু না, শুধু পরীক্ষা করে নিঃসংশয় হওয়া।

এইতো—জীবনের কটি গোনা দিন ছেড়ে সবাই গুণতে গুণতে একমাস কোথা দিয়ে কেটে গেলো। মনে হলো যেন [illegible] পাখায় ভর করে উড়ে গেলো। এমনি করেই তো মুহূর্তে উড়ে যাবে আর দুটো মাস।

তখন—হাজার হাজার বছরের পুরনো শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলেই তো মিটে গেলো সব বাধা। আর যদি—হ্যাঁ যদি আধুনিক যুগের অবিশ্বাস আর ধৃষ্টতাকে ব্যঙ্গ করে হাজার বছরের সত্য, সত্য হয়েই দেখা দেয়?

তখন?

তখন আর কি করবার থাকবে নমিতার? নমিতাকে ক্ষুন্ন করবার ভয়ে নমিতার জীবন ধ্বংস করে দিতে পারবে না সুরদেব।

হয়তো সুরদেব যখন থাকবে না—ইয়ে, সুরদেব যদি না থাকে—তখন কিছুদিনের জন্য ভেঙে পড়বে নমিতা, তবু আবার দাঁড়িয়ে উঠতে পারবে সে। আবার নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু হতভাগ্য সুরদেবের জীবনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলে বিব্রত করে রেখে যাবে না সুরদেব।

সুরদেবকে নমিতা ভুল বুঝবে?

বুঝুক।

দু'মাস পরে—সবই তো ধরা পড়বে।

যতোই নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করুক সুরদেব, যতোই ভাবতে থাকুক—আসলে সে শুধু পরীক্ষাধীনে রাখছে দিন কটা, তবু তার অজ্ঞাতসারে সমস্ত চিন্তার মধ্যে বাজতে থাকে বিদায়ের সুর।

একেবারে ভিতর থেকে সে যেন করুণ স্বরে বলতে চাইছে—বুঝতে পারবে নমিতা, বুঝতে পারবে কেন আজ এমন অদ্ভুত আচরণ করলাম! সেদিন হয়তো তোমার বুক ভেঙে একটা হাহাকার উঠবে, সুরদেবকে ভুল বোঝার জন্য। আর হয়তো সেদিন কৃতজ্ঞও হবে সুরদেবের কাছে।

—বড্ড বেশী চিন্তায় পড়ে গেছো মনে হচ্ছে।

সুরদেব চমকে ওঠে। সত্যিই চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিলো সে। কিন্তু একটা কথার আগেই নমিতার [illegible] স্বর [illegible] ভাবতে পারিনি। হয়তো বুঝতে পারলে তোমাকে এমন বিব্রত করতাম না। যাক মাপ করো।

—তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না নমিতা—সুরদেব [illegible] করুণ স্বরে বলে—আসলে কোনো বাধাই নেই—শুধু একটা কাল্পনিক বাধামাত্র—

—সেইটেই তো সবচেয়ে বড়ো বাধা গো!… নমিতা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে ওঠে—সত্যিকার বাধা বরং সরানো যায়, কাল্পনিক বাধা বড্ডো সাংঘাতিক—ও আর সরানো যায় না।

—দু' মাস পরে আমি তোমাকে সব বলবো নমিতা। অবশ্য যদি—মানে—"

"অবশ্য যদি মানে" ততোদিনে তোমার জীবনকে আর কারো কাছে বিক্রী করে না ফেলো। কেমন এইতো?

—বিক্রী? না নমিতা, আমার জীবন আর কারো কাছেই কখনো বাঁধা পড়বে না। সে শুধু ভাগ্যের কাছে বাঁধা আছে।

—ভাগ্য? হুঃ! নমিতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে—ভাগ্য ভগবান আর ভূত তিনটেই সমগোত্র! নাঃ বলা যাবে না, কিছুতেই না। এর কাছে সে কথা বলা যায় না।

—তোমার মনকে জানবার জন্যে কিছু সময় চাও?

শেষ চেষ্টা করে নমিতা। মহিমময়ীর ভঙ্গী দেখিয়ে উপন্যাসিকার ভূমিকা অভিনয়।
—সামান্য কিছু সময় চাওতো, দেখাতে পারি চেষ্টা করে।

—দু'মাস সময় আমার লাগবেই নমিতা।

—ওঃ আচ্ছা, ধন্যবাদ! তোমাকে ডেকে বিরক্ত করলাম, এজন্য দুঃখিত। আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার। তোমার এই অকারণ অনুপস্থিতিতেই বোঝা উচিত ছিলো। শুনলাম ইতিমধ্যে পুরী ঘুরে এসেছো।

—হ্যাঁ এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম মাকে আর জয়াকে নিয়ে। মার অনেক দিন থেকে—

—কাকে কাকে নিয়ে গিয়েছিলে, সে সম্বন্ধে অযথা কৌতুহল আমি করিনি! কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই।…শুধু এইটাই আশ্চর্য লাগছে, হঠাৎ এতো পরিবর্তনও মানুষের হয়!…অন্ত আর তোমার গোপনীয় কথা আমাকে বলা চলে না।

—তোমাকে বলা চলে না, এমন কোনো কথাই আমার নেই নমিতা, তুমি বিশ্বাস করো। শুধু—অদ্ভুত একটা অবস্থার মধ্যে আছি এখন—

নমিতা বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—সে তো বুঝতেই পারছি। দু'মাস সময়ের প্রয়োজন তোমার নিজের নয়, আর কারো, তা' ও বুঝতে আটকাচ্ছে না। যাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ কী?

বিদায় গ্রহণ না করেই হঠাৎ বাগানের চেয়ার থেকে উঠে বাড়ীর মধ্যে চলে যায় নমিতা।

অনেকক্ষণ বোকার মতো বসে থেকে থেকে, এক সময় নিঃশব্দে [illegible] উঠে যায় সুরদেব।

না, নমিতাকে সুরদেব দোষ দিতে পারে না।

একেত্রে এ ছাড়া আর কিছু করা কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব হতো না। তবু সুরদেব জানে এ রাগ পড়ে যাবে নমিতার। অভিমানের কুয়াশায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি আবার স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সুরদেবকে পড়তে ভুল হবে না নমিতার।

নিজের যন্ত্রণার চাইতেও নমিতার বর্তমান মানসিক যন্ত্রণার কথা ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে সুরদেব।…এখন মনে হয় দু'মাস সময় কতো দীর্ঘ!

এই দীর্ঘ সময়-সমুদ্র পার হলে তবে নমিতা বুঝতে পারবে সুরদেবের আজকের এই অর্থহীন আচরণের অর্থ।

নমিতা কি বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়বে?

আজকের এই ঘটনা স্মরণ করে সে কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে?…ভুলের চরম বিচার কি নমিতার কাছে চরম দণ্ডাদেশ হয়ে দেখা দেবে?

সুরদেবের মৃত্যু সংবাদে অনুতপ্ত শোকার্ত-মূর্তি নমিতাকে কল্পনা করে সুরদেব নিজের উপরও যেন করুণায় বিগলিত হয়ে যায়।

নমিতা অনুতাপে দগ্ধ হবে, এই কল্পনায়

আত্মাভিমানী পৌরুষ বলিষ্ঠ সুরদেবেরও চোখের কোণে কোণে হঠাৎ দু ফোঁটা জল দেখা দেয়। এখন আর ঝড়ের পাখায় ভর করে সময় দৌড়য় না।

স্তিমিত গতিতে এগিয়ে চলে। তবু চলে। চলে চলে একদিন শেষ হয়ে আসে প্রতীক্ষার দিন।

এর মধ্যে অনেকবার নমিতাকে চিঠি লিখতে চেষ্টা করেছে সুরদেব, পেরে ওঠেনি। পেরে ওঠেনি—নমিতার কাছে আপন কুসংস্কারের কথা স্বীকার করতে।...তাই এই দীর্ঘ দুমাস ধরে ভেবেছে সুরদেব যদি জ্যোতিষ বচন মিথ্যা হয়, যদি সুরদেব আবার পৃথিবীর আলো-হাওয়ার অধিকারী হয়ে টিকে থাকে, তাহলে কী মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলবে নমিতাকে? "রহস্যময় দুমাসের" কী হিসাব দেবে?

জয়া আড়ালে বলে—দাদার কি হয়েছে বলোতো মা? না বলতেই যখন তখন আমার জন্যে দামী দামী শাড়ী, জামা এনে দিচ্ছে, কেবলই বলছে—সিনেমা যাবি জয়া? আমি যা যা খেতে ভালোবাসি, তাই এনে দিচ্ছে, কেন মা?

মা চিন্তিতভাবে বলেন—কি জানি? কেমন যেন শুকনো হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কি যেন ভাবে সব সময়। সেদিন দেখলিতো—নলীন ঠাকুরপোর চিঠিটার উত্তরে আর চিঠিই দিতে চাইলো না। বলে 'কী লাভ?'

জয়া মার আদরের মেয়ে, কথার আটঘাট মানে না। মুচকে হেসে বলে—আমার তো মনে হচ্ছে তোমার ছেলেটি 'লাভে'ই পড়েছে! তাই এতো উদার হয়ে গেছে।

—থাম বাপু! দাদা হয় না?

—সেই তো মুশকিল! তা নইলে কবে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ভেতরের কথা আদায় করে ছাড়তাম।

কথার মাঝখানে কিটো দুখানা পোস্টকার্ড আর একখানা খাম হাতে করে এসে দাঁড়ালো—পিয়ন দিয়ে গেলো দিদিমণি!

বলার আগেই জয়া কেড়ে নিয়েছে।

—দেখি দেখি—এতো বাহারে বিয়ের চিঠি কার! চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই জয়া মুখ তুলে বলে—কে মা এরা? বুঝতে পারছিনা তো? ব্যারাকপুরে বাড়ী, বাপের নাম প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেয়ের নাম নমিতা...বুঝতে পারছো?

জয়ার মা চিঠিখানা হাতে নিয়ে দেখে শুনে বলেন—কই বাপু, এনামে আবার আমাদের কে আছে! এ বোধ হয় তোর দাদার অফিসের কারুর মেয়ের বিয়ে।

অফিসের! তাই বটে।

নিস্পৃহ উদাসীনতায় চিঠিখানা হাতে নিয়ে জয়া তিনতলায় দাদার ঘরে ওঠে—এই নাও দাদা, তোমার কার মেয়ের বিয়ে! অফিসের লোক বুঝি? কিছু টাকা খসলো বোধ হয়।

কিন্তু......

টাকা খসবার আশংকায় সুরদেব এমন নীরব পাষাণ মূর্তি হয়ে পড়বে এতোটা আশংকা জয়া করেনি। সে চৌকির কোণ চেপে একটু দাঁড়িয়ে থেকে উৎসুক্যভরে প্রশ্ন করে—কে গো দাদা?

—ও তুই চিনবি না।...চিঠিটা ঠেলে সরিয়ে রাখে সুরদেব।

পাথরের মুখ লোহার হয়ে ওঠে।

জয়া দাদার মুখ দেখে ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ংগম করতে না পেরে, অগত্যাই নীচে নেমে আসে।...তবু চিঠিটার মধ্যে 'সন্দেহজনক' কিছু থাকা সম্ভব, মনেও আসে না জয়ার।...এক চক্ষু হরিণের মতো ও শুধু 'প্রকাশচন্দ্র'কেই হাতড়ে বেড়ায়, 'নমিতা'কে গ্রাহ্য করে না।

লোহার চাইতেও কঠিন কি? ইস্পাত না?

ইস্পাতের মতোই কঠিন হয়ে ওঠে মুখের প্রত্যেকটি পেশী!

জয়া চলে যাবার পর চিঠিখানা আরও একবার দেখবার কথা মনে হলো কিন্তু হাত বাড়িয়ে টেনে নেবার প্রবৃত্তি হলো না কিছুতেই। আর— অনেকক্ষণ...অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে ইস্পাতের সেই কাঠিন্য শিথিল হয়ে অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গহাসির রেখে ছড়িয়ে পড়লো মুখের রেখায় রেখায়।

চিঠির প্যাডটা সামনে টেনে নিলো সুরদেব।

হ্যাঁ চিঠিই হচ্ছে ঠিক অস্ত্র।

মুখোমুখি কটা কথা শুনিয়ে দেওয়া যায়? বলতে পারা যায় কতোটা কটুক্তি?...কতোটা ধিক্কারের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় অতোটুকু চকিত বাক্যের মধ্যে? ধিক্কারে আর ব্যঙ্গে কাউকে যদি জর্জরিত করে ফেলতে চাও, তবে কলমের মতো কোনো অস্ত্র নেই। মুখে বেশী কথা বলা হয় যদি, ঠিক ঠিক কথাটা বলা হবে না। এখানে কলমই ঠিক।... কলমই পারে খোঁচা দিতে, ক্ষত বিক্ষত করে দিতে, বিদীর্ণ করে ফেলতে!

পাতার পর পাতা লিখে চলে সুরদেব।

ভেতরে যতো খোঁচা [illegible] সব প্রকাশ করতে চায় সে! দুটি মাস, মাত্র দুটি মাস! এই সময়টুকু তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলো সুরদেব, সেটুকু ধৈর্য ধরতে পারলে না নমিতা?

তুমি না শহরের মেয়ে!

ধন্যবাদ! ধন্যবাদ তোমায়!

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন যে, তোমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সুরদেব। কি করতো সুরদেব তোমার মতো আত্মসর্বস্ব অন্তঃসারহীন এক মেয়ে নিয়ে?

অভিমান?

অভিমান তোমার কোথায় নিয়ে গিয়েছে আরো তাহলে! নাঃ! 'অভিমান' বলে বাহুল্য সম্মান দেবার প্রয়োজন নেই! অভিমান আর প্রতিহিংসা এক জিনিষ নয়।

কলমের কালিটা হঠাৎ জবাব দিয়ে বসলো।...সেটাকে নামিয়ে রেখে পিঠটাকে টান্ টান্ করে চেয়ারে হেলে বসে সুরদেব লেখা কাগজগুলো দেখলো।...আরে কী করেছে সে বসে বসে! এ কী পাগলামী? এইগুলো কখনো পাঠানো যায়?

এক কলম কালিই গেলো।

বরবাদ গেলো এতোটা সময়।...প্যাডের কাগজও গেলো খান পাঁচ ছয়। দূর! কি হবে চিঠি লিখে? কী লাভ?

চাইনি তোমার ভালবাসা
চাব না কোন দিনও
কপালে যদি না জোটে রুটি
না পাই যদি তৃণও
অভুক্তই থাকবো, তবু
তোমার দরজায়
হবো না আমি শরণকামী
ক্ষুধা বা পিপাসায়।

ঘৃণা তোমার বুঝতে পারি,
বুঝি না ভালবাসা
সেটা যেন বেজায় রকম
[illegible]
যেমন খুসি [illegible]
[illegible]
[illegible]
পুরানো মনস্কাম।

[illegible]
[illegible]
আরও [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সেই প্রেম।

সব এ খাতা কাগজ এক সঙ্গে ধরে একটা দেশলাই কাঠি [illegible]। পোড়া ছাই-ও কোথাও জমা হবে না। খোলা [illegible] কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দেবে সেই ভস্মাবশেষ!

সুরদেবের [illegible] তো এমনি উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়বে কালই আর দেরী [illegible]?

না সে চিঠি না, কোনো চিঠিই না। সেদিনও হয়নি, পরেও হয়নি। নমিতার বিয়ের নেমন্তন্নটাই অম্লান বদনে খেয়ে আসবে কিনা এই ভাবতে ভাবতেই বিয়ের তারিখটা গেলো পার হয়ে!

নির্দিষ্ট নিয়মে দিনা [illegible] করে গেলো সুরদেব, কোথাও কোনোখানে ভয়ংকর একটা কিছু ঘটলো না।

তারপর—"জীবনের কোন কোন্ কর্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো" তারই হিসেব করতে করতে এলো সুরদেবের মৃত্যুর তারিখ! তিথি নক্ষত্র দণ্ড পল দিয়ে হিসেব করা দিন!

সেদিন?

না সেদিনও কোথাও কোনোখানে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটলো না! ঘড়ির কাঁটা সরতে সরতে ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠাটাকে দিলো ঠেলে সরিয়ে।...তারিখটা নিজস্ব নিয়মে মিলিয়ে গেলো অতীতের ধূসরতায়।

(ইহার পর ৬৪ পাতায়)

নৌকার গুণটানা মাল্লাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হত সাঁতার কাটা। বিকেলে মাছ ধরা, কচ্ছপ ধরা, পাখী ধরা, এসব আকর্ষণীয় বস্তুত ছিলই—মাঝে মাঝে পোষালু যা বনভোজন, অষ্টপ্রহর বা হরিসংকীর্তন এবং ঠেঙারী বা শিকারও ছিল কম উপভোগ্য ব্যাপার নয়। সাপ মারা, কুমীর মারা, বাঘ মারা, অনেক রকম শিকারের অভিযানেই বাগ্দী-বুনোদের সঙ্গে সঙ্গে চকে, গোয়াসে, নসীপুরে যেতো ছেলের দল। বিনা ডাকেই চলে যেতাম আমরাও। বর্ষার জলে ভেসে আসা এক কুমীর বড় সড়কের পাশে কালকাসিন্দার জঙ্গলে ঘুমিয়ে ছিল—জল নেমে যেতে ধরা পড়ে প্রাণ হারালো। দুটো মানুষ পর পর মারার পরে তেনাচিরে বটের কাছে এক বাঘ মারা পড়লো। পাখীর ছানা খেতে বট রাণুর বাড়ীর কাছের কদম গাছে উঠেছিল এক গোখরো সাপ—সে খুন হল সড়কীর ঘায়ে। আর সবাইয়ের বড় বড় হাতের সঙ্গে এই ছোট হাতও দু-চার ঘা বসিয়েছে এসব জানোয়ারকে—সুতরাং শিকার হল বৈকি! আজো স্পষ্ট মনে আছে সে সব কথা। আজো মনে আছে সামিয়ানার নীচে বকুল ও বেল ফুলের মালা গলায় নিয়ে প্রেম দাসের কীর্তন গাওয়া—'রাই জাগো, রাই জাগো'!

মামাদের এককালে অবস্থা ভালো ছিল। বাড়ীর লাগোয়া ছিল মস্ত একটা বাগান ও সেই বাগানে অনেক রকম গাছ-পালা—সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল এই বাগানের পলাশ গাছ, কদবেল গাছ এবং চেপ্টী ও পাটলী আমের গাছ। এই বাগানে শেয়াল নয়ত খরগোস তাড়ানো, কাঠ-বেড়ালি ধরা, নয়ত বাসায় হাত চালিয়ে পাখীর ডিম চুরি করা ছিল আমার প্রাত্যহিক খেলা। বহস্যার আঠা দিয়ে ফাঁদ বানিয়ে পাখী ধরেছি—আর ধরতে না পেরে বেঁজী এবং গোসাপদের ঠেঙিয়ে মেরেছি যখন-তখন। কিন্তু শুধু এই নয়—তাঁতীশালায়, কামারশালায়, ঘানী ঘরে, বাইনে, যখন তখন গিয়ে কাপড় বোনা, লোহা পেটা, তেল বানানো, গুড় বানানো দেখতেও ভারী ভালো লাগতো। ভীষণ ভালো লাগতো জেলে নৌকোর মাছ ধরা দেখতে—চাষাদের ধান রোয়া কিংবা কাটা এবং চাষী বৌদের ধুপুস-ধাপুস করে ঢেঁকী পাড় দেওয়া দেখতে!

ইসলামপুর আমাকে চিনিয়েছিল সত্যিকার বাংলা দেশের গ্রামকে, বহু বিচিত্র তার জীবনকে—যেমন কড়চাডাঙা শিখিয়েছিল, লুপ্ত গ্রামের পদচিহ্ন ধরে অতীতের স্বপ্নে চলে যেতে এবং তাকে ভালোবাসতে। কড়চাডাঙা আজ নেই, ইসলামপুর আছে—কিন্তু তার সে জীবনও নেই! পশ্চিমবঙ্গ আজ সহরকেই চেনে—গ্রাম তার মরে যাচ্ছে।

(৩)

তৃতীয় গ্রাম আমার চিত্তে স্মরণীয় হয়ে আছে—মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম। এ নদীয়া-মুর্শিদাবাদের জলময়, সবুজ সমারোহময় গ্রাম নয়। এখানে রুক্ষ কর্কশ লালমাটির পথ, সে পথের কোন বাঁকে নদী নেই, খাল বিল নেই। শুধু দীর্ঘ শালবন, পলাশ বন, মহুয়া বন, ক্যাঁদ বন গ্রামের চৌহদ্দিতে মাথা খাড়া করে আছে। তারি পটভূমিতে বিচালি ছাওয়া মেটে ঘর—দেওয়াল তার সাদা বা গেরুয়া মাটি দিয়ে ঝামানো এবং বেড়া ও বারান্দা বানানো ছিটেবেড়া দিয়ে। বনে ভালুক আছে, হেঁড়ার আছে, সজারু বজ্রকীট (আর্মাডিলো) আছে—লোকালয়ে আছেন সাঁওতাল, লোধা, কুমী, মাহাতো প্রভৃতি আদিবাসী এবং সেই সঙ্গে ঈষৎ উড়িয়া ভাবাপন্ন বাঙালী, যাঁদের পুরুষেরা কেউ কেউ কাজল পরেন, হাতে রূপোর বালা পরেন এবং পরনে পরেন রঙীন কাপড়।

ঝাড়গ্রামে মজার মজার পর্ব হত। তার একটা হল কাড়াখুটন। খুঁটায় মহিষ বেঁধে বাঘের চামড়া নাকে ধরে তাকে উত্যক্ত করা হত। আর একটা হল ইন্দ্রাভিষেক—শাল গাছের মাথায় পাগড়ী পরিয়ে তাকে উৎসব প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করা হত। তারপর তার চারদিকে মেলা বসতো। এছাড়া হত মুর্গী লড়াই—'কাক' পায়ে বেঁধে দুই মোরগে লড়াই করতে করতে মারা পড়তো। আর হত গরিয়া ভার এবং বিল্লি কিছোড়—প্রথমটা হল, শিবরাত্রি উপলক্ষে গাগরী (গরিয়া) ভরে জল এনে শিবের মাথায় ঢালা, দ্বিতীয়টা আর কিছু নয়, উড়িষ্যার ছউ নৃত্যের মতো মহড়া বা মুখোস পরে নৃত্য!

ঝাড়গ্রাম তখন ছিল এক অরণ্যময় স্থান—হাইস্কুল ছিল না, কোর্ট-কাছারী ছিল না, দোকানপসার সামান্য ছিল। এই অরণ্যময় রোমাণ্টিক রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন—যাঁর উপাধি ছিল উগাল ষণ্ড। উগাল হল তাঁর রাজধানীর চার কোণের চারটি পাষাণ ফটক এবং তার লাগোয়া পরিখা। এই রাজার এস্টেটেই আমার বাবা ছিলেন একাউন্টেণ্ট এবং সেই সূত্রেই আমাদের এখানে যাওয়া। বন-জঙ্গল, জীবজন্তু, পাখী, বিচিত্র বন্য মানুষ এবং তাদের আদিম ধরণের চালচলন খুবই ভালো লাগতো—কিন্তু কুড়কুড়িয়া ছাতু (পোকাল ফোঁড়), কাঁদা, কুন্দরী (মিঠি তেলাকুচো), ভেণ্ডী (ঢেঁড়স) এবং আলু-পোস্ত ছাড়া খাদ্য কিছুই পাওয়া যেতো না। আর গঙ্গাতীরবর্তী বাংলার যে স্নিগ্ধ বাতাসে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, তাও পাওয়া যেতো না—এই দোলা-দেশের স্বাদ এখানে কমই হত! তবে শাল-পিয়ালের বনকে, সাবিত্রী ও জলহরির পুকুরকে, ডুলা মাঠ ও অরণ্যময় উগালকে, এবং আশপাশের ধবনী, দুবরাজপুর, চিল্কা, চন্দ্রী প্রভৃতি জঙ্গল অঞ্চলকেই ভালোবাসতে শিখলাম। সেই ভালো-বাসাই ধীরে ধীরে কাব্য রচনা ও সাহিত্য পাঠে রূপ নিলো। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঝাড়গ্রামের এ অরণ্যময় আদিম রূপ থাকলো না বেশী দিন। হল মহকুমা—এলো কোর্ট-কাছারী, কারবার, লোক-লস্কর। হাইস্কুল হল এবং সেই স্কুল থেকেই প্রথম দলের ছাত্র হিসাবে পাশ করলাম। তারপর পড়তে চলে গেলাম কলেজে—মেদিনীপুর সহরে।

ঝাড়গ্রামের চতুর্দিকে তখন ভারী রোমাণ্টিক পটভূমি ছিল। শাল বনে যখন বসন্ত আসতো—শালের মাথায় মাথায় ফুল ধরতো, কুরচি ফুটতো, মহুয়া ফুটতো, আর সেই ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাঁড়িয়া খেয়ে হাত ধরাধরি করে সাঁওতাল মেয়েরা নাচতো, গাইতো, সাঁওতাল ছেলেরা বাঁশী বাজাতো, মাদল পিটতো, তখন কত যে ভালো লাগতো, তা বলে বোঝাতে পারি না। মনে হত, বাংলা দেশ থেকে, সভ্য জগৎ থেকে, চলে গেছি কোথায় কোন্ গভীর জঙ্গলে—যেখানে লেখাপড়া নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, লড়াই কাজিয়া নেই। মানুষ যেখানে খাটে—দুমুঠো ভাত, একখানা কাপড় ও একটু শোয়ার জায়গা পেলেই খুসী হয়। আদিবাসীদের সঙ্গে ভদ্রবাসীদের চাল-চলনে তফাৎ ছিল—কিন্তু জীবনযাত্রা তাঁদেরও ছিল খুব সাধাসিধা। শুধু রাজারা ছিলেন সর্বসাধারণ থেকে আলাদা। তবে রাজ পরিবার-ভুক্ত গরীব হাকিমরা ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে সাধারণের যোগাযোগ ছিল। এঁদের একজন ছিলেন মহেন্দ্রবাবু, তিনি বাঘ মারতেন, আর একজন ছিলেন বৃষভধ্বজবাবু, তিনি গান করতেন। কাশীবাবু বলে ছিলেন আর একজন—তাঁর ছিল যাত্রার দল। বারো মাস অভিনয় হত 'প্রবীর পতন'।

নিভৃতে সাহিত্য সেবা ও লুকিয়ে সাঁওতাল নাচ শেখা, কাঁড়বাঁশ চালানো শেখা—আর উদয়াস্ত লাল ধুলোর পথে, রহস্যঘন শাল বনে ঘোরা...এই করেই কৈশোরকাল কেটেছে। আজকের সহুরে ঝাড়গ্রাম আর দেখিনি—সেজন্যে দুঃখও নেই, কারণ মনের মধ্যে জেগে রয়েছে যে ঝাড়গ্রাম, চোখ বুজলেই তাকে দেখতে পাই এবং সেই ছায়াময়, মায়াময় কল্পনাটুকুকে বাস্তবের আঘাতে আর ছিন্ন করতে ইচ্ছা হয় না। তবে শুনেছি, আকণ্ঠ মহুয়া খেয়ে বেহুঁস হয়ে জঙ্গলে ভালুক ঘুমুচ্ছে, এ দৃশ্য নাকি আজ আর সেখানে দেখা যায় না—দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই!

(৪)

চতুর্থ গ্রাম হল বাঁকুড়ার রামসাগর—জীবনের প্রথম চাকরি করতে গিয়েছিলাম সেখানে [illegible] এবং মাস [illegible] থেকে ও দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া সঙ্গে করে সেখান থেকে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। তবু রামসাগর এবং তার অনুরাগী [illegible], বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর আমার মনে [illegible] হয়ে জেগে আছে, কারণ [illegible] আমার [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —কাছেই জঙ্গল এবং [illegible] পার হলেই পড়ে ছোট্ট [illegible] নদী, নাম তার [illegible], অথবা [illegible]। এই অঞ্চল ও [illegible]-এর মধ্যেই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। তাছাড়া রেলস্টেশনের পাকা সড়ক ধরে খানিকটা গেলেই পড়ে রেল লাইন ও পাকা সেতু—সেখানেও বেড়ানোর সুযোগ ছিল যথেষ্ট। অন্যর পাড়ায় ঘরে ঘরে বেড়ালেও ভালো লাগতো বেশ—কেননা মানুষের কথাবার্তা, চালচলন ও ব্যবহার ছিল ভারী সরল ও অমায়িক। তবে এমন অসীম দারিদ্র্য কমই দেখা যায়—মানুষ এবং জীব-জন্তু কারুর গায়েই মাংস নেই, মানুষের অঙ্গে কাপড়ও লজ্জা নিবারণের চেয়ে বেশী নেই। ভারী দুঃখ হত দেখে।

মেদিনীপুরের মতোই বাঁকুড়ার অনেক অংশেও রুক্ষকঠিন তামাটে মাটি—জল নেই, ঘাস নেই, কাঁটা গাছ শাল ও মহুয়ার গাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা ক্যাঁদ গাছ এবং তারি ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় গ্রাম। বর্ষার সময় বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখতে পারলে চাষের সুবিধা—নইলেই

চা ও ব্যাঙ্ক
চা আজ সর্বত্রই অতি জনপ্রিয় পানীয় এবং সকল দেশের চা-পায়ীদের নিকটই ভারত ও পাকিস্তানের চা স্বকীয় উৎকর্ষের জন্য সমাদৃত। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চারা লাগানো হইতে বিদেশী বাজারে বিক্রি পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের চা শিল্পের সকল স্তরের সহিত গত ত্রিশ বছর যাবৎ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।
আর্থিক সাহায্য ও অভিজ্ঞ পরামর্শের জন্য চা বাগানের মালিক ও ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে পারেন।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

রূপ-রচনায়
মলয়া
স্নো, ক্রীম ও সেন্ট
নিত্য ব্যবহারে মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি করে
এস, আর, কেমিক্যাল
কলিকাতা - ৬

ICI

বিপাক। এই বিপাকেই কাটে ওখানকার চাষী-দের দিন, তাই অবস্থা তাঁদের বড়ই করুণ। মাটিতে ফসল যেমন কম হয়, গাছে ফলটল হয় তেমনি ছোট ছোট—এত ছোট বেল, আম এবং কাঁঠাল আর কোথাও দেখিনি। তবে এ সবের চেয়ে ক্যাঁদ, ভাজিয়া, ডুমুর, বেংগচ এই সব বন্য ফলেরই ওখানে প্রাধান্য। তরী-তরকারি দুর্লভ—মাছ পাওয়া যায় না, দুধত নেইই। বারো মাসই ডাল এবং পেঁয়াজ যুক্ত পোস্ত সম্বল। তবে ওখানকার শত্রু হল দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া—তার হাত থেকে স্নান করলে আর রক্ষা নেই, কিন্তু স্নান না করেও থাকেন না স্থানীয় অধিবাসীরা, তাই ঘরে ঘরে সবাই শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস হুহু করে জ্বরে কাঁপেন! ফলে খাদ্য দরকারও হয় না সব দিন! আর এই পটভূমিতে পড়াশোনা কতটা সম্ভব, সে ত বলারই নয়। তাই স্কুলে অর্ধেকের ওপর ছেলেও আসতো না বেশীর ভাগ দিন।

ম্যালেরিয়ার তাড়নায় পালিয়ে আসতে হল রামসাগর থেকে এবং তিন মাসের চাকরিতে যা উপার্জন হল, তার চেয়ে ঢের বেশীই খরচ হয়ে গেল, এই ব্যাধিকে দেহ থেকে বিতাড়িত করতে। তবু আগেই বলেছি, রামসাগর আমার ভালো লেগেছিল। স্টেশন থেকে পাকা পথ ধরে গাঁয়ের ভেতর আসতে পড়ে চমৎকার একটা সাঁকো—তার নীচে দিয়ে বইছে একটা নালা মতো। ডানদিকে বেশ বড় একটা আম বাগান, শিব মন্দির, দু-চারটে কোঠাবাড়ী ও অজস্র খোড়ো বাড়ী—মাঝখানে বেশ বড় একটা দীঘি। বাঁদিকে তেলীপাড়া, দোকান-পসার, পুকুর—তাতে অজস্র শালুক ফুটে রয়েছে। দেখলে চোখ জুড়োয়! রেল লাইন পেরিয়ে উল্টো দিকের গ্রামে গেলে আখের ক্ষেত, আলুর ক্ষেত, ভুট্টার ক্ষেত দেখা যায়। নামটা মনে আসছে না গ্রামের, কিন্তু সেখানে এক অবস্থাপন্ন ভদ্র-লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম—ডাল, ভাত, শাকের ঘণ্ট, একরাশ ডিমের বড়া এবং পোস্ত-যুক্ত আমড়ার টক। মাছ দিতে পারেননি বলে দুঃখ করেছিলেন এবং আর একবেলা থাকলে, খাসী খাওয়াতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়ে-ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তা আর খাওয়া হয়নি। জমিদার হাজরারা, যাঁদের স্কুল, এক-দিন খাইয়েছিলেন—আয়োজন সে-ও ঐ রকমই। তাঁদের পাচকও বলেছিলেন, মাছ কুথাকে পাবেন ধন? ধন সম্বোধনটি জোটে ওখানে বড়দের ভাগ্যেও!

ঠিক মনে নেই—বোধ হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রই বলেছিলেন, তাঁর শ্বশুরালয় রামসাগরে। তা যদি হয়, তাহলে বন্ধুবরের সঙ্গে এখন আর একবার এবং জীবনে শেষবার রামসাগর যেতে ইচ্ছা করে—কারণ তাঁর সঙ্গে স্বর্গ-নরক যে-কোন জায়গাতেই যে সানন্দে যাওয়া যায়, এ কে না জানেন? কিন্তু থাক এই পর্যন্তই। তারাশঙ্কর লিখেছেন পঞ্চগ্রাম, আমি দিলাম চার গ্রামের কাহিনী, এর যে-কোনটা নিয়েই আপনারাও লিখতে পারেন এক-একটা উপন্যাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভোজন বিলাস

(৩৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমসি প্রভৃতি বৎসরকালের জন্য যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়। এই খাদ্যগুলি বাংলার সাধারণ গৃহস্থঘরের খাদ্য—এগুলি ভোজনবিলাসীর উপভোগ্য নয়। এইগুলি ভক্তগৃহিণীদের স্নেহ-রসে অমৃতময়। গৌড়িয়াদের মধ্যে ভক্ত শিবানন্দ ধনী লোক ছিলেন—তিনি সমারোহ করিয়া একদিন প্রভুর জন্য ভোজন আয়োজন করিলেন। ভক্ত দুঃখিত হইবেন বলিয়া মহাপ্রভু ভোজন করিলেন বটে, কিন্তু "অতি গুরুভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন।" শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাস তাহা লক্ষ্য করিলেন।

> আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
> প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥
> দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ।
> সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥

ভক্তদের মধ্যে জগদানন্দ ছিলেন মধুর ভাবের সাধক। মধুরভাবের মধ্যে বাৎসল্য ভাবও নিগূঢ়িত আছে। জগদানন্দ মহাপ্রভুকে মায়ের মত সেবা করিতেন, সখার মত অবহেলাজ্ঞান মান করিতেন এবং মাতৃস্থানীয়ার মত লালন করিতেন। আবার প্রিয়ার মত অভিমান করিতেন। কাজেই জগদানন্দ পরিতৃপ্ত পরিবেশন করিলে মহাপ্রভুর আহার সংকোচের উপায় ছিল না। "না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।"

> পুনঃ পুনঃ পরিতৃপ্ত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
> ভয় কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥

এই সকল [illegible] ব্যাপারে আমরা [illegible] পাই। মানুষ চৈতন্যদেব ভক্তগণকে আদর করিয়া খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক উৎসবে তিনি নিজে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। আয়োজন কতটা আছে তিনি তাহার সন্ধানও রাখিতেন না—তাই "দুর্লভ অন্ন ভিক্ষা দেন এক পাতে।" উদ্দণ্ড কীর্তনের পরই সাধারণতঃ আহারের আয়োজন হইত বেশি বেশি।

> কীর্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়।
> তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥

মহাপ্রভু নিজে না খাইয়া ভক্তগণকে খাওয়াইয়া অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি খাইতে বসিয়া কেবলি বলিতেন—

> * * মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
> পিঠা পানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে॥

এইভাবে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের অলৌকিক প্রেমানন্দ লৌকিক ভোজনবিলাসকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হইত। আমাদের দেশে সকল মায়ের স্নেহই অভিব্যক্ত হয় নিজেদের হাতে পাককরা নানা ভোজ্যউপচারে সন্তানের তৃপ্তি সাধনে। নবদ্বীপে শচীমাতার রন্ধন বিষয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শচীমাতার কেবলি মনে হইত আমার হাতের রান্না না খাইয়া বাছা আমার কেমন করিয়া শরীর ধারণ করিতেছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—শচীমাতা নিমাই-এর প্রিয় সুখাদ্যগুলি প্রস্তুত করিয়া, প্রিয় ব্যঞ্জনগুলি রন্ধন করিয়া প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সমর্পণ করিতেন। এই চিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী।

শ্রীচৈতন্যদেবও যখন মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়াছেন—তখনি তাঁহার হাতের রান্না গরিব-ঘরের নিমবেগুন আর শাকসুক্তার কথাই বলিয়াছেন—পুরীধামের রাজভোগ তখন তাঁহার মুখে রুচে নাই। অদ্বৈতের গৃহে তাঁহার হাতের শেষ রান্না তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"আইজানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে। বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে।" বনের শাক মায়ের মনের গভীর মমতায় অমৃত হইয়া উঠিত। সেকথা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভু অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের কাছে ভাববিগ্রহ, কবিরাজ গোস্বামী দেহধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় যে দৈনিক আহার তাহারই বার বার উল্লেখ করিয়া আমাদের বুঝাইয়াছেন—তিনি রক্ত-মাংসের দেহধারী ভগবান ছিলেন। সেকথা ভুলিলে চলিবে না। সকলের সঙ্গে সুখ-দুঃখের অংশী হইয়া তিনি মানবলীলা করিয়া গিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

৮৩-া

অরুন্ধতী ঘোষ

বিস্ময়

প্রাণতোষ ঘটক

নিউ আলিপুর [illegible]

[illegible] করবী।

[illegible]

[illegible] হাটপুকুর, সবুজ [illegible] আরমেনিয়ান, রোড [illegible] হোমিওপ্যাথ [illegible] মন্দিরের [illegible] আসছে [illegible] গড়েছে।

ডক্টর সান্যাল কিন্তু [illegible] থাকতে উঠে পড়েছেন। [illegible] কোটিপতি [illegible] খাস ইংরেজ মিস্টার বেডফোর্ডের ম্যানশন। এই [illegible]তের মাঝে বিশাল প্রাঙ্গণের আবেষ্টনে ছোট্ট একটি কটেজ সবুজ রঙের—নাম যার 'এভারগ্রীন কটেজ'। প্রাঙ্গণের চতুঃসীমায় মেহেদীর সুউচ্চ [illegible] প্রাচীর—প্রায় মানুষ-প্রমাণ উঁচু। কটেজের [illegible] ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না রাস্তা থেকে। এভারগ্রীনের মালিক ডক্টর এস সান্যালের নাম লেখা আছে ফটকের গায়ে। ফটকের দু'পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। রাশি রাশি ফুল [illegible] আগুন-এর মত। ভিজে বাতাসে [illegible] লাল ফুল।

প্রথম মোরগ ডাকতে না ডাকতে, ভোর হতে না হতে, ডিভানের শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন ডাঃ সান্যাল। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে, দালান থেকে ভিজে ঘাসের [illegible]। খুশীর হাসি হাসলেন যেন আকাশে চোখ তুলে। কি দেখলেন কে জানে, হাসি-হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক ক্ষণ।

এভারগ্রীন কটেজের পাশে পাঁচিলভারের মত দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার বেডফোর্ডের আকাশ-চোঁয়া ম্যানশন। পায়রার খোপের মত শ' দুয়েক ফ্ল্যাট—মাস গেলে যা থেকে বেডফোর্ড হাজার চারেক টাকা ভাড়া পায়।

বেডফোর্ড ম্যানশনের [illegible] এক [illegible] থেকে কে যেন হাতের ইশারায় প্রাতঃকালীন শুভেচ্ছা জানালো। ডাঃ সান্যাল দেখলেন জানালার চতুষ্কোণ ফ্রেমে বন্দী, যেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনা লিজা। এক হাস্যময়ী, পাটকিলা রঙের জ্যাকেট, ফাঁপানো রুক্ষ চুল, ফর্সা ধবধবে হাত। এভারগ্রীনের আঙিনা থেকে সে অনেক দূরে, তাই যেন কিছু অস্পষ্ট।

টেক টি স্যর?

কটেজের এক খোলা দরজা থেকে কার [illegible] ভাঙা কথায় দিনের প্রথম দেখা হওয়ার সুখানুভূতি মিইয়ে গেল যেন। কপালে হাত ঠেকালেন ডাঃ সান্যাল। ঐ দূরভাষিণীকে যেন অভিবাদন জানালেন। অদ্ভুত এক চাপল্যে যেন নাচতে নাচতে ফিরলেন কটেজপানে। বললেন,—বেয়ারা, চা লে আও।

বারোমাসের মরসুমী ক্রিনিয়া আর পিটুনিয়া ফুলের সারি সারি গাছ, ডাঃ সান্যালের চলার শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠলো। এক ঝাঁক চড়াই হঠাৎ-ভয়ে উড়ে পালিয়ে গেল ভোরের আকাশে।

—এভরিথিং রেডি, স্যর।

আবার সেই ভাঙা-কাঁসরের মত কর্কশ কণ্ঠ ভাসলো।

—ফলটা লে আও।

ডাঃ সান্যাল কটেজের লাগোয়া এক লম্বা কাঁচঘরের সবুজ দরজার খুলে ভেতরে চলে গেলেন। বিজলী আলো জ্বললো কাঁচঘরে। এখন সূর্যের আলো মিলবে না সুপ্রচুর, তাই নকল আলো। ডাঃ সান্যালের ল্যাবরেটারী আছে এই কাঁচঘরে।

শ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই আর ডাক্তারের। স্বর্গ থেকে অপ্সরী কিন্নরীরা এসে ডাকাডাকি করলেও সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবে তারা। এখন থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত।

ল্যাবরেটারীর একদিকে যত রাজ্যের খাঁচা। পরে কাঁচের খাঁচা। লোহা আর কাঠের খাঁচা।

একটি খাঁচার সম্মুখে পৌঁছে হেঁট হয়ে পড়লেন। পরে কাঁচের খাঁচা। বাহির থেকে ভিতর দেখা যায় স্পষ্ট। ডাঃ সান্যাল খুঁটিয়ে দেখছেন খাঁচার অন্দর। দেখতে দেখতে মুখে যেন তাঁর ক্ষীণ বিস্ময়ের রেখা দেখা দেয়।

—ব্রেকফাস্ট, স্যর।

সেই কাঁসর-ভাঙা সুর। সেই কিম্ভূত-কিমাকার। ডাঃ সান্যালের পোষা বেয়ারা। তার হাতে একটি ট্রে। পিরিচ-পেয়ালা, কেৎলী আর একটি রেকাবীতে খান কয়েক টোস্ট।

হেঁট হয়ে দেখতে দেখতে মাথা তুলে সোজা হলেন ডাঃ সান্যাল। বললেন,—আমি তো খাবো, কিন্তু সামুয়েল তোমার বেং-আচড়াতো দেখছি কাল থেকে কিছুই খায়নি। ওয়াণ্ট অফ এপিটাইট নাকি? বেং-আচড়াকে তোমাদের শাস্ত্রে কি নাম দিয়েছে হে সামুয়েল?

—প্যাসেরিটা মিক্রোরিঙ্কস, স্যর।

কথা বলতে বলতে সামুয়েল হাতের ট্রে নামিয়ে রাখে এক টেবিলের 'পরে।

ক্ষণেক নির্নিমিখ [illegible] ডাঃ

সান্যাল। মনে মনে অভিধানের পাতা ওলটাতে থাকলেন যেন। সহাস্যে বললেন,—কুড়ির মধ্যে কুড়ি দিলাম তোমাকে, ফর ইওর কারেক্ট অ্যানসার! কিন্তু তোমার প্যাসেরিটা খায় না কেন কিছু?

স্যামুয়েল তার নিজের অবিন্যস্ত চুলে হাত চালাতে চালাতে বললে,—বেত-আঁচড়া ক্যান স্টার্ভ স্যর। ছ' মাহিনা না খেয়ে থাকতে পারে!

এক টুকরো পাঁউরুটি তুলে নিলেন ডাঃ সান্যাল। মুখে তুললেন। ডান হাতের সাহায্যে খুলে ফেললেন খাঁচার ঢাকা। পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে ঝুঁকে পড়লেন খাঁচার মধ্যে। বললেন,—স্যামুয়েল, তোমার বেত-আঁচড়া মরে যায়নি তো? নড়ছে চড়ছে না কেন?

ইট্ ইজ্ অ্যালাইভ্, স্যর।

স্যামুয়েল একটি লম্বা লাঠি তুলে দেয় মনিবের হাতে। বাঁশের লাঠির শীর্ষে বাঁধা আছে একখণ্ড চামড়া। ঝুলছে।

বাম হাতের আধ-খাওয়া পাঁউরুটি মুখে পুরে ফেললেন ডাঃ সান্যাল। দু'হাতে লাঠি ধ'রে কুণ্ডলী পাকানো বেত-আঁচড়াকে ঈষৎ খোঁচাতেই গ্রন্থি শিথিল ক'রলো সে। জিলাপির আকারে ছিল, বাঙলা '৪' সংখ্যার আকৃতি ধ'রলো। আদি আর অন্ত, অর্থাৎ মুখ আর লেজ যে কোথায় লুকানো, দেখা যায় না। বেত-আঁচড়ার গায়ে বেতাঘাতের মত লম্বা লম্বা দাগ। ল্যাবরেটরীর বিজলী আলোয় ঝিলিক তুললো তৈল-চিকন, কোমল মসৃণ আঁশ।

হাতের লাঠি দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে ডাঃ সান্যাল বললেন—বড় জোর ঠকিয়েছে হে স্যামুয়েল। আমি ভেবেছি, ইট্ ইজ্ নো মোর!

পরিহাসের হাসি হাসলো স্যামুয়েল। ময়লা আর অবিন্যস্ত, ছোট আর বড়, দাঁত দেখিয়ে দেখিয়ে হাসলো বিশ্রী শব্দে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ল্যাবরেটরী থেকে।

আর এক টুকরো টোস্ট তুললেন ডাঃ সান্যাল। আর একবার লক্ষ্য করলেন খাঁচাটি। বললেন, ইঁদুরটা যেমনকার তেমনি প'ড়ে রয়েছে! শুধু মেরেছে, মেরে রেখে দিয়েছে।

বেত-আঁচড়ার খাঁচায় বালুকাশয্যার 'পরে নেতিয়ে প'ড়ে আছে একটি দেশী ইঁদুর। মৃত্যুর ঠিক আগে হয়তো খুব লালা ঝরেছে মুখ থেকে। গতকাল ইঁদুরটির ইহলীলা শেষ হয়ে গেছে বেত-আঁচড়ার একটি মাত্র দংশনে। খাঁচার মধ্যে খাবার পড়তেই মারেনি। খানিকক্ষণ ঠকঠকিয়ে কেঁপেছে ভয়ার্ত ইঁদুর, তার শত্রুকে একই খাঁচায় দেখে। কয়েকটা লাফ দিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রেছে। ইঁদুরের এই বৃথা আস্ফালন দেখে মনে মনে হয়তো হেসেছিল বেত-আঁচড়া। তারপর মাত্র একবার ফণা তুলে সোজা ছোবল মেরেছিল ইঁদুরের ঠিক বুকের মধ্যখানে। দংশনের অব্যবহিত পরে ক'বার শুধু ঘন ঘন পা ছুঁড়েছিল বিষের জ্বালায় অধীর হয়ে। তারপর নেতিয়ে পড়লো, এখন যেমন নেতিয়ে আছে।

ল্যাবরেটরীর বাইরে আর কটেজের দালানে, সিঁড়িতে টবে-বন্দী পাম গাছের সবুজ শোভা। মরিসিয়ানা আর রোটান্ডিফোলিয়া পামের ঘন পাতার আড়ালে, কটেজের সিঁড়ির এক ধাপে, চুপিয়ে বসেছিল স্যামুয়েল। জান্তব মুখাকৃতিতে গোটা একটা পাঁউরুটি কামড়ে কামড়ে খায় আর মাঝে মাঝে চা-ভর্তি মগ মুখে তোলে।

ভিজে আর উড়ু উড়ু হাওয়ায় তার বড় বড় এলোমেলো চুল থরথর কাঁপতে থাকে। দাঁতে-কামড়ানো এক টুকরো রুটি ঘাস-আঙিনায় ছুঁড়লো স্যামুয়েল। একটি শীর্ণ ইউক্যালিপটাস গাছের শাখা থেকে নেমে এলো একটা কাক।

রোজ আসে ঐ কাক। একটুকরো রুটি ফেলে দিলেই ঠোঁটে তুলে নিয়ে উড়ে পালিয়ে যায় কোথায়। কাকের স্মৃতিশক্তি আছে কিনা তারই দৈনন্দিন পরীক্ষা দিয়ে যায় যেন!

স্যামুয়েল!

ল্যাবরেটরীর ভেতর থেকে ডাঃ সান্যালের কণ্ঠ শোনা যায়। তিনি তখন গ্যাসের উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে উনুন জ্বালছেন। উনুনের মুখে ঝুলছে টেস্ট-টিউব। নানাজাতীয় উগ্র রাসায়নিক। ল্যাবরেটরীতে অ্যান্টিভেনম তৈরী হয়—যার ফর্মুলা ডাঃ সান্যালের আবিষ্কার। সর্প-দংশনের ওষুধ, ডাঃ সান্যালস অ্যান্টিভেনমের নাম আসমুদ্রহিমাচল বিখ্যাত।

স্যামুয়েল সাড়া দেয় না। মুখের শেষ গ্রাস গলাধঃকরণ করছে। চায়ের শেষ চুমুক।

—স্যামুয়েল!

ল্যাবরেটরী থেকে জোরালো সুর ছেড়েও সাড়া পান না ডাঃ সান্যাল। স্যামুয়েল জানতো এ ডাকের কি অর্থ। কি হুকুম করবেন মনিব, তাও জানতো। সাত-সকালে কাঁচি হাতে নিয়ে সারা ফুলবাগান চষে ফেলতে হবে। বেছে বেছে তুলতে হবে সদ্য ফোটা তাজা তাজা ফুল।

স্যামুয়েল ভাবছিল, বুড়ো বয়সে ডাক্তারের প্রেম আবার চেগে উঠলো না কি! ভাবতেও হাসি পায় তার। ময়লা আর অবিন্যস্ত, ছোট আর বড়, দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে আপন মনে। চায়ের শূন্য মগ এক পাশে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো। ল্যাবরেটরীর দুয়োরে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলো,—স্যর, হিয়ার আই অ্যাম্।

ফুল তুলবে না স্যামুয়েল?

অসাধারণ সোহাগের সুর ফুটলো ডাঃ সান্যালের কথায়। কত যেন স্নেহ ফুটলো!

—ইয়েস স্যর।

হাতের টেস্ট টিউব উনুনের মুখে ঝুলিয়ে রেখে এগিয়ে আসেন ডাঃ সান্যাল। অসাধারণ ফিসফিসিয়ে বললেন,—এটা সেটা তুলে এনো না যেন। দেখে দেখে বেছে বেছে সবচেয়ে বেস্ট লট্ তুলবে।

—ইয়েস স্যর।

থামলেন না ডাঃ সান্যাল। ব'লে চললেন,—আইরিস ফ্লোরী ফুটেছে। ব্ল্যাকপ্রিন্স আর মন্টিকুন্টোর গাছে কুঁড়ি দেখেছি কাল না পরশু। ফেরারি কুইনও নিও কয়েকটা। জিনিয়া, গিলার্ডিয়া নিও এক আধ ডজন।

—অল্ রাইট স্যর।

ডাঃ সান্যাল বললেন,—বাসি আর পোকায়—কাটা ফুল দিও না স্যামুয়েল। একটা আচ্ছা তোড়া বানিয়ে দিয়ে এসো মিসেস্ চৌধুরীকে।

প্রেমের উপহার। মনে মনে আবার হাসলো স্যামুয়েল। তবু যদি না মাথার দু'পাশে, কানের কাছ বরাবর, চুলে পাক ধরতো! বয়সটা তবু যদি না পেরিয়ে যেতো পাঁচের কোঠায়! মুখে যদি না রেখা আর কুণ্ঠন ফুটতো তবু!

দাসখৎ লিখেছে স্যামুয়েল। মনিবের হুকুম অমান্য করলে চলবে না। ভিজে ঘাস মাড়িয়ে চললো। কাঁচি খুঁজে নিয়ে যেতে হবে এখন কুন্তিমুখরা মুলুণ্ডে। আইরিস ফ্লোরী, ব্ল্যাক-প্রিন্স আর মন্টিকুন্টো গোলাপের কত কাঁটা হাতে ফুটবে, তার ঠিক কি!

মিসেস চৌধুরী আর মিসেস চৌধুরী! শেষ বয়সে ডাক্তার শেষ পর্যন্ত যেন না মত্ত হয়ে ওঠে। স্যামুয়েল কি যেন গজরাতে গজরাতে চললো। মুখে তার বিরক্তির রেখা। সবে এক মগ চা খেয়েছে, এখন একটি সিগারেট না খেয়ে কি কোন কাজে হাত দেওয়া যায়! চলতে চলতে পরনের জামার পকেটে হাত পুরল স্যামুয়েল। গত রাতের আধ-খাওয়া আধ-পোড়া একটি সিগারেট হাতড়ে হাতড়ে বের ক'রলো। খাকির কোট। বোতাম আছে কি নেই। এখানে সেখানে জোড়া-তালি। ছিন্ন পকেট। তেলচিটে ময়লা।

মিসেস চৌধুরীও যেন ভেসে ওঠে স্যামুয়েলের ঘুম-জড়ানো চোখে। বেডফোর্ড ম্যানশনের দিকে একবার চোখ তুললো স্যামুয়েল। দেখলো, মিসেস চৌধুরীর জানলা, দেখলো কেউ নেই সেখানে। শুধু দেখা যায় ঘরের ভেতরে, কড়ি-কাঠ থেকে ঝুলছে বিজলী পাখা। পুরোদমে ঘুরছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিরহাস্যময়ী মোনা লিজাকে আর দেখতে পায় না স্যামুয়েল। প্যাটকিলা রঙের জর্জেট ফাঁপানো রুক্ষ চুল, ফর্সা ফর্সা হাত—সবকিছুই অদৃশ্য এখন। ডাক্তারের সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর প্রাত্যহিক দেখাশোনার প্রথম পালা চুকে গেছে।

বেস্ট অব দি লট্! বাসি আর পোকায় কাটা ফুল চলবে না, সাজেন্ট! তাজা ফুল চাই। আইরিস ফ্লোরী, ব্ল্যাকপ্রিন্স আর মন্টিকুন্টো গাছের কণ্টকাকীর্ণ শাখা পল্লবে কাঁচি চালাতে শুরু করলো স্যামুয়েল। মুখে তার একটি জ্বলন্ত সিগারেট—গত রাতের আধ খাওয়া আর আধ পোড়া। তাজা ফুলের সুগন্ধে মিশলো বাসি সিগারেটের উগ্র আঘ্রাণ।

গ্যাসের উনুনের মুখে টেস্ট টিউবের জলীয় পদার্থ বুদবুদ কাটছে ধীরে ধীরে। তা থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে সর্পিল গতিতে।

ডাঃ সান্যাল গুণে গুণে ক' ফোঁটা নাইট্রিক অব সিলভার আর ক' ফোঁটা কার্বলিক অ্যাসিড ঢাললেন উনুনের মুখের টেস্ট টিউবে। জল রঙ পলকের মধ্যে ফিকে নীলাভ হয়ে গেল। ছোট ছোট বুদবুদ কোথায় বিলীন হয়ে গেল।

অ্যান্টিভেনম তৈরীর ফর্মুলায় সময়ের ব্যবধান আর আগুনের উত্তাপের পরিমাপ রক্ষা না করলে চলে না। তাই হাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ডাঃ সান্যাল দেওয়াল ঘড়ির সময়জ্ঞাপক মুহূর্তের কাঁটার দিকে চোখ রেখেছেন মাঝে মাঝে। গ্যাস-উনুনের কল প্যাঁচ ঘুরিয়ে আগুনের উত্তাপ কখনও কম বেশী করেন।

ডাঃ সান্যালের চোখেমুখে যেন অস্বাভাবিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবরেজ ইঁদুর মরেছে, এমনি যেন মৃত্যুকালী তাঁর [illegible]। ঘড়ির পানে তাকিয়ে [illegible] হঠাৎ সারি সারি কাঁচের [illegible] এগোলেন ডাঃ সান্যাল। [illegible]

সরু তারের জালের খাঁচার সম্মুখে পৌঁছে

খাঁচার ছোট দরজা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিতে হয় বিনা দ্বিধায়। হাত বের করতেই দেখা যায় ডাক্তারের আস্তিন-গুটোনো হাতের মুঠোয় ধরা একটি সাদা খরগোস। যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমন প্রাণ-চঞ্চল। ছোট ছোট লাল চোখ ভয়ার্ত যেন। এখনও হয়তো ছোলা কাটছে দাঁতে। লাল সূক্ষ্ম ওষ্ঠ নড়াচড়া [illegible]ছে।

খরগোসের দেহের স্পন্দন উত্তাপ হাতে অনুভব করলেন ডাঃ সান্যাল। একটি কাচের খাঁচার ঢাকনি খুলে ভেতরে ফেলে দিলেন তাকে। তৎক্ষণাৎ বন্ধ করলেন খাঁচার ঢাকা। হেঁট হয়ে রইলেন খাঁচার ওপর।

এ খাঁচার ভেতরে বালির শয্যা। একটা চটা-ওঠা শ্যাওলা-ধরা বাটিতে সামান্য জল। দেয়ালার পাকচক্রে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় নাকি! খাঁচার ভেতরে একপাশে জটিলগ্রন্থির মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে কি এক জাতের সাপ। গত ক'দিন আগে এসেছে ডাক্তারের ল্যাবরেটরীতে। হুগলীর সপ্তগ্রাম অঞ্চল থেকে এসেছে। এক বেদে বিক্রি দিয়ে গেছে মাত্র আড়াইটি টাকায়। হাঁড়ির মধ্যে এসেছিল, এখন কাচের খাঁচায় আশ্রয় পেয়েছে। খাঁচার গায়ে ইংরাজীতে লেখা আছে : Naja Tripudians —Cobra.

খরগোসের চুণী-লাল চোখ প্রথমে দেখতে পায় না, কোথা থেকে ছোবল দিয়ে গেছে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

অনা[illegible] [illegible] খরগোসের [illegible] পড়েছে, [illegible] আর। খরগোসের পায়ের দুরন্ত যেন শিথিল হতে থাকলো। কাঁপুনির [illegible] যেন কমলো কিছু মাত্রায়।

ছোবল মেরেই নিজেকে গুটিয়ে নেয় নাজা ট্রিপুডিয়ানস্। বাংলা ৪ সংখ্যার মত দেহটাকে পাকিয়ে যায় আবার। বাদামী চোখের নিষ্পলক চাউনি, ল্যাবরেটরীর আলো-আঁধারে ঝিলিক তোলে যেন।

বিষ ঢালার সঙ্গে সঙ্গে সাপ নাকি নিজীব হয়ে পড়ে—এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে ডাঃ সান্যাল খাঁচাটির ঢাকা খুলে ফেললেন। একটি লম্বা ফরসেপের সাহায্যে মৃতপ্রায় খরগোসটিকে তুলে আনলেন টেবিলের 'পরে। এনামেলের ট্রেতে রাখলেন তাকে। সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে চললেন ফুটন্ত টেস্ট-টিউবের কাছে।

খরগোস তখনও ধড়ফড় করছে। সাদা ফেনা পড়ছে তার দুই কষ বেয়ে। চিৎ হয়ে পড়েছে বিষের জ্বালায়। পেছনের পা দুটো ছুঁড়ছে এক একবার। চুণী-লাল চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে এখনই। কপালের 'পরে এক বিন্দু রক্ত টলমল করছে। দংশনস্থান এতক্ষণে নজরে পড়লো ডাঃ সান্যালের। টেস্ট-টিউব থেকে দশ সি-সির মত জলীয় পদার্থ ভরে নিলেন সিরিঞ্জে।

মরার ওপর খাঁড়ার ঘা নয়, সিরিঞ্জের সূক্ষ্ম ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলেন ডাঃ সান্যাল। খরগোসের সম্মুখের দুই পায়ের গ্রন্থিতে। প্রায় বুকের কাছাকাছি। এপাশে পাঁচ সি-সি, ওপাশে পাঁচ সি-সি।

কি এক পণ করেছেন যেন ডাঃ সান্যাল। কালকেউটে ইয়ো মরেঙ্গো। কারা নাকি জোর গলায় শুনিয়ে দিয়ে গেছে ডাঃ সান্যালের অ্যান্টিভেনমে কালকেউটের দংশন থেকে মানুষকে বাঁচানো যায় না। হুগলীর সপ্তগ্রাম থেকে এসেছিল এক দল গ্রামবাসী। তারাই অভিযোগ জানিয়ে গেছে সদম্ভে।

তাই কালকেউটে আনিয়েছেন ডাঃ সান্যাল। ওষুধ তৈরী করছেন অন্য এক জোরালো ফর্মুলায়। ওষুধ পরীক্ষার জন্য মানুষ তো মিলবে না হাতের কাছে। তাই নিরীহ খরগোসকে প্রথমে পরীক্ষার্থী বানিয়ে নিয়েছেন। ওষুধে কাজ হয় কি না তারই পরীক্ষা চলছে। সর্পবিষ নিবারণের অমোঘ ওষুধ ডাঃ সান্যালস্ অ্যান্টিভেনমে কড় তীক্ষ্ম বিষধর গোখরো, শঙ্খচূড় হার মেনেছে। কালকেউটের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে না কি! কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন ডাক্তার। গত কয়েক দিনে কয়েকটা খরগোস আর ইঁদুরের জীবনান্ত হয়েছে ঐ কেউটের দংশনে। তাদের রক্ষা করতে পারা যায়নি জোরালো ওষুধেও। আজ আবার পরীক্ষায় মেতে উঠেছেন ডাঃ সান্যাল। আজ আর কোন মতে মরতে দেবেন না খরগোসকে। বাঁচিয়ে তুলবেন তাকে, যেন তেন প্রকারেণ।

—বেস্ট অব দি লট স্যর! চোজেন বেস্ট!

স্যামুয়েল?

ইয়েস স্যর। ফ্রেশ ফ্রম দি গার্ডেন।

বিষের বেগ লক্ষ্য করছিলেন ডাঃ সান্যাল। নিবিষ্টচিত্তে। ফিরে তাকালেন। স্যামুয়েলের হাতে ফুলের তোড়া দেখে খুশীর মৃদু হাসি হেসে বললেন,—প্লিজ গো টু মিসেস চৌধুরী। টেল মাই নেম, অ্যান্ড হ্যান্ড ইট টু হার।

থ্যাঙ্কউ স্যর।

প্রেতাত্মার মত নিঃশব্দে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে যায় স্যামুয়েল। টাটকা গোলাপের সুগন্ধ ভাসিয়ে দিয়ে যায় ল্যাবরেটরীতে। কার্বলিক অ্যাসিডের উগ্র গন্ধের সঙ্গে গোলাপের মিষ্ট গন্ধ মিশে যায়।

বিষের বেগ লক্ষ্য করছিলেন ডাঃ সান্যাল। সাপের বিষের বেগ না কি সপ্ত প্রকার। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—বিষ শরীরে প্রবেশ করলে ক্রমে ক্রমে এই সপ্তধাতুকে দূষিত করে।

চোখের পাতায় আকাশ মেখলো ভোরে
যখনি সে চেয়ে দেখেছে পাহাড় পেরোনো
সুর-গঙ্গার গভীরতা বুকে নিয়ে,
তার দিকে চেয়ে ভুলে গেছি ভাষা
পলক পড়েনি চোখে,
এরি নাম ভালবাসা।

সারা সংসার সুরভিত তার
আঁটিকুলে গাঁথা মালায়
সে যেন উমার শঙ্খ-বলয়ে আত্মা অন্নপূর্ণারূপিণী
অন্ধকারে স্থির বিদ্যুৎ শিখা যেন।
মনকে জানায় সে যেন প্রেমের সাধনা
মানুষকে বলে শিব হও!

দু'চোখে গভীর দূরদৃষ্টির মায়া
শুধু ঘরে নয় সহজ উদার পৃথিবীর পথে পথে
অজস্র ফুল ফোটায় মায়া ভোলায়।
ঘরে কি বাইরে কাজের লাবনি ঝরে
তার সোনা ঘামে
আঙুলে বিশ্ববিমোহন তার সেবা
লক্ষ্মী আমার অনন্য সহচরী।

দুঃখের ঝড় যখনি নিবোতে আলো
তার হাতে রাঙা-প্রদীপের শিখা জ্বলেছে
পায়ে পুণ্য ছোঁয়া লেগে বড়
সেঁউতি হয়েছে সোনা।
নিবিড় বাসনা সে যেন আমার
দেবদারুবনচারিণী
চকিতা সে আজো কৃষ্ণচূড়ার আভাসে।

সে যখন চায় কুঁড়ি ফুটে ওঠে
রোপণে ওঠে কচি পাতা
শ্যামকল্পদ্রুমে মাধবী জড়ায় পিয়ালে।

ডাঃ সান্যাল দেখলেন, খরগোসটি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তার দেহের সন্ধি-সমূহ বিশ্লিষ্ট হতে চলেছে। মুখ থেকে লালাস্রাব ঝরছে। চুণী-লাল চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। দংশন স্থানের রক্তবিন্দু লাল নয়, যেন কৃষ্ণবর্ণ। ক্ষতস্থানে কয়েক ফোটা উগ্র রাসায়নিক ঢালতে থাকেন ডাক্তার। কিন্তু ক্রমেই যেন বজ্রাহতের মত শিথিলাঙ্গ আর অচেতন হয়ে পড়ছে খরগোস। তার কটি, পৃষ্ঠ আর গ্রীবা যেন ভেঙে গেছে। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ তুললেন ডাক্তার। ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দিকে। যন্ত্র আর সরঞ্জামের ট্রে থেকে একটি ক্ষুরধার ছুরি আর ফরসেপ তুলে নিলেন। খরগোসের দেহ সজোরে চেপে ধরলেন ফরসেপের চাপে। তারপর ক্ষতস্থানের চতুর্দিক চিরে ফেললেন ধারালো ছুরি চালিয়ে চালিয়ে। কালচে-লাল রক্তধারা গড়িয়ে পড়লো খরগোসের মাথা থেকে।

(এইবার পর ২২০ পৃষ্ঠায়)

আনন্দ আর আত্মমর্যাদায় গর্বিতা

বেশ বিন্যাসে

শ্রীমতী বেলা দে

নারীর রূপ কি জীবনের পক্ষে সত্যিই প্রয়োজনীয়? এ প্রশ্ন কবে থেকে সুরু হয়েছে জানিনা—তবে নারী-বিদ্বেষী আর হিতৈষীর দ্বন্দ্বমাতন চলে আসছে চিরদিনই। বিদ্বেষীদের নজির ঠিকই আছে—তাঁরা বলছেন জীবনে নারীর রূপের প্রয়োজন নেই বরং নারীর রূপ গভীর চিন্তাধারার পক্ষে অন্তরায়। মেয়েরা তাদের গৃহকোণে বসে রূপচর্চা করুন তাতে ক্ষতি নেই বরং কর্মক্লান্ত পুরুষের তাতে খানিকটা চিত্তবিনোদন হবে। হিতৈষীর দল কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে এড়িয়ে যেতে কিছুতেই রাজি নন। তাঁদের মতে নারীর রূপ জীবনের অনেকখানি। শুধু অবসরবিনোদনই নয়—নারীর রূপ জীবনকে রূপে, রঙে, রসে অভিষিক্ত করে তোলে। তাই বিদ্বেষীদের বাদ দিয়ে শারদীয়া সংখ্যার এই পাতাটি আমার হিতৈষীদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ এমন একটি অধ্যায় এসেছে যেখানে আমরা ঠিকরে পড়েছি, যেখানে জীবনের মান গেছে অর্থনৈতিক চাপে তলিয়ে। জীবন সংগ্রামের টানাপোড়েনে জীবনের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য দুটিই গেছে নষ্ট হয়ে, আজ তাই মেয়েদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই হারানো স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা—আমরাই যুগে যুগে সে কাজ করেছি। আমরা রামায়ণের কথা শুনিয়েছি ভবিষ্যৎ বংশধরদের; কাঁথায় করেছি নানা রকমের নক্সা, মেঝেতে আর সিঁড়িতে আলপনা দিয়ে গৃহের সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্য রেখেছি অটুট। কেয়ূরে কঙ্কনে সেজেছি, ঠোঁটে দিয়েছি রঞ্জনীর আভাস, পায়ে আলতা দিয়ে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত গৃহকোণের সাম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছি, আমাদের এই রূপচর্চা কি সত্যিই কোনো কাজে আসেনি? কি উত্তর দেবেন বিদ্বেষীরা? উত্তর তাঁরা যাই-ই দিন, কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে শুধু পশুর মত ভোজনপান আর নিদ্রাই জীবনের সর্বস্ব নয়। তার সঙ্গে দরকার সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলা। আমরা মেয়েরা জাগিয়ে তুলেছি সেই সৌন্দর্যবোধ। এতে দোষেরই বা কি আছে? প্রদীপের সল্তে যদি ভালো করে কাটা না হয় সে যেমন ভালো আলো দেয় না, নারীর দেহও তেমনি। রূপচর্চা বা বেশবিন্যাস না করলে তার রূপ থাকলেও নিষ্প্রভ হবে। ঘর তো সে আলো করতে পারবে না। মাতা, পত্নী আর প্রিয়া মেয়েদের এই তিনটি রূপ। মা হিসেবে মেয়েরা সন্তান প্রসব করে। পত্নী করেন সাংসারিক কাজ। আর প্রিয়া হিসেবে [illegible] এইখানেই রূপের প্রয়োজন। কিন্তু যে [illegible] করছেন, লোকের [illegible] তার উদ্দেশ্য নয়। [illegible] তিনি ভালবাসেন। [illegible] রেখা বা [illegible] যে কোনো নারী শুধু তার গহনায় নিজেকে [illegible] সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না। সৌন্দর্য নির্ভর করে

[illegible], কানবালা আর নেকলেসে বেশ মানিয়েছে

আধুনিকার হাতে প্রাচীনার (রতনচূড়সহ) অলঙ্কার

কেশবিন্যাসে

শ্রীমতী বেলা দে

নারীর রূপ কি জীবনের পক্ষে সত্যিই প্রয়োজনীয়? এ প্রশ্ন কবে থেকে সুরু হয়েছে জানিনা—তবে নারী-বিদ্বেষী আর হিতৈষীর খণ্ডনমণ্ডন চলে আসছে চিরদিনই। বিদ্বেষীদের নজির ঠিকই আছে তাঁরা বলছেন জীবনে নারীর রূপের প্রয়োজন নেই বরং নারীর রূপ গভীর চিন্তাধারার পক্ষে অন্তরায়। মেয়েরা তাঁদের গৃহকোণে বসে রূপচর্চা করুন তাতে ক্ষতি নেই বরং কর্মক্লান্ত পুরুষের তাতে খানিকটা চিত্তবিনোদন হবে। হিতৈষীর দল কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে এড়িয়ে যেতে কিছুতেই রাজি নন। তাঁদের মতে নারীর রূপ জীবনের অনেকখানি। শুধু অবসরবিনোদনই নয়—নারীর রূপ জীবনকে রূপে, রঙে, রসে অভিষিক্ত করে তোলে। তাই হিতৈষীদের দাবি দিয়ে শারদীয়া সংখ্যার এই পাতাটি আমার হিতৈষীদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ এমন একটি অধ্যায় এসেছে যেখানে আমরা ঠিকরে পড়েছি, যেখানে জীবনের মান গেছে অর্থনৈতিক চাপে তলিয়ে। জীবন সংগ্রামের টানাপোড়েনে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আর সৌন্দর্য দুই-ই গেছে নষ্ট হয়ে। আজ তাই মেয়েদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই হারানো স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা—আমরাই যুগে যুগে সে কাজ করেছি। আমরা রামায়ণের কথা শুনিয়েছি ভবিষ্যৎ বংশধরদের; কাঁথায় করেছি নানা রকমের নক্সা, মেঝেতে আর সিঁড়িতে আলপনা দিয়ে গৃহের সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্য রেখেছি অটুট। কেয়ূরে কঙ্কনে সেজেছি, ঠোঁটে দিয়েছি রঞ্জনীর আভাস, পায়ে আলতা দিয়ে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত গৃহকোণের সাম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছি। আমাদের এই রূপচর্চা কি সত্যিই কোনো কাজে আসেনি? কি উত্তর দেবেন বিদ্বেষীরা? উত্তর তাঁরা যাই ই দিন, কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে শুধু পশুর মত ভোজনপান আর নিদ্রাই জীবনের সর্বস্ব নয়। তার সঙ্গে দরকার সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলা। আমরা মেয়েরা জাগিয়ে তুলেছি সেই সৌন্দর্যবোধ। এতে দোষটাই বা কি আছে? প্রদীপের সলতে যদি ভালো করে কাটা না হয় সে যেমন ভালো আলো দেয় না নারীর দেহও তেমনি। রূপচর্চা বা বেশবিন্যাস না করলে তার রূপ থাকবে নিষ্প্রভ হয়ে। ঘর দেবে সে আলো কোথা থেকে? [illegible] মাতা, পত্নী আর প্রিয়া মেয়েদের এই তিনটি রূপ। মা হিসেবে ছেলের [illegible] [illegible]

আনন্দ আর আত্মমর্যাদায় গর্বিতা

[illegible], কানবালা আর নেকলেসে বেশ মানিয়েছে

আধুনিকার হাতে প্রাচীনার (রতনচুড়সহ) অলঙ্কার

প্রাচীন ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম, এস-সি.

প্রাচীন ভারতের পুলিশী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিতে গেলেই সর্বপ্রথম মনে পড়ে হিন্দু যুগের কথা। কারণ হিন্দু যুগেই প্রাচীন ভারতীয় পুলিশী ব্যবস্থার এক সর্বাঙ্গীণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে পুলিশী ব্যবস্থার দুইটি বিভাগ ছিল। এই দুইটি বিভাগকে যথাক্রমে নগর-পুলিশ বিভাগ এবং গ্রাম্য পুলিশ বিভাগ নামে অভিহিত করা হইত। গ্রাম্য পুলিশ বিভাগের অধিনায়কত্ব করিতেন গ্রাম্য প্রধান ও তাঁহার অনুচরবর্গ এবং নগর পুলিশ বিভাগের ভার অর্পিত ছিল একজন বিশেষ কর্মচারী ও তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের উপর। এই সকল কর্মচারী সাধারণ ভাবেই শান্তি রক্ষা কার্য করিয়া আসিয়াছেন। সাধারণতঃ ইঁহারা অপরাধীদিগকে পাকড়াও করিয়া যথাক্রমে গ্রাম্য প্রধান এবং নগর পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত বিশেষ কর্মচারীর নিকট বিচারার্থে চালান দিয়া থাকিতেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধে অপরাধীর বিচার উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা না করিয়া রাজ্যের রাজার নিকট প্রেরণ করিয়া থাকিতেন এইরূপ কথা জানা যায়। ইহাও কথিত আছে যে, ঐ সময় একদল দস্যুর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হইলে কোন-এক গ্রাম্য প্রধান নিজে তাহাদের বিচার না করিয়া বিচারার্থে তাহাদের ঐ রাজ্যের রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের কয়েকটি স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ঐ সকল গণতান্ত্রিক রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি রাজ্যে এক চমৎকার শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঐ শাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দ কোনও অপরাধী সত্য সত্যই অপরাধ করিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য উক্ত অপরাধের সাক্ষীদিগের নিকট হইতে যেমন বিবৃতি লইতেন সেইরূপ অপরাধীর নিকট হইতেও এক বিবৃতি গ্রহণ করিতেন। পরে যদি তাঁহারা বুঝিতেন যে, অপরাধী সত্য সত্যই নির্দোষ তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অপরাধী ব্যক্তিটিকে মুক্তি দিতেন। কিন্তু তদন্তে যদি তাঁহারা বুঝিতেন যে সেই ব্যক্তি দোষী তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরা অপরাধী ব্যক্তিটির বিচার না করিয়া একদল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আইন-কানুনে অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট বিষয়টি পেশ করিতেন। আবার ঐ সকল রাজকর্মচারী বিষয়বস্তু পর্যালোচনাপূর্বক যদি বুঝিতেন যে অপরাধী ব্যক্তির কোন দোষ নাই, তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতেন নতুবা তাহারা উক্ত অপরাধী ব্যক্তিকে সাতজন প্রধানের এক সংসদের (Court) নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিতেন। এই সংসদও অপরাধীকে নির্দোষ বুঝিলে মুক্তি দিতেন নচেৎ বিষয়টি প্রধানতঃ রাজ্যের উপরাজা এবং পরে রাজার নিকট পেশ করিতেন। এরপর ঐ রাজা তাহাকে দোষী বুঝিলে তৎকালীন প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুসারে এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া লঘু বা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন।

এইরূপ শাসন ব্যবস্থার সহিত বর্তমানের থানা, পুলিশ, নিম্ন আদালত, কিংবা উচ্চ বা দায়রা আদালতের বিচার ব্যবস্থার সামঞ্জস্য আছে। প্রাচীন তথ্য হইতে একথাও জানা যায় যে, তৎকালের এইরূপ বিচার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আইন কানুন মতেই সম্পন্ন হইত।

খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের আমলে রাজধানী পাটলীপুত্রের পুলিশ প্রধানকে নগরক নামে অভিহিত করা হইত। কবি কালিদাসের শকুন্তলা এবং মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে জানা যায় যে, শহরের পুলিশ প্রধানের নাম নগরিকা এবং তাঁহার অধীনস্থ সাধারণ রক্ষীরা রক্ষিণ নামে পরিচিত। যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে ইহাই ধারণা হয় যে, মৌর্য পুলিশের উপর নগর এবং উহার শান্তি রক্ষার ভার তো অর্পিত ছিলই, তাহা ছাড়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা পুলিশের ন্যায় তাঁহাদের নগরের স্বাস্থ্য রক্ষা, উহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কীয় (Conservency) ব্যবস্থাও সম্পন্ন করিতে হইয়াছে।

এই মৌর্য আমলের পুলিশের বিবিধ করণীয় কার্যের এক বিস্তৃত বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। সাধারণ কাজগুলি ছাড়াও পুলিশকে যে আরও দুই একটি কাজ করণীয় হিসাবে সমাধা করিতে হইয়াছিল তাহা যথাক্রমে,—

(১) অগ্নি সম্পর্কীয় বিধিনিষেধ যেন কেহ অমান্য না করে।

(২) সূর্যাস্তের দুইঘণ্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্বের মধ্যবর্তীকালে কেহ প্রদীপ ব্যতীত পথ চলাচল না করে।

(৩) মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়া যদৃচ্ছ নিবারিত হয়।

(৪) বিভিন্ন বেশে আত্মগোপন করিয়া অপরাধপ্রবণ বা অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা বা রাজকীয় কার্য উদ্দেশ্য গুপ্তভাবে সাধন করা।

(৫) সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে অপরাধের সময়ে বা উহার পূর্বে ধৃত করা।

(৬) আয় অপেক্ষা কেহ ব্যয় বেশী করে কিনা তাহা দেখা ইত্যাদি।

ঐ যুগের পুলিশ বা রক্ষিগণ যে এক প্রকার উর্দী পরিধান করিতেন এবং সকলেই একই ধরণের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন তাহা Rhea David-এর প্রবন্ধ কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি Vol—I. পৃষ্ঠা ১৭৮ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়।

মৌর্য যুগের গ্রাম্য পুলিশের অস্তিত্বেরও বহু নজীর পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রাম্য পুলিশ শুধুমাত্র সারা রাত্রি গ্রাম্য পাহারাতেই যে নিযুক্ত ছিল তাহা নহে, পরন্তু তাহারা গ্রামে নবাগতদিগের আগমন ও প্রত্যাবর্তন বা সন্দেহমান ব্যক্তিদিগের আগমন সম্বন্ধে গ্রাম-প্রধানকে সংবাদ প্রদান কার্যেও নিরত থাকিত। ঐ সকল গ্রাম্য চৌকিদার বা পাহারাদার তাহাদের কার্যের পারিশ্রমিক হিসাবে আপনারাই গ্রামবাসী-দিগের নিকট হইতে অর্থ, শস্য ইত্যাদি আদায় করিয়া লইত। ইহাতে তাহাদের পক্ষে প্রতিটি গ্রামবাসীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটিত এবং কেবলমাত্র এই জন্যই গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাহারা অনেক কিছুই অবহিত হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত সম্রাট স্বয়ং তাঁহার খাস বিভাগের অধীনে এক বিরাট গুপ্তচর বাহিনী পোষণ করিতেন। ঐ গুপ্তচরগণ গোয়েন্দা পুলিশ হিসাবেও বহু রাজকীয় কার্য সম্পন্ন করিত বলিয়া মনে হয়। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন হিন্দুরাজাগণ রাজ্য শাসন এবং উহা রক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাদের গুপ্তচর বিভাগের উপর অধিক প্রাধান্য দিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ইতিহাস সমূহ যাজ্ঞবল্ক্য, হিন্দু-সংহিতা, পুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। এমন কি অথর্ব বেদের সর্গ অধ্যায় ২৬-৩৫ এই সম্পর্কে একটি চমৎকার শ্লোক আছে যাহা উল্লেখ করিলে এইরূপ প্রতীয়মান [illegible] [illegible] [illegible] হইতে কিছুটা [illegible] পারিলাম।

মৌর্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] কর্তৃক [illegible] হইয়াছে।

[illegible] রাজকীয় [illegible] বিভাগ [illegible] ছিল, যথা—(১) [illegible] (২) [illegible] শাখা রাজনৈতিক অপরাধীদিগের এবং [illegible] শাখা সাধারণ অপরাধীদিগের [illegible] নিযুক্ত থাকিত। সমাজ [illegible] একটি [illegible] বিভাগ উল্লেখ-যোগ্য ছিল। এই [illegible] হইত

বলদেব রায়

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

ভেবেছিলেন। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবেননি। সেইটেই আরও ভয়ানক। প্রয়োজনের দিক দিয়েই মানুষের কাছে মানুষের প্রয়োজন। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে লোকে অবলীলাক্রমে বলুদাদের ঠিকানা ভুলে যায়!

অবশেষে বহু চেষ্টার পর বলুদার ঠিকানা পেলাম। বেহালায় নয়, টালিগঞ্জে নয়, দমদমেও নয়,—চেৎলার একটা নিভৃত অংশে থাকেন তিনি। একতলা, টিনের চাল, দুকুঠুরী একটা বাড়ি, সেইখানে। ক'টি ছেলে কোথায় কি একটা কারখানায় কাজ করে, তারাই কি করে তাঁর কাছে আটকে রয়েছে। সেখানেই থাকে এবং তাঁর দেখাশোনা করে।

অনেক গলি ঘুরে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর কাছে যখন পৌঁছুলাম, এখনও বাইরে অল্প দিনের আলো আছে, কিন্তু সেই নিচু চালার ভিতরটায় অন্ধকার নেমে এসেছে।

একটি ছেলে তাঁর বিছানার কাছে আমার বসবার জন্যে একটা মোড়া দিলে। আর জানালার উপরে রাখলে একটা হারিকেন।

আমাকে দেখেই বলুদা চিনতে পারলেন। উৎসাহের আধিক্যে উঠে বসতেই যাচ্ছিলেন বোধ হয়, কিন্তু দুর্বলতার জন্যে পারলেন না।

বললেন, এই যে! এসে গেছ! বেশ বেশ!

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

—ভালো। ভালো।—ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন।

যে ছেলেটি আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল, সে আড়ালে মাথা নাড়লে। অর্থাৎ ভালো কিছুই নয়।

ভালো যে নয় তা আমিও বুঝেছিলাম। দেহ বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। বুকের ওঠা-নামাতে বোঝা যায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। গাল ভেঙে গেছে। শুধু চোখ দুটো কোটরের মধ্যে থেকেও জ্বলছে। রোগের যন্ত্রণা একটা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু হাসি দেখলে তা মনেই হয় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এমন একটা হতভাগা জায়গা খুঁজে পেলেন কি করে?

হাসির দমকে বলুদার সমস্ত দেহটা নড়ে উঠল। বললেন, আমিই তো সেই কথাটা তোমাকে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম।

বললাম, আমি খুঁজে পেলাম প্রাণের দায়ে। আপনার তো তেমন কোন দায় পড়েনি।

কেন হে! জায়গাটা মন্দ কি! অন্ততঃ সেই লিলুয়ার বাগানবাড়ির চেয়ে তো ভালো। এর তো একটা সদর আছে। তার আবার জানালা টপকে যাতায়াত। সাপ অবশ্য এখানেও আছে, সেখানেও ছিল।

চমকে উঠলাম: সাপও আছে না কি!

—থাকবে না? ওদেরও তো একটা থাকবার জায়গা চাই হে! না পৃথিবী জুড়ে তোমরাই শুধু থাকবে, আর কেউ থাকবে না? এও এক রকমের সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধি!

বলুদা হাসতে লাগলেন। তারপরে ছেলেটির দিকে চেয়ে বললেন, ওরে, সেই ভালো চা অমৃতকে একটু খাইয়ে দিবি, না হাঁ করে দাঁড়িয়েই থাকবি?

ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললাম, না, না। আমি চা খাব না বলুদা।

—তা বললে আমি ছাড়ব কেন? যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এমুখো না আস তার ব্যবস্থা করতে হবে না?

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এমনই চা!

—নিশ্চয়। নাম দিয়েছি 'তৃষ্ণাহরণ চা'। এক পেয়ালা খেলে তিন-চার দিনের মধ্যে চায়ের তৃষ্ণা পাবে না। আন দামোদর, এক মগ চা। টুঁটি টিপে ঢেলে দাও ওর গলায়।

এবারে আসল কথাটা পাড়লাম।

বললাম, এখানে তো থাকা চলবে না বলুদা। কাল আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—কোথায়?

– হাসপাতালে।

—কেন?

—চিকিৎসার জন্যে, পথ্যের জন্যে, শুশ্রূষার জন্যে। এখানে থাকলে আপনি বাঁচবেন না।

বলুদার মুখের উপর একটা পাংলা ছায়া ঘনিয়ে এল। বললেন, কে বাঁচতে চায়? আমি বলি কি, মরবার পক্ষে এ জায়গাটাই বা মন্দ কি!

—মরবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট জায়গা! বলতে পারেন, এখানে একমাস থাকলে বাঁচবার ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমরা আপনাকে এখনই মরতে দিতে চাই না।

—কেন? আমাদের প্রয়োজন তো কবে শেষ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি মধ্যভারতের সেই জঙ্গলেই আমার মরা উচিত ছিল। কিম্বা লিলুয়ার সেই বাগানবাড়িতে। মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে এতদিন বেঁচে থাকাটাই ভুল হয়ে গেছে।

বলুদা মাথা নাড়লেন। বললেন, না ভাই, এখান থেকে আমি কোথাও যাচ্ছি না।

গেলেনও না। কিছুতেই নিয়ে যাওয়া গেল না। মৃত্যুর সঙ্গে মাসখানেক যুদ্ধ করার পর আমাদের হার হল। বলুদা দেহখানাকে সেইখানেই রেখে চলে গেলেন।

শোক করিনে। কেনই বা করব? এ সংসারে কে কাকে ধরে রাখতে পারে? কিন্তু সেই দিন চোখের কোণে একটুখানি জল জমে-ছিল বুঝি। বুকের ভিতরটা কেমন যেন একবার মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে হঠাৎ বলুদা কেমন অস্থির হয়ে উঠলেন। বিকারের ঘোরে কিনা জানিনে, সরু সরু লম্বা আঙুল দিয়ে বিছানায় কি যেন খুঁজতে লাগলেন। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না।

কি যেন বিড় বিড় করে বললেন। মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনলাম, বলছেন, আমার সেই রিভলবারটা? হারিয়ে গেল না কি?

জবাব দিতে পারলাম না। কে জবাব দেবে? চিনুদা তো আগেই চলে গেছেন। অনেক আগেই চলে গেছেন।

জীবন দর্শন

(৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সুরদেবের একগাছি চুলও স্থানভ্রষ্ট হলো না।

এমন কি রাত্রে কড়া রকমের একটা অনিদ্রাও হলো না। বুকের মধ্যে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে কিনা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ঘুম ভাঙলো স্পষ্ট সকালে।

তারপর?

তারপর শুধুই স্পষ্ট প্রখরতা!

বিছানা থেকে উঠে এসে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো সুরদেব।

আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। বয়ে যাচ্ছে প্রাণের প্রবাহ। এরই মাঝখানে বসে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছিলো সে? সে কি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো অন্ধকারের নেশায়?

নইলে মনে হচ্ছে কেন যুগ যুগান্তের বাসে এমন আলো দেখেনি সুরদেব!...

টেবিলের উপর বসানো রয়েছে নিজেরই বাঁধানো ফটো একটা। ওই তো মুখ সুরদেবের! মুখের প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় প্রচ্ছন্ন অহংকার! ঈষৎ বাঁকানো ঠোঁটের কোণে যেন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। এর মধ্যে কোথায় লুকোনো ছিল এতো দুর্বলতা!

* * *

বলদেবের ওপর রাগ নয়, যতীন সমাদ্দারের উপর ঘৃণা নয়, নিজের উপরেই ভারী করুণা হলো সুরদেবের।

করুণা হলো জীবজগতের উপর।

এই আলোর বন্যার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুরদেব যেন নতুন করে আবিষ্কার করলো মানুষের সমস্ত দুর্বলতার মূল কোথায়?

এই [illegible] তারই, তাই [illegible] আছে মানুষ!

* * *

নমিতার বিয়ের চিঠি পাবার পর একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলো, বলদেবের [illegible] মিথ্যা হলে পুলিশ কেস করবে [illegible] সকল দুর্বলতার [illegible] যতীন সমাদ্দারকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে [illegible]। আর নয় তাকে—'

উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের এই চলমান জীবনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন একটা উদারতায় উদাস হয়ে গেলো মনটা।

কী লাভ?

মানুষ তো এই রকমই।

কাল্পনিক মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়েও জীবনকে যেন দূরে থেকে দেখতে শিখেছে সুরদেব। শিখেছে—যেখান থেকে বিনা প্রতিবাদে মুহূর্তে বিদায় নিতে হয়, সেখানে ছোট ছোট অসহিষ্ণুতায় বাদ প্রতিবাদ করাটা অর্থহীন।

ইচ্ছে করলেই তো ক্ষমা করা যায়, বলদেবকে যতীন সমাদ্দারকে, আর—আর নমিতাকেও।

সুরদেব তো রইলো!... রইলো অফুরন্ত পৃথিবী। যে পৃথিবী কোটিকল্পকাল ধরে সীমাহীন ক্ষতের ক্ষয় সহ্য করেও এমন অম্লান হাসি হাসতে পারছে!

অমিয় কুমার তরফদার

দাঁড়িয়েছিল প্রতিবেশীরাই। মাসে মাসে চাঁদা তুলে তাকে অর্থসাহায্য করেছে, চ্যারিটি থিয়েটার করিয়েছে, সেবা-সমিতি থেকে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল দিয়েছে। তাঁর তয়ের করা আচার, আমসত্ত্ব, বড়ি পাড়ার ছেলেরা বাজারে বিক্রী করে দিয়েছে। তাঁর সেলাইকরা কাঁথা পাড়ার মেয়েরা কিনেছেন। ছেলেদের স্কুলে ফ্রী করাতে হবে, ক্লাসে পড়ার বই যোগাড় করতে হবে, ওষুধ-পথ্য কিনতে হবে, সব করেছে পাড়ার দশজনে। জন্ম জন্ম ঋণী তিনি পাড়ার লোকের কাছে। এঁরা না থাকলে তিনি ভেসে যেতেন! মণির আদালতের চাকরিটা পাড়ার অপূর্ববাবুই জজ-সাহেবকে ধরে করিয়ে দিয়েছিলেন। এই সেদিনও পটলা যে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের চাকরিটা পেল, সে কি পাড়ার দশজনে গিয়ে উপরে ধরা-ধরি না করলে হ'ত? সবচেয়ে বড়-কথা পাড়ার লোকে হাবুকে অবজ্ঞা করেনি কোনদিন। ওই তো ছেলে! নিজের বাড়ীতেও জিনিস হলে যেমন করত, তেমনি করেছে। ঠিক আপনজনের মত। এ ঋণ কি কোনদিন শোধ হবার! টাকা-পয়সার ঋণ নয় যে সুদিন এলে শোধ দিয়ে দেবে।......

রুগীর ঘরখানি ছোট। এক-সঙ্গে তিন-চারজনের বেশী লোক আঁটে না। সেই জন্য মেয়েরা সবাই সম্মুখের বারান্দায় ঠেসাঠেসি করে বসেছেন। পুরুষেরা বসেছেন পাশের ঘরে। রুগীর-ঘরে মণি, পটলা, ছাড়া আরও দুই-এক-জন সব-সময়ই আছেন। ঘরের মধ্যে সকলেই চুপচাপ। শুধু একখানি হাতপাখা চালানর শব্দ। এখানকার মন-চাউনির রাজ্যে, অপরের মন বুঝতে হয় চাউনির মধ্য দিয়ে; কথা বলা অপরিহার্য হলে, বলতে হয় যতদূর সম্ভব ইশারায়; চলতে হলে হাঁটতে হয় নিঃশব্দে; গঙ্গাজলভরা পাথরবাটিটা সরিয়ে রাখবার সময় অন্যমনস্কতায় একটু শব্দ হলে অপ্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। মুমূর্ষুর যতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, তার মধ্যে এটি একটি; চেঁচিয়ে কাঁদবার সময়তো সম্মুখে পড়েই রয়েছে। তাছাড়া যে রুগীর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অথচ জ্ঞান আছে তার ঘরে শব্দ বেমানান, কথাবার্তা এক-ধরণের রূঢ়তা। একমাত্র ছাড়পত্র পাওয়া পাখার শব্দটা কানে সয়ে গিয়েছে একঘেয়েমির জন্য। এখানকার চার-দেওয়ালে-ঘেরা বিষাদ ভরা জগৎটুকু থমথম করছে আসন্নের আশঙ্কায়।

বারান্দায় কথা বলা চলে; কিন্তু ফিসফিস করে। নইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটে কি করে? সব কথার কেন্দ্র জুড়ে রয়েছেন হাবুর মা। হ'ক একই গল্পের পুনরাবৃত্তি—তবু তাঁরা আজ অন্য কোন অবান্তর প্রসঙ্গের মালিন্য টেনে আনতে চাননা, এখানকার বিষাদপূত পরিবেশে।

"যাক, ছেলেরা তবু এসময় কাছে থাকতে পেরেছে।"

"হ্যাঁ, ওই ছেলেদের জন্যই তিল তিল করে দেহপাত করে গেল হাবুর মা—সারাটা জীবন।"

"মণিটাকে যে অফিস থেকে ছুটি দিয়েছে, সেই ঢের!"

"মা বলতে পাগল। অমন মা! কি কষ্ট করেই মানুষ করেছে! ওই টেলিগ্রাম পাবার পর ছুটি না পেলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই চলে আসত না! চিনিতো ওকে।"

"গবরমেন্টও তো মানুষ! মা মরনাপন্ন—ছুটি দেবে না?"

"না না; সেই কথাই বলছি।"

"পরশু এখানে আসবার পর থেকে সেই যে মায়ের শিয়রে বসেছে, এখন পর্যন্ত একবারও উঠেনি বললেই হয়। আহার নেই, নিদ্রা নেই, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। আমি বলি—তুই বেটাছেলে—তুইই এক-রকম বলতে গেলে মায়ের বড় ছেলে—তুই এত ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? তোর চোখে জল দেখলে মায়ের দুঃখ হবে না? রুগী বলে নিজের রোগের ব্যথা-বিষে কাতর; এখন তোরা এত অবুঝ হলে কি চলে?"

"পটলাটা সে হিসাবে শক্ত আছে।"

"এখন বউমা এসে পৌঁছলে হয়।"

"হ্যাঁ। সময় থাকতে থাকতে। তাহলে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হয়। সাতজন্ম তপস্যা করলেও অমন শাশুড়ী কোন বউ পাবে না কোন কালে।"

"গাড়ী কখন? সাড়ে বারোটায় না?"

"হ্যাঁ। আর ধরগে ষ্টেশন থেকে বাড়ী আসতে আধঘণ্টা। একটা নাগাত পৌঁছে যাবে বাড়ীতে। এখন ভগবানের দয়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত" ......

"সেইতো হচ্ছে কথা। ধুকধুক করছে। আমি তো কর্তাকে বলে দিয়েছি, গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যেতে।"

"তাহলে তো আরও আগেই আসবে। খুব ভাল করেছে। বাড়ীতে গাড়ী থাকতেও যদি পাড়ার লোকের বিপদ-আপদের সময় কাজে না লাগে, তবে গাড়ী রেখে লাভ? বাপের বাড়ীর কার না কার সঙ্গে আসছে—নতুন জায়গা—সে অত বড় পথঘাট চিনবে কি না চিনবে—অনর্থক দেরী হত—ভালই করেছ গাড়ী পাঠিয়ে।"

"তাছাড়া বউমার এই অবস্থায় ভাড়াটে ঘোড়ারগাড়ীতে না চড়াই ভাল। যা রাস্তা এখান-কার।"

"কমাস হল?"

"দেরী আছে এখনও; সবে সাতমাস চলছে।"

"মধুপুর থেকে ছেলে হবার জন্য বাপের বাড়ী গিয়েছিল কবে যেন?"

"এইতো দুমাস আগে। তখন যদি জানে যে শাশুড়ীর শরীরের এই অবস্থা তাহলে কি আর এখানে দেখা না করে অমন বাইরে বাইরে বাপের বাড়ী চলে যায়।"

"অত সাধ করে ছেলের বিয়ে দিল—নাতির মুখ দেখা আর বুঝি হলনা হাবুর-মায়ের!"

"যাক, দু-ছেলেতো মানুষ হয়েছে হাবুর মায়ের! বড়-ছেলের কথা বাদ দাও।"

"বড়-ছেলের কথা বাদ দাও—এই কথাটি অতর্কিতে বেরিয়ে আসে সকলের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। কথার মাত্রা যেন! কেবল ওই বাদ পড়ার শব্দের আকৃতি ছাড়া, বড়-ছেলে যেন কোন হিসাবের মধ্যেই পড়ে না। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত তাকে মর্ত্যের মধ্যে গণে না। হাবুদা যেন একটা জিনিস; মানুষ নয়। ওর সম্মুখে ছেলেদের সিগারেট খেতে সংকোচ নাই; মেয়েদের গায়ের আঁচল পড়ে গেলে লজ্জা নাই।

এতগুলি লোক, প্রত্যেকেই চান এদের সংসারের কোন কাজ করে দিতে, আজকের মত দিনে। নইলে ঠায় এসে বসে থাকা, কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে; কিন্তু এত লোকের কাজ কোথায়? অথচ হাবুর মাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। মাঝে মাঝে তাই এঁদের মধ্যে দুই-একজন ঘরে ঢুকছেন রোগিণীকে দেখতে। কিন্তু ছেলেরা রুগীর ঘরে ভিড় করা পছন্দ করে না। মণি মুখফুটে বলে না, কিন্তু পটলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারণ করে সকলকে ভিড় করতে। সে বারণ গায়ে না মেখে তবু দু একজন মহিলা থেকে যান ভিতরে।

ছেলেরা এই সময়টুকু একান্তে মাকে পেতে চায়—নিজেদের মত করে—শুধু নিজেদের মধ্যে নিভৃতে—বাইরের লোক যেন কেউ না থাকে সেখানে! কত কথা বলবার আছে মাকে মণির—কত কথা শোনার আছে—সময় পেল কই—সব যে বাকি থেকে গেল—নাই বা মা বলতে পারলেন কথা—তাঁর চোখের ভাষা যে ছেলেরা বোঝে—মাও যে চোখের দিকে তাকালেই তাদের মন বুঝে যান।......

এইতো ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়ে মায়ের ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছে মণি; আর কত কথা হয়ে যাচ্ছে দুজনের চোখে-চোখে। কত প্রশ্ন, কত উত্তর।

"মা তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

"না তো।"

"না, বলো! তুমি বলছ না। পিঠে লাগছে? অনেকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছ। পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিই?"

"না।"

"কেন?"

"তাহলে যে তোদের মুখ দেখা যায় না।"

"কি কষ্ট হচ্ছে বলো!"

"তুই এলি বাড়ীতে, আর আমি পড়ে থাক-লাম বিছানায় [illegible]।"

"তুই বলে কি কখনও অসুখ বিসুখ হতে নেই!"

"নানা; তুই বলিস [illegible] আমার মত [illegible] কি অসুখ হয়ে পড়ে [illegible] থাকলে চলে [illegible] জানিস তো!"

[illegible]

"[illegible] মা, [illegible] তুমি [illegible] অসুখ [illegible], দুদিন পরে আবার সেরে যাবে।"

মণি চায় যে একথা [illegible] মিথ্যা [illegible] পরিষ্কার [illegible] দিয়েছেন। মায়ের [illegible] কোনদিন মিথ্যা কথা বলেন না; কিন্তু এক—এই শেষ মুহূর্তে মিথ্যে কথা না বলে কোন উপায় নেই। মা যে বাঁচতে চান, যে মা জীবনে কোনদিন [illegible] [illegible], তিনি যে এবার [illegible] দিয়ে-ছেন। মৃত্যুকে ভয় করেন না; তবু বাঁচতে চান।... এক মিথ্যা... এই মিথ্যা আশ্বাসে যদি একটু মনে জোর পান, যদি তাঁর একটু দুশ্চিন্তা কাটে... যদি একটু শান্তি পান মনে এই শেষ সময়ে!

ডাক্তার বাবুরাও তো কত সময় ভুল

হয়। কতটুকু জানে ডাক্তার ? ডাক্তারের জবাব দেওয়া কত রুগীও তো আবার সেরে ওঠে পরমায়ু থাকলে।......

ছেলের চোখমুখে মা সত্যিকথা খুঁজলেন।

"হ্যারে মণি, সত্যি আমি সেরে উঠবতো ? মিছে বুঝ দিচ্ছিস না তো আমাকে ? সত্যি যদি, তবে তোর মুখচোখের ভাব এমন কে ? এত তোদের চিন্তা কেন ? কেন তোকে টেলিগ্রাম করে আনান হল ? তবে, এত পাড়ার লোক আমার দেখতে আসছে কেন ? কেন সবাই এত চুপ-চাপ ? পাড়ার কত লোকের বাড়ীর রোগেভোগে কত সেবা-শুশ্রূষা করেছি—জানিতো সব। বয়সতো কম হল না! ডাক্তারবাবু কেন আর ইনজেকশন দিতে আসছেন না, সেকথা আমি বুঝছি না ভাবছিস ? কবিরাজ মশাই নাড়ী দেখে যা বলে গেলেন, তা' তোরা আমার কাছে লুকোলি, সেকথা কি আর আমি বুঝিনি ? কিন্তু আমার যে মরলে চলবে না। কতটুকু কি পেয়েছি জীবনে ; তবু যে আমাকে বাঁচতেই হবে।"

"বুঝেছি, সব বুঝেছি মা !...আর বলতে হবে না !...অমন করে করে আর তুমি আমার কাছে ওকথা বল না।"

কত কথা মাকে বলতে ইচ্ছা করছে—চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে—চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে ইচ্ছা করছে ! চোখের ভাষায় যে সব বলা যায় না—সবটুকু যে বুঝনো যায় না—বলেও যে খানিকটা বাকি থেকে যায়—সেইটুকু ভাগ-টুকুই যে বাকি থেকে যায় ! চোখের কথায় বুকের ভার যে হালকা হয় না ! মায়ের না হয় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তবে তো কথা বন্ধ হয়নি ! মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলতে ইচ্ছা করছে—এবং বউয়ের জন্যে সব মনের কথা-গুলো ! মা কোনদিন জিজ্ঞাসা করেননি, তবু যে তাকে বলতে হবে ......যদি মা ভুল বুঝে থাকেন ! বাইরের লোকজনের সম্বন্ধে সে সব কথা মাকে বলা যায় না ; কিন্তু এরা যে কিছুতেই মন থেকে যাবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে ! পাশাপাশি দুটি আলনাগুলো ! এরা যে মানুষগুলোকে একদমই নিশ্চিন্তভাবে কথা বলতে দেবে না ! নাচছে বুক কর্তব্য করছে, খুব বলে দেখাচ্ছে ! কিছু দেখে না বাইরের লোকে ! কিছুতেই বুঝবে না .....

"ওকি মণি, তোর চোখের কোণে জল এসে গেল কেনরে ! মুছে ফেল ভাবাল বুঝি আমি দেখতে পেলাম না ? কি অন্যায় আমি বললাম। তোকে কিছু বলিনিতো। মিছি মিছি মন খারাপ করিস না। তোকে বলব আমি ! তোকে ভুল বুঝব আমি ! কি যে ভাবিস ! তোর মনের কথা যে আমি বুকের মধ্যে শুনতে পাই। তোকে আমি একদিনের জন্যও দোষ দিইনি ; ভগবান সাক্ষী আছেন। শুধু তোকে কেন, আমি অন্য কাউকে দোষ দিইনি। তুই তাই ভেবে নিয়েছিস বুঝি ? দেখ একবার বোকা ছেলের কান্ড !"

এইখানেই মণির দুঃখ সবচেয়ে বেশী। দোষ করে থাকলে সে মায়ের কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চাইত নিশ্চয়ই। তার দোষ নেই ; রেণুরও কোন দোষ নেই ; কারও দোষ নেই। তবু কেন এমন হয়। কেন এমনভাবে জট পাকিয়ে যায় সব ? কেন না-বলা-কথার ব্যবধান এমনভাবে খাড়া হয়ে ওঠে, যারা পরস্পর সবচেয়ে ভালবাসে তাদের মধ্যেও ? দু-বছর আগে সে কি কখনও ভাবতে পারত একথা। না তার মা-ই ভাবতে পারতেন। তবু দাঁড়িয়ে গেল এই রকম। উপায় ছিল না। সকলে হয়তো ভেবেছিল যে রেণু সাতখান করে লাগিয়েছে কথাটা তার কাছে। ভুল সে ধারণা। রেণু কিছু বলেনি। শুধু তার চোখে ফুটে উঠেছিল, ভয়। সর্বক্ষণ একটা আতঙ্কের ছায়া লেগে থাকত তার চোখমুখে সেইদিনের পর থেকে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্যের লেশমাত্র যদি রেণুর হাবভাবে মুহূর্তের জন্য প্রকাশ পেত, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যেত। সে তো তেমন মেয়ে নয়; কিন্তু আতঙ্কের উপর তো কোন কথা খাটে না। ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কি কখনও ভয় পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করে ? রেণুর মত নরম স্বভাবের মেয়েরা জানে যে, এ বিষয় নিয়ে কারও কাছে কোন কথা বলা মানেই রূঢ়তা প্রকাশ করা। কেউ বুঝে-সুঝে অন্যায় করলে তবে না তার উপর বিরক্ত হওয়া যায়। স্বামী এ নিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও হয়তো রেণু কোন জবাব দিত না। মণি জিজ্ঞাসা করেওনি। মা, ভাই, স্ত্রী কারও সঙ্গে তার কথা হয়নি এ সম্বন্ধে। এ পরি-বারের পাঁচজন লোকের মধ্যে কেউ কারও সঙ্গে সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে কথা বলেনি। বলা যায় না। দরকার মনে করলেও বলা যায় না।

অতি তুচ্ছ ঘটনা ; তবু কি করে যেন গুরুত্ব পেয়ে গেল সকলের কাছে। কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া গেল না কিছু নয় বলে। কারও কাছে কিছু না বললে কি হয়, রেণু নিজে নিতে পারে নি জিনিসটাকে সহজভাবে। বলে বোঝাতে হবে কেন ? হবে কেন চাউনি কি দেওরের নজরে পড়েনি ? সে যে পায়ের শব্দে ভয়ে চমকে ওঠে, এ জিনিস কি শাশুড়ী লক্ষ্য করেননি ? কিছুই বলেননি তবু শাশুড়ী, দেওর, স্বামী সকলেরই একটা মায়া এসে গিয়েছিল নতুন বউ-এর কাছে। সেইদিন থেকে এ পরিবারের প্রত্যেকেরই নিজেকে ছোট ছোট লাগে, পরের বাড়ীর ওই মেয়েটির সম্মুখে। অথচ প্রত্যেকে জানে যে, রেণুর মনে মনে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই ; সে পরকে আপন করে নিতে জানে। নিজেকে সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এখানে আসবার দিন থেকেই সে মনে-প্রাণে এই সংসারেরই একজন হয়ে গিয়েছিল। তবু কেন এমন হল ? গত কয়মাস থেকে মণি সময়ে অসময়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, নিজেকে বিচার করে দেখতে চেয়েছে যে, তার মধুগঞ্জে চলে যাওয়া শুধু কি রেণুর ওই ভয়বিহ্বল চাউনি দেখে—না তার মনের মধ্যে আরও অন্য কিছু ছিল। শুধু রেণুর দুঃসহ মানসিক অবস্থা দেখে দরদ ? নিজের নিভৃত মনের একান্ত বাঞ্ছিত অন্য কোন ভাব তার সঙ্গে মিশানো ছিল না তো ? নিজের মধ্যে খুঁজে মণি সেরকম কিছু পায়নি। এক যদি নিজের অজ্ঞাতে মনের কোন সুপ্তবৃত্তি, রেণুর অবস্থার অসহনীয়তাটাকে অতিরঞ্জিতভাবে কল্পনা করতে বাধ্য করে থাকে তাকে তাহলে হয়তো হতেও পারে। কিন্তু সে সজ্ঞানে ওই ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেয়নি। একথার মধ্যে একটুও ফাঁকি নেই।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়—আচ্ছা রেণুর স্বস্তিটাই কি বড় হল মায়ের সুখের চেয়ে ? স্ত্রীর দিকটাই কি বড় হল মা, ভাই আর নিজেকে মেশানো এখানকার মিষ্টি নিবিড় পরিবেশের চেয়ে ? তাদের পরিবারের স্বার্থের চেয়ে ? মা যে নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ে এখানকার এই সংসার গড়ে তুলেছিলেন, ভেবেছিলেন এই সুখের নীড় কোনদিনই বুঝি ভাঙবে না। ছেলেদের দিক দিয়ে মা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন ; তাতে যে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আঘাত আসতে পারে সে কথা মা কল্পনাও করতে পারেননি। প্রতি বিষয়ের কত দিক আছে ; সব দিক কি লোকে আগে থেকে ভেবে রাখতে পারে ? মাঝ থেকে মণিই হল নিমিত্তের ভাগী। একরকম বলতে গেলে মণিই এ বাড়ীর বড় ছেলে—হাবুর কথা বাদই দাও। এ পরিবারের সম্বন্ধে মণিরই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। একথা তাকে কোন দিন বুঝিয়ে দিতে হয়নি। তাদের মত দুঃস্থ পরিবারে আপনা থেকেই ছোটরা শিখে যায় যে, বাইরের ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে থাকা। এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল হাবুর জন্য। হাবুকে যে সব সময় আগলে আগলে রাখতে হয় ; দশজোড়া নিষ্ঠুর চোখের থেকে যে সর্বক্ষণ আড়াল করে দাঁড়াতে হয়। বাড়ীর মধ্যে দাদা যা ইচ্ছা করুক, তাতে কিছু যায় আসে না ; কিন্তু বাইরে ? বাইরের লোকের কাছে যে লজ্জা লজ্জা করে। কোন ছোট ছেলে-মেয়ে রাস্তায় হাবুকে দেখে যখন ভয়ে কেঁদে ওঠে, তখন লজ্জা করে সবচেয়ে বেশী। দাদা বাইরে গেলেই মণি, পটলার ভয় ভয় করে, এই বুঝি সে একটা হাস্যাস্পদ কিছু করে ফেলে ; এই বুঝি অপূর্ববাবুদের মালী তাকে শাসাচ্ছে, বাগানের গেট খুলে দিয়েছে বলে ; এই হয়তো দুষ্টু ছেলেরা তার পিছনে লেগেছে ; হয়তো মারধরই করল দাদাকে। বাইরের লোকে তো বুঝবেনা ; তাই একটু চোখে চোখে রাখতে হয়। মা সব সময় তটস্থ—দারোগা পুলিসে আবার কোনদিন কি করে বসে হাবুটাকে ! তিনি রান্নাঘরে রান্না করতে করতে এঘরের দিকে তাকালেই মণি, পটলা ছোটবেলা থেকে বুঝতে পারে যে মা জিজ্ঞাসা করছেন—"হ্যাঁরে সেটাকে তো দেখছি না। সেটা গেল কোথায় ?" অমনি তাদের মধ্যে এক ভাই বাইরে ছোটে। এরা প্রত্যেকে জানে যে 'সেটার' স্থানই এ পরিবারে সব চেয়ে উঁচুতে ; এক মুহূর্তের জন্য 'সেটার' কথা ভুললে চলে না। ছেলেরা জানে যে মায়ের টান দাদারই উপর সবচেয়ে বেশী। এইটাকেই তারা স্বাভাবিক বলে জেনেছে—এ যে হতে বাধ্য। এর জন্য কোন দিন হিংসা করেনি দাদাকে—ওকে কি হিংসা করা যায় ? তারা জানে যে পাড়ার লোকে যত ভাল ব্যবহারই করুক, তবু—পর একদিকে আপন অন্য দিকে ; দয়ামায়াহীন বাইরের লোকেরা একদিকে, আর দাদাকে কেন্দ্র করে তারা তিনজন অন্য দিকে। এই পরিবেষ্টনে পারিবারিক বন্ধন সাধারণের চেয়ে দৃঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

তবু মণি চলে গিয়েছিল বউ নিয়ে, সদর থেকে মহকুমা শহর মধুগঞ্জে। অন্য মা হলে হয়তো বলত যে, একটা পরের বাড়ীর মেয়ে এসে ছেলেকে পর করে নিল। কিন্তু হাবুর মা অন্য রকম মানুষ ; তিনি কিছু বলেন নি। তিনি জানেন রেণু কত ভাল। তিনি যে কিছুদিনের পরিচয়েই বুঝে গিয়েছিলেন শাশুড়ী, ভাশুর দেওরের উপর কর্তব্য সম্বন্ধে বউমা কত সজাগ। বুঝতে পেরে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে-

ছিলেন—পারবে—এ বউ পারবে ! কিন্তু পারল কই ? কি হল ? মানুষ যা চায়, তা কি পায় !! কত রকমের বাধা আছে পাবার পথে !.....

একজন বদলি হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। কত তুচ্ছ ঘটনাটি ! কিন্তু মন যে একটা বিশাল জগৎ। সেখানকার ফাটলগুলো যে বাইরের জগতের ফাটলগুলোর চেয়ে আরও কাছের জিনিস।

মণির দিক থেকে কি কোনই ত্রুটি হয়নি ? এ বিষয়ে তার বিবেক বোধহয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়; তাই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার এত চেষ্টা। তার আসল ত্রুটি হচ্ছে যে সে বদলির হুকুম রদ করানোর চেষ্টা করেনি। জজসাহেব খুব ভাল লোক। তাঁকে একবার গিয়ে বললেই বোধহয় কাজ হয়ে যেত; অপূর্ববাবুকে দিয়ে বলালে তো নিশ্চয়ই হত। মণি সে চেষ্টা করেনি। পটলা, মা দুজনেই একথা জানেন। সেই জন্যই তার এত কুণ্ঠা। বাইরের লোকে ধরতে পারবে না এ ত্রুটির গুরুত্ব; কিন্তু এ পরিবারের লোকে জানে যে হাবুকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবা, সামান্য ত্রুটি নয়। চলে যাওয়াতো নয়—এখান থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া। সে যে কি কষ্ট ! নিজের দুঃখ থেকে মণি বুঝতে পারে, মা আর পটলা কি রকম ব্যথা পেয়েছে মনে। তাদের মনের কোন-না-কোন জায়গায় কি আর চিড় খায়নি ? যতই ঢাকতে চেষ্টা করুক।......

তবু মণি বলবে যে তার দোষ ছিল না।...রেণু যে...! না না। রেণুকে সে দোষ দিতে চায়না, সে কিছু বলেনি। শুধু ...শুধু সে যখন রেণুর কাছে বদলির খবরটা প্রথম দিল তখন তার ভয়-কাতুরে মুখখানায় অজ্ঞাতে একটা স্বস্তির দীপ্তি ফুটে উঠেছিল। রেণুর অজানতে চাউনির মধ্যে মুহূর্তের জন্য তার সত্যি মনের ঝিলিক খেলে গিয়েছিল। তারপরই সে ঝিলিক মিলিয়ে গেল তার আটপৌরে চাউনির মধ্যে। এ জিনিষ মণির নজর এড়ায়নি। তখনই সে মনস্থির করে ফেলেছিল। এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন তার জীবনের পরীক্ষায় আগে কখনও আসেনি। মুহূর্তের মধ্যে তাকে পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তখনই রেণু যদি বলত—'তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছা হয় যাও, আমি যাবনা মধুগঞ্জে'—তাহলে কত সহজ হয়ে যেত আগাগোড়া ব্যাপারটা !...এই অঘটনে রেণুর দায়িত্ব ওইটুকুই। একে ত্রুটি বলা চলে না। রেণু বলতে পারেনি ভয়ে; এখানকার আতঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায়।—সেই ঘটনাটা তখন সদ্য ঘটেছে কিনা।...

...তারপর মণি যখন মাকে বদলির খবরটা দিল, তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কবে যেতে হবে ?" তার কথার সুরেই মা ধরতে পেরেছিলেন যে, সে মধুগঞ্জে যেতে চায়। মা তাকাতেই মণি চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, এখানকার দুঃসহ আবহাওয়া থেকে সে রেণুকে অব্যাহতি দিতে চায়। মনের দুশ্চিন্তা চেপে নিজে থেকেই বলেছিলেন—"তাহলে বউমাকেও নিয়ে যা একটা বাসা ঠিক করে। মেসে, হোটেলে খাওয়া তোর চলবে না।" সহজ করে দিতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা অল্প কথায়। এতো শাশুড়ী-বউএর মন-কষাকষির ব্যাপার নয়—এযে একেবারে অন্য রকমের কথা—আলোচনার বাইরের জিনিস। [illegible] কদিন মণি ছিল এখানে সে কদিন মায়ের দিকে তাকাতে পারেনি। সামনা-সামনি হলেই দুজনেরই ভারী চোখের পাতা, নীচের দিকে নামতে চায়—চোখোচোখি হলে যেন দুজনেই ধরা পড়ে যাবে। নিজের চাউনিকে বিশ্বাস পায়নি কেউ। দুজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সব সময় চেয়েছে; তাই পটলা কাছে থাকলে সোয়াস্তি পেয়েছে মণি।

মায়ের সেদিনকার সেই কিছু-না-বলাটাই আজ মণির বেশী করে মনে পড়ছে।...কিন্তু কি করতে পারত সে ? পরের বাড়ীর মেয়েকে এখানে থাকতে বাধ্য করতে বিবেকে বেধেছিল; যদি স্বেচ্ছায় থাকত তাহলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। সেইজন্যই পরশু রেণুকে যে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, তাতে মণি লিখেছে—"মা বিশেষ অসুস্থ।" শুধু এইটুকু; আর একটা কথাও না; রেণু যদি এই পরিবারের এমন বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়ান দরকার মনে করে তাহলে আসবে। তারপর কাল রেণুর বাপের বাড়ী থেকে এখানে টেলিগ্রাম এসেছে, তার রওনা হবার খবর দিয়ে। সে-ই থেকে রেণুর আসারই প্রতীক্ষা করছে মণি। মাকে সেকথা বলা হয়নি অযথা ব্যস্ত হবেন ভেবে। স্ত্রীর আসবার খবরে আনন্দ হয়েছে বইকি মণির। আনন্দের সঙ্গে খানিকটা আশা খানিকটা উদ্বেগ মেশানো।...তবে কি রেণু তার ভয় এতদিনে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ? চেষ্টা করলে মনের জোর নিশ্চয়ই বাড়াতে পারা যায়। সময়ের ব্যবধানে মনের কত গ্লানি আপনা থেকে কেটে যায়। আজ যেটাকে বড় বলে মনে হয়, কাল সেটাকে ছোট লাগে। ছেলেবেলায় যখন তারা তিন-ভাই মায়ের সঙ্গে এই জোড়া তক্তাপোশে শুত, তখন এখানাকে কত বড় লাগত। তা ছাড়া কাছে থেকে যে ঘটনাটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, দূরে গিয়ে ঠান্ডা-মেজাজে সব দিক থেকে ভাবলে, সেটাকে অতি তুচ্ছ মনে হতে পারে। তাই যদি হয়ে থাকে রেণুর বেলায় ! বুঝবার পরও হয়তো এতদিন বলতে পারছিল না এখানে ফিরবার কথা, সঙ্কোচে। কিম্বা হয়তো মনের কোণায় জমানো গ্লানি ও দ্বিধার অবশেষটুকু হঠাৎ মুছে গিয়েছে এই দুঃসংবাদের টেলিগ্রাম পেয়ে ! বড় বিপদের মুখে নিজেকে কাটিয়ে উঠে কত কিছু করতে পারে লোকে !...

স্ত্রীর এখানে আসবার কথাটা, এই রকমভাবেই ভাবতে ভাল লাগছে মণির আজকে। এ ছাড়া যে আর সমাধানের অন্য কোন পথ নেই। আর কেউ না বুঝুক সে যে জানে রেণুর মন কত নরম, কত ভাল। এখান থেকে তখন চলে যেতে পেরে, রেণু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বটে; কিন্তু ভাশুরের উপর তার মায়া-মমতা নেই, সে কথাতো সত্যি নয়। অন্য লোকের হয়তো সে রকম ধারণা থাকতে পারে; কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রমাণ মণি যে নিজের চোখে দেখেছে—সে-ই প্রথম মধুগঞ্জে যাবার দিন। না দেখলে তারও হয়ত স্ত্রীর মনের ভাবের একটা ভুল ধারণা থেকে যেত। স্টেশনে যাবার সময় রেণুর চোখে জল দেখে সে তার হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়েছিল। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় রেণু কাঁদেনি; কিন্তু তারপর কখন—ঠিক কোন মুহূর্তে কি দেখে তার চোখে জল প্রথম এসেছিল সে কথা মণির স্পষ্ট মনে আছে। সেইটুকুই তার আজকের আশা-ভরসার ভিত্তি।...ভাশুরের উপর রেণুর এত দরদ—এত আতঙ্ক সত্ত্বেও !...

সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখের সম্মুখে ভাসছে। গাড়ীখানা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। মা, পটলা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। রেণুর চোখের জল হয়তো মা, পটলা অত দূরে থেকে দেখতে পাননি কিন্তু মণি দেখে তার চোখে জল এসেছিল, সে জিনিস তাঁরা লক্ষ্য না করে পারেন না—এ পরিবারের কেউ পারে না। এ বাড়ীর লোকের পক্ষে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

হাবু সেদিন জীবনে প্রথম ডানদিকে ঘুরেছিল।

মণিরা বাড়ী থেকে বার হবার সময়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলের নজর অভ্যাসবশে একবার গিয়ে পড়েছিল অপূর্ববাবুদের গেটের দিকে।...বাঁ দিকে কাত করা মাথা।...পুরানো ইনামেলের থালাখানা গেটের শিকগুলোর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে, খটখট করে শব্দ করছে।...

কেউ তাকাতে চায়না সেদিকে; কেউ অন্যকে জানতে দিতে চায়না যে সে ওদিকে তাকিয়েছে। কিন্তু ওইদিকেই চুম্বকের আকর্ষণ। হাবুকে সব-কিছু থেকে বাদ দেবার যত চেষ্টা করে সকলে, তত সে জায়গা জুড়ে বসে মনের মধ্যে। হাবুকে নিয়েই এতবড় কাণ্ড বাড়ীতে, অথচ সে এসব কিছুর খোঁজও রাখেনা। গাড়ী যখন কাছাকাছি গিয়েছে তখন বুঝি তার হঠাৎ নজরে পড়ল। একটু বোধহয় বুঝতে সময় লাগল। একি !...চেনা-চেনা !...পিচুটিভরা চোখে ফুটে উঠল বিস্ময় !...গাড়ীতে করে চলে যাচ্ছে যে !...তার দৃষ্টিকে পাল্লা দিতে হবে চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে।...নইলে ততক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে যে !...বাঁদিকের দিকে ঢলেপড়া মাথা সুদ্ধ সারা দেহটিকে সে ডানদিকে ফেরালে, দেখবার জন্য। তখন চার-জোড়া চোখের অপলক দৃষ্টি তারই দিকে। চারজনই ভুলে গিয়েছে যে হাবুর দিকে তাকানোর সময় অন্য তিনজনের কাছে ধরা পড়ে গেলে একটু অপ্রস্তুত হতে হবে।...হাবু যে এর আগে কখনও ডানদিকে ফেরেনি।...একেবারে এদিক একেবারে ওদিকে শরীর দুলিয়ে, একটু পা ঘসটে ঘসটে [illegible] ধরণে হাবু চলে চিরকাল; মাথা থাকে বাঁদিকে কাত করা; হাঁটুর কাছটাতে একটু যেন দোমড়ানো ভাব; হাত দুখানা সামনে পিছনে দোলে। এইভাবে সোজা কয়েক পা হাঁটবার পর সারা দেহটাকে বাঁদিকে বাঁকিয়ে নেয় ধনুকের মত করে; তারপর বাঁদিকে একবার ঘুরে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করে। হাবুর হাঁটবার এই বিশেষত্বটুকু পাড়ার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত জানে। ......সেই লোক আজ ডান দিকে ঘুরেছে! অবাক কাণ্ড! হল কি আজকে হাবুর! ......পরিবারের এই সবচেয়ে বড় দুঃখের দিনেও, এটা সবচেয়ে আনন্দের কথা।

........ডান দিকে দেহটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হাবু টলতে টলতে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি সে কোনদিন হাঁটেনি। হাত থেকে তার বহুদিনের প্রিয় ইনামেলের থালাখানা পড়ে গেল সেদিকে তার খেয়াল নেই। অধীর আগ্রহে সে নিজের হাত দুখানা সম্মুখের দিকে তুলে ধরেছে। প্রাণপণ শক্তিতে সে চেষ্টা করছে যাতে ছুটে গিয়ে গাড়ীখানাকে ধরতে পারে। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে

পারবে কেন।.........গাড়ীখানা বাড়ীর সেই ঘোমটা-মাথায় অদ্ভুত রহস্যময়ীকে নিয়ে চলে গেল! আর দেখা যাচ্ছেনা! মোড়ের ওই মস্ত বাড়ীটা সে-ই অবাক-ঘোমটা মেয়েটিকে ঢেকে নিল! কেন? বুঝতে পারা যায় না কিছুই।.........হাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।.........না না। তাদের বাড়ীর সেই অবাক-ঘোমটা নতুন লোকটা—যেটা তাকে দেখলে মাথার ঘোমটা আরও টেনে দেয় সেইটা—বোধ হয় ও গাড়ীতে যায়নি। নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছে।.........

হাবু বাড়ীর দিকে এগল। মা, পটলা তখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অন্যদিন এতদূর আসতে হাবু অন্ততঃ চার পাঁচবার থেমে থেমে একটা করে বাঁদিকে ঘুরপাক খেয়ে তবে আসত। আজ এল সোজা। কাজের তাড়ায় ঘুরপাক খেতে ভুলে গিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে বাড়ীতে ঢুকবার সময় মা কিংবা পটলার দিকে সে একবার তাকালওনা।......ঘোমটা-ফাঁকে-মুখ-লুকানো সে-ই অন্যরকম মেয়েটাকে সে খুঁজেছে—এঘরে—ওঘরে—রান্নাঘরে।......কোথায় গেল? কোথাও তো নেই! ......হতাশার ছাপ পড়েছে তার মুখে। আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।......

পটলা তাকে ধরে গামছা দিয়ে তার চোখ-মুখ মুছিয়ে দিল। হাবুর চোখে পিচুটি পড়ে, আর কশ বেয়ে সব সময় লাল পড়ে। তাই যতবার সে বাড়ীর বার হয়, ততবার মা তার মুখ মুছিয়ে দেন; নইলে মাছিতে বড় জ্বালাতন করে। আজ মা তাঁর ডিউটি করলেন না দেখে পটলা এগিয়ে এসেছে।

মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; কি করবেন ঠিক করতে পারেননি এখনও। ....ভুল করলেন নাকি? মণিকে হয়তো কিছু বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল!... ...বাবা মারা যাবার সময়ের কথা পটলার মনে নেই; সেদিন সে জীবনে প্রথম মাকে কাঁদতে দেখল।

মায়ের মাথার কাছে বসে মণি সেইদিনকার কথা ভাবছিল। একটু অন্যমনা হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। হঠাৎ খেয়াল হয় যে, মা একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

মন-চাউনির ভাষায় আবার কথাবার্তা আরম্ভ হল।

"হ্যাঁরে, এত ভেবে আকুল হচ্ছিস কেন? আমি মরে যাব বলে? আমি মরব না রে মরব না। আমার মন বলছে আমি মরব না। ঘুম আসছে তোর—না? আসবেই তো—সারারাত জেগে! আচ্ছা বল, এ কি আমার ভাল লাগে? একটু ঘুমিয়ে নেনা কেন! হ্যাঁরে, সকাল থেকে খালি পেটে রয়েছিস তো?"

"না, খেয়েছি তো।"

"খেলি আবার কখন? এখান থেকে উঠলি কখন, খেলি কখন? বললেই আমি বিশ্বাস করি!"

"অপূর্ববাবুদের বাড়ী থেকে যে মাসিমা চা, জলখাবার দিয়ে গিয়েছিলেন সকালে।"

"জলখাবার দিয়ে গিয়ে থাকলে; কিন্তু তুই খাসনি। বাজে কথা বলিস না আমার কাছে! তার চেয়ে বরঞ্চ স্নান করে একেবারে দুটো ভাত খেয়ে নে। ভাত কি তোদের মাসিমার বাড়ী গিয়ে খেতে হবে, না এখানে দিয়ে যাবে? এখানে না দিয়ে গেলে 'সেটা'র অসুবিধা।"

আবার 'সেটা'র কথা এসে পড়েছে।

"না না, মা তুমি ভেবনা! পটলা সকালে দাদার মুখ ধুইয়ে, নিজে সম্মুখে দাঁড়িয়ে খাইয়েছে। টিফিন কেরিয়ারে করে ভাত মাসিমাদের বাড়ী থেকে দিয়ে গিয়েছে। দাদা বাড়ীতে এলেই খাইয়ে দেবো।"

"হ্যাঁরে, 'সেটা' গেল কোথায়? সেটাকে দেখছিনা তো! কালও দেখিনি, আজও দেখিনি!"

এইটিই আসল প্রশ্ন। হাবু নিজের খেয়ালেই ডুবে থাকে। কি জানি কেন, দুদিন থেকে এঘরে আসছে না। বোধ হয় ঘরে এত লোকজন দেখে। রাত্রেও ঘুমিয়ে পড়েছিল উঠনে তক্তাপোশখানার উপর। গরম লাগছিল হয়তো। চিরকাল সে মায়ের পাশে অয়েল ক্লথের উপর শোয়। তাকে কাছে না নিয়ে শুলে মায়ের ঘুম হয়না। তিনি হাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। মাঝে মাঝে এক-আধদিন রাত্রে, কি জানি কেন হাবুর ঘুম আসেনা; গোঙানি, কাতরানি ও কান্নার মাঝামাঝি একরকম শব্দ তার গলা দিয়ে বার হয়। সে কথা বলতে তো পারে না; এই শব্দই তার কথা। এই সব রাত্রে মা অস্থির হয়ে পড়েন। আর ক্বচিৎ কখনও এক একদিন হাবুর কি যেন মনে হয়—অকারণ আনন্দে মায়ের বুকের কাছে ঘেঁষে এসে তাঁর গা টিপে টিপে দেখে। কি দেখে সে-ই জানে। মধ্যে মধ্যে হাতের মুঠোয় মায়ের গা চেপে ধরে। এই হচ্ছে হাবুর আদর—তার নিবিড়তম সম্পর্ক অন্য লোকের সঙ্গে। আর তার এই আঙুলের চাপ, মায়ের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। কত রাত্রে এই আঙুলের চাপে ঘুম ভেঙেছে, আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছে তাঁর; আরও কাছে টেনে নিয়েছেন হাবুকে। ......হাবুদের জগৎ যে আলাদা! সেখানে যখন ইচ্ছা পৌঁছান যায় না যে! সেখানকার দরজা যে খোলে ক্বচিৎ কখনও!........

চোখের টেলিগ্রামে খেলে গেল মণি আর পটলার মধ্যে।

"দাদা কোথায় রে? বাইরে? মা দাদাকে দেখতে চাইছে। দ্যাখ, যদি ধরে আনতে পারিস। আলনার উপর থেকে মায়ের ওই শেমিজটা নিয়ে যা!"

হাবু পরনে কিছু রাখতে চায় না। হাফ-প্যান্ট কিংবা ইজেরে নানারকম অসুবিধাও আছে। সেইজন্য মা পুরনো কাপড় দিয়ে তার জন্য সায়া সেলাই করে দেন। সায়াও কোথায় ফেলে আসে, সব সময় জানতেও পারা যায় না। যখন সায়া পর্যন্ত পরনে রাখতে চায় না, তখনকার ওষুধ হ'ল মায়ের শেমিজ। এইজন্য মায়ের সব শেমিজগুলোর গলায় ফিতে দেওয়া; এই ফিতে পিঠের দিকে বেঁধে দিলে আর হাবু খুলতে পারে না। আজ বাড়ীতে অনেক লোকজন—পরনে সায়া রেখেছে কি না রেখেছে—তাই এই সতর্কতা। হাবু বড় হবার পর থেকে এইটাই দাঁড়িয়েছে বাড়ীর লোকের সবচেয়ে বড় সমস্যা; চোরের মত থাকতে হয় বাইরের লোকদের কাছে।

পটলা শেমিজ নিয়ে ঘর থেকে বার হ'ল। বারান্দার মেয়েদের মধ্যে একজন ফিস ফিস করে বললেন—"পটলা, তুই স্নান করে চারটি খেয়ে নে। যে যখন সময় পাস, খেয়ে নে। আবার বউমা এসে পৌঁছলে, তাকেও চারটি খাইয়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি; পোয়াতি মানুষ; রেল-গাড়ীর ধকলতো কম নয়।"

"আসছি এখনই"।

পটলা বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

নিজের পায়ের দিকটা মা দেখতে পাচ্ছেন না; কিন্তু বুঝেছেন যে, পটলা উঠে গেল।...... কত বুঝে চলে পটলা; সে পায়ের দিকে বসছে দুদিন থেকে, মাথার দিকটা মণিকে ছেড়ে দেবার জন্য। মণির যে এখন দরকার মায়ের চোখের দিকটা পাবার—কত চোখের কথা যে এখনও বাকি তা' কি সে জানেনা?...........চোখ কেন বন্ধ হয়ে আসছে?........চোখের পাতা ভারী! ......যেন রাশি রাশি পেঁজা তুলো এসে জমছে চোখমুখের উপর!.........

"মা তোমার ঘুম আসছে। ঘুমিয়ে পড়!"

"না! ঘুম অমনি এলেই হ'ল নাকি!"

পটলা ফিরে এল, একা। শেমিজটা হাতে নেই। তার মানে হাবুকে পরিয়ে দিয়ে এসেছে। চোখে চোখে দুই ভাইয়ে কথা চলল।

"দাদা এলনা। কত চেষ্টা করলাম।"

"খিদে পেলে, খানিক বাদে নিজে থেকেই আসবে। পটলা, তুই বরঞ্চ এক কাজ কর। তক্তাপোশে এসে বসিস না এখন—মা বুঝতে পারবে। তুই আস্তে আস্তে এগিয়ে আয়—পা টিপে টিপে—একটুও শব্দ না করে—মা যেন জানতে না পারেন! মায়ের পায়ের দিকের কোন জায়গা একটু চেপে ধর—ঠিক দাদা যেমন করে চেপে ধরে আদরের সময়। বুঝেছিস তো? আর কত বুঝিয়ে বলব তোকে!"

পটলা বুঝেছে ঠিক।

"তুমি বলছ বটে; কিন্তু মা ধরে ফেলবে। মা বুঝে ফেলবে যে এটা দাদার আঙুলের চাপ নয়।"

"আচ্ছা, একবার করেই দ্যাখ! এখন কি আর মায়ের অত সাড় আছে!"

পটলা ঠিকই বলেছিল। মা ধরে ফেলেছেন। চোখের ভাষায় ফুটে উঠল—"কে? পটলা না? খানিক আগেই যে উঠে গেল। পা ঠাণ্ডা কিনা তাই দেখছে নাকি? পা গরম করবার জন্য আবীর দিয়ে ঘষবে নাকি? দরকার নেই। ওকে বল, এখানে এসে বসুক। তুই যা—যাহোক কিছু খেয়ে আয়! বলছি, কথা শোন!"

মণি উঠে যেতেই একজন বর্ষীয়সী মহিলা রোগিণীর কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও হাবুর মা, কিছু খেতেটেতে ইচ্ছা করছে? একটু আম খাবে?"

পটলার চোখে অগ্নিবাণ দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা সরে গেলেন। সে গঙ্গাজলে ভিজানো ন্যাকড়াটা নিয়ে মায়ের মাথার কাছে বসল। মা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।........... তিনি বোধ হয় পটলার উপর একটু অন্যায় করেছেন এতদিন! আগে মনে মনে ঠিক করা ছিল যে, মণির বিয়ের পরই ছোটছেলের বিয়ে দেবেন। ওকথা তুললেই পটলা মৃদু আপত্তি জানিয়েছে—ওই যেমন সব ছেলেরা প্রথমটায় বিয়ে করবনা বলে আর কি, সেইরকম—কিন্তু সত্যিকার না বলেনি। বোঝাতে যায় সব! তারপর বাড়ীতে ওই কাণ্ড হয়ে গেল। মণি মধুগঞ্জে চলে যাবার পর তিনি আর পটলার কাছে বিয়ের কথা তোলেন নি। নইলে, পাড়ার মধ্যেই মেয়ে ছিল; মেয়ের বাপ মাতো ঝুলো-ঝুলি করছে আজও। এক ছেলের বিয়েতেই

তছনছ হয় গিয়েছে, তাঁর এত সাধের গড়ে-তোলা সংসার। ঘরপোড়া গরু—তাই এত ভয়। নিজের স্বার্থে—হ্যাঁ একরকম নিজের স্বার্থেই বলতে হবে বইকি! মণি মধুগঞ্জে চলে গেলে, তবু পটলা ছিল; কিন্তু আবার পটলাও যদি চলে যায় তাহ'লে? তাহ'লে হাবুটার কি হবে? এই ভয়েই পটলার উপর একটু অন্যায় করে ফেলেছেন। একটু দোষী দোষী ভাব, মনের মধ্যে কিরকির করে বিঁধছে। এবার সেরে উঠলে তিনি আর দেরী করবেন না। পাড়ার মেয়ে; হাবুদাকে জানে। কোন গোলমাল হবেনা।...... তাঁর কোলপোঁছা ছেলে পটলা! মণি না হয় মাসে মাসে ক'টা করে টাকা পাঠায়; পটলার উপরই তো এখানকার সংসার।......কিন্তু হাবুর জন্য কি আর তিনি অন্য ছেলেদের উপর নজর দিতে পেরেছেন? 'সেটা'র জন্য চিন্তাই যে সব সময় তাঁর সারা মন জুড়ে। সে-ই প্রথম যখন তিনি হাবুর অদৃষ্ট বুঝতে পারলেন, তখন থেকেই।......

......প্রথম ছেলে......কত আদরের ছেলে... ...কত রকমের স্বপ্ন তখন মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে।......প্রথমটায় তো বোঝা যায়নি; মায়েই বোধ হয় বোঝে সবচেয়ে শেষে এসব জিনিস!......সবাই বলে—এতটুকু ছেলে, এত শান্ত কেন? আমি ভাবি এ বুঝি ছেলের প্রশংসা। পাড়ার লোকে বলে—বেশ বিজ্ঞের মত চাউনি এই অল্পবয়সেই। আমি ধরতে পারিনা কোন্ দিকে ইশারা করছে তারা। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে—ছেলে হাসে না কেন? আমি জবাব দিই—হাসে তো। খল খল করে হাসে না, কিন্তু মুচকে হাসে...... আসলে সেটা হাসি কিনা জানিনা; মনে হ'ত হাসির মত। তখন কি বুঝেছি? ছেলের বাবা হাবা, হাবু, হাবলা বলে আদর করতেন 'সেটা'কে। তখন কি আর কেউ জানে যে সেকথা বর্ণে বর্ণে সত্যি হবে, তাঁর কপালে! তিনি বলেন—ছেলে বড় হাবা; কথা বলে না।...... আমি বলি—বলবে এখন; সকলেই কি এক বয়সে কথা বলে?......তারপর যখন মণি হাবুর চেয়ে আগে কথা বলতে শিখল, হাঁটতে শিখল, তখন আর মনকে বুঝ দেবার জন্য কিছু রইল না। প্রথম বুঝতে পারার সে যে কি দুঃখ, সেকথা মা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না; পরেও দুঃখ; যতদিন বাঁচতে হবে ততদিন দুঃখ।......হাবু নাম রাখার জন্য তখন ছেলের বাবার কি লজ্জা! ডাকতেই চাননা আর। কিন্তু তখন আর উপায় কি; পাড়ার দশজনে ওই নামে ডাকে। থেকে গেল ওই নাম। ......সেই দুঃখের জের আজও টেনে চলেছি। সত্যি করেই আমার মরবার ফুরসত নেই। 'সেটা'কে কার কাছে রেখে যাব? আমার মত করে কে তাকে দেখবে? বেটাছেলেতে পারবেনা—ও কাজ পারে মেয়েরা। পটলা চলে যাবে আপিসে; তখন সেটাকে কে দেখবে, কে খাইয়ে দেবে? কে পরিষ্কার করিয়ে দেবে? পুলিসেই হয়তো ধরে নিয়ে যাবে কোনদিন! হাবুর মত ছেলেদের শুনেছি ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় যেন পাঠিয়ে দেয়। সেখানে নাকি চোরডাকাতের মত বন্ধ করে রেখে দেয়; মারধর করে; খেতে দেয় না।................আমি না থাকলে কি হাবুর চলে? ওর গোঙানির, ওর মৃদু হাসির মানে, আমি ছাড়া আর কেউ কি বোঝে? সবাই যে ওকে ভুল বোঝে!...বিশ্ব-সংসারের কিছুই যে হাবুর মত ছেলেদের জন্য নয়! যা কিছু ভাল, সবই যে ভগবান সৃষ্টি করেছেন সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেদের কথা ভেবে! কেন, তা' তিনিই জানেন!...চিরকাল ভেবে এসেছি—যদি ও ছেলে বড় হয়ে আর একটু বুঝতে শেখে!...যদি আরও একটু বড় হয়ে নেংটিখানা গায়ে রাখতে শেখে!...এর চেয়ে বেশী আশা করিনি, বেশী চাইনি! কিন্তু আমার সে কথা কি ভগবানের কাছে পেঁছেচে? ..হাবুর বয়স হবার পর থেকে, বাড়ীর লোকেই যে একজন আর একজনের সম্মুখে, তাকাতে পারে না তার দিকে!...হে ভগবান! আমার চেয়ে আগে তুমি হাবুকে টেনে নাও! তখন আমার ছুটি। তখন আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই কর!...না না না! ছি ছি! এ আমি কি বলছি! মা হয়ে এমন কথা আমি ভাবলাম কি করে! দোষ নিও না, ভগবান; আমার কি এখন মাথার ঠিক আছে! ষাট্! সে যাবে কেন!......

...পটলাটা এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আমার মুখের দিকে; অথচ আমার মন উড়ে গিয়েছিল কোথায়!...ও বোধহয় বুঝতে পারেনি আমার মনের কথা!...

"মা, অমন করছ কেন? কি কষ্ট হচ্ছে?"

"হ্যাঁরে, সেটা গেল কোথায়?"

হাবু যে এল না, মায়ের কাছে এ কথা বলতে পটলার বাধে।

"আসবে এখনই খাবার জন্য নিশ্চয়ই। তখন দাদাকে নিয়ে আসব তোমার কাছে।"

"বাইরে এই প্রচন্ড রোদ্দুর! দেখেছিস নাকি সেটা কোথায় আছে?"

"না। বাড়ীতে এখন এত লোকজন—যত বাইরে বাইরে থাকে ততই ভাল।"

"কিন্তু মন মানে কই!"

হঠাৎ বাইরে যেন গাড়ীর শব্দ মনে হ'ল! এরই জন্য সকলে এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। খুব তাড়াতাড়ি পেঁছে গিয়েছে তো স্টেশন থেকে।

রেণু গাড়ী থেকে নামতেই মণির চাউনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল, এখানে আসবার জন্য।

রেণুর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মধুগঞ্জে যাবার পর থেকে রেণু একটু একটু করে বুঝেছে, মণির ব্যথা কত গভীর। দেখেছে সপ্তাহান্তে কবে শনিবার আসবে, কবে আবার মা ভাইদের কাছে যাওয়া যাবে, সে জন্য স্বামীর কি আকুল প্রতীক্ষা! লক্ষ্য করেছে মাইনে পেয়ে তখনই বাড়ীতে মণিঅর্ডার না করলেই নয়; শনিবার পর্যন্ত দেরী করবার তর সয়না। অস্পষ্টভাবে বুঝেছে সে, স্বামীর দোষী মন, তাড়াতাড়ি টাকা পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজছে। শনিবারে বাড়ী যাবার সময় মণি একবারও তাকে জিজ্ঞাসা করেনি সে, সেও সঙ্গে যেতে চায় কিনা। নিজেকে অতি ছোট, অতি হীন মনে হয়েছে তার সে সময়। পুরুষ-মানুষে মেয়েমানুষের মন কতটুকু বোঝে! সে সময় যদি মণি রেণুকে যাবার কথা বলত তাহলে বোধ হয় সে সঙ্গে যেত। একটা কেমন যেন সঙ্কোচে সে নিজে থেকে যাবার কথা বলতে পারেনি স্বামীর কাছে। মধুগঞ্জের বাসায় শনি, রবিবার রাত্রিতে একা থাকতে তার ভয় ভয় করে; তবু সে বলেনি।...

যে মহিলারা তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিতে এসেছেন তাঁদের রেণু জিজ্ঞাসা করল—"মা, এখন কেমন?"

"যাও, ঘরের মধ্যে যাও! মায়ের কাছে গিয়ে ব'স একটু! তারপর স্নান করে, তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নাও!"

ঘরে ঢুকবার আগে রেণু আবার একবার তাকালো মণির দিকে। ......কি কাতর মিনতি স্বামীর চোখে! সে চাহনি বলতে চায়—"তোমারই উপর সব নির্ভর করছে, রেণু! মায়ের স্বর্গ নরক দুটোরই চাবিকাঠি তোমার হাতে। তুমি কি ভুলে যেতে পারবে না সেদিনকার সেই ঘটনাটা? সে-ই রবিবারের দুপুরে তুমি যে ঘুমের থেকে হঠাৎ জেগে চেঁচিয়ে উঠেছিলে—দাদার হাতের মুঠোর চাপে ভয় পেয়ে! ভুল বুঝোনা তুমি দাদাকে! সে কি কিছু বোঝে! সে যে মাকেও অমনি করে হাতের মুঠোর চাপ দিয়ে আদর করে। দাদা যে অবুঝ শিশুর মত; দুবছরের ছেলের যে বুদ্ধি আছে, ওর যে তা'ও নেই! ওকে আবার ভয় কিসের? ওতো আজ পর্যন্ত কাউকে মারধর করেনি। মায়ের এই শেষ সময়ে তাঁর একটু তৃপ্তির জন্য, তুমি কি পার না মন থেকে মুছে ফেলতে সেইদিনকার কথাটা?".....

পটলা বাইরের লোকদের ঘরের মধ্যে ভিড় করতে বারণ করে। .....মা এখনও জানে না যে বউদি আসছে। মা আর বউদির মধ্যে এই অন্তিম বোঝা-পড়ার সময়, কোন বাইরের লোক যদি না থাকে, তাহলে ভাল হয়!.....বুক দুরু দুরু করে পটলার।

রেণু গিয়ে বসল শাশুড়ীর বালিশের পাশে।

"কে! বউমা!"

অবাক হয়ে গিয়েছেন হাবুর মা। রক্তহীন মুখখানি হঠাৎ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মোটেই তৈরী ছিলেন না তিনি এর জন্য। .....তাহলে টেলিগ্রাম করে আনিয়েছে বউ-মাকে। এরা কি কিছু বলে আমাকে! মরবার আগেই মড়ার সামিল করে তুলেছে! কোন কথা আমার কাছে বলে না ছেলেরা আজ কাল!.....

বউ একহাতে পাখাখানা তুলে নিল। আর একহাতে শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।

"থাক থাক বউমা! একটু জিরিয়ে, স্নান করে খেয়ে দেয়ে তারপর এস! এত দূর দেশ থেকে এলে! দেখি দেখি, মুখখানা এদিকে ফেরাও। দেখি কেমন চেহারা হল! কত দিন দেখিনি! সিঁদুর অমন ম্যাড়মেড়ে কেন? রেলগাড়ীতে এসেছ বলে? এই আমি বলে রাখলাম—সিঁথিতে সিঁদুর এমনভাবে দেবে, যাতে একেবারে যেন জ্বলজ্বল করে। নইলে কি মানায়? শুধু মুখখানা দেখা যাচ্ছে—চোখ ফেরাবার শক্তি যে আর আমার নেই! তক্তা-পোশের উপর উঠে এইখানে দাঁড়াতে, তবে না আমি তোমার সর্বাঙ্গ দেখতে পেতাম। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তোমার সারা গা দেখতে ইচ্ছা করছে! আমার যে নাতি! নাতি আসছে যে! কিন্তু হাত যে আমার পাথর হয়ে গিয়েছে! তুলতে পারি না। ......তোমার চেহারা এমন কেন? শরীরের যত্ন নাও না নাকি? না না, তাহলে কিন্তু আমি খুব বকে দেব। সেখানে, তোমার মা তোমাকে বকেন না? যেটা আসছে সেটার কথা মনে করেও তো শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। ......বোধ হয় ট্রেনে এসেছ বলে এমন

শুকনো শুকনো লাগছে। ......রাতে কি খেতে তুমি সেখানে? ......কত গল্প করতে ইচ্ছা করছে তোমার সঙ্গে! ওকি, তুমি কিছু বললে? বলো! বলো না! এরা সব রইল তো কি হল? একটুখানি বলো, আমি বুঝে নেব বাকিটা। ওকি, চোখ ছলছল করছে কেন? তোমাকে আমি দোষ দিইনি বউমা—একদিনের জন্যও দোষ দিইনি। আমি মেয়ে চিনি—দেখেই চিনে যাই। নিজে দেখে পছন্দ করে তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি এবাড়ীতে। তোমার কি দোষ? দোষ আমার কপালের। হাবুকে তো আমি ফেলে দিতে পারি না। তোমরা যেখানে থাক, সুখে থাকলেই আমার সুখ। ......যাকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তার কোন-না-কোন উপায় তিনি নিশ্চয়ই করে দেবেন! ......তোমার উপর বিরক্ত হতে যাব কেন! ......কিন্তু তবু—তবু একটা কথা বলি—তুমিও তো মেয়ে! ......হাবু যদি তোমার নিজের দাদা হ'ত, তা'হলে?"......

মায়ের চোখের ভাষা মণি, পটলা যতটা বোঝে, রেণু তা পারবে কেন। তবু শাশুড়ীর চোখের মৃদু অনুযোগটুকু ধরতে পারে। এরই উত্তর সে দিতে চায়; কিন্তু ভাষায় কুলায় না।

দোরগোড়ায় মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, হঠাৎ শেমিজপরা হাবু ঘরে ঢুকল। ......খুঁজছে কাকে যেন!...... অপূর্ববাবুদের গেটের কাছ থেকে সে দেখতে পেয়েছিল, সেই মাথায় কাপড় —মেয়েটার মত কে যেন গাড়ী থেকে নামল। তাই সে ছুটতে ছুটতে এসেছে। সেইদিনকার মত [illegible] হাবু একবারও থামেনি, একবারও পিছনে ফিরে চায়নি।

......দেখতে পেয়েছে!......ঠিক খুঁজে পেয়েছে!......ওই তো সেই অবাক-ঘোমটা-মেয়েটা! ......[illegible] দিয়ে সাজিয়ে [illegible]! ......[illegible]......

অমনি [illegible] [illegible] ছুটো করে পটলা চেষ্টা করল [illegible] কিন্তু কার সাধ্য [illegible] [illegible] [illegible] হঠাৎ মনে পড়েছে মায়ের কথা; সেও সে [illegible] মায়ের কাছে!

হাবুর বুকফাটা শব্দে মায়ের চোখের পাতা কেঁপে উঠল। ......না, ও কিছু না!...... মেয়েরা কি যেন ফেলল!......তাকিয়ে চললো না এরা কিছুতেই!...

হাবু এর পর কি কি করবে, সেকথা রেণু, মণি, পটলা তিনজনেরই নখদর্পণে।

মণি, পটলা, দুজনেরই অপলক দৃষ্টি রেণুর মুখের দিকে। ......[illegible] শব্দটা, সে মুখে ভয়ের সাড়া জাগাতে গিয়ে পিছিয়ে গেল! শুধু চোখের পাতা কাঁপছে। নিজের সত্তার সমস্ত দৃঢ়তাটুকু নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সে চেষ্টা করছে নিজেকে সামলে নেবার। এখনকার এই মুহূর্তটির গুরুত্ব সে জানে।

......শাশুড়ী তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে। ......ও যদি তোমার নিজের দাদা হ'ত!

......[illegible] অনুযোগভরা দৃষ্টি সে অনুভব করতে পারছে। ......স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তাদের অব্যক্ত মিনতি।

......রেণু পরে তুমি যা ইচ্ছা করো, যেমনভাবে ইচ্ছা চলো! শুধু এখন,—এই মুহূর্তে—মায়ের কথা ভেবে, আমাদের কথা ভেবে, একটা পরিবারের সব চেয়ে বড় সঙ্কটের কথা ভেবে, তুমি নিজেকে সংযত রেখো! ......ও যদি তোমার নিজের দাদা হ'ত! ......বউদি, তোমার চোখের মণিতে যেন ভয়ের ছাপ না থাকে! মা দেখছে। সাবধান! ভুরুর লেখায় যেন বিরক্তি না প্রকাশ পায়! দেখো, ঠোঁটের কোণে যেন ফুটিয়ে তুলো না বিদ্রুপের রেখাটি! দাদার কাণ্ডয় লজ্জা পেয়ো না! ......ও যদি তোমার নিজের দাদা হ'ত! ......বাইরের লোক থাকুকগে যাক; তারা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না; পাছে দেখতে পায় সেই ভয়ে আমরা দুজন তাদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তাছাড়া, এরা সবাই দাদাকে জানে; কেউ কিছু মনে করবে না। তুমি মনে জোর আন! লজ্জা পেয়োনা!...ও যদি তোমার দাদা হ'ত!...রেণু, এখন দাদার কথা ভেবো না! চেষ্টা কর অন্য কোন কথা ভাবতে; তাহলে মনে জোর পাবে। যে কোন অন্য কথা ভাবো!...চেষ্টা কর। পারবে! তুমি নিশ্চয়ই পারবে!

রেণু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে শাশুড়ীর চোখের দিকে। তিনি এখনও বুঝতে পারেননি কে এসেছে। মণি পটলা চেয়ে রয়েছে রেণুর দিকে, রুদ্ধনিশ্বাসে!...শান্ত, উদ্বেগলেশহীন, নির্ভয় তার মুখশ্রী।...ডান হাতের পাখাখানা বিছানায় রাখল, বাঁ হাতের আঙুলগুলো বার বার দিয়ে এল শাশুড়ীর মাথার চুলের মধ্যে; তার দুখানিকে রাখল তাঁর কপালের দুপাশে!...

সে চায় শাশুড়ী এখন যেন কিছু না দেখতে পান।

"আপনি একটু চোখ বুজে থাকতে চেষ্টা করুন। আমি বুড়ো আঙুলের উপর দিয়ে, চোখের চারদিক দিয়ে এমনি করে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দি—কেমন? আরাম লাগছে না?"

রেণু [illegible] এ প্রস্তাব শাশুড়ীর অপছন্দ। ...তার বাধা কিছুতেই কিছু করা গেল না!... তিনি চোখের পাতা বন্ধ রাখেন নি। আগেই সব দেখেছেন।...রেণুর পরীক্ষার চরম মুহূর্ত এসে গেল!...অবশ্য!

হঠাৎ মা চমকে উঠলেন। একি! ওদিকে আসছে আঙুলগুলো! এ আঙুল কি ভুল হবার জো আছে! অনেক দিন নখ কেটে দেওয়া হয়নি —কাটতে গেলে—[illegible] [illegible]... আঙুলগুলো বউমার মুখের দিকে এগিয়ে এল যে! শিউরে উঠেছেন তিনি।...আবার সেই কাণ্ড!...এরকমের মুহূর্তে!...শুধু তাঁর নয় —এ পরিবারের অন্য লোকেদেরও!...উদ্বেগ উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে এল সকলের!...এরমধ্যে হাবুর মুখ দেখতে পেলেন মা—আনন্দ বিহ্বল মুখ। সে মায়ের দিকে একবার তাকালও না। নিজের আনন্দেই বিভোর। তার স্থির লক্ষ্য সেই অবাক-ঘোমটা-মেয়েটার মুখের দিকে।...আজ অবাক-ঘোমটা-মেয়েটা পালিয়ে গেল না তো!, মাথার কাপড় বেশী করে টেনে দিল না তো!...তাই আজ আরও ভাল লাগছে হাবুর।

সংকটের এই তীব্রতম মুহূর্তে বউমার মুখের দিকে তাকাতে চাননা হাবুর মা।... জানেন, সেখানে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক আর

পাহাড়ী মন

অনপ্রভা ভাদুড়ী

সবুজ সাদা হরিদ্রা মেশা আকাশ গভীর নীল,
এ ত্রয়ীর মাঝে মানস মরাল অন্বেষি ফেরে মিল।
নৈরাশ্যের বিষন্নতার বন্যা বাষ্প দিয়ে;
হৃদয়ের মিল, আত্মার মিল, প্রণয় ও প্রেম মিশে
মিলনীভূত হয়। স্ফটিক তুষার তুহিন
হিমির তটে,
সুদূর উধাও উদাস পাহাড়ী মনের
পাঁচালি পটে।
দোলে ঝিরি ঝিরি, ঝরে ঝর ঝর, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি
বাতাস হিম,
সেখানে আমার অমেয় এষণা সীমিত
নভো নীলিম।
মনে মনে শুধু কুহেলী কল্পনা স্ফুরিত
কল্প রেণু
সুরভিত স্নিগ্ধ স্বর্ণ কুসুম মঞ্জুরিত তনু।
উদ্ঘুটে সব, শুধু ইঙ্গিতে সবই রহস্যাবৃত
কথার কনক ছল ছন্দের গুঞ্জন রণিত
প্রভাতী আকাশের পুষ্প স্ফুটনে বিকচ বর্ণরাগে
যে কথাটি তুমি বলেছিলে তার রূপলেখা জাগে।
কুহেলী শিল্পী কাল্পনিক মন কল্পনা কৌস্তুভ,
ফেনিল হাস্যে সম্মান করে সেই। পুষ্পের সৌরভ।
সেখানে আমার বাঁধা আছে সকল পরাণ মন
সোনার ঝরে পুঞ্জিত মেঘে বিদ্যুৎ নীল ঘন।
স্বর্ণালু তরু চকিত স্ফুরণে স্ফটিক
শেফালী বন,
ওরা ঘর বাঁধে অশ্রু ক্ষরণে একটি পাহাড়ী মন।

ঘৃণা!...হে ভগবান!...তবু তাঁকে দেখতেই হবে। ...কিসে যেন তাঁকে বাধ্য করাচ্ছে সেই দিকে দেখতে!...

নরকের অন্ধকার রুদ্ধনিশ্বাস-সুড়ঙ্গপথে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বউমার চোখমুখের দিকে।...একি দৃষ্টি!...ভয়, ঘৃণা, রাগ, কিছুর চিহ্নমাত্র নেই!...আছে শুধু উদার ক্ষমাশীলতা!...ভুরুটি পর্যন্ত কোঁচকানো নয়!... সেই ছেলের খুনসুড়ি সইবার হাসিটি ঠোঁটের কোণে ফুটে রয়েছে!... পারবে; পারবে...বউমা পারবে।...পারবে কি, পেরে গিয়েছে!...আর কোন দুঃখ নেই!...শুধু হাবুটা যদি একবার কাছে আসত; আর ওই রকম করে আমার গাটা যদি একবার চেপে ধরত!...যাকগে আমার বদলে বউমা সেটা পেয়ে গিয়েছে!...ওর নখগুলো কেটে দেওয়া উচিত ছিল!...

ঘুমে ভারী হয়ে আসছে চোখ। চেষ্টা করেও খুলে রাখা যাচ্ছে না। দরকারও নেই আর!... স্বর্গের মন্দিরের কাঁসর ঘন্টার শব্দ আসছে কানে!...

চোখের পথ বন্ধ; তাই ঠোঁটের কোণের রেখায় ফুটে উঠল স্বর্গের স্বাদ পাবার হাসি।

...একি! অবাক-ঘোমটা-মেয়েটা অমন করে কেঁপে উঠল কেন!...কেউ মারল নাকি?... তোমার লেগেছে?...না না লক্ষ্মীটি কেঁদো না!...

চতুষ্কোণ

ভাস্কর

মধ্য কালকাতার একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে হরিহর। দুইখানি ছোট ঘর, একফালি বারান্দা আর ছোট একটি রান্নাঘর। হরিহরের চাকরি সামান্য। কষ্টক্লেশে সংসার চলে। সংসারে আপাততঃ দুইটি প্রাণী, সে নিজে এবং তাহার নবপরিণীতা স্ত্রী। মাঝে মাঝে তাহার এক পিসিমা আসিয়া থাকেন দুই-চারিদিনের জন্য। স্থায়ীভাবে আর কেহ বাস করে না।

হরিহরের স্ত্রী অলকা অসামান্যা রূপসী। যেমন গায়ের বর্ণ, তেমনি চোখ-মুখের অপূর্ব শ্রী। একখানি লক্ষ্মীপ্রতিমার মতই সে হরিহরের অনটনক্লিষ্ট গৃহস্থালীর মধ্যে বিরাজ করে। পাড়ার লোকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যুবকেরা হরিহরকে হিংসা করে। বৃদ্ধেরা বলেন, আহা, এমন লক্ষ্মী মেয়ে, ভাল করে খেতে-পরতেও পায় না। রাজার ঘরে হলে একে মানাত। অলকা কিছুই গায়ে মাখে না। প্রাণপণে স্বামীকে সেবা করে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে। হয়তো মাসের মধ্যে একদিন একটা সিনেমা দেখিয়া আসে, কোন মাসে তাও হয় না। এজন্য তাহার মনে ক্ষোভ নাই। স্বল্পপরিসর জীবনের মাঝে অবরুদ্ধ তাহার কল্পনা পরম তৃপ্তিতেই রঙীন স্বপ্ন দেখে।

দারিদ্র্যের নিপীড়ন হরিহরকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। কখনই স্বস্তি পায় না। অথচ দারিদ্র্য দূর করিবার কোন সম্ভাব্য উপায়ও আবিষ্কার করিতে পারে না। সকাল ও সন্ধ্যায় অনেক দিনই সে চিন্তাভারাক্রান্তচিত্তে বসিয়া থাকে। অলকাকে সম্মুখে দেখিলে তাহার চিন্তা ও উদ্বেগ আরও বাড়িয়া যায়। অলকা বলে, কেন এত ভাব? হরিহর বলে, আমার জন্য কি আর ভাবি? ভাবি তোমার জন্য। অলকা অভিমান করিয়া বলে, আমিই বুঝি তোমার এত অশান্তি, এত দুর্ভাবনার কারণ? হরিহর কথার মোড় ঘুরাইয়া বলে, আহা, কি যে বল। এত দুর্ভাবনার মধ্যেও তুমিই যে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। অলকা বলে, আচ্ছা হয়েছে, এই নাও, কয়েকখানা নিমকি ভেজেছি আজ। ধর একটু, এখুনি চা নিয়ে আসছি।

একদিন বৈকালে হরিহর একখানি কাগজের পাতা উল্টাইতেছে। সহসা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল একটি বিজ্ঞাপন, ষাট বৎসর বয়স্ক মরণাপন্ন বৃদ্ধের জন্য যে কোন জাতের রূপসী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। অন্ততঃ ছয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি নূতন স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দিবেন। বক্স নম্বর ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া হরিহর বেশ একটু চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। খানিকক্ষণ চিন্তা করিবার পর অলকাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি নাকি ইস্কুলে আবৃত্তি, অভিনয় খুব ভাল করতে?

আর এখন সে কথা কেন?

একটু দরকারী কথা আছে।

আসছি। ভাতের ফেনটা গেলে রেখে আসি।

অলকা ফিরিয়া আসিল। হরিহর বলিল, একটু অভিনয় করতে পারবে?

অনেকদিন এসব করিনি। তবে একটু অভ্যাস করে নিলে পারতে পারি। কেন, কোথায় কিসের অভিনয় করতে হবে?

বলছি শোন।

আসছি, ডালে একটু জল ঢেলে দিয়ে আসি। নইলে ধরে যাবে।

অলকা ফিরিয়া আসিল। হরিহর বলিল, কিছুদিন এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে?

কোন্ নাটকে?

নাটক নয়। সত্যি সত্যি।

সে আবার কি?

হরিহর বিজ্ঞাপনটি অলকাকে দেখাইয়া তাহাকে বলিল, তুমি এই বুড়োটাকে যদি বিয়ে কর, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই ছ'লাখ টাকার মালিক হবে। তখন আবার তুমি আমাকে বিয়ে করবে। আমাদের সমস্ত জীবন বদলে যাবে।

কি, যা তা বল। কি হবে ছ'লাখ টাকা দিয়ে। বেশী টাকা মানেই বেশি অশান্তি। বেশ তো আছি। কিছুদিন পরে, তোমার মাইনে আরো কিছু বেশি নিশ্চয়ই হবে। কেন এসব লোভ [illegible] চোখের দিকে নজর দিচ্ছ। তাছাড়া, তোমার স্ত্রী হয়ে আবার অন্য একজনকে বিয়ে করব, কি ঘেন্না! তুমি ওসব আজেবাজে [illegible] ছাড়, [illegible]

অলকা ফিরিয়া আসিলে, হরিহর বলিল, তুমি একটু ভেবে দেখ। মাত্র ছ'মাস একটু অভিনয় করবে। তারপর টাকাটা হস্তগত হলেই—

যদি আমি আর না ফিরি?

তা কি হয় অলকা? তুমি একান্ত আমারই যে।

তা যাই বল, মেয়েমানুষ নিয়ে এসব খেলা খেলতে নেই। যারা এসব খেলা খেলে, তারা [illegible]

এসব সেকেলে কথা। ও সব কথা ভুলে মন ঠিক করে ফেল। আমি বিজ্ঞাপনের উত্তর দিচ্ছি কিন্তু।

ধর যদি আমি রাজি হই, আর পাত্রপক্ষও রাজি হয় তাহলে বিয়ের ব্যবস্থা কেমন করে হবে?

সেসব চিন্তা আমি ঠিক করব। তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এখন খুসি মনে মতটা দিয়ে ফেল।

অলকা বলিল, ভেবে দেখি।

(২)

অলকা ভাবিতেছে। তাই তো এ আবার কি উড়ো বিপদ! ওঁর মনের যে ভাব দেখছি, তাতে উনি একরকম ঠিক করেই ফেলেছেন। কিন্তু ছিঃ ছিঃ। স্বামীকে রেখে আবার আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে, মালাবদল হবে, তার একজন বরের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হবে। ছিঃ। কিন্তু যদি সত্যিই একটা অভিনয় বলে মনে করে

কোথাও না কাকাবাবু। ও'র শরীরটা কিছুদিন থেকে ভাল নেই কি না। এখানে আমার কি দুরবস্থা, তা তো স্বচক্ষেই দেখেছেন। তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি কিছুদিন বাগবাজারে ও'র এক দূরসম্পর্কীয়া পিসীর কাছে। তাঁর অবস্থা খুব ভাল, ছেলেপুলে নেই। যত্নেই থাকবে। কয়েক মাস থাকুক সেখানে, কি বলেন?

তা বেশ। এ অবস্থায় একটু বিশ্রাম, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া দরকার বৈ কি। তা বেশ। সব ভালয় ভালয় হয়ে যাক, তারপর আমাদের মিষ্টান্ন, হেঃ হেঃ।

হরিহর ও অলকা আর বিলম্ব না করিয়া সোজা বাগবাজারে কমলবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলবাবু অভ্যর্থনা করিলেন। কমলবাবুর স্ত্রী অসিতা ক'নেকে আদর করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহার দুইটি মেয়ে লতিকা ও বাণী, একজন অলকার চেয়ে বড় আর একজন ছোট। লতিকার বিবাহ হইয়াছে। তাহারা অলকাকে কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিল।

সন্ধ্যার সময়ে মেয়ে সাজান হইতেছে। বাণী ও লতিকার সঙ্গে পাড়ার দুই-একটি মেয়েও যোগ দিয়াছে। মেয়েকে সাজানর সময়ে পাড়ার একটি মেয়ে লতিকাকে একটু ইসারা করিয়া পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাণী এবং আর একটি মেয়ে তাহাকে সাজাইতে লাগিল। অসিতা এক একবার কাছে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল।

পাড়ার মেয়েটি লতিকাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আমার কিন্তু কেমন কেমন ঠেকছে।

কি হ'ল?

মেয়েটির যেন স্বামী আছে বলে মনে হচ্ছে।

যাও, কি যে বল!

সিঁথির পাশে একটু লাল দাগ দেখেছি। সিঁদুর মুছে ফেললে যেমন হয়।

ও তুমি ভুল দেখেছ।

বাঁহাতের একটা আঙুলে আংটির দাগ রয়েছে—একেবারে স্পষ্ট।

তাই নাকি? তা সখ করে হয়তো আংটি পরত, এখন খুলে রেখেছে।

তুমি যাই বল, কিছু একটা বিশ্রী ব্যাপার আছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছ না। ও নিশ্চয়ই কারো বউ।

যাই হোক গে, আমাদের সঙ্গে এই রাতটার সম্পর্ক। কোনরকমে কেটে গেলেই হয়। ভদ্রলোক এসে বাবাকে ধরে বসলেন, কোন স্থান নেই, উপায় নেই, অনাথা মেয়ে, যদি একটা বিয়ে হয়। তুমি আমাকে যা বললে, আর কাউকে কিছু বলনা যেন।

না, না। আমি কি পাগল নাকি? একটু পরেই বর এসে যাবে। এখন কোন গোলমাল করতে আছে।

উহারা ক'নের কাছে আসিয়া সাজানর কাজ শেষ করিল। মুখে চন্দনের নক্সা কাটা হইল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। ক'নে সাজান শেষ হইলে মেয়েরা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, কি চমৎকার! এমন একটা রূপসী লাখে একটা মেলে না।

বর আসিলেন। প্রায় নীরবে, নিঃশব্দে। গাড়ী হইতে নামিয়াই একেবারে বিবাহের আসরে। সেখানে সব প্রস্তুত ছিল। বিবাহ-অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গেল। এদিকে কমলবাবু পাশের একটা ঘরে দুই-তিনজন বরযাত্রী সহ আরো কয়েকজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া দিলেন। বরের সঙ্গী একজন বাদে আর সকলেই চলিয়া গেলেন।

বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হইলে বরকনে বাসরঘরে গেল। সেখানে লতিকা, বীণা আর পাড়ার চার-পাঁচটি মেয়ে ও বউ। কোনমতে নিয়মপালন করিয়া তাহারা সরিয়া পড়িলেন। যাইবার সময়ে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মেয়েটার কি পোড়াকপাল!

বাসরঘরে কি হইয়াছিল, আমরা জানি না তা। তবে অলকার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ছিল। কিন্তু সে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাহার অনুপম রূপলাবণ্য বৃদ্ধের মনে অমৃত সিঞ্চন করিতেছিল।

পরদিন সকালে এক কাপ চা ও খাবার খাইয়াই বরের একটি সঙ্গীর সঙ্গে বধূকে লইয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া বৃদ্ধ স্বগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিহর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরিয়া আসিয়া মুখ গোমড়া করিয়া বসিয়া রহিল।

(৪)

বরের বাড়ী প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আত্মীয়-স্বজন, লোক-লস্করে ভরা। বড় বড় ঘর। মার্বেল, মোজেইকের মেজে। দামী দামী আসবাবপত্র। বড় বড় আয়না। বধূবরণের পর্ব শেষ হইল। ভোজনাদি হইল। আত্মীয়-স্বজনের কলরবে বাড়ী মুখরিত। ফুলশয্যার রাত্রি পর্যন্ত প্রায় সর্বদাই একটা না একটা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ সব সমারোহ-সহকারেই সম্পন্ন হইল। ইতিমধ্যে হরিহর আসিয়া দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হিসাবে অলকাকে দাদুর বাড়ী দেখিয়া গিয়াছে। দেখা মাত্রই অলকার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে, কোন কথা বলিতে পারে নাই। বলিবার মত কথা কিছু বা আছে!

ফুলশয্যার আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ হইল। বর সদানন্দকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার নাতনি ও নাতবৌরা একটু রসিকতা করিল। তারপর দাদু তোমার বউ রইল, একটু দেখো-শুনো আমরা চললুম।

ঘর খালি হইয়া গেল।

অলকা মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা প্রকাণ্ড অভিনয় মনে করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, সবই তো হ'ল। এখন বুড়োটা শিগগির মরলে হয়। দেখে মনে হচ্ছে, দু এক মাসের বেশি বাঁচবে না। এরই মধ্যে দাদুবাবু প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

অলকা ধীরে ধীরে বরকে বলিল, সারাদিন নানারকম ঝঞ্ঝাট গেছে, খুব ক্লান্ত হয়েছ, এখন ঘুমিয়ে পড়।

ঘুম কি আর অমনি আসবে? ওই দেরাজটার মাঝে একটা কৌটায় কবিরাজের একটা ওষুধ আছে। এনে দাও তো।

অলকা ওষুধ আনিয়া দিল। ওষুধ খাইয়া বৃদ্ধ সদানন্দ একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অলকাও শুইয়া পড়িল।

পরদিন হইতে চলিল অলকার অভিনয়, রাত্রিদিনব্যাপী নানরূপ অভিনয়। নাতনিরা ঘিরিয়া ধরে, ঠাকমা, ঠাকুমা বলিয়া। পুত্রবধূরা, বউমা, বউমা, বলিয়া ডাকেন, আদর করেন, তাহার অসামান্য রূপের প্রশংসা করেন। দাস দাসীরা সাক্ষাৎমাত্র সমীহ করে, সেবাযত্নের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, পরোক্ষে একটু মুচকি হাসে। কেহ বলে, ও সিঁথির সিঁদুর আর ক'দিন!

সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রে আহারের কি ধুম! অলকা একটু একটু মুখে দিয়াও শেষ করিতে পারে না। বাড়ীর গৃহিণীরা, বৌরা নূতন 'বৌমাকে' লইয়া আজ এখানে, কাল সেখানে বেড়াইতে যায়। দু'এক দিন অন্তরই তাহারা বৌমাকে লইয়া সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। সদানন্দ সঙ্গে যাইতে পারেন না। তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না।

অলকা স্বামীকে সেবা করে অর্থাৎ সেবার অভিনয় করে। সময়মত ঔষধ দেয়, তৃষ্ণা পাইলে জল, সরবৎ প্রভৃতি দেয়, ফিট হইবার উপক্রম হইলেই নির্দিষ্ট ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে। কখনো মাথায় হাত বুলায়, কখনো পিঠ চুলকাইয়া দেয়, কখনো একটু পা টিপিয়াও দেয়। একটি দিনরাত্রের নার্স আছে। তাহাকে বেশি কিছু করিতে দেয় না অলকা। স্নান করান, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কয়েকটি কাজ সে করে। আর যখন অলকা বাড়ীতে থাকে না, তখন সে বৃদ্ধের পাশে বসিয়া থাকে। অলকা এক-একদিন হঠাৎ একটু-আধটু প্রেমের অভিনয়ও করিয়া ফেলে।

একদিন টেলিফোনে হরিহর অসিয়াছে সাক্ষাৎ করিতে। দু'একটি কথার পর হরিহর ফিস ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বুড়োর শরীর কেমন? আর কদ্দিন?

অলকা বলিল, শরীর যেন আগের চেয়ে একটু ভালর দিকেই মনে হচ্ছে। কি যে আছে কপালে জানিনে। হরিহর মুখ গম্ভীর করিয়া উঠিয়া গেল।

(৫)

হরিহর মাঝে মাঝে খবর নেয়। প্রতিবারেই শোনে সদানন্দ আগের চেয়ে বরং একটু ভালই আছে। কি মুস্কিল। সদানন্দের প্রতিবেশীরা বলে, বুড়োর কি বরাত! চন্দপ্রাণের সঙ্গে তরুণী ভার্যা পেয়ে আয়ু বেড়ে যাচ্ছে।

একদিন হরিহর আসিয়া অলকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা উইল-টুইল—

অলকা বলিল, হাঁ। সেদিন রাত্রে আমাকে কত আদর করে বললেন, তুমিই আমার প্রাণ। আর যা সব দেখছ বাড়ীতে ওরা কেউ নয়। আমি আমার চারলাখ টাকা উইলে শুধু তোমাকেই দিয়েছি। বুড়োর সে কি আকুতি! এক একদিন পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় যখন অস্থির হয়ে ওঠেন, তখন ডাক্তারের ঠিক-করা একটা ঔষধ খেতে দিই। সেই ঔষধ খান আর বলেন, অলকা আমার সামনে বস। তোমাকে দেখলে আমার অর্ধেক ব্যথা কমে যায়।

হরিহর বলিল, তুমি কি বল?

আমি অভিনয় করে বলি, তোমার ব্যথা, টাথা সব সেরে যাবে আমি কাছে থাকলে।

সব সেরে যাবে?

সত্যিই যাবে নাকি! অভিনয়, সব অভিনয়!

হরিহর বাড়ী গিয়া ভাবিতে বসিল। অলকার অভিনয় সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সংশয় নাই। কিন্তু বুড়োর খবর তো সুবিধার নয়। ক্রমে ভালর দিকেই যাচ্ছে!

হরিহর কয়েকদিন খুবই চিন্তা করিল। সে মনে করিয়াছিল, দু'এক মাস মধ্যেই ছক্কা

টাকা হাতে আসিয়া যাইবে, কিন্তু একি হইল। বুড়ো মরে না কেন?

আরো কয়েকদিন গভীর চিন্তার পর হরিহর কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিল, প্রচুর অর্থের অধিকারিণী বাহাত্তর বৎসর বয়স্কা মরণাপন্না বৃদ্ধা পাত্রী আবশ্যক। জাতিবিচার নাই। বক্স নম্বর ইত্যাদি।

এরূপ বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিবে, একথা কেহই কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন। কয়েকদিন পরে সত্যই উত্তর আসিল। হরিহর ব্যগ্রচিত্তে উত্তরটি পড়িয়া ফেলিল—

'মহাশয়। আমার বয়স বাহাত্তর, মরণাপন্না বিধবা। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ছ'লাখ টাকার কম হইবে না। একটি ভয়ঙ্কর ভাইপো আমাকে ভীষণ জ্বালাতন করিতেছে। যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে বিবাহ করিয়া আমাকে বাঁচান। আমার সব সম্পত্তি আপনাকে উইল করিয়া দিয়া যাইব।'

চিঠি পাইয়াই হরিহর পত্র লিখিয়া সম্মতি জানাইল এবং কয়েকদিন পরে গিয়া একেবারে পাকা দেখা শেষ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা কমলিনীর পক্ষে তাঁহার একজন অ্যাটর্নি সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা কেহ কেহ বিরক্ত হইলেও স্পষ্টভাবে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

স্বল্প সমারোহে বিবাহটি সম্পন্ন হইল। বাসরঘরের মেয়েদের মধ্যে নাতনিস্থানীয়ারা বেশ একটু মুখরা হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতেই স্থির হইল, জামাই নিজ বাড়িতে ফিরিবে না। স্ত্রীর বাড়ীতেই ফুলশয্যা হইবে এবং অতঃপর হরিহর এখানেই স্থায়ী-ভাবে বাস করিবে। ফুলশয্যার রাত্রে যখন সকলের আহারাদি শেষ হইয়াছে, তখন কমলিনীর আহারের আয়োজন হইল। বহুকাল অনভ্যাসের পর মাছের মুড়ো খাইতে গিয়া গলায় একটা বিষম খাইয়া স্থির হইলেন। তাঁহার অপরূপ সাজ, সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় জড়োয়া হার, মুখে চন্দন, প্রভৃতি দেখিয়া সকলেরই মনে একটা অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। একটি মেয়ে বলিল, সাতাশের পাশে বাহাত্তর মানিয়েছে বেশ! দুটি সাত আর সাত দুটি, প্রায় একই তো! হরিহর মনে মনে বলিতেছে, যাক না কটা মাস, ছ'লাখ টাকা ট্যাঁকে করে যখন উধাও হব, তখন দেখবে মজাটা! হরিহরও বেশ একটু খুশি খুশি ভাব অভিনয় করিয়া ফেলিল।

সকলে বাসরঘর হইতে চলিয়া গেলে কমলিনী বলিলেন, ওই দেরাজের মধ্যে আমার আফিমের কৌটোটা এনে দেবে?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলিয়া হরিহর আফিমের কৌটা আনিয়া দিল। একডেলা আফিম খাইয়া কমলিনী বলিলেন, সারাদিন বড় ঝঞ্ঝাট গেছে, এখন একটু ঘুমোই। অন্য কথাবার্তা কাল হবে, কেমন?

হরিহর বলিল, কমলিনীরা তো ঘরে ঘুমিয়েই থাকে।

ফিক করিয়া একটু হাসিয়া কমলিনী বিছানায় গড়াইয়া পড়িলেন।

(৬)

হরিহর একদিন গিয়াছে অলকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে। দেখা হইবামাত্র অলকা বলিল, তুমি নাকি এক বুড়ী বিয়ে করেছ?

ও কিছু নয়। শুধু একটা অভিনয়।

অভিনয়?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। নইলে বাহাত্তর বয়সের বুড়ীকে কেউ বিয়ে করে নাকি? ছ'লাখ টাকা উইল করে দিয়েছে। একবার চোখ বুজলেই ছ'লাখ টাকা পকেটস্থ করে উধাও! বুঝলে?

তাহলে আপাততঃ দু'জনেরই অভিনয়ই চলুক।

আর উপায় কি?

উপায় নেই সে তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু—

কিন্তু আর কি? কটা মাস বই তো নয়। সদানন্দ ভালর দিকে যাচ্ছেন বলে, কত ভাল আর হবেন? কোনদিন একটা ফিট হতে হতেই হয়তো তোমার মুক্তি হয়ে যাবে।

তোমার বুড়ীর খবর কি? কতদিন আর বাঁচবেন বলে মনে হয়?

ঠিক বুঝতে পারছিনে। সেদিন বলছিলেন, তোমাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার শরীর অর্ধেক ভাল হয়ে গেছে! তুমি কাছে থাকলে আমি একেবারে সেরে উঠব।

বেশ, সুসংবাদ। সারাজীবন তবে অভিনয়ই চলবে?

হরিহর বলিল, কিছু না। আমার এখনও বিশ্বাস আর কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা মুক্তি পাব।

এ যে নিজের হাতে বোনা জাল। সহজে ছিঁড়বে কি?

ছিঁড়বে, ছিঁড়বে। ও কথা থাক। আচ্ছা, সদানন্দ তোমাকে টাকা-পয়সা খুব দেয় নিশ্চয়ই। দিতে পার কিছু তার থেকে?

অলকা বলিল, সে গুড়ে বালি। পান-দোক্তা বাবদ মাসে আড়াই টাকা বরাদ্দ আছে। তার বেশি নয়। উইল প্রোবেটের আগে আর একটি ফুটো পয়সাও নয়। কেন, তোমার নতুন গিন্নী তোমাকে দু'চার হাজার টাকা দিয়ে দেয়নি?

আর বোলো না। সিনেমা-থিয়েটার বাবদ মাসে পাঁচ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর পরে আর একটি পয়সাও নয়। বুঝতে পারছ না, যারা টাকা দিয়ে মানুষ কিনতে জানে, তারা টাকার হিসেব রাখতেও জানে। এরা তো আর মাস্টার কেরাণী নয়, যে মাইনে পেয়ে দশ টাকার [illegible] কিনে ফেললে, এদিকে বাজার দেনা মাইনের চেয়ে বেশি।

কেরাণীই তো ছিলে। কেন হল এ দুর্মতি?

হরিহর সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা কেন ব্যস্ত হচ্ছ, দেখাই না কটা মাস। একটু অভিনয় বই তো নয়।

এমনি কথা প্রায়ই হয়। কিন্তু কোন সমাধান হয় না। দুজনেই অত্যন্ত ব্যাকুল। এমন করিয়া কতদিন চলে? অলকা লক্ষ্য করিতেছে, সদানন্দর শরীর ক্রমশঃই ভাল হইতেছে। অনেক উপসর্গ কমিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি আদরের মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কারণ, অলকাই তাহার স্বামীর দীর্ঘ আয়ুর কারণ। ওদিকে বৃদ্ধা কমলিনী শাড়ী গহনা পরিয়া দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। মৃত্যুর লক্ষণ দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে।

(৭)

একদিন হরিহর অলকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অলকা বলিল, বুড়োটা অবশ্য খুবই বুড়ো, কিন্তু লোকটা খুব খারাপ নয়।

হরিহর বলিল, আমার বুড়ীটাও অবশ্য খুবই বুড়ী, কিন্তু মানুষটা নেহাত মন্দ নয়।

সত্যি, খুব আদরযত্ন করে। একটুখানি চোখের আড়াল হলে যেন ছটফট করতে থাকে।

বুড়ীটাও তাই। কেবলই বলে, বসো, আমার কাছে, বসে গল্প কর। আর বলে, এই যে বাড়ী-ঘর, ছেলে-মেয়ে, বউমারা, নাতিরা, নাতনীরা, সব তো তোমারই। আমি চোখ বুজলে এদের নিয়ে তুমিই তো ঘর করবে। সামলে-সুমলে চল।

আমার বুড়োটাও ঠিক অমনি সব কথা বলে। বলে, আমি শুধু টাকাই তোমাকে দিয়ে যাব, তা তো নয়। এই সব ছেলে-মেয়ে, জামাই, বউ, সবই তোমার। কাঁচা বয়স, সাবধানে থেকো, ধর্মে মন রেখো, শ্বশুরকুলের মান রেখো, আরো কত কি? আচ্ছা, বুড়ীটা যখন তোমাকে ওই সব কথা বলে, তখন তুমি কি বল?

কি আর বলব? চুপ করে থাকি। তুমি তোমার বুড়োকে কি বল?

কি আর বলব? অনেক সময়ে চুপ করেই থাকি। তবে মাঝে মাঝে এক একদিন অভিনয় করে বলি, নিশ্চয়ই, খুব ভালভাবে থাকব, শ্বশুরকুলের মান রাখব।

হরিহর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদানন্দকে 'তুমি' বল, না 'আপনি' বল?

অলকা বলিল, এতদিন 'আপনিই' বলতাম। কাল থেকে 'তুমি' বলছি। হাজার হোক, স্বামী তো?

আমিও কমলিনীকে এখন 'তুমিই' বলি। 'তুমি' শুনে বুড়ী ভারি খুসী।

তা খুসী না হবেন কেন? অমন পঁয়তাল্লিশ বছর ছোট বয়সের স্বামী পেলে সবাই খুসী হয়।

তোমার বুড়োও নিশ্চয়ই বাহান্ন বছর ছোট বয়সের কনে পেয়ে একেবারে গলে গেছেন?

তা গেছেন বৈ কি?

আচ্ছা তুমি গলে যাওনি তো?

মশায়ের খবর কি? নাতি নাতনিরা সব ছেঁকে ধরেনি?

আচ্ছা, ওসব কথা থাক। একটু কাজের কথা বলি। দেখ, ব্যাপার যা দেখছি, তাতে ও'দের মরবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখন একমাত্র উপায়, উইলে ও'দের সই করিয়ে নিয়ে, আর সেই উইল দুটো হস্তগত করে সরে পড়া।

অলকা বলিল, তারপর?

তারপর, আমাদের বিরহে ও'দের অসুখ নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে। সদানন্দর ঘন ঘন ফিট হবে। কমলিনীর ভাইপোর দৌরাত্ম্য ভীষণ বেড়ে যাবে। সুতরাং ও'দের আয়ুও ফুরিয়ে যাবে। ও'দের মৃত্যুসংবাদ পেলেই আমরা আবার ভেসে উঠব, বাড়ী ফিরব উইলের প্রোবেট নিয়ে—ব্যস্, দুজনে সরে পড়ব।

অলকা বলিল, ছেলে মেয়ে, নাতি-নাতনিরা যদি না ছাড়ে?

ছাড়বে না বললেই হ'ল। ছাড়াতেই হবে।

ব্যাপারটা কিন্তু খুব বিশ্রী হয়ে যাবে। বিয়ের পর দু'চার মাস মধ্যে যা হোক একটা হয়ে গেলে, কথা ছিল না। কারো সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হত না। কিন্তু এতদিন পরে, ও'দের

(ইহার পর ৭৯ পৃষ্ঠায়)

অজিতা

দেবেশ দাশ

হঠাৎ অজিতাকে নাচতে দেখে সুজিত চমকে উঠল।

এখানে? প্ল্যাক্‌স্‌ অর্থাৎ মেয়েদের প্যান্টালুন পরা থোড়াই কেয়ার করা সাজে? সিমলা পাহাড়ে মেরানি রেস্তোরায় মিলিটারিদের ভিড়ে?

ভাল করে একবার চোখ কচলিয়ে নিল সুজিত। না, কোন সন্দেহই নেই। এ অজিতা না হয়ে যায় না। এ মূর্তি যে মনের মধ্যে আঁকা আছে। অজিতার অরুণ বরণী স্মৃতি বেদনায় নীল হয়ে আছে। কিন্তু...কিন্তু...।

কিন্তু, কিন্তুর উত্তর ত আর শুধু আন্দাজে মেলে না। একবার এগিয়ে যাবে না কি সুজিত ওর কাছে? ওর টেবিলে গিয়ে যদি হাজির হয় তাহলে কেমন হয়? সম্ভবত সে টেবিলে অন্য যারা বসেছে তাদের সংগেই অজিতা এখানে নাচতে এসেছে। তাদেরই নিমন্ত্রণে। সেখানে বিনা পরিচয়ে বা বিনা অনুমতিতে ত আর সে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে পারে না।

যেন এমনি অকারণে চারদিকে সে নজর ছড়িয়ে দিতে লাগল। এক দৃষ্টে কোন বিশেষ দিকে তাকান যে একেবারে অসভ্যতা। কোন দিকে কৌতূহল দেখান বা মনোযোগ দেওয়া এ রকম প্রকাশ্য জায়গায় বিলেতী শাস্ত্রমতে একেবারে অচল। তা ছাড়া অন্য লোকে তাকে বাংগাল ভাবতে পারে। কাংগাল ত বটেই। তার পরনে ফিটফাট মিলিটারী পোষাক; কাঁধে জ্বল জ্বল করে শোভা পাচ্ছে একটা রাজ-মুকুট। মেজর সুজিত এখন সংসারে সবার মাঝখানে বুক ফুলিয়ে চলে। সে এখন চেষ্টা করলেও হ্যাংলাভাবে নৃত্যপরা কোন মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না।

যার সংগে অজিতা নাচছে সেও একজন মিলিটারি অফিসার। আচ্ছা, এর সংগে অজিতার কতটা পরিচয় আছে? ভাব বা মাখামাখি কতখানি? পাইপটা মুখে দিয়ে যেন আনমনেই সুজিত চারদিকে তাকাতে লাগল। অবশ্য কাউকেই সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে না।

চা খাবার সময়েও নাচা চাই। সিমলা যুদ্ধের বাজারে একেবারে সরগরম। এ যাত্রা ইংরেজরা আবার টিকে যাবে মনে হচ্ছে। রাশিয়া থেকে জার্মাণরা হঠে আসছে। বর্মায় মিত্র পক্ষ দিচ্ছে পাল্টা হানা। মিলিটারী অফিসাররা যুদ্ধের মধ্যেই কয়েকদিনের জন্য ছুটি পাচ্ছে আর দেশের নানা জায়গায় 'হলিডে হোমে' ছুটি কাটাতে আসছে। সিমলাতেও এমনি একটা বড় আড্ডা আছে। ওদের ছুটি কাটানর প্রোগ্রামে নাচ, অকারণে সময়ে অসময়ে নাচ একটা খুব বড়ফুর্তির খোরাক। যুদ্ধে ফিরে গেলে যে কোন সময়ই ত জাপানী গুলীতে হয়ে যাবে খতম। অন্তত বর্মার সবুজ নরকে অর্থাৎ মারাত্মক জংগলে। তার আগে—আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে?

তাই রজনী সুরু হবার আগেই নাচ সুরু হয়েছে। সেই চায়ের সময় থেকেই। মেরানি রেস্তোরাঁ একেবারে জমজমাট। কোন টেবিলেই খালি চেয়ার নেই একটাও। নাচের শেষে অজিতা আর তার সংগী মিলিটারী যে টেবিলে এসে বসল সে টেবিলের অন্য দুজন মিলিটারীর সংগে একসংগেই ওরা এসেছিল কি না ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য কথাবার্তা সকলের সংগেই সমানভাবে কইছে। হাসছে হো হো করে। সোডার বোতল যেন উপচে উঠছে। অথবা হাসি-ঠাট্টার তুবড়ী। দূর থেকে তার ফিনকিগুলো সুজিতের আঁধার মনে আলো জ্বালিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আলো, না, আগুন? সে কথা ভেবে দেখবারও সময় নেই এই নাচের হুড়োহুড়ে।

এই অজিতাকে নিয়ে সুজিত দেখেছিল স্বপ্ন আর অজিতা সেজন্য শুধু হেসেছিল। আজো অজিতা হাসছে।

নাচের বাজনা আবার বেজে উঠল। একটা বেশ পুরানো ফক্সট্রট নাচের গান আর বাজনা। অর্কেস্ট্রার সামনে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিঙ্গি গায়ক গাইতে লাগল "ষ্টরমি ওয়েদার"। ঝড়ো আবহাওয়া।

বুকে ঝড় নিয়ে সুজিত দৃঢ় পদক্ষেপে অজিতাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ওর সংগে সে নাচতে চাইবে। নাচ মানে নাচ নয়। সত্যি কথা বলতে কি সুজিত নাচতে জানে না। মিলিটারীতে ঢুকেও শেখেনি। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে যেখানে ছেলেরা মেয়েরা ঠাসাঠাসি ধাক্কাধাক্কি করে ঘুর ঘুর করে ঘুরে যাচ্ছে, সেখানে নাচের নাম করে যদি অজিতাকে ডেকে নেওয়া যায় তাহলে কে আর সেটা বুঝতে পারবে? হায়! সভ্যতার কত যে দায়।

আমি আপনার সংগে এই নাচটার সৌভাগ্য পেতে পারি কি মিস্‌?

অজিতা চমকিয়ে উঠল। হঠাৎ চিনতেই পারল না। যার সংগে এইমাত্র নেচে এসেছে তার দিকে একবার তাকাল। ওর ইতস্তত ভাব দেখে সুজিত সেই মিলিটারীটির দিকে লক্ষ্য করে জুড়ে দিল,—অজিতা আর সুজিত বহু দিন আগেকার কলেজের বন্ধু। হঠাৎ দেখতে পেলাম। তাই আপনাদের মাঝখানে এসে বিনা পরিচয়ে ঢুকে পড়লাম। কিছু মনে করবেন না।

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল অজিতা। বলল,—না, না, এতে কারো কিছু মনে করবার নেই। ইউ আর ওয়েলকাম। তারপর বাংলায় বলল—চলে এসো।

চলে ত এলো ওরা। কিন্তু নাচের সঙ্গিনীকে কোন্‌ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয়? আর কোন্‌ হাত দিয়েই বা তার হাতখানা তুলে ধরতে হয়? বোকা বনে যাচ্ছিল সুজিত। কতদিন নাচ দেখেছে। ঠিক বাইরে সিঁড়ির ধাপ থেকে মন্দিরের ভিতরে দেবতা দেখার মত। কাজেই ঠিক মত খেয়ালও করেনি। ওর ইতস্তত ভাব দেখে অজিতাই ঠিক মত হাত এগিয়ে দিল। নাচের ভঙ্গিতে পা চালিয়ে নিজেই সুজিতের পা চালানকে নিয়ন্ত্রিত করে একটা কোণায় সরে এল। মাথা নেড়ে বলল—নাঃ, তুমি সেই সুজিতই রয়ে গেছ। কিস্‌সু হলে না তোমার। ইউনিফর্মটাই মাটি।

—তা হোক। কিন্তু তোমার সংগে অনেক কথা আছে।

—সে ত বুঝতেই পারছি। না হলে আর অতগুলো অচেনা লোকের মাঝখানে আমায় হাওয়া করে আন?

—উপায় ছিল না। কিন্তু আমায় একটু সময় দাও। অনেক কথা আছে।

হেসে ফেলল অজিতা। বলল—এই ভিড়েই ত কথা বলার সব চেয়ে সুবিধে। কেউ কারো কথা শুনতে পায় না।

সুজিত রাজী হল না,—না, এত বাজে ভীড়ের মধ্যে নয়।

অজিতা আবার হাসল—খুব কাজের কথা বুঝি তোমার? তা হোক। নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলে লোকে মনে করতে পারে যে, এরা প্রেমে পড়ে গেছে।

বলতে বলতে অজিতা ঘাড় বাঁকিয়ে এমন-ভাবে হাসল যে সুজিত উসখুস করতে লাগল। নাচঘরের কোণে এক রাশ টুপি, ছাতা প্রভৃতি জড়ো করে রাখার জন্য যে প্রকাণ্ড "গাছ" সাজান আছে—তার আড়ালে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসলে লোকেই বা কি বলবে।

শেষ পর্যন্ত বলল—বেশত, প্রেমে কখনো পড়তে পারি না এমন ভাব দেখিয়েই এসো, আমার টেবিলে বসবে।

—না, তা হয় না। বন্ধুদের সংগে এসেছি যে।

—আমিও একজন পুরোনো বন্ধু বলে ধরে নেবে ওরা। যাই, আমিই ওদের তোমার হয়ে বলে আসি।

"ডোণ্ট্‌ বি সিলি।" অজিতা খপ করে

ওর হাত ধরে বাধা দিল। এ হেন বোকামি করা উচিত নয়।

তবে?—আধুনিক হালচালে কি করা যে স্মার্ট ও বুদ্ধিমানের মত হবে তা বুঝতে না পেরে সুজিত শুধু প্রশ্ন করল,—তবে?

—চল, ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এক টেবিলেই বসা যাবে।

—চল, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা আছে। আজ রাতে ডিনারে এস আমার সঙ্গে।

(২)

সেদিনও অপরাজিতার চোখ ছল ছল করে উঠেছিল।

এম, এস, সি পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। অপরাজিতা খুব ভাল পাশ করেছে। আর সুজিতও। কিন্তু পাশ করেই ওরা ভাবনায় পড়েছে। এবার কিছু একটা ত করতে হবে।

অপরাজিতার ভাবনা এই যে, আর ত স্কলারশিপের টাকা ভরসা করে খাওয়া-পড়া

হাওয়ার উপর তোমার এই নয়া কেল্লা বানিয়েছ বোধ হয়।

সুজিত অনেক ভেবে চিন্তেই নতুন নামটা বের করেছিল। বলল—সত্যি তাই, তবে হাওয়ার উপর নয়, শক্ত পাথুরে মাটির উপর। তুমি আর আমার পর থাকবে না, তাই তুমি অ-পরা। অর্থাৎ আর পর নয়। একেবারে একান্তভাবে আমার।

বাঃ। তোমার এই সহজ পথটা আবিষ্কার

ইউ স্ট

—না, আমার এখন [illegible] চেহারা বড় দেখলেও শুনে শুনে 'অফিসার' বলতে হয়। তার দশটার পর বেতিয়ার অফিসের কাছে 'যাবো' অপেক্ষা করো। এক সঙ্গে হেঁটে ফেরা যাবে।

একসঙ্গে ওরা ফিরে এল অফিসার্স মেসে। শর্মিষ্ঠা এবার ওদের সবাইকে সুজিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনজনেই অবাঙালী মিলিটারী অফিসার।

একজন একটু তেরছা হেসে প্রজাপতি ধাঁচের গোঁফের রেখা চুমড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—আপনি বোধ হয় দিল্লীতে ছিলেন, এইচ. কিউ দপ্তরে আছেন? কোন্ "ব্রাঞ্চ" অফিসে কলম পেয়েছেন?

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে সে অজিতাকে প্রশ্ন করল,—জান না কি, জি?

জি অর্থাৎ অজিতা। একটা অর্থহীন ইংরেজী অব্যয় শব্দ। কিন্তু পেয়ারের ডাক নাম।

মুখ লাল হয়ে উঠল সুজিতের। খুব সংক্ষেপে বলল,—[illegible] ছুটে। মিলিটারী ক্রস পুরস্কার নেবার জন্য আমায় দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়েছিল।

ওঃ। মেজর এস, চাটুজ্জে এম, সি তা হলে এই শাদামাঠা নিরেমিষ্যি বাঙ্গালী। জোঃ।

তিনজনেই এক জোটে পাইপ ধরানতে মন দিল।

চারদিক চুরুট সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা। তার পাশের পাহাড়ের খাদ থেকে অনবরত কুয়াসা উঠে নাচ-ঘরটাতে বাসা বাঁধছে। সে জন্যেই জি'র চোখ ছল ছল করে উঠেছে না কি?

চলবে না। গরীবের মেয়ে। কিন্তু মাথার জোরে চালিয়ে এসেছে পড়া শুনো। এবার নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নিতে হবে। ভবিষ্যৎটা কি? বিয়ে? তা হলে এত কষ্ট করে পড়াশুনো করলাম কেন? তবে মাষ্টারী? ছিঃ, সে ত আরো অধম। অর্থাৎ দারিদ্র্য আর অস্তিত্ব-হীনতার সঙ্গে বিয়ে। নীরস খোড়-বড়ি-খাড়ার সনাতন মার্কা চাপে যৌবনকে আশা-আকাঙ্ক্ষা সমেত পিষে ফেলা। না, নতুন কোন ভাবে নিজের পথ করে নিতে হবে। "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।" অন্তত একটু হাত পা ছড়িয়ে জীবনযাত্রা।

সুজিতেরও সেই ভাবনা। যুদ্ধ প্রায় লাগে লাগে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু তার নিজের মনে আছে সাহস। বেপরোয়া বেহিসেবী সাহস। তারই জোরে সে সহপাঠিনীর কাছে প্রেম নিবেদন করতেও পেছোয়নি। কিন্তু কলেজে রোজ দেখা হবার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তা এবার ছিঁড়ে যাবেই যদি আর কোন সম্বন্ধ না গড়ে ওঠে।

অপরাজিতা আর সুজিত।

ওদের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ তৈরী হবে সে সম্বন্ধে অন্য সহপাঠীদের কোন সন্দেহ ছিল না। সুজিতের নিজেরও নয়।

তাই সে সেদিন খুব উল্লাস দেখিয়ে বলল—অপরা, এবার কেল্লা মেরে দিয়েছি। আর কোন ভাবনা নেই।

অপরাজিতা হেসে ফেলল—বেশ ত একটা নতুন নাম বের করেছ আমার। কিন্তু তোমার কেল্লা জয় ব্যাপারটা খুবই সহজ। শুধু

করবার জন্য অভিনন্দন করছি। এম, এস, সি পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিনা মেহনতে ডক্টরেটও হয়ে গেল। শুধু নামাবলীর জোরেই তোমার স্বর্গলাভ হবে।

হবেই ত। আমাদের দুজনের সংসারে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল অপরাজিতা। বলল,—তার মানে...তার মানে...

খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে সুজিত বলল—তার মানে হচ্ছে যে আমি বেলুচিস্থানে চাকরী পেয়েছি। লুচি-পোলাও না হোক ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে দুজনের মত। আকাশে নয়, মাটিতেই। ওখানে সরকার থেকে সালফার মাইন খুলছে। যুদ্ধ বাধলে এদেশে আর গন্ধক চালান আসবে না।

একটু শক্ত হয়ে উঠল অপরাজিতা—ওঃ, সেই জন্যেই অপরা বলছ। কিন্তু বন্ধু হিসেবে আপন হলেও সংসারে যে অপরা হব সে কথা ত কখনো ওঠেনি।

—এই ত ওঠালাম। আজকের বন্ধু আগামী দিনের বধূ হবে।

চুপ করে রইল অপরাজিতা। অনেক ক্ষণ। অনেক কিছু ভাবল মনে মনে। সুজিত শুধু তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তা-ও চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। কি জানি, তাতে আছে কি বাণী। মুখ ফুটে যে বরণ করা যায় না, চোখ দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শেষ পর্যন্ত অপরাই নীরবতা ভাঙ্গল। বলল,—তোমার সাফল্যের দিনে আমারও কত আনন্দ হবার কথা। [illegible] চাকরী পেয়েছ,

নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছ, মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছ। আমার কত আনন্দ। তবু সত্যি কথা আমায় বলতেই হবে তোমাকে।

সুজিত অস্থির হয়ে উঠল। যখন দুজনেই চুপ করে ছিল তখন ছিল না কোন চঞ্চলতা। কিন্তু এখন আর নিজেকে সে সামলাতে পারল না। বলল,—অর্থাৎ, তুমি আর কাউকে ভালবাস?

খুব স্থিরভাবে উত্তর দিল অপরা,—তাহলে কি তুমি জানতে না?

—হয়ত জানতে পারিনি। হয়ত তুমি জানাতে চাওনি।

—তুমি রেগে গেছ সুজিত। তোমায় জানাব না, তোমায় ঠকাব এ কথা তুমি ভাবতেও পারছ?

সুজিত উঠে এসে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল,—পারছি না। তাই ত বলছি তুমি ধরা দাও, হও আমার অপরা।

মাথা নেড়ে অপরা উত্তর দিল,—তা হয় না সুজিত। তা হয় না। সে-ই বিয়ে করে ঘর-সংসার করে জীবন কাটিয়ে দেবার জন্যেই এত কষ্ট করে, এত চেষ্টা করে লেখাপড়া শিখিনি। নীল আকাশে পাখী উড়তে শিখে—সে ত শুধু খড়-কুটোর বন্দোবস্ত করবার জন্য নয়। নীল আকাশে স্বাধীনভাবে ওড়ে।

—কিন্তু নীড়ও রচনা করে।

—করে, কিন্তু শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্য। জীবন ভরা নিগড় গড়ে না।

—ঘরকে নিগড় মনে করছ কেন? মানুষের রাতের আশ্রয়, দিনে বিশ্রাম, প্রাণের প্রয়োজন সে সবই কি বন্ধন?

হেসে ফেলল অপরা। বলল,—সে সব তোমরা পুরুষরা বুঝবে না। বিয়েকে যে সত্যিই বলে উদ্বাহ বন্ধন। হাতে হাত দিয়ে চলা যখন পাণি গ্রহণে দাঁড়ায় তখন সেটা যে হাতকড়া হয়ে ওঠে তা তোমরা বুঝবে না।

সুজিত সে কথা মানল না,—কিন্তু তোমার আগে আরো কত বাঙ্গালী মেয়ে, ইয়োরোপের চেয়ে অনেক শিক্ষা পেয়ে, চোখ চারদিকে খোলা রেখে বিয়ে করেছে, ঘর-সংসার করেছে। তারা কি তোমার চেয়ে কম স্বাধীনতা উপভোগ করেছে?

অপরা বলল,—ইয়োরোপের মেয়েদের কথা যখন তুললে তাদের কথাই বলি। ওরা কেউ বিয়ের জন্য পা বাড়িয়ে বসে থাকে না। সংসারে অনেক দেখে, অনেক শিখে, হয়ত বা ঠকে যখন শেষ পর্যন্ত কারো ঘরে পা দেয় তখনো বেরিয়ে আসার পথ খোলাই থাকে।

তোমারও তা থাকবে।

হেসে ফেলল অপরাজিতা,—যা বলেছ। এর পর রবি ঠাকুরের কবিতার ভাষায় বলে ফেল—

"আসা যাওয়া দুদিকেই
খোলা রবে দ্বার।"

কিন্তু দুয়ার বন্ধ যে হয়ে যায় আমাদের দেশে। দেশ, সমাজ, পরিবার সব কিছুরই আবহমান ধারা, ট্র্যাডিশন, শুধু যে মেয়েদের বেঁধেই রাখে।

সুজিত স্বীকার করল না—তোমার মত মেয়েকে কিছুই বাঁধতে পারবে না। বাঁধবে শুধু ভালবাসা, বিয়ে নয়। বাঁধবে প্রিয়ের বাহু, মন্ত্রের বাঁধন নয়।

কিন্তু সব তর্কের শেষ করে দিল অপরাজিতা,—ও সব কথার কোন দরকারই নেই। আমাকে কোন কিছুই হয়ত বাঁধবে না। অথবা হয়ত কোন দিন বাঁধবে। কিন্তু তার আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন গড়ে নিতে চাই। দেখতে চাই সংসারকে নিজের চোখ, নিজের ক্ষমতা দিয়ে। এই বিশ শতকে জন্মালাম, দুনিয়ার এত খবর, এত ব্যাপারের সংস্পর্শে আসছি। এত আধুনিকতা, স্বাধীনতা। সব কিছুকেই পুরো আস্বাদ করতে চাই, অনুভব করতে চাই। জান, আমার নামটা পর্যন্ত বড় সেকেলে, বড় লম্বা। তাই ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করে ওটাকে ছেটে নিয়েছি। এখন থেকে আমার নাম হচ্ছে অজিতা।

অপরাজিতা নয়, অজিতা। কিন্তু মানে একই।

(৩)

জি রেডিয়ো অফিস থেকে বেরিয়ে ম্যালের স্ক্যান্ডাল পয়েণ্টে এসে দাঁড়াল।

কেন যে জায়গাটার নাম হয়েছিল স্ক্যান্ডাল পয়েণ্ট তা সুজিত ভেবে দেখছিল। বিকেল থেকেই দলে দলে যুবক যুবতী, পৌঢ় প্রৌঢ়া হরেক রকমের আর বয়েসের লোক রথের মেলার মত ভীড় করে এখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। মেয়েদের পোষাক যত চটকদার ততই ছাঁটকাট। ছেলেদের সুটের ষ্ট্রাইপ আর টাইয়ের রঙের ফোয়ারা একেবারে হালফ্যাসানের মার্কিণ ধাঁচের। কিন্তু তারা এত সব করেও জুত করতে পারছে না। যুদ্ধের বাজারে বরমাল্য পাচ্ছে শুধু ইউনিফর্ম পরা অফিসাররা। তাদের কাঁধের উপর তারার সংখ্যা, মুকুট ও তারার পাঁচ মিশেলী এসবেই প্রমাণ হবে কে কতটা কুলীন। এমন কি চারজন কুলিতে টানা রিক্সা চড়ে যে বয়স্কা মহিলারা ককটেল পার্টি আলো করতে যাচ্ছেন তাদেরও নজর ওদিকে। পরনিন্দা না হোক পরচর্চা নিশ্চয়ই হয় এই স্ক্যান্ডাল পয়েণ্টে। কিন্তু পরের কথা ভাববার সময় নেই সুজিতের।

হাওয়ার উপর দিয়ে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে গুটি কয়েক পাঞ্জাবী অফিসার। হুইশিল দিয়ে এলোমেলোভাবে বেড়াচ্ছে। বেসুরো জড়ান গলায় দু একটা ইংরেজী গানের লাইনও যেন গাইবার চেষ্টা করছে। লড়াইয়ের কল্যাণে আর কিছু না আসুক বিলেত থেকে এসেছে দলে দলে তরুণী—ওয়াক-আই, রেন এনসা, ফ্যানি এ সব নামের নানান রকম দল। তারা সবাই যুদ্ধের কাছে পুরুষের সহচারী। সহচরীও হয়ে যায় একটু ভাব হলেই। হয় অফিসের কাজে, না হয় ফ্রণ্টের ঠিক পিছনেই রেডিয়ো, সেন্সার বা রাডারের কাজে, এমন কি নেচে-গেয়ে নাটক করে আনন্দ দেবার মধ্যে দিয়ে তারা করে লড়াইয়ে সহায়তা। জানটা যদি দিয়েই দিতে হয় তার জন্যও মনকে রাখতে হবে চাঙ্গা।

তাই সিমলার স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে রাত দশটার পরেও ভিড়ের কমতি নেই। বেসামরিকরা সব যে যার আস্তানায় ফিরে গেছে। কিন্তু মিলিটারীদের ত অহোরাত্র জীবন দেওয়া-নেওয়ার কারবার। কাজেই জীবন উপভোগের সময়েরও সীমানা টানা নেই। "ইন বাউণ্ড" অর্থাৎ মিলিটারী লোকদের পক্ষে বারণ নয় এমন জায়গা সিমলায় প্রায় সর্বত্র। খানাপিনার পর দিলটা আরো একটু বেশী মাত্রাতেই দরিয়া হয়ে যায়।

সামনের রেস্তোরাঁ থেকে একজন কিলট অর্থাৎ গামছা মার্কা পোষাক পরা মিলিটারী বেরিয়ে এল। বেশ রঙীন অবস্থা। বিড় বিড় করে গাইছে—মাই বনি ইজ ওভার দি ওশেন"।

ওর বনি অর্থাৎ প্রেয়সী যদি সমুদ্রের ওপারেই থেকে থাকে সমুদ্রের এ পারে কি ঔখ তাবলে সে দেবর লক্ষ্মণ সেজে বসে থাকবে? অতএব সে অজিতাকে কাছে দেখতে পেয়ে বেশ সচেতন হয়ে উঠল। একটু জোরেই সুরু করল—ব্রিংগ ব্যাক মাই বনি টু মি। প্রেয়সীকে কাছে পাবার জন্য যেই সে হাত বাড়াল অমনি অজিতা ঠাস করে তার গালে কষিয়ে দিল একখানা চড়। কঠিন স্বরে হাকল—ইউ ব্রুট।

পশু ততক্ষণ এক চড়েই চৈতন্য ফিরে পেয়ে মানুষ হয়ে গেছে। দেশী মেয়ের এই রুদ্র ব্যক্তিত্ব দেখে সে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্যালুট ঠুকে বলল—দুঃখিত মিস। আমি ক্ষমা চাইছি।

দূর থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এল সুজিত। তার হাতের মুঠো একেবারে তৈরী। কিন্তু অজিতা এক কথায় তাকে থামিয়ে দিল,—যথেষ্ট হয়েছে। আর কিছুর দরকার নেই। না হলে একটা দৃশ্য তৈরী হয়ে যাবে।

সুজিতের কিন্তু সামলিয়ে নিতে সময় লাগল। একটু হাঁটতে হাঁটতে এগোনর পর সে বলল,—কিন্তু তুমি ত খুব বিপদের মধ্যে কাজ কর। যে কোন দিন আবার এ রকম হতে পারে। হয়ত দল বেঁধেও আসতে পারে।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে অজিতা উত্তর দিল,—কিন্তু তা বলে ত আর মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে না।

—কিন্তু তুমি কেন এ বিপদে মাথা দিয়ে রেখেছ?

—বিপদ কাকে বলছ, সুজিত? তোমরা জীবন দিয়ে দাও লড়াইয়ে; আর আমরা এত টুকু ঝুঁকি নিতে পারি না? দেখেছ তোমাদের বর্মা ফ্রণ্টে কত সাধারণ ভদ্রঘরের মেয়েরা বিলেত থেকে এসে তোমাদের কত কাজে কত সাহায্য করছে।

—ওরা করছে দেশের জন্য।

—আমি করছি নিজের জন্য। নিজের জন্যই যদি না করতে পারি, দেশের জন্য মনুষ্যত্বের জন্য কি আর কোন দিন কিছু পারব?

—কিন্তু ওই পশ্চিমের মেয়েদের এ কাজ একদিন ফুরিয়ে যাবে। তারা দেশে ফিরে যাবে, সংসারে ফিরে যাবে। ঘর ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে আবার ঘর বাঁধবে।

অজিতা চুপ করে রইল।

কিন্তু সুজিত বুঝতে পেরেছে। অজিতার মনে যে কিছু ধাক্কা এসে লাগছে এই মৌন বোধ হয় তারি প্রমাণ। কাজেই সে আবার সুরু করল,—ভেবে দেখ অজিতা। স্বাধীন জীবন, নিজের পায়ে দাঁড়ান তার সব কিছুরই স্বাদ তুমি পেয়েছ। কলকাতার কলেজ থেকে সিমলার অফিস সবই ত করেছ নিজে নিজে, কারো উপর নির্ভর না করে।

বাধা দিল অজিতা,—এখনো নির্ভর করতে চাই না।

চাও না জানি। কিন্তু এই যে তোমার জীবন এ শুধু বাইরে থেকেই দেখতে স্বাধীন, কিন্তু আসলে নিজেকে মুছে রাখা। এ অস্তিত্বে

তুমি পাচ্ছ কি, অজিতা? তোমায় যখন অজিতা বলে ডাকি তখন তুমি আমার অনেক কিছু। আমার সব স্বপ্ন, সব ভবিষ্যৎ জড়িয়ে একজন মানুষ। কিন্তু ওই লোকগুলি যখন তোমায় জি বলে ডাকল তখন তোমার কণ্ঠকে ওদের কাছে রূপ পেল? ইংরেজীতে জি কথাটা শুধু একটা কথার কথা; ওর মধ্যে নেই কোন রূপ, নেই কারো আপন ছাপ। তুমি যে এত শিক্ষিত হয়ে উঠলে সে কি শুধু এমনি একটা ছোপছোপা অস্তিত্বহীন পুতুল হিসাবে প্রকাশ পাবার জন্য, অজিতা?

চুপ করে রইল অজিতা। সিমলা পাহাড়ের আকাশে তারাগুলির মত তার মনেও অনেক প্রশ্নের ঝিকিমিকি চলছে। কিন্তু সে নিজে নীরব।

ভেবে দেখ অজিতা, আজ তুমি ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসাবে নাচতে গেলে। কাল ওরা আরেক-জন বন্ধুর সঙ্গে যাবে। তুমিও যাবে হয়ত আর কারো সঙ্গে। কারো উপরই তোমার নেই দাবী। দায় নও তুমি কারো। কিন্তু কখনো কি তোমার মনে হয়নি যে, আজ আর দেরী হবে না ঘরে বসে শান্ত মুক্তি নিয়ে একজনের সংসারই গড়ে তুলবে? অথবা ধর, শুধু একজনের সঙ্গেই [illegible] না নাচলে যে মনে করবে না যে [illegible] ? তোমার [illegible] কি ভালবাসায় [illegible] হয়ে গড়ে উঠতে পারে না?

[illegible] সিমলার পাহাড়ের গায়ে একে একে [illegible] আলো নিভে যাচ্ছে। [illegible] উঠে আসছে [illegible]। তার [illegible] দেখা যাচ্ছে না [illegible]।

এই সব অজিতা, যে [illegible] যাচ্ছে সবাই [illegible] একদিন তোমার [illegible]। তোমার [illegible] অন্য পথের ইচ্ছা তখন নিয়ে যাবে। [illegible] হয় না [illegible]। [illegible] একেবারে [illegible] নিজেদের [illegible] হয়। [illegible] স্বাধীনতা [illegible] নয়।

অজিতা একবার ওর দিকে তাকাল আরেক-বার পাহাড়ের গায়ে। আকাশের বুকে তার একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না।

আমার সময় হল কম অজিতা। কাল ভোরের [illegible] মিলিটারী ট্রেন [illegible] নিয়ে যেতে হবে। তুমি কিন্তু আমায় এম, সি পাওয়ার জন্য অভিনন্দনও করলে না। অথচ তোমার কথা না মনে থাকলে আমার মিলিটারী ক্রসের দুর্লভ সম্মান পাওয়া সম্ভবই হত না।

অজিতার এতক্ষণে যেন হুঁস হল। বলল, —সত্যি, আমারি ভুল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথা বল। কেমন করে তুমি এম সি পেলে সে কথা বল। তুমি যে চাকরী ছেড়ে মিলিটারীতে গেছ তা ভাবতেও পারিনি। তাই এস, চৌধুরীর বীরত্বের খবর কাগজে দেখলেও তুমিই যে সেই লোক হবে এমন একটা সম্ভাবনা খেয়াল করিনি।

থাক সে সব কথা। বর্মা ফ্রন্টের লড়াইয়ের খবরে তোমার কি হবে বল? তুমি থাক তোমার মনগড়া পৃথিবীতে আর আমি থাকব তা থেকে অনেক দূরে। তোমার কথা ভুলতে চেষ্টাও যদি করি তবু পারব না।

—না, সুজিত। তুমি আমার কথা ভুলবেই বা কেন? তুমি চাও স্ত্রী, চাও ঘরসংসার। সে সবের সঙ্গে আমার স্মৃতির ত কোন বিরোধ হবার দরকার নেই।

সুজিত দৃঢ়স্বরে বলল—না অজিতা, যার নেই তার নেই। আমার আছে। আমি প্রত্যেক দিন মনে করব যে তোমারি বেপরোয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা ভেবে আমি নিরাপদ টেবিল-ঘেঁষা কাজ ছেড়ে লড়াইয়ের কমিশন নিলাম। তোমারি কথা ভেবে আমার কম্যাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির বুকে-চার্জ করা জাপানী বেয়নেটের সামনে নিজের বুক পেতে দিয়েছিলাম। ম্যাকেঞ্জি বেঁচে গেছে। যার ছবি তার বুক পকেটে সব সময় থাকে তার কাছে সে ছুটি নিয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু বাঁচলাম না আমি। বুকে বেয়নেটের প্রকাণ্ড ঘা শুকোল, কিন্তু মনটা রয়ে গেল ফোঁপড়া। আমি ছুটি নিয়ে কার কাছে যাব, অজিতা?

এতক্ষণে ওরা অজিতার হোস্টেলের কাছে এসে পড়েছে। ফগও ফিরে এসেছে ঘন হয়ে। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে চাবী বের করে বন্ধ দরজা খুললে অজিতা। সুজিত তবু তার হাত ছাড়ল না। দৃঢ়স্বরে বলল—বল, আমায় বলে যাও, আবার আমি আসব কি না। যদি যুদ্ধে বেঁচে থাকি, যদি ফিরে আসি তোমার মত বদলাবে কি না। বল, বল।

কিন্তু কোন সাড়াই নেই। সিমলা পাহাড় ঘুমোচ্ছে।

বাল্বের মৃদু আলো সুজিতের ব্যাকুল মুখের উপর এসে পড়ছে। কিন্তু অজিতার মুখ রহস্যের আঁধারে ঘেরা। সেই রহস্যের দিকে উদ্দেশ করে আপন মনে সুজিত কথা বলল। যেন সে অজিতাকে বলছে না কিছু। কোন নারীকে না, কাউকে না। সে শুধু বলল—অল রাইট, গুড নাইট।

রহস্যের আড়াল থেকে মৃদু উত্তর এল,—না, না, জি নয়। বল, অপরা।

চতুষ্কোণ

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারের সঙ্গে, আত্মীয়জনের সঙ্গে আমরা যে একেবারে মিশে গেছি।

তাহলে তুমি কি বল? যেমন চলছে এমনি চলবে? মাঝে মাঝে তোমার আমার—

কি, থামলে যে?

মানে, মাঝে মাঝে তোমার আমার এইরকম অভিসার?

জানিনে বাপু, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কি যে এক কাণ্ড করে বসলে, এখন কি করে যে এর সমাধান হবে, বলতে পারিনে। উইল নিয়ে পালানো সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। এখন ওঁরা কেউই উইলে সই করবেন না। ওঁরা বুড়ো হলেও ওঁদের মাথা খুব ঠিক আছে। আমাদের বিয়ের পর থেকে দেখছি, তুমিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, ওঁদের শরীর ও মন দুইই বেশ সতেজ ও স্বাভাবিকই আছে।

তাহলে উপায় কি?

ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন। বুঝছিলাম না, বিয়েটিয়ে নিয়ে খেলা করতে নেই।

হরিহর ও অলকা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হরিহর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা অলকা, কিছুদিনের জন্য তুমি আর আমি পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থাকলে হয় না। কোন একটা অজুহাতে পার না চলে আসতে?

কি পাগল! তা কি হয়?

তাহলে উপায়?

কোন উপায়ই নেই। আচ্ছা, আজ আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে, বুড়ো এখুনি আমার খোঁজ করবে।

তুমি একটু ভেবে দেখো, অলকা।

তা দেখব, কিন্তু পাগলামী করে তুমি যে জট পাকিয়েছ, সে জট আর খুলবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

হরিহর বিদায় লইল।

আরো কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সদানন্দ ও কমলিনী বেশ বাঁচিয়া আছে। হরিহরকে প্রায়ই দেখা যায়, অতি বিষণ্ণমুখে হোটেলর একটি বেঞ্চের উপরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

দেবনাথ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত একটি স্কেচ

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
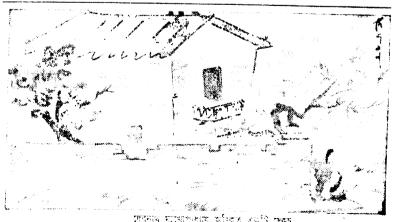
শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বহুদিন হইতে মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছে। প্রশ্নটি লইয়া মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়াছি, প্রভুপাদগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভক্তগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, আজিও তাহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। অবশেষে আপন মনেই সমাধানের পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি। লক্ষ্যস্থল এখনো অনেক দূরে। তথাপি যদি কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি, কেহ কৃপাপরবশ হইয়া আমার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন, তজ্জন্য প্রশ্ন ও কল্পিত উত্তর এক সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

আমার প্রশ্নের বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতার গ্রহণের প্রয়োজন প্রসঙ্গ। শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস-ঠাকুর শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের চিরন্তন প্রয়োজনের কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, সাধুদের পরিত্রাণ এবং "বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্" ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তখন তখনই শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। কলিযুগে অধর্ম যখন নিতান্তই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ ধর্ম সংস্থাপন এবং যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তনের জন্য কলিযুগপাবনাবতার নবদ্বীপ-পুরন্দর শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সুরসিক ভক্তগণ বলিলেন, "এহো হয় আগে কহ আর।" পুরীধাম হইতে, শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ইহার প্রতিউত্তর পাওয়া গেল। ভাবুক কবি রায় রামানন্দ দেখিলেন স্বর্ণ পঞ্চালিকা সমাবৃত নীলমণি, শ্রীরাধা মিলিত শ্যাম গোপ-কিশোরই এই নবীন সন্ন্যাসী। রসতত্ত্ববেত্তা স্বরূপ দামোদর ঘোষণা করিলেন—শ্রীরাধার প্রণয় কেমন মহিমময়, আমার মাধুর্য কত মধুর, আর সেই অদ্ভুত মাধুরী আস্বাদন করিয়া রাধা হৃদয়ের যে আনন্দ বৈচিত্র্য—তাহার চমৎকারিত্ব কিরূপ, এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য রাধা ভাবাঢ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম আসিয়াছেন শচীনন্দনরূপে। শ্রীপাদরূপ জানাইয়া দিলেন—নিখিল ব্রজ বধূগণের প্রেম ঘনীভূত হইয়া এই গৌরতনু পরিগ্রহ করিয়াছে।

আমার প্রশ্ন, শ্রীধাম পুরুষোত্তমের এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার স্থান হইল না কেন? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরম মর্মজ্ঞ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আদেশেই বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবৎ রচনা করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বাঙ্গালার ভক্তগণ নীলাচলে গিয়া চারি মাসকাল অবস্থিতি করিতেন এবং মহাপ্রভুর লীলাচিত্র হৃদয়ে লইয়া বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দীর্ঘ আঠার বৎসরকাল পুরীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গলায় চৈতন্যকথা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করিতে পারি, গৌরাঙ্গাবতারের এই সমস্ত তত্ত্ব এবং তথ্যই বৃন্দাবন দাসের জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তথাপি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তিনি সে সমস্ত কেন গ্রহণ করেন নাই, ইহা গুরুতর প্রশ্ন। আরো গুরুতর আশ্চর্যের কথা—বৃন্দাবন দাস শ্রীরাধার প্রসঙ্গ-মাত্র আলোচনা করেন নাই। গদাধর দাসের ভাবাবেশের উল্লেখে তিনি একবার মাত্র শ্রীরাধার নাম করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীরাধার কোন প্রসঙ্গ নাই। অথচ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কথার সর্ব প্রধান বক্তা, সর্ব প্রধান প্রচারক, সর্ব প্রধান আস্বাদক।

আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজিতেছি। আপাততঃ আমি ইহার তিনটি কারণ স্থির করিয়াছি। একে একে বলিতেছি। প্রথম কারণ—বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন—"অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।" কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।" ভক্তগণ বলেন শ্রীভগবান ভক্তের কথা বলিতে শতমুখ। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ কথাই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতার রহস্য অপ্রকাশিত থাকিয়া গিয়াছে। শ্রীভগবান আপন অবতার রহস্য নিজ মুখে যতদূর বলিবার শ্রীগীতায় বলিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ভগবৎ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কথাটা আর এক দিক দিয়া আলোচনা করা চলে। শ্রীনিত্যানন্দ ঐশ্বর্য বিগ্রহ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বিলাস পর্যঙ্করূপে যে লীলার তিনি দ্রষ্টা, ব্রজ লীলার সঙ্গে তাহার পার্থক্য থাকিলেও অনঙ্গ মঞ্জরী ভাবাবেশে মূল সংকর্ষণের গৌর লীলার বা কৃষ্ণ লীলার কোন রহস্যই অজ্ঞাত নাই। তথাপি জ্যেষ্ঠত্বের অভিমানে মধুর রসের কথা তিনি অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট বৃন্দাবন দাস তাই মাধুর্য তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই।

দ্বিতীয় কারণ—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব এবং জনসমাজের নিকট তাঁহার অনুবর্তীগণের সমাদর কয়েকজনকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। দুই একজন ভণ্ড ভক্ত কেহ নিজেকে রঘুনাথ, কেহ বা আপনাকে গোপাল বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। এই সমস্ত প্রতারকগণের হস্ত হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তিনি এই অপধর্ম প্রচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিজে নামকরণ করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য মঙ্গল। রচনা সমাপ্তির অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থখানি সকলের নিকট সমাদৃত হইল। গায়কগণ গ্রামে গ্রামে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গান করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে ইহা পঠিত হইতে লাগিল। ভণ্ড ভক্তগণের মুখোস খসিয়া পড়িল। তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সাধারণে সাবধান হইয়া গেল। বৃন্দাবনের কঠোর তিরস্কার দিকে দিকে ধ্বনিত হইল।

উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে॥
কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভুবন॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বোলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে সেই ছার শোচ্যতর॥

ইহাদের উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মহেশ্বর্যের কথাই বারম্বার বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় কারণ—বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবৎকালেই ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ অদ্বৈত আচার্যকে লইয়া দল গঠন করিয়াছিল, অদ্বৈতের দুই পুত্র এবং আরো কয়েকজন ইহার নেতা। আচার্যের এক ভৃত্য কমলাকান্ত তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনপূর্বক মহারাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট লিখিত পত্রে ঈশ্বরের সংসার খরচের দেনা পরিশোধের জন্য কিছু টাকা চাহিয়াছিল। জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আদেশ দিয়াছিলেন, কমলাকান্তকে এখানে আসিতে দিও না। অদ্বৈত আচার্যের অনুরোধে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

কতকগুলি লোক নিত্যানন্দকে লইয়া দল বাঁধিয়াছিলেন। কেহ মহাপ্রভুকে মানিতেন, নিত্যানন্দকে মানিতেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভ্রাতা তাহার অন্যতর উদাহরণ। কেহ নিতাই গৌরের উপাসনা করিতেন, কেহ গৌর গদাধরের উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ গদাধরকে মানিতে চাহিতেন না। কেহ অদ্বৈতকে অবহেলা করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার বহু উদাহরণ আছে।

(ইহার পর ৮৭ পৃষ্ঠায়)

হাওয়া বদল

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

অনুকা ইদানীং আবার ভাবতে সুরু করেছে। অনুকা ভাবছে স্বামীকে এবার হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নেবে। প্রায় মাস তিনেক কাটলো—বিশেষ উন্নতি হোল না। তার চেয়ে হাওয়া বদল করলে রোগটা হয়তো সারতে পারে।

কিছুদিন আগে রঞ্জনের রোগটার যখন সূত্রপাত হয়েছিল, স্বামীকে হাসপাতালে পাঠাতে কিছুতেই সম্মত হতে পারেনি অনুকা।

তখন অনুকা ভাবতো—হাসপাতাল ছিঃ—; স্বামীকে হাসপাতালে পাঠানো মানে স্বামীকে সে আর সেবা-শুশ্রূষা করতে পারছে না—না—না সে হয় না।

রঞ্জন দীর্ঘদিন কিডনীর অসুখে ভুগছে। বেসরকারী কলেজের সে অধ্যাপক। কলেজে যতক্ষণ যাতায়াত করতে পেরেছে,—মাইনেও পেয়েছে, চিকিৎসাও চলেছিল—, হাসপাতালের প্রশ্ন ওঠেনি।

এরপর চাকরী করবারও আর শক্তি রইল না রঞ্জনের—, অর্ধেক মাইনেও যখন বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে এল—, তখনও অনুকা স্বামীকে সেবা-শুশ্রূষা করবার অক্ষমতা প্রকাশের আশঙ্কায় হাসপাতালকে সমর্থন জানাতে পারছিল না।

না। স্বামীকে শুশ্রূষা করবার অক্ষমতা নয় অনুকার। সেবায় ওর একটুও ক্লান্তি নেই। শ্রান্তি নেই। বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই রঞ্জন অসুস্থ,—কিছুদিন হোল সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন সেবা করে চলেছে অনুকা, রাত্রিবেলা স্বামীর বুকের ওপর মাথা রেখেই ও ঘুমিয়ে পড়ে।

রঞ্জনের চোখে ঘুম নেই। নিঃশব্দে স্ত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। মধ্যে মধ্যে রঞ্জন বলে—'কত চিকিৎসা হবে, যখন কিছু হচ্ছে না,—আমি বোধ হয় আর ভালো হব না—'

অনুকা বলে—'কত চিকিৎসা আর কই? ডাক্তার যে প্রেসক্রিপসন দিচ্ছেন, তার সিকিভাগও কী আমরা কিনতে পারছি? একটা ওষুধের দাম কত জানো, উনিশ, কুড়ি থেকে নিরানব্বই টাকা পর্যন্ত। আমরা সাধারণ মানুষ কী করবো? সে কথা কেউ ভাবে না।

'ভাবেনা কেন?' রঞ্জন বলেছিল—'হাসপাতাল তো রয়েছে—'

'হাসপাতাল' অনুকা ম্রিয়মাণ হাসলো—' সেখানেও দামী ওষুধপত্তর বড়লোকদের জন্যে মজুত থাকে,—তা ছাড়া সীট পেতেও দুশ্চর তপস্যা করতে হয়।'

শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল অনুকার স্বামীকে। সেবা-শুশ্রূষার অক্ষমতায় নয়,—অর্থ-ব্যয়ের অক্ষমতায়।

সেদিন রঞ্জনের শারীরিক অসুস্থতার মাত্রাটা বেশ বেড়েছিল,—মঞ্জুল ডাক্তারকে খবর দিতে গিয়েছিল,—ডাক্তার মিত্র জানালেন—'তাঁর অনেক টাকা ফী বাকী, আর তিনি মাগনা রোগী দেখতে পারবেন না।'

'আসবেন না তিনি?' নিঃশ্বাসটা যেন বুকের মধ্যে আটকে গেছলো অনুকার—অসহায়ের দৃষ্টিতে সে মঞ্জুলের দিকে তাকিয়ে রইল।

মঞ্জুল রঞ্জনের প্রাক্তন ছাত্র। আই এ পাশ করবার পর বছর পাঁচেক ছবি আঁকা শিখছে। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হবে সে। ইতিমধ্যে দেশ উপন্যাস বইতে প্রচ্ছদপট আঁকে। রঞ্জনের বইয়ের ঘরে পেইন্টিং সেট হয়ে বছর পাঁচেক রয়েছে।

রঞ্জন অনুকাকে বিয়ে করবার পর মঞ্জুলকে বলেছিল—'আমার তো এবার বসে [illegible] হলো। তুমিও চলো না আমার কাছে থাকবে—একটু সাহায্য করতে পারবে।' রঞ্জন তার মঞ্জুল এক সঙ্গে বছর পাঁচেক [illegible] কাটাচ্ছে। মঞ্জুল চিত্রশিল্পী, পৃথিবীকে একটু অন্য চোখে দেখে।

অনুকার অসহায় দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে ও বললো—'ডাক্তারবাবু নাই বা এলেন। রঞ্জনদার জন্যে আমি এখুনি হাসপাতালে সীট ঠিক করে ফেলছি—'

'তুমি পারবে মঞ্জুল? তুমি পারবে—? সেও তো সেই'—অনুকা কথা আর শেষ করলো না,—ওর দুই চোখে শুধু ব্যাকুলতা [illegible] থরো থরো কাঁপতে লাগলো।

মঞ্জুল বললো—'হ্যাঁ বউদি সেও সেই মোহিনী টাকার লীলা—ডাক্তার তালুকদার এদিককার হাসপাতালের সর্বেসর্বা,—তিনি বলেন, তিনি মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নেবার কায়দা-কানুন জানেন। আমি যদি মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দিতে পারি—একটা বেডের নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।'

নিরুত্তর অনুকা শুধু আশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে মঞ্জুলের দিকে।

মঞ্জুল বললো—'দুখানা বইর প্রচ্ছদপট এঁকেছি,—প্রকাশকের কাছে অনেকগুলো টাকা পাবো—'

প্রায় মাস তিনেক হাসপাতালে কাটলো রঞ্জনের। রোগের সাময়িক উপশম হোল, কিন্তু স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হোলনা, রোগ নির্মূল হয়ে সারলো না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে একদিন অনুকা মঞ্জুলকে বললো—'যে আশা নিয়ে হাসপাতালে এলুম,—ভালো ওষুধ যদি দু-একটাও ও'কে প্রয়োগ করা হোত—' মঞ্জুল বললো—'বহু চেষ্টা করেও তার নাগাল কিছুতেই পাওয়া গেল না,—দামী ওষুধ বোধ হয়—দামী মানুষদের জন্যেই মজুত থাকে—'

'দামী মানুষ, নামী মানুষ'—ম্রিয়মাণ হাসলো অনুকা—'রুপো ঝলমলে জীবনের সর্বত্রই সমাদর—'

ইদানিং অনুকা ভাবছে—স্বামীকে এবার হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নেবে। তার চেয়ে হাওয়া বদল করলে রোগটা হয়তো ছাড়তে পারে,—দেওঘর থেকে ছোট মাসীমা ডাকাডাকি করছেন। শুধু যাতায়াত আর হাতখরচের কিছু টাকা দরকার।

মঞ্জুল আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল রঞ্জনকে বাড়ীতে,—প্রতিশ্রুতি দিল অনুকাকে 'বিচিত্র অনুষ্ঠানের চ্যারিটি' শো দিয়ে কিছু টাকা সে তুলে দেবে।'

* * * *

মঞ্জুল ওদের সংঘের কার্যনির্বাহক পরিষদে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলো। মঞ্জুল এদিককার নামকরা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উদয়ন সংঘের সভ্য। খেলাধুলো, ব্যায়াম, অভিনয়, নাচ, গান-বাজনা, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা সব কিছু এ সংঘের কার্যসূচি।

বৈশিষ্ট্য হোল এ সংঘের অভাবী মানুষকে সাহায্য করা।

যুগ বদলে যাচ্ছে,—জীবনের পটভূমি বদলাচ্ছে,—মনের ধারা এবং কাজের ধারাও বদলে যাচ্ছে।

যাদের পূর্বপুরুষেরা রাত জেগে রোগীর সেবাশুশ্রূষা করে, শ্মশানে মরা পুড়িয়ে জনসেবা করতো—তাঁরা উদয়ন সংঘের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের উপকার করে।

এই কিছুদিন আগে ওরা পাড়ার দুঃস্থ কবির মেয়ের বিয়ের সাহায্যে নিজের শিল্পী দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন অভিনয় দেখিয়ে টাকা তুলে দিলো।

মধ্যে মধ্যেই এমনই আয়োজন ওরা করে।

সংঘের সভানেত্রী অতিমা এম এ পাশ করে জার্নালিজম পড়ছে—একটা নাচের ইস্কুলে সে নাচও শেখায়।

অতিমা মঞ্জুলের কথার উত্তর দিয়ে বললো "রঞ্জনবাবুর হাওয়া বদলের সাহায্য করা আমাদের বিশেষভাবে কর্তব্য—তবে চ্যারিটি শো-তে নতুন কিছু দিতে না পারলে টিকিট বিক্রী করা কঠিন হবে—"

সম্পাদক অনুপম বললো—"আমাদের শিল্পীরা প্রায় সকলে এখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, কোনও বই-ও নামানো যায় না—

মঞ্জুল বললো—"রুগ্ন মানুষ, বেশী দিন অপেক্ষাও করা যায় না—"

দু' একজন সভ্য একটু আগ্রহ প্রকাশ করে বললো—"ডাক্তার তালুকদারের মেয়ে গৈরিকা ইদানিং নাচে বেশ নাম করেছে; কয়েকটি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, ওকে আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়—?"

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সভ্য প্রতিবাদ জানালো—"না—না ডাক্তার তালুকদারের মেয়েকে আমাদের প্রয়োজন নেই। উঃ লোকটা কী পয়সা চামার—হাসপাতালের সর্বেসর্বা হতে পেরেছে বলে ধরাকে সরা দেখে না—"

একটু হাসলো মঞ্জুল,— মঞ্জুল পৃথিবীকে একটু অন্য চোখে দেখে, বললো— "ক্ষমতার ব্যবহার কে না করে বলো? তিনি তো বলেনই মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নেওয়া জানা চাই—। তার জন্যে তাঁর মেয়ে

অতিমা মৃদু হাসলো, বললো—'আধুনিক ইতিহাসে এই বাঁকা রাস্তার নাম লেখা হবে বিনিময়ের কাল'।

যদি ভালো নাচতে পারে—তাকে বর্জন করবে কেন?"

অতিমা বললো—"ভালো মন্দ নাচের মান নির্ণয় একদিনে হয় না। প্রতিযোগিতার বিচারেও তা হতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে জনমত না মিশছে। জনমতই ভালো-মন্দ বিচারের মান নির্ণয় করতে পারে। গৈরিকা আগে আমাদের নাচের ইস্কুলের ছাত্রী ছিল—ইদানিংও নামী ও দামী নৃত্যশিল্পীদের কাছে নাচ শেখে। সে যদি আসে—, তোমরা আনতে পারো। তবে টিকিট বিক্রী হবে রুগ্ন অধ্যাপকের নামে,—গৈরিকার নামে নয়।" তবু কয়েকজন মৃদু গুঞ্জনে আপত্তি জানাতে লাগলো, "ডাক্তার হয়েও যে লোকটার নাম ও দামের দিকে ঝোঁক—নামী ও নামী ওষুধপত্র দামী ও নামী মানুষের জন্যে রাখে—তার মেয়েকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।"

"সমর্থন না করা ভুল হবে ভাই—", মঞ্জুল আবার বললো, "যে সাহায্য তাঁর কাছে আমরা সোজা রাস্তায় পাই না—তা বাঁকা রাস্তায় নিতে হবে। নামী ও দামী মানুষের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশী, মেয়েকে নামী ও দামী নৃত্যশিল্পী তৈরী করবেন। সুতরাং গৈরিকার নাচের শো নিয়েই আমাদের সাধারণ লোকের কাছে টিকিট বেচতে হবে। আমি জানি টিকিট ভালো বিক্রী হবে—রঞ্জনদার শুধু হাওয়া বদল নয়—দামী ও নামী ওষুধপত্রেরও খরচ উঠে আসবে।"

অতিমা মৃদু হাসলো, বললো—"আধুনিক ইতিহাসে এই বাঁকা রাস্তার নাম লেখা হবে বিনিময়ের কাল।"

শেষ পর্যন্ত উদয়ন সংঘের কার্য নির্বাহক পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো—ওদের চ্যারিটি শো-তে ওরা গৈরিকাকে আমন্ত্রণ জানাবে।

* * *

হাওয়া বদল।

রঞ্জনের হাওয়া বদলের আয়োজনটা, অনুকার মনে আর এক রাগিণী বাজালো। রুগ্ন স্বামীর দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে অনুকা, ক্রমশঃ নৈরাশ্যের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার—ওর সারা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যেন গুমোট ধরা মেঘ জমাট বেঁধে ওঠে ওর সমস্ত স্নায়ুতে।

ও মনের একটু হাওয়া বদল করতে চলে আসে চিত্রশিল্পী মঞ্জুলের ঘরে।

এবার আর রোগ বা রোগীর কথা নয়,—ছবি, রং আর তুলি টানার গল্পে ওরা দুজনে অনর্গল হয়ে ওঠে।

অনুকা বলে মঞ্জুলকে—"তোমার ঘরে এলে মঞ্জু গুমোট ধরা মনটা বেশ হাল্কা হয়ে আসে—"

"মনের একটু হাওয়া বদল হয় কিনা—" মঞ্জুল উত্তর দেয় অনুকার মনকে পাখীর পালকের মত হাল্কা করে দিয়ে।

হাওয়া বদল। এতদিন হাওয়া বদলটা অনুকার সংগোপন মনের বিচিত্র বিলাস ছিল। এ মনোবিলাস কানের পর্দায় বাজে না, চোখের পর্দায় ধরা দেয় না, শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়।

ইদানিং হাওয়া বদলটা আশার রাগিণী বাজায় অনুকার কানে কানে। এবার রঞ্জন ভালো না

হয়ে পারবে না। দেওঘরের ত্রিকূট আর তপোবন পাহাড়ের মনোরম পরিবেশ ওর হাওয়া বদলকে অনিবার্য করবেই। অনুকার স্বামী নূতন স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

রঞ্জনের স্বাস্থ্য পরিবর্তনের উদ্দাম আয়োজন চলছিল তখন।

মঞ্জুল নিজের ঘরে বিচিত্র অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র তৈরী করছিল। থেকে থেকে ওর অতিমার কথা মনে পড়ছিল। অতিমা বলেছিল—আগামী কালের ইতিহাসে এই বাঁকা রাস্তার নাম লেখা থাকবে—বিনিময়ের কাল। উদয়ন সংঘের সবাই জানে মঞ্জুল ও অতিমা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু ওদের বিয়ে হতে পারছে না, অতিমার বাড়ীতে প্রচণ্ড আপত্তি রয়েছে—, এম-এ পাশ মেয়ের সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট ছেলের বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু মঞ্জুল ও অতিমা জানে ওদের ঐক্য পুঁথিগত শিক্ষায় নয়,—কলা চর্চায়।

দুজনেই স্থায়ী কাজের অপেক্ষায় ওরা রয়েছে।

প্রচারপত্রগুলি লিখছিল মঞ্জুল—"প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গৈরিকা—"

আবার অনমনা হয়ে গেছলো মঞ্জুল—, যেদিন ওরা ওদের বিচিত্র অনুষ্ঠানে গৈরিকাকে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিল, খুশী হয়ে ডাক্তার তালুকদার বলেছিলেন—"শোন আমার মেয়ে নাচবে বইকি, ওকে আমি আনাপারলোভা করবই। টাকা পয়সা কী হবে? টাকা আমি চাই না—তোমরা শুধু ওর ভালো পাবলিসিটি দেবে—কাগজে কাগজে ছবি ছাপবে—"

মঞ্জুল ভাবছিল—"টাকার কী প্রয়োজন ডাক্তার তালুকদারের? শুধু মেয়ের খ্যাতির প্রয়োজন। চৌদ্দ বছরের মেয়ে গৈরিকা। নৃত্য-পটিয়সী হয়তো একদিন হয়ে উঠবে। মেয়ের নাচে টাকার কী প্রয়োজন তাঁর? তিনি একটা হাসপাতালের সর্বেসর্বা, মাটিতে ছড়ানো রয়েছে মুঠো মুঠো টাকা,— তিনি কুড়িয়ে নিতে জানেন। কুড়িয়ে শুধু নয়,— ছড়িয়েও দিতে জানেন। নৃত্যকলার সত্তাকেই যেন তিনি আপন আয়ত্তে এনে ফেলেছেন।

দ্রুত হাত চলছে মঞ্জুলের—একটার পর একটা সে প্রচার পত্র লিখে চলেছে, এই সময় ঘরে এসে ঢুকলো অনুকা—, নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে তক্তাপোষের এক প্রান্তে বসে, ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইল মঞ্জুলের দিকে। মঞ্জুল দেখলো অনুকা আরও শীর্ণ হয়েছে, আরও বিবর্ণ। তেইশ বছরের মেয়েকে মনে হচ্ছে যেন এক কিশোরী কন্যা। মঞ্জুল জিজ্ঞেস করলো—"বউদি আজ যেন তোমাকে বড় বেশী শ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে—"?

অনুকা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—এরপর অবরুদ্ধ গলার স্বরটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললো, "তোমার দাদাকে বোধহয় আর হাওয়া বদলে নিয়ে যাওয়া যাবে না—ক্রমশঃ যেন নিস্তেজ হয়ে আসছেন—"।

"নিস্তেজ—"অনুকার মনের গুমোট ধরা ভাবটা কাটিয়ে দেবার জন্যে চকিত কণ্ঠে খানিকটা হেসে মঞ্জুল বললো—" ওটা তোমার বৃথা আশঙ্কা বউদি—, সাত দিনের মধ্যে রঞ্জনদাকে নিয়ে যেতে পারবো হাওয়া বদলে—"।

হাওয়া বদলের একটু ছোঁওয়া যেন লাগলো অনুকার মনে—, অবসাদের একটু লাঘব হোলো—, তবু যে কান্নাটা জমেছিল দু চোখের অন্তরালে—, স্নেহ আর সহানুভূতির স্পর্শে তা অনর্গল ধারায় গড়িয়ে পড়লো ওর দুই গাল বেয়ে। এবার আর হাসতে পারলো না মঞ্জুল—, অনুকার চোখের ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ওকে ব্যথিত করে তুললো। অনুকা বললো—, আমি আর সহ্য করতে পারি না মঞ্জুল—তুমি যা করবে—, একটু তাড়াতাড়ি কর—, তখনও ওর গালে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল—।

মঞ্জুল কি পারে না ওর এই চোখের জল শুকিয়ে দিতে? মনের গুমোট যদি তার সে সরিয়ে দিতে পারে—চোখের জলই বা কেন সে শুকিয়ে দিতে পারবে না? ও অনুকার কাছে সরে এসে পরম যত্নে নিজের রুমালে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল।

একবার মনে হয়েছিল মঞ্জুলের—, অনুকা ওর শিক্ষকের পত্নী—, অনুকাকে স্পর্শ করা ওর কি উচিত হবে"?

পর মুহূর্তেই সে উত্তর পেলো নিজের কাছে, "অন্যায় হবে না নিশ্চয়ই এই জন্যে—, মনের আবহাওয়ার একটু অদলবদলের জন্যে—, এ শুধু একটু মনের হাওয়া বদল—"।

এই সময় দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকলো অতিমা—, কয়েক পা এগিয়ে এসে সে পিছিয়ে যেতে চাইছিল—, মঞ্জুল বললো—" এস তমা—, ইনি আমার বউদি, রঞ্জনদার স্ত্রী—; মঞ্জুল তাকালো অনুকার দিকে—" বউদি ইনি আমার ভাবী পত্নী—অতিমা দেবী—"

অনুকা হাসলো অতিমার দিকে তাকিয়ে। অতিমা হাসতে চেষ্টা করলো—, কিন্তু পারলো না—ঠোঁট দুটি ওর বাথা বিবর্ণ দেখালো।

মঞ্জুলকে বললো অতিমা—"বিচিত্র অনুষ্ঠানে আমার নাচের ইস্কুলের দুটি মেয়ে নাচবে—, প্রচার পত্রে এই নাম দুটি বসিয়ে দিও—"

নাচের মেয়ের নাম লেখা একটুকরো কাগজ মঞ্জুলের হাতে দিয়ে অতিমা যেমন দ্রুত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকেছিল—, তেমনি দ্রুত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেল। অনুকা ও মঞ্জুল নিঃশব্দ দৃষ্টিতে ওর গমন গতির দিকে তাকিয়ে রইল।

*　　*　　*　　*

দিন দুই আগে রূপন অধ্যাপকের সাহায্য-কল্পে বিচিত্র অনুষ্ঠান অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

কয়েকটি নাচ—, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও কিছু আধুনিক গান ছিল। এ ছাড়া একটি কৌতুক-নাট্য—, কয়েকজন চিত্র তারকার আবৃত্তি ও কিছু ব্যায়াম প্রদর্শনও রাখা হয়েছিল। প্রায় হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল।

অভাবনীয় সাফল্য।

মঞ্জুল ভাবছিল—অভাবনীয় সাফল্য কার? উদয়ন সঙ্ঘের? না ডাক্তার তালুকদারের? ডাক্তার তালুকদার তাঁর কন্যার অভাবনীয় নাম ও যশ অর্জন করেছেন। কথকেলির উর্বশী নাচে গৈরিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে গৈরিকা। ওর নৃত্য ভঙ্গিমায়—, মুদ্রায়, কারুকলায় উর্বশীর মর্ম আবেদন অভিব্যক্ত হয়েছিল। মঞ্জুলের মনে হয়েছিল—এই অভিব্যক্তিতে যেন কত মানুষের দীর্ঘশ্বাস—, কত প্রত্যাশা ফুলে ফুলে উঠছে। একটা বেদের

আত্মদর্শন　　নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

আবেদন—, দামী ও নামী ওস্তাদের আপন আবেদন নৃত্যের তালে ও ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ডাক্তার তালুকদার সেদিন হসপিটালে আউটডোরে বসেন নি। অভিভূত তালুকদার কন্যার নৃত্যের তালে ও ছন্দে যেন এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। মঞ্জুল নিজের মনে একটু না হেসে পারলো না। মনের হাওয়া বদল সকলেরই জীবনে প্রয়োজন বৈ কি। অর্থ উপার্জন সেদিন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল—একান্ত পানসে ও বিস্বাদ।

তখন উদয়ন সংঘের কার্য নির্বাহক পরিষদের সভা বসেছে। সভানেত্রী—অতিমা এসে পৌঁছয়নি। অন্যান্য সভ্যগণ বিচিত্র অনুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে—, মঞ্জুল বিচিত্র অনুষ্ঠানের কথা ভাবছে।

এই সময় অতিমা চঞ্চল পায়ে ঘরে ঢুকলো—, চঞ্চল ভঙ্গিতে সকলের দিকে তাকিয়ে জানালো—" আজ তার বিশেষ কাজ থাকায় সভায় উপস্থিত থাকতে পারছে না। সহ-সভাপতি যেন আজকের সভা পরিচালনা করেন। অতিমা একখানা রঙিন খামে আঁটা চিঠি উদয়ন সংঘের সভ্যদের নামে মঞ্জুলের হাতে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

চিঠিখানা খুলেছে মঞ্জুল—অতিমার বিয়ের চিঠি। অতিমার ভাবী স্বামী বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার সমীরণ মৈত্র।

চিঠিখানা এগিয়ে দিয়েছে মঞ্জুল আর সকলের দিকে। রঙিন কাগজে চিঠি—, রঙিন জীবনের কথা লেখা হয়েছে—, কিন্তু কারও মনে রঙিন ঢেউ তুললো না—, বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা প্রত্যেকের মনকে উৎসুক করে তুলেছে—, দৃষ্টির উন্মুখে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে উত্তর চাইছে—"অতিমার পাশে মঞ্জুল নয় কেন"?

কিন্তু মঞ্জুলের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্য ব্যয় করবার উদ্যম কারও ছিল না। মঞ্জুল নিঃশব্দে যেন কোনদিকে তাকিয়ে ছিল। ও ভাবছিল—মনের একটু হাওয়া বদল ওর জীবনের বাঁক ঘুরিয়ে দিল।

ঠিক তখন অনুকা রঞ্জনকে হাওয়া বদল করতে নিয়ে যাবার গোছগাছ করছিল, দরজার দিকে থেকে থেকে ও তাকিয়ে দেখছিল—, মঞ্জুল এখনও এল না? মঞ্জুল কখন আসবে?

———

কলঙ্ক

অমরেন্দ্র ঘোষ
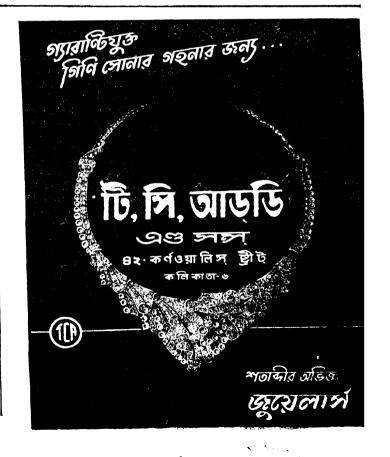
একখানা চিঠি পেয়েছেন? একটি মেয়ে এসে ঝলমলিয়ে বসে পড়ে আমার খাতার ধারে।

আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়ি। যা লিখব ভাবছিলাম ভুলে যাই। তারপর মুখের দিকে চেয়ে আনন্দে হেসে উঠি, দীপা! তুই?

চিঠি পেয়েছেন?

কার?

মা লেখেননি? আপনার ছবি দেখে তো আমরা মুগ্ধ। কী চমৎকার যে ডিরেক্সন দিয়েছেন! মা বলছিলেন, প্রথম বইয়েই এই—এরপর আর আপনার ভবিষ্যৎ রোকে কে? কেন, মা আপনাকে লিখে জানাননি?

সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে বসে জমা খরচ লিখছিলাম। দেখলাম এখন পর্যন্ত খরচের অঙ্কটাই তেজি। তবে ভরসার মধ্যে শুনছি বইটা নাকি হিট করবে। কিছু আশ্চর্যও নয়? বড় একটা ডিষ্ট্রিক্ট টাউন নদীয়ার খবরই তো দীপা।

কিন্তু ভয়ের একটা বিষয় আছে, ওরা তো ভাল বলবেই—কারণ ওরা আত্মীয়। ঠিক আত্মীয়ও নয়। তার চেয়েও যদি কিছু ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক থাকে, তবে তাই। সেই জন্যই দীপা মেয়েটিকে যে কি ভাল লাগে! রঙটা ময়লা হলেও একেবারে স্লিম-ফিগার। খুব সুন্দরী কিছুতেই বলতে পারব না। শাড়ি-ব্লাউজ আদৌ দামী কিম্বা চটকদারী নয়। তবু ওর বসার ভঙ্গিতে আলো করেছে ঘরখানা।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। দীপা জিজ্ঞাসা করে, তবে বুঝি চিঠি পাননি?

ঠিক মনে পড়ছে না।

দীপার একটু মুখ শুকিয়ে যায়। যাকগে—মা কিন্তু খুব পরিশ্রম করে লিখেছিলেন। চিঠি লেখার এমন উৎসাহ মার কত কাল যে দেখিনি! আপনি হয়ত জানেন না আজ দু'বছর হয় মার চোখ ধরেছে কিন্তু কুড়ি-পঁচিশটা টাকার দরুণ চশমা নেওয়া হয় না। আর মারও দোষ আছে। কতবার বাবা টাকা এনে দিয়েছেন, মা হয়ত নটুর এগজামিনের ফিস্ নইলে মুদীকে দিয়ে বসে আছেন। তাই বলছিলাম, আহা মা রাত জেগে জেগে কত কষ্ট করে চিঠিখানা লিখেছিলেন।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। চিঠিখানা কি ডেলিভারীতে গোলমাল হল, না পেয়েও আমি ভুলে যাচ্ছি? এমন ভুল যে আমার মাঝে মাঝে না হয় তা নয়। আপশোষ হয় দীপার মার কথা মনে পড়ে। বয়স তো তেমন কিছুই হয়নি! এককালে আয়েসা, জগৎ সিংহ এবং ওসমানকে নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি দুজনে।

ওগো শুনছ—দেখে যাও কে এসেছে।

গিন্নী বোধ হয় বাথরুমে। আমার ডাক অতদূর পেঁছায়নি। উঠতে যাচ্ছি, দীপা নূতো-পরা দেয়ালী শিখার মত একান্ত অকারণে হেসে ওঠে। শুনুন কাকা, যেদিন ছবি দেখতে যাই, তার কাহিনী। পরের বইতে আপনি একটা সিচুয়েশন খাড়া করতে পারবেন।

আশ্চর্য হয়ে যাই। মেয়েটা তেমন লেখা-পড়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু এত কথা শিখল কোত্থেকে? এই তো সেদিন দেখেছি দেশে বসে বৌ-বৌ খেলতো। এই ক বছর কলোনিতে এসে একি পরিবর্তন? পূর্ববাঙলার মেয়েদের ওপর বোধ হয় প্রকৃতির এ এক অপরিসীম দান!

হ্যাঁরে একটা কথা বলি, হয়ত ভুলে যাব, তাই আগেভাগেই বলে রাখছি, তুই দু'চার দিন এখানে থেকে যাবি এবার, বুঝলি—মনে থাকবে তো?

থাকবে কাকা থাকবে। একথা আর বলতে হবে কেন? সেই ভেবেই তো এসেছি। এখন টুইশনিও নেই, চাকরী-বাকরীও কিছু পাইনি। ভাবলাম দু'দিন বেড়িয়ে যাই।

চোখ জোড়া একটু কপালে উঠে যায় আমার।

ভাবছেন আমি ছেলে পড়াই কি বিদ্যেয়? কেন আমি এখন গড় গড় করে ক্লাস এইটের বই পড়াতে পারি; নিজেই চেষ্টা যত্ন করে শিখেছি, এ বয়সে তো আর ইস্কুলে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। আর সত্যি কথা কি নটুকে পড়িয়ে খরচপত্র চলে না। ক্লাস থ্রির ছেলেকে পড়াতে আমার কষ্ট হয় না মোটে।

মনে মনে বলি ধন্য মেয়ে!

হ্যাঁ যা বলছিলাম, শুনুন। আপনার পাশ তো থামে গিয়ে হাজির। আ সর্বনাশ, বিকাল বেলা দারুণ ঝড়-জল করে এল। যেতে তো হবে ওখানে গঙ্গা পেরিয়ে, ওপার নবদ্বীপ। মিটিং বসল ঘরে।

আমি হেসে উঠি। বলিস কি?

শুনুনই না—তারপর আরো ইনটারেষ্টিং।

বল, শুনছি।

আমি বললাম, সভাপতি কে? বাবা বললেন, কেন তোর মা, যিনি গৃহকর্ত্রী। আমি অনুমোদন করলাম। বাবা বললেন, গৃহকর্ত্রীর একটা কিন্তু কাষ্টিং ভোট রইল।

আমি মন্তব্য করলাম, সত্যি ইনটারেষ্টিং দীপা।

নটু আর বাবা বললেন এ অবস্থায় না যাওয়াই ভাল। আমি বললাম আমাদের দেশের মেঘনা, পদ্মা থেকেও কি এ মরা গঙ্গা ভয়ংকর হল? সময়ে তো তাও আমরা পাড়ি দি। বাবা বললেন, তেমন জরুরী নয়।

স্পন্দিত বুকে জিজ্ঞাসা করি, তোর মা কি বললেন?

তাঁর কাষ্টিং ভোটটা আমাকে দিয়ে কোনো প্রকারে হারের মুখ থেকে বাঁচালেন। কিন্তু জিত্ হল না আমার। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল কেউ না গেলেও মা আর আমি যাবই যাব ওপারে। নৌকা ঠিক করা হল। আমিই ভিজে ভিজে ঠিক করলাম।

সাবাস্ মেয়ে তুই।

সন্ধ্যা নাগাত ঝড়-জল বেমালুম থেমে গেল। ইস চিঠিখানা পাননি! এর চেয়েও চমৎকার করে লিখেছিলেন মা। আমাদের ঘরে পড়লেও মা তো একজন কবি ছিলেন।

ছিলেন কেন, সে কাব্য-প্রাণ এখনো আছে—নইলে তুই কি হতিস্ এমন মেয়ে! যেন মায়ের একখানা ঝঙ্কার। বলেই একটু চুপ করে রইলাম। কারণ বিগত কথা অনেক মনে পড়েছে। তা আজ আর বলার নয়।

কাকা আপনিও নাকি কবিতা লিখতেন? মার গানের খাতায় আজো একটা লেখা আছে—ভারি সুন্দর কিন্তু—

যৌবন সরসী তীরে কে তুমি সুন্দরী
আহা মরি মরি
দেখি তব কেশ ভার...

দূর, দূর ও কি আবার একটা কবিতা হল?

কেন হবে না—বেশ তো সুন্দর রাবীন্দ্রিক ছন্দে লেখা।

আবার আশ্চর্য করে দীপা। এত সব তুই জানলি কি করে?

যার মা কবি, কাকা কবি, তার পক্ষে কি এটুকু জানা বেশি?

তোর বয়স কত হল?

হঠাৎ? একটু বিস্মিত হয় দীপা।

দরকার আছে।

এই কুড়ি, একুশ, পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ—আমি তো বুড়ী হয়ে গেছি।

না না, কে বললে, কে বললে এ কথা তোকে? ভাবলাম কি যেন সংবাদে ও মনটা একটু দমে গেছে। আর ভাবলাম বইটা ছিঁড়ে করলে ওকে এখানে এনে পড়াব। পারলে—ওর বাপ, মা নিশ্চয় খুশি হবে।

এমনি সময় ঝিটা এসে পড়ে। পরনে ছিটা কাপড়, কাঁধে কাচবার মেলা কাপড়-চোপড়।

তোমার ঘরে অতিথি, আর তোমারই পাত্তা নেই।

কি করব মেয়েই তো চাকরানি নেই। ওমা দীপা নাকি? দেখি তো মুখখানা! কতদিন বাদে কাকা-কাকীদের মনে পড়ল! স্নেহভরা গৃহিণীর চোখ ছলছলিয়ে দীপা হাসতে থাকে। সম্ভবত যেন স্নেহের ছোঁয়া লেগে লেগেছে। আমার চিঠিখানা, ওদের শয়নঘরটি সরগরম হয়ে ওঠে।

স্ত্রী বলে, এই দেখিস তো ওর সাথে আলোচনা হচ্ছিল তোর মুখের আদল নিয়ে। তোর আর—বলতো আর শেষ করতে পারে না গৃহিণী। এক বোঝা কাপড় আনলা থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে।

দীপা বলে, তা আর আশ্চর্য কি? ভুত হয়ে অমনি হয়।

গভীর উত্তেজনা ও স্নেহের সঙ্গে ওদের কথা শুনছি। হঠাৎ দেয়াল ঘড়িটায় দশটা বাজল। স্কুটার নেই। ইস্কুল ছুটি হয়েছে। পুত্র পল্টু এসে দীপার গলা জড়িয়ে ধরে। তুমি এসেছ দীপাদি! ওর যে কত আনন্দ। সে হাততালি দেয়। আরো জম জম করে ওঠে ঘরখানা। দীপাকে এটা ওটা কত কি দেখায় পল্টু। দীপা পল্টুকে বারবার চুমো খায়। সেও যতদূর সম্ভব উচ্ছলা হয়ে ওঠে।

আবার আমি গভীর স্নেহে ওদের লক্ষ্য করি। কেন যেন ভাবি, দীপার মাও যদি ওর সঙ্গে আসত।

কাকীমা আপনারা একখানা চিঠি পাননি?

আর চা খাবি একটু। কার চিঠিরে?

মার। কাকাবাবু অস্বীকার করছেন।

কেন সেই পয়লা আষাঢ় যখন উঠে-পড়ে মেয়ের সম্বন্ধ দেখ, তখন ওর মাকে একখানা চিঠি দাওনি? ক'দিন পরে তারই তো জবাব এলো। এর মধ্যে ভুলে গেলে? তখনই তো পাশ পাঠিয়েছিলে।

ও!

সেই চিঠিতেই তো সিনেমা দেখার কাহিনী ছিল কাকীমা।

স্ত্রী বলে, মারে তোর জন্য সম্বন্ধ দেখার অনুরোধ ছিল। লজ্জায় দীপা রাঙা হয়ে ওঠে। কি যে বলেন আপনি!

সত্যি রে সত্যি। তুই তো সেই জন্যই এসেছিস। স্ত্রী একটু মুখ মচকে হাসে।

ধেৎ। ও কথা বললে আমি এক্ষুণি চলে যাব।

তবে থাক—আয় একটু চা খেয়ে যা। তুই তো সবই জানিস!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যায় দীপা, আচ্ছা কাকীমা ঘরটা একটু খালি খালি ঠেকছে কেন? মিলি কোথায়?

এত বড় সংবাদটাই এতক্ষণ জানান হয়নি। আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বলি, হঠাৎ তার বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইর একেবারে গ্রীসিয়ান ফিগার। চমৎকার নাক-মুখ। কেন, তোর মাকে তো চিঠি দিয়েছি। পায়নি?

স্ত্রী বলে, উঃ একেবারে গঙ্গাস্নানের পুণ্যি হয়েছে। গলগ্রহ মেয়ে ছিল। এখন ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত। এই দেখ ফুল-মুকুট, এই দেখ কেমন সুন্দর চিত্র করেছিল বিয়ের পিঁড়ি মিলির এক বন্ধু।

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখে না যেন দীপা। নিমেষে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অসীম ধৈর্যে সে যেন নিজেকে সংযত করে বলে, ভালই তো? বড় সুখী হলাম যে কাকীমা শুনে। চিঠি পেয়েই তো মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন মেয়ে-জামাই দেখতে।

চা খেয়ে দীপা বলে, আমি একটু মামার বাসা থেকে দেখা করে আসি।

আমি বলি, কখন আসবি?

সন্ধ্যার পর।

না তা হয় না। আমি তোকে এখন কিছুতেই যেতে দেব না।

রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছে না। গলগ্রহ মেয়ে শুভ কুশলে বিয়ে দিয়েছি তবু ইনসোমনিয়ার থাবা এড়ান যাচ্ছে না।

বিকালে আবার একখানা চিঠি এসেছে। লিখেছে দীপার মা।

প্রিয় সুরেশবাবু,

তোমার মেয়ের বিয়ের কথা শুনে বড় সুখী হলাম। এবার চাঁদের কলঙ্কটুকু ধুয়ে মুছে দাও।

ইতি তোমার প্রিয়তমা।

কখনো কোনো দিন একান্তে কথা উঠলেই রহস্যচ্ছলে ঐ কথাটা প্রিয়তমাকে বলতাম আমি। আজ ভাবছি, দীপা কি শুধু চাঁদেরই কলঙ্ক? তাই বুঝি আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

(৮০ পৃষ্ঠার পর)

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায়॥

* * * *

করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈতেই তারে সংহারিব ভাল মনে॥

* * * *

শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সর্বনাশ॥

* * * *

এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে এবং শ্রীনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য, শ্রীচৈতন্যের দাস, শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর বলিয়া গিয়াছেন। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধরপতি অদ্বৈত ঈশ্বর॥

দলাদলির বিষাক্ত সে প্রবাহ সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিতেছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতের তিরোধানের পর ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য শ্রীনিবাস এবং প্রভু শ্যামানন্দ সেই সর্বনাশের পথ হইতে বৈষ্ণব সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতেই তাহার অধিষ্ঠানভূমি রচিত হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত পরিবেশে, সুরসিক, সুপণ্ডিত, নৈষ্ঠিক গৌর ভক্তগণের মধ্যে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে যাহা সহজ হইয়াছিল, শ্রীবৃন্দাবন দাসের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। একদিকে ভণ্ড ভক্তগণের উপদ্রব, অন্যদিকে দলাদলিতে বিভক্ত বাঙ্গলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়—ইহারই মাঝখানে শ্রীবৃন্দাবন দাসকে শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের মহামহেশ্বরত্ব প্রতিপাদনেই অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন। চৈতন্য চরিত্রের মাধুর্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কারণেই আমাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। অন্তর বলিতেছে—

"এহো বাহ্য আগে কহ আর"—

ফেরতে দেরি হবে, মা।

সেকালের বেতারে সঙ্গীত

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সেকালের বেতারের কথা বলছি। সেকাল মানে এমন কিছু প্রাচীন কালের কথা হচ্ছে না,—বেতার প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে ত মাত্র সেদিন। শব্দার্থে যে অভিধানটা মানুষের মনে আপনা থেকেই রচিত হয় তার নির্দেশ অনুসারে 'সেকাল' আর 'সেদিন' মোটেই একার্থবাচক নয়। সেকাল আর একালের মধ্যে আমরা এই তফাৎ বুঝি যে, এই দুই সময়ের মধ্যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়েছে বেশী। আর সেদিন বলতে এমন একটা সময় বুঝি যখনকার অবস্থার একটা সক্রিয় রূপ এখনকার অবস্থার মধ্যেও লোপ পেয়ে যায়নি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই নিপাতন আছে, আর্ষপ্রয়োগ আছে, অর্থাৎ অনিয়ম আছে। অবশ্য কোন কোন বস্তু আছে, যেগুলি কালের পরিবর্তনকে কোন কালেই আমল দেয় না। যথা ঢেঁকি, গরুর গাড়ী। এই সকল বস্তু সেকালের বা একালের নয়, সেদিনের বা আজকের দিনেরও নয়—এরা সনাতন। তবে কোন কোন ব্যাপার সেদিনের হয়েও বর্তমানে নিতান্ত সেকালের হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে অল্প সময়ের ব্যবধানেই এত গুরুতর পরিবর্তন এসে গিয়েছে যে, আজকের দিনে তারা হয়ে পড়েছে আমাদের ধারণার অতীত। এই ত সেদিন এক সন্ধ্যায় যে সব যাত্রী দূরগামী রেলগাড়ী চাপল, তারা পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখে, যারা সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী তারা ফার্স্ট ক্লাসের আর ইন্টার ক্লাসের যারা তারা সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী হয়ে বসে আছে। থার্ড ক্লাসের যাত্রীও ছিল অনেক, তারা কিন্তু থার্ড ক্লাসেরই রয়ে গেল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর যাত্রীদের মনে এই ক্লাস পরিবর্তন কোন রকমের ছায়াপাতই করতে পারেনি।

আমাদের মত দুই একজনের ওপর গেল ক'বছরের বেতারীয় পরিবর্তন বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করেনি,—অর্থাৎ এর নূতন চেহারার স্বরূপ বুঝতে পারলেও এর প্রাচীন রূপকে ভুলবার বা অবহেলা করবার মত কোন কারণ উপস্থিত হয়নি। পরিবর্তনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যাদের যত বেশী তারাই তত সহজে আগেকার অবস্থাকে ভুলে যায়। এদেশে বেতারের বয়স এখনো ত্রিশের কোঠায় পৌঁছোয়নি, তা হলেও এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের কাছে বেতারের প্রথম দশ বছরের ইতিহাস একেবারে সেকালের ইতিহাস।

অনেকের জানবার কৌতূহল আছে বেতারের ভিতরকার রহস্যটা কি? অনেকেরই জানা নেই যে, বেতার আপিসের অগণিত তারের বেড়াজালের অন্তস্তলে 'বেতার' বস্তুটি আত্মগোপন করে আছে। এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের খোঁজ একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারগণ ছাড়া অধিকাংশ বেতার কর্মীদেরও জানা নেই। সাধারণ শ্রোতার আগ্রহ, ওখানে কিভাবে গান-বাজনার আয়োজন করা হয় আর কিভাবে তা প্রচারিত হয় সেইটে জানা। এই আগ্রহ নিয়ে সেকালে যে কোন শ্রোতা বিনা-বাধায় সরাসরি বেতার আপিসে ঢুকে পড়তে পারত। আজকাল বন্দুকধারী সেপাই থেকে আরম্ভ করে সরকারী অভ্যর্থনাকারীর কাছে অনেক রকমের বাধা পেয়ে তবে ঢোকা সম্ভব হতে পারে, অনেক সময় যথোচিত কারণ দর্শাতে না পারলে তাও পারা যায় না।

ব্যাপারটা হয়েছে এই রকম :—বন্ধু 'ক'বাবু ছিলেন অতি সদাশয় দিলখোলা লোক,—তাঁর বাড়ীতে আমরা সারাক্ষণ আড্ডা জমিয়েছি, সমাগত বন্ধুদের আদর-আপ্যায়নে তাঁর কোন ত্রুটি ছিল না। এমন সময় একদিন হঠাৎ মন্ত্রীর পদ পেয়ে গেলেন তিনি। রাতারাতি তাঁর চোখে-মুখে স্বাভাবিক হোক আর অস্বাভাবিকই হোক একটা নূতন ধরণের গাম্ভীর্য নেমে এল, তাঁর বাড়ীর সদর দরজাটাতেও বন্দুক সঙ্গীন পাগড়ী ও উর্দি যথাক্রমে বীর রৌদ্র ভয়ানক ও বীভৎস রসের আমদানি করল,—ফলে বন্ধু সমাগম বন্ধ, আড্ডা লুপ্ত। বেতার ষ্টেশনেও সেকালের তুলনায় একালে এই ধরণের একটা পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্র থেকে। নিয়ম-কানুনের বাঁধাবাঁধি যুদ্ধের কিছুদিন আগে থাকতেই কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছিল।

এরই আগেকার কথা বলতে যাচ্ছিলাম।—সব কথা নয়, শুধু সঙ্গীত বিষয়ক দু-একটা প্রসঙ্গ। সেই আমলের অনেকটা জুড়েই বেতারীয় সঙ্গীতের আয়োজন ও প্রয়োজনের ভার ছিল আমার ওপর। গোড়া থেকেই লক্ষ্য করতাম, ভদ্রঘরের মেয়েরা বেতারের সীমায় পা বাড়াতেন না। সুতরাং অনেক দিক দিয়ে বেতারের জনপ্রিয়তা থাকলেও আভিজাত্য যে ছিল না, এটা বেশ অনুভূতিযোগ্য ছিল। সেই আভিজাত্য সৃষ্টির কল্পনা নিয়ে একদিন বেতারজগৎ-সম্পাদক বন্ধুবর নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা গেল, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান করা যাক। বলা বাহুল্য এটা ছাপানো অনুষ্ঠান-লিপির অন্তর্গত ছিল না। এ রকম ব্যাপার বেতারে অনেক ঘটেছে। মনে করবেন না, আমাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ছিল না,—তা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তবে আমরা নিয়মতান্ত্রিক ছিলাম না, একথা স্বীকার করছি।—আপিস দোরস্ত ভাবটা পরে এসেছে। এতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তার বিচার করবেন ঐতিহাসিক। আমি এখানে ইতিহাস লিখতে বসিনি, সে কথা বলে রাখছি।

যা হোক সেই বিচিত্র অনুষ্ঠানে অনেকে যোগ দিলেন,—কাশিমবাজারের মহারাজা, সন্তোষের মহারাজা, গৌরীপুরের বীরেন্দ্র-কিশোর, গোবরডাঙ্গার জমিদার, নাটোরের মহারাজা, লালগোলার রাওরাজা এবং আরো অনেকে। কেউ গাইলেন, কেউ বাজালেন, কেউ আবৃত্তি করলেন। তা ছাড়া গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, খেলাধূলার আলোচনা, কত কি হল। ষ্টেশন ডিরেক্টর ষ্টেপলটন সাহেবকে বললাম, এতগুলি বিশিষ্ট লোক এসেছেন, আপনি গিয়ে একবার ও'দের সঙ্গে কথা বলুন, নইলে ভাল দেখায় না। ষ্টেপলটন বেচারী শিক্ষিত বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশতে একটু বিব্রত বোধ করতেন, কারণ কাকে কি বলতে হবে তা তাঁর জানা ছিল না। ষ্টুডিওতে ঢুকতেই আমি তাঁর সঙ্গে সন্তোষের মহারাজার পরিচয় করিয়ে দিলাম। একটু ইতস্ততঃ করেই সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বোধ হয় ক্লারিওনেট বাজিয়েছেন?' মহারাজা প্রথমে অবাক হলেন, তার পরক্ষণেই বিরক্ত হয়ে সেই যে সাহেবের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন, আর ফেরবার নাম করেননি। ষ্টেপলটন দু' তিনবার মাথা চুলকিয়ে কোথায় ভুল হয়েছে বুঝতে না পেরে সটান নিজের ঘরে চলে গেলেন। আর কারো সঙ্গে পরিচয় করানোই হল না। বেচারীর দোষ কি। তাঁর যুক্তি ছিল এই ধরণের :—নৃপেন মজুমদার (প্রোগ্রাম পরিচালক) বাঙ্গালী, মহারাজাও বাঙ্গালী। এখন যেহেতু নৃপেন মজুমদার বাঁশী বাজান, সুতরাং মহারাজাও বাঁশীবাদক না হয়ে যান কোথায়?

সাহেব চলে গেলে মহারাজা আমায় বললেন, 'লোকটার শিং আছে কিনা দেখেছেন?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে, ল্যাজও আছে।' তিনি একটু অপ্রতিভ হয়ে জানতে চাইলেন, 'কি রকম?' আমি বললাম 'বেচারী নিতান্ত ভাল মানুষ, গোবেচারী—তবে তাঁর সঙ্গে যুক্তিতে না মিললে গুঁতোতে আসেন। আবার ল্যাজ মুচড়ে দিলে অনেক দূর অবধি দৌড়ে গিয়ে কাজ হাসিল করেও আসেন।'

* * *

সকলেই জানেন রেডিওতে গাইতে গেলে আগে একটা অডিসন দিয়ে আসতে হয়। এই কাজটা আজকাল যত কড়াকড়ি নিয়মে করা হয়, তখনকার আমলে তার কিছুই ছিল না। শিল্পীরা সোজাসুজি ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলেই তাদের কণ্ঠ বা হস্ত (বাদনে) পরীক্ষা করা হত। আমিই ছিলাম একমাত্র পরীক্ষক। পরীক্ষার সময় আমি শিল্পীর সামনেই উপস্থিত থাকতাম। কেউ মনোনীত না হলে সেই দুঃসংবাদ তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেওয়া হত। স্থলবিশেষে পরদিন চিঠিতে জানানোর প্রথা ছিল।

একদিন বেলগাছিয়া থেকে একজন সেতারী এলেন। নবীন শিক্ষার্থী, তাঁর ধারণা তিনি একজন বড় ওস্তাদ। একটা গৎ বাজালেন,—অশ্রাব্য। তারপর ঝালা ধরলেন, কান ঝালাপালা। আমি রেজেষ্টরী খাতায় মন্তব্য ঘরে সংক্ষেপে লিখলাম N.G. ভদ্রলোক আমার পেছন থেকে এসে ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখে ফেললেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন 'মশায় N. G. মানে কি?' আমাকে বাধ্য হয়ে জবাব দিতে হল 'আপনার বাজনায় একটা Notable Grandeur আছে কিনা, তাই ব্যাপারটা নোট করে রাখা হল।' তিনি খুসী হয়ে চলে গেলেন। আসলে ওটার মানে Not good. পরের দিন লিখিত চিঠিটা পেয়ে তাঁর হাসি নিশ্চয়ই লোপ পেয়েছিল।

* * *

তখনকার অনুষ্ঠান ঘোষণায় আমাদের

কোন ঘোষকের দরকার ছিল না। আমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে ও-কাজটা সেরে নিতাম। নৃপেনবাবু একদিন ঘোষকের কাজ করছেন। গান গাইছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার পর যাঁর গাইবার কথা, তিনি অনুপস্থিত। এমতাবস্থায়, অনিবার্য কারণবশতঃ শিল্পী উপস্থিত হতে না পারায়' প্রায়ই রেকর্ড বাজানোর প্রথা ছিল, অথবা আচমকা কোন পরিচিত এমন কি অপরিচিত শিল্পী উপস্থিত থাকলে তাকেই বসিয়ে দেওয়া হত। এর জন্য কোন বাঁধা আইন-কানুন মানা হত না। যাক্, ভীষ্মবাবুর গান ত শেষ হল,—তিনি তাঁর গানের সমাপনসূচক ঘোষণার জন্য বসে অপেক্ষা করছেন। এদিকে নৃপেনবাবু বলতে লাগলেন, "ভীষ্মবাবুর খেয়াল গান এইখানেই শেষ হল,—অতঃপর যাঁর গাইবার কথা তিনি অনুগ্রহ করে আসেননি। এদিকে ভীষ্মবাবুর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একটু বাংলা গান গাইতে পারলে খুসী হন, অতএব এইবার ভীষ্মবাবু আপনাদের একখানি বাংলা গান শোনাচ্ছেন।" ঘোষণা শুনে ভীষ্মবাবু অবাক, কিন্তু নিরুপায়,—একটু হেসে গান ধরলেন। ব্যাপারটা তিনি নিজেও খুব অপছন্দ করেননি, আর শ্রোতারা ত খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। এখনকার দিনে এই রকম একটা ঘটনা ঘটলে সেটা চাই কি কোর্ট অবধি পৌঁছে যেতে পারত। কাজটা যে বেআইনি হয়েছিল সে কথা নৃপেনবাবু বা শিল্পী কেউ মনে করেননি। এমনি একটা আত্মীয়তাবোধ তখন ছিল বেতার-কর্মী, শিল্পী আর শ্রোতার মধ্যে। সন্ধ্যার পর হয়ত রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে এসে শুনলেন একজন গুণী সেতারী বাজাবেন, অমনি তিনি বসে গেলেন তবলা নিয়ে। রামপুরের তরুণ শিল্পী তসদ্দুক হোসেন গাইবেন, বেতারের পুরোনো কর্মী রাইচাঁদ বড়াল আড্ডা দিতে এসেছেন, তাঁকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হল তবলা বাজাতে। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটত। এ সব ব্যাপারের কোন কনট্রাক্টের বালাই ত ছিলই না,—অপর কোন নিয়ম-প্রথার কথা চিন্তাও করা হত না। কিন্তু এই সব অনিয়মের ফলে কোন তরফ থেকে কোন প্রকার আপত্তির কথা উঠেছে বলে কখনো শোনা যায়নি।

* * *

একদিন একজন গান শোনাতে এসেছেন,—বরাহনগরের দিকে বাড়ী, বয়স পঞ্চাশের বেশী, বহুকালের সাধনা তাঁর। এসেই বল্লেন, "আমাকে একটু বেশী সময় দিয়ে গাইতে দিতে হবে মশায়, হা করতেই খতম—এ রকম গান আমি গাই না।" সময় দেওয়া গেল,—তিনি গাইলেন একখানি খেয়াল,—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না, লয়ও ভালই ছিল। গানে বিস্তার, তান, বাঁট যথেষ্ট পরিমাণেই করলেন তিনি, যা খুব পাকা গাইয়ের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু গান শুনে আমাদের মন উঠল না, বরং উল্টে হাসি আর বিরক্তির সঞ্চার হল। সেক্সপীয়রের কথা মনে পড়ল,—তবে কি আমরা পাষণ্ড? সঙ্গীত আমাদের মনে সাড়া জাগায় না? শেষে এই ভেবে আশ্বস্ত হওয়া গেল সেক্সপীয়র যে সংগীতের সম্বন্ধে উক্তি করেছেন সেটা রঞ্জিকর সঙ্গীত, বিরক্তিকর পর্যায়ের সঙ্গীত নয়।

ভদ্রলোকের গানখানিকে যদি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দৃশ্য আর শ্রাব্য হিসাবে দুইভাগে বিচার করি, তা হলে বলব দৃশ্যের ভাগটা অর্থাৎ হাত-পা মাথা ও অন্যান্য অঙ্গের আলোড়ন ও বিক্ষেপ উপভোগ্যই হয়েছিল। কিন্তু শ্রাব্যের ভাগটা হয়েছিল একেবারেই অশ্রাব্য অর্থাৎ বেসুরো এবং রসহীন।

প্রথা অনুসারে তাঁকে জানানো হল, তাঁর এই অপূর্ব শিল্প-সামগ্রীকে বেতারস্থ করা যাবে না। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, "আমি তা জানতাম, কিন্তু আপনার নাম কি সুরেশ চক্রবর্তী?" অজানা আতঙ্ক চেপে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" তিনি বললেন, "আমি আপনাকেই খুঁজেছিলাম, আপনার আপিস ঘরে চলুন।" গেলাম। তিনি বলতে লাগলেন, "দেখুন, আমার এই সংগীতসাধনা ত্রিশ বছরের। এর জন্য লেখাপড়া ছেড়েছি, বাড়ীর সকলের কাছে গালিমন্দ শুনেও উপার্জনের চেষ্টা করিনি, বন্ধু-বান্ধবরা বার বার বাধা দিয়েছে, ঢিল ছুঁড়তেও কসুর করেনি। কিন্তু আমার সাধনায় আমি অটল আছি। সকলেই বলেছে আমার গান হবে না, গলায় সুর নেই, আমি নাকি আর জন্মে গাধা ছিলাম এবং পরের জন্মেও তাই হব, ইত্যাদি। আমি কারো কথায় কান দিইনি, নিজের সাধনাতেই মত্ত হয়ে আছি। তবে, একবার সাধ হয়েছিল, আপনাকে একবার গান শোনাব, আর

ঘরের কাজের ফাঁকে

ক্ষেতের কাজের ফাঁকে

(ডি, সোনা)

আপনার মতামত নেব। এতদিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কথায় বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আপনি ত আমার কেউ নন, আপনার কাছ থেকে আজ এই অপক্ষপাত সিদ্ধান্তের সন্ধান পাওয়া গেল যে, সত্যি সত্যি আমার এই দীর্ঘ সাধনা বিফল হয়েছে।"

সহানুভূতিতে আমার মনটা একটু দ্রব হয়ে এল, বললাম, "মশায় কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে নিরুৎসাহ করবার উদ্দেশ্যে বা আপনার সাধনার পথে বাধা জন্মাবার জন্য কোন কিছু বলিনি। আপনি জানতে চেয়েছিলেন,—তাই—" আর কিছু বলতে না দিয়ে তিনি গর্জে উঠলেন, "কি আমার সাধনায় বাধা দেবেন আপনি? স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও বাধা দিতে পারবেন না—জানেন আমি ব্রাহ্মণ,—জন্মান্তরে বিশ্বাস করি? হাজার জন্ম ধরে সাধনা করব, সঙ্গীতে অধিকার আমি লাভ করবই,—দুই এক জন্মে না হলেই কি?" আমার আর মুখ ফুটল না, পদধূলি নিয়ে তাঁকে বিদায় করলাম।

* * *

কুড়ি বছর আগে ক্যালকাটা মিউজিক এসোসিয়েশন নামে একটা সঙ্গীতচক্র গড়ে ওঠে, আমি ছিলাম সেটার প্রথম সেক্রেটারী। এর প্রথম অধিবেশন হয় নাটোরের মহারাজার বাড়ীতে। আমার উপস্থিতির খোঁজ পেয়ে "বিশ্বগুরু"—সেখানে গিয়ে উপস্থিত, রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম হয় কিনা তারই চেষ্টা করতে। সঙ্গীত সম্বন্ধে অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী বলে 'বিশ্বগুরু' মনে মনে বেশ খানিকটা দুর্বলতা পোষণ করতেন। ইনি বলে-কয়ে এবং টাকা-পয়সা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে এনায়েৎ খাঁ সেতারী, হাফেজ আলি সরোদিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত গুণীদের শিষ্য বানিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, "দেখুন ও সব ওস্তাদ কেবল নামেই ওস্তাদ, আসলে ওদের কিছু হয়নি। সঙ্গীতের আসল জ্ঞানের দিকটা আমি আপনার জন্যেই রেখেছি। আপনি আমার শিষ্য হলেই দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যে আপনাকে আমি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞানী করে তুলব।" টাকা পয়সার কথা কিছু বলেননি, তবে আমি একটু আগ্রহ দেখালে সে দিক দিয়েও কোন অসুবিধা হ'ত না। যা হোক্, আসরে তাঁর উপস্থিতিতে আমি মনে মনে বিপদ গুণলাম। সে দিন রাধিকা মৈত্র সরোদ বাজাবেন ঠিক করা ছিল। 'বিশ্বগুরু' আমার পাশে বসে থাকলে শুধু তাঁরই কথা শুনতে হবে, সরোদ শোনা আর হবে না, এইটেই ছিল আমার ভয়। তাড়াতাড়িতে আর কিছু উপায় না দেখে আমি 'বিশ্বগুরু'কে নাটোরের মহারাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, "মহারাজ, এর সঙ্গে একটু আলাপ করুন, ইনি গলায় চৌদ্দ-সপ্তক সুর বার করতে পারেন।" মহারাজা বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাঁকে নিয়ে খাস কামরায় চলে গেলেন,—আমি নিশ্চিন্ত মনে মৈত্র-মশায়ের বাজনা উপভোগ করবার সুযোগ পেলাম। খানিক বাদেই মহারাজা 'বিশ্বগুরু'কে নিয়ে এসে আসরে উপস্থিত। আমার কানে কানে বললেন, "বেশ লোক আপনি, শেষে আমারই ঘাড়ে এক পাগলকে চাপিয়ে দিয়ে আমার বাজনা শোনাটাই নষ্ট করলেন?" আমি আর কি বলি, এই বলে ক্ষমা চাইলাম, "তা নইলে আমারই বাজনা শোনা হত না যে,—রাধিকাবাবুর বাজনা এই প্রথম শুনলাম।" মহারাজা হাসিমুখেই ক্ষমা করলেন।

পরদিনই 'বিশ্বগুরু' রেডিও আপিসে গিয়ে হাজির। সেদিন নাটকের মহড়া চলছিল। বীরেন ভদ্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তা ছাড়া ছোট বড় অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী আসরে উপস্থিত ছিলেন। 'বিশ্বগুরু'কে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি গান ধরলেন,—কি রাগ মনে নেই, আর তাল কি সেটা কেউ কখনো এর আগে শোনেনি,—সাড়ে পনেরো মাত্রার তাল। সঙ্গতকার ছিলেন অনাথনাথ বসু,—আর কেউ নাকি সে তাল বাজাতে পারে না। তানের কাজ সুরু হ'ল, 'চাপা হাসির তান', 'খোলা হাসির তান', 'চাপা কান্নার তান', 'বিলাপের তান' ইত্যাদি শ্রোতারা যে সকলেই অভিনেতা, সেটা তাদের মুখের কৃত্রিম গাম্ভীর্য রক্ষাকার্যের সফলতা থেকেই বুঝা গেল।

তার পরে মাইকের সামনে অডিশন। আমি নৃপেনবাবুর শরণাপন্ন হলাম। নৃপেনবাবু মিছিমিছি ষ্টুডিওতে একটা লাল আলো জ্বালিয়ে 'বিশ্বগুরু'কে গাইতে বললেন। 'বিশ্বগুরু' মিনিট দশেক গাইলেন, তার লাল আলো দেখে ভাবলেন, গান ব্রডকাষ্ট হচ্ছে। গীতান্তে নৃপেনবাবু মুখে একটা অপূর্ব বিস্ময়ের 'মেক-আপ' নিয়ে এসে বললেন, "মশাই, মশাই, আপনি এ করলেন কি? এ যে স্বর্গরাজ্যের সঙ্গীত, মরজগতে ত আমি কাউকে দেখিনে যে আপনার এই অত্যুচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদর বুঝবে। আপনার পায়ে পড়ি এই অমূল্য মুক্তো আপনি ইতরজনের কাছে ছড়াবেন না। এ জিনিষ আমি কিছুতেই ব্রডকাষ্ট করে নষ্ট করতে পারি না।" 'বিশ্বগুরু' তাঁর গানের মহিমাকীর্তন শুনে খুসী হয়েই চলে গেলেন, আর কখনো রেডিওতে যাননি।

* * *

একজন তরুণ গায়ক। বেশ খেটে-খুটে গান শিখেছে। একদিন সে রেডিওতে অডিশন দিতে গেল। অডিশনের পর তাকে জানানো হ'ল, তার গান রেডিওতে চলবে না। ছেলেটি ক্ষুণ্ণ মনে আমাকে বলল, "আমি আপনার সঙ্গে একটু আলাদা দেখা করতে চাই।" বেশ, তাকে আমার কামরায় নিয়ে গেলাম। বলল, "দেখুন, রেডিওতে গাইবার একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি এতদিন সাধনা করে আসছি,—আমার ধারণা ছিল আমার গান রেডিওতে চলবার মতই। এখন দেখছি তা নয়,—কিন্তু কি কারণে আমি মনোনীত হইনি সেটা দয়া করে জানাবেন কি? রেডিওর ব্যাপার ছাড়া সাধারণ সঙ্গীত শিক্ষার্থী হিসাবেও আপনার মতামতগুলি আমার কাজে লাগতে পারে এই আশাতেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। রেডিওতে গাইতে না পারলে আমার সঙ্গীত-সাধনা বিফল হবে বলেই আমি মনে করি।"

আমি—"দেখ, তানসেনের আমলে রেডিও ছিল না; অর্থাৎ তিনি কখনো রেডিওতে গাননি। তাঁর সাধনা কি বিফল হয়েছিল?"

সে—"কিন্তু এখন যেহেতু রেডিও হয়েছে, সেই হেতুই বলব, এতে গাইতে না পারাটা বিফলতার লক্ষণ।"

আমি—"তাই যদি তোমার মত হয়, তবে তুমি প্রশ্ন করে যাও কি কি কারণে তোমার গান আমাদের পছন্দ হওয়া উচিত ছিল।"

সে—"বেশ তাই করব।—দেখুন, আমি কি বেসুরো গেয়েছি?"

আমি—"না, তোমার কণ্ঠে বেশ সুর আছে।"

সে—"তবে কি তালে ভুল করেছি?"

আমি—"না, তোমার গানে [illegible] হয়নি।"

সে—"[illegible] অপর কোন দোষ [illegible]?"

আমি—"তা কেন?—তোমার গলা বেশ সুরেলা আর মিষ্টিও বটে।"

সে—"দেখা যাচ্ছে সব বিষয়েই আপনি আমার গানের প্রশংসাই করে যাচ্ছেন। দেখুন, আমি বিখ্যাত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের ছাত্র। আমি সব বিষয়েই তাঁর অনুকরণ করেই গান গেয়ে থাকি।"

আমি—"তা আর তোমায় বলতে হবে না,—গোড়াতেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, আর সেই জন্যেই তোমার গান রেডিওতে চলবে না।"

সে—"দেখুন, যদি দয়া করে মাপ করেন তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।—গুরুর কাছে মাপ চেয়ে বলছি,—আমার গুরু কৃষ্ণবাবুর গান যদি রেডিওতে চলে, তবে তাঁর হুবহু অনুকরণ-কারীর গানই বা চলবে না কেন?"

আমি—"ওইখানটাতেই একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে তোমার। তোমার গুরুর সবগুলি গুণের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেইটিকে বাদ দিয়ে বাকীগুলোর অনুকরণ করাতেই তোমার সাধনা বিফল হয়েছে।"

সে—"আমার গুরুর সেই গুণটি কী জানতে পারি?"

আমি—"কৃষ্ণবাবুর আসল গুণ হচ্ছে, তাঁর মৌলিকতা, অর্থাৎ তিনি কারো অনুকরণ করেননি। তোমার মধ্যে মৌলিকতার আভাস পাচ্ছি না ত।"

ছেলেটি কতক্ষণ ভাবল, বোধহয় বুঝতেও পারল। তারপর, আস্তে আস্তে চলে গেল। আশাকরি, অতঃপর সে সত্যিকার সঙ্গীত-সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল।

• এষণা •

আনন্দ বাগচী

কোন ভোররাতে তার কান্নাঝরা বিছানার থেকে
মা গেল হঠাৎ মুছে চাঁদের আলোর মত, সব
এখন পড়ে না মনে, সংসারের পথ এঁকেবেঁকে
এসেছে অনেক দূর, মুখে তার পুণ্যশ্লোক স্তব।
বিবর্ণ পথের বাঁকে কানে কানে কথা বলা গলি
এখনো ভয়ের গল্পে চমকে ওঠে, তার ছেলেবেলা
এখনো আবছা হয়ে বেঁচে আছে?
পাখির কাকলি
শুনে তার কান্না পায়, বুকে বাজে
করুণ বেহালা।
চিরোলু দুটি চোখে, লজ্জাবতী বুকের ভিতর
স্বপ্নের জোনাকি তার খোঁজে কোন
অলৌকিক ঘর।
এ আমার শোনা গল্প, যদিও সে রাজকন্যা নয়
তবু তার কথামালা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়।
হারানো পথের বাঁকে চিরকেলে ভীরু
পাল্কী চড়ে
সে কোথায় চলে যাবে, অন্ধকারে ঘর যাবে ভরে॥

দি

আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোং

লিমিটেড

(হেড অফিস ঃ ১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আর্থিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়

৩১-১২-৫৪ ইং পর্য্যন্ত

মোট সম্পত্তি	১,০৪,০০,০০০৲ উপর
বীমা তহবিল	৮৩,৬৭,০০০৲ "
গভর্ণমেণ্ট ও	
অনুমোদিত সিকিউরিটি	৫২,৭৪,০০০৲ "
বার্ষিক প্রিমিয়াম	১৫,৭১,০০০৲ "

বোনাস প্রতি হাজারে ৮৲

(৩১-১২-৫২ ইং তারিখের ভ্যালুয়েশনে ঘোষিত)

শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্ব্বত্র।

পূজায় আপনার বন্ধুদের নিয়ে আমাদের এখানে আসতে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমাদের বিশেষত্ব

মাটন বিরিয়ানী	— ১ টাকা	প্রতি প্লেট
চিকেন "	— ১॥৹	" "
চিকেন কালিয়া	— ১	" "
চিকেন দো পিয়াজা	— ৸৹	" "
আফগান চপ	— ।৶৹	প্রত্যেকটি
মাটন কালিয়া	— ।৶৹	প্রতি প্লেট
মাটন [illegible] কাবাব	— ।৶৹	প্রত্যেকটি
মাটন [illegible] কাবাব	— ।৶৹	প্রত্যেকটি
ফিরণী (ক্ষীর)	— ।৹	প্রত্যেক খুরি
শাহী টুকরা	— ।৹	প্রত্যেকটি

আমিনিয়া

রেষ্টুরেণ্ট

(এলিট সিনেমার কাছে) ফোন ঃ ২৬-১৩১৮

১নং করপোরেশন প্লেস, কলিকাতা

(ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিং)

উপরে থাকার বন্দোবস্ত আছে

সিঙ্গেল সীট ৫৲।

নমস্কার

শারদীয় শুভ-উৎসবে আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ

উৎকৃষ্ট

কাচের জিনিষ যা দেখতে ভালো

তা কিনেও আনন্দ,

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এমন জিনিষই

আমরা তৈরি করি।

ঔষধ, কালি, সুগন্ধি, সোডাওয়াটার, দুধ, পেনিসিলিন ইত্যাদির জন্য নানাপ্রকার মজবুত শিশি, বোতল এবং সৌখিন কাচ দ্রব্যাদি আমরা প্রস্তুত করি।

ভারত গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ

বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

টেলিগ্রাম ঃ ভারতগ্লাস

ফোন ঃ বড়বাজার ৪০২১

ধলেশ্বরী

সুশীল রায়

নন্দনগাছিতে বেড়াতে এসেছে অমিতাভ। জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর মাত্র তার কেটেছে এই নন্দনগাছি গ্রামের এই বিরাট ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। তারপর সে চলে যায় শহরে—কলকাতায়। পালিশ করা রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে তার জীবনটাও পালিশ করে নিয়েছে।

ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তূপই বটে। চারদিকে বুক সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে বিশাল চৌহদ্দি বেড়া দেওয়া। কিন্তু সে প্রাচীরের চেহারা এখন আলাদা। নোনা লেগে ক্ষয়ে গেছে ইঁট—শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে প্রাচীরের সর্বাঙ্গ। নাটমণ্ডে এখন চামচিকের রাজত্ব, তার বারান্দায় ঐশ্বর্যের সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে একটা জীর্ণ পালকি। পুজো-মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজে, কিন্তু সে ঘণ্টার আওয়াজে জোর নেই। আগাছা গজিয়ে উঠেছে দেয়ালের আর ছাতের ফাটলে।

গা ছম ছম করে অমিতাভের। তবু ভালোও লাগে। শৈশবের সঙ্গে এখানে যেন নতুন ক'রে হয় তার শুভদৃষ্টি।

সন্ধ্যার পর ছাতের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গুণছিল অমিতাভ। এত তারা শহরের আকাশে দেখা যায় না।

পায়ের শব্দ শুনে অমিতাভ বলল, কে?

—আমি।

—আমি কে? অমিতাভ মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল।

—আমি ধলী।

অমিতাভ আবার হাতের উপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, কেন?

—বৌদি পাঠিয়ে দিলেন। একা যদি ভয় করে, তোমার।

অমিতাভ বলল, আচ্ছা, বসো।

ধলী একটু দূরে ছাতের আলসের উপর বসল।

—শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে সারা ছাত। পিছলে পড়ে যাবে। এদিকে এসে ব'সো।

—ঠিক আছি। যেখান-সেখান থেকে লোকে পিছলে পড়তে পারে। ধলী বলল।

অমিতাভ ধলীর কথাটির মানে বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝতে পারল না। এ কথার আবার মানে কী? পাড়াগাঁয়ের একটা অতিনগণ্য মেয়ের কথার আবার মানে কী?

—তোমার বাড়িতে কিছু বলে না? অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল। বলল, যখন-তখন যে এ বাড়িতে আস?

ধলী বলল, বলে।

—কী বলে?

—বলে, ও-বাড়িতে গিয়েছিলি বুঝি?

—আর, তার উত্তরে তুমি কি বল?

—বলি, হাঁ।

অমিতাভ একটু ভাবল, বলল, এরপর আর কিছু নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করে না?

—না। যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করত, তবে তুমি কি উত্তর দিতে?

ধলী এবার বলল, ধেৎ। বড় বাজে বকবক করে তো লোকটা!

অমিতাভ হেসে বলল, বাজে বকবক নয় ধলী, এরপর কাজের কথায় আসব।

—কাজের কথা না ছাই। কাজকম্ম ফেলে রেখে এখানে এসেছ বেড়াতে। এখানে আবার কাজের কথা কী?

কিন্তু কী সেই কাজের কথা, অমিতাভ অনেক চেষ্টা করেও সে-কথা বলতে পারল না। ওই পল্লীর এই নিবিড় আম, জাম, নারকেল, সুপারি গাছের সবুজ ভিড়ের মধ্যে এ এক আশ্চর্য মেয়ে বলে মনে হয় অমিতাভের। আশ্চর্য আর কোনো কিছুতে নয়, আশ্চর্য লাগে ওর গায়ের ঐ রংটা। এমন অদ্ভুত ফর্সা রং এর আগে কখনো দেখেনি অমিতাভ। কিন্তু কেমন একটা চাপা বেদনা অনুভব করে অমিতাভ। এই রং রক্ষা করার মত কোনো সঙ্গতি নেই এই সরল পল্লী-বালিকাটির।

অমিতাভ বলল, কাজের কথা বলতাম, কিন্তু বলব না।

—কেন?

—হঠাৎ যদি বৌদি এসে পড়েন!

হেসে উঠল ধলেশ্বরী, অদ্ভুত উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল সে, বলল, আচ্ছা লোক যা-হোক। কি কথা বলবে, বলো না। বৌদি শুনলে তো বয়ে গেছে।

অমিতাভ বলল, ছি। সব কথা গুরুজনদের শুনতে নেই।

—তবে থাক্। তুমিও আমার গুরুজন, তোমার কাছ থেকেও তবে তেমন কথা আমার শুনতে নেই।

নীচের উঠোন থেকে উঁচু গলায় বৌদি বললেন, অত হাসি কিসের রে ধলী।

—ভারি মজার কথা হচ্ছে বৌদি।

—তা হোক। অত গলা ছেড়ে হাসিসনে। বৌদি চাপা গলায় পরামর্শ দিয়ে আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

অমিতাভ চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, কি বলেন বৌদি?

—হাসতে বারণ করলেন। অমন হাসিয়ো না কিন্তু আমাকে।

—বেশ। উঠে বসল অমিতাভ, বলল, তবে চলো নীচে যাই।। ধলী বলল, তুমি যাও। আমি একটু বসি।

অমিতাভ আলসের ধারে এসে নীচে উঁকি দিল। কুপীর আলোয় রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখা গেল বৌদির মুখ।

অমিতাভ বলল, শহর দেখতে ইচ্ছে করে না, ধলী?

— করে।

—তোমাকে নিয়ে যাব আমি।

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়াল ধলেশ্বরী, বলল, ইশ। নিয়ে গেলেই হল। যাচ্ছে কে তোমার সঙ্গে?

—তবে কার সঙ্গে যাবে?

ধলী বলে উঠল, আচ্ছা বকবক করে তো লোকটা।

—বকবক নয় ধলী। শোনো—

—কি?

ধলী অমিতাভের মুখোমুখী দাঁড়াল সোজা হয়ে। ধলীর নিঃশ্বাস এসে যেন লাগছে অমিতাভের বুকে। বিরাট এক ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে আছে যেন নিটোল এই মূর্তি দুইটি। কারো মুখেই কোনো কথা নেই।

অমিতাভ বলল, তোমার রং এমন সাদা হল কী করে ধলী, এমন ধবধবে সুন্দর?

—জানিনে। চল, নীচে চল।

—না। অমিতাভ যেন একটু পথ রুখেই দাঁড়াল, বলল, না। কথার উত্তর না দিলে যেতে দেব না।

—বাঃ রে। বেশ মজা তো। আমার রং সাদা তার আমি কী করব, আমি তো নিজে হাতে সারা গায়ে চুণ লেপে দিই নি।

অষ্টমীর চাঁদ উঠে আসছে ধীরে ধীরে অদূরের নিবিড় গাছপালার ঝোপের মাথার উপর দিয়ে।

অমিতাভ বলল, ওই দ্যাখো।

—কি? অমিতাভের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে তাকাল ধলী।

অমিতাভ বলল, চাঁদ।

—বুঝেছি। ঢের হয়েছে। চল, নীচে চল। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না ধনেশ্বরী। অমিতাভের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে দ্রুত পায়ে সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

হাত বাড়াল অমিতাভ, কিন্তু দেখল, আর কেউ নেই তার সামনে। সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার। আর পিছনে কোণ-ভাঙা চাঁদের চোখ কুয়াশায় স্বপ্ন দিয়ে ঢাকা।

রাত্রে অমিতাভ কাৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল বৌদির সঙ্গে। দরজার কোণে লণ্ঠন রাখা আছে। পলতেটা কমানো। সারা ঘরে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। অমিতাভ বলল, তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই বৌদি।

বড় চৌকিতে দুটি বাচ্চাকে শুইয়ে দিয়ে মশারি ফেলতে ফেলতে বৌদি বললেন, কেন?

বৌদি বড় মাইডিয়ার, এইজন্যে তাঁর সঙ্গে সব কথা বলা চলে।

অমিতাভ বলল, কোন্ আক্কেলে ওকে ছাতে পাঠালে?

বৌদি নিজের মনেই একটু হাসলেন, যেন কিছু বুঝতে পারলেন না এইভাবে বললেন, কাকে?

—কেন, ধনীকে। তোমাদের ধনেশ্বরীকে।

—কিছু ক্ষতি হয়ে গেল নাকি তাতে।

—ক্ষতি একটু হল বই-কি।

বৌদি মশারি গুঁজতে গুঁজতে বললেন, তা একটু হওয়া ভালো। সারাজীবন লাভ করে বেড়ানো ঠিক না। একটু লোকসান সহ্য করতে শেখ। কেন, বেআড়া কিছু বলে বসেছ নাকি?

অমিতাভ উঠে বসল, বলল, উঁহু। কিন্তু বড় রোমাণ্টিক হয়ে উঠেছিল, বৌদি, ছাতের আবহাওয়াটা। অমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে নিয়ে একটা ছাতে, আর ঠিক সেই সময় ওদিক থেকে হঠাৎ একটা মস্ত চাঁদের আবির্ভাব।

—ধনী বলে কি?

—কিছু না। শুধু হাসে।

বৌদির হাতের কাজ শেষ হয়েছে। এবার তিনি নিশ্চিন্ত। এবার বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে অমিতাভের সঙ্গে কথা বলতে তিনি প্রস্তুত। আলনার গা থেকে মাদুর এনে বিছিয়ে নিলেন মেঝেয়। লণ্ঠনটা বাড়িয়ে টেনে নিলেন কাছে। বললেন, বস।

—কি বলব।

—তোমার মনের ইচ্ছেটা।

চৌকি থেকে প্রায় লাফ দেবার মত ক'রে নেমে এসে অমিতাভ বসল মাদুরে। বলল, অতি গ্র্যাণ্ড মেয়ে বৌদি।

—এটা তো ইচ্ছে জানানো হল না, এটা জানানো হল মত। তোমার অভিমত জানতে চাইনি, জানতে চেয়েছি তোমার অভিলাষ।

অমিতাভ বলল, কাল সকালে আমি চলে যাব।

একথা শুনে বৌদি চমকালেন না, ধীরে ধীরে বললেন, এটা ক্রোধ না অভিমান? এত সহজে এমন বিতৃষ্ণা এসে গেল যে হঠাৎ?

অমিতাভ জোড়াসন হয়ে ব'সে বিজ্ঞের মত বলল, ওরা সব হচ্ছে, বৌদি, সলজ্জ লতা। আর, আমরা হচ্ছি শহুরে কেউটে। বিতৃষ্ণাও নয়, অভিমানও নয়। এটা হচ্ছে বিবেচনার কথা। আমরা ওদের যোগ্য নই।

হাসলেন বৌদি, চিমনিতে কালী পড়ছিল, তাই সলতে একটু কমিয়ে দিতে দিতে বললেন, বিনয়ের অবতার হয়ে উঠছ যে ঠাকুরপো। এটা তোমার বিনয় না ব্যঙ্গ তা বোঝা অবশ্য মুশকিল।

—কেন। কেন। একটু এগিয়ে বসল অমিতাভ।

—নিজেকে ওভাবে অযোগ্য ব'লো না। তোমার বলাও পাপ, আমাদের শোনাও পাপ। আমরা গাঁয়ের এককোণে পড়ে আছি। আমাদের পোছে কে। তোমরা শহরের শৌখিন লোক। তোমাদের কত প্রতাপ, কত প্রতিপত্তি।

বৌদির কথা শুনে অমিতাভ একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, তোমার কথাও কিন্তু বড় ব্যঙ্গের মত শোনাচ্ছে বৌদি।

বৌদি উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। সারা বাড়ি ঘেরাও ক'রে ঝাঁঝা করে বেজে চলেছে ঝিঁঝিঁপোকার আওয়াজ। শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে।

অমিতাভ বলল, দিব্যি আছ। মনে হচ্ছে তুমি যেন এই পাষাণপুরীর বন্দিনী। দাদা তো প্রায়ই থাকেন বাইরে, তুমি একা থাক কী করে? ভয় করে না?

—না। ভয় ক'রে লাভ নেই বলেই ভয় করতে নেই।

হেসে উঠল অমিতাভ, বলল, কার সঙ্গে আমি কথা বলছি বুঝতে পারছিনে বৌদি। কোনো দার্শনিকের সঙ্গে কথা বলছি, না, আমার বৌদির সঙ্গে?

বৌদিও হাসলেন, বললেন, বৌদিদের বুঝি দার্শনিক হতে বারণ আছে? থাক্ ও-কথা। কিন্তু কী-যেন কথা হচ্ছিল?

অমিতাভ বলল, ধনেশ্বরী। আচ্ছা বৌদি, ওদের চলে কী করে? ওর বাবা পঙ্গু, ভাই-বোন কেউ নেই। ওই মায়ের উপর ভরসা। কী করে চালান তিনি?

বৌদি নিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় কষ্টের সংসার। চলে যায়ই। যেতে হয়। ওটা যে নিয়ম। বড় মায়া হচ্ছে বুঝি ওর উপর। ওটা শহুরে লোকের একটা ফ্যাশান, একটা বিলাস। ওরা মমতা বিলোতে আসে দু'দিনের জন্যে। গ্রামের মানুষ যেন বড় অসহায়, যেন সম্বল নেই তাদের— শহরের মানুষের এই রকমই ধারণা। কিন্তু ওটা ভুল।

—তা হোক। ভুল না শুদ্ধ—সে তর্ক করছিনে। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু না। কাল তুমি চলে যাচ্ছ, নিজের জায়গায় পৌঁছে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন সঙ্গী পাবে, নতুন বন্ধু পাবে।

—দাদা ফিরছেন কবে?

—এখনো দেরি আছে কয়েকদিন। কেন, হঠাৎ দাদার কথা কেন?

—না। এমনি।

রাত্রি গভীর হয়ে এল ক্রমশ। বৌদি বসে বসে কথা বলতে বলতে ঝিমিয়ে পড়তে লাগলেন।

—শুয়ে পড় বৌদি। আমিও শুতে যাই।

অমিতাভ পাশের ঘরে চলে এল। এ-ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে না সে। বড় ভয় করে তার। জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলতে লাগল লণ্ঠন, চিৎপাত হয়ে জেগে শুয়ে রইল অমিতাভ। ভাবতে লাগল সে নানা কথা, ভাবতে লাগল অন্য কথা। বৌদির সঙ্গে তার সেদিনের কথাও ভাবতে লাগল অমিতাভ। এর কারণ নিশ্চয়ই আছে। মাইডিয়ার বৌদি পেয়ে পেটের আর আঁতের কোনো কথাই তো গোপন করা হয়নি কোনো দিন। বৌদি নিশ্চয়ই সেইসব কথা মনে করেই তাকে ওভাবে খোঁচাচ্ছিলেন।

নন্দনগাছির পাঁচটা দিন কাটল। দুপুরগুলো বড় লম্বাই মনে হয়েছে তার, কিন্তু সন্ধ্যাগুলো কেটে গেছে বড় চট করে।

বৌদি বললেন, আবার এস।

—আসব। নিশ্চয়।

—মুখেই নিশ্চয়। কিন্তু চোখের বাইরে হলেই তো সব মনের বাইরে। দেশের কথা আর মনেই পড়ে না।

অমিতাভ হাতে সুটকেস আর বোগলে বেডিং নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরি করে করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু কোথাও কারো দেখা পেল না, বলল, বড় নির্জন আর বড় নির্জীব চারদিক। একা-একা থাক কী ক'রে বৌদি?

—পাঁচদিনে ওই এক কথা একশ'বার তো হল। আবার কেন? তোমার দাদা এলে বলব, তাঁর গুণধর ভাই দয়া ক'রে এসেছিলেন।

বৌদিকে প্রণাম ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অমিতাভ বলল, আবার শিগগিরই আসার চেষ্টা করব।

বৌদি বললেন, ধন্য হব আমরা।

—আমরা মানে? কার কার কথা বলছ?

বৌদি একটু মুচকি হেসে বললেন, আমার আর তোমার দাদার কথা।

অমিতাভ বলল, বা রে। আর বুঝি কেউ নেই?

—কে আছে?

—মনা, টুনটুন। কই, ওরা কই?

হেসে উঠলেন বৌদি, বললেন, যেমন কাকা তার তেমনি ভাইপো। ওদের কি পাত্তা পাবে?

অমিতাভ নেমে এল উঠোনে, এবার তাকে রওনা হতেই হবে। আর দেরি করলে বাস্ পাবে না। বাস্-এর রাস্তাও এখান থেকে কম নয়। মনা আর টুনটুনকে দেখার জন্যেই যেন আর-একবার সে তাকাল চার ধারে।

বৌদি বললেন, পাঁচ দিনে পাঁচশ' রকমের কথা হল। কিন্তু একটা কথা এবার শোনাই হল না।

—কি?

—তোমার কৃষ্ণার কথা।

—ধেৎ। বড় বাজে বকবক করে তো বৌদিটা।

কথাটা বলেই থমকে দাঁড়াল অমিতাভ। কার গলার স্বর যেন বেজে উঠল তার কানের মধ্যে। বাজুক। আর দেরি করা যায় না।

—চলি বৌদি। আবার আসব।

উঠোন ডিঙিয়ে, বিগ্রহের দরজায় মাথা নীচু ক'রে প্রণাম জানিয়ে, জীর্ণ ফটক পার হয়ে, পদ্মদীঘির গা দিয়ে সোজা হেঁটে চলে গেল অমিতাভ। একবার পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তাকাল না।

—এদিকে তাকাচ্ছ না কেন? কী দেখছ ওদিকে।

—কী রকম স্পীডে চলেছে দেখ।

—নৌকো-বাইচ বুঝি দেখনি আগে।

—দেখেছি। কিন্তু আজ বড় ভালো লাগছে।

—[illegible] এটিকেট।

—কোন্‌টা ?

—একজনকে একা-একা পাশে বসিয়ে রেখে অন্যদিকে এভাবে চেয়ে থাকা ?

—কী রকম সাদা ধবধবে দেখতে, ঠিক উড়ন্ত বকের মত মনে হচ্ছে।

—কোন্‌টা ?

ফিরে তাকাল অমিতাভ, বলল, দেখতে পাচ্ছ না ? ওই যে, ওই নৌকোটা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলল কৃষ্ণা। বলল, ওভাবে কথা বলার মানে ?

—কিভাবে ?

—যেভাবে আগে বলতে না।

এ কথার কোনো উত্তর দিল না অমিতাভ। বলল, বড় বেশি খুঁত ধরছ তুমি। কীভাবে বললাম কথা ?

—না। কিছু না। চল, উঠি। শুধু লোক আর লোক। লোক ছাড়া যেন যায়গা নেই বেড়াবার।

অমিতাভ বলল, তা আছে, কিন্তু বেড়াতে তো আসি নি আমরা।

—তা জানি। এসেছি প্রেম করতে। কিন্তু এর নাম বুঝি প্রেম করা। এইভাবে সাদা ধবধবে নৌকোর দিকে চোখ দিয়ে বসে থাকাটা ? মাথার উপর পরিষ্কার আর প্রকাণ্ড একটা আকাশ, চোখের সামনে কাঁচের মত ঝকঝকে জল, চারদিকে সবুজ মখমলের মত ঘাসের—

বাধা দিল অমিতাভ, বলল, সমস্ত জীবনটা যদি পারতাম এমনি কবিতা দিয়ে ঢেকে রাখতে।

—কেন পারবে না। নিশ্চয় পারবে। কিন্তু তুমি যদি অন্য দিকে চেয়ে থাক, তা হলে কিন্তু কবিতার ছন্দ কেটে যাবে।

শিউরে উঠল অমিতাভের গা। কৃষ্ণা হাত বাড়িয়ে অমিতাভের একটা হাত ধরল চেপে, বলল, সরে এসে বসো।

অমিতাভ বলল, কত লোকজন চারদিকে, দেখছ না ?

—তা হোক।

—তা হোক ? বল কি ?

—হ্যাঁ। তাই। তোমার বৌদিকে বুঝি আমার গল্প ক'রে এলে ?

—হুঁ।

—কি বললেন ?

—বললেন, বেশ।

কৃষ্ণা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, চল। উঠি। একটু পায়চারি করি।

জলের কিনার ধরে হাঁটতে লাগল দুইজন। ছোট ছোট গুঁড়ো গুঁড়ো ঢেউয়ের উপর এই যুগলমূর্তির ছায়া ভাসতে লাগল থর থর ক'রে।

অমনি থর থর ক'রে কাঁপছে কৃষ্ণার হাত, ক্রমে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর, অমিতাভের হাত ধ'রে সে বলল, কথা দাও এবার।

—কিসের কথা ?

—তুমি বিয়ে করবে আমাকে।

অমিতাভ থমকে দাঁড়াল, বলল, কথা কেন ? এতদিন পরে কথার জন্যে অধীর হলে কেন। যদি কথা আজ না দিই।

—আজ না দিলে। কবে দেবে বল।

—যদি কোনো দিনই না দিই।

যেন ফণা তুলে দাঁড়াল কালভুজঙ্গিনী। কৃষ্ণা বলল, কোনো দিনই দেবে না। দিতে তুমি বাধ্য। কথা কী ক'রে আদায় করে নিতে হয়, তা আমি জানি।

আলিম্পন

অজিত মিত্র

মখমলী ঘাস, পরিচ্ছন্ন আকাশ, আর কাঁচস্বচ্ছ লেকের জল হঠাৎ পঙ্কিল ভয়াল আর কদর্য হয়ে উঠল।

অমিতাভ বলল, বড় শিগগির চটে যাও তুমি।

কৃষ্ণা বলল, বড় শিগগির না। তোমার ব্যবহারে টেম্পার ঠিক রাখা কঠিন।

সারাটা জীবন কবিতা দিয়ে ঢেকে রাখার প্রতিশ্রুতি একটু আগে দিয়েছিল যে মেয়ে, সে-ই হঠাৎ জীবনের সবকটা ছন্দে এইভাবে ঘা দিয়ে বসবে—ভাবতে পারে নি অমিতাভ।

একটু পরে কৃষ্ণা বলল, তোমার কি হয়েছে বল তো ?

—কিছু না।

কৃষ্ণা বলেছে, কথা কী করে আদায় করে নিতে হয় তা সে জানে। অমিতাভের কানে তার ঐ কথাটা, একদিন না, দুইদিন না, পনেরো, কুড়ি বা তার চেয়েও বেশি দিন ধরে বেজে চলেছে ক্রমান্বয়ে। বৌদিকে কৃষ্ণার কথা এবার একেবারে বলা হয় নি। সত্যি, ভুলই হয়েছে। অমিতাভের ইচ্ছে করছে, ছুটে গিয়ে বৌদিকে সে বলে আসে সব কথা।

কিন্তু এই একটা কথা বলার জন্যে ছুটে যাওয়া যায় না। তাই, এই কথাটা বাদ দিয়েই সে অন্য অনেক কথা লিখে দিল বৌদিকে। এবং চিঠিতেই বার বার সে হলপ করিয়ে নিল বৌদিকে, যেন দাদার কানে কোনো কথা না ওঠে। লিখে দিল, শহর তার ভালো লাগছে না, শহরের মানুষেরা সব কেমন যেন হয়ে গেছে।

—কেন, কি ক'রেছে তারা ? চিঠি এল বৌদির।

—ভুল করেছিলাম। তাদের দোষ না। দোষ আমার। তাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিনে নিজেকে।

—লেখাপড়া শেখাচ্ছে, ঠাকুরপো। তোমার কথা।

চিঠির লেনদেনে মাস-তিনেক কেটে গেল। সকলের মন পরীক্ষা করে নিল সে, নিজের মনটাও যাচাই করে নিল। এবার যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত আর অনেকটা হালকা লাগছে নিজেকে। এবার তবে যাওয়া যেতে পারে নন্দনপাড়ি।

স্টেশনে সী-অফ করতে এল কৃষ্ণা। বলল, এত ঘন ঘন দেশে যাওয়া ঠিক না। শিগগির করে ফিরো। দেখো, গেঁয়ো হয়ে ফিরো না যেন।

—কেন। তাতে ক্ষতি কি !

কালো কাঁচের চশমা তার চোখে, চোখের চাউনিটা তাই দেখা গেল না, বলল, আই হেট।

গার্ড হুইস্‌ল বাজিয়েছে, সবুজ নিশান উড়িয়েছে। অমিতাভ পা-দানিতে পা দিয়ে, এক হাতে হাতল ধ'রে বলল, কি বললে ? হেট ? ঘৃণা করবে ?

—যদি গেঁয়ো হয়ে ফেরো। তবে নিশ্চয়।

চলতে আরম্ভ করেছে গাড়ি, পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে অমিতাভ বলল, তবে আর ফিরছি নে। অ্যাডিউ।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল কৃষ্ণা, সিল্কের নীল রুমাল নাড়তে লাগল। অমিতাভের কথাটা বুঝি শুনতেই পায় নি সে।

সবুজ নিশান গুটিয়ে নিয়ে গার্ড ঢুকে পড়েছেন তাঁর কামরায়। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের উড়ন্ত নীল রুমালের হাতছানিটা এখান থেকেও চোখে পড়ছে অমিতাভের।

বিয়ের রাতে যে তোমায় বোকা বানিয়ে তবে ছাড়লে!—

রমা মেয়েটি বোধহয় বিমলারই সমবয়স্কা, কিন্তু সজ্জায় সে যেন প্রতিযোগিতা করতে পারে টুকুর সঙ্গে।

মেদবহুল দেহের খাঁজে খাঁজে একটা হিল্লোল জাগিয়ে হাসলে ও—যেন উচ্ছল জলস্রোত! ব'ললে—

"এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন। ভয় নেই, আজ আর বোকা বানাতে আসিনি!"

ওর কথার শেষ সুরটা টানলে বিমলাই—

এইদিকে এসেছিল কি কাজে; তাই খুঁজে খুঁজে, ঠিক বের ক'রে এসেছে আমার ঠিকানাটা। হাজার হোক ছোট বেলার বন্ধু কিনা! দেখেছো। দেখো। মেয়ে আর ছেলের বন্ধুত্বের পার্থক্য।

পরেশ বসলো।

ঘরের মধ্যে নড়বড়ে একটা মাত্র চেয়ার; ওটা অধিকার ক'রেছে রমা; কিন্তু ওতেও তার দেহ ঠিক আঁটছে না। চেয়ারটা আরও একটু বড় হ'লেই ভালো হ'তো বোধহয়। অথচ মেঝেয় নেমেও ব'সতে পারে না— বিমলার কাছাকাছি; তাতে কাপড়ের ভাঁজ ভেঙ্গে যেতে পারে। বিমলার কোলের দামাল ছেলেটা আনন্দের আতিশয্যে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে ঘাড়ের ওপোর,—অতএব একটু স্বতন্ত্র আসনই ভালো। এই রমাই ওর সজল চোখ নয়, কাজল চোখের ইঙ্গিত জানালো আবার—

বসুন চক্কোত্তি মশায়,—আমাকে দেখে আজও ভয় পাচ্ছেন নাকি?

রমা হেসে ওঠে। পরেশ বসে। বলে—

না, না। মনে করছি। বিয়েটা হয়েছিল আমাদের কতদিন আগে, তারই ইতিহাস।"......

হ্যাঁ, ইতিহাসটা আজকের, কিন্তু ঘটনাটা ঠিক একুশ বছর আগের। নয় বিমলা?—"

বিমলা জবাব দেয়—

তাই। —একুশ বছর আগের একটা শ্রাবণ মাসেই বিয়েটা হ'য়েছিল বটে। ওঃ,—সে কি বৃষ্টি!......বাপ্‌রে বাপ্‌......

আর সেই বৃষ্টিতে ব্যাঙের ছাতা মাথায় দিয়ে—চক্কোত্তি মশায়, —কি বলেন?......

রমা আবার হাসতে সুরু করে......

: কি? কথা বলছেন না যে?...

—"মনে করছি।—"

—"সেই তখন থেকে?—"

পরেশ ততক্ষণ বিমলার রোগশয্যারই এক পাশে ব'সেছে। মাকে ছেড়ে বাপের কাছে আদরের প্রত্যাশায় এগিয়ে এসেছে নাল ফেলা—হাড় জিরজিরে—রুগ্ন ছেলেটা। পরেশ ওকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিলে।—রমার কথার উত্তর দেবার ফুরশৎ মিললো হয়তো। ব'ললে—

—"একুশ বছর কিনা! প্রায় দুই যুগের কাছাকাছি। তবু মনে পড়ছে—তখন আমি কলেজে পড়ি,—ইউনিয়নের স্বপ্ন দেখি,—আরও কত কি!"

—"হিঃ, হিঃ! তারপর?"......

কথা ব'লতে ব'লতে হাত ঘড়িটার দিকে তাকায় রমা। ইলেকট্রিকের কম-পাওয়ারের সমস্ত আলোটাই যেন এসে পড়েছে ওর ওপোর। ওর সজ্জায়, ওর ভঙ্গিতে, ওর কণ্ঠস্বরে। বলে

—"তারপর কি, তাই বলুন!"

"বাবা বিয়ে দিলেন, বধূ হ'য়ে এলেন শ্রীমতী বিমলা। ইউনিয়নের স্বপ্ন গেল,—পাশ হওয়ার আশা ডুবলো—আর ফুরলো—"

"কি?—"

—হয়তো বা ভবিষ্যৎও...

বিমলার অকাল বার্ধক্যে রেখা ফুটে উঠছে দার... ব'ললে—

—"ওসব তোমার রামায়ণ... কাজের মানুষ। এসেছে অনেব... কথায় সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি; কথা বল' বরঞ্চ। চলেই যেত এ... তোমার সঙ্গে দেখাটা করাবার জন্যে ...আমিই বসিয়ে রেখেছি ওকে।"

পরেশ হাসলো

—"তাই তো ভাবছি, কি বলা যায়। কি ব'লতে পারলে রমাদেবীর পক্ষে ঠিক হবে!—মানে একুশটা বছরের পার্থক্য কি না!—"

রমা হাসছে এখনও, তবে মৃদু মৃদু। ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে ওর লিপষ্টিক ঘসা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে—। ব'লছে—

—বসন্ত এবং বর্ষার! কুহু এবং কেকার:—উপমাটা চলনসই হবে না চক্কোত্তি মশায়!—

"হতেও পারে, তবে ও পথটাও আমার পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ, অর্থাৎ কাব্যটাব্য কোনদিন আলোচনা করেছিলাম, মনে নেই। বুঝেছেন শ্রীমতী রমা—"

—"চ্যাটার্জি, কুমারীটাও আগে যোগ করতে পারেন চক্কোত্তি মশায়—, কারণ আমি এখনও ইউনিয়নের স্বপ্ন দেখছি। আপনাদের কাব্য-জগৎ থেকেও বিদায় নেইনি—!"

—"সে কি? এযুগে তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ রক্ষা কে করতে আসবে শুনি?—"

প্রশ্নটা বিমলার। এই সময়ে চা দিয়ে গেল টুকু। কাপের কিনারে আলগোছে ঠোঁট ঠেকিয়ে রমা ব'ললে—

—এ যুগটায় ধনুকভাঁরের ব্যবহারই অচল, অতএব ও প্রসঙ্গ খাটে না।—"

—তবু!......

বিমলা যেন কি না ব'লতে পেরে হাঁপায়। কষ্টে প্রকাশ করতে চায়—

—মেয়ে মানুষ। বিয়ে-থাওয়া না ক'রলে কি চলে? সংসার না থাকলে কি মানায়?.........

ওঃ— এই কথা!

হাসতে থাকে রমা,—সেই উচ্ছ্বসিত হাসি। হাসি থামলে বলে—রাত হ'লো, সাতটা বেজে গেছে; আটটায় একজনের দেখা করতে আসবার কথা; অতএব এখনি উঠতে হবে। কিন্তু তোমার ঘর সংসারের কথা তো জিজ্ঞাসা করা হ'লো না বিমলা?

—জিজ্ঞাসা করবার মতও যে বিশেষ কিছু নেই ভাই।— ভাঙ্গা হাল আর ছেঁড়া পালে জোড়াতালি দিয়ে চলেছি।—' উত্তরটা বিমলারই। বলে—

—তবু যদি জিজ্ঞাসা করতে চাও—তার জবাবে বড় জোর ব'লতে পারি,— মেয়ে বড় হয়েছে......যদি কোনও পাত্র টাত্র হাতে থাকে তোমার—, কিম্বা জানা শোনা......"

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে রমা.... ...

—"পোনে আট! উঠি ভাই। আর একদিন এসে বসবো বরং—, শুনবো তোমার সংসারের সব কথা—। ছেলেরা সব কেমন যেন হ'...

উ'কেন, কি ক'রেছে তারা? চিঠি ... ...র।

—ভুল করেছিলাম। তাদের দোষ না। দে...

সূর্য-তপস্যা

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সূর্যের তপস্যা রত রাত্রি শেষ পৃথিবীর পথে
ফেরারী দস্যুর ভিড় নেমেছিল নানা দেশ হতে
তাই রৌদ্রদিন তার মুছে নিল আলোর স্বাক্ষর
বৃথা হয়ে গেল এই শতাব্দীর সবুজ প্রান্তর।
ফসলের ঘ্রাণ তুমি কোথা পাবে? ব্যর্থ এ সকাল
লোভের ক্ষুধায় কীর্ণ, দিকে দিকে মৃতের
কঙ্কাল।

তবু এই ব্যর্থ দিন, তবু এই শ্মশান কবর
কারা যেন খুঁড়ে খুঁড়ে এনেছিল প্রাণের খবর,
সে প্রাণ সূর্যের বীজে দিয়ে গেল উজ্জ্বল
আভাস
মুছে যাবে বারুদের গন্ধ-লাগা ধূসর আকাশ।
অযুত শস্যের দেশ, এই মাঠ, সবুজ আশ্বিন
এখানে আবার আজ ডেকে গেছে রৌদ্রভরা দিন।
খোলা জানালায় আলো। রাজপথে ভোরের
মিছিল।

তোমরা দেবে না সাড়া? এখানে যে
দূরের নিখিল
ডাক দেয় দ্বারে এসে। ওর গানে কঠিন শপথ
বাধার প্রাচীর ভেঙে পৃথিবীর এক হস পথ।
এবার তপস্যা শেষ। কেটে গেল রাত্রির প্রহর
যাত্রার সময় এল, তুলবে না তীরের নোঙর?

অনেকটা দূর। যেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা ট্যাক্সি পেলে এতক্ষণ......

পরেশ বাধা দেয়—

—"একটু দাঁড়ান। আমার বড় ছেলেকে পাঠাচ্ছি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে—, আনতে দেরী হবে না—।"

নিচে দাঁড়িয়ে —টুকু—বুকু আর খুকু তখনও অপেক্ষা করছে—রমা মাসীর একটুখানি সহাস্য প্রশংসার।— আর বিমলা উঠতে না পেরেও ভাবছে, এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ট্যাক্সি ডাকতে যাবে ছেলেটা? তারপর? ...... পরেশ কোলের ছেলেটা কাঁধে নিয়ে রমার পেছনে পেছনে, পা টিপে টিপে নামতে নামতে ভাবছে, মাস কাবার হ'তে এখনও ছটা দিন বাকি। একয়টা দিন যেমন তেমন ক'রে চালিয়ে নেওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে; আর ট্যাক্সি ভাড়াটা! এইখান থেকেই ঠিক ক'রে মিটিয়ে নিতে হবে ড্রাইভারের—, যাতে রমা কিছু না ভাবে। অন্ততঃ এইটুকুই তার আত্মীয়তার সৌজন্য রক্ষা। না হ'লে ভদ্রতা থাকে না।

আমরা তিনজন—গৌর দত্ত

গৌর দত্ত

আমরা তিনজন

সুনীল জানা

তারপরে একুশ দিনের আঁতুড় কেটে যাবে। পরদিনই শুক্কুরীর দুধ দিয়ে পায়েস রান্না ক'রে নারায়ণকে ভোগ দেওয়া হবে। সেই পায়েস-প্রসাদ মুখে দিয়ে আপনি আর গৃহিণী এমন আত্মহারা হয়ে উঠবেন যে, তা দেখে ছেলেমেয়েরা ঘর থেকে পালিয়ে যাবে। ছোট মেয়েটি আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বিস্ময়ে দেখবে, আপনারা কী কান্ড করছেন! আপনারা নাচতে পারেন—এমন একটা আশা এবং আশঙ্কা তাদের মনে জেগে ওঠা বিচিত্র নয়।

সে-রাত্রে শোবার আগে বিছানার ওপর ব'সে আপনি যখন সেই প্রথম নিজস্ব গোরুর এক পেয়ালা গরম দুধ একটু একটু ক'রে তারিয়ে তারিয়ে পান করতে থাকবেন, তখন আয়েস-ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টিতে আপনি দেখতে পাবেন যে, গৃহিণী কৌতুকে পুলকে আপনার দিকে চেয়ে আছেন। আপনি এক রকম নেশালু স্বরে জিজ্ঞেস করবেন, কী দেখছ?'

তিনি বললেন, 'লাটসাহেব।'

সকাল-সন্ধ্যেয় দুধ দুয়ে এনে তিনি আপনাকে কিছুতেই দেখাবেন না—শুক্কুরী কতখানি দুধ দেয়। বলবেনও না কিছুতেই। অতসব মাপজোখ করলে নাকি দুধ কমে যায়। কিন্তু আপনার কাছে তিনি লুকোবেন ক'দিন? কয়েকদিনের মধ্যেই রহস্য ভেদ হবে। আপনি জেনে ফেলবেন, সকালে দেড় সেরের আর বিকেলে এক সেরের বেশি ছাড়া কম নাকি দেয় না।

আপনি হেসে বলবেন, 'পশ্চিমা আর দিশী গোরুর মিশেল বটে। পশ্চিমী পরিচয় তো পাওয়া গেছে শ্রীমতীর দেহের আয়তন আর আহারের বহর দেখেই, এবার দুধের পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে দিশী নিরিখ।

তিনি পশ্চিমা ঝাঁজে বলবেন, 'তোমার দিশী গাই দিনে আড়াই সের দুধ দেয় নাকি?'

আপনাকে মানতে হবে যে, দেয় না। কেন না, অন্য প্রমাণ দূরে থাকুক, খাশ একেবারে সরকারী দাহিত্যেই আপনি খোদ নিজে পড়েছেন যে, বাঙালী গাই দিনে আধ সের থেকে এক সেরের বেশি দুধ দেয় না।

তিনি বলবেন, 'আমার নতুন হাত কিনা; হাত 'সড়গড়' হয়ে গেলে, সের-তিনেক ছাড়বেই!'

আপনি অনুভব করবেন যে, গো-আভিধানিক বিশেষ শব্দগুলি তাঁর আয়ত্তে আসছে।

বুড়োগয়লা অভিমত দেবে, ভাল ক'রে খাওয়ালে ওই গোরুই নাকি চার সের পর্যন্ত 'উজোবে'। শুনেই আপনি নিজের মুখে তালা এ'টে দেবেন—দুধের বেশিকমি নিয়ে আর কোন কথাই বলবেন না। কেন না, খড়, খোল, ভুসি, চুনি, খুদ, নুন, নরম গুড়, চিটেগুড়—বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদানের পেছনে তখনই একুনে মাসে আপনার স্রেফ অর্ধশত নেমে যাচ্ছে।

কাঁচাবাজার বলতে শুধু যে আলু আসছে, তাও বন্ধ ক'রে দেওয়া চলে কিনা, আপনি অনেক হিসেব ক'রে দেখবেন। কিন্তু সম্ভব হবে না। আলুরও ভাজা নয়, ডালনা নয়—সেসবে তেল-মশলার খরচা আছে—সোজাসুজি আলুভাতে চলছে তখন। খাদ্য হিসাবে রোজ—এবং রোজ তিনবার ক'রে—যখন দুধই পাওয়া যাচ্ছে, তখন ওদিকে শুধু ডাল আর আলু-ভাতে, বাস্।

প্রাতরাশ তো কবেই উঠে গেছে আপনার। সময় কোথায় গৃহিণীর? গোয়াল পরিষ্কার করা, ঘুটে দেওয়া, দুধ দোয়া, জাব দেওয়া, তারপর গিয়ে স্নান করা, আটটায় আপিসের ভাত দেওয়া, এর ওপর আর প্রাতরাশ-রচনার সময় হয়? প্রাতরাশ অর্থে শুধু চা! খেলে অপকার ছাড়া উপকার নেই। এ বাবতে কিছু খরচ বে'চে গেছে ব'লে আপনি ভগবানকে, গৃহিণীকে, শুক্কুরীকে এবং নিজের অদৃষ্টকে একসঙ্গে ধন্যবাদ দেবেন।

দুধ দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার অভ্যাস আপনার ছিল না, সে-অভ্যাসটা আপনি ক'রে নেবেন। আপনি বলবেন, দুধ খাওয়ার অভ্যাসটাই বা ছিল কবে? তারপর, প্রতিদিন সকালে খাওয়ার সময় তো এ সান্ত্বনাতেই শুধু ডা'ল-আলুভাতে দিয়ে অর্ধেকের বেশি ভাত উঠে যাবে যে, পরে দুধ আছে। বাকি ভাত-কটি তার পরে চিনি-সংযোগে আধপোটাক দুধ দিয়ে মেখে খেতে খেতে আপনি দুগ্ধবঞ্চিত তাবৎ হতভাগাদের প্রতি করুণাবোধ করবেন।

রাত্রের দুখানা রুটি তো আপনি এইটুকুন আলুর ছক্কা দিয়েই খালাশ ক'রে দেবেন। তার-পরে আর দুখানা রুটি যখন দেড় ছটাক দুধে ভিজিয়ে নেবেন, তখন গৃহিণী হেসে হেসে বলবেন, "আগে তো তিনখানার বেশি রুটি দিলে তুমি একেবারে রুখে উঠতে!"

সর্বশেষ যখন শোবার আগে বিছানার ওপর আসনপিঁড়িতে গদিয়ান হয়ে পরিপূর্ণ এক-পেয়ালা গরম খাঁটি দুধ রসিয়ে রসিয়ে পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে পান করবেন, তখন আপনার সঙ্গে কার তুলনা? তখন মহানগরীর প্রাসাদবাসী আপনার আপিসের বড়সাহেবও আপনার করুণার পাত্র—কেননা, তাঁর ভাগ্যে রোজের গয়লার দুধ কিংবা কৌটোর গুঁড়োদুধ ছাড়া তো জোটে না। বড়সাহেব কী। আপনি তখন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

আপিসের প্রত্যেক সহকর্মীকে এবং নাগালের মধ্যে পান এমন প্রতিটি পরিচিত লোককে, এমনকি অচেনা লোকের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিয়ে তাকেও আপনি জানাতে ছাড়বেন না যে, আপনি প্রত্যহ তিন বেলা নিজের গোরুর খাঁটি দুধ খান।

মাঝে সাঝে কেউ যখন আপনার বাড়িতে বেড়াতে আসবেন, আপনি তাঁকে চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করবেন না। চাএর সাধ্য পাট তো এখনও বজায় আছে বাড়িতে এবং ভাল বিস্কুটও আপনার বাড়ির সামনের দোকানেই, ধারেও, পাওয়া যায়; তা সত্ত্বেও আপনি শুক্কুরীর খাঁটি এক পেয়ালা দুধই তাঁকে পরিবেশন করবেন। তার অর্থ কী? অর্থ এই যে, দেখে যাও, আমি সত্যিসত্যিই খাঁটি দুধ খাই কি না, পরখ ক'রে নাও। পরখ কর এবং এই সৌভাগ্য দেখে আমাকে হিংসা কর।

'ও কি—ও কি! ছোটদের বঞ্চিত ক'রে আবার দুধ কেন?' ব'লে অভ্যাগত যখন আপত্তি করবেন তখন আপনি বিনীতভাবে বলবেন, 'ছোটরা বঞ্চিত হবে না; আপনার শুভেচ্ছায় লক্ষ্মী আমার ঘরেই বাঁধা আছেন, বিশ্বাস না হয় দেখবেন চলুন।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে আপনার গৃহিণী যখন সপ্তমে গলা চড়িয়ে রান্নাঘর থেকে হাঁক পাড়বেন—'অ খোকন! অ টেবলু! অ খুকি! খবর্দার বলছি দুধ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বি না'

— তখন তা শুনে আপনার জ্ঞাতি-প্রতিবেশীরা সুদীর্ঘশ্বাসে মনে করবেন, আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে দুধ এমনই সাধারণ জিনিস যে, তার কথা ভুলে গিয়েই তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

সুখস্বপ্নের পাখনা মেলে একটানা মাস-পাঁচেক কেটে যাবে আপনার। তারপর মনে হবে, ডানা যেন ভারি ঠেকছে—যেন নিচের দিকে নেমে আসছেন আপনি। এক সময়ে মনে হবে যে, আপনার পা মাটিতে ঠেকে গেছে।

স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে, শুক্কুরীর দুধে টান ধরেছে। দুধের বরাদ্দ তিন বেলার জায়গায় ক্রমে দু বেলায় নামবে, আরো ক্রমে এক বেলায় নেমে আসবে, এবং তারপরে ......

ক্রমে ক্রমে এমন একদিন আসবে যেদিন সকাল বেলা বাছুর দিয়ে 'পানাবার' পরে, বাঁটে

(২য়ার পর ১৬৮ পৃষ্ঠায়)

ক্ষণেক দাঁড়াও বন্ধু

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দাঁড়াও দাঁড়াও বন্ধু—
চলে যেয়ো গান শেষ হলে;
তোমার চলার পথে কি পেলে কুড়ায়ে
যাবার সময়ে যেয়ো বলে।
যে ফুল ঝরিয়া গেছে আমি তার গন্ধটুকু রাখি
যে গান ফুরায়ে গেছে আমি তার সুর ধরে থাকি
একেলা কাটাই দিবানিশি,
কত দীর্ঘ দিন আসে রাতের আঁধারে যায় মিশি।

ভগ্ন হৃদয়ের বীণা, ছিন্ন তন্ত্রীগুলি,
প্রদীপ নিভিয়া গেছে,—এসেছে আঁধার,
পথ খুঁজে পাই না যে, শুধু ঘুরে মরি,
রুক্ষ মরুভূর বক্ষে জেগে ওঠে তীক্ষ্ম হাহাকার।
কে জিজ্ঞাসে—কহ তারপর—
কে দিবে উত্তর?
কত প্রশ্ন জেগে ওঠে—হল না কিছুর সমাধান;
দিগন্তে খুঁজিয়া ফিরি হারাইয়া গেছে যেই গান,
শুধু সেই সুরটুকু লয়ে—
চলিয়াছি দীর্ঘ পথ বয়ে।

যে ফুল ঝরিয়া গেছে তার রূপই জাগে
পথভোলা হে পথিক
মোর ক্ষীণ আঁখি পুরোভাগে।
বিবর্ণ ফুলের দল রাখিয়াছি যতনে তুলিয়া
সেই দলে অর্ঘ্য নাও
চির অনাসক্ত মোর প্রিয়া।

তিষ্ঠ তুমি, তিষ্ঠ ক্ষণকাল
এখনও হয়নি দৃপ্ত অন্ধকার রজনীর ভোর গান
আলোর প্রথম স্পর্শে—চেতনা লভেনি মৃত
অতীতের রোমন্থনে ভুলে যাই সব দুঃখ ব্যথা
সব অপমান।

হারানো সুরের মালা ছিন্ন তারে গাঁথি
তোমারেই দান করি আজ,
ক্ষণেক দাঁড়াও পান্থ জীর্ণ মোর কুটিরের দ্বারে
ওগো বন্ধু, ওগো মহারাজ।

শরতের উৎসবের দিনগুলি
আবার সমাগত…
শুভেচ্ছা ও খুশিতে
চারিদিক ভরপুর,
প্রতি গৃহে আনন্দের
সাড়া পড়ে গেছে…
সেরা পাখা প্রস্তুতকারক
ম্যাচওয়েল ইলেকট্রিক্যালস্
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
তাঁদের অসংখ্য
বন্ধুবান্ধবকে এই
আনন্দের দিনে
আন্তরিক অভিনন্দন
জানাচ্ছেন।

ম্যাচওয়েল ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্ট:
ক্যামেলস লিঃ,
সবজিমণ্ডি, দিল্লী
শাখা: পি৩৬ রয়্যাল এক্সচেঞ্জ
এক্সটেনশান প্লেস কলিকাতা
ফোন: ব্যাঙ্ক ৫০৬৪

ঘরে ঘরে সঙ্গীতের এত প্রসার আজ হোতো না যদি হারমোনিয়মের মত একটি সাধারণ সুরের অতি সহজে আয়ত্তকারী বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার না হোতো। অবশ্য হারমোনিয়ম বেসুরো ও কর্কশ হলে উহার সাহায্যে গান-বাজনা না শেখাই উচিত।

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে ডোয়ার্কিনের বাড়ী হইতে এই হাতে হারমোনিয়মের আবিষ্কার হয় এবং তিন পুরুষের অভিজ্ঞতা এই যন্ত্রের নিখুঁত রূপ দিয়েছে।

শো-রুম:
৮।২, এসপ্ল্যানেড ইস্ট
কলিকাতা—১

সচিত্র মূল্য তালিকার
জন্য লিখুন।

অকূল

রমেশচন্দ্র সেন

মা এর মধ্যেই দু' তিনদিন অনুযোগ করেছেন, এ টাকায় ত আর চলে না অকূল। যখন একটা কাণাকড়িও আসত না তখন বলতেন, মাসে তিরিশ চল্লিশটে টাকা হলেই কোন রকমে চালিয়ে দিতে পারতুম।

আজ কমাস অকূলের চাকরি হয়েছে, মাসে মাইনে পায় পঞ্চাশ টাকা। পঁয়তাল্লিশটা টাকাই এনে মায়ের হাতে তুলে দেয়, নিজের হাত খরচের জন্য রাখে মাত্র পাঁচটি টাকা। তার কাপড় জামা, ধোপা-নাপিতের খরচা, জলখাবার সবই চালিয়ে নেয় ঐ পাঁচ টাকার মধ্যে, তার অর্থ জলখাবার প্রায় খায়ইনা, শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লে কিংবা রাস্তায় জলকাদা হলেও ট্রাম-বাসে চড়ার কথা ভাবতে পারে না। এত করে সে সংসারের জন্য তবুও মা অনুযোগ করেন।

অকূলের এক এক সময় রাগ হয়, এত দায়িত্ব তার কিসের? সংসারে বড় হয়ে জন্মেছে, এইত?

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুট ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়, বিলাতে ডিউক ও লর্ডের বড়ছেলেরা পিতার উপাধি, মর্যাদা ও সম্পত্তি পায়। কিন্তু সারা দুনিয়ায় তারা আর কজন? অতি মুষ্টিমেয় ঐ ভাগ্যধরদের জন্য জগৎশুদ্ধ বড়ছেলেরা মাথায় কাঁটার মুকুট পরবে, এক শ্রেণীর নাঙ্গা সন্ন্যাসীর মতন কাঁটার আসনে শুয়ে বসে কৃচ্ছ্র করবে, সমাজের এ এক ঘোর অবিচার।

আবার পরক্ষণেই হয়ত ভাবে, আহা বেচারী মা। পঁয়তাল্লিশটা টাকার মধ্যে পাঁচজনের অন্ন বস্ত্র যোগাতে হয় তাঁকে, ঘর ভাড়া দিতে হয়। তিনি বা কি করবেন?

প্রথম যে দিন চাকরি পায় সেদিন ভেবেছিল, যাক্ সংসারের একটা হিল্লে হল, মায়ের দুঃখ ঘুচল, ছোট ছোট ভাইবোনদের হল দুটো অন্নের সংস্থান। প্রতিবেশীরাও বলেছিল, তোমার বরাত ভাল, অকূল। কলকাতায় এসেই কেমন কাজ পেয়ে গেলে, অথচ একটা পাশ দেওয়া কত ছেলে কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কই দুঃখ ত ঘুচল না। ভাবনা বরং বেড়েই চলেছে। এ যেন গলায় শেকল পরা, একবার পরেছে ত নিজে নিজেই শেকলে জড়িয়ে যাচ্ছে। মুক্তি নাই আর ও থেকে।

ভাই দুটির পড়াশুনো বন্ধ, তারা পথে পথে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। সময় কাটায় হালকা গান গেয়ে, দাবা খেলে।

বিশ বছরের বোন ছন্দার গায়ে সেমিজ সায়া নেই। খালি কাপড়ে পরিপূর্ণ যৌবনের লজ্জা নিবারণ হয় না, সে তাই ভাইদের সামনেও জড়সড় হয়ে থাকে।

অকূলের মনে প্রশ্ন জাগে, এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? তার অক্ষম পিতামাতা, সমাজ-সংস্থা, না রাষ্ট্র? তখন সবই কেমন যেন গুলিয়ে যায়। ভাবে, মা ঠিকই নাম রেখেছিলেন অকূল।

তার বাবার ছাত্র গিরীনকে ধরে অকূল কোনও বাজারের সরকারি পেয়েছে। তার কাজ ভাড়া আদায়, জায়গা বিলি, ছোট-খাট ঝগড়া-ঝাঁটির মীমাংসা করা ও হিসাব রাখা। খাটতে হয় সকাল থেকে রাত নটা পর্যন্ত, দুপুরে খাওয়ার জন্য ছুটি পায় মাত্র দু' ঘণ্টা। এক দল দোকানী আছে যারা প্রত্যহ নিয়মিত বসে না, তাদের ফাঁকা জায়গায় কে বসবে তা ঠিক করে দেয় সরকার। দৈনিক ভাড়াটেদের অনেকেই রোজকার ভাড়া রোজ চুকিয়ে দিতে পারে না। সরকার নিজ দায়িত্বে তাদের দু' একদিন সময় দিতে পারে। অনুগ্রহ করার ক্ষমতা আছে তাই দোকানীরা খাতির করে, সব্জিওয়ালা টাটকা সব্জি দেয়, মাছওয়ালা দেয় মাছ। যে দাঁতনকাঠি নিয়ে বসে সেও সরকারবাবুকে দুটো দাঁতনকাঠি গছাতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত থাকে। সরকার কিছু জিনিষ পায় বিনামূল্যে, কিছুবা জলের দামে। যে ধরণের টাটকা জিনিষ পায়, বহু ধনীর ভাগ্যেও তা জোটে না। এর উপর নগদ বিদায় ত আছেই। সব দোকানীর উপরিই চাকরির প্রধান রোজগার, মাইনেটা যেন ফাউ।

অকূল উপরি পাওনা নেয় না; না পয়সা, না তরিতরকারি। সে যখন এই কাজ পায় তখন মা তখন চর্ব্য-চোষ্য টাটকা সব্জির স্বপ্ন দেখতেন। ভাবতেন ছেলে মেয়েদের দুটি করে গলদা চিংড়ি খাওয়াতে পারবেন, ইলিশের সময় ইলিশ মাছ, আম কাঁঠালের সময় আম কাঁঠাল। ছেলে তাঁকে নিরাশ করেছে। এ নিয়ে প্রতিবেশিনীদের কাছে তিনি দুঃখ করেন। কেউ কেউ সহানুভূতি দেখায়, তবে বেশির ভাগ লোকই তাঁর কথা বিশ্বাস করে না, পরে যে উপহাস করে। বলে, বুড়ী ছেলেকে সাধু বানাতে চায়।

মা অনুযোগ করেন, ভাইরা মুখভার করে থাকে। তার সহকর্মী মহেন্দ্র খুশি নয়। বাজে লোক হলেও অকূলের সামনে হাত পেতে উপরি নিতে তার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়।

দোকানীরাও আশকারা পেয়েছে, আগে যারা নিজে থেকে সিকিটা দো-আনিটা খুশিমনে দিত, তারাই এখন দেয় মুখভার করে।

বাজারের ম্যানেজার মনোজবাবুরও উপরি আয়ের একটা মোটা অংশ আসে সরকারদের হাত দিয়ে। সেটা অনেক কমে গেছে। মনোজ তাই প্রায়ই দুঃখ করেন, ছোকরা বাজারের মরালিস্ নষ্ট করে দিলে। এখনও বাল্যশিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

মহেন্দ্র বলে, আমাদের স্যার ভারী অসুবিধা হচ্ছে। শাকউলি এক আঁটি শাক দিতেও গজর গজর করে। মেছোনির কাছে মাছ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বলে, নতুন সরকারবাবুর কিন্তু কোন লালচ নেই। এর একটা প্রতিকার করা দরকার।

মনোজ বলেন, দরকার ঠিকই। তবে চট করে কিছু করা যাবে না, ছোড়াকে বাবু নিজে বহাল করেছেন। তাঁর বন্ধুর দেওয়া লোক, তবে আমার কি মনে হয় জান?

কি স্যার?

সময়ে ঠিক শুধরে যাবে, অভাবের সংসার ওদের।

সংসার-অভিজ্ঞ লোক তিনি। অনেক ঘাটের

ওর বাবার কথা বলছেন দিদি?

হাঁ দিদি। এক একটা স্কুল ছাড়তেন আর ছেলেরা গলায় মালা দিত, ফ্রেমে বাঁধানো পদ্য লিখে দিত—মহাত্মন্, দধীচি। খুঁজলে দু' একখানা এখনও পাওয়া যাবে। স্কুলের হেডমাস্টার কিন্তু একদিন দেখলাম না ছেলের জন্য একখানা বই, এক দিস্তে কাগজ কি দুটো পেন্সিল নিয়ে আসতে। অকু একবার বলেছিল, স্কুলে এত যে স্পেসিমেন কপি আসে তা থেকে আমায় দুখানা বই দাও। হেডমাস্টার ত রেগেই আগুন, ছেলেকে এক ধমক দিলেন। তুই আমায় চুরি করতে বলিস্ হতভাগা? ওসব যে স্কুলের সম্পত্তি।

ঘোষ-গিন্নী গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, বাঁশের গোড়ায় তাহলে বাঁশই গজিয়েছে, বলুন।

স্বর্গত স্বামীর সঙ্গে বাঁশের এ তুলনাটা অকুলের মায়ের মনঃপূত হল না। কিন্তু ফ্ল্যাট বাড়ির খবরটুকু বুকের মধ্যে গাঁথা ছিল। তিনি নকুলদের কাছে ফ্ল্যাট বাড়ি ও পোস্তার গল্প করলেন। নকুল বলল, ফেলাট না হক, আমি দাদার কাজ পেলে তোমার কোন দুঃখ থাকত না, রাঁধুনী রেখে দিতুম, দাসী তোমার সেবা করত।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বৃদ্ধা যেন মুহূর্তের জন্য আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পেলেন। বললেন, তা তুই পারতিস্।

সংসারের এইরূপ আর এক দিকে কর্মস্থল। বাংলার বিপ্লবী যুগের মনোরঞ্জনার চক্ষুলজ্জা-টুকু পর্যন্ত লোভের কাছে হার মেনেছে।

মহেন্দ্র বিড়ি খায়না কিন্তু বিড়িওয়ালার কাছ থেকে বিড়ি সিগারেট দেশলাই নিয়ে বন্ধুদের উপহার দেয়। তাদের কাছে বলে, খাইনা বটে, বাজারের মরালস্ ত নষ্ট হতে দিতে পারি না।

সে পাটালিওয়ালার কাছ থেকে পাটালি নিয়ে চুষতে চুষতে বাজারময় ঘোরে। প্রায় সময়ই কুল টমাটো শশা পেয়ারা তার মুখে একটা না একটা কিছু থাকে।

দোকানীরা বলে, বেঁটে সরকার মরার সময়ও বউর কাছেই হয়ত দু' আঁটি শাক চাইবে।

অকুল আগে মায়ের কাছে এ সব গল্প করত। হাসাহাসি হত। আজকাল আর করে না।

সংসারের কষ্ট দেখে সে নিজেও চিন্তাকুল হয়ে পড়েছে। এক একবার তার মনে ধিক্কার জন্মে, ছেলে হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারল না।

সে জানে এখানে চাকরিও আর বেশীদিন নয়, কিন্তু নতুন যে একটি চাকরি খুঁজে নেবে তারই বা সময় কোথায়? এক বেলারও ছুটি নেই। বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই কাজের কথা বলে রেখেছি। কোন অফিসের আর্দালীগিরি পেলেও যেন বেঁচে যায়। আর্দালীর মাইনে বাজার সরকারের চাইতে বেশী।

ব্যবসার কথাও ভেবেছে, পানের দোকান করলে কেমন হয়, চানাচুর ঘুগনি ফেরি করে লাভ থাকে কত। পানওয়ালা চানাচুরওয়ালার কাছে খবরও নিয়েছে। এক এক সময় ভাবে, গিরীনদার কাছে কিছু টাকা হাওলাত করে স্বাধীন ব্যবসায়ে নামবে। আবার ভয়ও হয়, পাঁচ পাঁচটা পেটের ভাবনা যার, হাতে যার একটা কানাকড়িও নেই অনিশ্চিত আয়ের ঝুঁকি নেওয়া তার ত উচিত নয়।

মোটের উপর কি যে করবে ঠিক করতে পারে না।

• • •

কদিন আগে মনোজের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। সেই থেকে অকুলের প্রতি তিনি বিরূপ। এ তার স্বভাব। হঠাৎ কাউকে ক্ষমা করতে পারেন না।

অকুল সেদিন বাজারে গিয়ে দেখল ওর অদ্ভুত পরিবর্তন। নিজে ডেকে হেসে কথা কইলেন। অকুল তার এ প্রসন্নতার কারণ বুঝতে পারে না।

শরীর খারাপ থাকায় মহেন্দ্র আসেনি। টাকা আদায়, হিসাব রাখা অকুল একাই সব করল। মন ছিল প্রফুল্ল। তাই আজও ভাল লাগল।

মনোজ বললেন, বাবু তোমাকে ডেকেছেন। আজই একবার দেখা করে যেও।

অকুলের মা। ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘর—চালের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

এক কোণে একটু শুকনা জায়গায় মাদুরের উপর ছন্দা শুয়ে। ছেলেরা তখনও ফেরেনি। মা আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবছেন—অতীতের স্মৃতি রোমন্থন, বর্তমানের হিসাব নিকাশ, ভবিষ্যতের আশা-আশা সব যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের উপর।

বাইরে উঠান থেকে অকুল ডাকল, ছন্দা আমার কাপড়জামা আর সুটকেস নিয়ে আয়।

ছন্দা সব শোনেনি। দাদার গলা শুনেই অভ্যাসবশে গামছা, জল আর হারিকেন নিয়ে

বাটখারা আমার ডিপার্ট, তাতে তুমি নাক গলাতে গেলে কেন?

বাবু কখনও ডাকে না। আজ এ ডাকার কারণ কি? ম্যানেজারের মুখের দিকে চেয়ে অকুল কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করে কিন্তু তার মুখখানা যেন পাথরে খোদাই আড়াই হাজার বছরের পুরানো বুদ্ধমূর্তি, ভাবলেশ-হীন। তা থেকে বোঝা যায় না কিছুই।

• • •

রাত নটা। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ক ক। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে যেন মাথার উপর রোলার টানছে কোনও অজানা দৈত্য। বিদ্যুৎ-ঝলকে এক একবার দিকচক্রবাল দুধের মতন সাদা হয়ে যাচ্ছে—চোখের পলক পড়ার আগেই আবার সব অন্ধকার।

শহরতলির খোলার চালার তলায় একটি হারিকেনের পাশে জড়সড় হয়ে বসে আছেন এসে বারান্দায় দাঁড়াল। অকুল বলল, সুটকেশ আনিস্ নি যে?

কণ্ঠস্বর চাপা অভিমানে ও বিরক্তিতে ভরা। দাদার এ-কণ্ঠ ছন্দার একান্তই অজানা। সে বলল, সুটকেশ কেন? কোথায়ও যাবে নাকি?

হাঁরে হাঁ, যাব।

হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকানিতে ছন্দার মনে হয় একবেলার মধ্যেই দাদার মুখ রক্তহীন হয়ে গেছে, চোখের চাহনি হয়েছে পাগলের মতন।

মা সবই শুনছিলেন। তাঁর বুকের ভিতরটায় যেন ঝড় বইছে। কি যে করবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না।

হাঁ রে হাঁ যাব শুনে অন্ধকারের ভিতর থেকে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। শীর্ণমূর্তি,

(ইহার পর ১০৮ পৃষ্ঠায়)

কল্পান্ত

রণজিৎকুমার সেন

কন্ট্রাক্টার এণ্ড বিলডার শ্রীমহীতোষ শ্রীমানীর রুক্ষকায় মুখখানির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কেমন যেন সন্দেহ চোখে চেয়ে রইলেন রিটায়ার্ড সেসন জজ মিস্টার এলিস। কোথায় যেন কবে কি সূত্রে দেখেছেন তিনি এই রুক্ষকায় লোকটিকে। অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রেও তা স্মরণে আনতে পারলেন না মিস্টার এলিস।

অথচ মিস্টার এলিসকে কিন্তু প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলতে কষ্ট হ'লো না মহীতোষ শ্রীমানীর। মনে পড়লেই পুরোনো [illegible] সন্দেহ [illegible], তারপর মুখোমুখি দেখতে পেয়ে [illegible] সন্দেহ [illegible] হ'লো।

[illegible] দেখতে দেখতে [illegible] বছর [illegible] চলেছে। সেদিন ছিল [illegible]। মহীতোষ শ্রীমানী তখন [illegible] পাশ ক'রে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছে। এই সময়ে [illegible] আদালতে নতুন সেসন জজ হ'য়ে এলেন মিস্টার এলিস। শোনা গেল ভারী [illegible] লোক।

মহীতোষের বাবা ঋষিকেশ শ্রীমানী তখন আদালতের পেশকার। সামান্য যা [illegible] রোজগার, তাতে সংসার চলে না। বিরাট পরিবার: দু'টি ছেলেকে নিয়ে বিধবা বোন আছে ঘাড়ের উপর, [illegible] আগে পর হ'লে কি হবে ঠাকুরমা এখনও বেঁচে— বৈধব্য আর বার্ধক্য নিয়ে অপেক্ষা [illegible] ক'রে বসে আছে। এর উপর আছে ঋষিকেশ শ্রীমানীর নিজের তিন ছেলে, দু' মেয়ে আর রুগ্না স্ত্রী। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মহীতোষই বড়। সবে বি-এ পাশ ক'রে কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে। ঋষিকেশবাবু চেষ্টা করলেন— কোনোভাবে যাতে আদালতে ঢুকিয়ে দিতে পারেন তিনি ছেলেকে। এই নিয়ে সেরেস্তাদার দিগিনবাবুর বাড়ীতে ঘোরাঘুরি করলেন কয়েকটা দিন। আদালতে জজ সাহেবের সঙ্গে সেরেস্তাদারের সম্পর্কটা অত্যন্ত কাছের। অনেকদিন দেখা দিগিনবাবু যদি মহীতোষকে মিস্টার এলিসের কাছে রেকমেণ্ড ক'রে পাঠান, তবে হয়তো সহজেই কাজটা হ'য়ে যায় না, সেই সঙ্গে ঋষিকেশবাবুর গোটা সংসারটাও অনেকখানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু মহীতোষের যে সত্যি সত্যিই এমন কেরানীগিরির চাকরীতে মন ছিল, তা নয়। কলকাতায় গিয়ে এম্-এ প'ড়ে ভবিষ্যতে সে কোনো সরকারী কলেজের প্রফেসার হবে, এমন একটা প্রতিশ্রুতিই একদিন দিয়েছিল সে সুজাতাকে। সুজাতাদের পরিবারের সঙ্গে ঋষিকেশবাবুদের অনেককালের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে মহীতোষ আর সুজাতার প্রেম একদিন নিবিড় হ'য়ে উঠ্লো। সেই থেকে দু'জনের কত স্বপ্ন, কত আশা! একদিন প্রফেসার হ'য়ে সুজাতাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে মহীতোষ, স্বর্গ নেমে আসবে তাদের ছোট্ট সংসারটিতে। ভাবতেও যেন সারা মন কেমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু ঋষিকেশবাবুর সংসারের একটানা অভাব মহীতোষের সেই রোমাঞ্চিত স্বপ্নকে যেন টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভেঙে দিল। ছেলেকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে একসময় মা বিন্দুবতী বললেন: 'তোর বাবার কি অসাধ যে তুই আরও অনেক লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হ'স! কিন্তু চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছিস খোকা, এই বয়সে এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রেও তোর বাবা এখন আর সংসারের সবদিক রক্ষা ক'রে উঠ্‌তে পারছেন না। ভালোয় ভালোয় যদি তোর বাবার অফিসেই কাজটা হ'য়ে যায় তো খোকা, তুই যেন 'না' করিসনে খোকা।'

প্রতিবাদ করার মতো অবস্থা থাক্‌লে মহীতোষ নিশ্চয়ই চুপ ক'রে যেতো না, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লো—যে সংসারে তার জন্ম, সেখানে কোনো কথাই তার টিকবে না। ব'ল্‌লো, বেশ, বাবাকে তবে চেষ্টা ক'রে দেখতে বলো, আমার আপত্তি নেই।'

ঋষিকেশবাবু অবিশ্যি চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। শেষ পর্যন্ত সেরেস্তাদার দিগিনবাবুর মত পাওয়া গেল। ব'ল্‌লেন, আমি জজ সাহেবের কাছে আপনার ছেলের নাম পেশ ক'রেছি। হয়তো ইণ্টারভিউতে ডাকতে পারেন।

শুনে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন ঋষিকেশবাবু—মিস্টার এলিসের কাছ থেকে ইণ্টারভিউর ডাক যেন সত্যিই আসে, এবং খোকা যেন কৃতকার্যতার সঙ্গে হাসিমুখে তাঁর ঘর থেকে ফিরে আসতে পারে!

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই একদিন ইণ্টারভিউর ডাক প'ড়্‌লো মহীতোষের।

শুনে সুজাতা ব'ল্‌লো, 'তুমি তবে সত্যিই এবারে কাজে জয়েন্ ক'রছো? আর তবে প'ড়্‌লে না?'

ঢোক গিলে কোনোভাবে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মহীতোষ ব'ল্‌লো, 'লেখাপড়া—কাজ না ক'রে যখন উপায় নেই, তখন কাজ ক'রতে ক'রতেই প'ড়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেবো। সামান্য মাইনের এই কেরানীগিরি বেশীকাল আমার বরদাস্ত হবে না।'

—'একবার ঢুক্‌লে আর কি বেরোতে পারবে, মনে ক'রেছ? তখন মনে হবে—মাইনে দু'পয়সা কম হ'লেও এই-ই ভালো!' ব'লে মহীতোষের মুখের দিকে একবার গাঢ় দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধরলো সুজাতা।

মহীতোষ কি ব'ল্‌বে, বুঝে উঠ্‌তে পারলো না। সুজাতাকে নিয়ে তার যে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা! সে স্বপ্ন কি সার্থক হবে এপথে? ভাবতে গিয়ে মাথাটা ক্রমেই ভারী হ'য়ে উঠ্‌ছিল মহীতোষের। একসময় সুজাতার পাশ কাটিয়ে উঠে প'ড়ে কোথায় একদিকে গিয়ে গা ঢাকা দিল সে।...

ইণ্টারভিউর দিন যতখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বেরোনো সম্ভব, তাতে এতটুকুও ত্রুটি রাখ্‌লো না মহীতোষ। সদ্য দাড়িকামানো মসৃণ গালের উপর দিয়ে পাউডারের ছোট্ট পাফ্‌টাকে একবার সযত্নে বুলিয়ে নিতে অবধি ভুল ক'রলো না সে। কোনোদিন তো এমন ক'রে সিভিলিয়ান সাহেবদের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াতে হয়নি তাকে! একটু ছিমছাম্ হ'য়ে না বেরোলে চ'লবে কেন? এখানকার নেটিভ্ পিপ্‌লদের কি ভাববে তবে সাহেব?

গিয়ে যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হ'তেই সেরেস্তাদার দিগিনবাবু তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন মিস্টার এলিসের প্রাইভেট চেম্বারে। যাবার সময় ঋষিকেশবাবু

এসে একবার কানে মন্ত্র প'ড়ে দিলেন : 'দেখিস, ঠিক ঠিক মতো যেন জবাব দিতে পারিস। উচ্চারণ যেন ভালো হয়। সেরেস্তাদারবাবু সঙ্গে আছেন, কোনো অসুবিধে হবে না তোর।'

সব কথাতেই নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় কাত ক'রে নিলো মহীতোষ। তারপর মিষ্টার এলিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন ক'রলেন : 'খেলাধূলো সম্পর্কে তোমার ইন্টারেষ্ট কিরকম?'

কোনোরকম দ্বিধা না ক'রে মহীতোষ ব'ল্‌লো, 'কলেজে উঠে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমি ফুটবল ম্যাচে যোগ দিয়েছি; এখন শুধু খেলা দেখ্‌তে ভালোবাসি।'

—'ভেরি গুড্‌।' থেমে মিষ্টার এলিস প্রশ্ন ক'রলেন : 'বি-এ-তে তুমি স্পেশালী কোন্‌ সাব্‌জেক্টে ইনটারেষ্টেড্‌ ছিলে?'

—'ম্যাথেমেটিক্স্‌। সায়ান্স ক্লাসে জয়েন ক'রতে না পেরে আর্টসে আমি ম্যাথেমেটিক্স্‌ নিয়েই পাশ ক'রেছি।'

মিষ্টার এলিস এবারে একটা শক্ত ইকুয়েশন ক'ষতে দিলেন মহীতোষকে।

ইকুয়েশনের চেহারা দেখে মনে মনে বিরক্ত হ'লো মহীতোষ। কোনোভাবে অংকটাকে শেষ ক'রে কাগজের সিট্‌টাকে মিষ্টার এলিসের দিকে এগিয়ে ধরতে যাচ্ছিল সে, তাড়াতাড়ি দিগিনবাবু সেটাকে নিজের হাতে টেনে নিলেন।

মিষ্টার এলিস এবারে প্রশ্ন ক'রলেন : 'সেকেণ্ড গ্রেট্‌ ওয়ার যদি অনিবার্য হয়, তবে ভারত তাতে কোন্‌ অংশ গ্রহণ ক'রবে ব'লে মনে করো?'

মহীতোষ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলো : 'ভারত কোনোদিন যুদ্ধ চায় না, অতএব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত নিরপেক্ষই থাকবে এবং এই নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়েই ভারত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হবে।'

—'আই সি।' ব'লে গাম্ভীর্যের সঙ্গে এবারে মুখে পাইপ ধরালেন মিষ্টার এলিস। তারপর ব'ল্‌লেন, 'আমার এজ্‌লাসের সময় হ'য়ে গেছে, তুমি এখন তোমার নিজের কাজে যেতে পারো।'

একমুহূর্তও আর অপেক্ষা না ক'রে মিষ্টার এলিসের প্রাইভেট্‌ চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো মহীতোষ।

দিন দুয়েক বাদে সেরেস্তাদার দিগিনবাবু নিজেই একসময় উপযাচক হ'য়ে ঋষিকেশ-বাবুকে ব'ল্‌লেন, 'মহীতোষ পরীক্ষা খারাপ দেয়নি, কিন্তু আকৃতি কালো ব'লে সাহেব এ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌ দিতে রাজি হ'লেন না। অনেক বুঝিয়ে ব'ল্‌লাম—মহীতোষ তো বাইরের লোক নয়, আমাদের পেস্কারবাবুর ছেলে, তবু সাহেবের ঐ যে কি এক ঝোঁক চেপে ব'সলো, কিছুতেই আর রাজি করানো গেল না।'

শুনে বিস্ময়ে আর হতাশায় ঋষিকেশ-বাবুর চোখ কপালে উঠলো। আপন মনে স্বগতোক্তি ক'রবার মতো কণ্ঠে ব'ললেন, 'মহীর গায়ের রং কালো ব'লে মহী এ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌ পাবে না?'

আড়াল থেকে কথাটা শুনে মহীতোষ নিজেও কম বিস্মিত হ'লো না। নিজের গায়ের রং নিয়ে ঠাট্টা ক'রে একদিন সে সুজাতাকে ব'লেছিল : 'তুমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যিই ঠকলে। এমন কালো কদাকার মানুষটাকে ভালোবেসে রং সম্পর্কে তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে মূক হ'য়ে গেলে।'

স্মিতহাস্যে সুজাতা ব'লেছিল : 'কে তোমাকে কালো ব'লেছে? যে ব'লেছে, সে নিজেই কদাকার কুৎসিত। তুমি কেন কালো হ'তে যাবে? তোমার মতো এমন রং না হ'লে কোনো পুরুষকেই মানায় না।'

শুনে সেদিন আনন্দে সারা বুকখানি ভ'রে গিয়েছিল মহীতোষের। তার গায়ের সেই রঙের ঐতিহ্যকে আজ এলিস সাহেব এমন ক'রে খর্ব ক'রে দেবেন জান্‌লে তাঁর কাছে পরীক্ষার্থী হ'য়ে গিয়ে দাঁড়াতো না সে। কী না ব'লেছেন মিষ্টার এলিস? ব'লেছেন—'এ ব্ল্যাক্‌ নিগার ইজ্‌ নট্‌ ফিট্‌ ফর দি পোস্ট্‌।' এ যে মহীতোষকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত বাঙালীকে অপমান!! চিরকালের কৃষ্ণজাতি বাঙালী, সেই কৃষ্ণজাতির প্রতি আজ নতুন ক'রে মিষ্টার এলিসের এই উপেক্ষা সমস্ত বাঙালীর প্রতিই কি অমর্যাদা নয়? ভালোই হ'য়েছে চাকরী না হ'য়ে। যে আদালতের অধিকর্তা মিষ্টার এলিস, সে-আদালতকে দূর থেকে প্রণাম।......

চাক্‌রীটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই হ'লো না মহীতোষের। বিভাবতী মনে মনে প্রমাদ গণ্‌লেন আর অভাবের তাড়নায় ঋষিকেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন।

প্রবোধ দিয়ে একসময় দিগিনবাবু ব'ল্‌লেন : 'এ বছরটা যাক। ইতিমধ্যে এলিস সাহেবের এখান থেকে বদ্‌লি হ'য়ে যাবার কথা আছে। নতুন জজ এলে তাঁকে ধ'রে যে-ক'রেই হোক মহীতোষকে আমি কাজে ঢুকিয়ে নেবো।'

হয় তো ঋষিকেশবাবু একথায় কিছুটা আশ্বস্ত হ'তেন, কিন্তু সংসারের দিকে লক্ষ্য ক'রে মহীতোষ আর একটা দিনও ঘরে ব'সে থাকতে চাইলো না। একসময় ব'ল্‌লো, 'আমি আপাততঃ ক'ল্‌কাতা যাচ্ছি বাবা। দেখি যদি চেষ্টা ক'রে অদৃষ্টকে তবু ফেরাতে পারি!'

অর্থের কথা চিন্তা ক'রে একবার বাধা দিতে গেলেন ঋষিকেশবাবু, কিন্তু পারলেন না। মহীতোষ ব'ল্‌লো, 'টাকা-পয়সা আমি কোনোভাবে ব্যবস্থা ক'রে নেবো, সে জন্যে আপনি ভাববেন না।'

কিন্তু ঋষিকেশবাবুকে ভাবতে না হ'লেও ভাবতে হ'লো এবারে সুজাতাকে। বললো, 'তুমি তবে সত্যিই কল্‌কাতায় চ'লে যাচ্ছ মহী? কিন্তু আমি এখানে কি নিয়ে থাকবো, ব'লতে পারো?'

মহীতোষ বললো, 'মাত্র কিছুদিন বৈ তো নয়! নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েই আমি তোমার বাবাকে পাঁজি দেখে আমাদের বিয়ের দিন ঠিক করতে বলবো। ভাবো দেখি একবার সেই সুন্দর দিনটির কথা?'

এবারে আর কথা ফুটলো না সুজাতার মুখে। অনেকক্ষণ নীরবে অভিভূতের মতো মহীতোষের মুখের দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চোখ দুটো নামিয়ে নিলো সে।

একসময় তার পাশ কাটিয়ে উঠে পড়লো মহীতোষ, তারপর ভাগ্যান্বেষণে সোজা একদিন কল্‌কাতার ট্রেণ ধরলো।......

পুরনো বন্ধু জহর নন্দী ক'লকাতার একটা বোর্ডিং-এ থেকে এম-এ পড়ছিল। মহীতোষ এসে সোজা তার কাছেই উঠলো।

ভরসা দিয়ে জহর নন্দী বললো, 'তোর যখন ছোটবেলা থেকেই কন্সট্রাকটিভ কাজে বেশ 'ন্যাক' আছে, তখন ইঞ্জিনীয়ারিংটা একবার রপ্ত ক'রে নে না! আমি বরং সকাল সন্ধ্যা তোর জন্যে দুটো মোটা টাকার টিউশনির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তাতেই তোর চলে যাবে।'

—'বেশ তো, তাই দে।' ব'লে পরম নির্ভরতার সঙ্গে একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো মহীতোষ।

তাকে টিউশনি জুটিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না জহর নন্দীর। একটি 'বিদ্যা-সাগরের' ছেলে আলোক সান্যাল, আর একটি 'আশুতোষের' মেয়ে বীথি চৌধুরী। দুটো টিউশনিতে মাসে প্রায় দেড়শো টাকার মতো এসে গেল মহীতোষের হাতে। পরম নির্ভাবনায় এবারে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হ'য়ে গেল সে। ছাত্রী বীথি চৌধুরী তার বাপ-মার একমাত্র সন্তান; বাপ প্রকাশ চৌধুরী ধনাঢ্য ব্যক্তি। মহীতোষের শিক্ষা আর আচরণ ক্রমেই তাঁকে মুগ্ধ ক'রছিল। একদিন তিনি এক প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হ'লেন মহীতোষের কাছে। বললেন, 'তোমাকে আমার বড় ভালো লেগেছে মাষ্টার। শুনেছি, তুমি এখনও বিয়ে করোনি। আমার ইচ্ছে, বীথির পরীক্ষার পর তুমি বীথিকে বিয়ে করো। তুমি কথা দিলে বীথি বাগ্‌দত্তা হ'য়ে থাকতে পারে। জানো তো, আমার আর কোনো সন্তান নেই। তুমি রাজি হ'লে আমি এখনই তোমার নামে ব্যাংকে একটা মোটা টাকার একাউন্ট খুলে রাখতে পারি। ভবিষ্যতে আমার যাকিছু বিষয়-সম্পত্তি সব তোমাদেরই হবে। বলো, রাজি আছ তুমি?'

শুনে বিস্ময়ে প্রথমটা কেমন স্তব্ধ হ'য়ে গেল মহীতোষ। বললো, দিনদুয়েক আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। এখনও আমি ছাত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমারও তো কিছু চিন্তা আছে!'

—বেশ, সময় তুমি দু'দিন নাও। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাববার আর বিশেষ কিছু নেই। আমি যা রেখে যাবো, তোমরা দু'জনে মিলে দু'হাতে উড়ালেও তা সহজে শেষ হবে না।' ব'লে অলক্ষ্যে একবার দম্ভভরে হাসি হাসলেন বিকাশ চৌধুরী।

আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় শুনে জহর নন্দী বললো, 'ইডিয়েট, তুই এখনও চুপ ক'রে আছিস? যা, শীগ্‌গির ছুটে গিয়ে কথা দিয়ে আয়, তারপর আমাদের বোর্ডিংয়ের সবাইকে মিষ্টিমুখ করা।'

ইতস্ততঃ ক'রে মহীতোষ বল্‌লো, 'কিন্তু—কিন্তু সুজাতার তবে কি হবে? সে যে আমার আসাপথ চেয়েই ব'সে আছে!'

জহর নন্দী বল্‌লো, 'অমন ছিটেফোঁটা প্রেম অনেকের সঙ্গেই হয়, অনেকেই অমন আসাপথ চেয়ে ব'সে থাকে। তা নিয়ে ভাবলে চলে না। মানি ইজ্‌ হানি, টাকাই প্রেম। যা ব'লছি, তাই কর।'

এতদিন দু'একদিন বাদে বাদেই সুজাতার চিঠি আসতো, সাহিত্য ক'রে তার জবাব দিতো মহীতোষ। এবারের চিঠিটা কিন্তু অন্যরকম। লিখেছে : 'গরীবের সংসারে মেয়েদের নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই দেখলাম। বাবাকে

কিছুতেই মনের কথাগুলোকে বুঝিয়ে বলতে পারলুম না। তোমাকে নিয়ে আমার বাসর-স্বপ্ন আর বুঝি সফল হ'লো না। বাবা ইতিমধ্যে আমার বিয়ে পাকা ক'রে ফেলেছেন। এর চেয়ে আমার গলায় দড়িও যে ভালো ছিল মহী!'

প'ড়তে গিয়ে হাত দু'খানি একবার কেঁপে উঠ্‌লো মহীতোষের, বুকের ভিতরটা একবার দুরুদুরু ক'রে উঠ্‌লো। এচিঠির কি জবাব দেবে সে, কি জবাব হ'তে পারে এ চিঠির?— দারুণ একটা অস্থিরতা নিয়ে কিছুক্ষণ এপাশে ওপাশে ছুটোছুটি ক'রলো মহীতোষ, তারপর নিজের অদৃষ্টকে বার বার ধিক্কার দিয়ে জহর নন্দীর ইচ্ছানুযায়ীই বিকাশ চৌধুরীকে গিয়ে কথা দিয়ে ফেললো সে। ছাত্রী বীথি চৌধুরী আর ছাত্রী রইলো না, উন্নীত হ'লো সে স্ত্রীত্বের পর্যায়ে।

এমনি ক'রে কিছুকাল কাটবার পর একদিন ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স শেষ ক'রে বীথির গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে যখন দেশের বাড়ীর গাড়ী ধরলো মহীতোষ, তার বহু আগেই সুজাতা তার স্বামীর ঘরে চ'লে গেছে। মনে হ'লো— সমস্ত বনপ্রকৃতি জুড়ে তার শ্বাস বইছে। তার শরীরের উত্তাপ এসে এখনও তার গায়ে লাগছে। বীথিকে পেয়েও মহীতোষ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে একথা বলতে পারলো না যে, সে সুখী হয়েছে। বীথির আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব প্রতি-মুহূর্তে কাঁটার মতো এসে বিঁধতে লাগলো তাকে। কিন্তু উপায় নেই, পথ নেই আর নিজেকে সরিয়ে নেবার। উর্ণনাভের মতো নিজের জালে আজ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে মহীতোষ।

ভেবেছিল—বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে দু'দিন শান্তিতে কাটাতে পারবে সে। কিন্তু তাকিয়ে দেখলো—একটানা অভাবের সংসারে কোথাও একবিন্দু শান্তি নেই। মা বিভাবতীর মুখে এককালে অনর্গল হাসির ফোয়ারা ছুটতো, আজ সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে কেমন একটা ক্লিষ্টতায় সারা মুখখানি করুণ হ'য়ে উঠেছে। বললো, 'তোমার কষ্টের কথা ভেবে ঘরে বউ নিয়ে এলাম, তবু তুমি আজ সহজভাবে হাসতে পারছো না কেন মা?'

শুনে হাসির বদলে বুক ফেটে কান্না আসছিল বিভাবতীর কোনোভাবে সেটুকু সম্বরণ ক'রে নিয়ে কোথায় একদিকে গিয়ে মুখ ঢাকলেন।

এ সংসারে যে লোকের আর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু টাকার, একথা মহীতোষও জানতো বৈ কি? জেনেই তো একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে কলকাতায় ছুটেছিল সে। জহর নন্দীর মতো বন্ধু ছিল, তাই রক্ষা। আপাত অভাবের বিভীষিকা থেকে যাহোক, তবু বাঁচিয়ে দিলেন বীথির বাবা বিকাশ চৌধুরী। ব্যাঙ্কে তার নিজের একাউন্টে বিকাশ চৌধুরীর জমা দেওয়া টাকা থেকে সামান্য একটা অঙ্ক তুলে এনে একসময় মায়ের হাতে গুঁজে দিল মহীতোষ, তারপর বললো, জানো মা, আমাদের আজ আর কিছু অভাব নেই। বীথির বাবা আমাদের সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে, শ্বশুরের টাকায় আমি বড়লোক হই। এদেশে ইঞ্জিনীয়ারের আদর না হলেও আমি সামান্য কন্ট্রাক্টারী ক'রেই অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারবো। শুনেছি, কলকাতার কাছাকাছি কৃষ্ণনগরে কন্ট্রাক্টারীর ভালো ফিল্ড আছে। আমি এবারে সেখানে গিয়েই ব্যবসায় মন দেবো ঠিক ক'রেছি।'

বিভাবতী বললেন, 'তাই কর খোকা, সে-ই তোর উপযুক্ত কাজ হবে। যাই, বৌমাকে দিয়ে আমি তোর জলখাবার পাঠিয়ে দিই গে।'

মায়ের আঁচল টেনে ধ'রে মহীতোষ বললো, 'তুমি আমার কাছে ব'সে কথা না বললে আমি কিছুতেই খাবো না। ভেবেছ, তোমার চাইতে তোমার বৌমা আমার কাছে বড় হ'লো? কক্‌খনো না।'

হেসে বিভাবতী বললেন, 'পাগ্‌লা ছেলে, চিরকাল তুই একরকমই থেকে গেলি, আজও তোর মাথা ঠিক হ'লো না।' বলতে বলতে হেঁসেলের দিকে পা বাড়ালেন বিভাবতী।......

এরপর বোধ করি দিন দুয়েকও কাটলো না। এক সময় কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যেই ট্রেণে চেপে বসলো মহীতোষ। বীথি ছাড়লো না, সেও সঙ্গে এলো। এসে ছোট্ট মতো একটা সুন্দর বাসা ভাড়া ক'রে কাজে মন দিলো মহীতোষ। যে ক'রেই হোক্—জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা নিয়ে দাঁড়াতেই হবে। ব্যবসায়ে চির-কাল লক্ষ্মী অচঞ্চলা। সারা জীবন পেস্কারী করে বাবা আর ক'পয়সা পেয়েছেন? অদৃষ্টে থাকলে তার ইঞ্জিনীয়ারিং আর কন্ট্রাক্টারী ফার্ম দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতে পারবে মহীতোষ।

আশ্চর্য যে, কাজের অভাব ঘটলো না। কয়েক মাসের মধ্যেই মোটা কয়েকটা কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেল সে। দেখতে দেখতে নাম ছড়িয়ে প'ড়লো চারদিকে। কোথাও বাড়ী, কোথাও ডাক বাঙলো, কোথাও স্কুল : লোক রেখে, কুলি-মজুর খাটিয়ে একটানা কাজের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিল মহীতোষ। নতুন টেক্‌নিকের কাজ দেখে পার্টিরা খুসী।

কিন্তু ঘরে থেকে খুসী হ'তে পারলো না বীথি। বললো, 'যদি নিজেকে কেবলই এম্‌নি ক'রে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন আমাকে?'

মহীতোষ বললো, 'বিয়ে ক'রেছি ব'লেই তোমার আঁচল ধরে ঘরে ব'সে থাকবো, এই বা কোন্ কথা?'

—'তবু আমিও তো একটা মানুষ, একা একা মুখ বুজে ঘরে ব'সে থাকতে আমিই বা ক'তক্ষণ পারি?' ব'লে নরম সুরে এবারে অভিমান জানালো বীথি।

মহীতোষ বললো, 'মনটাকে অবস্থা আর পরিবেশের অনুকূল ক'রে নাও, দেখবে—এ কষ্ট আর তখন থাকবে না।'

নিজের ব্যক্তিত্বের খরসূর্যে এবারে আবার জ্বলে উঠ্‌লো বীথি, বললো 'তোমার কাছে শুধু নীতিকথা শুনেতেই কি বাবা আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন? আমার কি সাধ আহ্লাদ ব'লে কিছুই নেই?'

মহীতোষ বললো, 'একথা আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রলেই তো পারতে!' ব'লে নিজের কাজের উদ্দেশে কোথায় একদিকে বেরিয়ে প'ড়তে যাচ্ছিল সে, ইতিমধ্যে ডাক এলো মিষ্টার এলিসের কাছ থেকে।

ইংরেজ রাজত্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে একসময় জজিয়তি ক'রেছেন মিষ্টার এলিস; কত মানুষকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন, কত মানুষকে ঠেলে দিয়েছেন জেলে আর দ্বীপা-ন্তরে! তারপর ভাগ্যচক্রে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হ'লেও রিটায়ার ক'রে মিষ্টার এলিস কিন্তু বাঙ্গলার মাটি ছেড়ে কোথাও ন'ড়লেন না। বাঙ্গলার শ্যামল স্নিগ্ধতা তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছে, কৃষ্ণনগরে এসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভগ্ন জমিদারীর একপাশে ভাড়াটে হ'য়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। ছেলেরাও ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এবারে দেখে শুনে একখানি বাড়ী তুলতে না পারলে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ব'লে কিছু থাকে না। অতএব কাছাকাছি বিঘাটেকখানেক জমি কিনে এবারে বাড়ী তৈরীর কাজেই উদ্যোগী হ'য়ে উঠ্‌লেন মিষ্টার এলিস। সহরে খ্যাতিমান কন্ট্রাক্টার এ্যাণ্ড বিল্ডার এখানে মহীতোষ শ্রীমানী। বাধ্য হ'য়ে এবারে লোক পাঠাতে হ'লো তার কাছে।

দেখা হ'তেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে কেমন স্তব্ধ হ'য়ে গেল দুজনে! অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রেও ভেবে পেলেন না মিষ্টার এলিস—কোথায় কবে এই চেহারার সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল তাঁর। কিন্তু প্রথম দর্শনেই মিষ্টার এলিসকে চিনে ফেলেছে মহীতোষ। সঙ্গে সঙ্গেই মনে প'ড়ে গেল তার ষোল বছর আগেকার একটি দিনের কথা— চাকরীর প্রার্থী হ'য়ে যেদিন প্রথম সে সেরেস্তাদার দিগিনবাবুর সঙ্গে তাঁর পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিষ্টার এলিসের প্রাইভেট চেম্বারে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তাকে জর্জরিত ক'রে তুলেছিলেন মিষ্টার এলিস। তাতেও দুঃখ ছিল না—যদি চাকরীতে সে বহাল হ'তে পারতো। কিন্তু সেই অনুগ্রহটুকুও সেদিন করেননি মিষ্টার এলিস। ব্ল্যাক নিগার ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাকে। এ জীবনে অনেক কিছুর মতো সে ইতিহাসও ভুলবার নয়।

নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলো মহীতোষ।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মিষ্টার এলিস বললেন, 'আপনার মতো একটি লোককে এর আগে কোথায় যেন আমি দেখেছি ব'লে মনে প'ড়ছে। তা যাক্। বাড়ীর কাজের জন্যে আপনাকে আমি খবর পাঠিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে—আপনি কন্ট্রাক্ট নিয়ে বাড়ীটা আমার কম্‌প্লিট্ ক'রে দিন।'

শুনে ইচ্ছে হ'লো—হো হো ক'রে হেসে ওঠে মহীতোষ। একদিন যেমন ক'রে সে সামান্য একটা কেরানীর কাজের জন্যে আবেদন নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিষ্টার এলিসের কাছে, আজ ঠিক তেমনি একটা অনুনয়ের আবেদনই ফুটে উঠেছে মিষ্টার এলিসের কণ্ঠে। কিন্তু ষোল বছর আগে আর পরে কতো পার্থক্য! সেদিন চাকরীটা পেলে সুজাতাকে অন্ততঃ সে হারাতো না। সুজাতা যে তার জন্যই অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিল! জীবনে আজ বীথি এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুজাতার স্থান সে পূর্ণ ক'রতে পারলো না। দিনে দিনে জীবনটা আজ ক্রমেই তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। তার দারিদ্র্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বীথির বাবা বিকাশ চৌধুরী একদিন অর্থের প্রলোভনে তাকে বশ

(ইহার পর ১০৮ পৃষ্ঠার ১ম কলমে)

অকূল

(১০৪ পৃষ্ঠার পর)

কাঁচা-পাকা চুল, পাকাই বেশী। বয়সের তুলনায় অনেক বেশী ভেঙে পড়েছেন।

ছেলেকে ডাকলেন তিনি—আয় উপরে উঠে আয়।

না, আমি উঠব না।

রাগ করিসনে বাবা!—বলে নেমে এসে মা ছেলের হাত ধরলেন।

অকূল বলল, অযোগ্যের আবার রাগ কি? আমি সুখে রাখতে পারিনি তোমাকে। তুমি গিরীনদার সঙ্গে বাবুর বাড়ীতে গিয়ে আমার *বদলে নকুলের চাকরি ঠিক করে এসেছ। এমন আভাসও তিনি পেয়েছেন যে, আমি তোমায় টাকা দেই না।*

মা বললেন, তুই আমায় ক্ষমা কর।

ছন্দা কিছুই জানত না। সে একবার দাদার মাথের দিকে তাকায় আবার তাকায় মায়ের মুখের দিকে।

অকূল আবার বলে, বাবু কি ভাবলেন বল দেখি। এক ছেলে চুরি করতে পারে না বলে তুমি আর এক ছেলেকে দিয়ে গেলে। গিরীনদাই বা কি মনে করলেন।

মনে করেন নি কিছু। তাহলে—

করলে নকুলের চাকরি হত না। এইত?—বলেই মায়ের হাত ছাড়িয়ে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ছন্দা ডাকল, দাদা, শোন দাদা—

বাষ্পে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

(১০৭ পৃষ্ঠার পর)

ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি পয়সাও স্পর্শ করতে আজ ঘৃণায় সারা মন রি-রি ক'রে ওঠে মহীতোষের। ভুল, মস্তবড় একটা ভুল ক'রে ফেলেছে সে জীবনে। এভুলের বুঝি আর সংশোধন নেই!

একটু কাল স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো মহীতোষ। নতুন কন্ট্রাক্ট, প্রচুর মুনাফা আছে সন্দেহ নেই। এক এক তাড়া নোট যেন চোখের উপর দিয়ে উড়ে গেল তার! কিন্তু না, এ অর্থ সেই যোল বছর আগেকার অপমান ভিন্ন আর কিছুই নয়; এ অর্থ স্পর্শ করাও পাপ। তেমনি মিস্টার এলিসের যে মুখ দিয়ে তার সম্পর্কে 'ব্ল্যাক নিগার' শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল, সেই কুৎসিত বীভৎস মুখের দিকে তাকানো আরও পাপ। জীবনে আর পাপ বাড়াতে চায় না মহীতোষ। বল্‌লো, 'আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন। কোনো 'হোয়াইট ভাল্‌চারের' (শ্বেত শকুনের) খোরাক তৈরী ক'রবার জন্যে আমি নই। আসি, নমস্কার।'

শুনে স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মিস্টার এলিস। মনে হ'লো—তাঁর সারা জীবনের সমস্ত জাতিগত সম্মান বুঝি এক নিমেষে ধুলোয় মিশে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন: 'হোয়াট্‌ ডু ইউ সে? আপনার বক্তব্য কি?'

কিন্তু জবাব দেবার জন্যে তখন আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই মহীতোষ। তার অনেক আগেই মিস্টার এলিসের ছায়া অতিক্রম ক'রে দূরে কোথায় মিলিয়ে গেছে মহীতোষের অস্তিত্ব।

সুদে আসলে

(১০০ পৃষ্ঠার পর)

হাত দেবার চেষ্টা করতেই শুকুরী আপনার গৃহিণীর হাতে একখানি চাট ছুঁড়বে। আচমকা এই আঘাত খেয়ে তিনি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে উঠবেন এবং তা শুনে আপনি ছুটে গিয়ে দেখতে পাবেন যে, তাঁর সেই হাতের শাঁখাটি ভেঙে গেছে—'ভেঙে' বলতে নেই, বেড়ে গেছে। তাঁর শাঁখায় ধরা রয়েছে আপনারই পরমায়ু; সুতরাং তৎক্ষণাৎ আপনার অপ্রত্যক্ষ জমা-খরচ-খাতার দক্ষিণ স্তম্ভে একপাটি শাঁখার মূল্য লিখিত হয়ে যাবে।

তার পর আপনার সামনে এই সমস্যাগুলো *দেখা দেবে—এক: কাঁচা ঘাসপাতা কমিয়ে পাকা খাবার খেয়ে এখন শুকুরীর এমন স্বভাব দাঁড়িয়েছে যে, দুধ না দেওয়ার সময়ও তার পেছনে মাসে অন্ততঃ তিরিশটি টাকা খরচ না করলে,* পরের বিয়োন নাগাদ তার পশ্চিমী কলেবরের হাড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুই: আধসের না পারলেও অন্ততঃ দেড়পো ক'রে গয়লার দুধ রোজ না নিলে কিছুতেই চলবে না। তিন: দুধ নেই ব'লেই আর আলু-নির্ভর থাকা চলবে না: মাছ-মাংস কিছু কিছু না এলে—ওদিকে রক্তরোগ তো থাবা উঁচিয়েই আছেন। চার: শুকুরী যে কতদিনে আবার বৎসগর্ভা হবার দাবি ঘোষণা করবেন, তার কিছুই ঠিক নেই......

গয়লা বুড়ো বললে, 'আজকাল যে ইন্‌জেক্‌শন বেরিয়েছে, তাই দিয়ে গোরুটাকে গাভিন করিয়ে নিন না, বাবু।'

আপনি এ প্রস্তাবে [illegible] আশা দেখতে পাবেন না, কেন না, গাভিন হলে ও-গোরুকে মাসে অন্ততঃ চল্লিশটি টাকা খাওয়াতে হবে, তা নইলে, পরের বিয়োনে দুধ একেবারে দিশী মাপে নেমে আসা বিচিত্র নয়। তা হলে, মাসে চল্লিশ টাকা ক'রে তাকে বসিয়ে খাওয়াবার সমস্যা ন'-দশ মাসের মত স্থিতিবান হয়েই থাকবে।

বিশেষজ্ঞ বন্ধু বললেন, 'দিশী কি চাস্‌, দিশী গোরু পুষে লাভ নেই। ভাল জাতের দুটো পশ্চিমা গাই কেনো। দিনে দশ সের দুধ দেবেই—কমে গেলেও কোনোদিন সাত সের। সারা বছর গড়ে তোমার আট সের দুধ রোজ। নিজেদের দরকারে চার সের রাখাও, বাকি চার সের রোজ বিক্রির ব্যবস্থা করলে, দুটো গোরুর খাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঢের।'

এ প্রস্তাব শুনে গৃহিণী উত্তলা হয়ে উঠবেন, বললেন, 'আবার তার নিয়ে যাও তুমি।'

আপনি বাধা দিয়ে সখেদে বললেন, 'আড়াই ভরি সোনার দামে যে গোরুর আধখানাও পাওয়া যাবে না।'

আপনার বড় মামা এ সময় একদিন বেড়াতে আসবেন। নিভেজাল পশ্চিমা গোরুর প্রসঙ্গে তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠে বললেন, খবরদার, বাবা, এমন সাধ কখনও যদি করো তা হ'লে তোমার বাড়ীতে আমি অনশন সত্যাগ্রহ শুরু ক'রে দেবো।'

কারণ?

তিনি নাকি এক খাঁটি পশ্চিমা গাই কিনেছিলেন পাঁচশো টাকা দিয়ে। আস্ত দিশী, প্রকাণ্ড জানোয়ার। দিনে দুধ দিত সাড়ে-আট সের ঠিকই। এক রাতে বাছুরটি কী ক'রে ছাড়া পেয়ে, প্রাণ ভরে মায়ের দুধ খেল। সেই শেষ খাওয়া। রক্ত ছেড়ে মরে গেল তিন দিনের মধ্যে। গোবদ্যির পেছনে তার নেমে গেল এক কাড়ি টাকা। বাছুর মরতেই গাই গেল ক্ষেপে। মরা বাছুরটার চামড়া দিয়ে ঢেকে এক গয়লা তৈরি ক'রে দিলে এক খড়ের বাছুর—কুশপুত্তল। গেল আট টাকা। কিন্তু ভাঁওতা দেওয়া গেল না। সেটা সামনে ধরতেই, গাইটা এক গুঁতোয় মামাকে শুদ্ধ চিৎপাত ক'রে ফেললে।

বড়মামা বললেন, 'আর-জন্মের পুণ্যিতেই প্রাণে বেঁচে গেছি, বাবা।'

তারপর?

সেই একটা গাই—নাকি ক্ষেপে গেল তার তিনটে পাগলা ষাঁড়। তার দুই চক্ষু নাকি ঘুরতে লাগল—যেন চন্দ্রসূর্য! টাকা দিয়ে গয়লাদের ডাকা হল। তারা তিন-চারদিন ধরে কী কী কায়দা-কসরৎ ক'রে, গোরুটাকে একটু নাকি ঠাণ্ডা করতে পারল। কিন্তু, তারপর কী হবে...

বড়মামা বললেন, 'তার পরের দিকে, হাত দেওয়া তো পরের কথা, [illegible] কি [illegible] আসছে। শেষটায় এক পাঞ্জাবী গয়লা হাত টাকায় গাইটাকে কিনে নিয়ে আমায় মুক্তি দিল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়বে বড়মামার।

শুকুরীর বদলে দুধিয়া আপনি যা [illegible] পাবেন—খাবেন-দাবেন বটে, কিন্তু ভাবনায় ভাবনায় [illegible]—কোন কূলকিনারা পাবেন না [illegible]।

শেষে একদিন আপনার বড় [illegible] আপনি চিঠি লিখবেন, [illegible] প্রণামান্তে [illegible] নিবেদন এই যে, [illegible] মহাশয়......"

দুই ভাই চুক্তি [illegible] দিয়া আপনি [illegible] লিখবেন,—"[illegible] আমি আপনার কোন [illegible] কখনও [illegible] করিয়াছি [illegible] মনে পড়িতেছে না। [illegible] ক্ষতি [illegible] মনে হয় না। অথচ আপনি [illegible] এই [illegible] ভাসাইবেন [illegible] না। এক কথা আমার [illegible] ছিলাম। তাহা যদি এমনই [illegible] থাকেন যে, [illegible] হইলে অধীনের [illegible] আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, [illegible] টাকা হিসাবে, যত [illegible] সেই টাকা আমি পরিশোধ করিব। [illegible] হইলে [illegible] উপরে [illegible] আমি [illegible] অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে [illegible]। আপনি অনুগ্রহপূর্বক [illegible] গোরুটি ফেরত [illegible] দিয়া আপনার স্নেহস্পদ [illegible] সম্ভাবনা হইতে পরিত্রাণ করিবেন। [illegible] থাকে যে, উপরি হিসাবে আপনি একটি [illegible] বাছুর পাইবেন—যাহাতে আপনার [illegible] ভবিষ্যতে একটি [illegible] গোরু হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, [illegible] আমিই বহন [illegible]......[illegible] নিবেদনমিতি।"

পঞ্চপ্রদীপ

আঙ্গমা দেবী

: কি সংবাদ মন্ত্রীবর?

: সংবাদ কিছু আছে।

: যথা?

: গুপ্তচর বৈশায়ন এইমাত্র রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার মত্ত সংবাদ এই যে কলিঙ্গরাজ চন্দ্রসেন দক্ষিণ সীমান্তে পল্লবরাজের সহিত গোপনে মিলিত হইয়াছেন মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মানসে।

: বহু পুরাতন সংবাদ। নূতন কথা আর কিছু নাই? সুভগ সেন হৃষ্ট নতশিরে তাকাইলেন।

: না মহারাজ।

: উত্তম। মহামাত্য, এই অপদার্থ বৈশায়নকে আমি বহুদিন যাবৎ সহ্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এবার অবস্থা চরম হইয়াছে। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সহকারে আমি উহাকে দক্ষিণ সীমান্তে পাঠাইয়াছিলাম কি প্রাচীন সংবাদগুলি রোমন্থন করিবার মানসে?

নগরপালকে আদেশ দিয়া দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বৈশায়নকে গুপ্তগৃহে বন্দী করিয়া রাখে। রাজকোষের অর্থ স্বেচ্ছাচারে অপচয় করিবার অপরাধে তাহাকে এই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

: যথা আজ্ঞা মহারাজ।

সুভগ সেন অভিবাদনান্তে নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অপসৃতি মহারাজের লক্ষ্য গোচরই হইল না। চিন্তাকুটিলচিত্তে তিনি মিনার সংলগ্ন প্রাচীর গাত্রে দেহভার ন্যস্ত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

: দাসানুদাসের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন লোকপাল মহারাজাধিরাজ।

অতীব বিস্মিত নেত্রে মহারাজ ঋজু ভঙ্গীতে সটান ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। অপরিচিত ব্যক্তির অশ্রুত কণ্ঠ।

: কে তুমি? কি চাও?

: আমি বৈশায়নের স্থলাভিষিক্ত হইতে চাই মহারাজ।

: বৈশায়ন? কিন্তু বৈশায়ন এই দণ্ডে এই স্থানে পদচ্যুত হইয়াছে। আমি এবং মহামাত্য সুভগ সেন ব্যতীত এ সংবাদ দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হইবার কথা নহে।

মহারাজের কণ্ঠ কুটিল শীতল।

: কিন্তু আমি জানিতে পারিয়াছি।

: তাহা স্বকর্ণে শুনিলাম। আরো একটি কথা শুনিতে চাই। এই সুরক্ষিত রাজান্তঃ-

মহাকালের অমোঘ চক্র অনু পরিক্রমায় লিপ্ত অনুক্ষণ।

দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বের পশ্চাৎপটে প্রতিফলিত হইতেছে শাশ্বত কাহিনীর অনুরঞ্জন।

প্রাসাদ শিখরের দুই পার্শ্বে দুইটি সুউচ্চ মিনার।

মিনার দুইটিই প্রস্তর খচিত; মধ্যস্থলে রন্ধ্র দৃষ্ট হয়।

তাহারই একটির নিম্নে এক বিশাল পুরুষ পদচারণা করিতেছিলেন। কুঞ্চিত ভ্রূ, মুখশ্রী কিঞ্চিৎ বক্রানত।

অস্তায়মান সূর্য-রশ্মির রঙ্গীন আভা সমগ্র শিখরদেশটিতে যেন [illegible]ণ্যের রঞ্জনী প্রলেপ মাখাইতেছিল। এমন শান্ত প্রোজ্জ্বল অপরাহ্নের রূপমাধুরিমা সম্বন্ধে কিন্তু বিরাট পুরুষ অচেতন।

সহসা প্রতিহারী সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রম নমস্কার নিবেদন করিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তাজাল ব্যাহত হওয়াতে বীরকেশরী সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিলেন।

: মহারাজ, মহামাত্য সুভগ সেন দর্শনপ্রার্থী।

: দর্শন পাইতে পারেন।

প্রতিহারী তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইল। মহামাত্য সুভগ সেন দ্বারপ্রান্তে উদিত হইলেন।

পারে। প্রাসাদশীর্ষে সম্পূর্ণ বাহিরের লোক অভ্যুদিত হইল কি উপায়ে?

: মহারাজের অযথা সন্দেহের প্রয়োজন নাই। সে উপায়ে আর যে কেহই হৌক শত্রু সৈন্যদের প্রাসাদশীর্ষে অভ্যুদিত হইয়া মহারাজকে আক্রমণ করিতে পারিবে না ইহা সুনিশ্চিত।

: সুনিশ্চিত? বটে? নিশ্চিন্ত হইলাম। তথাপি প্রণালীটা জানিতে কৌতূহল হইতেছে।

: শেষ পর্যন্ত এক নিরীহ নিরস্ত্র কিশোর প্রবল প্রতাপ মহারাজ অমোঘবর্ষের ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল? দুর্ভাগ্য তাহার!

: বালক!!

মহারাজ অমোঘবর্ষের সুগম্ভীর কণ্ঠ রুদ্ধ-রোষে সহসা অগ্ন্যুদ্গার করিয়া উঠিল।

: ধৃষ্টতার সীমা তুমি বহুক্ষণই অতিক্রম করিয়াছ। আমি শুধু লক্ষ্য করিতেছিলাম কতদূর তুমি যাইতে পার!

: যতদূর মহারাজের অভিরুচি। আপাততঃ গর্ভগৃহ অবধি তো বটেই।

: হুঁ। বালক তুমি কোন্ রাজ্যের গুপ্তচর জানিতে স্পৃহা হইতেছে।

: বর্তমানে এই রাজ্যের মহারাজ।

: রাজ্যের অধীশ্বর তোমাকে নিযুক্ত না করা সত্ত্বেও?

: হাঁ। তাহা সত্ত্বেও মহারাজ। এবং এ আস্পর্ধাও পোষণ করি যে [illegible] অধীশ্বর [illegible] আমাকে [illegible] গুপ্তচারী [illegible] নায়ক হিসাবে মনোনীত করিতে দ্বিধা করিবেন না।

: [illegible] নাই [illegible]

[illegible]

[illegible] সুতরাং সহজ কণ্ঠেই কিশোরকে প্রশ্ন করিলেন: এ লিপি তুমি কোথায় পাইলে?

: রাজ্যসেনের নিকট হইতে মহারাজ।

: হুঁ। পাণ্ড্যরাজের এই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক পত্রখানি হস্তগত করিবার জন্য আমি এযাবৎ কত গুপ্তচরকে নিযুক্ত করিয়াছি তাহা [illegible] প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন [illegible]। সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে—ধূর্ত রাজ্যসেনের নিকট হইতে তাহার গুপ্ত লিপি উদ্ধার করা নিশাচরী কোন পক্ষীরও অসাধ্য। আমি স্বীকার করিতেছি বর্তমান সময় পরিস্থিতিতে এ লিপিখানি অমূল্য। তথাপি তুমি ইহার বিনিময়ে কি পারিতোষিক আকাঙ্ক্ষা কর?

: তাহা তো পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি মহারাজ।

যুবকের অনমনীয় কণ্ঠস্বর সহসা আবেগে কাঁপিয়া গেল।

: সত্যই তুমি বৈশায়ন পদাভিলাষী?

: আমার একান্ততম অভিলাষ।

: উত্তম। আজ মাঘী একাদশী—আজ হইতে তিন দিন পরে মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে তুমি উক্ত পদে নিযুক্ত হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে একটা কথা আছে।

বৈশায়ন শুধুমাত্র গুপ্তচর ছিল না সে আমার পার্শ্বচরও বটে। বৈশায়ন মধ্যবয়স্ক, বলিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার পক্ষে যে যে কর্ম সম্ভব তোমার মতো সুকুমারমতি বালকের পক্ষে কি সে কার্য কঠোর শ্রমদায়ক হইবে না?

: পরীক্ষা করিয়া দেখুন মহারাজ। কিন্তু আপনি তরবারি হইতে হস্ত অপসারণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

: বিস্মৃত হই নাই—দেখিতেছিলাম তোমার লক্ষ্যগোচর হয় কি না! তাহা ভিন্ন অতি সতর্কতা অপেক্ষা অসতর্কতা বহুলাংশে মারাত্মক, তাই নয়?

তরবারির কোষার্পিত দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া মহারাজ সস্নেহে কিশোরের স্কন্ধে স্থাপন করিলেন।

: এ কি?

: কি হইল মহারাজ?

: আমার হস্ত স্থাপনামাত্র তোমার সর্ব-দেহ প্রবলবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিল কেন?

: রাজকীয় রক্তস্পর্শ সাধারণ মানবের দেহে তড়িৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াই থাকে। উহা অস্বাভাবিক কিছু নহে।

: বটে?

মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিশোরের সর্বাঙ্গ পর্যালোচন করিয়া ফিরিতেছিল। সে দৃষ্টিতে আর যাহাই হৌক আশিসের দাক্ষিণ্য ক্ষরিতে-ছিল না ইহা ঠিক। পুনরায় মহারাজ কিশোরের পৃষ্ঠদেশে সন্তর্পণে একবার কর চালনা করিলেন। তাহার পর দুই করতল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল উভয় করতল শোণিত রঞ্জিত।

: বোধগম্য হইতেছে না যথাযথরূপে। রক্তের অর্থ কি?

: রক্তের আবার দ্বিতীয় অর্থ আছে নাকি? রক্তের অর্থ রক্ত—

কিশোর সহসা তরলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

: তবে উহার পশ্চাতে কিছু অনর্থ আছে অবশ্য।

রাজ্যসেনের প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া আসিবার পথে একজন রক্ষীর সহিত কিঞ্চিৎ সংঘর্ষ হইয়াছিল। রক্ষীটি আমাপেক্ষা শক্তিশালী—কৌশলে তাহাকে পরাস্ত করিলাম। পৃষ্ঠদেশে কিন্তু তাহার চিহ্ন রহিয়া গেল।

: বালক তোমাকে শুধু বাক্‌পটু, নয় ধূর্ত বলিয়াও বোধ হইতেছে। আচ্ছা এখন তো সন্ধি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার প্রাসাদশীর্ষারোহণটির ইতিহাস বলিতে বোধ হয় আপত্তি নাই?

: বলিতে আপত্তি তো কোনো সময়েই ছিল না মহারাজ! উপায়টা এমন কিছু সাংঘাতিক নহে। যামিক রক্ষিণী মন্দাকিনীকে ছদ্ম পরিচয়ে প্রতারিত করি। মহামাত্য সুভগসেনের অনবধানতাবশতঃ মহারাজের মোহরাঙ্কিত একটি বিশিষ্ট অঙ্গুরীয়ক সপ্তাহ পূর্বে হারাইয়া গিয়াছিল স্মরণ থাকিতে পারে বোধ হয়। সেটি হারায় নাই, তখন আমি মহামাত্য গৃহে ভৃত্যরূপে অবস্থান করিতেছিলাম—আমিই সেটি অপহরণ করি। তাহার সাহায্যে রক্ষিণীকে ভুলাইয়া আজ শেষ রাত্রে পুরীমধ্যে প্রবেশ করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হয় নাই। তাহার পর লোকচক্ষুর অন্তরালে জলনালিকা বাহিয়া প্রাসাদের কুড্যে আরোহণ করি। সারাদিন ঐ মিনারের মধ্যে লুকাইয়া ছিলাম। ঐ স্থান হইতেই মন্ত্রীর সহিত আপনার আলাপন আমার কর্ণগোচর হয়।

: রাজ্যসেনরূপী শ্বাপদের গুহা হইতে শুধুমাত্র পৃষ্ঠদেশে একটা খোঁচা খাইয়া যে ব্যক্তি পলাইয়া আসিতে পারে তাহার পক্ষে এটুকু কার্য তো শিশুক্রীড়ার ন্যায়।

বৈশায়নের পদচ্যুতির কথা দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াই কি তুমি গুপ্তচর পদের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলে?

: না মহারাজ। বহু পূর্ব হইতেই আমার মনোগত বাসনা ঐরূপ।

বৈশায়ন পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে আমি উহার সহকারী অন্ততঃপক্ষে কিংকর পদের জন্য প্রার্থনা করিতাম।

: উত্তম। দৌবারিক!

আহ্বানমাত্র দৌবারিক শীর্ষের সোপানা-বলীর পাদদেশে দেখা দিল।

: এই বালককে দ্বিতলের বেষ্টনী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া যত্নসহকারে বসাও। দাসীদের নির্দেশ দাও ইহার পরিচর্যা করিবার জন্য। তাহার পর প্রাসাদ পর্যবেক্ষককে আমার নিকট প্রেরণ করিবে।

দৌবারিকের পশ্চাতে নামিতে নামিতে কিশোর সহসা ফিরিয়া তাকাইল। অপরাহ্নের রশ্মি আভা তখনো বিলুপ্ত হয় নাই তাহারি ক্ষীয়মাণ দ্যুতিতে দৃষ্টি মিলিত হইল। একপক্ষে মহারাজ অমোঘবর্ষ—মহাশক্তিধর বীরকেশরী। অমিত বীর্যপূর্ণ সবল বিশাল দেহ—সর্বাঙ্গকে রূপের আকর করিয়া তুলিতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। দীর্ঘায়ত দুই নেত্রের দৃষ্টিতে কোমলতার বাষ্প পর্যন্ত নাই—সদ্যশাণিত কোষ-মুক্ত তরবারির ন্যায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অপরপক্ষে ক্ষীণতনু কিশোর যেন স্বয়ং অতনুর মূর্তকায়া—নিবিড়পক্ষ্ম অক্ষিযুগলের আপাত-ঔদ্ধত্যের অন্তরালে কমনীয়তার সংগুপ্তি।

কয়েক মুহূর্ত চারিচক্ষে অসম মিলন হইল; উভয়েই নিষ্পলক দৃষ্টি। মহারাজের চক্ষু যেন পরীক্ষকের, আর কিশোর বিচারক।

একটি মুহূর্ত মাত্র!! তাহার পরেই কিশোর মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

মহারাজ পুনরায় পদচারণা আরম্ভ করিলেন।

প্রায় অর্ধদণ্ড পরে স্থূলদেহ প্রাসাদ পর্যবেক্ষক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

: মহারাজ অধীনকে স্মরণ করিয়াছেন?

: হাঁ। পর্যবেক্ষক মহাশয়, প্রাসাদের বেষ্টনী প্রকোষ্ঠে এক কিশোর অবস্থান করিতেছে। দৌবারিক তাহার প্রহরায় নিযুক্ত আছে। তাহাকে এইদণ্ডে অন্ধগৃহে নিক্ষেপ করিবার আয়োজন করুন।

: যথা আজ্ঞা মহারাজ।

: আর লিপি বিদ্ধুরন্দিগকে তলব করুন—একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লিপি জাল অথবা

জলদর্পণ

সুকমল ঘোষ

বিতংস

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আর জন্মে ও বোধ হয় শত্রু ছিল। অতিথি অভ্যাগতের সামনেও একেবারে নাজেহাল করে ছাড়লে। ঠক করে এক পেয়ালা চা রেখে গজেন্দ্র গমনে ফিরে চলল নৃত্যকালী। আমি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কই?

সে সাফ্ জবাব দিলে, আর নেই, দিনের মধ্যে সতেরবার চা খেলে লিভার থাকে!

কথাটা মায়ের মুখে শুনে শুনে শিখেছে। অতিথির সামনে হাসতে চেষ্টাই করলাম শুধু। হাসি ফুটল না। বললাম, এতকালের ঝি—দিনকে দিন মাথায় উঠছে, তাড়ালেও যায় না, কি যে করি—।

অতিথি বিদায় নেওয়া মাত্র একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য ভিতরে এলাম। ভিতরে মানে আর একখানিই মাত্র ঘর। কিন্তু নৃত্যকালী বাজারে চলে গেছে। ওকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছেন বলে স্বর্গগতা মায়ের ওপর পর্যন্ত রাগ হতে লাগল।

কাজ নিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদে তার সাড়া পাওয়া গেল, রান্নার তোড়জোড় করছে। একবার ভাবলুম, উঠে ওর সঙ্গে শেষবারের মত একটা বোঝাপড়া করে আসি।......কিন্তু হাতের কাজই পণ্ড হবে শুধু। তাছাড়া রান্নার সময়ে তার মেজাজ বিগড়ে দেওয়াটাও খুব সমীচীন নয়। কিন্তু একটু বাদে নৃত্যকালী নিজেই এসে উদয় হল। বেশ হাসিখুশী মুখে সংবাদ দিলে, সামনে যে নতুন ভাড়াটে এলেন গো দাদাবাবু।

কড়া কিছু বলব বলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কিন্তু তার আগে ওর মুখে পরের খবরটা শুনে রাগ আপাততঃ স্থগিত রাখতে হল। —তিন তিনটে ধিঙ্গী মেয়ে মোটর গাড়ী থেকে নেমে যেন নাচতে নাচতে এসে ঢুকল—সঙ্গে একটা বয়সী মেয়েলোকও আছে—মা টা হবে—।

—পুরুষ মানুষ কেউ নেই?

—তবে আর বলচি কি গো! মেয়ে ভাড়াটে, আমি খপর নিলুম—।

সামনের তিনঘরের একটা সবে গত সন্ধ্যায় খালি হয়েছে। পিছনের ব্লকের দুটি ঘর স্থায়ি কায়েমী বাসিন্দা। ভিতরের ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে ওদিকের কথাবার্তা স্পষ্ট কানে আসে। আর মাঝের দরজাটা খুলে দিলে তো এক বাড়ি।

বিকেলে নৃত্যকালী আরো খবর সংগ্রহ করে আনল। দুপুরে স্বয়ং কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ সালাপ করে এসেছে। কিন্তু তেমন পছন্দ হয়নি। ঝি বলে তাকে তেমন আমল দেয়নি বলেই বোধ হয়। মেয়েদের কারো সঙ্গে দেখা হয়নি তার। তারা সবাই অফিস-টফিসে চাকরী করে—ভালো ভালো মাইনে পায়। আমার কথা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কি করি না করি, কত রোজগার, ইত্যাদি—। নৃত্যকালী এতসব বড় বড় কথা শুনে কি আর ছোট করে বলবে আমার কথা। বলে এসেছে, তার দাদাবাবু পরের চাকরি হতে যাবে কেন, পৈত্রিক অর্থ যা আছে তাতে বসে এখনো তিনপুরুষ স্বচ্ছন্দে চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারে।

বিরক্তিকর। তিনপুরুষ ছেড়ে এই এক পুরুষেরই পরমায়ুর তেমন জোর থাকলে শেষ বয়সে কপালে অনটন লেখা আছে। তাছাড়া এই সামান্য পুঁজি থেকেও আর পাঁচজন শরণার্থীর নানা দায়ে মাঝে মধ্যে একটা আধটা স্ফীত অংক বেরিয়ে যাওয়ায় রীতিমত হাত টেনে চলতে হয়। নৃত্যকালী এসবই জানে। বন্ধু-বান্ধব অথবা কাউকে পাছে কেউ দিয়ে ফেলি সেই চিন্তায় তার ঘুম নেই। আর সেই কিনা আমাকে নবাব বাদশার শ্রেণীতে সাজিয়ে এলো!

ক্রমশঃ আরো কিছু কিছু খবর সরবরাহ করতে লাগল নৃত্যকালী। কিন্তু নিজে আর একদিনও যায়নি সে বাড়ি। ওর পাশের ঘরের সদু ঝি সেখানে কাজে লেগেছে। নৃত্যকালীর মতে সদু ঝি হাড়-বজ্জাত। কিন্তু তার মুখে শোনা মেয়েগুলোর অশোভন উচ্ছলতার রসালো ইঙ্গিতগুলি সে বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করেছে। যে খুড়তুতো ভাইটি রোজ সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে আসে, তার সঙ্গে ওদের হাসাহাসির বহরটা দেখলে নাকি গা জ্বলে যায়।

আমি নৃত্যকালীকেও তিনি [illegible] ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। [illegible] উল্টো দিকের [illegible] মুখে বললাম।

[illegible] মেয়ে তিনটে [illegible] মাঝে মাঝে [illegible] কিন্তু [illegible] তিন [illegible] প্রায় এক [illegible] আপিসে একটা কি [illegible] কাজ করে জানতুম না। [illegible] কৌতূহল [illegible] আমাকে [illegible] উপলব্ধি করলাম।

দিনের বেলায় তাদের [illegible] কাল- [illegible] মাঝে মাঝে [illegible] আসে। বেলা দশটা আড়াইটের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সপ্তাহে একদিন বা [illegible] একজনের [illegible] সদু ঝি নৃত্যকালীকে বলেছে, চাকরীর খাটুনি খুব। রাত দশটার পর মেয়েরা প্রায় আধমরা হয়ে বাড়ি ফেরে।

মেয়েদের নাম অমিতা শমিতা নমিতা। নাম-মাধুর্য আছে।

তৃতীয় মাসের গোড়ার দিকে একদিন তিন জন একসঙ্গে এসে আমার ঘর চড়াও করল। আমি [illegible] বিস্ময়ে [illegible] বিব্রত হয়ে তাদের বসতে দিলাম। নৃত্যকালী একবার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর এবং গম্ভীর মনোনিবেশে তাদের নিরীক্ষণ করে গেল।

ওদের মধ্যেই একজন পরিচয় পর্ব সারল। বললে, আমি [illegible] উনি অমিতা—বড়, আর উনি নমিতা—ছোট। তিনজনই মিত্র, একজন 'অ' একজন 'শ'

—ওর সঙ্গে কথা বললে আবার সদু ঝির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনবে, সেদিক থেকে লোক ওরা দুজনেই খাসা।

—আপনি তাহলে জেনে শুনেও ওকে রেখেছেন কেন, কলকাতা শহরে কি আর ঝি নেই?

—ছাড়াতে পারলে তো বাঁচতুম, ও-ই তাহলে উল্টে আমায় প্রাণ ছাড়া করবে।

বলা বাহুল্য, জবাবটা অমিতার মনঃপুত হয়নি। দিন দুই একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। ওদের কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। ওরাও কেউ আসেনি দেখে কাজের ফাঁকে ফাঁকেও বিস্মিত হচ্ছিলাম। এমন সময় নৃত্যকালী বারতা পেশ করল। —ও বাড়িতে যে অমিবস্যে নেমেছে গো দাদাবাবু!

সচকিত হয়ে তাকালুম ওর দিকে। নৃত্যকালী বলল, মেজ মেয়েটা এক বড়লোক ছেলের সঙ্গে ভালবাসাবাসি কচ্ছিল তলায় তলায়—ছেলের বাপ জানতে পেরে আগুন—শেষে ঠাণ্ডা হয়ে আড়াই হাজার টাকা পণ হেঁকেছে—এক কড়ি কমে ছেলের বে দেবে না বলেছে—।

—তুমি জানলে কোত্থেকে?

সদু ঝি বলল, গিন্নিমা নাকি কান্নাকাটি কচ্ছিল খুব।

শুনে দুঃখ হল, অমন হাসিখুশী চটপটে মেয়েটা। একটু বাদে গেলাম ওদের বাড়ী। আমায় দেখে শমিতা গম্ভীর মুখে আর একদিকে চলে গেল। অমিতা-নমিতারও মুখ কালো। একথা সেকথার পর তাদের মা দুঃসংবাদটা জানালেন। —ছেলেটা ভালো, কিন্তু বাপটা চামার। বাপের অমতেই বিয়ে করত, কিন্তু তাহলে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবে, অত বিষয় সম্পত্তি......এই একমাত্র ছেলে, ইত্যাদি—।

বললাম, একমাত্র ছেলে যখন বাপের দাবীটা নাবাতেও পারে, অপেক্ষা করে দেখুন না।

অমিতার কাছে গিয়ে বসতে সে বলল, শমির জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে, আমি তিন বছর আগেই বলেছিলাম ওসব বড়লোক টড়লোকের ধারে কাছে যাসনি। আমাকে তখন মারে আর কি। ভদ্রলোক অবশ্য ভালো মানুষই—।

ভালো মানুষের সম্বন্ধে দু'চারটে কড়া কথা বলতে পারতুম। কিন্তু কি লাভ। পরদিন দুপুরের দিকে শমি এলো। ক্লিষ্ট, ক্লিষ্ট মুখ। বলল, একটা বই দিন দেখি, সময় কাটছে না—।

—আজ আপিসে যাওনি?

—নাঃ, ভালো লাগল না।

ওকে বসতে বললাম। বসল না। বললাম, বাস্তবিক ভারী দুঃখের কথা—।

শমি জবাব দিলে, দুঃখের কথা না ছাইয়ের কথা, আপনি দিন দেখি আমাকে আড়াই হাজার টাকা, বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সুদ শুদ্ধ যদি না ফেরত দেওয়াতে পারি তো আমার নামে কুকুর পুষবেন।

হকচকিয়ে গেলাম। শমি বই না নিয়েই চলে গেল। এরকম কথা ও-ই বলতে পারে। অস্বস্তি লাগছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে নিজের সামান্য পুঁজিতে বেশ আড়াই হাজার টাকা কম দেখাচ্ছে।

পরদিনটা কেটে গেল। তার পরদিন সকালের দিকে নমিতা এসে হাজির। মুখভাব সন্ত্রস্ত। আঁচলের আড়াল থেকে একটা কৌটো বার করলে। বলল, আফিং, শমির বাক্সয় ছিল, কাল রাত্রি থেকেই কেমন সন্দেহ হতে সারাক্ষণ তাকে তাকে ছিলুম—এখন যেই বেরিয়েছে একটু, বাক্স ঘেঁটে দেখি এই ব্যাপার। এটা কি করব এখন? বাড়ি ফিরে তো হুলস্থূল বাধাবে।

কৌটোটা নমিতার হাত থেকে নিয়ে খুলে দেখলাম। আমারও উত্তেজনা কাটাতে সময় লাগল একটু। শেষে শান্ত মুখে বললাম, শমিকে বোলো, সেদিন সে যা বলে গেছে আমি চেষ্টা করে দেখব, হয়ত টাকা পাওয়া যাবে—।

নমিতা বিস্ফারিত হয়ে উঠল, আপনি টাকা দেবেন—!

—আমার টাকা কোথায় যে দেব, দেখা যাক—।

ওদের তাহলে কথা দিয়ে পাঠাই?

ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে বললাম। আড়াই হাজার টাকার মায়া একেবারে কাটানো সহজ নয় বলেই বোধহয়। নমিতা প্রায় ছুটেই চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে করাল-বদনী নৃত্যকালীর আবির্ভাব ঘটল। সে সবই শুনেছে বোঝা গেল। আমি যত তর্জন করি ওর গর্জন তত বাড়ে। ইচ্ছে হ'ল হাতের আফিমের কৌটোটা ওর মুখে গুঁজে দিই। শেষে আমার মাথার নামে দিব্বি দিয়ে গেল, এক সপ্তাহের মধ্যে যেন টাকা বা কোনো কথা না দিই—ও এর মধ্যে দেখছে কি ব্যাপার।

একে একে দু'টো দিন কাটল। ও বাড়িতে আদর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু ভালো লাগে না। আড়াই হাজার টাকার শোক বোধ হয়। অমিতা সেদিন নিরাশায় জিজ্ঞাসা করল, ওদের তাহলে কথা দিয়ে পাঠাই?

নিস্পৃহ মুখে বললাম, যাক কট দিন, চেষ্টা করে দেখি—।

অমিতা ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, এরকম আশা দিয়ে ফেলেছ যখন না দিয়ে তো পারবে না, মিছিমিছি দেরী করে লাভ কী?

টাকার আশ্বাস দিয়ে পাঠানোর পর থেকে অমিতা আমাকে তুমি বলছে। কিন্তু তার কথাগুলো কেমন যেন কটু লাগল কানে। নৃত্যকালী মায়ের দিব্বি দিয়ে রেখেছে সাত দিনের আগে কিছু বলব না। তা' ছাড়া ও এক বিষণ্ণ চিত্ত দেখে কেন ওদের এ বিপত্তি দেখে নিজের অজান্তে আসছে এখন। ভেবে দিয়েছি, আশা দিয়েও যদি আড়াই হাজার থেকে কাউকে বাঁচানো যায় সেটা খারাপ কি, ... কথা দিল না যেলে কিছুই বলতে পারছি না।

এর পরে তিনদিন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ওরাও আসেনি বা ডাকেনি। অমিতা আসেনি। কেমন একটা থমথমে ভাব। ভাবছি, আর দু'টো দিন গেলে ব্যাংক থেকে আড়াই হাজার টাকা তুলে একেবারে ওদের হাতে ফেলে দিয়ে টাকার শোক ভুলব। যেটা যাবে সেটা না যাওয়া পর্যন্ত অস্বস্তি।

ছ'দিনের দিন বেলা প্রায় চারটে নাগাদ নৃত্যকালী সেই কালো দাঁত বার করা হাসি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। —কি গো দাদাবাবু, ওদের টাকা দেবে তো দিয়ে এসো, ওদের যে টাকার বড্ড দরকার!

আমি শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিলাম। কাগজ সরালাম। নৃত্যকালী পা' ছড়িয়ে বসল মেঝেতে। —বিয়ে টিয়ে কিছু নয়, ওরা ব্যবসা করবে,—দোকান খুলবে গো—ওই যে গা হাত পা টেপানোর দোকান—সেরকম একটা দোকানেই তো তিনজনে চাকরী কচ্ছে এখন,—তোমার কাছ থেকে টাকা পাবে জেনে ঘরও ঠিক করে ফেলেছে—দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে যাবে এখন।

আমার হাত পা অসাড়। কোন রকমে উঠে বসলাম। তবু নৃত্যকালীর টিকা-টিপ্পনি বাদ দিয়ে যেটুকু আহরণ করা গেল, সেটা গুছিয়ে বললে এরকম দাঁড়ায়ঃ

—নৃত্যকালীর প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল ওরা বোন টোন কিছু নয়, আর ওদের খুড়তুতো ভাই যাকে বলেছে সেও একটা পাজি লোক। সদু ঝি আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলত। মায়ের এই এরকম ব্যাপারটা ও একদম বিশ্বাস করেনি, কারণ, সদু ঝি বলেছে, [illegible] মা—মা না ছাই—আর ওই লোকটা প্রায়ই ফিস ফিস করে কি পরামর্শ করে। আর [illegible] দিব্যি খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, অথচ [illegible] দেখলেই শুধু মুখ কালো করে থাকে। [illegible] আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার পর থেকেই নৃত্য-কালী সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। [illegible]

[illegible]

আছে—অবিলম্বে টাকাটা যেমন করে হোক পাইয়ে দিতে হবে।

নৃত্যকালীর কাছ থেকে সুনিশ্চিত আশ্বাস পেয়ে তারা কাজে বেরিয়ে যেতে সে আমাকে সুখবরটা দিতে এলো।

আমি নির্বাক, হতভম্ব, বিমূঢ়। বিশ্বাস করব? অবিশ্বাস করব? কি করব—?

অনেক ভেবে আমার একজন বন্ধুর কাছে গেলাম। বন্ধুটি পদস্থ পুলিশ কর্মচারী। আসল ব্যাপার কিছু না বলে তাকে একটা বিচিত্র অনুরোধ করে এলাম। দুজন লাল পাগড়ী বাহন নিয়ে এবং নিজেও সরকারী পোষাক পরে তাঁকে পরদিন সকালে আমার বাড়িতে একটু চা খেয়ে যেতে হবে। আর তার আগে একবারটি শুধু সামনের ব্লক-এ এক মিনিটের জন্যে থেমে সেই বাড়ির লোকদের ডেকে সেখানে কে কে থাকে না থাকে প্রশ্ন করতে হবে। বন্ধু বিস্মিত হলেও শেষ পর্যন্ত কথা দিলেন অনুরোধটি যথা সময়ে পালন করবেন।

পালন করলেনও। সামনের ব্লক-এ মিনিট দুই কথাবার্তা বলে দুজন পুলিশ সমেত আমার এখানে চলে এলেন তিনি। কিছু প্রশ্ন করবার আগেই আমি জবাব দিলাম, পরে বলব, যা বলেছি করেছ—?

তিনি ঘাড় নাড়লেন। আমি নৃত্যকালীকে বললাম সকলকে চা দিতে। পুলিশ দেখে নৃত্যকালী সুর সুর করে চা এবং নির্দিষ্ট খাবার দিয়ে গেল। তারা চলে যেতেই উচ্ছিষ্ট সরঞ্জামগুলো সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে একটা বই খুলে বসলাম।

একটু বাদেই অমল-বিমল [illegible] এসে ঢুকিল। শুকনো পাংশু মূর্তি সব। অমিতা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, পুলিশ কেন?

[illegible] জবাব দিলাম, [illegible]—কোথা থেকে খবর পেয়েছে পাড়ায় [illegible] খারাপ মেয়ের আমদানী হয়েছে—তাই শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে।

—এখানে কি করছিল?

—এই সবই জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। আমি মনোনিবেশ সহকারে পড়ছি। ওরা নিঃশব্দে একটুখানি অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু অমিতা ফিরল আবার। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ওই টাকাটার জোগাড় হয়েছে?

মুখ না তুলেই জবাব দিলুম, কই আর হল……।

চলে গেল।

বেশী রাতে টের পেলুম চুপি চুপি ওরা [illegible] চলল।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই নৃত্যকালীর গজ-গজানি কানে এলো। বেলা পর্যন্ত ঘুমুবার [illegible] আমারই উদ্দেশে এক পসলা বর্ষণ হচ্ছে। আমি ইচ্ছে করে ঘুমোবার ভান করেই পড়ে রইলাম আরো খানিক্ষণ। নৃত্যকালী বকেই চলেছে।

[illegible] আমি ভাবছি, আর জন্মে ও [illegible] ছিল।

মন থেকে মন

দিলীপ দাশগুপ্ত

রূপকথা হারিয়ে গেছে। নেই মধুমালতীও।
হারানো রাতের চোখ-ঝরা-কতো ফুল
হৃদয়-পাতানো সাধ—
কঠিন শপথ,
সুরের দোলানো মীড়ে কতোনা আহবান—
মনের গুহায় আজ শুধু প্রতিধ্বনি!
পুরাতন পৃষ্ঠা খুঁজে,
এক বুক জলে নেমে
তবু তো ঝিনুক থেকে মুক্তো-লাভ আশা—
হারানো সংবাদ-সুখ-প্রতীক্ষার মতো!

জ্বলন্ত-প্রখর-দীপ্ত নব গ্রহে বসে
তবুও প্রশ্নের সেই গাঢ় আকুলতা!—
ঃ মিতা তুমি কুশলে তো? ভালো?
সব ভালো?ঃ
রজনীগন্ধার বুকে একটি কাঁপন—
দক্ষিণের গন্ধবাহি একটি বাতাস—
রবি ঠাকুরের সেই 'মহুয়া' অথবা
বুকে পেতে রাখা কান সজাগ-বিভোর
মনে পড়ে। নিরন্তর ক্ষণ চলে যায়।
বার—বারবার,
জীবনের প্রাঙ্গনে আসুর ঘণ্টায়
জলতরঙ্গের ধ্বনি
ঠুং-ঠাং-ঠুং!
রূপকথার দেশ থেকে মধুমালতীর
যাবার আবেদন-ঘণ্টা বাজে অকস্মাৎ!
তার [illegible] যায়
পরিপূর্ণ [illegible] হাত থেকে পড়ে,
তারো শব্দ—
ঠুং-ঠাং-ঠুং…তবু…আঃ…
পুরাতন পৃষ্ঠা খুঁজে যদি কিছু পাই।

[illegible] —সতীন্দ্রনাথ দা

সুনিপুণ শিল্পীর
হাতে তৈরী গিনি
স্বর্ণের অলংকারই
আমাদের
বিশেষত্ব
দে, জুয়েলার্স
এণ্ড কোং
১৬৮, বহুবাজার স্ট্রীট • কলিঃ ১২

এন, সি'র বিভিন্ন
রুচির অবদান!
No. 1 N.C.
এন, সি, আর্য্য স্নাফ ফ্যাক্টরী
১১, ডেভিডসন স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১
কলিকাতা শাখা—
৯২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২

কেশপরিচর্যায় অতুলনীয় কেশ তৈল
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
অগুরু
দেবভোগ্য সুগন্ধি
গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড
স্নানে তৃপ্তিকর চন্দনগন্ধ সাবান
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

অনেক দূরে

বাণী রায়

আজ অনেকদিন আগের এক কাহিনী মনে পড়ে। আমার অজ্ঞাতে [illegible] আমার অজ্ঞাতসারে সে কাহিনীর জন্ম। আমার চেতনমনের কোন আবিষ্কার [illegible]।

জীবনের উপর দিয়ে [illegible] বয়ে যায়। সকল [illegible] নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। [illegible] মনে হয় এ [illegible] কোন [illegible] দেখা যায় [illegible] উপর [illegible] রেখে গেছে [illegible] স্মৃতি।

সেই সময়ের স্মৃতির কোন একটি সূত্র ধরে ফিরে যাই [illegible] করেছে [illegible] গাছে [illegible]।

[illegible] চড়ক-ডাঙা। [illegible] অবস্থায় নাম [illegible] রাস্তা।

[illegible] চড়ক-ডাঙা। পাড়াগাঁয়ে থেকে কেউ কেউ শহরে অর্থাৎ [illegible] এসে একেবারেই ছোটখাটো বাসা-বাড়ী বাঁধলেন। একজন আত্মীয়ের [illegible] আমাদের বাসা খুঁজে [illegible] ঔপনিবেশিক রূপ ছিল [illegible] আমাদের গ্রাম থেকে শহরে উপনিবেশ [illegible]।

ঘোষেদের বাড়ীর পাশে [illegible] একটি [illegible] কিছু [illegible] বাড়িয়েছে। এবাড়ীখানাও দোতলা। সামনে গাড়ী-বারান্দা ঝোলা আকাশ মাথায়। বর্ধিষ্ণু ঘোষ পরিবারের বাড়ী। ওঁরা আরও বাড়ীর মালিক, চড়কডাঙার মালিক। বাড়ী ভাড়া দেন। [illegible] নিজের গাড়ীঘোড়া রাখার পরেও [illegible] ভাড়া দেন।

বাড়ীতে [illegible] জাঁকজমকে পূজো হয়। [illegible] পৈতৃক উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত [illegible] তিনি চাকরি করেও [illegible] বাড়ানোর দিকে মন দিয়েছেন। এক কথায় অবস্থা তাঁদের খুবই সচ্ছল।

[illegible] হঠাৎ কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে স্মৃতির পাখার দ্রুত উত্থান-পতনের শব্দ শুনি। শুনি অলক্ষিতে প্রস্তর সীমায় কোমল পদক্ষেপ। ঘোষবাড়ীর বারান্দার রেলিং ধরে অনেকদিন আগে যে মেয়েটি নাচানাচি করেছিল, সে তো এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়-নি আমার জীবনে।

কিন্তু, ঘোষেদের ছোট মেয়ে কেন জানিনা [illegible] বাচ্চাটির উপর অতি সদয় হয়ে উঠল। কয়েক মাসের বাচ্চা সে। কিন্তু মায়ের [illegible] হওয়াতে কষ্টের সীমা ছিল না।

[illegible]। গভীর রাতে বাচ্চার অস্ফুট আর্তনাদ শুনে পাশের ঘর থেকে খুকুর মা দেখতে এলেন। প্রায় কৃষ্ণজাতকের অবস্থা। [illegible] নিদ্রিতা দাসীর সবলভাবে বাচ্চাটির [illegible] চাপা পড়ায় সে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যায়। [illegible] কণ্ঠে সে শেষ চেষ্টা করছে এমন অসহায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে। আর, যতটুকু ছোট হাত-পা মুক্ত আছে, প্রাণপণে চালনা করে যাচ্ছে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের আশায়।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে টিমটিমে আলোয় [illegible] খুকীর মাকে আতঙ্কিত করেছে। নিজের [illegible] অবস্থা ভুলে তিনি ঝি-এর কাছ থেকে খুকীকে বুকে তুলে নিলেন। কেটে গেল তার জীবনের প্রকাণ্ড একটি ফাঁড়া।

কি [illegible] হল। অতঃপর প্রতিবেশী-বৃন্দ স্তন্যপায়ী শিশুকে ঠিকমত আহার্য-দানের ব্যবস্থা করলেন। ঘোষ-বাড়ীর গিন্নী সদ্যপ্রসূতা ছিলেন।

দিনে দুইবার খুকীকে তার বাড়ী থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। মোটাসোটা সুশ্রী মেয়ে। অনেকেই স্নেহশীলা হলেন।

ঘোষ-বাড়ীর ওই বারান্দা, কি দালানে, কোথাও যেন অহেতুক অযাচিতভাবে দেবতার করুণা জন্ম নিল। একটি দশ বছরের ফ্রক-পরা মেয়ের মনে। একদিন বাড়ীর সকলকে বিস্মিত ও কৌতুকী করে সে বলে উঠল, "আমি খুকীর শাশুড়ী হবো।" মা হতে সে চায়নি নিশ্চয় খুকীর জলজ্যান্ত বিদ্যমান মাতা উপস্থিত থাকার হেতু। সেই মায়ের সঙ্গেও যে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে, এই ভয় ওর ছিল। কাজেই যা হতে পারে না, সে জন্য সে চেষ্টা না করে হাত বাড়িয়েছিল 'সেকেন্ড বেস্ট'-এর দিকে। সেদিন তার ওই ঘোষণা অনেকের কাছে পাগলামি বিবেচিত হলেও, আমার কাছে আজ যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

তলিয়ে গেল নাম তার, অতঃপর শাশুড়ী নামেই সে পরিচিত হল।

বাঙালীর মেয়ে খেলার ঘর গড়বার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে সংসারের স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ পুত্রের স্বপ্ন দেখে সে, দেখে ভাবী পুত্রবধূর স্বপ্ন। তাই দশ বছরের মেয়ের মনে কোন খটকা রইল না, সে যে ফাঁকি দিল, সে কথা কে বলবে আজ? তার যা দেবার ছিল, হয়তো সবই সে দিয়ে গেছে। জীবন তার কাছে চায়নি বলেই দেওয়া তার বাদ পড়ে যায়নি। অলক্ষিতে কোথাও পাওনার বোঝা হয়তো এতই ভারী হয়ে জমেছে যে, আজ কলম-কাগজে সে ঋণ শোধ করতে পারবে না।

শাশুড়ী খুকীর স্বয়ংবৃতা দ্বিতীয় জননী হল। যদি কোন অণুবীক্ষণে মানুষের মনের চরম সত্যটি গ্রহণযোগ্য হত, যদি সেই অণুবীক্ষণ শাশুড়ীর মনে ফেলা যেত তাহলে দেখা যেত খুকীর মা না হয়েও শাশুড়ী হিসাবে বাধ্যতামূলক 'মা' ডাকটি শুনবার বাসনা তার কত প্রবল। সে কায়স্থ, খুকী ব্রাহ্মণ, এই প্রভেদের অনিবার্য ফল সেদিনের যুগেও চড়কডাঙা রোডে বসে তার মনে এল না। একদা, এই শিশু বড় হয়ে তারই সম্পত্তি হবে, এ বিষয়ে শাশুড়ীর সংশয় ছিল না। দশবছর বয়সের অনূঢ়া ভাবী পুত্রবধূ

তখন আট মাসে পা দিয়েছে, এ হেন তথ্যে শাশুড়ী কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করল না। ক্ষীণ শ্যাম দেহটি নিয়ে, ছিটের ফ্রক দুলিয়ে সে ছুটে আসত হাজারবার খুকীর কাছে, "আমার বৌ কই? আমি ওকে একটু কোলে নেব।"

নিয়ে যেত খুকীকে সে কোলে করে নিজের বাড়ী, অন্যের বাড়ী। যখন যা পেতো এনে রাখতো খুকীর শিয়রে। খুকীকে আদর করে, যত্ন করে তৃপ্তি ছিল না ওর। চড়কডাঙ্গায় তখন দুই চারিটি স্কুল হয়েছে। মেয়েদের স্কুলে শাশুড়ী পড়তে যেত, কিন্তু মন রেখে যেত খুকীর কাছে। স্কুল থেকে ফিরে মুখে জল দেবার আগেই হাঁফাতে হাঁফাতে সে ছুটে আসত খুকীকে দেখার আশায়।

এমনি স্নেহনিবিড় যুগের উপর যবনিকা-

এ যুগের উপরও একটা যবনিকা পড়ে গেল। জিষ্ণু ঘোষ বয়স্থা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। অনেক ত্রুটি ছিল শাশুড়ীর আকৃতিতে। রূপহীনতার অভিসম্পাতে সে লাঞ্ছিতা। তবু, জিষ্ণু ঘোষের টাকা শিক্ষিত সুন্দর পাত্র কিনে আনল।

আজ আকাশে যখন মেঘ ওঠে, যখন পুরাতন জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যায় কুয়াশার অন্তরালে, অনেক যুগ আগে ফিরে যায় মন—ঝরঝর বর্ষণ বর্তমান ঢাকে, ঢেকে দেয় ভবিষ্যৎ। সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারে, ধারাপাতে পুরানো স্মরণ মনে করা ভিন্ন উপায় কি? রোমন্থন করা স্মৃতির কণ্ডুয়নে তাকে দেখি—ক্ষীণ, শ্যামদেহ, পাতলা চুলে প্রচুর তৈলদানে মসৃণ খোঁপা, চোখ ট্যারা তার; মুখে পান দোক্তা টিপে

হাস্যকর সম্বন্ধ স্থাপনাকে প্রশ্রয় দেবার মত একবিন্দু হাসি লিপস্টিকের রক্তে উজ্জ্বল করে তুলতে পারলো না।

পাত্র হল। খুকুর আইনজীবী বাবা আদালতে যাতায়াতের অসুবিধা হেতু সহরতলী থেকে সহরে চলে গেলেন। পাশাপাশি বাড়ীর মধ্যে ভেসে উঠল বহু মাইলের ব্যবধান।

তবু আসতো সে, শাশুড়ী বউ-এর কাছে। বেলফুল হাতে এনে রেখে যেতো, রেখে যেতো পিতলের হাঁড়িকুড়ি। হয়তো তখন থেকেই বউকে সংসারকর্মে দক্ষ হবার শিক্ষা সে দিচ্ছিল। খুকীর ও তার বাড়ীতে যাতায়াত করত দু বাড়ীর লোকজনেরা। শাশুড়ীর কাছে খুকীর বিশদ বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দিলে কারুর নিস্তার পাবার উপায় ছিল না। খুকীর অনর্গল প্রশ্নজালে বিব্রত করে তুলত আগন্তুককে। অন্যচ্ছলে বলে দিত "খুকীকে বল তার শাশুড়ী তাকে দেখতে যাবে শিগ্গির।"

রেখেছে। মিহি কালের শাড়ীর চওড়া পাড়, হাতের একগোছা চুড়িবালা, সিঁথির সিঁদুর জানিয়ে দিত মহিলা-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু, ওখানেই শেষ।

যে রূপ নিয়ে জন্মাতে পারেনি, রূপাভিমানীকে তারই জন্য কেন খুঁজে বার করা হবে? আত্মার সারল্য দেখে যে সানন্দে বরমাল্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, সে পাত্র পাওয়া না গেলে, অনূঢ়া থাকাই রূপহীনার উচিত। পিতা অর্থ দিয়ে পাত্র কিনতে পারেন, মন কিনবে কে?

বিবাহ দেন অভিভাবকেরা সমাজে মাথা তুলে চলবেন বলে, 'আমার মেয়ের পার করেছি।' পাত্রী রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেটুকু রক্ষা ক'রে পারে। কিন্তু, চলে না, জোর করে কিছুই চলে না।

অনিবার্য ফল ঘটল। পাত্র কোনদিনই অর্থের মোহে রূপদৈন্য ক্ষমা করতে পারেনি। তার বৌ মাথায় একটু ছিটগ্রস্ত। বড়লোক বাপের বাড়ী কাজ শেখেনি, মেজাজ মানিয়ে চলার নয়। সুতরাং শাশুড়ী পরিত্যক্তা হল। পিত্রালয়ে ফিরে দিয়ে গেল তারা কালামুখীকে। কারণ, বউ পছন্দ হয়নি।

যে আট মাসের মেয়েকে ভবিষ্যৎ বৌ বলে সন্তুষ্ট ছিল, তারই নিজের বৌ হবার সৌভাগ্য রইলো না! পরাজয়ের লজ্জা মেখে সে ফিরে এল বাবার বাড়ীর পুরাতন বেষ্টনীতে। তখন, সে বাড়ীর দেওয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, আস্তাবলে ঘোড়ার পা-ঠোকা শোনা যায় না।

জিষ্ণু ঘোষ বিগত হলেন ভাঙনের মুখে। ভাইদের গলগ্রহ তখন বিপদে পড়ল। লেখাপড়া শেখা হয়েছে সামান্য। এখন এত বয়সে আর পারবে না। ভাইএরা ক্রমেই গরীব হয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ সংসার। বাধ্য হয়ে সে হাতের কাজ শিখতে গেল। তাঁতবোনা বেছে নিল।

এই তাঁতবোনা মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাহিনীর তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করি।

একখানা আধুনিক বাড়ী বালিগঞ্জে। ড্রয়িংরুমে একটা গালিচা পাতা। সেখানে কয়েকজন বসে আছেন। শাশুড়ী এসেছে অনেক বছর পরে। দেখা করতে এসেছে সে।

সবাই হয়তো মাথায় ছিট ছিল তার। এতদিন পরে [illegible] কেন ওর কাছে কিছুই নয়। ব্যাংকে টাকা জমা আছে, [illegible] শাশুড়ী [illegible] খুকীর মাকে, খুকীকে বলুন ওর শাশুড়ী এসেছে।

তারপরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়াল স্থির [illegible]

[illegible]

শাশুড়ী হাঁ-করে দেখতে লাগল। এই কি সেই শিশু, যাকে সে বাহুর দোলায় দুলিয়েছে, বুকে চেপে আদর করেছে! সেদিন [illegible] বর্ধনশীলা বালিকার হাতে বেলফুল দিয়ে গেছে। মধ্যে কয়েকটি বছর শাশুড়ী নিজের বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে উদ্ব্যস্ত ছিল। দেখা করতে পারেনি। তারই মধ্যে বালিকার এতই রূপান্তর!

আন্দাজ করতে পারেনি শাশুড়ী তাতে যে ক্ষতি হবে মনে করেনি। তার খুকী, তার বৌ, সে কি

(ইহার পর ১২৬ পৃষ্ঠায়)

চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে অনংগকে। স্বর্ণকমলের ফার্ণডেল হোটেলে ওঠার কারণও তাই।

শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জি। ত্রিশ-বত্রিশ মাইলের মতো পথ। গাড়ি এগিয়ে চলে দুই বন্ধুকে নিয়ে। বন্ধ গাড়ি। কিন্তু তবু কোথা দিয়ে যেন প্রবল প্রচন্ডতায় শীতের শরজাল এসে বিদ্ধ করে স্বর্ণকমলকে। বরফ জমে গেছে যেন তার সব পোষাক-পরিচ্ছদে। তা' হলেও যেতেই হবে। কোথায় লুকিয়ে আছে উর্মিলাদি কে জানে।

চায়ের আসরে

শহরের বুকে চিরে এগোয় ট্যাক্সি। বাড়িতে কী একটা কথা বলে আসতে ভুল হয়ে গেছে অনংগের, তাই লাবান হয়ে যেতে হয়। লাবান পেরিয়ে পথ ঘুরে ঘুরে বেশ একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়ে গাড়ি। চমকে ওঠে স্বর্ণকমল। 'একটু থামো' বলে থামিয়ে দেয় ড্রাইভারকে।

কী হলো আবার?

না কিছু নয়। রবিঠাকুরের শেষের কবিতার শিলঙ-এর ছবি দেখছি এখানে। একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

ও তাই নাকি! হ্যাঁ শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন শিলঙ-এ ছিলেন তখন তিনি এদিকটায় রোজই বেড়াতে আসতেন।—অনংগের মুখ থেকে এ কথা শোনার পর স্বর্ণকমল আর একবার বেশ ভালো করে চারদিকে তার চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

গাড়ি আবার চলতে সুরু করে। পাহাড়-কাটা আঁকা-বাঁকা পথ। দশ হাত আগে-পিছেও অনেক সময় বোঝবার উপায় থাকে না পথের গতি কোনমুখো। কখনো কোন্ অতলে যেন নেমে যায় গাড়ি, আবার কখনো বা উঠে যায় সুউচ্চে! এই অবিরাম অজানা চলায় বেশ আনন্দ লাগে স্বর্ণকমলের। সময় সময় আবার ভয়ও লাগে।

দু'ধারে দূরে-কাছে সব লাল, সাদা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। পাকা দালান নয়, কাঁচা। ভূমিকম্পের দেশ। পাকা বাড়ি তুলতে বড়ো বেশি ভরসা পায় না কেউ। তা'হলেও বাংলো বাড়িগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। চলার পথ থেকে কখনো অনেক উঁচুতে, আবার কখনো বা অনেক নীচুতে। এই পাহাড়ী পরিবেশের জন্যেই হয়তো এতো সুন্দর দেখায় বাড়িগুলো। স্বর্ণকমল মনের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করে। কে জানে এরই কোন একটা বাড়িতে উর্মিলাদি এসে নতুন করে সংসার পেতেছেন কিনা! যদি এসেই থাকেন তাঁকে তো দোষ দেবার নেই কিছু।

শিলঙ-এর লাল-শাদা বাড়ি আর চোখে পড়ে না। শহর এলাকা শেষ হয়ে যায়।

তখনো পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাইনের ভজস্রতা। মনের ক্ষতে স্নিগ্ধ হাতের প্রলেপ লাগায় তারা। শিলঙ-রাণীর সখীকুল হবে হয়তো। তাই বুঝি শিলঙ-আত্মীর দিকে এতোটা প্রিয় দৃষ্টি! উর্মিলাদি ওদেরই মধ্যে একজন হয়ে যাননি তো আবার! শিলঙ-রাণীর সখী! কিন্তু তারাও হঠাৎ বিমুখ হয়ে যায় যেন। আরো কিছু পথ এগিয়ে যেতেই তাদের আর চোখে পড়ে না। সখীকুল দূরে থাকতে পারে কখনো? শিলঙ-রাণীকেই ঘিরে আছে।

একটানা গাড়ি চলায় ঘুম এসে যায় অনংগের। সে ঘুমোয়। বেশ নিবিড়ভাবেই ঘুমোয়।

ছোট ছোট অনেক স্রোতধারার সাক্ষাৎ মেলে পথে। শিলঙ শহরেও এমনি স্রোতস্বিনী অনেক দেখেছে স্বর্ণকমল। মন চায়না নদী বলতে। তবু এদের সব কটিই নাকি এক-একটি পাহাড়ী নদী। স্থানীয় নাম ছড়্ড়া। প্রত্যেকটিই ভারি লাজুক। পালিয়ে পালিয়ে চলে কেবল। উর্মিলাদির মতোই অনেকটা। মনের খুব কাছে এসে, পরক্ষণেই উধাও! একটা হঠাৎ আলোড়নের বুদ্বুদ যেন।

শুধু পাহাড় আর প্রান্তর। শ্রীহট্টের দূর-বিস্তৃত সমতল চোখে পড়ে বহুদূর থেকে। কী মনোরম সে দৃশ্য! উর্মিলাদি ওখানেই চলে যাননি তো!

'কোথা যে উধাও হলো'—রবীন্দ্রনাথের আর একখানা গান ধরে স্বর্ণকমল।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুকোমল স্পর্শ লাগে অনংগের চোখের পাতায়। তার ঘুম ভেঙে যায়।

তুমি যে এতো ভালো গান জানো তা কিন্তু জানা ছিলো না আমার।—গান থামতেই অনংগ বলে।

তা তো তোমার জানার কথাও নয় ভাই! এই ক'বছর আড়াই হলো আমি গান নিয়ে মেতে আছি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, গান করি আর বই পড়ি।

ঘুরে ঘুরে বেড়াও মানে! কেন, তোমার সেই কাচোরগড় কয়লাখনির ম্যানেজারি কী হলো, যেখানে আমায় নিয়ে গেছলে একদিনের জন্যে?

দূর, নিজের আবার ম্যানেজারি! কাকে জানাই বা কেমন করে। তোমাদের দেশ থেকে ফিরে আসার পর বাবা তাঁর এক খনির মালিক বন্ধুকে ধরে আমায় [illegible] ফেলার ব্যবস্থা করলেন একটা বড়ো চাকরিতে বসিয়ে দিয়ে। সত্যি সত্যি একটু অসুবিধে বোধ করছিলাম আমি। তবে সবাই মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলে যে, আমায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে আসতে হলো।

এ কি বলছো তুমি স্বর্ণকমল?

এতে অবাক হবার মতো কিছু নেই। এই বেশ চলছি। বছর কয়েক চাকরি করে যা জমিয়েছিলাম, আর চাকরিজীবনের শেষের দিকে যে টাকাটা এসেছে, তা দিয়ে বাকি জীবনটা ঘুরে-ফিরে নিশ্চয়ই কাটিয়ে দিতে পারবো। খুব ঢলনার সঙ্গেই একথাগুলো বলে যায় স্বর্ণকমল। কিন্তু তার এই কথার মধ্যে এমন একটা বেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে যা অনংগের মনকে দোলা দেয় ক্ষণিকের জন্যে।

কী এমন ঘটতে পারে এ কয় বছরের মধ্যে যাতে এমন বিবাগী হতে হয়েছে স্বর্ণকমলকে? —আপন মনেই প্রশ্ন করে অনংগ। ভেবে পায়না কিছু।

দেখতে দেখতে চেরায় এসে থামে গাড়ি। এ কালের শিলঙ থেকে বিগত শতাব্দীর 'শিলঙ এ' এসে নামে অনংগ তার বন্ধু স্বর্ণকমলকে নিয়ে। একদা খাসি জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র, জমজমাট শহর। এখন একটি নীরব শান্ত পল্লী চেরাপুঞ্জি।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী এসে অভ্যর্থনা জানান অনংগদের। ওরা মিশনেরই অতিথি হয়ে এসেছে সেদিনের জন্যে। পার্বত্য এলাকার লোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে, রোগ-চিকিৎসায় এবং বেকার সমস্যা সমাধানে মিশনের উদ্যোগে যে ব্যাপক প্রয়াস চলেছে, তার কথা শুনে এবং তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে খুবই খুশি হয় স্বর্ণকমল। স্বামীজীদের লোক-সেবায় বিদেশী

কিং এণ্ড কোং

শাখা ঃ

১২, রয়েড ষ্ট্রীট ঃ

১৫৪, শ্যামাপদ মুখার্জি রোড

অসভ্য জাতের মেয়েরা কিইবা খায়? কিন্তু তাতেই তাদের গায়ের বর্ণ কেমন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে হয়ে থাকে, এটা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। তার কারণ তারা অনেক রকমের খাদ্য কাঁচাই খায়, রন্ধন প্রকরণ তাদের খুবই সামান্য। আমরা যখন তাদের মতো কাঁচা ফলমূল ইত্যাদি খেতে পারি না, তখন আমাদের পক্ষে কোনো-রকমে অতিরিক্ত ভিটামিন খাবার কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি, এই দুটি জিনিষ চামড়ার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সভ্যজগতের খাদ্যে এই দুটি ভিটামিনের খুবই অভাব, তাই যেখানে খাদ্য হিসেবে এই সব ভিটামিন মিলছে না, সেখানে ওষুধ হিসাবেই এগুলি খেতে হয়। তার পরে রক্তের কোনো রকম দোষ থাকলে, কিংবা রক্তাল্পতা থাকলে তাতেও চামড়া ফ্যাকাশে ও জ্যোতিহীন দেখায়। রক্তের কোনো দোষ বা অল্পতা আছে কি না এটা অনেক সময় সাদা চোখে ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করালেই সে দোষ ধরা পড়ে। এসব দোষের জন্যে অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার, তিনি যেমন বলবেন তেমনি ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শরীরের রক্ত স্বাভাবিকমত আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের নজর রাখা দরকার।

তা ছাড়া শরীরের যে কোনো অসুস্থতাতেই চামড়ার স্বাভাবিক প্রভা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনেক রকমের চর্মরোগ আছে, তার দ্বারাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চামড়ার উপর কিছু একটা লেপন করলেই তার দোষটা ঢাকা পড়ে যাবে না।

অবশ্য চামড়ার স্বাভাবিক অবস্থাতেও তার ঘষামাজা ও প্রসাধন করা নিত্য দরকার, নতুবা সুস্থ চামড়াও একটু নিষ্প্রভ দেখাবে। দু'-চারদিন স্নানাদি না করলে বা দেহের নিয়মিত যত্ন না নিলে তাতেই মানুষকে যথেষ্ট রুক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু প্রসাধন করতে হবে বলে যে পেটেন্ট এবং কৃত্রিম জিনিষগুলোই দোকান থেকে কিনে কিনে ব্যবহার করতে হবে, এ ধারণাটা ভুল। এ বদ-অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত। ঐ সব জিনিষে অনেক রকম রাসায়নিক সংমিশ্রণ থাকে, তার সবগুলো না হলেও অধিকাংশই চামড়ার পক্ষে মঙ্গলকারী নয়, যদিও সাময়িক চকচকে তাতে কিছু হয় বটে। প্রসাধনের পক্ষে কৃত্রিম জিনিষের চেয়ে অকৃত্রিম জিনিষ ব্যবহার করাই ভালো, যেমন আমাদের দেশে আগেকার কালে প্রচলিত ছিল।

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রসাধনের খুব বেশি দরকার করে না, নিত্য স্নান করা ও চামড়ার ধোওয়া-মোছা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলেই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রসাধন হয়। গরমের সময় স্নানের পরে অবশ্যই কিছু পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে ততটা অনিষ্ট হয় না, কারণ, পাউডারগুলো কিছুক্ষণ পরে আপনি ঝরে যায়। কিন্তু স্নো, ক্রীম, পেন্ট প্রভৃতি প্রয়োগ করা একেবারেই ভালো নয়। শীতের সময় ব্যবহারের জন্য দুধের সরের মতো উৎকৃষ্ট জিনিষ আর কিছুই নেই। আগেকার মেয়েরা ডালবাটা, কমলালেবুর খোসা বাটা প্রভৃতি জিনিষ দুধের সরের সংগে মিশিয়ে গায়ে মাখতেন। তাতে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য চমৎকারভাবে বেড়ে যেতো। গায়ে প্রত্যহ নারকেল তেল মাখলেও চামড়া বেশ স্নিগ্ধ ও মসৃণ থাকে। যাঁদের চামড়া অতিরিক্ত ফাটে তাঁরা গ্লিসারিনের বা ভ্যাসেলিনের তৈরি

অ...
অ...
জাত...
রবী...
বদলে...
গায়ে ঘ...
আধ-বাঁচ...
থাকত। তি...
চামড়া খুব ম...
উপর বলতে চ...
সৌন্দর্য বজায় রা...
অকৃত্রিম উপায়েই অ...

—

গায়ের চাম...
আবরণমাত্র ন...
অনেক রকম ...
নৈমিত্তিক কা...
ঘটাই, বাইরে...
উত্তাপের এ...
আর এর ...
দিয়ে ক...
হয়ে যে...
অথচ ক...
দীর্ঘ...

NEW
ভিটাটোন
৫৫

অনেক দূরে

(১২০ পৃষ্ঠার পর)

তার থাকবে না? সে কি তাকে ভুলে যাবে, যেতে পারে? শাশুড়ীর অপ্রতিভ আঙুল সাবানের বাক্সটা বারে বারে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বাক্সের অকথিত রহস্য উন্মোচিত আর হল না।

আধুনিক মেয়েটির কোথাও মমতার রেখা নেই। হাসাকর সম্বন্ধ স্থাপনাকে প্রশ্রয় দেবার মত একবিন্দু হাসি লিপস্টিকের রংকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারলো না। সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণা গোপন করার চেষ্টায় তার মুখে ফুটে উঠল সুন্দর জটিলতার ছাপ, উত্তরকালে কখনও যা ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়াত।

শাশুড়ী তার শাশুড়ীত্ব থেকে স্খলিত হল নিঃসন্দেহে। সে স্বামী পরিত্যক্তা, রূপহীনা, অশিক্ষিতার চিরন্তন ভূমিকায় সেজে এল। কালো মুখখানি তার একটু যেন হাসের দেখাল।

যবনিকা ওখানেই শোষবারের মত পড়লো।

আজ স্মৃতির পৃষ্ঠায় পুরাতন লেখা যখন পড়ি, তখনি অস্পষ্ট, জড়ানো কাটাকুটির মধ্য থেকে ফুটে ওঠে সেই মুখ—একটু অসুখী, একটু বিস্মিত ও অপ্রতিভ কালো মুখটি। বাংলা দেশের যত দুঃখী, নিষ্ফল জীবনের মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত সেই মুখ বারে বারে আমার মনে পড়ে যায়। সে আমার দরজায় এসেছিল। সে ফিরে গেছে।

সে আমার শাশুড়ী হতে চেয়েছিল তাই বোধ হয় কঠিন ঈশ্বর তাকে পুত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। যে আমার ঘর বেঁধে দিতে চেয়েছিল, তারি ঘর ভেঙে গেল।

সাবানের বাক্সে সে এনেছিল উপহার—কোন উপহার সেই ছোট মেয়েটির জন্য। দিতে পারেনি সে আধুনিকা তরুণীর হাতে তার সামান্য উপঢৌকন। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু আজ তো আমার অসংখ্য উপকরণে ভারাক্রান্ত দিন তুচ্ছ নয়। শূন্যতা নিশ্বাস

সেতু

(১২৩ পৃষ্ঠার পর)

...ীর-পরিজনদের বিরুদ্ধে ...য় ব্যর্থ হয়ে গেল ...জীবন! কার কী লাভ হয়েছে তাতে? ...লাদির বয়েস যদি কিছু বেশিই হয়ে থাকে ...কাংখিতের চেয়ে, তাতে কঠোর আপত্তি ...প সমালোচনা যে কেন হবে, তা ভেবেই ...র না স্বর্ণকমল।

আলমানোরায় সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে মাদুই যদি ...খী হতে পারে, সে কি তাহলে উর্মিলাদিকে ...য়ে আরো বেশি সুখী হতে পারতো না! ...ভাবতে ভাবতে তরংগক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্বর্ণকমলের মন। অনংগ ও স্বামীজী আর আলমানোরা ও মাদুইর কথাবার্তায় কানই দিতে পারে না সে কিছুক্ষণের জন্যে।

আবার হঠাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায় চারদিক। শুধু কুয়াশাই নয়, ঝির্‌-ঝির্‌ করে পড়তে থাকে অতি সূক্ষ্ম সব জলকণা। বাইরের কোন কিছুই আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। ঘরের ভেতরেও আর কারুর মুখের দিকে চেয়ে কথা বলার উপায় নেই। কথা শুনে ঠাহর করে নিতে হয় বক্তাকে। তবে স্বর্ণকমলের চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল কুয়াশা আসবার আগেই। হয়ত আগে থেকে সে শুনতে পাচ্ছিল না কিছু। তবে উর্মিলাদির কথাই যদি না শোনা গেল, তাহলে কীই বা আর শোনার থাকতে পারে তার কাছে! আর উর্মিলাদিকেই যদি দেখা না যায়, তাহলে এমনি কুয়াশা চির-স্থায়ী হলেই বা তার কী ক্ষতি! একবার যেন ঠিক এমনিধারাই মনে হচ্ছিল স্বর্ণকমলের।

বিকেলে ফিরে যাবার পথে স্বর্ণকমলকে রোপওয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, স্থির ক'রেছে অনংগ। এই বার স্বামীজীও সঙ্গে যাবেন সে [illegible]।

চেরাপুঞ্জি রোপওয়ে। চেরাপুঞ্জির নীচের [illegible] পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে এ ছাড়া [illegible] কিছুই [illegible] বলে মনে হলো। এই রজ্জুপথে মালপত্র আনা নেওয়া চলছে সমতলের সঙ্গে ১৯৩০ সাল থেকে।

দেখা হলো। কিন্তু [illegible] সমতল-ভূমির সঙ্গে সেই যোগবন্ধন অক্ষুণ্ণ রক্ষা করে চলেছে এই চেরাপুঞ্জি রোপওয়ে। বহুদূর বিস্তৃত [illegible] সেই সমতলের কতো কাছে ছোট্ট চেরাপুঞ্জি! এতো কাছে শুধু এই সেতু-সংযোগের জন্যে।

[illegible] উর্মিলাদি, স্বর্ণকমলের [illegible] প্রাণের যোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে না কেন?

—

ফেলে প্রচুর্যের মধ্যে। শূন্যতা বলে যায়, যা পাবার, তুমি তো পাওনি?

তাই আমার অজস্র উপহার বিতৃষ্ণার দিন বারে বারে ফিরে তাকায়। ফিরে চায় সে কারেকার না দেওয়া, ছোট্ট, সামান্য কোন উপহার। এক মুহূর্তে নিষ্প্রাণ জীবন হাতে দাঁড়ায় সেই দুর্লভ উপহারের অভাবে। ছোট্ট বস্তুর মূল্যে এর কি শোধ হলো?

—

ঘুমন্ত পুরী — অনিল দত্ত

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে

দত দাসগুপ্ত

চলে যায়। শুধু মনোজিৎবাবু কখনো কোনো কিছুর জন্য জোর করতেন না।

পানুমাসী প্রায়ই নাকি মাকে বলতেন : "পাগলামীর বীজ আছে আমার মধ্যে একথাটা ভুলে থাকতে কি চেষ্টাই না করছি, কিন্তু হঠাৎ যখন আর সব কথা ভুলে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই তখনই দুঃসহ মনে হয়।"

"ডাক্তার দেখা তুই"—মা পরামর্শ দেন।

পানুমাসী বলেন, "দেখিয়েছি কলকাতায়, কিছু বাদ রাখিনি। বাবা জানতেন শুধু, মা জানতেন না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দিলেন কোন লক্ষণই নেই। এটা বংশগত রোগ নয় আমাদের বাড়ীর। দারুণ শক্ পেয়ে ঠাকুরদা অমন হয়েছিলেন। ঠাকুরমাও পাগল হয়েছিলেন ছেলের মৃত্যুশোকে। রিপোর্ট তো খুব ভাল...তবু...।"

"তাহলে তুই অত ভাবছিস কেন?"

"তাতো জানি না। মনে হয় মাঝে মাঝে আমার শিরায় শিরায় নেচে ওঠে খ্যাপামীর বীজ।"

"ও তোর কল্পনা।"

"হবে হয়ত। আর মনে হয়", কিছুক্ষণ নীরব থেকে পানুমাসী বলেন, "অভিশাপ কোথায় যাবে? জানিস, মাঝে মাঝে আমি যেন শুনতে পাই ওদের অভিশাপ—ঠাকুরদার পাপ বহন করছি—প্রায়শ্চিত্ত করবো না?"

"যা, যা, যত উদ্ভট কথা তোর।"—আমার মা পানুমাসীর কথাটা উড়িয়ে দিতে চান। তবু শঙ্কা জাগত তাঁর মনে। সত্যি যদি তাই হয়। "তোদের শিল্পকেন্দ্রের খবর বল।"—কথা ঘুরিয়ে নেন মা। "বেশ চলছে। কাজে থাকলে সব ভুলে যাই। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমোতে যাই......।" উচ্ছল হাসিখুশী ভরা মেয়েটির চোখে একটা ভয়াল অন্ধকার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মার কাছে পানুমাসী নাকি সব সময় সব কথা খুলে বলতেন।

সারা গ্রামে পানুমাসীর অসাধারণ প্রতিপত্তি। একে লেখাপড়া জানা মেয়ে, তার ওপর অমন সুন্দর অমায়িক ব্যবহার। সকলের জন্য গা ঢেলে কাজ করছে। এমন নিঃস্বার্থ সেবা সচরাচর চোখে পড়ে না। "যার ঘরে যাবে—আলো তার ঘর ভরে উঠবে"—ঘরে ঘরে কথা উঠতো।

পানুমাসী কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন। একদিন কোথায় কীর্তন শুনতে গেছেন। কীর্তনের মাঝখানেই উঠে চলে এলেন, মাকেও টানতে টানতে নিয়ে এলেন। পথে বললেন : "আমার ভেতর আবার সেই উচ্ছ্বাস এসেছে।"

"কিসের উচ্ছ্বাস?"—মা জানতে চাইলেন।

"ওমা, তোকে বলিনি? আজকাল মনে হয় আমার ভেতর ঢেউ আসে। পুরীর সমুদ্রের ঢেউ-এর কথা মনে হয়। একবার পুরীতে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ঐ বালুবেলার ওপর দিয়ে যেতে যেতে হয়ত সমুদ্রের ফেনিল রূপ দেখে ভুলেছিলেন। তাই ঝাঁপ না দিয়ে পারেননি। ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে। আজ ঐ কীর্তনের সুরে শুনে সেই ঢেউ-এর স্মৃতি মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা পানু, তুই লিখিস না কেন? তোর হাতে সাহিত্য [illegible]

মাকে থামিয়ে মাসী বলেন—: "এখনো মনে হচ্ছে আমার চারপাশে সেই ঢেউ ছল্‌ছল্‌ করে উঠছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন। গুম্‌ গুম্‌ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমি।"

জোনাকির ঝাঁক তখন অন্ধকার পেয়ে হাজার আলোর দীপালি জ্বালিয়েছে। তারই ভেতর মা আর পানুমাসী দুজনে চলতে লাগলেন। মা একটু ভীতু ছিলেন। পানুমাসীর ভয়ের লেশমাত্র নেই। অনর্গল কথা বলতে থাকেন। মা বলতেন সে রাতের কথা এখনো মনে পড়ে।

সেবার জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে পানুমাসী সম্পাদিকা নির্বাচিত হলেন। ভীষণ খাটলেন এ

"[illegible] অপেক্ষা করবো। তোমার ভুল ভাঙবেই।"

জন্যে। সবাই [illegible] এমনভাবে খাটলে শরীর পড়ে যাবে। কিন্তু [illegible] শরীর [illegible] সমস্ত [illegible] বিষয়ে [illegible]। হেসে বলতেন : "আমার উপর [illegible] অধিকার আছে। স্বার্থপরের মত কি করে বসে থাকি?" প্রাণ ঢেলে কাজ করতেন। সেবারকার সম্মেলন সব দিক থেকে খুব সুষ্ঠু হয়েছিল। তারপরই এল আগস্ট আন্দোলন। পানুমাসী একজন বিশিষ্ট মহিলানেত্রী হয়ে দাঁড়ালেন। এই আন্দোলনের মুখেই আমার ছোটকাকার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ছোটকাকা যুদ্ধ আরম্ভের কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছিলেন বিদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করে। তারপর বছর দুই [illegible] কাজ করতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। কিন্তু কোনবারই বেশীদিন থাকা হতো না দেশের বাড়ীতে। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় একবার গ্রামে এসে আর ফিরে যাননি কাকু, মা বলতেন : পানুমাসী তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। কোথায় গেল [illegible] সিভিলিয়ান, আর কোথায় খদ্দর পরা মিঠুকাকা। ওর পরিবর্তন দেখে বাড়ীশুদ্ধ লোক অবাক হয়েছিল। খুশীও হয়েছিল তেমনি। শুধু মা একটু শঙ্কিত হয়েছিলেন। মিঠুকাকু ঝুঁকেছে পানুমাসীর দিকে। ফলটা

খুব ভালো হবেনা। পানুমাসীও তাই বলতেন : "সুকু, ঠেকাও নিরুপমকে।"

"আমাকে তো মিঠু কিছু বলেনি। আমি ওকে কি বলব? শেষটায় কোথায় লেগে যাবে বাপু, ওরা সব পাশ্চাত্যশিক্ষা পাওয়া ছেলে!"—মা জবাব দেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"তুমি একটু [illegible]"—[illegible] সঙ্গে [illegible]।

"[illegible]" [illegible] উত্তর পানুমাসীর।

আর একদিন। পানুমাসী কোন কাজে বেরিয়েছিলেন। বাড়ী ফিরে এসে মাকে ডেকে পাঠালেন।

"সুকু, যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে।"

"কি হয়েছে রে?" মা জিজ্ঞাসা করেন।

"নিরুপম..." আর বলতে পারেন না পানুমাসী। থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে থাকেন উত্তেজনায়।

মা তাঁকে বসিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত পড়ে থেকে পানুমাসী চোখ খোলেন।

"আচ্ছা সুকু, নিরুপম কি জানেনা আমাদের বংশের কথা?"

"নিশ্চয়ই জানে, মিঠু তো সব শুনেছে।"

"তোর সঙ্গে কি কিছু কথা হয়েছিল?"

হয়ে যাচ্ছি। এ যেন জীবন্ত আত্মার দাহন। আমার হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করে জ্বলছে কামারের দোকানে আগুনের মধ্যে লোহা যেমন জ্বলে তেমনি। মিঠু আর কিছুতেই আগের শ্রদ্ধা নিয়ে আমাকে দেখতে পারবে না।"

"রাখ্ রাখ্। তোর সবতাতে বেশী বেশী চিন্তা। আমি সব খুলে লিখবো ঠাকুরপোকে। তোর বাবাকেও বলি। বাজে কথা ভেবে অনেক সময় নষ্ট করেছিস। স্বাভাবিক জীবনকে অস্বাভাবিক করে তুলেছিস। কিছু হয়নি তোর, আমার মনে হয় মিঠু ঠাকুরপোর হাতে পড়লে তোর সব ভয় কাটবে। ঐ মানসিক রোগও সেরে যাবে।"—মা বোঝান পানুমাসীকে। পানুমাসী এবার হেসে ফেলেন। বলেন "সন্তু, একটু হাসাতে পারলে যেন আমি বাঁচি। কিন্তু কিছুতেই পারি না। তুই রোজ আসিস। হাসির কথা বলিস।"

—"বুঝেছি, কিন্তু আমার কথাটার জবাব দে। আমি মিঠুকে লিখি।"

"না", পানুমাসী বলেন, "নিজেকে সামলাতে দে আমাকে; তারপর আমিই লিখবো মিঠুকে।"

তিন-চার মাস পরের কথা। মিঠুকাকু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। পানুমাসী নাকি তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। কাকু তার জবাব দিলেন: "অনেক দেরী হয়ে গেছে পানু। আমার জীবনটাতে ঘুণ ধরেছে, তোমার আশা, আমার আশা দুটোই অপূর্ণ থাকলো। আমি সম্ভবতঃ আর ভালো হবো না। তবু বড় শান্তি পেলাম যে জীবিত অবস্থাতেই তোমার কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া গেল।"

পানুমাসী চিঠিটা [illegible] হয়ে বসে-ছিলেন তিন-চারদিন। ওর মা [illegible] আমার মাকে ডেকে পাঠালেন। মা গিয়ে দেখেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন পানুমাসী। চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

মাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন: "সন্তু, আমি [illegible] হতে পারিনে। মিঠুকে বাঁচাতেই হবে। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও কেন করবে? ওকে ভালো করতেই হবে। সাবিত্রী এনেছিল সত্যবানকে, বেহুলা এনেছিল লখিন্দরকে—আমিও বাঁচাতে পারবো ওকে, মনে হচ্ছে দারুণ একটা শক্তি [illegible] আমার মধ্যে। ভুল করেছি; আমি কিছুতেই পাগল হবো না।"

মা ওকে হাত ধরে বসালেন।

"উত্তেজিত হোস্‌নে। বাঁচাতে তো হবেই। ওকে জেল থেকে [illegible] হচ্ছে। এবার [illegible] কিন্তু তুই শক্ত না হলে [illegible] কি করবে? নিজের দিকে একটু [illegible]।"

মা [illegible]। ওঁদের বাড়ীর [illegible] একমাত্র মেয়ে [illegible]। আমরা একটা [illegible] কিন্তু [illegible] কেউ [illegible] চাইতো না। ওঁর মা [illegible] তার [illegible]। [illegible] মানসিকতার [illegible]। কিছুই যেন ওঁর গায়ে লাগেনা।

অশান্তির ঢেউ আমাদের বাড়ীতেও পৌঁচেছে, কাকুকে জেল থেকে আনা হয়েছে। সেই সুস্থ সবল মিঠুকাকু সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। দুর্বল শরীরটা প্রায় বিছানার সঙ্গে লেগে রয়েছে। পানুমাসী তখন আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন বলতে গেলে। অনেক চিকিৎসা হলো। পানুমাসী আর মা দুজনে অমানুষিক সেবাযত্ন করলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। মিঠুকাকু মারা গেলেন, হাজার চেষ্টাতেও পানুমাসী মৃত্যুকে ঠেকাতে পারলেন না। মৃত্যুর [illegible] নাকি মিঠুকাকু বলেছিলেন: "পানু, তুমি ভালো, তুমি পাগল নও।"

এবার সত্যিই পাগল হলেন পানুমাসী, [illegible] করে গান করেন আর বলেন, "কিছুতেই না আমি পাগল হবোই পারি না, মিঠুকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতেই হবে।"

আমাদের বাড়ীতে পানুমাসী আর আসেন না। [illegible] নিয়ে কাকুকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সে পথ দিয়েই ঘোরাঘুরি করেন, [illegible] বিড়্‌ বিড়্‌ করে বলতে বলতে যান—"[illegible] বলো, হতেই পারি না পাগল। মিঠুকে লিখেছি। ওকে বাঁচাতে হবে। আমি পাগল হবো না, হতে পারি না।" গভীর রাতে মাঝে মাঝে একটা বিকট চীৎকার শুনি ওঁদের বাড়ী থেকে। মা বলেন পানুমাসী নাকি ঠিক ঐ সময় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। জিনিষপত্র ভেঙ্গেচুরে [illegible] করে দেন। কিন্তু কেউ যদি বলে, "তুমি পাগল হয়েছো"—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সব হট্টগোল। অদ্ভুত রকম শান্ত হয়ে যান। বলেন, "মিঠুকে বলেছি আমি তো পাগল হতে পারি না।"

• মানচিত্র •

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

হৃদয়ের মানচিত্র খুলে
দেখেছি আপন মনে সময়ের পাতা তুলে তুলে
খুশি মত,
তোমার গঙ্গোত্রী নদী অবিরত
ঢেউ তোলে, মানচিত্র জুড়ে
শ্রাবণ বসন্ত আর বৈশাখের হলুদ রোদ্দুরে।

তোমার জঙ্গলে
কত পাখী, কত সুরে কত কথা বলে
দারুচিনি লবঙ্গ এলাচে
কত শিশু গাছে
ছায়াতলে সপ্রেমে হরিণীরা শুয়ে
ধূসর রঙের মেঘ নীচু হয়ে কত কাঁচ ডাল
যায় ছুঁয়ে।

রেলপথ, খনি, ঘাট, গঞ্জে ও বন্দরে
সীমার প্রান্তটায় ভেঙে, সবখানে তুমি
ওড়ো ঝড়ে।

মানচিত্র খুলে
তোমাকেই দেখি তাই আমার আমিকে
যাই ভুলে।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

করে উঠল—ছুটে এল সবাই। শেষকালে এলেন সম্পাদিকা। ফোনে ফোনে কথার ছুটোছুটি হতে লাগল সমিতির সদস্যাদের মধ্যে। মোটরের পর মোটর এসে জড়ো হলো সমিতির সামনে। ব্যস্ত হ'য়ে নামলেন সদস্যারা। ঘরের সামনে গিয়ে কেউ বা চীৎকার ক'রে চোখে রুমাল চাপা দিলেন।

কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো আঁকড়ায় ঝুলছে দুর্গাবালা—সারা গায়ে বড় বড় জল ফোস্কা—রক্তের দু-একটি ধারা জমে আছে নাক-মুখের ফুটোয়— হাত-পা সোজা শক্ত— চোখ দুটো ঝুলে পড়েছে। অনেক উঁচুতে উঠে গেছে দুর্গাবালা। নীচে—অনেক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন মাননীয়া সদস্যারা। চোখের দৃষ্টি অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েও দুর্গাবালা তাঁদের দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে লজ্জায় নেমে এসে হয়তো বলত—উপরে ওঠেন দিদিরা!

পুলিশে খবর গেল—তারপরে মর্গ আছে, হিন্দু সৎকার সমিতি আছে। দুর্গাবালার চির-কালের ছুটি হয়ে গেল! লাশ চালান হলো মর্গে—পুলিশের হাঙ্গামাও সহজেই মিটে গেল—অভিজাত মহিলারা পরিচালনায় আছেন—কোনো অন্যায় ঘটতে পারে না।

এতক্ষণে সদস্যারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছেন—কিন্তু কি করতে পারেন? এ রকম এক একটা সমস্যা এইভাবেই মিটে থাকে। তাতে কারুর কিছু করবার নেই।

[illegible]

—[illegible] বাঁ [illegible] রুমালে [illegible]—[illegible] ঢুকেই গেল। একরকম ভালোই হলো—[illegible] দুর্গাবালা [illegible] এই অবস্থায় কে দেখত তাকে?

নিঃশ্বাস সকলেই একটু সহজে বইলেন। হঠাৎ একজন বলে উঠলেন—একটু চা পেলে হতো!

সত্যিই সকালবেলায় কারুর ভালো করে চা খাওয়া হয়নি। কথাটা [illegible] সবার মনেও হয়েছিল—ব্যবস্থা করেছিলেন। শুকনো শুকনো মুখে দুঃখী দুঃখী চোখে শান্তিময়ী আনছে চা। কাশ্মীরী কাজ করা কাঠের বড় ট্রেতে সাজানো হাল্কা পেয়ালা পিরিচ—মাঝখানে কারুকার্য করা টুপি দিয়ে ঢাকা—চায়ের কেটলি।

টুপি তুলতেই হাত বাড়িয়ে যেন সেই হেসে উঠল—মনোরম প্রভাত!

আকস্মিক ঘটনা নয়!

সুলেখার অপরিসীম জনপ্রিয়তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পিছনে আছে সুলেখার বিস্ময়কর উৎকর্ষতা যা' আজ ফাউন্টেনপেন কালি শিল্পের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ,
কলিকাতা ■ দিল্লী ■ বোম্বাই ■ মাদ্রাজ

আট নম্বর

— শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

অনেক বছর বাইরে বাইরে চাকরী করে, কলকাতায় বদলি হয়ে এলাম। তার দুদিন পরেই স্বামীজীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

বললাম "কিরে স্বামীজী? কেমন আছিস্? চিনতে পারিস্?"

স্বামীজী একবার বাহুল্যক্রমে আমার মাথা থেকে জুতোর ডগা পর্যন্ত চোখ চালিয়ে বললে "পারা শক্ত। যা মুটিয়েছিস!"

আমি বললাম "তুই রুগিয়েছিস। কিন্তু চিনতে আমার দেরি হয়নি। কই, বললি নে তো কেমন আছিস।"

বলেই মনে হলো জবাবটা ওর চেহারা থেকেই বুঝে নেওয়া উচিত। কত রকমে সে খারাপ আছে তারই ফিরিস্তি সুরু করবে আশংকা করে' প্রশ্ন করলাম। "বিয়ে করেছিস?"

সলজ্জ সর্পিল ভংগীতে দেহ বাঁকিয়ে স্বামীজী কৈফিয়ৎ দিলে "ওরা ভাই এমন করে ধরলে, যে—"

অর্থাৎ 'ওরা' নাছোড়বান্দা না হলে স্বামীজীর কৌমার্য আজও অক্ষত থাকতো।

শুধালেম "ক'বছর?"

স্বামীজী বললে "বছর সাতেক।"

প্রশ্ন করলাম "ক'টি?"

আবার সর্পিল ভংগীতে দেহ তরঙ্গিত করে স্বামীজী বললে, "ছটি।" একটু থেমে যোগ করলে "কোলেরটিকে নিয়ে সাতটি।"

বললাম "বৌ কেমন আছে?"

"ভালো নেই ভাই। আর চেহারাটিও যা করে রেখেছে, কহতব্য নয়।" স্ত্রীর বে-আক্কেলেপনায় সারা মুখে বিরক্তি স্বামীজীর।

আমি বললাম "যাবো একদিন তোর বৌকে আর বাচ্চাদের দেখতে। থাকিস্ কোথায়?"

"ঢাকুরেতে। ছাপোষা ক্ষুদে কেরাণী, কলকাতার ঘর ভাড়া পোষাতে পারবো কেন? তোর কি ভাই ওখানে যাওয়া পোষাবে?"

বললাম "পোষাবে মানে? তুই ছিলি আমাদের ছাত্রজীবনের গুরুদেব; চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, মোহ-মুদ্গর—এসব আমাদের তুই-ই তো পড়িয়েছিস্। তোর চেলা হয়ে আমরা পান খাইনি, সিগ্রেট ফুঁকিনি, মাথায় তেল-চিরুনি লাগানো ছেড়েছিলুম। এমন কি দিনকতক নিমপাতা ভাজা পর্যন্ত খেয়েছিলুম। বিলিতি কোম্পানীতে চাকরী করি বলে কি সে সব কথা ভুলে যাবো?"

"বেশ, তাহলে চলিস্ একদিন।"

"একদিন কেন? আজই। এখখুনি।"

ট্যাক্সী ডেকে স্বামীজীকে টেনে নিয়ে উঠে পড়ে বললাম "এবারে ড্রাইভারকে বল্ কোন দিকে যাবে।"

স্বামীজীর কাচ্চাবাচ্চাদের জন্য কিছু মিঠাই নেবার ইচ্ছে ছিল। নিতে দিলে না স্বামীজী। বাচ্চাদের মিঠাই রসের রসিক হতে দিতে সে রাজী নয়।

স্বামীজীর সহধর্মিণীকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। প্রতি বছর পতিদেবতাকে একটি করে সন্তান উপহার দিতে দিতে ভদ্রমহিলা একেবারে কংকালসার হয়েছেন, কি করে বেঁচে আছেন ভেবে অবাক হলাম। ভাবলাম যেমন করেই হোক স্বামীজীকে পিতৃত্বের সাধনা থেকে নিরস্ত করতে হবে; পতিদেবতাকে আট নম্বর সন্তান উপহার দিতে হলে ভদ্রমহিলা কিছুতেই বাঁচবেন না। ভদ্রমহিলা চা বানাতে গেলেন, সেই ফাঁকে স্বামীজীর মনের ভেতরটা একটু হাতিয়ে দেখে নিলাম। ভূতপূর্ব কঠোর ব্রহ্মচারীর কঠোর ব্রহ্মচর্যের সাতটি নমুনা দেখে মনে হলো ও রাস্তা দিয়ে গেলে কোনো কাজ হবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক পন্থার ইঙ্গিত মাত্রেই আমাকে থামিয়ে দিলে স্বামীজী। নোংরা আলোচনা তার কানে সয় না।

স্বামীজী-পত্নী চা দিয়ে গৃহকাজে গেলেন। হঠাৎ স্বামীজী বললে, "হাত দেখতে কি তুই ভুলে গেছিস্ ভাই?"

ইস্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়বার সময় বই পড়ে হাতদেখা শিখেছিলাম। আমাদের ক্লাসের আজন্ম-ব্রহ্মচারী জগাই বলতো সে বিয়ে করা স্বামী হবে না, বিয়ে না করা স্বামীজী হবে; সেই থেকেই ওর জগাই নাম ভুলে গিয়ে আমরা ওকে স্বামীজী বলে ডাকতুম। আমি হাত দেখে বলেছিলাম ভবিষ্যৎ জীবনে সে বিয়ে-করা স্বামীই হবে। বলাবাহুল্য হাত না দেখেও সেটা বলতে পারা যেতো।

বললাম "ও জিনিষ কি ভুলে যাবার জিনিষ ভাই? ও বেলা কি ছাড়বার? পরে আরো কত কালচার করেছি। এখন আমি রীতিমতো পাকা হাতদেখিয়ে। অনায়াসে চেম্বার খুলে পামিস্ট হয়ে বসে যেতে পারি।"

"তাহলে ভাই—" বলে ডান হাতের পাতা চিৎ করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে স্বামীজী। আমি নিবিষ্ট মনে ওর হাতের রেখার খুঁটিনাটি বিচার করবার ভান করে বানিয়ে অনেক কথা এমন বললাম যা যেকোনো লোক সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর সত্য। কিন্তু বলার ভংগীতে সেই ফাঁকিটুকু টের পেলে না স্বামীজী। আমার কাছ থেকে নিজের ভবিষ্যৎ জেনে নেবার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠলো ওর মনে।

কানে কানে মিনতি করার সুরে স্বামীজী বললে "বৌ-ছেলেমেয়েদের কিছু উন্নতি-উন্নতি হবে কিনা একটু দেখে দে ভাই। যা পাচ্ছি তাতে একবেলার বেশী খোরাক চলে না, তাই দিয়েই দুবেলা চলছে। বাচ্চাগুলোকে শুধু দুবেলা বেশী করে চা খাইয়ে খিদে মেরে রেখে—"

বললাম "দেখেছি।" দেখে বললাম "অর্থস্থানে তোর শনি, আরো চার বছর অধিক দুর্গতি চলবে, আয় কিছু কমে যাবার আশংকাও দেখা যাচ্ছে।"

স্বামীজী চিন্তিত মুখে বললে "স্বস্ত্যয়ন-টস্ত্যয়ন কিছু—"

গম্ভীরভাবে বললাম "সর্বনাশ। স্বস্ত্যয়ন করাতে গেলেই শনি আরো ক্ষেপে গিয়ে তুঙ্গী হয়ে বসবে, তারপর আর কিছুতেই নামাবে না। দেখছিস্ না এই রেখা দুটো কি রকম—"

দেখলাম চিন্তিত হয়ে স্বামীজী মনে মনে কিসের হিসেব করছে। বোধ হয় সে ভাবছিল যাহা তিপ্পান্ন তাহা বাহান্ন, আয় কমে গেলে ডালের বরাদ্দটা কমিয়ে নুনের বরাদ্দটা

বাড়িয়ে নিলেই হবে। মুখ দেখে মনে হলো না পিতৃত্ব সাধনার বরাদ্দ কমাবার কথা ভাবছে স্বামীজী।

ভাবলাম স্বামীজীর কঙ্কাল বৌকে তাঁর নারীত্বের আট নম্বর চরম বিকাশ থেকে বাঁচাতে গেলে আরো প্রত্যক্ষ এবং জোরালো উপায় ধরতে হবে। স্বামীজীর হাতের কয়েকটা রেখার ওপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলাম।

"কি দেখলি ভাই?" ভয়পেয়ে শুধালে স্বামীজী।

একটু ইতস্ততঃ করে' বললাম, "বলে' অনর্থক তোকে ভাবনায় ফেলতে চাইনে।" দেখলাম ওষুধে ধরেছে। আমার হাত দুখানা ধরে স্বামীজী বললে, "না ভাই, তোকে বলতেই হবে। না শোনা পর্যন্ত কিছুতেই আমি শান্তি পাবো না।"

বললাম, "কথাটা হচ্ছে তোর সন্তান সম্পর্কে। কিন্তু বড় ভয়ানক কথা। একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।"

ভগবান-ভক্ত স্বামীজীর মুখে ফুটে উঠলো পরম আত্ম-সমর্পণী মান হাসি। "তাঁর জিনিস তিনিই নিজের কাছে টেনে নিয়ে গেলে নালিশ করবার তো কিছু, [illegible] বললাম [illegible] সন্তানকে [illegible] টেনে নিয়ে গেলেও স্বামীজীর চিত্ত [illegible] কিছুমাত্র কমালে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ওর মাথায় [illegible] আরো জোরালো করে [illegible] স্বামীজীর [illegible] হাতের রেখা [illegible] আমার [illegible] আট নম্বর সন্তান [illegible] কারণ হবে।

[illegible] এমন ভয়ানক একটা [illegible] এই সহজ বিশ্বাসী [illegible] কিন্তু ঐ [illegible] বিবেক ঠান্ডা হলো। [illegible] এতটুকু অটল [illegible] আবেক অস্থির হয়ে [illegible] আশ্রমেই আট নম্বর সন্তানের [illegible] নিজেকে সে বঞ্চিত রাখবে। [illegible] প্রবৃত্তি হলে [illegible] অবলম্বন করবে, তার ইঙ্গিতও তাকে দিয়েছি।

স্বামীজীর সঙ্গে এরপর আবার দেখা হলো মাস তিনেক বাদে। প্রশ্ন করলাম, "তারপর, তোরা ভালো তো? বৌ কেমন আছে?"

স্বামীজীর মুখ দেখলাম চিন্তাক্লিষ্ট। বিরক্তিক্লিষ্টও বটে। বললে, "বৌর কথা আর বলিস্ নে ভাই। আবার 'ফ্যামিলি-ওয়ে'তে বসে আছে। আড়াই মাস চলছে।"

চিন্তিত হয়ে বললাম, "কি ফ্যাসাদ রে স্বামীজী? অসুখ? আকস্মিক দুর্ঘটনা?"

স্বামীজী বললে, "ন্যাকামি করিস্ নে।" বুঝলাম, আবির্ভাবের পথে আড়াই মাস হলো রওনা হয়েছে আট নম্বর, আমার মারাত্মক

তাঁর জিনিস তিনিই নিজের কাছে টেনে নিয়ে গেলে নালিশ করবার তো কিছু নেই।

ভবিষ্যদ্বাণী তার আগমনকে রুখতে পারেনি।

মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে গেল, "এ তুই করেছিস কি স্বামীজী?" বিকারে ভরে উঠলো আমার মন। ঠিক ঐ প্রশ্ন আমি আমাকেও করলাম। এ আমি করেছি কি? পৃথিবীর আলোর দিকে এগিয়ে আসছে স্বামীজীর আট নম্বর সন্তান। আর আমারি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর বিষে জর্জরিত স্বামীজীর মন ঐ সন্তানের বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে ভাবছে, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"। নিষ্পাপ শিশু জন্ম নেবে পিতার বিভীষিকার অভিশাপ নিয়ে?

বললাম, "মারাত্মক একটা অপরাধ করে' ফেলেছি স্বামীজী। বল্, ক্ষমা করবি?"

স্বামীজী বললে, "কি অপরাধ?"

"তোর আট নম্বর সন্তান না আসাই ভালো ছিল। তাই তোকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছে কথা বলেছিলাম। আসলে হাত দেখতে আমি কিছুই জানিনে। যে সন্তান তোর আসছে তাকে তুই নিঃসংশয়ে খুশী মনে বরণ করে নে। হয়তো এ সন্তানই তোর জীবনে সবচেয়ে বড় কল্যাণ আনবে।"

"হুঁ। পটল তোলার কল্যাণ।" বললে স্বামীজী। মেজাজ ভালো নয় এবং আমার কথাও সে বিশ্বাস করেনি বোঝা গেল: এ জাতের ভাষা আর এমনতরো ভাষণভঙ্গী স্বামীজীর মুখে অভূতপূর্ব। অমার্জিত ভাষা নিজের হলেও সে মার্জনা করে না।

তারপর চালাকী ধরে ফেলা জব্দ-করা হাসি হেসে বললে, "হাত দেখতে তুই জানিস্ নে, সব তোর ফাঁকি, না? কিন্তু যা যা বলেছিলি, একটির পর একটি ফলে যাচ্ছে কি করে জানিনে। বলেছিলি এক বড়বের [illegible] অসুখ বদ্ধে যাবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে হাতে। পুরোসও গেল না, মাসিক ভাতা পনেরো টাকা থেকে সওয়া দশ টাকায় নেমে গেল। বলেছিলি বৌর শরীর ভালো যাবে না এ বছর। উপসর্গের এমনিতেই অভাব ছিল না, তার ওপর ধরেছে অ্যানিমিয়া আর ডিস্পেপ্সিয়া। ঘন ঘন মাথাধরা তো আছেই। বলেছিলি অপিসে আমার শত্রুর অভাব নেই। তারও প্রমাণ হাতে হাতে পেয়েছি। আমার জোর বিশ্বাস লেজার-ক্লার্ক নিমাই হালদার বড়বাবুর কাছে গিয়ে আমার নামে লাগিয়েছে। তাছাড়া, যেদিন বৌর কাছে প্রথম শুনলুম সেদিন আপিস যাবার পথে এক মোটরলরীর তলায় পড়ে চিড়ে চ্যাপটা হতে হতে বেঁচে গেলাম। উঃ! আসতে না আসতেই এই!"

অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আট নম্বর সন্তানের বিরুদ্ধে যে বিষ নিজেই ঢুকিয়ে দিয়েছি স্বামীজীর মগজে, তাকে ক্ষয় করবার কোনো প্রতিষেধকই কার্যকরী হলো না। অন্যান্য নানা উপসর্গসমেত অ্যানিমিয়া এবং

(ইহার পর ১৯২ পাতায়)

আনন্দময়ীর আগমনে প্রিয়জনকে সাজাতে
"গহনা" চাই
স্বাভাবিক রূপকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে- ন্যাশনালের গহনা
গিনি স্বর্ণের
নতুন নতুন
ডিজাইনের নিখুঁত
অলঙ্কার তৈরীই
আমাদের বৈশিষ্ট্য।
ফোনঃ-
সাউথ ৪৬৩৯
ন্যাশনাল জুয়েলারী ওয়ার্কস
২০, কালীঘাট রোড • কলিকাতা
১৬৯, রসা রোড, ভবানীপুর • ১৬৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ

Swan Brand
PURE
GHEE
PURE
GHEE
CLARIFIED BUTTER
SWAN BRAND

GREAT EASTERN
CUTLERY WORKS
Manufacturers of Agricultural and
Horticultural Implements etc
20, STRAND ROAD. CALCUTTA-1

চাকরীটা [illegible] হয়েছিল। তারপর একদিন [illegible] পৌঁছতে হোলো [illegible] [illegible] থেকে ডাক যায় এই গাড়ীগুলোতেই।

গাড়ীতে বসে চড়াই উৎরাইয়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সুধাংশুর প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। স্টেশন এলাকা পার হবার পর থেকেই বসতির চিহ্নগুলো ক্রমশঃ কম আসছে। বাড়ছে শুধু পাহাড়ের সংখ্যা। টিলা, পাহাড়, পর্বত যা চাও সব। আর জঙ্গল। রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা কম। মাঝে মাঝে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে পুরুষদের পরনের কাপড়গুলো হাঁটুর ওপর বিশেষ একটা জায়গা পর্যন্ত এসেই থেমে গেছে। ঊর্ধাঙ্গে কারও হয়তো ফতুয়ার মত কিছু একটা পরিধেয়, কারও বা তাও না। কিন্তু কাঁধে একটা করে গাদা বন্দুক প্রায় সকলেরই। মেয়েদের অবয়বগুলির প্রায় সবটাই রঙীন মোটা কাপড়ে ঢাকা এবং কাপড়গুলিতে পুরুষের মত কাছা দেওয়া। পায়ে ভারি পেতল-কাঁসার মল, হাতে এক গোছা করে গালার চুড়ি।

নেটিভস্টেট। আজকের নয়, বছর তিরিশ আগের।

সেই নেটিভস্টেটের ডাক্তার হয়ে এসেছে সুধাংশু। নিয়োগপত্র মাফিক পদটার নাম স্টেট সার্জন। মাইনের অংকটা দেড়শোর কাছাকাছি। ফ্রী কোয়ার্টার। মনে মনে বেশ একটা জমকালো ভবিষ্যৎ কল্পনা করে প্রাণে উঠেছিল সুধাংশু। এখন এই বিকাল-বেলায় ঝিমিয়ে আসা রোদে শেষ গাড়ির ঝাঁকানি খেতে খেতে উৎসাহটা যেন ঝিমিয়ে আসতে লাগলো। সন্ধ্যার মুখে যে চটিতে গাড়ীর ঘোড়া-বদল করা হোলো সেইখান থেকেই রাজার খাস এলাকা সুরু। চারজন বন্দুকধারী সেপাই উঠলো গাড়ীতে। ডাক্তার সাহেবের পদমর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে নয়, যে কোন-মুহূর্তে পাহাড় বা জঙ্গল ভেদ করে একদল ডাকাত বেরিয়ে এসে গাড়ীর ওপর চড়াও হ'তে পারে। তাই।

রাজধানীতে পৌঁছতে প্রায় দশটা বাজলো। সুধাংশু মনে মনে নিজের আস্তানায় ঢুকে চারপাইয়ের ওপর ক্লান্ত শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে লম্বা একটা ঘুমের স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু সহরের ফটকে গাড়ী পৌঁছতেই মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শুকুলজী টমটম থেকে নেমে শেষ গাড়ীতে উঠলেন। রোগা লম্বা চেহারা মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট, পরণে ফিনফিনে ধুতি—লোমকূপ পর্যন্ত দেখা যায়। চোখ মুখে একটা অতি সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি—যেন প্রাইভেট কথাটা শীল-মোহর করা। সংবাদ পাওয়া গেল মহারাজা ডাক্তার সাহেবের সংগে মোলাকাতের জন্যে কোঠীতে অপেক্ষা করছেন। দেওয়ান সাহেবও আছেন সেখানে।

সুতরাং ডাক-গাড়ি থেকে একেবারে রাজ-প্রাসাদে।

জয়পুরী পাথর, জব্বলপুরের মার্বেল আর ঝাড়-লণ্ঠনের সমারোহের মাঝখান দিয়ে—বড় বড় অনেকগুলো ঘর পার হয়ে স্টেট সার্জন সুধাংশু ভট্টাচার্য শুকুলজীর পিছনে পিছনে একাধিক শ্রী-যুক্ত মহারাজ বিশ্বম্ভর সিংয়ের খাস কামরায় এসে পৌঁছলো। প্রকাণ্ড একটা সোফার ওপর লাল ভেলভেটের তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন মহারাজ। ভেলভেটের তাকিয়াটা না থাকলে কে মহারাজ চেনা শক্ত ছিল। শরীরের ঊর্ধাংশ যে পরিমাণ মেদবহুল, নিম্নাংশ তেমনি ক্ষীণ। এ অঞ্চলে গরমটা একটু বেশী—রাত বারটার আগে পাহাড়ের তাপ জুড়োয় না। তাই খালি গায়েই ছিলেন বিশ্বম্ভর। গলায় গার্ডচেনের মতন এক ছড়া মোটা সোনার হার। কাণে দুটো বড় বড় হীরের টপ। কপালে মস্ত একটা চন্দনের ফোঁটা। রং ঘোর কালো। মাথায় চুলগুলো কাঁচা-পাকা, ছোট করে ছাঁটা, টিকিটা দর্শনীয়-ভাবে গাঁঠ দিয়ে বাঁধা। গায়ের রং কালো পাথরের মতন। মুখময় বসন্তের দাগ। চোখ দুটো এত ছোট যে সেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হতে হয়। নাকটা চোখের নিচে থেকেই সুরু হবার কথা। কিন্তু সেটি বহু

স্থান থেকে বেশ খানিকটা দূরে এবং আয়তনে প্রায় একটা বোতামের মতন।

রামায়ণ-মহাভারত পড়ার পর থেকেই রাজা-মহারাজা সম্বন্ধে সুধাংশুর মনে বিশেষ কতকগুলো কল্পনা ছিল। তার কোনটার সঙ্গেই মিললো না। বোকার মতন সুধাংশু কতক্ষণ বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে চেয়েছিল ঠিক নেই, হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা হুংকার জাতীয় শব্দ হোলো। তার পরেই কোট-প্যাণ্ট-পরা দেওয়ান সাহেব বললেন, আইয়ে ডাংদার সা'ব, ইধার তশরিফকা টোকরা লে আইয়ে—

কিসের টুকরি কোথায় নিয়ে যেতে হবে কিছুই বুঝতে পারছিল না সুধাংশু। শুকুলজী বাঁচালেনঃ যাইয়ে, দেওয়ান সা'বকে পাশ বৈঠিয়ে—

বসলো সুধাংশু পাশের একটা কুর্শী দখল করে। দু'একটা প্রশ্ন করলেন দেওয়ান সায়েব। এর আগে কোন্ হাসপাতালে ছিলেন, বিবাহ করেছেন কিনা, এমনি কতকগুলো অবান্তর প্রশ্ন—যার উল্লেখ চাকরির দরখাস্তে সবিস্তারে করা ছিল। মহারাজ কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। তিনি শুকুলজীর সঙ্গে জনান্তিকে আলাপ করতে লাগলেন। কাটলো মিনিট কয়েক দারুণ অস্বস্তির মধ্যে। তার-পর শুকুলজীই বল্লেন, চলিয়ে ডাংদার সা'ব, আপকা কোঠি দেখাউঁ—

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সুধাংশু। মহারাজ আর দেওয়ান সায়েবকে নমস্কার জানিয়ে শুকুলজীর পিছু নিল।

গাড়ীতে উঠে শুকুলজী বললেন, আজ রাত্রে সুধাংশুর খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁর বাড়ীতে। আগামীকাল দেওয়ানজীর কোঠীতে। তার পরদিন স্বয়ং মহারাজের প্রাসাদে। আগের ডাক্তার দিন দুই হোলো চলে গেছেন, সুধাংশুকে কাল সকালেই হাসপাতালের চার্জ নিতে হবে। পরশুর পর থেকে সুধাংশুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজের কোঠীতেই হবে। একজন বামুন, গোটা দুই চাকর, ছ'জন সেপাই...এ সবের বন্দোবস্ত হবে স্টেট থেকেই।

নামেই নেটিভস্টেট। আয় বাংলা দেশের অনেক মাঝারি জমিদারীর চেয়েও কম। খাপরা-ছাওয়া খান তিনেক ঘর, তারি নাম হাসপাতাল। মজুত ওষুধপত্রের মধ্যে টিনচার আইডিন, আইডোফর্ম, বোরিক কটন আর কিছু কুইনিন। কুইনিনও বড় একটা কাজে লাগে না—ভগবানের কৃপায় লোকজনের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল। তবে আইডিন-আইডোফর্ম রাখতে হয়। লোক-জন কাট-খোট্টা, গোঁয়ার গোবিন্দ—মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে।

তৃতীয় রাত্রে খোদ মহারাজার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া।

সকালবেলাই শুকুলজী এসে হাজির। ঠিক সেই কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে নয়। তবে তারই সূত্র ধরে।

"একটি কাজ আপনাকে করতে হবে ডাংদার সা'ব। মহারাজের সঙ্গে যখন খানা-পিনা করবেন, তখন তাঁর মুখের দিকে চাইবেন না।"

'কেন?'

'উনি পছন্দ করেন না।'

'চোখ বুঁজে কথা কইবো?'

'পারলে ভাল হয়। কিন্তু তার দরকার নেই। একটু অন্য দিকে চোখ রেখে কথা বলবেন।'

'কারণটা খুলে বলুন।'

"মহারাজের পুরো খেয়াল আছে যে উনি দেখতে আদৌ খুব খুবসুরৎ ন'ন।"

'তাতে কি?'

"তাতেই তো মুস্কিল ডাংদার সাব। কেউ মুখের দিকে চাইলেই ভাবেন তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। আপনি পরশু রোজ যে রকম চেয়ে-ছিলেন তাতে মহারাজ খুব রাগ হয়েছিলেন।"

"তা হলে তো খাবার নিমন্ত্রণটা বাতিল হওয়া উচিত ছিল শুকুলজী। হোলো না কেন বলুন তো?"

'প্রথম অপরাধ বলে বোধহয় মার্জনা পেয়ে গেলেন। রাত্রে যাবেন কিন্তু—ঠিক আটটার মধ্যে।'

'আপনিও থাকবেন নিশ্চয়ই?'

'সে রকম কোন বন্দোবস্ত আছে বলে জানি না। আপনার কিন্তু জরুর যাওয়া চাই।'

শুকুলজীর কথাই ঠিক। সে রাত্রে খানা কামরায় বিশ্বম্ভর সিং, সুধাংশু ডাক্তার এবং বাবুর্চি-বেয়ারা ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না। কালো জিরের ফোড়ন দিয়ে সাঁৎলানো টক দহির পাত্রে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটা ডুবোতে ডুবোতে এবং তার সঙ্গে কাঁচা মুলো আর ধনেপাতা চিবোতে চিবোতে মহারাজ একটু একটু করে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বম্ভর সিংজী একেবারে সাত্ত্বিক। ডাংদার সাহেবের জন্যে কিন্তু একেবারে আলাদা ব্যবস্থা। গোটা মুর্গীর রোস্ট, সুপ, পুডিং ফ্রাই কিছুই বাদ পড়লো না। তবে দুজনের দুটো আলাদা শ্বেত পাথরের টেবল। শেষ দিকে বড় একটা লাড্ডুর গায়ে দাঁতের কামড় বসিয়ে বিশ্বম্ভর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, পুরুষ মানুষের ছেলে-পিলে হবার বয়স কোন্ পর্যন্ত ডাক্তার সাহাব?'

'তার কি কোন ঠিক আছে মহারাজ? আশি নব্বুইয়েও তো শুনি—'

'শোনা কথায় কাজ নেই। বিজ্ঞান কি বলে? আমার তো পঞ্চাশ হয়ে গেল। আপনাদের দাওয়াই-শাস্ত্রে কি একথা বলে না যে এখনও আমি গদীর কোন ওয়ারিশ রেখে যেতে পারি?'

খুব মুস্কিলে পড়লো সুধাংশু ডাক্তার। মহারাজ নিঃসন্তান এ কথাটা আগেই শোনা ছিল এবং মহারাজের বর্তমান শারীরিক গঠন ও সামর্থ্য যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে এ জীবনে পুত্র মুখ দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হবে বলে মনে হয় না। কি জবাব দিতে পারে সুধাংশু? মহারাজ বুদ্ধিমান লোক।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভাবভাবনার কিছু নেই। সময় নিয়ে ভেবে, শোচ-বিচার করে দেখুন।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—দোষটা আমার তরফের নয়, মানে রাণীজী...

'আজ্ঞে তা হতে পারে বইকি।' একটা ঢোক গিললো সুধাংশু—

'দেখবেন একদিন পরীক্ষা করে?'

'হুকুম হলে নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু, এর আগে, ডাক্তাররা কি কেউ দেখেন নি?'

'ও সব বাৎ ছোড় দিন।' এবার ঢোক গিললেন মহারাজ বিশ্বম্ভরঃ আপনি নয়া জমানার ডাংদার, লণ্ডন তক ঘুরে এসেছেন—আপনি দেখলেই আমি খুশী হই—

'মাফ করবেন, রাণী-মা'র বয়স কত?'

'কত আর! আমার চেয়ে দু'চার বছরের ছোট হবে—ব্যাস্।'

'তা হলে আর দেখবার দরকার নেই, রাজা সাহেব—'

'লেকিন—'

'দৈবাতের কথা বলা যায় না। কিন্তু সাধারণতঃ মেয়েরা এই বয়সে—'

বিশ্বম্ভর সিং আর কোন কথা না বলে হাতের লাড্ডুর শেষ টুকরোটায় জোর করে কামড় দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে শুধু হুংকার জাতীয় একটা শব্দ হোলো।

শব্দটা তাঁরই মুখনিঃসৃত।

কিন্তু রাগটা কার ওপর—রাণীজীর না ডাক্তারের, সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

সুধাংশু ক্রমে ক্রমে এখানকার জীবন সম্বন্ধে এক রকম মানিয়ে নেয়। মানিয়ে নেওয়া মানে সকাল বেলায় রুগী দেখা, দুপুরে ঘণ্টা তিনেক ঘুম, বিকেলে রাজার সঙ্গে মিনিট পনের দেখা-সাক্ষাৎ—তাঁর কি কি দরকার (দরকারী জিনিষ-গুলোর মধ্যে চকোলেট, ভাল সেণ্ট, সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যই প্রধান এবং সেগুলো কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে আনাবার ভার ডাক্তার সাহেবের) সেগুলো জেনে নেওয়া, সন্ধ্যার মুখে তহশীলদার কিংবা শুকুলজীর বাড়ী গিয়ে টেনিস খেলা, সেখান থেকে দেওয়ানজীর বাংলোয় এক পেগ—ব্যাস। রাজ-বাড়ী আর গোটা কয়েক উপরওয়ালা কর্ম-চারীকে বাদ দিলে দারিদ্র্য যে কত উৎকট হতে পারে তা এখানকার সাধারণ লোকগুলোকে না দেখলে বোঝা যায় না। সেপাইদের মাইনে মাসে ছ'টাকা। এ টাকা আবার মহারাজার নিজের টাকশালে তৈরী। চাকরদের মাসিক বরাদ্দ তিন মুদ্রার বেশী নয়। আহার্য জোয়ার কিংবা বজরার রুটি, শাক কিংবা লাউ সিদ্ধ, শুকনো লঙ্কা। বড় জোর খানিকটা মোষের দুধ কিংবা সেই দুধের ঘোল দই। মাছ পাওয়া যায় না, মাংসের চলন আছে—তবে অফিসাররা ছাড়া কেনে না। এরই পাশে রাজ-বাড়ী আর দেওয়ানজীর বাড়ী—মাখন মসৃণ ফ্রিজিডেয়ারের বিস্কুট, 'হেল হ্যাণ্ড এণ্ডারসনের' পাড়ার কেনা-কাটা জিনিষ, 'আর্মি অ্যাণ্ড নেভি' থেকে আনা জেলি 'ক্রিস্টালাইজড' ফল, বাজারের দোকান থেকে আনানো আখরোট কিসমিস মনাক্কার ছড়াছড়ি। বিস্কুটের টিন আর মেয়ের জিনিষগুলো ডাক্তার সায়েবকেই কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে আনাতে হয়। এগুলোও রাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গ।

মাস ছয়েক পরের কথা। হঠাৎ শোনা গেল, পলিটিক্যাল এজেন্ট আসছেন। উপরওয়ালা কর্মচারী-মহলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ব্যাপার কি? মাত্র কয়েক মাস আগে মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এজেন্ট সাহেব অনুগ্রহ করে রাজ্য পরিদর্শন করে গেছেন। আবার এরি মধ্যে?

ব্যাপারটা কিন্তু বাইরের লোক কিছুই বুঝতে পারলো না। অন্ততঃ সুধাংশু ডাক্তার পারলো না। তার পর একদিন স্বয়ং বিশ্বম্ভর সিং কুঠি পাহাড় দেখতে বেরোলেন প্রকাণ্ড রোলস রয়েস চড়ে। সঙ্গে দেওয়ানজী,

আট নম্বর

(১৩৫ পৃষ্ঠার পর)

ডিসপেপশিয়াগ্রস্তা মৃত্যুপথযাত্রিণী স্বামীজীর বৌর কথা মনে করে দুঃখ হলো। বল্লাম "চল্ তোর বৌকে দেখে আসি স্বামীজী।"

স্বামীজী বল্লে "থাক্। ও রূপ আর তোর দেখে দরকার নেই।"

বল্লাম "বেশ, নাই বা গেলাম দেখতে। কিন্তু বৌকে এবারে ভালো ডাক্তার দেখা, মাছ, দুধ আর ফলটল খাওয়া, ওঁর এখন বিশ্রাম আর পুষ্টি বিশেষ দরকার। বিশেষ করে অ্যানিমিয়া যখন বলছিস্—"

স্বামীজী বল্লে, "থাক্ থাক্। পরস্ত্রীর জন্যে অতো মাথা না-ই বা ঘামালি। তোর বৌকে তুই ও সব করিস্। আমার বাপের জমিদারিও নেই মোটা মাইনের অফিসারিও করিনে। অত টাকা জুটবে কোত্থেকে?"

বল্লাম, "আমি তোর ছেলেবেলার বন্ধু স্বামীজী। আমাকে তুই পর ভাবিস্নে। তোর বৌর জন্যে সবরকম সুব্যবস্থা তুই কর্, যা টাকা লাগে আমি দেবো। মাস গেলে অনেকগুলো টাকা আমার পকেটে আসে—ব্যাচেলর মানুষ আমি, কতটুকুই বা আমার দরকার?"

স্বামীজী জানালে সে গরীব, কিন্তু ভিখারী নয়।

আমি বল্লাম, "বেশ তো, না হয় তোকে আমি ঋণই দিচ্ছি।"

স্বামীজী বল্লে, "যে ঋণ শোধ করতে পারবো না জানি সে ঋণ আমি গ্রহণ করিনে।"

সেই মুমূর্ষু মহিলার শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে বল্লাম, "কিন্তু তাহলে তোর স্ত্রীর কি রকম ব্যবস্থা করবি?"

স্বামীজী বল্লে, "সে হবে 'খন। এই তো প্রথম নয়। এর আগে সাতবার তো ব্যবস্থা যা করবার আমিই করেছি। তুই তখন ছিলি কোথায়।"

দেখলাম আমার কাছে কোনোরকমে ঋণী থাকতে রাজী নয় স্বামীজী। এবং পরস্ত্রী সম্বন্ধে আমার মাথাব্যথাও তার অপছন্দ। অতএব রণে ভঙ্গ হয়েই বিদায় নিতে হলো। বিদায় নেবার আগে বল্লাম, "তোকে আবার বলছি স্বামীজী, বিশ্বাস কর্, তোর আট নম্বর সন্তান সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তা সব মিথ্যে, সব ফাঁকি। আমার মিছে কথাকে সত্যি ভেবে তুই তার প্রতি অবিচার করিস্নে। মোটেই সে অলক্ষুণে নয়, মোটেই—"

"ফলেন পরিচীয়তে।" বল্লে স্বামীজী। তারপর আর কিছু না বলে' চলে' গেল।

এর কিছুদিন পর অফিসেরই কাজে কয়েক-মাস বাইরে ঘুরতে হলো। ফিরে এসে মনে হলো স্বামীজীর স্ত্রীর হালের খবরটা একবার নেওয়া দরকার। অফিস ছুটির পর দেখা করলাম। বল্লাম, "ছেলেপুলেরা কেমন আছে? বৌ কেমন?"

স্বামীজী বল্লে, "বৌ তো নেই ভাই। গেল মাসে হঠাৎ এক রাত্তিরে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে মরে গেল।"

গর্ভস্থ আট নম্বর শিশুটির খবর বাংলা ভাষায় শুধালে স্বামীজীর কানে অশ্লীল বলে' মনে হতে পারে, তাই ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করে' বল্লাম, "আর চাইল্ড?"

স্বামীজী বল্লে, "মাকে নিয়ে একসঙ্গেই গেল। তবু তুই বোঝাতে চেয়েছিলি সে অলক্ষুণে নয়! না জন্মাতেই মাকে খেলো, জন্মালে হয় তো—"

পাঞ্জাবীর বুকের বোতামগুলো সব লাগানো ছিল না স্বামীজীর। হঠাৎ পাঞ্জাবীর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম ওর বুকে দুলছে দেহারা চেহারার একখানা মাদুলি। এ মাদুলি আগে দেখিনি।

স্বামীজী বল্লে, "মঙ্গলচণ্ডী মাদুলি। ফাঁড়া কাটাবার জন্যে ধারণ করেছিলুম ভাই।"

আমি বল্লাম, "এবারে খুলে ফেলতে পারিস্। আট নম্বরের ফাঁড়া তো কেটেই গেল।"

"বড্ড জাগ্রত মাদুলি ভাই।" বল্লে স্বামীজী। "কিন্তু ভাই বড্ড ভাবনায় পড়েছি আমার মাতৃহারা শিশুগুলোকে নিয়ে। কি করে যে এদের একটা হিল্লে করি।"

মাতৃহারারা আর বেশীদিন মাতৃহারা থাকবে বলে মনে হলো না।

পেরেক

(১৩৭ পৃষ্ঠার পর)

মনের সাচ্চা হুক্ চাই-ই চাই। এটেই দিচ্ছে শিল্পের দৃঢ়তা, চরিত্র। কাছ থেকে দেখো কিংবা দূরের ভিয়ূ নাও—দেখবে স্থির সুন্দর।

তুমি বলবে, এ সব অলঙ্কারের কথা। কিন্তু জীবনটাই তো অলঙ্কার, উৎপ্রেক্ষা। কাজেই মেটাফরিকাল পেরেক থাকবেই। প্রেয়সীর চুল সুন্দর, চাউনি মধুময়। কিন্তু সুকেশী শিরশোভা নির্ভর করছে কবরীর কাঁটায়, দৃষ্টির মদিরতা নির্ভর করছে আবেগের মোহন পেরেকে। তোমার মুগ্ধ কামনা ঘুরছে একটি ছোট্ট অভিলাষের অদৃশ্য কাঁটায়। এই রকম চলে যাও ঘুরে-ফিরে জীবনের বড় রাস্তায় বা অলি-গলিতে। দেখবে সর্বত্রই পেরেক, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেরণার ছোট বড় মাঝারি পেরেক। নেপোলিয়নের পেরেক সর্ব-গ্রাসী জয়, গগ্যাঁর হল আর্ট। রবীন্দ্রনাথ তথা যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির অবলম্বন হল অস্পৃশ্য পলাতক মুহূর্তের নিঃসঙ্গ অনুভূতি। উপলক্ষ না থাকলে সৃষ্টি সার্থক হয় না। [illegible] বড় শিল্পী খোঁজেন একটা মনের মতন পেরেক, যেখানে অনন্তকালের অসীম জিজ্ঞাসাকে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। কবিই বল আর কথা-সাহিত্যিকই বল, বিষয়ের খোঁটার সঙ্গে রচনার টিকিটি বাঁধা। বিশেষ করে, তোমাদের রম্য-রচনার লেখকদল। একটি পেরেক না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা অস্থির, বিশ্ব-সৃষ্টির বালুবেলায় তাঁরা সন্ধান করছেন একটি নগণ্য, কিন্তু নতুন সাবজেক্ট। সাহিত্যের বাজারে অনেক মেকি পয়সার চলাচল। কেবল জহুরী চোখের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে অনাদৃত খাঁটি পেরেক, মানে অবাবহৃত উপজীব্য।

সাহিত্যিকের সাধনা নিষ্কাম হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু শূন্য পকেটের বিড়ম্বনাও নিরর্থক নয়। তাই অসারে বলু, সংসারে সাহিত্যিক জড়িয়ে ধরেন খাঁসালো কাগজের সম্পাদকীয় খোঁটা। ব্যবসায়ী পাকড়ান ক্যাপিটালিস্ট, শিক্ষক ধরেন ছাত্র, উকিল ধরেন মক্কেল। চাহিদাটা পারস্পরিক, তাই খোঁটায় খোঁটা বাঁধা। দড়ি জোগাড় করে দেন মুনাফার দালাল। এইভাবে লেখক-প্রকাশক, মনিব-চাকর, স্বামী-স্ত্রী, নেতা-জনগণ—মানে সংসার-সমাজ সব [illegible] পেরেকে লটকানো রয়েছে। মধ্যে মধ্যে [illegible] নাড়ায়, নাগাল পায়, খুশি হয় আবার টোকা খাক [illegible] হয়, সরে আসে—এই আর কি! চোখ বুজলেই দেখি—পেরেকের রাজ্য। ভারি তামাসার ব্যাপার হে! তামাসা নয় তো কি!

মনে কর—কড়িকাঠে ইংরেজি এল অক্ষরের মতন পেরেক লাগানো। সেখানে দড়ি ঝুলিয়ে ব্যর্থ প্রেমিক দোদুল্যমান। কিংবা পত্রিকার অফিস, তার দেয়ালে এক বিরাট গজাল পেরেক। পেরেকের মাথাটা হল টেকো সম্পাদকের। সেই পেরেকে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন যশঃপ্রার্থী লেখক। এ ছবি যদি পছন্দ না হয়, তবে উল্টে দাও। পেরেকটাই লেখকের মুণ্ডু। চতুর প্রকাশক তার গলায় দড়ি দিয়ে দিব্বি আরামে কেদারায় বসে হিসেব মিলাচ্ছেন। এডিশানের পর এডিশান হু হু করে কাটছে, প্রকাশক ষোল আনা মুনাফা নিজের তহবিলে টানছেন আর লেখককে বলছেন, বাজার বড় মন্দা। কি করি বলুন! একখানাও বিক্রি হয়নি গত তিন মাসে...'

এই রকম কত পেরেকে কত লোক ঝুলছে, কত আশা-ভরসা দুলছে, কত বা ভেঙে পড়ছে,—মনে মনে সব দেখতে পাই। তোমার তো সংসার হয়েছে, তুমিই বল না। আজ থেকে বিশ বছর পরে কল্পনা করো, কাজ করে করে তোমার চেহারা হয়েছে হাড়গিলের মতন। গিন্নীটি হয়েছেন চাল-কুমড়ো। অর্থাৎ ভুঁড়িকে [illegible] পাম্পকিন। তুমি তখন সংসারের একটি মাত্র উপার্জনশীল খোঁটা। তোমার কাঁধেই সব ঝুলছে। কিন্তু কতদিন এ ভাবে সামলাবে? ক্রমে জীবনবৃত্ত স্বামীর মাথাটি যেন দেয়ালে গাঁথা জীর্ণ শীর্ণ নড়বড়ে পেরেক। তাঁর গলায় কৌশলে অনেকগুলি ফাঁস পরানো হয়েছে—শালাদের পরিবার, বাজার খরচ, পুত্রকন্যার দল একটি [illegible] ঝুলছে ওই ফাঁসে। [illegible] বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু নিরুপায়। যদি হঠাৎ [illegible] হাঁড়ির মতন দুম্ করে পড়ে ভেঙে যায় সব, তেমন সময়ে পেরেক—স্বামীটির মুখে [illegible] আবার একটু অন্য জায়গায় সরিয়ে ঠুকে বসালে ঐ মরচে ধরা জিনিসটাই কাজ চালাতে পারে। নয় কি? ভেবে দেখো—পেরেক ছাড়া জগৎ নেই, শিল্প নেই, সমাজ নেই, মনও নেই—মানে জীবনের অস্তিত্ব।

আজকালকার ছেলেরা খুব চালাক। পড়া-শুনো করুক না করুক, সিনেমা আছে, পলিটিক্স আছে, এতেই চলে যাচ্ছে। ওগুলো [illegible] পেরেক। আর আজকালই পেরেকও আছে একএকটি। কারুর রমা, কারুর [illegible] [illegible]। চায়ের পেয়ালায় সিগারেটের ধোঁয়ায় [illegible] দেখা যায় ঐ সব সোনালি পেরেকের ঝলমলানো দীপ্তি। আবার দেখ সিনেমার ইস্তাহারই সত্য। বাস্তব জীবনেও প্রেম পেরেক, তবে সেই পেরেক জোগাড় করে নিতে হয় যেন-তেন-প্রকারেণ, এ তত্ত্বজ্ঞান ওদের হয়েছে। তা সে ক্যালেন্ডারের পাতায় হোক আর হৃদয়ের খাতায়ই হোক, তা হলে বোঝো পেরেকের গুণ। একটি খোঁচা না দিলে কিছুতেই [illegible] দেওয়া যায় না। বিশ্বের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা ভাবো আমার মাথার ব্যালেন্স নাই। খুব সম্ভব ব্যালেন্স আছে হে, আর আছে বলেই ত ওই পেরেক নিয়ে শূন্যে ঠিক ঝুলে আছে।

ক্রীড়াকুশলীর জীবনপঞ্জীতে

ক্রিকেটে অনিশ্চয়তা

অধ্যাপক শৈলজা রায়

ক্রিকেট খেলায় ভালভাবে ব্যাটিং বা বোলিং করে খেলোয়াড়েরা সাধারণতঃ দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়। ব্যক্তিগত নিপুণতা প্রদর্শনের পরও কেউ কেউ দর্শকদের অভিসম্পাত কুড়িয়েছেন, এমন নজীরও আছে।

আমি নিজেই একবার দর্শক আসনে বসে মনে মনে অদ্বিতীয় বোলার বালুর 'মুণ্ডপাত' করেছিলাম। বালুর অপরাধ ছিল এই যে, তিনি সেদিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বোলিং করে অল্প রাণে ও স্বল্প সময়ে বিপক্ষের অনেককে আউট করে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে অমর খেলোয়াড় 'রণজি' এসেছিলেন কলকাতায়। সঙ্গে ছিলেন ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় এ সি ম্যাকলারেণ, ই টি কিলিক, এ ই এবং আর ই রেলফ ও সিমস। এই সব কীর্তিমান খেলোয়াড় নিয়ে যোধপুরের মহারাজা এক দুর্ধর্ষ দল গঠন করলেন।

স্থির হলো, কলকাতায় নাটোরের মহারাজের দলের সঙ্গে যোধপুর দলের দু' দিনব্যাপী ম্যাচ হবে নাটোর পার্কে। নাটোর দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন তখনকার দিনের সেরা ভারতীয় খেলোয়াড়েরা, যথা বালু, ভিঠল, ওয়ার্ডেন, এম ডি পাই, কে এস সেসাচারি প্রমুখেরা।

আমরা তখন ছেলেমানুষ। ক্রিকেট সম্পর্কে সবে একটু আধটু উৎসাহ জেগেছে। আর কাউকে না হোক রণজিকে তো একবার দেখতে হবে। সুতরাং দল বেঁধে চললাম নাটোর পার্কে।

প্রথম দিনে যোধপুর দলই ব্যাট করতে নামলো, আমাদের আর প্রতীক্ষা সইছে না, কতোক্ষণে রণজি মাঠে নামেন। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে চলেছে, মনোবাঞ্ছা কিছুতেই পূরণ হয় না। নাটোরের সেরা বোলারেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও সমস্ত দিনেও বিপক্ষের দুজনের বেশী তিনজনকে আউট করতে পারলেন না। ই টি কিলিক ৯৪ রাণ করে সেদিনের মত অপরাজিত থেকে গেলেন।

বাড়ী ফেরার আগে স্কোরবুকে একবার উঁকি মেরে দেখেও নিলাম যে, রণজি কখন নামবেন। দেখি যে রণজির নামের পাশে ক্রমিক চিহ্ন রয়েছে ছয়। অর্থাৎ আরও দুজন খেলোয়াড় বিদায় নেবার পর রণজির মাঠে

(শেষাংশ ১৫০ পৃষ্ঠায়)

প্রেরণার উৎস

শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবর)

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশনে পূর্ণ-স্বরাজ লাভের সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল সেই অধিবেশন উপলক্ষেই কংগ্রেসমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় পেশাদার মল্লবীর কাল্লু বনাম করীম বক্সের কুস্তি।

এ কুস্তির উদ্যোক্তা ছিলেন কোচবিহারের পরলোকগত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। কাল্লু ও করীম বক্স, দুজনেরই তখন খুব নামডাক। মহাবলী কিক্কর সিং ছাড়া তখন ভারতে এ দুজনের সমান জোরের পালোয়ান আর একটিও ছিলেন না।

কাল্লু ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গোলাম পালোয়ানের অনুজ এবং তাঁরই প্রিয়তম সাকরেদ আর করীম বক্স পেশোয়ারী কুস্তি শিখেছিলেন কিক্কর সিংয়ের গুরু বুটা পালোয়ানের কাছে।

দুজনেই লাহোরের অধিবাসী; কলকাতার আগে কমপক্ষে তাঁরা তিনবার পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু তবুও দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর সে প্রশ্নের ফয়সালা হয়নি।

[illegible]

[illegible]

তাঁদের [illegible] করীম বক্সের কুস্তির দিন কংগ্রেস-মণ্ডপে হাজির হলাম।

বাবা এবং আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন সেদিন তাঁদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, এ লড়াইয়ে করীম বক্সই জিতবে। করীম বক্স আমাদের আখড়ার পালোয়ান ছিলেন বলেই যে

(শেষাংশ ১৫০ পৃষ্ঠায়)

শুভ তেইশ

শ্রীবলাইদাস চ্যাটার্জি

তেইশ সংখ্যাটাকে নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামিয়েছে কিনা জানি না, তবে আমি কখনো ওটাকে ভুলতে পারবো না।

১৯২০ সালের ২৩শে অক্টোবর আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। তখন বয়সও ছিল আমার তেইশ, এইদিনে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করে দার্জিলিং জেলা এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় আমি ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছিলাম।

ঘটনাটি মনে রাখার প্রধানতম কারণই হলো আমাদের সম্পর্কে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরূপ মনোভাব। খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ এ্যাথলেটিকসে তখন ওদের খুবই প্রতিপত্তি। দেশীয় ভাল প্রতিযোগিতাতেই তারা পায় শীর্ষস্থান আর এই সাফল্যের গর্বেই যেন তারা তখন 'কালা নেটিভদের' মানুষ বলেই গণ্য করে না।

[illegible]

প্রতিযোগিতার দিন মাঠে গিয়ে দেখি হাজারে হাজারে সব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দর্শক উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালীও যাঁরা আছেন, সংখ্যায় নিতান্তই অল্প বলেই তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তিমিত। দর্শকদের দিকে

(শেষাংশ ১৫২ পৃষ্ঠায়)

খেলার মাঠে জাতীয় সরকার

অজয় বসু

দেশ আজ এগোচ্ছে। ভারতভূমিকে কল্যাণভূমিতে পরিণত করার সংকল্পে রাষ্ট্রের সৃজনীশক্তি আজ দিকে দিকে নিয়োজিত, জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ আবিষ্কারের প্রয়াসে নব নব পরিকল্পনাও গৃহীত হ'লো। এই আয়োজনের মাঝখানে খেলাধুলোর স্থান কোথায় হতে পারে সে কথাটা চিন্তা করা দরকার।

খেলাধুলোয় মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করতে, নির্মল আনন্দ উপভোগের অফুরন্ত সুযোগ উপস্থাপিত করতে এর জুড়ি নেই। নিত্য পরিবর্তনশীল এই দুনিয়ায় নব নব সমস্যার আবির্ভাবে মানুষের সহজ চলার পথ রুদ্ধ ও কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। জীবন-সংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে, অপ্রয়োজনীয় কোনও কিছুতে হাত দেবার, মন দেবার ফুরসত তার নেই, তবুও মানুষ খেলাধুলোর আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেনি, পারেনি ক্রীড়াঙ্গনের স্নিগ্ধ মধুর আবেদনকে ভুলে যেতে।

না পারাই স্বভাবধর্ম, কারণ খেলাধুলো যে অপ্রয়োজনীয় বিলাস নয়, সুস্থ জীবন যাপনের পথ খেলাধুলোর মাধ্যমেই যে প্রশস্ত হয়ে উঠতে পারে একথা অনস্বীকার্য। খেলাধুলোর সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও আছে। একথা আজ নয়, বিস্মৃত যুগেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁদেরই নিষ্ঠায় একদা পাণ্ডব-কুরু বালকদের ক্রীড়াভূমিতে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতো, অলিম্পিয়ার প্রান্তরে অংকুরিত হোতো মৈত্রী ও শান্তির বীজ।

পূর্বপুরুষদের এই বোধশক্তির নজীর উত্তরকালকে পুরানো কথা নতুন করে জানতে বুঝতে নির্দেশ দিয়েছে, নতুনতর পরিপ্রেক্ষিতে সেকথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। তাই দেখি আজ খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এ আলোড়নের বন্যায় ভেসে ভেসে দূরের মানুষ এসেছে কাছে, মত আর পথের ব্যবধান গিয়েছে ঘুচে।

এ আলোড়ন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত নয়; পৃথিবীর সুদূরতম কোণেও তার স্পন্দন অনুভব করা যায়। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা প্রাণের আবেগে মেতে রয়েছেন খেলাধুলার আসরে।

ওয়ারশ'র ক্রীড়াঙ্গণে বিশ্ব-যুব হকি প্রতিযোগিতায় জয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়দের সহিত বিশ্ববিশ্রুত এ্যাথলেট এমিল জ্যাটোপেক। ক্রীড়া-প্রতিনিধিদলের অধিনায়ক উধাম সিংয়ের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা।

ফটো—ভুবনেশ্বর পাণ্ডে

খেলাধুলোর এই আসরে ছড়ানো রয়েছে জাতির চরিত্র ও স্বাস্থ্য গঠনের অপরিমিত সুযোগ। হয়তো একথা উপলব্ধি করেই 'ভারত-ভাগ্য বিধাতা' কেন্দ্রীয় সরকার এতোদিনে স্বীকার করেছেন যে, খেলাধুলো ঠিক হেলাফেলার বিষয় নয়।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্পোর্টস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের উদ্যোগে ক্রীড়া শিক্ষণ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্যম দেখা দিয়েছে। এঁদেরই নির্দেশে ভারত সরকারের তহবিল থেকে খেলাধুলোর প্রসার ও উন্নয়নকল্পে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হলো, বিদেশ থেকে আনানো হলো মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞকে।

এ প্রচেষ্টা আশ্বাসজনক, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। খেলাধুলোর পৃষ্ঠপোষকতার নামে সরকারী তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা ভাল, যদি সেই অর্থ প্রকৃতই খেলা আর খেলোয়াড়দের কল্যাণে ব্যয় করা হয়, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এদেশে আনানোর রীতি সমর্থনীয়, যদি সেই বিশেষজ্ঞ প্রদর্শিত পথ নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করা হয়, বিদেশে এদেশের ক্রীড়া প্রতিনিধিদল পাঠানোর দৃষ্টান্ত আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা যায়, যদি সফরকারী ভারতীয় প্রতিনিধিরা বিদেশে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভে সচেষ্ট থাকেন এবং আদর্শ খেলোয়াড়োচিত আচরণে বিদেশীদের অন্তর জয়ে সমর্থ হন।

কিন্তু আমাদের দেশে সরকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় বছর বছর খেলাধুলোর নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়ে থাকে সে টাকাটা কি ব্যাপক কল্যাণকর, গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হচ্ছে? ভারতের ক্রীড়া প্রতিনিধিরা কি প্রকৃতই শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে যান, না শিক্ষা দেবার সংকল্পে বিদেশী দলগুলোকে এদেশে আনানো হয়? বিদেশে আমাদের ক্রীড়া-প্রতিনিধিদের আচরণই বা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে কতটা? হেলসিংকির ইতিহাস তো ভোলবার নয়, বিস্মৃত হবার নয় ওয়ারশ ও মিলানে ভারতীয় সাইক্লিস্ট দলের সদস্যদের সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানা।

খেলাধুলোর প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হবে, মাঝে মাঝে ধ্বনিত হবে ক্রীড়া-জগতের উন্নতি সম্পর্কে সরকারের দায়িত্বের কথা, অথচ সুষ্ঠু পরিচালনাকল্পে সক্রিয় ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হবে না, খেলাধুলো রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবে না, এ যুক্তি তো সমর্থনযোগ্য নয়।

জাতীয়করণের যুগে খেলাধুলোই বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হবে না কেন? খেলাধুলো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত করার বিরোধী পক্ষরা এপ্রসঙ্গে বৃটেন বা আমেরিকার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু নজীর তো সোভিয়েট দেশেরও আছে, আছে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়ার। রাষ্ট্রের পরিচালনায় সে সব দেশের প্রতিনিধিরা আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এঁদের দৃষ্টান্ত কি শিক্ষণীয় নয়?

এসব নজীরের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়

ষোড়শ বিশ্ব-অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান কেন্দ্র মেলবোর্ণ স্টেডিয়াম। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠে ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

যে খেলাধুলো সম্পর্কে বৃটেন বা মার্কিণ মুলুকের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী আর আমাদের বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমান নয়, ওদেশের ক্রীড়াজগতের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ আর এদেশের ক্রীড়া সংস্থা চালানোর নীতি এক নয়। খেলোয়াড়দের সম্পর্কে ওদেশে বিশেষ করে বৃটেন বা আমেরিকার প্রচার সকল হয়েছে খেলাধুলো সেখানে ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পক্ষান্তরে আমাদের দেশে খেলাধুলো পর্যবসিত হয়ে আছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বিলাসে। তারাই যাঁরা খেলাধুলো নিয়ন্ত্রণ করেন, সরকারী নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে খেলা আর খেলোয়াড়দের ভাগ্যের চাবি হাতে রয়েছেন ক্ষমতা আর কায়েমী স্বার্থ অনুকূল মাথায় খেয়ালে মশগুল।

জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থের অপচয় এবং ক্রীড়া-জগতে দুর্নীতির প্রশ্রয়ে এই খেয়ালের খেসারত দিতে হয়েছে, ফলে খেলাধুলোর মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র ও স্বাস্থ্য গঠনের যে সম্ভাবনা ছিল সে সম্ভাবনা ক্রমশঃই অন্তর্হিত হবার উপক্রম ঘটছে।

মুষ্টিমেয়ের খেয়ালের খেলা বন্ধ করে খেলার মাঠকে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার শক্তি ও অধিকার আছে একমাত্র রাষ্ট্রের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এ বিষয়ে প্রশ্নে কুণ্ঠিত। রাষ্ট্রের এই নিরপেক্ষ দুর্বল নীতির ফলে আরও দুর্যোগ ও সময় নষ্টের আশংকা থেকে গিয়েছে।

হয়তো অমূল্য সময় নষ্টের বিষয় সম্পর্কে সচেতন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশেষে স্টেডিয়াম নির্মাণ ও খেলাধুলো নিয়ন্ত্রণকল্পে কলিকাতা ক্রীড়া বিলটিকে বিধিবদ্ধ করেছেন। যে আকারে ও যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিলটি উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয়েছে তা অবশ্য নিখুঁত বা আদর্শস্থানীয় নয়।

রাজ্য সরকার বাংলা দেশের খেলাধুলোর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কামনা করেছেন, কিন্তু প্রস্তাবিত ক্রীড়া বিলের ধারা-উপধারায় অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদদের, বিশেষজ্ঞদের নব পরিকল্পিত আয়োজনের মাঝখানে যথাযোগ্য আসন গ্রহণে আহ্বান জানানো হয়নি। রাজ্য সরকার চেয়েছেন বাংলার ক্রীড়াজগতের আভ্যন্তরীণ দৈন্যদশা ঘোচাতে, কিন্তু বিরাট রাজ্যের গোশালা পরিষ্কার করতে হলে স্তূপীকৃত পচনশীল আবর্জনা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজনে সবার আগে যে দরকার পুরানো ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার করা, একথাটি সরকারী বক্তব্যে স্বীকৃত হয়নি, বরং পুরানো কাঠামো প্রায় অবিকৃত রাখার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। কলিকাতা ক্রীড়া বিলের মূল বক্তব্যের এই অসঙ্গতি ত্রুটিকেই সবচেয়ে বড় বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু এ অসঙ্গতি সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের এই প্রয়াসকে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করি, ক্রীড়া পরিচালনা ও উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকারের এই উদ্যমকে স্বাগত জানাই। খেলাধুলো সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নীতি কিছুটা কুণ্ঠিত হলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের মতো তা দুর্বল অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট নয়। বিশ্বাস করা যায় যে, হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভের পর ভবিষ্যতে একদিন রাজ্য সরকার আজকের কুণ্ঠাভাবও ত্যাগ করতে পারবেন।

বাংলা দেশে বিবিধ খেলাধুলোর আদর যেমন বেশী তেমনি ভারতের এই প্রান্তেই খেলোয়াড় চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে সর্বাধিক, খেলোয়াড়োচিত ধর্মের লাঞ্ছনা ঘটেছে নিত্য, খেলাধুলোর মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের অঙ্গীকার ভাঙ্গা হয়েছে অবহেলায়। তাই বাংলা দেশের মাঠ ময়দানকে দুর্নীতিমুক্ত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও সর্বাগ্রগণ্য।

ভারতের জাতীয় খেলাধুলোর ইতিহাস এখনও প্রণয়ন করা হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে উপযুক্ত ক্ষণে ইতিহাস রচয়িতারা একদিন খেলাধুলোর মাধ্যমে জাতি গঠনে পথিকৃৎ হিসাবে পশ্চিম বাংলাকে অভিনন্দিত করতে পারবেন বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়। এখানকার ক্রীড়া জগতের পঙ্ককুণ্ড থেকে যুব-বাংলাকে টেনে তুলে আদর্শ পথে পরিচালিত

(শেষাংশ ১৫০ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

প্রেরণার উৎস

(১৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এ ধারণা মনে দানা বেঁধে উঠেছিল তা নয়। প্যাঁচ প্রয়োগে করীম বক্সের তখনকার দিনে জুড়ি ছিল না কেউই। এক অবস্থায় পড়ে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি এমন সুকৌশলে দাঁও কষতে পারতেন যে, তাঁর পরাজয়ের বিষয় চিন্তা করাটাও যেন ছিল অকল্পিত।

করীম বক্স পেরলেওয়ালাকে সম্ভাব্য বিজয়ী ভেবে আমার বাবা সঙ্গে করে একছড়া মোহর, নগদ আড়াইশ টাকা আর একখানা দামী কাশ্মিরী শাল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, কুস্তি শেষ হলে নিজের হাতে বিজয়ীকে তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার উপহার দেবেন।

কুস্তির দিনে প্রায় দশবারো হাজার দর্শকের ভীড়ে মণ্ডপটি একেবারে ভরে গিয়েছিল। আমাদের আসন ছিল একেবারে রিংয়ের ধারে, যে অঞ্চলটিতে কাল্লু পালোয়ান তাঁর জামা-কাপড় ছাড়ছিলেন।

নির্দিষ্ট ক্ষণে দুজন পালোয়ান এলেন। প্রতিপক্ষের তুলনায় কাল্লুকে একটু চঞ্চল দেখাচ্ছিল, মণ্ডপে ঢুকেই তিনি ডাক ছাড়লেন "আলি হায়দার। গোলাম হাজির!" গোলাম তাঁর গুরুর নাম আর ইষ্টনাম জপের মতোই দংগলের আগে সব মুসলমান পালোয়ানেরা 'আলি হায়দার' বলে থাকেন।

রিংয়ের পাশে আর এক কোণে করীম বক্সও ততক্ষণে তৈরী হচ্ছেন, তাঁর কণ্ঠস্বরও শোনা গেল 'আলি হায়দার!'

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণই ছিলেন এই কুস্তির বিচারক। নির্দিষ্ট সময়ে ডাক দিতেই কাল্লু পালোয়ান একলাফে প্রায় পাঁচফুট উঁচু দড়ি ডিঙিয়ে আখড়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পাঁয়তারা ক'রে আখড়ার মধ্যে কাল্লুর লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যটা হয়েছিল চমকপ্রদ। অতো বড় একজন জোয়ান, প্রায় ছ' ফুট মাথায় লম্বা, তিনমণের ওপর দেহের ওজন, অতোটা উঁচু লাফাতে পারবেন একথা কে ভেবেছিল।

কাল্লু পালোয়ানের মতোর মধ্যে কিছু একটা ছিল, আখড়ায় নেমে সেটা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়ায় উত্তেজিত করীম বক্সও দড়ি ডিঙিয়ে আখড়ায় নেমে কাল্লুর গায়ে ছুঁড়লেন গুঁড়ো মাটী।

কাল্লু পালোয়ান এইদিনও তাঁর বরাবরের অভ্যাসের মতো গায়ে সুগন্ধি আতর মেখে আখড়ায় নেমেছিলেন, তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র অনুষ্ঠান কেন্দ্রটি আতরের সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠে। ওদিকে মাটী ছোঁড়াছুঁড়ির মাধ্যমে দুই মল্লের মেজাজ তখন সপ্তমে গিয়ে চড়েছে এবং দর্শকেরাও হয়ে উঠেছেন উত্তেজিত।

এবার কুস্তি সুরু হলো। কয়েক সেকেণ্ড ঠেলাঠেলির পর কাল্লু প্রতিদ্বন্দ্বীর গর্দানে এক পালোয়ানী হাত মারার করীম বক্স একটু বেসামাল হয়ে পড়তেই কাল্লু প্রতিদ্বন্দ্বীকে বগলভরে প্যাঁচ করে তাঁকে প্রায় আখড়ার বাইরে ঠেলে দেন।

করীম বক্স ছিলেন মস্তো প্যাঁচিয়াল, তাঁর দেহও প্রায় তিনমণ ওজনের। তাছাড়া সুগঠিত পেশীবহুল শরীরখানি দেখলে তাঁর গায়ের জোরের কথা প্রথমেই মনে পড়তো। বেসামাল অবস্থায় মাটীতে পড়ে যাবার সময়ও করীম বক্স 'টাং' প্যাঁচ করার উদ্দেশ্যে হাত ফাঁসিয়ে পা লাগিয়ে কল্লুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন।

কিন্তু এতো কায়দা করেও করীম বক্স শেষ রক্ষা করতে পারলেন না; বিচারক দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে আখড়ার মধ্যে আসার নির্দেশ দেবার পরই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দেখি যে, কাল্লু প্রতিদ্বন্দ্বীর পায়ের গোছ ধরে এমন জোরে এক হ্যাঁচকা দিয়েছেন যে, তাতেই করীম বক্স একেবারে চিৎপাত। ব্যাপারটা চোখের নিমেষে ঘটে যাওয়াতে হাজার হাজার দর্শক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকলেও কাল্লুর দলবল গগনভেদী জয়ধ্বনি করে উঠলেন আর মহানন্দে কাল্লু পালোয়ানও ততক্ষণে নিজের হাতে অনুষ্ঠান কেন্দ্রে স্থাপিত গুরুজের (স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত মূল্যবান গদা) তুলে সেটিকে নিজের কাঁধে স্থাপন করলেন।

মাত্র তিন মিনিট কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই কুস্তির মীমাংসা হয়ে যায়; বিশেষ প্যাঁচ প্রয়োগে নয় স্রেফ গায়ের জোরেই কাল্লু এই কুস্তিতে জিতলেন। দর্শকেরা ভেবেছিলেন যে, অনেকক্ষণ ধরে এই কুস্তি চলতে থাকবে, তাই পঞ্চম অঙ্কে উপনীত হবার ঢের আগেই নাটকের ওপর যবনিকা পড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ দর্শকই নিরাশ হলেন। সবচেয়ে আশাহত হয়েছিলেন বোধকরি আমার সঙ্গীরা কারণ মনে মনে তাঁদের আখড়ার পালোয়ান করীম বক্সেরই তাঁরা জয় কামনা করছিলেন।

আমার বয়স তখন অল্প, দলাদলি তখন অতো বুঝি না। কাল্লু পালোয়ানের পাঁয়তারার বহর আর তাঁর গায়ের জোর দেখে আমি তো একেবারে শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তে কাল্লুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েছি। মনে মনে ভেবেছি যে, হাঁ, লড়তে হলে এমনি জোয়ান হওয়াই দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, কাল্লুর এই সাফল্য লক্ষ্য করেই পালোয়ান হবার প্রেরণা আমি সেদিন লাভ করেছিলাম এবং বাড়ী ফিরে সেইদিন থেকেই কোমর বেঁধে লেগে পড়ি নিজের জোর বাড়াতে।

এই ঘটনার পরে আর একটু কাহিনীও রয়েছে। আমাদের পালোয়ান হেরে যাওয়াতেও আমি দুঃখিত হইনি বরং দঙ্গল শেষে বিজয়ীর প্রাপ্য পুরস্কারগুলো কাল্লুকে দেবার জন্যে বাবাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। আমার এ উচ্ছাস মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছিল আর কি! বাবা তো কিছুতেই হাত তুলে কাল্লু পালোয়ানকে মোহরমালা, শাল ইত্যাদি দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অনেক বলাকওয়ায় কাল্লুর কাছে গিয়ে তাঁর দক্ষতার তারিফে নগদ টাকা আড়াইশো দিয়ে আমার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন।

ক্রিকেটে অনিশ্চয়তা

(১৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নামার সময় হবে। পরের দিন খাঁটি সাজে রণজিকে দেখতে পাবই, নিশ্চয় এই বিশ্বাসে মাঠে গিয়ে দেখি কোথায় রণজি? তাঁর বিকল্প তখন ব্যাট করছেন অন্য খেলোয়াড়েরা।

ব্যাপারটা কি হলো জানবার চেষ্টা করতেই বুঝলাম যে, প্রায় একশো রানে সেঞ্চুরীতে গিয়ে পৌঁছানোর জন্যেই সকালে দিনের খেলায় এক চাঞ্চল্যকর নাটকের অবসান হয়ে গিয়েছে। গতকাল যিনি একাই [illegible] সেই বাবু আজ সকালে এক [illegible] যোধপুরের একটি [illegible] ফিরিয়ে দিয়েছেন। রণজি [illegible] আউট হন ২৪।২৫ রান করে। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকেন। কিন্তু আমার কাছে রণজির অপরাজিত থাকা না থাকা সমানই, তাঁর ব্যাটিং দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আর যে কারোর ঘটে উঠলো না।

বাবু যে এমনভাবে আমার সাধে বাদ সাধবেন একথা যদি আগে টের পেতাম! সেদিনের অভিজ্ঞতার পর অবশ্য বুঝেছি শিখেছি যে ক্রিকেট খেলার গতিবিধি সম্পর্কে আগে থাকতে স্থির ধারণা করে নেওয়া চূড়ান্ত বোকামী। এ ভুল ভবিষ্যতে আর আমি কখনো করিনি।

তুরীয়ান—তুঙ্গীয়ান—বলীয়ান

(১৫৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

[illegible]

[illegible] Citius, Altius, Fortius [illegible] করেছে।

(১৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করার যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে চাই রাজ্য সরকার ঘোষিত কর্ম-পদ্ধতির পরিণতিতে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে আজ আরও কামনা করি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইঙ্গিতে আজ যে অগ্নি স্ফুরিত হলো তার স্পর্শে সমগ্র দেশের অন্তরলোকে উজ্জ্বল শিখা প্রজ্বলিত হোক, সারা ভারত বাংলার দৃষ্টান্তে সত্যিকারের পথের সন্ধান পাক।

শুভ তেইশ

(১৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তাকিয়ে উৎসাহ বোধ করার কিছুই খুঁজে পেলাম না, বরং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মুখ-নিঃসৃত বাঁকা কথার তীর এসে মাঝে মাঝে কানে খোঁচা দিতে লাগলো।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পেতে হলে 'সম্মুখ সমরে' পরাজিত করতে হবে বিখ্যাত অ্যাথলেট হল, হল্যান্ড মরগ্যানস্টন, পিট ও সেনাবাহিনীর গোরাদের। কাজটা সহজ ছিল না। একেই তো প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অনেকে কয়েকটি বিষয়ে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, তার ওপর এক হল্যান্ড ছাড়া বাকী প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছলে, বলে, কৌশলে আমার চেষ্টা বিফল করে দিতে জোট পাকিয়েছিলেন। তখনকার দিনে দৌড়োবার ট্র্যাক হোতো সাধারণতঃ ২০০ মিটারের। স্বল্পপরিসর জায়গার দরুণ ট্র্যাকে ভীড়ের মধ্যে একজনের পক্ষে আর একজনকে ধাক্কা দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীদের জোটের কথা ভেবে মনে মনে যে একদম দুশ্চিন্তার উদয় হয়নি, এমনও নয়।

প্রতিযোগিতা সুরু হলো। আমিও একটার পর আর একটায় যোগ দিয়ে যাচ্ছি। কোনোটায় তৃতীয়, কোনোটায় দ্বিতীয় আবার কচিৎ কোনোটায় প্রথম স্থান পাচ্ছি। এমনি শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছি। দিনান্তে প্রতিযোগিতার সমাপ্তিতে পয়েন্ট সংখ্যা যোগ দিয়ে দেখা গেল যে, মোট ৪১ পয়েন্ট পেয়ে আমি গিয়েছি সকলকে ডিঙিয়ে।

এবার আমার মুচকি হাসি ফিরিয়ে দেবার পালা। মনে আছে, ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার 'গভর্ণর ট্রফিটি' চিরকালের জন্যে হাতে নিয়ে একবার দর্শকদের দিকে ফিরে তাকিয়েওছিলাম, কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্যে ফিরে তাকাই তাঁরা তখন সব গা-ঢাকা দিয়েছেন।

অবশ্য ওখানকার খাঁটি বাঙালীদের কথা স্বতন্ত্র। অনেক নাচানাচির পর তাঁরা বল্লেন, 'আপনি আমাদের মুখ রেখেছেন, নইলে ওরা কি আমাদের এখানে টিঁকতে দিত!'

সেবার ৪১ পয়েন্ট পেয়েছিলাম একশ, দুশ ও চারশো মিটার দৌড়ে তৃতীয়, ব্রডজাম্প দ্বিতীয় আর হাইজাম্প ও হার্ডলরেসে প্রথম হয়ে।

বুট না পরার ফ্যাসাদ

(১৪৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হলো, আমরা সব তাঁদের কোলে-পিঠে চড়েই হাজির হলাম স্নান ঘরে। সেখানে ছিল ফুটন্ত গরম জল ভর্তি টব। সেই টবে আধঘণ্টা বসার পর তবে সে যাত্রায় আমরা ধাতস্থ হই।

আর একদিনের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার পিটার ম্যারিট্‌সবার্গের মাঠে খেলা হচ্ছে। খেলা সুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি যে আমাদের দলের প্রায় সকলেরই পায়ের তলা কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা যেনো এক ভৌতিক কান্ড। মাঠে বড় বড় ঘাস রয়েছে অথচ আমাদের পা কেটে রক্তারক্তি হচ্ছে কি করে? অনেক শলাপরামর্শ ও অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে, ঘাসের নীচে মাঠের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো।

কাঁচের টুকরো দেখে খেলার সাধ তখনই কর্পূরের মতো উবে গেল। অবশিষ্ট সময়ে কোনরকমে মাঠের মধ্যে জায়গা বেছে নিয়ে আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম।

পরে শুনেছিলাম যে, নগ্নপদ ভারতীয়দের বিপর্যস্ত করে তোলার সংকল্পেই দক্ষিণ আফ্রিকার একদল উগ্র সমর্থক লোক চক্ষুর অন্তরালে মাঠের মধ্যে এই ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের এই সাধু উদ্দেশ্য যে রীতিমতো ফলপ্রসূ হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে কারণ এই ম্যাচটিতে আমরা হেরেছিলাম ৩-১ গোলে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এইটিই হয়েছিল আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পরাজয়।

উপরি পাওনা

(১৪৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গ্রীয়ার আর অ্যাভেরিয়ান্সের পয়েন্ট সমান সমান হয়ে যায়। ফলে লীগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকল্পে দু দলকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামতে হয়।

গ্রীয়ার আর অ্যাভেরিয়ান্সের শেষ খেলাটি চারিটি ম্যাচরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চারিটি হকি ম্যাচের প্রবর্তন হয় সেই সর্বপ্রথম। এবার অবশ্য গ্রীয়ার ২—০ গোলে অ্যাভেরিয়ান্সকে হারিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রথম ডিভিশন লীগ জয় করে।

লীগের শেষ খেলার দিন ভাগ্যদেবী আমার ওপর প্রসন্না ছিলেন, তাই দিনের দুটি গোলই হয় আমার হিট থেকে।

সন্তর্পণে দরজাটি বন্ধ করে দিলো ঘরে ঢুকে।

আমি ম্যাকিনটোশটা দরজার ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে দিলাম। সে টেবিলের উপর তার ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ রাখলো। তারপর সোফায় বসে বললে, 'এখন যদি তোমার ল্যান্ডলেডি হঠাৎ এসে দরজায় ধাক্কা দেন?'

হেসে বলি, 'তাহলে তিনি জানবেন আমি গভীর ঘুমে অচেতন।'

'আর যদি সন্দেহ করে পুলিস ডাকেন?'

আশংকা ছিল বই কি! মনে মনে খুব স্বস্তি বোধ করছিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই ভয়ের মধ্যে কাটছিলো। নিজের দুঃসাহসিকতাকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। রাগ হচ্ছিলো নিজের ওপরই।

মুখে সে ভাব গোপন করে বললাম, 'যাক সে সব কথা। এখন তোমার নাম বলো।'

'মরিণ।'

'নামটিত বেশ মিষ্টি। কন্টিনেন্ট থেকে নিশ্চয়ই?'

'ভিনিসের মেয়ে আমি।'

'তাই এত সুন্দর!'

সোহোতে বা ট্যাক্সিতে তাকে আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা হয়নি। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম সত্যিই সে নিখুঁত রূপসী!

'তুমিত ইন্ডিয়ান, না?'

'হ্যাঁ, ইন্ডিয়ানদের চেনা শক্ত নয়।'

'পাকিস্থানীদের সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের খুব সাদৃশ্য। চেনা যায় না পরিচয় না দিলে।'

বললাম, 'তার কারণ পাকিস্থানের জন্মের আগেও আজকের পাকিস্থানীরা ছিলো, আর তাদের বলা হতো ইন্ডিয়ান।'

ম্যান্টলপিসের ওপর অনেকগুলি বই সাজানো। মরিণ উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বইগুলির নাম দেখতে দেখতে বললে, 'তোমার লেখা কোনো বই নেই?'

টেবিলের দেরাজ টেনে বার করি নিজের লেখা বই। তারপর সেটি বাড়িয়ে দিই মরিণের দিকে।

পাতাগুলি আগ্রহের সঙ্গে উল্টিয়ে চলে সে। তারপর বলে, 'অদ্ভুত অক্ষরগুলি! একি সংস্কৃত?'

'বাংলা। আমি কলকাতার লোক কিনা, তাই আমার ভাষা বাংলা।'

সে বইএর পাতাগুলি উল্টিয়ে যেতে লাগলো।

আমি কোনো কথা না বলে সিগারেট কেসটি তার দিকে এগিয়ে দিই। সে ঘাড় নেড়ে আবার বইএ মন দেয়। আমি একটি সিগারেট ধরাই কিছু না বলে।

হঠাৎ মরিণ বলে, 'তুমি এখন কিছু লিখতে পারো?'

আমি অবাক হই, 'মানে?'

'মানে সোজা, লেখককে লিখতে বলায় অবাক হবার কি আছে?'

'কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ এ খেয়াল?'

'খেয়ালের আবার সময় অসময় কি? তাছাড়া যখন এখানে বসে তোমার লেখা বই দেখছি আর স্বয়ং লেখক সামনে বসে, তখন এতে অবাক হবার কিছু নেই।'

আজ যেন আমার কেবল বিস্মিত হবার পালা। সোহোর অলি-গলি ঘুরে অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাই পেয়েছি, মরিণকে দেখে তার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে রাত্রির সোহোর রহস্যময় বিস্ময়কর পরিবেশে মরিণের মত মেয়েরাই বুঝি স্বাভাবিক।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলে, 'কি ভাবছ? কি লিখবে তাই?'

আমি হেসে বলি, 'হয়ত তাই!'

'কেন ভাববার কি আছে? আজ রাত্রে তুমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ যা তোমার কাছে নতুন, তাই নিয়েই লেখো কিছু।'

সে ছেলেমানুষের মতো ৬৮৯৯০। ২৬শে ৭৬০।
'তাহলে তুমি সাহিত্যিকই না।'

'বয়স তোমার কত খুকী?'

'মেয়েদের বয়স জিগোস করতে নেই।'

আবার সে সোফায় গিয়ে বসে।

আমি লেখা শেষ করে বলি, 'শোন মরিণ তোমাকে নিয়েই একটা গল্প লিখলাম। তুমি এর নায়িকা।'

তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

আঃ, এ রকম করলে লিখতে পারবো না

'ঠিক বলেছ মরিণ', আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি। 'কিন্তু আমি ত লিখবো বাংলা ভাষায়, সে ত তুমি বুঝবে না।'

'কেন ইংরেজিতেই লেখ না, তুমি ত বেশ ইংরেজি জানো।'

রাত্রি গড়িয়ে চলেছে আর আমার কলমও সেই গতিতে ছুটেছে। বিস্ময়ের পালা শেষ করে এখন মেতেছি কৌতুকে। ভুলে গেছি এত রাতে আমার ঘরে সোহোর মেয়ে, আমার ঘরের সামনের পাশের ওপরের ঘরগুলিতে অসংখ্য ভাড়াটে; বুড়ী ল্যান্ডলেডি অনেক সময়ে অনেক রাতে ঘুম না এলে ওপর থেকে নেমে আসে বাইরের সদর দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখতে, আর সেই দরজার পাশেই রাস্তার ওপর আমার ঘর। ভুলে গেছি যত আস্তেই কথা বলি না কেন, ফিস-ফিস স্বরে কথা বললেও নিঃস্তব্ধ রাতে তার গুঞ্জন শোনা যায় বাইরে দেয়ালে বা দরজায় কান পাতলে।

মরিণ সামনের সোফায় বসেছিলো। আগ্রহ আর কৌতূহল উপচে উঠছে তার চোখের নীল তারায়।

এক সময়ে আমার পাশে এসে সে দাঁড়ালো। ঝুঁকে পড়লো লেখার ওপর কাঁধে ভর দিয়ে। আমার চুলগুলি নিয়ে সে খেলা করে। কখনো আমার নাকে ঠোকা মারে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'আঃ, এ রকম করলে আমি লিখতে পারবো না।'

শেষের গল্পটা। আমি তাকে পড়ে শোনাই।

শোনার পর সে বললে, 'এ কি গল্পের শেষ নাকি?'

'শেষ হয়নি, শেষ হবে কাল তুমি চলে যাবার পর।'

'তবে আমি শেষটা জানবো কেমন করে?'

বললাম, 'তা ঠিক, কারণ তোমার সঙ্গে ত আর আমার দেখা হচ্ছে না।'

মরিণ বলে, 'তাতে অসুবিধা কি? আজ আমায় যেখানে পেয়েছ, সেখানেই কালও পাবে।'

'তা আমি জানি মরিণ,' আমার গলা একটু ভারী হয়ে ওঠে, 'কিন্তু আমি আর চাইনা তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মরিণ আহত সুরে বললে, 'কেন, আমাকে তোমার ভালো লাগেনি?'

'ভালো লেগেছে বলেই আমি চাই না একে প্রশ্রয় দিতে। এখানেই একে শেষ করতে চাই।'

মরিণ চুপ করে থাকে, কিন্তু তার চোখের নীল তারা কি জ্বলে চিক্ চিক্ করে? হয়ত আমার দেখার ভুল!

আমি বলে চলি, 'তোমার মতো মেয়ের সান্নিধ্যে এর আগে আসিনি কখনো। অর্থাৎ তোমার মতো যারা পণ্যা। তোমাদের সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি ধারণাও করতে পারিনি যে, তোমাদের মধ্যে তোমার মতো এমন আশ্চর্য মেয়ে থাকতে পারে। আজ রাত্রে আমি

(ইহার পর ১৬০ পৃষ্ঠায়)

ডিভোর্স

শ্রীমতী সুষমা দেবী

বর্ষার সন্ধ্যা। বৃষ্টির একটানা শব্দ কানে আসছে। ভবনাথ সরকার ড্রইংরুমে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কাগজ পড়ছেন আর মাঝে মাঝে কাফের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী অন্য একটা চেয়ারে বসে নভেল পড়ছেন।

গাড়ীবারান্দায় এসে একটা ট্যাক্সি শব্দ করে থামল। এমন অসময়ে কে এলো? [illegible] সমীর [illegible] গেছে, তার ফেরবার সময় হয়নি। আর [illegible] নীচে পড়ছে। সাবিত্রী উঠে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখলেন ট্যাক্সির [illegible] ড্রাইভার একটা [illegible] সুটকেস নামিয়ে বারান্দায় রাখছে। আর গাড়ী থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে স্মিতা [illegible] জুতোর হীলের শব্দ করতে করতে উপরে উঠে আসছে।

এ কি? স্মিতা? তুমি এ সময়ে কি করে এলে? [illegible] হঠাৎ [illegible] হল? কই, আমায় ত কিছু জানাওনি?

প্লেনে এলাম। বৃষ্টির জন্যে ছাড়তেই অনেক দেরি হয়ে গেল। কেন, ইচ্ছে হলে বুঝি মা-বাবার কাছে আসতে নেই?

তা কেন? কই মণ্টু কোথায়?

তাকে আনিনি।

বলো কী? এতটুকু ছেলে কখনও মাকে ছেড়ে থাকতে পারে? কেঁদেকেটে একশা করবে যে।

উপরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে স্মিতা বলল—যার ছেলে সে বুঝবে। আমার কী? আয়া ত আছে? সে দেখবে।

স্মিতা বলে কী? এমন কথা কখনও সাবিত্রী শোনেননি। স্বামী আর আয়ার উপর নির্ভর করে আড়াই বছরের ছেলেকে ছেড়ে স্মিতা অনায়াসে চলে এল? তাও কাছেপিঠে নয়, একেবারে অন্য রাজ্যে। ভয়ে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল, অবাক হয়ে তিনি মেয়ের আপাদ-মস্তক দেখতে লাগলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঝগড়া করে এসেছ বুঝি? নইলে—

ঝগড়া করে আসি না কেন, তোমার এতে ভাবনার কী আছে? আমি ত আর কচিখুকী নই? যা ভালো বুঝেছি করেছি। বাপি কোথায়?

সাবিত্রী নির্বাক হয়ে সিঁড়ির উপরের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্মিতা তাঁর দিকে একবার চেয়ে ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

ভবনাথ নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়ছিলেন। অল্প শীত শীত করছিল বলে চাদরখানা পায়ের তলা থেকে টেনে তিনি গলা অবধি মেলে দিয়ে বসেছিলেন। স্মিতা দেখে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—বাপি, তোমার অসুখ করেছে বুঝি? গায়ে চাপা দিয়েছ যে?

মুখ তুলে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভবনাথ মেয়ের দিকে চাইলেন, বললেন—তুমি? তুমি কী করে এলে? আমার অসুখ করবে কেন? বর্ষার জলো হাওয়াতে শীত শীত করছিল, তাই চাদর মুড়ি দিয়েছি।...এ সময়ে ত ট্রেণ নেই? প্লেনও ত এখন আসবার কথা নয়।

প্লেনেই এসেছি বাপি। বৃষ্টির জন্যে দেরি হয়ে গেল।

কিন্তু এই বর্ষা মাথায় করে এ ধরণের রিস্ক্ নেওয়া তোমার উচিত হয়নি স্মিতা।

বাবার পাশে চেয়ার টেনে বসে আবদারের স্বরে স্মিতা বলল—আমি ত একাই আসিনি, বাপি? প্লেনে ত আরও অনেক প্যাসেঞ্জার ছিল? তারা যদি সাহস করে আসতে পারে, আমিই বা পারব না কেন?

মণ্টু—আমার দাদু কোথায়?

তাকে আনিনি। তোমাদের সবার এককথা! আমার চেয়ে সেই বুঝি তোমাদের বেশী আপনার?

দূর পাগলী! কী যে বলে তার ঠিক নেই।

হঠাৎ গম্ভীর স্বরে ভবনাথ বললেন—তাকে ছেড়ে এলে কেন? তোমার এ ধরণের আসা আমি পছন্দ করি না স্মিতা।

ঠিক সেই সময়ে সাবিত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে স্মিতা বলল—কিছু খেতে দিতে বলোনা মা? খিদে পেয়েছে। আজ বর্ষার দিনে ইলিশমাছ ভাজা আর খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে। তাই করতে দাও না মা? তোমার ঐ যোগেন বড়ুয়ার ইংরেজী রান্না আজ খাব না।

তা কী করে হবে? এই বৃষ্টিতে রাত্তির বেলা ইলিশমাছ কোথায় পাওয়া যাবে? তা ছাড়া রান্না ত এতক্ষণে সব হয়ে গেছে।

কেন, ভোলাকে পাঠিয়ে দাওনা গাড়ীটা করে? গিয়ে চেষ্টা করে দেখুক যদি গঙ্গার ইলিশ পাওয়া যায়।

ভবনাথ বলে উঠলেন—আমাদের খাবার না হয় তৈরি হয়ে গেছে। স্মিতার জন্যে একটু খিচুড়ি আর ভাজা করে দিক না? মেয়েটা খেতে চাইছে।

বিজয়িনীর দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে স্মিতা বলল—কেমন? আমার কথা ত উড়িয়ে দিতে চাইছিলে! বাপির কথা ঠেলতে পারবে? আসলে তোমার চেয়ে বাপি আমায় ঢের বেশী ভালবাসে। তুমি ত আমার চেয়ে মণ্টুকেই ভালবাসো, নইলে আমাকে দেখে তোমার মুখ অমন গম্ভীর হ'ত না!

ট্রের উপর স্যাণ্ডুইচ আর কফি নিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই স্মিতা বলল—উঁহু, ও সব স্যাণ্ডুইচ আমি খাব না।

তার চেয়ে বরং চীজ-স্ট্র আ... আলু-চিপস্ করে আনো। জলদি করো।

চেঁচিয়ে হুকুম দিয়ে স্মিতা মুহূর্তের মধ্যে বাবামাকে ভুলিয়ে দিল। তাঁরা ভালো করে মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন।

* * * *

পরদিন সকালে স্মিতা যখন খাবার টেবিলে এসে বসল তখন ভবনাথের প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেছে, তিনি বাড়ীর সামনের বাগানে পায়চারি করছেন। সাবিত্রী চা তৈরি করে সমীরকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। স্মিতা এসে বসতে তিনি আর এক পেয়ালা চা ঢালতে লাগলেন। তার দিকে চেয়ে দুষ্টামিভরা স্বরে সমীর বলল—এই যে, স্মিতাদেবীর খবর কী? হঠাৎ যে বাহনটিকে ছেড়ে আগমন? ব্যাপার কী? কাল সন্ধ্যে-বেলাতেই নাকি দেবীর শুভাগমন হয়েছে?

মাথার চুলে হাত দিয়ে টিপে বসাতে বসাতে স্মিতা বলল—আমার ত দোষ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তুমিই বা রাতদুপুর অবধি বাড়ী থাকো না কেন? সে কথাটি চেপে যাচ্ছ যে?

সাবিত্রী বললেন—সমু কী করবে? ওর যে কাল রাত্তিরে পিয়াদের বাড়ী ডিনার ছিল?

স্মিতা হেসে দাদাকে জিজ্ঞাসা করল—তাই নাকি? এবার তাহলে পিয়ার কপাল ফিরল দেখছি! আগে ত বরাবর ওদের নেমন্তন্ন তুমি এড়িয়েই চলেছ? লুনী বুঝি ... ছিয়ে গেছে? লুনীকে বাদ দিয়ে পিয়াকে বিয়ে করলে কিন্তু তুমি ঠকবে, ঠকবে, ঠকবে—আমি বলে দিলাম। ও সব সেকেলে বাড়ীর মেয়ে নিয়ে কখনও চলতে পারবে না। ... থেকে দুটো সংসারেই অশান্তি হবে।

তুই থাম্ ত, স্মিতা? নিজের চরকায় তেল দে। কে তোর পরামর্শ চেয়েছে! তুই নিজেই ত দেখেশুনে বিয়ে করেছিলি, এতদিন ত খুব হাবুডুবু খেলি! সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাল যে হঠাৎ—

কেন? আসতে নেই নাকি? আমি জানি তুমি আমায় হিংসে করো, চাও না যে আমি আসি! কেন, আমি বুঝি মার পেটে হই নি?

তোর মতো আধুনিকার মুখে এ সব কথা মানায় না স্মিতা। তুই এসে মা বাবার কাছে থাকবি, তাতে আমার কী? থাক্ না যতদিন ইচ্ছে? ...মা, আমায় আর এক পেয়ালা চা দাও না?

সাবিত্রী সমীরের দিকে চা এগিয়ে দিলেন। সুবীর নিঃশব্দে খাচ্ছে দেখে তিনি বললেন—তুই যে চুপচাপ, সুবীর? দিদির সঙ্গে কোনও কথা বলছিস না কেন?

কী কথা বলব মা- মন্টুকে আনেনি বলে আমার এ্যায়সা রাগ হয়েছে—

তার কথা শেষ হবার আগেই স্মিতা মন্তব্য করল—কেন? দিদির চেয়ে সেই বুঝি তোদের বেশী আপনার? বেশ ত, এবার থেকে আমার বদলে সেই এসে তোদের কাছে থাকবে এখন!

তা হলে কিন্তু বড্ড ভালো হয়, দিদি। ইস্কুল থেকে ফিরে তাকে নিয়ে রোজ আমি অনেক অনেক জায়গায় বেড়াতে যাব। বন্দুক ছুঁড়তে, ডার্টস্ খেলতে, মাউথ্ অর্গান বাজাতে, কত কী শেখাব তাকে।

ফিক করে হেসে ফেলে সাবিত্রী বললেন—যা, পড়তে যা, বয়স্বাগীশ, দেখব তুই কত শেখাতে পারিস! ওদিকে মাস্টার মশাই এসে বসে থাকবেন! ও কি? দুধ যে পড়ে রইল? খেয়ে নে!

রোজ রোজ দুধ খেতে আমার ভালো লাগে না। দাদা ত একটি দিনও দুধ খায় না, সকাল বিকেল চা খায়? আমায় ত দিতে পারো না!

খালি খালি মানুষকে জ্বালাতন করিস নে, সুবীর। দুধটুকু খেয়ে নিয়ে পড়তে চলে যা।

সুবীর ওষুধ গেলার মতো করে দুধ খেয়ে চলে গেল। স্মিতা সমীরকে বলল—আজ যেন গাড়ীটা নিয়ে অফিস যেও না, দাদা। আমার দরকার আছে।

সাবিত্রী স্মিতাকে বললেন—কেন স্মিতা? এই বর্ষা বাদলে সমু কী করে হেঁটে অফিস যাবে? তুমি না হয় বিকেলে নিও!

না, মা, আমায় সকালেই যেতে হবে, নাহলে অজয়ের দেখা পাব না।

অজয়ের নাম শুনেই মা ও ছেলের নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় হল। সেটা লক্ষ্য করে স্মিতা হঠাৎ গরম হয়ে বলল—কেন? দেখা করলে দোষটা কী? চিরকাল কেমন তোমার এ দুর্বলতা! এখনও ভয়?

সাবিত্রী গম্ভীর হয়ে বললেন—আমি চাই না, স্মিতা, যে তুমি তার ওখানে যাও। তোমার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে, এখনও কি অজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ইতি হয়ে যায় নি?

আমি যদি বলি যে যায় নি? আমি যদি বলি, এখনও তাকে আগের মতোই পছন্দ করি?

সমীর বলে উঠল—তা হলে রণেনকে বিয়ে করতে গেছলে কেন? গাড়ী তুমি পাবে না, আমি দোব না।

গাড়ী ত তোমার নয়? বাবার। তাতে তোমার যেটুকু অধিকার আছে, আমারও সেটুকুই আছে।

অধিকার নিয়ে কোনও কথা হচ্ছে না, কথা ... হচ্ছে তোমার ব্যবহারের। কী রকম অপমান করে তোমরা হঠাৎ অজয়ের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলে মনে নেই? শুধু তাকে নয়, তার বাপমাকে শুদ্ধ চিঠি দিয়ে অপমান করেছিলে। তোমার ব্যবহারের চোটে জাতটার ওপরেই অজয়ের ঘেন্না হয়ে গেছে। সে বলে, 'মেয়েদের ফাঁদে আর পা বাড়াচ্ছি না। নেহাৎ ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি!'

হ্যাঁ, ভাগ্যগুণেই অব্যাহতি পেয়েছে বটে। আমি নিজে থেকে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলাম, তাই। না হলে ওর হাত কী?

রণেন একটা আস্ত গাধা, তাই স্ত্রীকে এ রকম ছেড়ে দেয়। আজই আমি তাকে সব কথা লিখে জানাচ্ছি—বলে সমীর উঠে দাঁড়াল।

দাও না লিখে? আমি কি তাকে ভয় করি নাকি? কে তার কাছে ফিরে যাবে? যাব নাই ত!

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

আমি রণেনের সঙ্গে ... ফিরে যাব।

মরিনের গল্প

(১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

পেলাম পরম এক অভিজ্ঞতা। এ রাত্রির কথা আমি ভুলবো না, তাই আমার গল্পের মধ্যে আমি তোমাকে জীবন্ত করে রাখবো।'

মরিণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

* * *

পরদিন সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন সূর্যের আলো জানালার বন্ধ শার্সির ওপর ঢাকা মোটা পর্দার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। আমি উঠে বসলাম।

মরিণ কখন চলে গেছে জানি না। হয়ত খুব ভোরে, রাস্তার লোক চলাচল হবার আগেই। তার কথা মনে হতেই উঠে পড়লাম। জানালার পর্দা সরিয়ে দিতেই আলোয় ঘর ভরে গেলো।

টেবিলের কাছে এসে গতরাত্রের লেখা গল্পটি তুলে পড়তে সুরু করলাম।

বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি যেখানে আমার লেখা অসমাপ্ত অবস্থায় শেষ হয়েছে, তারপর থেকে কয়েকটি লাইন অপরিচিত মেয়েলি হাতের অক্ষরে লেখা।

"আমি জানতাম না যে, সেও একজন লেখিকা, গণিকা নয়। সে রাত্রে সেও বেরিয়েছিলো আমার মতো রাতের সোহোর-রূপ দেখতে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। বিচিত্র এক রূপ আর বিচিত্রতর এক অভিজ্ঞতায় সে রাত্রি সকল রাত্রির চেয়ে অনন্যা হয়ে রইলো। আর সে চলে গেলো চিরকালের জন্যে এক মহাসম্পদের বেচা-কেনা করে।"

টেবিলের ওপর পেপার ওয়েটের তলায় চাপা এক পাউণ্ডের পাঁচখানি নোট। আমি মরিণকে দিয়েছিলাম যখন সে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসতে রাজী হয়।

সেই রাত্রেই ছুটে গেলাম সোহো পল্লীর সেই গলিতে, যেখানে আগের রাত্রে মরিণের দেখা পেয়েছিলাম। কত পথ কত অলি-গলি সে রাতে অধীর উত্তেজনায় মরিণের খোঁজে ঘুরেছি!

তারপরেও কত রাতে দিনের আলোয় সেই কর্মমুখর চঞ্চল নগরীর যখন বিশ্রাম, পথচারীদের ভিড় নেই, মানুষের ছোটাছুটি বন্ধ বাস টিউব ধরার তাগিদে, রাস্তাঘাটে নেই ভিড়। [illegible] যখন মধ্যরাত্রি ঘোষণা করে এগিয়ে চলে। বিয়ারসেবীদের কেউ যখন ট্রাফালগার স্কোয়ারের চত্বরে বসে নেই— তখনো আমি মরিণের সঙ্গে দেখা হবার আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি।

অদ্ভুত মোহময় রাত লণ্ডনে অনেক এসেছে— কিন্তু সে রাত মরিণকে ঘিরে বিচিত্র এক রূপ আর বিচিত্রতর এক অভিজ্ঞতায় সকল রাতের চেয়ে অনন্যা হয়ে রইলো— সে রাত আর কখনো আসেনি।

তিক্ত অভিজ্ঞতা

(১৪৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

থেকেই একটু দুরন্ত ছিলাম, ডাকসাইটে ডানপিটে বলে আমার বেশ কুখ্যাতিও রটেছিল।

ছাব্বিশ বছরের উৎসাহের প্রাবল্যে জলে পড়া মাত্রই সাধ হলো সকলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার। গেলামও তাই, কিন্তু তখন কে জানতো যে এই যাওয়াই আমার 'কাল' হবে, উৎসাহের বন্যায় তীর তীরে এসে ভরাডুবি হবার উপক্রম ঘটবে!

দশ মাইল সমানতালে এগিয়ে আসার পর খড়দহের কাছে এসে শুনলাম যে পরের প্রতিযোগী জ্ঞান চ্যাটার্জি আমার অনেক পেছনে, প্রায় মাইলখানেক দূরে রয়েছে। সংবাদটি শুভ। বোধহয় শুভ সংবাদ পেয়ে আরও উল্লসিত হয়ে গতিবেগ বাড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। এমনি সময় সুরু হলো যন্ত্রণা, পেটের বাঁদিকে।

যন্ত্রণা অসহ্য, হাত পা সিঁটিয়ে দিলো, দম এল বন্ধ হয়ে। বুঝলাম 'ক্র্যাম্প' ধরেছে, এ যাত্রায় আর নিস্তার নেই, বিধি বাম।

দেহরক্ষী হিসেবে নৌকায় আসছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু বিভে মিত্র (প্রভাস)। যন্ত্রণার উল্লেখ করে তাকে বললাম নৌকায় টেনে তুলতে। আমার কথা শুনে রক্ষক স্বয়ং ভক্ষকের মূর্তি ধারণ করলো। হাতে তার নৌকার একখানা দাঁড় ছিল। তুলে ধরে বল্লে, 'নৌকো ছুঁয়েছো কি হাত দিয়েছি খেঁৎলে।'

কি করি বুঝতে পারছি না, বোঝবার শক্তিও বিশেষ ছিল না। কোনও রকমে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে হাত-পা ছুঁড়ছি। এমনি সময়ে বিভেও জলে ঝাঁপিয়ে আমার পাশাপাশি সাঁতরাতে লাগলো।

আমার দেহরক্ষীটি ছিল আবার আমার চেয়েও ডানপিটে। তার ধমকের বহর আর উগ্রমূর্তি দেখে আর কিছু বলবার সাহসও পেলাম না। বাঁ-হাতে পেট চেপে ধরে মরিয়া অবস্থায় একহাতে পাড়ি টানতে লাগলাম।

কতক্ষণ যে এইভাবে বেহুঁশের মতো এগিয়ে ছিলাম জানি না। বাগবাজার ঘাট বরাবর এসে বহুলোকের চীৎকারে আমার চৈতন্য ফিরে এলো। দেহরক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে জ্ঞান চ্যাটার্জি তখন আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছে।

পথ আর অল্পই আছে। খুব জোর আধ-মাইল বাকী। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হয়। দু'হাত তুলতে গেলাম পারলাম না, পেটের ব্যথা তখনো তেমনি রয়েছে। এক-হাতেই টানতে হলো, বাড়াতের মধ্যে পা দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি 'কল' করে গতিবেগ বাড়াবার চেষ্টা করলাম।

বাকী সময়ে জ্ঞান চ্যাটার্জি কোথায় আছে, দেখবার চেষ্টা করিনি। কোনো রকমে [illegible] ঘাটে এসে পৌঁছে [illegible] পথটুকু শেষ করেই হাত-পা এলিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

জ্ঞান ফিরলে শুনি যে আমার আর জ্ঞান চ্যাটার্জির মধ্যে কে প্রথম হয়েছে তা নিয়ে বিচারক মহলে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশের অভিমত আমার অনুকূলে [illegible] একটা মীমাংসা করে দাও। প্রথম বছরে এ নিয়ে গোলমাল হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

মীমাংসা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই করতে হলো। জ্ঞান চ্যাটার্জি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। বুঝলাম ছেলেমানুষ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা স্বীকৃত হওয়া দরকার। বিচারকদের সামনে ঘোষণা করলাম, জ্ঞানই প্রথম হয়েছে।

আমার ঘোষণা শুনে [illegible] শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই সেদিন সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু আজ পরিণত বয়সে মনে হচ্ছে যে কাজটা খারাপ করিনি। যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হার স্বীকার করা তো লজ্জার বিষয় নয় বরং সেইটেই তো সত্যিকারের খেলোয়াড়দের ধর্ম।

হাঁ এই সঙ্গে আর একটা কথা বলি।

আমি হার স্বীকার করলেও বিচারক বা উদ্যোক্তারা সেদিন আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিলেন। তাঁরা জ্ঞান চ্যাটার্জি ও আমাকে একই মূল্যের পুরস্কার উপহার দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। তাছাড়া একহাতে সাঁতার কাটার জন্যে প্রফুল্ল ঠাকুর দিয়েছিলেন একটি বিশেষ পদক।

বীরভূমের পল্লী — শিবনাথ পাল

ছোটদের পাত্‌

পরি

ছুটি

শরৎ কালে
মেঘ উড়ে
অঝোর
বনের
শারি
ডালে
ব

সার্বজনীন দুর্গাপুজোর
পাড়ার লোকে করছে আয়োজন,
যুবো-বুড়োর মত মিলে না,—
দুই দলেরই ধনুর্ভঙ্গ পণ।

'হালফ্যাসানের ঠাকুর হবে'—
তরুণ দলের উঠছে কলরব—
আর্টও হবে পুজোও হবে,
পরবটা তো পুজো ও উৎসব।

দেবীর হাতে ঢাল-তরোয়াল—
দেখলে দেবী দেবেন ফেলে লাজে।
এটম্ বোমার কাল না এটা?—
এই যুগে কি ঐ হাতিয়ার সাজে!

সিংহ অসুর যুদ্ধ করে,
সবাই যখন শান্তি দেশে চায়,
দিব্যি হবে যদি তাদের
কোলাকুলির মূর্তি গড়া যায়।

বুড়োরা কয়—'থামো, বাপুরা,
এই সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়া তোরা!
চিরকালের মায়ের মূর্তি
কাল্‌কে হবে তোদেরই মনগড়া?

দশভুজার দশটী হাতে
মনায় খাসা ঢাল-তরোয়াল দিলে;
মায়ের শত্রু অসুর-ব্যাটা—
কামড়ে তারে সিংহ ফেলুক্ গিলে।

'শাস্ত্রমতে প্রতিমা চাই'—
[illegible]নের রাগ চাঁচায় বুড়োর দল।
'ভোট্ নেওয়া হোক্ তবে'—বলে
যুবার দলও চালায় কোলাহল।

ভোট্ চলেছে মায়ের পুজোর—
শিব তা দেখেন বসে বসে কৈলাসে,
দেখান হেসে দুর্গারেও
বেলতলাতে আসন দিয়ে বামপাশে।

বলেন—দেবি, দেখছ তো ঐ
কেমন তোমার পুজোর ঘটা মর্ত্যে।
কাজ কি তোমার যেয়ে এবার
বাপের বাড়ী ভোটভুটির সর্ত্তে!

গৌড় বলতে এককালে সমস্ত বাংলাদেশকেই বোঝাতো। গৌড় ছিল বাংলার মহাসমৃদ্ধ রাজধানী। তখন গৌড় ছিল পাঁচটি, আর তা ছিল নানাদিকে। যেমন, সারস্বত অর্থাৎ পূর্ব পাঞ্জাব, মিথিলা, কান্যকুব্জ, উৎকল আর বঙ্গ। পালবংশের সম্রাটেরা এই পাঁচটি গৌড়-ই অধিকার করেছিলেন। হিন্দুরাজাদের সেজন্য এক আখ্যা ছিল—'পঞ্চগৌড়েশ্বর'। কিন্তু সে গৌড় এখন কোথায়? নেই। পরে মালদহ জেলার পূর্বদিকে বল্লালবাড়ী নামক উঁচু জায়গায় সেন রাজাদের রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড়ের অবস্থান সঠিক ধারণা করা শক্ত। তা হলেও গৌড় ছিল হিন্দু-মুসলমান রাজাদের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী।

১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করেন। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে গৌড় স্থানান্তরিত হয় পাণ্ডুয়ায়। পাণ্ডুয়া থেকে যায় মালদহ জেলায়। এই গৌড়ের স্মৃতি এখনও আছে। এই গৌড় রাজধানীর বিরাট বিরাট অট্টালিকা সে যুগের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হোয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কি বিস্ময়কর তার নির্মাণ-কৌশল! এই জায়গাটি হোল কলকাতা থেকে ১৯৮ মাইল আর মালদহ থেকে ১৪ মাইল। বহু নিদর্শন স্তূপে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হোয়ে পুরাতন গৌড় এক মহা কীর্তি ঘোষণা করছে এখনো।

এই গৌড় ছিল কেমন? গঙ্গা ও মহানন্দার মিলন যেখানে হোয়েছিল, সেইখানে ছিল এই গৌড়। এর উত্তর দিক জুড়ে ছিল মাটির বিশাল প্রাচীর—চওড়াতেই প্রায় একশ ফিট। পাঁচিশ মাইল জায়গা ঘিরে ছিল এই নগর। লক্ষ লক্ষ লোকের বাস ছিল এখানে, আর কত শত ইমারত-অট্টালিকা, দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ, দীঘি-সরোবর ছিল এই নগরে। মহাসমৃদ্ধ ছিল এই গৌড়। শেষের দিকে প্রায় চারশ বছর মুসলমান সুলতানেরা গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন বটে, কিন্তু তার আগে শত শত বৎসর ধরে হিন্দু সম্রাটেরাই ছিলেন গৌড় সিংহাসনের অধিকারী। এখানে শূর বংশ রাজত্ব করেছেন। পাল বংশের সম্রাটেরা রাজত্ব করেছেন প্রায় সাড়ে তিনশ বছর। হিন্দুরা যখন রাজা ছিলেন, সম্রাট ছিলেন, তখন কেমন ছিল এ দেশ? দেশটাতে তখন ছিল শুধুই কেবল হিন্দু। রাজাও হিন্দু, প্রজাও হিন্দু।

শূর ও পাল বংশের পর সেন বংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন অনেক বছর ধরে। সেন বংশের সর্বপ্রধান ছিলেন মহারাজা বল্লাল সেন। বল্লাল সেন পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। বারোটি রাজা ছিল তাঁর অধীনে। তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ। শুধু কি তাই! মহাসমারোহে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে তিনি সার্বভৌম সম্রাট হন। তিনি কবি ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল—'নিঃশঙ্ক-শঙ্কর গৌড়েশ্বর'। রাজকীয় উপাধি এই রকম,—'অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি সেনকুল কমল পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শঙ্কর গৌড়েশ্বর।'

রাজারা সবাই ছিলেন বীর, সবাই ছিলেন পরাক্রমশালী। এঁদের নাম আর খ্যাতি তখন হিন্দুরাজ্য দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। রাজা জয়চন্দ্রের সভা-বর্ণনায় আছে—

'গৌড়-বঙ্গালে কি বঙ্গালী বৈঠে দিল্লীকা চৌহান।'

শেষকালে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের পর এই গৌড় গেল মুসলমানের হাতে।

১৩৪২ সালে শামসুদ্দীন ইলিয়াস যখন বাংলার সুলতান গৌড়ের নবাব,—তিনি বলে বসলেন—'আমি হলুম স্বাধীন। আমি দিল্লীর বাদশাহকে মানি না।' দিল্লীর বাদশাহ তখন ফিরোজশাহ তোগলক। ফিরোজশাহ এই কথা শুনেই নিজে এলেন বাংলা মুলুককে যুদ্ধ করতে। সঙ্গে তাঁর প্রায় দু'লক্ষ সেনা, শত শত কামান-বন্দুক, অসংখ্য রণহস্তী, অশ্বারোহী সেনা প্রায় ষাট হাজার,—এমনি আরো কত কি। কোথায় বাংলা মুলুক আর কোথায় দিল্লী! এতসব সৈন্যসামন্ত, হাতী, ঘোড়া, লোকলস্কর এলো—মাঠ-জঙ্গল ভেঙে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদী-নালা পেরিয়ে যুদ্ধ করতে।

এদিকে শামসুদ্দীনও তৈরী, যুদ্ধ করবার জন্যে। শামসুদ্দীন গিয়ে আশ্রয় নিলেন একডালা দুর্গের ভেতর। ফিরোজশাহ এসে দুর্গ ঘেরাও করে ফেললেন, বড় বড় কামান বসালেন। যুদ্ধ হোতে লাগলো অতি ভয়ানক রকমের। গৌড় সুলতান শামসুদ্দীনের পক্ষ নিয়ে যারা যুদ্ধ করতে লাগলো, তারা কারা? তারা সবাই বাঙালী সেনা। ফিরোজশাহ এই যুদ্ধে কিছুই করতে পারলেন না। একেবারে হেরে গেলেন। হেরে গিয়ে তিনি ফিরে পালিয়ে গেলেন দিল্লীতে। যে সব বাঙালী সেনা যুদ্ধ করেছিল, তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় দু' লক্ষেরও বেশী। এরা যুদ্ধ করতে করতে পালিয়ে যায়নি। যুদ্ধ করে দেশকে বাঁচিয়েছিল, আর বহু লোকে মরণকে বরণ করেছিল।

ফিরোজশাহ ছিলেন বাদশার মত বাদশা। দিল্লীতে তিনি এক নূতন নগর তৈরী করেন, তার নাম [illegible]। [illegible] এখনো আছে। ফিরোজশাহ ছিলেন [illegible]। বহু কীর্তি আছে তাঁর। এমন বাদশাহকেও গৌড়-বাংলার বাঙালীদের কাছে যুদ্ধে হেরে পালাতে হয়েছিল, একবার নয়, দু'বার। [illegible] পরে আবার তিনি এলেন বাংলা আক্রমণ করতে। সেবারেও শামসুদ্দীনের ছেলে সিকন্দরশাহের কাছে তিনি হেরে যান। বাঙালীর [illegible] তখন বাদশাহেরও ভয়ের বস্তু ছিল।

তখনকার দিনে বাঙালীমায়েরাই ছিল যোদ্ধা। বাঙালীর মেয়েরা তখন যে সব ব্রত পালন করতেন, তার একটি প্রধান ব্রত ছিল 'এয়ো ব্রত'। এয়ো ব্রত নিয়ে বাঙালীর মেয়েরা বলতেন—

পাকা পান, মউরিদান
আমার স্বামী নারায়ণ
যখন যাবেন রণে
নিরাপদে ফিরে—
আসেন যেন ঘরে।

আর বলতেন—

রণে রণে এয়ো হবো।
জলে জলে সো হবো।
আকালে লক্ষ্মী হবো।
সময়ে পুত্রবতী হবো।

তখন বাংলা দেশের সুখ সমৃদ্ধির সীমা-পরিসীমা ছিল না। সে সব কথা শুনলে এখন অবাক হোয়ে যেতে হয়। তখন এক মণ ঘি পাওয়া যেতো মাত্র দেড় টাকাতে। এক মণ তেলের দাম ছিল শুধু কেবল আট আনা। সাত পয়সায় এক মণ চাল। দেড় টাকায় এক মণ চিনি। মাত্র তিন টাকাতে একটা ভালো দুধালো গাইগরু পাওয়া যেতো। মোটাসোটা ভেড়া বা ছাগল একটা পাওয়া যেতো চার আনাতে। মাসে যার দু'টাকা উপার্জন, স্বচ্ছন্দে তার সংসার চলে যেতো।

এমন যে সোনার গৌড়, সে গৌড় রইলো না—ধ্বংস হোয়ে

যাই বল ভাই, আমার কিন্তু সন্দেহ আছে!

প্রফুল্লকান্তি ঘোষ

কি রে কই শুরু কর তোর ম্যাজিক! সরোজ বললে।

চুপ কর। কথা বলিস না! ভারি গলায় বললে শচীন।

তারপর সবাই চুপচাপ! এক মিনিট দু মিনিট করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠেচি।

এমন সময় সরোজ আবার প্রশ্ন করলে, কি রে শচে ঘুমোলি নাকি বাবা?

চুপ।..দরজাটা খুলে দে কে আসচে দেখ। শচীন বললে।

সত্যিই! জলের ছপ্ ছপ্ একটা শব্দ সকলেই আমরা শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এসে যেন বন্ধ দরজার কাছেই থামল। তারপরই দরজার গায়ে শব্দ উঠলো টুক্ টুক্!

কে!

আবার শব্দ, টুক্ টুক্!......

আমিই উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই ক্ষণেক আলোর দীপ্তিতে দেখলাম কে যেন একজন ঠিক দোর গোড়াতেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত।

কে?

কিন্তু আগন্তুক আমার প্রশ্নের কোন সাড়া দিল না, খানিকটা জমাট কুয়াশার মতই যেন পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি দরজাটা যেমন বন্ধ করেচি সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের একটি মাত্র ক্যান্ডেলের আলোটি নির্বাপিত হলো।

মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করল।

এবারে শচীনের গলাতেই প্রশ্ন ভেসে এলো, তুমি কে?

আমি বিভূতি। কি রকম এক চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত অস্বাভাবিক গলায় সাড়া এলো।

বিভূতি! কে বিভূতি!

বিভূতি চক্রবর্তী!

হাত বাড়িয়ে দরজার ঠিক কাছেই দেওয়ালে আলোর সুইচটা টিপলাম। খট্ করে একটা শব্দ হলো মাত্র, কিন্তু ঘরের আলো জ্বললো না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হলো কে যেন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল! নিজের অজ্ঞাতেই দু'পা পিছিয়ে দেয়াল ঘেঁষে একেবারে দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেচে। হঠাৎ এমন সময় মনে পড়লো, বিভূতি, বিভূতি চক্রবর্তী ত আমাদের বন্ধু! তবে—! সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়টা কেটে গেল।

সোৎসাহে বললাম, বিভূতি—তুই!—

হাঁ! সেই পূর্বের মত চাপা কণ্ঠস্বর। মনে হলো বড় যেন কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে। আরো মনে পড়লো বিভূতি ত থাকে সেই ভবানীপুরে! প্রায় দশ বার দিন আড্ডায় আমাদের আসে না সে। এই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে সেই ভবানীপুর থেকে ও এসেচে! একটু বিস্ময়ই লাগে।

আমিই এবারে প্রশ্ন করলাম, এই ঝড় জলের মধ্যে এত রাতে তুই—ব্যাপার কি বিভূতি!

বিভূতি আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শচীনকে সম্বোধন করে বললে, শচীন আমাকে তুই ডাকছিলি কেন?

প্রশ্ন করলো এবার সরোজ, এই জলের মধ্যে তুই এলি কি করে রে বিভু?

জল!

হাঁ—বাইরে ত ভীষণ বৃষ্টি!

তা হবে!

তা হবে কি রে—চারিদিক জলে সব থৈ থৈ করচে না! ভাগ্যে বুঝি বের হয়েছিলি? বললে সরোজ।

না ত! শচী ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ত এলাম।

ভিজে গেছিস ত একেবারে?

না!

বললে কি বিভূতি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

হঠাৎ আবার বিভূতি বললে, আমি যাই ভাই!

যাবি। কোথায় যাবি এই বৃষ্টির মধ্যে! মাথা খারাপ হলো নাকি তোর! বললাম আমি। আমার বড় কষ্ট হচ্ছেরে আমি আর এ ঘরের মধ্যে থাকতে পারচি না। আমি চললাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেন খুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু কোথায় বিভূতি! আমরা পাঁচজন ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি।

বিভূতি! বিভূতি! আমিই ছুটে দরজার বাইরে গেলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েচে। গলির মধ্যে জলও অনেকটা কমে এসেচে। যতদূর দৃষ্টি যায় কাউকেই দেখতে পেলাম না। কেবল একটা জলের মধ্যে দিয়ে কারো হেঁটে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে ভেসে এলো।

* * *

পরের দিন দুটো সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, গত রাতে প্রচণ্ড তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টির মধ্যে শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ মিনিট কুড়ির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাত্রি নয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত। আর গত রাতে দিন নয়েক ভোগবার পর টাইফয়েডে আমাদের বন্ধু বিভূতি চক্রবর্তী রাত সাড়ে দশটায় মারা গিয়েচে।

তারপর অনেক দিন কেটে গিয়েচে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা আজও অস্পষ্ট হয়ে আছে। তবে স্বীকার করতে পারিনি যেমন ব্যাপারটার মধ্যে শচীনের কোন ম্যাজিকের কেরামতি আছে, তেমনি এও স্বীকার করে নিতে মন চায়নি যে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন কিছু ভৌতিক আছে! তবে যা ঘটেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

সংস্কৃতে এক বিখ্যাত শ্লোক আছে, তার একটি 'চরণের' মানে হচ্ছে—পুরুষের ভাগ্যে কখন কি হয় তা দেবতারাও জানেন না, মানুষ ত কোন্ ছার্!

এর উদাহরণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়—আমিও আজ ইতিহাস থেকে এমনি এক গল্প শোনাচ্ছি।

বাংলার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে বলা হয় রাঢ়। এই রাঢ়েই একটি ছোট্ট গাঁ আছে—তার নাম চাঁদপাড়া। মাত্র এক আনা খাজনায় এই গাঁ একজন পেয়েছিলেন বলে একানি-চাঁদপাড়াও বলে। অনেকদিন আগে, এখন থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে গরমকালের এক দুপুর বেলা এই গাঁয়ের পথেই এক মুসলমান ভদ্রলোক চলে-ছিলেন—সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। লোকটি খুবই বড় এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আরব দেশে বাড়ী তাঁর—নাম সৈয়দ আশরফ। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে বটে কিন্তু বড় গরীব। তাই গৌড়ের সুলতানের দরবারে চলেছেন, পায়ে হেঁটে—যদি কোন চাকরী পাওয়া যায়।

দুপুর বেলা রাঢ়ের মাঠে অগ্নিবর্ষণ হ'তে থাকে, তার ওপর গাছপালাও নেই যে ছায়ায় বসবেন। সঙ্গের ছেলেটি ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় নেতিয়েই পড়েছে। উপায় না দেখে গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে একটু আশ্রয়ের খোঁজ করলেন।

'সৈয়দ' শুনে সাধারণ লোক কেউ আশ্রয় দিতে সাহস করলে না। বললে, আপনার মত লোকেরা কি চাষাভূষোর বাড়ী থাকতে পারেন। বরং এক কাজ করুন—কাজী সাহেবের বাড়ী যান!'

কাজীর কানেও কথাটা পৌঁছল। তিনি লোক পাঠিয়ে সসম্ভ্রমে ডেকে নিয়ে গেলেন। হিন্দু বাঙ্গালীদের যেমন 'প্রভুপাদ'—মুসলমানদের তেমনি 'সৈয়দ'। এমন অতিথি পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু কাজী সাহেব বাপকে দেখে যত মুগ্ধ হলেন—ছেলেকে দেখে তার চেয়ে ঢের বেশি। এমন বুদ্ধিমান এবং সর্বসুলক্ষণযুক্ত ছেলে কদাচিৎ চোখে পড়ে। এ ছেলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পরের দিন সৈয়দের রওনা হবার কথা। কাজী সাহেব যেতে দিলেন না। সৈয়দ আশরফ যদি দয়া করে তাঁর ছেলেটির সঙ্গে কাজীর মেয়েটির বিয়ে দেন ত কাজী কৃতার্থ হবেন। তিনি প্রচুর জমিজমা দিতে রাজী আছেন—ওঁদের আর কোন অভাবই থাকবে না।

সৈয়দ রাজী হয়ে গেলেন। ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

এধারে হ'ল কি বর আদৌ লেখাপড়া জানে না—কনে কিন্তু বেশ বিদুষী, তাছাড়া সে বয়সেও কিছু বড়। বর বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কনে বাসরঘরেই বরকে বললে, 'ভয় কি, তুমিও লেখাপড়া শিখে নাও। আমি তোমাকে শেখাব।'

বর একটু ইতস্ততঃ করছিল, 'স্ত্রীর কাছে লেখাপড়া শিখব!'

'তাতে দোষ কি! কারুর কাছ থেকেই বিদ্যা গ্রহণ করতে লজ্জা নেই!'

কাজীর কন্যা বরকে শুধু লেখাপড়া শিখিয়েই ক্ষান্ত হ'লো না, প্রতিনিয়ত তাকে উৎসাহিত করতে লাগল, তুমি গৌড়ে যাও—এই সামান্য জমিজমা পেয়ে খুশী হয়ে বসে থেকো না—তোমার যা বুদ্ধি আর শক্তি [illegible] তুমি রাজধানীতে যাও, রাজ দরবারে [illegible]।'

বর ও বুঝলে। [illegible] গৌড়ে গিয়েই উপস্থিত হ'ল।

অজানা অচেনা [illegible] কেউ নেই। সুতরাং সামান্য কাজ ছাড়া [illegible]। ছেলেটি কিন্তু হাসি মুখে [illegible]। সামান্য সিপাহীর চাকরী, সন্তোষ [illegible]।

সে কিন্তু [illegible] কখনও [illegible]। কাজেই উন্নতি হল। [illegible] সামান্য সিপাহী সেনাপতি হয়ে উঠলেন।

গৌড়ের সিংহাসনে তখন [illegible] শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে। [illegible] সিদি বদর—বা সামসুদ্দীন মুজাফফর শাহকে [illegible] ও [illegible] হয়ে উঠতে দেরী হ'ল না এঁর। [illegible] তখন দরবারের অন্য সব সর্দারেরা [illegible] অনুরোধ করলেন সিংহাসনে বসতে!

ইনি কে জানো?

ইনি হলেন বিখ্যাত সুলতান হুসেন শাহ। [illegible] এঁরই সমসাময়িক। হুসেন শাহের মত [illegible] পণ্ডিত এবং সুশাসক আর কোন সুলতান গৌড়ের সিংহাসনে [illegible] নি।

—

শুভা সেন (শান্তিনিকেতন)

(১৭৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিন্তু প্রথমে দুটি ডাল সাজিয়ে রাখতে রাখতেই পায়রা বললে, "থামো থামো। জানি জানি। এবার আমি নিজেই তৈরি করতে পারবো।"

পাখীরা বললে, "বেশ। তোমরা যখন নিজেরাই পারবে তখন তোমাদের জন্যে আমাদের সকলের কষ্ট করার কি দরকার। তোমরাই তৈরি কর।"

এই বলে খড়-কুটো-কাঠি ফেলে সকলে উড়ে চলে গেল।

পায়রা গাছটির চারধারে ঘুরে ঘুরে উড়ে এখানে-ওখানে খড়-কুটো-কাঠিগুলো রাখতে লাগলো। কিন্তু তাতে বাসা হলো না।

তাই দেখে পায়রা বললে, "মিছে খাটনি।"

পায়রাণী বললে, "তাই তো।"

পায়রা বললে, "চল, ওদের আবার ডেকে আনি। এসে শিখিয়ে দিয়ে যাক্।"

দুটিতে আবার উড়ে গিয়ে বনের পাখীদের ডেকে আনলো।

বনের পাখীরা আবার কলরব করতে করতে এসে পায়রা-পায়রাণীকে বাসা তৈরি করা শিখাতে লাগলো।

পায়রা-পায়রাণী দেখতে লাগলো বসে বসে।

অর্ধেকটা বাসা তৈরি হয়েছে এমন সময়ে পায়রা বলে উঠলো, "বক্-বকম্, বক্-বকম্। থাক—থাক। আমি নিজেই তৈরি করতে পারবো।"

পাখীরা বললে "বেশ। তুমি যদি নিজেই তৈরি করতে পারো তো কর। আমাদের আর কি দরকার?"

তারা উড়ে চলে গেল।

পায়রাও আবার বাসা তৈরির কাজে লেগে পড়লো। সে এখানে একটা, ওখানে একটা, সেখানে দুটো খড় কি কাঠি গুঁজে দেয়। কিন্তু বাসা আর তৈরি হয় না।

তখন দুটিতে আবার গেল বনের পাখীদের ডাকতে।

এবার আর তারা কেউ এল না ; বললে, "যে সবজান্তা তাকে কষ্ট করে শেখাতে যাবার দরকার কি?"

তাই পায়রা ভাল করে বাসা তৈরি করতে জানে না। তাদের বাসা থেকে দুটি-চারটি ডিম পড়ে যাবই। আর, পায়রা-মা বসে বসে, ঘুরে ঘুরে মনের দুঃখ জানায়—বকম্-বকম্, বকম্-বকম্।*

* আর্যাবর্তের একটি উপকথা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমাদের বাড়ীতে কাজ করত বাঘাল। ছেলেবেলা থেকে একইভাবে দেখে আসছি ওকে। কবে যে কাজে বহাল হয়েছিল ও-নিজেই বোধ হয় জানে না। আমরা বলতাম, 'বাঘাল, আয়, এবার তোর একটা রজত-জয়ন্তী করি।' পঁচিশ বছর নিশ্চয়ই হয়ে গেছে তোর এখানে।

শুধু বাঘালকে নিয়ে এ গল্প নয়, এ গল্পের সুরু বাঘালের ঠাকুরমাকে নিয়ে। যদিও সে গল্পও বাঘালের কাছেই শোনা। একবার সেই ঠাকুরমার হ'ল ভীষণ জ্বর। জ্বরের ঘোরে সাতদিন অচৈতন্য হয়ে রইল সে। গাঁয়ের কবিরাজ এসে ওষুধ দিলেন। কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। তারপর শেষে আটদিনের দিন বুড়ী মারা গেল।

আত্মীয়স্বজন কাঁধে করে নিয়ে গেল শ্মশানে। [illegible] চিতা তৈরী করে সেই চিতার ওপর শুইয়ে দেওয়া হ'ল বুড়ীকে। [illegible] হঠাৎ সকলের... সবাই অবাক হয়ে দেখে বুড়ী চিতার ওপর খাড়া হয়ে উঠে বসেছে, আর তার মাঝ থেকে একটা অদ্ভুত রকম গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

'দানোয় পেয়েছে—দানোয় পেয়েছে'—বলে চিৎকার করে চীৎকার করে উঠল সকলে। শ্মশানের আশপাশে যে সব অশরীরী-ভূতপ্রেত ঘুরে বেড়ায় তাদেরই কেউ একজন এসে যে বুড়ীর মড়াটার মধ্যে ঢুকেছে এ বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না। গাঁয়ের মোড়লও সায় দিয়ে বলল। এ ক্ষেত্রে কি করতে হবে তাও তার অজানা নয়। সে চিতার একটা মোটা বাঁশের চলা নিয়ে এগিয়ে এল। তার দেখাদেখি আরও কয়েকটি জোয়ান লোকও তাই করল। ধপাধপ্ লাঠিপেটা করে তারা সেই 'দানো' অর্থাৎ ভূতকে অল্পক্ষণের মধ্যেই শায়েস্তা করে ফেলল। বুড়ীর দেহ আবার ঢলে পড়ল চিতার ওপর। গাঁয়ের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল—এমন কি বুড়ীর ছেলে, অর্থাৎ বাঘালের বাপও।

তোমরা, যারা ভূতপ্রেত মান না, তারা নিশ্চয়ই এই মর্মান্তিক গল্প শুনে শিউরে উঠছ—আমারই মত। এটা বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না যে আসলে বাঘালের ঠাকুরমা মারা যায়নি, অসুখের ঝোঁকে এমন গভীরভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল যাতে তার দেহে জীবনের কোন লক্ষণ টের পাওয়া যায়নি। তারপর শ্মশানে নিয়ে যাবার পর ঘটনাচক্রে চিতায় অগ্নিসংযোগে দেরী হওয়ায় আর বৃষ্টির জল পেয়ে কোনওক্রমে তার দেহে চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা ব্যাপারটাকে 'দানোয় পাওয়া' ধরে নিয়ে জ্যান্ত মানুষটাকে ঠ্যাঠিপেটা করে মেরে ফেলেছে।

১। গংগাজল সই—ফটো অমর মুখোপাধ্যায়; ২। মুক্তি চাই—ফটো ভগবতী দে; ৩। পুতুল বধূ—ফটো রমাকান্ত দত্ত; ৪। কানকথা—ফটো জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; ৫। ক্ষুদে কনে—ফটো অমিয় পাল; ৬। সভাপতি—ফটো অজিত রায়; ৭। কুঁড়ি—ফটো সুনীল সেন; ৮। গানের আসর—ফটো প্রতিমা দেবী; ৯। পেটুক—ফটো নির্মল দত্ত; ১০। প্রেমানন্দ; তবু তো দাঁত ওঠেনি—ফটো
১১। কে গো তুমি? ফটো দ্বারিক ভড়; ১২। কেড়ো না ভাও? ফটো কমল কুমার।

ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধিদল সোভিয়েট রাশিয়ার একটি পায়োনিয়ার্স ক্যাম্পে ছোটদের খাবারঘর পরিদর্শন করছেন।

শ্মশানে গিয়ে বেঁচে উঠেছে, এরকম আরও ২।৪টি ঘটনার কথা আমি জানি। তবে সে সব ক্ষেত্রে অবশ্য ওপরের ঘটনার মত কোনও বিয়োগান্তক ব্যাপার ঘটেনি। আমাদের পাড়াতেই এরকম একটি বুড়ো ছিলেন। চিতা থেকে উঠে আসবার পরও তিনি বহু বছর বেঁচে ছিলেন। আমরা স্কুলে যাবার পথে রোজ দেখতাম তিনি বাজার করে ফিরছেন। নিখুঁত স্বাভাবিক মানুষ। শুধু গায়ের একটা দিক কেমনধারা হয়ে গেছে। আমরা ভাবতাম বুঝি আগুনে ঝলসে গিয়েই হয়েছে। [illegible] ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার গল্প নিশ্চয়ই শুনেছ। সেখানেও নাকি সন্ন্যাসীরা মৃত কুমারকে শ্মশান থেকে নিয়ে গিয়ে জীবন দান করে এবং সেবা করে নিয়ে যায়। কুমারেরও সুরু হয় সন্ন্যাসীর জীবন। তারপর বহুদিন পরে যখন এক সন্ন্যাসী এসে নিজেকে [illegible] পরিচয় দিয়ে জমিদারীর অংশ দাবী করলেন সে কি [illegible] হয়েছিল! বিচারেও জজ সাহেব কুমারের [illegible] নিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা [illegible] মানুষ মারা গেলে তার হৃৎপিণ্ডের [illegible] থেকে যায়। থেমে যায় শ্বাসপ্রশ্বাস [illegible] এবং শক্ত হয়ে আসে। কাজেই [illegible] মৃত আর জীবিতের পার্থক্য [illegible] হয় না। ঐ সব লোকদের যারা শ্মশানে [illegible] তাদের [illegible] মৃত্যু [illegible] কাজ করতে পারত না [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কঠিন পরীক্ষা। [illegible] সমান দরকার এই সব কাজে। [illegible] কোন কোন ক্ষেত্রে যেন আশাপ্রদ ফল পাওয়া [illegible]

[illegible] কুলিয়াবকো [illegible]

নিয়েই এ পরীক্ষা করতে হবে। একটি তিন মাসের ছেলে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়েছিল। মারা যাবার প্রায় ২০ ঘণ্টা পরে কুলিয়াবকো তার হৃদযন্ত্রটি নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে সেটিকে সজীব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্চর্য কাণ্ড! তাঁর চেষ্টা ফলবতী হ'ল। অবশ্য একেবারে নয়—কারণ ঐ হৃদযন্ত্রটি প্রায় ঘণ্টাখানেক সচল থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাই বা কম কথা কি! মারা যাবার কুড়ি ঘণ্টা পরেও ওটিকে সচল করা গিয়েছিল এ কথাও তো মনে রাখতে হবে!

যাই হোক, কুলিয়াবকোর এই সাফল্য অন্যান্য রুশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা নতুন প্রেরণার সঞ্চার করল। অনেক প্রবীণ এবং সেই সঙ্গে দলে দলে তরুণ বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন এই মৃত্যুঞ্জয়ী গবেষণায়। সত্যিই কি মানুষ কোনদিন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

একজন রুশ বিজ্ঞানী এই গবেষণার বিষয়ে ভারী চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—'কাজ সুরু করার আগে আমরা এ সম্পর্কে আমাদের রাশিয়ার আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা যে সব গবেষণা করে গেছেন তা খুবই ভাল করে পড়ে নিয়েছিলাম। তাতে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হয়েছিল। তারপর আমরা পরীক্ষা সুরু করলাম কুকুর নিয়ে। সবশুদ্ধ প্রায় আড়াই শ' কুকুরের ওপর আমরা পরীক্ষা চালিয়েছি। এজন্য কি অমানুষিক পরিশ্রম আর কি অসম্ভব ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে আমাদের তা বলবার নয়। কুকুরের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বার করে নিয়ে আমরা কৃত্রিম উপায়ে তার শরীরে তাজা রক্ত সঞ্চালনের বন্দোবস্ত করেছি। এজন্য রক্তকে বিশেষভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'উপযোগী' করে নিতে হয়েছিল আমাদের। কিভাবে আমরা এই কুকুরগুলোকে একটু একটু করে মারতাম আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রত্যেকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম তা ভাবতেও অবাক লাগে। প্রতিটি সেকেণ্ডে যে পরিবর্তন হচ্ছে তাও আমাদের চোখ এড়াত না। তারপর চলত সেই মরে-যাওয়া শরীরগুলোতে জীবনীশক্তি ফেরাবার দুর্বার চেষ্টা। অবশেষে একদিন এল, আজ ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়,—যেদিন প্রথম একটি মৃত কুকুরের দেহে জীবনের স্পন্দন ফুটে উঠল। এইভাবে ক্রমেই আমাদের পরীক্ষা সফল থেকে সফলতর হ'তে লাগল। 'মরে যাওয়া' কুকুরগুলোকে আমরা শুধু বাঁচিয়েই তুললাম না—এগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল। পরে এদের কারো কারো বাচ্চাও হয়েছিল।

'তারপর কুকুর ছেড়ে সুরু হ'ল মানুষ নিয়ে কারবার। প্রথমে আমরা ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলাম—কারণ তাদের 'জীবনীশক্তি' বড়দের চেয়ে বেশী। যে সব ছেলেমেয়ে জন্মাবার আগেই মাতৃগর্ভে বা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে তারাই ছিল আমাদের গবেষণার পাত্র। এখানেও আমাদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠতে দেখা যেত। অবশ্য খুব বেশী সময় তাদের বাঁচিয়ে রাখা যেত না, কেন না তাদের শরীরে এমন সব খুঁত থাকত যাতে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কারও হয়ত মগজটাই ঠিকমত গড়েনি, কারও বা ফুসফুসটাতেই খুঁত রয়ে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এই সব খুঁতগুলো না থাকলে ওদেরকে বাঁচিয়ে হয়তো দীর্ঘায়ু করাও অসম্ভব হত না।'

তারপর বাধল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দলে দলে রুশ যুবক সৈন্য দলে যোগ দিয়ে চলে এল রণক্ষেত্রে এবং অনেকেই শত্রুর হাতে প্রাণ হারাতে লাগল। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন—এই তাঁদের গবেষণার সুবর্ণ সুযোগ। যুদ্ধে যারা প্রাণ হারাচ্ছে তারা কেউই ব্যারামে ভুগে মরছে না। পূর্ণস্বাস্থ্য নিয়ে—পূর্ণ প্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও গোলাবারুদ প্রভৃতি অস্ত্রের সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ [illegible] আর তার ফলে

মা বসে আছেন ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে, ছেলের অসুখ করেছে। বাড়াবাড়ি অসুখ, মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে শ্বাস বইছে। মা ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছেন বিছানার পাশে। শীতের দিন, বাইরে শন শন করে বাতাস বইছে, চারিপাশে বরফ পড়ে সব সাদা হয়ে গেছে।

একটি লোক দরজায় ধাক্কা দিল। মা দরজা খুলে দিলেন। একটি বুড়ো লোক কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে এসে ঢুকলো। ঘরে আগুন জ্বলছিল। মা তাড়াতাড়ি তাকে আগুনের ধারে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বুড়ো বললো—ছেলের অসুখ করেছে, বুঝি?

মা বললেন—বড় অসুখ!

তাইত দেখছি—বলে বুড়ো মাথা নাড়লো।

মা বসে রইলেন ছেলের বিছানার পাশে। তিন দিন তিন রাত মায়ের চোখে ঘুম নেই, খাওয়া নেই। বসে থাকতে থাকতে মায়ের ঘুম আসে, চোখ ঢুলে আসে। কোন্ এক সময় মা ঢুলে পড়েন।

ওই বুড়ো হচ্ছে যম স্বয়ং। মা ঢুলে পড়েছেন দেখে ছেলেটিকে নিয়ে সে চলে গেল। ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্যই সে এসেছিল। তন্দ্রা যখন ভাঙলো, মা চোখ মেলেই দেখেন—ছেলে তো নেই, সেই বুড়োও চলে গেছে। সেই বুড়োই তাহলে তাঁর ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গেছে! মা তখনই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে তুষারের উপর এক বুড়ী বসেছিল, মা জিজ্ঞাসা করলেন—দেখেছ, এক বুড়ো একটি ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে?

বুড়ী বললো—সে বুড়ো যে স্বয়ং যম, তোমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। সে তো হাওয়ার আগে যায়, যা নিয়ে যায় তাতো ফিরে দেয় না।

মা বললেন—বলতো সে কোন দিকে গেছে? আমি তাকে ঠিক খুঁজে বের করবো।

বুড়ী বললো—তা না হয় বলে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমার গলার সুর খুব মিষ্টি, তুমি ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে, আমি তোমার জানালার বাইরে বসে শুনতাম, সেই গানগুলি যদি আমাকে গেয়ে শোনাও তাহলে তোমাকে যমপুরী যাবার রাস্তা বলে দেবো!

মা বললেন—আর একদিন আমি তোমাকে গান শোনাবো, আজ তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও, আমি ছেলে খুঁজে নিয়ে আসি।

বুড়ী মাথা নেড়ে বললো—না, তা হবে না।

মা কেঁদে ফেললেন, কিন্তু বুড়ীর কথার নড়চড় নেই, কাজেই মাকে সেইখানে বসে গান গাইতে হোল। অনেক গান। গাইতে গাইতে রাত অনেক হোল। গান শেষ হলে বুড়ী বললো—বরাবর ডাইনে যাও, একটা বন পাবে, সেই বনেই তুমি যমের দেখা পাবে।

চলতে চলতে মা গিয়ে পৌঁছুলেন বনে। বনের মাঝে কিছুদূর যেতেই এসে পড়লেন এক চৌমাথায়। মা থমকে দাঁড়ালেন, এবার কোন্ পথে যাবেন? সামনেই চোখে পড়লো এক কাঁটা গাছ, মা কাঁটা গাছকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি আমায় বলতে পার আমি কোন্ পথে যাব? যমরাজ **আমার ছেলেকে নিয়ে কোন্ পথে গেছেন?**

কাঁটা গাছ বললো—আমি বলে দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তুষারপাতে, ঠাণ্ডায় আমি মরে যাচ্ছি, তুমি যদি তোমার বুকের মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধর, মাতৃস্নেহের উত্তাপে আমি একটু গরম হতে পারি, তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি তোমার ছেলের কথা।

মা তখনই কাঁটা গাছকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। কত কাঁটা বিঁধে গেল তার বুকে, তাঁর হাতে, মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মায়ের স্নেহের স্পর্শ পেয়ে, কাঁটা গাছ থেকে তুষারের কণাগুলি ঝরে পড়লো, সবুজ পাতা আবার দেখা দিল ডালে ডালে। কাঁটাগাছ এবার পথ দেখিয়ে দিল, বললো—এই পথে যাও!

মা আবার এগিয়ে চললেন, বন পার হয়ে এসে পড়লেন এক হ্রদের তীরে। শুধু জল আর জল—যতদূর চোখ যায় শুধুই জল। এই জল মা পার হবেন কেমন করে? মা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন, তারপর সেই জলে গিয়েই নামলেন। শীতের কনকনে জলে তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো, মায়ের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই।

জলদেবতা তখন দেখা দিল, বললো—এই হ্রদ তুমি সাঁতরে পার হতে পারবে? কোন মানুষ তা পারে?

মা বললেন—কিন্তু আমাকে পার হতে হবেই, আমার ছেলেকে যে যমরাজ নিয়ে গেছে ওপারে, আমি ওপারে যাব।

জলদেবতা বললেন—বেশ, আমি তোমাকে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছি, কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। মুক্তা পেলেই আমি তা জমিয়ে রাখি, এটা আমার একটা নেশা। তোমার চোখ দুটি মুক্তার চেয়ে সুন্দর, তোমার ওই চোখ দুটি যদি আমাকে উপড়ে দাও, তাহলে আমি তোমাকে একেবারে যমপুরীতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেব।

—বেশ এখনই উপড়ে দিচ্ছি—বলে মা চোখ দুটিকে উপড়ে দিলেন জলদেবতার হাতে। চোখ দুটি মুক্তার মত টলটল করতে লাগলো।

জলদেবতা প্রসন্ন হলেন, মায়ের হাত ধরে চোখের নিমেষে পৌঁছে দিলেন হ্রদের ওপারে।

হ্রদের ওপারে এক বিরাট বাড়ী, বাড়ী তো নয়, যেন একটি পাহাড়, ঘরের পর ঘর, যেন তার আর শেষ নেই। কিন্তু মা তো আর দেখতে পান না। বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন—যমরাজ কোথায় থাকেন? কোথায় আমি তাঁর দেখা পাব?

এক বুড়ী বাগানের গাছে গাছে জল দিচ্ছিল, বললো—তুমি কে গো? এখানে এলে কেমন করে?

মা বললেন—আমি এসেছি আমার ছেলেকে খুঁজতে, যমরাজ আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছে।

বুড়ী বললো—কে তোমার ছেলে তাতো আমি জানি না, তবে যমরাজার খবর আমি তোমাকে সব বলে দিতে পারি, কিন্তু তুমি তার বদলে আমাকে কি দেবে?

মা বললেন—কি দেবো? আমার তো দেবার মত কিছু নেই।

বুড়ী বললো—তোমার ওই কালো রেশমের মত চুলগুলি আমাকে দাও।

মা তখনই মাথার কালো চুলগুলি বুড়ীকে দিয়ে দিল।

বুড়ী খুসি হোল। মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, যমরাজার বাগানে, বললো—এটি হোল যমরাজার বাগান। এখানে গাছ আছে—ফলের গাছ, ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ। এই এক একটি গাছে এক একটি ফুল, এক একটি মানুষের জীবন, এই গাছগুলি হচ্ছে এক একটি বংশ। এই ফুলের মাঝে কাণ পেতে শুনলে তুমি শুনতে পাবে ধুক ধুক করে মানুষের হৃদপিণ্ড চলছে। যখন যার সময় হয়, যমরাজ তখন সেই ফুলটি তুলে নেয়।

মা বললেন—এতো বড় বাগানে, আমার ছেলের জীবন কোন্ ফুলে আছে তা কি করে জানবো?

বুড়ী বললো—চল তোমার বংশের গাছের কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। সেখানে তুমি চিনে নেবে কে তোমার ছেলে।

(শেষাংশ ১৯৩ পৃষ্ঠায়)

সাত সমুদ্র তের নদীর পারের একটা স্বপ্নের শহর। নাম মস্কো। এখন সেখানে গ্রীষ্মকাল। খুব শীতও নয়, খুব গরমও নয়। ট্রেন থেকে নেমেই দেখলাম দলে দলে ছেলে বুড়ো ছুটে এসেছে রাশি রাশি ফুলের তোড়া আর একমুখ হাসি নিয়ে। দুহাতে জড়িয়ে ধরলো বুকে, একটি ছোট মেয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে আমাদের স্বাগত জানালো। আমরা তাদের অতিথি, তাদের প্রিয়জন। তাদের প্রাণখোলা হাসিখুশি দিয়ে আমাদের প্রবাস ভরে দিতে চায় তারা। আমরা গাড়ীতে চড়লাম তারাও দুহাত তুলে অভিনন্দন জানালো। স্বাগত ভারতবাসী—

মস্কো। সহরের ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা হোটেলের দিকে। এক দল চড়ুই ছোট ছোট পাখা নেড়ে বালির ভেতরে খেলছে। এক ঝাঁক পায়রা বাকুম বাকুম করে গান গাইছে—আর একদল ছেলে ঢালা বালির ওপর [illegible] মত গড়াচ্ছে। আমার খোকা—আমার দেশের খোকাদের মুখ যেন মনে পেলো সেই [illegible] মত মুখগুলোর সঙ্গে; মায়ের স্নেহ দিয়ে তাদের অন্তর স্পর্শ করতে চাইলাম। শিশুরা সব দেশেরই তো এক রকম!—

এক রকম? এদের সম্পদ, এদের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য—এদের শিক্ষার মান—এদের আদর্শ—এদের লক্ষ্য কি আমাদের মতো? জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম বার বার : কী মন্ত্রবলে তোমরা প্রতিটি সাধারণ প্রাণে অসাধারণত্বের বীজ উপ্ত করো—? উত্তর পেলাম। পেলাম অনেক পরে।

মস্কোর ছেলেরা সব ছুটিতে সামার ক্যাম্পে চলে গেছে। কাজেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের মধ্যে।

শিশু তীর্থের সন্ধান পেলাম [illegible]। উজবেকিস্তান। ঠিক যেন বাংলা দেশ। তার গাছপালা, তার মাঠঘাট(?), তার লোকজন সবই যেন বাংলা দেশেরই মত—কোথাও একটুও তফাৎ নেই। ঘরের জানালায় ঘুঘু পাখীর ডাক থেকে আরম্ভ করে মাছির উপদ্রব পর্যন্ত বাংলা দেশের। এরা আমাদের পায়োনিয়ার্স ক্যাম্পে নিয়ে গেলো। গাড়ী এসে গেটে দাঁড়াতেই শিশুকণ্ঠের কাকলীর অভ্যর্থনা—। দলে দলে ছুটে এসে ঘিরে ধরলো আমাদের। এক পাল হরিণ শিশুর মত ছুটে ছুটে চললো সঙ্গে সঙ্গে।

দুধারে আঙ্গুরের ক্ষেত। থোকা থোকা ফলে ভরে আছে গাছ। বিরাট বাগানের মধ্যে বাচ্চাদের [illegible] জায়গা। গ্রীষ্মের ছুটিতে তারা এখানে সবাই মিলে আনন্দের মধ্যে দিন কাটায়। খেলে—ছোটে—হাসে; কিন্তু পড়ার কথা নেই। [illegible] কাছে শিখছে। নিজেদের কাজ নিজেরাই করছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা আমাদের তাদের খেলা আর কাজের সরঞ্জাম দেখাচ্ছে।

ওপরে মেঘনীল আকাশ—; দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধ্যে রাশি রাশি ফুল আর তার ওপর প্রজাপতির মত ডানা মেলে ছেলেমেয়ের দল খেলে বেড়াচ্ছে। সেখানে কিন্তু তাদের অভিভাবক দিদিমণিরাই, মা-বাবারা নন।

অবাধ আনন্দে নিজেদের হারিয়ে ফেললাম আমরা। তাদের সঙ্গে হাতির শুঁড়ের ওপরে চড়ে আমরা স্লিপ খেতে লাগলাম। আবার কেউ কেউ তাদের সঙ্গে চরকিতে ঘুরতে লাগলো। আর এক দল নাচছে। আর আমাদের ডাকছে।

না, আমরা নাচতে পারি না।

পাখীর মত কল কল করে বছর তিনেকের একটি মেয়ে বললে, পারো—এসো। ফুলের মত হাত দুটো বের করে আমায় ধরলো জড়িয়ে—। বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। একমুঠো তুলো। স্বাস্থ্যে—শিক্ষায়—দীক্ষায় সে যেন নূতন স্পন্দন এনে দিলো আমার প্রাণে।

আমি মা। কি করে ভুলি আমার দেশের ছেলের কথা। কত কষ্ট তাদের—খেলবার একটু জায়গা নেই, ছোটবার একটু মাঠ নেই, পেটে ভালো খাবার নেই। এতো বড় মাঠ? আর এতো সুব্যবস্থা? কে করবে? এতো জমির অপচয় কলকাতায় কোথায় আছে? বন্ধ ঘর—বন্ধ প্রাণের রুদ্ধ দরজা তাদের কে দেবে খুলে? তোমরা তো সব পেয়েছির আসরের সন্ধানে [illegible]—আমি স্বপ্ন দেখছি তেমনি শান্তির দেশের কথা,—যে দেশ তোমরা তৈরী করছো—তোমরাই রাজা সেখানকার। কবে তোমাদের দেখতে পাবো সেই আনন্দ-স্বর্গে—দেশেই তো [illegible] শেষে—; উদ্দেশ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছায় সফলতা পায় পূর্ণতার দীপ্তি—

তিন বছরের খোকা-খুকুরা মায়ের কাছে পুতুল নিয়ে রাতে শোয় খেলা ছুটির [illegible]। ছেলেরা থাকে আলাদা। বারো বছর পর্যন্ত তারা এখানে থাকতে পারে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলা আর হাসিতে কাটে(?)। মিলে-মিশে কাজ করে। নিজেদের কাজ নিজেরাই করে। [illegible] করে—বাগান করে। [illegible] হাতে-কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করে।

শিশুর কাছেই খেলা—; খেলাই কাজ। তারা খেলনা বানায়। [illegible] কাহিনী পড়ে। সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকে। [illegible] করতে ভালবাসে না। বাইরের [illegible] করতে হয় [illegible] শেখে। কি প্রয়োজন এই [illegible] তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

[illegible] ছুটির [illegible] পরিবর্তন এরা তাদের [illegible] আনন্দে তারা ফিরে যায় [illegible] নতুন প্রাণ নিয়ে।

যে [illegible] তিনি কি [illegible] সব পেয়েছেন [illegible] শুধু কথা নয় কিন্তু যে সব [illegible] বড় কথা। আমাদের [illegible] করে পেতে চাই। [illegible] শক্তির সন্ধান কি [illegible] পারো।

(১৮৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরদিন রাজা তাঁর দরবারে গিয়ে বললেন—"আজ আপনাদের এক প্রশ্ন করবো। ঠিক ঠিক জবাব চাই। এই দেশে এক চাষী আছে। সে রোজ চার আনা উপার্জন করে। সেই চার আনার এক আনায় খাওয়া-পরা, এক আনা যায় ধারে; আর এক আনায় ঋণ শোধে, শেষ আনা দেয় জলে। বলুন, এ-কথার মানে কি?" মন্ত্রীরা অনেক ভাবলেন, অনেক মাথা খাটালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। চাষীর এই হেঁয়ালী-কথার কোনো ব্যাখ্যাই তাঁরা করতে পারলেন না।

মন্ত্রীদের একজন তখন গোপনে গোপনে খবর নিলেন, রাজা গতকাল কোন চাষীর সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে এসেছেন। তিনি তখন সেই চাষীর কাছে গিয়ে তাকে তাঁর হেঁয়ালীর মানে ব'লে দিতে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করলেন। চাষী বললে—"মাফ্ করবেন, প্রতিজ্ঞা করেছি—যতদিন না একশোবার তাঁকে দর্শন করছি ততদিন ও-কথা কাউকে বলব না।" মন্ত্রী কি ভাবলেন, তারপর বাড়ি গিয়ে তাড়া-তাড়ি একটা মোহরের থলি নিয়ে এলেন। তা থেকে একশোখানা মোহর চাষীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"দেখ, একশোবার রাজদর্শন কর।" সেই সব মোহরে ছিল রাজার মুখের ছাপ। একশো মোহরে রাজার একশো মুখ। খুশী হয়ে চাষী তখন সেই হেঁয়ালীর মানে স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিল মন্ত্রীকে।

মন্ত্রী ফিরে এলেন রাজবাড়িতে। তারপর রাজার কাছে গিয়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন। একেবারে ঠিকঠাক্ জবাব। রাজা ভাবলেন—মন্ত্রী তাহলে নিশ্চয়ই সেই চাষীর কাছে গিয়ে সব জেনে এসেছেন। তিনি তখন হুকুম পাঠালেন চাষীকে ধরে আনতে। চাষী এসে দাঁড়াতেই রাজা বললেন—"কি গো, চাষীর পো! তুমি না প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে একশোবার আমার মুখ না দেখা পর্যন্ত তোমার হেঁয়ালী-কথার মানে কাউকে বলবে না?"

—"কেন মহারাজ! আমি তো মন্ত্রীমশাইকে সব বলবার আগে একশোবার আপনার মুখ দেখে নিয়েছি। এই দেখুন একশো মোহর —আর, এর প্রত্যেকটিতে আপনার মুখের ছাপ। কাজেই একশোবার তো আমার রাজদর্শন হয়ে গেছে।" সবিনয়ে নিবেদন করলো চাষী।

রাজা দেখলেন সত্যিই তো! চাষী তো তাহলে তাঁকে জব্বর ঠকিয়েছে! তিনি তখন চাষীর এই চতুরতায় খুশী হয়ে আরও একশো মোহর উপহার দিলেন তাঁকে।

তিন সাধু যাচ্ছিল বদ্রীনাথ দর্শনে।

তারা তিনজনে তিন দেশের লোক। ভিন্ন ভিন্ন পথে চলছিল পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে।

হঠাৎ একটা জায়গায় এসে যেমন তারা মিলিত হলো অমনি আকাশে দুর্যোগ নামলো। ঝড় ও মেঘগর্জনের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি! তারা তিনজনে গিয়ে আশ্রয় নিলে পাহাড়ের এক গহ্বরে। বৃষ্টি প্রবল থেকে প্রবলতর হলো। জলের তোড়ে পাহাড়ের একটা চাঁই ভেঙ্গে পড়লো ঠিক গহ্বরের মুখে এবং এমনভাবে আটকে রইল যে তিনজনে মিলে ঠেলাঠেলি করেও এক চুল তাকে নড়াতে পারলে না।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগ কেটে গিয়ে আবার ঝলমল করে উঠলো প্রকৃতি! কিন্তু সেই গহ্বরের মধ্যে তখনো রাত্রির জমাট অন্ধকার!

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল সন্ন্যাসীদের। সেখান থেকে বেরুবার আর অন্য কোন পথ নেই; চীৎকার করলেও কেউ তাদের কণ্ঠস্বরও শুনতে পাবে না। [illegible] কোন উপায় না দেখে বদ্রীনারায়ণের [illegible]।

প্রথমজন বললে, হে প্রভু আমি যদি কোন সৎকাজ করে থাকি ত তারি পুণ্যে আমায় এ [illegible] তুমি!

সঙ্গে সঙ্গে [illegible] উঠল আর তার ফাঁক দিয়ে [illegible] এসে পড়লো।

এবার দ্বিতীয় সাধু [illegible] বিশ্বাস [illegible] তুমি আজ এই সংকট থেকে উদ্ধার করো প্রভু!

সে থামতেই পাথরটা আরও একটু সরে গেল এবং সেই ফাঁক দিয়ে প্রচুর আলো [illegible]।

এবার তৃতীয় [illegible] হে প্রভু পরমেশ্বর, আমি তোমার [illegible] কোন পুণ্য কর্ম করেছি কিনা জানি না, [illegible] এই মিনতি যে, আজ আমাদের সকলকে এই বিপদ থেকে [illegible] তুমি!

আশ্চর্য! এই কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গহ্বরের মুখ থেকে পাথরটা গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল আর তারা তিনজন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার বদ্রীনাথের পথে যাত্রা শুরু করলে।

তথাগত

সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্যে জঙ্গলের মধ্যে সব সময় শেয়াল ছিল আগে,—এখন সে পেছনে আর সীজার তার আগে।

ধুঁকতে ধুঁকতে চাষীর বাড়ির কাছে শেয়াল যখন এসে পৌঁছল, তখন কুকুর চাষীর রান্নাবাড়ির আশপাশে যা পড়েছিল চেটেপুটে খেয়ে আরামে শুয়ে শুয়ে জিব দিয়ে মুখ পুঁচছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও শেয়াল কুকুরকে জিজ্ঞেস করলে, "কী ভাই, চাষীর বাড়ির আনাচে-কানাচে কিছু খাবারদাবার পেলে নাকি?"

—"কোথায় কি পাবো!" বললে সীজার।

ডাহা মিথ্যে বললে যে সীজার তা বুঝতে আর বাকী রইল না শেয়ালের। বুদ্ধিতে শেয়ালও ত' কিছু কম যায় না! সে বললে "তাহলে এখন কি উপায়?"

—"উপায় আর কি, একটু বিশ্রাম করে নিতে হয় নাও, তারপর আবার চলো।" বেশ উদ্ধতভাবেই কথাগুলো বললে সীজার। এখন আর তার সেই আগের শান্ত নম্র মেজাজ নেই।

ঠিক এমনি সময় চাষীর বাড়ির ভিতর থেকে একটি কোলের বাচ্চা ছেলে বিকট কান্না শুরু করলে। চাষী-বৌ নানাভাবে তার কান্না থামাতে না পেরে রেগেমেগে বললে, "এবার যদি তুই কাঁদিস, তাহলে তোকে নিশ্চয়ই বাইরে ফেলে দেবো শেয়ালের মুখে!"

একথা শুনে শেয়ালের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, মনে আশার সঞ্চার হলো। সে সীজারকে বললে, "শুনলে, ছেলেটা যদি আবার কাঁদে তাহলে চাষী-বৌ বাচ্চাটাকে আমাদের ভোজে দিয়ে দেবে বলছে!"

—"তুমিও যেমন বোকা, কান্নার জন্যে বাচ্চাকে কেউ কখনো শেয়ালের পেটে দেয় নাকি!"

—"তবে যে বলছে?"

—"বলছে মিথ্যে করে, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে—মাথায় এটুকুও বুদ্ধি নেই শেয়ালপণ্ডিত!"

—"অতটুকু বাচ্চাকে মা মিথ্যে বলে ভয় দেখাচ্ছে!" আশ্চর্য হলো শেয়াল।

—"জঙ্গলের ভূত এটুকুও মাথায় ঢোকেনি!" স্রেফ গালমন্দ দিতে লাগলো শেয়ালকে কুকুর। বাচ্চার কান্না ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে থেমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই তারস্বরে সে আবার কান্না শুরু করে দিলে। চাষী-বৌ এখন তাকে আবার ভোলাতে লাগলো এই বলে যে, "না না, তোমায় মিথ্যে করে বলেছিলুম শেয়ালের মুখে দেব—আর কেঁদোনা বাছা আমার—শেয়ালকে কি তোমায় দিতে পারি!...আসুক না শেয়াল, তাকে মেরেই ফেলব না!"

সীজার তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, "কি, শুনলি ত' বোকারাম! নে, এখন যাবি ত' ওঠ, নয়ত পালা এখান থেকে—ভোর হয়ে আসছে, বাইরে আসবে চাষী-বৌ!"

শেয়াল সবই শুনছিল চুপচাপ করে। সীজারের কথার ভাবভঙ্গী আর শহরে পৌঁছবার আগেই সহরতলীর মানুষের মিথ্যাভাষণের যে নমুনা পেল সে, তাতে কুকুরের সঙ্গে শহরে যাবার আগ্রহ আর তার রইল না। কুকুরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও ঘৃণা বোধ হলো তার। আস্তে আস্তে চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল শেয়াল। তার পর টলতে টলতে জঙ্গলের দিকে মুখ করে চলতে লাগল—সেই চির-পরিচিত জঙ্গলই তার সবচেয়ে সুখের আস্তানা—সেখানেই ফিরে যাবে শেয়াল।

—

(১) শেষ বর্ষা
ফটোঃ অবণী চক্রবর্তী

(২) জন্মদিন
ফটো : তুলসীকান্তি দেবিশ্বাস

(৩) স্মৃতির ব্যথা
ফটো : এম, জি

(৪) "কাদের কুলের বৌ গো তুমি"
ফটো : সুচারুকান্তি ঘোষ

'১১৬' (ড্রাই ব্যাটারী)
মূল্য ঃ ১৭৫৲

বিসিএ ৪৩৬ এ (এ-সি)
মূল্য ঃ ৪৩৫৲

বিসিএ ৫১৬ বি
(ড্রাই ব্যাটারী)
মূল্য ঃ ৪৭৫৲

ফিলিপস্ এর সুপার এম রেডিও

রেডিওতে ম্যাগনেটিক সরঞ্জামের ব্যবহার এটা ফিলিপ্‌স্ এর নূতন এক সৃষ্টি ; এঁদের আধুনিক রেডিওগুলি "সুপার এম্" কৌশলে সমৃদ্ধ হ'য়ে রেডিও জগতে নূতন এক মাপ-কাঠির প্রবর্ত্তন করেছে।

আনন্দ - মুখর দিনের খোরাক জোগাবে ফিলিপ্‌স্ এর নূতন এই 'সুপার এম্' রেডিও গোষ্ঠী। এ দিনের উপহার হিসাবে ফিলিপ্‌স্ এর রেডিওর কথা না ভেবে পারা যায় না।

বিসিএ ৬২৮ ইউ (এসি ডিসি)
মূল্য ঃ ৬৫০৲

সবে বেরিয়েছে

বিসিএ ৩৪৫ বি
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৫ ভাল্‌ভ্,
চমৎকার স্বর, ব্যাটারী খরচে
সাশ্রয়—মূল্য ঃ ২৯৫৲

বিএক্স ৭৪৫ এ (এসি)
মূল্য ঃ ১২০০৲

ফিলিপস্

আপনার গৃহের অফুরন্ত আনন্দের আধার

রেকর্ড চেঞ্জার
এজি ১০০৪ (এসি)
মূল্য ঃ ২৯০৲

ডিস্ক-যকি
এজি ২১৪১ (এসি) মূল্য ঃ ১৬৫৲

রেডিওগ্রাম
এফ্‌সিএ ৬৫৯ এ/ইউ (এসি কিংবা এসি-ডিসি)
মেহোগনী বহিরাবরণ—মূল্য ঃ ১৭৫০৲

মূল্যের উপর স্থানীয় ট্যাক্স্ দেয় কোন রকম ডিস্‌কাউন্টের ব্যবস্থা নেই।

"তা তোমায় বলতে হবে না, বাবা! তুমি স্থির জেনো সৌম্যেন, তোমার বাবাকে সুস্থ করে না নিয়ে আমি এ হাসপাতাল থেকে এক পাও নড়ব না। ভগবানের নিষ্ঠুরতায় যদি তোমার সর্বনাশ হয় বীথিও তার বাপকে হারাবে।"

বীথি কেঁদে ওঠে,—"বাবা"!

সৌম্যেন বলে,—"ছিঃ, কাকাবাবু! অমন কথা বলবেন না। ডাক্তার বোস বলেছেন, আজ অথবা কালকের মধ্যেই বাবার জ্ঞান ফিরে আসবে। ওঁর শক্‌টা একটু বেশী লেগেছে কিনা।"

"ভগবান করুন তাই যেন হয়। হ্যাঁ বাবা! পুলিশ কি কোনও কিনারাই করতে পারল না?"

"না। তারা বলে আপনার ওপর নারায়ণপুরের জমিদারের যে বিন্দুমাত্র আক্রোশ আছে, তার কোনও প্রমাণই তারা এখন পর্যন্ত পায়নি। দুর্ঘটনার কথা শুনে নারায়ণপুরের জমিদার নিজে এসেছিলেন আপনাদের দেখতে।"

"কি ভীষণ শয়তান এই জমিদারটা সৌম্যেন! বেশ, আমি সুস্থ হয়ে উঠি, তখন দেখব—প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। বিকাশ আসেনি বাবা?"

বিকাশ উত্তর দেয়,—এই যে ম্যানেজারবাবু! আমি এখানেই আছি।"

বীথি বলে—"বাবা! বিকাশবাবুর ঋণ আমরা এ জীবনে শোধ করতে পারব না। এই ক'দিন উনি দিবারাত্র একবার আমাদের বাড়ী একবার হাসপাতাল—ছুটোছুটি করছেন।"

বিকাশ প্রতিবাদ করে—"মিস্ সরকারের কথা আপনি শুনবেন না ম্যানেজারবাবু! উনি একটু বাড়িয়েই বলছেন।"

বীথি বলে,—"জানো বাবা! যাঁরা মহৎ, তাঁরা নিজেদের প্রশংসা শুনলে লজ্জা পান।"

"ঠিক বলেছিস মা! বিকাশের মত ছেলে হয় না।"

এমন সময় সঞ্জীবের গলায় একটা গোঙানির আওয়াজ হয়।

সৌম্যেন চেঁচিয়ে ওঠে,—"বাবা! বাবা! কাকাবাবু! বাবার বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে। ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!"

ডাক্তার বোস এগিয়ে আসেন—"কি, কি হ'ল?"

"বাবার বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে দেখুন, দেখুন ডাক্তারবাবু!"

ডাক্তার বোস রোগী পরীক্ষা করে বলেন,—"না জ্ঞান এখনও ঠিক হয়নি। তবে আজ রাত্রের মধ্যেই হতে পারে। আপনারা এখন আর এখানে গোলমাল করবেন না। কোন রকম শব্দে আবার শক্ লাগতে পারে।"

সকলে নীরবে বেরিয়ে যায় কেবিন থেকে।

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু পরে 'চৌধুরী লজের' ড্রইংরুমে বসে সৌম্যেন ও বীথি কথা বলছিল। সৌম্যেন বলে,—"মামলায় হেরেছে বলে নারায়ণপুরের জমিদারের রাগ কাকাবাবুর ওপর হবে কেন? বরং বাবার ওপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই নয় কি বীথি?"

"আমিও একথা ভেবেছি সৌম্যেনদা! তাছাড়া, হারটা এমন কিছু ত বিরাট হয়নি। ছোট্ট একটা তালুক—যার বাৎসরিক আয় ছ'শ টাকাও হবে কিনা সন্দেহ, সেই তালুকটা মাত্র এক বছর নারায়ণপুরের জমিদার দখল করেছিলেন। সে-টুকু হাতছাড়া হয়েছে বলে—"

"আরও একটা বিষয় এর ভেতর ভাববার আছে বীথি! এই পাড়াগাঁয়ে অমন দুর্দান্ত বোমার আমদানী হোল কেমন করে? আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, নারায়ণপুরের জমিদার অশিক্ষিত; তার বাড়ীতে বা গ্রামেও এমন কোনও লোক নেই যে, বোমা তৈরী করতে জানে। আশ-পাশের বিশ-পঁচিশখানা গাঁয়ের মধ্যে আমাদের এই কল্যাণপুরই বর্ধিষ্ণু বলে গর্ব করতে পারে। অথচ এ গাঁয়ে বাবা বা কাকাবাবুর শত্রু কেউ আছে বলে আজ পর্যন্ত আমি শুনিনি। তুমি কি কিছু শুনেছ বীথি?

"না তো।"

"আচ্ছা, বাবা বা কাকাবাবুর কাছে ইদানীং নূতন কোন লোক যাতায়াত করতে দেখছ?"

"না। আমাদের বাড়ীতে মাত্র তিনজন লোকই আসা-যাওয়া করেন। রায় বাহাদুর, বিকাশবাবু—এঁরা প্রায় রোজই আসেন; আর মাঝে মাঝে কল দিলে আসেন ডাঃ বোস।"

"ডাক্তার বোস তো এখানে প্রায় ছ-সাত বছর আছেন। বাবাই তাঁকে এখানকার হাসপাতালের জন্য নিযুক্ত করেন।"

"শুধু তাই নয়; দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রায় চৌদ্দআনা খরচই ত জ্যেঠামণি বহন করেন। না, সৌম্যেনদা! ডাক্তার বোসকে সন্দেহ করার কোন কারণই আমি দেখতে পাইনে। তাছাড়া, জ্যেঠামণি বা বাবার ওপর তাঁর রাগেরও ত কোন কারণ আজ পর্যন্ত ঘটেনি।"

"না, না, বীথি! ডাক্তার বোসের কথা আমি একটুও ভাবি না। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও হাত আছে বলে আমি ভাবতেও পারি না। বাবা ও কাকাবাবু ভাল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত এ ব্যাপারের কোনও হদিসই মিলবে বলে আশা করা যায় না।"

"সৌম্যেনদা! আর একবার খবর নিলে হোত না—জ্যেঠামণির জ্ঞান হয়েছে কিনা?"

"রাত প্রায় দশটা বাজে। এত রাত্রে খবর নিয়ে লাভ কি বীথি? জ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন ডাক্তার বোস কিছুতেই আমাদের কেবিনে যেতে দেবেন না। আজ ত বিকাশের নাইট ডিউটি। যদি পরিষ্কার জ্ঞান হয়, বিকাশ নিশ্চয়ই আমাদের একটা খবর দেবে।"

এমন সময় পুরাতন ভৃত্য শঙ্কর এসে জানায়—"আপনাদের খাবার দেবো দাদাবাবু?"

"এখনই খাইয়ে দেবে শঙ্করদা? বাবার খবরটা শোনবার জন্যে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।"

"তাহোলে আমি গিয়ে খবরটা নিয়ে আসি দাদাবাবু?"

এমন সময় বিকাশ ঢুকল। তার কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাস,—"সৌম্যেন! সৌম্যেন!"

"কি খবর বিকাশ? বাবা কেমন আছেন?"

"Happy News! একটু আগে চৌধুরী সাহেবের জ্ঞান হয়েছে!"

"বিকাশ! বিকাশ!"—আনন্দ আবেগে সৌম্যেন বিকাশকে জড়িয়ে ধরে।

"ছাড়ো, ছাড়ো সৌম্যেন!—এত জোরে আলিঙ্গন করলে দম বন্ধ হয়ে যাবে যে! শোন—চৌধুরী সাহেবের জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু ম্যানেজারবাবুর সন্ধ্যে থেকেই যেন কেমন একটা আচ্ছন্নভাব।"

বীথি আঁৎকে ওঠে—আঁ! "বাবা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?"

"ব্যস্ত হবেন না মিস্ সরকার! ওঁর পেটের ক্ষতটাই খুব বিপদজনক হয়েছিল কিনা! কোন কারণে চাড় লেগে আবার হেমারেজ সুরু হয়। ডাক্তার বোস আবার অ্যাটেণ্ড করেছেন। হেমারেজ্ বন্ধ হয়েছে কিন্তু কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।"

"বিকাশ! আমরা এখন যদি একবার যাই—"

"না, না, ডাক্তার বোসের কড়া আদেশ আমি ছাড়া আর কেউ এখন কেবিনে ঢুকবে না, সকালের আগে ত নয়ই। তাছাড়া এখন দশটা বেজে গিয়েছে। যথারীতি আটটার সময় ডাক্তার বোস কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টাটাক আগে চৌধুরী সাহেবের জ্ঞান হোতে দেখে আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি। উনি দেখে খুব খুশী হয়ে বল্লেন—

তিস্তার জল

• কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত •

তিস্তার উত্তাল জল খলখল সর্বত্র বিরাজে,
নির্লিপ্ত পাহাড়ে নদী বর্ষায় উদ্দাম
স্ফীত বুক;
আকাশের কালো মেঘ বুকে তার জাগায় কৌতুক,
দুধারে নিবিড় বনে
উচ্চকণ্ঠ তীক্ষ্ণ হাসি বাজে।
পাহাড়ের তুঙ্গ থেকে নামে ঢল মাঠে-তেপান্তরে,
জঠরে ঘূর্ণিত বাঁক, মেঘ ঝড় বৃষ্টিতে উদ্দাম,
লোকালয় জনহীন, জলের নিবিড়ে লুপ্ত গ্রাম,
রাত্রির আতঙ্ক জাগে বাতাসের অট্ট কণ্ঠস্বরে।

পাখী ওড়ে নিরুদ্দেশে,
মৃত পশু বেনোজলে ভাসে,
স্বেচ্ছাসেবকেরা তোলে
নিমজ্জমান লোককে নৌকায়;
সন্ত্রস্ত কৃষক মূক, বিচলিত পদক্ষেপ ঘাসে,
ক্রুদ্ধ সর্প খোঁজে স্থান প্লাবিত গাছের শাখায়।

রাত্রিদিন ক্লান্তিহীন কলকল ছলছল বাজে,
উন্মত্ত জলের স্রোত পাড় ভাঙে
সুতীব্র আওয়াজে॥

'থাক্, একটা দুর্ভাবনা কাটল। কিন্তু খুব সাবধান; ওঁকে কেউ বিরক্ত করবেন না। জ্ঞান এখনও বেশ পরিষ্কার হয়নি। একটুখানি শব্দও এখন মারাত্মক হতে পারে! আজ সারারাত উনি সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকুন, কাল সকালে দেখা যা হয় করবো।"

বীথি বলে,—"আর বাবা?"

"ওঁকে দেখে বল্লেন, আজ বিকেলে উনি বড্ড কথাবার্তা বলেছেন, নড়াচড়াও করেছেন,—তাই বোধ হয় স্টিচ ছিঁড়ে গেছে।" একটা ইনজেকশন দিয়ে বলে গেলেন—কাল সকালে আবার দেখবেন।"

"বাবার আবার জ্ঞান হবে তো?"—বীথি কেঁদে ওঠে।

সান্ত্বনা দিয়ে সৌম্যেন বলে,—"বীথি! কেন অধীর হচ্ছ? বেশী রক্তস্রাবের জন্যে কাকাবাবু হয়ত একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। কাল সকালেই তিনি আবার স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন, দেখো। বিকাশ! তুমি ভাই ওঁদের একলা রেখে চলে এসেছ; তোমার বোধ হয় আর দেরী করা উচিত নয়। তুমি খেয়েছ ত বিকাশ?"

"হাঁ, হাঁ, সে আমি সন্ধ্যার আগেই যাহোক একটু খেয়ে নিয়েছি; পরে আর দরকার হবে না। আর এ অবস্থায় খেতেও যে ইচ্ছে করে না সৌম্যেন!"

"বিকাশ! তোমার এ ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না ভাই! তুমি বোধ হয় আর-জীবনে সত্যিই আমার আপন ভাই ছিলে!"

উৎকণ্ঠিতা বীথি বলে,—"বিকাশবাবু! আমরা যদি হাসপাতালের বারান্দায় গিয়ে বসে থাকি?"

"লাভ কি মিস্ সরকার? General Ward-এ দুটো Male Nurse আর কেবিনে এক আমি ছাড়া সারা হাসপাতালটা হয়ে আছে নিঝুম। মাঝে মাঝে দু'একটা রোগীর কাতর কণ্ঠস্বর,—এর মধ্যে গিয়ে লাভ কি বলুন? তাছাড়া, ডাক্তার বোস যদি জানতে পারেন, খুবই বিরক্ত হবেন। আমি

পূজোর উৎসবে...
পূর্ব রেলওয়ে * দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের
শারদীয় অভিনন্দন
গ্রহণ করুন
প্রসিদ্ধ লৌহ এবং ইস্পাত বিক্রেতা—
টি. ডি. কুমার এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
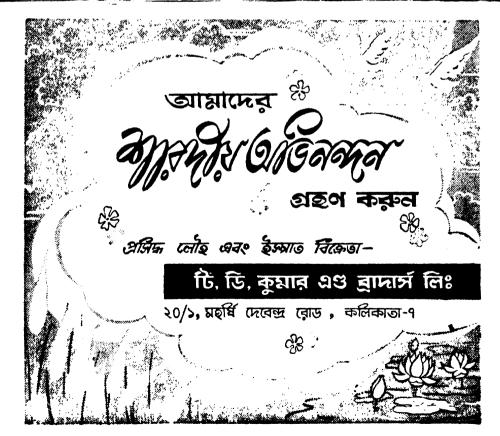
একজন Male Nurse-কে কেবিনের দরজায় বসিয়ে ছুটে চলে এসেছি আপনাদের খবরটা দিতে। আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করুন; কাল সকালেই ত দেখতে যাবেন। আমি তাহোলে এখন চলি ভাই সৌম্যেন।"

"এস বিকাশ! রাত্রে যদি দরকার মনে কর, ডেকে পাঠাতে দ্বিধা কোরো না। রাত্রে আমাদের কারোরই ঘুম হবে না।"

"ঠিক আছে", বলে বিকাশ বেরিয়ে যায়।

* * *

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে সৌম্যেন ও বীথি। চা ঢালতে ঢালতে বীথি বলে,—"তোমার মুখ দেখে বেশ মনে হচ্ছে সৌম্যেনদা, তুমি সারা-রাত একটুও ঘুমোওনি।"

"আর, তুমি যে কেমন ঘুমিয়েছ তা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।"

"সত্যি, সৌম্যেনদা! বাবার খবরটা শুনে,—"

"কাল সারারাত তুমি কেঁদেছ বীথি!—তা তোমার চোখই বলে দিচ্ছে। কিন্তু একথা কেন একবার ভাবলে না যে, কাকাবাবুর অবস্থা ভালর দিকে না গিয়ে যদি খারাপের দিকে যেত, তাহলে তখনই বিকাশ আমাদের সংবাদ পাঠাত? এখনও যখন কোন খবর নেই, তখন—ও'রা দুজনেই ভাল আছেন একথা আমরা নিঃসন্দেহে ভাবতে পারি।"

"খবর না এলেও, চল সৌম্যেনদা! আমরা চা খেয়েই হাসপাতালে চলে যাই।"

হঠাৎ সৌম্যেনের মনে হোল যেন দরজার বাইরে কেউ লুকিয়ে তাদের কথা শুনছে। সৌম্যেন চেঁচিয়ে ওঠে,—"কে? কে ওখানে?"

বীথি বলে,—"কি হোল সৌম্যেনদা?"

"কে যেন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে। দাঁড়াও দেখতে হোল।" সৌম্যেন চেয়ার ছেড়ে তিন লাফে বারান্দায় যায়, পেছন পেছন বীথিও।

বীথি বলে—"ও আমাদের চাকর গোকুল। কিরে গোকুল? তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?"

গোকুল জবাব দেয়,—আজ্ঞে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম দিদিমণি!"

সৌম্যেন ধমক দেয়—"তা, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন শ্রীমান লম্বোদর?"

"আজ্ঞে ঢুকতে সাহস হয়নি তাই।"

বীথি জানতে চায়,—"কি বলতে এসেছিলি বল্?"

"আজ্ঞে আপনারা ত হাসপাতালে চলে যাবেন, কি রান্না হবে?"

"তোর যা ইচ্ছে হয় কর গোকুল! খাওয়ার কথা আমি এখন আর ভাবতে পারব না।"

এমন সময় শঙ্কর এসে বলে, "দাদাবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? আমি নীচ থেকে শুনে ছুটে এলাম।"

"ও কিছু নয় শঙ্করদা! গোকুলটা ঘরে না ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই!"

"দরজার আড়ালে কেন?"

বীথি বলে—"বেকুব ঘরে ঢুকতে নাকি সাহস পায়নি। আচ্ছা তুই যা গোকুল।"

"যে আজ্ঞে, দিদিমণি!" গোকুল চলে যায়।

চলে যাওয়া গোকুলের দিকে শঙ্কর ভুরু কুঁচকিয়ে তাকিয়ে থাকে,—যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করে। সৌম্যেন তা লক্ষ্য করে বলে,—"কি হোল শঙ্করদা? গোকুলের দিকে অমন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছ কেন? ওর ওপর তুমি খুব চটেছ বলে মনে হচ্ছে!"

"কিছুদিন থেকে ওকে আমার একটুও ভাল লাগছে না দাদাবাবু! ও বড্ড মিথ্যে কথা বলে।"

"কেন? কি মিথ্যে বল্ল?"

বীথি বলে,—"মাঝে মাঝে ও একটু মিথ্যে বলে শঙ্করদা তাতে তুমি রাগ কোরোনা। বাবাও মাঝে মাঝে ওর মিথ্যে কথা শুনে চটে যান; তবে খোঁড়া মানুষ,—তায় আবার ৭।৮ বছরের পুরোনো চাকর, তাই ছাড়াতেও পারেন না।"

"না, দিদিমণি! একটু আধটু মিথ্যে নয়; যাকে বলে জলজ্যান্ত মিথ্যে—তাই ও আজকাল বলতে সুরু করেছে।"

সৌম্যেন জানতে চায়,—"কি রকম?"

"এই ত, কাল রাত্রে—"

এমন সময় ঝড়ের বেগে বিকাশ এসে বলে,—"সৌম্যেন! মিস্ সরকার! শীগ্গির,—ম্যানেজার-বাবুর অবস্থা খুব খারাপ!"

বীথি কেঁদে ওঠে,—"বাবা! বাবা!"

সৌম্যেন বলে—"বীথি! বীথি! ধৈর্য হারিওনা। হঠাৎ অবস্থা খারাপ হোল কি করে বিকাশ?"

"কাল সন্ধ্যা থেকেই যে আচ্ছন্ন ভাবটা চলছিল, সেটা আস্তে আস্তে শেষ রাত্রের দিকে ডীপ কোমাতে গিয়ে দাঁড়ায়। ভোর হতেই ডাক্তার বোসকে খবর দি। তিনি এসে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক চেষ্টাই করলেন, কিন্তু—"

বীথি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,—"বাবা! বাবাগো!"

"বিকাশ! তুমি বীথিকে নিয়ে এস, আমি করিমকে দিয়ে গাড়ী বের করছি।"—বলে সৌম্যেন ছুটে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে শোনা যায়, সে শঙ্করকে ডেকে বলে—"শঙ্করদা! শঙ্করদা! কাকাবাবুর অবস্থা খারাপ, আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি।"

বিকাশ বীথিকে সান্ত্বনা দেয়—"মিস্ সরকার! আপনি যদি এমনভাবে কাঁদেন, আমারও ধৈর্যের বাঁধ কিছু থাকবে না। বীথিদেবী! আপনার—হ্যাঁ, শুধু আপনার জন্যেই আমি এত ছুটোছুটি করছি।"

"তাতে কি লাভ হোল বিকাশবাবু? বাবাকে তো—" উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে বীথি।

"বীথি! বীথি! এমন করে ভেঙ্গে পোড়োনা। আমার সামনে এমন [illegible] কোরোনা। আমাকে মাথা স্থির রেখে কাজ করতে দাও। আমি তোমার হাত ধরে মিনতি করছি—" বিকাশ বীথির হাত ধরে।

"চলুন বিকাশবাবু! বাবাকে [illegible]—" আর বলতে পারে না।

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বীথি, তোমার মুখে আবার আমি হাসি ফুটিয়ে তুলব।"

* * *

সৌম্যেন, বীথি ও বিকাশকে নিয়ে গাড়ী ছুটে চলে হাসপাতালের পথে। গাড়ীর ভেতর থেকে ভেসে আসে বীথির কান্নার শব্দ। গাড়ী এসে দাঁড়ায় হাসপাতালের গেটে। ওরা দৌড়ে কেবিনের ভিতরে যায়। ভুবনের মৃতদেহের চারপাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বোস, রায়বাহাদুর বিলাস মল্লী, কম্পাউণ্ডার ইত্যাদি অনেকে। বীথি ছুটে গিয়ে বলে,—"বাবা! বাবা কি বেঁচে নেই ডাক্তারবাবু?"

"অনেক চেষ্টা করেছি মা! কিন্তু তাহলেও পারলাম না যে, ম্যানেজারবাবু চলে যাবেন। আমার ভয় ছিল চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে।"

"বাবা! বাবা!" বীথি ভুবনের মৃতদেহের উপর আছড়িয়ে পড়ে। পাশের বেড থেকে সঞ্জীব কেঁদে ওঠে,—"গেল, আমার সব গেল! বন্ধু, ভাই, অভিভাবক একসাথে আমার সব গেল! বীথিমা! আয় আমার কাছে আয়! বিকাশ! মাকে আমার কাছে এনে দাও বাবা!"

বিকাশ বীথিকে এনে সঞ্জীবের কাছে দেয়। বীথি কেঁদে বলে,—"জেঠামণি! বাবা—"

সঞ্জীব সান্ত্বনা দেন,—"আয় মা! আমার বুকে আয়! কাঁদিস্‌নে মা! আমিই তোর বাবা। আজ থেকে আমাকেই তোর বাবা বলে জানিস্ মা!"

ডাক্তার বোস বলেন, "চৌধুরী সাহেব! আপনি বেশী কথা বলবেন না।"

"না বলে যে পারছিনা ডাক্তার! বাইরে থেকে তোমরা দেখতে সঞ্জীব চৌধুরী জমীদার, আর ভুবন সরকার তার ষ্টেটের ম্যানেজার। কিন্তু, ভেতরের খবর তো তোমরা রাখ না ডাক্তার!! জান না বোধ—কি আজ আমি হারালাম কত বড় সর্বনাশ আমার হয়ে গেল?"

সৌম্যেন বলে, "বাবা, তুমি আর কথা বোলোনা। তুমি এখনও খুবই অসুস্থ। তোমার গলার স্বর পর্যন্ত এখনও বিকৃত হয়ে আছে। রায়বাহাদুর! আপনি একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলুন।"

রায়বাহাদুর বলেন, "চৌধুরী! তুমি নিজে এখনও অত্যন্ত অসুস্থ। মাত্র গতরাতে তোমার জ্ঞান হয়েছে, তার ওপর এত বড় শক; এখন যদি তুমি এত কান্নাকাটি কর, কথা বল,—"

"মারা যেতে পার", এইত বলবে রায়-বাহাদুর? কিন্তু আমি যে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না,—ভুবন নেই? চিরকালের মত আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে! ডাক্তার, তুমি আর একবার ভাল করে দেখ, দেখ প্রাণটুকু আছে কিনা।"

সৌম্যেন ডাক্তার বোসকে জিজ্ঞাসা করে—"বাবার গলার স্বরটা এমন হয়ে গেছে কেন ডাক্তার বোস?"

"বোমার প্রচণ্ড আওয়াজে ও'র ভোকাল অর্গান বেশ কিছুটা অ্যাফেক্টেড হয়েছে। কিছুদিন পরে আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। আপনারা আর দেরী করবেন না। লাসটা সৎকারের ব্যবস্থা একটু তাড়াতাড়ি করুন। নইলে চৌধুরী সাহেবকে—"

সঞ্জীব চেঁচিয়ে ওঠেন—"না, না, ডাক্তার! আর একটু থাকতে দাও,—আর একটু দেখতে দাও।"

* * *

[illegible] পর দিন কেটে যায়। সঞ্জীব চৌধুরী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। [illegible] হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন বাড়ীতে। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে [illegible] দিয়েছে তাঁর দেহে। কণ্ঠস্বর [illegible] গিয়েছে বদলে, বিশ্রীভাবে পুড়ে মুখখানা হয়ে গিয়েছে [illegible] বুক ও পেটের ক্ষতে চামড়ায় টান ধরে [illegible] দিয়েছে কুঁকড়ে। স্বভাবও অনেকটা গিয়েছে [illegible] লোকজনের সঙ্গ অপেক্ষা নির্জনে থাকতেই [illegible] পছন্দ করেন। আগে রায়বাহাদুর ছিলেন তাঁর [illegible] সঙ্গী, এখন বিলাসের সঙ্গেই বেশীক্ষণ [illegible] কাটান। সৌম্যেনের চাইতে বীথিই এখন তাঁর বেশী প্রিয়। তাঁর প্রিয় চাকর শঙ্কর [illegible] হয়ে গিয়েছে তফাৎ; তার স্থানে বসেছে [illegible] গোকুল। তিনি আগে দেখতেই পারতেন না গোকুলকেই এখন তাঁর প্রিয় ভৃত্য। আগের সদাহাস্যময় সঞ্জীব চৌধুরী এখন হয়ে পড়েছেন খিটখিটে। [illegible] প্রচণ্ড শকে এমনভাবে মানুষের [illegible] বদলে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবু, সৌম্যেন ও [illegible] হয়ে পড়ে মনমরা। সৌম্যেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার বাবার চিকিৎসা করাতে চায়। একদিন—

সঞ্জীব চৌধুরীর লাইব্রেরী ঘরে বাবা ও ছেলেতে কথা হচ্ছিল। সৌম্যেন বলে,—"এমনভাবে বাকী জীবনটা তোমাকে আমি কাটাতে দেবনা বাবা! আসছে [illegible] তোমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে expert দিয়ে তোমার চিকিৎসা আমি করাবই।" বিরক্ত হয়ে সঞ্জীব বলেন,—"আমাকে উত্যক্ত কোরোনা সৌম্যেন! যে কটা দিন বাঁচব, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

"এতে অশান্তির ত কিছু নেই বাবা! তুমি যদি চাও, বীথিও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

"না, না, আমি যাব না, কোথাও যাব না।"

"তুমি বুঝতে পারছ না বাবা!—তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! প্রায় এক মাসের ওপর হোল তুমি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ী এসেছ, কিন্তু সত্যিই কি তুমি সুস্থ হয়েছ বাবা? যে তুমি রোজ বিকেলে বেড়াতে না পারলে বিরক্ত হয়ে উঠতে, এই এতদিনের মধ্যে একবারও তুমি বাড়ীর বাইরে যাওনি;

যেতেও চাওনা। ঐ শোবার ঘর, না হয় লাইব্রেরী—এই দুই ঘরে তুমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছ।"

"That's my wish, youngman! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে চালিত করতে পার না।"

বিস্মিত হয়ে সৌমেন বলে, "বাবা! এরকমভাবে ত তুমি আমার সাথে আগে কথা বলতে না! ইচ্ছামান হলে সম্পাদন ত তুমি কোনদিন আমায় করনি। এ তোমার কি হোল বাবা? তোমার এমন ব্যবহার ত আমি সইতে পারছি না বাবা! তোমার দেহের সঙ্গে সাথে তোমার মনও কি এমনভাবে বদলে গেল যে, দিনের পর দিন তুমি আমার সাথে করছ দুর্ব্যবহার? অথচ, আগে তুমি গম্ভীর হলে একটা কথাও আমাকে বলনি। অথচ, কলেজে কামাই হলেও তুমি আমাকে কলকাতায় যেতে দিতে চাইতে না; আর এখন?—রোজ তুমি আমাকে চলে যাওয়ার জন্যে তাগিদ দিচ্ছ,—যেন আমার এখানে থাকাটাও তুমি সইতে পারছ না! কেন?—কেন?—কি করেছি আমি যে তুমি আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ?"—সৌমেন কেঁদে ফেলে।

সঞ্জীব যেন কিছুটা উপলব্ধি করেন। বুঝতে চেষ্টা করেন—নিজের আচরণের পরিবর্তন। অনুতপ্ত হয়ে বলেন,—"সত্যিই কি আমি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করছি সৌমেন? হয়ত করছি, নইলে তুমি এ অনুযোগ করবে কেন? কিন্তু কেন যে করি তাতো আমি বুঝতে পারি না! মাঝে মাঝে যেন আমার সবই গুলিয়ে যায়। বাড়ী থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না—মনেই হয়, তুমি এরা আমার সাথে যাবে না। এই ঘর দুটোর মধ্যেই আমি যেন অনুক্ষণ [illegible] পাই সৌমেন! সেই [illegible] আমার [illegible] [illegible] আমি তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আজকাল আমার [illegible] [illegible] আমি বুঝতে পারছি আমি বড় অন্যায় করছি, আমি বড় অসহায়!"

"না বাবা! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছুটা শান্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করেন—"কি [illegible]?"

"[illegible] লক্ষ্য করেছি, [illegible] তিনি গোকুলের [illegible] আমি দুঃখ [illegible], [illegible] গোকুলের মতো [illegible] [illegible] ঠিক হচ্ছে না।"

"[illegible] মানে?"

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

সঞ্জীব [illegible] [illegible]—"তুমি কি আমার [illegible] চাইছ সৌমেন?"

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], গোকুলের মতো [illegible]—"

"তুমি ভুলে যেও না সৌমেন যে, আমি এখনও বর্তমান। আমার [illegible] [illegible] ওপর তোমার যে অধিকার আসবে, এখনও তা আসেনি। কাজেই সে সম্বন্ধে কাউকে নিয়োগ, বরখাস্ত করার দায়িত্ব আমার, তোমার নয়।"

"বেশ!"—বলে সৌমেন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সঞ্জীব ডেকে বলেন,—"শোন, শঙ্করকে ভাল করে বুঝিয়ে দিও—সে চাকর। মনিবের কোন কাজের সমালোচনা করার অধিকার তার নেই। ভবিষ্যতে যদি এরকম বেয়াদপি সে করে, তাকে আমি চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেবো।"

সৌমেন আর্তনাদ করে ওঠে—"বাবা! কি বলছ তুমি? শঙ্করদা"—

সঞ্জীব [illegible] [illegible] ওঠেন—"Shut up youngman! লেখাপড়া শিখেছ, বাপের সম্মান

কাঞ্চনজঙ্ঘা

রবি দত্ত
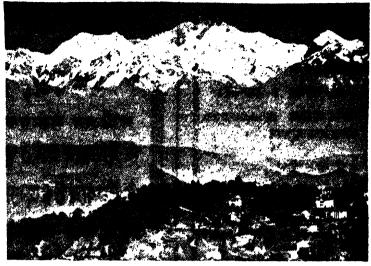
রাখতে শেখনি? তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় চলে গেলে আমি খুসী হব সৌমেন!"

"বেশ"—বলে সৌমেন বেরিয়ে যায়। দালানে দেখা হয় শঙ্করের সাথে। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছে দাদাবাবু?"

"আমার ঘরে চল শঙ্করদা! বলছি।"

যেতে যেতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে—"কর্তাবাবুর কি হয়েছে বলুন তো দাদাবাবু? আজকাল হঠাৎ এত রেগে যান!"

"শুধু রাগ নয় শঙ্করদা! বাবার দৃষ্টিভঙ্গীও একেবারে বদলে গিয়েছে। উনি যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছেন। আমি কালই কলকাতায় চলে যাব শঙ্করদা।"

"সে কি দাদাবাবু? কর্তাবাবুকে একটু স্বাভাবিক না করে—"

"কি করব শঙ্করদা? কলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করাতে চাই, কিন্তু উনি যাবেন না।"

"আমি একটা কথা বলব দাদাবাবু?"

"কি বল।"

শঙ্কর একবার চারিদিকে সতর্কদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপাগলায় বলে—"ব্যাপারটা আমার কাছে কিন্তু ভাল ঠেকছে না দাদাবাবু! আমার মনে হচ্ছে, যেন কি একটা ষড়যন্ত্র চলেছে।"

সবিস্ময়ে সৌমেন বলে,—"ষড়যন্ত্র?"

সৌমেনের আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে শঙ্কর বলে—"কিছুদিন থেকে গোকুলের চালচলন আমার ভাল লাগছে না।"

"কেন বলত?"

"কর্তাবাবুর দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকে আমি লক্ষ্য করেছি, গোকুল, ম্যানেজারবাবু আর ঐ বিকাশবাবু প্রায়ই ম্যানেজারবাবুর শোবার ঘরে বসে কি সব পরামর্শ করতেন। মাঝে মাঝে একটু বেশী রাতেও গোকুল গিয়ে বিকাশবাবুকে ডেকে এনে ম্যানেজারবাবুর সাথে দেখা করিয়ে দিত।"

"ওটা কিছু নয় শঙ্করদা! বীথির কাছে শুনেছি, বিকাশদের কয়েকখানা জমি নিয়ে কি একটা মামলা হচ্ছে। বিকাশ সেই সম্বন্ধেই হয়ত কাকাবাবুর সাথে পরামর্শ করতে আসত।"

"কিন্তু যেদিন ম্যানেজারবাবু মারা যান, তার আগের দিন রাতে কর্তাবাবুর জ্ঞান হওয়ার খবর নিয়ে বিকাশবাবু আপনাদের কাছে যখন এসেছিলেন তখন রাত প্রায় দশটা। তারও প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বিকাশবাবু আর একবার এসেছিলেন।"

"রাত নটায় বিকাশ আর একবার এসেছিল? কৈ আমাদের সাথে ত দেখা করেনি। কেন এসেছিল জান?"

"ঠিক জানিনা দাদাবাবু! তবে, এটুকু টের পেয়েছিলাম, তিনি বাড়ীর ভিতরে আসেননি। রান্নাঘরের পিছনের জানলা থেকে তিনি গোকুলকে ডেকে বাইরে নিয়ে যান। কোথায় গেলেন তাঁরা দুজনে তা জানি না; তবে প্রায় আধঘণ্টা পরে গোকুল ফিরে আসে।"

"কি বলছ শঙ্করদা? এতো আমার কাছে রহস্য মনে হচ্ছে?"

"সেই রাত থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি—আপনি ও দিদিমণি যখনই কোন কথাবার্তা বলতেন, গোকুল আড়াল থেকে তা শোনবার চেষ্টা কোরত।"

"তাই নাকি শঙ্করদা?"

"জিজ্ঞাসা করলেই স্রেফ বলত—'নাতো, আমি তো ওখানে দাঁড়াইনি; ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।' এত বড় মিথ্যেবাদী ও, দাদাবাবু!"

সৌমেন চিন্তিত হয়ে বলে, "তাইতো শঙ্করদা! বিকাশ আর গোকুল সম্বন্ধে আমাকে তুমি ভাবিয়ে তুললে। একটা সন্দেহের গন্ধ যেন আমি পাচ্ছি। কিন্তু—কি যে ব্যাপার তাতো বুঝতে পারছি না। তুমি গোকুলের ওপর কড়া নজর রাখো শঙ্করদা। আমি বিকাশের দিকটা দেখছি। কিন্তু, বিকাশকে সন্দেহ করতেও যে প্রবৃত্তি হয় না। কাকাবাবুর মৃত্যুতে কি যে ওর লাভ-লোকসান হোল, তাও বুঝি না। ও-ই কি তবে—?"

... সেটা বুঝতে

হঠাৎ শঙ্কর বলে ওঠে—"চু"

সৌমেন জিজ্ঞাসা করে ... মতের পরিবর্তনও তো

"চুপ! দাদাবাবু!, তোমাদের যেটা তখন বুঝতে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেন সেটা ভুলে যেতেই বলছি।"

হয়!" ... এরীতে বলছ নাকি, বাবা?"

"Nothing is too late, youngman! ... ইচ্ছা করি, বীথির সাথে তুমি আর বেশী ... শুনতে মশা করবে না। বিকাশের সাথেই আমি তার উত্তোলিতদের স্থির করেছি। বিকাশ শীগ্‌গিরই ... ক'ত টাকা Atomic Research করতে। তার আগেই—

গোকু আসছে মাসে আমি ওদের বিয়েটা সেরে "N ... ই। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার সৌমেন!

মাসের মে

* * *

শীমোহ... বিশ্বটা যেন ওলটপালট

আনন্দময়ীর আগমনে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
বেঙ্গল শটী ফুড
ইহা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত ও ব্যবস্থিত।
BENGAL SOTIE FOOD
অমূল্যধন পাল এণ্ড কোং
১১৩ নং খোংরাপট্টী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

হাজার টাকা নিয়েছে। তাকে বলে দে গোকুল। এ মাসে আর সে এক পয়সাও পাবে না।"

অন্তরাল থেকে শংকর বলে,—"দাদাবাবু!"

সৌমেন সাবধান করে দেয়,—"চুপ!"

গোকুল ঘাড় চুলকে বলে,—"আজ্ঞে, তা হোলে বিকাশবাবুকে তাই বলে দি'?"

"দাঁড়া, একটু ভাবতে দে। মেয়েটা আমায় সর্বস্বান্ত করবে। আচ্ছা, আজ থাক্। কাল সকালে তাকে আমার সাথে দেখা করতে বলিস্। বীথি কোথায় রে?"

"আজ্ঞে আসার সময় দেখলাম, তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সঞ্জীব বলেন,—"মেয়েটাকে শান্ত করার কোনও উপায়ই দেখছি না। আচ্ছা, তুই যা। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর্।"

* * *

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে চৌধুরী বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানের নির্জন প্রান্তে একখানা বেঞ্চের উপরে বসে বাপ-মা হারা বীথি তার দুঃখের কথা বলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। [illegible] —"আমায় একা ফেলে কোথাও গিয়ে তুমি একদিনও বেশীও থাকতে পারবে না [illegible] আমায় ছেড়ে তুমি কেমন করে আছ [illegible]"—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বীথি।

এমন সময় ধীরে ধীরে [illegible] এসে দাঁড়ায় সৌমেন। বীথির [illegible] —"বীথি!"

বীথি [illegible] বলে—"[illegible] অন্ধকারে [illegible] তুমি [illegible] হয়ে পড়েছ যে।"

"[illegible] সৌমেন!"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বীথি চুপ করে [illegible]

বীথি [illegible]

"কে বল?"

"জানি না।"

"[illegible] সামনের বছর [illegible] আমি [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] তুমি [illegible]"

"কিন্তু, [illegible]"

"কাকাবাবুর কথা [illegible] মত ছিল; [illegible] ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যা কিন্তু, আমি তোমার [illegible] বাবার সাথে তার বাহিরের সম্পর্কটা [illegible] অমত করছিলেন। এই নিয়ে বাবার সাথে তাঁর অনেক তর্কও হোত, শেষ পর্যন্ত কাকাবাবুই [illegible]"

"হঁ, কিন্তু বাবা আগের মতে স্থির থাকেনি।"

একটু অভিমানের সুরেই সৌমেন বলে,—"তাহলে কি আমায় বলতে হবে বীথি [illegible] বাবার মতেই তোমার মত?"

"আমি তাই বলেছি নাকি? [illegible] নেই; তাঁর মতের [illegible]"

"আজ কাকাবাবু [illegible] তিনি কখনই যেতেন না, তাও তো তুমি জান বীথি।

তাঁর সংকোচের কারণ ছিল—জমীদারের একমাত্র ছেলের সাথে তারই কর্মচারীর মেয়ের বিয়ে! কিন্তু, তুমি ত অস্বীকার করতে পারবে না বীথি!—কাকাবাবুও পারতেন না যে, বাবা তাঁকে কর্মচারী হিসেবে কোনদিনই দেখেননি; নিজের ভাই-এর চাইতে কম তাঁকে কখনও ভাবেননি। আমাদের বিয়েতে স্বর্গ থেকে কাকাবাবু আশীর্বাদই করবেন, এ তুমি স্থির জেনো বীথি! এ-ও কি তুমি লক্ষ্য করনি যে, বাবা আজকাল আমার চাইতে তোমাকেই বেশী ভালবাসেন? কেন জানো? এখন আর তুমি তাঁর কাছে শুধু বীথিই নও, তাঁর ভাবী পুত্রবধূ!"

এমন সময় গোকুল এসে জানায়—"দাদাবাবু! কর্তাবাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—গোকুল চলে যায়।

সৌমেন বলে,—"তুমি এখানেই বোসো বীথি! আমি বাবার সাথে কথা বলে এখুনি আসছি। তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে।"—সৌমেন চলে যায়।

বীথি ভাবে,—"তোমার স্ত্রীর আসনে বসতে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করব সৌমেন! সেই স্বপ্ন যে আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। [illegible] আমার সে স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারিনি। তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই আমি [illegible] সৌমেন! আজ তুমি আমার সমস্ত চিন্তার অবসান করেছ।"

ধীরে ধীরে বিকাশ এসে দাঁড়ায় বীথির পিছনে, হঠাৎ বীথির চোখ টিপে ধরে। বীথি বলে,—"চোখ ছাড়ো সৌমেনদা!"

চোখ ছেড়ে দিয়ে বিকাশ বলে,—"সৌমেনদা নয়, বিকাশ।"

"ছিঃ বিকাশবাবু! এ আপনার কি আচরণ?"

"[illegible] সৌমেন ধরলেই বরং সেটা অন্যায় হোত, কারণ তুমি বিকাশের বাগদত্তা স্ত্রী।"

[illegible] বীথি বলে,—"না। আপনি এখান থেকে চলে যান বিকাশবাবু।"

বিকাশ [illegible] বলে,—"তা কি পারি বীথি? এমন [illegible] সুন্দর সন্ধ্যা!"

"চুপ করুন বিকাশবাবু! আপনার মত একজন শিক্ষিতের কাছে এরকম আচরণ পাব তা আমার [illegible] ছিল না।"

"[illegible] আচরণ করেছি কি? তোমার [illegible] ইচ্ছাকেই আমি রূপ দিতে চাই। [illegible] তোমার কোন অধিকার আছে বলে [illegible] মনে করি না।"

"[illegible] মনে করুন। কিন্তু বাবার [illegible] আপনি দিচ্ছেন, তা ছিল তাঁর [illegible] আন্তরিক নয়।"

"[illegible] ইচ্ছাটা কি ছিল জানতে পারি [illegible] হবে—সেটা নিশ্চয়ই নয়!"

"[illegible] বাবা ও জেঠামণির সে ইচ্ছাই ছিল, এবং তাই হবেও।"

বিকাশ অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। বলে,—"খুবই [illegible] বীথি! তোমার বাবার মত ত বদলে ছিলই, [illegible] জেঠামণিও তাঁর মতের পরিবর্তন করেছেন—এও তুমি জেনে রাখতে পার।"

"আমি বিশ্বাস করি না। আর এবিষয় নিয়ে আপনার সাথে আমি আলোচনাও করতে চাই না।"—বলেই বীথি উঠে চলে যায়।

বিকাশ চেঁচিয়ে বলে—"যাচ্ছ যখন, চৌধুরী সাহেবকে [illegible] একবার জিজ্ঞাসা করে নিও। আশা করি, কাল তোমার মতের পরিবর্তনও আমি দেখতে পাব।"

* * *

[illegible] সঞ্জীব ও সৌমেনের মধ্যে তখন কথা হচ্ছিল। সঞ্জীব বলেন,—"আমাকে আর একটু সুস্থ

এখানেও রাত নামে : নিঝুম তারকা চুপে চুপে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে, পাহাড়িয়া মাদলের সুর
ক্লান্তির প্রবাহ আনে করুণ পৃথিবী ছায়াধূপে
ক্রমশঃ প্রগাঢ় হয়, মনে বাজে কথার নূপুর।

কাহিনী ফুরোয় সব, কাহিনী আবার সুরু হয়
স্বীপের নির্জন আলো গল্পের
কল্পনা গ'ড়ে তোলে,
উপোসী হাওয়ার স্বরে সমুদ্রের সজল বিস্ময়
নির্ঝরের মত ঝরে পড়ে নীল উপলের কোলে।

আবছায়া অন্ধকারে আশ্চর্য পাখির মত তার
অরণ্যের কাতরতা সুরেলা সময়ে কেঁপে ওঠে,
তুলসী মঞ্চে নেভে দীপ; মন্ত্রমুগ্ধ বর্ণ-বসুধার
উন্মীলিত চিত্রপটে বাঙময় গন্ধের-কলি ফোটে।

সকলে ঘুমোয় তবু শঙ্খমালা মেঘের ভিতরে
একটি অবাক আলো উজ্জ্বল প্রসন্ন হাসি হাসে,
শিশির শেফালী প্রায় দীর্ঘতর রজনীর চরে
তন্দ্রাহীন জীবনেরে একান্ত নির্ভয়ে ভালবাসে।

না দেখে যখন তুমি কলকাতায় যেতে চাওনা, তখন—বাপ হয়ে ত আর আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তবে পারসেন্টেজটা যাতে থাকে সেদিকে একটু লক্ষ্য রেখো।"

"কলেজের পারসেন্ট আমার শর্ট পড়বে না, বাবা!"

"বেশ। হ্যাঁ, তোমাকে যে জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। শুনলাম—তুমি বীথির সাথে একটু ঘনিষ্ঠভাবেই মিশছ। সেটা—"

"কে বলেছে তোমাকে এ কথা?"

"যেই বলুক, আমি জেনেছি। তুমি প্রশ্ন কোরোনা সৌমেন! আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোন। তুমি ভুলে যেওনা যে, তুমি মিলিওনিয়ার সঞ্জীব চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। তোমার সাথে আমার ষ্টেটের একজন কর্মচারীর মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।"

"বাবা!"—

"বাধা দিও না, আমাকে বলতে দাও। ভুবনকে আমি ভাই-এর মতই ভালবাসতাম সত্যি। কিন্তু, তাই বলে—তাকে আমি আমার বৈবাহিকের আসন দেবো, সেকথা আমি ভাবতেও পারি না।"

"কিন্তু, তুমিই কাকাবাবুর কাছে সে প্রস্তাব করেছিলে বাবা! বীথি এবং আমাকেও সেটা বুঝতে দিয়েছিলে।"

"স্বীকার করি; কিন্তু মতের পরিবর্তনও তো হতে পারে? আর, তোমাদের যেটা তখন বুঝতে দিয়েছিলাম, এখন সেটা ভুলে যেতেই বলছি।"

"খুব দেরীতে বলছ নাকি, বাবা?"

"Nothing is too late, youngman! আমি ইচ্ছা করি, বীথির সাথে তুমি আর বেশী মেলামেশা করবে না। বিকাশের সাথেই আমি তার বিয়ে দেবো স্থির করেছি। বিকাশ শীগ্গিরই জার্মানী যাচ্ছে Atomic Research করতে। তার আগেই,—অর্থাৎ আসছে মাসে আমি ওদের বিয়েটা সেরে দিতে চাই। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার সৌমেন!

* * *

সৌমেনের [illegible] বিশ্বটা যেন ওলটপালট

হয়ে যায়! সে ভেবে কূলকিনারা পায় না কেমন করে সবই যাচ্ছে বদ্‌লে। তার মনে হয় যেন চারিদিকে একটা অভেদ্য রহস্যের ব্যূহ গড়ে উঠ্‌ছে, একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের নাগপাশ তার চারদিকে কুন্ডুলী পাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাকে পিষে মারবার জন্যে। সে ভাবে,—"কেন এমন হোল? যিনি জীবনের কোন অবস্থার মধ্যেই আদর্শচ্যুত হননি, যাঁর কথার একটু নড়চড় হওয়ার দৃষ্টান্ত আজও আমার জানা নেই, সেই বাবার একি অদ্ভুত পরিবর্তন? তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব কিছুই আজ আর তাঁর ভেতরে অবশিষ্ট নেই! কে তাঁকে এমন করে ফেলল? শুধুই কি বোমার শকে এমন হোল? না, আর কেউ তাঁর আঘাত-দুর্বল মস্তিষ্কের সুযোগ নিয়ে এমনভাবে তাঁকে অমানুষ করে তুলছে। কে সে? বিকাশ? কি স্বার্থ তার? বীথি? কিন্তু কেমন করে সে সবরকম অসম্ভবকে সম্ভব করছে? কি যাদুমন্ত্রে সে বাবাকে মুগ্ধ করেছে, যাতে চাওয়ামাত্র বাবা হাজার হাজার টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছেন? দিচ্ছেন গোপনে। কেন? কেন? আজ বাবা না থেকে যদি কাকাবাবু বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়ত তাঁর দ্বারা এসব সম্ভব হোতেও পারত! বাবা যদি তাঁরই হাতে তুলে দিয়ে যেতেন আমার ভার, তাঁর মিলিয়নের সমস্ত দায়িত্ব, আর যদি দেবতুল্য কাকাবাবু অর্থের লোভে এমন করে আমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইতেন,—হয়ত এ রহস্যের অর্থ খুঁজে পেতাম। কিন্তু, একি হোল? এ রহস্যের মূলে কোথায় আমায় খুঁজে দেখতেই হবে।"

* * *

হঠাৎ সৌমেন বেরিয়ে পড়ে। সোজা চলে যায় রায়বাহাদুরের বাড়ীতে। বাইরের ঘরেই দেখা হয়ে যায় রায়বাহাদুরের সাথে। সৌমেনকে দেখে রায়বাহাদুর বলে ওঠেন,—"এস, এস সৌমেন! কেমন আছ বাবা? তোমার বাবা কেমন আছেন?"

"আজ্ঞে, ভাল আছি। বাবা—ঐ একই রকম। বিকাশ বাড়ী আছে?

"না তো! সে ব্রেকফাস্ট শেষ করেই বেরিয়ে গিয়েছে। তোমাদের ওখানে যায়নি?"

"তা আমি ঠিক বলতে পারি না। হয়ত বাবার কাছে গিয়েছে। আমার সাথে দেখা হয়নি।"

"সে কি সৌমেন! সে তোমার সমবয়সী। তোমার সাথে দেখা না করে সোজা চৌধুরীর কাছে! তাঁর সাথে ওর কি এমন দরকার তাতো বুঝি না! তোমার বাবাও যেন ওকেই আজকাল বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন। প্রায়ই লোকদের দিয়ে ওকে ডেকে পাঠান।"

"অথচ, এই গ্রামে আপনিই বাবার একমাত্র বন্ধু।"

ম্লান হেসে রায়বাহাদুর বল্লেন,—"ছিলাম, এখন আর নেই। তোমার বাবার কি হয়েছে বলত সৌমেন? হাসপাতাল থেকে আসার পর থেকে তিনি যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছেন।"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। ডাক্তার বোস বল্লেন, বোমার শকে ওঁর ওপর-ভেতর সবই ওলটপালট হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। বড়ই দুঃখের কথা সৌমেন।"

"আচ্ছা রায়বাহাদুর! আপনাদের সেই জমি নিয়ে মোকদ্দমাটার কি হোল?"

"মোকদ্দমা? কৈ!—জমি নিয়ে আমাদের ত কোনও মামলা কখনও হয়নি। তুমি একথা কোত্থেকে শুনলে বাবা?"

"বীথির কাছে বিকাশ বলেছিল কিছুদিন আগে।"

"বাজে কথা।"

সৌমেন আবার প্রশ্ন করে,—"বিকাশ বুঝি পরমাণু গবেষণা করতে জুরিখ যাচ্ছে?"

"জুরিখ? পরমাণু গবেষণা? এসব অদ্ভুত কথা তুমি কোত্থেকে শুনেছ সৌমেন? বিকাশ ত কোথায় যেন একটা কেমিস্টের চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেছে, শুনেছি। এতদিন চুপ করে বসেই ছিল। মাস দুই আগে—কি একটা কেমিস্ট্রির রিসার্চ করবে বলে কিছু কেমিক্যাল আনার জন্য টাকা নিয়েছিল। কয়েকদিন তার এই ছোট্ট লেবরেটারীটার ভিতরে করলও কি সব কাজ। তারপর,—ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে ওকে ত আর লেবরেটারীতে বসতেও দেখি না। কি-যে করে বেড়ায় তাও জানি না।"

"আপনি যদি একটু উৎসাহ দেন, তাহলে হয়ত ও আবার গবেষণায় লেগে পড়বে।"

"দেখি। তবে, হ্যাঁ,—ওকে খুব উৎসাহ দিতেন তোমাদের ম্যানেজার ভুবনবাবু। বিকাশকে খুবই ভালবাসতেন তিনি। মাঝে মাঝে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরেও ভুবনবাবু চলে আসতেন বিকাশের লেবরেটারীতে। অনেক রাত পর্যন্ত ওর কাছে থেকে ওকে উৎসাহ দিতেন। বিকাশকে বড় করবার তাঁর কি আগ্রহই ছিল! তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথেই বিকাশও সব ছেড়ে দিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—জুরিখের কথা বলছিলে না? ভুবনবাবুই আমাকে কয়েকবার অনুরোধ করেছিলেন—পরমাণু গবেষণার জন্য ওকে জুরিখ পাঠাতে। চৌধুরীকে বলে কিছু টাকাও ওকে সাহায্য করতে পারবেন, সে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু, সবই আকাশ কুসুমের মত মিলিয়ে গেল।"

"আচ্ছা, রায়বাহাদুর! আমি আজ তাহলে উঠি।"

"এস বাবা! মাঝে মাঝে সময় পেলে এস। তুমি ত আবার কলকাতায় চলে যাবে। [illegible] বাবাকেও নিয়ে যাওনা কেন? ভাল ডাক্তার দেখিয়ে—"

"আজ্ঞে, সে ইচ্ছে আছে; কিন্তু বাবা যেতে চান না। দেখি—চেষ্টা করে। আচ্ছা, তাহলে আজ চলি! নমস্কার!"

"এস বাবা!"

* * *

রায়বাহাদুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সৌমেন সোজা চলে যায় হাসপাতালে—ডাক্তার বোসের কাছে। তাঁর চেম্বারে গিয়ে ডাকে,—"ডাঃ বোস, ভিতরে আসতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। সৌমেনবাবু! আসুন—কি খবর? এমন সময় হাসপাতালে যে? আপনার বাবা কেমন আছেন?"

"ভাল। ভালই বা বলি কেন?—একই রকম।"

"আপনি বরং এক কাজ করুন, সৌমেনবাবু! ওঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান। বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে একটু বেশীদিন চিকিৎসা করালে আমার মনে হয় মস্তিষ্কের ক্রিয়া ভাল হতে পারে, তবে বয়সটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছে এই যা।"

"নিয়ে ত যেতে চাই ডাক্তার বোস! কিন্তু, উনি কিছুতেই যেতে রাজী নন। বোঝাতে গেলে ভীষণ চটে ওঠেন।

"না না—তাহলে আর জোরাজুরি করবেন না। তাতে আরও খারাপ হতে পারে। তাহলে বরং কোনও একটা ভাল জায়গায় চেঞ্জে নিয়ে যান,—তাতে হয়ত কিছুটা উপকার হতে পারে। তারপর কি খবর বলুন?"

"আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

"বলুন।"

"আচ্ছা, যেদিন সন্ধ্যায় বাবার প্রথম জ্ঞান হয়,—অর্থাৎ কাকাবাবু মারা যাওয়ার আগের দিন,—সেই সন্ধ্যাতেই কি কাকাবাবু আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন?"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না সৌমেনবাবু! যে সন্ধ্যায় চৌধুরীসাহেবের জ্ঞান হয়েছে বলে খবর পেলাম সে সন্ধ্যায় ম্যানেজারবাবু ত ভালই ছিলেন। তাঁর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কোন খবরই ত আমি পাইনি। আমি অবশ্য সেদিন একটু সকাল সকালেই—অর্থাৎ সন্ধ্যা ৮টার মধ্যেই কোয়ার্টারে চলে যাই।"

"বাবার জ্ঞান হওয়ার খবর পেয়ে আপনি যখন তাঁকে দেখতে এলেন, তখন কাকাবাবু—"

"আমি দেখতে আসিনি তো! মাথাটা খুব ধরেছিল বলে আমি কোয়ার্টারে গিয়েই শুয়ে পড়ি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিকাশবাবু গিয়ে আমায় বল্লেন যে, চৌধুরীসাহেবের জ্ঞান আছে। শুনে আমি খুব খুসীই হয়েছিলাম, বিকাশবাবুকে বলে দিলাম—তিনি যেন ওষুধের এক দাগ এখুনি খাইয়ে দেন; আর চৌধুরীসাহেবকে যেন কোনওরকম বিরক্ত করা না হয়। ওর আস্তে আস্তে এবার স্বাভাবিক ঘুম আসবে। কাল সকালে আমি গিয়ে দেখব।"

"কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ার কোন কথাই বিকাশ আপনাকে বলেনি?"

"না তো, তা যদি হোত তাহলে পরদিন সকালেই তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর একটা কারণ খুঁজে পেতাম,—সেটা এখনও আমার কাছে রহস্যের মতই রয়ে গিয়েছে।"

"তবে যে বিকাশ বলেছিল—কাকাবাবুর [illegible] আঘাতটাই খুব বিপজ্জনক হয়েছিল, [illegible] হঠাৎ [illegible] কাকাবাবু আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন।"

"This is a news to me, Soumen Babu! একথা এই প্রথম আমি [illegible] শুনছি। ম্যানেজারের injury [illegible] সামান্যই ছিল If I can correctly remember it."

"হু, আচ্ছা, আমি উঠি।"

"এখন, কি বাড়ী ফিরবেন?"

[illegible]

* * *

[illegible]

"আজই?"

"হ্যাঁ আজই। আর [illegible] তুমি [illegible] না। [illegible] তুমি জুরিখ যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের ব্যবস্থা করো। আমি এদিকে আর একটা [illegible] ব্যবস্থা করে তোমাকে লিখব। তখন তুমি এসে বিয়ে করে যাবে।"

"কিন্তু, বীথি যদি রাজী না হয়?"

"সেটা আমি দেখব; তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি আজই রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হও।"

"বাবাকে ত কিছুই বলা হয়নি। আজই হঠাৎ যেতে চাইলে—"

"That's right. চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি গিয়ে বলব যে, ভুবনের প্রতিশ্রুতি-মত আমি সমস্ত খরচ দিয়ে তোমাকে জুরিখ পাঠাচ্ছি; আর বীথিকে আমি তোমার হাতেই দেব স্থির করেছি।"

"তাহলে অবশ্য বাবার মনে কোন সন্দেহ আসবে না।"

"তবে, মনে রেখো বিকাশ নন্দী! বিশ্রী করলে তার ফল খুব খারাপ হবে। হ্যাঁ, দাঁড়াও যাবার আগে সৌমেন কোথায় আছে সেটা জানা দরকার।

বারান্দায় গোকুলকে বসিয়ে রেখেছি,—ওকে একবার ডাক তো!"

বিকাশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ডাকে—"গোকুল!"

গোকুল জবাব দেয়,—"যাই বাবু!" গোকুল এসে দাঁড়ায়।

সঞ্জীব বলেন,—"দাদাবাবু কোথায় রে?"

"ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে গিয়েছেন এখনও ফেরেননি।"

"আচ্ছা তুই যা। চলো এস বিকাশ!"

সঞ্জীব ও বিকাশ রায়বাহাদুরের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়।

* * *

হাসপাতাল থেকে উর্দ্ধশ্বাসে সৌমেন বাড়ী ফিরে আসে। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। বাড়ীতে ঢুকতেই দেখা হয়ে যায় শংকরের সাথে। শংকর জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছে দাদাবাবু? এমন হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী ঢুকছেন যে?"

"ভীষণ অবস্থা শংকরদা! তুমি এস আমার সাথে, সব বলছি। বীথি কোথায়?"

"ওপরেই আছেন।"

"আর, বাবা?"

"উনি দিনকয়েকের মধ্যে একটু আগেই বেরিয়েছেন। বোধ হয় বাবুদের বাড়ীতেই গেছেন।"

"খুব ভালো হয়েছে আমি ঠিক সময়েই এসেছি। এস শংকরদা। বীথিকেও একবার ডাকো।"

[illegible]

"আর বলো না শংকরদা! আমি একটা চিঠি লিখছি, শংকরদা! এটা নিয়ে তুমি এখনই থানায় যাও। চিঠি পেলেই দারোগাবাবু, তোমার সাথে চলে আসবেন।"

"থানায়? কি যে ব্যাপার!"

"কথা নয়, শংকরদা! ফিরে এলে সব জানতে পারবে। আর এক মুহূর্তও দেরী কোরনা যেন তোমার!"

"আমি এখুনি যাচ্ছি!"—শংকর চলে যায়।

বীথি জিজ্ঞাসা করে,—"কি ব্যাপার সৌমেনদা?"

"ভীষণ মজুমদার বীথি!"

"মজুমদার!"

এমন সময় সঞ্জীবের গলা শোনা যায়—"গোকুল! গোকুল!"

সৌমেন বলে,—"বীথি! তোমায় এখন একটা কাজ করতে হবে। বাবাবাবুরে গোকুলকে বলে এস, সে বারান্দা বসুক,—তুমি আজ বাবাকে তেল মাখাবে!"

"তার মানে?"

"খুবই সোজা। তুমি বাবাকে গিয়ে বল—'গোকুল রান্না করছে, তুমি আজ তাঁকে তেল মাখাবে।' তখন দেখে নিও, বাবার পিঠের সেই জড়ুলের দাগটা আছে কিনা!"

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। জড়ুলের দাগ নাকি আবার উঠে যায়!"

"না, যায়না। আর তাই তোমাকে দেখতে বলছি। তারপর—শুনো সব ব্যাপার!"

"বেশ, আমি যাচ্ছি!"—বলে বীথি চলে যায়।

* * *

ওদিকে সঞ্জীব তেল মাখার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছেন। গোকুল এখনও আসেনি। আবার ডাকেন—"গোকুল গোকুল! এ ব্যাটাচ্ছেলে গেল কোথায়!"

বীথি এসে বলে,—"কি জেঠামণি!"

"দেখত মা! বেলা কত, গোকুল হারামজাদার দেখাই নেই। কত বেলা হয়ে গেল!"

"গোকুল রান্নায় ভারী ব্যস্ত রয়েছে জেঠামণি!"

"কেন, শংকর কোথায়?"

"সৌমেনদা তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছে। আমি আপনাকে তেল মাখিয়ে দেব জেঠামণি!"

যাযাবর

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ওরা যাযাবর,
পথে পথে বাঁধে ঘর :
ওদের স্বপ্ন পথের কিনারে কাঁপে।
চরণ-চিহ্ন দিগন্তে যায় মিশে,
পথ-প্রাঙ্গণে শ্রান্ত দুপুর যাপে।
ঘাসে ঘাসে ঝরে হলুদ বাবলা ফুল,
বনে বনে জাগে মর্মরের আহ্বান :
ঘন পল্লবে মাছরাঙা দেয় সাড়া,
পূবালি বাতাসে ওরা পেতে রয় কান।

ওরা মানুষের পান্থশালার দ্বারে,
আসে আর যায় অকারণ বারে বারে।
নাই পরিচয়—
ঠিকানা ওদের নাই;
ঝরা-পাতা ওরা বাতাসে ভাসিয়া যায়।
তোমার আকাশ স্বপ্নে রঙীন হবে
ওদের আকাশে প্রখর সূর্য জ্বলে;
তোমার শয়নে কুসুম-কুন্দ কলি,
দূরের বালুকা ওদের চরণ তলে।

তোমার পেয়ালা সুধায় ভরিয়া ওঠে
—দুর্দিন দুয়ার রাতে;
ওদের নগ্ন বক্ষে উষ্ণ বাহু
চঞ্চল হয় জীবনের মদিরাতে।

ওরা পলে পলে কল্প-প্রাসাদ গড়ে,
পথের বাতাসে ভাঙে সে তাসের ঘর।
ওরা পৃথিবীর পান্থশালার দ্বারে
পরিচয়হীন—
অনাহূত যাযাবর।

ওরা প্রান্তিক,
প্রান্তর হতে প্রান্তরে দেয় পাড়ি :
বেদুইন নরনারী।
ওদের বক্ষে দীপ্ত আশার বাণী,
চক্ষে নিয়ত সুদূরের নেশা জাগে;
পৃথিবীর পথে তীর্থযাত্রী ওরা,
জীবনযাত্রী জীবনের অনুরাগে।

ওরা যাযাবর,
ঘর নাই, তাই বিশ্ব ওদের ঘর :
পথের ধূলায় পাতে যে সিংহাসন।
পৃথিবীর বুকে দুরন্ত শিশু ওরা,
জীবন-সাগর করিতেছে মন্থন।
বুকে ওদের রাজলিপ্সা নাই,
ধূলিকণা লয়ে হানে না বজ্রবাণ।
ওরা বর্বর,
বাতাসে মেলিয়া তান—
শুনিতে চাহে না চন্দ্রলোকের গান।

নাই কিছু, তাই হারায় না বারে বারে,
মৃত্যুর দ্বারে বারে নাকো কোলাহল।
ওদের বিশ্ব অমৃত-উৎসে ভরা,
সুধা মন্থনে ওঠে না তো হলাহল।
পৃথিবীর পথে দুরন্ত শিশু ওরা,
মাটির স্বপ্ন মাটিতে রাখিয়া যায়।
ওরা যাযাবর,
—প্রান্তিক পথবাসী :
ভোরের শেফালি জীবনের আঙিনায়।

"না না, তুমি কেন মা?"

"তাতে কি? আপনি গেঞ্জীটা খুলুন।"

"তোমার কষ্ট হবে যে মা! থাক, আজ নাই বা তেল মাখলাম।"

"না না কিছু কষ্ট হবে না। আচ্ছা বেশ, আমি শুধু পিঠটাতেই তেল মাখিয়ে দি। ওখানে ত আপনার হাত যাবে না।"—বীথি সঞ্জীবের পিছনে গিয়ে তেল নিয়ে বসে। সঞ্জীব গেঞ্জী খোলেন।

বীথি চিৎকার করে ওঠে,—"কে? বাবা?"—বীথি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সঞ্জীব তাড়াতাড়ি গেঞ্জী গায়ে দিয়ে বীথিকে ধরেন। এমন সময় সোমোন দৌড়ে আসে—"কি? কি হয়েছে বাবা?"

"বীথি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ওকে ধর, লাইব্রেরী ঘরে সোফায় শুইয়ে দি।"

দুজনে ধরাধরি করে বীথিকে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরের সোফায় শুইয়ে দেয়। সোমোন জিজ্ঞাসা করে,—"হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল?"

পরে শুনো, ঐ কুঁজোয় জল আছে, মুখে ঝাপ্টা দাও। আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি।"

এমন সময় অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা যায়। লাইব্রেরী ঘরে এসে ঢোকে থানার দারোগা, দুজন কনেষ্টবল ও শংকর। বিস্মিত সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করেন,—"What's matter? পুলিশ!"

থানার দারোগা বলে,—"একটু দরকার আছে; আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন সঞ্জীববাবু!"

"Alright"—সঞ্জীব চেয়ারে বসেন। এমন সময় বীথির জ্ঞান হয়। সে বলে ওঠে—"বাবা!"

থানার দারোগা বলে,—"সোমোনবাবু! বলুন, আপনি কি বলতে চান?"

"আমি বলতে চাই, সঞ্জীববাবু নামধারী যে ব্যক্তিটি ঐ চেয়ারে বসে আছেন, তিনি জমিদার সঞ্জীব চৌধুরী নন; ওঁর প্রকৃত নাম ভুবন সরকার।"

সঞ্জীব চেঁচিয়ে ওঠেন—"Nonsense!"

সোমোন প্রতিবাদ করে—"Shut up you imposter! অফিসার! আপনি ওঁর গেঞ্জীটা খুলতে বলুন।"

বীথি চিৎকার করে ছুটে গিয়ে সঞ্জীবকে জড়িয়ে ধরে ডাকে—"বাবা! বাবা!"

দারোগা বলে, "আপনি গেঞ্জীটা খুলুন সঞ্জীববাবু!"

"তার আর দরকার হবে না, আমি স্বীকার করছি—আমিই ভুবন সরকার।"

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হোল। সকলেই স্তম্ভিত। পরে, সকলের মুখ থেকেই একবার করে বেরিয়ে এল—"ভুবন সরকার!"

ভুবন বলে,—"আমার খোলস খুলে দিয়ে তুমি তীক্ষ্ম বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ সোমোন! আমি হেরেছি।"

সোমোন প্রশ্ন করে—"কিন্তু একটা কথা বলবেন কি ভুবনবাবু, কেমন করে আপনার পক্ষে এই রূপান্তর সম্ভব হোল?"

"বলব সোমোন! সবই বলব। ধরা যখন পড়েছি, তখন সব স্বীকার করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আপনি বসুন অফিসার! বীথি! তুই এখান থেকে যা মা! তোর বাপের কুকীর্তি আর নিজের কানে শুনিসনা।"

"না বাবা! আমি শুনব।"

"বেশ শোন সোমোন! ছোটবেলা থেকে ভায়ের অধিক স্নেহে একসাথে মানুষ হয়েও তোমার বাবাকে আমি বোধ হয় সত্যিই ভালবাসতে পারিনি। তা যদি পারতাম, তাহলে তাঁর অর্থ আমাকে লুব্ধ করতে পারত না, কিন্তু, নিজের ভেতর যে বিশ্বাসঘাতক প্রবৃত্তি এতকাল আত্মগোপন করেছিল, সারাজীবন চলে এসে এই বুড়ো বয়সে সে আত্মপ্রকাশ করে বসল। তোমার বাবার অতুল ঐশ্বর্য, নগদ লক্ষ লক্ষ টাকা আমার মাথা খারাপ করে দিল, সোমোন! কিছুদিন থেকেই আমার ভেতরের সেই শয়তান প্রবৃত্তিটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল—এই বিপুল সম্পদের অধিকার আমার চাই-ই। আমার পাপের সাথী পেলাম বিকাশ নন্দীকে। ভাল একজন কেমিষ্ট হয়েও চাকরী না পেয়ে অর্থের জন্যে সে হন্যে হয়ে উঠেছিল। আমার সহযোগিতা করে যদি আমাকে কৃতকার্য করাতে পারে, তাহলে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা সে আমার কাছ থেকে পাবে, এই করারে সে আমার হাতে হাত মেলায়। আমারই কথায় সে তৈরী করে প্রচণ্ড একটা বোমা। ঠিক হোল—নির্দিষ্ট দিনে আমি সঞ্জীব চৌধুরীকে নিয়ে গাড়ীতে বেড়াতে বেরোব, যথাস্থানে আসার আগে আমি যাব নেমে,—তারপর বিকাশ ছুঁড়বে সেই বোমা গাড়ীর ভেতরে। সঞ্জীব চৌধুরীর হবে মৃত্যু; লোকে জানবে—নারায়ণপুরের জমিদারের লোক ভুবন সরকার ভেবে ভুল করে সঞ্জীব চৌধুরীকেই মেরে বসল। অবশ্য, নারায়ণপুরের জমিদারের ভুবন সরকারের ওপর আক্রোশের গল্পটা আমার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন আমরা দুজনেই হলাম জখম, তখন আবার আমায় নূতন প্ল্যান করতে হোল। দুজনের একই রকম চেহারা, একই রকম জখম ও একই কেবিনে থাকা—আমাকে সঞ্জীব চৌধুরীর খোলস পরার সুযোগ দিয়েছিল। আহত হওয়ার পর সঞ্জীবের আর জ্ঞান হয়নি। বিকাশের সাথে পরামর্শ করে, সঞ্জীব মারা যাওয়ার আগের দিন রাত্রে বিকাশ ও গোকুলের সাহায্যে আমি সঞ্জীবের সাথে করি বিছানা বদল। এই ব্যাপার একমাত্র গোকুল জেনেছিল; কিন্তু সে জেনেছিল—সঞ্জীবের বিছানায় জল পড়ে যাওয়ায় আমার ভাল বিছানায় তাকে সরানো হোল। তারপর বিকাশ সবাইকে জানিয়ে দিল—সঞ্জীব চৌধুরীর জ্ঞান হয়েছে, কারণ সঞ্জীবের বেডে একই চেহারার একই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সজ্ঞান ভুবন সরকার তখন শায়িত; আর, সঞ্জীব চৌধুরী ভুবন সরকারে রূপান্তরিত হয়ে তারই বিছানায় পড়ে রইল অজ্ঞান। লোকে জানল, ভুবন সরকার আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—হঠাৎ হেমারেজ হয়ে। বিছানা বদলের সময়ই সঞ্জীবের সেলাই ছিঁড়ে যায় এবং হেমারেজের দরুণই শেষরাতে তার মৃত্যু হয়। পরদিন সকালে সঞ্জীবের বিছানায় ভুবনকে সজ্ঞান দেখে সবাই মনে করে—সঞ্জীবই বেঁচে আছে; আর ভুবনের বিছানায় মৃত সঞ্জীবকে ভুবন জেনেই যথাসময়ে তার সৎকার হয়ে যায়। এই হোল আমার রূপান্তরের রহস্য, সোমোন!"

দারোগা মন্তব্য করে,—"উঃ! কি ভয়ানক প্ল্যান!"

বীথি বলে—"ছি, ছি, বাবা! কেন তুমি এমন করতে গেলে? কি অভাব ছিল তোমার?"

"অভাব কিছুই ছিলনা মা! কিন্তু স্বভাবকে যে এড়াতে পারিনি।"

সোমোন বলে,—"অফিসার! আপনার বোমার আসামী বিকাশ নন্দীকেও বোধহয় আপনার পাওয়া দরকার।"

এমন সময় শোনা যায় রায়বাহাদুরের গলা—"সোমোন! সোমোন!" তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে ভয় ও বিস্ময়।

সোমোন জবাব দেয়—"আসুন রায়বাহাদুর!" উদ্‌ভ্রান্তভাবে এসে ঢোকেন রায়বাহাদুর। বলেন,—"সোমোন! সর্বনাশ হয়েছে বাবা! বিকাশ আত্মহত্যা করেছে!"

"অ্যাঁ, আত্মহত্যা, কেন?"

"তাতো জানি না বাবা! ও আজ কলকাতায় যাবে সেই সব কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে। হঠাৎ দেখতে পায় তোমাদের বাড়ীতে পুলিশ ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল,—মুখ থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটা শব্দ—পুলিশ! তারপরই—সোমা তুমি আমায় ক্ষমা কোরো—এই বলে ছুটে চলে গেল ওর লাইব্রেরীর ভেতর। আমিও পিছন পিছন গেলাম। ঘরে ঢোকার আগেই একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ কানে এল। ছুটে গিয়ে দেখলাম—বিকাশ মেঝের পড়ে আছে, আর তার টেবিলের ওপর পটাসিয়াম সায়ানাইডের খোলা শিশিটা। এতক্ষণে দেহে প্রাণ নেই।"

ভুবন হেসে ওঠে—"সোমা!"

রায়বাহাদুর ডাকেন, "চৌধুরী!"

ভুবন হেসে বলে,—"না, ভুবন সরকার। আমি চৌধুরীও হতে পারিনি।"

রায়বাহাদুর আঁৎকে ওঠেন—"হাঁ!"

দারোগা চিৎকার করে ওঠেন—"ভুবনবাবু, দেরাজের ভেতর হাত দেবেন না। হ্যাণ্ডস আপ।"

ভুবন হেসে ওঠে—"ভয় নেই অফিসার! দেরাজে রিভলবার নেই। সোমোন! বীথিকে তুমি দেখো বাবা।"—সাথে সাথে মুখের ভেতরে একটু সাদা গুঁড়ো ফেলে দেয়।

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—"কি মুখে দিলেন? কি মুখে দিলেন?"

তৎক্ষণাৎ ভুবনের দেহ চেয়ারের ওপর ঢলে পড়েছে। রায়বাহাদুর চেঁচিয়ে ওঠেন—"পটাসিয়াম সায়ানাইড! এবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

বীথি কেঁদে ওঠে—"বাবা! বাবা!"

লোকচক্ষে মৃত ভুবন সরকার বেঁচে উঠেছিল সঞ্জীব চৌধুরীতে রূপান্তরিত হয়ে, এবার সত্যিই হোল তার লোকান্তর।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূর্য পাটে নামে। কোথা থেকে রাশিরাশি ছায়া
জলের উপর নামলো।
গভীর থেকে গভীরতর জল।
কালো থেকে আরো কালো
জেলেরা ঘরে ফিরেছে, লবণাক্ত দেহ,
তামাক চিবোচ্ছে
—অস্পষ্ট—ভালো করে চেনা যায় না—তাকালো?
নাকি ফেরালো না মুখ? তাদের চোখে
সূর্যের স্ফুলিঙ্গ খানিক জ্বলে ছায়া হয়ে যাচ্ছে?

সূর্যাস্তের ঢেউ হাত ধরে নাচতে-নাচতে এসে
বিরাট হাসিতে আর অজস্র ফেনায়
মিলিয়ে যাচ্ছিলো।
এখন ছায়ায় চেনা যায় না। ছায়ায় তাদের হাসি
বুক-চাপা কান্না হয়ে গেছে।
সমুদ্র কি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে?

এই ছায়ার সমুদ্রে নিঃসঙ্গতায়
আর্তনাদে অবসাদে বোবা স্বর টানছে
ছায়ায়-ছায়ায় অতীতের মতো,
ভবিষ্যতের মতো মিলিয়ে আসে
কাউকে পাবে না কাউকে জানবে না
কাউকে চাইবে না
শুধু আগামী কাল শেষ রাতে
জেলেডিঙি ভাসাবার আগে
এইসব জেলেদের মৌন প্রণাম গ্রহণ করবে।
—কাউকে ফিরিয়ে দেবে, কাউকে দেবে না।

নাড়ী জ্ঞান

পূর্ণেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায়
এম.বি; এম.আর.সি.পি(লণ্ডন);
এফ.সি.সি.পি (আমেরিকা)

চলতি কথায় নাড়ী জ্ঞান চিকিৎসকের বিচক্ষণতার পরিচায়ক। যাঁর নাড়ী জ্ঞান যত ভাল তিনি তত বড় চিকিৎসক। অনেকের ধারণা যে, নাড়ী জ্ঞান আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষত্ব; আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় অথবা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নাড়ী জ্ঞানের উপর বিশেষ কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আগের কালের অনেক বিখ্যাত কবিরাজের অদ্ভুত নাড়ী জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। তাঁরা নাকি নাড়ী ধরে শরীরের যে কোনও রকম রোগের পরিচয়, তার উৎপত্তির কারণ, রোগের ধরণ-ধারণ এবং রোগের পরিণতি সবই বলে দিতে পারতেন। এমন কি রোগীর মৃত্যুর দিন ক্ষণ সম্বন্ধেও নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় রোগের ডায়গ্নোসিস (Diagnosis), ইটিওলজি (Etiology) এবং প্রগ্নোসিস্ (Prognosis) সবই তাঁরা ঐ নাড়ী জ্ঞানের মধ্যে পেতেন।

আজকাল কিন্তু এরকম অদ্ভুত নাড়ী জ্ঞানের কথা আর বিশেষ শোনা যায় না। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক এখনও অনেক আছেন এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ারও এখন অনেক ব্যবস্থা আছে। নাড়ী জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও নিশ্চয়ই হয়ে থাকে। আমার আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। প্রাচীন বিচক্ষণ কবিরাজদের নাড়ী জ্ঞানের ভিত্তি কিসের উপর জানি না। শুনেছি কেবলমাত্র নাড়ীর স্পন্দন স্পর্শ করলেই হয় না, শুদ্ধচিত্তে সমস্ত চৈতন্য ঐ স্পর্শে কেন্দ্রীভূত না করলে নাড়ী স্পন্দনের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি হয় না। এর মধ্যে অতীন্দ্রিয় কোন উপলব্ধির বিষয় আছে কিনা জানি না। তবে সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বোঝা যায় যে, নাড়ীর স্পন্দনের বিভিন্ন প্রকার ভেদ ও সামান্য পরিবর্তন স্পর্শ দ্বারা বিশ্লেষণ করতে হলে অত্যন্ত গভীর মনোনিবেশের এবং দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

নাড়ী পরীক্ষা করতে হ'লে চিকিৎসক রোগীর হাতের কব্জির ঠিক উপরে হাতের তালুর দিকে এবং যে দিকে বুড়ো আঙ্গুল থাকে সেই পাশে নিজের ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙ্গুল রাখেন। আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দিলেই আঙ্গুলের তলায় একটা সরু নলের মত জিনিষ দপ্ দপ্ করছে বলে অনুভব করা যায়। ঐটিই হচ্ছে নাড়ী বা পাল্‌স্। স্বাভাবিক অবস্থায় এই নাড়ীর স্পন্দন একটি বিশেষ ধারায় নির্দিষ্ট গতিতে সমতালে চলে। শরীরের নানারূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় এবং বিভিন্ন রোগে নাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। নাড়ী স্পর্শ দ্বারা এই সব পরিবর্তন অনুভব করে শরীরের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। নাড়ীর স্পন্দনের যাবতীয় স্বরূপ কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির সাহায্য ছাড়া অন্য উপায়েও সকলের ধরা ছোঁওয়া বা প্রত্যক্ষের মধ্যে আনা যায়।

শরীরের মধ্যে রক্ত কতগুলি নলের মধ্যে দিয়ে চলাচল করে। যে নলগুলি দিয়ে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে যায় সেগুলিকে বলে ধমনী অথবা আর্টারী এবং যেগুলি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হার্টে ফিরে যায় তাদের নাম হচ্ছে শিরা অথবা ভেইন। ধমনী এবং শিরার মধ্যে সমস্ত দেহ-ব্যাপী এক সূক্ষ্ম চুলের মত সরু নলের জাল (Capillary net work) সংযোগ স্থাপন করে। এই সরু নলের জালের মধ্যে দিয়ে রক্ত ঠেলে নিয়ে যায় হার্টের পেশীর শক্তি। হার্টের পেশী এক একবার সংকুচিত হয়ে তার ভিতরকার রক্ত প্রচণ্ড বেগে ধমনীর মধ্যে ঠেলে দেয়। ঠিক যে পরিমাণ রক্ত প্রতিবার হার্টের সংকোচনের সঙ্গে ধমনীগুলিতে ঢুকছে ঠিক সেই পরিমাণ রক্ত ধমনীর অপর প্রান্ত দিয়ে সূক্ষ্ম কৈশিকনালি ভেদ করে শিরায় সঙ্গে সঙ্গেই যেতে পারে না। তাই হার্টের সংকোচনের সঙ্গে ধমনীগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে। সেই জন্য সমস্ত ধমনীতে স্পন্দন দেখা যায়। শিরায় স্পন্দন থাকে না। হার্টের সংকোচনের পরও ধমনীর মধ্যে রক্ত বেশ চাপে ঠাসা থাকে। এই চাপের নাম ব্লাড প্রেসার (Blood Pressure)।

শরীরের ধমনীগুলির মধ্যে একটি বিশেষ ধমনী (Radial artery) হাতের কব্জির একটু উপরে চামড়ার ঠিক নীচ দিয়ে যায় বলে তার স্পন্দন খুব সহজে এবং স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এই ধমনীর স্পন্দন পরীক্ষাই চিকিৎসকের নাড়ী পরীক্ষা।

মনে করা যাক একটা রবারের নলে জল ভরা আছে এবং তার এক প্রান্তে একটা পিচকারী লাগান আছে। অপর প্রান্তের মুখটা খুব সরু করে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে পিচকারী থেকে খানিকটা জল নলটির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং জল যাতে পিচকারীর দিকে ফিরে যেতে না পারে তার জন্যে ভাল্ব লাগান আছে। এখন যদি কোনও লোককে চোখ বেঁধে এই নলটি স্পর্শ করতে দেওয়া যায় তা হলে সে তার স্পর্শ অনুভূতির দ্বারা ব্যাপারটা কতটুকু বুঝতে পারে দেখা যাক। প্রথম হাত দিয়ে সে নলটি সরু কি মোটা, শক্ত কি নরম এবং খালি কিংবা কোন জিনিষে ভর্তি বুঝতে পারবে। একটু চাপ দিলে নলটির ভিতরে কোনও কঠিন কিংবা তরল পদার্থ আছে তাও বোঝা যাবে। নলটি টানা অবস্থায় আছে কি ঢিলে হয়ে আছে তাও বোঝা যাবে। চাপ দিয়ে নলটি খালি করা যায় কিনা এবং তরল পদার্থ থাকলে কতটা চাপ দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে নলটির গায়ে গায়ে লাগান যায় তাই থেকে ভিতরকার তরল পদার্থের চাপ অনুমান করা যাবে। তারপর পিচকারী থেকে যখন হঠাৎ খানিকটা জল নলের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তখন নলটি ফুলে উঠছে বুঝতে পারা যাবে। কতটা ফুলছে এবং কত জোরে ফুলছে তাই থেকে কতটা জল এবং কত চাপে ঠেলা হচ্ছে এবং নলের অপর প্রান্তে জল নিকাশ হবার পথে কতখানি বাধা আছে এ সবেরও আন্দাজ পাওয়া যাবে।

নাড়ী পরীক্ষায় মোটামুটি এই সবই অনুভব করা যায়। স্পন্দন নির্দিষ্ট সময়ে কতবার হচ্ছে তাই থেকে হার্টের স্পন্দনের গতি (Rate) নির্ণয় হয়। নাড়ী সরু কিংবা মোটা (Volume) তাই থেকে ধমনীতে কত রক্ত আছে তার আন্দাজ পাওয়া যায়। নাড়ী কতটা টানা অথবা শিথিল অবস্থায় আছে (Tension) এবং স্পন্দনের সময় কত জোরে ফুলে উঠছে তাই থেকে রক্তের চাপ বোঝা যাবে। কতটা ফুলছে (Amplitude) তাই থেকে কতটা রক্ত হার্ট থেকে ধমনীতে ঢুকছে তা বুঝতে হবে। স্পন্দনগুলি সমতালে একই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হচ্ছে কিনা (Rthythm) এবং স্পন্দনের ধরণ (Character)ও লক্ষণীয়। যদি স্পন্দনগুলি সমান্তরালে না হয় এবং ছোট বড় হয় তাহলে কি ধরণের ব্যতিক্রম হচ্ছে তার বিশ্লেষণ দরকার। কখনও নাড়ী পর্যায়ক্রমে দ্রুত ও ধীরে চলে, কখনও বা এলোমেলোভাবে চলে, কখনও বা পর পর স্পন্দনগুলি পর্যায়ক্রমে ছোট ও বড় হয়, কখনও ছোট বড় খাপ ছাড়া মিশ্রণ থাকে, কখনও নাড়ী একতালে চলতে চলতে হঠাৎ এক একটা দীর্ঘ বিরাম আসে কখনও স্পন্দনগুলি জোড়ায় জোড়ায় অথবা তিন তিনটি করে হয়, ইত্যাদি। স্পন্দনের ধরণের মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে নাড়ী ফুলে উঠবার সময় আস্তে আস্তে উঠছে না হঠাৎ ফুলছে, একেবারে উঠছে না মধ্যে থেমে ধাপে ধাপে উঠছে, ফুলে উঠে কিছুক্ষণ থেমে থাকছে না সঙ্গে সঙ্গেই নেমে যাচ্ছে, নামবার সময় হঠাৎ চুপসে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে নামছে অথবা ধাক্কা খেয়ে নামছে। এ ছাড়া নাড়ীর অবস্থা শরীরের শোওয়া বসা বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে এবং হাতের অবস্থানের সঙ্গে কিংবা বিশ্রাম বা পরিশ্রমের সঙ্গে কোন পরিবর্তন হয় কিনা তাও অনেক সময় লক্ষ্য করতে হয়।

নাড়ী জ্ঞান শিক্ষা করতে হলে স্বাভাবিক অবস্থায় নাড়ীর এই সব লক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা পরিচয় লাভ করতে হয়। তারপর অস্বাভাবিক অবস্থায় কোনওরকম ব্যতিক্রম হচ্ছে কিনা, ব্যতিক্রম ও কতটা ব্যতিক্রম হচ্ছে তা নির্ণয় করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে ৭০—৮০ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়। প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে নাড়ীর স্ফীতি মাত্র ০·২৫—০·৩ সেকেণ্ড স্থায়ী। অস্বাভাবিক অবস্থায় নাড়ী আরও দ্রুত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনুভূতি দ্বারা স্পন্দনের ধরণ বুঝতে হবে। কাজেই স্পর্শ অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ না হলে নাড়ীর পরিচয় লাভ করা দুঃসাধ্য।

অনেকদিনের অধ্যবসায়ের ফলে মোটামুটিভাবে নাড়ীর অস্বাভাবিক অবস্থা উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা অর্জন করা অবশ্য অসম্ভব নয়। তবুও সেটা কোনও বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনও প্রকাশ্য মাপ না থাকায় নাড়ীর গতি, আকার, রক্তের চাপ ইত্যাদির স্বাভাবিক মান এবং অস্বাভাবিক ব্যতিক্রমের

(ইহার পর ২২৭ পৃষ্ঠায়)

অভিলাষের সঙ্গে এভাবে এখানে এমন করে দেখা হবে ভাবিনি। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, ভুরুর একটা পাশ এমনভাবে কেটে গেছে যে, চোখটা কেন যায়নি, এইটাই আশ্চর্য!

কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য নিয়তি পুরুষের প্রচ্ছন্ন কৌতুক। একটা ছোট্ট প্রাণী যাকে আরশোলার মত টিপে যে কোন সময়ে মেরে ফেলা যায়, তার বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত শক্তি সংহত করে সংগ্রাম ঘোষণা করে—লোকটা অহেতুক মার খায়, টলে পড়ে কিন্তু কিছুতেই হারে না।

সরকারী কাজে মজঃফরপুরে থাকতে হয়েছিল কিছুকাল। সেইখানেই অভিলাষকে প্রথম দেখি—একটা মনোহারী দোকানের মালিক, পাশে একটা চায়ের দোকানও চালায়—সেটা থেকে তার আয় হয় বলে মনে হয় না—সবাই প্রায় ধারে খেয়ে যায়, "এডভারটাইসমেন্ট স্যার! ওর থেকে খদ্দের টানি।" সত্যিই খদ্দের হয় কিনা জানি না তবে ওটা ওখানকার বাঙালীদের আড্ডা—ছেলে-বুড়ো নানা বয়সের নানা লোকের ভিড়—নানা রকম আলোচনা, আর অভিলাষ হাজার উপদ্রবের মাঝেও নির্বিকার, নির্বিকার বললে ভুল হবে—সদানন্দ। সে সকলের বয়স্য—সকলের বন্ধু।

অভিলাষ পূর্ববঙ্গের লোক কথার টানগুলো যথাসম্ভব বজায় রেখেছে। একই রাত্রে বৌ ও তিন-তিনটে ছেলে-মেয়ে কলেরা হয়ে মারা যায়। তাদের সৎকার করে সেই রাত্রেই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ে—চুলোয় যাক সংসার। মাঝের কোন একটা স্টেশনে মারমুখো ভিড়ের মধ্য থেকে কোনক্রমে একটি বিধবা আর তার অনূঢ়া কন্যাকে রক্ষা করে ট্রেনে তুলে নেয়—তারপর স্বভাবতঃই তাদের খবরদারীর ভার তার উপর এসে পড়ে—আর সেই সূত্রেই মজঃফরপুর পর্যন্ত কি করে যেন এসেছে। তারপর আর এগুনো হয় না, খবরদারীটা কায়েম হয়ে ঘাড়ে চাপে, তখনও তাই করছিল, তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে শ্বশুরের দোকান, ফাঁফালো সংসার, অবশ্য বিধবাটি আর নেই।

একদিন শুনলুম কে একজন বলছে—"আচ্ছা অভিলাষদা আমাদের কোন বৌদিটি ভাল, আগেরটি না ইনি।" অভিলাষ একগাল হেসে জবাব দিলে—"সব মেয়েছেলেই সমান দাদা—তবে ভাই একটু নিরিখ করে দেখলে মনে হয় আগের উনি ছিলেন গৌরী, আর ইনি হলেন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।" কালো মেয়েকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বলার যে চিরাচরিত প্রথা আছে—তার গোপন কৌতুকটুকু অভিলাষ একটা চোখ আধবোজা বুজিয়ে দুলে দুলে নিজেই উপভোগ করলে। তারপর আবার সুরু করলে—"ও সব কিছু নয় দাদা, আসল কথা ব্যাভার, ব্যাভার ভাল হলেই মেয়েছেলে ভাল..."

মনোহারী দোকানের খদ্দের ডাকতে ও উঠে গেল। বেশ কৌতুকবোধ করলুম। মেয়েদের সম্বন্ধে এই সরল জীবনদর্শন, প্রথম স্ত্রীর শ্মশানে বসেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে, কোথাও কুণ্ঠা নেই জড়তা নেই—এতগুলি কাচ্চাবাচ্চার পরও মুচকি হেসে নিরিখ করে গত ও বর্তমানের গৃহলক্ষ্মীদের রূপের তুলনা করতে পারে—এমন একজন লোকের সম্বন্ধে কৌতুকমিশ্রিত আগ্রহ বোধ না করাই শক্ত। অভিলাষ বলত—"কি করব স্যার, ঠিক তেমনি দেখা, তেমনি ব্যাভার ট্রেনের মধ্যেই দুবার বিমলা বলে ভুল করলুম। দু-রাত্তির ঘুম হয়নি—শরীর মন দুই খারাপ, বাচ্চাগুলোকেও তিনি কেড়ে নিলেন—পাপের ফল সব কি থাকে স্যার আপনিই বলুন না—দেনেওলা মন করলে আবার দেবেন, এইত দিলেনও, শম্ভু, বলু, ময়না... আর ঠাকরুণও বললেন কাঁচা বয়েস এ বয়সে সন্ন্যাসী লাইনটা নাকি খারাপ।" তারপর আর সেই সদানন্দ হাসিটুকু দিয়ে শেষ করলে—"সেই তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল স্যার, আর তিরিশে গেল, সতের বছর ঘর করেছি—বৌ বৌ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল স্যার নইলে শপথ করে বলতে পারি সন্ন্যাসী হতেই চেয়েছিলুম, হাতের রেখাতেও ছিল, এই দেখুন বলে হাত-খানা ফিরিয়ে ধরে একটা ক্ষীয়মাণ দাগ দেখিয়ে দিলে।

হেসে বলেছিলুম—"বেশ করেছ অভিলাষ। প্রথম স্ত্রী গত হবার পর আবার বিয়ে করেছে এরকম হাজার হাজার লোক আছে, আর তোমার বয়সও অল্প।"

অভিলাষ ঝাঁ করে নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে হাতটা মাথায় মুছে নিয়ে বললে—"বলুন স্যার বলুন—শিক্ষিত লোক না হলে এমন কথা আর কে বলবে—ওই হারাম-জাদাদের একটু বুঝিয়ে দিন।"

তারপর আমি মজঃফরপুর ছেড়ে চলে এসেছি।

১৯৩৪ সনের সকালের খবরের কাগজখানা একদিন সকলকে চমকে দিলে। কোলকাতায়ও ভূমিকম্প হয়েছিল, কিন্তু সে ভূমিকম্প যে কি অর্ধেক বিহারকে মাটির খেলনার মত ঝাঁকানি দিয়ে ভেঙে দিয়ে যাবে একথা কেউই ভাবতে পারেনি। অফিসে, আদালতে, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয় সকলের মুখে উৎসুক প্রশ্ন—প্রবাসী প্রিয়-পরিজনদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ। অভিলাষের কথা মনে হয়েছে অনেকবার—কিন্তু কার মারফৎ তার খোঁজ নোবো ভাবছি এমন সময় সে নিজেই খোঁজ দিতে এলো—একা, এক-বস্ত্রে নিঃসম্বল অভিলাষ।

—"সব চুকে-বুকে গেল স্যার, দূর হোকগে যার জিনিষ সে নিয়েছে আমি মিথ্যে ভেবে মরি কেন"—অভিলাষ মুখের দিকে চেয়ে হাসলে।

কে সান্ত্বনা দেবে, কি সান্ত্বনা দোবো, সান্ত্বনা দেবার সত্যিই কিছু আছে কি? —এমনি নানা

ফিঃ ডিপজিটে শতকরা ৪্ ও
সেভিংসে ২্ সুদ দেওয়া হয়

●

সেণ্ট্রাল অফিসঃ
৩৬নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা
অন্যান্য অফিসঃ
বাঁকুড়া ও কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ
চেয়ারম্যানঃ
শ্রীজগন্নাথ কোলে, এম, পি
জেঃ ম্যানেজারঃ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে

IF OTHERS FAIL — TRY Pelikan

'পেলিক্যান'

এই অতি পরিচিত ঝর্ণা
কলমটি যাঁনই লিখতে
জানেন তাঁরই ভাল লাগবে

●

একমাত্র পরিবেশক ঃ

জি, অ্যাথারটন এণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • মাদ্রাজ

কথা ভাবছি এমন সময় অভিলাষ একমুখ হেসে বললে—"কি ভাবছেন স্যার, সব বিলকুল শাফা... এবার দেশে গিয়ে বাস করব ভাবছি, চাষবাস আর কোরবো না—আর এ্যাদ্দিন পরে জ্ঞাতি-ভাইরা কি আর জমি ফিরিয়ে দেবে, দোকানই দোব একটা মনে করেছি। একশটা টাকা কর্জ দেবেন স্যার বিশ্বাস করুন সাঙ্গ চুরি-বাটপারী কখনও করিনি দয়া দাক্ষিণ্যও নিইনি—ঠিক করে গুছিয়ে বসতে হয়ত একটু দেরি হবে—কিন্তু ঠিক পাঠিয়ে দোবো।" টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ওকে ট্রেনে তুলে-দিয়ে ভারী মন নিয়ে ফিরে এলুম।

বছর ৪।৫ অভিলাষের আর কোন পাত্তা নেই। অবশ্য টাকাটা আমি ওকে এমনিই দিয়েছিলুম, ফেরৎ দেবে একথা কোনদিন ভাবিনি—কিন্তু ফেরৎ এলো একটা ইনসুওর খামে—সঙ্গে দীর্ঘ চিঠি। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ক্ষমা আর আশীর্বাদ চেয়ে শেষ পর্যন্ত লিখেছে, বলতে লজ্জা হলেও তাকে স্বীকার করতে হচ্ছে সে আবার বিয়ে করেছে— বছর-খানেক হ'ল তার একটা কন্যা সন্তান হয়েছে। —"কি করব স্যার বৌ বো অভ্যেস হয়ে গিয়েছে—নইলে কোন আহাম্মুক আবার সংসার কোরতো"—আর ব্যবসা আমার আশীর্বাদে ভালই চলছে।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলুম না। ভারী আশ্চর্য ত? হঠাৎ মনে হল, অভিলাষ একটা তুচ্ছ মানুষ নয়, সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের [illegible] সমস্ত মানুষের সমষ্টি ও একটি বিরাট পুরুষ —যে সৃষ্টির উপাসনায় [illegible] [illegible] বারবার যুদ্ধ ঘোষণা কোরেছে সেই অক্লান্ত সংগ্রামে সে জয়ী, সে সাধক। কি জানি সেই [illegible] [illegible] [illegible] মুখে [illegible] [illegible] বসে সকলের মনোরঞ্জন করছে—পাশে চায়ের দোকান করেছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলো জ্বলছে—[illegible] [illegible] পরিচয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-দের [illegible] সমালোচনা।

পরবর্তী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে লিখলুম যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] দেয়—এটা [illegible] [illegible] কৃতজ্ঞ [illegible] [illegible] [illegible], তারপর অভিলাষের আর কোন খোঁজ নেই— থাকার কথাও নয়।

এরপর এলো ১৯৬৬ এ কোলকাতায় নরমেধ যজ্ঞ ও [illegible] [illegible] [illegible] তার ব্যাপক বিস্তৃতি। কাগজে অভিলাষের গ্রামের কথা পড়ে তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লুম। পুরোনো ফাইল থেকে তার চিঠি বার করে ঠিকানা নিয়ে চিঠি লিখলুম— জবাব এলো না। শিয়ালদা ষ্টেশনে ওয়াগন পশুদের মত মুখ করে যে মানুষগুলো বসে আছে তাদের মধ্যেও কতদিন ঘুরে দেখেছি—যদি অভিলাষের দেখা পাই! নাঃ— তার দেখা পাইনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার খবর পেয়েছি!

তার ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে মেয়ে-দুটোকে মেরে বৌটাকে নিয়ে নেকড়ের দল চলে গেছে—তার খবর কেউ জানে না। ঝোপে ঝাড়ে নদীতে নালাতে তার মড়া কেউ দেখেনি, এইটুকু মাত্র বলতে পারে লোকে, তার বেশী নয়!

তবু মনে হ'ল অভিলাষ এতদিনে মরেছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, অবন্তী, মহেনজোদাড়োর মত অভিলাষ মরেছে। তবে একটু তফাৎ হচ্ছে—এ মৃত্যুর ইতিহাস নেই— কালগ্রাসী, নামগ্রাসী, সর্বগ্রাসী মৃত্যু!

জনৈক বন্ধুস্থানীয় মারোয়াড়ী মহা-জনের ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভেনিউএর একটি বিরাট প্রাসাদে এসেছি। আতরের পিচকিরি আর সুবাসিত রাংতা মোড়া মসলার গন্ধে বিভ্রান্তনাসা বসে বসে নানা কথা ভাবছি এমন সময় বাইরে থেকে একটা গোলমালের শব্দ এসে ভাবনায় বাধা দিলে। প্রশ্ন করে জানলুম বাইরে কম্বল বিলি হচ্ছে তারই হল্লা। দেখবার ঔৎসুক্য জানাতে তিনি আমাকে একটি কর্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন পৌঁছালুম তখন কম্বল বিলি শেষ হয়ে গেছে। তবু কি একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে উৎসুক জনতা ঘন হয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। প্রথমটা মনে হল দুটো বাঁদরের লড়াই করছে তারপর দেখলুম বাঁদর নয় দুটো লোক কম্বল জড়ানো অবস্থায় ধস্তাধস্তি করছে—নতুন কম্বল ছিঁড়ে গেছে—কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভিড় ঠেলে রঙ্গস্থলে পৌঁছলুম। দুজনকে তফাৎ করতে গিয়ে দেখি একজন জোয়ান হিন্দুস্থানী—নেড়া মাথার উপর টিকিতে গেরো বাঁধা আর একজন শীর্ণ বৃদ্ধ —কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফে মুখটা ভরা, পরিশ্রমে হাঁফাচ্ছে। আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—"আর এ কম্বলটা আমি আগে পেয়েছি"—অভিলাষ!

হিন্দুস্থানীটি গর্জে উঠল— "নেহি—ইয়ে হামরা পহলা মিলা" [illegible] [illegible] ওয়ার-এর [illegible] কম্বলের দুইপ্রান্ত তখনও দুজনে ধরে আছে। অভিলাষকে বললুম—"তুমি ছেড়ে দাও অভিলাষ, আমি তোমাকে আলাদা কম্বল দেবো।"

সে রাজী নয়। অদ্ভুত অভিমানের সঙ্গে বললে—"কম্বলে আমার কি হবে স্যার— ও সব শীতটীত আমার লাগে না, দরকার ঐ সোহাগীর জন্য—রোজ বিকেলে ওর জ্বর হচ্ছে।"

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম—একটা ভিখারী মেয়ে ভয়ে সংকোচে জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সোহাগী কে এ প্রশ্ন অবান্তর। বললুম—"তাই হবে অভিলাষ, আমি তোমাদের দুজনকেই কম্বল দোবো— ছেড়ে দাও।"

অভিলাষ ঘাড় বাঁকিয়ে জিদভরে বললে— উঁ হুঁ—তা হয় না স্যার, এ কম্বল আমি আগে নিয়েছি এতে আমার হক আছে—এ কম্বল আমার, আর ও শালা চোর।"

তার কণ্ঠস্বরে ভিক্ষুকের দীনতা নেই— অর্জনের দৃপ্ত পৌরুষ। ওদিক থেকে হিন্দু-স্থানীটি গর্জে উঠল—"আউর তুম ভি হায়"।

পরক্ষণেই দুজনে দুজনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আরো কয়েকজনের সাহায্যে যখন ওদের দুজনকে তফাৎ করলুম—তখন কম্বলটাও দুভাগ হয়ে গেছে। ছেঁড়া কম্বলের উপর মুখ গুঁজে অভিলাষ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জনতা ছড়িয়ে পড়েছে নানা রকম মন্তব্য করতে করতে। ঐ মেয়েটিও কখন এক-পাশে এগিয়ে এসেছে। নিচু হয়ে অভিলাষের পিঠে হাত রেখে বললুম—"চল, অভিলাষ, আমার সঙ্গে চল।" কিন্তু অভিলাষ যাবে না, সে কঠিন হাতে তার হকের জিনিষের আধখানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাটা ছাগলের মত ছটফট করতে লাগল।

নিরুপায় হয়ে ফিরে এলুম। কী জানি, প্রাচীন গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, অবন্তী, মহেনজোদাড়ো বোধ হয় সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর ফুটপাথে সমাধিস্থ হয়ে রইল।

বিস্মরণে

অনিল ভট্টাচার্য

প্রিয় এই কথাটি রেখো শুধু মনে।
দিনের পরে দিন যাবে মোর
তবু তোমায় ভুলব না জীবনে।
যদি কখন আধেক রাতে মনের ভুলে
সেই নামেতে বারেক ডাকো দুয়ার খুলে
আমার সাড়া মিলবে জেনো
সেদিন ক্ষণে ক্ষণে।

*   *   *

সেই যে কবে বলেছিলে "তোমায় ভালবাসি"
সে রাতে মোর সেই কথাটি আসবে কানে ভাসি
পড়বে মনে সকল কথা ভুলবোনাকো
বলবে তোমায় "মিনতি মোর আজকে থাকো"
জানিনাকো হয়তো তুমি
এলে অকারণে।

*   *   *

শীতল পাটি বিছিয়ে দেবো পরব নীলাম্বরী
পরব চুলে তোমার দেওয়া ফুলের মঞ্জরী
সেদিন যদি চাঁদের তিথি না রয় প্রিয়
আঁধার-রাতের অভিসার করব রমণীয়
মিলন প্রদীপ জ্বালব আমি
একলা ঘরের কোণে।

*   *   *

সেদিন যদি শেষ হয়ে যায় ফুল ফোটানোর পালা
কানন থেকে কুঁড়ি এনে গাঁথব তোমার মালা
পরিয়ে দেবো চন্দনেরি তিলক এঁকে
বলবে তুমি "মালবিকা" আমায় ডেকে
কানে কানে গান শোনাবো
অস্ফুট গুঞ্জরণে।

*   *   *

হয়তো আবার আনব আমার ভাঙা বীণাখানি
বলবে তুমি আগের মত "বাজাও ওগো রাণী"
গানের শেষে হয়তো তুমি যাবে চলে
অনেক বলা সেই কথাটি যাবে বলে
রাতের কথা রাত-পোহালে
যাবে বিস্মরণে।

পুষ্পরাজ

উমা চট্টোপাধ্যায়

এই নিয়ে তিনবার শুনলো ছেলের মুখে এই গালাগালটা লখিয়া। হাঁটু অবধি গামছা পরে ভিজে কাপড়টা মেলে দিতে দিতে, মুখটিপে একটু হাসলো—ছেলে তার 'লায়েক' হয়ে উঠেছে, তা নাহলে ঐ কথা মুখে আসে। বছরখানেক আগেও তো শ্যামলালের হাতের থাপ্পড় খেয়ে মায়ের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে এই ছেলে! আর আজ...

এই একটা বছরে ছেলের অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল লখিয়ার চোখের সামনে। ফ্যাক্টরীর কাজটা নেবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটকা কাপড় ছেড়ে পাজামা পরতে আরম্ভ করলো—যখন-তখন বিড়ি ধরাতে লাগলো মায়ের সামনে, ভাত দিতে একটু দেরী হলেই মেজাজ খারাপ করে, এই সময়েই মুখ দিয়ে তার ছর-ছেহর অনেক কথা বেরোতে থাকে, যখন তখন পকেট থেকে সরু চিরুনি বের করে চুল ফিরিয়ে দেয় চাঁছাছোলা করে একেবারে পেছনের দিকে—সাইকেল পরিষ্কার করতে করতে হিন্দী ফিল্মী গানের সুর ভাঁজে—লখিয়া এ সবই লক্ষ্য করে আসছে। হাসি পায়—ছোটকাও জোয়ান হয়ে উঠলো—যে! এগারো বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েছে ছোটকা—অদ্ভুত দুরন্ত আর আবদেরে ছেলে ছিল, আঁচড়ে, কামড়ে, কাপড় টেনেছিঁড়ে একসা করে দিত—কিন্তু মুখে একবার স্বাদ পেলেই সব চুপচাপ—এগারো বছরের শিশু চোখ বড় বড় করে পরম আরামে দুধ খেত! এই শিশুর ঠোঁটের ওপর কালো হয়ে দেখা দিল গোঁফের রেখা—গলার আওয়াজ এলো মোটা হয়ে; ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরে ছোটকা আতর লাগায় পাতলা গোঁফের দুই প্রান্তে। কাজে অকাজে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়, রাত করে বাড়ী ফেরে চোখ লাল করে। সব লক্ষ্য করে লখিয়া। লখিয়ার কিন্তু মন্দ লাগে না—লায়েক হয়ে উঠছে ছোটকা—দিব্যি মদ্দ হয়ে উঠছে! রাস্তার কলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে ছোটকা স্নান করার আগে—রান্না ঘরের বেড়ার গায়ে চোখ লাগিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকে লখিয়া—ছোটকা বিড়ি টানছে আর রাস্তার ওপাশের বস্তিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে শিস্ দিচ্ছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

বাপ-মার চোখের সামনেই বড় হলো ছোটকা একটু একটু করে, তবু যেন প্রায় ওদের অলক্ষ্যেই। রোগাপটকা ছেলে, বাড়ী থেকে ওকে বেরোতে দিত না শ্যামলাল। ও জানালায় বসে বসে দেখত সুরকির গাদায় ওর বয়সী ছেলেরা গড়াগড়ি খাচ্ছে, পুকুরের ঘাটে হুটোপুটি করে চান করছে পাড়ার ছেলেরা। শ্যামলালের ভয়ে বাইরে বেরোবার উপায় ছিল না ছোটকার। দু'তিন বছর বয়স থেকেই সে বাপের কড়া শাসনের আওতায় মানুষ হয়ে এসেছে। দোকান থেকে ফিরে যদি শ্যামলাল দেখত ছোটকা মায়ের কোলে, তবে চোটপাট শুরু করে দিত—বেশ, বেশ, খুব হয়েছে। ওর মত ছোকরা এক একটা দোকান চালাচ্ছে ঃ কোলে করে রাখবি হরবখৎ—কি হবে আর! না হবে কাজের, না হবে কোন সহবৎ।'

মিলের পর মিল বসিয়ে গ্রাম হলো সহর—সহর চললো বেড়ে। গ্লাস ফ্যাক্টরীর পেছনে যে ডোবাটা এখন প্রায় বুজে এসেছে, ওখানে এক সজনে গাছের তলায় বসে দশ বছর আগে শ্যামলাল ছিপে করে মাছ ধরেছে। ওর পাশে ফুটবল মাঠে গোরারা বল খেলতো, ছাই রঙের শার্ট গায়ে দিয়ে। বারে বারে গড়িয়ে গড়িয়ে ওদের বল এসে পড়তো ঐ ডোবায়। গ্লাস ফ্যাক্টরীর ভাঙা কাচের টুকরো, তারের রেলিং, কাঠের প্যাকিং বাক্স, ফুটো ক্যানেস্তারা—এই সবেই এই ডোবা প্রায় ভরে এলো। সজনে গাছটা গেছে অনেক আগেই। গোরারাও এখান থেকে কোথায় চলে গেছে কে জানে—শুধু গির্জের পাদ্রী বুড়ো মরিস সাহেব এখনো আছে একতলা বাঙলোয়।

গ্লাস ফ্যাক্টরীর পাশে আইস ফ্যাক্টরী বসলো—তার কাছে বসলো জুট মিল—সে প্রায় তিন চার বছরের মধ্যে। জমি মাপা হলো, কালো কালো মোটর এসে দাঁড়ালো ডোবাটার পাশ ঘিরে, কালো কালো মোটর থেকে নামলো ফুলকাটা টুপি মাথায় দিয়ে পেটমোটা মারোয়াড়ী শেঠজীরা, কি জওয়ান—এই ছাতি—প্রকাণ্ড মুখ—ইয়া গোঁফ—তারপর ইঁট, কাঠ, লোহালক্কড় আসতে লাগলো লরীকে লরী। এক এক মাসের মধ্যে এক একটা ফ্যাক্টরী গড়ে উঠলো—খড়িকাটা ছাদ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এ মুলুকে মানুষ আসতে লাগলো যেন পিঁপড়ের সার। সাঁওতালদের আনলো মালিকেরা নিজেরাই—জমি জায়গা দিলো—[illegible] জন্য ভর্তি হয়ে খোলার বস্তি বসে গেল। বারাকের ওপার থেকে এলো আরও লোক, এলো দলে দলে, [illegible] পেছনে পাঁটীর ঝুলিয়ে। [illegible] বছরে এ [illegible] কী থেকে কী অবস্থা হলো, সব জানা আছে শ্যামলালের। সবচেয়ে পরে এলো মুংরীরা। ছ'মাসের মেয়ে কোলে নিয়ে ষোল বছরের মেয়ে মুংরী এলো এই আধা সহরে একদিন। ওর মরদটা বেশ ভালো লোক ছিল কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতে তাড়ি খেতে আরম্ভ করলো—মুংরীকে মারপিঠ করতে আরম্ভ করলো। কোলের মেয়েটা মুংরীর মারা গেল এক বছর হতে না হতে। দুজনে মিলে কাজ করে উপার্জন মন্দ নয় কিন্তু বিশুকে তাড়ির নেশায় গ্রাস করলো; দিনরাত বেহুঁস হয়ে কাটায়। শেষকালে ইঁট মেরে এক সর্দারের মাথা ফাটিয়ে বিশু গেল জেলে। জেল থেকে ছাড়া পাবার দিনও পার হয়ে গেছে অনেকদিন কিন্তু বিশু আর ফিরে আসেনি। মুংরী সকাল-সন্ধ্যা খাটে—দিব্যি গতর—রোজগার মন্দ না, ভালোই আছে। কেউ বলে বিশু জেলেই মারা গেছে, কেউ বলে জেল থেকে বেরিয়ে বিশু চাপাইতলার গয়লাদের সঙ্গে মিশে ডাকাতি করে বেড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে. কেউ বলে রাজপুরের মেলায় সার্কাসওয়ালার তাম্বুর সামনে চুণকালি মেখে নাচতে দেখে এসেছে তারা বিশুকে। সে যাই হোক, বিশু আর আসেনি, মুংরীও বিশুর কথা আর জিজ্ঞেস করেনি কাউকে। মুংরী বেশী কথা বলে না, চুপচাপ খাটে, টিপে টিপে খরচ করে।

মাত্র একমিনিটের জন্য বাসটা ধরতে পারলাম না। আমারই-বা কি দোষ! সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে হাতে সময় থাকে খুব কম। এটুকু সময়ের মধ্যে আমাকে সবকিছুই করতে হয়। বাজার করা, ধোপার হিসাব লেখা থেকে আরম্ভ করে সংসারের খুঁটিনাটি, মায় ছেলেকে একটু খেলা দেওয়া পর্যন্ত—সবই আমার প্রাত্যহিক কাজ। তাতেও কি ছাই নিস্তার আছে। হয়ত কোনদিন হন্তদন্ত হয়ে বাজার সেরে ফিরলাম, অমনি রান্নাঘর থেকে গৃহিণী বলে উঠলেন, "হলুদ নেই! বাজারে ত গেলে, হলুদ এনেছ!"

দেখলেন ত একবার কাণ্ডখানা! আবার বাজারে যেতে হবে। আমি যেন মানুষ নই। যখন যা' বলবেন, নির্বিবাদে করে যেতে হবে ঃ প্রতিবাদ করবার উপায় নেই ছুটির দিনে বেড়াতে যাবেন, খোকাকে রাখতে হবে আমায়। বন্ধুদের নিয়ে সিনেমায় যাবেন, লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনে দিতে হবে আমাকেই। না বলবার কি জো আছে। থাক্, এর বেশী আর লিখতে ভরসা হয় না—যদি কোনদিন লেখাটা গৃহিণীর হাতে পড়ে যায়, ভাবতেও ভয় হয়।

হাঁটতে হাঁটতে অফিসের কাছাকাছি পার্কটার কাছে এসে পড়েছি, হঠাৎ অদূরে রোদ্রে কি একটা জিনিষ যেন চিক্‌চিক্ করে উঠল। কাছে গিয়ে দেখি, একটা "লেডিজ ফাউণ্টেনপেন।" পেনটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখে অফিসের দিকে এগুতে লাগলাম।

অফিসে এসে কিছুতেই স্থির মনে কাজ করতে পারলাম না। কোনরকমে বাড়ি পৌছুতে পারলে হয়। কুড়িয়ে-পাওয়া কলমটা গৃহিণীকে উপহার দেওয়া যাবেখন। কলমটা পেয়ে গৃহিণী খুব খুশী হবেন নিশ্চয়।

ছুটির পর একমিনিটও দেরী না করে বাসের বদলে ট্রামে চেপে বসলাম। ট্রামে চেপে কিন্তু সব চিন্তা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। উঁহুঃ, কলমটার কথা গৃহিণীকে কিছু বলা হবে না। কলমটা পেয়েই একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবেন নিশ্চয়। অত দাম দিয়ে কলম কেনার কি দরকার ছিল? শুধু শুধু টাকার শ্রাদ্ধ! কিনলে ত কিনলে, তায় আবার 'লেডিজ পেন'! চেঙে মরে যাই! এরকম নানা কথা শুনতে হবে। তার চেয়ে গৃহিণীকে কিছু না-জানানোই ভাল।

তবে কলমটা নিয়ে কি করা যায়। পকেট থেকে বের করে আর একবার দেখলাম। কলমটা দামী বটে। ক্লিপটা সোনার নাকি। তার ক্লিপে দেখছি আবার ইংরেজিতে "সি" লেখা রয়েছে। "সি" অক্ষরে কি নাম হতে পারে? চন্দ্রমুখী চপলা, চন্দ্রা—কত নামই ত হয়। কোথায় খুঁজে বেড়াব, বরং খবরের কাগজে লিখে দি, যার জিনিষ উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেখন। মন স্থির করে ফেললাম।

• • •

পরদিন সকালে বাজারে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় দরজার কড়া সজোরে নড়ে উঠল। দরজা খুলে দিতেই একটি সুবেশী, সুকেশী তরুণী আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "এইটেই কি গৌরবাবুর বাসা?"

ঘাড় নাড়তে তরুণী পুনরায় বললেন, "খবরের কাগজে আপনিই বোধ হয় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন একটা 'লেডিজ-পেন' কুড়িয়ে পেয়েছেন বলে।"

ঘাড় নাড়লাম। তরুণী এবার সুর মোলায়েম করে বললেন, "দয়া করে কলমটা যদি ফিরিয়ে দেন। কলমটা আমারই।"

এতক্ষণ পর আমি মুখ খুললাম। বললাম, "কিছু প্রমাণ দিতে হবে যে।"

হঠাৎ আমার এ ধরণের প্রশ্নে তরুণী যেন একটু বিরক্ত হয়ে গেলেন, বললেন, "কলমটা যে আমার সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সেজন্য আবার কোন প্রমাণের দরকার আছে নাকি?"

তরুণীর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম খুব। বেমালুম কলমটা আত্মসাৎ করে দেবার প্রচেষ্টা দেখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "মাফ্ করবেন। প্রমাণ না পেলে আমি কলম ছাড়তে রাজি নই।"

আমার কথা শুনে তরুণী কি ভাবলেন, জানি না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "কি প্রমাণ চান? অর্থাৎ কি ধরণের প্রমাণ চান?"

বললাম, "যে কোন প্রমাণ, যাতে প্রমাণিত হয় কলমটা আপনারই। এই ধরুন—"

আমাকে বাধা দিয়ে তরুণী বললেন, "থাক্, থাক্। আপনাকে আর বলতে হবে না।"

গজগজ করতে করতে তরুণী চলে গেলেন। আমি একবার শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার অপস্রিয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

• • •

বাজার করে ফিরে এসে গৃহিণীকে পয়সার হিসাব দিচ্ছিলাম, এমন সময় আবার দরজার কড়া নড়ে উঠল। বাকি পয়সাগুলো গৃহিণীর হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে, দরজাটা ঈষৎ খুলে অর্দ্ধেকটা শরীর বাইরে বের করে বললাম, "কি চাই?"

আমাকে দেখে আধবয়সী একজন ভদ্রলোক বললেন, "আপনি নিশ্চয় গৌরবাবু?"

ঘাড় নাড়লাম। ভদ্রলোক কোনরূপ ভূমিকা না করে বললেন, "কলমটা আমার স্ত্রীর। কিছুদিন আগে বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে এসেছেন। তা, আপনি যখন পেয়েছেন—"

বললাম, "আমি যখন পেয়েছি আমায় কি করতে হবে বলুন।"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, "আপনি রসিকতা করছেন। কলমটা দয়া করে ফিরিয়ে দিন।"

মুখটা বাইরের দিকে আর একটু বের করে, যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললাম, "প্রমাণ দিতে পারেন কিছু?"
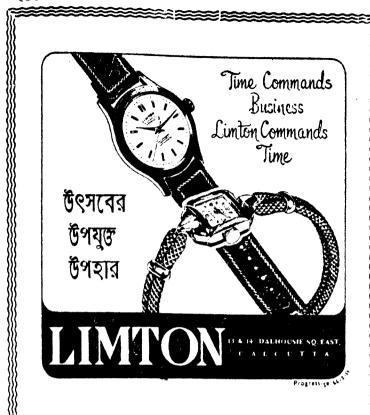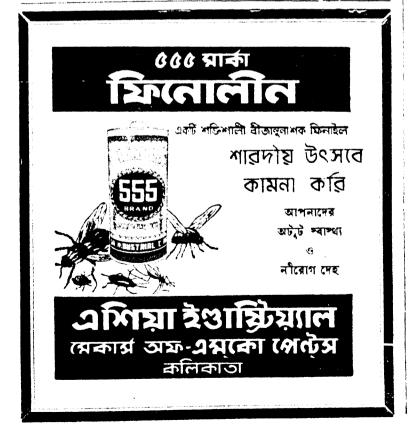
ভদ্রলোক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে

বললেন, "প্রমাণ—নিশ্চয় পারি। কি প্রমাণ আপনি চান বলুন।"

নিজেকে পূর্ববৎ গম্ভীর রেখে বললাম, "যে কোন প্রমাণ!"

ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, "যে কোন প্রমাণ!" একটু চিন্তা করে ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, প্রমাণ আপনাকে দিতে পারি। কি ধরণের প্রমাণ আপনি চান বলুন।" ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, "এমন যে কোন প্রমাণ যাতে আমরা পরস্পর সন্তুষ্ট হতে পারি, এবং যার ফলে কলমটা ফিরিয়ে দিতে আমি এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করব না।"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, "তাই বলুন। আমি ভাবলুম, কী ভীষণ প্রমাণ না আমাকে দিতে হবে। তা, আপনাকে আমি এমন প্রমাণ দিতে পারি, যা' শুনলে আপনি কলমটা ফিরিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবেন না।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে বাইরে বের-করে-দেওয়া শরীরের কিছুটা অংশ ভিতরের দিকে ঠেলে দিলাম। ভদ্রলোক একটু এগিয়ে এসে আমার কানের কাছে মুখটা এনে ফিস্-ফিস্ করে বললেন, "পেনের ক্লিপে বাংলায় "পি" লেখা আছে। "পি"-তে কি নাম হয় জানেন? প্রিয়তোষিণী,—প্রিয়তোষিণী আমার স্ত্রীর নাম।"

বললাম, "হল না মশাই। কলমের কোথাও "পি" লেখা নেই।"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু যেন দমে গেলেন। তবু একবারে হাল না ছেড়ে বললেন, "আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। একবার ভাল করে দেখে আসুন। আমি না হয়—"

বাধা দিয়ে বললাম, "ভুল আমার হয়নি। পেনের কোথাও "পি" লেখা নেই।"

ভদ্রলোককে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই বাইরে বের করে দেওয়া শরীরটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

দুপুরে আহারের পর একটু দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছিলাম, এমন সময় আবার দরজার কড়া নড়ে উঠল। আর পারি না—দুপুরে যে একটু ঘুমুব, তারো জো নেই দেখছি। দরজা খুলে দিলাম। দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কোনরূপ ভূমিকা না করে, একমুখ হেসে বললেন, "চলুন, বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।"

বাঃ, বেশ লোকের পাল্লায় পড়া গেছে দেখছি! কি দরকার, কাকে চাই, কোথা থেকে আসছেন—কিছু বলা নেই, কওয়া নেই—একেবারে বৈঠকখানায়! ব্যাপার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী চেয়ারের পিঠে কোঁচান চাদরখানা রেখে নিজে বসলেন চেয়ারে। আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে, তিনি বললেন, "আমার নাম কৃষ্ণধন পোদ্দার। আমি আসছি আলিপুর থেকে।" একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "বিশেষ দরকার পড়ে গেল কিনা, তাই আপনার কাছে আসতে হল। আপনি যে বিশিষ্ট ভদ্রলোক তা' আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আপনার ব্যবহারটা অতি মোলায়েম। এই দুপুরে আপনাকে বিরক্ত করলাম, আপনি একটুও রাগ করলেন না।"

পেটের দায়ে

সুনীল বসু

আমি চেয়ারে বসে ঘন ঘন হাই তুলতে লাগলাম। দুপুরের ঘুমটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। কিন্তু কি করব। প্রৌঢ় ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা পানের কৌটা বের করে আমার দিকে একটা পান এগিয়ে দিলেন। আমি হাত জোড় করলাম। তিনি নিজে গোটা দুই পান মুখে পুরে দিয়ে বললেন, "পান খান না—খুব ভাল করেন মশাই। খুব ভাল করেন। দেখছেন ত আমাকে, পান না খেয়ে আর পারি না। আগে তেমন খেতুম না। তৃতীয় পক্ষ এসে জোর করে পান খাওয়া ধরাল। আর বলেন কেন মশাই, তৃতীয় পক্ষকে নিয়ে আর পারি না। তাঁর জন্যেই ত এই দুপুরে আপনার কাছে আসা। নিত্য নতুন আব্দার লেগেই আছে। আজ চুড়ি কিনে দাও, কাল কানপাশা গড়িয়ে দাও। সিনেমা-থিয়েটার ত লেগেই আছে। বন্ধু-বান্ধবের কথা বলছেন, তার আর অভাব কি! কত আসছে, কত যাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হামেশাই বেড়াতে যাচ্ছে। আজ বালিগঞ্জ, কাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, পরশু পিক্‌নিক্—এর কি আর অন্ত আছে। সত্যি আর পারিনে মশাই!" তিনি আরো দুটো পান মুখে ফেলে দিলেন। কৌটটা বন্ধ করে পকেটে রেখে বললেন, "এই সেদিন নিউমার্কেটে গিয়ে নতুন ডিজাইনের একটা কলম কিনে দিলাম, দুদিনও রাখলে না, মশাই। বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে এল। আবার বায়না ধরেছে আর একটা কলম কিনে দিতে হবে। আপনিই বলুন মশাই, টাকা কি গাছে ধরে, যে নাড়া দিলেই পড়বে। আনুন ত কলমটা দেখি একবার। যদি সেইটেই হয় তবে আর কিনতে হয় না।"

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমার তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। এতক্ষণ পর ভদ্রলোকের আগমনের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম। একটু যে বিরক্ত হলাম না, এমন নয়। মুখে সে ভাবটা প্রকাশ না করে বললাম, "কোন প্রমাণ দিতে পারেন?"

আমার কথা শুনে প্রৌঢ় বলে উঠলেন, "এতগুলো প্রমাণ দিলাম—"

বললাম "প্রমাণ? প্রমাণ আপনি দিলেন কই?"

একটু চিন্তা করে বললেন, "হেঁ, হেঁ, মনে পড়েছে। এতক্ষণে মনে পড়েছে। যা ভুলো মন মশাই। সব কথা মনেই থাকে না। কলমটির একধারে বাংলায় "এল" লেখা আছে। ঠিক কিনা। আমার তৃতীয়পক্ষের নাম লবঙ্গলতিকা। এতবড় নাম কি মশাই মনে রাখা যায়, আমি ছোট করে লবঙ্গ বলে ডাকি। বলুন ত, নামটা আপনার পছন্দ হয় কিনা। এবারে দয়া করে কলমটি আনুন।"

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। ভদ্রলোকের প্রতি মনপ্রাণ বিষিয়ে উঠল। আর ঘুমুব কখন। একটু রাগতভাবেই বললাম, 'পেনের কোথাও বাংলা লেখা নেই। "এল' ত দূরের কথা।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আপনি ভাল করে দেখে আসুন আমি ততক্ষণ বসছি।"

একটু ঝাঝালো সুরেই বললাম, "ভুল আমার হয়নি নিশ্চয়। আমি ভাল রকম জানি, "এল" বলে কোন অক্ষর লেখা নেই পেনের কোথাও।"

"নেই যখন তখন আর কি করা যাবে।" ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোঁচান চাদরটা কাঁধে ফেলে নমস্কার করে বললেন, "আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম।" পরে দরজার কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, "নিউমার্কেট থেকে আর একটা কলম কিনে নিয়ে যেতে হবে। না নিয়ে গেলে কি আর রক্ষে আছে। সারারাত যাবে মান ভাঙ্গাতে। রাগ আছে আবার এদিকে ষোল আনা। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

নমস্কার জানিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসলাম। ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজল। রবিবারের দুপুরটা যে কিভাবে কাটল—না হ'ল একটু ঘুম, না হ'ল একটু কিছু। সব কিছুরই মূলে এই কলমটা। ওটাকে আর বেশীদিন কাছে রাখা চলবে না। আজকেই ওটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যতক্ষণ কাছে থাকবে, একটা না-একটা অনর্থ বাধাবে। আজকেই কলমটাকে গোলদীঘিতে বিসর্জন দিয়ে সমস্ত গোল মিটিয়ে ফেলব। আপদ জুটেছে একটা বড়। বড্ড আহম্মকের কাজ করেছি কলমটা কুড়িয়ে এনে। আরো দেখুন, পড়ল ত পড়ল, আমারই চোখে। কত-লোক যাচ্ছে-আসছে—কারুর চোখে পড়ল না। কপালে দুঃখ আছে, খণ্ডাবে কে?

সন্ধ্যার কিছু পরে ট্রাম থেকে গোলদীঘির পাড়ে নেমে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, কলমটা ঠিক আছে কিনা। গোল-দীঘির পাড়ে নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। নিজেকে যেন খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পকেট থেকে আস্তে আস্তে রুমালে ভাঁজ করা কলমটা বের করলাম। রুমালের ভাঁজ খুলতেই গ্যাসের আলোতে কলমটা চিকমিক করে উঠল। কি সুন্দর কলমটা! [illegible] নিশ্চয়ই [illegible]। ক্লিপের উপর "সি" অক্ষরটা যেন জ্বল জ্বল করছে। "সি" অক্ষরে ত কত নাম হয়—চাঁপা, চিন্ময়ী, চকোরী। কত নাম। কোন নামই যেন খাপ খায় না কলমটার সাথে। এমন কি নাম আছে যা কলমটার সাথে খাপ খায়। কে সে ভাগ্যবতী?

অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে গৃহিণী আবার হয়ত [illegible] হলে আবার [illegible]। কলমটার দিকে একবার [illegible] তাকিয়ে দীঘির জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠলাম। কেন [illegible] হাত থেকে বাঁচল, [illegible] লজ্জিত হলাম। [illegible]

বিষণ্ণ মনে বাড়িতে ফিরলাম। গৃহিণী আমাকে অনেক করে [illegible] বসালেন। [illegible] রান্না—[illegible]। আস্তে আস্তে [illegible]। গৃহিণী ভাতের থালাটা এগিয়ে দিয়ে [illegible] থালার চারিপাশে সাজিয়ে দিলেন। [illegible] হাতে পাখা নিয়ে বসলেন বাতাস করতে।

খাব কি! সব যেন [illegible] যাচ্ছে। হাওয়া করতে করতে গৃহিণী বললেন, "খাচ্ছ না যে কিছুই। মুখ [illegible] কেন? লক্ষ্মীটি, মাছের মুড়োটা খাও।"

নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বোধ করতে লাগলাম। আজ দীর্ঘ [illegible] বছরের বিবাহিত জীবনে এমন ব্যবহার [illegible]। শুধু গৃহিণীর কথায় [illegible] মাছের মুড়োটার কাছে [illegible]। গৃহিণী হাওয়া বন্ধ করে মুখ নিচু করে বললেন, "একটা অন্যায় করে ফেলেছি, কিছু বলতে পারবে না কিন্তু।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে গৃহিণীর দিকে তাকালাম। গৃহিণী [illegible] বললেন, "[illegible] সেদিন [illegible] টাকা দিয়ে একটা 'ফাউন্টেন পেন' কিনেছিলাম।

সখ করে ক্লিপের উপর আমার নামের আদি অক্ষর "সি" লিখেছিলাম। চারুশীল—অত-বড় নাম আবার কেউ লেখে নাকি? তাই ছোট্ট করে ইংরেজিতে "সি" লিখেছিলাম শুধু। যেদিন কিনলাম তার কয়েকদিন পর বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছি।" একটু থেমে আবার বললেন, "এতদিন ভয়ে ভয়ে তোমায় কিছু বলিনি। কিছু বলতে পারবে না কিন্তু।" পরে আবার আব্দারের সুরে বললেন, "হ্যাঁ গো, খবরের কাগজে একবার দিয়ে দেখ না, কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।" গৃহিণী পুনরায় হাওয়া করতে লাগলেন।

মনে হল, মাছের মুড়োটা বুঝি গলায় আটকে আসছে। কেন জানি না—কিন্তু আটকাচ্ছে।

পুত্র রাজ

(২০৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জানে", ছোটকা নিজের মনে বিড় বিড় করতে থাকে—"বুড়ো হয়ে এ বদতমিজ করতে সরম হয় না!"

ছোটকা চুড়িদার পাঞ্জাবী চাপিয়ে, আতর লাগিয়ে বেরিয়ে যায় সাইকেলে করে—বলে যায়, "আমার লৌটতে দের হবে। খানা চাপা দিয়ে রাখিস দাওয়াতে।

এক মিনিটের মধ্যে ছোটকার দেহটা বড় রাস্তার ওপর দিয়ে তরতর করে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওর দৃঢ় সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে থাকে লখিয়া—বিশ বছর আগে, যে শ্যামলাল এক সন্ধ্যে বেলা শালগাছের তলায় ডেকে বলেছিল, 'চল লখি ভেগে যাই—"এই ছোটকার মতই হবে বইকি তখন শ্যামলালের বয়স। কিন্তু কাঠ কেটে, মোট টেনে ঐ বয়সে আরও জওয়ান হয়ে উঠেছিল যেন শ্যামলাল।

বেশ রাত করে ফিরে এলো শ্যামলাল। এসেই বললো, "ভাত লাগা, রাত হল।" বলে ভিজে গামছায় গা মুছতে লাগলো। গা মুছে এসে দেখে লখিয়া যেমন বসেছিল, তেমনি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে, কোনও সাড়াশব্দ নেই। একটু জোর গলায় বললো শ্যামলাল, "কী হলো, ভাতের কী হলো রে?"

"রসুই হয় নি, ছোটকা বেরিয়েছে—অনেক রাতে ফিরবে; বেশী রাতে চুলা ধরাব। "আস্তে আস্তে নিরাসক্ত কণ্ঠে লখিয়া বলে।

আগুনের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে শ্যামলাল। "তোর বেটার খবর আমি জানতে চাইনে, চুলোয় যাক্—ভাত দে। বেটার সোহাগী হয়েছিস আজকাল—তা কি আমি দেখি না?"

কোনও একটা কিছু উপলক্ষ করে আজ যেন ফেটে পড়বার অপেক্ষায় ছিল শ্যামলাল। চেঁচাতে চেঁচাতে লখিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল, "লাথি মেরে ভাগিয়ে দেব তোর হারামি বেটাকে। রোজগেরে বেটা তোর একটা পয়সা ছোঁয়ায় কখনও বাপকে! এই বয়সে লুচ্চাগিরি করতে শিখিয়েছিস ত পয়সা থাকবে কী করে হাতে? লাথি মেরে পিঠের খাল খিচে নেব একদিন দেখিস! তোর জন্যই তো ওর এই লাপরওয়াই। বিশ্রী গালাগাল দেয় শ্যামলাল।

বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে রামহরক আহিরের মেয়ে, ছোটকার মা লখিয়ার। চার পয়সার জন্য মানুষ খুন করত রামহরক আহির।

রসুই ঘরের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছে শ্যামলাল। লাথি মেরে মেরে হাঁড়ি-কড়া ভেঙ্গে ফেলছে—। তেলের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলো উঠোনের মাঝখানে—থালাগুলো ঝন্ ঝন্ করে আছড়ে ফেললো শিলের ওপর।

দাঁতে দাঁত ঘসে কটকটিয়ে হাসলো একটু লখিয়া বিশ বছর আগেকার বেপরোয়া শ্যামলালের সে দুরন্তপনা দেখে ডাকুর মেয়ে লখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকতে পারত, আজকের পঞ্চাশ বছরের বুড়োর নাখরা দেখতে সে আর বসে থাকবে না।

সবকিছু চুরমার করে দিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল শ্যামলাল। কোথায় গেল, তা কি আর কেউ জানে না! রাত অনেক হয়েছে এখন—বস্তির সব চুপচাপ। ছোটকাও এসে গেছে অনেকক্ষণ। জামা কাপড় ছেড়ে, এদিক ওদিক ঘুরে একটু দেখলো—রসুই ঘরের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, তারপর খাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লো; বুঝলো বোধহয় আজকের সংগে অন্য দিনগুলোর তফাৎটা কোথায়!

অনেক রাতে মাথার মধ্যে সুড়সুড়িতে ছোটকার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে ছোটকা দেখে, লখিয়া শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। সে লখিয়া আর যেন নয়, পাথরের মূর্তির মতো যে দাওয়ায় বসে ছিল সন্ধ্যাবেলা। লখিয়ার চোখেমুখে খুশির ছাপ, মস্তবড় খবর যেন সে অনেক কষ্টে চেপে রেখেছে—চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় বড় হয়ে উঠেছে। লখিয়া মিটি মিটি হাসছেও। ছোটকা বিস্মিত অনু-যোগের স্বরে বলে, "ডাকলি কেন?"

জোরে ছোটকার ঠোঁটের ওপর পাঁচটা আংগুল চেপে ধরে লখিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "চল্, এক্ষুণি চল—অনেক দূরে যাব মা-বেটায়, পাত্তাটি কেউ পাবে না—চ এই রাতেই। এই শুয়োরখানায় কে থাকবে! মা-বেটায় আবার ঘর বানাব পর দেশে গিয়ে—পারবি নে, মাকে দুটি খাওয়াতে?"

ছোটকা কোনও উত্তর দেয় না এক মুহূর্তে সময় শুধু চুপচাপ বসে থাকে। তারপর উঠে সুটকেস খুলে কী সব খুঁটিনাটি জিনিসপত্র বেঁধে নেয় একটা পুঁটলিতে। তারপর সাইকেলটা নামিয়ে নিয়ে বলে, "চল্"। এতে যেতেও চলবে কমসেকম তিন মাস।

চুপিসাড়ে দুজন বেরিয়ে আসে বস্তি থেকে। নয়া সড়কের মোড়ে পুলিশ আছে পাহারায়, ধোবীতলাও ঘুরে বেটুয়াতলার শ্মশান বাঁদিকে রেখে গ্লাস ফ্যাক্টরীর চিমনীর পেছন দিক দিয়ে এসে নিঃশব্দে দুজন পড়ে বড় রাস্তায়। হাঁটায় অনভ্যস্ত লখিয়া হাঁপাতে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ এক সময় খুক খুকিয়ে হেসে ওঠে, বলে, "তাজ্জব লাগছে রে—এমনই ভাবেই একদিন ভাগলাম মরদের পিছে, আজ বিশ বছর পরে ভাগছি বেটার পিছে—তাজ্জব নয় ত কি?"

—

ইতিহাসের ছেঁড়াপাতায়

অমল ঘোষ

(বিদ্রোহী বীর ভেলু তাম্পি)

চোখের উপরে সন্ধ্যাতারার মত জ্বলজ্বল করে সতেরো শ' সাতান্ন সাল। ভারতের সে এক অন্ধকার শতাব্দীর শুরু। তার আগের বছর সতেরো শ' ছাপ্পান্ন সালে সুবেবাঙলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা কোলকাতায় কোম্পানীর কুঠীর উপরে হঠাৎ চড়াও হয়ে ইংরেজসৈন্যদের বিধ্বস্ত করে ছাড়েন। তখন কে জানত, তাঁর এই অভিযান ভবিষ্যতে বহু বীরের অন্তরে কালে কালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা জোগাবে।

সতেরো শ' সাতান্ন পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তনের [illegible]। সে ভিত্তির উপরে ক্রমাগত [illegible] কোম্পানীর গড়ে তুলেছিল [illegible] [illegible] শক্তির জোরে যে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মেরে কুমারী [illegible] [illegible] পর্তুগীজ অভিযাত্রী [illegible] ফেলেছিল। [illegible] পর্তুগীজদের [illegible] কোম্পানী নিজেদের [illegible] দিবা বসান [illegible]।

সারা [illegible] গেল তখন বহুজনই নিশ্চেষ্টভাবে বৃটিশের বন্দনা করে কৃতার্থ হবার প্রয়াস পেলেও ভারতের নানা প্রান্তে যে দু' চারজন দুঃসাহসী মনে মনে মাতৃভূমির মুক্তি অর্জনের স্বপ্ন দেখতেন তাঁদেরই একজনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল আঠারো শ' সালে ত্রিবাঙ্কুরে।

ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর বৃটিশরাজ্যের তলোয়ারের কাছে নতি স্বীকার করে নেবার পর থেকে ক্রমশঃ নিজের স্বাধীন সত্তা ভুলে যেতে বসেছিল। স্বয়ং ত্রিবাঙ্কুরঅধিপতি, যিনি নামেমাত্র রাজা আসলে ইংরেজরাজের হাতের পুতুল ও বৃটিশ রেসিডেন্টের পদলেহী—তিনি শরাবের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে কেবল নিজেকেই নয়, মাতৃভূমিকেও জাহান্নমে ভাসিয়ে দিতে বসেছিলেন। রাজ্যের প্রজা হাহাকারে মরে। তাদের মেরে বৃটিশরাজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেয় দেওয়ান। তার কি আসে-যায় দেশ ধ্বংস হয়ে গেলে! যতক্ষণ রেসিডেন্টকে খুসি রাখা যায় ততক্ষণ আর সবার সর্বনাশ হলেও তার ত পৌষ মাস! যে টাকা ইংরেজ সরকারে ত্রিবাঙ্কুরের কর দেবার কথা তার বহুগুণ গুণে দিতে হয় সাক্ষাৎ সম্রাট-প্রতিনিধি রেসিডেন্টের করে। আর দেওয়ানের ঘরে যা ওঠে তাও [illegible] হয় গরীব প্রজাকে পেটে কাপড় বেঁধে। কাপড়ও কি জোটে! তবু নিরুপায়, বাঁচতে হলে ইংরেজের ঘরে কর পৌঁছে দেওয়া চাই—সেই সাথে [illegible] পরে শাকের আঁটি দেওয়ান-[illegible]কে খুসি না রাখলে নয়!

এমনিই চলছিল। হঠাৎ ত্রিবাঙ্কুরের অন্ধকার [illegible] প্রচণ্ড সূর্যের মত ভেলু তাম্পির উদয় হল।

আঠারো শ' সালের এক দুর্যোগময় দিনে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ যখন 'মস্ত' ছিলেন [illegible], তখন হঠাৎ বজ্রের মত কার যেন হুঙ্কার শোনা গেল প্রাসাদের সন্নিকটে। আকাশ থেকে বজ্রনিপাত হল নাকি, চমকে উঠে ভাবছিলেন [illegible]। তাদের রঙীন চোখের রঙ [illegible] ভেলু তাম্পি প্রাসাদের [illegible] এসে সাক্ষাৎ যমের মত হাজির হলেন।

মহারাজের নেশা ছোটে-কি-ছোটে না। সে নেশা-নেশা ছুটিয়ে ছাড়লেন দেশমাতৃকার [illegible] মহাবীর ভেলু তাম্পি। তিনি [illegible] লোকের পক্ষ থেকে বললেন যে, হয় মহারাজকে প্রজার দাবী মেনে নিয়ে অবিলম্বে দেওয়ান বলরাম বর্মাকে বরখাস্ত করতে হবে, না হয় তাকে প্রজার হাতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

প্রাণভয়ে মহারাজ কাঁপতে কাঁপতে [illegible] দাবী মেনে নিতে বাধ্য হোলেন।

দেশদ্রোহী দেওয়ান জয়ন্তন (জয়ন্ত) [illegible] বরখাস্ত হোলেন। তাঁর জায়গায় মহারাজ শ্রীবলরাম বর্মা ভেলু তাম্পির সহকারী চম্পকরমণ পিল্লাইকে বসিয়ে দিলেন। বন্ধুবর দেওয়ান, তাম্পি হোলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী।

ইতিহাসে এক মেকলের নাম প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসাবে। আর এক মেকলেকে কেউ-বা চেনে। তবু এই লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কোলিন মেকলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এককালে সুখ্যাত হন বা না হন, কুখ্যাত কারো চেয়ে কম হলেন না এবং এই কুখ্যাত লোকটি, যাঁর পরিচয় খুঁজলে জানা যায়, ইনিই ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মেকলের পিতৃব্য, এঁরই হাতে ছিল [illegible] গোটা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের শুভাশুভের ভার। অর্থাৎ কোম্পানীর তরফ থেকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কোলিন মেকলেই ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের রেসিডেন্ট। হঠাৎ দেওয়ান বদল হওয়ায় রেসিডেন্ট সাহেবের মনোভাব যে কি হয়েছিল সে সঠিক জানা যায় না। হয়ত তিনি নীরবে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন, আর ভাবছিলেন, সব শিয়ালেরই এক রা। কিন্তু বছর দুয়েক বাদে চম্পকরমণ পিল্লাইয়ের মৃত্যুর পরে ভেলু তাম্পি স্বয়ং দেওয়ানের গদীতে বসায় রেসিডেন্ট সাহেব একটু চমকে না উঠে পারেননি। অবশ্য এই সবে তার চমকাবার শুরু।

বেশীদিন যেতে-না-যেতেই ভেলু তাম্পির আচার-আচরণ এমন কি রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে ব্যবহার কেমন যেন খটকা লাগাবার মত হয়ে উঠল। কোলিন মেকলে রেসিডেন্সির সুসজ্জিত, সুরক্ষিত কক্ষে নিশ্চিন্তে বসে মদ্যপান করতে করতে মাঝে মাঝে যে সকল টুকরো খবর পেতে লাগলেন, তাতে তাঁর কেমন সন্দেহ হল, এ শিয়াল ত শেয়াল নয়। পাছে এ শের না হয়। বলা ত যায় না, সারা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যজোড়া যে নিবিড় অরণ্য আর গম্ভীর পাহাড়, এর মধ্যে শেরের আবির্ভাব অসম্ভব কিছু নয়।

তবু কিছুকাল বিনা হাঙ্গামাতেই কাটল। কিন্তু কি আশ্চর্য, দেওয়ান কোম্পানীর প্রাপ্য বাকী ফেলছে কেন? হয়ত প্রজার কাছ থেকে পুরো খাজনা এখনো উসুল হয়নি, তাই। কিংবা ....কোলিন মেকলে সহজ রাস্তায় আর চিন্তা করে উঠতে পারেন না। বাধ্য হয়ে ভিন্ন পথই ধরেন।

আঠারো শ' পাঁচ সালের কথা। অতানক রেসিডেন্ট সাহেব জোর করে মহারাজ শ্রীবলরাম বর্মাকে দিয়ে নতুন এক সন্ধিপত্রে সই করিয়ে নিলেন। হঠাৎ কোম্পানীর এমন কি প্রয়োজন পড়েছিল যে, চিরন্তন বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের সন্ধি জোর করে না করলেই আর চলছিল না।

কোলিন মেকলে ভেবেছিলেন, বজ্র আঁটুনি দিয়ে ত্রিবাঙ্কুরকে এমন বাঁধাই বাঁধবেন, যে-বাঁধন চিরজীবনে আর কেউ খসাতে পারবে না। এইখানেই ভেলু তাম্পির নতুন দৃষ্টি খুলে গেল। ফলে যে সংঘর্ষ হয়ত বাধতে দেরি হত তার দিন সন্নিকট হয়ে এল।

বছরের পর বছর ভেলু তাম্পি কোম্পানীর প্রাপ্য বন্ধ করতে আরম্ভ করলেন। তাম্পির [illegible] হল, প্রজারা কর দেয় না, কর আদায় হলেই পাঠিয়ে দেব। রেসিডেন্ট সাহেব সেকথা শুনবেন কেন। তিনি আদেশ পাঠাতে লাগলেন, অবিলম্বে, আদায় হোক বা না হোক, কোম্পানীর প্রাপ্য শোধ চাই।

সে কথায় দেশপ্রেমিক দেওয়ান কর্ণপাত না করায় বিরোধ বেধে গেল। রেসিডেন্ট আদেশ

প্রাচীন ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা

(৬১ পৃষ্ঠার পর)

বলিয়াছেন যে, যদি ঐ ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রচারে প্ররোচিত করে এবং ঐরূপে প্ররোচিত হইয়া কোনও ব্যক্তি যদি পত্র প্রেরণ করে কিংবা প্রাচীরগাত্রে লিপিকা লিখিয়া মিথ্যা প্রচার করে, তাহা হইলে ঐ প্ররোচক ব্যক্তির অপরাধ প্ররোচিত ব্যক্তিকৃত অপরাধের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বর্তমান বৃটিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি পর্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্ররোচক ব্যক্তিরাও প্ররোচিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে বা হইতেছে। ইহা ছাড়াও আমরা আরও দেখি যে পত্রলিপি কিম্বা ইঙ্গিত দ্বারা অপরাধ সমাধা করা যায়। ঐ সকল দণ্ডবিধিতে উল্লিখিত অপরাধের জন্য বিবিধ দণ্ডেরও উল্লেখ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ দণ্ডগুলি অতীব কঠোর ছিল। শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর অপরাধীমনা ব্যক্তিদিগের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্যই ঐ সকল শাস্তি দেওয়া হইত। খৃষ্ট পূর্ব ৩য় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের রাজ্যকালে দেখা যায় যে, শাস্তিসমূহে কোনও-রূপ নিষ্ঠুরতা বা প্রতিশোধের মনোবৃত্তি ছিল না। বিচারক কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে ঐ সময় তিন দিন এবং তিন রাত্রি বিশ্রাম দেওয়া হইত; যাহাতে বিচারক ঐরূপ চরম শাস্তি সম্পর্কে প্রয়োজন বোধে পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন এবং অপরাধীও ঐ সময়ে দান, ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে। মহারাজ অশোকের আমলে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কাহাকেও বিচারের পূর্বে গ্রেপ্তার করা বা কারাগারে নিক্ষেপ করার রীতি ছিল না। ঐ সময় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তবে নাগরিককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইত। অর্থ এবং নীতিশাস্ত্রসমূহে দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর কথা লেখা আছে যাঁহাদের উপর হাট বাজার, রাস্তা, জনস্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষা প্রভৃতির ভার ন্যস্ত ছিল। সহজবোধ্য রূপে উঁহারা বর্তমান পুলিশেরই স্থলাভিষিক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকীর্ণ একটি চোল দেশীয় অনুশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময় দক্ষিণ ভারতের রাজপথে পাহারায় নিযুক্ত এক শ্রেণীর কর্মচারীর ভরণপোষণের জন্য সম্রাট কুলতুঙ্গের আদেশে স্থানীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর আদায় করা হইত। সেইহেতু নিঃসন্দেহে ঐ সকল কর্মচারীদিগকেও বর্তমান-কালীন পুলিশও মনে করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতের পুলিশী কর্মনীতি সম্বন্ধে 'মহাবীর চরিত' ১১,-১-১১০, সর্গে লোহাকুরা এবং বেহীগ নামক দুইজন চোরের কাহিনী জানা যায় এবং উহার মধ্যে তৎকালীন পুলিশী কর্মনীতি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়ায় ঐ কাহিনী হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

'রাজগৃহের নিকট বৈভববাসী এক চোর রাজধানীতে চুরি-চামারি করিতে সুরু করিয়াছিল। নাগরিকগণ স্থানীয় রাজাকে নালিশ জানাইলে তিনি নগর কোটালকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা পূর্বক বলিলেন, 'তোমাদের কি আমি অকারণে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি, এইরূপে চোরের উপদ্রব নিবারণ করিতে তোমরা অক্ষম কেন?' এরপর স্থানীয় রাজার আদেশে শহরের চারিদিক ঘিরিয়া রক্ষিদলকে মোতায়েন করা হয় এবং উহার ফলে চোর ঐ ফাঁদে পা দেওয়া মাত্র রক্ষিগণ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। গ্রেপ্তারের পর রাজসকাশে তাহাকে হাজির করিয়া রক্ষীপ্রধান জানাইলেন, 'মহারাজ, চোর চোরাই দ্রব্য সমেত ধরা পড়ে নাই, এইজন্য প্রমাণের অভাবে তাহাকে শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে না। তবে কোন কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রমাণ পাওয়ার পর তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।' ইহার পর রাজা নিজে অপরাধীমনা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করিলে সে এইরূপে এক বিবৃতি প্রদান করে—'আমার নাম দুর্গচাঁদ, কালী নামক গ্রামে আমার নিবাস, ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি এই শহরে আসি। পরে শহর দর্শন করিবার মানসে আমি একটি মন্দিরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ইহার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে রাক্ষসের মত নগররক্ষিগণ আমার গতিরোধ করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে এবং আমি তাহাদের এই আকস্মিক ব্যবহারে ভীত হইয়া নগর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি। কিন্তু নগররক্ষীদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও প্রাচীরের বাহিরে অপেক্ষারত সৈন্যবাহিনী আমাকে ধরিয়া ফেলে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে চোরের ন্যায় হস্তবদ্ধ অবস্থায় ইহারা আপনার নিকট আনিয়াছে।' ইহার পর স্থানীয় রাজা উক্ত চোরের এইরূপ বিবৃতি শুনিয়া তাহাকে সাময়িকভাবে কারারুদ্ধ করিয়া এক ব্যক্তিকে ঐ চোরের গ্রামে তাহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত কাহিনীটি কাহিনীমাত্র হইলেও উহা হইতে প্রাচীন ভারতের পুলিশী শাসন ব্যবস্থার এক চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় এবং প্রকৃতপক্ষে আধুনিককালের পুলিশী কার্যকারণ এবং তদন্তরীতির সহিত উহার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

প্রাচীন ভারতে সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর অধীনে প্রদেশে প্রদেশে শাসনকর্তা বা করদ রাজা ছিলেন। ঐ সকল করদ রাজার অধীনে ছোট ছোট রাজা বা ভূস্বামী থাকিত। এইরূপ প্রতীত হয় যে, [illegible] মাধ্যমে গ্রাম্য পুলিশ ঐ সকল ছোট ছোট রাজা বা ভূস্বামীদের অধীন ছিল এবং নগর পুলিশ উহাদের উর্দ্ধতন রাজা বা শাসকদের খাস নিয়ন্ত্রণে [illegible] অধীনে পরিচালিত হইত। [illegible] সাহায্যার্থে যে সৈন্যবাহিনী [illegible] প্রচলিত ছিল তাহা উপরোক্ত কাহিনী হইতে জানা যায়।

পরবর্তী যুগের হিন্দু রাজত্বকালে সাধারণভাবে পুলিশপ্রধানকে [illegible] বলা হইত [illegible] কোতোয়ালেরা [illegible] উহার [illegible] পর্যালোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে, [illegible] বলা যায় যে, তৎকালে [illegible] দিক হইতে রাজ্যের মন্ত্রীর পরেই কোতোয়ালের স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

হাট ফেরৎ — দিলীপ চৌধুরী

এবার
পূজায়
উৎকর্ষে ও নৈপুণ্যে
আপনাদের
মনোরঞ্জনের প্রতীক্ষায়
অন্নপূর্ণা
জুয়েলারী হাউস
মণিকার ও স্বর্ণশিল্পী
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট (দত্ত ম্যানসন) কলি-১২

উৎসবে
আনন্দে
কে,হোড়ের
প্রসাধন সামগ্রী
অপরিহার্য্য
K. HORE'S
MAHA
BHRINGARAJ
OIL
Kanak SNOW
কনক স্নো
কে,হোড় এণ্ড কোং
কলিকাতা-১৪

প্রিফেক্ট
প্রসাধন
সাবান
পূজার সাদর সম্ভাষণ
জানাচ্ছে
Prefect
মোদী সোপ ওয়ার্কস
মোদীনগর, ইউ, পি

নির্য্যাস-৩২
যে কোনও জিনিষকে সুগন্ধি করিতে

বিষস্য

(৫৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)
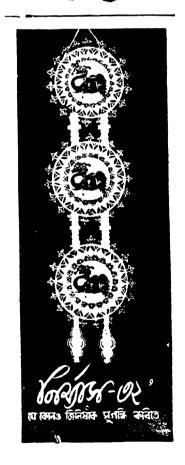
হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে যেন চমকে উঠলেন ডাঃ সান্যাল ! ল্যাবরেটরীর এক কোণে টেলিফোন—ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো। কিন্তু ডাঃ সান্যাল এখন বড় বেশী ব্যস্ত, শ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই যেন। খরগোসের ক্ষতস্থানে পিচকারী বসিয়ে বিষ শোষণ করছেন। কাঁচে পিচকারীর অর্ধেক ভরে যায় খরগোসের রক্তে আর কেউটের বিষে। এতেও যদি না বাঁচে, আর কোন উপায় নেই। ষ্ট্যাণ্ডে পিচকারী রেখে দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলতে যান ডাঃ সান্যাল।

—হ্যালো! ডক্টর সান্যাল হিয়ার। কে? মিসেস চৌধুরী? ফুল পেয়েছেন? পছন্দ হয়েছে? দেখা করতে আসবেন? খুব ভাল কথা। অলওয়েজ ওয়েলকাম। চলে আসুন, চলে আসুন।

আকুল আহ্বান জানালেন যেন ডাক্তার। তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটলো ব্যগ্র ব্যাকুলতা। ফোঁড়াফুঁড়ি আর কাটাকাটি করতে করতে ঘেমে উঠেছেন যেন। কপালে ফুটেছে স্বেদবিন্দু। মুখখানা যেন তৈলাক্ত হয়ে উঠেছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে ফেললেন। ওষুধের ব্যর্থতায় বিষণ্ণ মুখে যেন কিঞ্চিৎ আনন্দের আভাষ ফুটলো। নতুন উদ্যমে দেওয়ালের আলনায় ঝুলানো ষ্টেথোসকোপ টেনে নিয়ে খরগোসের বুকে রাখলেন। স্বকর্ণে অন্য দুই প্রান্ত। কি অনুভব করলেন কে জানে, ডাক্তারের মুখ যেন আরও বিমর্ষ হতে থাকে।

খরগোসের হৃদঘাত অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলেছে। অবিরাম নয়, সময়ের ব্যবধান রক্ষা করে এক একবার ধুক ধুক করছে যেন। হয়তো এখুনি একেবারে থেমে যাবে। প্রচুর লালা ঝরছে আটকে-যাওয়া চুয়াল থেকে। কেমন এক ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যায় খরগোসের রুদ্ধ কণ্ঠের।

—মিসেস চাউডুরী ইজ কামিং স্যর।

—স্যামুয়েল?

—ইয়েস স্যর!

—আই অ্যাম আনডান, স্যামুয়েল। ডিফিটেড বাই ইওর নাজা ট্রিপুডিয়ানস!

হেঃ হেঃ শব্দে যেন জান্তব হাসি হাসলো স্যামুয়েল। তার নোংরা আর অবিন্যস্ত ছোট বড় দাঁত দেখিয়ে দেখিয়ে হাসলো। দুপাশের দুটো দাঁত আবার রুপোয় বাঁধানো। চকচক করলো হাসির চাঞ্চল্যে! ঘোলাটে চোখে দেখলো টেবিলের পরে। দেখলো সর্পদষ্ট খরগোসের শিথিল দেহটা। দেখলো, খরগোসের চুণী-লাল চোখের তারা স্থির আর অকম্প। দেখতে দেখতে আবার সেই পাশব হাসি শুধু করলো পরম নিষ্ঠুরের মত। খরগোসের একটি পা টেনে ধরে বুঝলো কি কে জানে। হাসি থামিয়ে বললে,—ইট্ উইল্ ডাই স্যর, ভেরী সুন।

ডাক্তার চোখ বড় করে বললেন,—হোহাই? এত জোর ওষুধ পড়েছে, তবুও!

—ইয়েস স্যর। ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে চরম নিশ্চয়তার সঙ্গে বললে স্যামুয়েল। খানিক থেমে আবার বললে,—মানছুৰ আর জানোয়ার তো স্যর এক চীজ নয়! দেয়ারস্ এ গ্রেট ডিফারেন্স! বহুৎ তফাৎ আছে।

—ইজ ইট? তাই না কি?

—ইয়েস স্যর।

পরম বিজ্ঞের মত কথা বলে স্যামুয়েল। ডাক্তার যা জানেন না তা জানে স্যামুয়েল। সার্কাসের খেলোয়াড়দের সঙ্গে যেমন থাকে জোকার, ডাক্তারের সঙ্গে তেমনি থাকে অ্যাসিস্টান্ট। জোকার যেমন সব খেলায় ওস্তাদ, অ্যাসিস্টান্টরাও তেমনি হয় পাকাপোক্ত। ডাঃ সান্যালের কাছে কতকাল ধরে আছে স্যামুয়েল!

আসামের এক চা-বাগানের কুলীদের ডাক্তার ছিলেন ডাঃ সান্যাল। তখন সপরিবারে থাকতেন আসামের পার্বত্য অঞ্চলে, চা-বাগানের এক ব্যারাকে। বছর পনেরো অতীত হয়ে গেছে, আসাম থেকে চলে এসেছেন বাঙলা দেশে। ফেলে এসেছেন স্ত্রী-পুত্র আর কন্যাকে। আর তাদের কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না।

সে এক দুঃখরাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ডাঃ সান্যাল গিয়েছিলেন জরুরী ডাকে, ব্যারাক থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে। কুলীদের বস্তীতে হঠাৎ এক গ্রীষ্মের রাতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। রোগ বিস্তার করে কুলীদের ঘরে ঘরে। এক রাত্রির মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় এক কুড়িরও বেশী।

ডাঃ সান্যাল যখন নিজের ব্যারাকে ফিরলেন, তখন রাত পুইয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে পাহাড়ের আড়াল থেকে। চা-বাগানের কুলী রমণীরা দল বেঁধে কাজে বেরিয়েছে। মোরগ ডাকছে ঘরে ঘরে।

বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে টলতে টলতে ব্যারাকে ফিরেছিলেন ডাঃ সান্যাল। ফিরে দেখেছিলেন স্ত্রী-পুত্র আর কন্যা আর বেঁচে নেই। কি এক পাহাড়ী সাপ, ঘরে সেঁদিয়ে তিনজনকেই দংশেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল তারা একই বিছানায়, কারও আর ঘুম ভাঙলো না!

স্যামুয়েল তখন ছিল ডাক্তারের খানসামা। স্যামুয়েল খুঁজে খুঁজে বের করেছিল ঘাতককে! লাঠির আঘাতে তাকে কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছিল উগ্র আক্রোশে।

ডাঃ সান্যাল চা-বাগানের কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এসে তাই সর্পবিষনিবারণের ওষুধ তৈরীর কাজে লেগেছেন। তুষের আগুনের মত তার বুকে না কি সদাক্ষণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। পৃথিবীর যতেক মা-মনসার বাহনদের বিষ দাঁত ভেঙে দিতে চান যেন। ধ্বংস হোক সর্পকুল!

স্যামুয়েলকে আর ডাক্তার ফেলে আসতে পারেন নি আসামে। কে এক ব্রিটিশ সাহেবের জন্ম দেওয়া স্যামুয়েল জারজ সন্তান, কোন এক নিরীহ কুলী রমণীর।

স্যামুয়েল আবার কথা ধরলে ভাঙা-কাঁসরের শব্দে,—স্যর, দি অ্যানিমাল ডাইজ্ ইন্ দি থার্ড ষ্টেজ!

—দি ম্যান? দি হিউম্যান বিইং?

—দে ডাই ইন্ দি সেভেন্থ্ ষ্টেজ!

কথা শুনতে শুনতে ডাঃ সান্যাল কেমন যেন চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন। খরগোসের নাকের কাছে হাতের তালু ধরলেন। কান খাড়া করে শুনলেন, খরগোসের কণ্ঠ থেকে আর সেই ঘড় ঘড় ধ্বনি যেন শোনা যায় না। হাতের তালুতে লাগে না যেন শ্বাসবায়ু।

সাদা এনামেলের ট্রে, তাজা রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে। খরগোসের দেহের সাদা চিক্কণ লোম, তাও যেন রক্তে ভিজেছে। ডাক্তারও বুঝেছেন, পঞ্চনখ শশকের মরণমুহূর্ত সন্নিকট। সর্পবিষ আর উগ্র ওষুধের জ্বালায় খাবি খাচ্ছে থেকে থেকে। হিক্কা উঠছে হয়তো।

একটি হতাশ শ্বাস ফেললেন ডাক্তার। মাথা চুলকোতে থাকলেন। সর্পবিদ্যা ভুলতে বসলেন না কি! কালকেউটে কি না হারিয়ে দেয় ডাক্তারকে! কত গবেষণার আবিষ্কারকে নিষ্ফল করতে চায়। ডাক্তারের চুয়াল কঠোর হয়ে ওঠে। মনে মনে কি যেন পণ করছেন।

—ইট্ ইজ্ ডেড্ স্যর।

স্যামুয়েলের কথায় ডাঃ সান্যালের তন্দ্রা ভাঙলো যেন। চিন্তাকুল চোখ তুললেন। কি বলতে গিয়ে যেন আর বললেন না। পলকহীন চোখে দেখলেন, শশকের স্পন্দন নেই। আয়ু ফুরিয়ে গেছে। চুণী-লাল চোখের তারা অচঞ্চল যেন! ল্যাবরেটরীতে শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ।

ঘড়ি যেন বিদ্রূপ হাসি হাসছে, ডাক্তারের ব্যর্থ চেষ্টায়।

কত সাপের ছোবলকে ব্যর্থ করেছে ডাঃ সান্যালের অ্যাণ্টিভেনম্। শুধু ভারত নয়, সুদূর আফ্রিকাতেও এ ওষুধে কাজ হয়েছে। কত কৃষ্ণ-সর্প, মহাসর্প, গিরি-সর্প, আর আশী বিষের দংশন থেকে রক্ষা পেয়েছে কত কে! ল্যাবরেটরীর দেওয়াল ঘড়ির আশ-পাশে ঝুলছে কত কত সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, সরকারী সুপারিশ!

বাঙলার কালকেউটে কি না চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে শেষ পর্যন্ত? পরাজয়ের লজ্জা আর উত্তেজনায় ঘেমে উঠেছেন ডাঃ সান্যাল।

—খাঁচা ফাঁচা খুলে রাখেননি তো আবার!

দ্বিধা আর শঙ্কা মেশানো নারীকণ্ঠ ল্যাবরেটরীর দুয়োরে। ভয়ার্ত কোমল কণ্ঠস্বর।

—কে?

ডাক্তার সান্যাল জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালেন।

—মিসেস চাউডুরী স্যর!

স্যামুয়েল বললে, সহাস্যে। চোখের সম্মুখে মৃত্যু দেখেছে, তবুও তার মুখে হাস্যরেখা। চোখে পাষাণের চাউনি।

—আসুন, আসুন।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলেন ডাঃ সান্যাল। আগন্তুকের দুই-হাত ধ'রে বললেন,—চলুন, ল্যাবরেটরীর বাইরে যাই।

—বাঁচাতে পারলেন না তো বেচারী খরগোসকে?

মিসেস চৌধুরী হেসে হেসে কথা বললেন। মধুমিষ্টি সুরে। ল্যাবরেটরী থেকে দুজনেই বেরিয়ে যান।

স্যামুয়েল জানোয়ারের মত তাকিয়ে থাকে লুব্ধচোখে। একদৃষ্টে এতক্ষণ দেখছিল মিসেস চৌধুরীকে। পাটকিলা রঙের জর্জেট শাড়ীর

আঁটসাঁট বন্ধনে মিসেস চৌধুরীর দেহরেখা যেন স্পষ্ট হয়ে আছে।

—না, বাঁচাতে পারলাম না কোন' মতেই। বললেন ডাঃ সান্যাল। সলজ্জায় বললেন,—মিস্টার চৌধুরীর চিঠি পেয়েছেন? ছেলের চিঠি?

মিসেস চৌধুরী তাঁর খসে-পড়া আঁচল বুকে তুললেন। কপালের পরে নেমে-আসা রুক্ষ কুন্তল সরিয়ে বললেন,—ও'র চিঠি কাল পেয়েছি, বিকেলের এয়ার-মেলে। ছেলের কোন খবর নেই দিন পনেরো।

মিসেস চৌধুরীর স্বামী আছেন কোপেন-হেগেনে। কোন্ এক ফ্যাক্টরীতে থেকে হাতে-কলমে কাজ শিখছেন। সেই ফ্যাক্টরীর সার্টি-ফিকেট পেলে ভারত সরকার মোটা মাইনের কাজ দেবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শিবপুর কলেজ মিস্টার চৌধুরীকে দিয়েছে বি, ই উপাধি। কোপেনহেগেন দেবে এম, ই।

আর ছেলে আছে ডেরাডুনে। ডুন স্কুলে পড়ছে জুনিয়র কেম্ব্রিজ।

ডাঃ সান্যাল বললেন,—এক পেয়ালা চা হোক চৌধুরাণী।

—তা হোক! অপ্রস্তুততার মিহি সুরে বললেন মিসেস সুচরিতা চৌধুরী। বললেন,—আপনি যদি খান তবেই, নয়তো শুধু আমি—

কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা ধরলেন ডাঃ সান্যাল। বললেন,—হাঁ হাঁ আমিও খাবো বৈকি! আপনি যদি খান তবেই নয়তো নয়।

লাজুক হাসি হাসলেন সুচরিতা। লাল আর লালাময় ঠোঁটের ফাঁক থেকে মুক্তোর মত দাঁতের সারি দেখা যায়।

বলেন,—আমিও তবে খাই।

পায়ের-তলে ভিজে ঘাস। মাথার পরে গাছের শাখাপল্লব। নিমগাছের পাতা থেকে টুপ-টুপ জল পড়ছে। এক-ফোঁটা জল পড়লো সুচরিতার ফর্সা কপাল থেকে দুলে-রাঙা কপোলে।

কোন দোষ নেই, তবুও দোষীর মত অপ্রস্তুত হয়ে ডাঃ সান্যাল বললেন,—ইস্, এখনও জল ঝরছে গাছের পাতা থেকে! চলুন চৌধুরাণী, আমরা ঘরে গিয়ে বসি।

কটেজের দিকে কালো ভেলভেটের স্লিপার-সমেত পা চালালেন সুচরিতা। ভয়েলের লুটানো আঁচল টানতে টানতে।

ডাঃ সান্যাল গলা ছাড়লেন হঠাৎ। ডাকলেন—স্যামুয়েল! পোষা কুকুর যেন। দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির হয় স্যামুয়েল।

বলে,—ইয়েস স্যর।

এ পট অব্ টি স্যামুয়েল। কুইক!

স্যামুয়েলের চোখ নেই মনিবের দিকে। কেমন যেন টেরাচোখে সে দেখে মিসেস চৌধুরীকে। আলিপুরের চিড়িয়াখানার বাঘ যেন, দর্শকদের দেখছে লোহার গরাদের ওপার থেকে লোলুপ দৃষ্টিতে। ক'হাতের তফাতে মাংস-খাদ্য, অথচ স্পর্শের কোন' উপায় নেই। লোকের ভয়, তাই বাঘের খাঁচায় লোহার গরাদ। স্যামু-য়েলের শুধু লোকভয়! বাধা!

সুচরিতা কটেজের দালানে পৌঁছে একটি [illegible]-দণ্ড বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। চোখ রাখলেন বাইরের আঙিনায়, যেদিকে জিনিয়া আর জারবেরার রঙীন বৈচিত্র্য।

হারি আপ্ স্যামুয়েল!

কথার ধমকানি দিলেন ডাঃ সান্যাল। অবাধ্য পোষা কুকুরকে যে-সুরে বলতে হয়।

স্যামুয়েল তৎক্ষণাৎ দৌড়লো। পিছন ফিরেই দৌড় দিয়েছে আঙিনার সবুজতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মলিন খাকির রঙ। স্যামুয়েলের তালি-মারা ছিন্ন-জামা আর পাজামা। তার পদ-শব্দে চড়াইয়ের ঝাঁক উড়ে পালালো ভয়ে ভয়ে।

—চৌধুরাণী!

কটেজের দালানের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলেন ডাঃ সান্যাল।

সুচরিতা মুখে কিছু বললেন না। সাড়া দিলেন না। হাসি হাসি মুখ তুললেন। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ তুললেন। ম্যাক্স-ফ্যাক্টরের কালো পেন্সিলের স্পর্শমাখা চোখ। ডাক্তারের চোখে চোখ রাখলেন।

ডাঃ সান্যাল বললেন, ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে চাপা-কণ্ঠে বললেন,—আমাদের কাহিনী কেউ জানবে না এ পৃথিবীতে। কেউ লিখবে না তা নিয়ে গল্প উপন্যাস।

—কি কাহিনী? কার কাহিনী?

নকল গম্ভীর সুরে বললেন সুচরিতা। মুখের হাসি লুকিয়ে। এক চোখ বন্ধ করলেন ডাঃ সান্যাল। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন নিজের। আরও স্তিমিত-কণ্ঠে বললেন,—তোমার আমার কাহিনী।

ঘুম-ভাঙা ফোলা-চোখ বড় করলেন সুচরিতা। নকল রাগের দৃষ্টি ফুটলো চোখে। পিঠের 'পরে লুটিয়ে ছিল রুক্ষ চুলের ভারী খোঁপা। দু'হাত পেছনে তুলে এলোখোঁপাটি ঠিকঠাক করতে করতে বললেন,—ডক্টর, ডোণ্ট বি কেয়ারলেস! ইভেন দি ওয়ালস্ হ্যাভ ইয়ারস!

বেতের চেয়ার আর চারপেয়ে টেবিল। সবুজ রঙের। একটা চেয়ার হাতের এক আঙুলে টেনে নিয়ে অতিথির কাছাকাছি বসলেন ডাঃ সান্যাল। ফিসফিসিয়ে বললেন,—ফরগেট মি নট চৌধুরাণী।

—খুব হয়েছে। থাক, চুপ করো।

ডাঃ সান্যাল সেণ্টিমেণ্ট চাপতে পারেন না হয়তো। কথা থামলো না তাঁর। এলিস্ পড়েছেন, ফ্রয়েড পড়েছেন, তবুও বলে চললেন,—আমি শুধু ভেবে পাই না, তোমাতে আমাতে যোগাযোগ কোথা থেকে সম্ভব হয়েছে! আমার বয়স তো তোমার চেয়ে অনেক বেশী। তুমিতো ফুল অব্ ইউথ্ আর আমি একটা উইডোয়ার!

থাক আর অত ভাবতে হবে না। সরে যাও একটু, সরিয়ে নাও চেয়ারটা। এখুনি আবার তোমার স্যামুয়েল আসবে। লোকটা যেন একটা আস্ত গণ্ডার!

—দ্যাটস রাইট্।

ডাঃ সান্যাল চেয়ার সরিয়ে নিয়ে বললেন।

কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই সত্যিই এসে হাজির হয় মূর্তিমান স্যামুয়েল। ঝড়ের দিনের পাখীর বাসার মত আকৃতি যেন তার। তৈলহীন ময়লা চুলের রাশি মাথায়; ছিন্ন পোষাক; ঘোলাটে চোখে পাশব চাউনি যেন।

চায়ের সরঞ্জামের ট্রে টেবিলের 'পর নামিয়ে দিয়ে চলে গেল স্যামুয়েল। ধমকানি নয়, ধমকের সুর শুনে কি না কে জানে, মুখ তার গম্ভীর। ব্রণবহুল মুখে যেন কাঠিন্য। একবার শুধু তেরিয়ে দেখে যায় মিসেস চৌধুরীকে। দাঁড়িয়ে থাকলে বেশ দেখা যায় যে বসে থাকে, তাকে। স্যামুয়েল দেখেছে সুচরিতার অতি-স্ফীত দেহরেখা। ফর্সা বুকের 'পরে জেড্ পাথরের নেকলেসটা দেখে হয়তো।

—চৌধুরাণী, চল' আজ ইভনিং শোয়ে 'নাইটস্ অব দি রাউণ্ড টেবল' দেখে আসি। এভা গার্ডনার আছে। আই লাইক হার মাচ্। তারপর শো দেখে প্রিন্সেস কিম্বা শেরাজেডে রাতের খাওয়া সেরে ফেরা যাবে।

ডাঃ সান্যাল বললেন ফিস ফিস। কেৎলী থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে। হেসে হেসে।

অন্যদিকে তাকিয়ে হাসি চেপে সুচরিতা বললেন,—আপত্তি নেই। বাট্ আই মাস্ট্ স্ট্যাণ্ড ট্রিট। আজ আমার পালা। তুমিই শুধু খরচা করবে না কি!

—ও নো নো, নট অ্যাট অল।

ঘোর আপত্তির সুরে বলেন ডাঃ সান্যাল। বলেন,—লৌকিকতা বস্তুটিকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

—আমার বেলায় লৌকিকতা? ব্যথায় কাতর চোখ তুললেন সুচরিতা।

—হ্যাঁ, তোমার বেলায় তাই।

বলতে বলতে ডাঃ সান্যাল মিসেস চৌধুরীর চিবুক ধ'রে মৃদু নাড়া দিলেন।

—সার!

স্যামুয়েলের ভাঙা-কাঁসর কণ্ঠে দু'জনেই চমকে উঠলেন। স্যামুয়েল কিছু দূরে দাঁড়িয়ে বললে,— সাম জেণ্টলমেন ফ্রম হুগলী। ওয়াণ্ট টু মীট ইউ।

—কামিং। বললেন ডাক্তার। বললেন,—আচ্ছা জ্বালা হয়। সুচরিতাকে বললেন,—চৌধুরাণী, ওয়েট এ মিনিট, লোকগুলোকে আমি ভাগিয়ে দিয়ে আসি। ভাল লাগে না আর। সব সময়ে ভাল লাগে অ্যাণ্টিভেনম্ আর অ্যাণ্টিভেনম্! জ্বালিয়ে মারলে আমাকে।

ডাঃ সান্যাল আঙিনায় বেরিয়ে দেখলেন, এক আধ জন নয়, প্রায় জন পাঁচ ছয়। উগ্রমূর্তি যেন সকলের। ডাক্তার বললেন,—কি বলতে চান বলুন।

—আসছি স্যর বহু দূর থেকে। সেই হুগলীর সাতগাঁ থেকে। চিনতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ, চেনা চেনা মনে হচ্ছে তো। কি বক্তব্য তাই বলুন?

—সেদিন বললেন কেউটের বিষ থেকেও আপনার ওষুধে বেঁচে যাওয়া যায়, মনে আছে।

—হাঁ মনে আছে। কি হয়েছে কি?

স্যর আমাদের গাঁয়ের দু'জনকে আবার কেউটেয় কেটেছিল, আপনার অ্যাণ্টিভেনমে বাঁচলো না কেউ। অথচ আমরা আপনার ওষুধ ছাড়া আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারি না। এদ্দিন কতজনা বেঁচে গেছে আপনার ইনজেক-শনে।

—ওষুধ দিতে দেরী করেননি তো? ইমজেকশন ঠিক সময়ে দিয়েছিলেন?

—ডাক্তার আসতে যা দেরী হয়েছিল সার। ডাক্তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাকা হয়।

—একটা সাপ দেখতে পেলে বলতে পারতাম। বললেন ডাঃ সান্যাল।

—এনেছি সার একটাকে কোন রকমে।

—দেখি দেখি। বললেন ডাঃ সান্যাল। সাগ্রহে।

একজন গ্রামবাসীর হাতে একটি হাঁড়ি। সরায় ঢাকা। ডাঃ সান্যাল এগিয়ে যেতে সরা ঈষৎ ফাঁক করে দেখালো।

—দেখি দেখি।

মিসেস চৌধুরীও আর একা একা বসে থাকতে না পেরে উঠে এসেছেন। বললেন,—আমাকে একবার দেখান তো।

হাঁড়ির আবরণ সরানোই ছিল। সুচরিতাও দেখলেন। দেখে যেন শিউরে উঠলেন।

ডাঃ সান্যাল হেসে হেসে বললেন,—এঃ, এই আপনাদের কেউটে? [illegible] সুর যেন ডাক্তারের। বললেন—এর কোন পুরুষে কখনও কেউটে ছিল না। কেউটে কখনও এত ছোট হয় না। এ আপনাদের চিতি [illegible] হবে। এ সাপের তো বিষই নেই।

—আমরা তো সার, কেউটেই বলি।

—আপনারা সাপ দেখলেই বলেন কেউটে। এ আমার [illegible] সকলেই চেনে না [illegible]

—আমরা সার [illegible] জানি না। তবে কিং নেই কি বলছেন আপনি? আপনি দেখছি একেও [illegible] দেশের সাপ চিনতে পারলেন না।

—পরীক্ষা করতে চান আপনারা? [illegible] সকালে এসে সাপ চেনাতে এসেছেন [illegible] আজ দশ পনেরো বছর ধরে আমি এই কাজ করছি! বলছি এ সাপের বিষ [illegible] না!

ডাঃ সান্যাল কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিরক্তির কুঞ্চনরেখা ফুটে ওঠে মুখাকৃতিতে।

—পরীক্ষা হয়ে যাক সার। আমাদের যদি ভুল হয়ে থাকে তো সেটার একটা প্রমাণ হয়ে যাক। আপনিও সার ভুল করতে পারেন, তাই আমরা বলছি।

—স্যামুয়েল! স্যামুয়েল!

হঠাৎ যেন গর্জন শুরু করলেন ডাঃ সান্যাল।

স্যামুয়েল দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক শুনে ছুটতে ছুটতে এলো।

ডাক্তার বললেন,—সিরাম আউর সিরিঞ্জ তৈয়ার রেখো। টেন সি সি আউর টেন সি সি।

স্যামুয়েল ল্যাবরেটরীতে ছুটলো। সার্কাসের খেলোয়াড়দের সঙ্গে যেমন থাকে জোকার, ডাক্তারের সঙ্গে তেমনি সহকারী। জোকার সব খেলা জানে। সহকারীও জানে সিরিঞ্জ ফুঁড়তে, ছুরি চালাতে।

—আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। ঐ সাপটাকেও আনুন।

হুগলীর গ্রামবাসীরা ডাক্তারের পিছু পিছু যায়। সুচরিতাও ধীরে ধীরে যান সকলের শেষে।

ল্যাবরেটরীতে ঢুকে একটি আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে বসে পড়লেন ডাঃ সান্যাল। হাতের আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন,—স্যামুয়েল, কাম হিয়ার। ইনজেক্ট টেন সি সি।

ডাক্তার নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্যামুয়েল ওষুধ ভর্তি সিরিঞ্জ ধরে ঝুঁকে পড়লো। পরম উল্লাসে ডাক্তারের ডান হাতের পেশীতে খুঁজে খুঁজে কি এক শিরায় ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলো। মুখখানা একবার বিকৃত করলেন ডাঃ সান্যাল। স্যামুয়েল সিরিঞ্জের পাম্প টিপে থাকে। বড় ধীরে ধীরে অ্যান্টিভেনম ভেতরে সিঁদোয়।

সিরিঞ্জ টেনে নিতেই ডাক্তার বললেন,—আফটার বাইটিং এনাদার টেন সি সি।

অল রাইট স্যর।

—আপনারা কেউ একজন হাঁড়ীর মুখ খুলে ধরুন আমার এই হাতের কাছে।

—ডক্টর! করছেন কি আপনি! উইল ইউ ডাই?

এতক্ষণে বুঝতে পেরে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন মিসেস চৌধুরী।

—চৌধুরাণী, ভয় পাও কেন তুমি? ও সাপের বিষ ফিষ কিছু নেই। ডোণ্ট বি নার্ভাস।

ডাঃ সান্যাল বললেন তাচ্ছিল্যের সুরে। বললেন,—কৈ মশাই, সাপ কৈ আপনাদের?

—এই যে সার।

—আনুন, আনুন শীঘ্র। মেক হেস্ট। ইনজেকশন আগেই যে পড়ে গেছে। স্যামুয়েল এনাদার টেন সি সি, জাস্ট আফটার বাইটিং।

—অল রাইট স্যর।

স্যামুয়েলের হাতে তৈরী সিরিঞ্জ। টেন সি সি টলমল করছে।

গ্রামবাসীদের একজন হাঁড়ি এগিয়ে নিয়ে যায় [illegible]। ডাক্তারের হাতের কাছে ধরে। সরা সরিয়ে নেয়।

মুখখানা আর একবার বিকৃত হয়ে ওঠে ডাক্তারের। ছোবল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। স্যামুয়েলও ঝুঁকে পড়ে তখনই। এবার ছুঁচ চালায় হাতের যেখানে দুটি দংশন চিহ্ন, সেখানে।

হাসি হাসি মুখে ডাক্তার তাকাতে চেষ্টা করেন সুচরিতার মুখে চোখ রেখে, কিন্তু যেন পারলেন না। অসহ্য এক জ্বালায় হাতখানি আর সোজা থাকে না, নুইয়ে পড়ে। ডাক্তারের মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছে। চোখে যেন চিত্রাপর্ণ চাউনি ফুটেছে। কপালটা ঘেমে উঠেছে বেশ।

—ডক্টর!

ডাকলেন মিসেস চৌধুরী।

মুখ আবার বিকৃত করলেন ডাঃ সান্যাল। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে যেন। চোখ বন্ধ করে আবার চোখ মেললেন। স্যামুয়েল ক্ষতস্থানে ওষুধ ঢাললো ক' ফোঁটা।

ডাক্তার যেন কি বলতে চান, অথচ বলতে পারেন না। ওষুধ গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। দু'ফোঁটা রক্ত ফুটলো দংশনচিহ্নে। কেমন যেন ঘড়ঘড় ধ্বনি শোনা যায় ডাক্তারের কণ্ঠে। বমনের উদ্রেক হয় হয়তো। নিমীলিত চোখ সম্পূর্ণ মুদিত এখন। ডাক্তারের মাথা ঝুলে পড়েছে পাশে। অসম্ভব ঘামছেন তিনি।

পুলিস আসবে এখুনি, তাই গ্রামবাসীরা একে একে বেরিয়ে গেল এভারগ্রীন কটেজ থেকে। পুলিস আসবে এজাহার দিতে হবে। এখন শুধু মিসেস চৌধুরী আর স্যামুয়েল
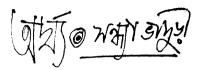
হে ধরণী একবার চেয়ে দেখ শুধু একবার!
আঁধার আকাশতলে জ্বলে দীপ শুকতারকার,
আর কোথা আলো নাই, আজি মোর শেষ রজনীর
মিলনের ক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে হতেছে অধীর
ব্যাকুল আগ্রহভরে। রহস্যের সরায়ে গুণ্ঠন,
ভরে নিতে দাও আজ হে ধরণী তৃষিত নয়ন
তোমার আনন পরে। একবার শুভ দৃষ্টিপাত
কর তুমি, তারপর রাত্রিশেষে নূতন প্রভাত
দেখা দিবে আকাশের পূর্ব তটে, দীপ যাবে সরে,
অনির্দেশকূলসীমা ঝাঁপ দিব তিমির সাগরে।
আজি মোর অসমাপ্ত পলাশের অরুণ উৎসব
সমাপ্তি লভিবে শোন, হৃদয়ের অনুরাগ সব;
জীবনের যত রঙ, যত গন্ধ, মুকুলিত আশা,
প্রথম দিনের সেই সবিস্ময় নব ভালবাসা
উতলা ব্যাকুল বায়ে; তারপর রচিবে তোমার
নূতন অর্ঘ্যের থালি শুচিশুভ্র বেলা যূথিকার
নির্মল সরোজমালা; সদ্যস্নাতা শিশিরধারায়
বহিয়া অপূর্ব তনু সঞ্চারিয়া বনের ছায়ায়
দাঁড়াবে আকাশতলে। আমি শেষ চৈত্রের দিবস
মিশাই সে অর্ঘ্যে মোর শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ,
রূপ রস।

ল্যাবরেটরীতে। ডাঃ সান্যাল তো হতচেতন। স্যামুয়েল দেখে মনের সুখে দেখে মিসেস চৌধুরীকে। পুলিস আসবে এখুনি, সুচরিতাও চোখের জল মুছতে মুছতে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আঙিনায় বেরিয়ে জোরে পা চালালেন। তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে যেন থরথর।

স্যামুয়েল বিষজর্জর মনিবের শব আগলে বসেছিল। পুলিস এসে তাকেই গ্রেপ্তার করেছিল। কোন কথা বলতে দেয়নি পুলিশ। বলেছিল, যা বলতে হয় আদালতে বলবে।

স্যামুয়েল উঠেছিল কালো-রঙ প্রিজন-ভ্যানে। আর ডাঃ সান্যাল গেলেন পোস্ট মর্টামে, শেষ পরীক্ষা দিতে হবে তাই।

মিসেস চৌধুরী মানশানের অনেক উঁচু থেকে, নিজের ফ্ল্যাটের এক জানালা থেকে শুধু দেখেছেন এই শেষ যাত্রা। রুদ্ধশ্বাসে দেখেছেন। তারপর ঘরের টেবিলে ফিরে গিয়ে চিঠি লিখতে বসেছেন কম্পমান বক্ষে। কাল এয়ার মেলে চিঠি এসেছে কোপেনহেগেন থেকে। মিস্টার চৌধুরী লিখেছেন। উত্তর লিখতে বসেছেন সুচরিতা।

কিন্তু মিসেস চৌধুরীর কানে যেন যখন তখন এক চেনা চেনা ডাক ফিস ফিস করে। চৌধুরাণী!

বুকের ভেতর গুমরে গুমরে ওঠে সুচরিতার। রাইটিং প্যাড আর কলম রেখে উঠে পড়েন। ড্রেসিং টেবলের ওপর থেকে কি এক সুগন্ধির শিশি উপুড় করে দেন নিজের মাথায়। পুরোপুরি জোশনের শিশি।

ডিভোর্স

(১৫৯ পৃষ্ঠার পর)

বিছানা বালিশ রোদে দেওয়াচ্ছিলেন, সব যেন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছিল।

অপর সকলে তাঁর আগেই গিয়ে প্রাতরাশ আরম্ভ করেছে। ভবনাথ সাবিত্রীকে দেখে প্রশ্ন করলেন—তুমি কাল রাত্তিরে কোথায় শুয়েছিলে? ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে কোথাও দেখতে পেলাম না? ভাবলাম, হয়ত আজ তাড়াতাড়ি উঠে গেছ।

কোনও উত্তর না দিয়ে সাবিত্রী নিঃশব্দে চা ঢালতে লাগলেন। স্মিতাও কথা কইল না তার মুখখানা থমথম করছে। সমীরই গত রাত্রের বৃত্তান্ত বাবাকে জানাল, বলল—মা, আমি, দুজনে এত করে ডাকলাম, কিন্তু স্মিতার এত জেদ যে কিছুতেই এল না, উলটে আমাদের নাকের সামনে দরজা বন্ধ করে দিলে।

দেখ দাদা, ঘুমের সময়ে বিরক্ত করলে কারুরই ভালো লাগে না। ফোন এসেছিল ত হয়েছিল কী? তোমরা ত ধরেছিলে? আমি গিয়ে কী করতাম?

তুমি খুব জানো, স্মিতা, রণেন আমাদের ফোন করেনি, করেছিল তোমাকেই। তুমি ফোন ধরলে না বলে সে ছেড়ে দিলে।

দিয়েছে ত দিয়েছে! তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ...মা, তুমি দাদার ঐ সব পাগলামি না শুনে আগে চা দাও দেখি? এলে ত দেরি করে! এতক্ষণ ধরে চা পাচ্ছিলাম না।

সাবিত্রী তখনও কিছু বললেন না, চা তৈরি করে নিঃশব্দে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। স্নান করে ভিজা চুল পিঠে ফেলেই তিনি এসেছেন। ভবনাথ তাঁকে বললেন—হ্যাঁগো, এই বর্ষাকালে সকাল বেলাই স্নান করলে? দেরিতে করলে কী হ'ত? অসুখ হ'লে কিন্তু আমি দেখতে পারব না!

বেশ, তোমায় দেখতে হবে না! এতখানি বয়স হ'ল, কবে তুমি আমার শিয়রে বসে রোগের সেবা করেছ? কই, আমার ত মনে পড়ে না!

তা বলবে না? ...যাকগে, আমায় আর এক কাপ চা দাও ত? ...সমু, তুমি হাঁচ্ছ কেন? সর্দি হ'ল নাকি?

পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক মুছতে মুছতে সমীর বলল—কাল অফিস যেতে রাস্তায় ভিজতে হয়েছিল, তাই হয়ত সর্দি আসছে।

স্মিতা বলে উঠল—কেন দাদা, একদিন ট্যাক্সি করে গেলে কী হ'ত? গাড়ী খারাপ হ'লে ট্যাক্সি করো না? তা ত নয়, আমি জানি, আমি গাড়ী নিয়েছিলাম বলেই তোমার রাগ!

ভবনাথ গম্ভীরস্বরে বললেন—নিয়েই বা গিয়েছিলে কেন? হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, কাল সকালে তোমার মা ডেকে তোমাকে পেলেন না, শুনলাম, গাড়ী নিয়ে একাই বেরিয়ে গেছলে?

গেছলামই ত? কিন্তু জানো বাপি, অজয় এমন ছোটলোক, পরামর্শ চাইতে গেলাম, পরামর্শ ত দিলেই না, উলটে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে! ভেবেছে, ও-ছাড়া আর ব্যারিস্টার নেই। এত বড় স্পর্ধা, আমায় বললে কি না, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, লুম্বিনীতে গিয়ে ভর্তি হও গে!'

কিসের পরামর্শ করতে অজয়ের কাছে গেছলে?

এই, একটু প্রাইভেট বিষয়ে। সে সব আমি এখন তোমায় জানাতে চাই না।

আমার কাছে ত প্রাইভেট, কিন্তু সেটার প্রাইভেসি রাখতে পেরেছ? তোমার মার কাছে শুনলাম, তুমি না কি—

চোখ পাকিয়ে হাত নেড়ে মার দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে স্মিতা বলল,—মা, তুমি বুঝি লাগিয়েছ? কেন, দেরি সইল না? তুমি বুঝি মনে করেছ ঐ সব শুনলে বাপি আমার ওপর রাগ করবে? তা কিন্তু নয়। আমি বাপিকে খুব চিনি। আমি যদি ইচ্ছে করে মুসলমান হই, আইনের সাহায্যে যদি বিয়ে ভেঙে দিই, তাতে কার কী বলবার আছে?

ভবনাথ রূঢ়কণ্ঠে বললেন—তার মানে? তুমি ভেবেছ কী, স্মিতা? তোমার এ খেয়াল আমি কখনও সমর্থন করব না। কালই তোমায় বম্বে ফিরে যেতে হবে, যাকে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছ, তার ঘরই করতে হবে।

এ কিন্তু তোমার অন্যায়, বাপি! যার সঙ্গে আমার বনছে না, দিনরাত খিটিমিটি হচ্ছে, বিয়ে করেছি বলেই তার ঘর করতে হবে? স্রেফ বলে দিচ্ছি, তা আমি পারব না। বম্বে আমি কিছুতেই যাব না।

বেশ, তা হলে আমার বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না। তোমার যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারো।

আচ্ছা, তাই হবে। আমায় সাত দিন সময় দাও, আমি তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

মায়ের দিকে, দাদার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চাইতে চাইতে স্মিতা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে খাবার টেবিলের উপর সজোরে ঘুষি মারল। বাসনকোসন ঝনঝন করে উঠল, দুএকটা কাটা চামচ ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়ল। মেয়ের মেজাজ দেখে ভবনাথ স্তম্ভিত হলেন, ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—সমু, আজই দুখানা প্লেনের টিকিট কিনে আনো। ওকে আমি নিজেই নিয়ে গিয়ে বম্বেতে রেখে আসব।

স্মিতা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল—হ্যাঁ, রোখ একেই ব'লে! আমি যাব না। কী করবে তোমরা? কচি মেয়ে নই যে তোমার কথা শুনে চলতে হবে। সাত দিন কেন, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। এখনই হোটেলে ঘর ঠিক করতে চললাম। তোমরা সব শয়তান!

কাঁদতে কাঁদতে স্মিতা উপরে চলে গেল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে ভবনাথ বললেন—ওর স্বভাব এমন হ'ল কী করে? তুমি যার মা, তার এমন হয়? আমার ত ধারণাই ছিল না!

ধারণা তোমার অনেক কিছুরই নেই! যদি থাকত, তা হ'লে কি স্মিতা এমন হ'তে পারত? তোমাদের যা ইচ্ছে হয় করো, আমি আর কোনও কিছুতে নেই।

* * *

পরের দিন রবিবার। বেলা প্রায় দুটো বাজে। ভবনাথ আর সাবিত্রী দুজনে মাথ দুজে চুপ করে বসে আছেন। স্মিতা রাগ করে সকাল থেকে একরকম না খেয়েই আছে। সাবিত্রীও তাই উপবাসী। তাঁরই হয়েছে যত জ্বালা। মেয়ের দুঃসাহসের সীমা নেই, সত্যিই হয়ত কাল হোটেলে উঠে যাবে। এদিকে সমীর প্লেনের টিকিট পায়নি। চিন্তায় চিন্তায় সাবিত্রীর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ভবনাথও আজ স্ত্রীর কাছে যেন কুণ্ঠিত। এত দিন ধরে মেয়েকে যে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, তার ফল আজ মর্মে মর্মে বুঝছেন।

হঠাৎ সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ আর সেই সঙ্গে ছোট ছেলের গলা শুনে সাবিত্রী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সামনেই আয়ার হাত ধরে মণ্টু দাঁড়িয়ে, তার পিছনে রণেন। দেখেই সাবিত্রী কেঁদে ফেললেন, মণ্টুকে দুহাত দিয়ে কোলে নিয়ে চেপে ধরলেন। টপ টপ করে তাঁর গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। মণ্টু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল—দিদু, তুমি কাঁদছ কেন? আয়া বুঝি চকোলেট দেয় নি? আমি তোমায় দোব। ...দিদু, আমার মা কোথায়, মামি? মেমছায়েব, মেমছায়েব,—

সাবিত্রীকে প্রণাম করে রণেন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। সাবিত্রীর সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি বললেন—উনি বারান্দায় বসে আছেন। আমি একে এর মার ঘরে দিয়ে আসছি।

স্মিতার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। সামনে মেঝের উপর সুটকেস, হালকা বেডিং রয়েছে। দুধ খাবার, খাটের পাশে টেবলের উপর তেমনি পড়ে আছে। স্মিতা পিছন ফিরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সাবিত্রীর কোল থেকে তাড়াতাড়ি নেমে মণ্টু বিছানায় গিয়ে মার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বলে উঠল—মা, মা, আমি তোমার জন্যে এত এত কেঁদেছি।

স্মিতা উঠে বসে ছেলের দিকে অবাক হয়ে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে রণেন এসে ঘরে ঢুকল। সাবিত্রী সেখান থেকে সরে গেলেন।

* * *

রাত্রে খাবার আগে স্মিতা আর রণেন গিয়ে সাবিত্রী ও ভবনাথের পাশে বসল। আড় চোখে সাবিত্রী চেয়ে দেখলেন, তাদের দুজনেরই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, যদিও চোখগুলি ফুলো-ফুলো। অনেক বর্ষণের পর বোধ হয় রোদ উঠেছে।

স্মিতা বলল—বাপি, মা, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। আমি রণেনের সঙ্গে পরশু বম্বে ফিরে যাব। ওকে তোমরা বলে দিও, মিছি-মিছি আমায় যেন আর রাগায় না। আমি যে সব জিনিষ ভালবাসি না, কেন তাই করে? এবার কিন্তু ও বলেছে, প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আর করবে না।

বিজয়িনীর দৃষ্টিতে হাসিমুখে স্মিতা স্বামীর দিকে চাইল।

———

মা গো জাগো

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাঃ

বুঝতে পেরেছি নকল ইদুঁর

মদন দত্ত

দেনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এবং কী পরিতাপ—বাড়ীতে একটা রেডিয়ো নেই!

স্বামী তখন এক টাকার বাজার এনে নামিয়েছেন ঘরের দাওয়ায়। তিন ছটাক মাছ, প্রায় স্বচ্ছ একটি লাউয়ের ফালি, এক পোয়া আলু আর বাজারের বাইরে থেকে সস্তায় কেনা গোটাকয়েক অসুস্থ চেহারার বেগুন। উদ্বৃত্ত তিন পয়সায় কেনা বিড়ি থেকে একটা সবে ঠোঁটে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় স্ত্রীর আক্রমণে হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এমন অদ্ভুত নিরীহ চোখ মেলে চেয়ে রইলেন যে মনে হল হিব্রু ভাষা শুনছেন!

—এখন? এখন কী? উত্তেজিত ভাষায় কার্তিকা জিজ্ঞেস করলেন: কী হবে এবার?

—কিসের কী হবে? শিবদাসবাবু তখনো বিস্ময়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন: ব্যাপারটা কী?

কার্তিকা এবার গলা তুললেন। দোতলার অহংকারে মট্ মট্ করা মোটা গিন্নীকে শোনাবার মতো করে স্বরগ্রাম ওপরে তুলে দিয়ে বললেন, উমা রেডিয়োতে প্রোগ্রাম পেয়েছে।

—অ্যাঁ!—পঁচানব্বুই টাকা মাইনে আর পঁচিশ টাকা ডি-এর শিবদাসবাবু এমন একটা ধ্বনি তুললেন যে, সেটা আতঙ্ক না উল্লাস ভালো করে বোঝা গেল না।

—এই দ্যাখো।—সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী নামাঙ্কিত এবং সার্ভিস লেখা স্ট্যাম্প আঁটা মেটে রঙের খামখানা কার্তিকা এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। আবার দোতলার মোটা গিন্নীর কানে মধু বৃষ্টি করে চড়া পর্দায় জানালেন: বারোই এপ্রিল। বেলা দুটোর সময়। পনেরো মিনিটের প্রোগ্রাম—পনেরো টাকা পাবে।

রাত দুটোর সময় হঠাৎ একখানা অনিশ্চিত এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম এলে যে আতঙ্ক আর উত্তেজনা নিয়ে মানুষ খাম ছেঁড়ে, তেমনি ভাবেই কাঁপা হাতে ছাপানো ফর্মের ওপর টাইপ করা চিঠিখানা খুললেন শিবদাস। বাঁ হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক করে নিলেন। তারপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার।

না কোনো ভুল নেই। উমা দত্ত, কেয়ার অব্ শিবদাস দত্ত, সাতের পাঁচ পটলডাঙা লেন, কলকাতা-নয়। আর কেউ নয়—আর কেউ হতেই পারে না।

হঠাৎ যেন চোখদুটো কেমন ঝাপসা হয়ে যেতে চাইল শিবদাসের।

উমা? উমা কই?

উমা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পাশেই। সুখে আর আনন্দে তার পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেমন একটা লজ্জাও হচ্ছে এখন—পা জড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

শিবদাস আবার ডাকলেন: উমা—উমা কোথায়?

উমা বেরিয়ে এল এবার। কালো রোগা চেহারার মেয়ে—বিয়ের বাজারে যারা প্রথম দৃষ্টিতেই বাতিল হয়ে যায়। সামনে এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে।

শিবদাস কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যিই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছে। কাল সন্ধ্যেবেলাতেই কুড়ি বছরের এই কুলক্ষণা অনূঢ়া মেয়েটির মৃত্যু কামনা করছিলেন শিবদাস। মাত্র সাড়ে সাত টাকা দিয়ে মাসের শেষ পাঁচদিন কী করে চালাবেন, তার সূক্ষ্ম হিসেব করতে বসে উমার গলা সাধবার উৎপাতে হিংস্র হয়ে ভাবছিলেন এক আছাড়ে ওর তানপুরাটা ভেঙে দেবেন কিনা। কিন্তু এখন—

অনুতাপের একটা বোবা বেদনা শিবদাসের বুকের ভেতরে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। আশ্চর্য সুন্দরী মনে হল এই শীর্ণদেহিনী কুরূপা মেয়েটিকে। কালো? যদি দুখানা ভালো সাবানও কোনোদিন কিনে দিতে পারতেন তা হলে এই কালো থেকেই আলো ঠিকরে বেরুত। যদি পেট ভরে এক মুঠো খেতে দিতে পারতেন, তা হলে এই কালো মেয়েই ফুটে উঠত কৃষ্ণকলির মতো।

চোখে জল আসছে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন শিবদাস। ধরা গলায় বললেন, দে—দে, শীগ্গির ডুপ্লিকেটটা সই করে দে। আমি এক্ষুণি রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে আসি।

উমা মৃদুভাবে বললে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবা, সাতদিনের মধ্যে পাঠালেই তো—

—না—না, পোস্ট অফিসকে বিশ্বাস নেই—শিবদাস প্রগল্ভ হয়ে উঠলেন: ওরা বনগাঁর চিঠি বক্সেতে নিয়ে গিয়ে ডেলিভারি দেয়। দে শিগ্গির সই করে—আমি এখুনি রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠিয়ে দিয়ে আসছি। আর বসন্তকেও খবরটা দিয়ে আসি ওই সঙ্গে।

উমা চিঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। হাতের সইটা কেমন আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার। ডুপ্লিকেটটা ছিঁড়ে দিতেও মায়া লাগছে—মনে হচ্ছে কেমন অঙ্গহানি হয়ে যাবে এমন সুন্দর চিঠিটার।

আর—আর বসন্ত দা। সবাই যখন ঠাট্টা করত, যখন পাড়ার তিন চারটে ছেলে শুনিয়ে শুনিয়ে তার গানকে ভ্যাংচাত, তার ওপর মা-র অসীম শিবদাসও মধ্যে মধ্যে টলে উঠত যখন, তখন শুধু বসন্তদাই হাল ছাড়ত না। বলত, হবে—নিশ্চয় হবে তোমার। গান গলায় তোমার আছেই, কেবল তাকে আর একটু পথ করে দিতে হবে, সুরের ভেতর আরো একটু খেলতে দিতে হবে। নাও—ধরো তানপুরো। হ্যাঁ—খেয়াল আছে তো? এটা ঝাঁপতাল—

এক টুকরো চিঠিও লিখে দিলে কেমন হয় বসন্তদাকে? ছোট্ট একটুখানি চিঠি?

কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। বাইরে থেকে শিবদাসের হাঁক এল: কইরে—এত দেরি হচ্ছে কেন? আমার যে আবার ওদিকে অফিসের বেলা হয়ে যাবে?

বসন্তদাকে চিঠি আর লেখা হল না।

শিবদাস বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। আর দোতলার মোটা গিন্নীকে শুনিয়ে শুনিয়ে কার্তিকা বলে চললেন, মেয়েটা রেডিয়োতে গান গাইবে—আর বাড়ীতে একটা রেডিয়ো নেই। কতবার বলেছি কেনো—কেনো একটা,

তা এমন হাড়কেপ্পন—কিছুতেই কিনলে না।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কুঁকড়ে গেল উমা। মা যে কখনো বাবাকে রেডিয়ো কিনতে বলেছিলেন এবং একশো ত্রিশ টাকা রোজগারের বাবা ইচ্ছে করলেই যে একটা রেডিয়ো কিনতে পারেন, এমন আশ্চর্য খবর উমা এই প্রথম শুনল।

—আঃ, চুপ করো মা—

বাজারের তরকারী ঝাঁকায় তুলতে তুলতে লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন : কেন চুপ করব? রেডিয়ো থাকলে কি আর ভাবনা ছিল? নিজের মেয়ের গান ঘরে বসেই শুনতে পেতাম। তা না-ই রইল। যারা রাতদিন বসে বসে রেডিয়ো বাজায়—তাদের কজনের মেয়েই বা প্রোগ্রাম পায় শুনি?

শেষের শব্দভেদী বাণটা দোতলার মোটা গিন্নির উদ্দেশ্যেই। কিন্তু ও পক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মোটা গিন্নির নিশ্চয়ই মাথা ধরেছে এতক্ষণে এবং কপালে অডিকলোনের পটি লাগিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।

বসন্ত এল বিকেল বেলাতেই। এক মুখ প্রসন্ন হাসি হেসে বললে, ভারী খুশি হয়েছি উমা।

উমা পায়ের ধুলো নিলে বসন্তের : সব আপনার জন্যেই বসন্ত দা।

—আমার জন্যে? না—না।—বসন্তের মুখে হাসিটা লেগেই রইল : তোমার নিজের ভেতরেই শক্তি ছিল। আজ হোক কাল হোক তোমার যা পাওনা, সে তুমি পেতেই।

উমা বসন্তের দিকে তাকালো। সে নিজে কুরূপা—কিন্তু তার চাইতেও কুৎসিত আর কদাকার বসন্তের চেহারা। একটা চোখ একেবারে সাদা—সে চোখে সে দেখতে পায় না। বাঁ গালটা কি করে পুড়ে গিয়েছিল, খানিক চামড়া তাল পাকানো কাগজের ভাঁজের মতো কুঁচকে আছে সেখানে। দু হাতের অস্থিসার আঙুলগুলো সব সময়েই অল্প অল্প কাঁপে—কোনো স্নায়বিক ব্যাধি আছে নিশ্চয়।

তবু তার আজকের এই সৌভাগ্য বসন্তের জন্যেই। বসন্তই তার গানকে জাতে তুলে দিয়েছে।

শিবদাসবাবুর বাড়ীতে বসন্ত প্রথম এসেছিল কি একটা দূরতম আত্মীয়তার সূত্রে। আর দেখেই আঁতকে উঠেছিল উমা।

—মাগো, কি বিশ্রী চেহারা লোকটার! যেন তালগাছ থেকে নেমে এসেছে!

শিবদাস বলেছিলেন, না না, ছেলেটা খুব ভালো। আর খুব বড় গাইয়ে।

গাইয়ে! সে পরিচয় পেতেও দেরি হয়নি। অদ্ভুত ভাঙা গলা—গান গাইলে মনে হয় গোঙানি। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সেদিন সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল উমা।

তারপর আস্তে আস্তে ওই কদাকার মূর্তি আর বিকৃত কণ্ঠস্বরের আড়াল সরিয়ে আর একজন বসন্ত আত্মপ্রকাশ করল। কি বিচিত্র জীবন এই মানুষটার! কবচ-কুণ্ডলের মতো অপরূপ সুরেলা গলা নিয়েই জন্মেছিল। নিজের সুরই কস্তুরী হরিণের মতো দিশেহারা করল তাকে। স্কুলের মাইনের টাকা নিয়ে উঠে পড়ল লক্ষ্ণৌয়ের গাড়ীতে—সেখান থেকে দিল্লী। বারো বছর পরে ফিরল কলকাতায়—তখন সে দস্তুর মতো ওস্তাদ।

পেছনে জোর ছিল না—তাই রেডিয়ো-রেকর্ডে সুযোগ পেলো না। সুরু করল গানের টুশন। হাওড়া থেকে বেলেঘাটা, শ্যামবাজার থেকে বালীগঞ্জ। তারও পরে মেনিনজাইটিস। একটা চোখ সাদা হয়ে গেল— গলা থেকে নিশ্চিহ্ন হল গান।

গান গেল—কিন্তু সুর রয়ে গেল। কাটা হাতে আর তুলি উঠল না—কিন্তু মনে রইল রঙের মেলা। টুশনের বাজার কেড়ে নিলে অন্তঃসারহীন সুকণ্ঠের দল। বারো বছরের সঞ্চয় নিয়ে রত্ন ভাণ্ডারের যখের মতো পড়ে রইল বসন্ত।

শুধু রাজা লেনের বস্তির ঘরে যারা তার সন্ধান রাখত—তারাই দু-চারজন এল এগিয়ে। অদ্ভুত বিকৃত গলায় বসন্ত তাদের হাতে তুলে দেয় সুরের চাবি, মণি ভাণ্ডার থেকে যা পারে তারা কুড়িয়ে নেয় দু হাতে। আর এল উমা। শুধু দূরতম আত্মীয়তার সূত্রেই নয়—উমার গানে বসন্ত জাত-শিল্পীর সন্ধান পেলো।

চার বছর ধরে ইস্পাতে বসন্ত শান দিয়েছে; শ্রান্তিহীন চেষ্টায় সোনার তারের মতো উজ্জ্বল আর মসৃণ করে দিয়েছে উমার গলা। শিবদাস বাবুর মুখ এক এক সময় বিকৃত হয়ে উঠেছে, কেবল পয়সা দিতে লাগে না বলেই সহ্য করে গেছেন কোনো মতে। কখনো কখনো লতিকা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছেন, এখন তোর ওই হা-হা-হা-হা বন্ধ কর বাপু, কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল। সকালে রেওয়াজ সুরু করলেই পাড়ার কয়েকজন রসিক ছেলে শেয়াল ডেকে উঠেছে একসঙ্গে। দোতলার মোটা গিন্নির গর্জন শোনা গেছে : আর তো এ জ্বালা সহ্য হয় না—কর্পোরেশনে একটা খবর দিলে হয়। সকাল-সন্ধে ওই মড়াকান্না শুনতে শুনতে পাড়ার কাক-চিলগুলো পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে গেল যে!

তবু উমা থামেনি—বসন্তই থামতে দেয়নি তাকে। পাড়ার ছেলেদের উৎপাতে এক-একদিন কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে উমা, বলেছে, আপনি মিথ্যেই চেষ্টা করছেন বসন্তদা—আমার কিছু হবে না। উত্তরে কদাকার মুখে সস্নেহ হাসি হেসেছে বসন্ত : তোমার যদি না হয়, তা হলে কারো হবে না উমা। অনেক তপস্যা না করলে দেবতা প্রসন্ন হন না সরস্বতীর বর পেতে গেলে তোমায় আরো কিছুদিন কষ্ট করতে হবে বই কি।

সেই তপস্যার আজ প্রথম ফল। রেডিয়োতে প্রথম প্রোগ্রাম। বসন্তেরই জিত হয়েছে আজকে

উমা তাকিয়ে রইল বসন্তের দিকে। যেমনভাবে সকলে শিবদাস আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি করে সেও যেন দেখতে পেলো ভারী সুন্দর ভারী স্নিগ্ধ বসন্তদার মুখখানা।

লতিকা ঘরে ঢুকলেন : এই যে বসন্ত, কখন এলে?—উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, শুনেছো তো খবর? দেখেছো চিঠিখানা?

উমা হাসল : চিঠি আর কি করে দেখবেন না? তুমিই তো ওটা হাতে করে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছ! লতিকা লজ্জা পেলেন, খামখানা বাড়িয়ে দিলেন বসন্তের দিকে। স্বল্প-শিক্ষিত বসন্ত ঠোঁট বিড় বিড় করে, ইংরেজী

জগদীশ গুপ্ত

সয়ে সয়ে দাদার একদিন জন্মে গেল কোপ,
লক্ষ্য করে আমায় হঠাৎ দেগে দিলেন তোপ;
"ভাগ পাবিনে আর তার যা" আনি রোজ খেটে—
"দূর হয়ে যা"—কথাগুলো ক'রলাম পকেটে।

আদেশ মতো পাকা রাস্তায় বেরিয়ে এলাম সোজা
মুখে উত্তম অহং ভাব, বিঁড়ি কানে গোজা...
হেঁটে হেঁটে ক্লান্তি এল, জ্বালা ধরলো পেটে
ক্লান্তি এবং জ্বালাটাও করলাম পকেটে।

আসছে দুপুরে—কিছু মাত্র নাহি হোয়ে ভীত—
জয়রামপুরে ইস্টিশনে হ'লাম উপনীত—
টিকিট নেই তাই গলাধাক্কা খেতে হল গেটে—
গলাধাক্কা অনায়াসে ক'রলাম পকেটে।

এল গাড়ী—উঠতে গেলাম চক্ষে দিয়ে ধুলো
উঠেছিল সে মাথায় নিয়ে গাঁটরি কতকগুলো—
মারল ঠেলা ছিটকে প'ড়লাম কপাল গেল কেটে—
যন্ত্রণা ও রক্তধারা করলাম পকেটে—।

মাটি ছেড়ে ঐ গাড়ীতেই উঠে পড়লাম ত্বরা...
পৌঁছে গেলাম; গেটে বললে,
"ওরে বেটা চোর"—
"টিকিট?" বলেই মারল চাঁটি ঘণ্টায় বা বেটে—
শব্দ এবং আঘাতগুলো করলাম পকেটে।

জ্ঞাতির বাড়ী এলাম,—তাঁরা বড়োলোকের ছেলে,—
দেখে আমায় বললেন তাঁরা চক্ষু দুটি মেলে;
শুনতে পাই তুই বেড়াস নাকি পরের চরণ চেটে
কথাগুলো পুনশ্চ করলাম পকেটে।

তাহার পরে বললেন, "এটা ভদ্রলোকের বাড়ী—
রান্না হয় রোজই, কিন্তু খাবে জোড়া হাঁড়ি
বেশী চালে ফাটবে হাঁড়ি কারণ হাঁড়ি ছোট"—
ভর্ৎসা—ভাষা হাসির ছটা করলাম পকেটে।
অতি উচ্চ শিরে
বেরিয়ে গেলাম ধীরে।

—

বানান হোঁচট খেতে খেতে কোনো মতে পড়ে ফেলল চিঠিটা। সাদা চোখটা পর্যন্ত যেন খুশিতে জ্বলে উঠল তার।

লতিকা উমার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন : সবই তোমার জন্যে বাবা। তুমি এমন করে লেগে না থাকলে কিছুতেই কিছু হত না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা তবু তোমার মুখ রেখেছে। তা একটু বোসো তুমি—আমি চা করে দিই, দুটো মিষ্টিও আনাই তোমার জন্যে।

বসন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললো, থাক থাক, আপনি বিব্রত হবেন না। আমার গ্যাস্ট্রিক গোলমাল আছে—বাজারের খাবার সহ্য হবে না। তার চাইতে উমার প্রোগ্রামটা ভালো করে হয়ে যাক—আমি এসে ওর বাবা পেট ভরে খেয়ে যাব।

—সে তো খাবেই, নিশ্চয়ই খাবে—আনন্দে প্রায় তরল হয়ে গেলেন লতিকা : তোমাকে খাইয়েই তো পারি। তোমার জন্যেই তো ও আজ দশজনের একজন হতে পেরেছে।

শারদীয় শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন
ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
EVEREADY
TRADE-MARK
"এভারেডী" টর্চ ও ব্যাটারী
প্রস্তুতকারক
NCC 619
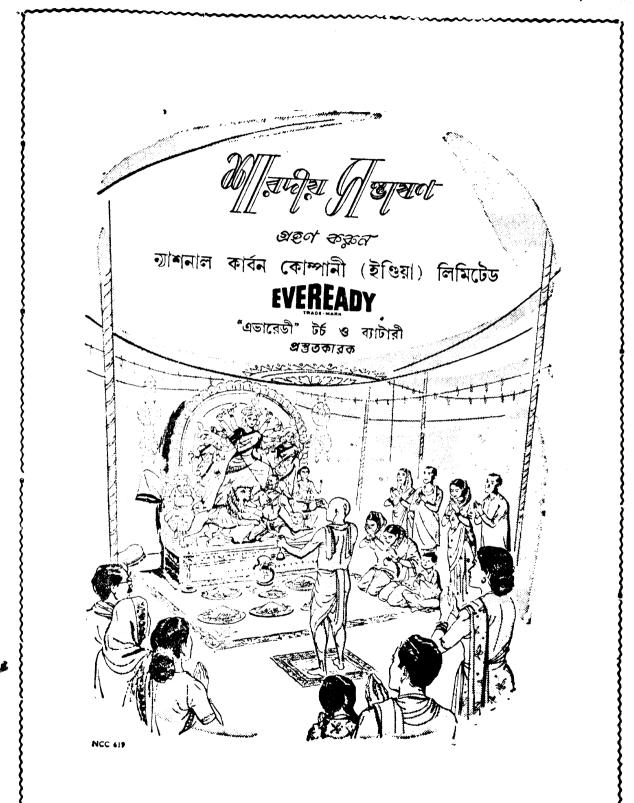
বসন্ত হাসলোঃ না মাসিমা, দশজনের একজন হতে এখনো কিছু দেরী আছে ওর। এতো সবে সুরু। এখনো অনেক খাটতে হবে—বিস্তর তপস্যা করতে হবে।

লতিকা কি বলতে চাইছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন। সকালে এক তরফা বাণ বর্ষণ করেছিলেন, এবার ও পক্ষ থেকে তীর আসতে সুরু হয়েছে।

মোটা গিন্নির কলেজে-পড়া গোলগাল মেয়ে রুনোকি সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আকাশকে কথা শোনাতে লাগলঃ ভারী তো পনেরো মিনিটের প্রোগ্রাম—তায় আবার দুপুরে! দুপুর বেলা তো ঝড়তি-পড়তি গাইয়েদের ওরা প্রোগ্রাম দেয়— পানওলা আর রাস্তার ঝাঁকা-মুটে ছাড়া সে গান কেউ তো শোনে না!

সারা দিনের পর এতক্ষণে মোটা গিন্নির দরাজ গলা গম গম করে উঠলঃ তারই চোটে তো সারাদিন কাড়া-নাকাড়া বাজছে। কাল থেকে রাস্তায় বোধ হয় পোস্টার পড়বে।

ঝগড়ার উৎসাহে লতিকার দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠল!

—শুনলে বসন্ত—নিজের কানেই তো শুনলে?—স্বরগ্রাম এক পর্দা চড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেইঃ হিংসেয় বুকের ভেতরটা একেবারে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে, তাই—

বসন্ত বাধা দিলে। শান্ত হাসি হেসে বললে, কেন ও-সবে কান দিচ্ছেন মাসিমা! ও-সব কথার উত্তর ঝগড়া করে দেওয়া যাবে না—উমা সত্যিকারের বড় গাইয়ে হয়ে তবেই ওর জবাব দেবে। আপনি আমার জন্যে চা আনবেন বলেছিলেন, নিয়ে আসুন।

আজ সেই দিন। সেই বারোই এপ্রিল।

বাড়ীতে একটা রেডিয়ো নেই সেই দুঃখে মরমে মরে যাচ্ছিলেন লতিকা। হঠাৎ কোথা থেকে বসন্ত এসে হাজির। শরীর ঘামে ভেজা, বললে লোক্যাল সেট রেডিয়ো একটা।

উমা বললে, একি বসন্তদা! এ আবার কোত্থেকে আনলেন?

কপালের ঘাম মুছে বসন্ত বললে, আমার এক বন্ধুর দোকান থেকে চেয়ে এনেছি। মাসিমার এত সখ তোমার গান শোনার—অথচ শুনতে পাবেন না—তাও কি হয়!

লতিকা উল্লসিত হয়ে বললেন, তা বেশ করেছো বাবা, খুব ভালো করেছ। পরের বাড়ীতে কার কাছে শুনতে যাব— কত ঠাকার করবে ঠিক নেই। বেশ হয়েছে। এখন তুমিই একটু ঠিক-ঠাক করে দাও—আমরা তো ওর কিছুই জানিনে।

ঘরের ভেতরেই এরিয়াল খাটিয়ে দিলে বসন্ত। উমা পুরোনো টিপয়টা নিয়ে এল, তার ওপরে সাদা ঢাকনিও পেতে দিলে একটা। সাদা প্লাস্টিকের ছোট্ট রেডিয়োটা খুশিতে ঝকমক করতে লাগল।

খুট করে সুইচ খুলে দিলে বসন্ত। অজানা গায়কের আধুনিক গান ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে।

মুগ্ধ হয়ে লতিকা বললেন, কি মিষ্টি আওয়াজ—কি স্পষ্ট! এর কত দাম হবে বসন্ত?

বসন্ত বললে, কত আর? শখানেক হবে বোধ হয়।

শখানেক! লতিকা নিভে গেলেন।

চৌকির কোণায় বসে গানটা শুনতে লাগল উমা। আধুনিক গান গাইছে। এরাও প্রোগ্রাম পায়। গলায় কাজ নেই—একটু চড়ায় তুললেই বেসুরো হতে যাচ্ছে, অথচ এরাই নিয়মিত গান গেয়ে চলেছে—বাঁধা আর্টিস্ট। আর উমা—

উমা জানে, তার গলাকে সোনার সুতোর মতো মেজে দিয়েছে বসন্ত। সুর তার ওপরে আলোর মতো ঝলমল করে উঠে। এবারে দেশের মানুষ তার পরিচয় পাবে। এতদিন যা অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল, তা এইবার ফুলের মতো ফুটে উঠবে সকলের সামনে। তারপর—তারপর—একদিন লোকে তারও গানের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবে সেটের পাশে। উত্তেজিত হয়ে বলবে, আজকের প্রোগ্রাম মিস করা চলবে না—উমা দত্তের গান আছে সাড়ে ছ'টায়। তারও ছবি ছাপা হবে প্রোগ্রামের বইয়ের মলাটে। ডাক আসবে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে—নতুন রেকর্ডের তালিকায় তার নাম থাকবে সকলের ওপরে। নানা জলসা থেকে লোক আসবে—আসবে অসংখ্য ভক্তের চিঠি—।

—উমা!—বসন্ত ডাকল। সুর কেটে গেল, ভেঙে গেল স্বপ্ন। আধুনিক গান যখন থেমে গেছে, কে যেন সেতারে সারং বাজাতে শুরু করেছে। এই সকাল বেলায় সারং। আশ্চর্য এরাও প্রোগ্রাম পায়!

—উমা!—আবার ডাকল বসন্ত। পটলডাঙা লেনের একতলা ঘরের ম্লান আলোয় কেমন বীভৎস দেখাল বসন্তকে। একটা চোখ সাদা—যেন চোখের ওপর পাথরের পরকলা পরা। কপালের বাঁ পাশে পোড়া চামড়াটা কুঁচকে রয়েছে কতগুলো কালো কালো কৃমি যেন জড়াজড়ি করছে এক সঙ্গে। আর একটু সুন্দর হলে কী ক্ষতি ছিল বসন্তদার?

ভেবেই লজ্জিত হল উমা। সুরের জগতে সম্রাট বসন্তদা। দুর্ভাগ্য তার গলা থেকে গান কেড়ে নিয়েছে। তবু অফুরন্ত রত্নের ভাণ্ডার তার কাছে। তা থেকে কতটুকুই বা নিতে পেরেছে সে আজ পর্যন্ত?

—কী বলছিলেন বসন্তদা?

—এসো, গান দুটো আর একবার মহড়া দেওয়া যাক।

উমা বললে, আর কী হবে? এতদিন ধরে যা হওয়ার সে তো হয়েইছে, এখন আর—

লতিকা ধমক দিলেন: থাম থাম, বেশি বক্তিমে করতে হবে না। বসন্ত বলছে—আর একবার ঠিক করে নে। আজ ভালো গেয়ে ওদের খুশি করতে পারলে তবে তো ওরা আবার প্রোগ্রাম দেবে।

—আচ্ছা, বসুন বসন্তদা। আমি আপনার জন্যে চা করে আনি—উমা উঠে দাঁড়াল।

লতিকা বিরক্ত হয়ে উঠলেন: হয়েছে—হয়েছে, তোমার আর কাজ দেখাতে হবে না এখন। এক পেয়ালা চা আমিই এনে দিতে পারব। তুই যা—ভুলচুক থাকলে এইবেলা ঠিক করে নে—

একটা দারুণ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উমার সকালটা কেটে গেল। অডিশন দেবার সময়েই বুকে থরথরি লেগেছিল, এখন কী হবে? সে তো শুধু মাইকের সামনেই গাইছে না—বিদ্যুতের স্রোত বেয়ে তার গান পৌঁছোবে হাজার হাজার মানুষের কাছে। কত গুণী-জ্ঞানী আছে তাদের মধ্যে, কত সমজদার আছে তাদের দলে। সেই অসংখ্য অগণিত শ্রোতাকে সে কি খুশি করতে পারবে? যদি ঘাবড়ে যায়—যদি তাল কাটে, যদি বেসুরো হয়ে যায়? কাল রাত পর্যন্ত যেটা তাকে মাদকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—মায়ের হাতে হাতে জীর্ণ হয়ে যাওয়া চিঠিখানাকে সকলের অগোচরে আর একবার লুকিয়ে পড়বার সময় যে ঢেউ দুলেছিল বুকের ভেতর—হঠাৎ তারা সব কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

পারবে তো—পারবে তো উমা?

বসন্তদা বলেছেন, কোনো ভয় নেই। কিন্তু ভরসাই বা কোথায়? তখন তো বসন্তদা সামনে থাকবে না। অভয় দিয়ে বলবে না—ঠিক হচ্ছে, গেয়ে যাও। সব অপরিচিত—সবাই অনাত্মীয়। স্নেহের চোখ দিয়ে তারা কেউ তাকে দেখবে না—যাচাই করে নেবে। উমার হাত-পা যেন হিম হয়ে আসতে চাইল। হঠাৎ মনে হল, রেডিয়ো প্রোগ্রাম তার দরকার নেই। একটা ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোন কিছু হোক—ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যাক কলকাতার—উমাকে যেন রেডিয়ো স্টেশনে যেতে না হয়।

কিন্তু কিছুই হল না। চৈত্র মাসের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আকাশে জেগে রইল খরধার সূর্য, ঘড়ির কাঁটা চলল লাফে লাফে, তারপর যথাসময়ে এল বসন্ত।

—একটা পনেরো এখন, রেডি তো উমা?

সাড়ে বারোটা থেকেই লতিকা উমাকে কাপড় পরিয়ে বসিয়ে রেখেছেন। একটা থেকেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন কেন এখনো আসছে না বসন্ত। আর রেডিয়োর সামনে এসে গান ধরে সব শুনেছিলেন কান পেতে। সঙ্গে সঙ্গেই তাড়া লাগালেন তিনি।

—[illegible] ভালো করে গাইবি। তুমি [illegible] একটু উৎসাহ দিয়ো বাবা বসন্ত। [illegible]—

বসন্ত তার কালিমা মুখে খানিকটা সুন্দর হাসি হাসল: কোনো ভাবনা নেই মাসিমা—দেখবেন ও ঠিক গাইবে। [illegible] একটা প্রণাম করে নাও উমা—

[illegible] বসন্তের সঙ্গে বেরুল উমা। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে লতিকা বলতে লাগলেন: [illegible] দুর্গা! আহা, উমা আজ প্রথম রেডিয়োতে গাইবে, ওর বাবা কেবল শুনতে পেলেন না। [illegible] অফিস—একটা দিনও ছুটি পেলে না।

ওপর থেকে [illegible] মোটা গিন্নির একটা চাপা হাসি যেন শোনা গেল। একবার অগ্নিদৃষ্টি তুলে জানলা [illegible] তারপর ঘরে এসে রেডিয়োটাকে [illegible] খুলে দিয়ে বসে রইলেন ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

কিন্তু রেডিয়ো স্টেশনের ভেতরে ঢুকল না বসন্ত। [illegible] দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

—আপনি আসবেন না বসন্তদা?

—না-না, আমি এখানেই থাকি।

—আমার যে বড্ড ভয় করছে!—উমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—কিছু ভাবনা নেই—চলে যাও ভেতরে।

আস্তে এগিয়ে গেল উমা। যেতে যেতে বার বার করুণ চোখে ফিরে তাকালো। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে উৎসাহ পাঠালো বসন্ত।

মাথার উপর চৈত্রের রোদ জ্বলছে। পথে গলে যাচ্ছে পীচ। হাইকোর্টযাত্রী লক্ষ্মীছাড়া চেহারার ট্রামগুলো কর্কশ শব্দ তুলে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। বসন্ত হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেলল একবার। এখনো কুড়ি মিনিট দেরী।

দুপা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো লালদীঘির রেলিংয়ের পাশে। টেলিফোনের নতুন শাদা বিশাল বাড়ীটা রোদে অদ্ভুতভাবে ঝক-ঝক করছে—কাচের জানালাগুলো থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে হীরের ধার। চারদিকে অবিশ্রাম ক্লান্ত কর্মযাত্রা। বসন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, এরই ভেতরে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রায় ন্যাড়া একটা গাছের ডালে এক জোড়া কাক নিবিষ্ট মনে বাসা বাঁধছে।

উমার চাইতেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে বসন্ত। ঘড়ির কাঁটা যত এগোচ্ছে—রক্তের মধ্যে ততই ঝড়ের মতো শন্‌শনানি উঠছে একটা। ধুলোপড়া ময়লা রেলিংটাকে সে মুঠো করে চেপে ধরল। তার হাঁটু দুটো কাঁপছে।

মাথার ওপর গাছের একটা হালকা ছায়া আছে বটে—তবু কী অসহ্য তাপ ঠিকরে আসছে তার ভেতর থেকে! একটা বিড়ি ধরিয়েই ফেলে দিল বসন্ত—বিশ্রী তেতো লাগছে মুখটা। পকেটে হাত দিতে একটা এলাচের খোসা পাওয়া গেল—নির্মমভাবে সেইটেকেই চিবুতে লাগল চুয়িং গামের মতো।

একটা সাড়ে—একটা—আটটা—

ঠিক রেডিয়ো স্টেশনের সামনেই একটা পানের দোকানে রেডিয়ো সেট্‌ দেখেছে বসন্ত। একটু আগেও সেটা বাজছিল। ঘর্মাক্ত দেহে সেই দিকেই চলল পায়ে পায়ে।

হৃৎপিণ্ডে শীত ধরিয়ে দেওয়া একটা ঘোষণা। তারপর বাজনা। তারপর—

গান গাইছে উমা। হ্যাঁ—উমাই। সেই চেনা গলা—সোনার তারের মতো যাকে মেজে মেজে মসৃণ করে দিয়েছে; সেই সুর—যে সুর দিনের পর দিন শিখিয়েছে একনিষ্ঠভাবে। পারবে তো উমা?

পারছে—চমৎকার পারছে! প্রথম মিনিটখানেক যেন একটু আড়ষ্ট লাগছিল—এখন ঝলকে ঝলকে আলোর মতো বেরিয়ে আসছে গান। কিন্তু কজন শুনেছে কান পেতে—বসন্ত একবার ভ্রুকুটি করে তাকালো চারদিকে। ঘর ঘরে ট্রামগুলো অসহ্য আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে—পথ-চলতি মানুষগুলো একবারও থেমে দাঁড়াচ্ছে না উমার গানের আকর্ষণে। এমন কি হতভাগা পানওয়ালাটা পর্যন্ত শুনছে না গানটা—একজন খরিদ্দারের সঙ্গে গল্প করছে সমানে।

বেরসিক—ক্রুদ্ধভাবে স্বগতোক্তি করল বসন্ত। সত্যিই খুব ভালো গাইছে উমা—এত ভালো এর আগে যেন ও কখনো গায়নি। কিন্তু এমন দুম্‌দুম্‌ করে কেন তবলা পিটছে তবলচিটা? যেন জয়ঢাক বাজাচ্ছে—খারাপ করে দিচ্ছে গানটাকে।

নির্ভুল সুরের পরিক্রমা শেষ করে উমা এসে থামল। বেশ গেয়েছে—খাসা। আবার একটা ঘোষণা। এবারে দ্রুত লয়ের গান। অনেক সহজ—অনেক স্বাভাবিক হয়েছে উমা, যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে।

একটা ছোকরা তাল দিতে দিতে চলে গেল। কথার ফাঁকে ফাঁকে পানওয়ালার মাথা দুলছে আস্তে আস্তে।

বসন্ত বলে ফেলল : বাঃ, বেশ হচ্ছে!

পানওয়ালা ফিরে তাকালো : কিছু বলছেন বাবু?

লজ্জিত হয়ে বসন্ত বললে, না—না, ও কিছু না—

গান শেষ হল। চমৎকার উতরে গেছে উমা। প্রথম দিনেই সচরাচর এত ভালো গাইতে শোনা যায় না। আনন্দে গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্যে বসন্ত গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো।

পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। বারো মিনিট।

মাথার ওপরে চৈত্রের সূর্য। পথে পীচ্‌ গলছে। পানওয়ালার রেডিয়ো থেকে রুক্ষ গলায় পল্লী-সঙ্গীত ভেসে আসছে—ঝুমুর গাইছে। বসন্তের অসহ্য বোধ হল। ওর নাম ঝুমুর নয়—ঝুমুরের ক্যারিকেচার। ওর চাইতে অনেক—অনেক ভালো ঝুমুর আসে উমার গলায়।

ট্রামের শব্দ। বাসের ভেঁপু। পোড়া তেলের কটু গন্ধ তপ্ত হাওয়ায় ছড়িয়ে যাওয়া মোটর। লক্ লক্ ধারালো লোহার শিকের মতো রোদের ছোঁয়া। এখনো কেন আসছে না উমা?

উমা এল আরো দশ মিনিট পরে। শার্টের তলায় বসন্তের গেঞ্জীটা যখন ভিজে জবজবে হয়ে গেছে—তখন।

কিন্তু একা এল না। সঙ্গে বেরিয়ে এল আর একজন। এই মানুষটিকে অনেকবার দেখেছে বসন্ত। গানের জলসায়—অসংখ্য পত্র-পত্রিকার পাতায়।

সিতাংশু চ্যাটার্জি। দুর্দান্ত আধুনিক গাইয়ে। বাংলা দেশ পাগল হয়ে থাকে সিতাংশুর নামে। উমা খুসিতে ঝলমল করতে করতে আসছে তার সঙ্গে। তার হাতে সবুজ রঙের ভাঁজ করা চেকটা।

উমার দৃষ্টি তখন সুদর্শন দীর্ঘকায় সিতাংশুর মুখের দিকে। অল্প অল্প স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের হাসি হাসছে সিতাংশু। উচ্ছল গলায় উমা বলছে, সত্যি ডুয়েট রেকর্ড করবেন আমার সঙ্গে- সত্যিই?

আর কি দাঁড়ায় বসন্ত? আর কি দাঁড়াতে পারে? একটা চোখ সাদা—কপালে খানিক পোড়া কোঁকড়ানো চামড়া—বিশ্রী ভাঙা গলার স্বর। সিতাংশুর সামনে দাঁড়াবার সাহস আছে নাকি বসন্তের?

চট্‌ করে সামনের হাইকোর্টের ট্রামটাতেই উঠে পড়ল বসন্ত। উমা দেখবার আগেই। এই নিয়ে তিনজন। মনে মনে জানত—ঠিকই জানত : এবারেও এমনি একটা কিছু নিশ্চয় ঘটবে। কিন্তু আজ দুপুরের রোদের শলায় যেন বিষ মেশানো ছিল। ইডেন-গার্ডেনের স্যাওলাভরা বদ্ধ জলটার পাশে মরা ঘাসের মধ্যে পা ছড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই বিষের জ্বালায় জ্বলল বসন্ত। অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর বিকেলের গাড়ীতে চলে গেল দেশে। বর্ধমানের দূর গ্রামের একটা ভাঙা বাড়িতে কিছুদিন মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকবার জন্যে।

* * *

পালাটা বসন্ত শেষ করতেই চেয়েছিল। কিন্তু উমাই যে তাকে থামতে দেবে না কে জানত সে কথা?

এক মাস পরে রাজা লেনের সেই খোলার ঘরে দুপুরের ঝিমুনিটা হঠাৎ কেটে গেল বসন্তের। উমাই ডাকছে। কোনো ভুল নেই।

ধড়মড় করে উঠে বসন্ত দরজা খুলে দিলে : এ কি উমা!

অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল উমা। রেডিয়োটা নামিয়ে রাখল বসন্তের তক্তপোষের কোণায়। মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, এটা ফেরৎ দিতে এলাম।

কেমন অপ্রতিভ আর অপ্রস্তুত হয়ে গেল বসন্ত। সংকোচে কুঁকড়ে গেল।

—তুমি আবার কষ্ট করে আনতে গেলে কেন? আমিই তো যেতাম।

—না, আপনি যেতেন না—শীর্ণ হাসি হাসল উমা : আজ এক মাসের মধ্যেও যাননি।

বসন্ত ঢোক গিলল : শরীর খারাপ হয়েছিল—দেশে গিয়েছিলাম—

—কৈফিয়ৎ দিতে হবে না বসন্ত দা, আমি জানি।—এবার বিনা নিমন্ত্রণেই উমা বসন্তের তক্তপোষের কোণায় বসে পড়ল : আর একটা খবর আছে। আসছে মাসে ফের প্রোগ্রাম দিয়েছে রেডিয়োতে।—সেই মেটে রঙের লেফাফা উমা বের করে আনল : এবার দুটো সিটিং। দশ আর পনেরো—মোট পঁচিশ মিনিট।

—ভালোই তো!—বসন্ত খুশি টেনে আনতে চাইল গলায় : দেখি—দেখি

—দেখে কী হবে?—উমা খামটা সরিয়ে নিলে : বাবা-মার হাতে পড়বার আগেই এটা তোমার কাছে আমি নিয়ে এলাম বসন্তদা। ভেবে দেখলাম, এ প্রোগ্রাম আমি নেব না। আরো অনেক শিখতে হবে আমাকে—অনেক বাকী এখনো। এ-সব থাক এখন—

—ছিঃ—ছিঃ—করছ কী!

কিন্তু বাধা দেবার সময় পেলোনা বসন্ত। তার আগেই টুকরো টুকরো করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল উমা। অসহ্য বিস্ময়ে বসন্তের একটামাত্র চোখে আর পলক পড়ল না। মুখ দিয়ে যান্ত্রিক শব্দ বেরিয়ে এল : কী করলে উমা—ও কি করলে!

ঘরের বিষণ্ণ ছায়ায় একবারের জন্যে বসন্তের মুখখানা অদ্ভুত কুৎসিত লাগল উমার—হঠাৎ যেন বসন্তকে একটা একচক্ষু দানবের মতো মনে হল; ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে নাড়ীছেঁড়া যন্ত্রণা আর্তনাদ করে উঠল বুকের মধ্যে।

তারপর আবার শীর্ণ হাসি হেসে উমা বললে, এই ভালো হল বসন্তদা। এখনো তো আমার অনেক শেখা বাকী আছে—ব্যস্ত হয়ে কী লাভ?

—

স্বপ্নকমল

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সেবার ওয়ার্ডে আর যায়গা ছিল না। বড় হল ঘর তো ভরেই গেছে, দুপাশের বারান্দার এক্সট্রা বেডগুলি আসন্নপ্রসবা আর প্রসূতির দলে বোঝাই। তবু বছর দুই আগের পাশকরা ছোকরা ডাক্তার সুনীল চক্রবর্তী ব্যস্তভাবে বেলা প্রায় এগারটার সময় এসে বলল, আপনার ওয়ার্ডে আর একটা বেডের ব্যবস্থা করতে হবে মিস গোস্বামী।

স্টাফ নার্স সুলেখা বিরক্ত হয়ে বলল করতে তো হবে! কিন্তু কোথায় এনে ঢোকাবেন এখানে? যায়গা কই আর?

ডাঃ চক্রবর্তী আর একটু এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, যায়গা কোনরকমে করতেই হবে। ডাঃ মুখার্জির পেশেন্ট।

সুলেখা আর কোন কথা বলল না। ডাঃ মুখার্জি এই ওয়ার্ডের সিনিয়র হাউস সার্জন।

সুনীল চক্রবর্তী সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, একটা বেলা কিছু অসুবিধে হবে। তের নম্বর আর সাতাশ নম্বর ওবেলা ডিসচার্জ করে দিচ্ছি, নয়ত কাল সকালে।

সুনীল কথাটা শেষ করতে না করতেই পেশেন্ট এসে হাজির হল।

বাইশ তেইশ বছরের একটি তরুণী সুন্দরী বউ। আর একটি মহিলা তার হাত ধরে নিয়ে আসছেন। এই অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। হাঁফাচ্ছে।

সতের আঠের বছরের আর একটি শিক্ষানবীশ নার্স কি করবে, নতুন পেশেন্টকে কোথায় বসতে দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। সুলেখা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ মল্লিকা! একটা টুল টুল এনে বসতে দাও ওঁকে।'

বলতে বলতে সুলেখা নিজেই একটা টুল এনে দিয়ে বলল, 'আপনি বসুন এখানে।'

বউটি লজ্জিতভাবে তার ওপর বসল। সঙ্গের মহিলাটি বললেন, 'খুব নরম হয়ে পড়েছে। এই প্রথম।' আমি ওর দিদি। 'আপনি বুঝি এখানকার স্টাফ নার্স?'

সুলেখা বলল, 'হ্যাঁ।'

মহিলাটি বললেন, 'একটু বিশেষ কেয়ার নিয়ে—এই প্রথম কিনা—'

সুলেখা বলল, '[illegible] নিশ্চিন্ত হোক, কেয়ার ঠিকই নেওয়া হবে। আমরা তো সেই জন্যেই আছি।'

তারপর ওয়ার্ডের জমাদারদের ডেকে হুকুম দিল, 'এই হরি, এই রাধানাথ একখানা খাট নিয়ে এস তো। বার নম্বর আর তের নম্বরের মাঝখানে এখনকার মত পেতে দাও। এইভাবে কি মানুষে কাজ করতে পারে? বেড নেই, তবু পেশেন্ট নিতে হবে? কই বেটা ছেলে কে এসেছেন সঙ্গে?'

ঊনত্রিশ ত্রিশ বছরের মোটাসোটা একটু বেঁটে ফর্সামত এক যুবক এই প্রমীলা-রাজ্যে ঢুকে বোধ হয় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সুলেখা তার মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়েই ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনারই বা কি আক্কেল শুনি? ওয়েটিং রুমে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারলেন না? একেবারে হুড়মুড় করে এসে হাজির?'

যুবকটি অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমাদের যে বলে দিল সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনারা যান—'

সুলেখা মুখে একটু বিকৃত ভঙ্গি এনে বলল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে! এখানকার মত এমন অব্যবস্থা আর কোথাও নেই—।' আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সুলেখা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ততক্ষণে অখিলেশও চিনতে পেরেছে। চেনা অবশ্য শক্তই। এই কালো স্থূলাঙ্গী, মাথায় সাদা শিরোভূষণ আঁটা, বদমেজাজী রূঢ়-ভাষিণী একটি বিগত যৌবনাকে দেখে দশ বছর আগের সেই তন্বী শ্যামা, সুলেখাকে মনেও আনা যায় না।

অখিলেশ বলল, 'তুমি!'

সুলেখা অস্ফুট প্রতিধ্বনি করল 'তুমি!'

মহিলাটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।

এবার বললেন, 'তোমাদের পরিচয় আছে বুঝি অখিল?'

চমকে উঠল অখিলেশ। পিছন ফিরে বলল, 'হ্যাঁ। আসুন এবারে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

ইনি আমার ইয়ে—মানে আমার স্ত্রীর দিদি, আর এ হল সুলেখা। এক সময় আমাদের মধ্যে—'

অখিলেশের স্ত্রীর দিদি মঞ্জুলার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। সিঁথিতে সিঁদুর, সুন্দরী পুষ্টাঙ্গী মহিলা। চওড়া পেড়ে মিহি শাড়ি, আর হাতের মোটা বালা, আঙুলের নীল পাথর বসানো আংটিতে স্বচ্ছল ঘরের গৃহিণী বলে সহজেই চেনা যায়।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় ছিল। সে কথাটা বলতে এত গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছ কেন? আমার এই ছোট ভগ্নীপতিটি ভারি নার্ভাস।'

সুলেখার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন তিনি। তারপর নিজের বোনের দিকে ফিরে বললেন, 'রীণার পরিচয় বোধ হয় আর আলাদা করে দিতে হবে না। এখন আর ভাবনা কি রীণা, নতুন এক দিদি পেয়ে গেলি এখানে।'

শরীর খুবই খারাপ লাগছিল। তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা লেগেই আছে। তবু রীণা সব ভুলে নার্সটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কিসের যেন একটা রহস্যের আভাস পেয়েছে। তার দুটি আয়ত সুন্দর চোখে কি শুধু কৌতূহল না আরো কিছু?

সুলেখার দিকে চেয়ে সে এবার হাত তুলে ছোট একটু নমস্কার জানাল।

সৌজন্যের নিয়ম রাখল সুলেখাও।

তারপর আর একবার তাকাল রীণার দিকে। এবার আর পেশেন্টকে দেখছে না, তরুণী রূপবতী নারীর দেহ-সৌষ্ঠবের পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অখিলেশ জীবনে কতখানি সুখী হয়েছে তাই যেন যাচাই করতে চাইছে।

রীণা মঞ্জুলার দিকে চেয়ে বলল, 'দিদি, কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব?'

সুলেখার যেন চমক ভাঙল। লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও আপনার বুঝি বসে কষ্ট হচ্ছে? একটু বসুন। এক্ষুণি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

হঠাৎ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল সুলেখা। অধস্তন আরো দুটি নার্সকে [illegible] জমাদার দারোয়ানদের হুকুম জারি করল, [illegible] হল ঘরের এধার থেকে ওধারে ঘুরে এল একবার।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেড ঠিক হয়ে গেল। নিজের হাতে সযত্নে পরিচ্ছন্ন চাদর পেতে দিল সুলেখা। বালিশটা ঠিক করে দিল। দরকার ছিলনা তবু নিজেই রীণার হাত ধরে এনে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার শুয়ে পড়ুন।'

লম্বা খাতায় রীণার নাম ঠিকানা লিখে নিল সুলেখা। তারপর অখিলেশের দিকে চেয়ে বলল, 'খাবার-টাবার কি বাড়ি থেকে আসবে, না আমরা এখান থেকেই ব্যবস্থা করব?'

অখিলেশ বলল, 'না, ভাত বাড়ি থেকেই দিয়ে যাবে। বাসা আমাদের কাছেই, এই শ্যামবাজার।'

সুলেখা বলল, 'তা জানি। ঠিকানা এ্যাডমিশন কার্ডের মধ্যেই পেয়েছি।'

যাওয়ার আগে মঞ্জুলা আর একবার বললেন, 'দেখবেন কিন্তু।'

সুলেখা হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই। এই তো আমাদের কাজ।'

বিদায় নেওয়ার আগে অখিলেশ একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভিজিটিং আওয়ারস যেন কখন?'

সুলেখা বলল, 'পাঁচটা থেকে সাতটা।'

যে কোন পরিবেশেই
বাংলা ও বাঙালীর
বিশিষ্ট রুচিমাফিক তৈরী বলেই
মণীন্দ্র মিলের ধুতি এত আদরের। যে কোন
পরিবেশের উপযোগী এই কাপড়গুলি বিশেষ টেকসই
অথচ দামে খুব সস্তা। আপনার
নিকটবর্তী দোকানে মিলের নাম
করলেই পাবেন।
মনীন্দ্র মিলের ধূতি
মনীন্দ্র
মিলস্ লিমিটেড
পি-৪৯, বি, কে, পাল এভেন্যু, কলি-৬
মিলস্—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ জেলা।

তারপর অখিলেশকে দাম্পত্যালাপের সুযোগ দিয়ে সে হলের আর একদিকে অন্য বেডের কাছে চলে গল।

পাঁচটার একটু আগেই অখিলেশকে ফের হলের সামনে দেখা গেল। মৃদুলা এবেলা আর আসতে পারেননি।

সুলেখা অন্য রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একটু অপেক্ষা করতে হল অখিলেশকে। সুলেখা কাছে এসে দাঁড়াতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'বেড খালি দেখছি যে? ও কোথায়?'

সুলেখা একটু হাসল, 'এই একটু আগে লেবার রুমে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অখিলেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি?'

সুলেখা এবারো হাসল, 'যত তাড়াতাড়ি হয় ততই তো ভালো। ততই তো কষ্ট কম। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিকই আছে।'

অখিলেশ বলল, 'আমি তাহলে বাইরে অপেক্ষা করব?'

সুলেখা বলল, 'হ্যাঁ, ভিতরে আর কোথায় অপেক্ষা করবে? বাইরে ওয়েটিং রুমে বস গিয়ে। আমি ঠিক সময়মত খবর পাঠিয়ে দেব।'

যেতে যেতে কি ভেবে আবার ফিরে এল অখিলেশ।

সুলেখা অন্য বেডে চলে যাচ্ছিল, মল্লিকা ডেকে আনল তাকে।

সুলেখা এবার একটু বিরক্ত হয়েছে। বলল, *'কি ব্যাপার!'*

অখিলেশ ইতস্ততঃ করে লজ্জিতভাবে বলল, 'ইয়ে...'

'তুমি থাকবে তো সেখানে?'

'না, আমার ডিউটিতো এই ওয়ার্ডে। তাছাড়া আমার থাকবার দরকারই বা কি। সেখানে ভালো ডাক্তার থাকবেন, নার্সরা থাকবে, ভয়ের কিছু নেই।'

অখিলেশ বলল, 'তবু তুমি থাকলে আরো বেশি ভরসা পাব।'

সুলেখার একবার ইচ্ছা হল বলে, 'এত বিশ্বাস আমার ওপর? এত দরদ?'

কিন্তু বলল না।

'আচ্ছা যদি চাও, আমিও না হয় থাকব। কোন চিন্তা কোরো না তুমি, বোসো গিয়ে বাইরে।'

তবু একমুখ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে অখিলেশ যে বিদায় নিল, সে কথা বুঝতে সুলেখার একটুও দেরি হল না। জানলা দিয়ে দেখতে পেল অখিলেশ করিডোরে দাঁড়িয়ে কি যেন আলাপ করছে।

হঠাৎ এক অদ্ভুত দুঃসহ বিদ্বেষে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল সুলেখার। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে নিয়েই অখিলেশের যত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা, দরদ আর সহানুভূতি, কিন্তু দশ বছর আগের কথা অখিলেশ একেবারেই ভুলে গেছে। পুরুষ এই রকমই হয়। নির্লজ্জ, নির্মম, সুবিধাবাদী। এতকাল বাদে দেখা। কিন্তু সুলেখা কেমন আছে, সে কথা একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করবার ইচ্ছা হয়নি অখিলেশের। যেন আরো পাঁচজন নার্সের মত সুলেখাও একটি নার্স মাত্র। অখিলেশের সঙ্গে যেন তার আর কোন সম্বন্ধ নেই, সম্বন্ধ ছিল না।

নটার সময় খবর পাওয়া গেল, ছেলে হয়েছে অখিলেশের। শুধু শোনা নয়, নিজের চোখে দেখে এলো সুলেখা। রীণার জ্ঞান এখনো ফেরেনি। বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। নিজে ধরতে গিয়েও ধরল না সুলেখা। এক পলক তাকিয়ে একটু দেখল, তারপর নার্স আর দাইকে দরকারী উপদেশ নির্দেশ দিয়ে অন্য কেশ এ্যাটেন্ড করতে চলে যাওয়ার আগে দারোয়ানকে ডেকে বলল, 'ওয়েটিং রুমে অখিলেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁকে গিয়ে বল ছেলে হয়েছে। সব ভালো আছে। ভাবনা নেই। কাল সকালে এসে সব দেখতে পাবেন। এখন দেখাবার নিয়ম নেই আমাদের।'

দারোয়ান ঘুরে এসে বলল, 'তিনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চান।'

সুলেখা বলল, 'বলে দাও আমি খুব ব্যস্ত। আজ আর দেখা হবে না। যা বলবার তিনি যেন কাল সকালে এসে বলেন।'

ওয়ার্ডের কাজকর্ম সারতে সারতে রাত দশটা হল। কেন যেন বার বার আজ বড়ই উন্মনা হয়ে উঠছে সুলেখা। কাজে কেবলই ভুল হচ্ছে।

সহকারিণী মিনতি তা লক্ষ্য করে বলল, 'সুলেখাদি তোমার অসুখ হয়েছে কি বল তো? শরীর টরীর খারাপ করেছে নাকি?'

সুলেখা প্রতিবাদ করে বলল, 'কই, আমার শরীর খারাপ হতে কোন দিন দেখেছ?'

তবু নটায় সিফ্‌টের ইনচার্জকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আজ একটু তাড়াতাড়ি বিদায় নিল সুলেখা। হাসপাতালের গেট পার হয়ে বাস স্টপের কাছে আসতেই দেখে অখিলেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুলেখা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি তুমি এত রাত্রে এখানে কি করছ? বউ ছেলেকে পাহারা দিচ্ছ নাকি?'

অখিলেশ বলল, 'না, সেজন্যে তো তোমরাই আছ।'

সুলেখা বলল, 'ওরা ভালোই আছে। কাল ফের এসে ছেলের মুখ দেখো।'

অখিলেশ বলল, 'আমি সে কথার জন্যে এখানে দাঁড়াইনি সুলেখা।'

সুলেখা বলল, 'তবে?'

অখিলেশ বলল, 'তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে।'

সুলেখা বলল, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় আর কোন কথাই আমাদের বাকি নেই।'

বাস এসে দাঁড়াল। অখিলেশ সুলেখার পিছনে পিছনে উঠে পড়ল বাসে। বলল, 'চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। কোথায় থাক?'

সুলেখা বলল, 'এই কাছেই। জীবনকৃষ্ণ মিত্র লেনে। কিন্তু তুমিতো থাক একেবারে উল্টোদিকে। তোমার ফিরতে অসুবিধে হবে। তুমি বরং এখনই নেমে যাও।'

কিন্তু অখিলেশ নেমে গেল না। সুলেখার পাশে এসে বসল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ভেবেছ ছেলে হওয়ার খবর শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি, তাই না?'

সুলেখা পরিহাসের সুরে বলল, 'তাইতো স্বাভাবিক, মেয়ের চেয়ে ছেলে হওয়ার খবরেই লোকে বেশি খুশি হয়।'

'অখিলেশ বলল, '[illegible] আমার মনের কথা তোমাকে [illegible] না সুলেখা।'

'দশ বছর আগে [illegible] বলেছি, এখন থাক।'

মোড়ে এসে বাস থামতে সুলেখা বলল, 'আমাকে এখানে নামতে হবে।'

অখিলেশ বলল, 'চল আমিও নামি। বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে।'

সুলেখা প্রবল আপত্তি জানাল, 'মাপ করো। তোমাকে আজ আর আমি বাসা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব না।'

অখিলেশ আহত হয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এতকাল বাদে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি চাইনে। কিন্তু দোষ শুধু আমার একারই ছিল না সুলেখা।'

সুলেখা বলল, 'সে কথা তুলে আর লাভ কি।'

অখিলেশ বলল, 'আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। বিয়ে করনি কেন সুলেখা?'

সুলেখা একটু হাসল। বলল, 'তুমি ছাড়া আরো অনেকেই জিজ্ঞেস করে। [illegible] বর জোটেনি, কাউকে বলি প্রবৃত্তি হয়নি।

সেদিন কেঁদেছি কত শূন্য হেরি'
তোমার আসন,
সেদিন ডেকেছি কত, "কই তুমি,
কোথায় জননী?"
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ঘুরে মরে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি,
পর্বতে পর্বতে বাজে, ভরে যায়
কান্তার-কানন।
চকিতে হেরেছি কভু অশ্রুসিক্ত
মলিন আনন,
সেদিন বাতাসে ছিল ঝঞ্ঝাবেগ,
আকাশে অশনি,
কালের প্রলয়নৃত্যে কেঁপে ওঠে
বিক্ষুব্ধ অবনী;
তোমার প্রতিষ্ঠা তরে করেছিনু
প্রাণ সমর্পণ।

জগৎসভার মাঝে বরাসনে
হে অধিষ্ঠান,
তোমার প্রণাম হলো আজ
[illegible]
মহিমামণ্ডিত বেশে তুমি কর
[illegible]
হে বরেণ্যা ধন্য তুমি, ধন্য এই
[illegible]
সে মন্ত্রে বন্দনা করে যে মানে
[illegible]
বিশ্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রাণে
[illegible]

আমি এবার নামি, একটা স্টপেজ বেশি চলে এসেছি।'

অখিলেশকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সুলেখা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। একা একা অনেকখানি পথ হেঁটে আসতে হল তাকে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে বিবর্ণ একফালি চাঁদ। পথ প্রায় জনশূন্য। গলির দুই ধারে পুরোনো বাড়ি। নিজেদের একতলা বাড়িটার জানালায় তখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

দরজার কড়া নাড়তে হল না। পায়ের শব্দ শুনেই ছোট বোন চিত্রা এসে দোর খুলে দিল। বলল, 'দিদি আজকে রাত হল এত?'

সুলেখা বলল, 'কইরে, আজ বরং সকালেই এসেছি।'

পাশের ঘরে থাকেন প্রৌঢ়া বিধবা মা আর ছোট দুই ভাই—হীরু আর নিরু। হীরু বছর দুই হল বি-এ পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। নিরু এখনো কলেজে পড়ে। মেজো বোন সুমিতার বিয়ে হয়ে গেছে তিন বছর আগে। এ ঘরে থাকে শুধু চিত্রা আর সুলেখা। সুলেখা আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে জড়ো হল। ভাইবোন কেউ এখনো খায়নি। এক সঙ্গে বসে খাবে। প্রত্যেকে সুলেখার জন্য অপেক্ষা। [illegible] শব্দ করে [illegible]।

[illegible] চিত্রা সুলেখা বলল [illegible] [illegible] নিজেই পারতাম। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ছাত্রী ছাত্রের [illegible] সুলেখার [illegible] কিন্তু অন্য দিনের মত সুলেখার আজ আর ঘুম এল না। [illegible] চোখের সামনে টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠতে লাগল। অখিলেশের সঙ্গে [illegible] সুলেখার সঙ্গে কি মধুর [illegible] ব্যবহার করেছে সুলেখা? আর একটু ভদ্র [illegible] কি উচিত ছিল না? তাড়াতাড়ি এতদিন বাদে [illegible] সামনে মনের ঝাঁজ প্রকাশ করে কি লাভ হল? নিজের নৈরাশ্য, ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতাই শুধু বেরিয়ে পড়ল সুলেখার। আর কিছু হল না। এর চেয়ে নির্লিপ্ত থাকতে পারলেই বরং ভালো ছিল। বোঝাতে পারলে ভালো ছিল অখিলেশের মত সুলেখাও সব ভুলে গেছে।

সুলেখাও তার চাকরি নিয়ে ভাইবোনদের পরিবার নিয়ে সমান সুখী হয়েছে, সার্থক হয়েছে।

কিন্তু একথা বলা কি সহজ? সেকথা ভোলা কি সোজা?

আজ নয়, বার বছর আগে অখিলেশ চন্দ প্রথম এসেছিল তাদের পরিবারে। সুলেখার বাবা সুধানাথ গোস্বামী তখন বেঁচে। কলেজে বাংলা আর সংস্কৃত পড়ান। মাণিকতলার দোতলার একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে বাপমায়ের স্নেহে আদরে দিনগুলি ভালোই কেটে যাচ্ছিল সুলেখার। একটু অভিযোগ শুধু ছিল। বাবা বড় গোঁড়া। নিজের ধ্যানধারণাকেই সবচেয়ে ভালো বলে মনে করেন। বিলাসিতা আড়ম্বর ভালোবাসেন না। নিজের আদর্শের সঙ্গে যাদের মেলে না তাদের কাছ থেকে দূরে থাকেন।

এই কঠিন যাচাই বাছাইয়ের ফলে সুলেখার মামা মেসো আর মামাতো, মাসতুতো ভাইবোনেরা অনেকে বাদ যেত। তাই নিয়ে মার সঙ্গে বাবার ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত। সুলেখার মা বলতেন, 'দুনিয়ার সবাই খারাপ, তুমিই শুধু ভালো মানুষের গোড়া।'

বাবা বলতেন, 'আমি তা বলিনে। আমি নীতি আমার মতের সঙ্গে পথের সঙ্গে যাদের মেলে আমি শুধু তাদের নিয়েই চলব।'

সেই দিক সবচেয়ে বেশি নেত্রকোণার [illegible] কিশোরকান্ত চন্দের সঙ্গে। দুজনে বছর দুই একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। সেই সূত্রে [illegible] তাঁর ছেলে অখিলেশকে নিয়ে এলেন সুধানাথের কাছে। ইংরেজীতে এম-এ পড়বে অখিল। কলকাতার কোন হস্টেল মেসে থেকে পড়বে সেই পরামর্শ করতে এসেছেন। সুধানাথ বললেন, 'আমার বাসা থাকতে তুমি যদি ছেলেকে হস্টেলে পাঠাও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

সেই থেকে সুলেখাদের বাসাতেই থেকে গেল অখিলেশ। দুদিনেই সুলেখার বাবা [illegible] উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এমন ছেলে আজকালকার দিনে মেলে না। কোন চাল নেই বিলাসব্যসন নেই, [illegible] ইয়ার্কি নেই [illegible] ছোঁয় না। [illegible] সুধানাথ আদর্শ [illegible] অখিলেশ প্রায় তার [illegible]। ধীরে ধীরে অখিল সুধানাথের স্নেহভাজন হয়ে উঠল। নিজের পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে সে অনেক কাজ করে সুলেখার বাবার। তাঁর লেখার প্রুফ দেখে দেয়, [illegible] চিঠিপত্র লেখে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর খোঁজ খবর নেয়। সবাই অখিলের ভক্ত হয়ে উঠল। বাবার মুখে সুখ্যাতি মায়ের মুখে প্রশংসা। অখিলের মত ছেলে আর হয় না। সুলেখাও আকৃষ্ট হল। ভালো ছেলের ওপর ভালো মেয়ের আকর্ষণ স্বাভাবিক। সুলেখা অখিলকে চা করে দেয়, জামার বোতাম লাগায়, ময়লা রুমাল আর গেঞ্জী কাচে। অখিল সুলেখাকে [illegible] কোর্স পড়ায়। সহজ নিঃসংকোচ ব্যবহার দুজনের। কেউ কিছু মনে করে না। কিন্তু নিজেদের মন বুঝতে বেশি দেরি হল না সুলেখার। ছুটি ছাটায় অখিল গাঁয়ে চলে গেলে সুলেখার দিন কাটতে চায় না। চিঠিতে অখিলও সেই কথা জানায়। সুলেখা ভালো মেয়ে, অখিলও ভালো ছেলে তবু দুজনের সম্পর্কের ধারা ঠিক সোজা পথে চলল না। এঁকে বেঁকে লুকোচুরির পথ ধরলো। বাপ, মা, ভাই-বোনদের চোখের আড়ালে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। সুলেখা যেন দুটি সত্তায় ভাগ হয়ে গেছে—সংসারের আর পাঁচজনের কাছে সে এক রকম, অখিলের কাছে আর এক রকম। তার যতখানি প্রকাশ তার চেয়েও বেশি গুপ্ত। অখিলেরও তাই। সুলেখা টের পেল তাকে যত ভালোমানুষ দেখায়, ভিতরে ভিতরে সে তত ভালো মানুষ নয়। তা নাইবা হল। আলাদা আলাদা-ভাবে ভালো হয়ে বাস করার চেয়ে দুজনের মধ্যে ভালোবাসা হওয়া ঢের ভালো। প্রথম প্রথম সেই ভালোবাসা সীমাবদ্ধ হয়ে রইল শুধু টুকরো চিঠি আর ছোটখাট উপহার দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে। তারপর তা সীমা ছাড়াতে লাগল, নিত্য নতুন সংকেত বার করবার চেষ্টায়। দেখা গেল সুলেখার বুদ্ধি অনেক বেশি, আর তার পরামর্শ নিয়ে চলতে অখিলেশের মোটেই আপত্তি নেই।

বিষ্ণুপদ বাঁড়ুয্যে সুধানাথের সহকর্মী বন্ধু। তাঁর ভাইপোর অন্নপ্রাশনে সুলেখাদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন সন্ধ্যাবেলায়। কিন্তু সুলেখা গেল না। মাথা ধরার অজুহাতে বিছানায় পড়ে রইল। আর অখিলেশও সেদিন লাইব্রেরী থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল। শুধু চেয়ে দেখা নয়, হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি নয়, সেই নির্জন নিভৃত সন্ধ্যায় তারা দুজনে পরস্পরের উপর এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করল। মনে হল তাদের যখন এক রুচি এক মন, এক প্রাণ, তখন দুটি আলাদা-আলাদা দেহ কেন। তারা অনুভব করল এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সর্বক্ষণ মেনে চলবার কোন সার্থকতা নেই। কিংবা অতশত কথা তখন কিছুই ভাবেনি সুলেখা, অখিলেশ ওই ধরণের হয়ত কিছুই একটা বলেছিল বটে, কিন্তু না বললেও কিছু এসে যেত না। না বুঝলেও যা ঘটেছিল তাই ঘটত।

লুকোচুরি বেশি দিন চলল না। প্রথম দুমাস মার কাছে মিথ্যা কথা বলল সুলেখা। কিন্তু তৃতীয় মাসে আর পারল না। ধরা পড়ে গেল, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিশ্বাসঘাতকতা করল।

সুলেখার মা বললেন, 'পোড়ারমুখী এমন করে মুখে কালি দিলি! সে কে স্পষ্ট করে বল।'

অখিলের নাম সুলেখার মুখ থেকে তাঁরা বের করে নিলেন। না বলেই বা উপায় কি ছিল তখন।

সুধানাথ গম্ভীর রাগে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন অখিলের হাত, বললেন, 'সব দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম তার এই শোধ নিলে?'

অখিল বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।'

সুধানাথ গর্জে উঠলেন, 'শুধু হাত এত স্পর্ধা তোমার! আমি তোমার জিভ এক্ষুণি ছিঁড়ে ফেলতাম কিন্তু তুমি নেহাৎই নিশাকান্তের ছেলে।'

অখিল বলল, 'কিন্তু যা ঘটেছে তারপর আমি ওকে বিয়ে না করে পারিনে—'

(ইহার পর ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

লীগমহলে লণ্ডনের ছাত্র

— বাসব ঠাকুর —

তখনকার কালে কলকাতার সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে যিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন শুনেছিলুম তাঁর লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ আর্টের ডিপ্লোমা ছিল বলেই তিনি ঐ পদে বহাল হতে পেরেছিলেন। তাঁর আগেও প্রিন্সিপাল ছিলেন যিনি তিনিও ছিলেন রয়েল কলেজ অফ আর্টের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। লণ্ডনের ঐ গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত শতাধিক বৎসরের আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বহু কৃতী ছাত্র সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করে ইংলণ্ডকে গৌরবান্বিত করেছেন। আজকের জগতে সুপরিচিত ভাস্কর শ্রীহেনরি মুর ও বিখ্যাত জলীয় রঙের পদ্ধতিবিদ জন ন্যাশ ছিলেন ঐ কলেজেরই অধ্যাপক। এই কারণেই আমার কাছে তখন রয়েল কলেজের একটি ডিপ্লোমা যেন মহামূল্য বলেই মনে হত। ছোটবেলা থেকে যা কিছু দুষ্প্রাপ্য বস্তু ও দুঃসাধ্য কাজ তার পিছনে ছোটাই ছিল আমার স্বভাব, তাই কলকাতা আর্ট স্কুলের মাত্র প্রথম বৎসরের ছাত্র হলেও রয়েল কলেজের ডিপ্লোমাটা জোগাড় করার উদ্দেশ্য নিয়েই লণ্ডনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। শুনেছিলাম নরনারীর এনাটমি ও লাইফ ষ্টাডিতে পারদর্শী না হলে বিলেতের আর্ট স্কুলে পাত্তা পাওয়া যায় না; কিন্তু কলকাতায় তখন মডেল মেলা প্রায় অসম্ভব ছিল এবং পেলেও সেই মডেল নিয়ে লাইফ-ষ্টাডী করার জায়গা আমার তখনকার বাসস্থান জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে কখনই হত না। তাই সদ্য নির্মিত সাদার্ণ এভিনিউতে লেকের গায়ে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিজের শিক্ষার জন্যই খুলেলাম একটা স্কেচিং স্কুল। কিন্তু মডেল পাওয়া হল এক সমস্যা। আমার এই খেয়ালের ভিতর অন্য উদ্দেশ্য আছে হয়তো এই ভেবেই দালাল মারফৎ এক মহিলা ফিল্ম ষ্টার একদিন খবর পাঠালেন যে, নগ্ন দেহে তিনি পোজ করতে রাজি আছেন। অবশ্য ঘণ্টায় ৭০, টাকা তাঁর পারিশ্রমিক। শুনে বুঝলাম তিনি আমাদের উদ্দেশ্যটা ভুল বুঝেছেন। তাই দালালটিকে নিরাশ করেই ফিরিয়ে দিতে হল। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম একটি মহিলার, যিনি বম্বের বহু নাম-করা আর্টিস্টের স্টুডিওতে কাজ করে এসেছেন। তাকে নিয়েই সুরু হ'ল আমাদের ক্লাস। এই ক্লাসে আমার সঙ্গে কাজ করতো কানওয়াল কৃষ্ণ, রথীন মৈত্র, পার্শি আর্টিস্ট এরিক ভিয়ন্তিওয়ালা, অজয় চৌধুরী ও কিষণ খান্না ইত্যাদি কয়েকজন। কথা ছিল সকলে সমান-ভাবে এর ব্যয়ভার বহন করবে, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সমস্ত খরচটাই আমার ঘাড়ে পড়ছে। তখন আমার একটা স্পোর্টস মোটর থাকায় ক্লাস ফ্রেণ্ডদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে প্রায়ই মোটরে তাদের বাড়ী পোঁছে দিতে এবং বাড়ী থেকে তুলে আনতে হত। এইভাবে ব্যয়ভার বেড়েই চলেছিল। ক্লাসটা আমায় শেষে বন্ধ করতেই হল। যদিও এর মধ্যেই আমার কাজ সংগ্রহ হয়ে গেছিল অনেক। তবু লণ্ডনে এসে ভারতীয় হাইকমিশনারের দপ্তরে শুনলাম শিল্পী হিসেবে যত ভালোই হই না কেন, যতক্ষণ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা পরিচয়পত্র না দেখাচ্ছি, ততক্ষণ আমার ভর্তি হওয়ার জন্য তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। ভেবেছিলাম পাসপোর্টে যা লেখা আছে সেইটাই যথেষ্ট পরিচয় তাই দেশের আর কারুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে আসিনি। ছাত্র বিভাগের পুরাতন কর্মী শ্রীগাস্পার স্পষ্টই বললেন, দেশে আমি জেলের কয়েদি ছিলাম কিনা তা তো আর পাসপোর্টে লেখা থাকে না, কাজেই কি করে আমাকে তিনি রেকমেণ্ড করার দায়িত্ব নেবেন। অগত্যা জিজ্ঞেস করলাম, আমার একটি সি-আই-ই উপাধিভূষিত লণ্ডন প্রবাসী আত্মীয়ের চিঠিতে কাজ হবে কিনা। কিন্তু তাঁর নামে কাজ হল না। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এখন যিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট তিনি তখন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। আমাকে চিনতেন। তাই বললাম তাঁর কথা শ্রীগাস্পারকে এবং তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলে শ্রীগাস্পার আমায় সাহায্য করতে রাজি হলেন।

বাড়ী গিয়ে স্যার সর্বপল্লীকে আমার বিপদের কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিলাম, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে শীঘ্র কোন উত্তর এলোনা দেখে আবার শ্রীগাস্পারকে জিজ্ঞেস করলাম জেনিভার উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমার একটি বন্ধুর চিঠি পেলে চলবে কিনা। তিনি বললেন চলবে, তাই এবিষয় বন্ধুটিকে লিখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেয়েছিলাম। তবে লণ্ডনে নিজের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বহুদিন বাইরে থাকার ফলে তিনি একটু সন্দিহান ছিলেন, তাই ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব ভারতীয় হাই কমিশনার স্যার অতুল চাটার্জিকে আমার বিষয় জানিয়ে আমাকে লিখেছিলেন স্যার অতুলের সঙ্গে দেখা করতে। গ্রেজ ইনের কাছে স্যার অতুলের বাসায় গেলে তিনি আমায় ঘরের গ্যাস রিং-এ স্বহস্তে এক কাপ চা বানিয়ে পান করতে দিলেন এবং নিজের জন্যও এক কাপ বানিয়ে পান করতে করতে দু একটি কথা জিজ্ঞেস করে শ্রীগাস্পারকে একটি চিঠি লিখে দিলেন, এটা ওকে দিয়ে দেখুন কি হয় তারপর দরকার হলে আবার আমায় জানাবেন। স্যার অতুলের যে কি মূল্য সে সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না, তাই জেনিভার বন্ধুটিও আমাকে আর একজনের উপর ঠেলে দিচ্ছেন দেখে একটু সন্দেহ হল। আমার কিন্তু বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করেও তেমন কিছু আশ্বাস পেলাম না তাই ভেবেছিলাম, রয়েল কলেজের ডিপ্লোমাটা নিতান্তই ভাগ্যে বুঝি নেই। তবু শ্রীগাস্পারের কাছে গেলাম পরের দিন। জেনিভার বন্ধুটির কাছ থেকেও কোন পরিচয় পত্র আসেনি শুনে আমি যে একজন প্রতারক হয়তো এবিষয় নিঃসন্দেহ হয়েই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন, কিন্তু স্যার অতুল চ্যাটার্জি বলে কারুর কাছ থেকে একটি চিঠি এনেছি শুনে আবার তিনি ফিরে তাকালেন এবং আমার হাতে চিঠির খামের উপর স্যার অতুলের পরিচিত হস্তাক্ষর দেখে সাগ্রহে চিঠিটা নিয়ে পড়ে ফেললেন। এর পর তাঁর ব্যবহারের পরিবর্তন দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যে লোক একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলতেও অনিচ্ছুক ছিলেন, এখন তিনিই নিজের সিট থেকে উঠে আমাকে বসতে বললেন। আমাকে কিভাবে সমাদর করবেন তা যেন তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না। বললেন,

লণ্ডনে ভারতের প্রথম হাই-কমিশনার এবং এখন ভারত সচিবের যিনি উপদেষ্টা তিনি যাকে জানেন তার আর কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আমাকে অযথা ঘুরিয়েছেন বলে ক্ষমা চাইলেন এবং বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে দিলেন। তারপর রয়েল কলেজের রেজিস্ট্রারকে টেলিফোনে আমার কথা বলে আমাকে সেইদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। ভেবেছিলাম এইখানেই ভর্তি হওয়ার ব্যাপারের শেষ, কিন্তু দেখলাম তা নয়। অনেকদিন হল কলেজের নতুন টার্ম সুরু হয়ে গেছিল। রেজিস্ট্রারের কাছে শুনলাম স্যার অতুলের চিঠির জোরে এই অসময়েও আমাকে তাঁরা নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার সমস্ত কাজের একটা প্রদর্শনী এবং একটা লাইফ স্টাডি দিয়ে পরীক্ষা করার আগে নয়। সেদিন বাসায় ফিরে দেখি স্যার সর্বপল্লীর কাছ থেকেও একখানা চিঠি এসেছে। কিন্তু তাঁর চিঠির আর দরকার হয়নি। যাই হোক আমার কাজের একটা প্রদর্শনীর পর একটি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মেলাটো মেয়ের প্রতিমূর্তি বানাতে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করে অবশেষে কলেজের অধ্যাপক সভা আমায় ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হলেন। ওখানকার নির্দিষ্ট কোর্স শেষ করে বছর আড়াই পর ডিপ্লোমাটাও পেয়েছিলাম। তবে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসানের পর ঐ ডিপ্লোমার আজ আর তেমন কোন মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। যাই হোক কলেজে ছাত্র হিসেবে কায়েম হবার পর জেনিভায় গিয়ে সেখানে আমার বন্ধুটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছিলাম। সে সুযোগ এলো ইস্টারের ছুটিতে। সেটা ছিল ১৯৩৭ সাল। চারদিকেই তখন অস্থির রাজনৈতিক বিক্ষোভ। আর জেনিভায় তখন লীগ অফ নেশনসের বৈঠক হয় বলেই বিশ্বের নজর পড়েছে ঐ সহরটির উপর। আমি [illegible] প্যারি ও মন্টিকার্লোয় কয়েকটা দিন কাবার করে [illegible] শেষে জেনিভায় এসে। আমার পৌঁছবার দিনক্ষণ উল্লেখ করে বন্ধুটির কাছে প্যারী থেকে একটি চিঠি কেবল পাঠিয়েছিলাম। তাই ব্লু ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমেই দেখতে পেলাম বন্ধুবরও একটি ব্লু স্যুট গায় দিয়ে আমাকে রিসিভ করতে এসেছেন। ব্লু ট্রেন রাত্রিতে চলে এবং এতে এত ভালো শোবার ব্যবস্থা থাকে যে, প্রায় মনে হয় বাড়ীতেই আছি। এতে শুধু উচ্চশ্রেণীর কামরাই থাকে এবং সাধারণ ট্রেনের চেয়ে ভাড়াও একটু বেশী। নিশ্চিন্ত মনে আরামে ঘুমিয়ে আসতে পেরেছিলুম বলেই ভোরবেলায় যখন ট্রেন থেকে নামলুম শরীরে তখন ক্লান্তির লেশমাত্র ছিল না। হোটেল বালমোরাল জেনিভার একটি নির্জন রাস্তার উপর ছোট্ট পাঁসিয়, ওখানে টমাস কুক মারফৎ আগে থাকতেই একটা কামরা রিজার্ভ রাখা ছিল। তাই কোথায় উঠবো সে নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হয়নি। বন্ধুবর আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে অফিস ফেরতা আবার খবর নিতে আসবেন বলে তখনকার মতন বিদায় নিলেন। একটু বিশ্রাম করে চায়ের সময় নীচের লাউঞ্জে বসেছিলাম এমন সময় বন্ধুবর এসে বললেন, "চলুন বাইরে আমার সঙ্গে একটু চা খাবেন আর রাত্রিতেও আমার গৃহিণীর অনুরোধ আমার বাসাতেই আপনার নৈশভোজন করতে হবে।" চায়ের জন্য জেনিভায় বিখ্যাত লেকের ধারে একটা নামজাদা কাফেতে আমরা পৌঁছলাম। একটি আমেরিকান তরুণী আগেই আমাদের জন্য একটি টেবিল দখল করে রেখেছিলেন, বন্ধুবর তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। মেয়েটিরও তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল তাই চায়ের পালা শেষে মেয়েটির উপর আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাবার ভার দিয়ে আবার তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন। মেয়েটির অনুরোধে জেনিভার চৌরঙ্গী কো উইলসন দিয়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে আন্তর্জাতিক জার্ণালিস্টদের একটি ক্লাবে এসে পড়লাম। ক্লাবটা চলে আমেরিকান টাকায়। আমার সঙ্গিনী আমেরিকান মেয়েটি হল ঐ ক্লাবের সুপারভাইজার। আমেরিকা থেকে তাঁকে সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে। এই ক্লাবে সেইদিন আমার সঙ্গে আলাপ হল ওখানকার ওয়ার্ডেন বা কর্ত্রী কাউণ্টেস জয়েটকফের সঙ্গে। কাউণ্টেসের বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। তাঁকে এক অসাধারণ সুন্দরী বলা যায় না, তবে তাঁর চেহারায় ছিল স্পষ্ট একটা জার বংশীয় আভিজাত্যের ছাপ। তাঁরই মতন রাশিয়া থেকে বিতাড়িত আরো অনেক জার-বংশীয় লোক প্যারিস অথবা লণ্ডনে হোটেল চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হলে কাউণ্টেস বললেন তিনি কোনদিন ভারতবর্ষে যাননি কিন্তু শিশুকাল থেকেই ভারতবর্ষের প্রতি ভীষণভাবে তিনি আকৃষ্ট। আমি যে আজ তাঁদের ক্লাবে এসেছি এটা তিনি পরম সৌভাগ্য মনে করেন। এবং সেই রাতে তাঁদের ক্লাবের নৃত্যসভায় আমাকে বিশেষ করে আসতে অনুরোধ করলেন। এই রকম খাতির পাওয়াটা তখন আর আমার কাছে নতুন ছিল না। জানি না আমার কোন্ গুণের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইউরোপের সর্বত্রই আমি প্রচুর সহানুভূতি ও সমাদর লাভ করে এসেছি। আসবার সময় স্যার ফ্রাঙ্ক ব্রাউন, যিনি [illegible] পুরাতন পাওনিয়র পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও তখনকার লণ্ডন টাইমস পত্রিকার ভারতীয় বিভাগের সম্পাদক বাঙলার বৃটিশ গভর্ণরের কাছে একটি পরিচয়পত্রে আমার বিষয় লিখেছিলেন—"তিনি আশা করেন ইউরোপে আমার সাফল্য আমার মাতৃভূমি বাঙলাতেও বজায় থাকবে" কিন্তু ৪১ সালে যে সময় দেশে এলাম লোকে তখন বোমার ভয়ে দেশ ত্যাগ করতেই ব্যস্ত। হাওড়ার পুল ভেঙে পড়ার জোগাড়। তাইতে আবার চলে গিয়ে নানা কাজের মধ্যে পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারতে ১৫ বছর কাটিয়ে সবে কিছুদিন বাঙলায় ফিরেছি। বন্ধুর বাসায় নৈশ ভোজন সমাপ্ত হলে জার্নালিস্ট ক্লাবে নাচের আসরে পৌঁছলাম। সেখানে কাউণ্টেস যে সব লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক বিদেশী জার্নালিস্ট আর একটি প্রৌঢ়া আমেরিকান মহিলা মিসেস বার্জেস ও তাঁর পরমাসুন্দরী নাতনি লরা। পরে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে তাঁদের দেশে চিকাগোয় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেইদিন আরো আলাপ হয়েছিল জর্জ হুসার বলে একটি অতি বুদ্ধিমান হাঙ্গেরিয়ান ছেলের সঙ্গে, আমি না যাওয়াতে মিসেস বার্জেস যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। এদের কাছ থেকে লণ্ডনে গিয়ে দু'একটা চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু উত্তর না দেওয়ার ফলে আজ আর কোন সংযোগ নেই। কে জানে আজ তারা কোথায়। পরের দিন প্রোগ্রাম অনুযায়ী দুপুরের দিকে গেলাম লীগ প্রাসাদ পরিদর্শনে। নৈশ ভোজনের সময় বন্ধুর বাসাতে একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যিনি লীগের একজন লাইব্রেরীয়ান। দুপুরে সময় কাটাবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কথায় কথায় শুনলাম তিনি ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। কিন্তু একটি ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য তাঁকে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। সেই থেকে বাপ-মার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই। এই মেয়েটিই লীগের বাড়ীটা আমায় ঘুরে ঘুরে দেখালেন, একদিকের দেওয়ালে দেখলাম মেক্সিকান শিল্পী দিয়েগো রিভেরার আঁকা অসমাপ্ত ছবিগুলো কিন্তু সেই অসমাপ্ত ছবি থেকেও পাওয়া যায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়। তারপর লীগের লাইব্রেরিতে ভারসাই চুক্তির থেকে আরম্ভ করে হোয়াইট স্লেভ ট্রাফিকের পর্যন্ত কতকগুলো দলিলপত্র দেখে বন্ধুর অফিসে গিয়ে হাজির

(ইহার পর ২৫৮ পৃষ্ঠায়)।

জীবনের উপকূলে ছুঁয়ে
দেখেছি অনেক ভীরু রাত
স্মৃতির পণ্যের ভারে
হৃদয়কে করেছে অস্থির;
কবে কোন্ দূর দিনে
একখানি নির্জন কুটীর,
অজস্র ক্লান্তির শেষে
আবেশ-বিভোর দুইহাত
আদরে সোহাগে স্নিগ্ধ
বিলিয়েছে—প্রাণ-পারিজাত
আমার ভিখারী মনে,
দুইচোখে প্রণয়-মদির
স্বপ্নের আল্পনা আঁকে
সীমাহীন ব্যাকুল গভীর,—
প্রাণে আনে সুরভিত
রোমাঞ্চের অনেক মৌতাত!

তবু এ অলীক-কল্প:
এ স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে
আচ্ছন্ন জীবন নিয়ে
শামুকের মতো আত্মলীন
যদি বা নিজের প্রতি
চোখ মেলে দেখি ভোজবাজী,
কোথায় বসন্ত-স্বাদ?
কোথায় বা ইসারা প্রেমের?
বকেয়া ভাড়ার দায়ে
বাসা ছাড়া বিমুক্ত বৈরাগী।—
নীলচে আকাশ দূরে।
আশেপাশে ধূসর দীনতা।

—

সোবিয়েৎ দেশের নাট্যশালা

শচীন সেনগুপ্ত

গত জুলাই মাসে তিন সপ্তাহকাল আমরা সোবিয়েৎ দেশগুলি এবং চেকোস্লোভাকিয়া দেখবার সুযোগ পাই। মাত্র তিন সপ্তাহে বিরাট সোবিয়েতের কতটুকুই বা জানা যায়, বোঝা যায়, এ প্রশ্ন যাবার আগে আমাদের মনে উঠেছিল। কিন্তু যাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে করে ওই অল্প সময়ে আমরা অনেককিছু দেখতে পাই। স্পেশ্যাল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন, চারখানা এরোপ্লেন, বাস চারখানা, অনেকগুলো মোটরগাড়ী তাঁরা আমাদের যাতায়াতের জন্য তৈরি রেখেছিলেন ও-ব্যাপারের সময়ের অপচয় নিবারণ করবার জন্য। সকাল ন'টা থেকে শুরু করে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত খাবার সময় ছাড়া আমাদের বিশ্রামের অবকাশ থাকত না। যাতায়াতের পথে আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য কেবল ইন্টারপ্রেটাররাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন না, অনেক জায়গায় শ্রমিক-কর্মীদের নায়করা এবং সরকারী সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য দপ্তরের উপমন্ত্রীরা, মন্ত্রীরাও সাহচর্য দিতেন।

যখনই যে প্রতিষ্ঠান দেখতে গেছি, তখনই দেখতে পেয়েছি সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা আমাদেরকে সাহায্য করবার জন্য সবাই এসেছেন। একটি প্রতিষ্ঠান দেখবার আগে [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] জবাব দিয়েছেন, [illegible] প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু [illegible] প্রতিষ্ঠানটি [illegible] দিয়েছেন। [illegible] মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, [illegible] প্রাসাদ, [illegible] দেখবার, [illegible] সবেতেই [illegible]।

কেবল যে [illegible] কিন্তু নয় [illegible] ব্যবস্থা, [illegible] কাজ [illegible] নিয়ম আছে। [illegible] ইউনিয়নের [illegible] প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই [illegible] দেখবার শুধু যে [illegible] যায় তা নয়, প্রতিষ্ঠানটির [illegible] মর্ম বুঝতে পারে।

মস্কোতে যে একটি [illegible] তোলা হয়েছে, তা যেমন একটি মিউজিয়াম, তেমনি একটি প্রমোদ-কানন, তেমনই একটি জন-বিশ্ববিদ্যালয়। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ষোলটি রিপাবলিকের ষোলটি ভবন নির্মিত হয়েছে, সেই ষোলটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকের নিজস্ব স্থাপত্যরীতির অনুসরণে। যে রাষ্ট্রের পরিচয় [illegible], তাতে সেই রাষ্ট্রের সকল কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্যই যে কেবল রাখা হয়েছে তা নয়, সেই রাষ্ট্রের অতীত সব-কিছুই চিত্রের সাহায্যে, চার্টের সাহায্যে, ফটোগ্রাফে ধরা হয়েছে। [illegible] আছেই। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে কৃষি শিল্পের সহায়তার জন্য যত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তার সবই দেখতে পাওয়া যায় এই প্রদর্শনীতে, যেমন দেখতে পাওয়া যায় তাদের ক্রম-পরিবর্তন এবং ক্রমোন্নতি। নিয়ম করে প্রতি ইউনিয়ন নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীকে এই প্রদর্শনী দেখতে পাঠায়। তারা আসে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের কেউ কেউ সঙ্গে করে খাবার নিয়ে আসে, কেউবা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত সস্তা ভোজনালয়ে খেয়ে নেয়। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুটা সময় টেলিভিসন ছবি দেখে নেয়, অথবা নানা রঙের ফুলের বাগানে, ফোয়ারার ধারে, ঘাসের গালিচায় শুয়ে বিশ্রাম করে। দলে দলে প্রতিদিন এমনি করে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কর্মীদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই জন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করবার জন্য।

প্রদর্শনীটি একটি শহরবিশেষ। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা, নানারঙের ও ধরণের ফোয়ারা, রকমারি রঙের ফুলের বাগান। সব ছাপিয়ে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে আকাশচুম্বী একটি স্তম্ভশীর্ষে বিচিত্র ভাস্কর্যে গঠিত একটি শ্রমিক ও একটি কৃষক-রমণীর যুগলমূর্তি—সোবিয়েতের মূল শক্তির পরিচয়। রাত্রিবেলায় নানা বর্ণের আলো যখন অসংখ্য ফোয়ারার জলে প্রতিবিম্ব ফেলে, ফুলের কেয়ারির পাশে পাশে হাসিমাখা মুখে ছেলে-মেয়েরা, [illegible] যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন দেখলে মাঝে মাঝে ভ্রম হয় বুঝিবা স্বপ্নপুরী। [illegible] কিন্তু স্থায়ী কৃষিশিল্পের প্রদর্শনী—একটি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে পুঁথি না পড়েও অযুত [illegible] জ্ঞান সঞ্চয় করছে।

(২)

এ সব কথা বলবার জন্য আমার কাছে লেখা [illegible] হয়নি, কেননা সাধারণ হয়েছে নাটুকে লোক নাটকের কথাই শোনাবে—আর ওসব কথা লিখবে হয় [illegible], নয় পাকা রাজনীতিবিদরা। আমি [illegible] নিয়েও নিজের গণ্ডি দিয়ে ধানভানা শুরু করেছি কেন, তার একটা কৈফিয়ৎ যুগান্তরের নাট্য বিভাগের সম্পাদক এবং তার পাঠক-পাঠিকারাও [illegible] চাইতে পারেন। তাই কৈফিয়ৎটা দিয়ে রাখি।

সকলেই শুনেছেন সোবিয়েৎ রাষ্ট্র কৃষক শ্রমিকের রাষ্ট্র। তার অর্থ কি? আসল অর্থ হচ্ছে জন-পরিচালিত রাষ্ট্র। সে জন হচ্ছে কৃষক আর শ্রমিক। আর সে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে প্রতি জনকে এমন করে গড়ে তোলা, যাতে করে সামগ্রিক গণজীবন শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সৃজন-প্রতিভা অর্জনে সমভাবে বিকশিত হতে পারে। কিন্তু ওই কৃষক আর শ্রমিক ছাড়া আর কেউ কি কিছুই নয়? না। ওদেশের সংবিধান বলে সবাইকেই কাজ করতে হবে। কাজ যে করবে, সেই ওয়ার্কার, সেই শ্রমিক। সকলকে কাজ দেবে কে? রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে তাই। কি কাজ রাষ্ট্র দেবে? গণজীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হলে যা যা করা দরকার, তাই করাই কাজ। তাই, যারাই কাজ করবে, তারাই শ্রমিক, তাই, কৃষক ও শ্রমিক বলতে বয়স্ক ও কার্যক্ষম সকলকে বোঝায়, শিশু আর অথর্ব বৃদ্ধ ছাড়া সকলেই, বাদ কেউ পড়ে না। কাজ যেমন দেওয়া হবে, তেমন কুকাজ করতেও দেওয়া হবে না—যেমন নীতিগত কুকাজ, তেমন আদর্শগত কুকাজ। ব্যক্তি-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার কাজকে আদর্শগত কুকাজ বলে ধরা হয়। তা কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না। কাজের আদর্শ হওয়া চাই, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' আদর্শেরই মতো।

বিপ্লবের পর এই আটত্রিশ বছরে সোবিয়েৎ রাষ্ট্রগুলি, এশিয়ান রাষ্ট্রগুলিও প্রতি বয়স্ক সক্ষম নরনারীকে কাজ দিয়েছে, প্রতিলোকের অন্নের সংস্থান করেছে, বাসস্থান গড়ে দিয়েছে, নিরক্ষরতা দূর করেছে, ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করেছে, উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, বহু কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে এমন দক্ষ করে তুলেছে যে, তারা নবদৃষ্টি লাভ করেছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে, সাহিত্যকে নতুন প্রাণ দিয়েছে, চারুশিল্পকে দিয়েছে নতুন রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইজেনহাওয়ার যে বই লিখেছেন, তাতে তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন—যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে দুটি রাষ্ট্র সম-শক্তি নিয়ে আর সকলকে অতিক্রম করে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, তারা হচ্ছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আর সোবিয়েৎ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রগুলি এই শক্তি অর্জন করেছে যুদ্ধে জয়ী হয়ে নয়, যা করলে যুদ্ধ জয় করা যায় তাই করে, অর্থাৎ জ্ঞানে বিজ্ঞানে সংগঠনে এবং সঙ্ঘ-শক্তিতে শক্তিমান হয়ে। কিন্তু তাতেই তারা পরিতৃপ্ত নয়। তারা জানে দৈনন্দিন জীবনযাপনের দুশ্চিন্তা থেকে সকলে যদিওবা মুক্ত হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনের অধিকার যদিও সবাইকে দেওয়া হয়েছে, সকল মানুষ এখনো বিকশিত হয়নি। তাদেরকে বিকশিত করবার ব্যাপক আয়োজন এখনো করে যেতে হবে, সঙ্ঘ-শক্তির বিকাশকে সংস্কৃতির বিষয় করে তুলতে হবে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সংস্কারকে মানুষের মন থেকে দূর করে দিতে হবে। তাই সে সব প্রতিষ্ঠানকেই যেমন কাজের প্রতিষ্ঠান করেছে, তেমন জন-বিশ্ববিদ্যালয় করেও গড়ে তুলেছে। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের নতুন কালচার হচ্ছে এই। মিউজিয়াম, লাইব্রেরীর মতো, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদর্শনীর মতো, স্কুল-কলেজের মতো নাট্যশালাও এই কালচারকে প্রতিষ্ঠা দেবার কাজ করে চলেছে। নাট্যশালার কি করণীয় বলে ওরা স্থির করেছে, সেই কথাটি বোঝার জন্যই ওপরের কথাগুলো বলা প্রয়োজন মনে করেছি। যাঁরা ও অংশটা অবান্তর মনে করবেন, তাঁরা গল্প শুনতেই চান। তাঁদেরকে আমি খুসি করতে পারব না; কেননা গল্প লিখতে আমি জানি না। এবার নাট্যশালার কথাই বলি।

(৩)

সোবিয়েতের সর্বত্রই প্রতি রাতেই আমরা নাট্যশালায় গিয়েছি, কিন্তু নাটকের অভিনয় দেখিনি কোথাও। এখন গরমের ছুটি তাই শহরের বড় বড় দলগুলি শহরে নেই। কোন কোন দলের অভিনেতৃরা আর কর্মীরা স্বাস্থ্য-নিবাসে গিয়েছেন, কোন কোন দল মফঃস্বলে অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন, কোন কোন দল নতুন নাটক, নতুবা অপেরা, নতুন ব্যালে তৈরি করছেন, কোন কোন নাট্যশালার সংস্কার চলেছে।

আমরা যে-সব অপেরা আর ব্যালে দেখেছি, তা যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা সবাই মফঃস্বল থেকে এসেছেন। মস্কোর 'বোলশয় থিয়েটারে' আমরা যাঁদের অভিনয় দেখেছি, তাঁরা এসেছেন সাইবেরিয়া থেকে। সাইবেরিয়া যে সংস্কৃতির দিক দিয়ে খুবই অগ্রসর, আমাদের ধারণায় তা কোনদিনই ছিল না। অভিনয় দেখে সন্দেহই হয় না যে বোলশয় দলের অভিনয় দেখছি কিনা। আমাদেরকে যদি না বলে দেওয়া হোতো, তা হলে আমরা, অন্ততঃ আমি, ভাবতেই পারতাম না যে একটি সাইবেরিয়ান দলের অভিনয় দেখছি। এ কথা বলছি এইজন্য যে, যখনই যেখানে যে দলেরই অভিনয় দেখেছি, তাতেই সমান নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছি। এমনকি পেশাদারী যাঁরা নন, তাঁদেরও অভিনয়ে, নাচে আর গানে এমনই নিপুণতার পরিচয় পেয়েছি যে, সন্দেহই করিনি যে তাঁদের পেশাদার অভিনয় নয়, নাচ-গানও নয়; তাঁরা আসলে শ্রমিক, দৈনিক আট ঘণ্টা দৈনন্দিন কাজ করবার পর, নিয়মিত কঠোর অভ্যাস করে, ওই নৈপুণ্য অর্জন করেছেন। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকিও নেই। থাকবে কেন? নতুন কালচারকে ফুটিয়ে তুলতে যে তাঁরা বদ্ধপরিকর। ছেলেবেলা থেকেই যে ওই সংকল্পে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। শুধু অভিনয়ে, নাচে ও গানে কেবলই নয়, দেহ-চর্চায়, ব্যায়ামে, খেলাধুলায়, সাঁতারে এবং নানা রকমের সংগঠনের কাজে এই শ্রমিক অ্যামেচারদের দান জাতির নানা শক্তি বৃদ্ধি করেছে। শহর থেকে যে-সব ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় মফঃস্বলে যায়, তাঁরা সেখানে থেকে নানা রকমের লোক-নৃত্য, লোক-সঙ্গীত শিক্ষা করে আসে। তাদেরও নাচ দেখেছি, গান শুনেছি। মনেই হয়নি যে, তারা শহরের ছেলেমেয়ে। আমাদের দেশে বহু ভাষা এবং লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের পার্থক্যও অনেক। সোবিয়েৎ দেশে আরো বেশি ভাষা এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশেও পার্থক্য আরো অনেক বেশি। কিন্তু মস্কোতেই থাকবার সময় দেখেছি মস্কোরই তরুণ-তরুণী শ্রমিকরা কত বিভিন্ন ভাষার লোক-সঙ্গীত শুনিয়েছেন, কত রকমেরই না লোক-নৃত্য দেখিয়েছেন। ও-সব লোক-সঙ্গীতকে ও লোক-নৃত্যকে তাঁরা আদৌ আধুনিক করতে চাননি। আবার আধুনিক নৃত্য-গীতকেও পরম্পরাগত লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাননি। অতীতের পল্লী জীবনের রোমাণ্টিক আবেদন সুরে লয়ে তালে ছন্দে এবং বর্ণোজ্জ্বল পোষাকে তাঁরা ফলিয়ে ধরছেন ওই লোক-নৃত্যের ও লোক-সঙ্গীতের সাহায্যে এবং আধুনিক লোক-সঙ্গীত আর লোক-নৃত্য তাঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন, যাতে করে নিত্যকার কাজে যে ছন্দ আছে, লয় আছে, তাল আছে, সৌন্দর্য আছে, তাকেও রূপায়িত করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, কাজও কেমন করে আর্ট হয়ে উঠতে পারে। জাহাজের খালাসীদের নাচ, কারখানার কারিগরদের নাচ, এমনকি ফুটবল খেলার নাচ প্রভৃতি দেখে যে কেবল আনন্দই পাওয়া যায় তা নয়, প্রেরণাও পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ নাচ, গান ও অভিনয়ের যে-সব প্রতিষ্ঠানে প্রফেসনাল বা পেশাদারী নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করেন, সেগুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত; আর সৌখীন সম্প্রদায় যে-সব অভিনয় করেন, তা পরিচালনা করেন ওই সব সম্প্রদায়ের শিল্পীরা যে যে ইউনিয়ানের অন্তর্ভুক্ত সদস্য, সেই সেই ইউনিয়ন। তাই সরকারী নাট্যশালা যেমন সর্বত্র, তেমন ফার্ম ফ্যাক্টরী বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছুর সঙ্গেই থাকে অভিনয়ের নাচের-গানের অসংখ্য দল। সরকার পরিচালিত এবং ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দলগুলি ছুটির সময় শহর থেকে মফঃস্বলে যায়, মফঃস্বল থেকে শহরে আসে। দেশময় অগণ্য দলের যাওয়া-আসা যেন সংস্কৃতির ও আনন্দের প্রবাহ। সব সোবিয়েৎ রিপাবলিকগুলিকে এই সাংস্কৃতিক বিনিময় এমন একটি সাংস্কৃতিক রূপ দিয়েছে, যা জাতিগুলিকে তাদের গণ-অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন রাখছে এবং সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখছে না। নব নব প্রতিভার অধিকারীর সন্ধান নিত্যই পাওয়া যাচ্ছে। তাদের আবির্ভাবে এই সব শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে এদের সচেতন রাখবার জন্য নানা সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে থেকে কলাপ্রতিভা নাট্যকারগণ অভিনেতারা গায়ক-গায়িকারা নানা অনুশীলন করছেন, গবেষণা করছেন এবং সকল প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ান তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন।

চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী

চিত্রজগতে নবাগতা শ্রীমতী শুক্লা সেন

Asian Film Parade
INDIA

নারগিস

সন্ধ্যারাণী

নভা গুপ্ত

বিকাশ রায়

রাজ কাপুর

Asian Film Parade

INDIA

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

কাবেরী বসু

দিলীপকুমাব

মধুবালা

কাই কাই থে

মু হুঙ

চ্যাঙ চেঙ-ওয়েন

উ চেঙ-হুঙ

মিচিয়ো কোগুরে

হিডেকো টাকামিনে

মাচিকো কিয়ো

চো-চো-সান - কাওরু ইয়া চিগুসা

লিউ এন-

লিন দাই

লি লি হুয়া

জীবনী-চিত্র

• শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ •

আজকের দিনে আমাদের দেশে জীবনী-চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা বলে শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে আমি গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে। জাতি গঠনের প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশী। দেশের লোক যদি মানুষের মত মানুষ হয়, তবে সে জাতিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তারা নিজেরাই উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে উঠে—কর্মের প্রেরণাকে অনুভব করে, জাতির সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অভাব-অভিযোগ অচিরেই দূর করে ফেলতে পারবে।

আমাদের অন্নাভাব আছে, দারিদ্র্য আছে, অশিক্ষা আছে, কুসংস্কার আছে, ধর্মান্ধতা আছে, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতির অভাব আছে। রোগ-ব্যাধি প্রতিকারের উপায় পর্যন্ত আমাদের ভাল করে জানা নেই; কিন্তু সব অসম্পূর্ণতা দূর হবে, জাতি যেদিন মনুষ্যত্বের প্রেরণায় উদ্বোধিত হবে। বন্যা এলে যেমন মজা খাল, বিল, নর্দামা, পানাপুকুর সব সংস্কার হয়ে যায়—জাতিকে মনুষ্যত্বের প্রেরণায় উদ্বোধিত করতে পারলে তেমনি সব সমস্যার সমাধান হয়।

কিন্তু জাতির মধ্যে এ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করা যায় কি করে? এর উত্তর জীবনী-চিত্র। —জাতির এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র। মহাপুরুষদের জীবন চিত্রে জীবন্ত প্রতিফলিত দেখলে, তাঁদের জীবন্ত সান্নিধ্য আমরা অনুভব করি। তাঁদের জীবনের উচ্চ আদর্শ আমাদের জীবনেও সংক্রামিত হয়। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের উন্নত লক্ষ্য, তাঁদের দেশপ্রেম, ভক্তি, কর্মে নিষ্ঠা, সহৃদয়তা, উচ্চ মানবতা, শত বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে তাঁদের অবিচলিত সংগ্রাম আমাদের মনকে যুগপৎ আশা, আনন্দ, উৎসাহে উদ্দীপিত করে। প্রতিদিনকার নীচতা, ক্ষুদ্রতা—যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে বিষিয়ে রাখে, —তার থেকে দু'ঘণ্টার জন্যে মুক্তি পেয়ে আমরা উন্নত সঙ্গ লাভ করে উন্নত হতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহনকে আমরা চোখে দেখিনি। সে সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। আমাদের দেশকে, সমাজকে উন্নত করবার জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁরা—শত গঞ্জনা লাঞ্ছনায় ভ্রূক্ষেপ না করে, নিজ দায়িত্বে অবিচলিত থেকে গত দুই শতাব্দীতে সংগ্রাম করে গেছেন তাঁরা—তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ আমাদের নেই। ইতিহাস পড়ে যা জীবনী পড়ে তার অতি অস্পষ্ট অনুভূতিই জাগতে পারে আমাদের মনে। কিন্তু চলচ্চিত্রে রামমোহনকে ও বিদ্যাসাগরকে তাঁদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সমেত, তাঁদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামনিষ্ঠা ও মনুষ্যত্ব সমেত প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি আমরা। দুই শতাব্দীর ঐতিহাসিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম ও উন্নতির ধারা চোখের উপর দেখতে পাই আমরা। এ হয় আমাদের জীবন্ত অনুভূতি। তাঁদের পাশে তাঁদের সমসাময়িক হয়ে জন্মাতে পারলে যে অনুভূতি পেতে পারতাম—তাই পেয়ে আমরা ধন্য হতে পারি। আর তারও চেয়ে বেশী পাই—বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কর্মধারার মূল্যও আমরা যাচাই করে নিতে পারি। এমনি করেই মানবমন গঠিত হয়। এমনি করেই মানুষ বিচার করতে শেখে। যে জাতি শিক্ষায় অনগ্রসর, যে জাতির কোটি কোটি নরনারীর আজও পর্যন্ত অক্ষর পরিচয় নাই—আমাদের সেই প্রিয় ভারতবাসীর দ্রুত মানসিক উন্নতির জন্য এর চেয়ে কার্যকর এবং সহজ পথ নেই। খবরের কাগজের প্রপাগাণ্ডা ও রেডিওর প্রপাগাণ্ডা অনেক কাজ করতে পারে। কিন্তু একটু ধীরচিত্তে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে—চলচ্চিত্রে জীবনী-চিত্র প্রদর্শন করে আমরা আমাদের পশ্চাৎপদ দেশবাসীকে যত শীঘ্র এবং যত নিশ্চিতভাবে উন্নত করতে পারবো, সংবাদপত্র এবং রেডিওর দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। এ কথাটা আমি গভর্ণমেণ্টকে অনুধাবন করতে বলি। সংবাদপত্রের আবেদন ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে—শুধু মাত্র দৃষ্টির সাহায্যে। রেডিওর আবেদনও শুধুমাত্র শ্রুতির সাহায্যে। কিন্তু আধুনিক সবাক চলচ্চিত্রের আবেদন দৃষ্টি ও শ্রুতি উভয়ের সাহায্যে। তদুপরি চলচ্চিত্রে যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষের কার্যকলাপ দেখা যায়, তা মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে—বহুদিন পর্যন্ত তা ভুলতে পারা যায় না। নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মতোই স্মৃতির মন্দিরে তার স্থান থাকে। তার মহৎ স্মৃতি প্রতি মানুষের মনকে উন্নত করবেই। মনের অবচেতন স্তরে সে স্মৃতি থেকেই যায়—নিত্যকার ক্ষুদ্রতার মধ্যেও সে বিবেকের বাণীর মতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে উঠে মানুষের কর্ম ও চিন্তার গতিকে উচ্চতর ধারায় পরিচালিত করে। এ হিসাবে চলচ্চিত্রের আবেদন রেডিও ও সংবাদপত্রের আবেদন অপেক্ষা অনেক বেশী গভীর এবং কার্যকর। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন করবার আরও একটি বিশেষ সুবিধা আছে। সেটি এই যে, দেশবাসী নিরক্ষর হলেও সবাক চিত্রের আবেদন তার উপর পূর্ণভাবেই কার্যকর। আমাদের দেশে যেখানে অধিকাংশ দেশবাসী নিরক্ষর, সেখানে তাই এর চেয়ে কার্যকর এবং সহজ উপায় নেই।

আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট এখন দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা যতশীঘ্র সম্ভব দূর করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁদের দু-দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তারই পরিচয়। এজন্য তাঁরা সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করছেন। তার কিছুটা অংশ তাঁরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনায়াসেই ব্যয় করে সুফল পেতে পারেন।

সমস্ত সভ্য দেশেই আজ চলচ্চিত্রকে দেশ গঠনের কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তা সর্ববাদি-সম্মতভাবে অনুভব করা হয়েছে এবং সকল সভ্য দেশই এ কাজে যথেষ্ট অগ্রসর। আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা যাঁদের হাতে ন্যস্ত—নানা কারণে তাঁরা এদিকটায় বিশেষ নজর দিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেশবাসীর দ্রুত এবং প্রভূত কল্যাণ হবে এবং দ্রুত জাতি গঠনের যে সংকল্প আছে গভর্ণমেণ্টের মনে, কত কম খরচে এবং কত দ্রুত তা সম্পন্ন হবে, তা দেখে গভর্ণমেণ্টই আশ্চর্য হবেন।

এ কথাটা আমি বলতাম না, কারণ গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া আমার কাজ নয়—সে কাজের জন্য তাঁদের মাইনে করা (শেষাংশ ২৮৬ পৃঃ)

অরোরার 'মহানিশা' চিত্রে সন্ধ্যারাণী

অপেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ের দান

মহেন্দ্র সরকার

নৃত্য, নাটক ও সংগীতের আবেদন চিরন্তন। আদিকাল থেকে মানুষ আপন প্রয়োজনে বিশেষ করে এই তিনটি কলার সাধনা করে এসেছে বিভিন্ন ধারা ও পদ্ধতিতে। কিন্তু নাট্যকলা বা নাটক নিয়ে বাঙালী যত সাধনা করেছে ও সিদ্ধি পেয়েছে, সারা ভারতে তার তুলনা নেই। একদল বিদ্যার্থী বাঙালী ছেলে-ছোকরা ছিল এর প্রথম ব্রতী। সেক্সপীয়রের নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় দ্বারা হয় এর গোড়াপত্তন। এ হচ্ছে প্রায় দুশ বছর আগের কথা। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সেই ছেলে-ছোকরারাই পূর্বসূরীদের ব্রত উদ্‌যাপন করে চলেছে নিরলস তপস্যায়।

সাধারণভাবে এদেরই বলা হয় সৌখীন দল। এই সৌখীন নাট্যামোদীরাই বাঙলার নাট্য-প্রবাহকে আবহমান কাল ধরে সঞ্জীবিত করে রেখে দিয়েছে, বাঙালীকে করে তুলেছে নাট্যরসিক, আর আজকের চিত্রামোদী। কৃষ্টির ক্ষেত্রে এরা বাঙালীকে এনে দিয়েছে একটা অপূর্ব মর্যাদা।

শুনতে পাই এই কলকাতায় [illegible] প্রায় [illegible] সৌখীন সম্প্রদায় আছে যারা বছরে একাধিকবার নাট্যাভিনয় করে [illegible] আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীদের নাট্যক্ষুধা মিটিয়ে আসছে। শুধু নাট্যপিপাসা মিটিয়ে আসছে তাই নয়, [illegible] নাট্যামোদী ও প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী সৃষ্টি করে নাট্য-রঙ্গমঞ্চের [illegible] করে চলেছে। [illegible] ও [illegible] এদের [illegible] নাট্যরস [illegible] নয়। এরা নিজেরাই যে শুধু নাটক করে তা নয়, নিজেদের পরিচালনার নাটক [illegible] করে, [illegible] এবং [illegible] নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনা [illegible] সমাজজীবনে। এরাই [illegible] সম্বন্ধে সবার আলোচনায় [illegible] এমন কি [illegible] নাট্য ও [illegible] এসেছে, [illegible] অভিনয় [illegible] ধরে এক-একখানি চিত্র [illegible] হচ্ছে—এরও মূলে রয়েছে সৌখীনদের [illegible] প্রচার। এরাই মাঝে মাঝে [illegible] নাটক ও ছবির আলোচনা করে [illegible] নাট্যপিপাসা জাগিয়ে তুলে [illegible] নির্লিপ্ত জনকে নাটক ও ছবি দেখায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলছে।

বাঙলার নাট্যশালার ইতিহাসে অপেশাদার সম্প্রদায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা অজানা নয়। মাঝে কয়েক বছর নানা কারণে এদের নাট্য-প্রচেষ্টা কিছুটা ম্লান হয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু বর্তমানকালে বিশেষতঃ রাষ্ট্র কর্তৃক নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তার কথা ঘোষিত হওয়ার পর এবং বিশেষ করে সরকারী প্রেরণায় ও সহায়তায় দিল্লী নাট্য সংঘের উদ্যোগে কয়েক মাস পূর্বে দিল্লীতে জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং তেরটি ভাষার মধ্যে একটি বাংলা নাটক শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাওয়ায়, বাঙালী অবৈতনিক দলরা যেন আবার নতুন জাগরণের প্রেরণা পেয়েছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে প্রতিদিনই কলকাতার কোথাও না কোথাও কোন না কোন নাটক অভিনীত হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহেই একাধিক নতুন সখের দলের পত্তনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আগের বহু সম্প্রদায় তো আছেই, তাছাড়া নতুনও হচ্ছে অনেক। বহু কৃতী শিল্পী এবং কর্মী এদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন এবং কেউ কেউ নাটকের ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন—পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কাছেও আশা করা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করে এঁরা নতুন নতুন নাটক এবং অভিনয়শৈলীর পরীক্ষা করে চলেছেন—ক্ষেত্রবিশেষে সফলও হয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে—এঁদের নিজেদের কোন মঞ্চ নেই, তাই আগ্রহ ও প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সাধারণে নতুন কিছু তুলে ধরে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারছেন না। সেদিন থিয়েটার সেন্টারের নিজস্ব প্রেক্ষাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটার ওপরেই বিশেষ করে জোর দিলেন। তাঁর বক্তৃতায় জানা গেল—প্রতিষ্ঠার পর গত এক বছরে থিয়েটার সেন্টার ৭০।৮০টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা আলোচনা করে জেনেছে—মঞ্চই তাদের বেশী দরকার। কেননা মঞ্চ না থাকায় বছরের পর বছর কেটে যায়, তবুও তারা নতুন কিছু দিতে পারে না। তাছাড়া, বড় হল-এ অভিনয় করতে গেলে যে প্রমোদকর দিতে হয়, সেকথাও তাঁরা উত্থাপন করেন।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ বাদে সর্বসাকুল্যে মোট চারটি মাত্র প্রখ্যাত প্রেক্ষাগার এবং থিয়েটার সেন্টারের মাত্র ১২৫টি আসনযুক্ত ক্ষুদ্র নাট্যশালাটির পক্ষে দিনশতাধিক অবৈতনিক দলের বিরাট চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। সুতরাং যতদিন না নাট্যহিতৈষীরা এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন, ততদিন সৌখীনদের কাছ থেকে খুব কিছু একটা অভিনব আশা করা বৃথা। কিন্তু আশার কথা—এসব বাধা সত্ত্বেও সৌখীন শিল্পীরা তাঁদের সাধ্যমত লোকরঞ্জনে নিয়মিতভাবেই লিপ্ত রয়েছেন।

কিন্তু এই সৌখীনদের লোকে নিন্দেও বড় কম করে না। তার কারণও যে একেবারে নেই তা নয়। কেউ কেউ বলেন—যতসব উন্মার্গগামী ছন্নছাড়া বখাটে ছোকরারাই এইসব দলের সভ্য, অভিনয়ের আড়ালে একপ্রকার উচ্ছৃংখলতা ও ও মস্তামীর প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়াই এঁদের প্রধান কর্ম। তাঁদের মতে বর্তমান সমাজজীবনের এরা দ্রুত অধঃপতন ঘটাচ্ছে। সৌখীন নাট্যকে-দলের এ-অপবাদটা নতুন নয়। অনেক সত্যকথার মত এটাও আংশিক সত্য মাত্র—সার্বিক সত্য নয়। কেননা, এমন অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকার ও নাট্যানুরাগী এঁদের দলে রয়েছেন—চারিত্রিক নির্মলতায় যাঁরা অনেকেরই আদর্শস্থানীয়। অবশ্য বিপরীত দৃষ্টান্ত যে নেই তাও নয়। কিন্তু তাই বলে একটা বিশেষ ছাপ মেরে দিয়ে এঁদের আলাদা করে দূরে সরিয়ে রেখে দেওয়াও যুক্তির কথা নয়। কেননা, সমাজের বুদ্ধিজীবির এক বৃহত্তর অংশই আজ কোনো না কোনো দিক দিয়ে এইসব সৌখীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এঁদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে হবে, ত্রুটি যদি কিছু থেকেই থাকে তা সংশোধন করতে অগ্রণী হতে হবে এবং সেইটেই হবে প্রকৃত সমাজহিতৈষণার কাজ। অন্যথায় কৃষ্টির উন্নয়নে ব্রতী যাঁরা, সংস্কৃতির কর্মী যাঁরা তাঁদের উপেক্ষা করে চললে সমাজেরই ক্ষতি বেশী।

মহাত্মা শিশিরকুমার, গিরিশচন্দ্র ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ

(২৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কুমার নানাভাবে উৎসাহিত করায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচারে' লিখিয়াছিলেন—"......... থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয়স্থলে মারামারি, হুড়োহুড়ি করিয়া দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে?"........১৮৭৯, ১৯শে এপ্রিল, 'সুলভ সমাচার'।

'সুলভ সমাচারে' এ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' নাটক ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়। শিশিরকুমার ন্যাশনাল থিয়েটারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গিরিশচন্দ্র 'বিষবৃক্ষের' নাট্য-রূপদান করেন এবং নগেন্দ্রের ভূমিকায় অবতরণ করেন। বস্তুতঃ অমৃতবাজার পত্রিকাকে গিরিশ-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখে কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচারে' উপরোক্ত মন্তব্য করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে যখন গিরিশচন্দ্র এসেছিলেন, তখনও আমরা কেশবচন্দ্রকে গিরিশচন্দ্রের ওপর বীত-স্পৃহ দেখতে পাই। পরমহংসদেবের কাছে 'মাতাল' গিরিশকে যাতায়াত করতে দেখে, কেশবচন্দ্র ওখানে যাওয়া-আসা শেষে বন্ধই করে দিয়েছিলেন।

এক সম্প্রদায়ের কাছে গিরিশচন্দ্রের যখন এই অবস্থা, তখন পরমবৈষ্ণব শিশিরকুমার তাঁকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করে এসেছেন। ১৮৭৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্রের প্রথমা পত্নী প্রমোদিনীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত আঘাত পান এবং সমস্ত বিষয়েই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। কেরাণীর চাকরি ছেড়ে দেন, থিয়েটারে যাওয়া-আসাও বন্ধ করেন। সেদিন কিন্তু চাকরীই ছিল তাঁর একমাত্র পেশা এবং থিয়েটারের সেবা ছিল তাঁর নেশা। শিশির-কুমার যখন গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক দুর্ঘটনা ও মানসিক অবস্থার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁকে ডেকে এনে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করে, ইন্ডিয়ান লীগের হেডক্লার্ক ও কেশিয়ারের চাকুরী জুটিয়ে দেন। সেদিন শিশিরকুমার যদি গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে এ ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে উত্তরকালে মহাকবি গিরিশচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়শিষ্য ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র কোন্ পথ অবলম্বন করতেন তা কে জানে?

জীবনী-চিত্র

(২৪২ পৃষ্ঠার পর)

পদেষ্টা এবং অবৈতনিক পরামর্শ-দাতাও অনেক আছেন। তথাপি বলতে হচ্ছে এই জন্য যে, দেশসেবার ও জাতি গঠনের কার্য চলচ্চিত্র মারফৎ কত সহজে এবং ভালভাবে হতে পারে, তা আমি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় ইদানীং প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে, জাতি গঠনের কাজে চলচ্চিত্রকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করেন না। তাই তাঁরা ফিল্ম নির্মাতাদের মাঝে মাঝে ভাল ছবি তৈরী করবার মামুলী উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন। সিনেমার যৌন আবেদনমূলক ছবি দেশের কতটা ক্ষতি করছে এবং সেন্সর-কাঁচি চালিয়ে তাকে কিভাবে সংযত রাখতে হবে, এই চিন্তাতেই তাঁরা বুড়ো হয়ে গেলেন।

কিন্তু একথাটাও তো ভেবে দেখতে হয় যে, যে আগুনের সদ্ব্যবহার হলে ঘর পোড়ায়, তাকেই উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনন্ত শক্তি করায়ত্ত হয়। সবাক চিত্র সেই আগুন। এই আগুনকে কাজে লাগালে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারবেন।

গুচ্ছের যৌন-আবেদনমূলক ছবি তৈরী করতে দেওয়ার দরকার কি? এতে শুধু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ধনী হয় এবং সিনেমা ষ্টারেরা লক্ষপতি হয়। গভর্ণমেন্ট যখন অনেক কিছু লোকসানই রাষ্ট্রের কল্যাণে সহ্য করছেন,—যেমন অনেক টাকা লোকসান দিয়েও Prohibition বা মদ্য-বর্জন নীতি—তখন প্রমোদকরের লোভ কিছুটা সংযত করে, সিনেমাকেও উন্নত করতে পারেন তো।

কিন্তু শুধু যৌন-আবেদনমূলক ছবিকে সংযত করলেই হবে না—সেই সঙ্গে জীবনী-চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দিতে হবে। ঐরূপ চিত্র নির্মাতাদের পুরস্কার দিয়ে—অথবা তাঁদের প্রমোদকরের কিছুটা অংশ জীবনী-চিত্র নির্মাতাদের ফিরিয়ে দিয়ে—তাঁরা সহজেই জাতীয় কল্যাণমূলক চিত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারেন এবং সেটা করতেই হবে—নতুবা মোট বাৎসরিক চিত্রের সংখ্যা হ্রাস হয়ে চলচ্চিত্র শিল্পে হাহাকার পড়ে যাবে।

অবশ্য সমস্তটাই ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করে—পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করে চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে গভর্ণমেণ্টকে অগ্রসর হতে হবে।

এই সঙ্গে বিদেশাগত যৌন-আবেদনমূলক চিত্রের প্রদর্শনও এদেশে বন্ধ করে দিতে হবে।

'মনের ধরণী' চিত্রে নায়িকারূপে একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গিমায় শ্রীমতী সবিতা চ্যাটার্জি

নইলে শুধু দেশী ছবি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ফল আরও খারাপ হবে। International Complication-এর জন্য গভর্ণমেণ্ট বিদেশী যৌন-আবেদনমূলক চলচ্চিত্র আনা বন্ধ করতে পারবেন কিনা তা গভর্ণমেণ্টই ভাল জানেন। কিন্তু দেশের [illegible] করতে হলে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন এবং [illegible] প্রয়োজন, তা গভর্ণমেণ্টকে [illegible] করতে হবে। গভর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ—জন-কল্যাণ। সে কাজে তাঁরা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতে পারেন না।

জীবনী চিত্র নির্মাণ করা বড় শক্ত। এ কাজ করতে কর্মীদের অনেক পড়াশুনা করতে হয়। রীতিমত সবল শিক্ষা না থাকলে, জীবনী-চিত্র নির্মাণে হাত দেওয়া যায় না,—দিলে সে জীবনী পণ্ড হয়, তা আর দর্শনযোগ্যও থাকে না—তাতে দেশের কোনও কল্যাণও নেই।

এজন্য জীবনী চিত্র নির্মাণে সাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের আগ্রহ পড়া শক্ত। বিশেষ্ঠ ইদানিং জন্য খরচও বেশী হয়, সময়ও বেশী লাগে। এই সব কারণে উপযুক্ত সংখ্যক জীবনী চিত্র আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না—যদি না এতে গভর্ণমেণ্ট উৎসাহদান করতে এগিয়ে আসেন। সেটা দেশের [illegible] কারণ হবে এবং [illegible] জাতি গঠনের একটা চমৎকার উপায় হবে যে। Lives of Great-men all remind us, we can make our lives sublime তাই জাতকে sublime করতে গেলে জীবনী চিত্রেরই সবচেয়ে প্রয়োজন।

উক্ত কারণে [illegible] ছবি নির্মাণে উৎসাহ [illegible] কিন্তু [illegible] জীবনী [illegible] চিত্র [illegible] নির্মাণে উৎসাহদান করলে [illegible] কল্যাণ হয়।

সোবিয়েৎ দেশের নাট্যশালা

(২৪০ পৃষ্ঠার পর)

লায়লা-মজনু অপেরা দেখলাম। হিরোইন ষ্ট্যালিন প্রাইজ উইনার এবং সুপ্রীম সোবিয়েতের সদস্যা।

মনে পড়ে পাবলিক মিটিংয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নায়ক হিসেবে এই বাড়ীটি সম্বন্ধে বলেছিলাম —"আপনাদের মিনিষ্টার ফর কালচার কাল বলেছিলেন আমাদের একটি তাজমহল দেখাবেন। সত্যিই আমরা দেশ থেকে বহুদূরে এসে আর একটি তাজমহল দেখলাম। আমাদের তাজমহল পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম হলেও আসলে মৃতের সমাধি। কিন্তু আপনাদের এখানকার এই তাজমহল নিত্য নতুন নতুন নাটক-অপেরা ব্যালে সৃষ্টি করে মানুষকে নব জীবন দিয়ে পরিণতির পথে এগিয়ে দিচ্ছে, সকল নাটকেরই যা স্বধর্ম।"

নরনারায়ণ পরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-নৃত্য

বিভ্রাট

বাণু ভৌমিক

'সেবা...এই সেবা'—ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে চেঁচাতে মীনা ঘরে ঢুকলো।

'নেই'...উত্তর দেয় অপরা রুমমেট তনিমা।

'কোথায় গেছে?'

'সেখানে যায়' তনিমার ওষ্ঠে অর্থদ্যোতক দ্বিধা।

মীনা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হোস্টেলের ঘণ্টা বেজে উঠলো। ছেদ পড়লো বক্তব্যে।

খাবার টেবিলের দিকে এক নজর তাকিয়ে মেট্রন বলে ওঠেন 'দুজন আসেনি দেখছি।'

'সেবা আর তপতী' উত্তর দেয় একটি মেয়ে।

'তপতীর জ্বর হয়েছে ও খাবে না' মেট্রন বলেন 'কিন্তু সেবার কি হলো?'

'তাহলে আর সেবা খাবে কি করে?' কোরাসে গাইবার মত সুরে বলে ওঠে কয়েকটি মেয়ে।

হাসে সবাই।

কথাগুলি শুনতে আশ্চর্য লাগছে—তাই না?

নতুন মেয়ে সুধাও অবাক হলো।

'তপতীর জ্বর তা সেবা খাবে না কেন?'

মেয়েরা মুখ-টিপে হাসে। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন মেট্রন 'তাও জানো না, ওরা যে জোড়া পায়রা।'

বেশ লাগে দুজনকে দেখতে। মাথায় ওরা সমান। কেউ-ই বেশী লম্বা নয়। তা নইলে চেহারায় আর কোন মিল নেই। একের রং ফর্সা—কাগজের মত ফ্যাকাসে। অপরার রং চাপা। তপতীকে বয়স অন্দাজে বড় ছেলে-মানুষ মনে হয় আর সেইজন্যই বোধহয় সেবাকে অনেকটা বড় লাগে। একজন একটু অসহায় ধরণের কিন্তু সেবা বেশ কর্মপটু। ওদের দুজনেরই স্বভাব এত ভাল, এত মধুর যে কেউ ওদের না ভালবেসে পারে না।

ভালবাসলেও হোস্টেলের মেয়েরা ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। ওরা হাসে—অতিরিক্ত বললে চটে মুখ গম্ভীর করে।

'সমস্ত সময় কি যে কথা বলে ওরা, কথা যেন ফুরোয় না'। মিত্রা বলে 'আমাদের হয়েছে এক জ্বালা, তিনজনের ঘরে চারজন থাকতে হবে। তপতী তো সব-সময়ই সেবার কাছে বসে আছে।'

'কেন যে ওদের এক-ঘরে সীট দেয় নি?'

'বন্ধুত্ব হলো সীট নেবার পর, আগে তো নয়।'

ওপারের ঘরে তপতী ও সেবা এই আলোচনাই করছিল। এক-ঘরে থাকতে পারলে কি মজাটাই না হতো? যাকগে, সামনের 'সেসনে' দেখা যাবে।

'তুমি এবার খেতে যাও'—তপতী বলে। 'খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'মানে? আমি খাব না বলে তুমিও খাবে না।'

'তা কে বলেছে? খেতে ইচ্ছে করছে না এই হচ্ছে আসল কথা।'

'তোমার আসল নকল সব কথাই বুঝি, বেশ চল, আমিও ভাত খাইগে।'

'এই অসুস্থ শরীরে?'

'কি করবো?'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

খেতে যায় সেবা। কিন্তু, সত্যই খেতে পারে না। ভাল লাগে না খেতে।

এমনি ধারার বন্ধুত্ব ওদের। প্রবল, প্রগাঢ়, প্রাণদ।

পাশ করে ওরা বি-এ-তে ভর্তি হয়। বন্ধুত্বও গাঢ়তর হতে থাকে। এমনকি, ছুটির সময়ও একে অন্যের বাড়ী গিয়ে থাকতো।

একদিন তপতী হোস্টেলে একা ছিল। দারোয়ান এসে শুধালো 'সেবা দিদিমণি কোথায়?'

'কেন?'

'একজন বাবু এসেছেন। আজ তো ভিজিটিং দিন নয়, তবু উনি বাইরে থেকে এসেছেন বলে...'

'ওর কিছু বখশিসও দিয়েছে বোধ' তপতী মনে মনে বলে।

'আচ্ছা, আমি দেখছি' প্রকাশ্যে বলে সে।

দারোয়ান আর কিছু না বলে চলে যায়। সবাই জানে ওদের একজনের ভিজিটর এলে অপরে দেখা করলেও চলে যায়।

ভিজিটিং রুম বন্ধ। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি।

তপতী গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটি বলে 'আপনি?'

'আমি ওর বান্ধবী তপতী।'

'ও, আপনার নাম জেনেছি ওর কাছে থেকে। আমি ওর পিসীমার ছেলে.....।'

'বারীশদা'—বাধা দেয় তপতী।

'কি করে জানলেন?'

'আমিও জেনেছি।'

ততক্ষণ ওরা হোস্টেলের সামনের গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে।

'কি দরকার সেবার কাছে?'

'দরকার আমার না আপনাদের?'

'আমাদের'—অবাক সুরে বলে তপতী। চোখদুটি তুলে তাকায় উপরের দিকে।

'যুদ্ধ হচ্ছে তা জানেন তো?'

এতক্ষণ বলতে ভুলে গেছি এ হচ্ছে গত মহাযুদ্ধকালীন ঘটনা।

'জানি, তাই কি?'

'তাই কি?' বারীশ ওর দিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থেকে বলে। আপনি কলেজে পড়েন তো?'

হায়রে, এরাই নাকি জাতির ভবিষ্যৎ।

'আপনি কি গালাগালি দিতে এসেছেন

কাঠের জুতোর তাজ্জব দেশে

অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
এম.এসসি; পি এচ.ডি (এডিন)

দিকে দিকে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের বাতায়ন খোলা—পথের ধারে রয়েছে দেখে বেড়াবার অবারিত আমন্ত্রণ-আহ্বান। যাকে উপলক্ষ করে সৌন্দর্য সঞ্চয়ের আয়োজন, তা যখন ছায়াময় কল্পলোক থেকে ধরা পড়ে বাস্তবের রূপজগতে, ধ্যানের মানসপট থেকে মূর্ত হয়ে আসে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নাগালের মাঝে, তখনই মনে হয় সম্পূর্ণ হোলো এই উপভোগের আনন্দ, খুঁজে পাওয়ার তৃপ্তি, আকর্ষণের সমাপ্তি। ভ্রমণের সার্থকতার মধ্যে যে পাওয়ার আনন্দ, দেখার আনন্দ তা সব মিলিয়ে মনের মধ্যে আনে একটা ক্লাইম্যাক্স সেটা যে কোন জিনিষকে উপলক্ষ করেই হতে পারে—হতে পারে তা প্রকৃতির কোন অনুকরণীয় এবং অপরূপ রূপসজ্জা দেখে কিম্বা মানুষের সৃষ্টি সুনিপুণ কোন কলাকৌশলের দাক্ষিণ্য হতে। দেশে নয়, একবার দেশের বাইরে কোট্ বা প্যান্ট পরা জ্বলজ্যান্ত মানুষের পায়ে কাষ্ঠপাদুকাভরণ দেখে চমক লেগেছিল।

কাষ্ঠ পাদুকাভরণ বললে চমকাবার কিছু নেই—জুতো তাদের কাঠের—চামড়ার নয়। সেই জুতো যারা পরে—তাদের কথাই বলছি।

লণ্ডনে তখন 'সামার'-এর মরশুম সবে সুরু হয়েছে—যেখানে যত পাতাঝরা গাছপালা ছিল তারা আবার সবুজের সাজে সেজে উঠছে। টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝলকে ঝলকে রদ্দুর এসে লোকের মনে সোনা ঢেলে দিচ্ছে—অমিতউচ্ছ্বাসে সবার মন 'হলিডে' চাইছে। টুরিষ্ট আফিসে ভীড় লেগেছে—দেওয়ালে দেওয়ালে রং করা পোষ্টার। প্যারিসের আইফেলটাওয়ার—রোমের অ্যাম্ফিথিয়েটার, সুইজার-ল্যান্ডের নীল লেকের কোলে সারি সারি বরফ ঢাকা পাহাড় আর জার্মানীর শ্যামছায়াঘন রাইনল্যান্ড। মানুষের আকাশ-ছোঁয়া কারিগরী দেখে অবাক হবার অবাধ সুযোগ আর সৃষ্টির অনন্য-অলঙ্কারে মুগ্ধ হবার অনন্ত অবসর। কিন্তু কেন জানি না চোখ কোথায়ও আটকাল না—সব পোষ্টার পার হয়ে যেখানে দাঁড়াল—সেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে --Wooden shoes of Holland. বলে কি! কাঠের জুতো? সোনার পাথর বাটীতে অমৃত-সম্ভোগ না মায়ামৃগের কস্তুরী বিতরণ!

পাশেই ছিল পুলকেশ, ও বললে, নির্ঘাৎ লোক ঠকাবার মতলব নয়-তো কলকাতা থেকে খড়ম আমদানী করে ওস্তাদি করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে উড়িয়ে দেবার মত নয়—কাউণ্টারে খবর নিয়ে জানা গেল এখনও হল্যাণ্ডে ওমনি কাঠের জুতোর চল আছে। ওখানকার মস্ত সহর আমষ্টারডামের মাত্র দশ মাইলের ভেতর একটি দ্বীপ আছে। সেখানকার লোকেরাই কাঠের জুতো ব্যবহার করে। প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে অগুণতি লোক তা দেখতে যায়। আমরাও রাজী হয়ে গেলুম কাঠের জুতোর তাজ্জব দেশ পরিভ্রমণে।

ইউরোপের মধ্যে থেকেও হল্যাণ্ড নানা দিক দিয়ে স্বতন্ত্র এবং নিজের বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান। এখানকার প্রকৃতিগত এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্য অন্য দেশ হতে সুস্পষ্ট। সবচেয়ে বিস্ময়ের জিনিষ হোলো সারা দেশটার এক-তৃতীয়াংশ জমি সমুদ্রের চেয়ে নীচুতে অবস্থিত। যার ফলে 'নর্থ সি'র জল দেশের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু হল্যাণ্ডের অপর নাম নেদারল্যাণ্ড বা নীচু জায়গার দেশ। কিন্তু হল্যাণ্ডের জাতীয় ইতিহাস হোলো সমুদ্রের সঙ্গে লড়াইয়ের ইতিহাস। সমুদ্রকে প্রতিহত করবার দুর্বার চেষ্টা হল্যাণ্ডের লোকেরা বারবার করেছে। তিন তিনবার সমুদ্রের জল ঢুকে দেশে মারাত্মক বন্যা ঘটিয়েছিল। সে ক্ষতি অপরিমেয়। ১৪২১ সালে বন্যার করুণ কাহিনী মন ভারাক্রান্ত করে দেয়। বাহাত্তরটা গ্রাম জলে উজাড় হয়ে যায় এবং প্রায় কয়েক হাজার লোকের প্রাণহানি হয়। ভবিষ্যতে এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় হল্যাণ্ডের লোকেরা এক মস্ত ফন্দি আঁটলে—সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমুদ্রের ধারে উঁচু করে বাঁধ বাঁধলে। এদের বলা হয় 'ডাইক'। পৃথিবীর আর কোথায়ও এমন অদ্ভুত ডাইক দেখতে পাওয়া যায় না। হল্যাণ্ডের সমুদ্রের ধারে ধারে মাইলের পর মাইল চলে গেছে ডাইক-এর বিস্তৃতি—সমুদ্রের ধার থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু। এক একটা ডাইক প্রায় তিন মাইল লম্বা—এমনি বহু শত ডাইক সেখানে রয়েছে। ডাইক তৈরীর সময় দেখা যায় বালি, কাঠের গুঁড়ি আর পাথর দিয়ে মজবুত করে পরিশ্রমী মানুষ সমুদ্রকে শৃংখলিত করেছে। তাই বোধ হয় হল্যাণ্ডের বহুপ্রচলিত প্রবাদ হোলো—God made the sea—we made the shore. তা বড় সত্যি কথা। মানুষের তৈরী সমুদ্রের তীর, কত ভাবে মানুষ তা ব্যবহার করছে। প্রথমতঃ সমুদ্রের জলের প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করেছে, তাছাড়া ডাইককে সমুদ্রের ধারে রমণীয় রাস্তা হিসাবেও ব্যবহার করা হয় এবং জায়গায় জায়গায় ডাইকের শক্ত গাঁথুনির ওপর বাড়ীও করা হয়। যে সমুদ্রের পাড় আগে বিভীষিকা ছিল এখন নতুন পরিকল্পনার ফলে ডাইকের ওপর নতুন বাড়ী-ঘর তৈরী করে ঝলমলমান সহর গড়ে উঠছে। এই ডাইক গেঁথে, হল্যাণ্ডের বহু বন্যা-প্লাবিত জায়গা থেকে পাম্প করে জল সরিয়ে ফেলে নতুন চাষ আবাদের সুবন্দোবস্ত হচ্ছে। এইসব জলের কবল থেকে যে সব জায়গা আবার মনুষ্যোপযোগী হয়ে উঠছে সেগুলোকে এখানকার লোকেরা বলে পল্ডারস (Polders)।

রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করে আকাশ-যানে সমুদ্র পার হবার সময় রামচন্দ্র সীতাকে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে দেখাতে দেখাতে বললেন—বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং মৎ সেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্। এই দেখ আমার বাঁধা সেতুতে সমুদ্রের জলরাশি বিভক্ত। সে ত্রেতা যুগও গেছে, রামচন্দ্রও নেই, সীতাও নেই—কালিদাসের মত কবি নেই সে উচ্ছ্বাস বর্ণনা করবার। অগাধ বিস্ময়ে পুলকেশের সঙ্গে ডাইক দেখতে দেখতে নেমে পড়লুম হল্যাণ্ডে—ভারতবর্ষের তুলনায় কতটুকুই বা জায়গা। সারা হল্যাণ্ডের প্রকৃতির নিজের একটা শ্রী আছে যা অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। জল নিকাশের অজস্র ক্যানেল বা নালা—এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ফিরে চলে গেছে। শোভাময়ী ধরণী হরিৎ-বসনা। বড় বড় উইণ্ড মিল আকাশের ব্যাক গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের বড় বড় চাকা যখন দুরন্ত বেগে ঘুরে চলে তখন মনে বিদ্যুৎ গতিতে মাকড়সার জাল যেন আকাশের যত নীল আছে তা সব বেঁধে ফেলছে। হল্যাণ্ডের ফুলের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। আমস্টারডাম থেকে যেতে হয় হারলেমে। সেখানে রং-বেরংয়ের টিউলিপের রাজত্ব—এপ্রিল মাসের 'টিউলিপ-রবিবার' দেখতে আসে অনেক লোক। সারা দেশটা ফুলের ভক্ত এমন জাত তো দেখিনি।

পুলকেশ দোকান থেকে একগোছা ফুল আনতে চলল—তারিফ করে দোকানদারকে বললে, তোমাদের মত এমন ফুলের দেশ দেখিনি, ফুলের মত ভক্ত তোমরা।

বুড়ো দোকানদার চোখ টিপে-টিপে মুচকে হাসলে, ভাগ্যানি হাতে তুলে দিয়ে বললে, এই বোধ হয় এ দেশে প্রথম পদার্পণ, তাই তারিফের এত আতিশয্য।

আমরা প্রত্যুত্তরে বললুম, হ্যাঁ তাই তো।

বুড়ো জোর দিয়ে বললে, হাঁ, তাই কিছু জান না।

আমরা অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে বুড়ো বললে, কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি তাহলে। একবার ইংলণ্ড থেকে কোন এক রাজা, দ্বিতীয় জর্জ বা অন্য কেউ হবেন—এলেন হল্যাণ্ড পরিভ্রমণে। দিব্যি আছেন আরামে এখানে। একদিন ভোরবেলা রাজা দেখলেন এক গাঁয়ের মেয়ে ডিম বোঝাই ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। রাজা তাকে থামিয়ে ডিমের দাম জিজ্ঞেস করলেন। মেয়ে তো হাঁকলে তেমনি দাম। বিস্ময়ে রাজা বললেন—কেন, বাপু, ডিম কি এখানে পাওয়া যায় না—এত দাম বলছ? মেয়ে তখন সসম্ভ্রমে বলেছিল—ডিম পাওয়া যায় বিস্তর—কিন্তু রাজা ত পাওয়া যায় না অনেক।

আমরা তো স্তম্ভিত। বুড়ো বললে, এটা গল্প কথা হলেও, আমাদের দেশের ব্যবসাদারী মনোভাবের মূল কথা, ফুলবাগানে যে ফুল ফোটে তা মনবাগানে রং ধরায় না, চালান করি, ভাল ব্যবসা হয়। পয়সা ঘরে আসে।

হল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত এডাম চীজ—তার চাহিদা পৃথিবীর দূরদূরান্তে। হল্যাণ্ডে এলেই চীজ মার্কেট সবাই দেখতে আসেন—এদের মধ্যে আলকমার মার্কেটটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আমরা ঘুরে ঘুরে হল্যাণ্ডের বড় সহরগুলো দেখলুম। তার মধ্যে ইউট্রেক্ট, দি হেগ, রটারডাম, আমস্টারডাম। প্রত্যেকটি সহর ছোট—সহরের ভেতর অনেক ক্যানেল আছে যা দিয়ে লোকে শুধু যাতায়াত করে না, নৌকাবিহার আনন্দ উপভোগও করে। এদের বলা হয় [illegible]। স্টীম-লঞ্চ করে যেতে হয়—অনেকটা ভেনিসের অনুকরণে বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি সহরে, বিশেষ করে ইউট্রেক্টে সাইকেলের ছড়াছড়ি—রাস্তায় পিজ-পিজ করে রং-বেরংয়ের পোষাক পরিহিত মহিলা। [illegible] সহর, নতুন রাস্তা এ সব আমাদের চোখে টানেনি যতটা টেনেছে হল্যাণ্ডের কাঠের জুতো। তাই আমস্টারডামে হাজির হওয়া গেল। সেখান থেকেই কাঠের জুতো দেখবার দ্বীপটিতে যেতে হবে।

দ্বীপের নাম মারকেন—মাত্র দশ মাইলের ব্যবধান এখান থেকে। [illegible] সালে সমুদ্রের জল যখন দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন থেকেই এটি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন যেখানে জুইডার জি [illegible] সমুদ্রের জল ঢুকে লোনা সাগর করে দিয়েছে—মারকেন দ্বীপকে বলা হয়, ডেড সিটি অব দি জুইডার জি। বাস চেপে আমস্টারডাম সহরের বাইরে যেতে হবে, তারপর স্টীম লঞ্চ করে দ্বীপটিতে। বাস ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমরা টুরিষ্ট অফিসে এসে হাজির। সামনেই বাসখানা রাখা রয়েছে। দিব্যি বাসটিতে উঠে বসা গেল—একেবারে পিছনের শেষ চওড়া সিটটিতে পুলকেশ আর আমি আসন নিলুম।

পুলকেশ বললে—কি মহান উপলক্ষ, শ্রীচরণ কমলেষু, তাই দেখতে আবার এত আয়োজন, জুতোর আবার দাম কি আছে, তাও আবার কাঠের।

বাধা দিয়ে আমি বললুম, জুতোয় অত হঠাৎ অবজ্ঞা কেন? ভাব দিকি, রাজা হবুচন্দ্রের পা দুখানি ধূলোর মালিন্য থেকে বাঁচাবার উপায় বার করতে গিয়ে বেচারা মন্ত্রী গবুচন্দ্রের কত বিনিদ্র-রজনী কেটেছে—রাজ্যের সেরা পণ্ডিতরাও উনিশ পিপে নস্যকেই নস্যাৎ করেছিলেন। আর মনে নেই শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা জুতোর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেলেন।

সৌন্দর্যে স্বকীয়তা
তনুশ্রীকে তরুণ কোমল ও প্রাণবন্ত রাখুন। অঙ্গের স্বাভাবিক লাবণ্যসুষমাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলুন। স্নিগ্ধস্পর্শী, শুভ্রকারী "'হেজলিন' স্নো" রূপকে অপরূপ করে তোলে।
"'HAZELINE' SNOW"
(TRADE MARK)
"'হেজলিন' স্নো"
(ট্রেড মার্ক)
HAZELINE SNOW
বারোজ ওয়েলকাম অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড পোস্ট বক্স ২৯০, বোম্বাই

কাছে গিয়ে পাণিগ্রহণের কথা জানাতে হয়। বাপ-মা যদি বোঝেন ছেলে নিতান্ত মন্দ নয়, তখন তাকে তাঁদের বাড়ীতে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করেন। ছেলে সেজেগুজে একেবারে ফিটফাট হয়ে কন্যাপক্ষের বাড়ীতে হাজির হয়। পাত্রীও সন্ধ্যার উৎসবে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকে গেলেই বাড়ীর কর্তা-গিন্নি আর সবাই ক্লান্ত হয়েছেন অজুহাতে নিশীথশয়নে অন্তর্হিত হন—কপোত-কপোতী তখন একলা। ভাবী বর একখানা কেক টেবিলের ওপর তুলে ধরে মেয়ের সামনে। মেয়ে যদি তার বধূ হতে চায়, তাহলে সে উঠে গিয়ে ফায়ার প্লেসের আগুনে এক টুকরো কেক ফেলে দেয়। ভবিষ্যতের শত বাসনার মিলিত শিখা যেন দীপ্ত হয়ে ওঠে—আঁধার ঘরে দু'টি হৃদয়ে একটি আসন পাতা হয়। তারপরে হৃদয়-মন্থনের পালা - বিবাহ - সংসার। আর যদি কেক সামনে রেখে মেয়েটি নির্বাক হয়ে বসে থাকে—মনে তার মিলনের বাতি না জ্বলে, বুঝতে হবে এ তার হৃদয়ের নীরব প্রত্যাখ্যান। ভাবী বরের আর বর হওয়া হয় না—ব্যর্থ অভিসারের পর টেবিল থেকে কেক তুলে নিয়ে দেয় চম্পট। বৌ জুটল না—কনসোলেশন প্রাইজ কেক পাওয়া গেল এমন ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটে থাকে। আমার মনে হোলো প্রেম শুধু যুগে যুগে নয় দেশে দেশেও।

একজন আমেরিকান তরুণী সামনের দিকে বসেছিল, কলকণ্ঠে গাইডকে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোমার অদৃষ্টে কি জুটেছিল কেক না বৌ?

রসিক গাইড সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—দুই-ই।

সারা বাসে হাসির কল্লোল বয়ে গেল। বাস তখন একটি ব্রিজ পার হচ্ছে—ওপারেই সমুদ্রের ব্যাক ওয়াটার দেখা যাচ্ছে। তারপর কিছুক্ষণ বাদেই বাস গিয়ে থামল। টলটল করছে জল—ঘাটে ছোট কয়েকখানা সাদা লঞ্চ দাঁড়িয়ে। দর্শকদের মারকেন দ্বীপে নিয়ে যাবে। বাস ছেড়ে সবাই লঞ্চে একে একে উঠে এলো। জোর হুইসিল বাজিয়ে জেটি ছেড়ে আমরা সমুদ্রের ব্যাক ওয়াটারের ভিতর পাড়ি দিলুম। এবার যারা আমাদের লঞ্চে উঠেছিল তারা সবাই আমেরিকান। একজোড়া অল্প বয়সী স্ত্রী-পুরুষ, স্ত্রী পাশে বসে স্বামীকে বলছেন, নিশ্চয়ই একজোড়া কাঠের জুতো কিনে আনব এখান থেকে, আমেরিকা ফিরে যখন কোন বিশেষ সোশ্যাল অকেসন হবে তখন পায় দিয়ে গিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব।

পুরুষটি স্ত্রীর কথা কানে নিয়েছিল কি-না জানি না—ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা কাঠের জুতো পরাতে পায়ে ফোস্কা হয় না—এমনিই-ত নতুন জুতো পায় দিতে রক্ষে নেই।

এর উত্তর দেওয়া দায়, বুঝলুম আমাদের দেশে দেহাতি লোকেদের মাঝে মাঝে দেখা যায় নতুন জুতো পায়ে না দিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তা চলেছে সেই থেকেই বোধ হয় এই ভয়। তবে সেটা পা বাঁচান, না জুতো বাঁচান সেটা কিন্তু হলপ করে বলা যায় না। মুখে বললুম, নিশ্চয় কড়া পড়ে যায়। এ নিয়ে তো বিলাসিতা নয় ওদের নিশ্চয় প্রয়োজন মেটান। সেতারীর আঙ্গুলে মিরজাফ প্রথম প্রথম দাগা দিয়ে বসে ব্যথা দেয়। কিন্তু তারপর হাতে সয়ে যায়—তখনই মোহন আঙ্গুলের স্পর্শে সুরের মূর্চ্ছনা। অবশ্য ওদের বেলা জুতো যে পায়ে বসে যায়—সেটা কোন সুরেলা ব্যাপার না—অক্লেশে পথ চলার জন্যে।

মারকেন দ্বীপটি মোটেই বেশী দূর নয়। লঞ্চ লক্ষ তুলে জোরে জোরে এগিয়ে চলেছে। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ ব্যাক-ওয়াটারের ভিতর দিয়ে দূরে মারকেনের তটরেখা দেখা যাচ্ছে—যাকে ভাবত মহাসাগরের লবণাম্বুরাশি ঘেরা কোন দ্বীপ হলে 'তমালতালী-বনরাজি-নীলা' বিভূষণে ভূষিত করা চলত। আস্তে আস্তে চোখের সামনে মারকেন পরিষ্কার হয়ে উঠল—বনরাজি কিছু নেই—ছোট্ট একটি দ্বীপ। এপার ওপার দেখা যাচ্ছে—চারদিকে থৈ-থৈ করছে নীল জল। শেষে লঞ্চ এসে থামল—সবাই নেমে পড়ল। মারকেন-এ পা রেখেই সবাই লোকের মুখের দিকে চায় না—পায়ে কি আছে তা আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। মারকেন দ্বীপের লোক—স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়েরা—সহাস্যে লোকের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু আশ্চর্য তাদের পাদুকাচরণে সবার দৃষ্টি আবদ্ধ। চোখের সামনে কচি-বুড় কাঠের জুতো পায়ে গলিয়ে টকটক খটখট করে নড়ছে-চড়ছে। তাহলে মিথ্যে নয়—কাঠের জুতো পায়েও মানুষ হাঁটে। ফ্যাসানের দিক দিয়ে কিন্তু নয়—পা বাঁচাবার একটা সাবেক আমলের রীতি মাত্র। পরার মধ্যে তবু একটা আলগা শ্রী আছে—যা বোধ হয় কোন চামড়ার জুতোতে পাওয়া যায় না।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় চীনা দেশে মেয়েদের পা বাঁধার করুণ ইতিহাসের কথা। সৌন্দর্যের মাপকাঠি দেশে ও কালে চিরকাল তারতম্য ঘটিয়েছে এবং সেই কারণেই সৌন্দর্যের আধারও সব দেশে এক নয়। চীনদেশে লোকেরা সৌন্দর্য দেখার নেশার ঘোরে নারীর অতি ক্ষুদ্র পদপল্লবে দেখতে চাইলে অপার্থিব মাধুর্য—তারা নারীর কোমল কান্তি মুখশ্রীতে কিন্তু দেখতে পেলে না, পেলে না দেহ-শ্রীতে তনিমা। তারা মনে করলে যত কিছু কমনীয় রমণীয় তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হবে নারী-পদযুগল যদি ছোটবেলা থেকে বেঁধে ছোট করে খর্ব করে দেওয়া যায়। তাই শৈশব থেকেই রূপ-সৃষ্টির দোহাই দিয়ে লোহার জুতোর আবরণে বাঁধা পড়ল কচি নরম পাদুখানি। শিশু যখন নারীত্বে বিকশিত তখন সমস্ত দেহের অনুপাতে তার পদ-যুগল রুদ্ধ থেকে ক্ষুদ্র হয়ে রইল। এই ক্ষুদ্র পদ-যুগল চীনা পুরুষের চোখে দুর্দমনীয় প্রলোভনের সামগ্রী। তখনকার দিনে কবিরা লেখায় এ হয়ে উঠল বিকৃত অভিলাষ। সুবলিত পদযুগলকে বলা হোতো 'Golden Lilies'। কিন্তু ক্রমে এই অবাঞ্ছিত এবং দুষ্ট রুচিবোধ চলে গেল—চীনা মেয়ের মনোবেদনা নাকি পারের! লোকে বুঝলে এবং সৌন্দর্য সাধনার নামে এই নির্যাতনের অবসান শেষ পর্যন্ত ঘটল। মারকেনের লোকেদের কাঠের জুতো পায়ে আবরণ এনে দেয়নি—এটা আভরণই। তাই নির্যাতনের প্রশ্ন ওঠে না—স্বাভাবিক আনন্দ দেয়।

কাঠের জুতো দেখে সবাই উৎফুল্ল—সবাই লোকগুলোকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললে। জানা গেল কাঠের জুতোর নাম ক্লমপেন। পায়ে তা ওদের মোটেই লাগে না—বরং আরামপ্রদ। অক্ষয় অব্যয় হয়ে একটা জুতোতে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের দেশে এমন লোক আছে যারা নতুন জুতো কিনে ক্ষয় হয়ে যাবার ভয়ে তাতে আগে ভাগেই হাফসোল লাগায়—তাদের এমন কাঠের জুতোর সন্ধান জানা নেই—তাই রক্ষে। মারকেনবাসিনী একটি বৃদ্ধা পরিষ্কার ইংরেজী বলতে পারেন; আমাদের উদ্দেশ্য করে মারকেন-এর প্রসিদ্ধির কারণ বুঝিয়ে বলে দিতে সুরু করলেন। গাইডের মত দর্শকের বুঝিয়ে দেন। তাঁর নির্দেশে আমরা সবাই একটি বাড়ীতে ঢুকলুম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরদোর। বাড়ীগুলো বাংলোর মত। সবগুলোই জমি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে খোঁটা দিয়ে তুলে রাখা আছে। তার কারণ সমুদ্রের জল মাঝে মাঝে বেড়ে দ্বীপের ওপরে চলে আসে, তখন যেন না সব ভেসে যায়। জলের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি অদ্ভুত সতর্কতা। এদের বাহুল্যবর্জিত জীবনযাত্রা। শিল্পবোধ প্রখর। কাঠের মেঝে, কাঠের চালা আর সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো কাঠের ঝালর ঝুলছে জানালায়। কাঠের প্রাধান্য সর্বত্র। বাড়ীর ভিতরে জুতো আনে না। তাই সব বাড়ীর বাইরে ছোট-বড় নানা রকমের কাঠের জুতো ছাড়া থাকে—নেমন্তন্ন বাড়ীতে জুতো ছাড়লে বিপদ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখানে সে বিপদ নেই, তা না হলে নির্বিকার চিত্তে জুতো—হোক না তা কাঠের জুতো—বাইরে রেখে ঘরে আসত না। ছোট ছোট ছেলেগুলো খুদে খুদে পায়ে কাঠের জুতো পরে দৌড়ঝাঁপ করতে ব্যস্ত। পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়ের মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদে কোন পার্থক্য থাকে না—তাই বাইরে থেকে ধরা মুস্কিল। সাত বছরে ছেলেদের মাথার চুল প্রথম ছোট করে ছাঁটা হয়। মেয়ে-পুরুষের গায়ে সার্জের সুট বা সাটিনের ফ্রক নেই—আগেকার দিনের মত প্রচুর কাপড় লাগান পোষাক। সমুদ্র ঘেরা দ্বীপের লোকের গায়ে দেখা যায় গাঢ় নীল রং-এর সুট আর বনেট। তাতে আছে হাতের নক্সা তোলা বাহার—সঙ্গে আছে রূপোর মত ঝক্-ঝকে বোতাম। মেয়েরা মাথায় দেয় লেসের টুপি—পায়ে কাঠের জুতো। জৌলুসবিহীন পোষাকে রূপের ঝলক তাদের সরল স্বচ্ছন্দ হাসির মাঝে ঝরে পড়ে।

বাড়ীটা থেকে বার হয়ে আসতেই চোখে পড়ল

(ইহার পর ২৫৫ পৃষ্ঠায়)

আলপনা — মিণ্টু [illegible]

লীগ মহলে লণ্ডনের ছাত্র
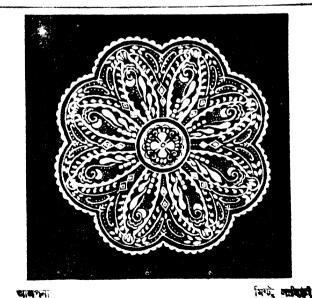
(২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

ছলাম, তিনি ক্লাবের সুপারভাইজার। সেই আমেরিকান মেয়েটির উপর আমাকে দু এক যায়গায় নিয়ে যাবার ভার দিয়ে পরে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন। সেই মেয়েটির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়লাম জাপানের রাজদূত শ্রীনিগাকির বাসায়। দেখলাম তিনি ভারতবর্ষের অনেক খবর রাখেন। ইংরিজিতে রামায়ণ ও মহাভারত পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবে একবার এক জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কি আলোচনা করেছিলেন সেটা তখনও মনে রেখেছেন। রাজনৈতিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকা তাঁর সখ ছিল। আমাকে এক সমজদার মনে করে তাঁর আঁকা জলীয় রংএর ছবিগুলো খুসির সঙ্গেই দেখালেন। তাঁর ওখানেই চা খেতে হল। শুনেছিলাম ভারতের এক নামজাদা লোক জাপানের কোন বিখ্যাত লোককে বলেছিলেন— ভারতবর্ষই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি জাপানে রপ্তানি করে আধুনিক জাপানকে উৎকৃষ্ট করেছে। জাপানের বিখ্যাত লোকটি একথা মেনে নিয়ে ভারতের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন কোন অপূর্ব সুন্দরী নারী পতিতা হলে তার সেই সৌন্দর্যের যেমন কোন মূল্য থাকে না তেমনি দুঃখের বিষয় ভারত আজ পরাধীন বলেই তার সংস্কৃতির কোন কদর নেই। শ্রীনিগাকিকে জিজ্ঞেস করলাম তিনিও এই মত পোষণ করেন কিনা। কিন্তু দেখলাম তিনি তা করেন না এবং ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবপূর্ণ বলেই তাঁর ধারণা। তাই সাহস করে বললাম আপনি তো রামায়ণ পড়েছেন, জানেন বোধ হয়, সীতাকে রাবণ বলপূর্বক হরণ করেছিলো কিন্তু তাঁর সতীত্বকে ম্লান করতে পারে নি। ভারতবর্ষও আজকের এই অগ্নি-পরীক্ষার পর সীতার মতই জয়যুক্ত হবে এ আপনি দেখে নেবেন। সেদিন সদর্পে একথা বললেও আমাদের জীবনেই যে সে আশা সফল হবে এবং একদিন যে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশে দেশে আজকের মত সম্মানিত হবেন এটা তখন স্বপ্নেও ভাবা যেত না। আমাদের এই আলাপের পরের দিন দেখি শিল্প, দর্শন, সাহিত্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে একরাশ বই জাপানী দূতাবাস থেকে পাঠানো হয়েছে আমার জন্য।

ব্রেকফাস্ট সেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জাপানী রাজদূতে প্রেরিত বইগুলোর থেকে একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম এমন সময় হোটেলের সবচেয়ে সুন্দরী পরিচিকা ইরমা এসে খবর দিলে একটি মহিলা এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম মহিলাটির নাম কি। সে বললে নামটা তিনি বলতে চান না, তাঁর চেহারারও সে কোন বর্ণনা দিতে পারলো না। কারণ মহিলাটি একটা পাতলা ঘোমটায় নাকি মুখ ঢাকা দিয়ে আছেন। বললুম তাকে ড্রইংরুমে বসতে বল। কিন্তু সে বললে তিনি মোটর থেকে নামতে চান না। বড়ই রহস্যজনক মনে হল। কে এই মহিলা! জেনিভায় আমার সঙ্গে এইভাবে দেখা করতে এসেছে! লণ্ডনের কোন মেয়ে এখানে এসে এমনই রসিকতা করছে না তো! যাই হ'ক কাপড় বদলে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য ঘর থেকে বেরোলাম। নিচে সিঁড়ির কাছে দেখি ছোট বড় এক দল মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় একটি মেয়ে এগিয়ে এসে ফরাসি ভাষায় কি যে বললে কিছুই বুঝতে পারলুম না। কোনভাবে তাদের কি কোন অসম্মান দেখিয়েছি! ভয়ে তাড়াতাড়ি ইংরিজিতে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু কথা ওদের থামলো না আর আমাকেই যে কিছু বলছে সে বিষয়ও সন্দেহ নেই। কি করি ভাবছি এমন সময় হোটেল কর্তার বোন এগিয়ে এলেন। তিনি ইংরিজি বলতে পারতেন। বললেন মঁসিও টেগোর এরা হচ্ছে আমার মেয়ের কলেজের বন্ধু আর ঐটি আমার মেয়ে। আপনি এখানে এসেছেন শুনে আপনার সঙ্গে ওরা দেখা করতে এসেছে আর এই বইটায় আপনাকে একটা অটোগ্রাফ করে দিতে হবে। এটা ওদের কলেজের লাইব্রেরিতে থাকবে বলে তিনি তার মেয়ের হাত থেকে একখানা বই নিয়ে আমার হাতে দিলেন। সেটা রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চের ফরাসি অনুবাদ। দেখে ভাবলুম হয়তো এরা আমাকে রবীন্দ্রনাথ বলেই ভুল করেছে। না হলে তাঁর বইয়েতে আমার অটোগ্রাফ চায় কখনো! তাই তাঁকে বললাম, "দেখুন আপনারা ভুল করছেন, আমি এই বইয়ের গ্রন্থকার নই"। কিন্তু তিনি বললেন তা আমরা জানি। তবে আপনার বিষয়ও সম্প্রতি আমরা কাগজে কিছু পড়েছি, আপনিই তো লণ্ডনে প্রথম সরস্বতী প্রতিমার ভাস্কর। এবং ভবিষ্যতে আপনি যে রবীন্দ্রনাথের মতন একজন নামজাদা লোক হবেন না তাই বা কে বলতে পারে। আমার মেয়ে আপনারই অটোগ্রাফ চায়। বুঝলাম লণ্ডনের সরস্বতী পূজোর খবরটা রয়টার মারফৎ এখানেও পৌঁছেছিল তাই আর দ্বিধা না করে লিখে দিলাম আমার নামটা তাদের বইয়েতে। বাইরে এসে দেখি এক প্রকাণ্ড কালো মোটর দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে আসতে দেখে দরজা খুলে দিলে সোফার এবং ভিতরে নজর যেতেই বুঝলাম ক্লাবের কর্ত্রী কাউন্টেস জেরেটকফ বসে আছেন। তিনি আমায় গাড়িতে উঠে আসতে বললেন এবং আমি উঠলেই সোফার গাড়িটা চালিয়ে দিলে। আমার মুখে দেখেই বুঝেছিলেন আমি তাঁর এই রহস্যজনক ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ চাই। তাই বললেন তিনি যে আমার কাছে এসেছেন এটা কেউ যাতে জানতে না পারে তাই তিনি মোটর থেকে নামেননি। অথচ তিনি মনে করেন জেনিভার কতকগুলো জায়গা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে দেখানো দরকার। যেমন এখানকার রাশিয়ান চার্চ একটা। আর তিনি বলতে এসেছেন যে, আমাকে না জিজ্ঞেস করেই ক্লাব কমিটি স্থির করেছেন আগামী কাল ক্লাবে আমাকে একটা ব্যাঙ্কোয়েট দেওয়া হবে যখন ভারতবর্ষের বিষয় আমাকে বলতে হবে কিছু। এ নিমন্ত্রণ এড়ানো গেলো না। ইতিমধ্যে গাড়ি পৌঁছে গেছিল রাশিয়ান চার্চে। তাই নেমে যেতে হল কাউন্টেসের সঙ্গে। সেদিন ছিল রবিবার তাই তখন সেখানে উপাসনার জন্য বহু লোক জমায়েত হয়েছিল। কাউন্টেসকে দেখে অনেকেই নতজানু হয়ে তাঁর হস্ত চুম্বন করলে।

রাশিয়ান ধর্মযাজকটিকে দেখে মনে হ'ল তিনি যেন এক বাইজানণ্টাইন যুগের সম্রাট। কাউন্টেস তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলেন। চারিদিকের কারুকার্য দেখলে কতকটা আমাদের দেশের মন্দিরের কথা মনে পড়ে। ধূপ ধুনোর সৌরভে ঘরটা ভরেছিল। মনে হয় এই জায়গাটিতে তখনও যেন জারিস্ট রাশিয়াকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ ঐ চার্চের ভিতর ও বাইরে পরিদর্শন করে ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। এর পর একটি গোল পাহাড়ের তলায় এসে কাউন্টেস তাঁর মোটরটি ছেড়ে দিলেন। আমরা পায়ে হেঁটেই ঘোরানো রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে বেশ বসে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। তারপর বেলা অনেক হয়েছে দেখে কাউন্টেসকে বললাম তিনি যদি কোন ভালো কাফে জানেন তো সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দিলে খুব খুসি হব। তিনি সম্মত হলেন এবং আমরা ওখানকার এক [illegible] রাস্তায় অবস্থিত, কিন্তু ভালো খাবারের জন্য বিখ্যাত কাফেতে এসে [illegible] লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। খেতে খেতে কাউন্টেস আমায় আবার মনে করিয়ে দিলেন যদি কেউ কাউকে না বলি আমার কাছে তাঁর [illegible] বিশেষ করে আমার বন্ধুটিকে। কারণ ঐ আমেরিকান মেয়েটি আজকাল সব সময়ই আমার বন্ধুটির কাছে নাকি থাকে এবং সে সুদূর কাউন্টেসের দোষ ধরবার জন্যই নাকি আমেরিকা থেকে এসেছে। কাউন্টেস ছিলেন জারতন্ত্রী রাশিয়ার শেষ চিহ্ন, আর মেয়েটি ছিল নাকি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন এবং এঁদের দুজনের মধ্যে যে অহি নকুলের সম্বন্ধ ছিল তা আমি জানতুম না। কাউন্টেস আরো বললেন ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার বিষয় সহরময় লোকে নাকি অনেক কিছুই বলাবলি করছে। শুনে আমি তাঁকে বললাম এটা লোকেদের ভারি অন্যায় তো। তিনি বললেন কিন্তু তারা সত্যি কথাই বলছে, কারণ আমার বন্ধুটি নাকি দিনের বেলায় সব সময়েই মেয়েটির সঙ্গে কাটান আর বড় বড় জায়গায় পার্টির ব্যাপারে নিমন্ত্রণগুলোতে ঐ মেয়েটিকেই পাঠিয়ে দেন। তাঁর মনে অন্য কিছু না থাকলে একটা মেয়েকে এমনভাবে কেউ সাহায্য করে? আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে এই আলোচনা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, তাই বললাম "না না এটা হয়তো আপনি ভুল বুঝেছেন। ওঁর স্বভাবই হচ্ছে লোকের উপকার করা। এই ধরুন আমার জন্যও তো কত করেছেন।' কিন্তু তিনি মানতে চাইলেন না সে কথা। তাই

তাদের করুণা যদি

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

প্রভাতের প্রত্যাশায়
আজও যারা রাত্রির জীবনে
স্বপনে সাধনা করে,
আমাদের অমাচ্ছন্ন মনে
তাদের করুণা যদি
জাগে, অনুরাগে অন্ধ ধরা
সূর্যের সোহাগে তবে
মৃত্যুসুখে হবে স্বয়ংবরা॥

ওকথা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়লাম এবং ভাবলাম বন্ধুটিকে এবিষয়ে একটু সতর্ক করে দেওয়া আমার উচিত। উনি হয়তো কিছুই জানেন না এসবের। লাঞ্চের পর ট্যাক্সি করে আমরা বিভিন্ন দিকে চলে গেলাম। সেদিন চায়ের নেমন্তন্ন ছিল মিসেস বার্জেসের কাছে এবং সেখান থেকে যাবার কথা ছিল বন্ধুবরের বাসায় একটু গল্প করার জন্য। মিসেস বার্জেসের ফ্ল্যাটে কাউণ্টেসের সঙ্গে আবার আমার দেখা হল। এখানে তিনি এমন ভাব দেখালেন যে মনেই হয় না সকাল থেকে অতক্ষণ সময় আমার সঙ্গেই তিনি কাটিয়েছেন। আমার সঙ্গে তাঁর মেশবার প্রয়াসটা তিনি কেন যে একটি রহস্যের আবরণে ঢাকতে চান তা কিছুই বুঝতে পারলুম না। চায়ের পর পরের দিন আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিসেস বার্জেস ও লরার কাছে বিদায় নিয়ে বন্ধুর বাসায় পৌঁছলাম। কথায় কথায় অনেক সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সহরের গুজবের কথাটা বলে তাঁকে সতর্ক করতে গিয়ে দেখলাম ভুল করেছি। সে যেন একটা বারুদের গাদায় হঠাৎ আগুন ফেলা। ঠিক সেই সময় ক্লাবের সুপারভাইজার আমেরিকান মেয়েটিও এসে হাজির হল। আমি যে কোথায় এ গুজব শুনেছি তা ওঁদের বুঝতে বাকি ছিল না। বন্ধুবর উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনি যদি সত্যি আমায় বন্ধু বলে মনে করেন তো কাউণ্টেসের সাহচর্যটা বয়কট করুন। এতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না, ভাবলাম অনুরোধের মান রাখলেই হবে। কিন্তু আমেরিকান মেয়েটি ছাড়বার পাত্র নয়। আমাকে বললেন যেখানে আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার হয় সে সহরের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখতে রাজি নই এই বলে আপনি এখনি একটা চিঠি লিখুন। আমি প্রতিবাদ করলুম কিন্তু সে আপত্তিতে কেউই কান দিলেন না। এই লিখতেই হল একটা [illegible] চিঠি। [illegible] না করলেই হল। কিন্তু আমেরিকান মেয়েটি [illegible] সেই রাত্রেই [illegible]। [illegible] পরের দিন [illegible] একটি [illegible] বলে [illegible] এবং [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] কথা [illegible]। পরের দিন সকালেই [illegible] চিঠি [illegible] পৌঁছেছিল। [illegible] পর [illegible] চিঠি [illegible] লোকের কাছ থেকে, আমার মত বদলাবার জন্য, কারণ [illegible] [illegible] [illegible]। অনেকে কাউণ্টেসের [illegible] আমার করার জন্য আমাকে [illegible] নিয়েছিলেন। বন্ধুটিকে ফোন করলাম কি করবো জানবার জন্য। তিনি বললেন সোজা তাঁদের বাসায় চলে আসুন। সেখানে গিয়ে দেখি হোটেলের অনেক বড় বড় লোক সমবেত হয়েছেন তার মধ্যে ছিলেন [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও ফরাসী [illegible] একটি প্রৌঢ় মহিলা। [illegible] ফিরে বাসায় এসে দেখি হোটেলের মালিক আমার নামে চিঠি আর টেলিফোন রিসিভ করতে করতে [illegible] হয়ে উঠেছেন। পরের দিন সকালে উঠে [illegible] আবার [illegible] চিঠি আর টেলিফোন। মিসেস বার্জেসকে ফোন করে সকাল সকাল তাঁর কাছে গিয়ে যেন একটু রেহাই পেলাম। লরা ও তিনি আমাকে সঙ্গে করে সহরের বাইরে এক জায়গায় নিয়ে গেলেন পিকনিক করতে। কোন রকমে সেদিনটা কাটার হলে পরের দিন প্রথম ট্রেনেই সেবারের মত [illegible] থেকে ফিরে চললাম। ওখানকার শান্ত পরিবেশকে হঠাৎ যে অশান্ত সৃষ্টি হয়েছিল পরে তার আর কোন খবর রাখার সুযোগ আমার হয়নি।

কাঠের জুতোর তাজ্জব দেশে

(২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

ডিঙ্গি-নৌকার মত অনেক ছোট ছোট নৌকা পাড়ে কাত করা রয়েছে। কি মনে হোলো ওই দিকেই পা বাড়ালুম। পথটুকু হেঁটে যাবার সময় দেখতে পেলুম রাস্তার মাঝে গুটিকয়েক বুড়ো বসে কি যেন করছে। সবার দৃষ্টি মনোযোগ সহকারে নিবদ্ধ রয়েছে মাটিতেই। যেখানে দেখা যাচ্ছে দু'চারটে মার্বেল আর পয়সা। সেগুলোকেই নাড়াচাড়া হচ্ছে। ওদের পাশ কাটিয়ে সমুদ্রের ধারটিতে এসে দাঁড়ালুম—জোরে হাওয়া দিচ্ছে—বুঝলুম সামনে কোন বাধা নেই—শুধু জলের অগাধ বিস্তৃতি। উল্টোন নৌকাটির উপর পা রেখে দিগন্ত দেখছি। কাশির আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখি একজন থোড়া মতন বুড়োলোক, মারকেন দ্বীপেরই অধিবাসী, ইংরেজীতে অভিবাদন জানাচ্ছে, কাম ফ্রম বোম্‌বেই?

আমি বললুম— না, কলকাতা।

সব যেন জানে এমনি ভান করে বললে—ও কালকাটা! তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কি যেন ভাবলে, তারপর বললে—খেদেরপুর—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

চমক লাগল আমার, বলে কি মক্কেল। যাদু জানে, কলকাতার স্মরণ চিহ্ন মনের মধ্যে এমনি করে ফুটিয়ে তুললে। নিজে থেকেই নিজের কথা খুলে জানালে, ডাচ নেভিতে আগে ছিলুম, বহুবার ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে গেছি। তারপর জাহাজের মাল খালাসের সময় একবার রেঙ্গুনে পায়ে জবর চোট লাগে, সেই অবধি আর যাইনি। এখন দেশেই থাকি ছেলের ভরসায়—দিনরাত নিষ্ফল মনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি, নয়তো অনারা মার্বেল আর পয়সা দিয়ে গিকা খেলে তাই দেখি। ভরসা আর কিছুতেই নেই। মাঝে মাঝে মনে আসে প্রবল উৎসাহ যখন দেখি দ্বীপের ছেলে ছোকরারা এখন বাপ ঠাকুরদাদের সাহসকে ভুলে যায়নি—তারা যখন ডিঙ্গি ভাসিয়ে মাঝ সমুদ্র হতে নিয়ে আসে নানান জাতের ছোট-বড় মাছ তখন অতীতের কথা ভেবে দুঃখ নয় বর্তমান ভেবেও আনন্দ হয়—সমুদ্র আমাদের সাত পুরুষের বন্ধু। তাকে আমরা কি করে ভুলব?

বুড়োর কথায় সমবেদনায় সারা মন আমার ভরে গেল।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরছি—এমন সময় পুলকেশকে দেখতে পেলুম। রীতিমত হন্তদন্ত হয়ে আমারই দিকে চলে আসছে। সাত তাড়াতাড়ি বললে, শীগ্‌গির এদিকে চল, ভাল সট ফসকে গেল।

[illegible] আমি বললুম, ব্যাপার কি, এত [illegible] কেন?

শুনলুম আমাদের সঙ্গে যে সব মার্কিণীরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এসেছেন আমেরিকার এক বিখ্যাত জুতো কোম্পানী থেকে। এটা ওঁদের বিজনেস ট্রিপ। নিজেদের তৈরী জুতোর বিজ্ঞাপনের জন্য এখানকার কাঠের জুতো পাশে রেখে বলতে চাইবেন—Progress of footwear. জায়গাটায় এসে পৌঁছতে দেরী হোলো না—বেশ লোকের ভীড় হয়েছে। ভীড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করা গেল। বিচিত্র দৃশ্য। এসে দেখি একজন প্রথরযৌবনা মার্কিণী তাঁর চামড়ার জুতোমুদ্ধ শ্রীচরণ দু'খানি আগিয়ে দিয়েছেন—আর তারই পাশে দ্বীপবাসিনী একটি সাদাসিধে লাজুক মেয়ে কাঠের জুতো পরা পা দু'খানি রেখেছে—মুখে তার একটু মিষ্টি মিষ্টি অপ্রস্তুত হাসি। ওদিকে ফোটোগ্রাফার এংগেল্ নিচ্ছেন। বিনা বাক্যব্যয়ে সে দৃশ্য যে পাচ্ছে ক্যামেরার মধ্যে আটকে রাখছে। ধন্য আমেরিকান ব্যবসায়ী বুদ্ধি—এখানেও তার জাল।

এবার যাওয়ার পালা—ঘুরে-ফিরে এক রকম সব দেখা হোলো। বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে আলো জেলে দিল। লঞ্চে পুলকেশের সঙ্গে উঠে বসা গেল—এখনও সবাই এসে জড় হননি, হর্ণ বাজাচ্ছে। এক এক করে সবাই এলেন। লঞ্চ মুখ ঘুরিয়ে চলতে সুরু করলে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে—মারকেন দ্বীপটিকে পিছনে ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে চললুম। পড়ন্ত সূর্যের লাল আলো এসে পড়েছে সাদা লঞ্চের গায়ে—ওদিকে জলেতে আলোতে পৃথিবীতে আকাশে সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি রঙীন জলছবি। প্রকৃতির সন্ধ্যা-বন্দনার মধুর ঐকতান। গগন-মর্ত্য কোন কিছুই দাঁড়িয়ে নেই—সবই সরে সরে যাচ্ছে। কল্পনা করলুম সুন্দর রমণীর মুখে যখন একটি পরিষ্কার কালো তিল থাকে—তাকে আমরা অসুন্দর বলি না—বলি বিউটি স্পট্। মারকেনও তেমনি—সারা ইউরোপের প্রোজ্জ্বল প্রগতি পরিমার্জিত মুখে যেন থমকে দাঁড়ান কৃষ্ণকলি। তা শুধু বিউটি স্পট্ নয়—কালচার স্পট্'ও।

ভাবনা ছেড়ে পাশে দেখি পুলকেশ রীতিমত জমিয়ে বসেছে। মারকেনের কাঠের জুতোর অদ্ভুতত্বে সবাই তারিফ করছেন। ও তারই মাঝে বলে চলেছে, আমাদের ভারতবর্ষেও এমনি কাঠের জুতোর বিস্ময় আছে। তা পুরোনো ভারতবর্ষ, বৈদিক ভারতবর্ষ থেকে চলে আসছে, আজও তার ব্যবহার লোপ পায়নি—অবশ্য ক্রমবিলীয়মান—। তা বহু প্রাচীন। মনে হোলো কথাগুলো যেন ওঁদের মনে ছাপ দিয়েছে—সবার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব। এমনি সময় একজন আধবয়সী মহিলা উৎসুক নয়নে পুলকেশকে প্রশ্ন করলেন, সে কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়ের নাম কি?

পুলকেশ চোখ বুজে স্পষ্ট করে বানান করে করে বলতে লাগল, KHARAM.

ভদ্রমহিলা হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ছোট্ট ডাইরী বার করে পেন্সিল দিয়ে লিখতে সুরু করলেন।

শেষ প্রশ্নের উত্তর

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

চকিতের উদ্ভাসিত অজানা সৌরভ
জাগায়ে সংসারে কত আশার মুকুল,
দিয়ে যায় কল্পনার ঐশ্বর্য অতুল;
রঙিন্ স্বপন ঘেরা কামনা বৈভব।
ক্ষণেকের অভিনয় লীলা খেলা সব
রূপ নিয়ে মাতামাতি তন্ময় আকুল,
হয়তো দু'দিন পরে ভেঙ্গে যায় ভুল;
স্থূল দেহে পোড়ে রয় স্মৃতির গৌরব।
বিজলী চমকে যায় মোহ ক্ষণেকের,
তবু 'ক্ষণ' সত্য সেই মুহূর্ত চঞ্চল।
জানাইয়া যায় কোন্ পথ প্রণয়ের,
মুক্ত করি লীলায়িত মায়ার অঞ্চল।
মোহ আনে ক্ষণিকের সৌন্দর্য-পিপাসা,
পরিণয়ে অভিনয়ে ব্যর্থ ভালবাসা।

স্বপ্নকমল

(২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

সুধানাথ বললেন, 'ফের ওই কথা? তুমি যদি শুধু কায়েত হ'তে তাহ'লেও বিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি চোর তুমি লম্পট, বদমাস আর বিশ্বাসঘাতক। তোমার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে ওকে টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভালো।'

সেই রাত্রেই নিজের হাতে ঘাড় ধরে সুধানাথ অখিলেশকে বাড়ীর বার করে দিলেন।

সুলেখা আর এক ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন বোবা হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে।

জন দুই চেনা ডাক্তারের পরামর্শ নিলেন সুধানাথ। তাঁরা বললেন, ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। সুধানাথের এক বিধবা পিসী থাকেন কাশীর বাঙ্গালী টোলায়। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে মেয়েকে সেখানে রেখে এলেন সুধানাথ।

সুলেখা আপত্তি করেছিল, প্রথমে কিছুতেই যেতে চায়নি। সুধানাথ বললেন, 'আমার কথা যদি না শোন, আমি আত্মহত্যা করে মরব। তোমার জন্যে তোমার ভাই-বোনেরা পথে পথে ভিক্ষে করবে, মা ঝি-গিরি করবে পরের বাড়ীতে।'

ছ'মাস কাশীতে ছিল সুলেখা। একতলার ছোট্ট অন্ধকার একখানা ঘরের মধ্যে সারাদিন সোনা ঠাকুরমা তাকে লুকিয়ে রাখতেন। চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখতে দিতেন না। ছ' মাস ধরে প্রতিটি মুহূর্তের সেই দন্ডভোগের কথা সুলেখা জীবনে ভুলতে পারবে না।

চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখত না, কিন্তু আর একজনের মুখ দেখবার তখনো আশা করত সুলেখা। ভাবত যেমন করেই হোক অখিলেশ তাকে খুঁজে বার করবে। তাকে উদ্ধার করবে এই পাতালপুরী থেকে। পুরুষে না পারে কি! প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই আছে এক দুঃসাহসী রাজপুত্র। রাক্ষসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে চিরদিন নিজের রাজকন্যাকে বুকে তুলে নেয়। নানা গোপন ঠিকানায় লুকিয়ে লুকিয়ে খান কয়েক চিঠি পর্যন্ত লিখেছিল সুলেখা কিন্তু অখিলেশের কোন জবাব আসেনি।

ছ'মাস পরে শেষ হল কারাযন্ত্রণা। কোন হাসপাতাল কি ক্লিনিক-টিনিক কিছু নয়, সেই ছোট অন্ধকূপের মধ্যেই সোনা ঠাকুরমা এক নিশাচরী বুড়ী দাইকে এনে হাজির করলেন। সুলেখার মনে হল যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু প্রাণ গেল না, শুধু ঘন্টা দুই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইল সুলেখা। জ্ঞান যখন ফিরে এল সোনা ঠাকুরমা তার কপালে মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোচ্ছেন। তাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ। আর তোর কোন ভয় নেই সুমি।'

সুলেখা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল সোনা ঠাকুরমা?'

তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'পোড়া-কপালী সে কথা শুনে তোর কি লাভ?'

সুলেখা বলল, 'তবু শুনি।'

সোনা ঠাকুরমা বললেন, 'ছেলে। তোর কথা আর ভাবিসনে সুলেখা। সে তোর কোলে থাকবার জন্যে আসেনি। আহাহা কি চেহারাই না হয়েছে। যেমন রঙ, তেমনি চোখ-মুখ। ঠিক যেন একেবারে রাজপুত্তুর।'

সুলেখা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তোমরা কি তাকে শেষ করে দিয়েছ?'

সোনা ঠাকুরমা প্রতিবাদ করে উঠলেন, ছি-ছি-ছি। এখানে জীবও যে শিবও সে। তাকে সব চেয়ে ভালো আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা খুব আদর যত্ন করবে। বড় হলে লেখা-পড়া শেখাবে।'

সুলেখা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সে আশ্রমের নাম কি ঠাকুমা?'

তিনি পরম স্নেহসিক্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, 'সে কথা তোর জেনে দরকার নেই দিদি।'

কলকাতায় ফিরে আসবার পরেও বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিল সুলেখা। সুধানাথ তার বিছানার কাছ থেকে নড়েননি। সুস্থ হয়ে ওঠবার পরেও খুবই আদর যত্ন করেছেন। বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন কয়েকবার কিন্তু সুলেখা রাজী হয়নি। অখিলেশ একবার গোপনে দেখা করতে চেয়েছিল। সুলেখা মত দেয়নি।

বাড়ীতে মুখ দেখাবার আর যো ছিল না সুলেখার। ছোট বড় সবাই তাকে অনুকম্পা করত। লজ্জায় সকলের কাছে মাথা নীচু করে থাকতে হত তাকে। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা ফের সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। শুধু অনেক টাকার ঋণ রেখে গেছেন সুধানাথ আর কিছুই রাখেননি। ভাই-বোনেরা সব নাবালক। তারা আঁকড়ে ধরল সুলেখাকে। দিন ভর টিউশনি করে, রাত ভর সেলাইয়ের কল চালিয়ে অনশনের হাত থেকে সমস্ত পরিবারকে সুলেখাই তখন বাঁচিয়ে তুলেছে। ছোট বোন বি-এ পাশ করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে বেশ মাইনের চাকরি নিয়েছে। বাড়ীতে বড় দিদির মর্যাদা সুলেখার একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। স্নেহ, ভালো-বাসা, কৃতজ্ঞতা, মায়া, মমতা নিয়ে ভাই-বোনেরা তার চারদিকে ঘিরে রয়েছে। হাসপাতালে নার্সিং-এর কাজে ভর্তি হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তার বেশ সুনাম হয়েছে। শুধু মাইনেই নয়, প্রতিপত্তিও বেড়েছে। সুলেখা বেশ সুখেই আছে একথা অখিলেশকে তার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। মিথ্যে প্রেমে মানুষ ভাসায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল সুলেখার। কোন দুঃখ নেই, সব ভুলে গেছে সে, তার জীবনেও সিদ্ধি আর সার্থকতা এসেছে।

সত্যি, তার কোন দুঃখ নেই, চৌবাচ্চা থেকে আর একবার ভালো করে ঠান্ডা জলে মুখ হাত ধুয়ে এল সুলেখা। তারপর ফের ঘুমোবার চেষ্টা করল। ঘুম এল না। ফিরে ফিরে নানা কথা নানা চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করে আসতে লাগল।

খানিক বাদে সুলেখা বিস্মিত হয়ে দেখল সে লেবার রুমে শুয়ে আছে। তার চারদিকে মল্লিকা মিনতির দল। তারা সবাই মুখ টিপে টিপে হাসছে। কি লজ্জা কি লজ্জা। তার কোলের কাছে সেই বাচ্চাটি যাকে নটার সময় সে বীণার কাছে দেখে এসেছে। সেই ফুটফুটে রং, কালো কুচকুচে আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ মেলে সে সুলেখার দিকে তাকিয়ে আছে। আরো কি অসম্ভব কান্ড। ভিড় ঠেলে ব্যস্ত-বাগীশ অখিলেশ ঠিক একেবারে সেইখানে এসে হাজির। ছি-ছি-ছি, একটুও লজ্জা নেই, একটুও ভয় নেই। এযে হাসপাতালের আইন-কানুনের বাইরে। হাউস সার্জনদের ধমক খেয়ে মরবে যে অখিলেশ, আর সুলেখার চাকরি যাবে।

সুলেখা কাতরভাবে বলল, 'এখানে আসতে নেই, তুমি বাইরে গিয়ে বসো।'

কিন্তু কোন যদি কান্ডজ্ঞান থাকে অখিলেশের, একটুও যদি লজ্জা ভয় থাকে। সুলেখার অনুনয়-বিনয়ে কোন কানই দিচ্ছে না সে। শুধু অপলকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। একবার তাকাচ্ছে সুলেখার দিকে আর একবার তাকাচ্ছে বাচ্চার দিকে। বার বার তাদের ছুঁইয়ে দেখতে চাইছে। আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে সুলেখা, 'ছি ছি ছি, তোমার কি সবুর সয়না?'

কিন্তু কোন নিষেধ শুনল না অখিলেশ, সত্যি সত্যিই এগিয়ে আনল হাতখানা। ছেলেকে পরম স্নেহে তুলে নিল। একি এতো অখিলেশ নয়, এ যে সেই দাই, কাশীর সেই বুড়ী, মুখপুড়ী দাই।

'নিসনে, নিসনে, এবার আর নিসনে। নিয়ে গেল, এবারো নিয়ে গেল। ও দারোয়ান, ধরো ধরো, শিগ্গির ধরো ওকে।'

হঠাৎ কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল সুলেখা।

মিনি হুড়মুড়ি জড়িয়ে ধরল সুলেখাকে, 'ও বড় দিদি, অমন করছ কেন, ফের বুঝি তোমাকে সেই বোবায় পেয়েছে। ওঠ, ওঠ, ভালো হয়ে শোও।'

পাশের ঘর থেকে দরজা খুলে ব্যস্ত হয়ে মনোরমা বেরিয়ে এলেন, দুই ভাইও জেগে উঠল।

মা বললেন, 'কি হয়েছে সুমি, অমন করছিস কেন?'

ভাইরা বলল, 'কি হয়েছে বড় দিদি?'

সুলেখা আস্তে আস্তে বলল, 'কিছু হয়নি। হাসপাতালের স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন।'

মনোরমা অভিযোগের সুরে বললেন, 'দিনরাত কেবল হাসপাতাল আর হাসপাতাল। এত করে বলি দুটো দিন ছুটি নে। তা কি মেয়ে শুনবে?'

সুলেখা বলল, 'তোমরা ঘরে যাও মা। আমি ফের একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।'

ঘরের আলো নিবিয়ে ফের শুয়ে পড়ল সুলেখা। চোখের জল ধুয়ে এল না, মুছে ফেলল না। পড়ুক তো পড়ুক। অন্ধকারে কে আর দেখবে!

আবার চারদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। শুধু শিয়রের কাছে দেয়ালের পেরেকে ঝুলানো হাত ঘড়ির টিক টিক শব্দ। এই একটানা শব্দ সুলেখাকে কি ফের ঘুম পাড়াবে? না বাকি রাতটুকু আজ আর ঘুমোবে না সুলেখা। জেগে থাকবে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবে। তাহলে আর শেষটুকু দেখবার ভয় থাকবে না।

CCP-1/55.56.

একটি নূতন প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব—মিসর

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

Young Turk Movement-এর বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে কার্য করিতেন। ফারুক নিজের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সংগে একটা সন্ধি করিলেন। সাম্রাজ্যবাদ চাহিত যে, মিশরে Feudalism বা সামন্ততন্ত্র* অক্ষুণ্ণ থাকুক। ফারুকও তাহাদের ইংগিতক্রমে এই সামন্ততন্ত্রের প্রধান সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া রহিলেন। যেদিন তিনি মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন, সেইদিনই তিনি অতি দ্রুত বৃটিশ দূতাবাসে গমন করিলেন ও তাহাদের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহাদের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ হইতে দিবেন না। বহুদিন ধরিয়া মিশর বৈদেশিক শক্তির সামরিক অধিকারে ছিল। সাম্রাজ্যবাদ বলিত যে ইহার প্রধান কারণ প্রজা বিদ্রোহের আক্রমণ হইতে মিশরের সিংহাসনকে তথা রাজতন্ত্রকে নিরাপদ রাখা। আর সেই জন্য রাজারাও বিদেশী শক্তির এই সামরিক অধিকারের জন্য চিন্তিত হইতেন না। রাজা ফারুককে যখন বৃটিশ সেনা বাহিনীতে জেনারেলের মর্যাদা দেওয়া হইল, তখন তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিলেন। তাঁহার জাতীয় মর্যাদাবোধ ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ ইউনিফর্ম পরিধান করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে সুয়েজখালে বৃটিশ ঘাঁটি পরিদর্শন করিতে যাইতেন। [illegible] অধিকার করিয়া [illegible] তিনি [illegible] সৈন্যদের নিকট হইতে কৃত্রিম সেলাম [illegible] লইতে একটুও লজ্জাবোধ করেন নাই।

এই রাজা [illegible] তিনি [illegible] করিতেন যে, [illegible] (joint defence) [illegible] করিয়া [illegible]।

রাজ পরিবারের অভিজাতবর্গের জীবন দুর্নীতিতে ভরা ছিল। ইঁহারা সর্বদা বিলাসব্যসনে মগ্ন থাকিতেন। আর মিশরের দরিদ্র প্রজাদেরকে ইঁহাদের এই বিলাস ব্যয় বহন করিতে হইত। [illegible] রাজবংশের অভিজাতবর্গের জন্য একটা নির্দিষ্ট [illegible] (civil list) ছিল। ইঁহারা [illegible] জনসাধারণের [illegible] হইতে বৃত্তি, ভাতা ইত্যাদি পাইতেন। সমস্ত সরকারী ব্যবস্থা ইঁহাদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। ইঁহারা যথেচ্ছা ব্যয় করিতেন, জনসাধারণের টাকা লুণ্ঠন করিতেন। রাজবংশের এইসব কুলাঙ্গারগণ কর পরিহারের (Tax evasion) সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিতেন। মহম্মদ আলি পরিবারের অভিজাতগণ দেশের কর্ষণযোগ্য ভাল ভাল জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে যেমন উচ্চবংশের হাতেই ভাল ভাল জমি ছিল, মিশরের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ ছিল। একদিকে অভিজাতবর্গের ঘরে ধনসম্পত্তির ছড়াছড়ি, আর অন্যদিকে মিশরের কৃষকগণ কঠোর দারিদ্র্য জ্বালায় নিপীড়িত। বস্তুতঃ মিশরের কৃষকগণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র। রাজা ফারুক তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সমস্ত প্রকার দুর্নীতির উত্তরাধিকারী ছিলেন। বিদেশে তাঁহারা এমন আচরণ করিতেন যাহা মিশরের পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল। নীতি ও শালীনতার প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখাইতেন। ১৯২৩ সালে মিশরকে যে শাসনতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহার ধারাগুলি জাতীয় সম্মানের দিক দিয়া অত্যন্ত হীনতাসূচক ছিল। আর ইহা সম্ভব হইয়াছিল ফারুকের স্বেচ্ছাচারমূলক মনোবৃত্তির জন্য। উহা ছিল নামেই কনসটিটিউশন। কারণ উহাতে রাজার হাতে চরম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছিল। রাজা ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু উহার মধ্যে এমন কোন ধারা ছিল না যাহার বলে রাজার কোন অন্যায় কার্যের প্রতিকার করা সম্ভব হইতে পারিত।

দেশপ্রেমের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে কোন কোন উৎসাহী দেশপ্রেমিক রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করিতেন কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে কঠোরভাবে দমন করিতেন। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘন ঘন এই প্রকার বিক্ষোভ হইতে দেখিয়া মিশরের রাজগণ বিশ্বাস করিতে লাগিলেন যে, কেবলমাত্র বৈদেশিক বিশেষতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যেই তাঁহাদের সিংহাসন নিরাপদ। উহারাই তাঁহাদিগকে টিকাইয়া রাখিতে পারিবে। ইহা সত্য যে, বৈদেশিক প্রভুদের উপর মিশরের রাজগণ মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতেন। কিন্তু রাজপদের স্থায়িত্বের জন্য সমস্ত অপমান সহ্য করিয়া সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন। মিশরের রাজারা প্রজাদের প্রতি অত্যাচারমূলক ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের কঠোর ও দুর্দান্ত দেখিয়া প্রজাকুল ভীত হইয়া পড়িত। কিন্তু সেই কঠোর প্রকৃতির রাজারা বৈদেশিক প্রভুদের নিকট একেবারে নম্র, ধীর ও শান্ত স্বভাব হইয়া থাকিতেন। রাজাদের এই প্রকার আচরণে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ দেখা দিল। সৈন্যগণ জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে কৃতসংকল্প হইল। জনগণের অসন্তোষকে তাহারা কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিল। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই মিশরের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এইদিন মিশরের সেনা বিভাগ জনসাধারণের প্রতিকারের ভার নিজেদের হাতে লইতে প্রস্তুত হইল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ রাজা ফারুককে শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত হইতে হইল। তিনি স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। সৈন্যদের এই সার্থক বিপ্লবকে দেশের জনসাধারণ সাদর অভিনন্দন জানাইল।

এই বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মিশরের রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং একটা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো রচনা করা। এই বিপ্লবের মূলনীতি হইবে সুবিচার ও সংনীতি। এইসব উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল মিশর হইতে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী রাজাকে অপসারণ করা। বিপ্লবীদল চরম সাহসের সংগে এই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লবীদল গোটা রাজতন্ত্রকেই নিঃশেষ করিয়াছিল এবং মিশরে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিল। ইহা স্মরণ করা দরকার যে, পূর্ব ব্যবস্থার (old regime) যুগে মিশরে যে পার্লামেন্ট ছিল তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না। রাজাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে দেশে এক প্রকার ডিক্টেটরী শাসন চলিতেছিল। ইহার প্রধান কারণ দেশে প্রচলিত ছিল সামন্ততন্ত্র। জমিদার, অভিজাত ও কোটিপতিগণ রাজার প্রশ্রয় ও স্নেহচ্ছায়াতলে থাকিয়া আরামে পার্লামেন্টারী শাসনের নামে দেশকে লুণ্ঠন করিয়া আসিতেছিলেন। সে দেশে লক্ষ লক্ষ ফেল্লাহ (Fellah) বা কৃষক পরিবারের কোন মর্যাদা ছিল না। বরং যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার হইত। প্রজাদের দুর্গতির একমাত্র প্রতিকার ছিল ভূমি আইনের সংস্কার। বিপ্লবী মিশর ক্ষমতা হাতে পাইয়া সর্বাগ্রে ভূমি আইনের সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করিল।

প্রজাতন্ত্রের সূচনা

১৯৫৩ সালের ১৯শে জুলাই সন্ধ্যার সময় মিশরের জনগণ শুনিল যে, আজ রাত্রে রেডিওতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হইবে। সেই ঘোষণা শুনিবার জন্য তাহারা অনেক রাত্রি পর্যন্ত রেডিওর নিকট কান পাতিয়া বসিয়াছিল। অবশেষে সেই মুহূর্ত উপস্থিত হইল। Revolution Command Council অর্থাৎ বিপ্লব পরিচালনকারী পরিষদ সেই সময় একটা ঐতিহাসিক ঘোষণা রেডিও মারফৎ প্রচার করিলেন—সমগ্র জগৎবাসীর নিকট ঘোষণা করা হইল যে, আজ হইতে মিশরে রাজতন্ত্রের বিলোপ করা হইল এবং জগতে আর একটি নূতন প্রজাতন্ত্র জন্মলাভ করিল। এই ঘোষণায় আরও বলা হইল যে, বিপ্লব পরিচালনকারী পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য মিশর হইতে সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিলোপ সাধন করা। যতদিন মিশরে রাজতন্ত্র অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন বৈদেশিক প্রভুত্বের বিলোপ হইবে না। সেইজন্য বিপ্লবী পরিষদ ফারুককে পদচ্যুত করিল। কারণ এই ফারুক সাম্রাজ্যবাদের হাতের ক্রীড়নক ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। কতকগুলি রাজনৈতিক দল ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি স্থিরভাবে বুঝিয়াছিল যে, রাজতন্ত্রের আশ্রয়েই তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে। সেইজন্য তাহারা সর্বপ্রকারে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করিত। এই ঘোষণায় আরও বলা হইল যে, মহম্মদ আলির বংশধরগণ দীর্ঘযুগ ধরিয়া ক্রমাগত নানাপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মিশরের চরম ক্ষতি করিয়াছেন। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, বিদেশীর নিকট দেশকে বিক্রয় করিয়াছেন। মিশরের রাজারা বিলাস-ব্যসন ◖

লাম্পট্যের মধ্যে দিন যাপন করিতেন। আর যদৃচ্ছা দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহাদের অবিবেচনার ফলে দেশের উপর বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। বৈদেশিক মহাজনের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি মিশরের অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব করিয়াছে। আর প্রজা বিদ্রোহের কবল হইতে সিংহাসনকে নিরাপদ রাখিবার জন্য দেশের উপর বিদেশী সৈন্য আমদানী করিয়াছে। বর্তমান রাজা ফারুক তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতামূলক কাজে পূর্ববর্তিগণকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিপ্লবীদল এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মিশর হইতে রাজতন্ত্র বাতিল করিতে হইবে। দেশকে পুনর্গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হইলঃ—

১। রাজতন্ত্রের অবসান ও মহম্মদ আলির পরিবারবর্গকে সমস্ত ক্ষমতার আসন হইতে অপসারণ করা।

২। মিশরকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা।

৩। অদূরভবিষ্যতে সর্বসাধারণের ভোটের সাহায্যে এই প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রচিত হইবে। বর্তমানে অস্থায়ীভাবে বিপ্লব পরিচালনকারী পরিষদ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

৪। নূতন ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করিয়া দেশের কৃষককুলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করিতে হইবে।

বিপ্লবী মিশরের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মেজর জেনারেল মহম্মদ নেজিব (Naguib) বলেন, "এই বিপ্লব একটা অগ্নিশলাকা। ইহা দেশ হইতে অরাজকতা ও দাসত্বের অন্ধকার দূর করিয়াছে। খৃঃ পূর্ব ৫২৫ সাল হইতে মিশর বিদেশী শাসকের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। তারপর আসিলেন মহম্মদ আলির বংশধরগণ। তাঁহাদের রাজত্বকালে মিশর বৈদেশিক শক্তির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। অতঃপর এই বিপ্লব মিশরের সমস্ত গুরুভার স্কন্ধে লইয়া দেশকে সাম্রাজ্যবাদ, পরাধিকার এবং শোষণ হইতে মুক্ত করিল, বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য এই সব অনাচার ও পাপ হইতে দেশকে উদ্ধার করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

প্রধানমন্ত্রী জামাল আব্দেল নাসের বলেন :—"হে দেশবাসিগণ, আজ আমাদের ইতিহাসে একটি গৌরবপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত। আজ বহুদিন পরে আমাদের দেশ স্বাধীন হইল। যাঁহারা এই দিনের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, কিন্তু নিজের জীবনে এদিন দেখিতে পান নাই, আজ তাঁদের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাদেরকে সমস্ত দেশের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

বিপ্লবী মিশরের প্রথম বৎসরের কাজ

বিপ্লব ঘোষিত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে মিশরে কি কি কাজ হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ মিশর সরকার হইতে প্রচারিত হইয়াছে। (Egypt's Republic in its first year) পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে জানা যায় যে, মিশরে এক বৎসরের মধ্যে বহু কাজ হইয়াছে। সংক্ষেপে কিছু কিছু [illegible] নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগে একটা মহা ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। ঘুষখোর অফিসারগণ বিতাড়িত হইয়াছে। অলস অকর্মণ্য কর্মচারিগণকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্বত্র একটা কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। দেশকে পুনর্গঠন করিবার জন্য বহু নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন প্রত্যেকটি বিভাগের কর্মচারীর দৃষ্টি কিরূপে সর্বসাধারণের মঙ্গলবিধান করা যাইবে। বৈদেশিক ব্যাপারে যাহাতে আন্তর্জাতিক জগতে মিশরের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পায় সেজন্য সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। চিরকাল ধরিয়া সামন্ততন্ত্র মিশরকে আর্থিক দিক দিয়া ধ্বংস করিতেছিল। ইহার ঐতিহ্য বহন করিয়া আজ বিপ্লবী মিশরকে অগ্রসর হইতে হইতেছে। সুতরাং ইহাতে প্রথম প্রথম বহু অসুবিধা হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান, দুর্নীতি, উৎকোচ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং সরকারী শাসনযন্ত্রের অক্ষমতা—এই সব বহু যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। স্বাধীন হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই সব অনাচার পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। এই সব অনাচার ও অযোগ্যতাকে সাম্রাজ্যবাদ সর্বদাই নিজের কাজে লাগাইত। প্রজাতান্ত্রিক মিশর এই সব দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া উহাদিগকে বহুলাংশে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা জনগণের নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত ও প্রাণবন্ত করার চেষ্টা হইতেছে। আজ প্রজাতান্ত্রিক মিশরের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে নীলনদের উপত্যকাকে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত করা, বৈদেশিক প্রভুত্ব দূর করা এবং একটি সুসংহত ভিত্তির উপর দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, যেন ব্যবসায় বাণিজ্যের নামে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদ মিশরে প্রতিষ্ঠা পাইতে না পারে।

ভূমি সংস্কার

মিশরে রাজতন্ত্রের আমলে যে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক কোন ভূমির অধিকারী ছিল না। প্রজাতান্ত্রিক মিশরের সম্মুখে ভূমির পুনর্বণ্টনের সমস্যাটাই প্রধান হইয়া উঠিল। বিপ্লবের কয়েক বৎসর পূর্বে ভূমি সংস্কারের বা ভূমি বণ্টনের কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বহু খাস জমির অধিকারী রাজগণ তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। এক্ষণে বিপ্লবী মিশর সেই অসমাপ্ত কাজ করিতে অগ্রসর হইল। মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই অধিকাংশ ভূমি ছিল। একদিকে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক আর অন্য দিকে মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছিল। এই অসম ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আর্থিক উন্নতির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। শিল্পের দিক দিয়াও মিশরের কোন উন্নতি হয় নাই। জমিদারদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল, যাহার বলে তাহারা দরিদ্র ভূমির অধিকারীকে উৎখাত করিতে পারিত। যাহারা চাষ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত, তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ ক্রমেই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছিল। জনগণের কষ্টের অবধি ছিল না। প্রজাতান্ত্রিক মিশর ভূমি বণ্টনের যে প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিব। বড় বড় এস্টেটকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

এক একজন লোক কত জমি রাখিতে পারিবে তাহার একটা সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আরও ঘোষণা করা হইল কেহ দুইশত ফেদ্দানের (এক ফেদ্দানের পরিমাণ এক একর চার শতক) অধিক জমি রাখিতে পারিবে না। ইহার ফলে প্রায় ছয় লক্ষ ফেদ্দান জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা হইল। বহু ভূমিহীন চাষী ভূমির অধিকারী হইল। এই ব্যবস্থাকে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্যকরী করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের শতকরা কুড়ি ভাগ কর্ষণযোগ্য জমির পুনর্বণ্টন হইবে। ইহা দেখা গিয়াছে বড় বড় এস্টেটের অধিকারীদের কেহই নিজে চাষ করে না। তাহারা নিজেদের জমি কৃষকদেরকে চাষ করিবার জন্য ইজারা দেয়। কিন্তু এই সব কৃষকদেরকে যদি ইজারা দেওয়া জমির প্রকৃত মালিক করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাতে কৃষকের উপকার ত হইবেই, তাছাড়া তাহাতে উৎপাদনও বাড়িয়া যাইবে। জমির উর্বরতা অনুসারে যদি দুই হইতে পাঁচ ফেদ্দান জমিকে একীভূত করার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষকদেরকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও হইতেছে। প্রাথমিকভাবে কৃষকদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য [illegible] বিভাগের কর্মচারীদের [illegible] জন্য নানা আয়োজন হইতেছে।

১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই [illegible] যুগোপযোগী পরিবর্তনের পর হইতেই ভূমি সংস্কারের জন্য নূতন আইন রচিত হইয়াছে। ইহার প্রধান নীতি হইতেছে কোন লোকই দুইশত ফেদ্দানের অধিক জমি রাখিতে পারিবে না। [illegible] অতিরিক্ত জমি রাষ্ট্র পুনর্বণ্টনের জন্য গ্রহণ করিতেছে। এই নীতির সাহায্যে [illegible] সব টুকরাগুলিকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন প্রকার বেআইনী হস্তান্তর [illegible] করা হইবে না। অতিরিক্ত জমির মালিকগণ [illegible] মূল্য হইতে [illegible] হইবে। [illegible] চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে [illegible] ভূমিহীন চাষী [illegible] জমির মালিক হইতে পারে। [illegible] এখনও জমি পাইবে না। [illegible] দুই হইতে পাঁচ ফেদ্দান জমি পাইবে। ভূমি সংস্কার আইনের ৯ ধারায় [illegible] হইয়াছে যে, জমিদারদের নিকট হইতে [illegible] যে সব জমি সরকার গ্রহণ করিবেন তাহা ছোট ছোট চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। তবে দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেকের জমি একত্রীভূত অবস্থায় থাকে। মিশরের দরিদ্র কৃষককুলের আজ কত আনন্দ। যাহারা বহু [illegible] ধরিয়া পরের জমিতে দিন মজুরী খাটিয়া জীবনধারণ করিত, আজ তাহারা নিজের জমিতে প্রাণ ঢালিয়া পরিশ্রম করিয়া মনের আনন্দে [illegible] ফসল তুলিতে পারিতেছে। বস্তুতঃ ভূমি সংস্কারের ফলে মিশরের জনগণ বিপ্লবের সার্থকতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেছে। আজ প্রজাতান্ত্রিক মিশর নানা প্রকার গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। প্রত্যেকটি নাগরিক অনুভব করিয়াছে যে, তাহারা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক। স্বাধীনতা এই ভাবেই জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

পরিকল্পনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে কলিকাতা থেকে খাটালগুলো সরিয়ে নিয়ে দূরবর্তী পশু ও তাদের মালিকদেরই পল্লী অঞ্চলে বসতির ব্যবস্থা করা।

বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির অনুপযোগী ৫০,০০০ একর পতিত জমিতে আরও বৃক্ষরোপণ এবং মৃত্তিকাক্ষয় নিবারণ ও কাগজ ও দেশলাইয়ের কলে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন বন সৃষ্টি ও কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি রোপণের সংকল্প আছে। তা ছাড়া, বালি, ঝড়ো বাতাস এবং বন্যা প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলস্থ কর্ষণযোগ্য জমির ক্ষতি করতে না পারে তজ্জন্য কৃত্রিম বনের বেষ্টনী সৃষ্টির ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার মধ্যে সেগুন গাছের চাষ, বনাঞ্চলে চলাচলের সুবিধা এবং বনকর্মীদের ও শ্রমিকদের কল্যাণমূলক বিবিধ ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে।

পল্লী ঋণ ও মাছের চাষ

[illegible]

[illegible] দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে [illegible] আরও ১২টি পরিকল্পনা কার্যকরী করার সংকল্প আছে।

[illegible]

সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রকল্পগুলোতে যে সব কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল তা দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলেও চালিয়ে যাওয়া হবে। পশ্চিমবাংলার পল্লী অঞ্চলে যে ২৫০টি থানা আছে, তার মধ্যে ৬৮টি থানায় প্রথম পরিকল্পনাকালেই এই উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। বাকী ১৮২টি থানায় কাজ আরম্ভ হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে।

সেচ পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের কৃষককে যাতে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের মুখ চেয়ে না বসে থাকতে হয় তজ্জন্য [illegible] পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনা আমলে ১৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে ১১৮টি সেচ-ব্যবস্থা চালু করার সংকল্প নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে তিনটি ছাড়া সবই প্রথম পরিকল্পনার আমলে শেষ হবে। বাকী তিনটি শেষ হবে ১৯৫৬-৫৭ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খরা অঞ্চলগুলোতে সেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য মোট ৮৫টি পরিকল্পনা কার্যকরী করার অভিপ্রায় আছে। তাছাড়া আরও তিনটা পরিকল্পনার কাজ প্রথম পরিকল্পনার আমলে আংশিকভাবে কার্যকরী করা হয়েছে এবং শেষ করা হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে। প্রথম পরিকল্পনা চালু হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গে সেচ-ব্যবস্থা সম্বলিত অঞ্চলের মোট পরিমাণ ছিল ২৪,৫০,৫০০ একর। প্রথম পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে আরও ১৩,৮২,৮০০ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা প্রসারিত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো সেচ-ব্যবস্থা কার্যকরী হলে কর্ষণযোগ্য ভূমির বিরাট একটা অংশে জল-সেচের ব্যবস্থা হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগতি

প্রথম পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। ঐসময় ১১টি পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয় এবং বর্তমানে ১৯৭ মাইল দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনের [illegible] সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি পাইকারী এবং খুচরাভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎশক্তি বোর্ড প্রস্তাবিত ১১টি পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যে সব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তার প্রসার এবং নতুন পরিকল্পনা প্রবর্তন করে রাজ্যের সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করাই এই প্রস্তাবের লক্ষ্য।

রাজ্যের [illegible] কুটিরশিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন একেবারে জরুরী, কারণ কুটির শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে পল্লী অর্থনীতির [illegible] কোনভাবেই সম্ভব নয়। কৃষিকে অবনতি থেকে রক্ষা করতে হলে ভূমির উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাতে হবে। এইজন্য, গ্রামের মানুষদের জীবিকার্জনে সহায়তার উদ্দেশ্যে কুটির শিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদুর, খাদি, গুড়, হাতে তৈরী কাগজ প্রভৃতি শিল্পের উন্নতির জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কালে আমরা গ্রামের দিকে লক্ষ্য রাখবার নীতি অনুসরণে কাজ করেছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে যেসব কাজ শুরু করা হয়েছে তা চালিয়ে যাওয়া হবে এবং ঘানি, ছোবড়া, মৃৎশিল্প, লৌহশিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নতুন কয়েকটা পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে।

শড়ক ও শড়ক পরিবহন

আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শড়ক ও শড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় ৩৮০ মাইল নূতন রাজ্য শড়ক, ১৬১৭ মাইল জিলা শড়ক এবং ১১৬ মাইল পল্লী-পথ নির্মাণের ব্যবস্থা স্থান পেয়েছিল। এছাড়া কেন্দ্রীয় শড়ক তহবিল থেকে জাতীয় শড়কগুলোর উন্নতি সাধনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আমাদের বর্তমান কারিগরী ও বস্তু-সম্পদের প্রসার দ্বারা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমরা এর চেয়েও বৃহত্তর নির্মাণসূচীতে হাত দিতে পারবো। আমাদের এই কার্যসূচীতে ১,২৪৮ মাইল রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ১,১৩৫ মাইল রাস্তা সুরু হয়েছে প্রথম পরিকল্পনার আমলে। তা ছাড়া, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২০০০ মাইল মিউনিসিপ্যাল রাস্তার উন্নতিবিধানেরও ব্যবস্থা আছে।

কলিকাতায় প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও প্রসার লাভ করবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি সহরের ২৬টি রুটে চালু ৫৫২ খানা প্রাইভেট বাসের বদলে সরকারী বাস চালু হবে।

শিক্ষা সম্প্রসারণ

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বস্তরের শিক্ষার সুসমঞ্জস উন্নতিবিধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রথম পরিকল্পনায় যে সব বিষয়ের উন্নতিবিধান সম্ভব হয়নি সেগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন আমাদের অনুমানের চেয়েও অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করায়, ৬ থেকে ১৪ বছরের বালকবালিকাদের জন্য সার্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। প্রত্যেক জেলায় ১০০ থেকে ১২০টা গ্রাম নিয়ে এই কাজ আরম্ভ হবে। এই রকম প্রতিটি অঞ্চলে একটা করে বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজ কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক ও জুনিয়র হাইস্কুলগুলোকে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রায় ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। এর কয়েকটাতে বিদ্যালয়ে ১১তম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করে সেগুলোকে উচ্চতম পর্যায়ের বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা যথোপযুক্তরূপে বৃদ্ধি করা হবে এবং যেসব জিলায় এখনো জিলা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়নি তথায় জিলা লাইব্রেরী, প্রতি সাবডিভিসনে শাখা লাইব্রেরী এবং নির্বাচিত অঞ্চলে পল্লী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি বিধানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সহর ও পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হবে। হাসপাতালগুলোর উন্নতি সাধনের কাজ চালিয়ে যাওয়া

হবে এবং ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, নার্স ও ধাত্রীদের শিক্ষালাভের কার্যসূচী প্রবর্তিত হবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে রাজ্যে আরও ৩৫০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করা হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে, কাঁচড়াপাড়া ও ডিগরিতে যক্ষ্মা হাসপাতালের সম্প্রসারণ হবে এবং নীলরতন সরকার ও কলিকাতা দন্ত চিকিৎসা হাসপাতালের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হবে।

এছাড়া, ফার্মাসী শিক্ষা, নার্সিং সার্ভিসের সম্প্রসারণ এবং মেডিক্যাল কলেজে রোগ প্রতিষেধক ও সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ক একটা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাজ্যে ২০০ শয্যাসম্বলিত একটা মানসিক ব্যাধি চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠার সংকল্পও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত যে সব ব্যবস্থা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, পুষ্টির মানের উন্নতি, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ দমনের পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনাকালে আরও ১৪টি হৃদরোগ চিকিৎসাগার, ৬০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি কুষ্ঠরোগী উপনিবেশ, ৩০টি কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র ও কতকগুলি কুষ্ঠরোগ দমন ও রোগের পর্যালোচনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প আছে।

গৃহ সংস্থান ব্যবস্থার উন্নতিসাধন

রাজ্যে গৃহ সংস্থানের যথেষ্ট পরিমাণ উন্নতিসাধনের ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে যে সব কাজ শুরু করা হয়েছে সেগুলি এখনও চালিয়ে যাওয়া হবে এবং রাজ্যের গৃহ সমস্যা সমাধানে আরও নূতন কতকগুলো পরিকল্পনা চালু করা হবে।

তা ছাড়া পঃ বঙ্গের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমিক ও খন্ডজাতীয় লোকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তব রূপান্তরে সাফল্য এবং আগামী ৫ বৎসরের জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক পরিকল্পনা প্রণয়নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় যে অক্লান্ত প্রয়াস করেছেন তার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। এই বিখণ্ডিত রাজ্যের জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বিধানের জন্য তিনি কোনপ্রকার চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি এবং ইতিমধ্যেই তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে যেরূপ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেছেন তজ্জন্য তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকেই প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর আর একটা মস্ত বড় কাজ হচ্ছে এই রাজ্যে তৃতীয় ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা। এই কারখানা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এখন চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যাতে আগামী ৫ বছর কালে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে পারে তাই-ই কামনা করি।

বসন্ত বাহার

(২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

...অন্যায় বুঝতে পারে, তাহলে যেন সে বাপকে মেনে নেয়।

মায়ের পা ছুঁয়ে সরমা প্রতিজ্ঞা করে, মায়ের বুকে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। লাইলীর ইচ্ছানুসারে ওর মৃতদেহ সেই বুড়ো কামিনী গাছের নীচে কবর দেওয়া হ'ল সযতনে।

মায়ের মৃত্যুর পর সরমার চার পাশে যেন রাজ্যের আঁধার ঘিরে ধরল। বুড়ি ঝি বাদে আপন বলতে রইল না কেউ। বাপের কথা মনে হতে ওর কান্না পায়, রাগ হয়, জ্বালা ফুটে ওঠে মুখে চোখে। যে বসন্ত-বাহারের লোভে, যে বসন্ত-বাহারের গর্বে অনাদিশংকর ভুলে আছে .. দূরে সরে আছে, সে বসন্ত-বাহারের গর্বই সে ছিনিয়ে নেবে বাপের কাছ থেকে।

কিন্তু গান যে সে শেখেনি। বসন্ত-বাহারও যে চলে গেছে মায়ের সঙ্গে। কি করে সে পাবে সংগীতে দখল?

মগনুবাঈর ছাত্র অনাদিশংকরের বন্ধু বিঠল দাসের কথা শুনেছে সে। মগনুবাঈর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে লাইলী এবং অনাদিশংকর বাদে বিঠলদাসই মগনুবাঈর গায়কীতে সমৃদ্ধ।

বিঠলদাসের কাছেই একদিন ছাত্রী হিসেবে উপস্থিত হ'ল সরমা। দশ বছর কঠোর পরিশ্রমে বিঠলদাসের কাছ থেকে একটি একটি করে প্রায় সব রাগিণীই তুলে নিল। কিন্তু বসন্ত-বাহার পায়নি বিঠলদাস, সরমার মুখ কালো হয়ে যায় নিরাশায়। বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায় অতো পরিশ্রম!

বৃদ্ধ তবলচী একদিন জানালে চুপি চুপি, —মগনুবাঈর সারেঙ্গীদার এখনও বেঁচে আছে, জ্বরার ভারে চলাফেরা করতে পারে না। যদি সরমা রাজী থাকে, গাড়ী নিয়ে গিয়ে আনা যায় মিছিরজীকে।

এরপর থেকে প্রতিদিন তবলচী গাড়ী নিয়ে গিয়ে মিছিরজীকে নিয়ে আসে। সরমাকে তালিম দেয় বৃদ্ধ। বহুদিন বহু জলসায় মগনুবাঈর সঙ্গে বসন্তবাহার বাজিয়েছে সে। মগনুবাঈর কণ্ঠ সে ধরে রেখেছে সারেঙ্গীর তারে।

একটু একটু করে বসন্ত-বাহার দখলে আসতে থাকে সরমার।

কিন্তু বিঠলদাসের বাড়ীতে আজ বাপকে দেখে, বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে সরমার সংকল্প টুটে গেল। স্নেহকাঙালী মন ওর কেঁদে উঠল। বাড়ী এসে মাঝরাত পর্যন্ত জানালার ধারে বসে রইল। মনের মাঝে কত আশা গুনেগুনিয়ে যায়।

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার কিছুই সে খুঁজে পায় না। কত সুন্দর..কত সৌম্য তাঁর চেহারা। টানা টানা চোখ দুটি যেন স্নেহ করুণায় ভরা...

স্বপ্ন দেখে সরমা, কত বড় বাপের মেয়ে সে। যদি বাবা ওকে ডেকে নেয়—কি মজাই না হবে। একসঙ্গে গান গাইবে। একসঙ্গে এ কনফারেন্স থেকে সে কনফারেন্সে ঘুরে বেড়াবে। সরগম দেখিয়ে দেবেন তিনি, টুক টুক করে তুলে নেবে সে। শেখাতে শেখাতে কতো না খুশী হয়ে উঠবেন তা হ'লে—

রাত এগিয়ে যায়। বিনিদ্র নয়নে স্বপ্নের জাল বুনে চলে সরমা।

থমকে দাঁড়ালেন অনাদিশংকর। এ সব কি ভাবছেন তিনি! স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে আজ প্রকান্ড সংসারের তিনি অধিকর্তা, দুটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে নামীঘরে। বড় ছেলেটি ডাক্তারী পাশ করে বিলেত যাবার তোড়জোড় করছে। এ অবস্থায় কি পরিচয় দেবে সে সরমার?—শিউরে ওঠেন অনাদিশংকর। এক ঝলক হাওয়া যেন হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ধিক্কার দেন তিনি নিজকে,—কাশী আসাই তাঁর বড় ভুল হয়ে গেছে। আজ রাতেই পালাতে হবে, মেয়েটার মুখোমুখী হওয়াই আর চলবে না......

বাড়ী ফিরে এসে সেই দুপুরে রাতেই বিস্মিত বন্ধুকে ডেকে তুলে বিদেয় নিয়ে নিলেন তিনি। কলকাতায় কি একটা জরুরী কাজ রয়েছে, মনেই ছিল না ছাই—

* * * *

সকাল হতেই অস্থির হয়ে উঠে সরমা। মনকে আর সে বেঁধে রাখতে পারে না। কাঙালী মন ওর আর বুঝ মানে না। মায়ের শেষ সময়ের প্রতিজ্ঞার কথা মনে হয়। দ্বিধা আসে। পরক্ষণেই যুক্তির জাল বোনে—বাপকে ধরে এনে মায়ের সমাধি পাশে দাঁড় করালে কৃতকর্মের অনুশোচনায় নিশ্চয় তাঁর বুক ভরে যাবে।

ভোরবেলার মুখে লাইলীর সমাধিপাশে ক্ষণেক দাঁড়াল সরমা। বুড়ো কামিনী গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে, সুগন্ধে ভরে আছে চারপাশ।

একগুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে সরমা মায়ের মাথার কাছে রেখে দিল। কিন্তু বিঠলদাসের বাড়ী এসে সরমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, দু' চোখ ছাপিয়ে কান্না ফুলে উঠল। ... অনাদিশংকর কলকাতা চলে গেছেন শেষ রাতের গাড়ীতে।

চোখের জল লুকোবার জন্য সরমা বেরিয়ে আসে বিঠলদাসের গৃহ থেকে। একটা টাঙ্গা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায় পথে পথে।

ভর দুপুরে টাঙ্গাওয়ালা বিদেয় চায়। ক্লান্তদেহে সরমা এসে মায়ের সমাধিপাশে বসে পড়ে।

ঝরা কামিনী ফুলে সাদা হয়ে আছে সমাধিস্থান। রৌদ্রের তাপে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে পাঁপড়ির শুভ্রতা, সুগন্ধ গেছে মরে।

কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে সরমা। লুটিয়ে পড়ে মায়ের সমাধিমূলে।

সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

ডাঃ এম, সি, ঘোষ, এম, ডি (U. S. A)
প্রতিষ্ঠিত

ঘোষ হোমিও ফার্ম্মেসী

৪৪বি, মনসাতলা লেন, কলিকাতা—২৩

স্বর্গীয় ডাঃ ঘোষের সুদীর্ঘ চিকিৎসা জীবনের অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার অতুলনীয় নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী বাজারের সর্বত্র এবং দীর্ঘদিন সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত—তাঁহার আবিষ্কৃত কয়েকটি হোমিও পেটেন্ট ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং অন্যান্য হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ আমাদের নিকট পাইবেন। সত্বর লিখুনঃ—

পুস্তকাবলী :—১। **কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা** (১১শ সংস্করণ) মূল্য—১১; ২। **প্রাকটিসনার্স গাইড** (১১শ সংস্করণ) মূল্য—৯; ৩। **কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেন্ট** (৬ষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য—২,

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন

মোটর সাইকেল যাঁরা চেনেন এবং কেনেন, তাঁরা সকলেই প্রথমে আসেন...

মোটর এণ্ড সাইকেল সাপ্লাই ষ্টোর্সে

যেখানে সমাবেশ হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত গাড়ীগুলি
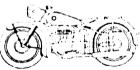
এন, এস, ইউ—হাল্কা ধরণের শ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী মোটর সাইকেল, ৮ ষ্ট্রোক ডবল স্প্রিং এবং অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়া তৈরী। বিদেশে মোটর সাইকেল রেসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং কলিকাতা—রাঁচী রেসে নির্ভরযোগ্য গতিশীলতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বি, এম, ডাব্লিউ—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জার্মাণ মোটর সাইকেল। যার গতি বিদ্যুতের মত। নূতন চালান এসেছে, আজই Order Book করুন।

এ, জে, এস—বিলাতে তৈরী একখানি মজবুত ভারী মোটর সাইকেল, যার রাস্তা সব রকম আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

লাচ সাইকেল ইঞ্জিন—জার্মাণে তৈরী ছোট ছোট কাজ সারবার জন্য সস্তায় এই ইঞ্জিন কিনে সাইকেলে লাগান এবং আরামে ভ্রমণ করুন।

ভিক্টোরিয়া স্কুটার—জার্মাণে তৈরী এই গাড়ী কিনে মোটর ভ্রমণের আনন্দ পাবেন। দামে সস্তা, কাজে মজবুত এবং সৌখীন দেখতে—শীঘ্রই এসে পৌঁছাবে। আজই আপনার অর্ডার দিন।

একমাত্র আমদানীকারক

মোটর এণ্ড সাইকেল সাপ্লাই ষ্টোরস

গ্রাম: "সাইমোসাপ" ৫, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। টেলিফোন: ২৪-৫১০৪

ঝকঝকে ছাপা

বর্ণপরিচয়কামী শিশু কিংবা গ্রন্থকীট ছাত্র সকলের কাছেই ঝকঝকে ছাপার আবেদন সমান। মরমী কবি কিংবা চিন্তাগম্ভীর দার্শনিক সকলের সার্থকতার প্রকাশ তো ঝকঝকে ছাপার মাধ্যমে। এই ঝকঝকে ছাপার নেপথ্যে যে কলাকুশলতা তা সাধারণে না জানুন কিন্তু রুচিশীল মুদ্রকের না জানা থাকলে চলে না। থাক না ভালো কাগজ, ভালো যন্ত্র, ভালো কালি—ভালো টাইপ না থাকলে সমস্ত সম্ভার থাকা সত্ত্বেও ছাপাকে আর পাতে দেওয়া চলে না। ভালো ছাপার জন্যে ভালো টাইপ আর ভালো টাইপের জন্যে

শ্রী টাইপ ফাউণ্ড্রারী

১২-বি, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা—১

আধুনিক গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা

জীবনবীমার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের জন্য একখানি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত বাসগৃহ নির্মাণের অভিনব পন্থা।

•

ওয়ার্ডেন ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস ঃ- বোম্বাই

কলিকাতা শাখাঃ
পি-৩৯, মিশন রো এক্সটেনশন

চিরন্তন

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

পড়বে। মাথাটা ঝুঁকে পড়বে হাঁটুর উপর—এই-ভাবেই আসবে চিরবিশ্রাম। এইত সহজ পথ। সবাইকেই ত মরতে হবে।

কোন নালিশ নেই ওর। এই ত জীবনের পরিণাম। এই ত ঠিক। মাটির অতি কাছাকাছিই সে জন্মেছে, জীবনটা কেটেছেও মাটির কাছে। দুনিয়ার নিয়ম ওর কাছে নতুন কিছু নয়। সব জীবেরই নিয়ম এই। প্রকৃতি জীবনের প্রতি সদয় নয়। একক জীব যতই বাস্তব হোক না কেন, প্রকৃতি তার ধার ধারে না। ব্যক্তি নিয়ে তার কোন কারবার নেই। তার একমাত্র উৎসাহ সমষ্টি নিয়ে, জাতি নিয়ে। বুড়ো কস্‌কুশের বর্বর মনে এর চেয়ে বেশী দার্শনিক চিন্তা ঠাঁই পায় না।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই ও প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে। সব জীবের মধ্যে এরই প্রকাশ দেখতে পায়। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে চারা, তারপর সবুজপাতায় ভরে যায়। সব শেষে, পাকা পাতা ঝরে পড়ে। এরই মধ্যেই ত সমস্ত ইতিহাস। কিন্তু প্রকৃতি একটি দায়িত্ব দিয়েছে প্রত্যেককে। যে তা পালন করেনি, সেও মরেছে; আর যে তা পালন করেছে, তার বেলায়ও কোন ব্যতিক্রম হয়নি, তাকেও মরতে হয়েছে। প্রকৃতি কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না। যারা মেনে চলে তাদের সংখ্যাই বেশী। এই মেনে চলাই বড় কথা। এই নিয়মই চিরদিন বেঁচে থেকেছে, চিরদিন থাকবেও নিয়ম মেনে যে চলেছে, তার বেঁচে থাকার কথা নয়।

কস্‌কুশের এই গোষ্ঠী বহু প্রাচীন। ছেলেবেলায় যে-সব বুড়োকে ও জানত, তারাও আবার অনেক বুড়োকে দেখেছে। কাজেই গোষ্ঠীটা যে বেঁচে আছে—এটা সত্যি। সকলে মেনে চলে বলেই ত বেঁচে আছে জাত। কোন্ বিস্মৃত অতীত যুগ থেকে ওরা চলে এসেছে। কার দেহ কোথায় বিশ্রাম করছে, তাও ভুলে গেছে সবাই। কে ধার ধারে তাদের, তার ত শুধু এক-একটি অধ্যায়, শরতের মেঘের মত মিলিয়ে গেছে। ও নিজেও তাই, যাবে মিলিয়ে। প্রকৃতি তার ধার ধারে না। জীবনকে ত সে একটি কাজের ভার দিয়েছে, দিয়েছে একটি বিধান। জীবনের ধারাকে চিরন্তন করাই জীবনের কাজ, আর জীবনের পরিণাম হল মৃত্যু।

কুমারীকে দেখতে ভাল লাগে: ভরা বুক, সবল দেহ, পদক্ষেপে নাচের ভঙ্গি, চোখের চাউনিতে বিদ্যুৎ ঝলক। কিন্তু তার কর্তব্য সামনে। চোখের দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পদক্ষেপ হয় আরও চঞ্চল। কখনো বে-পরোয়া হয়ে পড়ে তরুণদের সামনে, কখনো ভয়বিহ্বল। আর তরুণদের মনেও নিজের মনের অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়। দিন দিন রূপে বাড়ে, সুন্দরী থেকে আরো সুন্দরী হয়। অগত্যা কোন শিকারী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ওকে নিয়ে চলে যায়। সেখানে ও রাঁধবে, খাটবে আর ওর মরদের সন্তানের জননী হবে। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রূপের আলো ঝিমিয়ে আসে, দেহ তার আলগা হয়ে যায়, চলা ও নড়া-চড়ার মধ্যে ছন্দ যায় হারিয়ে; চোখের আলো ম্লান, দৃষ্টি ঝাপসা। আগুনের ধারে থ্যাবড়া-মুখো বুড়ী যখন বসে থাকে, তার শুকনো গাল দেখে শিশুরাই যা আনন্দ পায়।

কর্তব্য তার সারা হয়ে গেছে। কদিন বাদেই দুর্ভিক্ষ যদি কোন মতে উঁকি মারে বা দীর্ঘ পথযাত্রা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে ওকে ফেলে সবাই চলে যাবে বরফের মধ্যে গুটিকয়েক লাকড়ি সাথে রেখে, ঠিক যেমন আজ ফেলে গেছে বুড়োকে। এ-ই আইন এ-ই ব্যবস্থা।

এক টুকরো কাঠ আগুনের মধ্যে দিয়ে বুড়ো আবার তার ধ্যান শুরু করে। সব জায়গায়ই সবকিছুর ব্যাপারে এই এক ব্যবস্থা। প্রথম তুষারপাতেই মশা লোপ পেয়ে যায়, ছোট্ট গেছো-কাঠবিড়ালীটা কুট-কুট করে চলে মরার পথে, খরগোসটা বুড়িয়ে আসে, তার গতি হয় ধীর, পা হয় ভারী, শত্রুর সঙ্গে দৌড়ে আর প্রাণ বাঁচাতে পারে না। সর্দারের টেকো-মুখখানা পর্যন্ত বীভৎস হয়ে যায়, চোখ যায় অন্ধ হয়ে, মেজাজ হয় খিট-খিটে। শেষ পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করতে করতে একদল গাড়ী-টানা কুকুর ওকে কামড়ে শেষ করে দেয়। মনে পড়ে, কিভাবে ও একবার শীতের সময় ওর বাবাকেই ফেলে চলে গিয়েছিল সেই ক্লনডাইকের সীমান্তে। সেই শীতে—যেবার লম্বা লম্বা বই আর বাক্স বাক্স ওষুধ নিয়ে মিশনারীটা এসেছিল, সেই ওষুধের বাক্সের কথা স্মরণ করে অনেকবার ঠোঁট চেটেছে কস্‌কুশ্। আজ আর কিন্তু মুখ ওর ভিজতে চায় না। তার বেদনার দাওয়াইটা সত্যই ভাল ছিল। কিন্তু লোকটাকে নিয়ে হয়েছিল জ্বালাতন। মাংস নিয়ে ত আসেনি সে। কিন্তু খেত প্রাণভরে, আর শিকারীরা গজর গজর করত। মেও-র কাছে দুটো নদীর মাঝখানে ওর ফুসফুস গেল জমে, তারপর কুকুরগুলো নাক-মুখ দিয়ে পাথরগুলো সরিয়ে ওর হাড়ের জন্য লড়াই শুরু করে দিল।

আগুনের মধ্যে এক টুকরো কাঠ ফেলে দেয় কস্‌কুশ্। তারপর আবার কান খাড়া করে সুদূর অতীতের রেশটুকু শুনবার চেষ্টা করে সে। কী ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খালি পেটে আগুনের ধারে দুমড়ে বসে থাকত বুড়োরা। মাঝে মাঝে আরো প্রাচীন যুগের ভুলে-যাওয়া কাহিনী বলত এক-আধটা। পর পর তিন শীত প্রবল ধারায় বয়ে গিয়ে কিভাবে ইউকন নদী গরম কালে জমে থাকত। সেই দুর্ভিক্ষেই ও মাকে হারিয়েছে। গ্রীষ্মের দিনে সালমণ্ড (২) ধরবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে শীতের প্রতীক্ষায়—কখন বল্গা-হরিণ আসবে। কিন্তু শীত যখন এল, বল্গা-হরিণের দেখা মিলল না। এমনটি আর কখনো ঘটে নি—বুড়োরাও বলতে পারে না। সাত বছর এমনি করে কেটে গেল, হরিণের দেখা নেই, খরগোসগুলিরও সংখ্যা বৃদ্ধি নেই, কুকুরগুলিও শুধু হাড্ডিসার। দীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে কত বাচ্চা কেঁদে মরে গেল, মরল কত মেয়ে-ছেলে, কত বুড়ো। শতকরা দশজনও বেঁচে রইল না বসন্তের সূর্য-ওঠা চোখে দেখবার জন্য। হ্যাঁ, দুর্ভিক্ষই বটে।

প্রাচুর্যের দিনও চাক্ষুষ করেছে সে। ঘরে মাংস তখন নষ্ট হয়ে গেছে। খেয়ে খেয়ে অকেজো হয়ে গেছে কুকুরগুলো, শিকার ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েগুলো প্রচুর বিইয়েছে। ঘরে ঘরে ক্যাতর ক্যাতর বাচ্চাগুলি চিৎ হয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়েছে। পুরুষদের তখন মেজাজ গরম, যত

পুরানো কোঁদল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নদী-অঞ্চল পার হয়ে দক্ষিণে চলে গেছে পেলি (৩) অঞ্চলে শিকার করতে। পশ্চিমেও গেছে, তানানা-র নিকট আগুনের ধারে বসে গুলতানি করবার আশায়।

কস্‌কুশের মনে পড়ে, একবার ছেলেবেলায় প্রাচুর্যের মধ্যে একটা মুজ-হরিণকে নেকড়ের দল মেরেছিল ওরই চোখের সামনে। বরফের উপর শুয়ে পড়ে ও আর জিং-হা দুজনে তা দেখেছিল। এই জিং-হাই পরে সেরা শিকারী হয়ে ওঠে। তারপর একদিন জমাট ইউকনের একটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যায়। এক মাস বাদে তাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল—ঠিক যেমনটি ঢুকেছিল। বরফে জমে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ও, জিং-হা আর মুজ-হরিণটা সেদিন পূর্ব-পুরুষদেরই মত শিকার খেলা খেলতে গিয়েছিল। একটা খাতের উপর আর একটা মুজ-হরিণের সদ্য পায়ের ছাপ চোখে পড়ল, আর তারই সঙ্গে দেখা গেল অনেকগুলি নেকড়ের পায়ের ছাপ। 'বুড়ো একটা!' বলে উঠল জিং-হা। ছাপ দেখে সহজেই ও সব বুঝে ফেলত। 'বুড়ো একটা, দলের আর-সবার সঙ্গে সমান কদমে চলতে পারেনি। নেকড়েগুলি ওকে দলছাড়া করে ফেলেছে, আর ছাড়ছে না।'

(২) সামুদ্রিক তৈলাক্ত মৎস্য বিশেষ

(৩) ক্যানেডায় উৎপন্ন আলাস্কায় ইউকোনএর উপনদী।

সাহারা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

দিগন্ত-বিস্তৃত বুকে
        শুধু বালু দেখেছ তোমরা?
রুক্ষ তপ্ত তৃষাতুর
        পড়ে' আছি বুভুক্ষাকাতর,
হিংসালু নয়নে মোর
        তাম্রনীল নভ দেয় ধরা,
দুঃস্বপনের মত জাগে
        কবে-লুপ্ত সে মহাসাগর!
উন্মত্ত তরঙ্গে তাই
        গড়ে' তুলি দুরন্ত টাইফুন,
ধ্বংসের তাণ্ডবে মাতি'
        প্রলয়ের আতঙ্ক ছড়াই,
বালুর কটাহে জ্বালি
        লেলিহান্ মৃত্যুর আগুন,
স্বার্থবাহ উত্তরলে,
        রোষদৃপ্ত হুঙ্কার শোনাই।'

তবুও ধরিত্রী দেয়
        রুক্ষ চোখে কোন্ মায়াঞ্জন,
খর্জুর-কুঞ্জের মাঝে
        গড়ি দ্বীপ চারু মরূদ্যান,
আসে বেদুইন-কন্যা,
        অঙ্গে কাঁপে দুঃসহ যৌবন,
মরু-প্রেমিকের তরে
        নিত্য করে নিষ্ফল সন্ধান।
মানুষ বিজ্ঞান-বলে
        চাহে মোর শ্যাম রূপান্তর,
আমার অন্তর কাঁদে
        কার লাগি', কে দেবে উত্তর!

কথাটা ঠিকই বলেছিল। ও-ই নেকড়ের দস্তুর। দিনে-রাতে কখনো আসবে না, পায়ের কাছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করবে, নাকে-মুখে হাঁচোড় দেবে, শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবে ওর সঙ্গে। জিং-হার আর ওর—দুজনেরই রক্তের নেশা কেমন চনমনিয়ে উঠেছিল শেষের মুহূর্তটা দেখবার মত হবে বই-কি!

পরম আগ্রহে পা চালিয়ে ওরা ছাপগুলি ধরে চলল। এমন কি, কস্‌কুশ্‌ নিজে যে চোখে দেখে কম, ছাপ দেখে এগোবার বিদ্যেও হয়নি তেমন, সেও চোখ বুজে চলতে লাগল পায়ের ছাপ ধরে, এমন বড় ও স্পষ্ট ছিল সেই ছাপগুলো।

শিকারের পায়ে পায়ে চলেছে ওরা। কিভাবে মারা পড়বে মুজটা সেই করুণ দৃশ্য প্রান্ত পদে নতুন করে লেখা, যেন ওরা পড়তে পারছে। এবার যেখানে পৌঁছিল, মুজটা সেখানে রুখে দাঁড়িয়েছিল। একটা সেয়ানা মানুষের দেহের তিনগুণ জায়গা জুড়ে সবটা বরফ পায়ের চাপে দলাই-মলাই হয়েছে। মাঝে মাঝে শিকারটার খুরওয়ালা পায়ের দাগ। আর চারপাশে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে নেকড়েগুলোর পায়ের হাল্কা ছাপ। একদল নেকড়ে যখন শিকারকে ঘায়েল করতে ব্যস্ত, দলের গোটা কয়েক এক পাশে শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়েছে। বরফের উপর ওদের টান্‌টান্‌ শুয়ে থাকায় যে দেহের ছাপ, সেগুলি যেন এখনি মুহূর্তে পড়েছে। শিকারটা মরিয়া ও পাগলা হয়ে তেড়ে গেছে, একটা নেকড়ে তার পায়ের চাপে তখন চুরে গেছে। খুঁজে পেতে কুড়িয়ে আনা গোটা কয়েক হাড় অনেকদিন তার সাক্ষী হয়েছিল।

সেখান থেকে বরফ-ঠেকানো জুতো-ঢাকা পা চালাতে চালাতে আবার ওরা দাঁড়িয়ে গেল। মুজটা এখানে মরিয়া হয়ে পড়েছিল। দুবার টেনে ফেলা হয়েছিল ওটাকে, বরফের উপরকার দাগ দেখে তা বোঝা যাচ্ছে, আর দুবারেই শত্রুদলকে ঠেলে নিয়ে উঠে পড়েছে। জীবনের কাজ তার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু প্রাণের মায়া কাটে নি। জিং-হা বলেছিল, মাটিতে ফেলার পরও যে একটা মুজ্‌ দাঁড়িয়ে উঠতে পারে এটা সত্যি আশ্চর্য; তবু সেই মুজটা তা পেরেছিল। পুরুত মশাইরা যখন শুনলেন খবরটা, তাঁরা এর মধ্যে বিস্ময়কর অনেক লক্ষণই আবিষ্কার করলেন।

আরো একবার ওরা দেখা পেল। মুজটা এবার তাড়া খেয়ে তীরে উঠেছে, দাঁড়িয়েছে একটা মরা গাছের শুয়ে-পড়া গুঁড়ির উপর, কিন্তু আততায়ীরা ওৎ পেতে আছে পিছনে। পিছোতে পিছোতে মুজটা ওদের উপর পড়ল, বরফের মধ্যে পিষে দিলে দুটোকে। জাত-ভায়েরা তাদের স্পর্শও করলে না। শিকার ত এবার হাতে এসে গেছে। আরো দুটো খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেল ঝট্‌পট্‌। পথ এবার লাল হয়ে গেছে। বিরাটকায় মুজটার কদমে চলা আর নেই, ছোট ছোট পদক্ষেপে বেয়াড়াভাবে টলে টলে চলেছে। এবার কস্‌কুশ্‌ ও তার সঙ্গীদের কানে এল শেষ যুদ্ধের প্রথম ধ্বনি: শিকার তাড়া করার গলা ছাড়া ঐকতান নয়। ছোট ছোট খন্‌খনে চিৎকার। বোঝা যাচ্ছে যে, সবাই জমাট হয়েছে কাছাকাছি, মাংসের মধ্যে দাঁত বসছে। বরফ ও বাতাস ঠেলে গুটি-গুটি এগোল জিং-হা। তার সঙ্গে ও নিজেও—তারপর অনেক দিন সর্দার থাকতে হবে যার, সেই কস্‌কুশ্‌। একটা ছোট গাছের নীচের ডাল-পালাগুলো ঠেলে সরিয়ে ওরা দুজনে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। দেখলে চরম দৃশ্য।

যৌবনের আর সব স্মৃতির মত সেই দৃশ্যটা এখনো জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। চোখের দৃষ্টি আরো ক্ষীণ, কিন্তু সেই চরম সংগ্রাম আজো যেন সেদিনের মতই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বিস্ময় জাগে কস্‌কুশের মনে। কারণ, তারপর যখন সে হল সর্দার ও প্রধান মোড়ল, অনেক কিছু দুঃসাহসের কাজ করেছে ও। পেলি অঞ্চলে ওর নাম অভিশাপ বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই যে অদ্ভুত শ্বেতকায় লোকটিকে ও মেরেছিল, ছুরি নিয়ে খোলাখুলি যুদ্ধ করে, তার কথা আর না-ই বা হল।

অনেকক্ষণ ধরে যৌবনের দিনগুলির কথা ভাবতে থাকে কস্‌কুশ্‌। আগুন নিভে আসে, শীতটা কন্‌কনে করে কামড়ে ধরে। দুটো লাকড়ি ফেলে আগুনটা আবার উস্‌কে দেয়। আর বাকী কাঠ কটার দিকে চেয়ে জীবনের পরিমাপ করে। সিট্‌-কাম-টো-হা যদি দাদুর জন্য আরো কিছু বেশী করে কাঠ রেখে যেত, হয়ত আরো কয়েক ঘণ্টা বেশী টিকে থাকতে পারত ও। সেই কাঠটুকুও সহজ হত। কিন্তু মেয়েটা বরাবরই কাজে ঢিলে। আর যেদিন থেকে জিং-হার ছেলের বেটা বিভার-এর চোখ পড়েছে ওর উপর, সে দিন থেকেই বাপ-ঠাকুরদাকে গ্রাহ্য করা ছেড়ে দিয়েছে।

যাক, কি আর হয়েছে তাতে। নিজের চপল যৌবনে ও নিজেই কি এমনি ব্যবহার করে নি? একটু, কান নিস্তব্ধ পরিবেশে কান পেতে থাকে। যদি মেয়েটার বুকে হঠাৎ মায়া জাগে, আর কুকুরের দল নিয়ে ফিরে আসে বুড়ো বাপকে দলের সঙ্গে নিয়ে যাবে—যেখানে প্রচুর বল্গা হরিণ, আর তাদের গায়ে চর্বি ফেটে পড়ছে।

কান খাড়া করে থাকে কস্‌কুশ্‌, অশান্ত চিন্তাধারা ক্ষণিকের জন্য শান্ত হয়। কই? কোন সাড়া নেই। চারদিকের অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে ওর নিজের নিশ্বাসেই যা শব্দ হচ্ছে। কী নির্জন নিঃসঙ্গ! ও কি শব্দ? সারা দেহের উপর দিয়ে হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। অতি-পরিচিত একটানা খ্যাঁকানিতে স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে, খুবই কাছে। ওর আলো-নিভে-যাওয়া চোখে হঠাৎ জেগে ওঠে সেই মুজ হরিণটা—বুড়ো মদ্দা মুজটা—দু-পাশ ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত কেশরগুলো আলু-থালু, বিরাট শাখা-প্রশাখাযুক্ত শিং দুটো মাটিতে লোটাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করছে। দেখতে পাচ্ছে ধূসর রঙের কতকগুলি জানোয়ার বিদ্যুতের মত চমক হানছে, দেখতে পাচ্ছে জ্বলন্ত কতকগুলি চোখ, লোলহান জিহ্বা, লালাভরা দাঁত। আরো দেখতে পাচ্ছে, গোল হয়ে ঘিরে ধরে সেই জানোয়ারগুলো অদম্য গতিতে ক্রমেই সেই মুজটার কাছে ঘেঁষে আসছে, শেষ পর্যন্ত পায়ে দলা বরফের মধ্যে একটা কালো বিন্দুতে পরিণত হল সেগুলো।

একটা ঠান্ডা কামড় গালে বসতেই ওর মন বর্তমানে ফিরে আসে। হাত ছুটে যায় আগুনের মধ্যে, একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে বার করে। বংশ পরম্পরায় মানুষকে যে-ভয় করেছে, সেই ভয়ে জানোয়ারটা মুহূর্তের মধ্যে দু-পা পিছিয়ে যায়, তারপর গলা ছেড়ে লম্বা আওয়াজে দলের সবাইকে ডাক দেয়।

লোলুপ পশুগুলো সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়। একটা ধূসর বৃত্ত ওর চারপাশে ঘিরে ধরে। জানোয়ারগুলির দেহ কুঁকড়ে মাটি-মুখো, চোয়াল দিয়ে লালা বেয়ে পড়ছে। বুড়ো শুনতে পায় বৃত্তটা ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। হাতের জ্বলন্ত কাঠটা বুড়ো বেপরোয়াভাবে ঘোরায়, নাকে নিঃশ্বাসে ঘড় ঘড় আওয়াজ তোলে, কিন্তু জানোয়ারগুলি ফোঁস ফোঁস করতে থাকে, হটে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এবার একটা এসে ওর বুকে কামড়ে হেঁচকা মারে, পাছাটা পর্যন্ত এগিয়ে আসে হেঁচকার চোটে। আর একটা, আরো একটা এসে পড়ে ওর উপর। কেউ পিছু হটে না।

জীবনকে আঁকড়ে থাকবেই বা কেন? লক্‌লকে আগুন সমেত কাঠটা তাই বরফের মধ্যে ফেলে দেয় কস্‌কুশ্‌। ছ্যাঁৎ করে শব্দ করে নিভে যায় কাঠটা। গোল-হয়ে-ঘিরে থাকা জানোয়ারগুলো অস্বস্তিতে ঘোৎ ঘোৎ করতে থাকে, কিন্তু শিকার ছাড়ে না। বুড়ো মুজটার শেষ সংগ্রামের দৃশ্যটা আবার ভেসে ওঠে ওর চোখে। আর কস্‌কুশ্‌ শ্রান্তভাবে মাথাটা হাঁটুর উপর এলিয়ে দেয়। কি ক্ষতি হয়েছে এতে, এই ত জীবনের চিরন্তন বিধান। নয় কি?

•শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ•

বসন্ত গিয়াছে চলে শুষ্ক বন মাঝে—
একটি একটি ফুল তবুও বিরাজে।
কোন্ সুধা লয়ে বুকে
ফোটে তারা অন্তহীন বেদনার সুখে।
কলস্বনা চঞ্চলা তটিনী
হাস্যে-লাস্যে, নৃত্যে-গীতে উন্মনা নটিনী
সে ছিল অতীতে;
আজ তার ছন্দোহারা চলার গতিতে
পলাতকা ছবি এঁকে যায়
বিগত-বসন্ত ম্লান বনানীর গায়।
স্তব্ধ চারিদিক;—
ডেকে ডেকে শ্রান্ত হয়ে থেমে গেছে পিক্।

মত্ত বন-মরালের দল,
তবু কেন তোলপাড় করে বনতল।
রাতজাগা উদাসীন পাখী
রুদ্ধ বেদনার স্বরে কাঁদে কারে ডাকি।
ক্লান্তি নামে তন্দ্রাহীন আঁখির পাতায়
শয়নশিয়রে মোর দীপ নিবে যায়।

ধর্মান্তর

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

ছোকরা দরজার হ্যাণ্ডেলটা টানতে টানতে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু সে নিতান্তই এক লহমার জন্যে, তারপর বাক্যে আর আচরণে এতগুলো লোকের সামনে যাতে কোন প্রভেদ না হয়ে পড়ে যেন এই ভেবেই দরজাটা চেপে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিয়ে ধরেই বসে রইল।

বলতে কি, আমরা প্রথম ঝোঁকটায় একেবারে অবাক হয়ে গেছি। বৃদ্ধ কতকটা হাতড়ে হাতড়ে হ্যাণ্ডেলটায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, ছোকরার হাতটা চেপে ধরে কাতর মিনতির সঙ্গে বললেন—"খুলে দাও বাবা—শীগগির—বুড়ো মানুষ, দেখতে পাই না—থামবেও না গাড়ি—ভীড় ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ব—খুলে দাও।"

ততক্ষণ আমার সাড় না হলেও, অনেকের হয়েছে। অনুরোধ, উপরোধ, এমন কি হুমকি পর্যন্ত উঠল। একজন উঠে এগিয়েও যচ্ছিল, ছোকরা যেন একটু চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে হাতটা ওদিকে বেশ কড়া করে রেখে সুরে বলল—"রথের স্পেশ্যাল রয়েছে, এঁরা ভাইতে আসুন। ...দোর খুললেই এক্ষুণি হুড়ু হুড়ু করে ভীড় ঢুকে পড়বে—ফুড়্‌গেট্‌ খুলে দেওয়া..."

প্রৌঢ় যাত্রীটি খবরের কাগজের ওপর মুখ তুলে বললেন—"তুলেই নিন না এ্যাক্রোব্যাটদের মতন চ্যাংদোলা করে নিজেই হবে গাড়ি থেকে ফেলে..."

কয়েকজন বেশ চটে উঠেছে। আমারও সাড় হয়েছে—কিছু বলা না বলা উচিত; কিন্তু আর কিছুর দরকার হোল না। বৃদ্ধ নিরুপায় হয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগুচ্ছেন, এমন সময় একটি মেয়ে আলুথালু হয়ে সামনের দিক থেকে এসে উপস্থিত হোল। হাঁপাচ্ছে। বললে—"দাদু কোথায়? উঠ—উঠে পড়ুন ঐটেতেই—গাড়ি ছেড়ে দেবে যে। দেখুন তো! ...আমি উঁনিকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ..."

এর পর খোলা দরজা দিয়েই আগে বৃদ্ধকে তুলে দিয়ে, চলন্ত গাড়িতেই নিজে উঠে পড়ল। বাহাতের কব্জির ওপর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝোলানো, কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো একটা রেশন-ব্যাগও রয়েছে, ভারী, কিছু বই আছে সেটা টের পাওয়া যায়।

উঠে একটু ধমক দিল বৃদ্ধকে—"আমি আপনাকে বসে থাকতে বললাম—টিকিট কিনে না আসা পর্যন্ত—এসে দেখি ঠিক উঠে পড়েছেন! এই ভীড়ের মধ্যে—একে তো এক হাত তফাতে কি আছে আপনি দেখতে পান না—তার ওপর কারুর কথা শুনবেন না, নিজের যেটা ঝোঁক হবে ঠিক সেইটেই করে বসবেন—আর কি আপনার এ সব চলে এ বয়সে? একে তো কারুর কথা না শুনে এতগুলো স্টেশন পেরিয়ে এই ভীড়ে রথ দেখতে আসাটাই আপনার যে কতবড় বড় অন্যায় হয়েছে..."

বৃদ্ধের দেহটা একটু ভারী, যে জায়গাটুকু খালি হয়েছিল, কয়েকজন সরে সরে সেটুকুকে একটু বাড়িয়ে দিতে মেয়েটি গরগর করতে করতেই বৃদ্ধকে সেইখানে বসিয়ে দিলে। বৃদ্ধ কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলেন, লাঠির মাথার ওপর হাত দুটো রেখে মোটা চশমার মধ্যে দিয়ে চোখ দুটো তুলে একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বললেন—"তুই রাগ করলি মা? এই দেখো!"

তার পর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—"রথ দেখাটা ছিল বাৎসরিক, একেবারে সেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে; এখন এই মাহেশ সম্বল, সেটুকুও বাদ দোব? আর বছর পর্যন্ত চোখ ছিল। ভাবলাম এ বছর তবু পাদুটো তো রয়েছে এখনও, আর থাকবে কিনা কে জানে, নিজেই থাকব কিনা কে জানে, তাই..."

মেয়েটি জুড়ে দিলে—"তাই দুষ্টু ছেলের মতন সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়লাম..."

বৃদ্ধ ভালোভাবেই হেসে উঠলেন, বললেন—"চটেছে বেটি! এবার যে আরও দুষ্টু হয়ে একেবারেই বেরিয়ে পড়ব; তখন কে ঠেকাবে বল্‌?...তা হ্যাঁগা, তুই যে দাঁড়িয়ে রইলি। জায়গা হবে না একটু?"

বেশ ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে অস্বচ্ছ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

জায়গা হয় একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলে, কিন্তু বেটাছেলের মাঝখানটিতে মেয়েটিকে একটু চাপাচাপির মধ্যেই বসতে হয় বলে এদিককার সবাই বোধ হয় সংকোচ বোধ করছিল, ছোকরা লজ্জা আর লোভের মাঝামাঝি অবস্থায় পড়ে চেয়ে ছিল এদিকে, লজ্জাটা কাটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—"উনি না হয়...বলছি আপনি না হয় এইখানটা এসে বসুন না।"

"আর আপনি? দাঁড়িয়ে থাকবেন"

"ক্ষতি কি?"—আবার বেশ সপ্রতিভ হয়ে আসছে; হেসেই বলল।

মেয়েটি বলল—"তা হয় না..."

তারপর একটু হেসে বলল—

"আমি দাঁড়িয়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি বলুন?"

কয়েকজন এদিক থেকে বলল—"উনি না হয় এদিকে এসে বসুন না, হয়ে যাবে জায়গা।"

মনে হোল একটু যেন নিরাশ হোল ছোকরা, বোধ হয় এই জন্য যে, তাহলে তো আর স্যাক্রিফাইস করা হয় না। বলল—"না, থাক্‌, আমি দরজায় ঠেস দিয়েই দাঁড়াচ্ছি।... হাওয়াটাও পাব।"

প্রৌঢ় যাত্রীটি খবরের কাগজের ওপর দিয়ে মুখটা তুলে বললেন—"তাতে পাশেই ওঁর হাওয়াটা আটকানো হবে না?"

"তাহলে না হয়..." বলে ছোকরা একটু নিরুৎসাহ হয়েই পা বাড়িয়েছে, মেয়েটি এদিক থেকে হাত তুলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"না, না, আপনাকে আসতে হবে না, অত হাওয়ার ইয়ে নেই আমার! তবে এক কাজ করলে বোধ হয় ভালো হয়। আপনি যখন উঠছেনই, এঁকে ঐ জায়গাটায় বসালে..."

"হ্যাঁ, হাঁ, বুড়ো মানুষ, জানলার ধারে—একটু আরামে থাকতে পারে। বেশ, উঁকে আসতে বলুন।...আমিই ধরে নিয়ে আসছি না হয়।"

মেয়েটি বৃদ্ধকে তুলে সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বলল—"আপনার কিন্তু সেই কষ্ট হোলই; দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

ছোকরা ওদিক থেকে বৃদ্ধের হাতটা ধরে এগিয়ে নিতে নিতে আর সবার দৃষ্টি এড়িয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল—"আমি তো একে কষ্ট বলি না, তবে যদি হয়ই তো এরকম একজন বুড়ো মানুষের জন্যে না হয় একটু করাই গেল। ক্ষতিটা কি তাতে?"

—শেষের দিকে বৃদ্ধকে বসাতে বসাতেই ঘাড় হেঁট করে বলায় কারুর সঙ্গে চোখোচোখি হবার সম্ভাবনাই রইল না।

বৃদ্ধ হাতটা একটু তুলে বললেন—"বেঁচে থাকো বাবা।...আর এই একটু আগেই বেশ না—অত কাতর হয়ে বলছি—কোনমতেই দরজাটা..."

—চুপ করে গেলেন; বুড়ো মানুষ, কি যেন গোলমাল করে ফেলছিলেন। ছোকরা, প্রয়োজন না হলেও গোছগাছ করে বসিয়ে দেওয়ার ওজুহাতে মাথাটা হেঁট করেই ছিল, তুলে মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"আর আপনি? ঐখানেই...?"

মেয়েটি বসে নি, উত্তর করল—"ক্ষতি কি? তবে আপনি যদি এখানটায় এসে বসেন তো ওখানে গিয়ে দাঁড়াই।"

বৃদ্ধের জন্য ছেলেটির জায়গাটা নিয়ে ফেলে একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছে, তাকে বসিয়ে কতকটা সুধরে দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় হেসে বলল—"হ্যাঁ, তাই আসুন। হাওয়ার যে একেবারেই লোভ নেই একথা তো বলতে পারি না। বেশ ভালোই থাকব।"

সমস্যাটা অন্যভাবে মিটে গেল। রিষড়ায় এসে গাড়ি থামলে বৃদ্ধের পাশের ভদ্রলোকটি নেমে যেতে জায়গাটা খালি হয়ে গেল। মেয়েটি এসে বসতে বসতে বলল—"এবার আপনি দরজা থেকে সরে ওখানটায় গিয়ে বসতে পারেন।...যদি চান।...তেমন গরম তো নয়। রেস্ট পাবেন।"

সমস্যাটি এদিকে মিটলেও ছোকরার পক্ষে মনে হোল যেন আরও জটিল হয়েই উঠেছে। পা যেন না বাড়ায় আর উপায় রইল না। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি আছে, কিংবা হয়তো এসেই পড়ে এই রকম চরম সঙ্কটে, পা'টা টেনে নিয়ে বললে—"থাক, নিজের সুবিধে দেখলেই হয় না। এখানে থাকলে ভীড়টা তো ঠেকিয়ে রাখতে পারব; একজন বুড়ো মানুষ একেবারেই দরজার সামনে রয়েছেন।"

বৃদ্ধ একটু মুখ তুলে দুজনের মাঝামাঝি দৃষ্টিপাত করে বললেন—"দেখ্‌ মা, দেখছিস? যে রথের কাছি দিয়ে টেনেছে, সেই বাবস্থা করে দেয়; তার ভরসা না থাকলে কি দুষ্টু ছেলের মতন সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়তে পেরেছি?"

আমরা যে গাড়িটায় বসে ছিলাম সেটা বর্ধমানে জুড়ে দিয়েছিল, বোধ হয় এই মেলার জন্যেই, তবে একেবারে শেষে বলে ভীড়ের ধাক্কাটা পৌঁছচ্ছিল না। তবু জনচারেক এসে জুটেছে। ছোকরা দোর চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়াল—"আজ্ঞে না, এখানে হবে না, এগিয়ে দেখুন।"

তখুনি আবার কি ভেবে ঘুরে বলল—"আচ্ছা, একটা সীট রয়েছে; একজন যদি আসেন..."

অল্প বিরতি, লোকে আটকায় না, এগিয়েই ছুটেছিল সবাই, সব পেছনের লোকটি ফিরে এল। ছোকরা দরজাটা খুলে দিলে, লোকটি উঠে আসতে ছোকরা কিছু বলবার আগেই প্রৌঢ় যাত্রীটি খবরের কাগজের পেছন থেকে মুখটা তুলে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বললেন—"এই যে আসুন, উনি এই জায়গাটার কথা বলছিলেন। বসে পড়ুন।...হ্যাঁ এইবার নিশ্চিন্দি।"

আবার কাগজ পড়তে লাগলেন।

এরপর, বসা-দাঁড়ানো নিয়ে একটা কায়েমী রকম ব্যবস্থা হয়ে যেতে ওরা তিনজনে যেন আলাদাই হয়ে গেল গাড়ির আর সব যাত্রী থেকে। বৃদ্ধের সামনের সীটে পাশাপাশি দু'জন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক ব'সে 'তেজী-মন্দী' নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সামনে কি হচ্ছে না-হচ্ছে সেদিকে বড় একটা দৃকপাত নেই।

তিনজনের গোষ্ঠীটা আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল। গাড়ি হুইসিল দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় একটা লোক ডাব নিয়ে উপস্থিত হোল।

"চাই বাবু?...তিন আনা...পয়সাটা ফেলে দিন আগে দয়া ক'রে..."

ছোকরা তাড়াতাড়ি পকেটে হাত সাঁদ করিয়ে বের করে নিতে একটা আট আনি বেরিয়ে এল। গাড়ি স্পীড বাড়িয়েছে, একবার আট আনিটা দেখেই প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা ছুটতে ছুটতে ডাবটা হাতে দিয়ে দিলে।

কাটা ডাব, প্ল্যাটফর্মে যেমন বিক্রয় করে থাকে; ছোকরা বৃদ্ধের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে—"নিন্‌...একটু অসুবিধে হবে অবিশ্যি—গেলাস নেইতো..."

বৃদ্ধ একটু বিস্মিত হয়ে মুখটা তুলে ধরলেন, বললেন—"আমার জন্যে? আমার কি দরকার বাবা?"

ছোকরা একটু অমায়িকভাবে হাসল, বলল—"তবে, আমার জন্যে কিনলাম নাকি?... আপনি ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন—বুড়ো মানুষ, কম মেহনতটা তো হয়নি। ...হেল্প করবে; নিন।"

"না—না, আমার কেন?...বললে মানাই করে দিতাম..." বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছেন।

ছোকরা মেয়েটির দিকে চাইল।

"বলুন নিতে। ...আমার নিজের জন্যে কেনবার কী এমন দায় পড়েছিল!"

প্রৌঢ় যাত্রীটি একবার মুখ তুলে আবার কাগজের আড়াল হয়ে গেলেন। মেয়েটি একটু হেসে বলল—"আমি বললেই কি শুনবেন?... নিন, উনি যখন কিনেছেন—বলছেন আপনার জন্যেই। ...ক্ষতি তো করবেই না, বরং ভালোই।"

"দেখো তো! তুইও যে অবুঝ হলি মা! ...বেশ, তাহলে..."

নিরুপায়ভাবেই একটু হেসে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, ছোকরা বলে উঠল—"না, না; ওকি করছেন!"

বৃদ্ধ দু'জনের দিকেই মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাইলেন, বললেন—"বাঃ, তুমি কেন দণ্ড সইবে বাবা? ...সে হয়না। ...হ্যাঁ মা, ও কেন বুড়োর জন্যে দণ্ড সইবে?"

ছোকরা উত্তর করলে—"দণ্ড কিসের? আর যদি হয়ই তো বুড়ো মানুষ বলেই না হয় সইলাম একটু।"

মেয়েটিকে সাক্ষী মানলে—"যারা বুড়ো নয়, তাদের একটা কর্তব্যও তো আছে এঁদের প্রতি। কি বলুন?"

মেয়েটি বললে—"নিন, উনি যখন এত করে বলছেন......"

বৃদ্ধ হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন, একটু বিপন্নভাবে হাসতে হাসতে বললেন—"দেখো তো, দু'জনে একজোট হয়ে! ...না হয় নিয়েছে, নিয়েছে; পয়সাটাতোও নেয়..."

ছোকরা ওদিকে তুলে দিচ্ছে, মেয়েটি ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে চারটে দোয়ানি বের করলে।

বিস্মিত প্রশ্ন হোল—"আপনি আবার ওকি করছেন?"

মেয়েটি হেসে বাড়িয়ে ধরল দু'আনি ক'টা, বলল—"অস্বীকার তো করতে পারেন না যে ওঁর প্রতি কর্তব্যটা আপনার চেয়ে আমি অনেক আগেই অর্জন করেছি। নিন ধরুন দয়া ক'রে।"

ছোকরা হাত দুটো আরও পেছিয়ে নিয়ে বলল—"না, না, কোন মতেই নয়।"

তারপর হেসে তর্কের ভঙ্গিতে বলল—"আপনার অধিকার যেমন আগে তেমনি অনেক আগে থেকেই তো আপনি সে কর্তব্য পালন করে আসছেন। এখন আমার অধিকারে অনধিকার প্রবেশ করেন কেন?"

প্রৌঢ় যাত্রীর কাগজটি একটু নেমে পড়ে আবার পূর্ববৎ উঠে পড়ল। মেয়েটি হাতটা বাড়িয়েই আছে, একটু ভেবে নিয়ে বলল—"বেশ, কেউ কারুর সীমানায় পা দোব না; আপনি অর্ধেকটা দিন—আট আনা লেগেছে, চার আনা..."

"এ দেওয়া না বঞ্চিত করা? —মানে, যতটা দিচ্ছেন আমায় ঠিক ততটাই আমার ধর্ম থেকে আমায় বঞ্চিত করছেন না কি? যদি কনাভিন্স করতে পারেন অন্যায় বলছি, নোব।"

মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটি একটা হাসি মুখে করেই নূতন যুক্তি খুঁজছিল, বৃদ্ধ ডাবটা শেষ করে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে 'আ—হ' করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন—"থাক, ছেড়ে দে মা। তুই তো অনেক করছিস ছেলের জন্যে; বুড়োর এ উপকারটুকু করবার ভার যেন জগন্নাথ ওকেই দিয়েছেন মনে হচ্ছে। দীর্ঘজীবী হও বাবা।...বেটী বলে কার ভরসায় পালিয়ে এয়েছেন?—যেন আমারই ভাবনা সেটা!"

মেয়েটি পরাজয়টা স্বীকার করবার মুখেও একবার যেন শেষ চেষ্টা করল, বলল—"না, কিছু নিন, সত্যিই নেবেন না?"

ছোকরা বিজয়ীর মতোই হেসে উঠল, বলল—"এই দেখুন অন্যায় আপনার ভগবানেও বিশ্বাস নেই! শুনলেন উনি বলছেন জগন্নাথ আমাকেই ভারটা দিয়েছেন!"

এবার খবরের কাগজটা সেই প্রৌঢ় যাত্রীটির হাত দুটো যেন শিথিল হয়েই হঠাৎ নীচে পড়ে গেল। দরজার দিকেই চাইতে চাইতে আবার কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

মেলা ভাঙবার সময় না হলেও শ্রীরামপুর আর রিষড়ায় একটু একটু ভীড় ছিলই, গাড়ি একটু লেটও করে ফেলেছিল, কোন্নগরটা কখন ছুঁয়ে বেরিয়ে এসেছে টেরও পাইনি। গাড়িটা এসে 'হিন্দ্ মোটর'এ দাঁড়াল।

বৃদ্ধ সচকিত হয়ে উঠলেন—

"এসে গেল না ইস্টিশান—হ্যাঁ মা?"

মেয়েটিও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বলল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠে পড়ুন। বড্ড কম দাঁড়ায় এখানে।"

ছোকরার দিকে ব্যগ্র মিনতির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—"দোরটা খুলে দিন না।.............. আর আপনি দয়া করে একটু নীচে গিয়ে দাঁড়াবেন? —প্ল্যাটফরম নেই তো, আমি এদিক থেকে ধরছি, আপনি নীচে থেকে......"

"তাই নাকি?—এখানেই নামবেন?" —বলে ছোকরা হ্যাণ্ডেল ধরে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। সাহায্যের জন্য দু' একজন উঠে দাঁড়ালেও মেয়েটি নিজেই সতর্কভাবে ধরে বৃদ্ধকে এগিয়ে দিলে, ছোকরা বেশ শক্ত, একটা ধাপ উঠে এসেই তাকে গুছিয়ে ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে নিলে। বৃদ্ধ মাথায় হাতটা চেপে উচ্ছ্বসিত ভাষায় আশীর্বাদ করছিলেন, সেদিকে খেয়াল না করে মেয়েটিকে নামাবার জন্যে আবার একটা ধাপ উঠেই ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলে।

মেয়েটি বলল—"থ্যাঙ্কস্।...আমি তো এখানে নামব না; সেই বেলুড়। আমার বাড়ি মালীপাঁচঘাড়া।"

ছোকরার দৃষ্টিতে যে একটি প্রত্যাশা ফুটে উঠেছিল, সেটা এক মুহূর্তেই যেন ফুৎকারে নিভে গেল। সেটা অবশ্য বোঝা শক্ত নয়; কেন যে নেমে গিয়ে পাশের গাড়িতে উঠল সেটাও যায় বোঝা।

শুধু বুঝতে পারছি না নামার সময় আমার দিকে এমন তীব্র কটাক্ষ হেনে গেল কেন। প্রৌঢ় যাত্রীটি তবু কাগজ থেকে মুখ তুলে তুলে দেখেছেন বারবার, বার দুই তিন একটু আধটু মন্তব্যও করেছেন। আমি তো মূক দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নির্বিকার হয়ে বসে ছিলাম মাত্র।

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর সৌজন্যে স্কেচ

সেকেন্দর শা-র প্রত্যাবর্তন

(২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গবাক্ তরুর মতো সর্বদা যেন কম্পিত, একদণ্ড স্থির হইয়া থাকে না।

সম্রাট অনেক ভারতীয় দেখিয়াছেন, তাহাদের দেহ ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা সম্রাটের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি কখনো এরূপ জীব দেখেন নাই। তিনি যুগপৎ কৌতূহল ও কৌতুক অনুভব করিলেন, ভাবিলেন এ লোকটাও যদি ভারতীয় হয়, তবে বুঝিতে হইবে ভারত সম্বন্ধে এখনো কিছুই জানা হয় নাই, কি আশ্চর্য এ দেশ! তারপরে তিনি শুধাইলেন—

তোমার নাম কি?

বিদেশী বলিল—গৌড়দাস।

নিবাস?

ভারতের পূর্বাঞ্চলে।

মগধে?

মগধেরও পূর্বে।

আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

এবার বিদেশী বলিল,—

'মগধের পূর্বদিকে জাহ্নবীর তীর

গৌড়বাসীরা সেথা রচে সুখনীড়।'

ওকি আবার পদ্য কেন?

আমাদের দেশে গদ্য নাই, আমাদের ধারাপাত, শুভঙ্করী হিসাব-কিতাব সবই পদ্য। শুনবেন?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবৃত্তি করিয়া উঠিল—

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে

কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।

তাহার পদ্য শুনিয়া হেমার কোর্ফোত্তির আরো অভ্যস্ত গ্রীকগণ হাসিয়া উঠিল। জাতীয় পদ্যের অসম্মানে গবাক তরু আরও ঘন ঘন দুলিতে লাগিল।

সম্রাট বলিলেন, তোমার পদ্য শুনলাম, উত্তম, কিন্তু এবারে সত্য করে বলো তো যুবক এখানে কেন এসেছিলে?

যুবক বলিল—মাইরি আমার, হাসিকান্না করবার আর জায়গা পাওনি, সত্য কথা বলি, আর ধরে ঝুলিয়ে দাও।

সত্য কথা না বললেও ধরে ঝুলিয়ে দিতে পারি।

দিলেই হ'ল। আমার ওজন কত জানো? ঝুলেই থাকব, মাটিতে পড়বার মতো ভারটুকুও নেই শরীরে। মিছে দাড়ির অপব্যয় হবে।

তাহার অভদ্রোচিত উত্তরে বিরক্ত হইয়া সেলুকাস বলিয়া উঠিল, যুবক সাবধানে কথা বলো, সম্মুখে সেকেন্দার শা।

এবারে যুবক বদ্ধমুষ্টি নাকের কাছে তুলিল, বলিল, জয় হোক সম্রাটের।

সেলুকাস শুধাইল, ঘুষি তুললে কেন?

বিস্মিত যুবক বলিল—ঘুষি কোথায়? ওটা অভিবাদনের গৌড়ীয় রীতি।

তারপরে সে বলিল—এতক্ষণ জানতাম না আপনার পরিচয়, তাই কিছু উদ্ধত ব্যবহার করেছি। আমরা আবার শক্তের ভক্ত, নরমের যম কিনা।

তোমরা মানে! তোমাদের দেশের সকলেই তোমার মত?

আজ্ঞে বেবাক সব।

ভাবিয়ে তুললে যুবক।

আজ্ঞে, সে কথা নেহাৎ মিথ্যা নয়। আমরা স্বয়ং বিধাতার শিরঃপীড়া।

এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যুবকের উচ্চারণে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার মুখে যাবতীয় শ, স, ষ-এর উচ্চারণ 'S' বর্ণটির ধ্বনির মতো।

তোমাদের দেশের নাম কি?

গৌড়, সমতট, পৌণ্ড্রবর্ধন, আরও কত কি আছে।

এত নাম, তার মানে অনেক দেশ।

না সম্রাট, দেশ একটাই নাম ভিন্ন ভিন্ন।

আশ্চর্য। এমন কেন হল?

এমন না হওয়াই অস্বাভাবিক। জাতিবৈর আমাদের প্রধান লক্ষণ। এক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কোন কারণে কলহ বেধে উঠলে যারা পরাজিত হয়, তারা দেশের অন্য এক অংশে এসে বসতি স্থাপন করে, আর নূতন নামকরণ করে। এমনি করে নিত্য-নূতন নামের সৃষ্টি হচ্ছে।

কলহ মীমাংসার জন্য দেশে অবশ্য রাজা আছেন।

অবশ্যই আছেন কিন্তু তার ফলে কলহ আরো বেড়ে চলে।

কেন?

কেউ কাউকে রাজগদী ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একবার তো মন্ত্রী হবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেন?

ঐ পদের দাবী নিয়ে অর্ধেক লোক মাথা ফাটাফাটি করে মরেছে, বাকি অর্ধেক ভয়ে পালিয়েছে।

আশ্চর্য তোমাদের দেশ।

যা বলেছেন মাইরি। চলুন না একবার দেখে আসবেন।

যাবো বলেই তো প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন ভাবনা শুরু হয়ে গেল।

কেন?

সে কথা যথাসময়ে হবে। যুবক, তুমি এখন গ্রীক শিবিরে বন্দী রইলে, দুইজন প্রতিহারী থাকবে তোমার সঙ্গে।

দুইজন প্রতিহারীর বদলে একজন প্রতিহারিণী হয় না। শুনেছি গ্রীক রমণীরা বড় সুন্দরী।

যুবক বিদায় হইলে সেকেন্দার শা আদেশ প্রচার করিলেন যে, পুনরাজ্ঞা পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা বন্ধ রহিল। তারপরে তিনি চিন্তান্বিতভাবে নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

৩

গ্রীক বাহিনীর মগধযাত্রা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেকেন্দার শা নিজ শিবিরে বসিয়া আছেন, পাশে তাঁহার সুরাসঙ্গিনী এক গ্রীক রমণী। রমণী সুন্দরী। সেকেন্দার শা তাহাকে আদর করিয়া ডাকেন 'হেলেন।' হেলেন পাণ্ডুলিপি পড়িতেছে, সেকেন্দার শা গম্ভীরভাবে শুনিতেছেন। হেলেন পড়িতেছে—"আমাদের পূর্বপুরুষ মহাভেটক বহু যুগ আগে বন্যাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গৌড়-সমতটে আসিয়া আশ্রয় পান। সেই হইতে তিনি সেখানে বসবাস সুরু করেন। কালক্রমে সমস্ত দেশ তাঁহার বংশধরগণে ছাইয়া যায়। আমরা সকলেই সেই মহাভেটকের উত্তর পুরুষ। বিবর্তনের নিয়মানুসারে আমাদের গায়ের ভেড়ার চামড়া ক্রমে মানুষের চামড়ায় পরিণত হইলেও ভেড়ার চামড়ার সংকীর্ণতা ও স্থূলতা প্রভৃতি গুণ আমাদের চরিত্রগত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। এক সময়ে আমরা মহাভেটকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়া থাকিতাম, এখন আর তাহা করা হয় না সত্য, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি এখনো ভেটকাশ্রিত। জম্বুদ্বীপের অন্যান্য জাতি সামান্য মনুষ্য হইতে উদ্ভূত, আমাদের উদ্ভব সেই পৌরাণিক ভেড়া হইতে, তাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। জম্বুদ্বীপবাসিগণ আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলেও আমরা নিজেরাই নিজ মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের কিরীট অর্পণ করিয়াছি।"

এই পর্যন্ত পড়িয়া হেলেন হাসিয়া উঠিল, সুরাপাত্রের সঙ্গে সুরাপাত্রের আঘাত লাগিলে যেমন মদির চিক্কণ ধ্বনি ওঠে তেমনি শব্দ তাহার হাসির।

সেকেন্দার শা মুখ তুলিয়া বলিলেন, হেলেন তোমার হাসি পাচ্ছে কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠছে।

কেন সম্রাট?

ভয়ে!

পৃথিবীজয়ী সেকেন্দার শার মুখে এ কথা নতুন বটে।

সত্যই নতুন, তাই বলে মিথ্যা নয়।

কেন?

কেন কি। ওদেশ মগধের পাশেই, মগধ জয় করলে ক্রমে ওদের সংস্পর্শে আসতে হ'তো, আর ওদের সংস্পর্শে কি দশা হ'তো বুঝতে পারছ কি?

কার দশা?

গ্রীক বাহিনীর, গ্রীক সভ্যতার, গ্রীক সংস্কৃতির।

কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঐ একটি লোক এ কদিনে এখানকার গ্রীক শিবিরে একটা বিপর্যয় বাধিয়ে দিয়েছে। একটা লোকে যদি এমন করতে পারে তবে এক দেশ লোকের প্রভাবে গ্রীক সৈন্যরা কি বর্বর হয়ে উঠতো না? কোথায় থাকতো তাদের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা। তারা আবার গ্রীসে ফিরে গেলে সমস্ত গ্রীসের অবস্থা কী হ'তো একবার ভেবে দেখো।

হেলেন শুধাইল, সম্রাট কি ইতিমধ্যে লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

করিনি! প্রতিদিন একবার ক'রে সাক্ষাৎ করেছি। যত তাকে দেখি, যত তার কথা শুনি তত বিস্ময় ও ভীতি বেড়ে চলে।

লোকটি বলে কি?

যা বলে তা একমাত্র মহাভেটকের উত্তর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

লোকটা আছে কোথায়?

তাকে পণ্ডিত ও মনস্তত্ত্ববিদগণের নজরবন্দীতে রেখেছি। তার কার্যকলাপ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সমস্ত টুকে নেবার নির্দেশ দিয়েছি, প্রতিদিন সেই পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পেশ করবার নিয়ম। ঐ যে এতক্ষণ মহাভেটক পুরাণ পড়লে সেই পাণ্ডুলিপিরই অংশ।

এমন সময়ে দ্রুতপদে এণ্টিগোনাস্ শিবিরে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিল।

কি সংবাদ এণ্টিগোনাস?

ঐ গৌড়দাস নামে লোকটাকে নিয়ে মুস্কিলে পড়া গিয়েছে।

আবার নূতন কি ঘটলো? সেদিন তো বলেছিলে যে, গ্রীক সৈন্যদের ইক্ষুচর্বণ করতে শেখাচ্ছে।

সেটা ইক্ষু চর্বণ নয়, সম্রাট, যদিচ প্রথমে তাই মনে হ'য়েছিল।

তবে সেটা কি?

ঐ প্রথাকে নাকি গৌড়ে 'দন্তধাবন' বলে।

গাছ দিয়ে দাঁত ঘষা? ওদের দাঁত খুব শক্ত বুঝতে হবে।

হেলেন বলিল, না হ'বার কারণ কি! ওরা যে মহাভেটকের বংশ।

এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। হেলেন কথায় কথায় হাসে, তাহার হাসি সম্রাটের বড় প্রিয়। কিন্তু আজ তাহার হাসি সেকেন্দার শাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না।

যাক্ এখন সে কি করছে বলো।

আমাদের সৈন্যদের গৌড়ীয় পরিচ্ছদ পরতে শেখাচ্ছে।

অসম্ভব।

গৌড়ে সকলই সম্ভব, সম্রাট। এতো গ্রীকের মতো কথা নয়। নয়ই তো। ওটা আমি তার কথারই প্রতিধ্বনি করলাম।

আর কি বলে সে।

বলে যে অনুকরণ বিদ্যার বলেই গৌড় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, বলে যে সব বিদ্যার সেরা অনুকরণ বিদ্যা, বলে যে, গ্রীক সৈন্যগণ গৌড়ের অনুকরণ চর্চা করুক দূর ভবিষ্যতে একদিন মহাভেটকের মন্ত্রশিষ্য বলে গৌরব লাভ করতে পারবে।

কি সর্বনাশ। গ্রীক সৈন্যগণের মনোভাব কি রকম?

তাদের মন টলমল করছে, বাধা না পেলে ঐদিকে গড়িয়ে পড়বে।

সেকেন্দার শা বলিয়া উঠিলেন, পিতা জিউস্, রক্ষা করো।

সম্রাটের অনুমতি যদি হয় তবে লোকটাকে নিকেশ করে দি।

তার চেয়ে লোকটাকে একবার নিয়ে এসো।

এণ্টিগোনাস বিদায় হইবে এমন সময়ে অদূরস্থিত গ্রীক শিবির হইতে বিপুল সংগীত ধ্বনি উঠিল।

সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

সেকেন্দার শা বলিলেন, এতো হোমারের মহাকাব্য নয়।

এণ্টিগোনাস বলিল,—এতো পিন্ডারের স্তব নয়।

হেলেন বলিল,—এতো সাফোর কাব্য নয়।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—তবে কি?

তখনই সকল সন্দেহভঞ্জন করিয়া গানের বাক্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সমস্ত গ্রীক বাহিনী ঐকতানে গাহিতেছে

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিক্ষে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিক্ষে।'

হা পিতা জিউস বলিয়া দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা বসিয়া পড়িলেন।

অন্যদের বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

তখন সেকেন্দার শা আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অরাতিনিধন অসি হস্তে লইয়া বলিলেন, চলো দেখি এণ্টিগোনাস, একবার দেখি কোথায় সেই নরাধম।

হেলেন মনে মনে বলিল,—ভেটকাধম।

সম্রাটকে অনুসরণ করিয়া এণ্টিগোনাস সৈন্য শিবিরের দিকে চলিল।

৪

সম্রাটকে দেখিতে পাইয়া সৈন্যগণ গান থামাইল আর এমন ভাব ধারণ করিল যে, গৌড়দাসকে তাহারা কখনো চোখেও দেখে নাই। কিন্তু স্বয়ং গৌড়দাস তো গ্রীক নয়, সে নির্ভীক, সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সানকি থালা বাজাইয়া গাহিয়া চলিল—

'কাঠায় কাঠায় ধূলে পরিমাণ
বিশ গণ্ডা হয় কাঠায় প্রমাণ।
গণ্ডা বাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর
ষোল দিয়ে পূরে তারে সারা গণ্ডা ধর।

তাহার অভদ্রতা দর্শনে সেকেন্দার শা গর্জন করিয়া বলিলেন, বর্বর, তোমার মৃত্যুকে ভয় নাই?

গৌড়দাস বলিল,—

ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

কেন বর্বর?

সম্রাট বীর আর নপুংসককে বধ করেন না।

কি ক'রে জানলে?

আগে খবর নিয়েছি মাইরি। গৌড়বাসীর বীরত্ব, মহত্ত্ব, বদান্যতা সমস্তের মূলে সূক্ষ্ম হিসাব থাকে।

তুমি আমার সৈন্যদের কুশিক্ষা দিচ্ছ কোন্ সাহসে?

কুশিক্ষা? প্রাণ জল ক'রে দিলে মাইরি! গৌড়ের ভাষা শিখবে, গৌড়ের গান করবে, সেটা হল কিনা কুশিক্ষা? গৌড়বাসী যে পৃথিবীর সব জাতির সেরা।

গ্রীকদের চেয়েও?

নিশ্চয়।

কি প্রমাণ?

তোমরা গরু খাও, শূকর খাও।

আর তোমরা কি খাও?

ব্যাঙের ছাতা।

খাদ্য কি মনুষ্যত্ব নিরূপণের মাপকাঠি?

নয় কেন? খাদ্যসারই তো ক্রমে রক্ত মাংসে বুদ্ধিতে পরিণত হয়।

অদ্ভুত তোমার যুক্তি।

অদ্ভুত কিন্তু সত্য। দেখুন না কেন জম্বুদ্বীপের সব জাতির মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ। কেন? ওরা সব ছাতু খায়, অড়হর কি ডাল খায়, ইয়া মোটা মোটা গেহূম কি চাপাটি খায়, কাঁচা শুপারী খায়, পানের সঙ্গে গুন্ডী খায়, দহি-বড়া খায়, রসম্ খায়, দোসা খায়, শ্রীখান্ড খায়, ইমলি খায়! তাই তারা সব হীন, ছোট লোক। আর আমরা গৌড়বাসীরা শ্রেষ্ঠ—কেন না আমরা খাই বিশুদ্ধ ব্যাঙের ছাতা আর—

আর কি?

পত্নীর পদাঘাত।

সম্রাট ছাড়া আর সকলে হাসিয়া উঠিল।

সম্রাট শুধাইলেন, কোনটা বেশি ভালো লাগে?

গৌড়দাস বলিল, এখানে আমার সেই সহধর্মিণী নেই তাই সত্য কথাই বলবো, ব্যাঙের ছাতাই কিছু বেশি মিষ্ট।

(মনে রাখিতে হইবে যুবকের মুখে শ, ষ, স=S)

তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর কোন প্রমাণ আছে?

কত চাই? অনুকরণপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মকলহ, জাতিবৈর, পরজাতিবিদ্বেষ সমস্তই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

তোমরা যখন অন্য দেশে যাও সে দেশের লোকে তোমাদের মারে না!

মারে বই কি। সেটাও আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা প্রমাণ।

কেমন?

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষাপরায়ণ বলেই তারা মারে।

তোমরা কি করো?

সভা করে প্রতিবাদ জানাই।

গ্রীক সৈন্যগণ তোমাদের দেশে গেলে তোমরা কি করবে?

পরাজয় স্বীকার করবো।

লড়াই করবে না?

আরে রামো, লড়াই করে তো অসভ্য বর্বররা। আমাদের পূর্ব পুরুষগণও কখনো লড়েনি, উত্তর পুরুষগণও কখনো লড়বে না।

উত্তর পুরুষের কথা জানলে কি প্রকারে?

মহাভেটক পুরাণের ভবিষ্যৎ খণ্ডে লেখা আছে কি না।

কি লেখা আছে?

ভবিষ্যৎকালে আমাদের দেশে, শ্বেত জাতি, পীত জাতি, রক্ত জাতি প্রভৃতি আসবে, বিনা রণে তারা দেশ অধিকার করবে।

আমরা তোমাদের দেশ অধিকার করলে তোমরা আমাদের সহ্য করবে?

অবশ্য এমন ক'রে তুলবো যে তোমরা আমাদের সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকবে।

তা কিরূপে সম্ভব বুঝিয়ে বলো।

গৌড়দাস সুরু করিল—বেশি বোঝাতে হবে না, দু'চার কথা শুনলেই মাথার খিলু চড়চড় করতে থাকবে। তোমরা আমাদের দেশ জয় করবে, আমরা লড়াই করিনে কাজেই সহজেই তা পারবে, কিন্তু তারপর?

তারপর ওখানে স্থাপন করবো এক গ্রীক উপনিবেশ, তারা রাখবে তোমাদের চির পদানত ক'রে। তোমরা কি করতে পারো।

কি করতে পারি শুনুন সম্রাট। যে গ্রীক সমাজ ওখানে থাকবে প্রথমে তারা ভুলবে তাদের ভাষা, ভুলবে তাদের কাব্য, ভুলবে তাদের ভাস্কর্য, ভুলবে স্থাপত্য, সংগীত অন্যান্য সব শিল্পকলা। তারপরে তারা ভুলবে সভ্য আচরণ, সভ্য শিক্ষাদীক্ষা, সভ্য ব্যবহার। ক্রমে তারা নিজেদের মধ্যে এ ওকে মারবে কনুইয়ের গুঁতো, এ ওর পা দেবে মাড়িয়ে। এই কিছুক্ষণ আগে যে 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিক্ষে' শুনে সম্রাটের মগজে আগুন জ্বলে উঠেছিল শেষে এমন অবস্থা হবে যে ঐ গান না শুনলে ওদের বুকে আগুন জ্বলে থাকতে থাকবে। আর চূড়ান্ত হবে তখনি ব্যাঙের ছাতা ছাড়া মুখে আর কিছু রুচবে না। এইভাবে বিজিত গৌড় হবে বিজয়ী।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া গ্রীকগণ বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ।

কেবল হেলেন বলিল, তোমাদের আর একটা প্রিয় খাদ্যের কথা তো বললে না।

কি খাদ্য প্রাণাধিক?

স্ত্রীর পদাঘাত।

তার চেয়েও আর একটা প্রিয় খাদ্য আছে?

কি?

পরস্ত্রীর পদাঘাত।

কি যে বলো!

কি বিশ্বাস হ'ল না? চলো না মাইরি, ঐ ঝোপটার আড়ালে ব'সে একটু গল্পগাছা করি।

মরি কি শখ।

এতেই মরি, মরি। তবু তো দেখছি এ দেশে পাটের চাষ নেই।

পাট কি?

সে এক রকম ফসল। সেই পাট ক্ষেতের আড়ালে আমাদের দেশে যে নারীর সঙ্গে গল্পগাছা হয় তাকে আমাদের দেশে কি বলে জানো?

কি বলে?

পাটরাণী।

ক্ষণিক বিস্ময় অন্তে সেকেন্দার শা বলিয়া উঠিলেন বর্বর, ভদ্রতার সীমা অনেকক্ষণ লঙ্ঘন করেছিস। আজ রাত তুই বন্দী থাকবি, কাল তোর প্রাণদণ্ড হবে।

যুবক বলিয়া উঠিল, সম্রাট, আমাকে বধ করতে পারেন, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? গৌড়ীয় স্বভাব কি ধ্বংস করতে পারবেন।

সেকেন্দার শা আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৌড়দাস হেলেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—আয় না মাইরি একবার।

হেলেন প্রস্থানে উদ্যত হইলে গৌড়দাস হাত নাড়িয়া বলিল—

টা—টা
দেবো সোনার বাটা,
উঠছে না ওর পাটা
মিছামিছি হাঁটা

সৈন্যগণ তাহার ছড়া শেষ হইতে দিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। সে যাইতে যাইতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল হেলেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে, অমনি পরমোৎসাহে সে আঙ্গুলে কয়টা নাড়িয়া আবার বলিয়া উঠিল—টা-টা

৫

সারা রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া শেষ রাত্রে সেকেন্দার শার একটু ঘুম আসিয়াছিল। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, পরাজিত পারস্য সম্রাট দারীয়ুষ সসৈন্যে আড়াই লক্ষ ইঁদুরে পরিণত হইয়া সেকেন্দার শার মগজে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে, মাথার খুলি খুঁড়িবার শব্দ উঠিতেছে কুড়, কুড়। ভীত সেকেন্দার শা লাফাইয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন দুর্ঘটনা সত্য নয়, স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু একি তবু কুড় কুড় শব্দ থামে না কেন? প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার আশায় শিবিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—আর বুঝিলেন উঁহু। ইঁদুরের শব্দ নয়, গৌড়দাস কর্তৃক শিক্ষিত সেই মহা গণসঙ্গীত—

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।'

প্রভাতী কুক্কুট রবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ঐ সঙ্গীত তালে তালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—আর বিজয়ী গ্রীক সৈন্যগণ সেই সঙ্গীতের সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া সবেগে দন্ত ধাবন করিতে করিতে দলে দলে পুণ্যতোয়া শতদ্রু নদীতীরে চলিয়াছে।

এই সঙ্গীত শুনিয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া ভুবনবিজয়ী সেকেন্দার শা কপাল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—পিতা জিউস, আমাকে রক্ষা করো, গ্রীক সভ্যতাকে রক্ষা করো।

তখন রাত্রের আর একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাঁহার মনে পড়িল। অর্ধ জাগরণ ও তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে একটা অতিকায় ব্যাঙের ছাতা প্রসারিত হইয়া সমগ্র গ্রীস দেশকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাঁহার মনে হইল এ ব্যাঙের ছাতা আর কিছুই নয় গৌড়ীয় প্রভাব। তিনি ভাবিলেন এ কি সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, গৌড় জয় করিলে শেষ পর্যন্ত গৌড়েরই বিজয় হইবে, গ্রীক সভ্যতা ব্যাঙের ছাতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। গ্রীক সভ্যতা প্রসারের মানসে তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিমিকেও গিলিতে পারে এমন তিমিঙ্গিল সম্ভব। না, এ হইতেই পারে না, এভাবে গ্রীক সভ্যতা বিসর্জন দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এরিস্টটলের শিষ্য, প্লেটোর প্রশিষ্য, সক্রেটিসের অতি প্রশিষ্য এ ছাড়া আর কি ভাবিবেন? তিনি স্থির করিলেন যে, দিগ্বিজয় মাথায় থাকুক এখন ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরিতে পারিলে বাঁচা যায়।

এমন সময় একজন প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া অভিবাদনান্তে একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্র খুলিয়া দেখিলেন হেলেনের হস্তাক্ষর। পত্র পড়িয়া ভয়ে বিস্ময়ে পরিতাপে স্তম্ভিত হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেলুকাস প্রবেশ করিল। সম্রাটকে তদবস্থায় দেখিয়া সে বলিল সম্রাটকে বিমর্ষ দেখছি কেন?

সেকেন্দার শা বলিলেন—পত্রখানা প'ড়ে দেখো।

সেলুকাস পত্র পড়িল,

হেলেন লিখিতেছে—

সম্রাট,

কৌশলে বন্দীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে পাটরাণী হ'বার আশায় দুজনে প্রস্থান করলাম। আমার সন্ধান করবেন না, করলেও পাবেন না, পেলেও আমি আর ফিরবো না, কারণ বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

সম্রাট, অনেকদিন আপনার কাছে ছিলাম, অনেক দয়া, অনেক অর্থ পেয়েছি। বিদায়-কালে আপনার মঙ্গল কামনায় একটি মিনতি জানিয়ে যাই, সুরাপানের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন। ঐটি আপনার প্রধান দোষ। আমার মাথা খান অনুরোধটি রাখবেন।

ইতি—
গৌড়াভিমুখিনী
হেলেন।

পুঃ—"সম্ভব হলে কিছু উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় ব্যাঙের ছাতা আপনার ভোগের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।"

সেলুকাসের পত্র পাঠ শেষ হইলে সেকেন্দার শা শুধাইলেন কি বোঝো সেলুকাস।

সেলুকাস বলিল, হেলেনের মতো গ্রীক

আলোয় ভরা কালোবাজার,
সব শিখা তার তমাশ্রিত;
মানবতার এমন আঁধার
আর কখনো ঘনায়নি ত।
কেনা-বেচার নিমেষগুলি
চিরন্তনের রতন ভুলি,
ভ্রষ্টকালের কণ্ঠমণির নষ্ট শোভায় সম্মোহিত॥

মর্তমুখী লুব্ধ জ্যোতির
সূর্য জ্বলে সব প্রতিভায়,
সকল ধনীর প্রাণ-বিপণির
লাভের লিখন ক্ষতির খাতায়।
দুঃস্বভাবের এই প্রদীপন
মূর্ত করে বিশ্ব-মরণ!
দুর্মরতার দীপ্ত গরল এই যুগে হয় উচ্ছ্বসিত॥

যুগান্তরের শঙ্খ বাজাও
হে মহাজন, হে মহাকাল!
দুর্গাপুজোর লগ্ন ঘনাও,
ছিন্ন করো দুর্গতি জাল।
অসুর-আলোর অঙ্গ জ্বালি'
নাচুক তোমার অগ্নি-কালী,
তোমার বিভার বৈভবে হোক
ভবের বাজার বিচ্ছুরিত॥

সভ্যতার ক্ষীরপুত্তলির যেখানে এরূপ মতিগতি—অন্যে পরে কা কথা। সম্রাট আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ়।

সম্রাট বলিলেন—আমি কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছি।

কি কর্তব্য সম্রাট?

এসো তাঁবুর বাইরে এসো।

দুজনে বাহিরে আসিলে সম্রাট বাদকগণকে ঘোষণাধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন। মুহূর্তে শত শত তূরী, ভেরী গগনভেদী বৃংহিত করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পদাতিক, অশ্বারোহী উচ্চনীচ যাবতীয় গ্রীকসৈন্য সম্রাট সমীপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

বাদ্যোদ্যম শান্ত হইলে সেকেন্দার শা কম্বুকণ্ঠে আদেশ করিলেন—জাল গুটাও, অর্থাৎ শিবির তোলো। এখনি যাত্রা করতে হবে।

এণ্টিগোনাস প্রত্যাশাভরে শুধাইল, পূর্ব দিকে?

না, পশ্চিম দিকে, জন্মভূমি গ্রীসের দিকে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। যে যে-ভাবে আছ এখনি যাত্রা করো।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল হেলাস, হেলাস অর্থাৎ গ্রীস, গ্রীস।

সম্রাটের হঠাৎ মতি পরিবর্তনের কারণ কেহ বুঝিল না। কিন্তু সম্রাটের আদেশ অলঙ্ঘ্য, কাজেই গ্রীক বাহিনী তখনই পশ্চিম মুখে গ্রীসের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিল।

ইহাই পেস্কাডস লিখিত সেকেন্দার শা-র অকস্মাৎ ভারত ত্যাগের প্রকৃত বিবরণ।

অগ্নিক্ষেত্র জুনাগড়

(২৫ পৃষ্ঠার পর)

আধুনিককাল আজও এখানে এসে পৌঁছয়নি, পরম নিশ্চিন্ততার আস্বাদ সবাইকে যেন পেয়ে বসেছে,—কারো ঘুম ভাঙেনি। আমার উদ্দীপনার জন্য আমি যেন লজ্জিত, ওদের কারো মাথা ব্যথা নেই।

স্টেশন থেকে একটি টাঙ্গা পাওয়া গেল। সেটি চারিদিকে ঘেরা,—অনেকটা একটি বাক্সর মতো। বন্ধুবর নাগিয়াসহ আমরা ছিলুম তিনজন। আমাদের তৃতীয় বন্ধু মিঃ সত্যবান। ও'রা উভয়েই পশ্চিম পাকিস্থানের লোক,—আপাততঃ দিল্লীবাসী। উভয়েই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক এবং দিল্লীর লক্ষ্মী ইনসিওরেন্সের কর্মচারী। আমাদের টাঙ্গা এক হোটেলে এনে হাজির করলো।

বিরাবল থেকে সোমনাথের মন্দির কমবেশী তিন মাইল। এতকাল ধরে ছিল সোমনাথ কেবলমাত্র একটি স্থানের নাম, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সোমনাথ প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ করে জুনাগড়ের ভারত অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই সচেতন হয়ে উঠেছে সোমনাথ সম্বন্ধে। এই চেতনাকে মূর্ত করে তুলে ছিলেন স্বর্গীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। নিরিবিলি পথ ধরে আমাদের টাঙ্গা চলেছিল সোমনাথের দিকে।

একদা ভারত প্রদক্ষিণকালে আমার ডায়েরীতে লিখেছিলুম, অবিভক্ত ভারতের যে বিশাল সমুদ্র সীমানা পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমে কমবেশী প্রায় চার হাজার মাইল বিস্তৃত—যেটাকে জম্বুদ্বীপ বলা হোতো পুরাণে—সেই সমুদ্রে বিস্তৃত তটপ্রান্ত করাচী থেকে আরাকান অবধি সমুদ্র সীমানার তটভূমি অঞ্চলে সহস্র সহস্র দেব-মন্দির দণ্ডায়মান। ভ্রমণকারীরা বলে থাকেন, পৃথিবীর কোথাও এ দৃশ্য চোখে পড়ে না।

সোমনাথে পৌঁছবার আগে আমরা এসে উপস্থিত হলুম ত্রিধারা সঙ্গমে। এখানে অবগাহন স্নান এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান বিধি। একটি নারিকেল কুঞ্জবীথি সোজা এসে পৌঁছেছে সঙ্গমে। আশেপাশে মন্দির, তাদের কোনোটি রামজী, ত্রিবেণী মাতা, সূর্য-নারায়ণ,—কোনটি বা কালিকা মাতা এবং মহাকালী। কিন্তু ত্রিধারা সঙ্গমের সামনে এসে সমুদ্রের খাড়ি, বালুময় চরা এবং বিস্তীর্ণ সমুদ্র জলরাশির আভাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। পাণ্ডা কিন্তু সোৎসাহে বোঝাতে লাগলো, ত্রিধারার বিভিন্ন নাম। একটি হিরণা, একটি কপিলা এবং অন্যটি সরস্বতী। পিছন-দিকের একটি মন্দিরের নাম মানকেশ্বর।

বন্ধুবর নাগিয়া ভক্তি সহকারে সঙ্গমে স্নান করে নিলেন। চলতি গল্প হোলো, এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে আনা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের নশ্বর মৃতদেহ। এইখানে তাঁর দেহকে ভস্মীভূত করা হয়। এই ঘাট থেকে উঠে গিয়ে দেখা যায় 'দেহোৎসর্গ' মন্দির, এখানে একটি স্মৃতি-ফলক নির্মিত রয়েছে। কিন্তু এই দেহোৎসর্গকেই আবার বলা হয় নাগস্থান,—এখানে বলরাম পাতালের নীচে প্রবেশ করেছিলেন। বলরামের মৃত্যুকালে তাঁর মুখ-গহ্বর থেকে নাকি সহস্র নাগ নির্গত হয়েছিল।

ইচ্ছা করে সমস্তটা বিশ্বাস করি, কিন্তু উৎসাহ পাইনে। বুদ্ধিবিচার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যুক্তি কেবল তর্কের পথ ধরে। অথচ একথা জানি, মানুষ এত যত্নে এতকালের বিশ্বাসকে গড়ে তুলেছে, আমার কী অধিকার তাকে সন্দেহ করবো? মুস্কিল এই, বিশ্বাস যদি না করো, তুমি নাস্তিক। যদি বিশ্বাস করো, হিন্দু ভারতে তুমি ঠাঁই পেয়ে গেলে, ভদ্র সমাজ তোমাকে অভ্যর্থনা জানালো, সাধুবাদ দিল তোমাকে সবাই। ভারতীয় দর্শন এক বস্তু, হিন্দুধর্ম ভিন্ন বস্তু,—একথা বোঝাতে গেলে চলবে না। আনুষ্ঠানিক হিন্দুয়ানীতে রস পায় না আধুনিক মন,—কাকে বোঝাবো? কিন্তু অনুষ্ঠানের বাইরেও ত কিছু আছে—যেটার নাম দর্শন! সেই নির্জন সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে সমস্তই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম।

আনুষ্ঠানিক হিন্দুয়ানীর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অতি নিকট সম্পর্ক এ মানতে পারিনে। অনুষ্ঠান হোলো অভ্যাস, যেটা চলতি সংস্কার,—কেউ ওটাতে রস পায়, কেউ পায় না। দক্ষিণ ভারতে মহাকালী নেই, পশ্চিম ভারতে দুর্গা নেই, অর্থাৎ এক একটি অনুষ্ঠান একেকটি অঞ্চল বেছে নিয়েছে। কিন্তু তেলেগু সম্প্রদায় যদি কালীপূজো না করে, তাকে কি অ-হিন্দু বলবো? পশ্চিম ভারতে যাও, দেখবে 'সীতারাম' আর 'রাধেশ্যাম' নিয়ে বিবাদ। একজন আরেকজনকে কেবল বিদ্রূপ করছে। এগুলো সমস্তই আনুষ্ঠানিকতার ইতিবৃত্ত। বাঙ্গালী যদি গুজরাটীদের মতো শোভাযাত্রা সহকারে গণেশের পূজো করে, তাহলে হাসাহাসি পড়ে যায়। পাঞ্জাবী শিখরা কলকাতায় সরস্বতী পূজোর ভিড়ক দেখে অবাক হয়ে থাকে। এগুলো আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের বাইরে।

টাঙ্গায় চড়ে এবার আমরা 'ভালকা' তীর্থের দিকে। সমস্ত মিলিয়েই প্রভাস পত্তন, যেটাকে আগে বলা হয়েছে অগ্নিক্ষেত্র। এর মধ্যেই পড়ে সোমনাথ, প্রভাস, ত্রিবেণী সঙ্গম, ভালকো, মঙ্গরোল, কারওয়ার, সূত্রপাদ,—বরদা পর্বতের ভীমেশ্বর, এমন কি পূর্বাঞ্চলস্থিত দুর্গাদিল-ওয়ারা,—সমস্ত মিলিয়েই প্রভাসতীর্থ।

ভালকা হোলো বেলাকূলের ঈষৎ ঈশান কোণে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন বলেই এ স্থান অতি পবিত্র। এখানে একটি কুণ্ড দেখা দেয়। আশে পাশে একটু আধটু গাছপালা ছাওয়া মন্দির প্রাঙ্গণ,—ভিতরে রংকরা শ্রীকৃষ্ণ ও কিরাতের মূর্তি,—যতদূর মনে পড়ছে। এ অঞ্চলটি কিছু নিরিবিলি,—মনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কিছু আবেশ আনে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনাটা দৈবাৎ। কিরাত তার নিজ ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করেনি। তার লক্ষ্য ছিল সম্ভবত একটি সিংহের প্রতি। কিন্তু তার ধনুক থেকে বিষাক্ত তীর ছিটকে এসে অসতর্ক পথচারী শ্রীকৃষ্ণের দেহে বিদ্ধ হয়ে যায়,—সেই বিষক্রিয়ার ফলে বাসুদেবের মৃত্যু ঘটে। সিংহের পরিবর্তে পুরুষসিংহ।

মহাপুরুষের তিরোভাব তিথি আমাদের দেশে কখনও প্রাধান্য পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিশেষ তিথিটি আমরা জানিনে, কিন্তু জন্মাষ্টমীতে সমগ্র ভারত নাড়া খায়। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামীকে দেবতাজ্ঞানে লোকে পূজা করে,—তাঁকে অবতার বলে। সর্বভারতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের যে অবদান,—সেটি তৎকালীন বিশ্ববাসীর দ্বারা স্বীকৃত ছিল, সেই কারণে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়েছিল। দু'হাজার বছর আগে কার সমাজ ও নৈতিক জীবনকে গৌতম বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন যীশু খৃষ্ট,—সেই কারণে তাঁকে খৃষ্টানরা অবতার বলে। চৈতন্যে তাই, রামকৃষ্ণে তাই, একালে গান্ধীজীর জন্মতিথিটি আমাদের কাছে সত্য যেমন সত্য রবীন্দ্রনাথের পঁচিশে বৈশাখ। মহাপুরুষের পরিচয় তাঁর জীবনে, নশ্বর দেহাবসানে নয়। সেই কারণে তাঁদের আবির্ভাব তিথিটি আমরা গ্রহণ করি।

ভালুকাকুণ্ডের পাশেই হোলো অর্জুনেশ্বর মহাদেবের একটি মন্দির। কিরাত ঠিক যে স্থলটি থেকে শর নিক্ষেপ করেছিলেন,—সেটি কিছু দূরবর্তী স্থলে, চারিদিকে তার সুবিশাল প্রান্তর। কিন্তু সেখানকার ভীরভঞ্জন মহাদেবের মন্দিরটি সেই প্রাচীন ঘটনাটির সাক্ষ্য দেয়।

আমরা কতকটা যেন ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে বিদায় নিলুম।

অপরাহ্নের রৌদ্র তখনও প্রখর। আমরা সোমনাথের দিকে অগ্রসর হলুম। অলিগলি পথ ক্রমশঃ কিছু বিস্তৃত হচ্ছে। পাড়া পল্লী বাড়ী ঘর দোর নিয়ে বেশ একটি বড়সড়ো গ্রাম, অর্থাৎ ছোট্ট একটি সহর। কয়েক বছর আগে সর্দার প্যাটেল এবং কে এম মুন্সী মহাশয় সোমনাথকে সর্ব-ভারতীয় প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁদের মনে একটা চাপা বিক্ষোভ ছিল। সেই বিক্ষোভটি গজনীর মামুদ, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ, জুনাগড়ের নবাব এবং হায়দরাবাদের নিজাম গভর্ণমেণ্ট,—এঁদেরকে মনে রেখে নূতন সোমনাথ সৃষ্টির কথাটা উঠেছিল। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ হুজুগে পণ্ডিত নেহরুর মনের সায় কেন যে ছিল না, সোমনাথের মন্দির চত্বরে এসে দাঁড়ালে সেই কথাটি অনুভব করা সহজ হয়। যে প্রচারকার্যের মূলে অনুরাগ অপেক্ষা বিক্ষোভকে শুধু পাই, তার সার্থক পরিণতি লাভে কিছু বিলম্ব ঘটে বৈকি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সহসা সোমনাথের মন্দির সংস্কারের সর্বভারতীয় হুজুগ দেখে সোমপুরের অধিবাসীরাও অনেকখানি বিস্ময় বোধ করেছিল।

ঐতিহাসিক যুগে সোমনাথের আদি নাম ছিল সোমপুরা। এককালে সোমপুরা ছিল সমগ্র গুজরাটের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কাশীর পরে যেমন কাঞ্চি,—গুজরাটে সোমপুরা ছিল তেমনি শৈব-সম্প্রদায়ের মিলন কেন্দ্র। কিন্তু আজ আর সে কথা ওঠে না। মূল সোমনাথের মন্দির দেড় হাজার বছরেরও আগে নির্মিত হয়েছিল, অনেকের বিশ্বাস। হাজার বছরেরও আগে ছিল এখানে একটি ভারত প্রসিদ্ধ বন্দর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। এককালে যেমন ছিল সুরাট, পরবর্তীকালে যেমন হয়ে উঠেছে বোম্বাই অথবা কোচিন, —তেমনি এই সোমনাথ এবং বিরাবল ওদিকের বেলাকূলে সেই প্রকার বাণিজ্যের ঘাঁটি ছিল। ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে এসে জানা যায়, সোমনাথের মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের যে ভারতজোড়া আকর্ষণ ছিল, তারই জন্য নানা দেশের ধনপতিরা কোটি কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্নসম্ভার এখানে এনে দর্শনী দিতেন। সেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ এখানে শত শত বছের
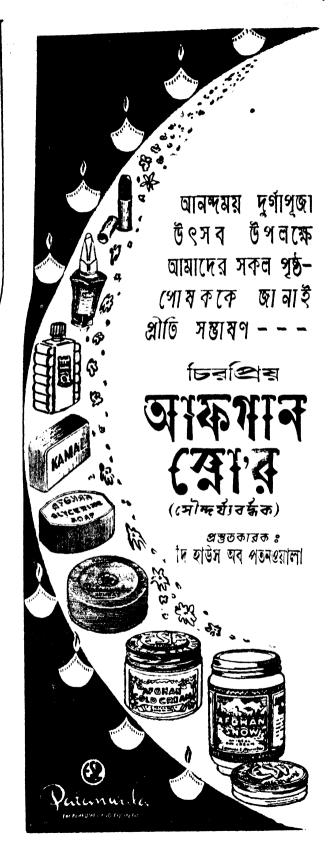
ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য, জহরৎ, হীরা-মুক্তাদি এবং বহু কোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকারাদি মিলে কি পরিমাণ হয়—তার হিসাব আজকে আর পাওয়া যায় না। সুতরাং সকল দিক থেকেই যে প্রবল আকর্ষণটা ছিল, সেটি লোভের। আজ থেকে নয়শো ত্রিশ বছর আগে গজনীর মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করেন। যতদূর জানা যায়, প্রথমবার তিনি অকৃতকার্য হন, কিন্তু দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সাফল্যলাভ করেন। কিন্তু তাঁর এই আক্রমণের মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের অপৌরুষ এবং বিশেষ একটি শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা ছিল, একথা ভুলে গেলে চলবে কেন? লুঠ করেছে আলাউদ্দিন, মহম্মদ ঘোরী, নাদির শা, আমেদ শা, আবদুল কাদির,—কে নয়? পরবর্তীকালে লুঠ করেছে ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেস্টিংস এবং সমগ্র ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ,—কাদের কথা বাদ দেবো?

চুপ করে এসে দাঁড়ালুম। কম-বেশী বিঘা আষ্টেক জায়গা নিয়ে মন্দির এবং তার পরিবেশ। এর বাইরে—অর্থাৎ কেবলমাত্র পশ্চিম দিকটি বাদ দিলে চারিদিকে বেশ ঘিঞ্জি লোক বসতি। সোমনাথের যে পারিপার্শ্বিক মহিমা পাওয়া যায় ইতিহাসে এবং শ্রুতি স্মৃতিতে,—সেই মহিমা এখানে সংরক্ষিত থাকবে কিনা সন্দেহ। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আশে-পাশে কোথাও কিছু নেই,—সমস্তটাই শূন্য এবং একেবারেই দরিদ্র। দু'চারখানা পাথর এবং ভাঙা পাঁচিলের টুকরো-টাকরা এখানে ওখানে ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু তাদের কিছুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করা যায় না। গজনীর মামুদ যখন মূল মন্দিরকে ধ্বংস করে চলে যান, তখন রাজা ভীমদেও পুনরায় মন্দিরটিকে নির্মাণ করেন এবং তার পঁচিশ বছর পরে রাজা কুমারপাল পুনরায় মন্দির পরিবর্ধনে লেগে যান। কিন্তু তৎকালে মুসলমানদের আক্রমণ না থাকলেও উৎপাত তাদের কম ছিল না। ফলে, পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে সোমনাথের অন্তর্বর্তী জ্যোতির্লিঙ্গকে যথাবিহিতভাবে পূজা নিবেদন করার পক্ষে বাধা-বিঘ্ন ছিল অবিশ্রান্ত। বুঝতে পারা যায়, যে কারণেই হোক, পাঠান মোগলদের বিষদৃষ্টি ছিল এই মন্দিরের প্রতি। এর অন্তর্নিহিত কারণ কোথায় এবং কেন ছিল, তা আজকে আর আলোচনা করে লাভ নেই। অতঃপর সেই কুমার পালের নবনির্মিত ও পরিবর্ধিত মন্দির অবশেষে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর স্থাপত্যের আকর্ষণ ছিল অনন্যসাধারণ। এর পর দেড়শো বছরেরও কিছু পূর্বে হোলকারের ভারতপ্রসিদ্ধা মহারাণী পুণ্যবতী অহল্যাবাই সেই প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে অল্পদূরে শহরের মধ্যে পুনরায় ছোটখাটো একটি সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেন এবং দেড়শো বছর ধরে সেখানে পূজা-পাঠ চলে এসেছে। কিছুদিন আগে কুমার পালের সেই ভগ্ন মন্দিরটিকে নষ্ট করা হয়, কিন্তু মাটির তলা খুঁড়ে বুঝতে পারা যায়, পুরাকালের মূল সোমনাথের ভিতের উপরেই ছিল কুমারপালের মন্দির। এই খননের ফলে পাওয়া যায় নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তি এবং বহু প্রকারের স্থাপত্য শিল্পের সামগ্রী। বর্তমানে সেগুলি যাদুঘরে রক্ষিত।

বন্ধুবর নাগিয়া পূজারীর সঙ্গে আলাপ করলেন। মূল মন্দিরের ভিতটি নাকি নির্মিত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে মন্দিরটি অস্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে উঠেছে সেটির উচ্চতা কয়েক ফুট মাত্র,—আমার বিশ্বাস, সেটি বেদীর উপর থেকে কুড়ি ফুটের বেশী নয়। কিন্তু পূজারী মহাশয় মন্দিরের মধ্যে ভবিষ্যৎ সোমনাথের মন্দিরের একটি মডেল রেখেছেন দর্শকদের জন্য এবং একটি চিত্রিত কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গ রয়েছে তারই পাশে। বলাবাহুল্য, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সকলকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। সমগ্রভাবে সোমনাথ এবং তার পরিবেশ আমাদের মনে একটুও রেখাপাত করলো না, এটি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার বিশ্বাস সমস্ত প্রকার আয়োজন এবং অধ্যবসায়ের মধ্যে একটি হঠকারিতা থেকে গেছে। সেটি হোলো এই, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষকে উৎখাত করা সঙ্গত হয়নি। কারণ তার সঙ্গে জড়ানো ছিল প্রাচীনের একটি স্বাভাবিক মহিমা এবং ইতিহাসের কালানুক্রমিক স্মৃতি।

নূতন সোমনাথের মন্দির নির্মিত হতে হয়ত দশ পনেরো বছর লাগতে পারে। হয়ত দেখবো তার অনেক সাজসজ্জা, অনেক মার্বেল পাথরের কাজ। কিন্তু সে মন্দির ত হবে দিল্লীর বিড়লা মন্দিরের সমগোত্রীয়! সম্পদ থাকবে প্রচুর, কিন্তু ঐশ্বর্য আসবে কোত্থেকে? বিস্ময় আনবে, কিন্তু শ্রদ্ধা আনবে কি? নূতন সোমনাথ উঠে দাঁড়াবেন বটে, কিন্তু তাতে প্রাচীন সোমনাথের সাংস্কৃতিক মহিমা থাকবে না!

তবু ঐ নবনির্মিত প্রাকারের উপরে দাঁড়িয়ে একবার স্তব্ধ চক্ষে তাকালুম পশ্চিমে। এই প্রাকার অবিশ্রান্ত ধৌত হচ্ছে আরব সাগরের তরঙ্গে,—আমাদের পায়ের নীচে অন্তহীন সমুদ্র। সূর্যাস্ত হচ্ছে সমুদ্রে—তারই সোনার রশ্মি এসে পড়ছে সোমনাথের ছোট্ট মন্দিরের সর্বাঙ্গে। সমুদ্রপাখীর দল উড়ে চলেছে দূর-দিগন্তের দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে নারিকেল কুঞ্জ চলেছে দৃষ্টিসীমানা ছাড়িয়ে,—শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে নীল সাগরে। মহাজলরাশির এই প্রান্ত থেকে এই পুণ্যভূমি ভারত ডাক দিয়েছে পশ্চিমের দিকে আবহমানকাল থেকে, যারা বন্ধু, যারা বৈরী, যারা বিদেশী,—কেউ অনাদর পায়নি। মঙ্গলশঙ্খে দিয়েছে ফুৎকার, দীপমালা জ্বালিয়ে রেখেছে অনন্ত নীলাম্বুরাশির দিকে, মন্ত্রমালা জপ করেছে বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায়,—ডাক দিয়েছে তার বিস্তীর্ণ হৃদয়ের ক্ষেত্রে। দ্বারকা থেকে ডেকেছে, মহালক্ষ্মী থেকে ডেকেছে, কন্যাকুমারিকা রামেশ্বরম থেকে ডেকেছে, জগন্নাথ ও কোনারক থেকে ডেকেছে। অপমানে তার মাথা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়, আঘাতে জর্জরিত হয়েছে,—কিন্তু তবু এই মহাবীর্যবান সুপ্রাচীন সন্ন্যাসী ভারত ভস্মমাখা দেহে উঠে দাঁড়িয়ে পিতামহের মতো স্নেহাসিক্ত চক্ষে ক্ষমা করে এসেছে চিরদিন।

ভারতবাসীর আহার

(১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গজা'—নামের এখন এমন পরিবর্তন হয়েছে যে মূল গজার রূপ বর্ণনের জন্য আমরা এখন ব্যাখ্যা ক'রে বলি—"জিভে-গজা"।

ভারতবর্ষের মিষ্টান্ন খুবই বিখ্যাত, কিন্তু মিষ্টান্ন বিষয়ে মুসলমান জগৎ, আরব-ইরানী জগৎ, আর ভারতবর্ষ, প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। আমাদের ভারতীয় মিষ্টান্ন দুই প্রকারের—এক, দুধ জমিয়ে আর দুধ ফাটিয়ে, ক্ষীর আর ছানার আধারে তৈরী মিষ্টান্ন; যেমন পেঁড়া, বরফী, কালাকন্দ, গোলাপজাম, রাবড়ী; আর সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, ছানার মুড়কী, চমচম। দুধ ফাটিয়ে ছানা ক'রে তার মিষ্টান্ন বাঙলা দেশের বৈশিষ্ট্য—ভারতের অন্যত্র ছানার রেওয়াজ নেই। বাঙলার রসগোল্লা এখন নিজগুণে "বঙ্গালী মিঠাই" নামে সমগ্র ভারতের এক অতি প্রিয় মিষ্টান্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—বহুস্থানে উচ্চাঙ্গের ভোজে রসগোল্লা থাকতেই হবে। দ্বিতীয় প্রকার মিষ্টান্ন হচ্ছে, শস্য-চূর্ণের আধারে—যবের ছাতু, গমের আটা, চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া প্রভৃতি ঘীয়ে বা তেলে ভেজে নুন বা চিনি বা চিনির রস মিশিয়ে তৈরী নোনতা বা মিষ্টি পক্বান্ন। এর উপরে আবার নারকেল কুচি বা কোরা, পেস্তা বাদাম কিশমিশ প্রভৃতি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। ইউরোপের মিষ্টান্নে Cakes and Pastry-তে ডিম থাকা চাইই—ভারতীয় মিষ্টান্নে ডিম থাকে না, ধর্মের দিক দিয়ে ডিম বারণ। হালুয়া, দক্ষিণ ভারতের উপমা, লুচী, সিঙ্গাড়া (বা সম্বোসা), ধোসা, নানা রকমের বড়া আর বড়ী। ভাজী আর ফুলুরী প্রভৃতি এই পর্যায়ে আসে।

খাঁটি ভারতীয় রান্নায় আবার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য আছে। উত্তর ভারতের দাল, ভাজী, শাক প্রভৃতিতে যেভাবে "বঘার" বা ফোড়ন দেওয়া হয়, তা আমাদের দেশের ফোড়ন থেকে বা সাঁতলানো থেকে আলাদা। আবার ভাপে সিদ্ধ ক'রে তরকারীর তার বদলানো হয়। দই, তেঁতুল, আমচুর, লংকা, মরিচ, গরমমশলা, কোথাও বা ভাজা মশলা, নারকল, এসব ভারতীয় রান্নার অন্যতম প্রধান উপকরণ, চীনা বা ইউরোপীয় অথবা আরব-ইরানী রান্নায় এসবের পাট তেমন নেই।

ভারতের গ্রামীয় বা প্রাদেশিক রান্নার কথা নিয়ে বড় একখানি বই লেখা যায়। সুখের বিষয়, বাঙলার নিজস্ব রান্নার সম্বন্ধে (খাঁটি বাঙালী রান্না, আর যেসব জিনিষ বাঙালীর হেঁসেলে স্থান পেয়েছে সেইসব বিদেশী রান্না, এই দুইয়ের সম্বন্ধে) স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখুজ্যে মহাশয়ের বিখ্যাত বই "পাক প্রণালী" গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করবার।

মুসলমানী অর্থাৎ ইরানী-ভারতীয় (বা মোগলাই) রান্না, ভারতের রান্নারই মধ্যে পড়ে। পোর্তুগীস, ফরাসী, ডচ—এদের কাছ থেকে আর ইংরেজদের কাছ থেকেও অনেক কিছু আমরা নিয়েছি—বিশেষ মাংস-পাকে। ডচেদের Poespas হ'য়েছে আমাদের "পিসপাস"—ভাতে মাংসে পাক করা—এ ঘৃতমিশ্র মশলা কেসর দেওয়া পোলাও নয়। ইংরিজি "চপ্

চাটনেট" নামগুলি নিয়েছি, কিন্তু পদ্ধতিটা আমরা পোর্তুগীসদের কাছ থেকে শিখেছি।—ইংরিজি চপ কাটলেটে মাংসকে কিমা ক'রে রাঁধা হয় না, হাড়শুদ্ধ পাঁজরার মাংসই এতে ব্যবহার করা হয়। ইন্দো-পোর্তুগীস যা গোয়ায় আর চাটগাঁয়ে প্রচলিত, আর অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ান রান্না, যা সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গির আর ইউরোপীয় হোটেল রেস্তোরাঁর বাবুর্চিখানায় প্রচলিত, এদুটিকেও ভারতীয় রান্নার মধ্যে গণ্য ক'রতে হয়।

ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও সাত-আট শ, হয়তো হাজার দেড় হাজার বছর ধ'রে, প্রাচীন রন্ধন পদ্ধতি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে যে ভোগ দেওয়া হয়—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নিরামিষ রান্নার এই নিদর্শন এই কয়েক শত বৎসর ধ'রে অপরিবর্তিত রূপে চ'লে এসেছে। তেমনি দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরের ভোগের সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। এইগুলির বিশেষ আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ষের রন্ধন-শিল্পের ইতিহাসের কথা নিহিত আছে। আবুল ফজলের আঈন-ই-আকবরীতে আকবর বাদশার রন্ধনশালার ত্রিশ রকম খাদ্যের উপাদান দেওয়া আছে—দশ রকম *শুদ্ধ নিরামিষ, দশ রকম মিশ্র আমিষ নিরামিষ, আর দশ রকম শুদ্ধ আমিষ।* দশ-সের ঘী, দশ সের মিসরী, দশ সের সুজী, আর অন্য উপকরণ সম্ভবতঃ এইভাবে এই হচ্ছে বাদশাহী হালুয়ার উপাদানের প্রমাণ।

মোট কথা ভারতবর্ষের লোকে যা খায়, তার একটা আলোচনা নানাদিক দিয়ে কৌতুক-প্রদ, শিক্ষাপ্রদ। পার্থক্য নানা রকমের আছে।, কিন্তু তবুও একটা সাধারণ ভারতীয়তা আছে। বিদেশে--লণ্ডনে, পারিসে, নিউ-ইয়র্কে--যেসব ভারতীয় ভোজনশালা আছে, সেইগুলির মাধ্যমে ভোজন বিষয়ে যে সাধারণ ভারতীয়তার বৈশিষ্ট্য ধ'রে দেওয়া হ'চ্ছে, তা স্বীকার করতেই হয়। ভারতীয় ভোজনশালায় এই জিনিসগুলি থাকবেই—ভাত, দাল, নিরামিষ বা মাংস বা মাছের রকমারি তরকারী, পোলাও, হালুয়া, ভাজী, পাকোড়া, চাটনী, দই, "রসগুল্লা", "গোলাব জামুন", পাঁপর। এই পাঁপর একটি নিখিল ভারতীয় বস্তু। শব্দটি সংস্কৃত 'পর্পট'রূপে পাওয়া যায়—এটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব'লে কেউ কেউ মনে করেন। "পর্পট" থেকে "পম্পড়-পম্পড়", তাহাকে পাঁপড়, পম্পড়, পাঁপর, পপডম্" ইত্যাদি আধুনিক রূপ। কিন্তু মনে হয় এই দালের পিষ্ট থেকে তৈরী এই জনপ্রিয় ভারতীয় খাদ্যবস্তু মূলে দ্রাবিড় জাতির দান তুলনীয়, তামিলে দাল অর্থে "পম্পপু" শব্দ।

ভারতীয় আহারের অনেকখানি অংশই প্রাগার্য যুগের খাদ্যবস্তু আর রন্ধন রীতির আধারে গঠিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিকারের কাহিনী

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

নীচের গর্তে। দড়িটি ধরে টানলেই যাতে টুকরীটি উঠে যায়। আরেকটি সুতো আলোর দীপ্তি নিয়ন্ত্রণ করবার যন্ত্রটির সঙ্গে বেঁধে ভেতরে আনা হল গর্তের মধ্যে যাতে সেটা টানলেই আলোর দীপ্তি বেড়ে ওঠে। এমনি ভাবে প্রস্তুত হয়ে সন্ধ্যার ছায়া যখন নেমে আসছে এমনি সময় সেই গর্তের ভেতর গিয়ে বসলাম, মাথার উপর টুকরী ঢাকা আলো স্তিমিত করে রেখে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, নেমে এলো রাতের অন্ধকার বনের ছায়ায় আঁধারতর হয়ে। পাশেই কোয়েলের জল পাথর থেকে পাথরে ও কিনারায় আহত হয়ে বয়ে চলেছে আপন পথে কলস্বরে ব্যক্ত করে তার বেদনার ভাষা। বহু-ক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। মশার তাড়নায় অস্থির হলেও নড়বার উপায় নেই। রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে শুনতে পেলাম ভারী জন্তুর সমবেত পদশব্দ। ক্রমে নিকট হতে নিকটতর হতে থাকে শব্দ। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকি। আরো কাছে, আরো কাছে, এবার এরা হুজবজ করে জলায় নেমেছে আমার সন্নিকটে। আস্তে সুতোটিতে টান দিতেই মাথার উপর হিস্-স্-স্-স্ করে ওঠে পেট্রোম্যাক্স, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার আলো। দড়িটি ধরে এক টান দিতেই পলকের মাঝে উঠে যায় অন্ধকারের যবনিকা, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আলোর নীচে অন্ধকারে বসে দেখি। নিঃশঙ্ক-চিত্তে চরমান সেই বাইসন যূথ হঠাৎ সেই আলোকের প্রকাশে সচকিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অতি নিকট থেকে দেখি তাদের সেই ঘন বাদামী রঙের বিশাল মধর চিক্কণ দেহ, পিঠের উপর ঈষৎ উন্নত কুব্জ। ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ায় তারপর দুড়দাড় করে চলে গেল অরণ্যের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে।

দেখবার আশা তো মিটল, এবার জাগল শিকারের নেশা। পাণ্ড্রা নালার ধারে অতীতে যে গ্রামটি ছিল পাণ্ড্রা, এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই, ভাঙা আলের চিহ্ন কোথাও কোথাও ছাড়া। যে জায়গায় আবাদী ক্ষেত ছিল সেখানে ১০।১৫ ফুট লম্বা ঘাস মাথা তুলেছে, এতো ঘন যে মানুষের অগম্য। শীতের সময় সেই ঘাসের আগা শুকিয়ে ওঠে। আমার নির্দেশমত খাসমহল গ্রাম রুদের অধিবাসীরা তাতে লাগিয়ে দেয় আগুন। সে ঘাস পুড়ে গেল দিন কয়েকেই, সেখানে গজিয়ে ওঠে নতুন ঘাস, বাইসনের অতি প্রিয় খাদ্য। এই আগুন লাগাবার একটা পদ্ধতি আছে। একটা শুকনো খড়ের নুড়ো তৈরী করে একজন শুকনো ঘাসের আগায় আগুন লাগাতে লাগাতে যায় যতোখানি জায়গা পোড়াতে হবে ততখানি জায়গাকে চক্রাকারে ঘিরে। আর কয়েকজন ছোট ডালপালা নিয়ে চক্রাকারে প্রজ্বলিত ঘাসের পরিধির বাইরের দিকের আগুনটা পিটিয়ে নিভিয়ে দিতে থাকে যাতে আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে সারা বনকে না গ্রাস করে ফেলতে পারে, কেবল মাত্র যতখানি জায়গা পোড়াবার প্রয়োজন ততখানিটাই পুড়তে পুড়তে যায় ক্রমশঃ চক্রাকার পরিধির ভেতরের দিকে এবং বৃত্তের ভেতরেই নিঃশেষ হয়ে থামে আগুন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে আমার কাছে খবর এলো পাণ্ড্রার কচি ঘাসে চরতে আসছে বাইসন, শিকারের সুযোগ উপস্থিত। পাণ্ড্রার কাছে রুদের ডাকবাংলোয় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সামনে দিয়ে বয়ে গেছে উত্তর বাহিনী কোয়েল। তার ওপারেই সুরু হয়েছে রাঁচি জেলার সীমানা। বনের ঢেউ দূরে বুলবুল পাহাড়ের কোলে মিশেছে ৩৪০০ ফুট উচ্চ তার চূড়া। দক্ষিণে নেতার হাটের অভ্রভেদী চূড়া। নেতার হাটের উত্তর কোলে রুদের দুর্ভেদ্য বন দিনের আলোতেও ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার।

বাইসন শিকারের রীতি এই যে, হাকোয়া শিকারে মারা হয় না, পায়ে হেঁটে গিয়ে সবচেয়ে বড় মাথাওয়ালাটিকে শিকার করতে হয়। মেয়ে বাইসন বা অপ্রাপ্ত যৌবন বাইসন শিকার নিয়মবিরুদ্ধ। ভোরের আলোতেই এদের শিকার প্রশস্ত, কারণ প্রখর দিবালোকে অরণ্যের গভীর গহনে এরা আশ্রয় নেয়।

শেষ রাত্রে এসে আমায় শিকারে যাবার জন্য ডাকল ওখানকার রুদের শিকারী রামা ভোক্তা ও মনবাহাল। তখনই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। ২৫।২৬ বছরের যুবক রামা ভোক্তা। পাতলা ছিপছিপে কচি বাঁশের মত নমনীয় দেহ, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর। এ বনের আনাচ-কানাচ গলিঘুঁচি তার নখদর্পণে, তাকে অনুসরণ করে চললাম। রাতের অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় রয়েছে। আঁধারের উৎসবে তারার বাতি তখনও ম্লান হয়নি। মুরগীর ডাক শুনে সময় অনুমান করে ডেকে এনেছে রামা, ভোর হতে তখনও বাকী আছে। গন্তব্যস্থান পাণ্ড্রার কিছু দূরে। পথের ধারে ঘাসের উপর বসে ঊষার অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। নিশীথের সুপ্তি ভঙ্গ করে শোনা গেল বাঘের "আ-ও-ও-ও..."। সব সাথীকে ডাকছে—বলল মনবাহাল। কাছেই ওর মান অর্থাৎ থাকবার গুহা। বাঘের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের শব্দ এদের সুপরিচিত। এরা যে তাদেরই প্রতিবেশী।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে দেখে আমরা আবার চলতে সুরু করলাম। কিছুক্ষণ চুপ চাপ করে চলার পর দেখতে পেলাম দূরে পাণ্ড্রা নালার ওপারে কালো কালো অস্পষ্ট ছায়া। বাইনাকুলার দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম বাইসনের মস্ত এক যূথ পাণ্ড্রার ধারের খোলা জায়গায় কচি ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে। এদের মারতে হলে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় ওদের দৃষ্টির অন্তরালে। পাণ্ড্রার ধারে ধারে আমাদের পথ যেতে শুকনো পাতা ডাল আগেই সরিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল যাতে পায়ের নীচে শুকনো পাতার ক্ষীণতম খচমচ শব্দও না শিকারকে সচকিত করে তোলে। পাণ্ড্রা নালাটি বেশ গভীর এবং এঁকে বেঁকে চলে গেছে তার গতিপথ। বাইনাকুলার দিয়ে আগে দেখে নিলাম যূথপতি কোথায়, তারপর তার কাছে যাবার জন্য অতি
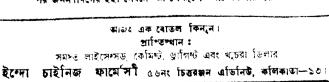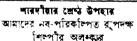
(ইহার পর ২৪৮ পৃষ্ঠায়)

তৃতীয় নেত্র

(২৬১ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] চিত্রপটে। এই সৌন্দর্য ক্লেদাক্ত অসত্য। চোখের দীর্ঘ পল্লব ভারী হ'য়ে এল নমনীয় আবেশে। চঞ্চল সে দৃষ্টিতে নিমন্ত্রণ খুঁজে পেল। অগ্রসর হলো সে। তার ঘোলাটে চোখ চিত্রিতা দেখলো। আর একজনের ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন তার মনের কোণে কোণে স্নিগ্ধতা বিছিয়ে দিল। কতদিন আগে সেই এক ছন্নছাড়া যুবক আলুথালু বেশ—তার দিকে চেয়ে কী যেন খুঁজেছিল। সে চোখে কী ছিল? চঞ্চলের ঘোলাটে চোখ ওর গায়ে কাদা ছড়িয়ে দিল। অকস্মাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠলো—'চঞ্চল'! 'কি হলো!' চঞ্চল ত্রস্তভাবে জানতে চাইল।

"আমায়—আমায়—তুমি রেহাই দাও, চঞ্চল।" ভেঙেগ পড়লো চিত্রিতা।

রুদ্ধ ঘর। অন্ধকারে ভরাট। ঘুমন্ত রাত্রি। তারাগুলি সব চেয়ে আছে নির্নিমেষে, কৌতূহলে। ধ্যানমৌন চিত্রিতা। নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা ঊর্ণনাভ সৃষ্টি করে চলেছে। সে দেখতে পেল, একদল অশরীরী লোক তাকে ঘিরে ধরলো। বীভৎস মত্ততায় তারা নাচতে সুরু ক'রে দিল। সেই নাচের ছন্দে মৃত্যুর ডাক। তাদের কলহাস্য কর্ণবিদারী। সবার হাতেই একটা করে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। সে শিউরে উঠলো। প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে তারা সবাই হুড়মুড় ক'রে ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। তারপর প্রবল বেগে তাকে টানাহেঁচড়া করতে সুরু করলো। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এল। অস্ত্র দিয়ে তার সমস্ত দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে তারা খেতে লাগলো তামসিক উল্লাসে। বেদনায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো চিত্রিতা। সম্বিত ফিরে এল তার। আবার স্থির হ'য়ে বসলো। পাশের বাড়ীতে এক শিশুর ঘুমভাঙগা কান্না ক্ষণিক নীরবতা ছিন্ন করে মিলিয়ে গেল। অবসাদের ভার নেমে এল চিত্রিতার দেহে। খিন্ন চোখে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারাগুলি সব একে একে কী যেন তার কানে গুঞ্জরণ সুরু করলো। সে কান পেতে তার ভাষা খুঁজতে লাগলো—খুঁজে পেল—"শিল্পী প্রেমিক—" "ভালবেসেছে"…… "ভালবাসা চেয়েছে"……"নইলে কি শিল্প অত সুন্দর হয়!" সমস্ত ঘর আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ। হাওয়ায় উড়িয়ে আনছে সেই নাম-না-জানা পথিকের উত্তরীয়।……

"হা ভগবান সারারাত মাটিতে শুয়ে র'য়েছিস!" পিসীমার ব্যথিতকণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল। চিত্রিতার ঘুম ভাঙগালেন মাথায় হাত বুলিয়ে। ধড়মড়িয়ে উঠলো সে। সূর্যের প্রদীপ্ত আলো ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে। "কী হয়েছে রে, চিতু, হ্যারে বল না আমায়—" স্নেহকাতর ব্যগ্রতা পিসীমার।

"কৈ, কিছুই তো হয়নি, পিসীমা" উঠে গেল সে।

"হুঁ, কী যে আমি ক'রবো তোকে নিয়ে—" আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে পিসীমা চলে গেলেন। ব'লে গেলেন "চায়ের জল চাপিয়েছি, তাড়াতাড়ি আয় বাছা—"

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চিত্রিতা। অস্ফুট ঘুমের ছাপ সারা মুখে। তবু এক অনবদ্য রূপ সেখানে সমাচ্ছন্ন। একরাতের কৃচ্ছ্রসাধন তার দেহে যেন এক নতুন জীবন সঞ্চার ক'রেছে। পটের চিত্রিতা আর সে অভিন্ন।

তিনদিন ধ'রে সে ভাবছে সমানে—কী ক'রবে। অফিস থেকে নিয়েছে ছুটি। সে দিনের পর থেকে চঞ্চলের সংস্রব ছিন্ন হ'য়েছে। দীপংকর, প্রদীপ, মোহন এক একবার করে এসেছে। অসুস্থতার অজুহাতে দেখা করেনি সে। পার্থ আসে নিয়মিত। তার প্রস্তাব অসামাজিক নয়। সে বিয়ে করতে চায়—কিন্তু চিত্রিতা বলে যে, পার্থ ওদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না ব'লে বিয়ে ক'রে তাকে বেঁধে ফেলতে চায়। পার্থের সংগেও সে দেখা করেনি।

এই ক'দিন ধরে সে কেবলই অনুভব ক'রছে তার গভীরে এক খরস্রোত। প্রবল আকর্ষণে সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে। এ টান সংবরণ করার ক্ষমতা আর তার নেই। সদ্য আহরিত ঠিকানাটির দিকে সে চেয়ে আছে পলকহীন, —"পরন্তপ রায়—সাউথ এণ্ড পার্ক"।

কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে কাছাকাছি কোথাও।

চিঠির প্যাড্‌টা টেনে নিল সে। না। বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে। উঠে ঘরময় পায়চারী ক'রতে লাগলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ফুলদানীতে আবদ্ধ রজনীগন্ধাগুচ্ছ তার সুরভি আকাশে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এখনো বাঁশী বাজছে।

আলমারী খুললো সে। একটা শ্বেতবরণ শাড়ী ও ব্লাউজ বার করলো টেনে। নিজেকে সজ্জিত করলো অনাড়ম্বর বেশে। খোঁপায় গুঁজে দিল কাঁটা। কপালে এঁকে দিল লাল টিপ—সন্ধ্যারাত্রির দীপ। ক্ষণে ক্ষণে এক অচেনা অনুভূতি তার অংগে অংগে।

ঘরে চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে এক দুর্লংঘ্য বাধা অনুভব করলো সে। পা দু'টি ভারী হ'য়ে এল। পিসীমার ঠাকুরঘরের দরজায় সে কোনমতে গিয়ে পৌঁছল। ধূপের গন্ধ তার সারা গায়ে যেন জড়িয়ে গেল। ভারী ভালো লাগলো তার। "আমি বেরুচ্ছি"—এই ছোট্ট কথাটুকু ব'লতে আজ সে ঘেমে উঠলো। লজ্জায় তার কণ্ঠস্বর হ'লো আড়ষ্ট। মুখটা হ'লো লাল। পিসীমাকে সে প্রণাম করলো।

"কি হ'লো রে তোর—" পিসীমা শুধোলেন।

"কিছু না—" সলজ্জভাবে ব'লে সে অগ্রসর হলো।……

যেন অনন্তপথ পেরিয়ে এসে সে নামলো ট্রাম থেকে। এতক্ষণ সে অনেক স্বপ্ন দেখতে দেখতে এসেছে। উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটে চ'লেছে একটার পর একটা বাড়ীর নম্বর দেখে দেখে। কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে। অবশেষে লক্ষ্যে এসে পৌঁছলো।

বাড়ীটা সাদাসিধে। ক্ষণেক দাঁড়ালো সে। নির্জন। গ্যাসের আলোর ছানিগ্রস্ত চক্ষু। দ্বিধান্বিতা চিত্রিতা। এক নিশিডাকের মোহে ছুটে এসেছে যেন অজানা প্রান্তরে। নিজেকে সামলে একটা ঝাকুনি দিয়ে সে দুয়ারে করাঘাত ক'রলো। একবার—দু'বার—তিনবার। বারবার। দরজা খুলে গেল। একটি অল্পবয়সী ছেলে জানতে চাইল, "কা'কে চান?"

গলাটা আটকে এল, তবু জোর ক'রে ব'ললে চিত্রিতা, "পরন্তপ রায়—"

"ও, তাঁকে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন—" বসবার ঘরের দিকে চললো ছেলেটি। কলেপুতুলের মত অনুসরণ করলো তাকে।

"তিনি তো এখন ষ্টুডিয়ো ঘরে র'য়েছেন—কি বলবো তাঁকে?"

এ্যাঁ, মানে—বল যে আমি একজন—" এই পর্যন্ত ব'লে কী ব'লবে ভেবে পেল না। ছেলেটি বললে, "ঠিক আছে, আপনি বসুন।" চলে গেল সে।

দুরু দুরু বক্ষে নিমেষ গুণে চ'লেছে চিত্রিতা। লগন ঘনিয়ে এসেছে। কাছাকাছি কোন থেয়েটারের নাট্যাভিনয়ে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সে কেঁপে উঠলো।

পরন্তপ এলো। সেই এলোমেলো চুল। অবিন্যস্ত বেশবাস। খানিকক্ষণ হতভম্ব চোখে চেয়ে রইলো তার মুখে। সে দৃষ্টির মাঝে চিত্রিতা হারিয়ে গেল। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তার একসংগে ঝংকার দিয়ে উঠলো। সর্বাংগের রক্ত যেন এসে জমে গেল তার মুখে—লজ্জায়।

পরন্তপ ব'ললে নির্লিপ্ত গলায় "আপনি কি চান—?"

বিস্ময়বিমূঢ় চোখ মেলে চিত্রিতা পরন্তপের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল—"কী চাই!"

দম্পতী — ভবানী দত্ত

আমাদের বাড়ীর দুর্গোৎসব

(১১ পৃষ্ঠার পর)

ইতিমধ্যে বাড়ীর ঝিঅড়ী এসে ঘট বসাবার জায়গায় আলপনা দিয়ে, ধান বিছিয়ে রেখেছেন, খড়ের বিড়া পুকুরে ধোওয়া হয়ে জল ঝরতে এক পাশে রাখা হয়েছে। ঘট স্থানের সম্মুখে, উত্তরমুখে গালিচা আসন, ডা'ন পাশে ফুল চন্দন, কোশাকুশী, চাঁদমালা, সিঁদুর, নৈবেদ্য সব রাখা হয়েছে। ধানের উপর বিড়া, তদুপরি ঘট স্থাপনা হ'ল। ভট্চাজ্জি মশায় পা ধুয়ে সিংহাসন-সহ রঘুনাথ জীউকে আনলেন। বাজনা বাজছে। গাড়ুর জল দিয়ে পথ দেখানো হ'চ্ছে। প্রথমে রঘুনাথের পূজা হ'ল, ঘটের গায়ে সিঁদুরের গণেশ অঙ্কিত হ'ল। তিনি সিদ্ধিদাতা। ইতিমধ্যে গিন্নী (মা) স্নান করে, তসরের কাপড় পরে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আর এক আসনে ব'সলেন, গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ক'রলেন, গঙ্গাজলে আচমন ক'রলেন। আর রঘুনাথের কাছে সংকল্প ক'রলেন, তিনি মায়ের পূজা ক'রবেন। প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ হ'ল।

ষষ্ঠীর বোধন পর্যন্ত পূজা-বাহুল্য নাই। কিন্তু বাকুলে কাজের বাহুল্য হয়েছে, বিজয় পর্যন্ত চ'লতে থাকবে। বাকুলের পশ্চিমে লম্বা দু-চালা ছিল, তার একপাশে ঢেঁকি, অন্যপাশে ভাজাশালা। কাজকর্মের সময় খই মুড়ি ভাজা হয়। এটি খুড়াদের। আগেই বলা ছিল, বছর বছর ভাজে, শশীর মা, কালীর মা, যদুর বউ ভাজাশালায় মুড়ির চা'ল নাড়ছে, ভাজছে, বেতের 'এদে'য় রাখছে, ঠেকে উঠছে। চতুর্থীর দিন খই ভাজা হ'বে, পঞ্চমীর দিন মুড়কি হ'বে। চতুর্থীর সকাল হ'তে না হ'তে সদরে অনেক লোক। আটচালার উত্তরে একটু দূরে ঠাকুরদালানের পশ্চিমে একটা উঁচু জায়গা ছিল। এটা চাঁছাছোলা গোবর-লেপা হয়েছিল। সেখানে চারিকোণে খুঁটি পোতা হচ্ছে, উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো হ'বে। এখানে বাড়ীর ও গ্রামের ব্রাহ্মণাদি ভদ্রজাতির মেয়েরা যাত্রা শুনতে ব'সবেন। সম্মুখে আটচালার দিকে চিক ফেলা হ'বে। আটচালার ডা'ন দিকের অনেক জায়গার উপর শামিয়ানা টাঙ্গানা হ'বে। আরও দূরে পাল দেওয়া হবে। এত শামিয়ানা ছিল না, পাল টাঙ্গাতে হ'ত। আটচালার পূর্বদিকে হাড়িকাঠ। সেখানে পাল টাঙ্গানা হ'তে পারে না। হাড়িকাঠের অনেক দূরে ছোট ছোট পাল বিকাল বেলা টাঙ্গানা হ'বে। শামিয়ানা ও পাল টাঙ্গাতে পূজাবাড়ী পূজাবাড়ী স্পষ্ট হয়ে গেল। আটচালাতে ও শামিয়ানার নীচে হাজার হাজার লোক বসতে পারে। শুধু যাত্রা শোনা নয়, দশমীর দিন গ্রামের লোক খাবে। উপরে আচ্ছাদন না থাকলে কোথায় ব'সবে।

চতুর্থীর দিন আমার এক পিসতাত ভাই আর এক মামাত ভাই বছর বছর আসেন। আর কেহ আসুন বা না আসুন, তাঁদিকে আসতেই হ'বে। ময়ালের শ্রীধর রায়, আমার পিসতাত দাদা। দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে ময়াল, তিন ক্রোশ দক্ষিণে এ'রা জল-কর রায়, দ্বারকেশ্বর নদীর জল স্বত্ব এ'দের ছিল। মামাত দাদা শ্রীপতি বক্সী, নিবাস সুলতানপুর, তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। শ্রীধর দাদার সঙ্গে এক বাগদীর মেয়ে, মাথায় এক ঝোড়া আনাজ। শ্রীপতি দাদার সঙ্গেও এক বাগদীর মেয়ে, মাথায় এক ঝোড়া চিংড়ি মাছ। তাঁরা নাইবার বেলায় এসে পড়লেন, দুজনেই কর্মিষ্ঠ, ভাঁড়ারীর কর্মে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। মেজদাদার অন্য কাজ ছিল। তিনি সদরের খবর বাকুলে দিতেন। শ্রীপতি দাদা ভাঁড়ার নিলেন, শ্রীধর দাদা সদরে কে কোথায় আসছে, কাকে কি খেতে দিতে হ'বে দেখছেন। এখন ভাঁড়ার দুটি, বাকুলের ভাঁড়ার বড় বউএর (এখনকার বৌদি) হাতে, সদরের ভাঁড়ার শ্রীপতি দাদার হাতে। ঠাকুর দালানের নীচের ঘর খালি থাকত। এই ঘরে সদরের ভাঁড়ার হ'ত। বাকুলের দিকে এর এক দ্বার, সদরের দিকে আর এক দ্বার। এই ভাঁড়ারে ঘট গাড়ু হাড়ী সরা মালসা ইত্যাদি হ'তে চা'ল ডা'ল আনাজ শাক পাতা তেল নুন মুড়ি মুড়কি পান সুপারী প্রভৃতি সব থাকত। এখান হ'তে বাইরের লোকেদের সিধা তেল জল খাবার পান তামুক সব দেওয়া হ'ত। আত্মীয়-স্বজন ও সজ্জনের জলখাবার ভিতরের ভাঁড়ার হ'তে আসত। বড় বউ বিবেচনা করে' যাকে যেমন, তাকে তেমন দিতেন।

আজ হ'তে ভাত খাবার লোক বেড়ে গেছে। হাটবারে হাটবারে আনাজপাতি কেনাও বেড়ে আসছে। অনেক আগে গুড় কুমড়া কেনা হয়েছে। এখন লাউ, কাঁচকলা, বেগুন, কচু, পুঁইশাগ কেনা হ'চ্ছে। তখন গোল আলু ছিল না বাড়ীতে বড়ী আছে। আজ হ'তে পুকুরে পোণা মাছ ধরানো হ'বে। সদর পুকুর, তালপুকুর, পুকুরটা বড় অনেক, জানা না হ'লে, মাছ ধরতে পারা যায় না, তাতে বড় বড় মাছ। পূজার সময় তত বড় মাছ দরকার হয় না। বাড়ীর একটু দূরে সাহারো পুকুরে, মাছ খুব বাড়ত। দুলো পাড়ায় পুকুর, তিন পাড়ে রাস্তা। জেলেরা বলে মানুষের শব্দে মাছ দৌড়ে বেড়ায়, বাড়ে। আড়াইসের হ'তে চারি পাঁচ সেরী মাছ ধরা হ'বে। তালপুকুরের ওধারের চিনিবাস পণ্ডিত অনেকক্ষণ এসেছে। দক্ষিণ পাড়ার জেলে দুজনও এসেছে, জাল বুনেছে, তামুক খাচ্ছে, পূব পাড়ার একজন এলেই হয়। এদের সঙ্গে বাড়ীর কাউকে যেতে হ'বে, জেলেরা মাছ চুরি করে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে রাখে, দুসেরী মাছও লুকিয়ে রাখে। বড়দের সময় নাই, ছোটদিকে যেতে হয়। এই রকম প্রত্যহ যেতে হয়। ক্রমশঃ মাছের পরিমাণ বাড়তে থাকে। জেলেরা মাছ এনে দিয়ে ভাঁড়ারীর কাছে তেল জল-পান নিয়ে ঘর যায়। মাছ ধরার বেতন নাই।

বাকুলে মাছ এল, এক দুলো বউ ব'টি নিয়ে উঠানের একধারে মাছ কুটতে বসে গেল। এখানেও বাড়ীর কোন মেয়েকে বসে থাকতে হয়। দুলো বউ লোক ভাল, তবে মাছের লোভ সামলাতে পারে না। বড়দের সময় নাই, ছোট ছোট মেয়েরা দেখতে থাকে। দুই পাহারাই মনকে আঁখি ঠারা। সেকরা সোনার পাকা চোর, জেলে মাছের পাকা চোর। বড়দের চোখে ধুলো দিতে ছেলে বেলা হ'তে শেখে।

আজ কুটুম বাড়ী হ'তে পূজোর তত্ত্ব আসবে। দু-এক কুটুমও আসতে পারেন, বড়রা না পারেন, ছেলেরা আসবে। অনেকের বাড়ীতে পূজা, তাঁদের আসবার সময় নাই। কে বাটনা বাটবে তাকে বলা ছিল, সকাল বেলা এসে, বাটনা বাটছে। হলুদ, ধন্যে, সর্ষে, জীরা-মরিচ, লঙ্কা। কে কুটনা কুটবে, কে ভাত রাঁধবে বামুন রাঁধবে, কে মাছ রাঁধবে, কাকেও ব'লতে হয় না, নিজে গিয়ে ব'সল। বউড়ীরা সুপারী কাটছে, পান সাজছে। গিন্নীর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নাই। কেউ ব'লছে, 'আজ কত চা'ল রাঁধা হ'বে ? ভাতের চা'ল না জানলে ডা'লই বা কত রাঁধা হ'বে, আনাজই বা কত কোটা হ'বে ? গিন্নী বড় বউকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন। বড় বউও জানেন না, বাইরে কত লোক খাবে, কে কখন আসবে। সকালের রান্না শেষ হ'তে তিন পর। তখন দেখা যাবে। বাইরে নাপিতে পূজার তত্ত্ব এনেছে, তত্ত্ব বাকুলে গেল, সদর ভাঁড়ারী নাপিতকে খুরীতে মাখবার তেল দিলেন, চানের পর ঠাকুর দালানের বারান্ডায় শাল পাতে জলপান দিলেন। আমাদের নাপিতের বাড়ী সিধা গেল, সেখানে কুটুম বাড়ীর নাপিত খাবে। এইরূপ অনেক বাইরের লোককে গাঁয়ে এর বাড়ীতে তার বাড়ীতে বাসা দেওয়া হ'ত।

পঞ্চমীর দিন হ'তে সধবা ঝিঅড়ী ও বউড়ীদিকে যার যা গয়না সব প'রতে হ'ত। অল্পবয়সীদিকে পুজরীপঞ্চম প'রতে হ'ত। অনেকদিন পার্বণীর শাড়ী এসেছে। আজ হ'তে সে শাড়ীও পরা হবে।

পূর্বদিন খইভাজা শেষ হয়েছে, আজ মুড়কি হ'বে। ভাজাশালায় শ্যামসাড়া আখের গুড়ের পায়া গেছে। যে মুড়কি ক'রতে জানে, সে এসেছে। গুড়ের পাক সকলে জানে না। মুড়কি নরম হ'বে না, জড়িয়েও যাবে না। কর্পূর ও গোল মরিচ গুঁড়া মুড়কিতে ছড়ানা হ'চ্ছে। কিছু মোআও ক'রতে হ'বে, ছেলেরা মোআ ভালবাসে। মুড়কি ঠেকে উঠল, এক ঠেক বাকুলের ভাঁড়ারে গেল, দু ঠেক সদর ভাঁড়ারে গেল। মেয়েরা নারিকেল কুরে রেখেছিলেন, নারিকেল নাড়ু হ'বে। কর্পূর ও এলাচ গুঁড়া ছড়ানা হ'বে। এই ক'রতে ক'রতে রাত্রি দেড় প্রহর হয়ে যায়। তারপর খেতে শুতে রাত দুপর হয়।

পঞ্চমীর দিন চিন্তামণি প্রতিমায় রং দিতে এসেছে। তার অনেক প্রতিমা, একে একে সেরে এসেছে, শেষ সারবে এখানে। কর্তারা এই নিয়ম করে' দিয়েছিলেন। আগে রং দিলে ধুলো উড়ে পড়ে, মশা জড়িয়ে যায়। চিন্তামণির সঙ্গে তিনজন এসেছে। একটা কাল পাথরের শিল ছিল, সেটা রং মাড়তে আলাদা রাখা হ'ত। ডাবাভাঙ্গায় চিন্তামণির বেটা জলে চা-খড়ী ঘষছে, কেউ পুতুলের গায়ে লাগাচ্ছে। কোথায় কাই বীজের আঠা, কোথায় বেলের আঠা; চিন্তামণি জোগাড় করে' নিচ্ছে। আজ আর কা'ল ঘরে গিয়ে ভাত খেয়ে আসবার সময় নাই। আমাদের খামার বাড়ীতে একটা ভাল মেলা ছিল, এক পাশে একটা কুঠরী। পরচালা নামিয়ে চাঁচ দিয়ে ঘিরে পালকী থাকত। সে মেলাতে অন্য কাজ হ'ত না। উৎসবের সময় বাজে লোক, অন্য সময় অতিথি নীচের মেলায় রেঁধে খেত। চিন্তামণির রান্না সেখানে হ'বে। রাঁধবার সময় বা কই ? একটি একটি অনেক কাজ। শণ কেচে চিরে হরীতকির জলে হিরাকষ দিয়ে গরম করতে হবে, তবে পুতুলের চুল হ'বে। মুড়ে

মুড়ে পাটায় পিটে পিটে সরিষা তেল মাখাতে হবে, তবে চিক্-চিক্যে কাল হবে। ডাকসাজ লাগাতে মালাকার কা'ল সকালে আসবে। এক সূত্রধর রং লাগাতে লাগল, আর দুইজন চাল-চিত্র ক'রতে ব'সল। প্রদীপ জেলে...সারা রাত্রি চাল চিত্র চ'লল; রং লাগানও চ'লল। সকাল হ'ল তখনও অনেক বাকি। মালাকার চাঙ্গারী মাথায় ডাকসাজ নিয়ে এল। তাকে নয়দার আঠা চাই। সূত্রধর ছাড়ে, মালাকার সাজায়, কেউ তামাক খেতে সময় পায় না। অপরাহ্নে ভট্টাচার্য মশায় ও তাঁর ভাই, তাঁর মলয়পুর হ'তে গুরু ঠাকুর এলেন। তাঁরা দেখলেন, এখনও অনেক বাকি। 'চিন্তামণি হাত চালিয়ে নাও। আর কত দেরী।' 'এই হয়ে গেল।' রাত্রি বারটা, তখনও 'হয়ে গেল।' সপ্তমীর সকাল হ'ল, তখনও 'হয়ে গেল।' 'এই যে বার্ণিশটুকু লাগালেই হয়।' কর্তা বিরক্ত, 'একদিন আগে এলে না কেন?' তিনি বুঝেন না, চিন্তামণিকে সাতখানা প্রতিমা গড়তে হয়, একে একে সারতে সারতে দেরি হয়ে যায়। আমি চিন্তামণির কোন দোষ দেখতে পেতাম না।

ষষ্ঠীর দিন সকাল বেলা গ্রামস্থ সকলকে পূজার নিমন্ত্রণ করা হ'ত। নাপিত যত, পাড়ায় পাড়ায় বলে আসত। পূজার নিমন্ত্রণ আর যারা শূদ্রের নিমন্ত্রণে, দুই বলতে হ'ত। ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণের ভার পুরুত নিতেন। গ্রামস্থদের ব্রাহ্মণদিগকে দুই পুঁটুলির পাতি পাঠাতেন। গ্রামস্থ লোককে পূজার নিমন্ত্রণ-পুষ্পাঞ্জলির নয়, প্রতিমা দর্শনেরও নয়। কেহ পুষ্পাঞ্জলি দিতেও আসত না। কেন না ব্রাহ্মণের পূজা ব্রাহ্মণের, তাদের নয়। প্রতিমা দর্শন এই বাল্যকালে কখনও শুনিনি। পূজায় নিমন্ত্রণ, পূজা উৎসবে নিমন্ত্রণ। সকলেই ঠাকুর প্রণাম করতে আসত। ঠাকুর কেবল ব্রাহ্মণদের নয়, সকলেরও। যেখানে যত ঠাকুর আছেন, সব ঠাকুর সবার।

প্রতিদিন পূজার পর হোম ও চণ্ডী পাঠ শেষ হ'লে পুরুষেরা পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। জ্ঞাতি ও আত্মীয় চাকর নফর দিতেন। মেয়েদের একটা রীতি ছিল। তার কানাত দিয়ে উঠান ঘেরা আড়াল করা হ'ত। খিড়কীর পথে মেয়েরা আসতেন, চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর কোনায় দুখানা পালকী থাকত চাঁচ দেওয়া। তার পাশ দিয়ে পথ। পূর্ব দিকের কোনায় তাঁবুর কানাত। চণ্ডীমণ্ডপের সে দিকের নীচের মেলা কানাত ঘেরা থাকত। এই পথ মেয়েদের জন্যে। সধবারা গেলী, বিধবারা তসর পরতেন। বাইরে অনেক লোক, মেয়েরা কানাতের আড়ালে বসে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। তাঁরা সন্ধ্যা বেলার আরতির সময় আসতেন, নীচের মেলার কানাতের আড়ালে দাঁড়াতেন। দুর্গাপূজায় অনেক লোক চাই। গ্রামের লোক, যে কাজ, যে পারে, সে না ক'রলে পূজাই হবে না। এতদিন বাড়ীর লোক, চাকর মানুষ দিয়ে, একে, ওকে ডেকে কাজ চ'লছিল। এখন গ্রামের সকলেই জানলে, তারা নিমন্ত্রণ নিয়েছে, যাকে ডাকা হবে, তাকেই আসতে হবে। পূজার তিন চার দিন কারও কোন কাজও নাই, উৎসব ছাড়বে কেন? এখন সকলকেই ডাকা হয়েছে, তারা না এলে পূজা ক'রবে কে? পূজা ভণ্ডুল ক'রলে কার পাপ হবে? বেতন দিয়ে এমন লোক পাওয়া যায় না।

বাড়ীর লোকের বিশ্রাম নাই; কোন দিকে কি ক'রবে? তিন দিন পূজারই উদ্‌যোগ সংযোগ। গিন্নী নিঃশ্বাস ফেলতে সময় পান না। কর্তা আটচালায়। বাইরের সংযোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি। সব সজ্জাতি চাই। একজন পুরোহিতের কাছে থাকবে, চন্দন ঘষবে, ধূপ-ধুনা ঘৃতের প্রদীপ দেখবে, কিছু দরকার প'ড়লেই এনে দিবে। দুজন ভোর হ'তে না হ'তে ফুল বিল্বপত্র তুলতে গেছে। আমাদের গ্রামে ফুল তত নাই। বকসনা ও করবী, এই দুই ফুল। কলিকা ফুলে পূজা হয় না। সেটা দেশী ফুল নয়। চাঁড়ালের মেয়ে পদ্মফুল দিয়ে যায়, জলে ধুয়ে তামার পুষ্পপাত্রে রাখা হয়। মেয়েটি পানিফল, পদ্মপাতাও আনে। পদ্ম-পাতে ডাল গলে যায়। এখন বাড়ীর সকলকেই কলাপাতায় খেতে হয়। এত বাসন মাজবে কে? কে বা খোঞ্জ রাখবে? একজন নৈবেদ্যের চা'ল সেরে মেপে ধুচনীতে ক'রে পুকুরে ধুয়ে আনে, জল ঝরতে দেয়। সে বরকোষ ধুয়ে এনেছে, খুরী ধুয়ে এনেছে। একজন বাতাবি ছাড়ায়, আখ ছাড়ায়, রম্ভা ছাড়ায়, (রম্ভা, কাঁঠালী কলা) শসা কুটে, নারিকেল কোরে। একজন খুরীতে নারিকেল কোরা, পানিফল, ছোলা ভিজা, মটর ভিজা, বাতাবী আর কি কি রাখে, নৈবেদ্য সাজায়। চা'লের চূড়ায় নবাত, তদুপরি চিনি, তদুপরি বনকরা। চিনিতে গাওয়া ঘি। কত চালের কখানা নৈবেদ্য হবে, কর্তার খাতায় আছে, উৎসর্গের পর কে কোনটা পাবে, তাও লেখা আছে। গ্রামে দশঘর ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকের ঘরে একখানা নৈবেদ্য যাবে। চিন্তামণি চক্রবর্তীর নৈবেদ্য পাবে। আরও কে কে নৈবেদ্য পাবে। নাপিত, কুমার, কামার, খেয়াঘাটের [illegible], পাড়ার দিগার (চৌকিদার), আরও অনেকে পাবে, ফর্দে লেখা আছে। পুরোহিতের প্রাপ্য নৈবেদ্য পৃথক আছে। বিলি করবার নৈবেদ্য অতিরিক্ত। এ সব নৈবেদ্য নবমীর পূজায় দেওয়া হ'ত।

সন্ধিপূজার যাবতীয় দ্রব্য গুরুর প্রাপ্য। আমরা শাক্ত, গুরু পুরুতও অবশ্য শাক্ত। গুরুর নিবাস মলয় (বা মলুই) পুরে, আমাদের বাড়ী হ'তে পাঁচ ক্রোশ ঈশান কোণে। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্ঞাতি। এইখানে তাঁর পিত্রালয়, বীরসিংহে মাতুলালয়। সন্ধিপূজার কৃষ্ণছাগ, বলিদানের ও উৎসর্গের পরে সেটি তাঁর বাড়ীতে পাঠাতে হ'ত। তিন দিনে তিনটি ছাগ বলি নিয়ম। কিন্তু, এটা গোপনীয় কথা। ভাত খাবার লোক অনেক; মায়ের প্রসাদ পেতে সকলেরই ইচ্ছা, অতিরিক্ত চারি পাঁচটা কখনও আট দশটা বলিদান হ'ত। বড়দাদা কমিয়ে তিনটায় এনেছিলেন। পুত্রের কল্যাণার্থে মা বছর বছর একটি মানসিক করতেন। নবমীর দিন দুটা বলি নিয়ম হয়ে গেছে। দশমীর দিন ব্রাহ্মণ ও গ্রাম ভোজন হ'ত।

বাড়ীর একজন রাত্রের আলোর জন্য লণ্ঠন সামলাতেন। এই কাজটি মেজদাদা ভাল বাসতেন। তিনি এক চাকর নিয়ে সারাদিন লণ্ঠনের কাছে থাকতেন। উপর তলায় লণ্ঠন ঝুলানো থাকত, বছর বছর নামানো হ'ত। গোলাকার লণ্ঠন, নাম ছিল হাঁড়ী। চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালায় টাঙ্গানো হ'ত, জল নারিকেল-তেল পলিতা দিয়ে গেলাস বসাতে হ'ত। প্রতিমার সম্মুখে দুপাশে উঁচু তেপায়ায় মোটা মোম-বাতির দুটা সেজ জ্বলত, নীচেও এখানে সেখানে সেজ জ্বলত। কাঁথে ও খুঁটিতে লোহার হুক ছিল, তাতে দেওয়ালগিরী ও একডালো আঁটা হ'ত। আটচালার বাইরে শামিয়ানা, তাতে চৌ-পলো লণ্ঠন ঝুলত। মেয়েদের জায়গায় আলো দেওয়া হ'ত না।

যাত্রার সম্প্রদায় সপ্তমীর দিন দুপুর বেলা আসত। দক্ষিণ পাড়ায় কারও ঘরে বাসা দেওয়া হ'ত। এই লোকটি তাদের খাওয়া, বসা, শোওয়া দেখত। বাইরের ভাঁড়ারী, সম্প্রদায়ে কতজন জিজ্ঞাসা ক'রতেন, সেইমত সিধা, হাঁড়ী, কাঠ, পাতা, জলখাবার তেল, পান, তামাক, আসন দিতেন। এদিকে লুচি মণ্ডা খাওয়াতে হ'ত না। মুড়ি, মুড়কি, লাড়ু, পান তামাক খেয়ে গান ক'রতে আসত। প্রায়ই কৃষ্ণযাত্রা, কখনও চণ্ডীর গান হ'ত। মনে হ'চ্ছে একবার শ্যামাযাত্রাও হয়েছিল। পালা ভুলে গেছি, দু'একটা সখের যাত্রার দল তখন দেখা দিয়েছে, না শ্যাম না শ্যামার নাম। সখের যাত্রা। একবার যাত্রার দল না পেয়ে রামায়ণ গান, আর একবার মহাভারত গান হয়েছিল। মহাভারতের দলটি দক্ষিণ অঞ্চলের, কথাগুলো বাঁকা বাঁকা,

স্ফটিক-স্বচ্ছ রোদ্দুর সরোবরে
সচ্ছল সুখী পাখিরা সাঁতার কাটে,
দিগন্ত ছোঁয়া নিরন্ত প্রান্তরে
বেকার বাতাস একমনে পথ হাঁটে।

বাজে শঙ্খের আনন্দ-মদিরা,
তন্দ্রী ফুলের রঙিন পাড়ায় পাড়ায়
ঘরে ঘরে যত মুগ্ধ মৌমাছিরা
মৌচাকে বাঁধা ফেরার সময় হারায়।

অমল আকাশে অলস মেঘে মেঘে
ছড়িয়ে পড়েছে সকালের কাঁচা সোনা,
শিউলির বুকে শিশির নিরুদ্বেগে
করে নীরব সূর্যের বন্দনা।

তরুণী নদীর তীরে দেখি আজ জাগে
ঘুম থেকে যেন হঠাৎ কাশের বন,
স্নাত সবুজে সুনীতির সংরাগে
দেবীর আলোর বিনীত প্রত্যর্পণ।

এই আশ্বিনে কোথাও উদ্দামতা
একটুকু নেই, সবখানে দেখি ঘরে
অনুপমা কার কল্যাণী স্নিগ্ধতা
মন হারাবার উন্মন অবসরে।

মেঘ-রৌদ্রের বিচিত্র সমারোহে
কী জানি কি এক হিরণ্য আশ্বাসে
হৃদয় আমার অপারসীমের মোহে
নীলাভ হাওয়ায় বালিহাঁস হয়ে ভাসে॥

আগে কথাপ্রসঙ্গে সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ কবির কথা কিছু বললে লাভ বৈ লোকসান হবে না।

ঠিক সাল-তারিখ স্মরণ নেই, তবে চুয়াল্লিশ বৎসরের আগেকার—বা তার কাছাকাছি কোন সময়কার কথা বলছি।

এক বৈকালে 'ফুলকবি'র কাছে ব'সে আছি। 'ফুলকবি' বললে এখানকার অনেকে হয়তো চিনবেন না, তবে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন একটি কবিতায় ঐ নামেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তখনকার দিনে বাংলার প্রধান কবি, বলা হ'ত এই চারজনকে—রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বলরাম দে—এখন ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি স্ট্রীটে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারা স্থাপিত 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' নামে একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় ছিল, এখন সেই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত 'কমলা হাইস্কুল'। দেবেন্দ্রনাথ বিদেশে ওকালতি করতেন, তখন কিছুকালের জন্যে কলকাতায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন সেই বাড়ীর ত্রিতলের ঘরে।

ঘর তো নয়, কবিতাকুঞ্জ বললেও অত্যুক্তি হবে না। সর্বক্ষণই শোনা যায় কাব্যগুঞ্জরণ। আসেন সব বড় বড় কবি আর ধুরন্ধর সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথেরও পদার্পণ হয়। নিত্যকার অভ্যাগতদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ভূতপূর্ব 'সাধনা'-সম্পাদক, গল্পলেখক ও কবি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ নামে আর একজন স্বল্পভাষী কিন্তু সদালাপী ও প্রবীণ বন্ধু প্রায় প্রত্যহই উপস্থিত থাকতেন, বোধ করি তাঁরই তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'কবিকাহিনী' মুদ্রিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকেও 'কবি' বলে ডাকতেন। আর যেতেন আসতেন কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি। সকলেই আজ স্বর্গীয়—মৃত্যু কারুকে ভোলে নি।

সেইখানে দেখেছিলুম বাংলাদেশের এক কবির অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় কাব্য-সাধনা। দেবেন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ, তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ, চক্ষে থাকে পুরু কাঁচের চশমা এবং সর্বাঙ্গীণ বাতব্যাধির আক্রমণে পঙ্গু হয়ে তিনি চলতে-ফিরতে পারেন না। হাতে লেখনী পর্যন্ত ধরতে অক্ষম। সেই অষ্টপ্রহরব্যাপী দারুণ যন্ত্রণাদগ্ধ শরীর, কিন্তু মুখে তাঁর প্রশান্ত। সকলের সঙ্গে হাস্যালাপে ক্ষান্তি নেই। বলেন সাহিত্যের কথা, কাব্যের কথা, লেখার আর্টের কথা। যখন অন্য কথা বলেন না, তখন মুখে মুখে অনর্গল কবিতার পর কবিতা রচনা করে যান আর কেউ তা লিখে নেন। তাঁর কাছে গিয়েই প্রমাণ পেয়েছিলুম, দেহের উপরে মনের প্রভাব কতখানি। তাঁর কাছে গিয়েই বুঝেছিলুম, সাহিত্যসাধক অন্য কোন শ্রেণীর সাধকের চেয়ে কম নন।

আসেন সম্পাদকের পর সম্পাদক। হাত পেতে বলেন, কবিতা চাই।

দেবেন্দ্রনাথ বলেন, তথাস্তু।

ভদ্রলোকের এক কথা। তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফেরবার উপায় নেই।

কেউ এসে সন্দেশ দিলে, অনেকে লোক আপনার নিন্দা করে।

দেবেন্দ্রনাথ হেসে বলেন, আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে নি।

একদিন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের একটি সদ্যপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে আলোচনা চলছিল।

অনেকেই মত প্রকাশ করলেন, ফুলকে যেমন সুতোর বাঁধনে গাঁথা হয়, এটিও হয়েছে তেমনি। ফুলকে গাঁথা দর্শনশাস্ত্রের সুতে।

দেবেন্দ্রনাথের মত কি, জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

তিনি বললেন, "কবিতাকে দর্শনশাস্ত্রের সূত্র বলে যদি বেশী ভ্রম হবে, সে হবে অত্যন্ত বেশী অসার্থক। কবিতার ভিতরে দার্শনিকতা থাকবে বৈকি, কিন্তু তা স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করবে না। যেমন নিছক সরল মুখরোচক নয়। কিন্তু মায়া রূপে তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে পারলে খাদ্য হয়ে ওঠে সুস্বাদ, অথচ তার অস্তিত্বের কথা স্মরণ হয় না। কবিতায় প্রধান থাকবে কাব্যরস, তার মহিমায় তলিয়ে থাকবে বিষয় নিঃশব্দভাবে হয়ে ওঠে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাবেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। তাঁর কবিতায় কি দার্শনিকতা নেই?"

একদিন 'মানসী' কার্যালয় থেকে জনৈক কর্মী এসে কবির হাতে এক সংখ্যা 'মানসী' অর্পণ করলেন।

ক্ষীণ দৃষ্টির খুব কাছে নিয়ে গিয়ে পাতাগুলো দেখতে দেখতে কবি বললেন, চমৎকার! অপূর্ব!

আমারও দেখলুম। 'মানসী'র পূজার সংখ্যা। তখনকার প্রকাণ্ড-এর চেয়ে আকারে সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ। অনেক ছবি, অনেক লেখা, বড় বড় লেখকের নাম। সুন্দর। রেশমের বন্ধনী।

সেই প্রথম দেখলুম বাংলা মাসিকপত্রের পূজার বিশেষ সংখ্যা। দেখতে দেখতে অন্যান্য মাসিকপত্রও সেই রীতি গ্রহণ করলে।

পত্রিকাগুলির সেই পূজার বিশেষ সংখ্যার পরিণতি হচ্ছে এখনকার পূজা-বার্ষিকী। তবে হ্যাঁ, বার্ষিকী আসে একা একা আর মাসিকের থাকে বারো সংখ্যা। কিন্তু এ পার্থক্য ধর্তব্য নয়, কারণ পূজার বিশেষ সংখ্যাও হয় অন্য সংখ্যাগুলি থেকে স্বতন্ত্র ও বড়।

কথাপ্রসঙ্গে অনেকটা এগিয়ে এসেছি, এইবারে বিশ্রাম।

অদেখা

কমলা চট্টোপাধ্যায়

দেখিনি তোমায় শুনেছি তোমার নাম
অনেকের কাছে—জানিনা সবার ধাম।
তারা বলে তুমি সুদূর আকাশে
ডানা মেলে ওড়া পাখী,
অমাবস্যার ঘন কালোরাতে
আলেয়ার জ্বলা আঁখি।
মুগ্ধ কবির কল্পনা তুমি
স্বপ্ন আবেশে নীল,
রুদ্রবীণার ঝংকার সাথে
তারা খুঁজে পায় মিল।
তারা বলে তুমি সাগরের বুকে
প্রলয় জাগানো ঢেউ,
আমার ঘরের মাটির প্রদীপ
শুধু বলেনাক কেউ।।

শিকারের কাহিনী

(২৮০ পৃষ্ঠার পর)

সাবধানে পাশ্রা নালার ভেতর দিয়ে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে কোনও ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে দেখে নিয়ে আবার এগোই। এমনিভাবে এগিয়ে যেখান থেকে তাকে বন্দুকের গুলীর নাগালের মধ্যে পাই সেখানে আন্দাজ করে ধীরে ধীরে নালা থেকে উঠলাম। উঠেই দেখি সে তখন চরতে চরতে সরে গেছে কিন্তু আরো অনেকে আছে। পূবের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে, ভোরের আলো আমার বন্দুকের ব্যারেলের উপর পড়তেই চকচক করে উঠল, তাতে একটি বড় বাইসনের দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। সে "ঘাঁ-আঁ-আঁ" করে বিপদসূচক শব্দ করল, সঙ্গে সঙ্গে যূথের ৭০।৮০টি বাইসন চরা থেকে ক্ষান্ত হয়ে যে যেখানে ছিল মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। প্রথম সংকেত যে দিয়েছিল সে খুব জোরে "ফোঁস—" করে শব্দ করল এবং মাথা ঝাকানি দিয়ে আমার দিকে চলতে সুরু করল। নিমেষের মধ্যে আমি তার মাথা লক্ষ্য করে গুলী করলাম, মাথা নাড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সে গুলী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেই বিরাট যূথ মাথা নীচু করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এইনা দেখে আমার সঙ্গের শিকারীরা "ভাগিয়ে হুজুর জান বাঁচাইয়ে" বলে নালায় নেমে দৌড়। আমি দেখলাম আর দেরী নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত আমার দিকে এগিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে নিকট থেকে আরো নিকটে। বন্দুক তুলে সামনে যেটা বড় পেলাম তাকে এক গুলী, তার বিশাল দেহ পড়ে যেতেই আর একটিকে, সে পড়তে ওরা তখন পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে লাগলো। আরেক গুলী ছোঁড়ে যাচ্ছে এমন একটিও পড়ে গেল। দুড়দাড় করে বাকীরা উধাও হয়ে গেল বনের অন্তরালে। কেবল পড়ে রইল তিনটি প্রকাণ্ড বাইসনের মৃতদেহ। কেবল মুখখানি আমার হাত এড়িয়ে চলে গেল তাকে আর শিকার করা হল না এই খেদ রয়ে গেল।

শ্রীমতী জ্যোতি সেন কর্তৃক অনুলিখিত

পূজাসংখ্যা সম্পাদনা : পরিমল গোস্বামী ও তুষার দাস। ছোটদের পাতা : অখিল নিয়োগী।

গল্পচিত্রণ : কালীকিংকর ঘোষ-দস্তিদার, শৈল চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, ধীরেন্দ্র বল ও সুধীর মৈত্র।

শারদীয় যুগান্তরের লাইন ও হাফটোন ব্লক প্রস্তুত করিয়াছেন : সরকারস্ ফোটোটাইপ স্টুডিও।

সম্পাদক—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
পত্রিকা প্রেস, ১২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও ১২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।

ॐ শারদীয় যুগান্তর ॐ

১৩৬৩

আলো আনো, আলো আনো, জীবনের রুদ্ধ বাতায়নে
মুক্তির নিঃশ্বাস আনো আমাদের পুরানো জগতে,
চাপাপড়া দিনগুলি বাজপড়া গাছের মতন
আগাগোড়া, জ্বলে গেছে, মরে আছে মড়ার মতন
সাড়া নেই শব্দ নেই!

কোথা কোন্ সুদূরে গগনে
উড়িছে ঈগল পাখী, বার্তা আনে সূর্যগ্রহ হ'তে
পালকে পালকে তার কিবা দীপ্তি আলোকের স্রোতে
ডানায় ডানায় তার না জানি কী সুদূরের ভাষা!
হে আমার বন্দী আশা, যদি কোন ঝঞ্ঝার লগনে
উড়াইয়া দেই তোমা ওই দূর ঈগলের মত
শূন্য হতে তুফানের বুক চিরি' আনিবে বহিয়া
নতুন সংগীত এক?

কি রাগিণী, কিবা ছন্দে তার
ছড়াইবে বহ্নিকণা, মধ্যাহ্নের সংগীত আবার?

যেখানে নিবেছে দীপ, মানুষের কাতর গোঙানি
শোনা যায় দূর হ'তে যেন এক চাপা আর্তনাদ
ঘোর বাদলের রাতে। এ পাথর, এই রাজধানী
বধির শ্রবণে তার শোনে নাকো মৃদু প্রতিবাদ,
সেই মৃত্যুক্ষণে মোরে নিয়ে যাও শহর-শ্মশানে।
হে সবিতা, সৌধচূড়া গুঁড়া করি দেখাও মানুষ,
কলিজাঝরা ইঁটখসা পাঁজরের দেখাও হৃদয়,
যে হৃদয় আজো আছে অন্ধকারে অজেয়, অক্ষয়!

হে ঈশ্বর, কোথা গেল তোমার সেই সৃষ্টির মহিমা
আনন্দ লোকের যাত্রী, অমৃতের সন্তানেরা কই?
আপন আত্মায় নাশি' স্বর্ণপিণ্ড কলুষের ভারে
তোমার সৃষ্টিরে আজ ব্যঙ্গ করে উদ্ধত মানুষ!
হাতে তার তরবারি মুখে তার শাস্ত্রের বচন
এই কি তোমার সৃষ্টি? নরকের দ্বার উদ্ঘাটন?

আলো আনো, আলো আনো জীবনের রুদ্ধ বাতায়নে
দুয়ার খুলিয়া দাও, দেখা দিক পৃথিবীর রূপ।
নীলাভ আকাশ আর নক্ষত্রের দূর নিমন্ত্রণ
আসুক আমার ঘরে, আসুক না নতুন নিঃশ্বাস।
হে সমুদ্র, কোথা তুমি? ডাক দাও তরঙ্গে তোমার
শহর ডিঙায়ে যদি এসো তুমি উত্তর সীমায়
যেখানে পর্বত আছে, আর আছে তরাই জঙ্গল
অজস্র ঝরণা পুষ্প মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের দল
সেখানে তোমার হাতে হাত দিব নয়া মিত্রতার,
নতুন স্বাক্ষর দিব, বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা আমার!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বয়স পর্যন্ত ছিল। এ বয়সে পঞ্চানন্দের পূজার পর মাথা মুড়িয়ে দাসত্ব হতে মুক্তি পেয়েছি। আমি মায়ের প্রথম পুত্র নই, এক পুত্র নই, আমার দুই দাদা এক দিদি ছিলেন। বেড়ী ধারণের অন্য কারণ ছিল। আমার এক অগ্রজের বাল্য-কালে মৃত্যু হয়েছিল। তারপর অনেক বৎসর পরে আমি হারাধন হয়ে এসেছি। এই কারণে আমার নাম 'হারাধন' হয়েছিল। কানে মাকড়ী, গলায় সোনার ডুমরো, হাতে বালা, কোমরে রূপোর পাটা ও নিমফল, পায়ে রূপোর দু' গাছা দু' গাছা—চারি গাছা মল ও লোহার বেড়ী, কদাচিৎ উপর ডান হাতে বাজু পরে হারাধন মায়ের আনন্দ বর্ধন করত।

পঞ্চম বর্ষ প্রবেশে হাতে খড়ি দেওয়া সনাতন বিধি। বাড়ীতে পাঠশালা ছিল মেজদাদা পড়তেন। আমিও এক পড়ুয়া হলাম। হাট হতে রামখড়ি আনা হয়েছে, পাঁচ-ছ আঙ্গুল লম্বা, দু-মুখ সরু। আমার মনে পড়ছে, আমি রঘুনাথ ও মাকে প্রণাম করে, নীলের কল্প দেওয়া নূতন কাপড় পরেছি। কাপড়খানা বড়, বাগাতে পারছি না। বাঁ আঠুরে কাপড় তুলে কোমরে গুঁজেছি, কোঁছা তার মধ্যে পুরে বাগিয়ে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে দাগা বুলুচ্ছি, পাঁচ আঙ্গুলে মুঠো করে খড়ি ধরেছি। গ্রামের সনাতন চক্রবর্তী তখন গুরু-মশয় ছিলেন, তিনি আমার হাতেখড়ি দিয়ে-ছিলেন। ক্রমে তালপাতায় ক, খ, কি অ অংক, আঙ্ক ইত্যাদি লিখতে পড়তে লাগলাম। সে তালপাতার কি পারিপাট্য! পাতা কেটে অল্প শুখিয়ে পুকুরের পাঁকে রাখা হত, দিন কয়েক পরে তুললে পাতার কষে ও পাঁকের লোহায় তালপাতা পাশুটে হত, কলমে লেখা স্পষ্ট হত, পাতায় তেল সরত না। কঞ্চির অভাব নাই, শর-গাছও প্রচুর, কলমও একগোছা। মুড়িভাজা খোলার পিঠের ভুষা চাল চৌআনি ও জলের ধারের লাউকেশুতের পাতার রসে মেড়ে কালী হত।* আমি করতে পারতাম না। যে পারত আমি তাকে সুস্থির হতে দিতাম না। পিতলের চারি কোণা দোয়াতে কালী ঢেলে এক টুকরা নেকড়া রাখা হ'ত, কলমে বেশী কালী উঠত না। দোয়াতের চারিকোণে ছিদ্র ছিল, সুতো পরিয়ে দোয়াত ঝুলাতে পারা যেত।

পূব-দুয়ারী প্রকাণ্ড দুর্গামেলা, সমুখে আটচালা। আটচালায় পাঠশালা। গ্রামের অনেক ছেলে পড়তে আসত। 'মশয়' কায়স্থ, নিকট-বর্তী গ্রামে বাস। তিনি দুবেলা আসতেন। মশয়ি কর্মে তাঁর সুনাম ছিল, ঠাকুরদাদা তাঁকে রেখেছিলেন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপের পরচালার নীচের মেলায় বসতেন। সেখানে তাঁর কাছারী হত। আমরা কি করছি তিনি দেখতে পেতেন। একদিন তিনি ছিলেন না, আমি কি করেছি, হয়ত দুষ্টামী, মশয় আমায় মেরেছিলেন। মার তেমন কিছু নয়, কিন্তু গায়ে হাত। আমি রেগে অনর্থ করেছিলাম। আমি আদুরে ছেলে, হারাধন। দুপুরবেলা আহারের সময় পিতা-মহের কর্ণগোচর হ'ল, তিনি কুপিত হলেন। হয়ত মশয়ও বুঝতে পেরেছিলেন, বিকালে এলেন না। পরদিন সকালে এলেন, পিতামহ তর্জন-গর্জন করে সে মশয়কে বিদায় দিলেন এবং গ্রামের মধুসূদন চক্রবর্তীকে নূতন মশয় করলেন। এ'র কাছে তালপাতায় লিখতে ও "শিশুবোধের দাতাকর্ণ", "গঙ্গার মহিমা", "চাণক্যশ্লোক" পড়তে থাকি। পরে কলাপাতা ও দেশী সাদা কাগজে মকষ করতে থাকি। এই সময় মশয় হাতে লেখা "অমরকোষ" পুঁথি মুখস্থ করাতেন তখন বুঝতাম না, অমরকোষ কি, নামই বা কি।

আমার সাত বৎসর বয়সের সময় পিতামহ স্বর্গগত হন। বোধহয় কার্তিক মাসে। সে বৎসর (সন ১২৭৩, ইং ১৮৬৬ সাল) আকাল। এমন আকাল আমি আর দেখি নাই। উপরি উপরি দু'বছর অজন্মা। ওড়িষ্যা, মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানের কিয়দংশে যে কত লোক খেতে না পেয়ে মরেছিল, তার সংখ্যা নাই। ধান-চাল ছিল না। লোকে সোনা রূপোর গহনা দিয়ে চাল পেত না। পরে ওড়িষ্যাতে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কিন্তু বাজারে চাল টাকায় বার সের। ইং ১৯২২ সালে কাগজে দেখতাম বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ, কিন্তু বাজারে চাল টাকায় ন' সের। এসব দুর্ভিক্ষ নয় দুরর্থ। ইং ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ, দুরন্ন। ওড়িষ্যাতে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। পিতামহের শ্রাদ্ধের দশ-পনর দিন পূর্ব হতে আমাদের বাড়ীর চারিদিক কাঙ্গালীতে ছেয়ে ফেলেছিল। ঘাটকুলে এঁটো-পাতা নিয়ে কুকুরে-কাঙ্গালীতে কাড়াকাড়ি করত। আহা কঙ্কালীই বটে, অস্থিচর্ম-দেহ, চলতে পারত না, নড়তে পারত না। যেখানে শুয়েছে, সেখানেই আছে। পিতামহের শ্রাদ্ধে সমারোহ হয়েছিল। বাড়ীর চারিদিকে রশা পুঁতে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয়েছিল। বৃষোৎসর্গ ব্যাপার। নানা স্থান হতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। চারি পাশের গ্রামের ব্রাহ্মণ একত্র হয়েছিলেন। আমাদের অঞ্চলে লুচির ফলার এই প্রথম। আকালে ভদ্র-ইতর সকলেরই হাহাকার। তার উপর লুচির গন্ধ। বেড়ার পশ্চিমের ও দক্ষিণের দুয়ারে লাল-পাগড়ী পুলিশ দাঁড়িয়ে রবাহূতকে নিবারণ করেছিল। আমাদের পূব দিকের গাঁয়ের কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ছাঁদাতে তুষ্ট না হয়ে গোপনে গোপনে ঝাঁকা ঝাঁকা লুচি উঁচু বেড়া পার করিয়ে দিতে লাগলেন কাঙ্গালীর কাড়াকাড়ি। ছোঁয়া গেল, তথাপি ব্রাহ্মণেরা বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা (ঘটকবংশ) অদ্যাবধি ঠেকো হয়ে আছেন। ভীষণ অন্নকষ্টে জাতিকুল থাকে না।

আমার বয়স নয় বৎসর, পাঠশালার পড়া সাঙ্গ হয়েছে। পিতা পূজার ছুটিতে বাড়ী এলেন এবং ছুটির অন্তে আমায় বাঁকুড়া নিয়ে গেলেন। তখন বাঁকুড়ার নাম "বাকুণ্ডা" ছিল। সেখানে তখন তিনি সদর-আলা (এখনকার সবজজ) ছিলেন। যাবার আগে হ'তে আমায় লোভ দেখানো হচ্ছিল। মাকে ছেড়ে থাকতে হবে, বুঝেছিলাম কিনা সন্দেহ। তখনকার দিনে কালেকটর সাহেবকে লিখলে তিনি পাল্কীর ডাক বসিয়ে দিতেন, চারি-পাঁচ ক্রোশ দূরে দূরে বেহারা বসে থাকত। আমাদের গ্রাম হ'তে বাঁকুড়া প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিম-উত্তরে। দু'বছর আগে হ'তে মেজদাদা বাঁকুড়া যাতায়াত করতেন। তিনি এক শওয়ারীতে (পাল্কী), বাবা ও আমি আর এক শওয়ারীতে গেছলাম। ... যাতায়াত ছিল না। বন-বিষ্ণুপুরের বনের ... দিয়ে পথ। ত্রিশ ক্রোশ যেতে ডাকেও দেড় ... লাগত।

বাঁকুড়ার বাসাটি তিন মহল, এক পশ্চি... লালার বাড়ী (এখন উকীল রাসবিহারী বাঁড়ুজ্জের)। পূবমুখে ঢুকতে হ'ত, ডাইনে পূবদুয়ারী এক-তলা বৈঠকখানা, সামনে উঠান। উঠানের বাঁ দিকে পাকা কুআ, চাকররা বলত ইঁদারা। ডানদিকে একখানা ভাল খড়ো ঘর। উঠানের পর লম্বা খড়ো ঘর। এখানে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, একঘরে চাকররা থাকত। তারপর দ্বিতীয় মহল, একটু উঠান, সামনে পশ্চি... দুয়ারী একতলা শোবার ঘর, বাঁ দিকে ... একখানা ভাল খড়ো ঘর। এই মহলের পেছনে ... বেলফুল আর কি কি ফুলগাছ, কলাগাছ ছিল।

দিন চারি আমার সবই নূতন। কুআ, নূতন দেখছি, জল ফুরিয়ে যায় না। কুআর পাশে খানিকটা জায়গায় কপি শাগের ক্ষেত। কপি নূতন। গাছগুলি দেখতে বেশ। সকাল বেলা পাতায় শিশির জমে। দিনকয়েক ভয়ে ভয়ে কাটল। তারপর আমার জন্মগত স্বভাব বেরিয়ে পড়ল। আমি না-কি ভারি দুরন্ত ছিলাম, কিছু বাধা পেলেই রেগে উঠতাম, বাড়ীর লোক বলত, ঘাড়ে পঞ্চানন্দ চেপেছেন। মাথায় জল দিয়ে আমাকে ঠান্ডা করতে হ'ত। খাবার সময় হলেই যত আখাটি এসে জুটত 'খাব না' বলত ... কেউ খাওয়াতে পারত না। সে সময় মারা ... বিপরীত ফল হ'ত। মায়ের পেটের উদ্বেগ ... অবধারিত হ'ত। বিকাল হয়ে যেত আমার খাওয়া নাই, মায়েরও নাই। বাড়ীতে ভাত খেয়ে দুপুর হ'তে ৯।১০টার সময় পাঠশালার ছুটি পেতাম, সে সময় আমার এক বাটি দুধ খেতে হ'ত। আমি বাইরে পালিয়ে আসতাম, মা আসতে পারতেন না, পিসীকে দুধের বাটি নিয়ে আমার পেছু পেছু ঘুরতে হ'ত। আমাদের বাড়ীতে ছেলেকে দুধ খাওয়ান এক বিষম ব্যাপার ছি... তিন বছর বয়স পর্যন্ত ছেলের সঙ্গে মাকে যু... করতে হ'ত, ছেলের মাথা, হাত, পা বাঁধে ধরে গাদলে করে দুধ গেলানো হ'ত, ছেলে দম আটকে যাবার মত হ'ত।*

বাঁকুড়ায় আসবার সময় হয়তো বাবাকে ছেলের গুণ বলে' দিয়েছিলেন। কিন্তু ব... নিজে কি হবে, আমি এক খানসামার (জাত ... নাপিত) হাতে পড়লাম। অমুক সময়ে ... খাওয়াতে হবে, সে এই জানত, ভুলাতে পারত না। বার বার বললে আমার রাগ চড়ে যেত, তখন সামনে যাকে পেতাম, তাকেই কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে নিজের হাতে ব্যথা করতাম। ছুটির দিনে ১০টার সময় বাবা কাছে ... খাওয়াতেন। কিন্তু বসালে কি হবে, কি ... চাই তিনি জানতেন না। আমাদের বাসায় ... লাল রায় নামে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। আ...

(ইহার পর ২২৫ পৃষ্ঠায়)

---

* এটি মসী, চাল-চৌআনি—চাল-চোয়া-পানি। এতে আঠা আছে। লাউ গাছ তুল্য সবুজ, লাউ কেশুতি। কেশুতি সংস্কৃত কেশরাজ। এর রসে কালী ঘন হয়। মসী ব্যতীত লোহা খয়ের ও তিয়ারী ফলের কষে পুঁথি লেখার কালী হ'ত।

* আমার ছেলেমেয়ে হ'লে আমি খাওয়ানার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলাম, আট মাস পর তারা গেলাসে নিজের ইচ্ছামত দুধ খে... কথা ফুটবার পর নিজেরা চেয়ে খেত। সকাল ৭টা ও দুপুরে ২টার সময় দুধ খেত। ... নিজের নিজের গেলাস নিয়ে উনানশালায় ... কড়ার কাছে গিয়ে বসত।

আনন্দীবাঈ

পরশুরাম

এটা খান ওটা খান বলে অনুরোধ করছে

এখন এর উপায় কি?

—দেখুন শেঠজী, আপনি মান্যগণ্য আমীর আদমী, আপনাকে মুশকিলে ফেলতে আমরা চাই না। একমাস সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন।

—কত টাকা লাগবে?

—আপনি একটি জরুকে বহাল রেখে আর দুটিকে ঝটপট খারিজ করুন। তার জন্যে কত খেসারত দিতে হবে তা তো আমি বলতে পারি না, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। আর এদিকে কত টাকা লাগবে সে তো আপনার আর আমার মধ্যে, তার কথা পরে হবে।

মাথা চাপড়ে ত্রিক্রমদাস বললেন, হো রামজী, হো পরমাত্মা, বাঁচাও আমাকে। একটিকে সনাতনী মতে বিবাহ করেছি, আর একটিকে আর্যসমাজী মতে, আর একটির সঙ্গে সিভিল ম্যারিজ হয়েছে। খারিজ করব কি করে?

—ঘবড়াবেন না শেঠজী, আপনার টাকার কমি কি? দু-চার লাখ খরচ করলে সব মিটে যাবে। দুটি স্ত্রীকে মোটা খেসারত দিয়ে কবুল করিয়ে নিন যে তারা আপনার অসলী জরু নয়, শুধু মুহব্বতী পিয়ারী। তারপর আমরা ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেব। দেরি করবেন না, এখনই কোনও ভাল উকিল লাগান। আচ্ছা, আজ আমি উঠি, হপ্তা বাদ আবার দেখা করব। আদাব।

ত্রিক্রমদাসের বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। তাঁর বৈবাহিক ইতিহাস অতি বিচিত্র। এক বৎসর আগে তাঁর একমাত্র পত্নী কয়েকটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান। তার কয়েক মাস পরে তিনি আনন্দীবাঈকে বিবাহ করেন।

মিস্ বলাকা, মৈ তুমকো শাদি করুংগা

তারপর সম্প্রতি তিনি আরও দুটি বিবাহ করেছেন কিন্তু তার খবর আত্মীয়-বন্ধুদের জানান নি। এখনকার পত্নীদের প্রথমা আনন্দীবাঈ হচ্ছেন খজৌলি স্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান হরজীবনলালের একমাত্র সন্তান, বহু ধনের অধিকারিণী। হরজীবন মারা গেলে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই অভিভাবক হয়ে ভাইঝীকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মেয়ের মামাদের সাহায্যে ত্রিক্রমদাস আনন্দীকে বিবাহ করে তাঁর সম্পত্তি নিজের দখলে আনলেন। আনন্দীবাঈ-এর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, দেখতে ভাল নয়, একটু কুলভাটে, উচ্চবংশের অহংকারও আছে।

ত্রিক্রমদাসের কারবার কেন্দ্র আর হেড অফিস দিল্লিতে, তা ছাড়া বোম্বাই আর কলকাতায় তাঁর যে ব্রাঞ্চ অফিস আছে তাও ছোট নয়। তিনি বৎসরে তিন-চার বার ওই দুই শাখা পরিদর্শন করেন। আনন্দীর সঙ্গে বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি বোম্বাই যান। সেখানকার ম্যানেজার কিষনরাম খেত্রানী একদিন তাঁর মনিবকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি সিন্ধের লোক, দেশ ভাগের পর দিল্লি চলে আসেন, তারপর শেঠজীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে বোম্বাইএ বাস করছেন। কিষনরাম শৌখিন লোক, তাঁর ফ্ল্যাট বেশ সাজানো। তিনি তাঁর স্ত্রী আর শালীর সঙ্গে নিজের মনিবের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শেঠজী সেকেলে লোক, আধুনিক মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মেশবার সুযোগ এপর্যন্ত হয়নি। কিষনরামের শালী রাজহংসী ভলকানীকে দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কি ফরসা রং, কি সুন্দর সাজ! পরনে ফিকে নীল সালোয়ার আর ঘোর নীল কামিজ, তার উপর চুমকি বসানো ফিকে সবুজ দোপাট্টা ঝলমল করছে। কথাবার্তা অতি মধুর, কোনও লজ্জা নেই, হেসে হেসে এটা খান ওটা খান বলে অনুরোধ করছে।

খাওয়া শেষ হল। কিষনরামকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শেঠজী রাজহংসী ভলকানীর সব খবর জেনে নিলেন। মেয়েটির বাপ মা নেই। একমাত্র ভাই সিংগাপুরে ভাল রোজগার করে, কিন্তু বোনের কোন খবর নেয় না, অগত্যা কিষনরাম তাঁর শালীকে নিজের কাছে রেখেছেন। সে ভাল অভিনয় করতে পারে, গাইতে পারে, সিনেমায় নামবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিষনরাম ও তাঁর স্ত্রীর মত নেই।

শেঠজী তখনই মতি স্থির করে বললেন, আমার সঙ্গে রাজহংসীর বিবাহ দাও, ওকে আমি খুব সুখে রাখব। এই বোম্বাই শহরেই আমার জন্যে জলদি একটা বাড়ি কিনে ফেল, রাজহংসী সেখানে থাকবে, আমিও বৎসরের বেশীর ভাগ বোম্বাইএ বাস করব। এখানকার কারবার বাড়াতে চাই।

আনন্দীবাঈএর কথা শেঠজী চেপে গেলেন। কিষনরাম জানতেন যে তাঁর মালিক বিপত্নীক, সুতরাং তিনি খুশী হয়ে সম্মতি দিলেন। রাজহংসীও রাজী হলেন, শেঠজীর বেশী বয়সের জন্যে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করলেন না। আর্যসমাজী পদ্ধতিতে বিবাহ হয়ে গেল। তারপর নূতন বাড়িও কেনা হল, রাজহংসী সেখানে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে ত্রিক্রমদাস তাঁর কলকাতার কারবার পরিদর্শন করতে গেলেন। ওখানকার ম্যানেজার পরিতোষ ঘোড়-চৌধুরী খুব কাজের লোক, আলিপুরে সাহেবী স্টাইলে থাকেন। তিনি তাঁর মনিবকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পরিতোষের স্ত্রী আর ভগিনীর সঙ্গে ত্রিক্রমদাসের পরিচয় হল। মিস বলাকা ঘোড়-চৌধুরীকে দেখে শেঠজী অবাক হয়ে গেলেন। রাজহংসীর মতন রূপসী নয় বটে, কিন্তু শাড়ি পরবার ভঙ্গীটি কি চমৎকার, আর চাল-চলন আদব কায়দাও কি সুন্দর! মেম সাহেবদের মতন ইংরেজী উচ্চারণ করে, আর হিন্দী বলতে ভুল করে বটে কিন্তু সেই ভুল কি মিঠে! শেঠজী একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। পরিতোষ ঘোড়-চৌধুরী তাঁকে জানালেন, বলাকা এম-এ পাস, নাচ-গানে কলকাতায় ওর জুড়ী নেই, সিনেমাওয়ালারা ওকে পাবার জন্যে সাধাসাধি করছে, কিন্তু পরিতোষের তাতে মত নেই। ত্রিক্রমদাস নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলে ফেললেন, মিস বলাকা, মৈ তুমকো শাদি করুংগা।

বলাকা সহাস্যে উত্তর দিলেন, তা বেশ তো, কিন্তু দিল্লির গরম তো আমার সইবে না, আর আপনাদের ডাল-রোটি ভাজী দহিবড়া আমার হজম হবে না।

শেঠজী বললেন, আরে দিল্লি যেতে তোমাকে কে বলছে, এই আলিপুরে

একটি কথা

সজনীকান্ত দাস

একটি কথা মনই শুধু জানে,
যে-কথাটির পাই না খুঁজে মানে।
বলেছিলে বাঁকিয়ে গ্রীবা
শুনেছি আমি রাত্রি দিবা,
জড়িয়ে আছে প্রাণের কানে কানে।
কেউ জানে না, মনই আমার জানে।

কল্পনাটাই ছিল ভুবন-জোড়া,
ছুটত যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া।
বাণী ছিলেন কলস্বরা
সব সংশয়-শঙ্কাহরা
সুরের পাখায় দূরের নভে ওড়া।
মনের স্বপন ছিল ভুবন জোড়া।

চলতে গেলেই পথের বাঁকে বাঁকে
দেখতে পেতাম হাতছানিতে ডাকে
ব্যাকুল হয়ে এই ধরণী,
মিলিয়ে যেত সুর-সরণি;
অলস বেলা, বধূ কলস কাঁখে
ডাকত আমায় পথের বাঁকে বাঁকে।

চলার পথেই তোমার সনে দেখা,
তুমি দলের মাঝে, আমি একা।
নিকষ-কালো রাত্রি এল
রইল বাতাস এলোমেলো,
মিলিয়ে গেল জোনাকিদের রেখা
শ্রাবণ-সাঁঝে তোমার সনে দেখা।

প্রয়োজনেই ঘটল পরিচয়,
একটি দুটি কথার বিনিময়।
এগিয়ে যেতে সাহস ভরে
তোমার কঠিন কণ্ঠস্বরে
অবহেলা হানল যে আমায়।
ঘটল তবু বিরূপ পরিচয়।

দূরের পথিক ঘরের আঙিনাতে
থামল—তোমার সায় ছিল না তাতে।
ব'সে বিমুখ গৃহীর দাওয়ায়
উদাস বাউল গান গেয়ে যায়
কখন সে গান বেঁধে তাহার আঁতে,
এক হয়ে যায় ঘর ও আঙিনাতে।

শ্রাবণ নিশি শরতে হয় ভোর,
আলোয় আলোয় ভরে ভুবন মোর।
যায় যে ভ'রে ফুলের সাজি
কার মালা কে গাঁথে আজি,
বিরাগই হয় অনুরাগের ডোর।
আঁধার রাতি আলোতে হয় ভোর।

দেখতে দেখতে বদলে গেল সব,
জয়ী আমি, তোমার পরাভব।
তোমার তরী আমার তীরে,
আমার কাব্য তোমায় ঘিরে
লোক জানিয়ে তুললে কলরব।
অবাক সবাই, বদলে গেল সব।

বেদনভরা শ্রাবণ রাতের গান,
ফাগুনে তাই আনল ফাগের বান।
শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ায়
মনের আগুন ফুল হয়ে যায়,
তুমি-আমির হয় যে অবসান।
মিলন-মধুর বিধুর ভাদর-গান।

থামার গান নদীর থির নীরে।
ঝিরিঝিরি হাওয়া ঝাউয়ের শিরে।
শুনি তাহার কলভাষা,
বলে, এবার বাঁধ বাসা।
যাত্রী, এবার ভিড়াও তরী তীরে।
স্নান ক'রে নাও ভালবাসার নীরে।

নদীর জলে আধেক বাঁকা চাঁদ,
কতক্ষণের পাততে পারে ফাঁদ?
আঁধার আবার এল ঘিরে
ডুব দিল মন কোন্ গভীরে,
আঁকল পটে কত নতুন ছাঁদ।
হারিয়ে গেল আধেক বাঁকা চাঁদ।

হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেলাম আমি।
কেন, শুধু জানেন অন্তর্যামী।
নিয়ে অভিমানের বালাই
প্রস্তাবনায় ভাঙল পালাই
ডুয়েট গান হঠাৎ গেল থামি।
হারিয়ে গেলে, হারিয়ে গেলাম আমি।
আবার দেখা বহু লোকের মাঝে,
আলোক-উজল উৎসবের সাঁঝে।
চেয়েছিলাম—পাইনি একা
দেখা পেয়েও হয়নি দেখা,
মিলিয়ে গেলে চকিত-চপলা যে,
বাঁকিয়ে গ্রীবা বহু লোকের মাঝে।
বলেছিলে একটি কথাই বুঝি,
অর্থ তাহার আজো পাই না খুঁজি।
সে দিন হতে কেবল শুনি
একটি কথার গুনগুনানি,
দেউলে মনের সেইটুকু তো পুঁজি।
মানে তাহার বুঝি বা নাই বুঝি।

কুমীর বিদায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

গামাল, তু নে কামাল কিয়া, ভাই।
আফ্রিকার পায়ের বেড়ী নাই।

খাল কেটে যে কুমীর হলো ডাকা
ভেবেছিল খালটা ওদের পাকা।
ঘুরিয়ে দিলি ইতিহাসের চাকা
কুমীরগুলোর গুমোর হলো ফাঁকা।
এবার ওরা মারবে বুঝি ঘাই
গামাল, তু নে কামাল কিয়া, ভাই।

আফ্রিকার ভেঙেছে আজ ভয়
পায়ের বাঁধন হয়েছে তার ক্ষয়।
যাই ঘটুক—জয় বা পরাজয়—
সে হীনতা আর নয়, আর নয়।
কালো ধলো সমান হওয়া চাই
গামাল, তু নে কামাল কিয়া, ভাই।

তাদেরও দেখেছি
হাত পা এলিয়ে পোলের কানায় শোওয়া,
রাতের কচিৎ ছুটে চলে যাওয়া
গাড়ির চাকার ধ্বনি
বৃথাই যাদের মড়ার মতন বেহুঁশ
ঘুম কাঁপায়।

নিচে কালো নদী সুদূর পাড়ের
সোনালী আলোয় কষা
দাগগুলো ভাঙে ছলছল স্রোতে
আছড়ে পাথুরে থামে।
ওপরে সাহসী দু একটি তারা
উঁকি দেয় নগরের
রুগ্ন ধোঁয়াটে ঘন নিশ্বাস
ক্লান্ত হাওয়ায় নেড়ে।

কি রূপক মন টানতেও পারে
তেশুনো এই অঘোর নিদ্রা থেকে!
কি গভীর কথা আদি ও অন্ত-ছোঁয়া!
তবু কেন শুধু গোপন ক্ষতের
না-বোঝা জ্বালায় জ্বলি?
কার কাছে চাই কড়া ও ক্রান্তি
হিসাব ক্ষমাবিহীন,
—জীবন না কি সে শুধুই নগরপাল?

স্মৃতি কথা

শ্রীকালিদাস রায়

সেকালের অধ্যাপক

১৯২০ সাল। আমি তখন ভবানীপুরের একটা মেসে থাকি। পুজোর ছুটিতে বাঁকুড়া গেলাম। সেখানে তখন আমার শ্বশুর চাকরি সূত্রে থাকতেন। একদিন প্রাতঃকালে একজন লোক ৮ হাতী তেঁতো ধুতি (বোধ হয় খদ্দর) পরনে, দেশী মুচির তৈরি জুতো পায়ে, একটা জাঙিগয়া গায়ে তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে এসে হাজির। খবরের কাগজ পড়-ছিলাম—একবার চোখ তুলে দেখে একজন গেঁয়ো গরিব লোক কোন প্রয়োজনে এসেছে ভেবে আর তাকালাম না। শ্বশুরমশায় পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে নমস্কার করে বললেন—"এই যে বিদ্যানিধি মশায়—আসুন—আসুন, কি খবর?"

আমাকে বল্লেন—"ইনি কে জান? ইনি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।" বিদ্যানিধি বল্লেন—"সত্যকিংকরের (পরে রায় বাহাদুর সত্যকিংকর সাহানা, সাহিত্যিক) মুখে শুনলাম—আপনার জামাই কবি কালিদাস এসেছেন,—তাই দেখা করতে এলাম।"

আমি ত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলাম। তিনি যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। "আরে থাক থাক"—বলে দু' পা পিছিয়ে গেলেন।

শ্বশুরমশায় বল্লেন—"আপনি কেন কষ্ট করে এলেন? ব'লে পাঠালে কালিদাসই যেত। কালিদাসত আপনার ছেলের মতন।"

বিদ্যানিধি—"বিলক্ষণ! শহরে মান্য অতিথি এলে আমার দেখা না করা ভালো দেখায়? আর কষ্ট? এইটুকু বেড়াতে বেড়াতে আসাকে বাঙ্গালীবাবুরা কষ্ট মনে করে বলেইত তাদের এত দুর্দশা।'

'অমানিনে মানদ' যোগেশচন্দ্র কত বড় মানুষ ছিলেন—তাই বুঝাবার জনাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

তারপর প্রতিদিন বৈকালে যেতাম—তাঁর বাড়ী। বাড়ীর সামনের ফুল-সব্জির বাগানটিতে তিনি বসতেন। শিক্ষার্থী আমি ২ ঘণ্টা ২॥ ঘণ্টা কাটিয়ে আসতাম। প্রত্যহই বলতাম—আপনার বহু মূল্য সময় নষ্ট করছি না—ত?

তিনি বলতেন—"আমার সময় সব ঘড়ি ধরে বাঁধা। সময় অতীত হলে আমিই নিজেই ছুটি চাব। এ বিষয়ে আমার চক্ষুলজ্জা নেই। এই ত আমার কথাবার্তা বলবার সময়—কাউকে না পেলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। এ-ওত কাজেরই অঙ্গ।"

দুইজন দিগ্‌গজ পণ্ডিতের চরণতলে বস্‌বার সুযোগ হয়েছিল এর আগে। একজন মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন। তিনিই আমাকে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের মারফত 'কবিশেখর' উপাধি দিয়েছিলেন। আর একজন রেভাঃ ই এম হুইলার যাঁর চরণতলে ৪ বছর ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষালাভ করেছিলাম। একজন প্রাচ্য বিদ্যায় পারংগত, আর একজন পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারংগত।

বিদ্যানিধির চরণতলে এসে তাঁর মধ্যে এমন একজন পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেলাম—যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যার সকল বহু শাখায় মহাপ্রাজ্ঞ। মহানদের জলরাশি অগাধ অপরিমেয়, কিন্তু কলসী তার যতটুকু ধারণ শক্তি ততটুকুই পায়। কাজেই তাঁর কাছে প্রায় মাসখানেক ধরে বসেও আমি তাঁর পরিচয় কতটুকু পেতে পারি! কেবল বিস্ময় বিস্ফারিত চিত্ত নিয়ে গৃহে ফিরতাম। মনে হ'ত "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"—এই বাক্যটি।

ডাঃ সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত বলতেন—"প্রোফেসার তাঁকেই বলে যিনি বই না দেখে তাঁর নিজের বিষয়ের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।" যোগেশচন্দ্র দেখেছিলাম এমনি একজন জ্ঞান-গুরু, যিনি যে কোন বিষয়ের প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারতেন। 'বিদ্যার জাহাজ' কথাটা তাঁর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হতে পারত।

তাঁর জীবন ছিল Mathematical Accuracy-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—ঘড়ির কাঁটার মত তাঁর দৈনন্দিন রুটিন চলত। এমন স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ মানুষ আর আমি দেখিনি—বেশ-ভূষায়, চালচলনে, আহারে বিহারে, সব রকম লেখায় ও রচনা রীতিতে, বাগ্‌বিন্যাসে জীবন-যাত্রার কোন অংশে তিনি গতানুগতিক ছিলেন না—সর্বত্রই আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে চলতেন। পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা ছিল তাঁর জীবনের মূলসূত্র। জীবনে তিনি ছিলেন মিতাহারী, মিতাচারী, মিতভাষী। তাঁর প্রত্যেকটি মনোবৃত্তি ছিল শাসন সংযত।

তিনি অনেক কিছু জানতেন—সেই সঙ্গে কেমন করে শতায়ু লাভ করতে হয়—তাও তিনি জানতেন। দীর্ঘ জীবন লাভ তাঁর কঠোর তপস্যার ফল। জীবনের এই প্রায় শতবর্ষে একটি মুহূর্তও তিনি অপচয় করেননি। তিনি শুধু বয়সে সবার বড় ছিলেন না—জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে, আত্মসংযমে, নৈতিক বলে, সাহসে, বিক্রমে, উদ্ভাবনী শক্তিতেও সকলের বড় ছিলেন। সেকালের এই আদর্শ জ্ঞানগুরুর আশীর্বাদ আমার জীবনপথের পাথেয় হয়ে আছে।

এইবার আমার সাহিত্যগুরু ই এম হুইলারের কথা বলি। ইনি আমার কলেজের (বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের) অধ্যক্ষ ছিলেন। এঁর কাছেই আমার সাহিত্য রচনার, বিশেষ করে সাহিত্য রসবোধের দীক্ষা। ইনি ল্যাটিনে প্রথম শ্রেণীর এম এ ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার ছিলেন। শুনেছি তিনি আট হাজার টাকা বৃত্তি পেয়ে সে টাকা এক বন্ধুকে দান করেন—ইউরোপে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

তাঁর অধ্যাপনা ছিল বঙ্গবিশ্রুত। তাঁর এক একটি লেকচার ছিল এক একটি Creation. ক্লাসের সমস্ত ছেলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কর্ণপুটে তাঁর রচনামৃত পান করত। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েও প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা ৪ শ্রেণীতে পড়াতেন। অনার্স ক্লাস নিতেন ৪টার পর। এ যুগে এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। অধ্যাপনায় কি আনন্দই পেতেন তিনি! অধ্যাপনাকালে তাঁর চোখ-মুখ দিয়ে দিব্যানন্দের দ্যুতি যেন নির্গত হত। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান—ইত্যাদি বিবিধ বিষয় তিনি পড়াতে পারতেন। তিনি কখনও চেয়ারে বসে পড়াতেন না। প্রত্যেক ছেলেকে তিনি নাম ধরে ডাকতেন। প্রত্যেক ছেলের শুভাশুভের দিকে নজর রাখতেন।

এইত গেল অধ্যাপনার কথা। কলেজেই তাঁর কর্তব্য শেষ হতো না। প্রত্যহ বৈকালে খেলার মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। সন্ধ্যার পর হোস্টেলের ছেলেদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন।—কোন ছেলের অসুখ হলে হেয়ার সাহেবের মত তার রোগশয্যায় সেবা করতেন, নিরুদ্যমকে উৎসাহিত করতেন, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি ছিলেন বিপন্ন ছাত্রের পরিত্রাতা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরকারী জুলুম ও পুলিশ উপদ্রব থেকে ছেলেদের রক্ষা করতেন নিজের পক্ষপুটে রেখে। উৎসবের দিনে ছেলেদের সঙ্গে বালকের মত উৎসবে মাততেন। ছাত্রদের দুঃখে শোকে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ত।

আমি কবিতা লিখি জানতে পেরে আমাকে উৎসাহিত করতেন এবং ইংরাজি কবিতা বেছে দিতেন অনুবাদ করার জন্য। আমি Versifier ছিলাম, তাঁর শিক্ষাগুণে নিজে লিখতে পারি না পারি, কাকে আসল কবিতা বলে তা জানতে পেরেছিলাম।

তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও প্রেসিডেন্সীর পার্সিভাল সাহেবের পাঠনার খুব সুখ্যাতি করতেন। বি এ পাশ করে কলকাতায় এসে ললিতবাবুর পাঠনা শুনতে যেতাম।

ললিতবাবুর অধ্যাপনা শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ললিতবাবু ছিলেন ইংরাজি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যে সমান নিষ্ণাত। বাংলা সাহিত্যে সেকালে তিনি একজন রথীর মর্যাদাই পেয়েছিলেন।

ইংরাজি সাহিত্য পাঠনার সময় তিনি ইংরাজি কাব্য সাহিত্য, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে অনর্গল Parallel Passage তুলতেন এবং সেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করতেন।

ইংরাজি সাহিত্যে মহাপ্রাজ্ঞ এই অধ্যাপকের বেশভূষা ছিল সংস্কৃত পণ্ডিতের মতো আর

(ইহার পর ২২৯ পৃষ্ঠায়)

ভুল পথে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নাঃ, গল্প তোমরা আমাকে লিখতে দিলে না।

গল্প তো লিখলাম অনেক। কিন্তু যাদের নিয়ে গল্প লিখলাম, যাদের সুখে হাসলাম, যাদের দুঃখে কাঁদলাম, তারাই দিলে আমার সব কিছু গোলমাল করে।

বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তারপর বড় হয়ে গিয়েছিলাম সাঁওতাল পরগণায়। সাঁওতালদের তিন বছর উপকার করলাম। ওদের অনেককেই দেখেছিলাম। কল্পনার রঙে ছবি এঁকেছিলাম। তোমরা সকলেই তারিফ করেছিলে। বলেছিলে, বাঃ, চমৎকার। এ পর্যন্ত কেউ যা করেনি তুমি তাই করলে। আমারও আনন্দের সীমা ছিল না। ভেবেছিলাম, কথাশিল্পী হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করা বুঝি হয়েছে।

তারপর যতই দিন যেতে লাগলো, সাঁওতাল-দের সঙ্গে আমার পরিচয় ততই ঘনিষ্ঠ, ততই নিবিড় হয়ে উঠলো।

হঠাৎ একদিন মনে হলো একবার যাচাই করে দেখি।

মুংরো মাঝিকে একদিন ডেকে আনলাম আমার বাড়ীতে। তাদেরই একটি গল্প তাকে আমি পড়ে শোনালাম।

গল্প শুনে মুংরো তো হেসেই খুন!

বলে, তোর সব মিছে কথা বাবু।

বলি, সে কি রে! এই যে এত কষ্ট করে থাকিস তোরা, তোদের কষ্ট হয় না?

হাসতে হাসতে সে আমার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, যাঃ!

তার কাছে এ যেন নেহাত উপহাসের বস্তু।

শেষে বুঝলাম—সত্যিই তাই।

তাদের চরমতম দুঃখ বলে যা ধরে নিয়েছি, যে-সব দুঃখের বর্ণনা করতে গিয়ে কলম আমার থামতে চায়নি, দেখলাম, সেটা তাদের দুঃখই নয়।

লজ্জায় মরে গেলাম।

সেদিন থেকে সাঁওতালদের গল্প লেখা

ভাবলাম এবার থেকে যা কিছু লিখবো, ভাল করে' জেনে-শুনে লিখবো। এই রকম ভাবে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলে সে আমাকে নির্ঘাৎ খানা-ডোবায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

ধরলাম আমাদের গ্রাম। ধরলাম গ্রামের লোকজনদের। ধরলাম আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের—যাদের সম্বন্ধে আমার ভুলচুক হবার সম্ভাবনা একরকম নেই বললেই হয়।

ভাবলাম এবার আর কারও কিছু বলবার থাকবে না।

কিন্তু এবারেও দেখি—বিপদ বাধলো।

গল্প লিখলাম—কেদার আর তার স্ত্রীকে নিয়ে। লিখলাম কেদারের একটি ছেলে হয়েছিল বুড়ো বয়সে। ছেলেকে নিয়ে সে কি আদর, সে কী যত্ন! একদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করে না—দিনরাত ছেলেকে তারা চোখে চোখে রাখে। মুখে তাদের ছেলের কথা ছাড়া আর কথা নেই। ছেলে আর ছেলে!

এতদিন তারা বাড়ী-ঘরদোর কিছু করেনি। পৈতৃক একটা মেটে বাড়ীতেই বাস করছিল। আর—কার জন্যেই বা করবে? বলতো—কি হবে বাড়ী করে? কে ভোগ করবে?

ছেলে হবার পর সেকথা আর বলা চললো না। বাড়ী তাকে করতে হলো।

আমাদের গ্রামের পাশেই ছোট্ট একটি শহর। কেদার সেই শহরে গিয়ে বড় একটি রাস্তার পাশে চমৎকার একখানি বাড়ী তৈরি করলে। সামনে রেলিং-দেওয়া দোতলা বাড়ী। ছেলে তখন বছর-পাঁচেকের।

ছেলেকে নিয়ে মা এ-ঘরে যায়, ও-ঘরে যায়। বলে, এই ঘরে থাকবে আমার খোকার বৌ, আর এই ঘরে থাকবো আমি।

খোকা তার কচি মুখে মুক্তোর মত দাঁত-গুলি বের করে হাসে।

স্বামী-স্ত্রীর আনন্দ তখন যেন আর ধরে না।

স্ত্রী বলে, এই জন্যেই ছেলে চেয়েছিলাম। বুঝলে?

কেদার বলে, তা সত্যি। ছেলে না থাকলে বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই।

তার পর?

তারপর সে এক ঘনঘোর দুর্যোগের দিন। আগের রাত্রি থেকে ঝম ঝম করে' বৃষ্টি নেমেছে। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি একটু থেমেছিল। ভিজে কাপড়গুলো কাল থেকে শুকোয়নি। কেদারের স্ত্রী তার আধ-শুকনো শাড়ীটা রাস্তার দিকের রেলিংএর ওপর মেলে দিলে।

ও মা, আবার মেঘ ডাকছে। আবার হয়ত' বৃষ্টি নামবে। কাপড়টা আবার যাবে ভিজে।

সেলাইএর কলটা নিয়ে বসেছিল খোকার মা। ডাকলে। খোকা! —যা তো বাবা কাপড়টা চট করে' তুলে আন ওখান থেকে।

খোকা তখন ঘরের মেঝের ওপর মোটর চালাচ্ছে। টিনের মোটরকার। দম দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। মোটর ছুটছে। খোকাও ছুটছে। তার সময় কোথায়? বললে, আমি পারবো না। তুমি যাও।

মা তাকে মারলে এক চড়! দুষ্টু ছেলে! কথা শোনে না একটা। যা না নিয়ে আয় কাপড়টা তুলে। আমি সেলাই ছেড়ে উঠতে পারছি না যে!

মার খেয়ে ছেলে গেল বারান্দায়—ভিজে কাপড় তুলে আনতে।

ওদিকে ঠিক সেই সময়েই রাস্তা দিয়ে আসছিল একটা শোভাযাত্রা—ব্যান্ড বাজছে, ব্যাগ্‌পাইপ বাজছে, সাজ-পোষাক পরে' অনেক লোক আসছে সেই সঙ্গে।

কাপড় তুলতে ভুলে গেল খোকা—ঝুঁকে পড়লো রেলিংএর গায়ে। রাস্তায় বিস্তর লোক। এ-বাড়ী ও-বাড়ী থেকে ছেলে-মেয়েরা ছুটে

বেরিয়ে আসছে। রাস্তার ধারের জানলা খুলে মেয়েরা এসে দাঁড়াচ্ছে।

কেদারের বাড়ীর রেলিংটা বেশ বড়। খোকার ভারি অসুবিধে হচ্ছে। রেলিংএর খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে খোকা দিব্যি কেমন টুক্ করে' উঠে পড়লো রেলিংএর মাথায়।

রাস্তার ওপর দিয়ে লোকজনের শোভাযাত্রা যতই এগিয়ে যাচ্ছে, খোকাও যেন ততই ঝুঁকে পড়ছে।

হঠাৎ রাস্তার ওপর হৈ হৈ একটা গোলমাল উঠলো। লোকজনের ছুটোছুটি, চীৎকার, কোলাহল—কি হলো? কি হ'লো?

সেলাইএর কল ছেড়ে কেদারের স্ত্রী ডাকলে, খোকা!

কোনও সাড়া না পেয়ে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখলে, খোকা নেই।

গোলমালটা তাদেরই বাড়ীর নীচে। ঝুঁকে পড়ে দেখলে—সর্বনাশ!

খোকা নীচে পড়ে গেছে।

তারপর যা ঘটলো—তা আর বলবার নয়।

তবু বলি। শুনুন। রক্তাক্ত কলেবর খোকাকে ধরাধরি করে' তুলে আনা হলো বাড়ীর ভেতর। ডাক্তার? হাসপাতাল? কি হবে আর ও-সবে? খোকা নেই। অমন সুন্দর কচি মুখখানি—এই কিছুক্ষণ আগেও যে হেসে হেসে কথা বলেছে—সেই মুখ থেঁতলে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

অত সাধের ছেলে তাদের এমনি করে' মরে গেল।

তারপর দেখলাম, কেদার হয়েছে ঠিক পাগলের মত, আর ছেলের মা? তার কথা তো বুঝতেই পারছেন। লিখে বা বলে বোঝানো যায় না তার সে অবস্থা। দিবারাত্রি কান্না ছাড়া তার যেন আর কোনও কাজ নেই। খোকার স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখে আর কাঁদে। হতভাগা যেন সারা বাড়ীতেই তার স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে রেখে গেছে।

কিছুদিন পরে এমন হলো—সে যেন আর চীৎকার করে' কাঁদিতেও পারে না। থাকে থাকে আর দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে আসে।

কেদারের পৃথিবী থেকে দুনিয়ার রং তখন বদলে গেছে। জীবনে তার যেন আর কোনও আশা নেই, আনন্দ নেই! কেঁদেও সান্ত্বনা নেই, বেঁচেও সুখ নেই।

স্বামী-স্ত্রী একদিন প্রতিজ্ঞা করে' বসলো—তারা মরবে। যেমন করে' হোক আত্মহত্যা করবে তারা দুজনে একসঙ্গে।

কেদার একটা উইল তৈরি করলে। ছোট ছোট অনাথ আতুর মা-বাপহারা ছেলে-মেয়েরা যেখানে মানুষ হয়, তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি—তাদের মৃত্যুর পর সেই অনাথ-আশ্রমে চলে যাবে।

একদিন দেখলাম কেদার বিষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় শুনেছে নাকি পোটাসিয়াম সায়েনায়েড খেলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়, মরতে এতটুকু কষ্ট হয় না। কিন্তু চাইলেই তো সে বিষ পাওয়া যায় না।

ঠিক এই সময়টায় আমার ডাক এলো দিল্লী থেকে। আমি দিল্লী চলে গেলাম।

কেদারের গল্প আমি দিল্লীতে বসেই শেষ করেছিলাম। লিখেছিলাম—সন্তানের দুঃখ তারা সহ্য করতে পারলে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে বিষ পান করে' পাশাপাশি শুয়ে পড়লো। তারপর আর উঠলো না।

পরের দিন পুলিশ এলো। দেখলে দুজনেই মরে পড়ে আছে। এমনি করেই কেদারের গল্প শেষ হয়েছিল।

বছর চার-পাঁচ পরে কোম্পানীর কাজে আমাকে একবার কাশী যেতে হলো।

সেদিন সন্ধ্যা এখনও হয়নি। [illegible] ঘাটে লোকজনের ভিড়ের একপাশে আমি চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

হঠাৎ দেখি, কেদার আসছে। অবাক হয়ে গেলাম। —কেদার তুমি!

কেদার বললে, হাঁ ভাই, এইখানেই [illegible] এসে এখানে দাঁড়িয়ে [illegible]

এই বলে কেদার তার বাড়ীতে নিয়ে গেল আমাকে।

কেদার মরেনি। তার স্ত্রীকেও [illegible] দেখলাম, দিব্যি সুস্থ শরীরে বেঁচে রয়েছে তারা—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। ছেলে তাদের কোনোদিন মরেছে বলে মনেই হলো না। কিম্ভুত কিমাকার প্যাঁচার মত একটা মেয়ে হয়েছে। আর সেই মেয়েটিকে নিয়ে পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে একখানি বাড়ী তৈরি করে' পরমানন্দে তারা বাস করছে।

না। এরকম গল্পও আর লিখবো না। এবার যদি লিখতে হয় তো লিখবো প্রেমের গল্প।

দূর দূর, কোন্ সে প্রাচীনকালের প্রেম! কেদার, গল্পের মর্ম সে বুঝবে কেমন করে? না মরে' আমার সঙ্গে সে যেরকমভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আধুনিক কালের যুবক-যুবতী নিশ্চয়ই তা করবে না।

কিন্তু এমন যুবক-যুবতীই বা পাই কোথায়?

প্রেমে পড়েছে, আর নয় তো পড়ি পড়ি করছে, কিংবা প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে এই রকম অন্ততঃ একজোড়া পেলেই আমার কাজ চলে যাবে।

নিজে কখনও প্রেমে পড়িনি, আর প্রেমে পড়ার তেমন রেয়াজও ছিল না, আমাদের কালে একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব-সাব হবে [illegible] যুবতী হওয়া চাই, তার ওপর সুন্দরী হওয়া চাই। সর্বনাশ! এই বয়সের সুন্দরী মেয়েদের দেখলেই বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে।

সত্য গোপন করে' লাভ নেই। [illegible] করেছিলাম। আমার এক বন্ধুর বোন। [illegible] যুবতী এবং সুন্দরী। [illegible]

[illegible]

দিন শেষে — সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

করা সম্ভবপর নহে। দীননাথের খুবই কষ্ট হইতেছিল, ভূতিবালাও তাহা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি। অসহায়ভাবে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বজন্মে কত পাপই যে করিয়াছি তাই এজন্মে স্বামীকে দিয়া নরক ঘাটাইতেছি। ভগবান আমাকে শাস্তি তো অনেক দিলে, এবার চরণে স্থান দাও। ভগবান কিন্তু এ অনুরোধটি রক্ষা করিলেন না। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না। দীননাথ নরকভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য ভগবান দয়া করিলেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না, বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। অনেকদিন পরে চামেলীকে তাঁহার মনে পড়িল।

চামেলী তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাহারও তিনকুলে কেহ নাই। থাকে তাহার পিসামশায়ের কাছে জব্বলপুরে। তাহাকে লিখিলে সে হয়তো আসিতে পারে। টানিয়া টানিয়া কথাগুলি তিনি দীননাথকে বলিলেন। প্রস্তাবটি ভালো, তবু দীননাথকে মাথা চুলকাইতে হইল সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হওয়ার মানেই খরচ বৃদ্ধি। এখনই তো রাধিকারমণ থাকাতে খরচ বেশ বাড়িয়াছে। চামেলী আসিলে সত্তর টাকায় কুলাইবে কি? ইহার উত্তরে ভূতিবালা যাহা বলিলেন তাহা কিন্তু খুবই আশ্বাসজনক। খবরটা দীননাথ জানিতেন না, চামেলীর কথাই জানিতেন না তিনি। চামেলীর পিতা নাকি পুলিশের সি. আই. ডি ছিলেন। অগ্নিযুগে বোমারুদের ধরাইয়া দিতেন তিনি। অবশেষে একজন বোমারুর গুলীতেই তিনি নিহত হন। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেজন্য চামেলীর মা এবং চামেলীর জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাতা দিতেন। চামেলীর মা মারা যাইবার পর ভাতা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও চামেলী প্রতি মাসে কিছু করিয়া পায়। কত পায় তাহা ভূতিবালা সঠিক জানেন না, কিন্তু তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন যে চলিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই, বিবাহ হইলে বিবাহের খরচস্বরূপ কিছু টাকা তাকে নাকি গভর্ণমেণ্ট দিবে। চামেলীর মা মারা যাওয়ার পর বাধ্য হইয়া চামেলীকে পিসামশায়ের নিকট যাইতে হইয়াছে, কারণ দেশে তাহার অভিভাবকত্ব করিবার মতো নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না। ভূতিবালার বিশ্বাস চামেলীকে খবর দিলে সে আসিবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন। সম্পর্কটা খুবই দূর, তাই দীননাথ প্রথমটা ইতস্তত করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ গুছাইয়া একটি পত্র চামেলীকে, আর একটি তাহার পিসামশায়কে লিখিয়া দিলেন। ভগবান আবার দয়া করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিসামশায়ের উত্তর পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত উত্তর। লিখিয়াছেন, চামেলীকে লইয়া শীঘ্রই যাইতেছি, সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি চামেলীসহ আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন। সাক্ষাতে যাহা বলিবেন লিখিয়াছিলেন তাহা গোপনে দীননাথকেই বলিলেন।

"মহাবিপদে পড়েছিলাম মেয়েটাকে নিয়ে মশাই। পাড়ার চার পাঁচটা ষণ্ডা ছোঁড়া দিনরাত আমার বাড়ির চারদিকে চক্কোর মারে। সিটি দেয়, রাত্রে টর্চ ফেলে, চিঠি লেখে। আর মেয়েটাও একটু ফরওয়ার্ড গোছের, বুঝলেন। কি করব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এমন সময় আপনার চিঠিটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক ঢিলে দুই পাখী ম'ল। আপনার উপকারও হ'ল, ওকে ওখান থেকে সরানোও হ'ল।"

পিসামশায়ের মুখেই তিনি শুনিলেন চামেলী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া ভাতা পায়। বিবাহ হইলে এক হাজার টাকা দিতেও গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, তবে এখন স্বদেশী গভর্ণমেণ্ট হইয়াছে, দিবে কিনা কে জানে। পিসামশায়ের মতে ও মেয়ের বিবাহ হইবে না, ষাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো মোটা ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসামশায় পরদিনই চলিয়া গেলেন।

দীননাথ এবং ভূতিবালা লক্ষ্য করিলেন চামেলী মেয়েটি হাস্যমুখী, একটু সাজগোজ করিতে ভালবাসে, আর খুব নেটিপেটি। খাটিতেও পারে খুব। গায়ে জোরও আছে। অবলীলাক্রমে সে ভূতিবালার সেবার সমস্ত ভার লইল। দীননাথের মনে হইল সবই ভগবানের দয়া। সব শুনিয়া সুধাংশু ডাক্তারও খুশী হইল। আর একটি সমস্যা দেখা দিল দুই মাস পরে।

(৩)

ভূতিবালার মনেই দেখা দিল প্রথমে। পক্ষাঘাত হওয়াতে তাঁহার দেহটাই অসমর্থ হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল, মন মোটেই নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মাস দুই পরে স্বামী দীননাথের জন্য তাঁহার একটু চিন্তা হইল। চামেলী সম্পর্কে দীননাথের কোনও অশোভন আচরণ অবশ্য তিনি দেখেন নাই—দেখিবেনই বা কিরূপে, তিনি তো শয্যাগত—কিন্তু ভূতিবালা অনুভব করিতে লাগিলেন যে চামেলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঘনিষ্ঠতা তো হইবেই, দুটি মাত্র ঘর, দুটি ঘরের মধ্যে যে দরজা আছে তাহাতে কপাট নাই, তাছাড়া শ্যালী সম্পর্ক, ঘি ও আগুন...ভূতিবালার আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। ভূতিবালা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করা যায়। চামেলী তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, দীননাথও তো অপরিহার্যই। ভূতিবালা চিন্তা করিয়া কোন কূল কিনারা পাইতেছিলেন না, হঠাৎ কিন্তু একদিন তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। দীননাথ তাঁহার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইতেন। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল, লক্ষ্য করিলেন দীননাথ বিছানায় নাই। দুই একবার ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না। চামেলী পাশের ঘরে থাকে, তাহারও সাড়া পাইলেন না। একটু পরে দীননাথ চামেলীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে গো।"

"পায়খানায়। তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে এ দরজাটা আর খুলি নি, চামেলীর ঘর দিয়েই গিয়েছিলাম।"

"চামেলী কোথা।"

"ঘুমুচ্ছে।"

"একটু ডেকে দাও তো। মাথার বালিশটা সরে' গেছে।"

"আমিই ঠিক করে' দিচ্ছি। ও বেচারী সমস্ত দিন খাটে তো, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে।"

চামেলীর প্রতি এই দরদটুকু ভূতিবালার একেবারে ভালো লাগিল না। ঈর্ষায় জ্বালা

নূতন সৃষ্টির তরে যুগান্তরে প্রতীচ্যের প্রাণে
একদিন জেগেছিল অকস্মাৎ প্রবল প্রেরণা,
এসেছিল নবলিপ্সা, এসেছিল বিচিত্র এষণা,
পরিচয় পাই তার চিত্রে কাব্যে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে।
সে আলোক নিভে গেছে,
সেই সুর থেমে গেছে গানে,
সে বিস্ময় কেটে গেছে, নিঃশেষিত নব-উন্মাদনা,
অমৃতের মন্ত্র ত্যজি' করে সে যে মৃত্যুর সাধনা,
মত্ত হয়ে ছুটে চলে দুর্নিবার প্রলয়-সন্ধানে।
পূর্বে হ'ল সূর্যোদয়, অপূর্ব সে নব-জাগরণ,
মিলায় জ্যোতির স্পর্শে
দিকে দিকে স্বপ্ন-কুহেলিকা,
মুক্তির আনন্দ জাগে, সরে যায় সব আবরণ,
প্রাচী-র ললাটে আজ
কে আঁকিল দীপ্ত জয়টীকা?
ওঠে তাই জয়ধ্বনি, জাগে এক নূতন জীবন,
সিন্ধুর কল্লোল জাগে,
জেগে ওঠে এসিয়া-আফ্রিকা।

যদি পক্ষাঘাতের অব্যর্থ ঔষধ হইত তাহা হইলে ভূতিবালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিতেন। তিনি সেদিন আর কিছু বলিলেন না। পরদিন চামেলী যখন রাস্তার কল হইতে জল আনিতে গেল, তখন তিনি প্রস্তাবটি করিলেন।

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। চামেলী সোমত্ত মেয়ে, ওর সঙ্গে তোমার এমনভাবে মেশা-মেশি করাটা লোকে মোটেই খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। অথচ অন্য উপায়ও তো নেই। তাই আমি বলছি, ওকে তুমি বিয়েই করো ফেল—"

দীননাথ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলছ কি তুমি!"

"ঠিকই বলছি। ভগবানের দয়ায় বলতে নেই তোমার শরীরটি এখনও সুস্থ আছে। কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারলুম না, আমি এখন তোমার গলগ্রহ। আর আমাকে সেবা করবার জন্যই চামেলীকে এনেছি, ওকে ছাড়া আমাদের চলবেও না, তাই বলছি বিয়ে কর ওকে, পাত্রটি ঘরেও আছে, তোমার দিক থেকেও ভালো হবে, আমার দিক থেকেও হবে। এরকম বিয়ে তো কত হয়। ভেবে দেখো কথাটা—"

দীননাথ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে গিয়া কিন্তু তিনি অনুভব করিলেন যে, ব্যাপারটাকে প্রণিধান বা পর্যালোচনা করিতে হইলে সুধাংশু ডাক্তারের প্রাজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইবে। ছোকরার বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। তাছাড়া হিতৈষীও। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু করা চলিবে না।

সব শুনিয়া সুধাংশু বলিল, "আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এ অবস্থায় বিয়ে করাই উচিৎ, আর করলে ক্ষতিই বা কি। আর কিছু না হউক কেলেঙ্কারির ভয় থাকবে না। এখনই আপনার নামে আপনার পাড়ার লোকেরা ফুসফুস গুজ গুজ আরম্ভ করেছে, কানে এসেছে আমার। বিয়েই করে ফেলুন। চুকিয়েই মেরে দিন ব্যাপারটার।"

(ইহার পর ২৬৮ পৃষ্ঠায়)

কালরাত্রি : [নাটক]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি নামজাদা ক্লিনিক

ডাঃ সেন বয়সে প্রৌঢ়, ক্লিনিকের ডাক্তারদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিমর্ষ বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে তরুণ ডাক্তার বোস আসিয়া টেবিলের ধারে দাঁড়াইল।

ডাঃ সেন—হতভাগ্য ছেলে, নিতান্ত হতভাগ্য ছেলে! আমি ভাবতেও পারি না। সমরেশের মত ছেলে আত্মহত্যার চেষ্টায় বিষ খেতে পারে, আমি ভাবতেও পারি না। an emotional fool! তা ছাড়া কি বলব? যাক বেঁচেছে এই ঢের!

বোস—কিন্তু এর জন্যে যে দায়ী তার কি হবে? তাকে unpunished যেতে দেবেন?

ডাঃ সেন—You mean নার্স সুপ্রিয়া? কিন্তু তাকে দোষী কি করে করব? সমরেশ তাকে ভালবাসত, কিন্তু সুপ্রিয়া তাকে ভালবাসতে না-পারে। কোন মেয়েকে জোর করে তুমি ভালবাসাতে পার না।

বোস—নিশ্চয়ই না। কিন্তু তারও তাকে নিয়ে খেলা করবার কোন অধিকার ছিল না। Why did she do that? what right had she to play false with him like that? তার প্রমাণ আছে। সমরেশের বাক্স থেকে সুপ্রিয়ার লেখা চিঠিগুলি সব আমি পেয়েছি। here she is—এই তো নিজেই এসেছে। জিজ্ঞাসা করুন ওকে।

(সুপ্রিয়ার প্রবেশ)

সুপ্রিয়া—আমি ভিতরে আসব স্যার?

বোস—এস। আমরাও তোমাকেই ডাকছি। সমরেশের বিষ খাওয়ার জন্য তুমিই দায়ী—অভিযোগ উঠেছে। তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে।

সুপ্রিয়া—সমরেশবাবু বেঁচেছেন, কিন্তু মৃত্যু হবে ভেবে তিনি তো নিজে হাতে চিঠি লিখে রেখেছেন তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

বোস—কিন্তু তুমি তাকে নিয়ে এমন খেলা খেলেছ যে জীবন তার বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল।

সুপ্রিয়া—ডাঃ বোস, আপনি সৎলোক, আপনাকে শ্রদ্ধা করি। সমরেশবাবু আপনার বন্ধু, কিন্তু আপনি তার দলের নয়। তাকে আপনি ভাল না হোক, মোটা-মুটি জানেন। তবু আপনি আমাকেই দায়ী করে অভিযোগ করছেন?

বোস—করছি। কারণ, শুধু সমরেশের সম্পর্কেই নয়—অনেকের সম্পর্কেই তোমার বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ অজস্র। উত্তর তোমাকে দিতে হবে।

সুপ্রিয়া—ডাঃ সেন আমাকে এর উত্তর দিতে হবে?

ডাঃ সেন—নিশ্চয় দিতে হবে সুপ্রিয়া। কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে। সত্য হলে তোমার সম্পর্কে সাবধান হতে হবে আমাদের। তোমাকে আমরা সরিয়ে দিতে বাধ্য হব।

বোস—এই দেখুন—এই দেখুন ওর চিঠি। সমরেশকে লিখেছে। দেখুন প্রেমের কাব্যের ছটা।

সুপ্রিয়া—আমার শুধু একটা চিঠি দেখুন ডাঃ সেন। চিঠি নয় চিঠির ফটোগ্রাফ। মূল চিঠিখানা দামী বলে আমি রেখে দিয়েছি। (ব্লাউজের ভিতর হইতে ফটোর খাম বাহির করিয়া ফটোগ্রাফটা দিল।)

ডাঃ সেন—কি চিঠি? (লইলেন।)

সুপ্রিয়া—দেখুন আপনি। সমরেশ লিখেছে তার বন্ধুকে, ডাঃ অরুণেন্দুকে।

ডাঃ সেন—তুমি সে চিঠি পেলে কি করে?

সুপ্রিয়া—ডাঃ অরুণেন্দুও আমার একজন প্রণয়-প্রার্থী। তিনি ওঁকে চিঠি লিখেছিলেন। ডাঃ অরুণেন্দু—এই ডাঃ বোস যা-যা বলে অভিযোগ করছেন—ঠিক তাই তাই বলে অভিযোগ করেছিলেন; আমি হৃদয়হীনা, আমি স্বৈরিণী, আমি অশুচি আরও অনেক। আপনি আমার পিতৃস্থানীয়—আপনার সামনে সে সব কথা বলতে আমারও লজ্জা করে। আপনি পড়ে দেখুন। যখন ওঁকেই বলা—সমরেশবাবু আমাকে বিয়ে করবেন—তখন তিনি এই চিঠি লেখেন। সমরেশবাবু উত্তরে এই চিঠি লিখে—ওঁকে পাঠাতে আমাকে পাঠিয়ে দেন। বোধ করি দুখানা চিঠি এক সঙ্গে লিখেছিলেন—একখানা আমাকে, একখানা ওঁকে। অসাবধানতায় খাম বদল হয়ে যায়।

ডাঃ সেন—(কিছুক্ষণ চিঠির ফটোখানা পড়িয়া ফেলিলেন।) লজ্জাকর। ছি-ছি-ছি। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসছে।

সুপ্রিয়া—আপনি কেন লজ্জা পাচ্ছেন স্যার। আপনি পবিত্র মানুষ। ডাক্তারদের গৌরব। মানুষের সমাজেরও গৌরব।

ডাঃ সেন—এ সত্য হলে ডাক্তারদের যে লজ্জার সীমা থাকবে না।

সুপ্রিয়া—না ডাক্তারবাবু, মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ দুইই আছে—ডাক্তারেরাও মানুষ—তাদের মধ্যেও ভাল মন্দ আছে। আমার দুর্ভাগ্য—আমার রূপ আছে; আর আমি নার্স—আমার আশপাশের পুরুষেরা ডাক্তার। তাদের মধ্যে যারা মন্দ তারাই আমার কাছে এসেছে—আমাকে নিয়ে খেলা করতে চেষ্টা করেছে—আমিও তাদের সঙ্গে খেলা করেছি। আমি স্বীকার করছি—আমি খেলা করেছি—ইচ্ছে করে; হ্যাঁ ইচ্ছে করে। ডাঃ সেন আমি শোধ নিয়েছি।

বোস—শোধ? কিসের শোধ? সমরেশ তোমার ওপর কোন অন্যায় করেনি।

সুপ্রিয়া—ওই চিঠিখানা দেখুন। অরুণেন্দ্র ডাক্তারকে সে যে চিঠি লিখেছে—তাতে কি লেখা আছে পড়ে দেখুন। অরুণ ডাক্তার তাকে সাবধান করেছিল আমার সম্পর্কে। তার উত্তরে সমরেশ ডাক্তার তার জীবনে কত মেয়েকে নিয়ে খেলা করেছে, তার একটা হিসেব দিয়ে লিখেছে—নির্ভয় হও তুমি। শেষে লিখেছে—আমাকে নিয়েও সে এটা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছে—সে হারে কি আমি হারি। হারল সে, হারল, হেরে মরতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে আমার কাছে হেরে নয়। ওই চিঠির ভয়ে।

বোস—কিন্তু তাতেও, তোমার অপরাধের স্খালন হয় না। প্রেমের অভিনয় করা তোমার স্বভাব। অস্বীকার করতে পার?

সুপ্রিয়া—অস্বীকার করব না। চুম্বকের মত আকর্ষণ করার শক্তির সঙ্গে স্বভাবও আছে। আমার এই স্বভাবের জন্য আমার দিদি, তিনি ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, শান্ত, ধীর এমন একটি মেয়ে হয় না ডাঃ সেন, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। সমরেশ ডাক্তারের জন্য একবিন্দু দায়িত্ব আমার নেই। কিন্তু—দিদির মৃত্যুর জন্য আমার বুকে কাঁটা বিঁধে আছে। দিদিকে ভালবাসতেন একজন। দিদিও তাঁকে ভালবাসতেন। আমার এই স্বভাবে এই শক্তিতে দিদির ভাবী স্বামী দিদিকে ফেলে আমার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। দিদিকে স্পষ্ট বললেন—আমি সুপ্রিয়াকে ভালবাসি। দিদি আত্মহত্যা করলেন। আমি তাকে কোনদিন ভালবাসিনি। দিদির ভাবী স্বামী বলে শ্রদ্ধা করতাম—হাসি ঠাট্টা করতাম। ঘৃণা হল তার উপর—তাকে—আমি, তাকে আমি।

(উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উত্তেজনায় মাঝপথেই কথা বন্ধ হইয়া গেল) এবং দ্রুতপদে (সে চলিয়া গেল।)

বোস—সিস্টার! সুপ্রিয়া।

চলিয়া যাইতে যাইতে **সুপ্রিয়া—আপনাদের যা খুসী করতে পারেন। পুলিশের কাছে আমি দায়ী বলে অভিযোগ করতে পারেন।**

আমাকে আপনাদের এখানকার চাকরী থেকে ডিসমিস করতে পারেন। যা খুসী।

ডাঃ সেন—বোস—ডেকোনো ওকে যেতে দাও। ওর উপর তোমরা বেশী রূঢ় হচ্ছ।

বোস—বেশী রূঢ় হচ্ছি? কি বলছেন ডাঃ সেন? আপনি জানেন না, আমি জানি—আজও আমি কথাটা প্রকাশ করিনি। যখন আপনি এই কথা বললেন—তখন বলছি। দু বছর আগে—ও তখন সবে নার্সিং পাশ করেছে। ওকে মফঃস্বলের একটি বড় লোকের ছেলের নার্সিংয়ের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার হয়েছিল হার্ট ডিজিজ—বিছানা থেকে তার উঠবার শক্তি ছিল না। This heartless-shameless girl—তাকে নার্সিং করতে গিয়ে এমন এ্যালিয়োর করলে যে—সে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ওর জন্যে। এবং নিজের অসুখের কথা ভুলে ওর পিছনে ছুটতে সুরু করলে—

ডাঃ সেন—তুমি কি করে জানলে সে কেস? রতনপুরের—

বোস—হ্যাঁ, (সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকাইয়া) আপনিও জানেন? আমি ও'দের বাড়ীর লোকের কাছে শুনেছি। মিথ্যে নিশ্চয়ই বলেননি। যিনি বলেছেন, তিনি আমার ভায়রাভাই এবং ছেলেটি এখন তাঁর ভগ্নীপতি।

ডাঃ সেন—ফ্যাক্টস তিনি সত্যই বলেছেন, কিন্তু মোটিভ হয় তিনি জানেন না, নয় একটু ঘুরিয়ে বলেছেন।

বোস—কি বলছেন আপনি ডাঃ সেন?

ডাঃ সেন—আমি ঠিকই বলছি। ওই কেসে আমিও ছিলাম। আমি জানি। জটিল মানসিক রোগের কেস—হার্ট ডিজিজ হয়েছে বলে সে ওইভাবে বসে থাকতে চাইত। পিছনে ছিল একটি চঞ্চলা কিশোরী। So a similar girl was needed to alure him—সুপ্রিয়া সে কাজ অতি সুন্দরভাবে করেছিল। অত্যন্ত চতুর—অত্যন্ত শক্ত—ছেলেটিকে ভুলিয়েও She saved herself from him.—ছেলেটি ওকে বিয়েও করতে চেয়েছিল—কিন্তু ও করেনি। She wanted her remuneration and promised reward. সুপ্রিয়া heartless বল—তোমার সঙ্গে সায় দেব। কিন্তু—

বোস—আপনি জানেন না বোধ হয়—আমরা junior ডাক্তারেরা—এরপর সুপ্রিয়া এখানে থাকলে কাজ করব না। and আমরা Medical Board-এ move করব—তাকে যেন এ প্রফেসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

(ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল)

ডাঃ সেন—যাক বোস। সাতটা বেজে গেল। সমরেশ বেঁচেছে এটাই এখন যথেষ্ট। সুপ্রিয়ার কথা পরে ভেবে দেখব।

(প্রবেশ করিল একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্কা নার্স)

নার্স—ডাঃ বোস।

বোস—একি? মিসেস ঘোষ—আপনি—আপনি চলে এলেন? পেশেণ্ট? মারা গেছে?

মিসেস ঘোষ—না। বেঁচে আছে। কিন্তু আর বোধ হয় বাঁচবে না। বাঁচানো যাবে না। আমি আর থাকতে পারলাম না—ডাক্তার। অসম্ভব। আর ওর দিদি আমাকে পাঠালে আপনার কাছে। আপনাকে যেতেই হবে। এবং ডাক্তার সেনকে নিয়ে যেতে হবে। একমাত্র ভাই—কেঁদে সে সারা হয়ে গেল। সে নিজে এসেছে আমার সঙ্গে নিয়ে।

ডাঃ সেন—কোথায়? কি কেস?

বোস—কেসটার কথা আপনাকে বলেছি। পথ মাইল তিরিশ। ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তায় যেতে হয়।

ডাঃ সেন—ও সেই কেস! নৌকো থেকে পড়ে—স্পাইনাল কর্ডে আঘাত—

বোস—হ্যাঁ। Such a sweet youngman—এমন শোচনীয় পরিণতি। হার্টও ড্যামেজড খানিকটা।

মিসেস ঘোষ—ওই হার্ট নিয়ে বাঁশী বাজায়। কাল রাত্রি থেকে হার্টের প্যালপিটেশন বেড়েছে। কাল ওর বোন মাথা ঠুকে—বাঁশী বাজানো বন্ধ করেছিল। কিন্তু আজ কারুর মানা সে শুনবে না। এত উত্তেজিত হয়েছে, সে বলে বোঝাতে পারব না। আজ তার ওই accident-এর এক বছর পূর্ণ হবে।

(গৌরী রোগীর দিদি প্রবেশ করিল)

সুরবালা—আমি আপনার পায়ে ধরতে এসেছি ডাক্তারবাবু। একবার আপনাকে যেতে হবে। আমি সান্ত্বনা পাব। আপনি দয়া করুন—

ডাঃ সেন—না-না-মা। আমি যাব। আমি যাচ্ছি। চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লীগ্রামে সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ীর দ্বিতলের একটি কক্ষ। কক্ষটি প্রশস্ত। একখানি খাটের উপর একটি সুপুরুষ যুবা শুইয়া আছে। কোমরের কাছে প্লাস্টার করা। আঘাতের জন্য ডাক্তারের নির্দেশমত এমন করিয়া রাখা হইয়াছে। কোমর হইতে পায়ের দিকটা পরিচ্ছন্ন ভাবে ঢাকা। কয়েকটি বালিশে আধশোয়া আধবসা অবস্থায় রহিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে দেখিতেছেন। গ্রামের ডাক্তার। পাশ-করা ডাক্তার। একটি বৃদ্ধ চাকর ঘর গুছাইতেছে। যুবকটির নাম সুরজিত। বিছানার পাশে একটি টিপয়ে কয়েকটি ওষুধের শিশি। কয়েকখানি বই। এবং একটি বাঁশের বাঁশী। ঘরের একটি জানালা দিয়া আমনাইল দূরের ভরা-গঙ্গা দেখা যাইতেছে। সুরজিতকে ডাক্তার দেখিতেছেন স্টেথোস্কোপ দিয়া—সুরজিত একদৃষ্টে ভরা গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। এবং এক হাতে বাঁশীটি ধরিয়া আছে।

সুরজিত—আজ এক বৎসর পূর্ণ হল। সত্তেরই শ্রাবণ (কথাগুলি গঙ্গার দিকে চাহিয়া যেন আপন মনেই বলিতেছে)। গঙ্গা ঠিক তেমনি ভরে উঠেছে। ঠিক তেমনি বাদলা শেষের সকাল। কাটাকাটা মেঘের মধ্যে নীল আকাশ। খানিকটা রোদ, খানিকটা ছায়া। আশ্চর্য মিল। আজ সে আসবেই। নিশ্চয় আসবে। আজ ভাল থাকি—মন্দ থাকি—

ডাক্তার—সকালে আপনি ভালই আছেন। রাত্রে আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছিলেন। এমনি উত্তেজিত আর হবেন না।

সুরজিত—তার জন্যে দায়ী আপনাদের নার্স! আর আমার দিদি। গতকাল রাত্রে গেছে আমার বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। আমি বললাম, কেউ আজ আমার ঘরে থাকতে পারবে না। নার্স ছাড়বে না। আমি বললাম, আজ আমি একটু বাঁশী বাজাব। জানেন ডাক্তারবাবু, বাসরঘরে আমাকে গান গাইতে বললে আমি বাঁশী শুনিয়েছিলাম। দিদি মাথা ঠুকতে লাগলেন, বাঁশী বাজাতে আমাকে দেবেন না। উত্তেজনা আমার স্বাভাবিক। আজ আমি আপনাদের কারুর কথা শুনব না। না। রাত্রি দুপুরে বাঁশী বাজাব এবং সে নিশ্চয় আসবে। পৃথিবী ঘুমিয়ে যাবে। তখন সে আসবে।

ডাক্তার—বেশ তো—আজ তো এই কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ বোস আসছেন—তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ডাক্তার এস সেনও আসছেন—তাঁরা যা বলবেন, তাই করবেন। তাঁরা যদি বলেন—

সুরজিত—তাঁরা না বললেও আমি শুনব না। ডাক্তারবাবু আমি ছেলেমানুষ নই—অশিক্ষিত যাকে বলে—সাধারণত—তাও নই। আমি বিজ্ঞানেরই ছাত্র ছিলাম। আমি সব জানি—সব বুঝি। আমি জানি ডাক্তারবাবু, আমি সেরে উঠব না। যখন যাবই আমি, তখন আমি যা চাই তা করতে দেবেন না কেন? আমিই বা করব না কেন? আজ এই এক বৎসর বিছানায় শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে শুধু ভেবেছি। আজ আমার নূতন ধারণা হয়েছে—আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমি আমার সর্বসত্তা দিয়ে বুঝেছি মৃত্যুতেই সব শেষ নয়। তারপরও আছে। রাত্রির পর রাত্রি অনুভব করেছি তার অশরীরী আত্মা—আসে—ওই খোলা জানালার পাশ দিয়ে চলে যায়। তার কাপড়ের খস্‌খসানি শব্দ ওঠে, সে সেদিন বকুলের এসেন্স মেখেছিল—তার গন্ধও আমি পাই। আমি চকিত হয়ে তাকে ডাকতে যাই। নার্স এসে আমাকে চেপে ধরে। বাধা দেয়। সে চলে যায়। আকর্ষণ না করলে তো ওরা আসতে পারে না। ওই নার্স। ওই নার্সকে আমি সেইজন্যে দুচক্ষে দেখতে পারি না। কাল রাতে আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

(নিচে মোটরের হর্ণ [illegible])

ডাঃ—কলকাতা থেকে বোধ হয় ডাক্তার বোস ডাক্তার সেনকে নিয়ে এলেন। আমি দেখি। আপনি যেন চঞ্চল হবেন না। মহাদেব তুমি বাবুর কাছে বস। (প্রস্থান)

(বৃদ্ধ মহাদেব চাকর কাছে আসিল)

সুর—না রে না, আমার কাছে বসতে হবে না। তুই ঘরটাকে আজ ভাল করে সাজিয়ে দে। সেদিন যেমন বজরাটা সাজিয়েছিলি! ঠিক তেমনি করে। চার কোণে রজনীগন্ধার ঝাড় বসিয়ে দে। ওই জানালাটায় লম্বা করে সারি সারি বেলফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দে। মাঝখানে বড় শ্বেতপাথরের টেবিলটার উপর পিতলের পুষ্পপরাত রেখে তার উপর একরাশ লালপদ্ম সাজিয়ে দে। আর দুগাছা খুব ভাল যুঁই ফুলের গড়ে মালা—সে সন্ধেবেলা টাটকা যুঁই থেকে গাঁথিবি। হাঁ—আর কিছু চাঁপা ফুল। মহাদেব দা!

(মহাদেব মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিল)

মহাদেব—(যথাসাধ্য ধরা গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল) খোকা ভাই!

সুর—শোন—কাছে আয়।

মহাদেব—(একটু কাছে আসিয়া) বল!

সুর—না—খুব কাছে আয়। চুপিচুপি একটা কথা বলব। কানে কানে।

মহাদেব কাছে আসিতেই সুরজিত দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া দেখিয়া বলিল।

সুর—চোখের পাওয়ার বেড়ে গেছে—চশমাতে ঠিক বুঝতে পারি না। তাই কাছে ডেকে দেখতে চাইলাম। তুই কাঁদছিলি? •

মহাদেব—তোকে যে আমি বুকে করে মানুষ করেছি খোকাভাই! তোর এ কষ্ট আমি কি করে দেখব ভাই?

সুরজিতের দিদি সুরবালার প্রবেশ

সুরবালা—কলকাতা থেকে আমি ডাঃ এস সেনকে নিয়ে এসেছি। ডাঃ বোস এসেছেন। তুমি যা জেদ ধরেছ—ডাঃ সেন যদি তা করতে বলেন—তুমি করো আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তিনি যদি না বলেন, তাহলে তো তোমাকে মানতে হবে তাঁর কথা!

সুরজিত—আমি আজ কোন কথা মানব না। কারুর কথা শুনব না।

সুরবালা—তোর পায়ে আমি মাথা কুটব।

সুরজিৎ—তাতে যে পাপ আমার হবে—তাতে মরার চেয়ে তো বেশী কোন সাজা হবে না দিদি।

সুরবালা—সুরজিত!

ডাঃ সেন, ডাঃ বোস ও সকলের পিছনে নার্সের প্রবেশ

ডাঃ সেন—বেশ তো আমি কলকাতা থেকে আপনাকে দেখতে এসেছি, আপনাকে দেখি। আমার মতামত আমি বলি। আপনার মানতে ইচ্ছে হলে আপনি মানবেন না হলে মানবেন না। ডাক্তারের মত আর জজের রায় এক নয়।

সুরজিৎ—আপনি ডাঃ সেন? লোকে বলে ধন্বন্তরি! কিন্তু আমাকে তো বাঁচাতে পারবেন না।

ডাঃ সেন—বেশ তো। আগে দেখি।

সুরজিৎ—(উত্তেজিত হইয়া) কিন্তু আপনাদের পিছনে ও কে? চশমাতেও আমি ভাল দেখছি না। উনি কি সেই নার্স? না—না। উনি থাকলে হবে না। না। উনি চলে যান।

ডাঃ সেন—আপনি হাঁপিয়েছেন এইটুকুতেই। আপনি শান্ত হোন। Be calm—Be calm please. নিন তো মা একটু জল দিন তো।

(সুরবালা আগাইয়া গিয়া জল দিল)

ডাঃ সেন—সিস্টার। আপনি যান। আমাদের সঙ্গে আপনি কলকাতা চলে যাবেন।

ডাঃ বোস—ঠিক আছে, কলকাতায় গিয়ে আমি নতুন নার্স পাঠিয়ে দেব।

সুরজিৎ—না। আজ আর কোন নার্স আমার কাছে থাকবে না। কোন লোক আমার ঘরে থাকবে না। না। আজ আমি আপনাদের কোন বাধা নিষেধ মানব না। আমার কাছে আজকের দিনের মর্ম আপনারা কেউ বুঝবেন না।

ডাঃ সেন—আমি শুনেছি। গত বৎসর এই দিনটিতে আপনি বিয়ে করে ফিরবার পথে গঙ্গার ঘাটে নৌকা থেকে আপনার স্ত্রী আর আপনি জলে পড়ে যান। আপনার স্ত্রী মারা যান—আপনি কোমরে বুকে আঘাত পেয়েও কোন রকমে বাঁচেন।

সুরজিৎ—সেইজন্যে [illegible] সব নার্স [illegible]।

[illegible] কিছু [illegible]।

ডাঃ সেন—[illegible] আমি নিচ্ছি। [illegible] আপনি [illegible]—আমি আপনাকে একবার দেখব [illegible] এই সামান্য দুর্ঘটনা। বাকী সব আমি ডাঃ বোসের রিপোর্ট থেকে পেয়েছি।

সুরজিৎ—দেখুন।

[illegible]

ডাঃ সেন—আপনি যেন [illegible] করবার চেষ্টা করছেন। আমি নিজে দেখছি।

সুরবালা—সুরজিত। সুরজিত। আমি—আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে।

সুরবালা গিয়া তাহার কাছে বসিল।
সুরজিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সুরজিৎ—না। না। তোমার পায়ে পড়ি। দিদি। তুমি যাও। তুমি যাও। শুধু ডাঃ সেন আর আমি। আর কেউ না।

ডাঃ সেন—ঠিক আছে। আমি আর উনি। আপনারা ওঘরে গিয়ে বসুন। ডাঃ বোস, যাও মাকে নিয়ে তুমি ওঘরে যাও। আমি দেখছি সুরজিতবাবুকে। যান। মা যান ওঘরে।

ডাঃ বোস—সুরবালাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন—পাশের ঘরে আসিয়া বসিলেন। সুরবালা চোখে কাপড় দিয়া একখানি সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

মোহমুদ্গর

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

[ছন্দ—পজ্ঝটিকা ঃ লঘুগুরু-উচ্চারণ-ভেদে পঠিতব্য।]

শুন হে ভ্রাতঃ! সতর্ক বাণী—
জীবন-মরণে লহ সম মানি
অস্থিরপঞ্চক জীবন-যাত্রা,
নাহিক ছন্দঃ, নাহিক মাত্রা।
"নলিনীদলগত জলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্॥"

চলি বাজারে প্রত্যহ প্রাতে,
শূন্য থলিটি বহি ফিরি বাসাতে।
[illegible] যাত্রা ট্রামে বাসে
[illegible] ঊর্দ্ধশ্বাসে।
"পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ।
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ॥"

মৎস্য আশা খাঁচাছাড়া
দর শুনি নেত্রে দরদর ধারা।
অদ্য নিরামিষ [illegible] কলা
[illegible] নাহিক [illegible]।
"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্॥"

[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্॥"

[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং।
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডং॥"

ক্রিকেট-ফুটবল-হকি-ময়দানে,
প্রেমোচ্ছেল-সিনেমা পানে
ধাবিত সুরসিক-রসিকা-যাত্রী
জোড়া জোড়া পাত্র চ পাত্রী।
"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত
স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ॥"

খুটিতে ভার্যা, মিটিঙে পুত্র—
নাহিক গেহে সঙ্গম-সূত্র।
হস্তভম্বপ্রায় গণ্ডে হস্ত
বিমূঢ় কর্তা চিন্তাগ্রস্ত।
"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ॥"

গর্জে প্রবীণ ঘন রণনীতে
নখর-দশন-গত-সিংহ-ধ্বনিতে।
অপঠিত ভারত-ভগবদ্গীতা,
রামায়ণস্থ রাঘব-সীতা।
"বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ।
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥"

জীবন-যাপন বড়ই অসহ্য,
ভেজালীকৃত ভোজ্যাভোজ্য।
মিথ্যা মায়া খলু সংসারে
মিথ্যা আসা বারংবারে।
"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥"

খাইনু আফিম—কি করি অগত্যা
আপন হাতে আপন হত্যা
নিষ্ক্রিয় আফিম—দেখিনু চাহি,
মৃত্যু ত নাহিই—তন্দ্রাও নাহি।
"কস্য ত্বং বা কুত আয়াত।
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

তৃতীয় দৃশ্য

পাশের ঘর।

ডাঃ বোস—আপনি কাঁদবেন না সুরবালা দেবী। ওর কথায় এখন কি রাগ করতে আছে? দীর্ঘ একটা বছর যে মানুষ—এই ভাবে ভুগছে—আপনার কাছে গোপন করব না—তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে চলেছে—তার কথায়।

সুরবালা—আমি যে ওকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি। আমার থেকে ও বারো বছরের ছোট। ও যখন পাঁচ বছরের তখন মা মারা গেলেন। আমিই তার কারণ। আমার বিয়ে হল—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সাত দিনের মধ্যে স্বামী মারা গেলেন। অষ্টমঙ্গলায় বিধবা সেজে বাড়ী এলাম সেই দেখে আছাড় খেয়ে মা পড়লেন—আর উঠলেন না। বাবা আমার কোলে ওকে দিলেন—মানুষ কর। চাকর মহাদেবকে দিলেন। দশ বছর পর—সুরজিত তখন পনের বছরের—বাবা মারা গেলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে দলিল ক'রে আমাকে ওর গার্জেন ক'রে গেলেন। ওকে আমি নিখুঁত করে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলাম। এম, এস-সি পাশ করলে; শরীর হয়েছিল—ভাস্করে গড়া পাথরের মূর্তির মত। বাঁশী বাজাতো—তার সুরে মধু ঝরত।

ফুলের ঝুড়ি লইয়া একটি লোক ও তাহার সঙ্গে একজন কর্মচারীর প্রবেশ।

কর্মচারী—ফুল এনেছে দিদি ঠাকরুণ, এগুলি এখন এ ঘরেই রাখি? ও ঘরে তো ডাক্তারবাবু দেখছেন!

সুরবালা—রাখ। এইখানেই রাখ। মহাদেব নিয়ে যাবে দরকার মত।

(ফুল রাখিয়া উভয়ের প্রস্থান)

ডাঃ বোস—এত ফুল? ও! আজ বুঝি সেই—।

সুরবালা—হ্যাঁ। আজ সেই সর্বনাশা দিন। আমার কপাল ডাক্তারবাবু। নইলে—এম, এস-সি পাশ ক'রে সুরজিত ঘোর অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। নাস্তিক হয়ে গেল বলে মনে মনে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। এম, এস-সি পাশ ক'রে ধরলে বিলেত যাবে। সেখানে গিয়ে পাছে মেম বিয়ে ক'রে বসে—তাই জোর ক'রে বিয়ে দিলাম। বিয়ে ক'রে ঘরে ফিরল—পথে ঘরের দোরে—এই কান্ড ঘটল। আমার কপাল। সেই সুরজিতের আজ বিশ্বাস—ওর সেই বউয়ের আত্মা ওকে ডাকে। ওর বিশ্বাস আজ সেই দুর্ঘটনার দিন—সে আজ নিশ্চয় আসবে—দেখা দেবে। তার জন্যে ওকে বাঁশী বাজিয়ে তাকে ডাকতে হবে। এসব আয়োজন তারই জন্যে।

ডাঃ বোস—নিষ্ঠুর আঘাতে মন দেহ যখন ভেঙে যায় তখন জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্বাস—এ সবও ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার পর আপনারা যখন কলকাতায় ওকে নিয়ে গেলেন—আমাকে দেখালেন—তখনও উনি অন্য মানুষ ছিলেন। কলকাতায় উনি ভাবতেন। আমি সে দেখেছি। কলকাতা থেকে যখন এলেন এখানে জোর করে—তখনও সন্দেহ খুব হয় নি আমার। এই তিন মাসে আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল। কলকাতা থেকে বাড়ীতে আসতে দেওয়াটাই ঠিক হয় নি।

সুরবালা :—উচিত অনেক কিছু হয় নি। কিন্তু সব অনুচিতগুলো যে আমার অদৃষ্টের ফল ডাক্তারবাবু। বিয়ে ক'রে বরযাত্রী বর-ক'নে এসে পৌঁছুল রাত্রি তখন দশটা। ডায়মন্ডহারবারে নেমে আমাদের বাড়ীর বিয়ে চিরকাল আসে নৌকোয় বজরায়। এসে নামে ওই গঙ্গার ঘাটে। বিয়ের দু-তিন দিন আগে থেকে ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ গিয়ে দুর্যোগ কাটছে সে দিন। গ্রামের পথে কাদা জল। আয়োজন করেছি বাজনা-চতুর্দোলা নানান রকম। গ্রাম ঘুরবে—দেবস্থানে প্রণাম করবে—তারপর বাড়ী ঢুকবে। পাড়াপ্রতিবেশী আসবে—বউ বরণ করব। তাই ঠিক হ'ল—আজ রাতে নয় কাল সকালে নামবে বর-ক'নে। রাত্রিটাও ছিল কালরাত্রি—বিয়ের পরের দিন। বর-কনের দেখা হ'তে নেই। তাই থাকল—বর এক বজরায়, ক'নে এক বজরায়। মাঝি-মাল্লারা থাকল—পাহারা থাকল। আমার কপাল—বিনা মেঘে হ'ল বজ্রাঘাত। সুরজিত বাঁশী বাজাচ্ছিল। হঠাৎ জলে একটা শব্দ হল—সুরজিত চেঁচিয়ে উঠল—সেও লাফিয়ে পড়ল। মাঝিরা বুঝতে পারে নি প্রথমটা। যখন বুঝতে পেরে জলে লাফিয়ে পড়ল—তখন দেরী হয়ে গেছে। সব আমার কপাল।

(একজন ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি—(বেশ একটু উত্তেজিতভাবে—একটু উচ্চ কণ্ঠে)। মা! আমি বাড়ী যাচ্ছি মা। কাজ করতে আমি পারব নি মা।

সুরবালা—কাজ করতে পারবি নে? বাড়ী যাচ্ছিস? মানে?

ঝি—না মা। সবাই কয়—আজ নাকি—

সুরবালা—কি?

ঝি—আজ নাকি দাদাবাবুর মরা বউ—রাতে—। আমি থাকতে পারব নি মা।

সুরবালা—না পারিস চলে যা।

ঝি—হ্যাঁ মা। এতদিন লোকে বলেছে—রাতে নাকি দাদাবাবুর ঘরের জানালার ধার দিয়ে বউ ডাক দিয়ে যায়। গন্ধ আসে। কাপড়ের খসখস শব্দ হয়। সে কোন মতে— সয়েছি মা, আজ বলছে—

সুরবালা—তোর মাইনে মিটিয়ে নিয়ে তুই চলে যা। তোকে থাকতে হবে না। এক্ষুনি এক্ষুনি।

নেপথ্য হইতে সুরজিত (উত্তেজিত কণ্ঠে)। **কে? কে? কে কথা বলছ? কে?—**

চতুর্থ দৃশ্য—

সুরজিতের কক্ষ।

ডঃ সেন ও সুরজিত।

সুরজিত—কে? কে?

ডাঃ সেন—উত্তেজিত হবেন না সুরজিতবাবু। হবে কেউ—। ও দিকে কান দেবেন না আপনি!

সুরজিত—শুনলেন—ও কি বললে?

ডাঃ সেন—শুনেছি।

সুরজিত—সে নিত্য আসে। শব্দে গন্ধে সে আমাকে ডাক দিয়ে যায়—ওই জানালার ধার দিয়ে। আসতে পারে না। পথ পায় না। এরা আমাকে ডাকতে দেয় না।

ডাঃ সেন—আপনি শিক্ষিত ছেলে। এম, এস-সি পাশ করেছেন। একে আপনি সত্য মনে করেন? রাগ করবেন না আমার উপর।

সুরজিত—ডাঃ বোস হলে রাগ করতাম। অন্য কেউ হলে রাগ করতাম। আপনি আমাকে আমার প্রশ্নের সত্য উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন আমার বাঁচবার সম্ভাবনা কম—মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশী। শতকরা ১০ আর নব্বই। স্বীকার করেছেন—দশদিন আগে আর দশদিন পরে আমার মৃত্যুর মধ্যে সত্যই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সেই কারণেই রাগ করব না। আপনি বলেছেন—আপনার জানাটাই একমাত্র সত্য নয়। তাই অকপটে বলছি—আমি সত্য মনে করি। অন্ততঃ আমার মনের কাছে এইটেই সত্য। ডাক্তারবাবু—আমিও এ সবে বিশ্বাস করতাম না। এই দুর্ঘটনার পর কলকাতায় ডাঃ বোসের চিকিৎসায় ছ মাসের বেশী কাটল। ভাবলাম—শুধু ভাবলাম। হঠাৎ শুনতে লাগলাম তার ডাক। বহু দূর হতে সে যেন ডাকছে। ঠিক বারোটার পর। ওগো! ওগো! হাতটা বাড়িয়ে দাও না গো!

ডাঃ সেন—এইটুকু খেয়ে ফেলুন।

সুরজিত—কোরামিন?

ডাঃ সেন—হ্যাঁ। অনেক কথা বলছেন আপনি। বোধ করি বললেন। থামুন।

সুরজিত—দিন। (খাইল)

ডাঃ সেন—আমি আপনার কথা শুনব। তারপর আমার কথা বলব। অন্ততঃ আপনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করব।

সুরজিত—এই কথাটাই তার শেষ কথা। ডাক্তারবাবু, লোকে জানে—মাধবী বজরার বাইরে এসে টাল হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল জলে। না! সে আমার নৌকোয় আসতে চেয়েছিল। সে দিন ছিল দেশাচারের মতে কালরাত্রি। স্বামী স্ত্রীর দেখা হওয়া নিষেধ!

ডাঃ সেন—জানি।

সুরজিত—তার আগের একটু কথা বলি। বিলেত যাব, দিদি সম্বন্ধ নিয়ে এলে— যেতে হবে। বললাম এই হবে। বললেন—কনে দেখে আয়। বললাম—কি হবে? মন আমার শক্ত মনই ছিল ডাঃ সেন। শুধু একটা বিচিত্র খেলাচ্ছলে কাব্য করতাম। গান জানি ভাল। তাই গান লিখতাম। লিখতাম সুর দিয়ে, স্বরলিপি সমেত ছদ্মনামে কাগজে ছাপাতাম। কেউ জানত না। কেউ না। আবার নিজেকেই ব্যঙ্গ করতাম। সাধারণের সামনে—মধুকরের গান নিয়ে এমন ব্যঙ্গ করতাম যে মধুকর আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

ডাঃ সেন—মধুকর—আপনি!

সুরজিত—হ্যাঁ। আমি। আপনার সামনে স্বীকার করছি আজ। আর স্বীকার করেছিলাম তার কাছে। সেই কথাই বলছি। যখন দিদি মেয়ে দেখার কথা বলেন—তখন আমি রঙ্গপ্রিয় ব্যঙ্গপ্রিয় সুরজিত। বললাম—আসবে তোমার দাসী—যদি আপত্তি ক'রে বল তোমার লক্ষ্মী—তাতেও আপত্তি করব না—বলব—দাসী লক্ষ্মী যাই বল—ব্যাপারটা তোমার। তোমার পছন্দ হ'লেই হ'ল। আমার হ'ল নোঙর। বেঁধে রাখতে পারে পারবে, না-পারে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত ছুটব—আপনার গতিতে।

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

আশ্বিন মাসের সাত তারিখে
সাত রকমের রঙবেরঙের ছবিতে
ভরা সাতখানি ছেলেমেয়েদের বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
মারুতির পুঁথি
দাম তিন টাকা চার আনা

২
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘনাদার গল্প
দাম দু' টাকা বার আনা

৩
'বনফুল'-এর
রঙ্গনা
দাম দু' টাকা

৪
বুদ্ধদেব বসুর
রান্না থেকে কান্না
দাম এক টাকা চার আনা

৫
'অ-কু-ব'-এর
খামখেয়ালী ছড়া
দাম এক টাকা আট আনা

৬
পশুপতি ভট্টাচার্যের
সুদূর দেশের রূপকথা
দাম দু' টাকা

৭
বিমল মিত্রের
টক-ঝাল-মিষ্টি
দাম দু' টাকা

পূজায় ছেলেমেয়েদের বই উপহার দিন

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড : কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৪-২৬৪১

থেকে এখানে পূজারীর কাজ নেয়। একা থাকে নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়। একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলুম—ভগবান দেখেছ?—বৃদ্ধ জবাব দিল, হ্যাঁ দেখেছি।

কেমন ক'রে দেখলে?

অম্লান বদনে প্রসন্ন হাস্যে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ বললে, আপনা দর্শন দেতা।

অতঃপর আমার প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বলেছিল, আর এক বছর মাত্র সে বাঁচতে চায়।

ছাতারপুর নামটি এসেছে মহারাজা ছত্রশালের থেকে। নওগাঁ নামক সহরটি ছেড়ে মোটর পথে যাবার কালে 'মাহেবা' নামক গ্রামে অতি প্রাচীন সুন্দর প্রাসাদ এবং তা'র স্থাপত্য শিল্প চোখে পড়ে। এটির নাম 'ছত্রশাল মকবারা।' সম্রাট আকবরের কালে 'ছত্রশাল' রাজত্ব করেছিলেন।

ছাতারপুর থেকে 'বমিঠা' হয়ে খাজুরাহো পর্যন্ত আটাশ মাইল মোটর পথ। পথ অতি মসৃণ এবং আনন্দদায়ক। প্রদেশের সর্বত্রই ঠিক এই প্রকারই মোটর পথের জালবোনা। দ্রুত গতিতে গাড়ী যায়, কিন্তু চারিদিকের মধুর পরিবেশের মাঝখানে আরোহীরা যেন তন্দ্রার ঘোরে থাকে,—পথের চেহারা এমনই নিরুদ্বেগ। কিন্তু ওই আটাশ মাইল পথের মধ্যে আমার মনে ছিল পুরুষোত্তমদাসের সেই বিবৃতিটি। বমিঠা থেকে মাত্র সাত মাইল হোলো খাজুরাহো। অসুবিধা ছিল এই, আসার আগে খাজুরাহো সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ-খবর আনিনি,—অর্থাৎ ওখানে বাসস্থানের বন্দোবস্ত আছে কিনা এটি সঠিক জানা ছিল না। পথের চেহারা অনেকটা বন্য, অনেকটা বা গ্রাম্য। সর্বাপেক্ষা যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেটি এখানেও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, জনবিরলতা। মোটরপথের বাইরে শস্যপ্রান্তর ও পাহাড়তলী। সবই নিরিবিলি। শুধু এখানে ব'লে নয়, সমগ্র বিন্ধ্যপ্রদেশেই লোকসংখ্যা কম। এ অবস্থাটি রক্ষিত হয়ে এসেছে সামন্ত নরপতিদের শাসনকাল থেকেই। রেলপথ ও কারকারখানা যেখানে সেখানে ঢোকেনি বলেই আধুনিক যুগের তাড়না কম।—এমনিতরো অন্যান্য কারণেও বিন্ধ্যপ্রদেশের 'স্বাভাবিকতা' থেকে গিয়েছে এখন পর্যন্ত।

হেমন্তের অপরাহ্ন পেরিয়ে দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম খাজুরাহো গ্রামে। সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব রয়েছে। মন্দির-প্রান্তরের পাশেই মহারাজার প্রাসাদ ও প্রাঙ্গণ। বর্তমান মহারাজা হলেন বয়সে তরুণ, নাম ভবানী সিং। তাঁর বৃদ্ধা জননীর পূজার্চনার সুবিধার জন্য ভবানী সিং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রসহ এখানেই থাকেন। তাঁর সাধারণ পরিচয় হোলো, তিনি ছাতারপুরের মহারাজা। এমন একটি নিরিবিলি গ্রাম্য আবহাওয়ায় কোনও মহারাজার পক্ষে বসবাস করা সম্ভব হয়, ঠিক জানা ছিল না আগে। শোভা-সমারোহ অথবা আড়ম্বর কোথাও দেখছিনে, এটি কিছু বিস্ময়জনক। জমিদারকে মহারাজা ব'লে আগে ঠাওরাতে পারিনি।

গ্রামে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বাসস্থানের সঙ্কট দেখা দেয়। শুনতে পাওয়া গেল, প্রায় তিন ফার্লং দূরে একটি নবনির্মিত সারকিট হাউস রয়েছে, কিন্তু তার জন্য ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি পাওয়া দরকার। তিনি এখানে থাকেন না, আগে থেকে [illegible] কিন্তু রীতিটি যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞাপিত হয়নি, এও সত্য। যাই হোক, কপাল ঠুকে সোজা এসে সারকিট হাউসের ফটকে দাঁড়াতে হোলো, এবং ভিতরের খানসামা এসে যখন অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করলো, তখনও তার জানা নেই—আমি সেই দুর্লভ অনুমতিপত্রের অধিকারী কিনা। অবশ্য মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রশ্নটা উঠলো, এবং তখনই একটি লোককে ডেকে একখানি চিঠি পাঠাতে হোলো স্বয়ং মহারাজার দরবারে। সে-চিঠিতে ছিল ঈষৎ কূটনৈতিক ভাষা, এবং আমার আগমনের প্রধান হেতু বর্ণনা। আধ ঘণ্টার মধ্যে জবাব এলো আমি এখানে অনায়াসে থাকতে পারি, এবং আগামীকাল সকাল এগারোটায় মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও পারি। সারকিট হাউসের চাকাটা একটুখানি ঘুরে গেল, এবং কপালগুণে দু'একটা সেলামও জুটতে লাগলো। আজ রাত্রের মতো এই অর্ধচন্দ্রাকার বৃহৎ সারকিট হাউসে আমিই একমাত্র বাসিন্দা। বাগানের উত্তর দিকে কোনও বাধন নেই,—এখানকার বারান্দায় বসেই বিশাল খোলা প্রান্তর চোখে পড়ছে। এমন নিরিবিলি জায়গা উত্তর ভারতে বোধ করি আর কোথাও নেই।

পরদিন প্রভাতকালে 'খাজুরাহো' দেখতে বেরোলাম। খাজুরাহো হোলো বর্তমানে একটি গ্রাম, কিন্তু পুরাকালে ছিল এটি সুবিস্তীর্ণ এক ভূভাগ। প্রকাশ, প্রাচীন যুগে এখানে নাকি ছিল দুটি স্বর্ণমণ্ডিত খেজুর গাছ। সেই অনুযায়ী এখানকার নাম হয় খাজুরাহো, এবং প্রায় নয় শো বছর আগে চান্দেল্ল রাজগোষ্ঠী এই নামেই এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কমবেশি পঁচিশ বর্গমাইল জুড়ে সেকালের কীর্তির নানাবিধ ক্ষয়িষ্ণু অবশেষ ও বিভিন্ন মন্দিরাদি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এখানে [illegible] পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ। চান্দেল্ল রাজগোষ্ঠী এই অঞ্চলের প্রায় হাজার বর্গমাইল ভূভাগে অপ্রতিহত চার শো বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় ছয়শো পঁচিশ বছর আগে [illegible] ইবন বতুতাও আসেন এই খাজুরাহোতে। বিস্ময়ের কথা এই, এখানে সপ্তম শতাব্দীতে একটি অতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ নির্মিত হয়েছিল, এবং তৎকালীন নরপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে এসে প্রথম নিশ্বাস নিলেই উপলব্ধি করা যায় অতীতকালের সমস্ত মহিমা এবং ইতিহাসের গৌরবসহ খাজুরাহো যেন আপন বিস্ময়টিকে বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে।

রাজবাড়ীর প্রাচীরের পাশেই খাজুরাহো মন্দির অঞ্চলের বিশাল প্রান্তর। বাইরে থেকে সহসা বুঝতে পারা যায় না, কি বিপুল ঐশ্বর্য উৎকীর্ণ রয়েছে প্রতি মন্দিরে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি মন্দির। প্রত্যেকটি নির্মিত হয়েছিল উঁচু বেদীর উপরে। কালক্রমে জীর্ণ হয়েছে কোন কোনটি, কিন্তু তাদের সতেজ ও জীবন্ত অভিব্যক্তি প্রত্যেক শিল্প-রসিক দর্শককে প্রথম দর্শনেই অভিভূত করে। সর্বাপেক্ষা যে মন্দিরটি এখানে প্রসিদ্ধ, সেটি হোলো খাণ্ডারিয়া কন্দর্প মহাদেবের মন্দির। তারপরে একটির পর একটি। পার্শ্বনাথ, রামচন্দ্র, বরাহ, ঘণ্টাই, চৌষট্টি যোগিনী, শঙ্করজি, পার্বতী, জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত, মাতঙ্গেশ্বর, লক্ষ্মী,—এদের দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। এদের সঙ্গে রয়েছে নন্দী, কালী, প্রতাপেশ্বর, লালগোয়ান, ওয়ারা, ভরতজী ইত্যাদি বিবিধ দেউল। সমগ্র ভূভাগই হোলো মন্দিরপ্রধান। গ্রাম ছাড়িয়ে পূর্বদিকে রওনা হয়ে মাইল দুই গেলে জনহীন অঞ্চলে একাধিক জৈন-মন্দিরও দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কেউ আদিনাথ, কেউ শান্তিনাথ, কেউ বা পরেশনাথ,—অধুনা এরা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। নানা স্থানে এইসব জৈন এবং বৌদ্ধ-স্থাপত্য কীর্তি ছাড়াও অন্যান্য হিন্দু-মন্দিরও কম নয়। তারা কেউ হনুমানজি, চতুর্ভুজ, বামনজি, ব্রহ্মা, দুলাদেও ইত্যাদি।

শঙ্করের মন্দিরটি বিস্ময় উৎপাদন করে। ঠিক মনে পড়ছে না এতবড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখেছি কিনা। আঠারো ফুট একটি গোলাকার 'গৌরীপট্টের' উপর প্রায় ছয় ফুট উঁচু শিবের লিঙ্গ,—এটি অভিনব দৃশ্য সন্দেহ নেই। সমগ্র স্থাপনাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি উঁচু বেদীর উপরে,—এগুলি আগাগোড়া সবই পাথরের। বাইরে এসে মন্দিরের সুউচ্চ বিশালতা দেখে সত্যই থমকে দাঁড়াতে হয়।

মন্দিরের বহির্গাত্রে অনেক স্থলে নরনারীর মৈথুন-চিত্র খোদিত। তাদের নানা ভঙ্গীর নানাবিধ অভিব্যক্তি। একটি-দুটি বা পাঁচটি নয়,—তারা সংখ্যাতীত। কিন্তু এরা ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পে নতুন নয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে, কোনারকের সূর্যমন্দিরে কাশীর গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র পশুপতিনাথের মন্দিরে,—এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এসব পাথরের ও কাঠের উপর শত শত বছর ধরে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। [illegible] এবং ত্রিবেণীর কোনারকী স্থাপত্য শিল্পে এসব ছবি অসংখ্যভাবে খোদাই উৎকীর্ণ। সমগ্র দেশের এর প্রশংসা। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প এইসব চিত্র আপন অঙ্গে ধারণ করতে কোনদিন ভয় পায়নি। অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার বিতর্ক নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এমন কিছু মাথা ঘামায়নি কোনও কালে। স্থাপত্য শিল্পের যেখানে সৌন্দর্য সুষ্ঠু অভিব্যক্তিতে সার্থক হয়েছে, সেখানে সে অশ্লীলতাকে অতিক্রম করেছে। দেবতাকে সামনে রেখে যেখানে ছন্দ ও সুষমার অপূর্ব বন্দনা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে তথাকথিত নীতি বিচারের ঠাঁই কতটুকু? শিল্পকলার ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার অপেক্ষা সৌন্দর্য বিচারই প্রথম ও প্রধান। এই মন্দিরগুলি দেখবার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশের স্থাপত্য শিল্প-বিচারকরা ভারতবর্ষে আসেন এবং তাঁরা এদের চমকপ্রদ ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অকুণ্ঠ স্তবগান ক'রে যান। অশ্লীল যদি অসুন্দর হোতো, তবে তার মৃত্যু ঘটতো অনেক আগে, কিন্তু সৌন্দর্যের কালজয়ী মহিমাই তাকে হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। একালের ক্ষুদ্র মানুষের ওপর মহৎ ঐতিহ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, সেই কারণে ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধির দ্বারা মহৎ শিল্পকে নিন্দিত করার চেষ্টা পাই। সুখের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টণ্ডনের কথা ভারতবাসীদের কেউ কানে তোলেনি এবং তাঁর এই ছেলে-

(ইহার পর ২২৪ পৃষ্ঠায়)

অদ্ভুত একটা চঞ্চলতা পড়ে গেছে ছেলে-মেয়েগুলোর ভেতর; এই যারা আট-নয় বছরের মধ্যে। পাকা-চুল তুলে দেওয়া, পায়ে হাত-বুলোনো, কি পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য যাদের ডাক পড়ে; এই ক'রে যারা দু'পয়সা রোজগার করে।

দু'দিন পরে জ্যেঠামশাই আসছেন।

রোজগার কিছু কিছু প্রতিদিনই আছে অবশ্য. দাদু রয়েছেন, দিদিমণি রয়েছেন; যাঁরা অত বড় নন, তাঁদেরও মাথায় খুঁজে-পেতে দেখলে পাওয়া যায় দু'চার গাছা ক'রে পাকা চুল; তা ছাড়া পায়ে হাত বুলোন, পিঠে সুড়-সুড়ি দেওয়া আছে, কিন্তু সে যা আয় তাতে জুৎ হয় না। ভাগ বসাবে অনেকগুলি। এদিকে দাদুর মাথায় একটা রুটির মতো টাকই মাঝখানে। দিদিমণির পাকা চুল বেড়ে যাচ্ছে বলে টাকের ভয়ে কমই তোলান আজকাল। হাত-বুলোন, সুড়সুড়ি দেওয়ার দিকেই ঝুঁকেছেন বেশি। ওতে পয়সা নেই তেমন। পাকা চুলের একটা হিসাব আছে—দাদু দেন বারোটায় এক পয়সা, দিদিমণি দেন ষোলটায়। আর সবাইও তাই; হিসাবের জিনিস, গুণিয়ে দিলে এসে যায় দাম। সুড়সুড়ি, কি পায়ে হাত-বুলোনয় মুশকিল হচ্ছে, কখন ঘুমিয়ে পড়েন, এতবার সুড়সুড়ি দিয়েছি, কি এতবার হাত বুলিয়েছি সেটা চোখের সামনে ধ'রে দেওয়ার কিছু থাকে না। বাড়িয়েই বলতে হয়; বাড়িয়ে বলছে মনে ক'রে ও'রা কমিয়েই হিসাব করেন। বিশেষ কিছু থাকে না হাতে। এ দুটোর রেটও কম, দাদু, দিদিমণি, অন্য কেউ—সব কুড়িবারে এক পয়সা। আবার বেগার খাটাও আছে; কেন না, "অন্য কেউ"-এর মধ্যে দাদারা আসে না। বলে—পুণ্য উপার্জন করছিস, আবার পয়সা কি? বরং বেশি ক'রে দে, দু'হাতে পুণ্য লুটে যা।

বাইরে থেকে কেউ এলে সে দেয় ভালো। পিসেমশাই, কি মামাদের কেউ, কি মেসোমশাই —এ'রা এলে সুবিধেই হয়, তবে কারুরই চুল পাকা নয়, সুড়সুড়ি কি হাত-বুলোন থেকে যা [illegible] দিন পরে পরে আসেন, কে পড়ায় ফাঁকি দিলে, কে কি দুষ্টুমি ক'রে ফেললে সে-সব দিকে নজর থাকে না তো, কাজেই দয়া-মায়া থাকে একটা। রেটও ভালো দেন, তা ভিন্ন একটু যদি বাড়িয়েই বলা যায় তো মিছিমিছি মিথ্যেবাদী ব'লে কমিয়ে দেন না।

জ্যেঠামশাই এলেন একেবারে অনেক দিন পরে। এমনি-সেমনি অনেক দিন নয়। আজমীঢ়ে থাকেন, সে অনেক দূর। এতদিন পরে এলেন যে টুনী, বাটুল দেখেইনি; হীরু দেখেছিল, তবে মনে নেই; সে তখন মাত্র দেড় বছরের। মনে আছে শুধু রমার, তার বয়স তখন তিন বছর। জ্যেঠামশাই মানেই তো কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু তখন পাকা চুল তোলা হোত না। রমার মনে আছে কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, খেলনা, বাঁশি কিনে দিতেন। এতদিন পরে এখন তো আরও ভালো ক'রে জ্যেঠামশাই হয়েছেন, পাকা-চুল আরও বেড়েছেই নিশ্চয়। যে অমনিই আদর ক'রে খেলনা-বাঁশি কিনে দেয়, পাকা চুল তুলে দিলে, পায়ে-হাত বুলোলে, পিঠে সুড়সুড়ি দিলে সে যে কত কিই না দেবে ওরা ভেবে পাচ্ছে না।...... সে খোঁজও নিয়েছে ভালো ক'রে সবার কাছে; না, জ্যেঠামশাইয়ের টাক নেই মাথায়; একেবারেই নেই।

দুটো দিন যে কী ক'রে কাটল ওদের তা শুধু ওরাই জানে। যতই জ্যেঠামশাইয়ের গল্প শোনে সবার কাছে, ততই ছটফটানি যায় বেড়ে, কবে আসবেন, কখন আসবেন। তারপর মাঝখান থেকে আর এক দুশ্চিন্তা, যেদিন আসবেন সেই দিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির,—জ্যেঠামশাই প্রয়াগে নেমে একদিন কাটিয়ে আসবেন। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল—সর্বনাশ, প্রয়াগ মানেই যে একেবারে মুড়োনো মাথা। দাদু এই তো সেবারে বড় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মুড়িয়ে এলেন, দু'জনেই। তারপর এই তো সেদিন সবাই গেল একসঙ্গে—জগুর ঠাকুরমা আর পিসিমা, হারাণের মা আর জ্যেঠাইমা, সনাতনের বড়দিদি, ফটিকের খুড়িমা; ফিরে এল যেন এক কুড়ি [illegible] মাথায় এক গাছি চুল নেই।

জ্যেঠামশাই আবার এমন সর্বনেশে জায়গায় নামতে গেলেন কেন? কি হবে, কি দেখতে হবে, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আরও একটা দিন কাটাল সবাই। তারপর দিন সকালবেলায় জ্যেঠামশাই এসে উপস্থিত হলেন। বাঁচল সবাই। না, প্রয়াগের ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছেন, এক মাথা চুল। একটু অসুবিধে, কিছু বোধ হয় বাদ যাবে, কানের কাছে আর ঘাড়ের কাছের-গুলো বড্ড ছোট; তাহলেও বাকি যা থাকে, তাতে বেশ দু'পয়সা আসবে সবার হাতে। তবে একটা মুশকিল হয়েছে; জ্যেঠামশাই যেন বড় কি রকম। বেশ মোটাসোটা মুখখানা টকটকে লাল আর এই বড়। কাছে যেতে যেন সাহসই হচ্ছে না। ভেবেছিল মামাদের বেলায় যেমন হয়, ডেকে নেবে কাছে, তারও তো কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর, মুখে একটুও হাসি নেই। এসে বড় দরাজ গলায় গল্প করছেন সবার সঙ্গে—দাদু, দিদিমণি, কাকা, দাদারা; এরা চারজন হাঁ ক'রে রয়েছে কখন একটা হাসির কথা হবে, জ্যেঠামশাই হাসবেন একটু, তা যদিবা হোল দু'বার; সবাই হাসল, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম, জ্যেঠামশাইয়ের মুখ কিন্তু সেই এক রকম। এ-জ্যেঠামশাইয়ের অত পাকা চুল তাহলে আর কি কাজে লাগবে, কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।

এমন সময় এক ব্যাপার হোল।

কাছে তো আসতে ভরসা হচ্ছে না। হীরু, টুনী, বাটুল, রমা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর ভাবছিল কি করে কি হবে;—হীরু আর টুনী দোরগোড়ায়। বাটুল আর রমা জানলার ধারে, জ্যেঠামশাই গল্প করতে করতে একবার ওদের দিকে চেয়ে দাদাদের বললেন,—"তা ওরা ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন বাইরে বাইরে? বৌমা ডেকে নিয়ে খাবার দিন না হাতে।"

সেজকাকা বললেন—"থামো, খাবারের ভাবনাই যেন বড় ওদের কাছে, ওরা এখন যা হিসেব নিয়ে পড়েছে।"

জ্যেঠামশাই হাঁ করে চেয়ে বললেন—"কিসের হিসেব?"

ছোট কাকা বললেন—"তুমি যে মস্ত বড় এক বেসাতি নিয়ে এসেছ মাথায় করে। দেখছ না কি করে চেয়ে আছে সব। ওদের নাকি এখন খাবারের কথা ভাববার সময় আছে!"

জ্যেঠামশাই মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"বেসাতি কি এনেছি? পাঞ্জাবীদের মতন পাগড়ি বাঁধতে হয়ে, তাওতো সেখানেই রেখে এসেছি।"

ছোট কাকা বললেন—"অনেক চুল পাকিয়ে এসেছ যে, পাগড়ি বেঁধে বড়দা। কি রকম চুলের ব্যবসা টের পাওনি তো এখনও। একেকটা চুল দিলে এক পয়সা। নেহাৎ দাঁড়িয়ে নেই চুপ করে কেউ, মাথার কোন্‌খানটায় কি রকম চুল রয়েছে......"

অত গম্ভীর তো জ্যেঠামশাই, হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠলেন যে, সবাই যেন চমকে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না, ওদিককার বাক্‌ গল্প থেমে গেল। ওদের সবাইকে ডাকলেন। তৎক্ষণে লজ্জায় পড়ে ওরা তো লুকিয়ে পড়েছে, দাদারা গিয়ে ধরে নিয়ে এল এক এক করে।

কী চমৎকার যে জ্যেঠামশাই! প্রকাণ্ড কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে একসঙ্গে চারজনকেই আদর করতে লাগলেন।..."আমি কোন্‌টিকে দেখে গিয়েছিলাম সেবার?...এইটিই সেই রত্না না?...কোলে কোলে থাকত।...হ্যাঁগো মা, তা তুমিই তো বুড়ী হয়ে গেছ, আমাকেই পাকা চুল তুলে দিতে হবে যে তোমার।" আবার সেইরকম করে হেসে ওঠেন।..."আর কাকে দেখে গিয়েছিলাম?"...ছোট কাকা বলেন—"ঐ যে, হীরু, যখন গেলে তুমি তখন মাত্র দেড় বছরেরটি তো।"...হাত দিয়ে মাথাটা একটু টেনে ধরে জ্যেঠামশাই চোখ বড় বড় করে বলেন—"আরে, এই নাকি সেই হীরুবাবু?—দেড় বছরের থেকে এমন করে চুপি চুপি সাত বছরের হয়ে গেলে কি করে চিনব? আমি জ্যোতিষ তো এক বছরও বাড়তে পারি নি।"...আবার হেসে উঠে ছোট-কাকার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"পেরেছি বাড়তে?"...রত্না তো বড় হয়েছে, এত হাসি দেখে সাহসও গেছে বেড়ে, খুব চালাক হতে ইচ্ছে হয়ে বলে দিল—"মোটা তো হয়েছেন আপনি।"...সবাই একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল, জ্যেঠামশাই তো মনে হোল যত হাসি পেটের মধ্যে এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলেন সব-গুলোকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন। দিদিমণি কেউ কাউকে মোটা বললে রেগে যান, তার ওপর জ্যেঠামশাই তাঁর ছেলে, কিন্তু ধমক দিতে গিয়ে তিনিও একটু হেসে ফেললেন। টুনী-বাটুলের কথাও জিগ্যেস করে ঐ রকম সব মজার কথা বলে হাসলেন জ্যেঠামশাই, আরও সবাই হাসল, তারপর পকেট থেকে চারটে টাকা বের করে সবার হাতে একটা একটা করে দিয়ে বললেন—"এই নাও, আমি বাপু দাদন দিয়ে রাখছি, খেয়ে দেয়ে সেই গিয়ে বিছানায় শোব, সবাই আসবে, পাকা চুল তুলবে, হাত বুলিয়ে দিতে। যাও, বৌমার কাছে খাবার রয়েছে, খাওগে।"

চমৎকার মানুষ জ্যেঠামশাই, এত আদর ওরা জন্মে আর কারুর কাছেই পায় নি। আর, সব রেটও বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক—পাকা চুল চারটে তুলতে পারলেই এক পয়সা, গায়ে সুড়সুড়ি আর গায়ে হাত বুলোন আটবারেই এক পয়সা। প্রথমদিনেই যে টাকাটা জ্যেঠামশাই দিয়েছিলেন সেটা শোধ হয়ে গেল। কত রাত জেগে এসেছেন, তার ওপর খুব ভালো বসে ওরা সবাই খুব যত্ন করে সেবা করল, পাকা চুল তুলে দিল, একটুর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু সত্যি এত ভালো যে ওরা যখন বলল এতবার করে হাত বুলিয়েছে, সুড়সুড়ি দিয়েছে, এতগুলি করে পাকা চুল তুলে দিয়েছে একবারও দাদু, দিদিমণি কি কাকা-দের মতো বললেন না যে, তোরা মোটে এতবার দিয়ে, এত বেশি করে বলছিস। ছোটদার কাছে ওরা সবাই হিসেবটা করিয়ে নিলে—এত পাকা চুল, এতবার করে সুড়সুড়ি, এতবার হাত বুলোনো, এত করে রেট; একটাকা শোধ। জ্যেঠা-মশাই উঠলে ওরা সবাই দেখাল শ্লেটটা, দেখে দেখে একটু হাসলেন, তারপর বললেন—"বেশ, আবার কাল দুপুরে।"

বেশ রোজগার হোত, তবে ছোটদা শত্রুতা করল। ছোটদা বলে ও হিসেব করে দেবে, তার জন্যে জনাপিছু ওকে আট আনা করে দিতে হবে। ওরা চার আনা করে দিলে, নৈলে আর থাকে কি ওদের? ছোটদা জ্যেঠামশাইকে বলে দিলে—দাদু, দিদিমণি, কাকারা সবাই পাকা চুল গুণিয়ে নেন; সুড়সুড়ি, হাত বুলোন যতবার বলবে তার থেকে দশটায় পাঁচটা করে বাদ দেন; এই বাড়ির নিয়ম, জ্যেঠামশাইও যেন তাই করেন, নৈলে ওরা বড় ফাঁকিবাজ, দুদিনে পকেট খালি করে ছেড়ে দেবে। জ্যেঠামশাই তো সব তাতেই আজকাল হাসেন ঐ রকম করে; বলেছেন—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। ওরা আর ছোটদার কাছে হিসেব করাবে না, সেজবৌদিদি চার আনাতেই রাজি হয়েছে, তার কাছেই করিয়ে নেবে।

সুড়সুড়ি আর হাতবুলোনতেই বেশি পয়সা, সবার ইচ্ছে ঐদিকেই থাকে; কিন্তু মুশকিল হয়েছে অত পা আর অত গা কোথায় জ্যেঠামশাইয়ের? তাই ঠিক হয়েছে দুজন দুজন করে থাকবে দুদিকে। এ দুজনের পাকা চুলের পালা শেষ হলে গায়ের দিকে, পায়ের দিকে চলে যাবে; ও দুজন আসবে চুলের দিকে।

চুলের দিকে আর একটা মুশকিল যে, মাথায় অত পাগড়ি বেঁধেও জ্যেঠামশাই খুব বেশি চুল পাকাতে পারেন নি। তা ভিন্ন দাদুর মতো এক রকমের বড় বড় চুলও তো নয়, কানের কাছে, ঘাড়ের কাছে এত ছোট যে, ধরতেই পারা যায় না ভালো করে। অথচ উপায়ও তো নেই; অমন করে পালা বেঁধে দেওয়া হোল, তুলতেই হবে। চুলের দিকটা নিয়ে সবাইকে যেন একটু মনমরা করে দিয়েছে। ভাবছে সবাই।

আরও ভাবনার কথা হয়েছে, জ্যেঠামশাই রেট খুব ভালো দিচ্ছেন, হিসেবের ওপরও একবার একটু হেসে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তখুনি যা হোক ফেলে দেন, রোজগার ভালোই হচ্ছে, কিন্তু থাকছেন না তো বেশিদিন উনি। শীগ্‌গিরই কলকাতায় চলে যাবেন, তারপর ফিরে দুটো দিনও থাকেন কি, না-থাকেন; তারপরেই আবার আজমীঢ়। সামনেই জন্মাষ্টমীর মেলা, জ্যেঠা-মশাইকে পেয়ে কত মতলব আঁটছে সবাই, কি কি কিনবে, কি করবে; কিন্তু সময় কোথায় আর? খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। বাড়ির অনেকেরও নজর পড়ল। ছোটকাকা প্রশ্ন করল—"হ্যাঁরে, খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তার ওপর রোজগারও করছিস ভালোই, তবু যত ভাবনা যেন তোদেরই ওপর এসে পড়েছে, ব্যাপারখানা কি?"

দুদিন পরে হঠাৎ যেন ভাবটা বদলে গেছে মনে হোল। ছোট কাকারই নজরে পড়ল আগে, সবদিকে তাঁর নজরটাই তো একটু বেশি থাকে। সন্ধান নিয়ে টের পেলেন যে, সবার আয় হঠাৎ বেড়ে গেছে। ছোট ভাইপোকে ডেকে বললেন—"ওরে একটু খোঁজ নিয়ে দেখ্‌তো ব্যাপার কি? এমনি তো বড়দাকে যেমন খুশি ঠকাচ্ছে, তার ওপর আবার হঠাৎ আয় বাড়িয়ে ফেলল কি করে?"

বাপ অডিটর, ছোট ভাই বলল—"সেজ বৌদি ওদের হিসেব করে দেন দাদা, অডিট করে দেখ্‌ব?"

অডিট করে কিছুই পাত্তা পাওয়া গেল না। যেতও না পাওয়া, কারুর ট্রেড সিক্রেট বের করে নেওয়া তো সোজা কথা নয়। তারপর কিন্তু একদিন আপনিই সমস্তটা বেরিয়ে পড়ল।

—সেই পুরনো ইতিহাস, যা নিত্য ঘটছে বাঙালীর ব্যবসায়। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য।

(ইহার পর ২২৩ পৃষ্ঠায়)

* স্বপ্ন সৌধ *

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যাক যাক ভেঙে যাক স্বপন সৌধ স্বপনেরই মতন
মধ্যাহ্নের রুদ্র সূর্যালোকে,
দিবানিদ্রা অপহৃত অতর্কিতে ঘটাল অমন
প্রভঞ্জ ধূলায় দৃষ্টি অপহৃত উন্মীলিত চোখে।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের সীমাহীন শূন্যতা-বাপিধারা
মরীচিকা কাঁপে থরথর,
ভয়ার্ত চিলের কণ্ঠে মহাকাশে উঠেছে কাঁদিয়া
রুদ্ধবেগ খর বায়ু অকস্মাৎ হল বর্বর।

স্বপন-ভাঙা দ্বিপ্রহরে একা বসি ভাবিতেছি মনে
কোন যুগে হয়েছে সকাল,
এ মোর শ্মশান-শয্যা বিরচিনু কখন নির্জনে
মৃত্যু-অবশেষ দেহ আমি আজ বীভৎস কঙ্কাল।

তবু আজ মনে পড়ে এ সৌধের জাগ্রত প্রহরী—
সিংহদ্বারে দাঁড়ায়ে একেলা
দস্যু-তস্করের অস্ত্র রুখিয়াছি—দিবস শর্বরী—
স্পর্ধিত মৃত্যুর ডাক সহাস্যে করেছি অবহেলা।

এ স্বপন-সৌধ কি গড়া কল্পনায় মনের গহনে
ভিত্তি তার শিথিল মৃত্তিকা?
কালচক্রে জয়স্তম্ভ দগ্ধ হবে খাণ্ডব দহনে
দৃষ্টিপথে জেগে রবে
লোক-লক্ষ্মী ভস্ম-ললাটিকা?

খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে যায়
সে সৌধের অভ্রভেদী-চূড়া
কালাপাহাড়ের মুখে হাসি,
স্বর্ণ শস্য ক্ষেত্রময় পরিকীর্ণ কঙ্কালের গুঁড়া
স্মৃতির কঙ্কাল আমি তবু কেন মনে ভয় বাসি!

মাথে বাঁশ ভেঙে যাক, কার 'পরে করি অভিমান
যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে মন,
ভাগ্যবিধাতার হাতে মানুষের একী অসম্মান
ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই—নিরঙ্কুশ বিবেক এমন?

এই ধ্বংসস্তূপে আমি জেগে রব কালের প্রহরী
আগ্নেয় কামনা লয়ে বুকে,
স্বপন-সৌধ জ্বলে যাক শ্মশানের চিতা বক্ষে ধরি
অনাগত ভবিষ্যৎ জেগে থাক আমার সম্মুখে।

সেকালে যখন ঘরে ঘরে প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়া হত, লক্ষ্মীমন্ত হবার কতকগুলি নির্দেশ ছিল পাঁচালীতে। তার অন্যতম হল— 'ক্ষৌর লাগি নাপিতের গৃহে না যাইবে।'

লক্ষ্মী আমাদের প্রতি কতটা বিরূপ হয়েছেন তার হিসেব করা কঠিন, তবে শহুরে জীবনে লক্ষ্মীভক্তির এই নীতি নিঃসংকোচে লঙ্ঘন করে চলেন অধিকাংশ লোক।

যে দুটি এসেনসিয়াল সার্বিসের জোরে আমরা সমাজে বাস করি, কাউকে সমাজচ্যুত করতে হলে সে যুগে সমাজপতিরা যে দুটি বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, তার অপরটি হল ধোপা।

ভদ্রতা রক্ষার সবচেয়ে বড় সহায়ই হল যারা কাপড় ধুয়ে কেচে সাফ করে দেয়। তবুও এই ধোপাই আমাদের সমাজে অস্পৃশ্য, অযাত্রা। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নাপিতের বেটুকু জায়গা আছে, ধোপার তা নেই। তবুও যখন ধোপা দিয়ে কাপড় কাচাতাম তখন তাদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে একটা সহজ প্রীতির ভাব দেখা যেত।

পল্লীজীবনের কথা বাদ দিলাম। এই কলকাতা শহরেই বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁধা ধোপা ছিল। তারা সাত-দিন, দশদিন বা পনর দিন অন্তর এসে ধোলাই কাপড়ের বোঝা নামিয়ে সেই যে বসত, তারপর সুরু করে দিত সুখ-দুঃখের কথা।

কাপড় দেওয়া-নেওয়া করতে অধিকাংশ সময়েই আসত ধোপা নয়, ধোপানী। সাফ পোষাকে আর ক্ষার-খোলে ধোয়া কর্মঠ দেহে এমন একটা চমক লাগিয়ে দিত যে, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে পরিবারের সবাই তাকে আপন জন বলে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করত না।

ঢাকাই শাড়ীই হোক, আর গরদের পাঞ্জাবীই হোক, নিশ্চিন্ত নির্বিবাদে তাকে দিয়ে দেওয়া হত মোট গুনতির হিসেবে। কোন্‌টা সযত্নে সাবান দিয়ে কাচতে হবে, আর কোন্‌টা কাচতে হবে রিঠের জলে, তা বলে দেবার কোন দরকার ছিল না। সে মাথাব্যথা যে কাচবে তার। গৃহস্থ যথাসময়ে ঝকঝকে করে কাচা ও পরিপাটি ইস্তিরি করা অবস্থায় ফেরত পাবে। সুতোর ঘায়ে পাথর বা খেজুর গাছের পাট ভাঙবার ব্যর্থ চেষ্টা করে এ দেশের ধোপা-ধোপানীরা—এমন বদনাম আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত লণ্ড্রী যতই প্রচার করুক না কেন, সেকেলে ধোপা-ধোপানীদের হাতে জামা-কাপড়ের আয়ু যা ছিল তাতে কোন গৃহস্থকেই এ বিষয়ে অপব্যয়ে পড়তে হত না। তিনখানা কাপড় এবং তিনটে জামা হলে অনেকদিন ধরে নিশ্চিন্তে ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলা যেত।

ধোপানীর হাসিতে যতই চমক ও চলনে যতই গমক থাকুক না কেন, তার ব্যবহারে কোন জটিলতা ছিল না। মাঠে-ঘাটে গাছের ডালে ও ঝোপের উপর কাপড় শুকোতে দিয়েও সেগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে আনত তারা। খোঁচা লেগে ছিঁড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখত। দাঁত দিয়ে কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে আসার স্বভাব কোন দিন তাদের মধ্যে দেখিনি। আর শার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে রেখে দিতে হবে এমন ফন্দি তাদের মাথায় আসেনি। এক-আধটা বোতাম যদি বা ছিঁড়েছে বা ভেঙেছে, সেটাকে যত্ন করে লাগিয়ে নিয়েই ফেরত এনেছে। আধুনিক শিল্পবোধ তখনো জাগেনি তাদের মধ্যে, তাই গরম ইস্তিরির দাগে জামা-কাপড় বিচিত্রিত করে দেওয়ার প্রয়াস তারা পায়নি কখনো।

তা বলে কোন দিন কোন জামা-কাপড় ছেঁড়েনি, পোড়েনি বা খোয়া যায়নি, তা নয়। কিন্তু সে অবস্থায় ধোপানী খবরটা যেদিন নিয়ে এল তা নিবেদন করল সভয়ে চোরের মত। ধমকে বললাম, দাম কেটে নেবো, চাইকি, কিছু জরি-মানাও দিতে হবে তোকে। মুখ কাচুমাচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন শাস্তিটা সে ন্যায্য বলেই মেনে নিচ্ছে। বর্ষাবাদলা ও অন্যান্য দুর্যোগে কাপড় দিতে অপরিহার্য বিলম্ব ঘটলে যখন তিরস্কার করেছি, হেসে বলেছে, আমাদের কথা কি দেবতা শোনে? গরীবের, ছোট জাতের কথা? আপনারা বললে শুনবে।

সে সব দিন কবে ফুরিয়ে গেছে। ধোপা-ধোপানীরা লণ্ড্রীর মারফত কাপড় কেচে গৃহস্থের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আর আমরাও লণ্ড্রীর হাতে কাপড়-জামা তুলে দিয়ে আধুনিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করছি। আধুনিক লণ্ড্রীগুলির মধ্যে যারা খুব বড় প্রতিষ্ঠান, দোকান দেখলে পাড়াগেঁয়ে লোক ঢুকতেই সাহস পায় না। তাদের ধোলাইয়ের কাজও নাকি আবার বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞানের ও পরমাণুর উপাসনার যুগে বাস করে কাপড়-জামা কাচানোর ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্মত বলে প্রতিভাত হবার চেষ্টা না করলেই বা সমাজে মুখ দেখাব কি করে!

তা ছাড়া, সেখান থেকে যখন কাপড় জামা কেচে আসে তখন সুদৃশ্য ছাপা প্যাকিং পেপারের পরিপাটি মোড়কে সুতো দিয়ে সুন্দর করে বাঁধা থাকে। দোকানে যিনি লেনদেন করেন তিনিও ভদ্রলোক, শুধু জাতেই নয়—মেজাজেও। আপনার আমার কোন কথা কোন নালিশ তিনি শুনতে নারাজ, কারণ তিনি কোম্পানীর সার্ভেন্ট হলেও আপনার আমার কোন জোর নেই তাঁর উপর। বরং আপনিও ভদ্রলোক, তিনিও ভদ্র-লোক। কাজেই আলেকজান্দারের কাছে পুরু যেমন ব্যবহার দাবী করেছিল, তাঁরাও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে তাই দাবী করেন। অবশ্য তাই বলে তাঁদের মিনিয়ানদের প্রতি তাঁদের ব্যবহার কেমন তা যেন জানতে না চান। শপ অ্যাসিস্-ট্যাণ্ট হলো ভদ্র ক্লাস, আর ধোপা ছোটলোক।

বিজ্ঞানসম্মত লণ্ড্রীর কাজের ধারা চক্ষে কখনো দেখিনি, তবে পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ এবং স্রষ্টা দেখে সৃষ্টি কল্পনা করার যে পদ্ধতি আছে সেই অনুসারে বহুবার চোখ বুজে তা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই বর্ণনাটা একটু শোনাবো আপনাদের :

জামা-কাপড়গুলি প্রথমে ভাগ করে ফেলা হয়, তারপর একজন বিশেষজ্ঞ সেগুলিতে কিছু এ্যাসিড ছিটিয়ে দেন। তারপর সেগুলি চলে যায় রঙ ঘরে, সেখানে জামা-কাপড়ের নিজস্ব রঙের বিপরীত কোন রঙ এখানে সেখানে মাখিয়ে দেওয়া হয় শিল্পের এক অতি আধুনিক রীতি অনুসারে। এবার গেল মেশিনগানের কামরায়, ফটফট গুলী ছুঁড়ে এক মিনিটে একশো জামায় একাধিক ফুটো করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে। তারপর যন্ত্রে বাহিত হয়েই সেগুলি চলে গেল সংলগ্ন একটা কুঠুরিতে। এখানে জামার হাতা এবং শাড়ীর পাড় ছেঁড়ার জন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে।

এরপর শার্ট কোট পাঞ্জাবীগুলোকে পাঠানো হল একটা প্রেস মেসিনে, নিদারুণ চাপ দিয়ে এক সেকেণ্ডে সব কটা বোতামকে এমন অবস্থায় পরিণত করে দেবে, যাতে একবার হাত চাপিয়েই একসঙ্গে সব কটা বোতাম ছিঁড়ে ফেলা যায়।

এই বোতাম ছেঁড়াটা অবশ্য হাতের কাজ এবং তার জন্য বিশেষ হিসেব রাখতে হয়। কারণ এখানে বিশেষজ্ঞের দরকার এবং তার মজুরীও বেশী। বোতাম ছেঁড়ার কাজ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। যে কোন পদার্থে তৈরী এক সারি বোতাম ফটপট ছেঁড়া কি হাত না পাকালে এমনিতে হয়! কারণ যতই তাড়াতাড়ি করুক একটাও বোতাম থেকে গেলে চলবে না। আরও আধুনিক ব্যবস্থা যে সব লণ্ড্রীতে করতে চায় তারা মাস্টার্ড গ্যাস, টিয়ার বম্ব, এমন কি অ্যাটম স্ম্যাশারও ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে।

বোধ হয় রেডিও অ্যাকটিভিটিও প্রয়োগ করে কোন কোন লণ্ড্রী; নইলে যে কাপড় দেখতে দিব্যি ধোপ ও শক্ত মনে হবে, বসা অবস্থা থেকে উঠবার সময় অংশ বিশেষ মাঝে মাঝে আসনেই থেকে যায় কেমন করে?

শার্ট কোটের কলার সম্পর্কেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে নিশ্চয়ই। তবে কলারের গাঁটা ফাটিয়ে দেওয়া হবে বা শেষ সীমান্তে আঁশ বার করে দেওয়া হবে, আসল প্রক্রিয়াটা নির্ভর করে তারই উপর। অধিকাংশ লণ্ড্রীই এক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখে : কোন শার্ট পাঞ্জাবী যেন একবার, বড় জোর, দুবারের বেশী কাচবার প্রয়োজন না হয়। যদি অগত্যা কোনটা তৃতীয়-বার বা পরেও এসে যায়, তখন সেটাকে মর্গ-ঘরে চালান করা হয়। টুকরো টুকরো করে তারপর ঢাকঢুকি দিয়ে 'ড্যামেজড' মার্কা করে মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক পদার্থ যদি সেকেলে ধোপা-ধোপানীদের থাকত তাহলে [illegible]

(ইহার পর ২২৩ পৃষ্ঠায়)

চাকরি খাওয়ার জন্য যেন হাঁ করে রয়েছে সব সময়।

স্বামীর কাছে তিনি সব শুনেছেন তো। হেন দিন নেই, যেদিন কারও না কারও চাকরি খাচ্ছে। আর মুখ কি খারাপ। থানায় যখন টুরএ আসে, একেবারে থরহরিকম্প লাগিয়ে দেয়। ছোট নেই, বড় নেই, সবার সম্মুখে গালাগালি দেয় থানার দারোগা কনস্টেবলদের।

দারোগাগিন্নীর খাওয়া-দাওয়া মাথায় চড়ল। হুঁকোয় টান মারতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন।

মিনিট পনর বিশ পরে দারোগাজী যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আর তাঁকে প্রশ্ন করতে হল না। নিজে থেকেই বললেন। তখনই তাঁকে বার হতে হবে, নালিশটার সরেজমিনে তদারক করতে; ধরাচূড়া পরতে যেটুকু দেরী..... *ভোখরাহার সাঁওতালটোলায়, একটা বাপ ছেলেকে কেটেছে কুড়ুল দিয়ে।*

"অন্য কোন গণ্ডগোল নেইতো এর মধ্যে?"

"মনে তো হচ্ছে না। তবে এখন কে বলতে পারে! কিছু বিশ্বাস নেই আজকালকার পুলিস সাহেবকে।"

সংক্ষেপে কথা। এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ বোধহয় এ কথার মানে ধরতে পারবে না। নতুন পুলিস সাহেব দারোগাদের কর্মতৎপরতা পরীক্ষা করবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা করছেন, এই রকম একটা গুজব রটেছে পুলিস মহলে।

...নিশ্চিন্দি আর নেই, এই পুলিস-সুপারের জ্বালায়। আগেকার কালে যখন সদর থেকে থানায় আসবার পথঘাট খারাপ ছিল, তখন দারোগাগিরি ছিল আরামের চাকরি। আগে থেকে খবর না দিয়ে সাহেবের আসবার উপায় ছিল না। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। পিচের রাস্তা, মোটর গাড়ী, —মেমসাহেবকে নিয়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বার হবার খরচও গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে নেওয়া যায়, থানা "ইন্সপেকশন" করে! এ সাহেবটা আবার কাউকে বিশ্বাস করে না। এর বদ্ধমূল ধারণা যে, প্রত্যেকটা দারোগা, থানায় বসে বসে মিথ্যা ডায়েরি লেখে—পারতপক্ষে সরেজমিনে যেতে চায় না!

"জয় মহাবীরজী!"

সাইকেল নিয়ে কোয়ার্টার থেকে বার হলেন রামভরোসা প্রসাদ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাতে খাওয়ার আগেতো ফিরবই; সে আর বলতে!"

বাড়ীর আরামটুকুর উপর লোভই তাঁর চাকরিতে কাল হয়েছে। স্নানের আগে তেল মাখিয়ে তাঁকে আধ ঘণ্টা ডলাই-মলাই পর্যন্ত করে দেন তাঁর স্ত্রী নিজহাতে। তাঁর সততার কথাটাও যেমন তাঁর ডিপার্টমেন্টএর প্রত্যেকের জানা, তেমনি তাঁর আরামপ্রিয়তার কথাটাও।

গত মাসে পুলিস সুপার যখন তাঁর বিরুদ্ধে "প্রসিডিংস" এনেছিল, তখন স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, কুঁড়ে লোক সে পছন্দ করে না পুলিস বিভাগে; তার চেয়ে নিজের কাজটি করে দুপয়সা ঘুষ খাওয়া অনেক ভাল। পুলিস সুপার অবশ্য শোনা কথার উপর নির্ভর করে এ মন্তব্য করেননি। তিনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন উপরওয়ালার কাছে।

[illegible]

জলযোগ — মুকা ঘোষ
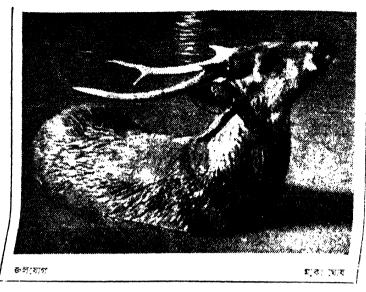
ভোখরাহা থেকে খবর এল খুন-জখমের "কেস"এর। খবর এনেছিল সহদেও সিং—ভোখরাহার পুরণ সিংএর ছেলে। পুরণ সিংএর নাম সব দারোগার জানা। এক কালের দাগী আসামী—এখন বলে চাষবাস করে খায় —কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে কথা। কেননা, খরচ অবস্থা অনুপাতে অনেক বেশী; আলাপ পরিচয়ও চোর-ডাকাতের সঙ্গেই। নানা রকম গুজব শোনা যায় তার সম্বন্ধে; কিন্তু খোলাখুলি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে লোকে ভয় পায়। সেই বুড়ো পুরণ সিং জখম হয়েছে—খবর এনেছিল তার ছেলে; কোথায় কোন্ গ্রামে একজন দাগী চোর জখম হয়েছে; তার জন্য এই অন্ধকার রাত্রিতে এগার মাইল সাইকেলে যাওয়া এ জিনিস রামভরোসা দারোগার কোষ্ঠীতে লেখেনি। তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেননি—বলে দিয়েছিলেন, পরের দিন যাবেন তদন্ত করতে। পরের দিন ভোখরাহাতে গিয়ে দেখেন যে, পুলিস সাহেব তাঁর আগেই হাজির হয়েছেন সেখানে। সহদেও সিং রাত্রেই থানা হয়ে সাহেবের কাছে গিয়েছিল শুনে সাহেব নিজে ছুটে এসেছে। তাঁকে দেখে সাহেব গ্রামের লোকজনের সম্মুখেই স্বাগত সম্ভাষণ করেছিল—"এতক্ষণে নবাব সাহেবের সময় হল?" তারপর নিজের গাড়ীতে করে সংজ্ঞাহীন পুরণ সিংকে নিয়ে গেলেন সদর হাসপাতালে ভর্তি করবার জন্য।

এর পরই হয়েছিল দারোগাজীর বিরুদ্ধে "প্রসিডিংস"। তখন তিনি জানতে পারেন যে, পুরণ সিং হচ্ছে পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের খাস বাহাল করা গুপ্তচর। সব থানায় এরকম "স্পাই" আছে। কি খবর দেয়, কত টাকা পায় সে শুধু জানে পুলিস-সাহেব। থানার দারোগা পুলিস এদের নাম পর্যন্ত জানতে পারে না। এরা প্রায়ই চোর-ডাকাতদের দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা লোক। তবে দারোগা পুলিসের বিরুদ্ধে খবর কিছু কি আর দেয় না পুলিস সাহেবের কাছে? তাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হয় চোর-ডাকাতের কাছেও আজকাল—কে জানে, [illegible] আবার কিনা! ওই ঘটনার পর এ থানা থেকে তাঁকে বদলি করে দিলেও তিনি বাঁচতেন!.....সাইকেলে যাবার সময় পথের দুধারের লোকরা দারোগাজীকে আদাব করছে; তিনি তাদের মুখের দিকে তাকাতেও পারছেন না; এরা সবাই জেনে গিয়েছে যে, পুলিস সাহেবের চোখে তাঁর কদর কানাকড়িও না। পুরণ সিংএর পরিবারের খাতির [illegible] দারোগাজীর চেয়েও বেশী। [illegible] চেষ্টা করুন, একটা [illegible] তাঁর মনে, এই পুরণ সিংএর কাণ্ডটার পর থেকে।

ভোখরাহার কাছাকাছি এসে গেলেন এতক্ষণে। সারাটা পথ পুরণ সিংএর কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছেন। গ্রামে ঢুকতে হয় রাজপুতটোলার মাঝ দিয়ে। সাঁওতালটোলা এখান থেকে মাইলখানেক দূরে একটা ছোট নদীর ধারে। রাজপুতটোলায় [illegible] সরু রাস্তার ধারে একটা সরকারী ইঁদারা [illegible] জল পড়ে পড়ে সেখানকার রাস্তায় এক হাঁটু কাদা [illegible]। এরই এক পাশের সরু শুকনো জায়গাটুকু দিয়ে [illegible] সাবধানে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে গেলেন। ইঁদারাটার অন্যদিকে পুরণ সিংএর বাড়ী। বাড়ীর সামনের [illegible] সেই কাণ্ডটার দিন পুলিস সাহেব ঘোড়া থেকে নেমেছিলেন। এই জায়গাটিতেই দারোগাজীর মান ইজ্জত ধূলোয় লুটিয়েছে।...প্রাণপণ চেষ্টায় সেদিকে না তাকিয়ে, তিনি এগিয়ে গেলেন। ভোখরাহাতে ঢোকবার মুহূর্ত থেকে তাঁর সঙ্কুচিত ভাবটা আরও বেড়ে গিয়েছে। গাঁয়ের লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে, 'আদাব হুজুর' করছে করছে।..... বিদ্রূপ নয়তো?

সাঁওতালটোলাতে একটা বাড়ীতে ভিড় দেখে সেখানে নামলেন দারোগাজী। সাঁওতালরা তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিরসা মাঝির বউ চিৎকার করে কেঁদে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

"ও দারোগা, দেখ একবার কি করেছে! তিন মাসের দুধের ছেলে! আহা রে! কুড়ুল

(ইহার পর ২১৭ পৃষ্ঠায়)

ভূত আপনারা দেখে থাকবেন, আমি কখনো দেখিনি। আমি অবশ্য সেই ভূতের কথাই বলছি, লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে যে ভূত মানুষের পাশাপাশি বাস ক'রে আসছে।

দেখিনি, কিন্তু তাকে আমি চিনি। না দেখলেও, তার পরিচয় সবার মুখস্থ। রবীন্দ্রনাথ ভূত দেখেননি, কিন্তু ভূত চিনতেন। তাঁর গল্পের নায়ক ভূতের পাল্লায় পড়েছিল। তিনি ভূতের সঙ্গে কেষ্টার চেহারার তুলনা ক'রেছেন।

ভূত দেখা নিয়ে সংসারে দু'টি দল আছে। একদল ভূত অতি সহজে দেখে, আর একদল আদৌ দেখে না। একদল লোক বরাবর ভূতের পক্ষে, আর একদল লোক কোনোদিনই ভূত মানে না। একদল লোকের কাছে ভূত কৌতুক, আর একদলের কাছে ভূত বিভীষিকা। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় ও পরশুরামের যাবতীয় ভূত কৌতুক ভূত। কিম্বা তারা এককালে বিভীষিকা ছিল, এঁদের হাতে পড়ে কৌতুকীভূত হয়েছে।

ভূত যারা দেখে না, তারা প্রায় সবাই অবিশ্বাসী। ভূতে যাদের বিশ্বাস নেই, সাধারণের বিচারে তারা নাস্তিক। অর্থাৎ ভগবানকে মানতে হ'লে ভূতকেও মানতে হবে। আরও সহজ ভাষায় : যারা ভূত মানে, ধ'রে নেওয়া যায় তারা ভগবানকেও মানে। তার কারণ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে মানা চলে না। ভগবান ও ভূতের মধ্যেকার সাঁকোটি সামান্য দীর্ঘ। ওটিকে জোড়াসাঁকো বলাই ঠিক। ভূতের সীমা ও ভগবানের সীমা জুড়ে আছে ডবল লাইন। মাত্র দশ জন লোক চক্রান্ত করলেই ভগবান ভূত হয়ে যান। অর্থাৎ ভূতের দলে মিশে পড়েন। প্রাচীন প্রবাদ : দশচক্রে ভগবান ভূত।

ভূতের সাধারণ পরিচয় হচ্ছে : দেহমুক্ত এমন একটি প্রেত, যা ইচ্ছে করলেই প্রেতদেহরূপে দেখা দিতে পারে, যদিও সাধারণ লোকের কাছে তা প্রীতিপ্রদ নয়। মাত্র বিশেষ এক জাতীয় সাধকের কাছে প্রেতমাত্রেই অভিপ্রেত।

মানুষ মারা গেলে তার আত্মা শূন্যে ঘুরে বেড়ায়—এ-বিশ্বাস অনেক দিনের। ভূত দেখা লোকের দেখাও পৃথিবীর সব দেশে মিলবে। এদের সংখ্যা কম নয়।

কিন্তু আমি বুঝতে পারি না মানুষের দেহ ভূত হয় কি ক'রে। কারণ যে মানুষ মারা গেছে, ভূত তার পরিচিত দেহেই দেখা দেয়। এই দেহ সে পায় কোথায়? হয়তো আত্মা ভূত হলেও ভৌতিক বস্তুরও ভূত হওয়ার সম্ভাবনা একটা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাইকেলে চলা মানুষ ভূতের সাইকেলও ভূত এবং যে জামা-কাপড় পরে মানুষ ভূত দেখা দেয়, সেই জামা-কাপড়ও ভূত। মানুষের দেহের মতো সাইকেল, জামা, কাপড় প্রভৃতি ভৌতিক বস্তুরও ভূত হওয়ার কোনো সহজ উপায় অবশ্যই আছে, আমি ঠিক জানি না। হয়তো অপঘাত মৃত্যুতে সব বস্তুই ভূত হয়, অথবা, বিকল্পে, সব বস্তুরই আত্মা আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেসব বিলিতি কাপড় পোড়ানো হয়েছিল, সেসব কাপড় অবশ্যই ভূত হয়েছে। (তবে তারা স্বাধীনতার পরেও এ-দেশে আছে কিনা জানি না।) যেসব সাইকেল বা রেলগাড়ি দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়েছে, তারাও অবশ্যই ভূত হয়েছে। বিমান, জাহাজ, নৌকো সবারই ভূত আছে। তবে সুবিধে এই যে, এ-সব জড় ভূত মানবীয় আত্মিক ভূতের চালনা ভিন্ন চলতে পারে না। মানবীয় ভূতের পোষাক পরার দরকার হলে পোষাকের ভূত গায়ে জড়িয়ে নেয়, সাইকেলে চড়তে হলে সাইকেলের ভূতে চড়ে বেড়ায়। আত্মিক ভূত ও জড় ভূতের এই আত্মীয়তা, আত্মা ও জড় দেহের আত্মীয়তার সঙ্গে তুলনীয়। বেশি ভাবতে গেলে ভয়ে জড়সড় হতে হয়। মনে করুন, একখানা সাইকেল ভূত বিনা আরোহীতে আপনার সামনে দিয়ে ক্রিং ক্রিং করতে করতে ছুটে চলে গেল, কিংবা একখানা কোঁচানো শাড়ির ভূত আপনার নাকের কাছে এসে ঝুলোচ্ছে—তাহলে আপনার সমস্ত আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করেও আপনার ভৌতিক দেহটাকে ভাইব্রেশনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না।—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, জড় ভূত সাধারণত তা করে না। শুধু ম্যাকবেথ একবার শূন্যে ছোরার ভূত দেখেছিল, জানা যায়।

কিন্তু জড় ভূত কেন দেখা যায় না, মাঝে মাঝে এর সদুত্তর পেতে ইচ্ছে করে, মনে হয়, ভূতকেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কোথায় ভূত? আজ পর্যন্ত কারো দেখা পেলাম না। অথচ এই বাংলাদেশেই যে কত ভূত আছে, তার হিসেব নিলে সেন্সাস কর্তাদের মাথা ঘুরে যাবে। যারা ভূত দেখেছে, তাদের নাম ছাপা হওয়ার যদি কোনো সুযোগ করে দেওয়া যায়, তাহলে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে এই বাংলাদেশেই। এই কনফেশনের জন্য পুলিসের চাপ দরকার হবে না। অপরাধীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাম লিখিয়ে যাবে। আমার মতে অপরাধী ভিন্ন অন্য কাউকে ভূতেরা দর্শন দেয় না। আত্মপ্রচারে উৎসুক ভূতেরা এই-ভাবেই কার্যসিদ্ধি করে থাকে।—অন্য কথায় ভূত দেখাই একটি অপরাধ।

তাতেই বলেছি বাংলাদেশে ভূতের সংখ্যা খুবই বেশি। অতএব পুলিস দিয়ে নয়, কর্তাদের ভূতদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা। বিনা লাইসেন্সে কাউকে দেখা দিতে পারবে না, এমন কড়া আইন হলে দেশের আয় বৃদ্ধির একটা পথ খুলে যাবে। সকলেই জানেন, একমাত্র মৎস্যভুক ভূত ভিন্ন অন্য কোনো ভূতই ভিক্ষে করে খায় না, অর্থাৎ তাদের যথেষ্ট আয় আছে এবং সে আয়ের উপর সহজেই ট্যাক্স ধরা যায়।

ভূত-বিশেষজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূতদের একটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ভূতের প্রধান বৃত্তিই সেইটি, অর্থাৎ ভূত হওয়ার সেটি প্রধান শর্ত। তাঁর এক ভূত বলছে—"তোমরা কিছুই জান না, লোকে বলে অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও, অমুকে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।'"

রূপসী কন্যার পিতা মাধব বিশ্বাস
ফেলিতেছে ক্ষণে ক্ষণে গভীর নিঃশ্বাস;
সর্বান্তঃকরণ তার ভাবনাকাতর......
কি করি কোথায় যাই কোথা বাঁধি ঘর
আবার নূতন করি ঘুরে' ঘুরে' ঘুরে'
বন্ধন কেটেছে হতে দূরে, বহু দূরে;
আপন ইচ্ছায় ধরা ছুঁড়ে দেছে তারে—
আবার সে দিতে চায় ঠেলে অন্ধকারে—
একবার হোয়েছিল মনে ঠিক তার......
উচ্ছেদ বন্ধন মাঝে প্রতিষ্ঠা আবার
লভেছে সে, কিন্তু তাহা সত্য নহে নহে—
মৃত্তিকায় বসে নাই, পড়িয়াছে দহে।
তুলনা আপনি এল; মনে হোলো তার
কর্মে মর্মে এক বস্তু এপার ওপার;
কোথাও পার্থক্য নাই—কোনো ভেদ নাই,
কেবল এ দেয় বলি, ও করে জবাই।
একদিন ছিল বাস পদ্মার ওপার—
ছিল শান্তি স্বচ্ছলতা সজীবতা তার,
অতর্কিতে রক্তচক্ষু অনেক মানুষ
করে দিল দিশেহারা আতঙ্কে বেহুঁশ—
করল না হত্যা তবে যত অপমান
করিল তা' দুর্বিষহ মৃত্যুর সমান—
দলবদ্ধ হয়ে এল ঘরে গেল ঢুকে—
লুণ্ঠন করিল বস্তু তাল ঠুকে ঠুকে';
ক হল...ভুলিয়া যাও, হিন্দুর সন্তান,
হিন্দু তুমি—আজ হতে অ-মুসলমান......
বলিতে বলিতে এক নবীন যুবক
কহিল সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী ও সেবক
হই আমি ভারি ইচ্ছা। বলে মেয়েটার
হাত ধরে টেনে নিল খুব কাছে তার...
নূরমেহেরু বিবি নাম, ভারি মিষ্ট নাম—
আমি ভালবেসে সেই নাম রাখিলাম;
যাবে না আমার ঘরে? রাখিব আদরে—
ভাল সজ্জা, ভাল খাদ্য পাবে মোর ঘরে...
বলিয়া যুবক তার কাঁধে রাখি হাত
হাসিতে লাগিল খুব ঘাড় করি কাত।

আতঙ্ক পাণ্ডুর মুখে কাঁপি থর থর
লুটায়ে পড়িল কন্যা মাটির উপর...
ষোড়শী রূপসী কন্যা মৃতের মতন
রহিল অসাড় হয়ে। হাসি বিলক্ষণ
কহিল দ্বিতীয় ব্যক্তি...সবুর সবুর—
যাচিয়া আসিবে কাছে নহে বহুদূর
সেইদিন। উপোষের তৃতীয় দিবসে
আসিবে ভাতের লাগি আমাদেরি বশে।
বলে তারা চলে গেল পরম উল্লাসে
করিয়া আনন্দধ্বনি কৃত সর্বনাশে
মাধব পালালো রাত্রে লয়ে পরিবার
মাটির নীচেয় দিত্ত যাহা ছিল তার,
আঁধার জঙ্গল কাটা পার হ'য়ে হয়ে
আকণ্ঠ শুকায়ে ধরা পড়িবার ভয়ে
আসিল আশ্রয়ে, এক অ-মুসলমান
দিলেন একটা দিন তাহাদের স্থান।
তারপর আসিল সে মনুষ্য সমাজে—
মহানগরীর পথে প্রজারণ্য মাঝে।
বহুকষ্টে পেয়ে গেল করিয়া সন্ধান
উদ্বাস্তু পল্লীতে পেল চারকাঠা স্থান—
কুটীর নির্মাণ করি বসিল মাধব—
খরচ কুলাতে গেল সোনা প্রায় সব;
স্থানটা লাগিল ভাল—অজস্র কুটীরে
বৃহৎ পল্লীটি গড়ি উঠিতেছে ধীরে......
নিশ্চিন্ত হইল মন—গঠিত আশ্রয়
যত ক্ষুদ্র হোক তাহা ভাঙিবার নয়—
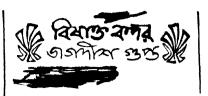
চিরদিন থাকা যাবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে—
গলি চাপা পল দুঃখ যত দুঃখদয়ে—
ছাড়িয়া এসেছে দেশ, অপমান তার
আর না জাগাবে প্রাণে ত্রাস হাহাকার।
আর কেহ বলিবে না, ওহে তুমি ওঠো—
তল্পি ঘাড়ে লয়ে পথে পদব্রজে ছোট।
মুক্ত বায়ু, মুক্ত আলো করিয়া সেবন
প্রাণশক্তি বেড়ে যাবে পাব সঞ্জীবন;
প্রতিবেশী সহ রাখি অটুট সম্ভাব
চলিতে হইবে নিত্য; মনুষ্য স্বভাব
বিচিত্র নিশ্চয়; হবে সবাই দরদী
সহিষ্ণু শুভানুধ্যায়ী, সদা নিরবধি
আশা তা যায়না করা; তবু ভালবেসে
টানিতেই হবে কাছে ভদ্রভাবে হেসে।
ছাগল খাইবে গাছ, গরুর উৎপাত
সহিয়া যাইতে হবে না তুলিয়া হাত...
ছয়মাস পরে এল দোলের উৎসব,
চঞ্চল হইল পল্লী—মহা কলরব—
দুলিয়া হইল শুরু খেলা ছোটদের—
রং নিয়ে পথে ঘরে ছড়াছড়ি ঢের;
বড়রা আবীর নিয়ে আসিল বাহিরে—
গাহিল কৃষ্ণের গান গলা চিরে চিরে;
দোবিল পুরুষোত্তমে ওই পদ্ধতিতে
যার যার সাধ যেন চাহে না মিটিতে।
কুকাজ নহে তো এটা—দুরন্ত আকারে
শাশ্বত সুখের বাক্তি আঁধারে আঁধারে।
উৎসব জমিল ভারি মোটের উপর।—
আনন্দ ইয়ত্তাহীন রসালো খবর,
মনে মনে যোগদান করিল মাধব—
নীরবে করিল দোল দেবতার স্তব...
হে কৃষ্ণ করুণাময়, পায়ে রেখো দাসে—
দিন যেন যায় প্রভু আরামে বিশ্বাসে;
যেন কেউ আসে নাকো দিতে দাগা ব্যথা,
ভুলে যেন যেতে পারি অতীতের কথা;
হলেও নগণ্য আর অ-মুসলমান
থাকে যেন আপনার স্ত্রী কন্যার মান।
জগৎ রক্ষক তুমি, আমার জগৎ
দেয় যেন মোরে সুষ্ঠু বাঁচিবার পথ—
বজায় থাকিতে চাই, রাখ হে বজায়—
বুকে কর অবস্থান—প্রণাম তোমায়।
পরম পুরুষে করি এইরূপ স্তব
থলে নিয়ে চলে গেল বাজারে মাধব।
হৃষ্টচিত্তে তুষ্ট করি বালকে যুবকে
নানাবিধ রঙ লয়ে আপাদ মস্তকে,
ভিজায়ে কাপড় জামা সর্ব অবয়ব
ফিরিল বাজার লয়ে প্রসন্ন মাধব।
চারিদিকে দোললীলা অপূর্ব রঙিন—
আজ কি আনন্দ, আজ ভারি শুভদিন!
চারিদিকে কি আনন্দ কত না উৎসাহ,
কারো মনে নাই যেন কাতরতা দাহ!
এমনি কোমল আর সুখী স্নিগ্ধ মনে
প্রবেশি কুটীরে তার পড়িল নয়নে
শোকের মূর্তিটা যেন দেখিল মাধব,
দেখিল করিল সারা প্রাণে অনুভব...
স্ত্রী কন্যা শোকাভিভূতা, সজল নয়ন—
রয়েছে বসিয়া যেন নাহিকো চেতন—

সারা অঙ্গে রঙ ঢালা পত্নী কমলার—
জলো রঙে ভিজে গেছে সম্মুখটা তার;
কন্যাটির মুখখানা রঞ্জিত আবীরে—
ভেসে গেছে গণ্ডযুগ নয়নের নীরে।
মাধব অবাক হোলো—মনে হোলো তার......
এই কাণ্ড করে গেছে মেয়েরা পাড়ার—
পাড়ার আমোদপ্রিয় কন্যা ও বধূরা
ঢেলে দিয়ে গেছে রং জলীয় ও গুঁড়া—
দুঃখের কি আছে তা'তে! দোলের এদিন
রং না থাকিলে দেহ দেখায় শ্রীহীন;
কাপড় হয়েছে মাটী—ক্ষতি সেটা নয়
এমন কিছু যে চক্ষু হবে জলময়।
কহিল...বলতো এই কান্না এল কিসে—
নির্জীব নিস্তেজ যেন জর্জরিত বিষে!
এসেছিল বুঝি ঢের প্রতিবেশী মেয়ে,
রং ঢেলে কাপড়ের মাথা দেছে খেয়ে...
মুছিয়া চোখের জল কহিল কমলা...
না, তা' নয়, সব কথা যাবে নাকো বলা—
তুমিতো ছিলে না ঘরে দেখনি ব্যাপার
শুনে তুমি বুঝিবে না একাংশও তার;
এখানে ছিলাম বসে, ঈশানী উঠনে
অদূরে দাঁড়ায়ে ছিল আপনার মনে—
সহসা ছুটিয়া এল জন দশ বার
পাড়ার যুবক—হাতে পিচকারী কারো,
কারো হাতে থলে ভরা আবীর প্রচুর—
টলিতেছে সারা দেহ চণ্ডে ভরপুর;
বহালো আমার গায়ে রঙের প্লাবন
বালতি উপুড় করি যণ্ডা তিনজন
ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে ঈশানীর পানে—
ঈশানী দাঁড়ায়ে ছিল কাছেই উঠানে
আতঙ্ক পাণ্ডুর হয়ে, হয়ে জড়সড়
তিনজন মিলে তারে শাস্তি দিল বড়।
বুঝাতে পারিব নাকো, বুঝিবেও কম,
সেই ক্ষিপ্ত পৈশাচিক প্রচণ্ড উদ্যম
গাত্র স্পর্শ করিবার—তাদের একটি
বাঁ হাতে বেড়িয়া ধরি ঈশানীর কটি
কাছে টেনে নিল তারে—মাংসাশী কুকুর
যেমন লোলুপ হয়ে ক্ষুধা করে দূর
ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খেয়ে তেমনি করিয়া
আবীর মাখালো তারে—কপাল ভরিয়া
দিল, দিল দুই গালে, চিবুকে ও কানে—
দুহাতে বুলায়ে দিল আরও নানা স্থানে,
সারাটি মাথায় পিঠে। তারপর তারা
চলে গেল, রহিলাম হয়ে বাক্যহারা—
ঘটনা ঘটিয়া গেল একটি নিমেষে—
শোন বেগে চলে গেল, শোন বেগে এসে।

এর আগে এসেছিল চিঠি একখানি :
"বড় ভালবাসি তোরে সুন্দরী ঈশানী,"
লেখাপড়া শিখি নাই ভবঘুরে আমি,
তথাপি হইতে চাই তোর প্রিয় স্বামী;
জাতিতে নিকৃষ্ট মত লাঙল বাহক,
তবুও রমণী রত্ন পেতে ভারি শখ,
মা বলে ; সরে যা, সর। মর জোড়া ঢেঁকী
বাবা বলে, দাঁড়াও তো জুতো মেরে দেখি
আক্কেল গজায় কিনা, পায় কিনা থই
কুড়োমির, বজ্জাতির ওষুধ জুতোই।
তবু আছি আরামেতে রাখিব আরামে,
সোনাটা লক্ষ্মীটি আয়, বসে পড় বামে।
আশা করি গুপ্তভাবে দেখা তোর পাব—
নাম নাই লেখা আছে শুধু একটা—"ব"।

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥

জাতি গঠনের মূলে আছে কোন বৃহত্তর ঘটনা, অথবা কোন মহত্তর আবির্ভাব। শকাব্দের চতুর্দশ শতকের বাঙ্গালী এই ঘটনা ও আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। চণ্ডীচরণপরায়ণ মহারাজা দনুজ মর্দনদেবের বঙ্গ সিংহাসন অধিকার বাঙ্গালার বৃহত্তর ঘটনা। বাঙ্গালাকে পরাধীনতা মুক্ত করিতে, মুসলমানের হস্ত হইতে বাঙ্গালা অধিকার করিতে তাঁহার সার্থক প্রয়াস ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। দনুজ মর্দন নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী হিন্দু স্মার্ত, হিন্দু কবি, হিন্দু জ্ঞানী-গুণীকে রাজসভায় স্থান দিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষার সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন। স্মৃতির নূতন নিবন্ধ রচয়িতা বৃহস্পতি মিশ্র তাঁহার অন্যতম সভাসদ। হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি রাজ্য পরিচালনে তাঁহার সহায়ক ছিলেন। দনুজ মর্দনের সংকল্প সফল হয় নাই। বোধনেই তাহার বিসর্জন ঘটিয়াছিল। রাজনীতির খেলায় বাঙ্গালী হিন্দু হারিয়া গেল। তথাপি দনুজ মর্দনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। পরবর্তী গৌড়েশ্বরগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনায় দনুজ মর্দনের প্রভাব একটা পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অভ্যুদয়, বাঙ্গালীর মহত্তর আবির্ভাব।

তৎকালীন বিশ্বের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, সম-সাময়িক ভারতের সমস্যাসমূহের পটভূমিকায় এই অভ্যুদয়ের আলোচনা হয় নাই। শকাব্দ চতুর্দশক শতকের বাঙ্গালীর সাধনা রাজনীতির খেলায় হারিয়া কোন্ কুশলতায় পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকেই ভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বাঙ্গালী জীবন শোভায় সৌন্দর্যে গানে গন্ধে পরিপূর্ণ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে রহস্যের মর্ম আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাব যাঁহাদের সর্বস্ব ত্যাগে অভিনন্দিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই বাঙ্গালীগণের মধ্যে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব ও রঘুনাথ দাস, এই পঞ্চ গোস্বামী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। দাস গোস্বামী শূদ্র। লক্ষ্য করিবার বিস্ময়জনক দৃশ্য—পরাধীন দেশে রক্ষণশীল সমাজে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে একজন কায়স্থ সন্তান শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় আপনার সাধন মহত্ত্বে চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সর্বজনপূজ্য হইয়াছিলেন। এই পূজার আসন আজিও সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহের দরবারে উচ্চপদস্থ রাজবল্লভ ছিলেন। সনাতনের উপাধি ছিল সাকর মল্লিক, বোধ হয় প্রধানমন্ত্রী। রূপ ছিলেন দবীর খাস, খাস মুন্সী অর্থাৎ একান্ত সচিব। বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি মানবকাম্য কোন কিছুরই তাঁহাদের অভাব ছিল না, বরং প্রাচুর্যই ছিল। ইঁহাদের সংসার ত্যাগ,—ত্যাগ যজ্ঞে আত্মাহুতি, অন্ধকার সমাজে যে জ্যোতি-প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, দাস গোস্বামীর গৃহ ত্যাগ তাহাতে পূর্ণাহুতিরূপে অর্পিত হইয়াছিল। রঘুনাথ দাস পিতার একমাত্র সন্তান এবং সেকালে এই দাস বংশের আয় ছিল বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা।

শ্রীরূপ সনাতনের গৃহ ত্যাগ মাত্র আধ্যাত্মিক প্রেরণারই পরিণতি বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বাঙ্গালীর সমাজ জীবন সে দিন এক সংক্রামক দুর্নিবার ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ ছলে বলে কৌশলে হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিত। নর-নারী অভাবের তাড়নায়, রাজার স্বজাতির মর্যাদা লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায়, সহজাত দুর্বলতায় এবং সমাজের উপর প্রতিহিংসায় ধর্ম ত্যাগে প্রলুব্ধ হইত। সমাজপতিগণের কঠোরতায় অতি সামান্য কারণেই লোকের জাতিনাশ ঘটিত। ইহার কোন প্রতীকার ছিল না। দেবীবর ঘটক একবার সমাজ সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সমাজের এই সর্বনাশা ব্যাধি রূপ সনাতনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। জাতির শোচনীয় দুর্দশা তাঁহাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এমনই দুর্দিনে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ঘটে। সাক্ষাৎ পরিচয় নয়, পত্রের দ্বারা পরিচয়। দেশের সমস্ত সংবাদই তাঁহারা রাখিতেন, রাজ-অমাত্যরূপে রাখিতে বাধ্য হইতেন। বিশেষ করিয়া নবদ্বীপের ঘটনাবলীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নিমাই পণ্ডিতের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ, গয়াধামে গমন, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন এবং অভূতপূর্ব পরিবর্তন রূপ সনাতনের মনে একটা ভরসা জাগাইয়াছিল। শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাইএর গোপন প্রস্তুতি, কাজীর নিষেধাজ্ঞা, আদেশ না মানিয়া নিমাই কর্তৃক নগরকীর্তনের তথা গণজাগরণের নেতৃত্ব গ্রহণ, নবদ্বীপের গৃহে গৃহে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের হরিনাম বিতরণ এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের বিস্ময়জনক সংবাদে তাঁহারা আশান্বিত হইয়াছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের সন্ন্যাস গ্রহণে এই আশাতরু দিগন্তবিস্তৃত শতশাখ বিশাল বনস্পতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। রূপ সনাতন বুঝিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অভ্যুদয় বাঙ্গালীর জাতীয় অভ্যুত্থান। হিন্দুর নব সংগঠনের শুভ সূচনা। তাঁহারা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাপথে বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে রামকেলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে অতি দীনবেশে গিয়া রূপ সনাতন শ্রীমহাপ্রভুর চরণে আত্ম

(ইহার পর ২১৬ পৃষ্ঠায়)

নারকী লোলুপ চিত্ত কামের অঙ্কুর
করেছিল বিদ্ধ যেন কুক্কুর নখর।
পড়েছিল চিঠিখানা মাধবের হাতে—
কোরেছিল ছিঁড়ে নষ্ট গোপনে তফাতে;
শুষ্ক মুখে থু থু করি বার দুই তিন
মাধবের মনে হোলো, পালাবার দিন
বিবাহাভিলাষী যুবা দস্যু একজন
চেয়েছিল ঈশানীরে করিতে আপন।
নিদারুণ স্মৃতি তার তীব্র জাগরণ
মাধবের ক্রোধানলে জোগালো ইন্ধন।
মাধব বসিয়া ছিল দাঁড়ালো সে উঠে,
কাঁপিতে কাঁপিতে জল লয়ে করপুটে
চাহিয়া আকাশ পানে দিল অভিশাপ......
ভগবান, করিও না ক্ষমা এই পাপ;
নরকজ্বালা যে শাস্তি সেই শাস্তি দাও—
বজ্রানল দাহ, প্রভু, পাঠাও পাঠাও;
জীবন দুর্বহ করো, হে রুদ্র, তোমার
যে কোরেছে অপমান এত বার বার;
কাঁটায় ভরিয়া দাও দূর ও নিকট—
চলুক পিষিয়া বক্ষ কালের শকট;

দুর্ভিক্ষ শুষিয়া রক্ত করে যেন ক্ষয়—
রহে যেন প্রাণে সদা দুর্বিষহ ভয়.........
আসিছে পাপের দণ্ড, সম্মুখে পিছনে
আঁধার হইছে জড়ো, পড়ে না নয়নে
নিজের কদর্য মূর্তি ছাড়া অন্যকিছু—
কে যেন প্রেতের মত লইয়াছে পিছু।
এই কর প্রভু, তুমি জগতের প্রভু—
ক্ষমা করিও না, ক্ষমা করিও না কভু।
মানুষের প্রাণ মান তুচ্ছ ভাবি মনে
যে খেলেছে খেলা তারে রাখহ শাসনে।
এই বলে দ্রুতগতি পূর্বদিকে ঘুরে'
প্রদীপ্ত সূর্যের পানে দিল জল ছুঁড়ে'।
সেদিন আহারে কারো রহিল না রুচি—
জেগে যেন স্পর্শ অশুভে অশুচি।
বেচে দিয়ে ঘরখানা তুলে দিয়ে বাস,
আবার আসিল পথে মাধব বিশ্বাস—
আবার করিল যাত্রা তুলিয়া নোঙর—
ছেড়ে গেল অভিশপ্ত বিষাক্ত বন্দর।
সঙ্গে নিল তল্পি আর কন্যা পরিবার—
এবার গন্তব্য স্থান গঙ্গার ওপার।

শারদীয়ার আনন্দে...
টসের
পূজা স্পেশাল চা
এ. টস্ এণ্ড সন্স
কলিকাতা

উপহারে...
প্রিয়মিলনে...
সবাই চায়...
ফোন - ৩৪-৪৮৪৮
এইচ·এল·সরকার
এণ্ড কোং
স্বর্ণ শিল্পী ও মণিকার
১২৫ এ·বহুবাজার স্ট্রীট·কলিকাতা·১২

মূল্যের অনুপাতে শ্রেষ্ঠ!
২৪তোলা নস্যের টিন ৪.
Dipak
MADRAS SNUFF
২৪ তোলা নস্যের টিন ৩৷৷৹
দীপক
দীপক নস্য

পূজা পার্বণে
ও নিত্য প্রয়োজনে
রমনী কড়াই
সবার সেরা
আর, এম, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
হেড অফিস: ৪৯, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া, হাওড়া।
ফোন: হাওড়া-৬১৫ টেলি: AREMCEE
PRASA/RMC 6

উপহার

মনোজ বসু

ডুয়ার্স অঞ্চলে গিয়েছিলাম। ভুটানের সীমান্তে। সেখানেও সাহিত্য সভা। এক চা বাগানে থাকতে দিয়েছে। আগে সাহেব-সুবোরা শিকারে আসত, তাদের জন্য অতিথিশালা বানিয়ে রেখেছে। ভিতরে ঢুকে তাজ্জব হবেন। দামী আসবাবপত্র এই উঁচু গদীর বিছানা, বিদ্যুতের আলো-পাখা—জঙ্গল পুরীর মধ্যে একটুকু ইন্দ্রলোক যেন।

আর এক তাজ্জব, ইন্দিরার মতো মেয়ে এই জায়গায়। বাগানের ম্যানেজারের মেয়ে— দার্জিলিং থেকে ইস্কুলে পড়ত। সোমত্ত বয়স হওয়ায় পড়া ছাড়িয়ে ম্যানেজার মশায় বাগানে নিয়ে এসেছেন। ফাল্গুনে মেয়েকে কলকাতা নিয়ে যাবেন বিয়ে দেবার জন্য। দেখতে বেশ সুশ্রী মেয়ে অতএব ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে না, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। যেটুকু সময় বাসায় থাকি, ইন্দিরা ছায়ার মতো ঘোরে। এত কাছাকাছি একজন লেখককে পেয়ে বর্তে গিয়েছে মেয়েটা। মুখেও সেই বলে, আপনার বই পড়ি; চোখে দেখব কোন দিন ভাবতে পারিনি।

তুমি লেখো-টেখো নাকি?

না, না—কি যে বলেন! কত বিদ্যে আমার তাই লিখতে যাবো!

ঐ জোরালো না-না—শুনে সন্দেহ আরও বাড়ে। প্রমাণও পেয়ে গেলাম। ড্রেসিং-রুমের একটা তাকে পদ্যের খাতা। প্রথম পদ্যটা ফুলের উপর—

কি হে, খাতায় কি লিখেছ এসব?

দুটো-একটা লাইন পড়তে ইন্দিরা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেঃ এমা কি করে এখানে? পড়বেন না আপনি। কক্ষণো না—

খাতা কেড়ে নিতে যায় আমার হাত থেকে। এই সময় ম্যানেজার এসে বললেন, চান করে নিন এবারে। বাথরুমে জল দিচ্ছে।

ইন্দিরারই সমবয়সী একটি মেয়ে টিউব-ওয়েল থেকে জল তুলে তুলে বাথরুমের টব ভর্তি করছে। ম্যানেজার পরিচয় দিচ্ছেনঃ আমাদের মালীর মেয়ে—কালীতারা। অতিথি-শালার ঘর-দুয়োর ওদের জিম্মায় থাকে। আপনি আসছেন—রান্নার লোক খুঁজছিলাম এই ক'দিনের জন্য। তা কালীতারা আড় হয়ে পড়লঃ লেখক মানুষ বাজে লোকের রান্না খাবেন কি—আমি রাঁধব। রাঁধা-বাড়া শুধু নয়—আপনার সমস্ত কাজ ও-ই করছে, আর কাউকে ছুঁতে দেয় না।

বলেন কি, অত ক্ষমতা ঐটুকু মেয়ের?

রাঁধছে খাসা।

ভাল মেয়ে, পড়াশুনোতেও খুব ভাল। আমরা এক বাংলা ইস্কুল বসিয়েছি বাগানে, ফার্স্ট হয়।

কাল এসে পৌঁচেছি—তাই তো বটে। মেয়েটা চরকির মতো ঘুরছে সেই থেকে, পান থেকে চুন খসতে দেয় না। খেয়ে উঠতে না উঠতে দেখি, আঁচানোর জন্য জল গরম করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আঁচিয়ে বসতে না বসতে ডিবে ভর্তি পান। এর উপরে পড়াশুনো করে শুনে ভাল লাগল।

ঘুমটুম দিয়ে সভায় গেছি। মস্ত সভা। এ সব জিনিস এদিকে বড় একটা হয় না, অনেক দূর থেকে লোক এসেছে। লোক দেখে আমাদেরও মুখ খুলে যায়, দু-ঘণ্টা এক নাগাড় বক্তৃতা চালিয়েছি। অত লোক স্থির হয়ে শুনল। বাগানের কুলি-কামিন বেশীর ভাগ—সাহিত্যের কি বুঝল তারা, কে জানে? কিন্তু হাততালির ঠেলায় অস্থির।

স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে বাগানে ফিরলাম। সাড়ে আটটার ট্রেন ধরব, স্টেশন পাঁচ মাইল মোটে সময় নেই। নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতে হবে এক্ষুণি।

তুমি সভায় গেলে না কালীতারা?

ভ্রূভঙ্গি করে ইন্দিরা বলে, ও যাবে—তবেই হয়েছে! বসে বসে উনদুটে ভাপে ডাল-চচ্চড়ি রাঁধছিল।

পান দিতে এসে কালীতারা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে দু-পায়ের উপর প্রণাম করল। তাই তো, কিছু দেওয়া তো উচিত। মনিব্যাগ খুলে দুটো টাকা দিলামঃ মিষ্টি খেও কালীতারা—

মোটরে হর্ণ দিচ্ছে। ইন্দিরাকে বলি, স্যুটকেশটা বের করে দাও গাড়িতে। জামা পরে যাচ্ছি।

তাকিয়ে দেখি, কালীতারার হাসি মুখ এদিকে কালো হয়ে গেছে। দু-চোখে জল টলটল করছে।

কি হল?

আমরা ঝি-চাকর, টাকাই তো দেবেন আমাদের।

খাটের উপর সেই পদ্যের খাতা, শুয়ে শুয়ে একটু দেখছিলাম। কালীতারা ছোঁ মেরে সেই খাতা তুলে নিলঃ আমার খাতা এখানে আনল কে?

খাতা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঐ দরজা দিয়ে। একবার মুখ ফেরাল, অশ্রুর ধারা বইছে। টাকা দুটো রেখে গেছে খাটের উপর।

হতভম্ব হয়ে আছি, এমন সময় ইন্দিরা ফিরে এলো। তার ভুল করব না। সভার পদ্মের তোড়া দিয়েছে, তোড়াটা তার হাতে তুলে দিলাম। বারম্বার হর্ণ দিচ্ছে। আর দাঁড়ানো চলে না।

কিন্তু গাড়ীতে উঠে চশমা খুলে রাখতে গিয়ে দেখি, খাপ ফেলে এসেছি।—রোখো, রোখো। আবার ঘরে গেলাম। বারান্দায় ম্যানেজারের গলা।

নর্দমায় ফেলে দিলি কেন? উনি বড় মানুষটা উপহার দিলেন—

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ইন্দিরা বলছে, কালীকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিলেন। আমার বেলা ফুলগুলো গছিয়ে গেলেন। খাটা-খাটনি আমিও তো করেছি—।

চন্দ্রমুখী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

স্ত্রী বিয়োগের পর ব্রজেন্দ্রের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্র এমনই প্রতিকূলে হয়ে দাঁড়াল যে, না করে উপায় রইল না। প্রথম পক্ষের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তারা এত বড় হয়নি যে, নিজেরাই নিজেদের দেখা-শোনা করতে পারে। ব্রজেন্দ্রের এমন কোনো আত্মীয়া নেই—যাকে এই জন্যে সে নিজের বাড়ি নিয়ে আসতে পারে। একটি দূর সম্পর্কীয়া পিসি আছেন, তিনি নিঃসন্তান এবং নিঃসম্বল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রের রুক্ষ মেজাজের সঙ্গে পরিচয় থাকায় তিনি এত বড় সুযোগ গ্রহণ করতেও স্বীকৃত হলেন না। অন্য দিকে ব্রজেন্দ্রেরও এমন সঙ্গতি নেই যে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় বাসা করেন।

ফলে ব্রজেন্দ্রের রুক্ষ মেজাজ রুক্ষতর হল। তাকে এমন বিপদে ফেলে পরলোকগমন করায় স্ত্রীর উপর চটল, পিসি না আসায় তাঁর উপর চটল, এমন কি বড় মেয়ে টুনু সংসার চালাবার উপযুক্ত আরও খানিকটা বড় না হওয়ার জন্যে তারও উপর চটল।

এবং এই রকম ক্রুদ্ধ অবস্থাতেই একদিন চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখ দেখে তার পছন্দ হয়ে গেল এবং মাস কয়েক পরেই তাকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এল।

চন্দ্রমুখী দরিদ্র পিতার পঞ্চম কন্যা। রূপ ছাড়া আর কোনো সম্বল তার ছিল না। ব্রজেন্দ্র তার চন্দ্রমুখ দেখে বিজিত হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা ছিল না, ওই মুখের অভ্যন্তরে যে রসনা আছে, সেটি ললিত-নৃত্যপরায়ণা।

যখন জানতে পারলে তখন আর বিবাহ ফেরৎ দেওয়ার উপায় ছিল না। এবং উপায় যদি থাকত, তাহলেও সম্ভবত ব্রজেন্দ্র ফেরৎ দিতে সম্মত হত না। কারণ 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। চন্দ্রমুখীকে তার ভালো লেগে গেছে। সুন্দর মুখ ছাড়াও তার তার একটি কারণ এই যে, বিবাহের কয়েকটা দিন পরেই আপিসে তার পদবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে কয়েকগুলো টাকা বেতন বৃদ্ধিও হয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রের দৃঢ় ধারণা, এটা চন্দ্রমুখীর পয়েই সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রমুখী শহরের মেয়ে। শাড়িতে সাটিনে, স্নোয়ে-পাউডারে সম্পূর্ণ শহুরে। কি রঙের শাড়ির সঙ্গে কি রঙের ব্লাউস মানায়, কোন্ স্নোটা সম্প্রতি বাজে হয়ে গেছে আর কোন্‌টা এখন চলছে বেশ ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রামের মেয়েরা তার কাছে শিক্ষা নিতে আসে।

ব্রজেন্দ্রের সাধ্য নেই কলকাতায় বাসা করে। বেতন-বৃদ্ধির পরেও না। আর চন্দ্রমুখী গ্রামে এসে তার সুন্দর নাকটিকে সকল সময়ই কুঁচকে রাখতে লাগল।

বাড়িতে নলকূপ নেই, একটা ইঁদারা পর্যন্ত না। অনাবৃত পুকুর ঘাটে গিয়ে স্নান করার নামে চন্দ্রমুখী শিউরে উঠল। সব চেয়ে বিপদ হল রাত্রে। অন্ধকার রাত্রি। চারিদিকে জঙ্গল। বাড়ির পিছনে শেয়াল ডাকছে, হুতোম পেঁচা।

শনিবার ব্রজেন্দ্র বাড়ি আসতেই চন্দ্রমুখী কেঁদে ভাসিয়ে দিলে : এখানে সে আর একটা দিনও থাকতে পারবে না। রবিবার রাত্রে ব্রজেন্দ্র যখন কলকাতা ফিরবে, তখন তার সঙ্গে চন্দ্রমুখীও যাবে। কোনো কথা শুনবে না। এখানে থাকলে সে মরে যাবে।

ব্রজেন্দ্র আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল : কি পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকছ!

—পাগলের মতোই বটে। তবু এখনও পাগল হইনি। আর কিছুদিন থাকতে হলে পাগল হয়ে যাব।

ব্রজেন্দ্রের মেজাজ উগ্র বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কান্নাকাটিতে সেও খানিকটা ভড়কে গেল। চেষ্টা করে একবার মেজাজটা গরম করলে। কিন্তু চন্দ্রমুখী তাতে ভয় পাবার মেয়ে নয়। আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগল।

আর বলতে লাগল : আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। তুমি না নিয়ে গেলে আমি আত্মহত্যা করব।

এবারে ব্রজেন্দ্র ভড়কে গেল সত্যই। সে শান্তভাবে চন্দ্রমুখীকে বোঝাতে বসল, পুকুরে স্নান করার মধ্যে বে-আব্রুতা মোটেই নেই। সকলেই এখানে তাই করে। এই পাড়া গাঁ, গাঁ বেশীরা এখানে আত্মীয়ের মতো। তা ছাড়া ব্রজেন্দ্র ঠিকই করেছে যে, আগামী মাসে আপিসের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু ধার নিয়ে বাড়িতেই একটা টিউব ওয়েল বসাবে।

—আর শেয়ালগুলো? তাদের ডাক তুমি থামাবে কি করে?—অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চন্দ্রমুখী বললে।

এবারে ব্রজেন্দ্র হেসে ফেললে। বললে, শেয়াল কি মানুষকে কামড়ায়? শেয়ালকে ভয় কিসের? তাছাড়া তুমি তো দোর-বন্ধ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু দোর বন্ধ করে থাকলেও ওই হুতোম-থুমোর ডাকে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

চন্দ্রমুখীর অশ্রু-ধারা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের সিক্ততা যায়নি একেবারে।

ব্রজেন্দ্র সাহস দিলে, ওতে আবার ভয়টা কি? ওটা কি জান তো?

কি?

—পেঁচা। মা-লক্ষ্মীর বাহন!

ব্রজেন্দ্রের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমুখী বললে, তা হোক বাপু। ডাক শুনলে ভয় করে।

—ওটা পেঁচার ডাক, তা জানার পরেও ভয় করে?

শরতের মেঘ　　　　জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চল মিত্র 'বন্য'
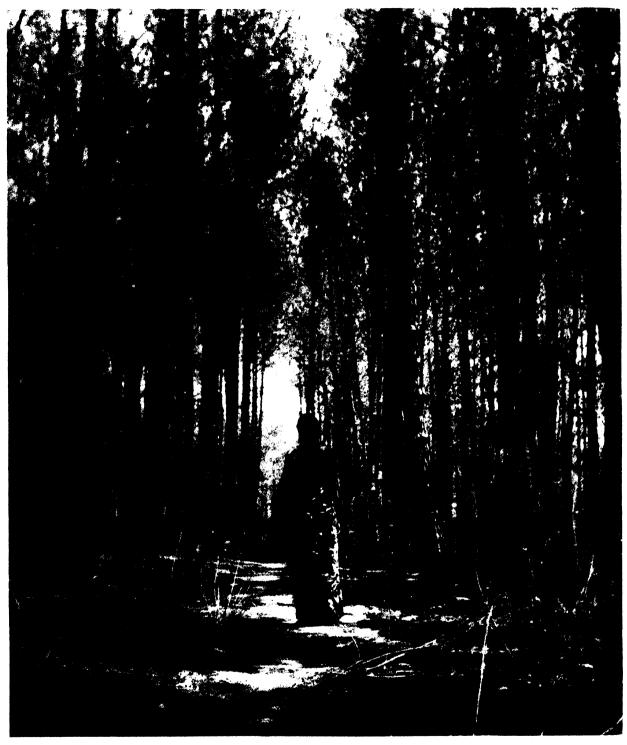
—এই তো জানলাম। দেখব ভয় করে কি না। —চন্দ্রমুখী হেসে বললে।

ওর হাসি দেখে ব্রজেন্দ্র খানিকটা ভরসা পেলে। পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে, টর্চটা হাতে করে সে তাসের আড্ডায় যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

চন্দ্রমুখী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় চললে?

—একটু বেড়িয়ে আসি।

—তাসের আড্ডায় তো?

—হ্যাঁ। দেরি হবে না।

—ওরে বাবা!—চন্দ্রমুখী ভয়ে কুঁকড়ে গেল,—আমি ওপরে চললাম। তুমি ফিরে এলে রান্না চড়বে।

ব্রজেন্দ্র সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কি! এখন সবে সন্ধ্যে। চারিদিকে লোকে গল্প করছে। এর মধ্যে এত ভয় কিসের?

চন্দ্রমুখীও বিরক্ত কণ্ঠে বললে, তা বাপু, আমার যদি ভয় করে, আমি করব কি?

—অন্য দিন কি কর?

—কি আবার করব? সন্ধ্যেবেলাতেই ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে দিই। নিজেও দুটো খেয়ে নিই। তারপরে রান্না ঘরে তালা বন্ধ করে, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

—এই সন্ধ্যে বেলাতেই?

—হ্যাঁ।

—প্রত্যহ?

—যেদিন পাড়ার মেয়েরা গল্প করতে আসে সেদিন শুধু নিচে থাকি। তা তারা তো রোজ আসে না।

পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলে ব্রজেন্দ্র বললে, ঠিক আছে। আমি এই ডেক-চেয়ারে বসে রইলাম। তুমি নিচেয় রান্না কর গে।

[illegible] চন্দ্রমুখী বললে, ঠিক তো? [illegible] আর তুমিও [illegible] পালাবে না?

—না না। পালাব না। তুমি মাঝে মাঝে দেখে যেও।

[illegible] চন্দ্রমুখী বললে, [illegible] আমিও ওপরে গিয়ে [illegible] তৈরি পারে!

[illegible] একটা কোপ কটাক্ষ হেনে [illegible] সেই ডেক চেয়ারে শুয়ে রইল। [illegible] চিন্তা পর্যন্ত করতে সাহস করলে না।

ওদের তাসের আড্ডায় যারা বন্ধু-বান্ধব, তাদের অনেকেই ব্রজেন্দ্রের মতোই কলকাতায় চাকরী করে এবং তাদের সঙ্গে একই ট্রেনেই এসেছে। ব্রজেন্দ্র আড্ডায় না আসায় তারা চিন্তিত হল ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে।

সকালেই এল হৃষীকেশ।

—কি হে, কাল গেলে না তো!

—শরীরটা ভালো ছিল না ভাই। মাথায় এমন যন্ত্রণা আরম্ভ হল—

ব্রজেন্দ্র নিজের মাথাটা টিপে ধরল।

হৃষীকেশ গম্ভীরভাবে বললে, আমরাও সেই রকম সন্দেহ করেছিলাম। ঠাণ্ডায় ওরকম হয়েছে।

—তাই হবে। —ব্রজেন্দ্র শুষ্ক মুখে বললে।

হৃষীকেশ বাড়ি ফিরতেই তার স্ত্রী রমা বললে, তোমার বন্ধুর কাণ্ড শুনেছ?

—কোন্ বন্ধুর?

—আবার কোন্ বন্ধুর! ব্রজেন বাবুর।

—বেচারার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রমা হাসতে হাসতে বললে, যন্ত্রণার এই তো সবে আরম্ভ! এখনও অনেক যন্ত্রণা হবে। যা কষ্ট সে-বৌটাকে দিয়েছে, সব মনে আছে।

হৃষীকেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বল তো?

—শক্তের পাল্লায় পড়েছেন এবার!

—তার মানে?

—তার মানে, দ্বিতীয় পক্ষ কাল বেরুতে দেননি! মাগো, কী ঘেন্নার কথা! রমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ। ঘাটে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দেখা। সে নিজেই বললে।

—কি বললেন?

—বললে, জামা গায়ে দিয়ে আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিলেন। বললাম, যাচ্ছ যাও, রান্না কিন্তু তুমি ফিরে এলে চড়বে। আমি সন্ধ্যেবেলায় একা নিচে থাকতে পারব না। ভদ্রলোক জামা খুলে চুপ করে বসলেন, আর বাইরে গেলেন না।

—ওর বৌএর খুব ভয় বুঝি?

ঠোঁট উল্টে রমা বললে, ভয় না হাতী! শহুরে চাল, বুঝলে না? কিন্তু এর দরকার ছিল। সে বৌটাকে নাস্তানাবুদ করে মেরেছে। ঠাকুরকে ডাকতাম, ও যেন বিয়ে করে, আর এবারে যেন একটা দজ্জাল বৌএর হাতে পড়ে। ঠাকুর শুনেছেন কথা। যেমনি চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনি মেয়ের হাতে পড়েছে!

রমার মুখখানা খুশিতে ভরে গেল।

তারপর বললে, এখানকার বাস তুলে ওরা সব কলকাতায় চলল যে!

—সে কি!

—হ্যাঁ। চন্দ্রমুখী এখানে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এখানে পুকুর ঘাটে স্নান করতে হয়, [illegible] থাকে না। তারপর রাত্রে শেয়াল ডাকে, [illegible] ডাকে। ওর একলা থাকতে ভয় করে। [illegible] এমন জায়গা জানলে, ওর বাবা কখনই এখানে বিয়ে দিতেন না।

হৃষীকেশ রেগে বললে, না। লাট সাহেবের বাড়ি মেয়ের বিয়ে দিত। দ্বিতীয় পক্ষ বলেই ব্রজেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। নইলে এবাড়িতেও ওর পড়বার কথা নয়!

—কিন্তু ও তো বলে,

—কি বলে? বাড়িতে তিনখানা মোটর আছে? দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না, জান?

এত গরীব?

—হ্যাঁ। একখানা এঁদো বাড়ির একতালায় একখানা ঘর নিয়ে অতগুলি প্রাণী থাকে। আমি দেখিনি?

—তাই বুঝি! কিন্তু ওর কথা শুনে তো মনে হয়,—

—লাট সাহেবের মেয়ে, না? ওর বাপের বাড়ির কথা আমাকে আর বোলো না। কলকাতায় অনেক সুখ, অনেক আরাম, অনেক সুবিধা আছে জানি। কিন্তু এরা যখন কলকাতায় থাকবার কথা বলে, তখন কি আনন্দে যে বলে, আমি তো ভেবে পাই না।

বন্ধুর ভবিষ্যৎ ভেবে হৃষীকেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

রমা বললে, তুমি ভেবে না পেলে কি হবে। ওরা ভেবে পেয়েছে একটা কিছু। আমি তো যা বুঝলাম, ওরা যাবেই। তোমার বন্ধুর যদি এখানেই ওদের রাখবার ইচ্ছা হয়, তাহলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে।

সবিস্ময়ে হৃষীকেশ বললে, চাকরী ছেড়ে দিতে হবে? কেন?

রমা বললে, না তো কি? চন্দ্রমুখী একলা থাকতে পারবে না।

—এ কথাও হয়েছে না কি?

—না হলেও হবে।

হৃষীকেশ ভীষণ রেগে গেল। বললে, ব্রজেনকে তো জান। রাগলে ও গুরুর খাতির রাখে না। দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী বৌ বলে এখন হয়তো একটু খাতির করছে। কিন্তু, তোমার বন্ধুকে বোলো, বেশি বাড়াবাড়ি যেন না করে। ওর চণ্ডাল রাগ। একবার রেগে গেলে চোখে অন্ধকার দেখিয়ে দেবে। সে বড় কঠিন লোক!

হৃষীকেশ রেগে দুম দুম করে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু রমা ভয় পেল বলে মনে হল না। বরং মনে মনে হাসতে লাগল: পুরুষ মানুষের দৌড় জানতে তার বাকি নেই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হৃষীকেশ বুঝলে, রমা একেবারে বাজে কথা বলেনি। হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা শেষ চেষ্টা করছে চন্দ্রমুখীকে বোঝাবার জন্যে। কিন্তু বোঝাতে যে পারবে, সে ভরসা ওর নিজের মনেই নেই।

বললে, মহা মুস্কিল রে ভাই! কি যে করি!

হৃষীকেশ বললে, দ্বিতীয় পক্ষে মুস্কিল তো থাকবেই। তাতে করার আর কি আছে।

ব্রজেন্দ্রের আত্মাভিমানে ঘা লাগল। বললে, না রে ভাই, দ্বিতীয় পক্ষ-টক্ষ নয়। ও সব আমি গ্রাহ্য করি না। মেয়ে-মানুষ চিট করতে জানি। কিন্তু মুস্কিলটা কি হয়েছে জান?

—আমি তো জানতাম, দ্বিতীয় পক্ষের চাঁদমুখ নিয়েই মুস্কিল। কিন্তু তুই বলছিস,

ব্রজেন্দ্র তার স্বাভাবিক তেজের সঙ্গে বাধা দিলে: ফের সেই দ্বিতীয় পক্ষ আর চাঁদমুখ! বলছি তা নয়।

—নয়? বেশ, তাহলে ব্যাপারটা বল।

—ভয়।

—ভয়! কিসের ভয়?

—শেয়ালের আর হুতোম প্যাঁচার।

—কি সর্বনাশ! ভদ্র মহিলাকে বাঘ নিয়ে ঘর করতে হবে, আর শেয়ালে ভয়! না কি বাঘই শেয়াল হয়ে গেল!

খোঁচাটা ব্রজেন্দ্র গায়ে মাখল না। বন্ধুদের সঙ্গে কত ঝগড়াই না করা যায়! খোঁচা তারা দেবেই।

বললে, শহরের মেয়ে। ওসবের ডাক তো শোনেনি কখনও। শুনলেই ওর মুখ ছাই এর মতো শাদা হয়ে যায়।

গম্ভীরভাবে হৃষীকেশ বললে, তাহলে মুস্কিলের কথা সন্দেহ নেই। দুর্বাশার মতো রাগতেই পার, কিন্তু দুর্বাশার মতো অভিশাপ

(ইহার পর ২১৪ পৃষ্ঠায়)
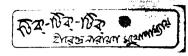
নিঃসঙ্গ দুপুর।
বাগানের ছোটঘরে একলাটি বসে,
আনমনে তন্দ্রালস চোখে,
কালের পায়ের ধ্বনি শুনি ঃ
টিক্—টিক্—টিক্।
দেয়ালের গায়ে
'বিগবেন' গুনে চলে পল।
আকাশে মন্থর সূর্য,
দূরে ডাকে আমলকী শিরে
শ্রান্ত কাক।
ধূসর ছায়া—লজ্জানতা বধূ
সংগোপনে লুকায় মুখ
বনস্পতি তলে।
দয়িতের কণ্ঠলগ্না প্রিয়া,
কালো ছায়া—
নারিকেল শাখা
দোলে যেন এলায়িত স্রস্ত কেশপাশ
তরু নীবিতটে।

মধ্যাহ্ন অলস।
চোখে নাই ঘুম ঃ
নিঝুম চেতনা কাঁপে অতন্দ্র পল্লবে
পিঙ্গলায় রক্তস্রোত ক্ষীণ হয়ে আসে।
চিন্তা নাই ঃ তবু চিন্তা ভাসে
মনের অতল নীলে শরতের শুভ্র মেঘ।
স্তব্ধতা অসীম।
নিজের নিঃশ্বাস যেন কথা কয় কানে কানে!
চকিতে চেতনা জাগে ঃ
টিক্ টিক্...
টিক্ টিক্ টিক্!

'বিগবেন' নয় ঃ
যৌবন লাবণ্যভরা সরটিকা তরুণী রূপসী
ধীরে নামে বাতায়নে।
লীলায়িত তনুলাস্যে মনের ধূসর রঙ,
দুটি চোখে উদগ্র কামনা ঃ
অসঙ্গ-পিয়াসী নারী
চলিয়াছে অভিসারে যেন!
টিক্—টিক্...
টিক্ টিক্ টিক্!
তাই...
বনচারী সন্ন্যাসীর তপশ্চর্যা ভাঙে ঃ
[illegible] সুগম্ভীর—তাপস কুমার
ধীরপদে বাতায়ন দ্বারে দিল দেখা।
[illegible] অলক্ষণ!
চোখে চোখে জ্বলিল বিদ্যুৎ।
......দুটি সরীসৃপ
আচম্বিতে হলো উতরোল।
ছুটাছুটি—মাতামাতি দেয়ালে দেয়ালে ঃ
উঠিল মত্ততার ঝড়!

কাটে দিন।
দীর্ঘ [illegible] নিঃশব্দিত মাস
একে [illegible] সরেছে।
এসেছে [illegible] সময়,
দাম্ভিক নিদাঘ ঃ
মাটীর মর্যাদা-দৃপ্ত গণিকার মত।
হাসে [illegible] বাতায়নে।
শ্রান্ত মন।
দিনান্তের অবসাদ অঙ্গে অঙ্গে নামে।

...চকিতে পড়িল চোখে ঃ
সেদিনের সে তরুণী বধূ সরটিকা
একাকিনী আজি:
সংগী তার নিয়েছে বিদায়।
যৌবন-উচ্ছল রূপ সমাহিত শান্ত সমুজ্জ্বল ঃ
জননী সে—
চলে ধীর পদে,
শিশু তার চলেছে পশ্চাতে, অপটু চঞ্চল।
থমকি দাঁড়ায় পাশাপাশি ঃ
শিকার সন্ধান—লক্ষ্যভেদ শিক্ষা বুঝি দেয়!
...ছুটাছুটি! আনন্দের স্পন্দন শিরায়।
সহসা স্খলিত হলো মাতার চরণ ঃ
দেহভার নারিল রোধিতে,
লভিল ভূতল ঃ মৃত্যুর করাল গ্রাস।

দিন যায়!
টিক্ টিক্ টিক্!
'বিগবেন' গুনে চলে পল।
অনশন-শীর্ণ শিশু সরট শাবক
আনমনে পাতে কান,
দেয়ালে দেয়ালে ঘুরে মরে
সকাতর সন্ধানে ঃ
কি যে ছিল, কি যে গেল তার!
খুঁজিয়া না পায়।

সপ্তাহ হয়নি শেষ।
প্রভাত বেলায়
চকিতে চাহিয়া দেখি,
'বিগবেন' স্তব্ধ অর্ধপথে ঃ
থেমে গেছে গান,
প্রাণের স্পন্দন সেই টিক্ টিক্ টিক্।

জাগিল বিস্ময় ঃ
করিনি তো ভুল।
প্রতি রবিবার গতি তার করেছি সঞ্চিত
নিয়ম-তান্ত্রিক উপচারে।
তবু স্তব্ধ!

খুলে দেখি,
নির্মম লোহার পিণ্ডতে
মাতৃহীন বিশীর্ণ কংকাল
পিঙ্গল কপিশ সেই টিকটিকি শিশু
নিয়েছে আশ্রয় ঃ প্রাণহীন।

টিক্ টিক্ টিক্!
মাতার সন্ধানে ফিরি
রাত্রিদিন শুনিয়াছে ধ্বনি ঃ
বিভ্রান্ত চঞ্চল মন শুনেছে মায়ের ডাক,
বার বার পাতিয়াছে কান।
নয়নের অন্তরালে
অলক্ষ্য সংকেত তারে দিল হাতছানি
টিক্ টিক্ টিক্!

বক্ষতলে হাহাকার!
কালো চোখে মৃত্যুর ইসারা!
রাত্রিদিন করেছে সন্ধান,
টিক্ টিক্ টিক্ ঃ
জননীর স্নেহার্ত আহ্বান
'বিগবেন' বুকে।
নির্মম ইস্পাত দিল সাড়া
তুহিন শীতল মৃত্যু,
কালের অখণ্ড গতি তলে ঃ
সীমাহীন অনন্ত বিশ্রাম।

টিক্ টিক্ টিক্ ঃ
চলিয়াছে 'বিগবেন'। তারা আজ নাই॥

এ জীবন সে তো এক নিমেষের গানের সুর
নিমেষের তরে ফুটেছি হইব নিমেষে দূর।
হিংসা, দম্ভ জাতি বিদ্বেষ
এবারেরই মত করে দাও শেষ,
নবীন যাত্রা কর একত্রে ছোট ও বড়
নিমেষের তরে এই খেলাঘরে হয়েছি জড়ো।
পশ্চিম, প্রাচী, মার্কিণ, রুশ
সকল দেশের নারী ও পুরুষ
কর্মের পথে জাতি ও ধর্মে যে বাধা আনে
ছিন্ন করিয়া এসো 'অভিন্ন' সমুখ পানে।
যুদ্ধ বিবাদে কি আছে গো সুখ?
তুলে লও বীণা ফেল বন্দুক,
ফেলি তলোয়ার এসো গো এবার সেবার লাগি,
কত অগণ্য মানুষ কাঁদিছে অন্ন মাগি।
এসো গো হিন্দু, এসো খৃশ্চান,
এসো গো বন্ধু হে মুসলমান,
এসো গো বৌদ্ধ বিজয় সৌধ গড়িতে আজি,
নব প্রভাতের আগমনী শোনো উঠিছে বাজি।
এসো বীর সেনা ওগো তুমি এসে
বিজয় করিও শুধু ভালোবেসে।
ছয় মহাদেশ তোমার আদেশ মানিয়া লবে
জাগিবে যুবান হবে আগুয়ান মাভৈঃ রবে।
যারা বার বার ভ্রাতৃ রুধিরে
সিক্ত করিছে এই ধরণীরে
অন্ধ স্বার্থে বন্ধ রয়েছে যাদের চোখ
দেখাও তাদের বিশ্ব প্রেমের স্বর্গলোক।
দুঃখ বেদনা আজি আর নয়,
আনো বসন্ত সুগন্ধময়,
ওগো বীর সেনা এসো আমাদের মুক্ত কর,
নব চেতনের শুভ্র কেতনে শূন্য ভরো।
দূর হয়ে যাক সকল ভ্রান্তি,
আসুক অভয় আসুক শান্তি,
দূত নির্ভীক ছুটুক তোমার দিগবিদিক,
মৈত্রী-মন্ত্রে এক নব যুগ জন্ম নিক।
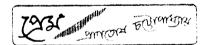
জীবনের চারদিকে অন্ধকার বেড়া
পথ নাই, নাই আলো আশা ভাষা নাই,
ওগো প্রেম তুমি শুধু তীর্থ শিখা সম
মগজের গুপ্ত কক্ষে স্থির হয়ে আছো।
নয়নের স্বপ্নলতা শুষ্ক হয়ে আছে
দুপুরের মরুজ্বালা মরীচিকা ধু ধু!
নিরক্ত অধরে তব আর রস নাই
ইন্দ্রধনু বক্ষে তব ইন্দ্রজাল কোথা?
সারা দেহে মধুক্ষরা পেলবতা কই?
বৈধব্যের মরু মায়া তাও যায় যায়।
আছে শুধু জ্ঞান-যুক্তি যজ্ঞ-অগ্নিশিখা
কাপালিক ললাটের নর-রক্ত টিকা।
করোটির এক পাশে তপস্যায় আছো
প্রেমের চৈতন্য দিন শুভ লগ্ন তরে।

উৎসবের উৎস
আনন্দই উৎসবের উৎস।
যে উৎসে অমৃত আপনার
মনের ও দেহের তৃপ্তি। তৃপ্তির
সন্ধানে মনের যে আকিঞ্চন, তারই
সামান্য সেবায় আমাদের সার্থকতা।
এফ্‌.এন্‌.গুপ্ত এণ্ড কোং
ভারতের প্রাচীনতম লেখনী-শিল্প প্রতিষ্ঠান
কলিকাতা

আমাদের
শারদীয় অভিনন্দন
গ্রহণ করুন
প্রসিদ্ধ লৌহ এবং ইস্পাত বিক্রেতা
টি, ডি, কুমার এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ
২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড • কলিকাতা-৭

চেনা-চেনা

"ভাস্কর"

(১)
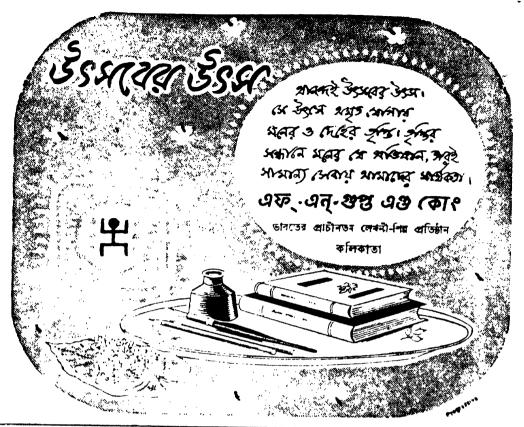
সন্ধ্যার পর। ফারপোর একতলা। ডানদিকের পাশের দিকে একখানি টেবিলে বসিয়া শ্রী এ. ব্যানার্জি, তরুণ ব্যারিস্টার। সামনে টেবিলের উপর সুপের প্লেট। দুই চামচে সুপ মুখে তুলিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার সামনে একটু দূরে একটি মহিলা আসিয়া বসিলেন। বেশ ছিমছাম বেশ, গালে পাউডার, ঠোঁটে রং, হাতে রিস্টওয়াচ, গলায় মুক্তার মালা। ছোট লাল টকটকে ব্যাগটি টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া এদিক ওদিক একটু চাহিতে লাগিলেন। অমল বাবুও চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। অমলবাবুর মনে হইল, মহিলাটি তাঁহার দিকে বারবার তাকাইতেছেন। মহিলাটিরও মনে হইল অমলবাবু তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন। অনেকবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। দুই একবার এমনও মনে হইল, মহিলাটির ঠোঁটে যেন সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল।

বয় আসিয়া যখন সুপের প্লেট লইয়া গেল, তখন অমল বলিলেন, ওই মেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, উনি এই টেবিলে এসে বসবেন? বলো, আমি জিজ্ঞেস করেছি।

বয় যথাস্থানে সংবাদ দিতেই মহিলাটি ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং ব্যাগটিকে ঝুলাইতে ঝুলাইতে অমলের টেবিলে আসিয়া বসিলেন। অমল সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন, কিছু মনে করবেন না, আমার যেন মনে হচ্ছিল, আপনাকে কোথায় দেখেছি।

তা দেখতে পারেন, কলকাতায়ই থাকি এখন।

তা বেশ! প্রায়ই বুঝি আসেন এখানে?

না, প্রায়ই নয়। তবে কখনো সখনো একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে।

আচ্ছা, আমার সুপ খাওয়া হয়ে গেছে। আমি একটু বসি। আপনি সুপটা খেয়ে নিন।

বয় সুপ দিয়ে গেল। মহিলাটি সুপ খাইতে লাগিলেন। অমল মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুপ শেষ হইলে মাছ ভাজা আসিল। অমল বলিল, মাছভাজা খেতে আমার বেশ ভাল লাগে।

আমারও।

আর একখানা করে অর্ডার দেব?

আপত্তি নেই।

আবার মাছভাজা আসিল।

এমনি করিয়া গল্প করিতে করিতে উঁহারা আহার করিতে লাগিলেন। কলকাতার কথা, দেশ বিদেশের কথা, এরোপ্লেনের কথা, মাউন্ট এভারেস্টের কথা, ফুটবলের কথা, এমনি কত কথা হইল। দু একটা সিনেমার কথাও বাদ গেল না। শুধু বাদ গেল, আত্মীয়-স্বজনের কথা।

কফির বাটিতে চুমুক দিতে দিতে অমল বলিল, আজ সন্ধ্যাটা বেশ কাটল।

হ্যাঁ। আমারও।

সত্যি। আমার যেন আর টেবিল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

তা, আপনি বসে থাকুন। আমাকে কিন্তু উঠতে হবে।

আমিই কি আর বসে থাকব না কি? আচ্ছা, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ এত আলাপ হল, কই আপনাকে কি বলে ডাকব, তা তো বললেন না। আমাকে ডাকতেই হবে? নাই বা ডাকলেন।

তা কি হয়!

তাহলে অমিয়া বলবেন।

আচ্ছা, মিস অমিয়া, আর কিছু খাবেন?

না। অনেক খাওয়া হয়েছে।

বয় বিল লইয়া আসিল। দুখানা বিল। দুখানাই অমল হাতে লইয়া বলিল, আচ্ছা, দামটা আমি দিয়ে দি? আমি আজকের হোস্ট।

আপনি যদি বলেন, আমি আপত্তি করব না।

বিল চুকাইয়া দিয়া তাঁহারা দুজনেই উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া অমিয়া একটু তাড়াতাড়িই অমলকে একটা নমস্কার করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। অমলও সেই দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

(২)

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ম্যাচ। সমস্ত কলিকাতা যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে গড়ের মাঠে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মাঠের গ্যালারীতে, বাহিরে, ফোর্টের পাশের চত্বরে লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য গাড়ী একত্র হইয়াছে। অসংখ্য পেরিস্কোপ মাথা উঁচু করিয়া আছে।

মোহনবাগানের গ্যালারী এবং ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারীর মাঝখানে একটি পথ। এই পথের পাশে একেবারে একধারে বসিয়া আছেন অমল ব্যানার্জি। একাগ্র মনে খেলা দেখিতেছেন। মুখে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন, ইস্, আহাহা, আর একটু, ঐ-যা, আরো কত কি। মনে মনে ভাবিতেছেন, ওই শটটা যদি একটু নীচে দিয়ে যেত, ওই বলটা যদি মিস না করত, হাফব্যাকটা যদি পা পিছলে পড়ে না যেত, ইত্যাদি। মোট কথা, তাঁহার সমস্ত শরীর, মন একান্তভাবে খেলার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনিও যেন খেলিতেছেন।

এমনি করিয়া খেলা দেখিতে দেখিতে হাফ-টাইম আসিল। খেলোয়াড়েরা একটু বিশ্রাম লইল। অমল বাবুরাও একটু বিশ্রাম লইলেন। কিন্তু সে বিশ্রাম শুধু শারীরিক। মৌখিক পরিশ্রম দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। পাশের দর্শকদের সঙ্গে সে কি তুমুল তর্ক! ও ফাউলটা রেফারি কেন ধরিল না, শুধু শুদ্ধ

কেন অফ-সাইড দিল, নিশ্চয়ই ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে, ওকে ধরে মার লাগান উচিত, ওকে আমি খুন করব, হাতে বন্দুক থাকলে এখনই গুলী করতুম, ওকে এখুনি ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হোক ইত্যাদি ইত্যাদি।

গ্যালারীর পাশে যে পথ সেই পথের ওপাশে সহসা লক্ষ্য করিলেন অমল দেখিতে পাইলেন, একটি মহিলা তাঁহার দিকে চাহিয়া মিট মিট করিয়া হাসিতেছেন। নিজের উত্তেজনায় যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তথাপি বেশ একটু সপ্রতিভভাবেই বলিলেন, ওঃ আপনি এখানে? প্রায়ই আসেন নাকি?

না, প্রায়ই নয়। তবে কখনো সখনো আসি, ভাল ম্যাচ থাকলে।

তা বেশ। খেলা কেমন দেখছেন?

বেশ দেখছি।

অমিয়ার পায়ে লাল স্যাণ্ডাল, পরনে লালপাড়ের কাপড়, লাল রংএর ব্লাউজ, হাতে লাল রংএর ব্যাগ, নখে লাল রং, ঠোঁটে লাল রং, ছোট বেঁটে ছাতাটিও লাল টকটকে। সব মিলিয়া তাঁহাকে অপরূপ দেখাইতেছে। অমল একটু চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আপনি ওই গোলটা লক্ষ্য করেছেন? কি চমৎকার গোল!

না। ঠিক সেই সময়ে আমি ব্যাগটা খুলে আয়নার সামনে নাকের ডগায় একটু পাউডার বুলোচ্ছিলুম। হঠাৎ শুনি ভীষণ হাততালির শব্দ! পাশের মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, ওদিকে একটা গোল হয়েছে, তাই সবাই হাততালি দিচ্ছে। পাশের মহিলাটিও ছাতা হাতে করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ধরে বসিয়ে দিলুম।

ইস্, আপনি কি জিনিস যে মিস করলেন, তা আপনি জানেন না। কি বিউটিফুল গোল! গোল তো নয়, একখানা ছবি। বছরে অমন একটা গোল হয় না। ইস্, কি জিনিসই আপনি মিস্ করলেন!

আচ্ছা, ওই তো আবার খেলা আরম্ভ হল। এবার খুব মনোযোগ দিয়ে দেখব। তবে আপনি অতটা উত্তেজিত হবেন না। দেখছেন গ্যালারীর একেবারে সামনে, হঠাৎ নীচে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবেন না যেন!

অমলকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অমিয়াকে দেখার পর হইতে তাহার মনের উল্লাস ও উত্তেজনা খেলা ও অমিয়ার মধ্যে বিভক্ত হইয়া অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। অমিয়াও আর মুখে পাউডার মাখিতেছেন না। তবে মাঝে মাঝে অমলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, অমলের চোখ কোন দিকে।

খেলা শেষ হইলে উঁহারা এক সঙ্গেই বাহির হইলেন। মাঠ ছাড়িয়া রাস্তায় আসিলেন। অমল বলিলেন, চলুন আমার গাড়ীতে। কোথায় যাবেন আপনি?

আমাকে ধর্মতলার মোড়ে নামিয়ে দিলেই হবে।

অমল ও অমিয়া গাড়ীতে উঠিল। ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

অমল বলিলেন, সত্যি আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আপনাকে কোথায় দেখেছি।

হ্যাঁ, ফারপোতে দেখেছেন। আমাকে ডিনার খাইয়েছেন।

উঁহু। তারও অনেক আগে যেন দেখেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছিনে।

আগের কথা নাই বা মনে থাকল। কি আসে যায় তাতে?

তা বটে, তা বটে, আচ্ছা, চলুন না, কোথায়ও একটু চা-টা—

না। আজ থাক। আর একদিন হবে।

আর একদিন? সে কোন্ দিন?

তা জানিনে। দেখা হবেই কখনো না কখনো।

না হতেও পারে।

হ্যাঁ, তা পারে!

তাহলে?

তা হলে এক সঙ্গে চা-খাওয়া হবে না।

সুতরাং আজই একটু—

বেশ। কোথায় যাবেন, বলুন।

ড্রাইভারকে একটি রেস্তোরার কথা বলিয়া দেওয়া হইল।

রেস্তোরায় বসিয়া চা-খাওয়ার সময়ে বহু গল্প হইল। তাহার মধ্যে ফুটবলের গল্পই বেশি। রেস্তোরা হইতে বাহির হইয়া অমিয়া আর গাড়ীর দিকে গেল না। তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার সারিয়া চৌরঙ্গীর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

অমল গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অমিয়া সম্বন্ধে নানা কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। রোজই বোধ হয় এই মহিলাটি এমনি করিয়া চা ও ডিনার খান। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িয়া গেল সেই অফ-সাইডটার কথা। ও! কি ভয়ানক! অমন লোককে কখনই আর রেফারীগিরি করতে দেওয়া উচিত নয়। ও কি না পারে? মানুষ খুন করতে পারে।

(৩)

ইস্টার্ণ পার্কে প্রদর্শনী।

চারিদিকে উঁচু টিনের পাঁচিল। তার উপরে আলোর মালা। গেটে বহু বর্ণের অসংখ্য আলো ঝলমল করিতেছে। ভিতরে ঢুকিলেই দেখা যায় আলোর কি বিচিত্র সজ্জা। প্রদর্শনীর মধ্যে যে কয়টি গাছ ছিল, সমস্ত গাছগুলিতেই নানা বর্ণের আলো ঝিকমিক করিতেছে। প্রদর্শনীর মধ্যে লম্বা লম্বা পথ। পথের দু পাশে অসংখ্য দোকান বা স্টল। কত প্রকার দ্রব্যসম্ভার সাজানো রহিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। জামা, কাপড়, বাসনপত্র, কাঠের জিনিস, এনামেলের জিনিস, কাচের জিনিস, খেলনার জিনিস, আচার চাটনি-পাঁপড়, সাবান, তেল, এসেন্স, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, আরো কত কি! প্রত্যেকটি দোকান নানা প্রকার আলোয় ঝলমল করিতেছে।

অগণিত দর্শক ও দর্শিকা। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কেহই বাদ নাই। কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সকলেই আসিয়াছেন। কেহ একা, কেহ স্বামী-স্ত্রী, কেহ সপরিবারে, কেহ সবান্ধবে আসিয়াছেন। এক এক স্থানে বেশ ভীড় হইতেছে। মাঝে মাঝে পরিচিত-পরিচিতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেলে মিষ্ট হাসি, মিষ্ট আলাপের বিনিময় হইতেছে। "এই যে তোমরাও এসেছ দেখছি," "আর বলেন কেন, ছেলেমেয়েগুলো কি ছাড়ে?" ইত্যাদি কথা শোনা যায়।

শ্রীঅমল ব্যানার্জি একখানি ছড়ি হাতে করিয়া প্রদর্শনীতে ঢুকিয়াছেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দোকানগুলি দেখিতেছেন। সহসা দেখিলেন একটু দূর হইতে একটি মহিলা তাঁহারই দিকে আসিতেছেন।

এই যে নমস্কার।

নমস্কার! কখন এলেন?

অল্পক্ষণ।

অমল বলিলেন, অনেকক্ষণ ঘুরেছেন। কি আর দেখবেন। সব প্রদর্শনীতেই তো এই সবই দেখছেন। চলুন, একটু বিশ্রাম করা যাক।

এখানে আর কোথায় বিশ্রাম করবেন?

চলুন না ওই স্টলটায়, একটু চা-টা—

বেশ চলুন।

অমল মনে মনে ভাবিল, আজও দেখছি আমিই জালে পড়েছি। ওঁর চা-খাওয়াটা আজ আমার উপর দিয়েই হবে। অথচ আমিই সব জেনে শুনেই তো নিমন্ত্রণ করলাম। অমলের চিন্তা শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহারা চায়ের স্টলে একটি টেবিলে বসিয়া পড়িয়াছেন। একখানি কেকের টুকরায় কামড় দিতে দিতে অমিয়া বলিলেন, এতদিন পরে আমার মনে পড়েছে।

কি মনে পড়েছে?

কোথায় আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম।

কোথায়, বলুন তো?

আপনার বাসরঘরে। বছর তিনেক আগে।

অমল চমকাইয়া উঠিল। তাহার মুখখানা যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে চার-পাঁচটি যুবক ও যুবতী হাসিতে হাসিতে এক সঙ্গে স্টলে ঢুকিয়া তাহাদেরই পাশের একখানি টেবিলে বসিয়া পড়িল এবং অমলের মনে হইল, তাহারা সকলেই তাহারই দিকে বার বার চাহিতেছে।

অমিয়া বলিলেন, এখন মনে পড়েছে আমাকে। ওই যে মেয়েটি গেয়েছিল—ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি—

অমলের মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অমিয়া বলিলেন, আপনার স্ত্রী নীলিমা আমার পিসতুত বোন। আজই সকালে তার চিঠি পেয়েছি—দেরাদুন থেকে লিখেছে—

অমল বয়কে ডাকিয়া বলিল, বিলটা নিয়ে এস।

অমিয়া বলিলেন, এই যে পাশের টেবিলে বসেছে, এরা সব আমার ভাই-বোন, দাদা, বৌদি। আসুন সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

বেয়ারা বিল লইয়া আসিতেই, অমল বিলটি চুকাইয়া দিয়া অমিয়াকে বলিল, মাপ করবেন। আর একদিন হবে। আজ আমার একটা দরকারী কাজ আছে।

এই কথা বলিয়াই শ্রীঅমল ব্যানার্জি স্টল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

—

হাসির দুর্ভিক্ষ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অল্পদিন আগে 'পাঞ্চে'র সম্পাদক এদেশে এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে সে সময় তিনি বলেন, হাসি জিনিষটা সারা দুনিয়াতেই ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠছে। রুচিবান নর-নারীর পাতে দেবার মতো ভালো লেখার অভাবে কাগজটা টিকিয়ে রাখা তাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর পক্ষে।

বাংলা দেশে কাগজ টিকিয়ে রাখা কঠিন হয় যে যে কারণে, লেখার অভাব তার অন্যতম নয়। তাই কথাটা অনেকের কেমন-কেমন ঠেকেছিল। তা ছাড়া সারা জগতেই হাসির দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে, এ কথাটাও বিশ্বাস হয়নি বোধ হয়। 'পাঞ্চ' সম্পাদকের পঞ্চরঙী মন্তব্য বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা কথাটাকে।

আমি কিন্তু আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছি কথাটা। সত্যি আজ পৃথিবীতে হাসি জিনিষটার অভাব হয়েছে। মানুষকে আজ দেখছি, উঁচুতলায় থাকলে গাম্ভীর্যের গুমোটে অনড় হয়ে থাকতে। নীচুতলায় থাকলে উত্তেজনার তাপে হু-হু করে জ্বলতে। কোন তলাতেই হাসির হাল্কা হাওয়া নেই!

আমার মতে এটা তাই মানব সভ্যতার দুর্দিন ছাড়া কিছু নয়। হয়ত চমকে উঠবেন সবাই। হয়ত বলবেন, এত উন্নতি করেছে মানুষ যে যুগে গতি আর উৎপাদনে, আবিষ্কার আর উদ্ভাবনে, তা যদি দুর্দিন হয় ত সুদিন কাকে বলে? কাকে বলে হয়ত জানি, কিংবা জানিই না। কিন্তু এই সব কূটতর্কে জড়াতে চাই না। মানুষ যদি হাসতে ভুলে যায়, সে যদি খালি মেসিনের মতো মাল উদ্গীরণ করে, নয়ত ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছড়ায়, তাহলে মানুষ খুবই উন্নতি করেছে, এ আমি মনে করতে প্রস্তুত নই।

আসলে এই প্রমত্ত গতি আর প্রগলভ উৎপাদনেই আমার আপত্তি। এতেই অবকাশ উপে গেছে মানুষের জীবন থেকে। তার এক ফোঁটা সময় নেই থেমে দাঁড়ানোর বা গুছিয়ে বসার। ট্রামে, বাসে, লোকাল ট্রেণে বোঁ বোঁ করে ছুটে চলেছে মানুষের মিছিল—কল কারখানা ও পণ্যশালার পথে। দুহাতে ঠেলে চলেছে তারা চাকরির চলন্ত চাকা। এই হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ির নামই আজ হল জীবন।

এ জীবনে ক্ষান্তিও নেই, শান্তিও নেই। পর্বত-প্রমাণ অসূয়া, আক্রোশ ও অসন্তোষ অবিরাম পাক খাচ্ছে প্রতি মানুষের মনে। সবাই আজ সবাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং যেহেতু নিষ্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত রূপ ধরে প্রচ্ছন্ন শত্রুতার, তাই সবাই সবাইয়ের শত্রুও। যন্ত্রযুগ জাগিয়েছে মানুষের মনে অভ্রভেদী লোভ, অফুরন্ত তৃষ্ণা, অথচ চরিতার্থতার চাবিটি রয়েছে তার নাগালের বাইরে। এর পরিণাম আর কি হবে?

হাসি যে ফুরিয়েছে দুনিয়া থেকে, এই হল তার কারণ। কি নিয়ে হাসবে মানুষ? কোথায় তার হাসির অনুপ্রেরণা? তার ঈর্ষা-দগ্ধ, অসন্তোষ তাড়িত চিত্ত থেকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বা নিষ্করুণ বিদ্রুপ যদি বা বেরুতে পারে, রঙ্গের রসনির্ঝর হা-হা করা হাসির কলধ্বনিতে ফেটে পড়া অসম্ভব আজ। এদেশে ওদেশে সব দেশেই তাই ঘটেছে নিদারুণ হাসির দুর্ভিক্ষ।

মলেয়ারের দেশে আজ দেখা দিয়েছেন সার্ত্র। শেরিডন, ল্যাম্ব, জেরোম কে জেরোম ও চেষ্টারটনের দেশে আজ 'পাঞ্চ' টিঁকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। যাবে কি করে? এ যুগের প্রবণতাই যে হাসির বিরুদ্ধে। এই সংস্কৃতি স্কন্ধ বিজ্ঞানদৃপ্ত যুগের মানুষেরা যে সবাই হয়েছেন এক-একটি রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা! তাইত বলছিলাম ভীষণ দুর্দিন আজ মানুষের।

পুরানো দিনের মানুষেরা কিন্তু সবাই হাসতে জানতেন। সাধু মোহান্ত বা জমিদার মহাজন হন, আর কৃষক কারিগর বা কুটি গাড়োয়ান হন, সবাই নিজেও হাসতেন, অন্যকেও হাসির খোরাক দিতেন। পুরানো দিনের সাহিত্যেও দেখি আদিরসের পরই স্থান হাস্যরসের—সে রস কোথাও পাতলা কোথাও ঘন, কিন্তু জিনিষটা আগাগোড়াই নির্ভেজাল।

মানুষের মনের দুনিয়াটা সেদিন অনেক বড় ছিল। তার পায়ের তলায় মাটি পিচে ঢাকা পড়েনি, ওপরের আকাশ অন্ধ হয়নি ধোঁয়ায়-ধুলোয়। ঘড়ির কাঁটা ও কারখানায় ভেঁপু নির্মমভাবে কেড়ে নেয়নি তার চণ্ডী-মণ্ডপের অনাবিল অবসরকে। দারিদ্র্য ছিল, দুঃখও যথেষ্ট ছিল, তবু হুজুরে মজুরে ফারাকের গণ্ডীটা দুরতিক্রম্য ছিল না। স্বল্পতার মধ্যেই তাই সন্তোষকে খুঁজে পেত মানুষ, আর সেই সন্তোষই উৎসারিত হত তার কথায়, কাব্যে, নির্মল নিটোল হাসির আকারে। আজ অনেক ঐশ্বর্য, অনেক উপকরণ, তবু ত হাসতে ভুলে যাচ্ছে মানুষ!

ভয় নেই, ফিরে যেতে বলছি না কারুকে সেই আদিকালের অনগ্রসরতায়। বিজলী আলো, কলের জল, ট্রাম-বাস, সংবাদপত্র ও তার-বেতারে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে যে জীবন, তা থেকে পিছু হঠে যেতে রাজী নই আমি নিজেই। কিন্তু এই অসম প্রতিযোগিতা, এই অসুস্থ চিন্তাবিকার, এই হাসিহীন নিষ্প্রাণ নিরুত্তাপ দিন...একেও মহিমান্বিত করে দেখতে এবং দেখাতে পারবো না আমি। এ স্নায়ুকেন্দ্রী মানুষের জন্যে নয়—মানুষের ভেতরকার সত্তাটা বাঁচে না এতে। সত্যিকার মানুষ ত সেটাই—তা খোয়া গেলে আর কি বাঁচবে মানুষের? তাকে বাঁচাতে হলে চাই মনের স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা।

অর্থাৎ হাসি চাই। জীবিকার পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ানোর মত্ততা থেকে ছুটি দিয়ে, বৈঠকী মেজাজের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে জুড়ে বসতে দিন মানুষকে। দেহ-মনের ওপর বুলিয়ে দিন তার প্রশান্তির স্নিগ্ধ হাত। আপনিই হাসতে শিখবে মানুষ আবার তাহলে। নিতান্তই না যদি শেখে, হাসির হাইস্কুল খুলুন একটা। তখন—পরশুরামকে করুন তার হেড-মাস্টার, প্রমথ বিশী ও পরিমল গোস্বামীকে করুন এসিস্টেন্ট টিচার, আর এই স্কুলে বিনা মাইনেয় ঘণ্টাবাদকের চাকুরী নিতে প্রস্তুত আছেন বর্তমান লেখক!

পুণ্যের কাজ — [illegible]

চুলের আভা দেখেছেন? চুলের আভা? ঘনকৃষ্ণ কেশদামের নয়, সপ্তবর্ষোর্ধে চারটি পাকাচুলের?

দেখেননি?

তার মানে চন্দর ঠাকরুণকে দেখেননি! চন্দর ঠাকরুণের পাকা চুল যেন সাদা রেশমের গোছা। তাতে অবিকল রেশমের মসৃণতা, আর রেশমের উজ্জ্বল আভা। কিন্তু শুধুই তো চুল নয়? রং? গড়ন? মুখ?

এখনো—এই তেষট্টি বছর বয়সেও দুধে-গরদের শাড়ীর সঙ্গে পিঠের রং এক, পিঠ আর পাঁজরের খাঁজে খাঁজে মাখনের তুলতুলানি!

আর মুখ?

শুনতে পাই চন্দর ঠাকরুণের 'ঠাকরুণ' উপাধি লাভের কারণই নাকি মুখ। "ঠাকরুণের মতো মুখ!" লোকের মুখে মুখে ফিরে চন্দ্র ভট্টাচার্যির 'ঠাকরুণমুখী' স্ত্রীর নামকরণ হয়ে গিয়েছিলো 'চন্দর ঠাকরুণ'! নইলে নিজের নাম তো ওঁর তিলোত্তমা। সার্থকনামা সন্দেহ নেই।

আমরা কতো সময় আড়ালে বলাবলি করি "বয়েসকালে কী ছিলেন চন্দর ঠানদি? আর কী কাণ্ডই না করতেন কে জানে!" করতেন মানে কি আর স্বেচ্ছায় করতেন? অজ্ঞাতসারে! নির্ঘাৎ উনি অসংখ্য ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়েছেন আর চোখ ট্যারা করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! এই তেষট্টি বছরেও বোঝা যায় বয়েসকালে পরমাসুন্দরী ছিলেন চন্দর ঠাকরুণ। এ যুগে 'পরমাসুন্দরী' কথাটা উঠে গেছে। তার কারণ সে সৌন্দর্যও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকাল আর পরমাসুন্দরী চোখে পড়ে না। চোখে যা পড়ে, সে হচ্ছে পরম রূপসী! কিন্তু সে রূপে মুগ্ধ হতে দ্বিধা হয়, সন্দেহ জাগে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে গেলে এ রূপের কতোটুকু থাকবে?

হয়তো ঊর্ধোৎক্ষিপ্ত ধনুকের মতো বাঁকানো ওই ভুরু জোড়াটি কোথায় উড়ে যাবে, তার জায়গায় পড়ে থাকবে আলুসিদ্ধর মতো তেলাগোলা একটু উঁচু অংশ! হয়তো টসটসে আঙুরের মতো রসালো, আর রক্তগোলাপের মতো রঙালো ওই ওষ্ঠাধর যুগল—

কিন্তু থাক্ একালের কথা। সেকালে সত্যিকার সুন্দরী ছিলো। এখনো এক আধটি পাকা আমের মতো টুকটুকে বুড়ির মধ্যে তার প্রমাণ রক্ষিত আছে। তাদের দন্তবিহীন মুখের দরজার আলতো গোলা পাতলা কপাট দুটি, অথবা বলী রেখাংকিত কপালের নীচে তিলফুলের মতো নাসিকাটি অতীত ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন করছে চন্দর ঠাকরুণের।

কিন্তু দোহাই আপনার, সামনে থেকে দেখবেন না চন্দর ঠাকরুণকে। ডানপাশ থেকেও না। শুধু বাঁ পাশ থেকে দেখবেন। [illegible] পাশের পাশ মুখ। যখন চন্দর ঠাকরুণ স্থির হয়ে বসে মালা জপ করছেন, কি নিবিষ্ট হয়ে চালের কাঁকর বাছছেন, নয়তো বা উঠোনের ধার থেকে দুর্বো তুলছেন খুঁটে খুঁটে! আর যেই তিনি মুখ ফেরাবেন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে ফেলবেন আপনার চোখের পাতা দুটি। কারণ, ডানদিকে বিভীষিকা, ডানদিক ভয়ংকর।

চন্দর ঠাকরুণের ডান গালের সমস্তটা জুড়ে বীভৎস এক পোড়ার দাগ। কালো কালো জড়ো জড়ো হয়ে যাওয়া পেশী, চোখটা কুঁচকে গিয়ে আধবোজা হয়ে থেমে আছে, কানটা এক টুকরো বিকৃত মাংস খণ্ড!

ডান চোখ দিয়ে দেখতে পান না চন্দর ঠাকরুণ, শুনতে পান না ডান কানে। যখন হাসেন, সামনে থেকে দেখলে বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠতে হয়। তিলফুলের মতো নাকের খাড়া দেয়ালের এপাশে কে যেন খানিকটা পাঁক আর কাদা লেপে দিয়ে গেছে। ওপাশে পদ্ম, এ পাশে পাঁক।

কিন্তু আশ্চর্য, চুলগুলো থেকে গেছে অবিকৃত। শুধু কালো রেশম থেকে সাদা রেশম। আচ্ছা! সেও এক আশ্চর্য নয়, কিন্তু কালের হাওয়ায় কালো রেশমের গোছা বিবর্ণ হতে হতে ধূসর, আর ধূসর থেকে সাদা হয়ে গেলো, কিন্তু অবিকল কাজল থেকে গেলো [illegible] কদর্য কালিমা! সে আর ফিরে গেলো না?

"—[illegible] পোড়া পুড়েছিলাম—" চন্দর ঠানদির নিজের মুখের বর্ণনা—"[illegible] কতো ওষুধ করে [illegible] কি করে পুড়লাম? [illegible] ঘরে আগুন লেগে। [illegible] বাড়ী নেই, আমি একা [illegible] এই ঘরে আমার [illegible]। [illegible] কিন্তু [illegible] মরতে পারিনি কিছুতে। শুধু [illegible] আর মরণ নেই, ষাট বছর [illegible] মুখপোড়া হয়ে বসে আছি। [illegible] মুখের কী হাল হয়েছে [illegible] দেখে সে শুনলে [illegible] ভাবিস বুড়ির চং দেখো! তা তখন [illegible] আর বুড়ি ছিলাম না ভাই? [illegible] বয়েস হয়েছিলো, লোকে বলতো [illegible] বছরের ছুঁড়ি বলে ভ্রম হয়। হাঁ [illegible] বলছিলাম—আয়নাতে মুখ দেখেই চীৎকার করে [illegible] উঠে আয়না আছড়ে ছুঁড়ে ফেলে এমন [illegible] হয়ে পড়েছিলাম, পুরো একটা বেলা নাকি জ্ঞান ফেরেনি। সেই অবধি আয়নায় মুখ আর দেখিনি।"

—বলো কি ঠানদি?

—সত্যি কথাই বলছি ভাই। আর কখনো আয়নায় মুখ দেখিনি, আর কপালে টিপ পরিনি, আর বাহার করে খোঁপা বাঁধিনি।

দুঃখে ধিক্কারে এমন হওয়া আশ্চর্য নয়, চুপ করেই থাকি।

চন্দর ঠানদি বোধ করি অতীতের সমুদ্রে অবগাহন করছিলেন, খানিকটা চুপ করে থেকে আত্মগতভাবেই বলেন—"আর কার জন্যেই বা [illegible] তো আর সেই অবধি মুখপানে চেয়ে দেখেনি।"

[illegible] বছরের পুরানো দুর্লভ কয়েকখানা [illegible] একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে।

—এই পুরুষের [illegible] যে মানুষ [illegible] স্বস্তি পেতো না, মাথায় তুলে রাখতে [illegible] এই ব্যাভার! [illegible] একটা ছেলে পুলে হয়নি, শুনাপ্রাণ [illegible] গোপাল [illegible] করেছিলাম! [illegible] তাকেই [illegible] খাওয়াতাম, ঘুম পাড়াতাম, মুখ [illegible] সেই দেখে—[illegible] বলতো [illegible] কথা, কী [illegible] সঙ্গে [illegible] জ্বলে [illegible] ওর বয়সী যে [illegible] ওর [illegible] মুখোমুখি বসে [illegible] বাড়ীতে [illegible] নেই, তাই বলে [illegible] শুধু বকবকম [illegible] না হয় [illegible] ছিলো, না হয় [illegible] এই বলে [illegible] বেটাছেলে [illegible] বসে থাকবে? [illegible] কান্না করতে [illegible] তুমি [illegible] সবুজ শাড়ী পরে [illegible] পায়ে আলতা আর কপালে টিপ পরে আমার সামনে বসে থাকো [illegible] শুধু দেখি। হাসিখুসি [illegible] আমি কিন্তু শুনে [illegible] ঠাকুরের অনাসৃষ্টি [illegible] ছেলের জন্যে [illegible] একটা কাপড়েচোপড়ে [illegible] থাকবে [illegible] কাপড়েচোপড়েই হলাম।

[illegible] আর বসে আছি।

ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বলি—গোপাল আবার কোথায় গেলেন [illegible] পাথরের গোপালের পা গজালো নাকি?

ভাবি—বোধ করি সোনার চূড়ো-বাঁশীর কল্যাণে চুরি গেছে।

চন্দর ঠানদি শিথিলভাবে বল্লেন—তা কেন, বরসুদ্ধ পুড়ে গেলেন! পাশাপাশি দুখানা কোঠা, একখানা শোবার, একখানা ঠাকুরের। দুখানা কোঠাইতো ভস্মীভূত হয়ে গেলো।

শিউরে উঠি মনে মনে। বিগ্রহ ভস্মীভূত? উঃ কী সাংঘাতিক!

—কিন্তু আগুনটা লাগলো কি করে?

প্রশ্ন করে বসি।

পোড়ারমুখি চন্দর ঠানদিকে দেখে অস্থির হবার, পোড়ার ইতিহাসটা ঠিক জানতাম না।

—সেইতো রহস্য!—চন্দর ঠানদি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বল্লেন—বললাম তো দিন-দুপুরে! গাঁয়ে আমাদের একটিও [illegible] ছিলো না। [illegible] সবাই [illegible] মার আর কি।

হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম? ধোঁয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম তাই না? কিন্তু লাভ হলোনা কিছু, সেকেলে সিন্দুকের ভারী ডালা ঠেলে তুলতেই পারিনে। তবে নাকি বলে প্রাণের দায়ে মশার গায়ে হাতীর বল আসে, তাই শেষ অবধি তুলে ফেলেছিলাম। কিন্তু ধোঁয়ায় আর ভয়ে চোখে যেন ধাঁধা দেখলাম, মনে হলো সিন্দুক বাঁঝি হাঁ হাঁ করছে খালি। তা তো নয়, ওতেই তো আমার যথাসর্বস্ব ছিলো। বিয়েতে বাবা দুদুখানা বারাণসী শাড়ী দিয়েছিলো, গা ভর্তি গয়না, ইদিকে শ্বশুর মটুক সুটের গয়না পরিয়ে বৌ নিয়ে এসেছিলো, শাশুড়ী মুখ দেখেছিলো মুক্তোর সাতনর দিয়ে, তাছাড়া —শাল, র‍্যাপার, পাশীশাড়ী সব ছিলো ওর মধ্যে। চোখের ধাঁধা আর কি! চোখেও ধোঁয়া দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে এধারের একখানা জানালার কপাট হঠাৎ 'লাউ লাউ' করে জ্বলে উঠে, যেন আমারই দিকে তেড়ে এলো। বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা! এদিকের দরজা দিয়ে যে ছুটে পালিয়ে আসবো, সে বুদ্ধি জোগালো না, ভয়ে আঁৎকে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

তাই বলি আমার গোপালের মতন একেবারে পুড়েওতো মলাম না? সেই মুহূর্তে কর্তার কি করতে বাড়ী ফেরবার দরকার পড়েছিলো। এসেই নাকি আমাকে বের করে ফেলেছিলো। পাড়ার পাঁচজনে ছুটোছুটি করে আগুনও নিভিয়েছে ততোক্ষণে।

জ্ঞান হয়ে দেখি দালানের চৌকীতে শুয়ে আছি, মুখে-মাথায় ফেট্টি বাঁধা। একটা চোখ তো ঘুচে গেছলো, আর একটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখলাম, দেখলাম মুখের কাছে আটি নাম বসে, তোর ঠাকুর্দার ছায়া মাত্তর নেই।

মুখও পুড়লো অদেষ্টও পুড়লো। সেই অবধি আর কখনো ভেন্দা করে আমার মুখপানে চেয়েও দেখেনি। তাইতো বলি— পুরুষের ভালোবাসার পোড়াকপাল!

সংবাদ নতুন নয়।

এ ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। জ্ঞানাবধিই চন্দর ঠানদির এই দুর্ভাগ্যের বিবরণ শুনে আসছি এবং পুরুষের ভালোবাসার অসারত্ব সম্বন্ধে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছেন চন্দর ভট্চায্যি!

কতো লোকের স্বামী বসন্ত হয়ে কদাকার কুৎসিত দৃষ্টিহীন হয়ে যায় এবং সতীসাধ্বী স্ত্রী কিভাবে তাকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসে সে উদাহরণও শুনতে পাওয়া যায় চন্দ্র ভট্চায্যির প্রসঙ্গে!

ভট্চায্যি কিন্তু নির্বিকার।

ভোরে উঠে খড়ম খটখটিয়ে গঙ্গাস্নানে যান, [illegible] তোলেন, সাজী হাতে করে চলে যান ব্রহ্মমোহিনীর মন্দিরে। সেখানে তিন ঘণ্টা [illegible] পূজো। অতঃপর পাড়া-ভ্রমণ। মধ্যাহ্নে দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ, অবশেষে বাড়ী ফিরে অধ্যয়ন। এই হচ্ছে চন্দর ভট্চায্যির দিন-লিপি।

দেখে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে সকলের, বহুকাল থেকেই এরো হয়েছে, তবু এখনো ওনার কথা উঠলেই আমাদের মা-পিসিমা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেন—ধম্ম না ছাই! ক্রিচিকিনেমী! ধম্মজ্ঞান থাকলে আর কেউ বিয়ে করা পরিবারকে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে বলে ত্যাগ দিয়ে রাখে না! ভণ্ড বিটেল! আর ওই পরিবারের যখন রূপ ছিলো? তখন আবার এমন আদিখ্যেতা ছিলো যে, দেখে গায়ে ধুলো দিতে ইচ্ছে করতো! পুরুষের ভালোবাসা, মোছলমানের মুরগী পোষা!

আটষট্টি বছর বয়েস হয়েছে চন্দর ভটচায্যির, তবু এখনো তাঁর ভালোবাসার ত্রুটি নিয়ে ধিক্কার দিচ্ছে লোকে। হৃদয়হীনতা জিনিসটা যে বরদাস্ত করা যায় না এই তার প্রমাণ।

কিন্তু সত্যিই কি হৃদয়হীন ছিলেন চন্দর ঠাকুর্দা?

হৃদয়হীন? না অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ?

'ছিলেন' বলছি বলে চমকালেন বুঝি? তা চমকাতে পারেন। জলজ্যান্ত সোজা সতেজ লোকটা ফুল তুলতে তুলতে শরীর কেমন করছে বলে এসে শুলো আর মরে গেলো, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তবু গেলেন! এই-ভাবেই গেলেন চন্দর ভট্চায্যি। মরণকালে চন্দর ঠাকরুণ এতোদিনের অবজ্ঞার অপমান ভুলে কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। চন্দর ঠাকুর্দা নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সেই অর্ধদগ্ধ মুখের দিকে, তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাতটা একবার তুললেন। ধপাস করে পড়ে গেলো হাতটা।

মনে হলো কী যেন একটা বলবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছেন। সবাই মিলে হুমড়ে পড়লো মৃতকল্প লোকটার বুকের উপর মুখের উপর। 'শেষকথা' শোনবার কৌতূহলে কম যায় না কেউ।

কিন্তু কথা কই? অস্ফুট একটা শব্দমাত্র। বাস! হয়ে গেল। দু' গজ দূরে পড়ে রইলো পিতলের ফুলের সাজিটা, দরজার কাছে পড়ে রইলো সদ্যপরিত্যক্ত খড়ম জোড়াটা, চন্দর ভটচায্যি বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

আর সহসা অনেককে পরাজিত করে রাখাল বিশ্বাস বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—আমি শুনেছি! স্পষ্ট শুনেছি! বললেন—'বাগানে সিঁদুরে আমগাছতলায়—!'

'তাই নাকি আঁ!' 'কিছু পোঁতা আছে বুঝি?' 'বুঝি' আবার কি? নিশ্চয়ই।

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো সবাই। সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের থেকেও দুর্বার হয়ে উঠলো গুপ্তধন সন্ধানের কৌতূহল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখ দেখে মনে হলো—শবদাহ প্রস্তাব মুলতুবি রেখে, এক একখানা কোদাল নিয়ে লেগে পড়েন ওরা।

আর বলে ফেলেই পরক্ষণে রাখাল বিশ্বাস মনে মনে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকেন। হায়! হায়! এ কি বোকামি করলেন তিনি! গুপ্ত-ধনের সন্ধানটি গুপ্ত রেখে, কিছুদিন পরে চুপিচাপি দেখে নিলেই হতো জায়গাটা। দেখা যেতো কী ঘোড়ার ডিম আছে তাতে।

মৃতের শেষকথা শুনতে পাওয়ার গৌরবে, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেলো, বলে বসলেন সবাইকে। ছি ছি ছি!

কিন্তু আপশোষ বৃথা! হাতের ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে।

চন্দর ঠানদির একটা গেঁজেল ভাইপো ছিলো কোথায় যেন, সে ঠিক সময় এসে পড়ে

(ইহার পর ২০৯ পৃষ্ঠায়)

সারাটি
বছর
অম্লান আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক
আপনাদের গৃহ, মুছে যাক অতীত কর্মের
যতো বেদনার স্মৃতি।
স্মরণে রাখবেন, বেদনা, মাথাব্যথা, সর্দি
এবং জ্বরের উপশমে এনাসিন দ্রুত, নিরাপদ
ও অব্যর্থ ফলপ্রদ।
'এনাসিন'
ট্যাবলেট
বেদনার উপশমের জন্য
ভারতে প্রস্তুতকারক:
জিওফ্রে ম্যানার্স এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
ম্যাগনেট হাউস, ডুগাল রোড, বোম্বাই-১।
ট্রেডমার্ক স্বত্বাধিকারী: হোয়াইটহল ফার্মাকল কোং, নিউইয়র্ক, ইউ, এস, এ,

পরিমল গোস্বামী — দার্জিলিঙের পথে

পান্না সেন — দক্ষিণ উপকূলে

দিয়ে যাচ্ছি আর প্যারিসটা দেখে যাব না? লোকে তাহলে বলবে কি? আর নিজেরাই যে নিজেদের বেকুব বলে মনে করতে থাকব রাত-দিন। সে অনুতাপ, সে আফশোসের সীমা থাকবে না।

অতএব প্যারিসের একটা ষ্টেশন থেকে নেমে সহরের মধ্যে দিয়ে অন্য ষ্টেশনে লণ্ডনের ট্রেন ধরতে যাবার সময় আর একবার হিসাব কষতে বসলাম। শেয়ালদা থেকে হাওড়া যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই একটা জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে।

আপনার পকেটে ত আর আমাদের মত আরসোল্লা ডন মারে না। কাজেই আপনি বুঝবেন না আমার আর রামুর অবস্থা। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে খুব সস্তা পেন্সনে যদি শুধু রাতে ঘুমানোর ঘর নেওয়া যায় আর বাইরে বাইরে সস্তা রেস্তোরাঁ থেকে খাওয়া যায় তাহলে হাতে যা টাকা বাকী আছে তা দিয়ে এ যাত্রা প্যারিসটাও সেরে নেওয়া যায়।

আমেরিকানরা বলে ডুইং ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ইণ্ডিয়া সারছি। আমরা তারচেয়ে ভালভাবেই প্যারিস্ সারব। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক্, তার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমরা—এ হেন কত ভারী ভারী কথা মনে এসে গেল। কি কি দেখব তার তালিকা সে অনুসারেই তৈরী করে নিলাম। সরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে লুভর্ মিউজিয়াম পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত আমি বলে ফেললাম্—কিন্তু ম্যাক্সিম? ম্যাক্সিম অব প্যারিস? সেখানে একবেলা না খেলে কি আর প্যারিস দেখা সম্পূর্ণ হতে পারে?

নোট বুক থেকে মুখ তুলে হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা থুতনীতে রাখল রামু। বলল,—দি আইডিয়া! প্যারিসে যখন এসেছি তখন ম্যাক্সিম অবশ্যই। তা যত খরচাই লাগে। তবে তার সঙ্গে যোগ দাও ফলি বারজেয়ার।

খুশীতে উছলে উঠে দুজনেই জুতোর গোড়ালীতে ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে নিলাম। যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।

কিন্তু ড্রেস স্যুট অর্থাৎ রাত্রে খাওয়ার পোষাক নেই বলে ডিনারের হাঙ্গামে গেলাম না। দুপুরের লাঞ্চ সারলাম সেখানে। আর ফলি বারজেয়ার থেকে মাঝরাতে সবাই যখন হুস হুস করে নিজের মোটরে, না হয় ট্যাক্সিতে ফিরে যেতে লাগল আমাদের দুই হিন্দুর তখন সম্বল রইল চরণ মাঝি।

তা, তাতে আর লোকসান কি, বলুন? আর্ট ইজ দি থিং। জীবনে শিল্পই হচ্ছে আসল, সুন্দরই হচ্ছে সত্য। তার আরাধনা, তার আস্বাদ—সেটাই বড় কথা। সে পরম সম্পদ কি আর মোটর চড়লেই বেশী পাওয়া যায়? না, পায়ে চলে চলে জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে সে ধনেও টান পড়ে? আমরা আকাশে পা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

আমি বললাম,—যা বলিস্ ভাই রামু, এই আমার বেশ লাগছে। শীতে হাত পায়ের আঙ্গুলগুলো অবশ্য কনকন করছে। ওভার-কোটের কলার উল্টে তুলে দিয়ে কানদুটোকে কোনমতে ঢাকবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তবু শিল্প সাধনার যা অপরূপ প্রতিভা দেখলাম তাই মনকে উত্তাপে ভরিয়ে রেখেছে, তাই না?

রামুও উৎসাহে সায় দিল,—ঠিক বলেছিস। ওই মোটরবিহারীরা এখখুনি বাড়ী ফিরে নাক ডাকাতে সুরু করবে। না হয় ককটেলের ঝোঁকে আবোল তাবোল ভাবতে থাকবে। কিন্তু এই যে আমরা নিখুঁতভাবে সাদা চোখে সাদা মন নিয়ে এই নাচের দৃশ্যগুলো হরেক রকম শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাচাই করতে করতে চলেছি এটা কি আর ওরা পারবে? ওরা কি হারিয়েছে তা ওরা জানে না।

—রেখে দাও তোমার ওদের কথা। এমন সব জালগার দর্শক, দেখলি না, যখন ওই নগ্ন নৃত্যটি দেখছিল, কত লোক একশো ফ্রাঙ্ক দিয়ে অপেরা গ্লাস ভাড়া করে সে নাচটি দেখতে লাগল, ছ্যাঃ, কি রুচি সব।

রামুও সায় দিল, বলল—ঠিক বলেছিস,—আমরা কেমন দূরে থেকে সাদা চোখে স্বাভাবিক মন নিয়ে ভগবানের সৃষ্টি সৌন্দর্য সোজাসুজি দেখবার, অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। আর ওরা? ছ্যাঃ। কতখানি বসন আছে, তার কতটুকুই বা আছে শাসনে সে সব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কি আর 'এসথেটিকসের' দিকে নজর থাকে? সুন্দরের অনুভব করা চলে?

দুজনেই বেশ একটু ধাপে ধাপে নৈতিক স্তরে উপরে উঠে গেলাম। মনটা চড়াসুরে বাঁধা রইল। হায় ব্যান্ডো, তুমি থাকো তোমার কণ্টেসার কাহিনী নিয়ে। আমরা এই নিশুতি রাতের নিঃসম্বল সাধনায় রূপের মধ্যে অপরূপের সন্ধান পেয়েছি।

এমন সময় কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল রামুর উপর? আঁৎকে উঠলাম। পুলিশ নাকি? শীতের প্যারিসে রাত দুপুরে লঙ্কা পাহারাদার হেঁটে বেড়ায় না। পকেটমারেরা খোলাখুলি বুক ফুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করে না। তবে কি গুণ্ডা নয় ত? তাহলে ত এক লহমাতেই হেস্তনেস্ত করে ফেলবে? তারা আমাদের পকেটে কি থাকবে তা ত চেহারা আর কাপড়-চোপড়েই মালুম। সাহেব গুণ্ডারা কি এত কাঁচা হবে?

কিন্তু এযে মেয়েলী গলা, মেয়ের চেহারা। গায়ে ওভারকোট নেই। তা বোধহয় খারাপ মেয়ে বলেই এই শীতের রাতেও নিজেকে ওভার-কোটে ঢেকে রাখতে চায় না। কথা বলছে বড় মিঠে সুরে। মায়ায় ভরে গিয়েছে সে সুর। সত্যি, ফরাসী ভাষাটাই কি মিঠে, তার উপর তাতে যখন থাকে 'আমুরের' মধু, ভেবে দেখুন ফরাসী 'আমুর' কথাটার মধ্যে সংস্কৃত প্রেমের 'র' ফলাটুকু নেই। সেইজন্যই কোমল, কমনীয়। মাখনের মত নরম অথচ মধুর মত মিঠে।

কিন্তু এই নির্জন শীতের রাতে? কালিদাসের লাইনগুলো মনে পড়ল। "রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে" অভিসারিকারা আনাগোনা করতেন। কিন্তু বিদ্যুৎ তাদের পায়ের কাছে চমক দিয়ে দিয়ে পথ আলো করে তুলত। আহা, এই ফরাসিনীর মুখও আলো করে তুলেছে রাস্তার 'মার্কারি ভেপার' ল্যাম্পের নীলাভ আলো।

আঃ, রামুটা একেবারে লাকি ডগ্। পকেট ফুটো হলে কি হবে, কপাল মোটেই ফুটো নয়। ওকে অভিনন্দন করে সরে পড়াই বোধহয় উচিত হবে। রসভঙ্গ হলে সেই দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হবার সময়কার অভিশাপ আমায় লাগতে পারে। বাবাঃ, আমি কারো অভিশাপ কুড়োতে চাই না।

কিন্তু রামুই আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। ফিস্ ফিস্ করে কাছে আসতে বলল। জানিয়ে দিল যে মহা বিপদ হয়েছে।

বিপদ কেন? ব্যান্ডো যে কণ্টেসার কাহিনী ঝেড়েছিল একখানা। আর এযে খাস প্যারিসের জলজ্যান্ত একজন অভিসারিকা। বিপদের কি হল? না হয় ঝেড়ে ফেলে সটান বাড়ী ফিরেই চল। তা বিপদ কিসের? কাতরকণ্ঠে রামু জানাল—ভাই মহা বিপদ। বলে কিনা সঙ্গে নিয়ে চল।

কথাটাতে একটা ধাক্কা খেলাম। এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি যে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা উঠতে পারে। সাদা চোখে মন না রাঙায়ে ফলি বারজেয়ারের নগ্ন নৃত্যও দেখে এসেছি। শিল্পে রঙীন চশমা দিয়ে দেখে এসেছি রূপের পশরা, যৌবনের অভিষেক। ভেবে এসেছি যে ও-ই হচ্ছে আমার মানস স্বপ্নের অনুপ্রেরণা। রূপসায়রের পারে দাঁড়িয়ে রূপসীর পানুচরের কথা মনেই হয়নি।

কিন্তু দুনিয়াটা অত বোকা, অত নিরেমিষ যে নয় তারই হাতে হাতে প্রমাণ [illegible] আছে রামুর গায়ে; জড়িয়ে ধরেছে তার গলা। [illegible] তার সঙ্গে ঘরে গিয়ে উঠবে। শিল্পের এই নতুন [illegible]।

চমকে উঠলাম প্রায়। ভয়ের বেশী চেঁচাতেও সাহস নেই। কি জানি যদি সেটা [illegible] [illegible] থেকে এসে হাজির হয়? [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] রামু, বলল,—কিন্তু [illegible] যে [illegible]।

[illegible]

রামু তাতে ভরসা পেল না। বলল—পুলিশ কোথাও নেই। তবে চুপে চুপে চুপে চল বাড়ীর দরজা পর্যন্ত যাই। সেখানে ওর মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেই হবে।

—উঁহু, অত কাঁচা মেয়ে নয় এরা। চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। সবাইকে জাগিয়ে তুলে জানাবে যে এতক্ষণ যে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে তার জন্যও টাকা দিতে হবে।

—তাও ত বটে, এমন কি পুলিশ ডেকে নালিশ করতে পারে যে চুক্তি অনুসারে টাকা দিই নি বলে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সর্বনাশ! রামুর চাবির নয়, পকেট নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে। হা ভগবান, এতও ছিল তোমার মনে।

এদিকে অন্য ভাষায় কথা কয়ে যাচ্ছি দেখে মেয়েটা খুব ভরসা পেয়ে গেছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—যাক বাঁচালে আমায়। আমি অবশ্য বেশী টাকা চাইব না।

চটে গেলাম। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত

জবলে উঠল। সেই শীতের রাতেও। এগিয়ে এসে মুঠো শক্ত করে পাকিয়ে বললাম,—সরে পড়, কেটে পড়, মাদমোজেল, ওসব সুবিধে হবে না। আমরাই পুলিশ ডাকব যদি চালাকী করতে চাও।

চোখ নিচু করে সে বলল—না, না আমি কোন চালাকী করব না। বেশী টাকা আমি চাই না। শুধু......

—হোয়াট। বেশী টাকা ত দূরের কথা, তোমায় পুলিশে দেব আমরা।

হ্যাঁ, মনে মনে ভেবে দেখলাম যে যুদ্ধের শাস্ত্রে বলে যে এগিয়ে এসে হামলা করাই নিজেকে বাঁচানর সব চেয়ে বড় উপায়। আক্রমণই শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা। তেড়ে হাকলাম,—তোমায় পুলিশে দেব আমরা।

রাগের চোটে জাদাম' (পুলিশ) কথাটা ইংরিজি বানান অনুসারে উচ্চারণ করে ফেললাম গেনডার মেস। কিন্তু যা মেজাজ সে উচ্চারণে ফুটে বের হল তাতে কথাটার মানে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ভাল করে নজর পড়ল। তন্বী তনুলতার উপরে ফুলের মত কোমল মুখ। তার মধ্যে ফুটে রয়েছে বন-হরিণীর ভীরু চাহনী। হ্যাঁ; স্বীকার করতেই হবে দেখতে ভাল, এমন কি খুবই ভাল। এত ভাল না হলেও চলত। কাণ্টেসাই হোক আর কাঠকুড়ুনীই হোক তাতে রামুর কি বা আসে যায়।

না, এসব মায়া রাক্ষসীর পাল্লায় পড়া ঠিক নয়। ও দেখতে ভাল বলেই বেশী বিপদ। যত দেরী তত বেশী বিপদ। রামুকে বাংলায় বললাম—দেনা ঝটকা মেরে একটা ধাক্কা। শেষকালে কে এসে পড়বে ঠিক নেই।

রামুও যেন জেগে উঠল। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যাবে এমন সময় মেয়েটা করুণ সুরে আবার বলল,—আমার বেশী টাকার দরকার নেই। সামান্য হলেই চলবে। আমি সত্যি দেখতে ভাল, এই দেখুন পেশ্ট পর্যন্ত করে আসিনি।

হুঃ ওরে হিন্দু ভোলে না। দরকার হলেই তোমরা সেজে গুজে নকল সুন্দরী সাজতে জান। আরেকটু বয়স হলেই তা সুরু করবে। কিন্তু আমরা সে সব যাচাই করতে ত প্যারিসে আসি নি।

আমরা সত্যি হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছি দেখে মেয়েটা আরো ব্যাকুল হয়ে উঠল,—না, না মঁসিয়ো, টাকা তোমার যা খুসী তাই দিয়ো। আমার কোন দাবী নেই।

তাতেও কোন ফল হবে না। মেয়েটা সত্যি বোকা। কারণ আমাদের এত বোকা ভাবে যে সস্তার লোভ দেখিয়ে একেবারে তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়। মনের উত্তেজনায় এবার মুখ দিয়ে হিন্দি বেরিয়ে এল। কাভি নেহি, নেহি নেহি।

নেহি কথাটা বোধহয় দুনিয়ার সব দেশেই বোঝা সহজ। যদি বা শক্ত হত, আমার গলার আওয়াজেই তার মানে মালুম করিয়ে দেবে।

কাতরভাবে অনুনয় করল মেয়েটা,—মঁসিয়ো, দয়া কর। এক ফ্রাঙ্কও চাই না, শুধু তোমার ঘরে রাতটা থাকতে দাও। বড় শীত। আমার গায়ে ওভার কোট পর্যন্ত নেই।

রাস্তার আলো ভীরু হরিণীর চোখের উপর এসে পড়ল আবার। দেহ পশারিণীরা কি আর তাদের পশরা ঢেকে রেখে, লুকিয়ে রেখে ব্যবসা করতে বের হবে? কিন্তু এই রাক্ষুসী তার চেয়ে বেশী শয়তান। একবার যদি ঘরে পা দিতে পারে তাহলে কি আর আমাদের রক্ষা আছে? যদি ওকে শীতের জন্য ঘরে থাকতেই দিই আর নিজেরা সিঁড়ির মোড়ে ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে রাত কাটাই তাহলেও কি আর কোন বুদ্ধিমান আমাদের ধর্মপুত্তুর বলে বিশ্বাস করবে?

ওরে রামু, বোকচন্দর, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, যদি বাঁচতে চাস।

ম্যাক্সিমের বিল আর ফলি বারজেয়ারের টিকিট পকেটটাকে একেবারে শুষে নিয়েছিল। তবু সে খরচটাত করব বলেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত কাটায় কাটায় হিসাব করেও কিন্তু সামলাতে পারলাম না। প্যারিস থেকে ভুল ট্রেণে উঠে যে বন্দরে এসে হাজির হলাম সেখান থেকে ইংলণ্ডে যেতে জাহাজের ভাড়া লাগবে বেশী। গেল; দুপুরের আর বিকেলের খাওয়ার পয়সাও উবে গেল এই টিকিট কিনতে গিয়ে। তা যাক, সস্তায় স্পেনে কিস্তিমাৎ করেছি। ম্যাক্সিমে খেলাম, দেখলাম ফলি বারজেয়ার। দেশে না হয় আপনার দেনার টাকা পাবে; সখ আর সামর্থ্যের অন্ত নেই। কিন্তু দেখা আর চাখার ব্যাপারে এত কষ্ট করে এত রস পাওয়ার সৌভাগ্য কি আর আপনার হবে?

কিন্তু এ বয়সে ছাই খিদেও আবার হয়ে ওঠে রাক্ষুসে। কিছুতেই সামলাতে পারি না। পকেটে মোটে পাঁচ পেনী। ওত লণ্ডনে পৌঁছে ষ্টেশন থেকে বোর্ডিং হাউসে যেতে বাস ভাড়াতেই লেগে যাবে। কাজেই ও পয়সায় হাত দেওয়া চলবে না।

অনেক মনোযোগ দিয়ে ঢেউ গুনতে লাগলাম। কটা 'সীগাল' পাখী একসঙ্গে দেখা যায়? কটা ট্রলার আজ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে? ইংলিশ চ্যানেলে বেশী ঝড় ওঠে, না বিস্কে উপসাগরে? জাহাজের উপরে ক্যাপ্টেনের ডেকে উঠে তার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করলাম। শেষ পর্যন্ত জাহাজের বৈঠকখানায় কোঁচায় খুলে দিয়ে চোখ বুঁজে বসে রইলাম।

খিদের যে এতগুলো দাঁত আছে তা আগে কখনো জানতাম না। আর এত বাঘের নখের মত দাঁত। পেটে কামড় দিচ্ছে। মাথা করছে ঝিম ঝিম। সকালেও খাইনি। মতলব ছিল যে জাহাজে উঠবার আগে, সকালের আর দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে একটা খাওয়া খেয়ে এক ঢিলে দু' পাখী মারব। সে মতলবটাত ফেঁসেই গেছে।

সন্ধ্যা নাগাদ বমি বমি করতে লাগল। আর পারি না। শেষ পর্যন্ত সবার নজরে পড়ে যাব; হাসবে লোকে ডুবাব দেশের নাম। তার চেয়ে না হয় লণ্ডনে পৌঁছে পাঁচ মাইল হেঁটে বাসায় পৌঁছবার জন্য। এখন ত খেয়ে নিই।

কিন্তু পাঁচ পেনী পকেটে নিয়ে জাহাজের রেস্তোরাঁয় ঢুকলে কি আর জাত থাকবে? সেখানে শুধু এক টুকরো টোষ্ট, মাখন মাখান তাও আর চাওয়া যায় না। শুধু এক কাপ চা না হয় নিলাম। অমনি দিতে হবে তার পেছনে ওয়েটারকে তিন পেনী টিপস্ বখশিষ। না, এক কাপ চাও চাওয়া চলবে না। তাহলে?

অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম যে, ওকে এক টুকরো চকোলেট কেনা চলে। তার পরে খাও বিনি পয়সায় এক গেলাস জল। ওইতে যতদূর হয়। পেটে পাথর চেপে পড়ে থেকেও যখন কুলোয় না তখন এতেই যথালাভ।

লাউঞ্জে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চকোলেট চুষছি। খাচ্ছি না কিন্তু। তাহলে যে ফুরিয়ে যাবে চটপট।

রামুর মুখে একটু হাসি ফুটল। বলল,—যাই বল ভাই, কালকে ম্যাক্সিম তার আর উপোষ—জীবনে কত বড় একটা কন্ট্রাষ্ট (বৈষম্য) হল ভেবে দ্যাখ। কজনের কপালে আর তা জুটেছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম—তার চেয়ে বড় কন্ট্রাষ্ট ত কাল রাতেই জুটেছে তোর কপালে। ফলি বারজেয়ার আর তার বাইরেই সেই রাস্তার মেয়েটা।

হঠাৎ আয়নায় নিজের মুখটা নজরে পড়ল। আজ যে খাইনি কিছু সারাদিন তার ছাপ সেখানে স্পষ্ট। কিন্তু এ অনশন ত শুধু একদিনের, সামান্য কতটুকু সময়ের। আর কালকের ওই মেয়েটা? ভাবতেই চমকে উঠলাম।

ওর তনু ত তন্বী নয়; অনাহারে, অর্ধাহারে ক্ষীণ। যে খেতে পায় না ভাল করে সে মেয়ের মুখ অল্প বয়সে কোমল না হয়ে আর কি হবে? আর ক্লান্ত দুঃখী চাহনীকে বনহরিণীর ভীরু চাহনী বলেই ত কবিরা রসিকরা দূর থেকে ভুল বুঝবে। তুষারঝরা দুরন্ত রাতে যে মেয়ে শুধু পাতলা গাউন পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে ত শুধু পশরা সাজাবার মতলবে নয়। —সে মুখের দিকে তাকিয়ে তার মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, ওর থাকার জায়গা নেই। পেটে নেই ভাত।

আমাদেরও চাল-চুলো এমন কিছু ছিল না তা বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই। তবু যে শুধু রাতের জন্য আশ্রয় চেয়েছিল সেটাও হয়ত চাইত না ওর ওভার-কোট থাকলে, ফলি বারজেয়ারের এয়ার কণ্ডিশন করা আরামে বিলাসে ভরপুর ষ্টেজে যে তনু নগ্ন নৃত্যে বিলসিত হয়ে ওঠে সে তনুকে অনশনে অর্ধাশনে সামান্য বসনে বরফের রাতে রাস্তায় ছেড়ে দিলে তার মধ্যে যে চাহনী ফুটে উঠবে তাকে কোন্ অপরূপের রূপায়ণ বলে ধরে নিব?

না গলা চকোলেটটা গলায় আটকে গেছে।

দিনকাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দু'ক্রোশ দূরে গঙ্গা—কাঁচা-পাকায় মেশানো পথ। তবু অবসরপ্রাপ্ত দুই বৃদ্ধ—শ্রীনিবাস আর শান্তিময়—নিত্য স্নানে বড় একটা গর হাজির হন না। পুণ্যসঞ্চয় অথবা স্বাস্থ্যরক্ষা কোন্‌টির তাগিদ বেশী সে ঠিক না জানা গেলেও পথ চলার নেশার আমেজ—ভোরবেলাকার ফুরফুরে হাওয়া গায়ে লাগলেই অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে গল্পের নেশা। অবসর পাওয়ার পর অতীত দিনের ঘটনাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—স্মৃতির পাতায় সেগুলি বর্ণাঢ্য ছবি। পথ চলতে চলতে দেশের খবর—গ্রামের খবর—পাড়া প্রতিবেশীর খবর না নিলে নিজ জীবনের মূল্য যাচাই কাজটা কেমন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়—শ্রীনিবাস আর শান্তিময় তাই পথ চলতে চলতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

জানলে শ্রীনিবাস ভায়া—পাড়াতে এবার যে থিয়েটার হবে পুজোর সময়।

থিয়েটার? কারা করবে? হরিনাম থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীনিবাস।

পাড়ার নিষ্কর্মা ছেলেরা। তোমার আমার সব বাড়ীর ধনুর্ধরেরা নাকি জুটেছেন।

বটে। ভ্রূকুঁচকে খানিক চুপ করে রইলেন শ্রীনিবাস। পরে বললেন, ভাগ্যিস কালো বাড়ী নেই—থাকলে আড্ডায় গিয়ে জুটতো।

ও হরি তা বুঝি জান না। শান্তিময় হাসলেন। যারা চাকরি করছে—তারাও নাকি পেছনে আছে। তাদের বলাই তো বল—তারাই নাকি রসদ যোগাচ্ছে।

হুঁ। গম্ভীর হয়ে গেলেন শ্রীনিবাস। তা কালো তো অনেক দিন বাড়ী আসেনি।

আহা, চিঠিপত্র চালাচালি কি আর হচ্ছে না! ও ভায়া—সব শেয়ালের এক রা। দেখো তুমি, পুজোর সময় ঠিক ভিড়ে যাবে দলে।

হুঁ। দেখা যাবে। হুংকার দিয়ে উঠলেন শ্রীনিবাস। একটু পরে বললেন, এইতো সবে দু' বছর হল ঢুকেছে চাকরিতে। মাত্র আশিটি টাকা মাইনে। কলকাতায় [illegible] পোষাক-আসাক—ট্রেন ভাড়া। শ্রীমানের [illegible] কতই বা থাকে। বাড়ীতেও মাসে মাসে কিছু দিচ্ছে।

তা সত্যি। তবে সখ চাপলে কিছুতেই বিশ্বাস নেই ভায়া, কোথা থেকে কি যে হয়—!

শ্রীনিবাস বেশ খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা ভায়া—একটু সন্ধানে থেকো তো। তোমাদের পাড়ার দিকেই তো ক্লাব।

আচ্ছা আচ্ছা—সে আর তোমাকে বলতে হবে না। আমাদের দুটো নাতিই শুনেছি ওদিকে উকিঝুঁকি মারছে। গিন্নী বলেন,—এমন টিকটিক কর কেন ছোঁড়া দুটোকে। এই তো ওদের হেসে-খেলে ফুর্তি করবার সময়। তোমরা করনি ফুর্তি?

শ্রীনিবাস চড়া গলায় বললেন, ওরা অমনি [illegible] বলে। আমাদের সময় এমন থিয়েটারের হুজুগ ছিল?

বললেন, [illegible] দল করনি?

হুঁ—[illegible] থিয়েটার সমান হতো! সাধে বলে [illegible]—দশ হাতে কাছা নেই!

স্নানের পথে কদিন ধরেই চলল আলোচনা। শান্তিময় বললেন, শ্রীনিবাস ভায়া, ঠিকই বলেছ। যাত্রা আর থিয়েটার আকাশ-পাতাল তফাৎ। সিন আঁকানো হচ্ছে, নাকি বাঁধা স্টেজ হবে।

বল কি—সে যে অনেক খরচ। চমকে উঠলেন শ্রীনিবাস।

আছে নানা ভাল ভাল দেনেওয়ালা আছে। মুখ মচকে হাসলেন শান্তিময়। কথায় বলে খুঁটোর জোরে—

আরে রাখ তোমার উপমা। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন শ্রীনিবাস। ভাল করে খোঁজ-খবর নাও—কে কে পাণ্ডা হয়েছেন দলের।

খোঁজ-খবর কি নিচ্ছি না? নিচ্ছি। শুনলাম হাজার টাকার ওপর খরচ হবে। গিন্নীকে আর কিছু বলিনি। বললেই তো ছেলেদের হয়ে রণমূর্তি! সিন্দুকের চাবিটা শক্ত করে বেঁধে রেখেছি কোমরের ঘুনসিতে, বিশ্বাস নেই কাউকে।

কখন কি হয় কখন কি হয়—এই ভাবনায় শ্রীনিবাস উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র নির্বিঘ্নে কাটল। কালো ওরফে হরিপদ মাস কাবার হলে বাড়ী আসে—শ্রীনিবাসের হাতে মাইনের টাকার হিসাব দাখিল করে। শ্রীনিবাস দিন কয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত হন। পরীক্ষা করবার জন্য মাঝে মাঝে বলেন, শুনেছিস, বাঁশপাড়ায় নাকি থিয়েটার ক্লাব হচ্ছে? ওরা পুজোয় থিয়েটার করবে।

হরিপদ অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি?

হাঁ। শুনি তো [illegible] করবে। যারা যারা চাকরি করে তাদের সবাইকার কাছ থেকে চাঁদা নেবে।

ওঃ।

আড়চোখে ছেলের মুখের ভাব দেখে নিয়ে বলেন, তা তোকে কিছু বলেনি?

আমাকে! চমকে ওঠে হরিপদ। আমাকে মানে বলেছিল বটে। তা বললাম এই তো নতুন চাকরি, কটা টাকাই বা পাই—

বেশ বলেছিস। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন শ্রীনিবাস। ও সব সখ বড়লোকদেরই মানায়।

হরিপদ বলল, আমায় ডেকেছিল। বললাম, চাঁদা তো দিতে পারব না। তা বললে, সবাইর কাছ থেকে চাঁদা তো নেয়া হবে না। যে দেয় দেবে, না দেয় পার্ট করার লোকও তো চাই।

বেশ বলেছিস। তবে পাড়ার ছেলে—একেবারে না বলাটা ঠিক নয়। রাগ করে কখন কি করে বসে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ভারি বদ ছেলে সব। নষ্টচন্দ্রের দিন কি কাণ্ডটাই না করল। বিনি ময়রার লাউ মাচা আর বাতাবি লেবু উচ্ছন্ন করে দিল। দোষের মধ্যে বিনি নাকি কাকে গাল দিয়েছিল।

হরিপদ এইভাবে জমি আবাদ করে নিল। শ্রীনিবাস কেমন করে জানবেন—নাটকের মহড়া বসে হরিপদদেরই মেসে এবং নায়কের ভূমিকা নিয়েছে ও স্বয়ং।

বাবার কাছে প্রতি মাসেই হিসাব দিতে হয়

অথচ মোটা টাকা চাঁদা পড়েছে হরিপদর নামে। কি উপায়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে—সেই চিন্তাই দিন-রাত করছে। সেদিনও ট্রামে বসে বসে ভাবছিল— উপায় কি? হঠাৎ মার শালাকে—ধর শালাকে চীৎকারে ওর ধ্যান ভঙ্গ হল। ট্রামের মধ্যে সকলে মিলে একটা লোককে ধরে গোবেড়েন দিচ্ছে। ব্যাপার কি? লোকটা নাকি পকেটমার। একটি কলেজের ছেলের বুকপকেট থেকে ফাউণ্টেন পেন উঠিয়ে নিয়েছিল। তারপর—

হরিপদর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সেদিন পুরো মহলা। হরিপদর দুই বন্ধু মিলে চায়ের ভার নিয়েছে চল্লিশ দুপুরে আশী কাপ চায়ের দাম পাঁচ টাকা।

রমেশ, হরেন, পাঁচু ওরা চেপে ধরল, শুধু চা? রিহার্সাল আর্লুনি আলুনি লাগছে। দু স্লাইস করে টোস্ট ছাড়—কিংবা দুখানা করে সিঙ্গাড়া। অর্থাৎ আরও দশটা টাকার ধাক্কা। এ ছাড়া আছে সিগারেট। অনেকেই ধূমপায়ী আছে—খরচাটি বিশেষ করে তাদেরই। পানের বেলাতেও ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেসবটা যদিও হরিপদর একা নয়, তবু বই-এর মলাটের ভূমিকা ওর ভাগ্যে পড়াতে—এ আসরে ও অদ্বিতীয়। চাঁদার তালিকায় ওর নাম সর্বাগ্রে।

সাবধান করে দিয়েছে সবাইকে, দেখিস— বাবার কানে যেন এসব না ওঠে। যে রাগী মানুষ!

হুঁ—আমরা যেন পাড়ায় বাস করি না—জানি না মুখুজ্জ্যে মশাইকে! তুই নিশ্চিন্ত থাক— কাকে-পক্ষীতে এ ব্যাপার জানতে পারবে না। চাঁদা কিন্তু পয়লা দেয়া চাই—দিন ফেণ্টারের মাইনে চুকিয়ে দেব।

পুজোর বন্ধের এক সপ্তাহ আগে পয়লা তারিখ। শনিবার। পকেট ভর্তি টাকাপয়সার হাতে বড় বড় প্যাকেট। মাথে মোক্ষ চোখ চকচকে মুখের হাসিটা গাজন চেয়ে মাথা দেবীমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়।

হরিপদর হাতেও মার্কার গোছের একটা ব্যাগ কিন্তু মুখখানা ওর মোটেই উৎফুল্ল নয়।

পাড়ার নেতো পরামানিক কাপড় কেচে এসেছিল হাওড়ার হাটে। তিন-চার দিন বাইরে থেকে ফিরছে।

হরিপদকে সামনে দেখে ঈষৎ হেসে দাঁড় বলল কিগো ভাইপো, তো মুখখানা অমন শুকনো লাগে কেন?

আর নেতো কাকা আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সেকি—এই তো মঙ্গলবার সকালে হাটে আসবার সময় দেখলাম ঠাকুর মশায় গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ঢুকলেন।

না-না, তিনি ভালই আছেন। হরিপদ তাড়াতাড়ি বলল। আজকাল শারীরিক ভাল থাকাটা এমন কিছু শক্ত নয়, মনের ব্যায়রামটা হলো গিয়ে আসল বুঝলে নেতোকা?

তা যা বলেছ ভাইপো, লাখ কথার এক কথা। তা বিত্তান্তটা কি?

এই দেখ। বলে আর একটু কাছে সরে এসে হরিপদ বুকের কাছে পাঞ্জাবীটার উপর হাত রাখল।

ও হরি—ছিঁড়ে গেছে যে!

ছিঁড়েই গেছে বটে। নতুন জামা ছিঁড়বে না! হরিপদ স্লানভাবে হাসল।

তবে অমন ফালানালা হলো কেমন করে? নেতো অবাক হয়ে শুধোল।

কলকাতা সহর সাংঘাতিক জায়গা নেতোকা। চারটে পয়সা পকেটে নিয়ে বার হলে—এক গণ্ডা গুণ্ডা লাগে পিছনে। পকেট কেটে বেমালুম সাফ করে দেয়।

ও হরি—তোমারও কি—

চেঁচিও না—এখুনি লোক জড়ো হবে। বলবে এমন বেকুফ মানুষটা।

তাই তো—তাহলে কি হবে ভাইপো?

সেই তো ভাবছি নেতোকা—কাকে ধরি এখন। অন্তত টিকিটের দামটা ধার পেলে কোন রকমে বাড়ীতে তো পৌঁছই। হবে দুটো টাকা?

কেন হবে না—এই যে।

টাকা দুটি পেয়ে হরিপদ আশ্বস্ত হ'ল। বলল, পাঁচ সিকে যাবে টিকিটে—আর বাবার জন্য পোয়াটেক বালাখানার তামাক নিয়ে যাব ভাবছি। যদি তামাক কিনে ট্রেণ ধরতে না পারি—পরের ট্রেণেই যাব। তুমি বরঞ্চ এক কাজ করো নেতোকা, যাবার সময় বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে যেও—আমি পরের ট্রেণে বাড়ী যাচ্ছি। না হলে ওঁরা আবার ভাববেন। দেখ তোমার আবার অসুবিধে হবে না তো?

অসুবিধে কি—ওই মোড়েই তো নামব। দু'পা এগিয়ে খবরটি আর দিতে পারব না? কি যে বল ভাইপো!

আর শোন নেতোকা; একটু থেমে গলাটি নামিয়ে হরিপদ বলল, এই পকেটমারের কথাটা যেন বাবাকে বলো না। শুনলে—বুড়ো মানুষ—বুকেতেই তো পারল—আঘাত পাবেন। আমি সময়মত ধীরে সুস্থে সব গুছিয়ে বলবক্ষণ। কেমন?

সেই তো ভাল ভাইপো। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কি দরকার আমাদের। নেতো যেন ক্ষুন্ন হয়েছে।

হরিপদ ওর মনোভাব বুঝে বলল, তোমাকে পর মনে করে যে সাবধান করে দিচ্ছি—তা নয় নেতোকা। বাবার বয়সটাও তো বিবেচনা করতে হবে। না হোক ট্রেণে—কি পথে—কি ঘোড়ার গাড়ীতে যার কাছেই গল্প কর না কেন—তাতে কিছু এসে যাবে না।

নেতোর মুখখানি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল বোধ হল। তা ভাইপো, কতগুলো টাকা গচ্ছা গেল?

কত টাকা কি—পুরো মাইনেটাই। আজই পয়লা তো—মাইনে নিয়ে সবে ট্রামে উঠেছি—

আহাহা—ট্রামে কেন উঠতে গেলে ভাইপো। শুনি ট্রেনের পাশেই ওরা ওৎ পেতে থাকে। আহা হা! নেতোকাকা তালুতে জিহ্বা ঠেকিয়ে চুক চুক শব্দে খেদ প্রকাশ করতে করতে চলে গেল।

সবাই জানে খবরের পাখা গজায়। হরিপদও জানত।

বাড়ীতে পা দিতে-না-দিতে শ্রীনিবাস বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা থেকে। একহাতে খোলা হুঁকো। তামাকটি সবে তৈরী হয়েছে, কিন্তু হুঁকোয় টান না দিয়েই বললেন, খবরটা তাহলে সত্যি?

হরিপদ ওঁর পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

চেয়ে আর কি হবে কেলে করে চাইলে কি হবে, ঘটে বুদ্ধি না থাকলে এমনই হয়।

তা পুরো মাসের মাইনেটি জলাঞ্জলি দিয়ে এলে তো?

কে বললে আপনাকে?

শুনতে কি আর বাকি থাকে—সত্যি কথা চাপা থাকে না। নেত্য বলল, যখন বলল। তোমার মেজ খুড়িমা এইমাত্তর খবর দিয়ে গেলেন। পুঁটকে ছোঁড়া বটা পর্যন্ত বলল, হাঁ দাদু, কাকাবাবু এমন বোকা কেন!

মাথা হেঁট করে হরিপদ বলল, যা ভিড় ট্রামে-বাসে—বিশেষ করে শনিবার। এক হাতে তামাক, আর একটা হাতে উঁচু করে ট্রামের রড ধরেছি। ওই ফাঁকেই হাতসাফাই করে কিনা! দুজন দেখে ফেলেছিল—ধর ধর করতে করতে ট্রাম থেকে নেমে দে ছুট। আমিও নেমে পড়ে ছুটেছিলাম ওর পাছু পাছু। লোকটা সাঁ করে একটা কাণা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। আমিও ঢুকছিলাম—আর একজন লোক পিছন থেকে আমার কাঁধ চেপে ধরল।

ভগবান রক্ষা করেছেন! ভাগ্যিস যাওনি! শুনেছি ওদের সঙ্গে ছোরাছুরি থাকে। একলা পেলেই নির্ঘাৎ একটা কাণ্ড হয়ে যেত।

ভদ্রলোকটিও তাই বললেন—গলির মধ্যে সাংঘাতিক ঢোকা অমনি ছোরা—

যাক নারায়ণ রক্ষা করেছেন! যাও, বাড়ীর মধ্যে গিয়ে হাতেমুখে জল দিয়ে সুস্থ হওগে। ভাবতে হবে না, এমাসের মেস খরচ বাড়ী থেকে নিও, বুঝলে?

মাথা নীচু করে হরিপদ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

খবরের যে পাখা গজায় আর একবার প্রমাণ পেল হরিপদ। তখন পুজো শেষ হয়েছে—থিয়েটারের পাট চুকে গেছে। সু-অভিনয়ের জন্য হরিপদকে একখানা রূপোর মেডেল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহকুমা শাসক। গৌরবে ওর বুক ফুলে উঠেছে। এমন সময় এক শনিবার বাড়ী আসতেই শ্রীনিবাস খোলা হুঁকো হাতে বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা থেকে। কলকের মাথায় টিকেগুলো হাওয়া পেয়ে হাসছে, তামাকের খোসবুও সেই বাতাসে ছড়িয়েছে—অর্থাৎ তামাকটি মজেছে বেশ। তবু হুঁকোয় টান না দিয়ে বেরিয়ে এলেন শ্রীনিবাস। পকেটমারের খবর শুনে সেদিন ওঁর মুখখানি যেমন থমথমে দেখাচ্ছিল—আজকের ভাবটা তার চেয়েও ঘোরালো যেন।

হরিপদ প্রণাম করে বাড়ীর মধ্যে পা বাড়াচ্ছিল, উনি গম্ভীর গলায় বললেন, শোন।

শ্রীনিবাস ঘরে এসে বসলেন তক্তাপোষের উপর। বললেন, বস।

হরিপদ বসল না—দাঁড়িয়ে রইল। না জানি কি অঘটন ঘটবে এই আশংকায় দুরু দুরু বুকে মাটির পানে চেয়ে রইল।

শুনলাম একটা কথা। হুঁকোয় গোটাকতক টান দিয়ে শ্রীনিবাস বললেন, কথাটা সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করে নেয়া ভাল। কি বল?

ভণিতাটা বেসুরো মনে হচ্ছে—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হরিপদ।

তামাকের গন্ধটা ঘন হয়ে উঠল। হুঁকোয় আরও গোটাকতক লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া তৈরী করলেন শ্রীনিবাস। সেই ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব শ্লেষ মাখিয়ে বললেন, শুনলাম—তুমি নাকি

নাচন-কোঁদনে পুরো মাসের মাইনেটি ব্যয় করেছ?

সামনে যেন বজ্রাঘাত হল। দারুণ চমকে উঠে হরিপদ বলল, কে বললে?

যেই বলুক কথাটা সত্যি কিনা? শ্রীনিবাস দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে চাইলেন হরিপদর দিকে।

হরিপদ ও'র প্রশ্নের ধারে-কাছেও গেল না, নিজের প্রশ্নের জের টেনে বলল, অশোক বলেছে বুঝি?

না।

ভটচাজ্যি মশায়?

না।

অবনী? ধীরেন? হরিবিলাস দা?

না—না—না।

তবে?

শুনলে খুসী হবে? বলেছেন শান্তিময় দা। বল মিথ্যে বলেছেন?

আমি তাই বলেছি? একমুহূর্তে নিভে গেল হরিপদ। আমতা আমতা করে বলল, উনি সব জানেন না ঠিক। মানে—

আর ব্যাখ্যায় কাজ নেই। সব বুঝি আমি। পকেটমার তোমার পকেট কাটেনি—কেটেছে আমার গাঁট। আমি গঙ্গাস্নান না করে ত্রিসন্ধ্যা না করে জলগ্রহণ করি না—আর আমার ছেলে হয়ে তুই কি না ডাহা মিথ্যে কথাটা বললি? হারে কালের ধর্ম!

আক্ষেপে ও তর্জনে বৈঠকখানা মুখরিত হয়ে উঠল।

হরিপদ আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। হাতমুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে গেল ক্লাবে। গিয়ে বলল, আমি আর তোমাদের দলে নেই—রিজাইন দিচ্ছি এখুনি।

সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যাপার কি হরিপদ দা? রাগ কর কেন?

না, রাগ করবো কেন। তোমাদের ভালর জন্যে পুরো মাসের মাইনেটা দিলাম—আর তোমরা কিনা কথাটা ফাঁস করে দিলে?

কি—কি—ব্যাপার কি?

বাবা জানতে পেরেছেন আমার কীর্তির কথা! আমি যে মাইনের সব টাকাটা চাঁদা দিয়েছি—এ টপ সিক্রেট আউট হল কেমন করে! শান্তিময় কাকা জানলেন কি করে!

সবাই চাইলো ভোলার দিকে। ভোলা শান্তিময়ের ভাইপো।

ও কাজ তোরেই ভোলা। সবাই গর্জে উঠল।

মাইরি বলছি—আমি বলিনি।

তবে? তোর জ্যেঠা কি অন্তর্যামী ভগবান—

হয়েছে কালীদা। ভোলার মুখে সমস্যা সমাধানের আলো। হয়েছে। চাঁদার খাতাটা একদিন আমার কাছে দিয়েছিল মণীশ। ও পাড়ায় কটা আদায় ছিল কিনা। দুপুরে বেলায় ঘুমিয়ে ছিলাম—খাতাখান শিয়রের দিকে ছিল—জ্যেঠু বোধ হয়—

দাঁড়াও, তোমার জ্যেঠুর ঘুঘুগিরি ভাঙছি আমরা।

সবাই ঘন হয়ে বসল। ফিসফাস করে মন্ত্রণা চলতে লাগল। দেখা গেল গুপ্ত মন্ত্রণাতে ভোলার উৎসাহও কম নয়।

একা একা গঙ্গাস্নান ভাল লাগে না—স্নানের অর্ধেক আনন্দই মাটি। শ্রীনিবাস তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। শান্তিময় কি শিষ্যবাড়ী চলে গেলেন? আজ তিন দিন দেখা নাই মানুষটির। এমন ধারা হঠাৎ কোথাও তো যান না, অন্ততঃ শ্রীনিবাসকে জানিয়ে যান যাওয়ার আগে। তবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাকি? ভাবনার কথা।

বৈকালে শান্তিময়ের সংবাদ নিতে এলেন শ্রীনিবাস।

শান্তিভায়া আছ? ও ভায়া—

ভোলা বেরিয়ে এলো। বলল, আসুন জ্যেঠাবাবু।

তোমার জ্যেঠার হল কি? গঙ্গাস্নানে যায় না কেন?

যাবেন কি করে—পড়ে গিয়ে পা ভেঙে গেছে যে।

সে কি—কেমন করে পড়ল?

ভোরবেলা—তখন ভালো করে ফরসা হয়নি তো—চান করতে যাবেন বলে যেমন সদর দরজার বাইরে এসেছেন, অমনি বে-টনকা একটা গর্তে পড়ে—

আহা হা—! চল দেখে আসি।

দেখবেন—গর্তটা এখনও ভাল করে বোজানো হয়নি তো।

তা সদর দরজার মাঝখানে এমন গর্ত খুঁড়লে কে? তোমরা এমন অকর্মা—গর্তটা বুজিয়ে দাওনি!

লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে শান্তিময়ের শিয়রে এসে বসলেন। বললেন, তোমারই বা আক্কেল কি ভায়া—গর্তটা বুজিয়ে দিতে পারনি?

গর্ত জানতে পারলে তো ব্যবস্থা করব। ওটা এমন ভাবে ঢাকা ছিল যে, বুঝতেই পারা যায় না।

কেউ করেছিল বুঝি?

না—না। শান্তিময়ের মুখ পাংশু হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললেন, করবে আবার কে? আমারই অদৃষ্টের লিখন! ঠ্যাং ভাঙবে—তাই ভাঙল।

তোমার সন্দেহ হয় কি কারও ওপর?

আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন শান্তিময়।

না—না, কারোকেও সন্দেহ হয় না। এ পাড়ায় বদ ছেলে একটিও নেই। সবাই ইস্কুল কলেজে পড়ে—চাকরি-বাকরি করে—থিয়েটার-যাত্রা নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করে এই পর্যন্ত। ওদের মাথায় এমন দুষ্টু বুদ্ধি খেলে না। ওরা ভারি ভাল ছেলে—সৎ ছেলে—

ভোলা বলল, জ্যেঠামশায়, আপনার জন্য তামাক সেজে আনি।

ভোলা চলে গেলে শান্তিময়ের শিয়রের কাছে চেয়ারটা আর একটু টেনে এনে শ্রীনিবাস নীচু গলায় বললেন, তাহলে গর্তটি কেউ করেনি—ওটা আপনি আপনি হয়েছিল, কেমন?

ওসব কথা থাক ভায়া, দিনকাল খারাপ—ওসব কথা থাক। শান্তিময় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

হুঁ! শ্রীনিবাস গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, পায়ের বদলে প্রাণটা বেঁচেছে—এই ঢের! কি বল ভায়া?

একটু থেমে পুনরায় চাপা গলায় বললেন, তা তোমার কাকে সন্দেহ হয়? ওদের ক্লাবের কাউকে—

প্রশ্ন

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

ফুলেরে দিই নে প্রেম ফলের পূজারী
সফল প্রয়াসে রাশ ভারি!
তবু কি ফোটে না ফুল অনুকূল
বসন্ত সন্ধানে?

ধরার হাটের পথে মন্দিরের স্বপ্নগন্ধে
স্বর্গ কারা আনে?

ঊষারে হেরি না কভু আমি নিদ্রাতুর
অলস আঁধারে রচি সুর!
তবু কি জপে না ঊষা সূর্যমন্ত্র
আকাশের কানে?

রাত্রির তমসা-বক্ষে কে সে শান্ত প্রভাতের
সমুদ্ররে টানে?

ছাড়ান দাও ভায়া ওসব কথা। ক্লাবের ছেলেরা আছে তাই বেঁচে গেলাম। ওরাই তুললে গর্ত থেকে—ডাক্তার ডেকে আনল—ওষুধ কিনতে ছুটল, আর বাঁচার ব্যবস্থা করল..... চমৎকার সব ছেলে।

শ্রীনিবাস ঈষৎ হেসে বললেন, হাঁ—ছেলেরা চমৎকারই বটে! অত ভোরে উঠে তোমার দুয়োরের গোড়ায় অপেক্ষা করছিল পরোপকার করবে বলে—চমৎকার নয় আবার!

ভোলা এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে বলল, তামাক খান জ্যেঠামশাই।

তামাক! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোলার পানে চেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন শ্রীনিবাস। [illegible] কঠিন কঠিন কথা [illegible] কণ্ঠদেশে ঠেলাঠেলি সুরু করে দিল। [illegible] ভিতরে ঠেলে দিয়ে [illegible] পড়লেন এবং তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা টেনে নিলেন।

বাড়ী ফিরতেই দোরগোড়ায় দেখা হরিপদর সঙ্গে। একটু আগেই ও [illegible] থেকে এসেছে। [illegible] পাড়ায়। ক্লাবেই চলেছে বোধ হয়।

শ্রীনিবাসকে প্রণাম করে বলল, শান্তি জ্যেঠুকে দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি? কেমন আছেন জেঠু?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিপদর পানে চেয়ে শ্রীনিবাস বললেন, ভাল।

কেমন করে পা ভাঙলেন জেঠু?

কেমন করে? কণ্ঠরুদ্ধ কঠিন কথা পুনরায় কণ্ঠদেশে ঠেলাঠেলি সুরু করে দিল। অতি কষ্টে তাদের ভিতরে পাঠিয়ে শ্রীনিবাস বললেন, অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট! হরিপদ অকৃত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

তাছাড়া কি! দিনকাল খারাপই যে—

কথা শেষ না করে শ্রীনিবাস গট্ গট্ করে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

পরলোক-রহস্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পথে ঘাটে দুর্ঘটনা ঘটাটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। নিত্যই ঘটছে। নিত্যই বহুলোক মরছে— স্ত্রী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে কিন্তু সেদিন পালপাড়ার মোড়ে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সেটা একটু বিচিত্র বৈ কি!

দিন দুপুরে—পথে তেমন ভীড়ও ছিল না তখন—হঠাৎ মালবোঝাই লরী তার [illegible] থেকে ফুটপাথের ওপর উঠে গিয়ে একটা বাড়ীর গায়ে ধাক্কা মারল। গাড়ীর বিশেষ কিছু হ'ল না, মালপত্র যেমন ছিল তেমনি রইল—লোকসানের মধ্যে কর্পোরেশনের একটা ল্যাম্প-পোস্ট একটু বেঁকে গেল, আর গেলেন ১৩।১এ নম্বর বাড়ীর শ্রীবিলাস বাবু। হাসপাতালে নিয়ে যেতেও দেরী সইল না, অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছবার আগেই তিনি ইহজীবনের মত চোখ বুজলেন।

ইঞ্জিন খারাপ ছিল? ঠিক না, পুলিশ উপযুক্ত লোক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিয়েছে; কোথাও কোন গোলমাল ধরা পড়েনি।

ড্রাইভার মদ খেয়েছিল? তাও ত নয়। কারণ, যে উন্মত্ত জনতা চারিদিক থেকে হঠাৎ গজিয়ে উঠে তাকে ধরে সহজেই শ্রীবিলাস বাবুর সঙ্গী করে দিতে চেয়েছিল, তারাও এ অপবাদ কেউ দিতে পারে নি। সবাই স্বীকার করেছে, আর যাই হোক্, মদের গন্ধ কেউ পায়নি তার মুখে। সে লোকটি নিজেও বার বার কসম খেয়ে বলেছে যে, সেদিন সে তখনও পর্যন্ত মদ ছোঁয়নি। তাছাড়া কাজ কাম সেরে রাত্রেই তারা কোন কোনদিন এক-আধটু ফূর্তি করে। সেটা তখনও ফূর্তি করবার সময় নয়।

তবে?

এ তর্কের উত্তর ড্রাইভার রামলগনও ভাল করে দিতে পারেনি। সে বার-বার ঐ একই কথা বলেছে—'কী করে যে কি হ'ল বাবুসাব, তা বলতে পারব না। আমি বেশ সুস্থই ছিলাম, পথে কেউ ছিলও না তেমন যে তাকে বাঁচাতে যাবো, যেভাবে স্টিয়ারিং ঘোরাবার কথা সেভাবেই ঘুরিয়েছি—কী ক'রে যে হঠাৎ অমনভাবে গাড়ী বেঁকে ফুটপাথে উঠে গেল, তা আমি বলতে পারব না। যেন মনে হ'ল বাবুসাব্, কে ঠেলে নিয়ে গিয়ে গাড়ীখানাকে আছাড় মারলে দেওয়ালে!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হ'ল না এ রহস্যের। সরকারী তদন্ত হ'ল, খবরের কাগজে লেখালেখি হ'ল, অ্যাসেমব্লীতে প্রশ্ন উঠল, বিরোধীদলের নেতারা গরম গরম বক্তৃতা করলেন, বেসরকারী তদন্ত দাবী করা হ'ল—মুলতুবী প্রস্তাব উঠল—তারপর আবার সব ঠান্ডা হয়ে গেল। শুধু শ্রীবিলাস বাবুর ক্ষুদ্র সংসারে এই সত্যটা বহুকাল ধরে ঘুরে-ফিরে নানা কাজে নানা অভাবে নিত্য-স্মরণীয় হয়ে রইল যে—শ্রীবিলাস বাবু নেই এবং তাঁর সঙ্কল্পিত ইন্‌সিওরেন্সের প্রথম প্রিমিয়ামটাও দিয়ে যেতে পারেন নি! এক কথায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অকূলে ভাসিয়ে চলে গেছেন।

কিন্তু এই ঘটনায় দুর্ঘটনার কারণ ছাড়াও আর একটি রহস্য অমীমাংসিত রয়ে গেল। সে কথাটা—যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন নিয়মিত, তাঁদের চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই—হয়ত অতটা লক্ষ্য করেন নি। ব্যাপারটা যখন ঘটে, তখন শ্রীবিলাসবাবু তাঁর বাড়ী থেকে এক বোঝা বই নিয়ে কোথায় বেরোচ্ছিলেন। বইগুলি একটা ছেঁড়া গামছায় পুঁটুলি বাঁধা ছিল, কিন্তু সেটা কিছু রহস্য নয়—রহস্য যা তা হচ্ছে এই—বইগুলি সবই পরলোক তথা জন্মান্তর সম্পর্কিত। 'পরলোকের কথা', 'মৃত্যুর পরপারে', 'জন্মান্তর রহস্য' 'আঁধারের পারে'—এমনি সব নানা নামের এবং নানা আকারের বই—সবগুলিরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক, মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কি নেই! ঐ বইগুলি অমন পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে শ্রীবিলাসবাবু কোথায় যাচ্ছিলেন? আর সেদিন অফিস খোলা, ছুটির বারও নয়—অফিসে না গিয়ে তিনি বাড়ীতেই বা করছিলেন কি?

এ-সব প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল চিরকালের মত। এ-সব নিয়ে অবশ্য জনসাধারণ বা জননেতারা—কেউই মাথা ঘামান নি। শুধু বিশেষ দু-একজন একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন মাত্র।

আসল রহস্যটারও কোন মীমাংসা হ'ল না। কেন এ ঘটনা ঘটল? শ্রীবিলাসবাবু কেন মারা গেলেন?

এ রহস্যের কিছু সদুত্তর বোধ হয় দিতে পারতেন—একজন লোক। তিনি হলেন শ্রীবিলাসের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চিরদিনের তর্ক-সহচর—হরিকেশববাবু। মজার কথা এই, তদন্তের সময় তাঁকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা কারুর মাথাতে যায় নি।

হরিকেশব কলেজ-জীবনে শ্রীবিলাসের সহপাঠী ছিলেন। তারপর প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায়—সহকর্মীও হতে পেরেছিলেন। সুতরাং গত দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে তাঁরা দিন-রাতের অনেকখানি সময়ই একসঙ্গে কাটিয়েছেন (ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে নাকি শ্রীবিলাস মারা গেছেন) আর এই সময়েরও বেশীর ভাগ তাঁদের কেটেছে তর্ক করে। শ্রীবিলাস আর হরিকেশব দুজনেই তর্ক করতে ভালবাসতেন এবং সে তর্ককে আর যাই হোক্, অবসর বিনোদনের খেয়াল মনে করার কারণ নেই। কারণ যদিচ তর্কটা তাঁদের প্রাত্যহিক এবং প্রায় প্রতি-মুহূর্তিক ছিল, তবু তাঁরা বেশ আন্তরিকভাবেই তর্ক করতেন। তর্ক করতে করতে প্রায়ই দুজনের চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠত, দুই কষের প্রান্তে থুথু জমত, কপালের ও গলার শিরাগুলো উঠত ফুলে—তবু তাঁরা তর্ক থামাতেন না। সকাল থেকে চলে অফিস যাওয়ার সময়ে সেটা মুলতুবী থাকত—আবার অফিস থেকে ফেরার পর শুরু হয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত গড়াত। উভয়েরই সংসার এবং নিত্যকার জীবনের বাকী কাজগুলো কীভাবে চলত, সেটা পরিচিত সকলকার কাছেই বিস্ময় এবং আলোচনার বস্তু হয়ে ছিল।

প্রথম যৌবনে তর্কের বিষয়বস্তুটা অবশ্যই রাজনীতি ছিল। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা ক্রমান্বয়ে সাহিত্য, দর্শন, ঈশ্বর-

তত্ত্ব ঘুরে পরলোকতত্ত্বে এসে পৌঁচেছিল। গত দু'বছর ধরে ও'রা বলতে গেলে আর কিছুই আলোচনা করেন নি—অথবা আর কোন কথা নিয়ে তর্ক করেন নি।

দেহত্যাগই কি সব শেষ?

না মরবার পরেও কোন জীবনের অস্তিত্ব আছে?

হরিকেশব বলতেন, 'ফুঃ!... সমুদ্রে ঢেউ ওঠে আবার সমুদ্রে মিলিয়ে যায়—সাগরকে লহরী সমানা।... পঞ্চভূতের সমুদ্রে আমরা বুদ্বুদ মাত্র—হঠাৎ উঠেছি হঠাৎই মিলিয়ে যাবো। পরলোক আবার কি? এই বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র আছে, এই পৃথিবীর মত কত কোটি গ্রহ তাদের কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। সেই সব গ্রহে এমনি কত জীব আছে—তাদের জন্যে যদি মরবার পরেও আবার একটা বাসার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে ত ভগবান নাচার!

শ্রীবিলাস উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। ইদানীং তিনি ইংরেজী, বাংলা বিস্তর বই কিনেছিলেন পরলোক সম্বন্ধে। সে-সব বইয়ে দেহাতীত জীবনের নানা চমকপ্রদ বিবরণ এবং প্রমাণ আছে—বই খুলে খুলে সেই সব অংশ পড়ে শোনাতেন ভদ্রলোক আর প্রশ্ন করতেন—'এসব কি মিথ্যে তা হলে? এতগুলো লোক মিছে কথা কইছে?'

হরিকেশব বলতেন, 'অত শত আমি বুঝি না। নিজে চোখে না দেখলে—নিদেনপক্ষে অনুভব না করলে আমি বিশ্বাস করব না। একটি হেলদি হোলসাম প্রত্যক্ষ ভূত বার করো—বহুৎ আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করতে রাজী আছি। শুধু 'বাক্য'-এ ভুলছি না!'

কোনদিনই এসব আলোচনার কোন মীমাংসা হ'ত না।

অবশেষে একদিন শ্রীবিলাস বলে বসলেন, তাঁর একটি পরিচিত ভদ্রলোক ভাল প্ল্যানচেট নামান—তাঁর বাড়ী যাওয়া যাক্।

হরিকেশবও রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'চলো তোমার বুজরুক ভেঙ্গে দিয়ে আসি।'

দিনক্ষণ দেখে সন্ধ্যার সময় একদিন গেলেন দু'জন। সে ভদ্রলোক একটা খালি ঘরে ধূনো-গঙ্গাজল দিয়ে মৃদু নীল আলো জেলে প্ল্যানচেটের টেবিল পেতে বসলেন। ভদ্রলোক হরিকেশববাবুকে বললেন, 'মৃত কোন আত্মীয়কে চিন্তা করুন আপনি। তিনিই আসবেন।

হরিকেশব শ্রীবিলাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার বাবার কথাই ভাবি। তুমিও ত তাঁকে দেখেছিলে বহুবার। তুমিও ভাবো। তাহলেই ব্যাপারটা সহজ হবে।'

তিনজনে স্থির হয়ে বসলেন। একটু পরেই টেবিলে প্রাণ লক্ষণ দেখা দিল। সে ভদ্রলোক ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন, 'এসেছেন, এসেছেন আপনার বাবা। প্রশ্ন করুন।'

হরিকেশবও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বৈ কি।

দু'-একটা প্রশ্ন করলেন। কাগজের ওপর তার যথাযথ উত্তরও ফুটে উঠল।

যথা—হরিকেশবের স্ত্রীর নাম, বোনের নাম, ছেলেদের নাম।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন শ্রীবিলাসেরই হাতটা সম্পূর্ণ প্ল্যানচেটের ওপর আছে। কারচুপি হয়ত আপনিই, কিন্তু তবু—!

তিনি ফস্ করে বলে বসলেন, 'আমার প্রপিতামহের নামটা লিখুন [illegible]

তিন-চারটি নাম লেখা হ'ল। কোনটাই মিলল না।

হরিকেশব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বোগাস্। অল্ বোগাস্। আমিও বেশ বুঝে নিয়েছি। এ তোমাদের এক রকমের সেল্ফ্ হিপ্‌নোটিজ্‌ম্।'

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। শ্রীবিলাস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। গৃহস্বামী বিরক্ত হয়ে উঠে আলো জেলে চায়ের ফরমাস করলেন।

অর্থাৎ আবারও তুমুল তর্ক বেধে ওঠবার ভূমিকা রচিত হ'ল।

শ্রীবিলাস বললেন, 'তোমার বাবার যে তাঁর ঠাকুর্দার নাম জানা ছিল তার প্রমাণ কি?'

'বাবা আমাকে ছেলেবেলাতে দশ পুরুষের নাম মুখস্থ করাতেন। সেকেলে লোক, ঠাকুর্দার নাম ভুলে যাবেন সেটা সম্ভব নয়। বিশেষ পরলোকে গিয়ে ত সর্বজ্ঞ হবার কথা!...এই ত তোমরাই বলেছ যে, মাননীয় ভূতেরা এসে কত কি সব অজানা খবর দিয়ে গেছেন!'

বাড়ীর বাড়ী তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'তাঁর সান্নিধ্য পেয়েও আপনি সন্দেহ করেছেন—তাতেই তিনি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ইরিটেটেড্ হলে কন্‌ফিউশান্ আসাই স্বাভাবিক।'

'আজ্ঞে সে ত দেহীদের পক্ষে। বিদেহীরাও যদি সামান্য বিরক্তিতে বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলে বসেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তাঁদের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ।... চলো হে শ্রীবিলাস, ওঠো।'

শ্রীবিলাস কথা কইলেন না। এমন কি যখন চা-টা এল তখনও কতকটা অন্যমনস্কভাবেই চা খেলেন বসে বসে—যদিচ তাঁর চা-প্রীতি অসাধারণ—শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফেরার পথেও হরিকেশববাবুর সঙ্গে ভাল করে কথা কইলেন না। সেটা তাঁর পরাজয়ের লজ্জা মনে করে হরিকেশব মনে মনে খুব হেসে নিলেন!

এর পর থেকেই শ্রীবিলাসবাবুর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। জীবনের যেটা ছিল প্রধান অবলম্বন—তর্ক, সেটাতেও যেন আর রুচি রইল না তেমন। দিন-রাতই গুম্ খেয়ে বসে থাকেন, কেউ কথা কইলে সংক্ষেপে 'হাঁ' 'না' উত্তর দেন। কোন প্রসঙ্গেই আর তর্কে নামতে চান না—এ-বিষয়ে হরিকেশবের সহস্র কলা-কৌশল ব্যর্থ হয়।

তবে তিনি কি করেন?

অফিসের সময়টুকু ছাড়া, বাকী সমস্ত সময়টাই পুঁথিতে ডুবে থাকেন। হরিকেশববাবু নিয়মিত আসেন। কিন্তু তাঁর দিকে একটা বই কি কোন সাময়িকপত্র এগিয়ে দিয়েই শ্রীবিলাসবাবু আবার বালিশের ওপর উপুড় হয়ে পড়েন; সামনে বই খোলাই আছে—তাইতেই ডুবে যান মুহূর্তের মধ্যে।

আসলে শ্রীবিলাসবাবুর আত্মাভিমানে প্রচণ্ড একটা ঘা লেগেছে। এতকালের কোন পরাজয় তাঁকে কোন দিন এত বিচলিত করেনি—সেদিনের ঐ ক্ষুদ্র ঘটনাটি যতটা করেছে! এটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় এবং অপমান। তাহলে তিনি এতদিন পড়াশুনো করে যা শিখেছেন তা কি সবই ভুল? তিনি কি এতটুকু লেখাপড়া শেখেন নি—তাঁর কি এতটুকু সহজবুদ্ধি নেই যে, তিনি এর ফাঁকিটা ধরতে পারেন?

না। তাঁর কোথাও কোন ভুল হয়নি। হরি-কেশবটাই নির্বোধ। হামবাগ। কিন্তু সেটাও যে প্রমাণ-সাপেক্ষ। হরিকেশবকে প্রমাণ [illegible] দিতে হবে যে, সে নির্বোধ এবং হামবাগ। [illegible] দিয়ে স্বীকার করাতে হবে যে, পরলোক [illegible] —আত্মা আছে—এই দেহটা ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সবকিছু ফুরিয়ে যায় না।

অথচ সেটার উপায় কি?

প্রাণপণে সব বইগুলো পড়েন আবার। নিজের বিশ্বাসে না কোথাও ফাঁক থাকে; যত পড়েন ততই মনে হয় যে, না—তাঁর কোথাও বোঝবার কোন ভুল হয় নি। ঐ হরিকেশবটাই—

পড়েন—এবং তাঁর জানা যতগুলো উপায় আছে পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার, সবগুলোই প্রয়োগ করেন। তারপর পরিচিত অপরিচিত যে-কোন আত্মারই নাগাল পান, [illegible] কেন—কাকুতি-মিনতি করেন, 'যেমন ক'রেই হোক ঐ হরিকেশবটাকে বুঝিয়ে দিন, আপনাদের অস্তিত্ব যেন কোনমতেই ও আর অস্বীকার করতে না পারে। এমন শিক্ষা দিন যাতে এই [illegible] এর জন্যে রীতিমত অনুতাপ হয় ওর—আর কখনও ওর এত আস্পর্ধা না হয়—'

কিন্তু কোন আত্মাই যে এ অনুরোধে কর্ণপাত করেন বলে মনে হয় না। দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে যায়। হরিকেশবের [illegible] [illegible] ওঁকে [illegible]; তাঁর [illegible] ওঁর করুণা বলে, তাচ্ছিল্য বলে বোধ হয়।

অবশেষে শ্রীবিলাস যেন আর স্থির থাকতে পারেন না। বন্ধুর বাড়ী প্ল্যানচেটে নিজের বাবার আত্মাকে নামিয়ে [illegible] শ্রীবিলাস [illegible] বিশ্বাস সেই সন্ধ্যাও আত্মা পাঠের [illegible] নিরঞ্জনবাবুর পাঠের [illegible] [illegible] বসু মজুমদার [illegible] [illegible] এসেছিলেন সেদিন [illegible] দিয়েছিলেন যে, আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে যদি হরিকেশবটা [illegible] না পায় তার ধৃষ্টতার, তার ঔদ্ধত্যের ও তার [illegible]—তা হলে তিনিও আর পরলোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তিনিও ধরে নেবেন যে, এতদিন ধরে তিনি আত্মপ্রবঞ্চনাই করেছেন—আসলে পরলোক, ভূত, আত্মা কিছুই নেই!......

এর পরও তিনটি দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। হরিকেশবের মুখের সকৌতুক ও সহজ হাসি এতটুকুও ম্লান হ'ল না। উল্লেখযোগ্য এমন কোন ঘটনাই ঘটল না যে, এ-বিষয়ে [illegible] কিছু প্রমাণ করা যায়। এতবড় একটা [illegible] যে তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে দেওয়া হয়েছে, তা হরিকেশব সন্দেহ মাত্র করলেন না।

এধারে এই তিনটি দিন এবং তিনটি রাত্রি শ্রীবিলাসের যেভাবে কাটল তা অবর্ণনীয়। আশা ও আশঙ্কা—বিশ্বাস ও সংশয়ের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত দোলা খেয়েছে তাঁর মন। আশঙ্কাটা শুধু নিজের পরাজয়েরই নয়—তা বললে শ্রীবিলাসের বন্ধু-প্রীতির ওপর একটু অবিচারই করা হবে—হরিকেশবের সম্বন্ধেও কিছু ভয় ছিল বৈকি! যদি ওর কোন বিপদাপদ ঘটে। আত্মারা যে কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন তার ত ঠিক নেই! নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে বন্ধুর কোন অনিষ্টের কারণ হবেন না ত!

কিন্তু আশা বা আশঙ্কা কোনটাই সফল হ'ল না। অবশেষে তৃতীয় রাত্রিটি বলতে গেলে কণ্টক শয্যায় জেগে কাটিয়ে ভোরবেলাই হরি-কেশবের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন এবং [illegible]

(১)

ধ্রুপদ গায়ক গানের অন্তরার প্রথম আবর্ত শেষ করে আবার যখন তার পুনরাবৃত্তির সময় তারার 'সা' স্বরে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে যান আর সেই এক স্বরেই আবর্তের পর আবর্ত তাল চলতে থাকে, তখন শ্রোতার মনে অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হয়। 'সা' সেখানে একমেবাদ্বিতীয়,—অপর কোন স্বরের সঙ্গে তার আদান-প্রদান বন্ধ; বিভিন্ন স্বর সন্নিবেশে নক্সা সৃষ্টির প্রশ্ন সেখানে আসে না,—একটানা একটা স্বর অপর সকল স্বরের কথা ভুলিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন,—আর সেই সঙ্গে আসরের তাবৎ শ্রোতা এক অনির্বচনীয় রসের আস্বাদনে ধ্যানস্থ। এটা কোন্ রস?

(২)

অপর এক আসরে সেতার বাজনা হচ্ছে। গৎ তোড়ার পর ঝালা সুরু হোলো। ঝালার গোড়াতেই হঠাৎ একটা পট পরিবর্তনের সাড়া পেয়ে শ্রোতা কান খাড়া করলেন। ক্রমশঃ লয়ের বৃদ্ধি।—ঘন বিন্যস্ত তালের আঘাত ক্রমেই শ্রোতার অনুভূতিকে উত্তেজিত করতে লাগলো। তারপর আরো দ্রুত বাদন,—বাদক আর সঙ্গতকারী পরস্পরের সঙ্গে গতিবেগের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন।—সেই সঙ্গে শ্রোতারাও,—তাঁরা তখন ভুলে গিয়েছেন এটা সঙ্গীতের আসর, না ফুটবল খেলার অথবা ঘোড়দৌড়ের মাঠ? প্রথমোক্ত আসরের মত এই আসরেও একটা রসের অনুভূতি আছে।—এটাই বা কোন্ রস?

(৩)

কর্ণাটকী সঙ্গীতের আসরে বসে আছি। বিখ্যাত বেহালাবাদক চোয়াডিয়া বাজাচ্ছেন, মৃদঙ্গ সঙ্গতকারেরও বেশ খ্যাতি আছে। বাজনা খানিক অগ্রসর হওয়ার পরেই চারদিক থেকে মৃদু করতালির আওয়াজ পাওয়া গেল। ক্রমে দেখা গেল সভাশুদ্ধ লোক বাজনার তালে তালে নিজ নিজ হাঁটুতে চাঁটি মারছেন আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ছেন। ক্রমে হাঁটু চাপড়ানোর শব্দ এত বেড়ে গেল যে, বেহালা বা মৃদঙ্গের শব্দ আর কানে পৌঁছায় না। পিছনে চেয়ে দেখা গেল শ' পাঁচেক লোক যেন একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই উন্মাদনার মূলে ছিল তালের রস। শুনেছি দক্ষিণ ভারতের প্রায় সঙ্গীত জলসাতেই অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তালের রসকে অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে কোন্ রস বলব?

(৪)

ওস্তাদজী গান গাইতে বসেছেন। তানপুরায় সুর বাঁধা হচ্ছে, তবলচী অপেক্ষা করছেন,—তানপুরায় সুর বাঁধা হয়ে গেলেই তবলাটার পাগড়ীতে হাতুড়ি মারবেন, সুর বাঁধবার জন্য। তানপুরার কানমলা আর তবলার হাতুড়ি পেটার পর্ব শেষ হতে এখনো খানিক দেরী আছে। ইতিমধ্যে ওস্তাদজী ভেবে নিচ্ছেন কিভাবে তাঁর কল্পিত রাগটির গোড়াপত্তন করবেন। আসর ভরা শ্রোতা উন্মুখ হয়ে আছেন, খ্যাতিমান গায়কের রাগ পরিবেশন উপভোগ করবার জন্য।—সুর বাঁধার পালা শেষ হ'ল। ওস্তাদজী তাঁর পেছনে তানপুরোধারী দু'জন শিষ্যের কানে যথারীতি উপদেশ বর্ষণ করেই আস্তে আস্তে চোখ বুজলেন,—এইবার সত্যি সত্যিই গান আরম্ভ হবে। আসরের গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গেল,—সকলেই আসন্ন গীত পরিবেশনের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু ওস্তাদজীর ঠিক সামনেই যে শিষ্যটি বসে আছেন, তাঁর অবস্থা একটু আলাদা রকমের। গান এখনো আরম্ভ হয়নি, ঠিক উপভোগের বস্তু এখনো অজ্ঞাত সম্ভাবনার ভিতরেই নিহিত আছে;—অথচ সেই সম্ভাবনাই শিষ্যকে বিচলিত করে দিল, —তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না,—ওস্তাদজীর নিমীলিত নয়নের কল্পিত ভাবই শিষ্যের মনে রস সঞ্চারে সমর্থ হ'ল,—আর সেই রসই দরবিগলিত ধারায় তাঁর দুটি চোখে নেমে এল। গান শোনার পূর্বেই রাগের প্রতি এই যে পূর্বরাগ, একে আমরা কোন্ রসে নামাঙ্কিত করব?

(৫)

'তারা বেয়ে নয়নধারা' পড়বার আর একটা উদাহরণ,—একটু অন্য ধরণের। পাশাপাশি দুই জমিদার বাড়ীতে দুই দলের যাত্রাগান হচ্ছিল। অপর এক জমিদারের একজন আমলা অনেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। যাত্রার দল দুটিই বিখ্যাত, একটা 'ব্রজবাসীর' দল আর একটা 'নবীনের' দল। গান চলল,—হঠাৎ 'বিবেক' বা 'উদাসী' গোছের ভূমিকায় একজন গায়ক গাইতে গাইতে আসরে প্রবেশ করল। সাধারণত ব্রজবাসীর দলে ব্রজবাসী এবং নবীনের দলে নবীন স্বয়ং এই ধরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। যা হোক এই গানখানি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বোক্ত আমলা ভদ্রলোক হাপুস নয়নে কান্না জুড়ে দিলেন। তাঁর সশব্দ এবং দেহসঞ্চালনযুক্ত কান্নায় পার্শ্ববর্তী শ্রোতারা বিরক্ত হলেন,—একজন বললেন, 'কি মশায় অত কান্নার কি ব্যাপারটা হল?—আপনি ত আমাদের গান শোনাটাই মাটি করে দিচ্ছেন!' আমলা ক্রন্দনের বেগ না থামিয়েই বললেন, "আপনারা কি বুঝবেন মশায়, এই ব্রজবাসীর গানে যে রস আছে, তা পাষাণকেও গলিয়ে দেয়, আপনাদের মন পাষাণের চাইতেও শক্ত।" মহা বিস্ময়ে কয়েকজন সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সে কি মশাই, ব্রজবাসী কোথায়, এ তো নবীনের গান শুনছেন!" আসলে আমলাটি নবীনের দলকেই ভুল করে ব্রজবাসীর দল ভেবেছিলেন।—হঠাৎ তিনি কান্না বন্ধ করে বললেন "ওঃ, তাই না কি?—তবে আর কাঁদছি কেন?"—অবশ্য এর পর তিনি আর সে আসরে রইলেন না। কিন্তু যে বিশেষ রসটি এতক্ষণ তাঁর দরদী মনকে নিপীড়িত করছিল তাকে রসশাস্ত্রের (আয়ুর্বেদীয় নয়) কোন্ পর্যায়ে ফেলব?

(৬)

মস্ত ধনীলোকের বাড়ী,—হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, বিচিত্র ফুলের বাগান, কারুকার্যমণ্ডিত মহামূল্য আসবাবে সজ্জিত রঙমহল। সেই রঙমহলে আজ গানের জলসা,—পাত্রমিত্রসহ গৃহস্বামী শ্রোতার আসনে উপবিষ্ট। প্রসিদ্ধ গায়ক রুদ্রপ্রতাপ-সিংহের বংশধর মনসব আলি খাঁ সর-তাজ-এ মুসিকি (গোয়ালিয়রের ঘরানা) খেয়াল গাইবেন। সারা হিন্দুস্থানে তান পাল্টার কসরতে তাঁর জুড়ি নেই। ওস্তাদের নাম স্মরণ করে খাঁ সাহেব গান ধরলেন। মাঝখানে গান থামিয়ে তিনি তাঁর ঘরানার বৈশিষ্ট্য তথা তানের বাহাদুরি সম্বন্ধে দু' চারটি কথা বলেই আরম্ভ করলেন নানা ধরণের তান। ক্রমে তাঁর বিস্তৃত কণ্ঠ থেকে উদ্গত হলক তান, জবরদার তান আর বেজরবী তানের ফল সভাতলে অনুভূত হতে লাগল,—কখনো মেঘগর্জন, কখনো বজ্রনির্ঘোষ, কখনো বা ভূমিকম্পের আকারে। ভূমিকম্পের ফলে রঙ-মহলের ছাদ ফেটে গিয়ে খানিকটা মশলার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঝাড় মেজেয় পড়ে গিয়ে একেবারে চুরমার। মেঘগর্জন আর ভূকম্পন এক সঙ্গে হওয়ার ফলে সামলাতে না পেরে ঘোড়াশাল থেকে একটা ঘোড়া ছুটে কোথায় যে পালিয়ে গেল, আর তার খোঁজই পাওয়া গেল না। এদিকে বজ্রনির্ঘোষের সময় হাতী-শালের একটা হাতী শিকল ছিঁড়ে উন্মাদের মত ছুটতে গিয়ে একটা চোরাই গর্তে পড়ে মারাই গেল। বাগানের হাজার হাজার টাটকা ফুল নিমেষে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। অক্ষত রইলেন শুধু গায়ক, গৃহস্বামী আর অন্যান্য শ্রোতা। এটা আমার মনগড়া গল্প নয়। কিতাবের কথা সত্যি হলে এই সব বিবরণ একেবারে খাঁটি ঐতিহাসিক।

যা হোক, এই ব্যাপারে গৃহস্বামীর আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল হাজার পঞ্চাশেক টাকার কাছাকাছি। কিন্তু দেখা গেল তিনি গানের পরিবেশে এমনি মুগ্ধ হলেন যে, এই বিরাট ক্ষতিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে গায়ককে হাজার টাকা ইনাম দিলেন। যে রস উপভোগ করবার ফলে ক্ষতি তাঁর মনে নিরানন্দ সৃষ্টি করল না, উপরন্তু আনন্দ তাঁর দক্ষিণ হস্তকে উপুড় করে ছাড়ল সেই রসের নাম কি বলতে পারেন?

(৭)

একজন তবলাবাদক,—দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট। তাঁর বাজনা শোনা, তাঁর সঙ্গতের সঙ্গে গাইতে পারা, এমন কি তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারাও ছিল ভাগ্যের

কথা। বাদন আরম্ভের পূর্বে তিনি গণেশাদি নানা দেবতার আবাহন করে কিছুক্ষণ একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিতেন এবং শ্রোতাদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করে দিতে পারতেন যে, সুরের কাজকে বাদ দিয়ে শুধু তাল-যন্ত্রের সাহায্যেই সংগীতের চরম সার্থকতা লাভ করা সম্ভব। শ্রোতারা তাঁর কথায় বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যখন বাজাতে আরম্ভ করতেন তখন ব্যাপারটা হয়ে পড়ত একেবারে আলাদা।—তবলায় হাত পড়তেই তাঁর চেহারার মধ্যে নিমেষে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে যেত। বিচিত্র, বিরূপ, বিকট এবং বীভৎস এই চার রকমের ভঙ্গীতে বাদনের সঙ্গে কখনো তালে আর কখনো বেতালে এমনভাবে তিনি অঙ্গ সঞ্চালন করতেন যা যুগপৎ নানা রসের সৃষ্টি করত। তাল ও ছন্দের অপূর্ব কৌশল প্রদর্শনের সঙ্গে এই অঙ্গ সঞ্চালন কোন্ ভাবের দ্যোতক, তা শ্রোতা বা দ্রষ্টা কারো মুখ দেখে স্পষ্ট ধরা যেত না। শুধু একজন সংগীত-রসিক বিখ্যাত অভিনেতা শ্রোতার আসরে থাকাকালীন তাঁর চোখ-মুখে একটা বৈদগ্ধ-ভাবের আভাস পাওয়া যেত। এই অভিনেতার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল,—তিনি এক চোখে হাসতে এবং আর এক চোখে কাঁদতে পারতেন। এই বিশিষ্ট শ্রোতার মুখের দিকে না চেয়ে বলতে পারেন কি সেই তবলার আসরে কোন্ কোন্ শুদ্ধ বা সংকর রসের প্রবাহ বইত?

(৮)

অখিলবঙ্গ সংগীত মহাসম্মেলন। দেশ-বিদেশের মহা মহা গুণীজন গুণপনা প্রদর্শনের জন্য আসরে অবতীর্ণ।—ইতিমধ্যে রহিম খাঁ সেতার বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। এমন সময় সম্মেলনের মুখপাত্র [illegible] ঝুনঝুনওয়ালা ঘোষণা করলেন, "এইবার পবিত্র মনে যে সংগীত উপভোগ হবে, ভারতবিখ্যাত গুণী পণ্ডিত শিবশংকর জীর কণ্ঠ থেকে শোনা যাবে।" সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নিস্তব্ধ। ওস্তাদজী এক সাগরেদ সমেত মঞ্চের ওপর আসনখানা বিছিয়ে নিলেন—যাতে সম্পূর্ণ আসরে পবিত্র সংগীতের পবিত্র-ভাব বিরাজ করে। তারপর ধূপ দীপ জ্বালিয়ে শতরঞ্চ, মখমলের গদি আর ফরাসের চাদর দিয়ে মঞ্চ আবৃত হল। সেতার, তাকিয়া, দুপাশে দুটো ধূপতি। ওস্তাদের আপাদমস্তক-বিলম্বিত নামাবলী পোশাক পরিহিত, কপালেতে সিঁদুর তিলকের প্রলেপ। তিনি আসন গ্রহণ করতেই শ্রোতাদের মধ্যে একটা সশ্রদ্ধ উৎকর্ণ ভাব দেখা গেল। তানপুরা ইত্যাদিতে সুর মেলাবার পর প্রথম আলাপনে ওস্তাদজী একবার গলা পরিষ্কার করে নিলেন,—অমনি শত কণ্ঠে শোনা গেল "দেখেছ, ওঁর কাশির মধ্যেও সা রে গা মা বাঁধা হয়ে আছে, এমনটি না হলে কি আর গায়ক!" গান চলল,—অপরাপর গুণীর, বিশেষত অস্পৃশ্য যবন (!) ওস্তাদদের বাধ্য অনুকরণ ছাড়া সেই গানে আর কোন পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু ঝুনঝুনওয়ালার দল এতেই মশগুল!—"অমন গাইয়ে আর্যসংগীতের খাঁটি ধারার সাধক ছাড়া আর কারো পক্ষে হওয়া শক্ত!" গানান্তে জয়জয়কার, প্রণতি নিবেদন

অপরাহ্ন যাপন

নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

ও দীর্ঘজীবন কামনায় আধঘণ্টা কেটে গেল।

এরপর যিনি গাইবেন তিনি সত্যসত্যই মস্ত গুণী—কিন্তু নামের পেছনে 'খাঁ সাহেব' আছে। সুতরাং খাটমলের দলের আর বরদাস্ত হ'ল না।—তাঁরা শুধু জেনে নিলেন নাচের আসর কখন আরম্ভ হবে,—বিশেষত অনিন্দ্য-সুন্দরী মণিমালা জয়পুরওয়ালীর। মণি-মালার আসরে অবতীর্ণ হতে আরো ঘণ্টা দেড়েক বিলম্ব আছে শুনেই ঝুনঝুনওয়ালা পরিকরসহ নৈশ ভোজনে চলে গেলেন। সভা-গৃহের অধিকাংশ আসন খালি—সেইগুলির সামনেই খাঁ সাহেব গেয়ে চললেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে মনোভাব ওস্তাদজীর পবিত্র আর্য-সংগীত আর মণিমালার চটুল নাচ পরিবেশনে সমানভাবে সরব যোগায়, তাতে কোন্ রসটি ক্রিয়াশীল বলুন তো?

(৯)

গান গাইতে পারা যেমন শক্ত কাজ, শুনতে জানাও তেমনি। সমঝদার হওয়া যে কোন মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। সমঝদারের মধ্যে নানা শ্রেণী বিভাগ আছে—কেউ হয়ত সুরের দিকে বেশী নজর দেন, কেউ বা তালের দিকে। কিন্তু এমন একজন সমঝদারের কথা শুনেছি যিনি চক্ষু কর্ণ নাসিকা আর জিহ্বা এই চার চারটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গানের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে পারতেন। এক একটা রাগ তাঁর কানে বিভিন্ন রূপে পৌঁছত—যা আর সকলের বেলায় হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখে এক একটা বিশিষ্ট রঙের খেলা দেখতে পেতেন, নাকে এক বিশেষ ধরনের গন্ধ পেতেন, আর জিভে অম্ল, মধুর, কষায়, কটু ইত্যাদি ছয়টি রসের আস্বাদ অনুভব করতেন। তাঁর অনুভূত সেই ছয়টি রস শাস্ত্র বর্ণিত ছয় রাগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত কিনা, তাঁর দৃষ্ট সপ্তবর্ণ সপ্তস্বরের প্রতিচ্ছবি ছিল কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে আমরা কোনো গবেষণা করিনি। যাহোক, একদিন তিনি এক আসরে গান শুনছিলেন,—খুব উঁচুদরের গায়কের রাগালাপ। সমঝদার ভদ্রলোক বড়ই বিপদে পড়লেন,—বারে বারে চোখ রগড়ে নিলেন, কানে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন, মুখে নানারকম ভঙ্গিমায় জিভটাকে উলটিয়ে-পালটিয়ে নিলেন, নাকটাও বার বার ঝাড়তে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পাশে উপবিষ্ট আর একজন বন্ধুকে বললেন, "ব্যাপার কি বল তো, গান শুনে কোনো গন্ধও পাচ্ছি না, কোনো স্বাদও না, চোখেও কোনো রঙ ভাসছে না, শুধু কানে একটা আওয়াজ আসছে—তাতেও স্বরবৈচিত্র্য কিছু টের পাচ্ছি না!" বন্ধু বললেন, "তুমি ঘুমিয়ে নেই তো?" সমঝদার বললেন, "তবে তোমার সঙ্গে কথা কইছি কি করে?" বন্ধু ভাবলেন "তাই তো!"—তিনি ছিলেন অলংকার শাস্ত্রজ্ঞ,—একটু ভেবে ঠিক করলেন—এটা বোধ হয় শান্তরসের ফল! বন্ধুর অনুমান কি ঠিক?

* * *

ভরতের মতে রসের সংখ্যা আট। তিনি নবরসে বিশ্বাসী ছিলেন না— শান্তরস তাঁর মতে রস নয়,—কারণ ওতে কোনো স্থায়ীভাব নেই। আবার একথাও তিনি বলেছেন, রস মূলতঃ চারটি, বাকী চার রস সেই মূল রস-চতুষ্টয়েরই অন্তর্গত। সংগীতের বেলায় আমাদের মনে হয় রস একটাই। সেই একমেবাদ্বিতীয় রসের সন্ধান যদি উপরোক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে কেউ পেয়ে থাকেন তা হলেই আমাদের এই লেখা সার্থক। মহর্ষি চরক বলেছেন, রোগের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার, সুতরাং ঔষধের সংখ্যাও অনুরূপ, তবে ঔষধের সেই সংখ্যা কমিয়ে পঞ্চাশ করতে যিনি পারবেন তিনিই সফল চিকিৎসক। আমরা বলি একটা ঔষধে সব ব্যারাম সারাতে পারলেই সার্থকতা চরমে পৌঁছবে। সংগীতের ক্ষেত্রে রসের প্রয়োগে যিনি এই নীতি সমর্থন করতে না পারবেন তিনি উপরোক্ত নয়টি ঘটনার মধ্যে কোনটিতে কি রসের অবতারণা করবার পক্ষপাতী তা লিখে জানালে লেখক বাধিত হবেন।

একথাও জানিয়ে রাখছি, আমাদের জনৈক জ্ঞানী বন্ধু বলছিলেন, "সংগীতের প্রাণ হচ্ছে নাদ, সেই নাদই ব্রহ্মস্বরূপ; আর যিনি ব্রহ্মস্বরূপ তাঁকেই উপনিষদে বলা হয়েছে রসস্বরূপ। এখন রসস্বরূপের রসের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করতে নেই, কারণ ব্রহ্ম অবিভাজ্য, সুতরাং সংগীতের রসও শ্রেণী-বিহীন অর্থাৎ এক।"

এই উক্তি আমাদের যুক্তিরই সমর্থক, আপনারা ইচ্ছা করলে এর প্রতিবাদ করতে পারেন।

গ্রীক ভাস্করের তৈরী মূর্ত্তিরই মতন সুন্দর, সুঠাম গড়ন, চোখে মুখে সারা দেহে অপরূপ লাবণ্য। আবার কঠোরও ঐ পাষাণ মূর্ত্তিরই মতন, কঠোর, নিষ্প্রাণ, নীরস। পাথরের দেবতার সামনে হত্যা দিলে তারও হয়ত অনুকম্পা হত কিন্তু শ্রীর একটুও দয়া হল না।

এই মেয়েটির কাছে হেমেশ নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছে। শ্রী তার সাধনা, তার স্বপ্ন কিন্তু সেই দুশ্চর তপস্যা সিদ্ধির পথে একটুও এগোয়নি। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। আর হেমেশ এই তরুণীর উদ্দেশে কবিতার পর কবিতা লিখেছে, গান গেয়েছে, নিজের মনে রাঙিয়ে দেখেছে তাকে, সাজিয়েছে নানা বিচিত্র বর্ণে। কিন্তু তার মনে কোন রেখাপাতই করেনি।

একদিন কবিতা পড়তে পড়তে হেমেশ তার সুন্দর মুখখানি দুই হাতের মধ্যে তুলে ধরে তার চোখে চোখ তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে শ্রী বলল, ছাড়ুন দেখি, এর চেয়ে বরং নিজের কাজ করে যান। এরই মধ্যে প্রফেসার হিসাবে নাম করেছেন, আপনি একজন শক্তিমান কবি, এভাবে শক্তির অপচয় করছেন কেন? তাছাড়া আমি হিন্দু ঘরের বিধবা, এসব শোনাও আমার পক্ষে মহাপাপ।

হেমেশ বলল, সংস্কার দেখছি জগদ্দলের মতন তোমার উপর চেপে বসেছে।

শ্রী তিক্তকণ্ঠে জবাব করল, ওই হল আপনাদের কাছ থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।

বাধা আগেও সে দিয়েছে, তার মধ্যে হেমেশ মাধুর্যের সন্ধান পেত। মন কখনও বা রঙিন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ শ্রী তাকে অপমান করল। তার মুখে পড়ল বেদনার ছাপ। তা লক্ষ্য করেও শ্রী বিন্দুমাত্র দুঃখিত হল না। সে নিষ্ঠুর হাতেই টেনেছিল, টেনেছিল এ অধ্যায়ের উপর যবনিকা টেনে দিতে।

এরপর তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অর্থ নিজেকে অপমান করা। তা পারে না হেমেশ। সে ঠিক করল শ্রীকে নিজের জীবন থেকে মুছে দেবে। ভুলে যাবে শ্রীনামে কেউ আছে কিংবা কোন দিন ছিল। কষ্ট—কষ্ট হবে খুবই কিন্তু সে কখনও এ প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না।

শ্রী হেমেশদের প্রতিবেশী মতি সান্যালের মেয়ে। ষোল বছর বয়সে তার বিবাহ হয়, সে তখন ক্লাস নাইন-এ পড়ত। সুন্দরী ও সুলক্ষণা বলে পাত্রের মা তাকে ছেলের বৌ করে নেন। মতিবাবুর অবস্থা ভাল নয়, পণ দেওয়া, এমন কি দু'ভরি সোনা দিয়ে মেয়েকে সাভরণা করে দেওয়ার মতনও সঙ্গতি তাঁর ছিল না। অথচ আপনা থেকে পাশ করা চাকুরে জামাই জুটল। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মনে করলেন, এ হল মেয়ের গেল জন্মের পুণ্যের ফল।

শ্রীর মা মহামায়া প্রতিবেশিনী দারোগা-গিন্নীর কাছে গল্প করলেন, পাপমুখে বলতে নেই, মেয়েরা আমার ভাগ্যমন্ত। সুমারও কেমন আপনা থেকে বর জুটে গেল। জামাই হাজার টাকার চাকরে। আমরা কি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি যে, অমন জামাই পাব?

বিয়ের এক মাসের মধ্যেই শ্রী বিধবা হল। শাশুড়ী অলুক্ষণে বৌকে একরূপ দূর দূর করেই বিদায় করে দিলেন। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, আগুন, আগুন। রূপ নয়, আগুন এনেছিলুম ছেলের জন্য। ছেলে আমার পুড়ে গেল।

মতিবাবু এই মেয়েকে সবচেয়ে বেশী ভাল-বাসতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শ্রীকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। কিন্তু তার বৈধব্যের আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সংসার ভাসিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

দরিদ্রের সংসার; শ্রীর দাদার আয়ে অতি কষ্টেসৃষ্টে চলে। ঝি-চাকর নেই। দাদার বিয়ে হয়েছে অল্পদিন—নতুন বৌ, তায় সন্তান-সম্ভবা। শ্রী তাকে কাজ করতে দেয় না। নিজে এক হাতেই সব করে। বাসনমাজা,—আমিষ, নিরামিষ দুই হেঁসেলের রান্না, কাপড় কাচা—এসব ত আছেই। তার উপর কখনো কখনো ছোট ছোট ভাই-বোনদের পড়ায়। এ সব ভার নিজে থেকেই সে নিয়েছে। বিশ্রাম নেই। ক্লান্তিবোধও যেন এই তরুণী স্বামীহীনার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

মেয়ে বিধবা হওয়ার কিছু পরে মহামায়া স্বামী হারালেন। সেই থেকেই তিনি পুজো আহ্নিক নিয়ে আছেন। হবিষ্যি করেন বেলা চারটার পর। শ্রী তাঁর সঙ্গে খায়।

তিনি অনেকবার বলেছেন, কাঁচা বয়সে এত অবেলায় খাওয়া সহ্য হবে কেন? তুই আগে খেয়ে নিস।

শ্রী বলে, আমার খিদে পায় না। একদিন বলল, বিধবার কি কোন বয়স আছে? আমি তুমি প্রদ্যোত কাকার পিসিমা সব আমরা এক বয়সী।

মহামায়ার চোখ বাষ্পপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবেন, যে সমাজের বিধানে তাঁর কাঁচা মেয়ে মনু ঠাকুরপোর ছিয়াশিবছরের পিসির এক বয়সী হয়ে গেছে, সে কি মানুষের সমাজ, না আর কিছু?

মায়ের সংসারের কাজ ছাড়া শ্রীর আর একটি কাজও আছে। সে বিধবা হওয়ার পর তার মাতামহ একটি কষ্টি-পাথরের গোপাল বিগ্রহ তার হাতে দিয়ে বলেন, এখন থেকে এর ধ্যান ক'র দিদা। ইনিই তোমার স্বামী-গুরু সব।

সেই থেকে সে দাদুর আদেশ পালন করেই এসেছে। রোজ বিগ্রহকে স্নান করায়, তাঁর ভোগ দেয়, সন্ধ্যারতি করে। কখনও বা একা একা গল্প করে গোপালের সঙ্গে। এক একবার মনে পড়ে যায় স্বামীর কথা।

তাকে দেখেছে শুধু বিবাহে ও ফুলশয্যার রাত্রে। চার ধার থেকে ঠানদি, বৌদিরা, সখীরা আড়ি পেতেছিলেন বলে ভাল করে চোখ মেলেনি। লজ্জায় আধবোজা চোখে দেখেছে। যুবক স্বামীর মূর্তি আজ মনে পড়ে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক কিশোরের ছবি। চৌদ্দ বছরের ছেলে মৃত পিতার পা ছুঁয়ে বসে আছে। ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে একটু ফাঁক, ভারী করুণ চাহনি।

শ্বশুরের মৃত্যুর পরে রাত্রে শ্মশানে তোলা স্বামীর এই ফটোখানি শ্রী শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। এই কিশোরকে স্বামী বলে সে ভাবতে পারে না, ছবিখানা দেখলে কেমন যেন স্নেহ জাগে, ছোট ভাই দুলালের প্রতি স্নেহের মতন সে অনুভূতি নিবিড় অথচ অনুত্তাপ।

তরুণী বিধবার দিন চলেছে এইভাবে, উদ্দেশ্যহীন জীবন যেন হালহীন একখানা নৌকা। ভেসে চলেছে ত চলেছেই। এত কাছে করে তবু যেন সে সংসার ও সমাজের একটু অপ্রয়োজনীয় অংশ। স্বজনের দায়স্বরূপ। সঙ্গে অমঙ্গল নিয়ে ফেরে।

সেকেলে পরিবার, বাইরের লোকের যাতায়াত কম। আত্মীয়-স্বজন দু'-একজন যা আসে তারাই শ্রীকে প্রেম নিবেদন করে।

কেউ আকারে ইঙ্গিতে, চোখের চাহনি দিয়ে—কেউ বা স্পষ্টই ভালবাসা জানায়। তরুণেরা ত দূরের কথা, পক্বকেশ বৃদ্ধেরাও যৌবনের প্রাপ্য থেকে সুন্দরী এই তরুণীকে যেন রেহাই দিতে চায় না।

এর মধ্যে হেমেশের প্রেমই ছিল গভীর, শান্ত। নিজের অজ্ঞাতে শ্রী তাকে সৃষ্টির প্রেরণা জোগাত। তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলত, সেই ঝংকার রূপ পেত—তার কবিতার মধ্যে।

অনেকদিন পরে শ্রীর দিদি সুমা জামসেদপুর থেকে মায়ের কাছে এসেছে। শ্রীর বিয়ের সময় আসতে পারে নি, বিয়ের পরও এল এই প্রথম। পথ অনেকটা, তার স্বামী প্রতাপের বেশী ছিনেমা সর্বময় কর্তা, ছুটি তার কম। সুমারও ঘন ঘন সন্তান হয়। তার পক্ষে আসার বিঘ্ন অনেক।

স্বামী মোটা রোজগেরে, তার নিজেরও হাত দরাজ। সে এসে সকলকে কাপড় জামা দিয়েছে, বৌদিকে দিয়েছে বেনারসী শাড়ী ভাইবোনদের প্রায়ই থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখায়, সার্কাসে নিয়ে যায়। ঘন ঘন ভোজ দেয়।

তার ছেলেমেয়েরা সুদূর প্রবাসে থাকে, বাংলা থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে না। সন্দেশ রসগোল্লার স্বাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। মামাবাড়িতে এসে মামা-মামী মাসীর সঙ্গে মিলে বাংলার খাবার খেয়ে বাংলা বই দেখে বাড়িটাকে তারা উৎসবমুখর করে তুলল। অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভুলে গেল যে তারা দরিদ্র।

শ্রী এ দলে ছিলনা, ভাল খাবারও খেতে চাইত না সে। কিছু পেলেই গোপালের ভোগ দিত। সুমা সিনেমায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বলত এক রাশ এঁটো বাসন পড়ে রয়েছে দিদি, উনোনটা ভেঙে গেছে, মাটি দিতে হবে, সুভাষের জাম্পারটা আর ফেলে রাখা চলে না। শীত এসে পড়ল বলে। সুভাষ তাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই। সুমা তার জাম্পারের উল কিনে দিয়েছে।

সে জানে শ্রীর এ সব এড়াবার ছুঁতো। আনন্দ আর করবেনা সে।

এই জন্য মহামায়াও থিয়েটার-বায়স্কোপে যেতে চান না। সুমার আনন্দের ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি, দু'দিন সে প্রোগ্রাম নাকচও করে দিয়েছে। তার ছেলে-মেয়েরা, ভাই-বোনেরা এইজন্য রাগ করেছে শ্রীর উপর।

সুমা একদিন মাকে বলল, খুকুর সাধ-আহ্লাদ করা দরকার, নইলে পাগল হয়ে যাবে যে।

কথাটা শ্রীর কানেও গেল। সে বলল, পাগল হতেও বরাত চাই দিদি। আমি সে বরাত করেও আসিনি।

কয়েকদিন পরে সুমা বলল, ধর্মমূলক বই দিয়েছে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চল, দেখে আসি গিয়ে।

চৈতন্যদেব—তার গোপাল এই রূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে দেশকে হরিনামে মাতিয়েছিলেন। তিনি গোপাল, তিনিই শ্রীহরি। এই সব ভেবে শ্রী বলল, আচ্ছা যাব আমি।

আনন্দের সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। ছেলেরা কলরব করে উঠল। সুভাষ হাততালি দিয়ে বলল, মেজদি বড় ভাল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে-গুণে-কুলে-শীলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায় লোকবরেণ্য পুরুষ। মানুষ না যেন মূর্ত প্রেম। জগাই-মাধাইকে বুকে টেনে নিলেন, রূপ-সনাতনকে ভাসিয়ে দিলেন প্রেম-বন্যায়।

একদিকে এই মহান প্রেম আর একদিকে প্রস্তরের কাঠিন্য। জননীকে জায়াকে চোখের জলে ভাসিয়ে সংসারত্যাগী হলেন। কোমল কঠোরের এই মিলন লোকোত্তর পুরুষেই হয়ত সম্ভব।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার এই বঞ্চনা শ্রীর বুকে বড় বাজল। নিজে চিরবঞ্চিতা, তাই কোন নারীকে বঞ্চিত হতে দেখলেই সে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ত। রাগ করত বঞ্চনাকারীর উপর। আজ ছবি দেখে চৈতন্যদেবকেও সে যেন ক্ষমা করতে পারল না।

*   *   *

প্রায় তিন ঘণ্টা পর্দার উপরে দ্রুত অপসৃয়মাণ ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে শ্রীর অনভ্যস্ত চোখ দুটো কড় কড় করছিল। হাওয়াটা মনে হচ্ছিল বড় বেশী ভারী। ছবি দেখে বাইরে খোলা বাতাসে এসে বেশ একটু আরাম বোধ হল।

সামনের রাস্তায় অসম্ভব ভিড়। দুটি ট্রাফিক পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মানুষের কলরবের সঙ্গে মিশেছে মোটরগাড়ীর হর্ণের প্যাঁক প্যাঁক, রিক্সার ঠুন-ঠুন, ট্রামের ঠন ঠন। বিভিন্নমুখী বাসের কণ্ডাক্টররা চেঁচাচ্ছে—পাইকপাড়া, কালীঘাট, বালিগঞ্জ। এর মধ্যেই মানুষে ধাক্কাধাক্কি করছে, কনুইয়ের সাহায্যে যে যার পথ করে নিচ্ছে। আধ মিনিটের দেরী সইছে না কারও।

সুমারা হেঁটে চলেছে। একটু গিয়ে—বাসের দোকান থেকে নানারকমের কেক কিনে পাঁচ রাস্তার মোড়ে গিয়ে তারা ট্যাক্সি নেবে। ভিড় কমে গেলে বাসেও যেতে পারে।

কার্তিকের অপরাহ্ন। ম্যাটিনী শো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছিল। প্রকৃতিতে নেমেছে শান্তির আমেজ। চলেছে ছায়াছবির কথা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের [illegible] তাদের অভিনয়-কৌশল পরিচালনায় প্রয়োগনৈপুণ্য। সুমারা সবাই সোৎসাহে আলোচনা করছে, মন্তব্য করছে। মহামায়াও [illegible] নিয়েছেন। ছোট্ট সুভাষও গুন গুন করে গাইছে, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু—।

সবাই একসঙ্গে [illegible] দেখছে [illegible] শ্রী সঙ্গে আছে—তাই এত আনন্দ। কিন্তু সে ও আলোচনায় নেই। সে দু'তিন কদম আগে আগে চলেছে, কী যেন ভাবছে। হয়ত বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা।

সামনেই জনবহুল পাঁচ-রাস্তার মোড়। গাড়ী মোটর যথেষ্ট, কিন্তু ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি নেই।

শ্রী অন্যমনস্কভাবে চওড়া রাস্তাটা পার হচ্ছিল।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁ-া-া-চ লৌহে লৌহে ঘর্ষণের বিরাট আওয়াজ। সঙ্গে হো-ও-ও-গেল-গেল—এইরে—মানব কণ্ঠের অস্পষ্ট কলরব।

শ্রী শূন্যে উঠে গেল, তার মনে হল শক্ত বাহুপাশে বেঁধে কে যেন তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। উড়ে যাচ্ছে। হাত দুটো যেন ইস্পাতের তৈরি। এ কি দৈত্য, না যন্ত্র, না মানুষ?

খেলার পুতুলকে ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন দরদ দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দেয়, মানুষটি তাকেও সেইরূপ আলতোভাবে ফুটপাথের উপর রেখে গেল।

শ্রী যেন স্বপ্ন দেখছে, পুরুষ মানুষের স্পর্শের আমেজ, বাতাসে তার দেহের গন্ধ, কানে আসছে নানা আওয়াজ। কেমন যেন বিহ্বল ভাব।

আর ঠিক এই সময় অচেনা মানুষটি তার চোখের উপর দিয়ে অদূরে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শ্রী পিছন থেকে দেখল—লম্বা-চওড়া, জোয়ান পুরুষ, পরনে ঘি রঙা পাঞ্জাবি, গায়ের রংটা মনে হল ধবধবে ফরসা।

পথচারীরা তখনও টিপ্পনী কাটছে, আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি, পথ চলতে জানে না ত বেরোয় কেন, ভাগ্যিস্ ড্রাইভার পাকালোক—তাই বেঁচে গেছে।

রক্ষা করেছে ঐ ছেলেটি, বাহাদুর বটে।

সুমা এসে পরম স্নেহভরে তার হাত ধরে ডাকল, খুকু।

মেজভাই দুলাল বলল, আর একটু হলে কি হ'ত বল দেখি মেজদি। ডবলডেকার দাঁতটার তলে পিষে যেতিস যে, কি ভাবছিলি তুই?

সুমা ধমক দিল, তোর আর সর্দারি করতে হবে না। আর মহামায়া শ্রীর দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে মনে বলছিলেন, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু।

শ্রী তৎক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল, একটা ঝড় বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে তাকে রক্ষা করেছে অচেনা ঐ মানুষটি। আর অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা বাসটা, বাস না যেন বাঘমুখো কালো বিরাট যমদূত। ভয়ে সে চোখ বুজল নিমীলিত চোখের পাতার উপর দেখল ঘি-রঙা পাঞ্জাবি-পরা গৌরাঙ্গ সেই যুবাকে। সমগ্র সত্তা দিয়ে যেন তার দৃঢ় স্পর্শ অনুভব করছিল।

সুমা বলল, তোর পা ছড়ে গেছে, ব্লাউজেরও খানিকটা ছিঁড়েছে দেখছি।

শ্রীর জীবনদাতা হ্যাঁচকা টান দিয়ে যখন তাকে রাস্তার উপর থেকে তুলে নেয়, তার বাম স্তনের কাছে ব্লাউজটা তখন ছিঁড়ে গেছে। সেটা লক্ষ্য করে শ্রী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি স্কার্ফটা টেনে দিল বুকের উপর।

বাড়ি ফিরেও কিছুক্ষণ চলল ঐ আলোচনাঃ আর একটু হলে কী দুর্দৈবই না ঘটত।

মহামায়া বললেন, পথ চলার অভ্যেস নেইত। ঐ রকম হয়ে অবধি রাস্তায় যায় না, রাস্তা দিয়ে মিছিল গেলেও চোখ তুলে তাকায় না। দুলাল বলল, হবেই বা কোত্থেকে? ওর গরুতে যা ভয়।

মহামায়া বললেন, ভাগ্যিস্ ভগবান ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলেন। এ সব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যেরই লীলা। আর ধন্যি বলতে হবে ছেলেটিকে, নিজের জীবনের পরোয়া না করে ছুটে এলো ত।

দুলাল বলল, যেমন ভদ্র তেমনি লাজুক। মেজদির দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। কাকে বাঁচালাম তা একবার দেখতেও তার ইচ্ছে হল না। আশ্চর্য।

অপরিচিত এই তরুণকে নিয়ে পরিবারের সবাই আলোচনা করছে। তাদের পরম আত্মীয় সে, খুকুর জীবনদাতা। মানুষটির তারা পরিচয় জানল না, ভাল করে তাকে দেখলও না। এই তাদের আক্ষেপ।

সুভাষ বলল, ঠিকানা জানলে বড়দি তাকে লুচি-মাংস করে খাওয়াত। আমরাও খেতুম।

অপরিচিত মানুষটিকে নিয়ে সবাই আলোচনা করছে, কিন্তু শ্রী যোগ দেয়নি। তার দেহ মন দুইই অবসন্ন, পায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা একটু একটু জ্বালা করছে। কোন কথা বলতে কি শুনতে ভাল লাগে না। একবার শুধু তার মনে হয়েছিল, ছিঃ ভদ্রলোক কি ভাবলেন? হয়ত মনে করলেন মেয়েটা পথ চলতেও জানে না। কী আনাড়ি!

একবার মনে প্রশ্ন জাগল, বয়স কত হবে? আটাশ-তিরিশ?

রং ত সুন্দর। মুখখানা কেমন? মুখচোখ—

লোকটার কি বিয়ে হয়েছে?

পরক্ষণেই এসব ঝেড়ে ফেলে দিল তার মন থেকে। রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে, একরাশ বাসন। দিদির ছোট্ট মেয়ে তনুকে খাওয়াতে হবে। কাঁদিনেই কচি মেয়েটা তার বড় নেওটো হয়ে পড়েছে।

* * *

সারা রাতটা শ্রী প্রায় জেগেই রইল। ঘুম আর আসে না। চোখ বুজলেই চোখের পাতার নীচে দেখতে পায় শচীমাতার শোক, বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না। রাস্তার সেই দৃশ্য। কানে আসে—হো-ও—ও-গেল—গেল।

শেষরাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে দেখল একটা উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে সে, পড়ছে ত পড়ছেই। বিরামহীন, বিশ্রামহীন পতন, উন্মাদ একটা তারা যেন নিচের দিকে ছুটছে। চারধারের অন্ধকারে শিহরণ জাগছে, পতনের শব্দ হচ্ছে—শ্......শ্......শ্।

হঠাৎ একটা মানুষ তাকে লুফে নিল, রক্ষা করল পতন থেকে। তার গায়ে ঘি-রঙা পাঞ্জাবি। তাকে নিয়ে সে একটা বলের মতন লুফতে লাগল। একবার উপরে ছুঁড়ছে, আবার ধরে ফেলে। তার কুশলী হাত শ্রীকে মাটিতে পড়তে দেয় না। কিন্তু ভারী শক্ত সে হাত, লোহার মতন রুক্ষ কর্কশ। মানুষটা বোধ করি শ্রমিক, কারখানায় হাতুড়ি পেটে, হাতুড়ির ঘায়ে লোহার কড়ি টুকরো টুকরো করে দেয়।

শক্ত বটে, কিন্তু দরদী সে স্পর্শ।

মানুষটি চেনা, কোথায় যে দেখেছে শ্রী ঠিক মনে করতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে থাকে, ডুবে যায় স্মৃতির অতল তলে। কিন্তু—খালি পাঁক সেখানে, হিমশীতল পাঁক।

হ্যাঁ, ঠিক এই মানুষটি—হ্যাঁচকা টানে তার ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছে। কী লজ্জা!

তার মুখ দেখেনি তখন। মুখ দেখার আগ্রহে শ্রী কাঁধ ধরে তাকে ফেরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু অমন জোয়ান পুরুষকে ফেরাতে পারবে কেন সে?

বাইরে কি একটা শব্দে তার স্বপ্ন টুটল। স্বপ্নের রেশ ধরে গেল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এবার উঠতে হবে তাকে, উনুন ধরাতে হবে। দাদা আপিস বেরোবে নটায়, তার আগে রান্না করে খাইয়ে দিতে হবে তাকে।

ধীরে ধীরে শ্রীর একটা পরিবর্তন আসতে লাগল। কথা কয় আরও কম, কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব। কি যেন ভাবে। ভিতরে একটা অভাববোধ তাকে পীড়া দেয়। সে অভাব যে কেন, কিসের অভাব তা' সে নিজেও জানে না। মধ্যে মধ্যে শুধু মনে পড়ে ঘি-রঙা পাঞ্জাবি, তার স্পর্শ। মানুষের স্পর্শে যে এতটা আমেজ আছে সে তা জানত না। স্পর্শ ত অনেকই সে পেয়েছে, মায়ের ভাইয়ের বোনের। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র জিনিস।

হেমেশ তার হাতে হাত রেখেও কথা বলেছে দু'একবার—তার স্পর্শ সে পেয়েছে, কিন্তু তাতেও কোন উন্মাদনা ছিল না। কিন্তু একী! আজ কেন এরকম হল?

ভাবতে ভাবতে এক এক সময় নিজের কাছেই লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই ঐ ভাবনা এসে আবার মাথার মধ্যে চেপে বসে।

সুমা এর পরও কয়েকবার সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়ার জন্য বলেছে, কিন্তু শ্রী যায়নি। সে ভাবে কি লাভ গিয়ে? ছবি দেখে পরের দুঃখে মনকে মিছিমিছি ভারাক্রান্ত করে তোলা, চোখকে পীড়িত করা।

তার শরীর খারাপ হয়ে গেল। দিনের পর দিন কৃশ হতে লাগল, কৃশ পাণ্ডুর। সুমা ডাক্তার ডাকল, তিনি বললেন, 'নার্ভাসনেস্'।

কবিরাজ চোখ বুজে নাড়ী পরীক্ষা করেও অনুরূপ রায় দিলেন।

ওষুধ আসে, শ্রী ওষুধের শিশি হাতে করে আপন মনে হাসে। কান্নার চেয়েও করুণ সে হাসি। মনে পড়ে সেই অপরাহ্ণের ম্লান আলো, সেই স্পর্শ। মনে পড়ে হেমেশকে। তাকে বাধা দিয়েছে বলে মন অনুশোচনায় ভরে যায়। ভারী দুঃখ পায় সে।

বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মতন বিশাল অগ্নিগর্ভ, জ্বালাময়।

এক-একবার মনে প্রশ্ন জাগে, হেমেশ এলে আবারও কি তাকে ফিরিয়ে দেবে। পারবে দিতে

জগৎ পারাবারের তীরে — ক্ষীরোদ রায়

রয়েছে—, পুণ্যসলিলা গঙ্গা—; দীর্ঘদিন গঙ্গা স্নান হয়নি অপলার। আর একদিকে অপলার বাপের বাড়ী।

মেয়েটা বড় হয়ে উঠছে। চৌদ্দ থেকে পনেরোয় পা দিল কাকলী। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। ওই একটি মাত্রই মেয়ে ওদের।

অপলা ঠিক করেছে মার সঙ্গে, দিদি, বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক করবে। ঠিক করতেও তো খানিকটা সময় যাবে। মনে মনে ভেবে রেখেছে অপলা বেশ সংসারী মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে।

বদলি সম্বন্ধে বাবা-মার কথাবার্তা শোনে কাকলী।

মিষ্টি ধরণের মুখখানা ওর—রং ফর্সা—, স্বাস্থ্য নিটোল। বুদ্ধিদৃপ্ত চোখের ছায়ায় কৈশোরের প্রগলভতার সঙ্গে মনন মাধুরী এক হয়ে মিশেছে। কথা বলে অনর্গল কণ্ঠে, ওর সে বলায় চপলতা যত, বিন্যাস তত।

মাস কয়েক ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে,—শাড়ী সামলাতে বেশ হিমসিম খেয়ে উঠছে। অপলার মনে হয় মেয়েটা যেন বাপের ধাঁচেই যাচ্ছে।

বদলির চাকরী। জন্মানোর পর থেকে বাপ-মার সঙ্গে নানা জায়গা ঘুরেছে। ধরা বাধা রাস্তায় লেখাপড়া খুব এগোয়নি—নানা দেশ-বিদেশের বাতাস আর মাটির স্পর্শে মন যত সজীব তত পুষ্ট হয়েছে।

হয়তো বাপেরই প্রতিরূপা সে হয়েছে। মিত্রক মন সমর্পণ করেছে প্রাচীন পুঁথিপত্রের গবেষণায়, কন্যা আলোকচিত্র গ্রহণের দক্ষতায়।

বছর পাঁচেকের মধ্যে ছবি তোলায় কাকলী বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে।

এবারকার বদলির ব্যাপারে আদৌ খুশী হতে পারছে না মিত্রক—, ঠোঁটের বাঞ্জনায় অস্বস্তির প্রলেপ—, গলায় বিরক্তির স্বর—'কাশীপুর রেল ইয়ার্ড নয়তো, যেন নরককুণ্ড—'

এবার মিত্রকের সঙ্গে কথা বলে তার পঞ্চদশী কন্যা—, অনর্গল কণ্ঠে তার ইতিহাসের সঞ্চয় উদ্দাম হয়ে ওঠে—'শুধু নরককুন্ড নয় বাবা—, ওই ইয়ার্ডের রেল লাইন উপড়ে ফেললে তুমি পাবে বাঙালীর নব জন্মের আর এক ইতিহাস—, উনবিংশ শতাব্দীর যুগ অভ্যুত্থান তুমি খুঁজে পাবে ওই মাটির গভীরে—, প্রাচীন কোলকাতার কত ঐতিহ্যের গরিমা ওখানে অবলুপ্ত রয়েছে।'

পিতা বিস্ময়ের চোখে কন্যার দিকে তাকিয়েছিলেন—, দৃষ্টিতে তাঁর কৌতূহল আর আনন্দ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, স্নায়ুতে রোমাঞ্চ জাগছে—'তুই এসব কথা জানলি কী করে?' উৎসাহের কণ্ঠে কাকলী বলছে—'নৈহাটী থাকতে লাইব্রেরীর একটা বইতে আমি পড়েছিলুম। নীলিমদা আমাকে একটা কোলকাতার ম্যাপ দিয়েছে—ওতে অনেক কিছু আছে—দেখবে বাবা—'

'নিয়ে আয় তো মা—'

কাকলী নীলিমের দেওয়া মানচিত্র আনতে গিয়েছে। নীলিম। নীলিম মিত্রকের সহকর্মী নীলুদার ছেলে। নীলুদা আজ আর মিত্রকের সহকর্মী নয়। ধাপে ধাপে তার উন্নতি হয়ে গিয়েছে। গুডস্ ক্লার্ক থেকে গুডস সুপারভাইজার। অর্থে প্রতিপত্তিতে সে এক উচ্চাঙ্গের মানুষ। ক্লাস টু—ষ্টাফ।

মিত্রক আজও ক্লাস ফোর ষ্টাফের আওতায় রয়ে গেল।

উন্নতি নেই—, অবনতি—সাংসারিক সংজ্ঞায় ও একটা অপদার্থ।

ততক্ষণে জোড়াতালি দেওয়া একটা মানচিত্র নিয়ে ফিরে এল কাকলী।

মানচিত্রখানা তক্তোপোষের উপর খোলা রয়েছে। বাপ ও কন্যা একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে কাশীপুর অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করছে।

থেকে থেকে কাকলীর কণ্ঠ অনর্গল হয়ে উঠছে—'বাবা এখানে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহেরই এলাকা ছিল—, টোল, উদ্যানবাটী—; নীলিমদা বলেছিল—এখানেই তিনি কত পন্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করে মহাভারত রচনা করেছিলেন।' 'মহাভারত? কালীপ্রসন্ন সিংহ? কাশীপুর রেল ইয়ার্ড—?' উত্তেজনায় আর শিহরণে মিত্রকের গলার স্বর কাঁপছে।

কাশীরাম থেকে পরশুরাম পর্যন্ত মহাভারতেরই গবেষণা করছে মিত্রক। টিনের রং চটা বাক্সের মধ্যেকার প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতখানা বের করলো।

জীর্ণ-বিবর্ণ পৃষ্ঠা সে পুঁথির,—কত তার অক্ষর পোকায় গ্রাস করেছে। তবু তার মধ্যে শতাব্দী পূর্বেকার যে গৌরব অধ্যায়ের সাক্ষ্য রয়েছে—তা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যকে জানবার এবং জানানোরই উদ্দীপনা।

তন্ময় মিত্রক প্রাচীন সে পুঁথির বিবর্ণ পৃষ্ঠা বিহ্বল হয়ে দেখছে। কাকলী মানচিত্রের পৃষ্ঠায় কোলকাতার আরও সমৃদ্ধি খুঁজছে।

এমনই অনুধ্যান আর অনুসংহিতের ফাঁকে ফাঁকে বদলির গোছগাছ চলতে লাগলো।

* * *

মহাভারত, কালীপ্রসন্ন, কাশীপুর ইয়ার্ড—আর এক পটভূমিতে বদলি হয়ে এসে অপরূপের অনুভূতি জাগছে মিত্রকের রোমাঞ্চিত স্নায়ু স্পন্দনে—; এই রেল ইয়ার্ড উপড়ে ফেললে কত হীরের খনির না আবিষ্কার হবে।

ধ্যান চোখে অনুভব করে মিত্রক শতাব্দী পূর্বেকার কৃষ্টির ইতিহাস। স্মৃতির গরিমা। ধ্যান চোখে কেন?

কিছু অস্তিত্ব আজও বর্তমান রয়েছে বইকি—

রেল কলোনীর ধার ঘেঁষে মিত্রকের কোয়ার্টার। একদিকে বড় রাস্তা—, সিনেমা, মাইকের হৈ হল্লা; অন্যদিকে প্রাচীন কোলকাতার বনেদী স্বাক্ষর। লাল ইঁটের প্রকান্ড ইমারত—মাথায় গম্বুজ—; এই প্রাসাদের যজ্ঞবেদীতে সমকালীন কালীপ্রসন্ন পন্ডিত ও সভাসদগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন।

রেল সংস্থা একদিন এদিকটা অধিকার করে সব ভেঙে রেল ইয়ার্ডেরই বিস্তৃত এলাকা স্থাপন করেছিল। শুধু ভাঙা হয়নি এ ইমারতখানা—হয়তো এর মধ্যে কিছু বাণিজ্যিক আস্বাদন পেয়েছিল।

বাণিজ্যিক আস্বাদন বইকি—

কালীপ্রসন্ন প্রাসাদের পঞ্চাশখানা প্রকোষ্ঠে পঞ্চাশজন রেল কর্মচারীর আবাস হয়েছে। টোল, বিদ্যার্থীদের বিদ্যা অনুশীলনের জায়গা জুড়ে নিয়েছে—টাকা আনা পাইর হিসাব নিকাশ।

এত কথা মিত্রককে বলেছিল নীলিম।

মিত্রকের প্রাক্তন সহকর্মী নীলুদার ছেলে নীলিম। নীলুদা মোগলসরায়ে পোষ্টেড। গুডস সুপারভাইজার। ছেলে ওই ঐতিহাসিক প্রাসাদের একখানা প্রকোষ্ঠের বাসিন্দে। বছর বাইশ-তেইশ বয়স নীলিমের। বি-এ পাশ করে নম্বর টেকারের চাকরীতে ঢুকেছে।

ইয়ার্ড থেকে যখন মালগাড়ী—নানা দিকে যাত্রা করে তখন সে নম্বর লিখে রাখে। মিত্রক বলেছিল ওকে—'বি-এ যখন পাশ করলে—শিক্ষা লাইনে থাকলে পারতে'—'শিক্ষা লাইন' উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে নীলিম—'ওখানে কী উন্নতি আছে? বাবা ঢুকিয়ে দিলেন এই নম্বর নেবার কাজে—, বললেন,—'বরাতের যদি জোর থাকে, আর থাকে বুদ্ধির একটু জৌলুস উন্নতি না হয়ে যায় না।'

'নিশ্চয়' এবার কথা বললো কাকলী। নূতন জায়গায় বদলি হয়ে এসে—জিনিষপত্র গোছগাছ করতে করতে কাকলী বাবার সঙ্গে নীলিমের কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে সেও তার বক্তব্য পেশ করছে।

'নিশ্চয় কেন?' নীলিম ওর দিকে হাস্যোজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

'নিশ্চয় বইকি'—কৌতুকের কণ্ঠ কাকলীর—'মালগাড়ীর নম্বর নিতে নিতে একদিন তো তুমি মালগাড়ীর অধিকর্তা হয়ে উঠতে পারো—ষ্টেশন মাষ্টার—, ডি-টি-এস। কত টাকা—, কত প্রতিপত্তি—'

আবার হাসলো নীলিম। বললো—'বছর তিনেক পর তোমায় দেখছি—, দেখছি ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছ—কিন্তু বাক্যের একেবারে ফুলঝুরি হয়েছ যেন—ছবি তোলা এগুলো কিছু? আমাকে একটু শেখাতে হবে—'

মিত্রক এবার উত্তর দিল—'ছবি তুলতে বেশ শিখেছে। ওই তো আমাকে এদিককার সমৃদ্ধির কথা শোনালো। তুমি ওকে একটা কোলকাতার যে ম্যাপ দিয়েছিলে—তাই দেখে আমি কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলুম।'

'তাই নাকি—' এবার আর হাসি থামতে চায় না নীলিমের।

'কী হাসি হাসতে পারে নীলিমদা'—প্রগলভ গলায় কাকলী বললো।

'কী কথা কইতে পারে কল-কাকলী—' নীলিম উত্তর দেয় সহাস্য গলায়।

বছর তিনেক আগে কাকলী যখন পাখীর কূজনের মত কিচির-মিচির করতো—নীলিম তখন ওকে কল-কাকলী বলে ডাকতো।

এমনই কথা আর হাসির মধ্যে দিয়ে ওরা দুজন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

মিত্রক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এদিককার বনেদী গরিমার ঐতিহ্যে। কী ভালোই না লাগে ওর কালীপ্রসন্ন আমলকার সমৃদ্ধি অনুধ্যান করতে।

অপলা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে পুণ্যসলিলা গঙ্গার অবগাহনে।

আর এক দিককার বড় রাস্তার গা ঘেঁষে গঙ্গা বেয়ে চলেছে। প্রত্যেকদিন অপলার গঙ্গা স্নান করা চাই।

গঙ্গার গৈরিক ঢেউ-এ কত জাহাজ ভেসে যায়। ঘাটে ঘাটে নোঙ্গর করে ধান-চাল-পাট বোঝাই নৌকাগুলি। মাঝ গঙ্গায় জেলেরা ডিঙ্গি নিয়ে ইলিশ ধরে। গঙ্গার গা ঘেঁষে সারি সারি গুদাম ঘরে থরে থরে মাল বোঝাই হয়। রেল ইয়ার্ড থেকে মাল গাড়ীর মারফৎ পুনরায় জাত হয়। সিমেন্ট, চুণ, কাপড়চোপড় গাটি কত কী—

Nirod Ray.

"Power in Smoke"

নীরদ রায়

বাষ্পশক্তি

রঞ্জিৎ রায়চৌধুরী

সুপ্ত

একবার চোখ পড়লে চোখ ফেরানো যায় না। —এমনি রূপ! রূপটা খোলতাই হয়েছে আরো শরীরের মসৃণ গড়নের জন্যে। পটে-আঁকা ছবির মত দেখতে অবশ্য নয়, কিন্তু এর ছবি পটে আঁকতে পারলে সে-পটের চাহিদা হবে।

বৈদ্যনাথের বৌ। স্কলার মানুষ বৈদ্যনাথ। কলেজে পড়ায়। বয়স কাঁচা। ঘরকুনো ভালো-মানুষ টাইপের সে।

বাপের মতই নিরীহ আর নম্র প্রকৃতির সে এবং আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়েরই উপযুক্ত ছেলে। আদ্যনাথও সারাটা জীবন পুঁথির পাতা ঘেঁটে ঘেঁটে, নিজেকে সবার আড়ালে রেখে রেখে, অধ্যাপক-জীবন কাটিয়ে গেলেন; বৈদ্যনাথও সেই একই পথের যাত্রী হয়েছে।

অনেক খুঁজে-পেতে, অনেক দেখে-শুনে, ঘরে মনের মত বৌ এনেছেন আদ্যনাথ।

আদ্যনাথ খুশি। বৈদ্যনাথও।

কিন্তু কলোনির মানুষরা বলে, "বানরের গলায় মুক্তোর মালা হল যে।"

অন্য একজন বলে, "মুক্তোর গলায় বানরের মালাও বলতে পার।"

এ-মন্তব্য একটু অদ্ভুতই শোনায়। যার গলায় যে মালাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই যে বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের আঘাত ছোঁড়া হচ্ছে—একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এমন দিন তো ছিল না। এর আগে সারা কলোনির শ্রদ্ধা আর কৌতূহল ছিল এই নিরীহ প্রকৃতির মানুষটার উপরেই। বিদ্বান বুদ্ধিমান আর নম্র প্রকৃতির বলেই হয়তো সে পেয়েছে এই সম্ভ্রম।

কিন্তু আজ একটা রূপের জলুষ এসে তার বিদ্যা আর বুদ্ধির ছটা বুঝি নিবিয়ে দিয়েছে একেবারে।

এখন সকলের চোখ ওই রূপের দিকে।

আদ্যনাথ খুশি। বৈদ্যনাথও।

বৈদ্যনাথকে ডেকে আদ্যনাথ পাশে বসান, বলেন, "শোনো। নতুন বৌ এসেছে বাড়িতে। বাড়ির শ্রী ফিরেছে। কিন্তু শ্রীটাই বড় কথা নয়, বড় কথা সুনাম। তোমার বোনের কল্যাণে এ-বাড়ির সুনাম একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেটা ফিরিয়ে আনা চাই।"

মাথা নীচু করে বসেছিল বৈদ্যনাথ, ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ পিতার এ উপদেশ গ্রহণ করল সে এবং পালনেও কোনো ত্রুটি হবে না।

আদ্যনাথ আবার বললেন "চারদিকে একটা সাড়া উঠেছে—রূপ রূপ। বৌমার রূপ আছে স্বীকার করি। আর রূপ যদি না থাকবে তাহলে পছন্দ করে তাকে আনব কেন বল। কিন্তু—"

আদ্যনাথ দম নিলেন, কি-যেন ভাবলেন একটু, বললেন, "কিন্তু রূপটাই বড় কথা নয়। বড় কথা গুণ। সেই গুণের কালচার করতে হবে। রূপে মুগ্ধ হয়ে যাবে না, গুণে গৌরবান্বিত হতে শিখবে।"

মাথা নীচু করে ব'সে আবার মাথা নাড়ল বৈদ্যনাথ। অর্থাৎ বাবার এ যুক্তি স্বীকার করে সে এবং এই যুক্তি অনুসারে নিজে চলার এবং বৌকে চালাবার দায়িত্ব সে মাথা পেতে নিল।

খুশি হলেন আদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বুক ভরে উঠল তৃপ্তিতে আর আনন্দে।

আদ্যনাথের স্বপ্নের সঙ্গে মেলেনি বটে, কিন্তু তাঁর স্বপ্নকে হার মানিয়ে দিয়েছে এই নববধূটি। আদ্যনাথের চোখে একটা স্বপ্ন ছিল—নতুন বধূ ঘরে এলে তার নাকে দুলবে মুক্তোর নোলক, পায়ে বাজবে হাল্কা খাড়ু, লাল-টুকটুকে চেলিতে আপাদমস্তক মুড়ে বাড়িময় ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াবে একটা জীয়ন্ত পুতুল, আর রাঙা রেখা-আঁকা ফুটফুটে পা-দু'খানি দেখে মনে হবে অবিকল যেন দুটি আলতাপাটি শিম।

তাঁর সে স্বপ্নের সঙ্গে মেলেনি বটে, কিন্তু তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। পুতুল পাননি তিনি ঠিকই, কিন্তু তিনি পেয়ে গেছেন একটি প্রতিমা।

প্রতিমাই বটে। যেমন গাঁথুনি তেমনি গড়ন।

আদ্যনাথ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেন। গৌরবে তাঁর বুক ভরে ওঠে। তাঁর মেয়ে বাসন্তীর কথা মনে পড়ে তাঁর। তাঁর উপর রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা। সে রাগটা নিশ্চয়ই একটা অছিলা। ও যেতই। মাঝখান থেকে বাপকে দোষী করাও হল, নিজের মত-লবও সিদ্ধ হল। নিষ্কলঙ্ক এই বাড়িটার গায়ে কালির দাগ এঁকে দিয়ে গেছে ওই মেয়ে। সে-দাগ মুছতে হবে।

আদ্যনাথ পায়চারি করতে করতে খোলা ছাদে এসে দাঁড়ালেন। উঃ, আকাশটা আজ কী পরিষ্কার, বাতাসটা কী ঠাণ্ডা।

হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়তেই আদ্যনাথ ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, "ও কি বৌমা, ও কি করছ?"

"শ্যাওলার দাগ পড়েছে বাবা, প্রাচীরে। ঘষে তুলে দিচ্ছি।"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আদ্যনাথ, বললেন, "সে কি! এ-কাজ তুমি করবে কেন? এ সব কাজ করার কি লোক নেই?"

নীচের উঠোনের দিকে ঝুঁকে আদ্যনাথ ডাকলেন, "ভীম। ভীমপ্রসাদ।"

ঝি-বুড়িটা রান্নাঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল, চমকে উঠে উপরে তাকাল, বলল "ভীম তো নেই। ঠাকুর দোকানে গেছে।"

যাক গে। আদ্যনাথ সরে এলেন। শ্যাওলার সবুজ দাগের উপর হাত বুলিয়ে বললেন, "এ তো সামান্য দাগ। এ জন্যে ভেব না।"

বলেই তিনি আর যেন দাঁড়াতে পারলেন না। ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা একটু যেন নাটকীয়ই মনে হল।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। তার চোখের তারা-দুটোও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

একমনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল নানা কথা। কোন দূর দেশ থেকে কোন্ সুদূর কিনারে এসে সে পৌঁছেছে। এদের মেজাজের সঙ্গে, এদের রুচির সঙ্গে, এদের আচার-আচরণের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তাকে। এটা কম দায়িত্ব নয়।

ক্রমে ক্রমে গোধূলির নিষ্প্রভ আলো মুছে যেতে লাগল, ক্রমে ফুটে উঠল আকাশের শেষ পারে একটিমাত্র তারা।

এমন সময় সিঁড়িতে বেজে উঠল পায়ের শব্দ। ওই শব্দে চকিত হল, কিন্তু চঞ্চল হল না তারা।

বৈদ্যনাথ এসেছে।

বৈদ্যনাথের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বলল, "আজ একটু দেরি হল যেন।"

"দেরি হয়ে ভালোই হয়েছে।"

"কী রকম?"

হাসতে লাগল বৈদ্যনাথ, বলল, "কবিত্ব করতে একটুও ভালো লাগে না। ও সব নেহাৎ ন্যাকামি। কিন্তু তবুও বলতে ইচ্ছে করছে, আমাদের এই নির্জন বাড়িটার এক কোণে এই-মাত্র তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সিঁড়ি থেকেই মনে হল যেন আমাদের এই বাড়ির আকাশে ফুটে উঠেছে একটা আস্ত সন্ধ্যাতারা।"

"তাই নাকি?" খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল নয়নতারা। হঠাৎ মুখ গম্ভীর ক'রে নিখুঁত নাটকীয় ভঙ্গিতে সে বলল, "সত্য বলেছ, নাথ।"

হেসে উঠল দু-জন একসঙ্গে। নয়নতারার মুখ চেপে ধরে বৈদ্যনাথ বলল, "আস্তে। ও-ঘরে বাবা আছেন না?"

রাঙা ঠোঁটের দাগ লেগে গেল নাকি হাতে? বৈদ্যনাথ হাতটা মেলে ধরে যেন তাই পরখ করতে লাগল।

বুঝল নয়নতারা. বলল, "না মশাই। এ রং একেবারে পাকা রং, উঠবে না।"

"না না।" বৈদ্যনাথ কথাটা ঘুরিয়ে নিল, বলল, "দেখছি ফোস্কা পড়ল কি না। ও তো ঠোঁট নয়, যেন দুটো আগুনের শিখা।"

খিলখিল করে আবার হেসে উঠল নয়নতারা।

এই রকম হাসা চলে প্রায় প্রত্যহ। নিরীহ, [illegible] মুখচোরা [illegible] বৈদ্যনাথের, নয়নতারার শরীরের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে [illegible] বৈদ্যনাথ আজকাল [illegible] হয়ে ওঠে; সে যেন হয়ে ওঠে [illegible]।

বিয়ের কয়েকদিন পরে নতুন বৌয়ের সঙ্গে আলাপটা একটু ঘন হয়ে এলে বৈদ্যনাথ এক-দিন বলেছিল, "এইটে [illegible] তুমি, কিন্তু নামটা এমন কেন—অমন [illegible] আর অমন [illegible]?"

নয়নতারা হাসতে লাগল, হেসে উত্তর দিয়েছিল [illegible], "নতুন জীবন শুরু হল, নামটাও [illegible] দাও।"

বৈদ্যনাথ বলেছিল "তোমার নাম [illegible]।"

রাজি হয়ে গেল নয়নতারা, বলল, "বেশ, আজ থেকে আমি [illegible]। তবে তোমার নামটাও [illegible] নেহাৎ [illegible] নয়, তোমার নামও আমি পাল্টে দিলাম।"

"কী নাম রাখলে?"

নয়নতারা বলেছিল, "নাথ। তোমাকে আমি নাথ বলে ডাকব।"

একসঙ্গে হেসে উঠেছিল দু-জন।

দু-জনের সেদিনের সেই হাসি এখনো ক্লেশ-হীনভাবে অবিরাম বেজে চলেছে শেফালিকুঞ্জের দোতলার নিরালা ঘরের এই নিভৃত কোণটিতে।

কলোনির চাই [illegible] বয়সে প্রাচীন হলে হবে কি, উৎসাহে এখনো [illegible]। যেহেতু বৈদ্যনাথের বিয়ের ঘটকালি করেছেন তিনি, সেই জন্যে [illegible] গর্বের শেষ নেই। কেবল ঘটকালি করাই নয়, বিয়ের সবরকম [illegible] ও [illegible] তিনি। এই জন্যে শেফালিকুঞ্জের নতুন বৌ সম্বন্ধে [illegible] মতামত প্রকাশ করেন সবার আগে [illegible] তিনি। বলেন, "মুক্তোর গলায় বানরই হোক, আর বানরের গলায় মুক্তোই হোক—হয়েছে [illegible] একটা। তোমাদের বেলা যে বানরের গলায় বানর আসবে।"

বাইরের এসব আলোচনা শেফালিকুঞ্জের কানে এসে পৌঁছয় না। সে-কান এখন কলহাস্যে ঠাসা।

দেখতেই যে রূপময়ী এমন নয়, তার রুচিরও একটা রূপ আছে। বাড়ি-ঘর গোছগাছ ক'রে একেবারে ফিটফাট করে তুলেছে। ছাদে সার সার বসিয়েছে টব। তার একটার মধ্যে ছোট একটা শেফালির চারা। মরা বাড়িটা জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে যেন এই জাদুকরীর হাতের ছোঁয়া পেয়ে।

দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে অধ্যাপক আদ্যনাথের বুক আনন্দে আর তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। টবে টবে সাদা লাল চকো-লেট আর গোলাপি ডালিয়ার অরণ্যের মাঝখানে ছোট্ট ওই শিশু-তরুটি দেখে পুত্রবধূর সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর অসীম শ্রদ্ধা জাগে আদ্য-নাথের। তাঁর রচা দারিদ্রের এই তাজমহলের মাঝখানে শিশু-তরুটি যেন সবুজ মমতার পাত্র বিস্তার করে তাঁকে হাতছানিতে ডাকে। শেফালি দেবীর কথা মনে পড়ে আদ্যনাথের। আজ তিনি বেঁচে থেকে তাঁর এই পুত্রবধূটিকে যদি দেখতেন, তাহলে নিশ্চয়ই মরতে দ্বিধা করতেন তিনি। তাঁর নামকে স্মরণ ক'রে, স্মৃতি শোধ না হয় না বললেন, এই স্মৃতি-গৃহটি তিনি নির্মাণ করেছেন অনেক সাধ ও অনেক অধ্যবসায় নিয়ে—সেই গৃহ বিপুল যত্নে আজ সজ্জিত করে তুলছে যে-মমতাময়ীর হাত, সে হাত যে তাঁর পুত্রবধূর—এ তো সামান্য আনন্দের কথা নয়।

শেফালি দেবী নেই, দু-জনের আনন্দ তাই একা উপভোগ করতে হচ্ছে আদ্যনাথ মুখো-পাধ্যায়কে।

আদ্যনাথ প্রায় সারাটা দিনই পুঁথি-পত্তর আর বই-খাতার স্তূপের মধ্যে ডুবে থাকেন। বৈদ্যনাথকেও ক্লাস-নোট তৈরি করতে হয়, টিউটোরিয়ালের খাতা দেখতে হয়।

বৈদ্যনাথের কাঁধের উপর ঝুঁকে বসে হাতে হাত [illegible] ফিসফিস ক'রে বলে, "নাথ, আর কত দেরী। অভাগী তারা যে অস্থির হয়ে উঠল। উঠে পড়, তারানাথ।"

চমকে তাকায় বৈদ্যনাথ, বলে, "এ কি, থিয়েটার করছ নাকি?"

"না গো না, থিয়েটার নয়। চল, যাত্রা করি।"

বৈদ্যনাথ কথা বুঝতে পারল না, বলল, "বুঝতে পারছিনে কিছু।"

"কটা বাজে দেখ। ছবির শো দেখতে হলে এখনি রওনা হতে হয়। ওঠো চল।" নয়নতারা তার হাত ধরে টানল।

বৈদ্যনাথ বলল, "ওসব সিনেমা-টিনেমা ভালো লাগে না আমার।"

"তবে কথা দিয়েছ কেন? যেতেই হবে।" নয়নতারা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। বলল, "সব দিন ঘরের কোণে বসে-বসে খাতা-বই ঘাঁটলেই জীবন ধন্য হয়ে যায় না।"

গা-মোড়ামুড়ি দিতে লাগল বৈদ্যনাথ, হাই তুলতে তুলতে বলল, "বাবাকে তবে একবার বলতে হয়।"

"কেন? তাঁর পার্মিশন? [illegible] খোকা আমার, নাকি টিপলে এখনো দুধ বেরোয়? চল, চল। সব কথা গুরুজনদের বলতে নেই।"

অগত্যা [illegible] বই পড়ে রইল ছড়ানো। চটপট তৈরি [illegible] দু-জন বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরোলেন আদ্যনাথ। নীচের উঠোনের দিকে [illegible] ডাকলেন, "ভীমপ্রসাদ।"

উনুনে কী-যেন চাপিয়েছিল ভীমপ্রসাদ। [illegible] কড়াই নামিয়ে রেখে তর্-তর্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল উপরে, "জী।"

"ওরা গেল কোথায়? তোর দাদা-বৌদি?"

"[illegible] নেই।"

"ওরা এলে বোলো, আমি জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম।"

মাথা নীচু করে নেমে গেল ভীমপ্রসাদ।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে না ভীম-প্রসাদের। বৌদি [illegible] ছোটবাবুকে সে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।

আদ্যনাথ বড় [illegible] মানুষ। মন-মরা হয়ে তিনি বসে থাকেন নিজের ঘরে।

পাশের ঘরে বৈদ্যনাথ মাথা নীচু করে বসে ক্লাস-নোট তৈরি করার চেষ্টা, নয়নতারা কেবলই তাকে বিরক্ত করছে, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার মধ্যে বৈদ্যনাথকে দেখছে সে বাঁ হাত দিয়ে খস্-খস্ করে কী-যেন লিখে চলেছে, নয়নতারা বলছে, "অমন বাম হলে কেন? চোখ তুলে একটু চাও।"

চোখ তুলে তাকাল বৈদ্যনাথ, অমনি অপরূপ একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তারা বলল, "বল, পারছি কী না?"

"কী?"

"অভিনয় করতে? [illegible]-ছবির নায়িকার চেয়ে দেখতে আমি ভালো কিনা বল।"

"অনেক ভালো। তাতে হয়েছে কী?"

"কিছুই না নাথ, কিছুই না। আমি অভি-নয় করব—এ আমার ইচ্ছা।" বলেই আয়না ছেড়ে সে বৈদ্যনাথের পাশে এসে তার হাত চেপে ধরে বলল, "কথা দাও।"

অকস্মাৎ যেন কয়েকগুলো জোনাকি-পোকা জ্বলে উঠল বৈদ্যনাথের চোখের সামনে, কথা খুঁজে পেল না সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল নয়ন-তারার মুখের দিকে।

নয়নতারা বলল, "ও কি, আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলে নাকি? [illegible] ভয় করছে আমার। তোমার [illegible] উপদেশটা মনে আছে তো?—[illegible] বড় কথা নয়, বড় কথা গুণ। সেই [illegible]। আমি, মশাই, [illegible] ভাব তত [illegible]।"

কথা [illegible], কোনো কথাই এল না বৈদ্যনাথের মুখে, চুপ করে সে বসে রইল।

"ভীতু কোথাকার!" বৈদ্যনাথের পিঠের উপর [illegible] একটা [illegible] দিল নয়নতারা, বলল, "আমাকে [illegible] করতেই হবে। এ আমার অনেক দিনের সাধ। এতে টাকা আছে, নাম আছে—এ খবর কি রাখা হয়?"

বৈদ্যনাথ ভয়ার্ত গলায় বলল, "এমন অদ্ভুত সখ কেন?"

অকস্মাৎ বন্ধীর কথা মনে পড়ল বৈদ্য-নাথের। তিনি অনেক খোঁজ করে নিয়ে এসেছেন [illegible]। রূপ দেখে নিয়ে এসেছেন, মনটা বুঝি তিনি দেখতে ভুলেছিলেন একেবারে। বৈদ্য-

(শেষাংশ ৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কান্না

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল একটু। দুরন্ত শিশু অপরিচিতের সান্নিধ্যে এলে হঠাৎ যেমন হয় প্রায় তেমনি। কিন্তু কতক্ষণ আর সংকোচ। হেসে উঠল এক সময়।—দেখছেন কি, আমাকেই ধরে সিনেমায় নাবিয়ে দেবেন নাকি?

বন্ধু খানিক চেয়ে থেকে ঈষৎ হাস্যে জবাব দিল, দিতে পারি, আপত্তি আছে?

চোখ বড় বড় করে অঞ্জলি সোজাসুজি তাকালো তার দিকে।—নায়িকা হব? রাজা মহারাজা পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে!—তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে গো? শেষেরটুকু নিখিলেশের উদ্দেশে। তারপর বেদম হাসি।

নিখিলেশ লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে খুশিই হল।

বাইরে এসে বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, তোর বউ লেখাপড়া কদ্দুর করেছে?

নিখিলেশ আমতা আমতা করে জবাব দিল, লেখা পড়াটা তেমন—বাড়িতে যা একটু আধটু—

বন্ধু মনে মনে বলল, ওরে [illegible] লেখাপড়ার জোর থাকলে তোমার মত হাঁদার গলায়ই বা ঝুলবে কেন। কিন্তু [illegible] জানে বন্ধু। তার এবারের আগ্রহটা [illegible]। বলল, এ বইটার তো শুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে, পার্টটার্টও সবই প্রায় সিলেকটেড [illegible] হয়নি—। বন্ধু [illegible]—পার্ট একটা অবশ্য আছে এখনো... কিন্তু তোর বউ পারবে না, সেটায় হাস[illegible]—।

নিখিলেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি রকম পার্ট?

—ছোট্ট এক সিনের একটা রোল। ছোট হোক, বড় হোক নেবে পড়া ভালো, দশজনের চোখে পড়লেই পাঁচজনে ডাকাডাকি করে। আমি ডিরেক্টারকে বলে দেখতে পারি...কিন্তু রোলটা ভয়ানক কান্নার, তোর বউ কাঁদতে পারবে?

ভিতরে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভব করছে নিখিলেশ। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, তা আর পারবে না কেন, যেমন বলবে তেমনি কাঁদবে, কান্নারই তো জীবন মেয়েদের—। আর কথা খুঁজে পেল না।

বন্ধু বলে গেল, অমুকদিন স্টুডিওতে নিয়ে আসিস, ডিরেক্টারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—।

যে ধরনের পার্ট অবশিষ্ট আছে পরিচালকরা সাধারণত যাকে তাকে ধরে সেটুকু করিয়ে নেন। কাজেই বন্ধু জানত বেগ পেতে হবে না। এটুকু কাজের জন্য এরকম একটি মেয়ে বাড়তি আকর্ষণ।

অঞ্জলিকে দেখেই পরিচালক ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ, অনুমোদন করলেন। সহকারী বন্ধু নিখিলেশের সিগারেটের টিনটা নিজের হাতে

সময়মত অঞ্জলি একটুখানি কাঁদতে পারল না বলে নিখিলেশের সমস্ত জীবনটাই যেন বিষিয়ে গেল। এতদিনের এত তোড়জোড়, এত পরিশ্রম, এত সাধ্যসাধনা সব ব্যর্থ। অঞ্জলি একটুখানি কাঁদতে পারল না মনের মত করে। এমন ঢালা সুযোগ পেয়েও পারল না। এটুকুর আড়ালে অজস্র হাসির সম্ভাবনা ঝলমল করে উঠেছিল নিখিলেশের চোখের সামনে। আর তার চিহ্নমাত্র থাকল না। কান্নায় কালো হয়ে গেল সব কিছু।

একমাত্র সম্বল দেড়শ টাকা মাইনের আপিস কামাই করেছে দিনের পর দিন। গলির মোড়ের দোকানে এ পর্যন্ত কম করে পনের' টিন দামী সিগারেটের ধার জমেছে। দিনের পর দিন গিয়ে ধরণা দিয়েছে সাত মাইল দূরে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে। সহপাঠী সহকারী-পরিচালককে শেষে একদিন ট্যাক্সি করে বাড়িতে এনে আপ্যায়ন করেছে পর্যন্ত।...তারপর স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু লঙ্কা ভাগই সার হল কালনেমির।

উদ্দেশ্যটা নিখিলেশ স্ত্রীর কাছেও ব্যক্ত করেনি প্রথম। স্টুডিও থেকে এক একদিন ঘুরে এসে দশখানা করে গল্প করেছে শুধু। অঞ্জলি ছেলেমানুষ। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছে সেখানকার কাণ্ডকারখানা। কখনো আবার খুব হেসে উঠেছে। সেদিন বলল, অত ঘন ঘন যাও যে, তোমার দিকে নজরটজর দেয়না তো ওই মেয়ে-গুলো?

ইচ্ছে করেই প্রশ্রয় দেয় নিখিলেশ, তা দিলেই বা—।

—ও মা! আমি তাহলে কোথায় যাব গো?

—তুমিও আর কারো দিকে নজর দেবে।

—ধ্যেৎ! নাসিকা কুঞ্চিত করে ফেলে অঞ্জলি।

—তোমাকেও নিয়ে যাব একদিন, দেখো'খন কি ব্যাপার। নজর আর ওদের দিতে হয় না, রাজা মহারাজা পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেলেও ফিরে তাকায় না পর্যন্ত। অতঃপর নায়িকা-জীবনের সার্থকতার প্রসঙ্গে রঙ চড়ানো শুরু হয়ে যায়।

স্টুডিও দেখতে যাবে এই আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল অঞ্জলি। খবরটা অন্যান্য ভাড়াটে দিদিদের কাছে বলতে না পারা পর্যন্ত ছটফটানি যাবে না। দিদিরা সবাই ভালোবাসেন তাকে। কিন্তু ছেলেমানুষ বলে আবার একটুখানি মুরুব্বিয়ানার ভাবও আছে। কদিন ধরে দুপুরের মজলিশে স্টুডিওর গল্প ফেঁদে অঞ্জলি তাঁদের বিস্ময় ও কৌতূহলের ফাঁক দিয়ে অনেকটাই যেন সমপর্যায়ে উঠেছে।

নিরিবিলি অবকাশে সহকারী-পরিচালক বন্ধুর কাছে নিখিলেশ সসঙ্কোচে প্রস্তাবটা উত্থাপন করল একদিন। বন্ধু চুপচাপ বসে (নিখিলেশের টিনের) সিগারেট টানল খানিকক্ষণ। তারপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, তোর বউ দেখতে কেমন?

বিনয়ের ব্যাপার নয়। গম্ভীরমুখে নিখিলেশ সংক্ষিপ্ততর উত্তর দিল, ভালো—।

—কি করে জানলি?

—রাস্তায় নিয়ে বেরুলে লোকে ঘন ঘন তাকায়।

—সে আজকাল অভ্যাসেও তাকায়।

—তা একবার এসো না আমার বাড়ি—লোক তো একটু আধটু আলাপ-পরিচয়ও করে—কিন্তু তুমি একেবারে বর্জন করেছ।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বন্ধু নিস্পৃহ জবাব দিল, একদিন এসে নিয়ে যাস, যাব'খন—।

কিন্তু এমনটি দেখবে বন্ধু ভাবেনি। পংকজ-পদ্ম। পাড়াগাঁয়ে জামরুল গাছে, পেয়ারা গাছে উঠে, পুকুরে সাঁতার কেটে আর পড়ার সময় হাই তুলে যে মেয়ে বড় হয়েছে তার মধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য কিছু থাকবেই। এবং দেহ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে সেটুকুর যোগাযোগ বিশেষ নয়নাভিরাম।

বন্ধু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অঞ্জলিকে। নিখিলেশ ভাবল, চলবে কি না দেখছে। অঞ্জলি

নিয়ে বলল, এখন বাড়ি যা, তারিখ পরে জানাব আর পার্টও বুঝিয়ে দিয়ে আসব'খন।

অঞ্জলির ধারণা স্টুডিও আর শুটিং দেখতে এসেছে। কথাবার্তা শুনে একেবারে হকচকিয়ে গেল। ট্রামে জিজ্ঞাসাবাদের সুবিধে হল না। আড়চোখে এক-একবার চেয়ে দেখে মানুষটা আনন্দে যেন বিভোর হয়ে আছে।

বাড়ি ফিরেই শুনল সব। বুঝলও। কিন্তু তবু দুর্বোধ্য বিস্ময়ে হাঁ করেই রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ তারপর হাসতে হাসতে বসে পড়ল একেবারে।—আমি সিনেমায় নাববো কি গো!

নিখিলেশ গম্ভীর মুখে বলল, ওই হাসি রেখে এখন কান্না প্র্যাকটিস করো।

অঞ্জলি ঘাবড়ে গেল, তুমি কি সত্যি বলছ নাকি?

—না, এতদিন ধরে এতসব করলাম ইয়ার্কি করতে!

সহকারী-পরিচালক বন্ধু এসে পার্ট বুঝিয়ে গেল।...আদর্শবাদী নায়কের মিথ্যে মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শোকে স্তব্ধ তার সাহায্য-মুখাপেক্ষী অন্তরঙ্গজনেরা। সেই নিদারুণ স্তব্ধতা খান খান হয়ে যাবে নায়কের একমাত্র অনাথা ভগ্নীর আর্ত হাহাকারে। অঞ্জলি সেই অনাথা ভগ্নী। তাকে আছড়ে পড়ে কাঁদতে হবে।

অঞ্জলি ক'টাদিন ধরে অনেক হাসল, অনেক রাগ করল, অনেক অনুনয় করল এবং সবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে রাজিও হল। দিনরাত নিখিলেশ এক মন্ত্র কানে দিচ্ছে তার, সত্যিকারের কান্না কাকে বলে একবার দেখিয়ে দাও। সকলের বুকের ভেতরে একেবারে যেন কেটে কেটে বসে যায়। কান্না অভ্যাস করার জন্য দেয়ালে একটা বড় আয়না ফিট করে দিল সে। কিন্তু কাঁদতে গিয়ে বেশির ভাগ হেসেই ফেলে অঞ্জলি, ঠিকমত কাঁদতে পারে না বলেই কান্না পেয়ে যায়।

শুটিং এর দিন এগিয়ে আসে। অঞ্জলির অস্বস্তি বাড়ে। নিখিলেশ তাকে চুপ করে থাকতে দেখলে বকে, নার্ভাস হচ্ছ কেন? হাসতে দেখলে বকে, হাসি রেখে শোকের কথা ভাব, কান্নায় কি করে পাথর ভেঙে তাই চিন্তা করো।

কিন্তু অঞ্জলির ভালো লাগে না কিছু। নিখিলেশ ভবিষ্যতের আশায় বিভোর। সেও যেন পাপপুরুষের দৃষ্টি নিয়েই অষ্টপ্রহর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাকে।

সেই দিন।

শ্যেন দৃষ্টিতে নিখিলেশ স্ত্রীর বেশবিন্যাস পরীক্ষা করে নিল। জোর করে মুখে সহজ হাসি ফুটিয়ে অঞ্জলি স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু স্টুডিও-ফটকের এধারে এসে পা আর চলে না। বুকের ভেতরটা কাঁপছে কেমন। লোক আসছে, যাচ্ছে। সকলেই এক নজর দেখে নিচ্ছে তাকে। আর অঞ্জলির গায়ে যেন একটা করে হুল বিঁধছে।

সহকারী-পরিচালক বন্ধু মুগ্ধ চোখে তার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।—গ্র্যান্ড! চলুন একেবারে সোজা মেক-আপ-এ। কাঁধে হাত দিয়ে সে আর একদিকে নিয়ে চলল তাকে। অঞ্জলির মনে হল কাঁধটা যেন দেহ থেকে আলগা হয়ে গেছে।

অভিনয়ের বেশবাস পরা হতে এলো মেক-আপ ম্যান। পান-খাওয়া মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় বাবড়ি চুল। পরনে আধময়লা পাজামা। গায়ে গেঞ্জি। ঢ্যাঙা রোগা। রঙ এবং প্রসাধনের সামগ্রী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই অঞ্জলির মুখ শুকালো আবার। অবস্থাটা উপলব্ধি করেই হয়ত মুচকি হেসে তার কাজ করে গেল মেক-আপ ম্যান্। সারাক্ষণ অঞ্জলি একেবারে কাঠ।

তারপর শুকনো আড়ষ্ট একখানি জড় পদার্থের মত ফ্লোরে এসে দাঁড়াল সে। আর একদফা দেখা শুরু হল তাকে। যারা শুটিং দেখতে এসেছে তারা দেখল। কর্মকর্তারা দেখল। আর যারা অভিনয় করতে এসেছে তারা দেখল। এমন কি নিখিলেশও তাদের চোখ দিয়েই দেখতে লাগল তাকে। নিজের অজ্ঞাতে বার বার পরনের শাড়ীটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিচ্ছে অঞ্জলি। বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে।

পরিচালক বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে কাঁদতে হবে। সেট্-এ দাঁড় করানো হল তাকে। জোরালো আলোর বন্যায় সহসা যেন দিশেহারা হয়ে গেল অঞ্জলি। চিত্রশিল্পী ক্যামেরায় মুখ লাগালেন। পরিচালক হাঁক দিলেন, সাইলেন্স! মনিটার—! নিন্ কাঁদুন—!

মনিটার অর্থাৎ একবার মহড়া দেওয়া। অঞ্জলি চমকে উঠল প্রথম। অত আলোর বাইরে কাউকে সঠিক দেখতে পাচ্ছে না। পা দুটো কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। বসে পড়ার কথা—বসেই পড়ল। শুকনো জিবে করে রঙকরা ঠোঁট ঘসে নিল বার দুই, কিন্তু তারপর আর কিছুই করে উঠতে পারছে না।

—লাইটস অফ্! খট্ খট্ করে আলো নিভতে লাগল। পরিচালক এগিয়ে এলেন।—ভয় কি, আপনি কোন দিকে তাকাবেন না, কাঁদতে বসলেই একেবারে দাদা গো বলে আছড়ে পড়বেন।

অঞ্জলি একটুখানি হাসতে চেষ্টা করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, একটু জল—।

জল এলো। মেক-আপ ম্যান আবার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে দিয়ে গেল। গালে গ্লিসারিনের অশ্রুধারাও।

—সাইলেন্স! লাইটস অন্! কাঁদুন—!

অঞ্জলি এবারে ধপ্ করে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল, কিন্তু কান্না আর বেরোয় না। যাও বেরুল তাকে কান্না বলে না।

—লাইটস অফ! পরিচালক ঈষৎ বিরক্ত হয়েই এগিয়ে এলেন আবার।—আপনি মরা-কান্না দেখেন নি কখনো? ঠিক সেই রকম কাঁদতে হবে। তার চেয়ে বড় কান্না। তারপর উবুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদবেন।

অদূরে নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে নিখিলেশ। তার বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

—কাঁদুন এবার!

এক ধরনের আর্তনাদ করেই মাটিতে লুটালো অঞ্জলি। প্রাণপণে কাঁদতেও চেষ্টা করল তারপর। কিন্তু সে কান্না দেখে আর শুনে হাসির গুঞ্জন উঠল এদিক ওদিক থেকে।

শুধু নিখিলেশেরই কান্না পাচ্ছে।

—কাঁদুন! আবার হাঁক দিলেন পরিচালক।

এবারে ব্যাঘাত ঘটাল শাড়ীর আঁচল। কাঁদতে ভালোই শুরু করেছিল অঞ্জলি। কিন্তু বুক থেকে ওটা খসে পড়তেই তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেল। আর্তনাদ এবং ভূ-লুণ্ঠনে [illegible] ছেদ পড়ে গেল বেশ বসন-সংবরণের প্রয়াসে। মর্মান্তিক দৃশ্য। স্টুডিওর দুই শুটিং-দর্শকদের হাসাহাসি।

নিখিলেশের বুকের ভিতরে মরুভূমির শুকনো টান ধরেছে।

পরিচালকের মেজাজ বিগড়তে শুরু করেছে। কান্নার আবেদন কেমন হবে বুঝতেই পারছেন। ক্যামেরার আবেদনটুকুই ভরসা। ধমকে উঠলেন, অত লজ্জা করতে হলে সিনেমায় নাবা হয় না। ভাই মরে গেলে শাড়ীর আঁচল টাইট্ করে বেঁধে নিয়ে কেউ কাঁদতে বসে না—ওটা ওভাবে খসেই পড়বে।

আরো পাঁচ-সাতবার মহড়া দেবার পর পরিচালক হাল ছাড়লেন। দূরে থেকে নিখিলেশ যেন প্রাণের দায়েই ভাবে-ভঙ্গিতে নিঃশব্দে কান্নাটা স্পষ্ট করে দিতে চায়। কিন্তু বসন বিস্রস্ত হবার সম্ভাবনায় আরো আড়ষ্ট এবং কাঠ হয়ে অঞ্জলি হাসির উদ্রেকই করল বার বার।

পরিচালক ঘড়ি দেখলেন। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। বললেন, আচ্ছা, আর একদিন চেষ্টা করা যাবে আজ থাক, আপনি যান—।

ওটা যে মুখের কথা সকলেই জানে। অঞ্জলি প্রস্থান করে বাঁচল। পরিচালক তাঁর সহকারীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন এবার, অর্থাৎ, খুব অ্যাকট্রেস্ এনেছ—! নিখিলেশকে সামনে পেয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, ভাই মরলে কি করে কাঁদতে হয় এটুকু ঠিক করে আনতে পারেন নি?

সব থেকে বড় ঝড়টা সকলের অজ্ঞাতে নিখিলেশের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে। তবু আশা মরীচিকা। ঢোক গিলে বলল, ওর কোন ভাই-ভাই নেই...মানে আমার শ্বশুর মশায়ের সব ক'টিই মেয়ে কিনা...সেই জন্যই বোধ হয় ফিলিংটা ঠিক...।

পরিচালক ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ছেলেও গোটাকতক থাকা উচিত ছিল, একটি দুটি ভাইয়ের শোকে আপনার স্ত্রীকে কাঁদানো সহজ নয়।

বাড়ির পথ।

ট্রামের ভিড় সীট-এ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে নিখিলেশ। অঞ্জলির মুখে এর পরেও যে হাসির মত দেখা যাচ্ছে সেটাই সব থেকে বেশি অসহ্য লাগছে এখন। বাড়ির গলিতে এসে থমথমে মুখে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কেনার জন্য দাঁড়াল সে। সঙ্গে দূরের কথা, এই দুনিয়াতেই যেন তার কাছাকাছি আপন বলতে কেউ নেই। অঞ্জলিও থামল একটু। তারপর পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

নিখিলেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানল একটা। আর একটাও ধরাল। কিন্তু ভালো লাগল না। এ জগতে ভালো লাগার মত আর কিছু নেইও তার। সিগারেট ফেলে দিয়ে ধীর গম্ভীর মুখে বাড়ি ঢুকল।

ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। তারপরেই একেবারে স্তব্ধ, নির্বাক সে। মেঝেতে উবুড় হয়ে পড়ে অঞ্জলি কাঁদছে। মর্মবিদারী কান্না। সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে উঠছে মুহুর্মুহু। ওই পোষাকি শাড়ির আঁচল মুখে একরাশ গুঁজে দেওয়া সত্ত্বেও অব্যক্ত কান্নার শব্দ গুমরে গুমরে উঠছে। পাথর-গলানো কান্না। এ কান্না যেন আর শেষ হবে না।

হাঁ করে দেখছিল নিখিলেশ।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা যেন চড় চড় করে উঠল তার। নিবিড় যাতনায় বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, হু-হু করে উঠল।

অঞ্জলির কান্না দেখে নয়।

অঞ্জলি অমন কাঁদতে পারে দেখে।

পড়ুয়া লোকের বিপত্তি

নারায়ণ চৌধুরী

আমার বন্ধু নিখিলানন্দ মিত্র পড়াশুনায় খুব চৌকস। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তার একটা সহজাত তৃষ্ণা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে সে কবে সংসার-জীবনে প্রবেশ করেছে, কিন্তু আজও তার বই নিয়ে বসে থাকার রোগ গেল না। বরং যত বয়স বাড়ছে ততই যেন তার এ রোগ তাপমান যন্ত্রের পারার মত চড়চড় করে উপরের দিকে চড়তে শুরু করেছে। আর শুধু কি এক-জাতীয় বিষয়ের প্রতি তার অনুরাগ, জ্ঞানরাজ্যের নানা বিষয়, নানা দিক সম্বন্ধে তার কৌতূহল। চেন-স্মোকার জাতীয় সংশোধনের অতীত ধূমপায়ীরা যেমন এক সিগারেটের আগুনের সাহায্যে আর-এক সিগারেট ধরান, তেমনি নিখিলানন্দ এক বিষয়ের মশালের আলো থেকে আরেক বিষয়ের মশালের আলো ধরিয়ে নিয়ে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার ম্যারাথন রেস-দৌড়কারীর মত সম্মুখপানে ছুটেই চলেছে। জ্ঞানরাজ্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছনো না পর্যন্ত যেন এই সাংঘাতিক পড়ুয়া ব্যক্তিটির স্বস্তি কিম্বা সন্তোষ নেই।

নিখিলানন্দের এই অতিরিক্ত পড়াশুনোর অভ্যাসকে বাতিক না বলে রোগ বলবার কারণ, এ অভ্যাসকে একবার বিধিমতে প্রশ্রয় দিলে পুরাতন রোগের মতই তা প্রশ্রয়দাতার দেহ-মনের ভিতর মজ্জাগত হয়ে যায়। তখন শত চেষ্টাতেও আর তার জড় মারা যায় না। হ্যাঁ, রোগ ছাড়া আর কী! বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পেরিয়ে কি না পেরিয়ে মানুষ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে, শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বই-খাতাপত্র যার যা কিছু আছে, সযত্নে তাকে কিম্বা কুলুঙ্গিতে কিম্বা শিকায় তুলে রেখে সব আদাজল খেয়ে টাকা রোজগারের ধান্ধায় লেগে যায়। কেজো লোকের লেখাপড়ার সঙ্গে ঠিক ততটাই সম্পর্ক, যতটা সম্পর্ক লেজারের খাতায় হিসাব মেলাতে, আটপৌরে চিঠিপত্র লিখতে, দোকানের ফর্দ কষতে, ভোরে উঠে অন্ততঃ শতবার 'শ্রীদুর্গা সহায়' লিখতে কিম্বা রসিদ ও ভাউচারে সহি করতে কালিতে কলম ডোবানোর জন্যে প্রয়োজন হয়। কালি-কলমের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই আমাদের সমাজে এমন সফল সংসারী মানুষেরও কিছু অভাব আছে বলে মনে হয় না। এ সমাজে লেখাপড়ায় যিনি যত বেশী লবডঙ্কা, লোকসাধারণের ভিতর তাঁর জয়ডঙ্কা তত সজোরে বাজে—এ ত নিত্যকার অভিজ্ঞতা।

এ হেন সর্বব্যাপী অনুদ্যম আর কৌতূহল-হীনতার মধ্যে কেউ যদি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান-পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্যই দিন-রাত ঘরের দরজা-জানলায় কুলুপ এঁটে রাশি রাশি বই আর খাতাপত্র নিয়ে পড়ে থাকে, তাকে রোগাক্রান্ত ছাড়া আর কী বলা যায়। আর সে কি এক-জাতীয় বই! সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সংগীত, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, চিকিৎসা-শাস্ত্র—এমন কোন বিষয়ের বই নেই যার উপর আমার এই গ্রন্থ-কীট বন্ধুটির মনোযোগ সমর্পিত নয়। এ-সব কুলীন বিষয় তো রয়েছেই, এ ছাড়াও জ্ঞান-রাজ্যের অনেক টুকি-টাকি বিষয় রয়েছে, স্বাদ বদলের উপাদান হিসাবে যাদের উপযোগিতা নিখিলানন্দের নিকট অগ্রাহ্য নয়। মোট কথা, এই নিখিল বিশ্বে যা কিছু জানবার, বোঝবার, প্রণিধান করবার রয়েছে সবই একটু একটু করে চেখে বেড়াতে পারলে নিখিলানন্দ আর-কিছু চায় না। বিপুলা এ পৃথ্বীর সর্ববিধ ঐশ্বর্য অন্বেষণ, আবিষ্কার আর আহরণেই নিখিলানন্দের আনন্দ।

কিন্তু আমার এই জ্ঞান-পিপাসু বন্ধুটির যত পড়ার নেশাই থাকুক, আর যত বড় গ্রহণ আর ধারণক্ষমতারই সে অধীশ্বর হোক, এই তত্ত্ব তার অবিদিত নয় যে, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে তীরে নুড়ি কুড়ানোর অধিক সাফল্য কোন সময়েই তার অধিগত হবার নয়। নিউটন শুধু বিজ্ঞানের কথা মনে রেখেই নুড়ি কুড়াবার কথা বলেছিলেন। আর যে ব্যক্তি বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞানের নানা মুখে তাঁর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার জাল বিস্তার করেছেন, তাঁর ভাগ্যে নুড়ি তো পরের কথা, সমুদ্র-সৈকতের রেণুসদৃশ ক্ষুদ্র বালিকণাও সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে। আমাদের নিখিলানন্দ যত বেশী সংখ্যক বিষয়ের এলাকায় তার কল্পনা ও জিজ্ঞাসাকে ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, তত বেশী সে পল্লবগ্রাহী হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার স্বভাবের এমনি গড়ন যে, জেনে-বুঝেও সে তার কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে এই তার যথার্থ মনোভাব, আর এই মনোভাবের তাড়নায়, ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাব-জাত অতৃপ্তির বশে সে কেবলই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে ছুটে হয়রান হচ্ছে।

নিখিলানন্দ অনেক পড়ুয়া হলেও বোকা কিম্বা পাগল নয়। ভূরি-পরিমাণ অধ্যয়ন তার সাধারণ বুদ্ধির ধার ভোঁতা করতে পারে নি। সে ভাল করেই জানে যে, এই স্পেশালাইজেশনের হিড়িকের যুগে যখন এক বিষয়ে অধিকার অর্জন করতেই জেরবার হতে হয়, কারও কারও আক্ষরিক অর্থে জিভ বার হয়ে পড়ে, তখন একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের উপর মনোনিবেশের অর্থ নিজেকে কেন্দ্র করে প্রাণান্তকর অবস্থা সৃষ্টি করে তোলা। কিন্তু জেনে-বুঝেও নিখিলানন্দ তার এই বহুধাবিস্তৃত জ্ঞানের সাধনা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হতে পারে না। এ-কালের অন্যতম চালু মুদ্রা স্পেশালাইজেশনের আদর্শের প্রতি নিখিলানন্দের বিন্দুমাত্র মোহ নেই। কারণ এ বৃত্তান্ত তার অবিদিত নয় যে, তথাকথিত স্পেশালাইজেশনের ক্ষুরে মাথা মুড়োবার অর্থই হল একটি বিশেষ বিষয়ের খণ্ডিত জ্ঞান অর্জন করবার চেষ্টা করতে গিয়ে অন্য অনেক বিষয় সম্পর্কে নিরেট-অচেতন থাকা। মগজে যার শুধু এক ধরণের বিদ্যা কিলবিল করছে, অন্য সব বিদ্যার নিতান্ত প্রাথমিক বোধও হাতুড়ির বাড়ি মেরে যাঁর মাথায় ঢোকানো যায় না, তাঁকেই আধুনিক কালের পরিভাষায় বলে স্পেশ্যালিষ্ট। এ-জাতীয় একদেশদর্শী, একবর্গাভিমুখী খণ্ডিত জ্ঞানের সাধনাকে নিখিলানন্দ দূর থেকে দণ্ডবৎ করতেই অভ্যস্ত।

তার চেয়ে সনাতন জ্ঞানসাধনার রীতি তার নিকট বহুগুণে শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, জ্ঞানের রাজ্যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বলে কিছু নেই। উচ্চতর স্তরে এক বিষয়ের সীমা অন্য বিষয়ের সীমারেখা হামেশাই অতিক্রম করছে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য এক এলাকার সামিল হয়ে পড়ছে।—বিষয় যত বিভিন্নই হোক, উচ্চতর ক্ষেত্রে পরস্পরে জড়া-জড়ি মেশামেশি। নিখিলানন্দের নিকট এই পরস্পর-নির্ভর জ্ঞান-সাধনের আদর্শটিই ভাল লাগে। রেনেসাঁর ঐতিহ্য অনুযায়ী humanities বলতে যা বোঝায়, সেই নানামুখী শিক্ষার সংস্কারটিই বদ্ধমূল নিখিলানন্দের মনের ভিতর প্রোথিত হয়ে গেছে। সে এতে লাভবান হোক চাই না হোক, আজীবন ভোর এই আদর্শেরই পোষকতা তাকে করতে হবে। কেন না, এই বিচিত্র পথপরিক্রমা তার স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে গেছে, তাকে প্রত্যাহরণ করবার আর উপায় নেই। এক বিষয়ে অধিক জানার চাইতে অনেক বিষয়ে কিছু কিছু জানা, সম্ভবস্থলে বেশ-কিছু জানাটাই নিখিলানন্দের সর্বাধিক কাম্য বলে মনে হয়। স্বভাবের তাগিদেই হোক, আর অনুশীলনের ফলেই হোক, যে ব্যক্তি একবার বহু বিষয়ের জ্ঞানের স্বাদ পেয়েছে, সে কি কখনও এক বিষয়ের সংকীর্ণতা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে? প্রাণটা যার সাগরের অভিমুখে, সে কূপমণ্ডূক হয়ে থাকবে তার সাধ্য কী! নিখিলানন্দের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তা' হলে সে 'Jack of all trade, master of none' কথাটা প্রবাদবাক্যের তালিকা থেকে খারিজ করে দিত। Master যেন কেউ এক বিষয়েই হতে পারে!

বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিখিলের পায়ের কড়ারও আমি যোগ্য নই, তবু তাকে আমার আদৌ দুরধিগম্য মনে হয় না বরং আমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে তাকেই আমার সব-চেয়ে পছন্দ। সে তার আর আমার ভিতরকার জ্ঞানগত দুস্তর ব্যবধানটিকে ভুলেও কোন সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না, যদিও জ্ঞানের অভিমান তাকেই সবচেয়ে বেশী মানায়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, জ্ঞান থেকে জ্ঞানান্তরে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের ফলে তার স্বভাবে আশ্চর্য এক প্রসন্নতা ও মাধুর্য এসেছে, যা খণ্ডিত জ্ঞানের কারবারী আমার অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। আর সবারই মধ্যে কিছু-না-কিছু হামবড়া ভাব লুকিয়ে আছে, সেটা তাদের পায়ের কড়া একটু চটকালেই বোঝা যায়, কিন্তু নিখিলানন্দ আশ্চর্য

প্রশান্ত ও বিনয়পূর্ণ। কিছুতেই তাঁর আত্মাভিমান উদ্রিক্ত করা যায় না। বরং আমার নিকট নিখিলানন্দের এ স্থির ভাব ও বিনয় এক-এক সময় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। নিখিলকে আমার এ মনোভাবের কথা আমি একদিন জানিয়েও ছিলাম। তার উত্তরে নিখিল যা বলেছিল তার সারমর্ম এই—

সংসারে যে-সব ব্যক্তি বহুমুখী জ্ঞানের সাধনা করে, তাঁদের মত অতৃপ্ত ব্যক্তি আর নেই। অতৃপ্তি থেকে তাঁদের ভিতর এক ধরণের হীনমন্যতারও জন্ম হয়। সংসারে এত-কিছু জানবার শেখবার আছে, অথচ কিছুই জানলাম না, শিখলাম না—এই বোধ তাঁদের অহংচেতনাকে একেবারেই গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। তাঁরা সমস্ত জ্ঞান-সাধনার শেষে প্রায়শঃ সক্রেটিশের মত এই সিদ্ধান্তের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন যে, জ্ঞান সাধনার শেষে এইটুকু মাত্র জানতে পারা যায় যে, কিছুই জানতে পারা যায় নি। এই-যে অজ্ঞানতার চেতনা, এই বোধ যে-কোন বিবেকবান ব্যক্তিকে নৈরাশ্যপীড়িত আর অসহায় করে তুলতে বাধ্য। ফলে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির তরফে বিনয়ের কখনও ঘাটতি ঘটে না। বরং তাঁর স্বভাবে আরও কেন বিনয় নেই, আরও অবনত কেন তিনি হতে পারেন না, এই তাঁর নিয়তের আক্ষেপ।

নিখিলানন্দের একথা যথার্থ বটে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, স্বল্পজ্ঞানীদের কেন বিনয় গুণের বালাই নেই। তাঁদের জ্ঞানের পুঁজি অল্প বলেই তাঁরা [illegible]। তাঁদের অহঙ্কারের সীমা-পরিসীমা নেই। আর শুধু কি অহঙ্কার, অজ্ঞানতা তাঁদের ভিতর এক ধরণের কল্পিত আত্মপ্রত্যয় আর শক্তির বোধ জন্মায়, যা তাঁদের সংসার-পথে চলতে সহায়তা করে। কথায় বলে Ignorance is bliss, এই সাধু কথার একেবারে উল্টো Knowledge is power কথাটির সার্থকতা মোটেই সিদ্ধ নয়। সংসারে তাই দেখতে পাওয়া যায় অধিক বলদৃপ্ত, অধিক আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন যাঁরা অল্প জেনেই মনে করে অনেক জানা হয়ে গেছে। তাঁদের আচরণে আড়ষ্টতা নেই, বাক্যে জড়তা নেই, আলাপচারিতে বিনয়ের সংকোচ নেই, উল্টো একপ্রকার উদ্ধত আত্মঘোষণ তাঁদের প্রায় সকলেরই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এই আত্মবিঘোষণ তাঁদের ক্ষতি করে না, বরং কর্মজীবনে এগিয়ে চলার পথে সহায়তাই করে। অজ্ঞতা তাঁদের অগ্রগমনের প্রতিকূল না হয়ে অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু জ্ঞানপিপাসুদের সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। তাঁরা অক্ষমতার গ্লানিভারে ম্রিয়মাণ হয়েই আছেন। জ্ঞান তাঁদের বহুবিধ রহস্যের সন্ধান দিলেও এবং আধ্যাত্মিক মানসিক দৈহিক বহুবিধ সংকটের সমাধানের সংকেত দিলেও তাঁরা জীবনের পথে চলতে গিয়ে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হন। সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে, দশজনার সঙ্গে ব্যবহারে তাঁদের স্বভাবগত বিনয় আর নম্র ভাব তাঁদের কোন কাজেই লাগে না। [illegible], এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য সমাজের চোখে তাঁদের প্রকৃত মূল্যনিরূপণে বাধারই সৃষ্টি করে। এই জগৎ-সংসারে শতকরা নিরানব্বইটি মানুষ যেখানে দাপট দেখানেওয়ালা, অপ্রিয়ভাষী, bully জাতীয় জীব, বিত্তপ্রতিপত্তি ছাড়া ক্ষমতা পরিমাপের আর কোন মানদণ্ড যেখানে স্বীকৃত নয়, সেখানে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানপিপাসা আর বিনয় তাঁকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে? জ্ঞানপ্রয়াসী ব্যক্তি সমাজে-সংসারে তাই নিতান্ত সাধারণ মানের অস্তিত্বের মধ্যে সচরাচর অবলুপ্ত হন; সংসারের সর্ববিধ সুখ-সুবিধা সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা বুলি জাতীয় মূঢ় ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং তারাই তা লুণ্ঠন করে। জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্য সাফল্য আর প্রতিষ্ঠার কাঙাল নন, তবে ভ্রমেও কখনও এসব বস্তু তাঁর করায়ত্ত হয় না এইটেই লক্ষ্য করবার।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর অভ্যস্ত বিনয়ীর ভূমিকা পরিত্যাগ করেন না। বরং যত জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হন ততই তাঁর ভিতর অকিঞ্চিৎকর চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তদনুপাতে আরও তিনি বিনয়ী হয়ে পড়েন। বিনয় যাঁর মনোগঠনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, যাঁর অস্তিত্বের পরতে পরতে অকিঞ্চিৎকরত্বের বোধ ওতপ্রোত, তিনি সাধারণের দেখাদেখি হামবড়াই করবেন তার যো কোথায়, অহঙ্কারের বশে যদি বা তিনি বুক ফুলাতে চান, লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যাবে। কথায় কথায় মাথা চাড়া দেওয়ার বদলে মাথা ঠিক রেখে সমাজ-সংসারে চলতে পারলেই তিনি তৃপ্ত। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা যতই শক্তির অসার আস্ফালন আর আত্মপ্রাধান্য ঘোষণা করুক, যথার্থ জ্ঞানপ্রয়াসী ব্যক্তি তাঁর আত্মসমাহিত প্রশান্তির আদর্শটিকে কোন মূল্যের বিনিময়েই ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন।

নিখিলানন্দের জ্ঞানসাধনার আদর্শের মধ্যে কোনরূপ ফাঁক বা ফাঁকী নেই, এই কারণে লোকে তাঁকে আরও বেশী ভুল বোঝে। ভুল করে তাঁর বিনয় আর শান্তভাবকে তারা দুর্বলতার নিদর্শন মনে করে। শক্তির অসার মদমত্ততায় তারা কখনও কখনও তাঁকে অগ্রাহ্য করবারও দুষ্প্রবৃত্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু নিখিলানন্দ এসব ছোটখাট তাচ্ছিল্য আর অপমান গায়ে মাখে না। ওর কথা হচ্ছে, বড় সাধনা নিয়ে যে আছে সে যদি ছোটখাট অন্যায়ের দৃষ্টান্তে নিজেকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হতে দেয়, তবে প্রকারান্তরে সাধনার বড়ত্বটাকেই ছোট করা হয়। নিখিলানন্দ সর্বাবস্থায় স্বীয় চিত্তের প্রশান্তিকে অনাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

আরেকটি কারণে লোকে তাকে ভুল বোঝে। এ সংসারে মানুষ কোন-না-কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্যের তাড়নাতেই সচরাচর কার্যে প্রবৃত্ত হয়। এমন যে পবিত্র বিদ্যাশিক্ষা তারও পিছনে অর্থকরী উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু নিখিলানন্দের সাধনার পশ্চাতে শুদ্ধমাত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভের বিমূর্ত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। সে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেছে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের প্রবৃত্তির বশেই। এর ভিতর জাগতিক কামনা-বাসনার কোন স্থান নেই। সে জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে সমাজে একজন কেউ-কেটা ব্যক্তি হবে এমন অভিপ্রায় দূরতম কল্পনায়ও তার মনের কোণায় স্থান পায় না। বিভিন্নমুখী জ্ঞান অর্জনের লোভ তার ভিতর দুর্নিবার বলেই সে ওই পথে আকৃষ্ট হয়েছে, বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা ছাড়া এই আকর্ষণের অন্য কোন হেতু নেই।

গড়পড়তা সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নির্লোভ, নিরুদ্দেশ সাধনার আদর্শ হজম করা একটু শক্ত। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, গণমুখী-ব্যক্তিগত, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব-কিছু কাজের মধ্যেই স্বার্থবুদ্ধিদুষ্ট উদ্দেশ্যের পোষকতা দেখতে দেখতে তাদের চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তারা অতি মহৎ সাধনার ধারার মধ্যেও উদ্দেশ্য কল্পনা না করে পারে না। কিন্তু জ্ঞানই যেখানে জ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি ও পুরস্কার, সেখানে আর কোন উদ্দেশ্য মনের ভিতর লালন করবার সত্যই কি কোন সার্থকতা বা অবকাশ আছে? নিখিলানন্দ জ্ঞান আহরণ করে তৃপ্ত, অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ বিষয়েও সে অচেতন নয়, কিন্তু জ্ঞানকে স্থূল সাংসারিক সাফল্যের সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে তার মন স্বতঃই দ্বিধাযুক্ত। তার উন্নত রুচিই এই পথে সাংসারিকতার প্রধান অন্তরায়। জ্ঞানের পরোক্ষ ফল হিসাবে যদি কিছু সামাজিক স্বীকৃতি ও সাফল্য এল ত ভাল, কিন্তু নিজে আগ বাড়িয়ে চেষ্টা-চরিত্র

([illegible] পর পৃষ্ঠায়)

জাদুকরী

(৮৫ পৃষ্ঠার পর)

নাথের ভিতরটা প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে, কিন্তু মুখে সে অমত জানাবে এমন দম তার নেই।

নয়নতারা বলল, "অত ভাবতে হবে না। আমার জানা লোক আছে ও-লাইনে। তোমাকে কিচ্ছু চেষ্টা করতে হবে না।"

"তার মানে?" সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল বৈদ্যনাথ।

খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠল নয়নতারা, চোখে অপূর্ব চাহনি হেনে নাটকীয় ভঙ্গিতে সে বলল, "সে-কথা এখন নহে।"

ওই চাউনি দেখে বিগলিত হয়ে উঠল বৈদ্যনাথ, মুচকে হেসে বলল, "সে-কথা তবে কবে?"

"হবে মশায়, হবে। অত ব্যস্ত কেন? সবই জানতে পারবে তুমি।" নয়নতারা বৈদ্যনাথের হাত ধরে টেনে পাশে বসাল।

বৈদ্যনাথ বলল, "বাবার কিন্তু তোমাকে নিয়ে অনেক আশা—অনেক সাধ।"

"বাবার সব সাধ পূর্ণ করব আমি।"

"আর আমার?" বোকুবের মত প্রশ্ন করল বৈদ্যনাথ।

কানের কাছে মুখ নিয়ে নয়নতারা বলল, "কেন, পূর্ণ কি করছি না? বোকা কোথাকার। কেবল পুঁথিপত্তর নিয়ে মশগুল থাকলে বুদ্ধির এই দশাই হয়।"

দুই-তিন দিন ধরে বৈদ্যনাথ কী-যেন ভাবল, তারপর এক দিন নয়নতারাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, "তুমি পর হয়ে যাবে না তো?"

"পাগোল! তুমি-না আমার স্বামী। যত টাকা যত নামই আমার হোক, তুমি আমার স্বামীই থাকবে।"

"বেশ।" বৈদ্যনাথ কথা দিয়ে ফেলল।

নয়নতারা বলল, "তবে বাবাকে একবার বলা যাক।"

বৈদ্যনাথ আপত্তি জানিয়ে উঠল, বলল, "কেন? তাঁর পারমিশন? কচি খুকি আমার। জান না, সব কথা গুরুজনদের বলতে নেই।"

———

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে জ্ঞানের শক্তিকে টাকা আনা-পাইয়ে রূপান্তরিত করবার পাত্র নিখিলানন্দ নয়।

নিখিলানন্দ আগে খুব মিশুক প্রকৃতির লোক ছিল। ইদানীং তার যাতায়াতের পরিধি নিতান্ত সংকুচিত হয়ে এসেছে বলে মনে হয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশায় সে আর পূর্বের ন্যায় উৎসাহবোধ করে না। বোধ করি আমিই একমাত্র বন্ধু যার সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছে। আমি তার বন্ধুই শুধু নই, তার ছাত্রও বটে। তার মুখ থেকে অনেক বিষয়ের মূল্যবান আলোচনা শুনে আমার প্রভূত উপকার হয়েছে। সুযোগ পেলেই তার নিকট আমি আমার জীবনের প্রশ্ন-সমস্যা উত্থাপন করি, সে তার সদুত্তর দেয়। এ সকল উত্তর আমার মনে যথেষ্ট বলের সঞ্চার করে। কিন্তু আমার অপরাপর বন্ধুরা নিখিলানন্দের এই বহুবিষয়মুখিনতা আর বিচিত্র পথগামিতার সুযোগ গ্রহণে আদৌ তৎপর নয়। তারা সব নিজেদের খণ্ডিত জ্ঞানের সাধনা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত এবং তাতে নিমজ্জিত। নিজ নিজ কাজের ক্ষুদ্র এলাকার বাইরে তাদের কোন কৌতূহল নেই, জিজ্ঞাসা নেই। তারা শুধু অপরকে নিজের কথা বলতেই ব্যগ্র, স্বকীয় সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের বহির্ভূত জগতের বিচিত্র কথা নিয়ে আলোচনায় তাদের উৎসাহ দেখা যায় না। তাদের উৎসাহ শুধু নিজের কাজ নিয়ে এবং নিজেকে নিয়ে। অপরের মনোযোগের উপর স্বকীয় অস্তিত্বকে সজোরে প্রক্ষেপ করতে পারলে তারা আর কিছু চায় না। কিন্তু স্বয়ং মনোযোগী হওয়ার ধৈর্য তাদের ভিতর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

নিখিলকে একদিন তার সাম্প্রতিক বন্ধু-বিতৃষ্ণা সম্বন্ধে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম। তার উত্তরে সে অনেক কুণ্ঠা-সংকোচের পর যা বলেছিল তা আমার অপটু জবানীতে লিপিবদ্ধ করলে এইরূপ দাঁড়ায়—

নিখিল প্রথম প্রথম তার সকল বন্ধুর সঙ্গেই খোলা মন নিয়ে মিশত। কিন্তু কিছুদিন যেতেই দেখা গেল, বন্ধুরা তার মুখ থেকে তাদের নিজের কথা শুনতেই সমধিক ব্যগ্র। কেউ অন্য কথা শুনতে চায় না। গল্প-লেখকের নিকট গল্পের প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ তুললে তার হাই উঠতে থাকে; চিত্রকর বন্ধুকে সাহিত্যের বার্তা জানাতে গেলে সে কাজের অছিলায় রঙ-তুলি নিয়ে আপাতব্যস্ত হয়ে পড়ে; ডাক্তার বন্ধুর নিকট অর্থনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন মাত্র সে ব্যাগ হাতে করে 'কলে' বেরিয়ে যায়; অধ্যাপকের নিকট ক্লাশ-পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাতমাত্রে তার সহসা ছাত্র পড়াবার কথা মনে পড়ে; রাজনৈতিক বন্ধুর মুখে হোমরা-চোমরা নেতাদের এবং তাঁদের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই অন্য কথার সূচনা হতে না হতেই জরুরী মিটিং-এর তাগিদ তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করে; বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে সর্বশেষ-দেখা বাংলা সিনেমার ছবির খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের ঊর্ধ্বে আলোচনা এক-কাঠিও উঠতে চায় না ইত্যাদি।

ফলে নিখিল বন্ধুদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে ভেবে দেখেছে, বন্ধুদের termএ তাদের সঙ্গে মিশতে গেলে তার বহুরূপী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। জলকে যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের রঙ যেমন জলে প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে নিখিল অশেষ জ্ঞানবিদ্যা সত্ত্বেও নিতান্ত বর্ণহীন তরল জলের আকার পরিগ্রহ করতে চলেছিল। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তার স্বাতন্ত্র্যের অবলোপের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়েছে। সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। নিখিল উদারচরিতানাং বসুধৈব কুটুম্বকম্ নীতির বশে নিখিল বিশ্বের বন্ধু হতে গিয়েছিল, বন্ধুরা তাকে [illegible] করে তার উদারতার প্রতিদান দিয়েছে।

মালতী সেন

(৮৩ পৃষ্ঠার পর)

দুপুরের কথা বলছি। এলগিন রোড ষ্টপেজে আপনি নেবে যাওয়ার পর মণিব্যাগটা দরজার কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।'

আর কিছু বলবার দরকার হোলো না। একটি ভয়ত্রস্ত, শাণিত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করে মেয়েটি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো নিরঞ্জন। আমাদেরই প্রতিবেশী।

'মালতী সেনকে আপনার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'মালতী সেনকে কি না বলতে পারবো না, তবে একটি মেয়ে এইমাত্র এখান থেকে ......'

'কি জন্যে এসেছিল বলুন তো?'

চোখে-মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে নিরঞ্জন আমার সামনের চেয়ারখানায় বসে পড়লো।

'কি ব্যাপার বলতো? ধাপ্পাবাজী করে চাঁদা আদায় করে বেড়ায় বুঝি?'

'ধাপ্পাই বলতে হবে। তবে কে কাকে মারছে, সেইটাই ভাববার।'

'কি রকম?'

নিরঞ্জন একটু বিজ্ঞের হাসি হাসলো। তারপর বললে, মালতী প্রেমে পড়েছে।

'কার সঙ্গে হে? তোমার নাকি?'

'আজ্ঞে না, ওদের সমিতির সেক্রেটারী বিভাস চৌধুরীর।'

'আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা দরকার।'

'বিভাস চৌধুরী বিশারদ লোক, প্রেমে এবং প্রতারণায়। অনেক নাম অর্থাৎ অনেক নাম, ওরফে অমুক, ওরফে অমুক। মালতী তার ইদানীংকার শিকার। মালতী সমিতির দেশের কাজ করতে চায়। বয়স অল্প, চোখে একটা রঙীন স্বপ্ন থাকবেই বা দোষ কি! বিভাস চৌধুরী তার এই দুই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে দিয়ে যা খুশী তাই করিয়ে নিচ্ছে। মালতীর চোখে বিভাস হীরো। বিভাসের পূর্ব [illegible] কথা উল্লেখ করে অনেকে ওকে সাবধান করেছে। কিন্তু মালতী কারও কথায় কান দেয়নি। শুনেছি, বিভাস চৌধুরীর হুকুমে মালতী সমিতির জন্যে পকেট মেরে বেড়ায়। চাঁদাও চায় বড় বড় লোকের কাছে। আপনি কিছু দেননি তো ওকে?'

'পাগল হয়েছ!' হাসতে হাসতেই নিরঞ্জনের জবাব দিলাম: এ বয়সে আর ওসব ভুল হয়!

কিন্তু কথাটা নিজের কানেই ভাল লাগলো না। মনটা যেন মালতীর জন্যে সহানুভূতিতে ভিজে উঠতে লাগলো।

অপদার্থ

(৮১ পৃষ্ঠার পর)

একটা নম্বর টেকারকে মনে ধরলো? বুকের স্পন্দনে অপলার ব্যর্থ নিশ্বাসটা গুমরে ওঠে।

কথাটা কীভাবে জানাজানি হয়ে গেল—, কাকলীর ভাবী বরের জন্য ওষুধের কারখানা আছে। মিত্রিক বেঁকে বসলো—না মেয়েকে ও নরককুণ্ডে দানবের আস্তানায় ঠেলে দিতে পারবো না।'

'স্বর্গ আর দেবতা পাবে তুমি কোথায়?' রেগে উঠেছে অপলা।

মিত্রিক তবু হাসছে—নীলিমকে তোমার পছন্দ হয় না পলা? আমার বন্ধুর ছেলে—'

কথার উত্তর দিল না অপলা—মেঘের মত ওর মুখ থমথম করছে।

এই সময় ঘরে এল কাকলী আর নীলিম। কাকলী কালীপ্রসন্ন প্রাসাদের অনেকগুলি ছবি তুলেছে। একটার পর একটা বাবাকে দেখাচ্ছে। নীলিমও প্রাসাদের প্রতি প্রকোষ্ঠের ইদানিংয়ের কাহিনী মিত্রিককে শোনাচ্ছে। নানা মানুষের নানা কথা। সান্টার, পোর্টার, ফায়ারম্যান,—রেল ইয়ার্ডে ওরা বৃত্তাকারে ঘুরছে।

মুগ্ধ মিত্রিক একাগ্রদৃষ্টিতে ছবি দেখছে কাণ পেতে কাহিনী শুনছে—ও এবার নব মহাভারত রচনা করবে।

এই সময় মকবুল দর্জি কাকলীর তৈরী জামা নিয়ে উপস্থিত হোল। লম্বা চুমকি দেওয়া ভেলভেটের ব্লাউস,—জর্জেট সিফনের চীন— একটা নিঃশ্বাস ফেলে অপলা ভাবছে নম্বর টেকারের বউর গায়ে এ সব জামা কী মানায়! দর্জিটা একটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছু না, [illegible] এই অপদার্থদের বাড়ী কাজের প্রত্যাশায় এসেছিল। ওর বাড়ীতে ওর [illegible] করেছে। ওকে চুপচাপ দেখে [illegible] বললো— নির্দিষ্ট টাকাটা দিয়ে দাও আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—'

'টাকা' অপলা ভাবছে—'কবের একটাও কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই। টাকা যার [illegible] অনিশ্চিত হয়েছে—সুতরাং— ?'

এই সময় মিত্রিক বারান্দায় বেরিয়ে এসে স্ত্রীর পাশে ঠেস দিয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করলো দর্জির কত টাকা হয়েছে পলা?

'একশ টাকা—' নিষ্প্রাণ গলার স্বর অপলার।

মিত্রিক পকেট থেকে একখানা একশ টাকার নোট বের করে মকবুলকে দিয়ে জামাগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো।

এইমাত্র মকবুল চলে গিয়েছে। মিত্রিক বললো স্ত্রীকে—"কালীপ্রসন্ন প্রাসাদ ও তাঁর মহাভারত" এই নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম একটা সাময়িক পত্রে—তাই দেখে একজন বইর প্রকাশক—ওই বিষয় নিয়ে একখানা বই রচনার জন্যে কাল এসে দুশো টাকা বায়না দিয়ে গেলেন।'

অপলা কী উত্তর দেবে? নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েলী কাণ্ড

— কালীপদ চট্টোপাধ্যায় —

যা[illegible]

[illegible] একজন বলল, "আমি দরখাস্ত করব। ফোটো তুলেছি।"

পুরো বন্ধুরা যা-তা বলতে লাগল। বলতে আর বাকি রাখল না কিছুই। একজন তো এমন কথাই বলল, "ও তো বিজ্ঞাপন নয় অনঙ্গ, ও যে মেয়েছেলের চিঠি! তুমি মাথা খেয়ে দেবে!"

অনঙ্গ বলল, "চাকুরে পুরুষ যখন শিক্ষিত, নিখুঁত সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, প্রকৃত গৃহিণী, সুগৃহিণী, কর্মপ্রবণ, রন্ধনদক্ষা, গৃহকর্মনিপুণা সেলাই-বোনায় অভ্যস্তা, এ-রকম ফর্সা পাত্রী চায় পণের দাবি ছাড়িয়ে, তুমি কি সে বিজ্ঞাপনকে ব্যাটাছেলের জালিয়াতি মনে কর?"

অনঙ্গ সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হয়ে একজন বলল, "তুমি একটি মেয়েছেলে!"

অনঙ্গ বলল, "এ বিজ্ঞাপন যিনি দিয়েছেন, তিনি তো হলেন ব্যাটাছেলে!"

বাস্তবিক এ বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত করবার মত যোগ্যতা অনঙ্গের আছে। সে বি-কম পাস করেছে এবং ঘরে পড়ে অর্থনীতিতে এম এ দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। রীতিমত ব্যায়াম করে চেহারাখানা দেখবার মত। গায়ের রঙ একটু চাপা বটে, তবে মূলত ফরসা, শুধু রোদে-জলে একটু শ্যামলা হয়ে পড়েছে। দাড়িতে কানভাসারি করে। পড়াশোনা করে বলে এ কাজটা ছাড়ছে না। আশা আছে এম এ পরীক্ষাটা দিয়ে সিনেমা-লাইনে চেষ্টা করবে—গান শিখছে, গায় ভালই। রান্নাবান্না, ঘরের কাজ, সেলাইফোঁড়, এসবে তো সুদক্ষ। কুলে মুখুজ্জে—পালটি ঘর বাঁড়ুজ্জের। [illegible] হলেও। বাড়িঘর নেই, ছ পুরুষ ভাড়াটে। বাস্তুহীনের ঝাড়। বাপ মা মারা গেছেন সেই কবে তার শিশুকালে। দাদার খেদানো [illegible]। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পরে, পাস করবে না ভেবে, দাদা ছাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে ট্রেনে ফেরির কাজ ধরেছে। তখন থেকেই আস্তানা এই মেসে। ফল বেরোতে যখন দেখা গেল ম্যাট্রিক পাস করেছে, তখন দাদা এসেছিল ফেরাতে; অনঙ্গ যায়নি। সে ক্যানভাসারি করতে করতে আই-কম পাস করেছে, বি-কম পাস করেছে, এম-এর ফি জমা দিয়েছে। চাকরির চেষ্টা করে চলেছে সমানে—জুটছে না কিছুই। সে জন্যে ভাবনাও নেই। তার একার জীবন—ডংকা মেরেই কেটে যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের জবাবে অনঙ্গ চিঠি ছাড়ল, আলোকচিত্র সমেত।

কর্মখালির বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত ছেড়ে ছেড়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মেছে, তা থেকে তার মনে হয়েছিল, এ চিঠিরও জবাব আসবে না। কিন্তু এল। উত্তরে বাসার ঠিকানা দিয়ে বিনতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম্নী কোন এক মহিলা অনুরোধ করেছেন পাত্রপক্ষকে দেখা করে কথাবার্তা বলতে—সাক্ষাতের সময় সন্ধ্যা ছটা থেকে আটটা; ছুটির দিন দেখা হবে না।

আর একটা সন্ধ্যার কাজ পণ্ড হল অনঙ্গর। ঠিকানায় গিয়ে দেখল, একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। সরকারী সিঁড়ি ধরে তেতলায় উঠে যেতে কোন বাধা নেই। যথাস্থানে ফ্ল্যাটের দরজার কড়া দুদফা নাড়তেই এক তরুণী এসে দরজা খুলে দিল। নমস্কার জানিয়ে অনঙ্গ প্রতিনমস্কার পেল এবং প্রাপ্ত চিঠিখানা দেখাল। তরুণী বলল, 'আসুন।'

ছিমছাম সাজানো-গোছানো মধ্যবিত্ত বাসা। বারান্দায় একটা ছোট গোল খাটো টেবিলের দুদিকে দুখানা বেতের চেয়ার। অনুজ্ঞা পেয়ে অনঙ্গ তার একটাতে বসল।

তরুণী বসল অপরটাতে এবং প্রশ্ন করল, "আপনি পাত্রের কে হন?"

অনঙ্গ ভেবেছিল, ইনিই পাত্রী। কিন্তু চিঠির সঙ্গে অনঙ্গ যে ফোটো পাঠিয়েছে, খোদ পাত্রী কি আর তা না দেখে ছেড়েছেন! ইনি যদি পাত্রী হন এবং ফোটো যদি দেখে থাকেন, তা হলে এ প্রশ্ন করার কোন মানেই হয় না। নত মুখে লজ্জা টেনে অনঙ্গ বলল, "আমিই—ইয়ে—মানে অনঙ্গ মুখোপাধ্যায়।"

"ও! আচ্ছা, আমি একটু আসছি।" বলে তরুণী উঠে ঘরে গেল। শোনা গেল, ঘরে নিচু গলায় কার সঙ্গে কথা বলছে। দ্বিতীয় কণ্ঠও নারীর। সুতরাং অনঙ্গর বুঝতে বাকি রইল না যে, খোদ পাত্রী ঘরের মধ্যে আছেন এবং বাইরে যিনি ছিলেন, তিনি পাত্রীপক্ষীয়া। অনঙ্গ তো নিজেই পাত্র, নিজেই পক্ষ, আর কা'কে সে পাঠাবে! মেসের বন্ধুদের কাছে তো এ কাজে বাধা ছাড়া এতটুকু সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই।

একটু পরে একটা ফাইল হাতে নিয়ে তরুণী এসে আবার বসল। ফাইল খুলে অনঙ্গর চিঠিটা আর একবার পড়ে নিল। তারপর প্রশ্ন করল, "এম-এ কোন্ বছর দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন?"

"এবারই।" অনঙ্গ বলল, "ফি জমা দিয়েছি।"

"রান্নাবান্না শেখা হল কী ক'রে।"

অনঙ্গ বলল, "অনেককাল মেসে আছি। ঠাকুর নেই। নিজেরাই রান্না করি—পালা ক'রে।"

"ঘরকন্নার কাজ?"

"ঠাকুর যেমন নেই, তেমনি চাকরও নেই আমাদের, কাজেই বাজার-করা, বাসন-মাজা, বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, কাপড় কাচা, ইস্তিরি করা......"

একটু হাসি ফুটল তরুণীর মুখে। প্রশ্ন হল, "বিছানা-পাতা, মশারি-খাটানো..?"

অনঙ্গ বলল, "মশারি তো আমাদের অন্য কেউ খাটিয়ে দিতে আসে না—আমরাই খাটাই। তবে অনেক সময়ই প্রথম বারের খাটানোতে মশারি চিত হয়ে যায়, তখন আবার পরের বারে ঠিক ক'রে নিতে হয়।"

"সেলাই অভ্যেস হল কী ক'রে?" তরুণী বলল, "এখানে অবিশ্যি তেমন কোন সেলাই জানার দরকার নেই। এই, ধরুন, টিপবোতাম আঁটা, কি ধরুন, বাসে উঠতে গিয়ে নতুন শাড়িটা কোথাও......"

"সে সবই তো অভ্যেস আমারও। কিছু যদি মনে না করেন"—ব'লে নিজের পরনের কাপড়ের কোঁচার প্রান্তটা তুলে ধ'রে তার এক জায়গায় একটা কোণাকার সেলাই দেখাল।

তরুণী বলল, "বাঃ! আপনার হাতের সেলাই?"

"পরহাতের কোন কারবারই নেই আমাদের ওখানে।" বলতে বলতে কোঁচার খুঁটের এক জায়গায় একটা আধুলি-প্রমাণ এবং আর এক জায়গায় একটা দুআনি প্রমাণ রিপুকর্ম দেখাল অনঙ্গ। তরুণীর দু' চোখ বড় হয়ে উঠল, "এ যে রীতিমত ওস্তাদী হাত!"

এ সময় এত চমৎকার দেখাল মেয়েটিকে যে, অনঙ্গর মনে হল, এ মেয়েই যদি খোদ পাত্রী হত—সি'থের সি'দুর নেই যখন, হ'তেও তো পারত—তা হ'লে এর সঙ্গে বিবাহিত হতেও কোন আপত্তি হত না তার।

প্রশ্ন হল, "গান কি বেশ ভালই গাইতে পারেন?"

"তা পারি।" অনঙ্গ বলল, "কিন্তু, আমি বললেই তো আর বিশ্বাস করবেন না আপনারা।"

"গাইবেন?"

"গাইতে পারি। কিন্তু কোন পাত্রী কি পাত্রের বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা দিতে রাজি হবেন? আমিও শুধু কথাবার্তা বলতে এসে......" থেমে গেল অনঙ্গ; দু মুহূর্ত থেমে থেকে বলল, "তানপুরো আছে? কিংবা অন্তত হারমোনিয়ম? আর, গান গেয়ে উঠলে, আশপাশের বাসার কেউ তাড়া ক'রে আসবেন না তো?"

হেসে উঠল তরুণী। ভারি মিষ্টি হাসি। বলল, "তাড়া করার মত গান না হলে কেউ তাড়া করবে না। আচ্ছা, থাক, বাড়ি বয়ে এসে গান শোনাবেন কেন আপনি? আপনাদের মেসে গিয়েই বরং......"

"পাত্র দেখতে যাবেন?" অনঙ্গ বলল, "দরকার নেই। ওখানে গেলে আপনাকে বসতেও দিতে পারব না। তা ছাড়া, আমার বন্ধুদের কারও মত নেই এ বিয়েতে....."

অনঙ্গর কথায় কোন জড়তা নেই, সংকোচ নেই দারিদ্র্যের জন্য। যা সত্য তাই চটপট বলছে। সে সত্যের ওপর কেউ করুণা দেখাতে গেলে, অনঙ্গ তাকে ক্ষমা করবে ব'লে মনে হয় না। সে বলল, "মানে, দেশাচার হচ্ছে, ছেলেরাই মেয়েকে বিয়ে করে, আর এখানে যেন আমি যাচ্ছি মেয়ের সঙ্গে বিবাহিত হতে। এতে আমার বন্ধুদের পৌরুষে ঘা লাগছে।"

"আপনার নিজের?" তরুণী প্রশ্ন করল।

"আমার পৌরুষ অত ঠুনকো নয়—কাঁচের নয়—" অনঙ্গ বলল, "আমার পৌরুষ পাথরের—আমার নিজের হাতে খোদাই করা। আর, সত্যিকার পুরুষই তো তাই। পুরুষ হচ্ছে সজীব, সচল, সংগ্রামী এক পাথরের মানুষ, তার অন্তর হচ্ছে ফুলের মত।"

"আর নারী?"

"নারীর কথা আমি জানি না। বিয়ে হলে জানবার আশা রাখি। তবে, শুনেছি, নারী হচ্ছে ফুলের মানুষ আর তার অন্তরটা পাথরের।"

মাঝবয়সী একটি স্ত্রীলোক এল চা আর মিষ্টি নিয়ে। ভদ্রবেশা, কিন্তু পরিচারিকা বলে চিনতে ভুল হয় না। অনঙ্গর মনে হল, ফাইল আনতে ঘরে গিয়ে তরুণী এর সঙ্গেই কথা বলেনি তো? স্ত্রীলোকটি চলে যেতেই অনঙ্গ প্রশ্ন করল, "কিছু মনে করবেন না। পাত্রী আপনার কে হন?"

একটু গোলাপীমত হল তরুণী, বলল, "আমিই যদি পাত্রী হই......"

"তা হলে তো আমাকে দেখেই চিনতে পারতেন—আমার ফোটো তো দেখা ছিল আপনার।"

"ফোটো কি একখানা এসেছে? তা ছাড়া, ফোটোর সঙ্গে আসল চেহারার মিল কতটুকুই বা থাকে? যেমন আপনার।"

"আমার!"

"আপনার ফোটোতে যে চেহারা রয়েছে—"

তরুণী বলল, "তার চেয়ে আপনার চেহারা আরও ঢের ভাল।" অতএব পাত্র-পাত্রী দেখার পাট চুকে গেল।

বিনতা চাকরি করে চৌধুরী কম্পানিতে। অফিসার। কাটাদোর খুপরিতে সেক্রেটারিএট টেবিল কোলে নিয়ে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে। বিজলী-ঘণ্টার বোতাম টিপলে আয়া এসে দাঁড়ায়। দেশী কম্পানি—মাইনে কম, তা হ'লেও, অফিসার তো বটে। ডাঁট তো আছে!

মেয়েটির বাপ ছিলেন চৌধুরী কম্পানির একজন, যাকে বলে, উল্লেখযোগ্য কর্মচারী। প্রতিষ্ঠানের এতখানি উন্নতির মূলে তাঁর কৃতিত্ব আছে অনেকখানি। কিন্তু ভদ্রলোক কয়েক বছর আগে মারা গেছেন—একমাত্র সন্তান এই বিনতাকে রেখে। মেয়ের মা গেছেন তাঁরও আগে। বাপ মারা যাবার পরে হোস্টেলে থেকে মানুষ হয়েছে মেয়ে। বাপের সামান্য যা সঞ্চয় ছিল, তার বি-এ পর্যন্ত পাস করতেই প্রায় নিঃশেষ হয়েছে। আর পড়াশোনা করেনি সে, চৌধুরী কম্পানির মালিক—চৌধুরী-কর্তাকে গিয়ে ধরেছে, "চাকরি দিন।"

বাপের ওপর টানের বশে মেয়েকেও স্নেহ করেন কর্তা। বলেছিলেন, "বিয়ে কর, জামাইকে চাকরি দেওয়া যাবে।"

মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়নি, আবদার ধ'রে বলেছে, "কেন, আমি কি অযোগ্য?"

স্নেহের বশে তাকেই চাকরি দিয়েছেন চৌধুরী।

বিনতা ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। ঠিকে ঝি-তথা-রাঁধুনী রেখেছে। কিছুদিন এভাবে কাটবার পরে তার শখ হয়েছে, বিয়ে করবে। কিন্তু চাকুরে বর বিয়ে করবে না। শিক্ষিত চাকুরে পুরুষ যে রকম পাত্রী চায়, সেও ঠিক সেই রকমের পাত্রকে বিয়ে করবে। চাকুরে বর যেমন বিয়ে ক'রে বউকে নিজের ঘরে গিন্নি বানায়, বিনতাও বিয়ে ক'রে তার বরকে তেমনি নিজের ঘরের গিন্নি করবে। যেমন পাত্র জোটে ভাল, না জোটে তো—একেবারে রাষ্ট্রভাষায় চেপে বলেছে, "নেহি করেগা সাদি।"

তারপরেই ওই বিজ্ঞাপন।

যাক্, পাত্র হিসেবে অনঙ্গকে পছন্দ হল বিনতার। প্রশ্ন উঠল, "বিয়ে হবে কীভাবে? যথারীতি পাত্রী-সম্প্রদান হবে, না এ ক্ষেত্রে পাত্র-সম্প্রদান হবে? পাত্রী কন্যাযাত্রা ক'রে পাত্রের আস্তানায় গিয়ে বিয়ে করবে, না, পাত্রই যথারীতি কন্যার বাসায় যাবে বরযাত্রা ক'রে? অনঙ্গ বলল, "শ্রীমতী যদি পাত্রের ভূমিকা নেন, তবে আমার সম্প্রদত্ত হতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, বিয়ের খরচ জুটবে কোত্থেকে? মেসের বন্ধুরা এক পয়সাও চাঁদা দেবে না—দেবার ক্ষমতাও নেই; চাঁদা তারা তুলবেও না, উল্টে লাঠি ধ'রে বাগড়া দেবে এ বিয়েতে।"

এ সব প্রশ্নের মীমাংসা হল না। শেষে রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে হয়ে গেল। নির্ঝঞ্ঝাট একেবারে। কন্যালয়ে প্রীতিভোজ হল।

তারপর?

তার পরের কথা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়। যা হবার [illegible]।

দুটি দিনের মধ্যেই দুজনের ওইটুকু

সংসার অনঙ্গ তার হাতের তেলোয় তুলে নিল। কোন্ কাজ না জানে? কোন্ কাজে তার অভ্যাস নেই! ঝি-রাঁধুনী সে বিদায় ক'রে দিল, বলল, "বাজে মেয়েছেলের ঝামেলা আমার পোষাবে না।"

যেন তার পোষানোটাই আসল কথা।

বিনতা খুশি হয়ে বলল, "তাহলে একটা ঠিকে চাকর রাখা যাক।"

ঠিকে চাকর পাওয়া গেল না। সারাক্ষণের জন্যে চাকর রাখা চলে না; তা হ'লে আবার দরোয়ান রাখতে হয়। ঘরে জিনিসপত্র তো আছে কিছু। তা ছাড়া, ইনকিলাবি যুগে সারাক্ষণের চাকর কি আর পেটভাতায় রাখা যাবে? নাহক খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই কিছু। অনঙ্গ বলল, "আমিই তো আছি। আর সংখ্যা বাড়ানো ঠিক হবে না।"

দেখতে-না-দেখতে অনঙ্গ হয়ে দাঁড়াল সংসারের সর্বেসর্বা। বিনতা যেন বাইরের লোক; সে যেন সারাদিন খেটে সন্ধ্যেবেলা ঝিমোতে ঝিমোতে আসে রাতটুকু কাটাবার জন্য। চাকুরে পুরুষের যেমন দশা, তেমনি আরকি। সংসারের কে সে? সে তো শুধু টাকার যোগানদার। সারাদিন চাকরির ঠেঙিয়ে সন্ধ্যেবেলা সে টলতে টলতে আসে রাতটুকু বিশ্রাম করার জন্য। পরদিন সকাল হতেই নাকেমুখে গুঁজে ফের বেরিয়ে পড়ে চাকরির ঘানি ঘোরাতে। পুরুষের সংসারকর্ত্রীর কাণ্ডারী হচ্ছেন গিন্নি। বিনতার সংসারে তেমনি অনঙ্গ হচ্ছে গিন্নি।

বিনতার বান্ধবীরা আসে রোজ সন্ধ্যায়— পাড়ার মেয়েরা। [illegible] দিকে [illegible] আসত। কলেজে পড়ে হোস্টেলে থাকে মেয়েরা [illegible] কি [illegible] আছে? [illegible] বান্ধবীর বান্ধবী—তস্য বান্ধবীরা। তারা আসে মজা দেখতে— [illegible] পুরুষের [illegible] দেখতে। [illegible] কিন্তু মুখফুটে বলে না। কেবল, দেখতে পায় সংসার চলছে একটি লোক— সে অনঙ্গ আর বিনতা যেন কেউ না, যেন বান্ধবীদের মতই বেড়াতে এসেছে।

একদিন অনঙ্গর হাতের তৈরি খাবার খেয়ে একটি মেয়ে বলল, "আপনি দেখছি একটি পুং দ্রৌপদী!"

গম্ভীর হেসে অনঙ্গ বলল, "দ্রৌপদী পুং হয় না। দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী [illegible] জানতেন। বরং ছিলেন ভীমসেন— অবশ্যই পুরুষ এবং তাঁর কাছে রান্না শিখতে হত দ্রৌপদীকে।"

সেদিন বান্ধবীরা চলে গেলে, বিনতা রান্নাঘরে এসে বলল, "আমায় রান্না শেখাও!"

শিখতে লাগল। স্বামীর কাজে হাতে সাহায্যও হতে লাগল টুকটাক। তবে ঘুম পেলেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে চলে আসে বিনতা, শুয়ে পড়ে বিছানায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর তাকে ওঠানো এক মুশকিল ব্যাপার। অনঙ্গ এক রাতে ঘুমন্ত বিনতাকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে এল। নিজের কোলে মাথা রেখে বিনতাকে [illegible] দিল এবং পরম স্নেহে তাকে খাইয়ে দিতে লাগল। গরাসে গরাসে ঘুম ভাঙতে লাগল বিনতার এবং কয়েক গ্রাস গেলার পরে সে ধড়মড় করে উঠে বসল, জিভ কেটে বলল, "ছি ছি!"

তারপর থেকে আর কখনও সে খাওয়ার আগে ঘুমিয়ে পড়ে না। জেগে থাকবার জন্যে হেঁশেলে থেকে সমানে কাজ ক'রে যায় অনঙ্গর সঙ্গে। ক্রমে মোটামুটি রান্নাবান্না তার অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেল এক রকম। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে, যতক্ষণ বান্ধবীরা থাকে, ততক্ষণ রান্নাঘরের দিকেও যায় না বিনতা।

গোল বাধল ওই বান্ধবীদের নিয়ে। তাদের আসা ক্রমে বন্ধ হল। আশাহত হয়েই তারা আসা বন্ধ করল। তিন-চারটে মেয়ে কিন্তু আসা ছাড়ল না। প্রায় রোজ সন্ধ্যেয় তারা আসতে লাগল। অনঙ্গ যথাশক্তি তাদের আদর-আপ্যায়ন করে, চা-খাবার খাওয়ায়, গালগল্প করে, গান গেয়ে শোনায়। কিন্তু মেয়েদের চোখ বলে কথা, বিনতা বলল, "তুমি ওদের আশকারা দিচ্ছ, তাই ওরা রোজ আসে।"

পরদিন থেকে বান্ধবীরা এলে অনঙ্গ আর হেঁশেল ছেড়ে বেরোয় না—নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে চা-খাবার দিয়ে আসে ওদের সামনে। সে সময়ও মুখ নিচু ক'রে থাকে, কারও দিকে তাকায় না। চা-খাবার দিয়েই আবার রান্নাঘরে চলে আসে। খাঁটি সতী-ব্যাটাছেলের ব্যবহার যাকে বলে।

কিন্তু দেখা গেল, বান্ধবীরাই এসে রান্নাঘরে ঢোকে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, অনঙ্গ গম্ভীর হয়ে থাকলে তার গায়ে পড়ে সাধে। অনঙ্গ কী করবে? কী করতে পারে সে? পুরুষ-কর্তার সংসারে এমনটি হবার জো আছে? কর্তার বন্ধুরা বেড়াতে এলে—বসেন বৈঠকখানায়। স্ত্রী গিয়ে হাসিমুখে চা-খাবার দিয়ে এল, ভদ্রতার খাতিরে সে সময় দু-একটা মিষ্টি কথা বলে, ফের ঢুকল এসে রান্নাঘরে। কর্তার বন্ধুরা কি রান্নাঘরে আসবে? কক্ষনও না।

এক সন্ধ্যায় অনঙ্গ যখন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, একটা মেয়ে এসে দোরে দাঁড়িয়ে ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলতে লাগল। বিনতা তার পেছনে এল পা টিপে টিপে, তারপর তার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, "ব্যাটাছেলে দেখে কি করছ?"

মেয়েটি সোজা চেয়ে একেবারে অ-ন্যাকা গলায় বলল, "ব্যাটাছেলে কি পথেঘাটে গড়াচ্ছে যে দেখতে পাব? হুঁ, তোমার রান্নাঘরে এলে একটি দেখতে পাই—হ্যাঁ ব্যাটাছেলের মত ব্যাটাছেলে। রান্নাঘরে বন্দী করে তুমি কি [illegible] লোকের চোখের হাত থেকে ওঁকে আটকাতে পারবে?"

এর ফলও হয়েছে উল্টো। বিনতার বদনাম রটতে শুরু করেছে। মেয়েদের আসাও বন্ধ হয়নি। তারা যেন বিনতাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যেই আসতে লাগল। এবং, সত্যি, বিনতা ক্ষেপতেও লাগল।

কদিন সন্ধ্যায় অনঙ্গকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেল বিনতা। কিন্তু পথে-ঘাটে বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হয়। কয়েকদিন সন্ধ্যায় বিনতা সিনেমায় গেল অনঙ্গকে নিয়ে। কিন্তু সিনেমাতেও দেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বান্ধবী [illegible]। [illegible] দেখা হয়, বান্ধবীরা বিনতাকে ছেড়ে অনঙ্গর সঙ্গেই গল্প করে। আর সত্যিই সন্ধ্যায় অনঙ্গ আরও মনোরম হয়ে ওঠে। বিনতা তাকে নিয়ে বাইরে বেরনো বন্ধ করল।

মাসে মাসে প্রায় বছর কেটে গেল। অনঙ্গ এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে। তার ফল বেরিয়েছে। সে পাস করেছে—ভালভাবেই। এতকাল দুপুরবেলা পড়াশোনা করতে হয়েছে, এখন তো সে সময়ে তার অখণ্ড অবকাশ। শরীরের দিকে আবার বিশেষ নজর তার, কাজেই দিবানিদ্রা হারাম।

বিনতা আবিষ্কার করল, অনঙ্গ দুপুরবেলা পাশের ফ্ল্যাটের বউটির কাছে সেলাই-বোনা শিখছে—ইতিমধ্যেই সে বিনতার শায়াতে লাগাবার জন্য সুদীর্ঘ এবং সুদৃশ্য এক লেস বুনে ফেলেছে কুরুশকাঠি দিয়ে। আর, বউটিকে নাকি সে গান শেখাচ্ছে।

বিনতা ঠিক করল বউটির স্বামীর কানে তুলতে হবে এটা, অবশ্য, কৌশলে। তার নিজের ছোট হওয়া চলবে না। কিন্তু সে চেষ্টায় এগিয়ে দেখল যে সেই স্বামীটি অনঙ্গর কাছে ব্যায়াম শেখে, অনঙ্গকে রীতিমত শ্রদ্ধা করে। গান শেখাবার আর বোনা-শেখার ছলে অনঙ্গ আর কিছু করতে পারে ব'লেও মনেই করে না সে। তা ছাড়া, নিজের স্ত্রীকে সে বিশ্বাস করে।

বিনতা ঠিক করল অনঙ্গকে দেখিয়ে দেখিয়ে এবং পাশের বাসার বউটির সামনেই তার স্বামীর সঙ্গে প্রেম করার ভান করবে। কিন্তু চেষ্টায় নামতে দেখা গেল, ভদ্রলোক আপিস থেকে ফিরে চা-খাবার খেয়ে, দ্বিতীয় একটা চাকরির করতে ছোটেন, এবং ফেরেন অনেক রাত্রে।

চোখে চোখে নজরবন্দী ছেড়ে দেখছে বিনতা, কিন্তু অনঙ্গ হাসির কাটান-দাগে সব নস্যাৎ করে দেয় বলে, "মাথা খারাপ হল নাকি তোমার! দুপুরবেলার অবকাশটাতে সেলাই-বোনা, গান-টান কি চাকুরে পুরুষের ঘরের মেয়েরা করছে না? তাতে অপরাধটা কী হয়েছে!"

বিনতা কঠোরস্বরে বলেছে, "তুমি কি মেয়ে?"

"বালাই-ষাট!" অনঙ্গ বলেছে, "কিন্তু আমি যে চাকুরে মেয়ের ঘরের পুরুষ! দুপুরবেলা আশপাশের সব বাড়ির পুরুষেরা বাইরে থাকে, মেয়েরা থাকে ঘরে। আমি তখন পুরুষ-বন্ধু পাব কোথায়—একটু সময় কাটাবার জন্যে? কাজেই বাধ্য হয়ে তখন আমায় মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। তুমি যে দুপুরবেলা পুরুষদের সঙ্গে পুরুষপনা করছ, তাতে কোন পুরুষ কিছুমাত্র আপত্তি জানিয়েছে? বরং তোমার আপিসের পুরুষেরা হয়তো তোমাকে মেয়ে-সাথী পেয়ে খুশিই হয়েছে।"

বিনতা বলেছে, "তুমি যে দুপুরবেলা শুধু একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে মেশ।"

"কে বললে!" প্রতিবাদ করেছে অনঙ্গ, "আরও মেয়ে আসে। তোমার কত বান্ধবীই তো আসে কতদিন। দুজন তো রীতিমত আসন ব্যায়াম শেখে আমার কাছে এসে।"

শুনে বিনতার চক্ষুস্থির। উপায়? হা হতোস্মি উপায় কী? কিন্তু নিরুপায়ভাবেই মনে মনে জ্বলতে লাগল বিনতা। কিন্তু তাতে কি শুধু মনই পুড়তে লাগল। দিনে দিনে সোনার দেহও হয়ে উঠল পোড়াকাঠ। মনের হাল আধপাগল। আপিসের কাজকর্মে মন বসে না, ভুলচুক হয়, ওপরওলা ভুরু কুঁচকে

তাকায়। বাড়িতে মান অভিমান। মাঝে মাঝে চলল আপিস-কামাই।

অনঙ্গ বলল, "তা হলে এক কাজ করি। বাইরের মেয়েরা এলেই আমি তাদের তাড়িয়ে দেব, বলব, আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নয় যে........"

ঝাঁঝিয়ে উঠল বিনতা, "তাতে আমার খুব মান বাড়বে!"

অনঙ্গ বলল, "কিন্তু যদি বলি যে তাঁদের আসা আমি পছন্দ করিনে, তা হ'লে মিছে কথা বলা তো হবেই, কেউ বিশ্বাসও করবে না।...আচ্ছা, আমি দুপুরবেলা বেরিয়ে গেলে কেমন হয়?"

বিনতা আরও তেতে উঠে বলল, "বাইরে কি মেয়ের অভাব আছে?"

তাও তো বটে! মুখ কাচুমাচু ক'রে অনেক ভাবল অনঙ্গ, কিন্তু কর্তব্য ঠাহর করতে পারল না।

বিনতা তো ভেবেই চলেছে। হঠাৎ একটু যেন আলোর সন্ধান পেল, বলল, "তুমিও একটা চাকরি নাও।"

কিন্তু চাকরির চেষ্টা তো ঢের করেছে অনঙ্গ। এতকাল ধ'রেই করেছে। বলল, "দাসত্ব জোটাতে পারিনি বলেই তো স্রেফ পেটভাতায় তোমার কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি। বল তো, ফের দরখাস্ত ছাড়তে থাকি—আপিসে আপিসে ঘুরতে থাকি মুখঝামটা খেয়ে। তুমিও একবার তোমাদের চৌধুরী-কর্তাকে ব'লে দেখবে নাকি!"

অসম্ভব। চৌধুরী বিনতাকে বলেছিলেন, সে বিয়ে করলে জামাইকে চাকরি দেবেন। কিন্তু বিনতা শোনেনি সে কথা, আবদার ধরে চাকরি নিয়েছে। এখন যদি অনঙ্গর জন্য চাকরি চায়, তা হলে চৌধুরী নির্ঘাত মনে করবেন যে, কৌশলে দুজনেরই চাকরি বাগাবার জন্যে তাঁর টেকো মাথায় হাত বুলোতে গেছে মেয়েটা।

অনঙ্গ বলল, "তার চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, তুমি তোমার সন্দেহ-বাতিকটা ছাড়। নইলে, ধর, আমার চাকরি যদি কোথাও জোটেই, তা হলেও তো তোমার মনে হতে পারে যে......মানে, মেয়েরা সব আপিসেই তো আছে।"

সন্দেহ কি বিনতা ইচ্ছা ক'রে জুটিয়েছে যে, চেষ্টা ক'রে ছাড়বে! আর, ওটা ঠিক বাতিকও নয়। ও হচ্ছে একটা রোগ।

সেই রোগে ভুগে ভুগে দিনে দিনে শুকোতেই লাগল বিনতা। সংসারে শান্তি ব'লে কিছু রইল না। অতিষ্ঠ হয়ে অনঙ্গ বলল, "বেলেঘাটার মেসটা এখনও আছে, সিট না পাই, বারান্দায় থাকব। আর রেল-গাড়িও চলছে এখনও। আমায় তুমি ছেড়ে দাও।"

বিনতা কেঁদে মাথা ধরাল।

ক্রমে তার মাথাঘোরা রোগ দেখা দিল। চলতে গিয়ে চক্কর লাগে। মাথা গরম হলে যা হয়—রাত্রে ঘুম হয় না ঠিকমত, পরদিন সকালে গা গুলোতে থাকে। এর ওপর কি আপিস করা চলে?

ডাক্তার ডাকতে হল। তিনি দেখে শুনে, পরীক্ষা ক'রে বললেন, "ভাবনার কিছু নেই। তিন-চার মাস এ অবস্থা চলবে। তবে, ক্রমেই কমের দিকে যাবে। প্রথমবার কিনা, তাই একটু অসহনীয় মনে হচ্ছে। হবারই কথা। তবে, প্রথমবার ব'লেই একটু সাবধানও হওয়া ভাল। শরীর দুর্বল—বিশ্রাম দরকার—ছুটি নিতে হবে।"

তিন মাসের ছুটি চাওয়া হল। ম্যানেজার সেই দরখাস্ত নিয়ে হাজির করতে চৌধুরী সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন বটে, সেই সঙ্গে মুখ গোমড়া ক'রে বললেন, "ওইজন্যেই মেয়ে-কর্মচারী নেওয়ার বিরোধী আমি।"

তিন মাস কাটল। মাথাঘোরা, গা-গুলানো, এসব ক'মেও এল; কিন্তু শরীরে যে বল পাওয়া যাচ্ছে না। শরীর ভারি হয়ে পড়ছে। বিনতা চাকরি করবে কী ক'রে! তিন মাস ঘরবসা হয়ে থাকার পরে আর বাইরে পা বাড়াতেও চাইছে না দেহ। এবং সেই সঙ্গে মন। আর দিনে দিনে দেহের যা ছিরি খুলছে, এ-দশা নিয়ে বিনতা আপিসে যাবে কী ক'রে। খুপরিতে গা-ঢাকা দেবার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু সেই খুপরির দিকে এগোবার পথের দু'পাশে যে রাশি রাশি পুরুষ কিলবিল করছে। সবাই চেনা। তিন মাস অদর্শনের পরে এ মূর্তি নিয়ে হাজির হলে, মুখে না বলুক, মনে মনে তো সবাই বলতে পারে—'এ কী রূপে দিলে দরশন!' কোন ডেঁপো ছোঁড়া হয়তো মুখ লুকিয়ে পেছন থেকে বলেই উঠবে!

আরও ছুটি চাইল বিনতা।

ম্যানেজার সেই আবেদন উপস্থাপিত করতেই একেবারে দপ্ ক'রে উঠলেন চৌধুরী কর্তা, "আবদার! মামাবাড়ির আবদার পেয়েছে! তিন মাস ছুটি নিয়ে আপিসের কাজের কতখানি ক্ষতি করেছে, ও জানে তা? ভাবতে পারে? নেহাত মেয়েছেলে বলেই, আর ওর বাপের কথা মনে করেই, এক সঙ্গে তিন মাসের ছুটি দিয়েছি। জানিয়ে দিন, ছুটি দিতে পারি—বিনা-মাইনেতে। কেন না, ছুটিকালে ওর জায়গায় লোক নিতে হবে—সে লোক বিনা-মাইনেয় পাওয়া যাবে না।"

বিনতার বাসায় গিয়ে দেখা করলেন ম্যানেজার এবং জানালেন কর্তার ক্রোধের বিবরণ। অগাধ জলে পড়ল বিনতা। পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ হাতের কাছে পেল এক ভাসন্ত কাঠ। বলল, "আচ্ছা, আমার ছুটির সময়টাতে যদি উনি—মানে—"

ম্যানেজার বললেন, "অনঙ্গবাবু! ভাল কথা। তিনি তো যোগ্য লোক।"

"আমার চেয়েও!" বিনতা বলল, "এম-এ পাস করেছেন তো। তা ছাড়া কমার্সের গ্রাজুএট, ইকনমিক্সের এম-এ—আপিসের কাজে......"

ম্যানেজার বললেন, "দেখি, কর্তাকে রাজি করতে পারি কিনা।"

পরদিন এসে তিনি সুসংবাদ দিলেন, কর্তাকে নাকি অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করা গেছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বিনতা। দু'দিক থেকেই। অনঙ্গর বোনাবুনি, গান-শেখানো আদি যে ইতিমধ্যে বন্ধ ছিল তা নয়—রীতিমতই চলেছে। তবে, বিনতার ধারণা, তার সামনে চলেছে ব'লে বাড়াবাড়ি চলতে পারেনি।

চা খেয়ে উঠবার সময় ম্যানেজার বললেন, "ভাল কথা, অনঙ্গবাবু, যতদিন কাজ করবেন, ততদিন আপনাদের বাড়িভাড়ার বিলটাও তাঁর নামেই হওয়া চাই। তা নইলে তো বাড়ি-ভাতাটা পাওয়া যাবে না—মানে, হাউস অ্যালাউন্স'।

তাই করা হবে ঠিক হল। চৌধুরী-কর্তার প্রতিষ্ঠানটা ভাল—অফিসাররা বাড়িভাতাও পান।

তিনি চ'লে গেলে, অনঙ্গ বলল, "রান্না-বান্নার কী হবে?"

বিনতা বলল, "আমি করব। রান্না করতে জানিনে নাকি আমি! তুমিই তো শিখিয়েছ। নুনেপোড়া তরকারি যদি কখনও রেঁধেই ফেলি, খাবে তো তুমি, খাব তো আমি, কেউ তো আর নিন্দে করতে আসছে না।"

"কিন্তু, শরীরটা যে ভাল নয় তোমার।" অনঙ্গ বলল।

বিজ্ঞের মত বলল বিনতা, "ভাল নয় মানে চলাফেরা দৌড়ঝাঁপ করার পক্ষে ভাল নয়—ট্রাম-বাসে চাপার পক্ষে ভাল নয়। ঘরের কাজ করার পক্ষে বেশ ভাল আছি আমি। এ অবস্থায় শুয়ে বসে না থেকে, একটু নড়াচড়া করা দরকার। তাতে ভাল হয়। না করলে খারাপ হতে পারে।"

হবে। অনঙ্গর এবিষয়ে কিছুই জানাশোনা নেই। পরদিন থেকে ধড়াচুড়ো প'রে অনঙ্গ মুখুজ্জে আপিস করতে লাগলো।

যথাসময়ে সোনার চাঁদ ছেলে হল বিনতার। চৌধুরীকর্তা সস্ত্রীক এসে সোনার হার দিয়ে দেখে গেলেন।

এক মাস গেল—দু' মাস গেল—তিন মাসে

(ইহার পর ১৬ পৃষ্ঠায়)

রোগ শয্যায়

গোবিন্দ চক্রবর্তী

জানলা দিয়ে আসছে নক্ষত্রের আলো—
স্কাইলাইটে পাখির ডাক
আর প্রচুর হাওয়া আসছে—
নীল নদের উচ্ছ্বসিত ফেনার মত
উন্দাম, উচ্ছ্বসিত, অফুরন্ত হাওয়া!

শিখরে বুদ্ধের মূর্তি—
নিটোল একটি কমলালেবু,
ওষুধের শিশি, টেম্পারেচার চার্ট—
আর টাইমপিসের টিকটিক আওয়াজ!
আরেকটি পোকাও কোথা বাসা বাঁধছে যেন
দূরের গাছ-গাছালির শুকনো
হৃদপিণ্ডের ভিতর।

একাকী শুয়ে আছি রোগশয্যায়—
নিস্তব্ধ ঘর,
নির্লিপ্ত চরাচর—নির্জন আকাশ!
তার চিরকালের বিরামহীন যাত্রাপথে
উদাসীর পৃথিবীও বুঝি
ক্ষণকালের জন্য থেমে পড়েছে!

ইচ্ছে করে:
আবার বেঁচে উঠি!
ঐ বুদ্ধের মূর্তিটির মত,
ঐ নিবিড় কমলালেবুটির মত,
অমনি রূপে-রসে ভরা এই প্রাণের জগতে—
এই করুণার বসুন্ধরায়!

হ্যাঁ অজাতশত্রু বটে! কিন্তু মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু নহে। অজাতশত্রুর জন্মের আগে ও পরে ত্রিকালদর্শী জ্যোতিষীরা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এ ছেলে পিতৃহন্তা হবে। অপোগণ্ড অবস্থায় এহেন শত্রুকে নাশ করে ফেলতেই হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেও সেদিনের রাজা কারো কথায় কান দেননি। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেবের সদুপদেশ সত্ত্বেও এরূপ হিংসাত্মক কার্যে মহারাজ বিম্বিসারের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি হয়নি।

বাঙালীজাতের কুলপঞ্জী ঘাঁটলে এরূপ জাত কিংবা অজাত অনেক শত্রুরই সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের অধ্যাপক অমিয়কান্তি মিত্তিরের সুদর্শন মুখকান্তি যে এরূপ একটা সম্ভাবনায় চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠবে কিংবা তাঁর দাম্পত্যজীবনে যে ফাটল ধরাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

কয়েক মাস হল অধ্যাপক অমিয়কান্তি আমাদের পাড়ায় উঠে এসেছেন। ছোট্ট একখানি বাড়ী, লোকজন নেই বললেও চলে। একটিমাত্র চাকর আর একটি ঠিকা রাঁধুনি বামুন নিয়েই ওঁর সংসার। ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি বয়স হলেও, তাঁকে চিন্তাক্লিষ্ট প্রৌঢ় বলেই ধারণা হয়। অমিয়কান্তি কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেন না। তিনি বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত তাও জানিনে। অধ্যাপক বন্ধুবর একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন; তারপর দু'একবার দেখাসাক্ষাৎও হয়েছে। ভদ্রলোক জ্যোতিষ ও জ্যোতিষীর উপর ভারি চটা; নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠেন। সুতরাং যতদূর সম্ভব তাঁকে এড়িয়েই থাকি।

অপ্রত্যাশিত ঘটনা! রাত তখন দশটা হবে; কি একটা বই পড়ছিলাম; পাশের ঘরে আমার মেজো মেয়ে সোমা কবিতা আবৃত্তি করছিল; তাই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ উস্কখুস্ক অমিয়কান্তি ভেজান দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা ও হাবভাব দেখে চমকে উঠলাম। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ অমিয়কান্তি যেন এই দারুণ শীতেও ঘেমে উঠেছেন।

"অমিয়বাবু যে! বসুন বসুন।"

"নমস্কার পণ্ডিতমশাই! আপনার কাছেই এসেছি।"

"তাই বুঝেছি; কিন্তু এই রাত্রে কি মনে করে?"

"বড় বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি পণ্ডিতমশাই! কি যে করব ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা!"

"এমন কি বিপদ যে আমার মত লোকের সহায়তা দরকার? বেশ বলুন, দেখি কি করতে পারি।"

"হাঁ বলব, বলবার জন্যেই এসেছি। বড় গোপন কথা; আজো পর্যন্ত কারো কাছে প্রকাশ করিনি। আমার জীবন-মরণ এর উপর নির্ভর করছে।"

"সে ভয় করবেন না অমিয়বাবু, আপনার কি বলুন?"

অধ্যাপক ঢোক গিলে বললেন, "দেখুন, জ্যোতিষ ঐ আপনারা যা বলেন বা আপনাদের শাস্ত্রে যা বলে তা কি ঠিক ঠিক মেলে?"

"নিশ্চয়ই মেলে; অন্ততঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা মিথ্যা হতে পারে না।"

অধ্যাপক অমিয়কান্তি আমার কথা শুনে যেন আঁৎকে উঠলেন, "কি বললেন?—সবই ঠিক ঠিক মিলে যায়!"

"হ্যাঁ, মিলে যায় বৈকি; অবশ্য মিলনোটা জ্যোতিষীর বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে; তার নির্ভর করে যার সম্বন্ধে বলা তার সঠিক জন্মকুণ্ডলীর উপর।"

অধ্যাপক অমিয়কান্তি আরো ঘামতে লাগলেন; তিনি ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, "তা হলে মিথ্যা বলেনি! নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ আছে, তা না হলে এরকম ঘটবেই বা কেন?"

আমি বললাম, "কি করে বলব বলুন? আমি ত আপনার কোষ্ঠী কোনদিন দেখিনি।"

তিনি উত্তর দিলেন, "না, না, আমার কোন কোষ্ঠীঠিকুজি নেই; আর আমি এ সব বিশ্বাসও করতাম না। কিন্তু ইদানীং আমার বড় খট্কা বেধেছে।"

আমি বললাম, "কাউকে বুঝি হাত দেখিয়েছেন?"

অমিয়কান্তি বললেন, "না, হাতটাত দেখানোর অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু পণ্ডিতমশাই, পাঁচ-পাঁচ বছর আমি প্রায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আর যে পারিনে। এবার তারা আমার ঠিকানা পেয়েছে; কি যে করব ভেবে পাইনে।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, "পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? কারা আপনার ঠিকানা পেয়েছে?"

অধ্যাপকের কণ্ঠে আর্তস্বর, "হ্যাঁ পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আপনার জনকেও ধরা দিতে ভয় হয়। চুরি, জোচ্চুরি-টোচ্চুরি কিছুই করিনি; তবুও পালিয়ে বেড়াচ্ছি।"

অধ্যাপকের কথায় বিস্মিত হই। ভদ্রলোক বলেন কি? এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, এ রকম করে পালিয়ে বেড়াতে হবে! প্রকাশ্যে বললাম, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে অমিয়বাবু! আপনার মত লোককে পালিয়ে বেড়াতে হবে, একথা আমি ভাবতেও পারিনে।"

ম্লানহাসি খেলে গেল তাঁর মুখে; তিনি বললেন, "বিশ্বাস করলেন না পণ্ডিতমশাই! এ পাঁচ বছরে পাঁচটি কলেজে এবং পঁচিশটা জায়গায় বাসা বদল করেছি।"

"বলেন কি অমিয়বাবু! এ যে বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস হয় না! তার জন্য দায়ী আপনাদের এই জ্যোতিষ,—বুঝলেন?"

"বুঝতে পারছিনে; আপনার পালিয়ে বেড়ানোর সঙ্গে জ্যোতিষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"শুধু প্রাণের দায়ে; বুঝলেন, শুধু প্রাণের দায়ে। স্ত্রীপুত্রকেও এড়িয়ে এই পাঁচ বছর

কাটিয়েছি! সুচিত্রা,—সুচিত্রা,- যাঁর কত সাধ আহ্লাদ! সংসার সাজাবে! কিন্তু দৈবের একটা অভিসম্পাত আমাদের জীবন বিড়ম্বিত করে দিয়েছে; তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় কিনা তাতেও সন্দেহ আছে!"

অধ্যাপক অমিয়কান্তি যে বিবাহিত; এমন কি তাঁর স্ত্রীপুত্রও রয়েছে, তা জানতাম না। ভাবলাম অধ্যাপক হলে কি হয়! নিশ্চয়ই লোকটার মাথা খারাপ; কিংবা এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! লোকচরিত্র বুঝা বড় কঠিন।

আমায় নীরব দেখে অমিয়কান্তি বলতে লাগলেন, "কি ভাবছেন পণ্ডিতমশাই! আমার কথাগুলো অন্যভাবে নেবেন না। আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমত আজ পর্যন্ত এমন কোন খারাপ কাজ আমি করিনি, যার জন্যে আমাকে এরকম করতে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "আপনার কথাগুলো আমি ঠিক ধরতে পারছিনে অমিয়বাবু! সবই আমার কাছে হেঁয়ালি ঠেকছে!"

আকুলকণ্ঠে অমিয়কান্তি বললেন, "হ্যাঁ, আমার কাছেই আমি একটা হেঁয়ালি হয়ে পড়েছি। বিয়ে করেছিলাম; সুচিত্রাকে পেয়ে সুখীও হয়েছিলাম। দু'জনে তারই প্রতীক্ষায় ছিলাম বহুদিন,—তারপর যখন সে এল, আমাদের স্বপ্ন সার্থক হ'লেও দৈবের এক নিষ্ঠুর আঘাতে সব চুরমার হয়ে গেল; সুচিত্রা আর লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরেনি বা সত্যি কথা বলতে কি আমিই তাকে আর আমার কাছে আসতে দেইনি।"

আমি বললাম, "আপনার স্ত্রীর কোন অসুখ-বিসুখ কিংবা কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার হয়ত!"

অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "না, না, কোন কিছুই হয়নি। তবুও সুচিত্রা তার বাবার কাছেই আছে আজ পাঁচ বছর!"

আমি বললাম, "এ বিচ্ছেদের কারণ কি অমিয়বাবু; আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক; আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে!"

অমিয়কান্তি বললেন, "সে কথা কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করিনি; আজ আপনার কাছেই প্রকাশ করছি। এমন কি সুচিত্রাও জানে না! আহাঃ, সে বেচারী নিশ্চয়ই আমায় ভুল বুঝেছে! কিন্তু কি করব পণ্ডিতমশাই! এ ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না!"

অমিয়কান্তির কথায় কৌতূহল বাড়ে! তাঁকে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা আপনাদের মধ্যে এ দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণ জানতে পারি কি? এমন কি ঘটেছিল যে, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে পাঁচ বছর ধরে দূরে রয়েছেন?"

"দূরে রয়েছি বটে, কিন্তু আমার অন্তর-মন তাদের নিকটই পড়ে আছে! দাউ-দাউ ক'রে বুকটা জ্বলছে পণ্ডিতমশাই!"—অমিয়কান্তি নিজের বুকটা দু'হাতে চেপে ধরলেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমিয়কান্তি বলতে লাগলেন, "আপনাদের জ্যোতিষ পণ্ডিত মশাই! আপনাদের জ্যোতিষ আমাদের জীবন বিড়ম্বিত করে তুলেছে!"

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, "সে কি রকম!"

অধ্যাপক বললেন, "শ্বশুরের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এ'ল, ছেলে হয়েছে! সাধ করে জ্যোতিষীর কাছে গেলাম, ছেলের ভবিষ্যৎ জানতে। জ্যোতিষী কুণ্ডলী এঁকে বললে কি না—পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতৃরিষ্টি, অর্থাৎ ছেলে কি না পিতৃঘাতী হবে। এই দেখুন ছেলের ছক।"

বিস্মিত হয়ে বললাম, "পাঁচ বছরের মধ্যে! পাঁচ বছরের ছেলে পিতৃঘাতী হবে?"

হতাশার সুরে অমিয়কান্তি বললেন, "হ্যাঁ, তাই বলেছিল; শ্লোকটা এখনও আমার মনে আছে,—

লগ্নাষ্টমে গতে ভৌমে দ্বাদশে পাপ-বিগ্রহে।
পিতৃঘাতী ভবেন্নিত্যং শুভৈর্যদি ন দৃশ্যতে॥

অমিয়কান্তির কথা শুনে হাসি পেয়ে গেল। হাসি চেপে বললাম, "ওঃ, বুঝেছি; কিন্তু আপনি ভুল বুঝেছেন অমিয়বাবু। পাঁচ বছরের ছেলে পিতৃঘাতী হতে পারে না। এটা পিতৃরিষ্টিরই কথা! রিষ্টি মানে ফাঁড়া। বুঝলেন? ছেলের পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে পিতার ফাঁড়া ছিল। আর যে ছেলের লগ্নে বৃহস্পতি রয়েছে, তার কোন রিষ্টিই থাকতে পারে না।"

অমিয়কান্তি বললেন, "কিন্তু সত্যিও হতে পারে ত? অজাতশত্রুর কথা জানেন না? প্রথমে জ্যোতিষীর কথাটা আমার বিশ্বাসই হয়নি; কিন্তু যখন ছেলের দিদিমা নাম রাখলেন—অজিতকান্তি, তখন সংশয় জেগে উঠল; অজাত আর অজিত! নিশ্চয়ই বিধাতার ইঙ্গিত! সেই থেকে সাবধান হয়ে গেলাম; সুচিত্রাকে লিখে দিলাম—পাঁচ বছর তোমরা আমার আর কোন খবর করো না। ব্যস—।"

তাঁর কথা শুনে হেসে ফেললাম, "বড় ভুল বুঝেছেন অমিয়বাবু! অথবা কেউ আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে; ইতিহাসের অধ্যাপক কিনা! তাই অজাতশত্রুর নামটা গোলমাল বাধিয়েছে!" অমিয়কান্তির সাথে তাল রাখবার জন্যই দিদিমা আদর করে নাম রেখেছেন—অজিত-কান্তি! তাতে বিধির কোন ইঙ্গিত নেই; এই দেখুন লিখেছে—সর্বারিষ্ট নাশে—"কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি।"

অমিয়কান্তির মুখ-চোখে যেন আশার আলো ফুটে উঠল, তিনি বললেন, "তা হলে,—তাহলে, আমি নির্ভয়ে যেতে পারি! সুচিত্রা মৃত্যুশয্যায়, এই দেখুন টেলিগ্রাম এসেছে।"

আমি বললাম, "করেছেন কি অমিয়বাবু? যান—যান—শীগ্‌গির চলে যান।"

অমিয়কান্তি বললেন, "তা হলে ভয় নেই? পাঁচ বছর কেটে গেছে কার্তিক মাসে,—এখন পৌষ!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেটে না গেলেও কোন ভয় নেই! নিশ্চয়ই কেটে গেছে,—মনে রাখবেন—"কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি!"

"তাহলে রাত সাড়ে এগারটায় দিল্লী এক্‌স্‌প্রেসটা ধরি,—নমস্কার!"

অধ্যাপক অমিয়কান্তি হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন! আমিও আপনমনে আওড়াতে লাগলাম—অজাতশত্রু আর অজিতকান্তি!

মেয়েলী কাণ্ড

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

পড়ল খোকা। সে 'আ-বু' বলে, 'বু-আ' বলে, মুখ ভাঙ্গ ক'রে 'অক্ক' বলতে পারে, ফ্যাক্ ফ্যাক ক'রে ঐ ফোকলা মুখে হাসে, নিজেই অনেক চেষ্টা ক'রে হঠাৎ উপুড় হয়ে যায় এবং বুকে চাপ লাগতেই আর্তনাদ ক'রে ওঠে, চিৎ ক'রে শুইয়ে দিলে ফের উপুড় হবার চেষ্টায় লেগে যায়......

একদিন অনঙ্গ বলল, "তোমার তো শরীর সেরেছে—বোধ হয় আপিসে বেরোতে পার এবার।"

"আমি! ক্ষেপেছ!" বিনতা চোখ কপালে তুলে বলল, "ঘন্টায় ঘন্টায় খিদে পায় না খোকার?"

"তা তো পায়ই।" অনঙ্গ বলল, "তার জন্যে আমিই তো রয়েছি—বিলিতি ভাল ভাল খাবারও রয়েছে বাজারে কত রকমের।"

বিনতা চোখ পাকিয়ে বলল, "কেন, আমি কি মরেছি!"

"কিন্তু চাকরি......"

বিনতা কথাই বলতে দিতে চায় না অনঙ্গকে। বলল, "ওসব চাকরি ফাকরি তুমি কর-গে। আমার দায় পড়েনি।"

"চৌধুরীকর্তা কি রাজি হবেন?" চিন্তান্বিত হল অনঙ্গ, "তোমার জায়গায় কি পাকা করে নেবেন আমায়!"

"না নিতে চান, আমি নিজে গিয়ে ধরব ওঁকে।" জোর আশ্বাস দিল বিনতা।

"ভাগিস আমাদের খাতিরের মত একটা আপিস পাওয়া গেছে।" অনঙ্গ চেপে চেপে বলল, "কিন্তু, বাইরে যে অনেক মেয়ে ঢুকে গেছে।"

বিনতা প্রবল বিশ্বাসভরে বলল, "আপিসে আর মেয়ে নিচ্ছেন না চৌধুরী। শিক্ষা হয়ে গেছে। আর, তুমি যদি আপিস থেকে বাদ পড়ে যাও, তা হলে—তা হলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র করব আমি!"

হেসে উঠল অনঙ্গ, "একেবারেই মেয়েদের মত বললে কথাটা। ঠিক এ কথাই, মনে আছে, একদিন আমার দাদাকে বলেছিলেন বউদি—মত প্রাইমারি স্কুলের বিদায় জোরেই!"

অনঙ্গ চাকরিতে বহাল হয়ে গেল—বিনতার শুধু এক আবেদনের ফলেই।

সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

কালো হলে কি হয়, বৌ-এর অনেক গুণ!

মুকুলকান্তি ঘোষ

আমার ভাই শাদাই ভাল!

সরল স্নেহশীল মন আমাদের মুগ্ধ করেছিল। এরপর সকালবেলার প্রাতরাশ সেরে খাকী ইউনিফর্ম পরে, ভারী বুটের তলায় পাথর গুঁড়িয়ে আমরা অবোলা-রা সবল পদক্ষেপে পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে প্যারেড গ্রাউণ্ডে যাই। সেখানে চলে জোর কুচকাওয়াজ আর অস্ত্রশিক্ষা। তারপর আর এক পাহাড়ের চূড়োয় উঠে পড়তে যাই মানচিত্র পঠন, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা সামরিক কৌশল সম্বন্ধীয় পাঠ, এরপর দুপুর রোদ্দুর মাথায় করে যখন নিজেদের ব্যারাকের উদ্দেশে রওনা হই তখন চরণ অচল। চড়াই পথে ওঠা ক্লান্তিকর। কেউ বা পথের ধারে বসে পড়ে বাঁধান চত্বরে। একটু জিরিয়ে নিয়ে পথ চলতে সুরু করে—বেরিয়ে যখন পড়েছি তাই থামলে তো আর চলবে না!—অতএব। পথের দু'পাশে পাইনের, দেওদার বনের আকর্ষণ। একটানা ঝিঁঝির সংগীত, নাম-না-জানা পাখীর প্রাণকাড়া হাঁক, সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে নন্দাদেবীর তুষার শৃঙ্গ থেকে চোখ ফিরিয়ে আমরা চলে আসি। রডোডেনড্রন গাছ ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে চুপ করে সরে থাকে। মন ভোলে, দৃষ্টি ভোলে কিন্তু চরণ চলে নিয়মবাঁধা পথে। প্রথম প্রথম এমনি চলতে চলতে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম। তখন তালে তালে পা ফেলাটা অনভ্যস্ত বলে বেতালা হয়ে উঠত। পরে আর ক্লান্তি আসত না। তালে তালে পা ফেলার মধ্যে সৈনিক জীবনের সুর প্রকট হয়ে উঠত। তখন সংগীত সুরু হত—চলার সংগীত। এ বিষয়ে আমাদের তামিল বন্ধুরা খুব উৎসাহী ছিলেন। মাদ্রাজ এবং অন্ধের অধিকাংশ বোনেরা এর আগেও দু' একটা ক্যাম্পে এ ধরনের শিক্ষা পেয়ে এসেছে। ওদের কাছে এখানকার জীবনের আঁটুনি বাঁধুনি গায়েই লাগত না। যাঁরা ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী তাঁদেরও সহ্য হত। কিন্তু আমাদের মত কল্পনাপ্রবণ মন এবং অনভ্যস্ত স্বভাবের লোকের হত বিপদ। মনে হ'ত, "একী রে বাবা! মুখে লাগাম পরে ছুটোছুটি কেন? রয়ে সয়ে, ভেবে বুঝে, সমঝে সামঝে চল না কেন। কি দরকার এমন ছুটপনা করবার? "What is life if full of care, And no time to stand and stare?" কিন্তু শোনে কে? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমাদের পাকা সামরিক গুরুজীরা কেন শুনবেন রয়ে-সয়ে চলবার কথা? তাঁদের তো শয়নে-স্বপনে এটাই ভাবতে হয় শত্রু যদি আসে, কোনদিক থেকে, কিভাবে জানপ্রাণ দিয়ে রুখবো, দেশকে রক্ষা করব। চব্বিশ ঘণ্টা দু'পায়ে দাঁড়াবার অভ্যাস তাঁদের রাখতে হয়—অন্য চিন্তা নৈব নৈব চ। আমাদেরও ও'রা তেমনি শক্ত বুনিয়াদের উপর গড়ে তুলতে চান। তেমনি সুস্থ, সবল, সতেজ মনের অধিকারী করে তুলতে চান। ভাবনা চলবে এখানে। ভাববিলাসিতা নয়। প্রথমে আমাদের কাব্যবিলাসী ভাবপ্রবণ মন পদে পদে নিয়মের বাঁধনকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হতে চাইত। কিন্তু পরে মনে হ'ত এই ভালো। কিছুটা কল্পনা ত্যাগ করে নিয়ম মানার অভ্যাস করলে কঠোর জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত থাকলে আমাদের জাতির উন্নতি হবে। কঠোর [illegible] সরল সংযত জীবনযাত্রা দেখে আমাদের খুব ভাল লাগত। কিন্তু প্রাণোচ্ছলতা এখানকার জীবনে কিছুমাত্র কম নয়। কর্মের অবসরে এদের যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত জীবনচিত্র দেখেছি তাতে মনে হয়েছে কে বলে সামরিক জীবন কঠোর, কঠিন?

এখানকার জীবনের মূল কথা 'শৃঙ্খলা।' উপরিওয়ালার কথা মানতে হবে। যদি উপরিওয়ালা বলে 'কুয়োয় ঝাপ দাও',—দিতে হবে। আপত্তি না করে যদি এ নিয়ে নালিশও করতে হয় তাহলেও প্রথমে ঝাঁপ দিয়ে তারপর যাঁর বিরুদ্ধে নালিশ তাঁরই মারফৎ তস্য উপরিওয়ালাকে জানাতে পারো। এর মধ্যে কুয়োয় ডুবে যদি মৃত্যু হয় তাহলে একেবারে স্বর্গে গিয়েই নালিশ চলবে। রাইটফুল অথোরিটির আদেশ অমান্য করলে শাস্তি এবং বিতাড়ন। এ শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারও নেই। অতএব প্রতিটি লোক এখানে অভ্যস্ত হয় আদেশ মানতে। তাতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশংকা কমে যায়। এইভাবে মুখ[illegible] কাজ [illegible] খারাপ দিক আছে সত্য কিন্তু জাতীয় চরিত্র গঠনে এর ভালো দিকটা আমাদের গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। যে শৃঙ্খলার অভাব এবং সততার অভাব আমাদের গোটা ভারতবর্ষের উন্নতিকে পদে পদে ব্যাহত করে তুলছে তা' দূর করতে হ'লে একেবারে গোড়া থেকে আমাদের সুরু করতে হবে।

আমাদের গুরুজীরা নিজেদের প্রতিটি কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। এত বেশী সজাগ যে, আমাদের মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতে হ'ত 'হে ভগবান, এমন বৃষ্টি হোক যেন মাঠঘাট জলে থৈ থৈ করে, যেন ক্লাস হতে না পারে।' কখনও কখনও যখন ঝম্ ঝম্ করে পাহাড়ে বর্ষা নামত, অথবা তুফান আসত, শিলাবৃষ্টি সুরু হ'ত আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতাম আজ পি-টি, প্যারেড বন্ধ। ওমা তারই মধ্যে যথাসময়ে গুরুজীরা এসে হাজির। হায়রে, 'বজ্র যদি মাথায় পড়ে ভেঙ্গে' তা'ও এদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে না। 'চলো বারান্দায় ক্লাস হবে'—শুনেই সরবে এবং নীরবে মুণ্ডুপাত করতাম সকলের,—বেচারা ভগবানেরও রেহাই ছিল না তা' থেকে। কোনদিন যদি শুনতাম, 'আজ সকালে ক্লাস হবে না'—আমাদের খুশীর অন্ত থাকত না। সমস্ত রুমে খুশীর ঝড় বয়ে যেত। কেউ কেউ তক্ষুণি আবার লেপের তলায় ঢুকত। গুরুজীরা অবাক হয়ে বলতেন, 'আমরা ভেবেছিলাম ক্লাস না হওয়ায় দুঃখিত হবে তোমরা।' হাসির ঢেউ বয়ে যেত আমাদের মধ্যে এ কথা শুনে। আধুনিক কালের ছাত্রী আমরা; মাঝে মাঝে 'ফ্রেঞ্চ লীভ' কাটতে পারলে ছাড়ব নাকি আমরা!

ক্যাম্পে প্রায়ই মান্যগণ্য অতিথি আসতেন; আর আমাদের দ্বিপ্রাহরিক স্বল্প অবকাশটুকু ব্যয় করতে হ'ত তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনে। 'ডিনার নাইট' হত প্রায়ই এঁদের আগমনে। আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতাম আমরা সেদিন। নাচ, গান, কৌতুকে আসর জমজমাট হ'ত। এরই মধ্যে অবাক হয়ে দেখতাম যাঁদের দেখলে প্যারেডের মাঠে সকলের বুক শুকিয়ে যায় ভয়ে, তাঁরাও [illegible] সহজ আনন্দে মিশে [illegible] সঙ্গে। তখন মনেই হ'ত না, এই কর্ণেল, মেজর বা জেনারেলের সামনে ভয়ে কাঁপবার মত কিছু আছে। কিন্তু প্যারেড গ্রাউণ্ডে এ'দের সামনে চরণ দুটো ভারী হয়ে যায় কেমন! স্লো মার্চিং হয়ত কুইক হয়ে যায় সকলেরই। এখানকার সামাজিক জীবনে আমাদের ছোটখাট আনন্দানুষ্ঠান যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। এর উদ্বোধন করেছিলাম আমরা বাঙ্গালীরা রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সর্বাঙ্গ-সুন্দর অনুষ্ঠান মারফতে। তারপর আমরা পড়ে থাকলাম কত পেছনে। এগিয়ে এলো পাঞ্জাবী এবং দাক্ষিণাত্যের বোনেরা। আমাদের সংগীত এবং নৃত্যকলার যে সূক্ষ্ম দিকটি আছে তার চেয়ে প্রাধান্য পেত হৈহুল্লোড়ে হালকা ধরনের নাচগান। জীবন হাতে নিয়ে চলে এখানকার লোক। সম্ভবত সে জন্যেই সূক্ষ্ম চারুকলার আবেদন তাদের মনে সাড়া জাগাতে পারে না। তাই আলপনা দেখে ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্টের 'অর্থহীন, সময়ের অপচয়'—এই উক্তি শুনে আমাদের অবাক লাগেনি। তবে বাঙ্গালী সুগায়িকা স্মৃতিবোনের গান ওরা শুনতে খুব ভালবাসত এবং ওর একটু হালকা সুরের গানগুলিই বেশী পছন্দ করত।

'পাবলিক স্পীচ'এর আসরগুলো, বিভিন্ন বক্তার সরস আলোচনায় প্রাণবন্ত হ'ত। সবাই বলতে পারে ভাল। মেজর-সাহেব বললেন, "তোমাদের কথা বলা শেখাবো কি? আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাদের কথা নিয়ে কারবার।" মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো বলতে পারে গুছিয়ে সাজিয়ে সে কথা ও'রা বার-বার স্বীকার করতেন।

আমাদের অধিকাংশ বন্ধুই অস্ত্রশিক্ষার ক্লাস পছন্দ করতেন। শক্ত হলেও ধ্বংসকারী আগ্নেয়াস্ত্র তো। আমরা যাচ্ছি দেবী দুর্গার অংশ! একবার অস্ত্র হাতে নিলেই হ'ল। আমাদের মুখাস্ত্রের কাছে দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ হার মানেন। তবু এতদিন পুরুষেরা প্রচার করে এসেছেন মেয়েরা অবোলা! এবার তাঁরা সতর্ক হোন। সর্বদিক থেকে অস্ত্র ধারণ করলে তাঁদের আর রক্ষা নেই। এখনই চটপট সকলের উচিত—'আত্মরক্ষা সমিতি' করা। এহারে অস্ত্রশিক্ষা মেয়েরা পেলে সমূহ বিপদ। ফায়ার করতে গিয়ে দেখা গেল কিছু মহিলার গুলী টার্গেটেই লাগল না—ওয়াশ-আউট। অধিকাংশের প্রথম ফায়ার ভালই হয়েছে। যাঁদের ওয়াশআউট হল তাঁদের উপরই ভরসা। না হলে সমাজ সংসারে আগুন জ্বলবে। ভয়ে পুরুষদের আবার গুহাবাসী হবার সংকল্প নিতে হবে। দেড় ইঞ্চি, এক ইঞ্চি এবং সওয়া ইঞ্চি গ্রুপিং হল অনেকের শুটিংএ। বাঙ্গালার ভাল গ্রুপিং আশা করেছিলেন সবাই। দু' তিনজনের ওয়াশ-আউট হলেও অন্যদের বেশ ভাল হল।

দু' মাসের ক্যাম্পজীবনে মিলিটারী কনট্রাকটারের মেস পরিচালনা ভুলবার উপায় নেই। আমাদের কোন কোন বন্ধু স্পষ্ট বলতেন কনট্রাক্টরকে "আপনার নতুন বাড়ী তৈরী হলে গৃহ প্রবেশে আমাদের নেমন্তন্ন করবেন। কারণ, আমাদের অর্থ সাহায্য না পেলে আপনার বাড়ী উঠত না।" ভদ্রলোক হাসতেন, বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না। খাওয়া-দাওয়া ধোপী সংক্রান্ত কোন নালিশ হলেই তিনি [illegible]

Keo-Karpin
HERBAL

হল টু-মরো। কিন্তু টু-মরো এন্ড টু-মরো, এন্ড টু-মরো। সে আর আসে না। অব্যাহত-গতিতে কনট্রাক্টর সাহেব দুধমেশানো জল, বাজারের পচা ফল এবং খারাপ ডিম মাছ ইত্যাদি দিয়ে মেনু সচল রাখতেন। ধোপা ঠিক আসতো না ঠিক মত। ইউনিফর্ম পরিষ্কার করে নিতে হত নিজেদের। বহু কষ্ট মানতে হত সময়ের অভাবে নালিশ করা সম্ভব হত না বলে। কিন্তু আমরা ভদ্রলোকের অমায়িক শান্ত ব্যবহারে অবাক না হয়ে পারিনি। লেট দি ডগ বার্কস্ এন্ড দি ক্যারাভান পাস্—এর মর্মার্থ কনট্রাক্টর সাহেব যতটা বুঝেছেন আর কেউ বোধ হয় বোঝেনি। আমাদের অভিযোগ, মেজর সাহেবের তিরস্কার, ধমক—কোন কিছুই তাঁর অটল ধৈর্যকে কিছুমাত্র টলাতে পারত না। এখানকার ক্যাম্প থেকে এই ধৈর্যের শিক্ষাও আমরা পেয়েছি।

স্নানের ঘরটা ছিল আমাদের আব্রুহীন। সেও কনট্রাক্টরের কল্যাণে সন্দেহ নেই। স্নানের ঘরে পর্দাও নেই, দরজাও নেই। অনেকের অসন্তোষ দেখা গেল। কিন্তু যাই হোক এ যুগে আমরা মেয়েরাই তো সাধ করে পর্দা বর্জন করেছি। পর্দার বিরুদ্ধে করেছি আন্দোলন, আর স্নানের ঘরে পর্দা নেই বলে করছি আস্ফালন? অন্যায়, অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। এখানে সর্ব অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার শিক্ষা পাব, অতএব এত সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘামাবো—এটা অনুচিত। কনট্রাক্টর সাহেব এটা সম্ভবত বুঝেছিলেন। তাঁদের তো মারামারি করে সমান কিছুটা সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। ছেলেরা শুনেছি এ ধরনের কনট্রাক্টরকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ছাড়েন। শক্ত হলেও এতটা আমরা পারিনি। শক্তির অংশ হলে কি হবে, মায়ের জাত তো।

পাহাড়ের মেঘের খেলা কিন্তু আমাদের মনের সব গ্লানি দূর করে দিত। কোন দিন পাহাড়গুলো মেঘের আবরণে অদৃশ্য হয়ে যেত। আকাশ পৃথিবী একাকার হয়ে যেত যেন। কখনও আবার স্তবকে স্তবকে সাজানো মেঘলোককে পাহাড় বলে ভুল হত। আবার পাহাড়গুলো কখনও কখনও মেঘ হয়ে যেত যেন। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে মেঘগুলো আনমনা কাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে যেত, আলতোভাবে ছুঁয়ে যেত আমাদের, —কেন এখনও দেখেছো এদিকে কাউকে যেতে? ইচ্ছে করত ঐ মেঘগুলোকে ধরে রাখি। ওরা বাঁধন মানে না। কখনও বা মেঘের মাথা উঁচু করে থাকা পাহাড়গুলোকে স্বর্গের রাস্তা বলে মনে হত। বুঝি ঐ রাস্তা ধরে নীল আকাশের সীমা পেরিয়ে চলে যাওয়া যায় স্বর্গপথে। বৃষ্টির দিনে পাহাড় ভাঙা স্রোতে জল নামত। পাইন বন থেকে পাগলা হাওয়া ছুটে আসত। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতাম সে কী শব্দ, মনে হত বুঝি পাহাড় ভেঙে যাবে। হাওয়ার তোড়ে কখনও বা আমাদের স্কাই-লাইটের কাচ ভেঙে ঘরে জল ঢুকত। সার্সি ভেঙে যেত। কখনও বা শিলাবৃষ্টিতে ঘরের বারান্দা সাদা হয়ে যেত টুকরো টুকরো বরফে। দুরবীণ দুচোখে আমরা মুখেও পুরে নিতাম এ দৃশ্য উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে এখানকার দৃশ্য আরও উপভোগ্য হত। কি রকম ঘুম পাহাড়, ঘুম পাহাড় মনে হত। সমস্তটাই যেন স্বপ্ন। —এই পাহাড়, এই নিস্তব্ধ প্রহরী পাইন গাছ। তারই মধ্যে জেগে থাকত আমাদের এই পুরী। কখনও ভাবতাম, হিমালয়ের কোলে বসে আমরা হিমকন্যা গৌরী। তপস্যাটা অবশ্য কোন শিবের জন্য নয়—শক্তির জন্যই।

"ফেরবার সময় অশ্রুর বন্যা বইবে"—আমাদের লেডী অফিসার বলেছিলেন। হ'লও তাই। এখানকার জীবনের এই কঠিন-কাঠিন্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা কোমলতার উৎস রয়েছে। শেষের দিনগুলোর কাজে-কর্মে, বেড়ানোতে—সব কিছুতে আমরা এটি অনুভব করতাম। যাদের দূর থেকে লৌহমানব ভেবেছি তাদের সুকোমল মনে যে আমরা দাগ কেটেছি আমাদের সুন্দর রুচিসংগত ব্যবহারে, তাতে সন্দেহ নেই। শেষদিনের অনুষ্ঠানের পর আমাদের বিদায় অভিনন্দন দিতে এসে তাই সকলের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ, দৃষ্টি সজল হয়ে উঠল। পরদিন আমাদের যাবার তাড়া সকাল থেকেই, এদিন রাতে আমাদের ঘুম নেই। পূর্ণিমা রাত্রি। আনন্দানুষ্ঠান শেষ হবার পর অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান সুরু হল যেন সকলের বিদায় দেবার পর। বাহুতে বাহুতে নাচগান হল, আমাদের সঙ্গে মিলে আনন্দ করা দেখে কে বলবে রাত পোহালে এরা অন্য মানুষ, পাথরের মানুষ হয়ে যায়। কর্ণেল, মেজর, আমাদের প্রধান ইন্সট্রাক্টররা সবাই আমাদের আনন্দ দিলেন নেচে-গেয়ে। গভীর রাতে ব্যারাকে ফিরে আমরা থামলাম না—সানন্দে শোরা খুখরী নাচ আর গানে ব্যারাক মুখর করে তুললাম। যারা ঘুমের আয়োজন করছিল তাদের ঘুম টুটে গেল, আর সকলের মিলিত নৃত্যে, গানে জ্যোৎস্না রাত্রিতে ব্যারাকের প্রাঙ্গণে আনন্দঘন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। সান্ত্রী অবাক হয়ে এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকল। হাত ধরে নাচবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও অনুভব করলাম আমরা নব্বইটি মেয়ে একেবারে কাছাকাছি এসে গেছি; আমাদের হাত এক সঙ্গে মিলেছে। আর কি আমরা কাউকে ভয় করতে পারি? আমাদের গোটা দেশের সব ভাইবোন যদি এমনি হাত মেলাতে সক্ষম হয় তাহলে আমাদের ভারতজননীর দুঃখরজনী প্রভাত হবেই। জগতে তখন কাউকে ভয় করবার নেই। আমাদের এই শিক্ষা সেদিন সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়েছে বলব।

মা

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

গড়িয়ে পড়ল। দেবুর জন্যে তার চিন্তা হল, যদি ছেলেটা না বাঁচে? তারা না হয় কেউ লোপাকে খবর দেয়নি, তাই বলে তারও কি উচিত ছিল না দেবুর খবর নেওয়া? খালি অপরের ঘাড়ে দোষ চাপালে কি চলে? কর্পোরেশনে, কাউন্সিলে, মীটিংএ কী হয়? বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা প্রকাশ্য গালাগালি করলেও আবার পরক্ষণে ত তাদেরই সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়?...চোখের জল মুছে লোপা ভেতর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

গিয়ে সে দেখল বাইরে চারদিকে আলো জ্বলছে। রাত তখন দুটো বেজে গেছে। পা টিপে টিপে সে শাশুড়ীর ঘরের সামনে গিয়ে দেখল, সেখানে কেউ নেই। পাশের ঘরের দরজায় উঁকি মেরে দেখল, ঘরে নীল আলো জ্বলছে। নার্স দেবুর মুখের সামনে, অক্সিজেনের ফানেল ধরে আছে। খাটের মাথার দুপাশে স্বামী ও শাশুড়ী বসে আছেন। দুজনেরই চোখ বোজা, বোধহয় তন্দ্রা এসেছে। দরজার আরও সামনে লোপা এগিয়ে গেল, দেবুর মুখখানি দেখতে লাগল। এই কদিনে তার কী চেহারা হয়ে গেছে! অমন যে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে শুকিয়ে ম্লান হয়ে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে আছে।—ঠিক একগাছি শুকনো মালার মতো। ঠোঁট দুটি শুকনো, চোখের পাতা বোজা। এই ছেলে লোপাকে মা বলে ডাকার জন্যে পাগল, যতদিন ডেকেছে আদরের বদলে বকুনিই খেয়েছে। লোপা তাকে কোনওদিন একটা ভালো কথাও বলেনি। ঐ কচি ছেলের মুখে 'মা' ডাক কেন তার এত খারাপ লেগেছে? দেবু যদি তার পেটে হ'ত আর 'মা' বলে ডাকত, তাহলে কি সে এমনি করে মানা করতে পারত? ...লোপার চোখ ছাপিয়ে জল এল। ধীরে ধীরে গিয়ে সে বিছানার পাশে বসল। তার দিকে একবার চেয়েই নার্স নিজের কাজ করতে লাগল। লোপার চুড়ির টুংটাং শব্দে অনুপের তন্দ্রা ভেঙে গেল, অবাক হয়ে সে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল।

আদেশের স্বরে লোপা বলল—যাও, ওঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নাওগে।

তুমি? তুমি কেন এলে, লোপা? ডিফথিরিয়া ছোঁয়াচে রোগ, না এলেই ভালো করতে। সারাদিন খেটে এসেছ যাও, শুয়ে পড়ো। আমরা মায়ে-ছেলেতে ম্যানেজ করে নোব। এই একটু আগেও জেগেছিলাম, কখন চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল, টের পাইনি।

কেন? তোমাদের বুঝি ছোঁয়াচের ভয় নেই? তোমরা বসতে পারো, আর আমি পারি না? তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী অধিকার দেবু আমায় দিয়েছে।

* * *

দেবু নড়ে উঠল, ঘুম ভেঙে গেল। —উঃ, মা, মা, কষ্ট! —জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, জল খেতে চাইল। নার্সের হাত থেকে চামচ নিয়ে লোপা নিজে দেবুর মুখে জল দিল। দেবুর বুকের কাছে ঝুঁকে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আদর করে লোপা বলল—এই যে তোমার মা, দেবু। তুমি ত মার কাছেই রয়েছ বাবা। কী কষ্ট হচ্ছে?

রোগের কষ্ট ভুলে গিয়ে দেবু চোখ মেলে চাইল, লোপাকে দেখে যেন কেমন হয়ে গেল। দেবুর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খেয়ে লোপা বলল—ঘুমিয়ে পড়ো দেবু। তোমার মা তোমায় ছেড়ে উঠবে না।

শীর্ণ ছোট্ট হাত দুটি তুলে দেবু লোপার গলা জড়িয়ে ধরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল। অনুপ আর জ্যোতির্ময়ী অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

সরল গৃহচিকিৎসা

(৫ম), ৫৲

ডাঃ মণি মুখোপাধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক প্রবেশিকা

মূল্য ২৸৹

কিং এণ্ড কোং

(১৮৯৪)

৯০।৭এ, হ্যারিসন রোড

শাখা ঃ

১২, রয়েড ষ্ট্রীট ঃ

১৫৪, শ্যামাপদ মুখার্জি রোড

—কলিকাতা—

—যা বলেছেন—আমারও ঐ দশা! কারুর প্রশংসা করতে হ'লে কি বলেন জানেন? বলেন—একেবারে ধোপদোরস্ত।

দুজনেই হেসে ওঠেন। একটু উচ্চকণ্ঠে। তারপর দুজনেই একটু চকিত হ'য়ে ওঠেন।

সুইচ টিপে পাখা বন্ধ ক'রে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজেও এক কাপ চা নিয়ে বসেন পুষ্পিলা। দুজনেই নীরবে খানিকক্ষণ চা-পান করতে থাকেন। তারপর হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই দুজনেই পূর্ব সূত্র ধ'রে হেসে ওঠেন।

—চমৎকার লাগছে সকালটা। প্রথম ফাল্গুনের রোদ্দুর—এখনও মিঠে মিঠে স্বাদ! বাতাসও তেমন কনকনে নয়। পাখাটা বন্ধই থাক।—আর এক পেয়ালা চা ঢাললেন পুষ্পিলা।

—না না থাক থাক—আচ্ছা দিন—চমৎকার চা তৈরি করেন আপনি—

পুষ্পিলার সঙ্গে নিকুঞ্জের যেন অনেক দিনের বন্ধুত্ব—এমনই একটি ঘরোয়া আবহাওয়া গড়ে উঠেছে যদিও পুষ্পিলার ফ্ল্যাটে তিনি এই প্রথম ঢুকলেন। মুখের আলাপ বহুদিনের। নিকুঞ্জের স্ত্রী ও পুষ্পিলার মধ্যে যাতায়াত আছে।

—মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না হ'লে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়াই যায় না। এই দেখুন না—আপনাকে মনে হ'তো বেশ বদমেজাজী বুঝি, কিন্তু আসলে কি অমায়িক—

—দেখুন—নিকুঞ্জ সুচিন্তিত ভাবে বললেন—আপনার সম্বন্ধেও কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল, মনে হ'তো দাম্ভিকা এক নায়িকা, কিন্তু এখন দেখছি ঠিক তার উলটো।

দু-জনেই আবার হেসে ওঠেন—একটু আস্তে। ঠুনঠান ঠিনঠিন চুড়ি ও পেয়ালার শব্দের সঙ্গে হাসির ঝংকারটি বড় মানাল। আর সেই ঝংকার ছাপিয়ে একটি মধুর স্বর পঞ্চমে বেজে উঠল।

নিকুঞ্জ বললেন—কোকিল ডাকছে।

পুষ্পিলা হাসলেন—আমার বারান্দায়। একটা পুষেছি। আজ কদিন থেকে খুব ডাকছে।

—পরিতোষ বাবু ভাগ্যবান। আপনার মতন এমন সুরুচিসম্পন্না শিক্ষিতা মহিলাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেয়েছেন—

ঠোঁট কুঁচকে একটা তাচ্ছিল্যসূচক আওয়াজ করলেন পুষ্পিলা—তিনি তা মনে করেন না। বরঞ্চ ভাবেন রুচিবাতিকের রুগী আমি, স্বার্থপর—হিংসুটে—কুচুটে—ঝগড়াটে—

—কেন—কেন—নিকুঞ্জ মর্মাহত হলেন। যেন তাঁকেই কেউ ঐ কথাগুলি বলছে। এক অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যক্ষ উদাহরণে তিনি স্তম্ভিত!

—হিংসুটে নই? —ছলছল কণ্ঠে বললেন পুষ্পিলা—রাত দুপুরে তিনি কাপড় কাচবেন—সে আমি সহ্য করতে পারিনে, তাই আমি হিংসুটে। তাঁর মতন কাপড় কাচতে নাকি ধোবারাও পারে না—সে কথা আমি মানিনে তাই কুচুটে। এসব নিয়ে কিছু বললেই আমি ঝগড়াটে। তাঁর কাপড় কাচার সুখ আমি দেখতে পারিনে—তাই আমি স্বার্থপর আর আমার রুচির মার্জিত রূপটা বাতিক মাত্র।

—ওঃ—নিকুঞ্জ রাগতভাবে বললেন—কাপড় কাচা মানুষগুলি তার মানেই বোঝে না—

পুষ্পিলা ঠোঁট কাঁপিয়ে বললেন—শুধু ভাই? আমরা খরচে, বাউণ্ডুলে, আমরা উড়নচণ্ডে—

যোগ দিলেন নিকুঞ্জ—আমরা লণ্ড্রিতে কাপড় দিই তাতে আমাদের নাকি সর্বস্ব পুড়ে যায়—

—মণ দরে সাবান আর সোডা কিনে রাখলেই ও'রা খুশি হন বেশি—পুষ্পিলা ছেদ টানলেন।

—রীতিমত একটা বিলাস—বুঝলেন পুষ্পিলা দেবী! ও'র কাছে কলতলায় বসে কাপড়ে সাবান মাখাবার মতন সুখ আর কিছুতে নেই—বুঝলেন—

—একটা নেশা—বরঞ্চ বলতে পারেন। না হ'লে আপিস থেকে খেটেখুটে এসে—গালগল্প নয়, বিশ্রাম নয়, সিনেমা নয়, আড্ডা নয়—কিছু নয়, শুধু মাত্র কাপড় কাচতে কেউ লেগে যায়?

চোখ পিটপিট করে নিকুঞ্জ বলেন—রজকিনী রামী ও শুনেছি বেশ কলঙ্কমাখা। চণ্ডীদাসকে যদি রজকিনী রামী নিয়ে ঘর করতে হ'তো তাহলে আর শীতল পায়ে শরণ নেবার কথা মনে করতে হ'তো না।

অভিমানাহত হ'য়ে পুষ্পিলা ছলছল সুরে বললেন—তবু তো আপনাদের একটা আদর্শ আছে, কাব্যের নায়িকা রামী দেবদী। কিন্তু আমাদের মনের শান্তি কোথায়? সান্ত্বনাই বা কোথায়? একটাও কাব্যের নায়ক দেখাতে পারেন—যে ধোপা? একটিও নেই—

—ধোপার আর আমাদের কি সান্ত্বনা? [illegible] পুষ্পিলাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন নিকুঞ্জ।

কিন্তু বৃথা। মনের আবেগ ক্ষোভ হ'য়ে গুমরে উঠছিল বুকে, এবার বৃষ্টি হ'য়ে দু এক ফোঁটা ঝরে পড়ল।

—ইস্—[illegible]—ভাবলেন—[illegible]। —বিহ্বল নিকুঞ্জ তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দেন রুমালের জন্য। না, ভুলে গেছেন—অথচ জামা বদলেছেন সকালে। মেজাজও খিঁচড়ে ছিল—তাই কাচা রুমাল নিতে ভুলে গেছেন। কিন্তু তাতে কি? উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ উদ্যোগেই হ'য়ে থাকে আর তাঁর সামনে আজ একজন শ্রীমতী [illegible]—তিনি [illegible] হ'য়ে বসে থাকবেন? [illegible] নিজেও [illegible] চুপ করে থাকবেন? এতে তার মাথা ঠিক থাকে? আর মাথা যদি ঠিক না থাকে তাহলে কি এ জ্ঞান থাকে যে পুষ্পিলারই পাশে [illegible] দিয়ে তিনি তাঁরই চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন?

—থাক থাক—বললেন নিকুঞ্জবাবু, [illegible] হবেন না। আমরা শিক্ষিকা—আমাদের জীবন নিয়ে কত গল্প লেখা হয়। আমরা অসুখী, আমাদের বিয়ে হয় না, আমাদের জীবন নীরস, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করি—আরো কত কি! কিন্তু এ পর্যন্ত কি একজন লেখকও আমাদের একজনেরও সাংসারিক সমস্যার কথা ভেবে-চিন্তে লেখেছেন? সারা দিন মেয়ে ঠেঙিয়ে আর অশিক্ষিত প্রতিবেশিনীদের চক্ষুশূল হ'য়ে ঘরে ফিরে রাতে একটু ঘুমোতেও পারব না? অমনি সুরু হবে ঝপাঝপ ঝপাঝপ ধপাধপ ধপাধপ—মনে হয় যে, মাথার মধ্যেই কেউ যেন কাপড় আছড়াচ্ছে—

—বাসনা—বাসনা—বুঝলেন—বাসনাসক্ত! [illegible] শাস্ত্রকারেরা [illegible]—যাদের বাসনাসক্ত তাদের ভোগান্তি নেই ভোগান্তি হচ্ছে আমার আর আপনার। এ একটা বদভ্যাস—বুঝলেন—একটা ব্যাধি—

—দুরারোগ্য ব্যাধি—পুষ্পিলা এবার একটু মিঠে মিঠে হাসলেন।

—ঠিক—দুরারোগ্য ব্যাধি—মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিকুঞ্জ বললেন—যার প্রধান উপসর্গ হচ্ছে সাবান কেনার বাতিক আর সর্বদাই কি-কাচি কি-কাচি ভাব! বুঝলেন পুষ্পিলা দেবী—এই যে লন্ড্রি থেকে আনা কাপড়-জামা আলমারিতে নিশ্চিন্তে রেখে যাব তা যে আমার স্ত্রী আমার অনুপস্থিতিতে বার ক'রে কেচেকুচে ইস্ত্রি ক'রে আবার রেখে দেবেন না—এমন কথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি না।

—আমার ঠিক অতটা নয়—পুষ্পিলা আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন—তবে কি জানেন, সহ্য-শক্তি ব'লে একটা কথা আছে। সেটার অতীত ব্যাপার আমাদের দু-জনেরই হ'য়ে যাচ্ছে।

—হ'য়ে যাচ্ছে——ঘাড় কাত ক'রে নিকুঞ্জ সায় দিলেন। আচ্ছা, এবার উঠি—লণ্ড্রিটা আবার না বন্ধ হ'য়ে যায়—

হ্যাঁ, আমিও উঠি, একটু যাবো। মার্কেটিংয়ে। আমাদের আবার এই রবিবারটি ছাড়া সুবিধে হয় না। ইস্কুলের কাজ—বড় খাটুনি—

নিকুঞ্জ চলে গেলেন। পুষ্পিলাও উঠলেন। সকালটি বেশ কাটল। কোকিলটা খুব ডাকছে। চমৎকার ঠাণ্ডা রোদটি, হাওয়াও কেমন মিঠে। মুখে পাউডারের পাফটা একবার বুলিয়ে পুষ্পিলাও বেরিয়ে গেলেন।

(২)

পুষ্পিলাও বেরুলেন আর পরিতোষবাবুও [illegible] দেখা হ'তে [illegible]। দরজায় টোকা দিতেই সদুর মা এসে ছিটকিনি খুলে দিল।

—বৌমা বাড়ীতে আছে? পরিতোষ জিজ্ঞাসা করেন।

—না? এই বেরুলেন।—সদুর মা ওপরতলার দিকে একবার চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখাল—ওপরতলার ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁকে মা চা ক'রে খাওয়ালেন, এই তো—সেই সব বাসনপত্তর ধুচ্ছিলুম যে—

—কে ওপরের ভদ্রলোক? নিকুঞ্জবাবু?

হাঁ বাবু, ঐ দিন দাদাবাবুর ঘরেতে—

—আচ্ছা, আচ্ছা পরিতোষ [illegible] থেকে [illegible] একখানা [illegible]। —না এবার, —[illegible] এখন কিছু বলে গেছে কখন ফিরবে?

—না গো, আমায় শুধু ব'লে গেলেন, রান্না হ'য়ে গেলে দাদাকে খেতে দিতে বলিস সদু—আমার জন্যে যেন বসে না থাকেন।

—যাক—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন পরিতোষ। কিছুক্ষণের জন্য শ্রীমতীর কুঞ্চিত রুক্ষ দৃষ্টির হাত থেকে অব্যাহতি। ছাড়া পেয়ে গেল পরিতোষের। এখন এক প্যাকেট নতুন চালান সিগারেট কিনে আনা যাক।

দরজা খুলে বেরুতেই ওপর থেকে মিঠে গলায় কুণ্ঠিত অনুরোধ ভেসে এল নীচে—শুনুন—

পরিতোষ এদিক ওদিক চাইলেন—ওপর দিকেও চাইলেন—দেখলেন নিকুঞ্জগিন্নী।

নিকুঞ্জগিন্নী বিলোল কটাক্ষে মাথার কাপড় একটু টেনে এবার সলজ্জ ভাবে বললেন—দেখুন, একবার আসবেন? একটু বিপদে পড়ে গেছি।

বিপদে? কি বিপদে? রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন পরিতোষ। একটু ভীতু ভীতু নিরীহ

কুসুমিতা অমিয় তরফদার

মজা৷ ক'রে কথা বলেন আপনি। পুষ্পদি শুনলে রাগ করতেন।

—কোথায়? শুনেছেন নাকি?—হাতে পটল জড়ানো পরোটা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন পরিতোষ।

—আচ্ছা বাস্তবাগীশ মানুষ তো আপনি। আমি এমনি কথার কথা বললুম।—মনটা নরম হ'য়ে এল মায়ারাণীর। শিশুর মতন মন পরিতোষের। এমন মানুষের সঙ্গেও ঝগড়া করেন পুষ্পদি!

—আর দুখানা পটল-ভাজা এনে দি?

—না—না—

—তা হলে একটু আচার? খেয়ে দেখুন—আমের বরফি—আমি নিজের হাতে করেছি—

—কখন করেন এ-সব?—একখন্ড বরফি মুখে দিয়ে বলেন পরিতোষ—সন্দেশ কোথায় লাগে?

—এই তো আমাদের কাজ!—অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন মায়ারাণী—মুক্খু সুক্খু মানুষ আমরা—বিদ্যেতো দু-কলম নেই যে ঘরে টাকা আনব! তাই ঘরের টাকা যতটা বাঁচানো যায় তারই চেষ্টা করি। আপনি তো ভালো মুখে খেলেন—ঘরের মানুষটি মুখেও তোলেন না এ সব। ঐ দেখুন জেলিজ্যামের বোতল—

—আশ্চর্য তো!—অবাক হয়ে, আহত হয়ে এক রকম কাতরেই ওঠেন পরিতোষ!—এই সব ফেলে জেলি-জ্যাম! ও তো পয়সা দিলেই পাওয়া যায়! আর এই আমের বরফি? পাবেন কোথায় কিনতে?

—তবেই বুঝুন, কি মানুষ নিয়ে ঘর করি!—ছলছল চোখে তাকাল মায়ারাণী। মাথা ছড়াতে ছড়াতে বললেন—ধোপাবাড়ী দিলে কাপড়-চোপড় টেকে না, মোটে—বাড়ীতেই আমি সব কাচি—কিন্তু এ নিয়ে অশান্তির শেষ নেই! আমি নাকি কাপড়ের পরমায়ু বাঁচাবার জন্যে তাঁর পরমায়ু ক্ষইয়ে ফেলছি।

—কি রকম!—উত্তেজিত হয়ে পড়েন পরিতোষ। রীতিমত উত্তেজিত হয়েই বলেন—রেখে দিন ও-সব বিরুদ্ধ পক্ষের নালিশ—নিজেদের কাপড় নিজেরা কাচবো—তাতে কার কি নালিশ?

—ঐতো—রেকাব আর গেলাশ সরাতে সরাতে মায়ারাণী বলেন—সে আর কে বোঝে? সেদিন উনি লণ্ড্রি থেকে কাপড়-জামা এনে আলমারিতে রাখলেন—আমি ভাবলুম দেখি কেমন কেচেছে! তা দেখি কাপড়ময় চোরকাটা। সেগুলি একটি একটি করে তুলে আবার ইস্ত্রি করতে গিয়ে দেখি কাপড়খানায় এক জায়গায় নীল বেশি পড়ে গেছে। তাই সাবান দিয়ে কেচেকুচে আবার ইস্ত্রি-টিস্ত্রি করে রেখে দিলুম। তা উনি এসেই গজরাতে লাগলেন—কাপড়ের তো এ রকম ভাঁজ ছিল না—

—নিকুঞ্জবাবু কি এসেই কাপড়ের ভাঁজ পরীক্ষা করেন?

—না তা নয়, তবে সেদিন কি মতি গেল! বললেন—আমায় একখানা ফরসা ধুতি বার ক'রে দাওতো—একবার বেরুতে হবে সরকারের কাছে। আমিও মরতে ঐটিই বার ক'রে দিলুম। দেখেই বললেন—আমার ধুতি নয়—এ অন্য কারো ধুতি। তারপর এ-কথা সে কথা হতে হতে বেরিয়ে গেল কাচবার কথা। তারপর কি রাগ ঐ মানুষের! ওঃ—ভাবতেও এখনো গায়ে কাঁটা দেয়।—ও কি—ও কি—আপনি কেন প্লেটটা তুলছেন? দিন দিন—আমার হাতে। ছিঃ ছিঃ—লজ্জাই দিলেন—গল্পে গল্পে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম—এই নিন জল—হ্যাঁ—ঐখানেই রাখুন—নিন মশলা—

মশলার দুটো কুচি মুখে ফেলে পরিতোষ উঠলেন—যাই, মেলা কাজ পড়ে আছে—

—আমিও উঠি এবার। রান্না-বান্না পড়ে আছে, কুটতে ধুতে কম সময় যাবে না। আচ্ছা—আসুন—

চমৎকার সকাল—একটু বেলা হয়েছে বটে কিন্তু বেলা বলে মনেই হচ্ছে না। হু হু করে কন্‌কনে বাতাস বইছে—এদিকে আবার মিঠে রোদ্দুরটিও কড়া হয়ে উঠছে—রঙিন জামা-কাপড় শুকোবার আদর্শ দিন বললেই হয়—মায়ারাণী উঠলেন। কাচা কাপড়ের আণ্ডিল নিয়ে ছাদে উঠলেন শুকোতে দিতে।

(৩)

দিনটা আজ ভালোই কেটেছিল—গোলমাল বাধল রাত্রে।

প্রথম সুরু করলেন পুষ্পিলা। রেগে গিয়ে একটা বড় প্লেট ছুঁড়ে ফেলেছিলেন জলের বালতি তাক ক'রে—ভেঙে কুচি-কুচি হয়ে ছড়িয়েছিল চারপাশে ভাঙা প্লেটের কুচি। রাতের খাবার টেবিলে সাজিয়ে পরিতোষের অপেক্ষায় বসেছিলেন তিনি, দেরি দেখে সদুর মা-কে পাঠালেন ডাকতে।

সদুর মা এসে বললে—বাবু ইস্তিরি করতে লেগেছেন মা—

আর সহ্য হলো না পুষ্পিলার। নিজেই তরতরিয়ে চলে গেলেন বারান্দা পেরিয়ে ছোটো কোণের ঘরে। দেখলেন পরিতোষ ইস্ত্রি করছেন। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি তোলা—অল্প অল্প ঘামে তাঁর কপাল চিক্‌চিক্ করছে—মুখে একটি পরম তৃপ্তির হাসি। দেখে আরো জ্বলে উঠলেন পুষ্পিলা—যেন তাঁর মাথার মধ্যে কেউ একটা পিন্ ফুটিয়ে দিলে। টান দিয়ে তিনি পরিতোষের কাপড়খানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—টেবিল দিলেন উলটে—তরতরিয়ে ছুটে এলেন খাবার ঘরে। পেছন পেছন পরিতোষও ছুটে এলেন—শান্ত হয়ে বললেন—কি হোলো তোমার ইলু—কি হোলো?

—এই হয়েছে—মাছ-ভাজার প্লেটটা বালতির দিকে তাক করে ছুঁড়ে ফেললেন পুষ্পিলা—হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—আর এইবার—

চট ক'রে হাতটা চেপে ধরলেন পরিতোষ—কি হয়েছে কি তোমার?

এইমাত্র ইস্ত্রিটা রেখে এসেছেন পরিতোষ, হাতের চেটো রীতিমত গরম। সেই তাপ পুষ্পিলার হাতের শিরা বেয়ে পৌঁছলো মগজে—চাপা গর্জন ক'রে বললেন পুষ্পিলা—কি হয়েছে? সে কথা ধোবায় কি বুঝবে? তুমি কি আর ভদ্রলোক আছ—

—কি বলছ তুমি পুষ্পিলা—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?

—মাথা খারাপ? তা হতেও পারে?—উত্তেজনার ঝাঁজ খানিকটা বেরিয়ে যেতেই চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন পুষ্পিলা—দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন—বললেন—দিনরাত মাথার ভেতর ছপাছপ ধপাধপ শব্দ হ'লে মাথার কি দোষ? ওঃ অসহ্য—অসহ্য—

ওদিকে প্লেট ভাঙার ঠন্‌ঠনাৎ ঝন্‌ঝনাৎ ঝন্ আওয়াজ পেয়ে নিকুঞ্জগিন্নী মায়ারাণী নেমে এসেছিলেন। কান্ড-কারখানা খানিকটা দেখে খানিকটা এ'চে নিয়ে ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন নিকুঞ্জকে—ওগো—নীচে পুষ্পদির কি হ'য়েছে—সদুরমা মাথায় জল দিচ্ছে—পরিতোষবাবু চেপে ধরে আছেন—আর পুষ্পদি থেকে থেকে •ধোবা—ধোবা ব'লে চেঁচিয়ে উঠছেন—চারপাশে ভাঙা কাঁচের বাসনের কুচো ছড়ানো—পরিতোষবাবুর পা কেটে রক্ত পড়াচ্ছে—

—ঠিক হ'য়েছে—আস্তে আস্তে সিগারেট ধ'রিয়ে ঠোঁটের কোণে সেটাকে চেপে ধরে একটান দিয়ে নিকুঞ্জ বললেন—গলা কেটে রক্ত পড়ানো উচিত ছিল। একটা বাঁদরের গলায় পড়েছে মুক্তোর মালা—স্কাউন্ড্রেল একটা—

—খুব যে দরদ দেখছি!—হাঁপানো বন্ধ হ'য়ে যায় মায়ারাণীর মুহূর্তের মধ্যে।—তা পুষ্পদি মুক্তোর মালাই হোন আর যেকটি হোন—তোমার গলায়ও পড়বে না, তোমার মাথায়ও চড়বে না—পরস্ত্রীর দরদে জ্বলুনি ছাড়া লাভ কি?

সক্রোধ কটাক্ষপাত করে নিকুঞ্জ বললেন—এই সব পাড়াগেঁয়ে কথাবার্তা করে ছাড়বে? ঘর ছেড়েছ! কাজ ধরেছ ছোটলোকের—মুখের আর দোষ কি? কর্মের গুণ কোথায় যাবে—

—আমি ছোটলোক? আমি পাড়াগেঁয়ে?—মায়ারাণী কেঁদেই ফেললেন ফ্যাঁক ক'রে।

—নও?—ধীরে ধীরে সিগারেটে আর এক টান দিয়ে নিকুঞ্জ বললেন—দিনরাত কাপড়-কাচা কি ভদ্রলোকের কাজ? যেমন জুটেছে আমার তুমি তেমনি জুটেছে পরিতোষ ঐ পুষ্পিলা দেবীর—

উত্তাপ চড়তে থাকে—ছড়াতে থাকে দুজনারই মনে, চ'রিয়ে পড়ে কথা থেকে কথায়। তারপর হঠাৎ নিকুঞ্জ উঠে পড়েন। লেখাপড়ার চাকা খুলে পাটকরা শাড়ী-জামা উঠোনে ছুঁড়তে থাকেন নিকুঞ্জ—ছিটিয়ে দিতে থাকেন চারপাশে—

মায়ারাণী দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন—নীল কল্কাপেড়ে শাড়ীটা হাবুডুবু খাচ্ছে চৌবাচ্চায়! দু'জোড়া ইস্ত্রি-করা টাই ঝুলতে থাকে পাইপের আঁকড়ার সঙ্গে—ফর্সা জামা-কাপড়গুলো উড়ন্ত বকের মতন ঝুপ্‌ঝুপ্ করে যেন বসে পড়ছে উঠোনে, কার্ণিশে, বারান্দায়—নাঃ, আর তিনি দেখতে পারেন না। হাত-পা অবশ হ'য়ে যায়—কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন মাটিতে—ওঃ, এমন নিষ্ঠুরও মানুষে হয়!

রাত গভীর হ'তে থাকে। চারপাশের উৎসুক মুখগুলি জানলা, ছাত আর বারান্দা থেকে সরে যেতে থাকে—মজা ফুরিয়ে গেছে। নিকুঞ্জ অরণ্য হ'য়ে বসে থাকেন, পুষ্পিলারও পুষ্পকান্তি মিইয়ে যায়—দুজনেই অনুতপ্ত হন। না—রাগের মাথায় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন—এতটা করা ঠিক হয়নি। বিয়ে-করা স্ত্রী যখন—নিকুঞ্জ ভাবেন। বিয়ে-করা স্বামী যখন—পুষ্পিলাও ভাবেন।

আর ভাবেন মায়ারাণী আর নিকুঞ্জ—কাল আরো কতটা কাজ বাড়ল—যত—সব—

দিগন্ত জানালা পথে স্থির দৃষ্টিতে বাইরের পানে চেয়ে আছে সীমা। তার দৃষ্টিতে এবং দাঁড়ানর ভঙ্গীতে মনের একাগ্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সুশান্ত জানে সীমা কি দেখছে। আজ কদিন ধরেই এমনি যখন তখন সে ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়ায়। মনের সবখানি একাগ্রতা নিয়ে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে ছোটকু গোয়ালার নধরকান্তি কাল গাইটি আর তার সাত দিনের বাছুরটির পানে। চেয়ে চেয়ে দেখে বাছুরটির স্বাস্থ্যসম্পদ সীমার চোখে মুখে ফুটে ওঠে কেমন এক-প্রকারের বেদনামিশ্রিত অতৃপ্তি। কিন্তু সুশান্ত কি করতে পারে। ওর এই ছেলেমানুষিতে কখন সে বিরক্ত হয়, কখন পায় দুঃখ। মুখে লেগে থাকে প্রশান্ত হাসি। অন্তরের কথা সে বাইরে প্রকাশ পেতে দেয় না। তাছাড়া মিথ্যা কথার সৃষ্টি করে অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি করতে আর সে চায় না।

স্বামীর উপস্থিতির কথা জানতে পেরে সীমা ঘুরে দাঁড়ায়। অকারণে তার দুটি গণ্ড লাল হ'য়ে উঠে। কতকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে মৃদু কণ্ঠে বললে, ছোটকু গোয়ালার বাছুরটা দেখছিলাম। বড় সুন্দর হয়েছে দেখতে। চমৎকার মোটাসোটা।

সুশান্ত একথার কোন জবাব দিলে না। বস্তুতঃ বলবার মত কিছু তার ছিলও না। সীমার এমনি অনেক পাগলামিকেই তার মেনে নিতে হয়। ওর মুখের পানে চেয়ে সীমাকে খুশী ক'রতে সুশান্তই শেষ পর্যন্ত পাগল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সে মোহও তার ইদানীং বহু পরিমাণে কেটে গেছে। আজ দীর্ঘ দুটি বছর ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে আসছে সে, কিন্তু দুঃখের কথা আজও সফল হ'তে পারেনি। সূচনায় অনেক স্বপ্ন তার দেখেছে, কিন্তু অতীতের সে স্বপ্ন দেখা বাস্তব জীবনে একটি মাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করে নিরন্তর পাক খাচ্ছে। হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও পিছলে দূরে স'রে যাচ্ছে। নইলে আজ এই মুহূর্তে ছোটকু গোয়ালার বাছুরটি সীমার চোখে এত মনোরম হ'য়ে উঠতো না। দৃষ্টি তার বর্ষণক্লান্ত মেঘমেদুর আকাশের পানে ছুটে যেতো। চোখে নামতো ভাব-বিহ্বলতা—মুখে দেখা দিতো মিষ্টি হাসি। সুশান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মনে হ'য়ে গেছে—জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির মধ্যে সে ফিরে গেছে। সুশান্তর মৌন মুখের পানে বারেক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে সীমা ডাকলে, শোন......

শুনবো বৈকি......না শুনলে চ'লবে কেন। তাদের বিবাহিত জীবন আজ এমন একটা গণ্ডীর মধ্যে এসে স্থির হ'য়ে আছে যেখানে এক বিন্দু মুক্ত বায়ু সে খুঁজে পাচ্ছে না। বাঁচবার জন্যে কষ্ট ক'রে তাকে দম নিতে হচ্ছে। অকারণ অভিযোগ আর মিথ্যা হয়রানি। তবুও সুশান্ত নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। আজও তার আশা আছে......।

সীমা একটু এগিয়ে এসে সুশান্তর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে পুনরায় বললে, শোন খোকার জন্যে যে নতুন ফ্রক আনবার কথা বলেছিলাম ওটা আর এনো না। আমি ভেবে দেখলাম—

কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে সুশান্ত জবাব দিলে, কিন্তু আমি যে আনতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সীমা মৃদু কণ্ঠে বললে, নিয়ে এলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিও। মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। আমার নিজের উপর বিশ্বাস নেই বলেই সেইহেতু অপরকেও বিশ্বাস করতে পারি না।

সীমার চোখে মুখে একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব ফুটে উঠলো।

সুশান্ত স্ত্রীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে কতকটা বিস্মিত হ'লো, কিন্তু মুহূর্তে সে-ভাব কাটিয়ে উঠে স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললে, এ কথা আবার কবে তোমাকে বলেছি আমি!

সীমা একটুখানি হাসলে, বললে, বলনি—কিন্তু বলা উচিত ছিল। এতদিন কি মিথ্যে তোমার সঙ্গে ঘর করেছি! তবে এত বেশি তোমার এতখানি নির্বিকার থাকা উচিত হয়নি। খোকার ভালমন্দ চিন্তা কি শুধু একলা আমার—সে কি তোমার কেউ নয়?

চমৎকার অভিযোগ! কিন্তু আজও সে প্রতিবাদ করলে না। তার কপালের শিরাগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত হলো মাত্র। পরমুহূর্তেই প্রশান্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে তাকাল।

স্বামীর এই নীরবতায় সীমা ক্ষুণ্ণ হলো। বললে, তোমার ঐ দৃষ্টিকেই আমি সহ্য করতে পারি না। এর চেয়ে তিরস্কার করো। তার বরং একটা মানে হয়।

সুশান্ত হেসে জবাব দিলে, কিন্তু তুমিতো জান সীমা তর্ক করাটা যেমন আমি ভালবাসি না, তেমনি পারিও না।

সীমা রাগ করে বললে, আর আমিই বুঝি খুব ভালবাসি?

সুশান্ত পুনরায় হেসে জবাব দিলে, আমি শুধু আমার নিজের কথাই বলেছি।

সীমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, তুমি সব সময়েই নিজের কথা বলো। অপরের কথা তুমি কি কখনও জানবার চেষ্টা করো না ভেবে থাক! অথচ একথাটাও তুমি কখনও স্বীকার করো না।

সুশান্ত একটু যেন গম্ভীর হলো। সে বললে, জোর ক'রে কেউ কাউকে স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করাতে পারে না। কথাটা তোমার বেলায়ও যেমন সত্য আমার বেলায়ও ঠিক ততখানি সত্য।

সুশান্তর আজকের কথা বলার ধরণে সীমা কিছুটা বিস্মিত হ'লো। এ যেন অতি সূক্ষ্ম একটা আবরণের আড়াল থেকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের উঁকিঝুঁকি। সোজা ভাষায় প্রতিবাদ করা চলে না। শুধু মনটা বিরূপ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে।

সীমা সুশান্তর কথার কোন প্রত্যুত্তর ক'রলে না। নিঃশব্দে সরে গিয়ে পুনরায় জানালার পাশে দাঁড়াল।

সুশান্ত ব'ললে, তুমি অন্যায় রাগ করছ সীমা। তুমিতো জান জোর ক'রে একটা কথা বলা তখনই সম্ভব যখন আমি নিশ্চিত জানব যে, আমার সে কথাটার যথার্থ মূল্য পাব।।

সীমা আচমকা ঘুরে দাঁড়ায়। জ্বলে উঠে

বললে, তুমি ব'লতে চাইছ কি! কবে কোন্ কথাটা তোমার অবজ্ঞা করা হয়েছে শুনি?

সুশান্ত রাগ ক'রলে না। ধীরে ধীরে ব'লতে লাগল, অবজ্ঞা করা হয়েছে এমন কথা আমি বলিনি সীমা। পাছে কথা না থাকে এই ভয়টাই বড় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া এ কথাটা কি আমি জানি না যে, তোমার খোকার মঙ্গল কামনা তোমার চেয়ে বেশী আর কেউ করতে পারে না। কাজেই জোর করে আমার মতামতকে যদি চাপিয়ে না দিয়ে থাকি সেটা কি আমার অন্যায় না কর্তব্যে অবহেলা?

সীমার মুখে খানিক অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠলো, সে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলে, এ সব ছেলেভুলানো কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া তুমি যখন জানতে আমি ভুল ক'রছি তখন তা সংশোধন ক'রে না দেওয়াটাকে আমরা কর্তব্যে অবহেলা ব'লেই জানি। কিন্তু এ নিয়ে আর নয়—অনেক কথা কাটাকাটি হ'য়েছে।

সীমা থামতে চাইলেও সুশান্ত থামতে পারলে না! সে বললে, এ তোমার কেমন অনুযোগ সীমা! ভুল ব'লে আমি আগেও জানতাম না, এখনও জানি না। ওটা আমার সন্দেহ।

সুশান্ত একটু থেমে চিন্তা করে পুনশ্চ বললে, তবে একটা কথা, যা কিছুই করতে চাও মন স্থির ক'রে ক'রো।.....

সুশান্ত ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে অন্যত্র প্রস্থান ক'রলে। সীমা পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালা পথে বাইরে দৃষ্টি স্থাপন ক'রলে।...

কালো গাইটা তখনও তার বাছুরের গাত্র লেহন ক'রছে। বাছুরটা মায়ের গণ্ডে থেকে থেকে ঢু মারছে। বার কয়েক একো বেঁকে লাফ ঝাঁপ দিয়ে পুনরায় মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। গরুটি আবার সুরু করলে সন্তানের গাত্র লেহন ক'রতে। সীমা বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নীরবে সে গিয়ে দাঁড়ায় তার দু বছরের শিশুপুত্রের পাশে। ছেলেটা ঘুমুচ্ছে। ক্ষীণজীবী রুগ্ন শিশু। এমনি এক দুর্বল ক্ষীণ শিশুর মা হবার কামনা সে কোনদিন করেনি। সন্তান প্রায় সব মেয়েই কামনা করে। সীমার মধ্যেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু কি সে কামনা ক'রেছে আর এ কি সে পেয়েছে! প্রথম দর্শনে সীমা আনন্দের পরিবর্তে শিউরে উঠেছিল। মাগো! একে সে কেমন করে মানুষ ক'রে তুলবে! সেদিনের সে প্রশ্নটা আজও প্রশ্ন হ'য়েই তাকে অনুক্ষণ খোঁচা দিচ্ছে। অথচ সাধ্যমত সীমা চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। যখন যা ভাল মনে হ'য়েছে.....আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, বান্ধব যে যখন যেমনটি ব'লেছে সীমা সেই-ভাবেই চ'লেছে কিন্তু দীর্ঘ দু বছর পরেও সে দেখতে পাচ্ছে যে এক ইঞ্চিও সে এগোতে পারেনি। আর এই নিয়েই স্বামীর সংগে তার যত বিরোধ।

সুশান্ত শিক্ষাদীক্ষায় আধুনিক যুগের হ'লেও ব্যবহারে সে তার পিতামহের যুগে র'য়ে গেছে। তার চিন্তা ক'রবার একটা নিজস্ব ধারা আছে যার রীতি-প্রকৃতি একটু অন্য ধরণের। কিন্তু তাই ব'লে অপরের স্বাধীনতায় সে কোনদিন হাত দেবার পক্ষপাতী নয়। এমন কি তার স্ত্রীর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সন্তান তাদের দু'জনার। সেখানে রক্তের যেমন সম্বন্ধ রয়েছে, তেমনি আছে একটা মস্ত বড় দায়িত্ব। তাই সূচনায় সে সীমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তাকে সন্তানের উপর দিয়ে এভাবে পরীক্ষা চালাতে দেখে নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ ক'রেছে। সীমা তার কথায় একেবারে কান দেয়নি এমন কথা সুশান্ত ব'লছে না, কিন্তু আস্থা রাখতে পারেনি এ কথাও ঠিক। সন্তানের মঙ্গল কামনা সীমাকে ধৈর্যহীন ক'রে তুলেছিল। সুশান্ত স্ত্রীর মনের ভাষা প'ড়তে পারে। এবং পারে বলেই সে চুপ করে ছিল। কিন্তু আজ যখন আবার নতুন করে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হ'তে চলেছে তখন সাধারণভাবে একটু প্রতিবাদ না ক'রেও সে পারল না। ফলে অদৃষ্টে জুটল অনুযোগ!

তা জুটুক—সুশান্ত ভাবলে, ওর জন্যে তার ক্ষোভ নেই। তাছাড়া সীমা আজ তাকে যে কথাটা স্পষ্ট করে বললে, তা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ কথা সে ব'লতে পারে। নইলে এতবড় একটা দুর্বলতা কেন তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এমন একটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এত একখানি অনাসক্তির পেছনে কোনো দুর্বোধ্য আসক্তি থেকে এমন নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছিল এই কথাটা চিন্তা ক'রতে গিয়ে সুশান্ত নিজেকেও অনেকখানি অপরাধী বলে গণ্য ক'রলে। এবং যেমন আচমকা সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল তেমনি আকস্মিক ভাবেই আবার ফিরে এল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না ক'রে পার্শ্বকথার সুরে সে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস ক'রলে, সোজা লোক দুটির কথা ছেড়ে দিয়ে একটা সত্য কথা বলতো সীমা! হঠাৎ আবার তুমি খোকার দুধ বদলাতে চাইছ কেন!

সীমা স্বামীর এ প্রশ্ন বাদ ক'রলে না বরং [illegible] ব'ললে, আমি তো বলতেই চেয়েছিলাম তুমিই শুনলে না।

একটু থেমে একটু লজ্জিত হাসি হেসে সে পুনরায় ব'ললে, ছোটকু গোয়ালার ঐ কাল গাইটার দুধ আমি খোকাকে খাওয়াব—অন্য কিছু নয়।

একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সুশান্ত বললে, বাছুরটা ভারী সুন্দর হ'য়েছে সীমা। তাই না?

সীমা লজ্জারুণ হ'য়ে উঠল। সুশান্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চেয়ে রইল।

সীমা কতকটা আত্মগতভাবেই পুনরায় বলতে লাগল, তুমি ঠিক বলেছ। বাছুরটা যেন নন্দবাবুর ছোট ছেলেটাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

সুশান্ত এবারে শব্দ ক'রে হেসে উঠল। তরল কণ্ঠে বললে, তোমার হ'লো কিগো? কার সংগে কিসের তুলনা দিচ্ছ!

এ হাসিতে সীমা একবিন্দু লজ্জা পেল না বরং হাসিমুখেই জবাব দিলে, তা হোক, রক্ত মাংসের জীব তো বটে?

এ কথা অবশ্যই স্বীকার ক'রতে হবে। তাছাড়া সুশান্ত সীমার মনের কথা জানে। কোথায় ওর অতৃপ্তি, ওর কাঙ্গালপনা সে কথা লুকোবার চেষ্টা সে কোন সময়ই করে না। বরং একটু অস্বাভাবিক রকম স্পষ্ট।

* * *

ছোটকু গোয়ালা আসা যাওয়া সুরু করেছে স-বৎসা কাল গাইটি সহ। এ বাড়ীর দুধের যোগান ছোটকুই দিচ্ছে। সুশান্ত সবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রছে। কোন কারণেই সে আর মুখ খুলবে না। বরং উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করে আবার কবে সীমা তার নতুন সিদ্ধান্তের কথা সুশান্তকে এসে জানাবে। বস্তুত বর্তমান ব্যবস্থাটা সীমার অস্থির চিত্তের বহিঃপ্রকাশ বলেই সে ধরে নিয়েছে। গত দু বছরের অভিজ্ঞতা তাকে এই সিদ্ধান্ত ক'রতে বাধ্য করেছে।

নন্দবাবুর ছেলেটি কেমন ক'রে এত সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'লো......শ্যামবাবুর মেয়েটির স্বাস্থ্য কেন অতো খারাপ... সুধীরেন্দ্রর ছেলেটির অত সুন্দর মোটা-সোটা হওয়া কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো...ওরা কি খায়...কেমন ক'রে সন্তান পরিচর্যা করেন ওদের মায়েরা...কতটুকু খাওয়ালে কম খাওয়ান হয়, কতটুকুতে বেশী হ'য়ে যায় এ নিয়ে সীমা রীতিমত গবেষণা সুরু ক'রে দিয়েছিল। এক এক ক'রে সব কথাই এই মুহূর্তে সুশান্তর মনে পড়ছে। আর ভাবছে ছোটকু গোয়ালার পরমায়ু এ বাড়ীতে কতদিন!

কিন্তু সুশান্তর বিস্ময় দিন দিন বেড়েই চললো অভ্যস্ত নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম দেখে। মনে হ'চ্ছে ছোটকু এ বাড়ীতে কায়েমী বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। বিগত দিনের রসালো দিনগুলির রসটুকুও মাঝে মাঝে ফিরে পাচ্ছে। সীমার মাতৃমূর্তির আড়াল থেকে তার প্রিয়ার রূপটি ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ ক'রছে। ওর মধ্যে আবার ফিরে এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য। আর সুশান্ত আবার নতুন ক'রে অনুভব ক'রছে তার নিজের অস্তিত্বকে যা এতদিন পারিপার্শ্বিকের নিষ্পেষণে মৃতপ্রায় হ'য়ে গেছিল। সুশান্তর মনটা বড় হালকা লাগছে। উৎসমুখের ভারী পাথর কপাটটা খুলে গেছে—প্রাণের স্রোত উঠছে সুরে।

ছোটকু গোয়ালার আদর বেড়েছে সীমার কাছে। তাদের শিশুপুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে এই অল্প সময়ের মধ্যেই। সীমা অবশ্য একথা মুখে বলে না। সব কথা বলা চলেও না। প্রকাশ পায় তার ব্যবহারে। নইলে নানা ছুতোয় ছোটকু সীমার কাছ থেকে বকশিস আদায় ক'রতে পারতো না। সীমা বলে, নিকগে দুটো টাকা। খাঁটি দিয়ে দুটো টাকা বেশী নিলে দুঃখ হয় না। তাছাড়া [illegible] নেই ...ও চমকে উঠে থেমে যায় এবং অকস্মাৎ প্রসংগান্তরে উপস্থিত হ'য়ে বলে, বাছুরটা বড় হ'চ্ছে আর দুধও কমে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আপত্তি তুলেছে, অন্য গাইয়ের দুধ নিতে হবে, নইলে বাছুর বাঁচান যাবে না। .....

সুশান্ত একটু হেসে বললে, তাই বুঝি এই ঘুষের ব্যবস্থা করেছ?

সীমা একটা জবাব দেবার জন্য মুখ তুলতেই বাইরে থেকে ছোটকুর আহ্বান শোনা গেল। সীমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে নিঃশব্দে প্রস্থান ক'রলে। এবং খানিক পরে পুনরায় ফিরে এসে একমুখ হেসে বললে কথাটা তুমি মিথ্যে বলোনি। ঘুষই বটে। ছোটকুর মুখে আর বাছুরের কথা শোনা যায় না।

(ইহার পর ১২৮ পৃষ্ঠায়)

বসন্তের মৃত্যু

সুরাইয়া হোসেন

ফেব্রুয়ারীর বিদীর্ণ বুক থেকে
একমুঠি ঠাণ্ডা রক্ত নিয়ে
ফাল্গুন ছিটিয়ে দিলো
গুল্‌মোরের মাথায় মাথায়॥

রমনার গাছে গাছে ডালে ডালে
সহস্র ফুলের সম্ভাবনা দল দিয়েছে
তবু বেদনায় মোড়া তাদের ছায়া
তবু ভুলতে পারে না
একটি দিনের কাহিনী॥

বাংলার নদীতে অরণ্যে
চৈতালীর গমেভরা মাঠে মাঠে
সীমান্ত নিস্তব্ধ পাহাড়ে, পাথারে
পদ্মার বাঁকে বাঁকে
কাঁখে কলসী নারীদের বুকে বুকে
নিহত বসন্তের কথা
নিহত সন্তানের কথা
হতভাগ্য স্বামীর নিষ্করুণ মৃত্যুর কথা॥

ফেব্রুয়ারীর বুক থেকে
এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে এসে
আগন্তুক ফাল্গুনের
রমনায় নিরন্তর
ব্যর্থ প্রয়াস হাহাকার করে।
তারে কে বলে দেবে
বসন্ত বেঁচে নেই আর।

(২১শে ফেব্রুয়ারির স্মরণে)

আলো ও ছায়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আলোময় এ ধরণী—
এরে আমি বেসেছিনু ভালো,
ব্যর্থ করে ভালোবাসা
আমারে করেছে দৈন্য হীন,
হে কল্যাণ, হে সুন্দর,—
নয়নের সম্মুখে যে আলো
মুছে দেবে তুমি মৃত্যু—
জানি আমি সদা তাহা জানি।
এড়াইতে পারিব না তোমার স্নেহের আলিঙ্গন
দীন হয়ে যাবে দেহ,
দৃষ্টিহীন হবে মোর আঁখি,—
ফেলে রেখে যেতে হবে
অতি প্রিয় যত পরিজন,
আজ ভাবি সেদিনের
কতদিন আছে আর বাকি।
তাই তো হিসাব করি আমি—
কি পেয়েছি কি দিয়েছি,
কি কাজ করিয়া আজও যাই,
অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ নিয়ে দিনগুলো
গত করি স্বামী,
জানি বন্ধু, সত্য তুমি—
তাই তো তোমারে পেতে চাই।

মুক্তি

প্রকৃতি দেবী

আমাকে মুক্তি দাও।
ইট-কাঠ-পাথরের পাকা ঘর থেকে
অসীমের ছোঁয়া পেতে দাও।
বাতায়ন ফাঁকে ভেসে আসা,
সুদূর দিগন্ত-লীন অনন্ত নীলিমার ভাষা
শুনে মোর ডানা কেঁপে ওঠে।
ওখানে যখন দেখি সূর্যের অকৃপণ দান
প্রাণ ভরে দেবে,
আমার বিহঙ্গ-বুকে শিহরণ লাগে॥

তুহিন শীতল এই পরিপাটি সোনার খাঁচায়
স্পন্দিত জীবনের উষ্ণতা উত্তপ্ততা নাই।
এত শুধু নিয়মের ছকে
প্রতিদিন নিষেধের পাশা খেলে যাওয়া।
এর চেয়ে ভাল কালমেঘ,
ভাল কাল-বোশেখীর উদ্দাম মাতাল
ঝোড়ো হাওয়া,
সে ত বেঁচে থাকা।
সে ত এই তিলে তিলে আপনাকে
ভুলে যাওয়া নয়,
নরক তৃপ্তির কূপে
মণ্ডূক মন নিয়ে সুখে ডুবে থাকা॥

বাধার দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়,
প্রাণের বিস্ফোরকে বিদীর্ণ করে দিয়ে
পাড়ি দিতে চাই
নক্ষত্রলোকের আহ্বানে।
আমার যাত্রাপথ ব্যেপে কত মরু কত জনপদ,
কত সুখ-দুঃখের ঢেউ,
জীবনের বালুচরে, আঁকাবাঁকা অচেনা অক্ষরে
অদৃষ্টের লিপিলেখা লেখে।
সুন্দর-অসুন্দরে মেশা,
কত আশা কত ভালবাসা,
সব আমি যাব দেখে দেখে॥

ক্লান্ত যদি হই?
শ্রান্তি যদি নেমে আসে ঝিমা পক্ষপুটে?
ঘনশ্যাম বনানীর কোণে
ঐ যে বিশাল-বক্ষ উদার উন্নত মহীরূহে,
সবুজে পাতায় ভরা শাখায় শাখায়
দোলা লাগে দখিনা হাওয়ায়,
সেখানে দিনান্তে মোর আশ্রয় আছে।
জ্যোতিষ্মান চন্দ্রাতপতলে,
ভূমার অমেয়-স্বপন দেখে যাব
প্রতি পলে পলে॥

সবুজ পাপড়ী

স্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী

সবুজ সুস্মিত পাপড়ী সুরভি শোভন
সেপথে নিলীন বায়ু হিম প্রস্রবণ।
শিশির নিষিক্ত রাত্রি তারায় তরল,
তুমি পথিক আমি পথ শপথ সরল॥
কোনও একদিন গ্রহতারা জন্মান্তর বাদ,
শতাব্দের অন্তরের ঘোর সিন্ধুনাদ।
ঊর্মিময় ফেনপুঞ্জে স্ফটিক বিম্বিত,
তোমার আমার চলা ছিল সুচিহ্নিত।
প্রমিত সন্ধ্যায় স্থির নিভৃত এষণা
চিন্ময়ী চেতনায় চ্যুত পাপড়ী শৈবাল ভূষণা॥
তারপর কতদিন কত দীর্ঘদিন,
সময়ের অলক্ষ্যে উচ্ছ্বসিত তুসার তুহিন।
কোন্ অতলান্তে সুপ্ত হোল চেতনান্তরিত,
মুহূর্তের মুৎপাত্রে সঞ্চিত মহার্ঘামৃত।
নিঃসৃত ক্ষরিত উচ্ছলিত হোল দুঃখ দহে
ঝরে গেল নীলপাপড়ী
কালের বৈশাখী সম্মোহে।
ক্রমে ক্রমে এক দুই শত সহস্রাধিক
তোমার আমার অমীমাংসিত প্রশ্ন প্রাথমিক।
অর্ধস্ফুট পুষ্পদল নানা বর্ণানুরঞ্জিত,
[illegible]
যে বাসনা ছিল আমার সর্বেন্দ্রিয়াতীত,
সবুজ পাপড়ী প্রেমে
সে প্রত্যাশায় তুমি তন্দ্রাতুর॥

এমন দিনেতে

মণিমালা দাশগুপ্ত

অনেক দিন ধরে হয়েছে অনেক কথা।
একাধিক কথা, লক্ষ ভাবের মালা—,
সুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে—, মনের আকাশ নীল—,
গুন্ গুন্ গানে—, লক্ষ তারকা-জ্বালা।

এমন দিনেতে—, অতর্কিত কোন ক্ষণে
হঠাৎ ছায়ারা আমারি আঙিনা ঘিরে,
থরো থরো প্রেমে জাগায় আর্তনাদ
ছিন্নমেঘেরা বাতাস ব্যাকুল করে।

বিমূঢ় চেতনা—, শঙ্কিত—শরাহত,
চঞ্চল আঁখি অনন্ত বেদনাভারে।
ছায়ারা তখনো সারি সারি সারি আসে—,
তারার আকাশে আলো নেই কোনওধারে।

লক্ষভাবের ছিন্নমালার ফুল—,
সুর-ঝরা দিনে বিহ্বল-ব্যাকুল।
সাত সমুদ্রের সপ্ত দীর্ঘশ্বাস—,
কেঁদে কেঁদে ফেরে—
মেঘে নাচে বিশ্বাস—॥

অধ্যাপিকা

অমরেন্দ্র ঘোষ

সমস্যা, একখানা বাসা-ভাড়া চাই—

তা হলে মিস রায়কেই আসতে বলবেন। আপনি কিছু জানেন না, আপনার সংগে আর বকবক করে লাভ নেই। একবার আপনাকে বোঝাব, আপনি গিয়ে তাঁকে বোঝাবেন, এ করে কি কাজ হয়? ক্ষমা করবেন, যথেষ্ট স্যাড্ এক্সপিরিয়ান্স আছে বলেই এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই করে করে আমার বয়স হল প্রায় চল্লিশ। বুঝলেন, আমার জীবনে দালালী না করেছি হেন চিজ নেই। আমি বেশি কথা বলতে ভালবাসিনে। এ তো চাব, দরকার হলে আমি ঘাটের মড়ারও কনে জুটিয়ে দিতে পারি। পশুপতি এখানেই থামে না। সে বেশি কথা বলতে ভাল না বাসলেও আরো মিনিট পাঁচেক বক্তৃতা দেয়। তারপর বলে, তবে আসুন আজ আপনি।

তবু আগন্তুক ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে। বয়স বাইশ তেইশ, পরনে বুশ সার্ট ও প্যাণ্ট, মুখে একটি সলজ্জ ভাব।

পশুপতি বিস্মিত হয়। একটু আগেই না ছেলেটি বলেছিল যে তার কলেজে লেট হয়ে যাচ্ছে?

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। জ্যৈষ্ঠের শেষ বেলা। এখনো আলো জ্বলেনি রাস্তায়। ফুটপাথের সম্মুখে রকে বসে কথা বলছে পশুপতি মিত্র। মাথার কার্নিশ ঘুরিয়ে কালো কুচ-কুচে চুল থাকলেও, ছাদে একটি নিটোল টাক। পশুপতি চালশে ধরা চোখ জোড়া বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে। কিছু বলবেন নাকি? কাল তিনি এলে আমাকে এখানেই পাবেন। রোজ বিকালে ছটা নটা আমার এখানেই ডিউটি। শুধু ঝড়বৃষ্টি হলে ঘরে। নইলে এইটাই আমার অফিস গোডাউন সেক্রেটারিয়েট। পশুপতি আরো খানিকটা বাঁকে একটু যেন হাসে।

তবু ছেলেটি বিদায় হয় না।

একটু বিরক্ত হয় পশুপতি। কিন্তু তা থাকে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত। এ ব্যবসার এ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে ধৈর্য এবং সংযম। কিছু বলার থাকলে বলুন।

এবার ছেলেটি সসংকোচে বলে, মিস রায়ের সংগে আমার তেমন পরিচয় নেই, কি করে এই ফুটপাথে তাঁকে সন্ধ্যাবেলা একা আসতে বলি! আর বললেও কি তিনি আসবেন?

না আসতে পারলে আমি কি করব বলুন! আপনার আশীর্বাদে কত জজ ব্যারিস্টার নিত্য এখানে আসছেন। এই তো সেদিন, যাকগে সে কথা। তিনি যদি ঠুনকো আত্মসম্মানের ভয়ে এখানে আসতে না পারেন, তা হলে তাঁর কাজও হবে না। পশুপতি আবার পাঁচ মিনিট টানা বকবক করে যায়। বকতে বকতে মুখের প্রায় ফেনা বেরিয়ে আসার জোগাড়। পশুপতি একটু দম নিয়ে বলে, কেন, আপনি সংগে আসবেন?

কটা দিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ ছাড়া আমি একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি। আর সংগের কথা বলছেন, তিনি পর্দানসিনা মহিলা নন। তিনি একজন বয়স্কা অধ্যাপিকা।

ও? পশুপতির ভিতর দারুণ একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ পায় না।

পশুপতি এখনো অবিবাহিত। একটা ডিগ্রি আছে বটে এম এ। কিন্তু তাতে মরচে ধরেছে অনেককাল। এ মরচে যে কানে ধরে তোলাবে, তার সংগে আজ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয়নি।

পশুপতি বলে, তা হলে তো তিনি একাই আসতে পারেন।

কিন্তু এ পাড়াটার যে বড্ড দুর্নাম রটেছে। গত সপ্তাহে নাকি দিনে-দুপুরে হার চুড়ি ঘড়ি আংটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুর্জনার।

এ অভিযোগ সত্য। একটা ঘটনা নাকি পশুপতির রকের সুমুখের রাস্তায়ই ঘটেছে। চুপ করে থাকে সে। ছেলেটি পাল্টা কোনো প্রস্তাব করলে সে চট করে রাজী হয়ে যাবে দুহাতে কাজের বোঝা দূরে ঠেলে।

কিছু না বলে ছেলেটি এবার চলে যায়।

পশুপতিকে চালশেতে ধরলেও দূরের দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ। সে চেয়ে থাকে। তার মনে হয় ছেলেটি ফিরবে। ফিরে এসে বলবে আরো দুটি একটি বাজে কথা। এমন তো অনেকেই করে। এর বিনিময়ে উত্তর দেওয়ার কোনো প্রফিট নেই। তবু আজ সে দেবে। সে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখবে না।

কিন্তু ছেলেটি বড় রাস্তায় পড়ে চলন্ত ট্রামে উধাও হয়।

আর একজন আধা দালাল প্রায় ঝিমিয়ে পড়েছিল। সে বলে ওহে, যার সংগে তেমন পরিচয় নেই, তার জন্যে মাথা ব্যথা—যত সব ফোরটুয়েণ্টি।

পরদিন পশুপতি মিত্র যথারীতি দু হাত চওড়া পাঁচ হাত লম্বা তার রকে ছটার একটু আগেই অফিস খুলে বসে। এখন রোদের তাত না থাকলেও ঝাঁঝ রয়েছে যথেষ্ট। অফিস কাছারী থেকে বাড়ি ফিরে একটু সুস্থ হয়ে এলেই না লোকজন আসবে। সে প্রায় সাতটা। তবু ছটার আগেই আজ প্রস্তুতি।

পশুপতি মনে মনে প্রশ্ন করে কেন?

দালালী সে আজ করছে না, সুরু করেছে কিশোর বয়স থেকে।

পাশের বাড়ির হেমলতার বয়স বছর

আসুন, আসুন—বসুন। **একটু সরে** বস্‌তো কেষ্ট।

কেষ্ট তেরছা হয়ে কাল্পিক মারে—একটু সরে কি সরে না।

পরিশ্রান্ত ছেলেটি দুজনার মাঝখানে এসে ঠেলে-ঠুলে বসে পড়ে। উঃ ছুটতে ছুটতে আসছি। ভাবলাম আপনাদের দেখা পাই কিনা। রাত বোধহয় নটা।

আমরা কাজের মানুষ। এতক্ষণ থাকবার কথা নয়—নিতান্ত একজন মহিলাকে কথা দিয়েছি, তাই—কিরে কেষ্ট?

চোখ বুজে কেষ্ট বলে, হুঁ।

তা তিনি কোথায়? পশুপতি জিজ্ঞাসা করে।

ছেলেটি জবাব দেয়, মিস রয় বললেন, যে ডাকাতে পাড়া রক্ষে করো, আমি একা যেতে পারব না। টাকা-পয়সা যা লাগে তা আমি দিচ্ছি—তুমি ভাই যা হক্ ঠিক করে এসো। দশ পঁচিশ বেশি লাগলেও পয়লার আগে চাই। একখানা বেড রুম, একখানা ড্রইং-রুম, জল-কল, বাথরুমে আলাদা।

ভাড়া?

একশর মধ্যে। কিছু কম হলে খুবই ভাল।

এ্যাডভান্স?

দরকার হলে, এক মাসের দেবেন।

আমাদের কমিশন?

যা চালু আছে, এক মাসের মত ভাড়া।

অর্ধেক ভাড়ায় দুখানা ঘর আছে এবং চমৎকার সাউথ ফেচিং, বালিগঞ্জ পাড়ায়। সে বেলা তো পঞ্চাশে চলবে না।

কেষ্ট বলে, দুশ' লাগবে? ইচ্ছে হয় দেবেন, নইলে কত ভাড়াটে পাওয়া যাবে। ছোটখাটো একখানা রাজবাড়ি!

ছেলেটি বলে, তা হলে আজ উঠি, কাল আবার আসব।

ওরা হুঁ হ্যাঁ কিছু বলে না।

ছেলেটি একটু দূরে চলে গেলে, পশুপতি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠতে চায়।

কেষ্ট বলে, থামো দাদা থামো। অত হাঁইপাঁই করলে আর দর থাকবে না আমাদের।

তবু পশুপতি হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায়। শুনুন, শুনুন।

ছেলেটি থামে।

নিচু গলায় পশুপতি আরম্ভ করে, অধ্যাপিকা আপনার কি হন? আজ তো আপনার আসার কথা ছিল না।

হ্যাঁ ওঁরই আসা উচিত ছিল। কিন্তু কি করি বলুন—অনুরোধ এড়ান গেল না। এক বাড়িতে থাকি, নিচ-ওপর ঘর। দিদির সঙ্গে নাকি ওঁর খুব ভাব। নইলে এত পরিশ্রমের পর কে আসত এখানে।

বলবেন এমন বাড়ি আর হয় না—যদি উনি একান্তই নেন, তবে দালালী না দিলেও চলবে। এই যে হঠাৎ পালা-বদল এ যেন পশুপতির কানেই বেসুরো লাগে। সে নিজেকে সংযত করতে পারে না আজ।

ছেলেটি বলে, এর মানে?

পরে বলব।

একি ঠাট্টা করছেন আমাকে?

না, না সত্যি বলছি।

ছেলেটি বিশ্বাস করে না।

দাঁড়িয়ে থাকবেন না, কেষ্ট বেটা সন্দেহ করবে। এত কাজ করি একখানা বাড়ি কি এমনি জুটিয়ে দিতে পারিনে? একা দায় ঠেকে পরেছেন শিক্ষিতা মহিলা। আমরাও তো মানুষ।

পশুপতি চলে আসে। তেমন কোনো প্রশ্ন করলে হয়ত জবাব দিতে পারতো না? সে বুঝতে পারে, তার এ প্রস্তাবটা নিতান্ত খাপছাড়া হয়েছে। যাঁর ভিতর এতটুকুও আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি কখনো এ অনুগ্রহ নিতে পারেন না—বিশেষ করে একজন অপরিচিতা মহিলা।

কেষ্ট বলে, মুখে যতই বড়াই করি, কিছু টাকা নইলে বাড়িটা অন্য হাতে চলে যাবে। অত ঘুষ ঘুষ করলে টাকার কাজ হয় না।

কত চাই?

অন্তত বিশটা। আজ চাকর বেটার হাতে কিছু দিতে হবে। কাল পাঁচ টাকার আম আর সন্দেশ কিনে গিন্নী মার সঙ্গে দেখা করে কর্তাকে পাঠাতে হবে। তারপর আরো যা লাগে এদিকওদিক।

একটাও হাতে নেই।

বেশ, তা হলে নিশ্চিন্দি ঘুমাও, আমি উঠি।

দাঁড়া কেষ্ট, একটু ভেবে দেখি কোথাও কিছু আছে কিনা।

পশুপতি একটা আংটি বন্ধক রেখে কুড়িটা টাকা এনে কেষ্টর হাতে দেয়। উপরে ধর্ম আর নীচে তুই—কেষ্ট আমায় কিন্তু ভোগা দিস নি।

কেষ্ট চলে গেলে পশুপতি খানিক উদভ্রান্ত হয়ে থাকে। ভাবী ঘরণীর উদ্দেশ্যে সে আংটিটা গড়িয়েছিল। তখন তার বয়স ত্রিশ। কিন্তু এমন পথ ধরে তাকে হাঁটতে হল, যে কোনোদিনই তার স্বপনসাধ-কল্পনা বাস্তবে রূপ পেল না।

পশুপতি আজ রাত্রেও ভাল ঘুমাতে পারে না। আবোল-তাবোল কত কি যে ছাই-পাঁশ ভেবে চলে। এতখানি লেখাপড়া শিখে যদি একটা বাঁধা মাইনের চাকরীও করত! আজ আছে, কাল নেই—তাই তার সাহস জন্মেনি বুকে। এতকাল একটা তেজ ছিল বয়সের, এখন সে পলতেটাও যেন তেলশূন্য হয়ে এসেছে। সুমুখে আঁধার। কিন্তু কি যেন দেখায়, জানায়, পাওয়ায় বাকি থেকে গেল!

ঘোর অতৃপ্তিতে বিছানায় সে ছটফট করে।

সকালবেলা কেষ্ট আসে। সব ঠিক করে এয়েছি দাদা?

বেঁচে থাক কেষ্ট—এযুগে তুই বুঝি একমাত্র ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। বিকালের দিকে ছেলেটি আসে। আজ বেশ হাসি-খুশি মুখ। সে এসে বলে, এই নিন দেড়শ টাকার চেক। এখন একটা রসিদ করে দিন। পঞ্চাশ এ্যাডভান্স, আর একশ আপনাদের।

কেষ্ট বলে, ওতে হবে না।

পশুপতি বলে, তুই চুপ কর। তোর বড্ড খাই। তোর ভাগেরটা তো পেলেই হল। পঞ্চাশ টাকার বাড়িতে কি চাইলেই দেবে দুশ টাকা দালালী? এক্ষুণি তো একখানা রসিদও দেওয়াতে পারবিনে বাড়িওয়ালার। শুধু পজেসন দিয়ে এর বেশি কি চাস?

কেষ্টর মুখে চুণকালি পড়ে।

এখন রসিদ কে দেবে কেষ্ট? তোর বাড়িওয়ালা তো গিরিডি?

কেন তুমি দিয়ে রাখো—পরে বাড়ি-ওয়ালার কাছ থেকে এনে দেবে?

এ নিতান্ত কাঁচা কাজ। একটু এদিক-ওদিক হলে আমার কানকাটা যাবে। তোকে দিয়ে কিছুই বিশ্বাস নেই। পশুপতি একটু ইতস্ততঃ করে এবার ছেলেটির দিকে ফিরে বলে, একবার কি মহিলাকে এখানে আনা যায় না?

সম্ভব নয়?

মাথা চুলকে পশুপতি বলে, এখন যদি আমি যাই?

তিনি হয়ত বাড়ি নেই, ফিরবেন রাত দশটায়।

খুব বুঝি টিউসনি করেন? খুব কর্মী মহিলা যা হক।

ঠিক কিছু বলতে পারিনে! তবে কদিন ধরে শুনছি খুবই তিনি ব্যস্ত—অন্ততঃ দিদির মুখে তাই শুনি! আমি তো বেশি কথা বলি নে!

একটু ইতস্ততঃ করে পশুপতি জিজ্ঞাসা করে, কত বয়স তাঁর?

আমি বলতে পারব না। একটু লাল হয়ে ওঠে ছেলেটি। দিদির বন্ধু নিশ্চয় দিদির সমবয়সী।

এ অবান্তর কথা কেষ্টর ভাল লাগে না। ছেলেটিরও।

কি নাম তাঁর?

মিস রয়—এর বেশি তো আমি জানিনে।

ও নামে তো রসিদ হয় না? পুরোটা চাই। সে ছাড়া বাড়ি-ঘর দেখালেন না।

কেষ্ট বলে, আমরা কি জোচ্চোর? পজেসন দিয়ে দেব। দুদিন বাদে পাকা বিল। এখন ওঁর নামে একটা রসিদ করে দাও তুমি?

কেষ্টকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করে পশুপতি বলে, কাল সকালে আমি যদি যাই?

তিনি ছটার আগেই কলেজে বেরিয়ে যান—দেখা হওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই।

মুস্কিলে পড়ে পশুপতি। অনেক চিন্তা করে সে মিস রয়কেই একখানা রসিদ লিখে দেয়। কাল পজেসন্ দিতে পারবি তো কেষ্ট?

খুব! পাকা কথা হয়ে গেছে কর্তার সঙ্গে।

পরদিন দুপুরের পর জিনিষপত্র আসবাব ফার্ণিচার আসে লরীতে। মিস রয়ের হয়ে পজেসন্ নেয় ছেলেটি? কেষ্ট ও পশুপতির উপস্থিতিতে। তারা শোনে আজও নাকি হেভিলি এনগেজড্ মিস রয়। সন্ধ্যার একটু আগে ওরা আবার রকে এসে নিত্যকার মত বসে। দু-একটা কাজ-কর্মের খোঁজ-খবর জোটে—দু-একটা ছোটখাটো বায়না। তারপর রাত নটা। কেষ্ট তার বখরা নিয়ে খুশিতে শিষ দিয়ে চলে? পশুপতি রাতে আর কিছু খায় না।

ছেলেটি কদিন আর আসে না। কেষ্টও না? পশুপতির মনে হয় জীবনের যা কিছু দেনা পাওনা সব চুকে বুকে গেছে!

কিন্তু মিস রয়ের আসল নামটি জানা হয়নি। তাই এখনো রয়ে গেছে বাড়ি ভাড়ার

(ইহার পর ১২৮ পৃষ্ঠায়)

টেলি: এনামেলার্স
ফোন ৩৪—৩৫৫২
নবরূপে নূতন অলঙ্কার
গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার,
জুয়েলারী এবং সাচ্চা
গ্রহরত্নাদি বিক্রয়ার্থ
মজুত থাকে
আমাদের প্রস্তুত গহনার সোনা
পানমরা বাদ না দিয়া খরিদ করি।
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গিনি স্বর্ণের সর্বপ্রকার অলংকার বিক্রয়ার্থ সর্বদা মজুত
থাকে অথবা অর্ডার অনুযায়ী তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়।
মহাত্মা গান্ধীর অভিমত:—“আমি স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর নানাপ্রকার শিল্পকার্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে, দেশীয় শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের নিকট আমি ইহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।”

নিখুঁত শিল্পীর পরিচয়
পেতে হলে
আমাদের এখানে আসুন
রাজলক্ষ্মী শিল্প মন্দির
মণিকার ও স্বর্ণশিল্পী
ফোন: ৩৪-৩৮৫২
১০১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

কবিতা রায় বলেন
নিয়মিত ব্যবহারে মুখ আরো
সুন্দর ও লাবণ্যময় হবে। ব্রণ
ও মলিনতা উঠে গিয়ে ত্বক
কমনীয় ও উজ্জ্বল করবে।
মন মাতানো গন্ধে ভরপুর!
সকল ষ্টেশনার্স ও
ঔষধালয়ে পাওয়া যায়
বোরোলীন
উচ্চাঙ্গের ফেসক্রীম
পরিবেশক:-
জি, দত্ত এণ্ড কোং
১২, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা—১

খুট! খুট!!......

দরোজার ঝাঁপখানা নড়ে উঠতেই সজাগ চোখ দুটো সামনের দিকে মেলে ধরলে বৈদ্যনাথ; নড়ে চড়েও বসলো একটু।

তারপর প্রশ্ন ক'রলে—

"—ঃ কে ও? বাঁশ দরোজায় নাড়া দেয় কে?"

উত্তর আসে না। তার বদলে ভেসে আসতে থাকে একটানা একটা 'গোঁ-গোঁ' শব্দ।

বাইরে, অবিশ্রান্ত দাপাদাপি সুরু ক'রেছে আজকের এই বর্ষা রাত;—চারিদিকে ফিরে ফিরে আছড়াচ্ছে ওর ফোঁপানো কান্না।

ও যেন কাঁদছে!

আর, সেই কান্না, সেই দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছেঁচা বাঁশের দেওয়াল,—টিনের চালা।

ঘরের এপাশে নাবাল জমি, ওপাশ থেকে মাঠের সুরু।—

সে পথে পাড়ি দিয়ে আর কোন গ্রামে, কোন মানুষের পাড়ায় পৌঁছানো যায়,—বৈদ্যনাথ তা জানে না;

জানেনা বৈদ্যনাথের স্ত্রী আশাও। শুধু জানে, বহুদূর পথ পায়ে হেঁটে যেখানে এসে ওরা মাথা গুঁজবার মত এইটুকু জায়গা পেয়েছে, সেইখানেই মিলেছে ওদের পরম সান্ত্বনা।

এটুকুও হয়তো বা অনেকের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু থাক্ ও কথা!

তবু, চোখের ওপোর দিয়ে ঐ ছবিগুলোই যখন একটার পর একটা ভেসে ভেসে চলেছিল, তখন সেদিকে তাকিয়েও ঘুম এলো না।

উঠে বস্‌লো বৈদ্যনাথ।

বিছানা আর বালিশের তলা হাতড়ে জ্বাললে দেশলাই ধরালে টিনের ল্যাম্পটা; ল্যাম্পের আলোয় এধারের দেওয়ালে প'ড়লো ওর নুয়ে পড়া রোগা দেহটার বিকৃত ছায়া,—আর অন্যদিকের দেওয়াল থেকে সশব্দে খসে প'ড়লো এক চাংড়া ভিজে মাটি।

চম্‌কে উঠলো আশা; ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। ছেলেটার জ্বরতপ্ত রুগ্ন দেহখানা ঘেরা হাতটা প্রশ্নের ভঙ্গীতে উঁচু ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

—"উঠলে যে? হাঁপের টানটা এখন আবার বেড়েছে নাকি?"—

"—ঃ না।"

"—ঃ তবে?..."

"—ঃ তবে আবার কি? কেবল শুয়ে থাকতেই পারে নাকি মানুষে? আমি তো পারিনা।"

"—ঃ কিন্তু, না পারার জন্যে রাত দুক্কুরে আলো জেলে ব'সে থাকতে হবে? এ আবার কি ন্যাকামো!"—

"—ঃ তুমি তো ন্যাকামোই দেখো কেবল, নয়?"

"—ঃ ন্যাকামো নয়তো কি বলবো? দরকার নেই, কিছু নেই,—তবু জেবলে জেবলে কেরোসিন খালি পোড়াচ্ছ! ন্যাকামো নয়?..."

বৈদ্যনাথ এবারও জবাব দেয়, কিন্তু খুব আস্তে—

"—ঃ বেশ্ ক'রবো, জ্বালবো,—আমার খুশী!"

কথাটা যেন ঘুমন্ত কানেও গরম তেল ঢেলে দিলে খানিকটা। ঘুমের যে রেশটুকু ছিল এতক্ষণ সেটুকু চোখ আর মন থেকে ছুটে গেল অকস্মাৎ—।

আশা মুখ ফেরাল;

আড়চোখের বাঁকা দৃষ্টিতে বৈদ্যনাথ দেখলে সে চোখে জ্বলে উঠেছে যেন শত মণির দীপ্তি।—

আশা তখন ব'লে চ'লেছে—

"—ঃ বিষ নাই, তাও কুলোপানা চক্কোর! দেশ, ঘর ছেড়ে এসেছ কি একলাই? আর কেউ আসেনি! যারা এসেছে, তারা কেউ কোনও কাজ করে না? বেকার ব'সে থাকে? কিন্তু ব'সে ব'সে খাওয়া জোটে কয়জনের—?"

বৈদ্যনাথের কান দুটো যেন বন্ধ! কেবল নির্বাকে ব'সে দেখতে লাগলো ল্যাম্পটা জ্বলছে। শিখাটা ওর হ'য়ে উঠছে হলুদ থেকে লাল, আর লাল থেকে কালো!

তারপর—পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।—

দেখতে দেখতে কেরোসিনের ধোঁয়া আর গন্ধে ভরপুর হ'য়ে উঠলো ঘরের ভেতরটা।—

বৈদ্যনাথ উবু হ'য়ে ব'সে তাই দেখতে লাগলো।......

জড়ো করা দুই হাঁটুর মাঝখানে ঝুঁকে প'ড়লো ওর মাথাখানা।—পিঠের শিরদাঁড়াটা থেকে উঁচু হ'য়ে উঠলো সেই অনুপাতে।—কনুই দুটো মাটির চেয়ে উঁচু হ'য়ে রইল [illegible] [illegible]।

—সেদিকে না তাকিয়েও আশা ব'লে চ'ললো—

"—ঃ এত মানুষ এসেছে দেশ, ঘর ছেড়ে, কিন্তু খেটে খাচ্ছে সকলেই। যার যেমন ক্ষমতা, সেই [illegible] সে যোগাড় ক'রছে নিজের পেটের [illegible]। আর যার শক্তি নাই সে [illegible] [illegible] [illegible] ক'রে। কিন্তু এরকম কথার কথার জবাব দেওয়া তো কারো কাছে শুনিনি। [illegible] কথা [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] না—তারপর 'এটা [illegible] লাগে না', 'ওটা পারছিনে', 'সেটা করবো না'—এসব জবাব তো মুখে মুখে আছেই। [illegible] [illegible]—"

চম্‌কে [illegible] [illegible] [illegible]।

কথা [illegible]—[illegible] আরো কাছে টেনে নেয় আশা ওকে।—

দূরে—

"—ঃ খট্‌ ঃ খট!—"

বৈদ্যনাথ তখন আলো নিভিয়ে দিয়েছে আর সেই আলো নেভা অন্ধকার—পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে স্যাঁতানো আর পোড়ানো কেরোসিনের দুর্গন্ধে।

ছোট ছোট কয়টা পুঁটুলী দেহের এখানে ওখানে লুকিয়ে গাড়ীর পাদানিতে পা রাখতেই চোখের সামনে প'ড়লো একখানা চেনামুখ।

সবল, সুদীর্ঘ দেহটাকে কুঁকড়ে সে পথ দিলে আশার; তরকারীর বাজরাটাকে সরিয়ে ব'ললে—

"ঐ যে, ঐখানটায় জায়গা আছে।"

"—ঃ যাবো,—কিন্তু—"

গাড়ী তখন চ'লতে সুরু ক'রেছে। [illegible] [illegible] শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে আসছে প্লাটফর্মের শেষটুকু।

পাথরের গায়ে লেখা ষ্টেশনের নামটা চোখের সামনে থেকে স'রে যাবে এখনি। [illegible]

হলদে দেখা দেবে—দু'পাশের আম, জাম, কাঁঠালের বাগান—আর ধানক্ষেত।

একটা হাতের শক্ত মুঠোয় দরোজার হাতল ধ'রে ঝুলতে থাকে আশা; অন্য হাতে তখনও সামলায় পুঁটলীগুলো। ওগুলো সুপুরীর; চড়া দর এখন ওর কলকাতা সহরের বাজারে।

কেবল, একবার নিয়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারলেই হ'লো! তারপর?...হুঁ!...তারপর...

"—ঃ গেল! গেল!!"

সামনা সামনি কতকগুলি মানুষের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে চাকার শব্দে।

কি একটা আশঙ্কাও যেন রাতের অন্ধকার নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে আশার দৃষ্টিতে! চোখের পাতা দুটোও এ সঙ্গে বন্ধ হ'য়ে আসে হয়তো!

কিন্তু সে এক মুহূর্ত!

এক মুহূর্তের পরেই চোখ মেললে সে! সচকিতে তাকিয়ে দেখলে দুটো সবল হাতের আকর্ষণে গাড়ীর পাদানি ছাড়িয়ে উঠে এসেছে ও কামরার মাঝামাঝি। আর, ওকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে সেই লোকটা—যে তাকে একটু আগেই আসবার পথ দিয়েছিল।

—এবার চারিদিকে ভালো করে তাকাল আশা।—

নাঃ!—কামরা সুদ্ধ মানুষগুলো এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

যে কাঁদছিল—সে বললে—

"—ঃ এখুনি মরতে গো! অমন করে কেউ ওঠে নাকি গাড়ীতে—?"

এ অভিযোগ, এর আগেও হয়ে গেছে হয়তো—এখনও ওদের চোখে মুখে ঘুরে ফিরছে তারই বিস্ময়ের ছায়া।

কাপড়ের খুঁট একবার লক্ষ্য করে দেখলে পুঁটলীগুলো—

নাঃ! ঠিকই আছে।

যেগুলো ছোট ছোট সুপুরীর পুঁটলী একটারও স্থানচ্যুতি ঘটেনি তাহলে!

"—ঃ কিন্তু—হুঁ!......"

ম্লান একটু হাসির রেখায় ফুটে ওঠে ওর অধরোষ্ঠে! বলে—

"—ঃ আমার মতো মেয়েমানুষের কে আছে নাকি? তাই যে—"

সেই সঙ্গে বাড়ীতে রেখে আসা রুগ্ন ছেলে আর তার বাপেরও রক্তহীন মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বোধ হয়!

শিউরে ওঠে।

মনে মনে যেন সংকল্প করে বাঁচতে তাকে হবেই! মরলে চলবে না!

সে না বাঁচলে—ওদের অন্ততঃ এক মুঠো খাইয়ে বাঁচাবে কে?......

গাড়ী ছুটে চলে।

কানে আসে ওর চাকার অবিশ্রান্ত ঘস্-ঘসানি, আর দেহে লাগে ওর দোলন।

দুলছে! মালপত্র, যাত্রীরা—সকলেই দুলছে! কেউ দুলছে গাড়ীর পাদানিতে পা রেখে হাতল ধরে, কেউ দুলছে কামরার ভেতর বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে।

এ দৃশ্য আজকের নয়,—বহুদিনের। তবে আজকের যাত্রী সংখ্যায় বেড়েছে আগের চেয়ে অন্ততঃ সহস্র গুণ বেশী!

এরাই গাড়ী ভর্তি করে কাঁচামাল সহরের বাজারে পৌঁছে দেয় প্রতিদিন, আজও দিচ্ছে!—দেওয়ার শেষে দেনা-পাওনারও হিসাব মিটিয়ে ফিরে যাবে আজই!

বর্ণহীন এই কণাগুলোই আবার ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে চিরদিনের বৈচিত্র্যহীনতায়। এর যেন ব্যতিক্রম নেই; থাকতেও পারে না।

"—ঃ তোমরাই নতুন ঘর বেঁধেছ না,—ঐ মাঠের ধারে?"

"—ঃ হ্যাঁ। কিন্তু তোমারেও তো ঐদিকেই যেতে-আসতে দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে!"

"—ঃ কেন দেখবে না?"

লোকটা হাসে।

ফাটা, মোটা ঠোঁটের আগল ঠেলে বার হয় ওর দাঁতগুলো; সে দাঁত যেমন বড়, তেমনি কালচে। সেই সঙ্গেই চোখের কোলে কোলে কুঁচকে যায় পাৎলা চামড়া।

বহু রেখা পড়ে তার।

ও বলে—

"—ঃ দেখবে না কেন? পুরুষ-ছেলে আমরা, কত কাজে ঘুরতে হয়—হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, তাছাড়া এখান থেকে ওখান থেকে মাল কিনে এনে কলকাতায় বেচা, এইতো আমাদের কাজ; দেখবে না! আর মানে—আমাদের জীবনই তো এই, তার ওপোর কথাই নেই; কিন্তু বাপু তোমরা—"

কি কথাটা বল'তে গিয়েও সে আর বলতে পারে না, কিম্বা ইচ্ছে করেও বলে না হয়তো; তার বদলে ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে বিড়ি আর দেশলাই—বিড়িটাকে ধরায় এবার,—তারপর মুঠোয় চেপে ওটা হুস্ হুস্ করে টানতে থাকে অন্যমনস্কতায়।

বোধহয় কি ভাবে!

এরপর কিছু বলার দরকার,—অন্ততঃ আশার পক্ষে, তাই ও মাথার কাপড়টা টেনে নামায় একটু,—সিঁথি পর্যন্ত। বলে—

"—ঃ কি একটা কথা বলছিলে না?—"

"—ঃ বলছিলাম নাকি? ও—!"

লোকটা আবার একটু অন্যমনস্ক হয়; বোধহয় মনে মনে খুঁজতে থাকে হারিয়ে যাওয়া কথাটার খেই।

কিন্তু, দৃষ্টি ওর ভেসে বেড়ায়—মানুষের ভিড় কাটিয়ে, জানালা গলানো ফাঁকের আকাশে—মাটিতে আর ওরই মাঝখানে। দেখে—ওখানে নেমে এসেছে দুপুরের রোদ, মেঘহীন নীলাকাশ,—আর সবুজের সমারোহ। ঘোলা জলে দাঁড়িয়ে যেন মাথা তুলে তুলে চারদিকটা দেখছে চারা আউষ!

উড়ে বসছে ফিঙে!

খাবার খুঁজছে বকের দল।

বসন একবার তাকায় এদিক থেকে ওদিকে; দেখে মাঠের মাঝে মাঝে জলা, খাল। আম, জাম কাঁঠালের বাগান—আর মাঝে মাঝে মানুষের বসতি।

মানুষও তাহ'লে কম নেই দেশে।

তাকায় আশা-ও; কিন্তু হঠাৎ সশঙ্কিত হ'য়ে ওঠে ও। বলে—

"—ঃ কাস্টম ঃ কাস্টম উঠেছে গাড়ীতে। আমার এই পুঁটলী কয়টারে একটু—সামলাতে পারো? একটু"

ওর অসহায় চোখের দৃষ্টি কাতর আবেদনে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে! সেই সঙ্গে সমস্ত ভরসা এসে বাসা বাঁধে বসনের মুখের ওপোর।

কিন্তু, নির্বিকার চিত্ত বসনের; মুখভাবেরও কোন পরিবর্তন ঘটলো না।

তবু,—আশা বুঝলো,—ওর কৌশলী হাত দুখানার যাদু স্পর্শে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে তার এগিয়ে দেওয়া সুপুরীর পুঁটলী কয়টা।

"—ঃ খোকনের মা আছে না, খোকনের মা!"

বসন এসে দাঁড়াল দাওয়ার নিচে, উঠোনের মাঝামাঝি; হাতে ওর তরকারীর খালি বাজরা, মাথায় গামছাটা জড়ানো।

বারান্দায় বসে আজও বিড়ি ফুঁকছিল বৈদ্যনাথ;

বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে সে একবার দেখে নিল বসনকে, তারপর বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করলে—

"—ঃ কে ও, কারে খোঁজ?—"

"—ঃ ঐ সেই বউটিকে; যে রোজ সুপারী নিয়ে যায় কলকাতায়,—তাকে।"

"—ঃ কেন?—"

"—ঃ সেদিন সে বলেছিল তার ছেলের অসুখ। তারপর তিন-চার দিন আর দেখি না তারে; তাই এধার পানে যেতে যেতে এলাম একবার!—বলি, জেনে যাই খবরটা।"

"হুঁ!"

অনুচ্চারিত একটা জঘন্য মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথ সোজা করে নিলো নিজের নুয়ে পড়া পিঠ, আর মাজাটাকে।

তারপর নেমে এলো বারান্দা থেকে। আর একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

"—ঃ চেনা হয়েছে বুঝি?"

কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল প্রশ্নটা! সে স্বরে একটু বিস্মিত—একটু শঙ্কিতও হ'লো যেন বসন। একটা ঢোক গিলে জবাব দিলে—

"—ঃ না। হ্যাঁ.....মানে ঐ গাড়ীতে আসতে যেতে—" বাধা পড়লো বৈদ্যনাথের কথায়—

"—ঃ এটা ভদ্দর লোকের বসা; তা মানো?......"

বসনের মুখে কি একটা জবাব আসে; জবাবটাও কড়া। তবু, থেমে যায় ও,—বলে না। বলে বৈদ্যনাথ—

"—ঃ ভদ্দর লোকের বৌ-মেয়ের খোঁজ নিতে আস! আস্পদ্দা তো বড় কম নয়, হ্যাঁ....."

ভদ্রতার মাত্রা বোধহয় ছাড়িয়ে যায় বসনও। জবাব দেয়—

"—ঃ আস্পদ্দা আমার, না যারা ঘরে ব'সে থেকে মেয়েছেলেকে রোজগার করতে পাঠায়,—তাদের?"

চীৎকার ক'রে ওঠে বৈদ্যনাথ

"—ঃ কি! আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই শাসানো! তাতে, মেয়েছেলের কথা নিয়ে-এ..."

এবার পাশাপাশি ঘর থেকে বার হ'য়ে আসে প্রতিবেশী কয়েকজন।

ঘর থেকে বার হ'য়ে আসে আশাও।

চোখে, মুখে ওর উৎকণ্ঠা, বুঝি ভয়ও। তবু, বৈদ্যনাথের একখানা হাত ধ'রে ও টান দেয়—

"—ঃ আরে! বলছো কি?"

"—ঃ বলছি তোর মাথা আর মুণ্ডু!"

ওর দিকে এবার ঘুরে দাঁড়ায় **বৈদ্যনাথ।** চোখ দুটো বড় করে বলে—

"—ঃ এতদিনে বুঝতে পারছি, তোকে বিয়ে ক'রে ভালো করিনি;—তখনই বারণ করেছিল পিসি, তবু—"

আশার দুই কানের মধ্যে বৈদ্যনাথ যেন ইচ্ছে ক'রেই গরম কোনও তরল পদার্থ ঢেলে দিচ্ছে, এমনি অস্বস্তি আর যন্ত্রণায় সমস্ত মুখখানা বিকৃত হ'য়ে উঠলো ওর, তারপরেই নিজেকে সামলে নিলে সে।

তাকিয়ে দেখলে, বসন তখন উঠোন পার হ'য়ে চলে যাচ্ছে।......

যাচ্ছে হয়তো সে নিজেরই দৈনিক কাজে; কিন্তু চোখের কোলে কোলে উপচে পড়ছে ওর অন্তরের গভীর ঘৃণা।

কিম্বা ওর সঙ্গে একটু করুণাও।

আবার দেখা হয়। দেখা হয় গাড়ীতেই। কথাটা আগে বলে বসনই—

"—ঃ সেদিন গিয়েছিলাম তোমারই ছেলেটার খবর নিতে,—কিন্তু—"

কিন্তু যে কথাটা ব'লতে গিয়েও সে ব'লতে পারে না, সে কথাটা মনে ক'রতেই সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত হঠাৎ যেন থেমে আসে আশার।

কিন্তু,—এ অবসন্নতাকে গ্রাহ্য ক'রলে তো চ'লবে না আশার,—তাই ও নিজে থেকেই হাল্কা ক'রে তুলতে চায় প্রসঙ্গটাকে—

"—ঃ আর বল কেন ভাই—, সারা জীবনটা জ্বলে মলাম ঐ একটা মানুষকে নিয়ে; মাথা-খারাপ। এই যদিই বা বলে একটা মনের কথা,—তখনই ভুলে যায় আবার। কিছু মনে করে রাখতে পারে না, আর এই নিয়েই আমার সংসার!"

বসন তবু বলে—

"—ঃ আমি কিন্তু গিয়েছিলাম শুধু তোমার ছেলেটার তল্লাস ক'রতে। সেদিনে তার অসুখ ব'লেছিলে—তাই।"

এর উত্তর আশা খুঁজে পায় না—তাই বিমর্ষ মুখে বলে—

"—ঃ কি বলবো ভাই,—ছেলেটার শরীরই বা ভালো যায় কদিন! তবু, তাকে ফেলেও কাজকর্ম করতে হয়! কিইবা করি নইলে পেট চলাও তো মুস্কিল!"

গাড়ী চলে—।

আশপাশের জন-কোলাহলের মধ্যেও ওরা যেন ডুব দেয় নিজের নিজের চিন্তায়।—

গায়ে দোলা লাগে; লাগে হয়তো মনেও; সে দোলা আশা আর আশঙ্কার, নিশ্চয় আর অনিশ্চয়তার।

এরই মাঝে মাঝে আসে স্টেশন, গাড়ী থামে; ওঠানামা করে যাত্রীদল, ওঠে মাল। সকলেরই গন্তব্যস্থল কলকাতা,—শেয়ালদহ ষ্টেশন।

এই পথটুকুর সহযাত্রিতা আর সান্নিধ্য গড়িয়ে তোলে পরস্পরের মধ্যে পরিচয়,—হয়তো একটু আন্তরিকতাও।

দুটো দিন পরের কথা।

কেবলমাত্র গাড়ীর জন্যে এসে আশা একাই ব'সেছিল প্ল্যাটফর্মে।

কেউ কেউ ব'সে আছেন বাক্স, কেউ মাথা ভর্তি নানা জিনিস।...লেজেন্স, বিস্কুট আর কমলা। যার দুই পাশেতেও গাড়ী কাঁধা।

কিন্তু, এও শুধু নয়! এর সঙ্গেও আছে বিভিন্ন বর্ণের ওষুধভরা কয়টা শিশি।

ছেলেটার জ্বর একেজ্বরী, বৈদ্যনাথেরও হাঁপের টান বেশ বেড়েছে!

কি হবে তার ভাগ্যে,—কে জানে!......

সজল চোখে ও তাকিয়েছিল অন্যদিকে!

দেখলে,—একটা মানুষ এগিয়ে আসছে—এইদিকেই, হয়তো তাকেই লক্ষ্য ক'রে!—

কিন্তু, ওর সমস্ত গা, মাথা আর মুখেরও খানিকটা ঢাকা একখানা কম্বলে।......

আশা তাকিয়েছিল! হঠাৎ মনে হ'লো ওর প্রতি পদক্ষেপ যেন তার চেনা! কিন্তু......

এগিয়ে এলো ও। মুখের ঢাকা খুললো একটু; লম্বা একটা কাটা দাগ ওর নাকের কাছে! সে কাটাও বেশীক্ষণের নয়, তাই ওখানে রক্তের রেখা— টাটকা!

চমকে উঠলো আশা—

"—ঃ বসন ভাই,—তুমি? কি হ'য়েছে তোমার?"

ঠোঁটের ওপোর আঙুল রেখে বসন ব'ললে—

"—ঃ চুপ!"

তারপর আশার দিকে এগিয়ে দিলে একটা কাগজের তাড়া; ব'ললে—

"—ঃ এটা—হ্যাঁ এটা তোমার জন্যে এনেছি, নিয়ে যাও, কিন্তু সাবধানে। জানিওনা কাউকে।"

"—ঃ কিন্তু—তুমি? তুমি, কেন ভাই...?"

বসনের চোখে মুখে ওঠে নিঃশব্দ ভ্রুকুটি; তারপরই সে দ্রুত পদক্ষেপে মিশে যায় জনারণ্যে।

আশা আর ওকে দেখতে পায় না।

অনেকদিন পরের কথা।

জেল-ফেরৎ বসন এসে দাঁড়ায় নিজের গ্রামে। সেই জলা, আর সেই ধানক্ষেতের মাঝামাঝি পথে। পথের ধারে,—নাবাল জমিতে জল জমেছে এখনও— আর সেই জলের মধ্যে উঁচু উঁচু হ'য়ে আছে কতকগুলো মাটির ঘরের দেওয়াল! ঘর আর এখানে নেই,—নেই যারা বাস করতো তারাও।

তবু, একদিন ছিল!...একদিন যারা এখানে বাস ক'রতো এসেছিল—তাদেরই একটি মেয়ের হাতে সে তুলে দিতে পেরেছিল কতটুকু সাহায্য! কয়খানা নোট? কত টাকার?......কতশো, কিম্বা কত হাজার?......

ভাবতে চেষ্টা করে বসন।

নিজেরই অজ্ঞাতে কোনসময় নিজে স্পর্শ করে মুখের ওপোরের কাটা দাগটা।......

মনে হয়—ও দাগ শুধু বুকে কি মাংসে আঘাত চিহ্ন এঁকে রাখেনি,—রেখেছে মনেও।

নির্মোক

(১১৬ পৃষ্ঠার পর)

সুশান্ত খোলা জানালা পথে তাকাল। ছোটকু গোয়ালা তার গাই এবং বাছুর নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কয়েক মাস পূর্বের দেখা সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নধর-কান্তি বাছুরটির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার পরিবর্তে এক হাড়সর্বস্ব ক্ষীণ দুর্বল বাছুর নামধের জন্তুকে দেখা গেল তার মার পিছু পিছু কষ্টে এগিয়ে যেতে। বাইরে থেকে সহসা সুশান্তর দৃষ্টি ফিরে এল নিজের শিশু-পুত্রের পানে। ছেলেটার পানে এখন চেয়ে থাকতেও ভাল লাগে।

* * *

সময় এগিয়ে চলেছে। সুশান্তর সংসারে আনন্দ ফিরে এসেছে। আর সে ফিরে পেয়েছে তার হারানো প্রিয়াকে। মেঘের ডাকে আবার যার চোখে বিদ্যুৎ চমকায়। কথায় ঝরে পড়ে স্নিগ্ধ বারিবিন্দু......বাহুতে ফিরে এসেছে নাগিনীর বেষ্টন শক্তি......প্রাণে উথলে উঠেছে সপ্ত সিন্ধু।

সুশান্ত পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলে, তোমরা সত্যিই আশ্চর্য সীমা।

সীমা খিল খিল করে হেসে উঠলো। অলস ভঙ্গীতে দুখানি হাত স্বামীর কাঁধের উপর রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললে, এ কথা কেন গো?

সুশান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলে, এমনি ক'রেও কি মানুষ ঘুমিয়ে থাকতে পারে!

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সীমা পার্শ্বে শায়িত তার শিশুপুত্রের পানে পরম স্নেহে চেয়ে রইল।......

* * *

সময়ের গতিপথ থেকে আরও কয়েক মাস এগিয়ে গেছে। কোনদিক থেকে আর এতটুকু অভিযোগ নেই। শুধু মাঝে মাঝে ছোটকু গোয়ালার উপর সীমা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার খোকার দুধের যোগান দেওয়া নাকি আর কোনক্রমেই সম্ভবপর হচ্ছে না। বিশেষতঃ সীমা যখন ঐ বিশেষ গাইটির দুধ ছাড়া কিছুতেই নেবে না। ছোটকুর চেষ্টার ত্রুটি নেই। বাছুরটা তার মাসখানেক পূর্বে গত হ'য়েছে। ছোটকু মরা বাছুরের চামড়ার সাহায্যে এক খড়ের বাছুর তৈরী ক'রে নিয়েছে। ওতেই কাজ চলে যায়। প্রথম প্রথম অবশ্য বেগ দিয়েছে। ইদানীং কতকটা ধাতস্থ হ'য়েছে। অবোধ জীব কতখানি আর অনুভূতি-জ্ঞান। খড়ের বাছুরকেই লেহন করে গরুটা। আর ছোটকু প্রাণপণে নিংড়ে নেয় শেষ বিন্দু দুধটুকু। নইলে সীমার ছেলের চলে না।

সীমা আজ বাড়ীতে নেই। তাই সুশান্তকেই দাঁড়াতে হ'য়েছে ছোটকুর প্রহরায়। ওদের বিশ্বাস নেই। না পারে এমন কাজ নেই। সুশান্ত তন্ময় হ'য়ে দেখছিল কেমন করে ছোটকু গরুটির শেষবিন্দু দুধটুকু টেনে বের করে নিচ্ছে আর গরুটা কেমন নির্বিকার চিত্তে খড়ের বাছুরের গা চাটছে।......

সীমার আহ্বানে সম্বিৎ ফিরে পেল সুশান্ত। সে মুখ তুলে তাকাল। ছেলে কোলে করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সীমা। সর্বাঙ্গে তার খুশীর হিল্লোল।

আরও একটু এগিয়ে এসে স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে বললে, একটা ভারী ভাল খবর আছে গো...আমাদের খোকন এবারে শিশু প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

ছোটকু তখনও প্রাণপণে গরুটাকে নিংড়ে নিচ্ছে আর গরুটা লেহন করছে খড়ের বাছুরটাকে......।

"উনপঞ্চাশ বায়ু

অনিলবরন ঘোষ

শীতের রাত। ফাঁকা পথ। চাপ চাপ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঝুলছে ইলেকট্রিক [illegible] টেলিফোনের তারে, [illegible] দালানের আলিসে কার্নিসে গাছের ডালে-পাতায়।

পার্কের গেট ঠেলে বেরিয়ে এল একটি ছেলে। ওর মুঠিতে মুঠি [illegible] পেছনে পেছনে [illegible] দিয়ে এগিয়ে এল একটি মেয়ে। [illegible] চঞ্চল পদবিক্ষেপে ওরা এগিয়ে যায়। মেয়েটির পেছনে প্রকাণ্ড লেজটা দুলে দুলে চলে একটি এ্যালশেসিয়ান কুকুর।

রাস্তা পেরোবার জন্য ওরা [illegible] নামে। একচক্ষু একটা ট্রাম ছুটে আসছে পাগলা গতিতে। ওরা ট্রামটা চলে যাবার অপেক্ষায় লাইনের পাশে দাঁড়ায়। কুকুরটা আপন খেয়ালে লাইনের ওপাশে চলে গেছে, খেয়াল হতেই লাইন পেরিয়ে এপাশে আসতে চায়। ট্রামটা তখন এসে পড়েছে। মেয়েটি ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ছেলেটি চিৎকার করে ট্রাম ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে অনুরোধ করে। প্রাণপণে ড্রাইভার ব্রেক চেপে ধরে। কর্কশ চিৎকারে রাস্তা আঁৎকে ওঠে।

বিরাট একটা স্পঞ্জ থেকে ছিটকে আসা রাঙা জলের মত চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে এক ঝলক উষ্ণ টাটকা রক্ত। এ্যালশেসিয়ানকে দুমড়ে দিয়ে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে যায়।

নেমে এল ট্রামের যাত্রী, ছুটে গেল চারপাশের দু'চারজন। এ বীভৎস দৃশ্য যাতে দেখতে না হয় ট্রামের মেয়েরা দু'হাতে চোখ ঢাকে। প্রিয় কুকুরের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি থর থর কাঁপে ছেলেটির দু' বাহুর মাঝে।

অনেকে দুঃখ প্রকাশ করে, কেউ ড্রাইভারকে গালি দেয়, কেউ বা মেয়েটিকে সান্ত্বনা জানায়।

হঠাৎ সকলে চমকে উঠল। [illegible] একটা [illegible] দাঁড়িয়ে আনন্দে [illegible] নাচছে একটা পাগল। [illegible] হাসছে। নাচের তালে মাথার জটা ওর লাফিয়ে উঠছে আকাশে। বুকের উপর [illegible] একটা টিনের [illegible] থেকে [illegible] রক্তাক্ত [illegible] কুকুরটার পাশে।

পাগলের [illegible] সেই [illegible]।

ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে [illegible] ট্রাম কণ্ডাক্টরের [illegible] এ্যালশেসিয়ানের দেহটা [illegible] থেকে সরিয়ে দেবার পর গাড়ী চালিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে [illegible] ফাঁকা হয়ে আসে চারপাশ। [illegible] এ্যালশেসিয়ানের দেহটা ঘিরে ধরে নাড়ী কুকুরের দল। নিঝুম রাত। গুটি গুটি পা ফেলে হাঁটে।

ওদিকে বিশে পাগলার আস্তানায় মহা পার্বণ [illegible] দাঁড়িয়ে এলো রাস্তায়, গলা ফাটিয়ে গান গাইছে বিশে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে আকাশ ছুঁয়ে নিচ্ছে। আনন্দ যেন চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই। [illegible] আনন্দ করবে নাই বা কি [illegible] বিশে পাগলা। [illegible] আজ সে ওর [illegible] কুকুরটাকে দু'বছর [illegible] এসেছে সে। [illegible] শাপ শাপান্ত করেছে, [illegible] ওটার মৃত্যু কামনা করেছে। এতদিন বাদে আজ শত্রু নিপাত হল। আজ সারা রাত সে গান গাইবে আর নাচবে। কাল থেকে আর শয়তানটার রক্ত চক্ষু দেখতে হবে না। কি আনন্দ!—লাটুর মত বন বন করে ঘোরে বিশে। কাল থেকে আর রীতাকে পাহারা দেবে না কুকুরটা। কি আনন্দ!—হাততালি দিয়ে নাচে বিশে।

আজ থেকে দু'বছর আগে। ঠিক এমনি, শীতের রাতে এক ধূপছায়া গোধূলি লগ্নে যখন রীতা ঢুকল পার্কের গেটটা ঠেলে। দূরের এক পাশ পোস্টের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশে পাগলা চমকে উঠল, সোজা হয়ে দাঁড়াল শিড়দাঁড়ার মড়মড়ি ভেঙে। সেদিন থেকে ভ্রাম্যমাণ বিশে পাগলা ঘর বাঁধল পার্কের কোণে একটা গাছের নীচে। মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টি বয়ে যায়, রদ্দুরে পুড়িয়ে যায় দেহ। নির্বিকার বিশে।

এ পাড়ারই মেয়ে রীতা। ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা অভ্যেসে রোজই সে আসে বেড়াতে। রীতাকে প্রথম নজরে তেমন সুন্দরী বলে মনে হয় না। দেহসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সময় এখনও ওর পেরিয়ে যায়নি। তন্বী, শ্যামলী, ঋজুদেহী অষ্টাদশী মেয়েটি বয়েস অনুপাতে একটু কম বাড়ন্ত। কিন্তু ওর [illegible] কালো সরু সরু ভ্রূদুটির উপর মসৃণ নিটোল কপালের দিকে তাকিয়ে, গভীর স্নিগ্ধ দুটি আয়ত চোখের উপর দৃষ্টি ফেলে মুগ্ধ না হয়েও পারা যায় না। কপাল, ভ্রূ, আর ঐ দুটি চোখ ওর সমস্ত অপূর্ণতাকে ঢেকে রেখেছে।

রীতা ঘুরে বেড়ায় পার্কের রাস্তার উপর দিয়ে, কখন রাস্তা ছেড়ে নধর ঘাস মাড়িয়ে।

রীতার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিশে। রীতার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। রীতার পিছু পিছু ওর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে। এ খেয়ালের জন্য পাড়ার ছেলেদের হাতে একদিন বেদম মার খেয়ে ওকে বেশ কিছুদিন ডাক্তারখানার বারান্দায় পড়ে থাকতে হ'ল। এ সময়ে ওর একটা চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। একটু ভাল হতেই আবার বিশের পাগলামো সুরু হ'ল। এখন রীতার সামনে সে যায় না। অনেক দূরে দূরে থেকে পাগলা বিশে ঘুরে বেড়ায় রীতার উপর দৃষ্টি রেখে। রীতার দিকে তাকিয়ে খুশী উপচে পড়ে ওর ভালো চোখটা ছাপিয়ে গুন-গুনিয়ে আবোল-তাবোল গানের কলি ভাঁজে, দাড়ি চুলকায়, গোঁফে তা দেয়। রীতা যদি কোনদিন বেড়াতে না আসে সেদিন ওর ক্ষিপ্ততা বেড়ে যায়, সারা রাত ঘুরে বেড়ায় পথে পথে। সকাল হতেই নিজেকে লুকিয়ে বসে থাকে রীতা যে পথে কলেজে যায় সে পথে।

পাগলাটার কান্ড দেখে ভ্রূ কুঁচকে রীতা কি যেন ভাবল। হাসি ফুটে উঠল ওর পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে। এরপর থেকে এলশেসিয়ানটা দেখা দিল। তখন সেটা নেহাৎই কয়েক মাসের শিশু।

কুকুরের বাচ্চাটা দেখে বিশে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এতটুকুন বাচ্চা কিন্তু বিশেকে দেখে রাগে যেন ফেটে পড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বিশেকে আক্রমণ করতে চায়। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে গুম্ হয়ে বিশে ফিরে এল ওর ন্যাকড়া কাপড়ের জটে জড়ান গাছের নীচের আস্তানাটায়। দু' হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল সারা রাত।

দেখতে দেখতে কুকুরটা বড় হয়ে উঠল। রীতার পাশে পাশে সে পথ চলে। মাঠের ঘাসে বসে রীতা কুকুরটাকে আদর করে, চুমু খায়, দৌড়ঝাঁপ করে। দূরে—অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বিশে তাকিয়ে থাকে। হিংসায়, ক্ষোভে ওর ভাল চোখটা দপ দপ করে জ্বলতে থাকে, কানা চোখটা উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপে।

একদিন কুকুরটা খেলা করতে করতে রীতার কাছ থেকে সরে আসে অনেকটা। বাগে পেয়ে বিশে দু'হাতে দুটি দশ ইঞ্চি ইট তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটার উপর। শয়তান কুকুরটা কি ভয়ংকর না ধূর্ত। পাশ কাটিয়ে সরে যেয়ে বিশের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। তারপর কামড়ে ছিঁচড়ে বিশেকে কি নাজেহালই না করল।

হৈ-চৈ চিৎকারে রীতা এসে কুকুরটাকে ধরে নিয়ে যায়। চারপাশে জমে ওঠা লোকজন বিশের দুর্গতি দেখে হাসে।

কয়েকদিন বিশে বড় মনমরা হয়ে রইল। কুকুরটার আঁচড় কামড়ের দাগগুলি বসে বসে দেখে। রীতাকে পার্কে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে থাকে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বিশে ঘুরছে দোকানে দোকানে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এক ঠোঙা বিস্কুট সে জোগাড় করে ফেলল। রীতার প্রতীক্ষায় সে উন্মুখ হয়ে বসে রইল।

যথাসময়ে রীতা এল বেড়াতে। বিস্কুট-গুলি হাতে নিয়ে বিশে মিটি মিটি হাসে। কুকুরটা একবার এদিকে এলে হয়!

কুকুরটা এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে, বিশের দিকে আসবার নাম নেই। বিশে একটু এগিয়ে গেল, আরও একটু। কুকুরটা ওকে দেখতে পেয়ে তেড়ে এল প্রচন্ড চিৎকার তুলে। সচকিতে রীতা কুকুরটাকে ডাকে, উঠে আসে ত্রাসে।

কুকুরটা বিশের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। হাসি হাসি মুখে বিশে কুকুরটার সামনে বিস্কুটগুলি তুলে ধরে। গদ গদ কণ্ঠে বলে, নে ভাই, আর রাগ রাখিস্ নে, কেমন ভাল ভাল বিস্কুট এনেছি খেয়ে দ্যাখ—

রীতা এসে পড়েছে ঘটনাস্থলে। মনিবকে দেখে কুকুরটা মহাবিক্রমে জেগে ওঠে, ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশের উপর।

রীতা কাছে ছিল তাই রক্ষা। বেশী দূর এগুল না ঝামেলা। রীতা কুকুরটাকে টেনে নিয়ে গেল। ধুলো ঝেড়ে উঠে গেল বিশে। বিস্কুটগুলি মাটিতে ভেঙ্গে চুরে ছড়াছড়ি।

সে রাতেই বিশে মস্ত একটা রড কোত্থেকে জোগাড় করে নিয়ে এল। পরদিন দূর থেকে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রডটা বন বন করে ঘোরায়, বিড় বিড় করে গাল পাড়ে।

সেদিন বিশে চমকে উঠল নতুন একটা দৃশ্যে। শক্ত হাতে সে রডটা চেপে ধরল। বাঁকা বাঁকা নোংরা আঙুলগুলি রড কেটে ঢুকে যাবে যেন। দুরন্ত আক্রোশে গলার শিরা দুটি মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। চোখটায় যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া।

ঘাসের উপর বসে আছে রীতা, একটু দূরে বেঞ্চির উপর বসে আছে একটি সুবেশ সুন্দর যুবক। শয়তান কুকুরটা ছুটে ছুটে একবার ছেলেটির কাছে যাচ্ছে, ছেলেটি আদর করছে, পরক্ষণেই ছুটে আসছে রীতার পাশে। রীতার কাছ থেকে আদর পেয়ে আবার সেটা ছুটে যাচ্ছে ছেলেটির কাছে।

রডটা শাঁই করে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে বিশে হুংকার ছাড়ে। দাঁতে দাঁত ঘসে ভয়ংকর কড়মড় আওয়াজ করে। এক পা এগিয়ে গিয়ে [illegible] পিছিয়ে আসে। সাহস হয়না ঐ বাঘটাকে কুকুরটার সামনে যেতে। বিশেষ করে রীতার সামনে। মুখের ভেতর গোঙা লজ্জা [illegible] কোথায় যে—আয় না এদিকে, মারি কি বাঁচি, আজকে দেখব এসপার কি ওসপার—

বিড় বিড় করে বিশে শপথ কাটে। রড বাগিয়ে পায়চারী করে।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। কুকুরটার দৌরাত্ম্য সফল হয়েছে। কুকুরকে কেন্দ্র করে রীতা আর যুবকটি অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। অপরিচয়ের গন্ডী ছিঁড়ে গেছে। একই বেঞ্চিতে বসে দুজনে গল্প করে। নিরিবিলি হলেই ছেলেটি কবিতা আবৃত্তি করে। নিস্পন্দ আবেশে, শ্লথ বাহুবেষ্টনী কোলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, ডাগর চোখ দুটি তুলে রীতা কান পেতে শোনে। আবৃত্তি শেষে ছেলেটি রীতাকে গান গাইতে মিনতি করে। চারপাশ দেখে নিয়ে রীতা গুন-গুনিয়ে গান গায়। রীতার মুখের দিকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ছেলেটি। কখনও হয়ত রীতার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নেয় সে। মধুর শিহরণে রীতা গান থামিয়ে দেয়। দু'জনে চুপচাপ বসে থাকে। ছেলেটির মুঠিতে বন্দী রীতার নরম হাতখানা কেঁপে কেঁপে ওঠে। পুলকে ছেলেটির বন্ধনী আরও নিবিড় হয়ে ওঠে।

আনন্দে কুকুরটা লাফায় ঝাঁপায় দৌড়য়। কখনও ডিগবাগিয়ে দু'জনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। কাড়াকাড়ি করে ওরা কুকুরটাকে আদর করে। আদরে শান্ত হয়ে কুকুরটা হাই তোলে।

ওদিকে বিশে পাগলা রড বাগিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে। কোত্থেকে একটা ভাঙা দা জোগাড় করেছে, আজকাল সেটাও সর্বদা কোমরে ঝুলিয়ে রাখে।

কুকুরটা এগিয়ে আসে কয়েকপা। দাঁত কড়মড়িয়ে বিশে হুংকার ছাড়ে, এদিকে আয় শালা, পয়লা রডটা ঝাড়ব, তারপর দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটব—

কুকুরটা আসে না। নরম ঘাস খুঁজে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

দিন কয়েক পর বিশেকে দেখা গেল পার্কে উঁকি দিয়ে মিটমিটি হাসতে। বহু দিন বাদে ওর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। পকেট থেকে একমুঠো পোড়া বিড়ি-সিগ্রেট বের করে বসে পা ছড়িয়ে। একটা জ্বলন্ত সিগ্রেটের টুকরো কুড়িয়ে জমান বিড়ি-সিগ্রেটগুলি একটার পর একটা টানতে থাকে। মৌজ করে কোনটায় একটান, কোনটায় দুটান দিতেই আঙুলের ডগায় এসে যায় আগুন। মুহূর্তে অন্য একটা ধরিয়ে নেয়। কামাই নেই, পাক্কা চেন স্মোকার।

সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। রীতা আসেনি এখনও। ছেলেটি রীতার প্রতীক্ষায় কোণের বেঞ্চিতে বসে ছটফট করছে, ঘন ঘন তাকাচ্ছে ঘড়ি আর গেটের দিকে। ওর উদ্বেল অবস্থা দেখে বিশের আনন্দ আর ধরে না। মিহি মিহি শিস্ দেয় ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে।

হঠাৎ গেট ঠেলে রীতাকে হন হন করে ছেলেটির দিকে এগুতে দেখে বিশের দাঁড়ির গোছা ঝুলে পড়ে। দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। মুখের আগুন নিভে যায়।

রীতা ছেলেটির পাশে নিবিড় হয়ে বসে নানা কথায় ডুবে যায়। কুকুরটা আনন্দে ডিগবাজি খায়, দৌড়য়, ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা কুকুরটাকে আদর করে, [illegible] করে।

রাগে কাঁপে বিশে। কুকুরটাকে উদ্দেশ করে [illegible] কাটে। থু থু ছড়ায়, গালাগালি করে। রডটায় সস্নেহে হাত বুলোয়, কোমরে ঝোলান দাটা দেখে নেয়।

একটু রাত করেই রীতা ছেলেটির সঙ্গে পার্ক থেকে বেরোয়। বীরদর্পে কুকুরটা লেজ উঁচিয়ে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে চলে কখনও আগে, কখনও পিছু।

রেলিংয়ের গায়ে ঠেশান দিয়ে বিশে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটি করে। চোখ দুটি বোজা, ঠোঁটের ফাঁকে একটা নিবে যাওয়া বিড়ির অবশিষ্টাংশ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখের উপর কালো কুচকুচে দাড়ি চিক চিক করে, বুকে উপরকার টিনের মেডেলটা জ্বল জ্বল করে।

হঠাৎ মানুষের কোলাহলে চমকে জেগে উঠল বিশে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে ট্রাম লাইনের ধারে মানুষের জটলা। পাংশু মুখে রীতা দাঁড়িয়ে আছে সেই জটলার মধ্যে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিশে লাফিয়ে উঠে রডটা নিয়ে। কি হয়েছে রীতার, কে কি করেছে—

কয়েকটা লাফেই বিশে জটলার সামনে গিয়ে পড়ে। ওর নজর যেয়ে পড়ে 'কাউ-ক্যাচারে' যেন [illegible] দাঁড়িয়ে গেল বিশে। মাথার মধ্যে কতগুলো

(ইহার পর ১২৮ পৃষ্ঠায়)

ছোট একটি লাল রংয়ের বাড়ী। মেয়েদের হস্টেল।

বৎসরের পর বৎসর কত মেয়ে আসে—কত মেয়ে চলে যায়। রেখে যায় তাদের সবুজ মনের ছোট ছোট ছাপ।

সেদিন সেই হস্টেলের [illegible] একটি মেয়ে নীরবে বসে ছিল। এ কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। [illegible] মেয়েকেই এখানে নীরব নতমুখে কিংবা [illegible] হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

তবু এই মেয়েটির [illegible]

মেয়েটির নাম রেবা। [illegible]

আজ সেই আনন্দময়ীর মুখে বিষাদের ছায়া কেন? চোখে কেন [illegible] কি হয়েছে ওর?

[illegible] প্রশ্নই ওর কাছে [illegible] সরে যেতে লাগলো [illegible] কে যেন বলে—লতা ফিরে আসুক—তবে যাবে সব।

লতা রেবার অভিন্নহৃদয় বান্ধবী। লতার নাম শুনে সে একবার ব্যাকুল নেত্রে তাকায় চারিদিকে।

কিছুক্ষণ পর লতা ফিরে আসে। আর, অন্ধকারে রেবাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে বাইরের কাপড় না ছেড়েই ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে—কেউ কিছু বলেছে?

'না'—উত্তর দেয় রেবা।

'তবে বাড়ীর থেকে কোন চিঠি—'

'চিঠিই এসেছে একখানা। তবে বাড়ীর থেকে নয়। এই দেখ'—রেবা নীল [illegible] একখানা চিঠি তার হাতে গুঁজে দেয়।

অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় লেখা একখানি প্রণয়-পত্র। মনোযোগ দিয়ে পড়ে লতা। চিঠির আবেদন উদ্দিষ্টাকে ছাড়িয়ে পাঠিকার মনে পৌঁছয় কিনা কে জানে? পড়া শেষ হলে গম্ভীরভাবে বলে—'তোর তো সৌভাগ্য রে!'

তারপর নীচের দিকে নামের স্বাক্ষর পড়বার চেষ্টা করে বলে—'ছেলেটি কে?'

'রজত সেন'—গম্ভীর সুর রেবার।

'ও যে তোর সঙ্গে ট্রেনে......!'

ওকে বাধা দিয়ে রেবা বলে—আমার কান্না পাচ্ছে।

'কেন? ছেলেটি খুব ভাল। তার উপর এত সুন্দর চিঠি যে লিখতে পারে......!'

কথা অর্ধসমাপ্ত রেখেই থেমে যায় লতা।

'চিঠি সুন্দর বলেই তো যত গোলমাল!'—[illegible] রেবার।

'[illegible]'—থমকে যায় লতা।

[illegible], রেবার কল্পনা শক্তি, রচনা কৌশল, [illegible]—কিছুই এই চিঠির উপযুক্ত নয়। তাই, নিজের [illegible] খাতিরেও লতা বলতে পারলো না—যাহোক করে চালিয়ে দে।

'তাহলে কি হবে?'—ভীত চিন্তিত সুরে লতা বলে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রেবা। 'ঠিক আছে—এই দিলাম [illegible]'

'সে কি?'—বিস্মিত লতার মুখে শুধু এই কথাটুকু বেরিয়ে আসে।

কিন্তু রেবার চোখের দিকে তাকিয়ে সেই [illegible] গোপন মিনতি পৌঁছয় লতার মনে। [illegible] স্বীকৃতা হয় সে।

নতুন উৎসাহে নতুন ভাব প্রবাহে লতা লেখে:—

'কোন অদৃশ্য মধুর আকর্ষণে আজ আমার ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে দেখি আপনার চিঠি। নীল খামে অসীম আকাশের আহ্বান। কালো কালির আখরে সাগরের গভীরতা।

এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত মাত্র আমি চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু, সেই মুহূর্তের মাঝেই যেন কত জীবন, কত মৃত্যু, কত সুখ, কত দুঃখ, কত আনন্দ, কত বেদনা, কত অমৃত, কত গরল রয়েছে মিশে।

মনে হলো—সার্থক আজকের এই প্রভাত। তরুণ তপনকে মনে হলো উজ্জ্বলতর। পাখীরা গান গাইলো মধুরতর সুরে। প্রতি-দিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের মাঝে আজিকার দিন এ কি বরণডালা নিয়ে এসে দাঁড়ালো ঘরের আঙিনায়—দুয়ারে এঁকে দিল অপরূপ আলিম্পন রেখা......।'

অবশ্য এখানে জনান্তিকে বলে রাখি চিঠি ওরা বিকেলে পেয়েছিল কিন্তু কবিত্বময় ভাষা লিখবার সুবিধের জন্য বিকেলকে সকাল করতে দ্বিধা করে নি লতা।

এই হল সুরু—কিন্তু শেষ নয়। প্রতি সপ্তাহেই রেবার নামে চিঠির জবাব দিয়ে চলে লতা।

* * *

এর পর প্রায় দু'বছর চলে গেছে। আবার দেখতে পাচ্ছি রেবার সাময়িক রূপান্তর। খোলা চুলে আঁধার মুখে বসে আছে ও। তবে আজ আর ওকে সাধছে না কেউ। পরিবেশও ভিন্ন। নানা আসবাবে ভরা একটি ঘর।

বিয়ে হয়েছে ওর। হাঁ, রজতের সঙ্গেই হয়েছে। বিয়ের অল্পদিন পরই রজতকে চাকরী নিয়ে যেতে হয়েছে মাদ্রাজে।

সেই জন্যই কি ওর চোখে এত বিষাদ! কিন্তু, বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি তো প্রায় প্রত্যেক দম্পতিরই হয়। এতে এত দুঃখিত হবার কি আছে?

কিন্তু, রেবার দুঃখ অকারণ বা ভিত্তিহীন নয়। আজ পনের দিন হলো রজত মাদ্রাজে গিয়েছে অথচ কোন চিঠি দেয় নি। বিয়ের আগে যে প্রতি সপ্তাহে তিনখানা করে চিঠি লিখতো বিয়ের পরই যদি সে এ রকম ব্যবহার সুরু করে তবে কি মনে দুঃখ হয় না? আশঙ্কা আসে না!

রজত যে দৈহিক সুস্থ আছে তার খবর পেয়েছে রেবা। অপরাপর পরিজনদের নিকট চিঠি দিয়েছে রজত। একমাত্র যার সকলের আগে চিঠি পাওয়া উচিত ছিল সেই বাদ পড়ে গেছে।

কি হতে পারে—ভাবে রেবা। রজত কি রাগ করেছে তার উপর? কই যাবার সময় তার কোন ব্যবহারে ক্রোধের লক্ষণ ছিল না। তবে কি রজত অপর কাউকে—

......তাই বা কি করে সম্ভব!

সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা রেবার মাথায় পাক খেতে থাকে।

সমস্ত সমস্যার সমাধান কিন্তু একটুতেই হয়ে যায়। যদি রেবা নিজে একখানা চিঠি লেখে।

কিন্তু, তাও তো পারছে না রেবা। এতদিন এত ভাবভরা ভাষায় ও চিঠি দিয়েছে যে আজ ওর নিজস্ব রীতিতে চিঠি লিখতে লজ্জা করছে।

মনে জাগছে ভয়। রজত চটে আছে বলে মনে হচ্ছে। যদি তার এই রকম চিঠি পেয়ে পূর্বের ছলনা বুঝতে পারে? যদি ঘৃণা করে তাকে। রজতের চিঠির একটি লাইন পড়ে মনে—তোমার চিঠির জন্যই যেন তোমাকে ভালবেসেছি।

হায়রে, প্রেম-পঙ্কজ যেখানে জন্মেছে সে পঙ্কটুকুও তো তার নিজস্ব নয়। তবে কি রজত জেনে গেছে তার ছলনা! তাই কি নিঠুর দেবতার মত মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সে।

আরও দুদিন কেটে যায়। রেবা যেন আর সইতে পারে না। মরীয়া হয়ে চিঠি লিখতে বসে। অন্যান্য কথার পর লেখে—

এবার আমার চিঠি অত্যন্ত গদ্যধর্মী হলো বলে কিছু মনে করো না। এখন চিঠিতে অত কাব্য করতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। তোমাকে পেয়েই হৃদয় আমার ভরে গেছে। আর অত উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন কি?

* * *

মাদ্রাজের ছোট একটি ঘরে বসে ছিল রজত। তার মুখও অত্যন্ত করুণ ও বিষণ্ণ।

শুধু আজ বলে নয়—এ কয়দিন ধরে রজত এই রকম দুরবস্থায় কাটিয়েছে। পারিপার্শ্বিক নয় মানসিক।

এবং সে কষ্টের মূল হচ্ছে রেবাকে চিঠি না লিখতে পারার গ্লানি।

প্রত্যহ কাজের শেষে সে টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে বসতো। উঠতো রাত্রি দুটোয়।

কিন্তু একটি চিঠিও লেখা হতো না। শুধু স্তূপাকারে জমতো কাগজের টুকরো। আর ওর মুখে ভরে উঠতো চিন্তা-ছায়ায়।

আজও প্রাত্যহিক চিঠি লেখার চেষ্টা চলছিল। হঠাৎ পেল রেবার চিঠি। খামখানির দিকে তাকিয়ে ওর মুখে ফুটে ওঠে একদিকে ভয় আর একদিকে আনন্দ।

বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে খামটি খোলে ও। কিন্তু রেবার সেই সাধারণ চিঠিখানি পেয়ে এক মুহূর্তেই ভয়ের ছায়া সরে যায় মুখ থেকে। মেঘমুক্ত সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ।

তখনই দশ মিনিটের মধ্যে একটি উত্তর লিখে ফেলে। বেসুরে গাইতে গাইতে খামে নাম লিখতে থাকে।

ওর এই ব্যবহারে আপনারা অবাক হয়ে গিয়েছেন। ভাবছেন—চিঠির জন্যই যখন এত ব্যাপার তবে এতদিন চিঠি লিখতে কি হয়েছিল ওর? বিয়ের আগে যে এত চিঠি লিখেছে তার কাছে দু একখানা চিঠি লেখা অত্যন্ত সাধারণ কথা। কেনই বা রেবার চিঠি পেয়ে ওর মুখে ফুটে উঠেছিল একদিকে আনন্দ অপর দিকে আশংকা।

চিঠিখানি খামে ভরবার আগে রজত আর একবার পড়ে। কিন্তু তাতে এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। রেবার ভাষার চেয়েও অধিক নীরস ও সাধারণ ভাষায় উত্তর লিখেছে। লিখেছে—

বড় চিঠি, কাব্যময় চিঠি লিখতে গেলে তাই নিয়েই ডুবে থাকতে হয়। আর কোন কাজ হয় না...ইত্যাদি কতগুলি মামুলী কথা।

কিন্তু, রজত যে কথাটি লিখলো না এবং লিখতে পারবেও না কখন তা হচ্ছে এই যে তার জীবনেও লতার মত একটি পত্র-লেখক জুটেছিল এবং তার কাছ থেকে সে এখন দূরে।

অধ্যাপিকা

(১২০ পৃষ্ঠার পর)

পাকা বিলখানা বাকি। সেইখানা আদানপ্রদান হয়ে গেলে সব শেষ। অফুরন্ত ছুটি, হঠাৎ পশুপতির মনে হয় ট্রেণে চাপবে সে। আলমোড়া নৈনীতাল নয়ত কাশ্মীর। লাইফ ইনসিওরেন্সের পলিসিটা না হয় বন্ধক দেবে।

দিনকয়েক বাদে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আসে ছেলেটি—হলুদ খামে ভাল শঙ্খ-আঁকা—শুভ-বিবাহ। আগামী কাল। ভিতরে দুটি বহু পরিচিত নাম লেখা।

ছেলেটি বলে, বাড়ি পেয়ে ভারী খুশি মিস রায়। আপনারা দুজনে অবশ্য যাবেন।

শুকনো হাসি হেসে পশুপতি জবাব দেয়, আচ্ছা। এ আর বলতে?

রোসন চৌকিতে সানাই বাজছে—ভিতরের বাগানে আলোর ফুলঝুরি।

* * *

কেষ্টর হাতে একটা নেকলেসের কাসকেট ও সেই ছাপটি দিয়ে পশুপতি বলে, তুই দেখে যা, এক্ষুণি আমি কিছু ফুল নিয়ে আসছি। আবার খিড়কির দরজা দিয়ে কেটে পড়িস নে ভাই।

চুড়িদার পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসেছে আজ কেষ্ট? ফুটপাতেও অতিথি ছেলে-মেয়ের ভিড়। সব সময় কি তামাসা করতে হয় দাদা? আমরা কি শুধু ফোকটে খেতে আর চিঠি-বাজ? তা এত দান যে দিচ্ছ, মেয়ে তোমার কে?

পরে শুনিস, এখন যা।

কাসকেট খুলে সেই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক কোথায়? একখানা কার্ড পরে যায়। তাতে শুধু লেখা—প্রীতি তোমাদের পশুপতি।

তিনি আসছেন। কেষ্ট বলে।

পশুপতি আর আসে না? সে তখন ট্রেনে।

শুধু ট্রেনে নয়, কৈশোরে। চকলেট চুষছে। আজকার মতই হেমলতা তখন দূরে—গ্রীণ-রুমে?

"উনপঞ্চাশ বায়ু"

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

খোকা আনন্দে নেচে ওঠে; সমস্ত শরীরে [illegible] একটা খুশীর শিহরণ ঢেউ খেলে যায়। [illegible] তালি দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল [illegible] ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। জুতোর [illegible] গেল, হাতের রঙ পড়ে গেল, [illegible] গেল। খেয়াল নেই বিশের। [illegible] আছে, শত্রুর নিপাত হয়েছে। কি আনন্দ [illegible]

ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে [illegible] গেল আস্তানায়। একটা ভাঙ্গা টিন [illegible] গান ধরল। কি আনন্দ!...আজ [illegible] গান গাইবে আর নাচবে। নাচবে আর [illegible]

সহর ঘুমিয়ে পড়েছে [illegible] রাস্তায় মাঝে মাঝে দু একজন পথচারীর [illegible] পদশব্দ শোনা যায়। ক্লান্ত ট্রামগুলো [illegible] ডিপোতে। শুধু বিশের একঘেয়ে গান [illegible] বেড়ায় নিস্তব্ধ রাতের বুকে। [illegible] ঠেশ দিয়ে আপন মনে বিশে গান গাইছে। [illegible] টিনটা ছেড়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে [illegible] রাখছে।

হঠাৎ কি ভেবে বিশে গান থামিয়ে [illegible] উঠে পড়ল, ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল [illegible] মৃতদেহের পাশে। চারপাশে [illegible] কাকে যেন খুঁজল। তারপর [illegible] মার্কেটের দিকে এক দৃষ্টিতে [illegible] রইল। হঠাৎ [illegible] [illegible] পাশে। একভেলা [illegible] উলঙ্গ মেয়েটা [illegible] ফেলল। [illegible] মরাদেহটার [illegible] লাগল। [illegible] থেকে থেকে চমকে [illegible] দূরে কোন মেয়ের শাড়ীর আঁচল দেখে, [illegible] কোন মেয়েকে ট্রাম থেকে নামতে দেখে।

রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে।

অসহ্য ওর অসামাজিকতা! ওকে এবার বিলেত পাঠাতেই হবে।

গোরা মল্লিক

তিনতলায় বরযাত্রীদের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। বিয়ের লগ্ন [illegible] বাজেশ, কাজেই [illegible] করে ফেলাই সমীচীন। [illegible] ভাইপোর গলার আওয়াজ, [illegible] এদিকে।

সিঁড়ির কাছ বরাবর এগিয়ে [illegible] কি ব্যাপার! [illegible] আমি [illegible] লাঞ্ছিত শরীর [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—[illegible]

—নরেশ? [illegible]

—তা ছাড়া আমার [illegible] দেখেছি বরের কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। এখন তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। [illegible] সটকেছেন।

নরেশ মানে আমার জ্ঞাতি ভাই। আমরা গ্রামে ফিরে আসতে [illegible] চেয়ে বেশী। মাঠের ধান, পুকুরের মাছ, [illegible] কিন্তু পুকুরপাড়ের সীমানা নিয়ে বাপ [illegible] রূপ নিল। দেওয়ানী আর ফৌজদারী দু[illegible] বিদ্বেষের [illegible] স্রোত। [illegible] মেয়ের বিয়েতে সবকিছু ভুলে আমি নিজে নিমন্ত্রণ করে এসেছি গলবস্ত্র হ'য়ে। বাঁকা বাঁকা কথা, টিটকারি কিছু গায়ে মাখি নি। এই আমার প্রথম কাজ, এমন একটা ব্যাপারে [illegible] দূরে সরে থাকবে, ভাবতেও ভাল লাগে নি। কিন্তু একবারও ভাবি নি খাল কেটে কুমীর এনেছি নিজের এলাকায়। এখন ভয় পেলে চলবে কেন?

[illegible] সঙ্গে যখন নিচে পৌঁছলাম তখন [illegible] শুরু হ'য়েছে। বর একেবারে উঠানের মাঝখানে। [illegible] দল। [illegible] পাশ দিয়ে আসতে আসতে [illegible] কানে এল। কথাটা সেখানেও পৌঁছেছে। আমি সোজাই পাত্রের সামনে এসে দাঁড়ালাম। [illegible] চেহারা, হাতে গলায় [illegible] ন্যুব্জদেহ। এতক্ষণ ঘরের [illegible] চেঁচামেচি করছিলেন, বড়লোক [illegible] হ'য়ে উঠেছেন। [illegible] করে পাক খাচ্ছে [illegible]।

—ছি ছি [illegible] এই কাজ মুখুজ্জে মশাই?

[illegible] আর বলতে হ'ল না, ভিড় [illegible] এল, শুধু চোখ নয়, [illegible]।

—কি মশাই, [illegible] দুয়ানী চালিয়ে [illegible] খবরটা কানে এল, [illegible]।

[illegible] বাপেদের জন্য ভগবান আছেন কিনা জানি না, থাকলেও অসহায় আর্তনাদেও বোধহয় তাঁর ঘুম ভাঙে না। বহুকষ্টে নিজেকে সামলালাম দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে। খুব আস্তে বললাম, কি ব্যাপারটা দয়া ক'রে ভেঙে বলবেন আমাকে?

—আ হা হা, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না। ন্যাকামির [illegible] সীমা আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন [illegible] অঙ্গারের টুকরো ছুঁড়ে দিল। [illegible] শুধু বুকেই নয়, জ্বালা [illegible]।

পাত্র হাত দিয়ে গোলমাল থামিয়ে দিল, গম্ভীর গলায় বলল, ভদ্রলোককে শুনতেই দাও না ব্যাপারটা। কি উত্তর দেন শুনি।

সংক্ষেপেই বলল। আমার মেয়ে বহুদিন ধরে ডুবে ডুবে জল গিলছিলেন। শিবের বাবা কেন, নিজের বাবাও বোধহয় জানতে পারেন নি, পারলেও বেগতিক দেখে স্রেফ চেপে যাচ্ছেন ব্যাপারটা।

দম নিলাম। খুব সংযত গলায় বললাম, কথাটা শুনেছেন বোধহয় পাড়ার নরেশ মুখুজ্জের কাছে।

—অত নাম ধাম গোত্র কুলুজী জানি না মশাই। আমার স্পষ্ট কথা, মেয়ে কালো হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, সব সহ্য করব, কিন্তু চরিত্রে এক ফোঁটা দোষ থাকলে, অন্ততঃ চিন্তাপুরের বাঁড়ুজ্জে বাড়ীতে বৌ হ'য়ে ঢুকতে পারবে না।

—খুবই ঠিক কথা, হক কথা, আমি আবার দম নিলাম, ডানহাতে পৈতে জড়িয়ে বললাম, আমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা জপ না ক'রে জলস্পর্শ করি না। যদি আমি পৈতে ছুঁয়ে বলি, ব্যাপারটা সর্বৈব মিথ্যা, কুলোকের রটনা, জ্ঞাতি-শত্রুর কারসাজি তা হ'লে কি বিশ্বাস হবে? তা ছাড়া, চলুন আপনারা আমার সঙ্গে নরেশ মুখুজ্জের বাড়ী, ডাকুন তাকে আমার সামনে। নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলুক কথাটা সত্যি। আমি একটি কথাও বলব না। গুণে গুণে সাত জুতো আপনারা মারবেন আমাকে, যে শাস্তি ইচ্ছা দিন, মাথা পেতে নেব।

পাড়ার বুড়ো লোক কয়েকজন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার কথা শেষ হ'তেই বললেন, যা শুনেছ, একেবারে মিথ্যে কথা বাবাজী। নরেশটা চিরকাল এমনি ধরণের। কেবল পরের সর্বনাশ করার চেষ্টা। জমি নিয়ে মামলা বেধেছে ডাক্তারের সঙ্গে, তাই বিয়ে পণ্ড করার জন্য এ সব রটাচ্ছে। আমাদেরও বাড়ী গিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণে আসতে বারণ করেছিল। ডাক্তারের নাকি জাত নেই। সায়েবসুবোর সঙ্গে যা-তা খেয়েছে শহরে।

পাত্রপক্ষের চীৎকার কিছুটা কমল বটে, কিন্তু গুঞ্জরণ থামল না। পাত্র নিজেই প্রস্তাব করল, বেশ, সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে চলুন।

মুখোমুখি বোঝাপড়া হ'য়ে যাক। সবকিছু নিজের কানে না শুনে, পাপ আমি ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না।

—এই তো মনের কথা। কে একজন জোর গলায় সায় দিল।

অগত্যা দল বেঁধে যাওয়া হ'ল নরেশের বাড়ী। দূর এমন কিছু নয়। বাগানটা পার হ'লেই দু'তলা জরাজীর্ণ বাড়ী। ব্যাপারটা নরেশ বোধহয় আঁচ করেছিল। আমরা বাড়ীর কাছ বরাবর যেতেই হ্যারিকেনের স্তিমিত দীপটুকুও নিভে গেল। কাছে গিয়ে নাম ধ'রে ডাকতেই দু একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মিনিট দশেক ধরে চেঁচামেচি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এবারে পাত্রের মামা কথা পাড়লেন, ঠিক আছে মশাই, চলুন ফিরে যাওয়া যাক। যত সব বদমাইস লোকের কাণ্ড। দিলে মেজাজটা খারাপ করে।

পাত্র তবু নাছোড়বান্দা। সুখেশ ঘোষাল মশাইয়ের দিকে ফিরে বলল, আপনি প্রাচীন লোক, আপনি দিব্যি করে বলুন, মেয়ে নিষ্পাপ?

ঘোষাল মশাই পাত্রের একটা হাত জড়িয়ে ধরলেন। আস্তে বললেন, ডাক্তারবাবুর মেয়েকে আমরা অনেকদিন থেকে জানি। রূপ গুণ চাল চলন সবই মায়ের আমার নিন্দার বাইরে। আর তা ছাড়া, এ অজ পাড়াগাঁয়ে ওসব নভেলী ব্যাপারের কোন চল নেই বাবাজী। তুমি নির্ভয়ে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যেতে পার।

পাত্র এবার ফিরল নিজের মামার দিকে, কি বল মামা, তুমি গুরুজন উপস্থিত রয়েছ, তুমি যা বলবে তাই হবে।

মামার অবস্থা কাহিল হ'য়েই এসেছিল। দুটো চোখ লাল, কাঁপুনিও বেশ জোর। জ্বরটা খুবই চেড়ে এসেছে। এই অবস্থায় বর উঠিয়ে নৌকায় ফিরে যেতে হ'লেই মুস্কিল। দেশ অবধি গিয়ে হয় তো আর পৌঁছোতেই হবে না। তার চেয়ে মিটমাট একটা হ'য়ে যাওয়াই ভাল।

কাজেই তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এঁরা বলছেন যখন, তখন ঠিকই আছে। শুভ কাজটা শেষ করেই নাও।

পাত্র তার পরেও হাতমুখ নেড়ে চারিত্রিক নিষ্ঠার মহত্ত্ব সম্বন্ধে দু-এক কথা বলল, অবশ্য বন্ধুদের দিকে ফিরে।

কোণের দিকে দাঁড়িয়েছিলাম চুপচাপ। আমার অবস্থা একেবারে নিন্দার নয়। সরকারী ডাক্তার হিসাবে যশ আর অর্থ দুই-ই আহরণ করেছিলাম। মেয়ের বিয়েতে খরচপত্র নেহাৎ কম করছি না। একবার মনে হ'ল, স্পষ্ট গলায় বলি, দরকার নেই এমন ঘরে মেয়ে দিয়ে। আমার মেয়ে আজন্ম না হয় কুমারীই থাকবে, তবু এমন মানুষের গলায় মালা দেবে না। কিন্তু মনকে বোঝালাম। পাত্রের আর দোষ কি। ঘরের শত্রু বিভীষণই যত নষ্টের মূল। তাছাড়া, এমন পাত্র হাতছাড়া করলে, পরে পস্তাতে হবে। একটু পড়তির মুখে, তা হোক নামী জমিদার-বংশ। এখনও [illegible] করেও, আয় মন্দ নয়। এ ছাড়া ছেলেটি শহরে নতুন কারবার ফেঁদেছে। [illegible] একবার দাঁড়িয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। পরন্তু মেয়ের গায়ের চামড়া [illegible] না। [illegible] ছেলেটি [illegible] বাড়ীর একটা ক্ষীণ আপত্তির সুর উঠেছিল, কিন্তু [illegible] —

ভালয় ভালয় বিয়েটা শেষ হ'য়ে গেল। বর-কনে নৌকায় উঠতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

বছর দুই কেটে গেছে। দু একবার মেয়েকে আনতে লোক পাঠানো হ'য়েছিল, মেয়েকে পাঠায় নি। নানা ওজর আপত্তি তুলে এড়িয়ে গেছে। গৃহিণীর শরীরের অবস্থা খারাপ। বাত ছিলই, তাতে বিশেষ কাত করতে পারে নি, কিন্তু হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী মাস ছয়েক। ইদানীং বাড়াবাড়ি চলেছে। সকাল বিকাল ইনজেকশন দিচ্ছি। দামী দামী দু একটা টনিক, কিন্তু উন্নতির লক্ষণ চুলোয় যাক, দিন দিন অবনতিই হ'চ্ছে। মেয়েকে দেখার খুব ইচ্ছা। সারা দিনরাত মেয়ের নাম করছেন। আমার এ শরীরে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাবার ধকল সইবে না। নৌকা, পালকি, নয়ত গরুরগাড়ী। সব মিলিয়ে পাক্কা মাইল কুড়ি। এ বয়সে সাহস হ'ল না। মোলায়েম একটা চিঠি লিখে বড় ছেলেকেই পাঠালাম। অভিভাবক বলতে সেই পালা-জ্বরাক্রান্ত মামা, তাই চিঠিটা সোজাসুজি জামাইকেই লিখলাম।

দিন তিনেক। ভোরের দিকে গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। দাওয়ায় বসে দাঁতন করছিলাম, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘোমটা মাথায় মেয়ে এসে দাঁড়াল। বেশ যেন রোগা, গায়ের রংও তামাটে। মাঝে মাঝে চিঠি অবশ্য লিখেছে। তাতে অসুখ বিসুখের কোন খবর পাইনি, তবে বিষাদের একটা প্রচ্ছন্ন সুর ছিল। কিসের যেন একটা অভাব, অর্থ, আভিজাত্য সব পেয়েও পরিপূর্ণ শান্তি যেন পায় নি। দু একবার ছেলেরা গিয়েছিল বোনের বাড়ী। তারা ফিরতে গৃহিণী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।—মিনতি ভাল আছে তো? জামাই? আদরযত্ন করলে কেমন?

ছেলেদের কথায় এমন কিছু মনে হয় নি যাতে ধারণা হ'তে পারে মিনতি কষ্টে আছে। দেহের কিংবা মনের। সেইজন্যই গৃহিণী বলতেন, [illegible] মিনতি। সুখে থাক, শান্তিতে থাক। আর আমার কিছু দরকার নেই।

মিনতি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ঘোমটা না সরিয়ে—থাক মা থাক, চিবুক ধরে আদর করতে যেতেই ঘোমটা একটু সরে গেল। খুব অল্প, কিন্তু তাতেই কাজ হ'ল। ডাক্তারী চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

হাত দিয়ে ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এ সব কবে থেকে হয়েছে মিনতি।

মিনতি প্রথমে কোন উত্তর দিল না। ঘোমটাও সরাল না। দুটো চোখ জলে ভরে এল। কেঁপে কেঁপে উঠল দুটো ঠোঁট। আবার জিজ্ঞাসা করাতে আস্তে আস্তে বলল, প্রায় বছর খানেক।

চোখের সামনে থেকে অনেকগুলো দিন সরে গেল। ভেসে উঠল আর এক আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। কুৎসা আর অপবাদে পঙ্কিল রাত্রির আকাশ। চিন্তাপুরের বাঁড়ুজ্জে বাড়ীতে পাপ না ঢোকে তার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস।

আর একবার ভাল করে দেখলাম মিনতির মুখের দিকে। না, আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমার এত বছরের অভিজ্ঞ চোখ ভুল করে নি। যৌন ব্যভিচারের নির্মম প্রতিলিপি। বাঁড়ুজ্জেবাড়ীতে নতুন করে পাপ আর প্রবেশ করেনি, পুরনো পাপই অপরূপ লীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

সেই মধুমিতা

দিলীপ দাশগুপ্ত

এক বার্তা ব'য়ে এনে ক্লান্ত হ'য়ে
বিয়াত্রিচে সেন
একবার বলেছিলো : রাঙাসাধ কখনো ফুরিয়ে,
কুড়িয়ে ফাগুন
একটি ইচ্ছার ছোঁয়া রেখেই যাবোতো। :
সে কথার চারা
টবে পুঁতে রেখে দিতে ভুলে গেছি। তাই
সাহানা বিশ্বাস এসে তিলে তিলে ক্ষ'য়ে
রাতভোর করে দিলো আকাঙ্ক্ষা-প্রদীপ।
উজ্জয়িনী ...সারাস্তুপ ...[illegible] ... আর
আজবনগরী এই মধু-ক'লকাতা
ঢাকেনিকো মেঘ দিয়ে জল-চাওয়া মেঘ!
প্রথমবারের সেই বিয়াত্রিচে সেন
মধুমিতা মনোমিতা হয়েছিলো কতো!
ঘুমন্ত মধ্যাহ্ন নিয়ে স্বপ্ন স্বপ্ন-খেলা :
মিতা গুপ্ত... লোলা রায়... গোপা মজুমদার...
নিপুণিকা... রেখা বাসু... আরো আরো কতো
দান্তের দৃষ্টির পথে বাংলাদেশে এই
ব্যাকুল বুকে-ও যেন বিমুগ্ধ জিজ্ঞাসা!
আর কানে তালা লাগা
: চাই চুড়ি চাই, বেলোয়ারী...রকমারী... :
সবই যেন আজ শিলীভূত
হ'য়ে গেছে
একটি সত্তার।
যে-কৈশোর কারামুক্ত আত্মবিনোদিনী
যাযাবরী হয়নি এ দৃষ্টির আড়ালে
সে এখনো বাল্মীকির-বন্দীদের ধ্যানে
নব নবরূপে আনে কতো মধুমিতা!
আর
বিয়াত্রিচে সেন,
এক বার্তা কী যে এনে দিয়েছিলো জানি,
আর জানি মন্দিরের সায়াহ্ন আরতি!

ফুলদানি — দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

এদেশে বরফ পড়ে না। বরফ ঝাঁট দেবার জন্য কোন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়েকে নিযুক্ত করতে হয় না। অবশেষে সেই ঘুঁটে-কুড়ুনী পরীর বরে রাতারাতি রাজকুমারের মন হরণ করে মহারাণী হয়ে বসে না। এদেশের গল্পও নয়।

এদেশের অন্য গল্প আছে, আমি তা জানি। তুহিনের ঝড় আলপসের ওপারে ঠেলে রাখলেও এদেশে বৃষ্টি পড়ে অজস্র ধারায়। ঝড় ওঠে। গরীবের কুঁড়েঘর উড়ে যায়, পুরনো বাড়ী ধ্বসে পড়ে। গাছের তলায় রেফিউজী ভেজে। বন্যায় বাড়ীঘর ভেসে যায়। বরফ পড়ার গল্প তো এর কাছে ছেলেমি। এদেশে ঘুঁটেকুড়ুনীর ঘুঁটেই শুকোয় না। তায় আবার সে রাজরাণী হবে।

এমনি বর্ষার দিনে মল্লিক বাড়ীর সামনে বাঁধানো উঠোন, সিঁড়িগুলো পরিষ্কার করছে পারুল। বর্ষার দিনে বাড়ীঘর নোংরা হয়ে যায়। নিত্যকার ঝি-চাকর বাড়তি কাজ করতে চায় না। অথচ দিনে দু'তিনবার জল ঝাঁট দিয়ে, ধুলো-বালি-পাতা পরিষ্কার করে না দিলে তো বাড়ীর সামনে অপাংক্তেয়। জমাদারের দ্বারা হয় না। অতএব গৃহিণী রাজমিস্ত্রীর কন্যা পারুলকে উক্ত কাজের জন্য সাময়িকভাবে বহাল করলেন।

এই বাড়ীতে মিস্ত্রীর কাজ লেগেই থাকে। প্রাচীন বনেদী বাড়ী। এখানে সুরকি ঝরছে, ওখানে কাঠ খসছে। বড়মিস্ত্রী তদারক করে কাজকর্ম করিয়ে দেয়। পাড়ার বকুল গাছটা পেরিয়ে কিছুদূরে গেলেই মিস্ত্রীর বস্তী।

মিস্ত্রী ধরাধরি করেছিল। অনেক সন্তানের জনক সে। দিন চলে না। তের বছরের পারুলকে একটা কাজ দিলে তার বড় উপকার হয়। ছোট মেয়ের এখনও বিয়ে দেয়নি মিস্ত্রী। তের বছরে পা দিলে কি হবে, ঝিরকুটে চেহারা পারুলের, বাড় নেই। বিয়ের বাজারে দর উঠবে কি করে। তাছাড়া, পারুল না থাকলে পারুলের মায়ের হাতে-হাতে কাজ করা, ছোট ছোট ভাই চারটিকে মানুষ করার লোক থাকবে না। অতএব পারুল মিস্ত্রীর ঘর আলো করে আছে।

এ বাড়ীর লোকজনকে পারুলের বড় ভাল লাগে। বাড়ীভর্তি লোকজন। নানা বয়সের, নানা ধরনের। তাছাড়া লোকগুলির ভালত্বের সীমা নেই। গরীব ঘরের হেলা-ফেলার সন্তান পারুল। মা-বাবা ভালমুখে কথা বলে না কখনও। এহেন পারুলের হাতে যদি বাড়ীর বিলাসিনী ছোটবউ একটা বিবর্ণ সিল্কের জামা অবহেলায় দান করে, তবে তো পারুলের দিন লাল হরফে ছাপার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড়বৌ সোপকেসে নূতন সাবান রাখতে গিয়ে পুরোনো ক্ষয়-যাওয়া গন্ধ সাবান তুলে দেয় পারুলেরই হাতে—কারণ দুই চোখ চা-কাপের সম্ভারের রূপে ধাঁধিয়ে পারুল হাঁ করে এ বাড়ীর লোকের কাজকর্ম গিলবার জন্য সামনেই উপস্থিত। দিদিমণিরাও কখন একটা ফিতে, একটা পাটাপাচটার ক্লিপ ফেলে দেয়। পারুল মোটের ওপর বেশ ভাল আছে।

সবচেয়ে পারুলের ভাল লাগে বাড়ীর ছোটছেলে শুভেন্দুবিকাশকে। সারাক্ষণ নিজের ঘরে বসে বসে নীল কাগজে, সাদা কলমে কি যেন তিনি লেখেন। আদ্দির পাঞ্জাবী, গিলে-ধুতি, সাদা নাগরা তিনি সর্বদা পরেন। কাছ দিয়ে হেঁটে গেলে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়।

কিন্তু, না, আপনি ঠকে গেলেন। তের বছরের ওই কি বলে—হরিজনকুমারীর ধনী-কুমারের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, স্বপ্ন সফল হওয়া, বিয়ের বাজনা বাজা, এ সমস্ত আমি লিখতে বসিনি। সিণ্ডেরেলার গল্পটা বেমালুম চুরি করার মত মনোবলও খুঁজে পাই না। তা ছাড়া আমি যে ভাল করেই জানি সিণ্ডেরেলার গল্প কত মিথ্যা। ঘুঁটেকুড়ুনী রাজরাণী হয় না। আমি তো হতে দেখিনি।

অতএব পারুলের সিণ্ডেরেলার সংগে মিল কেবল বাইরে। তার কোন পরী পেট্রন নেই—নিমন্ত্রণ বাড়ী ধার-করা পোষাক পরে যাওয়ার কল্পনা তার মাথায়ও ঢোকে না।

তবে শুভেন্দুকে ভাল লাগে যে বড়? কারণ, শুভেন্দুর কথাবার্তা। কেমন যেন অন্য রকম লাগে পারুলের। ভারি ভাল লাগে।

শুভেন্দু নাকি বই লেখে। পারুলের মত মানুষকে নিয়ে কালির অক্ষর গেঁথে গেঁথে গল্প বানায়। অবাক হয়ে পারুল দেখে আর আকাশ-পাতাল ভাবে।

একদিন বৈঠকখানার সামনেটা পরিষ্কার করার পরে পারুলকে গিন্নীমা দোতালার বারান্দা পরিষ্কার করে দিতে বলেছিলেন। টানা বারান্দার দুই পাশে ঘর চলেছে। একখানা ঘরে বসে শুভেন্দু লিখছে।

পারুলের দিকে চোখ পড়ল। ছোট ঝিরকুটে একটা মেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। শুভেন্দু প্রশ্ন করল, "তুই কে?"

পারুল বিনীত উত্তর দিল, "আমি বড়-মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল।"

সেই তার নাম হয়ে গেল শুভেন্দুর কাছে। দেখা হলেই শুভেন্দু ওই নামে ডাকবে, "কি রে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল, তোর বাবার মত বড় হবি কবে?" অথবা "কি বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল, হালচাল কেমন?"

একদিন পারুল বলেছিল, "ভাল আছি, বাবু।"

"ভাল আছিস, বলিস কিরে? বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল ভাল থাকতে পারে নাকি? ভাল থাকা যায় না। ভাল থাকা চলে না।" গানের গলায় শুভেন্দু বলে উঠল। পারুল অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বাড়ীর লোকে শুভেন্দুবাবুকে পাগল বলে সাধে?

কি যে লেখেন বাবু, রাতদিন? অন্য বাবুরাও লেখাপড়া করে পাশ দিয়েছেন, শুনেছে পারুল। কিন্তু তাঁরা দিনরাত এমন কাগজ-কলম নিয়ে বসে থাকেন না। পারুলের জটপরা, উকুন-ধরা মাথা [illegible] হয়ে গেল শুভেন্দুবাবু কি লেখেন তাই ভেবে ভেবে।

পারুলকে কাহিনীর নায়িকা করায় বিপদ হয়েছে। পারুল 'গোবরে পদ্মফুল' নয়। হ'লই বা মিস্ত্রীর মেয়ে! যদি ওর বর্ণনায় তিলফুল নাসা, পটলচেরা চোখ বসাতে পারতাম, তবে আমার পারুলকে নিয়ে গল্প লেখার মানে হ'ত। পারুল কালো, শান্ত, ছোট চেহারার একটি মেয়ে। তের বছরে পা দিয়েছে, যৌবন এখনও অনাগত।

যদি পারুল অসামান্য হত, তাহ'লেও চলত। পারুল যদি বাবুর বাড়ীর ছেঁড়া বই কুড়িয়ে রাত জেগে নিজেকে [illegible] করবার চেষ্টা করত; পারুল যদি কান পেতে রেডিও বা রেকর্ডে গান শুনে হঠাৎ একদিন দোয়েল কোকিলের গান গেয়ে উঠত, তবে পারুলের ভবিষ্যৎ আমি দেখাতে পারতাম।

কলমের এক আঁচড়ে অমনি পারুল চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গে যেতে পারত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করত বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল। স্বদেশী করে জেলে যেত। হাসপাতালে ডাক্তার হ'ত; সুধাকণ্ঠী [illegible] হত বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল। কিন্তু হায়, পারুলের মত এমন গুণহীনা নায়িকা আমি কমই পেয়েছি।

চরিত্রেতে [illegible] যদি থাকত পারুলের। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারুলের চরিত্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে হবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেহাৎ বাজে মানুষ একটি পারুল।

যদি শুভেন্দু-বিকাশের প্রেমে কোনমতে পা পিছলে পড়ত পারুল, তবে কাজ হত। নীরব এবং ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নিয়ে স্যাম-স্যাম করে [illegible] [illegible] ফেলতাম আমি নিঃসন্দেহে। কিন্তু পারুল যে ছোট। অশিক্ষিত মিস্ত্রীর অপরিণতদেহা মেয়ে কেবল [illegible] দেহকে বুঝতে শেখে ওই বয়সে। প্রেম চেনে না। শুভেন্দু-বিকাশ যদি পারুলের হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে [illegible] সন্ধ্যার অন্ধকারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে বলত, তাহলে পারুল [illegible] [illegible] দিতে পারত। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] মত প্রেমে পড়ার নায়িকা বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল নয়। শুভেন্দুর প্রতি ওর আছে [illegible], কেবল বিস্ময়।

তবে, [illegible] [illegible] পারুলকে নিয়ে একটি কাহিনী রচনা করতে পারি। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি আছে পারুলের? দেখা যাক। এইবার চোখ-কান বুজে গল্প আরম্ভ করি।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খোলার চালের ঘর, মাটির উঠোন পারুলের দেশ। আর, দূরেই যে প্রাসাদ, সেই প্রাসাদের পেছনে এমন বস্তি থাকতে পারে জানা যায় না।

পারুল রাস্তা দিয়ে চলেছে প্রাত্যহিক কাজের পরে। মাসের পয়লা। চার টাকা মাইনে তো পেয়েছে, তাছাড়া আরও একটি রজতমুদ্রার ভারে পারুলের অঞ্চল ভারাক্রান্ত।

পারুল গিন্নীমাকে আবেদন দিয়েছিল, "আমি ও-বেলা এসেও কাজ করে দিয়ে যাব। তাহ'লে বিকেলবেলা সিঁড়িগুলো পরিষ্কার থাকবে।" আসল কথা, এই সুযোগে প্রাসাদে যতক্ষণ থাকা যায়।

গৃহিণী অবশ্য ভুল বুঝলেন। টাকার অঙ্কটাই বাড়াবার উদ্দেশ্যে বোধ হয় পারুল কাজের সময়ও বাড়াতে চাইছে। মুখে হেসে 'না' বল্লেন। কিন্তু মাসান্তে মাইনের অঙ্কে একটা টাকা যোগ করলেন, "নে তুই বায়স্কোপ দেখিস।"

তাই আজ ঝিরকুটে পারুলের গতির পেছনে জোয়ারের উৎসাহ। ঘাড় দুলিয়ে রাস্তার দুই পাশ খরদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলেছে পারুল। অন্যমনস্কভাবে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। অভ্যাস খারাপ পারুলের। নিজের মনে উচ্চারণ করে কিছু আওড়ানো ওর অভ্যাস আছে। এখনও বলছে—"হটর মটর! খটর-খটর!"

মানে নেই কথাগুলোর অবশ্য। কিন্তু, পারুলের অবচেতন মনে অর্থ আছে। বেলি-দিদিমণি আজ নতুন হাইহীলের জুতো পরে মার্বেল বাজিয়ে হাঁটছিলেন। সেই বাজনা দুই কান ভরে এনেছে পারুল বয়ে। সেই গানই গাইছে সে বাড়ী ফেরার পথে। না, রেডিও রেকর্ড নয়, পাড়ার বখা ছেলের গুঞ্জন নয়—বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল জুতোর হীলের গান গাইছে—

"হটর মটর! খটর-খটর!"

খটর-খটরের গান বন্ধ হ'ল পারুলের বাড়ীর কানাচে এসে। ইস্! হুলো। তাক ধরে বসে আছে পাশের ঝোপে ঘাড় বেঁকিয়ে, মাঝে মাঝে ল্যাজের ডগা নাড়ছে। দুইটি শালিকের চঞ্চুশূল সে হয়েছে। তারা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। হুলো নির্বিকার।

হুলো, না সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চা [illegible]। পারুল অন্য গান ধরল।

"ডোরাকাটা বাঘ,
ডোরাকাটা বাঘ!"

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের শিহরণ অশিক্ষিত-অজ্ঞানী মেয়েটির শিরদাঁড়া বেয়ে উঠল। রাত্রির মিটমিটে আলোয় ঘুম-না-আসা প্রহরে মাতার ভয় দেখানো বাঘ! ভাইদের জ্বালাতনে পারুলের মুখেও বাঘের ভয় দেখানো লেগে থাকে। অনার্য মনের আধো আলো ছায়ায় বাঘের ভয়, সাপের ভয় গাঁথা। শহরের কোন জায়গা ব্যাঘ্র দেবতার বাসোপযোগী নয়। একটু দূরে ঘন বন, শহর ছেড়ে। থাকলেও সেখানে তাঁরা থাকতে পারেন। কিন্তু, কেউ দেখেনি। [illegible] বছরের মনে মেয়েটির শরীরে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। সুতরাং বাঘের [illegible] [illegible] হয়ে গেল।

বাড়ীর দেওয়ালে পোস্টারের প্রদর্শনী। বস্তির দেওয়ালের এধারে জানালা নেই। অতএব পোস্টার লাগিয়ে লাগিয়ে দেওয়ালের দুর্বলিতহীন চুণের রংটা ঢেকে দাও। মেটে উঠোনে পারুলের মা উনুনে রুটি সেঁকে রাখছে। তিন বোন পারুলের বড়; বিয়ে হয়ে গেছে ওদের। মোটা টাকা পণ নিয়েছে মিস্ত্রী। চার মেয়ে চার ছেলে মিস্ত্রীর অবদান। চমৎকার হিসাব মিলিয়ে সাজানো। প্রথমে চার বোন, তারপরে চার ভাই। মিস্ত্রী মানুষ, মাপ-জোখ দেবার অভ্যাস জীবনেও আছে। কিন্তু, অসাবধান মাপে সংসারের মাপের চেয়ে সন্তান সংখ্যার মাপ অধিক হয়ে গেছে। বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি।

আকাশে রোদ—সোনার মত চক্‌চকে রোদ, নীচের ঘাসে রোদের ছায়া। পারুলের মনে খুশী। কাজটা ভাল জুটেছে তার। হঠাৎ কেমন এক আশ্চর্য পরিবেশে জন্ম-হাভাতে পারুল হাসি কুড়িয়ে ফেরে। ভারি চমৎকার কিন্তু। অবোধ কৃতজ্ঞতাবোধ মনের কোণ থেকে ঠেলে ওঠে। ভাল খাওয়ার পরে, কোন দুর্যোগের রাত নিরাপদে কেটে যাবার পরে অজানা শক্তির উদ্দেশে অনার্য মনের এমনি কৃতজ্ঞতাবোধ দেখা দেয়। যে জীবন সাদা-কালো ছিল, তারই পাশে পাশে সোনালী পাড় দেখা হয়েছে, তারই বুকে গোলাপী সুতোর ফুল উঠেছে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুলের।

মায়ের কাছে দাঁড়াল পারুল। একহাতে উনুনে রুটি সেঁকার চিমটে ধরে মা অন্যহাত বাড়াল নিরুত্তরে। নিরুত্তরে চার টাকা হাতে তুলে দিল পারুল। আঁচলে অন্য টাকাটাও চোখে পড়ল মায়ের।

"ও কি র‍্যা?"

"ওটা গিন্নীমা আমাকে বায়াসকোপ দেখতে দিয়েছেন।"

"বায়াসকোপ দেখতে আর হয় না। দু'দিন চাল নেই, রুটি হচ্ছে। চাল আনগে।"

পারুলের মুখ শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাশে কপালে ঘাম দেখা দিল। টাকাটা হাতে শক্ত করে ধরে সে ঘাড় দুলিয়ে বলল, "চার টাকা তো দিলাম। ওতে চাল আনগে।"

"হারামজাদীর হিসাব দেখ? দে আজ টাকাটা। কাল নিতে মাইনে পাবে, তখন বায়াসকোপের পয়সা নিস্।"

এখানে পারুলের মা যদি পারুলকে দুই ঘা বসিয়ে দিত, হাঁউমাউ করে সে কাঁদত, তবে গল্পটা জমাতে পারতাম। গরীবের মেয়ের উৎপীড়িত, দুঃখিত জীবন অঙ্কন করে। কিন্তু পারুলের মাও তো সাধারণ, তাকে অবস্থা তাইমুরের নিষ্ঠুরতায় রং ধরাবার দরকার দেখি না। পারুলের মা অত্যাচারী নয়, যৌথ পরিবারের দাবী মাত্র তার।

অতএব পারুলকে মা 'হারামজাদী' বলে গাল দিলে পারুল মাকে আরও খারাপ একটা কথা বলল। অনেক যা তা লিখেছি জীবনে, একথাটা বাদ দিলে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতি হ'বে না।

"এই যে [illegible]!" পারুল টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ঘরে এল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!"

কিন্তু, বায়াসকোপ দেখার [illegible] পারুল এমন কিছু ভেঙে পড়ল না। ভাত খাবার আশায় সে মশগুল। নির্বিকার পারুল। কোন সাধ-আহ্লাদ তীব্রবেগে ওর মনকে আশ্রয় করে না।

হাত দিয়ে চুলের নীল ক্লিপটা ঠিক করতে

করতে পারুল মেজভাইকে চাল দিল, "দেখ, আজ কি দিয়েছে।"

অতি বিশ্রী আকারের একটা অতিকায় প্রজাপতি-ক্লিপ। দিদিমণিদের অপছন্দের জিনিষ পারুল পেয়েছে।

ওঁরা সর্বদা জিনিষপত্র দেন, কখনওবা টাকা-পয়সা দেন। কিন্তু, খাবার-দাবার দেন না। দেবেন কেন? পারুলের মত হ্যাংলা তো ওঁরা নন।

জলখাবার খেয়ে কাজে বার হয় পারুল। ফিরে এসে আবার ভাত বা রুটি খায়। সন্ধ্যার পরেই আবার আহার। প্রাসাদেও লোকেরা এর চেয়ে বেশীবার খায় না, পারুল দেখেছে লক্ষ্য করে। অথচ পারুলের দোষ, পারুলের সর্বদা ক্ষিধে পায়। অমন সুন্দর স্থানেও একটুক্ষণ পরেই পারুলের পেটের মধ্যে অন্য একটা অস্তিত্ব দেখা দেয়—ক্ষুধার অস্তিত্ব।

পারুল অনাহারে আছে বলতে পারলেও গল্প জমে উঠত। কিন্তু, দেখলাম হাত-মুখ ধুয়ে কাজে যাবার শাড়ী ছেড়ে পারুল বেগুনপোড়া, কুমড়োঘণ্ট দিয়ে মোটা মোটা রুটি গিলছে গোগ্রাসে। মিস্ত্রী যেমন করে হোক, ধার করে হোক, টাকার যোগাড় করে পাঁচটি সন্তান ও নিজেরা দুইজনের নিত্য খাবার যোগাতো। চাল না পায়, রুটি খায়, কিন্তু অনাহারে থাকে না তারা।

পারুলের দেশ বা জাত কি হয়তো জানতে চান কেউ। কিন্তু, পারুল যে-কোন দেশে, যে-কোন সমাজে জন্মাতে পারে। মনের বাগানে অনেক ফুল ফোটে, তারই পারুল ফুল সে।

বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুলের নির্বিকার, অবোধচিত্তে কিন্তু একটা ইচ্ছা জাগল। মাথামুণ্ডু নেই সেই ইচ্ছার। শুভেন্দুকে সে অনায়াসে ইচ্ছার কথা জানাল।

শুভেন্দুর বেয়ারার কয়েকদিনের অসুখ। পারুল কাজের ভার পেয়েছে। মনে যথেষ্ট আনন্দ পারুলের। স্যাঁৎসেঁতে মেজে, টিনের চাল, সুরকিবিহীন ইঁটের দেওয়ালঘেরা বস্তি ছেড়ে যতক্ষণ এখানে থাকা যায়, ততই ভাল।

শুভেন্দু লিখতে লিখতে দেখল সনারের মত দুই চোখ পারুল ঘর মুছছে হাতে, চোখে তার লেখা গিলছে। শুভেন্দু কলম রেখে দিল।

"কিরে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল, কি দেখছিস?"

"কি লিখছেন বাবু?"

"লিখছি গল্প।"

"কার গল্প?"

"এই তোর-আমার মত লোকের গল্প।"

"কি হবে গল্প দিয়ে?"

"বইতে ছাপা হবে। সবাই পড়বে। সবাই জানবে আমাদের কথা।"

পারুল ভাবতে লাগল বিস্মিত হয়ে। দিন দুই ভাবার পরে সে শুভেন্দুর কাছে প্রস্তাবটা করল।

"বাবু, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন।"

বলে কি মেয়েটা? কাল-ঝিরকুটে বার বছর তিন মাসের মিস্ত্রীর মেয়ে! সে হঠাৎ বিখ্যাত হ'তে চায়।

শুভেন্দু বলল, "লিখব রে লিখব, বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল।"

"কবে লিখবেন, বাবু?"

"কবে তোর মত আর একজন লোক খুঁজে পাবি।"

"কেন?"

"তুই বড় ছোট। তোকে একা নিয়ে গল্প হয় না। তুই যদি অনেকের এক হ'তে পারিস, তবেই তুই আমার গল্পে ঢুকতে পারবি?"

পারুল অবাক হয়ে গেল। অহোরাত্র তার চিন্তা হ'ল কি করে এখন আর একটি লোক যোগাড় হয়। কিন্তু, আর একটি লোকের গল্পটা কি? সে গল্প আর তার নিজের গল্প কি করে এক হ'বে? তার নিজের গল্পটাই বা কি?

সন্ধানী পারুল সন্ধানী-দৃষ্টি মেলে পথঘাট, বাড়ীঘর সমস্ত খুঁজে দেখতে লাগল, কখন কি পাওয়া যায়? কবে শুভেন্দুর গল্পে তার প্রবেশলাভ হ'বে?

সেদিনও পথ দিয়ে চলছিল পারুল। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গলায় তার অর্থহীন কথার মালা:—

"চাঁদ-চাঁদা, চাঁদ-চাঁদা, কামরাঙা রে"—

ভাবার্থ: আজ বাড়ীতে চাঁদামাছ এসেছে, দেখে এসেছে পারুল। এখন দুপুর। দুইবেলা মাছ হ'বে। চাঁদ উঠলেও তখন ওরা মাছ খাবে। পথের বাগান থেকে কামরাঙা অপহরণ করে নিয়ে চলেছে পারুল। বেজায় টক—মা যদি গুড় যোগাড় করে অম্বল রাঁধে!

ছোকরা বেয়ারা চলেছে অফিসের পথে। পারুল সহগামী তার। স্বাভাবিকভাবেই কথা হ'ল।

বেয়ারা বলল, "ও খুকী, আপনমনে বকবক্ করছ কি? তুমি পাগল নাকি?"

কথাটা শুনে পারুলের গা জ্বলে গেল। পাগল তাকে কেউ বলে না, প্রাসাদের শুভেন্দু-বাবুকে পাগল বলে। মুখখানা হাঁড়ি করে পারুল উত্তর দিল, "তোমার তা দিয়ে দরকার?"

"চটো কেন, খুকী? কোথায় কাজ করো তুমি?"

তারপরে পরস্পরের আলাপ-পরিচয়, নাম বিনিময় হল। কিন্তু এখানেও গল্পের মোচড় পেয়ে ছেড়ে দিলাম বাধ্য হয়ে। ছোকরা বেয়ারা ও খুকী-ঝি প্রেমে পড়ল, একটু বড় হল, বিয়ে করল তারা। কিন্তু, জীবনের আসল গল্পে ছোকরা বেয়ারার পারুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্র একটি দিনের।

ছোকরা বেয়ারা নিজের কথা বলল: "বাবুর বাড়ীতে থাকি, অফিসে কাজ করি।"

"বাড়ীর কাজ কি?"

"সকালে উঠে ঘরঝাঁট, বাসনমাজা, চা করা"—

লোভী পারুল বাধা দিল, "চা খেতে দেয়?"

"দেয় এককাপ।"

"কি কি খাও তুমি রোজ? জলখাবার পাও?" কাজ সেরে ফিরছে পারুল। পারুলের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলছে ক্ষুধা।

ছোকরা বেয়ারারও আহারের বর্ণনায় অনুৎসাহ দেখা গেল না। জিভের ডগা ঠোঁটে বোলাতে বোলাতে সে বলে চলল:—"সকালে চা পাই। তারপর ভাত দেয়। বাড়ী ফিরে চা, জলখাবার পাই। রাত্রে খেতে দেরী হয় কিনা। রাতে আমাকেই রাঁধতে হয়।"

রান্নাঘরের চার্জ যার হাতে, সে তো সর্বশক্তিমান পারুলের চোখে। মা কেমন যা
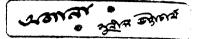
আকাশ ভরা নীলের নীলা আলোর অপরাধে
দগ্ধ হয়, বীতংসের বেদনা করে জড়ো,
সুদূর কোন শঙ্খচিল ছাউনি-খোলা ছাদে
খেলতে এসে ফুল-কপাটি রৌদ্রে ঝরোঝরো।
জীবন তার সারাটিদিন পাথরে ছক কাটে
ক্লান্ত হ'য়ে ঝিমিয়ে পড়ে পাথির পাথসাটে।

তবুও মন মুকুরে দেখে পাংশু মৃত-মুখ
সকাল এবং সন্ধ্যা তোলে দুদিকে দুই ঢেউ,
অন্ধকারে তবুও কাঁপে হতাশা-হত বুক
মধ্যে তার কিসের চর জানলো না তা কেউ।

ইচ্ছে রান্না করে, যাকে যা খুসী খেতে দেয়! পারুল সসার-চোখ হয়ে বলে উঠল, "কি মজা তোমার!"

"মজা কিসে খুকী? আগুনের পাড়ে বসে রান্নায় কি মজা থাকে?"

"আমার নাম পারুল, খুকী নয়। মজা না তো কি? সমস্ত খাবার জিনিষ তোমার হাতে।"

ছোকরা বেয়ারা হেসে উঠল, "কি বোকা তুমি, পারুল? প্রত্যেকটি ভাজা, আলুর টুকরো পর্যন্ত গুণে দেয়। একটা জিনিষও মুখে তোলার উপায় নেই।"

ততক্ষণে বকুলগাছের তলায় দুইজন দাঁড়িয়েছে। হাতে গুণে দেখল পারুল বেয়ারার খাবার বার তার সঙ্গে সমান। বড়লোকদের সঙ্গেও প্রায় সমান। তবে? তারা ক্ষোভ জানাতে পারে না।

"আচ্ছা, তোমার ক্ষিধে পায়?" পারুল জানতে চায় ক্ষুধার শিকার একমাত্র সেই কিনা।

"পায় না আবার? এক একবার মনে হয় অফিসের টেবিল-চেয়ার শুদ্ধ গিলে ফেলি।"

"অথচ দেখ, আমরা কতবার খাই। আমরা না খেয়ে নেই তো। বড়বাড়ীর লোকেরা তো আমাদের চেয়ে বেশী খায় না। কিন্তু, আমাদের এত ক্ষিধে পায় কেন?"

দুইজনে যথারীতি অবাক হ'ল।

"আজ কি খেয়ে বেরিয়েছ?" পারুল প্রশ্ন করল।

"আজ বেশী কিছু ছিল না, ডাল আর চচ্চড়ি।" একটু থেমে ছোকরা বেয়ারা যোগ দিল, "আর ভাত।"

খাবারের নামে পারুলের জিভ লক্-লক্ করছে। সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, বেলা দশটা বাজে। এরি মধ্যে ক্ষিধের তাগিদ জোর।

ছোকরা বেয়ারা ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি খেয়েছ?"

"বাসি রুটি ছিল, গুড় দিয়ে খেয়েছি। ঝোলা গুড়।" মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পারুলের, বলল সে, "আজ আমাদের মাছ এসেছে, অনেক মাছ। হেরম্বকাকা জেলে-নৌকো থেকে চুরি করে এনেছিল। অর্ধেক দামে বাবাকে বেচেছে। মা আমাকে পেট ভরে মাছ খাওয়াবে। কেন জানো? বাবুদের বাড়ী কাজ আমার পাকা হয়ে গেল। আমাকে ওরা ছাড়াবে না আর।"

এখানে গল্পের আরও একটা মোচড় আমার নষ্ট হয়ে গেল। গরীব হরিজনকে বড়লোক

(শেষাংশ ১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেওয়া যেতে পারে। ইংরাজীতে বলছি 'পাম্প' করা—বাংলায় বলা চলে হৃদ-স্পন্দন। দেখা গেছে মানুষের বেলা প্রতি মিনিটে ৭২ বার হৃৎ-স্পন্দন হয়। শিশুর হৃৎ-স্পন্দন আরও বেশী—মিনিটে প্রায় ১২০। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ইঁদুরের প্রতি মিনিটে ১৭৫ এবং ভয় পেলে ৩০০-এর উপরে উঠতে পারে। ঘোড়ার ও হাতীর মিনিটে ৪০ বার, খরগোসের ১৫০ বার। পাখীদের সাধারণতঃ হৃৎ-স্পন্দন খুব বেশী হয়। দূর সাগরে অভিযান করে তিমি মাছের হৃৎ-স্পন্দন গণনা করা হয়েছে। আইসেনহাওয়ার-এর খোদ ডাক্তার তিনি গিয়ে তিমির ওপর পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং দেখা গেছে তিমি মাছের হৃদ-কম্পন খুব শ্লথ—মিনিটে মাত্র ১০।১২ বার। হিসেব ধরে অংক কষলে দেখা যাবে সপ্তাহে, মাসে, বছরে কোনদিন কামাই না করে সারা মানব দেহে কতবার হৃদ-স্পন্দন ঘটে গেছে—

প্রতি ঘণ্টায় হৃদ-স্পন্দন = ৭২×৬০ =চার হাজার তিনশো কুড়িবার
প্রতি দিনে " = ৪৩২০×২৪ = এক লাখ তিন হাজার ছশো আশিবার
প্রতি সপ্তাহে " = ১০৩৬৮০×৭ = সাত লাখ পঁচিশ হাজার সাতশো ষাটবার
প্রতি মাসে " = ৭২৫৭৬০×৪ =উনত্রিশ লক্ষ তিন হাজার চল্লিশবার
প্রতি বছরে " = ২৯০৩০৪০×১২ = তিন কোটি আটচল্লিশ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮০ আশিবার

যদিও এক মিনিটে সাধারণতঃ ৭২ বার মানুষের হৃদ-স্পন্দন হয় তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়—অনেক দৃষ্টান্ত আছে যা ৫০ থেকে ৯০ বার করে হৃদ-স্পন্দন হচ্ছে। একটি স্পন্দন বা বিট হতে তা হলে সময় লাগে এক সেকেণ্ডের ৪/৫ ভাগ। এত সূক্ষ্ম হিসেবের কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিষ হলো এরই মধ্যে হৃদ-যন্ত্র প্রত্যেকটা বিট-এর পরে পরে একটু করে থমকে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে। একটি বিট সম্পূর্ণ হবার পর আর একটি বিট সুরু হবার মাঝখানে ১ সেকেণ্ডের ⅕ ভাগ সময় হার্ট পাম্প না করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম নেয়। মানুষটা জলজ্যান্ত হয়েই বেঁচে আছে যদিও তার হার্ট একটি বিট করার পর ১ সেকেণ্ডের ⅕ ভাগের চুলচেরা সময়ে কাজ করে না ফাঁকি দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। এই স্বল্প মুহূর্তটুকু বিরাম নিয়েই হৃদযন্ত্র আবার পরেরবার পাম্প করতে সুরু করে। সে সময়টুকু লাগে ·৮ সেকেণ্ড। সেটুকু কাজ করে আবার পরেরবারের মত অপেক্ষা করে। তারপর আবার পাম্প করে। প্রতিনিয়ত এমনি করেই চলছে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ। কেউ যদি কাগজে-কলমে হৃদযন্ত্রের থমকে দাঁড়ানোর মুহূর্তটুকু প্রত্যেকবার হিসাব করে রাখে তা হলে দেখা যাবে সারা দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছ' ঘণ্টা সময় হৃদযন্ত্র কাজ না করে বিরতি নিয়েছে। সাধারণ একজন লোকের ক্ষেত্রে সারা জীবনে সর্বক্ষণ হৃদযন্ত্র কাজ করেও ২০ বছরের মত সময় ফাঁকে ফাঁকে কিছু না করে স্রেফ বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়েছে। সমস্ত আয়ুষ্কালের মধ্যে এমনি করে খণ্ড মুহূর্তকে চুরি করে করে হার্ট বিরাম নেয়। তার পরিমাণ জুড়লে সারা জীবনের ছুটির সঞ্চয়কে এত বড় মনে হয়। তা বলে কেউ যদি ভাবেন একটানা বেশীক্ষণ হৃদয় যন্ত্রের বিরাম চেয়ে নেওয়া যাক—তার কিন্তু ফল হবে সাংঘাতিক—মৃত্যু। সত্যি-মিথ্যে জানি না—তবে এ কথা বহুলোকের মুখে শোনা যায়— আমাদের দেশে নাকি দু'চারজন সাধু-সন্ত আছেন যাঁরা হৃদ-যন্ত্রকে নিশ্চল করে যতক্ষণ খুসী মৃতের মত পড়ে থাকতে পারেন। স্বচক্ষে দেখিনি, না দেখলে তাই মানছি না। মিশরের এক ফকিরের কথা অনেকেই হয়তো পড়েছেন যে তিনি ইচ্ছে করলেই প্রতি মিনিটে হৃদ-স্পন্দনকে ৭২ থেকে ১৪০-তে ঠেলে তুলে দিতে পারতেন। হৃদয় যন্ত্রের বিশেষত্ব হ'ল তা একটা কর্মচক্রের মধ্য দিয়ে চলে। একটা চক্র সম্পূর্ণ হলে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি—তারপর আবার একটা চক্র আবার বিরতি। এমনি করেই প্রাণের টানে যন্ত্রটাও ছুটেছে, জীবন-প্রবাহও চলছে। দেহের ভিতর অক্সিজেন-এর কম বেশীর উপর হৃদযন্ত্রের আস্তে আর জোরে চলা নির্ভর করে। যে কোন ভয়-ভাবনায়, উত্তেজনায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে।

বুকের মধ্যে দিন-রাত্রি যে ধিক্ ধিক্ শব্দ হৃদয় যন্ত্র থেকে উত্থিত হচ্ছে তাকে উদ্দেশ্য করে কে একজন কবে বলেছিলেন শব্দটি হলো—murmur of the soul—চিত্তের গুঞ্জরণ অথবা মুগ্ধ প্রাণের অনুরণন। কোন মরমী সংগীতজ্ঞ কান পাতলে হয়তো বলবেন যন্ত্রটি অনুভূতির musical 256 cycles-এর নীচের middle 'c'-তে বাঁধা আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দায় আরও বেশী। তাঁরা কম্পমান হৃদয়ের ধ্বনিকে মুগ্ধ প্রাণের রোল বলে সহজে ক্ষান্ত হতে পারেননি। তাঁরা আওয়াজের যথার্থ ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। সতের শতকে সর্বপ্রথমে রবার্ট হুকে (Robert Hooke) হৃদয় যন্ত্রের আওয়াজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ব্যক্ত করেন। অবশ্য ১৬২৮ সালে উইলিয়াম হারভে তাঁর বিখ্যাত লেখা De Motu Cordis-এ ব্যক্ত করেছিলেন এক ভগবান ছাড়া হৃদ-কম্পনকে কেউ বুঝতে পারবে না। তারপর প্যারিসে একজন ডাক্তার Rene Theophele Hyacinthe Laennee হৃদ-যন্ত্রের মর্মর ধ্বনি নিয়ে কোমর বেঁধে গবেষণা সুরু করেন। তিনি হৃদরোগী পেলেই তাদের বক্ষোদরজায় কান পেতে শুনতেন আওয়াজটা কেমন আসছে—মন্দ না মধুর তালে না বেতালে? সেই থেকেই নির্ণয় হতো হৃদরোগ হয়েছে কি না। যখন এমনি পরীক্ষা করার উপায় বার করেছিলেন তখন ডাক্তারের একথা বোধহয় খেয়াল ছিল না যে তরুণীরাও হৃদয় ব্যথায় ব্যথিত হতে পারেন। একদিন তাঁর বড় বিপদ ঘনিয়ে এল। ১৮১৬ সালে একজন মধুক্ষরা তন্বী বুকে ব্যথা নিয়ে এসে হাজির। ডাক্তারের সম্ভ্রমে বাধল—কি করে এমন বক্ষ দরজায় কান পাতবেন। বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর, কাগজকে লম্বা চোঙ্গার মত তৈরী করে একটু ব্যবধান সৃষ্টি করে তিনি অবশেষে কানে শুনলেন তাঁর হৃদ-কম্পন। ব্যাস—সেই থেকেই ষ্টেথসকোপের সৃষ্টি—সম্ভ্রমের বালাই থেকে এর জন্ম। এরপর Rene কাগজের বদলে ছোট ভেঁপু-বাঁশীর চোঙ্গা ব্যবহার করতে সুরু করেন—তাতে স্পষ্ট হৃদ-কম্পন অনুভূত হয়। তারপর আস্তে আস্তে এই যন্ত্রটির উন্নতি হলো—ক্রমে য়্যামপ্লিফায়ার ও রবারের নলের ব্যবহারও এলো। আজও মাতৃজঠরে শিশুর হৃদ-কম্পন পরীক্ষা করার সময় সেই পূর্ব প্রচলিত Rene আমলের পদ্ধতিতেই শোনা হয়ে থাকে।

ধ্বনিটা খোলার নয় বন্ধ হওয়ার ধ্বনি

কবির হৃদয়ে কি হয় বলা যায় না—তা না হলে রবীন্দ্রনাথ কেন লিখলেন—

'হৃদয় মাঝে— ওই যে বাজে
তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি—
ওই যে বাজে।'

কিন্তু আসলে হৃদ-স্পন্দনের যে আওয়াজ আমরা শুনতে পাই সেটা হলো—হৃদয় যন্ত্রের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। খোলার সময় এক রকম বলতে গেলে কোন শব্দই হয় না। এর আগে বলা হয়েছে আর্টারি ও ভেনের সংগে হৃদযন্ত্রের কত আশ্চর্য সংযোগ আছে। মানুষের হৃদযন্ত্রের মধ্যে আর্টারির রক্তের সংগে ভেনের রক্তের কখনও মেশামেশি হয় না। সেই কারণেই হৃদযন্ত্রের মধ্যে যেখানকার রক্ত সেখানে থাকবার জন্যে ছোট ছোট আলাদা খোপ বা কুঠরী আছে। ভেন-এর রক্ত প্রথমে এসে ডান দিকের অরিক্ল-এ জমা হয়। সেখান থেকে তার নীচের ঘরে অর্থাৎ ডানদিকের ভেনট্রিক্ল-এ আসে। ডানদিকের ভেনট্রিক্ল থেকে ফুসফুস এবং সেখান থেকে পরিষ্কার রক্ত আসে হার্টের বামদিকের ওপরের ঘরে—অরিক্ল-এ সেখান থেকে বাম ভেনট্রিক্ল-এ; এবং বাম ভেনট্রিক্ল থেকে সোজা বড় আর্টারিতে—তারপর শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। হৃদযন্ত্রের ভিতর রক্ত আনাগোনার জন্যে প্রত্যেকটি কুঠরির সংগে এবং আর্টারির মুখে ঝিল্লির জানলা আছে। তাদের মোট সংখ্যা ১১টি। এই জানলাগুলি কেবল একদিকে খোলে—যে দিকে রক্ত বয়ে যায় সেইদিকে—অন্যদিকে নয়।

হৃদপিণ্ড যখন পাম্প করে তখন এক সংগে এগুলো খোলে আর বন্ধ হয়। কোন কারণে ঝিল্লিগুলো ঠিক মত খোলা বন্ধ না হলে রক্ত চুঁইয়ে আসতে পারে ও রক্ত পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটে। এই দোষকে বলা হয় Regurgitation. আবার অনেক সময় রক্ত আর্টারির মধ্যে ভালভাবে প্রবাহিত হতে পারে না, নানানভাবে বাধা পায়—সে ত্রুটিকে বলা হয় Stenosis. অনেক সময় দেখা যায় নীল ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। বাড়ীর লোকে যখন ভাবছেন ডাইনীতে বুঝি পেল তখন ডাক্তারের ভাবনা হচ্ছে শিশুর হৃদযন্ত্রে মধ্যে আর্টারির ও ভেনের রক্ত মিশে যাচ্ছে কেন? তাই সেই কারণেই এই কাণ্ড ঘটেছে। এমন গোলমালের চিকিৎসা করা এখন সম্ভব। পামেলা বলে একটা শ্বেতাঙ্গিনীর হৃদয় রহস্য এমনি ধারা আশ্চর্য ছিল। সে কাঁদলে পরেই তার সাদা ধপধপে রং কোথায় পালিয়ে গিয়ে সে হয়ে যেত নীলবর্ণা। ডাক্তাররা এর কারণ অনেক কষ্ট করে বার করলেন—হৃদযন্ত্রের কুঠরীর মধ্যে অহেতুক যোগাযোগ হয়ে রয়েছে—ফলে উত্তেজনার ফলে দু' রকম রক্ত মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রোপচার করে পামেলার হৃদয় মেরামত করা সম্ভব হয়েছিল, তারপর সে কাঁদলে শুধু চোখের জলই পড়ত, বর্ণ নীল হোতো না। এমন সন্দেহ হয় স্বর্গরাজ্যে ভাল সার্জেনের বোধহয় অভাব—তা না হলে রক্তচাপির বর্ণ নীলকণ্ঠের গলার রং আর গায়ের রং এর প্রভেদ নিশ্চয়ই এতদিনে ঘুচে যেত। ভিতরের ঝিল্লিগুলো রক্ত পরিচালনায় অসামান্য কাজ করে থাকে। তাদের প্রতিবার বন্ধ হওয়ার সময় যে আওয়াজ হয় তাই আমরা শুনতে পাই কারণ, খোলে তারা নিঃশব্দে। এ ব্যাপারটি সর্বলোকে, সর্বকালে ও সর্বদেশে সমান—সে হোক না কেন বিদ্যাপতি বা বিদ্যাসাগর—ভিতরের ঝিল্লির তলকব্জা এক রকমই।

অন্যান্য প্রাণীর হৃদযন্ত্র আছে ঠিকই কিন্তু তারা মনুষ্য হৃদয় কোথায় পাবে? ক্রমবিকাশের নানা পথ পেরিয়ে যে অভিব্যক্ত হয়েছে হৃদযন্ত্রের গঠনের কারুকাজ দেখলে তার রূপটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ক্রমে এ জটিল হয়েছে—হয়তো বা সেই সংগে কুটিলও! হৃদযন্ত্রের কুঠরীর সংখ্যা ঝিল্লির কৌশল সব কিছুই জীবনের অভিব্যক্তির ফল। মাছের হৃদয় থেকে ব্যাঙ-এর হৃদয়ের কৌশল অনেক বেশী। আবার ব্যাঙ-এর চেয়ে সরীসৃপদের আরও উন্নত। উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় স্তন্যপায়ী-দের আর পাখীদের বেলায়। কেঁচোদের চারটে রক্ত পাম্প করার যন্ত্র থাকলে কি হয় কৌশলের কেরামতি তাতে তেমন নেই।

কোন মধুরঞ্জনের হৃদয়ের নিভৃত ছায়ায় বসে একটু আকাশ-কুসুম ভাবা—তাতেই আছে মোক্ষম দাওয়াই।

হৃদয়টা বুকে নয়—আসলে মাথায়

হৃদয় যন্ত্রটি যে রক্ত চালনার নিছক পাম্প নয়— এ কথা অন্ততঃ মানুষের পক্ষে না মেনে উপায় নেই। যন্ত্র হয়েও এ যে যন্ত্রেতর কিছু তা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে একবার অনুভব করবেনই। প্রাণে যখন খুসীর তুফান লেগে রক্ত ছোটে জোরসে তখন মনে হয়, এ হলো পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্র। কান্না-হাসির এমন কোন সুর নেই যা এখানে একবার না একবার সপ্তমে বেজে উঠে। কেউ ভাবেন এটা বেদনার ভরা-পেয়ালা। এটি প্রত্যাশারও প্রতীক। এখানে কত গোপন-মোহন আশার আসন পাতা। হৃদয় কেটে যে পথ করা যায় তা কংক্রীটের পথের চেয়ে অনেক মজবুত—মনের মধ্যে প্রবেশ করবার এই একটি মাত্রই পথ। অনুভূতির ঘনঘটা ঘটান হৃদয়ের ধর্ম। ঝিমঝিম রাত্রে উদাস করা অলস মুহূর্তে নিতান্ত সহুরে লোকের হৃদয় যন্ত্রটিও আবেগে রিমঝিম করে ওঠে, যেমন করেছিল সেই মালবিকা—অগ্নি-মিত্রের দুরু দুরু মনে। অন্তরের গভীর সুধার পরশ পেয়ে কম্পিত হৃদয়খানি ব্যাকুল বসন্তে বিকল হয়ে ওঠে। অন্তরের বিচিত্র বর্ণের যত উৎসব তার মায়া প্রকোষ্ঠ ভেবেছি এই হৃদয় যন্ত্রকে—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান চক্ষে তা ঘুণাক্ষরে সত্যি নয়। যখন ভাবছি হৃদয় রয়েছে তোমায় ভরে তখন সত্যি সত্যি হৃদয়ে নয়—রয়েছে মাথায় ভরা। মস্তিষ্কের কাছে উতল হৃদয়ও বাঁধা পড়েছে—তা যে কোন ভ্যাদভ্যাদে রোমান্টিক-এর বেলায় পর্যন্ত খাঁটি সত্যি। মস্তিষ্কের হাতেই হৃদয় যন্ত্রের কঠিন লাগাম পরান। অনুভবের খোদ পাত্রটি হলো মাথা—সেখান থেকেই অনুভূতির আলোড়ন স্নায়ুর সাহায্যে নেমে আসে হৃদয় যন্ত্রে, তারপর ওঠে হৃদয়ে শোণিতে কি কল্লোল! প্রমাণ করা হয়েছে হৃদয় যন্ত্রের সঙ্গে দু' রকম স্নায়ুর তার বাঁধা আছে। একটি আলোড়নের আতিশয্য দেখায় এটি হলো সিমপ্যাথেটিক নার্ভ। আর দ্বিতীয়টি হৃদয়াবেগকে প্রশমিত করে—যাকে বলে ভেগাস নার্ভ। যখুনি কোন উল্লাস, আনন্দ, অধীরতা, আবেগ আসে প্রাণের মধ্যে তার আলোড়ন সিম-প্যাথেটিক নার্ভ দিয়ে চলে আসে হৃদয় যন্ত্রে। তারপর করে তোলে তাকে উল্লসিত। রোমান্টিকদের বেলায় এইটুকু এতখানি হয়ে ফুটে ওঠে। যারা বিষণ্ণতার আর অবসাদের প্রতীক তাদের মাথা থেকে আলোড়ন নেমে এসে ভেগাস নার্ভ দিয়ে আসে হৃদযন্ত্রে যেখানে নার্ভের শাসনে উচ্ছলতাকে সংবরণ করার হুকুম দেয়। মাথার স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়াই হৃদয় যন্ত্রে দেয় ব্যাকুল করছানি বারে বারে। তাই মানুষের আসল হৃদয়টা বসে আছে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে—মাথায়। মাথার হুকুমে হৃদয় যন্ত্রের এত ছোটা-ছুটি।

তবু এ কথা একশোবার সত্যি যে, হৃদয় নিয়ে যত ব্যাখ্যাই করা যাক না কেন, যদি তেমন হৃদয় না থাকে তা হলে কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম হবে না। সংসারে হৃদয়টুকু আছে বলেই হৃদ্যতা। স্বপনে-স্মরণে, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে এই হৃদয়টুকুর দাম বিস্তর! শুধু দেওয়া-নেওয়া মিলনের এটি বাসাই নয়, মনুষ্যত্বের এটি একটি মস্ত চিহ্ন।

বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে

(১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

হেনস্তা কমছে দেখাতে পারলে রাতারাতি গল্প আমার সিনেমা হ'ত। কিন্তু, পারুলকে মনিবেরা ভালই বাসে। বোকা হ'লে গরীব বড়মানুষের প্রিয়পাত্র হয়, লক্ষ্য করেছি।

দুইজনে আবার পথ চলছে। একটু চিন্তান্বিত ভাব। একটু পরে পারুল বলল, "যা ক্ষিধে পেয়েছে! এত ক্ষিধে যে কেন পায়? আমরা তো অনেকবার খাই।"

ছোকরা বেয়ারার পথ এবার পারুলের থেকে ভিন্ন বাঁক নেবে। যাবার আগে একটু থেমে ভেবে নিয়ে সে বলে গেল, "আমাদের ক্ষিধে পায়, তার কারণ, শুধু আমরা যে হ্যাংলা তা নয়। আমরা বার বার খেলে কি হবে, কোনও বারতো ভরপেট খেতে পাইনে। বড়লোকেরা আমাদের সঙ্গে বারে সমান খেলেও ভালমন্দ জিনিষ যত ইচ্ছা খেতে পায় পেট পুরে। তাই ওদের আমাদের মত ক্ষিধে পায় না। আমরা খেতে পেলেও যতটা দরকার, ততটা তো পাইনে কখনও। এই তো আমি ভাত খেয়ে বেরিয়েছি, কিন্তু এখনি ক্ষিধে পেয়েছে। বাবু খেয়ে বা'র হ'বেন, কিন্তু ও'র ক্ষিধে পাবে না। রসিয়ে-রসিয়ে যত খুশী ও'রা খান তো।"

নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি দিয়ে ছোকরা বেয়ারা নিজের পথ ধরল। পারুলও বাড়ী ফিরল।

চাঁদা মাছের ভোজ খাবার পরে পারুল ভাবল, একটু ঘুমিয়ে নিলে হ'ত। দিনে সে ঘুমোয় না, ঘুমোবার অভ্যাস নেই। কিন্তু ঘুম ঘুম লাগে কেন রে?

দুপুরে খাবার পরে বড়মিস্ত্রীর বৌ সূচী-শিল্পের ক্লাস খোলে। ছেঁড়া জামা-কাপড় রিফু করে, কাঁথা সেলাই করে শীতের উদ্দেশ্যে। চটচটে সতরঞ্চের ওপর মায়ের পাশে গড়িয়ে গেল পারুল।

পারুল ভাবছে : ছোকরা বেয়ারা ঠিক কথা বলেছে। খেলে কি হ'বে? পেটভরে খায়না তারা। যার যা হিসাবমত ভাগ, তার বেশী তারা পায় না। চাইতে তারা জানে না, চাওয়া নিয়ম নয়। প্রত্যেকে চারখানি বরাদ্দ রুটি যদি পায়, পাঁচখানির জন্য হাত বাড়ানো চলবে না। তাই বোধহয়, তাদের কলাই করা থালায় এক কুঁচি আহার্য দেখা যায় না, ভোজনের পরে। খেয়ে উঠে রোজ পারুলের থালা ধুতে যাবার মুখে কেমন খালি-খালি বোধ হয়। আরও ভরাট কিছু পারুলের মধ্য থেকে ঠেলে উঠলে হয়তো লাগতো ভাল। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী যে পরিমাণ রসদের জন্য হাত বাড়ায়, সে পরিমাণ রসদ যোগানো তাদের ঘরে সম্ভব নয়। তাই বার বার ক্ষুধা তাদের দ্বারে হানা দিয়ে থাকে। তারা নিয়মিত খেলেও তাদের খাওয়াটা খাওয়া নয়। ভাবতে ভাবতে পারুলের ঘুম এসে গেল।

আজ বরাদ্দ আহারের ওপর মাছ ছিল। তাও মা আরও একবার দিয়েছে। তাই গা এলিয়ে আসছে। একে বলে ভরাপেট। কেমন শান্তির ভাব সারা গায়ে!

পারুলের চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

পারুলের মা তাকিয়ে দেখল, পারুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তা পড়ুক। রোজগারী মেয়ে। একটু গায়ে এখন মাংস লাগলেই পণের টাকার অঙ্ক বেড়ে উঠবে। এবারকার টাকা দিয়ে জামা-কাপড় করানো হ'বে। ততদিনে নিতের সঙ্গে সঙ্গে হরে, সিধু রোজগার ধরবে। শুধু বাচ্চা ছেলেটাকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। তারামায়ের পুজো দেবে বড় মিস্ত্রীর বৌ, সংসার একটু সুরাহা হলেই। প্রসাদ বেঁটে দেবে পাড়ায়। কি প্রসাদ? মাংস, ভাত, বোঁদে। ভবিষ্যৎ সম্পদের আনন্দে বড় মিস্ত্রীর বৌ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল তার মেয়ে—বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল।

সেই হুলো, যার উদ্দেশ্যে পারুলের অমর-গীতি রচিত হয়েছিল :—ডোরা-কাটা বাঘ!

ডোরা-কাটা বাঘ!—

সেই হুলো বিরাট হয়েছে—জঙ্গলের মধ্যে চোখ জ্বলছে তার। শালিকের দল ভয়ে পালিয়ে গেছে। হুলো আর হুলো নয়, সত্যই ডোরা-কাটা বাঘ। প্রস্তুত হয়ে আছে লাফিয়ে পড়বার জন্য শিকারের উপর। সে ক্ষুধার প্রতীক।

কিন্তু, পথ অনেক দূরে চলে গেছে, বাঘের গায়ের গন্ধ ছেড়ে। বকুল ঝরে সেখানে। কত লোক চলেছে। এত লোকের মধ্যে পারুল মিশেছে। তবু কি শরদিন্দুবাবু পারুলের গল্পটা লিখবেন না?

পারুল নিজে জানল না যে, আজ তার গল্পের লোকের দেখা সে পেল। শরদিন্দুর কাহিনীর নায়িকা হওয়ার যোগ্যতা এল তার আজ।

ঘুমন্ত অনার্য মনের আলো-ছায়ায় গাঁথা বাঘের ভয় পেরিয়ে পা চলেছে পারুলের। মুখে বিড় বিড় : ডোরা-কাটা বাঘ!

ডোরা-কাটা বাঘ!

আস্তে মিলিয়ে গেল একঘেয়ে ছড়া। ছোকরা বেয়ারা চলে গেল। আরও ছোকরা বেয়ারা আসবে। কারুর একজনের সঙ্গে বকুল-ঝরা ঝামামাটির পথে চলবে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল। পেছনে তাদের থাবা মেলে তৈরি থাকবে ওই হুলো—বাঘ। তবু তো বকুল-ঝরা পথে চলা আছে, অনেক ছোকরা বেয়ারার মধ্যে একজনের সঙ্গে। অনেকের মধ্যে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল একজন। অনেকের মধ্যে তারা দুজনে একজন।

সাঁওতালী বউ

শ্রীশান্তি পাল

ওগো সাঁওতালী বউ, কাজল-চোখে
আঁজলা ভরা সুখ
দুলে যাচ্ছো কোথা খোঁপায় গুঁজে
ডাইনপালী ফুল?
বুকের মধু চলকে ওঠে,
ঠোঁটের ফাঁকে কুন্দ ফোটে,
গন্ত দ্রোণ, দোপাটি দুপারেতে
গুলঞ্চের মঞ্জুরী।
ঘন বাবলা ঝাড়ে চুড়ুই-চুড়ি
ভীমরাজ বুকেবুকে!

(২)

আজ ভুলিয়ে নিল তোর মনকে
কোন্ মহুয়া বন,
হেন নিটোল রূপের নেশা কেন
ছাড়ল অকারণ?
গন্ধমোট-ভরা বাদলা দুপুরে,
হারাল কোন যাদুর মেলায়,
সেথা কোন্ দরদীর দোকানে সে
জমায় আলাপন?
তার কোন্ রূপসীর চাঁদের ছটায়
টাউরে গেল মন?

(৩)

জানি আজকে সাঁঝে জ্বলবেনা দীপ
ফিরবে না তার ঘর,
হোথা মাদলা সানাই তালে তালে
আপন হবে পর।
কণ্ঠে তোমার জোগাবে গান,
নেইকো প্রাণে তার অভিমান,
বুঝি আজ কাঁদেছ নাচের দলে
তোমার পায়ে ভর!
রাঙা ব্যথার গানে আমেজ-ভরা
উঠবে সবুজ চর!

নাম

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

১

বুড়ী নয় খুড়ি।
পাঁচ বছরের খুকীটির নামটি তাই বুড়ী
খোকা নয় ধোঁকা,
ষাট বছরের বুড়োটার নামটি তাই খোকা।

২

ভাল নাম পদ্মলোচন
আসলে কিন্তু টাঁরা।
মাথায় তাঁর অনেক কেশ,
তোঁড়টিও কাটেন বেশ,
ডাক নাম তাই ন্যাড়া।

৩

অম্বরবাবু বড় ছেলের
নাম দিয়েছেন দিগম্বর,
মেজ ছেলের পীতাম্বর,
সেজ ছেলের নীলাম্বর,
ন ছেলের আড়ম্বর
ছোট ছেলের ডিসেম্বর।

প্রতিধ্বনি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যে ধ্বনি বাজে দূরে অনেক দূরে
অথচ কাছে অনেক কাছে কাছে,
যে ধ্বনি শুধু স্বপন, নেই কোথা
অথচ সর্বকিছুতে লেগে আছে।
যে শুধু পাখি, যে শুধু লঘু ডানা
যে শুধু গান দুজোড়া আঁখি পাতে,
যে শুধু ঘাসে সহজে ফুটে ওঠা
যূথীর কুঁড়ি শিশিরভেজা প্রাতে।
যে ধ্বনি তুমি যে ধ্বনি মধুমাস
যে ধ্বনি শুধু আকুল প্রত্যাশা
আকুলতার প্রতিধ্বনি তার
আকাশভরা সেই কি ভালবাসা?
সোনালি ভোর, ভোরের তারা তুমি
উষার মেঘে পদ্মরাগমণি,
স্বপন আমি দেখেছি শেষ রাতে
তুমি যে ধ্বনি, আমি প্রতিধ্বনি।

ভাঙা তক্তার গান

প্রভাকর মাঝি

আমার ঘরের ভাঙা তক্তায় ভাই,
আমার পুরোনো আকাশকে ফিরে পাই!
ফিরে পাই সেই শান্ত মেজাজ মন
যে করে গরলে অমৃত অন্বেষণ।
প্রতিদিনকার দুঃখে ও বেদনায়
নিত্য কার পাখী মন উড়ে যায়।
হঠাৎ কখন কালি-কাগজের পরে
খস্ খস্ দাগ কাটি কালো অক্ষরে।
কোটরে কোটরে সেয়ার ছারপোকাগণ
রক্ত চাটে পেছে, ঝরে গেছে যৌবন।
(হায় যৌবন আমাদেরও আছে নাকি?
কোথা নীল চোখ, কোথা সেই সুরা সাকী!)
নড়বড়ে পায়া আরামে বসার নয়,
তবু কী আরাম জাগে সারা দেহ-ময়।
ওইখানে বসে কবিতায় চিঠি লিখে
হেসেছি ও ভালবেসেছি যে শ্যামলীকে।
প্রথম প্রেমের উগ্র মদিরা ঢেলে
সে মেয়ের বুকে আগুন দিয়েছি জেলে।
কোজাগরী রাতে উষ্ণ আলিঙ্গনে,
দুহু করে কেটে গিয়েছে সঙ্গোপনে।
শূন্য মঞ্চ: আজ তারা কেউ নেই,—
সেদিনের স্মৃতিরেখা আছে এখানেই।

একটি অনুরোধ

সুধীরেন্দ্ররঞ্জন ঘোষ

অনেক দিয়েছ মৃত্যু—
কালো মেঘ, অন্ধকার
কামনার আবেগ বেদুর।
এবার মুক্তি দাও—
অনন্ত আকাশ আর
সোনা রোদ্দুর।
একটি আকাশগামী
পাখির গানে
আমি যে পেয়েছি আজ
জীবনের সহজ মানে।

কঙ্কাবতী

অনিল ভট্টাচার্য

কঙ্কণা নদীর তীরে
কঙ্কাবতী কাঁদে!
কোন সে অরূপ রাজকুমারের
রূপ কামনা ফাঁদে।
রূপকথারি কোন সে কুমার
এলো সোনার নায়
কঙ্কাবতীর সাথে দেখা
বকুল বনের ছায়
শাপলা কমল চেয়ে তখন
দেখেছিলো চাঁদে!
কঙ্কণা নদীর তীরে কঙ্কাবতী কাঁদে।

* * *

"শ্যামলা মেয়ের কানে কানে
বললে রাজকুমার
বকুল মালা দিলাম তোমায়
তুমি যে আমার।"
দিনে দিনে ফুরিয়ে এলো
ফুল ফোটানোর বেলা
রাজারকুমার ফিরলো দেশে
ভাসিয়ে সোনার ভেলা
আর কঙ্কাবতী রইলো একা
প্রেমের অপরাধে
কঙ্কণা নদীর তীরে কঙ্কাবতী কাঁদে!

* * *

বসন্ত রাত আবার ফিরে
এলো বকুল বনে
রাজকুমারের ফুলের শপথ
রইলো না হায় মনে!
(আজ) সেই সে মালা শুকিয়ে ওঠে
কঙ্কাবতীর গলে
ফুলের মালা কাঁটার মত
বিঁধছে পলে পলে
তার কত সাধের বকুলতলায়
চলতে চরণ বাধে।
কঙ্কণা নদীর তীরে কঙ্কাবতী কাঁদে!

ছায়া বিহারিণী

বংশীধারী দাস

সরু সরু আঙুলের সূক্ষ্ম কারুকাজে
সে তার বিনুনি বাঁধে, জর্জেটের সুবিন্যস্ত ভাঁজে
বহুবিধ অঙ্গরাগে যৌবনের সুঠাম ভঙ্গিমা
রেখায় রেখায় রঙে লীলায়িত করে দিতে চায়,
দর্পণের প্রতিবিম্বে খুঁজে ফেরে আপনার সীমা
আপনাকে খুঁজে ফেরে ছায়ার সীমায়!

ছায়ার সীমায় হায় নিঃশেষে দেয়না বুঝি ধরা
অতৃপ্তির মায়াজালে তাই তার সাজের মহড়া
বিচিত্র বর্ণাঢ্য সাজে চলে সদা আপনার মনে:
এ এক লীলাখেলা আপনারই রূপের প্রকাশে
আপনাকে খুঁজে ফেরা আপনারই রূপের দর্পণে—
অকস্মাৎ জর্জেটের ভাঁজে ভাঁজে রাত্রি নেমে আসে।
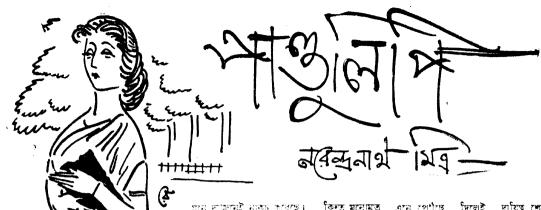
ঘর গুছাতে গিয়ে ব্যাপারটা ধরা পড়ল। কয়েক দিন ধরেই অসিত স্ত্রীকে বলছিল, 'বইয়ের র‍্যাক আর তাকগুলি বড় এলোমেলো হয়ে আছে। ঘরের দিকে আর তাকানো যায় না। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে যদি না রাখ, লোকে তোমাকেই বদনাম দেবে।'

মনীষা বলে, 'বাঃ রে, আমি শুধু একা বদনামের ভাগী হব কেন?'

অসিত জবাব দেয়, 'তুমি ছাড়া আর কে হবে। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। ঘর দেখলেই লোকে টের পায় এ বাড়ীর ঘরণীটি কেমন উড়ুনচণ্ডী।'

মনীষা বলে, 'আর বাড়ির যিনি কর্তা, তিনি যে ভোলা মহেশ্বর সেকথা বুঝি লোকে টের পায় না? আমি যত গুছিয়ে রাখি তুমি তত এলোমেলো ক'রে দাও। এদিক থেকে তোমার স্বভাব ঠিক একেবারে বাচ্চুর মত। আমি একা তোমাদের দুজনকে সামলাই কি ক'রে!'

অসিত গলা নামিয়ে মুখ টিপে হেসে বলে, 'এর পরে কতজনকে সামলাতে হবে?'

মনীষা আরক্ত হয়ে মাথা নাড়ে। 'মোটেই না। আর একটিও না। তুমি চেয়েছিলে বলেই—আমার মোটেই দরকার ছিল না। ওর জন্যই তো আমার বি-এর রেজাল্ট অমন খারাপ হল। ওর জন্যেই—।'

দেড় বছরের দুরন্ত শিশু তক্তপোষের তলা থেকে বেরিয়ে ধুলোমাখা হাতে মাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে।

মনীষা বি-এ ফেলের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে কোমল সুখস্পর্শ অনুভব করতে করতে বলে, 'ছাড় ছাড়, গেল আমার শাড়ীটা।'

এমনি ছোটখাট অনেক দুঃখের কথাই ওরা ভুলেছে। অসিত রায়, মনীষা রায় আর ওদের দেড় বছরের ছেলে বাচ্চু রায়। এখনো তার স্থায়ী ভালো নাম রাখা হয়নি। অন্নপ্রাশনের সময় বাচ্চুর দিদিমা নাম রেখেছিলেন পার্থসারথি। সে নাম অসিত আর মনীষা মনে মনে দুজনেই নাকচ করেছে। কিন্তু মনোমত দ্বিতীয় নাম এখনো খুঁজে পায়নি।

ক্ষুদ্রতম একটি সুখী পরিবার পণ্ডিতিয়া লেনের দু' রুমের এই ফ্ল্যাটটিতে এসে বাসা বেঁধেছে। তার মধ্যে একটি ঘর শয্যাকক্ষ। শুধু খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল নয়, মনীষার গৃহস্থালীর আরো নানা টুকি-টাকি জিনিষপত্রে বোঝাই। দ্বিতীয় ঘরখানি অসিতের লাইব্রেরী আর ড্রয়িং রুম।

এই ঘর নিয়েই বিবাদ। এই ঘর নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কৃত্রিম কলহ শুরু হয়। শেষে অবশ্য কৃত্রিমতাটুকু আর থাকে না। অনেক রাত অবধি জেগে অসিতকে মান ভাঙাতে হয়।

কলেজ স্ট্রীটের একটি বড় পাবলিশিং ফার্ম-এ কাজ করে অসিত। প্রথমে অবশ্য সেলসম্যান হিসেবেই ঢুকেছিল। এম-এ ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু কলমের জোরে, বুদ্ধির জোরে, ব্যক্তিত্বের জোরে পদ-গৌরব আর বেতনের অঙ্ক দুই-ই বাড়িয়ে নিতে পেরেছে অসিত। এখন সে পাবলিশারের প্রকাশযোগ্য ম্যানাসক্রিপট নির্বাচন করে, এডিট করতে গিয়ে অনেক সময় বইয়ের খোলনলচে বদলে দেয়। তরুণ কবি-যশপ্রার্থীরা শুধু নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখেই খুসি থাকে। ইংরেজী, বাংলা দুই কলমই চলে অসিতের। অবসর সময় কলেজের পরীক্ষার্থীদের জন্যে নোট লেখে, ইয়ার-বুকের গোটা কয়েক চ্যাপটার লিখে দেয়। নানাধরণের সংকলন গ্রন্থ সম্পাদন করে। ভবিষ্যতের বিভিন্ন পথের দিকে তার লক্ষ্য আছে।

আর লক্ষ্য বই সংগ্রহের দিকে। ইংরেজী, বাংলা, নতুন পুরোন নানা ধরণের নানা বিষয়ের বই সঞ্চয়ের দিকে তার ঝোঁক। আলমারী, র‍্যাক, আর দেয়ালের তাকগুলি সব বোঝাই হয়ে গেছে। নতুন বই রাখবার আর জায়গা নেই। এ নিয়ে মনীষা প্রায়ই রাগ করে, 'তোমার কেবল বই জমাবার দিকে ঝোঁক। যত বই আনো তত তো পড় না।' অসিত বলে, 'এখন অত পড়বার সময় কই। ভবিষ্যতে পড়ব। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পড়বে। বইতো শুধু এক-পুরুষের জন্যে নয়, পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা উত্তরপুরুষে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তো বই লেখা, বই রাখা।' মনীষা বলে, 'লেকচারতো খুব লম্বা লম্বা দিচ্ছ। কিন্তু বই রাখতে হলে তার জন্যে খাটতে হয়, যত্ন করতে হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে ঝাড়পোঁছ করতে হয়। শুধু কাগজদারা ক'রে রাশ রাশ বই বাড়িতে এনে পৌঁছে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আমার ছোট কাকাকে দেখেছি নিজের হাতে তিনি তাঁর লাইব্রেরী গোছান। বউ, ঝি, ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর কাউকে হাত দিতে দেন না। আর তোমার সব পরের হাতে?' অসিত বলে, 'তুমি কি পর? তুমি কি পরস্ত্রী?' মনীষা রাগ ক'রে সামনে থেকে সরে যায়।

স্ত্রীর খোঁটা আর খোঁচা খেয়ে খেয়ে অসিত শেষ পর্যন্ত নিজেই তার সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বেরোল। ছুটির দিনে সকালে আড্ডার লোভ ত্যাগ করে নিজেই বইগুলির ঝাড়পোঁছ, গোছ-গাছ শুরু করল। র‍্যাক থেকে অনেকগুলি বাংলা উপন্যাস অন্তর্হিত হয়েছে। তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া।

অসিত বলল, 'এ তোমার বন্ধুদের কীর্তি। যারা নিয়েছে তারা আর ফেরৎ দেবে না।'

মনীষা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মুখের ঘাম আঁচলে মুছতে মুছতে জবাব দিল, 'মোটেই না। তোমারই বান্ধবীদের কাণ্ড। আমার বন্ধুরা আর কদিন আমার থাকে। দুদিন আসতে না আসতেই তারা তোমার বান্ধবী হয়ে যায়। তুমিই তাদের বেছে বেছে বই দাও।'

এ অভিযোগের ঠিক উপযুক্ত জবাব না দিতে পেরে অসিত আবার বই গুছানোয় মন দেয়। একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পুবদিকের দরজার ওপর যে তাকটা আছে সেই তাকের বইগুলি একটা একটা ক'রে নামাতে থাকে। আর কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে পড়ে লম্বা পুরু হাতে লেখা একটা খাতা।

অসিত সঙ্গে সঙ্গে সেখানা হাতে তুলে নেয়। ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'জোয়ার-ভাটা।' খানিকটা নীচে লেখকের নাম, 'প্রাণকুমার চক্রবর্তী।'

অসিত অস্ফুট স্বরে বলে, 'মাষ্টার মশাইর সেই উপন্যাসের ম্যানাসক্রিপট। কিন্তু কী দশা হয়েছে এর!'

খাতাটা হাতে নিয়ে টুলের ওপর থেকে নেমে আসে অসিত। দু'চার পাতা করে উল্টে দেখে। অর্ধেকেরও বেশি ড্যাম্প লেগে পচে গেছে। একটি লাইনও ভালো ক'রে পড়া যায় না। শেষার্ধের দুর্দশা অত বেশি হয়নি। মোটামুটি পড়া যায়।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে অসিত স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'মনীষা, মনীষা!'

মনীষার কড়ায় তখন মাছের ঝোল। সে

রান্নাঘর থেকেই জবাব দিল, 'কেন অমন করে ডাকছ? কী হয়েছে বলনা?'

অসিত অধীর হয়ে বলল, 'তুমি এসো এখানে।'

মনীষা বলল, 'আঃ! উনুনে মাছ। আমি এখন যেতে পারব না। তোমাকে তো তখনই বললাম, খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের পরে ওসব গছানো টেঁছানোর কাজ ধরা যাবে। এখন কি আমার নিঃশ্বাস ফেলবারই জো আছে। সেটাকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তুমি খুব উদারতা দেখালে। আমি যে মরি সেদিকে তোমার লক্ষ্য নেই।'

অসিত আর কোন কথা না বলে খাতাটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ক্ষোভ, হতাশা আক্রোশ মেশানো এক অদ্ভুত স্বরে বলল, 'কী অবস্থা হয়েছে দেখেছ?'

উনুনের কড়া থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মনীষা বলল, 'কি ওটা?'

'চিনতেও পারছ না, মাস্টার মশাইর সেই ম্যানাস্‌ক্রিপটখানা।' মনীষা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আহা কি করে এভাবে নষ্ট হল?'

অসিত বলল, 'তুমিই বলো। সেবার বইটই গোছাবার সময় তুমিই বোধহয় রেখেছিলে।'

মনীষা বলল, 'দেখ মিছিমিছি সব দোষ আমার ওপর চাপিয়ো না। নিচের র‍্যাকে পড়ে ছিল। বাচ্চুর টানাটানিতে ছাড়া প্রায় হয়ে যায়। আমি ওপরের তাকে তুলে রাখলাম। তুমিতো তখন সামনেই ছিলে।'

অসিত নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দেখে বোঝা গেল ভিতরের রাগটা সে অতি কষ্টে হজম করবার চেষ্টা করছে।

মনীষা তা বুঝতে না পেরে বলতে লাগল, 'ছি ছি। বুড়ো ভদ্রলোক পাঁচ বছর আগে দিয়ে গেছেন খাতাটা। ছাপাতে পারবে না তুমি গোড়াতেই জানতে। এর মধ্যে তুমি খাতাটা একদিন ফেরৎ দিয়ে আসতে পারলে না?'

অসিত বলল 'থাক থাক, তোমার আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। কাজের জিনিসটি আমরা পরকে দেখাই। নিজেরা করে দেখিনে। দায়িত্ববোধ তোমারও যে কত বেশি তা আমার জানতে বাকি নেই।'

খাতাখানা হাতে নিয়ে আবার বসবার ঘরে ফিরে এল অসিত। এই মুহূর্তে বই গোছাবার উৎসাহ তার আর নেই। এলোমেলো বইগুলিকে কোনরকমে তাকে ঠেসে রেখে খাতাখানা টেবিলের ওপর রেখে দিল।

বছর পাঁচেক আগে প্রাণকুমারবাবু তাঁর এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে এসেছিলেন। অসিতদের স্কুলের অঙ্কের টিচার ছিলেন প্রাণকুমারবাবু। লম্বা চওড়া চেহারা। বয়সে অবশ্য তখনই প্রৌঢ়। তাঁর হাঁকডাকে স্কুলশুদ্ধ ছেলেরা কাঁপত। তাঁর সহকর্মীরাও ভয়ে তটস্থ থাকতেন। প্রাণকুমারবাবু সেক্রেটারীর কাছে কার নামে কখন গিয়ে কি লাগাবেন কে জানে! সেক্রেটারী বিপিন ঘোষালের বাড়ির প্রাইভেট টিউটর ছিলেন প্রাণকুমারবাবু। সামান্য টিচার হলেও মফঃস্বল সহরের থানা, কাছারি, পোস্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড সর্বত্র প্রাণকুমারের গতিবিধি ছিল। আর খুব কড়া করে খাতা দেখতেন প্রাণকুমারবাবু। অসিত অতি কষ্টে তাঁর কাছে পাশের মার্ক পেত। টেস্টে দু'নম্বর কম দিয়ে তিনি তাকে প্রায় আটকে রাখবার জো করেছিলেন। হেড মাস্টারের সুপারিশে শেষ পর্যন্ত এলাউড হয়।

সেই প্রাণকুমারবাবুকে এখন প্রায় চেনাই যায় না। চেহারা ভারি রোগা হয়ে গেছে। মাথার চুল সব পাকা। অবশিষ্ট দাঁতের সংখ্যা পাঁচ-সাতটির বেশি নয়। শরীর সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। গায়ে আধ-ময়লা পাঞ্জাবি। পায়ে পুরোন এক জোড়া ফিতে বাঁধা জুতো।

তবু মুখের আদলে অসিত ঠিকই চিনতে পারল। মাথা নিচু করে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'স্যার আপনি!'

প্রাণকুমারবাবু হেসে বললেন, 'এলাম তোমার কাছে। অনেক খুঁজে খুঁজে ঠিকানা জোগাড় করে এলাম।'

বসবার ঘরখানার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঈস, একেবারে বইয়ের রাজ্য বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! আমাদের স্কুল-লাইব্রেরী বেশ বড়ই ছিল। দেখেছ তো তিন-চারটে আলমারী বোঝাই ছিল বইতে। কিন্তু তোমার মত এত বই আমরা জোগাড় করতে পারি নি। তোমার বাহাদুরি আছে অসিত। বাহাদুরি আছে।'

তারপর নিজের কাহিনী সংক্ষেপে বললেন। পার্টিসনের পরে দেশ ছেড়ে এসেছেন। এখন আছেন বরানগরে। না, কোন কলোনি-টলোনিতে নয়। বাড়ি ভাড়া করেই আছেন। ওখানকারই একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। টুইশনও জুটেছে দুই একটা। টেনে মেনে কোন রকমে চলে যায়। সংসারে লোকজন তো বেশি নেই। স্ত্রী তো আগেই গেছেন। সতীলক্ষ্মী। তাঁকে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। মেয়ে তিনটিরও বিয়ে দিয়েছেন। দুটি স্বামীর ঘর করছে। আর সব চেয়ে ছোট সুধা। সে বছর যেতে না যেতে সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছে। সেই এখন বাপের দেখা-শোনা করে।

প্রাণকুমারবাবু অবশেষে একটু হেসে বললেন, 'সুধার কথা তোমার মনে আছে তো অসিত? অঙ্কের নম্বর বার করবার জন্যে তোমরা যাকে কলা, পেয়ারা, আম ঘুষ দিতে? আর আমি টের পেয়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করতাম।'

অসিত বলল, 'খুব মনে আছে মাস্টার-মশাই। আহা, সুধা অত কম বয়সে বিধবা হল! বেচারা!'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'কি আর করবে বাবা! যার ভাগ্যে যা আছে—তা কে খণ্ডাবে! দেখে শুনেই তো দিয়েছিলাম।' একটু চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর মৃদু হেসে তৃপ্ত বললেন, 'যাকগে। তোমার কাছে যে জন্যে এসেছি তা এবার বলি। এই নাও।'

ফুলস্কেপ কাগজের মোটা একখানা খাতা প্রাণকুমারবাবু অসিতের সামনে রেখে বললেন, 'তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। এখন তোমার যা ধর্ম-কর্ম হয় তাই কর।'

অসিত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার মাস্টার মশাই?' প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'খুলে দেখইনা বাবাজী। একখানা উপন্যাস লিখেছি।'

বৃদ্ধের মুখে কিশোর-সুলভ লজ্জা ফুটে বেরোল। সেই লজ্জা লুকোবার জন্যে মৃদু হেসে মুখখানা একটু ফিরিয়ে রাখলেন প্রাণকুমারবাবু।

অসিতের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। সে বলল, 'বলেন কি মাস্টারমশাই, আপনি শেষ পর্যন্ত উপন্যাস লিখলেন!'

প্রাণকুমারবাবু এবার মুখ ফেরালেন, 'হ্যাঁ লিখেছি। আরে অঙ্কের মাস্টার বলে কি মনে কোন রসকষ নেই ভেবেছ?'

অসিত অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না না, তা বলছিনে।'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'সব ছিল অসিত, সব ছিল। শুধু তোমাদের কাছে প্রকাশ করতাম না। এমনিতেই তো তোমরা মানতে চাইতে না। তারপর যদি এ সব বাতিকের কথা জানাজানি হয়ে যেত তাহলে কি আর রক্ষা থাকত? কাব্যরোগ আমার তখন থেকেই। হেডমাস্টার মশাই একটু একটু জানতেন। আর কাউকে টের পেতে দিইনি।'

অসিত বলল, 'সত্যি আমরা তো কিছুই জানতাম না।'

প্রাণকুমারবাবু বললেন, 'তখন জানবার বয়স হয়নি বাবা। এখন বড় হয়েছ এখন বলি। পুত্রেমিত্রবদাচরেৎ, এখন আর লজ্জা কি। অঙ্কের মাস্টারদের মনেও রসকষ থাকে বাবাজী। দুনিয়াদারির সুখদুঃখ হাসিকান্নার তারাও ডোবে, ভাসে, হাবুডুবু খায়। সেই সব কথাই বসে বসে লিখেছি। পড়ে দেখ। অনেক কষ্ট করে অনেক যত্ন নিয়ে লিখেছি। পড়ে-টড়ে যদি ভালো লাগে একটা সদ্গতি কোরো।'

মাস্টার মশাইকে সেদিন চা আর খাবার আনিয়ে আপ্যায়ন করেছিল অসিত। মনীষাকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর দুজনে অনুরোধ করেছিল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়ার জন্যে।

প্রাণকুমারবাবু তাতে রাজী হননি। বলেছিলেন, 'আর একদিন এসে খাব। কিন্তু খাইয়ে আমাকে কি আর খুসি করবে অসিত! সবচেয়ে বেশি খুসি হব যদি ওর একটা ব্যবস্থা করতে পার।' আঙুল দিয়ে খাতাটা ফের একবার দেখিয়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'টাকা-পয়সা কিছু চাইনে অসিত। বিশ পঁচিশ কেউ যদি দয়া করে দেয় দেবে। না দিলেও দুঃখ নেই। আমি চাই বইটা ছাপা হোক। দশজনে পড়ুক। এত কষ্ট করে লিখলাম জিনিসটা—সকলে দেখুক। তারপর তোমার মত এখন যারা বড় বড় লাইব্রেরী করে তাদের শেলফের হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে আমার জন্যেও ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা যদি কেউ ছেড়ে দেয় আমি তাতেই কৃতার্থ। আর কিছু চাইনে অসিত।'

রাস্তার মোড় পর্যন্ত অসিত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল। ভরসা দিয়ে বলেছিল, 'ভাববেন না মাস্টার মশাই, আমি চেষ্টা করে দেখব।'

প্রাণকুমারবাবু খুসি হয়ে বলেছিলেন, 'আমি তা জানি বাবা। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। এই খাতাখানা নিয়ে কতজনের কাছেই না ঘুরেছি! কেউ তোমার মত এমন ভালো ব্যবহার করেনি। ভেবে লজ্জা হয়, তোমার মত ছেলেকে তখন কত অকারণ মারধোর করেছি। সে সব কথা মনে রেখ না বাবা। তখন অত কড়া হয়েছিলাম বলেই তো তুমি এত বড় হতে পেরেছ।'

অসিত লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'কি যে বলেন মাস্টারমশাই!'
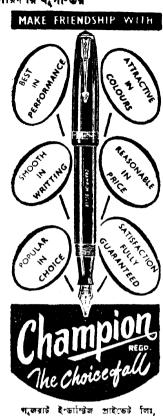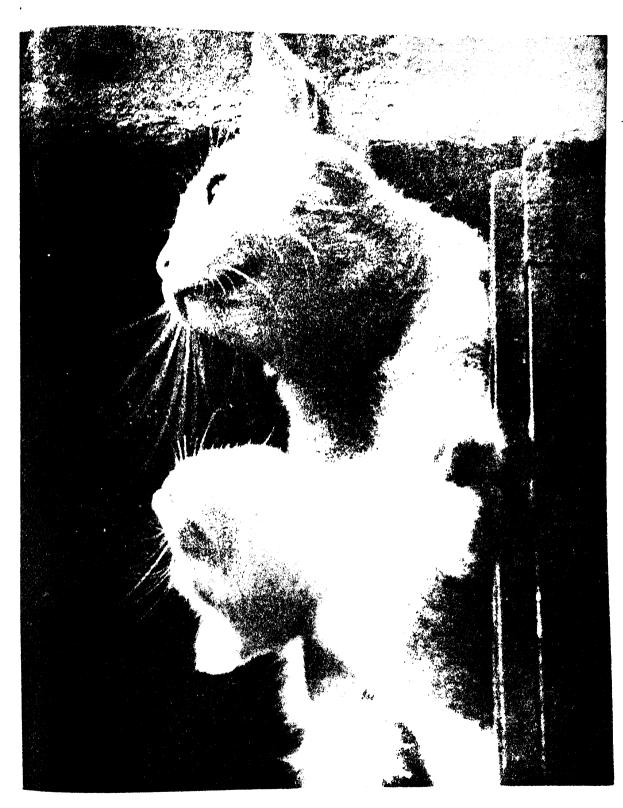
MAKE FRIENDSHIP WITH
BEST IN PERFORMANCE
ATTRACTIVE IN COLOURS
SMOOTH IN WRITTING
REASONABLE IN PRICE
POPULAR IN CHOICE
SATISFACTION FULLY GUARANTEED
Champion REGD.
The Choice of all
গুজরাট ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ,
লোহার চাওল, বোম্বাই-২

আনন্দোৎসবে অপরিহার্য্য
রেকো কাশ্মীর
স্নো, সেণ্ট, ট্যালকাম
ও ফেস্ পাউডার।
RECOKASHMIR
TALCUM POWDER
RECOKASHMIR
রেকো কেমিক্যাল কলিকাতা-১

নগেন্দ্রনাথের
হিমকল্যাণ
বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল
★
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা-৪

"আচ্ছা ভাই, আকাশেও কি মাছ পাওয়া যায়?"

গৌর বসু

লেখার ভাটার দু' চার পাতা পড়েই অসিত বুঝেছিল এ লেখা চলবে না। ভাষা কাঁচা, ভাবের মধ্যে পক্কতা বলে কিছু নেই। ধরন দেখে বোঝা যায় লেখকের আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস। কিন্তু জীবন যাপন করার চেয়ে সাহিত্যে তাকে স্থাপন করা কম কঠিন কাজ নয়। তবু প্রকাশককে অসিত একবার দেখিয়েছিল খাতাখানা। তিনি একটু নেড়েচেড়ে দেখে হেসে বলেছিলেন, 'আপনার কেউ হন নাকি?' অসিত বলেছিল, 'আমার ছেলেবেলার মাস্টারমশাই।' তিনি বলেছিলেন, 'রেখে দিন। এমন মাস্টারমশাই আমারও অনেক ছিলেন। এখনো মাঝে মাঝে এসে হানা দিতে ছাড়েন না।'

খাতাখানা তখনই ফেরৎ পাঠাতে অসিতের সংকোচ হয়েছিল। বুড়ো ভদ্রলোক দুঃখ পাবেন। তারচেয়ে অশুভস্য কাল হরণমেই ভালো। প্রাণকুমারবাবু চিঠিতে দু' একবার খোঁজ নিয়েছিলেন বইটার। অসিত লিখেছিল, 'দেখাটা চলছে।' তারপর এই চার বছরের মধ্যে তিনিও আর খাতাটা ফেরৎ চাননি। অসিতেরও আর দিয়ে আসা হয়নি। [illegible] কি, ব্যাপারটা সে আগাগোড়া ভুলে গিয়েছিল।

[illegible] অসিত আর [illegible] স্থায়ী হল [illegible] মনীষা [illegible] সমান হাত। [illegible] উপায় যেন [illegible] থাকে।

[illegible] দিয়ে পারে [illegible] চা খেতে [illegible] আর একটু আলোচনা [illegible] তার আর চারা নেই। [illegible] ব্যাপারটা লিখে দেওয়া [illegible] আর যদি কোন কপি থাকে [illegible] ফেরৎ [illegible] নামে যাবে [illegible] টাকা কিছু খরচ করে [illegible] দেবে বইটা।

[illegible] খুলে দু'পিয়সার একখানা [illegible] স্বামীর দিকে এগিয়ে [illegible] মাও বলো। আজ [illegible] তুমি আবার ছুতাস [illegible] আমার।'

[illegible] দিয়ে অসিত সংক্ষেপে [illegible]

[illegible] আপনার [illegible] বইখানা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার আছে। আপনি যদি দয়া করে একবার আসেন বড় ভালো হয়। আর সব কথা সাক্ষাতেই বলব। ইতি অসিত রায়।'

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ এল না। অসিত আর মনীষা ভাবল বাঁচা গেছে। বইখানি সম্বন্ধে বোধ হয় মাস্টার মশাইর মমতাও এতদিনে নষ্ট হয়েছে। নইলে অনেক আগেই তিনি খোঁজ-খবর নিতে পারতেন।

পরের রবিবার সকালে স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি চায়ের টেবিলে বসেছে। শ চুও দুধ খাবে না, চা খাবে। তার হাতে বিস্কুট গুঁজে দিয়ে অনেক কষ্টে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করছে মনীষা, ঠিক সেই সময় বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। এত সকালে কে আবার এল! একটু বিরক্ত হয়েই অসিত দরজা খুলে দিল। খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে সুধা। এতকাল বাদেও চিনতে ভুল হয়নি। পরনে ফিকে পেড়ে শাড়ি। সাদা ব্লাউসের হাতা কনুইর একটু আগে এসে থেমে গেছে। হাতে একগাছি করে সরু চুড়ি ছাড়া সারা দেহে কোন আভরণ নেই। ঘন কালো চুলের রাশ এলো-খোঁপায় জড়ানো। কিন্তু আশ্চর্য! এত রিক্ততার মধ্যেও ওর রূপ ফুটে উঠতে বাধা পায়নি। গায়ের রঙে শরীরের গড়নে মুখশ্রীতে অসিতদের সেই ছোট সহরে রূপবতী বলে সুধার যে খ্যাতি ছিল এই বড় সহরে এসেও তা একেবারে নিষ্প্রভ হয়নি। অসিতরা ওর নাম দিয়েছিল দৈত্যকন্যা দেবযানী। অসিতের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট ছিল সুধা। এখন ওর বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি হবে না।

অসিত শেষ পর্যন্ত বলল, 'সুধা তুমি!'

সুধা বলল, 'হ্যাঁ অসিতদা, তোমার চিঠি পেয়ে এলাম।'

অসিত বলল, 'বেশ বেশ। এসো ঘরে এসো।'

বাইরের ঘরে নয়, একেবারে ভিতরের ঘরে তাকে নিয়ে গেল অসিত। মনীষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অসিত নিজের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল 'বোসো সুধা। তারপর কি ব্যাপার? মাস্টারমশাই কোথায়? তিনি এলেন না যে?'

সুধা একটু থেমে বলল, 'তিনি নেই অসিতদা।'

'নেই মানে?'

সুধা বলল, 'ছ' মাস আগে বাবা মারা গেছেন। প্রায় বছর তিনেক ধরে ভুগছিলেন।'

অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল তাঁর?'

সুধা বলল, 'রানিক [illegible] তো ছিলই। শেষের দিকে আরো নানা উপসর্গ জুটেছিল। বুড়ো বয়সে যা হয়।'

'তুমি তাহলে এখন আছ কোথায়?'

সুধা বলল, 'যে [illegible] ছিলাম সেখানেই। আর এক ঘর ভাড়াটে [illegible] হয়ে আছি। বাবা যে স্কুলে মাস্টারি করতেন তারই গার্লস সেকশনে কাজ পেয়েছি একটা। বাবার [illegible] বলে কয়ে সে, [illegible] একটা [illegible] করেছিলাম। না হলে ওর জুটত না।'

একটু চুপ করে থেকে সুধা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'বাবার বইটা তাহলে তোমরা পাবলিশ করেছিলে অসিতদা?' এক ফোঁটা ফুর্তির হাসি দেখা গেল সুধার ঠোঁটে। তারপর একটু করুণ সুরে বলল, 'বাবা অসুখের মধ্যেও অনেকবার বলেছেন বইটার কথা। দেখে যেতে পারলে খুসি হতেন। দেখি কি রকম গেট-আপ টেট-আপ হয়েছে।'

অসিত একবার স্ত্রীর দিকে তাকাল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'না, বইটা ঠিক পাবলিশ করা এখনো হয়ে ওঠেনি সুধা।'

'তাহলে বুঝি এখনো প্রেসে আছে?'

অসিত বলল, 'না, ঠিক প্রেসেও দেওয়া হয়নি।'

মহীয়সী

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

তোমরা লিখেছ ঢের জানি
করুণায়? মমতায়? কিম্বা ভালবেসে?
আমার মৃত্যুর কথা, সীমাহীন বঞ্চনার কথা
অনেক দিয়েছ ঋণ, অনেক পেয়েছ যশমান।
এখন সয়েছি শুধু সব গ্লানি লাঞ্ছনার বোঝা
সোনার দেশের এই শ্যামল মাটির এক মেয়ে।

পার হয়ে শতাব্দীর খেয়া—
এখন আছড়ে পড়ে বেলাভূমে সোনালি সকাল
আঘাতে আঘাতে ভাঙে হৃদয়ের একূল-ওকূল
শিরায় শিরায় কাঁপে দুর্নিবার জাগার বেদনা
মহীয়সী মানবীর।

আমার বেদনা লও সৃজনের মর্মকোষ ভরে
আমার স্নেহের ধারে সিক্ত কর তোমার লেখনী
আমার নিদ্রার কথা, আমার মৃত্যুর কথা নয়
এখন জীবন জয়ী; আমার জাগার কথা লিখো।

সুধা বলল, 'তবে? ম্যানাস্‌ক্রিপটা কি এখনো তোমার কাছেই পড়ে আছে?'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ আমার কাছেই আছে। তবে খাতাটা অসাবধানে ইয়ে—মানে একটু জখম হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে আর কোন কপি আছে কি? সেই জন্যেই খবর দিয়েছিলাম। এবার তাহলে একটু এডিট-টেডিট করে, ভালো একজন পাবলিশার দেখে—।'

সুধা বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু অসিতদা, আর কোন কপিই যে নেই। দেখি, দাওতো খাতাটা!'

দেরাজ খুলে মনীষা খাতাটা বের করে দিয়ে বলল, 'দেখুন, সত্যিই বড় অন্যায় হয়ে গেছে।'

খাতাটা একটু উল্টে-পাল্টে দেখে সুধা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর চাপা অভিযোগের সুরে বলল, 'এর যে কিছুই আর নেই অসিতদা।'

অসিত আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে মানে খানিকটা আছে।'

সুধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সেটা তোমার দয়ায় নয়, উঁই আর ইঁদুরের দয়ায়। বাবা তোমাকে অনেক বিশ্বাস করেছিলেন, তোমার ওপর অনেক নির্ভর করেছিলেন। তার খুব প্রতিদান দিলে।'

স্বামীকে রক্ষার জন্যে মনীষা এবার এগিয়ে এল। সুধার দিকে চেয়ে সে বলল, 'দেখুন, দোষটা শুধু আমাদেরই নয়। এতদিন হয়ে গেল, আপনারাও তো এক আধবার খোঁজ-খবর নিতে পারতেন।'

সুধা শ্লেষ করে বলল, 'ঠিক কথা বউদি, আপনাদের কোন দোষ নেই।'

তারপর অসিতের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি মাঝে মাঝে বলতাম, বইটার কি হল, একটা খোঁজ নাও বাবা।' তিনি বলতেন, 'অত ব্যস্ত হসনে সুধা। অসিতকে অস্থির করে তুলে লাভ নেই। বড় বড় পাবলিশারের ঘরে কত বই শুনেছি পাঁচ-সাত বছরও পড়ে থাকে।

(ইহার পর ১৫০ পৃষ্ঠায়)

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্ষিতীশের ঘুম ভাঙল একটা তিক্ত কলরবে। এই ত একটু আগে দুটো চোখের পাতা এক করেছে ভোর রাত্রে, এখন সবে সকাল। বিরক্ত হয়ে ডাকল "কমল"।

কমলা ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলে—"কিসের গোলমাল রে ওখানে?"

কমলা উদ্‌ভ্রান্তই হয়েছিল, বললে—"দেখ না বাবা পিণ্টুটার কাণ্ড, কয়লা রাখার জায়গাটায় এই সময়টা একটু রোদ্দুর আসে, ওই রোদ্দুরটা নিয়ে নিত্য সকালের কাড়াকাড়ি। পিণ্টুটা আজ দাদুকে ঠেলে ফেলে দিলে—দাদুও কষে দিয়েছে কানটাকে—"

ক্ষিতীশ প্রথমটা কমলার মুখের দিকে চাইলে, যেন বুঝতেই পারেনি তার বক্তব্য। তারপর জানলার বাইরে পাতাঝরা দেবদারু গাছটার দিকে চাইলে—অনেক, অনেক রোদ্দুর, তারপর চোখ নামিয়ে নিলে কয়লার গাদার উপর থেকে মিলিয়ে যাওয়া রোদ্দুরের দিকে,—সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ আর সাতবছরের শিশু যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে একটু আগে ওর কাঁচা ঘুমটাই ভাঙিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধের তর্জন আর শিশুর কান্না তখনও ভেসে আসছে।

প্রথমটা মনে হল পিণ্টুটাকে ধরে এনে জোরেজোর করে আরো কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়—তোর সামনে প্রচুর রোদ্দুর আর তুই কিনা গিয়েছিস মৃত্যুপথযাত্রী বুড়োমানুষটির কাছ থেকে শেষ রোদ্দুরটুকু চুরি করতে! তারপরই মনে ভাবলো, বাবাকে ডেকেই দুকথা শুনিয়ে দেয়—অফুরন্ত রোদের আশীর্বাদ সাতষট্টি বছর ধরে ভোগ করে আজ একটা বাচ্চা শিশুর কাছ থেকে সেটুকু কেড়ে নেবার কী কদর্য হ্যাংলামী! কিন্তু দুজনের কাউকে কিছু বললেনা, শুধু ধমকে উঠল কমলাকে—"হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, খেলবার জন্য একটু গরম জল দিবিত।"

চাকে চা' বলা ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন ক্ষিতীশ।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই তার মনটা আশ্চর্য ভাবে প্রসন্ন হয়ে উঠল। মিথ্যে মা মরা মেয়েটাকে বকল সকাল বেলায়। রাতদিন তার জন্য কি না করছে। 'আর কটা দিন সবুর কর মা, অফুরন্ত রোদে ঘর ভরে দেবো'—মনে মনে বললে ক্ষিতীশ। বাইরের দেবদারু গাছটার ডালে ডালে রোদের লুকোচুরি, খুশী মনে সেইদিকে চাইলো, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলে দেওয়ালে ঝোলান একটা এনলার্জ করা ফটোগ্রাফের দিকে—কমলার মা।

অজস্র কাটাকুটিতে ভরা পাণ্ডুলিপিগুলি পাতা হিসেব করে গুছিয়ে নিলে। এবার বেরোতে হবে, আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেবে বলেছে সরোজ। এবার দেখিয়ে দেবে ক্ষিতীশ, যারা জীবনকে বাদ দিয়ে শুধু শুকনো তত্ত্বের ভীড় জমিয়েছে ও তাদেরও নয়, আবার যারা তত্ত্বকে অস্বীকার করে স্বপ্নবিলাস দিয়ে পৃথিবীকে পেতে চেয়েছে, ও তাদেরও নয়। জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের, কর্মের সঙ্গে মর্মের, শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের পথ খুঁজে পেয়েছে ক্ষিতীশ,—সারা ভারতের মুক্তির পথ, সারা পৃথিবীর মুক্তির পথ।

রোদ্দুর আসবে—নিশ্চয়ই আসবে, শুধু তার ঘরে নয়, সকলের ঘরে। কমলা আবার সসঙ্কোচে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে—কি একটা বলবে, কিন্তু সকালের অকারণ ধমক বোধ হয় এখনও ভুলতে পারেনি। ক্ষিতীশ আদর করে ডাকল—"কি রে কমল, কিছু বলবি!"

"আজকের বাজার..."

লজ্জা পেল ক্ষিতীশ, কোমল হল আরো—"আজ এ বেলাটা চালিয়ে নিতে পারবিনা মা।"

লজ্জা যেন একটা মুখোসের মত, নিজের মুখ থেকে খুলে নিয়ে কমলার মুখে পরিয়ে দিয়েছে। সে আঁচলের খুঁটটা আঙ্গুলে পাকাতে পাকাতে বললে—"কাল পিসীমার একাদশী গিয়েছে।"

অনেক খুঁজে একটা পাঁচ আনা পেল ক্ষিতীশ। পাঁচ আনা লুকিয়ে ফেললে, কারণ রাস্তায় বেরোতে হলে ওটুকু পাথেয় দরকার। অথচ কমলা দেখলে নিঃসংশয়ে ভাববে ওতে সংসারে সম্পূর্ণ অধিকার। একটাকা দিতেই কমলা খুশী হল—কয়লার গাদায় বসে সকলের শীর্ণ রোদটুকু নিয়ে বৃদ্ধ কেদারনাথ আর বাচ্চা পিণ্টু যেমন খুশী হয়।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে ক্ষিতীশ, এমন সময় কেদারনাথ ডাকলেন—"কই, তুই ত কিছু বলে গেলিনা ক্ষিতীশ। ওরা এখুনি হয়ত আসবে, মেয়ে যখন তাদের পছন্দ হয়েছে তখন একটা দেনাপাওনার কথা পাকা করতেই হবে।"

ক্ষিতীশ পাপোষের উপর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ডুবিয়ে খুঁটছে।—"এইজন্যই ত বলেছিলুম মেয়েটার বিয়েটা পর্যন্ত চাকরী ছাড়িসনি। আমি বলি কি, বৌমার গয়নাগুলো একটু ভেঙ্গে গড়িয়ে...আর বাড়ীটা..." এইবার গলায় আটকাচ্ছে কেদারনাথের, এককাঠার উপর ছোট্ট ভদ্রাসন—সংসারের শেষ ও সমস্ত ঐশ্বর্য।

"—বিমলবাবু বলছিলেন—বাঁধা রেখে হাজার দুই টাকা দিতে পারেন। মোট কথা, সোনায়-দানায় মিশিয়ে পাঁচহাজারের কমে ওরা কিছুতেই রাজী হবেন না।"

কিন্তু দরকার কি তার? এত তাড়াতাড়ি কমলার বিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয়না। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলে বরং...'বরং'টা কি সেইটাই বলতে পারলনা ক্ষিতীশ, একান্ত গোপনীয়, এরই প্রতীক্ষা করছে আজ তিনবছর। অথচ ও বলতে চেয়েছিল—"আর কটা দিন সবুর কর বাবা, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য দরজায় কিউ পড়বে।" প্রথমটা ও বলতে গিয়েই ধমক খেলে—"অপদার্থ! সে কিছুতেই হবেনা, আমি তোর বৌকে কথা দিয়ে ওকে পাত্রস্থ করবই—ওরা এলে আমি ঐ কথাই দেবো—বলে রাখলুম।"

ক্ষিতীশ বেরিয়ে গেল। কোথায় কোথায় যাবে হিসেব করে নিল, পয়সাটা পকেটে থেকে বার করে একবার মিলিয়ে নিল, তারপর একপাশে গিয়ে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল।

—সরোজ, তুমি দিনের পর দিন খেটে জোগাড় করেছ তাই মহাত্মা বলছেন, তারা সাবলীল হবে ভারতের একজন গণ্য কৃষক লেখকের লেখা। কারোও বলতে পার, বিজ্ঞানীরাও বলতে পারে। কিন্তু মনে কর এমন একজন লেখককে ভাবাতে করা হয়েছে—দেশের বহু প্রাচীন সংস্কার সম্বন্ধে ত দূরের কথা, গ্রহণ করার কথাও তার পক্ষে অসম্ভব। এইবার মনে কর, তার মাথায় খানিকটা মগজ দাও, আলো কালচার; তাহলে সে আর গ্রামবাসী কৃষক থাকবে না মুস্কিল ত এইখানেই..."

চেয়ে দেখলে সরোজ শুনছে না, একটু করুণা হল ওর—বললে, "যাকগে, কি করলে সেই ফিগারগুলোর; অফিসের ফাইল থেকে নিতে পেরেছিলে?"

সরোজ সলজ্জ হাসি হেসে বললে—"পারিনি দাদা, টেষ্টম্যাচের একটা টিকিট পেলুম তাই বেরিয়ে পড়েছিলুম—কালপরশুর মধ্যে..."

কাল-পরশু—তাও সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। উঠে পড়ল ক্ষিতীশ। চা খেতে বললে সরোজ—খেলেনা। বাইরে বেরিয়ে মনে হল তার তিনটে পয়সার অপচয় হল—সোজা পাবলিশার্স এর কাছে গেলে পারত। সেখানে কিছু পাণ্ডুলিপি এদিন আগে দেখে এসেছিল।

বেশ ভাল সম্বর্ধনা পেলো সেখানে।

মাথার ব্যথা — সেকালে ও একালে

পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম বি • এম আর সি পি (লণ্ডন) এফ সি সি পি (অ্যামেরিকা)

মাথার ব্যথায় একালে আর কেউ মাথা ঘামায় না। মাথা ব্যথার ওষুধ এখন বিজ্ঞাপনের কল্যাণে সকলেরই জানা। পড়তে জানলে ত কথাই নাই। সর্বত্রই মাথা ধরার ওষুধের চটকদার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। লেখাপড়া না জানলেও অসুবিধা নাই। ক্যানভাসারের বক্তৃতা ও সিনেমার ছবির বিজ্ঞাপনে আপনি মাথা ধরার 'অত্যাশ্চর্য' ওষুধের নাম জানতে পারবেন এবং সেই ওষুধের গুণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবেন। কাজেই মাথা ধরলেই আপনাকে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে না। পানের দোকানে, মুদির দোকানে, সব জায়গাতেই মাথা ধরার ওষুধ পেয়ে যাবেন। রোগ আপনার যাই থাকুক না কেন, মাথার যন্ত্রণার অন্তত সাময়িক উপশম আপনার হবেই।

কিন্তু চিরকালই মাথা ধরার এ রকম সহজ সমাধান ছিল না। মনে করুন আপনি প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগে বাস করছেন। প্রাচীন অরণ্যে দলবদ্ধভাবে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ আপনার মাথার মধ্যে দপ্‌-দপানি সুরু হল। ক্রমেই যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। আপনার নিশ্চয়ই মনে হল মাথার মধ্যে বনের ভূত অথবা গাছের ভূত কি ঐ রকম কিছু ঢুকে গেছে। ভয়ে আপনার হাত পা কাঁপাতে লাগল। আপনি হয়ত বসেই পড়লেন। শিকারে ব্যস্ত দলের অন্য লোকেদের হয় ত আপনার অবস্থা নজরেই পড়ল না। না পড়বারই কথা। চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থায়, হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত হয়ে সে যুগের জীবনযাত্রায় প্রতি মুহূর্তেই বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই বনের মধ্যে কে হারিয়ে গেল আর কে হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ল অত খোঁজ রাখবার সময় তাদের ছিল না। অথবা আপনাকে ভূতে ধরেছে দেখে, ভূতের ভয়ে আপনাকে ফেলেও চলে যেতে পারে। যাই হোক, যদি ভাগ্যবলে কোনও রকমে নিজের আস্তানায় বা গুহায় ফিরে আসতে পেরে থাকেন তখনি আপনার মাথার ভূত ছাড়াবার ব্যবস্থা হত। আপনাদের দলপতি বা সর্দার যিনি থাকতেন, তাঁর নানা রকম ক্ষমতার মধ্যে রোগ সারান বা ভূত ছাড়ানও একটি। সর্দারের নানা রকম প্রক্রিয়া এবার সুরু হত। তার সবই যে খুব সুখকর হত তা নয়। শারীরিক পীড়ন দ্বারা ভূত ছাড়ানই উৎকৃষ্ট পন্থা। তার সঙ্গে মন্ত্র, তুকতাক্‌ এবং গালাগালি ত আছেই। ছোটখাট ভূত যদি আপনার মাথায় ঢুকে থাকে তবে এই সব প্রক্রিয়াতেই সে পালিয়ে গেছে হয়ত। তা না হলে হয়ত আপনার যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। আপনি হয়ত যন্ত্রণায় প্রলাপ বকছেন। সর্দারের মন্ত্রতন্ত্র বিফল করে, অথবা হয়ত তার তাড়নার ফলে ক্ষিপ্ত হয়েই, ভূত তখন আপনার মস্তককে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। সর্দার কিন্তু ভূতের কাছে হার মানবার পাত্র নয়। সর্দার সকলকে দেখিয়ে দিল—'দেখছিস্‌ ব্যাটা এবার আর পালাবার পথ পাচ্ছে না। তাই মাথার মধ্যে ছটফট্‌ করছে, দাঁড়া, এবার বার করে দিচ্ছি।' তখন আপনাকে জোয়ান জোয়ান কজনে সর্দারের নির্দেশ মত চেপে ধরেছে। চারিদিকে তুমুল সোরগোল ও বাদ্য বাজছে। সর্দারের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে আস্ফালন। এবার ভূতের আর নিস্তার নাই। আপনার মাথার ভূত যখন ছেড়ে দেবার জন্যে কাকুতি মিনতি করছে, তখন হঠাৎ সর্দার প্রস্তরের ধারাল বাটালি নিয়ে প্রস্তরের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে আপনার মাথার খুলিতে ফুটো করে দিল। ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গেই ভূত মাথা ছেড়ে সেই ফুটো দিয়ে পালাল। আপনার অবস্থা? মাথা ধরা ত সারলই, তবে প্রাণটা বাঁচল কিনা বলা শক্ত। ভাগ্য ভাল থাকলে হয়ত বেঁচে গেলেন।
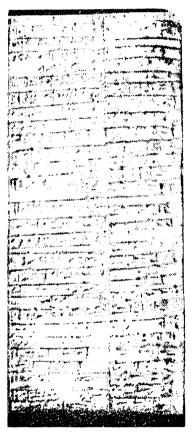
৬০০০ বছর আগেকার কোনো অজ্ঞাত সুমেরীয় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র

প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সব নরকংকাল পাওয়া গেছে, তাদের অনেকগুলির মাথার খুলিতে পরিষ্কার করে কাটা ছিদ্র দেখা গেছে। ছিদ্রগুলি ঠিক আকস্মিক কারণে হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেক দিন মাটির ভিতরে পড়ে থাকার জন্যেও হয়েছে বলে মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, সে যুগে প্রস্তর অস্ত্রদ্বারা এ রকম সার্জিকেল অপারেশন করা হত। আধুনিক সার্জারিতে মাথার খুলি ফুটো করে মাথার ভিতরকার চাপ কমানর ব্যবস্থা অবশ্য আছে। একে বলা হয় ট্রেফাইন করা। তবে এখন করা হয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সঠিক রোগ নির্ণয় করে রোগীকে অচেতন করে। যে সব রোগে মাথার ভিতরকার চাপ বাড়ে সেই রকম কোনও রোগজনিত মাথার ব্যথায় প্রস্তর যুগের সার্জন হয়ত ভূত তাড়ানর নামে মাথায় ট্রেফাইন্‌ করে ব্যথা সারিয়ে থাকতে পারে।

এই উপায়ে মাথার ব্যথা সারানটা যে মোটেই আরামপ্রদ ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। তবে ভূতে পাওয়া লোকের নিজের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই তার চিকিৎসা চলত না। যাই হোক, অন্য যারা এরূপ প্রক্রিয়া একবার দেখেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মাথার ব্যথা হলে বনে পালিয়ে গিয়ে ফলমূল, পাতা লতা ইত্যাদি থেকে ওষুধ খুঁজত। কবে যে প্রথম বেদনা নাশক হিসাবে বন থেকে আফিং, গাঁজা ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছিল তার ইতিহাস জানা নেই।

প্রস্তর যুগ ছেড়ে আপনি মনে করুন প্রাচীন মিশর দেশে বাস করছেন। আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বৎসর আগে। তখন আপনার মাথা ব্যথা হলে যেতে হত দেবতার মন্দিরে পুরোহিতের কাছে। তাকে স্তব-স্তুতি দিয়ে খুশী করতে পারলে আপনি ওষুধ পেতেন। কি রকম ওষুধ? এই ধরুন মাথায় লাগাবার প্রলেপ। প্রায় ৩৫০০ বৎসর আগেকার একটি পেপিরাস্‌ থেকে এ রকমের একটা প্রলেপের প্রেস্‌ক্রিপসান পাওয়া গেছে। তাতে আছে বিশেষ একরকম কীটের রক্ত তেলে সিদ্ধ করতে হবে, তারপর একটা ছুঁচো মেরে তেলে সিদ্ধ করে তার ক্বাথ নিতে হবে আর দুধের সঙ্গে গাধার গোবর মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর এই তিনটি বস্তু মিশিয়ে প্রলেপ তৈরী করতে হবে। কিন্তু শুধু প্রলেপ লাগালেই হবে না। তার সঙ্গে বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ ও পুজো ইত্যাদি করতে হবে। কাজেই পুরোহিত ছাড়া কারও দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। দেবতায় এবং পুরোহিতে ভক্তি থাকলে দেবতার কৃপায় এতেই আপনার মাথার ব্যথা সারবে। না সারলে? তারও ব্যবস্থা ছিল। পুরোহিতের সব ওষুধই দেবদত্ত। দেবতারাই যা কিছু আবিষ্কার করতেন এবং কখনও কখনও মানুষের উপর খুসী হয়ে পুরোহিতদের দু একটা ওষুধ বর দিয়ে দিতেন। মিশরের প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সূর্য দেবতা 'রা' যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দেবী তেফনুত্‌-এর কাছে যান মুক্তির আশায়। দেবী তেফনুত্‌ তাঁকে একটা পাঁচন খেতে দেন। কিন্তু তাতে ব্যথা না কমে আরও বেড়ে গেল। তখন কৃষি ও বনসম্পদের দেবী আইসিস্‌ রা দেবকে বেরী ফলের রস খেতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যন্ত্রণা চলে গেল।

ঢেঁড়ী ফলের রস থেকেই আফিং তৈরী হয়। রা দেব পরে মানুষের উপকারের জন্য এই আফিং পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। পুরোহিতদের দেবতার কৃপায় আফিমের ব্যবহার জানা ছিল। কাজেই আপনার মাথার ব্যথার জন্য প্রার্থী হলে তিনি সেই ওষুধেই আপনার যন্ত্রণার উপশম করতে পারতেন।

প্রাচীন ব্যাবিলনে কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থা বোধ হয় পুরোহিতদের হাতে ছিল না। সেখানে স্বতন্ত্র চিকিৎসক সম্প্রদায় ছিল। কথিত আছে হাম্মুরাব্বির রাজত্বে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে, কোন চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের ফলে যদি রোগীর মৃত্যু ঘটে তবে সেই চিকিৎসকের হাত কেটে ফেলা হবে। কাজেই তাঁর রাজত্বে চিকিৎসকদের যে খুব সাবধানে কাজ করতে হত সেটা বোঝা যায়। তবে বেদনানাশক হিসাবে তাঁরাও অনেক রকম প্রলেপ ও ওষুধের ব্যবহার জানতেন। প্রায় ৪০০০ বৎসর আগেকার একটি মাটির ফলক ইরাকের একস্থান হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই ফলকে প্রাচীন সুমেরীয় ভাষায় কয়েকটি প্রেসক্রিপসান্ লেখা আছে। চিকিৎসা বিষয়ে লিখিত বিবরণ এইটিই বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন বলে পুরাতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। এই ফলকে বিশেষ একজাতীয় সাপের চামড়া, কোনও কোনও পাখীর চামড়া, নানা রকমের গাছের ফল, ফুল, শিকড় প্রভৃতি দিয়ে ওষুধ তৈরী করবার নির্দেশ আছে। তবে ওষুধের ব্যাপারে মন্ত্র তন্ত্রের কিন্তু কোনও উল্লেখ নাই। তাতে মনে হয় সুমেরীয়দের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটা বৈজ্ঞানিক ধরনের ছিল। খাওয়ার ওষুধগুলি প্রায় সবই দুধ বা বিয়ারের সঙ্গে সেব্য ছিল। তাতে মনে হয় ওষুধগুলি লোকপ্রিয়ই ছিল।

তারপর চলে আসুন প্রাচীন গ্রীস দেশে। আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বৎসর আগে। সেখানে এপোলো ও এসক্লিপিয়াসের মন্দিরের পুরোহিতরাই চিকিৎসক। বংশানুক্রমিক পুরোহিতদের সেবা ও সাকরেদী করেই তবে চিকিৎসক হওয়া যেত। এর বিনিময়ে পুরোহিতরা সর্প, জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের সন্ধান দিত।

আপনার মাথার ব্যথা? অতএব আপনাকে সন্ধ্যায় মন্দিরে যেতে হবে। সন্ধ্যার সময় দেখবেন আর্ত লোকদের সারি ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলতে থাকত। আপনিও মাথার ব্যথা নিয়ে তাদের সঙ্গে জুটে গেলেন। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে সকলে একে একে পুণ্য প্রস্রবণে হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে নিলেন। মন্দিরের শিক্ষার্থী বালকগণ তখন বীণা বাজিয়ে ও বাঁশীতে সন্ধ্যারতির সুর তুলেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রদীপের মৃদু আলোক। ধূপ ও গুগ্গুলের ধোঁয়ায় চারিদিকে মাদকতাময় সৌরভ। একে একে রোগীরা পুরোহিতের সামনে এসে রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রার্থনা জানাল। পুরোহিত সকলকে আশ্বস্ত করলেন। এবং একে একে সকলকে কিছু প্রলেপ বা তৈলাক্ত ওষুধ দিলেন। তারপর সকলকে বললেন— বেদনা ভুলে যাও। সংসারের সব ভাবনা ভুলে যাও, মনকে নির্মল কর। শরীরে প্রলেপ লাগিয়ে নিয়ে পবিত্র সুর ও সঙ্গীত শ্রবণ কর। নিদ্রা এসে যাতনা থেকে মুক্তি দেবে। স্বপ্নে এসক্লিপিয়াস আবির্ভূত হয়ে তোমার রোগ মুক্তির উপায় বলে দেবেন। নিশ্চিন্ত থাক। মনকে নিঃসন্দেহ কর। দয়াময় এস্‌ক্লিপিয়াস্ কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন না।"

পুরোহিতের প্রলেপে ও ধূপ গুগ্‌গুলের ধোঁয়ায় মাদকদ্রব্য থাকত। রাত্রিতে মাদকের ঘোরে রোগীরা আচ্ছন্ন হলে পুরোহিতরা তাদের চিকিৎসা করতেন। সার্জারিই বেশী হত। ফোঁড়া কাটা, ভাঙ্গা হাড় বসিয়ে দেওয়া, এমনকি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বাভাবিকভাবে প্রসব না হলে আধুনিক সীজারিয়ানের মত অপারেশনও তাঁরা করতেন। অন্য রোগীদের প্রাতঃকালে নানা রকম গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ স্বপ্নপ্রাপ্ত ওষুধ বলে দিয়ে দিতেন।

এসক্লিপিয়াসের বংশধর এই সব পুরোহিতদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যাপারে ধর্মান্ধতার এই সব বুজরুকি পছন্দ করতেন না। গুরুদের অনেক কথা নির্বিবাদে মেনে নিতেও তিনি চাইতেন না। সর্বদাই তর্ক করে বুঝতে চাইতেন এবং প্রমাণ চাইতেন। ইনিই হচ্ছেন হিপোক্রেটিস্। ইনিই সর্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করেন। হিপোক্রেটিস্ প্রায় ৪০০ রকমের গাছ-গাছড়া থেকে প্রাপ্ত ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করে তাদের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। তাঁর পরীক্ষা এত ব্যাপক ছিল যে, তাঁর বর্ণিত ৪০০ ওষুধের মধ্যে প্রায় ২০০ ওষুধ আজও ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষেও ঐ সময়ে হিন্দু চিকিৎসকগণ সার্জারিতে খুব উন্নত ছিলেন। তাঁরাও মাথার ব্যথায় বা অন্য বেদনানাশক হিসাবে আফিং বা অন্য মাদক জাতীয় ওষুধই ব্যবহার করতেন। তার সঙ্গে খানিকটা দৈব ও মুষ্টিযোগ মেশান থাকত।

এর পর মধ্য যুগেও আপনাকে মাথার ব্যথায় পুরোহিতের দরজায় ধন্না দিতে হয়েছে। তবে পুরোহিতের রকম ফের অনেক হয়েছে। কিন্তু ওষুধ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ক্রমে ক্রমে চিকিৎসক সম্প্রদায় আলাদা হয়েছে। কিন্তু তাদের হাতেও ওষুধ বিশেষ ছিল না। প্রস্তর যুগে আপনার মাথার ব্যথায় মাথার খুলি ফুটো করে আপনার মাথার ভূত বের করা হয়েছে। মধ্য যুগে মাথার ব্যথায় হয় খানিকটা রক্ত মোক্ষণ করে আপনার শরীরের খানিকটা ক্লেদ বার করবার চেষ্টা হয়েছে, নয় ত মাথায় জোঁক বসিয়ে আপনার রক্ত শোষণ করা হয়েছে। তাতে আপনার মাথার ব্যথা কখন কখনও সত্যিই কমেছে। এখনও এই দুই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এবং ক্ষেত্র বিশেষে খুবই ফলপ্রদ। তবে যাবতীয় সকল রোগের মহৌষধ হিসাবে এগুলো ব্যবহার্য নয়।

আপনি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্যারিসে থাকতেন তবে আর ভাবনা ছিল না। প্যারিসে তখন কাতারে কাতারে লোক মঁশিয়ে মেসমারের বাড়ীতে যেত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে। মেসমার যে কোনও বস্তুকে "মেগনেটাইজ" করে দিতেন। তারপর সেটা ছুঁলেই সব যন্ত্রণা সেরে যেত। আসলে ব্যাপারটা ছিল হিপনোটিজম্। সেই সময় এই নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। তবে বৈজ্ঞানিকগণ এই পদ্ধতি অনুমোদন করেন নাই এবং এর অনেক অপপ্রয়োগও হয়েছিল।

এর পর থেকে আরম্ভ হল য়ুরোপে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা—কেমিষ্ট্রিতে নূতন নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে চিকিৎসারও হতে লাগল অনেক উন্নতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সোডিয়াম্ সেলিসাইলেটের বেদনা নিবারণের ক্ষমতা জানা গেল। তখন মাথার ব্যথায়, বাতের ব্যথায় সোডিয়াম্ সেলিসাইলেট্ খুব ব্যবহার হত। আফিং থেকে মর্ফিয়াও তখন পরিস্রুত হয়েছে এবং বেদনানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই রকম সময়ে জার্মানীতে ফেলিক্স হফ্‌ম্যান নামে একজন তরুণ কেমিষ্ট ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধ পিতার ছিল বাত এবং তিনি সোডিয়াম সেলিসাইলেট খেতেন পুরো মাত্রায়। কিন্তু এই ওষুধে ভদ্রলোকের বেদনা কমলেও অন্য অনেক উপসর্গ হত। একে বিস্বাদ, তার উপর সোডিয়াম্ সেলিসাইলেট্ খেলেই ভদ্রলোকের পেটে গোলমালে বমনের উদ্রেক হত। বৃদ্ধের এই কষ্ট দেখে তরুণ কেমিষ্ট পুত্র যাবতীয় সব সেলিসাইলেট নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করল। কি করে সোডিয়াম্ সেলিসাইলেটের চেয়ে সুস্বাদু ও পেটের পক্ষে কম পীড়াদায়ক ওষুধ বার করা যায়। এই চেষ্টা থেকেই আবিষ্কার হল অ্যাস্পিরিন। অ্যাস্পিরিনের বেদনা নিবারণের ক্ষমতা সোডিয়াম সেলিসাইলেটের চেয়ে অনেক বেশী এবং পেটেও বেশী সহ্য হয়।

আজকালকার মাথা ধরার যে কোনও ওষুধের প্রধান উপাদানই অ্যাস্পিরিন। পৃথিবীতে বছরে হাজার টন অ্যাস্পিরিন এখন উৎপন্ন হচ্ছে। আরও অনেক বেদনা-নাশক ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু অ্যাস্পিরিনের স্থান এখনও অটল।

ফুলের প্রণামী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে
মেঘলা আকাশ থেকে কান্না যেন ঝরে
আমন ধানের ক্ষেতে, বনে, নদীতীরে
গন্ধরাজ গাছের গভীরে,
সমস্ত হৃদয় ভরে তারি সুর, কথা
জীবনের কোন এক পরিপূর্ণতা।

বৃষ্টি ঝরে :
হলদি নদীর চরে
দুপারের গ্রাম-ঘরে গাছের সবুজে :
ভিজে ফুল চোখ দুটি বুজে,
মাটির উঠান কোণে দোপাটির চারা
খুঁজে পায় আশ্বিনের গানের ইশারা;
কী এক বিস্ময় নিয়ে শুধু চেয়ে থাকি
নির্জন বিকেল বেলা এ ঘরে একাকী,
কখন টেবিলে
ছোট দুটি বেল ফুল রেখে গিয়ে ছিলে
তখন পাইনি সাড়া, গন্ধটুকু তার
গোপন স্মৃতির গান চোখের পাতার।

সমস্ত বিকেল ধ'রে বৃষ্টি ঝরে গেলে
পৃথিবী শুধায় শুধু 'কী পেলে কী পেলে',
আমি বলি, 'সে আমার সবচেয়ে দামী
কিছু নয়, ছোট দুটি ফুলের প্রণামী'।

সহজিয়া
গোপাল ভৌমিক

ভেবেছি আসবে হাসিমুখে
এলে কান্নায় নত হয়ে, বুকে
অজস্র ব্যথা নিয়ে;
ভাবনা তাই তো ভোলাই কি দিয়ে
শোনাই কি রূপ কথা?
ঊর্মিমালার শিখরে যে রম্যতা
ভাষায় তা যদি এনে দিতে পারি—
পারবে কি তবু ঘোচাতে নয়ন-বারি?
মনে হয় পারবে না,
মধ্য দিনের সূর্যের সেনা
যতই প্রখর হোক,
অগ্নিবর্ষী হয় যদি দুটি চোখ,
ব্যর্থ সে তবু নরম একটি ভোরে :
নতমুখী মেয়ে মেঘের কাজল পরে
একাকী যখন কান্নায় টলমল—
কোথায় তখন সূর্য-সেনার দল?
তাই চঞ্চল
হৃদয় বলে যে ছল
করে আমি যতই ভোলাতে চাই—
কাটবে না মেঘ, বসন্ত-বেদনাই
সচকিত হবে, তুমি হয়ে উন্মনা
করবে যেমন করেছ প্রবঞ্চনা।
যুগ যুগ ধরে তাই শুধু ভালবাসি,
অপেক্ষা করি, ফুটুক সহজ হাসি।

অকারণ
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

এখানে অনেক আলো, জমেছে
এ দেয়ালে চারপাশে,
স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলার আবরণ
ঝকঝকে প্রতিফলনে

দাঁড়িয়ে দুদণ্ড দেখি তাই
আজকের এ বাতাসে;
শুনি গান চেনা সুরে, কত
স্মৃতি উঁকি দেয় মনে।

আগে তো আলোই ছিল, এখনো
আলোয় রাঙা সরণি
কি জানি কি মনে করে, এইসব
কেন যে না দেখলাম

দেয়ালের এ ফোকরে বাজে, শুনি
আজ প্রিয় সিম্ফনী;
অকারণে চোখ বুজে মিথ্যেই
দূরপথে দুলেছিলাম।

বাহির থেকে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভাবতেই অবাক লাগে। যে-মেয়ে সমস্ত দিন ঘাটে
ঘুরে ঘুরে আসত, যার কণ্ঠে জলতরঙ্গের সুর
ধ্বনিত হয়েছে আগে সারাক্ষণ, সমস্ত দুপুর
নদীর উন্মুখ ব্যগ্র বালুর কিনারে বসে যার
তৃষ্ণার হয়নি তৃপ্তি,—কী বিস্ময়, ঘরের কপাটে
পড়েছে অর্গল তার সহসা। এবং সে এখন
ঘরের গভীর স্থির শান্ত এই পরিবেশে তার
ইচ্ছাকে নিভিয়ে ভাবে,
কী পেয়ে পায়নি তার মন।
না কি সে ইচ্ছাকে তার নেভায়নি?
না কি সে আবার
তৃষ্ণাকে দিয়েছে জ্বেলে আর-এক আগুনে?
কার প্রেমে
শান্তি পেয়েছে সে,
যার আকাঙ্ক্ষা অথই জলে নেমে
তবুও হয়নি শান্ত? জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায় খড়ে-ছাওয়া
ঘরের দাওয়ায় দ্যাখো মগ্ন হয়ে বসেছে সে; তার
ইচ্ছার শরীরে লাগে প্রসন্ন প্রেমের মৃদু হাওয়া।

কাঁটানটে গাছ
আনন্দ বাগচী

তোমারো আশ্চর্য সেই দুর্বলতা : একটি মুখের
এবং একটু সুখ কাঁটাভরা বুকের ছায়াতে
সঞ্চয় করেছ তুমি যুগ যুগ ধরে। গৃহস্থের
মাটির দেয়ালে চিরকাল বন্য বৃষ্টি বেঁধে রাখে,
তবু কানে কানে বলো : পৃথিবীটা তত মন্দ নয়।
তোমারো আশ্চর্য সেই দুর্বলতা সময় সময়।
ক্লান্ত আমি বহুকাল আকাশকে হাসপাতাল ভাবি
যন্ত্রণা কাতর মেঘ, দগ্ধ দিন, অন্বয়বিহীন
ঘৃণিত পশুর মত রাত, এই ঘরে যার দাবী
মৃত্যু সে; সমস্ত স্বপ্ন তার কাছে অহেতুক ঋণ।
তোমার কথিকা শুনে হাসি পায়, আর মনে হয়
রূপকথা দিয়ে আর কতকাল ভোলাবে হৃদয়?
তেপান্তর মাঠ, বন, অলৌকিক সমুদ্রের মত
আরো কত গল্প দোলে তোমার হৃদয়ে অবিরত।

পাণ্ডুলিপি

(১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

তারপরে বেরোয়। আমি না দেখে গেলেও তুই দেখতে পারবি।' আসলে তাঁর ভয় ছিল পাছে তুমিও ফেরৎ দাও। আর তাঁর সব আশা নির্মূল হয়ে যায়। চলি অসিতদা, চলি বউদি।

সেই অর্ধেক পচে যাওয়া খাতাটা হাতে নিয়ে সুধা দোরের দিকে পা বাড়াল।

মনীষা এগিয়ে এসে বলল, 'সেকি, এক কাপ চাও অন্তত খেয়ে যাবেন না?'

সুধা মাথা নেড়ে বলল, 'না, চা আমি বেশি খাইনে।' তারপর দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নামল।

অসিত গেল তার পিছনে পিছনে। রাসবিহারী এভেনিয়ু পার হয়ে বাস স্টপের কাছে দুজনেই দাঁড়াল। সুধা অসিতের সঙ্গে একটি কথাও বলল না, একবার তাকালও না। সঙ্গে আসতে তাকে নিষেধও করল না, আহ্বানও করল না। ভারি অন্যমনস্ক। কোনদিকে সুধার কোন খেয়াল নেই।

একটু বাদে খাতাখানার শেষদিকটা খুলে পড়তে লাগল সুধা। আর তার দুচোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। পাণ্ডুলিপির বাকিটুকুও বুঝি যায়।

অসিত এবার আরো কাছে এগিয়ে এল। কোমল, মৃদু অনুতাপের সুরে বলল, 'কেঁদোনা সুধা। আমাকে মাফ করো।'

সুধা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'জানো অসিতদা, শেষের দিকে বাবা শুধু আমার কথা লিখেছেন, শুধু আমার কথা! আমরা যে দুজনে দুজনের সব ছিলাম।'

পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সুধা।

অসিতও সেইদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে কত ভুল, কত ত্রুটি, কত অন্যায়, কত বিচ্যুতিই না ঘটেছে। এই অসতর্কতা তার তুলনায় কিছুই নয়। তবু এই মুহূর্তে অসিতের মনে হতে লাগল এ অপরাধের বোঝা সবচেয়ে দুর্বহ, দুঃসহ। জীবনভর অনুতাপ করলেও এর দুঃখ লজ্জা আর গোপন শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে না।

মাটী মাখার সাধনা • যতীন্দ্রচরণ গুহ

মল্লক্রীড়া পৃথিবীর প্রাচীনতম ক্রীড়া এবং আমাদের এই ভারতভূমিতেই সভ্যতার আদি যুগে কুস্তির প্রসার ও উন্নয়ন ঘটেছিল সর্বাধিক। রামায়ণ, মহাভারতের কালের কথা তো সর্বজনবিদিত, মহাবলী বালী, হনুমান, সুগ্রীব, ভীম, জরাসন্ধ প্রমুখ মহাকাব্য-বর্ণিত বিশিষ্ট চরিত্রগুলি বিখ্যাত হয়েছিলেন সুদক্ষ মল্লবীররূপে। ঘটনা বর্ণনায় এই সব মহাবলীদের দিয়ে বাল্মীকি ও বেদব্যাস কুস্তিও করিয়েছিলেন এবং অস্ত্র শিক্ষা কেন্দ্রে গুরু-গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে রাজকুমারদের মল্লক্রীড়া-কৌশল আয়ত্তে আনার প্রয়াসে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বৈদিক যুগের জ্ঞানী, গুণী, মুনিদের মুখে সমাজবদ্ধ মানুষের দেহমনের সুস্থতা অর্জনের পথনির্দেশকালে সুপরিকল্পিত উপায়ে মল্লক্রীড়া চর্চার উপদেশ শোনা গিয়েছে।

প্রাচীন ভারতে সাধারণ মানুষ মূলতঃ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিলেন। গৃহী, সাধক, ভোগী, ব্যায়ামবীর সকলেই ছিল। সকলেরই প্রয়োজন ছিল শারীরিক সুস্থতা ও সক্ষমতা অর্জন করা। ভগবৎ চিন্তায় আত্মনিমগ্ন সাধক অথবা পার্থিব ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে তারও প্রয়োজন ছিল শরীরটাকে সুস্থ রাখা, কারণ অসুস্থতা ও অক্ষমতার অভিশাপে যে দিন দিন পঙ্গু হয়ে পড়তো তার পক্ষে শান্ত চিত্তে ভগবৎ সাধনা করা অথবা নির্বিঘ্নে পার্থিব ভোগবিলাস নিয়ে মেতে থাকা সম্ভবপর হোতো না। আর গৃহী ও ব্যায়ামবীরদের কথা তো স্বতন্ত্রই, ব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে দৈহিক কলকব্জাগুলো সক্রিয়, সচল রাখতে না পারলে, জীবন সংগ্রামে প্রতি পদে পরাজয় বরণ করা ছাড়া তাদের যে আর কোনো গতি থাকতো না।

শ্রেণী বিভক্ত মানুষের কথা, তাদের প্রয়োজনের বিষয় চিন্তা করে সেকালে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জন্যে বিভিন্ন প্রণালীর ব্যায়ামচর্চার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গৃহী ও বলশালী-দের ব্যায়াম পদ্ধতি মূলতঃ এক ছাঁচে গঠিত ছিল, বাল্যে যোগব্যায়াম, যৌবনে ডনবৈঠক, তৈলমর্দন, প্রাত্যহিক স্নান ও আভ্যন্তরীণ ধৌতি ছিল তাদের ব্যায়াম পদ্ধতির অংগীভূত। অবশ্য বলশালীরা ডনবৈঠক করতেন অপেক্ষাকৃত বেশী, যেমন সাধকরা ডনবৈঠক বাদ দিয়ে যোগ-ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর গঠন ও মনোবল বৃদ্ধির প্রয়াস পেতেন। ভোগীদের অবশ্য মনোবল অটুট রাখা দরকার ছিল না। মনের দিক থেকে তারা ছিল অনগ্রসর, শরীরটাকে মজবুত করাই ছিল আদর্শ। ভোগী বাদে অন্য সকলেরই জীবন-যাপনে সংযম অভ্যাসে ছিল সনিষ্ঠ প্রযত্ন, তারা সকলেই লেংটি বা কৌপিন ব্যবহার করতো, আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতো তীক্ষ্ণ এবং খাদ্য গ্রহণে বাদবিচার ছিল যথেষ্ট। নিয়মিত উত্তেজক আহার্য বা পানীয় গ্রহণ একরকম নিষিদ্ধই ছিল। ভোগীদের কথা স্বতন্ত্র: বলশালীদের অপ্রয়োজনে বলবিক্রম প্রকাশে সামাজিক ক্ষতির যে আশঙ্কা ছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যেই ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে নিয়মিত পূজোঅর্চনা ও ধর্মভাব জাগ্রত করার উৎসাহ দেওয়া হোতো এবং গুরুর নির্দেশে তারা রীতিমতো সংযত শিক্ষা পেতো। ভারতীয় ব্যায়ামপদ্ধতির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান জড়িত রাখার উদ্দেশ্যই হলো উগ্র মনোভাবকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস।

প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যাপীঠে ব্যায়াম চর্চার রীতি চলে আসছিল এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ ভারতের সর্বত্রই আখড়া স্থাপনের রেওয়াজ দেখা দেয়। গ্রামের আখড়াগুলোর জাঁকজমক ছিল না, কিন্তু সেখানে সত্যিকারের শক্তি সাধনা করা হোতো এবং আখড়ার দরজা সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামবাসীদের জন্যে থাকতো উন্মুক্ত। শিষ্যদের মতো ওস্তাদরাও ছিলেন গ্রামের মাটীরই মানুষ, বিনা পরিশ্রমেই তাঁরা বিদ্যাদান করতেন। শরীর-চর্চায় অথবা আখড়া চালাতে কোনো খরচই ছিল না বললেই হয়। বিজয়াদশমী, নাগপঞ্চমী, বসন্ত-পঞ্চমী, বীরাষ্টমী ও অন্যান্য পালপার্বণে দংগল বসতো, কে কতোটা শিখলো তারই পরীক্ষা নেওয়া হোতো সেখানে। এমনি করেই এক সময় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কুস্তির প্রসার ঘটে। তারপর আসে রাজারাজড়ার যুগ, যে যুগে কুস্তিগীররা অর্থোপার্জনের পথের সন্ধান পায়। রাজারা নিজেরা কুস্তি করতেন আর পুষতেন বড় বড় পালোয়ানদের, ফলে জীবিকা সংগ্রহেও অনেকে কুস্তি চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বিগত কালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলেই সাধারণ মানুষ কুস্তি চর্চায় অনুরক্ত ছিল। গত একশ বছরে অবশ্য পাঞ্জাবীদের মধ্যেই বেশী সংখ্যক বড় পালোয়ান দেখা গিয়েছিল কিন্তু তবুও মনে হয় যে, কুস্তিচর্চার ব্যাপক রেওয়াজ ছিল উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে। বাংলাদেশকে এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা ব্যতিক্রম বলে মনে করা চলে। কুস্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের মনোভাব এক সময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। কুস্তি করলেই নাকি গুণ্ডা বনে যায়, এই ছিল সাধারণ মনের ধারণা, তাই ভারতের অন্য প্রান্তের তুলনায় মল্ল-ক্রীড়ায় বাঙালীরা তেমন এগিয়ে যেতে পারেনি।

কালক্রমে মল্লক্রীড়া চর্চা ভারতে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কুস্তির জনপ্রিয়তা নষ্ট হবার মূল কারণ আধুনিক সভ্যতা মানুষকে বিলাসিতা শিখিয়েছে যথেষ্ট। তা ছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজন্যবর্গের মতিগতি পাল্টে যায়, তারা কুস্তি ছেড়ে টেনিস, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধুলো নিয়ে মেতে উঠায় রাতারাতি একদিন পালোয়ানবংশ বেকার হয়ে পড়ে। রাজারাজড়াদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অন্যান্য খেলাধুলোয় আকৃষ্ট হয় এবং আমেরিকান ফ্রিস্টাইল ও ওই জাতীয় খেলাধুলোর উদ্ভাবন ঘটায় স্বল্প-পরিশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জনের সুবিধা দেখা দেওয়ায় নিরলস সাধনায় দেহচর্চায় ক্ষান্তি দিয়ে

(ইহার পর ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

যুগোপযোগী পরিকল্পনার প্রয়োজন

শঙ্করবিজয় মিত্র

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় দ্রোণের নির্দেশে বিদুরের উদ্যোগে সমতল স্থানে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মিত হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে ধৃতরাষ্ট্র এলেন সুসজ্জিত প্রেক্ষাগারে। গান্ধারী কুন্তী প্রভৃতি রাজপুরনারীগণ উত্তম পরিচ্ছদ-ভূষিতা হয়ে বসে আছেন মঞ্চোপরি। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের কোলাহলে ও বাদ্য ধ্বনিতে সেই সভা মহাসমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হল।

ধনু ও তূণীর ধারণ করে অঙ্গুলিত্র কটিবন্ধ প্রভৃতিতে সুরক্ষিত হয়ে রাজপুত্রগণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুরোভাগে রেখে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অস্ত্রপ্রয়োগ দেখাতে লাগলেন; রথ, গজ ও অশ্বচালনার, বাহুযুদ্ধের এবং খড়্গচর্ম প্রয়োগের বিবিধ প্রণালী- সুন্দর অতীতে মহাভারতের যুগে ভারতে শক্তি চর্চার এই চিত্রটি আমাদের মনকে অভিভূত না করে পারে না। শক্তিচর্চা তখন শুধু রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জনসাধারণও যে সমভাবে শরীরচর্চা করত এবং সে বিষয়ে নরনারীর আগ্রহও যে অপরিসীম ছিল এই একটি বর্ণনা থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

মহাভারতের যুগ ছেড়ে ঐতিহাসিক কালেও শক্তি সাধনার সমাদর ভারতে কম ছিল না। আলেকজাণ্ডারের আমলে পঞ্চনদের দেশে শক্তিশালী ভারতবাসীর অসীম সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও বলবত্তার দৃষ্টান্তে যেকোন মানুষই গৌরব অনুভব করতে পারে। মুসলমান আমলে রাজপুতানার রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের অমিতবিক্রমের কাহিনী যেকোন জাতির শ্লাঘার বস্তু। বাংলা দেশও সে সময় মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিতেও সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলার প্রতাপ শৌর্যে, বীর্যে ছিলেন ভাস্বর। বাংলার পল্লী অঞ্চলেও তখন শরীর চর্চার প্রচলন ছিল। দেশে কুস্তিগীর ও লাঠিয়ালের অভাব ছিল না। তাই এদের মধ্য থেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহকালে সেনা সংগ্রহ করা হত। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল বীর্যবান বাঙ্গালীর উজ্জ্বল প্রতীক—আজও তিনি সকলের পূজা পেয়ে থাকেন।

বৃটিশ আমলে হঠাৎ চিত্রটা গেল সম্পূর্ণ বদলে। ধূর্ত ইংরাজ ভারতের বুক থেকে জাতিগতভাবে সামরিক মনোভাব বিনষ্ট করবার দিকে দৃষ্টি রেখেই নিজেদের শাসন কায়েম করবার চেষ্টা করেছে। ধাপে ধাপে নানা আইনের প্রয়োগ, অর্থনৈতিক শোষণ ও কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে জাতীয় সংহতি ধ্বংস করে দাস-মনোভাবের সৃষ্টিই ছিল প্রধান লক্ষ্য তাদের এবং সেদিক দিয়ে সাফল্যও অর্জন করেছিল তারা। নিষ্ঠুর শোষণে প্রাচুর্যের দেশে এল চরম দারিদ্র্য, অন্ন সংস্থানের চিন্তায় শক্তি গেল কর্পূরের মত উবে। ঐতিহ্যমণ্ডিত শক্তিশালী একটা জাতিকে যেন ক্লীবত্ব আচ্ছন্ন করে রাখল। **কিন্তু দেশাত্মবোধের শাশ্বত প্রেরণা জাতির প্রাণ**-শক্তিকে জীবন্ত করে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হয়ে রইল। এরই সার্থক বিকাশ দেখা গেছে পাঞ্জাবে শিখজাতি, মহারাষ্ট্রে মারাঠা প্রভৃতি শক্তির অভ্যুদয়ে। স্বদেশী যুগে বিপ্লবী বীরগণের অসাধারণ শক্তি অনমনীয় মনোবলের কাহিনীও দেশের প্রান্তে প্রান্তরে, প্রতি গৃহকে মুখরিত করেছে।

কত সাধনায়, কত ত্যাগে, কত শত বীরের রক্তদানে দীর্ঘদিনের পরশাসন পাশ থেকে ভারত মুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার অরুণ আভায় দেশের নর নারী পরিস্নাত হয়ে প্রাণের স্পর্শ পেয়েছে। নয়টি বছরের স্বাধীন যাত্রাপথে ভারত যেন বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। পথের বাধা-বিঘ্ন স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ সবলহস্তে অপসারণ করে চলেছে যেন। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, চারুকলায় জাতির প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠছে। জগৎসভায় ভারত তার আসন গৌরবের উচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করছে। ভারতের প্রতিটি সন্তানের মুখ এই সাফল্যে আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

নবীন যাত্রায় বহু বিঘ্ন, বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু কোন সমস্যাই সঙ্কল্পবদ্ধ মানবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। ভারতের নবীন নাগরিকদের সংকল্প এই সমস্তকেই অতিক্রম করে যাবে। এই কাজের জন্যে চাই সবল ও সুস্থ নাগরিক। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম'—বাণীকে স্মরণ রেখে জাতি গড়ার কাজে এগিয়ে যেতে হবে দেশের রাষ্ট্র-শক্তিকে। সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনায় দৃঢ়হস্তে সমস্ত মালিন্য মোচন করে দেশের তরুণ কলিকাগুলিকে প্রস্ফুটিত পুষ্পে পরিণত করতে হবে।

খেলাধূলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শৈশবের মধুর দিনগুলি দৌড় ঝাঁপের মধ্যেই কাটে খেলাধূলোর অনাবিল আনন্দ জীবনকে মাধুর্যে ভরে রাখে। শিশু তার প্রতি অঙ্গে প্রাণ শক্তিকে বিচ্ছুরিত করে সহজ যত খেলার ছলে। সেই খেলাধূলোই তাকে স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ করে মনে আনন্দের প্রবাহ অব্যাহত রাখে, আর বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করতে সহায়তা করে। দেখা গেছে যে, কুনো ছেলের তুলনায় ডানপিটে ছেলেদের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অনেক বেশী। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে ডানপিটের যোগ থাকে অনেক বেশী। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৌড়-ঝাঁপের সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে নেয়।

এই খেলাধূলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনের প্রয়াসই তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশ বিদেশে এই পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে এই পদ্ধতির প্রচলন হলে বহু সমস্যার সহজ সমাধানের পথ আবিষ্কৃত হতে পারে। পাঠশালা থেকে সুরু করে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়, তাহলে দেশ থেকে বহু রোগ উৎখাত হবে। দেশের ছেলে-**মেয়েদের শরীর সবল ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠবে, তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং** সুস্থ সবল তরুণ দলের ভেতর থেকে দেশের প্রয়োজনে সৈনিক তৈরী হবে।

খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সংগঠনী প্রতিভা বিকাশ লাভ করে দেশের যোগ্য নেতা তৈরী হবে। ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে ক্রীড়াক্ষেত্রে বহু প্রতিভাধর ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতেরই মুখ উজ্জ্বল করবে তারা।

পাঠশালা থেকে সুরু করে স্কুল-কলেজ প্রভৃতি সর্বস্তরে ক্রীড়ানুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শারীরিক যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে নিয়ে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান, ক্লাব বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ব্যায়াম ও খেলাধূলো অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর জন্য অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদ্ ও শারীরতত্ত্ববিদদের নিয়ে পরিদর্শকমণ্ডলী গঠন করা দরকার। আজ ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার যে অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে অভাব থাকার কথা নয়, কারণ জন-সম্পদে পরিপুষ্ট দেশ যে ক্রীড়াক্ষেত্রে দীন নয়, একথা সোভিয়েট রাশিয়া প্রমাণ করেছে সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসরণে।

ক্রীড়াবিদদের মূলমন্ত্র অনুশীলন। যে যত অনুশীলন করে, তার যোগ্যতা ততই বৃদ্ধি পায় এ সত্য জলের মতই স্বচ্ছ। সোভিয়েট্ রাশিয়ায় দেখেছি কাজের ভীড়ে যে ক্রীড়াবিদ্ দিবাভাগে অনুশীলনের সুযোগ পায় না, রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোয় সে নিয়মিত অনুশীলন করে তার উৎকর্ষ বজায় রাখে। তবে দৈহিক যোগ্যতা ও অনুশীলনই শেষ কথা নয়, অনুশীলনের পদ্ধতিটা নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত হচ্ছে কিনা, তা জানা দরকার। এর জন্যে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক। বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় যে দেশ যে বিষয়ে সমুন্নত, সেই দেশ থেকে সেই বিষয়ে শিক্ষক আনিয়ে যাচাই করতে হবে। তা না হলে শারীরিক যোগ্যতা ও সম্যক অনুশীলন সত্ত্বেও প্রতিযোগীকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রীড়া শিক্ষাদানে চলচ্চিত্র একটা প্রধান মাধ্যম। কোচ্ প্রদত্ত পদ্ধতির চলচ্চিত্র পার্কে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রদর্শন করে ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ হয়। নিখুঁত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া যায়। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ক্ষেত্রে, এথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ে এই রীতিতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে।

কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতের মান উন্নত না হয়ে অবনতির দিকে চলেছে। ক্রিকেট, ফুটবল, এথলেটিকস্, হকি, মুষ্টিযুদ্ধে ভারতের ক্রমাবনতি প্রত্যেক ক্রীড়ানুরাগীকে আজ চিন্তিত ও ব্যথিত করে তুলেছে। এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী ক্রীড়া-জগতের পরিচালকমণ্ডলী। সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ক্রীড়া-মান উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই এঁদের নেই। কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাওয়াটাই যেন তাঁদের লক্ষ্য হয়েছে। দেশের স্বার্থ ও অর্থের চেয়ে কায়েমী স্বার্থই আজ বড় হয়ে উঠেছে। ভারতের ক্রীড়া-জগতের এই অভিশাপ দূর করতে হবে। যদি কেহ সত্যই

(ইহার পর ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

নাগরিক জীবনে খেলাধুলা

গোষ্ঠ পাল

বছর ত্রিশ আগেও আমাদের গুরুজন ও অভিভাবকেরা খেলাধুলার নামে আঁতকে উঠতেন। ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে খেলতে যেত লুকিয়ে, হাতে-পায়ে চোট লাগলে মার খাবার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। সাঁঝের বাতি না জ্বলতেই ছেলেদের বাড়ী ফিরতে হত, গৃহশিক্ষক পৌঁছাবার পূর্বেই। অভিভাবকদের খেলাধুলা-বিরোধী এই মনোভাবের পিছনে ছিল—"লেখাপড়া শিখলে ভাল চাকুরী পাওয়া যাবে—খেলাধুলায় মেতে থাকলে ছেলেরা 'বকে' বা 'বয়ে' যাবে।" পাড়ার মাতব্বর শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিই ডানপিটে ছেলেদের দেখতে পারতেন না, অভিমত প্রকাশ করতেন ভবিষ্যতে এরা গুণ্ডা হবে, লোকের গলায় ছুরি দেবে।

অভিভাবকদের এই মনোভাব আজ অনেক বদলেছে। ছেলেদের খেলাধুলায়, অভিভাবকেরা সক্রিয় সাহায্য না করলেও, সক্রিয়ভাবে বাধা দেন না। মনোভাবের পরিবর্তনের পিছনে ছেলেদের দেহগঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদ কতখানি আছে বলা কঠিন। তবে এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, অভিভাবকরা আজ লক্ষ্য করছেন যে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই চাকুরী জীবনের একমাত্র প্রবেশদ্বার নয়, খেলাধুলায় পারদর্শিতাও চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে অন্যতম যোগ্যতা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

খেলাধুলা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনোভাব যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতের উদ্যোগী ও কর্মঠ নাগরিক গঠনে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে খেলাধুলার আবশ্যকতা আজ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই আজ ক্রীড়া শিক্ষক ও ব্যায়াম শিক্ষক বা গেমস্ মাষ্টার আছেন।

সুদূর অতীতের দিকে ফিরে চাইলে আমরা দেখতে পাব যে, তখন ব্যায়াম চর্চার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হত। যোদ্ধার জাত স্পার্টানদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল যা অনেকের কাছেই নৃশংস বলে মনে হবে। নবজাত পুত্রসন্তান দুর্বল বা বিকলাঙ্গ হলে তাকে মেরে ফেলা হত। রাষ্ট্র-জীবনে দুর্বল বা বিকলাঙ্গ নাগরিকের স্থান নেই, এরা আত্মীয়স্বজনের ও রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে উঠবে বলেই। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নাগরিক জীবনে খেলাধুলা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। গ্রীসেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রবর্তিত হয়। অলিম্পিক ক্রীড়ার সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত রাখা হ'ত। প্রাচীন বৃটেনে রাজা ও রাজপুরুষদের উদ্যোগে ধনুর্বিদ্যা, অসি চালনা, অশ্বারোহী বর্মাবৃত যোদ্ধাদের কৃত্রিম যুদ্ধ ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। ভারতে ধনুর্বিদ্যা, গদাযুদ্ধ, অসি-চালনা, রথ ও অশ্বচালনা ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভারতের নিজস্ব যোগ-ব্যায়ামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরীর সুস্থ না থাকলে, মনও সুস্থ থাকে না, কাজে উৎসাহ আসে না। শৈশবাবস্থা হতেই নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়ামের মাধ্যমেই ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হবে। খেলা-ধুলার মারফতে নির্মল আনন্দ লাভ করবে ছেলে-মেয়েরা। আর সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলারক্ষার অভ্যাস। দলবেঁধে খেলাধুলায় যোগদানের ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দলসংহতি বা টিম ওয়ার্ক এবং সংঘানুবর্তিতা বা টিম্ স্পিরিট বড় হয়ে উঠবে। নিজের কৃতিত্ব দেখানোর চেয়ে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় দলের জয়লাভের পথ সুগম করে দেওয়া এবং দলের পরাজয় রোধ করার স্পৃহা-ই তাদের মধ্যে ফুটে উঠবে। শৈশবে ও ছাত্রাবস্থায় এই মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে, পরবর্তী জীবনে নাগরিক হিসেবে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার কোন অভাব হবে না। ছাত্রজীবনে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিনা প্রতিবাদে অধিনায়কের নির্দেশ মেনে নেওয়ার অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে গেলে কর্মজীবনে দলা-দলির প্রবৃত্তি হ্রাস পাবে। মনোনীত নায়ক বা নেতার, কিম্বা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীর অধীনে কাজ করতে অসুবিধা বোধ হবে না।

পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ জাতির শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সর্বজনবিদিত। অধিনায়কের বিরুদ্ধে কর্মীদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা বিদ্বেষ থাকলেও তা' কদাচিৎ প্রকাশ্যে জানাজানি হয়। ক্রিকেট খেলা হ'ল ইংরাজদের জাতীয় ক্রীড়া। সুস্থ প্রতিযোগিতা, প্রতিপক্ষের ভুল-ত্রুটি বা দৌর্বল্যের কোন অবৈধ সুযোগ না নেওয়া, অধিনায়ক এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে স্বীকার করে নেওয়া—ইহাই হল ক্রিকেট খেলার মূল নীতি। ক্রিকেট খেলায় যে খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাব বা স্পোর্টিং স্পিরিট প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হতেই ইংরাজদের মধ্যে প্রবাদবাক্য হিসেবেই একটা কথা চলে আসছে—কেউ কোনও অবৈধ বা অসঙ্গত সুযোগ গ্রহণ করলে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়—ইট ইজ নট 'ক্রিকেট'!—খেলোয়াড়ের মত কাজ হচ্ছে না! শৈশবাবস্থা হতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলাধুলার মাধ্যমে এই সুস্থ মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে উদ্যোগী ও কর্মঠ নাগরিক গঠনের বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।

শরীর গঠন ও নির্মল আনন্দ ছাড়াও খেলা-ধুলার আর একটি উপযোগিতা আজ অধিকতর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সেটা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বোঝাপড়া এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির বিষয়ে খেলা-ধুলার ভূমিকা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্-রাও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সৌহার্দ বৃদ্ধির পন্থা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই আজ লৌহ-যবনিকার এপারে ও ওপারে ক্রীড়া প্রতিযোগী-দের যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্যে রাজনৈতিক বাধার গণ্ডী—পাসপোর্ট ও ভিসার নিয়মকানুনও শিথিল করা হচ্ছে!

হকি খেলায় ভারত আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলি আজ হকি খেলায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। অপর পক্ষে উপযুক্ত অনুশীলন ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতে হকি খেলার মান নিম্নগামী। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যে সকলকেই উদ্যোগী হতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানী করা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিলটেনিস ইত্যাদি অধিকাংশ খেলাই ব্যয়বহুল (এইগুলির মধ্যে ফুটবল খেলাতেই খরচ অপেক্ষাকৃত কম)। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে হলে, এই খেলাগুলিতে আমাদের মান আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক কুস্তির নিয়মাবলী ভারতীয় পদ্ধতির নিয়মাবলী হতে স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে হলে, আমাদের মল্লবীরদের আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী জানতে এবং শিখতে হবে। ভারোত্তোলনে ভারতীয় ক্রীড়াবিদ্‌দের কৃতিত্ব দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবুও আমরা পিছিয়ে আছি—উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে। বিভিন্ন অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক মান-এ পৌঁছাতে হলে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অনেক দূর।

খেলাধুলার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু, একমাত্র হকি খেলা ছাড়া, ভারত প্রায় সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে কেন? আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্রীড়াবিদের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলেই এর জবাব পাওয়া যাবে। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে নজর দিতে হবে। খেলোয়াড়-গণকেও স্বাস্থ্যবিধির নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে ধর্মীয় আচরণের মতন। একাগ্রমনে অনুশীলন করতে হবে খেলোয়াড়দের। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে তাদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চার প্রচলন করতে হবে। ব্যায়ামচর্চা ও খেলাধুলার পরিশ্রমে শরীরের ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্যে তাদের দিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য। উৎকর্ষলাভের জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যে চাই রাষ্ট্রের আনুকূল্য, দেশনায়কদের সক্রিয় সহ-যোগিতা এবং জনসাধারণের সদিচ্ছা। দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে বড় শহরগুলি ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জনসাধারণ খেলাধুলার বিষয়ে উদাসীন।

ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠনে এবং আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ ও সৌহার্দ স্থাপনে খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেই কেন্দ্রীয় সরকার আজ এগিয়ে এসেছেন। নিখিল ভারত ক্রীড়া-পরিষদ স্থাপিত হয়েছে, বিভিন্ন ক্রীড়া-সংস্থাকে অর্থসাহায্যের জন্যে। রাজকুমারী অমৃত কাউর ক্রীড়া শিক্ষণ পরিকল্পনায় বিদেশ থেকে ক্রীড়া-শিক্ষক বা কোচ্ আনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে স্পোর্টস বোর্ড স্থাপিত হচ্ছে, রাজ্যের খেলাধুলা সুস্থ পথে পরিচালিত করার জন্যে। সরকারী এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সরকারের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে, সরকারী অর্থানুকূল্যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রীড়া-

(ইহার পর ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

এক যে ছিল রাজা আর তার পরমাসুন্দরী কন্যা। রাজার শৌর্যবীর্য, ঐশ্বর্যের কাহিনীকে ছাপিয়ে রাজকন্যার রূপের খ্যাতি ছড়িয়েছিল দূরে দূরান্তে।

রূপবতী রাজকন্যাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার আশায় রূপবান যুবকেরা আসতো দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে। কেউ বিত্তবান রাজপুত্র আর কেউ বা সাধারণ মানুষ। কিন্তু শুধুমাত্র চেহারার জোরে বা অভিজাতের গৌরবে রাজকন্যাকে লাভ করার উপায় ছিল না। দুর্লভ রত্নটির কামনায় এগিয়ে আসতো যে, তাকেই নামতে হতো এক অভিনব অগ্নিপরীক্ষার ক্ষেত্রে। কথা ছিল যে, অগ্নিপরীক্ষায় যে পারবে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে, রাজাজ্ঞায় রূপবতী কন্যা দেবে তারই গলায় মালা দুলিয়ে।

আর নিষ্ফল হবে যে প্রার্থীর প্রয়াস, রাজরোষে আহুতি দিতে হবে তার মূল্যহীন জীবন। পরীক্ষা ক্ষেত্রে রাজা নিজেই হতো প্রার্থীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, সুরু হোতো রথ-যুদ্ধ। দ্বৈরথ সমরে পরাস্ত হ'লে নিষ্ঠুর রাজা নিজের হাতেই বর্শা বিঁধিয়ে ভাবী জামাতার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতো।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ছিল সত্যিকারের বীরপুরুষ, অশ্বারোহণে পটু, রথ চালনায় সুদক্ষ। রাজকন্যার মুখচন্দ্রের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আশাবাদী যুবকদের তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো ছিল সহজ, সহজ ছিল না রথ-যুদ্ধে রাজাকে পরাস্ত করা। তবুও সাধ্য না থাক সাধ ছিল অনেকেরই, অনেকেই এলো, রথ-যুদ্ধে পরাস্ত হলো এবং ঘাতকের মারণাস্ত্রের সামনে মাথা নত করে অতৃপ্ত কামনার প্রায়শ্চিত্ত করলো।

অবশেষে এলো সেই সর্বজয়ী পুরুষ, সুন্দর, সুঠাম আকৃতি, বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলে তার পরম আত্মনির্ভরতার ভাব। অথ্যাত, অজ্ঞাতকুলশীল এই যুবকের নাম পেলপস্। পেলপ্‌সের দেহে শক্তি ছিল যতো, মস্তিষ্কে ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি আরও বেশী। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র-শিষ্য যেন এই পেলপ্‌স, সম্মুখ সমরে ছলে-বলে কৌশলে, যে কোনো উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করাই ছিল তার আদর্শ। সর্বদিক ভেবে যুদ্ধে নামার আগে পেলপ্‌স কর্মচারীদের উৎকোচে বশীভূত করে রাজ-রথের একখানি চাকা রাখলো আলগা করে।

কৌশলী পেলপ্‌সের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল ছিদ্রবিহীন, নিখুঁত, তাই দ্বৈরথ সমরের নিষ্পত্তি হলো সহজ ও স্বাভাবিক পথে। কুরুক্ষেত্রে মহাবীর কর্ণের রথচক্র মেদিনী গ্রাস করেছিল আর প্রাচীন গ্রীসের এই 'ধর্মযুদ্ধে' চরম মুহূর্তে রাজা এনমাসের রথচক্র গেলো ছিটকে, ছুটে। কূটবুদ্ধির কাছে বলবীর্যের পরাভব ঘটলো, যুদ্ধ-রীতির কাছে মাথা নোয়ালো ন্যায় নীতি, শক্তিমান এনমাসের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতেই, বুদ্ধিমান পেলপসের অট্টহাসিতে রণক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

অন্য প্রার্থীদের জীবন নেবার সময় সত্যাশ্রয়ী রাজা এনমাসের মুখে হাসি উঠতো ফুটে। এবার অবশ্য তার ব্যতিক্রম ঘটলো। তবে হাসতে না পারলেও রাজা এনমাস বিজয়ী পেলপ্‌সের বর্শা ফলকের সামনে বুক পাততে পেরেছিল। বুদ্ধিধর পেলপস এনমাসকে রাজ-ধর্মচ্যুত হবার কোনো সুযোগ দেয়নি। রাজ অঙ্গীকারের পূর্ণ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এনমাসের প্রাণ নিয়ে রাজ দুহিতা হিপ্পোডামিয়াকে বিজয় রথে তুলে নিতে সে কোনো ভুল করেনি।

কথিত আছে যে, বিজয়োৎসবের স্মরণে পেলপ্‌স সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যে আনন্দময় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, উত্তরকালে তা অলিম্পিক উৎসবরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বুদ্ধির জোরে পেলপ্‌স কবে যে রাজা এনমাসকে পরাস্ত করে রাজকন্যা হিপ্পোডামিয়াকে লাভ করেছিল, প্রাচীন গ্রীসে কবেই বা হয়েছিল অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধন, ইতিহাসে তার স্বাক্ষর নেই, সে সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপাখ্যান। আর উপাখ্যান কি এই মাত্র একটি? আরও আছে।

কেউ কেউ বলেন যে, পেলপ্‌স আর রাজা এনমাসের কাহিনী আজগুবি, সত্য হলো গ্রীক দেবতা জেউসের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রবর্তনেরই কাহিনী। দেব-দেবীর অলৌকিক লীলাকে যাঁরা সত্যজ্ঞানে ধ্যান করেন, সেই সব ধর্মভীরুদের মতে জিয়াস আর ক্রোনোস ছিলেন দেবলোকের নেতা বিশেষ, ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে তাঁরা ছিলেন নিত্য নিয়োজিত, একে অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করাকে মনে করতেন কাপুরুষোচিত কাজ।

গ্রীক দেবতা জিয়াস আর ক্রোনোসের মধ্যে একদিন সুরু হলো ঘোর যুদ্ধ। সুরলোক ছেড়ে তাঁরা এবার মর্ত্যলোকের অধীশ্বর হবার সংকল্প এঁটেছেন। ক্রোনোসের সঙ্গে জিয়াসের যুদ্ধ, দেবতায় দেবতায় রণ, সে এক মহা ভয়ংকর কাহিনী। মারণাস্ত্রের ঝনঝনানিতে, রথচক্রের ঘর্ঘরে, মহাবীরদের হুহুঙ্কারে দ্যুলোক সচকিত হলো; নভঃস্থল হলো মুখরিত, সর্বংসহা মেদিনীও বুঝি কেঁপে উঠলো শঙ্কায়। ঘোর যুদ্ধের মধ্যেই দিন, মাস, বর্ষ, অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তারপর একদিন দেবতা ক্রোনোস দিলেন রণে ক্ষান্তি, জিয়াসের হলো জয়।

শোনা যায় যে, এই বিজয়োৎসবের স্মরণেই দেবরাজ জিয়াস ও তাঁর অনুগামীরা সেদিন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উত্তরকালে এই অনুষ্ঠানই অলিম্পিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। এ উপাখ্যানেরও সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের উপায় নেই, তবে ইতিহাস স্বীকৃত যুগেও অলিম্পিকের আসরে দেবরাজ জিয়াসের যে এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, অলিম্পিক আন্দোলনের নেতারা যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে জিয়াসের দেবলীলার কাহিনী স্মরণ করে এসেছেন সে কথা অনস্বীকার্য।

দক্ষিণ গ্রীসে পর্বতমালা বেষ্টিত এলিসের পিসা শহর সন্নিকটে অলিম্পিয়ার প্রান্তরে একদা দেবরাজ জিয়াসের আকাশ ছোঁয়া মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে জার্মাণ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করে প্রাচীন গ্রীসের সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় এক অধ্যায় বিশ্ববাসীর সামনে খুলে ধরেন। সেকালে অলিম্পিক প্রতিযোগীরা জিয়াসের মন্দিরে প্রবেশ করে দেবরাজের উদ্দেশে পুজো দিতো, প্রার্থনা করতো তাঁর আশীর্বাদ, তারপর শুদ্ধচিত্তে ধর্ম ও ন্যায়সংগত পথে প্রতিযোগিতা চালাবার অঙ্গীকার নিয়ে দেবদৃষ্টির সামনে সুরু করতো বিবিধ খেলাধুলো ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। সেকালে স্টেডিয়াম ছিল, ছিল ধাবন-চক্র। ষাট ফুট উঁচু মন্দিরের অভ্যন্তরে, স্থাপিত ছিল হস্তিদন্ত ও স্বর্ণে নির্মিত জিয়াসের যে মূর্তি—আকারে সেটিও ছিল বিশাল। ধ্বস নেমে ভূমিকম্পে সে সব একদিন চাপা পড়ে যায়। বস্তুতান্ত্রিক একালে পুজো-পার্বণের ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলেও, ঐতিহ্য অনুসরণের প্রয়াস এখনও থামেনি। আজও

প্রতিটি অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রাক্কালে ভগ্নাবশেষ জিয়াসের মন্দির প্রাঙ্গণে অতসী কাঁচের সাহায্যে সূর্য-রশ্মি কেন্দ্রীভূত, ঘনীভূত করে অলিম্পিক পূতাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে অনেক পুরোনো কথা ভুলতে শিখিয়েছে কিন্তু সভ্য মানুষের মন থেকে এ বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারেনি যে, অলিম্পিয়ার প্রান্তরে দেবরাজ জিয়াসকে সাক্ষী রেখে যে পূতশিখা প্রজ্বলিত করা হয় সেই শিখার দীপ্তি দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের অন্তরলোক আলোকিত করে, অনুপ্রাণিত করে প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্মানে [illegible]। পূতশিখার দ্যুতিতে চলার পথের দিশা মেলে, মানুষ যেন তখন আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে পারে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের যাথার্থ্য—বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী রচনার প্রয়োজন।

কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক অলিম্পিকের আসরে দেবরাজ জেউসের ভূমিকা যতো বড়ই হোক না, তিনিই যে অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রবর্তক একথাও সর্বসম্মত নয়। অমর কবি পিন্ডার তাঁর অলিম্পিক গাথায় পথিকৃৎ রূপে [illegible] করেছেন উপাখ্যান বর্ণিত মহাবীর হারকিউলিসকে। রাজা অগিয়াসকে রণক্ষেত্রে

অলিম্পিয়ার প্রান্তরে জেউসের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

যুদ্ধ করে এলিস জয় করে হারাকিউলিস নাকি অলিম্পিয়ার প্রান্তরে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই আয়োজনই নাকি পরে অলিম্পিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। কথিত আছে যে, প্রান্তরস্থিত আলটিস কুঞ্জে হারাকিউলিসের নির্দেশে পোঁতা হয়েছিল এক অলিভ গাছ। এই পবিত্র অলিভ গাছের পাতায় তৈরী মুকুটে সাজিয়ে পুরস্কৃত করা হোতো সেকালের অলিম্পিক বিজয়ীদের।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে যিনিই অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রবর্তন করে থাকুন না কেন, ঐতিহাসিকদের কাছে তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত, পুরোনো কথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিংবদন্তীর স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছে। ইতিহাস অবশ্য একজনকে অলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরনুষ্ঠানের প্রবর্তক বলে স্বীকার করে নিয়েছে, নাম তাঁর হেরাক্লিস।

খৃষ্টের জন্মের ৭৭৬ বছর আগেকার কথা, গ্রীসে তখন একচ্ছত্র সম্রাট বলে কেউ ছিল না। বড় বড় শহরের এক একজন বীর হতো সেই অঞ্চলের নায়ক। স্ব স্ব প্রধান এই বীরপুরুষদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। এই কাটাকাটি, হানাহানি, রক্তরাঙা পরিবেশের মাঝে আত্মপ্রকাশ ঘটে চিন্তানায়ক হেরাক্লিসের। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হেরাক্লিস উপলব্ধি করলেন যে পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষ এমনি অব্যাহত থাকলে গ্রীসের জাতীয় অস্তিত্বই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এই আত্মঘাতী সংগ্রাম বন্ধ করে গোটা গ্রীসকে যদি ঐক্যীভূত সংঘবদ্ধ [illegible] তবেই গ্রীকজাতি অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হতে পারবে।

হেরাক্লিসের মস্তিষ্কেই অলিম্পিক ক্রীড়ার পুনঃ প্রবর্তনের পরিকল্পনার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। এরই সূত্রে উচ্চারিত হয়েছিল একতা, একপ্রাণ একতার মন্ত্র। হেরাক্লিস বলেন, বীরের বংশধর তোমরা, [illegible] কিন্তু অলিম্পিক অনুষ্ঠানের [illegible]। এ এক পবিত্র মুহূর্ত ও অনুষ্ঠানের [illegible] দেবলোক [illegible] পূর্ব [illegible] পারেন। এই কটি দিনের জন্য সকলে ভুলে যাও বিবাদ বিদ্বেষের কথা।

[illegible] উচ্চারিত এই মন্ত্রে সাড়া দিল [illegible] হয়ে প্রতি চার বছরের অন্তরে অলিম্পিয়ার প্রান্তরের ক্রীড়া-ভূমিতে এসে মিলতে হতো। সেখানে মর্তের মানুষেরা দেবতাদের আবাহন করে পরলোক-গতদের আত্মার তৃপ্তির [illegible] নানাবিধ সুস্থ ক্রীড়ানুষ্ঠানে [illegible] ক্রীড়া প্রতিযোগিতার [illegible] পরিবর্তিত হলেও, ধীরে ধীরে এই আসর গ্রীসের জাতীয় কৃষ্টি [illegible] হয়েছিল। খেলার মাঠের পাশেই [illegible] হয়েছিল পাতা, সেখানে [illegible] করা হোতো। [illegible] আলোচিত হতো জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা।

হেরাক্লিসের পরিকল্পনাকে সার্থক করতে যাঁরা এগিয়েছিলেন তাঁরাও ছিলেন [illegible], পিসার রাজা [illegible], স্পার্টার [illegible] মালিক [illegible] ও [illegible] ইফিটাস। প্রাচীন অলিম্পিক ক্রীড়ার ইতিহাসে হেরাক্লিসের মতোই এই তিন জনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কেননা তিন বিদ্বান ও প্রভাব-শালী [illegible] সহযোগিতা না পেলে হেরাক্লিসের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারতো কিনা সে সম্পর্কেই সন্দেহ।

প্রাচীন যুগে এই অলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান একাদিক্রমে ১১৬০ বছর ধরে অব্যাহত ছিল, গ্রীকদের পর রোমানদের আমলেও। কিন্তু দুঃখ ও বেদনার কথা এই যে, যে শক্তিকে সংহত করার উদ্দেশ্যে একদিন অলিম্পিক ক্রীড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই শক্তির দম্ভ আত্মপ্রকাশে আর একদিন এই অনুষ্ঠানের উপর যবনিকা টেনে দিতে হয়।

গ্রীকদের স্বর্ণ যুগে একমাত্র অভিজাত গ্রীক বংশধরেরাই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অধিকার ছিল। দেশে যখন অবিমিশ্র হেলেনিক রক্তস্রোত বইতো স্বচ্ছ নদীর মতো, পরীক্ষার পর একমাত্র তারাই প্রতিযোগী রূপে হোতো স্বীকৃত। রোমানদের আমলে তারাও যোগ দিল এই অনুষ্ঠানে, আয়োজন হয়ে উঠলো মিশ্রিত। গ্রীকরা আভিজাত্য ভুলতে বাধ্য হলেও সহজে পথ ভুলতে পারেনি, ধর্মাচরণ জেনেই তারা অলিম্পিকের আদর্শ সামনে রেখে প্রস্তুত হয়েছে, আর রোমানরা আসরে এসেছে নিছক কৌতূহল বশে। শাসক আর শাসিত, এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য ছিল, একের ছিল দৈহিক ও আত্মিক শক্তি, আর অন্যজন ছিল শুধুমাত্র বাহুবলে বলীয়ান। ফলে ক্রীড়ানুষ্ঠান কেন্দ্রে গ্রীকেরা প্রতিদ্বন্দ্বী রোমানদের হারিয়ে দিয়ে জয়মাল্য নিত ছিনিয়ে।

বারবার এই পরাজয়ের অক্ষমতা স্বীকার করা একদিন শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিভূ রোমানদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এক অনুষ্ঠানের পর তারা পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে চাইলো শাসিত গ্রীকদের ওপর চরম আঘাত হেনে, তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে, প্রাণে মেরে। এ কাহিনী ৩৯২ খৃষ্টাব্দের, রোম সম্রাট থিওডসিয়াস তখন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। ন্যায় ও ধর্মযুদ্ধে পরাজিত রোমানদের বিকৃত, বিকারগ্রস্ত মনের এই নির্লজ্জ প্রকাশ দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। বললেন, আর নয় এবার চিরদিনের মতো দাঁড়ি টানা হোক—অলিম্পিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রে ধ্বংসের বীজাণু সংক্রামিত হয়েছে, এ আয়োজনে ঘটছে জাতীয় বিপর্যয়।

দেবরাজ জেউসের প্রস্তরমূর্তি

রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। ৩৯২ খৃষ্টাব্দের পরই প্রাচীন অলিম্পিক ইতিহাসের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গেল। কল্যাণকামী শুভবুদ্ধির বিকাশে গ্রীক সভ্যতার ঊষাকালে দেবাশীষে অনুরঞ্জিত যে আলো একদা অলিম্পিয়ার প্রান্তরে ঝলমল করে উঠেছিল, শক্তিমদে মত্ত রোমানদের জীবন মধ্যাহ্নে অসুরের এক ফুৎকারে তা হলো নির্বাপিত। সমগ্র ইতিহাসের আখরগুলো প্রাগৈতিহাসিক রূপ-কথায় অবলুপ্ত হবার আশঙ্কা ঘটলো। অবশ্য এ আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। ইতিহাস ইতিহাসই হয়ে আছে, যদিও তার জীর্ণ, লুপ্তপ্রায় অধ্যায়গুলোকে উদ্ধার করতে উত্তর সাধকদের অনেক কাঠ-খড়ই পোড়াতে হয়েছে।

নাগরিক জীবনে খেলাধুলা

(১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

সংস্থাগুলি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করবে উদীয়মান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে, যথাযথভাবে অনুশীলনের সুযোগ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে ভারতের ক্রীড়ামান ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে দেবেন, আমরা এই আশাই করব।

খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতা

কিছুদিন ধরে খেলার মাঠে যা ঘটছে তা ক্রীড়ামোদীদের এবং খেলাধুলার উন্নতি ও জাতীয় জীবনে খেলার কল্যাণ-পরশ যাঁরা চান তাঁদের সকলকেই ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত করে তুলেছে। মার্জিত ভাষায় একে যাহাই বলা হ'ক না কেন, আমরা সেকেলে লোকেরা একে 'গুণ্ডামি' বা হুলিগ্যানিজম ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই উচ্ছৃঙ্খলতা দর্শকদের এবং ক্লাব সমর্থক ও সদস্যদের গণ্ডী ছাড়িয়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। খেলার মাঠে দাঙ্গা দমনের জন্যে পুলিশকে যদি লাঠি চার্জ করতে হয় তাহলে আমাদের মত সেকেলে লোকেদের কাছে সে দৃশ্য খুবই বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে।

এর কারণ খুঁজতে আমাদের বেশীদূরে যেতে হবে না। আমার মনে হয় দর্শক এবং ছাত্রদের নৈতিক মনোবলের দৃঢ়তার অভাবই এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দায়ী। আজকের দিনে যারা স্কুল ও কলেজের ছাত্র, আগামী দিনের তাঁরাই হবেন নাগরিক। ছাত্রদের নীতিবোধ ও চরিত্র গঠনের দিকে যদি আমরা নজর দিতে পারি, তাহলে শুধু খেলার মাঠেই নয়, নাগরিক জীবনেও আমরা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখতে পাব। খেলারধুলোর মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা গড়ে ওঠে, একথা ওপরেই বলা হয়েছে। খেলাধুলোটা আনন্দের জন্যে, প্রতিযোগিতায় জয়লাভই একমাত্র লক্ষ্য নয়, সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের ও দলের শ্রেষ্ঠ নিপুণতা দেখান সত্ত্বেও, প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয়ের মধ্যে কোন গ্লানি নেই, ব্যষ্টির নিপুণতার চেয়ে দল সংহতি ও সঙ্ঘানুবর্তিতা কোন অংশেই ছোট নয়—এই স্পোর্টিং স্পিরিট বা খেলাধুলোর মূলে নীতি শৈশবাবস্থা থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে যাতে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। ছাত্রদের ঠিক পথে চালাতে হলে স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে বাড়ীর আবহাওয়াও যাতে সুস্থ থাকে, সে দিকে নজর দিতে হবে। এর জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ চাই। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। বাপ মা, বড় ভাই-বোন যা করছেন বা বলছেন, তারাও সেইমত কাজ করতে ও বলতে চাইবে। শিশু মনস্তত্ত্বের কথা স্মরণ রেখেই, বাড়ীর আবহাওয়া ও পরিবেশ যাতে সুস্থ থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে। শুধু স্কুলে নয়, অভিভাবকদেরও উচ্ছৃঙ্খলতার কুফল ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে। ছাত্রজীবনেই ছেলেমেয়েদের নীতিবোধ ও চরিত্রগঠনের সুযোগ সবচেয়ে বেশী। সেই বিষয়েই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

মাটী মাখার সাধনা

(১৫২ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ মানুষও কালক্রমে ফাঁকির পথ অবলম্বন করে বসে।

কুস্তিচর্চা জনপ্রিয়তা হারাবার মূলে আরও কতকগুলো কারণ আছে। বড়জোরের পালোয়ান হতে হলে অনেক পয়সা খরচ করে 'হাতীর খোরাক' সংগ্রহ করতে হয় এবং শরীরের তরিবত করতে হয় অত্যধিক। কুস্তিগীরদের কথা উঠলেই সাধারণ মানুষের চোখের সামনে বড় বড় পালোয়ানদের রেওয়াজ, শরীর রাখার হেফাজৎ ও আহার্যের বিরাট তালিকার চিত্র ভেসে ওঠে এবং স্বভাবতঃই তারা পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু সকল কুস্তিগীরই তো আর বড়জোরের পালোয়ান হতে পারে না, শরীর রাখবার জন্যে যে কুস্তিচর্চা তা ব্যয়সাপেক্ষ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম তথা মনোযোগসাপেক্ষ নয়। কুস্তি সম্বন্ধে আমাদের বিরাগের আর একটা কারণ তোলো যে বহু লোকের ধারণা, কুস্তি করলে নাকি মাথা মোটা হয়ে পড়ে। অভিমতটা হাস্যকর। মথুরার চোবে কুস্তিগীররা পণ্ডিতরূপে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বহু চোবে পালোয়ান দার্শনিক হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, চোবে পালোয়ানদের দৈনন্দিন কাজ ছিল বিদ্যাচর্চা। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত পালোয়ানরা লেখাপড়ায় আগ্রহশীল ছিলেন না বলেই জনসাধারণের মনে তাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মায়। অপেশাদার পালোয়ানদের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ বরাবরই ছিল আজো আছে। আর পেশাদার সম্প্রদায় লেখাপড়ায় মন না দিলেও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও সঙ্গীতচর্চায় মনোযোগী ছিল। সুতরাং মাটী মাখার সাধনা সম্পর্কে নব্যভারতের উন্নাসিকতার প্রয়োজন নেই। অল্পস্বল্প মাটী মাখলে দেহটাকে সুস্থ, সবল রাখা যায়, মানসিক উন্নয়নও ঘটে এবং সেই সঙ্গে ভারতের এক সুমহান ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পাওয়া যায়। সব খেলাধুলোই ভাল, কিন্তু যে খেলা খাঁটি ভারতীয় তার চর্চা রাখা কি সবচেয়ে ভাল নয়?

যুগোপযোগী পরিকল্পনার প্রয়োজন

(১৫৩ পৃষ্ঠার পর)

ভারতের ক্রীড়ামানের উন্নতিসাধন করতে চান, তাহলে সর্বাগ্রে এ-বিষয়ে লক্ষ্য করতে হবে।

হকিতে ভারত বিশ্ব-বিজয়ী। গত পাঁচটি অলিম্পিকে ভারতের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু পূর্বেকার সে দোর্দণ্ড প্রতাপ যেন এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হকিতে ভারতের প্রায় সমকক্ষ হতে চলেছে। ভারতকে তার পূর্ব খ্যাতি বজায় রাখতে হলে আরো কঠোর অনুশীলনের দ্বারা উন্নতি করতে হবে। এই এক হকি ছাড়া আর কোন বিভাগে ভারত বিশ্ব-অলিম্পিকে স্বর্ণ-পদক আহরণ করতে পারে নি এখনও। ১৯৪৮ সালে হপ-ষ্টেপ এণ্ড জাম্পে রেবেলোর স্বর্ণ-পদক পাবার যে ক্ষীণ আশা দেখা গিয়েছিল, তা টিম ম্যানেজারের গাফিলতিতে নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া, কোন্ সুদূর অতীতে ভারতের এথলিট্ নরম্যান প্রিচার্ড ২০০ মিটার হার্ডল রেসে এবং ২০০ মিটার ড্যাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে দুটি রৌপ্য-পদক এবং কুস্তিতে ব্যাণ্টাম ওয়েটে যাদব তৃতীয় স্থান অধিকার করে একটি ব্রোঞ্জ মেডেল লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভারতের তুলনায় আয়তনে ও জনসংখ্যায় কম অনেক দেশ এর অধিক স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেছে।

জন-সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের পক্ষে ক্রীড়াক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়ে থাকা কলঙ্কের একমাত্র ভারতের অসাফল্যের জন্য দায়ী হল অযোগ্য পরিচালক-গোষ্ঠী। সরকার এই সমস্ত অযোগ্য লোকের হাতে অর্থের ভাণ্ডার তুলে দিয়ে এতদিন নিশ্চিন্তে কাটিয়েছেন। তার ফলাফলও এখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। এখন রাষ্ট্রকে সমগ্র ভার নিজহাতে নিয়ে এর প্রতিকার করতে হবে। তবেই ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্র সাফল্যের গৌরবে অভিনন্দিত হতে পারবে।

ভারতে মেয়েদের স্বাস্থ্য চর্চার সমস্যা

(১৬০ পৃষ্ঠার পর)

ইউরোপের অধিকাংশ দেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা দেখে, বাংলাদেশে ষ্টেডিয়ামের অভাবে খেলোয়াড় ও দর্শকদের দুরবস্থা, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে দেশের লোকেদের ও সরকারের উদাসীনতা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে মনে বিঁধতে থাকে। মনের আকাশে জাগে বিরাট জিজ্ঞাসা, কবে আমরা সজাগ হবো, কবে মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী হবে। অর্থনৈতিক সমস্যা ও নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলায় সত্যিই আজ আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত, কিন্তু তা বলেত মুখ বুজে সরে দাঁড়ালে চলবে না। আমাদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা সচেতন হয়ে, নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়েছেন তাঁদের আজ এগিয়ে আসা আশু প্রয়োজন। পাড়ায় পাড়ায় মহিলা সমিতি গঠনে তার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের ও সন্তানদের শরীর চর্চা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারি। শৈশব থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলো ও ব্যায়াম চর্চা করে, ভবিষ্যৎ সমাজে নিজেদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সম্পূর্ণ মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে তারই চেষ্টা করা উচিত। আমাদের কাজের ভিতর দিয়েই আমরা সরকারকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে সজাগ করে তুলতে পারবো বলে মনে করি। জ্ঞানের প্রদীপ ও স্বাস্থ্যের মশাল ঘরে ঘরে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে, আমাদের শক্তিপূজা সার্থক হবে আগামী দিনের ভোরে বাংলার নারী শক্তির জাগরণে—

'আগে চল্, আগে চল্ ভাই
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।'

পূজোর ভ্রমণ

পুজোর ছুটির সুর যে বাজে খোকার মনের তারে—
ভাব্‌ছে যাবে—সাত সমুদ্দুর তের নদীর ধারে॥
স্বপনবুড়ো বল্লে, "আমার সাড়ে সাত হাত দাড়ি—
তাই না ধরে ঝুলে পড়ো—সাগর দেবে পাড়ি।"
মনের সুখে খোকা তখন রওনা হল রাতে—
পুজোর ছুটির আনন্দেতে নতুন করে মাতে॥
গরুর গাড়ীর পাড়ি জমায়, নৌকোতে পাল তোলে,
জাহাজ ভাসায় অথৈ জলে, সাগর মাঝে দোলে!
রেল গাড়ীতে চড়ে চলে অনেক দূরের পথ
মোটরে দেশ দেখ্‌বে কত—পূরবে মনোরথ।
শেষ কালেতে খোকনবাবু হাওয়াই জাহাজ চোড়ে—
সাত সমুদ্দুর তের নদী মনের সুখে ঘোরে।
স্বপনবুড়ো বলে "এবার ফিরবে কি ভাই বাড়ী?"
খোকন বলে, "দেখ্‌বো ভুবন, কিসের তাড়াতাড়ি?"
হঠাৎ খোকার ঘুম ভেঙে যায় সপ্তমীরই ভোরে—
শুনলো পুজোর ঢাক যে বাজে মণ্ডপেরই দোরে।
'সাংগ হল পুজোর ভ্রমণ, নতুন পোষাক গায়—
খোকন সোনা অঞ্জলি দেয় মায়ের রাঙা পায়॥

স্বপনবুড়ো

(১) অবাক পৃথিবী—ফোটো—অমর নান, (২) কোনদিকে পালাই? ফোটো—জি ঘোষ, (৩) খেলার সাথী—ফোটো—প্রভাতকান্তি ঘোষ
(৪) ছায়া—ফোটো—শম্ভু বোস।

● উৎসব হবে দেশে ●

পদ্মের বুকে সাদা [illegible] উঠি [illegible] এসে
শরৎ দাঁড়াল [illegible] হেসে।

স্বাধীনতায়—সার্থক [illegible] অঞ্জলি দেব-সেবার,
দেবতার সাধ, মানুষের [illegible] আসন পেতে নেবার।
লক্ষ্মী [illegible] লক্ষ লক্ষ,
তারা আসুক [illegible] লক্ষ্য
দেশের অভাবে, দুঃখে [illegible] — ০ — * লিখে দেবার।
বীণাপাণি [illegible] এসে বাঁধে
অজানার [illegible] জানার নায়ে,
[illegible] প্রাণ
দিতে [illegible] নিমন্ত্রণে,
আলোর তারে বাজিয়ে দিতে [illegible] সামনে এগোবার।
হবে যারা কার্তিক [illegible] অসুর কোটি দলে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
জানুক [illegible]
[illegible]
[illegible]
এবার উৎসবে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
জাতির পতাকা উড়ুক [illegible] নিশানের সারে,
[illegible]
[illegible]

* ০—শূন্য।

(খোকা ও খুকু)

খুকু। দাদা, ওই যে সাদা জোছ্‌না মাখা মেঘের ফাঁকে
ওই যাচ্ছে দেখা থালার মত চাঁদ মামাকে,
বল ওইখানে কি সত্যি ক'রে মানুষ থাকে?

খোকা। নারে চাঁদের গায়ে জন্তু মানুষ কিচ্ছু নাই,
তবে চাঁদবুড়িও সত্যি কিনা ভাবছি তাই;
ভারি ইচ্ছা করে নিজের চোখে দেখতে যাই।

জানিস্, জন্মদিনের আমার টাকা, হবাই পাচ্ছে,
তাই মা রেখেছেন যত্ন ক'রে নিজের কাছে;
বুঝি একশো টাকা আলমারিতে বন্ধ আছে।

আমি ভাইনা দিয়ে, সাহেবরা যে করছে 'রকেট'
—চাঁদে পৌঁছে যাবার উড়ো জাহাজ—কিম্বা "লজেট্"
সেই জাহাজখানায় উড়ব ব'লে কিনব টিকেট।

খুকু। দাদা, কিন্তু বাবা করবে মানা নিশ্চয়ই।
মাও বলবে "খোকা ছাড়বনাত কক্ষণই,
দাও আমার হাতে, কোথায় তোমার টিকেট কোই।"

শোন, সাহেবদের সে চাঁদের জাহাজ উড়বে কবে?
যদি ফস্‌কে সেটা হঠাৎ নীচে খসবে তবে,
ভাব কী ভয়ানক মুস্কিলেতে পড়তে হবে।

(রাত্রে)

(প্লেনের শব্দ হচ্ছে। খোকা স্বপ্ন দেখছে।)

চাঁদবুড়ি। ওগো খোকাবাবু, আছ বিছানাতে?
খোকা। কে রে কথা বলে, ডাকে এত রাতে?
বুড়ি। আমি চাঁদবুড়ি, চাঁদেতেই বাড়ী,
তুমি যাবে শুনে, এনু তাড়াতাড়ি।
খোকা। ওমা তাই নাকি? তুমি চাঁদবুড়ি?
চাঁদ থেকে নেমে, এলে গুড়ি গুড়ি?
বল বল দেখি, কেমন সে দেশ,
পথ কোন্ ধারে, যাব কিনা বেশ।

বুড়ি। সেই দেশেতে জোছ্‌না আলো বেজায় কড়া ভাই,
গাছের ছায়া নেই সেখানে, মেঘের ছায়া নাই।
এক ফোঁটাও মিলবে না জল যতই তেষ্টা পাক,
করছে খাঁ খাঁ নিঝুম সে ঠাঁই, মরুর মত থাক্।
মস্ত উঁচু পাহাড় জাগে আকাশটাকে রুখে।
কোন্ সে কালে আগুন ছিল সেই পাহাড়ের বুকে;
কবে কখন জুড়িয়ে এল, ঠাণ্ডা হল শেষে,
হাড়-কাঁপুনি লাগবে গেলে বরফ-হিম দেশে।

মন যদি চায় জুটতে সেথা এই সবেরো পরে,
রইল তোমার নেমন্তন্ন আমাদের সে ঘরে।

খোকা। হোক্ ঠান্ডা সে, হোক্ মরুভূমি,
মানুষেরা যাবে, দেখে নিও তুমি;
দরকারি যা যা, সাথে নিয়ে যাবে।
ঘর-বাড়ী সেথা কোথা বল পাবে?
কাচ দিয়ে ক'রে নেবে ঘর-দোর,
—কত কেরামতি, কত তোড়জোড়—
শূন্যের গায়ে হবে ইস্টিশান।
এই হ'ল ব'লে চাঁদ ব্যোমযান।

(খুকু ও খোকা। মেঘের শব্দ, প্লেনের শব্দ।)

খুকু। তুমি আমি, মনে কর,
হয়ে গেছি খুব বড়—
সেই প্লেন চড়লাম,
এই উড়ে চল্লাম।
এইবার মেঘ ঢাকে
বিদ্যুৎ চমকায়।
বজ্র বুঝি প্লেনটাকে
গড়ে গড়ে ধমকায়?

খোকা। ওই দ্যাখ ছুটে চলে,
ঝক্ ঝক্ ঝক্ জ্বলে
—এক দুই তিন চার—
আকাশটা হ'ল পার,
উড়ন্ত থালা নাকি?
কোন্খান থেকে এল?
মঙ্গলবাসীরা কি
আমাদের দেখে গেল?
চাঁদ ভরা মস্ত
গোল গোল গর্ত,
পাহাড়ে প্রকাণ্ড:
কি বিরাট কাণ্ড।
ওই ফের উল্কা
ধাঁ—ক'রে পড়ল,
প্রাণ তার পল্কা,
পৃথিবীতে খস্‌ল।
নীলে-নীল শূন্য
সবখানে পূর্ণ,
নেই তার নিশানা,
রাস্তার ঠিকানা।

খুকু। চাঁদ মামা জ্বলছে,
আলো ঝরে পড়ছে,
ঠিক যেন হাসছে,
ভালবেসে ডাকছে।

খোকা। এইবার হই পার,
বাধা কিছু নেই আর।
চলি সামনের পানে
দুইজন খুসী প্রাণে।
ব্যোমযান সাঁই সাঁই
উড়ছে ত উড়ছেই,
চাঁদ দেখে বাঁই বাঁই
ছুটছে ত ছুটছেই।

খুকুর প্রিয় কুকুরছানা কোথায় গেল হায়রে,
খুঁজছে খুকু সারা দুপুর, কোথাও নাহি পায়রে।
বাইরে দাওয়ায় যায়না পাওয়া, অন্দরেও নাইতো
পায়না তারে কোথাও খুঁজে, কান্না ঝরে তাইতো।
আট বছরের ছোট্ট খুকু—ছোট্ট কুকুর তার যে—
দুপুরবেলা কোথায় গেল, খুঁজছে চারিধার যে!
মা-দিদিরা ঘুমিয়ে আছে! রান্নাঘরের পাশে
ভাজছে কিছু তেলের বড়া আয়া-মাসি তার সে।
মেনী বিড়াল ঐ তো শুয়ে মাচার ধারে চুপটি,
খাঁচার টিয়ে ঝিমায় বসে ডানায় গুঁজে মুখটি।
সবাই আছে, কুকুরটা নাই, হায় কি হলো আজ যে—
টিকিটা তার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এ-বাজে।
খিড়কি খুলে আস্তে খুকু বের হোলো আজ তাই-রে
খুঁজতে তারে বাগান ধারে, পুকুর-পাড়ে বাইরে।
নীরব নিঝুম পল্লীখানি, মধ্যদুপুর চারদিক—
হাওয়ায় হাওয়ায় আসছে ভেসে উদাস ঘুঘুর স্বরটা।
বটের গুঁড়ি বেয়ে ওঠে কাঠবিড়ালীর বাচ্চা,
কোথায় গেল খুকুর কুকুর? বিপদ বটে আচ্ছা!
পুকুর ধারে ঝোপের আড়ে ঐ যেন কে নড়ছে,
দুষ্টু কুকুর ঐখানে কি কাঠবিড়ালী ধরছে?
দৌড়ে গেল ছোট্ট খুকু, থাকতে নারে আর যে,
কোথায় কুকুর লেজ নাড়ে এক মস্ত বড় ষাঁড় যে।
যেই না খুকু সামনে গেছে, আসলো তেড়ে ষাঁড়টা;
বেদম ভয়ে ছুটলো খুকু। সামনে পুকুর ধারটা,
পা হড়কে পড়লো খুকু পুকুর জলে হায়রে
আতঙ্কে সে হাঁপায় করে, প্রাণ বুঝি আজ যায়রে।
খুঁজতে কুকুর দুপুর বেলা খুকুর বিপদ সঙ্গ—
হাবুডুবু খাচ্ছে খুকু তালপুকুরের মধ্য।
আয়া-মাসি শুনলো হঠাৎ খুকুর কাতর কান্না
দৌড়ে এলো পুকুর ধারে -ফেলে ঠেলে রান্না।
দেখলো এসে সর্বনেশে ব্যাপারটা আজ চক্ষে
একটুখানি করলে দেরী আর ছিল না রক্ষে।
লাফিয়ে মাসি ঝাঁপিয়ে পড়ে—শ্যাওলা-পানা হাতড়ে
অনেক করে আনলো তুলে পুকুরটাতে সাঁতরে।

পাহাড়ী রাজ্যের গল্প

পাহাড়ীদের রাজ্যে আসতে সূর্যিঠাকুরের ছয়-ছয়টা আকাশ আর সাত-সাতটা পাহাড় ডিঙোতে হয়। তাই আসতে আসতে ঘেমেঘুমে তাঁর মুখখানা লাল-টকটকে হয়ে ওঠে।

একবার গরমের দিনে এসেই তিনি হাঁপিয়ে পড়লেন। দুপুরে জোরে রদ্দুরে তাঁর প্রাণ আইঢাই করতে লাগল। তখন একখানা মেঘ দেখে তার ছায়ায় জিরোতে বসে হঠাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই ঘুম চলল তাঁর দিনের পর দিন একমাস ধরে।

এই এক মাস সূর্যিঠাকুর ঠিক মাথার উপরে রয়েছেন, দারুণ গরমে লোকজনেরা তেতেপুড়ে অস্থির। শেষে আর টিকতে না পেরে তারা সূর্যিঠাকুরকে গালাগাল দিতে লাগল।

চেঁচামেচিতে সূর্যিঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ীদের গালাগাল শুনে তাঁর রাগেরও সীমা রইল না। তিনি তক্ষুণি সে-দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন না।

* * *

এদিকে সূর্যিঠাকুর নেই পাহাড়ীদের রাজ্যে রাত্তির আর ফুরোয় না। রদ্দুরের অভাবে শীতও দেখা দিল। শীতে লোকজনেরা হী-হী করে কাঁপে। বনের জন্তুজানোয়ারেরা শিকার খুঁজতে দায়। গাছের পাখীদেরও আহারের বাসা ছেড়ে যাওয়ার জো নেই।

* * *

[illegible] যুক্তি করে ঠিক করল সূর্যিঠাকুরকে [illegible] ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু ছটা আকাশ আর সাতটা পাহাড় [illegible] খরগোস ছুটতে পারে খুব। [illegible] পাঠানো ঠিক হলো।

ছুটতে ছুটতে খরগোস [illegible] কাছে গিয়ে হাজির। [illegible] বলল 'দেবতা, চলুন [illegible] নইলে, আমরা যে [illegible] মরছি।'

সূর্যিঠাকুর স্পষ্ট [illegible] লোকেরা [illegible] গালিগালাজ করেছে। [illegible]

একথা শুনে খরগোস আর কি করে? মুখ কাঁচুমাচু করে ফিরে এলো।

* * *

পাখীরা যুক্তি ক'রে ঠিক করল পায়রা উড়ে যেতে পারে অনেক দূরে। তাকে পাঠানো যাক্ সূর্যিঠাকুরকে ফিরিয়ে আনতে।

উড়ে উড়ে ছয়টা আকাশ আর সাতটা পাহাড় ডিঙিয়ে পায়রা সূর্যিঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁকে খোসামোদ করতে লাগল— 'দেবতা, চলুন আমাদের দেশে। নইলে, আমাদের যে বাসা ছাড়ার উপায় নেই।'

সূর্যিঠাকুর স্পষ্টই ব'লে দিলেন—'উঁহু। তোদের দেশের লোকেরা আমাকে গালমন্দ করেছে। আমি যাব না।'

এ কথা শুনে পায়রা আর কি করে? মুখ চুণ ক'রে ফিরে এলো।

* * *

পাহাড়ীরা কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। ও-পাড়ার হুটোচুটো বুড়ো বুদ্ধি বাৎলে দিল—'সূর্যিঠাকুর গোসা ক'রেই আসছেন না, মুরগীকে পাঠালে তাঁর গোসা ভাঙতে পারে। দেখছ না, মুরগীকে তিনি কেমন ভালবাসেন। ভোরবেলা মুরগী যেই না ডেকে উঠে কোঁকর-কোঁ-কোঁকর-কোঁ, অমনি তিনি এসে হাজির হন।'

হুটোচুটো বুড়োর কথা শুনে সবাই মুরগীর কাছে গেল।

মুরগী তাদের কথা শুনে বলল—'আমি যেতে রাজী আছি। কিন্তু নেড়া মাথায় রদ্দুরে গিয়ে পড়লে যে আমার তালু ফেটে যাবে। তোমরা আমাকে একটা মুকুট দাও, মাথা ঢেকে যাব।'

লোকজনেরা একটা রাঙা মুকুট এনে তার মাথায় পরিয়ে দিল। মুরগী মাথা ঢেকে সূর্যিঠাকুরের গোসা ভাঙাতে গেল।

কিন্তু তার খোসামোদ শুনেও সূর্যিঠাকুরের গোসা ভাঙল না। তিনি বললেন—'উঁহু, আমি যাব না। তোদের রাজ্যের লোকগুলো ভারী পাজী, আমাকে গালাগালি দিয়েছে।'

মুরগী তখন আর কি করে? ফিরে আসবার জন্যে পা বাড়াতেই হঠাৎ তার মাথায় একটা ফন্দী এলো। সে সূর্যিঠাকুরকে বলল—'দেবতা, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাই কি করে? দেখলুম একটা জানোয়ার রয়েছে আপনার দরজার পাশে। আসার সময় অনেক কষ্টে তার নজর এড়িয়ে এসেছি। কিন্তু যাওয়ার বেলা সে সুযোগ কি হবে? আমার বড় ভয় করছে। আমাকে একলা পেলে জানোয়ারটা আমার ঘাড় মটকাবে! আপনি দরজাটা পর্যন্ত আমাকে পার ক'রে দিয়ে যান।'

একথায় সূর্যিঠাকুর আর না বলেন কি করে? তিনি মুরগীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে তার সঙ্গে চললেন।

মুরগী দরজার কাছে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ যাঃ! দেখুন, জানোয়ারটা এ দরজা ছেড়ে সামনের দরজায় যে চ'লে গেল! আমার বড় ভয় করছে, ও দরজাটাও আমাকে পার করে দিয়ে যান।'

কিন্তু সে-দরজার কাছে গিয়েও মুরগী আগেকার মতই চেঁচিয়ে উঠল—'দেখুন দেখুন, জানোয়ারটা এ দরজা ছেড়ে সামনের দরজায় চ'লে গিয়েছে। আমার বড় ভয় করছে। ঐ দরজাটাও আমাকে পার ক'রে দিয়ে যান।'

এই রকম ব'লে ব'লে মুরগী সূর্যিঠাকুরকে নিয়ে এক একটা ক'রে ছয় দরজা পার হয়ে গেল। সেই ছয়টা দরজাই ছিল ছয়-ছয়টা আকাশ আর সাত-সাতটা পাহাড় ডিঙোবার পথ। তাই পেরিয়ে এসেই মুরগী ডেকে উঠল—কোঁকর-কোঁ কোঁকর-কোঁ। সে-ডাক শুনেই পাহাড়ীরা বুঝল সূর্যিঠাকুরের গোসা ভাঙিয়ে মুরগী তাঁকে নিয়ে এসেছে। ঘরের বার হয়ে তারা দেখে সত্যিই তাই।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

[illegible] অন্ধকার [illegible]
কাঁপছে ভয়ে, [illegible]
বেরিয়ে তারা ঢুকলো [illegible]
[illegible] ঘরে [illegible]
[illegible] তাদের [illegible]
আরাম করে বসে [illegible]
[illegible] হোলো [illegible]
[illegible] হোলো আচ্ছা [illegible]
অধৈ জলে খাচ্ছে [illegible]
কুকুর তখন আচ্ছা করে [illegible]

কোথা গেলে চেনাজন মোটে পাব না?
—পাবনা।
কোন্‌খানে গেলে মুখ মোটে খুলে না?—
—খুলনা।
কোথা হেঁটে পা দুখানি গেছে ফুলিয়া?
—ফুলিয়া।
আজ যেতে পেলে কোথা বলি কাল না!—
—কালনা!
কোথায় আকাশ মাঠ ফাটে রোদে ঝাঁ ঝাঁ?—
—ঝাঁ ঝাঁ।
কোন্‌ দেশে বোর্‌খায় বউ নেই ঢাকা?—
—ঢাকা।
কোথায় গিয়ে খোকনের হোলো জ্বর কাশি?
—কাশী।
ধুলোয় ধোঁয়ায় কোথা নাক কাণ পুরে?—
—কাণপুর।
কোথায় নগর আগে ছিল বর্ধমান?—
—বর্ধমান।
হরিণে ময়ূরে কোথা সুন্দর বন?
—সুন্দরবন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

তারা তখন দামামা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে সকলে মিলে সূর্যি-ঠাকুরের পুজো করতে লাগল।

পুজো পেয়ে সূর্যিঠাকুরের গোসা ভেঙ্গে গেল। তিনি খুশী হয়ে আগেকারই মত পাহাড়ী রাজ্যে রোজ রোজ আসতে লাগলেন।

আর সেই মুরগী?......সে যে-রাঙা মুকুট পেয়েছিল, তা আর মাথা থেকে খুলল না; এখনও মাথায় পরে রয়েছে। মুরগীর মাথার লাল ঝুঁটি দেখিয়ে পাহাড়ীরা বলে—ঐ তো সেই মুকুট!

এক রাজা। রাজার বাবা মারা গিয়েছেন,—রাজা করবেন বাপের শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে রাজা দান করবেন সোনা, রুপো, কাঁসা...... হাতী-ঘোড়া-গোরু......কাপড় চোপড়......বিছানা-বাসন-কোশন... কত সামগ্রী। সে-সবের ফরমাস দেওয়া হচ্ছে, কেনাকাটা হচ্ছে। শ্রাদ্ধে এক হাজার একজন ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হবে......ব্রাহ্মণেরা লুচিটুচি খাবেন না, তাঁরা খাবেন চিঁড়ে ফলমূল—দই, ছানা, সন্দেশ। কোন্‌ দেশে সরু ধানের চিঁড়ে পাওয়া যায় রাজার পেয়াদা গিয়ে গাড়ী ভরে ভরে সরু ধানের চিঁড়ে নিয়ে আসছে..... যে রাজ্যে যে ফল পাওয়া যায় সে রাজ্য থেকে সেই ফল আনা হচ্ছে। কোথায় সবচেয়ে ভালো চিনিপাতা থক্‌থকে দই পাওয়া যায়, ঠেলা গাড়ী ভরে ভরে দই আসছে......।

রাজ্যের যত প্রজা...দোকানী-পশারী, মুটে-মজুর মাথর মুদ্দফরাস, হাঁড়ি-ডোম, সকলে পাত পেড়ে তিনদিন ধরে রাজ-পুরীতে কত কি খাবে—রাজ্য জুড়ে চলেছে বিপুল আয়োজন। পাশাপাশি পাঁচ-সাতখানি রাজ্য পর্যন্ত একেবারে হৈ-হৈ রব।

শ্রাদ্ধ হলো...দান হলো...এবারে ব্রাহ্মণভোজন। একহাজার একজন ব্রাহ্মণ খেতে বসেছেন—ন্যাড়া মাথায় রাজা নিজে দেখে দেখে সকলকে খাওয়াচ্ছেন। যিনি যত চান, যত পারেন, খাচ্ছেন—এমন খাওয়া সকলে খাচ্ছেন যেন দুচার মাসের খোরাক ঠেসে পেটগুলোকে বোঝাই করছেন। দই পড়লো পাতে—দইয়ের সঙ্গে ভোঁদা ভোঁদা সন্দেশ মেখে ব্রাহ্মণেরা খেলেন। কিন্তু খাওয়া সেই শেষ, অমনি আসন থেকে কাকেও আর উঠতে হলো না! একহাজার একজন ব্রাহ্মণ যিনি যে আসনে বসে খাচ্ছিলেন, সেই আসনেই ঢলে পড়লেন.....কারো নড়ন নেই চড়ন নেই—একেবারে যেন কাঠ!

চারিদিকে হায়-হায় রব। এ-কি সর্বনাশ! রাজবৈদ্য এলেন—রাজ্যের যত বৈদ্য এলেন...পাশাপাশি কত রাজ্যের কত বৈদ্য এলেন—বৈদ্যেরা নাড়ী টিপলেন, পেট টিপলেন—টিপে-টুপে তাঁরা বললেন—নাঃ, কেউ বেঁচে নেই। এখন দাহ করা ছাড়া এঁদের জন্য করবার আর কিচ্ছু নেই।

একহাজার একজন ব্রাহ্মণের দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হলো। তারপর!.. ...

সারা রাজ্য নিঝুম নিস্তব্ধ। প্রজারা যে যার ঘরে চুপ করে বসে আছে ঘুমে হয়ে! যুদ্ধ নয়, বন্যা নয়, ভূমিকম্প নয়, মারী নয়, বজ্রাঘাত নয়, এ-কি আশ্চর্য ব্যাপার! অমন ভালো ভালো খাবার...কত দাম দিয়ে কত যত্নে আনান—তাও রাজার বাড়ীতে কোনো ব্রাহ্মণের পেটে একদণ্ড সহ্য হলো না! খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরা সকলে একেবারে......!

রাজার খাওয়া নেই—নড়া নেই, চড়া নেই—রাজা বসে আছেন যেন পুতুল। মন্ত্রী পাত্রমিত্র অমাত্য—তাঁরাও বসে আছেন, চুপচাপ—সব পাথর।

রাজা হঠাৎ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন, নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বললেন,—এত ব্রহ্মহত্যা। আমি মহাপাপ করেছি!......সিংহাসনে বসে রাজ্য করা আমার আর চলবে না। আমি বনে যাবো, জপতপ করবো—তাতে যদি এই মহাপাপ কাটে।

একথা বলে রাজা গেরুয়া কাপড় পরলেন, গায়ে গেরুয়া চাদর—একটি কমণ্ডলু নিলেন—নিয়ে রাজ্য ছেড়ে তিনি চললেন বনে।

রাজা বনে বনে থাকেন—কখনো এ বনে, কখনো ও-বনে, গাছে বসে জপ-তপ করেন; ভগবানকে ডেকে বলেন—আমার এ মহাপাপ খণ্ডন করে দাও, ঠাকুর!

বনে বনে রাজা ঘুরছেন এক মাস—একদিন তিনি আর এক বনে এলেন—এসে দেখেন, গাছের ছায়ায় এক মুনির আশ্রম। আশ্রমে মুনি নেই—মুনিপত্নী আছেন। রাজা ভাবলেন, আমি মহাপাপী মুনির আশ্রমে যাওয়া আমার উচিত হবে না।

এই ভেবে আশ্রমের পিছন দিকে বড় একটা গাছের ছায়ায় রাজা বসলেন।

এখন যে মুনির এ আশ্রম সে মুনির তপস্যার খুব জোর, তাঁর মতো জ্ঞানী-গুণী মুনি পৃথিবীতে কোথায়ও আর নেই, তাই স্বর্গের দেবতারা মাঝে মাঝে রথ পাঠিয়ে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যান—পৃথিবীর মানুষদের পাপ-পুণ্যের বিচার করবার সময়। মুনি এখন স্বর্গে গিয়েছেন—দেবতারা রথ পাঠিয়েছিলেন, সেই রথে চড়ে। কার নাকি পাপ-পুণ্যের বিচার করতে।

রাজা বসতে না বসতে কানে শুনলেন ছুটন্ত রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ। চেয়ে দেখেন স্বর্গ থেকে পুষ্পক-রথ আসছে নেমে। দেখে তিনি চমকে উঠলেন—এ বনে পুষ্পক রথ আসে কেন? কিন্তু কাকেই বা তা জিজ্ঞাসা করবেন?

জিজ্ঞাসা আর করতে হলো না। পুষ্পক রথ এসে নামলো মুনির আশ্রমের সামনে। মুনি রথ থেকে নামলেন—রথ আবার উড়ে স্বর্গে চলে গেল।

মুনিপত্নী বললেন মুনিকে—ব্যাপার কি? সাত-সাত দিন দেরী হলো স্বর্গে—স্বর্গে কি এত কাজ ছিল দেবতাদের?

মুনি বললেন—এ কাজ নয়—কাজ শুধু একটি!

—কি কাজ শুনি? মুনিপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজা আশ্রমের পিছনে বসে বসে শুনছেন মুনির আর মুনিপত্নীর কথা।

মুনি বললেন—এক রাজার বাবা মারা গেছে—রাজা খুব ধুমধামে বাপের শ্রাদ্ধ করেছিলেন। অনেক দান করেছেন, তারপর সে রাজার একজন ব্রাহ্মণকে [illegible] করে খাইয়েছিলেন—ব্রাহ্মণরা [illegible] কিন্তু খাওয়া শেষ হবার [illegible] আসনে বসেই মারা গেছেন, এত ব্রহ্মহত্যা হলো কার দোষে? [illegible] বিচার হলো।

মুনিপত্নী বললেন—কি সাব্যস্ত হলো তার?

মুনি বললেন—হলো তৈর্কি!

—কি হলো? কার দোষে? শুনি।

মুনি বললেন—, দেবতাদের মধ্যে কেউ বললেন, রাজার দোষ! রাজা যদি ব্রাহ্মণ-ভোজন না করাতেন, তাহলে এমন ব্রহ্মহত্যা হতো না! কেউ বললেন, রাজার দোষ নয়—যে-সব কারিগর খাবার তৈরী করেছিল, তাদের দোষ, তারা নিশ্চয় খারাপ খাবার দিয়েছিল, আবার কেউ বললেন, [illegible] করে এনেছিল, তাদের দোষ!

মুনিপত্নী বললেন—তুমি কি [illegible]?

মুনি বললেন,—আমি [illegible] জানলুম তখন। জানলুম, দোষ এদের কারো নয়। [illegible] হয়েছিল——[illegible], দোষ এদের কারো নয়। [illegible] তখন ঐ পথে পাড়ীতে করে যখন দই সন্দেশ [illegible] চিল [illegible] এক কেউটে সাপ আকাশে উড়ে চলেছিল একটা চিল। চিলটি [illegible] মেরে সে সাপটিকে নখে বিঁধে নিয়ে যাচ্ছিল......আর সাপের মুখ থেকে বিষ ঝরে পড়ছিল—সেই বিষ পড়েছিল দইয়ের গামলায় আর সন্দেশের চ্যাঙারিতে। সেই বিষেই হয়েছে ঐ এক রাজার একজন ব্রাহ্মণের মৃত্যু। কাজেই এ ব্রহ্মহত্যার পাপ রাজাকে স্পর্শও করেনি—কাকেও স্পর্শ করেনি।

মুনিপত্নী বললেন—পাপ তাহলে ঐ চিলের? না, সাপের?

মুনি বললেন—তাও নয়। চিল তো জানেনা—সাপের মুখ থেকে বিষ ঝরে পড়ছে...আর সাপটা তো মরা—কাজেই তাদেরই বা পাপ হবে কেন?

মুনি বললেন—কতগুলি ব্রাহ্মণ মারা গেলেন—এক-সঙ্গে তাঁরা তাহলে নিশ্চয় কোনো মহাপাপ করেছিলেন।!

মুনি বললেন—হয়তো তাই! হয়তো এতগুলি পাপী একত্র জুটেছিল যেমন দৈবাৎ ভূমিকম্পে অনেক লোক মারা যায়—আবার তার চেয়ে অনেক বেশী লোকের গায়ে আঁচড়ও লাগে না—দৈবাৎ যেমন মহামারীতে, ভূমিকম্পে, বন্যায়, ঝড়ে বজ্রাঘাতে অনেক লোক একসঙ্গে মারা যায়—এও তেমনি হয়তো! কিন্তু ব্রাহ্মণদের পাপ-পুণ্যের সম্বন্ধে আমরা কোনো সন্ধান করিনি!

রাজা শুনলেন এইসব কথা—শুনে তিনি মনে শান্তি পেলেন। রাজা ভাবলেন, তাহলে রাজ্যে ফিরি।

রাজা রাজ্যের পথে ফিরলেন। পথে নদী—রাজা ভাবলেন নদীতে স্নান করি। রাজা নদীর ঘাটে নামছেন, একজন লোক সেই সময়ে স্নান সেরে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল—রাজাকে সে লোক দেখলো—দেখে চিনলো। চিনেই সে বলে উঠলো—হায় হায় হায়, স্নান করে উঠেই এমন মহাপাপী রাজার মুখ দেখলুম—না জানি কি অনর্থ ঘটবে আজ!

একথা বলে সে লোক আবার গিয়ে জলে নামলো—স্নান করে শুদ্ধ হবে!

একথা শুনে রাজার আর স্নান করা হলো না—রাজ্যে আর [illegible] হলো না—[illegible] তো মহাপাপী রাজা বলে মুখ ফিরিয়ে থাকে। তিনি [illegible] ..চললেন সেই মুনির আশ্রমের দিকে।

আশ্রমের [illegible] সেই বড় গাছ—রাজা সেখানে এলেন, আশ্রমে মুনি তখন খেতে বসেছেন—মুনিপত্নী পাশে বসে পদ্ম-পাতার হাতপাখা নেড়ে মুনিকে হাওয়া করছেন—দুজনে কথা হচ্ছে—রাজা সেকথা শুনলেন।

মুনি বললেন—রাজা মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরছেন—রাজ্য ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী হবেন। রাজা বুঝছেন না, এ ব্রহ্মহত্যায় তাঁর কোনো পাপ হয়নি, কোনো অপরাধ হয়নি—তিনি পাপ করছেন রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর মতো বনে বনে ঘুরে।

মুনিপত্নী বললেন—কেন?

মুনি বললেন—তার কারণ, তিনি রাজা—তাঁর কর্তব্য হলো রাজ্য পালন করা, প্রজারা যাতে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, তাই দেখা, তাই করা। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে তাঁর পাপ হবে। রাজা হয়ে রাজ্য ত্যাগ করে, প্রজাদের দেখাশুনো না করে নিজের মনের পাপের জন্য রাজা যদি সেই চিন্তায় আকুল হয়ে বেড়ান,—আত্মসুখী হয়ে—তাহলে রাজার মহাপাপ হবে। সে পাপ ভগবান কখনো ক্ষমা করবেন না।

একথা শুনে রাজা সেখানে আর একদণ্ড দাঁড়ালেন না—রাজ্যে ফিরলেন। ফিরে রাজ্য-শাসনে প্রজাপালনে মন দিলেন—তাঁর মনে আর এতটুকু অশান্তি রইলো না।

এখনকার কালে মুসলমানী আমলের কোন কথা রুচিকর হবে কি? তবু বলি, শেরশাহের রাজ্য শাসনের কথা।

শেরশাহ—অর্থাৎ কিনা ব্যাঘ্রবিক্রমী বাদশাহ্। যেমন নামে, তেমনি কাজে। শেরশাহের আমলে ছিল ভারতময় বহু রাজ্য আর বহু রাজা। কিন্তু তখন এমন একজনও রাজা ছিলেন না, যিনি শের-শাহকে ভয় না করতেন। যুদ্ধে তাঁর ছিল অপার উৎসাহ, আর এমন নিপুণ যোদ্ধা তিনি যে, কেউ তাঁকে হারাতে পারতো না শেষ পর্যন্ত। দিল্লীর সম্রাট সাহান্‌শাহ্ হুমায়ুন পর্যন্ত শেরশার সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে যান।

ছেলেবেলায় দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই তাঁর জীবন কেটেছে। তিনি ছিলেন বিহারের জায়গীরদারের এক ছেলে। জায়গীরদারের ছেলের দুঃখ-কষ্ট পাবার কথা নয়। কিন্তু তাহলে কি হয়। তাঁর নিজের মা ছিলেন না। বিমাতা তাঁকে দেখতে পারতেন না। সেজন্য তাঁকে ঘর-ছাড়া হয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। জৌনপুরে তখন লেখাপড়ার চর্চা খুব। তিনি পালিয়ে গিয়ে জৌনপুরে থেকে আরবী-ফারসী শিখলেন। তারপর পালালেন একেবারে দিল্লীতে। বাদশাহী দরবারে বড় এক চাকরি পেলেন। মোগল-সম্রাট বাবর তখন দিল্লীর সিংহাসনে।

একদিন বেশ এক মজার ব্যাপার ঘটলো। সম্রাট বাবর তাঁর সভাসদদের ভোজ দিলেন ঘটা করে। তাঁরও হয়েছে নিমন্ত্রণ। সবাই জাঁকজমক ক'রে খেতে বসেছেন সম্রাটের সঙ্গে। সবাই মোগল, তিনিই শুধু পাঠান। ষড়যন্ত্র হয়ে গেল—পাঠানকে নিয়ে একটু মজা করতে হবে। তাঁর সামনে থালা ভর্তি করে দেওয়া বড়-বড় আস্ত-আস্ত মাংস ধরে দেওয়া হোলো। আস্ত মাংস দেওয়া হোলো, কিন্তু ছুরি দেওয়া হোলো না। কাটবেন কি দিয়ে—খাবেন কি করে। তিনি বুঝে নিলেন তাঁকে নিয়ে তামাসা হচ্ছে। তাঁর হয়ে গেল রাগ। কি, এত-বড় কথা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন, আর কোমরে বাঁধা খাপ থেকে সাঁ-করে তলোয়ারটা বার করে ফেললেন, আর সেই তলোয়ার দিয়ে মাংস কেটে কেটে খেতে লাগলেন স্বাচ্ছন্দে। যারা হাসাহাসি করছিল, তারা সবাই চুপ। তাঁকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই ঠকে গেল। সম্রাট কিন্তু চটে গেলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অমন ফস্-করে তলোয়ার বার করাতে তিনি ভয়ানক অপমানবোধ করলেন।

এই ব্যাপারের পর আর তাঁর মোগল-দরবারে থাকা চললো না। তাঁর বাপও মারা গেছলেন এর ভেতর। তিনি বিহারে ফিরে গেলেন। বিহারে ফিরে গিয়ে নিজেদের জায়গীরের ভার নিলেন। ক্রমে তিনি বিহারের সুলতানের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

পৈতৃক জায়গীর পেয়ে তিনি স্থির করলেন যে, ভাল-রকম করে এর বিলি-ব্যবস্থা করবেন। জায়গীরদার ছোটখাট রাজারই সমান। অনেক কৃষক-প্রজা তাঁর জায়গীরের ভেতর। তিনি বললেন,—"চাষীরাই তো দেশের সম্পদের মূল। তারা মেহনৎ করে চাষ-আবাদ করে বলেই তো সকলের আহার জোটে। ওরা যদি সুখে না থাকে তো চাষ-আবাদ করবে কে? দেশের রাজা যদি কৃষকদের রক্ষা করতে না পারে, তবে তাদের কাছ থেকে রাজকর আদায় ক'রে নেওয়া অত্যাচার ছাড়া আর কি। কৃষকদের রক্ষা করাই রাজার আসল কর্তব্য।" তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যে, কৃষকে আর জমিদারে হয়ে গেল প্রায় সমান সমান।

কৃষকদের তিনি বললেন,—"তোমাদের যা কিছু বলবার আছে সোজা আমার কাছে এসে বলো। নিজে আমি শুনবো তোমাদের কথা। কাউকে আমি দোব না, তোমাদের ওপর জুলুম করতে। তোমাদের কাজ হোলো মন-প্রাণ দিয়ে চাষ-আবাদ করা। তাই তোমরা করে যাও। তোমরা দেশ চাষ, আমি দেখবো তোমাদের।" ফৌজের লোক-দের উপর তিনি কড়া হুকুম জারী করলেন। কেউ যেন কৃষকদের উপর অত্যাচার না করে, তাদের কাছ থেকে জোর করে শস্য আদায় না করে। যে করবে, সেই পাবে কঠিন সাজা।

প্রথমেই বলেছি, সাহান্‌শাহ্ হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ হয় অনেকবার। হুমায়ুন এলেন বিহারে, শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু হেরে পালিয়ে গেলেন। একেবারে দেশ ছেড়ে পালালেন। আর শেরশাহ্ বসলেন দিল্লীর সিংহাসনে। হোলেন তিনি দিল্লীর বাদশাহ্ অর্থাৎ ভারতবর্ষের সম্রাট।

বাদশাহ্ হোয়েও কিন্তু গরীব চাষীদের ভুললেন না বরং বাদশাহ্ হবার পর বেশী করে মনে পড়লো প্রজাদের কথা। রাজ্য সুশাসন করবার সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা করলেন তিনি। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় চুরি, ডাকাতি, খুন আর বদ্‌মায়েসী বন্ধ হয়ে গেল একে-বারে সম্পূর্ণভাবে। সাজা দেওয়ার রীতিই ছিল তাঁর একেবারে আলাদা ও অদ্ভুত ধরণের। কি ধরণের তা বলি।

কোন গ্রামে চুরি হয়েছে। চোর ধরা পড়ছে না। তখন পাকড়াও করা হোলো গ্রামের যে মোড়ল, তাকে। শেরশাহ্ আইন করে দিয়েছিলেন, গ্রামের শান্তিরক্ষা করতে হবে মোড়লকেই। মোড়লের অধীনে রয়েছে অনেক লোক-লস্কর। মোড়ল কাজে ফাঁকি দিয়েছে নিশ্চয়। তাইতো হয়েছে চুরি, নইলে কি চুরি হোতো। আর যে-সব জিনিস চুরি গেছে, তার দামও দিতে হোতো মোড়লকেই।

খুন হয়েছে কোন জায়গায়। এবারও মোড়ল মশায়ের নেই পরিত্রাণ। কাঁক্ করে তাকে ধরা হোলো, আর ধরে নিয়ে হাজতে পোরা হোলো। খুনী ধরা পড়লে মোড়ল ছাড়ান পেতো, খুনীর হোতো ফাঁসী। আর খুনী যদি ধরা না পড়তো তাহলে মোড়লকেই দেওয়া হোতো ফাঁসী। খুন হোলো কেন? কি রকমের শান্তিরক্ষা কর তুমি? যাও এখন ফাঁসী। লোকে দেখে বুঝুক যে, এ রাজ্যে খুন যেন আর না হয়।

অসহায়ের সহায় ছিলেন তিনি। সকল দিকেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। উটের পিঠে নানা জিনিস বোঝাই দিয়ে বণিকেরা ব্যবসা করবার জন্য যায়—দূর থেকে দূরে। এমন জায়গায় রাত্রি হোলো যেখানে শুধু মাঠ আর রাস্তার ধারের গাছ ছাড়া কোন আশ্রয়ই নেই। কিন্তু তাতে কি? তারা সেখানে খুসি আড্ডা নিতো। জিনিসপত্র নামিয়ে রাস্তার ধারেই রেখে দিতো, আর নির্ভয়ে নিদ্রা দিতো গাছতলায় শুয়ে। জিনিসপত্র চুরি যাবার বা টাকাকড়ি লুঠ হবার কোন ভয়ই নেই। আশ-পাশের জমিদারেরা তার মানে, জমির মালিকেরা এসে সেখানে পাহারা দিতো, যাতে চোর ডাকাত না আসে বা কোন অনিষ্ট না হয়। তা-হোলে জমিদারেরই প্রাণ যাবে আগে। শেরশাহের এমনই সুশাসন।

এর উপরেও আবার তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতেন। একটা বুড়ীর মাথায় কতকগুলো সোনার-তাল রেখে ছেড়ে দেওয়া হোতো। সে ঠুক্ ঠুক্ করে হেঁটে চলতো গাঁয়ের ভেতর দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে, বন-জঙ্গল দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো। এইভাবে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করা হোতো যে, বুড়ীকে একা পেয়েও কেউ তার কাছ থেকে সোনা কেড়ে নেয় কিনা। কিন্তু কেউ তার কাছেও

পৃথিবীর সব দেশেই তোমরা জিপসীদের দেখতে পাবে। এদের নিজের বলে কোনও দেশ নেই। বাস করবার মতো কোনও ঘর-বাড়ী নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। কাজ-কর্মও করে না। নাচ-গান করে কিছু পয়সা পায়। হাটে-মাঠে-পথে তাঁবু টাঙিয়ে রাত কাটায় আর চুরি-চামারি করে দিন চালায়।

এদের এই বদ-স্বভাবের জন্যে সবাই ঘৃণা করে। কোনও পাড়ায় বা কোনও গাঁয়ে এই জিপসীর দল এসে আস্তানা গাড়লে লোকে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ের লোকেরা সাবধান হয়ে রাত্রে দোর তালা বন্ধ করে সজাগ থাকে। ওদের দেখলেই চেনা যায় যে, ওরা জিপসী। মেয়েরা ঘাগরা পরে তার ওপর চড়ায় একটা রঙীন ব্লাউস। পুরুষেরা পরে পায়জামা ঢিলে পিরান, তার ওপর একটা রংচঙে খাটো কোর্তা। মেয়েরা খোঁপা বাঁধে না। তাদের মাথায় টুপীর নিচেয় বিনুনী দোলে। কারুর এক বিনুনী, কারুর জোড়া বিনুনী। বেশীরভাগই থাকে খালি পায়ে। জুতো যদি অসৎ উপায়ে কেউ জোগাড় করতে পারে তবেই পরে।

গাঁয়ের শেষে জংগলের ধারে কিংবা শহরের একপ্রান্তে ওরা এসে তাঁবু ফেলে। এক এক দলে দশ বারোজনের বেশী থাকে না। সারাদিন পথে পথে ঘুরে নেচে গেয়ে ভেল্কী ভোজবাজী দেখিয়ে যা পায় তাইতে তেল নুন চাল ডাল কিনে সন্ধ্যের পর তাঁবুতে ফেরে। তাঁবুতে তাদের কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। দেখতে পাবে বনের শুকনো কাঠ-কাঠরা কুড়িয়ে এনে তারা আগুন জেলেছে। সেই আগুনে তারা ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করছে। নয়, তাওয়া চড়িয়ে রুটি সেঁকছে। সেই আগুনের আঁচে যেটুকু আলো হয় তাতেই ওদের ঘরের কাজ চলে যায়।

আগুনের পেছনেই অন্ধকার। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে যখন দেখতে পাওয়া যায় জিপসীদের কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সত্যিই ভয় করে। ছোট ছেলে মেয়েরাও কেউ দিনের বেলাতেও ওদের কাছে ঘেঁসে না। বড়রা কেউ কেউ যায়—হাত দেখিয়ে ভাগ্য জানতে। কেউ যায় দুরারোগ্য রোগের ওষুধ সংগ্রহ করতে। এই জিপসী বেদেরা নাকি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান গুণে বলতে পারে। অনেক শক্ত রোগের ওষুধও জানে। অবশ্য সত্যিই জানে কিনা ঠিক নেই। তবে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেদের সেই রকম বিশ্বাস! তারা ওদের পয়সা দিয়ে হাত দেখায়। টাকা দিয়ে ওষুধ নেয়।

তরিতরকারি ওরা কেনে না। কারুর ক্ষেতের আলু বেগুন, কারুর ক্ষেতের লাউ কুমড়ো, এমন কি হাঁসটা মুর্গীটা পর্যন্ত বাগে পেলে চুরি করে এনে ওরা রেঁধে খেয়ে ফেলে। এটা গাঁয়ের লোকেরাও জানে, পাড়া-প্রতিবেশীরাও জানে। কিন্তু হাতেনাতে ধরতে পারে না বলে কিছু বলতে পারে না। টের পায় যে, আমার যে মুর্গীটা বা হাঁসটাকে কদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সে নিশ্চয় ওদের পেটে চলে গেছে এতদিন। তার পর জিপসীর দল এসে পড়ছে দেখলে লোকে তাদের জিনিষপত্র সামলে রাখে। ক্ষেতে বসায় কড়া পাহারা।

আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধান নগর 'প্রাগ' শহর থেকে কিছুদূরে অস্ত্রাভা অঞ্চলে একদিন দলবেঁধে বেড়াতে গেছলুম। কথায় কথায় শুনলুম সেখানে নাকি একটি জিপসী উপনিবেশ আছে। আমরা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বাস্তুহারাদের কলোনী হয়েছে জেনে আমরা অবাক হইনি। কারণ, তারা 'যাযাবর' নয়। গ্রামে বা শহরে তারা চিরদিন ঘরবাড়ীতেই সপরিবারে বসতি করে এসেছে। আজ প্রাণের দায়ে আর মান-ইজ্জতের ভয়ে ভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু, এই বেদের দল তো কোনও দিনই কোথাও ঘর বাঁধেনি। আজ এখানে কাল ওখানে করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের আবার উপনিবেশ কি?

অসীম কৌতূহল নিয়ে গেলুম দেখতে। আমাদের সঙ্গী চেক্-বন্ধুরা বললেন এইসব জিপসীর দল বিশ পঁচিশ বছর আগেও পথে পথে কর্মহীন বিত্তহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতো। হঠাৎ আমাদের খেয়াল হল, এদের সভ্য-ভব্য ও ভদ্র প্রতিবেশীরূপে গৃহ-বাসী করা যায় না কি? এরা কি এদের এই লক্ষ্মী-ছাড়া ভবঘুরে বৃত্তি ছেড়ে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে না? এরা কি কখনও কাজের লোক হয়ে উঠতে পারবে না?

পরীক্ষা শুরু করা হল। ময়লা কাপড়-চোপড় পরা ওদের সেই নোংরা ছেলে-মেয়েগুলোকে আগেই ধরা হল। ধুয়ে-মুছে সাফ করে,

---

ঘেঁষতো না। বুড়ী যেমন-কে-তেমন সোনার থাল নিয়ে ফিরে আসতো, আর শেরশাহ এই দেখে খুসি হতেন যে, তাঁর আইন-কানুন তাহলে ঠিক মতোই চলছে।

আরো ভেতরের দিকে তাঁর নজর ছিল। দোকানদার উচিত দাম নিয়ে ঠিকমতো জিনিস দেয় কিনা, তার পরখ করতেন তিনি সময়ে-সময়ে। একটি ছোট ছেলের হাতে দাম দিয়ে দোকান থেকে তাকে জিনিস কিনে আনতে পাঠাতেন। ছেলেটি জিনিস নিয়ে ফিরে এলে ওজন করে দেখা হোতো, জিনিস ঠিক এনেছে, কি কম এনেছে। কম এনেছে দেখলে ছেলেটিকে সঙ্গে করে দোকানীর কাছে যেতেন, আর যতো সে কম দিয়েছে ততো মাংস তার গা থেকে ঘ্যাচ করে কেটে নিতেন। কি ভয়ঙ্কর আর ভয়াবহ সাজা! ভয়ানক লোক বা নিষ্ঠুর লোক, এই রকম সাজাই তিনি দিতেন। অপরাধীকে গুরুতর দণ্ড দিতে নিজের পদমর্যাদার দিকেও খেয়াল করতেন না। এমনই ছিল তাঁর কঠোর নীতি।

রাজকার্যের সকল দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল, আর সেই সকল [illegible]। দেশের লোকের সুখ-সুবিধা হবে কিসে, সেই দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রাজ্যের বিস্তর নানা জনহিতকর কাজের কথা সবাই জানেন, ছেলেমেয়েরাও ইতিহাসের বইতে তা পড়েছে।

তিনি হিন্দুকে আর মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন। এদের মধ্যে প্রীতি আর সদ্ভাব স্থাপন হয় সে চেষ্টা তিনিই করেন সর্বপ্রথম, আর তার নানা উপায়ও তিনি করেন। তাঁর আদর্শ ছিল দেশের হিত আর দেশের লোকের হিত এই আদর্শেরই অনুসরণ করে বাদশাহ আকবর সুবিখ্যাত হয়েছিলেন।

শেরশাহের রাজধানীর স্মৃতিচিহ্ন আছে এখনো। এখনকার নয়াদিল্লীতে গেলে, এখনকার পুরানো কিল্লা নজরে পড়বেই। শেরশাহের এই পুরানো কিল্লা এখনো তার বাইরের রূপ বজায় রেখে গৌরবের দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, কোটি কোটি মুদ্রার নিদর্শন— একালের ইমারতগুলির দিকে। এখনো সে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূরের ওই বড় বড় প্রাসাদগুলির দিকে চেয়ে।

ভাল খাইয়ে পরিয়ে, লেখাপড়া ও ভদ্র খেলাধুলো শিখিয়ে মানুষ করে তোলার কাজ আরম্ভ হল। জিপসীরা প্রথমটা খুবই আপত্তি করেছিল, কারণ, ছেলে-মেয়েগুলো তাদের অনেক কাজ করে দিতো। কাঠ কুড়িয়ে আনা, জল তুলে আনা, এটা-সেটা খুচরো জিনিষপত্র বেমালুম গৃহস্থ বাড়ী থেকে সরিয়ে আনা। পথে পথে হাত পেতে ভিক্ষে করে পথিকদের কাছে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে আনা—এইসব অনেক কাজই ওদের ছেলে-মেয়েরা করে দিত। কাজেই ওরা কেউ ছেলে-মেয়েদের ছাড়তে চায়নি। কিন্তু পরে যখন তাদের বুঝিয়ে বলা হল যে, এইসব ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে বড় হয়ে দেশের গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠবে একদিন। তারাই হয়ত কেউ ভবিষ্যতে এদেশের প্রধান শাসনকর্তার পদ অলংকৃত করবে। তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। ভিখিরী ভবঘুরের জীবন ছেড়ে তোমরা যদি সমাজের মধ্যে এসে বাস করো এবং নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত অর্থে আপন আপন জীবনযাত্রা নির্বাহ করো কেউ আর তোমাদের ঘৃণা করবে না, অবজ্ঞা করবে না। তোমরাও দেশের আর পাঁচজনের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসনে উঠে আসতে পারবে।

তারা একথাগুলো বুঝলো এবং সমাজে ফিরে আসতে রাজী হলো। কেউ তো কোনওদিন এমনভাবে তাদের ভাল করবার জন্যে কোনও প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তাছাড়া, সেই অনিশ্চিত কণ্টকর জীবন বহন করে, সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে দেশ-বিদেশে নিয়ত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তারা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল।

চেক সরকার এগিয়ে এসে তাদের দিতে চাইলেন চাষ-বাসের জমি, বসবাসের ঘরবাড়ী, সাপ্তাহিক মোটা মজুরীতে শ্রমিকের কাজ। লেখাপড়া শেখার সুযোগ। আমোদ-আহ্লাদের আড্ডা। জিপসীরা পরীক্ষামূলকভাবে এ প্রস্তাবে রাজি হল। কারণ চারিদিকে তখন ফ্যাসিস্ট আর নাৎসী অত্যাচারে জিপসীরা ভীষণভাবে নিগৃহীত হচ্ছিল।

জিপসীদের আর কিছু থাক বা না থাক প্রাণশক্তি ছিল তাদের প্রচুর। উন্মুক্ত আকাশের নিচেয় প্রকৃতির কোলে তারা মানুষ। পেটভরে খেতে না পেলেও স্বাস্থ্য সবল মানুষ তারা। অভাবে পড়েই তাদের স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে তারাও আর পাঁচজন মানুষের মতো কাজের লোক হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস চেক বন্ধুদের ছিল। তাই, তারা উঠেপড়ে লেগে গেল, দেশের যেখানে যত ভবঘুরে জিপসী বেদের দল দেখতে পাবে তাদের ধরে এনে একটা জিপসী উপনিবেশ গড়ে তুলবে।

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় কথাটা খুবই সত্য। জিপসীদের ভাল করতে হবে, মানুষ করতে হবে, কাজের লোক করে তুলতে হবে, চেকেদের মনের এই একান্ত শুভেচ্ছা সত্য হয়ে উঠলো একদিন। অস্ত্রাভা অঞ্চলের 'জিপসী-কলোনী' আজ পৃথিবীর লোকের প্রশংসা অর্জন করছে। অবশ্য, খুব সহজে যে এ কাজ করা সম্ভব হয়েছে তা বলা চলবে না। এই ঘরছাড়া উদাসীদের ঘরবাসী করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল চেক ভায়াদের। তাদের চিরকালের সব বদ অভ্যাস আর নোংরা স্বভাব কি তারা সহজে ছাড়তে চায়? তাদের মধ্যে ধর্মের গোঁয়াটে চিন্তা কিছু না থাকলেও, ছিল প্রচুর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জনা। এসব মানুষের মন থেকে তাড়ানো সহজ কাজ নয়।

কিন্তু বলেছি ত, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে কি না হয়? চেকেরাও মানুষের এই কল্যাণব্রতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে দেখলুম।

তারা কিভাবে কাজ শুরু করেছিল শুনবে? বুড়ো-বুড়িদের ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ, তাদের আর পরিবর্তনের কোনও আশা-ভরসা নেই। আধাবয়সীদেরও টানাটানি করেনি প্রথমটা। তাদের এতদিনের অভ্যাস ও জিপসী জাতের সংস্কার তারা সহজে ছাড়তে পারবে না। তবে কাদের নিয়ে কাজ শুরু করা যাবে? ধরা হল প্রথমেই শিশু ও কিশোরদের। নার্সারি আর কিন্ডারগার্টেন স্কুল নিয়ে আরম্ভ হল শিশু শিক্ষা। তারপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক। কিন্তু করলে কি হবে? জিপসী বাপ-মা কি সহজে ছেলেদের ছাড়তে চায়? অনেক কষ্টে অনেক বুঝিয়ে তবে তাদের রাজী করাতে পারা গিয়েছিল।

অবশ্য এখন যা দেখে এলুম তাতে জিপসী সমাজের মধ্যে এক নবজাগরণ এসেছে বোঝা গেল। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগে তারা আজ দলে দলে সামাজিক মানুষ হয়ে উঠছে। ঘরবাড়ী বেঁধেছে। চাষবাস করছে। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়াচ্ছে। বয়স্ক শিক্ষারও প্রচলন করেছে। শিক্ষার গুণে তারা আজ ভিক্ষা ছেড়ে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করতে শিখেছে। নানা শিল্প-বাণিজ্য আর কলকারখানার কাজেও ঢুকেছে।

ওদের মধ্যে ছেলে-বুড়োর মনে এমন একটা উৎসাহ এসেছে আজ সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল মানুষ হয়ে উঠবার জন্য যে, দেখলে বিস্মিত হতে হবে। প্রতি রবিবারেই স্কুল-কলেজ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অধিকাংশই বন্ধ থাকে। কিন্তু সেদিনও দেখা যায় জিপসী কলোনীর ছেলেমেয়েরা এসে স্কুলে হানা দিচ্ছে—আমরা পড়বো। আমাদের পড়া দাও,—বলে দাবি তুলছে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, এই জিপসী ছেলে মেয়েগুলোর মেধা ও বুদ্ধি এত বেশি যে, অন্য ছেলেমেয়েরা যা ছ'মাসে শিখতে পারে না, ওরা সেগুলো তিন-চার মাসের মধ্যেই শিখে সড়গড় করে ফেলছে। দেখে শুনে শিক্ষকদেরও আনন্দ আর ধরছে না।

ছোট ছোট জিপসী ছেলেমেয়েরা তাদের অস্ত্রাভা উপনিবেশে শুধু লেখা পড়া শিখেই মানুষ হচ্ছে না। মানব জীবনে উন্নতি করতে হলে যা কিছু শেখা দরকার সমস্তই তারা আগ্রহের সঙ্গে শিখছে। খেলাধুলো, ব্যায়াম শরীরচর্চা, নাচগান, যন্ত্রসংগীত, রূপকলা জিপসী ছেলেমেয়েরা সবই শিখছে। আজ আর তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে জিপসী ছেলেমেয়ে বলে চিনতেই পারবে না। নেই সে আধময়লা ছেঁড়া ঘাগড়া, বিউনী বাঁধা রুক্ষ চুল, কানে দুই জিপসী কানবালা—। তারা সব ভোদস্ত য়ুরোপীয় ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছে।

জিপসী বুড়ো-বুড়িরাও এখন খুশী হয়ে তাদের সেই ভবঘুরে জীবন আর অনির্দিষ্ট ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে আত্মনির্ভরশীল হবার ব্যগ্রতা বোধ করছে। পৃথিবীর এতদিনের অবহেলিত ঘৃণিত এক পরোপজীবী জাত আজ সুযোগ পেয়ে কেমন লেখাপড়া জানা ভাল লোক আর কাজের হয়ে উঠছে তার আশ্চর্য পরিচয় পেলুম এই চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্ত্রাভা অঞ্চলে এসে। তোমরা বড় হয়ে যখন দেশভ্রমণে যাবে তখন ঐ দেশের জিপসীদের দেখে যেও।

।রাণা ডাকাত এক সময়ে নদীয়া জেলার একজন বিখ্যাত দস্যু ছিল। তার ভয়ে লোকে সন্ত্রস্ত থাকিত। জলে ও ডাঙ্গায় দুইদিকেই সে করিত ডাকাতি। সে দস্যু হইলেও তাহার অনেক গুণের কথা পাওয়া যায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। সে জাতিতে ছিল বাগ্দী। চূর্ণী নদীর পারে ছিল তার বাড়ী। রাণা ডাকাতের নাম হইতেই হইয়াছে রাণাঘাটের নাম একথা লোকে বলে সত্য কিনা বলা যায়না। এখানে তোমাদের কাছে রাণা ডাকাতের গল্প বলিতেছি। তাহার লোকেরা জলপথে ও স্থলপথে সন্ধান করিত, কোথায় কি-ভাবে ডাকাতি করিতে হইবে। অনেক রাণা লোক পাঠাইয়া বা নিজে যাইয়া করিত ডাকাতি।।

এক

ঠাকুরমশাই, কোথায় চলেছিস্ এই ভর সন্ধ্যাবেলা। ডুলিতে কে?

ব্রাহ্মণের নাম পীতাম্বর চক্রবর্তী। বামুনডাঙ্গায় তার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী। সেখান হইতে কন্যাকে নিজের বাড়ী নিয়া যাইতে-ছিলেন। তাঁর নিজের বাড়ী চন্দনপুর, সেখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে।

ও ঠাকুর, বল্‌লি না—কোথা যাবি?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে বলিলেন—ভাই আমার মেয়েকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। বেশী দূর নয়। কিছু পরে চাঁদ উঠবে—জোছনায় জোছনায় রাত দুপুর নাগাদ বাড়ী পৌঁছে যাব। ডুলির বেহারারা আমার গাঁয়ের লোক। পথঘাট চেনা। কোন অসুবিধা হবে না।

তাত হলো। কিন্তু তুই ঠাকুর যেতে পারবি না। পথে ডাকাতের ভয়ও ত আছে। রাণার এলাকা কাটিয়ে যা। কোন দিকে [illegible] যাবি। চল্ আমার সাথে। ব্রাহ্মণ মিনতি করিয়া কহিল—না ভাই আমাকে বাধা দিও না। বাড়ীর সবাই ঠিক সময়মত না পৌঁছালে ভাবনায় পড়বে। এ সময়ে ডুলির বেহারারা মাটিতে ডুলি নামাইয়া বসিয়াছিল।

চূর্ণী নদীর পারে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের ভিতর নদীর পার হইতে পথ চলিয়া গিয়াছে। নদীর দুই পারেই ঘন বন। পাশে বসতি নাই। লোকজন কাহাকেও দেখা যায় না।

যে লোকটি আসিয়া ব্রাহ্মণকে বাধা দিয়াছিল, সে একটা লম্বা চওড়া জোয়ান মানুষ। গায়ের রং মিশমিশে কালো। মাথায় বড় বড় চুল। বলিষ্ঠ শরীর—হাতে লম্বা লাঠি। চক্ষু দুইটা লাল। দেখিলেই ভয় হয়।

এদিকে ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। নদীর বুক দিয়া দুই চারিখানি নৌকায় দাঁড়ের ঝুপ ঝুপ শব্দ শোনা যাইতেছিল। নৌকার ভিতরে প্রদীপের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

ও বেহারা ডুলি তোল্। চল্ ঠাকুর। খবরদার যদি কথা না শুনিস্, তবে তোদের সকলকে মেরে ফেলবো। চল্ ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ আর কি করেন—অগত্যা লোকটার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—মা জগদম্বা রক্ষা না করলে আর রক্ষা নেই।

তাহারা লোকটার পিছু পিছু চলিতে লাগিল। বেহারারা প্রাণের ভয়ে যাইতে লাগিল। পথের দুই পাশে নিবিড় জঙ্গল। পায়ে চলার সরু পথ। দুই পাশে বড় বড় গাছ। বন জঙ্গল, বাঁশবন কাঁটা গাছ। প্রায় দু' ক্রোশ পথ পার হইয়া একটি প্রকান্ড আমবাগান পড়িল। আমবাগানের মধ্য দিয়া পথ। সেই পথ পার হইলেই তাহারা একটা বড় বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল। জীর্ণ দোতলা বাড়ী। বাড়ীর কাছেই মস্ত বড় একটা দীঘি। দীঘির উত্তর পারে একটি প্রাচীন কালীমন্দির। মন্দির মধ্যে পাষাণময়ী কালীমূর্তি। অতি ভীষণা মূর্তি। ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলেন—মা আমাদের বাঁচাও। বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ডাকাতের হাতে পড়িয়াছেন। রক্ষা পাইবেন, সে আশা বড় কম। শুধু বিপদে ধৈর্য ও সাহস করা ছাড়া কিছু নাই। নীরবে সেই বাড়ীতে গেলেন।

বাড়ীর বাইরের দিকে তিনটা বড় বড় ঘর। একটা ঘরে তক্তপোষের উপর ফরাস পাতা। পিলসুজের উপর তেলের বাতি জ্বলিতেছিল। মাঝখানে একটা ঝাড়ের সঙ্গে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলিতেছিল।

একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া একজন প্রৌঢ় লোক বসিয়াছিল। তাহার মাথায় কাঁচা পাকা বড় বড় চুল। গায়ে ফতুয়া। বাহুতে সোনার কবচ। হাতে বালা। বলিষ্ঠকায়। দীপ্ত চক্ষু। লোকটির পাশে আরো তিন চারজন লোক বসিয়া তামাক খাইতেছিল। যে লোকটি তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, সে টানিতেছিল গড়গড়া।

ব্রাহ্মণকে ও মেয়েটিকে লইয়া সেই লোকটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। মেয়ে কাঁদিতেছিল।

কে রে?

উত্তর হইল—আমি কালী সর্দার।

সর্দারের বয়স পঞ্চাশের উপর। হাড়েমাসে গড়া শক্তিশালী পুরুষ।

আজ্ঞে শিকার এনেছি।

কোথায় শিকার?

এই যে সর্দার, ব্রাহ্মণকে ও তাহার মেয়েকে দেখাইয়া বলিল কালী।

পিলসুজের বাতিটা বাড়াইয়া নিজে ব্রাহ্মণের দিকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে কহিল—কে আপনি? বামুন?

প্রণাম করিয়া কহিল—ওরে ঠাকুর মশাইকে বসবার জন্য গালিচার আসনটা পেতে দে। মুহূর্তে আদেশ পালিত হইল। মেয়েটির দিকে অপলকে চাহিয়া বলিল—এ কে ঠাকুরমশাই?

আমার মেয়ে।

আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

চন্দনপুরে আমার বাড়ী। আমি মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর—

তোত আমি দেখতেই পাচ্ছি।

তোর নাম কি মা?

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমার নাম মহেশ্বরী।

মহেশ্বরী!

বা! এযে আমার মায়ের নাম রে! মার যে কত নাম। কালী, তারা, ভৈরবী, ভবানী, মহেশ্বরী! —সত্যিই তুই মহেশ্বরী।

হাঁরে সর্দারণীকে ডেকে আন্। হাঁ এখানেই আসুক।

সর্দারণী অন্দরের দিকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে,—সর্দার বলিল—দেখ, আমার এই মা মহেশ্বরীকে নিয়ে যাও। বড় ভয় পেয়েছে। ডাকাতের হাতে পড়েছে কিনা। উচ্চহাস্য করিল সর্দার। আর দেখ ঠাকুরমশাইর সন্ধ্যা আহ্নিকের যোগাড় করে, রান্না বান্নার ব্যবস্থা করে দেওগে। বুঝলে?

ঠাকুরমশাই, যান মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভিতর। সর্দারণী শ্যামাঙ্গিনী। তাহার প্রফুল্ল হাস্যময়ী মূর্তি দেখিয়া চক্রবর্তী মহাশয় আশ্বস্ত হইলেন এবং তাহার সহিত ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

দুই

এই সর্দার হইতেছে বিখ্যাত রাণা বাগদী—সকলের কাছে রাণা ডাকাত নামে পরিচিত। রাণা ডাকাত হইলেও তার মধ্যে ছিল মনুষ্যত্ব। সে কোন দিন মেয়েদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে নাই। কোন চাষা-ভূষা, গরীবদের প্রতি নির্যাতনের কাহিনী পাওয়া যায় নাই।

সর্দার অতি কর্কশ স্বরে ডাকিলেন—কালী?

সর্দার! উত্তর করিল কালী।

এই তোর শিকার? একটা নিরীহ বামুন, আর একটা কচি মেয়ে! ছি! ছি! এমন শিকার ত একটা স্ত্রীলোকও করতে পারে। আমি কি এজন্য তোকে পাঠিয়েছিলুম? আমার মায়ের জাত, তাদের কি অপমান করতে আছে? —কোম্পানীর খাজনার টাকা এই পথে যাবে কলকাতা, সে নৌকার খোঁজ এনে দিতে পারলি না! নিয়ে এলি একটা গরীব বামুনকে আর তার মেয়েকে! তুই আর শ্যামা এক্ষুণি নদীর দিকে যা, বোধ হয় এতক্ষণে গঙ্গের কাছাকাছি কোম্পানীর নৌকা এসেছে।

তাহার আদেশে তৎক্ষণাৎ কালী ও শ্যামা ডাকাত চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা। রাণা ঠাকুরমশাই আর তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—ঠাকুরমশাই, হতভাগা আপনাদের খুব কষ্ট দিয়েছে। আমার কোন দোষ নেই। তারপর মেয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—কাল ঘুম হয়েছিল ত?

কেন হবে না বাবা!

ডাকাতের বাড়ী যে রে!

ডাকাতও ত মানুষ বাবা! আপনি কি ডাকাত, বিশ্বাস হয় না!

হাসিল রাণা।

হুঁ, পুজো আসছে তাই বাপের বাড়ী যাচ্ছিস দুর্গা ঠাকুরুণের মত!

রাণা পেটরা খুলিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে একশত সিক্কা টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুরমশাই, মায়ের পুজোর জন্য এ সামান্য প্রণামী দিলাম। মা, মহেশ্বরী, এই বারাণসী শাড়ীখানি দিলাম তোকে। কেষ্টনগর রাজবাড়ীতে যখন লেঠেল সর্দার ছিলাম, তখন মহারাণী আমাকে বকশিশ দিয়েছিলেন,—সিন্দুকেই তোলা ছিল, তুই নে।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন লোক দিয়া তাহার নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দিল। তাঁহারা হাসি মুখে চলিয়া গেলেন।

তিন

সাগঞ্জ একটি ছোট গ্রাম। সে গ্রামে ছিল একজন ধনী ব্যবসায়ী। বড় কৃপণ ছিল সে। টাকার কুমীর সে, অথচ একটি পয়সা কাকেও দান করিত না। লুঠ করিবে তার বাড়ী। দলবলে চলিয়াছে ডাকাতি করিতে রাণা সেদিকে। পথে পড়িল ঠাকুরগাঁও নামে একটি ছোট গাঁ। সে গাঁয়ের পথের ধারে বসিয়া একটি গরীব বিধবা কাঁদিতেছিল। সেই পথে রাণা,—রাণা তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁদছিস কেন মা?

বিধবা বলিল—জমিদারের কাছারী হতে পেয়াদা, বরকন্দাজ এসে আমার ঘর-বাড়ীর জিনিষপত্র টেনে বাইরে ফেলে দিয়েছে। আমি রান্না করছিলাম, উনুন থেকে বোগনাটা লাঠি দিয়ে ফেলে দিয়েছে, বাকী খাজনার দায়ে আমার এই দুর্দশা হয়েছে। আমার কি উপায় হবে?

কত টাকা তোর বাকী খাজনা?

পঞ্চাশ টাকা বারো আনা। সব খবর জানিয়া লইল রাণা। তারপর কহিল—যা রান্না করগে যা। আমি এক্ষুণি তোর খাজনার টাকা মিটিয়ে দিয়ে আসছি। দেখ্ এই লোক রইল, তোর যা কিছু দরকার, সব এনে দিবে। পাহারা রইল ও এখানে। আবার যদি জমিদারের লোক আসে, মেরে তাড়িয়ে দিবে।

বিধবা জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি বাবা।

সে দিয়ে তোর দরকার কি! যা ঘরে যা। রান্না করগে। যা বলছি।

ঠাকুরগাঁয়ে জমিদারের কাছারী। নায়েব, মুহুরী, পাইক বরকন্দাজ সব সেখানে থাকে। গেল রাণা তার দলবল নিয়ে। দলের লোকেরা রহিল—দেউড়ীর বাইরে। নায়েব বিকেলবেলা আরামে বসিয়া তামাক টানিতেছিল। সহসা রাণা নায়েবকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দেখ, সাগঞ্জের বিধবার বাড়ী তুমি পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে অত্যাচার করেছ। শোন, তার বাকী খাজনার টাকা মিটিয়ে নিয়ে রসিদ দেও।

নায়েব রাণার হঠাৎ এইভাবে আসায় চমকিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তুমি কে—

সে পরিচয় নাই বা জানলে। রসিদ দাও সব বাকী খাজনার টাকা বুঝে পেলে। ফের যদি গরীব দুঃখীর উপর এমন অত্যাচার করো, তবে তোমাদের মেরে হাড় গুঁড়ো করে—চূর্ণীর জলে ফেলে দিব। লেখ, রসিদ লেখ, এই নাও টাকা! নায়েব বাকী খাজনার খাতা খুলিয়া সাগঞ্জের বিধবা কাদম্বিনী দাসীর নাম পাইল এবং খাজনা বুঝিয়া পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিল।

নায়েব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তার কে?

সে কথায় কি দরকার!

রাণা রসিদ লইয়া বাহিরে যাইবার সময় পুনরায় নায়েব জিজ্ঞাসা করিল কার কাছ থেকে খাজনা বুঝে পেলাম, সে কথাটা লিখতে হবে তা তোমার নাম তাই জানতে চাইছি!

আমার নাম কেবল এই শুনতে চাইছ? আমি রাণা ডাকাত।

নায়েব গেলো মূর্চ্ছা। কাছারীর লোকদের হাতের কলম হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

চার

রামপ্রসাদের একটি গান আছে ঃ

পাণের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম জারি।

ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী।

সেকালে কৃষ্ণ পান্তি ছিলেন একজন বিখ্যাত ধনী ও জমিদার। খাঁর দারিদ্র ছিলেন প্রথম জীবনে, অতি কষ্টে দিন চলিত। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র একটি আধুলি সম্বল করিয়া নিজের পরিশ্রম ও সাধুতার বলে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ধনী ও জমিদার হইয়াছিলেন।

এই কৃষ্ণ পান্তি চলিয়াছেন কলিকাতার আড়তে। জ্যোৎস্না রাত্রি। গঙ্গার জল ছল ছল করিতেছে। চাঁদের আলোতে যেন শত হীরামাণি ফুটিয়াছে। বেশ বড় বজরা। সঙ্গে লোকজন ও দারোয়ান আছে। পথে ডাকাতের ভয়। দুমুদণ্ডের পাশাপাশি আসিয়া পান্তির নৌকা ঘিরিয়া ফেলিল কতকগুলি ছিপ নৌকা। ছিপ নৌকার লোকগুলি হারে রে রে করিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া দাঁড়িমাঝিরা বজরা থামাইল, গোলমাল হৈ-চৈ শুনিয়া কৃষ্ণ পান্তি বলিলেন—কি হয়েছে?

উত্তর হইল—ডাকাত পড়েছে।

ডাকাত! ডাকাত কেন!

সেই মুহূর্তে ডাকাতের সর্দার লাফাইয়া পড়িল কৃষ্ণ পান্তির [illegible]বার উপর। সে চীৎকার করিয়া বলিল—পান্তিমশাই এক্ষুণি আমাদের দশ হাজার টাকা দিন, নইলে আপনাকে যেতে দিব না।

কৃষ্ণ পান্তি বলিলেন, তুমি ভিতরে এস। নির্ভীক ডাকাত ভিতরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—দিন, টাকা দিন। তারপর আপনি চলে যান নিরাপদে কেউ দিবে না বাধা।

কৃষ্ণ পান্তি ভাবিয়া বলিলেন,—দেখ বাবা, আমার সাথে এত টাকা নেই। হাঁ, আমি তোমাদের টাকা দিব এই সর্তে যে, কাকেও প্রাণে মারবে না। বলো সে কথা।

হাঁ। ডাকাতেরা মিথ্যা কথা জানে না। মা কালীর নামে শপথ কচ্ছি, আপনার বা আপনার লোকদের আমরা কোন ক্ষতি করবো না—একটি আঁচড়ও কারো গায়ে লাগবে না।

কৃষ্ণ পান্তি একখানা কাগজ ডাকাতের সর্দারের হাতে দিয়া বলিলেন, আমার এই চিঠি নিয়ে কলকাতায় আমার গদীতে তোমরা যে কেউ যাবে তার হাতেই টাকা দিয়ে দিব।

ধরিয়ে দিবেন না ত—দারোগার হাতে ?

হাসিয়া বলিলেন পান্তি—কৃষ্ণ পান্তি মিথ্যা কথা বলে না।

ডাকাত চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারের ইঙ্গিতে ছিপ নৌকাগুলিও ভিন্ন দিকে পাড়ি দিয়াইল।

একদিন কৃষ্ণ পান্তির কলিকাতার গদীতে একজন লোক আসিয়া তাঁহার হাতে চিঠিখানি দিল।

তৎক্ষণাৎ খাজাঞ্চীকে বলিলেন—একে দশ হাজার টাকা দিন। টাকা পাইয়া লোকটি পান্তি মহাশয়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

খাজাঞ্চী জিজ্ঞাসা করিলেন—কার নামে খরচ লিখবো, কর্তা? এই লোকটি কে ?

সে পরিচয়ে তোমার দরকার নেই। আমার নামে খরচা [illegible] লেখ।

কে এই লোকটি জানা [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছিল। সে কোন [illegible] নাই। কেন পড়ে নাই ? [illegible] কথা কাহাকেও বলিত না। [illegible]

সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী [illegible] করিয়া দেয়। চূর্ণী নদীর পাড়ে [illegible] করিত। তার সেই বাড়ীর [illegible] না। চূর্ণী নদীর জলে তার [illegible] গল্প এখনও শোনা যায়।

রাণা ডাকাত হইলেও সে ছিল—[illegible]

যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তোমাদের কাউকে সবাই খালি জিজ্ঞেস করে—'এটা কেন হয় ?', 'ওটার আবিষ্কার কে করলে ?' 'কোন্ সালে অমুকের জন্ম হলো ?' এমনি সব ভয়ংকর ভয়ংকর প্রশ্ন, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা চটে যাবে। রেগেমেগে বলবে—"দূর ছাই আর পারিনে বাপু !" অথবা, যারা এমন সব প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের পেছনে লাগে, তাদের এড়িয়ে চলতে চাইবে। আমার কিন্তু সেটি করবার উপায় নেই। আমার ছোট বন্ধুর দলকে খুশি করে তাদের সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে আমি নিজেই ও ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি। যত রাজ্যের প্রশ্ন আর উদ্ভুট্টি [illegible] সমস্যা যা তোমাদের মনে জাগে, তারই জবাব চেয়ে বসো তোমরা আমার কাছে। রাগ করবার উপায় নেই, 'জানি না' বলবারও যো নেই। তাহলেই তোমরা ছোট্ট বন্ধুরা মুখ গোমড়া করে আমার সঙ্গে আড়ি করে দেবে। সেই জন্যেই তো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, খেটেখুটে, রকমারি বই ঘেঁটেঘুঁটে হাজার হাজার ছোট বন্ধুর মনের কোণে জেগে ওঠা নতুন নতুন প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছি। সে সব জবাব-গুলো বই করে ছেপেও দিয়েছি—"জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" নাম দিয়ে। হাজারে হাজারে তোমরা সে বই কিনেছ, পড়েছ কিন্তু আজও দেখছি তোমাদের মাথা থেকে প্রশ্ন করার পোকাটা বেড়েছে বৈ কমছে না। শুধু তাই নয়, ছোট্ট হলেও তোমরা কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করে পাঠাও যে, তাতে দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসবার যো নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে খালি মাথা ঘামাও আর বই পড়ো এন্তার।

তোমাদের জ্বালাতেই এই অবস্থা—তার ওপর যদি 'স্বপনবুড়ো' দাদাও পাকে ফেলবার চেষ্টা করেন, তাহলে যাই কোথায় বলতো ? পুজোর পাতাজোড়া ছবি দিয়ে সবাইকে গল্প, কবিতা শুনিয়ে খুশি হবেন, খুশি করবেন, অন্য সবাইকে দিয়ে গল্প কবিতা লিখিয়ে আদায় করে। আর 'মৌমাছি'র বেলাতেই নিরস খটখটে ছোবড়া ফেলে দেবেন। চিঠিতে অনুরোধ জানাবেন—"জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন প্রশ্ন নিয়ে কিছু লিখে পাঠাতে হবে পুজোর পাতাড়ির জন্যে।"

আসলে পুজোর লেখা-চেয়ে স্বপনবুড়ো দাদার ঐ চিঠিটি এলেই —আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমার কাছে আশেপাশে ঐ যে নেণ্টু, মিঠু, বিভু, শঙ্কর ওরা তখন খুশিতে মেতে ওঠে। ওরা হাততালি দিয়ে, বগল বাজিয়ে নাচতে শুরু করে দেয়, আর বলে—"বেশ হয়েছে। [illegible] জব্দ। জবাব তোমার কাছে—কিন্তু নতুন প্রশ্ন কোথায় পাবে যদি আমরা কিছু না জিজ্ঞেস করি ?"

কথাটা খুব খাঁটি। দুনিয়ার যা কিছু নতুন প্রশ্ন তোমাদের মত ছোটদের মনেই। নেণ্টু, মিঠুরা মুখ না খুললে—আমার মুখ বন্ধ, কলম অচল।

তাই এবার 'স্বপনবুড়ো' দাদার চিঠি আসতেই—ওদের সব্বাইকে ঘুঘ্‌নি আর চিড়েভাজা খাওয়ার নেমন্তন্ন জানিয়ে ডেকে আনলুম। বললুম—"তোরা যদি আমাকে নতুন কিছু না জিজ্ঞেস করিস—তাহলে স্বপনবুড়ো দাদার কাছে গোহারা হারতে হবে।"

ওরা সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"ভেবোনা কিছু মৌমাছি। তোমাকেই আমরা জিতিয়ে দেবো। স্বপনবুড়ো দাদা যদি তোমার কাছে পাত্‌তাড়ির জন্যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে'র লেখা না চাইতেন—তাহলে তো তাঁর সঙ্গে আড়ি করে দিতুম।"

আমি বললুম—"তার মানে তোরা সবাই মিলে আমাকে ঘাঁটিয়ে আর বই ঘাঁটিয়েই মজা পাস?"

নেণ্টু বললে—"দাদা! তুমিও তো তাই চাও, সস্তায় কিস্তিমাত করার ফন্দি—

পট্ করে ছোট্ট নিতুটা বলে বসলো—"যদি চিরকালের জন্যে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে যেতো?"

আমি হেসে বললাম—"তাহলে বর্ষাবাদলায় ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হতো না তোদের, এই কথাটাই বুঝি ভাবছিস? কিন্তু আরও যে কি কি কাণ্ড হতো ভেবেছিলি কি সেগুলো? এই ধর বৃষ্টির অভাবে গাছপালা, ঘাস-পাতা সব শুকিয়ে মরে যেতো। আর তাই সেই সব পশু পাখি, মানুষ যেগুলো ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচে সেগুলো লোপাট হতো। ঐ পশু-পাখিগুলোকে খেয়ে যে সব প্রাণী বাঁচে তাদেরও পটল তুলতে হতো। শুধু কি তাই! পুকুর নদীর জল শুকিয়ে যেতো—তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরতে হতো, সমুদ্রের জল? তাও শুকিয়ে যেতো শেষ পর্যন্ত। বাতাসের জল শুকিয়ে গিয়ে আগুনের হল্‌কা ছুটতো—পৃথিবীটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতো। আর আমরা যারা তার সঙ্গে লড়াই করে কোনও রকমে বাঁচতুম, তাদেরও উঠে পড়ে লাগতে হতো নকল বৃষ্টি নামানোর জন্যে। হয়তো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ভরা আকাশের মেঘগুলোতে বিদ্যুতের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে সবাইকেই মরতে হতো। কাজেই একেবারে বৃষ্টি না পড়ার মানেই হবে সৃষ্টির ধ্বংস।"

নেণ্টু বললে—"নিতু'র যদির জবাব তো দিলে! এবার আমার মনের 'যদি'র কথাটাই বলে ফেলি। আচ্ছা যদি—পোকামাকড়গুলো আমাদের মতো নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে আর নিতে পারতো? তাহলে কি হতো?"

—"উড়ে বাস্‌রে! নেণ্টু তোর ঐটুকু মাথায় কি উদ্ভট চিন্তারে! পোকা-মাকড়রা নিঃশ্বেস ফেলতে নিতে পারলে—ওরা হয়তো হয়ে উঠতো ইয়া ইয়া মস্ত মস্ত। পিঁপড়েগুলো হয়ে উঠতো ইঁদুর-ছুঁচোর মতো! শোঁ-পোকাগুলো হতো ঠিক খাটের পাশ বালিশের মতো। গুবরে পোকাগুলো তোদের এক একটা আঙুল। আস্ত গিলে খেতো। বোলতাগুলোর ডানা হতো প্রায় এক-একটাই ছ' ইঞ্চি করে লম্বা!—"

শঙ্কর খপ করে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে—"হয়েছে! হয়েছে। আর বলতে হবে না, আমার বড্ড ভয় করছে।"

আমি বললুম—"ভয়ের কিছু নেইরে শঙ্কর। পোকা-মাকড়রা তাদের শরীরে চারপাশের অসংখ্য ছ্যাঁদাগুলো দিয়েই শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। তবে যদি পায়ের চামড়া কিংবা শরীরের বাইরের কাঠামোটা এখন যেমন আছে তেমনটা না থেকে ক্রমশঃ যদি মোটা কিংবা বড় হয়ে যায়, তাহলে তারা একেবারে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেই পারবে না। কাজেই ওরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও নেবে না, বড়োও হবে না—এই কথাটাই বিশ্বাস কর।"

মিঠুয়া বললে—"দেখো মৌমাছি দাদা। আমার মাথাতেও একটা 'যদি' ঢুকে বড্ড ভাবাচ্ছে ক'দিন। ভূগোলে পড়লুম আমাদের পৃথিবীটা দিনরাত ঘুরছে লাট্টুর মতো। অথচ সেটাতো আমরা টেরই পাই না একদম। এমন ঘুরে লাভ কি পৃথিবীটার? পৃথিবীর ঐ ঘোরাটা যদি থেমে যেতো তাহলে কি হতো?"

—মাথাটা আমারও ঘুরিয়ে দিলে মিঠুয়ার 'যদি'। ওকে বললুম—"যদি পৃথিবীটা অমন করে না ঘুরে পট্ করে হঠাৎ থেমে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই আমাদের চার পাশের সব কিছু মহাশূন্যে ছিটকে ছড়িয়ে যাবো। আর যদি পৃথিবীর ঘুরপাক খাওয়ার বেগটা খুব আস্তে আস্তে থেমে আসে—তাহলে পৃথিবীটাও ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ঠাণ্ডার চোটেই আমরা জমে পাথর হয়ে যাবো, পৃথিবীটাও পাথরের মত মহাশূন্যে তলিয়ে যাবে। আধখানা পৃথিবী চির অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। কিন্তু রক্ষে এই যে, পৃথিবীর ঘুরুনিটা থামবে না কোনওদিনই—মিঠুয়ার ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।"

মিঠুয়া বললে—"সবশেষে 'আমারও মনে হচ্ছে—যদি তুমি স্বপনবুড়োর কাছে পুজোর পাততাড়ির জন্যে—আমাদের এই 'যদি'র কথাগুলোই লিখে পাঠাও—তাহলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকায় ফিষ্টি করবো আমরা।"

আর সবাই বললে—"ঠিক বলেছে মিঠুয়া। ব্যস! ব্যস! তুমি এখুনি যদি লিখে না পাঠাও তাহলে তোমার সঙ্গে আড়ি।"

আমি বললুম—"স্বপনবুড়ো যদি না ছাপে?"

"তাহলে তার সঙ্গেও আড়ি"—এই বলে সব্বাই ওরা পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

মা যে কেবলই বলেন পড়া লেখা যেমন প্রতিদিনের কাজ তেমনি আরো অনেক কাজ আছে যা প্রতিদিন না করলে হয় না। কথাগুলো শুনে শুনে পার্থ আর মালার অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রতিবাদ তারা করে না, কিন্তু মেনে চলছে বলেও মনে হয় না। শুনেও শোনে না।

পার্থ আর মালা দুই ভাই-বোন—ওদের দু'জনে খুব ভাব আবার ঝগড়া যে নেই সে কথাও বলতে পারি না—এই ঝগড়া, এই ভাব।

সেদিন ওদের একটা নেমন্তন্ন এসেছে। ঠিক নেমন্তন্ন বলা যায় না। বন্ধু-বান্ধবরা 'পিকনিক' করছে—সেইখানে তারাও যদি যায়, খুব আনন্দ হবে বলে তারা চিঠি লিখেছে। বাড়ী থেকে যদিও অনেক দূর—তবুও যাওয়া আসার খুব অসুবিধা নেই। অনেক দেরী করে আসা যাওয়া করলেও বাস আছে আর তাছাড়া ছুটির দিন বলে অসুবিধা হবে না বলেই ওরা জানিয়েছে।

মালা তো খুসীতে লাফাতে আরম্ভ করলো আর সারা সকালটা পার্থকে খোসামোদ করতে লাগলো—'চলো দাদাভাই আমরা ঘুরে আসি।' পার্থ তখন সুযোগ পেয়েছে, তাই গম্ভীর হয়ে বলে, 'ভেবে দেখি'। মালা রেগে গিয়ে বলে : তার মানে? তুমি দেখছি বাবার

[illegible] কথা বলতে শিখছো! ভাববে আবার কি? যেতে হবেই। পার্থ তখনও বলছে ঃ ভেবে দেখি।

রাগ করে মালা মার কাছে চলে গেল, অনেক অনুনয় করে বল্লে ঃ তুমি বলো না মা দাদাভাইকে, লক্ষ্মী মা, সোনা মা--।

মা হেসে ফেল্লেন তার রকম দেখে, তারপর বল্লেন ঃ আচ্ছা বলছি, কিন্তু মনে রেখো আর কেউ যাবে না, পার্থ আর তুমি দুজনে যাবে। আমি যে পৌঁছে দেবো তা পারবো না। আর তোমার বাবা তো কালই ক'দিনের জন্য কাজে বাইরে যাচ্ছেন।

মালার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে আরো খুসী হয়ে বল্লে ঃ খুব চমৎকার হবে মা সে, আমাদের তুমি মোটে একলা ছাড়ো না, এখন তো বড় হয়ে গেছি, একটু ছেড়ে দেখো না পারি কিনা।

আবার মা হাসলেন, তারপর বল্লেন ঃ আচ্ছা চিঠি লিখে দাও পার্থ, তারপর কি করে যাবে আমি ভাবছি।

মালা ছুটলো দাদার কাছে, বল্লে ঃ বুঝলে দাদাভাই, হয়ে গেছে মার পারমিশান, তুমি গম্ভীর হয়ে চালাই দেখাও আর যাই করো— যাওয়া হবে।

পার্থ তখনও সেই ভাবেই বললে ঃ দাঁড়াও ভেবে দেখি। রেগে গেছে মালা। বলে উঠলো ঃ দেখ, দেখো দাদাভাইর [illegible] দুবছরের বড় আমার চেয়ে—এই তো এখন [illegible] বয়স আমার আবার বড় কথা বলা শেখা হয়েছে।

পার্থ মালার সঙ্গে [illegible] কিন্তু পিকনিকে যাবার ইচ্ছা তার ষোলো আনা ছিল আর কারই বা না থাকে বল।

মা যখন বল্লেন ঃ পার্থ, তুমি মালাকে সঙ্গে করে যাবে। এখান থেকে বাসে তুলে দেবে আর তোমাদের [illegible] পিকনিক হচ্ছে সেখানেই বাস থামবে। আবার সেখান থেকে উঠে সোজা চলে আসবে, কোনো গোলমাল নেই, [illegible] কেউ যাবে না সঙ্গে।

—আচ্ছা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, অনেক দূর তো, আসতে যেতে সময় লাগবে।

—না ভাববো কেন, তবে [illegible] আমার। [illegible] সব ভুলে যেও না।

মালার সব চেয়ে আনন্দ—[illegible]

মা হেসে বল্লেন ঃ [illegible] হচ্ছে? [illegible] সে খেলবে।

দুই ভাই বোন কাঁধে [illegible] মালাকে নিয়ে [illegible]

সারা দিনটা কি আনন্দে [illegible] ঐ বড় গাছটার তলায় [illegible] একটু বসলো।

মা পার্থর হাতে ঘড়ি [illegible] রিস্টওয়াচ। [illegible] সূর্য [illegible] ভুলে না যাও—[illegible] পার্থ আর একটা কিছু ভাল জিনিস পাবে। পার্থ [illegible] এখনও সময় আছে। [illegible] দুটো পনেরোয় ছাড়বে। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

মস্ত ঝাঁকড়া মাথা গাছটার নীচে গিয়ে দুই ভাইবোন ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো—ঝিরঝির হাওয়া [illegible] ঘুমিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তার ঠিক নেই হঠাৎ পার্থর ঘুম ভেঙে গেল আর মালাকে উঠিয়ে দিল ঃ ওঠ, ওঠ মালা, অনেক দেরী হয়ে গেছে যে।

চোখ রগড়ে মালা বল্লে ঃ কটা বেজেছে দাদা? হাত উল্টিয়ে ঘড়ি দেখে পার্থ বললে ঃ ওঃ সময় আছে, এখন একটা বেজে পনেরো মিনিট মোটে—তা হোক তবুও চল। অনেকখানি গিয়ে তবে তো বাস পাবো, আর এইটা ছেড়ে গেলে আবার সেই রাত্তিরে বাস। এতো আর সহর নয় যে, দু' তিন মিনিট অন্তর বাস পাওয়া যাবে।

ওরা প্রায় বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে পৌঁছেচে এমন সময় দেখতে পেলো দূরে বাসটা চলে যাচ্ছে। পার্থ চেঁচিয়ে উঠলো, এই রোকো, রোকো—

আর রোকো! ওখানে অমন কত বাজে দুষ্টু ছেলের দল বাস রুখতে বলে তারপর পালিয়ে যায় এদিকে, ওদিকে। বাস ড্রাইভার কোনো কথা না শুনে সোজা জোরে বাস চালিয়ে চলে গেল।

দু' ভাইবোনে অসহায় ভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। মালা তো প্রায় কেঁদে ফেলবার যোগাড়—কি হবে দাদা?

পার্থর মনে যাই হোক, পুরুষ মানুষ—ওই মনের ভাব প্রকাশ না করে বল্লে ঃ চল দেখি কি হয়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেক দূর এলো। কি রকম যেন মনে হচ্ছে, ঠিক করা যাচ্ছে না। কাছে পিঠে লোকজনও নেই,—দূরে দু' চারটে গরু মহিষ চড়ছে। আর সামনে বিরাট খড়ের গাদা। মালা আর পার্থ সেই খড়ের গাদার উপর গিয়ে বসে গল্প করতে লাগলো আর কখন বাস আসবে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ওমা! আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা? ঘুম ভেঙে দেখে খড়ের গাদা চলতে আরম্ভ করেছে, সে আবার কি? পার্থ চেঁচিয়ে উঠলো ঃ এই ও—এ কি হলো। এ কি হলো?

হঠাৎ চলা বন্ধ হয়ে গেল। একটা লোক সামনে এসে বল্লে ঃ আরে সুখনভাই দেখরে, দুটো ছেলে-মেয়ে কি করে এলো খড়ের উপরে!

সুখনভাই সামনে এসে বল্লে ঃ আরে এরা কোথা থেকে এলো!

ভয় না পেয়ে মালা বল্লে ঃ আমরা তো খড়ের গাদায় শুয়ে ছিলাম।

—ওঃ তাই বলো গাড়ীতে খড় গাদা করে রেখেছিলাম, গাড়ী দেখতে পাওনি? তা বেশ, তোমরা কোথায় যাবে?

এবার পার্থ বল্লে ঃ আমরা পিকনিকে এসেছিলাম এখানে। পার্থকে বাধা দিয়ে মালা আগাগোড়া যা ঘটেছে সব বল্লে।

সুখনলালেরা মালার কথায় ভারী খুসী হয়ে গেল—বল্লে, 'চল খোকা, খুকু, আমরা ঐ দিকেই যাচ্ছি তোমাদের পৌঁছে দেবো।'

বাড়ী পৌঁছে ওরা দেখলো মা দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায় আর খুব ভাবছেন।

তারপর তারা এগিয়ে এসে সব বল্লে। মা সুখনলালদের জল খাইয়ে বকশিশ করলেন আর পার্থকে বল্লেন ঃ এখন ক'টা বেজেছে পার্থ?

হাতের ঘড়িতে পার্থ দেখলো একটা বেজে পনেরো মিনিট। মার দিকে তাকিয়ে সে খুব লজ্জা পেলো। ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয়নি—তার ফলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়ে এই অঘটন ঘটলো।

মা শুধু পার্থ আর মালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু এখন তারা প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করে। আর ভুল হয় না।

দাদুর টাকে টোকা মেরে ঠান্‌দি কুঁদ্‌দুলি
বল্‌লে—"বুড়ো! ত'বিলদারী নেবো এবার কেড়ে,
হাড়কিপ্‌টে ব্যয় করোনা একটা আধুলি—"
দাদু তখন খাপ্পা রেগে, বল্‌লে ভীষণ তেড়ে ঃ
'—ঐ যে তাঁতের পরছ শাড়ী নতুন টেকা পেড়ে
কতদিন আর থাক্‌বে হয়ে গলার মাদুলি!
রোজ দু'বেলা রুজ মেখে তো থাকো পটের বিবি,
মুখখানিতে ফিরোও কীল স্নো-পাউডার মেখে;
মণ্ডা-মেঠাই দুধ খেয়ে তো হচ্ছ জগাই চিবি,
পিত্তি জ্বলে সাদাচুলের ওপর কলপ দেখে!
তোমার এত বিবিয়ানী আসছে কোথা থেকে?
চুপ করে সব সইছি কাঁর মুখে লাগিয়ে ছিপি—

এই কথাতে ঠান্‌দি রেগে ধর্‌লো দাদুর দাড়ি,
লেটপকায় বুড়ো তখন পড়্‌লো হয়ে কাৎ।
চেঁচা-চেঁচির চোটে তাহার ছাড়লো বুঝি নাড়ী,
কিচির-মিচির করছে পাখী, হোলো অনেক রাত।
বুড়ো-বুড়ির ঝগড়াতে আর চড়লো নাকো হাঁড়ি,
ওদের জানালায় লোকের পেটে পড়্‌লো নাক ভাত।

ভোর না হোতে দাদু আমার পালিয়ে গেল শেষে,
রইলো তবিল বুড়ির হাতে ঃ ভাঙ্‌লো তাসের ঘর!
দাদু কোথায়? সবাই কাঁদে—গেল সে কোন দেশে
বুড়ির দাপট রইলো নাকো, কণ্ঠে নাহি স্বর,
পাগ্‌লি সেজে বেড়ায় ঘুরে ছিন্ন মলিন বেশে।
[illegible] পেয়ে বহুদিনের পরে
[illegible] —এ কি!'
দাদুর এক বন্ধু শেষে মুণ্ডের ফটো ধরে—
পাঠায় তাকে মোড়ক করে—অবাক্ ফেলে দেখি!
একাদশীর উপোস ঠেলে ঠানদি কেঁদে মরে।

শ্রাদ্ধ যবে চল্‌ছে দাদুর হরিনামের সাথে,
হঠাৎ বুড়োর আবির্ভাবে আঁৎকে ওঠে সবে।
হট্টগোলের উঠ্‌লো সুর শ্রাদ্ধ সভাতে!
বল্‌লো দাদু—'শ্রাদ্ধ চলুক—হেসে মাভৈঃ রবে।
'—জ্যান্তে যেমন পিণ্ডি পড়ে দেখতে এলেম প্রাতে—
থান কাপড়ে ঠান্‌দি তখন নেড়া মাথা নিয়ে
বল্‌লে এসে—'মিন্‌সে! তুমি পুজোর সময় মোরে—
শেষ করেছ মুড়োর ওপর খাঁড়ার খাঁটি দিয়ে।
লোহার বেড়ি পরিয়ে তোমায় রাখবো ঘরের দোরে।

গম্ভীর হয়ে তো বল্‌লো দাদু দোলা খাটেয় চড়ি,
মোরা সবাই [illegible] গিয়ে দম্ ফেটে যে মরি।'

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফ্ ইয়ার্লি'র ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে দু' তিনদিন ধরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এতো পড়লাম, অথচ ফল বেরুলে দেখলাম ইংরেজিতে ২২, বাংলায় ২৯, আর অঙ্কের কথা নাই বল্‌লাম। তাই দেখে শুধু বাড়ীর লোকদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধু চক্ষুস্থির। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে একরকম টেকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপীরও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আরেক কাঠি বাড়া। ক্লাবে নাম কাটিয়ে টাটিয়ে, মাউথ্-অর্গ্যান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন! সন্ধ্যেবেলায় গুপী এসে বলল, "জানিস মানোয়ারি জেটি থেকে একটা মাল বোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!" আমার হাত থেকে পেনসিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধক করে জ্বলে উঠল। বললাম, "কে বলেছে?" গুপী বলল, "আমাদের অফিস থেকে মাল বোঝাই-এর পারমিট করিয়েছে। আজ রাত দুটোয় জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে পড়বে।"

বললাম "ডায়মণ্ডহারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আরেকটু এগুলে না জানি কেমন!" গুপী বলল, "যাবি? না কি বাকি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কষে কাটাবি?" পেনসিলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, "পয়সাকড়ি নেবে ওরা নেবে কেন?" গুপী বলল, "পয়সা কেন দেবে? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময় চড়ে বসে থাকব, [illegible] ত্রিপল রয়েছে, তার কোনো অসুবিধা হবে না। তারপর [illegible] চাকরির [illegible] হবে। তারপর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়লেই হল, তখন ফেরবার নিয়ম নেই, আমাদের নাবাবার উপায় থাকবে না' যদি তো চল্। আজ রাত বারোটায় এসপ্লানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।"

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া পাখী উড়ে যাচ্ছে, আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, দূরে জঙ্গলের [illegible] থেকে সারি সারি কালো হাতী বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বললাম, "বেশ, তাই হবে।"

তারপর সে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপীর সঙ্গে জুটলাম সে আর কি বলব। সঙ্গে একটা সার্ট, প্যান্ট তোয়ালে আর একটি টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময়ও পুরোনো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনদিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাট সাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে

হাসির কবিতা? আরে কত চাস্ শুনেতে?
হাসি দিয়ে নাড়িভুঁড়ি পারি তুলো ধুনেতে!
ভাণ্ডারে আছে মোর কত শত হাস্য
বলছি একেক করে ঃ ক্রমশ প্রকাশ্য!
"এক ছিল হুমো প্যাঁচা—বোঁচা তার নাকটা।
ইঁদুরের মতো তার চিঁচিঁ করা ডাকটা—"
গম্ভীর কেন মুখ? হাসি বুঝি পেল না?
এর মাঝে কত রস মগজে তা গেল না?
"ঘোড়াটার ঠ্যাং ছিল বারো হাত লম্বা—
সেই ঠ্যাং দিয়ে রোজ পেড়ে খায় রম্ভা—!"
তবু হাসি পেল নাকো? আরো জানি গল্প ঃ
পেট ঠাসা হাসি মোর—নয় মোটে অল্প।
"একদিন হারু খুড়ো বসে এক খামারে
কুলির মাথায় চড়ে যায় দাড়ি কামাতে
টিকি তার ঢাকা ছিল মোটা এক চাদরে—
খপ করে সেটা এসে কেড়ে নিলো বাঁদরে—!
মুখে তবু হাসি নেই, ভাবি বেরসিক হো?
খেয়েছিস চিরতা কি? তাই মন তিক্ত?
শোন্ তবে আরো বলি ঃ "নাম তার পঞ্চু
মুখখানা ঠিক যেন শকুনের চঞ্চু।
পান্তুয়া খাবে ভেবে কিনে খেলো পান সে
খেয়ে বলে একি হল? কেন লাগে পানসে?
তার ছিল ছোট মামা—চেহারাটা খুঁজড়ো
মাথা জোড়া টাক তার যেন এক খুন্তো"—
তবু দেখি হাসি নেই—মারলি তো জ্বালিয়ে—
হাঁড়ি মুখো যত সব—হাড় দিলি কালিয়ে—!
আরে—আরে বাপ্—বাপ্ মাঁড়ে মারে গুঁতো সে—!
পড়ে গেছি চিৎপাত—ধরে তোল্ ভুতো রে—!
মাজা করে টন্ টন্—কন্ কন্ কাকটা
সারা গায়ে কাদা—জল—গেল বুঝি প্রাণটা!
হাহা—হি—হি এই বার ফেটে গেলি হাসিতে—
রাগ মেটে সবগুলো ঝোলে যদি ফাঁসিতে॥
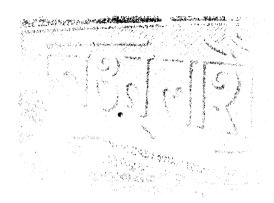
আমাদের ফেকুলাল চিরকাল অজ পাড়াগাঁয়ে মানুষ। জীবনে একবার মাত্র সে গিয়েছিল দ্বারভাঙ্গা সহরে। তাই সহর বলতে সে শুধু ঐ দ্বারভাঙ্গাকেই চেনে এবং তার ধারণা, পৃথিবীর মধ্যে অত বড় আজব সহর আর কোথাও নেই।

কিন্তু দুনিয়ায় কত অঘটনই না ঘটে! এহেন ফেকুলাল তার চাচার সঙ্গে এল চাকরী করতে কলকাতায়, আর প্রথম দিনই সন্ধ্যাবেলায় চাচা তাকে এনে ছেড়ে দিল ধর্মতলার চৌমাথার মোড়ে—তোমরা যেখানটাকে বল "এস্‌প্ল্যানেড" কিংবা আরও কায়দা করে "স্‌প্ল্যানেড"।

ভাবো একবার ফেকুলালের অবস্থাটা! দিশেহারা বললে ঠিক বলা হয় না, অভিধানে সেই যে একটা চমৎকার শব্দ আছে, একটু দাঁতভাঙ্গা কিন্তু ভারী অর্থব্যঞ্জক, "কিংকর্তব্যবিমূঢ়"—এই বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে শুধু গাড়ী আর গাড়ী আর গাড়ী! আর তার ফাঁকে ফাঁকে কেবল অগণিত মানুষের মাথা। শ নয়, হাজার নয়, বুঝি বা লক্ষ মানুষ একত্র হয়েছে!

বেগতিক দেখে ফেকুলাল হাঁপ নেবার জন্য ওপরের দিকে তাকাল। চোখটা যেন ধাঁধিয়ে গেল তার। এত আলো! বাড়ীর গায়ে গায়ে সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন তাও রঙ্গীন আলো দিয়ে লেখা। বিজ্ঞাপনের ভেতরে ভেতরে ছবি, তাও রং-বেরংএর আলো দিয়ে আঁকা! লাল, সবুজ, নীল, হলদে কোন্ রং নেই? কোন কোন ছবি আবার সচল। একটা ছবিতে বিরাট কেটলি থেকে চা গড়িয়ে পড়ছে। চা তো নয়, যেন তরল আগুন! ওটা নাকি চায়ের বিজ্ঞাপন! আর একটা ছবিতে বোঁ বোঁ করে বিজলী পাখা ঘুরছে—সত্যি সত্যি ঘুরছে মনে হয়। সেটাও বিজ্ঞাপন—পাখার। আলো দিয়ে আঁকা কোন লেখা হঠাৎ নিভে যাচ্ছে, পর মুহূর্তেই তারাবাজীর মত ঝর্ ঝর্ করে ফুটে উঠছে আকাশের গায়ে।

চাচা হয়তো ফেকুলালের অবস্থাটা আন্দাজ করেই তাকে একটা ঠেলা দিয়ে নিজের ভাষায় বললে, "ক্যা দেখ্‌তা? আসমানকা খেল্ নেহি, ছাইও কা খেল্!"

"ছাইও" মানে সাইন্স। কথাটা সে কিছুদিন আগে তাদের ছোটদাদাবাবু বুলটুর কাছে শিখেছিল। তার ইংরেজীর স্বল্প পরিসর ভাণ্ডারে ঐ নতুন কথাটি যুক্ত হয়েছে। তাই আজকাল বিজ্ঞানের কথা বলতে হলেই সে তার নিজস্ব উচ্চারণে বলে 'ছাইঞ্চ।'

তা উচ্চারণে কি আসে যায়? আসল ব্যাপারটা যে সত্যিই "ছাইও"—মানে বিজ্ঞানের খেলা,—তা আর বলতে? চাচাজী যদি আর একটু খোঁজখবর রাখত তাহলে ভাতিজা ফেকুলালকে আরও দু'চারটি কথা সে বুঝিয়ে দিতে পারত। বলতে পারত যে, এই অদ্ভুত বিচিত্র স্নিগ্ধ অথচ চোখ-ঝল্‌সানো আলোর নাম

উপরের ছবিঃ "আমরা আছি, কোনো ভয় নেই, তোমার বক্তৃতাটা শুরু কর।"
নীচের ছবিঃ (পরদিন) শিশু-সভাপতি বক্তৃতা ঘরে ঘরে পাঠ।

(১) হো হো
(২) হি হি

(৩) "শৌখিন মালি," ফোটো, দীপ্ত ভট্টাচার্য
(৪) "দায়ে পড়া মা", ফোটো রামকিঙ্কর সিংহ

ভূত! সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

দেবু বললো—আমরা এতজন আছি, ভূত কি করবে? যত সব বাজে কথা।

নীরু বললো—না ভাই, আমি বাঘকে ভয় করি নে, কিন্তু ভূতকে বড় ভয় করি।

ভূত দেখেছিস কখনও? দেবু ধমক দিয়ে ওঠে।

—দেখলে আর রক্ষে আছে। তোরা যা, আমি বাড়ী চললাম।

ভজা বললো—তাহলে আমিও যাই। কাল সকালে এসে বাঁশ কাটবো'খন।

সকলে সাড়া তুললো—সেই ভাল, আজ সবাই বাড়ী যাই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, কাল দিনে দিনে এসে কাটবো।

ভূতের কথা শুনে দেবুরও ভয় কম হয়নি, তবু সে মুখে সাহস দেখিয়ে বললো—কিন্তু ডাকাত হতে গেলে এই বনেতেই তো আমাদের থাকতে হবে।

বিনু বললো—এই বনের মাঝে ভূতের আড্ডায় আমি একদিনও থাকতে পারবো না। তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে বাড়ীতে ঘুমুবো, সকাল-বিকেল খানিক পড়াশুনো করবো, সে অনেক ভাল।

—প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেছিস?—দেবু বললো।

—আমার সই আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—বিনু সই ফিরিয়ে নিলে, আমরাও সই ফিরিয়ে নেবো!—সবাই সাড়া তুললো।

—তোদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই যা, তোদের সই আমি ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি?—দেবু কাগজখানা পকেট থেকে বের করে ছিঁড়ে ফেললো, তারপর হন হন করে এগিয়ে গেল বাড়ীর দিকে।

আর সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিনু বললো চল চল্‌ বাড়ী চল, সন্ধ্যে হয়ে এলো। আজ বন-খেলাটাই মাটি হোল।

———

আলপনা— রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে ন' ঠাকুন্দার কাছেই আমাদের যাওয়া স্থির হল।

আমরা সহোদর ভাই তিনজন আর জেঠতুত ও খুড়তুত ভাই তিনজন এই ছ'জনে মিলে যখন দিল্লীতে ন' ঠাকুন্দার বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

না। ন' ঠাকুন্দা পেল্লায় বাড়ী করে ফেলেছেন; ছেলে নাতি [illegible] কেন, টাকার কাঁড়ির উপর বসে আছেন, বে-থা করেননি—একা মানুষ, লোকজন ঝি চাকর গাড়ী ঘোড়া এই সব নিয়ে থাকেন, সন্ন্যাসীই [illegible] এত টাকা নিয়ে করবেন কি! বাড়ীখানা দেখবার মত বটে! সহরের বাইরে; কাছেই যমুনা নদী, চারিদিক খোলা, ধু ধু করছে মাঠের পর মাঠ। মনে মনে আমরা ভাবলুম—হ্যাঁ চেষ্টা আসা সার্থক বটে।

আমাদের দেখেত ঠাকুন্দা মহা খুসী। আমাদের সাড়া পেয়ে সিঁড়ির কাছে এসে বল্লেন, "আয় আয় ভাই তোদের জন্যেই বসে আছি। তোদের জিনিসপত্তর সব গোছ করে তুলেছেত ফকির? ওরে ও লছমন, কই রে আমার নাতিদের চা দেনা রে! হাঁ তারপর একেবারে সব তেল তেলে ম্লান হয়ে গেছ দেখছি' ক'দিন থাকা হচ্ছে? [illegible] একমাসত? বেশ বেশ, তা এখন বাপু গরম চা খেয়ে একটু জিরোও, তারপর হাত মুখ ধুয়ে ধীরে সুস্থে খাবেখন কি বল [illegible] বস, সবাই আমার কাছে এইখানে বস, শেষ পর্যন্ত এসে পড়লে তাহলে!" ন' ঠাকুন্দা একাই একশ' প্রশ্ন করে চল্লেন।

ঠাকুন্দাকে [illegible] আমাদের খুব ভাল লাগল, আমুদে [illegible] মানুষ। ভাই-এ ভাই-এ চেহারায় খুব মিল আছে। ন' ঠাকুন্দা [illegible] আমার ঠাকুন্দার আপন সহোদর ন' ভাই। [illegible] ছিলেন, এখন রিটায়ার করে প্রবাসেই রয়ে গেলেন। যতদিন [illegible] মা বেঁচে ছিলেন, ততদিন নাকি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। [illegible] তিনি মারা যাবার পর আর কলকাতামুখো হননি। [illegible] তাঁকে এই প্রথম দেখলুম। শুনেছি তিনি ভারী কৃপণ মানুষ। নিজে ছাড়া আর কারুর জন্যে কখনও এক পয়সা নাকি খরচ করেন না। সকালে ওঁর নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফাটে। এই রকম অনেক কথা [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুনেছি।

আগেই বলেছি, ঠাকুন্দার বাড়ী ঘর দোর দেখবার মত, আমাদের শোবার ব্যবস্থাও চমৎকার! গেট গড়ের মাঠ হলে কি হয়! শোওয়া আরামদায়ক হ[illegible]। প্রকাণ্ড একখানা সাজান-গোছান ঘরে ছ'ভাই-এর বিছানা হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ আমাদের সকলেরই নজর পড়ল দক্ষিণ দিকের দুটো প্রকাণ্ড জানালা একদম বন্ধ। খুলতে গিয়ে দেখি ওরে সর্বনাশ! এ যে পেরেক দিয়ে আঁটা! ব্যাপারটা বুঝলুম না, ঘুম পেয়েছিল, যে যার বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম—এক ঘুমে রাত-কাবার!

ফকির চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যাঁ—হে তোমাদের এ জানলা দুটো বন্ধ করে রেখেছ কেন?"

ফকির গলার স্বর নামিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে বল্লে, "আজ্ঞে দাদাবাবু, ওটা বাবু নিজেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। জানলার সোজাসুজি ঐ যে মাঠ পড়ে কিনা, তার পাশেই কবর স্থান।

ধিনতা ধিনা
ঢোলক বাজে—
দোলক জাগে
মনের মাঝে।
চল্ না ছুটে
দেখতে যাই—
বাজনা শোনা
আজকে চাই।
ধিনতা ধিনা
ঢোলক বাজে—
নাইকোরে মন
কোনই কাজে!

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

সেদিনটা বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল। বেশ ফুটফুটে চাঁদের আলো, চারিদিকে আলোর বন্যা, ঝিকমিকে ছাওয়া দিচ্ছে। চারিদিকে আলোতে স্বচ্ছ পরিষ্কার, দূরে রূপোর পাতের মত যমুনা বয়ে চলেছে। আমরাও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে খাবার গাছের তলায় রেখে মহানন্দে সতরঞ্চি পেতে গল্প করছি, হঠাৎ ছোটু গাছটার দিকে চেয়েই আঁ—আঁ করে অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়ল, আমিও গাছের দিকে চাইতেই দেখি, একটা আলখাল্লা পরা লোক ঐ গাছের মগডালে বসে ইয়া লম্বা হাত বাড়িয়ে ঝুড়ি থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে!

আমারও ছোটুর অবস্থা হয় হয়। একবার চোখ বুজে বসে ভাবলুম, কি করা যায়। দেখি আর একবার, কিন্তু কোথায় কি, ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে গেল চট করে। কই কেউত নেই। ভাবলুম ভ্রম, কিন্তু খাবারগুলো? সবাই গিয়ে দেখি শূন্য ঝুড়িটা প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষী দিচ্ছে।

তরঙ্গমুখর নীল সমুদ্র।

ঢেউয়ের হাজারো হাত তুলে অবিরাম যেন তাল ঠুকে বলছে: এসো দেখি কে আছ শক্তিমান, লড়বে এসো।

লড়তে আসে একদল প্রবাল কীট।

ক্ষুদে ক্ষুদে চেহারা। গায়ের রং লাল্চে। তুচ্ছাদপি তুচ্ছ তাদের শক্তি। তবু প্রাণে বেঁচে থাকার তাগিদে তারা এগিয়ে আসে লড়তে। যতো শক্তিমানই হোক, তবু ওই সমুদ্রের সংগে সংগ্রাম করেই তাদের বাঁচতে হবে। করেংগে ইয়া মরেংগে!

লড়াই সুরু হয়।

ঢেউয়ের এক আঘাতে ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে কোথায় চলে যায় প্রবাল কীটেরা। আর তাদের দেখা পাওয়া যায় না।

বাঁচার লড়াই তবু থামে না। একদল যায়। আর একদল আসে। তারপর আর একদল।

এমনি করেই চলে প্রবালের সংগ্রাম। কতো প্রাণ হয় বলিদান। তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ে কতো প্রবাল কীট। তবু সংগ্রামের বিরাম নেই। দলে দলে আসে আর দলে দলে মরে।

কিন্তু তাই বলে তারা নিঃশেষ হয়ে যায় না। বীরের এ রক্তস্রোত কি সাগরের নীল জলেই হারা হবে? প্রবালের স্বপ্নের ফল কি কোনদিন কেনা হবে না? সব কি ব্যর্থ হবে?

হবে না তা কখনো হয় না।

হাজারো প্রবালের এ আত্মদানও ব্যর্থ হয় না। সাগরের বুকে বুকে জমে ওঠে হাজারো মরা প্রবালের দল। তাদের লাশ জমে গড়ে ওঠে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রবাল-কেন্দ্র। তারপর আরো ঢেউয়ে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ প্রবাল-কেন্দ্র পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়।

গড়ে ওঠে প্রবাল দ্বীপ। হাজারো প্রবাল শহীদের দেহে গড়া প্রবাল দ্বীপ। এতো দিনে বুঝি প্রবাল কীটের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হয়।

সমুদ্রের আক্রোশ তবু থামে না।

অবিরাম সে আঘাত করে প্রবাল দ্বীপের বুকে—ঢেউয়ের হাজারো হাত তুলে। কিন্তু এবার আর ভ্রূক্ষেপ করে না প্রবাল দ্বীপ। শত শহীদের মরা হাড়ে গড়ে উঠেছে তার ইস্পাত-কঠিন দেহ।

সমুদ্র-সংগ্রামকে তার কিসের ভয়?

কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলুম, কারো মুখে রা নেই।

না ঠাকুমাকে ব্যাপারটা খুলে বললুম না, কিন্তু ওখানে আর একদিনও থাকবার সাহস আর কারুর রইল না, সেইদিন সকাল হতেই সোজা কলকাতা।

এ রাজ্যের সবই উল্টো!

যেমন ভণ্ডরাজা, তেমনি শঠ ও প্রতারক তার মন্ত্রী ও পারিষদবৃন্দ! প্রজা পালনের নামে রাজা করেন প্রজা শোষণ! ধর্মদণ্ড হাতে থাকলেও অধর্মের সাহায্যে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। তাই যারা অন্যায় করে তারা এখানে শাস্তি পায় না, যারা ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে চলে তারাই দণ্ড ভোগ করে।

ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক প্রজারা সব সময় আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকে। কি জানি কার ওপর কখন রাজ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। রাজার চেয়ে ভয় করে সবাই বেশী তাঁর অনুচরবর্গকে। তারা সব সময় পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়। কার ক্ষেতে ধান জন্মেছে বেশী, কার পুকুরে মাছ হয়েছে অঢেল, কার ব্যবসায়ের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে গোপনে তার তথ্য করে সংগ্রহ। তারপর চুরি, জোচ্চুরি, বাটপাড়ী যে যেদিক দিয়ে পারে তা থেকে আত্মসাৎ করে। আর নিরপরাধ প্রজাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের চালান দেয় রাজার কাছে, বিচারের জন্যে!

যেমন রাজা, তাঁর শাসন করার পদ্ধতিটাও তেমনি চমৎকার। যে অপরাধী তাকে একটা কাঠের বাক্সের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলা হয়, সেই বাক্সের ওপরে যে গর্ত তার মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো টেনে বার করতে। সেই কাগজে যে লেখা উঠবে, তাই হবে রাজার বিচার। 'বাঁচা' আর 'মরা' এই দু'রকমের কথা দু'টুকরো কাগজে লেখা থাকে যার ভাগ্যে যা উঠবে, তাকে মেনে নিতে হবে তাই। এর ওপর আর কোন আপীল নেই!

বিচারের নাম শুনলে তাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে সকলে।

একদিন এক ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ীকে রাজার সামনে এনে হাজির করলে মন্ত্রী। বললে, হুজুর এর অপরাধ সাংঘাতিক। এ রাজশুল্ক ফাঁকী দিয়েছে, যতটা দেবার কথা তার অনেক কম দিয়েছে।

এ গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই! রাজা তাই সঙ্গে সঙ্গে তার বিচারের দিন ধার্য করে আসামীকে হাজতখানায় বন্দী করে রাখতে হুকুম দিলেন।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই, যত বিচারের দিন ঘনিয়ে আসে, তত মন্ত্রীর বুকের ভেতরটা দুরদুর করে। কি জানি যদি তার ভাগ্যে ওঠে 'বাঁচা'! তাহলেই ত আসামী রাজার কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবে! মন্ত্রী যে তার কন্যার বিবাহের সময় অনেক টাকার বস্ত্র এই মহাজনের কাছ থেকে ধারে কিনেছিল এবং ছ'মাস, এক বছর করতে করতে প্রায় আড়াই বছর কেটে গেলেও সে দেনা শোধ করেনি—উপরন্তু সেই টাকার জন্যে তাগাদা করাতে মন্ত্রী ওর ঘাড়ে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাকে এইভাবে ফাঁসীতে লটকাবার মতলব করেছে, রাজা সে কথা জানতে পেলে রক্ষে নেই। তাই এই আপদ একেবারে নিষ্কণ্টক করার জন্যে মন্ত্রী গোপনে সেই বাক্সরক্ষককে

মাঝদুপুরে হঠাৎ খুকু তুললে ডেকে মাকে,
ঘুম ভেঙে মা জেগে বসেন খুকুর কাতর ডাকে।
খুকু বলেঃ কানে আমার ঢুকলো কোনো পোকা,
কতো রকম আওয়াজ শুনি নেইকো লেখাজোখা।
যত্ন করে মা দেখে কন ঃ কই, কিছু না দেখি।
অবাক হয়ে খুকু বলেঃ বলছ তুমি সে কি?
ঝিঁঝি—ঝিঁঝি আওয়াজ শুনি, শোঁ—শোঁ—শোঁ রব,
তোমায় তবে বলছি আমি মিথ্যে কি এই সব?
মা বললেনঃ কানে তোমার নেইকো পোকা কোনো,
সর্দি হলে কানে অমন লাগেই তালা শোনো!
খুকু বলে ঃ আওয়াজ আমি শুনতে ঠিকই পাই,
অবাক কথা—বলছ তুমি কিছু ঢোকে নাই!
সর্দি লাগুক, তালা লাগুক, আওয়াজ কিসের হবে?
ঝিঁঝি আওয়াজ শুনছি যখন, ঝিঁঝি পোকাই হবে।
আমি ত মা শুনছি ঠিকই আওয়াজ ঝালাপালা,
তুমি শুনতে পাওনা কেন? মা তুমি কি কালা?

ঘুষ খাওয়ালে। বললে, ওর ভেতরের দু'টো কাগজেই 'মরা' এই কথাটা লিখে দিতে হবে, তাহলে যে কাগজই সে তুলুক, মৃত্যু একেবারে সুনিশ্চিত। মন্ত্রীর ইচ্ছামত কাজ বাক্সরক্ষক করলে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা মতলবও তার মাথায় খেল।

ঘুষখোরের কি লোভের সীমা আছে! তাই ওখান কারাধ্যক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে বন্দীর সঙ্গে গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলে এবং তার হাতের বহুমূল্য হীরার আংটিটার বিনিময়ে তাকে সেই মন্ত্রীর কৌশলের কথাটা ফাঁস করে দিয়ে এলো।

বিচারের দিন সকলের সামনে বন্দীকে এনে দাঁড় করিয়ে তার সামনে সেই বাক্সটা রাখা হলো। রাজার হুকুমে ঘাতক আগে থেকেই এসে তার পাশেই হাজির ছিল। মন্ত্রীর বুকের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠতে লাগল!

বন্দী প্রথমে ভগবান ও তারপর রাজা ও উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে প্রণাম করে একখানি কাগজ টেনে নিলে বাক্সটা থেকে। কিন্তু 'মরা' এই কথাটাকে দেখেই সে তৎক্ষণাৎ কাগজটা মুখের মধ্যে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে রাজার দুই চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠলো এবং জনতাও হৈ হৈ করে উঠলো।

তখন হাত জোড় করে বন্দী রাজাকে বললে, হুজুর ভয়ে আমি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে এই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি, এর জন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আর একটি কাগজ ত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে—সেটা তুললেই ত আগেরটাতে কি লেখা উঠেছিল বুঝতে পারা যাবে।

সেদিন প্রচণ্ড গরমে হঠাৎ মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে হাত-পাখা দিয়ে বাতাস খেতে লাগলুম। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে, নিজের হাত-পাখার শব্দে নিজেই চমকে চমকে উঠছি। বাইরের গুমোট যেন মনের মধ্যেও এসে জমা হয়ে উঠেছে। কিছুতেই আর ঘুম আসছে না।

এমন সময়ে আমার মনে হল কে যেন আমার মাথার দিকের জানালাটার পাশে খুব চাপা গলায় কাঁদছে, খুব মিহি সুরে ফোঁপাচ্ছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ভয়ে আমার বুক ধুকপুক করতে লাগল। ভাবলুম, আমার ভুল। হয়ত বা হাওয়া করতে করতে পাখা থেকে যে আওয়াজটা বেরুচ্ছে সেটাকেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেবে ভয় খাচ্ছি। সন্তর্পণে পাখাটা পাশে নামিয়ে রাখলুম। ভয়ে যখন গা ছমছম করে, তখন নিঃশ্বাসও যেন আস্তে আস্তে পড়ে যেন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ফেলে কোনো অদৃশ্য শত্রু আক্রমণ করবে! সেই রকম অবস্থা হয়েছিল বলেই পাখাটাও খুব আস্তে আস্তে শব্দ না করে নামিয়ে ফেললুম।

কিন্তু তবু সেই শব্দ থামল না। থেকে থেকে শব্দটা আসতে লাগল, কখনো আস্তে কখনো জোরে, যেন প্রাণপণে কান্নাটা চেপে চেপে মাঝে মাঝে আর চেপে রাখতে পারছে না, এক একটা দীর্ঘশ্বাসে সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে বোধহয় একটু দম নিয়ে নিচ্ছে, পরে আবার শুরু হচ্ছে।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাংঘাতিক ভয়ে শিউরে উঠল। এমন সাহস হলনা যে, উঠে গিয়ে টর্চটা জ্বালিয়ে দেখি কে সেই হতভাগা এত রাতে গুমরে গুমরে কাঁদছে। অথচ টর্চটা রয়েছে বালিশের পাশেই, কিন্তু আমার হাত পাগুলো যেন বিছানার সঙ্গে আঠা দিয়ে সেঁটে গেছে, সেগুলোকে নাড়তে চাড়াতে গেলে ওয়েট-লিফটারের প্যাঁচ কষতে হয়। গলা দিয়ে আওয়াজ বার করবার মত শক্তিও আমার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, চীৎকার করে কাউকে যে ডাকব তা ভাবতে পর্যন্ত পারছি না। নিরুপায় হয়ে অজানার আশংকায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় হয়ে পড়ে রইলুম। এমন সময়ে হঠাৎ কে যেন জানালাটার কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল, আর সঙ্গে একটা কুকুর অস্বস্তিকর গুমোটকে বিদীর্ণ করে তীব্র স্বরে চীৎকার করে উঠল 'ঘেউ, ঘেউ।' দূর থেকে এই সময়ে পাহারাওয়ালার বাঁশী বেজে উঠল দুবার।

আমার শরীরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রক্তটা ঝিঁঝিক মেরে উঠল। ভাবলুম, চোর নাকি? জানালাটার দিকে যে একবার তাকিয়ে দেখব সে সাহসও আর অবশিষ্ট নেই। কি জানি, যদি বিশ্রী একটা কিছু দেখে ফেলি? কিন্তু চোরই বা হয় কি করে? তাই যদি হবে তবে চুরির চেষ্টা না করে সে জানালার পাশে বসে বসে কাঁদবে কেন? হয়ত হবে। চুরি করতে গিয়ে কোথাও খুব মার খেয়ে কোনো মতে পালিয়ে এসেছে, আর এখানে বসে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। কিম্বা হয়ত বেচারা চোর কয়েকদিন চেষ্টা করেও কোথাও কিছু জুটিয়ে উঠতে পারেনি, আজকে আমার জানালার কাছে এসে দেখে সিঁধ-কাঠি, জানালার শিক ভাঙবার অস্ত্র-শস্ত্র আনতে ভুলে গেছে, তাই মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে একটু হাল্কা হয়ে নিচ্ছিল। এমন সময়ে পুলিশের ছায়া দেখে দৌড়ে পালিয়েছে। কিন্তু এরকম ভাবুক প্রকৃতির চোর কি আছে আমাদের দেশে? গল্প শুনেছি, কোথায় যেন সিঁধ কেটে এক চোর চুরি করতে ঢুকে ছবি আঁকবার সরঞ্জাম দেখতে পেয়ে সব ভুলে গিয়ে ছবি আঁকতে বসে গিয়েছিল।

এই সকল সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙতে দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধোবার আগেই সকলকে ঘটনাটা বলে ফেললুম। শুনে সকলেই বেশ একটু ঘাবড়ে গেল, আর ঘাবড়ে গেল বলেই বোধহয় বিশ্বাস করতে চাইলনা ব্যাপারটা। কিন্তু ছোটকাকা অনেকক্ষণ ধরে ডিটেকটিভের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন আমাকে। তারপরে ভ্রূ কুঁচকে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, কী হতে পারে ব্যাপারটা! অনেকক্ষণ ভেবেও যখন তাঁর কোঁচকানো ভ্রূ মসৃণ হলনা, তখন অভিপ্রায় জানালেন যে, তিনি রাতে আমার ঘরে শোবেন।

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। থেকে থেকে আজ একটু মৃদু হাওয়া বইছে, আর তাইতে গাছের তলাকার শুকনো পাতাগুলো নড়ছে সরসর করে। হঠাৎ একটা নিশাচর পাখীর চিৎকারে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। আমি এপাশ থেকে ওপাশ ফিরলুম। এমন সময়ে আবার আমার কানে এল সেই চাপা কান্নার স্বর। উত্তেজনার চোটে আমি উঠে বসলুম। ছোটকাকাকে ডাকতে যাব, নিঃশব্দে তাঁর হাতখানা আমার কাঁধের উপরে এসে পড়ল। দেখি, টর্চ হাতে করে তিনি নেমে দাঁড়িয়েছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসে জানালার কাছে দাঁড়ালুম। সেই মুহূর্তে টর্চের আলো সাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু এদিক থেকে ওদিক সেই আলোকে পরিচালিত করেও কোনো কিছু দেখা গেল না। এমন সময় রাত্রিকে সচকিত করে দিয়ে 'ঘেউ ঘেউ' করতে করতে একটা কালো কুকুর ছুটে চলে গেল পশ্চিমের মাঠটার দিকে—যেটা গিয়ে শেষ হয়েছে এক নিবিড় জঙ্গলে। দূরে বেজে উঠল পাহারাওয়ালার বাঁশী।

গভীর নৈরাশ্যে ছোটকাকা বলে উঠলেন, "নাঃ, আজ আর হলনা কিছু!" অগত্যা আমরা আবার শুয়ে পড়লুম। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েও টের পেলুম ছোটকাকা বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করছেন। ব্যাপারটার কিনারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আর ঘুম হবে না।

আবার সেই স্তব্ধ অস্বস্তিকর রাত্রি। ভয়ে আর উত্তেজনায় ঘুম আসছে না। প্রহরের পর প্রহর গুনে চলেছে শেয়ালের ডাক, শুয়ে শুয়ে শুনছি আর প্রতি মুহূর্তে ভাবছি—এইবারে বোধ হয় সে আসবে। তখন বোধ হয় রাত আর বেশী অবশিষ্ট নেই; ছোটকাকার ভাগ্যে আজও কিছু নেই ভেবে সবে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি, এমন সময়ে শুরু হল সেই ক্রন্দন—যেন শতাব্দীর ব্যথা বুকে নিয়ে কার আত্মা গুমরে গুমরে উঠছে। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতে যাব—হঠাৎ বাইরেটা তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আর মনে হল কে যেন প্রাণের ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

সবাই সায় দিয়ে উঠলো। বললে, এ সাধু প্রস্তাব। শুধু মন্ত্রীর মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করলে।

বন্দী এবার সেই কাগজখানি বাক্স থেকে বার করে সকলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরায় সবাই দেখলে তাতে 'মরা' এই কথাটা লেখা। কাজেই পূর্বের কাগজটায় যে 'বাঁচা' লেখা ছিল এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে রাজা একমত হয়ে তখনি বন্দীকে মুক্তি দিলেন।

গঙ্গা ফড়িং, গঙ্গা ফড়িং, গঙ্গাতে কি থাকো?
এই ত কাছে ছিলে, তবু ধরতে পারি নাকো।
এই বসেছ গোলাপ ফুলে, এই নেমেছ ঘাসে
এই উড়ে যাও ঘাটের ওপর, শিউলি গাছের পাশে!
কোথায় গেলে গঙ্গা ফড়িং? আমি বেড়াই খুঁজে।
ঐ চলেছেন নায়েবমশাই কানে কলম গুঁজে,—
ও'র টাকে ত বসলে দেখি। আবার গেলে কোথা
ধরা দেবার নামটি যে নেই, একি অসভ্যতা?
গঙ্গা ফড়িং, আমি তোমায় রাখব কাঁচের জারে।
যা চাও তা দোব খেতে; দেখব না কেউ মারে।
ওড়ার চেয়ে লাফাও বেশী, একি তোমার ঢং?
লুকিয়ে থাকার জন্যে তোমার পাতার মতন রং।
হঠাৎ চোখে যায়না দেখা, তড়াক ক'রে আসো।
গঙ্গা ফড়িং হাওয়ার ওপর কেমন করে ভাসো!
তোমার মতন শান্ত প্রাণী আর কি ধরায় আছে?
এই পৃথিবীর কারো ক্ষতি হয়না তোমার কাছে।
তাই ত তোমায় ভালোবেসে ধরতে আসি ছুটে।
আমায় দেখে গঙ্গা ফড়িং কেন পালাও উঠে?
সারা সকাল তোমার জন্যে মাঠে ঘাটে নেমে
গঙ্গা ফড়িং, দেখো গেছি একেবারে ঘেমে!
গঙ্গা ফড়িং গঙ্গা ফড়িং, আমার কথা শোনো,
আমি তোমার বন্ধু আমায় ভয় কোরো না কোনো!

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

লাফিয়ে জানালায় এসে দাঁড়ালুম, মনে হল সেই কালো কুকুরটার ছায়া যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডানদিক থেকে ঘেউ ঘেউ করতে করতে কালো কুকুরটা তীব্র বেগে ছুটে গেল মাঠের পারে বনের দিকে। কিছুই বোঝা গেল না। দরজা খুলে বাইরে দৌড়িয়ে এসে ছোটকাকাকে—শুধালুম, "কী দেখলে?"

গম্ভীর পরিতৃপ্তির হাসি হেসে ছোটকাকা বললেন, "বলবখন তাহলে টুনিকে তোর ভাবুক চোরের কাহিনী। এখন একটু ঘুমিয়ে নিই।"

চায়ের পেয়ালা হাতে করে ছোটকাকা শুরু করলেন,— "আজগুবি চিন্তা বলে যে একটা ব্যাপার আছে তার কারণ বোধ হয় ভয় পেয়ে নিজের কাছেই তা গোপন করবার চেষ্টা। কিম্বা মাথা খারাপ হবার সেই অবস্থাটা যখন রোগী ভাবে তার মাথা খারাপ হয়নি। এই দীনবন্ধু (আমাকে দেখিয়ে) চোরের আর্তকণ্ঠ থেকে শুরু করে কত কিছুই না গবেষণা করে ফেলেছিলেন এবং আমাকে চটিয়ে দিয়েছিলেন। আসল ব্যাপারটা থেকে এই গল্পটুকু বলা চলে: একটি দুর্বল শেয়াল শ্মশান-সঙ্গীদের অত্যাচার এড়িয়ে মুখে করে হাড়গোড় নিয়ে এসে এখানে বসে আহার করে। কিন্তু এখানেও শত্রু তাকে তাড়া করে কালো কুকুরের বেশে। আগেই বলেছি, পরিশ্রান্ত হয়ে কুকুর টুকুর যখন হাঁফায় তখন মাঝে মাঝে একটা গোঙানির মত শব্দও হয়। আমাদের শেয়াল বেচারারও একটা ছুটে এসে বেশ পরিশ্রম হত, আর অমনি ক্রন্দন জুড়ে দিত আর কি।"

টুনির মুখে টনিক দিতে
সবাই নাজেহাল,
একটু তেঁতো তাই খেতে সে
করলো কী নাকাল!

মা বললেন—

টুনটুনি মা ওষুধ খা'না
ওষুধ নাতো সিরাপ খা'না
সিরাপ যেন গুড়ের মতো
কিম্বা মধু চিনির মতো
জিভে দিলেই ফেলবে গিলে
এক ঢোকেতেই ফেলবে গিলে...
জানো এটা একটা টনিক—
দামী এবং মস্ত টনিক!
খেলেই দেখো বাড়বে জোর
হবে ডাগর বাড়বে জোর।

টুনি বলে—

হ্যাক! এযে বিচ্ছিরি
তেঁতোর চেয়েও বিচ্ছিরি।
একেই বলে সিরাপ বুঝি
মধুর মতো মিষ্টি বুঝি?
যদি ওদের বুঝতে পারি—
ভুলিয়ে দেওয়া ধরতে পারি!
টনিক! টনিক! আচ্ছা বেশ
দুষ্টু এবার কচ্ছি বেশ,
টনিক যদি জোর বাড়ায়—
মাথায় গায়ে মন বাড়ায়—
তা হলে ত মিনুদিটাকে
ছোট্ট রোগা মিনুদিটাকে
তিনটি চামচ খাইয়ে দিই
ধরে বোঁকেই খাইয়ে দিই!

সবাই তো ভাই বাড়ির ভিতের চরে।
উনি বেড়ান বাড়ি পিঠের করে।
বাড়ি আছেন কিম্বা বাড়ি নেই
জানতে হলে জানতে তা [illegible] নেই
নেহাৎ সহজেই।
বাড়িতে নেই তখন উনি ভাই,
যখন দেখবে বাড়িটি তাঁর নাই।
এবং বাড়ির নাগাল পেলে পরে,
তাঁরও দেখা মিলবে জেনো ঘরে।
শামুকভায়া, ওগো
শামুকভায়া!
তোমার জুড়ি নেই!
মাড়িয়ে চলো নিজের বাড়ির ছায়া
সকল সময়েই।

ঢেঁচিয়ে লোকে বাড়ি মাথায় করে।
তুমি চলো বাড়ি মাথায় করে—
টুঁ শব্দটি কই!
বাড়ির ছাদ আর বাড়ির ছাদ ধরে
রোদে জলে চলছো তো চলছই!
গায়ে লাগে না [illegible] ভাই,
দারুণ রোদে [illegible],
তোমার ছাদে [illegible]!
শামুকভায়া, ওগো
শামুকভায়া!
ছাদটি তোমার [illegible]!

জানো নাকো [illegible] বাড়ি ছাড়া।
তোমায় যে কেউ [illegible] বাড়ি ছাড়া
উপায় [illegible]!
[illegible]
[illegible]
[illegible]
জানি না কোন [illegible],
পাছে আসে বাড়ি [illegible]
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible]
[illegible]
তাই বলে কেউ [illegible]
[illegible]
সইতে নারো [illegible]
এটা তোমার [illegible]
ঘর ছেড়ে তো [illegible]
শামুকভায়া, ওগো [illegible]
তোমার জুড়ি নেই!

টেবিলের উপরে রয়েছে তিনটে সমান আকারের কাঁচের গ্লাস। প্রথম দুটো গ্লাসের অর্ধেক অংশ ভর্তি আছে জল দিয়ে, তৃতীয় গ্লাসটি খালি। এই গ্লাস তিনটির দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাদুকর বললেন, "জলের সঙ্গে জল মিশিয়ে কি কখনো দুধ বানানো যায়? তাই যদি বানানো যেতো তাহলে আর পয়সা খরচা করে দুধ কিনতেন না কেউ। কল থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে সেই জলে পুকুরের জল মিশিয়ে নিয়েই দুধ তৈরী করে নিতেন সবাই। কত কোটি কোটি টাকা যে তা হ'লে বেঁচে যেতো তা আর বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু তবুও আমার কথাটা মিথ্যে নয়। কারণ যাদুমন্ত্রবলে আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি।" এই কথা বলে যাদুকর তাঁর হাতে তুলে নিলেন প্রথম গ্লাস দুটো। দর্শকেরা দেখলেন, গ্লাস দুটোরই অর্ধেক ভর্তি আছে কলের জলে। এইবার যাদুকর যেই মাত্র প্রথম গ্লাসের জল দ্বিতীয় গ্লাসের জলের মধ্যে ঢেলে দিলেন অমনি দ্বিতীয় গ্লাসটি ভরে উঠলো দুধে! কাণ্ড কারখানা দেখে তো দর্শকদের চক্ষু ছানাবড়া! এর পরে যাদুকর বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা এই মাত্র যে অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখলেন তা কেবল আমার যাদুমন্ত্রবলেই সম্ভব। যতক্ষণ আমার মন্ত্রের গুণ থাকবে ততক্ষণই আপনারা দেখতে পাবেন যে, গ্লাসে দুধ আছে, মন্ত্রের গুণ চলে গেলেই সব হবে লোপ।" এই কথা বলে যাদুকর এক টুকরো খবরের কাগজ নিয়ে তৃতীয় গ্লাসটার চারদিকে এমন করে জড়িয়ে নিলেন যে গ্লাসের মুখটা খোলা থাকে। এই কাগজ জড়ানো খালি গ্লাস (৩নং)এ যাদুকর এবার ঢেলে দিলেন দ্বিতীয় গ্লাসের দুধ আর আস্তে আস্তে খুলে নিলেন খবরের কাগজের আবরণ। তাইতো! কোথায় দুধ? —গ্লাসের মধ্যে পড়ে আছে টলটলে জল!

কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্ভব হয় বলতে পারো? যাদুমন্ত্রের গুণ নয় মোটেই। এও হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক। কতকগুলি রাসায়নিক ওষুধপত্রের গুণেই এই অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রথম গ্লাসের জলে গোলা ছিল বেশ কিছুটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট, দ্বিতীয় গ্লাসের জলে গোলা ছিল কিছুটা সোডিয়াম কার্বনেট আর তৃতীয় গ্লাসে রাখা ছিল ২।৩ ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড। এই এসিড খুব সাবধানে ব্যবহার করবে কিন্তু কোনভাবে হাতের বা গায়ের চামড়ার সংস্পর্শে যেন না আসে বা মুখেও যেন না যায়, কোনভাবে পূর্বোক্ত রাসায়নিক মশলাগুলোও যেন মুখে না যায়।

প্রথম গ্লাসের মশলার সঙ্গে দ্বিতীয় গ্লাসের মশলার রাসায়নিক মিলনের ফলে জন্ম নেয় এমন একটি পদার্থ যার রঙ দুধের মতন একেবারে সাদা। এই সাদা দুধের মতন পদার্থটি আবার যখন আসে তৃতীয় গ্লাসে রাখা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংস্পর্শে, তখন তার দুধের মতন সাদা রঙ বেমালুম উড়ে যায় আর পড়ে থাকে বর্ণবিহীন

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

খাওয়া ছাড়া বড় কাজ নেই নাকি মানুষের
তাই তারা রাতদিন খাচ্ছে!
ভাত-ডাল-রুটি-মাছ পোলাও-কালিয়া-চপ্
খেয়ে খেয়ে আরও খেতে চাচ্ছে।
নিধুবাবু ভোরবেলা হাওয়া খেতে বেরুবেন
বেড়াবেন পাকা চারঘণ্টা—
অন্ততঃ একটন হাওয়া খেয়ে ফিরবেন
তবু নাকি ভরে নাকো মনটা!
এত গাল খেতে পারে ঠাকুর সে আমাদের
নাম তার রাম মহাপাত্র,
তবু ভালো রাঁধবে না ঝাল-ঝোল-তরকারী
গালাগাল খাবে দিবারাত্র!
গোল খেলে হার হবে, ফুটবল-ম্যাচেতেই—
তবু গোল খাবে গিয়ে রাশিয়া
আমাদেরি বাঘা বাঘা খেলোয়াড় যতসব
যেন গোল খায় ভালোবাসিয়া!
ঘুষ খাওয়া অপরাধ, তবু খায় লোকেরাই—
লোভ নাকি ছাড়া বড় শক্ত,
আসলের চেয়ে ফাউ ভালো লাগে, বুঝি তাই
ঘুষ খেতে সবে অনুরক্ত!
'পেটে খেলে পিঠে সয়!'—তাই বুঝি যত চোর
চুপি চুপি চুরি করে রাত্রে,
ধরা পড়ে সকলেই কীল-চড়-ঘুঁসি খায়
বেত খায় পৃষ্ঠে ও গাত্রে?
মনিব সে খেতে চায় চাকরিটা চাকরের
নুন খেয়ে গুণ গায় ভৃত্য,
আদরের চোটে হায় কেউ কারো মাথা খায়;
ঠোক্কর খায় কেউ নিত্য!
আরো কত খাওয়া আছে, নেই লেখাজোখা তার
হোক্ ভালো, হোক্ কিবা মন্দ—
গলাবুক জলে ডুবে কেউ খালি খাবি খায়
খাওয়াতেই যত কি আনন্দ!

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

জল। এইবার ইউরোপ সফরকালে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস সহরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এক মজলিসে এই খেলাটা দেখিয়ে ছোটদের অবাক করে দিয়েছিলাম। আশা করি তোমরাও অবাক করে দিতে পারবে তোমাদের বন্ধুদের।

শরীরটাকে গড়ে তোলো ভাই। কি করে গড়ে তুলবে—গালে হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লে তো?—আচ্ছা, তোমাদের শরীর গঠন সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কিছু জানাচ্ছি।

এই শরীর গঠন সম্বন্ধে জানবার আর জানাবার তো আর শেষ নেই। সে অনেক অ-নে-ক কথা রয়েছে।

এই তো সব পূজাসংখ্যা সামনে নিয়ে গোল হয়ে বসে পড়েছো,—কিন্তু এই পড়তে বসার মধ্যেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটা মারাত্মক ভুল করে যাচ্ছো। এ বদ অভ্যাস না ছাড়লে শরীরটাকে গড়ে তোলবার ইচ্ছা থাকলেও, সে ইচ্ছা তোমাদের পূরণ হবে না।

কি এমন মারাত্মক ভুল করলে—গম্ভীর হয়ে ভাবছো, না?

আর সকলের কথা না হয় বাদই দিলাম—নিজের দিকেই চেয়ে দেখনা—কেমন কুঁজো হয়ে বসেছো বইখানা সামনে রেখে। কেন অমন করে বসেছো?

এভাবে কুঁজো হয়ে বসলে—শরীরটাকে গড়ে তোলার কাজে শরীরের ভিতরের কলকব্জায় ভালোভাবে রক্ত এবং রস চলাচল করতে পারে না—যার ফলে শরীরের কাঠামোতে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায়। এই ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি বজায় রেখে শত ব্যায়াম করলেও বা খুব করে ঘি, দুধ, ছানা, মাংস, পলায়ে খেলেও নীরোগ শরীরে বেশীদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না।

বাগানের সুন্দর গোলাপ চারাটি—দাও যদি বাঁকিয়ে মাথাটা মাটির দিকে করে—শত জল ঢাল—দাওনা কেন সার, দামী আর নামী—গড়ে উঠতে পারবে কি সতেজ সুষ্ঠুভাবে?

তোমাদের শরীরও ঐ গোলাপ চারাটির মতো।—কোন অনিয়ম হলেই নেতিয়ে পড়বে—বাড়তে পারবে না একটুও।

সেইজন্যই শরীরটাকে গড়তে যাবার আগে, তোমাদের এবিষয়ে মোটামুটিভাবে কিছু জানিয়ে দিচ্ছি। বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়বে কিন্তু।

—আমাদের এই শরীর কারখানার মধ্যে কত শত কলকব্জা রয়েছে। এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা কাজ; আবার মজা কি জানো? কেউ কাউকে ছাড়া নিজের কাজ করতে পারে না। সেইজন্যই একটি যন্ত্র খারাপ হয়ে পড়লেই আর একটিও খারাপ হতে সুরু করে সঙ্গে সঙ্গেই। তোমাদের এই কুঁজো হয়ে চলা বসার মধ্যে ঐ ধরণের যান্ত্রিক গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে খুব বেশী।

এইভাবে চলা বসার দোষে শরীরের কোন্ অংশের খুব বেশী ক্ষতি হয় জানো? বুকের খাঁচা যায় ছোট্ট হয়ে; তারপর হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্, প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র আর শিরদাঁড়ার আগে

পাশের স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যক্ষমতা আসে ক্রমশঃই কমে। যার ফলে বয়স বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শরীর আর মনের পরিমাণমত উন্নতি বা পুষ্টি হতে পারে না—এই না পারারও একটা কারণ আছে, সেটি হ'ল—কুঁজো হয়ে চলা বা বসার অভ্যাসে বুকের খাঁচাটি যায় ক্রমশঃ কুঁচকে; সাধারণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ঐ কুঁচকে যাওয়া খাঁচাকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় না—বড় করা তো দূরের কথা। আর ফল হয় সাংঘাতিক, আমাদের ফুসফুস আর হৃদযন্ত্র ঐ কুঁচকে যাওয়া ছোট্ট খাঁচার চাপে ছোট্টটিই হয়ে থাকে। এই ফুসফুস আর হৃদযন্ত্রই কিন্তু আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে।

এ-তো নিশ্চয়ই জান—হাওয়ার অক্সিজেন গ্যাস ছাড়া আগুন জ্বলতে পারে না;—আর, আগুন ছাড়া কোনরকম শক্তি বা Energy-র সৃষ্টি হতে পারে না। সেই শক্তি সৃষ্টি করবার জন্যই প্রকৃতি আমাদের বুকের মধ্যে ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। হৃদযন্ত্র সেতো অনবরতই ধুকধুক করে চলেছে আমাদের বুকের বাঁ ধার ঘেঁষে। রক্তধারক সে। ভালোমন্দ সব রক্তই স্থান পায় সেখানে। বদরক্তকে পাম্প করে সে ফুসফুসে পাঠায়—শোধনের জন্য। ঐ শুদ্ধ রক্তই খাদ্যকণিকা এবং হাওয়ার অক্সিজেন বহন করে শরীরের সর্বত্র পৌঁছে দেয়—বাহন ধমনী এবং ওর শাখা প্রশাখারা।

কিন্তু কুঁজো হয়ে থাকলে ওদের স্বাভাবিক পথে চলার গতি আসে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে। তাহলে বল—এই সব দেহযন্ত্রগুলি বজায় রেখে শরীর গড়ে তুলবে কেমন করে?

এছাড়াও আর কি কি হয় জান? এই কুঁজো হয়ে বসার দোষে পেটের যন্ত্রগুলি,—যারা খাবার বয়ে নিয়ে যায়, ঐ সব খাবারগুলিকে সুন্দরভাবে হজম করিয়ে সারটুকু ছেঁকে নিয়ে শরীর গঠন কাজে লাগিয়ে দেয়, তারা আস্তে আস্তে হয়ে পড়ে অকেজো। তখনই পেটে দেখা দিতে থাকে নানা রকমের গোলযোগ ফলে মেজাজটা হয়ে পড়ে খিটখিটে, খেলা-ধুলা বা পড়াশুনোয় মন বসতে চায় না কিছুতেই।

এ দোষ ডাক্তারী ওষুধে সারে না—সারলেও সেটা সাময়িক। কারণ, গোড়ায় গলদ থাকলে ওষুধে কাজ করবে কেমন করে? এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যায়াম করাই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। বুঝলে?

তারপর ধর শিরদাঁড়ার কথা। অনেক সময়ে কুঁজো হয়ে বসার জন্য তার যা নিজস্ব ধর্ম, সোজা সজাগ থাকতে বেশ বাধা পায়। যেজন্য আমাদের স্মৃতিশক্তি, ধীশক্তি বিকশিত হতে পারে না। কারণ শিরদাঁড়ার আশেপাশের স্নায়ুমণ্ডলীর সাথে মাথার কল-কব্জার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ওটা হলো আমাদের দেহ-কারখানার হেড অফিস। এই হেডঅফিসের সঙ্গে আবার দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গায় অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র অর্থাৎ সাব-অফিস-গুলোর যোগাযোগ রয়েছে।

এদের খবরাখবর পাঠাবার পথ হচ্ছে শিরদাঁড়ার ছিদ্রপথটি। কারণ মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুকোষের সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুগুলি একত্রে দড়ির মত গোছা হিসাবে শিরদাঁড়ার ছিদ্রপথ দিয়ে নেমে এসে যে যার কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। শিরদাঁড়া ঠিক সোজা সজাগ থাকলো তাহলে এরা দেহের চারিদিকের খবর অফিসে চালিয়ে পূরণ করে দেহের মঙ্গলের প্রতি নজর দেবে কেমন করে বল?

এই দেহ-কারখানার অন্তরালে রয়েছে এক অফুরন্ত সম্ভাবনা। ওকে ভালভাবে ধোয়া মোছা করে গড়ে তুলতে পারলে অনেক অ-নে-ক মহামানবের সৃষ্টি হবে তোমাদের মধ্য থেকে। ভুলো না যেন—স্বামীজী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, শ্যামাকান্ত ভীমভবানীর দেশের সন্তান তোমরা। তোমার আমার মত দেহ-কারখানার থেকেই হয়েছিল তাঁদের অত প্রতিভার চরম বিকাশ।

এখন থেকে আর ভুল করেও কুঁজো হয়ে বসো না। ইস্কুল কলেজ, বাড়ী কোথাও না। হ্যাঁ ভালো কথা, আরও কয়েকটা সোজা এবং সাধারণ নিয়ম মেনে চলো। যেমন, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে—উঠে, হাতমুখ ধুয়ে এক আধ গ্লাস অল্প গরম জলে সামান্য পাতিলেবু, আর পরিমাণ মত সৈন্ধব নুন মিশিয়ে খেয়ে নেবে। এতে পায়খানা পরিষ্কার থাকবে তাছাড়া ক্ষিদেও পাবে। আর ভোরে ওটা খাবার পর, হাল্কা ধরণের কিছুকিছু ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম করবে অথবা সন্ধ্যায়।

লোভে পড়ে অসময়ে খেও না যেন কখনও। হজম শক্তির অবস্থা বুঝে পুষ্টিকর খাদ্য যতটুকু পার খেয়ে যাবে। আর একটা কথা, রাত্রে শোবার সময় প্রথমে কয়েক মিনিট বাঁ-কাতে, পরে চিৎ হয়ে তারপরে ডান কাতে ঘুমের ভাব নেবে, সুনিদ্রা হবে তাতে।

যার যেমন পরিশ্রম হয় তার ঠিক সেই অনুপাতে শরীর এবং মনকে বিশ্রাম দিতে হয়।—বুঝলে?

তাহলেই দেখবে শরীর আর মনের কাজ ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত সুশৃঙ্খলভাবে চলছে।

শিক্ষামূলক আনন্দের খোরাক নিজেরাই রুচি ও বুদ্ধিমত বাছাই করে নিয়ে শরীর আর মনকে ফুলের মত সুন্দর করে গড়ে তোলো।

টিয়েরাণীর বিয়ে যে আজ ট্যা ঢেং—ট্যা ঢেং—ট্যাং,
পাল্কি চেপে বর চলেছে বেহারা তার ব্যাঙ।
শিম্পাঞ্জি বাজায় সানাই বানর বাজায় বাঁশি,
জয়ঢাক জোর বাজায় জিরাফ কুকুর বাজায় কাঁসি।
নেকড়ে বাজায় নাকাড়া বেশ ডাহুক বাজায় ঢোল,
বেজি বাজায় বেহালা তার খেঁকশেয়ালি খোল।
বাঘ বাজায় বিউগল্ জোর ক্যাঙ্গারু করতাল,
ভালুক দেয় তবলা এবং বাঁয়ায় কষে তাল।
সিংহী স্বয়ং সিংগা ফোঁকেন ঘন্টা নাড়েন ঘোড়া,
চিতা করেন চামর ব্যজন হাত দুটি তার জোড়া।
বড়কর্তা বকবাবাজী চলেন গুটি গুটি,
বনেকর্তী কাকাতুয়া নেড়ে চলেন ঝুঁটি।
হুলো নিয়ে কুলো মাথায় চলেন সাথে সাথে,
ইঁদুর বহেন সিঁদুর কেবল কনেরই কৌটাতে।
মশাল নিয়ে মহিষ চলেন সবার আগে আগে,
কাণ্ড দেখে পশু পাখীর বিস্ময়ে তাক লাগে।
সিংহমশাই সিংহনাদে করেন খবরদারি,
গর্জনে তার গজহস্তি চলেন বেঁধে সারি।
বিয়ের বিরাট মিছিল চলে পাহাড়তলীর পথে,
শৃঙ্খলা এর রাখছে বজায় সিংহ সাধ্যমতে।

নিধু রায় ধরি মোড়লের হাত, বলে ঃ শোনো ধলু মিঞা
তোমরা সকলে খুশী হও যদি করি পূজা শারদীয়া।
সংগতি আজ নাহি তো কিছুই ভরসা তিনিই মম
ধলু মিঞা কয় ঃ তুমি জমিদার, আমাদের পিতা সম।
যাহা প্রয়োজন, কহো অকপটে, যে-টুকু সাধ্য যার
তোমার সেবায় করিব হাজির—যেটুকু সাধ্য যার।

সেইদিন হতে নিধু রায় খুশী মনে
ঠাকুর গড়ার বায়না করিয়া চিঠি দেন জনে জনে।
এখনো যাহারা রয়েছে সেথায়—প্রসাদ পাইবে মা'র
আরতি ও ঢাকে জাগিয়া উঠিবে রায় বাড়ী আর বার।
সাবেক দিনের মতন আবার হাসিয়া উঠিল পাড়া
হিন্দু মুসলিম দুজাতের মাঝে পড়িল খুশীর সাড়া।
প্রসাদ পাইয়া গরীব দুঃখী ফিরে গেল নিজ ঘরে
সপ্তমী চাঁদ জাগিল যেন রে অনেক দিনের পরে
পাড়ার ছেলেরা বাঁশের মঞ্চে করে গীতি অভিনয়
দূরে দাঁড়াইয়া দেখে ধলু মিঞা হাসে রায় মহাশয়।

পাঁচটি বছর পরে
রায় মহাশয় এসেছেন ফিরে আজি আপনার ঘরে।
কয়টি বছরে কাঁটায় ঘিরেছে আঙিনার চারিধার
ঘাসে ও লতায় ঢেকেছে ঘরের রুদ্ধ জানালা দ্বার।
মজুর লাগায়ে ঘর ও বাহির বাসের যোগ্য করি
বসিয়া নীরবে দেখেন চাহিয়া—আঁখি জল পড়ে ঝরি।
এই ভিটা তাঁর প্রপিতামহের—হেথা জন্মেছে পিতা
হেথায় তিনিও মেলেছেন আঁখি—ভুলিতে পারেন কি-তা!
এই বাড়ীটার প্রতি ঘরে ছিল আত্মীয় পরিজন
হাসি উল্লাস, কল-গুঞ্জন রহিত সর্বক্ষণ।
শিশুর কণ্ঠে মধুর কুজন—বুড়োদের কলরব
বৎসর ধরি আছিল হেথায় নিতি নব-উৎসব।
সেই বাড়ী-ঘর রয়েছে তেমনি—নাহি সেথা কেহ আর
ফুরাইয়া গেছে সুখের স্বপন—ঝিঁঝিঁ ডাকে চারিধার।

পলাশপুরের বড়লোক তিনি নিধু রায় মহাশয়
আজ তিনি একা ভিখারীর মতো ঘুরিছেন বাড়ীময়।
ঘরে তালা দিয়া ছেলে-পুলে লয়ে গেছিলেন একদিন
এই বাড়ী আর বিষয় লইয়া ভাবনায় দেহ ক্ষীণ।
বাড়ী-ঘর আর জোত-জমি বেচে যাইবেন চিরতরে
এই আশা লয়ে ফিরেছেন তিনি দীর্ঘ দিনের পরে।
বাহিরে বসিয়া ভাবে মনে মনে আর হুঁকা টানে অবিরাম
পাকা বড় বাড়ী সোনার খামার পাবেন কি তার দাম।
গাঁয়ের মোড়ল ধলু মিঞা আসি বসিল পাশেতে তাঁর
বলে ঃ রায়বাবু, ফিরে যদি এলে—ফেলে যেও নাকো আর।
তোমরা গিয়েছ—আমরা সেথায় বড়ই দুঃখে আছি
তোমরা সকলে ফিরিয়া আসিলে আমরা আবার বাঁচি।
এখানে যাহারা বাহির হইতে আসিয়াছে ধনী লোক
তাহারা মোদের দেখে না চাহিয়া—বোঝে না দুঃখ শোক।
তোমরা আছিলে আপনার জন—আত্মীয় হতে বাড়া—
ওদের দুয়ারে মরিলে ক্ষুধায় দেয় নাকো এরা সাড়া।
নিধু রায় বলে ঃ ধলু, ভাই শোনো, এ-দেশ দেখে তুমি
সাত পুরুষের এই বাড়ী-ঘর ছাড়ি কেন গেলো তুমি!
ধলু মিঞা কহে ঃ বুঝিলাম সব, শোনো রায় মহাশয়
তোমাদের বাড়ী মোদের জীবনে ছিলো এক বিস্ময়।
পুণ্যাহ দিনে নাট খেলা আর দোল দুর্গোৎসব
হিন্দু মুসলিম মিলিয়া করিত আনন্দ কলরব।
সে-দিন কোথায় স্বপ্ন না কি সে—ভাবি বসে বসে তাই
বলো রায়বাবু, হারানো সেদিন কেমনে ফিরায়ে পাই!

একালের দানব   ফোটো রেবন্তকুমার ঘোষ

আলপনা— শ্রীঅঞ্জলি দত্ত

পাততাড়িতে যাঁরা অর্ঘ্য সাজিয়েছেন ঃ—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুখলতা রাও, শ্রীসুনির্মল বসু, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাধারাণী দেবী, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যামিনীকান্ত সোম, নরেন্দ্র দেব, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), ইন্দিরা দেবী, শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার, আশা দেবী, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, রেবতীভূষণ ঘোষ, ধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীমতী পুষ্প বসু, শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, শ্রীসমর দে, শ্রীমণীন্দ্র দত্ত, সুমথনাথ ঘোষ, শ্রীধীরেন বল, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকিরণ বসু, শৈল চক্রবর্তী, শিবরাম চক্রবর্তী, যাদুকর এ. সি. সরকার, মনোজিৎ বসু, বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়, শ্রীহরেন ঘটক, বন্দে আলী মিয়া, শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীদেড়কড়ি শর্মা ও স্বপনবুড়ো।

এস্, মুখার্জি

প্ল্যানিং-এর চিন্তা

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই।

এই দেখ সুন্দর সেজেছি যে কনে
বিয়ের বাদ্য বাজে বড় সাধ মনে।।
ফটো: সরোজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যা। যেন হঠাৎ [illegible] এসে দিগন্তরেখায় পথ [illegible]।

চৌরঙ্গীর বিলাস [illegible] অপরাহ্নের সান্ধ্যপ্রসাধনের মতই [illegible]। সহরের সমস্ত রাস্তার মধ্যমণি [illegible]। এরই পথ ধারে আমি [illegible] দাঁড়িয়েছিলুম। [illegible] ভারী কুয়াশা। [illegible] তার [illegible] স্পর্শ [illegible] বুলিয়ে দিচ্ছে। [illegible] টিকে। [illegible] হয়েছিল। [illegible] উঠে আসছে [illegible] লাগানো বাতাস। [illegible] ওপর তুলে দিলাম [illegible]।

আলোর বন্যা। একপাল [illegible] যেন হলো। সিনেমা হাউস। [illegible] একদিন এমনি [illegible] জন্যে...

"একটা টিকিট আছে, [illegible]" ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কে যেন বললে। আমি [illegible] চমকে উঠে তাকালুম লোকটার দিকে। "[illegible] ক্লাসের টিকিট?—ঐ দামেই [illegible]" বললে আবার।

"সিনেমা দেখার মতলব থাকলে [illegible] থেকেই টিকিট—" ব'লে [illegible] দেখালুম—"হাউস ফুল।" কথাটা শেষ করতে পারলুম না। "আজ্ঞে হাউস ফুল [illegible] বলছিলাম। তা'ছাড়া এ আমার পেশা নয়। এক বন্ধুর টিকিট—হঠাৎ খুব কাজে পড়ে গেছে—তাই আমায় দিয়ে গেছে বিক্রী ক'রে দিতে।" একনিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে গেল। খুব উৎসাহ নিয়ে শোনার ইচ্ছা ছিল না। ভাবছিলুম—অনেকদিন সিনেমা দেখি নি। "বেশ দিন—" আলোর রাজ্য থেকে হঠাৎ অন্ধকার ঝাঁপ পড়ে গেলে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়—আমারও সেই অবস্থা। সুরু হয়ে গেছে ছবি। প্রেক্ষাগৃহ যেন একটা অন্ধকারের স্তূপ। পাহারাদারের সাহায্যে অন্ধের মত পা ঠুকে ঠুকে কোনমতে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশটা আমার মাথায় ভেঙে পড়লো। তারাগুলো সব যেন ছোটাছুটি করতে লাগলো আমার চোখের সামনে।

"উঃ, অসভ্য কোথাকার!—এতক্ষণে তুমি এলে! আমি সেই কখন থেকে—খেয়েও আসতে পারি নি তাড়াতাড়িতে"—নারীকণ্ঠ।

ছানাবড়া দৃষ্টি নিয়ে চাইলুম কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে। বাঁ পাশের সিট্। মানে, আমারই বাঁ পাশের আসন জুড়ে বসা। আমার হাতটা ধ'রে আবার বললে, "তুমি কী গো—একটু আগে এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! ইঃ যেন সিনেমা দেখতেই আসা—!" মেয়েটি পর্দার দিকে চেয়েই চাপা গলায় ব'লে যেতে লাগলো। ঘেমে উঠলুম। কান দু'টো জ্বলে যাচ্ছে। ছোট বেলায় [illegible] মশাই একশোবার কান মললেও এত জ্বালা কখনো হয় নি।

"ও [illegible] কি? মাফলারটা বুড়ো মানুষের মত মাথায় জড়িয়েছ কেন? কত যে ঢং জানো!" মাফলারটা খুলতেই যাচ্ছিলুম—কিন্তু খোলা হ'ল না। [illegible] ভুলের খেসারত দিতে লাগলুম—মাফলারের [illegible] সম্ভাষণ শুনতে শুনতে।

অন্ধকারের চাপটা চোখ থেকে স'রে গেছে। পার্শ্ববর্তিনীকে চেয়ে দেখলুম আড় চোখে। সুন্দরী—হয়ত বা অপূর্ব সুন্দরী। হাতটা আমার তখনো তারই হাতের মুঠোয়। আমি বৃষকাষ্ঠের মত মৃতের সাক্ষী হয়ে রইলুম।

"বইটা বেশ ভালো, না গো?"—আবার কথা!

খেয়াল হ'লো সিনেমা দেখছি। পর্দার দিকে অকারণে চেয়ে রইলুম পাথরের চোখ মেলে। একটা অপরিচিত—যে আমার কোন জোরের দাবী না রেখেই কথা ব'লে চ'লেছে মেয়েটি। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। আকস্মিকতার থম্‌থমে ভাবটাও হাল্কা হ'য়ে এলো। মনে প'ড়লো টিকিট বিক্রেতার কথাগুলো, "আমার বন্ধু কাজে আট্‌কে গেছে—তার টিকিটটা—" তার আসন আমি দখল ক'রে ব'সেছি। কিন্তু হাতটা কি আমার নয়? অসাড়। ফিরিয়ে আনতে পারি এমন শক্তি কি আমার নেই? এ কি, আমার হাত নিয়ে ও যা ইচ্ছে তাই করবে! না, না, আর নয়, ব্যস্‌—মানে আমি,—আমি সে লোক নই—ছেড়ে দাও। পাখীর ডানার নীচের নরম উষ্ণতা। মিষ্টি মিষ্টি। স্কার্ফটা টেনে দিল।

নবীন সৈনিক গভীর রাতে শিবির ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রিয়ার ডাক। চোরের মত পা ফেলছে। শিবিরের শেষ সীমানায় এসে থমকে দাঁড়ালো। অস্পষ্ট আলোয় দেখলো—লেখা—"আউট্‌ অব বাউন্ডস্‌।"

ঠিক। তবু কেন ছেড়ে দিচ্ছে না হাত?

সমুদ্রের কল্লোল। উত্তাল ঢেউ শিলার বুকে মাথা খুঁড়তে লাগলো। বার বার। একটু একটু ক'রে ধ'সে গেল। তলিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে। বেশ লাগে। অনেকক্ষণ।

ভেতর থেকে একটা শাসন অনেকক্ষণ থেকেই শুনছি। কিন্তু আর অবাধ্যতা করা যাচ্ছে না। পিক্‌চারের আলো জ্বলে ওঠার আগেই তাই হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে আনলুম। ছিনিয়ে নিলুম হাতটা। "কোথায় যাচ্ছ?" জিগ্যেস ক'রলে ও। "আসছি"—সংক্ষিপ্ত জবাব ছুঁড়ে বেরিয়ে এলাম ছুটে। খানিকক্ষণ প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবতে লাগলুম। অনেক রকম ক'রে ভাবলুম। পায়চারী ক'রে—সিগারেট ধরিয়ে—মাফলার খুলে ফেলে। হ্যাঁ, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। বেশ, তাই পালিয়েই যাই। পা বাড়ালুম। মিষ্টি উষ্ণতা তখনো যেন সারা গায়ে আমার ছড়িয়ে আছে। এক অচেনা অনুভূতি। পরিবেশটা ফাল্‌গুনের হাওয়া ব'য়ে গেছে জীবনের বন্ধ্যা জমির উপর দিয়ে। তার যাওয়া আসা দেখেছি,—খেয়াল করিনি। কিন্তু আজ এই শীতের শীর্ণ সন্ধ্যায়—ঐ কুহেলি রমণীর এ কী আবেদন! অপরিচিতার অন্ধ প্রণয়! এক নিমেষে ঈভের সাপটা আমাকে সাপ্‌টে ধ'রলো আষ্টেপৃষ্ঠে। মাফলারটা আবার মাথায় জড়ালুম। বেল বেজে গেছে।

"অমনি হন্‌ হন্‌ ক'রে চ'লে গেলে আমায় একলা ফেলে! আবার এলে সেই ছবি সুরু

হ'লে। কা হ'য়েছে তোমায় বল তো? আমার ওপর রাগ ক'রেছ?" আবার হাত ধরা! কিন্তু জবাব চায় না। বড় ভাল তো—

জীবনে কোন নারীর নিবিড় স্পর্শ পাইনি। তার দেহমনের খবর পেয়েছি স্বপ্নে—কল্পনায়। কখনো বা ব্যর্থ ক্ষুধার ইচ্ছা-নারীর রূপায়ণে। তাই আজ যৌবনের অন্তাচলে বাসি যৌবনের বকেয়া ক্ষুধা লক্-লকিয়ে উঠ্‌লো—অবাধ্য, অসম্বৃত।

বেপরোয়া হ'য়ে উঠলুম। খুলে ফেললাম মাফলার। আমার নিষ্ক্রিয় হাতের সেতু বেয়ে এক অনির্বচনীয় হিল্লোল দেহকে অনুরণিত করে দিল।

বহু বাধাবিপত্তির বেড়াজাল ভেদ ক'রে নায়ক নায়িকার দর্শন পেয়েছে। দু'জনের নিবিড় আলিংগনে আর নির্বাক অধরসংগমে পুঞ্জীভূত কামনাবেদনার অভিপ্রকাশ।

আমার নিশ্চল হাতখানিকে প্রাণপণ উদ্যমে চেপে ধ'রলো বুকের গহন প্রান্তে। এক ঝলক দৃষ্টি হানলো গ্রীবা বাঁকিয়ে। কেঁপে উঠলুম। এই বুঝি!! না।

এইবার আলোর আদালত। বিচার। সাজা। আমি প্রস্তুত। ব্যস্ত প্রেক্ষাগৃহ বহির্মুখী। চোখ মুখ থেকে ভয়ের লেশমাত্র মুছে ফেলে চাইলাম তার চোখে। জীবনে প্রথম সোজা একটি রমণীর চোখে চাইলাম—জানি না কোন্ দুঃসাহসে! অপরিচিতার স্থির দৃষ্টিতে রোষ-বিস্ময়-লজ্জা অথবা আফ্‌শোষে কিছুই ঠাহর পেলাম না। তার সুগৌর দেহ আর নীল চোখে আমার দৃষ্টি গেল হারিয়ে। সময় সংক্ষেপ। অভাবনীয় আত্মপ্রত্যয়ের সুর টেনে এনে বললাম, "আপনার ভুল ভাঙবার চেষ্টা আমি গোড়াতে ক'রেছিলাম কিন্তু সুযোগ পাইনি। পরে হয়ত পারতাম, কিন্তু করিনি। কী যেন আমায় পেয়ে ব'সেছিল।" আরো বললাম, "ব'লতে দ্বিধা নেই—জীবনে কখনো কোন নারীর স্পর্শ পাই নি। তাই আপনার ভুলকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। অন্যায় ক'রেছি—সন্দেহ নেই—আমাকে ক্ষমা করুন।" কথাগুলো একদমে ব'লে যেন নিষ্কৃতি বোধ করলুম।

"অদ্ভুত মিল তো চেহারার"—বিস্ময় জড়ানো স্বর।

আমার চেহারার সংগে মিল! এবং সেই ব্যক্তি এই নারীর প্রণয়ী!! আশ্চর্য, রূপের প্রতি কি নারীর কোন মোহই নেই! যাক্ সে কথা। বললাম আবার, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

"না, না, আপনার ক্ষমা চাইবার কি আছে! বরং আমারই চাওয়া উচিত," ব'লে উঠে দাঁড়ালো। আমি অনুসরণ করলুম। কোথা থেকে এত সাহস এলো—তাই ভাবি। নারীর স্পর্শে? হবে।

"আর একটা কথা—" ব'লে ফেললুম।

ফিরে দাঁড়ালো। নীল চোখ মেলে।

"এখনো আমার মনে আছে—ব'লেছিলেন খেয়ে আসেন নি। ভুল ক'রে অনেকখানি অধিকার দিয়েছিলেন জেনেশুনে যদি এইটুকু প্রশ্রয় দেন যে, আপনাকে অনুরোধ করি কিছু খেতে—"

"না। তার দরকার হবে না" জবাব দিল দু'টিতে হাঁটতে।

"দরকারটা আমারই" বললুম অমিত রায়ের মত।

"বেশ।" নির্লিপ্ত স্বর।

রেস্তোরাঁ। যত দেখি ভাল লাগে। কোন জড়তা নেই। কত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। না লজ্জারক্তিম—না নির্লজ্জ। সুযোগ পেয়ে বললাম, "সিনেমা দেখার কোন মতলবই ছিল না। হঠাৎ একজন একটা টিকিট বেচতে এলো—বললে—তার বন্ধুর টিকিট—নেহাৎ কাযে আটকে—"

"কায না ছাই। আমাকে এড়াতে চায় বুঝলেন?" এড়াতে চায়? কে সে গর্বিত পুরুষ—তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

"আমিই টিকিট কিনে পাঠিয়েছিলুম এলো না। ঠিক আছে।"

মনে হ'লো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলো। প্রসংগ ব'দলে ব'ললে, "যাক্ গে—আমায় একটু পৌঁছে দেবেন? রাত্তির হ'য়েছে তো বেশ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"আরপুলি লেন। ঐ মেডিকেল—"

"হ্যাঁ, জানি। ওখানে তো আমার এক বন্ধুর বাড়ী। আপনার কত নম্বর?"

বললাম।

"কি নাম?" নামধাম জেনে নিয়ে তবেই আমার সংগে পথে বেরোবে বোধ হয়। কী ভাবে আমায় ও! বললুম নাম। কী যেন ভাবতে লাগলো! চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না, বললাম, "কি, নাম শুনে কেমন যেন মুষড়ে প'ড়লেন! আমি কোন দাগী চোর, ডাকাত নই।"

"না, না, নামটা শুনেছি মনে হ'চ্ছে। তা' ও নামতো কত লোকেরই আছে।" একটু হেসে আবার বললে, "কি করেন আপনি?"

এই প্রশ্নটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যা'তে অন্ততঃ উত্তর দিলে বুঝতে পারে যে, আমি একটা বাজে লোক নই।

বললাম নির্লিপ্ত সুরে, "লিখি"

"লেখেন! কি লেখেন?"

"এই নাটক, উপন্যাস, গল্প—"

"আপনি লেখক?"

"হ্যাঁ।"

"কি কি বই লিখেছেন বলুন না—" ঔৎসুক্য জড়ানো সুর।

"অনেকই আছে—তার কোনটাই হয়ত আপনার জানা বই নয়। তবে একটার নাম হয়ত শুনে থাকবেন 'কুলটা।'"

"কুলটা! মানে যেটা ফিল্ম হ'চ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"কি আছে তা'তে? নামটা কিন্তু বিশ্রী—হুঁ কুলটা।" একটু ঘৃণাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি।

গম্ভীরভাবে বললুম, "আমরা সাম্যবাদী প্রগতিবাদী লেখক। নামের সৌন্দর্য দিয়ে নোংরামি ঢেকে রাখতে চাই নে। তবে যা' কিছু নোংরা তাকে আমরা ঘৃণার চোখ দিয়ে দেখি না। এই উপন্যাসে আছে এমন একটা জাতের মর্ম-বেদনার কাহিনী—যাদের গণিকা বলে সমাজ ঘৃণায় মুখ ফেরায়।"

সংগে সংগে [illegible] প্রশ্ন করলো তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে, "এই যে আপনি বললেন কোন স্ত্রীলোকের স্পর্শ পান নি। অথচ গণিকার সুখ-দুঃখের খবর রাখেন কি ক'রে?" একটা কুটিল সন্দেহে তার ভ্রূ দু'টো কুঁচকে গেল।

বললাম জবাবে, "না না সে রকম কিছু জানবার দরকার নেই। সবই কি আর প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায়—না জানার দরকার হয়? বই আছে—আর আছে কল্পনা।"

"অ"—কেমন একটু বাঁকা হাসি যেন ফুটে উঠলো,—"চলুন আমায় একটু এগিয়ে দিন—" ব'লে উঠে দাঁড়ালো—"আমি অবশ্য পথ চিনি—তবে একা—এত রাত্রে—"

নিঃশব্দে পথ চ'লতে লাগলুম মন্ত্রমুগ্ধের মত। মনটা খচ্ খচ্ ক'রছে। আমি যা' নই—তাই হয়ত ভেবেছে আমায়। কিন্তু কী অবাক! হঠাৎ মেয়েটি ব'ললে স্নিগ্ধস্বরে, "জানেন, যতবার ভাবছি একজন সাহিত্যিকের সংগে আমার আলাপ হ'য়েছে—ভীষণ ভাল লাগছে।"

"না, না, আমি আর কি এমন—" বিনয় করলুম।

"পরিচয়ের যে ভূমিকা তাই ভেবে আবার ভয়ও হয়—আমাকে নিয়ে হয়ত বা কোন গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি ক'রবেন। নিজে তো হেসেছেন খুব। পাঁচজনকেও হাসাবেন। সেটা কিন্তু খুব অবিচার হবে।"

আমি কিছু একটা ভাল জবাব মনে মনে সাজাচ্ছি। কিন্তু বলার আগেই হঠাৎ [illegible] সমস্ত ভাবে ব'ললে, "ঠিক আছে—আপনি যান্—"

"কেন চলুন না, আর একটু—"

"না, না দরকার নেই" ব'লে দ্রুতপায়ে চ'লে গেল।

ট্রামে ব'সে ভাবতে লাগলাম—শেষের [illegible] যেন বড় খাপছাড়া। ধ'রে নিলুম না হয়—[illegible] অভিভাবক বা তার প্রণয়ীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল বা অন্য কিছু—তবু বিদায়ের পূর্বে একটা নমস্কারের অবকাশ নিশ্চয় [illegible] [illegible]। [illegible] নেই [illegible] হ'[illegible] [illegible]।

কিন্তু [illegible] [illegible] না। [illegible] কোলাহল সে স্বপ্নের রেশ ছিঁড়তে পা[illegible] [illegible] তার কথা, কথার ভংগি, তার চলার [illegible] ছন্দ, নীল চোখ, উচ্ছ্বল [illegible] আর সবশেষে [illegible] [illegible] [illegible] উৎকণ্ঠা—[illegible] [illegible] [illegible] আঙুলিশিশুলি [illegible] [illegible] বাতাসে। চারিদিকে। [illegible] [illegible] [illegible]।

সাত দিন বাদে স্থির হ'তে বসলাম [illegible] নিয়ে। কিছু লিখবো। একখানি চিঠি [illegible] গেল টেবিলে বিহারী-ভৃত্য। খামের চিঠি [illegible] বড় একটা আসে না। খুলে বার করলাম [illegible] [illegible] চিঠি।

শ্রদ্ধেয়,

চমকে যাবেন জানি। তবু লিখছি। [illegible] সেদিন কথায় কথায় আপনার নাম, [illegible] শুনেছিলাম।

আমাকে চিনতে পারছেন তো?

কাল বেলা বারোটায় দক্ষিণেশ্বর [illegible] যাবো। যদি পারেন একবার আসবেন। [illegible] জন্যে অপেক্ষা ক'রবো।

ইতি [illegible]।

পুনশ্চ—আপনার বইটা প'ড়েছি।

কাল বেলা বারোটায়? অর্থাৎ [illegible]? দক্ষিণেশ্বরে? এখন ক'টা বাজে? [illegible]!! ওরে বিহারী, বিহারী, [illegible] থেকে [illegible] [illegible]। উঃ দাড়িটাও তো [illegible] দরকার। ওরে বিহারী রান্নার কত [illegible]? [illegible] নি? খাবো না।

"যদি পারেন একবার আসবেন"—কেন এই

অনুরোধ! এর একটা সংগত অর্থ খুঁজতে লাগলাম চলন্ত বাসে ব'সে। "আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো"—কেন? অর্থ যা সবার আগে মনে ধরা দেয় তা'তে উৎসাহ নিবে আসে। আমারই মত চেহারার যে ব্যক্তি এঁড়িয়ে যায় ওকে—সেই না-পাওয়া-মানুষটিকে আমার মাঝে খুঁজে পাওয়া! আমি গৌণ—লক্ষ্য অন্য! কিন্তু, রাস্তাটা কি রবারের মত লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে? শেষ নেই? ট্রাফিক পুলিশটা হাত তুলে দাঁড়িয়ে কি ঘুমিয়ে পড়লো? আচ্ছা, এমনও তো হ'তে পারে যে, এতদিনে সত্যিকারের মনের মানুষের সন্ধান সে পেয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর।

"আপনি এসেছেন! কত ভাল হ'লো আপনি এলেন।"

স্বপ্নময় কণ্ঠস্বর। সাদাসিধে বেশবাস স্বপ্নার।

"এ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছি। কিন্তু ভালটা কি হ'লো?"

"ভাল? তা' ঠিক বলতে পারি না—তবে মনে হ'লো যেন আপনি এসেছেন ভাল হ'য়েছে।" সহজ সরল স্বীকৃতি।

ঢোক গিলে জিগ্যেস করলাম, "কি মনে ক'রে হঠাৎ ডাক পড়লো জানতে ইচ্ছে।"

"সেইটেই ভাবছি। ভেবে ব'লবো। চলুন না গঙ্গার কাছটাতে,—" ব'লে এগোতে লাগলো—আমি সঙ্গ নিলুম।

একটা নীরবতা যেন একটু একটু ক'রে দু'জনকেই গ্রাস ক'রে ফেললো। এক সময় স্বপ্না রসিকতা ক'রে ব'ললে, "কি, অমন বোকামত হ'য়ে গেলেন কেন?" রসিকতার উত্তরে সুযোগ পেয়ে গেলাম অনেক বলার, "শুনেছি প্রেমে প'ড়লে পুরুষরা বোকা হ'য়ে যায়—মেয়েরা হ'য়ে ওঠে চালাক—কথাটা ঠিক মনে হ'চ্ছে।"

"কিন্তু, কেন হয় বলুন দিকিনি"—প্রশ্ন করলে স্বপ্না।

"তা' জানি না।"

"জানেন না তো শুনুন আমার কাছে। কারণ হ'চ্ছে—প্রেমে পড়ে পুরুষরা পথ হারায় আর মেয়েরা খুঁজে পায় পথ" ব'লে ছেলেমানুষের মত খিল খিল ক'রে হেসে উঠ্লো। পরে কি ভেবে বললে আবার, "চলুন না নৌকোয় চ'ড়ে বেলুড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসবো, বেশ মজা হবে।"

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "বেলুড় কেন? নৌকো ভাসিয়ে চলুন না যতদূর এই স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যায়। না হয় ফিরে নাই এলাম।" হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠ্লো মুখটা। পরক্ষণেই সভয়ে বললে, "না, না, তিনটের আগে আমায় ফিরতে হ'বে।"

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। দাঁড় টানার শব্দ। আর নৌকার গায়ে ছোট্ট ঢেউয়ের মৃদু আঘাত। একটু একটু দোলা। জগত ছাড়া এক জগত—পূর্ণ, ভরাট। গলুয়ের দিকে আধশোয়া হ'য়ে দু'কনুইয়ের ওপর ভর ক'রে মুখ রেখেছে স্বপ্না। চেয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। জলের স্পন্দনে চিক্ চিক্ ক'রছে টুকরো টুকরো রোদ্দুর। নীরবতার বিরাট ফাঁকটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ঢেকে দিচ্ছি আমি। স্বপ্না মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে শীতে। স্কার্ফটা আনে নি। বিনাবাক্যে নিজের চাদরটা খুলে আলগোছে তার পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। স্বপ্না মুখ ফিরিয়ে দেখলো। স্নিগ্ধ হেসে উঠে বসলো। চাদরটা আবার দেবার চেষ্টা করলো আমার গায়ে। আমার জ্বলন্ত সিগারেটের ছোঁয়া লাগলো তার হাতে। 'উঃ' ব'লে হাতটা সংকুচিত ক'রে নিল। গভীর অনুতাপে সিগারেটটা ফেলে দিলাম জলে। নিবিড় আবেগে তার হাতখানি টেনে নিলাম দু'হাতে। তার জ্বালা নিঃশেষে শুষে নেবার জন্যে হাত বুলোতে লাগলুম। শান্তভাবে ব'সে রইল স্বপ্না। ভারী খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে কাঁধ বেয়ে বুকে। মনে হ'লো—স্বপ্নসম্ভবা। আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, "গয়না পরেন না কেন?"

"নেই। পরবারও ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে থাকলে হ'তো।" সরিয়ে নিল হাতটা। মেয়েমানুষের গহনা পরার ইচ্ছে নেই!! সব হিসেব যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

"জানেন, আপনার বইটা পড়লুম—'কুলটা'।"

উৎসাহ বোধ করলুম, অন্ততঃ কথা বলার সুযোগ পেয়ে, "কেমন লাগলো?"

"খু-উ-ব ভালো। আপনি খুব ভালো লিখতে পারেন। কলমের খুব জোর। অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত ক'রে ছেড়েছেন।"

"—অবাস্তব!" প্রশস্তির শেষটায় অস্বস্তি বোধ করলুম।

"হ্যাঁ, নায়ক শেষটায় একটা, মানে—ইয়ে-কে বিয়ে ক'রে ফেললো—এটা অবাস্তব হ'লেও বেশ কিন্তু সত্যির মত ক'রে লিখেছেন।"

"কেন, বেশ্যাকে বিয়ে করা কি অবাস্তব! ভালবেসেছে, বিয়ে ক'রেছে এতে অবাস্তবের কি আছে?"

"দেখুন" সমালোচনার কেতায় ব'ললে স্বপ্না, "ওদের ওপর আপনার সহানুভূতি না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু আসলে, আমার মনে হয়, ওদের করুণা করা যায়,—হয়ত ভালওবাসা যায়—কিন্তু বিয়ে করা যায় না। শরৎবাবুও বোধ হয় ঐ জন্যই ওদের বিয়ে দেন নি।"

"শরৎবাবুর সংগে সংগেই সময় আর সমাজ তো সব থেমে যায় নি। সেদিন যা' হয় নি—আজো তা' হবে না—এ তো ঠিক নয়। যারা সমাজসচেতন,—মর্মী, তাদের কাছে, ভালবেসে একটি বেশ্যাকে বিয়ে করাতে অবাস্তবতা কিছু নেই। যে নারী সমাজবিড়ম্বিতা তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করায় গৌরব আছে,—লজ্জা নেই।"

"সবই সত্যি। তবু ভাবতে কেমন লাগে।"—হঠাৎ চ্যালেঞ্জের সুরে বললে, "পারেন আপনি নিজে আপনার নায়কের মত"—

কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "অবস্থার মিল হ'লে নিশ্চয়ই পারি।"

"পারেন!" চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠ্লো। মনে হ'লো যেন আমার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

আমি বোঝাবার চেষ্টা ক'রলাম, "দেখুন, গণিকাবিলাসী হওয়ার চেয়ে ভালবেসে একজন গণিকাকে বিয়ে করায় অনেক ঔদার্য, অনেক মহত্ত্ব—এ আপনার পক্ষে ভাবা কঠিন আমি স্বীকার করি। আমাদের দেশের মেয়েরা যতই প্রগতিবাদী হোন্ না কেন—মনটা তাঁদের সেই সনাতনী বৃত্তির চৌকাঠ পেরোয়নি।"

স্বপ্না নির্বাক।

আক্ষেপের সুরে বললাম, "আমার একটা বই প'ড়েই আমার সম্বন্ধে আপনার যা ধারণা হ'লো, অন্য বইগুলো পড়লে হয়ত আর কথাই বলবেন না।"

আগ্রহ নিয়ে জিগ্যেস করলো স্বপ্না, "আর বইগুলোর নাম বলুন। আমি প'ড়বো।"

"নামের দরকার কি? যদি পড়েন তো বইগুলো না হয় আপনাকে উপহার দেব।"

"দেবেন!" যেন আকাশের চাঁদ দেবে এমনি আনন্দ উছলে পড়লো স্বপ্নার সুরে।

"দেবো।" আবার চুপ। দু'জনেই। শুধু একটানা দাঁড়ের শব্দ।

ফেরার সময় জানতে চাইলাম, "আর কি দেখা হবে?"

"দেখা? কি হবে দেখা ক'রে?" নীল চোখে এক অকারণ কারুণ্য।

"তা জানি না, তবে, আর দেখা হবে না

ঊনত্রিংশতি

● কৃষ্ণ ধর ●

শালবনে ভীরু পায়ে আদরের
চাদর জড়িয়ে এসেছো অনেক পথ,
কুশাঙ্কুর দু'পায়ে মাড়িয়ে চৈত্র রাতে।
নির্জনতা একাকার জ্যোৎস্নার প্রসার
হিজলের বন ছুঁয়ে, ডেকে ডেকে
মেঘের বুড়িকে, সময়ের অনন্ত
চরকায় সুতো কেটে, মালা গেঁথে,
গান গেয়ে, রূপকথা বুনে, বৈতরণী
পার হবে ভেবেছো তো এতকাল তুমি।

এবার বেদনাবারি পান করো
ঊনত্রিশে এসে, যৌবনের স্মৃতিসার
তীব্র হলাহল।

শিমুলে পলাশ রাঙা দীপ্ত কোনো
কনে-দেখা গ্রীষ্মের বিকেলে, সলজ্জ
কবরীবন্ধে হাত রেখে বলেছো কি
তাকে : কুমারী, তোমার জন্যে জীবনের
ঊনত্রিশ যৌবন, প্রত্যহ প্রতীক্ষা
করে কান্না মেখে হয়েছি শ্রাবণ।
ফাল্গুনে হলোনা দেখা, চৈত্র শুধু রিক্ত
শালবন, পদধ্বনি সুভদ্রার,
স্বপ্নে দেখি তোমারই আনন।

হে ভদ্রা, অর্জুন আমি, চোখ তোলো
নীলাঞ্জন আঁখি। তোমার প্রণয় স্নেহে
দেহে মোর আনন্দ উত্তাপ, আকাশে
বাতাসে ওড়ে, মেঘে মেঘে নিরুদ্দেশ
ডানা। ধাবমান অশ্বে, কেশপাশে
মত্ত ঝড়, কী উদ্দাম হে বসন্ত সেনা!

ক্ষণটুকু দাও তুমি, আমি দেবো জেনো
চিরকাল। তোমার চোখের নীলে
স্নান করে প্রশান্ত সকাল।

অকস্মাৎ মনে হয়, কেন তুমি দেখা
দিলে সর্বনাশ চোখের আগুনে।
নীতিপর বৃক্ষ যেন হৃদয় উড়ায়ে
নিল অশান্ত শ্রাবণে। শান্ত মন,
ক্লান্ত ডানা, স্থাণু হয়ে রয়েছি
দাঁড়ায়ে, দুঃসহ স্মৃতিতে ঘেরা
যৌবনের তৃষ্ণার্ত প্রাঙ্গণে। হে ভদ্রা,
তুমিই এবার জীবনেরে ভরে দাও
সুদক্ষিণ গানে।

রূপকার হলধর

রনজিৎ কুমার সেন

জাত-ব্যবসা ছিল কুমোরের কাজ। মাটির ঘড়া, কল্‌সি আর প্রতিমা তৈরী ক'রে ছাঁচে ফেলে তাকে চিত্রাঙ্কিত ক'রে তুল্‌তো হলধর। মাঝে মাঝে ছুরি আর সরু কাঠি দিয়েও অদ্ভুত ছবি ফুটিয়ে তুল্‌তো সে কাঁচা মাটির বুকে। তারপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে বিক্রীর জন্যে বাজারে ছেড়ে দিত পাইকেরি হারে। তিন পুরুষের ব্যবসাটা এমনি ক'রেই একটানা কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে চ'লে আস্‌ছিল।

কিন্তু হলধরের জীবনের পঁচিশটা বসন্ত পেরিয়ে আকস্মিক একটা দারুণ ঝড়ের মুখে এসে হঠাৎ তা থেমে গেল। এতকাল গ্রামের বাড়ীতে বিধবা মা আর ছোট ভাই টোকনকে নিয়ে কোনোভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ চৈত্র-শেষের আকাশ ভেঙে একদিন কালবৈশাখী নেমে এলো। ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল হলধরদের কুঁড়ে-ঘরখানি। পোড়ো ভিটেয় নতুন ক'রে যে আবার খুঁটি বসিয়ে তার উপর দিয়ে খড়ের ছাউনি দিয়ে নেবে, এমন সম্বল ছিল না তার। মা কেঁদে প'ড়লো, বল্‌লো, 'এখন আমাদের কি অবস্থা হবে রে হলধর?' টোকন এসে দাদার হাত ধরে তার মুখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল। মুখ ফুটে কাউকেই কিছু-একটা জবাব দিতে পারলো না হলধর। বুক ফেটে তারও কান্না আস্‌ছিল। তাদের তিন-পুরুষের কারবারটা নষ্ট হ'য়ে গেল, নষ্ট হ'য়ে গেল বাড়ীটা; চোখের সাম্‌নে এ দৃশ্য দেখবার মতো তার মনের বল ছিল না। তবু জোর ক'রে তাকে বুক বাঁধতে হ'লো।

এক-সময় পাড়ার হারান স্যাঁকরার মেয়ে দুলি এসে ব'ল্‌লো 'তোমরা কি এম্‌নি ক'রে কষ্ট ক'রবে গো? চলো, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ক'রবে। মাকে গিয়ে এক্ষুণি আমি বল্‌ছি।'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মমতায় বুকখানি ভ'রে উঠ্‌লো হলধরের। এগাঁয়ে এতলোক তো আছে, কিন্তু দুলির মত এমন দরাজ মন আছে কার? শ্মশানের উপর দাঁড়িয়েও জীবনটাকে একবার স্বপ্নের মতো সুন্দর ব'লে মনে হলো হলধরের। একান্তে ব'সে ব'সে যখন আপন-মনে গান গাইতে গাইতে মাটির ঘড়ার উপর চিত্র ক'রতো সে, এসে সাম্‌নের দাওয়ায় ব'সতো দুলি। কত আর বয়স তখন তার? বছর সাত-আট হবে। ব'সে অবাক-বিস্ময়ে তার চিত্র করা দেখতো দুলি আর মাঝে মাঝে ব'ল্‌তোঃ 'আমাকে একটা দেবে? রোজ আমি এই ঘড়ায় ক'রে পুকুর থেকে জল আনবো।'

হলধরেরই বা তখন খুব-একটা বয়স কি! ব'ল্‌তো, 'তোকে আমি ছোট্ট একটা ঘড়া সুন্দর ক'রে এঁকে দেবো; এতবড় ঘড়ায় তো আর তুই জল আন্‌তে পারবিনে!'

খুসীতে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে উঠে যেতো দুলি।

তারপর সত্যিই একদিন তাকে সুন্দর ক'রে নতুন একটা ছোট্ট ঘড়া বানিয়ে দিল হলধর, ব'ল্‌লো, 'নে, এবারে খুসী তো?'

'হুঁ।' ব'লে একটুকাল থাম্‌লো দুলি, তারপর ব'ল্‌লো, 'তুমি খুব ভালো, খু-ব ভালো হলধরদা।' তারপর আর এক মিনিটও অপেক্ষা নয়, ঘড়া নিয়ে নাচতে নাচতে কোথায় একদিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল দুলি।

এরপর প্রায় বছর সাত-আট কেটে গেল। চোখের সাম্‌নে ধীরে ধীরে আট থেকে ষোলয় উত্তীর্ণ হ'লো দুলি। শরীরের কি অদ্ভুত গড়ন! দেখে তাক লেগে গেল হল-ধরের। দুলি একদিন ব'লেছিলঃ 'তুমি খুব ভালো হলধরদা।' সেদিন থেকে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল হলধরের। মনে হল—সংসারে তাকে ভালোবাস্‌বারও তবে লোক আছে! দুলি তাই যখনই কাছে এসে বসতো, যেতে দিতে ইচ্ছে হতো না হলধরের। হারান স্যাঁকরা বেঁচে নেই, নইলে মাঝে মাঝে তার হাঁপর-খানায় গিয়ে বস্‌তো সে, হাল-ফিল নানা কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ইচ্ছে করেই দুলির কথা উল্লেখ ক'রে দুলি সম্পর্কে তার স্নেহশীলতাকে হারানের কাছে বড় ক'রে তুলে ধ'রতো। হারান হয়তো নিজে থেকেই এক-সময় মেয়ে সম্পর্কে তার কাছে কিছু-একটা প্রস্তাব তুলে ধ'রতো। কিন্তু সে পথ অনেকদিনই বন্ধ হ'য়েছে। দুলির মায়ের অন্দর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাতে কেমন বাধো বাধো লাগ্‌লো তার।

এম্‌নি ক'রেই মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে ছিল হলধর। কিন্তু দুলির উদ্ধত যৌবন তাকে রুদ্রেই মাতাল ক'রে তুল্‌লো। সংসারে দারিদ্র্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সংসারের নিত্যদিনের অভাবটাই কি তার কাছে বড় হ'য়ে থাকবে, প্রেম ব'লে কিছু নেই, প্রেম ব'লে কিছু থাকবে না?

সেদিন কল্‌সিকাঁখে পুকুরঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল দুলি, সাম্‌নে এসে মুহূর্তের জন্য একবার দাঁড়ালো সে হল-ধরের; ব'ল্‌লো, 'কি, এম্‌নি ক'রে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছো হলধরদা?'

মনের কথাটাকে এতকাল চাপা দিয়ে রেখেছিল হলধর, কিন্তু আজ আর পারলো না, বল্‌লো, 'তোকে, তোকে দেখ্‌ছি দুলি।'

মুখ টিপে হেসে দুলি ব'ল্‌লো, 'কেন আমাকে কি আজ নতুন দেখ্‌ছো?'

—'নতুন কেন দেখ্‌বো!' হলধর ব'ল্‌লো, 'কিন্তু এত রূপ কোথাও দেখিনি।'

লজ্জা পেয়ে এবারে মুখ নিচু ক'রে নিল দুলি। অলক্ষ্যে বুঝি কাঁখের কল্‌সির জল একবার ছলাৎ ক'রে উঠ্‌লো।

হলধরের মনে হ'লো—ও তো কল্‌সির জল নয়, দুলির ষোড়শী যৌবন নতুন জোয়ারের মতো ছলাৎ ছলাৎ ক'রে উঠছে। এতটুকুও দ্বিধা করলো না হলধর; ব'ল্‌লো, 'আমি যদি তোকে বিয়ে ক'রতে চাই, তুই কি আপত্তি করবি দুলি?'

কল্‌সি থেকে হাতখানি বুঝি আলগা হ'য়ে খসে প'ড়ছিল, আরও জোরে তাই কল্‌সিটাকে আঁকড়ে ধরে দুলি একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল; হলধরের কথার যে কিছু একটা জবাব দেবে, এমন ভাষা খুঁজে পেলো না।

হলধর ব'ল্‌লো, 'কই কিছু যে ব'ল্‌ছিস না?'

এবারে তার মুখের দিকে চোখ দুটো তুলে ধরতে গিয়ে চোখের মণি দুটো অশ্রু ভারে ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌লো দুলির। ব'ল্‌লো, 'আমি যে তবে বর্তে যাই হলধরদা!' তারপর আর একমুহূর্তও দাঁড়ালো না দুলি, ছুটে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। কল্‌সি থেকে জল উপ্‌চে প'ড়ে যে তার শাড়ীর একটা পাশ ভিজে গেল, সেদিকে লক্ষ্য ক'রলো না সে।

কিন্তু দুলির মুখ থেকে কথা পেয়েও এই নিয়ে আর বেশীদূর এগোতে পারলো না হলধর। ভেবেছিল—মাকে দিয়ে একদিন দুলির মাকে কথাটা পাড়াবে, কিন্তু মনস্থির ক'রেও লজ্জায় কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ছিল সে। এম্‌নি-সময় চৈত্রের আকাশ ভেঙে অকস্মাৎ একদিন কালবৈশাখী নেমে

এলো। হলধরদের বাড়ীটা চোখের সামনে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল।

দুলিরা তবু কোনোরকমে টিকে ছিল। এক-সময় কাছে এসে ব'ল্লো, 'ইস্, এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্ট ক'রবে? চলো আমাদের বাড়ীতে।'

হলধর জানতো—গ্রামে তার শেষ আশ্রয় আছে দুলিদের ঘরে। কিন্তু হলধরের বিধবা মা তাতে সাড়া দিতে পারলো না। কোথায় যেন তার সঙ্কোচ আর সম্ভ্রমে বাধলো। ব'ল্লো, 'এভাবে এক-মুহূর্তেও আর গাঁয়ে থাকতে আমার মন চাচ্ছে না; আমাকে নিয়ে তুই বরং সদরে কোথাও চল হলধর। তারপর যা বরাতে আছে হবে।'

হলধর জানতো—মাকে তার সংকল্প থেকে টলানো সহজ নয়। বাধ্য হ'য়ে সামান্য পুঁজি-পাটা যা ছিল সঙ্গে নিয়ে মা আর টোকনের হাত ধরে সদরের পথে পা বাড়ালো হলধর। সামনে দুলিদের কলাবাগানটা পথে পড়লো। দেখলো—একটা গাছও আস্ত নেই, ঝড়ে সব ভেঙে পড়েছে। সেগুলো থেকে থোর আর মোচা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল দুলি। হলধরকে চোখে প'ড়তেই উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। তারপর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটো তুলে ধ'রে জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'তোমরা সবাই মিলে কোথায় যাচ্ছো হলধরদা?'

ভাঙা-গলায় হলধর ব'ল্লো, 'গাঁ ছেড়ে আমরা চ'লে যাচ্ছি দুলি, আর বোধ করি আমাদের দেখা হবে না!' ব'ল্তে গিয়ে গলাটা ধ'রে এলো হলধরের।

চোখ-ফেটে জল আস্ছিল দুলির। আরও দু'পা কাছে এগিয়ে এসে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা তবে কোনোদিনই আর এগাঁয়ে ফিরে আসবে না?'

হলধর ব'ল্লো, 'গ্রাম আছে, ভিটে নেই। কোথায় ফিরে আসবো দুলি?'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে এবারে দুলি ব'ল্লো 'যদি এমনি করে চলে যাবে, তবে একথা সেদিন আমাকে ব'ল্লে কেন? কেন তবে মিথ্যে এম্নি ক'রে ছলনা করলে আমাকে?'

বুকের কোথায় যেন এসে কথাগুলো বড় নিবিড় হ'য়ে বাজলো হলধরের। সঙ্গে মা আর টোকন না থাকলে এই মুহূর্তে সে যে কি ক'রে ব'স্তো, তা সে নিজেই ভাবতে পারলো না। মা আর টোকনের দিকে অপাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দুলির কথার জবাবে সে শুধু বল্লো, 'মেটে কল্সির গায়ে ছাঁচের দাগের মতো ওটা। কল্সিটাই ভেঙে গেল, দাগটা আর থাকে কোথায় বল্? ওকথা তুই ভুলে যা।'

দুলির ইচ্ছে হ'লো—এবারে ডুকরে কেঁদে ওঠে। ব'ল্লো, 'জলের বুকে দাগ কাটলে দাগ মুছে যায় ঠিকই, কিন্তু জল জানে—কতখানি আঘাত তার লাগ্লো। আমি তোমাকে ভুল্তে পারবো না হলধরদা, না না কিছুতেই না, কিছুতেই না।' কান্নায় ভেঙে প'ড়ে কলাগাছের শ্মশান-শয্যার উপর দিয়ে এক দৌড়ে ছুটে কোথায় পালিয়ে গেল দুলি, আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

আবার সামনের পথে পা বাড়ালো হলধর। সদর যে এখনও বহু দূরে! বেলা-বেলি গিয়ে না পৌঁছোতে পারলে মাথা [illegible] কষ্টের আর শেষ থাকবে না। আর একটু জোর দিল এবারে পা দু-খানির উপর হলধর।

এম্নি করেই এক-সময় তারা সদরে এসে পৌঁছালো।

কিন্তু এখানে জীবন আরও দুর্বিষহ, আরও ভয়াবহ এখানে পথের দিশা। তবু তার মধ্যে যেন এক-টুক্রো আলোর রেখা দেখ্তে পেলো হলধরের মা। মাসীর সম্পর্কে বোন হয় রঙিলা, এখানেই কোথায় যেন তাদের চালের কলের ব্যবসা আছে। খুঁজে খুঁজে সেইখানে এসেই উঠ্লো সকলে। রঙিলা তাতে খুসী হলো কিনা জানি না, কিন্তু হলধর খুসী হ'তে পারলো না। ছোটবেলা থেকে দিনরাত সে কেবল কাজ করেছে, কাজ ছাড়া একটা মুহূর্তও তার ভালো লাগলো না। নিষ্ক্রিয় সময়গুলো কাল-নাগিনীর মতো ফণা বিস্তার ক'রে অনবরত তাকে দংশন ক'রতে চায়। মনে পড়ে তখন দুলির কথা। দুলির মনটাকে সে ভেঙে দিয়ে এসেছে—যেমন ক'রে তাদের কুঁড়ে-ঘরখানিকে ভেঙে দিয়েছে দুরন্ত কালবৈশাখী।

নিজে থেকেই এক-সময় উদ্যোগ ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লো হলধর। দেখলো—সামনেই একটা চন্ডীমন্ডপকে কেন্দ্র করে বিরাট সামিয়ানা প'ড়েছে। কি ব্যাপার? শুনলো—কি একটা পার্বণ উপলক্ষে পর-পর দশ-রাত্রি এখানে যাত্রাগান হবে। সারা সহরে ঢোল পড়েছে। কল্কাতা থেকে নাম-করা যাত্রার দল এসেছে, অপূর্ব তাদের অভিনয়। গান-বাজনার দিকে আগাগোড়াই ঝোঁক ছিল হলধরের। কাজে ব'সে এমনদিন নেই যে, সে পটুয়া কিম্বা ভাটিয়ালি না গেয়েছে। কতদিন সামনে গান গেয়ে ব'সে ব'সে দুলি শুনেছে আর তার গানের তারিফ করেছে। ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ লাগে।

যাত্রার আসরে গিয়ে এক-সময় ব'সে প'ড়লো হলধর। কল্কাতার দল, এ-কি যে-সে গান! কেমন বিস্ময়কর সব মেক্-আপ, কি অপূর্ব কন্সার্ট। গ্রামে থাকতে এতদিন এ রস থেকে বঞ্চিত ছিল হলধর। এরকম একটা দলে যদি কোনো-রকমে ঢুকে যেতে পারতো সে, তবে জীবনটাকে সার্থক ব'লে মনে হ'তো। ছোটবেলা থেকে কেবল কাদা ঘেঁটেই দিন গেল, তাতে একমাত্র সংসারের ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাড়া আর কি পেলো সে? কিছু না। না আনন্দ, না উদ্দীপনা। যাও-বা কাছে পেয়েছিল দুলিকে, শেষ-পর্যন্ত তাকেও ছেড়ে আস্তে হ'লো।

বুকে সাহস নিয়ে এক-সময় যাত্রার দলের ম্যানেজারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো হলধর। বল্লো, 'বড় অভাবি লোক, দয়া করে যদি একটা কাজ দেন, বেঁচে যাই।'

ম্যানেজার জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কখনও কোথাও অভিনয় ক'রেছ?'

মাথা চুলকিয়ে হলধর ব'ল্লো, 'আজ্ঞে না, তবে তা ছাড়া আরও তো কাজ আছে! নিজে আমি কুমোরের ছেলে; ঘড়া, কল্সি বানানো থেকে সুরু ক'রে প্রতিমা-চিত্র করা, প্রতিমা সাজানো—সব কাজই আমি ক'রেছি! সাজ-পোষাকের কাজ পেলে আমার সুবিধে হয়।'

(শেষের পর ২৩০ পৃষ্ঠায়)

নীল চোখ

(১৯৭ পৃষ্ঠার পর)

দিয়েই ওরা কার্য সিদ্ধি করলে। ঘাতকের ফাঁসী হয়নি। তাকে তুমিও দেখেছ। সে-ই তোমার কাছে সিনেমার টিকিট বিক্রী করেছিল। সে কথা পরে বলছি।

তারপর আমার দেহকে বেসাতি ক'রে ওরা হাজার হাজার টাকা রোজগার ক'রেছে। ওদের লোভের শেষ নেই। কতভাবে যে আমায় কাজে লাগায়, আমি ভেবে তাজ্জব হয়ে যাই। কী সাংঘাতিক ওরা! বাঘের চেয়েও বেশী ভয় করি। ওদের বজ্রমুষ্টি থেকে আমার নিস্তার নেই। নিষ্কৃতি নেই। কত কষ্টে যে তোমার সঙ্গে দেখা করি, তা' যদি জানতে!

সেদিন সিনেমা হাউসে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই আকস্মিক নয়। নিশ্চয়ই সেদিন তোমার পকেটে টাকা ছিল অনেক,—সে খবর ওরা আগেই পেয়েছিল। তারপর যা যা ঘটেছে— যা যা আমি বলেছি—তা সব সাজানো। সব অভিনয়—মঞ্চে সীতার অভিনয় করার মত। আমার কাজ ছিল তোমার দেহে-মনে মাদকতার টোপ ফেলে টেনে এনে ওদের ডেরায় ছেড়ে দেওয়া। এ আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ হ'লেও— সেদিন শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটে গেল। কেন সেদিন জানিনি। পরে বুঝেছি,—তোমাকে ভালবাসলো ব'লে তাই। এ কাজ আমার বাড়তি কাজ। এ ছাড়া আর যে কাজ আমাকে না বললেও বুঝবে। তবু তার সঙ্গে আমার মনের সংযোগ নেই বলে নিজেকে নিষ্পাপ মনে করি।

এ পরিবেশ অসহ্য। এর থেকে কবে আমায় উদ্ধার ক'রবে? ওগো, তুমি এসো আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে অনেক দূরে।

তোমার সকলা

অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার গোড়া থেকে প'ড়তে সুরু করলাম। লেখাগুলো যেন ছোটাছুটি ক'রছে—পড়তে পারছি না। পড়লাম আবার। বার বার।

একটা আরশুলা গা বেয়ে উঠেছে। শিরশির ক'রে ওঠে সারা দেহ। এক ঝাকুনি দিয়ে সরিয়ে দিলাম। কুৎসিত কীট।

দম বন্ধ হয়ে আসছে। ধোঁয়া—ধোঁয়া মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে। চারিদিকে ধোঁয়া। শুধু ধোঁয়া!

"দাদাবাবু আগুন!" বিহারীর চীৎকার।

"এাঁ! আগুন!!"

"বইয়ের গাদায় আগুন লাগলো কি ক'রে দাদাবাবু? জ্বলন্ত সিগারেট-টিগারেট ফেলেছো নাকি,"

বইতে আগুন লেগেছে! লাফিয়ে উঠ্লুম। "জল—ফায়ার ব্রিগেড—"

'কুলটা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সবে বাঁধাই হয়ে এসেছে। আগুনের লকলকে জিভ তাকে আত্মসাৎ করার জন্যে পঞ্চমুখ।

বিহারী দু'বালতি জল নিয়ে ছুটে এল। তার হাতটা চেপে ধরলুম হঠাৎ,—"থাক্"—

ওপরে নীচে মাথা দোলায় বাঁদর। বাঁশের কঞ্চিটা তুলে নেয় আমিনা। বুড়োর আগা-পাশতলা পিটিয়ে দেয় খুব আস্তে আস্তে। আমিনা বললে,—কান ধর্ বুড়ো। বল্ আর কক্ষণও করবো না।

কান ধরলো বাঁদর। এপাশে ওপাশে মাথা দোলালো।

আমিনা বললে,—ওঠাবসা কর্ দশবার। আমি ততক্ষণে সাজিয়ে দিই বুড়ীকে।

বাঁদর ওঠে আর বসে। শিশুদের দলে হাসির ফোয়ারা ছুটতে থাকে। হাততালি দেয় শিশুরা। মজা দেখে কেউ কেউ ধেই ধেই নেচে ওঠে। আনন্দে আত্মহারা যেন।

আমিনা ছাগলকে সাজিয়ে দেয়। তার পিঠে ফেলে দেয় সত্যিকার বেনারসী এক টুকরো। শতচ্ছিন্ন, তা হোক। ছাগলের মাথায় দেয় হাওয়াই শাড়ীর আঁচল, আসমানী রঙের। ফেঁসে গেছে, তা যাক। একটা নানান পুঁতির মালা পরিয়ে দেয় বুড়ীর গলায়। খিল খিল হাসি হাসতে হাসতে আমিনা বললে,—সাদি করবি বুড়ী? তবে বাবুদের সেলাম জানিয়ে দে।

বুড়ী মাথা দুলিয়ে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে সামনের দুই পা শূন্যে তুলে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। চতুষ্পদে দাঁড়ায়। একবার ব্যা করে।

আমিনা হেসে লুটিয়ে পড়ে যেন। হাসতে হাসতে বলে,—এই বুড়ো, মাথায় টোপর পরবি আয়। গায়ে জামা দিবি আয়। বিয়া করতে যাবি, পাউডার হেজলিন মাখবি, চোখে সুর্মা দিবি! মাথায় বাবুদের মত টেরি কাটবি।

বাঁদর আবার দুটো ডিগবাজী খেয়ে নেয় শিশুদের হাসিয়ে। তার পায়ে ঘুঙুর বোল বলে যেন ডিগবাজীর সঙ্গে সঙ্গে।

ভদ্রলোক একান্তই নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে এক বেয়াড়া দৃষ্টিতে। দেখছে তো দেখছেই। আমিনাকে দেখছে। চেটে নিচ্ছে যেন চোখের চাউনিতে। নীলাম্বরীর আঁচল টানে আমিনা। মাথার খোঁপা আলগা হয়ে গেছে। দুহাত ওপরে তুলে খোঁপাটা একবার খুলে আবার জড়িয়ে নেয়। অনাবৃত কাঁকাল দেখায় আমিনা। পেট আর পিঠ দেখায় হেসে হেসে।

ভদ্রলোক আর একটি সিগারেট ধরালেন।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। চোরা হাসি হাসতে হাসতে আবার চোখ বন্ধ করলেন একটি। ধোঁয়া লেগেছে যেন চোখে।

—ডুগ ডুগ ডুগ। বাঁদর লাচ বাবু! আচ্ছা আচ্ছা খেল।

ডুগডুগি বেজে উঠলো আমিনার হাতে। নকল না আসল কে জানে, মুখে হাসি ফুটালো, পান-লাল দাঁতের সারি দেখিয়ে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললে,—আয়নায় মুখ দেখবি বুড়ো? কেমন মানিয়েছে দেখবি না!

বাঁদর যেন একটু হাসলো। মুচকি হাসি। মাথা দুলিয়ে হাত পাতলো। আমিনা একটা আয়না দিলে তার হাতে। মেলা থেকে কেনা দেশী আয়নায় মুখ দেখে বুড়ো। ন্যাকড়ার টোপর মাথায়। গায়ে শলমা-আঁকা ছিটের জামা। ছাতার কাপড়ের কালো পায়জামা। নবাবী কেতায় আয়নাটা ফিরিয়ে দেয় বুড়ো। সাজসজ্জা ঠিক আছে দেখে মৃদুমন্দ হাসলো যেন।

আমিনা বললে,—একটা সিগ্রেট খাবি বুড়ো?

বাঁদর আবার সম্মতি জানালো। হাত পাতলো।

আমিনা বললে,—সিগ্রেটটা বাবু দিয়ে দিন. দেখুন আপনাদের বুড়ো সিগ্রেট খেতে খেতে সাদি করতে যাবে।

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন। আমিনা নিজেই উঠে গেছে ভদ্রলোকের সামনে। তার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা ছিনিয়ে নেয় চকিতের মধ্যে। প্রথমে অপ্রস্তুত এবং তার পর-মুহূর্তেই ঈষৎ হেসে ভদ্রলোক ইতিউতি দেখলেন যেন। দেখলেন, আর কারও দৃষ্টি প'ড়লো নাকি!

ডিজেলের গন্ধভরা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—রাস্তার দু'পাশে চাইনীজ ওয়ালের মত গৃহের সারি। তফাৎ নেই, ব্যবধান নেই, এমনই ঘেঁষাঘেঁষি। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, মানুষের যেন কসমোপোলিটন শহরপল্লী।

কোথায় কোন গৃহশীর্ষের জানলা থেকে কে লক্ষ্য করেছিল শ্যেনদৃষ্টিতে—নীচে, রাস্তার ফুটপাথে বাঁদর নাচ চলেছে। চোখে পড়তে না পড়তে ছুট দিয়েছে সে। সাততলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। তার মা ডাকলো তাকে। কর্ণপাত করলো না মায়ের ডাকে। ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে ফটক পেরোতে গিয়ে ধরা পড়লো ভোজপুরী দারো-য়ানের হাতে। রুখতে পারলো না সে। শিশু তার বাহুর বাঁধন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। বিপরীত ফুটপাথে বাঁদরনাচ চলেছে। ডুগডুগি বেজে চলেছে। ভোজপুরী দরোয়ান পিছু নেয় ছুটন্ত শিশুর, কিন্তু নাগাল পায় না তার।

ঠিক সেই সময়ে একটি লরী ছুটতে ছুটতে আসে আর ঐ শিশুকে আঘাত করে সজোরে। লরী দাঁড়ায় না আর। তীরের বেগে ছুটে পালায়। শিশুর রক্তাক্ত দেহ। ছটফট করছে শিশু, প্রচণ্ড আঘাতে। হয়তো এখনই তার সংজ্ঞালোপ পাবে। মাথায় আর পায়ে আঘাত লেগেছে। পা ভেঙেছে হয়তো। মাথার খুলি ফেটে চৌচির।

পিলপিলিয়ে লোক ছুটতে থাকে। হল্লা শোনা যায় মানুষের। শিশুটির চতুর্দিকে মানুষ জমতে থাকে। লরীর পাত্তা পাওয়া যায় না আর। পথের পথিকরা শুধু লরীর নম্বরটি মনে রাখে ডব্লিউ বি এল—

বাঁদর নাচ ফেলে সকলেই দৌড় দেয় ঐ জখমী শিশুর কাছে। অন্যান্য শিশুরা ভয়ে পালিয়ে যায় মানুষের চিৎকার শুনে। বাঁদর আর ছাগলের দড়ি ধ'রে টানতে টানতে আমিনাও ছুটলো ভয়ে ভয়ে। তাদের পেছনে চললো বৃদ্ধ, তার পিঠে সাজ-সরঞ্জামের বস্তা।

দুপুরের জনবিরল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। সূর্যের কড়ারোদের তাতে রাস্তার গলন্ত পিচ থেকে ধোঁয়া উঠছে। দেখতে দেখতে কোথা থেকে মানুষের কালো মাথায় ভ'রে যায় যেন রাস্তা। ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ীর হর্ণ বেজে বেজে থেমে যায়। তবুও মানুষের ভীড় সরে না রাস্তা থেকে। হরেক-রকমের গাড়ীর ক্যারাভান গতিহীন হয় যেন। পুলিশের কালো বেতার-গাড়ী আসে কোথা থেকে খোঁজ পেয়ে। খাকির পোষাক পরা ব্যাটনধারী পুলিশ রাস্তার ভীড় সরাতে লেগে যায়। ক্যারাভানের যাওয়ার পথ তৈরী ক'রে দিতে হবে। লরীর নম্বরটা লোকমুখে শুনে নেয় পুলিশ অফিসার। নোট-বুকে টুকে নেয়।

আহত শিশুটির মা ধনীর ঘরের বৌ, উন্মাদিনীর মত সাততলার ওপর থেকে নেমে আসেন। রক্তাক্ত শিশুকে বুকে তুলে ধরেন। তাঁরও হয়তো জ্ঞান হারিয়ে যায় এত রক্ত দেখে। তাঁর বুকের শিশুর দেহ থেকে তাজা লাল রক্ত ঝরেছে রাস্তায়।

দর্শক মানুষ চিৎকার করছে—অ্যাম্বুলেন্স! অ্যাম্বুলেন্স! হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে! হয়তো আর বাঁচবে না! আহা, কার ছেলে কে জানে!

অনেক দূরে এগিয়ে থামলো আমিনা। ছুটতে ছুটতে তার হাঁফ ধরেছে যেন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। পেছন দিকে দেখে নেয় চোখ ফিরিয়ে একবার!

ফুটপাথও তেতে উঠেছে। পা পড়লে জ্বলে উঠছে। এক জায়গায় বেশীক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ানো যায় না যেন। ছায়া নেই কোথাও। দূরে একটি গাড়ী-বারান্দা চোখে পড়লো। আমিনা আবার চলতে থাকে, একটু ছায়া চাই। জল চাই একটু। বাঁদর আর ছাগলে খাবে। বৃদ্ধ খাবে, বস্তা ব'য়ে ব'য়ে সেও শ্রান্ত হয়েছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

ঘোড়ার জলপানের লোহের চৌবাচ্চা একটা চোখে পড়লো। শ্যাওলায় ভর্তি ময়লা জল। সূর্যের তাপে গরম জল।

ছাগল জল খায়। বাঁদরও জল খায়। বস্তা থেকে একটা টিনের মগ বের করলো বুড়ো। সেও জল খায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে।

পানের ডিবে থেকে দুটো পান মুখে পুরতে যাবে, এমন সময় নজরে পড়ে আমিনার। সেই ভদ্রলোক, দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত কামনার মত। আবার কখন সিগারেট ধরিয়েছে।

দোক্তার পাতা মুখে দেয় আমিনা। পান চিবিয়ে চিবিয়ে পানের জলে কণ্ঠ ভিজিয়ে নেয়। ভদ্রলোকের দিকে কটাক্ষ হেনে উঠে পড়ে। দুই জানোয়ারের গলার দড়ি বুড়োর হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। বৃদ্ধ ঝাপসা চোখে দেখে ইতি-উতি।

ভদ্রলোক আবার চমকে ওঠে। তার ঠিক সম্মুখেই বাঁদরওয়ালী। বুক চিতিয়ে চিবিয়ে হাসছে। বলছে,—এই বাবু, একটা সিগ্রেট খাওয়াতে পারিস?

দর্জির সৃষ্টি ভদ্রলোক, আরেকবার চমকে ওঠে। আশপাশের মানুষের মুখের দিকে দেখে ভয়ে ভয়ে। তার ঠিক কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক উগ্রযৌবন, শাড়ীর আবরণে ঢাকা। তপ্ত হাওয়ায় আমিনার রুখু রুখু চুল উড়ছে কপালে। নীলাম্বরীর আঁচল উড়ে খ'সে পড়ে বুক থেকে।

ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রলো। চারমিনার সিগারেটের হলুদ-রঙের আধার। একটি দিতেই হয় ভিক্ষা-প্রার্থীকে। ভদ্রলোক আলগোছে দেয় যেন। আমিনা মুখে ধরিয়ে বললে, ম্যাচিশটা দিবি বাবু?

আবার একবার দেখে ভদ্রলোক। আশ-পাশের পথিকদের মুখ দেখে নেয়। কাছেই একজন ঝাঁকামুটে। গাড়ী বারান্দার তলায় ঝাঁকায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে গরমের দুপুরে। বাদামী রঙের দুটো দো-আশলা কুকুরও অকাতরে ঘুমিয়ে আছে। রাস্তার কুকুর, রাস্তায় ঘুমোয়।

পূজার অভিনন্দন জানাই
আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের
দিন ভোর সুবাষ
KAMINIA OIL
Regd. Regd.
Delicately perfumed oil for beautifying and increasing the growth of the hair.
To be rubbed well into the roots of the hair daily
KAMINIA PERFUMERY Co BOMBAY
কামিনীয়া কেশ তৈল ব্যবহার করুন
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিকেল কোম্পানী, বোম্বাই ২
MEMBER: INDIAN SOAP & TOILETRIES MAKERS' ASSOCIATION
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য একমাত্র পরিবেশক ঃ
মেসার্স আর শঙ্করলাল এণ্ড কোং
৮৭, খ্যাংরাপট্টী স্ট্রীট কলিকাতা—৭

দম্ভ

(৬১ পৃষ্ঠার পর)

যেতে হবে, অনেক কাজ আছে, একটু চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আবার বলল, অমূল্যবাবু নেই?

প্রশ্ন শুনে মনে মনে প্রতিমা জ্বলে উঠল। কেন এসেছে সে কি বুঝতে পারে না সে। প্রতিমা কেমন আছে সে কথা জানবার জন্যে তো ঘুম হচ্ছে না এলার। আগে আসতো সকালে, এখন আসছে সন্ধ্যায়, এরপর আসতে আরম্ভ করবে রাত্তিরে। এমনি করেই আরম্ভ হয়। এমনি করেই সংসার ভেঙে চুরমার করে দেয় ওর মতো মেয়েরা। কিন্তু প্রতিমা কিছুতেই তা হতে দেবে না। দেখা যাক তার কাছ থেকে এলা অমূল্যকে ছিনিয়ে নিতে পারে কিনা। এলার সঙ্গে কোন রকম অভদ্রতা করবে না প্রতিমা। সে তার কে? কিন্তু সে তার স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে আজ। অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্র পড়ে যখন তাকে অমূল্য ঘরে এনেছে তখন এমন করে তুচ্ছ করবার কোনো অধিকার নেই তার। শান্তস্বরে প্রতিমা বলল, উনি অফিস থেকে এখনও ফেরেননি?

কখন ফিরবেন?

মিথ্যা কথা বলল প্রতিমা, বলে গেছেন আজ ফিরতে দেরি হবে।

কী ভেবে এলা বলল, দয়া করে একটা কথা বলবেন তাঁকে?

নীরস স্বরে প্রতিমা বলল, বলুন?

বলবেন আমি এসেছিলাম। যতো রাত্তির হোক আজ যেন উনি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেন। আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকব—বিশেষ দরকার।

যন্ত্রের মতো প্রতিমা বলল, বলব।

আমি আসি আজ, আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম, আর একবার মনে করিয়ে দিল এলা, উনি এলেই বলবেন কিন্তু, প্রতিমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বেরিয়ে গেল।

আর রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল প্রতিমার। এত সাহস কোথা থেকে হয় এই সব মেয়েদের। নির্লজ্জ! স্ত্রীকে কেমন করে এরা বলতে পারে, যতো রাত্তিরই হোক, তোমার স্বামীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল প্রতিমা। আজ এলাকে দোষ দিয়ে কী হবে? সব দোষ তো তার। সে নিজেই তো দূরে সরিয়ে দিয়েছে অমূল্যকে। নির্দোষ মানুষকে অকারণে কষ্ট দিয়েছে। তা না হলে এলার সাধ্য কি এ বাড়িতে অমন করে যখন তখন এসে তার স্বামীর সঙ্গে গোপনে কথা বলে! সে কী করেছে অমূল্যর জন্যে? তাকে মানুষ বলেও মনে করেনি। অমূল্য দেবতা তাই তার মতো স্ত্রীকে এতদিন বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। অন্য কেউ হলে এমন স্বার্থপর মেয়েকে বাড়ি থেকে দূর করে দিত। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল প্রতিমার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি ফিরল অমূল্য।

ম্লান স্বরে মাথা নিচু করে প্রতিমা বলল, এত দেরি হল কেন?

কেন বল তো? অফিসে কাজ ছিল—

বসো এখানে!

অবাক হয়ে অমূল্য বলল, কী?

আমার ভীষণ অসুখ করবে—

প্রতিমার স্বর শুনে অমূল্য বুঝতে পারল সে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। তাই আরও অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কেন অসুখ করবে? কী হয়েছে তোমার প্রতিমা?

আমি আর বাঁচতে চাই না—

কেন? কোনোদিনও অমূল্যর কাছে প্রতিমা এমন ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠেনি। আজ ওকে একেবারে অচেনা মনে হচ্ছে তার।

রুদ্ধস্বরে প্রতিমা বলল, আমার মরে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু এসব কথা তুমি কেন বলছ প্রতিমা? কী হয়েছে তোমার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রতিমা বলল, আমি তোমার ওপর অবিচার করেছি। একদিনের জন্যেও তোমার সেবা করিনি—

অমূল্য বলল, কিন্তু তা নিয়ে আমি কোনোদিনও কোনো অভিযোগ করিনি প্রতিমা। ভগবান আমাকে মেরে দিয়েছেন। আমার চেহারা দেখে লোকে ভয় পায়—

না পায় না, বেশ জোর দিয়ে প্রতিমা বলল, এলা তো আপনার লোকের মতো তোমার কাছে আসে—এলা? নাম শুনে চমকে উঠল অমূল্য।

একটু আগে এসেছিল—

এলা এসেছিল? ইস্! ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল অমূল্য, কিছু বলেছে নাকি?

হ্যাঁ—

কি—কী বলেছে সে?

স্বামীর ব্যস্ততা লক্ষ্য করে ভাঙা গলায় প্রতিমা বলল, যতো রাত্তিরই হোক না কেন, তোমাকে তার বাড়িতে আজ যেতে বলেছে, একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, বুঝলে তো সকলে তোমার চেহারা দেখে ভয় করে না—প্রতিমার কথা শেষ হবার আগেই অমূল্য উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ?

এলার ওখানে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব—

না, সমস্ত শক্তি দিয়ে অমূল্যর একটা হাত চেপে ধরে প্রতিমা বলল, আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছে তুমি দাও, কিন্তু এলার বাড়িতে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না—আমি তোমাকে যেতে দেব না—

এতক্ষণ পর অমূল্যর মুখে হাসি ফুটল কিন্তু এমন করে আমাকে কোনোদিন তুমি তো কোনো অনুরোধ জানাওনি প্রতিমা?

আমি মূর্খ। তাই একজন অ্যাকট্রেস আমাকেই বলে যায় আমার স্বামীকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে—

ছি ছি, এলা খুব ভাল মেয়ে, ওর সম্বন্ধে এসব কথা তুমি ভেব না।

আমি বোকা নই। কে ভাল আর কে মন্দ সে কথা বুঝতে আমার দেরি হয় না। যে যাই হোক, তুমি কিছুতেই এখন ওখানে যেতে পারবে না। আর ওকে বারণ করে দিতে হবে, ও যেন আর এ বাড়িতে না আসে—

অমূল্য হেসে বলল, তুমি যখন চাওনা, নিশ্চয়ই আমি এলাকে আসতে বারণ করে দেব—তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তুমি রাখতে পারবে না।

রাখব না, আবার হাসল অমূল্য, কিন্তু আমি আজ না গেলে কাল সকালে এলা আবার এসে হাজির হবে, কী ভেবে সে বলল, তার চেয়ে আমি আজ যাই—

বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে প্রতিমা বলল, না।

শোনো প্রতিমা, আমি আজ গিয়ে ওকে এখানে আসতে বারণ করে দিয়ে আসি। গ্রীষ্মের রাত, সবে সাড়ে সাতটা বেজেছে। আমি যাব আর আসব।

কিন্তু গেলেই তুমি যে দেরি করবে।

না, বিশ্বাস কর, আমি এলার ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকব না।

ঠিক?

হ্যাঁ। তুমি আমার জন্যে এমনি করে অপেক্ষা করে থাক। খুব তাড়াতাড়ি অমূল্য বেরিয়ে গেল।

(চার)

অমূল্য এসেছে শুনে এলা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে বলল, আমি ভীষণ লজ্জিত অমূল্যবাবু সামান্য টাকার জন্যে বারবার আপনাকে তাগাদা করি। চতুর্দিক থেকে এমন মুশকিলে পড়েছি—অমূল্য হেসে বলল, লজ্জা পাবার কথা আমার—আপনার নয়। বড্ড দিন আপনার টাকাটা আটকে রাখলাম, এই যে—একটা হাজার টাকার নোট এলার দিকে এগিয়ে দিয়ে অমূল্য আবার বলল, এক সঙ্গে দেব বলেই দেরি করলাম। বিয়ের পর আমাদের মতো লোকের পক্ষে হাজার টাকা জমানো কি সোজা কথা, একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল, খুশী তো?

কে জানে, স্বরে অনেক প্রকাশ করে এলা বলল, আপনাদের অফিসের চাকরি কেন ছাড়ল ভগবান জানেন—

আর কথা না বাড়িয়ে অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ যাই, প্রতিমা অপেক্ষা করে আছে—

চমৎকার বউ হয়েছে কিন্তু আপনার, এলা বলল, ওঁকে দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন হঠাৎ খুব দরকার পড়েছিল বলে সামান্য টাকার জন্যে আমি অমন তাগাদা করতে গেছি। উনি যেন আমাকে অভদ্র মনে না করেন—বাড়ীতে আমারও কাউকে জানাবার ইচ্ছে ছিল না তাই অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই যেতাম—

না-না, অভদ্র মনে করবে কেন? আমি বুঝিয়ে বলব, রাস্তায় নেমে অমূল্য মনে মনে হাসল। কোনোদিনও সে বোধ হয় প্রতিমার কাছে স্বীকার করতে পারবে না যে, বিয়ের সময় বন্ধুর অভিনেত্রী স্ত্রীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার করেছিল আর তারই তাগাদা করতে সে ছুটে আসত তার বাড়ীতে।

মনোতোষ কুশারী চিত্রিত একটি শহরতলীর স্কেচ

অগ্নিদহন

(৫৯ পৃষ্ঠার পর

গম্ভীরভাবে বললো—মড়াটা পুড়িয়ে আসুন আপনারা। আমি এই গাছ পাহারা দিচ্ছি। যাতে আমার চিরটাকাল বঞ্চিত হয়ে থেকেছে, এখনও কি আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় ফাঁকে পড়বো?

তারপর?

তারপর যা হলো সেটা গল্প কথা হলে মুচকি হেসে বলতাম—"হবেইতো, গল্পের গরু গাছে ওঠে যে!" কিন্তু এটা সত্যি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আমগাছের গোড়া খুঁড়ে বেরোলো একটা মজবুত স্টীল ট্রাঙ্ক। তা থেকে বেরোলো চন্দর ঠাকরুণের "বাবার দেওয়া দু দু'খানা বারাণসী শাড়ী, বেরোলো বালুচরী শাড়ী আর কাশ্মীরী শাল, বেরোলো বাপের বাড়ীর গা-সাজানো গয়না, আর শ্বশুরের দেওয়া মটুক সুটের গয়না। বেরোলো শাশুড়ীর দেওয়া মুক্তোর সাত লহর।

চিরবিধবা চন্দর ঠাকরুণ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, টুঁ শব্দ বেরোলো না মুখ দিয়ে। মনে হলো চন্দর ভট্টাচার্যির মতো উনিও না নিথর হয়ে যান। কিন্তু না, নিথর হলেন, বাঁ চোখটা ক্রমশঃ সংকুচিত হতে হতে আর ডান চোখটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় হাহাকার করে চীৎকার করে উঠলেন চন্দর ঠাকরুণ।

কী এই রহস্য? কে জানে! তবে পুরনো একটা রহস্য ভেদ হয়েছে।

তিরিশ বছর পরে প্রমাণিত হলো নিজেই নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছিলেন চন্দ্র ভট্টাচার্য।

কিন্তু কেন?

....

কেন তাও জানলাম। এইমাত্র জানলাম চন্দর ভট্টাচার্যির রোজনামচার খাতা পড়ে। মোটা বাঁধানো দাঁড় বাঁধা খাতা। তাতেই আপন মনে ব্যক্ত করে গেছেন চন্দর ভট্টাচার্য।

ধারাবাহিক কিছু নয়, জায়গায় জায়গায় অসংলগ্ন লেখা।

গোপাল! গোপাল! গোপাল! গোপাল আমার শনি! আমার সংসার, আমার জীবন, আমার সব কিছু ধ্বংস করছে একটা পাথরের ঢিপি! ও আমার শত্রু, ও আমার রাহু!

....

তোমার কি হলো!

তুমি কেন এমন হয়ে গেলে? ক্রমেই যে আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছো? মানুষের ভালোবাসায় আর দরকার থাকছে না তোমার? শুধু পাথরের ঠাকুরকে ভালোবেসেই তোমার সব বাসনা মিটে যাচ্ছে!

....

রক্তমাংসের মানবী থেকে, তুমিও কি পাথরের দেবী হয়ে যাবে?

... ...

তোমাকে দেখলে যে আমার ভয় করে, আমার লজ্জা হয়, আমার সমীহ হয়! দেবতার কাছ থেকে তোমাকে কি করে ছিনিয়ে আনবো আমি?

... ...

না না এ আমার সইবে না! কিছুতেই সইবে না! তোমাকে হারাতে পারবো না আমি! তোমাকে আমি ফিরিয়ে আনবো, আবার পরাবো তোমায় নীলাম্বরী শাড়ী, পরাবো বেলফুলের গোড়েমালা, দেবী থেকে মানবী!

গোপাল! গোপাল! গোপালকে সরাতে হবে! ওকে না সরিয়ে আমার শান্তি নেই! চুরি করে জলে ফেলে দেবো? কিন্তু কখন? তুমি যে সব সময় আগলে আছো! আমার কথার উত্তরে তুমি সেদিন স্পষ্ট বললে গোপালই তোমার ধ্যানজ্ঞান। গোপাল তোমার সাতরাজার ধনের বাড়া! চুরি করতে গেলে যদি ধরা পড়ি? তাহলে কি তুমি জীবনে আর আমার মুখ দেখবে?

নাঃ! চুরি করা যাবে না, অন্য কিছু, অন্য কিছু!

... ...

সর্বনাশ!

এ কী!

এ কী হলো?

এ কি করলাম আমি? কী সর্বনাশা বুদ্ধি হয়েছিলো আমার!

হে ভগবান, আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? নিরেট মূর্খের মতো কাজ করলাম আমি? গোপালকে জব্দ করতে গিয়ে নিজের ঘরে আগুন লাগালাম?

কিন্তু তাতে কি লাভ হলো ঠাকুর? আমার প্রাণের ধনও যে পুড়ে গেলো! প্রাণের সেই ঘরে যে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সে মূর্তি যে পুড়ে কালো হয়ে গেলো! এই সৌন্দর্যহীন মূর্তি নিয়ে কি করবো আমি?

রূপ?

হ্যাঁ, রূপ ভালোবাসি বৈ কি।

কিন্তু শুধু রূপে কি আছে? রূপের সঙ্গে চাই মহিমা!

ফুলের সঙ্গে যেমন গন্ধ!

আমার ...... লেখা। হিজিবিজি অক্ষর! চন্দর ভট্টাচার্য যে এতো ভাবুক ছিলো, একথা কে কবে জানতো?

.... লোক আমায় ছিছি করছে।

করবেই তো। ...... ছিছি কাজ করলে করবে না? ......র আক্রোশ লেগে কুরূপে হয়ে গেছে বলে যে লোক ...... করা বৌকে ...... দিয়ে রেখে দেয়, তাকে কি ...... করবে?

কিন্তু সেই জন্যেই কি আমি......?

তুচ্ছ রূপ! সত্যিই যদি ...... যেতো তোমার, কি ...... ছিলো? যদি — যদি ...... আমার মনের মন্দিরে তোমার মূর্তি থাকতো তো? গোপালকে পুড়িয়ে মারতে গিয়ে তোমার সেই মূর্তি যে পুড়িয়ে ফেললাম আমি!

গোপাল তোমার ধ্যান জ্ঞান, গোপাল তোমার প্রাণের পুতুল, গোপাল তোমার পেটের ছেলের বাড়া। গোপালের টানে আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসাও তুচ্ছ হয়েছিলো তোমার কাছে। হ্যাঁ সেই জন্যেই তুমি বুঝিয়ে রেখেছিলে আমায়।

গোপালকে হিংসে করেছি, কিন্তু তোমার ওই মহিমময়ী মূর্তিকে পুজো করে এসেছি এতোদিন!

কিন্তু একী করলে তুমি?

আগুন দেখে আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত তুমি, গোপালের ঘরের দিকে দৃকপাত না করে ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলে তোমার গহনার বাক্স রক্ষা করতে!

ছি ছি ছি!........

ধুয়ে গেলো প্রতিমার গায়ের স্বর্ণতৈল আর ঘামতেলের রং। ধুয়ে গেলো মাটির ছাউনী। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে খড় আর বাঁশ! এ নিয়ে আমি কি করবো!

....

কিন্তু এ কথাতো তোমায় বলতে পারবো না।

নিজের এই খড় বাঁশের কঙ্কাল দেখে তুমি শিউরে উঠবে, মরমে মরে যাবে। তার থেকে আমায় ভুল বোঝো। আমায় ঘৃণা কোরো!"

....

আর কিছু লেখা ছিলো কিনা জানি না। শেষের পাতাগুলো আরশোলায় খেয়ে দিয়েছে।

পড়ার শেষে আর কিছু ভাবছি না, শুধু ভাবছি, সেই খড়ম আর মটকার থানপরা লোকটাও একদিন যুবক ছিলো, ছিলো এমন অদ্ভুত রকমের ভাবুক। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে অবিরাম শুধু লোক নিন্দে আর ছিছিক্কার শুনে গেছে, কোনোদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেনি।

আর চন্দর ঠাকরুণ?

তিরিশ বছর ধরে শুধু পতি নিন্দাই করে এসেছেন চন্দর ঠাকরুণ! আমার অন্যমনস্ক দৃষ্টির সামনে চন্দর ঠাকরুণের চুলের আভা আর সমস্ত রূপের আভা ম্লান হতে হতে কুঁচকে কালো হয়ে যাচ্ছে তাঁর আগুনে পোড়া ডানগালের মতো!

তাইতো বলছি চন্দর ঠাকরুণদের কখনো অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আচমকা দেখে ফেলবেন না। দেখবেন তার আত্মস্থ অবস্থায়, একটা পাশ থেকে। যে দিকটা তাজা, যে দিকটা লাবণ্যমণ্ডিত।

---

* তীর্থ বৈচিত্র্য *

সুরেন্দ্রনাথ সিংহ

একাকী সুদূরে ভ্রমি জীবন ব্যাপিয়া,
পুণ্যভূমি ভারতের সারা তীর্থ মাঝে;
যেদিকে ফিরাই আঁখি সৌন্দর্য বিরাজে,
অভিভূত কোরে দেয় মোরে বিশ্ব-প্রিয়া।
বিচিত্র মিলনে প্রেমে ব্যাকুল ...রিয়া;
প্রেরণা পরশে প্রিয় ভুলায় আমারে;
চেতনায় বেদনায় লভিতেছি তারে,
সুন্দরের সাধনায় উদ্ভাসিত হিয়া।

কন্যা-কুমারিকা হোতে উর্ধ্বে হিমাচল,
তাজের মর্মর-স্মৃতি আবু, দিল্লোয়ারা;
ইলোরা, অজন্তা আর পার্বত্য অঞ্চল
সর্বত্র দেখেছে হৃদি প্রীতি-সুধা-ধারা।
ক্ষুধার আবৃত স্নেহে ভুলায়ে রেখেছে,
চিত্তমত আলোকে দীপ জ্বালায়ে দিয়েছে!

অভিনয়

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

পিসিমা টান মেরে হরিণের চামড়াটাকে রাস্তায় ফেলে দিলেন। সারা বাড়িতে ময়লা গঙ্গাজলের বান ডাকল। চাকরটাকে দিয়ে কোথা থেকে গোবর আনালেন—মোজেয়িক ফ্লোরের ওপরে গোবরের এক বিরাট পলেস্তারা লেপে দিলেন।

আমি জানতাম, আজ রাত্রে একটা অঘটন ঘটবে। সারা বিকেল সবিতা চুপ করে রইল, রাত্রে পিসিমার মতো সে-ও অনশন ধর্মঘট করলে। তারপর শুতে এসে জিজ্ঞাসা করলে, পিসিমাকে কবে কাশীতে পাঠাচ্ছ?

আমি বিপন্ন হয়ে বললাম, এখন কী করে পাঠাই? ডাক্তার বলছেন, ও'র হার্টের অবস্থা এখনো খুব ভালো নয়। একা ওখানে গিয়ে যদি হঠাৎ কিছু একটা হয়ে যায়—

সবিতা একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, তাহলে একটা কাজ করি। যে-ক'দিন ও'র হার্ট ভালো না হয়, আমি বরং সে-দিন-ক'টা বকুলবাগানে গিয়েই থাকি।

বকুলবাগানে সবিতার বাপের বাড়ি।

আমার মেজাজটা বিশ্রী হয়েই ছিল। এর আগে পিসিমার অনেকগুলো বাক্যবাণ আমাকে হজম করতে হয়েছে, হঠাৎ মনে হল এ-ব্যাপারে আমার জন্যে খানিকটা সহানুভূতি বোধ করা উচিত ছিল সবিতার। কিন্তু সহানুভূতি দূরে থাক, সবিতা কাটা ঘায়ে নুন আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

আমি বলে ফেললাম, জানোই তো পিসিমাকে। কুকুরটাকে একটু সামলে রাখলেই তো চলত।

—আমাদের বাড়িতে কুকুর ছাড়াই থাকে। তাকে অস্পৃশ্য অধম বলে মনে করা হয়না।

—কিন্তু পিসিমা তো তোমাদের বাড়ির লোক নন। তাঁর একটা আলাদা সংস্কার আছে। সে-দিকটাও দেখা উচিত।

সবিতা বিছানার ওপরে উঠে বসল : তা হলে তাঁর সংস্কার নিয়েই তিনি থাকুন। আমি আমার সংস্কারেই ফিরে যাব। তাছাড়া তুমি যে পিসিমার এতখানি আঁচলচাপা—এমন মেরুদণ্ডহীন—এটাও জানতাম না। এর পর থেকে তোমার ওপর শ্রদ্ধা রাখা আমার পক্ষে শক্ত হবে।

প্রথম কথাটা তেমন গায়ে মাখিনি, কিন্তু সবিতার শেষ কথাটা কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মতো আমার সারা গায়ে যেন বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিলে। আমি তীব্রভাবে বললাম, শ্রদ্ধা না রাখতে পারো—রেখো না। তাই বলে তোমাদের খেয়ালখুশি মাফিক আমি পিসিমাকে এ-অবস্থায় কাশীতে পাঠিয়ে দিতে পারব না।

—বেশ তো—পারবার দরকার নেই। আমাদের মান-অপমানে যখন তোমার কিছু আসে যায় না, তখন তাঁকে নিয়েই সংসার করো—হাওয়ায় চাবুকের আওয়াজের মতো কথাটা ছেড়ে দিয়ে সবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—সোজা চলে গেল ছাতের দিকে।

পরদিন সকালেই সবিতা ট্যাক্সি ডেকে রওনা হল বকুলবাগানে। এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খেলো না। যাওয়ার আগে একটা কথাও বলে গেল না আমাকে। পিসিমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার জন্যেই তোর সংসারে এমন অশান্তি হল বাবা। তুই বৌমাকে ফিরিয়ে আন, আমি আজই কাশীতে চলে যাচ্ছি।

আমি শক্ত গলায় বললাম, তুমি কেন যাবে পিসিমা? তুমিই থাকবে এখানে। এবাড়িতে সবচেয়ে বেশী দাবি তোমারই।

পিসিমা বললেন, আমার আর কিসের দাবি বাবা? আমি তো সব বন্ধন কেটে বিশ্বনাথের পায়েই ঠাঁই নিয়েছি। আমাকে ছেড়ে দে। তোরা সুখী হলেই আমার যথেষ্ট—এর বেশি আমি আর কিছুই চাইনে।

আমি জবাব দিলাম না। অফিসে চলে গেলাম।

ট্রামে যেতে যেতে মনে পড়তে লাগল : দু বছর বয়সে আমি মা-কে হারিয়েছিলাম। গ্রাম থেকে এলেন নিঃসম্পর্কীয়া পিসিমা—অসীম স্নেহে আমাকে কোলে টেনে নিলেন। তারপর থেকে একটি দিন আমি মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। কোনোদিন যদি সামান্য একটুখানি জ্বর হয়েছে—তা হলেই পিসিমার আহার-নিদ্রা থাকেনি, চব্বিশ ঘন্টা আমার মাথার কাছেই বসে থাকতে দেখেছি। পনেরো ষোলো বছর বয়সে একবার শক্ত রকমের টাইফয়েড্ হয়েছিল—পিসিমা তখন কেবল সেবা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, কালী-বাড়িতে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো সাজিয়েছিলেন আমার কল্যাণ-কামনায়।

সেই পিসিমাকে সবিতা বুঝল না। শুধু বাইরের আচারটাই দেখল—ও'র স্নেহের সেই অন্তঃশীলা দিকটা আবিষ্কার করতে পারলো না। ক্ষুব্ধ অভিমানে আমি ভাবতে লাগলাম, সেই ভালো। সবিতা বাপের বাড়িতেই থাকুক। পিসিমার স্নেহচ্ছায়াতেই আমার দিনগুলো পরম শান্তিতে কেটে যাবে।

অফিস থেকে ফিরতে রাত হ'ল। ইচ্ছে করেই রাত করেছিলাম। বহুক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর—কালো-আকাশ ছাওয়া একরাশ তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সবিতাও যে এত সহজে ভুল বুঝবে তা কে জানত? পৃথিবীতে কোনো মেয়ের মনের কাছ থেকেই কি এতটুকু গভীরতার আশা করা যায় না?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, পিসিমাও নেই। তিনি বেনারস এক্সপ্রেসে চলে গেছেন—চাকরটা তাঁকে তুলে দিয়ে এসেছে। বলেছেন, তোর কোনো ভয় নেই বাবা। তোর বাবুকে বলিস্, আমি ষ্টেশন থেকে টাঙ্গা নিয়ে ঠিক বাসায় চলে যাব।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার আরও মনে পড়ল, পিসিমাও কম অভিমানিনী নন। বিধবা হয়েও শ্বশুরবাড়িতে তাঁর মর্যাদার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু ছোট দেবরের একটিমাত্র কথায় তিনি এক বস্ত্রে সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন—আর ফিরে যাননি। তারা সাধাসাধি করেছিল অনেকবার।

অতএব আমার এখানেও তিনি আর ফিরবেন না। মরে গেলেও না।

তিনদিন পরে আমি সবিতার কাছে গেলাম।

—পিসিমা চলে গেছেন। এবারে তুমি ফিরে এসো নিজের ঘরে।

ইচ্ছে করলেই সবিতা তখন সব জিনিসকে সহজ করে দিতে পারত। কিন্তু আমার কথাটাকে যে কী ভাবে নিল, তা সে-ই জানে। হঠাৎ তার চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠল।

তীক্ষ্ণ, ধারালো গলায় সবিতা বললে, তিনি থাকতে বুঝি ডেকে নিয়ে যাওয়ার সাহস ছিল না? ইন্‌ভার্টিব্রেট্।

আমি বলতে পারতাম, তুমি চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও চলে গেছেন। কাজেই সাহসের পরীক্ষা দেবার সময় পাইনি। কিন্তু ও-সব কিছুই বলা হল না। সবিতার ওই কুৎসিত গালটা যেন বিস্ফোরকের পলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদীর্ণ হয়ে গেলাম।

বললাম, আমি ইন্‌ভার্টিব্রেট্‌ই বটে। যাদের ভার্টিব্রা আছে, সে-সব উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের সঙ্গে দেখছি আমার আর পোষাবে না। বেশ, আমি যাচ্ছি। নিজে থেকে কখনো ফিরে যাও যাবে, আমি সাধতে আসব না তোমাকে।

সবিতা দীপ্ত চোখে বললে, তোমার ঘরে সেধে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন আমার কোনো-দিনই ঘটবে না। সামান্য লেখাপড়া আমি শিখেছি—নিজের পায়ে কেমন করে দাঁড়াতে হয়—তা জানি।

হন্‌হন্ করে আমি বেরিয়ে এলাম। ট্রামে উঠতে যাচ্ছি—এমন সময় শুনলাম পেছনে মুকুল ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকছে : প্রদ্যোত দা—শুনুন—শুনুন—

কিন্তু আমি আর শুনলাম না। তৎক্ষণাৎ চলন্তি গাড়িটায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল। মাস ছয়েক কোনোমতে কাটল—আমার অনুতাপের পালা শুরু হয়ে গেল। আর চলে না। এমনকি একবারে রাগ হতে লাগল পিসিমার ওপরেই। বেশ তো ছিলাম আমরা—মাঝখান থেকে তিনি এসে খামোখা একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে গেলেন।

কিন্তু সবিতার রাগ আর কিছুতেই পড়ে না। আমি বার কয়েক গেলাম, সে আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না। শ্বশুর মশায় আমার পক্ষ নিলেন—বিস্তর গালমন্দ করলেন মেয়েকে। কিন্তু সবিতা প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার মতো মেরুদণ্ডহীনের ঘর সে কিছুতেই করবে না।

শেষ পর্যন্ত মুকুল অবধি ক্ষেপে গেল। একদিন সোজা আমার কাছে এসে বললে, দিদি মুখপুড়ীর ভারী তেজ হয়েছে প্রদ্যোত দা। ওর শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি আবার বিয়ে করুন!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তুমি এ-কথা বলছ মুকুল?

এন্ সি সির ক্যাপ্টেন স্পোর্টস্‌ম্যান মুকুল বললে, কেন বলব না? দিদি যখন কিছুতেই ফিরে আসতে রাজী নয়—তখন আপনি কেন আর মিথ্যে কষ্ট করবেন? বিয়ে করে ফেলুন—আমি আছি আপনার সাপোর্টার।

বলে মুকুল চলে গেল। এক দিক থেকে হয়তো কথাটা অন্যায় বলেনি—এভাবে মিথ্যে প্রতীক্ষা করবার কোনো অর্থ হয় না। এখন স্বচ্ছন্দেই আমাদের মধ্যে লিগ্যাল্ সেপারেশন
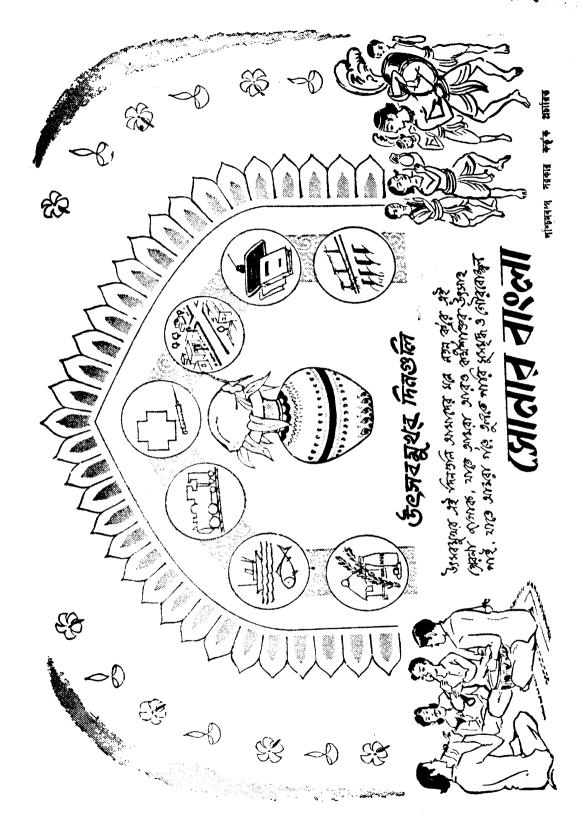
হতে পারে। আমিও নতুন করে শুরু করতে পারি—সবিতাও মুক্তি পায়।

কিন্তু মনের মধ্যে কিছুতেই সাড়া পেলাম না। ক্রমাগত অনুভব করতে লাগলাম এ আমার পৌরুষের অপমান। আমার মনুষ্যত্বের গ্লানি। নিজের শক্তি দিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি জয় করতে পারলাম না—শেষ পর্যন্ত তার একটি অন্ধ জেদের কাছেই আমায় হার মানতে হল। এতবড় লজ্জা নিয়ে বন্ধুদের সামনে আমি কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়াব!

আমি প্রদ্যোত লাহিড়ী—ছাত্র-জীবনে কোনো পরীক্ষায় ফেল করিনি। এম-এ, ল'—সবগুলোই পাশ করেছি কৃতিত্বের সঙ্গে। খেলার মাঠেও কিছু নাম ছিল এক সময়ে। আজকে যে চাকরি করি, যে কোনো শিক্ষিত বাঙালি ছেলের পক্ষেই তা লোভের বস্তু।

তা হলে কেন হার মানব সবিতার কাছে? এত সম্পদ থাকতেও কেন মুখ লুকিয়ে সরে আসব কাঙালের মতো? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাকে দেখলাম। না—এখানেও আমি ঠকিনি। রূপবান কিনা জানি না—কিন্তু কোনো মেয়ে অন্ততঃ আমায় কুশ্রী কদাকার বলবে না। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে চোখ-মুখ আমার ঝলমল করছে। নার্সিসাস্ না হয়েও বলতে পারি—আমার চেহারার সঙ্গে যদি আমি প্রেমে পড়ে যাই, তা হলে কেউ সেটাকে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করবে না।

এত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সবিতা আমায় স্বীকৃতি দেবে না? অসম্ভব—এ কিছুতেই হতে পারে না। যেমন করে হোক—তাকে আমায় জয় করতে হবেই।

সবিতাকে টেলিফোনে ডেকে বললাম, তোমার সঙ্গে শেষবার খানিকটা আলোচনা করতে চাই।

—কোনো দরকার নেই। সব আলোচনা শেষ হয়ে গেছে—এই বলে সবিতা কনেক্শন কেটে দিলে।

নিরুপায় ক্রোধে আমি রিসিভারটাকে আছড়ে ফেললাম। ইচ্ছে করতে লাগল, নিজের হাত দুটোকেই কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিই।

এমন সময় আবার মুকুল এসে হাজির।

—দিদি বিহারের কী একটা কলেজে চাকরি পেয়েছে। চলে যাচ্ছে আসছে মাসেই। ডিভোর্সের কাজটা এখুনি সেরে নিন প্রদ্যোত দা।

বললাম, না। এত সহজেই আমার অধিকার আমি ছাড়তে পারব না। তা ছাড়া এমনি একটা কেস নিয়ে কোর্টে গিয়ে দাঁড়ানোর চাইতে আত্মহত্যা করা অনেক বেশি সম্মানের হবে প্রদ্যোত লাহিড়ীর পক্ষে।

মুকুল চিন্তিত হয়ে বললে, তাই তো। তা হলে?—তার পরেই ওর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একুশ বছরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা রোমান্টিক কল্পনা চাড়া দিয়ে উঠল ওর মাথায়।

—একটা উপায় আছে প্রদ্যোত দা। শেষ অস্ত্র আপনার।

—কী উপায়?

—জেলাসি।

—মানে?

—আর একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ঘটা করে মিশতে আরম্ভ করুন। দিদি কখন কোথায় যায়—সব খবর আমি সাপ্লাই করব। আপনি এমন ব্যবস্থা করবেন—যাতে ব্যাপারটা ওর ভালো করে চোখে পড়ে। তারপরে আমার ম্যানিপুলেশন তো আছেই। দেখুন না একবার চেষ্টা করে।

এত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পেলো।

—কী পাগলামি করছ মুকুল। জীবনটা নাটক নয়।

—কে বললে প্রদ্যোত দা? জীবন নিয়েই তো নাটক। কখনো কখনো নাটকের সুরটা জীবনের চাইতে খানিক চড়া পর্দায় তুলে দিতে হয়—এইটুকুই যা তফাৎ।

আমি বললাম, না—না, সে হয় না।

মুকুল ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

ওকে আমল দিলাম না বটে, কিন্তু কথাটা মাথা থেকে একেবারে মুছে গেল না। অলস কল্পনার মতো গুঞ্জন করতে লাগল সারা সকাল। তারপর অফিসে এসে নতুন টাইপিস্টকে যখন জরুরি একটা চিঠি ডিক্টেট্ করছি—তখন মুকুলের আইডিয়াটা আবার বিদ্যুৎ-চমকের মতো ফিরে এল।

নতুন টাইপিস্টটি পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ। সামান্য সর্টহ্যান্ড আর টাইপরাইটিং জানে। আমার এক বন্ধু ওকে আমার কাছে এনে দিয়েছিল। অনেক মিনতি করে বলেছিল, চাকরিটা একে করে দাও ভাই—একটা বিপন্ন সংসার রক্ষা পাবে।

শীর্ণ, শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। গভীর কালো দুটি চোখের তারা—হঠাৎ দেখলে মনে হয় জলে টল টল করছে। আমার ভারী করুণা হয়েছিল। বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিনি—চাকরি দিয়েছিলাম।

মেয়েটির নাম মায়া।

আজ যখন আমার সামনে বসে এই প্রায়-কিশোরী, ভীরু শ্যামবর্ণা মেয়েটি ডিক্টেশন নিচ্ছিল, তখন আচমকা খেয়ালে আমার মনে হল, একে কাজে লাগালে কেমন হয়? এর জন্যে অনেক কিছুই তো আমি করেছি, প্রতিদানে এর কাছ থেকে এটুকুও কি আশা করতে পারি না?

বললাম, ছুটির পরে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো মায়া। কথা আছে।

মায়া একবার সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। হয়তো ভাবল—কোথায় কী অপরাধ করে ফেলেছে—ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

বিকেলে আমি সব খুলে বললাম ওকে অকুণ্ঠভাবেই। আমার স্ত্রীর কথা, তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কথা। শান্ত গভীর চোখ মেলে সব শুনে যেতে লাগল, কোনো জবাব দিলে না।

তারপরে আমার প্ল্যান ওকে খুলে বলতেই ও চমকে উঠল। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল মুহূর্তে।

—না-না, সে আমি পারব না।

—কেন পারবে না? এ তো অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। এর মধ্যে তো কোনো সত্যি নেই?

—মাপ করবেন, আমি—

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, বেশ, তা হলে থাক। তুমি যদি রাজী না থাকো, আমি তো তোমার ওপরে জোর করতে পারি না। তবে এক সময়ে আমি তোমার কিছু উপকার করেছি, তাই ভেবেছিলাম—

মায়া কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল নিঃশব্দে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, আপনি যা চান—তাই হবে।

আর, ওদিকে মুকুল লাফিয়ে উঠল।

—ঠিক আছে প্রদ্যোত দা—আর ভাবনা নেই। কাল শনিবার তো? আপনি অফিসের পর আপনার টাইপিস্টকে নিয়ে বটানিক্যলে বেড়াতে চলে যান। আমি ওদিকে দিদিকে ম্যানেজ করে ফেলছি।

পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল। মায়াকে নিয়ে কোথায় কীভাবে আমি বসব—দূর থেকে জিনিসটা কতখানি রোম্যান্টিক দেখাবে, সে-সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি প্ল্যান করে ফেললাম। একেবারে নিখুঁত স্টেজ-এ্যাক্টের ব্যাপার।

যথাসময়ে পরের দিন আমি মায়াকে নিয়ে বটানিক্যলে চলে গেলাম।

বসলাম গিয়ে ভাঙা জেটিটার ওপর—যেখানে সচরাচর কেউ বসে না। বসলাম মায়ার গা ঘেঁষে। সামনে রৌদ্র-ঝলমল গঙ্গা—মাথার ওপরে গাছের ছায়া কাঁপছে—পাখি ডাকছে একটানা। মায়া পাথরের মতো শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে রইল।

কী বলব—কী বলা উচিত ভেবে পেলাম না। একবারের জন্যে চোখে পড়ল মায়ার শাড়ীটা ভারী খেলো—ওর পায়ের জুতোজোড়া জীর্ণ আর বিবর্ণ। পায়ে ছেঁড়া জুতো দেখলে আমার কেমন বিশ্রী লাগে। মনে হয় এর চাইতে দারিদ্র্যের দীনতা আর কোথাও নেই—মেয়েদের ক্ষেত্রে তো নেই-ই।

চুপ করেই বসেছিলাম আমরা। হঠাৎ পেছনে মুকুলের উচ্ছ্বসিত গলা ভেসে এল: দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্—সামনে গঙ্গাটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

কোড্-সিগন্যাল! সঙ্গে সঙ্গে মায়ার একখানা ঠান্ডা শীর্ণ হাত আমি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলাম। থর থর করে কেঁপে উঠল মায়া—একটু হলেই গঙ্গার জলে পড়ে যেত।

মুখ না ফিরিয়েও শুনতে পেলাম, আমাদের পেছন দিয়ে দু-জোড়া জুতোর শব্দ এগিয়ে চলে গেল। একটা নতুন কম্বিনেশন শু—মুকুলের; আর একটা মেয়েদের চটির আওয়াজ—একটু বেশি চঞ্চল আর দ্রুত। যেন [illegible] তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল জায়গাটা।

আর আমি তৎক্ষণাৎ মায়ার হাতটা ছেড়ে দিলাম। মড়ার হাতের মতো সেটা ধপ করে পড়ে গেল।

আরো মিনিট তিনেক বসবার পরে উঠে বললাম, চলো।

মায়া নড়ল না। তেমনি পাথর হয়ে বসে রইল।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, শুনতে পাচ্ছ না? চলো, যাওয়া যাক। আজকের মতো অভিনয় মিটে গেছে।

মায়া নিঃশব্দে একটা ছায়ার মতো উঠে দাঁড়ালো।

ফেরার পথে আমরা একটা কথাও বলিনি। না। ট্যাক্সির পেছনের সীটে মায়াকে বসিয়ে আমি বসলাম ড্রাইভারের পাশে। সমস্ত মনটা বিস্বাদ হয়ে ছিল। নিজের নির্লজ্জ অভিনয় যেন আমাকে চাবুক মারতে লাগল এখন। ছি ছিঃ—কী ভাবল যে সবিতা! অন্ততঃ আমার চরিত্রের এই দিকটা সম্পর্কে ওর [illegible] শ্রদ্ধা এতদিন ছিল।

মায়াকে আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারতাম—কিন্তু কোনো উৎসাহ ছিল না। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে আমি ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যায় আলো নিবিয়ে চুপ করে ঘরে বসে ছিলাম। কেমন একটা আত্মগ্লানির পালা এসেছে—তীক্ষ্ণ অনুতাপে জর্জরিত হচ্ছে মন। নিজের হাতটাকে অদ্ভুত [illegible] ক্লেদাক্ত বলে বোধ হচ্ছে। সবিতার ঘৃণাভরা চোখ দুটো যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম। শেষকালে অফিসের একটা টাইপিস্ট্—আর ওই তার চেহারা! ছিঃ—আমার সম্পর্কে কী ভাবল সবিতা!

জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে সোল্লাসে মুকুল এসে ঘরে ঢুকল।

—আরে মন খারাপ করে অন্ধকারে বসে আছেন কেন প্রদ্যোত দা? গুড্ নিউজ। ওদিকে ওষুধ ধরেছে!

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম: তাই নাকি?

—আমার প্ল্যান প্রদ্যোত দা—[illegible] সাকসেস্। বাড়িতে ফিরেই দিদি [illegible] বলে সটান নিজের ঘরে গিয়ে [illegible]। আমি গিয়ে আরো ভালো করে তাতিয়ে দিলাম। বললাম, প্রদ্যোত দা-র দোষ কী? সে [illegible] আর কত-দিন হাঁ করে বসে থাকবে তোমার আশায়? শুনছি, অফিসের ওই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে কিছুদিনের মধ্যে। শুনে দিদি চিৎকার করে বললে, তুই বেরো আমার সামনে থেকে।—[illegible] উচ্ছ্বসিত হয়ে [illegible]: তুমি [illegible] এ-কথা এমনি [illegible] দিদি [illegible] একটা [illegible] পড়ল না। [illegible] [illegible] একেবারে [illegible]। [illegible] ইন্‌সাল্টিংলি [illegible]। [illegible] দু-চারদিন [illegible]—দেখবেন দিদি নিজেই [illegible] ছুটে [illegible]।

[illegible]

আর শাড়ীটা [illegible]—ঠিক [illegible] পাশ দিয়ে [illegible] ফিরেও দেখল না।

মুকুল এসে খবর দিল [illegible] দিদি ঘুমোয়নি—[illegible] দেখলাম, ওর চোখ দুটো [illegible]।

—আর কত দেরি মুকুল?

—দেরি নেই প্রদ্যোত [illegible] এসেছে সব। আজ [illegible] থেকে দিদির অ্যাপয়েন্টমেন্ট [illegible] দিদি সেটাকে ছিঁড়ে জানালা [illegible] দিয়েছে। চালিয়ে যান প্রদ্যোত [illegible]

—কিন্তু অফিসে যে [illegible] নিয়ে কথা উঠেছে হে।

—উঠুক না—উঠবে [illegible] এবং আপনার ফেরবার [illegible] ফিরে এলে আর ভাবনা [illegible]?

মানুষ [illegible] হয় তাড়াতাড়ি ফেনিয়ে তোলে—তার তাড়াতাড়ি ভুলেও যায়। আপনি ঘাবড়াবেন না। চিয়ারিও!

সেদিন অফিসে বিবর্ণ নীরক্ত মুখে মায়া আমার ঘরে এসে ঢুকল। সামনে একটা কার্ড রেখে বললে, এটা আমার টেবিলের ওপর ছিল।

পড়ে দেখলাম, তাতে বড় বড় হরফে লেখা আছে: কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্, টু মিসেস মায়া লাহিড়ী।

ওর দিকে তাকিয়ে আমার সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। বললাম, কিছু মনে কোরো না মায়া। আর বেশিদিন তোমায় কষ্ট পেতে হবে না। শুধু একটা কথা বলে রাখি। আমার জন্যে যা তুমি করলে, তার দাম দেব না—এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই। কিছুদিনের মধ্যেই একটা মোটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট হবে তোমার। আর তোমার সেই আই-এ ফেল বেকার ভাইটারও একটা ব্যবস্থা প্রায় করে এনেছি—আসছে মাসেই তার চাকরি হবে।

মায়া উচ্ছ্বসিত হল না—একটা কথাও বললে না। কেবল দুটো জলভরা কালো চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপরে একবার ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

নাটকের ক্লাইম্যাক্স ঘটল তিন দিন পরে। সিনেমায়।

প্রেমের গল্প। আমার দু-একবার মনে হল যেন পাশে মায়া বার বার চঞ্চল হয়ে উঠছে—ওর চাপা দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে থেকে থেকে। কিন্তু সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম, মাত্র দুটো রো পেছনেই বসে আছে সবিতা—ওর চোখ যতখানি পর্দায়—তার চাইতেও বেশি করে পড়ে আছে আমাদের দুজনের ওপরে। আর সে চোখে ছুরির ধার।

ইনটারভ্যালের আলো জ্বলল।

দেখি, কেমন এলিয়ে বসে আছে মায়া। এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ড্ হলে আমার শীত-শীত করছিল কিন্তু মায়ার কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম চিক্‌ চিক্ করে উঠছে।

আর তক্ষুণি এগিয়ে এল মুকুল। হাসির ছটায় উদ্ভাসিত চোখ।

—একবার বাইরে আসুন প্রদ্যোত দা। লবীতে দিদি আপনাকে ডাকছে।

আমি বুঝলাম। প্রায় লাফিয়ে উঠলাম সীট্ থেকে। মায়ার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেয়ো।

মায়া আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে—আমার কথাটা সম্পূর্ণ শুনতে পাচ্ছে না—বিশ্বাসও করতে পারছে না। কিম্বা এই মুহূর্তে ও আমাকে চিনতেই পারছে না ভালো করে।

আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

সবিতা অপেক্ষা করছিল লবীতে। মুখটা টকটকে লাল—দু চোখে আগুন জ্বলছে।

বিনা ভূমিকাতেই বললে, কী ভেবেছ তুমি? এত শিক্ষা, এত কাল্‌চার সত্ত্বেও শেষকালে এই টাইপিস্টের সঙ্গে—?

বললাম, কী করব বলো। তুমি যখন ফিরবেই না, তখন বাধ্য হয়েই—

লবীর মধ্যে দাঁড়িয়ে যতটা চিৎকার করা সম্ভব, সবিতা তাই করলে। বললে, কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এখুনি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে চলো। তুমি কি ভেবেছ আমি বেঁচে থাকতে ওই মেয়েটা আমার ঘরে গিয়ে ঢুকবে? তার আগে—

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি ডাকলাম। দেড় বছর পরে ফিরে এলাম সবিতাকে নিয়ে। দেড় বছর পরে আমার পৌরুষের কাছে হার মানল সবিতা। নাউ—উই আর হ্যাপিলি রি-ইউনাইটেড্!

প্রদ্যোত হাসল।

লাঞ্চের সময় শেষ হয়ে গেছে। অফিসে ফিরে আসছে কেরাণীর দল। আমিও ওঠবার উপক্রম করলাম।

প্রদ্যোত বললে, আজ সন্ধ্যায় গ্রেট ইস্টার্ণে মুকুলকে একটা ভালো ডিনার দিতে হবে। মায়াকেও আসতে বলেছি। তুমিও এসো না সুকুমার? চমৎকার হবে।

আমি বললাম মন্দ কী! প্রীতিভোজের এর চাইতে ভালো উপলক্ষ্য কী হতে পারে?

ঠিক সেই সময়ে একটা বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট, একখানা পাঁচ টাকার নোট আর একটা দরখাস্ত প্রদ্যোতের সামনে রেখে বললে, মিস্ রায় এগুলো আপনাকে দিতে বলে চলে গেলেন।

—মিস্ রায়! মায়া! —দরখাস্তের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রদ্যোত বললে, হোয়াট্! রিজাইন্ দিয়েছে!

আমি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছিলাম—দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রদ্যোত বললে, লুক সুকুমার—হোয়াট্ এ ফুল! চাকরি ছেড়ে দিলে! খাবে কী? দুদিন পরে ইন্‌ক্রিমেণ্ট হত—ওর ভাইটার একটা ব্যবস্থা করেও এনেছিলাম। সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল? ইডিয়ট! আর এই প্যাকেটটাই বা কিসের? টাকাই বা কেন?

আমি কিন্তু প্যাকেটটা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ওর ভেতরে একটা শাড়ী আছে—ওপরে নিউ মার্কেটের দোকানের ছাপ। আর ওই পাঁচটা টাকা বোধ হয় ট্যাক্সি ভাড়া—সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যে নোটটা প্রদ্যোত মায়ার হাতে গুঁজে দিয়েছিল।

একটি গান

শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তী

যমুনার তীরে বসি কাঁদি একেলা
হারায়ে ফেলেছি তারে
যে ছিল সাথী কিশোর বেলা।
চঞ্চল ছিল মম ছন্দ
চম্পা করবী দিত গন্ধ
সমীর বহিয়া যেত ধীরে
গান কত গেয়েছি সুরেলা।
আজ হায় তুমি নাই, তুমি নাই
মোর ভুবন কাঁদিয়া কহে তাই
কেন অকারণ বাঁশী বাজে
সহিতে পারিনে বেদনা যে
তুমি দূরে বসি বাঁধি প্রাণ
মোরে দিয়ে শুধু অবহেলা॥

চন্দ্রমুখী

(৪৯ পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে শেয়ালগুলোকে ছাই তো আর করে দিতে পার না! তাহলে করবে কি?

—তাই তো ভাবছি। কি করি বল দেখি?

ব্রজেন্দ্রের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।

দুটি পথ আছে। —হৃষীকেশ বললে।

—কি কি?

—এক, তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বৌএর কাছে থাক।

—সে কি সম্ভব?

—না। দুই, সবশুদ্ধ নিয়ে কলকাতায় বাসা কর।

সেও কি সহজ?

—না। প্রথমটি অসম্ভব, দ্বিতীয়টি কঠিন।

—দেখি ভেবে।

হৃষীকেশ মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল। ব্রজেন্দ্র ভাবতে বসল। কিন্তু ভাববারই বা সময় কই? রাত্রের ট্রেণেই ফিরতে হবে।

চন্দ্রমুখী পরিষ্কার বলে দিলে, রাত্রের ট্রেণে যদি যাও, আমরাও সঙ্গে যাব। ক'দিন বাপের বাড়ীতে থেকে তারপরে কাছাকাছি একটা বাসা খুঁজে নিলেই চলবে।

শুনে ব্রজেন্দ্রের সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে গেল! কিন্তু সে সাড়া দিলে না।

বিকেলে হৃষীকেশ যখন যথারীতি জিজ্ঞাসা করলে, তোর তো ঘুম ভাঙে। আমাকে না ডেকে যাসনে যেন, সেবারকার মতো।

ব্রজেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, আমি রাত্রির ট্রেণে যাচ্ছি না বোধ হয়।

—যাচ্ছিস না? ছুটি নিয়েছিস? বলিসনি তো কই!

—ছুটি নিইনি নোব।

—হঠাৎ ছুটি নিবি?

হৃষীকেশ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ব্রজেন্দ্র ওর মুখের দিকে চাইলে দেখতে পেত, ওর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ঝিকমিক করছে।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র মুখ তুলে চাইলে না। চাইবার সাহসেরই তার অভাব ঘটেছে। বললে, অনেকগুলো ছুটি পাওনা আছে, শরীরটাও ভালো লাগছে না। ভাবছি কয়েক দিন বিশ্রাম নোব।

—তাই নে। তোর বিশ্রামের দরকারও হয়েছে।

হৃষীকেশ ফিক করে হেসে ফেললে।

ব্রজেন্দ্র চোখ তুলে চাইতেই এই হাসিটা তার চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাগে ব্রজেন্দ্রের পিত্ত জ্বালা করে উঠল: হাসছিস। হাসির কেন? হাসির কি আছে?

—না, হাসিনি। বিশ্রাম নে কিছুদিন।

হৃষীকেশ চলে যেতে টুলু ছুটে এসে বললে, বাবা, শীগ্‌গির ভেতরে এস। মা ডাকছেন।

ব্রজেন্দ্র একবার অপসৃয়মান হৃষীকেশের দিকে চাইলে, সে এই তলবটা শুনতে পেলে কি না। পায় নি হয়তো। কি হয়তো পেয়েছে, বন্ধুমহলে এই নিয়ে হাসাহাসি চলবে তাহলে।

কিন্তু টুলু দ্বিতীয়বার চীৎকার করবার আগেই সে ভিতরে চলে গেল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় পাড়ার মেয়েদের ভীষণ ভিড়। একটা-কিছুকে ঘিরে এই ভিড়। কিন্তু সেই কিছুটা যে কি, বাইরে থেকে ব্রজেন্দ্র ঠিক বুঝতে পারলে না।

টুলু বললে, পুকুরঘাট থেকে ঘড়া নিয়ে আসতে পা পিছলে মা পড়ে গেছেন। কাকিমারা কোনো রকমে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছেন। তারপরে রান্নাঘরে বসতেই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে আবার কি!

ব্রজেন্দ্র এগিয়ে এল। বৌরা তাঁকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিলে। কিন্তু সরে গেল না। যে যেখানে ছিল, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, সেইখানেই রইল। পাড়ার একটি মেয়েও সেখানে ছিল। সে চীৎকার করে বললে, শীগ্‌গির মধু ডাক্তারকে ডেকে আনুন। বৌদি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তখনই ছুটে গিয়ে ব্রজেন্দ্র মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ভিড় সরিয়ে সে রোগিণীকে পরীক্ষা করলে। জিজ্ঞাসা করলে, হিষ্টিরিয়া আছে না কি?

—জানি না তো।—ব্রজেন্দ্র কাঁচুমাচু করে বললে।

একটা ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রমুখীর জ্ঞান হল। আরও কিছু পরে পাড়ার মেয়েরা অস্ফুট কণ্ঠে এই সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা করতে করতে চলে গেল।

সবাই চলে যেতে ব্রজেন্দ্র ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—কি হয়েছিল?

চন্দ্রমুখী ঘটনাটা বললে। টুলু সংক্ষেপে যা বলেছিল, তারই বিস্তৃত বিবরণ।

ব্রজেন্দ্র বললে, ডাক্তার জিজ্ঞেস করছিল তোমার হিষ্টিরিয়া আছে কি না।

চন্দ্রমুখী অম্লানবদনে মিথ্যা বললে, নেই।

ব্রজেন্দ্র গুম হয়ে চিন্তা করলে, ভয়ে-ভয়ে থাকার জন্যেই এমনটা হয়ে থাকবে হয়তো। বুকটা দুর্বল হয়ে গেছে। হওয়া বিচিত্র নয়। ভয়,—ভিতরে-ভিতরে গুমরে-গুমরে ভয়,—অতি পাজি জিনিস। ওতে না হতে পারে এমন রোগ নেই। কোন ডাক্তারের কাছে ব্রজেন্দ্র যেন এমনি একটা কথা একদিন শুনেছিল।

বললে, যাও। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলে শুয়ে পড়গে।

চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে উঠে বসল। পড়ে যাওয়ায় কোমরে একটা চোট লেগেছিল ঠিকই। ওঘর থেকে কাপড় ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রান্নাঘরে এল।

ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, শুলে না যে!

চন্দ্রমুখী হাসলে। খুব করুণ একফালি হাসি। বললে, রান্না করতে হবে না?

সেই হাসি! সেই করুণ একফালি হাসি, যা তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ওষ্ঠাধরে লেগেই থাকত!

ব্রজেন্দ্রের মাথায় রাগ চড়ে গেল। বললে, না।

চন্দ্রমুখীর কটাক্ষেও ক্রোধ ঘনিয়ে এল: খেতে হবে না?

—না।

এবারে ব্রজেন্দ্রের কণ্ঠস্বর একপর্দা নিচু।

—তবে আর কি!

চন্দ্রমুখী খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে টুলু এসে ডাকলে, মা!

—কি রে? ক্ষিদে পেয়েছে? কি খাওয়াই বল তো?

টুলু হেসে ফেললে। বললে, আহা! বাবা তো রাঁধছেন। আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ আর মাছের ঝোল। জান মা,

বিস্ময়ে চন্দ্রমুখী উঠে বসেছে। বাধা দিয়ে বললে, উনি রাঁধছেন কিরে!

—হ্যাঁ মা, সত্যি।—মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে টুলু বললে,—রান্না হয়ে এল প্রায়!

—বলিস কিরে!

—হ্যাঁ।

—এর আগে রেঁধেছেন কখনও?

—আমরা তো দেখিনি।

—কি রাঁধলেন কে জানে! হয় তো ভাত পুড়ে গেছে, নয়তো সিদ্ধ হয়নি। আর নয় তো তরকারী নুনে পুড়ে গেছে, মুখে দেওয়া যাবে না। দেখি আবার কি করছেন।

চন্দ্রমুখী উঠে রান্নাঘরে গেল। ব্রজেন্দ্র তখন মাছের ঝোলটা নিয়ে ব্যস্ত। চন্দ্রমুখী দেখলে, ওর হাতের কয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট ফোস্কা। বোধ হয় মাছ ভাজতে গিয়ে গরম তেল ছিটকে পড়েছে।

—কখনও রেঁধেছ এর আগে?

ব্রজেন্দ্রের কথা বলার সময় নেই। ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—কিসে কি মসলা দিতে হয় জান?

এবারে ব্রজেন্দ্র ওর দিকে চাইলে। বললে, টুলুর কাছে জেনে নিয়েছি।

চন্দ্রমুখী হেসে ফেললে। বললে, সর্বরক্ষে! তুমি এক পণ্ডিত, সে আবার তোমার ওপর! দেখি, সর।

ব্রজেন্দ্রের সব গেছে, কিন্তু গোঁ যাবে কোথায়? সে সরবে কি সরবে না ভাবছে, এমন সময় হৃষীকেশের গলা পাওয়া গেল: ব্রজেন আছ না কি হে!

সরবার সময় নেই। হৃষীকেশ একেবারে রান্নাঘরে দোরগোড়ায়। তার হাতে একটা বাটি।

চন্দ্রমুখী ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্র কিন্তু হাতের হাতাখানা ফেলে দেবারও সুযোগ পেলে না।

হাতের বাটিটা মেঝের উপর ঠক্ করে নামিয়ে হৃষীকেশ রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর উবু হয়ে বসল।

বললে, তুমি রান্না করছ শুনে এলাম। একটু মাছের ঝোল দাও দিকি বাটিটায়। কেমন রাঁধতে শিখলে দেখি!

শুনে ব্রজেন্দ্র কিন্তু রেগে গেল না, চীৎকারও করে উঠল না। বরং একগাল হেসে একখানা মাছ, গোটা কয়েক আলু আর এক-হাতা ঝোল ওর বাটিতে ঢেলে দিলে।

এবার পূজায়
রূপ-চর্চ্চার চরম উৎকর্ষ কুশলী-শিল্পীর নিখুঁত
অলঙ্কারে—দেহরূপ
হয়ে উঠুক অপরূপ।
এইচ, কে, দত্ত এণ্ড কোং
১০৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন-
৩৪-২৪৭৬

দ্রব্যজাত প্যাকিং-এর জন্য
সুলভে সুদৃশ্য ছাপান এবং সাদা

টীনের কৌটা,
ছাতার অংশাদি,
শীট মেটাল ও
প্লাষ্টিকের ডাই প্রভৃতি

প্রস্তুতকারক ঃ

টীন বক্স অব ইণ্ডিয়া

৭৩, বেলগাছিয়া রোড
(ট্রাম ডিপোর পার্শ্বে)
কলিকাতা—৩৭

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিস ঃ—২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা
ফোন—২২-৫৯৮৮ ও ২২-৫৯৮৯

— ব্রাঞ্চ —

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা।

উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীযুক্ত এন, ব্যানার্জি, এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার

সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দেশ ✱ ✱ ✱

সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব সেদিনও ছিল কল্পনা। সমাজতন্ত্রের দেশ ছিল স্বপ্ন! সমাজতন্ত্র বাস্তবে কী রূপ নেবে, তার রাষ্ট্রকাঠামো কেমন হবে, তার সম্ভাবনা কতোদূর—এ নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ তার বাস্তব রূপায়ণ দেখছি পৃথিবীর ৯০ কোটি মানুষের দেশ—সোবিয়েত, চীন ও পূর্ব ইউরোপের নবগণতন্ত্রে, পূর্ব-পশ্চিম গোলার্ধের দুই-পঞ্চমাংশে। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও সমাজতন্ত্রের আদিভূমিকে জানতে হলে পড়ুন——

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের *Manifesto of the Communist Party* চার আনা ॥ *Socialism Utopian & Scientific* তিন আনা ॥ লেনিনের *Karl Marx* দু' আনা ॥ *State and Revolution* ন' আনা ॥ *Imperialism* ছ' আনা ॥ কারপিনস্কির *Social and State Structure of USSR* ন' আনা ॥ কারপিনস্কির *How the Soviet State is Governed* দু' আনা ॥ (মস্কো প্রকাশিত বাংলা সংস্করণের দাম দু' আনা) ॥ মেদিনস্কির *Public Education in the USSR* তিন আনা ॥ *Moscow University* দুই আনা ॥ *American Workers look at the Soviet Union* তিন আনা ॥

॥ রুশ চিরায়ত সাহিত্য ॥

এ, পি, চেখভের *Short novels and Stories* ২৷৷৴০ ॥ তুর্গেনেভের *Rudin* ১৸৵০ ॥ গর্কির *My Childhood* ১৵০ *My Apprenticeship* ১৷৷৶০; *My Universities* ১৵০ ॥ গোর্কির *Selected Short Stories* ২।০ ॥

॥ আধুনিক উপন্যাস ॥ ডি গ্রানিনের *Those Who Seek* ২৸০ ॥ বোরিস পোলেভয়ের *A Story about a Real man* ২৷৷৵০ ॥ ভি, লাৎসিসের *Fisherman's Son* ২, ॥

॥ ছোটদের বই ॥ *Russian Folk Tales* ১৷৷৵০ ॥ ইয়েফ্রিমভের *Stories* ১৸৶০ ॥ নোসভের *The Jolly Family* ৸৶০ ॥

বিস্তারিত তালিকার জন্য লিখুন

V/O MEZDUNARADNAYA KNIGA Moscow 200

বেরিয়ে গেল হাত থেকে। ছুটে গিয়ে লেগেছে একেবারে ওই কচি মাথায়। ময়না গাছটাই শোধ হয় শোধ নিল আমার উপর, অমন করে সেটাকে গোড়া থেকে কাটলাম বলে। গাছে ওরকম শোধ নেয়। গাছ কাটতে কাটতে চাপা পড়ে লোক মরতে দেখিসনি? গাছের ডাল কাটতে কাটতে, গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙতে দেখিসনি? আঁধার রাতে একলা পেলে গাছকে ভয় দেখাতে দেখিসনি? ময়না গাছটা বুঝি আগে থেকেই ছিল আমার বিরুদ্ধে। নইলে ময়না ডালের বাঁটটা অমন পিছল হয়ে উঠবে কেন হঠাৎ আমার হাতের মধ্যে?"

দারোগাজী কাঠ কাটবার জায়গাটা থেকে ছেলে শোয়াবার জায়গার দূরত্ব ইত্যাদির একটা আন্দাজ করে নিচ্ছেন মনে মনে। মাপজোখ পরে হবে। এখন তিনি এদের কথার মধ্যে বাধা দিতে চান না। বুঝেছেন যে, আসল কথাটা এখনও বার হয়নি। বিরসার স্ত্রী বোধ হয় ভাবল যে, তার স্বামীর কথাগুলো দারোগাজীর মনে বসছে; সেইজন্য সে আগের চেয়েও বেশী চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে—"না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আমায় সন্দেহ করে। কিছুদিন থেকে দেখছি সোনাই সা'র দোকানে সওদা কিনতে গেলে বিরক্ত হয়। বলেনি আমায় কিছু, কিন্তু বোঝা তো যায়। একটু চোখে চোখে রাখছে ও আমায় দিনকতক থেকে। এমন তো ও ছিল না। আমি কি বুঝিনা। ছেলেটার রং একটু ফরসা হয়েছে বলে সোনাই সা'র উপর ওর সন্দেহ।"

"এ যদি সত্যি না হবে, তবে তুই জানলি কি করে যে আমি সোনাই সা'কে সন্দেহ করি? জবাব দে আমার কথার! শোন্ দারোগা, কোন কথা আমি তোর কাছে লুকোব না। সোনাই সা লোকটা ভাল না। বড় খারাপ। কাল রাতে শয়তানটাকে আমি খুঁজেছিলাম। ধরতে পারলে আমি ওটাকে এই কুড়ুল দিয়েই সাবাড় করে দিতাম। বংশের ইজ্জত রাখতে গেলে ঠাকুরদার কুড়ুল দিয়েই ওটাকে খতম করা উচিত। ধরতে পারিনি। ছিল না বাড়ীতে। পালিয়ে ছিল। আঁচ পেয়েছিল বুঝি আগে থেকে।"

এতক্ষণে দারোগাজী শাঁসালো খবর পেতে আরম্ভ করেছেন। সফল হয়েছে তাঁর এতক্ষণকার ধৈর্য।

"দারোগা, শুনেছিস তো ওর কথা! কাল রাতে ও গিয়েছিল সোনাই সা'র খোঁজে। কাল সকালেই ও বলেছে যে, বড় বড় হচ্ছে তবেই বাচ্চাটা দেখতে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কথাটা বাঁকা লাগল। শুনেই বুঝেছি। বোঝা তো যায়!"

"তোর মনে ভয় রয়েছে, তাই তুই বুঝেছিস! আমি ময়নাগাছটা কেন কাটলাম তাও তুই না বলতেই বুঝেছিস! ভাবিস যে তোদের শয়তানী আমি ধরতে পারি না! তুই যে খানিক আগে দারোগাকে বললি,—ভোরে গাছ কাটার শব্দে তোর ঘুম ভেঙেগ গেল,—মিছে কথা—এত মিছে কথাও তয়ের করে বলতে পারিস! ঘুমিয়ে ছিলি না আরও কত! যত বোকা আমাকে ভাবিস, তত বোকা আমি নই, বুঝলি!"

বিরসার বউ চিৎকার করে [illegible] ওরে বাপরে। দারোগা তুই আমাকে বাঁচা নইলে ও আমাকে মেরে ফেলবে [illegible] তুই থানার রাজা। তুই আমার মা-বাপ [illegible] বাঁচা! এখনও খাটিয়ায় বসে বসে দেখছিস কি? ওর মাথায় খুন সওয়ার রয়েছে। হাতকড়ি দিচ্ছিস না কেন এখনও? বাপরে বাপ!......"

বিরসার বউ ছুটে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল এখান থেকে। কনস্টেবল দুজন তাকে ধরে, তাড়া দিয়ে আবার বসাল। 'থানার রাজা' কথাটা দারোগাজীর কানে খুব মিষ্টি লাগে, এই গোলমালের মধ্যেও।

"খুন সওয়ার হয়েছিল কালকে বুঝলি! কাল যদি তোদের দুজনকে একসঙ্গে পেতাম তাহলে ওই কুড়ুল দিয়ে কাটতাম ঠিকই। বাপের কাছ থেকে পাওয়া কুড়ুল—বাপের বংশের ইজ্জত বাঁচাবার ঠিকা আমারও যেমন, ওই কুড়ুলখানারও তেমনি। আমার চেয়েও বোধ হয় কুড়ুলখানার বেশী। দেখছিস না? নইলে, ছিটকে অমন করে হাত থেকে বেরিয়ে যাবে কেন নিজের কাজ সারতে? চোখের নিমেষে, বোঝবার আগেই একেবারে উড়ে চলে গেল হাত থেকে; সাপে যেমন করে ছোবল মারে, বাঘে যে রকম করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম করে। সত্যি বলছি দারোগা, বিশ্বাস কর; ছেলেটাকে আমি মারিনি। আমার যে ইচ্ছা হয়নি একবারও তা নয়; মিছে বলব না তোর কাছে—ছেলেটাকে শেষ করে দেবার কথা আমি কালকেও ভেবেছি। আমার বাপ ঠাকুরদার মুখে কালি দিচ্ছে ওই ছেলেটা। একথা আজ কাঠ কাটবার সময়েও ভাবছিলাম। আমার বাপ-ঠাকুরদারা উপর থেকে দেখছে, চোখে আঙুল দিয়ে ছেলেটাকে দেখাচ্ছে, ওটাকে শেষ করে দেবার কথা মনে পড়াচ্ছে,—এই সব কথা কুড়ুলটা হাত থেকে ফসকে যাবার আগের মুহূর্তেও আমি ভাবছিলাম। কিন্তু আমি মারিনি। এত কথা তোর কাছে স্বীকার করছি, আর মারলে পরে সেই কথাটা তোর কাছে কবুল করতাম না? একেবারে বাচ্চা যে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুন্দর হাসে যে! মায়ের নাক খামচে নেয় যে! ওকে কি মারতে পারা যায়! কীই বা জানে, কীই বা বোঝে, অতটুকু রক্তর দলাটা! ও কি পারা যায়! কিন্তু আমি না পারলে কি হবে! কুড়ুলটা শুনবে কেন? ওটা যে চলে আমার বাপ-ঠাকুরদার হুকুমে। আমার মনের চেয়েও এগিয়ে চলে। বললে বিশ্বাস করবি না, হাতের মধ্যে বেঁচে উঠে কুড়ুলটা শিঙি মাছের মত পিছলে বেরিয়ে গেল দূ-উ-ই দূরে। কাঠ কাটছিলাম উঠনে, ওখানে। ওখান থেকে এখানে ছুটে এল কুড়ুল, কি হচ্ছে বোঝবার আগেই। আমি নিজেই হাঁ হাঁ করে উঠেছি। এ কি হ'ল! দেখতে না দেখতে! কুড়ুলটা হাত থেকে পালাবার মুহূর্তেই আমি বুঝে গিয়েছি সেটার মতলব। জেনে গিয়েছি সেটা কোথায় যাচ্ছে; কিন্তু জানলে কি হবে। তার উপর আমার যে কোন হাত নেই। মানুষের সঙ্গে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করা যায়; কিন্তু জিনিস একবার খেপলে কি তাকে সামলান যায়! অবিশ্বাস করিস না আমার কথা দারোগা। তীরধনুকে আমার হাতের নিশানা ভাল; কিন্তু হাজার নিশানা করেও ওই কাঠ কাটবার জায়গা থেকে কুড়ুল ছুঁড়ে এই বারান্দার বিড়ালের গায়ে আমি লাগাতে পারব না। আর লাগবি তো লাগ, একেবারে ঠিক মাথায়! একটা কথাও লুকোচ্ছিনা রে। সে সাহস আমার ছিল না। বাঘ ভালুক মারবার চাইতেও অনেক বেশী বুকের পাটার দরকার হয় অতটুকু একটা দুধের

> # সেঃ কফি সরাই
> ## কবিতা সিংহ
>
> কফি-সরায়ের রং করা শিশু মন
> কথার শিখরে ফড়িঙের মত ওড়া
> কফি-কাপে কাপে তরলিত প্রয়োজন
> হঠাৎ কোথায় ঝলসে উঠলো ছোরা!
>
> কৃপাণ নয় সে কৃপাণের মত চোখ
> নয়নের নভ মেঘকাটা নীল হ্রদ
> স্বচ্ছ কৃপাণ ঝলছে বিনির্মোক
> দুই চোখে তার বাসনা চোয়ানো মদ!
>
> কেন ভালো লাগে কেন ভরে ওঠে প্রাণ
> কফি-সরায়ের মরুতে সে যেন মাটী
> সে আছে তাইত শহরে ধানের ঘ্রাণ
> তার বুকে দোলে ঘুমের শীতলপাটী।

বাচ্চাকে মারতে। সে বুকের পাটা আমার নেই।"......

বিরসার বউ সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে। যত শুনছে তত তার ভয় বাড়ছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। ময়নাগাছটাকে কাটতে দেখেই বুঝেছিল যে, সে ধরা পড়ে গিয়েছে স্বামীর কাছে। কিন্তু এতটা সে ভাবেনি। নিজেকে ভাবত খুব চালাক। বিরসার মাথায় যে খুন চড়ে আছে তা' সে আঁচ করতে পারেনি আজ সকালেও।...আর রক্ষা নেই তার, বিরসার হাত থেকে! মরা ছেলেটার চেয়েও নিজের প্রাণ বাঁচানর প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে হঠাৎ। আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে দারোগার কাছে, নিজের সব দোষ স্বীকার করে—সোনাই সা'র সব কথা বলে। কিন্তু সমাজের সব লোক যে সম্মুখে বসে! বাধো বাধো ঠেকছে। তা' ছাড়া বিরসা কতটুকু জানে তাদের আশনাই সম্বন্ধে সেটা জানতে পারলে সুবিধা হত! দোষ স্বীকার করবার লোভ ছেড়ে, সে তার পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলে।

"না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না। ও আগাগোড়া মিছে কথা বলছে।..."

"থাবড়ে মুখ ভেঙেগ দেবো! বারবার ওই একই কথা কি শোনাচ্ছিস দারোগাকে! মিছে কথা কি? সোনাই সা'র কথাটা মিথ্যা? ময়নাগাছটা কাটলাম মিছামিছি? আমি কি পাগল না কি? তবে হ্যাঁ, ময়না গাছটা আমি কেটেছি রাগ করে। মিছে বলব না তোর কাছে দারোগা। নইলে অন্য গাছের ডাল দিয়ে কি আর কুড়ুলের হাতল হ'ত না? বুনো গাছ ঠিকই; কিন্তু ছাগলটা বাঁধতেও তো গাছটা কাজে লাগত! এই যে এতগুলো লোক উঠনে রোদ্দুরে বসে রয়েছে, ময়নাগাছটা থাকলে এরা কি একটু ছায়া পেত না? বুঝিতো; কিন্তু ও গাছটা না কাটলে যে সত্যিই চলছিল না। আর এখন সে কথা লুকিয়ে কি লাভ, ও ওই গাছটার উপর কাচা কাপড় শুকোতে দিত মাঝে মাঝে। দেখাদেখি একদিন আমিও কাপড় শুকোতে দিলাম ময়নাগাছের উপর। সংগে সঙ্গে দেখি ও আমার ধুতিখানা

সেখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় মেলে দিল।

—কেনরে? তুললি কেন? বেশতো রোদ্দুর আছে এখনও ওখানে?

—পাতায় বড় ধুলো রে আজ। যা জোর হাওয়া গিয়েছে কাল! কাচা কাপড় ময়লা হয়ে যাবে।

নে বাবা, যা ভাল বুঝিস তাই কর!

আবার আর একদিন ওই ব্যাপার।

—কেনরে? তুললি কেন?

—আজ হাওয়া দেখছিস না; যেন ঝড় বইছে। এই হাওয়ার মধ্যে ময়নাগাছের কাঁটায় কি আর তোর ধুতি আস্ত থাকবে।

বেশ। যা বুঝোস তাই বুঝি। ভাবি, মেয়ে মানুষের খেয়াল! তখন বুঝতে পারিনি।

"না না দারোগা, এসব ওর বানানো কথা। আরও কত বলবে বানিয়ে বানিয়ে। বিশ্বাস করিস না একটা কথাও।"......

"দারোগা, তুই আগে সবটুকু শুনে নে। তারপর বুঝে দেখিস, এ আমার বানানো গল্প, না আমি সত্যি কথা বলছি।......আর এক দিনও দেখি ময়নাগাছের উপর কাপড় শুকোতে দিল। এই প্রহর বেলা তখন—গাছের দিকটায় রোদ্দুর নেই। এখানে ওখানে, বেড়ার উপর, দাওয়ার বাঁশে, ঘরের ছাঁচতলায়, চারিদিকে ভরা রোদ্দুর! তবু কাপড় শুকোতে দিচ্ছে ছায়ায়! ভাবলাম বলি; কিন্তু বলি বলি করেও বললাম না। খটকা লাগল। সেই রাত্রেই প্রথম সন্দেহ হয়। সোনাই সা'র সঙ্গে ওর আলাপ দরকারের চেয়েও একটু বেশী, এ কথাটা খেয়াল হল সেইদিন। সোনাই সাটা যে লোক ভাল না, আমাদের টোলার এত লোকতো এখানে রয়েছে; এরা সবাই বলবে একথা। এসব গত বছরের কথা। আমি কিন্তু মনে করে রেখেছিলাম। ময়নাগাছে কাপড় শুকোতে রোজ দেয় না। আবার ঝড়ের দিনেও ডালের সঙ্গে গেরো বেঁধে দেয়; পাতায় ধুলো জমে থাকলেও দেয়; রোদ না থাকলেও দেয়! দেখি। ভাবি। বোঝবার চেষ্টা করি। লক্ষ্য রাখি। মনে হয় যেন বুঝতে পারছি, অথচ ধরতে পারি না ঠিক, ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। কালও দেখি কাপড় শুকোতে দিয়েছে গাছটার উপর অনেক কাল পরে। দিনে কাজে মন বসল না। রাতে ভাবতে ভাবতে ঘুম এল না। সারা রাত জেগে থাকব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। চোখ বুজে পড়ে আছি। ওটাও বুঝতে পারছি জেগে রয়েছে। পাশে শুয়ে। উশখুশ করছে। একবার আমার নাকের কাছে আঙুল রেখে বোঝবার চেষ্টা করল আমি জেগে আছি কিনা। আঙুলে তেলের গন্ধ পেয়েই আমি বুঝেছি। সাঁঝের বেলা চুলে তেল মেখেছে। কত বড় শয়তান! মটকা মেরে পড়ে আছি; কিন্তু কান খাড়া রেখেছি।......হঠাৎ ময়নাগাছতলায় শুকনো পাতার উপর শব্দ হল। পায়ের শব্দ। জন্তু-জানোয়ারের নয়। তাহলে খরখর করে শব্দ হ'ত। শুনেই বোঝা যায়। এ শব্দ মানুষের পায়ের—চাপা, না জানানো শব্দ। সাবধানে টিপে টিপে পা ফেলবার শব্দ। চুলে তেল মাখা শয়তানটা তখন পাশে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে। বেশী চালাক কিনা! বুঝেছে আমি জেগে। নাক ডাকানর মানে, ও শুনেছে পায়ের শব্দটা। কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে ঘরের ঝাঁপ খুলতেই নাক ডাকানী মেয়েটা কাশল। বোধ হয় সড় ছিল আগে থেকে যে কাশির শব্দ শুনলেই পালাতে হবে; কেননা, আমি ঝাঁপ খুলতে না খুলতেই ময়নাতলার লোকটা ছুটে পালাল। অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাইনি; কিন্তু দুড় দুড় করে পায়ের শব্দ হল—স্পষ্ট শুনলাম। আগে থেকে সড় না থাকলে লোকটাইবা অন্ধকারে বুঝল কি করে ঝাঁপ খুলে কে বার হচ্ছে—আমি, না যার বার হবার কথা, সে। আমি ও শব্দটার পিছু পিছু ছুটেছিলাম; কিন্তু সেও ওই শালা ময়নার কাঁটা পায়ে ফোটায় দৌড়ে পারলাম না লোকটার সঙ্গে। এই দেখ এখনও সেই কাঁটা ফুটে রয়েছে পায়ে। ও গাছের কাঁটাটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।......সোজা গেলাম মুদীর দোকানে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখি, আলো জ্বলছে মিটমিট করে; সোনাই সা নেই। ফেরেনি। দোকানে সোনাই সা একাই থাকে কিনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তার জন্য। শেষকালে ভোর রাত্রেও ফিরল না দেখে, বাড়ী ফিরি। ঘরের মধ্যে ঢুকিনি। দাওয়ায় বসে বসে কত কি ভাবি। যদি লোকটা সোনাই সা না হয়! ......একটু ফরসা হতেই গেলাম ময়না গাছতলায়। ঠিক যা ভেবেছি! রবারের জুতোর দাগ! দোকানদারে মানুষ; জুতো পরে কিনা—রবারের জুতো। মাথা গরম হয়ে উঠল। দিলাম ময়না গাছটাকে কেটে সাবাড় করে তখনই! আমাকে জেল দে, ফাঁসি দে, যা ইচ্ছা তাই কর; কিন্তু ছেলেটাকে আমি মারিনি।"

'না-না দারোগা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না!.....'

বিরসার স্ত্রী ওই একই কথা বারবার বলে চলেছে গ্রামোফন রেকর্ডের মত। কিন্তু কথার পিছনে প্রাণ নেই। গলার স্বর মিইয়ে এসেছে; কথার ঝাঁজ মরেছে।

দারোগাজীই পড়েছেন মুস্কিলে। তাঁর মনে হচ্ছে যে বিরসা মিথ্যা কথা বলছে না; নিজেকে বাঁচিয়ে কথা বলবার চেষ্টা তার নেই। তবু মনে খটকা থেকে যাচ্ছে, একটা বিষয়ে; আর সেইটাই এই তদন্তের মুখ্য বিষয়। বিরসা ছেলেটাকে ইচ্ছা করে মেরেছে, না এটা একটা দৈবাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা মাত্র। বিরসার কথার এই অংশটা একটু কেমন কেমন যেন ঠেকে। এও কি সম্ভব? অসম্ভব অবশ্য পৃথিবীতে কিছু নেই। কিন্তু উপরওয়ালারাতো তা শুনবে না! তিনি নিজে চিরকাল এসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছেন। পুলিশ সাহেব তার উপর যত বিরূপই থাকুক, এখনও তিনি নির্ভীকভাবে নিজের বিবেক অনুযায়ীই কাজ করতে চান। তাঁর মন যা বলছে, যুক্তি বিবেচনা বলছে ঠিক তার উল্টো। বিরসার কন্ঠস্বর আর চোখমুখের ব্যঞ্জনা ছাড়া আর সব তথ্য প্রমাণই তার বিরুদ্ধে। ঘটনাপরম্পরা এমনভাবে সাজানো যে, ওকে নির্দোষ বলে ভাবতে বাধে। হাত থেকে কুড়ুল ছিটকে যাওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু সেটা গিয়ে কি একেবারে ওই ছেলেটার মাথাতেই লাগবে! আর ও নিজেই স্বীকার করেছে যে, ও ছেলেটাকে মারবার কথা ভাবছিল তখন!.....এতগুলো যোগাযোগ কি সম্ভব?... না-না, লোকটা সত্যি কথা বলছে এই ধারণাটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই তার স্বপক্ষে। এই ক্ষীণ ধারণাটুকুর উপর নির্ভর করে কি কখনও পরিষ্কার বিবেকে, এটাকে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার কেস ব'লে রিপোর্ট করা যায়?...

'না-না দারোগা, ওর আজগুবী গল্প একটুও বিশ্বাস করিস না। আগে হাতকড়ি লাগিয়ে দে ওর হাতে; তারপর ওর কথা শুনিস।'......

দারোগাজী মন স্থির করতে পারেন না। চৌকিদারকে হুকুম দিলেন সোনাই সা'র খোঁজ করতে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে থেকে কে একজন যেন বলল যে, সোনাই সা পালিয়েছে। আজ ওর মুদীখানার দোকান খোলেনি।

এতক্ষণে দারোগাজী বাইরে লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রাজপুতটোলার লোকরাও এসে জুটেছে। যে লোকটা কথা বলল, সে পুরণ সিং-এর ছেলে সহদেও সিং। ঝুঁকে নমস্কার করে সে দারোগাজীকে। ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি! মন খারাপ হয়ে গেল। ওই নমস্কার আর হাসির মধ্যে দিয়ে লোকটা সহদেও সিং সকলকে মনে পাড়িয়ে দিচ্ছে দারোগাজীর নগণ্যতার কথাটা।...লোক দেখানো নমস্কার! ও বোঝাতে চাচ্ছে যে, পুরণ সিং-এর স্থান থানার মধ্যে দারোগাজীর চেয়েও উঁচুতে!......ঠোঁটের কোণের হাসিটা তাচ্ছিল্যে ভরা!......

বেশ এতক্ষণ কর্তব্যের মধ্যে ডুবেছিলেন। আর এখন পুরণ সিং-এর কথাটা ভুলে থাকবার জো নেই! হাজার কাজে ডুবে থাকলেও। সহদেও সিং মনে পাড়িয়ে দিয়েছে সেই দিনকার অপমানের কথাটা। ভোখরাহা গ্রামের এই সব লোকজনের চোখে সেইদিন থেকে তিনি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছেন! সংকোচে তিনি রাজপুত টোলার লোকের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। গম্ভীর হয়ে তিনি লেখাপড়া, মাপাজোখা, সাক্ষ্য প্রমাণে মনোনিবেশ করলেন।

তদন্তের কাজ শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সাক্ষ্য প্রমাণ সব বিরসার বিরুদ্ধে। মনের সংশয়টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। কুড়ুলটা হাত ফসকে অমনভাবে ছেলের মাথা

ওপারে জীবন পূর্ণতা দিয়ে ঘেরা,
আকাশে বাতাসে ছন্দ মেদুর সুর,
জোছনার আলো তার মুখেতেই হাসে,
"শ্যাম্পেন-মোহে" হিয়া মন ভরপুর।
এপারে আঁধার নেই সুখ মৌতাত,
জমা হয়ে আছে শুধু অভিশাপ রাশি;
নেই স্নেহ, নেই সুখ স্বপ্নের রাত;
সাহারার বুকে বালুকা তপ্ত হাসি!
এপারে কেবল বিনিদ্র রাত জাগা,
সান্ত্বনাহীন অশ্রু জলের ভাষা;
আত্মার শুধু পরাভব নিয়ে
ঝটিকা ক্ষুব্ধ হৃদে
আকাশে পাঠায় জীবনের জিজ্ঞাসা।
দীর্ঘশ্বাসেতে ভরা একুলের ঢেউ,
হেথায় বাতাসে হতাশার উদ্বেগ,
ওপারে সুনীল শীতল প্রলেপ ঘিরে
হাসি মুখে চায় সোনালী রোদের মেঘ।
ওপারে জাগুক সবুজের শিহরণ,
আসুক শান্তি অমরার প্রেম নিয়ে,
তার জীবনের পূর্ণতা অবলোকি
এপার বাঁচবে তার সব কিছু দিয়ে।

—

অথ বস্ত্রহরণ কথা

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] কাটত না তাদের জীবন। বেচারী পাঁচ-সাত টাকা শ হিসেবে কাচত সব কিছু, কাঁথা থেকে কস্তাপাড়, জড়ি পাড় থেকে গরদ—সব। তোষক, বালিশের ওয়াড় [illegible] ফাউ। লণ্ড্রীতে কাপড়ের দাম রঙ ও জাত বুঝে প্রত্যেকটিরই স্পেশাল রেট। ধোপাদের এত কায়দা ও হিসেব জানা থাকলে মাথায় বা গাধায় চাপিয়ে নিয়ে যেতে হত না কাপড়ের বোঝা। আরামে ঠেলা গাড়ীতে চড়িয়ে লোক দিয়ে পাঠাত। ভদ্রলোক বললেও যেতে পারত অবিলম্বে। তা ছাড়া, জামা-কাপড় কামড়ে টেনে ছিঁড়বার পদ্ধতির প্রবর্তন যদি করত, হয়ত বস্ত্রশিল্প সঙ্ঘের কাছ থেকে কিছু বৃত্তিও আদায় হত সে আবিষ্কারের জন্য। ধোপার যুগের শেষে লণ্ড্রীর যুগে বস্ত্রশিল্পের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তাতে নতুন ধোলাই পদ্ধতির দান অনেকখানি।

এ যুগে অবশ্য ধোপা লোপ পায়নি। কিন্তু [illegible] তারা যুগোপযোগী হয়েছে। দোরে দোরে না ঘুরে লণ্ড্রীর সঙ্গে কন্ট্রাক্টে কাজ করছে এবং লণ্ড্রীর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলি যথাযথ প্রয়োগ করছে।

এ যুগের আর একটা বৈশিষ্ট্য—কেউ কারো নালিশ শুনতে রাজী নয়। কাপড়-জামা নষ্ট হয়েছে, দামী নতুন কাপড় হারিয়ে ফেলেছে, সিল্কের পাঞ্জাবী গলিয়ে ফেলেছে, কোন কথা বলবার অধিকার নেই আপনার। দোকানে যিনি বসেন, যাঁর সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ লেনদেন, তিনি কি জানেন আপনার [illegible] কেন কি ক্ষতি হয়েছে? তিনি বলে দেবেন—কোম্পানীকে লিখুন।

সোজা কোম্পানীর কারখানায় চলে যাবেন? একটা পাঁচটার মধ্যে যেতে হবে [illegible] কাজে ছুটি করে। গিয়ে দেখলেন, কেউ কিছু জানে [illegible]। জানবে কি করে? আপনি কে, অন্য কোনটি আপনার পাঞ্জাবী হিসেবে এসেছিল, তা তাদের [illegible] জানার কথা নয় ত। তিন দিন ঘুরো [illegible] ও হতাশ হয়ে যদি তখনও ধৈর্য ধরে চিঠি লেখেন, হয় ত জবাব পাবেন:

প্রিয় মহাশয়, আপনার অভিযোগ আমাদের হস্তগত হয়েছে। এ সম্বন্ধে [illegible] পরে আপনাকে খবর দেওয়া হবে। ইতি—

পুত্রশোক যতদিনে লোকে ভুলে যায়, জামা-কাপড়ের শোক যদি ততদিন [illegible] ভুলে যেতেন। অনুসন্ধানের পর খবর [illegible]। তেমন যদি নাছোড়বান্দা গোছের [illegible] বন্ধ করার জন্য আদা-জল [illegible] শেষ জবাব পাবেন:

প্রিয় মহাশয়, আপনার [illegible] হারিয়ে যাওয়ায় আমরা [illegible] আমাদের কাচতে নেওয়ার সর্ত [illegible] প্রক্রিয়ায় নষ্ট হলে বা চুরি গেলে [illegible] দায়িত্ব থাকে না। তবু [illegible] ধোলাই খরচের আটগুণ [illegible] তার বেশী দেওয়ার নিয়ম [illegible] সেটা আপনাকে ক্রেডিট [illegible] ঐ দাম পর্যন্ত কাপড় [illegible] ইতি—

এ ধরণের অবস্থায় যেদিন [illegible] পড়েছিলাম,

‘কালো বাজার’

(৩৭ পৃষ্ঠার পর)

কার ভাগে একটু বেশি পড়ছে তাই নিয়ে ঈর্ষা, অন্তর্দাহ, তাই থেকেই এ ওর কেচ্ছা ছড়াতে আরম্ভ করলে, সব কথা পড়ল বেরিয়ে, কোম্পানীও গেল রসাতলে।

আয়টা সর্বপ্রথম বাড়িয়ে ফেলল রত্নাই; সব চেয়ে বড়, আগে তার মাথাই তো খুলবে। একটি দিনের হিসেবে দুগুণ আয় করে নিল একেবারে, তাও হাত বুলিয়ে। না সুড়সুড়িতে নয়, পাকা চুল গুঁজিয়ে দিয়ে।

রহস্যটা ধরতে পারল আগে হীরু, দিদির পরে তো ওই। তর্কে তর্কে থেকে রহস্যটা বের করল; কিন্তু একেবারে নকল না করে সেই পথেই একটা মৌলিক উপায়ে সেও দুদিন পরে আয়টা প্রায় আড়াই গুণ করে নিলে। টুনীর আরও একটা দিন লাগল, তবে সে যা উপায় বের করল তাতে প্রায় তিনগুণ টেনে নিয়ে গেল। চার-পাঁচ গুণও স্বচ্ছন্দে করে ফেলতে পারত, অত সুবিধা সত্ত্বেও সে করল না, তার জন্য তার আত্মসংযমের প্রশংসাই করতে হয়।

কথাটা বেরুল প্রথমে রত্নার মুখ দিয়েই। দুজনে ছোট অথচ দুজনেই হঠাৎ বাড়িয়ে নিলে তার চেয়ে, লেগেছে তো মনে। তার ওপর বোধ হয় লেনদেনের কথাও কিছু তুলেছিল, ওরা রাজি হয়নি।

চারজনে সেবা করছে, জেঠামশাই পাশ ফিরে শুয়ে একটা বই পড়ছেন। একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছেন পড়তে পড়তে। অন্যদিকে ওরা গল্প করে, মাঝে মাঝে তাঁকেও টানে, আজ কিন্তু যেন অন্যরকম ভাব। কি যেন ইসারা বিনিময় হচ্ছে তিনজনের মধ্যে; মাথা নাড়ানাড়ি, শাসানো, আঙুল উঁচানো। একবার ফিসফিসানিও কানে গেল—“বলে দিই?”

রত্নাই জিগ্যেস করছে। হীরু সেই রকম ফিসফিসানিতেই [illegible] উত্তর করল—“দাও গে... ইস্‌!”

[illegible]। একটু চুপচাপ গেল। তারপর আবার—“[illegible] কথাও!”

রত্নাই [illegible], এবার টুনীকে। বইয়ের আড় [illegible] টুনী [illegible] ভাবেই। [illegible] বেপরোয়া ভাবেই। আবার একটু চুপচাপ গেল।

[illegible] হাত বুলোচ্ছিল, হাতটা আরও [illegible] করে দিল, বেশ লম্বা লম্বা

[illegible] দুঃখ ততদিনে মনে [illegible] গেছে। [illegible] থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল, গৃহিণী পাশে ছিলেন, [illegible] করে বললেন—ব্যাপার কি?

গৃহিণীর প্রশ্ন রবের জোয়ার আমার মনে, [illegible]—

[illegible] বস্ত্রবিলাসী [illegible]
[illegible] দুটি চরণ [illegible]
[illegible] আমি॥ *

---

* [illegible] অনুভাবে॥

গোটাকতক টান, তারপর আরম্ভ করল—“জেঠামশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?”

“[illegible] কিছু বলবে?”

বইয়ের আড়াল থেকে সন্তর্পণে দেখা গেল হীরুর ওপর আবার তীর্যক দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। হীরুও আবার বেপরোয়াভাবেই ফিরিয়ে দিল দৃষ্টিটা।

“বলছিলাম জেঠামশাই—এই, আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে আপনাকে ঠকাচ্ছে হীরু।” (টুনীর দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ, সেও ফিরিয়ে দিতে)—“আর টুনীও। ওদের দেবেন না অত করে পয়সা।”

হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠছে জেঠামশাইয়ের পেটে। বললেন—“ঠকাবার পদ্ধতিটা কি, না হয় শুনি একবার, তবে তো বুঝব।”

আর একবার সেইরকম দৃষ্টি বিনিময় হোল।

“আপনি ভেবেছেন নাকি সবগুলো আপনার চুল? বয়ে গেছে। এই দেখুন এই কাঁচি। নিয়ে এসেছি আমি।”

“বুঝলাম না তো; কাঁচি তো কি?”

“ওগুলো সব নাকি আপনার চুল? দিদিমণির চুল বিকেল বেলা বসে বসে তোলে। তারপর কাঁচি দিয়ে আপনার মতন করে কেটে কেটে গুণে দেয়। একটাতে পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা যেমন হয়। সেখানেও পয়সা নেয়, এখানেও আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে...”

হাসি চাপা কষ্টকর হয়ে পড়েছে জেঠামশাইয়ের। কোন রকমে প্রশ্ন করলেন—“তাই নাকি?”

ওদিকেও যে নালিশ জমছে সেই প্রত্যাশায় কোন রকমে চেপে রেখেছেন হাসিটা।

রত্নাই বলছে—একবার যেন তীর্যক দৃষ্টিতে টুনীকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়ে—

“আর টুনীই কম নাকি—ঐটুকু দেখতে হলে কি হবে?”

“ব্যাপারখানা কি?”

“আপনি কি ভেড়া জেঠামশাই? আমাদের বড়ো গুরুজন তো? দাদু দিদিমণি ছাড়া সবাই গুরুজন। টুনী কম্বল থেকে বেছে বেছে শাদা শাদা ভেড়ার লোমগুলো...”

—আর রাখা পারা যায় না; বুকটা চেপে ধরতে হয়েছে।

টুনীর একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ গিয়ে পড়ল রত্নার ওপর। মাথাটাও একটু দুলে গেল।

তারপর—

“হ্যাঁ জেঠামশাই, তাব’লে আপনি কি গোরু? বললে না।”

—ভাল ক’রে জিভের আড়ও ভাঙে নি।

শরীরটা দুলে উঠছে, তবু কোনরকমে বইয়ে মুখটা ঢেকে প্রশ্নটুকু করতে পারলেন জেঠামশাই—“কেন গা মা?”

“ওগুলো আপনার ঘাড়ের চুল মনে করেছেন নাকি? ধবলীর পিঠ থেকে আঁচড়ে আঁচড়ে নিয়ে আসে দিদি...”

—দুই বোনে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিনিময়ও হয়ে [illegible], ছুরাই যেন জেঠামশাইয়ের এখন বোকা!”

বিন্ধ্য প্রদেশ

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

মানুষী ধ্বংসাত্মক বুদ্ধিও ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রশ্রয় পায়নি।

রাজবাড়ীর নীচের তলাকার একটি ঘরে গিয়ে বসলুম। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক রয়েছেন রাজকুমারের গৃহশিক্ষক হয়ে,—নাম, সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই একজন মাত্রই বাঙ্গালী এ তল্লাটে। তাঁর বাড়ী হোলো বরিশালে। তাঁর সঙ্গে আলাপের মাঝপথেই এসে দাঁড়ালেন মহারাজা। পরনে হাফ প্যাণ্ট এবং গায়ে বোতাম খোলা ফুলশার্ট। কেউ যদি বলতো ইনি রাজবাড়ীর মাইনে করা পালোয়ান,—বিশ্বাস করতুম। কেউ যদি বলতো, ইনি একজন কুস্তীগীর, তাও মানাতো। আপাদমস্তক এমন কোনও লক্ষণ নেই, যাতে 'মহারাজা' বলা চলে। আনন্দের কথা এই, ঘণ্টা-দুয়েক বসে গল্প করলেন, কিন্তু একটিবারও মনে হয়নি যে, তিনি ছাতারপুরের মহারাজা! তাঁর সরলতা ও স্বাভাবিকতা দেখে আমি অনেকটা যেন হতবুদ্ধি হয়েছিলুম।

পান ও মশলা মুখে দিয়ে ভবানী সিং বললেন, আপনিই প্রথম এলেন টাণ্ডনজীর বিদায়ের পর। এতবড় একটা অন্যায় মন্তব্য তিনি করে গেলেন, কিন্তু কেউ কিছু বললে না, এটি আশ্চর্য। কাল সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে এই জন্যই আনন্দ হয়েছিল।

মহারাজা তাঁর ছবির অ্যালবাম এনে হাজির করলেন। তার সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের ফটো। ওই সঙ্গে আনলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত স্টেলা ক্রামরিশের স্থাপত্য-শিল্প চিত্র-সম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থ এবং ফ্রেঞ্চ আকাদমী ও ফাইন আর্টসের প্রকাশিত মস্ত ছবির বই,—তাতে দেখতে পাওয়া গেল প্রায় আশীখানি চমৎকার খাজুরাহোর ছবি। তারপর ওই সব নিয়েই তিনজনে গল্প চলতে লাগলো দীর্ঘক্ষণ।

এক সময় ভবানী সিং সহাস্যে বললেন, খাজুরাহোকে গালি দেবার পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে টাণ্ডনজী এখানে আসেননি এবং আমাদের এক বিরুদ্ধ-পক্ষীয় ব্যক্তির প্রভাবের মধ্যে ছিলেন। খাজুরাহোর সঙ্গে আমাকেও তিনি যথেষ্ট গালি দিয়ে গেছেন, এটি কৌতুকের বিষয়। আমার নৈতিক চরিত্র নাকি মন্দ।

আমরা হাসছিলুম। মহারাজা বললেন,—একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি,—আরে, রাজা-রাজড়ার চরিত্র একটু-আধটু মন্দ না হলে মান-সম্ভ্রম থাকবে কেন?

প্রশ্ন করলুম, তাঁর এবম্বিধ আচরণের কারণ?

কারণ? তবে শুনুন, তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া হয়নি। তিনি পূজো চেয়েছিলেন, বন্ধুত্ব চাননি!

এরপর ব্যক্তিগত কথাবার্তা এসে পড়লো অনেক। তিনি এখন প্রিভিপার্স পান, তাই-তেই তিনি সন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে তাঁর শিকার অভিযান বেশ ভাল লাগে। নিরিবিলি এই গ্রামে বাস করা তাঁর বেশ পছন্দ।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোতে বেলা দুটো বাজলো। সেই দিনই অপরাহ্ণকালে খাজুরাহো ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম।

সমগ্র বিন্ধ্যপ্রদেশকে স্বপনপুরীর মতো মনে হয় পদে পদে। মাঝে মাঝে দেখা যাবে তেপান্তরের মাঠ, দূরে দিগন্তে পাওয়া যাবে নীলবর্ণ গিরিশ্রেণী, কোথাও অরণ্যলোকে স্বচ্ছন্দচারী হরিণের দল, কোথাও নির্জন পাহাড়তলীতে নির্ঝরিণীর ঝুমুর-ঝঙ্কার। পর্যটকের চোখে যবনিকার আবরণ যেন পলকে পলকে সরে যায়, এবং শিশুপাঠ্য কাহিনী থেকে উঠে আসে সেই সেকালের রাজপুত্র—যিনি ঘোড়ায় চলেছেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নদী-উপনদী ছাড়িয়ে জনহীন বনভূমির ভিতর দিয়ে,—যেখানে সন্ধ্যা হলে বাঘের ভয়, গাছের কোটরে মস্ত সাপ! এই রূপকথার জন্ম বুঝি বা বিন্ধ্যপ্রদেশেই।

পান্না রাজ্যের দিকে যাচ্ছিলুম। এদিকের পাহাড়ে সাপের উপদ্রব প্রচুর। একটি পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় 'পাণ্ডব জলপ্রপাত।' পান্না সহরটির চারিদিকে পাহাড়। মাঝখানে প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ। বর্তমান মহারাজা প্রবীণ কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর নাম যাদবেন্দ্র সিং। কথাবার্তার মধ্যে তিনি সহাস্যে বললেন, রাজাদের রাজত্ব গিয়ে ভালোই হয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি অনেকে। দায়িত্বের থেকে মুক্তি! এক সময়ে হেসে তিনি বললেন, বাড়ীঘরদোরগুলো নিয়ে নিলেও বাঁচতুম—এত খরচ যোগাতে পারিনে না। [illegible] চাইনে। আমি ভারতবাসী, এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

পান্না সহর থেকে উনিশ মাইল দূরে এশিয়ার প্রসিদ্ধ পান্নার হীরের খনি। সেই খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন পান্না ডায়মণ্ড সিণ্ডিকেটের সুদর্শন ম্যানেজার এবং প্রধান অংশীদার মিঃ [illegible]। তিনি মারাঠী এবং [illegible] বাঙ্গালী সুহৃদদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অনেকদিন অবধি তিনি ছিলেন আফ্রিকায়। [illegible] তখন কাজ চলছিল হীরের খাদে। [illegible] ডেলার ভিতর থেকে হীরের কণা বার করার কাজে মেয়েরা নাকি বিশেষ পারদর্শিনী, তাদের দৃষ্টি পুরুষের অপেক্ষা প্রখরতর। সুতরাং এই কাজটা অধিকাংশ মেয়েরাই করে। আমি এই প্রথম হীরের খনি দেখলুম। আরেকটি আছে দক্ষিণ ভারতে।

পান্নায় একটি মস্ত মন্দির দেখলুম—তার নাম বলদেও মন্দির। এমন অনেক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হোলো, যারা আজও রেলগাড়ী চোখে দেখেনি। সমগ্র পান্না রাজ্যটি অনেকটা লোকচক্ষুর বাইরে এবং পাহাড়ের অন্তরালে। সর্বত্র ভূমি অতি উর্বর এবং জনসাধারণ অধিকাংশই চাষী। কলকারখানা অথবা কুটীরশিল্প কোথাও গড়ে ওঠেনি—একমাত্র ওই হীরার খনি ছাড়া।

পান্না থেকে সাৎনা বহুদূরে—বোধ করি পঁয়তাল্লিশ মাইল। সাৎনা হোলো বাঘেলাখণ্ডের অন্তর্গত। এটি বোম্বাই-এলাহাবাদ রেলপথে পড়ে। চূণের জন্য সাৎনা বিখ্যাত। সহরটি প্রাচীন, কিন্তু প্রশস্ত।

আসা-যাওয়া

কমলা চট্টোপাধ্যায়

জীবনের ঘাটে কত তরী আসে
কত তরী চলে যায়,
খোঁজ তো রাখেনা কেউ;
বালুকা বেলায় কত পথিকেরা
পায়ের চিহ্ন আঁকে,
মুছে দিয়ে যায় ঢেউ।
প্রতি সকালের সোনালী আলোর
বর্ণালী ধরে' দেহে—
কত ফুল ওঠে ফুটে,
ভ্রমরের মধু মৃদু গুঞ্জনে
স্বপ্নবাসর রচে',—
বিকালেতে যায় টুটে।
নতুনেরা এসে মুছে দিয়ে যায়
পুরান দিনের স্মৃতি,
এই চিরকাল চলে;
আজকের এই গেয়ে যাওয়া গান
কালকে হারিয়ে যাবে,
নতুন গানের তালে।

সাৎনা থেকে রেওয়া হোলো মোটর পথে বত্রিশ মাইল। বিন্ধ্যপ্রদেশের রাজধানী হোলো রেওয়া, কিন্তু রেলপথের সঙ্গে এটি যুক্ত নয়। পাহাড়ী নদী আর প্রান্তর পেরিয়ে আসতে হয়। গ্রামের মধ্যে সভ্যতা এসে পৌঁছেছে একমাত্র মোটরবাসের সঙ্গে। এমন নিরুদ্বেগ এবং নিরিবিলি সংসার সহসা ভারতের কোথাও চোখে পড়ে না।

রেওয়া হোলো মস্ত আধুনিক সহর। উপকরণ সবই আছে, কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দূরে দূরে। জায়গা পেয়েছে অনেক। [illegible] প্রতি সন্ধ্যা বিন্ধ্যপ্রদেশে [illegible]। [illegible] চাকুরে বাঙ্গালী বহুকাল থেকে এখানে নানা সরকারী বিভাগে পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হোলো। একজন স্থানীয় দরবার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত জয়ন্ত দাশগুপ্ত এবং অন্যজন ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রিজ শ্রীযুক্ত সুধীর সেন—[illegible] প্রিয়রঞ্জন সেনের পুত্র।

রেওয়া থেকে উনত্রিশ মাইল দূরে [illegible] 'চাচাই' জলপ্রপাত। পূর্বোক্ত বন্ধুদের [illegible] সেনই আমাকে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে গেলেন এই প্রপাতে। নিরিবিলি নির্জন প্রান্তরের [illegible] হঠাৎ নেমে গেছে প্রপাত প্রায় দেড়শো ফুট নীচে। তখন বিশ্বাস করি, এতদিন ছিলুম একটি মালভূমিতে।

রেওয়া থেকে বেরিয়ে চল্লিশ মাইল ছুটিয়ে চললুম। কিন্তু শেষের দিকে সহসা মোটর নামতে লাগলো পাহাড় থেকে। বুঝতে পারলুম চারশো ফুট উঁচুতে বাস করছিলুম এতদিন। পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে দেখি, উত্তরে উত্তরপ্রদেশের বিরাট সমতল দিক-দিগন্তে প্রসারিত। আমাদের গাড়ী নেমে এলো আরো দশ মাইল পেরিয়ে তমসা নদীর তীরে। নদী পার হয়ে চকঘাট—আর এক মাইল দূরে এলাহাবাদ জেলার সীমানা। এখান থেকে এলাহাবাদ সহর আরও তিরিশ মাইল এবং যমুনার পুল অতিক্রম করে যেতে হয়।

বলা বাহুল্য, আমাদের মোটর চললো নাইনী হয়ে এলাহাবাদের দিকে।

রামলাল রায় নিকটে দাঁড়িয়ে, পিতা আমাকে ডাকলেন। "কেন দুধ খাবি না?" আমি সেই হারার দিকে তাকিয়ে ব'ললাম "আমি কি ওদের সমান?" বলেই আমি কেঁদে ফেললাম। সকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, আর হাসতে লাগলেন। তারা যত হাসে, আমি তত রাগে ফুলতে থাকি। তখন পিতা বললেন "আচ্ছা, এখন দুধ খা, বিকাল বেলার নাম পাল্টান হবে।" বোধ হয় সেদিন ইস্কুল কাছারী ছুটি ছিল। বিকালবেলায় দেখি, বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতমশায়, জেলা ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকমশায় এসেছেন। রোয়াকে কেদারায় বসেছেন, পিতা একটায় বসেছেন। আমাকে ডাকলেন, আমি একটায় বসলাম। পণ্ডিত-মশায় চার পৃষ্ঠা এক তালিকা নিয়ে এসে-ছিলেন। বোধহয় বাঙ্গালা অভিধান থেকে লিখেছিলেন। অ-হ'তে, অক্ষয়, অনন্ত, অবিনাশ একে একে নাম পড়তে লাগলেন। এমন নাম হবে, যে নাম আর কারও নাই। পণ্ডিতমশায় পড়তে পড়তে থামেন, এক-একবার জিজ্ঞাসা করেন। আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েছিলাম, রামায়ণের নাম প্রথমেই বাদ গেল। আমি কয়টা নামই বা শুনেছি, কিন্তু মনে হ'তে লাগল এ-নাম হ'তে পারে। এইরূপ বিচার চলতে চলতে, "যোগেশ" নামটা নূতন মনে হ'ল। সেদিন হতে আমার স্ব-দত্ত নাম হ'ল। পরদিন ইস্কুলের রেজেষ্টারী বহিতে নূতন নাম লেখা হ'ল। *

কিছুকাল দুই নামই চলেছিল। বহুকাল পরে পিসী ও দিদি আমার স্ব-দত্ত নাম স্বীকার ক'রেছিলেন, মা কখনও করেন নাই। একবার তখন আমি কলেজে কর্ম করি, মাকে ব'ললাম "মা, আমায় সবাই যোগেশ বলে, তুমিই বল না।" মা একটু থেমে ব'ললেন, "তারা জানে কি, কেন বলি?" তারা কি জানে না, মা ব'ললেন না।

আমার নূতন নাম ধরতে গ্রামের লোকেরও অনেক কাল গেছল। একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। তখন আমি কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে কাজ করি। ছুটিতে বাড়ী গেছি। বাগানে জাম পেকেছে, কিন্তু প্রায়ই ফাটা, থেঁতলানা জাম আসত। বাগান একটু দূরে, গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়, দক্ষিণেশ্বর নদীর ধারে। কুঁড়ি একুশ বিঘা কিন্তু লম্বা। মাঝে খানিকটা গাছ ছিল না। দু-তিনটা কাঁঠাল গাছ, দু-তিনটা জাম গাছ, বাকি সব আম গাছ। দুই পাঁচটা গাছের আম ছাড়া সব টক। কিন্তু গ্রামজনের মুখে পরম উপাদেয়। বাগানের গা দিয়ে গ্রামান্তরে যাবার পথ। নিকটে এক ঘর বৈষ্টমী ছিল, বিধবা। সে বাগান আগলাত। বেড়া নাই, পগার নামমাত্র। হাটবারে হাটবারে অনেক লোক যাতায়াত ক'রত। গাছে পাকা আম ঝুলছে দেখলে কার না লোভ হয়। অনেকদিন বাগান দেখিনি, দেখে আসি জামও আনব, এই মনে করে' এক ছোকরা চাকর নিয়ে চললাম। সে একটা চাঙ্গারী নিয়ে চ'লল। তার নাম আশু। জাতিতে দুলে, গাই রাখত। সকালবেলা, ৯টা হবে। সে জানত কোন্ গাছের জাম মিষ্টি। গাছটা পথ হতে একটু ভিতরে। সে গাছে উঠল, আমি তলায় দাঁড়িয়ে। বৈষ্টমী দূর হ'তে দেখতে পেয়ে 'কেরে', 'কেরে' ক'রতে ক'রতে, দৌড়ে এল। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হবে, আমার আঠাশ। আমায় দেখে আর চাঙ্গারী দেখে বুঝলে, জাম চুরি করতে গেছি।

"ওমা! যাব কোথা! আমি বলি, পোড়ারমুখোরা খেতে পায় না, মরুক গে, তলার জাম কুড়িয়ে খাক। কতই বা খাবে। ওমা! চাঙ্গারী নিয়ে এসেছে! এমন দিনে-ডাকাতি কখন দেখিনি। ভদ্দনোকের মত দেখছি, পায়ে জুতো আছে, হাতে ছাতাও আছে। তোমার একটু নজ্জা হ'ল না? মিষ্টি জাম কিনা। রায়েদিকে ব'ললে তারা কোন্ না দিত।"

"আমি রায়েদের।"

(মাথা নেড়ে নেড়ে)—"ও-মা—া, বলে কি! এখন ব'লবে বৈকি। হাতে-নোতে ধরা পড়েছ কিনা। তোমাকে ছাড়ব না, চল, রায়েদের ওখানে নিয়ে যাব। রায়েরা বুঝবে না, কত মুখ-পোড়া চুরি করে, তারা বলে, আমি বেচে খাই।"

"আমার নাম যোগেশ।"

(চেঁচিয়ে) ওমা—া', যাব কোথা! পোড়া-কপাল আমার! আমাকে কচি খুকী পেয়েছ? ভু-ভারতে এ-নাম শুনিনি।"

আশু গাছের টং-ডালে এতক্ষণ চুপ করে' বসেছিল। এবার খিলখিল করে হেসে উঠল। এতক্ষণ বৈষ্টমীর দৃষ্টি আমার পানেই ছিল।

বৈষ্টমী—'হে-রা এলো, তোকে বুঝি গাছে চড়িয়েছে? এমন দিনে-ডাকাতি বাপের বয়সে দেখিনি। তুই মুখ-পোড়া এর কথায় ভুললি? নাম বলছি, তোকে সুদ্ধ ধরে' নিয়ে যাব। বাবুরা কি গুণধর চাকরই রেখেছে!"

আমি বেগতিক দেখে, আশুকে ইসারা ক'রলাম। সে নেমে এসে কোঁচড়ের জাম কটা ঢেলে দিলে। বৈষ্টমী হতভম্ব হয়ে গেল। আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।

"জাম কই?"

"আর জাম! যে বাঘিনী বৈষ্টমী রেখেছ, তার মুখের তোড়ে দাঁড়ায় কে?"

বাড়ীর সকলে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। মা ব'ললেন, "পোড়া-কপালী দেখেও চিনতে পারলে না।" বিকাল বেলা বৈষ্টমী কিছু জাম নিয়ে এল।

এসেই—

"তোমরা বল, আমি চুরি করে' বেচি। ভদ্দনোকও জাম চুরি করে, আমার বাপের বয়সে শুনিনি। ডাক তোমাদের আশুকে, শোন।"

আশুকে ডাকতে হ'ল না। বৈষ্টমী শুনলে। "ওমা,—া, যাব কোথা! আমি বলি, কে না কে। আমায় বলে' দিতে হয়! আমি কি ছাই এত কথা জানি। হায়, এত বড় হয়েছে!"

প্রাণ-সংশয়

পূজার ছুটিতে পিতার সঙ্গে অবশ্য বাড়ী এলাম। এক বৎসর পরে মাকে পেলাম, কিন্তু কেমন যেন সে মা নয়। আমার পরে এক বোন হয়েছিল, নাম বিনোদিনী, মা গৌরী ছিলেন, বিনোদিনীর কাঁচা হলুদ রং মাকে [illegible] [illegible] দিদি কত বড় হয়েছে। তখন সে পাঁচ বছরের। বাড়ীতে পূজা দেখে, রাত্রে যাত্রা গান শুনে ও পরে এপুকুরে-ওপুকুরে, এখানে-সেখানে ঘুরে কটা দিন ফুরিয়ে গেল; আবার বাঁকুড়া আসতে হ'ল। এসে শোনা গেল, পিতাকে চট্টগ্রামে ৮০০, শত টাকা বেতনে বদলি করার কথা হয়েছে। তিনি পূর্বে একবার সেখানে ছিলেন, আবার যেতে অনিচ্ছুক, জজ সাহেবকে বলে বদলি রদ করালেন। এ সব কথা আমায় কেহ বলেনি। বাসায় অনেক লোক থাকত, রামলাল রায় ছাড়া গোয়ালসাড়ার পিসতুত দাদা চণ্ডীচরণ চৌধুরী, পিতার মাতুল বংশের পিয়াসাড়ার বামাচরণ সরকার এই কয়েকজনকে মনে পড়ে। আমায় কেহ মানুষের মধ্যে গণ্য ক'রতেন না। আমিও তাঁদিকে, মেজদাদাকেও ভয় ক'রতাম না। তাঁদের পরস্পর কথা শুনে বদলির খবর জেনেছিলাম।

একদিন শুনলাম, বাবার জ্বর হয়েছে, কাছারী যাবেন না। পরে দেখলাম, তিনি ভিতর বাড়ীতে না শুয়ে বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন। কেহ আমায় বলত না, আমায় বৈঠকখানায় ঢুকতে দিত না। কিছু হয়েছে এইটুকু বুঝলাম। বড়দাদা হুগলী কলেজে পড়তেন, দেখি তিনি এসেছেন। কেন এসে-ছেন, কে জানে। একদিন সকাল বেলা খেলতে খেলতে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ি। দেখি, বাবা মেঝেয় বিছানায় শুয়ে আছেন, মাথার কাছে একটা পিতলের ডাবরে [illegible] কফ জমা হয়েছে। এক সাহেব ডাক্তার পাশে বসে কি দেখছেন। আরও দেখি, [illegible] [illegible] বসা রয়েছে। [illegible] কি? কাকেও সাহসে বলে, অসুখ হয়েছে। একদিন এক নূতন লোক দেখি। কালো চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে রক্ত চন্দন, দেখলেই ভয় হয়। বিষ্ণুপুর হতে [illegible] এসেছে, তান্ত্রিক, রাত্রে শ্মশানে [illegible] কি করেন, ভোরবেলা আসেন। একদিন শুনলাম বাবার সান্নিপাত হয়েছে; কিন্তু সেটা কি অসুখ জানতাম না। তখন আমার বয়স দশ বৎসর, লক্ষণ দেখে ব্যাপার বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কোনও কালে নাই, শেখাবে কিছুই ছিল না। চিরকাল এই রকমই গেছে। সন্ধ্যার আগে অসংখ্য ভদ্রলোকে বাসা ভরে গেছে, দাদারা কাঁদছেন, সকলেই নিস্তব্ধ। আমি দেখছি, কিন্তু বুঝছি না। [illegible] কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কি ঘটেছে, তার [illegible] কিছুমাত্র বুঝতে পারিনি। দিন দুই পরে দেখলাম, জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে, বাড়ী যেতে হবে। বাড়ীতে পঁহুছিলাম, কান্নাকাটি শুনতে লাগলাম।

বড়দাদা আর হুগলী গেলেন না, এফ এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। সেখানকার (চকের বাজারের) বাসা তুলে দিয়ে সেজখুড়া, [illegible] খুড়া বাড়ী এলেন। খুড়ারা বাবার খুড়তুত ভাই, বাড়ীতে পৃথক-অন্ন। কিন্তু [illegible] দাদার সঙ্গে থাকতেন, হুগলীতে পড়াশুনা করতেন। পিতা চকদীঘির রায়েদের [illegible] তালুক বেশী সেলামি দিয়ে পত্তনি [illegible] ছিলেন। মুনাফা তেমন ছিল না। এক নায়েব বিশ্বাসঘাতক হয়ে রাজস্ব দাখিল না করে নীলাম করিয়ে গা ঢাকা দিলে। [illegible] জমীদারের নিকট হতে কেনা একখানি [illegible] (উদয় রাজপুর) ছিল। কিন্তু প্রজারা [illegible] বুঝে খাজনা বন্ধ করলে। ঘর হতে রাজস্ব

* ইহার দিনকয়েক পরে 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে অভিধান কিনি। তাতে দেখি প্রকাশক শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবিষ্কারে মনটা দমে গেছল। কিন্তু তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রায়, [illegible]

আধুনিক
ডিজাইনের
গিনি সোনার
নিখুঁত
অলঙ্কার
সৃষ্টিই
আমাদের
সাধনা।

ফোন ঃ ৩৪-৪৮৫৭

দিতে হল। শেষে নীলাম হয়ে গেল। দাদা কিছু জানতেন না, বুঝতেন না, দেখতে, দেখতে, সাত আট মাসের মধ্যে পূর্বের ঠাট ওলট-পালট হয়ে গেল। সেতারের তার বে-সুরো বাজতে লাগল।

এই সময় (ইং ১৮৭০ সালে এবং বাং ১২৭৭ সালে) বর্ধমান হতে দক্ষিণ দিকে এগুতে এগুতে মহামারী মেলেরিয়া আমাদের গ্রাম ও পাশের গ্রামে ঢুকল। ক্রমে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকোপ বাড়তে লাগল। সে নিদারুণ বার্তা লিখতে আমার কলম সরছে না। যে না দেখেছে, না ভুগেছে, সে বুঝবে না। পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে গ্রামের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক চলে গেল। কাঁদিবার লোক নাই, কে কাকে দেখে। পোড়াবার লোক নাই, শ্মশানে টেনে ফেলে দিয়ে আসত। সেখানে দিবারাত্রি শেয়াল, কুকুর ও শকুনির মাতামাতি চলত। বড় বড় পাড়ায় একটি দুইটি লোক রইল। আমাদের নায়েবের (দুর্গাদাস কুণ্ডুর) বৃহৎ পরিবার। এবেলা ঊনচল্লিশ, ওবেলা ঊনচল্লিশ পাত পড়ত। রইল তিনটি পুরুষ। মেলেরিয়া রাক্ষসী বেছে, বেছে, বালক-বালিকা ও নারী গ্রাস করতে লাগল। ডেঙ্গোর ঘর হয়ে গেল। আমাদের ছয় সাত ঘর জ্ঞাতি, এক ঘরে ঠেকল। খুড়োদের বাড়ী হতেও দুটি গেল। আমাদের বাড়ী হতে বোনটি গেল। মা তাকে আদর করে বিনোদিনী বলতেন, তখন এক বছর হয়নি, বাবা চলে গেছেন। এখন বিনোদিনী গেল, ধৈর্য থাকে কি? এদিকে জ্বর, কাঁদিবার শান্তি নাই, কে বা সান্ত্বনা করে? * বাড়ীতে বড়দাদা, মেজদাদা, আমি ও একটি রাঁধুনি সকলেরই কম্পজ্বর, সকলের পেটেই ডাগর পীলে। গ্রামের কবিরাজ বংশ নির্মূল, এক নারী থাকলেন, তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন। এক হাতুড়ে বড়ুজো ছিলেন, আমাদের তালপুকুরের পশ্চিমে বাসা, তিনি নাড়ী দেখতেন। কিন্তু তাঁর দশমূল পাঁচন আর ভাস্কর লবণের সাধ্য কি মেলেরিয়া ভাল করে।

শীতের পর নূতন আক্রমণ একটু কমল। বড়দাদা একটু সুস্থ হয়ে, চাকরীর চেষ্টায় বর্ধমান চলে গেলেন। মা, মেজদাদা, আমি ও রাঁধুনি থাকলাম। বাড়ীর চাকর অরুণ, গ্রামেই বাস, তার ছ-ভাই, বলিষ্ঠ যুবা, সবাই গেল। অরুণ মরে গেছে ভেবে, তার এক দাদার সঙ্গে বেঁধে সন্ধ্যার পূর্বে শ্মশানে ফেলে দিয়ে এসে-ছিল। রাত্রে প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টি জল খেয়ে কি রকমে সে বেঁচে ঘরে ফিরে এল। আমাদের নূতন নায়েবেরও জ্বর, কোনদিন আসেন, কোনদিন আসেন না। একবার ডাকাতি হবার পর হতে বাড়ীতে এক মাঝি (বাগদী) দরআন থাকত। কিন্তু জ্বরে কোঁ কোঁ করবে, না দরআনী করবে। বাড়ীতে খেয়ে রইল। রাঁধুনী নিজের বাড়ী চলে গেল, না গেলে তার দাদার সংসার অচল। আমরা থাকলাম তিনটি প্রাণী। তিনেরই জ্বর, এখন জ্বর পালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে। মাকেই আমাদের দুটা ভাত ফুটিয়ে, রাত্রের সাবু রাঁধতে হত। তাঁর রান্না কোনদিন হত, কোনদিন হত না। তাঁর জ্বরের পালা হলে, কে বা কাকে দেখে, কে বা কাকে জল দেয়! মা থাকতে পারতেন না, ধুঁকতে, ধুঁকতে কলসী হতে জল গড়িয়ে দিতেন, তাঁর হাত হতে গেলাস খসে পড়ত। শোনা গেল, কুইনীন মেলেরিয়ার ওষুধ। কিন্তু দুর্লভ। এক বৎসর পরে সরকারের টনক নড়ল। এক ডাক্তার বড় বড় দু বোতল আরক আনতেন, সপ্তাহে দুইদিন, লোকের পাথর বাটিতে একটু একটু ঢেলে দিয়ে যেতেন। নিরুপায় মানুষের আশ্রয় ঠাকুর। শীতলা মায়ের ও ধর্মরাজের কৃপা হল। পেটে পীলের দাগ দিয়ে অসংখ্য লোক বেঁচে গেল। কোথাও পেটে একটি কোথাও অনেক, কোথাও পিঠে দাগ নিতে লাগল। কোথাও দাগ ছাড়া আপাং গাছের ডাঁটার মালা পরতে লাগল। বিশেষ বিশেষ ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্যের প্রমাণও শুনতে পেতাম। বঁটি দিয়ে গোঁড়া নেবু কাটলে রক্ত রস বেরত। রুস্তা ছুঁচ দিয়ে বিঁধলে রোগীর পীলে ফোঁড়া হত, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করত। মেজদাদার পীলে তেমন বড় হয় নাই, তিনি দাগ নিলেন না। মা নিলেন, আমাকে ধর্মের দুয়ার ধরতে বললেন। আমি কিছুতে শুনলাম না। গলা ছিনা, পেট ডাগর, চোখ কোটরে, মুখ ফেকাসে, পাঁজরার হাড় জিবু-জিরো, বুকের ধুক-ধুকনি দেখতে পাওয়া যেত। জ্বর হত, পথ্য নানা জিনিস। মিছরি, বাতাসা, খই, ক্ষুদ ভাজা, কুড়ুন ভাজা, জেওটি ভাজা পথ্য ছিল। মা অনেক বুঝালেন, কিন্তু পেট পুড়িয়ে দেবে, আমি শিউরে উঠতাম। কতক দিন যায়, বোধ হয় বৈশাখ মাস, আমি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি, গো-ঘাটের বাবা স্বরূপ-নারাণ, প্রশান্তবদন, ব্রাহ্মণ মূর্তিতে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। শুনলাম তিনি বলছেন, "বাবা কোন ভয় নাই, আমার দাগ নে, ভাল হয়ে যাবি।" আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, স্বপ্নাদেশ আমায় আকুল করে দিল। সকাল হল, বেলা ৯টা, ১০টা হল, পেটে আর রাখতে পারলাম না, মাকে স্বপ্নের কথা বললাম। মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, মুখে আনন্দ ফুটে উঠল। আমি ধর্মরাজের দাস, পায়ে বেড়ী তার সাক্ষী। বাবা মুখ তুলে চেয়ে-ছেন। মা আমায় ভুলাতে লাগলেন, আমি চুপ করে থাকলাম। পরদিন গো-ঘাট লোক গেল স্বরূপনারাণের দুজন পূজক ব্রাহ্মণ নিয়ে এল। তখন বেলা ১১টা হবে। আমি দাঁড়িয়ে, একজন পেট টিপে পীলের স্থান ও পরিমাণ ঠিক করলেন। সেখানে সরিষা তেল লেপা ও তার উপরে কচি কলাপাতা বসান হল। তারপর কুল গাছের ডাল পুড়িয়ে একবার কলাপাতার বুলিয়ে দিলেন। বোধ হয় এক সেকেণ্ডও নয়। কিন্তু পীলে ও সমস্ত দেহ গুর-গুর করে উঠল। তাঁরা ঘা করতে বলে দক্ষিণা নিয়ে চলে গেলেন। সে ঘা শুখাতে এক মাস লেগে-ছিল। কিন্তু জ্বর ছেড়ে গেল। এরপরে বর্ষাকালে ও পরে দুই চারিবার জ্বর হয়েছিল, কিন্তু জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসতে হয়নি। তখন টিঞ্চারের আরক খুব চলেছিল, দু' গেলাস খেলে কিছুদিন ভাল থাকত। আরকের এমন বিশ্রী তিত-টক স্বাদ, বিশ্রী গন্ধ যে, খেতে গেলে বমি হ'ত, নাক টিপে খেতে হ'ত। লোকে বলত যোড়ার মত আছে। পালা বন্ধ করবার নানা রকম টোটকাও বেরিয়েছিল। কি এক পাতা, দু' হাতে রগড়ে তার রস শুঁকলে পালা বন্ধ হ'ত। কেউ কেউ বলত, পালার দিন ভুলে গেলে, পালাও ভুলে যায়। এটা মিথ্যা কথা। পালার দিন ভুলবার জো ছিল না। বেলা ৮টা ৯টা হতে রোদ এক নূতন রকমের মনে হত, গাছের পাতা চিক্-চিক্ করত। কেউ কেউ পালার দিন ভোরে উঠে, নদীতে দশ-পনরটা ডুব দিয়ে আসত, পালা ছেড়ে যেত। মেলেরিয়ার প্রথম দু'বছর যে কি করে কেটেছিল, আমার কিছুই মনে নাই।

---

* বড় বউ পিত্রালয়ে, বাড়ীর এই অবস্থা দেখে মা তাঁকে আনেননি। মেজবউ ছেলেমানুষ, পিত্রালয়ে। দিদি শ্বশুর-বাড়ীতে, তাঁদের গ্রামে তখন মেলেরিয়া ঢোকেনি, মা আনতে ভয় করলেন। তখন তাঁর বয়সও বেশী নয়।

লেখকের অপ্রকাশিত আত্মচরিতের প্রথম দুই পল্লব।

বঙ্গের দুর্গোৎসব

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

পরে অরিন্দম ধনুষ্পাণি সুমিত্রানন্দন বহু-দূরে গমন করতঃ দূরে হইতে রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্য-ব্যূহ দেখিয়া পিতামহ যেরূপ নির্দেশ করিয়া-ছিলেন সেইরূপেই সেই মায়াবিশারদ ইন্দ্র-জিৎকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

পাঠক এই দৈবরথ পন্ডিতের যুদ্ধে জয়মাল্য কাহার গলে দিবেন তাহা বিচার করিবেন। তবে বেদের একটা মন্ত্রের সাহায্যে এই রহস্যের সমাধান হইতে পারে।

যথা—

পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়াহৃদা পশ্যন্তি
মনসা বিপশ্চিতঃ
সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরীচিনাং
পদমিচ্ছন্তি বেধসং॥
(ঋ ১০)

সায়ন ভাষ্যে অসুর অর্থে অসন কুশল বা নিক্ষেপ কুশল পরমাত্মা। অস্ বা অসু ধাতু নিক্ষেপে যেমন অস্ত্র। মীয়তে মতিমিমেতি বা অনয়া ইতি মায়া যাহার দ্বারা মাপ বা পরিমাণ অনুমান বা মনন করা যায়। অচল পরমাত্মা হইতে পরিমিত শক্তি ও মন লইয়া তন্দ্বারা অভিভূত হইয়া সৃষ্ট এক একটি গতিশীল আত্মা—(অস ধাতু গত্যর্থে) যেন পতঙ্গরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া এক একটি দেহক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাকে সাধকগণ নিজ হৃদয়ে দেখিতে পান। পরন্তু আরও উন্নত দৃষ্টি লইয়া কেহ কেহ সমুদ্ররূপে অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্তলে তাঁহাকে ব্যাপিত দেখিয়া থাকেন। ইহাই 'সোহহং' রূপে দেহী আত্মার ভূমাজ্ঞান বা ব্রহ্মাণ্ডস্য পরিচয়। আর যে সকল প্রাণী। যে কারণ হইতে এই মরীচিকা অর্থাৎ মরুভূমিতে জল দৃষ্টি হয় তাহার নিকটে সেই অদৃশ্য অবিনশ্বর মরীচিকারূপে পদপ্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের (ব্রহ্মার নহে) বিধান। উত্তরকাণ্ডে সনৎকুমারের নিকট নারদের এই ভূমাজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্তির কথা আছে। যাহা উপনিষদে পরে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মের সেই অপরিমিত শক্তি, দৃষ্টি ও মনরূপ মায়ার সহিত নিজ যোগসাধন করিয়াই লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের পরিমিত মায়া বা শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মণই গোলোকে সরযূ তীরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অনেক পন্ডিত মহোদয় এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাম সরযূ সলিলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

স্মৃতি কথা

(২০ পৃষ্ঠার পর)

চালচলন ছিল পল্লীগ্রামের বাঙালী গৃহস্থের মত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত [illegible], স্পষ্ট বক্তা, স্বাধীনচিত্ত ও তেজস্বী। এজন্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শিথিল। সেকালের স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ অধ্যাপক রাজমোহন সেনের মতই তিনি তেজস্বী ছিলেন।

তিনি মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন [illegible] উপভোগ্য হাস্যরসের পরিবেষক ছিলেন। শুধু লেখায় নয়, বন্ধু মজলিসের [illegible] ও অধ্যাপনায় নির্মল স্বচ্ছ হাস্যরসের [illegible] ছুটাতেন। শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ নিয়ে [illegible] কেউ এমন হাস্যরসের সৃষ্টি করতে [illegible] জানি না। তাঁর সমস্ত রচনায় হাস্যকৌতুক ও রঙ্গরসিকতা থাকত। সেরূপ [illegible] এ যুগে কারো দেখিনা।

বিধাতা এই সদাপ্রফুল্ল [illegible] ভাণ্ডারীকে কম দণ্ড দেন নি। একে একে তিনি দুইটি উপযুক্ত কৃতবিদ্য পুত্রকে ও একটি কন্যাকে হারালেন। তিনি শেষ [illegible] স্ত্রী বিয়োগে। এই মানুষটির [illegible] দেখেছি শোক বিজয়ে। এইরূপে শোক [illegible] শক্তি ছিল অধ্যাপক মান সাহেবের। [illegible] শোক তাঁকে তাঁর জীবনব্রতে [illegible] বিচলিত করতে পারেনি—[illegible] হাসিও নিঃশেষে হরণ করতে [illegible]।

তাঁর এম-এ পাশ [illegible] লালের অকাল মৃত্যু [illegible] লিখেছিলাম, তার উত্তরে তিনি [illegible]—

উত্তর চরিতের—

"দুঃখ সংবেদনের [illegible]
মাহাত্ম্য—এই হ'লো আমার [illegible]।
ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল [illegible]
তোমার প্রেমে [illegible]
[illegible]।

রবীন্দ্রনাথের এই [illegible] সান্ত্বনা পাচ্ছি।

ললিতবাবু রবীন্দ্রনাথের [illegible]— কিন্তু যখনই তাঁর সঙ্গে মতভেদ [illegible]— তখনই নির্ভীক ভাবে তিনি প্র[illegible] সবুজপত্রে প্রকাশিত কবিগুরুর [illegible] প্রতিবাদ 'ভর্তার উত্তর' সে [illegible] সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

বৈকালে ললিতবাবুকে [illegible] পুরাতন বই-এর দোকানগুলিতে [illegible] তাঁর সামান্যই, দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থের [illegible] যাপন করতেন—তাতে যা [illegible] পারতেন, তাতে বই কিনতেন। [illegible] কাশীতে কিছুকাল থাকার [illegible] তাতেই।

বেসরকারী কলেজে [illegible] মহাপ্রাজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] অল্প মাহিনাতে সারাজীবন [illegible] আর্থিক উন্নতির কোন চেষ্টা [illegible] কতবার ধনী সন্তানদের গৃহ[illegible] জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন—তিনি [illegible] রাজী হ'ন নি।

পর্ণপুটের মারফত আমি [illegible] হয়েছিলাম। সাহিত্য-জীবনে তাঁর [illegible]

আমাকে [illegible] করেছে। অধ্যক্ষ জি-সি-বসুর আহ্বানে [illegible] গ্রহণে সম্মতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সুখবর দিতে গেলাম।

তিনি বললেন, "সর্বনাশ! আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তুমি সম্মতি দিয়ে এলে। [illegible] অসম্মতি জানিয়ে এসো। তুমি [illegible] উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের শাসনে রেখে পড়াতে পারবে না। তোমার সাহিত্যিক মর্যাদা তারা [illegible] না বুঝবে না। তোমার আয়ুক্ষয় হবে। সাহিত্য সেবারও অবসান হবে। এই বয়সে আমিই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সাহিত্য সাধনায় অধ্যাপকদের চেয়ে বেশী মর্যাদা পাবে। চাল বাড়িয়ো না, অর্থের অভাব কোনদিন হবে না।"

আমার কলেজে প্রবেশ এইখানেই ইতি হয়ে গেল। আজ তাই মনে হয় সাহিত্যের মারফত [illegible] নাই পেলাম, এই সব মহাপুরুষের স্নেহলাভ করেছি, এ কি আমার কম সৌভাগ্য?

এইবার আমার গুরুদেব হেনরি ষ্টিফেন সাহেবের কথা বলি—এঁকে দেখলে আর্য ঋষিদের কথা মনে পড়ত। ইনি অতি দীন বেশে থাকতেন—বিন্দুমাত্র সাহেবিয়ানা ছিল না। পায়ে তাঁর বিবর্ণ কেম্বিসের জুতো—তাতে ফিতেও সব সময়ে বাঁধা থাকত না। নিজে দরিদ্র জীবন যাপন করে বই কিনতেন। আর ছাত্রপ্রার্থীদের সাহায্য দান করতেন।

তাঁর স্কচ উচ্চারণ আমরা ভালো বুঝতাম না বলে তিনি লেকচার বেশি দিতেন না,—তাঁর [illegible] খড়ি দিয়ে বোর্ডে সমস্তটা লিখে দিতেন—[illegible] তাঁর বসাই হত না। তাতে [illegible] হতো খুব, তিনি ঘেমে উঠতেন। [illegible] দর্শনশাস্ত্র তাঁর ব্যাখ্যায় জলবৎ তরল হয়ে যেত। সেকালে তাঁর শিক্ষাগুণে দর্শনশাস্ত্র ছাত্রপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এক অর্বাচীন অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন—"ষ্টিফেন সাহেব [illegible] ফিলসফিই প্যারোটের মত আওড়ায়,—ওর নিজের ফিলসফি কিছু নেই।"

একথা শুনে আমি বলেছিলাম—"নিজের ফিলসফি কোন অধ্যাপকেরই ত দেখি না— Mr. Stephen does not write Philosophy, but lives Philosophy. [illegible] যে তাঁর জীবনেও ওতপ্রোত, অনুস্যূত [illegible] দেখেননি না, স্যার। দর্শনশাস্ত্র যে তাঁর জীবনে জীবন্ত হয়ে রয়েছে।" তারপর বেশী দিন [illegible] হয়নি, একদিন ঐ অধ্যাপকটির নিজের [illegible] ফিলসফি বলতে ছিল, সেই থিসিস [illegible] একখানা জার্মাণ বই থেকে আগাগোড়া চুরি, এমন কি অনুবাদ তা ধরা পড়ে গেল এবং চুরি [illegible] ঐ ষ্টিফেন সাহেবই। অধ্যাপক [illegible] বাংলা দেশ ছেড়ে পাঞ্জাব না [illegible] কোথায় যেন পালালেন।

[illegible] ষ্টিফেন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। [illegible] হয়ে থাকতেন। একটা সুতোয় [illegible] তাঁর চশমা গলায় ঝুলানো থাকত। [illegible] পড়াতে পড়াতে তিনি চশমা খুঁজে [illegible] না। পকেটে হাত দিলেন—টেবিলের [illegible]—তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন। বাসাতেও চশমা খুঁজে না পেয়ে আবার ক্লাসে এলেন—এসে বললেন—To day I cannot proceed further as my spectacles are missing. একটি ছাত্র বললে—"So you are perturbed Sir! Your spectacles are reposing on your back." চশমা পেয়ে অধ্যাপকের আনন্দ আর ধরে না—দশবার Thank you master ব'লে আবার বোর্ডে লিখতে লাগলেন। সর্বাঙ্গে খড়ির গুঁড়োয় ভূষিত হয়ে তিনি ক্লাস ছেড়ে যেতেন। মনে হ'ত যেন ময়দার কল চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই হ'লো সেকালের অধ্যাপকের নিদর্শন। আমাদের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন তিনি ছিলেন বি-এ। তাঁর নাম ছিল শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বি-এ অধ্যাপকের মতো অনর্গল ইংরাজি কেউ বলতে পারতেন না। তিনি ছিলেন—Chemistry ও Mathematics এর অধ্যাপক। কিন্তু যে কোন অধ্যাপক না এলে তাঁদের বদলে তিনি Logic, Physics, History ইত্যাদিও পড়াতে আসতেন। অনর্গল ইংরাজি বলার ক্ষমতা থাকায় কোন বিষয়ের অধ্যাপনায় তাঁর বাধা হ'তো না। ইনি পরে কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ হন।

আমাদের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার হীরালাল হালদার। ইনি Logic, Philosophy ও English prose পড়াতেন। খুব কড়া মেজাজের লোক—কখনো হাসতেন না, কিন্তু হাসাতেন। তাঁর পড়ানোর ধরণ ছিল স্বতন্ত্র। তিনি যা পড়াতেন তা In other words ব'লে ৫।৭ বার ব্যাখ্যা করতেন—তার ফলে, শুধু শুনলেই ক্লাসে পড়া তৈরি হয়ে যেত। ছেলেরা বলতো—বইয়ের কোন অংশের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়লেও ক্ষতি হয় না—জেগে উঠেও দেখা যাবে—সেইটারই ব্যাখ্যা হচ্ছে। অনায়াসে বাজারে গিয়ে পান খেয়ে আসাও চলত। ডাঃ হালদার হেগেল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন—তাঁর থিসিসও ছিল Hegelianism এর উপরে। তিনি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

রিপন কলেজে একজন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর নাম বিপিনবিহারী গুপ্ত (গণিতের বিপিনবাবু ন'ন)। ইনি ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। এঁ'র পড়ানোতে খ্যাতি ছিল খুব বেশি,—তার চেয়ে খ্যাতি ছিল কলেজকে সায়েস্তা ও শান্ত রাখার। মানুষটি ছিলেন রুগ্ন ও খর্বাকৃতি। কিন্তু তাঁর হুংকারে কলেজ নিস্তব্ধ হয়ে যেত। অত্যন্ত রাশভারী মিতভাষী লোক। ইনি সাহিত্যিকও ছিলেন। ইনি আমার বন্ধুর বড়দাদা ছিলেন সেজন্য এঁকে বড়দা বলতাম। একদিন বড়দা বল্লেন— "দেখ, সুরেশ সমাজপতি বলে কিনা আমি বুড়ো ধরে ধরে তাদের মুখের কথা শুনে শুনে বই লিখি। বুড়োর মর্যাদা সুরেশ কি বুঝবে? আমরা কিই বা জানি! ঐ বুড়ো অধ্যাপকগুলো দুদিন পরেই মরে যাবে, ওরা এক একটা বিদ্যার জাহাজ। ওরা যা পড়েছে তার সিকির সিকিও আমরা পড়িনি। ওদের বিদ্যাটা কলেজের ক্লাসে wasted হয়েছে, ওদের বিদ্যাটাকে আমি কেতাব-বন্দী ক'রে রাখতে চাই, দশের ও দেশের উপকার হবে। অন্যায় কি করি বলত?"

কবিরাজ কার্তিকচন্দ্র করের

এন্টিসেপ্টিক সার্জিক্যাল অয়েল

ভারতমাতার ভৈষজ্যভাণ্ডার মন্থন করে কবিরাজ 'কার্তিকচন্দ্র কর মহাশয় যে "এন্টিসেপ্টিক সার্জিক্যাল অয়েল" তৈরী করে গেছেন, তা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত। সুদীর্ঘকাল যাবৎ নিজের শক্তি বজায় রেখে জাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

এই সার্জিক্যাল অয়েলের উপকারিতা দেখিয়া অর্থলিপ্সুগণ তাহাদের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বহু জাল ও নকল বাহির করিয়া বাজারে চালাইতেছে; তবুও গুণীর গুণ কেহ লংঘন করিতে পারে নাই। তাই এই এন্টিসেপ্টিক সার্জিক্যাল অয়েলের গতি সদর্পে আপনাদের সেবা করিয়া যাইতেছে।

যে কোন দূষিত ঘায়ে ও কাটা, পোড়া, ফোড়া, একজিমা, কাউর ঘা, খোস পাঁচড়া ও চর্মরোগে ব্যবহার্য। গৃহপালিত পশুর জন্য ব্যবহার করাও হয়।

এইটুকু মনে রাখিবেন—ইহা সম্পূর্ণ কবিরাজী মতে প্রস্তুত।

ভারতের প্রত্যেক জেলায় উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক

কবিরাজ—

কার্ত্তিকচন্দ্র কর এণ্ড সন্স

৮৫নং বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

সাধারণতঃ রসগোল্লা ও সন্দেশ চিরপ্রচলিত প্রথায় প্রস্তুত হয়ে থাকে

— কিন্তু —

বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

মিষ্টান্ন শিল্পের প্রসারতা ও উন্নয়নকল্পে বিজ্ঞানের সাহায্যে "প্রস্তুত - প্রণালীর" আমুল সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছে।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

আবিষ্কারক — রসোমালাই

কলিকাতা।

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ — কেন ও কিভাবে? ...

১৯৩৪ : যখন বিদেশী কালি ভারতের বাজারে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিয়াছিল সেই সময় উৎকর্ষের ভিত্তিতে সুলেখা কালিই **সর্বপ্রথম** প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়;

১৯৩৮ : সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালিই **সর্বপ্রথম** প্রাথমিক রঙের ক্ষেত্রে নূতনত্ব আনে;

১৯৪৪ : সুলেখা কালিই **সর্বপ্রথম** 'সলভেন্ট' আবিষ্কার করিয়া ভারতীয় কালি-শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে;

১৯৪৫ : সুলেখা কালিই **সর্বপ্রথম** সর্বভারতীয় ভিত্তিতে উৎকর্ষের গুণে খ্যাতি ও প্রসার লাভ করে;

১৯৪৮ : সলভেন্ট এস-১০০' মিশ্রিত সুলেখা স্পেশাল ফাউন্টেনপেন কালি ভারতীয় কালি-শিল্পকে আরেক ধাপ অগ্রসর করে;

১৯৫৪ : **একমাত্র** সুলেখা কালিই **দক্ষিণ** ভারতের বাঙ্গালোর কংগ্রেস প্রদর্শনী ও মহীশূর দশহরা প্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর স্বর্ণ-পদক লাভ করে;

১৯৫৫ : দিল্লীর প্রসিদ্ধ ভারতীয় শিল্প মেলার ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশানের প্রদর্শিত শিল্পপণ্যের মধ্যে **একমাত্র** সুলেখা কালিই স্থান লাভ করে;

১৯৫৬ : ভারতে অধিকাংশ "বিদেশী" কালির কারখানা স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বাধিক চাহিদা সন্দেহাতীতরূপে সুলেখা কালির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছে।

পৃথিবীর কালি-শিল্পে একটি ভারতীয় কালি যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আপনারও গর্বের বিষয়। আজ এশিয়ার বৃহত্তম কারখানায় সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুলেখা কালি প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধ-পূর্বদিনেও ভারত লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী কালি কিনিয়া ঘরের টাকা বাহিরে পাঠাইত, আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে কালি-শিল্পে সে শুধু স্বাবলম্বীই নহে, ভারতীয় কালি আজ উৎকর্ষের গুণে বিদেশেও সমাদৃত হইতেছে।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

বিপিনবাবু আচার্য কৃষ্ণকমলের কাছে পরিপ্রশ্ন করে অনেক তত্ত্বকথা জ্ঞান জগতের অনেক তথ্য আদায় করে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' আর আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মুখের অমূল্য কথাগুলো সংগ্রহ করে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামে দুখানা বই লিখেছিলেন। সে বই এখন আর পাওয়া যায় না। বিপিনবাবু বলতেন "অপ্রবীণ অধ্যাপকদের উচিত বর্ষীয়ান অধ্যাপকদের বিদ্যা প্রশ্নের আঁকশীতে আকর্ষণ করে বার করে বই লেখা। নইলে সব লুপ্ত হয়ে যাবে।

রিপন কলেজের আর একজন অধ্যাপক ছিলেন প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি আমার গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ বিদ্যায় ও বিবিধ জ্ঞান-শাখায় এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। আসল জ্ঞান-লাভের ও পাণ্ডিত্যের স্বাভাবিক পরিণাম যা তাই হয়েছে। তিনি এখন সংসার ত্যাগ করে প্রত্যাগাত্মানন্দ স্বামী হয়েছেন। ইনি এক সময় ভারতবর্ষে যে সকল আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ লিখতেন, সেগুলি পড়ে আমি তত্ত্বমূলক কবিতা লিখতাম। এ হিসাবে তিনিও আমার গুরু। সন্ন্যাস গ্রহণের পরও তাঁর জ্ঞান বিকিরণের ব্রত বন্ধ হয়নি। ইনি ইংরাজিতে ও বাংলায় অনেক বই লিখছেন। এঁর রূপসুন্দর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনার ফল।

তাঁর ইংরাজিতে লেখা ইদানীং কতকগুলি মিষ্টিক কবিতার একখানি বই পেয়েছি। তত্ত্ব ও রসের এমন অপূর্ব সমন্বয় কচিৎ পাওয়া যায়।

গৌহাটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। শুনেছি ইনি ইংরাজি, দর্শন, সংস্কৃত তিন বিষয়ে অনার্স পান। ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণী, বাকি দুটিতে প্রথম শ্রেণী। সংস্কৃতে এম. এ. পড়েছিলেন—একজন কে বলেছিল—উনি ইংরাজিতো একটু কম জানেন। তিনি একগুঁয়ে ও জেদী মানুষ ছিলেন, একথা কানে যেতে তিনি সংস্কৃত ছেড়ে ইংরাজিতেই এম-এ দিয়ে খুব ভাল ফল করেন। কিন্তু ইনি সংস্কৃতেরই অধ্যাপক ছিলেন। প্রত্যেক সাহিত্য সম্মেলনে ইনি যেতেন। সাহিত্য-পরিষদের কাজে খুব উৎসাহ ছিল তাঁর। দেখা হলেই বলতেন, একবার গৌহাটিতে আসুন। গৌহাটি গিয়ে এঁর অতিথি হলাম। ইনি গোঁড়া [illegible] আচারের বিধি নিষেধে আমি [illegible] পড়লাম। এঁর বাড়িরের [illegible] ছিল—তাতে আমার বিছানা হল। [illegible] সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে আলোচনা [illegible] প্রধান আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] স্থান হয়েছে—তার মূলে আছে [illegible] চেষ্টা ও সাহিত্য পরিষদের আন্দোলন [illegible] বললাম, এইবার আপনি [illegible] অধ্যাপক বললেন—তা কি হয় [illegible] একা থাকবেন—আমি এই [illegible] কাটিয়ে দেব। সমস্ত রাত্রি [illegible] আমার নানা ভ্রান্ত সংস্কার [illegible] করলেন—নিজেও ঘুমোলেন না, [illegible] দিলেন না। এইসব দিগ্‌গজ [illegible] কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, এটা তারই [illegible]

প্রতিবেশী কবি দেবেন্দ্র [illegible] পেয়ে এসে আমাকে পণ্ডিতের [illegible] উদ্ধার করলেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল সম্বন্ধে [illegible]

তিনি সর্বদা সারস্বত সাধনায় এমনই তন্ময় হয়ে থাকতেন যে তাঁর একেবারে বাহ্যজ্ঞান থাকত না। শীল মশায় একটা money order formও fill up করতে পারতেন না। একজোড়া কাপড় না কেটে পরে শীল মশায় একবার কোন সভায় গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সভায় যারা উপস্থিত থাকে তারা সবাই তাঁরই মত বিদ্বান। সেজন্য তিনি অত্যন্ত দুরূহ অপ্রচলিত শব্দে পরিপূর্ণ ইংরাজিতে বক্তৃতা করতেন। সভার লোকেরা একবর্ণও বুঝত না। তাঁর ছাত্র শ্রীকুমার বাবুর মুখে শুনেছি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেব একবার তাঁর লেকচার শুনে এসে বলেছিলেন—"Oh, I thought he was a seal! I found he was a hippopotamas." শীল মহাশয় একবার ক্লাসে প্রবেশ করলে দু'তিন ঘণ্টার আগে তাঁকে বার করা কঠিন হত।

আমার অধ্যাপক শশীবাবুর কাছে শুনেছি বহরমপুর কলেজে (কাসিমবাজার রাজার কলেজে) যখন তিনি অধ্যক্ষ, তখন যে ঘরে তিনি পড়াতেন সেই ঘরটাকে তাঁরই নির্দিষ্ট সময়ে চুনকাম করতে এসে রাজমিস্ত্রীরা প্রত্যেকদিন ২।৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফিরে যায়—তাঁর অধ্যাপনা কিছুতেই শেষ হয় না। মিস্ত্রীরা বিল্ডিং সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে নালিশ করে। তিনি বিরক্ত হয়ে এসে শীল মহাশয়কে বলেন—"দেখুন, টাকা দিলে আপনার মত প্রোফেসার অনেক পাওয়া যাবে; কিন্তু টাকা দিলেও অনেক সময় মিস্ত্রীদের পাওয়া যায় না।" তাতে সদাশিব শীল মশায় লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করেন না। অথচ গুরু স্থানীয় অধ্যক্ষের প্রতি এই অমর্যাদা প্রকাশের জন্য অধ্যাপক ললিত-কুমার বহরমপুরের চাকরি ছেড়ে কুচবিহারে চলে যান।

সেকালের অধ্যাপকরা এত বেশি জ্ঞান-চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন যে, তাঁদের লৌকিক বা ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকত না। মান-অপমান বোধও তাঁদের লুপ্ত হয়ে যেত। মূর্খ প্রাকৃত জনের উপর কখনও তাঁরা রাগ করতেন না। সেকালের অধ্যাপকদের চরিত্রবলও ছিল অসাধারণ। তাঁরা জানতেন বিলাসিতা অধ্যাপকদের আভিজাত্য নষ্ট করে। নানাভাবে আয় বৃদ্ধির কথা কেউ ভাবতেও পারতেন না। তাঁরা মান-যশের কাঙালও ছিলেন না। প্রাইভেট টিউশন করাকে সে কালের অধ্যাপকরা অমর্যাদাকর কাজ এবং বহুমূল্য সময়ের অপচয় মনে করতেন। আমাদের স্বর্গত রাজাপাল (তখন সিটি কলেজের অধ্যাপক) তরুণ বয়সে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে ভালো প্রাইভেট টিউশনের জন্য সুপারিশ চেয়েছিলেন। রাজা-পাল লিখেছেন—"He shouted at me and chased me out of his study the verandah of his house and the compound."

অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্রের নৈতিক আদর্শ ছিল অত্যন্ত উচ্চ। তাঁর নৈতিক আচার-বিচারের কঠোরতার কথা ছাত্র সমাজে হাস্যপরিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে আমার এক সহপাঠী বলেছিলেন—আপনি যদি বইগুলো বাংলায় না লিখে ইংরাজিতে লিখতেন তা হলে International reputation লাভ করতে পারতেন,—বইএর বিক্রয়ও খুব বেড়ে যেত। অনেক বেশি আয় হ'ত। ত্রিবেদী বলেছিলেন—"আমি আমার দেশের লোকের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করতে চাই—আমার মাতৃভাষার একটা দিককে সমৃদ্ধ করতে চাই, আমার এই ব্রতের কাছে যশ, মান, অর্থ তুচ্ছ। ইংরাজিতে আমার মত লেখক বিলাতের গলিতে গলিতে।"

সেকালের অধ্যাপকরা একটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হয়েই ক্ষান্ত হতেন না। তাঁরা বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতেন। তাঁরা আমরণ শিক্ষার্থীই রয়ে যেতেন। কারো কারো বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান, তাঁর বিশেষজ্ঞতাকেও গভীরতায় অতিক্রম করে যেত। আচার্য কৃষ্ণকমল, ব্রজেন্দ্র শীল, যোগেশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হুইলার, টিৎকেন, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য, সারদারঞ্জন রায়, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

যত বিদ্বানই হোন, তাঁরা সকলেই ছিলেন নিরভিমান, সরলচিত্ত ও স্বল্পে পরিতুষ্ট। ইঁহাদের সকলেরই জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর। বিলাত ফেরতা অধ্যাপকেরা সাহেব ব'নে যেতেন না। প্রফুল্লচন্দ্রের মত সবাই তাপস-জীবন যাপন করতেন না বটে, কিন্তু সকলেরই চালচলন ছিল সাদাসিধে। এজন্য এঁদের অনেকে সঞ্চিত অর্থ থেকে বিবিধ সারস্বত অনুষ্ঠানে কিছু কিছু দান করতে পারতেন।

যোগেশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশ বিদ্যাভূষণ, বিধুশেখর শাস্ত্রী এঁরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এক একজন মহারথী। এঁদের সঙ্গে এবং এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে অনেক অধ্যাপকই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত। যেমন—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ (রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক), বিপিন-বিহারী গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমচন্দ্র দাশ-গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞান), পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, জগদানন্দ রায়, রাধাগোবিন্দ নাথ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ইত্যাদি।

সেকালের অধ্যাপকদের কেউ কেউ ইংরাজিতে চমৎকার কবিতা লিখতেন। মনোমোহন ঘোষের ত কথাই নেই, তিনি ইংলন্ডের কবি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবি দত্ত, বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি আরো কেউ কেউ ইংরাজি কবিতা রচনায় কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অনেক অধ্যাপক ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতার জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলেই বলতে—এন, ঘোষ (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ), জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পি, কে, রায়, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, জয়গোপাল-বাবু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জানকীনাথ ভট্টাচার্য ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানবাবুর বক্তৃতা আমরা বহু সভাতেই শুনেছি। সর্বদা একটি ছাতা তাঁর হাতে থাকত। আমরা তাঁকে ছত্রপতি অধ্যাপক বলতাম। সভায় সভায় বক্তৃতা করা তাঁর একটা দৈনিক ব্রত ছিল। জিতেন-বাবুর মুখ থেকে বক্তৃতা কালবৈশাখী ঝড়ের মত ছুটত। ই. এম হুইলার ও সারদারঞ্জন রায়

(ইহার পর ২৪৩ পৃষ্ঠায়)

মেয়েদের শাড়ী পরা

শ্রীমতী বেলা দে

রেখাচিত্র: কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার
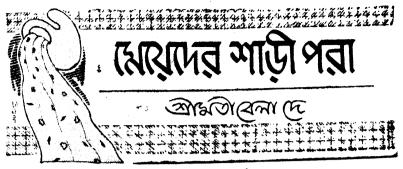
অতি প্রাচীনকাল থেকেই কাপড় বোনায় বাঙালী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একখানি খুব পুরোনো বই এবং অন্ততঃ দুহাজার বছর আগেকার লেখা। এই বইতে বাংলায় প্রস্তুত চার রকম

কাপড়ের উল্লেখ আছে। এদের নাম ক্ষৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক। নানা জাতীয় গাছের শাঁস থেকে সুতো তৈরী করে যে সব চিকণ কাপড় তৈরী হোত তার নাম দুকুল।

এখন যাকে 'লিনেন' বলি আমরা। ঠিক এই জাতীয় মিহি ও মসৃণ কাপড়। কৌটিল্য লিখেছেন যে, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় যে দুকুল তৈরী হোত তা বেশ সাদা ধবধবে ও নরম এবং উত্তর বাংলায় আর এক শ্রেণীর 'দুকুল' তৈরী হোত তা অনেকটা নীলাম্বরীর মত কালো এবং রত্নের মত স্বচ্ছ ও কোমল। দেশের নাম অনুসারে এই দুই শ্রেণীর দুকুলের নাম ছিল বঙ্গক ও পৌণ্ড্রিক। ক্ষৌম নামে যে কাপড় হোত তা দুকুলের মতই কিন্তু একটু মোটা ধরণের কারণ এর সঙ্গে কিছু তুলোর সুতো মেশানো

থাকতো। পত্রোর্ণ মানে রেশমের কাপড়। কোনো কোনো গাছের পাতায় এক রকম পোকা থাকত তাদের মুখের লালা থেকে সুতো তৈরী করে এই কাপড় প্রস্তুত হোত। এই কাপড়কেই কৌষেয় বলা হোত, এর রং ছিল সাদা। এই কাপড়ও উত্তর বাংলায় তৈরী হোত। কার্পাসের সুতায় যে কাপড় তৈরী হোত তার নাম ছিল কার্পাসিক।

ঊনিশ শত বছর পূর্বে একজন গ্রীক বণিক এদেশে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন বাংলা দেশ থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মসলিন কাপড় বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। সুতরাং সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে অন্যান্য সভ্য জগতেও বাংলার কাপড়ের খুব আদর ছিল এবং বস্ত্রশিল্প খুব প্রাচীনকাল থেকে বাংলার একটি বড় রকমেরই শিল্প ছিল।

ভারতবর্ষের নানা ভাগে নানা রকম জল-হাওয়ার জন্য মানুষের চেহারা, পোষাক ও [illegible] বিচিত্রতা আমাদের চোখে পড়ে।

তবে এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে ভারতীয় মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিচ্ছদ পৃথিবীর অন্যান্য মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিচ্ছদ অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও সুরুচিসম্মত। আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব বাংলা দেশে শাড়ী পরার প্রচলন কবে থেকে হলো।—

বিশাল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শাড়ীর প্রচলন সর্বত্র। আদম-ইভের আমল থেকেই ধরা যাক—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়েরা হয় তো নারীর বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দর আরামদায়ক বেশভুসা রচনায় বহুদিন ব্যস্ত ছিলেন। জলপাই আর ডুমুর-পাতা গেঁথে এক ধরণের পোষাক রচনার কথা জানা যায়। আজকের রঙ্গীন চোখে পাতার তৈরী সে সব পোষাকের মর্যাদাকে নিশ্চয় আমরা মোটেই আমল দিতে রাজী নই। কিন্তু সেই সময়ের পরিবেশে সে পোষাক হয় তো

অজানা সুন্দরীদের অতুলনীয় মাধুর্য [illegible]
করেছিল। ভারতে অবশ্য বহুকাল [illegible]
শাড়ী পরার প্রচলন চলে আসছে। [illegible]
যুগের আর্যললনা থেকে পূর্ব [illegible]

অভিসার

কল্যাণী মজুমদার

গুরু গুরু করি ডাকিতেছে মেঘা
দুরু দুরু করি কাঁপিছে বুক,
কাহার লাগিয়া নয়ন মেলিয়া
চাহিয়া আছি গো সমুখেতে।
হৃদযমুনার কালোজল পাড়ে
কোন্ কালা আজ বাজায় বাঁশী,
নয়নে কাহার বাঁকা কটাক্ষ
মধুর অধরে বিষের হাসি?
মেঘে ঢাকিয়াছে কদম্বগাছ
কালো জলে আজ উঠেছে ঢেউ,
বাতাস হয়েছে উতল পাগল
পথে ঘাটে আজ নাহিকো কেউ।
এমন সময় কেন বাঁশী ডাকে
এ পরাণ মন আকুল করি,
সমাজের ভয়, গৃহের বাঁধন
পারিছে না আজ রাখিতে ধরি।
বর্ষার ধারা নামিল ভূতলে
পঙ্কিল হ'ল সে পথঘাট,
বজ্র হাঁকিছে, বনানী কাঁপিছে
এমন সময় ডাকিলে তুমি।
পিছনে রহিল স্নেহছায়াঘেরা
মমতা জড়ানো গৃহের কোল,
তুমি [illegible] ডাকি ঘুচিল আমার
মধুর মোহের সব বাঁধন।
[illegible]
আজ লইনু শরণ অভয় চাহি,
তুমি আলো মোর নয়ন জুড়িয়া
ওগো নিঠুর হৃদয় স্বামী।

প্রতীক্ষা — দিলীপকুমার দাশ

[illegible] এ সম্বন্ধে [illegible] সুন্দরীর [illegible] থেকেই স্মৃতির অতীত কাল থেকে শাড়ী [illegible] করেছেন। [illegible] যুগ থেকে ভারতে শাড়ীর প্রচলন [illegible] প্রায় কয়েক হাজার বছর [illegible] কথা।

বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা [illegible] মেয়েদের সাংস্কৃতিক [illegible] সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস [illegible] মনে হয় মেয়েদের কাপড় [illegible] পুরুষদের মতই ছিল। [illegible] সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরতেই ছিল [illegible] মেয়েদের শাড়ী কখনই [illegible] উপরে উঠত না। আজকের [illegible] মেয়েরা [illegible] কোমরে এক বা একাধিক [illegible] করেন। [illegible] ছিল তবে আজকের দিনের মত [illegible] মেয়েরা শাড়ীর সাহায্যে উর্ধ্বাঙ্গ [illegible] আবৃত করতেন না। [illegible] ওড়না। চোলি অথবা [illegible] পরা হোত। কেউ কেউ আবার [illegible] সেলাই করা 'বাডিস' জাতীয় এক [illegible] সাহায্যে স্তনযুগল ও বাহু উর্ধ্বে [illegible] রাখতেন। কবি বিজয় [illegible] এই জাতীয় কাঁচুলী তৈরীর [illegible] জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, এই [illegible] পাথর সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি সুতোয় অথবা জড়ির কাজ করে তাঁরা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া হোত। এ ছাড়া নানা রকম নক্সার কাজ করা শাড়ীও সে সময় ব্যবহার করার উল্লেখ আছে।

সেকালের কবিরা নারীদের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে যে বেশভূষার বর্ণনা করে গেছেন তা পড়ে আমরা আশ্চর্য বোধ করি। এখনো তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাটি, পাথর ও ধাতুতে গড়া প্রাচীনকালের যে সব নারীমূর্তি বাংলাদেশের পুরানো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে তাই থেকে। তাদের পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ। কোমরের উপর প্রায়ই কোন কাপড় থাকত না, যদি বা থাকত তা এত স্বচ্ছ যে, কাপড় না থাকার মতই। কোমরের নীচে যে কাপড় থাকত তাও প্রায়ই পায়ের সঙ্গে জড়ানো এবং শাড়ীর চেয়ে অনেকটা যেন পায়জামার মত আঁটভাবে জড়ানো, যাতে দুটি পায়ের রেখাগুলি বেশ আলাদা এবং স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। একটি মেখলা বা চন্দ্রহার দিয়ে আবার ঐ কাপড়টি এঁটে বাঁধা হোত এবং সামনের দিকে পুরুষের কোঁচার মত ঝোলা একটি কাপড় ঐ মেখলা থেকে ঝুলানো থাকত। কেবল যে প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্তিতেই এই সব পোষাক পরিচ্ছদ দেখা যায় তা নয়। পাহাড়পুরের যে সমস্ত পাথরে খোদাই করা সাধারণ নরনারীর জীবন-যাত্রার চিত্র পাওয়া গেছে তাতেও মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ ঠিক এই রকমই।

সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। যে যুগে সে গৃহনির্মাণ করতে শেখেনি, বন্য পশুর সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে জীবন ধারণ করত, সেই আদিম প্রস্তরযুগেও তার সৌন্দর্য পিপাসা ছিল আর তার রুচি অনুরূপ সে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চাইত। তবে সময় ও অবস্থাভেদে রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। নারী সৌন্দর্যের প্রতীক —শিল্পী তাকে সাজায় জগতের সব কিছু সৌন্দর্যের ডালি উজাড় করে।

দরকার বুঝে

পুত্র : বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে, বাবা ?

পিতা : যে লোকটি দল ত্যাগ ক'রে অন্য দলে যায়।

পুত্র : অন্য দল ছেড়ে তোমাদের দলে যদি কেউ আসে, তাকে কি বলবে ?

পিতা : বলব—সে আমাদের নীতিতে বিশ্বাসী।

হিন্দী রাষ্ট্রীয় কবিতায় বাংলার প্রভাব

বাংলার স্বদেশী কবিতা বঙ্গদেশের সীমা ছাড়িয়ে ভারতের অন্যান্য ভাষায় একদা যুগান্তর এনেছিল। সে প্রভাব যে কতখানি তার বিশদ বিবরণ দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ প্রবন্ধে কিছু উদ্ধরণ দিয়ে সেই প্রভাবের সামান্য পরিচয় দেওয়া হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীধর পাঠক 'বন্দে মাতরমের' প্রেরণায় 'হিন্দ বন্দনা' লিখেছিলেন, এই রচনা দ্বারা হিন্দী সাহিত্যে তিনি অমর হয়েছেন। তাঁর রচিত 'হিন্দ বন্দনা' পাঠ করলে মনে হয় 'জয়দেবের লেখনীতে যেন বন্দে মাতরম এই রূপেই রচিত হত।

"প্রণমামি সুভগ-সুদেশ ভারত
সতত মম মনরঞ্জনম্
মম দেশ মম সুখধা সময় তন
প্রাণ-ধন জন জীবনম্
মম তাত মাত সুতাদি প্রিয় নিজ বন্ধু
গৃহ গুরু মন্দিরম
সুর-অসুর নর-নাগাদি অগণিত জাতি
জনপদ সুন্দরম।"

"বন্দে ভারত দেশ মুদারম্
সুষমা-সদন সকল সুখ সারম"

*　　*　　*

"ভাল বিশাল হিমাচল ভ্রাজম
চরণ বিরাজিত অর্ণব রাজম
তপধৃত সহস্র কোটি কর বাসম
দুসহ-দুরূপ প্রতাপ বিশালম।"

জয়দেবের রচনা এবং বঙ্কিমের রচনার সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য সংস্কৃত অনুরাগকে সে সময়কার 'যুগ প্রবৃত্তি' বলা যায় নিঃসংশয়ে। বঙ্কিমের বন্দে মাতরমও তারই নিদর্শন। কিন্তু উক্ত রচনাগুলির প্রত্যক্ষ প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র এবং জয়দেব।

এই ধারারই অনুরণনে আচার্য মহাবীর-প্রসাদ দ্বিবেদী 'জন্মভূমি ভারত ভূমি' কবিতায় লিখেছেন।

"লহ জো ভারত ভূমি হমারী
জন্মভূমি হম সবকী প্যারী
এক গেহ সম বিস্তৃত ভারী
প্রজা কুটুম্ব তুল্য হৈ সারী (১৯০৩)

*　　*　　*

জন্মভূমি কো বলিহারী হৈ
সহ্ সুরপুর সে ভী প্যারী হৈ।"

বঙ্কিমের বন্দে মাতরম-এর প্রভাব মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীর অন্য কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে

—"পাণী কী কুচ কমী নহী হৈ
হরিয়ালী লহরাতী হৈ
ফল ঔ ফুল বহুত হোতে হৈ
রম্য রাত ছবি ছাতী হৈ।
মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহতী হৈ,
শীতলতা অধিকাতী হৈ
সুখ-দায়িনী বরদায়িনী তেরী,
মূর্তি মুঝে অতি ভাতী হৈ।"

মনে হয় যেন 'বন্দে মাতরমের' বিশদ ব্যাখ্যা।

তাঁর পরবর্তী কবিদের রচনায়ও বন্দে মাতরমের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

রায় দেবী প্রসাদ 'পূর্ণ' 'স্বদেশী কুন্ডলে' লিখেছেন—একই প্রভাব তাঁর কবিতাতেও স্পষ্ট।

"বন্দে বন্দে মাতরম, সদা পূর্ণ বিনয়েন
শ্রীদেবী পরিবন্দিতা যা নিজ পুত্র জনেন
যা নিজ পুত্র জনেন, পূজিতা মান্যা নৃপা
যা ধৃত ভারতবর্ষ, দেশ বসুমতী স্বরূপা।"

গিরিধর শর্মা 'ভারতমাতা' কবিতায় লিখেছেন

"সুজল সুফল হৈ ময়ী য়'হা কী
শস্য শ্যামল মহী য়'হা কী
মলয়জ শীতল মহী য়'হা কী
বিবুধ মনোহর মহী য়'হা কী।"

কবি মৈথিলী শরণ গুপ্ত এরই দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে লিখেছেন।

"হৈ তেরী কৃতি মে বিক্রান্তি
তেরী প্রকৃতি মে অবিচল শান্তি
ফটক্ নহী সকতী হৈ ভ্রান্তি
আঁখো মে' হৈ অক্ষয় কান্তি
আত্মা সে' হৈ অজু অখিলেশ
মেরে ভারত—মেরে দেশ।"

হিন্দী কবিতা সাহিত্যের এই ধারা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় বঙ্গভূমির জন মানস তার সীমা অতিক্রম করে অন্য প্রদেশগুলি প্লাবিত করেছিল এবং 'বন্দে মাতরম' আর্যাবর্তের জনগীত হয়েছিল। যদিও হিন্দী-সাহিত্যের সর্ব স্তরে এবং বিভাগে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ, কিন্তু ঠিক এক সময় 'বন্দে মাতরম্' হিন্দী কবিতাকে যতটা প্রভাবান্বিত করেছিল পরবর্তী যুগে কোন একটি রচনা এমন সর্বব্যাপী প্রভাব আনতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের

"অয়ি ভুবন মন-মোহিনী
অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধারিণী,
জনকজননি জননী।"

এই মধুর ও গম্ভীর বন্দনার অনুকরণে শ্রীসিয়ারামশরণ গুপ্ত তাঁর 'ভারত-লক্ষ্মী' কবিতায় লিখেছেন—

"জয় জনক-জননি জননী
জয় ভুবন মানসহারিণী
ধোত তেরা চরণতল হৈ নীল নীরধি নীরসে।
জয় অনিল কম্পিত
মনোরম শ্যাম অঞ্চলধারিণী
ব্যোমচুম্বী ভাল হিমগিরি হৈ
তুষার কিরীট হৈ
জয় জয়তি লক্ষ্মীস্বরূপ
দৈন্য দুঃখ নিবারিণী।"

কবি রাম নরেশ ত্রিপাঠী 'মাতৃভূমি' কবিতায় রবীন্দ্রের ছায়ানুসরণে লিখেছেন—

"বিবিধ-সুমন সমূহ চিত্রিত
শস্য শ্যামল বসন সজ্জিত
মলয় মারুত সে সুগন্ধিত
মঙ্গলা জননি
অমল-করণি, সঙ্কট হরণি....।"

তিনি 'বন্দে মাতরমের' দুর্গামূর্তির কল্পনায় লিখেছেন ('মাতৃভূমি')

"অজস্র দুর্জয়া শক্তিধারিণী
নিমিষ মে অরি-উর-বিদারিণি
খড়্গহস্তা তেজ রূপিণি
দেবি দুর্জন দলনি।"

'জন-গন-মন অধিনায়ক' মহাসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রীধর পাঠকের 'ভারত ভারতী'তে 'ভারত গীত' রচনায় পাওয়া যায়—

"উন্নত-ভাল বিরাজিত চারু হিমাচল হৈ
প্রণত পয়োধি সমর্পিত পদচল অঞ্চল হৈ
জয় জয় ভারত হে
জয় ভারত জয় ভারত জয় জয় ভারত হে।"

কবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত লিখেছেন রবীন্দ্রের "ভারত-তীর্থের অনুকরণে—

"শক হূণ যবন ইত্যাদি কহা হৈ অব ওয়ে
আয়ে জো তুঝমে কৌন কহে কব কব ওয়ে
তু মিলা ন উনসে, মিলে তুঝীমে সব ওয়ে
রখ সকে তুঝে, দে গয়ে আপকে জব ওয়ে।"

*　　*　　*

"পাঞ্জাবী, গুজরাত নিবাসী
বাঙ্গালী হোয়া ব্রজবাসী
রাজস্থানী য়া মাদ্রাসী,
সবকে সব হ্যায় ভারতবাসী।
তেরে সুত প্রিয় দেশ
জয় দেশ, জয় দেশ।"

দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বিখ্যাত গানখানির অনুকরণে রামনরেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন—

"জিসকে তীনো ওর মহোদধি রত্নাকর হৈ
উত্তরমে হিমরাশি রূপ সর্বোচ্চ শিখর হৈ

*　　*　　*

পৃথ্বী পর কোই দেশ ভী
ইসকে নহী সমান হৈ
ইস দিব্য দেশ মে জন্ম কা হমে'
বহুত অভিমান হৈ"

গয়াপ্রসাদ শুক্ল 'সনেহী' লিখিত একটি কবিতা—

"করতে হো কিস ইষ্টদেব কা
আঁখ মুঁদ কর ধ্যান?
তীস কোটি লোগো মে দেখো
তীস কোটি ভগবান।
মুক্তি হোগী ইস সাধন সে
ভজো ভারত কো তনমন সে।"

রবীন্দ্রনাথের—"রুদ্ধদ্বারের দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে" কবিতাটিরই প্রতিধ্বনি এই।

কয়েকটি মাত্র উদ্ধরণ দেওয়া সম্ভব হল এই প্রবন্ধে। হিন্দী কবিতায় বাংলা কবিতার প্রভাব সর্বজনবিদিত এবং একটি বৃহৎ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া চিঠি

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

(এই চিঠিগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখিয়াছিলেন।)

কল্যাণীয়েষু।

নোট বুক সম্বন্ধে তোর কাছে আবেদন করে যে ফল পেয়েছি সেটা গজভুক্ত কপিত্থবৎ ব্যবহারে লাগল না। নিলেমে বিক্রীর চেষ্টা করেছিলুম দেড় পয়সার বেশি দাম চড়ল না। সেক্রেটারিকে বলেছিলুম এনে দিতে—সে বুদ্ধিপূর্বক এনে দেয়নি। কারণ তার অনেক গলদ ভুলে যাই, নোট বই থাকলে ধরা পড়বে। এখনো সে রোজই বলে এনে দেব কিন্তু দিন যায় নোট বই আসে না। সপেন্সিল নোটবই যদি বাজারে দুর্লভ হয়ে থাকে আমাকে জানালে আমি ফরমাস দিয়ে বানিয়ে নেব। Almond oil বহুদিন পূর্বে কিনেছিলুম বটকৃষ্ণের দোকানে। বটবৃক্ষে আজও হয়ত বাদাম ফলে।*

১।৩।৩৭ —রবীন্দ্রনাথ

* আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। কোনো জিনিষ আনিতে বলিলে যদি তাড়াতাড়ি না আনিয়া দেওয়া যাইত তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে অধীর হইতেন তাহা নহে, বিরক্তও হইতেন, কিন্তু সে বিরক্তিকে সরস করিয়া প্রকাশ করিতেন। "সপেন্সিল নোটবই" (অর্থাৎ পেন্সিল লাগান নোটবুক) এবং বাদাম তৈল তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। বিলম্ব ঘটিয়াছিল ২।৩ দিন মাত্র।

সুধাকান্ত

কল্যাণীয়েষু।

Silicia ফুরিয়ে এসেছে। আশার মেয়ের কানের জন্য সাইলিসিয়া দরকার একটা কিনে রাখিস,—আজকালের মধ্যে কোলকাতায় যাবে। আমারো একটা চাই। নির্জনে ভালই আছি। সেক্রেটারির জনতাও ঘুচেছে। সুধীরচন্দ্রও বাড়ি যাচ্ছে।

* * *

সাধনা বোসের নাটানৃত্য বোধহয় না দেখে ছাড়লিনে। পুজোতে পাঁঠার ছুটি হাড়কাঠে, আমার ছুটি এইখানেই। দিনগুলো বেশ গরম গরম—টাটকা খোলায় ভাজা লুচির মতো। দেহটা হয়েছে রসগোল্লা জাতীয় ঘর্ম-রসে। অন্যান্য খবর পূর্ববৎ—সাপে কাউকে কামড়ায়নি—চাঞ্চল্যকর সংবাদ নেই।*

ইতি—২৯।৯।৩৮

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* রবীন্দ্রনাথ বাইওকেমিক এবং হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই দুই মতের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিস্তর গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন;—নিজেও রোগী পাইলে যথেষ্ট যত্নসহ চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধের ক্রিয়া বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেও তিনি অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন না এবং প্রয়োজন হইলে নিজেও অ্যালোপ্যাথিক ও কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেন।

চিঠিতে যে সুধীরবাবুর নামের উল্লেখ আছে তাঁহার পুরানাম সুধীরচন্দ্র কর। সুধীরবাবু ইতিমধ্যেই বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ বিষয়কেন্দ্রিক বিবিধ বিষয়ের লেখক হিসাবে প্রশংসালাভ করিয়াছেন। সাপে কামড়ান কথার উল্লেখ করিয়াছেন, আমাকে সাপে কামড়ানোর বহুদিন পূর্বের ঘটনার জন্য। কবির এই চিঠি লেখার কিছুদিন পূর্বে আমাকে একদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে একটি সাপে বাম পায়ে কামড়াইয়াছিল এবং ঐ ব্যাপার লইয়া শান্তিনিকেতনে খুব একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাপের কামড়ে যতটা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি যন্ত্রণা ও দুঃখভোগ করিয়াছিলাম হিতৈষী বন্ধুদের হাতে এবং সদাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছুরির কৃপায়। যাহাতে সাপের বিষের ক্রিয়া আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত না হয় তজ্জন্য সমাগত হিতৈষীরা পায়ের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ফালুটি আর সরু দড়ি দিয়া যে রকমের শক্ত বাঁধন দিয়াছিলেন তাহা সত্যই দুঃসহ হইয়াছিল। তার উপর সাপে কামড়ানোর জায়গায় ডাক্তারবাবুর ছুরিচালনা ও সেই ছুরি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং দেহের রক্ত লইয়া সেই রক্ত আবার একটি মাঝারি সাইজের মুর্গীর অঙ্গে প্রবেশ করান ইত্যাদি অনেককিছু কাণ্ডই ঘটিয়া গেল। অবশেষে জানা গেল, যে সাপে কামড়াইয়াছিল তাহা বিষধর সাপ নহে, কারণ মুর্গী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও মরিল না,—মরিল তার পরদিন সকালে রন্ধনশালের দরকারে। হিতৈষীদের মধ্যে ২।৩ জন সানন্দে কুক্কুটের কারীসহ মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত করিলেন। পরদিন কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, খোঁজ লইয়া জানা দরকার সাপটা সুধাদার রক্তের বিষক্রিয়ায় মরিল কিনা।

যে সময় কবি এই চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন তখন তাঁর কাছাকাছি বড় কেহ নাই। বড়ই নিঃসঙ্গ ছিলেন। সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ কয়েকদিনের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। আমিও কবির কাজেই কলিকাতায় ছিলাম, কাজ সারিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ও বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কাজেই কবির মন উড়ু উড়ু—অথচ কোথাও যাইবারও কোনো প্রোগ্রাম নাই। আমাকেও স্নেহ করিতেন সেইজন্য তাঁর নিঃসঙ্গ সময়ে আমাকে কাছে পাইলে এটা-ওটা-সেটা কত রকমের গল্প করিতেন, আমিও অসংকোচে নানারকম গল্প করিতাম। কাজেই শ্রীমতী সাধনা দেবীর নাটানৃত্যের উল্লেখ করিয়া কবি গৌণভাবে ইঙ্গিত করিলেন যেন কলিকাতার তৎকালীন সব রকমের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাই।

সুধাকান্ত

মংপু।

কল্যাণীয়েষু।

এখানে এসে অত্যন্ত ভাল লাগচে। নড়বার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নাই। উপরের শিখ[illegible] বুকের ভিতর যে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছি[illegible] আমার বিশ্বাস সেখানে বায়ুভারের লাঘব[illegible] বশত। ওখান থেকে মংপু ১০০০ ফুট নিচে—অনেকখানি তফাৎ—ঠান্ডা কম, সিক্ততাও কম এখানে সূর্যদেবের আচ্ছন্ন গদগদভাব অনেক কম। এই লেখবার ঘরে—ধরণীর কাছের অং[illegible] থেকে শ্যামলের অভ্যর্থনা আসছে আমার কা[illegible] প্রতি মুহূর্তে। এই চিঠি নিয়ে যিনি যাচ্ছে[illegible] তিনি আমার বাহন—কিছুদিনের জন্য [illegible] কাঁধ খালি করে দেওয়া গেল। তাঁর বদলে তু[illegible] এসো—দিলীপের আগমন সম্ভাবনা [illegible] তোমার যথোচিত গতি করা যাবে।*

ইতি—রবিবার,

—রবীন্দ্র[illegible]

* এই চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন মংপু পা[illegible] হইতে। সেখানে তিনি স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রী[illegible] মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে ছিলেন। তার কিছুদিন [illegible] মৈত্রেয়ী দেবীর কাছেই ছিলেন মংপু হইতে [illegible] ফুট উর্দ্ধে আর একটি পর্বত শিখরে সুন্দর এ[illegible] বাঙলোতে। সেখানে স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় পু[illegible] মংপুতে নামিয়া আসেন। মংপুতে মৈত্রেয়ী দে[illegible] বাঙলোতে স্থানাভাব না থাকিলেও কবির ২। অনুচর রাখার মত ঘরের বাহুল্য ছিল না। সেই[illegible] সেখানে একসংগে দুইজন সেক্রেটারি থাকা সম্[illegible] হইত না। তখন পণ্ডিচারীর শ্রীঅরবিন্দ আ[illegible] শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের মং[illegible] রবীন্দ্রনাথের কাছে যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ম[illegible] দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত। বঙ্গীয় গভর্ণমে[illegible] কুইনিন তৈয়ারীর কারখানা মংপুতে ছিল।

সুধাক[illegible]

দেখা হবে না

ভৃত্য (অসুস্থ অধ্যাপককে): ডাক্তার এসে[illegible] ছেন, বাবু।

অধ্যাপক (অন্যমনস্কভাবে): কি জ্বা[illegible] বলে দাও এখন দেখা হবে না, আ[illegible] অসুস্থ।

রূপকার হলধর

(২০০ পৃষ্ঠার পর)

—'মানে—ড্রেসার অ্যান্ড্ পেইণ্টার?' কথাটা উচ্চারণ ক'রতে গিয়ে কেমন একটা উদ্গত হাসি ফুটে উঠ্‌লো ম্যানেজারের মুখে।

এ হাসির অর্থ বুঝলো না হলধর, ব'ল্‌লো, 'আজ্ঞে ইংরাজি-টিংরাজি তো আমি জানি না, তবে সাজ-পোষাকের কাজে আমাকে সুযোগ দিলে আমি আপনাকে খুসী ক'রতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে।'

—'বটে!' ম্যানেজার ব'ল্‌লো, 'আমাদের ড্রেসার এ্যান্ড্ পেইন্টারের সঙ্গে দিন দু'য়েক জোগান দিয়ে তবে দেখাও, কি-রকম কাজ ক'রতে পারো তুমি!' ব'লে ড্রেসার দোল-গোবিন্দের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দিল সে হলধরকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য। একবার দেখেই আবহ সমস্ত বিষয়টাকে মুখস্থ ক'রে ফেল্‌লো হলধর। যে হাতে ঘড়া, কল্‌সি আর প্রতিমা বানিয়ে তাতে রং চড়াতো সে, সেই হাতে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে দিল সে এক-একটি অভিনেতাকে। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে এতদিন স্ত্রী-ভূমিকায় যারা অভিনয় ক'রেছে, মঞ্চে এলে বড় পুরুষ-পুরুষ লাগে তাদের মনে হয়েছে। হলধর তুলি আর রং নিয়ে তাদের সেই পুরুষালি চিহ্নকে একেবারে ঢেকে দিল। এককালে মাটিকে সে দেবী ক'রে গড়ে তুলেছে, আর আজ মানুষকে সে পারবে না নারীর রূপ-সজ্জায় গড়ে তুল্‌তে? তার প্রতিমা দেখে যদি এককালে গ্রামসুদ্ধ লোক এসে ভেঙে প'ড়তে পারে, তবে আজই বা তার মেক্‌আপ দেখে সারা সহরের লোক এসে খুসীতে হাততালি দেবে না কেন?

স্বেচ্ছায় এবারে ম্যানেজার তার মাইনে ঠিক ক'রে দিল, আপাততঃ মাসিক ত্রিশ টাকা। পরে দেখে-শুনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আপাততঃ তাতেই বর্তে গেল হলধর। ত্রিশটা টাকাই বা আসে কোত্থেকে? এবারে তদ্বির-তদারক ক'রে টোকনকেও সামান্য মাইনের একটা মুদিখানায় ঢুকিয়ে দিল সে। এতদিনে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মাকে নিয়ে রাঙিলা মাসীর বাড়ীর একপাশে অনায়াসে দিন কাটিয়ে দিতে পারবে টোকন; মাসে মাসে হলধর সাধ্যমতো কিছু কিছু সাহায্য করতে পারলেই হ'লো।

বায়নার চুক্তি ফুরিয়ে গেলে আবার মোট-ঘাট বাঁধা সুরু হ'লো যাত্রা-দলের। হলধরকেও এবারে যেতে হবে; গ্রামে নয়, মফঃস্বল সহরে নয়, সোজা কল্‌কাতায়।

মা এক-সময় চেপে ধ'রলো, 'তুই চ'লে গেলে টোকনকে নিয়ে আমি এখানে কোন্ ভরসায় থাকবো বল্?'

হলধর ব'ল্‌লো, 'ক'টাদিন তো মাত্র। কল্‌কাতায় গিয়ে আমি নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েই তোমাদের নিয়ে যাবো। এত ভাববার কি আছে?'

কিন্তু কি যে ভাববার আছে, তা মায়ের মন না হ'লে বুঝবার নয়। হলধর সেটুকু বুঝলো না, এক-সময় দলের সঙ্গে রওনা হ'য়ে প'ড়লো সে ক'ল্‌কাতায়। চির-স্বপ্নের কল্‌কাতা সহর। গ্রামে ব'সে মাটি দিয়ে কল্‌সি আর ঘড়া বানাবার অবকাশে একটা দিনও কি ভাবতে পেরেছিল সে যে, একদিন সে ক'ল্‌কাতা দেখতে পাবে? ঈশ্বর বুঝি এতদিনে সত্যিই তার মুখের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইলেন!

ক'ল্‌কাতায় এসে প্রথমটা কেমন স্বপ্নের মতো মনে হ'লো সব-কিছুকে। ট্রাম ছুট্‌ছে, বাস ছুট্‌ছে, লোকজন ছুটছে। এখানে কেবল ছুটোছুটি, বিশ্রাম নেই একফোঁটা। বেশ লাগলো হলধরের। এমনি ক'রেই সে ছুট্‌তে চায়, তলিয়ে দিতে চায় তার মধ্যে সে তার অতীতের যত স্বপ্ন, যত ব্যর্থতা। মাঝে মাঝে দুলির কথা মনে প'ড়ে কেমন যেন হ'য়ে যায় সে! কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তবু কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ ভুলে থাকা যায় দুলিকে। তার ব্যর্থ যৌবনের প্রথম স্বপ্ন। মুকুল না ধ'রতেই বোঁটা ছিঁড়ে গেল। কিন্তু ছেঁড়া বোঁটা আর কি জোড়া লাগে না?

হঠাৎ গ্রীণরুম থেকে ডাক প'ড়তেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ত্রস্তে উঠে গিয়ে কাজে যোগ দিল হলধর। শোভাবাজারের বায়না। মাথুরে অভি-নয়। দোলগোবিন্দ দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, হলধরের একার ঘাড়ে এবারে সমস্ত চাপটা এসে পড়েছে। ম্যানেজার এসে একবার তাতিয়ে দিয়ে গেলঃ 'আজ তুমিই যা একমাত্র ভরসা; দেখো, শেষ পর্যন্ত ডুবিয়োনা যেন হলধর!'

মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে হলধর ব'ল্‌লো, 'আপনার আশীর্বাদে কাজ আটকাবে না, দেখে নেবেন।'

মিথ্যেই আশ্বাস দেয়নি হলধর। প্রাণপণ খেটে সে একা-হাতেই গোটা মাথুর বইটার মেক্-আপ্ সেরে দিল। খুসী হয়ে ম্যানেজার এবারে এক-সঙ্গে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিল তার।

এমনি ক'রেই কিছুদিন কেটে গেল। নতুন কল্‌কাতা ক্রমে পুরনো হ'তে সুরু হ'লো। হলধর দেখলো—এতবড় বিরাট বিশাল কল্‌কাতায় যদি নাম ক'রে দাঁড়াতে হয়, তবে আর যাত্রা নয়, প্রয়োজন থিয়েটার। তাতে একটা আলাদাই গৌরব আছে। পয়সা খরচ ক'রে লোক এসে সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহের ফোল্ডিং-চেয়ারে ব'সে অভিনয় দেখে। মাথার উপরে ভন্ ভন্ ক'রে পাখা ঘোরে। ইতর-লোকের বড়-একটা ভিড় নেই, বাবু-ভায়াদেরই কেবল আনাগোনা। আলাদাই একটা গৌরব আছে বৈ-কি! ইতিমধ্যে দিন-দু-তিন গিয়ে দেখেও এসেছে হলধর অভিনয়। যাত্রার মতো এমন চক্‌চকে পোষাকের বাহুল্য নেই সেখানে, বাহুল্য নেই তেমনি কড়া মেক-আপের। অথচ তাতেও কী জমাট অভিনয়! মেয়েদের পার্ট মঞ্চে এসে মেয়েরাই করে, সেখানে পুরুষকে পিটিয়ে পাটিয়ে মেয়ে সাজাতে হয় না। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির দৃষ্টিতে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে অভিনয় দেখে। এ কি কম গৌরবের?

কাজে ক্রমশঃ শৈথিল্য এসে গেল হলধরের। নাঃ, যাত্রার দলে আর নয়, ভদ্রভাবে কাজ ক'রে খেতে হ'লে প্রয়োজন মঞ্চের। একদিন সেই মঞ্চের সঙ্গেই চুক্তি ঠিক ক'রে ফিরে এলো হলধর।

শুনে ম্যানেজার ব'ললো, 'কাজটা কি ভাল ক'রলে হে হলধর? ছিলে কুমোর, টেনে নিলাম সাজঘরে। আজ বুঝি খুব পয়সা চিনেছ?'

হঠাৎ এ কথার কিছু জবাব দিতে পারলে না হলধর। কোথায় যেন একবার বাধলো। দুঃসময়ে ম্যানেজার তাকে চাক্‌রী দিয়েছিল, আজ তাকে হঠাৎ এমনি ক'রে ছেড়ে যাওয়াটা হয়তো ঠিক হ'লো না। কিন্তু সেই বা [illegible] ক'রবে? তারও তো জীবনে দাঁড়াতে হবে, [illegible] হ'তে হবে! একটুকাল চুপ ক'রে থেকে [illegible] ব'ল্‌লো, 'আজ্ঞে না, পয়সা আর চিনলাম কোথায়? থিয়েটারের দলে জানাশোনা [illegible] বেরিয়ে গেল, ওদের কথায় রাজি হ'য়ে গেলাম।'

—'আর কি, সঙ্গে সঙ্গে অমনি [illegible] স্বাক্ষরটা ক'রে এলে, এই তো?' ম্যানেজার ব'ল্‌লো, 'তা বেশ করেছ। একদিন [illegible] ওরা বিদায় ক'রে দিলে এখানেই যেন ফের [illegible] দাঁড়াও! অনেক মান নিয়ে আসবে তো, [illegible] আবার তোমাকে নতুন মর্যাদা দিয়ে [illegible] তুল্‌বো।'

কথাটা শ্লেষপূর্ণ, লেখাপড়া না জানলেও সেটুকু ধ'রে নিতে বেগ পেতে [illegible] হলধরের। একদিন ম্যানেজার দয়া ক'রে [illegible] কাজে বহাল ক'রেছিল ব'লে চিরকালই কি [illegible] গোলাম হ'য়ে থাকতে হবে? [illegible] যাত্রার দলের আয়ু [illegible]? [illegible] এসে হলধর স্পষ্ট বুঝেছে—[illegible] বায়স্কোপের ঔজ্জ্বল্যে যাত্রা ক্রমেই ম্লান [illegible] যাচ্ছে। একদিন যদি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে [illegible] তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। [illegible] নিয়ে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও [illegible] দৃঢ় হ'য়ে নিল হলধর, তারপর ব'ল্‌লো, [illegible] [illegible] থিয়েটার থেকে [illegible] না। আমি তা'হলে আসি এখন।'

ম্যানেজারের আর মুখ দিয়ে [illegible] না যে 'এসো'। হলধর একদিন যে [illegible] এখানে যোগ দিয়েছিল, ঠিক সেই [illegible] ম্যানেজারের সামনে থেকে [illegible] গেল।

এসে দেখলো যাত্রা আর থিয়েটারে [illegible] রঙের আকাশ পাতাল পার্থক্য। এখানে [illegible] আলাদা পরিবেশ। এখানে প্রথম প্রথম [illegible] দিন হেড্ মেক্-আপম্যানের অধীনে [illegible] ক'রতে হ'লেও কাজে আনন্দ আছে। [illegible] দলে এতকাল প্রতিমূর্তি শুধু পুরুষের [illegible] হ'য়ে থাকতো, এখানে মেয়েদের হাতে [illegible] রঙে, শাড়ীতে আর [illegible] মাখামাখি। কাজে একঘেয়েমি নেই। [illegible] ছেলেরা এখানে বাচ্চা ছেলেই, মেয়েরা [illegible] পুরুষকে দাড়ি কামিয়ে মেয়ে সাজালেই [illegible] মেয়ে হয়, না মেয়ে ব'লে তাকে [illegible] মেক্-আপে তাই কাট হয় না, একটুখানি [illegible] এদিক ওদিক হ'লে নিজেই পুরোপুরি [illegible] চরিত্রে এসে যায়। হেড্ মেক্-আপম্যান [illegible] বিপিন চাকলাদার কাজ দেখে খুসী [illegible] হলধরের। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই কি [illegible] খুসী! আলমগীরে উদিপুরীর মেক্-[illegible] নিতে নিতে আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য ক'রে গোপি

শ্রীকালীকিংকর ঘোষদস্তিদার

অঙ্কিত দুইটি ছবি

পূজোর প্রীতি-সম্ভাষণ
দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৮৯৫
শ্রী এস, পি. জৈন
চেয়ারম্যান.
আর, এল, ডুলি
ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার

উৎসবের দিনে...
শরতের উৎসবের দিনগুলি
আবার সমাগত—
শুভেচ্ছা ও খুশিতে
চারিদিক ভরপুর,
প্রতি গৃহে আনন্দের
সাড়া পড়ে গেছে…
সেরা পাখা প্রস্তুতকারক
ম্যাচওয়েল ইলেকট্রিকালস্
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
তাঁদের অসংখ্য
বন্ধুবান্ধবকে এই
আনন্দের দিনে
আন্তরিক অভিনন্দন
জানাচ্ছেন।
ম্যাচওয়েল ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্ট:
ক্যাসেলস্ লিঃ,
সবজিমণ্ডি, দিল্লী
শাখা: পি৩৬ রয়্যাল এক্সচেঞ্জ
একস্টেনশন প্লেস কলিকাতা

বাংলা নাটকের কথা

শচীন সেনগুপ্ত

লেখা চেয়ে ধন্য [illegible]। লিখতেও বসেছি। কিন্তু লিখি কী? [illegible] সেই পরবশ আমল থেকে এই [illegible] পর্যন্ত নাটক আর নাট্যশালা সম্বন্ধে কত [illegible] না লিখিছি, কত বক্তৃতাই না করিছি। পঁচিশ বছরে আমার নাটকও অভিনীত হয়েছে [illegible]। কিন্তু কী হয়েছে তাতে? ব্যক্তিগতভাবে, টাকা না পেলেও, আমার প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত [illegible] কিছু আমি অবশ্যই পেয়েছি। তার [illegible] আমি নাট্যশালার কাছে, নাট্যশালার মালিকদের কাছে এবং বহু শিল্পীর কাছে, দর্শকদের [illegible] কৃতজ্ঞ রয়েছি। কিন্তু সে ত গেল আমার [illegible] কথা। কিন্তু নাট্যশালার কী হয়েছে? সেই ত একই আর্তনাদ—নাটক নেই! নাটক নেই!

(২)

কিন্তু কেন নাটক [illegible] না? আশী বছর বাংলা থিয়েটার চলেছে কি উপন্যাসকে অবলম্বন করেই? বঙ্কিম যখন উপন্যাস লিখেছিলেন, তখন কি নাটকও লেখা হয়নি? ইতিহাস বলে, জাতিও মানে, নাটক তখনো লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখেছিলেন, নাটকই কি লেখেননি? এক কালে তাঁরও নাটককে অনেকে নাটক বলতেন না। আজ অবশ্য বলছেন। বহুরূপী যেদিন প্রথম রক্তকরবী অভিনয় করেছিলেন, সেদিন যাঁরা মারমুখো হয়ে উঠেছিলেন, আজ তাঁদেরও সুর আর [illegible] বদলে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর থেকে তাঁরই নাটক কি বাংলা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছে? বাঁচায়নি; তাঁর নাটকও না, তাঁর উপন্যাসও না। তাঁর নাটক এবং তাঁর উপন্যাসের [illegible] বাংলা থিয়েটার পরম শ্রদ্ধাভরে পরিবেশন [illegible] বোঝাতে চেয়েছে তা বাংলা নাটকের এক [illegible] রূপ। সে কথা সকলে তখন মানে [illegible] কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ [illegible] এবং ভারতবর্ষে অথবা বাংলাদেশে [illegible] হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কোন [illegible] দেখে নি, বিদেশী সমালোচকরা [illegible] নাটক সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাই [illegible] বাংলা নাটককে বিচার [illegible]। দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথের নাটক [illegible] স্বীকার করলে এ কথা [illegible] সাহিত্যের অন্য ফর্মগুলি [illegible] বাংলা নাটক তেমনই অবনত। [illegible] যে সাহিত্যকে গৌরব দেওয়া হয় না [illegible] পারেন না। কোন সাহিত্যে নাটক [illegible] সেই সাহিত্যের সম্পদ সম্বন্ধেই মানুষ [illegible] করে। যেমন সাহিত্য অপরিণত থাকলে সেই সাহিত্যে সার্থক নাটক রচিত হয় না।

(৩)

বঙ্কিম জীবিত থাকাকালে [illegible] থিয়েটারে তাঁর নানা উপন্যাসের নাট্যরূপ [illegible] হয়েছে। কিন্তু তবুও বঙ্কিম নাটক [illegible] লেখেন নি? তার নানা কারণ [illegible] তিনি নিজে ও-সম্বন্ধে কিছু বলে [illegible] জানা নেই, তবে নাটকের [illegible] দীন-১৮৭২ খৃষ্টাব্দে [illegible] বন্ধু রচিত লীলাবতী [illegible] তার এক-জন উদ্যোক্তা ছিলেন [illegible]।

লীলাবতীর [illegible] বলে অক্ষয়চন্দ্র সরকার [illegible] নাটক লেখায় বঙ্কিম হাত [illegible] দিতেন তা হলে তখনকার দিনে, তিনি কতটা সফল বলে বিবেচিত হতেন? স্বদেশী যুগে তিনি নিশ্চিতই সফল হতেন, কিন্তু দীনবন্ধু, মাইকেল, গিরিশ যে নাটক লিখেছিলেন, তা কি ম্লান করে দিতে পারতেন? আবারো বলি, স্বদেশী যুগ হলে পারতেন। তখনকার দিনে পারতেন বলে আমি মনে করি না। নীলদর্পণ, আনন্দ মঠ হয়নি একথা ঠিক; কিন্তু আনন্দ মঠের নাট্যরূপ নীলদর্পণের চেয়ে সার্থকতর নাটক রূপে স্বীকৃতি পেতে পারে কিনা আমার সন্দেহ। 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' অনুপম রচনা, কিন্তু একেই কি বলে সভ্যতা? অথবা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যে কাজ করেছে তা করতে পারে না। দেবেন দত্ত চমৎকার সৃষ্টি, কিন্তু নিমে দত্ত যেমন সমাজের এক শ্রেণীর একটা ঝোঁককে প্রকাশ করে, দেবেন দত্ত তেমন তা করে না। যোগেশ, করুণাময়, প্রসন্ন বাংলার তৎকালীন সমাজকে যেমন ফলিয়ে ধরে—নগেন দত্ত, গোবিন্দলাল, প্রতাপ তেমন ধরে না। সামাজিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের চরিত্রগুলি ব্যক্তি হিসেবেই ফুটে উঠেছে, সমাজ প্রতিফলন করেনি।

বঙ্কিমের চরিত্রগুলিকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় না, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে হয় না। তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। গিরিশের চরিত্রগুলিকে অবিরাম অন্তরে-বাহিরে লড়ে যেতে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসেও সংসার ভেঙে যায়, উপন্যাসের চরিত্রগুলিও ভেসে যায়—গিরিশেরও তাই যায়। তখন ভাঙবারই সময়। অতীতের সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে, নতুনও কিছু গড়ে উঠছে না। বাঙালী নর-নারী ভেসে বেড়াচ্ছে,—ব্রাহ্ম সমাজ গড়ছে, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে, বিধবা বিবাহ নিয়ে বিতণ্ডা করছে, বিদ্যোৎসাহিনী সভা নিয়ে মাতামাতি করছে, খৃষ্টান হচ্ছে, সংস্কৃত পড়ছে, ইংরেজিও শিখছে, মদ খাচ্ছে, বারবণিতা সংস্রবও করছে, সতী-সাবিত্রী-সীতারও প্রতিষ্ঠা চাইছে। বাংলা উপন্যাস নাটকে সবই প্রতিফলিত হয়েছে। যে অতিরঞ্জন নাটকে আছে, সে অতিরঞ্জন উপন্যাসেও আছে। নাটুকে ভাষা বলে যে ভাষা নিন্দিত হয়, তা কিন্তু মাইকেল-দীনবন্ধু, গিরিশ-অমৃতলালের নাটকে নেই। তা নাটকে এসেছে বঙ্কিমের উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত হয়ে জনপ্রিয় হবার পর। মাইকেল-দীনবন্ধুর নাটকে আদর্শের প্রতি ঝোঁক নেই, বঙ্কিমের আছে। গিরিশের সামাজিক নাটকে আদর্শ আছে, কিন্তু ঝোঁক নেই; পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটকে দুই-ই আছে। মাইকেল-দীনবন্ধু সমাজকে আঘাত করেছেন, উন্নয়নের ইংগিত দেননি; বঙ্কিম-গিরিশ দিয়েছেন।

সে ইংগিত কি? মানুষের রূপান্তর। কি করে তা সাধিত হবে? ত্যাগ দিয়ে, আপোষ করে। কিন্তু যে বঞ্চিত, সে কি ত্যাগ করবে? কেমন করে বঞ্চনার সঙ্গে আপোষ করবে? যে বঞ্চনার প্রতিকার ত্যাগের দ্বারা হয় না, যার সঙ্গে আপোষ করা সম্ভব নয়—সে বঞ্চনা নীলদর্পণে পাওয়া যায়; কিন্তু বঙ্কিম-গিরিশে পাওয়া যায় না। বঙ্কিম-গিরিশে যে বঞ্চনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে প্রণয় থেকে বঞ্চনা, সম্পদ থেকে বঞ্চনা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চনা, খুসি-খেয়াল থেকে বঞ্চনা। সব বঞ্চনার মূল কারণ সামাজিক বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতি। সে সমাজ জাতীয় সমাজ নয়, শিক্ষিতদের অর্ধ-শিক্ষিতদের সমাজ। বঙ্কিম-গিরিশ ওই সমাজকে স্বীকার করে নিয়েছেন, ওর রীতি-নীতি বিধি-নিষেধের রদ-বদল কামনা করেছেন; কিন্তু বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে চাননি। রামমোহনও তা চাননি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দও তা চাননি, বিদ্যাসাগরও নন। সকলেই চেয়েছেন রিফর্মেশন, সকলেই চেয়েছেন সমন্বয়। সমাজ-বিপ্লব বলতে ওঁরা কেউ পুরাতনকে একেবারে ধ্বংস করে নবসৃষ্টি কামনা করেননি।

কিন্তু বঙ্কিম জানতেন জনগণ আছে, দীনবন্ধু-মাইকেলও জানতেন, জানতেন গিরিশ। বঙ্কিম কেবল 'সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে' শুনিয়েই ক্ষান্ত হননি, বাংলার কৃষকের কথা সেই দিনে শিক্ষিতদের কানে তুলে দিয়েছেন। দীনবন্ধু নীল চাষীদের জীবন চিত্রিত করেছেন। মাইকেল ভক্তদাসবাবুর অনাচার বন্ধ করিয়েছেন ব্রাহ্মণ-মুসলমানের সমবেত প্রয়াস দিয়ে। কিন্তু শিক্ষিতদের মাঝে অত্যন্ত অল্প কয়েকজন ছাড়া তার খবর কারা রাখত? রামমোহন সকলের অগ্রবর্তী হ'য়ে কৃষকদের সম্বন্ধে যা' ভেবেছিলেন, তাতেই বা কোন্ শিক্ষিত মনোযোগ দিয়েছিল? সহরের আর পল্লীর অধিবাসীরা, শিক্ষিতরা আর অশিক্ষিতরা, একই জাতের মানুষ হয়েও, পরবশতার শাসন-ধারার দুই কূলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পৃথক হয়ে পড়েছিল। সহরের সাহিত্যের সঙ্গে পল্লীর কোন সম্বন্ধই ছিল না। একমাত্র বাংলা নাটকই সেতুবন্ধ করে সহরের আর পল্লীর সংস্কৃতির সংযোগ করে দিয়েছে, সহরের লোকদেরকে দেখিয়েছে হানিফ-ফতিমাদেরকে, উড-রোগ, তোরাপ-রাইচরণ নবীন সাধকদেরকে, আর পল্লীর লোকদেরকে দেখিয়েছে বঙ্কিমের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস, গিরিশের সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটক। সহরের মঞ্চে এসেছে বাউল, ভাটিয়ালী, মনোহরসাহী,—মফঃস্বলে নাটকের মাধ্যমে গিয়েছে নানা মার্গ সঙ্গীত। কোলকাতার কথা-ভাষা গিয়েছে মফঃস্বলে নাটকেরই মাধ্যমে, আর মফঃস্বলের নানা জিলার কথ্য-ভাষা এসেছে কোলকাতার মঞ্চে ওই নাটকেরই মাধ্যমে। কোলকাতার দর্শকরা যে নাটক দেখে অশ্রু মোচন করেছেন, যে-নাটক দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন,—মফঃস্বলের অশিক্ষিত নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণও সেই নাটক দেখে কেঁদেছেন, হেসেছেন, উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। মফঃস্বলের নিরক্ষর লোকরা জেনেছেন আনন্দমঠ কি, দেবীচৌধুরাণী কি, বিষবৃক্ষ কি, চন্দ্রশেখর কি—আর সহরের লোকরা বুঝেছেন চৈতন্যলীলা কি,

শঙ্করাচার্য কি, জনা কি, পাণ্ডবগৌরব কি! বাংলার নাট্যশালার এই অবদান বাংলা সাহিত্যকে গোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে মুক্ত করে নিয়ে জনগণের কাছে পেঁাছে দিয়েছে; উপন্যাসকে, নাটককে, ন্যাশনাল করেছে—সম্পূর্ণ ভারতীয় যদিচ করতে পারেনি। এই অসাধ্য সাধন নাট্যশালা করতে পারত না, যদি না গিরিশের আবির্ভাব হতো। এইজন্যই ন্যাশনাল থিয়েটারের আদিকাণ্ডে তিনি যোগ না দিলেও, তাকেই বলা হয় বাংলা থিয়েটারের জনক। তিনি নিজে কিন্তু দীনবন্ধুকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলে নমস্কার নিবেদন করে গেছেন।

(৪)

মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা করলেন। কিন্তু নাটক তিনি সে-ছন্দে লিখলেন না। একমাত্র পদ্মাবতীর স্বল্প একটি অংশ ছাড়া। কিন্তু তিনি বল্লেন, নাটক কবিতাতে লিখতে হবে এবং তার ছন্দ করতে হবে অমিত্রাক্ষর; কিন্তু সহসা নয়, ধীরে ধীরে। গিরিশ বুঝলেন দেরী করা চলবে না। দেরী করলে নাটককে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে না। একে বাংলাদেশ গীতি-কাব্যের দেশ, তায় বই পড়বার সামর্থ্য সাধারণ লোকের নেই। তাই ভাষার চেয়ে সুর দিয়েই নাটকের বিষয় তাদের চিত্তে দেগে দিতে হবে। প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী বৈচিত্র্য দিতে পারবে না, মাইকেলের মিল্টনী ছন্দ নাটকের উপযোগী হবে না, সেক্সপীয়ারের ছন্দকে রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তা-ও বড় দুরূহ কাজ। তিনি নিজে ছন্দ সৃষ্টি করলেন অভিনয়-কালীন আবৃত্তির দিকে দৃষ্টি রেখে। রাবণবধ থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে ছন্দকে উন্নত করে চল্লেন তিনি। তাঁর ম্যাক্‌বেথের অনুবাদের সুখ্যাতি করলেন তখনকার বিদগ্ধরা। তাঁর বুদ্ধদেব চরিত দেখে লাইট-অব-এশিয়া রচয়িতা আর্নল্ড বিস্ময় প্রকাশ করলেন শুধু রচনাতে অভিভূত হয়েই নয়, দর্শকরা যেমন করে তা' গ্রহণ করছে, তা-ও দেখে। তাঁর বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বল্লেন—ওই নাটক রচনায় তিনি সেক্সপীয়ারকেও অতিক্রম করেছেন। গুরুভাইকে 'পুশ' করবার জন্য ও-কথা তিনি বলেছিলেন—এরূপ মন্তব্য করবার মত মূঢ়তা, আশা করি, কেউ প্রকাশ করবেন না। তাঁর ও-কথা বলবার কারণ হচ্ছে বিল্বমঙ্গলের রূপান্তর। ওটা ভারতীয় আদর্শ।

গিরিশ যে বছরে প্রফুল্ল লেখেন (১৮৯০), রবীন্দ্রনাথ সেই বছরেই রাজা ও রাণী লেখেন; আর জনা লেখেন মালিনী রচিত হবার এক বছর আগে। তিনি ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন রাজা ও রাণী আর মালিনী রচিত হবার মধ্যবর্তী কালে। প্রফুল্ল, জনা আর ম্যাকবেথ রচনা হিসেবে ভাষার বিচারে রাজা ও রাণী আর মালিনীর ভাষা থেকে খুব নীরস হয়েছে বল্লে কি ঠিক কথা বলা হয়? রাজা ও রাণীকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আগেকার চেয়ে অনেক বেশী পাশ্চাত্য রূপ আরোপ করলেন ঢেলে সেজে তপতীরূপে। হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার লিখলেন, রোমিও-জুলিয়েটও বাংলায় রূপায়িত করলেন। মাইকেলের মেঘনাদবধ মঞ্চে রূপ দেওয়া সম্ভব হলো, কিন্তু হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারকে নাট্য-রূপ দেওয়া গেল না, রোমিও-জুলিয়েটও মঞ্চে স্থান পেল না। কেন এমন হোলো? ভাষা পড়লেই বোঝা যাবে। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে নাটকীয়তা বেশ ছিল। পলাশীর যুদ্ধ মঞ্চেও উত্‌রে গেল। কিন্তু রৈবতক, অমিতাভ, অমৃতাভ প্রভৃতিকে নাটক করবার কথা কেউ ভাবলেন না গিরিশ ওদের নাট্য-রূপকে রসঘন করেছিলেন বলে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র যদি নাটক লিখতেন, তা'হলেই কি গিরিশকে ডুলিয়ে দিতে পারতেন? পারতেন মনে করবার মতো পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজ কবিদের অনেকেই এবং বিশিষ্ট উপন্যাস-রচয়িতাদের কেউ কেউ নাটক লিখেছেন, কিন্তু নাট্যকারের খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন ক'জনা? কবি, উপন্যাস-রচয়িতা হিসেবেই তাঁদের খ্যাতি রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ বিচার করলে কোন্‌টা ছোট, কোন্‌টা বড় বলা শক্ত হবে। সামগ্রিক আবেদন কবিতারই যে বেশি তার স্বপক্ষে, যুক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উপন্যাসের আর নাটকের পক্ষে যুক্তির প্রয়োজন হয়। কেননা, তাঁর উপন্যাসের আগে বঙ্কিম উপন্যাসের একটা রূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন, যার আঙ্গিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আঙ্গিকের মিল নেই। নাটক সম্বন্ধেও প্রচলিত নাটকের সঙ্গে তাঁর নাটকের মিল ছিল না বলেই প্রশ্ন উঠেছিল, তাঁর নাটক নাটক কিনা?

(৫)

গিরিশ যা' চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা' চান নি। গিরিশ চেয়েছিলেন নাটককে ন্যাশনাল করতে, অর্থাৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের পাশাপাশি বসিয়ে একই রস পরিবেশন করে তৃপ্ত করতে। রোমা রোলাঁ গণ-নাট্য বলতে এই-ই বুঝতেন। রবীন্দ্রনাথ নাটকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন যতটা না আঙ্গিকের দিকে, তার চেয়ে বেশীটা সাধনাগত উপলব্ধির দিকে। এ-কথা বুঝতে জাতির সময় লাগল। আজই কি জাতি বুঝেছে? বোঝেনি বলে মনে হয় রক্তকরবী, ডাকঘর, অরূপরতন, অচলায়তন নিয়ে বুদ্ধির নানা কসরৎ দেখে। রবীন্দ্র-নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব বড় কম নয়, এ-কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু প্রভাব বলতে যা' বোঝায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তার পরিচয় কোথায়? কোন্ নাটকে তিনি পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনকে ফলিয়ে ধরেছেন, সমর্থন করেছেন? একখানারও নাম স্মরণ করতে পারছি না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য প্রয়াস বাল্মিকী প্রতিভা। ভারতীয় একটা আদর্শ নিয়ে তিনি তা রচনা করেছিলেন, তরুণ বয়সে। কিন্তু সে যে নাটক বলে স্বীকৃতি পেতে পারে, তা কেউ তখন মানতে রাজী হলেন না। তিনি রাজা ও রাণী লিখলেন পাশ্চাত্য ফর্ম অবলম্বন করে। নাটক বলে তা স্বীকৃতি পেল। কিন্তু ওই ফর্ম অবলম্বনই প্রভাব নয়। পাশ্চাত্য ফর্ম তিনি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনকে। ভারতীয় জীবনাদর্শকে তিনি বর্জন ত করেনই-নি, মোহন আর মহান করে তুলেছেন তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে। ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, গ্যয়েটে তাঁর মনে অবশ্যই প্রশ্ন এনে দিয়েছে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি ও'দের জীবন-দর্শনকে সত্য বলে স্বীকার করেন নি। করতেন যদি, তাহলেই বলা যেত, তিনি পাশ্চাত্য ওই সকল নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কেবল ফর্মের সাদৃশ্য দেখেই ও-কথা বলা যায়না। পাশ্চাত্যের নাটক উপন্যাস কাব্য দর্শন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু তিনি তাদের সমাধান করতে চেয়েছিলেন কোন্ দৃষ্টি-কোণ থেকে? পাশ্চাত্যের, না প্রাচ্যের? নিশ্চয়ই প্রাচ্যের। কাজেই এ-কথা বলবার কারণ নেই যে, তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রাজা ও রাণীর সুমিত্রা রাণী হিসেবে এবং স্ত্রী, অর্থাৎ সহধর্মিণী হিসেবে যে আত্ম-ত্যাগ করেছিলেন, তা নোরা হেলমার প্রয়োজনীয় মনে করতে পারেন নি। নোরা স্বামীকে ছেড়ে চলে গেলেন তার হীন স্বার্থপরতা অসহ্য মনে করে। সুমিত্রা চলে গেলেন স্বামীকে মোহ-মুক্ত করবার জন্য। কিন্তু চলে গিয়ে যখন বুঝতে পারলেন স্বামীর মুক্তি নেই যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, তখন তিনি পরম আত্ম-ত্যাগ করলেন। বলা হয় নোরার গৃহত্যাগ রিয়েলিটি, আর সুমিত্রার গৃহত্যাগ অথবা পরম আত্ম-ত্যাগ অবাস্তব। মেনেই নিলাম। কিন্তু মোদ্দা ফলটা কি দাঁড়াল? সমাজের পক্ষে কোন্‌টা হিতকর হোলো? হেলমারদের তার নোরাদের মনের পরিবর্তন ঘটাবার কথা কে ভাববে? ও-দেশে ও-রকম নাটকের ফলে অনেক আইন পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আইন ত মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আইন পলিটিশিয়ান-দের বিচারে প্যানেসিয়া; আর মানুষের প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি সাহিত্যিকের বিচার্য। ইবসেন মানুষকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন সামাজিক জীব হিসেবে, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন মানুষ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের দেশ অনেক সামাজিক ব্যবস্থা দেখেছে; দেখেছে কত হিত আর কত অহিত সমাজ করেছে, অর্থাৎ সমাজের মানুষই করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সমাজের গণ্ডীর মাঝে ফেলে রেখেই নাটক শেষ করেন নি। সংঘাত যেমন এ ডলস-হাউসে আছে, তেমন রাজা ও রাণীতেও আছে। ইবসেন এ ডলস-হাউস লিখেছিলেন পরিণত বয়েসে, রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রাণী লিখেছিলেন তারুণ্যের দিনে; কিন্তু প্রাচীন ভারত তাঁকে দিয়েছিল প্রবীণের বিচার-বুদ্ধি।

বিসর্জনের জয়সিংহ আর সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট তুলনা করা যাক। দুজনাই তরুণ। দুজনাই পৃথক কারণে হলেও, জীবন দুর্বহ মনে করে। হ্যামলেট করে বাস্তবজীবনে যে অবিচার অনাচার ঘটে তারই জন্য। আর জয়সিংহ করে মানবতার অবমাননা অসহ্য বোধ করায়। হ্যামলেটের মনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কুসংস্কার, পিতার প্রেত-মূর্তির কল্পিত আবেদন। জয়সিংহের প্রশ্ন ওঠে মানবতার আদর্শ নিয়ে। তাতে কুসংস্কার নেই, সংস্কৃতি আছে। বিচারে বিশ্লেষণে তা ভাস্বর। হ্যামলেট হত্যা করে, জয়সিংহ আত্মবলি দেয়। ক্রোধ, হিংস্র অশান্তি নয়, পরম প্রশান্তি। অরূপরতনের রাজা ও রাণী, রক্ত-করবীর রাজা রঞ্জন-নন্দিনী কেউ বাস্তব নয়। অথচ যুগে যুগে ওদেরকে দেখা গেছে। রক্ত-করবীর রাজা মন্দার নয়, সভরেণ নয়, রাজা—মানুষ। তাই মানুষের দুর্বলতাও আছে, শক্তিও আছে, মানসিক সংঘাত-ও আছে। রঞ্জন-নন্দিনী-বিশুরা যুগে যুগে সকল দেশের সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। ওরাই ত যুগে যুগে মানুষের চরম সংকটকালে অগ্রগামী হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে ধরে ধরে মানব-ফুল ফুটিয়ে তোলে, মানুষের যে কোন আন্দোলনে ওদেরকে দলে দলে দেখা যায়। ওরা সত্য না হলে মানুষের কোন প্রয়াস সফল হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে যা করেছেন, তার চেয়ে তাঁর নাটকে অনেক স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন কালের যাত্রায় মানুষের অগ্রগতির পরম-প্রয়াস।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন ও-সব নাটক লিখেছেন তখনো ও-কথা বোঝবার সময় আসেনি। কেন আসেনি? আসেনি কালের যাত্রায় যোগ দেবার যোগ্যতা পরবশ ভারত তখন অর্জন করতে পারেনি বলে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন জাতি তখন তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারবেনা। কিন্তু এও তিনি জানতেন বোঝবার দিন বেশি দূরে থাকবেনা। তাইত তিনি ডেকে ডেকে বলতেন—"[illegible] ঐ, ভারত তবু কৈ?"

লেনিনগ্রাদে পুস্কিন থিয়েটার বাড়ীটি দেখে এসেছি। সেখানে শুধু পুস্কিনই অভিনীত হয় না। নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয় সেখানে। হালে পুস্কিন থিয়েটারে মৃচ্ছকটিকের অভিনয় হয়েছে। আমাদেরও [illegible] রবীন্দ্র-ভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হলটি আদৌ [illegible] ভাল নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাই নেই। ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মোৎসবের [illegible] ব্যাপক আয়োজন করছেন। কোলকাতায় তাদের [illegible] একটা রবীন্দ্র থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া উচিত। তাতে শুধু রবীন্দ্র-নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের [illegible] পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত, লাইব্রেরী মিউজিয়ামও থাকা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ নাটকের ভিতর দিয়ে জন-সংযোগ স্থাপন করতে চাননি, নাটকের উন্নত আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষকে তিনি নেশন হিসেবে গ্রহণ করতে অনেক দ্বিধা করেছেন। ভারতীয় না হওয়া পর্যন্ত ভারত 'নেশন' হবে না, অথবা

ভারতকে ভারতীয় না করে নেশন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা হবে, রবীন্দ্রনাথ সে-কথা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। আজ তা প্রত্যক্ষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার অথবা মানবতাকে গৌরব দেবার জন্যই চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, গিরিশের মতো আশে-পাশে যত মানুষ দেখেছেন টেনে এনে নাটকে স্থান দেন নি।

(৬)

রবীন্দ্রনাথ যখন নাটকের পর নাটক লিখে চলেছেন, তখনই ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠা হয় নাট্যশালায়, গিরিশ-অমৃতলালের আমলে। এরই মাঝে আসে স্বদেশী আন্দোলন, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক বৈপ্লবিক আন্দোলন। দুই আন্দোলনেরই মন্ত্র হোলো 'বন্দে মাতরম'। বঙ্কিম নূতন করে ফিরে এলেন। নাটক রোমান্টিক হতে শুরু করল, ভাষাও তাই হোলো। রোমান্সও নাটকে ক্রমশ জমে উঠতে লাগল। ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশের ছন্দ গ্রহণ করলেন না। রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি কবিতায় যে নাটক লিখলেন, তা যেমন হোলো মধুর, তেমনই হোলো বর্ণাঢ্য। রঘুবীর আর নরনারায়ণের ছন্দ তখনকার কোন কবির ছন্দ থেকে নীরেস হোলো না। তাঁর গদ্য, সংলাপও অনেক জায়গায় নাটকের আদর্শ সংলাপ হোলো। আলমগীর নাটকের আলমগীর-উদীপুরীর সংলাপ নাটকীয় সংলাপের আদর্শ। আলমগীর যেখানে দিলীরের কাছে তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করছেন, সেখানে ভাষা যেমন সংযত তেমনই চিত্রবহ। বঙ্কিমের রাজসিংহের ভাষাও সুন্দর, কিন্তু আলমগীরের ভাষা তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। আলিবাবার ভাষাও তাই।

দ্বিজেন্দ্রলালও কবি ছিলেন। কিন্তু নাটক তিনি পদ্যে লেখেন নি; তাঁর সীতা অভিনীত হলেও নাটক নয়, কাব্য। সোরাব রুস্তমও তাই। কিন্তু তিনি গদ্য-কবিতায় নাটক লিখলেন। সেক্সপীয়ারের পদ্যই যেন তিনি গদ্যে রূপ দিলেন। মানবতাকে তিনি বড় আসন দিলেন, যেমন দিলেন ব্যক্তির প্রীতিকে, স্নেহকে। নর-নারী প্রেম যে দেশ-প্রেমে মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে, বাংলা নাটকে তিনিই প্রথম তা দেখালেন। তাঁর ভাষা সমসাময়িক বাঙালীর পরিচিত ছিল না, কিন্তু এমনই বর্ণাঢ্য ছিল যে অভিনেতার মুখ থেকে নির্গত হতে হতে শ্রোতার মনের পটে ছবি ফুটিয়ে তুলত। আর বিখ্যাত 'যে-দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ' গানে ভারতের যে চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তার চেয়ে সার্থক ভারত চিত্র ফুটে উঠেছে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সেকেন্দারের ভারত বর্ণনায়। ভাষার সাহায্যে একটা থমথমে আবহ চাণক্য সৃষ্টি করেন কত অল্প সময়ে নন্দকুলের ওপর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর বর্ণনা দিয়ে। সেক্সপীয়ার ম্যাকবেথকে হত্যা করতে পাঠাবার ঠিক আগেকার মুহূর্তে হিকেট আর টারকুইন সংশ্লিষ্ট আবৃত্তি দিয়ে ওই আবহ সৃষ্টি করেছেন। নাটকে ওর প্রয়োজন হয়। শুধু আলো-আঁধারের খেলা দেখিয়ে, দৃশ্যপট সাজিয়ে, ও-কাজ সুসম্পন্ন করা যায় না। ওর জন্য ভাষার প্রয়োজন হয়, সু-অভিনয়ের আবশ্যক হয়। কেবল ভাষার আবৃত্তি দ্বারাও ও-কাজ করা যায় না। সু-অভিনয়ও চাই। আর মঞ্চের অভিনয়ে ভাষার সাহায্য অপরিহার্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সেই ভাষার ওপর দখল ছিল বিস্ময়কর; যেমন বিস্ময়কর ছিল ভাষার অপপ্রয়োগ। যাকে 'ভিলেন' বলা হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তা নেই; বোকা আছে, বাচাল আছে। অকাজ-কুকাজ তারাই করছে। তবুও মাঝে মাঝে তাদের খোলসের ভিতর থেকেও মনুষ্যত্বের কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বাংলা নাটকে এই ধরণের চরিত্র আমদানি মনে রাখবার মতো কথা। স্নেহ, মমতা, দেশাত্ম-বোধ, মানব-প্রীতি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে সংগত কারণেই অসাধারণ জনপ্রিয় করে। 'গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ!' এই সান্ত্বনা, এই অভয়বাণী, নাটকের মাধ্যমে চিত্রিত ও প্রচারিত হওয়ায় জাতির মুক্তি সংগ্রামকে যে শক্তির যোগান দিয়েছে, সেদিনের সংগ্রাম যাঁরা করেছিলেন, তাঁরাই তা জানেন। বঙ্কিমের পর ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্রর রচনায় দেশপ্রীতিকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রয়াসের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, সম-সাময়িক কথা-সাহিত্যে তেমন পাওয়া যায় না।

অপরেশচন্দ্র গিরিশের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি গিরিশের ছন্দ অনুকরণ করেননি। তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই-ই ছিল মধুর। তাঁর কর্ণার্জুন সম্বন্ধে নানা বিরূপ সমালোচনা শোনা যায়, পড়াও যায়। কিন্তু কর্ণার্জুনের লক্ষ্য করবার মতো একটি বড় বিষয় হচ্ছে ওর গতি। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনা এগিয়ে যায়, মনকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। বক্তব্যে যে বিশেষ কিছু আছে, তা নয়; কিন্তু মাদকতা আছে। নাটকে ওর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না—যদিচ প্রশ্ন অবশ্যই করা যায় ওর কতটা থাকা বাঞ্ছনীয়। অপরেশচন্দ্রের পদ্য বেশ সাবলীল। পল্লী-চিত্র ফুটিয়ে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর চণ্ডীদাস নাটকে রামী-চণ্ডীদাস যা-ই হোক, পল্লীবাসীদের চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজের চরিত্রগুলির মতোই সার্থক সৃষ্টি। অনুবাদে নয়, রূপান্তরে অপরেশ-চন্দ্র সুদক্ষ ছিলেন। অস্কার ওয়াইল্ডের ডাচেস অব পাদুয়াকে ইরাণের রাণীরূপে, ইবসেনের ওয়ারিয়র্স অব হেলিগোল্যাণ্ডকে রাখী-বন্ধনরূপে রূপান্তরিত করে তিনি কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। এই রূপান্তর করবার শক্তি ও-দেশে স্বীকৃতি পায়, যেমন অনুবাদের কৃতিত্ব স্বীকৃতি পায়। আমরা ইংরেজী গদ্যে মলেয়ারের যে নাটকগুলি পড়ি, সেগুলি মলেয়ার কবিতাতেই রচনা করে-ছিলেন। কবিতার অনুবাদ কবিতায় করা বড় শক্ত, বিশেষতঃ নাটকে।

নিশিকান্ত বসু হুবহু দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-লালের শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন না।

(৭)

বিপ্লব-আন্দোলন আর স্বাধীনতা আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নাট্য-শাসন আইন খুব কড়া হোলো। নীলদর্পণ থেকে সুরু করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ বণিকের, শাসকের, নানা অসঙ্গত শাসনের ও শোষণের তীব্র প্রতিবাদ সমানে চালিয়ে এসেছে। গান আর কবিতাও তা করেছে। কিন্তু বঙ্কিম রমেশের পর আর কোন উপন্যাস রচয়িতা তা করেন নি। স্বদেশী আন্দো-লনের সময়, বিপ্লব-আন্দোলনের সময়, জাতি যখন সেই প্রতিবাদ কণ্ঠে তুলে নিল, তখন শাসকরা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আইন কড়া করে ফেল্লেন। ওই সময়ে যে নাট্যকারদের আবির্ভাব হোলো, তাঁরা নীতি স্বীকার করলেন না, দ্ব্যর্থবাচক নাটক লেখা সুরু করলেন। মন্মথ রায় তাঁদের অগ্রণী। দেবা-সুর, কারাগার প্রভৃতি নাটকে তিনি মুক্তির সংগ্রামই প্রচার করলেন ক্যামুফ্লাজের আশ্রয় নিয়ে। ফলে নাটক ভেজাল দোষে দুষ্ট হোলো, কিছু অস্পষ্টও হলো। কিন্তু তবুও নাটক পল্লীতে পল্লীতে মুক্তির বাণী বয়ে নিয়ে জন-সংযোগ অব্যাহত রাখল। ওই দিনে নাট্যকারদের দৃষ্টি পড়ল নাটকের আঙ্গিকেরও দিকে। ব্যবসায়ী থিয়েটারে প্রথম একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয় মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' আর্ট থিয়েটারে।

স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকে যে পরিবর্তন দেখা দিল, তা কেবল আঙ্গিকেরই পরিবর্তন নয়, আদর্শেরও পরিবর্তন, একই সঙ্গে ভাঙা ও গড়ার আবেদন। এটি ভারতীয় সংস্কৃতি। এর জন্য আপোষ করতে হয়। আপোষ, ও-দেশের বিচারে, নাটকের দুর্বলতা। ভারতের সাহিত্যিকদের তা করতে হয়েছে। স্বাধীনতা নিতে হয়েছে আপোষে। তার জন্য ত্রুটি যা রয়ে গেছে, তা মেনে নিতে হয়েছে আপোষ-বিহীন সংগ্রামে যে ক্ষতি অনিবার্য ছিল তাই ভেবে। আপোষ করবার জন্য বাংলার উপন্যাসও দুর্বল রয়েছে, নাটকও তাই। কিন্তু সংগঠনের ইঙ্গিত আগেকার তুলনায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার নাটকে স্পষ্টতর হয়েছে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। নাটক ওই সময়ে অধিকতর প্রচারধর্মীও হয়েছে। কিন্তু সে প্রচারের প্রয়োজন ছিল। আজও আছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা সাহিত্যে ও রাজনীতিতে রোমান্স এনেছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর সাহিত্যিক দৃষ্টিকে রোমান্স থেকে সরিয়ে আনবার প্রয়োজন বুঝিয়ে দেয়। অবশ্য তার আগে মহাত্মার বাণী এবং মার্কস্-এর বাণীও কম কাজ করেনি। মহাত্মার বাণী বাংলার উপন্যাস নাটকে প্রতিফলিত হয়নি—মার্কসেরও নয়। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর বাস্তববাদের দাবী ধ্বনিত হয়। প্রগতিশীল মন তাতে সায় দেয়। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই প্রধানতঃ গড়ে ওঠে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। নবান্ন নাটকের দিক দিয়ে কি হয়েছে, সে আলোচনা না তুলে শুধু এই কথাই বলে রাখতে চাই যে, এর অভিনয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। নাটক সম্বন্ধে চলিত ধারণা প্রগতিশীলরা ওই থেকেই বর্জন করেন। এর প্রয়োজন খুবই ছিল, এখনো আছে। কৃষককে, শ্রমিককে, শিক্ষককে, নাটকের চরিত্র করে নেওয়া বাংলা নাটকের পক্ষে একেবারে নূতন না হলেও যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এদেরকে দেখা হচ্ছে তা নিশ্চয় নূতন এবং অবাঞ্ছনীয়ও অবশ্যই নয়। কিন্তু আমার মনে হয় প্রয়াসে কৃত্রিমতাও কিছু কম নেই। কৃষক-শ্রমিক ব্যক্তিহীন, সমাজে যে স্থান পেলে তাদের রূপায়ণ নাটকে স্বাভাবিক হোতো, সে স্থান তারা সমাজে আজও পায়নি। তাই যাঁরা ও-দেরকে নাটকে স্থান দিতে চাইছেন, তাঁরা সকলেই কিছু অবজেকটিভ হতে পারছেন না; কেউ কেউ কোথাও কোথাও পেরেছেন। তুলসী লাহিড়ী 'ছেঁড়া-তারে' পেরেছেন, 'দুঃখীর ইমানে' পেরেছেন, কিন্তু 'বাংলার মাটিতে' পেরেছেন বলে আমার মনে হয়নি। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাস্তু-ভিটেয়' পেরেছেন, 'তরঙ্গে' পেরেছেন, মশালে পারেননি। আরো বহু লেখক কোথাও পেরেছেন, কোথাও পারেন নি। না পারাটা বড় কথা নয়, প্রয়াসই বড় কথা।

কিন্তু যতদিন না শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মীয়ভাবে গড়ে উঠবে, কৃষকদের সঙ্ঘ না গঠিত হবে, ততদিন শ্রমিক-কৃষকের সংস্রব বাঁচিয়ে লেখকদের রচনায়, অভিনেতাদের অভিনয়ে, শ্রমিক কৃষকের 'মর্মবাণী'ও ঠিক করে বলা যাবেনা, তাদেরকে কল্যাণের পথটিও দেখানো সম্ভব হবে না। যদি কেবল মেন্টাল রিহ্যাবিলিটেশনের কথা ভেবে লোকরঞ্জনই করতে হয়, তাহলে চলিত নাটকের রূপ অপরিবর্তিত রেখেই কিছু করতে হবে; রং দিতে হবে, আবেগ জাগাতে হবে, আশা জিইয়ে রাখতে হবে, পালা-যাত্রা এবং পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটক যে কাজ এতদিন করে এসেছে তাই করতে হবে। অর্থাৎ, নাটককে নূতন করে ন্যাশনাল করতে হবে।

শহরে আর মফস্বলে নাট্যশালার একান্ত অভাব সন্ধানী মনের প্রয়োজনীয় নাটকের স্বরূপ ঠিক করে নেবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অভাব দূর করবার সামর্থ্য আছে সরকারের—নানা রকমের নাট্যশালা খুলে দিয়ে, পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ করে দিয়ে। কিন্তু সরকারকে তাই করতে বলবার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে যে দলীয় মতবাদ নাটকের মাধ্যমে প্রচার করবার জন্য কোন দলই সেই সব নাট্যশালা ব্যবহার করতে পারবেন না। আবার সরকারকেও স্বীকার করতে হবে মানুষের কল্যাণকর সব কথা বলবার স্বাধীনতা।

সরকারী কর্মচারীদের কাউকে কাউকে বলতে শুনি

(ইহার পর ২৫১ পৃষ্ঠায়)

নটগুরু গিরিশচন্দ্র ও নটনায়ক শিশিরকুমার

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতির জীবনে এবং সমাজের গতি পরিবর্তনের উপর নট, নাটক ও নাট্যশালার প্রভাবের কথা এযুগে সকলেই স্বীকার করেন। প্রত্যেক দেশেই সাহিত্য-প্রতিভাই নাট্যকারকে অমর করে রাখে। কিন্তু নট-জীবনের সংগেই নটের হয় জীবনাবসান। তাই নট-নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু বড় দুঃখেই নটপ্রসংগে বলে গেছেন—দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়। নটগুরু গিরিশচন্দ্রেরও বোধ হয় বড় বেদনা পেয়েই মহাশক্তিকে উদ্দেশ করে জানিয়েছিলেন—'মাগো! তোমার ঐ শক্তির খড়্গে নট-বৃত্তির দরুণ আমার যে খ্যাতি, তার অবসান কর।'

এ-যুগের নট-নায়ক শিশিরকুমার ভাদুড়ীও সম্প্রতি কথাপ্রসংগে লেখকের কাছে আক্ষেপ করেন—বলতে পারেন, এতগুলি বছর ধরে করলাম কী? এই যে মঞ্চের পর মঞ্চ পরিচালনা করে অভিনয় করেছি—অভিনেতা, অভিনেত্রী সব গড়েছি, একশোর ওপর ভূমিকায় রূপ দিয়েছি। লোকের খ্যাতিও পেয়েছি, কিন্তু এ সবের স্বাক্ষর বা স্বীকৃতি থাকবে কোথায়? তাই ভাবি, যদি নাটক লিখতাম; অভিনেতা না হয়ে নাট্যকার হতাম, তাহলে হয়ত শিশির ভাদুড়ীর নাম থেকে যেত ইতিহাসে। কিন্তু অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর নাম তার সংগে সংগে মুছে যাবে। তাই মহাপ্রতিভাবান কথাটা বলেছিলেন অমৃতলাল বসু—দেহপট সনে নট সকলি হারায়।'

লেখক উত্তরে বললেন, অভিনেতা থেকেই ও আপনি নাট্যকার হতে পারতেন। গিরিশবাবু ত গোড়ায় অভিনেতাই ছিলেন, নাটক লিখবার কল্পনাও তখন করেননি। কিন্তু যেই দেখলেন, নাটক নাট্যশালার প্রাণ, নাটক বিহনে নাট্যশালা চলতে পারে না, অথচ, বিজ্ঞাপন দিয়েও ভাল নাটক পাওয়া যাচ্ছে না। তখন নাটক লেখবার জন্যে কলম ধরলেন। আর আপনিও যদি নাট্যকার হন, নাট্য-প্রতিভা [illegible] সব্যসাচীর মত [illegible] সামনে [illegible]

কিন্তু শিশিরকুমার [illegible] উদাসভাবেই বললেন—আমার সে [illegible] গিরিশবাবুকে যখন দেখেছেন [illegible] অবস্থায় যদি [illegible] আমার মত একাই [illegible] করতে হোত না। [illegible] শুনিয়ে তৈরী করে দিতেন [illegible] তাঁর সহকর্মীরা—[illegible] যেমন—অর্ধেন্দুবাবু [illegible] ইত্যাদি। এখন আমার [illegible] নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা [illegible] হয়েছে—কী সে খাটুনি [illegible] চেষ্টা—অসম্ভব। [illegible] এখন লেখা সুদূর [illegible] হলো।'

লেখক জিজ্ঞাসা কর[illegible] বললেন—[illegible] ছেড়ে নাটক লিখে সেটি [illegible] পারে স্বাদে? এক [illegible] অ্যাড্‌ভান্স করেছেন [illegible] সে-কথা। সেদিন আমার [illegible] করেছি। নাটক [illegible] নাম দিয়েছি—'প্রয়োগ' [illegible]

লেখক বললেন—[illegible] নাট্যশালায় প্রকৃত [illegible] আমদানী। যদি বইখানা [illegible] অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীর নাম [illegible] কালে মুছে

দুই যুগের দুই নাট্য-দিক্‌পালের নট-জীবনের ধারা

গেলেও, প্রয়োগ-শিল্পী শিশিরকুমার নাট্য-জগতে অমর হয়ে থাকবেন।

প্রসংগক্রমে কথাটা এখানে উল্লেখ করতে হলো। এইজন্যই মনে হয়, বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে একদা যাঁরা জাতির জীবন আনন্দ-রসে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন, তাঁদের নট-জীবনের তথ্যগুলিও নাট্যশালার ইতিহাসের সামিল করে রাখা উচিত।

বাঙলার নটশ্রেষ্ঠ নটগুরু নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধেও দেখি, এ-পর্যন্ত যেসব গ্রন্থ ছেপে বেরিয়েছে ও নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে নটগুরুর নট-জীবন ও তাঁর নট-ধর্ম পালন সম্পর্কে কোনো পরিচিতি নেই। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নট-জীবন সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে মোটামুটি কিছু আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাল্যকালে কিভাবে গিরিশচন্দ্র যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, হাফ-আখড়াই প্রভৃতির সংস্পর্শে অভিনয়ে আকৃষ্ট হন, পাড়ার সংগীদের নিয়ে যাত্রার দল গঠন করেন এবং পরে সেই যাত্রাসম্প্রদায় বাগবাজার এমেচিওর থিয়েটারে পরিণত হয়ে বাঙালীর জাতীয় নাট্যশালার সূচনা করে—এ-সকল কথা মোটামুটি অনেকেই জানেন। সুতরাং পুরাতনের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ভেবেই নটগুরুর নট-জীবনের প্রকাশ ও বিকাশের আলোচনাই এই স্বল্প পরিসর মধ্যে সংগত মনে করি।

তরুণ জীবনে গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন ২৪ বছর মাত্র; সেই বয়সেই কবি দীনবন্ধু মিত্রের নতুন প্রকাশিত সধবার একাদশী নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকা নিয়ে গিরিশচন্দ্রের যে নট-জীবনের সূচনা হয়, পরবর্তী জীবনে ৬৮ বছর বয়স পর্যন্ত [illegible] সেই [illegible] নট-জীবন তাঁর অব্যাহত থাকে।

নট-জীবনে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব সাফল্যের [illegible] যে-সব তথ্য জানা যায়, [illegible] নট-নটীদের জানাতে গেলে [illegible] আলোচনা করলে ভালো মনে করি।

[illegible] ২৪ বছর বয়সে [illegible] ৬৮ বছর বয়সে [illegible] বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ [illegible] —[illegible] নাট্যকাররূপে [illegible] অভিনয়ে [illegible] চরিত্রের রূপায়ণেও [illegible] দর্শকসমাজকে [illegible] আনন্দ দান করেছে।

[illegible] গিরিশচন্দ্রের অভিনীত নিমচাঁদ, ললিত, [illegible], মেঘনাদ ও রাম, পশুপতি, ম্যাক্‌বেথ, [illegible], [illegible], কঞ্চুকী, [illegible] প্রভৃতি ভূমিকাগুলির [illegible] সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁরাই [illegible] গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-ধারার বৈচিত্র্যই [illegible] একটি ভাব থেকে চরিত্রের [illegible] ধীরে ধীরে আর [illegible] যাচ্ছে। গিরিশের [illegible] বিবর্তনে মনোবিজ্ঞানের [illegible] ভাবুক অভিজ্ঞ দর্শককে কিরূপ

অভিভূত করত, এ-থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিদেশে দক্ষ অভিনেতাদের অভিনয় দেখে তাঁদের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, ভারতে ফিরে এসে বাঙলার নট-দুলাল গিরিশের ভাবাভিনয় তাঁর সে ধারণা নস্যাৎ করে দেয়। তাই তাঁকেও ভাবাবেগে স্বীকার করতে হয়েছিল—[illegible] অভিনয়ে মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দেখে বুঝতে পারা যায় যে, বাঙলা দেশের আবহাওয়া ছাড়া এমনটি হতে পারে না। গিরিশ-বাবু যদি ওদেশে গিয়ে ওখানকার নামকরা নট-নটীদের সামনে তাঁর অপরূপ অভিনয়ের এমন ভাবতন্ময়তা দেখাতেন, তাঁরা গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদা দিয়ে ধন্য হতেন, এমন কি তাঁর পদতলে বসে এই অদ্ভুত ভাব-তন্ময়তা শিক্ষা করতেন।

গিরিশচন্দ্রও নটের সাধনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতেন। 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকায় তার কিছু কিছু ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু এখন সে-সব দুষ্প্রাপ্য। একস্থানে নটগুরু বলেছেন—'নটের সাধনা বড়ই কঠোর। নাটকীয় চরিত্রের সংগে আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে—এক করে নিয়ে, সেই চরিত্রের মত কথা বলতে ও ভাবভংগীতে অভ্যস্ত হবার জন্য সাধনা করতে হয়। পার্ট মুখস্থ করে মঞ্চে নেমে অংগভংগীর সংগে বলে গেলেই অভিনয় করা হয় না।'

গিরিশচন্দ্র নিজেকে নাটকীয় চরিত্রের সংগে মিশিয়ে দিয়ে একাত্ম হয়ে অভিনয় করতে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই, তিনি যখন কোনও ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে অভিনয় করতেন, তখন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে অভিভূত দর্শকগণের মনে হত যে, তাঁরা নাটকের সেই চরিত্রকেই যেন জীবন্ত দেখছেন—গিরিশচন্দ্রের কথা ভুলে যেতেন।

অনেকের ধারণা, অভিনয়ের সময় বিশেষ বিশেষ ভংগী ও তার পরিবর্তন—এগুলি বিদেশের আমদানী। ও-দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই এ-ব্যাপারে ওস্তাদ। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দৃঢ়তার সংগে এ-কথার প্রতিবাদ করে বলতেন—মিছে কথা, যাঁরা এ-কথা বলেন, যদি আমাদের দেশের প্রাচীন কথকতা, কীর্তন ও পাঁচালীওয়ালাদের গানের সময় মুখভংগীর সংগে ভাব পরিবর্তন দেখতেন, তাহলে তাঁদের ধারণা পালটে যেত। আমি জানি, বড় বড় কথকরাও নানা উপায়ে কথকতার সময় মুখে বিশেষ বিশেষ ভংগী আনবার জন্য চেষ্টা করতেন, লোকের শোক-দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-উল্লাস-মর্মবেদনা—এ-সব দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। বালক-বালিকাকে কাঁদিয়ে, কিংবা মজার কথা শুনিয়ে হাসিয়ে, কখনও বা খেলনা-খাবার দিয়ে মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়ে সে-সব ভাব আদায় করে নিতেন নিজের মধ্যে।

নটগুরু ও নাট্যাচার্য সম্বন্ধে এত কথা বলছি কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখে ধন্য হই ১৯০০ অব্দের গোড়াতে সর্বখ্যাত অমর দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে। এ-সময় গিরিশচন্দ্র বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন—৫৬ বছর বয়স চলেছে। কিন্তু এ-বয়সেও নট ও নাট্যকারের বৃত্তি পূর্ণ শক্তিতে বজায় রেখে উভয় দিকের প্রতিভার উজ্জ্বল আলো ফেলে চলেছেন। গিরিশ-শিষ্য অমৃতলাল মিত্র তাঁর থিয়েটারের কর্ণধাররূপে গুরুদত্ত শিক্ষার প্রভাবে ষ্টারের খ্যাতি অম্লান রেখেছেন। প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ তাঁর নট-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা নয় শিষ্যের সংগে সংগ্রাম করা। কিন্তু তিনি যে বেতনভুক নট, সম্প্রদায় ও মঞ্চের শীর্ষে তাঁর স্থান

'পূজোয় জানাই আমাদের অভিনন্দন'

বাংলা নাটকের কথা

(২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

নাটকে রাজনীতির, অর্থনীতির স্থান থাকা উচিত নয়। অনেকেই তাতে সায় দেন। কিন্তু পৃথিবীর নাটক সে নির্দেশ রক্ষা করে চলে না। আজকার দিনে তা করা যায় না। জীবনের সব দিক তাতে রূপ পায় না। পঞ্চশীলের কথা, প্ল্যানিংয়ের কথা নাটকের মাধ্যমে প্রচারণার প্রয়োজন অবশ্যই আছে যদি মনে করা যায় এ-সবেতে জাতির হিত হবে। মানুষকে প্রবুদ্ধ করতে হলে এর প্রয়োজন আছে। যেমন প্রয়োজন আছে নাটককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে উন্নত করা।

কিন্তু এ-সব করবে কে? মঞ্চ-মালিকরা ঘরের কড়ি ব্যয় করে তা করবেন কেন? যাঁরা মিশন মনে করে এগিয়ে আসে, তাদেরকে সন্দেহ করা হয় অকারণে। তাদের পথের বাধা দূর করা হয় না। অধিকন্তু তারা যাতে না নিরঙ্কুশ হয়, তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। নাটক-নাশন আইন, প্রমোদ-কর, পুলিশ তদন্ত, সব কিছু স্বীকার করে লেখকরা আর অভিনেতারা না চায় লিখতে, না চায় নূতন নূতন পরীক্ষা করতে। কাজেই সেমিনারে ফেস্টিভ্যালে বাণী আর বুলির তুবড়ীবাজী চল্লেও প্রয়োজনীয় নাটক হচ্ছে না, নাটক প্রয়োজনীয় রূপও পাচ্ছেনা। আশী বছর বাংলা নাট্যশালা আপন শক্তি দিয়ে করেছে, আজ সরকারী, আধা-সরকারী, বে-সরকারী প্রয়াস প্রবল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও অবস্থা তার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত হচ্ছে না। কারণ কি? কারণ জাতির বাসনা-কামনা আজ দানা বেঁধে রূপ-পরিগ্রহ করছেনা; দল আর মত, অন্ধ বিশ্বাস আর অবিশ্বাস, সংস্কৃতিকেও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই অবস্থা। কিন্তু ভারতের তা হওয়া উচিত নয়। কারণ ভারত সমন্বয়ে, আপোষে, অভ্যস্ত। যতদিন না তা ঘটে, ততদিন অপেক্ষাই করতে হবে। শুধু মনে রাখতে হবে থিয়েটার চাই, আরো থিয়েটার, অনেক থিয়েটার, রকমারি থিয়েটার। তা হলেই নাটক হবে, ভালো নাটকও হবে।

হলেও, সকল দিক দিয়েই ছিলেন ভারতের আদর্শ-বাদী। মঞ্চস্বামীকে প্রচুর মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত। অগত্যা একদা যোগেশের ভূমিকায় তাঁকে রূপ দিতে হলো। সবার মুখে প্রশ্ন ও মনে সংশয়—অমৃত মিত্রের যোগেশের পর নটগুরু হলেও, তাঁর লেখা হলেও আর কি বেশী দেখাবেন! কিন্তু যোগেশের ভূমিকায় রূপ দিয়ে তিনি যা দেখালেন, সবার আগেকার ধারণা পাল্টে গেল। অমৃতলালের যোগেশ নিষ্প্রভ হয়ে বিদায় নিল—মঞ্চের বিভব-রূপে মূর্ত হয়ে উঠলেন যোগেশরূপী গিরিশ। এখন থেকেই অর্থাৎ ১৯০০ অব্দের পর থেকেই নাট্যকার গিরিশের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি—মনের মতন, ভ্রান্তি, ফণীর মণি, সৎ নাম, বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, বাসর, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, শাস্তি কি শান্তি, শঙ্করাচার্য, রাজা অশোক, তপোবল প্রভৃতি নাটক ও নাটকবর্ণিত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে নাট্যজীবনের সঙ্গে নট-জীবনকেও সার্থক করে তোলেন। প্রায় এক যুগ পরে ১৩১৯ অব্দের ৩০শে আষাঢ় মিনার্ভা মঞ্চে 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় তাঁর নট-জীবনের শেষ অবদান। এরপর ছয় মাসকাল রোগ ভোগ করে ১৯১২ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী সংসার-মঞ্চের অভিনয় শেষ করে বাঙলার নটগুরু, জাতীয় মঞ্চের গৌরব-ভাস্কর গিরিশচন্দ্র অস্তমিত হন।

যে-বয়সে গিরিশচন্দ্র নাট্যশালার সঙ্গে যোগ-সূত্র অক্ষুণ্ণ রেখে যুগপৎ নাট্য রচনা ও নটের সাধনায় সক্রিয় অবস্থার মধ্যে সহসা দুর্বার ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সাধনোচিতধামে মহাপ্রস্থানে বাধ্য হন, ঠিক সেই বয়সে বাংলার আধুনিক যুগের মঞ্চপতি, লোকপ্রিয়, প্রতিভাধর নট-নায়ক শিশিরকুমার ভাদুড়ী অকালে মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করছেন। মঞ্চানুরাগী ও জাতীয় মঞ্চের প্রতি আগ্রহশীল নাট্য প্রেমিকদের পক্ষে এটা দুর্ভাগ্যের মতই মর্মন্তুদ।

ছাত্র-জীবনে শিশিরকুমার গিরিশ-প্রতিভার [illegible] ভক্ত [illegible] সংযোগ স্থাপনে [illegible] উদ্যোগ [illegible] নটগুরুর [illegible] তাঁর সংযোগ সম্ভব [illegible] কিন্তু নট-[illegible] সহকর্মী ও [illegible] অনন্যস্বরূপ [illegible] অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর [illegible] সান্নিধ্য লাভে [illegible] সমর্থ হয়েছিলেন। [illegible] এমনি [illegible] ছিলেন যে [illegible] কিছু [illegible] আশায় একবার [illegible] পারলেই [illegible] অর্ধেন্দু তখন [illegible] শিশির-পীড়িত [illegible] দেরী করে [illegible] পর্যন্ত ছাড়তেন না [illegible] নিজের কাজ—তা সে যত [illegible] এমনি [illegible] সান্নিধ্য পেয়ে তরুণ শিশিরকুমার [illegible] তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র রচনা [illegible] এই সুদর্শন মিষ্টভাষী [illegible] চোখে-মুখে প্রতিভার [illegible] বিরাট সম্ভাবনার আভাস [illegible] জানি না, কিন্তু তাঁকে [illegible] ধীরে ধীরে তাঁর সংস্কারক [illegible] করে দেন শিশিরকুমারকে।

যাঁরা অর্ধেন্দুশেখরের [illegible] আদর্শ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল [illegible] পূর্বের অতুলনীয় অভিনয় [illegible] শালার অবদান এখনো [illegible] সুস্পষ্ট, তাঁরাই বলবার [illegible] যুগের অনন্যসাধারণ নট [illegible] নাট্যশিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর [illegible] কৌশল, স্বাভাবিক [illegible] আদর্শ এ-যুগের নট-নায়ক [illegible] নাট্যাচার্য শিশিরকুমার [illegible] এমন প্রণালীর উপর সুস্পষ্টভাবে [illegible] কি, ভূমিকা-বিশেষে বিশেষ গভীর ভাবপূর্ণ অংশের উপসংহারে স্বকপোলকল্পিত আপ্তবাক্য প্রয়োগ-দ্বারা কৌতুক-রস-সৃষ্টির অহেতুকী আসক্তিও শিশিরকুমারের নট-জীবনে অর্ধেন্দুর অপকীর্তির অনুকৃতি। মঞ্চে যে কোন ভূমিকায় অর্ধেন্দু অবতরণ করুন না কেন, দর্শক ভাবতেন—অর্ধেন্দুবাবুর অভিনয় তাঁরা দেখছেন, ভুলে যেতেন ভূমিকার কথা। এ-যুগে শিশির-কুমারের অভিনয় সম্পর্কেও দর্শক-সমাজ এই ধারণাই পোষণ করে এসেছেন বরাবর। শিশির-কুমার মঞ্চে এলে, তাঁরা শিশিরকুমারকেই দেখতেন, তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব শিশিরকুমারের ভূমিকাটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে বরাবর এবং একথা স্বতঃসিদ্ধ।

অবশ্য নটজীবনের যাত্রাপথে সহজাত নট-প্রতিভা, উচ্চশিক্ষা, পাশ্চাত্য নাট্য-সাহিত্য ও কলা-শিল্প সম্পর্কে অধ্যয়নলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ-গুলি পাথেয় করে শিশিরকুমার নিজেই নিজের নট্যবিদ্যার বিচারকরূপে তাঁর অভিনয় ধারার সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তন করেছেন: নব নব রীতির প্রবর্তন দ্বারা নব নব কলাকৌশলে তাকে বিশেষত্ব দিয়েছেন; নূতনত্ব দেখিয়ে স্বতন্ত্র ও অপূর্ব সৌন্দর্যময় করেছেন।

কথা-প্রসঙ্গে লেখক জ্ঞাত হবার সুযোগ পান যে, গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমারের রুচি ও প্রকৃতির মধ্যে বহু সাদৃশ্য ছিল। শিশিরকুমার কথাপ্রসঙ্গে বলেন—আমাদের মঞ্চসংস্থানে গোড়া থেকেই ভুল হয়েছে। এই যে দৃশ্যপট ও আলোর ব্যাপার, এর কোন সার্থকতা নেই—বেশী অর্থ এতেই চলে যায়। আমি কি চাই জানেন—সিনফিন তুলে ফেলে প্রাচীন যাত্রার আদর্শে থিয়েটারকে নূতন করে ভেঙেচুরে তৈরী করা। এতে খরচ কমে যেত, অভিনয়ের উৎকর্ষ হতো, টিকিটের হার কমিয়ে দিয়ে সকলকে সহজে অভিনয় দেখানো যেতো। যদি গোড়াতেই গিরিশবাবুরা এটা করতেন, তাহলে আজ আমাদের নাট্যশালা অন্য রকম হ'ত।

লেখক এ কথার উত্তরে বলেন—গিরিশবাবুকে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওঁদের যাত্রার প্রতি আসক্তির কথা আমার জানা ছিল। সে সময় থিয়েটারে কোনো উৎসব হলে, পেশাদারী যাত্রা দল ভাড়া করে এনে মঞ্চের উপর আসর করে গাওনার ব্যবস্থা হ'ত। নটনটীরা শেষ পর্যন্ত যাত্রাভিনয় দেখতেন। তাই একদিন নটগুরুকে বলি—নীল-দর্পণ নাটকে যাত্রার ধরনে প্রস্তাবনা লিখে মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন শুনেছি, কিন্তু মঞ্চকে আপনারা যদি যাত্রার আসরে পরিণত করতে পারতেন, কত সুবিধা হোত!

গিরিশবাবু তখনি কথাটার খণ্ডন করে দিলেন ওঁদের পূর্ববর্তীদের নজির দেখিয়ে। বললেন, আমার যখন ৫।৬ বছর বয়েস, তারও আগে থেকেই কলকাতার বড় বড় ঘরের বাবুরা সখ করে সাহেবদের অনুকরণে থিয়েটার খুলে সবার চোখে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। যতগুলো নামকরা বড় বড় ঘর আছে সহরে, সবাই কোমর বেঁধে দাঁড়ান থিয়েটার করে সখ মেটাবার জন্যে। এতগুলো বছর ধরে সিনসিনারীর জোরে থিয়েটার যখন লোকের চোখে চেনা হয়ে গেছে, তখন আমরা যদি সিন-সিনারী খুলে তাকে যাত্রায় নামাই, লোকের মনে ধরবে না বুঝেই আর ও চেষ্টা করিনি।

শিশিরবাবু বললেন—গোড়াতেই গলদ হয়ে গেছে। যাই হোক, গিরিশবাবুর মাথায় তাহলে ব্যাপারটা ছিল। কিন্তু আমাদের নাটক আর অভিনয়কে যদি দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়, এই যাত্রার সাহায্যেই সেটা সম্ভব করতে হবে। কিন্তু কটা লোক এ কথা ভাবে? এই [illegible] না, [illegible] লিলিপুট থিয়েটারের ক্ষুদে [illegible] মঞ্চ নাম দিয়ে [illegible] জন্য কি চেষ্টাই না হয়েছে। [illegible] এর উদ্যোক্তা, তাঁরা জানাও প্রয়োজন [illegible] না যে, ওদেশে ছোটদের জন্যে যে সব মঞ্চ থাকে, সেখানেই সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাজানো, ছোট ছোট দৃশ্যগুলো তাড়াতাড়ি দেখাবার জন্যই রিভলভিং স্টেজের ব্যবস্থা। কোনো বড় বিখ্যাত থিয়েটারে এ জিনিসটি নেই, অথচ আমাদের দেশের সর্বজ্ঞ নাট্যবিদ্‌রা এর পিছনে কি টাকাটাই না ঢেলেছেন! যাকে বলা চলে—সর্বস্ব ঘুচিয়ে পাকা সেতখানা বানানো!

বলতে বলতে শিশিরকুমার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, তাঁর মুখ, চোখ ও ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলাম। এর পর তাঁর ভবিষ্যৎ আশা, নবতম পরিকল্পনা, বর্তমান যুগোপযোগী নাট্যরচনা সম্বন্ধে কত কথাই বললেন তরুণ সুলভ উদ্যম ও সাফল্য সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে। ভাবলাম, যে বয়সে গত যুগের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জরাগ্রস্ত অবস্থায় অস্তমিত হন, সেই বয়সে আর এক জ্যোতিষ্মান নটনায়ক ধূমকেতুর মত দীর্ঘকাল নাট্যাকাশ উদ্ভাসিত করে কালচক্রের আবর্তনে কক্ষচ্যুত অবস্থায় পুনরুত্থানের প্রতীক্ষাধীন! এ অবস্থায় সদা সক্রিয় ও গতিশীল চলমান তেজীয়ান জ্যোতিষ্মান সূর্যদেবতাকে উদ্দেশ করে আমাদের সূর্যপ্রভ নটনায়কের উদ্দেশে প্রশস্তি বাচন করি—

যিনি সচল চলমান—তিনিই অমৃতের অধিকারী, অমৃতলাভ করে ধন্য হন! একইভাবে চলেছেন বলেই এত আলোক—সম্পদ ঐ সূর্য-দেবতার। সেই আদর্শে সূর্যসম সক্রিয় হয়ে হে জাতীয় নাট্যাকাশের জ্যোতিষ্মান [illegible], [illegible] চলমান অবস্থায় কামালাভ কর। চলো চলো—এগিয়ে চলো। চরৈবেতি—চরৈবেতি!

দর্শক নেবে না

অসিতকুমার সেন

চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগটুকু অনেক দিনের। একটা কথা প্রায় সেই থেকেই আমার কানে আসত। কোন একটা পরিকল্পনার মুখে হঠাৎ থমকে যাওয়া ক'টা কথা, 'উঁহু, পাবলিক নেবে না', বা 'পাবলিক নেবে কি?' কথা ক'টা সহজ বটে, কিন্তু হালকা নয় খুব। এই একটুখানি সংশয়ের ফাঁক ভরাতে গিয়ে কতজনের কত ভাণ্ডার উজাড় হয়ে গেছে ঠিক নেই। কিন্তু তবু নতুন কোনো পরিকল্পনার মুখে প্রশ্নটা থেকেই গেল। শুধু থেকে গেল নয়, বরং সেটা চতুর্গুণ বেড়ে গেল। দিন যত এগোচ্ছে, প্রতিযোগিতা যত বাড়ছে, পাবলিক নেবে কি নেবে না, সেই সমস্যা নিয়ে চিত্র-নির্মাতারা তত বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন। ছবি গড়ার পরিবেশে এলে এই একটা স্পেকুলেশানই অগণিত বার আপনার কানে আসবে। কেউ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলছেন, এ পাবলিক নেবে না, কেউ বা আবার নিঃসংশয়ে রায় দিচ্ছেন, এ পাবলিক লুফে নেবে।

ছায়াচিত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান পরিমিত। তবু সমস্যাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। সমাধানের একটা সহজ কলকাঠি খুঁজেছি। কি বিড়ম্বনা ভাবুন। আপনার জিবের স্বাদ অনুমান করে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে আপনাকে নেমন্তন্ন করলাম আপনারই মনের মত জিনিস পরিবেশন করব বলে। আপনি এলেনও। সমস্ত উপচার সাজিয়ে নিয়ে ধরলাম আপনার সামনে। কিন্তু কিছুই ভালো লাগল না আপনার। একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে অভুক্ত উঠে চলে গেলেন আপনি। আর সবকিছু নিয়ে বোকার মত মুখ কালো করে বসে রইলাম আমি। আজকের সফল বিজ্ঞান কি এমন কিছু একটা ইশারা বাতলে দিতে পারে না, যাতে করে এক মুহূর্তে বুঝতে পারি কোনটা পাবলিক নেবে আর কোনটা নেবে না?

আমার ধারণা, বিজ্ঞান সেটা বহুদিনই বাতলে দিয়ে বসে আছে। বিজ্ঞান ঠিক নয়, মনোবিজ্ঞান। আমরা সেটা যথাযথ পাঠ করে নিতে পারিনি বলেই পায়ে পায়ে এত ঘা খাচ্ছি, এত হোঁচট খাচ্ছি আর এত বিড়ম্বনায় ভুগছি।

একদিন, পর্দায় ছবি নড়ে চড়ে, এটুকুই ছিল দর্শকদের সব থেকে বড় আকর্ষণ। এটুকুই ছিল তাঁদের কাছে মস্ত বিস্ময়, এটুকুই তাঁরা দেখতে আসতেন, আর এটুকু দেখেই তাঁরা খুশী হয়ে ফিরে যেতেন। তখন আমরা তাঁদের কোন নালিশও শুনিনি, অভিযোগও শুনিনি। তারপর এলো সবাক চিত্র। ছবি এখন কথা কয়, হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। দর্শকেরাও আসেন সেটুকু দেখতেই। যা' হয় না, তা তাঁরা কোনদিনও চাননি। যেটুকু পেলেন, সেটুকুতেই খুশী। তারপর এলো ছবিতে গল্পের যুগ। এলো একটা কাহিনীর আলেখ্য রূপায়ণের যুগ। ছবির গতি বিভিন্নমুখী হল ঠিক এইখানটাতে এসে—ঠিক এখান থেকেই সুরু হল স্পেকুলেশানের যুগ। বাইরের ছবি আমদানীর সংখ্যাও তখন বেড়ে গেছে বহুগুণে। দর্শকদের চোখ বৈচিত্র্য পাচ্ছে। এক-একটা ছবিতে গিয়ে দলে দলে ঝুঁকছেন তাঁরা। ছবিওলাদের ভাষায় সে-ছবি 'হিট' করল। চলচ্চিত্র-নির্মাতারা এবার একটা ছক কাটতে বসলেন। অমুক ছবিতে এই ধরণের বড় বড় কথা ছিল বলে পয়সা পেয়েছে। অতএব গল্প যাই হোক, নিজের ছবিতে এ-ধরণের 'ডায়লগ' চাই। অমুক ছবির এই আদি রসাত্মক ব্যাপারটা এক শ্রেণীর দর্শক টেনেছে তিনবার করে। অতএব নিজের ছবিতে সে পর্যায় বাদ দিলে চলবে না। অমুক ছবির ওই করুণ ব্যাপারটা দেখে মেয়েরা হাপুস নয়নে কেঁদেছে, আর দলে দলে কাঁদতে এসেছে, অতএব নিজের ছবিতে তা-ও চাই। এই করে কোন ছবির হাসি, কোন ছবির কান্না, কোন ছবির সেক্স, আবার কোন ছবির অধ্যাত্মবাদ, কোন ছবির বীরত্ব, কোন ছবির বা কাপুরুষতার নিদর্শন নিয়ে দর্শক মনোরঞ্জনের ছক বা ফরমুলা ঠিক করা হল। কিন্তু আগেই বলেছি, ছবিতে তখন এসে গেছে নিখুঁত একটা গল্প রূপায়ণের যুগ—একটা সংগতিপূর্ণ গল্প পড়ে পাঠক যে আনন্দ পান, ছবি দেখে সেই আনন্দটুকুই চোখের সামনে প্রতিভাত দেখতে চান তাঁরা। কিন্তু ওই বাঁধাধরা ছকে ফেললে কোন্ গল্প টেকে? কোন্ গল্পের সামঞ্জস্য থাকে? ফলে পাঁচমিশালি করে দর্শকদের সামনে যা' আমরা ধরে দিই, প্রায়ই তা' একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ছকে ফেলে শিল্প সৃষ্টি আর হাতের মুঠোয় জল আটকানোর প্রয়াস দুই-ই নিরর্থক।

আমার স্থির বিশ্বাস, দর্শকের কথা ভুলে গিয়ে যদি আমরা ছবি করায় মন দিই, তাহলে এত দুর্ভোগ হয় না। একটা চোখ, একটা কান যদি দর্শকের দিকে ফেলে রাখি, তাহলে এক চোখে আর এক কানের সৃষ্টিতে গলদ আটকাব কেমন করে? এদিক থেকে গীতার প্রবচন মানা ভালো। ফলাফলের কথা ভুলে গিয়ে নিজের কাজটুকু নিখুঁতভাবে করো আগে—সেটাই সাফল্যের কলকাঠি। কথায় আছে, নিখুঁতভাবে ঘাস কাটতে পারলেও লোকে সেটা দাঁড়িয়ে দেখে। অথচ দেখার ফাঁস্ট লেগে আছে যেখানে, যেখানে চোখ-কান-মনের এত বড় এক ঢালা ভোজের আয়োজন, সেখানে এসেই কিনা চিত্ত থাকছে উপোস করে! আশ্চর্য! যেখানে গল্প টেনে রাখতে পারে দর্শক-চিত্ত, যেখানে গল্প ফেল করলে অভিনয় ধরে রাখতে পারে, অভিনয় ফেল করলে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরা ফেল করলে সাউন্ড এফেক্ট আছে—ভালো লাগানোর এত অস্ত্র আছে আমাদের হাতে—তবু যদি ভালো না লাগাতে পারি, শতকরা একশ' ভাগই ব্যর্থতা আমাদের নয়তো কার? বসে দেখার মত ভালো ছবি আজ পর্যন্ত একটাও কি ব্যর্থ হয়েছে? লোকের ভালো লাগানোর ফরমুলায় না ফেলে শুধু যদি একখানা ভালো ছবি করার দিকেই সম্পূর্ণ মন দিই, বিশ্বাস, তাহলেই আর কোন সমস্যা থাকে না।

একটা গল্প বলি। কোন পরিচালক বেশ পরিচ্ছন্ন ছবি করেছেন একটা। কিন্তু পরে তাঁর এবং কর্মকর্তাদের খেয়াল হল সাধারণ দর্শকদের খোরাক কিছু দেওয়া হল না। অতএব নায়িকার মুখে একটা গান দেওয়া যাক। যথা কাজ। গানটিও সুন্দর হল। এবারে পরিচালক নানা চপল এবং প্রগল্‌ভ ভঙ্গীতে (প্লে-ব্যাক করা) গানটি নায়িকার দ্বারা পরিবেশন করালেন। স্টুডিওতে স্পেকুলেশান শোনা গেল, কোন্ কোন্ বিশেষ শ্রেণীর দর্শককে একেবারে বন্দী করে ফেলা হল। ছবি যথাসময়ে হল-এ এলো। সকলেই চুপচাপ, বেশ আগ্রহসহকারে বসে দেখছেন। কিন্তু যেই সে গানটি আসা, চিৎকার, চেঁচামেচি, হাসাহাসি এবং শিস্-এর হুল্লোড়ে অস্থির কাণ্ড! পড়ি-মরি করে ছুটে গিয়ে এডিটার গোটা গানটাকে কাঁচি চালিয়ে খতম করে তবে বাঁচলেন। এই তো আমাদের দর্শক-মন বিচারের নিদর্শন। হাসাতে গিয়ে কাঁদাই, আর কাঁদাতে গিয়ে হাসাই।

ছবির রাজ্যটা রেসকোর্স নয় যে, শুধু স্পেকুলেশানেই মাৎ করব। অমুক ঘোড়া এবার অমুক বাজিতে জিতেছে। ব্যস্ এবারেও লাগাও সকল পুঁজি ওরই ঘাড়ে। অমুক ছবির ওই ধরনের গল্প আর সংলাপ, ওই সব আর্টিস্ট ছবিটাকে 'হিট' করিয়েছে। কাজেই দেখো ওরকম গল্প আর কোথায় আছে, যত টাকা লাগে ওই আর্টিস্টদেরই নিয়ে এসো—যথাসর্বস্ব লাগাও এই স্পেকুলেশানের পিছনে। উৎরে যদি গেল ভালো, কিন্তু অন্যথায়? স্পেকুলেশান শুধু উৎরে দেয় না, উল্টে দেওয়াটাও তার বিশেষ একটা ধর্ম।

আপনার টাকা আছে, আপনি বাড়ি করবেন। আর্কিটেক্ট প্ল্যান দিলে, আপনি তার থেকে একটা প্ল্যান বেছে নিলেন। তারপর ইঞ্জিনীয়ার ডেকে নির্দেশ দিলেন, এই বাড়িটি আমার চাই। ইঞ্জিনিয়ার তাঁর দলবল নিয়ে এলেন। তাঁর নির্দেশমত প্রতিটি ইঁটের গাঁথনি নিখুঁতভাবে পড়তে পড়তে আপনার সেই বাড়িটি দাঁড়াল। তা' না করে আপনি যদি মাঝে পড়ে বলতে থাকেন, ওখানে অত ইঁট দিও না, খরচ কুলোবে না, সিমেন্টের বদলে ওখানে অন্য কিছু চালাও, আর সবশেষে আলগা রঙের পোঁচটোচ দিয়ে যা' হোক্ করে ওই মূর্তিটাতে এনে দাঁড় করাও, তাহলে? সব মিলিয়ে আপনি একটা গোঁজামিলই পেলেন, আর কিছু নয়। ছায়া-ছবিও ঠিক তাই। লেখক প্রধান আর্কিটেক্ট। আপনি তাঁর প্ল্যান বা গল্প বেছে নিলেন। ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ ডিরেক্টরের হাতে সেটা দিলেন। তিনি তাঁর দলবলের সাহায্যে গাঁথনি তুলতে লাগলেন। এই প্রতিটি গাঁথনি হল এক-একটি শট। আপনার বা কারো নির্দেশে এতে ফাঁকি থাকলে শেষ পর্যন্ত ফাঁকে পড়তেই হবে। শিল্পের সূক্ষ্মতায় স্থূলে গোঁজামিল অচল।

যাক, আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। দর্শকেরা কি নেবেন আর কি নেবেন না, সে সমস্যা ঘোচাতে হলে একমাত্র পথ ছবি করার সময় দর্শকের ভাবনা না ভেবে সমস্ত সংযত বুদ্ধি দিয়ে আর বিবেচনা দিয়ে ছবিটি সুসম্পূর্ণ করে তোলা। সে ছাড়া যে আর দ্বিতীয় পথ নেই, এতবার ঘা খাবার পরেও সেটুকু অন্ততঃ আমাদের বোঝা উচিত। কোন শিল্পই জগতে একেবারে নিখুঁত হয় না। রুচিবোধের কিছুটা তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা' বলে সত্যিকারের কোন একটা ভাল ছবি দর্শক একেবারে নেননি, এমন নজির নেই। আমরা আমাদের ভাবনাটুকু যথাযথ ভাবতে পারলেই, দর্শকের ভাবনা দর্শকেই ভাববেন। সেজন্য ছবির কর্মকর্তাদের এতটুকু ভাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে ক'রিনে। দিন বদলেছে। পারমাণবিক বাস্তব যুগ এটা। সূক্ষ্ম প্রতিফলনের দ্বারা বৃহত্তর অনুভূতি প্রকাশের যুগ এটা। এরই সঙ্গে তাল রেখে দর্শকের চোখও বদলেছে। বদলাইনি শুধু আমরাই, যারা ছবি করছি। সেই একই স্থূলের যুগে, অসংগতির যুগে পড়ে আছি প্রায়। আর এই পিছিয়ে পড়া চোখ দিয়ে দর্শক-মন বিচার করতে বসছি বলেই পায়ে পায়ে এত হোঁচট খাচ্ছি, এত ঘা খাচ্ছি। তাই দর্শক-মনের নাগাল পেতে হলে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে অনেক, অনেক দ্রুত।

বাংলা ছবির বাজার

শ্রীমহেন্দ্র সরকার

বাজার বলতে কোন্ ছবি কত ভালো বা কেমন তার চাহিদা, বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য তা নয়। বাংলা ছবির বাজার বলতে এখানে তার প্রসার ও প্রচারের কথাই বলছি।

চলচ্চিত্রকে বলা হয় "সিক্সথ্ এস্টেট।" কিন্তু সম্পদের বিচারে বাংলা ছবির স্থান ছয় কেন ষাটও নয়। তার প্রথম ও প্রধান কারণ বাংলা ছবির সংকীর্ণ গণ্ডি। দেশ বিভাগের পর সেই গণ্ডি আরও ছোট আরো খাটো হয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র গণ্ডির এই সীমিত পরিবেশে নিত্য ঘুরে-পাক খেয়ে বাংলার চিত্রনির্মাতারা আজ উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন, শিল্পীদের প্রতিভা মরচে-ধরা এবং স্বাভাবিক কারণেই দর্শকরাও নিরুৎসাহ। নিজের সামান্য পুঁজির ও পরিধির উপর নির্ভর করেই বাংলা চিত্রশিল্পকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কোনো শিল্পই বেশীদিন টেঁকে না, টিকতে পারে না। সুতরাং বাঁচার তাগিদেই তাকে বাজার সম্প্রসারণ ও প্রচারের কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে নতুন দর্শক ও নতুন বাজারের কথা।

সেই সম্প্রসারিত বাজার বা প্রচারের স্থান বহির্বঙ্গ, বহির্ভারত। অনেকের মতে তাতে সমস্যা বহু, বাধাও অনেক। প্রধান বাধা ভাষা। কিন্তু আমেরিকায় ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে জাপানী ও ইতালীয় ছবির সাফল্য, এবং মধ্য-প্রাচ্যে ও কমিউনিস্ট প্রভাবিত দেশগুলিতে কয়েকটি হিন্দী ছবির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আমাদের সে ভুল সম্প্রতি ভেঙে দিয়েছে। ছবিতে 'সাব-টাইটেল' জুড়ে এবং নিখুঁতভাবে 'ডাব' করে ও বাধা কাটানো সম্ভব হয়েছে। আর একটি বাধা বাংলা-ছবির কলা-কৌশলগত অদক্ষতা। এ-বাধা অবশ্য এই মুহূর্তে দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু কলা-কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব বাদেও এক দেশের ছবি যে অন্য দেশে জনপ্রিয় করা সম্ভব তার প্রমাণ তো জাপানী ইত্যাদি ছবি দিয়েইছে। এ ছাড়া কোনো ছবির বৈদেশিক সাফল্যের জন্য তার সার্বজনীন আবেদনের কথাও বিবেচ্য। বাংলা ছবির পক্ষে এটাও অলঙ্ঘ্য বাধা নয়; এবিষয়ে বাংলা সাহিত্যই তাকে অশেষ সাহায্য করতে পারে। তার কারণ আন্তর্জাতিক জীবন ও সমস্যা তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু, মানব-জীবন তার অবলম্বন। বাদ থাকে প্রচারের কথা, সে আলোচনা আমি সর্বশেষে করবো। একমাত্র যে বাধাকে বাধা বলে গণ্য করতে হয় তা হচ্ছে বাংলা ছবির অনুন্নত মান ও প্রচারবিমুখতা সম্পর্কে। এ ব্যাপারে আমরা এখনও অন্ধকারে। কিন্তু এই ঘন অন্ধকারের মাঝেও হঠাৎ যেন দীপ-শিখার মত ছোট্ট একটি আলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি, যা শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই নয়, বিশ্বের দরজায় হাজির হয়ে বলছে—আমি আছি, আমি এসেছি। কিন্তু চারধারের ডামাডোলে একটি 'পথের পাঁচালী'র ক্ষীণকণ্ঠ নীরব হতে কতক্ষণ, যদি না আমরা যথাসময়ে পরিচয় করে উৎসাহ দিয়ে তার জয়যাত্রার পথকে সফল করে তুলতে পারি! বলা বাহুল্য সে-কাজ বাংলা চিত্রশিল্পের, রাষ্ট্রের। আমরা কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি মাত্র।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কোলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের গোটা সত্তর সিনেমা হাউস এবং মফঃস্বলের অত্যল্প সংখ্যক চিত্রগৃহ নিয়ে বাংলা চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধি অভাবনীয়। তাই নতুন দর্শক তাকে খুঁজতেই হবে। সেই দর্শক যেমন ঘরে তেমনি বাইরেও খুঁজতে হবে, এবং সেই সঙ্গে সমস্যার কথাও ভাবতে হবে।

বাইরে, দূরে আমেরিকার কথাই ধরা যাক্। আমেরিকায় ভারতীয় ছবি চলতে পারে—কিছুদিন আগেও এটা নিতান্তই দুরাশা ছিল। বৃটিশ বা ইতালীয় ছবিকেও আমেরিকার বাজারে প্রতিষ্ঠা করে নিতে প্রথম দিকে কম বেগ পেতে হয়নি।

দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় ডিলাক্স-এর নির্মীয়মান আগামী নিবেদন 'নবজন্ম'তে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

অথচ ওসব দেশের সঙ্গে আমেরিকার সংস্কৃতিগত ঐক্য বহুদিনের। চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে ইতালী প্রথমে তো সদর দরজা বা সাধারণ প্রদর্শকের মাধ্যমে আমেরিকার বাজারে ঢুকতেই পারেনি। তাকে যেতে হয়েছিল খিড়কির দোর দিয়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রদর্শক বা আর্ট থিয়েটারের সাহায্যে। তাছাড়া ছবি দেখানোর ব্যাপারে বৈদেশিক ছবির ওপর বহুবিধ ট্যাক্সের কথা তো আছেই। এখন অবশ্য মার্কিণ বাজারে—বৃটিশ, ফরাসী ইতালীয়, জার্মান এবং জাপানী ছবির জোর বরাত। দিন বদলেছে, হাওয়াও পালটাচ্ছে, ঠেলায় পড়ে আইন-কানুনও পাল্টাতে হচ্ছে। তাই শোনা যায় 'বুট-পলিশ' ছবিটি সম্প্রতি খাস কালিফোর্নিয়ার বুকেই দু' হপ্তা চলেছে। তাহলে ভালো বাংলা ছবিরই বা বাধাটা কোথায়?

বাংলা ছবির বহির্ভারতীয় সম্ভাবনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই সর্বাধিক। এসব জায়গায় হিন্দী ছবির প্রদর্শনীতে খুবই উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে; কিন্তু আশ্চর্য এই যে এসব অঞ্চল হিন্দীভাষী নয়। সুতরাং ভালো বাংলা ছবির পক্ষে এসব অঞ্চলে বাজারের সুযোগ করে নেওয়া যে মোটেও কঠিন নয় তা বোঝাই যাচ্ছে।

এছাড়া রাশিয়া ও কমিউনিস্ট শাসিত ও প্রভাবিত দেশগুলিতে 'দো বিঘা জমীন' কি প্রচণ্ডভাবে অভ্যর্থিত হয়েছে, সেকথা এখন আর কারো অজানা নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ছবির সর্বত্রই আজ জয়-জয়কার। এর পরেও বাংলা ছবি তার বিশ্বব্যাপী মান আর ভারতজোড়া নাম নিয়ে, এই সুযোগে তার বাজার তৈরী করে নিতে যদি না পারে তবে এমন সুদিন আর সে পাবে কবে?

সর্বশেষে আসছে বাংলা ছবির প্রচারের কথা। এটা প্রচারের যুগ। আর্থিক কারণেই হোক্ আর সম্মানের জন্যই হোক, কোনো সামগ্রীকে লোকের মনে ধরিয়ে দিতে হলে তার জন্যে প্রচার চাই-ই চাই। বিশেষতঃ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তো বটেই। যথাযথ প্রচার হলে ভালো একখানি ছবি সম্মানের সঙ্গে লাভের কড়িও প্রচুর আনে এমন ঘটনার অভাব নেই; কিন্তু না হলে কি হয় সেই বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য। কথাটা উঠেছে আবারও ঐ 'পথের পাঁচালী' ছবিটি সম্পর্কেই। শোনা যায় যথাসময়ে ভালোভাবে প্রচার কার্যটি অর্থাৎ আনুকূল্য আবহাওয়া তৈরী হয়নি বলে কান-এর চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি তার ভাগ্য থেকে ফসকে গেল। সুতরাং এই থেকে আমরা ভবিষ্যতের পাঠ নিতে পারি, ঘটনাটি উল্লেখ করতে হলো এই কারণে।

প্রচার বিষয়ে সরকার এখনও নিরুৎসাহ, কাজেই বি-এম-পি'এর ঘাড়েই চাপটা এসে পড়েছে বেশী। বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র মেলা থেকে আরম্ভ করে যা কিছু করণীয় বাংলা ছবির জন্য তাকেই করতে হবে। একটি 'রাইকমল' নিয়ে বা একখানি 'পথের পাঁচালী' অবলম্বন করে হিতেন চৌধুরী প্রোডাকসন্সের একক চেষ্টায় বহির্ভারতে বাংলা ছবির বাজার তৈরী করা অসম্ভব। বি এম পি-এ বা বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির দায়িত্বের কথা উঠছে আরো এই কারণে যে, আজ অবধি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠিত এমন কোনো সংস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, যার ওপর এই কাজের ভার ন্যস্ত করা যেতে পারে। আর সে প্রতীক্ষায় থেকে লাভও নেই। কেন না অতীতে সর্বভারতীয় উদ্যম যা কিছু দেখা গিয়েছে বাংলা প্রায়শঃই তাতে অবজ্ঞাত। 'পথের পাঁচালী'র কল্যাণে বাংলা ছবি বিশ্বের দরবারে আজ শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে। আর এই শ্রদ্ধা বা সম্মান কিছু অনবরত আসার সম্ভাবনা নেই, তা হয়ও না। অতএব যা কিছু করার—এখনই, শুভস্য শীঘ্রম্—
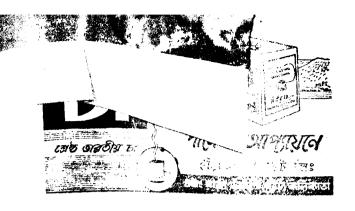
আধুনিক প্রমোদ

রেণুপদ দাস

আধুনিক জীবনের পক্ষে প্রমোদ এমন এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে যে মনে হয় আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত জীবনটা বুঝি নিতান্তই সুখতৃপ্তি আরাম-আনন্দহীন একটা দুষ্কার্যের বোঝা। বাস্তবিক জীবনটা যাতে বোঝা বলে মনে না হয়, তার জন্য প্রতিদিন মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কত প্রমোদের ব্যবস্থা; সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস ম্যাজিক, নাচ-গান, নাইট ক্লাব, জুয়া ক্রীড়া প্রভৃতি কত বিচিত্র প্রমোদ অনুষ্ঠান। যাদের জন্য এত আয়োজন তাদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অবিবাহিত বেকার বা চাকুরিজীবী, স্বল্প আয়ের অর্ধ-শিক্ষিত দোকান কর্মচারী বা শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী সাধারণ। এরা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবিবাহ, সামাজিক অসাম্য, নিরাপত্তাহীন জীবনে বিপর্যস্ত —ক্ষণ উত্তেজনা ও তাৎক্ষণিক ভোগে বিশ্বাসী। তাই আধুনিক প্রমোদের প্রকৃতিও হয়েছে স্থূল এবং তীব্র। ভোগও হয়েছে স্বল্পকালস্থায়ী।

এই কারণেই একদা দার্শনিকপ্রবর রুশো ফরাসী জনতার স্থূল রঙ্গপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আধুনিক প্রমোদ সর্বৈব মন্দ। তাঁর ধারণা হয়েছিল আধুনিক প্রমোদ যতই প্রশ্রয় পাবে ততই মানুষের সুক্ষ্মবৃত্তি, স্বাভাবিক ভদ্রতা এবং মানসিক সুস্থতার অপমৃত্যু ঘটবে। মানুষের স্থূল রঙ্গপ্রিয়তা উদ্দাম হয়ে উঠবে। রুশোর সমালোচনা সত্য-মিথ্যা যা হয় হোক আপাততঃ আধুনিক প্রমোদ যে বিপুল গণ-সম্বর্ধনা লাভ করেছে তা অসত্য নয়। এর ক্রমবর্ধমান 'পপুলারিটি' লক্ষ্য করে অনেকে একে জনতার সংস্কৃতি হিসেবে অভিনন্দনও জানাচ্ছেন। কারণ অধুনা পপুলারইজেশনই হচ্ছে কোন বস্তুর সার্থকতার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর। সে পরীক্ষায় নাকি আধুনিক প্রমোদ উত্তীর্ণ!

আধুনিক প্রমোদ বলতে প্রধানতঃ সিনেমা থিয়েটার যাত্রা নাচগান প্রভৃতিকেই বোঝায় এবং এক্ষেত্রে যদি পপুলারইজেশনটা কার্যকরী হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় সিনেমা থিয়েটার যাত্রা নাচগান জনচিত্তে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চভাব ও সৌন্দর্যানুভূতি সঞ্চার করছে। আধুনিক যুগে সিনেমাই হচ্ছে বৃহত্তম প্রমোদ ব্যবস্থা এবং এর বিপুল চাহিদা ও উৎপাদনের জন্য সিনেমা পরিপূর্ণভাবে ব্যবসায়ীর পণ্যও বটে। যেহেতু সিনেমা ব্যবসায়ীর পণ্য এবং মুনাফার জন্যই ছবি তোলা হয় সেইহেতু বৃহত্তম চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রমোদ পরিবেশন করা হয়। এই চাহিদাটাই কি পপুলারইজেশনের লক্ষণ?

ভারতবর্ষের মত শিল্পে অনগ্রসর দেশে সিনেমা শিল্পে বিয়াল্লিশ কোটি টাকার মত মূলধন নিয়োজিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী, কারিগর, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী এই প্রমোদ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সিনেমার অভিনবত্ব ও এদের মিলিত চেষ্টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রতিদিনকার খাওয়া-পরা-আশ্রয়ের মত আধুনিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অত্যাজ্যতাই কি পপুলারইজেশন, না অর্থক্লিষ্ট, দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত, যৌন অতৃপ্ত জনতার গূঢ় বিকৃতি সাধনটুকুই পপুলারইজেশন? ব্যবসায়ীরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝেছেন জনতার পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে আধুনিক জীবনের অতৃপ্তির মানস-পরিতৃপ্তি ঘটালেই 'ছবি হিট' করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, ছবি পপুলার হয়। ছবির ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করবার জন্য অসামাজিক প্রেম, স্থূল অভিনয়, জনতার জীবনের সঙ্গে সংস্রবহীন জীবনের অদ্ভুত কাহিনী, অতি নাটকীয়তা, অশোভন স্থূল রঙ্গ-ব্যঙ্গ, অভিনেতা অভিনেত্রীদের যৌনতা সূচক গ্ল্যামার প্রভৃতি আমদানী করা হয়। একথা বলাই বাহুল্য, সামান্য আঘাতেই মানুষের যেসব বৃত্তিগুলি ঝন-ঝন করে বেজে উঠে এইসব প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা অতি তৎপরতার সঙ্গে সেই সব প্রবৃত্তির বাজনাই বাজাচ্ছেন আর তৎসঙ্গে এক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আধুনিক প্রমোদের জনপ্রিয়তার এই আকস্মিক জোয়ার দেখে আধুনিক প্রমোদের পপুলারইজেশনের স্বপ্ন দেখছেন।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধপরবর্তী যুগে জনসাধারণের রুচি প্রকৃতি আশ্চর্যভাবে মোড় ফিরেছে এবং এই পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে তাল রেখে সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, ম্যাজিক, নৃত্যগীতানুষ্ঠানের প্রকৃতিও পাল্টে যাচ্ছে।

অত্যন্ত আধুনিককালে কলকাতার থিয়েটারগুলি কাহিনী নির্বাচন, নাট্য-সংগঠন, দৃশ্যপট রচনা, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে এবং দর্শকদের অধিকতর আরাম দানের ব্যাপারে সিনেমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রীতিমত পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক সিনেমা, থিয়েটারের সাফল্যের কারণ অনুধাবন করে ম্যাজিসিয়ানরা এবং সার্কাসওয়ালারা পর্যন্ত গুটিকয়েক সুবেশা তরুণীকে কখন পায়জামা, কখন ট্রাউজার, কখন শালোয়ার বা শাড়ী পরিয়ে দর্শকদের খুশী করবার চেষ্টা করছেন।

নৃত্য গীতানুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে জনপ্রিয় শিল্পীরা অত্যন্ত হালকা চালের এবং তুরিমারা তালের গান শোনাচ্ছেন শ্রোতাদের। সে সব গান ভাবে ভাষায় এবং সুরের চটুলতায় বিশেষ সমাদৃত। এই সব জনপ্রিয় শিল্পীদের প্রায় সকলেই সিনেমার নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী। পেশাদার নৃত্যানুষ্ঠানগুলিতেও এই জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নৃত্যের বিষয়বস্তু ও শিল্পী নির্বাচন করা হয়।

আধুনিক প্রমোদের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে তাতে প্রগতিশীলতার লক্ষণ আবিষ্কার করা কঠিন। এর সাধারণ প্রকৃতিতে প্রতিক্রিয়াশীলতাই মুখ্য। পুরাতন প্রমোদের ভিত্তিভূমি ছিল ধর্ম কিন্তু আধুনিক প্রমোদ সামাজিক অসংগতিতে বিপর্যস্ত। এই নতুন পুরাতন যাবতীয় চিন্তাধারা রীতিনীতির প্রতি অবিশ্বাসই আধুনিক প্রমোদের প্রতিষ্ঠাভূমি। পরিপূর্ণ শিল্পায়ন এবং যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন দ্বারা সমৃদ্ধতর সমাজবিন্যাসের সার্থক সূচনা না হলে এই অবিশ্বাস কুরুচি ও সংস্কৃতিবিহীন যুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে না বা বাঞ্ছিত প্রমোদেরও সৃষ্টি হবে না।

নৃত্য ও সংগীত বিদ্যালয় নরনারায়ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারের নৃত্যশিক্ষার্থীবৃন্দ। শিল্পীঃ মীরা চ্যাটার্জি, গৌরী ঘোষ ও প্রেমলতা

নিত্যানন্দ ঘোষ

আশীর হাসি

ভুলপথে

(২২ পৃষ্ঠার পর)

আবার ভাবলাম, না। বন্ধুর বোন, নিজের বোনের মত। তার যদি আমাকে ভাল না লেগে থাকে তাহ'লে হয়ত'-বা একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। চিঠি লেখা হয়ে উঠলো না।

কিন্তু মন মানলে না। যাওয়া-আসা চলতে লাগলো।

হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি, বন্ধু বাড়ীতে নেই।

বাইরের ঘরে বন্ধুর বোন একা বসে বসে কি যেন লিখছে।

ঘরে ঢুকলাম।

শোভা বললে, বোসো। এক্ষুণি আসবে।

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। শাড়ীর আঁচলটা গায়ে তুলে নিলে।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো। কি বলে কথাটা সুরু করবো বুঝতে পারলাম না। মুখ তুলে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল। কিছু একটা বলা দরকার। ফট করে বলে ফেললাম, এক গ্লাস জল।

হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শোভা।

কি সুন্দর হাসি।

গ্লাস ভর্তি জল আমার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শীতকাল। জল খাবার কথা নয়। তবু সেই দারুণ শীতে অতি কষ্টে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে ফেললাম। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে দিয়েই সেই যে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে, আর কোনোদিন বন্ধুর বাড়ী যাইনি।

হয়ত বলতে পারেন আমি ভীতু, আমি কাপুরুষ। তা' যা বলবেন বলুন, এই আমার অভিজ্ঞতা।

এ নিয়ে গল্প লেখা চলে কিনা জানি না। অন্ততঃ তখন জানতাম না। তাই একজোড়া প্রেমিকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

মিলেও গেল কিছুদিন পরে।

আমি তখন থাকি শ্যামবাজারের একটা মেসে। দক্ষিণ খোলা দোতলার ছোট্ট একখানি ঘর। একাই থাকি। মাঝে মাঝে আবোল্-তাবোল্ যা মনে আসে তাই লিখি। লেখক বলে খ্যাতিও যেমন রটেছে, অখ্যাতিও তেমনি। আমি প্রথম যেদিন এই মেস-বাড়ীতে একটুখানি আশ্রয়ের প্রত্যাশায় আসি, সেদিনের কথা আমার আজও মনে আছে।

বললাম, দক্ষিণের ওই ছোট ঘরটা শুনলাম খালি আছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ আছে। তা কি করতে হবে?

—আমাকে দেবেন?

—দিতে পারি। মাসিক ভাড়া কুড়ি টাকা। লাইটের দরুণ দু' টাকা। খেতে হবে এইখানে।

—খাওয়া খরচ কত?

—যে মাসে যে রকম পড়ে। তা মাসে প্রায় বিশ-বাইশ টাকা হয়।

বললাম, দিন আমাকে। আমি আজ থেকেই নিতে চাই। কত অগ্রিম দিতে হবে বলুন।

ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন। বললেন, এ্যাডভান্স কুড়ি আর দুই-এ বাইশ টাকা।

পকেট থেকে টাকা বের করে' দিতে যাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক হাঁ হাঁ বলে' নিষেধ করলেন। বললেন, দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, এটা কলকাতা শহর, এখানে রীতিমত ভদ্রলোকের ছেলেরা থাকেন। —আপনার কি করা হয়?

ভাবলাম, লেখক বললে খাতির নিশ্চয়ই বাড়বে। তাই চাকরির কথাটা না বলে' বললাম, লিখি।

আবার তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন। বললেন, কি লেখেন? দলিল, না দোকানের খাতা?

বললাম, আজ্ঞে না, আমি লেখক। সাহিত্যিক। আমার নাম—

—থাক্ থাক্ আর নাম বলতে হবে না। আপনি আসুন। নমস্কার।

এই বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুখের চেহারাটা তাঁর এমনি হয়ে গেল যেন আমার সঙ্গে কথা বলতেও তিনি ঘৃণা বোধ করছেন।

চলে যাচ্ছিলেন। যেতে দিলাম না। ধরলাম। বললাম, দেবেন না আমাকে ঘরখানা? কেন দেবেন না বলে যান।

—না মশাই ও-সব লেখক-টেখক চলবে না।

বললাম, যদি বলি আমি অমুক কোম্পানীর বড়বাবু। যদি বলি, আমি মাইনে পাই মাসে চার'শ টাকা। তার ওপর টি-এ পাই।

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, সত্যি? তা যদি সত্যি হয়—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে দিলাম না। টেবিলের ওপর টেলিফোন ছিল। বললাম, টেলিফোন করুন আমার অফিসে। কাল আমি দিল্লী থেকে এসেছি, আজ আপিস যাইনি, থাকবার একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তখনকার দিনে চারশ' টাকা মাইনে নেহাৎ কম নয়।

সত্যিই তিনি টেলিফোন করলেন। নিঃসংশয় হ'তে দেরি হলো না। ঘরখানা পেলাম।

সেদিন রাত্রে কি যেন লিখছিলাম, দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স। স্নানের জায়গায়, খাবার ঘরে দু'চারবার দেখেছি। চেনা মুখ। বললাম, আসুন।

নমস্কার করে' তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। বসেই বললেন, আমার নাম ভবেশ সেন।

লেখা বন্ধ করে' তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম।

ভবেশবাবু বললেন, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম। কি লিখছিলেন? গল্প বুঝি?

বললাম, আমি লিখি তা' আপনি জানেন?

বললেন, নিশ্চয় জানি। —জানি বলেই তো এসেছি। কেমন করে লেখেন মশাই! পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা লিখে চলেছেন, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্ নেই, বানান ভুল নেই! আর আমাদের দেখুন না, একখানা চিঠি লিখতে কলম ভেঙে যাচ্ছে, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

এই বলে' তিনি তাঁর কোঁচড়ের ভেতর থেকে ভাঁজ করা একখানা খামের চিঠি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, নিন পড়ুন।

চিঠিখানি দেখলাম ডাকে এসেছে ভবেশবাবুর নামে। লিখেছে একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম অনুরাধা। বললাম, এ আমি পড়ে কি করবো?

খুলে বলি তবে শুনুন।

এই বলে' ভবেশবাবু এই অনুরাধা মেয়েটি সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ কাহিনী আমাকে শোনালেন। মেয়েটিকে তিনি ভালবেসেছেন। মেয়েটিও তাঁকে ভালবেসেছে। এখন বাকি শুধু বিয়ে। অথচ সেদিক দিয়ে এসে জুটেছে এক প্রচন্ড বাধা।

অনুরাধার মামা হঠাৎ তার আপিসের এক বাবুর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে। বাবুটির বয়েস বেশি, দেখতেও ভাল নয়, দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ। অনুরাধার ইচ্ছে নয় তাকে বিয়ে করে।

কিন্তু বাপ যেন ঢলেছে সেই দিকে, ঢলবার কারণও আছে। কলকাতার কাছেই বারাসাতে তার প্রকান্ড বাড়ী। মস্ত একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরে বড় বড় মাছ। অনুরাধার বাবার মাছ ধরার ভারি সখ। একদিন তার শালাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে মাছ ধরতে। ছিপ ফেলে হাঁ করে বসে থাকতে হয়নি। আধঘণ্টার ভেতর বড় বড় দুটো মাছ ধরে এনেছে।

সুতরাং এইখানে যদি অনুরাধার বিয়ে হয়, আর কিছু না হোক, মেয়ে-জামাই-এর পুকুরে মজাসে মাছ ধরা চলবে।

কিন্তু—

অনুরাধা তার চিঠিতে লিখেছে ঃ মাগো মা বারাসাতের সে লোকটাকে আমি দেখেছি। হোঁৎকা একটা ভূতের মতন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা। এখানে যদি আমার বিয়ে হয়, নিশ্চয় জেনো আমি মরবো। আমি আত্মহত্যা করবো।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম চিঠিখানা। পড়লাম ভাল করে'।

কেমন যেন সন্দেহ হ'লো—এরকম চিঠি কোনও অবিবাহিতা মেয়ে কোনও ছেলেকে লিখতে পারে কি-না। মেয়েটি বলতে চায়—তুমি আমাকে বিয়ে কর, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।

নিজে বিবাহ করিনি, প্রেমেও পড়িনি। লিখতে পারে কিনা জানবোই-বা কেমন করে?

হয়ত-বা পারে। হয়ত-বা এমনিই প্রেমের মহিমা।

ভবেশবাবুকে বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

ভবেশবাবু বললেন, করুন সার। কিন্তু সার, আপনি আমাকে আপনি বললেন না, তুমি বলুন। আমি আপনার চেয়ে বয়সেও ছোট, আর আপনারা হলেন গিয়ে...হেঁ হেঁ।

তুমিই বলতে হলো।

বললাম, এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার ভালবাসা তোমার হ'লো কেমন করে' আমাকে বলবে?

ভবেশ বললে, কেন বলুন তো সার? গল্প লিখবেন?

বললাম, যদি লিখি, তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি? বলেন কি সার? বলেই ঢিপ করে' ভবেশ হাত বাড়িয়ে আমার পায়ে হাত

"সততা ও নিষ্ঠা"র সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তার ফলে আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা আজ বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত। এই সাফল্য কিন্তু আমাদের উদ্যমে শৈথিল্য আনে নাই। আমরা চাই আজও আর এক উৎকর্ষের পথে অগ্রসর। আধুনিক রুচিসম্পন্ন অলঙ্কার নির্ম্মাণ দ্বারা অভিজাতদের সর্ব্ব বিষয়ে সন্তুষ্টিবিধান করিয়াছি আমরা তাই "জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে"।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার ব্যবসায়ী

কলিকাতার অন্যতম
সৌখীন, রুচিপূর্ণ
ও আরামদায়ক
রেস্তোঁরা
কার্'কো

আনন্দময়ীর আগমনে আপনাদের আনন্দকে আরও রসাল এবং তৃপ্তিপ্রদায়ক করিবার মানসে আমরা ২৫, টাকা তোলার জাফরাণ মিশ্রিত খাঁটী গাওয়া ঘৃতের তৈরী বিরিয়ানী পোলাও, জর্দা ইত্যাদি নানা জাতীয় দেশী-বিদেশী খাবারে এবং আধুনিকতম যন্ত্রচালিত নাচ-গানে আপনাদের আনন্দ পরিবেশনের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি নিয়ে রাত্রি ১২টা অবধি দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি।

কারকো রেষ্টুরেণ্ট

হগ মার্কেট, কলিকাতা।

চমকে উঠলাম। এতক্ষণ [illegible] ওকে চিনতে পারলাম। বললাম, তুমি তো পুটু?

মেয়েটি বললে, হ্যাঁ। [illegible] এখন আর পুটু নয়, মালতী।

অনেকদিন আগেকার [illegible] আমাদের [illegible]হারী গ্রামে জরিপ হচ্ছিলো। অনেকগুলি কর্মচারী গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের গ্রামে। জরিপ শেষ হলো। গ্রাম থেকে কর্মচারীরা চলে গেল। সেদিন থেকে পুটুকেও কেউ দেখতে পেলে না আমাদের গ্রামে। গ্রামে থাকবার মধ্যে ছিল পুটুর এক দাদা আর বৌদিদি। তারা বলিয়ে দিলে পুটু মামার বাড়ী গেছে।

এই সেই পুটু।

পুটু আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। বলতে লজ্জা করছিল, তবু [illegible] না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম, [illegible] থেকে তুমি বেরিয়ে এলে সেই বাড়ীর মেয়ে অনুরাধার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।

পুটু হাসতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুটুই আমাকে বাঁচালে। আমার চিঠিপত্র সব পুটুই নিয়ে যায়, ওর [illegible] পুটুই নিয়ে আসে।

ওর পেছনে টাকাও আমি অনেক খরচ করেছি সার। এবার আমার বিয়েটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

এই তো গল্প। এবার লিখুন সার, চিঠির জবাবটা কিন্তু [illegible] আমি বেঁচে থাকতে বারাসাতের [illegible] তোমার হতে দেবো না কিছুতেই। সাহস যদি থাকে তো [illegible] আসতে হবে তোমাকে [illegible] তোমাকে না পেলে আমিও বাঁচবো না।

জবাবটা কেমন করে [illegible] ভাবছি, এমন সময়ে ভবেশ [illegible] আমাদের গল্পটা লিখবেন তো সার?

বললাম, লিখবো।

আনন্দের আতিশয্যে [illegible] আমার পায়ের ধুলো নিলে।

চিঠির জবাব [illegible] দিলাম লিখে। জবাব না [illegible] ভবেশ উঠলো না কিছুতেই।

বললাম, দেখাবে তোমার এই অনুরাধাকে একদিন?

ভবেশ বললে, নিশ্চয় দেখাবো।

ভবেশ-অনুরাধার প্রেমের [illegible] শুনেছি, তার ওপর আমার কল্পনার [illegible] কেমন করে লিখবো তাই ভাবছি।

গল্পটি আরম্ভও করলাম [illegible] আমার অদৃষ্ট মন্দ, গল্প শেষ [illegible] আমার ডাক পড়লো দিল্লী থেকে।

আবার দিল্লী।

তা হোক! অনুরাধাকে [illegible] না, কিন্তু মনের মধ্যে তার [illegible] নিয়েছি, সেই অনুরাধা [illegible] চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। [illegible] সুখী হোক! বিবাহিত [illegible] আনন্দময় হোক!

দিল্লী গিয়ে গল্পটি শেষ [illegible] বারাসাতের ভদ্রলোককে [illegible] কাগজে [illegible] তার বাবা রাগ করলে। বললে, [illegible] কথা দিয়েছি।

[illegible] বললে, আমিও কথা দিয়েছি ভবেশকে।

—[illegible] কিছু নেই। আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি [illegible] একখানি বাড়ী আছে মাত্র।

—তা থাক্। গ্রামে যদি তার বাড়ী না থেকে একটি গাছ থাকতো, তাহ'লে সেই গাছের তলায় গিয়ে আমরা আশ্রয় নিতাম।

বাবা বললে, তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক রইলো না তাহ'লে।

আমার দুর্ভাগ্য। বলে অনুরাধা ভবেশের হাত ধরে বাড়ী থেকে চিরদিনের জন্যে বেরিয়ে গেল।

যে পত্রিকায় গল্পটি ছাপা হয়েছিল, সেই পত্রিকাটি পাঠিয়েছিলাম ভবেশের মেসের ঠিকানায়।

প্যাকেটটি ফিরে এলো। ভবেশ সে মেসে নেই।

না থাকবারই কথা। বিবাহের পর কেনই বা সে থাকবে সেখানে?

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর।

দিল্লী থেকে গেলাম বোম্বাই। বোম্বাই থেকে আবার দিল্লী। এতদিন পরে আবার ফিরে এলাম কলকাতায়।

প্রথমেই ছুটে গেলাম ভবেশের মেসে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, অনেকদিন হলো ভবেশবাবু চলে গেছেন এখান থেকে। আপনি কি থাকবেন এইখানে?

বললাম, থাকবো। কিন্তু ভবেশের ঠিকানাটা কেউ কি দিতে পারে না?

হরিশ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন ভবেশের বন্ধু। তিনি বললেন, হরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

হরিশবাবু বললেন, বৌবাজারের কাছে তার সঙ্গে আমার একদিন দেখা হয়েছিল। বিয়ে করেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আর কিছু জানি না।

বৌবাজারের একটি রেস্টুরেন্টে একদিন চা খেতে গিয়ে ভবেশের সঙ্গে দেখা। চাকরি ছেড়ে ভবেশ রেস্টুরেন্ট করেছে।

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বললে, বসুন সার, অনেকদিন পরে দেখা। চা খান।

বললাম, তা না-হয় খাচ্ছি। কিন্তু আছ কেমন?

বললে, ভালই আছি।

চা খেয়ে ভবেশকে বললাম, এসো তুমি আমার সঙ্গে।

—কোথায় সার?

বললাম, চল তোমার বাসায় যাব। অনুরাধাকে দেখবো।

হো-হো করে হেসে উঠলো ভবেশ। বললে, অনুরাধাকে আপনি ভোলেননি দেখছি।

বললাম, না ভুলিনি। এসো।

চলুন।

ভবেশ আমাকে নিয়ে গেল তার বাসায়। গলির মোড়ে ছোট একখানি একতলা বাড়ী। দোরের কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিলে। খুলে দিয়েই ছুটে চলে গেল ঘরের ভেতর।

পাহাড়িয়া

পারুল ঘোষ

রুপালির ঝর্ণার কোলে রাশি রাশি পাইনের সার,
গড়িয়ে গিয়েছে নেমে অন্ধকার খাদের কিনারে
দুর্গম জংলার পথ—ভুটিয়া বস্তীর ধারে ধারে
মাথা তুলে জেগে আছে, ছোট বড় অনেক পাহাড়।
নিটোল সবুজ দেহ অশোক পলাশ দেওদার
ছুঁয়ে আছে দিগন্ত, যেখানে কুয়াসা ভারে ভারে
দিনের সোনালি মুখ আড়াল করেছে এক পারে,
অন্যপারে সন্ধ্যালোকে তুষারের অপরূপ কিরণ
বিস্তার।
এইখানে বসে বসে স্বপ্ন দেখি বসন্ত সন্ধ্যায়—
স্বপ্ন দেখি, গিরি নদী অরণ্যের জনপদ ছাড়িয়ে
মসৃণ মমতাময় সবুজের গালিচা মাড়িয়ে
মুহূর্তে হাজির হতে মেঘচুম্বী সর্বোচ্চ চূড়ায়—
যেখানে পাখীরা নেই, ফুলেরা না সুষমা ছড়ায়,
সেখানে তুহিন স্তূপে যেতে চাই নিঃশেষে
হারিয়ে।

ভবেশ ডাকলে, শোনো শোনো, পালাচ্ছো কেন? এদিকে এসো।

মেয়েটি ঘরথেকে বেরিয়ে এলো।

ভবেশ আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালে। তারপর মেয়েটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, এই আপনার অনুরোধা।

অবাক্ হয়ে তাকালাম মেয়েটির দিকে। রোগা লম্বা কদাকার কুৎসিত একটি মেয়ে।

ভবেশ বললে, ওরকম ভাবে তাকাচ্ছেন কেন সার? বিশ্বাস হচ্ছে না?

কি জবাব দেবো ভাবছি। এমন সময় ভবেশ নিজেই বললে, এ আপনার অনুরাধা নয় সার, এর নাম শতদল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাহ'লে অনুরাধার কি হলো?

বললে, কি আর হবে? অন্য জায়গায় বিয়ে হ'লো। আর আমি বিয়ে করলাম শতদলকে।

তাহ'লে যে লিখেছিল, বারাসাতে বিয়ে হ'লে, আত্মহত্যা করবে।

ভবেশ আবার হাসলে। বললে, কিছু করেনি। খুব সুখে আছে। ছেলে হয়েছে একটি।

—আর তুমি?

ভবেশ বললে, আমিও বেশ আছি সার। কাজ নেই বাবা আমার সুন্দরী মেয়েতে।

বললাম, তাহ'লে তার চিঠিগুলো কি সব মিথ্যে?

ভবেশ বললে, সব মিথ্যে। সব আমাদের সেই পুটুরাণীর রচনা। মাঝখান থেকে আমার অনেকগুলো টাকা গেছে ওর পেছনে। যাক্‌গে সার, ও-সব কথা ভুলে যান। আমিও ভুলে গেছি।

একটু থেমে আবার বললে, অনুরাধাকে নিয়ে গল্প-টল্প লেখেননি তো? লিখবেন না সার, প্রেম-ট্রেম সব বাজে, সব মিথ্যে।

আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, এর পরে গল্প লেখা চলে?

জীবন ছন্দ

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

মৌতাতের মতই উপভোগ্য রমেশের কাছে তার এই সন্ধ্যাবেলার ঘুমটা—সারাদিন আপিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে প্রায় গড়ের মাঠের মত ফাঁকা এবং বন্ধ সিন্দুকের মত ছ'দিক ঢাকা ফ্ল্যাট বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নাতীনাতনীহীন নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরুপদ্রব সংসারে ফিরে আসবার পর একটানা ঘণ্টা তিনেকের অবসরের প্রকাণ্ড ফাঁকটাকে পূর্ণ করবার একটা মনোরম উপায়ও বটে। সেই ঘুমটাই দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ভেঙে যাওয়াতে রমেশ বেশ বিরক্তই হয়েছিল। কিন্তু অপরিচিত প্রিয়-দর্শন যুবকটিকে দেখে সেটা অনেক নরম হয়ে গেল। তার সব কথা শোনবার পর তো একেবারে জল।

তার বাসা খুঁজে পেতে কম ভুগতে হয়নি ছেলেটিকে, বললে সে। আপিসে গিয়ে দেখে যে আপিস ছুটি হয়ে গিয়েছে; দারোয়ানকে কত তোষামোদ করে যে সে তার বাসার ঠিকানা পেয়েছে তা সে কি বলবে। তারপর আবার গলি ও নম্বর খুঁজে বাড়ী বের করা, বাড়ী পাবার পরেও আবার ফ্ল্যাট এবং তারও পরে মিনিট পাঁচেক কড়া নাড়া।

মাসীমা চিঠি দিয়েছেন। কেন, অমল মেশোমশায়ের বাড়ীর মাসীমা,—অমল বসুকে চেনেন না তিনি?

নিশ্চয়ই চেনে রমেশ,—তার বাল্যবন্ধু, কৈশোরের সহচর, যৌবনের সুহৃদ এবং তার পরেই মীরার বাবা।

সেই মীরার বিয়ে। মীরার মা কল্যাণী হাতে লেখা দু'ছত্রের চিঠিতে সেই খবর দিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে, রমেশকে যথা-সময়ে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হয়ে তার মেয়েকে আশীর্বাদ করতে।

সেই অনুরোধেরই পুনরাবৃত্তি করে ছেলেটি হাত তুলে রমেশকে নমস্কার করে তর তর করে নেবে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

রমেশ বসতে বললে না তাকে,—হয়তো লক্ষ্যই করলে না যে সে চলে যাচ্ছে। তার মনে তখন স্মৃতির জোয়ার এসেছে। বিপুল সেই জলোচ্ছ্বাস। ওর কলকল্লোলের নীচে পৃথিবীর আর সব ধ্বনি, ওর ফেনকিরীটী বিরাট তরঙ্গমালার পশ্চাতে আর সব দৃশ্য চাপা পড়ে গিয়েছে।

এক নিমেষেই প্রায় দুই যুগের ইতিহাস রমেশের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে উঠল।

মীরার বিয়ে, যে মীরা তার জন্মের দিন থেকে তো বটেই, ধরতে গেলে ক্ষণ থেকেই রমেশের চেনা। বছর পঁচিশেক আগে সে এক আশ্চর্য যোগাযোগ।

নিজে সে তখন এলাহাবাদে চাকরি করে। আপিসের কাজে কোন নোটিশ না দিয়েই সে কলকাতায় অমলের বাসায় এসে উঠেছিল। অমল বাসায় ছিল না, শহরেও নয়। আর সেই সময়েই কল্যাণীর প্রসববেদনা উঠেছিল। রমেশই বাধ্য হয়ে প্রায় ধুলোপায়েই প্রসূতিকে নিয়ে গিয়েছিল সেবাসদনে।

কিন্তু পৌঁছিয়ে দিয়েও নিস্তার নেই। শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় প্রসব হলেও গোড়াতে ডাক্তারেরাও যেন ভড়কে গিয়েছিলেন। ফরমাশ পালন করতে হয়েছিল রমেশকে নানারকম ওষুধ কিনে আনবার, উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষা করতে হয়েছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা,—প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত।

কিন্তু দুঃসহ প্রতীক্ষার কি মধুর সে অবসান!

ষ্ট্রেচারে শুয়ে ওয়ার্ডে ফিরেছিল কল্যাণী। পাশেই নার্স, তার বুকে নবজাতক। রমেশ ছুটে আসতেই তরুণী নার্সটি কলকণ্ঠে বলে উঠেছিল, বাব্বা কি ভয়ই পেয়েছিলেন আপনি। নিন, মেয়ে হয়েছে আপনার। দিব্যি পরীর মত ফুটফুটে হবে। নিন, কোলে নিন।

রমেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল, লজ্জায় পাণ্ডুর মুখও রাঙা হয়ে উঠেছিল কল্যাণীর। কিন্তু রমেশই সামলে নিয়েছিল অবস্থাটাকে এবং আশ্চর্যরকমে ওকে সহজ করে তুলেছিল।

নার্স চলে যেতেই রমেশ বলেছিল, ধাত্রীর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বৌদি। ওটিকে আমারও মেয়ে করে নেব আমি। আমার খোকার বয়স এখন পাঁচ। যথাসময়ে পুত্রবধূ করে খুকীকে আমি আমার ঘরে নিয়ে যাব।

কল্যাণী মুখ টিপে হেসেছিল। দেবতাও হেসেছিলেন হয়তো—দুজনেরই অলক্ষ্যে।

রমেশের সে খোকা বিয়ের বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকেনি। আর থাকলেও বিয়ে হত না হয়তো। যে রকম জাতিসচেতন অমল—ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের পর উপবীত ধারণ করে শূদ্র থেকে ক্ষত্রিয় হয়েছিল যে সব কায়স্থেরা তাদেরই একজন। কন্যাদান করে রমেশের মত ব্রাহ্মণের পুত্রে জাত মাড়তে হয়তো রাজীই হত না সে।

তথাপি ছেলেটি যতদিন পর্যন্ত বেঁচেছিল এবং মেয়েটি ছিল নিতান্ত শিশু, ততদিন যখনই অমলদের সঙ্গে রমেশের দেখা হয়েছে তখনই একটা কল্পিত বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে তাদের মধ্যে পরিহাস রসিকতা নিতান্ত কম হয়নি। মীরার মুখে কথা যখন ফোটেনি তখন তাকে দিয়ে "শ্বশুরমশায়" বলাবার চেষ্টাও মাঝে মাঝে হয়েছে এবং কথাটা তার মুখে ফুটলে রমেশের সঙ্গে সঙ্গে মীরা নিজে তো বটেই, তার বাপ-মাও হেসে লুটিয়ে পড়েছে।

ছেলেটি মরবার পর চুকেবুকে গিয়েছিল দুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যে তরল পরিহাস। কিন্তু মীরা ছিল; আর পুত্রবধূ হতে পারে না বলেই যেন আরও বেশী জায়গা অধিকার করে নিয়েছিল সে রমেশের হৃদয়ের। তাকে বাড়তে দেখেছে রমেশ,—দিনে দিনে বা মাসে মাসেও না হোক, মোটের উপর সে রমেশের চোখের সামনেই বড় হয়েছে। ধাপে ধাপে এক এক একটা বয়ঃসন্ধিক্ষণে রীতিমত লাফিয়ে লাফিয়েই তাকে রমেশ এগিয়ে যেতে দেখেছে পরিণতির দিকে, যেমন সে দেখেছে অমলের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি—লোকসান বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত

ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বিলোপ, বড় বাড়ী থেকে ছোট বাড়ী এবং ছোট বাড়ী থেকে শেষে কাঁচা বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ; নিজের আয় থেকে সঞ্চয়ের উপর, সঞ্চিত অর্থের সম্পূর্ণ অন্তর্ধানের পর প্রথমে ধার এবং শেষ পর্যন্ত ঐ মীরার উপার্জনের উপর নির্ভরশীলতার আর্থিক [illegible] মধ্যবিত্ত জীবনের বিপরীত বিবর্তন।

খুব যে সুন্দরী তা নয়। সাদাসিধে গড়ন, মোটামুটি রঙ। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই মীরা প্রাণময়তা, বুদ্ধিমত্তা, নিয়মানুবর্তিতা, পাঠনিষ্ঠা এবং সকলের উপর, কর্তব্যপরায়ণতায় সাধারণের চেয়ে অনেক উপরে। কতবার কত অবস্থায়ই না তাকে দেখেছে রমেশ। জেঠামণি বলে সে তাকে ডাকত। শৈশবে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত, বড় হয়ে আসত পড়া বুঝে নিতে। লেখাপড়া সে করেছে অসাধারণ রকমের মন দিয়ে, পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ করেছে অবলীলাক্রমে। অথচ পড়া তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ঘর-করনার কাজও করেছে সে,—এত বেশী এবং এত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে যে দেখে অবাক হবার মত। নিজের কানে শুনেছে রমেশ, মা বা আর কেউ পরীক্ষার দোহাই দিয়ে তাকে রান্না করতে বারণ করলে মীরা উত্তর দিয়েছে, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র ভাত রাঁধতে রাঁধতে উনোনের আলোতে পড়া করেই বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন,—আমার তো কোন রকমে পাশ করা। তা আটকাবে না, আশা করি।

শুধুই কি পড়া আর গৃহস্থালীর কাজ! নিজের প্রেরণা, চেষ্টা ও পরিশ্রমে সংসারের জন্য অর্থ উপার্জন করে মীরা সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই। অল্প দিনেই যেন সে দেখতে পেয়েছিল অমলের [illegible] অবস্থার ক্রমাবনতি। অভাবের সংসারে [illegible] যখন তার অতি অল্প [illegible] কম মাইনের ইস্কুলের চাকরি নিয়েছিল [illegible] ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে [illegible] পরীক্ষা দেবার আগেই [illegible] নিজের জন্যও একটা মাস্টারি [illegible] নিয়েছিল মীরা। বি এ পাশ করে [illegible] ভর্তি হয়েছিল বি-টি ক্লাশে [illegible] করবার পর থেকে সে [illegible]

সব দিক থেকেই মীরা [illegible] পরিমলের বিপরীত। পরিমল তৃতীয় [illegible] বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে [illegible] সরস্বতীর সঙ্গে তার [illegible] বুদ্ধের দৌলতে কোন এক [illegible] একটা কেরাণীগিরির চাকরি [illegible] কিন্তু এই জুটে যাবার [illegible] দৈনিক একটানা ঘণ্টা [illegible] ছাড়া পরিমলের চাকরির [illegible] বাড়ীর লোক কোন দিন [illegible] সাজ-পোষাকের বাহার সকলের [illegible] তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে [illegible] দেখা ও থিয়েটার করার [illegible] তার বাইরে রাত কাটানো। [illegible] বিপরীত—দুটি যে পিঠোপিঠি [illegible] বিশ্বাসই হয় না।

নিজের চাকরি হতেই [illegible] জিদ করে কল্যাণীকে চাকরি [illegible] ছাড়িয়ে দিয়েছিল জোরালো [illegible] তো মা চাকরাণীর কাজ এক হাতে [illegible] তিন তিনটি প্রাণীর একা করছ। একটা ছেড়ে আর দুটো নিয়ে থাক। মাইনে যা লোকসান হবে তোমার তা আমি পুষিয়ে দেব।

চোখ ফেটে জল এসেছিল কল্যাণীর; বলেও ফেলেছিল সে, মেয়ে হলেও তুই যখন আমার পেটের সন্তান, তখন তোর উপার্জন দিয়ে না হয় এ পোড়া পেট ভরাতে লজ্জা নেই আমার। কিন্তু আবাগীর বেটি, তুই যখন পরের ঘরে যাবি তখন আমাদের উপায় হবে কি?

বয়ে গেছে আমার পরের ঘরে যাবার!—ঠোঁট উলটিয়ে উত্তর দিয়েছিল মীরা। জিদ সে ছাড়ে নি, কল্যাণীকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল।

এ সব ঘটনার কিছু কিছু রমেশ শুনেছিল মীরার মা-বাপের মুখে, কিছু মীরার মুখ থেকে নিজের কানে শোনা, কিছু তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অতি সামান্য অংশই অনুমানের সূত্রে গাঁথা। বছর পাঁচেক আগে পর্যন্তও ওদের বাড়ীতে হামেশা সে যেত, বিদেশে থাকলে চালাত পত্রালাপ। স্বভাব এবং সংসারের নিয়মে দুই বাল্যবন্ধুর প্রণয়ে ভাঁটা ধরলেও মীরা রমেশের হৃদয়ে এক অভিনব বাৎসল্যরসে সঞ্চারিত করে অমল ও রমেশের বন্ধুত্বকে এক নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত করেছিল। মীরাকে রমেশ নিজের ঘরে নিতে পারে নি বলেই হৃদয়ের মধ্যে তার জন্য আরও বেশী জায়গা তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল; আর যে কারণে মেয়েটিকে সে পুত্রবধূ করতে পারে নি, ঠিক সেই কারণেই যথাসময়ে এবং উপযুক্ত বরের সঙ্গে মীরার বিয়ে দেবার দায়িত্বটাকে ঐ অত বড় পারিবারিক দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই রমেশকে নিজের বলে নিজের মনে মেনে নিতে হয়েছিল।

অথচ এত দিন বিয়ে হয়নি মীরার, কল্যাণীর স্বাভাবিক ব্যাকুলতা এবং রমেশের আগ্রহ ও উদ্যম সত্ত্বেও।

বছর দশেক আগে প্রথম যেদিন রমেশ কল্যাণীর কাছে প্রথম কথাটা তোলে, সেদিন কল্যাণী এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল প্রসঙ্গটাকে; বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি কি দরকার ও সব ভাববার? সবে তো সতেরতে পড়েছে মীরা।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করে নি, বরং অনুনয় করেই বলেছিল রমেশকে, আপনার বন্ধুকে বলুন আপনারা। উনি তো সব খুইয়ে ভোলানাথের ভোল নিয়েছেন। এ সব তুচ্ছ সাংসারিক কথা আমার মুখ থেকে শুনলে উনি কানেই তোলেন না।

অমলকে বলতে প্রায় পরমহংসের নির্লিপ্ত কণ্ঠেই উত্তর দিয়েছিল সে, ও সব নির্বন্ধের ব্যাপার হে, সময় হলেই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

চেষ্টা করতে হবে না?

করছি যে না, তা তোমায় কে বললে? সময় হয়নি বলেই চেষ্টার কোন ফল হচ্ছে না।

কিছু দিন পর আবার গিয়ে রমেশ ধরেছিল অমলকে। কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করতে অমল চটে গিয়ে বলেছিল, মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ছেলেখেলার কথা? ও সব টাকার খেলা। আমি [illegible] টাকা কোথায় পাব?

টাকার দরকার হলে আমি দেব, উত্তর দিয়েছিল রমেশ।

অমল কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর মুচকি হেসে বলেছিল, তাহলে বরও তুমিই খুঁজে নিয়ে এস।

বিবরণ শুনে কল্যাণী হাসে নি; কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর প্রায় অনুনয়ের সুরেই সে রমেশকে বলেছিল, আপনিই একটু খোঁজ-খবর নিন। ওঁর ভরসায় থাকলে হয়তো কিছুই হবে না।

খোঁজ করেছিল রমেশ এবং বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটি ভাল পাত্রের সন্ধানও পেয়েছিল সে। কিন্তু পাত্রের বিবরণ শুনেই রমেশকে রীতিমত বিস্মিত করে দিয়ে অমল বলেছিল, ও ছেলে আমাদের স্ব-ঘর নয়।

রমেশ বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ঘর না মিললে বর ভাল হতে পারে না?

ভাল হতে পারে, কিন্তু বর হয় না।

আমার ছেলে বেঁচে থাকলেও এই কথা বলতে নাকি তুমি?

বেঁচে যখন সে নেই, অমল বন্ধুর চোখ এড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল, তখন এ প্রশ্ন অবান্তর।

প্রশ্নের মীমাংসা হবার পূর্বেই পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় পাত্রের সন্ধান পায় রমেশ মাস ছয়েক পর। এবার অমলকে এড়িয়ে কল্যাণীর কাছে গিয়েছিল সে; বলেছিল, আপনার যদি মত হয় বৌদি, তো অমলকে উপেক্ষা করেই শুভকর্ম আমরা মিটিয়ে ফেলব।

সব শুনে কল্যাণী ছোট্ট করে বলেছিল, দেখি মীরাকে একবার জিগ্যেস করে,—তার মত ছাড়া তো কিছুই হবে না।

পর দিন রমেশকে সে বলেছিল, না, রমেশবাবু, সবই পণ্ডশ্রম করলেন আপনি।

রমেশ বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন, বৌদি? মীরা কি বললে?

কল্যাণী নিজের ললাটে হালকা মতন একটি করাঘাত করে উত্তর দিয়েছিল, সবই আমার অদৃষ্ট রমেশবাবু! গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। মীরা বলছে যে, সে বিয়েই করবে না।

বিয়ে করবে না? কেন?

সেই 'কেন'র জন্যই তো আমার এত দুঃখ রমেশবাবু। ওর অনিচ্ছার কথা কেবল নয়, যুক্তি পর্যন্ত কান পেতে শুনতে হয়েছে। উত্তর দিতে পারি নি, প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। আর সেই জন্যই মনে হয়েছে, ও কথা শোনবার আগে আমার মরণ হল না কেন?

চমকে উঠেছিল রমেশ। মীরার মত মেয়ে! অন্যায় দূরে থাক, অযৌক্তিক কিছুও যে সে করতে পারে, তা-ও রমেশের কল্পনার অতীত। সেই মেয়েই তার মাকে কাঁদাবার মত—

কি বলেছে মীরা? রমেশ ভয়ে ভয়ে, প্রায় অস্ফুট-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল।

কল্যাণী তা রমেশকে জানায় নি; উত্তরে মুখ নীচু করে শুধু বলেছিল, আপনি নিজে মীরাকে বলুন গে। সে আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার কথায় কিছু ফল হলেও হতে পারে।

রমেশ মীরার কাছেই গিয়েছিল। [illegible] পাঁচেক আগের সেই সাক্ষাৎকারের স্মৃতি [illegible] জ্বলজ্বল করছে রমেশের মনে।

রমেশের বক্তব্য অর্ধেকটা শুনেই থামিয়ে দিয়েছিল মীরা। হালকা রকমে হেসে মাথা দুলিয়ে বলেছিল, আমার

খ‍ুজতে বের হয়েছিলেন আপনি? আমি তো বিয়ে করব না, জেঠামণি।

মনে করলে ঐটুকুই উদ্ধত প্রতিবাদ; সে দিন পরে আর যা কিছু বলেছিল মীরা, তার সবই যুক্তিতে তীক্ষ্ণ ও সংকল্পে দৃঢ় হলেও প্রকাশের নম্রতায় কোমল এবং সংযম ও শালীনতায় মধুর।

কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা বেশ জোরেই লেগেছিল রমেশের মনে; সে অপ্রস্তুতের মত বলেছিল, বিয়ে করবে না? সে কি কথা, মা?

ততক্ষণে মীরা নিজের ভুল বুঝে থাকবে; হাসি থামিয়ে সসম্ভ্রমে উত্তর দিয়েছিল সে, কি করে ও সব হবে! আমাদের অবস্থা সবই তো আপনি জানেন।

তোমার বাবার অবস্থার কথা বলছ?

বাবা, মা, দাদা,—কাউকে বাদ দেবার উপায় আছে?

কিন্তু মেয়ের বিয়েই কি বাদ দেবার উপায় আছে মীরা? কোন বাপ-মা'ই বাদ দিতে পারে না।

সেটা হয়তো বাপ-মায়ের মনের কথা। কিন্তু মেয়েরও একটা বিচার-বিবেচনা আছে তো!

উত্তরটা ভালই লেগেছিল রমেশের; সেই জন্যই সহাস্যকণ্ঠে সে বলেছিল, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু মা, তোমার বাবাকে তোমার এই জেঠামণির থেকে অমন আলাদা করে ভাবছ কেন তুমি? দু'জনে মিলে কাজটা আমরা চালিয়ে নিতে পারবই।

তার মানে, মুখ টিপে হেসে মীরা উত্তর দিয়েছিল, বিয়ের খরচ দেবেন আপনি। তা আমি জানি। কিন্তু আমাদের যা সমস্যা তার সমাধান না হয়ে ওতে তা যে আরও বাড়বে, জেঠামণি।

কেন, মা?

তোড়জোড় করে আমাকে যদি এ বাড়ী থেকে আপনি বিদায় করে দেন, তারপর এ সংসার চলবে কেমন করে?

তৎক্ষণাৎ কথাটার অর্থ রমেশের বোধগম্য হয় নি, সে বিহ্বলের মত মীরার মুখের দিকে চেয়েছিল।

মীরাই বুঝিয়ে বলেছিল তাকে, বাবার তো কোন রোজগার নেই জেঠামণি,—আমি গেলে এ সংসার যে অচল হয়ে পড়বে।

যুক্তিটি অকাট্য, কিন্তু মন ওতে সায় দেবে কেন? রমেশ প্রতিবাদের সুরে বলেছিল, সেই কথা ভেবে তুমি বিয়ে করতে চাও না, মীরা?

মীরা মৃদু কিন্তু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিয়েছিল, ভাবাভাবির কথা নয় তো, এ যে প্রত্যক্ষ সত্য। দাদা তো মানুষ হল না; বাবার ব্যবসাও গিয়েছে, শরীরও যেতে বসেছে। আমি এখান থেকে গেলেই মাকে আবার চাকরি নিতে হবে। কিন্তু চাকরিতে কি পাবেন তিনি? মানও যাবে, লাজও টিকবে না।

শেষের দিকে মীরার মৃদু স্বর বড়ই যেন করুণ হয়ে বেজেছিল এবং কথা শেষ হবার পরেও সে সুরের রেশ মিলিয়ে যায় নি। ঘরের বাতাসের মতই থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল রমেশের মুখ। সে উত্তর দিতে পারে নি।

একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মীরাই আবার বলেছিল, না, জেঠামণি, আমি বেশ ভেবে দেখেছি বিয়ে করা আমার চলবে না। কিন্তু আমার [illegible] একটা উপকার করবেন আপনি?—বলতে বলতে অদ্ভুত রকমের একটু হাসি ফুটে উঠেছিল মীরার ঠোঁটের কোণে,—বরের বদলে আমাকে কিছু বেশী মাইনের একটা চাকরি যদি আমায় জোগাড় করে দিতে পারেন তো সত্যি-কারের উপকার হয় আমাদের।

সেই মীরা। তার বিয়ে। জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে রমেশের হাতে,—কল্যাণীর নিজের হাতের লেখা চিঠিতে।

মীরার দাদা হয়তো এতদিনে 'মানুষ' হয়েছে। অথবা,—সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা রমেশের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল,—অথবা এ অপরাজেয় জীবনের অদমনীয় জয়যাত্রার শাশ্বত ছন্দেরই আর একটি ঝঙ্কার।

কিন্তু খুশী হল রমেশ। মীরার বিয়ে আগে সে দিতে পারে নি বলে তখন যতটা দুঃখিত সে হয়েছিল, সেই অনুপাতেই আজ বেশী খুশী হল সে এবং আশ্চর্যের কথা, মীরার প্রসঙ্গে নিজের ছেলের অকালমৃত্যুর স্মৃতি অনেক দিন পর আবার তার মনে জেগে ওঠা সত্ত্বেও। এই যে সুখী হবার সুযোগ পেয়েছে মীরা, এ তো স্বল্পায়ু বরের ভার্যা হবার দুর্ভাগ্য থেকে স্বয়ং ভগবান তাঁর দুর্বোধ্য, নির্মম উপায়ে তখন মেয়েটিকে রক্ষা করেছিলেন বলেই সম্ভব হল,—এমনি মনে হল রমেশের।

রান্নাঘরে স্ত্রী জগদ্ধাত্রীর কাছে ছুটে গেল সে। প্রায় চেঁচিয়েই ঘোষণা করলে, ওগো শুনেছ,—মীরার বিয়ে।

মীরা!—কোন্ মীরা? —হঠাৎ মনে করতে না পেরে জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করলে।

মীরা গো, উত্তর দিলে রমেশ, আমাদের মীরা,—ঐ যে অমল বোসের মেয়ে, যার সঙ্গে—

থেমে যেতে হল রমেশকে, জগদ্ধাত্রীর মনে পড়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছে তার মুখের উপর কেমন যেন একটা কালো ছায়া। মৃত পুত্রকে স্মরণ করে মায়ের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

রমেশ একটা ঢোক গিলে বললে, এই দেখ চিঠি।

কিন্তু চিঠি পড়ে জগদ্ধাত্রী বললে, বিয়ের চিঠির এ কি ছিরি! হাতের লেখা, কালো কালিতে। চন্দনের একটা ছিটে পর্যন্ত নেই। আর অমলবাবু লিখেন নি তো!

ত্রুটিগুলি এতক্ষণ রমেশের চোখে পড়ল; কিন্তু লজ্জা করেও তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বললে, তাতে আর কি হয়েছে! আর আমাকে কি ওরা সামাজিক নিমন্ত্রণ করবে? এ চিঠিতে আন্তরিকতা আছে।

যেয়ো তুমি, জগদ্ধাত্রী ছোট্ট করে বললে।

তুমি যাবে না?

আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি মীরাকে,—শরীরটা আমার তেমন ভাল নেই।

রমেশ পীড়াপীড়ি করলে না, কিন্তু তার নিজের সংকল্প আরও দৃঢ় হল।

পরদিন সকালে রমেশ বাড়ী থেকে বের হল অন্য দিনের তুলনায় ঘণ্টাখানিক আগে, আর আপিসে গেল ঘণ্টাখানিক পরে। মাঝের সময়টাতে সে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা একটা টাকা তুলে নিলে। আপিসের পর সে বৌবাজার গিয়ে অনেকগুলি দোকান খুঁজে কিনলে দু'তিন রকমের গয়না, ধর্মতলার এলাকা থেকে কিনলে দামী বেনারসী শাড়ী এবং চৌরঙ্গী থেকে প্রসাধনের টুকিটাকি। সন্ধ্যার আগেই কালিঘাটে বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল সে।
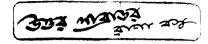
নিঃশব্দে অনন্তের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে,
ধূসর বর্ণালি খিলানাকৃতি
আকাশকে আলিঙ্গন করে,
পড়ে আছে :
বরফাবৃত এক ভূখণ্ড।

কৃষ্ণা সুন্দরী!
তোমাকে আপন করে নেবার জন্যে
কেউ কী এখানে আসেনি?
তোমার উজ্জ্বল বুকের ওপর
ভীরু-লজ্জার ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়ে
কেউ কী চলে যায়নি?
মনের মণি-কোঠায় তোমার কোনো
স্মৃতিই কী নেই?

নিশ্চুপ শৈত্য। শুধু মুহূর্তের পরিবর্তন।
সে যাত্রা কোনো বসন্তের উদ্দেশ্যে নয়।
কোনো জন্ম, কোনো মৃত্যু,
কোনো সময় বা সূর্য নেই
তার উত্তর দিতে॥ *

* Hart Crane-এর North Labrador কবিতার অনুবাদ।

কিন্তু এ কি বিয়ে বাড়ী। দেখে বিস্মিত হল রমেশ। সাধারণ একটা ফ্ল্যাট, সাধারণ দিনে যেমন থাকে তেমনি। না আছে বাজনা, না আলোকসজ্জা, না জনসমারোহ। অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য দোরে একজন লোক পর্যন্ত নেই—কবাট ভিতর থেকে বন্ধ। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়বার পর দরজা খুললে একটি ছেলে। সরকারি সিঁড়ির অস্পষ্ট আলোকে মিনিট খানিক কাল ঠাহর করে দেখবার পর তবে দুজনে দুজনকে চিনতে পারলে,—গতকাল রমেশকে চিঠি দিতে গিয়েছিল এই ছেলেটিই।

ভিতরে ঢোকবার পর তবে কল্যাণীকে দেখা গেল এবং তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রমেশ বললে, এই যে, বৌদি। আমি তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখে এতক্ষণ পর নিশ্চিন্ত হলাম যে আজ এ [illegible] মাসের পয়লা তারিখ নয়।

কল্যাণী হেসে উত্তর দিলে, আপনাকে দেখে আমি স্বস্তি পেলাম আপনার চেয়েও বেশী। কাল চিঠি লিখতে লিখতে ভয় হচ্ছিল, পাছে চিনতে না পারেন।

একটা সরস উত্তর মনে এসেছিল রমেশের, কিন্তু সেটা মুখে বলবার সুযোগ হল না। ততক্ষণে কল্যাণীর পিছনে পিছনে সে একটি ঘরে ঢুকে পড়েছে। নিতান্ত ছোট ঘর, একটিমাত্র জানালা, কোনরকম আসবাব নেই; মেঝেতে চাদর মোড়া সতরঞ্চি পাতা। তারই এক প্রান্তে একজন মাঝ-বয়সী অপরিচিত ভদ্রলোক বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। রমেশের নিজের বয়সী আর এক জনকে সে দেখতে পেলে দোরগোড়ায়।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে রমেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কল্যাণী, ইনি হরিসাধনবাবু, আমার পিসতুত বোনের বর। এরই বাসা এটা।

● সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা—পাহাড়পুরের জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রীরামেশ্বরের কল্যাণময় ইঙ্গিতেই কোনও শুভমুহূর্তে স্ত্রীরোগের এক অলৌকিক ঔষধের বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া জনকল্যাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এই পাহাড়পুর ঔষধালয়।

● তদবধি বহু সাধনা, শ্রম ও অর্থব্যয়ে পাহাড়পুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল প্রাচীন ভারতের লুপ্তপ্রায় ঔষধসমূহ যে সব ঔষধের রোগ-আরোগ্যকারী অমোঘ ও অলৌকিক শক্তি দেখিয়া জনসাধারণ ও দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী অবাক ও স্তব্ধ হইয়া গেলেন। দেশে ঘরে ঘরে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল পাহাড়পুরের কথা।

● ১৯৪৬ সালে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা পাহাড়পুর পরিদর্শন করিয়া ইহার উচ্ছ্বসিত ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক্ষণে বিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর পরিচালনে ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান ও [illegible] আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান।

● ১৯৫৬ সালের মে মাস হইতে পাহাড়পুর [illegible] ডিস্পেন্সারীতে আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ [illegible] মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতির [illegible]।

● বর্তমানে পাহাড়পুর চিকিৎসক ও ডিরেক্টর বোর্ডে রহিয়াছেন—

(১) স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় [illegible] শ্রীঅমিয়বালা দেবী, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, (২) [illegible] হাসপাতালের ভূতপূর্ব চিকিৎসক শ্রীধরণীধর গোস্বামী (৩) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন সাংখ্যতীর্থ, ষড়দর্শনশাস্ত্রী (৪) কেমিষ্ট এণ্ড টেক্নোলজিষ্ট শ্রী[illegible] দাস, বি এস-সি, (৫) ডাঃ অরুণকুমার ঘোষ, এম-বি, ডি-টি-এম, (৬) ডাঃ এস্ চন্দ, এম-বি, বি-এস (সম্প্রতি বিলাতে আছেন)

ইং ১৯৫৫ সালে

বাত, অবশ, পক্ষাঘাত, অর্শ, ভগন্দর, হাঁপানি, যক্ষ্মা, রক্তচাপ (ব্লাডপ্রেসার), শিরোরোগ, উন্মাদ, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, মেহ, প্রমেহ, শুক্ররোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা, চক্ষু-কর্ণরোগ, যকৃৎ ও পাকাশয়ের রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বহুমূত্র, হৃদরোগ, যাবতীয় [illegible], অসাড়, একজিমা, সোরাইসিস প্রভৃতি সর্ববিধ জটিল ও কঠিন রোগে পাহাড়পুরে চিকিৎসাপ্রার্থী রোগীর সংখ্যা এক লক্ষ [illegible] হাজার তিন শত নিরানব্বই। তন্মধ্যে স্ত্রীরোগীর সংখ্যা এক লাখের কাছাকাছি। [illegible]—পাহাড়পুরের হেড অফিস [illegible], কলিকাতা-২৮ থেকে।

ভদ্রলোক অমায়িক হবার চেষ্টা করে রমেশকে বললেন, অনেক সৌভাগ্য আমার যে আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়ীতে পড়ল। বসুন আপনি, আমি এক্ষুণি আসছি। বড্ড জরুরি একটা কাজ রয়েছে—বাইরে একবার না গেলেই নয়।

কল্যাণীও বললে, এঘরেই বসুন, রমেশবাবু; আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলেই অদৃশ্য হবার উপক্রম করেছিল কল্যাণী, কিন্তু রমেশ তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে বললে, চা এখন থাক্। আগে বলুন তো বৌদি,—অমল কৈ? আর মীরা? বিয়ে এবাড়ীতেই হবে নাকি?

রমেশের দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলে কল্যাণী, 'তাড়াতাড়িতে কোন আয়োজনই করা সম্ভব হয়নি রমেশবাবু। হ্যাঁ, বিয়ে এবাড়ীতেই হবে। আপনি বসুন, মীরাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

মীরাই চা নিয়ে এল; দুজনের সামনে দুবাটি চা নাবিয়ে রেখে পরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে রমেশকে।

মীরাকে দেখে আরও বিস্মিত হল রমেশ। পাঁচ বছরে সে মাথায় অনেকটা লম্বা এবং সেই কারণেই গায়ে খানিকটা রোগা হয়ে থাকলেও বেশ চেনা যায় তাকে। কিন্তু আর সবই অপরিচিত, মানে, বিয়ের কনের যে রূপ রমেশ গত রাত থেকে নিজের মনের পটে কল্পনার তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে তার সঙ্গে এ মীরার মোটেই কোন মিল নেই। ঠিক এই অনাড়ম্বর, অসজ্জিত এবং বিবাহবাসর হবার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত বাড়ীটার সঙ্গে আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য রয়েছে তার। মুখ শুকনো, মাথার চুল এলোমেলো, প্রায় নিরাভরণ দেহ, পরনে আটপৌরে শাদা শাড়ী। দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র মেয়েটি ইস্কুল থেকে পাড়িয়ে নয়, রান্নাঘরে কাজ করতে করতে আর একটা কাজের জন্য উঠে এসেছে।

এ কি, মীরা! রমেশ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, আজ না তোমার বিয়ে? আর লগ্ন তো শুনেছি এই ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই। তবু এ কি অবস্থা তোমার?

একটু লাজুক হাসি হেসে মীরা বললে, কেন, কি দুরবস্থা দেখলেন আমার!

বিয়ের কনে তুমি, সাজ কই?

সাজ আবার কি!

শাড়ী, গয়না, মুকুট, চন্দনের—

ধেৎ! বলে মীরা মুখ নত করলে।

রমেশ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেই আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললে, না, মীরা,—একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে কোথাও। [illegible] কি—

বলতে বলতে থেমে গেল রমেশ,—ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে সে সজাগ হয়ে উঠেছে।

[illegible] আন্দাজে বুঝল রমেশের অসুবিধাটা; মীরার [illegible]ও চোখাচোখি হল তার; দুজোড়া চোখেই [illegible] ফুটে উঠল মিষ্টি রকমের [illegible] এক [illegible]; পরক্ষণেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, [illegible] বসুন আপনারা; আমি নীচে যাচ্ছি, [illegible] আসবার সময় হল।

ভদ্রলোক [illegible] হবার পর মীরা [illegible] মুখের [illegible] চেয়ে বললে, সতীশ-

পালিত কন্যা ভগবতীশঙ্কর দে

বাবুকে তাড়ালেন তো ঘর থেকে! ঝাড়গ্রামে যাবার পর উনি আমাদের বাড়ীর লোকের মত হয়েছেন,—কিছু দরকার ছিল না।

কিন্তু রমেশ প্রতিবাদটিকে একেবারেই গ্রাহ্য না করে বললে, তোমার না থাক, আমার আছে।

তারপর মীরার দিকে ঝুঁকে প্রায় তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে একেবারে সুর বদলিয়ে সে আবার বললে, আজকের দিনে তোমার এমন শুকনো মুখ কেন মীরা?

আবার লাল হয়ে উঠল মীরার মুখ; 'কি যে বলেন,' বলতে বলতে চোখ নাবিয়ে নিলে সে, 'সব ভুল দেখছেন আপনি। নিশ্চয়ই আপনার চশমা বদলানো দরকার—

কিন্তু রমেশ একটুও অপ্রস্তুত হল না; আরও উদ্বিগ্ন, আরও সাগ্রহকণ্ঠে সে বললে, আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না, মা। সত্যি বল তো, তোমার বাপ-মা জুলুম করছে না তো তোমার উপর?

জুলুম! মীরা চোখ বড় করে তাকাল,—এবার তার বিস্মিত হবার পালা।

জোর করে বিয়ে দিচ্ছে না তো তোমার?

খিল খিল করে হেসে উঠল মীরা, পরক্ষণেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, না, জেঠামণি, একেবারে না। ছিঃ ছিঃ! কি ভেবে মন খারাপ করছেন আপনি! দিব্যি করে বলছি আপনাকে, আমার অমতে কিছু হচ্ছে না। বরং—

বাধা পড়ল। দোরের ওপাশে দাঁড়িয়ে কল্যাণী বললে, আয় মীরা, এদিকে সময় যে হয়ে এল।

রমেশকে লক্ষ্য করে সে আবার বললে, ওকে ছাড়ুন এখন, আর কিছু না হোক, কাপড়খানা পরতে হবে তো।

বিয়ে সত্যি হবে? রমেশ জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে কল্যাণী নয়, মীরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, শুনছ মা? জেঠামণির বিশ্বাসই হচ্ছে না—শানাই আনান নি যে! উনি ভাবছেন, এ বুঝি ওকে ঠকাবার জন্য আমাদের একটা ষড়যন্ত্র।

কল্যাণীর মুখের দিকে তাকাল রমেশ, কিন্তু সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মীরাও উঠে দাঁড়াল।

কল্যাণী এতক্ষণ পরে বললে, আপনাকে আর একটু চা দেব, রমেশবাবু?

না, রমেশ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল, তারপর টেনে সামনে আনলে উপহারের জিনিষগুলি; বললে, তাহলে, মীরা, এই জিনিষগুলি দেখে নাও মা। তোমার জেঠাইমা আর জেঠামণির আশীর্বাদ।

শাড়ী, সায়া ইত্যাদি, অলংকার, প্রসাধন সামগ্রী—একে একে প্যাকেট খুলে মেলে ধরলে রমেশ। অল্প আলোতেও ঝলমল করে উঠল জিনিষগুলো; উজ্জ্বল হয়ে উঠল মীরার চোখ দুটি, অস্ফুট একটা আওয়াজ বের হল তার বিহ্বল কণ্ঠ থেকে। কল্যাণীও এগিয়ে এল ওগুলির আকর্ষণে।

খুঁৎ যদি থাকে, বৌদি, বললে রমেশ, তবে দোষ বেশীর ভাগ আপনার। যাচাই করে কিনবার সময় হাতে ছিল না,—আপনি বড্ড দেরীতে খবর দিয়েছেন।

কিন্তু কথাগুলি মা বা মেয়ের কানে গেল কিনা সন্দেহ। মীরা ওগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, এত সব জিনিষ আপনি আমার জন্য এনেছেন জেঠামণি। আগে বলেন নি কেন? না, এবার বিয়ের কনে আমাকে সাজতেই হবে।

কল্যাণীকে লক্ষ্য করে সে বললে, ভাগ্যিস আগে সাজিনি, মা। তাই না এ সব ভাল ভাল জিনিষ দিয়ে ভাল করে সাজতে পারব! চল মা, শীগগির চল।

কিন্তু এটা ক্ষণিকের বিদ্যুদ্দীপ্তি।

[illegible] হাত ধরে কল্যাণী ঘর থেকে চলে যেতেই [illegible] আলোর ঝিলিকটুকু নিশ্চিহ্ন হয়েই নিভে [illegible] যেন। আবার সেই অস্বাভাবিক থমথমে [illegible], এটা যে বিয়ে বাড়ী, মনেই হয় না তা। পাশের ঘর থেকে মেয়ে-পুরুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে বটে, কিন্তু শোনা যায় ফিস-ফিসানির মত। বারান্দা দিয়ে দু' একজন লোক আনা-যাওয়া করছে, কিন্তু যেন সন্ত্রস্ত পদে। অনেকক্ষণ রমেশ ঘরের মধ্যে একেবারে একা বসে রইল। নিঃসঙ্গতা দূরে [illegible] পর যে অবস্থার সৃষ্টি হল সেটা আরও অস্বস্তিকর।

মিনিট পনর পর বাড়ীতে একটা সাড়া জাগল। সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মেয়ে ভিতরের দিক থেকে এসে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল; শাঁক বাজল, উলুধ্বনি উঠল। রমেশের চেনা সেই তিনজন পুরুষ অপরিচিত কয়েকজন যুবককে অভ্যর্থনা করে এনে ঘরের মধ্যে বসাল। গত সন্ধ্যার চেনা যুবকটি নবাগতদের একজনের গলায় একগাছা মালা পরিয়ে দিলে। রমেশ তাকিয়ে দেখলে যে তার ললাটে চন্দনের একটি ফোঁটাও রয়েছে। অনুমান করলে সে যে ঐ যুবকই মীরার বর।

হ্যাঁ, অনুমানই করলে রমেশ এবং তা আগাগোড়া নিজের মানসিক চেষ্টায়। [illegible] পরিচিতদের কেউ অপরিচিত নবাগতদের কাউকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না। নবাগতেরা সতরঞ্চির একটা কোণ দখল করে বসে নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে আলাপ শুরু করলে, অর্ধ-পরিচিতেরা অতিথিদের ঘরে বসিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। দু' দলের একজনও রমেশের সঙ্গে একটি কথাও বললে না—কারও যেন চোখেই পড়ল না যে সে ঘরের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।

একেবারে একা থাকা অস্বস্তিকর, কিন্তু কতকগুলি অপরিচিত লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষা একেবারে অসহ্য। অমলের কথা মনে পড়ল রমেশের—এতক্ষণের মধ্যে একটিবার সে এসে তার সঙ্গে দেখাও করেনি। হঠাৎ নিজেকে কেবল উপেক্ষিত নয়, অপমানিত বোধ করলে রমেশ।

নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে,—কেউ যখন তাকে লক্ষ্য করছেই না, সকলের অলক্ষ্যে চলেই যাবে সে।

কিন্তু তখনই নীচে থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছিল রমেশের চেনা সেই ছেলেটি, মুখোমুখি হয়ে গেল দুজনে। [illegible] দাঁড়াতে হল রমেশকে; অপ্রস্তুতের মত [illegible] সে বললে, কল্যাণী-বৌদিকে [illegible] দিতে পার?

তার মুখের দিকে চেয়ে [illegible] করে থাকবে ছেলেটি, গিয়ে [illegible] কল্যাণীকে। একটু পরেই কল্যাণী [illegible] অনুতপ্তের মত বললে, [illegible] অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছে আপনার [illegible] উত্তর

মুখখানা হাসবার মত [illegible] কিছু দিলে, অস্বস্তির চেয়েও খারাপ। [illegible] যেন বুঝতেই পারছি নে। অমল [illegible] একটু

কল্যাণী চোখ নাবিয়ে [illegible] ইতস্ততঃ করে তারপর বললে, [illegible] নাই। বিয়ে তো ওখানেই হবে। আর একদম নিরিবিলি আছে জায়গাটা।

ছাদের এক কোণে মামুলী বিছানার চাদরের চাঁদোয়া খাটিয়ে বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত হয়েছে। নীচে মামুলী আসন, অনুষ্ঠানের জিনিসপত্র, বরের টোপর ইত্যাদি একটিমাত্র অল্প শক্তির বিজলীর আলোতে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। রমেশের আধ-চেনা দু'জন লোক ক্ষিপ্র হস্তে আয়োজন সম্পূর্ণ করছিল।

মণ্ডপের কাছে একটিবার দাঁড়িয়েই কল্যাণী ছাদের অপর প্রান্তে চলে গেল। আলিসায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রমেশকে সে বললে, নিমন্ত্রণ করে এনে আপনাকে আমরা খুব কষ্ট দিলাম, রমেশবাবু।

রমেশ উত্তরে বললে, আমার কথা থাক্। কিন্তু আপনাদের এ কি ব্যাপার, বৌদি? বাজনাই না হয় উঠে যাচ্ছে আজকাল। কিন্তু আলো নেই, লোকজন নেই, উৎসব বলে মোটে মনেই হয় না—এ কেমন বিয়ে?

সুখের বিয়ে তো নয়, মৃদুস্বরে উত্তর দিলে কল্যাণী।

সে কি কথা!

মানে, আমাদের সুখের জন্য তো নয়, মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ, ইচ্ছায় ইচ্ছা। আমরা অনুষ্ঠান পালন করছি মাত্র।

এ যে হেঁয়ালির মত কথা হল, বৌদি।

হবে না? আমাদের মেয়ে তো চিরদিনই হেঁয়ালি। আপনার অজানা আছে নাকি কিছু?

অন্ততঃ শেষেরটুকু তো অজানা নিশ্চয়ই রয়েছে।

মেয়েকে জিগেস করলেন না কেন?

সময় পেলাম কোথায়? আপনিই তো সাজাবার জন্য টেনে নিয়ে গেলেন তাকে।

বেশ একটু দেরী করে উত্তর দিলে কল্যাণী, আমিই যে সব কথা জানি তা আপনি মনে করছেন কেন?

এবার একটু হাসি ফুটে উঠল রমেশের ঠোঁটে, বললে, অমল আপনাকে না জানিয়েই সব ঠিক করেছে নাকি?

উনি নন, মেয়ে নিজেই।

তার মানে?

মানে আর কি? মীরা নিজেই তার বরকে পছন্দ করেছে, আর পছন্দ করবার সময় যেমন আমাদের জানাবার দরকার মনে করেনি, তেমনি বিয়ে করবার সময়েও নয়।

বিয়ে!

হ্যাঁ, রেজেষ্টারি বিয়ে ওদের হয়ে গিয়েছে। আমরা জেনেছি সেদিন ওরা বিদায় নিতে আসে।

ও, বলে গম্ভীর হয়ে গেল রমেশ।

[illegible] দুজনেই চুপচাপ। বিবাহ-মণ্ডপের বাতিটি প্রায় টিম টিম করে জ্বলছিল [illegible] এ কোণে ওদের চারিদিকের অন্ধকার যেন [illegible] গাঢ় ও ভারী হয়ে জমতে লাগল।

[illegible] ভঙ্গ করলে কল্যাণীই। আঁচল [illegible] চোখের কোণ দুটি মুছে ফেলে গাঢ় স্বরে [illegible] বললে, হতভাগী মেয়ে মুখে চুণকালি [illegible] দিয়েছে আমাদের।

তা কেন, রমেশ প্রতিবাদ করলে; এ [illegible] আবার বাড়াবাড়ি করছেন। আমাদের [illegible] আর নেই! তা ছাড়া, মীরার মত [illegible] মেয়ের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক।

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ছেলেটি? এতদিনে সে সব খবর নিশ্চয়ই জেনেছেন আপনারা।

জেনেছি বলেই তো এত দুঃখ আমাদের, আর—আর এত লজ্জা।

সে কি! রমেশ চমকে উঠল, মীরার মত মেয়ে অপাত্রকে বরণ করবে!

আমাদের কাছে অপাত্রই, উত্তর দিলে কল্যাণী, অসবর্ণেরও একটা সীমা আছে। মীরা তাকেও ছাড়িয়ে নীচে নেবেছে।

রমেশ একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, এই মাত্র! তা এও তো এ যুগের ধর্ম, বৌদি। এর জন্য এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন আপনারা।

আত্মীয়-স্বজনেরা যে শুনছে সে-ই ছি ছি করছে যে! দেখছেন না, বিয়েতে কেউ আসেনি!

এখানে এসে অবধি যা রমেশের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল তা এবার সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা হয়ে গেল তার মনের ভিতরটা। সে হেসে বললে, আমাকে আত্মীয় বলে মেনে নিলেই তো সব গোল চুকে যায়, বৌদি,—আমি একাই একশো। একটু আগেই রাগ করে চলে যাব মনে করেছিলাম। এখন আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, রাত জাগা এবং রাতে খাওয়া আমার ধাতে না সইলেও [illegible] আমি বিয়ের শেষ পর্যন্ত থেকে ভরপেট খেয়ে তবে যাব।

কল্যাণী একটু সান্ত্বনা পেলে যেন, বললে, বোকা মেয়েটাকে আশীর্বাদ করবেন রমেশবাবু।

নিশ্চয় করব, উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে রমেশ, আমার নৈতিক অধিকার আপনারা স্বীকার করলে আমিই ওকে সম্প্রদান—বলেই থেমে গেল রমেশ; একবার ঢোক গিলে কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে কণ্ঠস্বরে অনেকখানি আগ্রহ [illegible] কতকটা উদ্বেগ মিশিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু অমল,—অমল কোথায়, বৌদি।

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলে কল্যাণী, সেই দুঃখের কথাই তো বলছি আপনাকে, তিনিও আসেননি।

সে কি! কেন!

বললাম তো!

মেয়ে জাত মানেনি, তাই!

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

গান

[illegible] মুখোপাধ্যায়

ক্লান্তি যখন বারে বারে
জীবন তারে আঘাত করে
তখন হে নাথ নূতন গানে
নূতন সুরে বেঁধে তারে॥

নিরাশার এ আঁধার পথে
চলতে নারি কোন মতে
অশ্রুভারে মগ্ন হৃদয়
পিছলে পড়ে শ্রান্তিভরে॥

ছিল যারা সুখের সাথী
চলে গেল সবে
একলা চলার যাত্রা আমার
ফুরাবে গো কবে

পথ যে আজি কাঁটায় ভরা
নাইক ছায়া দুঃখ-হরা
তুমি আছ রাজার রাজা পার
করে দাও মোরে॥

✻ উত্তরণ ✻

• বটকৃষ্ণ দাস •

ছিন্ন পাপড়ি ক্লান্ত আমার দিন
ঘূর্ণ হাওয়ায় কাঁপে বৈশাখী মেঘে,
অনিবারণীয় চিন্তায় উড্ডীন
রাত্রি আমার স্পন্দিত উদ্বেগে।
অপহৃত সুখ, শান্তিও অপগত—
রুক্ষজীবন রুদ্রাক্ষের মালা,
বিনিদ্র নদী বালুচরে বিব্রত,
তপ্ত তামায় দিক-দিগন্ত জ্বালা।
সারাদিনমান নিষ্ঠুর দাবদাহে
ঊর্ধ্বনেত্র তপস্বী খোঁজে, নারি,
তোমার রূপের অনন্ত শীতল ছায়ে
নবমেঘমায়া দিগন্ত-সঞ্চারী।
তুমি ছাড়া নেই জীবনের সম্পত্তি,
ব্যর্থ পুরুষ পরমা প্রকৃতি ছাড়া,
জীবনের রূপ দ্বৈতের সংহতি,
যুগল প্রাণের মিলনে একটি ধারা।
চারিদিকে ধূ-ধূ গৈরিক মরুভূমি,—
রূঢ়-রৌদ্রের নিপীড়ন দুঃসহ,
মেঘের মাদলে আনো ঘন-মৌসুমি,
পশ্চাদপটে আঁকো শ্যামসমারোহ।
মেঘরৌদ্রের হরপার্বতীরূপে
এ-জীবন হোক শিল্পের উপাদান,
জড়বুদ্ধির অচল অন্ধকূপে
আনো জীবনের সিন্ধুর কলতান।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তা তো আছেই। তা' ছাড়া পিতৃত্বের অহংকারেও আঘাত লেগেছে হয় তো। আর—আর কি?

রোজগেরে মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেলে দুঃখ আর রাগ হয় না!—তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে কল্যাণী।

কথার ঝাঁজটা এত বেশী অনুভব করলে রমেশ যে, ইচ্ছা থাকলেও সায় দিলে না সে। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ এটা, নিজে সে তৃতীয় পক্ষ। চুপ করেই রইল রমেশ।

কিন্তু ক্ষণকাল পর কল্যাণী নিজেই একেবারে অন্য সুরে আবার বললে, কিন্তু আমি তো ওঁদের মত পারলাম না, রমেশবাবু। মীরার উপর রাগ করতে গেলেই আমার চোখে জল [illegible] যে!

[illegible] আর মা তো এক নয়, স্নিগ্ধ কণ্ঠে [illegible] দিল রমেশ।

[illegible] কোণ দুটি আঁচল দিয়ে আর [illegible] মুছে ফেলে কল্যাণী বললে, বাপের মত [illegible] এই আনুষ্ঠানিক বিয়ে—ছেলে [illegible] নয়। কিন্তু শালগ্রাম সাক্ষী রেখে, [illegible] অনুসরণে মন্ত্র পড়ে, পাঁচজনের [illegible] মীরার পাণি গ্রহণ করেনি তারই [illegible] আমি যেতে দিতে পারলাম না। [illegible] প্রয়োজন আজ আপনি দেখছেন তার [illegible] করেছি।

[illegible] এখন বেশ হয়েছে, বললে [illegible] কষ্ট আপনার করতে হত না, [illegible] আগে জানাতেন। ভুলেই [illegible] যে মীরার বিয়ের সকল দায়িত্ব ওর জন্মের দিনেই আমি নিজে স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম।

ভুলিনি, রমেশবাবু, কল্যাণী ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, সব, সমস্ত ইতিহাসই মনে আছে আমার,—বড়াই করে আপনাকে অপমান করেছিল যে মেয়ে, তারই এই কান্ড! কোন্ মুখে আবার আপনার কাছে যাব!

রমেশ হেসে বললে, ভাগ্যিস শেষ পর্যন্ত এ ভাব আপনার মনে থাকেনি!

হাসির কথা নয়। সত্যি মেয়ে আমার কাউকে খবর দেবার মুখ রাখেনি।

মীরা নয়, বৌদি। আপনার মুখ বন্ধ করেছে আপনার নিজেরই সংস্কার। কিন্তু থাক এ কথা, বললে রমেশ, আসল কথা বলুন তো এবার,—ছেলেটির জন্ম যা-ই হোক, কর্ম কি?

কল্যাণী মৃদুস্বরে উত্তর দিলে, ওরই মত মাষ্টারী করে শুনেছি।

চমৎকার! আবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে রমেশ, এ তো রাজযোটক, বৌদি। মেয়েটাকে আর একবার ডাকুন তো—ওর পিঠ চাপড়ে দেব আমি।

ভগবানের দয়া

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

"কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করে যদি আবার ছেলেপিলে হয়ে যায় তাহলেই তো মুশকিল, যদিও অবশ্য আগে জনকয়েক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, আমার ছেলে-পিলে হবে না। কিন্তু যদি হ'য়ে যায়—"

"তাহলে এক কাজ করুন। আসুন আপনার ভাসেক্টমি করে দি"

"সে আবার কি।"

"সামান্য একটা অপারেশন। ওটা করে দিলে ছেলেপিলে হওয়ার ভয় আর একদম থাকবে না। আর ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, চামেলীর কানে যেন না যায়—" শুনলে হয়তো সেই আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না।"

"না, না আমি কাউকেই বলব না। বেশী সিরিয়াস অপারেশন নয় তো?" "আরে না, না সে কিছুই নয়। চামেলী কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?"

"না তাকে জিগ্যেস করা হয়নি এখনও।"

"জিগ্যেস করুন। যদি রাজি হয় খুব ভালো হবে আপনার পক্ষে। আপনার স্ত্রী যে এত বুদ্ধিমতী তা জানতাম না।"

"ওর দেহটাই মোটা, বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। এতদিন দেখছি তো—"

ভুতিবালাই কথাটা চামেলীর কাছে পাড়িলেন। সে 'হাঁ বা 'না' কিছুই বলিল না, ঘাড় হেট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। ভুতিবালা এবং দীননাথ উভয়েই বুঝিলেন সম্মতি আছে। দিনকয়েক পরে সুধাংশু তাঁহার অপারেশনটুকুও করিয়া দিল। দীননাথ বাড়িতে রটাইলেন যে, কুঁচকির কাছে একটা ফোড়া হইয়াছিল সুধাংশু ডাক্তার সেটা অপারেশন করিয়া দিয়াছে। দিন সাতেক শুইয়া রহিলেন, তাহার পর সব ঠিক হইয়া গেল। তাহার পর পাঁজি দেখা হইল, মাস-খানেক পরে বিবাহের শুভ দিনও একটা পাওয়া গেল। কিন্তু গোল বাঁধিয়া গেল হঠাৎ একটা। হিন্দু কোড বিল পাশ হইয়া গেল। আইন হইল এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলিবে না। করিতে হইলে আদালতের সহায়তা লইয়া প্রথম বিবাহ বন্ধনটি বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। দীননাথ ইহাতে রাজি হইলেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার সংগত কারণ অবশ্য দীননাথের ছিল, আদালতে হয়তো তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। বরং এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, ভুতিবালা ও সুধাংশু যেন জোর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চামেলীকে চাপাইবার চেষ্টায় ছিল, আইনটা পাশ হওয়াতে তিনি রক্ষা পাইলেন। বলিলেন, সবই ভগবানের দয়া।

৪

মাস ছয়েক পরে ভুতিবালা স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিবাহের বাধা অপসারিত হইল, তবু কিন্তু দীননাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মাস দুই কাটিল। তারপর হঠাৎ চামেলী একদিন তাঁহাকে বলিল, "এবার বিয়েটা হয়ে যাক, আর দেরি করা উচিত নয়।"

"কেন"—বিস্মিত দীননাথ প্রশ্ন করিলেন।

উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া গেল। চামেলী সন্তান-সম্ভবা!

ছুটিয়া চলিয়া গেলেন তিনি সুধাংশু ডাক্তারের কাছে। সমস্ত শুনিয়া সুধাংশু ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, "তাহলে সম্ভবতঃ আমি অপারেশনটা ঠিক করে' করতে পারি নি।"

"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হলপ করে' বলছি—"

"চুপ করুন। ভাবতে দিন আমাকে।"

দীননাথ থামিয়া গেলেন। সুধাংশু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম হইয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে দীননাথ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন "আর একটা বিপদও হয়েছে।"

আবার কি।"

"রাধিকারমণও কাজ থেকে সরেছে।"

সুধাংশুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"এখন কি করি বলুন।"

"বিয়েই করে' ফেলুন চামেলীকে। ও ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

বিবাহ হইয়া গেল। যথা সময়ে চামেলী একটি কুচকুচে কালো পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সুধাংশু তাহার নাম রাখিয়া দিল—কোকিল-কুমার।

৫

আরো পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

চামেলীরও মৃত্যু হইয়াছে। সুধাংশু ডাক্তারও একটা বড় চাকরী পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। দীননাথের বয়স প্রায় পঁচানব্বই। কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে, চোখে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কোকিলকুমার এখন পঁচিশ বৎসরের যুবক। সে লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিল, এখন ভালো চাকরি করিতেছে। সেই এখন স্থবির দীননাথের একমাত্র অবলম্বন। দীননাথ ভাবেন, সবই ভগবানের দয়া।

মায়ের

পূজা ও অর্চনায়

●

দেশের তৈরী
মোহিনী মিলের
ধুতি-শাড়ী প'রেই
বেশী তৃপ্তি পাওয়া
যায়

●

মোহিনী

মিলস লিঃ

●

রেজিঃ অফিস :

২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

●

ম্যানেজিং এজেণ্টস :

চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং

●

১নং মিল :

কুষ্টিয়া (পূর্ব পাকিস্তান)

●

২নং মিল :

বেলঘরিয়া (ভারত)

শুধু দেখাতেই নয়
কাজেও সুন্দর !

নূতন
গল্ফ-১
ক্যামেরা
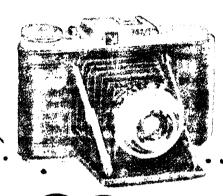
নিখুঁত ছবি তোলা কত সহজ তার বিস্ময়কর প্রমাণ পাবেন এই ক্যামেরাতে। মূল্য কম—অথচ দামী ক্যামেরার মতই সমস্ত গুণাবলী। ২¼"×২¼" সাইজের ১২খানা ছবি তোলা যায়। বিখ্যাত ষ্টাইন্‌হিল কোটেড এবং 'কলার করেক্‌টেড 'ক্যাসার' লেন্স (f/4.5); প্রণ্টো সাটার

মূল্য মাত্র ১৩৬৲

সেরা ফিল্ম "এডক্স"—সমস্ত চলতি সাইজে পাওয়া যায়।

যে কোন সম্ভ্রান্ত ফটো ডিলারের দোকানে দেখুন

এল, সি, শেঠ এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১৩, মাদ্রাজ-২
'এডক্স' ক্যামেরা, ফিল্ম, পেপার এবং
এক্স-রে ফিল্মের পরিবেশক।

'এডক্স' ক্যামেরা আরও বিভিন্ন মডেলে পাওয়া যায়
আপনার ফটো-ডিলারের নিকট দেখুন।

● ভারতের "এডক্স" ফিল্মের দাম বাড়ান হয় নাই—এখনও পূর্বের দামে পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত চলতি সাইজে ভারতের সর্বত্র ফটো-ডিলার নিকট পাওয়া যায়।

ডঃ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
এম বি • বিএস (কলিঙ্গ) এম ডি (জার্মানী) যোগীরাজ (ঋষিকেশ)

পশ্চিম জার্মাণীতে ৬ বৎসর বয়স হইলেই বিদ্যালয় যাইতে হইবে—সকলকেই—তা সে রাজার ছেলেই হউক বা চাষার ছেলেই হউক।

৬—১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও পয়সা-কড়ি লাগে না। এমন কি, বই, খাতা, পেন্সিল, রবার পর্যন্ত সব বিনা পয়সায়। এ নিয়মের কেউ ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না; করিলেই শাস্তি পাইতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ৪ বৎসর বয়স হইতেই বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে মনস্তত্ত্ববিদগণের মতানুযায়ী ৬ বৎসর ধার্য করা হয়।

'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম 'ফোলক্‌শুলে।' ইহার দুইটি অংশঃ—

(ক) প্রথম চারি বৎসর 'গ্রুন্ডশ্টুফে' বা প্রথম ভিত্তির ধাপ।

(খ) দ্বিতীয় চারি বৎসর 'ওবার শ্টুফে' বা উচ্চ ধাপ।

প্রথম ভিত্তির ধাপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়ঃ—

ধর্ম, জার্মাণ ভাষা, দেশীয় ও স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ব্যায়াম, গান ও ড্রইং। মেয়েদের শেষের ২ বৎসর সেলাই বোনা। এখানে বৎসরান্তে পরীক্ষা হয় না। ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীই ছাত্রকে ক্লাসে উঠাইয়া দেন। যদি কোনও ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশুনায় কাঁচা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ১ বৎসর আটকানো হয় ও 'সাহায্য বিদ্যালয়ে' (হিলফ্‌স্‌শুলে) পাঠাইয়া মানের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। মানসিক রোগগ্রস্ত বা বুদ্ধির অভাববিশিষ্ট ছাত্রদের 'জন্ডারশুলে' পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

জার্মাণদের, জীবনের ১০ বৎসর বয়স হইতেই কাহাকে কোন্ লাইনে যাইতে হইবে তাহা স্থির করিয়া লইতে হয়।

১। শতকরা ৮১ জন যান বিভিন্ন ব্যবসায় বা কল-কারখানায়। তাঁরা ভবিষ্যতে হন চাষা, ধোপা, নাপিত, রুটিওয়ালা, কলের মজুর ইত্যাদি। এঁরা যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ-ধাপে (ওবারশ্টুফে)।

২। শতকরা ৫ জন হন কেরাণী, ম্যানেজার, কোনও বিভাগের পরিচালক, কোম্পানীর [illegible] ইত্যাদি। এঁরা যান 'মধ্যবিদ্যালয়ে' (মিটেলশুলে)।

৩। বাকি শতকরা ৯ জন হন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, জজ, দার্শনিক ইত্যাদি। এঁরা যান 'উচ্চ-বিদ্যালয়ে' (হোহেরেশুলে)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চধাপ (ওবারশ্টুফে)

৮১% জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চার বৎসরের 'ভিত্তি-ধাপ' হইতে উচ্চ-ধাপে। তার জন্য কোনও পরীক্ষা হয় না। তারপরে মুহুর্মুহু পরীক্ষা হয় না। ক্লাসেতেই এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এঁরা হন ভবিষ্যতে কারিগর, ধোপা, মুচি প্রভৃতি।

এই সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কেন এত বেশী সংখ্যক লোক এই লাইনে যান? ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হন না কেন? তখন একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ওদের দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও আমাদের দেশের বিদ্যার মধ্যে তফাৎ আছে। একটি কথা মনে করে দেখুন ত— আমাদের দেশে চাষা, ধোপা, মুচি, ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশী? আমাদের প্রতিটি চাষা, ধোপা, নাপিত, আলুওয়ালা, মাছওয়ালা যদি বিদ্যালয়ে যাইত, তাহা হইলে আমাদের দেশেও অনুরূপ হইত।

তাঁহারা 'উচ্চধাপে' ৪ বৎসর অধ্যয়ন করেন। এখানে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা জার্মাণ ও পৃথিবীর ইতিহাস, প্রকৃতি তত্ত্ব, কোনও একটি বিষয়ে হাতের কাজ ও একটি বিদেশী ভাষা—ইংরাজী বা ফরাসী বা স্প্যানিশ ইত্যাদি শেখান হয়।

এই ৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ জীবনের ১৪ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া 'পেশাদারী বিদ্যালয়ে' যাইতে হয়। প্রতিটি জার্মাণ নর এবং নারীকে জীবনের ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় যাইতে হয়। ইহা অবশ্যকরণীয়।

'পেশাদারী বিদ্যালয়' (বেরুফ্‌সশুলে) জার্মাণীর এক অভিনব কীর্তি। যেমন, যিনি নাপিত হইবেন তাঁহাকে এই বিদ্যালয়ে ৩।৪ বৎসর ধরিয়া চুলকাটা শিখিতে হইবে। যিনি রুটিওয়ালা হইবেন, তাঁহাকে ঐ সময় ধরিয়া রুটি প্রস্তুত প্রণালী—কোন্ আটা ভাল, কত ডিগ্রী উত্তাপে রুটি প্রস্তুত হয়, কিসে রুটি তৈয়ারীর উন্নতি করা যায়— ইত্যাদি শিখিতে হইবে।

পেশাদারী বিদ্যালয় সারাদিন ধরিয়াও হয় অথবা অল্প সময়ের জন্য (part time) হয়। যদিও কাহারও সংসারের অবস্থা অচল হয়, তাঁহাকে কোথাও চাকরী করিতেই হইবে। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য ও জীবনের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত 'পেশাদারী বিদ্যালয়ে' যাইতেই হইবে। এই সময় দেখা যায় অনেকে ২।৩টা জিনিস শিখিয়া ফেলেন। যথা তিনি হয়ত একটি কারখানায় মোটর মেরামতের কাজ করিয়া সংসার চালান। কিন্তু অন্য সময় 'পেশাদারী বিদ্যালয়ে' কাপড় কাচা শিক্ষা করেন। সেইজন্য, দেখা যায় জার্মাণীতে লোকেরা নিজেদের ব্যবসাটা খুব ভাল করিয়াই জানেন।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'ভিত্তি ধাপ' হইতে ১৯% জন সরিয়া আসেন। একদল ৫% যান 'মধ্য বিদ্যালয়ে।' এঁদের জীবনে খুব উচ্চ কামনা নাই। এঁরা হয় কেরাণী হন, নয় ম্যানেজার হন বা হোটেল পরিচালক হন।

এই 'মধ্য বিদ্যালয়ে' পাঠ ৬ বৎসরের। তারপর স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এঁদের পড়িতে হয়।

ধর্ম, জার্মাণভাষা, সামাজিক ব্যবহার ও সমাজ গঠন, ইতিহাস, ভূগোল ২টি আধুনিক ভাষা (ইংরাজী হউক বা ফরাসী হউক বা ইতালীয়ান হউক), অঙ্ক, প্রকৃতিতত্ত্ব, অঙ্কন, কোনও হাতের কাজ, বাগানের কাজ, গান-বাজনা, ব্যায়াম, শর্টহ্যান্ড ইত্যাদি। মেয়েদের সেলাই-এ সামান্য বেতন দিতে হয়।

(৩) বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা—যাঁহারা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা দার্শনিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তি ধাপ হইতেই যান 'উচ্চ বিদ্যালয়ে' (হোহেরেশুলে)। এর আবার তিনটি ভাগ—গ্যমনাজিউম আমাদের আই-এর অনুরূপ; সেখানে কলা বা আর্টস শিক্ষা দেওয়া হয়—ইতিহাস, ভূগোল, প্রাচীন ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি। 'রেয়ালশুলে' বা ওবাররেয়ালশুলেতে শিক্ষা দেওয়া হয় বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি। এখানকার বেতন মিটেলশুলের প্রায় দ্বিগুণ। পাঠের সময় ৯ বৎসর। অর্থাৎ জীবনের ১৯ বৎসর বয়সে যিনি 'উচ্চ বিদ্যালয়ের' শেষ পরীক্ষা দেন—তাঁহাকে 'আবিটুঅর' বলে। আমরা যেমন গ্রাজুয়েট হইলে একটু গর্ব বোধ করি, উঁহারাও তেমনি 'আবিটুঅর' পরীক্ষা পাশ করিলে আনন্দ ও গর্ববোধ করেন। 'আবিটুঅর' পরীক্ষার মান কিন্তু আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের সমান।

তবে জার্মাণীতে নামের পিছনে ডিগ্রী লেখার নিয়ম নাই। কেবল ডক্টরেট পাইলে নামের পূর্বে তাহা লেখেন। যথা এম-ডি না লিখিয়া, লেখেন ডক্টর মেড [illegible] বা পি এইচ ডি না লিখিয়া লেখেন ডক্টর ফিল গোয়েবল্‌স ইত্যাদি।

এই আবিটুঅর পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক হয়। লিখিত পরীক্ষা প্রথমে হয় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে—জার্মাণ ভাষায় রচনা, ২টি বিদেশী ভাষা, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন, সঙ্গীত অঙ্কন। এই পরীক্ষা খুব ভাল হইলে অনেক সময়ে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয় না। মৌখিক পরীক্ষা হেডমাষ্টার মশাই ও এডুকেশানাল অফিসারের সামনে হয়। প্রশ্নগুলি ১০ মিনিট পূর্বে দিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ন্যায় ওখানে নম্বর দেওয়া হয় না। ১০০-র মধ্যে একজন ৭১ পাইল ও অপরজন ৬৯ পাইয়া মন খারাপ করিয়া বাড়ীতে যাইয়া শুইয়া রহিল, তা ওদেশে হয় না। হেড মাষ্টার মশাই ও এডুকেশানাল অফিসার দুইজনে একমত হইয়া বিবেচনা করিয়া "অত্যন্ত ভাল", "ভাল", "সন্তোষজনক", "যথেষ্ট", "যথেষ্ট নহে" এবং "অনুপযুক্ত" লিখিয়া দেন। —সাধারণতঃ পরীক্ষার ফল সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া দেওয়া হয়।

শিক্ষার প্রণালী

পশ্চিম জার্মাণীর শিক্ষা দিবার প্রণালী তিন রকম।

প্রথম—প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে। অর্থাৎ এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের অত্যন্ত ভয় করে। শিক্ষকও কঠোরভাবে তাহাদের শাসন

নৃপেন মুখোপাধ্যায়

পথের দায়